কবিতা

আমাদের অগণিত গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকাদিগকে

আমাদের শারদীয়ার প্রীতি-নমস্কার
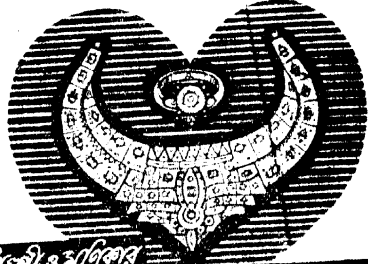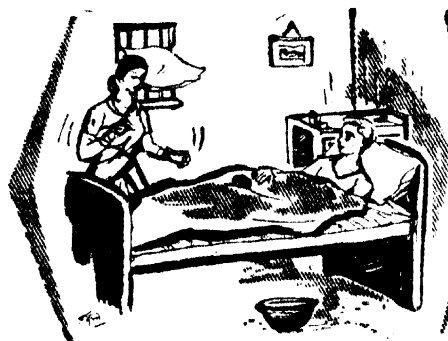
সংক্রামক ব্যাধি !

শতাব্দীর পুঞ্জীভূত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ নিপীড়িত সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে করতো ঘৃণা—স্থান দিত তাকে সমাজের বাহিরে।

* * * *

আর আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সে স্থান পেয়েছে আত্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে, রোগমুক্ত হচ্ছে-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মাধ্যমে।

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীরের নব নব আবিষ্কার চিকিৎসা জগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় সংক্রামক ব্যাধি ছাড়াও ধবল-কুষ্ঠ, একজিমা, সোরাইসিস্ ও নানাপ্রকার কঠিন কঠিন চর্মরোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হচ্ছে।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১ নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট হাওড়া। ফোন—৬৭—২৩৫৯

শাখা—৩৬ নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পার্শে)

L. A. A.

Cooch Behar

সূচীপত্র

ATUL
अ
अतुल
ATUL

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী

শারদীয়া **দেশ** পত্রিকা

॥ ১৩৬৭ ॥

॥ মাতৃপূজা ॥

বাঙালীর ঘরে মা আসিয়াছেন। অগ্নিবর্ণা আমাদের জননী। সন্তানের বেদনার জ্বালামালার মেখলায় তিনি রক্তপিঙ্গলা। মায়ের পদভরে পৃথিবী কাঁপিতেছে। তাঁহার প্রতি অঙ্গ হইতে অত্যুগ্র করাল বহ্নিশিখা দিগন্তে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিতেছে। মায়ের মুখে অট্ট অট্ট হাস। ভীমা ভৈরবীরূপে বিশ্বনাশে তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রলয়ের আভাস। মায়ের এ রূপ দেখিয়া অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। মা, মা বলিয়া চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিলাম। ভিতরে এ কি আলোড়ন! অন্ধকার গর্ভ হইতে অসুর দলের জাগরণ উপলব্ধি করিলাম—কি হিংস্র, কি ভীষণ! আকুল কণ্ঠে আবার ডাকিলাম—এসো মা এসো নাশিনী, শ্মশানী ঘোরা, এসো গর্জিনী চামুণ্ডী, এসো দুর্গে দনুজদলনী, তোমার মাতৃ-মাধুর্যের প্রচণ্ড প্রভাবে তুমি নাচো মা। তোমার সেই তাণ্ডবের উদ্দণ্ড রঙ্গে অগ্নিময় তরঙ্গ চারিদিকে বিচ্ছুরিত হোক্। চূর্ণ হোক্ স্বার্থ, সাধ, মান, আমাদের সকল অবীর্য ভস্মীভূত হোক্। অতি সৌম্যা তুমি, তোমার এই রুদ্রলীলায় পশুজীবনের দৈন্য এবং দুর্বলতা হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর মা। আমাদের বাহুতে শক্তি দাও, অন্তরে দাও ভক্তি। আমরা তোমার পূজা করিব।

॥ পত্রাবলী ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

শ্রীমতী নির্মলকুমারী দেবী
C/o P. Mahalanobis Esq
Observatory
Alipur
Calcutta

VISVA BHARATI
SANTINIKETAN
Bengal

ওঁ ॥ এক ॥

কল্যাণীয়াসু,

বোধ হয় তোমার মনে আছে একজন দরিদ্র জার্মান তার স্ট্যাম্পের খাতা আমাকে পাঠিয়েছিল। তার অনুরোধ ছিল তার পরিবর্তে তাকে ভারতের ডাকটিকিট উপযুক্ত পরিমাণে পাঠাতে। সেই চিঠি সুদ্ধ টিকিটের খাতা তুমি নিয়েছিলে। তোমার সঙ্কল্প ছিল কাবুলকে এইগুলি দিয়ে তার পরিবর্তে তার কাছে থেকে অন্য টিকিট জোগাড় করে যথাস্থানে পাঠাবে। আমার কেমন মনে হচ্ছে তোমরা এ বেচারার কথা ভুলে গেছ। মাঝে মাঝে আমার নিজের মনে হয়েছিল এবং উৎকণ্ঠাও অনুভব করেছি। কিন্তু ইতিমধ্যে তোমরা গরঠিকানা অবস্থায় নানাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে বলে তোমাকে লিখতে পারিনি। এতদিনে নিশ্চয় তোমাদের আলিপুর পর্যবেক্ষণীতে আবার ঘরকন্না গুছিয়ে বসেছ। অতএব এখন যদি সেই জার্মান ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা কর তাহলে আমার মনটা ভারমুক্ত হয়।

কিছুদিন থেকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়াতে গান লেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারচিনে। গান বন্ধ হলে পরে কাজে মন দিতে পারব। তোমাদের কোনো খবর অনেকদিন পাইনি। ইতি তারিখ জানিনে।

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রাবলী শান্তিনিকেতন থেকে লেখা। কবিকে জানিয়েছিলাম যে তাঁর চিঠি পাবার আগেই আমি জার্মান ভদ্রলোকের কাছে টিকিট পাঠিয়েছি, কাজেই ওঁর উৎকণ্ঠার কোনো কারণ নেই।

১৯২৪ সালে জানুয়ারী মাসে সায়না কংগ্রেসে গিয়েছিলাম আমার স্বামীর সঙ্গে। ফিরে এসে এই চিঠি পাই। মাদ্রাজে চলে গিয়েছিলাম বলে "গরঠিকানা" হয়ে ঘুরে বেড়াবার উল্লেখ করেছেন।

ওঁ ॥ দুই ॥

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, তোমার নামাঙ্কিত একখানি শূন্যগর্ভ পত্রাবরণী নিয়ে আমার দপ্তরের মধ্যে আবিষ্কার করলুম। তোমার চিঠি তোমাকে ফিরিয়ে দেবার ঔৎসুক্যবশত এই চিঠি লিখছি। অমনি সেই উপলক্ষ্যে একটা কাজের কথা বলে নিই।

মণ্টুর সঙ্গে কথোপকথন সূত্রে সংগীত সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি অন্য কোনো আকারে তা সম্ভবপর হত না। প্রকাশের প্রত্যেক প্রণালীরই একটি বিশেষত্ব আছে—তার দ্বারা বিশেষ ফললাভ করা যায়। অতএব মণ্টুকে বোলো এই তর্কটিকে তার স্বকীয়রূপেই প্রকাশ করে যেন। কিন্তু সাপ্তাহিকে নৈব নৈবচ। এবং একবার যেন আমার কাছে প্রুফ আসে। বলাবাহুল্য আমি কেবল নিজের কথিত অংশেরই দায়িত্ব নেব।

আমার দ্বারবাতায়নহীন ঘরের মধ্যে বসে বসে আমি মনঃকর্ণে সাহানা রাগিণীতে বিয়ের নহবৎ শুনছি। ইতি ৯ই বৈশাখ ১৩৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা ১লা বৈশাখের উৎসবে শান্তিনিকেতনে যাই। কবি তখন দেহলীতে থাকতেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঐ সেই খোলা ছাতেতেই দিন কাটাতেন। গ্রীষ্মের দারুণ গরম হলেও একেবারে জ্বরেও কখনও ঘরের মধ্যে যেতে চাইতেন না। সেই খোলা ছাতের বসেই সারাদিন কাজকর্ম করতেন। এই চিঠিতে যে দ্বারবাতায়নহীন ঘরের উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে এই দেহলী নামে বাড়িটির ছাত।

আমরা কলকাতায় ফিরে আসবার দু-একদিন পরেই ডাঃ কালিদাস নাগের সঙ্গে শ্রীমতী শান্তা চট্টোপাধ্যায়ের বিয়ে হয়। সেই কথা স্মরণ করেই মনঃকর্ণে সাহানা রাগিণীতে বিয়ের নহবৎ শুনছি লেখা।

ওঁ ॥ তিন ॥

কল্যাণীয়াসু,

আর দিন দশ পরেই আমার বয়স ৬০ হতে সত্তরের মাঝখানের স্টেশনে এসে পৌঁছবে। এই অতি দীর্ঘকালের মধ্যে স্বদেশের বা বিদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে একজন লোকও আমাকে বলেনি আমার কাছ থেকে চিঠির জবাব চায় না। আমার জন্মভূমিতে একজন বাঙ্গালী বালিকার এই স্পর্ধা দুঃসহ। অতএব জবাব দেবই, দেবই, দেবই। এবং এই চিঠির জবাব চাইনে, চাইনে, চাইনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চঃ এই জবাবের জন্য শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য নয়। তোমার নিজের অপরিমেয় অহংকারের কাছে কৃতজ্ঞ থেকো।

ওঁ

বর্জ্জনীয়াসু

আর দিন দশ পরেই আমার বয়স ৬০ হতে সত্তরের মাঝখানে এসে পৌঁছবে। এই অতি দীর্ঘকালের মধ্যে স্বদেশের বা বিদেশের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার মধ্যে একজন লোকও আমাকে বলেনি যে আমার কাছ থেকে চিঠির জবাব চায় না। "আমার দীর্ঘজীবনে একজন অভূতপূর্ব ব্যক্তির এই সম্পর্কে দুঃসাহসজনক জবাব দেবই, দেবই, দেবই। এবং এই চিঠির জবাব চাইবে, চাইবে, চাইবে।"

১৬ বৈশাখ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ এই জবাবের জন্য শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য নয়। তোমার নিজের অপরিমেয় অহংকারের কাছে কৃতজ্ঞ থেকো।

এই চিঠি ১৬ই বৈশাখ ১৩৩২ সালে লেখা। কবি বছরটা বসাতে ভুলে গিয়েছিলেন।

প্রতিমা দেবী একখানা খামে আমার নাম লিখেছিলেন কলকাতায় আমার কাছে চিঠি পাঠাবেন বলে। কি জানি কেন সেই খামখানা তিনি ব্যবহার করেননি এবং ঘটনাক্রমে সেটা কবির লিখবার টেবিলের কোণায় আশ্রয় পেয়েছিল এবং সেই শূন্য খামখানিই ওঁর আগের চিঠি আমার কাছে বহন করে আনে। আমি সেই চিঠির জবাবে ওঁকে লিখেছিলাম যে আমাদের বাড়িতে উনি যখন থাকেন তখন আমি দেখেছি ওঁর চিঠি লেখায় কি রকম ক্লান্তি। প্রতিদিন ডাক এলেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন—আঃ আবার এতগুলো চিঠির জবাব লিখতে হবে। আমি এটা জেনে শুনে ওঁর আর বোঝা বাড়াতে ইচ্ছে করিনে। তাই অন্ততঃ আমার চিঠির জবাব ওঁকে দিতে হবে না। এই কারণেই আমি পারতপক্ষে ওঁকে চিঠি লিখি না। আমাকে কাজের ভার দিয়েছেন, সেটা যে করেছি তা না জানালে ব্যস্ত হবেন তাই লিখছি—অন্য কোনো প্রত্যাশায় নয়। অতএব এই চিঠির জবাব আমি চাইনে। ধন্যবাদও দেব না, কারণ সেটা প্রতিমাদিরই প্রাপ্য। তিনি খামের উপরের নামটা লিখেছিলেন বলেই তো আমি চিঠিখানা পেলাম, তাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ আছি।

ওঁ ॥ চার ॥

কল্যাণীয়াসু,

রাণী এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম কিন্তু খুশী হয়েছি কি করে বলব? তোমার জ্বর বেড়েছে শুনে আমার একটুও ভালো লাগছে না। ইচ্ছে করছে কোনো রকম ঝাঁকানি দিয়ে জোর করে তোমার ব্যামোটা ঝাড়িয়ে দিই। এই ব্যামোর বীজ কোন্ মর্মস্থলে আশ্রয় নিয়েছে সেখানে আরোগ্যের কোনো চেষ্টাই নাগাল পাচ্ছে না, এর জন্যে আমার মনের মধ্যে ভারি একটা উদ্বেগ রয়ে গেছে। আজ এইমাত্র নটুদের একটা নতুন গান শেখাচ্ছিলুম কিন্তু তোমার চিঠি পড়ার ব্যথা আমাকে ভিতরে ভিতরে ভারি পীড়ন করছিল, কিছুতে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলুম না। মানুষের মনের একান্ত উৎকণ্ঠার যদি কোনো শক্তি থাকত তাহলে আমার ইচ্ছার জোরে তোমার শরীর সুস্থ হয়ে উঠত। নিশ্চয় আর ওষুধ খেয়ো না।

আমি কতকটা ভালো আছি। কিন্তু বুকের কাছে ক্লান্তির বাসাটা ভাঙেনি। এখানে একটা বড় উৎপাত আছে। কত যে টুরিস্ট এসে আক্রমণ করে তার সংখ্যা নেই। শুনছি আজ এগারো জন মার্কিন অতিথি আসবে। তাছাড়া আজ ইটালীয়ান কন্সালদের আসবার কথা আছে। তাছাড়া আজ আসবে নোটিস দিয়েছে, তাছাড়া আরো অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় এখানে ছুটি যাপন করে যাবে বলে শাসিয়ে রেখেছে।

সেই পাগল কবি বেচারা দিন তিনেক এখানে ছিল। কথায় বার্তায় হঠাৎ তাকে পাগল বলে চেনা যায় না। এমন কি, সে বেশ ভালো করেই আলাপ করতে পারে। আমাকে কাল বলছিল, আমার অবস্থা আপনার চিরকুমার সভার পূর্ণবাবুর মত—আমার এক রসিক দাদা আছেন (অর্থাৎ আমি) তাঁর কাছে এসে মনের সব কথা বলতে চাই কিন্তু কিছুই বলতে পারিনে। লোকটিকে দেখে আমার বড় কষ্ট হয়—একটুখানির জন্যে ওর তার ছিঁড়ে গেছে অথচ হয়ত ওর যন্ত্রটি ভালো করেই গড়া ছিল। ও যেন আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। কাজের ও বিশ্রামের ব্যাঘাত করলেও ওকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না। আমাদের সকলের মধ্যেই একটা পাগল আছে, সে আমাদের সব দেখা ও ভাবার মধ্যে নিজের খেয়ালী রং মিশিয়ে দেয়, আমাদের ছবির মধ্যে নিজের তুলি বুলোয়, আমাদের গানের মধ্যে নিজের সুর লাগিয়ে বসে। ফলের মধ্যে আঁটির কর্তা হচ্ছেন জ্ঞানী, তিনি তাকে পাকা রকমে পাহারা দেন, আর ফলের মধ্যেকার পাগল বসে বসে খামোকা তার খোসার উপর রং মাখায়, যে খোসা ফেলে দিতে হবে, তার শাঁসের মধ্যে রসের সাধনা করে যে শাঁস দুদিনে যাবে নষ্ট হয়ে, তাতে পাগলের খেয়াল নেই। যে পাগলের তুলি রং দিতে গিয়ে খোঁচা দিয়ে বসে, তাকে নিয়েই বিপদ। জীবনের মধ্যে পাগলের খোঁচা সম্পূর্ণ এড়ানো চলে না—এড়াতে পারলে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে দিনে ঘুমিয়ে তাস পাশা খেলে নিরাপদভাবে সংসার যাত্রা করে নাতী নাতনীর মুখ দেখে কোম্পানীর কাগজ জমিয়ে আয়ুটিকে বায়ুর ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে চলা যেতে পারত। সে আর হয়ে উঠল না।

বুধবারে আমি বলিনি—কিন্তু মন খুঁত খুঁত করছিল—ভিতরকার পাগলটা তাড়া দেয়, ঠাণ্ডা থাকতে দেয় না। এখনো মনে হচ্ছে ফাঁক দেওয়াটা ভালো হয়নি। কেন না বুধবার পরের হিতের জন্য নয়, ওটা আমার নিজেরই গরজে। নিজের ভিতরকার কথা শুনতে পাইনে যদি কবিকে শোনাতে না বসি। এই ভিতরকার মানুষটা বাইরের মানুষটার সঙ্গে ঘর করে বটে কিন্তু তেমন চেনা শোনা নেই—সেইজন্যে তাকে চেনবার জন্যেই মাঝে মাঝে তাকে বাইরে আনতে হয়—তাতে করে অন্ততঃ খানিকক্ষণের মতো বাইরের লোকটাকে থামিয়ে রাখা যায়। যাহোক সম্প্রতি এই বাইরের লোকটা তাগিদ দিচ্ছে স্নান করতে যেতে হবে—বেলা অনেক হয়ে গেল। আমার অন্তরের আশীর্বাদ জেনো।

ইতি ১৯শে চৈত্র (ঘোষের ডায়েরী থেকে তারিখ পেয়েছি।) ১৩৩২।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই চিঠিখানা লিখবার বোধহয় দিনদশেক আগে কবি আমাদের আলিপুরের বাড়ি থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। আমার স্বামী তখন কলকাতার আবহাওয়া আপিসের কর্তা, তাই আমাদের সরকারী বাসস্থান ছিল আপিসের উপরতলায়। চমৎকার প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে বাড়িটা, কাজেই কবি কলকাতায় এলে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে না থেকে অনেক সময়েই আমাদের কাছে এসে থাকতেন। সেবার কিছুদিন ধরেই কবির দেহযন্ত্রটা ভালো চলছিল না। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত এবং মাঝে মাঝে একটু হার্টের কষ্ট অনুভব করায় বোধহয় ডাক্তার দেখাতেই কলকাতায় এসেছিলেন; অবশ্য সংগে আরো নানারকম কাজও ছিল। আমারও তখন কিছুদিন ধরে রোজ বিকেলে অল্প জ্বর হচ্ছে। কবির হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স চিরকালই সংগে থাকত এবং কাউকে অসুস্থ দেখলে এত উদ্বিগ্ন হতেন যে ওষুধ না দিয়ে থাকতে পারতেন না। কাজেই আমাকেও ওষুধ দিতে হোলো। প্রথমে পরীক্ষা করবার জন্যে সালফার ৩০ দিলেন। তারপর কয়েকদিন পরে জ্বরের পরিমাণ একটু কমে এলো দেখে ওঁর উৎসাহ বাড়লো চিকিৎসা করবার। এদিকে তখন ওঁর শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার সময় হয়ে এসেছে। যাবার সময় আমাকে সালফার ২০০ দিয়ে বলে গেলেন ওষুধ খেয়ে কেমন থাকি তা যেন ওঁকে নিশ্চয়ই জানাই। উনি চলে যাবার পর একদিন জ্বর ১০৩ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে যায়। সেটা ওষুধের কারণে কি অমনি তা জানিনে। তাই ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আর ওষুধ খাবো কি না।

পরের কষ্টে যে ওঁর মন কিরকম পীড়িত হোতো এই চিঠিখানা তার একটা নিদর্শন। এইখানে আর একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

সেইবার কবির শরীর অসুস্থ বলে আমরা বেশি লোকজন আসাটা বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলাম ডাক্তারের পরামর্শে। একতলার সিঁড়ির কাছে প্লেকার্ড লিখে রেখে দেওয়া হোলো যে ডাক্তার নীলরতন সরকার কবিকে যথাসম্ভব বিশ্রাম নিতে বলেছেন, কাজেই অনুগ্রহ করে সকলে যেন সে কথা মনে রাখেন। একদিন পরেই কবি খবর পেলেন যে আমরা এই রকম করে লোক ঠেকাবার ব্যবস্থা করেছি। সম্ভব কোনো এক ব্যক্তি নিজের স্বার্থ সিদ্ধিটা কবির স্বাস্থ্যের চেয়ে বড় মনে করায় ডাক্তারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই সোজা উপরে চলে আসে এবং যাবার সময় কবিকে জানিয়ে দিয়ে যায় যে আমরা কি ব্যবস্থা করেছি; তা না হলে উনি প্লেকার্টের কথা জানলেন কেমন করে? পরদিন সকাল বেলা দেখা হতেই বল্লেন, দ্যাখো, আমি এত বড় মানুষ নই যে এতদূরের পথ যদি কেউ আসে আমাকে দেখবে বলে তাকে দরওয়াজা বন্ধ বলে দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে দিতে পারি। ঐ সিঁড়ির কাছের লেখা-টেখাগুলো তোমরা সরিয়ে ফ্যালো।" কবির হুকুম পালন করতেই হোলো।

সকালবেলা চা খাওয়া হয়ে গেলে কবি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে কাজে বসতেন। সে সময়টা আমিও সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকায় অনেকক্ষণ কোনো খবর রাখতেম না। তখন "চিরকুমার সভা" বইখানাকে স্টেজের উপযোগী করে লেখা চলছে, কাজেই সারাদিনই প্রায় ওঁকে লিখবার টেবিলের কাছেই দেখা যেত। সেদিনও আমার সংগে ঘরে ফিরে সোজা লেখার খাতা টেনে নিয়ে বসলেন দেখে আমি নিজের কাজে চলে গেলাম। প্রায় ঘন্টা তিনেক পরে ওঁর জন্যে ফলের রস নিয়ে গিয়ে দেখি একটি ছেলে একখানা মোটা খাতা হাতে নিয়ে ওঁর পায়ের কাছে বসে কি যেন পড়ে শোনাচ্ছে, আর উনি অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে গালে হাত দিয়ে আরাম চৌকিটাতে বসে গম্ভীর হয়ে শুনছেন। আমি নিজে অপরিচিত লোকের সামনে না গিয়ে চাকরের হাতে রস পাঠিয়ে দিলাম!

রোজই স্নানের বেলা হয়ে গেলে আমি গিয়ে তাগিদ দিয়ে লেখার টেবিল থেকে ওঠাই; সেদিনও সময় মত গিয়ে দেখি তখনও ছেলেটি বসে আছে। আরো একটু অপেক্ষা করে আবার যখন ফিরে গেলাম দেখি উনি গম্ভীর হয়ে একা বসে, আগন্তুক চলে গেছে। আমি ঘরে ঢুকতেই বলে উঠলেন, "জানো, ও পাগল? বেচারার জন্যে আমার ভারি মন খারাপ হয়ে গেছে। মস্ত একটা কবিতার খাতা নিয়ে এসেছিল আমাকে শোনাবে বলে। এত কাজ হাতে জমে আছে, তবু বলতে পারলুম না যে আমার সময় নেই। ওর সত্যিই লিখবার ক্ষমতা ছিল। ওর যদি মাথা খারাপ না হতো তাহলে একজন উঁচু দরের কবি হতে পারতো। বেচারার কবিতাগুলোর আরম্ভ বেশ পাকা রকমেরই হয়, কিন্তু কয়েক লাইন লিখতে লিখতে সূত্র ছিঁড়ে যায়, আর শেষ করতে পারে না। ও নিজে জানে না যে ও পাগল, তাই ভেবে পায় না যে কেন শেষ পর্যন্ত ওর লেখা পৌঁছয় না। তাই এসেছিল আমার কাছে, যদি আমি কিছু সাহায্য করতে পারি। ওর এরকম ভাগ্য কেন হোলো বলোতো? ও বেচারার জন্যে আজ আমার এত কষ্ট হয়েছে যে সমস্ত সকালটা কাজ ফেলে দিয়ে ওর অনুরোধ রক্ষা করে লেখাগুলো শুনলুম; কিন্তু মনে ব্যথা দিয়ে বলতে পারলুম না যে আমার কাজ আছে, এখন যাও। হতভাগা একটুর জন্যে বীণাপাণির প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমাদের সকলের ভিতরেই তো একটা পাগল আছে। তা না হলে কবিতা লিখি কেমন করে? কিন্তু ওর পাগলামির ডিগ্রীটা একটু বেশী, এই যা তফাৎ।"

সেদিন খেতে বসেও সমস্তক্ষণ এই পাগল ছেলেটির কথাই আলোচনা করলেন। কয়েকবার বল্লেন, "কিছুতেই ওর দুঃখটা ভুলতে পারছি না। ওর সত্যিই লিখবার ক্ষমতা ছিল বলে ওর ব্যর্থতাটা আমাকে এত বেজেছে। ও খুব ভালো কবি হতে পারত।"

সেদিন দুপুর বেলাও কাজে বসলেন না। বিকেলে চায়ের সময় ঘরে গিয়ে দেখি টেবিলে বসে একটা কবিতা লিখছেন। কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন "বোসো, একটু পড়ে শোনাচ্ছি।" তারপরেই শেষ করে শোনালেন—

"তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
কখনো শুনি, কখনো ভুলি
কখনো শুনি না যে।
আকাশ যবে শিহরি উঠে গানে
গোপন কথা কহিতে থাকে ধরার কানে কানে,
তাহার মাঝে সহসা মাতে বিষম কোলাহলে
আমার মনে বাঁধনহারা স্বপন দলে দলে।
হে বীণাপাণি তোমার সভাতলে
আকুল হিয়া উন্মাদিয়া বেসুর হয়ে বাজে।
তোমার বীণা কখনো শুনি কখনো শুনি না যে।
চলিতেছিনু তব কমল বনে
পথের মাঝে ভুলালো পথ উতলা সমীরণে।
তোমার সুর ফাগুন রাতে জাগে
তোমার সুর অশোকশাখে অরুণ রেণু রাগে।
সে সুর বাহি চলিতে চাহি আপন ভোলা মনে
গুঞ্জরিত ছন্দিতপাখা মধুকরের সনে।
কুহেলি কেন জড়ায় আবরণে,
আঁধারে আলো আবিল করে,
আঁখি যে মরে লাজে,
তোমার বীণা কখনো শুনি কখনো শুনি না যে।"

বিকেল বেলাতেই সুর বসিয়ে গানটা আমাকে শেখালেন।

গাইবার সময় বল্লেন "সারাদিন ওর কথা ভুলতে পারছিলুম না বলে মনের মধ্যে গানটা তৈরী হয়ে উঠলো। ও বেচারার কেবলি তার ছিঁড়ে যায়, তাই বীণাপাণির দরবারে ঢুকতে পারলো না।" এই পাগল ছেলেটির কথাই এই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

॥ পাঁচ ॥

কল্যাণীয়াসু,

রাণী কোথাও একটা কোনো অন্যায় উপদ্রব হলে আমার বুকের ভিতর ভারি একটা ক্ষোভ উপস্থিত হয়। এই হিন্দু মুসলমান উৎপাতে আমার শরীরটাকে ভারি পীড়ন করচে। এক এক সময় মনে হয় অবস্থা শোচনীয়তম না হলে অবস্থার পরিবর্তন হয় না। মারের বীজে আমরা ধর্মের নামে জল সেচন করে এসেছি, তারই ফল ফলে যখন মাথায় ভেঙ্গে পড়বে তখনই চিকিৎসার কথা প্রাণপণে স্মরণ করতে হবে। অতএব মারকে পালন করার চেয়ে মারকে খাওয়াই ভালো। এইটি হচ্ছে প্রথম কথা, যেটা সম্প্রতি মাথার ভিতর সর্বদা ঘুরচে, তাই লিখে ফেললুম।

দ্বিতীয় কথাটা হচ্চে, তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে। আমাকে বেশ ভদ্রকম করে চিঠি লিখেছ, তাতে ঝগড়াঝাঁটির কোনো আমেজ নেই—কিন্তু রোজ শতকরা একশ ডিগ্রির হাবে জ্বর করা এটা কি রকম? এক এক সময় মনে হয় কোনো কবিরাজী ভালো টনিক ব্যবহার করে দেখলে কিরকম হয়। কবিরাজ বলতে আমাকে বুঝে নিও না, তাতে আমাকে খাটো করা হবে—বিজ্ঞাপন প্রভৃতিতে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে আমি কবিরাজ নই, আমি কবিসম্রাট।

তৃতীয় কথাটা হচ্চে এই যে, দিলীপ আমাকে একখানি পত্র লিখেছিল আমি তার জবাবও লিখেছিলুম। সেই ডাক এবং ডাকের পেয়াদা একযোগে পঞ্চত্ব পেয়েছে কিনা জানিনে। রামানন্দবাবুকেও সেই জগদীশের পত্রাবলীর একটা ভূমিকা সমেত একটি রেজিস্ট্রী পত্র চালনা করেছিলুম। সেটাও পৌঁছলো কিনা খবর পাইনি।

ক্লান্ত হয়ে আছি, সর্বদাই কেবল ঘুম পায়। লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়ি—বই পড়তে গেলে সেটা যেন ক্লোরোফর্মের কাজ করে। মাঝে মাঝে চৌকিতে পড়ে আধ ঘুম আধ জাগা অবস্থার কুয়াসার ভিতর দিয়ে আমার ঐ মধুমঞ্জরী লতাবিতানের উপরকার আকাশে মেঘ ও রোদ্দের নিরন্তর হাত কাড়াকাড়ি দেখি আর ভাবি—

"ভালোবেসেছিনু এই ধরনীরে
সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে
কত বসন্তে দখিন সমীরে
ভরেছে আমার সাজি।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে
বাঁশরী বেজেছে আজি।"

ইতি ২৫শে চৈত্র ১৩৩২
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চঃ পয়লা বৈশাখে তোমরা আসবে ত? না হিন্দু মুসলমানের প্রেম সম্মিলনের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে?

১৯২৬ সালে কলকাতায় যে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বেধেছিল এ চিঠিতে তারই উল্লেখ রয়েছে। এই দুর্যোগটা যে কবির মনকে কি রকম পীড়ন করেছিল তা এই চিঠিখানা পড়লেই বোঝা যায়। এরকম কোনো কারণ ঘটলে বার বার দেখেছি ও'র সত্যি সত্যিই শরীর খারাপ হয়ে পড়তো, যেমন জালিয়ানওয়ালাবাগের পরে হয়েছিল। এই হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার পরেও হার্টের কষ্ট কিছুদিন ধরে অনুভব করেছিলেন।

আমরা চৈত্র সংক্রান্তির আগে গিয়ে পৌঁছই। তারপর ১লা বৈশাখের উৎসব হয়ে গেলেও আমি অনেকদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম। কবি থাকতেন কোনার্কে আর আমি মীরাদেবীর কাছে মৃন্ময়ীতে। এই মৃন্ময়ী নামে ঘরখানা কোনার্কেরই পাশে খড়ে ছাওয়া ঘর ছিল তখন। বোধ হয় আন্দ্রে কার্পেলে শান্তিনিকেতনে থাকবার সময় এই ঘরখানাতেই থাকতেন। পরে এই বাড়িটাতেই শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী সপরিবারে কিছুদিন থাকেন। তারপরে বাড়িটা ভেঙ্গে ফেলে বোধহয় "শ্যামলী" তৈরী হয় কবির জন্যে। তখন ঐ দিকটাতে "শ্যামলী" "পুনশ্চ" "উদীচি" প্রভৃতি কোনো বাড়িই ছিল না।

কবি কোনার্কের চাতালে বসে সারাদিন গান লিখছেন, মেয়েদের শেখাচ্ছেন—মৃন্ময়ীর পিছনের বারান্ডায় বসে রোজ সে সব গান আমি, মীরাদি, (মীরাদেবী) শ্রীমতী (পরে হাতীসিং অধুনা ঠাকুর) শুনেছি। কখনো দূরের থেকে শুনতাম কখনো বা গানের দলে ঢুকে পড়ে কবির টাটকা তৈরী গানগুলো শিখে নেবার চেষ্টা করতাম। সেইবারই "দিন পরে যায় দিন", "হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী কি পাইনি" "লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি" প্রভৃতি অনেক গান লেখা হয়। আমার এই চিঠিখানার শেষে ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে

সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে,
কত বসন্তে দখিন সমীরে
ভরেছে আমার সাজি।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে
বাঁশরী বেজেছে আজি"

এই কয়টা লাইন লিখেছিলেন। শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখি এইটাই একটা গানে পরিণত হয়েছে যার প্রথম লাইনটা হচ্ছে "হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী কি পাইনি।" আমার চিঠির মধ্যে ছিল "আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে বাঁশরী বেজেছে আজি", পরে সেটাকে গানের মধ্যে সংশোধন করে "বাঁশরী উঠেছে বাজি" করেছেন।

যতদূর মনে পড়ে সেইবার নববর্ষের দিনই সকালবেলা উৎসব অনুষ্ঠানের পরে "কোনার্কের" কাছে "পঞ্চবটীর" বৃক্ষরোপণ হোলো।

যখন "লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি" গানটা কবির মুখে প্রথম শুনলাম, শেখাতে গিয়ে বল্লেন, "জানো এ গানটা লেখা হোলো কেমন করে? চাতালে বসে দেখলুম গ্রীষ্মের শুকনো হাওয়ায় লাল কাঁকরের রাস্তার উপর ফরফর করে একটা ছেঁড়া চিঠির টুকরো উড়ে চলেছে; ব্যাস, ঐ টুকু। কেমন যেন মনের মধ্যে একটা ছবি তৈরী হয়ে উঠলো যে একদিন যে চিঠির কারো আদর ছিল আজ তা অনাদরে পথের ধুলোর উপর উড়ে চলে যাচ্ছে। এই ছবিটাতে মন উদাস হোলো বলেই সঙ্গে সঙ্গে গান আপনি তৈরী হয়ে উঠেছে। মনে করলে যেন কি রকম আশ্চর্য লাগে যে কতো সামান্য উপলক্ষ্য ধরে এক একটা কবিতা লেখা হয়েছে। এই বসন্ত কালে, এই বৈশাখের শুকনো বাতাসে সহজেই কেমন যেন মনটা কাজ ভুলে গিয়ে কেবলি গান তৈরী করতে চায়। সারাদিনই মাথার ভিতরে সুর গুন্ গুন্ করছে। খালি চুপ করে চেয়ে চেয়ে পৃথিবীটাকে দেখি আর ভাবি কী দরকার বিশ্বভারতীর? কী দরকার কাজকর্মের? শুধু গান গেয়ে, কবিতা লিখে আলস্যে দিন কাটিয়ে দিলুমই বা। তাতে পৃথিবীর কিইবা ক্ষতি হবে? এই রকম মন নিয়েই তো লিখেছিলুম 'হেলা ফেলা সারা বেলা একি খেলা আপন মনে।' গান জিনিসটা ভারি বিশ্রী; একবার যখন পেয়ে বসে তখন অন্য সব দায়িত্ব ভুলিয়ে দেয়।"

মনে পড়ছে আর একদিন কবির মুখে শুনেছিলাম "আহা জাগি পোহালো বিভাবরী" গানটা লেখার বিবরণ। সেদিন কবি তাঁর বজরাতে ছিলেন পদ্মায়। সঙ্গে দুই ভ্রাতুষ্পুত্র—শ্রীবলেন্দ্র-

নাথ ঠাকুর এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সন্ধ্যে থেকে দারুণ ঝড়, সারারাত সেই ঝড়ের মধ্যে উদ্বেগে কাটাতে হোলো। ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছে এইবার বুঝি নোঙ্গর ছিঁড়ে নৌকো উলটে যাবে। সমস্ত রাত তিনজনে জেগে বসে রইলেন। ভোরবেলা প্রকৃতি শান্ত হোলো। সেই ভোরে ঐ গানটি লেখা। হাসতে হাসতে বললেন "গানটা শুনে কি কল্পনা করতে পারো যে এই রকম অবস্থায় ঐ গান লিখেছি? সেদিন কোনো সুন্দরীই ধারে কাছে ছিল না। শুধু ছিল আমার বলু আর সুরেন, এবং কবিত্ব করবার মতো রাত্রি জাগরণ নয়, একেবারে জীবন মরণের দোলায় মধ্যে রাত কেটেছিল। অথচ আশ্চর্য এই যে গানের মধ্যে সে উদ্বেগের কোনো চিহ্ন নেই।"

আর একটা গান সম্বন্ধেও বলেছিলেন। সেটা হচ্ছে "কখন বসন্ত গেলো এবার হোলো না গান।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মানসী" নামে একটা স্টীমার ছিলো, বোধহয় তিনি যখন দেশী স্টীমার কোম্পানী করে বিদেশী প্রতিপক্ষদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন সেই সময়। কবি কয়েকদিন এই কলকাতার কাছে গঙ্গার-বাকে কাটিয়েছিলেন সেই "মানসী"তে, সেই সময় ঐ গানটা গঙ্গাতে বসেই লেখা।

পয়লা বৈশাখের উৎসব শেষ হয়ে গেলে প্রতিমাদেবী একদিন কবির কাছে একটি দরবার নিয়ে উপস্থিত হলেন—পঁচিশে বৈশাখ কবির জন্মোৎসবে শুধু মেয়েদের নিয়ে একটা নাটক অভিনয় করাতে চান। সেটা এমন হওয়া চাই যাতে কোনো পুরুষের ছোঁয়া থাকবে না। তাই তাঁর বাবামশাই যদি পূজারিনী কবিতাটা নাটকে রূপান্তরিত করে দেন তাহলে সহজেই হয়ে যায়। প্রস্তাবটা কবির খারাপ লাগলো না। "বৌমার যখন সখ হয়েছে তখন এটা আমাকে করতেই হবে। কিন্তু ওঁর শুধু মেয়েদের প্রতিই এরকম পক্ষপাতিত্ব কেন। বেচারা ছেলেরা কি দোষ করলো?"

নাটক লেখা শুরু হোলো। মনে আছে সেই সময়ে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা সবাই কী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতাম পড়া শোনবার জন্যে। সারাদিনে যতটা লেখা হোতো সন্ধ্যেবেলা সবাইকে সেটা পড়ে শোনাতেন। দেখতে দেখতে বোধ হয় তিনদিনের মধ্যে "নটীর পূজা" বইখানা লেখা হয়ে গেলো। একে নটীর পূজার মতো বই, তাতে কবির নিজের মুখে পড়া—যারা শুনতে পেলো না তাদের জন্যে দুঃখ হয়।

বইখানা লেখার সঙ্গে সঙ্গেই রিহার্সালের পালা শুরু, কারণ ২৫শে বৈশাখের যে আর দেরী নেই—মেয়েরা সকলেই মন দিয়ে পাঠ মুখস্থ করতে লাগলো। খালি মেয়েদের দিয়েই নাটকটার অভিনয় হবে; যাতে কিছুতেই খারাপ না হয় এ ইচ্ছে আমাদের সকলের মনেই প্রবল। বিদ্যালয়ের অল্প বয়সী সব ছাত্রীরা যারা অভিনয় করেছিল বোধহয় তাদেরও মনে এই আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে দেখিয়ে দেবে অভিনয় কাকে বলে—হোলোই বা তাদের বয়স কম। তা না হ'লে অত অল্প সময়ের মধ্যে শিখে নিয়ে অতটুকুটুকু ছোট মেয়েরা কি করে এমন জিনিস দেখাতে পারলো?

নটীর পার্ট শ্রীযুক্ত নন্দলাল বোসের বড় মেয়ে গৌরীকে দেওয়া হোলো। কবি গৌরীকে বললেন, "শ্রীমতীর নাচটাতো আমি নিজে করে তোকে দেখিয়ে দিতে পারবো না, ওটা তোকেই তৈরী করতে হবে। শুধু এই কথাটা মনে রাখিস যে খালি ঐ নাচটার উপরেই সমস্ত নাটকটার সাফল্য নির্ভর করছে। শ্রীমতীর মনের সমস্ত ভক্তি ও উপাসনা তোকে নাচের প্রত্যেকটা ভঙ্গী দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। খুবই শক্ত, কিন্তু আমার বিশ্বাস তুই ঠিক পারবি।"

গৌরী চুপ করে যখন শুনছিল আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না যে অতটুকু মেয়ে "ক্ষম হে ক্ষম" গানটার সমস্ত গভীরতা, ওর ভিতরকার সমস্ত ভক্তি ও পূজা কি করে নাচের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলবে। আমি পরে কবিকে সে কথা বলায় বললেন "দেখো, গৌরী ঠিক পারবে। ওর সম্বন্ধে আমার মনে কোনো ভয় নেই কারণ আমি ওর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছি ও সমস্ত বইখানার অন্তরে প্রবেশ করেছে, কাজেই তোমাকে বলে দিলুম ও নিশ্চয়ই পারবে।"

একটা কথা কবি গৌরীকে বার বার বলেছিলেন যে নাচটা দেখে যেন কারো মনে না পড়ে যে ওটা নাচ। লোকে যেন উপাসনা বলেই ওটাকে দেখতে পায়। হোলোও তাই। যখন পঁচিশে বৈশাখ সন্ধেবেলা কোনার্কের চাতালে প্রথম দেখলাম নটীর নাচ, মুহূর্তের মধ্যে মন স্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হোলো সত্যি সত্যিই উপাসনা হচ্ছে এবং আমরা সেই উপাসনায় যোগ দিচ্ছি। গৌরী রিহার্সালে একদিনও নাচটা করেনি কাজেই সকলেই চমকে গেলো ওর নিজের রচনা দেখে। কী অপূর্ব জিনিস দেখেছিলাম সেদিন তা আর জীবনে ভুলবো না। সমস্ত নাটকটাই একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে অভিনীত হয়েছিল। মেয়েরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের অংশ খুবই ভালো করেছিল, কিন্তু গৌরীর পার্টটাই সবচেয়ে শক্ত, বিশেষ করে ঐ নাচের অর্ঘ্য দিয়ে পূজা নিবেদন। কবি মহা খুশী; নাচ দেখে বললেন "আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।" পুরস্কার স্বরূপ কবি "নটীর পূজার" পাণ্ডুলিপিখানা গৌরীকে উপহার দিয়েছিলেন।

> শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পাঁচ শতাধিক পত্রাবলীর প্রথমাংশ পাঁচখানি পত্র শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট পত্রাবলী শ্রীযুক্তা মহলানবিশের সুদীর্ঘ ভূমিকা ও টীকাসহ দেশ পত্রিকার ২৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে (৫ই নভেম্বর ১৯৬০) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।
>
> সম্পাদক

পঁচিশে বৈশাখের উৎসবের কয়েকদিন পরেই কবি ইটালী যাত্রা করেন মুসোলিনীর নিমন্ত্রণে। বোধহয় ১০ই মে শান্তিনিকেতন থেকে বম্বে রওনা হন। সঙ্গে প্রতিমাদেবী, রথীন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় গৌরমোহন ঘোষ, মিঃ লাল ও শ্রীমতী নন্দিনী। আমরা কলকাতা থেকে বর্ধমান গেলাম কবিকে প্রণাম করবো বলে। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও গিয়েছিলেন বর্ধমানে।

গাড়ি ছাড়বার মুহূর্তে কবি আমার স্বামীকে বলেন, আমরা যেন পরদিন বম্বেমেলে রওনা হই, কারণ হয়তো শেষ মুহূর্তে ওঁদের জাহাজে কিম্বা অন্য কোনো জাহাজেও জায়গা পেয়ে যেতে পারি ইটালী যাবার জন্যে।

সেদিন রাত্রে কলকাতায় ফিরবার আর কোনো গাড়ি না থাকায় সারা রাত বর্ধমান স্টেশনে কাটিয়ে পরদিন সকালে কলকাতা ফিরেই আমার শ্বশুরমশাইকে বললাম বিদায়ের মুহূর্তে কবি তাঁর কি ইচ্ছে জানিয়ে গিয়েছেন। শুনে শ্বশুরমশাই তাঁর ছেলেকে অনুরোধ করেন যেমন করেই হোক চলে যেতে। বাবার কাছ থেকে এই নির্দেশ পেয়ে পরদিনই অর্থাৎ ১৫ই মে আমরা কলম্বো রওনা হয়ে ১৯শে সেখান থেকে জাহাজ ধরে ২রা জুন নেপলস্ পৌঁছই। কবিরা তার দুদিন আগেই ইটালী পৌঁচেছেন। আমরা দুদিন নেপলস্এ কাটিয়ে তারপরে রোমে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একসঙ্গে সারা য়ুরোপ ঘুরেছিলাম। সে ইতিহাস ভুলবার নয়। আমি অন্যত্র এর বিশদ বিবরণ দেব।

খাতাঞ্চি মশায় বল্লেন, ওহে অবু বাবু, বুঝলে, এই আমার প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে এণ্ট্রি; বইখানার একটা জমকালো নাম দেওয়া তো চাই বুঝলে?

—কেন এর পূর্বেও তো আপনি কয়েকবার সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করে এসেছেন।

—আহে সে কয়েকবার হস্তকলমির বনে দাঁটা চিবোনো হয়েছে। এখন দন্তহীন হয়েছি, সুতরাং মাখম শিমের মতন রসনাতৃপ্তিকর নরম অথচ বলকর একটা নামের প্রয়োজন। কি বল সনাতন?

—আজ্ঞে।

—আজ্ঞে বলে চুপ করলে যে?

—আজ্ঞে লজ্জা—

—ও তোমার লজ্জা রাখো বাঁধন্দার হয়েছো গীত বাঁধতে হবে সঙ্গে। লজ্জা থাকলে চলবে না। আমি কথা বলে যাবো, সঙ্গে সঙ্গে তুমি গীত বেঁধে চলবে, তবেই না।

—আজ্ঞে ভয় হয় কসে বাঁধতে।

—ভয়টা কি? আমাকেই একদিন কসে বেঁধে চালান করতে হবে। আমি হুকুম দিচ্ছি, নির্ভয়ে বাঁধো বাঁধন্দার

খাতাঞ্চি মশায়ের গর্জনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সনাতন গাজন ধরলেন।

॥ গীত ॥

আহা সে কয়েক বার বাল্যকালে
হস্তকলমির আগডালে
দাঁত বসায়ে করা গেছে
রসকসহীন দাঁটা সার॥
এখন দন্তহীন
দিন খাই মাখম শিম
রসকরা বলকরা
বৃদ্ধকালে রসনার
পিকার প্রিয়োজোন একটার॥
কয় সনাতন
গ্রাণ্ড টৌটোলজি হলে হয় যেমন
ওল মান কলার॥

খাতাঞ্চি মশায় বল্লেন—ঠিক হয়েছে। বইখানার নাম দেওয়া যাক ওল্মান। কি বল অবু বাবু?

—মন্দ নয়, কিন্তু গ্রাণ্ড টৌটোলজি নামটা হিসেবী রকম বোধ হচ্ছে না? খাতার একটু আভাস আছে।

—উঁহু লোকে ভাববে ছাইকলজি করছি। ওল্মান নামটা যেন প্যাঁজ রসুনে ভাজা শিক কাবাবী রকম, কি বল?

—তাই রাখেন। কি বল সনাতন?

॥ গীত ॥

ওল্মান নামে দোল আছে
মজা আছে মুখ চুলকোতে
ঝালে ঝোলে ভাতে মাছে সবেতেই সমান
সোনাতোন বলে খাতাঞ্চি মশায়
প্যাটি মুখাজ্জিকে বাঁধন্দার কর
আমারে দাও ছাড়ান।

—আহে, প্যাটি মুখার্জ্জি সেদিনের ছেলে, তুমি হলে সনাতন কালের কবি। অবু বাবু হলেন ছবির রাজা। আমি হলেম যারে বলে খাতাঞ্চি। ওল্মানের গ্রাণ্ড টৌটোলজি দিয়ে ফেলা যাক নাম, কে আর করে হাঙ্গাম!

বলতে বলতেই প্যাটি মুখাজ্জি হাজির।

—জীব জীব! থলিতে কি প্যাটি নাকি? নাও তোমারে দিলাম উপহার ওল্মানখানা।

—দাদামশায় বিলখানা।

—ও আর দিচ্ছি না। যাও একেবারে নির্ভয়। দেখো বই বাঁধাই যেমন হতে হয়। অনেকে মলাটই চেটে যাবে, বুঝলে হে মেজোবাবু—প্যাটি খেতে জানে কজন? কি বল সনাতন!

লঙ্কাকাণ্ডের জের

মেঘরাজ কাক কালো মিশমিশে
দিলে শিসে ঘষা আবাজ
আষাঢ়ের প্রথম দিনে আজ
মেঘনাদের মউর আর নাচ দিসে
ইন্দ্রজিতের বউর সাধের মউর
বলে—দূর! লঙ্কা কাণ্ডে লেজ
পোড়া গেল, প্যাখম ধরি কিসে!

কুটকুটে

তিলকুটে তিলকুট ঢিল কুটে সুরকি
তামাক কুটে তাম্রকুট মুড়া কুটে মুড়কী
চিত্রখানা কুটে দেখ হবে চিরকুট
বিশ্বের জিনিস কুটে বনাও বিস্কুট।

রাজপত্র

যাই মন-মনুয়ার সন্ধানে
ঘোড়া পাই ভাল, না পাই তা-ও ভাল
পা চালাতে কাঁকড়া মাছবৎ পিছাই কেনে?
জলপথ স্থলপথ আকাশপথ
পথ তো তিনটা।
থলেতে চলি ধরে লাঠি
জল পারাই সাঁতার কাটি
আকাশ পথে স্বপ্নে হাঁটি কি আর চিন্তা?
সতেজে আগাই পিছাই কেনে?

মন্ত্রীপত্র

আহা দ্রুত গমনে কি এত প্রয়োজন
দু মুঠো ভোজন করে নেওয়া কি
প্রয়োজন নয়?
হয়েছে বয়েস, দিয়ে গেদা ঠেস
ভোজনান্তে শয়ন উচিত হয়
তৎপরে বৈকালিক খেয়ে
চিন্তা করা কোথাকে গমন।

হস্তকলমি

অকারণ বিলম্ব কি কারণ
নদী গিরি এমন কি সাগর লঙ্ঘন
হস্তকলমী পিছপাও নন।
আমি নয় কাঁচ ছেলে বুড়িয়ে গেলাম
কলম ঠেলে; কলম চালাতে
হস্তকলমী শাক
মেলেনারে মন এ জীবনে।

চলন বলন

এই এক পা আগাই দুই পা পিছাই
এই ভাবে যাই বুদ্ধিমান
শাস্ত্রে বলেছে এরেই চলা
সহজে চলা সে চলার ভান।
এক পা আকাশে এক পা মাটিতে
এই ভাবে যদি না পারো হাঁটিতে
হবে পপাত হঠাৎ মাটিতে
খুলি ফাটিবে উড়িবে জ্ঞান।

শব্দ সংগীত

দ্রুম দন্দড় ধ্রুম ধদ্ধড়
কি স্পোলো কী পোলো
শিল পলো না চিল পলো?
ও মজুন্দার ও বাজন্দার
কী পলো হুড়দুম
ডিক্‌স্‌নারি ওয়েবস্টর
চেপে পলো শব্দকল্পদ্রুম
ও মাই ও মাস্টার।

চালতা চিত্র

সিন্দুর বরণ মেঘ বিন্দু বিন্দু বর্ষে পানি
রং ধরলো বন চালতা দুধ-আলতা একটুখানি।

ডাল বেয়ে ওঠে লাল পিঁপড়া
ঝাং কিটি বলে উই চিংড়া
চিকুর চিড়্ খায় কি হয় কি জানি।

ঝিঁঝি পোকার বোল

ঝাং কিটি কিটি ঝাং জী জী মার কার ফোড়ান্
মনজীর জীনজীর থনজরী টিং টিং
রিপিটিং রিপিটিং ড্রিপ ড্রপ
লিমিন ড্রপ টু থ্রী ওয়ান
ঝিনঝার সন্দার সিলভার ঝঙ্কার
রঞ্জিত সিংগীর পঞ্জার কিসমার
হিরলী দিরলী ঝাংকিড়ি যান
ঝাঁজাং ঝাঁজাং ঝাঁ ঝাঁ মিহিজাম
জিরোও অবু চান্।

সাধুভাষার ব্যাঘ্রগর্জন

অরে ছাগাত্মজ অহহ দুরাত্মন
তুমি কি কারণ তৃণচয় না করি রক্ষণ
অপহরণ করি করহ ভক্ষণ!
অকারণ যত তৃণচয় হইল অপচয়
বল কি খাইয়া বাঁচে গো গর্দভ হয়?
তৃণ নহিলে নয় ব্যাঘ্রেরও গাত্র কণ্ডুয়ন
পশু রে অন্যায় পশু রে পশ্বাধম!

মিশ্রভাষার মিনতি

হয়ে স্থিরাত্মন দীনের কথা করেন শ্রবণ
আমি বারোমাস বাঁচি খেয়ে ঘাস
আপনি বাঁচেন খেয়ে হাড় মাস
ওহে মহাত্মন অধমে বৃথা ভর্ৎসন
যুক্তি যুক্ত নয় অবিচার করণ।

মিশ্র ভাষার তর্জন

অসম্ভবাম্ ন বক্তব্যম্
নাই তো লজ্জা নাই কো শরম।
বাঘের হাতে পাজি
কে তোরে রাখে আজি
মস্তক ইস্তক শিং করিব চর্বণ
উঁচার কাছে কর ছুঁচার কীর্তন
এর শাস্তি ঘোড়াজাসি গর্দান কর্তন
পুনঃ না কর ঘাস চর্বণ।

চলতি ভাষার মেশালি

ম্যা অ ম্যা কোথা যাই গো ম্যা
কোথা গেলে কিছু পাই গো ম্যা।
নটে শাক মুড়ানু বনে
লাগ পাই না বাঁশ পাতার
প্যেট বলছে কি খাই কি খাই?
পটল তুলতে চল হে সবাই
ম্যা ম্যা বলে ডাকতেছি তাই
কোথা কি পাই ম্যা এ ঘোর বনে ম্যা অ ম্যা।

কাঠাকলি ভত্ত্ব

কুড়বা কুড়ুবা কুড়ুবা লিজ্জে
কাঠায় কুড়ুবা কাঠায় লিজ্জে
ডালে পাতায় মুড়ায়ে লিজ্জে
চানায় দানায় চিবায়ে লিজ্জে।
কুড় কুড় কুড়ুবা চিবায়ে লিজ্জে
ধারাপাত্ কলাপাত্ ভিজ্জে ভিজ্জে।
এক রাশ গ্রাস গ্রাস লিজ্জে লিজ্জে

বায়ু তত্ত্ব

বাস্‌রে বাস্‌ ঐ কি বাতাস
চিতিয়ে প'লো প্রতিপদের চাঁদ সইতে আকাশ।
চরের মাটি বলছে উড়তে যাচ্ছি
না পড়তে যাচ্ছি
ঘরের পাটি বলছে কান মলা খাচ্ছি
নাক মলা খাচ্ছি।
পিরেক তেজে ওড়ে
মশারিটার পাছু ধরে
মশার ঝাঁক ওড়ে ধরে পাছাটি।
গেরোস্তো আগে গৃহ তার পরে,
তোষক আগে তার পরে তুলো,
আগে পিলসুজ তার পরে পিদুম,
উড়ে চলছে আগে মাঠ পাছে ধুলো,
সব শেষে তেল সমুদ্রে তেলের কুপি
টলতে টলতে করে হাঁস ফাঁস বাস্‌রে বাস।

দুঃস্বপ্ন

হে মা লংকাবতী! কি স্বপ্ন দিলে মা
ভয়ে যে বাঁচি না
আদিবুড়ি মধিবুড়ি অন্তিবুড়ির মা
ত্রিজটার কি হবে গতি?
পিরেকী গজালী হাতুড়ি বেড়ী
চেড়ী কটা সীতাকে করে তেরি মিরি
মানা করি আমি ত্রিজটী
তারা বলে এই করে যে কামাই রুটি।
ল্যাজা মুড়া বাদ, ভেড়ীর ঠ্যাং
লংকাপতি রোজই খেতে দেন
কি করবো উঠলে রুটি
ওলো ও ত্রিজটী
কি করি মা নিশিচরী নফরী
ঘুরঘাটি ঘুটমুটি কালকুটি গালফাটি
হনু এসে রাতে দেখায় ভিরকুটি।

বৈধব্য তত্ত্ব

সূর্পনখা পিসি বলে লো প্রমীলে
তোর হল আমার দশাই
কি করবি বল এখন নোয়া শিথলাই।
দাসী বলে ঢের হল নাকে কান্না
পিসি ঘরে যাও চড়াতে রান্না।
না লো না এসব না করলে নয়
ছাড়িয়ে দে আঙরাখা পাট বস্তর
গায়ে গহণা রাখতে নেই বলেছে শাস্তর।
বা রে নিশিচরী দাঁতে মিশি খাঁদা পিসি।
খুলে দে সোনার চিরুনি, চাই মাথা মুড়ুনি।
ভাল রে শাস্তরে নিণ্ঠে এমন দেখিনি।
দাঁতে কামড়ে খুলবে নাকি কান-বালা মাকড়ি
নখে চিরি ছিনাবে নাকি গলার হাঁসুলি।
হার খুলতে পিসি তর যে সইচে না
প'ইচের সঙ্গ নিলে যে হাতের ছালখানা
ওরে একালের তোদের সবি অবিবেচনা।
পিসি মরে যাই দেখে তোমার বিবেচনা।
চল আর না মাদুরী বিছানা
সরিয়ে নেওয়া চাই।

পুত্তলিকা তত্ত্ব

কেমন কারিগর রে তুই বিদ্যুৎজিত্
নাচ পুতুল দেখায়ে বানর ক্ষেপায়ে
রাজার নাটশালা পোড়ালি ধিক।
আজ বার করবো টেনে গোটা আলজিভ।
হুকুমে গড়েছি পুতুল
ধরা অনুচিত কারিগরের ভুল
শুধাও কার দোষ—
আছে ভগ্নদূতে খোস্তোষ,
রাক্ষসাধীপ বিচার করুন
নাটশালে আগুন কোন জন নেভায়।
মেঘনাদ কন বাদল বর্ষায় কিঞ্চিৎ
কারিগরের দোষ ক্ষমা করা উচিত।

যুদ্ধ তত্ত্ব

হাতী মলো ঘোড়া এলো চক্ষে চর্মঠুলি
ঘোড়া মলো মশা এলো দাও মুগুড়ি মুড়ি।
চালা ভাই ঢাল চড়াই তাল পাতার ব্যজন
মশা মারতে কামান দাগাতে
টিয়া পাখী দাও মন।
কামান কাজ কি দেগে
উঠবে রেগে ভীমবুলি মহাশুলী
কোলা বেঙ বসে থাকো
গোল পাতার ছাতি খুলি
চল চল যুদ্ধে অটল প্রবল দল
ক্ষেতে যেয়ে পটল তুলি।

মর্কট তত্ত্ব

মর্কটী বলে মর্কট যুদ্ধ হতে হটে এলে প্রাণেশ্বর
মর্কট বলে যুদ্ধ দিই কারে, বালকটা নামমাত্র নিশাচর।
মর্কটী বলে ছেলের গলে দেখেছি মোহর টাকা
কোন না ছিঁড়ে আনলে তারি দু-দশটা চাকা চাকা?
মর্কটী—ও টাকা নয় মোহর নয়
রাম লেখা গিরি-মাটির ছাপ
তুইও যেমন হাবা
লে এখন উকুন বাছাই কর।

ভূকম্পন তত্ত্ব

থাম কাঁপে কাঁপে ছাত
ভিত কাঁপে দালান ধসে হঠাৎ
ছাতি কাঁপে রাবণের রণবারণ হয় কাত
অকম্পন বলে লংকাতে ভূকম্পন কেন অকস্মাৎ?
প্রকম্পন বলে ওরে কয় হৃদ্‌কম্পন দাদা
হনুমান দিচ্ছে লাফ এই কথা দাদা।

নগর তত্ত্ব

কিষ্কিন্দা কিচিকিন্দা শহরটি নিন্দার নয়
বড় বড় বানর বড় বড় ঘরে ছোট ছোট বানর
ছোট ঘরে রয়।
কিষ্কিন্দার বাজার খাসা
কপিতে রূপীতে ঠাসা
অলি গলি বদলী কদলী
মটর মসুরী ছড়াছড়ি যায়।
বড় বড় বানরের বড় বড় পেট
ছোট ছোট বানরের ততোধিক লেজ
কেউ মটকাতে কেউ চাতালে রোদের কালে
রোদ পোহায়
বানরী পাড়াটিতে কুল বিচি তাল আঁটিতে
গিজি গিজী সব সময়।

দধি-মুখ মামা পরে সামা
মধুবনে পাহারা ফিরয়।

বৃক্ষ তত্ত্ব

রাক্ষসী-মায়া বুঝে ওঠা ভার
তুলার গাছ দেখালো যেন সিংশপার ডাল।
যেমন লাফিয়ে পড়া হনু আগায় হঠাৎ
তুলো মেখে বুড়ো সেজে তলায় পপাৎ।
চেপে ত্রিজটীর ঘাড়
আঁক করে ত্রিজটী হাঁক পাড়ে
সক্কালে যেন ডাক ছাড়ে কুড়াগাল।

কাঠঠোকরা তত্ত্ব

কেটে ফোঁপরা কর্বো খর্ব নির্মূলে
গোদাবরী কূলে যত আছে শাল্মলী শিমূলে।
সাতবেলে হিতোপদেশের গাছ
ঠোঁচ ঠেলে বোঁচা কর্ব আজ।
চঞ্চু মন্ত্রে পঞ্চতন্ত্রের অন্ত্রে অন্ত্রে
রন্ধ্র ভেজাবো আমূলে।

বাস্তু তত্ত্ব

দাদা শহর বাসেতে সুখটা কি?
সুখ নাই থাক আছে সোয়াস্তি।
আপিসটি দূরে টেরামটি কাছে
গেরামে কি আছে এমনটি?
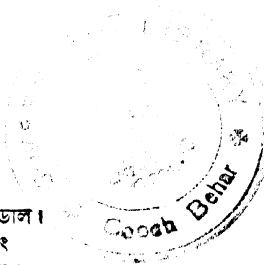
এখানে আছে হোপি বয় গনেশ টাঁক
কাঁচি ছিগারেট কেবিনের চা কাফিখানা কাফি
ফুটবলের গোল মোহনবাগান
বেতার জগৎ তার নাচ গান।
পাড়াগাঁয়ে কি আছে যে হবে ভক্তি
কেন দাদা সেখানে সবই আছে নাস্তি কি?
চাল আছে ডাল আছে চালে চাল কুমড়ো
বাউলের গান আছে আউলচাঁদের আখড়া।
গাজীর গান আছে আর চাই কি?
মাছরাঙা কাক কোকিল আছে
হোক্কা আছে কল্কি আছে,
হোক্কা শ্যালের আছে ছ্যার নাই কি?
সব মানচি ভাই
পাড়াকুঁদুলি আছে তারি ভয় বাসচি।

সওদাগরী তত্ত্ব

চাঁদসদাগরের দাদা, পাগড়িটি শিরে বাঁধা
এক কানে সোনার মাকুড়ি, গায়ে ভোট কম্বলী কাঁথা।
সাগরের কোলে নুন-চোরের হাট, জুড়াই পহরে
গলা শুকিয়ে কাঠ
নুনের জাহাজ ধরে দিলাম পাড়ি, পড়ে রইল আপন ঘর বাড়ি।
লংকায় গিয়ে আনতে সোনা হয়েছে কোমর বাঁধা
দেখতে দেখতে চম্পাইপুর লবণাম্বর রঙে মিশালো
খর বাতাসে মন আকাশে ক্ষুধা চাগালো।
মাল্লারা রাঁধছে মৎস্য শুটকী, ভাবচি আমি বুজে মুখটি
লাল ঝরতে চায় বেয়ে দুই কস্।

ফোড়ন দিয়েছে যেই কাঁচা লঙ্কার
সেই জ্বলে উঠেছে পিত্তি, কোথা থাবো আর—
পেটের কাছে জেতের বিচার কখনো টেকে?
দেনা ভাই দুখানা থাই বল্লাম ডেকে।
মাল্লাদের শুটকী মাছে খেয়ে মুছতে মুখটি
শুকতারা উদয় হল শুক্তির মধ্যে মুক্তি।
সঙ্গে সঙ্গে উঠলো বাতাস বাধলো জঞ্জাল
পঞ্চাশ না গুনতে জাহাজ বানচাল।

দ্বারী তত্ত্ব

হয়েছে নিদ্ধি খাবি সিদ্ধি আর ঘুমাবি
সিং দরোজায় লাগাসনে চাবি।
নামেই হুঙ্কার সিং শার্দুল সিং
কেবলি ঢোলে চাঁটি তা দিন্ দিন্।
মৌসিমা, পিউঁসি, মং কীজিয়ে রোষ্
দোষ করবে তো রোষ করবে না বেহোঁস
কেবলি ঘুমাবি আর ছার খিলাবি
দরোজায় না খিল না তালা না চাবি।

পথ্য তত্ত্ব

চলতি পথে সম্বল থাকা চাই
চালতা কিছু, কাঁচা কিছু পাকা,
অম্বলের সম্বল দই পাতকে দম্বল,
অরুচির রুচি পুঁজি রাখ ভাই।
সব স্থানে আছে চালের গোলা
চুলোর মুখও সব স্থানে খোলা
দই অম্বলের না নিয়ে সম্বল
রথ্যার মাঝে পথ্যাভাবে আটকাই।

স্থান তত্ত্ব

হস্তিনাপুরী কোস্তাকুস্তির দেশ
অযোদ্ধাপুরী বেগমদের দেশ।
মিউটিনির দেশ কানপুর
কলিকাতাপুর হল পাঁঠাবলির দেশ।
এক এক নামে এক এক পুর
খাঁদিয়াবাটি আর কত দূর।

রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব

কৌতুকে সুগ্রীব রাজা পালঙ্কে বসিয়া,
তেপায়াতে জাম্বুবান কোমর কসিয়া,
নল-নীল দু-বানর দুধারে পাংখা চলে,
তালপত্র নয়, তালবৃক্ষ বলি যারে।
কলাপাতি সাটিনের ছত্রটি মাথায়
গয় গবাক্ষের আশাসোঁটা দুটো মোচার প্রায়।
ডাইনে বানরী বামেতে বানরী
সমুখে মামা দধিমুখ মধু পায় ধরি
রাখছেন মধুবনের দেওয়ানি বজায়।

নাম তত্ত্ব

মোহনলাল নাম মন রাঙায়
সোহনলাল সোহন পাঁপড়ি।
বুলু নাম চুলবুলে করায়
কাবুলী নাম বেদানা ঝুড়ি।
বোকা নামে ঝোল আছে
খোকা নামে আছে ঝাল,
দাদার নামে ভাঁড়া ঘুবুনী,
দিদির নামে মিঠি মিছরী
প্যাটি মুখার্জি নামেব রাজা।

'লিপিকা'র সূচনা

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

১৯১৯ সাল। গরমের ছুটি হয়ে গিয়েছে। কলেজ বন্ধ। বাইরে যাইনি। পাঞ্জাবের কথা অল্প অল্প করে আসছে লোকমুখে। কবি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। কিছু খবরের কাগজে, কিছু চিঠিতে, জালিয়ানালা-বাগের খবর এসে পৌঁছচ্ছে। রুচিরাম সাহনির কাছ থেকে অনেক কথা একদিন বনোয়ারি-লাল চৌধুরী কবিকে এসে শুনিয়ে গেলেন। কবি এই সব শুনে ক্রমেই এমন অস্থির হয়ে পড়লেন যে আমাদের ভাবিয়ে দিলো। রথী-বাবুরা বাইরে। আমি মেজোমামাকে স্যার নীলরতন সরকার ডেকে আনলুম। কবির শরীর তখন এমন দুর্বল যে দোতলা থেকে তিনতলায় উঠতে কষ্ট হয়। সারাদিন একটা লম্বা চেয়ারে শুয়ে। লেখা বন্ধ। কথাবার্তা কম বলেন। হাসি-গল্প তো নেই-ই। মেজো-মামা দেখে complete rest-এর হুকুম দিয়ে গেলেন। শুয়ে থেকে কবি আরও অস্থির হয়ে উঠলেন। Andrews সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। পাঞ্জাবে যে কাণ্ড ঘটছে, তা নিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একজন লোকও প্রতিবাদ করবে না, এটা কবির পক্ষে অসহ্য। Andrews সাহেবকে মহাত্মাজির কাছে পাঠালেন এক প্রস্তাব নিয়ে। তখন বাইরে থেকে পাঞ্জাবে লোক প্রবেশ করা নিষেধ হয়েছে। কবির ইচ্ছা যে মহাত্মাজি যদি রাজি থাকেন, তবে মহাত্মাজি আর কবি দুজনে দিল্লীতে গিয়ে মিলবেন। সেখান থেকে দুজনে একসঙ্গে পাঞ্জাবে প্রবেশ করবার চেষ্টা করবেন। ওঁদের দুজনকেই তাহলে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই হবে ওঁদের প্রতিবাদ। Andrews সাহেব মহাত্মাজির কাছে চলে গেলেন।

এদিকে কবির দিন কাটে না। Andrews সাহেবের পথ চেয়ে বসে আছেন। আমি সারাদিন যতটা পারি কাছাকাছি থাকি। একটা বড়ো চেয়ারে হেলান দিয়ে মাঝে মাঝে ছেলেবেলার কথা বলেন। পেনেটির বাগানের গল্প। গঙ্গার ধারে সেই বাড়ি। পুকুর ঘাট। বললেন আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারো? সেখানে গিয়ে কিছু দিন থাকি। আমি খোঁজ করে জানলুম যে, সে বাগান বাড়ি বনোয়ারিবাবুর এক শরিকদের হাতে। বনোয়ারিবাবু উৎসাহ করে ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন। বাড়ির মালিকরা বলে পাঠালেন, কবির যতদিন ইচ্ছা ওখানে
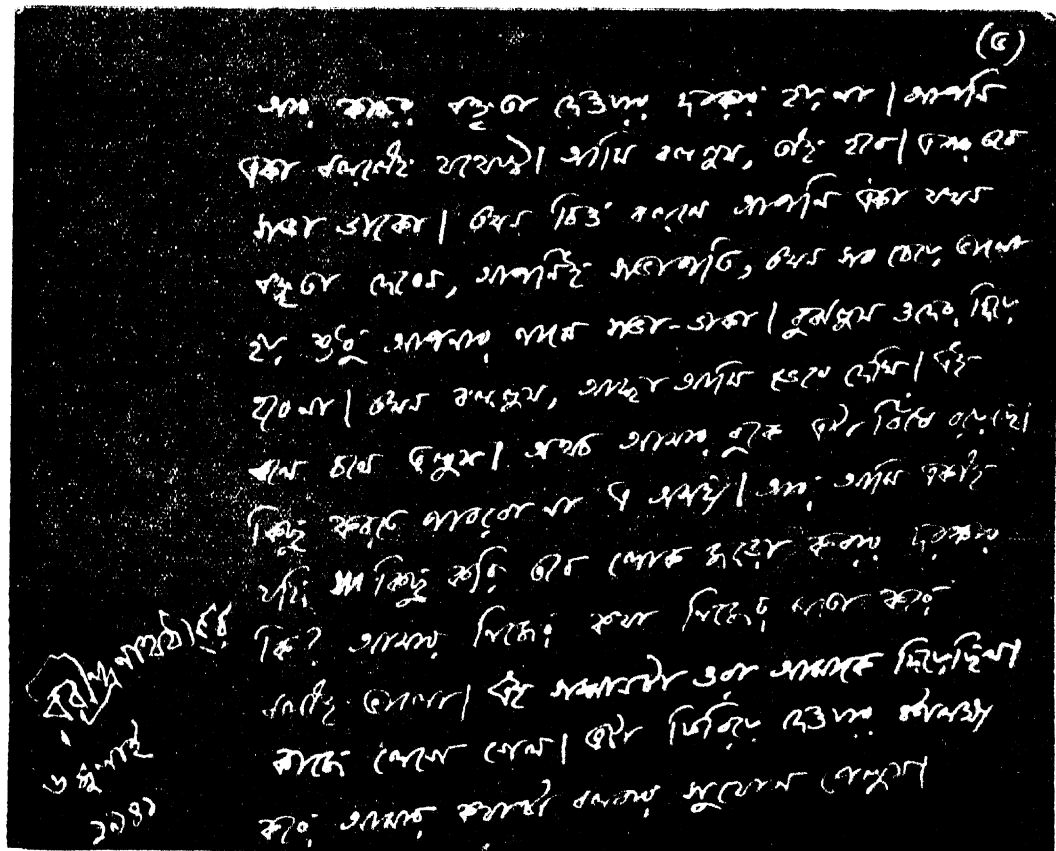
তিরোধানের এক মাস পূর্বে এই রচনায় উল্লিখিত তথ্যের সমর্থনে পাণ্ডুলিপির উপর রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর

গিয়ে যেন থাকেন। ঠিক হোলো একদিন গিয়ে দেখে আসবেন। যদি ভালো লাগে, বেশি দিন থাকবার মতো ব্যবস্থা করা হবে।

ইতিমধ্যে Andrews সাহেব গান্ধিজির কাছ থেকে ফিরে এলেন। সকাল বেলা পুরোনো বাড়ির দোতলায় পশ্চিমদিকের বারান্দায় কবি বসে আছেন। Andrews সাহেব আসতেই অন্য সব কথা ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হোলো? কবে যাবেন?" Andrews সাহেব একটু আস্তে আস্তে বললেন, বলছি সব—গুরুদেব কেমন আছেন এই সব কথা পাড়ছেন; কবি আবার বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে কী হোলো? তখন Andrews সাহেব বললেন যে, গান্ধিজি এখন পাঞ্জাব যেতে রাজি নন—I do not want to embarrass the Government now—শুনে কবি একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বললেন না।

সেইদিন বা দু-একদিনের মধ্যে বিকালে কবিকে পেনেটির বাগানে নিয়ে গেলুম। কবির সঙ্গে আমি একা। বাড়ির মালিকদের বলে দেওয়া হয়েছিল যে, কবি একা যেতে চান। মালিকদের খবর দেওয়া হয়েছিল তারা দরজা খুলে দিলে। দোতলা বাড়ি। এখন বাগান বেশি কিছু নেই। কতকগুলি পুরোনো গাছ, কবি একবার চারদিক দেখলেন। গঙ্গার ধারে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়ালেন। সেখান থেকে পুকুরের দিকটা গেলেন—এখনো একটা পুরোনো গাছ দাঁড়িয়ে আছে। তারপরে দোতলায়। এঘর ওঘর একটু দেখলেন। মালিরা গাছ থেকে আম আর ডাব এনে দিলে। চামচ, গেলাস কিছুই ছিল না। মালিরা দিয়েছে। খোসা ছাড়িয়ে আম খেলেন, মুখে ডাব থেকে ঢেলে জল খেলেন। নীচে নেমে এসে আরেকবার পুকুরের দিকটা দেখলেন। তারপরে আমাকে বললেন এবার চলো। কিছু নেই। সেই পেনেটির বাগানে আর ফেরা যায় না। জোড়াসাঁকোয় ফিরে এলুম।

জয়গোপালবাবু সে সময় Calcutta Universityতে ইংরাজির অধ্যাপক। ব্রজেন্দ্র শীলের বিশেষ বন্ধু। তাঁকে অল্পদিন আগে একবার শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলুম। তিনি একদিন কবির সঙ্গে দেখা করতে চান। কবি বললেন বিকালে নিয়ে আসতে। বিকালবেলা জয়গোপালবাবুকে সঙ্গে করে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে শুনি কবি একটু আগে একটা ঠিকে গাড়ি ডাকিয়ে বেরিয়েছেন। কোথায় কেউ জানে না। কবি যখন যেখানে যান আমিই ব্যবস্থা করি—আমাকে কোনো খবর দেন নি।

লালবাড়ির একতলায় তখনো "বিচিত্রার" লাইব্রেরি ঘর রয়েছে। জয়গোপালবাবুকে নিয়ে সেইখানে বসলুম। বেশ যখন সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে—সাড়ে সাতটা, পৌনে আটটা হবে—কবি একটা ঠিকে গাড়িতে ফিরে এলেন। আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম। তারপরে তিনজনে পুরোনো বাড়ির বড়ো কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় সিঁড়ির পাশে বসবার ঘরে গিয়ে বসলুম। পাঁচ সাত মিনিট কথা বলতে বলতেই দেখলুম, কবি খুব ক্লান্ত আর অন্যমনস্ক। জয়গোপালবাবু নিজেই উঠে পড়লেন। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামছি—কবি আমাকে পিছু ডেকে বললেন, প্রশান্ত একটা কথা শুনে যাও। আমি জয়গোপালবাবুকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলুম। পশ্চিমের বারান্দা অন্ধকার। কবি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে বললেন, "তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। কাল তুমি এখানে এসো না।" আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কেন? "তা জানবার দরকার নেই। তোমাকে বারণ করছি। আমার কথা তোমাকে রাখতেই হবে। কাল তুমি এখানে আসবে না। আমি বারণ করে দিচ্ছি।" দেখলুম কবি খুব বিচলিত। কিছু না বলে চলে এলুম।

জয়গোপালবাবুকে বাড়ি পৌঁছিয়ে ফিরে এলুম। রাত্রে ভালো ঘুম হোলো না। ভোর হয়নি—হয়তো চারটে হবে—উঠে স্নান করে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের সমাজপাড়ার পশ্চিম দিক দিয়ে সরকার লেনের রাস্তায়। গলিতে তখনো গ্যাসের আলো জ্বলছে। জোড়াসাঁকোয় গিয়ে দেখি দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। গরমের দিন দরোয়ানরা বাইরে খাটিয়াতে শুয়ে। তাদের জাগিয়ে দরজা খুলিয়ে উপরে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সিঁড়ির উপরের জানলা দিয়ে দেখলুম বসবার ঘরের উত্তর-পুবের দরজার সামনে টেবিলে বসে কবি লিখছেন। পুব দিকে মুখ করে বসে আছেন। পাশে একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। আকাশ একটু ফর্সা হয়েছে। কিন্তু ঘর তখনো অন্ধকার। আমি ঘরে যেতেই মুখ ফিরিয়ে বললেন, কী এসেছো? এই বলে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। দু-তিন মিনিট। তারপরেই একখানা কাগজ হাতে দিয়ে বললেন পড়ো। বড়লাটকে লেখা নাইটহুড পরিত্যাগ করার চিঠি। আমি পড়লুম।

কবি তখন বললেন—সারারাত ঘুমোতে পারিনি। বাস্ এখন চুকলো। আমার যা করবার, তা হয়ে গিয়েছে। মহাত্মাজি রাজি হলেন না পাঞ্জাবে যেতে। কাল তাই নিজেই গিয়েছিলুম চিত্তরঞ্জনের কাছে। বললুম যে, এই সময় সমস্ত দেশ মুখ বন্ধ করে থাকবে এ অসহ্য। তোমরা প্রতিবাদ সভা ডাকো। আমি নিজেই বলছি যে, আমি সভাপতি হবো। চিত্ত একটু ভেবে বললে, বেশ। আর কে বক্তৃতা দেবে? আমি বললুম, সে তোমরা ঠিক করো। চিত্ত আরেকটু ভাবলে—বললে, আপনি যদি সভাপতি হন, তবে তারপরে আর কারো বক্তৃতা দেওয়ার দরকার হয় না। আপনি একা বললেই যথেষ্ট। আমি বললুম, তাই হবে। এবার তবে সভা ডাকো। তখন চিত্ত বললে, আপনি একা যখন বক্তৃতা দেবেন, আপনিই সভাপতি, তখন সব চেয়ে ভালো হয় শুধু আপনার নামে সভা ডাকা। বুঝলুম ওদের দিয়ে হবে না। তখন বললুম, আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। এই বলে চলে এলুম। অথচ আমার বুকে এটা বিঁধে রয়েছে কিছু করতে পারবো না, এ অসহ্য। আর আমি একাই যদি কিছু করি, তবে লোক জড়ো করার দরকার কি? আমার নিজের কথা নিজের মতো করে বলাই ভালো। এই সম্মানটা ওরা আমাকে দিয়েছিল। কাজে লেগে গেল। এটা ফিরিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ্য করে আমার কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম।

আস্তে আস্তে তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। ঘরের আলো নিবিয়ে দিলুম। Andrews সাহেব এলেন। বড়ো লাটকে তার পাঠানো খবরের কাগজে দেওয়ার জন্য কপি তৈরি করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। রামানন্দবাবুকে এক কপি এনে দিলুম। এই সব করতে খানিকটা বেলা হয়ে গেল। দুপুরের দিকে আর জোড়াসাঁকোয় যাইনি। বিকালে গিয়ে শুনি কবি দোতলা থেকে তিনতলায় চলে গিয়েছেন। পশ্চিমের শোবার ঘরে গিয়ে দেখি একটা ছোটো বাঁধানো খাতা, লাল মলাট দেওয়া। তাতে কী লিখছেন। আমি যেতেই বললেন, এই শোনো আরেকটা লেখা, লিপিকার প্রথম যেটা লেখা হয় "বাপ শ্মশান থেকে ফিরে এল"। তখন পাঞ্জাব কোথায়, জালিয়ানালা-বাগ কবির মন থেকে মুছে গিয়েছে। দিনের পর দিন এক একটা করে "লিপিকা"র লেখা চলতে লাগলো। শরীরের ক্লান্তি, সমস্ত অসুখ তখন একদিনের মধ্যেই সেরে গিয়েছে।

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punish[ments] inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are unparallelled in the history of civilised governments, barring some conspicuous exceptions, recent & remote. Considering that such treatment has been meted out to a population disarmed and resourceless by a power which has the most terribly efficient organisation for the destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less, moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers, possibly congratulating themselves for imparting what they imagined as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers — which have in some cases gone to the brutal length of making fun of our sufferings,

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local
disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British
subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people
and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised
governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment
has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly
efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political
expediency, far less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers
in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal
agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers, possibly
congratulating themselves for imparting, what they imagine as salutary lessons. This callousness has been
praised by most of the Anglo-Indian papers, which have, in some cases, gone to the brutal length of making
fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in
smoothering every cry of pain and expression of judgment from the organs representing the sufferers.
Knowing that our appeals have been in vain, and that the passion of vengeance is blinding the noble

without receiving the least check from the same authority which is relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgment from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the nobler vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of our countrymen, surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who for their so called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency with due deference and regret to relieve me of my title of Knighthood which I had the honour to accept from H.M. the King at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

Rabindranath Tagore
May 30. 1919

vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen, who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency to relieve me of my title of my Knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

RABINDRANATH TAGORE,
May 30, 1919

কয়েকটা মুহূর্ত সমস্ত দেহমন যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল।

দেশলাইএর কাঠিটা শেষ পর্যন্ত পুড়ে আঙুলে ছেঁকা লাগতে সাড় ফিরে পেয়ে চমকে পিছু হটে এসে শিকল তুলে দিয়েছিল দরজায়।

চেঁচামেচি করেনি, ডাকেনি কাউকে।

ডাকবে-ই বা কাকে?

উমেশ বাড়িতে নেই। আজ রাত্তিরের ডিউটি। ফিরবে অন্তত সেই রাত চারটের আগে নয়।

পাশের কোয়ার্টারের রাঙাবৌদিকে ডাকা যায় অবশ্য। হ্যাঁ তিনিও একা আছেন। জেগেও যে আছেন পাতলা দেওয়ালের ব্যবধানে শোবার ঘর থেকে এই একটু আগেই হামানদিস্তায় কি গুঁড়ো করবার আওয়াজে তা টের পেয়েছে।

কিন্তু রাঙাবৌদিকেও ডাকেনি। ডাকবেও না।

শোবার ঘরে এসেও সমস্ত শরীরের শির-শিরানিটা যায়নি কিন্তু।

কোণ কানাচগুলোয় খাটের নিচে, বাসন-কোসনগুলোর মধ্যে তোরঙ্গ বসানো চৌকিটার নিচে ভালো করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব দেখবার চেষ্টা করেছে।

তেমন তন্নতন্ন করে দেখবে আর কি করে? ছোট ঘরটা সামান্য যা জিনিসপত্র আছে, তাতেই ঠাসা। আলোটারও তেমন জোর নেই। দেখতে গেলে সব কিছু নাড়তে চাড়তে হয়।

সে সাহস হয়নি।

ঠিক করেছে আলোটা আজ জেলে রেখেই শোবে। সারা রাত আলো জেলে রাখার খেসারত দিতে হবে অবশ্য কোম্পানীর সে দরাজ দিল আর নেই যে, যত খুশি আলো জেলে রাখো বাঁধা টাকা দিলেই চলবে। এখন মিটার বসেছে তাদের এইসব অখদ্দে কোয়ার্টারেও।

তবু আলোটা জেলে রেখেই উমা দরজায় ছিটকিনি দিয়ে তক্তপোষটার ওপর উঠে বসেছে। শুতে পারেনি।

বুকের ভেতর যেখানটা হিম হয়ে গেছল সেখানটা যেন সম্পূর্ণ গলেনি তখনও।

দুটো করে ইঁটের ওপর বসিয়ে তক্ত-পোষটা উঁচু করে রাখা বলে কিছুটা যেন নিরাপদ বোধ করেছে।

অথচ এই ইঁট সাজিয়ে তক্তপোষ বসানোতে কি আপত্তিই তার ছিল। প্রথম বিয়ের লজ্জা ও কাটিয়ে উমেশকে মৃদু প্রতি-বাদ না জানিয়ে পারেনি।

উমেশ হেসে উঠেছিল। বলেছিল, শোনো রাঙা বৌঠান শোনো। ভাঙা তক্তপোষের জন্যে সোনার খুরো গড়াতে হবে।

রাঙাবৌদিই ঘরদোর সাজানো-গোছানো দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে এসেছিলেন।

তিনি উমাকেই সমর্থন করেছিলেন প্রথমে, ঠিকই ত বলেছে উমা। ঘরের মধ্যে খান ইঁট-গুলো বেখাপ্পা লাগে না!

একটা রীতিমত অশ্লীল রসিকতা করে উমেশ বলেছিল, ওঃ কি আমার ঘর, তার আবার বাহার!

সব কিছু মিলিয়ে কেমন একটা অস্বস্তি। উমা ঘর থেকে চলে গেছল। কানদুটো তার ঝাঁ ঝাঁ করে' উঠেছিল কিরকম একটা বিমূঢ় লজ্জায়। আত্মীয়া-অনাত্মীয়া কোন মেয়েছেলের সামনে এরকম কথা উচ্চারণ করা যায়, এ তখন তার কল্পনার বাইরে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে দেওয়ালে কি একটা নড়তে দেখে উমা শিউরে উঠেছে এখন।

না, কিছু নয়। দেওয়ালের একটা হুকে বাঁধা পাড়ের ফাঁজিটা হাওয়ায় দুলে উঠে তার ছায়াটা নড়ছে।

তক্তপোষটা মেঝে থেকে এতটা উঁচু হওয়ায় একটু বুঝি নিশ্চিন্ত।

জানাশোনা নানা সত্যমিথ্যা আজগুবি গল্প মনে এসেছে একসঙ্গে।

কিন্তু এতটা অস্থির হবার বুঝি কিছু নেই। ওঘরে ত শিকল তুলে দিয়েই এসেছে। এঘরের দরজাও বন্ধ। খাটের ওপর তার ভাবনাটা কিসের?

কাশির শব্দ শোনা গেছে পাশের কোয়ার্টারের উঠোনে। কাঠের ভাঙা গেটটা খোলা আর বন্ধ করার কর্কশ আওয়াজের সঙ্গে দমকে দমকে ওঠা একঘেয়ে কাশি।

অধরদা তাঁর শিফ্‌ট ডিউটি থেকে ফিরলেন।

রাঙাবৌদি দরজার খিল খুলে নিত্য-নৈমিত্তিক সম্ভাষণ জানালেন, ছাইপাঁশ গিলে আসোনি ত?

অধরদার কাশির শব্দ ঘরের ভেতর থেকে অনেকটা চাপা হলেও শোনা গেছে সমানে।

যতক্ষণ ঘুম না আসে ও আওয়াজ শুনতে হবে। রাঙাবৌদির অভ্যাস হয়ে গেছে নিশ্চয়। নইলে ঘুমোন কি করে।

অভ্যাস সবই অবশ্য হয়ে যায়। তারও

অনেক কিছু হয়ে গেছে। এমন কি উমেশের মুখের ওই নোংরা কথাগুলো পর্যন্ত।

তক্তপোষের তলায় কি একটা নড়ছে।

কান খাড়া করে উমা তক্তপোষের ওপর থেকে ঝুঁকে নিচেটা দেখবার চেষ্টা করেছে।

সেই নেংটি ইঁদুরটা। বিদ্যুতের মত এক ছুটে ঘরের এক কোণ থেকে বেরিয়ে তোরঙ্গের চৌকিটার নিচে সেঁধিয়ে গেছে। নিচে নামতে না নামতেই আবার কোথায় যে ছুটে গিয়ে ঘাপটি মারবে জিনিসপত্র তোলপাড় করেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিছুদিন ওটা ধরবার কি চেষ্টাই না হয়েছিল।

রাঙাবৌদি একটা ইঁদুর কল আনতে বলেছিল উমেশকে।

তাই নিয়ে কি কুৎসিত রসিকতাই করেছিল উমেশ।

আঃ উমেশ! রাঙাবৌদি মৃদু ভৎর্সনা করেছিলেন, কিন্তু মুখ চোখের চেহারা দেখে বোঝা গেছল উপভোগও করেছেন।

সেদিন উমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়নি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামী ও রাঙাবৌদির মুখের দিকে চেয়েছিল।

দুজনের কেউই সে দৃষ্টি লক্ষ্যও করেনি বোধ হয়, করলেও গ্রাহ্য করেনি।

রাঙাবৌদির আসল রূপটা কি!

এখানে আসার কিছুদিন পরেই প্রশ্নটা জেগেছিল।

তখন রোজ বিকেলে রাঙাবৌদি নিজে হাতে চুল বেঁধে দিতেন। একদিন চুল বাঁধতে বাঁধতে বলেছিলেন উমেশকে বলব ওই আজকাল কি সব নকল চুল হয়েছে, তাই এক গুছি কিনে আনতে।

উমার মাথায় চুল বেশ কম।

একটু বুঝি মনে মনে আহত হয়ে উমা বলেছিল, কেন? নকল চুল দিয়ে সাজতে হবে! আমার যা আছে এই টিকটিকির ল্যাজই ভালো।

রাঙাবৌদি হেসেছিলেন, তা তুই বলতে পারিস বটে! জোয়ান বরের জন্যে নকল সাজ দরকার হয় না। ওরা তুবড়ির পলতে, দেশলাই কাঠ ঘুঁটে যা কিছুর হোক আঁচ লাগতে না লাগতেই জ্বলে আছে। আমার মত ভিজে সলতে হ'ত ত বুঝতিস। সেঁকে সেঁকেও হয় না। নিজকেও আসল নকল মিলিয়ে বারুদ জোগাতে হয়।

অধরদার রাঙাবৌদির তুলনায় সত্যিই বয়স অনেক বেশী। যত না বয়স, তার চেয়েও বুড়িয়ে গেছেন রোগে অভাবে খাটুনিতে অত্যাচারে। হাঁপানি কাশি ত লেগেই আছে।

রাঙাবৌদির কথাগুলোতে মনের চাপা দুঃখই হয়ত একটু ফুটে বেরিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সব কিছু মিলিয়ে কি একটা স্থূল ইঙ্গিত উমাকে পীড়া দিয়েছিল বড় বেশী।

রাঙাবৌদির সাজগোজের শখটা যে বেশ আছে, তাতে সন্দেহ নেই।

এককালে হয়ত সত্যিই রাঙা নামের যোগ্য ছিলেন। এখন রঙটা মরা তামাটে হয়ে এলেও চেহারার বাঁধুনিতে আগেকার রূপ-যৌবনের ঝড়তিপড়তি যা আছে, তাও হেলা-ফেলার নয়। তার ওপর অভাবের সংসারেও যথাসম্ভব ছিমছাম হয়ে থাকেন সারাক্ষণ। এই বয়সেও চোখে কাজল পায়ে আলতা। নিজে মশলা গুঁড়িয়ে মিশিয়েও গন্ধ তেলটি মাথায় মাখা চাই।

বৃদ্ধ স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যেই এতসব করা শুনেও উমা ঠিক খুশী হতে পারেনি। খুশী হতে পারেনি আরো কয়েকটা ব্যাপারে।

আপনার জন কেউ নয়, কোন কুলের কোন সম্পর্ক নেই, শুধু এক কোম্পানীতে কাজ করার দরুণ পাশাপাশি কোয়ার্টার পাওয়া থেকেই কয়েক বছরের পরিচয়। কিন্তু উমেশের ওপর কর্তৃত্বটা দেখলে তা মনে হয় না। মনে হয়, ওই রুক্ষ ষণ্ডা মানুষটারও নাকে কোন সূক্ষ্ম অদৃশ্য দড়ি বাঁধা যাতে রাঙাবৌদি যখন খুশি টান দিতে পারেন।

টান অবশ্য যখন তখন দেন, তা বলতে পারে না, কিন্তু কর্তৃত্বটা লুকিয়েও রাখেননি।

নিজেই একদিন কি কথায় বলেছেন, নাম ধরে তোদের রাজযোটক করেছি বুঝেছিস। উমা নাম শুনে দেখার আগেই তোর বরকে বলেছিলাম, ওইখানেই বিয়ে করতে হবে। উমেশকে সামলাতে যদি কেউ পারে ত, উমাই পারবে। তাও রাজি করাতে কি কম বেগ পেতে হয়েছে। একদিন বলে কি জানিস? বলে জোর করে বিয়ে দিচ্ছ দাও, ফুলশয্যার রাত্রেই বৌটার গলা টিপে রেখে চলে যাবো। তখন মজা টের পাবে। আমি চুপ করে থেকে হেসেছি, উনি বলেছেন...

নির্বিকার মুখে রাঙাবৌদি অধরদার ইতর রসিকতাটাও শুনিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সে-দিন ইতর রসিকতাটার চেয়েও পীড়া দিয়ে-ছিল কি একটা অস্ফুট বিক্ষোভ। সেটা যে উমেশের ওপর রাঙাবৌদির অনায়াস অধিকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, তা নিজের কাছে স্বীকার করতেও সময় লেগেছে।

উমেশ অবশ্য ফুলশয্যার রাত্রে না তার-পরে কখনো গলা টিপে মারবার চেষ্টা করেনি। ষণ্ডা গুণ্ডা মানুষটা ব্যবহারে বা কথাবার্তায় পালিশ টালিশের ধার ধারে না, কিন্তু মারধোর দূরের কথা উমাকে দুটো কড়া কথাও কোনদিন শোনায়নি।

তবু উমার মন ধীরে ধীরে বিষিয়ে উঠেছে।

কড়া কথা যেমন নয়, তেমনি মিষ্টি কথাও উমেশ বলতে জানে না বা বলে না। তার নোংরা রসিকতাগুলোও সব রাঙাবৌদি সামনে থাকলে তখন।

সেসব রসিকতায় অশ্লীল ইতরতা দ্বিগুণ অসহ্য হয়েছে সেই কারণে।

উমার বাপের বাড়িতেও গরীবানির সংসার। কিন্তু তারা পড়তি ঘর। স্বচ্ছলতার যুগের সভ্যতা-ভব্যতা রুচির জীর্ণ আচ্ছাদনটা এখনো একেবারে খসে পড়েনি।

উমেশের সঙ্গে বিয়ের কথা হবার সময় বেশ একটু আপত্তি উঠেছিল। তার ভাইদের তুলনায় উমেশ অনেক বেশি রোজগার করে, কিন্তু বংশমর্যাদা বলে কিছু নেই, তার ওপর ইংরেজি একটা নাম থাকলেও আসলে হাতে-নাতে কাজ-শেখা মিস্ত্রী ছাড়া কিছু নয়।

শেষ পর্যন্ত অভাবের যুক্তিই বড় হয়ে সব দ্বিধা আপত্তি হটিয়ে দিয়েছিল।

উমার বেশ উপযুক্ত বয়সেই বিয়ে হয়েছে। অনেক কিছুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্যে মনকে প্রস্তুত করেই সে এসেছিল।

কিন্তু এই আবহাওয়ার কথাটা ভাবতে পারেনি।

কিছুদিন বাদেই রাঙাবৌদির কাছে চুল বাঁধতে যাওয়া সে বন্ধ করেছে। রাঙাবৌদি ডেকেছেন কোয়ার্টারের মাঝখানের নিচু দেওয়ালের ওপার থেকে। প্রথম দিন কাজের ছুতোনাতা করে এড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় দিন রাঙাবৌদি নিজেই এসেছেন ঠিক সময়ে। এসে দেখেছেন উমার চুল বাঁধা হয়ে গেছে তার আগেই। রাঙাবৌদি সে কথা আর তোলেননি। পরেও কোনদিন ডাকেননি বা আসেননি।

রাঙাবৌদি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন বা কিছু মনে করেছেন এমনও বলা যায় না। তাঁর ব্যবহারে কোন পরিবর্তনই দেখা যায়নি।
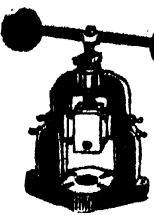
সকাল বেলা কোনোদিন এক বাটি তরকারি নিয়ে এসে বলেছেন, উমেশ ত আজ ভোরের ডিউটিতে গেছে। দুপুরে বাড়িতেই খাবে। বড়ির ঝালটা দিস। কদিন ধরে মাথা খেয়ে ফেলছে। পুরো বাটিটা যেন সামনে আবার ধরে দিস না। ও রাক্ষস তাহলে তোর জন্যে কিছু রাখবে না।

উমা পুরো বাটিটাই অবশ্য খাবার সময় ধরে দিয়েছে।

পরে আরেক দিন অন্য একটা তরকারি কিন্তু সামনে বারই করেনি। বাইরের বড় নর্দামায় ফেলে দিয়ে এসেছে এক সময়ে।

একদিন রাত্রে হঠাৎ উমেশকে জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা তোমার ত মাইনে বাড়ল। এখন এর চেয়ে ভালো কোয়ার্টার পাবে না?

পাবো না কেন! নিচ্ছে কে?—উমেশ তেলকালি মাখা প্যাণ্টটা ছাড়তে ছাড়তে বলেছে।

কেন? পেলেও তুমি নেবে না? উত্তরটা জেনেও ক্ষুণ্ণ স্বরে উমা জিজ্ঞাসা করেছে।

নেব কি করে শুনি। উমেশ যেন উমার সোজা কথাটা বুঝতে না পারায় অবাক হয়েছে—ডবল কোয়ার্টার ত আর আমায় দেবে না। ওরা থাকবে কোথায়?

উমার ইচ্ছে হয়েছে চীৎকার করে বলে, জাহান্নমে। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করেছে বেশ একটু কষ্ট করে?

নিজের দিক থেকে সম্পর্ক এরপর সে একরকম ঘুচিয়েই দিয়েছে।

অতিবড় প্রয়োজনেও সে পাশের কোয়া-র্টারের চৌকাঠ মাড়ায় না।

মাঝে দু চারদিন প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপের চেষ্টাতেও বেরিয়েছে। সুবিধে হয়নি মোটেই। এদিকের কোয়ার্টারগুলোতে বেশীর ভাগই অন্ধ্র মদ্র পাঞ্জাবী। বাঙালীর একটি কোয়ার্টার যা আছে অনেক দূরে, সেখানেও স্ত্রীলোক বলতে একজন অতি-বৃদ্ধা মহিলা কানে কম শোনার দরুণ যাঁর সঙ্গে আলাপ চালাতে শেষ পর্যন্ত গলা ধরে যায়।

সেখান থেকেই এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে পাতলা দেওয়াল ভেদ করে আসা আওয়াজ আর গলার স্বর শুনে পাথর হয়ে গেছে এক নিমেষে।

একটা চাপড়ের সঙ্গে হাসির শব্দ। তার-পরই শোনা গেছে, জ্বালাতন করিসনি। যা, তোর বৌ এসে গেছে এতক্ষণে বোধহয়।

আসুক। বিয়ে তুই দিলি কেন?—উমেশের গলা।

না, তুই ধম্মের ষাঁড় হয়ে থাকবি—আমার বুঝি কলঙ্কের ভয় নেই।

হ্যাঁ, বুড়ো বাহাত্তুরের বৌ-এর আবার কলঙ্কের ভয়। কলঙ্ক হলে বর্তে যায়।

উমা আর শুনতে চায়নি। ইচ্ছে করেই দরজার একটা পাল্লা সশব্দে ঠেলে দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেছে। সমস্ত কথার মধ্যে একটা শব্দ তার কানের ভেতর বিঁধছে বিষাক্ত ছুঁচের মত। উমেশের সঙ্গে রাঙা-বৌদির সম্পর্কটা কোন পর্যায়ের গোপনে ব্যবহার করা ওই একটা শব্দেই তা দিবা-লোকের মত সুস্পষ্ট।

খানিক বাদেই উমেশ বাড়ি ঢুকেছে।

কি? ঘরে তালা দিয়ে গেছলে কোথায়? আমিত ভাবলাম, পালিয়েই গেলে বুঝি!

গেলে লুকিয়ে পালাব না। জানিয়েই যাবো!—উনুনটা সিক দিয়ে অযথা খোঁচাতে খোঁচাতে উমা বলেছে।

ও বাবা! এও যে ফোঁস করতে শিখেছে! উমেশ হেসে উঠে দু কোয়ার্টারের মাঝখানের দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে চীৎকার করেছে,—ও রাঙা বৌঠান শোনো শোনো দেখে যাও।

কি হল আবার! কি দেখব!—রাঙা বৌদি দেওয়ালের ওধারে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর গলায় কৌতুকের স্বর উমার সারা গায়ে যেন বিষ ছিটিয়েছে।

কেঁচো বলে যা গছালে তা যে কেউটে হয়ে দাঁড়াল গো!—যথারীতি নোংরা একটা রসিকতা করে উমেশ শেষে বলেছে, এখন সামলাবে কে?

কেঁচো খুঁচিয়ে কেউটে করে থাকলে সামলাবে তুমি! পাড়ার লোকের ত দায় নয়!

হ্যাঁ পাড়ার লোক শুধু আছে তামাশা দেখতে!—উমেশ আরেকটা বিশ্রী কথাও তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে হেসে উঠেছে। ওদিক থেকে রাঙা বৌদির হাসিও শোনা গেছে।

দাঁতে দাঁত চেপে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে উমা বলেছে,—হাসি তামাশা দেওয়াল ডিঙিয়ে করার দরকার কি! ও বাড়ি গেলেই ত পারো?

গলার স্বরে ও কথার মধ্যে তীব্র শ্লেষের হুল যা ছিল তা কিন্তু উমেশের ওপর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

ঠিক বলেছ। তুমি হেঁসেল ঠেলো, আমরা হাসি তামাশা করি গিয়ে।—বলে অম্লান বদনে সে বেরিয়ে গেছে।

উমেশ হয়ত কিছুই বোঝেনি, কিন্তু সেই দিন থেকে একটিবার বাদে রাঙা বৌদি আর এ বাড়িতে পা দেন নি।

উমেশের সেটা নজরে পড়েনি এইটেই আশ্চর্য, তবে কোন কিছু লক্ষ্য করবার মানুষ সে নয়।

রাঙা বৌদি এসেছিলেন এই কদিন আগে হঠাৎ দুপুর বেলা। অধরদা উমেশ দুজনেই তখন ডিউটিতে গেছে।

রান্নাঘরের বাইরে সরু রোয়াকটায় বসে উমা তোলা উনুনটায় মাটি লেপছিল। রাঙা বৌদিকে এভাবে ঢুকতে দেখে ভুরু কুঁচকে মুখ তুলে তাকিয়েছে।

রাঙাবৌদি তার দিকে নীরবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ঈষৎ হেসেছেন। হাসিটা কিন্তু স্বাভাবিক প্রসন্নতার নয়, বেশ একটু বাঁকা।

হাসির সঙ্গে মেলানো গলার স্বরেই তিনি বলেছেন,—সম্পর্ক তুই রাখতে না চাস

রাখিস নে। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাসনি, যা পেয়েছিস আমি হাত উবড়ে করেছি বলেই পেয়েছিস। ভাগ রাখবার জন্যে দিই নি। তবে ইচ্ছে থাকলে এখনো শুধু কড়ে আঙুলে নেড়ে নিয়ে যেতে পারতাম।

কথাগুলো বলেই রাঙাবৌদি চলে গেছলেন।

উপযুক্ত জবাব দিতে না পেরে উমার ভেতরটা আরো বেশী জ্বলছে।

অবরুদ্ধার কাশিটা আজ যেন আরো বেড়েছে। মনে হচ্ছে দম যেন বন্ধ হয়ে যাবে।

শব্দটা যেন কাশির নয় আর কিছুর। দেওয়ালগুলো কাঁপিয়ে উঠোন ছাড়িয়ে বহু দূরে সেই আকাশের শেষ পর্যন্ত চলে গিয়ে আবার ফিরে আসছে।

* * *

উমা ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। কখন নিজের অজান্তেই বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না।

ঘুমের মধ্যে সেই দৃশ্যটাই প্রায় হুবহু আবার দেখেছিল। হরেক রকম জিনিসে ঠাসাঠাসি অপরিসর ভাঁড়ার ঘরটা। ও ঘরের বাতিটা খারাপ হয়ে গেছে বলে, দেশলাই জ্বেলে কেরোসিনের বোতলটা আনতে গেছল। উমেশ রাত চারটেয় ফিরেই চা চাইবে। অ্যালুমিনামের বাটিতে একজনের মত চায়ের জল কাঠকুটোয় একটু কেরোসিন ঢেলেই ফুটিয়ে নেওয়া যায়।

কেরোসিনের বোতলের জন্যে কোণের দিকে হাত বাড়াবার আগেই দেশলাই এর আলোয় সেই সমস্ত শরীর হিম করা চোখ দুটো দেখেছে। তারপর সেই ধীরে ধীরে পাক ছাড়ানো মৃত্যুর কুণ্ডলী। চোখ দুটোর হিম ক্রূর দৃষ্টি যেন তাকে অসাড় করে দিচ্ছে ক্রমশ। প্রাণপণে সেই সর্বনাশা সম্মোহ কাটিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। এবারে কিন্তু পেছনের দরজা বন্ধ। সে আকুল হয়ে ছুটে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আঘাত করেছে সমস্ত শক্তি দিয়ে বার বার। দরজা খুলছে না।

ঘুমের ঘোর কাটার সংগে সংগে উমা টের পেলে সে নিজে না দিক সাঁত্যই তার দরজায় ঘা পড়ছে।

উমা! উমা! দরজা খোল।

এ ত রাঙাবৌদির গলা। সমস্ত মনটা এক মুহূর্তে আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে তিক্ত হয়ে উঠল।

দরজা অবশ্য সে খুললে, খুলে বেশ একটু কঠিন স্বরেই বললে,—কি হয়েছে কি?

তোদের সেই মধুর শিশিটা আছে না? উমেশ সেবার এনেছিল।

তার আর কতটুকু আছে!

যেটুকু থাক তাতেই হবে! আমার এক ফোঁটা নেই। ওঁর টান আর বুকের কষ্ট ভয়ানক বেড়েছে। সেই বড়িটা মোড়ু না খাওয়ালেই নয়, এই রকম অবস্থা হলেই কবিরাজ খাওয়াতে বলেছিল।—রাঙা-বৌদিকে এমন অস্থির হয়ে কথা বলতে কখনো শোনে নি বটে। স্বামীর জন্যে যেন তাঁর সাত্যই কত ভাবনা!

কিন্তু এ অভিনয়ে মন আরো বিরূপ হয়ে উঠল। বললে,—কিন্তু সে শিশিটা ভাঁড়ারে কোথায় রেখেছি মনে নেই!

মনে থাকবার দরকার নেই আমি খুঁজে নিচ্ছি।

রাঙাবৌদি স্টোর রুমের দিকে এগোলেন।

কিন্তু...নিজের প্রায় অগোচরেই বলে ফেলতে গিয়ে উমা নিজেকে সামলালে।

ও ঘরে ত আলো নেই!—বলে কথাটা শেষ করলে।

তোর দেশলাইটা দে তাহলে।—রাঙাবৌদি নাছোড়বান্দা।

উমা দেশলাইটা দিলে। মনকে তখন সে বুঝিয়েছে, যাই এখন হোক তার আর কোন দায়িত্ব নেই।

রাঙাবৌদি ঘরের শিকলটা গিয়ে খুললেন।

উমা প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে দরজার একটা পাল্লায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পর পর সমস্ত শব্দগুলো শুনল।

রাঙাবৌদি দেশলাই জ্বাললেন। সামনের জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে তিনি বাঁধানো তাক-গুলোর কাছে যাচ্ছেন খুঁজতে। তাঁর প্রথম দেশলাই-এর কাঠিটা বোধ হয় নিভে গেছে, তিনি আরেকটা জ্বাললেন। একটা চাপা চমকে ওঠার শ্বাস কি? কিছুক্ষণ, তারপর সব একেবারে নিস্তব্ধ। রাঙাবৌদি বেরিয়ে এসে দরজায় আবার শিকল তুলে দিলেন।

বললেন,—না দেশলাই এর কাঠিতে হবে না। তোদের ত আবার কুপি নেই। আমার কুপিটা জেলে নিয়ে আসি।

রাঙাবৌদি চলে গেলেন।

উমার মনের ভেতরটায় কি হচ্ছে তা বোঝবার ক্ষমতা তার নেই। একটা দুর্বোধ অনুভূতির কুণ্ডলী তার বুকের ভেতরে থেকেও যেন পাক দিয়ে উঠেছে।

রাঙাবৌদি কুপি নিয়ে ফিরে আসার পর সেটা যেন স্পষ্ট রূপ পেল।

রাঙাবৌদি দরজায় শিকলি খুলতে যাচ্ছেন।

দাঁড়ান—বলে উঠল উমা,—আপনি পারবেন না। আমি খুঁজে দিচ্ছি।

না!—রাঙাবৌদি ফিরে দাঁড়ালেন,—তোকে আসতে হবে না। ঘরে একটা সাপ আছে। আগে মারতে হবে।

কুপির আলোটাই লক্ষ্য করেছিল, এখন রাঙাবৌদির আরেক হাতের লাঠিটাও চোখে পড়ল।

সাপ বলে বিস্ময়ের ভান করবার আর প্রবৃত্তি হল না। এগিয়ে গিয়ে উমা বললে, তাহলে মধুর শিশিটা কি এখন না খুঁজলে নয়?

না নয়,—কুপির আলোতেই রাঙাবৌদির অদ্ভুত হাসিটা একটু দেখা গেল,—অন্তত বড়িটা ঠিকমত দিয়েছি এটুকু ত জানব।

তাহলে আমি আলো ধরছি, চলো।—উমা গিয়ে কুপিটা হাতে নিলে।

নে তবে!—এই মুহূর্তেও অদ্ভুত পরি-হাসের সুরে রাঙাবৌদি বললেন, আড়াল দেবার একটা নকচে এখনো আছে যখন, সেটা রাখবার চেষ্টা ত করতে হবে। এ ঝক্কিটা তাই একা আমায় নিতে দিলেই পারতিস!

সামান্য এই কুপির আলোতেই এতদিনে কি আসল চেহারাটা উমা দেখতে পায়?
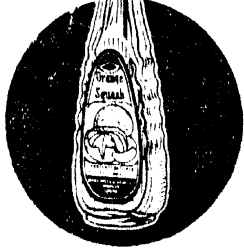
উত্তর না দিয়ে উমা নিজেই ঘরের শিকলিটা খুলে ফেললে।
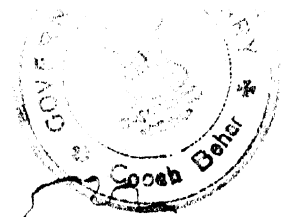
আধুনিক কবিতায় প্রকৃতি

বুদ্ধদেব বসু

এক অতি তরুণ বাঙালি কবি, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, পাঠকসমাজে বিক্ষোভ তুলে ঘোষণা করেছিলেন যে ভগবান ও মানুষ পরস্পরের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী, কেননা যে-আদিমানব বিধাতার সৃষ্টি সে অসহায়ভাবে পাশব বৃত্তির অধীন, কিন্তু সেই মানুষই তার আপন সাধনার দ্বারা নিজেকে সংস্কৃত ও রূপান্তরিত করেছে, হ'য়ে উঠেছে কবি ও শিল্পী, ঈশ্বরের মতোই স্রষ্টা। নবযৌবনের স্পর্ধা বলতে যা-কিছু বোঝায়, এই কবিতাটি তার দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হ'তে পারে, এবং এর প্রথম প্রকাশের কাল আমাদের সাহিত্যপত্রিকায় বিদ্রোহের ঋতু ব'লে চিহ্নিত। পরবর্তী দশকে এক প্রবীণ মেধাবী সমালোচক কবিতাটির উদ্দেশে বক্রোক্তি ক'রে বলেন যে ভগবান যদি মানুষকে জান্তব লালসাদি দিয়ে থাকেন, তার চিত্তের উন্নত প্রেরণাগুলিও তারই দান; আমাদের দৈহিক ক্ষুধার উৎস যদি ঈশ্বর হন, সেই ক্ষুধাকে পরাজিত ও রূপান্তরিত করার ক্ষমতাও তাঁরই কাছে আমরা পেয়েছি। সমালোচকের যুক্তি অকাট্য; এদিক থেকে দেখলে, সন্দেহ নেই, কবিতাটিতে গূঢ় একটি ভ্রান্তি ধরা পড়ে; লেখক যেন, তাঁর খেয়াল অনুসারে, তাঁর কুবৃত্তির জন্য দায়ী করছেন ঈশ্বরকে, কিন্তু ভালোটুকুর জন্য নিজে কৃতিত্ব নিতে চাচ্ছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ যুক্তিসহ কবিতা হয়তো শশবিষাণেরই নামান্তর; অন্ততপক্ষে এ-কথা আমরা সকলেই জানি যে এই ধরনের 'ভ্রান্তি'র উপরেই জগতের বহু কবিতা প্রতিষ্ঠিত। সত্যি বলতে, কবিতাটি যুক্তির দিক থেকেও সমর্থনযোগ্য হ'য়ে ওঠে, যদি আমরা 'ভগবানে'র বদলে 'প্রকৃতি' শব্দটি ব্যবহার করি। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি উত্তেজনার উৎসস্থল প্রকৃতি; সে আমাদের অনবরত আহ্বান করছে জৈবতার স্রোতে গা ঢেলে দিতে; কিন্তু কবিতা একটি চিন্ময় পদার্থ, তা সৃষ্টি করতে হ'লে অন্তত কিছুক্ষণের মতো জৈবধর্মকে অস্বীকার করতে হয়, ঘোষণা করতে হয় চিত্তবৃত্তির ক্ষণিক ও বলীয়ান স্বাধীনতা। অতএব কবিতা লেখার কাজটিকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বললে ভুল হয় না।

আমাদের দেশে বহুকাল ধ'রে একটা কথা চ'লে আসছে যে কবিরা প্রকৃতি-প্রেমিক; অর্থাৎ তাঁরা ফুল পাখি রাখাল ভালোবাসেন, কলকাতার চাইতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে থাকেন সাঁওতাল পরগনায়। ধারণাটির আদি উৎস রুসো, আমরা পেয়েছি ওআর্ডস্বার্থ ও ইংরেজ রোমান্টিকদের কাছ থেকে; আমাদের রবীন্দ্রনাথ, মাঝে-মাঝে আশ্চর্যরকম উল্টো কথা ব'লে থাকলেও, তাঁর কবিতায় ও ব্যক্তিগত আচরণে আজীবন এর বিপক্ষে সমর্থন জুগিয়ে গেছেন। এক বিগত যুগের সাহিত্যে সার্থক হয়েছে এই প্রকৃতিপূজা, কিন্তু মাত্র দু-তিন দশকের ব্যবধানে এই করুণাময়ী দেবীটি কী-রকম করালী মূর্তি ধারণ করলেন, তা লক্ষ করলেই আমরা বুঝতে পারি যে কেন আজকের দিনে, প্রভূত চেষ্টা ও সদভিপ্রায় সত্ত্বেও, হ্রদতটবাসী যাজককণ্ঠ ইংরেজ কবিকে কিছুতেই ঠিক ভালোবাসা যায় না। যাকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলি—আর তার মধ্যে উনিশ শতকের অবদানও প্রচুর—তার একটি মূলসূত্র হ'লো প্রাণ ও মনের দ্বৈত, প্রকৃতি ও চৈতন্যের বিরুদ্ধতা। বোদলেয়ার ও ডস্টয়েভস্কি, মালার্মে ও নীটশে, এডগার পো ও অস্কার ওয়াইল্ড—উনিশ শতকের এই লেখকেরা, তাঁদের ভিন্ন-ভিন্ন ধরনে, এই কথাটি ব্যক্ত করেছেন যে নির্বোধ ও বিশৃঙ্খল প্রকৃতির উপর চৈতন্যের স্বাক্ষর মুদ্রিত করাই মনুষ্যধর্ম। এর উচ্চারণ প্রথম যাঁর মধ্যে স্পষ্ট হ'লো তিনি বোদলেয়ার; তাঁর ধারণায় নারী স্বাভাবিক ব'লেই ঘৃণ্য, এবং এক উদ্ভিদহীন ধাতুনির্মিত প্যারিস তাঁর স্বপ্নকামনা। যে-সব 'মূক ও নিশ্চেতন বস্তু' ওআর্ডস্বার্থের উপাস্য, বোদলেয়ারের 'আদর্শ' থেকে তারা নির্বাসিত হ'লো, কেননা তাদের উদ্ভবের জন্য মানুষের চেষ্টার প্রয়োজন করে না, এবং তাদের অনাদৃত বংশবৃদ্ধি কবিকে মনে করিয়ে দেয় যে কোনো-কোনো অন্ধ প্রক্রিয়া থেকে মানুষেরও নিস্তার নেই। স্মর্তব্য, যিনি ওআর্ডস্বার্থের প্রধান বন্ধু, সহকর্মী ও প্রচারক, তিনি স্বয়ং প্রকৃতির 'বিরুদ্ধে' এক অলৌকিক শিল্প-প্রসাদ নির্মাণ করেছিলেন; কোলরিজ যদি জর্মান দর্শনে আচ্ছন্ন হ'য়ে কবিতাকে ত্যাগ না করতেন, তাহ'লে হয়তো আরো আগেই রোমেই আধুনিক কবিতার জন্ম হ'তো।

যাঁরা ঐতিহাসিক অর্থে রোমান্টিক, তাঁদের কাছে প্রকৃতি ও ভূদৃশ্য প্রায় সমার্থক ছিলো, অরণ্য পর্বত ও নির্ঝরিণীর এক সন্নিপাতকে মানুষের ত্রাতা ব'লে ভেবেছিলেন তাঁরা। কোলরিজ সেই দৃশ্যাবলিকে অতিপ্রাকৃতের স্তরে উন্নীত ক'রে মধ্যস্থলে কবিতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন; এক বনেদি রোমান্টিকের হাতেই রোমান্টিক প্রকৃতির প্রথম পরাজয় ঘটলো। আর বোদলেয়ার, কাব্যে নবযুগের প্রবর্তক, সেই সব বিবর্ণ পট সরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হলেন না; আধুনিক নগর তাঁর রঙ্গমঞ্চ, আর তাঁর কুশীলব—নিষ্পাপ ও প্রায় গাছপালার মতোই মনোহীন মাইকেলরা নয়, নগরের উচ্ছিষ্ট সেই বস্তিবাসীরা, যারা একাধারে অকিঞ্চন ও পাপোন্মুখ, পতিত ও মুমুক্ষু। কিন্তু এই সবই—পরবর্তী ছন্দোমুক্তি বা ব্যাকরণ-লঙ্ঘনের মতো, এক গভীরতর পরিবর্তনের উপসর্গ। মৌলিক কথাটি প্রকৃতি।

প্রকৃতির একটা অসুবিধে এই যে ঐ একটিমাত্র শব্দের দ্বারা আমরা সব-কিছুই বোঝাতে পারি, আবার অবস্থাবিশেষে

তার একেবারে অর্থহীন হবারও বাধা নেই। যা তার মধ্যে নেই, আর থাকতেও পারে না, তেমনি কোনো-কোনো গুণ প্রকৃতির উপর আরোপ ক'রে নিয়ে তবেই মানুষ তার অর্চনা করতে পারে। 'মেঘদূত' কাব্যে প্রকৃতিবর্ণনা একদিক থেকে খুবই বাস্তবধর্মী; যক্ষ প্রায় মানচিত্র মিলিয়ে-মিলিয়ে মেঘের গতিপথ নির্দেশ করছে; কিন্তু ঐ সব নদী, পর্বত বা তরুপল্লব মুহূর্তের জন্যও তার বিরহজ্বালা প্রশমিত করতে পারছে না। রোমক কবি সপ্তাহান্তে সমুদ্রতীর আকাঙ্ক্ষা করেছেন, কিন্তু তাঁর কাছে তা ক্লান্ত স্নায়ুর পুনরুজ্জীবনের একটি উপায়মাত্র, সুনিদ্রা বা স্বাস্থ্যকর বায়ুর চাইতে অধিক মূল্যবান নয়। কিন্তু রুসো তাঁর পার্বত্য দেশে বিচরণ ক'রে সব শোকের সান্ত্বনা পেয়েছেন, আল্পস-এর দৃশ্য তাঁকে ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছে; আর রবীন্দ্রনাথ এক আত্মহারা মুহূর্তে ব'লে উঠেছেন—'এই তো তোমার প্রেম, ওগো/হৃদয়হরণ/এই যে পাতায় আলো নাচে/সোনার বরন।' আশ্চর্যের বিষয় এই যে আলেকজান্ডার পোপ, যাঁকে বলা হয় যুক্তিবাদের প্রতিভূ, এবং পোপ-হন্তা ওআর্ডস্বার্থ — এ'দের দু-জনেরই জপমন্ত্র প্রকৃতি : পোপ-এর 'সর্বাগ্রে অনুসরণ করো প্রকৃতিকে' আর তাঁর উত্তরসাধকের 'প্রকৃতি হোন তোমার গুরু' প্রায় আক্ষরিক অর্থে একই উপদেশ। বলা বাহুল্য, দু-জনে দুই ভিন্ন অর্থে 'প্রকৃতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন; পোপ-এর কাছে তা-ই স্বাভাবিক যা স্বভাবী, যুক্তিনিষ্ঠ ও বিধিসম্মত, এবং রুসো অথবা ওঅর্ডস্বার্থ যাকে স্বাভাবিক বলেন, তা সভ্যতার পাপস্পর্শরহিত এক অব্রণ পূর্ণতার প্রতিচিত্র। অর্থাৎ যুক্তিবাদী ও রোমান্টিকের 'প্রকৃতি' সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের আধার, কিন্তু উভয়েই প্রকৃতি নামক ব্যাপারটিকে নৈতিক মূল্যে গরীয়ান ক'রে দেখেছিলেন; স্বাভাবিক বলতে তাঁরা যা বুঝেছিলেন সেটাই যে ভালো সে-বিষয়ে কোনো পক্ষেরই সন্দেহ ছিলো না। স্বীয় ধারণার অনুসরণ ক'রে সুইফট যেমন এক অসহ্য অশ্বসমাজকে নমস্য ক'রে চিত্রিত করলেন রুসো তেমনি প্রচার করলেন যে 'মহান বর্বর'ই সর্বমানবের গুরুস্থানীয়। আমরা আশ্চর্য হই না, যখন লিসবনের ভূমিকম্পের খবর শুনে ভাবোন্মাদ রুসো অবিচলিত থাকেন, আর যুক্তিবাদী ভলতেয়ার সরোষে প্রতিবাদ ক'রে ব'লে ওঠেন : 'কী সর্বনাশ! এ যে দেখছি বুদ্ধির সিংহাসনত্যাগ!'

যুক্তিবাদীরা প্রকৃতির কাছে বুদ্ধির আশা করেছিলেন, আর রোমান্টিকের প্রকৃতি ছিলো হার্দ্যগুণের অফুরন্ত ভান্ডার, যা-কিছু স্নিগ্ধ, সুখদ ও কল্যাণকর, রুসো তারই নাম প্রকৃতি দিয়েছিলেন। এর কোনোটাই তথ্যের সঙ্গে মেলে না। পোপের নিয়মনিষ্ঠ 'প্রকৃতি'র অস্তিত্ব নিউটনের গণিতে থাকলেও মানুষের স্বভাবে বা ভবিতব্যে নেই, তেমনি রুসোর ভৌগোলিক শুশ্রূষাকারিণীটিও আমাদের অভিজ্ঞতার একটি অংশ মাত্র। এক মিনিটের ভূমিকম্পে হাজার মানুষ প্রাণ হারালে তা নিয়ে পরিতাপ করা মনুষ্যধর্ম, কিন্তু তাকে বুদ্ধির স্খলন বললে বুদ্ধিকেই অপমান করা হয়। কেননা যে-শক্তির দ্বারা ভূমিকম্প প্রসূত হ'য়ে থাকে, তার মধ্যে কোনো বোধ বা বুদ্ধি নেই, কখনো ছিলো না, তা নিতান্তই চিরন্তনভাবে নিশ্চেতন। এবং এই শক্তিও প্রকৃতি। এই সহজ কথাটি যদি ওঅর্ডস্বার্থ বা ভিক্তর উগোর মনে কখনো প্রতিভাত হ'তো, তাহ'লে ১৮৩২ সালে লন্ডনে ও প্যারিসে কলেরার মহামারী দেখে তাঁরা প্রকৃতির মঙ্গলময়তার বিষয়ে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য সন্দিহান হতেন। কিন্তু

প্রাণতত্ত্বের দিক থেকে প্রকৃতির স্বরূপ কী-রকম, তা ডারুইনের গবেষণার আগে স্পষ্ট হয়নি; এবং সর্বান্তঃকরণে রোমান্টিকতার পক্ষপাতী হ'য়েও আমরা একথা মানতে বাধ্য যে কলেরার বীজাণুটা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরপারে বিরাজ করছে, কিন্তু মেঘ বা নির্ঝরিণীর 'সৌন্দর্য' একান্তভাবে মানুষেরই হৃদয়াশ্রিত। তবু টেনিসনের 'নখদন্তরক্তিম' প্রকৃতি'র ধারণায় আজকাল আমরা সাড়া দিতে পারি না, এই পংক্তিতে যে-খেদ ও সন্ত্রাস প্রকাশ পেয়েছে সেটা আমাদের অনর্থক ব'লে মনে হয়। চিতাবাঘ যে হরিণকে বধ করে সেটাকে কষ্টের বা ভয়ের কথা বলা যায় না, কেননা চিতাবাঘের পক্ষে ঐ কর্মই 'স্বাভাবিক'। এই যাকে 'স্বভাব' বা 'প্রকৃতি' বলছি সেটা ভালোও নয় মন্দও নয়, সুন্দর বা অসুন্দর নয়, আমাদের নিন্দা প্রশংসা কোনোটাই প্রাপ্য নয় তার, কেননা তা সম্পূর্ণ অ-নৈতিক, তার ব্যবহারে কোনো বিকল্প সম্ভব নয়, এক অন্ধ অস্তিত্বই তার সর্বস্ব। কিন্তু মানুষ 'আছে' বললে তার বিষয়ে সব কথা বলা হয় না, তৎক্ষণাৎ যোগ করতে হয় যে সে কোনো-কিছু বা অন্য কিছু হ'তে পারে। তাই সদসৎ বা সৌন্দর্যের প্রশ্ন একমাত্র মানুষের পক্ষেই প্রাসঙ্গিক। শুধু মানুষই পারে বীর, সন্ত অথবা শিল্পী হ'তে, শুধু তার পক্ষেই সম্ভব হিংসা বা আত্মত্যাগ, চেষ্টা, চিন্তা, সাধুতা বা দুষ্কৃতি। পৃথিবীতে প্রাণী যদিও অসংখ্য, মানুষের তুলনায় তাদের সপ্রাণ জড় বললে ভুল হয় না; চেতন সত্তা একমাত্র মানুষেরই আছে। তাই মানুষ প্রকৃতিচ্যুত, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার নিদ্রাময় মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্ছিন্ন, তার চৈতন্যের প্রভাবে সে যা-কিছু হ'তে চায়, হ'তে পারে, এবং কখনো-কখনো হ'য়েও থাকে, তার সমস্তটাই প্রকৃতির বিরোধী। কবিদের মধ্যে এই কথাটি প্রথম উপলব্ধি ও উচ্চারণ করেন শার্ল বোদলেয়ার, এবং তিনিই আধুনিক কবিতার জনক।

তিনটি বিখ্যাত কবিতা পাশাপাশি উপস্থিত ক'রে প্রকৃতি ও মানুষের সম্বন্ধ-নিরূপণের চেষ্টা করবো। কীটসের 'ওড টু এ নাইটিঙ্গেল'-এ কাব্যকলা ও পাখির গানকে এক ব'লে ধ'রে নিতে হবে, নয়তো কবিতাটি অর্থহীন ভাবোচ্ছ্বাসে পরিণত হয়। কী ভেবেছিলেন কীটস, কী ভাবছিলেন, যখন অকস্মাৎ আনন্দের আবেগে তিনি ব'লে উঠলেন—'হে অমর বিহঙ্গ, মৃত্যুর জন্য জন্ম হয়নি তোমার, কোনো ক্ষুধিত বংশাবলি তোমাকে বিচূর্ণিত করে না!' ফুল, মাছি বা মানুষের মতো নাইটিঙ্গেল পক্ষীও যে মরণশীল, ঐ পংক্তিটি রচনা করার মুহূর্তে কবি তা ভুলে গিয়েছিলেন, এ-রকম প্রস্তাব করাও হাস্যকর; মনে হ'তে পারে যে বংশানুক্রমে পাখির গানের ধারাবাহিকতাকেই কবি 'অমরতা' বলছেন কিন্তু এই তত্ত্ব অনুসারে তো অন্যান্য জীবও একই প্রকার 'অমর', হঠাৎ শুধু নাইটিঙ্গেলটা ব্যতিক্রম হবে কেন? আসল কথা, কীটস যাকে অমর ব'লে ভাবছেন, এবং জীববংশের তুলনায় যার অমরতা আমরা মেনে নিতে আপত্তি করবো না, তা ঐ কবিতাতেই পূর্বোল্লিখিত 'poesy', পাখির গান এখানে শিল্পকলারই নামান্তর। তবু, এই কবিতার দুর্বার সম্মোহন সত্ত্বেও, এ-কথা আমরা ভুলতে পারি না যে পাখির গান শিল্পকলা নয়, বরং ও-দুই বস্তুর বৈপরীত্য স্বতঃসিদ্ধ, কেননা পাখির গান নিতান্তই প্রাকৃত, আর শিল্প মানুষের সাধনার ফল।

পরবর্তী 'গ্রীশিয়ান আর্ন' কবিতায়, একটি শিল্পকর্মকে বিষয় রূপে বরণ ক'রে কীটস নিজেই এই ভুল সংশোধন করেছিলেন; কিন্তু যা মনে হয় নাইটিঙ্গেল' কবিতার সচেতন প্রতিবাদ তা, আশ্চর্যের বিষয়, ধ্বনিত হ'লো সেই বাঙালি কবির রচনায়, যাঁকে আমরা প্রকৃতির দুলাল ব'লে ধারণা ক'রে থাকি। 'পাখিরে দিয়েছো গান, গায় সেই গান/তার বেশি করে না সে দান/আমারে দিয়েছো স্বর, আমি তার বেশি করি দান/আমি গাই গান।' এই কবিতা লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ কীটসের কথা ভেবেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি, জানবার তেমন প্রয়োজনও নেই; আসল কথাটা এই যে পক্ষীরূপী প্রকৃতির বিরুদ্ধে স্থাপন ক'রে মানুষের চেষ্টাপ্রসূত কবিতাকে তিনি জয়ী করেছেন এখানে। আর ইয়েটস, তাঁর 'Sailing to Byzantium' কবিতায়, যেন কীটসের প্রেতকে আহ্বান ক'রে সোজাসুজি ব'লে দিচ্ছেন যে তাঁর 'অমর বিহঙ্গ' বালকের কল্পনামাত্র। 'নাইটিঙ্গেল' কবিতায় কীটস যা বলতে চেয়েছিলেন, এবং তা থেকে যে-অর্থ

নিষ্কাশন ক'রে নিয়ে আমরা তাকে ভালো-বেসে থাকি, ইয়েটসের কবিতার প্রথম স্তবকে সেই কথাটি প্রাঞ্জল হ'লো:

That is no country for old men. The young
In one another's arms, birds in the trees,
—Those dying generations—at their song,
The salmon-falls, the mackarel-crowded seas,
Fish, flesh or fowl, commend all summer long
Whatever is begotten, born, and dies.
Caught in that sensual music, all neglect
Monuments of unageing intellect.

কেমন লঘুভাবে এই প্রবীণ কবি তাঁর তরুণ পূর্বসূরিকে স্মরণ করছেন এখানে, যেন প্রসংগক্রমে অথচ নির্ভুলভাবে তাঁর জবাব দিচ্ছেন। যে-পাখি কীটসের কবিতায় 'ক্ষুধিত বংশাবলি'র আক্রমণের অতীত, সেই পাখিরই বংশাবলি এখানে মুমূর্ষু; পাখির প্রসংগে 'generations' শব্দটির ব্যবহারে ইয়েটসের এই অভিপ্রায় সুস্পষ্ট যে পাঠকের যেন কীটসের পংক্তিটি মনে পড়ে। কোথাও নেই স্থিতি—শুধু শিল্পকর্মে আছে; কোথাও প্রমিতি নেই, আছে শুধু 'মনীষার মিনারে'। প্রজনন ও সৃষ্টির মধ্যে ব্যবধান যে কত বিরাট তারই ঘোষণা আমরা শুনতে পাই এখানে: রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতাকে পৃথক ক'রে নেয়াও সহজ হয়। ইংরেজি ভাষার এই দুটি রত্নের মধ্যে যে-ব্যবধান ছড়িয়ে আছে, তা শুধু এক শতাব্দীকালের নয়; কবিতায় এক নতুন অন্তর্দৃষ্টি প্রবেশ করেছে, এই বিশ্বে মানুষের অবস্থা বিষয়ে অন্য এক ধারণা। এইজন্যে সাল-তারিখ দিয়ে আধুনিক কবিতার যাচাই চলে না; অধুনা-রচিত অনাধুনিক কবিতারও উদাহরণ প্রচুর। কীটস ও ডি লা মেয়ারের মধ্যে কালব্যবধান একই, তবু রোমান্টিক-দের সঙ্গে পরিচয় থাকলে ডি লা মেয়ার পড়ার প্রয়োজন করে না। কিন্তু অন্তর্বর্তী এক শতকে বিশ্ব-কবিতায় যা-কিছু ঘটেছে, ইয়েটসের পূর্বোক্ত কবিতাটিকে তার দর্পণ বলা যায়; এবং তার মূল কথাটি হ'লো প্রকৃতি ও চেতনার দ্বৈতের উপলব্ধি। রাইনের মারিয়া রিলকের কাব্যেও চেতন মানুষের পরিবর্তনের কার্যিত্রী প্রকৃতি নয়—তা শিল্পকলা, কোনো প্রাচীন মুণ্ড-হীন আপোলো-মূর্তি, বা অর্ফিয়ুসের বংশীবাদন।

টোমাস মান্, তাঁর দীর্ঘায়িত, পুঙখানু-পুঙখ জর্মান ধরনে প্রাণ ও মনের এই দ্বন্দ্বকে বিরাট ও বিচিত্রভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে হয়তো সেই সব লেখকই অধিক উৎসুক্যজনক, যাঁদের রচনার চেহারায় ও চরিত্রে ঠিক মিল নেই, অথবা, আত্মচেতনা মান্-এর মতো অত্যধিক নয় ব'লে, যাঁরা স্বীয় মল্লিনাথের কাজ করেননি। আমি তাই অন্য একজন বাঙালি কবির বিষয়ে উল্লেখ করে এই নিবন্ধটি শেষ করবো। 'ধূসর পাণ্ডু-লিপি' প্রকাশের পর আমি জীবনানন্দ দাশকে প্রকৃতির কবি ব'লে আখ্যাত করে-ছিলাম সেই সঙ্গে দেখাতে চেয়েছিলাম যে তাঁর আত্মীয়তা ওআর্ডস্বার্থের সঙ্গে নয়, কীটস ও প্রির‍্যাফেলাইট গোষ্ঠীর সঙ্গে। শুধুমাত্র 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' দিয়ে বিচার করলে—'ক্যাম্পে' নামক কবিতার বিপরীত ইঙ্গিত সত্ত্বেও—এই কথাটিকে আজও হয়তো স্বীকার্য বলা যায়; 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় স্পর্শগন্ধময় প্রাকৃত বস্তুর রোমাঞ্চকর পর্যায়ের শেষে অন্তিম স্তবকের ঘোষণাটিকে ভিত্তি ক'রে ('আমরা মৃত্যুর আগে কী দেখিতে চাই আর?') আমার এ-কথা বলতেও বাধে না যে আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে জীবনানন্দই মহত্তম প্রকৃতির কবি। উপরন্তু, 'ঘাস' নামক ক্ষুদ্র গদ্যকবিতাটি স্মরণ করলেই আমরা বুঝতে পারি যে কোনো-কোনো মুহূর্তে জীবনানন্দ হুইটম্যানীয় জৈবতার হাতেও আত্মসমর্পণ করেছিলেন, এবং অচেতনের প্রতি তাঁর এই তীব্র আসক্তির জন্য বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা বহুদিন পর্যন্ত তাঁর গুণগ্রাহী হ'তে পারেননি। অথচ, প্রায় 'ঘাসে'রই সমকালীন, কিংবা তার কিছু পরবর্তী বহু কবিতায় আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে প্রবেশ করছি: 'নগ্ন নির্জন হাত'-এ—যেমন বোদলেয়ারে—পর্দা, গালিচা 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ-মদ'—এই সব রচিত বস্তু সপ্রাণ হ'য়ে উঠছে: 'বনলতা সেন'-এ মানসীর চিত্রকল্প জুগিয়েছে—কালিদাসের উদ্ভিদ ও পশুরা নয়, 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' ও সমগ্র মানবে-তিহাস। সম্প্রতি আমি এই মত প্রকাশ করেছি যে জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা কবিতার দুই বিপরীত প্রান্তকে ধারণ ক'রে আছেন এই কথাটা নানা দিক থেকে যথার্থ কিন্তু উপলব্ধির গভীরতম স্তরে এই দু-জনের সবর্ণতাও কি স্পষ্ট নয়? যেমন সুধীন্দ্রনাথ 'আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গনের অন্ধ বন্যায় মর্মাহত হ'য়ে 'পিশাচের উপজীব্য হওয়াকেই 'জীবনের সার কথা' ব'লে জেনেছিলেন, তেমনি জীবনানন্দের 'সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে' ভ'রে গিয়েছে তাদের কথা ভেবে যাদের 'অনেক সময় সন্তানের জন্ম দিতে-দিতে কেটে যায়'—সেই সব প্রাকৃত মানুষ যারা 'কোটি-কোটি শুয়োরের আর্তনাদে' পৃথিবীতে তাদের 'উৎসব' রাষ্ট্র ক'রে দেয়। যদি এখনো বাংলাদেশে এমন পাঠক থাকেন যিনি জীবনানন্দকে শুধু স্নিগ্ধ, কোমল, বর্ণনানিপুণ কবি ব'লে কল্পনা করেন, তাঁকে আমি অনুরোধ করবো 'আট বছর আগের একদিন' আর-একবার সমনস্কভাবে প'ড়ে দেখতে। ভীষণ সেই কবিতা ক্ষমাহীনভাবে প্রকৃতিদ্রোহী; 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় যা-কিছু কবি ভালোবেসেছিলেন এক অখ্যাত আত্মঘাতী সেই সব-কিছুর প্রত্যাখ্যানে তাঁকে বাধ্য করলো। চারদিকে বিস্তীর্ণ হ'য়ে আছে নিছক প্রাণ, অপ্রতিরোধ্য, জান্তব প্রকৃতি: জঘন্য ক্লেদরক্ত থেকে মাছি তার খাদ্য খুঁটে নিচ্ছে, 'আরো দুই মুহূর্তের' আকাঙ্ক্ষায় 'গলিত স্থবির ব্যাং' বেঁচে আছে এখনো, 'প্রগাঢ় পিতামহী' প্যাঁচা অন্ধকারে মূষিক-হননে মেতে উঠলো:—এই 'প্রচুর ভাঁড়ার'কে সজ্ঞানে উপেক্ষা ক'রে অস্তিতার দাসত্ব থেকে স্বেচ্ছায় নিষ্ক্রান্ত হ'লো একমাত্র মানুষ। এই আত্মহত্যার কারণ—কবি আমাদের স্পষ্ট ভাষায় ব'লে দিয়েছেন—কোনো দুঃখ বা নৈরাশ্য নয়, আমাদেরই রক্তের অন্তর্গত 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়'। হয়তো না-বললেও চলে যে এই বিস্ময়ের নাম মন—মানুষের সবচেয়ে বিপন্ন ও বিপজ্জনক সম্পত্তি।

সত্তর পঁচাত্তর বৎসর আগের দিনের দুর্গোৎসব। এখনকার দিনের দুর্গোৎসবের সঙ্গে সে উৎসবের তুলনা করলে প্রথমেই মনে হবে আগের দিনের নিরাড়ম্বর উৎসবে যে প্রাণ ছিল এখন সে প্রাণ নেই, আছে কেবল প্রতিযোগিতা আর জাঁকজমক। মূর্তি গঠনের ধারাও যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছে, তাই কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত কারিগরের হাতের তৈরী মূর্তিও যেন আর সে রকম জীবন্ত দেবীমূর্তি বলে মনে হয় না, হয়তো এটা আমার মনেরই দোষ।

সে যাক্, তখনকার দিনের কথাই এখন বল্‌ছি। দুর্গোৎসব হ'ল নিজস্বভাবে বাংলা দেশের সবচেয়ে বড় উৎসব। তাই এই পূজোকে বলা হয় মহাপূজো। পূজার তিথিগুলিও তাই মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী আর মহানবমী।—দশমী তিথি কিন্তু মহাদশমী নয় সেটি হল বিজয়াদশমী, শ্রীরামচন্দ্র নাকি এই তিথিতেই লংকাবিজয় করতে বের হয়েছিলেন।

পূজার আগেই আসে আকাশে বাতাসে একটা পূজো পূজো গন্ধ, সে হয়তো শিউলি ফুলের আর শাপলার ফুলের সৌরভ, নয়তো সেটা মনেরই একটা আসন্ন আগমনীর অনুভূতি। যেন কি আসছে, যেন কি আসবে আসবে এমনি একটা ভাব। আমাদের শিশু মনেও এই ভাবটা এসেছিল, কেন যে এসেছিল আজ ঠিক সে কথা বুঝিয়ে বলতে পারবো না। ভিখারী তার একতারা বাজিয়ে দোরগোড়ায় এসেই গান ধরতো "গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল, ঐ এল পাষাণী তোর ঈষাণী।" গাইতো "গিরি হে, এই আমার মনের বাসনা,"—

"ঘর-জামাতা করে রাখ্‌বো কৃত্তিবাস
গিরিপুরে করবো দ্বিতীয় কৈলাস,
হরগৌরী চক্ষে দেখ্‌বো বারমাস,
বৎসরান্তে উমা আনতে হবে না।"

—বাংলা দেশ, মা দুর্গার বাপের বাড়ির দেশ। এক বৎসর পরে—বরফে ঢাকা কৈলাসশিখর থেকে একবার আসেন, বাংলার মেয়ে তিনটি দিনের জন্য বাপের বাড়িতে। এই তিনটি দিনের জন্য মেনকার সঙ্গে সমস্ত দেশবাসীর সারা বৎসরের আকুল প্রতীক্ষা, সারা বৎসরের এত আয়োজন।

এই আয়োজনের ভিতরই আছে বিদায়ের আশংকা—মেনকা আবার বলছেন, "উমা আমার তিনটি দিন মাত্র থাকবে, তারপর—"

"সপ্তমী অষ্টমী নবমীর শেষে,
যদি আসেন হর দশমীর প্রত্যুষে,
আমি উমায় বুকে নিয়ে যাব নিরুদ্দেশে,
প্রাণ থাক্‌তে আর উমায় পাঠাবো না।"

এই হল পূজার আগমনীর গান। পূজো আসছে, এই গানই গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে শোনা যেত। আজ সে মুষ্টিভিক্ষার্থী পথ ভিখারীও শহরের পথে দেখা যায় না, এখন যারা ভিক্ষা দেবে তারাই হয়েছে ভিক্ষার্থী।

তাই পূজার সময় সেই দিনের কথাই মনে পড়ে বার বার, যখন সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ভড়ং আর প্রতিযোগিতা ছিল না দেশে, যখন পূজো ছিল প্রাণের আগ্রহের পূজো, ভক্তির পূজো।

পল্লীগ্রামে পূজার আগেই পূজার আয়োজন আরম্ভ হ'ত, চিঁড়েকোটার বিরাম থাকতো না ঢেঁকী ঘরে, অনবরত দুমদোম পাড় দেওয়ার শব্দ।

—খই ভাজা, মুড়কীর মোয়া বাঁধা, ক্ষীরের নাড়ু আর চন্দ্রপুলী,—স্নান করে শুদ্ধ কাপড়ে প্রবীণার দল এই সব ভোগের উপকরণ তৈরী করবার জন্য ভোগ রান্নার ঘরে ঢুকতেন, ছোটদের সে ঘরের চৌকাঠ মাড়াবারও সাহস হত না। সবাই জানতো মা আসছেন, মায়ের জন্য ভোগ তৈরী হচ্ছে।

তখনকার দিনে ধনীর প্রাসাদেও যেমন ঘটা করে দুর্গোৎসব হ'ত, আবার তেমন নিঃস্ব ব্রাহ্মণও তার পর্ণ কুটীরে মাকে নিয়ে এসে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতো। লাহাবাবুদের বাড়ি, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ি, হাটখোলার দত্তবাবুদের বাড়ি যেমন মায়ের পূজার বৃহৎ আয়োজন, তেমনি গরীবের খড়ের ঘরেও হ'ত মায়ের পূজার আয়োজন সামান্য উপকরণ দিয়ে, কিন্তু আসল উপকরণ যেটা সেটা হল, প্রাণের আগ্রহ আর ভক্তি।

এই তিনদিন ছিল পূজাবাড়িতে সর্বসাধারণের জন্য নিমন্ত্রণ। যে আসছে সেই পাত পেতে বসছে, আরতির পর বিলি হচ্ছে, প্রসাদী নাড়ু, ফেনীবাতাসা আর মোয়া।

দলে দলে ঢুলি আসছে পিঠে ঢাক বেঁধে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁসী হাতে বাজনদার ছেলে। ঢোল কাঁসীর সে কি তুমুল কলরব। ঢোল বাজনার যখন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'ত তখন সে যে কি শব্দ সে বলা যায় না। ঢোল বাজনার ওস্তাদীই বা ছিল কত। ঢোল বাজনদার শাল মাথায় বেঁধে বখ্‌শিস্ নিয়ে পূজোবাড়ি থেকে নাচতে নাচতে বের হ'ত।

ঢুলি আর বাজনদারদের খাওয়া দেখেছি একবার। দোতলার বারান্দার নীচে প্রকাণ্ড উঠান, উঠানের গায়ে রোয়াক, সেই রোয়াকে সারি সারি পাতা নিয়ে বসেছে বাজনদারের দল। পাতায় বালতি ভর্তি ভাত ঢেলে দিয়ে গেল রাঁধুনে ব্রাহ্মণ, সেই ভাতের স্তূপের ভিতর গর্ত করলে আহারার্থী, তাতে ঢেলে দিয়ে গেল আধ বালতি ডাল, তারপর এল ছ্যাঁচড়া চচ্চড়ি, সঙ্গে সঙ্গে গোটা দশ বারো করে ভাজা মাছ, আবার এক এক হাতা ইলিশ মাছ ভাজা তেলও পরিবেশন করা হ'ল; আবার এক বালতি ভাত এল, আবার এল ডাল আর চচ্চড়ি—দেখতে দেখতে তা নিঃশেষ হয়ে গেল। শেষে আবার ভাত আর অম্বল, আর সব শেষে প্রকাণ্ড হাতা ভর্তি করে এক এক হাতা পায়েস।

তখনকার দিনে ডিসপেপ্‌সিয়ার নামও কেউ শোনেনি।

কৃষ্ণনগরের রাজার বাড়ির প্রতিমার নাম ছিল রাজরাজেশ্বরী:—প্রকাণ্ড দেবীমূর্তি; মণ্ডপেই গড়া হ'ত; প্রতিমার কারিগর রাজবাড়িতেই থাকতো। সেই প্রতিমার হাতের ও গায়ের মাপের সোনার ও জড়োয়া গয়না ছিল খিলেন করা; খিলেনের খিল খুলে পুরোহিত এসে গয়না পরাতেন মাকে, অপরূপ সেই রাজরাজেশ্বরী মূর্তি! কি চোখ, আর কি সেই চোখের দৃষ্টি, যেভাবে সিংহের পিঠে পা রেখে অসুরের চুল ধরে আকর্ষণ করছেন কি সেই ভঙ্গী, রণচণ্ডী যেন জীবন্ত মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়েছেন আবার সেই সঙ্গেই ছিল মূর্তির সর্ব অঙ্গে যেন আশীর্বাদের ভাব।

গোয়াড়ির খড়েয় যখন প্রতিমা বিসর্জন হ'ত তখন ঘাটে সমস্ত গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের মানুষ একত্র হ'ত। বাচ খেলার জন্য বড় নৌকা থাকতো খড়ের ঘাটে। খড়ের আর এক নাম জলঙ্গী। পুজোর আগে থেকেই নদীতে নৌকা আনাগোনার বিরাম থাকতো না। তখন পর্যন্ত জলপথই ছিল যাওয়া আসার প্রধান পথ।

সপ্তমীর দিন সাত তরকারি, অষ্টমীতে আট তরকারি নবমীতে নয় তরকারি রাঁধার নিয়ম ছিল। আমার পিসিমা নিরামিষ ঘরেও ভাজাভুজি দিয়ে তরকারির সংখ্যা পূর্ণ করতেন, কেননা বড়দাদা নিরামিষ খেতেন, আর পিসিমার ঠাকুরেরও তো ভোগে তরকারির সংখ্যা পূর্ণ করা চাই।

অষ্টমীর দিন পিসিমার সন্ধিপুজোর নির্জলা উপবাস। অবশ্য কয়দিনই পুজো শেষ না হলে বাড়ির কেউই প্রায় জল খেত না। কোন কোন বারে সন্ধিপুজো শেষ হ'তে প্রায় রাত্রিও শেষ হয়ে আসতো। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে সে সময় তোপ দাগা হ'ত সেই তোপের শব্দ শোনবার জন্য সকলেই জেগে ব'সে থাকতো।

বস্তা বস্তা পুজোর কাপড় কিনতে হ'ত, কেননা সবাইকেই তো নূতন কাপড় একখানা করে দিতেই হবে। বাড়ির লোকজন ছাড়াও ধোপা, গোয়ালা, গঙ্গাজল আনা ভারী, উঠোন ঝাঁট দেওয়া মানুষ, আর দুঃস্থ আত্মীয় ও তাঁদের ছেলেপিলে সকলের জন্যই সাধ্যমত কাপড় কেনা হ'ত। তাই বাড়ির ছেলেমেয়েদের দামী কাপড় হ'ত না। যা' পেত তাতেই সবাই খুশী। আমার বাবা আবার ফরিদপুরের বাড়ির প্রজাদের জন্যও কাপড় কিনতেন, হিন্দু আর মুসলমান প্রজা কেউই বাদ যেত না। বাবার চারজন মুহুরি ছিলেন, তাঁদের আমরা দাদাই বলতাম। তাঁদের পরিবারের জন্যও কাপড় কেনা হ'ত। আমি কোনবার একখানা নীলাম্বরী, কোনবার শান্তিপুরে ফুলতোলা শাড়ি পেতাম। জমা সেমিজের পাটই ছিল না।

বিজয়াদশমীর দিন তখন বাড়ি বাড়ি মিষ্টি খাওয়া ছিল না। সে খাওয়াটা হ'ত লক্ষ্মীপুজোর রাতে। আর দশমীতে শান্তি-জল নেওয়া ও সিদ্ধির সরবৎ খাওয়া হ'ত। তখন একটা প্রণাম মন্ত্র পড়ে দেবীকে নমস্কার করাও হ'ত।

দেবী ছিলেন যেন মা, মন্ত্রেও তাই দেখি খালি 'দাও দাও' আবদার। শক্তি দাও, ধন দাও, বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও, প্রতিষ্ঠা দাও, সম্মান দাও, বীর্য দাও, শৌর্য দাও, রূপ দাও, মনোমত ভার্যা দাও এবং সবশেষের কথা, 'দেহি, দেহি পদাশ্রয়।'

তখনকার দিনের কথা যতটা মনে পড়ে তার মধ্যে কুমারী পুজোটাই খুব ভাল লেগেছিল। অষ্টমীর দিন কুমারী পুজো হ'ত। কুমারীর বয়স তিন চার বৎসরের বেশী নয়, সেই ছোট্ট খুকী কিভাবে যে পুজো নিত দেখলে অবাক হতে হয়। তাকে লাল চেলি কি ডুরে কাপড় পরানো হয়েছে। মাথায় দেওয়া হয়েছে একটা সোলার মুকুট। আর গায়ে ফুলের গহনা। যিনি পুজো করতেন ঠিক যেন মা দুর্গারই পুজো করছেন এমনই ভক্তির ভাবে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। কুমারীকে আলতা পরাতে পরাতে তাঁর চোখের জল পড়তে দেখেছি। আলতা পরানো থেকে মুখে মিষ্টি তুলে দেওয়া, মুখ ধোয়ানো, পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া, ধূপ দীপ দিয়ে আরতি করা এই সমস্তই তিনি করতেন। যখন তখন মণ্ডপের সম্মুখে বাজনা বাজতো। আর দলে দলে মেয়েপুরুষ আসতো এই অপূর্ব পুজো দেখতে। পুজো-বাড়ির কর্তা থেকে সকলেই সাষ্টাঙ্গ হয়ে যখন প্রণাম করতেন, তখন সেই ছোট্ট খুকী সকলেরই মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতো। সকলেই বলতেন, 'ওতে এখন মা দুর্গার আবির্ভাব হয়েছে।'

নদীতে মেয়েরা যখন জল সইতে যেতেন কেউ বরণডালা, কেউ শ্রী, কেউ গাড়ু হাতে, সকলেই তখন হয় বালুচেরে শাড়ি, নয় বারাণসী পরে যার যা গয়না আছে সবই পরে যেতেন। ঝাঁকে ঝাঁকে উলু পড়তো। প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নয় দিনকে নবরাত্রি বলা হ'ত। পুরোহিত আর পুজোর্থিনীরা এ সময় একবার মাত্র দিন-শেষে হয় ফলমূল, না হয় হবিষ্যান্ন খেতেন।

নয়দিনই মণ্ডপে চণ্ডীপাঠ হ'ত। নয় রকম গাছের পাতা আর একটা চারা কলা-গাছকে একত্রে বেঁধে একখানা লালপেড়ে কাপড়ে জড়িয়ে 'কলাবৌ' করা হ'ত, সেই কলাবৌকে যখন বাজনা বাজিয়ে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হ'তে তখন ছেলেমেয়ের দল সারবেঁধে সঙ্গে সঙ্গে যেত, কি যে আনন্দ হ'ত তখন।

সবচেয়ে খারাপ লাগতো বলি দেওয়া, বিশেষ করে মোষ বলি। জমিদারেরা প্রায় সকলেই শাক্ত ছিলেন, তাই বলিটা যেন না হলেই নয়, এইরকম একটা ভাব ছিল। কিন্তু বলির সময় সেই রক্ত মেখে তাণ্ডব নাচ 'মা, মা' চিৎকার মনে হলে এখনও বুক কেঁপে ওঠে। মোষের কি রকম রাঙ্গা রাঙ্গা চোখের ভয়-ব্যাকুল, চাহনি, প্রাণ নিয়ে পালাবার চেষ্টা, সে দৃশ্য দেখলে আর জীবনে ভোলা যায় না।

পুজো বাড়িতে যাত্রাগানও হ'ত। ঢপ, আখড়াই গানও হ'ত। সে সময় নীলকণ্ঠের কৃষ্ণযাত্রা বিখ্যাত ছিল।

পুজো সম্বন্ধে যা মনে আছে, সংক্ষেপে লিখলাম। মনে হচ্ছে যেন সব কিছু বলা হল না।
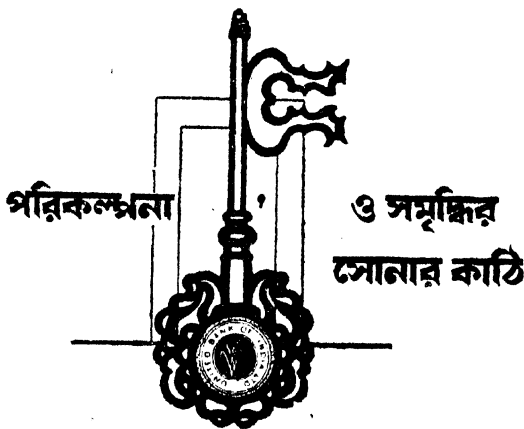
বৈজ্ঞানিক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আগের থেকে দিন-ক্ষণ ঠিক না করে এলে দেখা হয় না।

নথির মধ্যে ক্লান্ত চোখ রাজেন্দ্রনাথ হাত নেড়ে বারণ করে দিলেন।

'এ এক সন্ন্যাসী, স্যার।' মুহুরি কানে-কানে বলার মত করে বললে।

'কেন, কোনো কেস আছে?'

'সন্ন্যাসীর কেস?' যারা উপস্থিত ছিল সন্দেহ প্রকাশ করল।

'আজকাল সন্ন্যাসীর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স আছে, স্থাবর-অস্থাবর আছে, রাগ-দ্বেষ, লোভ-মোহ আছে, আর সামান্য মামলা-মোকদ্দমা থাকবে না?'

আপনি যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই থাকবে। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সকলে সায় দিলেন একবাক্যে। আপনি ব্যারিস্টারদের প্রধান। বিদ্বান-বিদগ্ধের শিরোমণি। আপনি বেশি জানেন। হয়তো বা শেষ জানেন।

'কেস নেই তো, চায় কী?' বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকোলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'বললে শুধু দেখা করতে চায়।'

'চাঁদা চায় বোধ হয়।' উপস্থিতদের মধ্যে কেউ বললে। 'অর্থ অনর্থের মূল জেনে হয়তো অর্থের প্রতিই লালসা।'

'কিংবা হয়তো কোনো মামলার বিপক্ষ দলের লোক সন্ন্যাসীকে দিয়ে আপনাকে তুক করতে এসেছে।' যে-উকিল মামলা নিয়ে এসেছে সে বললে।

অবজ্ঞার হাসি হাসলেন রাজেন্দ্রনাথ। শিখণ্ডী পাঠিয়ে ভীষ্মকে তুক করা যায়, কিন্তু রাজেন্দ্রনাথকে বশীভূত করতে পারে, এমন কোনো শক্তি নেই।

চিরকাল সংক্ষেপ করতে চেয়েছেন রাজেন্দ্রনাথ। এক দানে বাজিমাতের

মানুষ তিনি। পর্বতপ্রমাণ নথি, বস্তা-বস্তা সাক্ষ্য-প্রমাণ, গাড়ি-গাড়ি আইন আর নজিরের কেতাব—সমস্ত কিছুর মধ্য থেকে একটি দ্রুত, তীক্ষ্ম, বিদ্যুদ্দীপ্ত সূত্র তিনি ধার করে নিয়েছেন, আর তাতেই সমস্ত রহস্যের নিরসন করে জিতে নিয়েছেন মামলা। যুক্তির পাষাণে শান দেওয়া একটি অব্যর্থ শরক্ষেপেই দুর্জয়।

ইনিয়ে-বিনিয়ে আর যে যাই বলুক, আইনের কথাটা অত্যন্ত ছোট। পল্লব-বর্জিত।

'ডাকো সন্ন্যাসীকে।'

সন্ন্যাসী কাছে এসে দাঁড়াল।

চেহারা দেখে সবাই থমকে গেল। মোটেই মডার্ন মণ্ডের চেহারা নয়। একেবারে সেকেলে। দাড়ি-গোঁফ ও জটা-জুটের দণ্ডকারণ্য। হাতে গলায় এক রাজ্যের মালা। সংগে আবার চিমটে কমণ্ডলু। পায়ে খড়ম। গায়ে ছাইভস্ম।

মোটেই সংক্ষেপে করেনি। মনে মনে বিমুখ হলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'দিন-ক্ষণ আগে থেকে ঠিক না করে এসেছেন কেন?'

'দিন-ক্ষণ ঠিক না করে অনেকেই আসে।' হাসল সন্ন্যাসী।

'অনেকেই আসে?'

'হ্যাঁ, রোগ আসে, মৃত্যু আসে আর এই সাধুও আসে।'

কথায় যেন হেরে গেলেন রাজেন্দ্রনাথ। তাই স্বর নিজেরও অজান্তে রুক্ষ হয়ে এল। 'কী চাই?'

'আপনার বউমাকে চাই।'

বড় বেশি যেন সংক্ষেপে বলা হল, এমনিই এখন মনে করলেন রাজেন্দ্রনাথ। আরেকটু খুলে-মেলে বললে যেন ভালো হত।

'কাকে? তৃপ্তিকে? সে এ-বাড়িতে কোথায়?'

'তার মানে? আপনার ছেলে আর বউ আপনার সংগে থাকে না?'

'না। আমার সংগে থাকবে কেন? আমার ছেলে শংকর, বিরাট ইঞ্জিনীয়ার, বিলিতি ফার্মে প্রকাণ্ড মাইনেতে কাজ করে, সে বিবাহিত, সে থাকবে কেন আমার সংগে। সে স্ত্রী নিয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে আছে। আর, তাই তো উচিত।'

'তার বয়েস তো অল্প—'

'হ্যাঁ, কত আর! প'য়ত্রিশ ছত্রিশ।'

'আর তার তো খুব অসুখ।'

রাজেন্দ্রনাথ আবার নথিতে চোখ রাখলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আজ তিন দিন। বাঁচবার কোনো আশা নেই।'

সন্ন্যাসী হাসল। মামলার হার-জিত বলে দেওয়া যায় হয়তো, কিন্তু—বাঁচা-মরা কে বলতে পারে? বললে, 'শংকরকে দেখবার জন্যেই তৃপ্তি-মা আমাকে স্মরণ করেছেন।'

অল্প কথায় হবার নয়। মোকদ্দমার আর্জিটা তো অন্তত সবিস্তার পড়তে হবে।

তাই বিতং করে বলুন, মামলার বিষয়টা কী।

স্ট্রোক হয়ে শংকর পড়ে আছে তিন দিন। হ্যাঁ, এটাও অনাবশ্যক দীর্ঘকাল। যতদূর সম্ভব, প্রচুর-প্রচণ্ড আসুরিক চিকিৎসা হচ্ছে। এবার তৃপ্তির ইচ্ছে, দৈবিক হোক। তৃপ্তির এখনো গুরুকরণ হয়নি, কিন্তু তার বন্ধু সুপ্তির এমন এক গুরু আছেন, যিনি সিদ্ধাইয়ে সিদ্ধহস্ত। অমানুষী আধ্যাত্মিক শক্তিতে অনেক কঠিন রোগ তিনি সারিয়েছেন নিমেষে। সুপ্তির স্বামী নিশীথ জুনিয়র ব্যারিস্টার, যদি গুরু-কৃপায় সুফল কিছু ফলিয়ে দিতে পারে, তাহলে রাজেন্দ্রনাথের অনুগ্রহের রোদে সে বিলক্ষণ তপ্ত হতে পারে। তাই সে উদ্যোগী হয়ে যোগাযোগ করেছে। কত বড় ধনী ব্যারিস্টার রাজেন্দ্রনাথ, আর তাঁর ঐ একমাত্র ছেলে শংকর—গুরুদেব যদি একটা ভেলকি লাগিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আর দেখতে হবে না, বিজ্ঞাপনের জোরে লাখ লাখ শিষ্য হয়ে যাবে গুরুদেবের—

'এরা সব বিলেত-ফেরত, এদের সব উচ্চ-শিক্ষিতা স্ত্রী, এরা যে কী করে এসব আজগুবিতে বিশ্বাস করে ভেবে পাইনে।' ভিতরে-ভিতরে গুমরে উঠলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'সব রকম চেষ্টাই করে দেখছেন।' সাধু বললে সবিনয়ে।

'কিন্তু আপনারটা কোন্ চেষ্টা? কী করবেন আপনি?'

'শংকরের মাথায় হাত রেখে নির্জনে জপ করব।'

'আর তাইতেই শংকর চোখ চাইবে, জ্ঞান ফিরে পাবে? যত সব অবৈজ্ঞানিক কথা। যান মশাই, আমি ওসব অপকার্যে বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু তৃপ্তি-মা করে।'

'ওরে, এঁকে কেউ ও-বাড়িতে নিয়ে যা।' হাঁক পাড়লেন রাজেন্দ্রনাথ। 'আর যারা বিনি পয়সায় ম্যাজিক দেখতে চায়, তাদেরও খবর দে।'

'আপনি যাবেন না?' যাবার আগে জিজ্ঞেস করল সাধু।

'না-না, আমার জরুরী কাজ আছে। আমাদের মশাই লজিক, ম্যাজিক নয়।' ঘড়ির দিকে তাকালেন রাজেন্দ্রনাথ।

উপস্থিত সকলে, যারা পরামর্শে এসেছে, তারা মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল। 'আপনার ছেলের অমন অসুখ, কই জানি না তো!'

'জেনে কী ফয়সালাটা হবে?'

'তিন দিন ধরে অজ্ঞান, আর আপনি কোর্ট করছেন?'
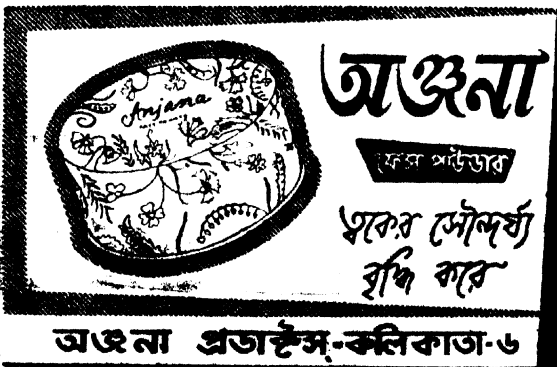
'কোর্ট করব না কেন? আমি তো আর অজ্ঞান হইনি। সূর্য-চন্দ্র তাদের কাজ করে যাবে, আমিও আমার কাজ করে যাব।' রাজেন্দ্রনাথ আবার নথিতে নাক ডোবালেন।

'কে দেখছে?'

'কে না দেখছে?' রাজেন্দ্রনাথ চোখ তুলে নিলেন আবার। 'কলকাতায় ডাক্তার-কবরেজ আর বাকি নেই। শেষকালে, দেখছেন তো, এক সন্ন্যাসী ধরে এনেছে। স্বামীর জীবনের জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে। কোনো কিছুই আর বাকি রাখছে না। বাদ দিচ্ছে না। যত পাথর পাচ্ছে উলটে-উলটে দেখছে। শেষ পর্যন্ত শুনুন, কী কেলেংকার, মানত করছে গিয়ে মন্দিরে। ঝাড়-ফুঁক করাচ্ছে, মাদুলি পরাচ্ছে।'

'আহা বেচারী!' সকলেরই সমবেদনা তৃপ্তির জন্যে।

'তিনটে নার্স আছে, তবু দিনে-রাতে

একফোঁটা ঘুম যাবে না মেয়ে। সর্বক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, যদি কখনো চোখ চায়, যদি ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোনো কথা অস্ফুটে বেরিয়ে আসে। এতখানি ধৈর্য ও প্রতীক্ষা চোখে না দেখলে কল্পনা করা যেত না। মনে হয় ও শুধু তাকিয়ে থেকে থেকেই স্বামীর চোখ চাওয়াবে, জ্ঞান আনাবে। যদি কিছু অলৌকিক থেকে থাকে সংসারে, তবে স্ত্রীর ঐ সতী শক্তি। তাই শঙ্কর যদি বাঁচে, তবে ওষুধে-পত্রে নয়, জপে-তপে নয়, বউমার ঐ সতী শক্তিতে।'

'আপনি আজ কোর্টে যাবেন?' উপস্থিত সকলে উঠে পড়তে পারলে যেন স্বস্তি পায়।

'বা, কোর্টে যা বৈকি। আমরা আমাদের কাজ করে যাব। আইন বসে থাকবে না, আমরাও বসে থাকব না। এ কী, উঠছেন নাকি আপনারা?'

'হ্যাঁ, আজ উঠি। আপনার মন ভালো নেই।'

'আরে রাখুন। আইনের চোখে মন বলে কিছু নেই। শুধু শরীর। শরীরের ক্রিয়া। কী যেন বলেছে আপনাদের শাস্ত্র? শারীরং কেবলং কর্ম—' হেসে উঠলেন রাজেন্দ্রনাথ।

তবু নথিপত্র গুটিয়ে মক্কেলের দল পালিয়ে গেল। আরেক সময় আসব।

কোর্ট থেকে যথাবিধি বাড়ি ফিরে টেলিফোন করলেন রাজেন্দ্রনাথ। ওপার থেকে ধরল তৃপ্তি।

'খোকা কেমন আছে?'

'একই রকম।'

'সকাল বেলায় এক সন্ন্যেসী গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, উনিই তো সুন্দরানন্দ স্বামী, খুব পাওয়ারফুল সাধু, খুব নাম-ডাক।'

'করল কিছু?'

'শিয়রে বসে চোখ বুজে কতক্ষণ জপ করলেন দেখলাম।'

'ফল হল? চোখ চাইল খোকা?'

'দেখি না তো!' বাথায় বুক ভেঙে যাচ্ছে তৃপ্তির। 'এখন পর্যন্ত তো চেতনার এতটুকুও রেখা দেখি না। তবে রাতের দিকে কী হয়, কিছু উন্নতি হয় কিনা ভগবান জানেন—'

'শোনো, হয়তো ডাক্তারিতেই ফল দিল রাতের দিকে, আর তারই সুবিধে নিয়ে বসল ঐ সন্ন্যেসী—'

'কে কী সুবিধে নিল, তা দিয়ে আমাদের কাজ কী। আমাদের রুগীর জ্ঞান হলেই আমরা খুশী। তবু মহাপুরুষ যে দয়া-পরবশ হয়ে এসেছিলেন বাড়িতে, এটাই আমার কাছে খুব শুভলক্ষণ মনে হচ্ছে।'

'নিজের থেকে এসেছে মনে কোরো না। নিশীথ ভটচাজ নিয়ে এসেছে অনেক খোসামুদ করে। হয়তো বা টাকা কবুলে। সে ভাবছে, তাতে যদি তার প্র্যাকটিসের সুবিধে হয়। আর সাধু ভাবছে, তাতে যদি তার প্র্যাকটিসের।' রাজেন্দ্রনাথ একটু বা তিক্ততা আনলেন কণ্ঠস্বরে। 'কারু সর্বনাশ কারু পৌষ মাস।'

'আর সকলের দুধে চিনি হোক, তাতে আমাদের আপত্তি কী', তৃপ্তি বললে, 'আমাদের শাকে বালি না হলেই হল। আপনি একবার আসছেন?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

রাজেন্দ্রনাথ ছেলের বাড়ি গিয়ে পৌঁছুলেন।

ভিড়—ভিড়—এত ভিড় কেন বাড়িতে? আর কেন এত গোলমাল?

ও-ঘরে কী? তান্ত্রিক স্বস্ত্যয়ন করছে আর এ ঘরে? চণ্ডী পাঠ করছে পূজুরী

'এ সব কেন?' ভীষণ বিরক্ত হলেন রাজেন্দ্রনাথ। 'এ সবে কী হবে?'
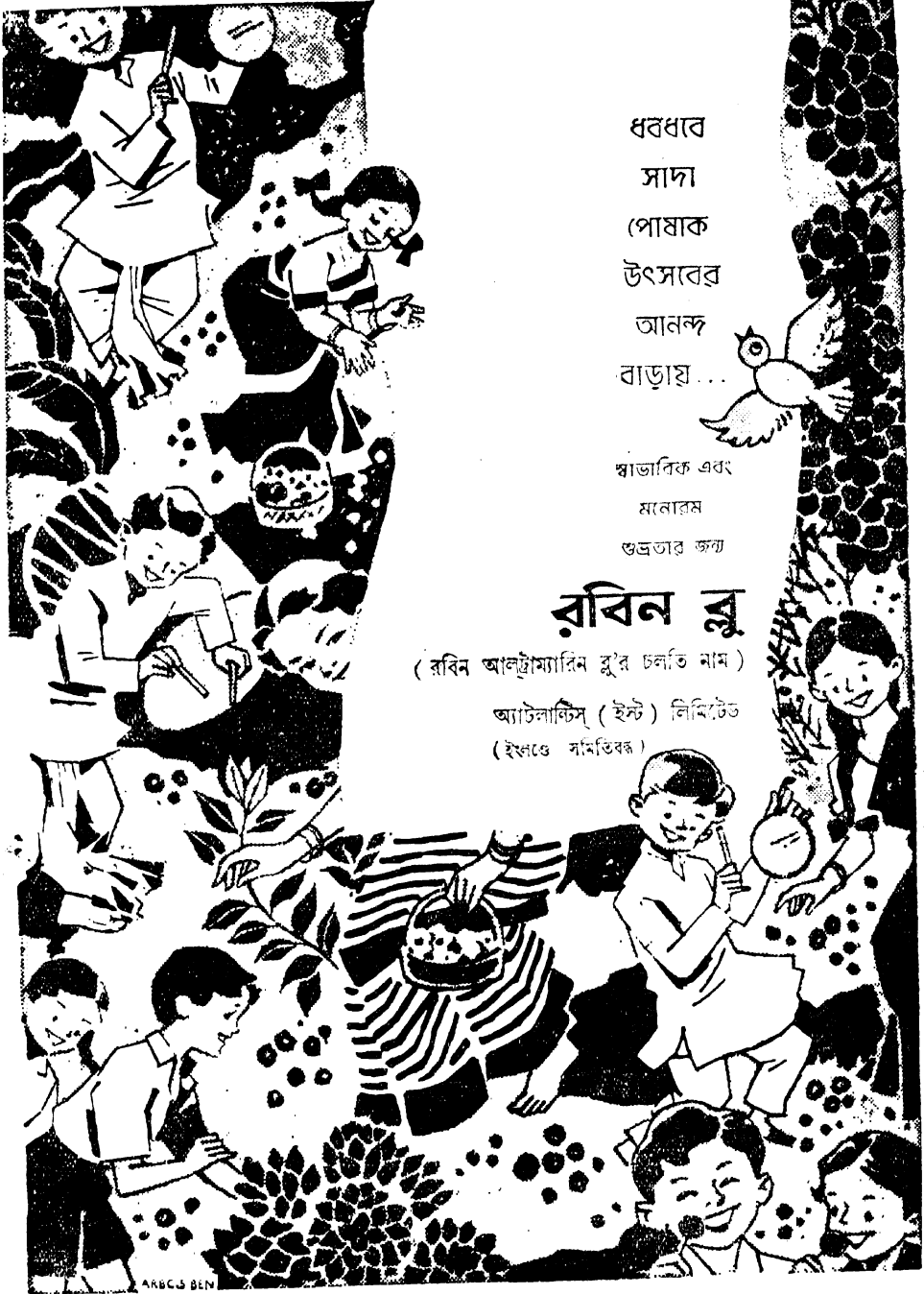
ধবধবে
সাদা
পোষাক
উৎসবের
আনন্দ
বাড়ায়...
স্বাভাবিক এবং
মনোরম
শুভ্রতার জন্য
রবিন ব্লু
(রবিন আলট্রাম্যারিন ব্লু'র চলতি নাম)
অ্যাটলান্টিস্ (ইস্ট) লিমিটেড
(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)
ARBCJ BEN

'যে যা বলছেন সব রকম করে দেখছি।' তৃপ্তি বললে, 'কোনো ত্রুটি কোনো খুঁত রাখতে চাচ্ছি না।'

'ডাক্তার—ডাক্তাররা কোথায় ?'

'তারা সব উপরে, রুগীর কাছে।'

রাজেন্দ্রনাথ উপরে উঠলেন। তাঁকে দেখে উৎসুক আগন্তুকের ভিড় সরে পড়তে লাগল।

'আমাদের সবতাতেই ভিড়, সবতাতেই গোলমাল।' বললেন রাজেন্দ্রনাথ। 'কিছুতেই সংক্ষেপ হবার জো নেই। সর্বত্রই বাহুল্য, সর্বত্রই বিস্তার। রুগীকে শান্তিতে মরতে দিতে পর্যন্ত আমরা প্রস্তুত নই। রুগীর ঘরে-বারান্দায় এত লোকের যে আমদানী হয়েছে তাতে রোগের সুরাহাটা কী হচ্ছে শুনি ?'

একজন কে বলে, 'আর নিচে যে ঐ কী পাঠ হচ্ছে শুনি ?'

'ন্যুইসেন্স!' রাজেন্দ্রনাথ গর্জন করে উঠলেন। 'পড়বি তো এক-আধ পৃষ্ঠা পড়, তা না, গোটা বইটা পড়ছে। মানে, পসার বাড়াবার চেষ্টা। সশব্দে বই পড়লে হবে কী? যম মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনবে আর ভুলে যাবে রুগীকে? এ কি জজ-ঠকানো উকিলের রুলিং পড়া?' রুগীর খাটের কাছে চেয়ারে বসলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'তৃপ্তির ইচ্ছে।' কে আরেকজন বললে।

'হাঁ, তৃপ্তির তৃপ্তি।' সায় দিলেন রাজেন্দ্রনাথ। 'ওর সর্বস্ব নিয়ে প্রশ্ন, তাই ওকে কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু ও একটা অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের বশবর্তী হবে, হাঁচি টিকটিকি মানবে এ অসহ্য।'

ছোট একটা খুরিতে করে একটা জবাফুল নিয়ে কে ঢুকল।

'এ ফুল দিয়ে কী হবে?' রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'এ বাবা চিত্তেশ্বরীর নির্মাল্য।' পিছন থেকে তৃপ্তি বললে, 'চিত্তেশ্বরী খুব জাগ্রত। এর প্রসাদী ফুলের তাই অনেক মূল্য।'

লোকটা সাহস পেয়ে ফুলটা রুগীর মাথায় ঠেকিয়ে বালিশের নিচে গুঁজে দিল।

ডাক্তার বসেছিল পাশে। তার দিকে ক্রুর দৃষ্টি ছুঁড়ে রাজেন্দ্রনাথ বললেন, 'এ সব আপনারা অ্যালাউ করছেন?'

'কেন করব না?' ডাক্তার হাসল। 'আমরাই কি জানি কী দিয়ে কী হয়!'

'তার মানে? বিজ্ঞানে আপনাদের বিশ্বাস নেই?'

'খানিক দূর পর্যন্ত আছে, তারপরে সব ঝাপসা, সব এলোমেলো।'

'তাই আপনারা, ডাক্তাররা, আপনারাও খোল-কত্তাল ধরেছেন?' ঝাঁজিয়ে উঠলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'উপায় নেই। দিব্যি আউট অফ ডেঞ্জার ডিক্লেয়ার করে এলাম, শুনলাম তার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টেঁসে গিয়েছে—তেমনি আবার—'

'তার মানে কী হল?'

'মানে হল, বিজ্ঞানই শেষ নয়, বিজ্ঞানের বাইরেও আরো কিছু আছে।' ডাক্তার সবিনয়ে বললে।

'যদি কিছু থেকে থাকে তা অজ্ঞান।' ছেলের দিকে তাকালেন রাজেন্দ্রনাথ।

কিন্তু রাত নটা হতেই রুগীর অবস্থা ভালো হল। শঙ্কর চোখ চাইল। চিনতে পারল লোকজন। বললে, জল খাব।

আনন্দের ঢেউ পড়ে গেল সংসারে।

বাড়িঘর আস্তে আস্তে জনশূন্য হয়ে এল, থেমে গেল মন্ত্রতন্ত্র, পাঠকীর্তন।

'তুমি এবার একটু ঘুমোও।' বাড়ি ফিরে যাবার আগে তৃপ্তিকে সস্নেহে বললেন রাজেন্দ্রনাথ।

বিষণ্ণরেখায় তৃপ্তি একটু হাসল, কথা কইল না। রাজেন্দ্রনাথকে এগিয়ে দিল গাড়ি পর্যন্ত।

ভোরবেলা টেলিফোন বাজল।

'কর্তাবাবু, মানে ব্যারিস্টার সাহেব কোথায়?'

'প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কোনো খবর আছে?'

'আছে। শঙ্করবাবু এইমাত্র মারা গেলেন।'

বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে শুনলেন রাজেন্দ্রনাথ। কাছাকাছি চেয়ারটাতে বসলেন। বসে পড়লেন না—ধীরে ধীরে বসলেন।

ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালেন। আজ শনিবার। কোর্ট নেই। বাতাসে স্বস্তির স্পর্শ পেলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'কাল রাতে যখন ও বাড়ি থেকে চলে আসি, বউমার মুখের হাসিটা আমার ভালো লাগল না।' যেন কাউকে না লক্ষ্য করে নিজের মনেই বলছেন, 'শঙ্করের জ্ঞান হবার পর সকলে কেমন হালকা মনে আনন্দ করছে, কিন্তু তৃপ্তির হাসিটি বিষাদে মাখা। ও কি বুঝতে পেরেছিল এই আনন্দ টিকবে না।'

কিন্তু এখন একবার তৃপ্তিকে গিয়ে দেখ। শঙ্করের মৃতদেহের উপর লুটিয়ে পড়ে সমুদ্রের মত কাঁদছে। আর কত কী বলে-কয়ে আকুলি-ব্যাকুলি করছে তার লেখাজোখা নেই।

স্তব্ধ হয়ে এক পাশে বসে আছেন রাজেন্দ্রনাথ।

তৃপ্তির শোক যতই গভীর হোক, অভ্রভেদী হোক, এই প্রকাশটি রাজেন্দ্রনাথের কাছে বাড়াবাড়ি লাগছে—অবৈজ্ঞানিক। মৃতদেহটাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রাখবার কী হয়েছে? কতক্ষণ ধরে রাখতে পারবে? শ্মশান যাত্রীরা টেনে কেড়ে নিয়ে যাবে জোর করে।

স্বামী তাকে কত কী আদর সোহাগ করেছিল, কত কী আরো প্রতিশ্রুত ছিল, সেসব গোপন কথা জগজ্জনে প্রচার করাটাও নিরর্থক। সব স্বামীই এ রকম করে থাকে, বলে থাকে। এর মধ্যে কী এমন অভিনবত্ব শঙ্করের! কিসে শঙ্কর অনন্য।

শোক প্রকাশের রীতিতেও শালীনতার দরকার।

আহা, কাঁদতে দাও, ঢালতে দাও, নিঃশেষ হতে দাও। তোমার মত নির্মম, নিরশ্রু আর কজন!

ফুল—ফুল, ফুলই বা কত! আর কত বা ফটোগ্রাফারের ক্লিক-ক্লিক।

তৃপ্তি নিজের হাতে সাজিয়ে দিল স্বামীকে। বরবেশে সাজিয়ে দিল। সাজিয়ে দিয়ে উঠেই মাথা ঘুরে টলে পড়ে গেল মাটিতে। সবাই ভাবলে বরের সঙ্গে বধূবেশে সহমরণে যায় বুঝি।

না, সামলেছে তৃপ্তি। বলছে, 'আমি বেঁচে না থাকলে এ দহনজ্বালা বইবে কে?'

'কিন্তু আপনার এতটুকু অস্থিরতা নেই।' সোমবার দিন কোর্টে এলে সবাই ঘিরে ধরল রাজেন্দ্রনাথকে, 'আশ্চর্য পুরুষ আপনি।'

'বৈজ্ঞানিক পুরুষ।' নির্লিপ্ত মুখে বললেন রাজেন্দ্রনাথ। 'অস্থির হয়ে উন্মত্ত শোক করলে কিছু সুফল হবে? হয়েছে? আমার বৌমা যে এত শোক করছেন, বিশ্ব-প্লাবী শোক, তাতে তাঁর স্বামীকে ফিরে পেয়েছেন?'

কত বারণ করেছিল সবাই, তবু পুরো-পুরি থান পরেছে তৃপ্তি। হাতে গলায় সোনার এক সুতো স্মৃতিও রাখেনি। চুল ছেঁটে দিয়েছে। মেঝেতে খড় বিছিয়ে শুচ্ছে। চারদিকে দেয়ালে শঙ্করের নানা বয়সের নানা ভঙ্গির ছবি, নানা জাতের জিনিসপত্র। যেখানে চোখ পড়বে সেখানেই শঙ্কর দেখবে। শঙ্কর ছাড়া দিক নেই দেশ নেই দৃশ্য নেই।

রাজেন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে দেখেন তৃপ্তিকে মনে মনে অভ্যর্থনা করেন, বলেন, একেই বলে সতীশক্তি।

ছেলেপিলে হয়নি, তৃপ্তিকেই শ্রাদ্ধ করতে হবে।

যত অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার। চালকলার পিণ্ড করে নাও নাও খাও খাও বললেই মরা লোকের ভূত এসে তা খেয়ে নেবে? গাঁজার কলকে দিলে তাও?

শ্রাদ্ধের বিরোধী রাজেন্দ্রনাথ।

আর যদি কিছু করতেই হয় নমো নমো করে সেরে দাও। কিন্তু তাতে তৃপ্তির আপত্তি। অশৌচের পর্বটাও দশ দিনে সংক্ষেপ করতে সে রাজী নয়, পুরো ত্রিশ দিন সেটাকে টেনে নিয়ে চলো। আর ত্রিশ দিন কি, বাকী জীবনটাই তো এখন মরণাশৌচ।
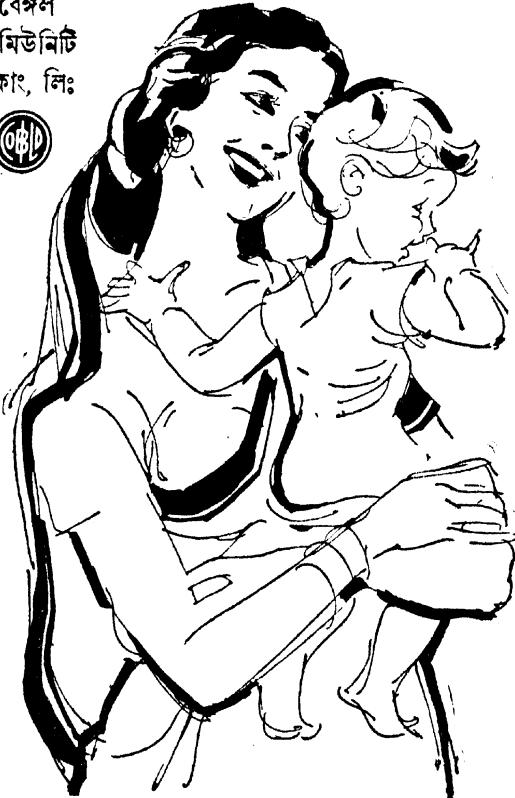
'বাবা, ও'র ভারি ইচ্ছে ছিল আমাকে দিয়ে একটা নার্সারি খোলান—' বললে তৃপ্তি।

'হ্যাঁ, আমি জানি। নইলে তুমি বাকী জীবন থাকবে কী নিয়ে? সতীশক্তি এবার মাতৃশক্তি হবে।' রাজেন্দ্রনাথ কি অবৈজ্ঞানিক হচ্ছেন? পরমুহূর্তেই বাস্তব স্বরে বললেন, 'তোমার নামে আমি এ বাড়ি কিনে নেব। কথাবার্তা আজ সকালেই হয়ে গেছে। দিন সাতেকের মধ্যেই রেজেস্ট্রি করে দেবে আশা করি।'

'ও'র নামে ইস্কুলটার নাম হবে।'

'ওর নামের কী দরকার? তোমার নামের মধ্যে দিয়েই ও বেঁচে থাকবে। তাই নার্সারির নাম হবে তৃপ্তি। এমনিতেই একটা তুষ্টিবাচক নাম।

অনেক দিন পর তৃপ্তি একটু হাসল।

পরদিন বুধবার বললে, 'বাবা, ও'র লাইফ ইনসিয়োরের টাকা—'

'খোঁজ নিয়ে দেখলাম মোটে চল্লিশ হাজার। আমি নিজের থেকে আরো ষাট হাজার দিয়ে এক লাখ পুরিয়ে তোমার নামে ব্যাঙ্কে রেখে দেব। ভালো হবে না?'

'হবে।' সামান্য ঘাড় হেলাল তৃপ্তি। আর এবারের হাসি ঠোঁট ছাপিয়ে গালে লুটিয়ে পড়ল।

'ইস্কুল নিয়ে, বাবা, আমাকে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে।' এ বললে বৃহস্পতি-বার।

'তাতো করতেই হবে।' রাজেন্দ্রনাথ বললেন, 'তাই ভাবছি ছোট গাড়িটা তোমাকে ট্রান্সফার করে দেব।'

হাসি আজ তৃপ্তির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। বললে, 'আমি ড্রাইভিং শিখে নেব।'

'কী দরকার! ড্রাইভারের মাইনে আমি দেব।'

ভালোবাসায় ভোলালেন রাজেন্দ্রনাথ। বাড়ি দিলেন গাড়ি দিলেন নগদ টাকা দিলেন ষাট হাজার।

সমস্ত কায়-কারবার চূড়ান্ত করে নিতে তিন সপ্তাহ লাগল।

তারপর আটাশ দিনের দিন, শ্রাদ্ধের দুদিন আগে রাজেন্দ্রনাথের কাছে ডাকে এক চিঠি এল।

বাবা,

আপনি মহানুভব। আমি দিনকয়েকের মধ্যে বিয়ে করছি। আপনি আমাকে মার্জনা করবেন। শ্রাদ্ধটা আর কাউকে দিয়ে করিয়ে নেবেন দয়া করে। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিন ইতি।

তৃপ্তি

চিঠিটা বার কতক পড়লেন রাজেন্দ্রনাথ। অন্যমনস্কের মত এটা-ওটা কটা আইনের বই ঘাঁটলেন। পরে টেবিলের উপর মাথা গুঁজে দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন ছেলের জন্য।

একটি লোকের কাছে আমি নানা দিক দিয়ে কৃতজ্ঞ ছিল্ম। মাসাধিক কাল আমি যখন টাইফয়েডে অজ্ঞান, সে তখন আমার সেবা করে বাঁচিয়ে তোলে। ভালো করেছে, কি মন্দ করেছে, সে অবশ্য অন্য কথা। আর শুধু আমিই না, আমাদের পার্ক সার্কাস পাড়ার বিস্তর লোক তার কাছে নানান দিক দিয়ে ঋণী। মাঝারি রকমের পাশ-টাশ দিয়েছে—পরীক্ষার ঠিক আগে তার জোর চাহিদা। বেশ দু' পয়সা কামায়—ধার চাইতে হলে ও-ই ফার্স্ট চইস। আর বলল্ম তো, রুগীর সেবায় ঝানু নার্সকে হার মানায়।

তার যে কেন হঠাৎ শখ গেল সাহিত্যিক হবার বোঝা কঠিন।

একটা ফার্স লিখেছে। তার বিষয়বস্তু : ধনী ব্যবসায়ী তাঁর ম্যানেজারের উপর ভার দিয়েছেন, কলেজ-পাশ মেয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে ইন্টারভ্যু নিয়ে বর বাছাই করতে। নাটকের আরম্ভ ইন্টারভ্যু দিয়ে। কেউ কবি, কেউ গাবতা লিখে গবি, কেউ ফিলিম স্টার—আরো কত কি।

পড়ে আমার কান্না পেল। দুই কারণে। অত্যন্ত প্রিয়জনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা দেখলে যে রকম কান্না পায়, এবং ঐ কথাটি ওকে বলি কি প্রকারে? ওটা কিছুই হয়নি, ওকে বলতে গেলে আমার মাথা কাটা যাবে। শেষটায় মাথা নিচু করে, ঘাড় চুলকে বলল্ম 'বুঝলে, মামা, আমি ফার্স-টার্স বিশেষ পড়িনি দেখিনি আদপেই অথচ এ-সব জিনিস স্টেজে দেখার এবং শোনার।'

মামা সদানন্দ পুরুষ। এক গাল হেসে বললে, 'যা বলেছিস। আমিও ঠিক তাই ভাবছিল্ম।'

সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলল্ম।

ওমা, কোথায় কি। হঠাৎ পাড়ার চায়ের দোকানে শুনি, মামার ফার্স ট্যাংরা না বেনে-পুকুরে কোথায় যেন রিহার্সেল হচ্ছে। সর্বনাশ। বলি, 'ও চাটুয্যে, এখন উপায়?'

সোমেন যদিও নিকম্মা, তবু কথা কয় কলকাতার খাস বাসিন্দা বনেদি সোনার বেনেদের মত। অর্থাৎ আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে 'হুতোম' 'আলাল'কে আড়াই লেন্‌থ্ পিছনে ফেলে। দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত বের করে বললে, 'উপায় নদারদ্। দেখি নসিবে কি কি গর্দিশ আছে?'

তারপর মামা একদিন ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে ফার্স-অভিনয়ের লগ্ন রাঁদেভু বাৎলে গেলেন। ট্যাংরা, গোবরায় নয়। রাজাবাজারের কোন এক গলির ভিতরে।

চাটুয্যের বাড়ি মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটে। ওখানে কখনো যাইনি। ভাবল্ম, সেদিন ওখানেই আশ্রয় নেব। মামা সময় পেলেও আমাকে খুঁজে পাবে না।

চাটুয্যে তো আমাকে দেখে অবাক। ব্যাপার শুনে বললে, 'তা আপনি চা পাঁপড় খান আমাকে তো যেতেই হবে।' চাটুয্যে চাণক্যের সেই আইডিয়াল বান্ধব—রাজদ্বারে শ্মশানে ইত্যাদি। আর এটা যে মামার ফ্যুনেরেল সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দ ছিল না।

ওমা একি?

ঘণ্টা দুই দাঁত কিড়িমিড়ি দিয়ে বার বার রাজাবাজারের দৃশ্যটা মনশ্চক্ষু থেকে তাড়াবার চেষ্টা করল্ম। কিছুতেই কিছু হল না। কোথাকার কে এক কবি বলেছে, সদ্য লাঞ্ছিত জন যে রকম বার বার চেষ্টা করেও অপমানের কটুবাক্য মন থেকে সরাতে পারে না।

এমন সময় চাটুয্যে এক ঢাউস প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। তার সর্বাঙ্গ থেকে উত্তেজনা ঠিকরে পড়ছে। মুখে শুধু 'এলাই ব্যাপার, পেল্লায় কাণ্ড।' বুঝল্ম, মামাকে উদ্ধারের সৎ কারে, কিংবা নিমতলার সৎকারে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু চাটুয্যে ঢাউস গাড়ি পেল কোথায়—পায় তো কুল্লে পঞ্চাশ টাকা, খাদী প্রতিষ্ঠানে।

গলির বাইরে থেকে শুনতে পেল্ম তুমুল অট্টরব। বুঝল্ম, গর্দিশ পেল্লায়।

ওমা, এ কি? কোথায় না দেখব, মামা লিন্‌চ্‌ট্ হচ্ছে—দেখি, হাজার দুই লোক হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, হেথা হোথা কেউ কেউ পেটে খিল ধরেছে বলে ডান দিকে চেপে ধরে কাতরাচ্ছে, আরেক দঙ্গল লোক হাসতে হাসতে মুখ বিকৃত করে কাঁদছে। সে এক ম্যাস্‌হিস্টিরিয়ার হাসির শেয়ার-বাজার কিংবা/এবং রেসের মাঠ। ইস্তেক চাটুয্যে হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছে 'চাক্কু মারছে, চাক্কু মাইরা দিছে।'

ইতিমধ্যে ফার্স শেষ হয়েছে। মামাকে স্টেজে দাঁড় করানো হয়েছে। মামা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এ সম্মান সম্পূর্ণ আমার প্রাপ্য নয়। বস্তুত সবটাই পাবেন, সুসাহিত্যিক আকাদেমি কর্তৃক সম্মানিত শ্রীযুত গজেন্দ্রশঙ্কর সান্যাল। একমাত্র তাঁরই পরামর্শে আমি এটা স্টেজ করি। পাড়ার আর সবাই বলেছিল, এটা সাপ ব্যাঙ কিছুই হয়নি।'

বুঝতেই পারছেন, আমার নাম গজা সান্যাল। তখন আরেক ধুন্দুমার। আমার

গলা জিরাফের মত হলেও অত মালার স্থান হত না। নিতান্ত রঙ্গদর্শী গৌরীকিশোর সেদিন সেখানে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে আমাকে সময় মত না সরালে, বঙ্গীয় পাঠক-মণ্ডলী মল্লিখিত 'কলকাতার কাছেই কবির মহাপ্রস্থান' বই থেকে বঞ্চিত হত।

বাড়ি ফেরার পরও আমার মাথা তাজ্জিম-মাজ্জিম করছিল। নল ছেড়ে দিয়ে তলায় মাথা রেখে মনে মনে বললুম, 'অয়ি বাগেশ্বরী, তোমার সৃষ্টিরহস্য আমাকে একটু বুঝিয়ে বলোতো। মামার ঐ ফার্স পড়ে এ-পাড়ার সক্কলের তো কান্না পেয়েছিল। তবে কি পাড়ার মেধো ও-পাড়ার মধুসূদন?'

বিস্তর অলংকার শাস্ত্র পড়ে আমার মনে একটা আত্মম্ভরিতা হয়েছিল, আমি বলতে পারি কোন্ রচনা রসোত্তীর্ণ হয়েছে, কোন্‌টা হয়নি। এখন দেখি ভুল।

ভারত, বামন, ক্রোচে, বের্গসোঁ, তাহা-হোসেন, আবুসঈদ আইয়ুব সবাইকে পরের দিন বস্তা বেঁধে শিশি-বোতলওলার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলুম।

আমি জানি, আমার পাঠকমণ্ডলী অসহিষ্ণু হয়ে বলবেন, 'তোমার যেমন বুদ্ধি! পার্ক সার্কাসের রদ্দি বই পেল

মামাকে স্টেজে দাঁড় করানো হয়েছে

রাজাবাজারে সম্মান। আর তুমি তাই করলে বামন ভামহকে প্রত্যাখ্যান! জৈসন্‌কে তৈসন্, শাটকিসে বৈগন—যার সঙ্গে যার মেলে—শুঁটকির সঙ্গে বেগুনই তো চলে। রাজাবাজার পার্ক সার্কাসে গলাগলি হবে না?

কথাটা ঠিক। ফার্সীতেও বলে,

স্বজাতির সনে স্বজাতি উড়িবে মিলিত হয়ে
পায়রার সাথে পায়রা শিকরে শিকরে লয়ে!

The same with same shall take its flight,
The dove with dove and kite with kite.

কুনদ্ হম্-জিন্‌স্ ব্ হম্-জিন্‌স্ পরওয়াজ
কবুতর্ ব্ কবুতর বাজ্ ব্ বাজ্।

এসব অতিশয় খাঁটি কথা। কিন্তু প্রশ্ন, শেকসপীয়র মলিয়েরের জনসাধারণের—রাজা-উজির গুণীজ্ঞানীর কথা হচ্ছে না—চিত্ত জয় করেছিলেন যে রস দিয়ে সেটি কি খুব উচ্চাঙ্গের রস? মাঝে মাঝে তো রীতিমত অশ্লীল। এবং শেকসপীয়র যে আজও খাতির পাচ্ছেন তার কারণ জনসাধারণ তিনশ বছর ও'র নাটক দেখতে চেয়ে চেয়ে ওগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছিল বলে। শুধুমাত্র গুণীজ্ঞানীর কদর পেলে ও'র নাট্য আজ পাওয়া যেত লাইব্রেরির টপ শেলফে—সেটা উচ্চাসন হলেও অপ্রয়োজনীয় বই-ই রাখা হয় সেখানে।

আরেকটা উদাহরণ দি: ওস্তাদ মরহুম ফৈয়াজ খানের শিষ্য শ্রীমান সন্তোষ রায়ের কাছে শোনা। রাস্তায় এক ভিখিরির গাইয়া গান শুনে ফৈয়াজ তাকে আদর যত্ন করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে, তার সেই গাইয়া গানের এক অংশ শিখে নিয়ে, তাকে 'গুরুদক্ষিণা' দিয়ে বিদায় দিলেন। কয়েক দিন পরে সেই

টুকরোটি তাঁর অতিশয় উচ্চাঙ্গ ওস্তাদী গানে বেমালুম জুড়ে দিয়ে বড় বড় ওস্তাদদের কাছে শাবাশী পেলেন—ও রকম ভয়ংকর অরিজিনাল অলংকার কেউ কখনো শোনেনি!

আরেকটি নিবেদন করি: মেজর জেনরল স্লীমান গেল শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক রাত্রি কাটান দিল্লী থেকে মাইল দশেক দূরের এক গ্রামে। রাত্রে শোনেন ইঁদারা থেকে বলদ দিয়ে জল তোলার সময় এক চাষা অন্য চাষাকে মিষ্টি টানা সুরে 'হুশিয়ার,' 'খবরদার', 'সবুর' বলছে। পরদিন সে কথা এক ভারতীয় কর্মচারীর সামনে উল্লেখ করাতে সে বললে, 'তানসেন মাঝে মাঝে এখানে এসে এসব সুর শিখে নিয়ে আপন সৃষ্টিতে জুড়ে দিতেন।'

মামার প্যাসেটা চেয়ে নিয়ে আবার নূতন করে পড়লুম। নাঃ! আমি ফৈয়াজ নই, তানসেনও নই। এর কোনো বস্তুই আমার কোনো কাজে লাগে না। মামাকে দোষ দেওয়া বৃথা।

সমস্তটা তাহা অনুরিয়েল, কোনো প্রকারের বাস্তবতা নেই কোনোখানে।

তখন মনে পড়লো অস্কার ওয়াইল্ডের একটি গল্প। তিনি সেটি তাঁর সখা এবং শিষ্য আঁদ্রে জিদ্‌কে বলেছিলেন। তিনি সেটি ওয়াইল্ড সম্বন্ধে লেখা তাঁর 'ইন মেমোরিয়াম (সুভনীর)' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। নিজের ভাষায় বলি—ও বই পাই কোথায়?

গ্রামের চাষাভূষোরা এক কবিকে খাওয়াতো পরাতো। কবির একমাত্র কাজ ছিল সন্ধ্যার পর আড্ডাতে বসে গল্প বলা। চাষারা শুধোতো 'কবি, আজ কি দেখলে?' আর কবি সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাতো। রোজ একই প্রশ্ন। একদিন যখন ঐ শুধোলে, তখন কবি বললে, 'আজ যা দেখেছি তা অপূর্ব। ঐ পাশের বনটাতে গিয়েছিলুম বেড়াতে। বেজায় গরম। গাছতলায় যখন জিরোচ্ছি তখন, ওমা, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ দেখি, একটা গাছের ফোকর থেকে বেরিয়ে এল এক পরী। তারপর আরেকটি, তারপর আরেকটি, ক'রে ক'রে সাতটি। আর সর্বশেষে বেরুলেন রানী। মাথায় হীরের ফুলে তৈরী মুকুট, পাখনা দুটি চরকা-কাটা-বুড়ীর সুতো দিয়ে তৈরী। হাতে সোনার বাঁশী। সাতটি পরীর চক্করের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাজাতে লাগল সেই সোনার বাঁশী। তারপর নাচতে নাচতে তারা এগিয়ে চলল সাগরের দিকে। আমিও ঘাপটি মেরে পিছন পিছনে। সেখানে গিয়ে এরা গান গেয়ে বাঁশী বাজিয়ে কাদের যেন ডাকলে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল সাত সমুদ্র-কন্যা। সবুজ তাদের চুল—তাই আঁচড়াচ্ছে সোনার চিরুণী দিয়ে। সন্ধ্যা অবধি, ভাই, তাদের গান শুনলুম, নাচ দেখলুম—তারপর তারা চাঁদের আলোয় মিলিয়ে গেল।'

সবাই বললে, 'তোফা, খাসা, বেড়ে।'

কবি রোজই এ রকম গল্প বলে।

একদিন হয়েছে কি, কবি গিয়েছে ঐ বনে, আর সত্য সত্যই একটা গাছের ফোকর থেকে বেরলো সাতটি পরী, তারা নাচতে নাচতে গেল সমুদ্র পারে, সেখানে জল থেকে বেরিয়ে এল সমুদ্র-কন্যা। কবি একদৃষ্টে দেখলে।

সেদিন সন্ধ্যায় চাষারা নিত্যিকার মতো শুধোলে, 'কবি আজ কি দেখলে, বলো।'

কবি গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'কিচ্ছু দেখিনি।'

অর্থ সরল। যে বস্তু মৃন্ময় রূপে চোখের সামনে ধরা দিল, সেটাকে নিয়ে কবি করবে কি? কবির ভুবন তো চিন্ময়, কল্পনার

গাছের ফোকর থেকে বেরিয়ে এল একটি পরী

রাজ্য। বাস্তবে যে জিনিস দেখা হয়ে গেল তার ঠাঁই কল্পনা রাজ্যে, কাব্যের জগতে আর কোথায়? চার চক্ষু মিলনের পর বধূকে তো আর কল্পনা কল্পনায় তিলোত্তমা বানিয়ে বেহেশতের হুরী-পরীর শামিল করা যায় না।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে ওয়াইল্ডের আরেকটি ফরিয়াদ, সৃষ্টিতে আছে শুধু একঘেয়েমি। প্রকৃতি বিস্তর মেহন্নৎ করে যদি একটি ফুল ফোটায় (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে/ধরণীর তলে/ ফুটিয়াছে এ মাধবী/,) তবে বার বার তারই পুনরাবৃত্তি করে, অপিচ, কবির সৃষ্টি নিরঙ্কুশ একক, সৃষ্টিকর্তারই মত একমেবা-দ্বিতীয়ম্, এক জিনিস সে দুবার করে না, অন্যের নকল তো করেই না, নিজেরও কার্বন-কপি হতে চায় না।

ওয়াইল্ডের বহুপূর্বে জর্মন কবি শিলার বলেছিলেন, 'প্রকৃতি প্রবেশ করা মাত্র কবি অন্তর্ধান করেন।'

আর রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কি বলেছেন, সেকথা অন্যত্র বলার সুযোগ আমার হয়েছে। পুনরাবৃত্তির ভয় বাধ্য হয়ে বর্জন করে বলছি, তিনি প্রকৃতির সওগাৎ কদম ফুল দেখে বলেছেন, ওটা ঋতুস্থায়ী, আর আমার সৃষ্টি অজরামর,

আজ এনে দিলে হয়তো দেবে না কাল
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল
এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী
বহি তব সম্মান।

এ আবার কি রকমের সম্মান হল!

প্রকৃতিকে সব কবি হেনস্তা করার বর্ণন দেবার পর, আবার ক্ষণতরে ওয়াইল্ডে ফিরে যাই।

আচ্ছা, মনে করুন, ওয়াইল্ডের সেই গ্রাম্য কবি যদি চাষাদের একদিন বলতো, 'আজ ভাই, আবার সেই বনে গিয়েছিলুম। দেখি, গাছতলায় বসে এক পথিক তার সঙ্গীকে বলছে, সে তার পুরনো চাকরকে নিয়ে তীর্থ করতে যায়, সেখানে চাকরটা মারা যায়; তাই নিয়ে সে বিস্তর আপসা-আপসি করছিল।'

চাষারা নিশ্চয়ই ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতো, 'এতে আবার বলার মত কি আছে—এ তো আকছারই হচ্ছে।'

কিন্তু মনে করুন, তখন যদি কবি, 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি আবৃত্তি করতো? বিষয়বস্তু উভয় ক্ষেত্রে একই।

কবিতাটিতে যে অতি উত্তম রসসৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে এ-যাবৎ কেউ কখনো সন্দেহ করেনি।

অথচ ওয়াইল্ড বর্ণিত কবির 'পরী-সিন্ধুবালা' অবাস্তব, 'পুরাতন ভৃত্যের' বিষয়বস্তু অতিশয় বাস্তব। 'পুরাতন ভৃত্য' মনে না ধরলে 'দেবতার গ্রাস' নিন। সেটা তো অতিশয় বাস্তব—আইন করে বন্ধ করতে হয়েছিল, পরীর নাচ বন্ধ করার জন্য আইন তৈরী হয় না।

তা হলে দাঁড়ালো এই, বাস্তব হোক, কাল্পনিক হোক—প্রাকৃত হোক, অতি প্রাকৃত

হোক—যে কোনো বিষয়বস্তু রসোত্তীর্ণ হতে পারে যদি—

এইখানেই আলংকারিকদের ওয়াটারলু। কি সে জিনিস, কি সে যাদুর কাঠি, কি সে ভানুমতী মন্ত্র যার পরশ পেয়ে পুরাতন ভৃত্য আর বনের পরী কাব্যরসাঙ্গনে একই তালে, একই লয়ে চটুল নৃত্য আরম্ভ করে? কিংবা বাস্তবে না নেচেও কাব্যেতে নাচা হয়ে যায়? যথা:—

'জোন বললে,—চ্যাটার্জি, এই আনন্দের দিনে তুমি অমন গ্লাম হ'য়ে ব'সে থেকো না। আমাদের নাচে যোগ দাও।

বললুম,—মাদার লক্ষ্মী, আমার কোমরে বাত। নাচতে কবিরাজের বারণ আছে।

(শুনুন কথা! পৃথিবীর উপরে—হাউ অন্ আর্থ—কবিরাজ কি করে কল্পনা করতে পারে যে, ষাট বছরের বুড়ো গাঁইয়া চাটুয্যের বলডান্সের অভ্যাস আছে; আগে-ভাগে বারণ করে দিতে হবে!)

'ভানুমতী' বলে ভালোই করেছি। ম্যাজিকের জোরেই শরৎকালে আম ফলানো যায়। দীপক গেয়ে আগুন ধরানো যায়। মল্লার গেয়ে বৃষ্টি নামানো যায়। কিন্তু সত্য সংগীতজ্ঞ নাকি তাতে কণামাত্র বিচলিত না হয়ে বলেন, 'এর চেয়ে ঢের বেশী সার্থক হয় সংগীত যদি সদ্য-বিধবাকে সান্ত্বনা দিতে পারে, স্বাধিকারপ্রমত্তকে শান্ত করতে পারে। (১)' এবং কিছু না করেও সে যে সার্থক সংগীত হতে পারে সে তো জানা কথা।

আর্টে এই ম্যাজিক জিনিসটির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথঃ—

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা,
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি,'
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর
সাতটি যেন পোষা পাখি।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন
নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
কখন কোথা যায় না পাই দিশা,
বিজুলি হেন ঝিকিমিকে।
আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল
আপনি কাটি দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে অবাক মানে,
সঘনে বলে, বাহা বাহা॥

এখানে বিশেষ করে লক্ষ্য করবার জিনিস, সভার লোকে 'বাহা বাহা' বলছে, কেউ কিন্তু আহা আহা বলেনি।

পার্থক্যটা কোথায়?

দড়ির উপর নাচ দেখে বলি 'বাঃ', যাদুকর যখন চিরতনের টেক্কাকে ইস্কাপনের দুরি

মাদার লক্ষ্মী, আমার কোমরে বাত। নাচতে কবিরাজের বারণ আছে।

বানায় তখন বলি 'বা রে—' কাশীনাথ যখন গানের টেকনিকাল স্কিল (ম্যাজিক) দেখায় তখন বলি, বাঃ, কিন্তু যখন কবি গান,

'তোমার চরণে আমার পরানে,
লাগিল প্রেমের ফাঁসি—'

তখন মনে হয়, যেন আমারই বিরহতপ্ত ক্লান্ত ভালে প্রিয়া তাঁর আপন কণ্ঠের যূথীর মালে আমার সর্ব দহনদাহ ঘুচিয়ে দিলেন; চরম পরিতৃপ্তিতে হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে বেরিয়ে আসে, 'আ—আ—হ।'

আশ্চর্য হলে বলি বাঃ, পরিতৃপ্ত হলে বলি 'আহ্'। ম্যাজিক 'বাব্বাবাব্বা,' আর্টে 'আহাহা!'

'হাঁ'-কে 'না' করা, 'না'-কে 'হাঁ' করা কঠিন নয়, কিন্তু উভয়কে মধুরতর করাই আর্ট, সেইটি কঠিন, ঐটেই আলংকারিকদের ওয়াটারলু। এবং সবচেয়ে কঠিন, মধুরকে মধুরতর করা। ফুল তো সুন্দর তাকে সুন্দরতর করা যায় কি করে? স্বয়ং খৃস্ট বলেছেন, 'লিলিফুলকে তুলি দিয়ে রঙ মাখায় কে?'

অথচ জাপানী শ্রমণ রিয়োকোয়ান রচলেন,

কি মধুর দেখ রেশমের গাছে
ফুটিয়াছে ফুলগুলি
কোমল পেলব করিল তাদের
ভোরের কুয়াশা তুলি।

কি সে ভোরের কুয়াশা তুলি যা সব-কিছুকে মধুর মেদুর, কোমল পেলব করে দেয়?

দৃষ্টান্ত দেই;—

প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে পবন আসিয়া আমাকে দোদুল্যমান করাতে আমি মুগ্ধ হইয়া 'আমরি, আ মরি' বলিতেছি'—

কবির তুলির পরশ পেয়ে হয়ে যায়; 'পুব হাওয়াতে দেয় দোলা মরি মরি'—

আমি বললুম, 'সব বনে ছায়া ক্রমে ক্রমে ঘন হইতে ঘনতর হইতেছে—

কবির তুলি লাগাতে হল, 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে।'

কিংবা আমি বললুম, শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী রাত্রে পথ দিয়া যাইবার সময় যখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাহাকে কি শুভলগ্ন বলিব, জানি না।

'যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে
চাঁদ উঠেছিল গগনে।
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা লগনে।'

পাঠক হয় তো বলবেন, 'তুমি বলেছ গদ্যে, —সে যেন পায়ে চলা; আর কবি বলেছেন ছন্দে—সে যেন নাচা।'

উত্তম প্রস্তাব। ছন্দে বলি,

পথিমধ্যে তোমার সঙ্গে
পূর্ণিমাতে দেখা
বলবো একে মহা লগন
ছিল ভালে লেখা।

আর নিখুঁৎ, নিটোল ছন্দ মিল হলেই যদি কবিতা হয় তবে নিচের কবিতাটির নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কথাঃ—

হের প্রতি প্রিয় ভাষে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি!
কোন গ্রহ রাজা হৈল কেবা মন্ত্রিবর
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ দিগম্বর!

অলংকারের দিক দিয়ে কবিতাটি দিগম্বরই বটে।

এই যে তুলি সব-কিছু মধুময় করে তোলে, কি দিয়ে এ বস্তু তৈরী, কি করে এর ব্যবহার শিখতে হয়? এ কি সম্পূর্ণ বিধিদত্ত না পরিশ্রম করে এর খানিকটে আয়ত্ত করা যায়?

ঘটিতে টোল দেখলে চট করে টের পাই, কিন্তু নিটোল ঘটি বানাই কি করে?

আর এই তো সেই তুলি সে যখন আপন মনে চলে তখন সে গীতিকাব্য—লিরিক—'মেঘদূত'। যখন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, চরিত্রের ক্রমবিকাশের উপর এর ছোঁয়া লাগে সে তখন কাব্য—'রঘুবংশ।' যখন ধর্মকে ছুঁয়ে যায় সে তখন 'গীতা', 'কুরান', 'বাইবেল।'

---

(১) ধর্মজগতেও এই ম্যাজিকের বড় সম্মান। সাধু সম্বন্ধে যদি গ্রামে রটে তিনি লোহাকে সোনা করতে পারেন, তবে এবিষয়ে নির্লোভিজনও তার কাছে ধর্মোপদেশ চায়—যেন যে ম্যাজিক দেখায়, সে বুঝি ধর্মও বোঝে। রাজা রামমোহনের সঙ্গে খৃস্টানদের ঐ নিয়ে বেধেছিল। তিনি খৃস্টের অলৌকিক কর্মে (জলকে মদে পরিবর্তন করা ইত্যাদি) বিশ্বাস করতেন না। মুসলমানদের ভিতর দুই দল আছেন। একদল বলেন, হজরৎ মুহম্মদ অলৌকিক কর্ম দেখাতে রাজি হতেন না; বলতেন 'আমি যা বলেছি সেইটে সত্য না মিথ্যা যাচাই করে নাও।' কোনো এক সাধু নাকি ত্রিশ বৎসর সাধনার পর পায়ে হেঁটে নদী পেরতে পারতেন। তাই শুনে কবীর বলেছিলেন, এক পয়সা দিয়ে যখন খেয়া পার হওয়া যায়, তখন ঐ মূর্খের ত্রিশ বৎসরের সাধনার দাম এক পয়সা।

রস বিচারেও বলা যেতে পারে, একটি কাঠি দিয়েই যখন সব কটা প্রদীপ জ্বালানো যায়, তখন ওর জন্যে সংগীতে ত্রিশ বৎসর সাধনা করার কি প্রয়োজন?

আভাদিদির কথা সেদিন বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলুম কেন, সে কথা আর মনে পড়ে না। মুশকিল হল এই, বয়সে তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বড় এবং নমস্য—তাঁর সম্বন্ধে কোনওপ্রকার আপত্তিজনক মন্তব্য প্রকাশ করা নৈতিক কর্তব্য নয়। আভাদিদি কেন চিরদিন অবিবাহিত রইলেন তা নিয়ে আমাদের মাথা-ব্যথার প্রয়োজন নেই।

আভাদিদি একদিন আমাকে বলেছিলেন, তুমি আমার মনের কথাটি বেশ ধরতে পার। তোমাকে বিশ্বাস করতে আমার একটুও বাধে না। তুমি নাকি বিয়ে করেছ, দেবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়েটা হঠাৎ হয়ে গেল!

কই, আমাকে নেমন্তন্ন করলে না ত?

বললুম, সে আর বলবেন না আভাদিদি। সবাই জোর ক'রে ধরে বিয়ে দিয়ে দিলে। আমার একটুও এতে আনন্দ ছিল না।

আভাদিদি বললেন, তা যাকগে, হয়ে যখন গেছে! তবে তোমাকে ব'লে রাখছি ভাই, বিয়েটা হল অন্ধকারে ঢিল ছোড়া। কেউ হারে কেউ জেতে। তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়, দেবু?

তৎক্ষণাৎ মিছে কথা বলতে হল। বললুম, শ্বশুরবাড়ি! ও, সে অনেক দূর। কাটোয়া লাইন দিয়ে যেতে হয়।

তা বেশ—ভালই হয়েছে। তোমার বউয়ের কথা ননীবাবুদের ওখানে শুনেছি। ওরা তোমার বিয়েতে গিয়েছিল কিনা—। তা সে যাই হোক, মেয়েটির সঙ্গে যেন তোমার বনিবনা হয়, দেবু। আজকাল কথায় কথায় মেয়ে পুরুষে বড্ড খিটিমিটি লাগে। তোমার বউ বুঝি খুব একরোখা? দু'একটা কথা আমি শুনছিলুম এখানে ওখানে।

আভাদিদি কি শুনতে চান আমি জানতুম। আমার মুখের কথাটি তিনি সযত্নে তাঁর ঝুলিতে রেখে দিতে চান। মুখে বললুম, কই, এখনও সেসব কিছু জানতে পারিনি আভাদিদি—

তা বেশ, এত' খুব আনন্দেরই কথা।—আচ্ছা, এবার যাই ভাই, আমার ইস্কুলের আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে—

আভাদিদি তখনকার মতো চলে গেলেন এবং পিছন দিক থেকে আমি তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম।

ভদ্রমহিলার চুল পেকেছে। বয়সও তাঁর যথেষ্ট। চোখে তাঁর চশমা, পায়ে কেডস্ জুতো এবং হাতে একটি ছাতা। তিনি অতি প্রসিদ্ধ এক অভিজাত বংশের মেয়ে, এবং বিভিন্ন ও বিচিত্র সমাজে তাঁর আনাগোনা আজও অবারিত। তাঁর স্বভাব প্রকৃতিতে উগ্রতা নেই বলে কারও সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য বিরোধিতাও নেই। এখন আভাদিদি কর্পোরেশনের কোনো ইস্কুলে

শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। নেবুতলায় তাঁর সম্পর্কে এক ভাইঝির ওখানে থাকেন।

আভাদিদি এককালে নাকি পরমাসুন্দরী ছিলেন, এবং তৎকালে কোনও ব্যক্তি অথবা পরিবারের সংগে তাঁর ঈষৎ ঘনিষ্ঠতা ঘটলেই তাঁর আসন্ন বিবাহের খবর রটে যেতো। তাঁর সান্নিধ্য লাভের আশায় অনেক ফ্যাসনেবল পরিবারের যুবক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যেত। আভাদিদি এটি জানতেন, এবং শিক্ষিত যুবক দলের এই নির্বুদ্ধিতা মনে মনে উপভোগ করতেন। আভাদিদির বাবা ইংরেজ আমলে একজন পাকা দেশী সাহেব ছিলেন,—তাঁর জমিদারীর প্রচুর আয় ছিল, এবং তাঁর একটিমাত্র কন্যার স্বাধীন চলাফেরা ও শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি হস্তক্ষেপ করতেন না। আভাদিদির এক ভাই এখন বিলাতে বাড়িঘর কিনে বসবাস করছেন এবং অন্য ভাইটি নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে এই বছর পাঁচেক হল দেহরক্ষা করেছেন। সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যুর খবরটি ছাপা হয়েছিল।

দিন আষ্টেক পরে একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে হঠাৎ দেখি, আভাদিদি আমার নববিবাহিতা স্ত্রী মণিপ্রভার কাছে ব'সে অতি ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করছেন। পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরা নিজ নিজ মহলে থাকায় এদিকে বিশেষ কারও মনোযোগ নেই। আমি শশব্যস্তে বললুম, কী সৌভাগ্য আমার আভাদিদি, না ডাকতেই আজ আপনার পায়ের ধুলো পড়েছে। পরিচয়াদি হয়েছে ত?

হ্যাঁ ভাই হয়েছে। বউটি তোমার ভারি চমৎকার মেয়ে। আচ্ছা দেবু, তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বললে কেন? ননীবাবুর কথায় সেদিন আমার একটু সন্দেহই' হয়েছিল, সেই জন্যে আমি গিয়েছিলুম রত্না ঘোষের শ্বশুরবাড়িতে—ওর দেওরও আমাকে দিদি বলে। ওরা বললে, তুমি বিয়ে করেছ কাশীপুরে—গোপাল বক্সীর লেনে তোমার শ্বশুরবাড়ি। কাটোয়ায় কে বললে?

এবম্বিধ অধ্যবসায় সহকারে আভাদিদি আমার শ্বশুরালয় সম্বন্ধে অবহিত হতে চান, এটি আমার চিন্তার বাইরে ছিল। মণিপ্রভা যখন আমার প্রতি সহাস্য তথা কালকটাক্ষে তাকাল আমি তখন একটু ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলুম। বললুম, আভাদিদি, আর বলবেন না। ঠিক বলেছেন আপনি। এ দেশের বিয়ে হল অন্ধকারে ঢিল ছোড়া! নাম ধাম বংশ পরিচয়—সব অন্ধকার। আপনি ঠিক বলেছেন। আপনি চা খাবেন, আভাদিদি?

চা আমি খাইনে, তুমি জান।

ও, হ্যাঁ, তাই ত—ওই দেখুন, আগাগোড়াই ভুল! আসছি—

অত্যন্ত ভয় পেয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আড়ালে এসে দাঁড়ালুম। ভিতরে আভাদিদি তখন বললেন, দেবু বড্ড মিথ্যে কথা বলে। ওই জন্যেই ওকে কেউ বিশ্বাস করে না। আগেকার কথা কেউ ত আর ভোলেনি। আজ ভাই উঠি, আমার আবার নেমন্তন্ন আছে বোকেন মিত্তিরের বাড়ি।

আবার এসে আমি দাঁড়ালুম। আভাদিদি বললেন, চললুম এখন, দেবু। তোমরা ভাল থাক, সুখে থাক—এই আমি চাই ভাই।

তিনি নিজেই অগ্রসর হলেন। বুঝতে পারা গেল আমার প্রতি অসীম বিরক্তি নিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। আমি তাঁকে ভয় পেতুম।

মণিপ্রভা হাসিমুখে বলল, তোমার বউ আজ থেকে কিন্তু চালাক হয়ে গেল। দুটো কথা ও'র কাছ থেকে জানতে পারলুম। তুমি সত্যি কথা বল না, এবং তোমার অনেক 'আগেকার কথা' আছে।

সহাস্যে বললুম, আভাদিদি তাহলে বেশ ভালই ইনজেকশন দিয়ে গেলেন বলো? নেমন্তন্ন না ক'রে কী ভুলই করেছি!

উনি তোমাদের কে হন?

বলা বড় কঠিন, মণি। উনি কেউ হন না কারও। উনি নিজেই নিজের পরিচয়। ও'কে বাদ দিয়ে চলবার উপায় নেই কারও।

ঈষৎ গাম্ভীর্যের সংগে মণিপ্রভা বলল, অনেক আজে বাজে কথা উনি বলে গেলেন, তার মাথা মুণ্ডু নেই। আমার কিন্তু ভাল ঠেকল না।

আমি সেদিনকার মতো চুপ করে গেলুম বটে, কিন্তু চার পাঁচ দিনের মধ্যেই খবর পেলুম, আভাদিদি আমার শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। আমার অহেতুক আতঙ্কের আর সীমা রইল না।

বাংলার একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক নেতার মৃত্যু উপলক্ষ্যে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল। আমার আপিসের দুজন ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু আমাকে সেই সভায় টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। পিছনের দিকে একটি বেঞ্চের কোণে ব'সে মুগ্ধ হয়ে যখন একের পর এক বক্তৃতা শুনছি, তখন সহসা পিছন থেকে আমার কাঁধের উপর একটা টিপ পড়ল। ফিরে দেখি আভাদিদি। তিনি আমার ঠিক পিছনের সারিতে বসেছিলেন। গলা বাড়িয়ে চুপি চুপি তিনি বললেন, লোক মারা গেলে অনেক আজে বাজে সুখ্যাতি তার হয়, শুনতে পাচ্ছ ত? একবারটি বাইরে এসো দেবু, কথা আছে। অনেকদিন পরে তোমার সংগে দেখা।

তাঁর কথা কোনদিনই অমান্য করিনি। সুতরাং ভিড়ের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে তাঁর কাছে দাঁড়ালুম। তিনি গলা নামিয়ে বললেন, কিচ্ছু বিশ্বাস করো না, দেবু! লোকটা চিরকাল ধ'রে তার বউটার হাড়ির হাল ক'রে রেখেছিল। ওসব ছেঁদো বক্তৃতা, সব সাজানো কথার কারসাজি। লোকটার স্বার্থত্যাগের কথা শুনছিলে ত? তিন-তিনটে বিধবার সম্পত্তি ও লোকটা নিলেম করিয়ে বেনামে গ্রাস করেছিল! যুদ্ধের ঠিক পরে দু'-একটা ব্যাংক ফেল করিয়ে সব টাকা মেরে দিয়েছিল ওই চামার। ওদের একটা ব্যাংকে আমারও একশ তিপ্পান্ন টাকা ছিল, দেবু।

আভাদিদির কণ্ঠ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। তিনি পুনরায় বললেন, আমি এসেছিলুম, যদি একজনও কেউ সত্যি কথাটা বলে। কিন্তু খবরের কাগজের এমন সব কলকাঠি, সত্যি কথা বলতে কেউ সাহস পায় না। ওসব তুমি বিশ্বাস করো না, দেবু।

সমগ্র শোকসভাটার প্রতি আমার মনটা যেন বিরূপ হয়ে উঠল, এবং এই যে শত সহস্র লোক উৎকর্ণ হয়ে পরলোকগত নেতার সম্বন্ধে প্রশস্তির বাণী শুনছে, এদেরকে নির্বোধ ছাড়া আর কিছু মনে হল না। আমি যন্ত্রচালিতের মতো আভাদিদির পিছনে পিছনে বাইরে এলুম।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—সকল ঋতুতেই আভাদিদির হাতে একটি ছাতা থাকে। প্রকৃত পক্ষে দূরের থেকে কালো রংয়ের ছাতাটি দেখলেই নিশ্চিত হওয়া যায় যে, উনিই আভাদিদি। উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা
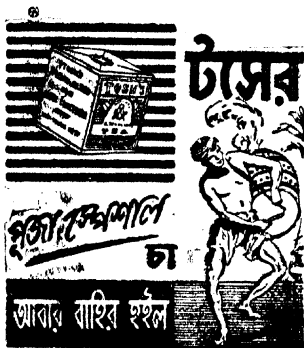
অচ্ছেদ্য। এ সম্বন্ধে আমিই একদিন ওঁকে প্রশ্ন করেছিলুম। উনি বললেন, ছাতাটা আছে বলেই পথঘাটে নিরাপদে হাঁটতে পারি।—পরে নাক সিঁটকে পুনরায় বললেন, কী নোংরা তোমাদের কলকাতা! চারদিকে যেমন শিং বাঁকানো গরু, তেমনি নেড়িকুকুর! অনেক জন্মের পাপ নৈলে কেউ কলকাতায় থাকে না! নর্দমার চেহারাগুলো একবার দেখেছ?

কলকাতার যে অংশগুলি সুদৃশ্য সেসব দিকে আভাদিদির চোখ একবারও পড়েনি, এ আমি জানতুম। কিন্তু বহুবাজার অঞ্চলটার সম্বন্ধে উনি সব চেয়ে কটু কথা বলতেন। একদিন আমাকে পথের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে বললেন, বউবাজারে থাকে ব'লে অমলার স্বভাবটাও নোংরা হয়ে গেছে।

প্রশ্ন করলুম, অমলা কে, আভাদিদি?

তোমাকে না সেদিন বললুম অমলা আমার সম্পর্কে ভাইঝি? আমার কথা বুঝি কানে তোল না?—আভাদিদি একটু ক্ষুব্ধ হলেন।

বললুম, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আচ্ছা, আপনি ত' তাঁরই ওখানে থাকেন!

হ্যাঁ, থাকতুম। এখন আর থাকিনে।—আভাদিদি বললেন, একখানা শাড়ি দিয়েছিল আমাকে, তাই নিয়ে কী খোঁটা! দক্ষিণের ঘরটায় থাকতুম ব'লে সকলের গায়ের জ্বালা! আমিই বা কেন চুপ ক'রে থাকব বলো, দেবু? ওর স্বামী যে মদ খায় আমি কি আগে জানতুম? ছোট মেয়েটা লোরেটোয় পড়ছে, এরই মধ্যে লুকিয়ে সিনেমায় যায়। আমি একখানা নোংরা চিঠি ধ'রে ফেলেছিলুম তাই মেয়েটার কী রাগ! বললে, বাড়ি থেকে বেরোও তুমি রাঙ্গাদিদি। আমি নাকি গোয়েন্দা, শুনলে দেবু?

এখন আপনি আছেন কোথায়?

এই যে, এই নাও ঠিকানা। একদিন যেয়ো ভাই।—আভাদিদি তাঁর বর্তমান ঠিকানাটি আমার হাতে দিয়ে পুনরায় বললেন, ছোট ছোট কাগজের টুকরোয় লিখে রেখেছি। একটি তোমার জন্যে ছিল।

অতঃপর আমাকে মুক্তি দিয়ে এক সময় তিনি বিদায় নিলেন।

আমার বিশেষ শ্রদ্ধেয় বন্ধু ধীরেন ডাক্তার একদিন আমার আপিসে টেলিফোন ক'রে বললেন, তুমি আজকাল আভাদির সঙ্গে অত ঘোরাফেরা করছ কেন বলো ত? তোমার সময় বুঝি অঢেল?

জবাব দিলুম, উনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন, ধীরেনদা!

বটে! কিন্তু তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে উনি যেরূপ ঘনিষ্ঠ সংবাদ একটু আগে আমার কাছে সবিস্তারে দিয়ে গেলেন, তাতে আমার মনে হয় না তিনি তোমাকে খুব স্নেহ করেন! একটু সাবধান থেকো হে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আমি খুব হেসে উঠলুম। বললুম, ও'র এখন বয়স হয়েছে ত, ও'র সব কথা ধরতে নেই!

বলো কি হে?—ধীরেন ডাক্তার বলল, উনি ব'লে গেলেন, কাটোয়া থেকে তোমার শ্বশুর নাকি তোমার বউটিকে নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন একটি তরুণ প্রেমিকের উৎপাতে। তারপরে উনি তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে যা বললেন, সেটি যথেষ্ট শ্রুতিসুখকর নয়। তোমার প্রতিবাদ করা উচিৎ, দেবু। আভাদির মতলবটা খুব ভাল নয়, মনে রেখো।

ধীরেন ডাক্তার টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

এর ঠিক দুদিন পরে আমার এক মাসিশাশুড়ী মণিপ্রভার কাছে এক পত্র দিলেন। তিনি লিখেছেন: আমার ভগ্নিপতি তোমার হাত পা বেঁধে যে জলে ফেলে দিয়েছেন এটি আমরা কেউই আগে বুঝতে পারিনি। বিয়ের দিন বিকেলবেলাতেও এসব খবর জানতে পারলে বাড়ির ছেলেরা অমন পাত্রকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াত!

চিঠি প'ড়ে মণিপ্রভা হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগল। আমি তাকে ঠিক কি প্রকারে সান্ত্বনা দেবো ভেবে উঠতে পারলুম না। বুঝতে পারা গেল, আমার নতুন শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা আভাদিদির কাছে আজগুবি অনেক গল্প শুনেছেন। মণিপ্রভার কান্না থামাবার জন্য আমি বললুম, নিন্দে শুনে চটতে নেই, নিজের সত্যে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তুমি নুইয়ে পড়লেই ত হেরে গেলে! এবার শোনো তোমার নিজের চরিত্র-কথন!

মণিপ্রভা চোখ মুছে আমার দিকে তাকাল। বললুম, তোমার বিয়ের আগে কাটোয়ায় কোন্ ছেলের সঙ্গে নাকি তোমার প্রণয় ছিল।

কাটোয়ায়? সে কোথায়?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ,—শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা লুকিয়ে রাখার জন্যে আভাদির কাছে মুখ ফসকে কাটোয়া বলেছিলুম, মনে নেই?

তারপর?

তারপর তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে পালিয়ে এসে এখানে তোমার বিয়ে দেন। এবার হয়েছে? সুতরাং মাসির ওপর অভিমানও করো না, এবং আমার ওপরেও একটু সুনজর রেখো!—আমি হাসলুম।

মণিপ্রভা এবার ঠিক সর্পিনীর মতো ফণা তুলে দাঁড়াল। বলল, তোমার সেই আভা-দিদি এ বাড়িতে আবার যদি আসেন, তাহলে আমি অপমান ক'রে তাড়াব!

হাসিমুখে বললুম, ওই নাও, যা ভয় করেছিলুম, ঠিক তাই। উত্তেজনাকে এত সস্তা করে নাই তুললে? মানুষের অজ্ঞান আর দুষ্প্রবৃত্তিকে ক্ষমা করতে না পারলে সংসার করবে কেমন ক'রে? যার ওপর রাগ করছ তার দুর্গতির দিকে চোখ পড়ছে না কেন? এককালে আভাদিদি প্রাধান্য পেয়েছিলেন সর্বত্র, সেটা তিনি ভোলেননি। আজ একালের সমাজের উপেক্ষা আর অনাদরের তলায় তিনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চান না। নিন্দা রটনার হাতিয়ার নিয়ে তিনি বেঁচে থাকার চেষ্টা পাচ্ছেন। তোমার মাসিমার সঙ্গে দেখা হলে কথাটা বুঝিয়ে বলো।—চলো, একটু বেড়িয়ে আসি।

কলকাতার পুরনো মহলে একদা যে কোনও সামাজিক কাজকর্মে সর্বাগ্রে আভা-দিদিকে স্মরণ করা হত। তিনি এসে দাঁড়ালে শুভকর্মের আসর জমজম ক'রে উঠত। তাঁর মৃদু হাসি, মিষ্ট আলাপ এবং অতি শোভন আচরণ সমগ্র অনুষ্ঠানকে অলংকৃত ক'রে তুলত। অভিজাত পরিবারে তাঁর খ্যাতি ছিল সুপ্রতিষ্ঠ, এবং তাঁর সান্নিধ্যে যে মধুর মুখচোরা সুগন্ধ পাওয়া যেত সেটি অনেকের নিকটেই ছিল লোভনীয়। দেশের বহু কবি, শিল্পী, সাহিত্যকর্মী এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিরা তাঁর কাছাকাছি এসে অনুপ্রাণিত বোধ করতেন। তাঁর যৌবনকালের ছবি আজও বহু প্রাচীন অট্টালিকার হলঘরের দেওয়ালে বিবর্ণ অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়। আধুনিক-কাল চিরদিনই অকৃতজ্ঞ, তাই সে অতীত যুগকে নিজের হাতেই মুছে চলে।

রাজা হরমোহন রায়ের বাড়িতে বিবাহের নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু আজকে সেই রাজাও নেই, হরমোহনও নেই। সেই ঝলমলে দুর্গা দালানে বট-অশ্বত্থের শিকড়গুলি আক্রমণ করেছে, পুরনো আমলের কোন কোন কর্তা জুয়া খেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছেন, কেউ বুড়ো বয়সে ভুগছেন দুরারোগ্য ব্যাধিতে। অত বড় চকমিলানো বাড়ি খান-খান হয়ে ভাগ হয়ে গেছে। তাই নিয়ে মামলাও চলছে হাইকোর্টে। সেদিনের সেই পরিবার আজ ছিন্নভিন্ন। সেকালের বড় রাজবাড়ি তার ভগ্নাবশেষ নিয়ে কালের কৌতুকের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিবাহ উপলক্ষ্যে বাড়ির সামনে অংশটায় কতকটা চুনকাম করা হয়েছে। জরাজীর্ণা বৃদ্ধার মুখে কে যেন পাউডার বুলিয়ে দিয়েছে।

নিমন্ত্রণটা সস্ত্রীক। কিন্তু যাবার আগে আমার আপিসে টেলিফোনযোগে স্বয়ং পাত্র আমাকে খবর দিল, বৌভাতে আসছ ত? বৌকে নিশ্চয় নিয়ে এস। ভয় নেই, আভাদি আসছেন না, তাঁকে আসতে বলা হয়নি। জান ত, আজকাল তাঁকে নেমন্তন্ন করতে অনেকেই ভয় পায়? তিনি আসছেন শুনলে কেউ আজকাল আসতে চায় না। তোমরা নির্ভয়ে এসো।

হাসিমুখে বললুম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো রতীন, ভয় আমি পাইনে। আভাদিকে দেখলেও আমি দুঃখিত হতুম না।

রতীনের বৌভাতে ঘটা ছিল খুব। তা'র নতুন বধূটির চেহারা ভারি সুশ্রী। মেয়েটিকে বসানো হয়েছিল একটি রক্তনীল মখমল বাঁধানো মঞ্চের উপর। আত্মীয় পরিজন ছাড়াও কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন। আমার নবপরিণীতা স্ত্রীকে দেখে অনেকেই অভিনন্দন জানালেন। আমি মণিপ্রভার কানে কানে কৌতুকের লোভে এক ফাঁকে বললুম, রতীনের বৌয়ের চেয়ে তুমি কিন্তু বেশি সুন্দর, মণি।

মণিপ্রভা হঠাৎ আঁতকে উঠে বলল, আঃ চুপ!

ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আভা-দিদি! আশ্চর্য, আধুনিক কাল তাঁকে এড়িয়ে যেতে চাইলেও তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। যে রাজপরিবার একদা তাঁকে বহু সম্মানে এবাড়িতে অভ্যর্থনা করে আনত, তাঁদের অনেকেই আজ বেঁচে নেই। আজ তাঁদের উত্তর পুরুষকে তিনি ক্ষমার চোখে দেখবেন বৈকি। এ বাড়ি তাঁর কাছে নতুনও নয়, অপরিচিতও নয়। ফীটন গাড়ি চ'ড়ে এ বাড়ির কর্তারাই তাঁকে একদা কর-যোড়ে আমন্ত্রণ করতে যেতেন; আজ সামান্য একখানা সস্তার ছাপা নিমন্ত্রণ পত্র ডাকযোগে তাঁর কাছে যাবে কিনা—তার অপেক্ষা তিনি করবেন কেন? আভাদিদি মাথা উঁচু করেই এসেছেন।

হাসিমুখে এদিকে ফিরে বলুম, আভা-দিদি, বড় খুশী হলুম আপনাকে দেখে। আপনার কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিলুম। দিন আপনার ছাতাটা, আমি রতীনের ঘরে ঠিক জায়গায় রেখে আসছি।

না ভাই, ছাতা আমি ছাড়ব না—আভা-দিদি বললেন, এ বাড়িতে বড্ড চুরি হয়। নেমন্তন্ন খেয়ে বেরোবার সময় কত লোক যে জুতো খুঁজে পায় না, কি বলব। বিয়ে বাড়িতে এসে মেয়েরা আজকাল বড্ড চটি-জুতো নিয়ে পালায়। শুনলেও ঘেন্না করে! ওইজন্যেই ত আমি ফিতে বাঁধা জুতো পরি। ছাড়তে বললেও ছাড়িনে!

মেয়ে মহল যে তাঁকে দেখে নানাবিধ কানাকানি করছিল,. সেদিকে আভাদিদি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। ওরা হল একালের চটুল রঙ্গীন পতঙ্গ!

মণিপ্রভা আভাদিদিকে দেখামাত্রই গা ঢাকা দিয়েছিল, তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বিয়ে বাড়ির হট্টগোলের ফাঁকে রতীন এক-

যার এসে আড়চোখে আমার নিরুপায় চেহারাটা দেখে পালিয়ে গিয়েছে। আমি তার প্রতি একবার কটমটিয়ে তাকিয়েছিলুম।
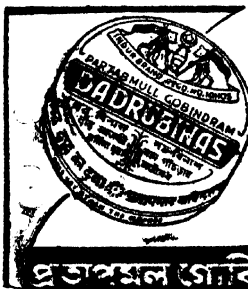
আভাদিদি আমাকে ছাড়তে চাইলেন না, সংগে সংগে ফিরতে লাগলেন। এক সময় জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার খাওয়া দাওয়া হয়নি?

না ভাই, এখানে খেতে আমার ঘেন্না করে! —আভাদিদি বললেন, ঘিয়ে ভাজা না ছাই! কিনা কি দিয়ে রাঁধে,—পচা মাছের গন্ধ! দই দেখলে বমি আসে! সন্দেশগুলো চিনির ড্যালা,—কে খাবে ওসব?

নাক সিঁটকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

এক সময় বললুম, রতীনের বউ দেখলেন? ভারি চমৎকার!

হ্যাঁ দেখেছি,—ব'লে আভাদিদি এক মুহূর্তে চুপ ক'রে রইলেন. পরে বললেন, মেয়েটা হল গদাধর রায়ের নাতনী, ওরই পিসি ত' সেই ফিরিঙ্গিটার সংগে বিলেত পালায়,—তুমি জান না? ওদের গুষ্ঠিটাই অমনি। চিরকাল ঘরের বেড়া ভেঙে বাইরের ঘাস খায়!

আমার বলবার কিছু ছিল না। চেষ্টা করছিলুম আভাদিদির কাছ থেকে সরে প'ড়ে বন্ধুসমাজের মাঝখানে গিয়ে একটু আমোদ করব। কিন্তু উনি এই বিপুল জনতার মাঝখানে নিজকে সম্পূর্ণ নিঃসংগ মনে করেন ব'লেই আমাকে ছাড়তে চান না। এর কারণ, দীর্ঘকাল ধ'রে সবাইকে উনি বিরূপ ক'রে তুলেছেন, সেজন্য আজ কেউ ওকে আপন মনে করতে চাইছে না। এই হাস্যোচ্ছ্বসিত বিশাল মিলন-উৎসবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আভাদিদির জীবনের অন্তহীন বিচ্ছেদ স্বচক্ষে দেখে যাওয়া অতিশয় বেদনাদায়ক মনে হচ্ছিল। আভাদিদির অতীত গোরব ছাই হয়ে গেছে।

এক সময় বললুম, আপনি একটু দাঁড়ান এখানে আভাদিদি, আমি গিয়ে রতীনের মা'র সংগে একটু দেখা ক'রে আসি—

শোনো দেবু, যেয়ো না—আভাদিদি বাধা দিয়ে বললেন, আমি একবার গিয়েছিলুম উঁকি মেরে দেখতে,—কিন্তু কী ঠ্যাকার সরোজিনীর! বললে, যদি এসেই পড়েছ তবে দুটো মিষ্টি কথা বলে যাও মিষ্টি মুখে দিয়ে! শুনলে দেবু, কথাটা কেমন ব্যাঁকা? ছোটবেলার বন্ধু হলে হবে কি, ওর মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না!

হাসিমুখে বললুম, না আভাদিদি, শুভ কাজের মধ্যে আপনি মন খারাপ করবেন না। আমি আসছি—একটু দাঁড়ান—

দ্রুতপদে আমি অন্যত্র চলে গেলুম। অন্দর আর বাহির মহলের মাঝামাঝি এক জায়গায় একটু ছমছমে ছায়ায় গা বাঁচিয়ে আভাদিদি আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে রইলেন।

কিন্তু আমি আর ও-মুখো হলুম না। ঘণ্টা দুই কাল বন্ধুবান্ধবদের হৈ-হুল্লোড়ের মাঝখানে কাটিয়ে এক সময় পংক্তিভোজনে বসবার চেষ্টা পাচ্ছিলুম।

সহসা বাইরের বড় আসরের দিকে একটা গোলমাল শোনা গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু পুরুষ ও মহিলাদের অনেকেই সেদিকে অগ্রসর হলেন। বৌভাতে আমন্ত্রিতের সংখ্যা অগণিত, সুতরাং সেই জনতার ভিড় পেরিয়ে আসল ঘটনাটা কি, সেটি জানবার জন্য রতীনের সংগে আমিও অগ্রসর হলুম। আমরা এখনও অভিভাবক দলের মধ্যে গণ্য হইনি, সুতরাং দর্শকদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিলুম।

রতীনের খুড়িমা এবং বড়মামা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে সর্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে নিতান্ত অপমানজনক ভাষায় যাঁর প্রতি কটুকাটব্য করছেন, তিনি হলেন উদ্‌ভ্রান্ত অশ্রুসজলা আভাদিদি। বাহির মহলের মস্ত অংগনে সেই নিমন্ত্রিত জনতার মাঝখানে আভাদিদির এই প্রকাশ্য অপমান রতীন কোনমতেই বরদাস্ত করতে পারল না।—এই, আয় ত'—ব'লে আমার হাত ধ'রে টেনে ভিড় ভেদ ক'রে সে আভাদিদির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার পর চেঁচিয়ে বলল, ছিঃ খুড়িমা, তোমাকে ধিক! বড়মামা, ছিঃ, তুমিও এই? আভাদিদি কত নোংরায় ডুব দিয়েছেন, সে আলোচনা করার অধিকার আমাদের কে দিল? তিনি কত নীচে নেমেছেন, তিনিই বুঝবেন। কিন্তু রাজা হরমোহন রায়ের কালচার? তোমরা তাকে আজ কোথায় নামিয়ে দিলে? যদি তোমাদের আত্মসম্মানবোধ থাকে, তবে এই সমস্ত নিমন্ত্রিত সমাজের কাছে হাত যোড় ক'রে ক্ষমা চাও,—তোমরা সবাইকে অপমান করেছ!

বড়মামা রুক্ষকণ্ঠে বললেন, ওঁকে আমরা কেউ নেমন্তন্ন করিনি!

আমি করেছি, বড়মামা—রতীন মিথ্যা ভাষণ করল।

কানাকানি শুনলুম, আভাদিদি নাকি ইতিমধ্যে কা'কে-কা'কে যেন ডেকে রতীনের মায়ের চরিত্র, এবং রতীনের নববধূর পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে অত্যন্ত আপত্তিজনক সংবাদাদি প্রচার করছিলেন। অতঃপর খবরটি ভিতর মহলে যায়।

চারিদিকের এই 'ক্ষুদ্র নীচ ইতর ও অধঃপতিত' সমাজ পাছে তাঁর কালো ছাতাটি হঠাৎ ছিনিয়ে নেয়, এজন্য সেই সেদিনকার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার এবং বিশিষ্ট 'নোটারি পাবলিক'-এর লোকবিশ্রুত সুন্দরী কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণাভা রায় ওরফে আভাদিদি সেই ছাতাটি প্রাণপণে চেপে ধরেই তাঁর ঘৃণাকে প্রকাশ করছিলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, আপনি চলে আসুন আভাদিদি, এখানে আর দাঁড়াবেন না। চলুন, আপনাকে আমি পেঁছে দিয়ে আসি।

আভাদিদিকে সংগে নিয়ে বেরিয়ে এলুম। রতীন তার গাড়িখানায় আমাদের দু'জনকে তুলে দিল। সেকালের বংগসমাজের আদরিণী প্রতিমাকে সেদিন সর্বশেষবারের মতো বিসর্জন দেওয়া হল।

আভাদিদি আক্রোশে নিশ্চেতন ছিলেন। আমার চোখে জল এসেছিল।

• • •

প্রায় মাস ছয়েক পরে আভাদিদির হাতের লেখা একখানি পোস্টকার্ড পেয়ে জানলুম, তিনি বিশেষ অসুস্থ। তাঁর নতুন ঠিকানা ধ'রে আমি একদিন তাঁর ওখানে গিয়ে হাজির হলুম।

বাড়ি ও বাগান মিলিয়ে মস্ত বড়, কিন্তু এখন ভগ্ন দশা। বিরাট হলঘরগুলিতে পূর্ববংগ থেকে রেফুজিরা এসে বসবাস করছে। এ বাড়ি কার, জানিনে। শুনলুম, কোনও এক নবাব বংশের লোক এর মালিক। তিনি এখন কোথায়, কেউ বলতে পারে না।

ওই বাড়িরই সিঁড়ির নীচে দর্মার আড়াল দিয়ে আভাদিদি তাঁর আশ্রয়টুকু ক'রে নিয়েছেন। রেফুজিদেরই কেউ একজন তাঁর নিরুপায় অবস্থায় দেখাশোনা করে। আমাকে দেখে খুশী হয়ে আভাদিদি বললেন, বসো ভাই, ওই কাঁথাখানা টেনে নাও হাত বাড়িয়ে—

আভাদিদিকে আজ অত্যন্ত বৃদ্ধা মনে হচ্ছিল। অবশ্যম্ভাবী জরা তাঁকে ধরেছে এবার। কিন্তু তাঁর গাত্রবর্ণ যে এত সুন্দর, আগে আমার জানা ছিল না। আভাদিদি
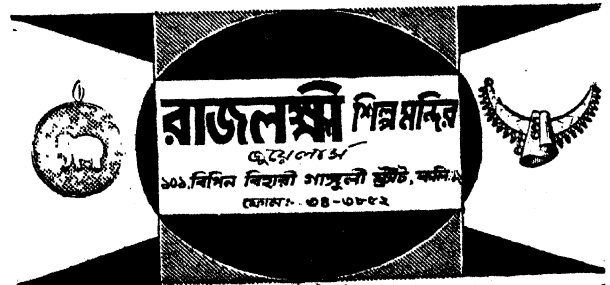
বললেন, আজ দিন তিনেক উঠে বসেছি। বিছানায় শুয়ে তোমার কথাই মনে পড়ছিল! তুমি বড় দুষ্টু, তাই তোমাকে ভুলিনি।

আভাদিদি মৃদু শান্ত হাসি হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ দেবু, বিশ্বাস করো, তোমারই কথা ভাবছিলুম। তুমিই বোধ হয় আমার দেখা সব শেষের মানুষ—

এবার একটু আড়ষ্ট বোধ করছিলুম। কোন্‌খান দিয়ে তিনি তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী কোন্ কোন্ ব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁর নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করবেন তারই জন্য অপেক্ষা করছিলুম। এক সময় বললুম, আপনার শরীর এখন কাহিল আভাদিদি, আপনি যেন উত্তেজিত হবেন না।

না ভাই, হবো না—শান্তকণ্ঠে পুনরায় তিনি বললেন, তবে কি জান দেবু, পথ বোধ হয় ফুরিয়ে এল!—বাইরে মস্ত তালগাছটার দিকে তাকিয়ে আপন মনে তিনি বললেন, কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সবাই একে একে কোথায় যেন হারিয়ে গেল! বুঝতেই পারিনে তাদের সকলের জন্যে আজ কেন চোখে জল আসে। পেছন ফিরে দেখছি, কেউ নেই, দেবু। শেষের দিকে জেনে গেলুম, আমি বড় একলা! রাত্তির বেলা শুয়ে থাকি, কিন্তু কে যেন ডাকে অন্ধকার থেকে। ভয় পেয়ে তোমাকে চিঠি দিয়েছিলুম। মাথার কাছে কে যেন এসে ভূতের মতন ব'সে থাকে। সন্ধ্যে হলেই গা ছমছম করে, ভাই—

ঈষৎ ব্যস্ত হয়ে বললুম, ওসব ভাববেন না, আভাদিদি—ও কিছু নয়। যদি এখানে আপনার থাকতে ইচ্ছে না করে, আমার ওখানে চলুন নিয়ে যাই আপনাকে। কোনও অসুবিধে হবে না আপনার।

না ভাই দেবু,—আভাদিদি বললেন, বড় স্বাধীন আমি। এখন আর এ বয়সে স্বারস্থ হব না কারও। মাস্টারী ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন হল,—ওরা কিছু টাকা দিয়েছিল আমার হাতে। সে টাকা অবিশ্যি দিয়ে দিয়েছি ওই রেফুজিদের সবাইকে। বড় কষ্ট ওদের।

চুপ ক'রে আমি আভাদিদির দিকে তাকিয়ে ছিলুম। আমি যেন আজ ভিন্ন ব্যক্তিকে দেখছিলুম। আমার ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাটাকে আজ অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হল। জীবনের অঙ্ক কোনদিনই মেলে না!

আভাদিদির কণ্ঠে গরলের চেহারাই দেখে এসেছি এতদিন। কিন্তু আরেকটু গভীরে, বোধ হয় তাঁর হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি, আরও কোনও বস্তু হয়ত লুকোনো ছিল, সেটি বেরিয়ে এল তাঁর শান্তমধুর নম্র হাসিতে। তিনি বললেন, না, কষ্ট আমি পাইনি দেবু, আমি আনন্দেই ত কাটিয়ে গেলুম। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্যিই কষ্ট পেয়েছিল, তাকেই এতকাল ধ'রে মনে রাখতে হল। আমার সেই অহঙ্কারের যুগে পোড়া চোখ অন্ধ ছিল!

কে তিনি, আভাদিদি?

আভাদিদি একটু থামলেন। পরে বললেন, তিনি আমার ছোটবেলাকার শত্রু! আচ্ছা দেবু, বলতে পার—বেথুন থেকে বি-এ পাস ক'রে যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালুম, তখনও আমার চোখ খোলেনি কেন? কই, আমি ত তাঁকে দুঃখ দিইনি! কেউ কি তখন আমাকে বলেছিল যে, গড়-মধুপুরের কুমার অরুণ চৌধুরীর জীবন আমারই জন্যে পুড়ে খাক হচ্ছে? না, কেউ আমাকে বলেনি। ছেলেটা দু'চার বার আমার কানে কানে প্রলাপ বকে গেল বটে, কিন্তু তখন কি জানতুম, আমার জন্যে সে রাজপরিবার ছেড়ে চিরজীবন শূন্যে ভেসে বেড়াবে? অরুণ বড় ছেলেমানুষী ক'রে গেছে, ভাই।—আভাদিদির কণ্ঠস্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল।

তিনি কোথায় এখন, আভাদিদি?

জানিনে ত ভাই! বছর পনেরো আগেও সে কোন্ দূর দেশের আশ্রম থেকে একখানা চিঠি দিয়েছিল। ছেলেমানুষী ক'রে লিখেছিল, পরের জন্মে নিশ্চয় দুজনের দেখা হবে! যাই হোক, মাঝখানে সে সব অনেক ঘটনা, ভাই। আজ বুঝতে পারছি, দুজনেই আমরা বড় অজ্ঞান ছিলুম!

আপনি কেন বিয়ে করলেন না, আভাদিদি?

প্রশ্নটা শুনে আভাদিদি কিশোরী কুমারীর সলাজনম্র হাসি হাসলেন। বললেন, ভাই, খুঁটিনাটি সব কথা আজ আর মনে নেই। তবে বোধ হয় ওই অজ্ঞান ছেলেটার আত্মাভিমান মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল বলেই আমিও হাসিমুখে চুপ করে গেলুম। সেকালে শরীরটা নিয়ে অত টানা-হ্যাঁচড়া ছিল না, দেবু,—সেইজন্যে ছটফট করিনি কেউ। নাটকীয়ভাবে দেখাশোনা হত, কিন্তু নাটকের অভিনয় হত না। আবেগ অসংযত ছিল না, —সেইজন্য সব দুঃখ আর ব্যথা-বেদনা মনের গভীর স্তরে বাসা নিয়েছিল। আমরা কেউ কারও হাত ধরিনি জীবনে। আমার চোখে জল দেখে অরুণ কখনও সামনে দাঁড়িয়ে থাকেনি; তার চোখে জল দেখে আমি কখনও সংযম হারাইনি। শ্রাবণের মেঘের মতন আমাদের সেই বিচ্ছেদ কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠত।

ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে হেসে আভাদিদি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে গিয়েছিলেন। পরে এক সময় যেন আমার ধ্যানভঙ্গ ক'রে তিনি পুনরায় বললেন, অনেকদিন আগে কা'র কাছে যেন শুনেছি গড়-মধুপুরের কুমার মারা গেছে। সে নাকি মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমার জন্যে বসেছিল। তা হবে। তাই জন্যেই হয়ত রোজ রাত্তিরে অন্ধকারে আমার মাথার কাছে সে এসে নিশ্বাস ফেলে। আমিও যে ঘুমিয়ে পড়ব একদিন, হয়ত সেই জন্যেই অপেক্ষা ক'রে থাকে,—কে জানে!—বলতে বলতে সেদিনকার মতো তিনি চুপ ক'রে গেলেন।

আভাদিদি সত্যিই একদিন ঘুমিয়ে পড়লেন, কিন্তু সেদিন তাঁর কাছে কেউ ছিল না।—

ন্যাশন্যাল ইনফারমারি হাসপাতাল থেকে আমার আপিসে একদিন হঠাৎ টেলিফোন এল: আপনি কি দেবুবাবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

দেখুন, আমাদের এখানে এক বৃদ্ধা দিন দুই আগে মারা গেছে। কোথাকার মেয়ে-ছেলে আমরা খোঁজ পাইনি, ঠিকানাও জানা যায়নি। বুড়ীর ডেড-বডিটা প'ড়ে রয়েছে মর্গে। আজ সকালে ওর সীটের পাশে একটুকরো কাগজ পাওয়া গেল তাইতেই আপনার ঠিকানা জানলুম। বুড়ী একটা কালো ছাতা আপনার জন্যে রেখে গেছে! আপনি কি ডেড-বডি আর ছাতাটা ডেলিভারি নিতে চান?

জবাব দিলুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, দুটোই চাই। লোকজন নিয়ে এখনই আমি যাচ্ছি।

হাঁ মশাই, যারপর নাই সোজা। এর চেয়ে সহজ আর নেই। অবশ্য তারাশংকর কি মজ্‌তবা আলীর মত লেখক হওয়া সহজ কিনা তা আমি বলতে পারব না। তবে আমার মতন লেখক হওয়া মোটেই কিছু কঠিন নয়।

যদিও আমি লেখক কি না, এই প্রশ্ন, আপনার মত আমার মনেও রয়ে গেছে। লেখক হতে পেরেছি কিনা সেবিষয়ে আমার সংশয় কিছুমাত্র কম নয়।

তাহলেও নামমাত্র এইটুকুই বা কী করে হলাম তার কাহিনী আজ আপনদের শোনাই।

জানেন তো, প্রেরণা না হলে লেখক হওয়া যায় না। লেখার প্রেরণা চাই। এই প্রেরণা আমার প্রথম বয়সেই আমি পেয়েছিলাম। পেতে হয়েছিল আমায়।

'প্রেরণ করো ভৈরব' বলে প্রার্থনা করিনি কোনোদিন। তবু এই প্রেরণা দুর্জয় আহবানের ন্যায় ভৈরবাকার ধরে হাজির হয়েছিল হঠাৎ।

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস লেখার প্রেরণা পান, শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির থেকে। আমার প্রেরণা কাবুলিওয়ালা।

না, রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটা নয়, আসল জলজ্যান্ত এক কাবুলি।

একবার এক কাবুলিওয়ালার কাছে আমি ধার করেছিলাম। করতে হয়েছিল আমায়।

তখনকার দিনে, আমার সেই লেখক-জীবন শুরুর সময়, লেখার আদর কেমন ছিল জানিনে, কিন্তু লেখার দর তেমন কিছু ছিল না। আমার লেখার দর অন্ততঃ। পাঁচ দশ টাকা দক্ষিণা আদায় করতেই প্রাণ যায় যায় হত।

আর, এই পাঁচ দশ টাকাই যে আনব তারই বা যো কি! দিনরাত যদি মেসের বকেয়া পাওনার দাবিতে কান দিতে হয় ত লেখায় মন দিই কখন! কাজেই দেখলাম, লেখাটাকে ব্যবসা করতে হলে একটা মোটা রকমের মূলধন নিয়ে বসা দরকার।

অবশ্যি তখনকার দিনে পাঁচ-দশ টাকার আমদানী নেহাৎ যা তা না। রীতিমতন খানদানী ব্যাপার। তাই থেকে খাওয়াও যায়, দেওয়াও যায়। তখন দেলখোস কেবিনে পাঁচ আনায় প্রকাণ্ড মটন চপ পাওয়া যেত, অপরকে ভাগ দিয়ে খাবার মতই। দশ আনা ছিল রাবড়ির সের। দশ পয়সার পোয়াটাক খেলে দুনিয়ার দুঃখ ভোলা যায়।

এখন, নিশ্চিন্ত মনে লিখতে পারলেই ঐরকম কয়েক দশ টাকাতেই বেশ দশাসই হতে পারি। কেবল কিছু মূলধনের দরকার।

শরৎ যা বলে আমার এক বন্ধুজন ছিলেন, তাঁকে আমি শরৎদা বলতাম। টাকার জন্য শরৎদাকেই ধরলাম। শরৎদা বলল, তোর মত বাউণ্ডুলেকে কে আর টাকা ধার দেবে। তবে আমার এক কাবলিওলার সঙ্গে আলাপ আছে সে যদি দেয়। চল দেখি।

নিয়ে গেল সেই কাবলির কাছে। কাবলি-ওলারা মুখ দেখে টাকা দেয়, মুখ দেখেই তারা ধরতে পারে লোকটা টাকা মারবার কিনা। আমার কোন চাকরিবাকরি নেই জেনেও সে মাসিক পনের টাকা সুদে দেড়শ টাকা ধার দিল। এক মাসের সুদের পনের বাদ দিয়ে তার কাছ থেকে আমি মোট একশো পঁয়ত্রিশ টাকা পেলাম। কড়ার হল, পরের মাস থেকে ফি মাসের দশ তারিখে সে হাজির হবে সুদ নিতে।

শরৎদা বল্লেন, মাসে মাসে নিয়মিত সুদ দিয়ে গেলেই হবে। তাই পেলেই ওরা খুশী, আসল ওরা চায় না। আসল তোকে কোনো দিন দিতে হবে না। কেউ সুদে আসলে ফিরিয়ে দিয়ে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলে ওরা ভারী প্রাণে ব্যথা পায়।

আমিও কারুর প্রাণে ব্যথা দিতে চাই না। মাস মাস পনের টাকা করে গুনতে আমারও কোনো কষ্ট নেই। দেড়খানা কি দুখানা গল্পের মামলা।

কেবল, মাস কাবারে দশ তারিখে লাঠি হাতে কাবুলি এসে হাজির হবে এই ডর। আগে ক্ষুধার তাগাদায় লিখতাম এখন ভয়ের তাগিদে। আর বলতে কি, এই কাবুলিওলার প্রেরণাতেই আমার লেখার হাত গেল খুলে।

উপায় গেল বেড়ে। এর কারণ বলি। পেশাদার মানুষ রোজগার করতে শুরু করলে প্রয়োজনীয় আয়ের সীমায় এসে ঠেকে থাকতে পারে না, বেশি উপায় করে ফ্যালে। স্বভাবতই সীমা ছাড়িয়ে যায়। মানুষত আত্মসংযমী নয়। আমারও পনের টাকার মত লিখতে গিয়ে পঁয়তাল্লিশ টাকার মত লেখা হয়ে যেতে লাগল।

সুখে কাটতে লাগল সময়টা। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—বেদান্তে বলেছে মিছে না। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো। না দিতে শিখলে

দুনিয়ায় কিছুই মেলে না। পনের টাকা দিয়ে পঁয়তাল্লিশ টাকা উপায় করো। কিন্তু ত্যাগ করতে করতে শেষটা ত্যক্ত হয়ে পড়তে হয়। জীবনে বৈরাগ্য আসে। মনে হয়, দূর দূর, এসব কী করছি!

তিন চার বছর বেশ টানলাম সুদ। কিন্তু দেড়শ টাকা নিয়ে পাঁচ ছ শো টাকা দিয়ে জীবনে একটা ধিক্কার এল। মনে হল, ধুত্তোর কাবলিওলা! মাস মাস এই পনের টাকা মুফৎ গোনা! এই পনের টাকায় ত্রিশটা সিনেমার টিকিট, পঁয়তাল্লিশটা মাটন চপ, আর দশ পয়সা পোয়া হিসেবে কত ভাঁড় যে বাবড়ি হয়, তার ইয়ত্তা হয় না। যথেষ্ট দিয়েছি, আর দেব না ব্যাটাকে।

সুদ আর দেব না বললে আসল গুনতে হয়। কিন্তু দেড়শ টাকা একসঙ্গে তখনো আমি চোখে দেখিনি। পাঁচ দশ টাকা যা আসে তা দেখতে না দেখতে উপে জায়, জমতে পায় না। কিন্তু মাসের দশ তারিখে কাবুলিওলা এসে জমলো ঠিক। এই উপেন্দ্রনাথের কাছে।

'এ শিব্রামবাবু—' হাঁক ছাড়ল নীচের থেকে।

'আইয়ে আইয়ে খাঁ সাহেব, উপর আইয়ে।' বলতে না বলতে খাঁ সাহেব খাঁড়া নিয়ে হাজির!

সুদ নিতে প্রত্যেকবারই সে উপরে আসত। কিন্তু নীচের থেকে না ডেকে আর আমার অভ্যর্থনা না পেলে সে উপরে আসত না। লোকটা ভারী ভদ্র ছিল। আর উপরে এলেই সে আমাকে তার তল্পীর থেকে পেস্তা কিসমিস বাদাম আখরোট খাওয়াত। কিছুটা দিয়ে যেত আবার। সেরকম তারালো পেস্তাবাদাম আমি কখনো খাইনি। কলকাতার বাজারে মেলে না। আমি তারিয়ে তারিয়ে খেতাম।

এবার কিন্তু তার ব্যত্যয় ঘটল। ঘরে আসতেই আমি বললাম—'খাঁ সাহেব, রুপিয়াকা তো কুচ্ছ যোগাড় নাহি হুয়া।'

খাঁ সাহেব অম্লান বদনে বলল, হম কাল আয়েগা। বলে আমাকে আখরোট ইত্যাদি না খাইয়েই চলে গেল।

এই প্রথম দুজনের ব্যবহারে দুজনেই মর্মাহত হলাম।

তারপর দিন আবার সে এল। আবার আমার সেই জবাব। সত্যি বলতে, আমার ছিলও না। কাবুলিদায়ে গল্পটল্প লেখা মাথায় উঠে গেছল। খাঁ সাহেবকে গলায় ঝুলিয়ে মা সরস্বতীকে হৃদয়ে আরাধনা করা যায় না। চারিধারেই তখন খাঁ খাঁ।

সে বলে গেল—হম কাল আয়েগা।

আবার কাল। তার পরের কাল। কালও যেমন ফেরফের আসে আর যায় সেও তেমনি রোজই এসে ফেরৎ চলে যায়। কিন্তু কালে কালে তাকে নব নব রূপে দেখলাম। ক্রমেই সে কালান্তক হয়ে দেখা দিল।

না, এভাবে চলে না। পালাতে হবে। সবাই কাবুলিকে দেখলে সটকায়। সদরে এলেই খিড়কির দোর দিয়ে সরে পড়ে। আমাদের খিড়কি ছিল না, তার আসার আগেই আগেভাগেই আমায় ভাগতে হবে।

সে দশটায় আসে আমি সাড়ে নটায় সরি। তারপরদিন নটায়, তারপরের দিন আরো আধ ঘণ্টা আগে। কেননা, জানিত বাসার কেউ নিশ্চয় তাকে বলে দেবে যে, আভিতো

সে কালান্তক হয়ে দেখা দিল

থা, থোরা আগারি চলা গিয়া।' কাজেই আমাকে তারপরের দিন আরো থোরা আগারি যেতে হয়।

কিন্তু আটটার কাঁটা পেরুতে গিয়ে আমার আটকালো। সকাল আটটার আগে আমার ঘুম ভাঙে না। আর সকালের ঘুমটা এমন মিষ্টি। কখনো যে ভোরবেলায় উঠিনি, তা নয়। উঠেছি। পরের প্ররোচনায় প্রাতঃকালের শোভা দেখবার জন্যেই উঠেছি। কিন্তু প্রকৃতির মহিমা দেখে নিয়েই তারপর বিছানায় ফিরে গেছি আবার।

আমার ঘুম আকট্য ঘুম। কাঁচের মতন কাঁচা নয়, ভঙ্গুর নয়। সহজে ভাঙে না। একবার রাত দুপুরে কলকাতায় ভূমিকম্প হয়েছিল। বাসার সবাই হাঁক ডাক করে আমায় তুলতে না পেরে আমাকে ফেলে রেখেই নেমে গেছে রাস্তায়। পাড়া জুড়ে সাড়া পড়ে গেছে বিরাট।

হঠাৎ বিছানার থেকে ছিটকে পড়ে আমার ঘুম ভাঙতেই একটা সোরগোর শুনলাম।

ব্যাপার কী? বারান্দায় গিয়ে দেখি আমাদের অলিগলি জুড়ে কাতারে কাতারে লোক। কী হয়েছে? তাদের রাস্তায় দেখে আমি যত না অবাক, আমায় বারান্দায় দেখে তারা তার চেয়ে আরো বেশি।

হয়েছে কী?

ভূমিকম্প হয়েছে। পাড়ার একটা ছেলে তলার থেকে জানাল।

হয়ে গেছে? তবে আর কি! আবার আমি বিছানায় গিয়ে ভাঙা ঘুম জুড়ে দিলাম।

সে-ই আমার ঘুম ভাঙানো সোজা কথা নয়। মেসের লোকদের বলা বৃথা, আমার অনুরোধে আমার ঘুম ভাঙাতে কেউ আসবে না। বাসার সবাই নিজের নিয়ে ব্যস্ত, পরের ঝামেলায় তাদের ফুরসৎ কম। তাছাড়া, আমার জন্য বাসায় কাবুলিওলার এই যাতায়াত তারা পছন্দ করত না। এতে তাদের সকলের চরিত্রেই কটাক্ষপাত হচ্ছিল। পাড়ার লোক আমাদের সবাইকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। কাবুলিওলার ধারে আমাদের ভেতর কে গেছে? তারা সবাই রোজগেরে লোক, চাকরিবাকরি করে, আমার মতন ইনসলভেন্ট নয় কেউ। কাজেই তারা আমার ওপর মনে মনে চটেছিল।

তখন অগত্যা আমার ছোটবেলার একটা ট্রিকস কাজে লাগালাম। মার কাছে শিখেছিলাম কৌশলটা। সেটা আর কিছু না, রাত্রে ঘুমোবার আগে নিজেকে সম্বোধন করে বলা —এই শিবরাম, আমাকে ঠিক অতটা অত মিনিটে তুলে দিবি। তারপর নিশ্চিন্ত মনে ঘুম দাও। শিবরামের ভেতরে যে শিবরাম আছে, যে নাকি সর্বজ্ঞ, তার দ্বারাই কাজ হাসিল হবে। তোমার অবচেতন মনই যথাসময়ে তোমায় চেতনা দান করবে। ঘাড় ধরে একেবারে কাঁটায় কাঁটায়।

এই আত্মসম্বোধনটুকুই যথেষ্ট। এই করেই তুমি খালাস। তারপরে তোমাকে সম্বুদ্ধ করার দায় তোমার অন্তরের। হৃদিস্থিতেন পরাৎপরের। মনের এক ভাগ মাত্র চেতনাংশ, বাকি ন ভাগ মনের তলায়—পরের পর। পরাৎপর সেই মনই তোমার কাজে লাগে, তোমাকে কাজে লাগায়। সেই নিমজ্জিত মনই নিমজ্জমান তোমাকে বাঁচায়।

একরকমের আত্মজিজ্ঞাসা আর কি! আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ-এর ব্যাপার, তাছাড়া কিছু না। কি করে ঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠে ট্রেন ধরতে হয়, তার হদিশ বাতলাবার জন্যে মা আমাকে এটা একদিন শিখিয়েছিলেন। ট্রেন আমার কখনো ফেল করেনি, এই কৌশলও না। বারে বারে আমার পরীক্ষা করে দেখা, ঠিক একেবারে কাঁটায় কাঁটায় উঠিয়ে দেয়। এক মিনিট এদিক ওদিক হয় না। এমনকি, যদি উঠে দেখি আমার ঘড়ির কাঁটা অন্য কথা বলছে, তখন ভালো ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি, আমার ওঠাটাই ঠিক, ঘড়িই ভুল— আমি ঠিক সময়েই উঠেছি।

এই কায়দাটা আমি কাবুলিটাকে বেকায়দায় ফেলার কাজে লাগালাম। রোজ রাত্তিরে ঘুমোবার আগে নিজেকে ডাক দিয়ে যাই—

এই শিবরাম! কাবুলিটা ওঠবার আধ ঘণ্টা আগে উঠবি। উঠেই কাটবি। দেখিস যেন আবার ফের ঘুমিয়ে পড়িস না। তারপর ঘুম থেকে উঠেই পাঞ্জাবিটা পিঠে চাপিয়ে আমার পিঠটান! বাসার আওতা ছেড়ে চোরবাগানের গলি ধরে সরে পড়ি সটাং।

জানি, কাবুলিও আমাকে পাকড়াবার জন্য রোজই আরো একটু আগে করে উঠছে, কিন্তু আমি তারও আগে উঠে তাকে আমার কলা দেখাচ্ছি। দেখে দেখে আমারই তাক লাগছে —এটা কি করে হয়? আমার মন না হয় আমার অভিভাবক, কিন্তু সে কি কাবুলিটারও মনের খবর রাখে? তার হালচালের হিসেব?

মনে হয়, এটা নিছক মনোযোগের ব্যাপার। কোনো সুড়ঙ্গ পথে হয়ত সবার মনের সঙ্গে সকলের মনের মিল রয়েছে। সকলের সঙ্গে সবার সংযোগ, সবাই সবার অন্তরগত। খণ্ড খণ্ড মন খণ্ড খণ্ড সময়—তার বহুখণ্ডিত পাত্র আমরা—দেশ কালে ছড়ানো। কিন্তু এমন এক অখণ্ড মন আছে, যা অখণ্ড সময়ে অখণ্ড মণ্ডলাকারে বিধৃত। তার সহযোগেই এই যোগাযোগ সাধিত হয়। মনের সঙ্গে মন জুড়ে দেয়। সব কিছু মঞ্জুর করে।

দেখেছি—না, কাবুলিকে তারপরে আর দেখতে পাইনি। সে কোনোদিন এসে পথ আটকায়নি আমার। দেখেছি এই কৌশলটা অনেক রকমে খাটে, অনেক কাজে লাগানো যায়। রোগ ব্যারাম সারানো যায় এইভাবে। ডাক্তার অবশ্যি ডাকতেই হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেকে ডাকলেও মন্দ হয় না। রোগের শক্তি কমানো যায়, ভোগের শক্তি বাড়ানো যায় এই উপায়ে। অপরের রোগব্যাধিও আরাম করা যায়। ও যেন আমাকে ভালো-বাসে, ও যেন আমাকে ভালোবাসে বলতে বলতে ওর ভালোবাসা পেয়ে যাই। কালো-কুচ্ছিৎ হয়েও।

এই উপায়ে আমি নিজেই যে কেবল বার বার উদ্ধার পেয়েছি তাই নয়, আমার অনেক লেখাও এইভাবে উদ্ধার করা। যখন একটা লেখার ভীষণ দরকার, অথচ কোন গল্পই মাথায় আসে না, প্লট পাইনে, কিম্বা হয়ত গল্পের গোড়াটা ফেঁদেছি তারপর আর আগাতে পারছি না। তখন করি কি, গল্পটার উপর একটু গড়িয়ে নিই। গল্পটাকে পাশে রেখে এক আধ ঘণ্টার জন্য ঘুমিয়ে পড়ি, (ঘুম তো আমার হাতধরা) আর জেগে উঠে দেখি তৈরি লেখাটা মাথায় লেগে রয়েছে। মাথার থেকে পাতার ওপরে পেড়ে ফেলতে বাকি কেবল। কলম ধরতে না ধরতেই গড় গড় করে বেরুতে থাকে, একটুও আটকায় না কোথাও। ঘুমের ফাঁকে অবচেতন মনে লেখাটা তৈরি হয়ে যায়। বীজমাত্র গল্পবস্তু অংকুরিত পুষ্পিত পল্লবিত হয়, পরে জাগ্রত মন দিয়ে কাগজের পৃষ্ঠায় ফলিত হয়ে ওঠে। এটা যোগনিদ্রা কিনা জানিনে, তবে আমার অনেক লেখাই এই-রকম নিদ্রাযোগে পাওয়া। আর এইভাবেই, আমার দৃষ্টান্ত থেকে বলতে পারি লেখক হওয়া ভারী সোজা। এমনকি রাজা উজীর হওয়াও কিছু কঠিন নয়।

নিজের কাছেই চাইতে হয়। তাহলেই দশদিক থেকে দশ হাতে দিতে থাকে। নিজেই মনেই অন্নপূর্ণা। পূর্ণাৎ পূর্ণমদুচ্যতে। নিজের কাছে না চেয়ে পরের দোরে হাত পাততে গেলে খুদ্‌-

বৃষ্টি কোথায়?

কুড়োও কখনো জোটে না। ব্রাহ্মাণ্ড-ভিখারী শিবের দশা হয়। লক্ষ্মীর ভাঁড়ারেও তাঁর জন্য কণামাত্র ছিল না। সর্বত্রই ভাঁড়ে ভবানী। কিন্তু নিজের ভাঁড়ের ভবানীর কাছে চাইলে অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলে যায়। অভাব মিটতে থাকে তক্ষুনি।

আত্মানং বিদ্ধি—লাখ কথার এক কথা। নিজেকে বিদ্ধ করো, খোঁচাতে থাকো। আত্মবেধ না হলে আত্মবোধ হয় না। আমি খেজুড় গাছ, আমি খেজুড়ের পত্রে খেজুড়, রসো বৈ সঃ, ভেবে কোনই লাভ নেই, এক ফোঁটাও রস বেরুবে না তার থেকে। কিন্তু নিজেকে খোঁচালেই নিজের রহস্য টের পাব —নিজেকে বুঝতে পারব তখন। নিজের কত রস বুঝব। দেখব যে অপরকে দিয়ে থুয়েও আছে, থৈ থৈ! যতদিন না নিজেকে, খোঁচাতে সুরু করছি ততদিন আমি নিতান্তই গোঁফ-খেজুড়ে। সব কিছু আমার নাগালে থেকেও গালে নেই।

তাই আমি নিজের সঙ্গে খচ খচ করতে লাগি। এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই। নিজেই নিজেকে হুকুম করি। আমার কথা আর কে শুনবে—আমি নিজে না শুনলে? কথাটা গিয়ে মনের মণিকোঠায়—আজ্ঞাচক্রে গিয়ে ঘা মারে। চাকা ঘুরতে থাকে। যা কিছু পাবার, মনের চক্রান্ত থেকে মুক্ত হয়ে এই চক্রবর্তীর হাতের নাগালে চলে আসে—গালের মধ্যে গলে যায়। আজ্ঞাবাহী পুরুষ আমার হুকুম তামিল করে।

সকালে, আরো সকালে, তারও সকালে উঠে উঠে বেরুতে বেরুতে কলকাতাকে যেন আমি নতুন নতুন করে আবিষ্কার করতে লাগলাম। দেখলাম, বেশ চওড়া একটা নতুন রাস্তা তৈরি হয়ে বেরিয়ে গেছে শ্যাম-বাজারের দিকে—কর্নওয়ালিস স্ট্রীট আর চিৎপুর রোডের মাঝামাঝি সমান্তরালে। সেই রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে নতুন নতুন পার্ক। সেই সব পার্কে অত ভোরেও ছেলেরা উঠে দৌড়চ্ছে, ব্যায়াম করছে। আড্ডা মারছে মানুষ। অত সকালেও লোক চলছে রাস্তায়। কাজে বেরিয়েছে অনেকে। কলকাতা কি কখনো ঘুমোয় না?

আরো কতো কী দেখলাম। অবর্ণনীয়ও অনেক কিছু চোখে পড়ল।

দেখলাম, মোড়ের চায়ের দোকানের সেই রোগা ছেলেটাকে। এইটুকুন ছেলে, এখনও তার খেলাধুলোর বয়স পেরয়নি। এই সময়েই সে এই চায়ের দোকানে এসে ঢুকেছে। লেখা-পড়ার সময়ও বোধ হয় ও কোনদিনই পাবে না। পরশু রাত্তির বারোটার সময় বাড়ি ফেরার মুখে দেখেছি, চা বানাচ্ছে, বাবুদের দিচ্ছে। কাল ভোরে চারটার সময় বেরিয়ে দেখেছি সে চা বানাচ্ছে। দিচ্ছে। ভোরের দু'একজন খদ্দের জুটেছে। কাল রাত্তিরে একটার সময় ফিরতে দেখলাম যে, চাখানা ধুয়ে সাফ করে টেবিলচেয়ার গুছিয়ে তুলছে। আর আজ সকালে তিনটের সময় বেরিয়ে দেখি সে কয়লার উনুন ধরাচ্ছে চায়ের জন্য। দিনভোরই তো খাটতে হয় ওকে। ও তাহলে কখন ঘুমোয়?

দেখলাম, রাস্তা ফুটপাত ভিজে, এর আগে কখন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। অসময়ে বৃষ্টি! এই সাত সকালেও দেখলাম, রাস্তায় জল দেওয়ার লোকরা হোসপাইপ ঘাড়ে বেরিয়েছে। তাদের ডেকে বললাম, আজকে আর কষ্ট করা কেন ভাই? আজ জল দিয়ে আর কী হবে? একটু আগেই ত বৃষ্টি হয়ে গেছে।

'বৃষ্টি হয়ে গেছে!' তারা বিরক্ত হয়ে বলল—'বৃষ্টি কোথায়? আমরাই ত জল দিয়ে গেছি একটু আগে।'

ওমা, এত ভোরে কলকাতায় জল পড়ে নাকি!

কাবুলির ভয়ে সারাদিন বাড়ি থাকি না, কখন এসে হানা দেয় ঠিক নেই! এগারোটার সময় বাসায় ফিরে নাকেমুখে দুটি গুঁজে আবার সটকাই। সারাদিন পার্কে পড়ে থেকে রোজ আরো রাত্তির করে বাসায় ফিরি। বাড়া ভাত ঠাসাই করে একটু না ঘুমিয়েই আরো আরো সকালে বেরিয়ে পড়ি। এমনি দিনের পর দিন।

কিন্তু ধরা পড়তে হল একদিন। এক গভীর রাতে ধরা পড়ে গেলাম।

কি করে ধরা পড়লাম? আমার মন কি তবে এই বিশ্বাসঘাতকতা করল? নাকি, কাবুলিও আমায় ধরবার জন্য মন দিয়ে
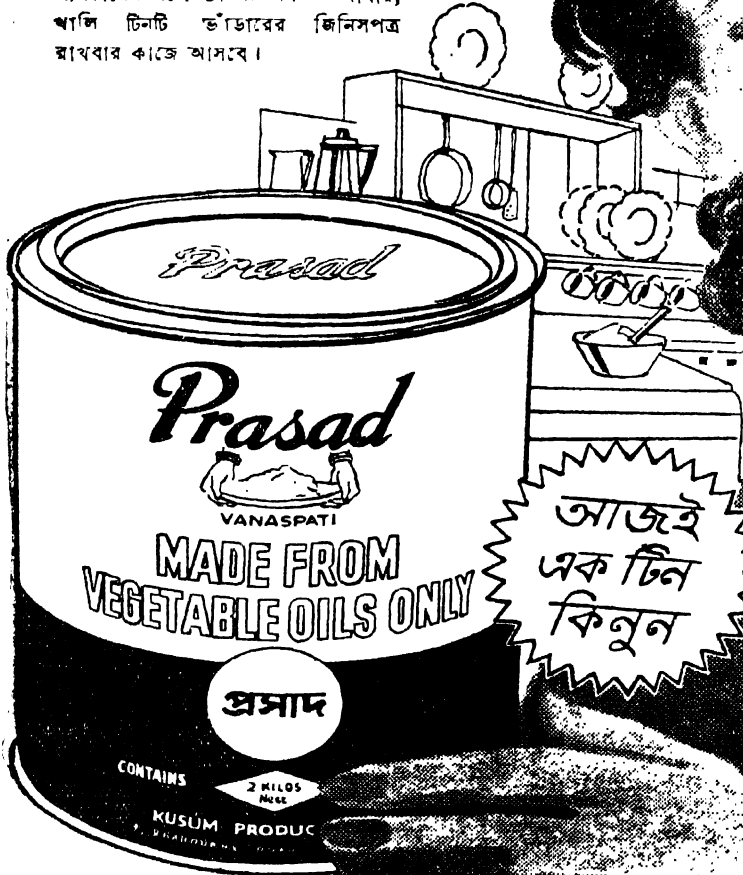
সাধছিল এতদিন? যে-মনের দয়ায় আমি এতদিন তার ছায়া এড়িয়েছি সেই মনেরই মায়ায় সেদিন ধরা পড়ে গেলাম। সবার মনের সঙ্গে সবার মন বাঁধা তো? তাই সবার সঙ্গেই সবার আন্তরিক বাধ্যবাধকতা।

রাত দুটোয় উঠে সেদিন পাঞ্জাবি চড়িয়ে বেরুতে যাচ্ছে, এমন সময়ে কড়া তলব এল। না, কাবুলিওয়ালার কড়া নাড়া নয়, তার চেয়ে বড়ো তাগাদা। বাথরুমে ছুটতে হল চটপট। দরজায় তালা লাগিয়ে গেলাম।

খানিকক্ষণ না বসতেই সিঁড়ি দিয়ে মস মস এক আওয়াজ এল। নির্ঘাৎ সেই কাবুলিওয়ালা। তার পায়ের ভারী জুতোয় সিঁড়ি ভাঙছে।

দোতলায় উঠে আমার দরজার কাছে এসে সে তালাটা নাড়ল। তারপর তেমনি মস-মসিয়ে চলে গেল। আমাকে সেদিনের মত তালাক দিয়ে গেল বোধ হয়। তবু আরো খানিকক্ষণ সবুর করে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি বেরুলাম।

কাবুলিওয়ালা তার ডেরায় ফিরে গেছে।

আহা, আজ বেশ আরাম করে ঘুমোনো যাবে। সৃষ্টির সেরা ভোর বেলাকার মিষ্টি ঘুম।

গা থেকে পাঞ্জাবি খুলে আঁধার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, দেখলাম তলাকার অন্ধকারের আড়াল ছিঁড়ে যেন একটা আব-ছায়া এগিয়ে এল—'এ শিব্রামবাবু।' এগিয়ে এসে হাঁক ছাড়লো ছায়াটা। সাড়া পেলাম বাবাজীর! ওমা, এ এখনো যায়নি যে! ঠায় তপস্যায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরকম সাধনায় ভগবান মেলে, শিবরামতো ছার!

'আইয়ে আইয়ে খাঁ সাহেব, উপরমে আইয়ে।' আপ্যায়িত গলায় ডাক ছাড়লাম আমিও।

বলতে হল না। শ্রীমান গটগটিয়ে উপরে উঠে এলেন।

আসতেই আমি পরম সমাদরে তাকে বিছানায় বসিয়ে বললাম, 'দেখিয়ে, আপকো হাম বহুৎ রোজসে ঢুড়তা থা। আপকো সাথ দেখা হো গিয়া আচ্ছা হুয়া।'

'ওতো ঠিক হ্যায়।' গম্ভীর মুখে বলল ও।

তাকিয়ে দেখলাম, ওকে চেনা যায় না। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে। বুলিও ক্ষীণ।

'খাঁ সাহেব, আপকো কেয়া হুয়া। কেয়া, তবিয়ৎ খারাপ হ্যায়? আপ এতন দুবলা পাতলা হো গিয়া কাহে?'

'আপকো বাস্তে।' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল ও। —'লেকিন আপকো তো বহুৎ মোটা তাজা দেখতা হুঁ।'

হামকো বাস্তে! অবাক হতে হল আমায়।

আমি একবার একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে আহার নিদ্রায় রুচি চলে গিয়ে রোগা প্যাঁকাটি হয়ে গেছলাম মনে আছে, কিন্তু

তুমকো আউর কুছ দেনে নেহি হোগা।

কাবুলিও কি কারো প্রেমে পড়ে?

নাকি, আমাকে পাকড়াবার সাধনায় রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে দিনের পর দিন দুশ্চিন্তায় ওর এই দশা হয়েছে? আর আমি ওর হাত এড়াতে, জীবনে যা করিনি, এত-দিন ধরে নিয়মিত সেই মর্নিং ওয়াক করে আমার চেহারা ফিরিয়ে ফেললাম?

কিন্তু প্রেমচর্চার সময় এ নয়, কর্তব্য কাজ করতেই হয়। সাধ্যমত গম্ভীর হয়ে আমি বলি—'হাঁ, আপকো হাম ঢুড়তা হ্যায় এসি বাস্তে, আপ জরুর জানতে হোগি...'

আমার সহজাত রাষ্ট্রভাষায় রাষ্ট্র করতে থাকি—'ফজলুল হক সাহেব নে এক আইন জারি কর দিয়া। থোরা রোজ আগারি। ও আইনকা বাৎ এহি হ্যায় যে, যো আদমি ধার লিয়া থা সুদ দেতে দেতে যদি উসকো ডবল দেনা হো যায়, তব আউর উসকো কুছ নেহি দেনে পড়েগা। সুদ আসল উসুল হো কর্ তামাম খতম। আউর ডবল সে জেয়াদা দেনে পর জেয়াদাঠো উসকো ফিরতি মিলেগা। আপ জরুর জানতে হোগি।'

সে চুপ করে থাকে। কিছুই জানায় না।

আমি বলতে থাকি—'দেখিয়ে, এই চার বরষমে মাহিনা মাহিনা পনর পনর দেকর হাম সাতশো বরাবর দে চুকা। আভি উসকো তিনশো আপ লেকর বাকি জাস্তি রুপিয়া হামকো খয়রাত দিজিয়ে। আইনসে তো ও রুপেয়া হামরা মিলনা চাহি। হাম আদালতমে যানে নেহি মাংতা, আপ দোগুড় আদমি হ্যায়, লেকিন, হামরা তো উ মিলনা চাহি।'

কাবুলিওলা চুপ করে বসে থাকলো খানিকক্ষণ। তারপর সে কেবল বলল— 'শিব্রাম্‌বাবু এ তুম কেয়া কিয়া?' হাম তো কুছ নেহি কিয়া। লেকিন, জনাব ফজলুল হক সাহেব—লেকিন বাত এহি হ্যায়, আপ হামারা হক্‌কা রুপেয়া...ফজলুল হক্‌কারু-পেয়া নেহি...হামরা আপনা হক্‌কা পাওনা —আপ হামকো দে দিজিয়ে......।

গম্ভীর ম্লান মুখে সে উঠে দাঁড়াল। তুমকো আউর কুছ দেনে নেহি হোগা।'

এই কথাই বলল। এই কথা বলে বিমর্ষ মুখে সে চলে গেল। আমাকে পেস্তা কিস-মিস না খাইয়েই।

আর সে ফিরে এল না। তারপর আর তার দেখা পাইনি। আমাকে লেখক করে দিয়ে চিরদিনের জন্যই সে চলে গেল। ভুলেও আর আমার কাছে এল না কোনোদিন। চিরদিনের মতই বুঝি ছেড়ে গেল সে। একেবারে ভুলে গেল আমায়।

ঠিক মেয়েরা যেমন ভুলে যায়।

ঘরের মধ্যে একটুও হাওয়া নেই। দমবন্ধ হ'য়ে আসছে। অথচ বাইরে দেখতে পাচ্ছি ঝড় হচ্ছে। গাছপালাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। আকাশে মেঘের দল উড়ে চলেছে মহানন্দে। অথচ ঘরে একটুও হাওয়া নেই কেন। ঘরের বাইরে হাওয়া প্রবল বেগে বইছে, অথচ ঘরের ভিতর সে ঢুকছে না কেন।

হঠাৎ মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথকে। বহুকাল আগে তাঁকে একবার মাত্র দেখেছিলাম এক সভায় অনেক দূরে থেকে। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি হাসছিলেন, হেসে হেসে গল্প করছিলেন কার সঙ্গে যেন। তাঁর চোখের অপরূপ দৃষ্টি, তাঁর মুখভাবের প্রদীপ্ত প্রকাশ, তাঁর প্রতিভার দিব্যদ্যুতি সবই দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু দূরে থেকে। তাঁকে কাছে পাইনি। অপরিচয়ের বিরাট ব্যবধান ছিল। তাঁর স্পর্শ পাইনি তখন।

আজ হাওয়ার এই কাণ্ড দেখে তাঁকে মনে পড়ল। তিনিও তো হাওয়ার মতোই ছিলেন সর্বত্রবিহারী। কখনও দখিন হাওয়া, কখনও ঝড়। কখনও আকাশে, কখনও গৃহকোণে। তাঁকে সেদিন পাইনি, আজ হাওয়াকেও পাচ্ছি না।

হঠাৎ ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে গেল। জানলা বন্ধ আছে। এতক্ষণ খেয়াল করিনি সেটা। জানলার কাচ দিয়ে বাইরের ঝড় দেখা যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি জানলাটা খুলে দিলাম। ভাল করে' খুলে দিলাম।

অবাক কাণ্ড। তবু হাওয়া ঘরে ঢুকল না। ঢুকল কায়াহীন কতকগুলো কথা।

"তোমার নাক বন্ধ, তাই নিশ্বাস নিতে পারছ না"

"তোমার ফুসফুস নেই, তাই দমবন্ধ হ'য়ে আসছে"

"তোমার চামড়া অসাড় হয়ে গেছে, তাই হাওয়ার স্পর্শ পাচ্ছ না"

খিলখিল করে' হেসে উঠল কে যেন।

"আরে তুমি যে সিনেমা দেখছ—ও সত্যি ঝড় নয়, সিনেমার ঝড়!"

আসল সত্যটা কিন্তু স্পষ্ট হ'ল আর একটু পরে।

হাওয়া, কাচের জানলা, সিনেমা সবই মিথ্যা।

একটা বন্ধ ঘরে শুয়ে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম—হাওয়ার স্বপ্ন। বাইরে প্রচুর হাওয়া, কিন্তু আমি বঞ্চিত হয়ে আছি। তারপর যা ঘটল তা অলৌকিক, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য। বন্ধ ঘরের দেওয়াল ভেঙে পড়ল। হু হু করে' হাওয়া ঢুকল ঘরে। গান শুনতে পেলাম।

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।

দেখি সামনেই রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন।

হাওয়ার বেগে কাঁপছেন তিনি।

স্কেচ ঃ শ্রীনন্দলাল বসু

ডালপালা নড়ে বার-বার

জীবনানন্দ দাশ

ডালপালা নড়ে বার-বার,
পৃথিবীর উঁচু উঁচু গাছে
কথা আলোড়িত হয় ; কেমন সে-কথা।
অন্ধকারে শঙ্খ নুড়ি ঝিনুকের কাছে

অবশেষে একদিন থেমে
মনে হয় ক্লান্তির সাগর
মাঝে-মাঝে চেনাতে চেয়েছে তার
দুই ফুট জমিনের ঘর।

শুনো-শুনো ঢের মেঘ মুছে গেছে, তবু
নীলিমায় গা ভাসিয়ে দিয়ে সাদা মেঘ
সারাদিন কী চেয়েছে তবে,
সারারাত কীসের উদ্বেগ।

কেন এই জীবনের সাগরে এসেছি,
হেসেছি খেলেছি কথা ব'লে গেছি কাজ ক'রে গেছি,
আরো কিছু আলো পেলে ভালো হত ভেবে
তবু তার মূল্যে সেই প্রাথমিক আলো হারিয়েছি।

হয়তো সবই আলো—আলো মনোহীন:
মানুষের মনন হৃদয়
আলোহীন: অথবা যা আলো ছিল—আজ
আলো চাই নব আলো আশার আনন্দে জ্যোতির্ময়।

ইতিহাস

অজিত দত্ত

আমাদের ইতিহাস লেখা হয় জলের রেখায়,
রক্তের অক্ষরে মুছে যায়।

কত যুগ যুগান্তের বিবর্তনে গড়ে তোলা মন,
কত তার সমারোহ, রূপে রসে কত আবর্তন,—
একদিন মানুষের ইতিহাস-রথচক্রতলে
শেষ চিহ্নটুকু তার চূর্ণ হয়ে উড়ে যাবে চলে।
দুর্গম কান্তার-মরু পার হয়ে কাছাকাছি আসা—
তখনি রক্তাক্ত বান অকস্মাৎ নিরুদ্দেশে ভাসা।
তাই কাব্যে লেখা যত মনের পাণ্ডুর ইতিহাস
মনে হয় চিরন্তন নিষ্ফল প্রয়াস।

আমন্ত্রণ শব্দমন্ত্র জপ করে দুর্বল হৃদয়
তীব্র বিতাড়ন মন্ত্রে দ্রুত তার নিশ্চিত বিলয়।
যত ছন্দ, যত গান, যত কাছে ডাকা,
সকলি সজল দিনে জলের রেখায় যেন আঁকা।
মানুষ সান্নিধ্য খোঁজে, এ কল্পনা সুখস্বপ্ন মতো,
রক্ত তাজা রক্ত চায়, এই সত্য পার্থিব, শাশ্বত।

বিষ্ণু দে

অসীম নীলে শুধু মোছে সে লজ্জা।
দেখেছি রাত্রির সতীকে দীনাকে
চিনিনে অশ্রুর অতনু সজ্জা।

চিনিনি গানে চেনা তুলনাহীনাকে
অশ্রুসাগরের পারে যে সঞ্চিত
করেছে কানাড়ার পাহাড়ী পিনাকে

আকাশচুম্বিত তুষারে অঞ্চিত
হৃদয়ঝঞ্ঝার নিকষ নীলিমা।
দেখেছি, তবে নিজে থেকেছি বঞ্চিত।

দেখেছি বটে, তবে চোখের ত্রিসীমা
বাঁধিনি এক তারে একটি মননে।
মিলবে সে ক্ষতি পূরণে কি বীমা

আজকে বৃথা বলো স্মৃতির রণনে?
আজকে শহরের জাগর অতলে
উদাসী ডুবেছে যে আত্মহননে,

ক্ষতির হিমালয়ে রতির অনলে
নগ্ন হৃদয়ের অস্থিমজ্জা।
সময়ে চিনিনি যে, কি দাবি-দখলে
অসীম নীলে ভাবি মুছি সে লজ্জা।

মোটর দুর্ঘটনার অর্ঘ্য

নিশিকান্ত

(১)

সামনে তাকিয়ে হ'য়েছি অন্যমনা!
পাশে ড্রাইভার, ছুটেছে যন্ত্ররথ;
হঠাৎ ঘটলো মোটর দুর্ঘটনা,
মুহূর্তে মোর তনু হ'লো জড়বৎ!

পা-দুটো পাথর! হাত-দুটো যেন কাঠ!
ঘাড় বেঁকে গেছে! মাথাটা প'ড়েছে ঝুলে!
ব্যথাবোধ নাই! হায়, একি বিভ্রাট!
তখনি হাজার কাঁকড়াবিছের হুলে

বুঝি বিঁধে গেছি! তবু সে যন্ত্রণাতে
সর্ব অঙ্গে অসাড়তা হ'লো গত;
আনন্দে বলি: মায়ের খড়্গাঘাতে
পক্ষাঘাতের অসুর হ'য়েছে হত।

গাড়ি থেকে আমি নামতে পারিনা! তাই,
গাড়িতে গড়িয়ে মায়ের চরণ চাই।

(২)

খবর পেয়েই এসেছেন ডাক্তার;
বয়েস্কাউট এলো স্ট্রেচার নিয়ে:
তুলে নিয়ে তারা নামালো এ দেহভার
এক্স্রের ফটো তোলবার ঘরে গিয়ে।

নেগেটিভে দেখি, স'রেছে ঘাড়ের হাড়,
অর্থাৎ, মেরুদণ্ডে উর্ধ্বভাগে
দুইটি গ্রন্থি হয়ে গেছে একাকার;
তাই জড়তায় ব্যথা সম্বোধি জাগে।

বলেন অস্থিবিশারদ মৃদু হেসে,
"বেঁচে গেলে কবি, অল্পের জন্যেই;
মরণের ফাঁড়া কেটে গেছে ঘাড় ঘেঁষে,
প্যারালিসিসের শঙ্কাও আর নেই।"

আমি তাঁকে বলি, মা যাকে রাখেন, তারে
কোনো যমদূত কখনো কি নিতে পারে?

(৩)

ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে এখন শুরু:
বারো-তেরো-হাত গজকাপড়ের ফালি
ভিজোনো-প্যারিস-প্লাস্টারে হ'লো পুরু;
বুক-থেকে-মাথা অবধি নেই তো খালি—

অতি বিচিত্র বন্ধনদশা ঘটে!
উঁচুতে-নীচুতে-ডাইনে অথবা বামে
তাকাতে গেলেই পড়ি মহাসঙ্কটে:
পরশুরামের কুড়ুল কি ঘাড়ে নামে!

গভীর রাত্রি; নার্সেরা ঘুম যায়;
বত্রিশদিন শিরদাঁড়া খাড়া রেখে
সোজা হ'য়ে বোসে র'য়েছি অনিদ্রায়;
আঁধারে জেগেছি আলোর স্বপন দেখে,

জেনেছি বিশ্বতামসহরণী মোর
বন্দীদশার বিভাবরী করে ভোর!

(৪)

সকালেই হ'লো ব্যাণ্ডেজ কাটা, তার
প্লাস্টার-ভাঙা কঠিন খণ্ডগুলি
যত দেখি, তত মনে হয় তা আমার
গত জন্মের শবের মাথার খুলি;—

নিমেষে তাও যে বিনিশ্চিহ্ন হ'লো,
নিয়ে গেলো শিবলিঙ্গম্-ঝাড়ুদার।
বন্ধুরা বলে, "এবার কলম তোলো,
পুজো এলো, লেখো আগমনী দুর্গার।"

আমি শুধু বলি: দুর্গতিনাশিনীরে
মোটর দুর্ঘটনার অর্ঘ্য দেবো,
এই দক্ষিণভারতসিন্ধুতীরে
অবতীর্ণার পদতল থেকে নেবো

নবজীবনের প্রতীক-দূর্বাদল,
প্রণতবীর্যে হ'বো আমি অবিচল।

গত-অনাগত

মনীন্দ্র রায়

আহা আমি যদি তার মনের প্রান্তরে
পাশাপাশি ব'সে শুধু ঘাসের স্পর্শের
কোমলতা পেতাম স্নায়ুতে!
আহা, একবার যদি শাড়ির জামার
মোহজাল খুলে, ত্বক রক্তের দাহের
ওপারে হৃদয় পারি ছুঁতে!

সে মেয়ে আমারই কাছে। আমি তবু তার
বুকের জঙ্ঘার ঢেউয়ে সমুদ্র আঁধারে
কখনো দেখিনি ধ্রুবতারা।
ঘুরেছি কেবলই তাই লবণছাওয়ায়—
জোয়ারের ফস্‌ফরাসে দেখেছি শুধুই
শতচক্ষু ভয়ের ইশারা।

তবু কি ছিল না তার কামনা? ও-মনে
নেইকি নিজেকে মেলে বিলিয়ে দেবার
রাজেন্দ্রানী সুখ?
আহা, প্রেম চোখে তার চিত্রল হরিণ
হ্রদের ওপারে, আমি পিছনে স্মৃতির
বাহুমেলা রাত্রির ভালুক॥

অরুণ মিত্র
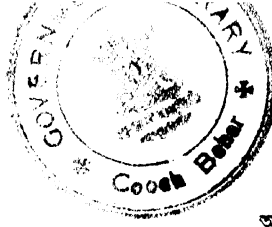
ঐ কোণে

ঐ কোণে আমার নজর রয়েছে।
বিশালতার জন্যে অস্থির হ'য়েও আমি বেরিয়ে পড়িনি
সাত সমুদ্দুর আমাকে হাতছানি দিয়েও টানতে পারেনি,
যন্ত্রণাক্ষোভ আলোড়ন
বারোমাসের টালমাটাল
সব ঐ কোণে জমা ক'রে দিয়ে ব'সে আছি,
ওখান থেকে নদী বইতে পারে।

যে এসে জাগায়

রাত্রির খাড়া কিনার ধ'রে চোরা পথঃ
আমায় যে সন্তর্পণে এসে জাগায়
তাকে আমি দেখতে পাই না
কিন্তু তার মুখে ভোরবেলাকার মুগ্ধতার সৌরভ,
তাকে আমি দেখতে পাই না
কিন্তু আমার করতলে
দিনের দূর উৎসের অনুভব।
আমার সব ছত্রভঙ্গ কথা এক দীপ্ত রেখা খোঁজে
যেখানে তারা ধুলোর মতো নাচবে।

দিনেশ দাস

নিঃশব্দে নিভৃতে সেই শিকড় গজানো পুরাতন।
ঘুম-ঘুম চোখে দোঁথ দুধে জ্যোৎস্নায়
চাঁদ উড়ে যায়
শঙ্খ ধবল লক্ষ্মীপেঁচার মতন।

তবু দিন গণি,
কখন বসন্ত পাতাবাহারের দিনে
জাগাবে বাঁকানো ডালে আমার প্রাণের প্রতিধ্বনি।
নিঃসঙ্গ পাতার মত ঝরি অতঃপর
ঘুম থেকে আরো গাঢ় ঘুমের ভিতর।

বিরাট টকটকে বটফলের মতই
সূর্য ডোবে মাঠের ওপারে,
যেখানে অজস্র চারা মানব-শিশুর মত
মাথা তুলে ওঠে চারিধারে।
এখানে আমারি হৃদপিণ্ডে রাঙা ফুলগুলি পড়ে ঝ'রে ঝ'রে,
বন্ধ্যা কালো পাথরে-কাঁকরে।

তারপরে সন্ধ্যার বাতাসে নামে
থোলো থোলো কালো আঙুরের মত রাত—
বোঁটার বাঁধন হ'তে একে একে
পাতাগুলি কেটে দেয় হাওয়ার করাত॥

দূর থেকে দেখো

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আমি আমার ভাবনাগুলোকে
চামচে ক'রে নাড়াতে থাকব—
অন্য কোন টেবিল থেকে তুমি শুনো।

সামনে দাঁড় করানো থাকবে কাপ,
আমার কোলের ওপর দুটো আঙুলে
কুরুশকাঠির মত বুনবে
স্মৃতির জাল—
তুমি অন্য কোন টেবিল থেকে দেখো।

তারপর
যখন জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে সময়
চেয়ারে শব্দ ক'রে আমি উঠে পড়ব।

পেছনে একবারও না তাকিয়ে
আমি চলে যাব

যেখানে বাড়িগুলোর গায়ে
চাবুক মারছে বিদ্যুৎ

যেখানে গাছগুলোকে চুলের মুঠি ধরে
মাটিতে ফেলে দিতে চাইছে হাওয়া

যেখানে বন্ধ জানলায় নখ আঁচড়াচ্ছে
হিংস্র বৃষ্টি।

তুমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখো।

কোন সামাজিক মহিলাকে

রাজলক্ষ্মী দেবী

মহিলা তোমার এই বসবার ঘরে আসবাব
পরিপাটি। তাকভরা রঙচঙে পিরিচ রেকাব।
ছাইদান ঝকঝকে। গামলায় পরদেশী ফুল।
অসম্ভব সব কোণে মণিপুরী নাচিয়ে পুতুল।

সমস্তই তার জন্যে। সব তার নাম জপ করে।
সে আসুক। সে দেখুক। দগ্ধ হোক সুখের সাগরে।
তুমিও,—যদিও ঠোঁট আঁকো নি এখনও, চোখে টানা
হয় নি কাজল,—ভুরু মেলে নি উড্ডীন দুই ডানা,
তবু কী ইচ্ছার তেজে তোমার সে শ্যামবর্ণ মন
আজকের এ সন্ধ্যায় হয়ে গেছে আতপ্ত কাঞ্চন।

সে নির্বোধ আসবেই। অনেকের এলোমেলো বসা,
সাতপাঁচ কথা ঠেলে তোমাকে সে পাবেই সহসা
প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মতো। —এই আসবাবী মেলামেশা
শীঘ্র তার মনে হবে চড়াদামী কড়া এক নেশা।

অন্যে পরে দোষ ভাবে এই সুখ, এ সব নেশায়,—
ইচ্ছুক মৃত্যুতে। —আমি তোমার সঙ্গেই দেবো সায়।
দোষ নেই,—মোমবাতি নিজের আগুনে গলে যায়।
দোষ নেই,—প্রজাপতি ভস্ম ক'রে পাখনা পোড়ায়॥

অফুরন্ত হরিশ সারখেল

হরপ্রসাদ মিত্র

নিশ্চয় ফোটাবে ফুল এই মাটি যেখানে আজকে
একটি আশার সঙ্গে জোটে বিশ পঁচিশ হতাশা।
অসংখ্য ভিখিরি, চোর, কয়েকটি দুর্বল সুজন—
সামনে দুস্তর খাদ, পেছনে সে ছবির অতীত
যা আজ কোথাও নেই তারই ক্ষীণ আলোর আড়ালে
জীবন হাঁপায় এই অন্ধকার মাটির খাদেতে।
পালিয়ে বেঁচেছে কেউ, কেউ বা বাঁচেনি—
একুনে সমস্ত নিয়ে তাতে মোট বিয়োগের ফল
কমে না, বাড়ে না; শুধু পা ডুবিয়ে বাধার প্রপাতে
অগত্যা ভাবতে হয় নিশ্চয় ফলন্ত হবে মাটি।

ঋতুর মিছিল যাবে প্রকৃতির গভীর আইনে
আমরা এলুম তাই পৃথিবীর আশ্বিনের রোদে।
নিজের কঠিন টানে টিঁকে থেকে নিজেকে ছড়ানো,
মেঘ-বিষ্টি- ঝড় খেয়ে আদিগন্ত রোদে পা বাড়ানো,
মাটিকে জননী বলা, জীবনকে ঈশ্বরের নামে—
পরমবিস্ময় বলে মেনে নেওয়া তাই গানে গানে!

শুধুই বাঁচবার জন্যে আমাদের হরিশ সারখেল
ঘুরছে সমস্ত দিন সম্ভাবনা খুঁটতে খুঁটতে।
অনেক চওড়া রাস্তা পার হয়ে ঢুকলো গলিতে।
সেখানে বাঁচুক সেও লাভ-ক্ষতি-আশার দয়াতে
উদ্‌ভ্রান্ত আশ্বিনে রোদে অফুরন্ত হরিশ সারখেল
দেখলুম দিগন্তজোড়া কাদা ঠেলে ঢুকলো গলিতে।

ডাকঘর

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাজার পিওন আজ চিঠি আনবে। দরজার ওপাশে
অমল, বন্ধুরা তোর সবাই অপেক্ষা ক'রছে।
মাধব দত্তের ভয়ে ওরা কেউ ঘরে আসতে পারে না; সবাই
বন্ধ জানালার বাইরে ব'সে আছে।

দই-ওলা অনেকখন এই পথ দিয়ে গেছে: হয়তো এখন
পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে
একটি আশ্চর্য বাড়ি দেখতে পেয়ে ভাবছে—'রোজ এই রাস্তা দিয়ে
হাঁটছি: কই, আগে তো পড়েনি চোখে!'

এমন সময় তাকে চমকে দিয়ে কে ডাকবে অচেনা মানুষঃ
'তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে—
বলতে পারো, মাধব দত্তের বাড়ি কোন দিকে?'

দাওয়ায় মাধব দত্ত ব'সে আছে, দৌড়ে আসবে পাগলের মতোঃ

'অমল! অমল! দেখ, রাজার পিওন তোর জন্য কী এনেছে!
চোখ মেল নিষ্ঠুর অমল!'

দরজাগুলি খুলে দাও, বাতাস আসুক!
অমল! অমল! এলো রাজার পিওন! —আজ
সবাই অপেক্ষা ক'রছে॥

অন্য দ্বীপ

গোবিন্দ চক্রবর্তী

বরং দাও না কোনো সহজ সংবাদ
অন্য এক নোতুন দ্বীপের
আজও যা হয়নি আবিষ্কার,
দিগন্তের শোভা যার
মেঘ নয়—কুন্দশুভ্র দিন,
তারাগলা তপ্ত রাত প্রিয়ার মতন:
সৃষ্টি-স্রষ্টা অর্ধনারীশ্বরঃ
ধ্যানমগ্ন ধ্বনি ও মৌনতাঃ
ধ্বান্ত-স্তব্ধ একাসনে
এখনো যেখানে।

এখনো যেখানে
পাখিদের কূজন মধুর
তিন পাহাড়ের শিলা ঝর্ণা করে চুর,
খাঁজে-খাঁজে, চড়াইয়ে-উৎরায়ে
নৃত্যচ্ছন্দে উতরোল মৃগযূথখুর,
চিরবনস্পতিশাখে চিত্রলময়ূরে
এবং সে আকাশের ছায়াছাপা হ্রদ;
এবং সে সমুদ্রের উদ্দামযৌবন
অসহ্য সোহাগে যারে করে আলিঙ্গন—
গড়ো না তেমন কোনো দ্বীপ
শঙ্কাহীন নিতান্ত নির্জন।

ঢের সত্য জেনেছি তা ঠিক মূল্য দিয়ে—
কত নাম, সর্বনাম, মুগ্ধ বিশেষণঃ
স্মৃতির ধাতুর সেই রুধিরক্ষরণ,
দিতে পারে যা আজ মুছিয়ে—
বজ্রের মতন অক্ষয়
বুঝি অন্য আরেক প্রত্যয়
প্রথম যা সূর্য-সনাতন।

দিগন্ত কাঁপানো কল্লোলে
উঠুক না যত আলোড়ন—
ভূগোল করুক স্তুতি,
যে মহিমা ইতিহাস দিক;
থাক তবু গহন গোপন
দূর সেই দুরাশা কুহক।

আছে কি সে দ্বীপ নেই
সে তথ্যও যে খোঁজে খুঁজুক—
ফুরুলে সমস্ত গুলি, বারুদের ঝাঁঝ-
খুলে-খুলে সবটুকু রহস্যের ভাঁজ,
সে দ্বীপে প্রাণের প্রান্তে
জানি তবু একদিন ছায়া ফেলবেই।

ভোর-করবী

অরুণকুমার সরকার

তিনটি ফুল যেন তিনটি বোন
বেগনী শাড়ি পরা, বারান্দায়
সোনালী রোদ্দুরে সকালে সুহাসিনী।

চকিতে জেগে ওঠা শিকারী যৌবন
রঙের তীর ছোঁড়ে কালোর পর্দায়;
ছিল না কোনদিন বালিকা বয়সিনী।

আকাশে আধো আলো, এখনও ঘুমঘোর
তিনটি বোন তবু সেরেছে প্রসাধন।
শিশিরস্নাত দেহে কিসের প্রত্যাশা!

এখনই টেনে নেবে খুশিতে ফাঁসিডোর
পরুষ সূর্যের মৃত্যুচুম্বন।
আত্মঘাতী বুঝি প্রাকৃত ভালোবাসা?

বৈদেহি আমার সেতু

জগন্নাথ চক্রবর্তী

ডোভার লেনের মাঠে রক্তচূড়া গাছের ছায়ায়
বসেছিল মুখোমুখি একজোড়া কপোত কপোতী
জ্যোৎস্নার আবর্তে দুটি সমুদ্রের ঢেউ বুকে নিয়ে
অনাঘ্রাত প্রথম সৌরভ—নারী।
"কথা দাও," কণ্ঠস্বরে অস্ফুট প্রার্থনা, "কথা দাও"
মিশরের প্রহেলিকা কথা দাও! মোনালিসা কথা দাও!
কণ্ঠের বৃষ্টিতে রুদ্ধ কণ্ঠস্বর—প্রথম পুরুষ।

প্রথম কোথায় দেখা? স্নিগ্ধচ্ছায়া রামগিরির শিলং পাহাড়,
অথবা সমুদ্রতীর, ঝিনুকের-পিঠে-নাম-লেখা?
অথবা দুপুর-দগ্ধ লালদীঘির অফিসক্যান্টিনে
কফির পেয়ালা থেকে মুখ তুলে
হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট অন্য এক চোখের তারায়
নিজের লজ্জাকে দেখে সঙ্কুচিত,
এ-জি অফিসের বহু স্তূপীকৃত ফাইলের নীচে
যেন কোনো ম্যাডোনার ছবি।
ডি-এ-জি-পি-টিতে শেষে?   "আপনিও?"
তারপর কফির পেয়ালা নেড়ে "কাল দেখা হবে";
তারপর অফিসের ছুটি শেষে ঘড়ির কাঁটাকে পিছে ফেলে
শহরতলীর ট্রেনে, কখনো বা
সিনেমা-হলের ভীড়ে আলো-অন্ধকারে
কলরবে, কখনো নীরবে রক্তচূড়া গাছের ছায়ায়
সমুদ্রের দুই তীর—মাঝখানে যুগযুগান্তের মৌন—
"বৈদেহি! আমার সেতু বিভক্ত করেছে দেখ ফেনিল জলধি।"
সেতু!

পলাতক প্রত্যহ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সময়ের কাছে যা কিছু চেয়েছি হয়তো পাইনি সব;
যাও বা পেয়েছি অক্ষম হাতে নিতেও পারিনি কতো—
ভাগ্য কিছুটা ছলনা করেছে—কিছু নিজ পরাভব—
নইলে হয়তো সার্থক হতো এ-জীবন অংশত।

কালের ভর্তা প্রতারক হলো, আমি বঞ্চিতা বধূ—
আকাশে মাটিতে আমার রোদন বিলপিত অহরহ!
বৃথা দিন আসে, দিন যায়, তবু যেন এক ফোঁটা মধু
মনের ভাণ্ডে রেখে গেছে দেখি পলাতক প্রত্যহ।

প্রসাদ

উমা দেবী

কেউ নয় মর্মসহচর।
জীবনের জ্বলন্ত মশালে
পতঙ্গের পাখা পোড়ে।
তারপর হয় তার মৃত্তিকাবিসর্পী যত পিপীলিকা প্রাণ
খাদ্য খেচরের—
পরিণতি পায় তারা বিস্মৃতির আকস্মিক চঞ্চুর গহ্বরে।
হৃদয়-উৎখাত-করা প্রেম শেষে স্মৃতিতেই হয় অবসান—
গর্ব-স্পর্ধা-ধৈর্য-ধৃতি মুখ ঘষে ভাগ্যের পাথরে
ছায়া শুধু থাকে সঙ্গী হয়ে।

এ চেনা-মহল থেকে অচেনার পাতাল গহ্বরে
জীবনের জলের পরিধি
ক্রমশ হারায় তার আয়তন-স্বাদ—
প্রতিবিম্ব ডুবে যায় আলোকের—লোষ্ট্রের মতন।

অথচ থাকত যদি মধ্যবিত্ত মন
অনায়াসে গড়া হ'য়ে যেত এক মৎস্য-পরিবার,
যাদের চোখের ভাষা সুখে দুঃখে একই প্রকার।
গভীর জলের তলে পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য রঙ
হারাত তীক্ষ্ণতা তার—
ভোঁতা হ'য়ে শান্ত হ'ত সুখী-সুখী মন।

কেউই পারে না হ'তে মর্ম-সহচর
তবে জানি—এনে দিতে পারে এক দু' দণ্ডের স্বপ্নের প্রহর
যখন নিশীথ নামে মাতৃজঠরের ঘন অন্ধকার নিয়ে
জন্ম-শত চেতনার আলোর নক্ষত্র জ্বেলে দিয়ে
আশ্চর্য ফুলেরা গায় গান আর পাখীরাও রঙে রঙে
হঠাৎ বিভোর হয়ে যায়
প্রেমের শরীর ক্রমে গড়ে ওঠে জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায়
এনে দেয় অশরীরী স্বাদ—
শুধু মুহূর্তের জন্য জীবনের মধ্যে নামে স্বাপ্নিক প্রসাদ।

দৃশ্যের বাহিরে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সিতাংশু, আমাকে তুই যত কিছু বলতে চাস, বল।
যত কথা বলতে চাস, বল।
অথবা একটাও কথা বলিসনে, তুই
বলতে দে আমাকে তোর কথা।
সিতাংশু, আমি যে তোর সমস্ত কথাই জেনে গেছি।
আমি জেনে গেছি।

কী বলবি আমাকে তুই, সিতাংশু? বলবি যে,
ঘরের ভিতরে তোর শান্তি নেই, তোর
শান্তি নেই, তোর
ঘরের ভিতরে বড় অন্ধকার, বড়
অন্ধকার, বড়
বেশী অন্ধকার তোর ঘরের ভিতরে।

(সিতাংশু, আমি যে তোর সমস্ত কথাই জেনে গেছি।
আমি জেনে গেছি।)

কী বলবি আমাকে তুই, সিতাংশু? বলবি যে,
দৃশ্যের সংসার থেকে তুই
(সংসারের যাবতীয় অস্থির দৃশ্যের থেকে তুই)
স্থিরতর কোনো-এক দৃশ্যে যেতে গিয়ে,
যে-দৃশ্য অনন্ত ভাল সেই স্থির দৃশ্যে যেতে গিয়ে
গিয়েছিস স্থির এক দৃশ্যহীনতায়।
অনন্ত রাত্রির ঠাণ্ডা নিদারুণ দৃশ্যহীনতায়।
দৃশ্যের বাহিরে, তোর ঘরে।

জানি রে সিতাংশু, তোর ঘরের চরিত্র আমি জানি।
ওখানে অনেক কষ্টে শোয়া চলে, কোনোক্রমে দাঁড়ানো চলে না।
ও-ঘরে জানালা নেই, আর
ও-ঘরে জানালা নেই, আর
মাথার ছ ইঞ্চি মাত্র ঊর্ধ্বে ছাত। মেঝে
স্যাঁতসেতে। দরোজা নেই, একটাও দরোজা নেই। তোর

চারিদিকে কাঠের দেয়াল।
চারিদিকে নির্বিকার কাঠের দেয়াল।
এবং দেয়ালে নেই ঈশ্বরের ছবি।

এবং দেয়ালে নেই শয়তানের ছবি।
(তা যদি থাকত, তবে ঈশ্বরের ছবির অভাব
ভুলে যাওয়া যেত) নেই, তা-ও নেই তোর
নির্বিকার ঘরের ভিতরে।

না, আমি যাব না তোর ঘরের ভিতরে।
যাব না, সিতাংশু, আমি কিছুতে যাব না।
যেখানে ঈশ্বর নেই, সেখানে শয়তান নেই, কোনো-কিছু নেই,
প্রেম নেই, ঘৃণা নেই—সেখানে যাব না।
যাব না, যেহেতু আমি মূর্তিহীন ঈশ্বরের থেকে
দৃশ্যমান শয়তানের মুখশ্রী এখনও ভালবাসি।
না, আমি যাব না তোর দৃশ্যহীন ঘরের ভিতরে।

সিতাংশু, তুই-ই বা কেন গেলি?
অস্থির দৃশ্যের থেকে কেন গেলি তুই
স্থির নির্বিকার ওই দৃশ্যহীনতায়?

সিতাংশু, আমি যে তোর সমস্ত কথাই জেনে গেছি।
আমি জেনে গেছি।
দৃশ্যের ভিতর থেকে দৃশ্যের বাহিরে
প্রেম-ঘৃণা-রক্ত থেকে প্রেম-ঘৃণা-রক্তের বাহিরে
গিয়ে তোর শান্তি নেই, তোর
শান্তি নেই, তোর
ঘরের ভিতরে বড় অন্ধকার, বড়
অন্ধকার, বড়
বেশী অন্ধকার তোর ঘরের ভিতরে।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান

কে ওই আড়ালে এসে অন্ধকারে বাজায় মন্দিরা,
জলে তার বাজে ঢেউ গলে গলে ঝরে পড়ে যেন
স্তব্ধতার ধ্যানভাঙা সোনার কান্নার ভীরু গান;

বিন্দু বিন্দু মধুজমা প্রপাতের স্নিগ্ধধারা ক্রমে
বনানীর দৃষ্টি ভুলে লোকালয়ে এসে রাখে তার
একাগ্র দুরন্ত গাঢ় আকাঙ্ক্ষার প্রসন্ন মহিমা

দোলায়িত স্বরে সেই মন্দমৃদু মন্ত্রণার মায়া
ছড়ায়, ছড়ায় কাছে, দূরে দূরে, আরো আরো দূরে-

এবং নিকটে তার গাঢ়তর স্বাদের পূর্ণিমা
দেহের মোহন কানে স্পর্শে মিশে ডুবে বলে তার
গোপন মধুর নেশা মেশান সফল আয়োজন;

কী কান্না, কী সুখ তার, ব্যথামুগ্ধ কী তার মহিমা
অপার আনন্দ হয়ে মুহূর্তেই হারায় স্মৃতিকে;
তরঙ্গে তরঙ্গে ভেঙে একাকার মেশামেশি সব—

অন্ধকারে দ্রুতরবে মন্দ্রধ্বনি মন্দিরার মধুর আলাপ
ক্রমে ক্রমে জমে জমে অবশেষে মেশে এসে সমে।

ক্লান্তি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

১

বরবটির খেত ঘুরে রামনাথ বিশ্বাস রোদ্দুরে
তুমি খুশি হও, তুমি অভিযোগ কোরো না,
বোলোনা 'অভাব' বলো 'বাড়ন্ত সর্কাল',
বরবটির খেত ঘুরে পর্যটন করছে রোদ্দুর।

আঙুল হেলিয়ে দোলে বরবটির সার,
জননী পৃথিবী সুখী, তিনি রাজমাতা,
রত্নগর্ভা; আপাতত আর-কোনো শস্য নেই তাঁর,
আর-কোনো চাষী নেই। মনোনয়নের শস্য নেই।
তাবলে কী এসে যায়? কচি-কচি বরবটির মুখে
বাতাস লেগেছে, আর রোদ্দুরের তেজে
বেড়ে উঠে তারা হেসে কুটি-কুটি নেচে নেচে সারা;
এবার মরতে তিনি রাজি। নৌকো খুলে দাও, মাঝি॥

২

আমি তো আগেই যতো সন্তাপ এনেছি রূপান্তরে
শরদচন্দ্রসন্নিভ সরোবরে।

আমি কি দুখেরে ডরাই? আমি তো প্রস্তুত হয়ে আসি
রাখি কুবলয় কোকনদে বুক, বুকে মোহারী বাঁশী।

তিনটি নিরাতি দুই বেলা আসে ছন দিয়ে ছাওয়া ঘরে,
বাঁকা চাতুরীর মরাল গ্রীবার তবু সারাদিন ভাসি
যোগীর অবোধ চিত্তের মতো নির্মল সরোবরে।

রাতে যখন ক্লান্তি, বুঝেছি বাকে মোহারী বাঁশী
ত্যাগের অগাধ সলিলে, হরিশ্চন্দ্রের সরোবরে॥

পরস্পর

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

ফিরে আসব অন্ধকারে বারবার নির্ভুল নিয়মে।
না প্রেম, না স্মৃতি, আজ কেউ নয় তোমার আত্মীয়;
দিগন্তের শান্ত রৌদ্র নিবে যাবে, নিঃসঙ্গ নিরীহ
তুষারের মতো সাদা শূন্য স্বপ্নগুলি ক্রমে-ক্রমে।
কুয়াশায় ভরে আছে অরণ্যের ম্লান পত্রাবলী;
না মেঘ, না রৌদ্র, আজ কেউ নয় তোমার, কেবল
প্রতিবিম্বহীন এই অন্ধকার নির্জন সম্বল,
রক্তের অচেনা স্রোতে পরবাসী হাওয়ার অঞ্জলি।

স্মৃতি বড় ক্ষমাহীন, এক ঝলক উত্তরে বাতাসে
খুলে যাবে একে-একে এই ঘরের জানালা,
—অথচ না প্রেম, স্মৃতি, মেঘ, রৌদ্র কেউ না তোমার—
তবু অবিশ্বাসী ঝড় যদি কোনোদিন ফিরে আসে
ভেঙে দেয় কুয়াশায় অরণ্যের নৈঃশব্দ্য নিরালা,
স্পর্শের সান্নিধ্যে রেখো অনাত্মীয় এই অন্ধকার।

নিয়তি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নরকের চারপাশে কেমন কেয়ারি করা সুন্দর বাগান
আমরা দুজনে ওই ফুল-বাগানে
বিকেলে বেড়াতে যাব আজ
হাওয়ায় উড়বে চুল, গুনগুন স্বরে প্রিয় গান
গেয়ে উঠব দুইজনে, কৌতুকে চকিত করে নরক-সমাজ।

গোলাপকুঞ্জের পাশে এস' এইখানে একটু বসি
তীব্র ঘন নীল আলো চতুর্দিক উজ্জ্বল করেছে
তোমার গ্রীবার ভঙ্গি, স্তনের সবল রেখা হঠাৎ আমাকে
যেন করে বিষম সাহসী
দেয়ালের এই পাশে আমরা দুজনে আছি কি উল্লাসে,
উষ্ণতায় বেঁচে।

কঠিন শাস্তির ঘর থেকে ঐ যে দেখ হিরন্ময়
চেয়ে আছে আমাদের দিকে,
সুকুমার মূর্তিখানি ছিন্নভিন্ন, চক্ষু থেকে মুছে গেছে
সমস্ত বিস্ময়
গলায় ছুরির দাগ, তবু কি দর্পিত রোখ,—আজ মনে হয়
আমারও সমস্ত পাপ আঙুলের নখের প্রতীকে
তোমার চুলের মধ্যে খেলা করছে দ্বিধান্বিত আদরে সম্প্রতি;
স্বর্গের অপ্সরী হয়ে থাকবে তুমি
হিরন্ময় ও আমার সমান নিরাত।

দুঃস্বপ্ন

আনন্দ বাগচী

হয়ত মনের ভুল, অসুখ না, যন্ত্রণার চিহ্নও ছিল না
সেই মাঝরাতে সেই একা বিছানায় ঘুম ভেঙে
দুঃস্বপ্নের রেশটুকু তখনো চোখের পাতা জুড়ে
হয়ত দুলেছিল, যেন অলীক গাছের ছায়া দোলে
আলো নিভলে দুধসাদা ঘরের দেওয়ালে, রোজ দ্যাখ।
তুমি ভাবলে সেই ছায়া তোমার রক্তেই মিশে গেল
হঠাৎ আয়নায় দেখা দেহটা শিউরে উঠে ফের
বিছানায় ভেসে রইল অস্পষ্ট জটিল ভয়াবহ,
বাইরে নিথর রাত, নক্ষত্র পল্লীর তলদেশে
ঘুরপাক খাওয়া পথ, অট্টালিকা কালপেঁচার মত
জমিয়ে বসেছে যেন বহুক্ষণ অশরীরী চোখের আয়নায়।

হয়ত মনের ভুল, হাওয়া লেগে জানলার ছিটকিনি
খুলেছে, দরজায় কেউ টোকা দেয়নি বালিকা বয়সে,
নিচের তলায় ছিল আস্তাবল, বৃদ্ধ, বেতো ঘোড়াটি সেখানে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার নিদ্রা সাধছে অগম্য-গোপন,
আজন্ম দণ্ডিত যার পরমায়ু, লোহা পরা-পা ঠোকে মেঝেতে
তখন অপাপবিদ্ধ অন্ধকারে প্রতিধ্বনি জাগে।
মনোনীত কেউ আসবে তখনো জানতে না তাই, উঠে
আলো জ্বেলে বসে থাকতে জানতে না নাচের ডমরু
তোমার রক্তেরই মধ্যে দ্রুত বাজছে, জানতে না, জানতে না।
কাঁচের চৌবাচ্চা সামনে, আলোকিত গন্ধে ও পাথরে
মৎস-কেলি অবিশ্রাম, ফাঁদ পাতা জলের কবরে।
হয়ত মনের ভুল, অসুখ না, যন্ত্রণার চিহ্নও ছিল না—

আরতি দাস

দরজা খোলো অন্ধকার ঘর;
আকাশে মেঘ, থমকে আছে ঝড়;
সুমুখে নেই আঁধারচেরা আলো
যেদিকে চাই কালো শুধুই কালো।

কখনো মন আকুল হয়ে কাঁদে,
কখনো ফের আশায় বুক বাঁধে,
ভয়ের হাত সবলে পিছু টানে
ব্যাকুল চোখ তবু দুয়ার পানে।

দরজা খোলা ভেতরে আছ কেউ?
নদীর জল শুধু জলের ঢেউ,
শূন্যে দোলে খড়কুটোর বাসা
ওড়ে পাখীর আশা ও ভালবাসা,
পায়ের মাটি চোরাবালির চর—
আকাশে ঝড় বিষম এলো ঝড়;

দুর্যোগের দারুণ এল রাত
দরজা খোলো আশায় ভরা হাত।

মানস রায়চৌধুরী

খবর পাঠাই রোজ নানাভাবে, মিনারের চূড়া অবারিত
কেন রেখে গেলে জনহীনতার স্তব্ধ উচ্চতায়?
এতদিনে গ্রহান্তরে গলিত ধাতুর প্রস্রবণ
ঠাণ্ডা খনিজের মূর্তি ধরে সুপ্ত মাটির গহ্বরে
কিন্তু কার আর্তনাদে ভরে তুলি আমার শ্রবণ!

ও নাহলে বাঁচবো না। আঙুরের ক্ষেত ছুঁয়ে নীল হ্রদ অথবা
পৃথিবী
নারিকেল বীথিঘেরা সমুদ্রের খোলাবুক যদি
সাজাও অনন্তকালে তবু কি প্রলুব্ধ হবো, স্বপ্ন অলক্ষিত
চাই দুঃখী লোকালয়, পাশে কোনও অভিমানী নদী
গ্রহতারকার গতি না জেনেই বয় চিরাগত।

পরিশ্রান্ত মিনতির গলা কাঁপে পাহাড়ের বুকে, প্রতিধ্বনি
ফিরে আসে অনাদৃত, কত শব্দ হারিয়েছে পিছনের পথ
হয়ত অবেণীবন্ধ কেশভার গন্ধ আনে অবিস্মরণীয় এই আশা
চোখ বুজে দেখা যায় আরেক নীলিমা গড়ে সোনার শরৎ
বিলীন দুহাত শূন্যে আন্দোলিত, সাঙ্কেতিক নিশানের ভাষা।
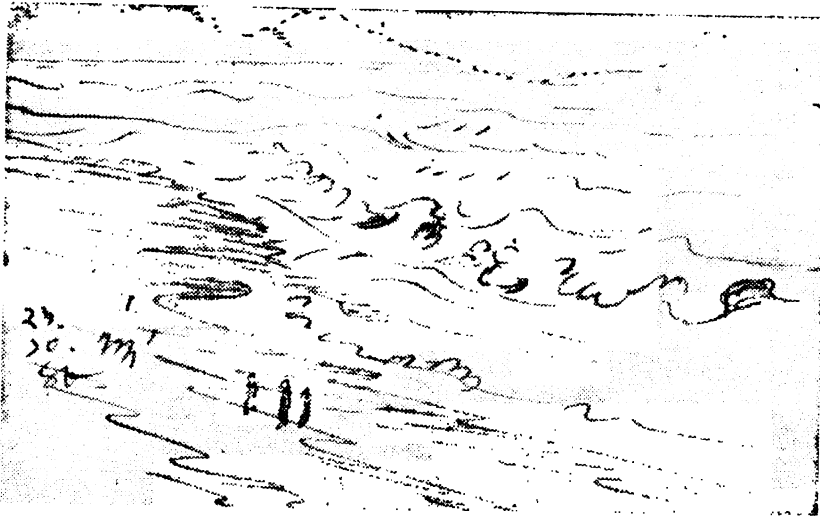
সুন্দরের পিয়াসী — শ্রীনন্দলাল বসু

একবার দেখলে অনেকবার মনে পড়বে; আর, একদিন দেখলে অনেকদিন মনে থাকবে; এ রকম একটি চেহারা।

চোখ দুটি বেশ টানা-টানা; কিন্তু দুই চোখেরই কোল দুটো বেশ কুঁচকে গিয়েছে, এবং বোধ হয় সেই জন্যেই মনে হয়, সব সময় হাসছে চোখ দুটো। তা ছাড়া, কাঁচা-পাকা এক জোড়া গোঁপও একটু শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে। তাই বোধ হয় মনে হয়, যেন ঠোঁটের উপর একটা হাসির ছায়া লুটিয়ে পড়েছে।

বারো মাস ঐ একই সাজ; খাকি কামিজ, খাকি হাফ-প্যান্ট আর খাকি মোজা। দু'পায়ে কালো চামড়ার এক জোড়া ভারি বুট। আর মাথায় একটা হ্যাট।

হ্যাটটা শোলার; কিন্তু মাঝে মাঝে খেজুর পাতার হ্যাটও তাঁকে পরতে দেখা যায়। এ জিনিসটা তাঁর নিজেরই হাতের কারুকলার একটি কীর্তি। কেউ শিখিয়ে দেয়নি, কারও কাছ থেকে দেখা-শেখা ব্যাপারও নয়। নিজেই ভেবে-চিন্তে, বার-বার পরীক্ষা করে, শুধু একটা পেন্সিল-কাটা ছুরির সাহায্যে তিনি খেজুর-পাতার হ্যাট তৈরী করে থাকেন।

একটা একনলা বন্দুক; সেটা কখনও পিঠের সঙ্গে আবার কখনও বা তাঁর সাইকেলের রডের সঙ্গে বাঁধা থাকে। ষাট বছর বয়স, তবু এই সেদিনও তিনি ষাট মাইল পথ সাইকেল চালিয়ে সেই কুলডিহা থেকে এই শিউলিবাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মাসটা ছিল আষাঢ়; সারা দিনে তিন পশলা জোর বৃষ্টিও হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সময়মত, অর্থাৎ সন্ধ্যার জোনাকী জ্বলে উঠতেই বাড়ির দরজার কাছে এসে সাইকেলের ঘণ্টি-বাজিয়ে ডাক দিয়েছেন—আমি এসেছি নিরু।

লোকে জানে, প্রতিবেশীরাও শুনে আসছে, রোজই ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে, ঠিক এইরকম একটি স্মিতময় স্বরে, ঠিক এইভাবেই ঘণ্টি বাজিয়ে ডাক দিয়ে থাকেন এই ভদ্রলোক: আমি এসেছি নিরু।

ঘরের ভিতর থেকে লণ্ঠন হাতে দরজার কাছে এগিয়ে আসেন নিরুপমা। মাঝে মাঝে নিরুপমাকেও কথা বলতে শোনা যায়। যেন একটু বেশি খুসি হয়ে আর হেসে কথা বলছেন নিরুপমা।—এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে? এখনও তো জোনাকী জ্বলেনি।

ভদ্রলোকও হাসেন—আমি ঠিক সময়েই ফিরেছি। সন্ধ্যাটাই আসতে একটু দেরি করেছে।

সেই ভোজপুরী হালুয়াই রামসিংহাসন আজও বেঁচে আছে। রামসিংহাসন জানে, বাঙালীবাবু আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে এসে আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়েছেন, আর, বউকে নাম ধরে ডেকেছেন।

আজকাল অর্থাৎ এই পাঁচ বছর ধরে বাঙালীবাবু কিন্তু মাঝে মাঝে অন্য একটা নাম ধরেও ডাকেন—আমি এসেছি নন্দু।

ঘরের ভিতর থেকে লণ্ঠন হাতে নিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে আসে সুনন্দা। সুনন্দাকেও মাঝে মাঝে বলতে শোনা যায়—আজ কিন্তু একটু দেরি করেছ বাবা।

রামসিংহাসন শুনতে পায়, বাঙালীবাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে

নাগলতা

সুবোধ ঘোষ

হেসে হেসে কথা বলছেন—আমার দেরি হয়নি নন্দ, সন্ধ্যেটাই একটু তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে গেছে।

রামসিংহাসনের বাড়িটা এমন কিছু দূরে নয়। বাঙালীবাবুর বাড়ি আর রাম-সিংহাসনের বাড়ি, মাঝখানে শুধু একটা পেঁপে বাগানের ব্যবধান।

এই শিউলিবাড়ির কে না চেনে বিজনবাবুকে? কিন্তু বিজনবাবু নামটাকে কেউ জানে বলে মনে হয় না। জানে শুধু তারা, যারা আজকাল মাঝে মাঝে এখানে কলকাতা থেকে হাওয়া বদলাতে আসে আর বিজনবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়ে নাম জিজ্ঞাসা করেন

বিজনবিহারী রায়, আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এখানে আছেন। এই রেললাইন আর এই শিউলিবাড়ি স্টেশনও যখন হয়নি, তখন থেকে তিনি এখানে আছেন। আর্থ-কাটিং অর্থাৎ মাটিকাটার ঠিকেদারী করেন ভদ্রলোক। পাব্লিক ওয়ার্কসের, রেলের আর জেলা বোর্ডের যত কণ্ট্রাক্টর, আর মাটিকাটা যত মজুর, সকলেই বিজনবাবুকে যে-নামে চেনে আর ডাকে, সেটা একটা অন্য নাম—মাটি সাহেব। পাঞ্জাবী কণ্ট্রাক্টরেরা বলে—মিট্টিসাহেব।

মাটিসাহেব বিজনবাবুর খাকি-সাজের রং; তা ছাড়া মুখটার, হাঁটু দুটোর আর কনুই থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত হাত দুটোরও রং, যদিও দেখতে মেটে-মেটে বলে মনে হবে, কিন্তু তাঁর কামিজের কলারটা একটু এলিয়ে পড়লেই দেখা যাবে, কী চমৎকার ফরসা একটা গায়ের রং খাকি কামিজের আড়ালে ধবধব করছে। কোন সন্দেহ নেই, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একটানা মাটি-কাটা ঠিকেদারীর জীবন, যত পাহাড়ী ডাঙ্গার ধুলো, শাল-জঙ্গলের হাওয়া, আর বারো মাসের রোদ-জল-হিম বিজনবাবুর পরিশ্রমের শরীরটার যেটুকু ছুঁতে পেরেছে, সেটুকু মাটি-রং করে ছেড়েছে।
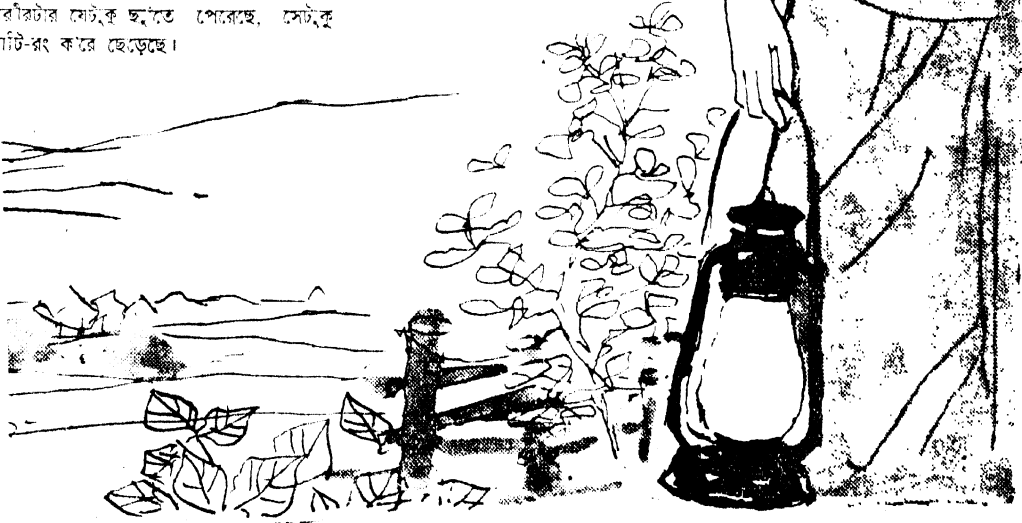
তিনি যখন এখানে এসেছিলেন, তখন এ-জায়গাটার কোন নামই ছিল না। পালামোয়ের জেলা বোর্ডের রাস্তাটা এখানে এসে রাঁচি যাবার সড়কটার সঙ্গে মিশেছে; তাই এখানে সড়কের পাশে শুধু একটা সরাই ছিল, একটা হালুয়াইয়ের দোকান ছিল, আর মহুয়া চোলাই করবার একটা ভাঁটি ছিল। পঁয়ত্রিশ বছর আগে রেল লাইনের জন্য মাটি কাটবার ঠিকেদারী নিয়ে বিজনবাবু এখানে এসে সেই সরাইয়ের একটা ঘরে ঠাঁই নিয়েছিলেন। সরাইয়ের পিছনে একটা মহুয়ার নীচে সারা রাত ধরে দুই নেকড়ের মারামারি আর ঝগড়ার শব্দও শুনেছিল সেদিনের যুবক বিজনবিহারী।

কিন্তু, সেজন্য জায়গাটার উপর একটুও রাগ করেনি বিজনবিহারী; কোন ভয় নয়, একটু বিরক্তিও নয়। বরং, ঠিক একটি বছর পরে, সড়ক থেকে একটু দূরে মাঠের উপর কাঁচা-ইঁটের দেয়াল-দেওয়া একটি বাড়ি তৈরী করেছিল বিজনবিহারী। তারপর একদিন সেই বাড়িতে ঢুকে আর হেসে হেসে সন্ধ্যাপ্রদীপ জেলেছিল নিরুপমা।

চারদিকে জঙ্গল, কাছে ও দূরে ছোট-বড় পাহাড়, সড়ক দিয়ে সারা দিনে একবার মাত্র জোড়া উটের ডাকগাড়ি যায় আর আসে; তা'ও সপ্তাহে তিন-চার দিন বাদ যায়। এহেন এক জগতে বাঙালী বিজনবিহারীর ঐ কাঁচা-ইঁটের বাড়িটাই হলো প্রথম গৃহস্থের বাড়ি; যে-বাড়ির চারদিকে চারটে শিউলির চারাকে বিজনবিহারী নিজের হাতে রোপণ করেছিল; আর বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনেক যত্নও করেছিল।

নিরুপমা হেসে হেসে বলেছিল—বাঙলা দেশের শিউলি, এই পাথুরে মাটিতে বেঁচে থাকতে পারবে কি?

—খুব পারবে। আমি পারিয়ে ছাড়বো। বাঙলা দেশের শিউলি বলে নয়, সেদিনের পঁচিশ বছর বয়সের বিজনবিহারীর কাছে সে শিউলির আরও একটা মায়া ছিল। সে-বড় অদ্ভুত মায়া।

কিছুদিন আগে সড়কের মোড়ে উটগাড়িটা চাকা ভেঙে আর বিকল হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল; আর একজন যাত্রী গাড়ি থেকে নেমে বিজনবিহারীর সঙ্গে আলাপ করেছিল। —আমার নাম পীতাম্বর। বাড়ি কটক। সাসারামে সিংহ বাবুদের বাড়িতে মালীর কাজ করি।

এই পীতাম্বরের সঙ্গের একটা ঝুড়িতে এক গাদা চারা গাছ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল বিজনবিহারী—ওগুলি কি?

পীতাম্বর—শিউলির চারা। বাংলা দেশের শিউলি। নেবেন কয়েকটা?

বিজনবিহারী—না।......আচ্ছা দিন।

নিরুপমাকেও বলতে ভুলে যায়নি বিজনবিহারী—হঠাৎ মনে হলো, বাংলা দেশের শিউলি মানে তুমি। তাই নিলাম। তা না হলে বাঙলাদেশী জিনিস আমি ছুঁতামও না।

বিজনবিহারীর নিজের হাতের রোপা সেই শিউলিতে যেদিন ফুল ধরেছিল, সেদিন ভোজপুরী হালুয়াই রামসিংহাসন একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল—কওন ফুল বা?

—শিউলি।

—শিহুলি?

—নেহি নেহি, শিউলি বোলিয়ে।

—শিউলি! শিউলি! রামসিংহাসন বেশ খুশি হয়ে হেসেছিল।

কাঁচা ইঁটের সেই বাড়ির সামনে একটা কুয়ো কাটিয়েছিল বিজনবিহারী। ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটিয়ে কুয়া কাটা! বিজনবিহারী সেদিন সেই জংলী নিভৃতের শান্ত বুকটার উপর যেন প্রচণ্ড এক বিস্ময়ের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। আট ক্রোশ দূর থেকে মুণ্ডা নরনারী আর ছেলে-মেয়ের দল সে দৃশ্য দেখতে এসেছিল; যদিও রামসিংহাসন ভয় পেয়ে আর ঝাঁপ নামিয়ে দোকান বন্ধ করে দিয়ে তিন ক্রোশ দূরের একটা বুড়ো বটের কাছে গিয়ে বসেছিল।

বিজনবিহারীর কুয়োর জলের সুনাম চারদিকে রটে যেতে বোধ হয় এক মাসেরও বেশি সময় লাগেনি। যেমন মিঠা তেমনই ঠাণ্ডা, চমৎকার জল। প্রথম সার্ভিস বাসের ড্রাইভার সড়কের মোড়ে বাস থামিয়েই খালাসীকে ডাক দিত—চলো জী, শিউলি-বাড়ির কুয়োর জল খেয়ে আসি।

কেউ চেষ্টা করে নামটাকে তৈরী করেনি; যেন মানুষের ভাবা নিজেরই খুশিতে মুখর হয়ে বাঙালী বিজনবিহারীর কাঁচা ইঁটের বাড়িটাকে শিউলিবাড়ি নাম দিয়ে ফেলেছিল।

দুটো বছর যেতে না যেতেই বিজনবিহারী দেখেছিল, বাস-সার্ভিসের টিকিটে একটা নতুন জায়গার নাম ছাপা হয়েছে—শিউলি-বাড়ি।

তারও তিনটে বছর পরে যখন রেল লাইন হলো আর স্টেসনটা তৈরী হলো, তখন দেখা গেল, প্ল্যাটফর্মের উপর মস্তবড় কাঠের বোর্ডের উপর ইংরেজীতে স্টেসনের নামটা নতুন রঙে লেখা হয়ে ঝলমল করছে—শিউলিবাড়ি।

এই ইতিহাসটা জেলা গেজেটিয়ারে লেখা নেই; কিন্তু এটা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্য একটা ইতিহাস। শিউলিবাড়ি নামটা এক মাটি-কাটা ঠিকেদারের, বাঙালী বিজনবিহারীর, আজকের এই মাটিসাহেবেরই জীবনের একটা ঘটনার দান। তা না হলে, চারদিকের যত ডিহা-ডিহির মধ্যে একটা জায়গার নাম শিউলিবাড়ি হয়ে যেতে পারতো না।

রাতের অন্ধকারে সড়কের মোড়ে দাঁড়িয়ে যখন কোন আদিবাসী গাঁয়ের ওঝা কিংবা মুখিয়ার সঙ্গে মুণ্ডারী ভাষায় গল্প করেন মাটিসাহেব, তখন কারও সন্দেহ করবারও সাধ্য হয় না যে, বাঙালী বিজনবিহারী রায় কথা বলছেন। শুধু কথা নয়, মুণ্ডারী ভাষায় গানও গাইতে পারেন মাটিসাহেব। এই সেদিনও তাঁকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে, জেলা বোর্ডের কাঁচা সড়কের উপর গাছতলায় দাঁড়িয়ে মুণ্ডারী ভাষায় ছড়া কাটছেন, আর মাটি-কাটা মেয়ে-মজুরের দল হেসে লুটিয়ে পড়ছে।

আজকের শিউলিবাড়ির চেহারা দেখে কারও কল্পনা করবার সাধ্য নেই যে, পঁয়ত্রিশ বছর আগে এখানে শুধু শাল-জঙ্গলের ছায়ায় ঘেরা নিতান্ত দীনহীন একটা সড়কের মোড়ে ততোধিক দীনহীন তিনটে মাটির ঘর শুধু পড়েছিল। নেকড়ের উপদ্রবের জন্য দিনের বেলাতেও কোন গরুর গাড়ি এই পথে একলা যেতে সাহস পেত না। আজকের শিউলিবাড়িতে, স্টেশনের দিক থেকে এগিয়ে এসে সর্দার সুচেত সিং-এর সেগুনের আসবাবের প্রকাণ্ড দোকানটা পার হলেই অন্তত চারটে বেশ ভাল চেহারার স্টেশনারি দোকান দেখতে পাওয়া যাবে। আর, তার পাশেই আছে পর পর তিনটে ফলের দোকান। চারদিকের যত কোলিয়ারির মালিক আর ম্যানেজারের গাড়ি, প্রতিদিন অন্তত আট-দশটা গাড়ি এখানেই আসে আর সওদা করে চলে যায়।

তাছাড়া, শিউলিবাড়ির দক্ষিণের গা ঘেঁষে চমৎকার চেহারার যত বাংলো গড়নের বাড়ি দেখা যায়; সেগুলির বেশির ভাগই বাঙালীর বাড়ি। অনেকদিন আগেই শিউলিবাড়ির জল-হাওয়ার সুনাম কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এমনিতেই নয়, এই মাটিসাহেবই রেল-বিভাগের অনেক বড়-বড় বাঙালী অফিসারকে বুঝিয়েছিলেন, আর তাঁদেরই দিয়ে শিউলিবাড়ির স্বাস্থ্যের গৌরব প্রচার করিয়েছিলেন। শীতের সময় এইসব বাড়ির কোনটাই খালি থাকে না। বাড়ির মালিকেরা নিজেরাও সপরিবারে আসেন; আবার চার-পাঁচ মাসের ভাড়াটে হয়েও অনেকে আসেন। সে-সময় এক-একদিন শিউলিবাড়ির শান্ত কুয়াশাভরা সন্ধ্যার বুকে যেন নতুন দীপালির আনন্দ মুখর হয়ে হেসে ওঠে। ছোট ছোট ছেলেরা একলব্য অভিনয় করে। আর, ত্রৈলোক্য অপেরা এসে সুভদ্রাহরণ গেয়ে চলে যায়।

হাওয়া বদলাতে কলকাতা থেকে বাঙালীরা যাঁরা আসেন, শুধু তাঁরা নন, বদলি হয়ে স্টেশনের নতুন স্টাফ হয়ে বাঙালী কর্মচারী যাঁরা আসেন তাঁরাও দেখে আশ্চর্য হয়ে থাকেন, শিউলিবাড়ির বাজারে কইমাছ কিনতে পাওয়া যায়। সে

কইয়ের স্বাস্থ্যের তুলনায় যশোরের কইও রোগাটে। দামও অন্তত কলকাতার বাজারের চেয়ে কম গলা-কাটা। শিউলি-বাড়ির চারদিকে ঝুমরা রাজ এস্টেটের যত ঝিল আছে, তার প্রায় সবগুলিই কইমাছে ভরে গিয়েছে।

আরও নানা বিস্ময়ের চেহারা শিউলি-বাড়ির এই ছোট্ট বাজারেই দেখতে পাওয়া যাবে। হালুয়াই রামসিংহাসনের দোকানে সরপুরিয়া আর ক্ষীরমোহন পাওয়া যাবে। আদিবাসী মেয়েরাও ঝুড়ি-ভর্তি মুড়ির মোয়া নিয়ে বাজারের ভিতরে এক সারিতে বসে আছে। রাঁচির পাইকারের লোকজন চাঁপা কলার কাঁদি কেনবার জন্য এই শিউলিবাড়ির বাজারে এসে ভিড় করেছে; দশ বছর আগে ওরা শেওড়াফুলিতে যেত।

তিন দিকে পাহাড় আর প্রায় চারদিকেই জঙ্গল—বাংলা দেশ থেকে এত দূরের একটা নিরালার বুকের যত কাঁকর আর পাথরের উপর কে যেন আলাদীনের প্রদীপের সেই অদ্ভুতকর্মা দাস-দানবটির মত শক্তিধর হয়ে বাংলা দেশের মাটির যত সাধ তুলে নিয়ে এসে ছড়িয়ে দিয়েছে।

অনেকেই জানেন, এই সবই মাটিসাহেব বিজনবাবুর পঁয়ত্রিশ বছরের একটা একরোখা চেষ্টার কীর্তি। অনেকে শুনেছেন, ভদ্রলোক এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও এই শিউলিবাড়ি ছেড়ে থাকেননি। হালুয়াই রামসিংহাসনও ভেবে পায় না, মাটিসাহেব কেন এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও নিজের দেশে গেল না?

ফিকে সবুজ রঙের চেহারার যে শৌখীন বাড়িটার দরজায় বাঘছালের পর্দা ঝুলছে, সেই বাড়ির মালিক মিস্টার দস্তিদার একদিন মাটিসাহেব বিজনবিহারী রায়কে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আর বেশ খুশি হয়ে গল্প করেছিলেন।—আপনাকে দেখলেই আমার স্যার সেসিল রোডসের জীবনের যত ঘটনার গল্প মনে পড়ে যায়। জঙ্গলের মত জংলীপনাকে মেরে-কেটে সরিয়ে আপনিও যে একটা উপনিবেশ তৈরি করে ফেলেছেন মশাই। শিউলিবাড়ি যে সত্যিই আপনার রোডেসিয়া। আপনি সত্যিই একজন ফার্স্ট ক্লাস অ্যাডভেঞ্চারার।

মাটিসাহেব যেন লজ্জিত হয়ে আর মাথা হেঁট করে হেসেছিলেন। কোন কথা বলতে পারেননি।

মিস্টার দস্তিদার—শুনেছি, জুপলা পাহাড়ের উত্তরের ঐ জঙ্গলের ভেতর বলবলা নদীর প্রপাতটা আপনিই আবিষ্কার করেছিলেন।

মাটিসাহেব তাঁর পিঠের বন্দুকটাকে একবার কাঁধ দুলিয়ে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বিনীতভাবে হেসেছিলেন—আমিই ঐ সাংঘাতিক ঝর্ণাটাকে একদিন খুঁজে বের করেছিলাম। তাছাড়া, আপনাদের ঐ দামোদরের উৎসটাকেও......

মিস্টার দস্তিদারের চোখ দুটো আরও খুশি হয়ে চমকে ওঠে—সেটাও কি আপনি খুঁজে বের করেছেন?

মাটিসাহেবের চোখ দুটো ঝিকঝিক করে। —আজ্ঞে হ্যাঁ, তিন দিন ধরে একাই হেঁটে হেঁটে, আর শুধু পাকা বটফল খেয়ে......। বলতে বলতে যেন আরও লজ্জিত হয়ে, শেষে নীরব হয়ে যান মাটিসাহেব।

মিস্টার দস্তিদার কিন্তু ছাড়েন না। —বলুন বলুন, থামলেন কেন?

মাটিসাহেব—সে জায়গাটার নাম হলো চুলহাপানি। পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় ছোট্ট চুলোর মত একটা গর্তের উপর টুপ্ টুপ্ করে একটা সরু ঝর্নার জল ফাটা পাথরের ভেতর থেকে ঝরে পড়ছে। এই সেই.....আপনার ঐ মহাদেব ডোঙা, বোলা পাহাড় আর ধওরা পাহাড় পার হয়ে; লাটেরাইটের খাদান ছাড়িয়ে যে পাহাড়টা, সেটারই প্রায় মাথার কাছে একটা বুড়ো অশ্বত্থের পাথরে তলায় উৎসটা গুবগুব করছে। ঐদিকের দামোদরটার আমি একটা নামও দিয়েছিলাম স্যার।

—কি বললেন?

—হ্যাঁ স্যার, আমি নাম দিয়েছিলাম সেকেন। ওদিকের গাঁয়ের লোক আজও কিন্তু ঐ নাম বলে থাকে স্যার; দামোদর বললে ওরা বুঝতে পারে না।

—বেশ করেছেন! অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন! হেসে হেসে চেঁচিয়ে ওঠেন মিস্টার দস্তিদার।

মাটিসাহেব—তৎকালীন কমিশনার হার্কোর্ট সাহেব কিন্তু শুনে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

—কি বললেন?

—দামোদরের উৎসের খবরটা আর জায়গাটার একটা ম্যাপ এঁকে আমি জেলা গেজেটের সম্পাদককে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু হার্কোর্ট সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, সাবধান, দামোদরের উৎস ঐ চুলহাপানি চুলোয় যাক; আপনি এমন ব্যাপার নিয়ে কখনো লেখালিখি করবেন না।

মিস্টার দস্তিদার আশ্চর্য হন—কেন? এরকম ভয় দেখাবার মানে কি?

মাটিসাহেব হাসেন—হার্কোর্ট সাহেব সেক্রেটারিকে জানিয়েছিলেন, আমার ঠিক পনর-দিন আগে তিনিই দামোদরের উৎসটা আবিষ্কার করেছেন।

মিস্টার দস্তিদারও হেসে ফেলেন।

আর-একবার, সে বছর এখানে হাওয়া বদলাতে কলকাতা থেকে এসেছিলেন প্রফেসর বিনোদ দত্ত। তিনিও একদিন আশ্চর্য হয়ে মাটিসাহেব বিজনবাবুকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

প্রফেসর বিনোদ দত্ত বলেছেন—আপনাকে দেখলে আমার সত্যিই সেই পিলগ্রিম ফাদারদের কথা মনে পড়ে। দুঃসাহসে আপনিও কম যান না মশাই। তাছাড়া, এ-তো আর অ্যাডভেঞ্চারারদের মত শুধু কাটাকাটি করবার দুঃসাহস নয়। আপনি সেই পিলগ্রিম ফাদারদেরই মত জঙ্গল সরিয়ে সেখানে দেশের যত ফুল ফুটিয়েছেন, ফল ফলিয়েছেন। আপনাকে হাজার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে মশাই।

মাটিসাহেব তাঁর সেই অদ্ভুত নম্রতার ভঙ্গীতে, লজ্জিত হয়ে আর মৃদুভাবে হেসে, মাথা হেঁট করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেন।

প্রফেসর বিনোদ দত্ত যেন মুগ্ধ হয়ে নাকি জঙ্গলের যত গাঁয়ে বাংলা ভাষা-টাষাও চালাতে চেষ্টা করেছেন।

—ভাষা নয় স্যার, একটা গান চালিয়েছিলাম।

—কিসের গান?

—বাংলা গান।

—কি গান?

—হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো।

—বলেন কি? এ-গান এখানে চলছে?

—হ্যাঁ স্যার। রাঙু চিড়োয়া আর মুরি পাহাড়ের মুণ্ডাদের আর ওরাওঁদের ছেলে-মেয়েরাও এ-গান গাইতে পারে।

প্রফেসর বিনোদ দত্ত যেন মুগ্ধ হয়ে মাটিসাহেব বিজনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। —আপনি একটা অলৌকিক কাণ্ড সম্ভব করেছেন। ধন্যবাদ, আপনাকে হাজার ধন্যবাদ।

কিন্তু আজ এই সাত দিন হলো কলকাতা থেকে হাওয়া বদলাতে এসেছেন যিনি, রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করালীবাবু, তিনি আজ মাটিসাহেব বিজনবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই নাক কাঁপিয়ে একটা অদ্ভুত হাসি হেসেছেন।

মাটিসাহেব বিজনবাবু কিন্তু তাঁর স্বভাবসুলভ সেই লজ্জিত হাসিটাকেই আরও নরম করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন। —আপনি নতুন এসেছেন বলে মনে হচ্ছে স্যার?

করালীবাবু—হ্যাঁ, আমি নতুন এসেছি, আর আপনার নামও শুনেছি। কিন্তু চিনতেও পেরেছি।

মাটিসাহেব—আজ্ঞে?

করালীবাবু হাসেন—আপনি তো একজন মিউটিনিয়ার।

মাটিসাহেব—আজ্ঞে?

করালীবাবু—বুঝলেন না?

মাটিসাহেব—আজ্ঞে না।

করালীবাবু—মিউটিনি অর্থাৎ মস্ত একটা বিদ্রোহের কাণ্ড করেছেন, আর সেই জন্যে ইচ্ছে করে এখানে এসে একটা বনবাস খুঁজে নিয়েছেন। নয় কি?

মাটিসাহেবের লাজুক হাসির মুখটা সেই মুহূর্তে শোকার্তের মুখের মত করুণ বিষাদে ভরে যায়।

পঁয়ত্রিশ বছর ধরে রোজ সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়েছেন যিনি, সেই মাটিসাহেব বিজনবিহারী রায় আজ সন্ধ্যা হতেই ঘরে ফিরেও দরজার সামনে যেন হতভম্বের মত থমকে দাঁড়িয়েছেন; ঘণ্টি বাজাতেই ভুলে গিয়েছেন। ঘণ্টি বাজাবার শক্তিটাও যেন হঠাৎ অলস হয়ে হাতটাকে অলস করে দিয়েছে।

আস্তে আস্তে ডাকেন মাটিসাহেব—আমি এসেছি নিরু।

পেঁপে বাগানের ওদিকে নিজের ঘরের দাওয়ার উপর বসে বুড়ো রাম-সিংহাসনও শুনে আশ্চর্য হয়; এ কী রকমের উদাসীর মত ভাংগা গলায় আস্তে আস্তে, যেন ক্লান্ত শ্রান্ত হতাশ মানুষের মত কুণ্ঠিতভাবে ডাক দিচ্ছেন মাটিসাহেব? মাটিসাহেব আজ কি একটা জ্বর-জ্বালা নিয়ে ঘরে ফিরেছেন? এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে মাটিসাহেবকে এক-দিনের জন্যও তো কোন অসুখে ভুগতে দেখেনি রামসিংহাসন।

লণ্ঠন হাতে দরজার কাছে এগিয়ে এসেই চমকে ওঠেন নিরুপমা। এ কি? চিরকেলে দুঃসাহসের মানুষটার মুখের উপর আজ এ কোন্ হতাশ সন্ধ্যার অন্ধকার থমথম করছে? সেই যে পঁচিশ বছর আগে এক মাঝরাতে থানার লোক বাঁশের ডুলিতে বয়ে নিয়ে বিজনবিহারীকে যখন বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল, তখনও তো বিজনবিহারীর মুখে একফোঁটা আতংকের চিহ্ন দেখতে পাননি নিরুপমা। ভালুকটার ভয়ানক থাবার নখ বিজনবিহারীর পিঠটাকে তিন জায়গায় আঁচড়ে দিয়ে মাংস উপড়ে নিয়েছিল। সেই রক্তাক্ত যন্ত্রণার মধ্যেও নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে পেরেছিল যে বিজনবিহারী, সে আজ এত বিষণ্ণ আর এত গম্ভীর কেন?

চেঁচিয়ে ওঠেন নিরুপমা—কি হলো? ওরকম করে তাকিয়ে আছ কেন?

ছুটে আসে সুনন্দা—একি বাবা? কি হয়েছে? অসুখ করলো নাকি?

বিজনবিহারী হাসতে চেষ্টা করেন—না, কিছু না।

ঘরে ঢুকেই কিন্তু ক্লান্তভাবে বিড় বিড় করেন বিজনবিহারী।—একটু একলা হয়ে কিছুক্ষণ বারান্দার উপর বসি। খাবার-টাবার একটু পরে দিস নন্দ, লণ্ঠনটাকে সরিয়ে নিয়ে যা।

একলা হয়ে বসে থাকলেই তো সব কথা মনে পড়ে যায়। আজ যেন, ইচ্ছে করেই সে-সব কথা মনে করবার জন্যে একটু একলা হয়ে বসে থাকতে চেয়েছেন বিজনবিহারী।

মাকে একটুও মনে পড়ে না। কিন্তু বাবাকে খুবই ভাল করে মনে পড়ে। পনের বছর বয়সের ধাড়ি ছেলে হয়েও যে-ছেলে বাবাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে লৌহভীমচূর্ণ খেলেছে, সে কি করে বাবার মুখের সেই আহ্লাদের হাসির ছবিটা ভুলে যেতে পারবে, সে-ছেলে যদিও আজ ষাট বছর বয়সের এক মাটিসাহেব।

বাবা শুধু যে নায়েবী করেই জীবন কাটিয়েছিলেন তা নয়; এককালে খুব ভাল কুস্তি লড়তেন। বাবার মাথাটা তাই সাদা হয়ে গেলেও বুকটা টান ছিল, আর হাত দুটোর মাস্‌লও কত মজবুত ছিল। প্রাণপণ জোরে বাবার হাতের গুলি টিপেও সেই শক্ত মাংসপেশীর গর্ব একটুও খর্ব করা যেত না; বিজন নিজেই হাঁপিয়ে পড়তো। বাবা হাসতেন—বৃথা চেষ্টা বিজু; তোর সাধ্যি নেই। জিমন্যাস্টিকের মাস্টার তোর ঐ মেজমামাও যে হার মেনে যায়।

মামাদের বাড়িটাও কেষ্টনগর থেকে বেশি দূরে নয়। দীঘনগর যেতে পথের উপরেই নোনা আতার আর কামরাঙার বাগান দিয়ে ঘেরা সেই মামাবাড়িতে যখন-তখন চলে যেতে আর থেকে আসতে কোন বাধা নেই। বাবাই বলেন—যা বিজু, লক্ষ্মীপুজোর দিনটা মামাবাড়িতে গিয়ে পেট ভরে নারকেল নাড়ু খেয়ে চলে আয়।

বিজুরও আপত্তি নেই। মামাবাড়িটা এত কাছে যে, এক দৌড়ে পৌঁছে গিয়েও হাঁপাতে হয় না। দেরিও করে না বিজু, লক্ষ্মীপুজোর আগের দিনেই বিকালে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে, আর ব্যস্তভাবে দুটো মুড়ি চিবিয়ে নিয়েই মামাবাড়ির দিকে দৌড় দেয়। আর, শুধু নারকেলের নাড়ু নয়, কাঁচা-পাকা কামরাঙাও পেট ভরে খেয়ে নিয়ে লক্ষ্মীপুজোর পরের দিনে বাড়ি ফিরে আসে।

বাবা বলেন—দৌড়ে গিয়েছিলি, না হেঁটে হেঁটে?

বিজু—একদমে দৌড়ে গিয়েছিলাম।

বাবা—বহুৎ আচ্ছা। পেট ভরে কামরাঙা খেয়েছিস তো?

বিজু—খেয়েছি বাবা।

বাবা—বহুৎ আচ্ছা। হ্যাঁ...পরীক্ষাটা পার হয়ে যাক্, তারপর দেখবো, সাঁতার দিয়ে জলঙ্গী পার হতে তোর ক'মিনিট লাগে?

মেজমামা বড় কড়া মেজাজের মানুষ। কিন্তু কি আশ্চর্য, বিজুকে গাছ উজাড় করে কামরাঙা খেতে দেখেও কিছু বলেননি, যদিও চোখ পাকিয়ে অনেকক্ষণ বিজুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সন্দেহ হয় বিজুর, মেজমামা বোধহয় বাবার দুহাতের মাস্‌ল্-এর চেহারাটা স্মরণ করে বিজুকে কোন কড়া কথা বলেন না। সন্দেহ কেন, মাঝে মাঝে বেশ বুঝতেও পারে বিজু, বাবাকে বেশ ভয় করেন মামারা। বিজুকে আদর করে দুটো কথা বলতে যেন বুক ফেটে যায় মামাদের; কিন্তু অনাদর করবারও সাহস পান না। মেজমামা একদিন অবশ্য বেশ সাহস করে আর রাগ করে চেঁচিয়ে উঠে-ছিলেন—এটাকে বারান্দায় আসন পেতে খাবার জায়গা করে দাও ছোট বউমা।

বিজুও চেঁচিয়ে ওঠে।—বারান্দায় কেন?

মেজমামা—হ্যাঁ।

বিজু—না; আমি রান্নাঘরের ভেতরেই বসে খাব।

তখুনি রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠেছিল বিজু—আমাকে শিগগির ভাত দাও ছোট মামী।

এত কড়া রকমের রাগ করেও মেজমামার চড়া মেজাজ যেন ফস্ করে দমে গেল। বোধহয় বুঝতে পেরেছেন, পনের বছরের ঢেঁকি হয়েও যে আদুরে ছেলে এখনও বাপের সংগে এক থালায় ভাত খায়, সে ছেলেকে একেবারে ঘরের বাইরে একটা বারান্দায় পাত পেড়ে ভাত খাওয়াবার সাহসটা ভাল সাহস নয়।

বড়দা আর মেজদার মেজাজ অনেকটা মামাদেরই মেজাজের মত। বড়দা থাকেন জলপাইগুড়িতে, আর মেজদা ডিব্রুগড়ে। দুজনেই সরকারী চাকরি করেন। বড়দা ডাক্তার, মেজদা অ্যাকাউণ্টেণ্ট। পুজোর ছুটিতে বড়দা আর মেজদা বাড়িতে এসে যে-কটা দিন থাকেন সে-কটা দিন বিজুর মুখের দিকে দুজনেই যেন যখন-তখন গম্ভীরভাবে তাকান। দশমীর সন্ধ্যাতে বিজু যখন হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে বড়দা আর মেজদাকে প্রণাম করে, তখনও কেমন যেন কাঠ-কাঠ একটা চেহারা ধরে আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন দুই দাদা; একটা কথাও বলেন না। বিজুর মাথায় একবার হাতটাও রাখেন না।

ছোড়দা কিন্তু একেবারে উলটো রকমের মেজাজের মানুষ। ছোড়দা অনেক-বার ফেল করে এখনও বি-এ পড়ছেন, দিন-রাত পড়তে আর লিখতেই ভালবাসেন ছোড়দা। আর ভালবাসেন বিজুর সঙ্গে গল্প করতে। বিজুর জামা কবে ছিঁড়ে গেল, আর, দুটো নতুন প্যাণ্ট না হলে যে চলে না; এসব খবর ছোড়দাই রাখেন। ছোড়দা নিজেই বিজুকে সংগে নিয়ে কাপড় কিনতে যান, দরজির দোকানে গিয়ে জামার ছাঁটের রকম-সকম দরজিকে ভাল করে বুঝিয়ে দেন।

প্রতি রবিবার ছোড়দা নিজের হাতে বিজুর গায়ে সাবান ঘষে ঘষে যেন বিজুর সাত দিনের মাটিমাখা দুরন্তপনার সব

ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেন। বাড়ির ঠাকুরও হাসতে থাকে। এরকম একটা ধাড়ি বয়সের ভাইকে এত যত্ন করতে কোন বাড়ির কোন দাদাকে দেখেনি ঠাকুর।

ছোড়দার সঙ্গে এক বিছানায় না শুতে পেলে বিজুরও ঘুম হয় না। যদি কোন দিন বাবার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হয়েছে, বিজুর আত্মাটাই যেন হাই তুলে আর এপাশ-ওপাশ করে বিনা ঘুমে ছটফট করেছে। বাবা বলেন—যা, কমলের কাছে গিয়ে শুয়ে থাক্। কমলের গায়ের গন্ধ ছাড়া তোর ঘুম হবে না।

এক লাফে বাবার বিছানা ছেড়ে দিয়ে ছোড়দার বিছানায় উঠে আর ছোড়দার পিঠের কাছে মুখটা গুঁজে দিয়ে শুয়ে পড়ে বিজু। আঃ, সত্যিই কি চমৎকার আরামের ঘুম চোখের পাতা জড়িয়ে ধরছে। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে; থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিকও ফুটে উঠছে, আর ঝড়ো বাতাসের শব্দটাও বেশ শনশনে। একটু শীত-শীতও করছে।

ছোড়দার প্রাণটাও থার্মোমিটারের মত একটা যন্ত্র। টের পেয়ে বুঝে নিতে পারে, বিজুর গায়ের তাপ বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। তা না হলে, তখুনি ধড়ফড় করে জেগে উঠে আর পায়ের কাছে রাখা চাদর-টাকে টেনে বিজুর গায়ে জড়িয়ে দেবেন কেন?

বড়দি আছেন এলাহাবাদে। বড় জামাইবাবু নাকি মস্ত নামজাদা উকীল। কিন্তু বড়দিকে আজও চোখে দেখেনি বিজু। ছোড়দা বলেন, অনেকদিন আগে, তুই যখন খুব ছোট্ট, তখন বড়দি একদিনের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু এক রাত্রিও থাকেননি।

—কেন ছোড়দা?

—বড় জামাইবাবু বড়দিকে থাকতে দেননি। বড়দি খুব কেঁদেছিলেন।

—কেন ছোড়দা?

—বাবার উপর বড় জামাইবাবুর খুব রাগ ছিল।

বিজু বলে—আমি তখন যদি একটু বড় থাকতাম, তবে বড় জামাইবাবুকে বুঝিয়ে দিতাম।

ছোড়দা বলেন—চুপ কর।

বিজু বলে—বড়দা আর মেজদাও নাকি বাবার উপর রাগ করে বিয়ে করলেন না।

ছোড়দা—জানি না।

বিজু—তুমি নিশ্চয় বিয়ে করবে, ছোড়দা?

ছোড়দা—নিশ্চয়?

মেজদির শ্বশুরবাড়িটা কিন্তু মন্দ নয়। কথা ছিল, এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার পর বিজু গিয়ে মেজদির বাড়িতে তিনটে মাস থেকে আসবে। কিন্তু ওপরের ক্লাসেই উঠতে পারা গেল না; এনট্রান্স পরীক্ষাটা কপালে আছে কিনা, তাও ভগবান জানেন। এত অপেক্ষা সহ্য হয় না। বিজু তাই এই এক বছরের মধ্যে তিনবার মেজদির শ্বশুরবাড়িতে বেড়িয়ে এসেছে।

মামাবাড়ির মত মেজদির শ্বশুরবাড়িটা অবশ্য কেষ্টনগরের এত কাছে নয়; আবার বড়দির শ্বশুরবাড়ির মত অত দূরেও নয়। মানকর ছাড়িয়ে মাইল দুই হাঁটা দিলেই মানিকপুরের বাবুদের একটা কাছারি বাড়িতে পৌঁছনো যায়। জায়গাটার নাম শিব-পুকুর। সরকার মশাই বটুকবাবুও বেশ ভাল লোক। কিছুই বলতে কইতে হয় না, বটুকবাবু নিজেই একটা গো-গাড়ি ডেকে আনেন; আর বিজু সেই গো-গাড়ির ভিতরে

ছোড়দার পিঠের কাছে মুখটা গুঁজে দিয়ে......

চুপ করে বসে, ঝিমোতে ঝিমোতে আর ঘুমোতে ঘুমোতে আট ক্রোশ দূরের মানিকপুরে পৌঁছে যায়।

মেজ জামাইবাবু খুব বড় জমিদার। মেজদিদের বাড়িটাও বিরাট। ছাদটা এত বড় যে, ফুটবল খেলতে পারা যায়। কিন্তু খেলবার উপায় নেই। হাজার হাজার কবুতরের ভিড় ছাদটা সব সময় ছেয়ে আছে; আর কী অদ্ভুত বকম্-বকম্ আওয়াজের ঝড়।

মেজদি সাবধান করে দেন—ছাদে যাসনি বিজু। মানিকপুরের পায়রা ভয়ানক হিংসুটে; নাক-চোখ ঠুকরে দেবে।

—ইস্, সাধ্যি কী? ছোলাখেকো কবুতর আমাকে ঠুকরোবে?

সিঁড়ি ধরে এক দৌড়ে ছাদে উঠে আর একটা বাঁখারি দুলিয়ে সারাটা বেলা কবুতরগুলিকে উত্যক্ত করে, ভয় দেখিয়ে, অতিষ্ঠ করে আর উড়িয়ে উড়িয়ে ক্লান্ত করে তোলে বিজু, তবু নিজে একটুও ক্লান্ত হয় না।

মেজদি বিজুর চেয়ে দশ বছরের আর ছোড়দার চেয়ে দু'বছরের বড়। প্রায় দশ বছর হলো, মেজদির বিয়ে হয়েছে; কিন্তু এখনও চেষ্টা করলে মনে মনে দেখতে পায় বিজু, ঘুমভরা চোখে চাঁদের দিকে তাকালে যে-রকমের ছবি চোখের উপর ভেসে ওঠে, যেন সেই রকমের একটা ছবি। মেজদির যেদিন বিয়ে হয়ে গেল, তার পরের দিন ঝকঝকে বেনারসী শাড়িতে সেজে, টায়রা-পরা কপালের উপর ঘোমটাটি টেনে দিয়ে আর হেসে হেসে শ্বশুরবাড়ি রওনা হবার জন্য মেজদি গাড়িটার দিকে এক পা এগিয়ে যেয়েই কি-ভয়ানক ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন। বিজুর গলা জড়িয়ে ধরে পুরো পাঁচটা মিনিট এক ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন মেজদি। বিজুও মেজদির শাড়ির আঁচলটা শক্ত করে ধরে রেখেছিল।

কে জানে কেন, মেজদির সেই কান্না, আর বিজুর গলা জড়িয়ে ধরা মায়ার কাণ্ডটা দেখেও মেজ জামাইবাবু যেন ঠোঁট চেপে একটা অদ্ভুত হাসি হেসেছিলেন। মেজমামা তো চোখ পাকিয়েই দেখছিলেন। শুধু বাবা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে মেজদির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন; আর বিজুর একটা হাত ধরে বললেন—মেজদিকে যেতে দাও বিজু; তুমি আমার কাছে এস।

মানিকপুরে মেজদির বাড়িতে যতবার এসেছে বিজু, ততবারই বিজুকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছেন মেজ জামাই-বাবু—দেখে যাও রমা, তোমার অদ্ভুত ভাইটি এসেছে।

মেজ জামাইবাবুর এই চেঁচানো খুশির ভাষাটা শুনতে একটুও ভাল লাগে না বিজুর। একদিন মেজদিকেই আচমকা জিজ্ঞাসা করে বসে—মেজ জামাইবাবু আমাকে তোমার অদ্ভুত ভাই বলেন কেন? কথাটার মানে কি?

মেজদির মুখটা হঠাৎ যেন করুণ হয়ে যায়। —ওটা একটা কথার কথা।

বিজু—বাঙলাতে ফেল করলেও আমি

বাঙলা ভাষা একটু বুঝি মেজদি। অদ্ভুত মানে তো কুৎসিত।

মেজদি হেসে ফেলেন—তোমাকে কুৎসিত বলে মনে করবে, কার মনের এত সাধ্য আছে? খুঁজে বের করুক দেখি তোমার জামাইবাবু, সারা মাণিকপুরে এরকম ফরসা রংটি, এরকম টানা-টানা চোখ দুটি, এরকম ঢলঢলে সুন্দর মুখটি কোন্ ছেলের আছে?

বিজুও হেসে ফেলে—তবে ওকথা বলেন কেন জামাইবাবু।

মেজদি—সেই জন্যেই বলেন। অদ্ভুত ভাইটি মানে সুন্দর ভাইটি।

মাণিকপুরে মেজদির বাড়িতে এই এক বছরের মধ্যে তিনবার বেড়াতে গিয়ে মাঝ-পথের আর-একটা বাড়িকেও খুব ভাল লেগে গিয়েছে। শিবপুকুরের সেই কাছারি বাড়ির সরকার মশাই বটুকবাবুর বাড়িটা।
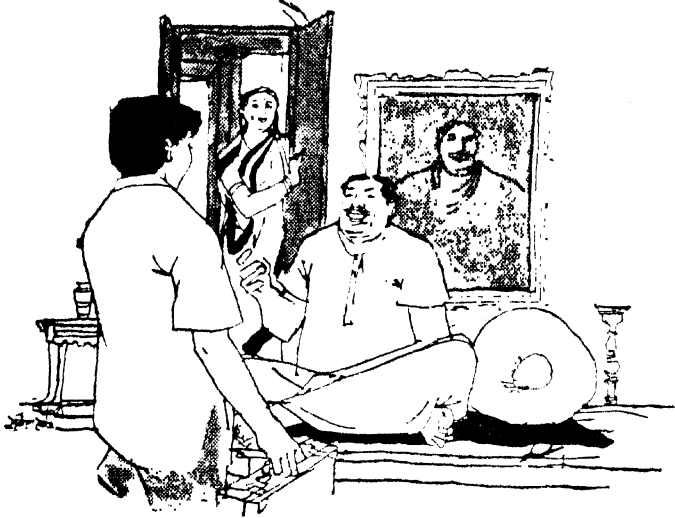
সত্যিই একটা পুরনো শিবমন্দির আছে; আর সেই শিবমন্দিরের সামনে একটা পুকুরও আছে। পুরনো মন্দিরটার এক দিকে কাছারিবাড়ি, আর অন্য দিকে সরকার মশাই বটুকবাবুর বাড়ি।

নিতান্ত একটা মাটির বাড়ি। চালাটা টিনের। প্রথম যে-বার মানিকপুর যাবার সময় মানকর স্টেশন থেকে হাঁটা দিয়ে এই কাছারি-বাড়িতে এসে উঠেছিল বিজু, সে-বারই বটুকবাবুর বাড়ি থেকে এসে বিজুকে প্রথম অভ্যর্থনা করে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল যে, সে হলো বটুকবাবুর মেয়ে, নাম কাজলী, বয়সটা দশ বছরের বেশি হবে না।

কাজলীর মা বেশ যত্ন করে বিজুকে কদমা ক্ষীর আর মুড়ি খাইয়েছিলেন। জলের গেলাসটা কাজলীই নিয়ে এসে বিজুর হাতে তুলে দিয়েছিল।

যতক্ষণ গো-গাড়ি আসেনি ততক্ষণ কাজলীর সঙ্গেই গল্প করেছিল বিজু।

বিজু বলে—কাজলী আবার কেমন নাম? কাজলী তো একরকমের ধানের নাম। শুনতে একটুও ভাল লাগে না।

কাজলী বলে—ভাল না লাগে তো বলো না। আমার নাম ডাকতে তোমাকে বলছে কে?

এর পরেও তো আরও পাঁচবার শিব-পুকুরের কাছারিবাড়িতে আসতে হয়েছে বিজুকে। মানিকপুরে যাবার সময় দুবার, আর ফেরবার সময় তিনবার। দ্বিতীয়বার, তার মানে সেই প্রথমবারই মানিকপুর থেকে ফেরবার পথে গো-গাড়িটা কাছারিবাড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই কাজলী ছুটে এসে বলে—আজ কিন্তু ভাত খেতে হবে।

—নিশ্চয় খাব। বিজুও গো-গাড়ি থেকে একটা লাফ দিয়ে নেমে পড়েই হেসে ওঠে।

কাজলী বলে—কিন্তু রান্না শেষ হতে একটু দেরি হবে।

—হোক না। ভালই তো।

কাজলীদের বাড়ির সবই ভাল, বিজুর প্রাণটা যেন এরই মধ্যে টের পেয়ে গিয়েছে। কাজলীর বাবা আর মা, কাজলীদের বাড়ির কদমা ক্ষীর আর মুড়ি, সবই ভাল।

উঠোনের বেলগাছটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে বিজু—এ বেলগুলো পাকে না?

তোমার সেই অদ্ভুত ভাইটি এসেছে

কাজলী হাসে—পাকে বই কি? বোশেখ মাস পড়লেই পাকবে।

বিজু—এটা কি মাস?

কাজলী—এটা তো ফাগুন।

চুপ করে কি-যেন ভাবে বিজু। কিন্তু কাজলীই যেন বিজুর সেই ভাবনাটাকে চমকে দেয়।—বোশেখ মাসে আসবে তো আবার?

বিজু—কি বললে?

কাজলী—বোশেখ মাসে এলে কিন্তু পাকা বেল খেতে পাবে।

বিজু—আসবো।

বোশেখ মাস আসতে দেরি করেনি। বিজুও মানিকপুরে মেজদির বাড়িতে আর-একবার বেড়িয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেরি করেনি।

কাজলীও দেখা হওয়া মাত্র বিজুকে বলে দিতে দেরি করেনি—অনেক বেল পেকেছে।

বিজু—ছিঃ, সত্যিই কি পাকা বেল খাবার লোভে আমি এসেছি?

কাজলী—তবে কেন এসেছো?

বিজু—এসেছি তোমার বাবা আর মার সঙ্গে একবার দেখা করতে।

কাজলী—দেখা কর তাহলে।

বিজু—করবোই তো। কিন্তু সেজন্য তুমি ছটফট করছো কেন? আমার যখন ইচ্ছে হবে, তখন দেখা করবো।

কাজলী—তবে এখন কি করবে?

বিজু—চল, তোমাদের হাঁসের ঘর আগে দেখে আসি।

শুধু হাঁসের ঘর দেখে নয়, কাজলীর সঙ্গে গল্প করে করে আর বেড়িয়ে আরও অনেক বিস্ময়ের জিনিস দেখে নেয় বিজু। মন্দিরের পিছনে একটা পুরনো চাঁপা গাছ আছে, একশো বছর বয়স। ওটার নাম গৌরীচাঁপা।

বিজু বলে—আশ্চর্য! মহাদেবের বউ গৌরী এই গাছটাকে পুঁতেছিল নাকি?

কাজলী—কে জানে?

কুমোরের চাক ঘুরছে, আর নরম মাটির তাল চেপে ধরে দু-হাতের কায়দায় হাঁড়ি সরা আর কুঁজো গড়ছে কুমোরেরা, কাজলীর সঙ্গে কুমোরপাড়াতে গিয়ে এই দৃশ্যও দেখে আসে বিজু।

কাজলী বলে—দেখলে তো! আর কখনো দেখেছো?

বিজু হাসে—কেষ্টনগরের ছেলেকে মাটির কারিগরীর গর্ব দেখাচ্ছো তুমি? মনে করেছো, আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি? আমাদের কেষ্টনগরের কুমোরদের কাছে তোমাদের এই শিবপুকুরের কুমোরেরা যে আঁতুড়ে শিশু।

মেজদি বলেছেন—অ্যানুয়াল পরীক্ষাটা এগিয়ে এসেছে; কাজেই এখন আর এত ঘন ঘন এখানে বেড়াতে আসিস না বিজু। মন

কাজলী আবার কেমন নাম?

দিয়ে পড়াশোনা কর, পরীক্ষাটা দিয়ে নে, তারপর আবার আসিস।

ছোড়দাও বাবার সঙ্গে তর্ক করেছে—বিজুকে আপনি যখন-তখন মানিকপুরে যেতে দিচ্ছেন কেন? তিন মাসের মধ্যে দু-বার তো গেল। আবার যাব-যাব করছে।

বাবা বলেন—যাক্ না।

ছোড়দা—তা ছাড়া, এভাবে একা-একা ট্রেনে চেপে ছুটোছুটি করাও এই বয়সের ছেলের পক্ষে একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। পথে বিপদ-আপদ তো লেগেই আছে।

বাবা বলেন—এখন থেকেই ট্রেনিং নিক। একটু বিপদে-আপদে পড়তে অভ্যেস করুক।

ছোড়দা জানেন, বাবাকে আর বেশি বুঝিয়ে বললেও কোন লাভ হবে না। তিনি বুঝবেনই না। বাবা এই সেদিনও, বর্ষার জলঙ্গী সাঁতরে পার হবার জন্য বিজুকে যে-ভাবে উৎসাহিত করেছিলেন, দেখে খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন ছোড়দা। ভাগ্যি ভাল, বাবা আর জেদ করেননি। বিজুও বোধহয় মানিকপুরে যাবার ব্যাকুলতায় বর্ষার জলঙ্গী সাঁতরাবার লোভটাকেও আপাতত ভুলে বসে আছে।

কিন্তু উপায় নেই; বিজুকে বলেও কোন লাভ হলো না। আবার মানিকপুরে চলে গেল বিজু। এবার ঘুড়ি-লাটাইও সঙ্গে নিয়ে গেল। বাবা নিজেই হেসে চেঁচিয়ে বিজুকে উপদেশ দিলেন—মানিকপুরের সব ঘুড়ি এক এক গোত্তায় ভোকাট্টা করে ফিরে আসা চাই।

আবার শিবপুকুর। আবার কাজলী।

ঘুড়ি-লাটাই দেখে খিল খিল করে হেসে ওঠে কাজলী—ছিঃ, একেবারে ছেলেমানুষের মত কাণ্ড!

বিজু—কি বললে?

কাজলী—আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরতে পারবো না।

বিজু—ঘুরতে হবে।

কাজলী—না। তুমি ঘুড়ি উড়োবে, তোমার সঙ্গে থেকে আমার লাভ কি?

বিজু—আমার তো লাভ আছে।

কাজলী—ছাই লাভ।

বিজু—সত্যি বলছি, তুমি সঙ্গে থাকলে খুব ভাল লাগে।

কাজলী—কেন?

বিজু—তুমি তো তোমার মা'র চেয়েও সুন্দর।

কাজলী ভ্রূকুটি করে তাকায়। —মাকে বলে দেব?

বিজু—যাও, এখনি গিয়ে বলে দাও। আচ্ছা, আমিই গিয়ে বলে দিচ্ছি। কেষ্ট-নগরের ছেলেকে তুমি ভয় দেখাতে এসেছ?

কাজলী—আচ্ছা, আর বলবো না।

বিজু—কি বলবে না?

কাজলী—কারও কাছে কোন কথা বলবো না।

বিজু—বাস্; তবে চুপটি করে এস আমার সঙ্গে।

কাজলী—না।

বিজু—কেন?

কাজলী—ভাল লাগছে না।

বিজু—তবে আমারও তোমাকে ভাল লাগছে না। ঘরে যাও তুমি।

বিজু একাই ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে চলে যেতে থাকে। কাজলী বলে—রাগ করে চলে যাচ্ছ; কিন্তু মনে থাকে যেন......।

বিজু—কি মনে থাকবে?

কাজলী—আমি ছাড়া তোমার গতি নেই।

বিজুর হুংকার শোনবার অপেক্ষায় আর দাঁড়িয়ে থাকে না কাজলী। দৌড় দিয়ে বাড়ির দিকে চলে যায়।

আর, বিজু চলে যায় ধানক্ষেতের দিকে। আলের উপর দাঁড়িয়ে ফুরফুরে হাওয়াতে ঘুড়ি ভাসিয়ে দিয়ে আর নাটাই দুলিয়ে সুতো ছাড়তে থাকে।

কিন্তু, বোধহয় আধঘণ্টাও পার হয়নি, নাটাই গুটিয়ে নিয়ে, আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে, কাজলীদের বাড়ির কাছে এসে, কাটা তালগাছটার ধড়ের উপর চুপ করে বসে থাকে বিজু।

ছুটে আসে কাজলী— —কি হলো?

বিজু—একটা গর্তের মধ্যে পা পড়ে গিয়েছিল। পা'টা বেশ মচকে গিয়েছে।

কাজলী—খুব ব্যথা করছে?

বিজু—সে আর বলতে?

কাজলী—তাহলে? কি করবো বল?

বিজু—একটু বাটা হলুদ গরম করে আর একটু চুন নিয়ে চলে এস। কিন্তু খুব সাবধান, মাসিমা যেন টের না পান।

কাজলী—মা টের পেলেই তো ভাল। তাড়াতাড়ি চুন-হলুদ গরম করে......।

বিজু—না, কখখনো না। মাসিমা তাহলে আমাকে খুব অপছন্দ করে ফেলবেন।

কাজলীও সত্যিই চুপি চুপি একটা সরাতে গরম চুন-হলুদ নিয়ে ফিরে আসে। পায়ের পাতার উপর আর গিঁটের চারদিকে চুন-হলুদ লাগিয়ে নিয়ে আর হেসে-হেসে কাজলীর মুখের দিকে তাকাতে গিয়েই বিজুর পনর বছর বয়সের দুরন্ত চোখ দুটো যেন চমকে ওঠে। জীবনে এই যেন প্রথম একটা বিস্ময়কে দু'চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছে বিজু। কাজলীর চোখ দুটো ছলছল করছে।

বিজু—কি হলো?

কাজলী—বলেছিলাম না, আমি ছাড়া তোমার কোন গতি নেই। কে চুন-হলুদ এনে দিল?

গল্পটা মেজদিকে না শুনিয়ে থাকতে পারে না বিজু। কদমা আর ক্ষীর থেকে শুরু করে হাঁসের ঘর, বোশেখী বেল আর গৌরী-চাঁপা পর্যন্ত গল্পের সব কথা শুনে নিয়ে মেজদি বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন—কি বলেছে কাজলী?

বিজু—কাজলী বলেছে, আমি ছাড়া তোমার গতি নেই।

মেজদি—বেশ করেছে। কিন্তু তুমি, লক্ষ্মী ভাইটি, তুমি কাজলীর সঙ্গে আর কথাটথা বলো না।

বিজু আশ্চর্য হয়—কেন মেজদি?

মেজদি—কাজলী আজ ভাল কথা বলছে, কিন্তু একদিন হয়তো খুব শক্ত একটা কথা শুনিয়ে দেবে।

মেজদিও এবার নতুন রকমের একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। মানিকপুর থেকে যে গো-গাড়িটা বিজুকে নিয়ে যাবে, সেটা আর শিবপুকুর কাছাড়িবাড়িতে থামবে না। সোজা চলে যাবে মানকর।

গো-গাড়িটা ঠিক যখন শিবপুকুরের কাছারি বাড়িটা পার হয়ে চলে গেল, তখন সন্ধ্যার জোনাকী জ্বলতে শুরু করেছে। কাজলীদের বাড়িটাকে আর চোখে দেখতেও পায় না বিজু। কে জানে কেন, গাড়ি থেকে নামবার জন্য বিজুর মনটা একবার ছটফট করে উঠেই শান্ত হয়ে গেল।

বাইরের ঘরে বসে বাবা ডাকছেন—বিজু! বিজু কি মানিকপুর থেকে ফিরেছে?

ছোড়দা ভিতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উত্তর দেন—হ্যাঁ।

বাবা—বিজুকে এখানে একবার পাঠিয়ে দে।

ছোড়দা—কেন?

বাবা—কেন আবার কি? আসুক না একবার।

ছোড়দা—বিজুকে পড়তে বসিয়েছি।

বাবা—এখন আবার কি পড়ছে বিজু?

ছোড়দা—বাংলা ব্যাকরণ।

বাবা—বাংলা ব্যাকরণ থাকুক এখন।

ছোড়দা—বেশ তো, এখন তাহলে ভূগোল পড়ুক।

বাবা—আরে না না। বিজু এখানে একবার আসুক; আমার সঙ্গে একটু পাঞ্জা-টাঞ্জা লড়ুক। তারপর না হয়......।

আর বেশি বলতে হয় না; বিজু নিজেই একটা লাফ দিয়ে; যেন এতক্ষণের ব্যাকরণ-ভীরু প্রাণটাকেই নাচিয়ে দিয়ে বাইরের ঘরের দিকে ছুটে চলে যায়।

বাবার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বিজু। বাবা বলেন—মন্দ নয়। এই এক বছরে তোর কব্জির জোর বেশ বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

বিজু বলে—কিন্তু তোমার হাতটা গরম কেন বাবা?

বাবা হাসেন—জ্বর হলে গা তো গরম হবেই।

বিজু—জ্বর? তোমার জ্বর?

বিজুর পাঞ্জার উপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে বাবা আবার হাসেন।—হ্যাঁ রে বিজু।

তারপরেই কেমন-যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলেন বাবা—আচ্ছা, তুই এখন যা। কমলকে একবার পাঠিয়ে দে।

বাবারও জ্বর হয়, বাবাও হাঁপায়? বিজুর বিশ্বাসের জগৎটা যেন ভয়ানক একটা বিস্ময়ের প্রশ্নে আহত হয়ে মনমরা হয়ে যায়। কিন্তু উপায় নেই। চোখের উপরে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, রোজই বাবাকে দেখবার জন্য ডাক্তার আসছেন; আর ছোড়দা ওষুধ আনবার জন্য ছুটোছুটি করছেন।

বাবাও এমন নিশ্চল হয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ে থাকতে পারেন? এমন অসম্ভবও সম্ভব হয়? কেষ্টনগরের কে না জানে, রাজনগরের নায়েব রুদ্রবাবু একবার নবদ্বীপঘাটের ফেরি লঞ্চের উপর রাগ করে গঙ্গা সাঁতরে ওপারে গিয়ে উঠেছিলেন, আর সময়মত আদালতে হাজির হয়েছিলেন। কারণ; যে লঞ্চের সকাল আটটায় ছাড়বার কথা, আটটা বিশ মিনিট হয়ে গেলেও সে লঞ্চ তখনও কুমড়ো-বোঝাই হবার জন্য পাইকারের নৌকোর অপেক্ষায় অলস হয়ে ভাসছিল।

কিন্তু বাবা যে মরতেও পারেন! ডাক্তার চলে যাবার পরেই ছোড়দা যখন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন, তখন হতভম্ব বিজুর বুকটা যেন পৃথিবীর সব চেয়ে নিষ্ঠুর বিস্ময়ের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে কেঁদে ওঠে। বিজুও এত চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে? বাবা দেখতে পেলে যে লজ্জা পেয়ে আর চেঁচিয়ে হেসে ফেলতেন—ছিঃ বিজু, তুইও যে চেঁচিয়ে কাঁদছিস!

রাত্রিবেলা, যখন ছোড়দার গা ঘেঁষে শুয়ে থাকতে হয়, শুধু তখন বিজুর বুকের ভিতরের ছটফটে কান্নাটা যেন শান্ত হয়ে যায়।

বিজুর দু'চোখের ছলছলে ভাবটাও শান্ত হয়ে শুকিয়ে আসতে থাকে। বড়দা এসেছেন, মেজদা এসেছেন, আর মেজমামা তো সকাল-সন্ধ্যা ব্যস্ত হয়েই আছেন। বাবার শ্রাদ্ধের জন্য বেশ জাঁকালোরকমের একটা আয়োজনের পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু, ঠিক শ্রাদ্ধের দিনেই, ষোল বছর বয়সের দুরন্ত যে বিজুর চোখ দুটো কান্না ভুলে গিয়ে শান্ত হয়ে গিয়েছে সেই শান্ত চোখ দুটো যেন ভয়ানক একটা সন্দেহের আঘাত পেয়ে চমকে ওঠে।

বড়দা মেজদা আর মেজমামা এত আপত্তি করছেন কেন? বিজুর মাথা কামাবার দরকার নেই কেন? বড়দা, মেজদা আর ছোড়দা, তিন-জনই যদি মাথা কামাবে, তবে বিজুই বা বাদ যাবে কেন?

ছোড়দা জেদ ধরলেন—না, সেটা হবে না। হতে পারে না। বিজুও মাথা কামাবে।

বড়দা মেজদা আর মেজমামা যেন নিতান্ত একটা অনিচ্ছার সঙ্গে কোনমতে আপোষ করে শেষে রাজি হলেন। বিজুও মাথা কামালো। কিন্তু, বিজুর প্রাণটা যে কোন মতেই মনের সেই ভয়ানক সন্দেহটার সঙ্গে আপোষ করতে পারে না। কেন? কিসের জন্য? বড়দা মেজদা আর মেজমামা কোন্ সাহসে এমন কথা বলে?

ছোড়দাকে জিজ্ঞেস করলে ছোড়দা বারে বারে ঐ একই জবাব দিয়ে সরে পড়েন—ওদের কথা ছেড়ে দে। ওদের মাথা খারাপ।

শ্রাদ্ধ তো মিটে গেল। বড়দা আর মেজদাও চলে গেলেন। কিন্তু মেজমামা তবু ব্যস্ত। নিজের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এখন

যেন এবাড়ির অদৃষ্টের গার্জেন সেজে বসেছেন। রোজই একগাদা কাগজ-পত্র নিয়ে উকীলবাড়িতে যান আর আসেন। মেজমামা কি সাপুড়ে জাদুকরের মত সংসারের আরও বড় কোন রহস্যের ডালা তুলে ফেলবেন, আর, আরও ভয়ানক কোন বিস্ময়ের সাপ হিস্ হিস্ করে ফণা তুলে বের হয়ে আসবে?

ঠিকই, তাই হলো। সন্ধ্যাবেলা আদালত থেকে ফিরে এসে চেঁচিয়ে উঠলেন মেজমামা। —সব ব্যবস্থা হয়ে গেল রে কমল।

ছোড়দা—কি হলো?

মেজমামা—সম্পত্তির পার্টিশন হয়ে গেল। তোর ভাগে পড়লো এই বাড়িটা। রাজনগরের বাড়িটা, ধীরেন আর নরেনের সমান দুই ভাগে; আর, পলাশীর জমিদারীটা তোদের তিন ভাইয়ের সমান তিন ভাগে।

বিজু বলে ওঠে—তবে আমার ভাগে কি পড়লো?

মেজমামা বলেন—কিছু নয়। তুমি চুপ কর।

বিজু চেঁচিয়ে ওঠে—কেন চুপ করবো? বাবার সম্পত্তি শুধু তিনভাই পাবে কেন? আমি কি মরে গেছি?

মেজমামা বিরক্ত হয়ে বলেন—তুমি মরেই ছিলে। তোমার থাকা আর না-থাকা দুইই সমান। দেখছিস কমল, এইটুকু ছেলের কিরকম টনটনে সম্পত্তিজ্ঞান?

বিজু বলে—আমি এখনই উকীলবাড়ি যাব। দেখি, কে আমাকে কোন্ সাহসে ঠকাতে পারে?

ছোড়দা বিজুর হাত ধরে বলেন—আয়, আমার সঙ্গে আয়; একটা কথা বলবো, শুনে যা। আয় বিজু।

বিজুকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আর গাছপাকা পেয়ারার গন্ধে ভরা উঠানের এক কোণে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে, যেন নিবিড় একটা প্রতিজ্ঞার আশ্বাস ঢেলে দিয়ে কথা বলেন ছোড়দা—আমি থাকতে তোর আবার সম্পত্তির চিন্তা কেন বিজু? আমার ভাগের সম্পত্তি তোরও সম্পত্তি।

বিজু—কিন্তু মেজমামা তো সে-কথা বলছেন না। উকীলবাবুও সে-রকম ব্যবস্থা করেননি।

ছোড়দা—ও ছাই দলিলে যা-ই লেখা থাকুক না কেন; আর আইন যা খুশি বলুক না কেন, তুই তো আমাদেরই ভাই।

চমকে ওঠে বিজু—আইনে আমি বুঝি তোমাদের ভাই নই?

বিজুর মাথাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ছোড়দা হাসেন—না রে ভাই; কিন্তু তাতে কি আসে যায়?

—না, আমি তোমার বাজে কথার মানে বুঝতে পারছি না। আমাকে ছেড়ে দাও, ছোড়দা। আমি আজই জানবো; উকীলবাবুকে, বিধুবাবুকে, সাবিত্রী মাসিমাকে সবাইকে জিজ্ঞেস করবো। আমি এখনই বের হয়ে গিয়ে জেনে আসবো, আমি তবে কে?

ছোড়দা—ছিঃ, কোন দরকার নেই। আমি আমার সম্পত্তির একটা ভাগ তোর নামে দলিল করে দেব বিজু। তুই কিছু ভাবিস না।

ছোড়দার সেই ব্যাকুল আদরের হাত দুটো যেন দমবন্ধ করবার দুটো ফাঁসির দড়ি। কিংবা, একটা মিথ্যে মায়ার মিথ্যে তোষামোদ। সহ্য করতে পারা যায় না। ছোড়দার হাত দুটোকে দুরন্ত একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়েই ছুটে চলে যায় বিজু।

অনেক রাত, মাঝরাতও বোধহয় তখন পার হয়ে গিয়েছে, বাড়িতে ফিরে এসেই দেখতে পায় বিজু, একটা নেভানো লন্ঠন আঁকড়ে ধরে আর জুতো পায়েই বিছানার উপর যেন দুর্ঘটনায় মরা একটা মানুষের মত এলোমেলো হয়ে শুয়ে পড়ে আছেন ছোড়দা। বুঝতে পারা যায়, বিজুকে খুঁজতে বের হয়ে আর অনেক হয়রান হয়ে ফিরে এসেছেন ছোড়দা। এখন বোধহয় স্বপ্ন দেখছেন, বিজু ফিরে এসেছে; কিংবা খোঁজ করলেই বিজুকে পাওয়া যাবে।

না, অসম্ভব। বৃথা স্বপ্ন দেখছেন ছোড়দা। বিজু এজীবনে আর এবাড়িতে আসবে না।

ছোড়দার মাথার বালিশের কাছে চিঠিটা রেখে দেয় বিজু—সবই জেনেছি ছোড়দা। আমি বাবার ছেলে বটে, কিন্তু তোমাদের ভাই নই। আমি বাবার রাজনগরের বাড়ির এক ঝিয়ের ছেলে। আমার সে ঝি-মা মরে যাবার পর বাবা আমাকে এবাড়িতে এনে আর আদর করে পুষেছিলেন। বাস্; আমার আর কিছু বলবার নেই। যাই ছোড়দা।

কেষ্টনগরের আকাশের তারা ঝিকঝিক করে। জলঙ্গীর জল ছলছল করে। একটা নিশাচর একলা নৌকার বৈঠা ঝুপঝাপ করে। মুচিপাড়ার কুকুর কিন্তু ঘেউ ঘেউ করে না, শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে।

তারপরেই খোলামেলা ধানক্ষেতের বাতাস ফুরফুর করে। বুঝতে পারে বিজু, কেষ্টনগর নামে একটা শ্মশানের সীমা ছাড়িয়ে প্রাণটা অনেক দূরে চলে এসেছে। এ রাত্রি ভোর হবার আগে আরও অনেক দূরে চলে যেতে পারা যাবে।

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, সে নদীর আক্ষেপ হলো হারিয়ে যাওয়ার আক্ষেপ। হারিয়ে যেতে চায়নি সে নদী। কিন্তু ষোল বছর বয়সের বিজনবিহারীর জীবনের নদীটা যেন ইচ্ছে করেই ধারা হারাতে চায়। বাংলা দেশের মাটির ছোঁয়া থেকে পলাতক একটা প্রাণ সত্যিই সুদূরের এক মরুপথে এসে তার ধারা হারিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে।

একেবারে রাজস্থান, যার সঙ্গে বাংলা দেশের মাটি নদী আর গাছপালার কোন মিল দেখা যায় না। চিতোরের এক উটওয়ালার কাছে চাকর হয়ে খেটে খেটে বিজনবিহারীর জীবনের পুরো একটা বছর কেটে গিয়েছে।

কিন্তু একটুও কি ভয় পেয়েছে বিজন-বিহারী? একটুও না। প্রথম দিনটা উটের গায়ের সেই বীভৎস গন্ধে গলা থেকে এক ঝলক বমি উথলে পড়েছিল। কিন্তু তারপর আর নয়। তারপর নিজের হাতেই উটের পুরীষের ঘুঁটে পুড়িয়ে, জওয়ারের চাপাটি সেঁকে, আর সেই চাপাটি কাঁচা গাজরের সঙ্গে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে একটুও খারাপ লাগেনি। দড়ির মত করে পাকানো লাল শালুর মস্ত বড় একটা মুড়েঠা মাথায় বেঁধে, তুলোর মেরজাই গায়ে চড়িয়ে, আর কাঁচা চামড়ার নাগরা পায়ে দিয়ে চিতোরগড়ের ডাঙ্গার কাঁটাজঙ্গল থেকে মাদার পাতার বোঝা মাথায় বয়ে নিয়ে বাজারের উটের আস্তানায় ফিরে আসবার সময় পশ্চিমের আকাশে যে সূর্যাস্ত দেখতে পায় বিজন-বিহারী, সে সূর্যাস্তের চেহারার সঙ্গে

কেষ্টনগরের সূর্যাস্তের মিল নেই; মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। কিন্তু দেখতে ভাল লাগে। এ আকাশে সূর্যাস্তের রং ছলছল করে না, যেন দাউ-দাউ করে জ্বলে।

মিল নেই বলেই ভাল লাগে। চিতোর-গড়ের রাতের নীরবতার মধ্যেও মাঝে মাঝে, বিশেষ করে যে রাতে জ্যোৎস্না থাকে, ময়ূরের ঝাঁক ডেকে ডেকে উড়ে বেড়ায়। বিজনবিহারীর প্রাণটা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ময়ূরের ডাকের যত প্রতিধ্বনির উৎসবের মধ্যে ডুবে যায়। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। যদি এখানেও বউ কথা কও কখনও ডেকে ওঠে, তবে বোধহয় সেই মুহূর্তে চিতোর ছেড়ে দিয়ে একেবারে জয়সলমীরের দিকে চলে যাবে বিজন।

চিতোরের উটওয়ালা মালিক মাইনে বাবদ একটা পয়সাও দেন না বলেই কাজটা ছেড়ে দিতে হলো। তারপর ঝান্সি। মেওয়া-ওয়ালা মদনলালের দোকানে পুরো দুটি বছর চাকরি করতে হয়েছে। মাইনে দিতে কিপ-টেমি করেনি মদনলাল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাইনের লোভ ছেড়ে দিতেই হলো।

দোকানঘরের পিছনের একটা অন্ধ কুঠুরি, সেই কুঠুরির ভিতরে একটা তয়খানা, যেন রসাতলে যাবার একটা সুড়ঙ্গঘর। এই তয়-খানার ভিতরে পচা মেওয়া চোলাই করে মিঠা মদ আর খুশবুদার মদ তৈরী করে মদনলাল, রহিমেকে দিল বহুজানেকে নিয়ে।

দোকানঘরের কাজ তেমন কিছু নয়। আসল কাজটা এই তয়খানার ভিতরে; মাঝ-রাত পর্যন্ত জেগে জেগে কাঠের গামলায় পচা মেওয়া চটকাতে হয়। বিজনবিহারীর দু'হাতের মাংসের পেশীগুলি এরই মধ্যে পচা মেওয়া চটকাতে গিয়ে কত মজবুত হয়ে ফুলে উঠেছে।

কিন্তু কাজটা কপালে সইলো না। পালিয়ে যেতে হলো। যে রাতে মেওয়াওয়ালা মদন-লালের দোকানের উপর হানা দিল আবগারী পুলিস, সে রাতেই, সেই মুহূর্তে, তয়খানা থেকে বের হয়ে, পিছনের আঙিনার একটা গাছ বেয়ে পাঁচিলের উপর উঠে, আর ওপাশের শেখ সাহেবের আস্তাবলের চালার উপর লাফিয়ে পড়ে, তার-পর যেন একেবারে অশরীরী হয়ে উধাও হয়ে যায় বিজন।

ঢোলপুরে রেলের এক সাহেবের বাড়িতে বেয়ারা হয়ে আরও একটা বছর। শেষরাতের আবছায়ার মধ্যে চম্বলের বালিয়াড়ির উপর দাঁড়িয়ে হরিণ শিকার করতে ভালবাসেন ডি টি এস মিস্টার রাইট। দোনলা হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ডটা মিস্টার রাইটের হাতে থাকে, আর বেয়ারা বিজনবিহারীর হাতে থাকে একটা একনলা মার্টিন হেনরি। ভীরু, চিতল হরিণ নয়, একদিন সাংঘাতিক গাঁটা-গাট্টা একটা লেপার্ড পিছনের একটা ফনী-মনসার ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে এসে মিস্টার রাইটের ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু সাহেবের গায়ে একটা আঁচড়ও লেগে দিতে পারেনি লেপার্ডটা, চামড়ার জার্কিনের কলারটাকে শুধু এক কামড়ে ছিঁড়ে নিতে পেরেছিল। আর, বেয়ারা বিজনবিহারীর হাতের বন্দুকের এক গুলিতে সে লেপার্ডের বুকও সেই মুহূর্তে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল।

তারপর জব্বলপুরে। লাইনম্যান বিজন-বিহারী। দেশে চলে যাবার আগে মিস্টার রাইটই সুপারিশ করে বিজনবিহারীকে এই কাজে বহাল করিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

লোকে বলে, স্টেশনের ইয়ার্ড। বিজন-বিহারী জানে, লোহার পাঁজরা দিয়ে ছাওয়া এই ইয়ার্ডই তার জীবনের জগৎ। বাইরের সংসারের যত ভিড় এসে এখানে উপচে পড়ে আর মিলিয়ে যায়। কখনও লাল আর কখনও সবুজ, আলো আর নিশানের অফুরন্ত সঙ্কেত যেন এখানে নীড় বেঁধে বসে আছে। ট্রেন-বোঝাই হয়ে বাইরের পৃথিবীর যত হর্ষ আর কলরবের ভার এখানে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বিজনবিহারীও যেন তাদের সবারই যাওয়ার পথের কাঁটা সরিয়ে দেয়। শাবল দিয়ে ছোট্ট একটি আদরের আঘাত, ঠং করে একটি শব্দ শিউরে ওঠে, আর লাইনের লোহার ফাঁক গায়ে গায়ে জোড়া লেগে যায়। মনে হয়, লোহার শিব যেন বুক পেতে দিল। তার পরেই হুহু করে ছুটে আসে থ্রী আপ কিংবা ফোর ডাউন। সত্যিই মনে হয়, যেন একটা শব্দের এলোকেশীর নাচন সেই লোহার বুকে মাড়িয়ে ছুটে চলে গেল।

ট্রেনবোঝাই এই সব হর্ষ আর কলরব নিশ্চয় নিজের নিজের দেশে যায়। ওদের দেশ আছে, ঘরও আছে। সবাই হয়তো নিজের দেশের দিকে যাচ্ছে না; কেউ কেউ দেশের দিক থেকে এসে কোন অদেশের দিকে চলে যাচ্ছে। যেখানেই যাক্, শেষপর্যন্ত একটা আশার ঘরে গিয়েই তো ওরা জিরোবে আর ঘুমোবে।

কিন্তু ডিউটি শেষ হলে যে-ঘরে গিয়ে জিরোতে আর ঘুমোতে পারে বিজন, সেটা আশার ঘর নয়, ডি ব্লকের একটি কুঠুরী: একটা বেঁটে দরজা, আর, ঘুল-ঘুলির মত ছোট্ট একটা জানালা। জানালার কাছেই দেয়াল-ঘেঁষা ড্রেনের মধ্যে কাদামাখা শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। পাশেই এইচ ব্লকের যত কুঠরীর সারি, সামনে নীচের ক্লাসের যত সিগন্যাল আর খালাসীদের ঘর। জানালাটা এক বেলা খোলা থাকলে কয়লার ধোঁয়া ঘরে ঢুকে দেয়ালে টাঙানো জামা-কাপড়ের গায়ে লম্বা লম্বা ঝুল ঝুলিয়ে দেয়, যেন কতগুলো কালো-কালো সাপের খোলস।

যেন জীবনের যত আশার একটা কয়েদ-ঘর। এ চাকরির মেয়াদ ফুরোলে তবেই বোধ-হয় এই ডি কুঠুরির আশ্রয় থেকে সরে গিয়ে আবার ভাবতে হবে, আবার কোথায় যাওয়া যায়। কোন না কোন দিকে চলে যাওয়া যাবে নিশ্চয়; কিন্তু বাংলা দেশের দিকে নিশ্চয় নয়; ভুলেও নয়।

নীলরঙা কামিজ আর নীলরঙা বেঁটে প্যান্টলুনে জড়ানো একটা চেহারা হয়ে, লণ্ঠনটা হাতে ঝুলিয়ে রাতের ইয়ার্ডের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেও মন্দ লাগে না। বেশ ভালই লাগে, যখন শান্টিং-এর ইঞ্জিনগুলি এক-একটা চিৎকারের রাক্ষসের মত ডাইনে-বাঁয়ে ছুটোছুটি করে।

—এ বিজ্জন! লোকো শেডের গেটম্যান টহলদার সিং যখন চেঁচিয়ে ডাক দেয়; তখন বিজনও খুশির স্বরে চেঁচিয়ে উঠতে পারে—রাম রাম চাচা! বোলিয়ে কেয়া খবর!

—খবর কুছ নেহি, এক বাত পুছনা হ্যায়।

—বোলিয়ে।

—সাদি-উদি করোগে কি নেহি?

—সাদি কি আয়সি-ত্যায়সি! চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বিজন।
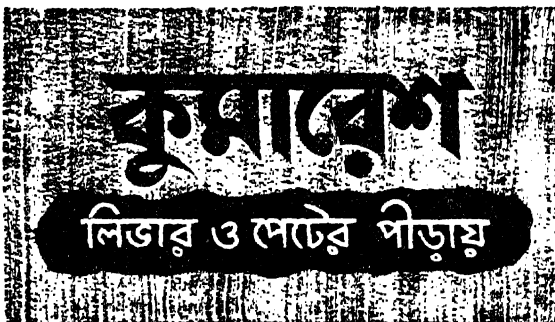
টহলদার সিং চোখ পাকিয়ে ধমক দেয়—জওয়ানি বরবাদ করোগে, কেয়া?

—জওয়ানি নর্মদামে বহা দেংগে। হেসে হেসে জবাব দেয় বিজন।

চাচাজী টহলদার সিং-এর চোখ দুটো যেন হঠাৎ একটু মুচকে হেসেই কুঁচকে যায়।—তব্ দের কেও? বঙ্গাল মুলকসে এক ছোটি-মোটি নজকুবদন নর্মদাকো উঠা লে কর চলে আও।

চাচাজী টহলদার সিং আর একবার মুচকে হেসে নিয়ে চলে যায়। শুধু আজ নয়, আরও কতবার এই ধরণের হাসির কথা শুনিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে চাচাজী। চাচাজীর এইসব মুচকি হাসির ভাষা যেন বিজনবিহারীকে বার বার এই সত্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, জীবনের আরও দুটো বছর এই জব্বলপুরেই পার হয়ে গিয়েছে। বয়সটা বাইশের কোঠাও পার হয়েছে। ইস্, কত তাড়াতাড়ি বয়সটার হাত থেকে খেলার ঘুড়ি-লাটাই খসে পড়ে গেল; আর, হাতে উঠে এল একটা কাজের লোহার শাবল।

কি আশ্চর্য, স্বপ্নের মধ্যে এখনও যে মাঝে মাঝে বাংলা দেশের একটা ধানক্ষেতের হাওয়া ফুরফুর করে, আর সেই ফুরফুরে হাওয়াতে বিজনবিহারীর প্রাণের একটা রঙীন খুশির ঘুড়ি আকাশে ভেসে ভেসে দুলতে থাকে। বলতে থাকে শিবপুকুর, গোরাচাঁপা, বোশেখী বেল আর......আর কাজলী।

ছিঃ, স্লেটের সব অংকের দাগ এত ভাল করে ধুয়ে দেবার পরেও একটা দাগ কেন আবার ফুটে ওঠে? ফুটে ওঠেই বা কেমন করে? কাজলীও তো আর সেই কাজলী নেই। ছোট নয়, বোকাও নয়। বড় হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, আর ঘেন্না করতেও শিখেছে।

কাজলীরও কি আর কিছু বুঝতে বাকি আছে? মাণিকপুরের বউঠাকরুনের অদ্ভুত ভাইটা যে একটা বে-আইনী প্রাণ, একথা কি আজ কাজলীরও অজানা আছে? কাজলী বোধহয় এখন স্বপ্ন দেখে ভয় পায়, বিজনবিহারী নামে একটা অস্পৃশ্য ছায়া ওর কাছে জল খেতে চাইছে। বোধহয় ঘুমের মধ্যেই ঘেন্না করে চেঁচিয়ে ওঠে কাজলী—সাবধান, তুমি আর এখানে এস না।

সত্যিই কি তাই? নাইট ডিউটি শেষ হবার পর, হাতের লণ্ঠন আর শাবল নামিয়ে রেখে, ইয়ার্ড মাস্টারের অফিস ঘরের কাছে পাথরের বেঞ্চিটার উপর চুপ করে বসে যখন হাঁপ ছাড়ে বিজন, তখন শিশিরে ভেজা চাঁদটা ঘোলাটে হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ডুবছে। রাতের আকাশটাকে ছেড়ে যাবার দুঃখে চাঁদটা যেন নিজের চোখের জলে মুখটাকে ভিজিয়ে দিয়ে ঘোলা হয়ে গিয়েছে। মনে হয়, জি কুঠুরির কালিঝুলি-ময় বুকটা সত্যিই একটা শাস্তির কয়েদঘর।

নিজেরই নিঃশ্বাসের শব্দগুলিকে শুনতে পায় বিজন, আর লজ্জাও পায়। নিঃশ্বাসের শব্দের মধ্যে যেন একটা ব্যাকুল লোভের শব্দও বেজে চলেছে। মানকর স্টেশনের সেই বুড়ো নিমকিওয়ালাকে আর একবার দেখবার জন্য মনটা ছটফট করে উঠছে। লোকটা কি এখনও বেঁচে আছে? তখনই তো তার বয়স ছিল আশির কাছাকাছি।

লোভটা বোধহয় খুব লাজুক, নয়তো চালাক, নয়তো ভণ্ড, নয়তো ভীরু; বুড়ো নিমকিওয়ালার জন্য দরদ দেখাবার ছুতো করে মানকর স্টেশনে দাঁড়িয়ে শিবপুকুরের দিকে তাকিয়ে আছে।

যে প্রতিজ্ঞাটা কেণ্টনগরকে এক কথায় ঘেন্না করে আর তুচ্ছ করে চলে আসতে পেরেছে, সে প্রতিজ্ঞার সব জোর শিব-পুকুরের কাছে হার মানতে চায় কেন? মনটা সত্যিই যে চোরের মত উঁকিঝুঁকি দিয়ে যখন-তখন কাজলীর মুখটাকে দেখতে চায়।

চাচাজী টহলদার সিং আবার যেদিন দেখা হতেই চোখ টিপে হাসে, সেদিন সকাল বেলাতেই ফোর ডাউন যেন বাংলা ভাষার একটা ঝংকার তুলে প্লাটফর্মের গায়ে এসে লাগলো। ট্রেনের অন্তত বিশটা কামরা বাঙালীতে ভর্তি। বুড়ো-বুড়ি, তরুণ-তরুণী, ছেলে-মেয়ে, সব বয়সের মানুষ কলকল করে হাসছে আর কথা বলছে। তার মধ্যে কাজলীর বয়সের মেয়েও আছে। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, একজনও কাজলীর মত সুন্দর নয়।

আকাশের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারে বিজন, শরৎকালের ডাক এসেছে। আজি কি তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে—সেকেণ্ড পণ্ডিত গুরুদয়াল-বাবুর হুংকার শুনেও, আর অনেক চেষ্টা করেও এর পরের লাইনটা মুখস্ত করতে পারেনি বিজনবিহারী। তবু বুঝতে অসুবিধে নেই, শারদ প্রভাত দেখা দিয়েছে, তাই বাঙালীর দল বঙ্গদেশে চলেছেন, কে জানে কোন্ ছাই মধুর মুরতি দেখবার জন্য।

ওরা ছুটি পেয়েছে, পুজোর ছুটি। ফোর ডাউন আবার বাংলা ভাষার ঝংকার তুলে চলে গেল।

চাচাজী ডাকে—এ বিজ্জাওন।

বিজন—বলুন।

চাচাজী—তোমারও তো ছুট্টি পাওনা আছে।

—আছে।

—ছুটি নাও তবে।

—কি দরকার?

—আরে বুদ্ধু, ছুট্টিই যে একটা দরকার।

জবাব না দিয়ে নীরব হয়ে কি-যেন ভাবে বিজনবিহারী।

চাচাজী বলে—ছুট্টি পাওনা হলেও যে ছুট্টি নেয় না, সে বুদ্ধু আওরভি কিছু আছে; সে বুদ্ধু পাগল আছে।

বিজনবিহারীর মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে যায়। চাচাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে আন-মনার মত বিড়বিড় করে বিজন—ছুটি নেব তবে?

চাচাজীও যেন স্নেহকোমল স্বরে উপদেশ দেয়—লেও বেটা। ছুটি নিলে মেজাজ ভাল হয়, আর কাজেও আবার নতুন ফুর্তি পাওয়া যায়।—ইনসনকা জান ধোবিকা কুত্তা নেহি হ্যায়, বিজ্জাওন।

চমকে ওঠে বিজনবিহারীর বাইশ বছর বয়সের বুকটা। না ঘাটকা না ঘরকা, সত্যিই কি ধোবিকা কুত্তা হয়ে গেল বিজনবিহারীর জীবন?

ভোরের চা-ওয়ালা হাঁক দেয়—মানকর। ট্রেনটা থেমেছে। আর ট্রেনের একটা কামরার ভিতরে ঘুমন্ত বিজনবিহারীর স্বপ্নটাও যেন ঝাঁক দিয়ে ফেলেছে—মানকর। আর, দুচোখে যেন সেই স্বপ্নেরই আবেশ সংগে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে বিজন-বিহারী।

বুড়ো নিমকিওয়ালাকে দেখতে পাওয়া গেল না; কিন্তু কি আশ্চর্য, প্লাটফর্মের সেই কাঞ্চনটা আছে, যেটাতে টুকটুকে লাল ফুলের হাসি আলো হয়ে ফুটে থাকতো। মানকর স্টেশনের চেহারা এই ছয় বছরের মধ্যেও একটুও বদলে যায়নি।

কিন্তু একটানা হেঁটে শিবপুকুর পৌঁছে গিয়ে একটা মাটির বাড়ির আঙিনার উপর এসে যখন দাঁড়ায় বিজন, তখন বুঝতে আর বাকি থাকে না, শিব-পুকুরের সব আলো-ছায়া বদলে গিয়েছে।

বটুকবাবু আশ্চর্য হয়ে বলেন—তুমি?

কাজলীর মা চমকে ওঠেন—তুমি?

সত্যিই কি বিজনকে দেখে ভয় পেলেন কাজলীর বাবা আর মা? বিজনকে কদমা ক্ষীর আর মুড়ি খেতে দিতে কোন ইচ্ছে নেই?

তাইতো মনে হয়। তা না হলে আর একটাও কথা না বলে দুজনেই ঘরের ভিতরে চলে যাবেন কেন? দাওয়ার উপরে রাখা ঐ মোড়াটার উপর বিজনকে বসতে বলতেও দুজনেই ভুলে যাবেন কেন?

আঙিনার উপর মস্ত একটা আলপনার দাগ একটু ময়লা হয়ে গিয়েও এখনও হাসছে। ওটা কি তবে কাজলীর জীবনের একটা উৎসবের স্মৃতির দাগ? কাজলী আর এবাড়িতে নেই? কোন আশার ঘরে চলে গিয়েছে কাজলী?

তাইতো সন্দেহ করতে হচ্ছে। এ শিবপুকুরে বোধহয় আজকাল আর গৌরীচাঁপা ফোটে না। পুরনো মন্দিরের পাঁচিলের গায়ের কাছে সে গাছটাকেও যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না!

শুনতে পায় বিজন, ঘরের ভিতরে বটুকবাবু যেন চেঁচিয়ে উঠলেন—যাসনি কাজলী! সাবধান!

কাজলীর মা ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—যাসনি, যাসনি কাজলী।

কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে যেন চাঁপা ফুলের একটা স্তবক ছুটে বের হয়ে এসে, আর বিজনবিহারীর চোখের কাছে দাঁড়িয়ে হেসে ওঠে—চিনতে পার?

বিজন আবার হাসতে চেষ্টা করে—বিশ্বাস কর।

কাজলী—একটুও বিশ্বাস করি না। মনে পড়লে ছটা বছর এভাবে পালিয়ে থাকতে পারতে না। আগেই আসতে। তাহলে আজ আর......।

বিজন—কি বলছো?

কাজলী—আজ আর বলে কোন লাভ নেই।

কি আশ্চর্য, কাজলীর চোখের পাতাগুলি যে ভিজে গিয়েছে। ঠোঁট দুটোও যেন ফুঁপিয়ে উঠতে চাইছে।

বিজন—আমি কেন চলে গেছি, সেটা তুমি বোধহয় জান না।

চিনতে পার?

সত্যিই কাজলী। গৌরীচাঁপাও দেখতে বোধহয় এই রকমের। কাজলীর সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ, গলায় সোনার হার, পায়ে আলতা, আর খোঁপাতে রুপোর প্রজাপতি।

কাজলী বলে—আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আর পনর দিন আগে এলে বিয়েটা দেখতে পেতে, আর পেটভরে লুচি-সন্দেশও খেতে পেতে।

বিজন হাসে—বড় ভুল হয়েছে।

কাজলী—কিসের ভুল?

বিজন—সময়মত এলে বিয়ের নেমন্তন্নটা খেতে পেতাম।

কাজলী—সময়মত আসতে পারনি কেন? মনেই পড়েনি নিশ্চয়?

বিজন—মনে পড়েছিল।

কাজলী—ছাই মনে পড়েছিল।

কাজলী—খুব জানি। সবই জানি। সব শুনেছি।

বিজন—তবে আর একথা বলছো কেন? আমি আগে এলেই বা কি হতো?

কাজলী—সব হতো।

চমকে ওঠে বিজন—কি বললে?

কাজলী—খুব স্পষ্ট করেই তো বলছি। তুমি হাঁ বললে আমি না বলতাম না। কখখনো না। আমি যে সত্যিই ভেবেছিলাম, তুমি ঠিক সময়মত এসে পড়বে। না এসে পারবে না।

বটুকবাবু চেঁচিয়ে ডাক দেন—গো-গাড়ি তৈরি হয়েই আছে বিজন। বেলাবেলি মাণিকপুরে পৌঁছে যাওয়াই ভাল।

বিজন বলে—গো-গাড়ির দরকার নেই মেসোমশাই; আমি মাণিকপুর যাব না।

—তবে কোথায় যাবে?

—কোথাও না। বলতে বলতে পিছু ফিরে দাঁড়ায় বিজন; আর, তার পরেই যেন একটা একরোখা ঝড়ের বাতাসের মত ছুটে চলে যায়।

মানকর স্টেশনের কাঞ্চনটা তবু হাসছে। একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে; সে ট্রেন কোথায় যাবে, কোন্ দিকে যাবে, খোঁজ নিতেও ভুলে যায় বিজন। যেন ফেরারী আসামীর মত একটা উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি; ছুটে গিয়ে একটা কামরার ভিতরে ঢুকে পড়ে।

হাত তুলে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে মনে হয়, কপালটা বুঝি রক্তে ভিজে গিয়েছে। ভয়ানক একটা ঠাট্টার ভূত হেসে হেসে কপালের উপর কাঁটাভরা হাতের একটা চাপড় ঠুকে দিয়ে সরে পড়েছে। বাংলা দেশের আকাশ দেখবার নেশাটা হোঁচট খেয়ে কাদার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছে। খুব হয়েছে। শিবপুকুর কোন গাঁয়ের নাম নয়। শিবপুকুর একটা [illegible] শাস্তির নাম। বিজনবিহারীর দুরাশার প্রায়শ্চিত্তের নাম। চোর ফিরে এসে দেখেছে, তার চুরি-করা সোনার ঘড়া চুরি হয়ে গিয়েছে।

ভালই হয়েছে। [illegible] মাষ্টারের অফিসঘরের কাছে বেঞ্চের উপর বসে নাইট ডিউটির লাইনম্যানকে আর মাঝরাতের চাঁদের চেহারা দেখবার জন্য চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকতে হবে না। কালিঝুলি মাখা ঐ কুঠুরীর মধ্যেও আর স্বপ্ন দেখবার সাহস করবে না। একটা বদ্ধ পাগল না হয়ে গেলে, এরপর আর কাজলীর মুখটা মনে করবার দরকার হবে না।

এটা কোন স্টেশন? রাতই বা কত হলো? যাত্রীতে ঠাসা এই কামরাটার এই বেঞ্চের এই কোণে একটা বাসি লাশের মত অসাড় হয়ে পড়ে থেকে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে বিজন?

কিন্তু সত্যিই যে একটা স্বপ্নের কথা শুনতে পেয়ে ধড়ফড় করে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে। কি আশ্চর্য, দু'হাতে চোখ দুটো ঘষলেও যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, স্টেশনের প্লাটফর্মের এক কোণে কাঞ্চনটা হাসছে; অথচ স্টেশনটা মানকর নয়, মানকর হতেই পারে না।

গোমো জংশন। এবং এই গোমোর এই প্লাটফর্মের কোনদিকে কোন কাঞ্চন নেই। হেসে ফেলে বিজন। আর বুঝতেও পারে, বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাস যেন হাসছে। ভাবতে খুবই ভুল করেছিল বিজন। শাস্তি পেয়ে নয়; হেরে গিয়ে নয়, বিজনের প্রাণটা যে জয়ীর মত একটা তৃপ্তির উপহার নিয়ে, গৌরীচাঁপার মত মায়াফুলের মস্ত বড় একটা মালা গলায় দুলিয়ে চলে যাচ্ছে। কাজলী যে স্বপ্নের মধ্যেও এসে কথাগুলি

শুনিয়ে দিয়ে গেল—আসতে দেরি করলে কেন?

কোন্ সাহসে এমন কথা বলতে পারে কাজলী? অথচ কাকে বলছে, তা'ও সে জানে। যার প্রাণটা পৃথিবীর কোন দাদা-দিদির ভাই নয়; বাপ-মায়ের ছেলে নয়; যার ছায়ার কাছেও কোন ভালমানুষের মেয়ে আসতে চাইবে না, আইন যাকে মিথ্যে মানুষ বলে মনে করে, তাকেই আশা করেছিল কাজলী? কাজলী যেন সংসারের যত নিয়মের শাসন তুচ্ছ করে, একটুও ভয় না পেয়ে জানিয়ে দিয়েছে, বিজনবিহারীর প্রাণের জন্ম একটা অনিয়মের রহস্য হলেও তাকে ঘেন্না করতে, ঠাট্টা করতে আর দয়া করতে চায়নি কাজলী; ভালবাসতে চেয়েছিল।

ভালবেসেছিল বোধহয়। তা না হলে ওকথা অত স্পষ্ট করে বলবে কেন কাজলী?

তবে আর কিসের আক্ষেপ? কিছুই না। চাচাজীকে বরং হেসে হেসে শুনিয়ে দিতে পারা যাবে, তুমি যা বলেছিলে তার চেয়েও অনেক সুন্দর একটি নর্মদাকে আমি পেয়ে গেছি চাচাজী, যদিও তাকে তুমি কোনদিন আমার ঘরে দেখতে পাবে না। তা ছাড়া, আমার যে কোনদিনই ঘর হবে না। ঘর করবার অধিকারও যে আমার নেই। কোথাও ঘর যদি বাঁধি, তবে লোকে সেই ঘরের দিকেও তাকিয়ে ঠাট্টার হাসি হাসবে, যেমন নদীর চরের গর্তে ক্ষেপা শেয়ালের ঘর দেখে মাচানের চাষী যেমন হাসে। ঠাট্টাটা যদি খুব ভদ্র হয়, তবে হয়তো দয়া করে বলবে, অদ্ভুত ঘর: মেজ জামাইবাবু যেমন মেজদিকে বলেন, তোমার সেই অদ্ভুত ভাই। মেজজামাইবাবু মানুষটা তো অভদ্র নয়।

সুতরাং, বিজনবিহারী পরোয়া করে না, চাচাজী। সে ঘর চায় না। ঘরকে সে ঘেন্না করে। তোমাদের নিয়মের দুনিয়াতে যত ঘর আছে, সব, সব ঘরকেই যত প্রেতের ঘর বলে মনে করে বিজনবিহারী।

আর জব্বলপুরে নয়।

নতুন রেল লাইন পাতবার জন্যে যে সার্ভে পার্টি উড়িষ্যার জঙ্গল পার হয়ে আর তাঁবু ফেলে ফেলে পালামৌয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, সেই পার্টির সঙ্গে চেনম্যান হয়ে কাজে করে দুটি বছর ফুরিয়ে যায়, তবু বিজনবিহারীর মনে এতটুকু আক্ষেপ নেই যে, জীবনটা যাযাবর হয়ে গেল। তাঁবুই ভাল। কোন জায়গায় এক মাসের বেশি ঠাঁই নিতে হয় না। জংলী হাতী তাড়াবার ডিউটিটা আরও ভাল লাগে। সারা রাত মশাল জেলে জেগে থাকা, আর টিন পেটানো। যে সাহস কেউ করতে পারে না, সে সাহস করবার জন্য বিজনবিহারী যেন খুশি হয়ে এগিয়ে যায়। বাঁশের জঙ্গলের ভিতরে মটমট্ হুটোপুটির শব্দ শোনা মাত্র ক্যাম্প থেকে বের হয়ে এক'শো গজ দূরের খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেবার ডিউটিটা বিজনবিহারী ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছে। চীফ সার্ভেয়ার সাহেব খুশি হয়ে বিজনবিহারীকে প্রত্যেকটি হাতিতাড়ানো সাহসের জন্য পাঁচ টাকা বকশিস দিয়ে থাকেন।

আরও একটি বছর। সার্ভে পার্টির তাঁবু যেদিন কোয়েল নদীর এপারে এসে পৌঁছলো, সেদিন চীফ সাহেব বললেন—হাম অব হোম চলেগা; মেম সাহেব বহুৎ কড়া চিঠি ছোড়া হ্যায়।

অদ্ভুত ব্যাপার হোমপ্রিয় চীফ সাহেব এত লোকের মধ্যে বেছে বেছে চেনম্যান বিজনবিহারীকেই বললেন—বেভ চেনম্যান, তুমভি অব ঘর যাও।

বিজন—ঘর নেহি হ্যায়, সাহেব।

চীফ সাহেব—ঘর বনাও।

চমকে ওঠে বিজনবিহারী।

চীফ সাহেব—তুম আর্থ-কাটিংকা কন্ট্রাক্টর বন্ যাও। হম বন্দোবস্ত কর দেগা।

হোম যাবার আগে চীফ সাহেব তাঁর প্রতিশ্রুতির কথাটা ভুলে যাননি। চীফ সাহেব হোম চলে যাবার পরে দুটো মাসও পার হয়নি, গোমোর রেল-অফিস থেকে একটি চিঠি পেয়ে বুঝতে পারে বিজনবিহারী, নতুন লাইনের জন্য মাটি কাটবার ঠিকাদারী যদি করতে হয়, তবে ঐ সিংহানী পাহাড়ের দক্ষিণে এক অজানা-অচেনা জঙ্গলের বুকের ভিতরে ঢুকে কোন মুণ্ডা কিংবা ওরাও' গাঁয়ের গাছতলায় খেজুরপাতার ছাউনি দেওয়া একটা ঠাঁই তৈরী করে নিতে হবে।

দেখে খুশি হয় বিজনবিহারী; না, খেজুর পাতার ছাউনি তৈরী করতে হবে না। উটগাড়ি থেকে নেমে, আর সড়কের মোড়ে দাঁড়িয়ে চারদিকের জঙ্গলটার দিকে তাকিয়েও খুশি হয়। যেন বাইরের হৈ-চৈ সভ্য-ভব্যতার ভয় থেকে ফেরার হয়ে একটা শান্ত নিরালা এখানে এসে শালের হাওয়াতে খুশি হয়ে পড়ে আছে। একটা হালুয়াইয়ের দোকান, একটা সরাইঘর আর একটা মহুয়া-চোলাই ভাঁটি। মাটির দেয়াল আর খাপরার চালা দিয়ে তৈরী তিনটে ক্ষুদে চেহারার বাড়িতে শুধু তিনটে মানুষ বাস করে—হালুয়াই রামসিংহাসন, সরাই-ওয়ালা হীরারাম আর ভাঁটিদার গুলু মিয়াঁ।

এই সরাইঘরে আর কতদিন থাকা যাবে? মাঝে মাঝে গরুর পিঠে শুকনো লংকার

বস্তা চাপিয়ে করনপুরার বোনিয়ারা যখন হাজির হয়, তখন সরাইঘরে আর লোক ধরে না। নেকড়ের ভয়ে গরু আর লংকার **বস্তা** নিয়ে বেনিয়ারা সারা রাত ঘরের **ভিতরেই** গাদাগাদি করে থাকে আর ঘুমোয়।

রামসিংহাসন বলে— যতদিন না একটা **ডেরা** বানিয়ে নিতে পারেন, ততদিন আমার দোকানের পিছনের ঘরটায় থাকতে পারেন।

বিজনবিহারী বলে—বহুৎ আচ্ছা।

রোগা শালের খুঁটি, এবড়ো-খেবড়ো **মাটির দেয়াল** আর খপরার চালা; দরজায় **কাঠের কপাট** নয়; খেজুর পাতার একটা **ঝাঁপ।** ঘরটাকে দেখিয়ে দিয়ে রামসিংহাসন **বলে—এর মধ্যে থাকতে যদিও আপনার বেশ কষ্ট হবে......।**

বিজন বলে—বলেন কি? আমার পক্ষে **এটা যে একটা কেল্লাঘর, রামসিংহাসন!**

কিন্তু একবার যে কলকাতা যেতে হবে। **কোদাল গাঁইতা** আর শাবলের জন্য রেল-**কোম্পানীর** সাপ্লাই এজেন্ট ভুরামল **ব্রাদার্স**কে ধরতে হবে, যেন অন্তত এক **বছরের** মেয়াদে মালটা ধারে দিতে রাজি **হন।**

কলকাতা যাবার পথে, রাতের মানকর **স্টেশনটার** দিকে ইচ্ছে করেই তাকায়নি **বিজনবিহারী।** সে কাঞ্চন ফুলে-ফুলে লাল **হয়ে** আছে কি-না কে জানে? না থাকতেও **পারে।** তিনটে বছরও তো কমদিনের **ব্যাপার** নয়।

কিন্তু ফেরবার পথে ভোরের মানকর **স্টেশন**কে দেখতে সত্যিই যে ভোরের স্বপ্নের **মত মায়াময়** বলে মনে হলো। পঁচিশ বছর **বয়সের** বিজনবিহারীর চোখের আশাও যে **আবার** উতলা হয়ে উঠতে চাইছে। **কাজলীকে** দেখতে ইচ্ছে করে। শুধু **একবার** দেখা দিয়েই চলে আসা।

কিন্তু কাজলী কি এখন শিবপুকুরে আছে? থাকতেও পারে। **কিন্তু থাকলেই** বা কি?

কিছু নয়; কাজলী যদি সেদিনের মত কালো চোখের তারা দুটোকে আবার হাসিয়ে-কাঁদিয়ে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকায়, তবে একথা বলে দিতে পারবে বিজন, না কাজলী, আমার মনে একটুও দুঃখ নেই। এই তিন বছর ধরে, একটি দিনও বাদ যায়নি, যেদিন তোমার কথা না ভেবে থাকতে পেরেছি। জংলী হাতি তাড়াবার সময় ক্যাম্পের কশন বেড়া পার হয়ে খড়ের গাদায় আগুন ধরাতে গিয়েও শুধু মনে পড়েছে, জংলা হাতির কাছে যদি এখন প্রাণটা হারাতে হয়, তবু কাজলী কোন দিন জানতে পাবে না যে, মানুষটা মরবার আগে কাজলীরই কথা ভেবেছিল।

ট্রেন থেকে নেমে পড়ে বিজন। আর ট্রেন ছেড়ে যাবার পর বুঝতে পারে, চোখের আশা আবার পাগল হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখের সামনে একটা অলক্ষুণে শূন্যতাও চমকে উঠেছে। সেই কাঞ্চনটা নেই।

শিবপুকুরের কাছারিবাড়ির নতুন সরকার মশাই ত্রিলোচনবাবুও একটু চমকে উঠেই বললেন—না, বটুক আর নেই। বটুকের স্ত্রীও নেই। দুজনেই মারা গিয়েছে।

বিজন—বটুকবাবুর মেয়ে?

—সে অবিশ্যি আছে। কিন্তু থেকেও নেই।

—কোথায় আছে?

—তার শ্বশুরবাড়িতে আছে। মেয়েটি এই এক বছর হলো বিধবা হয়েছে।

—কেন?

—এ তো বড় আশ্চর্য প্রশ্ন। কেন মানে কি? একটা ক্ষয়রোগী মানুষের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হয়, সে মেয়ে কতদিন সধবা থাকতে পারে?

—বটুকবাবুর মেয়ের শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

—গাঁয়ের নাম বেনাগ্রাম, দুবরাজপুর স্টেশনে নামতে হয়।

—শ্বশুরের নাম?

—তা জানি না। তবে শুনেছি, বটুকের বেয়াই হলেন নাম-করা দৈবজ্ঞী। বলে-ছিলেন বেয়াই, তুমি নাতির বিয়ে দেখে যাবে বটুকবাবু; হুঁঃ!

—আচ্ছা, আমি যাই, নমস্কার।

—তুমি কে বট?

—আমি কেউ না।

কাজলীকে দেখবার জন্য চোখের আশা পাগল হয়েছিল, এইবার যেন চোখের জ্বালাটা পাগল হয়ে ওঠে। তুমি এ কেমন ঘর পেলে কাজলী? এমন ঘরের জীবন যে আমার ঘরছাড়া জীবনের চেয়েও শূন্য জীবন। ভাগ্য আর আইন না হয় আমার জন্মের ভুল ধরে আমাকে অমানুষ বলে দাগী করে দিয়েছে, কিন্তু আইনের আর ভাগ্যের ভগবানেরা তোমাকে অমানুষ করে দিল কেন?

দুবরাজপুরের কাছেই বেনাগ্রাম, মাঝে শুধু তাঁতীদের একটা গাঁ পার হতে হয়। দৈবজ্ঞী বাড়িটা খুঁজে নিতে দেরি হয় না। বাড়ির কর্তা হাতের হুঁকো নামিয়ে রেখে আর চোখ বড় করে তাকান—কাজলী আবার কে?

বিজন বলে— শিবপুকুরের বটুকবাবুর মেয়ে।

কাশির বেগ চেপে কথা বলেন কর্তা—বল না কেন, নিরুপমা! যাই হোক, তুমি কে?

—আমি শিবপুকুর থেকে আসছি।

—বউমার দেশের লোক? বেশ কথা।

কিন্তু তুমি এখানে এই দোরগোড়াতেই দাঁড়াও বাপু, আমি বৌমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কাজলী এসেই হাসতে থাকে।—কাজলী কাজলী করছিলে কেন ? ও নামটা কি এখন আর আমাকে সাজে? না, তোমারও এই বয়সের মুখে সাজে? আমার নামটা যে নিরুপমা, সেটুকুও কোনদিন বোধহয় জানতে চেষ্টা করনি?

বিজন হাসে—না, করিনি।

নিরুপমা—ভালই করেছিলে; জেনেই বা লাভ কি?

বিজন—কেমন আছ ?

নিরুপমা—ভালই আছি। বিশজন মানুষের জন্যে দুবেলা ভাত রাঁধি আর বাসন মাজি।

বিজন—আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একটিও বাজে কথা বলতে পারবো না। শুধু জানতে চাই.....।

নিরুপমা—চুপ কর। এটা আমার শ্বশুর-বাড়ি।

বিজন—তোমার অভিশাপের বাড়ি।

নিরুপমা—ছিঃ, ওকথা বলো না।

বিজন—না বলে উপায় নেই। তুমিই না একদিন বলেছিলে.....।

নিরুপমা—কি বলেছিলাম?

বিজন—বলেছিলে, তুমি ছাড়া আমার নাকি গতি নেই।

নিরুপমা—একটা একরত্তি মেয়ের মুখের সেই কথাটা এখনও মনে করে রেখেছ ?

বিজন—মনে করে রেখেছি, আর সেই জন্যেই বলতে এসেছি।

—বল।

—আমি ছাড়াও তোমার গতি নেই।

—তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে এত ভয় দেখিও না।

—ভয় ?

—এত লোভ দেখিয়ো না, তোমার পায়ে পড়ি।

—আমি তোমার কোন আপত্তি শুনবো না।

সাদা থানে জড়ানো নিরুপমার রিক্ত মূর্তিটা থরথর করে কাঁপে।—কি বলতে চাইছো, বল।

—আমার সঙ্গে চল।

—মাপ কর।

—না।

—তবে ভাবতে দাও।

—না। তোমাকে আমি চুরি করতেই এসেছি।

—ভাবতেও যে বুক কাঁপছে।

—কেন ?

—ভয়ে।

—কার ভয়ে? কিসের ভয়ে? ঐ কেষ্টনগর আর এই বেনুগ্রামের ভয়ে? আমি যাদের চোখে একটা অমানুষ, আর তুমি যাদের চোখে একটা দাসী, তাদের ভয়ে? না, এখনি চল।

চোরের মত নয়, ডাকাতের মত কথা বলছে বিজনবিহারী। নিরুপমার সেই ভীরু চোখ দুটোও দেখে আশ্চর্য হয়, ডাকাতের চোখের জ্বালা জলে ভরে গিয়ে ছলছল করছে।

কিন্তু তখনই নয়। মাঝ রাতের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে একটা ছায়াদস্যু যেন বেনুগ্রামের দেউলের কাছে অজগরের মাথার মাণিক লুটে করবার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। নিরুপমা আসে। নিরুপমার মাথাটা দুহাতে জড়িয়ে, নিরুপমার জলভরা ভীরু চোখ দুটোকে বুকের কাছে একবার চেপে ধরে শান্ত করে দিয়েই বিজনবিহারী বলে—চল; কোন ভয় নেই নিরু।

শুধু বাঙালীবাবুর যত দুঃসাহসের কাণ্ড দেখে নয়; বাঙালীবাবুর এই জেনানারও সাহসের রকম-সকম দেখে আশ্চর্য হয় রাম-সিংহাসন। নতুন রেললাইনের জন্য মাটি কাটবার ঠিকে পেয়েছে নিতান্ত ছোকরা বয়সের এই বাঙালীবাবু, কিছু টাকা লাভ রাখে ঠিকই; আর কাজের দায়ে দশ বিশ তিশ মাইল দূরেও চলে যেতে হয়। কিন্তু সেজন্য কি ভুলে গেলে চলে যে, সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফিরে আসা উচিত? এই জঙ্গলের রাজ্যে সন্ধ্যাটাই যে সবচেয়ে ভয়ানক একটা লগন-কাল; ভুখা জানোয়ার যখন শিকার ধরবার জন্য মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি করে।

কিন্তু বাঙালীবাবু সন্ধ্যা না হবার আগে ঘরে ফেরে না। বাঙালীবাবুর জেনানা, অল্প-বয়সের ঐ মেয়েটা, সারাটা দিন একা-একা ঘরের ভিতরে থেকে শুধু খুট-খাট ঠুং-ঠাং ধুপ-ধাপ কাজ করে। কাদা মাটি দিয়ে দেয়ালের ফাটল জোড়া দেয়, গোবর দিয়ে আঙিনা নিকোয়; কাঠের মুগুর দিয়ে ধানের তুষ ভাঙে, আর কাটারি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কাঠ চেলা করে। আর, ঘর তো ঐ একটা নড়বড়ে ঘর, যার দরজায় কাঠের কপাটও নেই, শুধু খেজুরপাতার একটা ঝাঁপ।

সন্ধ্যা হতেই দোকানঘরের টিনের ঝাঁপ নামিয়ে দিয়ে, আর কেরোসিনের কুপির কাছে বসে জীর্ণ তুলসী-রামায়ণটা হাতে তুলে নিয়েই এক-একদিন চমকেও ওঠে রাম-সিংহাসন। একটা নেকড়ে ঘরের চারদিকে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে ছুটছে। অথচ বাঙালী-বাবু এখনও ঘরে ফেরেনি। বউটা একা-একা ঘরের ভিতরে বসে রান্না করছে।

—রাম রাম! ডরো মত্ দিদি। হাঁক দেয় রামসিংহাসন। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে, বাঙালীবাবুর বউ একটুও ভয় না পেয়ে, উনুন থেকে জ্বলন্ত চেলাকাঠ তুলে নিয়ে অন্ধকারের ভিতরে লুকোনো ঐ খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দটার গায়ে ছুঁড়ে মেরেছে।

যেমন এই বাঙালীবাবু তেমনই তাঁর বউ, দুজনেই কি-ভয়ানক বেপরোয়া হয়ে খাটতেও পারে! সড়কের ওপারে, একটু দূরে, কাঁচা-ইঁটের দেয়াল তুলে বাড়িটা তৈরী করবার সময় বাঙালীবাবু তাঁর মুণ্ডা মজুরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমানে কাজ করেছে। নিজেই ইটের ছাঁচ তৈরী করে নিয়েছে। নিজেও দুহাতে কাদা ঘেঁটে ইঁট গড়েছে। টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে শালের রোলা কেটেছে। সাত দিনের মধ্যে খুঁটো পুঁতে আর বাঁশ পেতে ঘরের ছাউনির ঠাট তৈরী করে ফেলেছে। ছাউনির উপর বসে খাপরা চেলেছে বাঙালীবাবু; বউটাও শক্ত করে কোমরে আঁচল জড়িয়ে, আর একটা চঙের উপর দাঁড়িয়ে বাঙালীবাবুর হাতের কাছে খাপরা যোগান দিয়েছে।

নতুন ঘরে ঢুকে যেদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে নিরুপমা, সেদিন নিরুপমার আলো-মাখানো মুখের হাসিটার দিকে তাকিয়ে বিজনবিহারীর হৃৎপিণ্ডেরই একটা তৃপ্তি যেন হেসে ওঠে।

সন্ধ্যাটাকে সন্ধ্যা বলে মনে হয় না। বিজন-বিহারীর নতুন অদৃষ্টের ঘরে যেন ভোরের আলো উঁকি দিয়েছে। এই তো সবে মাত্র শুরু হলো। যা চাই, যা না হলে চলে না, তার সবই পেতে হবে। কারও কাছে ভিক্ষে করে নয়; বিজনবিহারী তার এই গায়ের আর এই প্রাণেরই জোরে সব আদায় করে ছাড়বে।

নিরুপমার হাত ধরে নতুন ঘরের দাওয়ার উপর বসে যখন গল্প করে হাসতে থাকে বিজনবিহারী, তখন সেই জংলী নিরালায় বুকটাও যেন সঙ্গে সঙ্গে হাসতে থাকে। চৈত্র মাসের শালের কাঁচ পাতাও নতুন বাতাসের ছোঁয়ায় ঝিরঝির করে নতুন হাসির শব্দ ছড়াতে থাকে।

ফেরারী আসামীর ভীরু হাসি নয়, ফেরারী অভিমানীর করুণ হাসিও নয়, যেন এক ফেরারী বিদ্রোহীর অনাহত প্রতিজ্ঞার হাসি। পুরনো ভাগ্যটা যা-কিছু কেড়ে নিয়েছে, নতুন ভাগ্যটা তার সবই কেড়ে আদায় করে ছাড়বে। দেখি, কার সাধ্যি আছে, বিজনবিহারীর এই ঘরের দিকে তাকিয়ে আর ঠাট্টার হাসি হেসে বলতে পারে, এটা একটা অদ্ভুত ঘর?

রামসিংহাসন তো এরই মধ্যে আশ্চর্য হয়ে গিয়ে তিনবার বলেছে, বাঙালীবাবুর ঘরনীর মত ঘরনী তো কাঁহুভি না দেখি। বনবাসিন সীতাজি যৈসন পতিপূজন লাগু......।

নিরুপমার সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোটা এই জংলী নিরালার বুকে সত্যিই একটা নির্ভয়ের আলোর সঞ্চার। তা না হলে গালুয়াই রাম-সিংহাসন, সরাইওয়ালা হীরারাম আর ভাটিদার গুলু মিয়াঁ, তিনজনেই তিনটে মাস যেতে না যেতেই দেশের বাড়ি থেকে বউ আনিয়ে ফেলতে সাহস পেত না। এখানে ঘর-সংসার করা যায়, এই বিশ্বাস যে এই বাঙালীবাবুর ঘরের আলোটাই ফুটিয়ে তুলেছে।

ক'বছরের মধ্যেই যে অনেক কিছু পেয়ে গেল বিজনবিহারী। ঘরের গা ঘেঁষে চারটে শিউলি ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল। ঘরটাও যে একটা নাম পেয়ে গেল—শিউলিবাড়ি। স্টেশনটারও নাম শিউলিবাড়ি। পাঁচ মাইল দূরে যে কোলিয়ারিটা প্রথম দেখা দিল, সেটারও নাম শিউলিবাড়ি কোলিয়ারি। বিজনবিহারীর পুরনো নামটাকেও মাটি করে দিল একটা নতুন নাম—মাটিসাহেব। বেশ নাম। বিজন-বিহারীর প্রাণের সেই প্রতিজ্ঞার স্বপ্নটা যে পাহাড় আর শালবনে ঘেরা এই চমৎকার এক-টুকরো জগৎটার মাটি দিয়ে সুখের ঘর তৈরী করে নিতে পেরেছে। এই মাটি বিজন-বিহারীর স্বপ্নের বন্ধু; বিজনবিহারীও এই মাটির স্বপ্নের বন্ধু।

যেমন শিউলিবাড়ির সড়কের দুপাশে, তেমনই স্টেশনের আশে পাশে কত নতুন ঘর উঠছে, নতুন দোকান বসছে। ঝুমরা রাজ এস্টেটের তশীলদার ফুলনবাবুও এসে একটি কাছারি বসিয়েছেন। মাটিসাহেব সবারই দরকারের বন্ধু। সবাই মাটিসাহেবের ইচ্ছা উপদেশ আর পরামর্শের বন্ধু।

ধর্মশালা কমিটির প্রথম প্রেসিডেন্ট বিজন-বিহারী। সরাইওয়ালা হীরারাম স্টেশনে পানিপাঁড়ের কাজ নেবার পর সরাইটা বিনা যত্নের দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে গলে একটা ঢিবি হয়ে পড়েছিল। নতুন দোকানীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ইঁট কেনা হলো, আর কাঠ কেনবার সব খরচ দিল বিজনবিহারী। পুরনো সরাইয়ের যত ধ্বংসের জঞ্জাল সরিয়ে নতুন ধর্মশালা তৈরী হতে শুরু হলো যেদিন, সেদিনও রামসিংহাসন দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়, বাঙ্গালীবাবু গাছতলায় দাঁড়িয়ে আর একটা করাত হাতে নিয়ে শাল কাঠের পাটা চিরছে। কারণ, দেয়াল গাঁথবার জন্য ভারা বাঁধতে হবে, অথচ তক্তা নেই, আর কাঠুরে মিস্তিরিটাও আসেনি।

শিউলিবাড়ি রাস্তা কমিটিরও প্রথম প্রেসিডেন্ট বিজনবিহারী। স্টেশন থেকে শুরু করে সড়কের মোড় পর্যন্ত প্রায় এক মাইল লম্বা যে রাস্তাটার দুপাশে নতুন নতুন বস্তি, গোলা, দোকান আর আড়ত গড়ে উঠেছে, সে রাস্তাটা রাস্তাই নয়। বড় বড় গর্তে ভরা সে রাস্তায় চলতে গিয়ে গরুর-গাড়ির ধড় মচকে যায়, চাকা ছিটকে পড়ে। শিউলিবাড়ির সব মানুষের কাছ থেকে মাসিক এক আনা চাঁদা নিয়ে রাস্তাটার উপর খোয়া বিছাই করতে হবে। তা ছাড়া, অন্তত চারটে ল্যাম্প পোস্টও বসাতে হবে।

শিউলিবাড়ি রক্ষা সমিতির প্রথম সেক্রেটারী মাটিসাহেব, সভাপতি তশীলদার ফুলনবাবু। কাগজ-কলম হাতে নিয়ে নয়; পুরো তিনটে মাস রোজ রাতে লম্বা একটা বল্লম হাতে নিয়ে সেক্রেটারীর কাজ করেছে বিজনবিহারী। খবর পাওয়া গিয়েছিল, বিরসা মুণ্ডার দল আবার ক্ষেপেছে। একটা দল নাকি এদিকে এসে তশীল কাছারি লুট করবে আর পোড়াবে। দোকানীরাও ভয় পেয়েছে, হামলা যদি হয়, তবে ওরাও কি রেহাই পাবে? স্টেশনটার উপরেও হামলা হতে পারে। ক্যাশব্যাগ বগলদাবা করে স্টেশন-মাস্টার চৌধুরীবাবু রোজ রাতে এক ভিখিরী বুড়োর কুঁড়ে ঘরের ভিতরে বসে-শুয়ে আর জেগে-ঘুমিয়ে রাত পার করে দেন। তশীলদার ফুলনবাবুও আতঙ্কিত হয়ে আবেদন করেন—একটা কিছু করুন মাটিসাহেব। আপনি না করলে করবে কে?

পঁচিশ জন লোক, পঁচিশটা লাঠি আর পাঁচটা মশাল; আগে আগে মাটিসাহেব বিজনবিহারীর বল্লমের ফলক মশালের আগুনের আভা লেগে চিকচিক করে। সারা রাত টহল দিয়ে বেড়ায় রক্ষা সমিতির পাহারা পার্টি। অমাবস্যার মাঝরাতে তশীল-কাছারির উপর এক ঝাঁক তীরও ছুটে এসে পড়েছিল। কিন্তু বিজনবিহারীর দলের হাল্লা অমাবস্যার অন্ধকার কাঁপিয়ে দিতেই তীরছোঁড়া আক্রোশটা যেন আড়াল থেকেই ছুটে পালিয়ে গেল।

এক মাস পরে, দশ মাইল দূরের থানাতে গিয়ে ডি এস পি'র হাত থেকে একটি উপহার নিয়ে যেদিন শিউলিবাড়ি ফিরে এল বিজনবিহারী, সেদিনটা শিউলিবাড়ির জীবনেও যেন একটা মহোৎসবের দিন। পঞ্চাশ জন খুশি মানুষের একটা মিছিল, তার মধ্যে রামসিংহাসন আছে, গুলু মিয়াঁ আর হীরারামও আছে, দশ মাইল পথ বিজনবিহারীর পালকির সঙ্গে হেঁটে হেঁটে থানাতে গেল আর ফিরে এল। তশীলদার ফুলনবাবু নিজের হাতে পালকিটাকে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। রাম-সিংহাসন নিজের হাতে একটা মালা বিজন-বিহারীর গলায় পরিয়ে দিয়েছিল।

শিউলিবাড়ি রক্ষা সমিতির সেক্রেটারী বিজনবিহারীকে একটা একনলা বন্দুক উপ-হার দিয়েছেন সরকার! সেই জন্যেই সারা শিউলিবাড়ির বুকে এই আহ্লাদের উৎসব।

মিছিলটা যখন ফিরে এসে বিজনবিহারীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি হাঁকে—মাটি-সাহেব কি জয়! তখন শিউলিবাড়ির রাতের আকাশে মস্তবড় চাঁদ উঠেছে। যেন জ্যোৎস্নামাখা শিউলিবাড়ির অন্তরাত্মা জয়-ধ্বনি হাঁকছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিরুপমার চোখদুটোও যেন জ্যোৎস্না ছড়িয়ে হাসতে থাকে। ঐ মানুষটা, নিরুপমার হাতে নিজের হাতে শাঁখা পরিয়ে দিয়েছে যে, তাকে যে সত্যিই মানুষের রাজা বলে মনে হয়। এই তো, মাত্র পাঁচটা বছর পার হয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে কেষ্টনগরের ভাগাহারানো ছেলে সত্যিই যে নিজের হাতে একটা সম্মানের রাজ্য তৈরী করে নিল।

মাটিসাহেব সেলাম! মাটিসাহেব আদাব! বন্দেগী মাটিসাহেব! সাইকেলে চেপে আর বন্দুকটা পিঠে বেঁধে যখন সড়ক ধরে এগিয়ে যায় ত্রিশ বছর বয়সের বিজনবিহারী, তখন বুড়ো বুড়ো দোকানীও হাত তুলে অভিবাদন জানায়। স্টেশন মাস্টার চৌধুরী-বাবুও বলেন—আপনি না থাকলে আমি এখান থেকে কবেই ট্র্যান্সফার নিতাম মাটি-সাহেব। ক্ষেপা জংলীর তীরের ভয় মাথায় করে এখানে চাকরি করা আমার বুড়ো হাড়ে পোষাতো না!

—না, আর ভয়টয় নেই। আপনি এখানে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।

—কিন্তু ইয়েতেও যে পোষাচ্ছে না মাটি-সাহেব। এই একরত্তি একটা ফ্ল্যাগ স্টেশন, শুধু কয়লাগাড়ি যায় আর আসে। কি ইনকম হবে বলুন?

—হবে হবে। শিউলিবাড়ির এ অবস্থা চিরকাল থাকবে না। হেসে হেসে চৌধুরী-বাবুকে যেন একটা আশ্বাস দিয়ে চলে যায় বিজনবিহারী।

চৌধুরীবাবু যদিও বাংলা কথা বলেন, কিন্তু বাঙ্গালী নন, তিনি হলেন মুঙ্গেরী চৌধুরী। তা না হলে বিজনবিহারী চৌধুরীবাবুর সঙ্গে এরকম হেসে হেসে কথা বলতেন না। কথা বলতেনই কিনা সন্দেহ। অনেকদিন রাণীগঞ্জে ছিলেন চৌধুরীবাবু; বেচারা টাকা পয়সার হিসাবে কি-যেন একটা গোলমেলে কাণ্ড করে আর ধরা পড়ে এই জঙ্গলের ফ্ল্যাগ স্টেশনে

শান্তির বদলি নিয়ে এসেছেন। কে জানে কেন, বিজনবিহারীও বুঝতে পারে না, চৌধুরী বাবুর সঙ্গে যেন একটু মায়া করে কথা বলতেই ভাল লাগে।

নিরুপমা বলে—সকলকেই তো ভরসার কথা শুনিয়ে বেড়াচ্ছো, শুধু আমার বেলায় ফাঁকি।

বিজনবিহারীর হাতটা নিরুপমার কাঁধের উপরেই পড়ে আছে, আর চোখের সামনে শিউলিটাও দুলছে, আকাশ ভরে তারা গিজগিজ করছে; কথাটা বলে ফেলেই আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে নিরুপমা।

তারার আলোতে জোর না থাকুক, কিন্তু বিজনবিহারীর এই চোখের আলোতে বেশ জোর আছে। দেখতেও পায় বিজনবিহারী, নিরুপমা যেন আঁচল চাপা দিয়ে একটা অদ্ভুত বিহ্বলতার হাসি লুকিয়ে ফেলতে চাইছে।

—ফাঁকি? তোমাকে? বিজনবিহারীর গলার স্বরে যেন একটা নিরীহ বিস্ময় চমকে ওঠে।

বিজন—বলেই ফেল, কিসের ফাঁকি?

উত্তর দেয় না নিরুপমা। শুধু চোখ তুলে বিজনবিহারীর মুখটাকে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করে।

বিজন—বল।

নিরুপমা হেসে ওঠে—যাঁতা যাঁতা। কতবার বললাম, ছোট্ট একটা পাথরের চাকি জোগাড় করে দাও, নইলে ডাল ভাঙতে আর পারছি না। বড় যাঁতাটায় ডাল গুঁড়ো হয়ে যায়।

বিজনবিহারী—তাই বল। আমি মনে করলাম আজ সকালে রামসিংহাসনের বউ এসে যে ফাঁকির কথাটা বলে গেল......।

চমকে ওঠে নিরুপমা। এই অন্ধকারের মধ্যেই বিজনবিহারীর চোখের ধূর্ত হাসিটাকে দেখতে পেয়েছে নিরুপমা। সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমার মাথাটা যেন অলস হয়ে আর হেঁট হয়ে বিজনবিহারীর বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ে।

ঠিক কথা, আজই সকালে এসেছিল রাম-সিংহাসনের বউ বিন্ধ্যাচলী। বোধহয় মনে করেছিল, বাঙালীবাবু বাড়িতে নেই; তাই রান্নাঘরের দরজার কাছে বসে একেবারে মুখ খুলে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলেছিল বিন্ধ্যাচলী।—পাঁচ বছর ধরে তুমি কি শুধু ভাত খাচ্ছ দিদি? আর কিছু খাও না?

নিরুপমা—কি বললে?

বিন্ধ্যাচলী—আমার তো এই পাঁচ বছরে তিনটে হয়ে গেল। তুমি করলো কি?

নিরুপমা—চুপ কর।

বিন্ধ্যাচলী—না দিদি, দেখতে একটুও ভাল লাগে না। বাঙালীবাবুকে তুমি বড় ফাঁকি দিচ্ছ দিদি।

নিরুপমা—চুপ কর। জান না, বোঝ না, শুধু যত বাজে কথা......।

বিন্ধ্যাচলী একটুও অপ্রতিভ না হয়ে আরও জোরে চেঁচিয়ে কথা বলে—তুমি কাজে দেখাবে, তবে তো আমি বাজে কথা বলবো না। আহা, কেমন সুন্দর হতো, যদি তোমার কোলে একটি ফুলফুলিয়া ভুলভুলুয়া টুপলে-টুপলে গোলগাল......।

নিরুপমা—ছিঃ, চেঁচিও না বিন্ধ্যাচলী।

বিজনবিহারী নিরুপমার হেঁটমাথাটা তুলে ধরে আবার একটা ধূর্ত হাসি হাসে—কিন্তু রামসিংহাসনের বউ তো বলে গেল, তুমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ।

সেই মুহূর্তে বিজনবিহারীর চোখের ধূর্ত হাসিটা যেন অপ্রস্তুত হয়ে চমকে ওঠে, করুণ হয়ে যায়। কেঁদে ফেলেছে নিরুপমা; দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ে বিজনবিহারীর গেঞ্জির বুক ভিজিয়ে দিয়েছে।

—কি হলো, নিরু? এর মানে কি?

—সত্যিই তোমাকে ফাঁকি দিলাম মনে হচ্ছে।

—তার মানে?

—তোমার ঘরে শুধু আমিই পড়ে থাকবো, আর কেউ আসবে না।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী—পাগল কোথাকার? এমন বাজে কথা ভেবেও মানুষ মাথা খারাপ করে?

—না, একটুও বাজে কথা নয়। তুমি আমাকে ঘর দিলে, আর আমি তোমাকে ঘরের আনন্দ এনে দিতে পারলাম না; আমার যে একটুও ভাল লাগছে না।

—ছিঃ, এসব কি বলছো? তুমি কি মরে গেছ, না, মরে যেতে বসেছ যে, এত হতাশ হয়ে কথা বলছো?

—সেই তো ভয়। যদি হঠাৎ মরে যাই, আর তোমার ঘরে কাউকে রেখে না যেতে পারি, তবে তুমি থাকবে কি নিয়ে? আমি যে হেসে হেসে মরতেও পারবো না।

বিজনবিহারী—আমি বলছি নিরু, এসব তোমার নিশ্চিত মিথ্যে ভয়।

নিরুপমা—আমার মাথা ছুঁয়ে বল; তুমি বললেই আমার সব ভয় মিথ্যে হয়ে যাবে।

সত্যিই নিরুপমার মাথাটা ছুঁতে হয়, তা না হলে বোধহয় আশ্বস্ত হবে না নিরুপমা। আমি বলছি নিরু, কোন ভয় নেই।

—যাই হোক......। বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে, গা-মোড়া দিয়ে আর হাই তুলে, বুক টান করে আর হাত দুটোকে ঝাঁকুনি দিয়ে এপাশে-ওপাশে ছুঁড়ে, তখনি যেন একেবারে অন্যরকমের একটা মানুষ হয়ে গিয়ে হেসে ফেলে বিজনবিহারী।

নিরুপমাও জানে, এটা বিজনবিহারীর একটা কাজমাতাল চেহারা। সময় অসময়ের ধার ধারে না। ঘুম বিরাম ক্লান্তি, কিছুই মানে না। কাজ করবার জন্য প্রাণটা যখন ছটফটিয়ে ওঠে, তখন ঠিক এইরকমের মূর্তি ধরে বিজনবিহারী।

—যাই হোক, তার আগে তোমার যাঁতাটা তো চাই। লণ্ঠনটা একবার নিয়ে এস নিরু।

নিরুপমা—না, কখখনো না। এখন কোন কাজ নয়। তুমি এখন ঘুমোওগে।

দাওয়া থেকে নেমে, শিউলিতলার জড়ো করা এক গাদা ছোট-বড় পাথরের চাংগড় থেকে ছোট্ট একটা চাংগড় তুলে নিয়ে এসে ব্যস্তভাবে বলে বিজনবিহারী—ছেনিটা আর হাতুড়িটা দাও।

না, আর বাধা দেবার কোন মানে হয় না। বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। বিজন-বিহারীর দু'হাতের পেশী ও শিরা এখন রাত জেগে শুধু কাজ করবে; কোন বাধা মানবে না।

ঠুক-ঠাক ঠুন-ঠান, ছেনি চালিয়ে আর হাতুড়ি ঠুকে এবড়ো-খেবড়ো পাথরটার চাকলা তুলতে থাকে বিজনবিহারী। আহত পাথরের কুচি জ্বলন্ত ফুলকি হয়ে ছিটকে পড়তে থাকে। বিজনবিহারীর পাশে বসে হাতপাখা দোলায় নিরুপমা।

আকাশে আধখানা চাঁদ যখন দেখা দিয়েছে, শিউলির মাথা থেকে রাতের শিশির টুপ-টাপ করে ঝরতে শুরু করেছে, তখন কথা বলে বিজনবিহারী—এই নাও তোমার যাঁতা। কাল সকালে শুধু ফিনিস দিয়ে ছেড়ে দেব। তারপর যত ইচ্ছে ডাল ভেঙ।

শুধু এই পাথুরে যাঁতাটা কেন, ঘরের ভিতরে কাঁঠাল কাঠের ঐ খাট দুটোও যে বিজনবিহারীর নিজের হাতের কারিগরীর সৃষ্টি। করাত কাটারি ছেনি হাতুড়ি রেতি র‍্যাঁদা তুরপুন পাটিকস—রাংতাঝালা শিরীষ-আঠা, সোহাগা—একটা প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুক যে বিজনবিহারীর কারিগরী কাজের যত সরঞ্জামে আর হাতিয়ারে ভরে আছে। আলনাটাকেও একদিনের মেহনতেই তৈরী করেছিল বিজনবিহারী। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে একগুলি মোড়া আর এই ডিজাইনের মোড়াও

বিজনবিহারী নিজেই তৈরী করে নিয়েছে। তালের পাতা কেটে হাতপাখা তৈরী করতে নিরুপমাও জানে। কিন্তু খেজুর পাতার হ্যাট? এটা বিজনবিহারীর একটা সখের সাধনার সৃষ্টি। একগাদা খেজুরপাতা আর ছোট্ট একটা ছুরি হাতে নিয়ে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেন ধ্যানীর মত মন নিয়ে ভেবেছে বিজনবিহারী। এক মাসের চেষ্টার পর স্বপ্ন সফল হয়েছে। বাঁধনছাঁদন নেই, একটা গিঁটও দিতে হয় না, শুধু গুনে গুনে পাতা সাজাবার আর ভাঁজ করবার কায়দার জোরে চমৎকার হালকা একটা হ্যাট তৈরী হয়ে যায়।

—এ হ্যাট তোমাকেও চমৎকার মানাবে নিরু। কৃতার্থতার খুশিতে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠেছিল বিজনবিহারীর চিৎকারটা। নিরুপমা বলেছিল—তুমি পরিয়ে দিলে মানাবে বইকি।

নিরুপমার মাথায় হ্যাট পরিয়ে দেখার সুযোগ অবশ্য পায়নি বিজনবিহারী; ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল নিরুপমা।

দামোদরের উৎসটা খুঁজে বের করতেই হবে, আবার এক অদ্ভুত সখের প্রতিজ্ঞার কথা নিরুপমাকে শুনিয়ে দিয়ে যেদিন শিউলিবাড়ির এই ঘরের দরজা পার হয়ে চলে গেল বিজনবিহারী; খাঁকি কামিজ আর প্যাণ্ট, পিঠের উপর বাঁধা বন্দুকটা, মাথায় খেজুর পাতার হ্যাট—একটা কর্মঠ সুন্দরতা, একটা সুপুরুষ দুঃসাহস হেসে-হেসে সাইকেল চালিয়ে যখন সড়কের দু-পাশের যত গাছের ছায়ার ভিড়ের ভিতরে উধাও হয়ে গেল, তখন নিরুপমার বুকের ভিতরে একটা আক্ষেপ যেন ছটফটিয়ে মাথা কুটতে থাকে। ভুল হলো, ভুল হলো। বলে দেওয়াই ভাল ছিল। যেতে না দিলেই ভাল হতো।

দামোদরের উৎসটা দূরের ঐ মেঘ-মেঘ রঙের পাহাড়গুলোর কাছে কোথায় যেন লুকিয়ে আছে, কে জানে কোন পাহাড়ের গায়ে? পায়ের কাছে, না বুকের কাছে, না মাথার কাছে, তাই বা কে জানে? ফুলনবাবু বলেছেন, ডেপুটি কমিশনার হার্বার্ট সাহেব একবার ক্যামেরা হাতে নিয়ে আর ঝুমেরা রাজের হাতির পিঠের উপর বসে ত্রিশ মাইল দূরের ঐ পাহাড়গুলোর একটা ফটো তুলেই খুশি হয়ে গিয়েছিল—বাস্, হো গিয়া! দামোদরকা পোঁছিকা পাত্তা মিল গিয়া।

এই গল্প শোনবার পর থেকেই বিজনবিহারীর মাথায় যেন একটা দুরন্ত সখের জেদ ভর করেছে, উৎসটাকে খুঁজে বের করতেই হবে। বয়সটা তিরিশ পার হয়ে গেলই বা, বিজনবিহারীর এই জেদ যেন ছেলেমানুষের ঘুড়ি ওড়াবার জেদের চেয়েও দুরন্ত। বাধা দিলে কোন ফল হবে না।

বাধা দেওয়া উচিত নয়। কথাটা না বলে ভালই করেছে নিরুপমা। মানুষটা সংসারের কারও স্বার্থের গায়ে একটা আঁচড়ও না দিয়ে; কাঙালের মত কারও দয়া-মায়াকে বিরক্ত না করে, শুধু নিজে শূন্য হয়ে আর রিক্ত ভাগ্যটাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে নিজের তৈরী একটা আনন্দের জগতে ইচ্ছামত খেলছে আর ছুটোছুটি করছে; তাকে বাধা দেওয়া নিরুপমার জীবনের কাজ নয়; তাকে বরং একটু যত্ন করে সাজিয়ে দেওয়াই যে নিরুপমার জীবনের সাধ।

নিরুপমার গায়ে হঠাৎ জ্বর এসেছে; মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে, নিঃশ্বাসটা যেন পুড়ছে; কিন্তু নিরুপমার চোখে-মুখে সেই জ্বরজ্বালার এক ছিটে ছায়াও ফুটে উঠতে পারেনি, ফুটে উঠতে দেয়নি নিরুপমা। জ্বরের জ্বালাটাকে জোর করে মনের মধ্যেই চেপে দিয়ে সারা সকালটা হেসে-হেসে আর ছুটোছুটি করে কাজ করেছে। উনুন ধরিয়েছে, রুটি তৈরী করেছে, আলু ভেজেছে। বিজনবিহারীর দু-বেলার ক্ষিদের খোরাক শালপাতায় মুড়ে নিয়ে নিজেরই হাতে সাইকেলের কেরিয়ারে বেঁধে দিয়েছে নিরুপমা।

সে সন্ধ্যায় নয়; মাঝ রাতেও নয়; দরজার কাছে শেষ রাতেও কোন সাইকেলের ঘণ্টি আর বেজে উঠলো না। 'আমি এসেছি নীরু' বলে কেউ ডাক্ও দিল না।

জ্বরের জ্বালার চেয়েও দুঃসহ একটা দুঃস্বপ্নের জ্বালায় ছটফট করে নিরুপমা। অভিশাপের সাপটা বুঝি লখিন্দরের মাথায় এইবার ছোবল দিয়ে ফেলেছে।

না না না। কখ্খনো না। কোন অভিশাপের সাধ্যি নেই, কাজলীর ভালবাসার বিজুকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে। —ও বিন্ধ্যাচলী। এ রামসিংহাসনজী! ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে যখন উতলা আর্তনাদের মত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে নিরুপমা, তখন রাত ভোর হয়ে গিয়েছে।

দুটো দিন পার হয়ে যায়।

ফুলনবাবু চারজন লোক আর একটা টাট্টু ঘোড়া দিলেন; রামসিংহাসন আর গুলু মিয়া এই দলবল সঙ্গে নিয়ে ঝুমেরা পর্যন্ত গিয়ে আর বিজনবিহারীর কোন খোঁজ না পেয়ে যে সন্ধ্যায় শিউলিবাড়ি ফিরে আসে, ঠিক সেই সন্ধ্যাতেই থানার চৌকিদারের সঙ্গে আর চারজন জংলীর কাঁধে কাঁচা বাঁশের একটা ডুলিতে বসে দুলতে দুলতে বাড়ি ফিরে এল বিজনবিহারী।

বিজনবিহারীর খাকি কামিজটার গায়ে ছোপ-ছোপ রক্ত শুকিয়ে আছে; কিন্তু মুখটা হাসছে।—এ দুটো দিন শুধু পাকা বটফল আর জল খেয়েছি; কিন্তু দামোদরের উৎসটাকে খুঁজে বের করে ছেড়েছি নিরু।

বিজনবিহারীর গায়ের কামিজ দুহাতে খিমচে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে নিরুপমা—এ কি দশা করে ফিরে এসেছ?

বিজনবিহারী—ভালুকটা হঠাৎ পেছন থেকে ধেকে এসে...কিছুই করতে পারেনি, পিঠটাকে একটু জখম করে দিয়েছে। ভালুকটাকে অবিশ্যি এক গুলিতে সাবড়ে দিয়েছি।...কিন্তু একি?

নিরুপমার কপালে গালে আর গলায় হাত রেখে রেখে আর চমকে চমকে প্রশ্ন করতে থাকে বিজনবিহারী—জ্বর? সত্যিই কি জ্বর? তোমার আবার জ্বর কেন হবে নিরু?

—তুমি আগে কামিজ খোলো। চেঁচিয়ে ওঠে নিরুপমা।

বিজনবিহারী যেন বিরক্ত হয়ে কামিজের পকেট থেকে, কে জানে কোন্ গাছের শিকড়ের একগাদা শুকনো ঝুরি বের করে নিয়ে বলে—আমার চিকিৎসা আমি জানি। কিন্তু তোমার.... তোমার কি হলো, কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

সত্যিই বুঝতে পারেনি, কল্পনাও করতে পারেনি বিজনবিহারী; একদিন দুদিন, এক মাস দু' মাস, এক বছর দু'বছর; পুরো দুটো বছরও পার হয়ে যাবে, তবু বুঝতে পারা যাবে না, নিরুপমার কেন জ্বর হলো? কোন্ অদৃষ্টের জ্বর? কোন্ অভিশাপের জ্বর?

জ্বরে ভুগতে ভুগতে তিনটে মাসের মধ্যেই নিরুপমার শরীরটা শুকিয়ে-পাকিয়ে কতটুকু হয়ে গেল!

কিন্তু বিজনবিহারীর চোখে যেন কোন আতঙ্ক নেই, উদ্বেগ নেই, এক ছিটে ভয়ের ছায়াও নেই। দু'চোখে যেন একটা জেদের আগুন শুধু দপ্‌দপ্ করে জ্বলে আর কাঁপে। বিজনবিহারীর আত্মাটা যেন অসুর হয়ে খাটছে আর ছুটছে। জল গরম করে নিরুপমার জ্বরের শরীরটাকে ভাপচান করিয়ে আর ঠাণ্ডা জলে মাথাটাকে ধুয়ে দিয়েই বের হয়ে যায় বিজনবিহারী। ষোল মাইল দূরের মুণ্ডা গাঁয়ের ওঝার কাছ থেকে শিকড় বাকড় নিয়ে আসে; আসবার পথে মাইল তিনেক ওদিকে জঙ্গলের ভিতরে এগিয়ে মাটি-কাটার কাজটাও দেখে আসে।

রামসিংহাসনের বউ বিন্ধ্যাচলী যখন এক থালা ভাত আর এক বাটি কচুর তরকারি নিয়ে এসে নিরুপমার নীরব রান্নাঘরের দরজার কাছে রাখে, তখন দেখতেও পায় বিন্ধ্যাচলী, বাঙালীবাবু এরই মধ্যে সাগু জাল দিয়ে ফেলেছে; সাগুর বাটি দু'হাতে তুলে নিয়ে নিরুপমার মুখের কাছে ধরে রেখেছে।

কি আশ্চর্য, বাঙ্গালীবাবুর বউটার প্রাণটা যেন রান্নাঘরের এই দরজারই কাছে পড়ে আছে। শুনতে পায় বিন্ধ্যাচলী, দুর্বল পাখির বাচ্চার ডাকের মত চিঁ-চিঁ করে বিন্ধ্যাচলীকেই একটা অনুরোধের কথা বলছে নিরুপমা।—বাবুর তরকারিতে হিং-টিং দিওনা বিন্ধ্যাচলী। কেমন?

বিন্ধ্যাচলী—দিব না।

চলে যায় বিন্ধ্যাচলী। বিজনবিহারী বলে —ঝুমরা রাজ আমার একটা কথা রেখেছে।

নিরুপমা—কি?

—শিউলিবাড়িকে একটু বাড়িয়ে তুলতে হবে।

—কি বললে?

—স্টেশনের পূব দিকের শালজঙ্গল সরিয়ে যদি বাড়ি তৈরীর মত ছোট বড় দু'চারশো প্লট করা যায়, তবে বাইরে থেকে অনেক ভাল লোক এখানে এসে বাড়ি করবে বলে মনে হয়। এরকম ভাল জল-হাওয়া তো যেখানে-সেখানে আর সহজে মেলে না।

—কি বললে ঝুমরা রাজ?

—রাজি হয়েছে। শিউলিবাড়ি কলিয়ারির বাবুরা এখনই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বাড়ি তৈরীর জমি চাইছেন।

—ভাল কথা।

—আমিও ঠিক করেছি নিরু, তুমি সেরে উঠলেই, এঘরের লাগাও দক্ষিণে পাকা ইঁটের দুটো নতুন ঘর তৈরী করবো।

নিরুপমার শুকনো সাদা ঠোঁটে একটা করুণ হাসির শীর্ণ ছায়া সিরসির করে। —এখনই শুরু করে দাও, আমার অসুখ কবে সারবে কে জানে? সারবে কি সারবে না, তাই বা কে জানে?

বিজন বলে—সারবে না মানে? তুমি বাজে কথা বলবে না, নিরু।

নিরুপমা তবু হাসে—তার মানে, তুমি আমাকে সারিয়ে ছাড়বে?

বিজনবিহারী—নিশ্চয়।

এক পাঁজা ইঁট পুড়িয়ে ফেলেছে বিজনবিহারী। দক্ষিণের ঘর দুটোর নক্সাও এঁকে ফেলেছে। ওদিকে, স্টেশনের পূব দিকের শালজঙ্গলও অনেকখানি সাফ হয়ে এসেছে। একশো ছত্তিশগড়ী কুলি আনিয়ে জঙ্গল কাটতে শুরু করে দিয়েছেন ঝুমরা রাজের তশীলদার ফজলবাবু। মাটি ফেলে রাস্তা তৈরী করছে মাটিসাহেবের মুণ্ডা মজুরের দল।

এরই মধ্যে আরও কত কাজ সেরে ফেলতে পেরেছে বিজনবিহারী। ঝুমরা রাজের সঙ্গে গাঁয়ের মুণ্ডাদের ঝগড়াটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে চলেছিল। মুণ্ডা চাষীরা জমিতে পাকা রায়তী স্বত্ব চায়। খাজনার রেট কমাতে চায়। সালিয়ানা দিতে না পারলেও এক-কথায় মুণ্ডা চাষীর হালিয়তী জমি কেড়ে নেওয়া চলবে না।

দুই পক্ষই শেষে মাটিসাহেবকে সালিশ মেনেছে। মাঝামাঝি একটা রফা করে দিয়েছে বিজনবিহারী। না, হালিয়তী জমিকেও রায়তী জমি বলে মেনে নেবেন ঝুমরা রাজ। নগদ টাকার সালিয়ানা দিতে পারবে না যে, সে শুধু জঙ্গল কাটবার কাজে কিছু দিন খেটে দিলেই সালিয়ানা শোধ হয়ে যাবে। ঝুমরা রাজ চেয়েছিলেন, জঙ্গল কাটবার মজুরী হবে এক আনা; মুণ্ডারা চেয়েছিল চার আনা। বিজনবিহারী রফা করে দিয়েছেন—দুই আনা।

রাঁচির দুজন বিদ্বান ভদ্রলোক জানতে পেরেছেন, শিউলিবাড়িতে মাটিসাহেব নামে সাহসী এক ভদ্রলোক থাকেন। এক গাদা নানা-রকমের পাথরের নমুনা নিয়ে আর একটা চিঠি নিয়ে রাঁচি থেকে পি এন বসুর লোক বিজনবিহারীর কাছে এসেছিল। শিউলিবাড়ির, উত্তরের জঙ্গলটার ষাট মাইল ভিতরে ঢুকে আর দুধিয়া নামে নদীটার দু'পাশের যত অদ্ভুত-অদ্ভুত পাথরের টুকরো একটা গরুর গাড়িতে বোঝাই করে রাঁচি পাঠিয়ে দিয়েছে বিজনবিহারী। ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন পি এন বসু; লিখেছেন, এরকম পাথরের আরও কিছু নমুনা পাঠাবেন।

রায় বাহাদুর শরৎ রায়ের চিঠি নিয়েও লোক এসেছিল।—মুণ্ডাদের গাঁয়ে একটু খোঁজ করে দেখবেন, আর মাটি কাটবার সময়েও একটু লক্ষ্য রাখবেন, পাথরের তৈরী কোন কুড়ুল বা টাঁঙ্গি বা যে-কোন রকমের হাতিয়ার পাওয়া যায় কিনা।

টিকই, সিলয়াডির মুণ্ডা গাঁয়ের কাছে, আদ্যিকেলে একটা মশান পাথরের কাছে তেঁতুলগাছের নীচে তিনটে পাথুরে কুড়ুল দেখতে পেয়েছিল বিজনবিহারী। লক্ষ বছর আগের পাথুরে কুড়ুল বোধহয়। সেই পাথুরে কুড়ুল পেয়ে রায় বাহাদুর শরৎ রায়ও ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন—অনুগ্রহ করে আরও খোঁজ করবেন।

ঘরের বাইরে এত ধন্যবাদ; কিন্তু ঘরের ভিতরে নিরুপমার চোখ দুটো যেন নিভু-নিভু দুটো দীপশিখা। বিছানার উপর পড়ে আছে সোনার পুতুলের মত হালকা একটা করুণ শরীর। এক বছরের পুরনো জ্বরটা এখনও যেন নিরুপমার পাঁজরের আড়ালে ধুকপুক করছে। তা ছাড়া, আর-একটা শত্রু, আমেশা। নিরুপমাকে রক্তহীন করে যেন হাড়মাংসের এক মুঠো সাদা ছোবড়া করে বিছানার উপরে ফেলে রেখে দিয়েছে।

বিজনবিহারী যখন চীনকুলি পাত্রের ঝোলের বাটিটা নিরুপমার মুখের কাছে তুলে ধরে তখন নয়; যখন নিরুপমাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে থাকে বিজনবিহারী, তখন নিরুপমার সেই নিভু-নিভু চোখ দুটো যেন বড় হয়ে হেসে ওঠে।

বিন্ধ্যাচলীও আড়াল থেকে দেখে আর কোন শব্দ না করে কেঁদে কেঁদে চলে গিয়েছে; নিরুপমাকে কোলে করে তুলে নিয়ে ওদিকের ছোট ঘরের ভিতরে চলে গেল বাঙালীবাবু। উপায় তো নেই, নিরুপমার যে আর নড়ে বসবারও সাধ্য নেই।

বিকেল হলে, বাঙালীবাবু যখন বাড়িতে থাকে না, তখনও এসে দেখতে পায় বিন্ধ্যাচলী, চোখ বন্ধ করে অসাড় হয়ে পড়ে আছে নিরুপমা। কিন্তু বাঙালীবাবু এত কাজের মধ্যেও একটা কাজ ভুলে যায়নি; নিরুপমার মাথার রুক্ষ চুলের বোঝাটাকে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে আর ঢিলে করে একটা খোঁপা বেঁধে দিয়ে, সিঁথিতে টাটকা সিঁদুর বুলিয়ে দিয়ে, তবে বাইরের কাজে বের হয়ে গিয়েছে বাঙালীবাবু।

তসীলদার ফজলবাবু একবার বলেছিলেন, মাটি সাহেবের স্ত্রীকে রাঁচিতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে ভাল হতো। আর, আক্ষেপও করেছিলেন, এখন আর সেটা সম্ভব নয়। রামসিংহাসন যা বলছে, তাতে তো মনে হয় যে, মোটরবাসের একটি ঝাঁকুনিতেই মহিলার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। আর মোটরবাসেরও যা চেহারা আর যা মতি-গতি! আধমাইল যেতেই হয়তো চাকা-ভাঙা হয়ে তিন ঠ্যাং-এর উপর দাঁড়িয়ে থাকবে; পাঁচ-সাত-দশ ঘণ্টার মধ্যেও আর নড়বে না। তা ছাড়া, ষাট মাইলের পর দারু-চটিতে বাসবদলও আছে। সারা রাতটা সেখানে পার করে দিয়ে পরের দিন সকাল আটটায় রাঁচির বাস ধরতে হয়। সে বাসও রোজ সকাল আটটায় ছাড়ে না। যদি আসে, ফাটা টায়ার তালি দিয়ে সেলাই করে; হাওয়া ভরতে হয়তো আরও দু'টো ঘণ্টা। তারপর রওনা হয় বাস, যদি স্টার্ট নিতে ইঞ্জিন আর দেরি না করে। এই অবস্থায়... না, মাটিসাহেবের স্ত্রীকে এখন রাঁচি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও নিরাপদ নয়।

বিজনবিহারী জানে, শুধু এখন কেন, তখনও নিরাপদ ছিল না, যখন নিরুপমার জ্বরের শরীরটা কাহিল হয়েও উঠতে-বসতে

আর একটু হাটহাঁটিও করতে পারতো। শিউলিবাড়ির বাইরের পৃথিবীটা যে বড়দা আর মেজদার সম্পত্তি; বেনুগ্রামের দৈবজ্ঞীর শাস্ত্র; মেজমামা আর উকীলবাবুর আদালত। ঠাট্টা ঘেন্না আর অপমানের জগৎ। নিরুপমাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না বিজনবিহারী, এক মুহূর্তের জন্যও না। হাসপাতালের খাতা প্রশ্ন করবে, কে আপনি? পিতার নাম কি? উনি কি আপনার স্ত্রী? কতদিন বিবাহিত? কতগুলো গিধ আর শকুন যেন বিজনবিহারী মনুষ্যের প্রাণটাকে ঠুকরে ঠুকরে প্রশ্ন করবে। হয়তো ডাক্তারটাই চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করে বসবে, আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি
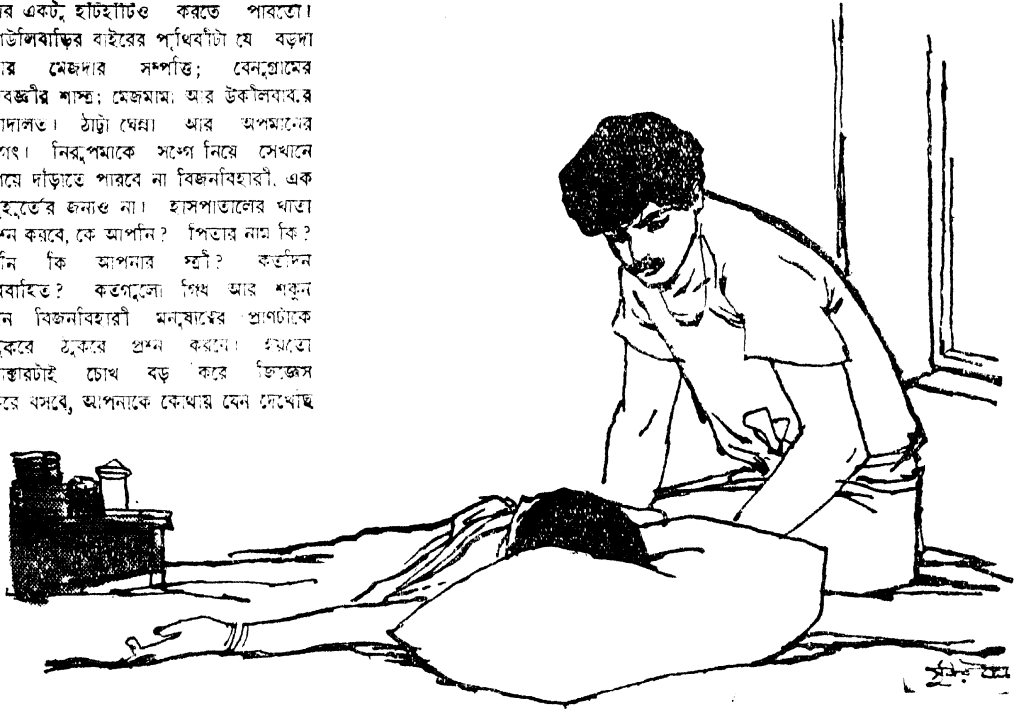
শুধু নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন বিজনবিহারী

বলে মনে হচ্ছে? কিংবা, নিরুপমারই মুখের দিকে তাকিয়ে একটা নার্স বলে বসবে, বেনুগ্রামে আমার এক মামী ছিলেন, ঠিক আপনার মত দেখতে! না, ও জগতের ধারে-কাছেও আর নয়।

শিউলিবাড়ির আলো-বাতাসেরও প্রাণের সব জোর কি ফুরিয়ে গেছে; নিরুপমার কাহিল প্রাণটাকে টেনে তুলতে পারবে না? গরীব ওঝার বিশ্বাসের ঝুলির যত শিকড়-বাকড় সবই মিথ্যা, সত্য শুধু ঐ ওদের হাসপাতালের ওষুধ?

না, বিশ্বাস করে না বিজনবিহারী। বিশ্বাস করতে পারবেও না। নিরুপমা যদি...না, তবুও বিশ্বাস করবে না বিজনবিহারী।

সেদিন অনেক রাতে শালের জঙ্গলের ঝড়টা শান্ত হয়ে যেতেই শিউলিবাড়ির অন্ধকার যেন সব ঝিঁঝিঁর ডাক চুপ করিয়ে দিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। শিউলি-তলায় একটা শুকনো পাতাও উসখুস করে না।

নিরুপমার শিয়রের কাছে বাতিটাকে একটু উসকে দিয়ে আর দুই চোখ অপলক করে শুধু নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিজনবিহারী। হিক্কাটা আস্তে আস্তে যেন মন্দ হয়ে আসছে।

সন্ধ্যার একটু পর থেকে শুরু হয়েছে, নিরুপমার ঐ হিক্কার শব্দটা। কি-হিংস্র একটা ঠাট্টার শব্দ! একটা শাস্তির গর্ব যেন বিজনবিহারীর বুকে ছোঁকা দিয়ে দিয়ে হাসছে আর কথা বলছে: শিউলি চোর! শিউলিচোর! একটা অমানুষ হয়ে বাংলা-দেশের শিউলি চুরি করে নিয়ে এসে এই জঙ্গলের ভেতরে সুখের ঘর করবে? খুব যে সাহস দেখিয়েছিলে বিজনবিহারী?

হ্যাঁ, বিজনবিহারীর দুঃসাহসের বুকটাকে ঘিরে আর চোখ পাকিয়ে কথা বলছে কেষ্ট-নগর আর বেনুগ্রামের অভিশাপ। এ-ঘর আর ও-ঘর, কখনো বা একেবারে ঘরের বাইরে বারান্দায়—ছুটোছুটি করে ঘুরতে থাকে বিজনবিহারী। চোখ দুটো যেন মাথার ভিতরের একগাদা পাগল রক্তের চাপ সহ্য করতে না পেরে লাল হয়ে ফুটতে থাকে।

ঐ তো বন্দুকটা পড়ে আছে। টোটার মালাটিও কাছেই আছে। নিরুপমার কানের কাছে ফিসফিস করে এখনি বলে দিতে পারা যায়, কোন ভয় নেই নিরু; তুমি হেসে হেসে আমার হাতেই মরে যাও; অভিশাপটার হাতে মরো না। ও অভিশাপের হাতে তোমাকে মরতে দেব না। এখুনি......।

হঠাৎ চোখ মেলে, আর কি-অদ্ভুত একটা জলজলে অথচ ছটফটে একটা দৃষ্টি তুলে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিরুপমা। নিরুপমার একটা হাতের উপর হাত রেখে আস্তে আস্তে ডাকে বিজন—কি নিরু?

—না, তোমাকে একা রেখে, তোমার ঘর খালি রেখে আমি মরতে পারবো না। চেঁচিয়ে ওঠে নিরুপমা; নিরুপমার ধুকপুকে বুকের ভিতর থেকে যেন সমস্ত শক্তি নিয়ে একটা দুর্বার পিপাসা চেঁচিয়ে উঠেছে।

বিজনবিহারীরও প্রাণটা যেন চিৎকার করে ওঠে।—না, কখখনো না; তুমি মরতে পারবে না, নিরু।

নিরুপমা—ভগবান আমাকে বাঁচাতে চায় না। ভগবান আমাকে বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু তুমি পারবে; তুমি আমাকে বাঁচাও, লক্ষ্মীটি!

বিজনবিহারী—নিশ্চয় বাঁচাবো।

নিরুপমা—একটু কাছে এস।

নিরুপমার কপালের উপর মুখটাকে উপুড় করে পেতে দিয়ে; যেন একটা ধীর স্থির ও শান্ত স্বপ্নের স্নেহ হয়ে বসে থাকে বিজনবিহারী।—ঘুমোও নিরু! নিরু-পমার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বোলায় বিজনবিহারী। ওঝা বলেছে, ডান হাতের চার আঙুল দিয়ে মাথাটাকে ডান থেকে বাঁয়ে শুধু একটু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে বুলিয়ে দিলে জাদু তাড়াতাড়ি জাগে।

ঘুমিয়েছে নিরুপমা। নিরুপমার কপালটাও ঘামে ভিজে গিয়েছে। ভোরের পাখিও ডেকে উঠেছে। নিরুপমার কপালের ঘাম মুছে দিয়ে পাখার বাতাস দিতে থাকে বিজনবিহারী।

চোখ মেলে তাকায় নিরুপমা; আর, শালের কচিপাতার উপর ভোরের আভার মত

একটা লালচে হাসির আভা যেন নির্‌পমার সাদা ঠোঁটের উপর ফ্‌টে ওঠে।

—শ্‌নছো?

বিজনবিহারী—কি নির্‌?

নির্‌পমা—মাথার জনালাটা সত্যিই যে নেই বলে মনে হচ্ছে।

প্‌জো প্‌জো প্‌জো! সকালবেলাতেই চে'চিয়ে চে'চিয়ে রামসিংহাসনকে তাগিদ দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে বিন্ধ্যাচলী। বাঙালীবাব্‌র বউ-এর উপর পিশাচের যে নজর পড়েছিল, সে নজর ছ্‌টে গইল বা। মির্চার বেল আর জবা ফ্‌ল নিয়ে রামসিংহাসনকে এখনই রওনা হতে হবে; বার মাইল দ্‌রে দামোদরের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

একটা তামার খনি নাকি শিগগিরই চাল্‌ হবে। সিংভূমের রাখা মাইনস্‌ থেকে দ্‌'জন সাহেব এসেছিলেন। মাটিসাহেবেরই ডাক পড়েছিল। দ্‌ধিয়া নদীর দ্‌' পাশের পাথ্‌রে ডাঙগার এদিকে-ওদিকে সাহেবদের সঙ্গে তিনটে দিন সারাবেলা ঘ্‌রে বেড়িয়েছে বিজনবিহারী। কৃতজ্ঞ সাহেবেরা যাবার সময় বিজনবিহারীকে একটা জিনিস উপহারও দিয়ে গেলেন—একটা গ্রামোফোন, আর এক ডজন রেকর্ড; এক ডজন বিলিতী বাজনা আর বিলিতী গান। বাংলা গানের রেকর্ড হলে বোধহয় এই উপহার ছ্‌'তেও চাইতো না; ছ্‌'তে পারতোও না বিজনবিহারী।

শিউলিবাড়ির ইতিহাসেও এটা একটা রেকর্ড; প্রথম কলের গান বাজলো। এই বিস্ময়ের গান শোনবার জন্য বিজনবিহারীর বাড়ির বারান্দার কাছে একটা ভিড়ও জমে উঠেছিল। এমন কি, গ্‌লো মিয়াঁর বউ, যে মান্‌ষটা ঘরের বাইরে একটা গাছের দিকেও উঁকি দিতে চায় না, সে-মান্‌ষও ছেলে কোলে নিয়ে আর নির্‌পমার কাছে বসে কলের গান শ্‌নে চলে গেছে।

তসীলদার ফ্‌লনবাব্‌ও একদিন জানিয়েছেন, দেড় শো প্লট বিক্রী হয়ে গিয়েছে।

—কিনলে কারা?

ফ্‌লনবাব্‌—কিছ্‌ প্লট রাঁচির মারোয়াড়ীরা কিনেছে। কিছ্‌ কিনেছে গোমোর ফিরিঙ্গী সাহেবেরা। ঝ্‌মরা রাজের রাজপ্‌ত কুট্‌মেরাও কিছ্‌ কিছ্‌ কিনেছে।

—খ্‌ব ভাল হয়েছে। যেন একটা স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে বিজনবিহারী। কোন বাংগালী যে একটাও প্লট কেনেনি, এটা যেন বিজনবিহারীর জীবনের কাছে একটা আশ্বাসের সংবাদ।

তিনটে বছরের মধ্যে শিউলিবাড়ির বাজারটাও বেশ বেড়েছে। কোথা থেকে অচেনা-অজানা এক শিখ সর্দার একদিন শিউলিবাড়িতে এসে মাটি সাহেবেরই সঙ্গে রোজগারের উপায় আলোচনা করেছিল, পরামর্শও চেয়েছিল। সর্দার স্‌চেত সিং। ঝ্‌মরা রাজের একটা জঙ্গলকে লীজ পাইয়ে দেবার জন্য স্‌চেত সিংকে সঙ্গে নিয়ে বিজনবিহারীই তিনদিন ঝ্‌মরা রাজের বড় কুমারের সঙ্গে দেখা করেছিল। লীজ পেয়েছে স্‌চেত সিং। স্‌চেত সিংএর কাঠের গোলাটা এখন লম্বায় প্রায় আধ মাইল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নানা নতুনের আবির্ভাবে ভরে উঠছে ছোট্ট শিউলিবাড়ি। স্টেশন মাস্টার চৌধ্‌রীবাব্‌র ম্‌খেও একটা নতুন হাসির আবির্ভাব দেখা যায়—একটা স্‌খবর আছে মাটি সাহেব। এ লাইনে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন নাকি চাল্‌ হবে।

—তাহলে আপনার একজন অ্যাসিস্টেন্টও হবে নিশ্চয়।

—ওটাই তো ভাবনার কথা মাটি সাহেব। যদি ভাল লোক হয়, তবে ইনকামের শেয়ার নিয়ে হয়তো তেমন কিছ্‌ খিটিমিটি বাধাবে না। কিন্তু যদি না হয়, তবে?

আর, নির্‌পমার ম্‌খের দিকে তাকালে যে সব চেয়ে স্‌ন্দর নতুনের আবির্ভাবের হাসিটাকে দেখতে পাওয়া যায়! নির্‌পমার ম্‌খের উপর যেন রাঙা জবার আলো ফ্‌টে উঠেছে। শরীরটাও কী স্‌ন্দর স্বাস্থ্যে ভরে গিয়েছে। রামসিংহাসনের বউ হিসেব করে দিন গ্‌নেছে।

—ছি ছি, এ কি করছো? এখনই এসব কেন? বিন্ধ্যাচলী দেখতে পেলে যে তোমার নামেও যা-তা বলে ঠাট্টা করবে। নির্‌পমা দ্‌'বার এসে বাধা দিয়েছে আর হেসেও ফেলেছে।

সেগ্‌নের একটা পাটাকে ট্‌করো ট্‌করো করে কেটে, আর করাত হাতুড়ি র‍্যাঁদা নিয়ে দ্‌'দিন ধরে যে কাণ্ডটা করে চলেছে বিজনবিহারী, সেটা বিন্ধ্যাচলী এখনও দেখতে পারনি। দেখে থাকলেও ব্‌ঝতে পারেনি। একটা দোলনা তৈরী করছে বিজনবিহারী।

বিজনবিহারী—যা-তা আর কি বলবে রামসিংহাসনের বউ? বড় জোর বলবে, ভুখা বাঙালী।

নির্‌পমা—কথাটা তাহলে সত্যি?

বিজনবিহারী—নিশ্চয়।

ভুখ, ঠিক কথা, একটা স্বপ্নের ভুখ যেন এতদিনে একটা আশার আশ্বাসে বিভোর হয়ে বিজনবিহারীর চোখ দ্‌টোকেও নিবিড় করে তুলেছে।

সেই সন্ধ্যাতেই, যখন বারান্দার কেরোসিনের আলোয় কাছে বসে ব্‌র্‌শ চালিয়ে দোলনার ফ্রেমে গালা বার্নিশ লেপতে শ্‌র্‌ করেছে বিজনবিহারী, তখন ঘরের ভিতর থেকে উতলা হয়ে ছ্‌টে এসে হাঁপাতে থাকে নির্‌পমা—বিন্ধ্যাচলীকে এখনই ডেকে দাও।

বিজনবিহারী—বিন্ধ্যাচলীকে কেন?

নির্‌পমা—একলা হয়ে পড়ে থাকতে যে বড় ভয় করছে। শিগগির ডেকে দাও।

বিজনবিহারী—কোন ভয় নেই; আমি আছি। রামসিংহাসনের বউকে ডাকবার কোন দরকার নেই।

তিন ক্রোশ দ্‌রে; কাট্‌কি জঙ্গলের বস্তিতে যে চামারিন ব্‌ড়িটা থাকে, সিধো চামারের মা, তাকে খবর দেওয়া হয়েছিল। ব্‌ড়িটা রামসিংহাসনের বাড়িতেও দ্‌'বার ধাইয়ের কাজ করেছে। কিন্তু এক মাস ধরে কাট্‌কিতে বাঘের হাম্‌লা চলছে। তাই বোধহয় আসতে পারেনি ব্‌ড়িটা।

কিন্তু বিজনবিহারীর মনটা সেজন্য একট্‌ও দ্‌শ্চিন্তিত নয়; বিজনবিহারীর হাত দ্‌টো আজ যেন ইচ্ছে করেই এক পরম কারিগরীর কাজ করে ধন্য হতে চায়। একটা শিউলি-কুঁড়িকে শ্‌ধ্‌ দ্‌' হাত পেতে তুলে নেওয়া; আর নাড়ি কেটে ধোয়া-মোছা করে নির্‌পমার ব্‌কের কাছে শ্‌ইয়ে দেওয়া।

বড় শান্তি আর বড় স্নিগ্ধ রাত্রি। এক ঘণ্টাও সময় লাগেনি; নির্‌পমার শরীরটা যখন সব যন্ত্রণার ভার থেকে ম্‌ক্ত হয়ে একটা স্নিগ্ধ তন্দ্রার ঘোরে শান্ত হয়ে পড়ে, থাকে, তখন নির্‌পমার কানের কাছে ম্‌খ নিয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেয় বিজনবিহারী, যেন একটু স্নিগ্ধ জয়রব—নির্‌, তোমার মেয়ে।

আর, নিরুপমার তন্দ্রার চোখদুটোও তাকাতে গিয়ে যেন একটা বিস্ময়ের সুখে হেসে ফেলে।

যখন দূরের খেজুর গাছের কাছে একটা ল্যাম্পের আলো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে, আর শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে থকে বিজনবিহারী তখন বাঙ্গালীবাবুর বাড়িতে নতুন আবির্ভাবের কান্নার স্বর শুনে হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে অসে বিন্ধ্যাচলী।

—বেটি ভইল বা। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খুশির হাসি ছড়িয়ে চলে যায় বিন্ধ্যাচলী; আর বিজনবিহারীও ফিরে এসে হাত ধুয়ে নিয়ে শিউলিতলার পাথরটার উপর শান্ত হয়ে বসে। রামসিংহাসনের বাড়িতে তখন ঢোলক বাজতে শুরু করেছে।

কে বাজাচ্ছে? রামসিংহাসন? না, রামসিংহাসনের বড় ছেলেটা?

কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে কান পেতে থাকলে ঢোলকের শব্দটাকে বড় অদ্ভুত শোনায়। যেন আকাশে ঢোলক বাজছে। প্রয়াগের ধর্মশালার সেই সাধুটা ধুনীর আগুনের কাছে বসে গল্প করতে করতে বলেছিল, যখন পৃথিবীতে কোন পুনীত

দাঁড়িয়েছিল। বিজনবিহারীর কপালটাকে আজ ছুঁয়ে ফেলেছে সেই আশীর্বাদের হাত। তা না হলে, বাংলা দেশের শিউলিতে এরকম একটি নতুন কুঁড়ি ফুটবে কেন? বিজনবিহারীর আশার ঘর এমন একটা উপহার পেয়ে যাবে কেন?

নিরুপমা যে বাংলা দেশেরই একটা গোপন দান। শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবকে একটা ফেরারী আসামীর গা-ঢাকা জীবন বলে মনে করবার কোন মানে হয় না। বিজনবিহারী যেন মিথ্যে রাগ করে নিজেরই বিরুদ্ধে একটা মিথ্যে অভিযোগের মামলা দায়ের করেছিল। বাংলা দেশের শিউলি চুরি করেনি বিজনবিহারী। কেষ্টনগর শিবপুকুর আর বেনুগ্রাম, যেন তিনটি ভীরু-মায়ার প্রাণ, শুধু একটা চক্ষুলজ্জার ভয় ছিল বলেই ওরা খিড়কির দরজার ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে বিজনবিহারীর হাতে একটা মায়ার দান ঢেলে দিয়েছিল। ছিঃ, এতদিন ধরে ভুল করে কার উপর রাগ পুষে এসেছে বিজনবিহারী?

ফিল্ডটা বিজনবিহারীর কাছে সত্যিই যেন যুদ্ধের ফিল্ড; তা না হলে সাজটাও এরকম জঙ্গী হবে কেন? আর দুপুরের খাওয়ার রসদ হিসাবে এক দিস্তা রুটি, দু' মুঠো আলুর তরকারী আর, গুড়ের একটা ডেলা শালপাতায় মুড়ে নিয়ে এত ব্যস্তভাবে ছুটে যাবার অভ্যাসই বা হবে কেন? ঝড়-বাদলের দিনেও বিজনবিহারীর অভ্যাসের এই রীতিটার নড়-চড় হতে দেখা যায়নি। কিন্তু আজকাল, বিশেষ করে আজ, এ কি কান্ড করে বসে আছে বিজনবিহারী? সকালের রোদ ঝলমল করছে; তবু বিজনবিহারী এখনও কাজে বের হয়ে যেতে
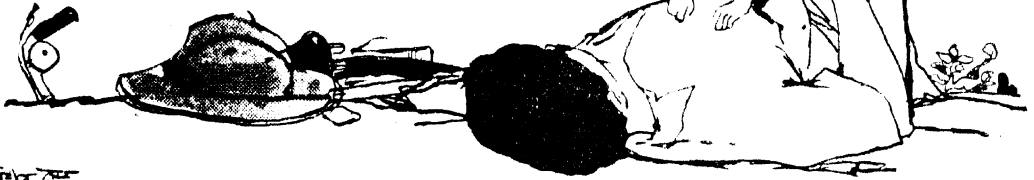
হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে বিজনবিহারী

প্রাণ জন্ম নেয়, তখন আকাশমে দুন্দুভি নাদ হোতা হ্যায়।

ঢোলকটা বাজছে বিজনবিহারীর বুকের আকাশে। সত্যিই যে মনে হচ্ছে, মস্ত একটা পুণ্যির প্রাণ জন্ম নিয়েছে। এই তো ওখানে, ঐ ঘরে, নিরুপমার বুকের কাছে ঘুমিয়ে আছে। এতক্ষণে কান্না থামিয়েছে।

চোখ মেলে আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে চারদিকে তাকায় বিজনবিহারী। কপালের উপর আস্তে আস্তে হাত বোলাতে থাকে। যেন হাত বুলিয়ে ভাগ্যেরই একটা বিস্ময়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব করছে বিজনবিহারী।

মনটাই বা হঠাৎ এত শান্ত হয়ে গেল কেন? এ মনে এক ছিটেও রাগ নেই; আর প্রাণটাও যেন কারও উপর রাগ পুষে রাখতে চাইছে না, পারছেও না।

জেদটার সব ঝাল মিটে গিয়েছে; আর জেদটাও যেন একটু লজ্জা পেয়েছে, তাই বোধ হয় বুকের ভিতরে একটা গর্বের সুখ লাজুক তারার মত মিটমিটি হাসছে।

কিন্তু সেজন্যে এত শান্ত হয়ে যাবে কেন মনটা? না, সেজন্যে নয়। মনে হয়, অভিশাপ নয়, মস্ত বড় একটা আশীর্বাদ যেন হাত তুলে একটা লগ্নের অপেক্ষায়

—কি ব্যাপার? মাটিসাহেব যে একেবারে মাটির মানুষ হয়ে গেল দেখছি। কথাটা বলেই মুখ টিপে হাসতে থাকে নিরুপমা।

নিরুপমার এই মুখ-টেপা হাসিটা একটা মিষ্টি বিস্ময়ের হাসি নিশ্চয়; কিন্তু একটা মিষ্টি চিমটির হাসিও বটে।

সূর্য উঠতে না উঠতে যে মানুষটা তড়বড় করে দুটো রুটি চিবিয়ে আর জল খেয়েই সাইকেলটাকে আঁকড়ে ধরে আর হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে যায়; সে মানুষটা এখনও যায়নি, যদিও সূর্য ওঠবার পর তিনটি ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে।

মাটিসাহেবের কাজের জীবনের সেই তাড়াহুড়োর নিয়মটা যেন একটু বিপদে পড়েছে। শেষ রাতে উঠে উনুন জেলে রুটি তরকারি তৈরী করে দিতে নিরুপমার যেটুকু সময় লাগে, সেটুকু সময়ের অপেক্ষা সহ্য করবার মত ধৈর্যও যেন বিজনবিহারীর ছিল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজের ধড়াচূড়া গায়ে চড়িয়ে—শোলার হ্যাট, খাকি কামিজ, খাকি হাফ-প্যান্ট আর বুট পরে, বন্দুকটাও পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে ফিল্ডে যাবার জন্য তৈরী হয়ে যেত বিজনবিহারী। মাটিকাটার জায়গাটা, দশ মাইল বা বিশ মাইল দূরের

পারেনি। মুখ টিপে না হেসে থাকতে পারবেই বা কেন নিরুপমা?

মেয়েকে বুকের উপর বসিয়ে শিউলিতলার ঘাসের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আছে বিজনবিহারী। সাইকেলটাও এক পাশে ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে। শোলার হ্যাটটা আর বন্দুকটাও। বিজনবিহারীর খাকি কামিজের বুকের উপর এক গাদা টাটকা শিউলি। মেয়েটা সেই শিউলির গাদা দু'হাতে ঘেঁটে ঘেঁটে খেলা করছে। আর দু'চোখ বন্ধ করে, যেন একটা তৃপ্তির ভারে অলস হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে বিজনবিহারী।

—শুনেছো? আবার ডাক দেয় নিরুপমা।

—কি হলো? চমকে উঠে প্রশ্ন করে বিজনবিহারী।

—ফিল্ডে যাবে না? আবার মুখ টিপে হাসে নিরুপমা।

—তুমি মেয়েটাকে ধরবে, তবে তো যাব।

—মেয়ে তো ঘুমিয়েছিল। তুমি ওকে তুলে নিয়ে এলে কেন?

—এ সব কথার কোন মানে হয় না, নিরু। আমার কাজে বের হবার সময় খিটিমিটি করে দেরি করিয়ে দিও না।

বিজনবিহারীর মেয়ে, বয়স দু' বছর; নাম সুনন্দা। নিরুপমা আর বিজনবিহারী ডাকে, নন্দু। বিন্ধ্যাচলী বলে—নন্দুয়া। মাটিসাহেব বেটি নন্দুয়ার মুখটা কী সুন্দর! যৈসন ফুটলকা কমল বা!

রামসিংহাসনের বড় মেয়েটা, রাজমোহিনী, ছ' বছর বয়স, দৌড়ে এসে নন্দুকে কোলে তুলে নেয়। নিরুপমা জানে, এখন অন্তত একটি ঘণ্টা নন্দুকে কোলে নিয়ে আর কাঁকাল বেঁকিয়ে ট্যাং-ট্যাং করে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবে রামসিংহাসনের এই মেয়েটা, ছ' বছর বয়সের এই রাজমোহিনী।

সাইকেল চালিয়ে বেশি দূরে যায়নি বিজনবিহারী। কিন্তু যেন একটা বাধা পেয়ে আচমকা ব্রেক কষে থেমে পড়েছে বিজন-বিহারী। অথচ পথের উপর কোন বড় পাথর-টাথরও নেই, কোন নালা খানা গর্ত-টর্তও নেই।

আকাশের দিকে অমন ক'রে তাকিয়ে আর একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে বিজনবিহারী? আশ্বিনের সকালের আকাশ, ঝলমলে রোদ, কালো মেঘের ছিটে-ফোঁটাও তো কোথাও নেই।

সাইকেলটাকে হাতে ঠেলে আর আস্তে আস্তে হেঁটে ফিরে আসে বিজনবিহারী। —কি হলো? বিজনবিহারীর গম্ভীর মুখটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে নিরুপমার গলার স্বর যেন একটা চাপা ভয়ের গুঞ্জনের মত বেজে ওঠে।

হ্যাট আর বন্দুক নামিয়ে রেখে, পা থেকে বুট-জোড়াও খুলে সরিয়ে দিয়ে, যেন আরও হাল্কা হবার জন্য জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে বিজনবিহারী।

মুখটা গম্ভীর; কিন্তু চোখ দুটো চিক-চিক করছে। মাঝে মাঝে মাথা হেঁট করেও কি যেন ভাবছে। বিজনবিহারীরও যে এরকম একটা করুণ রকমের অশান্ত চেহারা থাকতে পারে, চোখে না দেখলে ধারণা করতে পারতো না নিরুপমা। তা ছাড়া, কোনদিনও বিজনবিহারীর চোখ দুটোকে এভাবে চিকচিক করে কাঁপতে দেখেনি নিরুপমা। যেন একটা ভক্ত মানুষের চোখ, কাউকে পুজো করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে।

—ফিরে এলে কেন? নিরুপমার গলার স্বর আবার ভীরু হয়ে কেঁপে ওঠে।

—ছিঃ, আজকেও সাত-সকালে জানোয়ারের মত রুটি চিবেতে হলো। জঙ্গলে এসে অভ্যেসটাই জংলী হয়ে গিয়েছে।

কা'কে ধিক্কার দিয়ে আক্ষেপ করছে বিজনবিহারী? নিজেকে? কেন?

—এতদিন ধরে রাগের মাথায় কি-ভয়ানক একটা বিশ্রী ভুল করে এসেছি, নিরু! রাগই হলো ভূত, একবার ঘাড়ে ভর করলে সব ভুল করিয়ে দেয়।

—ভুল? আশ্চর্য হয়ে তাকায় নিরুপমা।

—হ্যাঁ। আজ হলো ছাব্বিশে আশ্বিন। বাবার মৃত্যু দিন। আজ আমার উপোস করা উচিত ছিল, বাবার বাৎসরিক কাজটাও করা উচিত ছিল।

নিরুপমার চোখ ফেটে এখনই বোধ হয় একটা করুণ বিস্ময়ের ফোয়ারা উথলে উঠবে, বুকটাও ফুঁপিয়ে উঠবে; সরে গিয়ে বিজন-বিহারীর পিছনে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে নিরুপমা।

—যাই হোক, তবু আজ আর আমি কিছু খাব না নিরু। হ্যাঁ, এখনই তাহলে বেরিয়ে যাই; ছোট্ট নদীটায় স্নান করে আসি। এক মুঠো তিল দাও তো, নিরু।

শিউলিবাড়ির ছোট নদী, সামনের ডাঙ্গার উপর দিয়ে আধ মাইল এগিয়ে গেলে বালু ছড়ানো নদীটার বুকের মাঝখানের ঝিরি-ঝিরি বয়ে যাওয়া স্রোতটা দেখা যায়। নদীর ধারে একটা বট আছে, বটের পায়ের কাছে সিঁদুরমাখা একটা পাথর আছে; আর সাতটা পাথরের ধাপ নিয়ে একটা ঘাটও আছে।

স্নান সেরে, এক মুঠো তিল স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিয়ে, আর ভিজে ধুতির খুঁটে গা জড়িয়ে যখন বাড়ি ফিরে আসে বিজনবিহারী, তখন বিজনবিহারীর তৃপ্তি-ভরা স্নিগ্ধ মুখটার দিকে একবার তাকিয়ে নীরবেই সরে যায় নিরুপমা। ভিতরের ঘরের এক কোণে চুপ ক'রে বসে কান্না চাপে আর চোখ মোছে।

বিজনবিহারী ডাক দিয়ে বলে—কোথায় গেলে? শুনছো? এ বছর ভুল-টুল যা হলো তা তো হলো; কিন্তু আসছে বছর কাজটা এভাবে সারলে চলবে না। শাস্তরে যা বলে, যেটা নিয়ম, ঠিক সেভাবে করতে হবে।

নিরুপমা সাড়া দেয়—হ্যাঁ, করবে বইকি।

বিজনবিহারী—কিন্তু সেজন্যে যে পুরুত চাই।

নিরুপমা—চাই বই কি।

বিজনবিহারী—ঝুমরা রাজের পুরুত শমাজীকে দিয়ে কাজ চলতে পারে, কিন্তু... কিন্তু বাঙ্গালী পুরুত হলেই ভাল হয়। কি বল?

নিরুপমা বলে—হ্যাঁ।

বিজনবিহারী—হ্যাঁ হ্যাঁ তো করছো, কিন্তু কোথায় তুমি?

এবার আর নিরুপমার কথার সাড়া পায় না বিজনবিহারী। কিন্তু চমকে উঠতে হয়। যেন ওঘরের ভিতর থেকে একটা ডুকরে ওঠা নিঃশ্বাসের শব্দ সাড়া দিয়েছে।

এ কি হচ্ছে নীরু? দেখে আশ্চর্য হয় বিজনবিহারী; আঁচল দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে মেজের উপর নিথর হয়ে বসে আছে নিরু-পমা। কেন? আজ আবার কোন্ ভয়ের ছায়া দেখতে পেল নিরুপমার উজ্জ্বল হাসির চোখ দুটো?

বিজনবিহারী ডাকে—কি হলো?

নিরুপমা—কিছু না; তুমি কিছু ভেব না।

বিজনবিহারী—ভাবিয়ে দিয়ে ভেব-না বললে চলে না। আজ তুমি হঠাৎ কি ভেবে...।

নিরুপমা—জানতে চেয়ো না। বলতে পারবো না।

হঠাৎ চোখ ঘষে আর মুখের উপর থেকে চাপা-আঁচল সরিয়ে দিয়ে শান্ত ও সুস্থির হয়ে বসে জানলাটার দিকে তাকিয়ে থাকে নিরুপমা। চোখ দুটোও শান্ত শুকনো খট্‌খটে। নিরুপমার এরকমের মূর্তি একটু অদ্ভুত বটে; তাই বোধহয় একটা শালিক বার বার জানলার কাছে এসে বসছে, আর ঘরের ভিতরের দিকে একবার তাকিয়েই উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

বিজনবিহারীর কাণেও বোধহয় নিরুপমার কথার শব্দটা নতুন বিস্ময়ের আঘাতের মত বেজেছে। জানতে চেয়ো না! কি-অদ্ভুত শুকনো স্বরে কথাটা বলেছে নিরুপমা। কথা-গুলি যেন এক মুঠো ঠাণ্ডা আর বাসী ছাই, হঠাৎ জ্বালার ছোঁয়া পেয়ে তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিজনবিহারীর জীবনের কোন আগ্রহের জিজ্ঞাসাকে এভাবে চুপ করিয়ে দিতে চাইবে নিরুপমা, এটা যে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না বিজনবিহারী।

কি-এমন নতুন আর অদ্ভুত কিছু দেখতে পেল নিরুপমা, যেজন্যে নিরুপমার ভিজে চোখ দুটো এত শুকনো হয়ে যেতে পারে, আর গলার স্বরে এত শুকনো ছাই ঝরাতে পারে নিরুপমা? আজ ছাব্বিশে আশ্বিন, বাবার বাৎসরিক স্মৃতির তর্পণের জন্য স্রোতের জলে শুধু এক মুঠো তিল ভাসিয়েছে বিজনবিহারী, কিন্তু সেজন্য নিরুপমার প্রাণটা ভীরু হয়ে গিয়ে কেঁদে ফেলবে কেন; আবার, কান্নায় চোখ দুটোকে এত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ফেলবেই বা কেন? দেখতে পেয়েছে বিজনবিহারী, নিরুপমার হাতটা যেন হঠাৎ কঠোর হয়ে চোখ দুটোকে একটা হতাশ অভিমানের আঘাত দিয়ে জোরে জোরে ঘষেছে।

বিজনবিহারী বলে—জানতে চাইবো না কেন?

নিরুপমা—না; জেনে তোমার কোন লাভ হবে না।

বিজনবিহারী—আমাকে না জানিয়ে কি তোমার কোন লাভ হবে?

নিরুপমা—তুমি সুখী থাকবে।

—তার মানে?

—তুমি শাস্তর আনবে, নিয়ম আনবে বাঙালী পুরুত ঠাকুর আনবে; তবে আ আমাকে কেন?

—তার মানে!

—আমাকে বাদ দাও।

—এর মানেই বা কি?

—আমাকে চলে যেতে দাও।

—কোথায় যাবে?

—শিউলিবাড়িতে কি শ্মশান নেই?
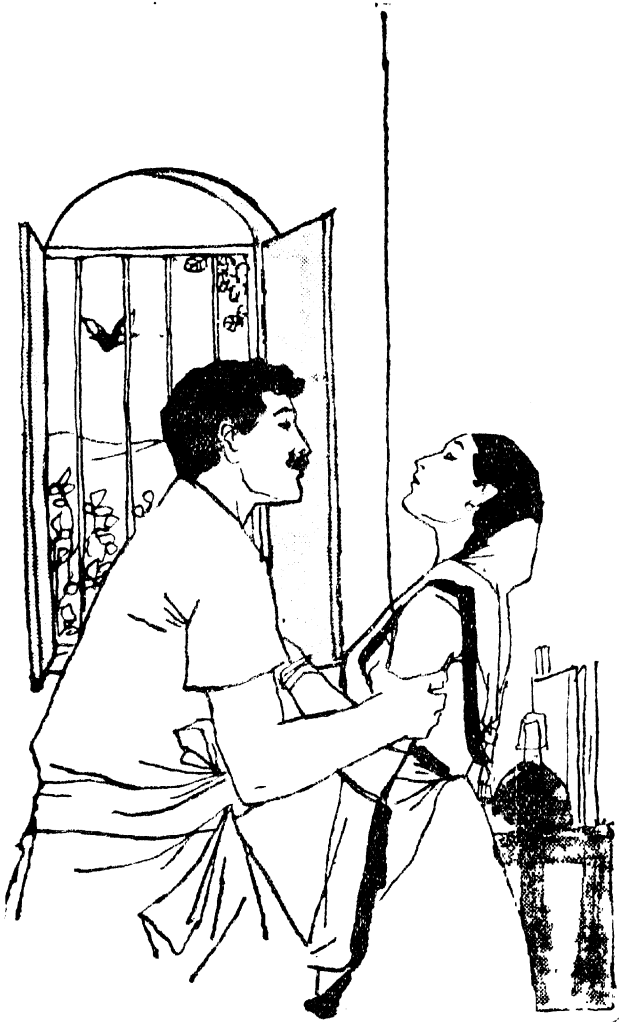
তুমি আগে না শান্তর আগে?

—আছে বইকি। কিন্তু যাবে কেন?

—যেখানে শান্তর আসবে, নিয়ম আসবে, মন্তর আসবে, সেখানে আমি থাকবো কি করে? বাঁচবো কি করে? নিরুপমার শুকনো চোখের তারা দুটো যেন ছটফটিয়ে পুড়তে থাকে।

—কি বললে? চেঁচিয়ে ওঠে বিজন-বিহারী।

—বলছি তো! শান্তর নিয়ম আর মন্তর এসে তো একদিন আমাকে তাড়িয়েই ছাড়বে; তার চেয়ে ভাল, তার আগে তুমিই তাড়িয়ে দাও। তোমার হাতের আগুনে মুখে নিয়ে ছাই হয়ে যাই। শান্তর এসে পড়লে তো আর তোমার হাতে এ সাহসটুকু থাকবে না।

নিরুপমার প্রাণও এমন বিদ্রোহ করতে জানে? আর, বিদ্রোহটাও এমন ভাষায় কথা বলতে পারে? আর, ভাষাটাও বিজন-বিহারীকে এত ভীরু বলে গাল দিতে পারে?

কি-যেন বলতে চায় বিজনবিহারী। কিন্তু নিরুপমার মাথাটা বিজনবিহারীর পায়ের কাছে আছড়ে পড়েছে। আর যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছে সেই বিদ্রোহেরই একটা ভীরু অন্তরাত্মা।—শেষে তুমিও ভয় পেলে। আমি তবে আর কোন্ সাহসে……।

বর্ষার জলঙ্গী সাঁতার দিয়ে পার হতে ভয় পায়নি যে ষোল বছর বয়সের বিজু, চম্বলের বাজিয়াড়ীতে আগুন-চোখো লেপার্ডের মুখের কাছে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলতে হাত কাঁপেনি যে কুড়ি বছর বয়সের বিজন-বিহারীর, আজ আটত্রিশ বছর বয়সের সে বিজনবিহারী ভয় পেয়েছে? নিরুপমাকে বুকে থেকে নামিয়ে দিয়ে শান্তর বুকে তুলে নিতে চাইছে?

শান্তর আসছে; যেন হুটোপুটি করে জংলী হাতী আসছে, নিরুপমার জীবনের সুখ আশা আর তৃপ্তির ছোট্ট তাঁবুটাকে উপড়ে ফেলে দেবার জন্য। এই ভেবে ভয় পেয়েছে নিরুপমা। কিন্তু ভুল করছে, ভয়ানক ভুল করছে নিরুপমার দুর্বল বিশ্বাসের বুকটা। বোধহয় ভুলেই গিয়েছে নিরুপমা, এই বিজনবিহারী জংলী হাতীর চোখের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিতে জানে, পারে, তার বুক একটুও কাঁপে না।

মেজের উপর থেকে নিরুপমার লুটিয়ে পড়া শরীরটাকে দু' হাতে তুলে নিয়ে আর দাঁড় করিয়ে বুকের কাছে শক্ত করে ধরে রাখে বিজনবিহারী।—তুমি আগে, না শান্তর আগে?

নিরুপমা আবার ফুঁপিয়ে ওঠে।—বুঝতে পারছি না।

—তোমাকে আগে নিয়ে এসেছি, না শান্তর আগে নিয়ে আসতে চেয়েছি?

—সবই তো জানি। কিন্তু……।

—কিন্তু আবার কিসের?

—শুনে যে বড় ভয় করছে।

—কোন ভয় নেই। কোন ভয় আর থাকতেই পারে না।

চিরকাল যে ভাষায় নিরুপমাকে আশ্বাস দিয়ে এসেছে এই নির্ভয়ের মানুষটা, আজও সেই ভাষায় নিরুপমাকে আশ্বাস দিয়ে কথা বলছে। এই আশ্বাসের কাছে লুটিয়ে পড়ে শান্ত না হয়ে পারবে কেন নিরুপমা?

দু' চোখ বন্ধ করে, শান্ত আর স্নিগ্ধ একটা মুখ নিয়ে, আর মাথার ভারটাকে একে-বারে অলস করে বিজনবিহারীর বুকের উপর রেখে দিয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়তে চায় নিরুপমা।

বিজনবিহারী বলে—আজ আর আমরা কাকে ভয় করবো বল? কার সাধ্যি আছে যে, আমার ঘরের দিকে তাকিয়ে সন্দেহ করবে? কার সাহস আছে যে ঠাট্টা করবে? কার এমন মাথা খারাপ হবে যে, ঘেন্না করবে? ফুলন-বাবু সেদিন কি বলছিলেন, জান?

হেসে ওঠে বিজনবিহারী; যেন উৎফুল্ল এক পৌরুষের শান্ত গর্বের কণ্ঠস্বর হেসে উঠেছে—ফুলনবাবু বলছিলেন, মাটি সাহেবের বাড়িটা যেন হিমালয়জায়া সংসার।

নিরুপমা—তার মানে?

—তার মানে আমি হিমালয়; তুমি মেনকা আর নন্দু হলো উমা।

নিরুপমার চোখ দুটো অদ্ভুত একটা অনুভবের আবেশে নিবিড় হয়ে বিজন-বিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থমথম্ করে; যেন একটা স্বপ্নের কোলে বসে আছে নিরুপমার প্রাণটা; ফুলনবাবুর কথা নয়; যেন এক গাদা ফুলচন্দনের কথা দু কান দিয়ে স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছে নিরুপমা।—হিমালয়জায়া সংসার।

বিজনবিহারী—সব ভয় পার করে দিয়েছি,

নিরু। তবু তুমি ভুল করে একটা পূর্ব-জন্মের কতগুলো বাজে ছায়া-টায়া দেখো...।

হেসে ফেলে নিরুপমা।—না, আর ভয় করি না।

বিজনবিহারী—তুমিই না সেদিন ঠাট্টা করে বলেছিলে......।

—কি ?

—শিউলিবাড়ির রাজার নাম মাটিসাহেব।

—বলেছিলুম, কিন্তু ঠাট্টা করিনি।

—তবে ?

বিজনবিহারীর শেষ কথাটা যেন এত-ক্ষণের একটা মিথ্যে আতঙ্কের লজ্জাকে প্রশ্ন করে হাসিয়ে দেয়। নিরুপমা বলে—বাঙালী পুরুত ঠাকুর কি শুধু বাবার বাৎসরিক কাজের জন্যই আসবেন ?

—না; তা কেন হবে ? এখানকার সব কাজই করবেন। পুজো-পার্বণ, সত্য-নারায়ণে ব্রতব্রত, কিংবা তোমার কোন মানত-টানতের পুজো থাকলেও কাজ করবেন। মোট কথা...।

নিরুপমার দুই চোখ হেসে হেসে ঝিকমিক করে।—কি ?

—মোট কথা, আর জংলী হয়ে থাকা চলবে না। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী।

শালিকটা আবার এসে জানালার কাছে বসেছে; ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়েছে। কিন্তু তখুনি আবার ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে গেল না শালিকটা। বোধহয় আর ভয় পেয়ে নয়; বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতে চাইছে।

বিজনবিহারী বলে—তা ছাড়া, মিছিমিছি কারও ওপর আর রাগ পুষে রাখার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া......।

হঠাৎ নীরব হয়ে গিয়ে, আর জানালার বাইরে আশ্বিনের আকাশটারই দিকে পিপাসিতের মত তাকিয়ে থাকে বিজন-বিহারী। তার পরেই, গলার স্বর একেবারে মৃদু করে দিয়ে বলতে থাকে—হবে, একে একে সবই হবে; সবই করে নিতে হবে; ছেড়ে দেবই বা কেন ?

ভাষাটা হেঁয়ালী, কিন্তু গলার স্বরটা যেন একটা নতুন মানতের প্রতিধ্বনি। কিংবা আশ্বিনের আকাশের বুকে একটা ক্ষমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে একটা খুশি অভিমান। নয় তো একটা পুরনো মায়ার হাতছানির দিকে তাকিয়ে কথা বলছে ব্যাকুল একটা পিপাসা। যেন দেউলবাড়িতে ভোগের ঘণ্টা বাজছে, খালের এ পারে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছে আর ছটফট করছে ছোট্ট বিজুর দুরন্ত লোভ

—মাটিসাহেবের মতলবটা এবার বুঝতে পারা গেল। মুখ টিপে হাসতে থাকে, নিরুপমা।

তিন বছর আগেও একবার ঠিক এইভাবে মুখ টিপে হেসে বুকভরা খুশির ভার সামলাতে চেষ্টা করেছিল নিরুপমা। কিন্তু সামলাতে পারেনি। আজও নিরুপমার সারা মুখ রাঙা হয়ে ওঠে; শিউলিবাড়ির ভাগ্যটা যে সত্যিই ভোরের আলোর মত রাঙা হয়ে হাসছে।

সাইকেলের চাকার ধুলো মুছতে ব্যস্ত বিজনবিহারী নিতান্ত অব্যস্ত স্বরে কথা বলতে গিয়েও নিরুপমার মুখের দিকে তাকায়।—মাটিসাহেবের মতলব ?

—হ্যাঁ।

—কি মতলব ?

—শিউলিবাড়িকে একেবারে কেষ্টনগর করে তুলতে চাইছেন মাটিসাহেব।

বিজনবিহারী হাসে—বাঃ, খুব চমৎকার সন্দেহ করতে শিখেছো, দেখছি।

মাটিসাহেবের কাঁচা ইঁটের সেই বাড়ির ঘরগুলি এখন ধান অড়হর আর মকাইয়ের ভাণ্ডার। সেই শিউলি যেখানে-সেখানে ছিল, সেখানে-সেখানে এখন নতুন শিউলির ভিড়। নতুন বাগানের মাদারের বেড়ার সঙ্গে কৃষ্ণ-কলির ঝাড় এলিয়ে এলিয়ে ছড়িয়ে আছে। বছরে দুবার ফুল ফোটায় কৃষ্ণকলির ঝাড়—লাল হলদে বেগুনী আর হলদে-লাল। পুরনো বাড়ির সামনে দুটো পাকা ইঁটের ঘর, বারান্দাটা বেশ চওড়া। বারান্দায় চার-পাঁচটা চেয়ার আর একটা টেবিল।

দিল্লিতে করোনেশন দরবার। শিউলিবাড়ি স্টেশনের মাথার উপরে উঁচু বাঁশের ডগায় পুরো একটা মাস ধরে ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে। সেই চৌধুরী বাবু বদলি হয়ে চলে গিয়েছেন। বদলি হয়ে এসেছেন গাঙ্গুলী-বাবু আর বোসবাবু—এস-এম- আর এ-এস-এম। দেখে আরও খুশি হয়েছে বিজন-বিহারী, দুই ভদ্রলোকই সপরিবারে এসেছেন।

গাঙ্গুলীবাবুর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। কোলেরটার বয়স চার মাস। অথচ গরুর দুধ পাওয়া যাচ্ছে না। রামসিংহাসন শুধু মোষের দুধ বিক্রী করে। খুবই চিন্তায় পড়েছেন গাঙ্গুলীবাবু।

কিন্তু গাঙ্গুলীবাবুকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে বিজনবিহারী। বিজনবিহারী তার বাড়ির গরুর দুধের আধসের মাত্র সুনন্দার জন্য রেখে দিয়ে বাকি সবটাই গাঙ্গুলীবাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।—আমি থাকতে শিউলিবাড়িতে এসে কোন বাঙালী কষ্ট পাবে, এটা তো ভাল দেখায় না, নিরু।

ছোট নদীর ধারে এক বিঘে জমি করে-ছিল বিজনবিহারী। সে জমি চক্রবর্তীকে দলিল-করে দান করে দিতে হয়েছে। সে জমিতে পুরনো রটের কাছে নতুন কালী-বাড়ি হয়েছে। কালীবাড়ি তৈরীর সব ইঁট বিজনবিহারীই দিয়েছে। তশীলদার ফুলন-বাবুর কাছ থেকে কাঠ আদায় করা হয়েছে। কালীবাড়ির পুরোহিত চক্রবর্তী মশাইও সপরিবারে—স্ত্রী আর দুটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন; কি করে দিন চলবে। যজমান কোথায়; আর পুজোর ভিড়ও কতটুকু ?

কালীপুজো কমিটি তৈরী করে চক্রবর্তীকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে বিজনবিহারী। বছরে চার আনা চাঁদা আর একটা সিধা—ধান চাল চিঁড়ে কিংবা কলাই; এরই মধ্যে শিউলিবাড়ির ষাট-সত্তরজনকে কমিটির সদস্য করে ফেলেছে বিজনবিহারী। কিন্তু তবু চিন্তা করতে হচ্ছে, চক্রবর্তীর জন্য আর কী ব্যবস্থা করা যায়। তা না হলে সত্যিই যে ছেলেপুলে নিয়ে কষ্টে পড়বে চক্রবর্তী।

কবিরাজ সেনবাবুর জন্যে এতটা চিন্তা করতে হয়নি। তাঁর জন্য শুধু এক বিঘা বসত জমির ব্যবস্থা করে দিতে হয়েছে। ঝুমরা রাজ আর তাঁর রাজপুত কুটুম্বদের বাড়ি থেকে সেনবাবুর ঘন ঘন ডাক আসে। তা ছাড়া শিউলিবাড়ির এত-গুলি ঘর তো আছেই। এরই মধ্যে মন্দ রোজগার করছেন না সেনবাবু। সেন-বাবুর স্ত্রী একদিন এসে নিরুপমাকে নতুন সোনার বালা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সেনবাবুর মেয়ে দুটো বড় শান্ত। সুনন্দার সঙ্গে খেলা করতে এসে এবাড়িতেই ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

দেখতে পায় বিজনবিহারী, লুকোচুরি খেলবার জন্যে তৈরী হয়েছে সুনন্দা, রামসিংহাসনের তিন ছেলেমেয়ে, সেনবাবুর দুই মেয়ে, আর নতুন বস্তির লালাদের যত ছেলেমেয়ে।

সাইকেল নিয়ে ঘরের বাইরে এসেই এক-বার থমকে দাঁড়ায় বিজনবিহারী। গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে বাচ্চাদের দল, মাঝখানে সুনন্দা। বাচ্চাদের বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে আর ছড়া কেটে ছুট আর ফুট গুণছে সুনন্দা—আডাং বাডাং তিতা ঘোর, বীর বার শং!

সাইকেলটাকে ঝপাং করে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে বিজন-বিহারী।—আর-একটা ছড়া আছে নন্দু, খুব ভাল ছড়া।

সুনন্দা—শিখিয়ে দাও।

—শেখ, সবাই শেখ।...উচ্ছে পটল চচ্চড়ি; তাতে দিলাম ফুলবড়ি; ফুলবড়িটা গলে গেল; সবাই মিলে এক পা তোল।

বিজনবিহারী এক পা তুলে দাঁড়ায়, বাচ্চার দলও এক পা তুলে দাঁড়ায়। সব শেষে বার পা পড়ে, সে ছুট হয়ে সরে দাঁড়ায়।

বিজনবিহারী—বল অবার বল, উচ্ছে পটল চচ্চড়ি...।

হল্লা শুনে নিরুপমা বের হয়ে আসে—এটা আবার কী শুরু করলে?

সাইকেলটাকে তুলে নিয়ে বিজনবিহারী বলে—একটা বাংলা স্কুল চালু না করে উপায় নেই নিরু; তোমার নন্দুর ভাষা আডাং বাডাং করতে শুরু করে দিয়েছে।

হ্যাঁ, বাংলা স্কুলটা চালু করতে একটা বছরের বেশি সময় লাগেনি। একটা প্রাইমারী স্কুল। স্কুল কমিটির প্রথম প্রেসিডেন্ট বিজনবিহারী। সেনবাবুর দুই মেয়ে, চক্রবর্তী মশাইয়ের তিন ছেলে আর স্টেশনের দুই বাঙালী পরিবারের চারটি ছেলে-মেয়ে; তা ছাড়া বাঙালী নয় যারা, তাদেরও বাড়ির পঁচিশটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে শিউলিবাড়ির প্রথম স্কুলের প্রতিষ্ঠার উৎসব যেদিন হয়ে গেল, সেদিন আবার রাতের আকাশটার দিকে তাকিয়ে চিকচিক করেছিল বিজনবিহারীর চোখ। নিরুপমা বলে—স্কুলের কি নাম হলো?

বিজনবিহারী — রমাসুন্দরী বেঙ্গলী প্রাইমারী স্কুল।

চমকে ওঠে নিরুপমা। এখন আর বুঝতে অসুবিধে নেই, কেন চিকচিক করছে বিজনবিহারীর চোখ দুটো।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী। —কেন যেন মেজদির নামটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তাই স্কুলটাকে ঐ নামটা দিয়ে দিলাম। মেজদির বাড়ির দানাদার সন্দেশের স্বাদ আজও তো ভুলতে পারিনি, নিরু।

নিরুপমার চোখ দুটো যেন আবার ছলছল না করে ওঠে, তাই বোধহয় আরও জোরে চেঁচিয়ে কথা বলতে থাকে বিজনবিহারী। —চক্রবর্তী মশাইয়েরও একটা সুবিধে হয়ে গেল। বাঙালী বাচ্চাদের বাংলা পড়াবেন হিন্দী বাচ্চাদের অঙ্ক। বুড়ো লালাবাবু হিন্দী পড়াবেন। দুই মাস্টারের মাইনের জন্য স্কুল কমিটি দেবে দশ টাকা, আর জেলা বোর্ড দেবে দশ টাকা।

কবিরাজ সেনবাবুকে আর কালীবাড়ির পুরোহিত চক্রবর্তীকে শিউলিবাড়িতে আনতে গিয়ে পুরো একটা বছর কী চেষ্টা আর কত চিন্তাই না করতে হয়েছে। বিজনবিহারীর কাছ থেকে নানা অনুরোধের আর অঙ্গীকারের চিঠি নিয়ে রামসিংহাসন বারবার ছুটেছে, বর্ধমানে আর রাণীগঞ্জে। মাটিসাহেব নামে শিউলিবাড়ির সব চেয়ে সম্মানের আর দাপটের এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে অনেক ভরসার পাকা কথা পেয়ে আর রেল-খরচ পেয়ে তবে তাঁরা এসেছেন। নিরুপমার কাছে আগেই বলে রেখেছিল বিজনবিহারী—আমি ওদের আনিয়ে ছাড়বো, নিরু।

নিরুপমাও দেখে আশ্চর্য হয়েছে, বয়সটা চল্লিশ বছর পার হয়ে গেলেও মাটিসাহেবের সেই জেদের মাটি একটুও নরম হয়ে যায়নি।

কার্তিক মাসের হিমেল কুয়াশায় ভরা শিউলিবাড়ির অমাবস্যার শীতাতুর মাঝরাত যখন একেবারে নিস্তব্ধ; কালীবাড়িতে শ্যামাপূজোর ঘণ্টাধ্বনি যখন বাজতে শুরু করে, সিধো চামার ঢাক বাজায়; তখন কমিটির প্রেসিডেন্ট এই মাটিসাহেব যেন রাতজাগা দুরন্ত ছেলের উৎসাহ নিয়ে আর চঞ্চল হয়ে কালীবাড়ির আঙিনায় ছুটোছুটি করে। লোক পাঠিয়ে ফুকনবাবুকে খবর দেয়, নতুন বস্তির লালাদেরও ডেকে পাঠায়, শিগগির চলে এস সবাই, ভোগ হয়ে যেতে আর দেরি নেই; সবাইকে প্রসাদ নিয়ে যেতে হবে।

রেলওয়ের এক বাঙালী অফিসার এসেছিলেন; স্টেশনের রেস্টরুমে একটা দিন ছিলেন। পদস্থ অফিসার, তাঁর খাওয়া-দাওয়ার অভিরুচিও বেশ পদস্থ। গাঙ্গুলী-বাবু একটু চিন্তায় পড়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গাঙ্গুলীবাবুকে একটুও ব্যস্ত হতে হয়নি। শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবই অফিসারকে খাওয়াবার সব দায় খুশি হয়ে নিজের উপর টেনে নিয়েছেন। নিজের হাতে পোলাও আর মাংস রান্না করেছে বিজনবিহারী; নিরুপমা রেঁধেছে বড়ি দিয়ে আড় মাছের ঝোল, কাঁচা পেঁপের সুক্ত, লাউয়ের ঘণ্ট, আর পায়েস। অফিসার ভদ্রলোক বিজনবিহারীকে বলেছেন, আপনি মশাই এখানে না থাকলে ছাতুটাতু খেয়ে আমার বোধহয় একদিনেই পাঁচ পাউণ্ড ওজন হারাতে হতো।

অফিসারকে নিজের বাগানের এক ঝুড়ি পেঁপে উপহার দিয়ে বিজনবিহারী দুটো কাজের কথাও বলে নিয়েছে; স্টেশনের নামটা শুধু ইংরেজী হরপে লেখা আছে স্যার, আপনি কাইণ্ডলি একটা ব্যবস্থা করুন, যাতে বাংলা হরপেও নামটা লেখা হয়।

—তা হয়ে যাবে; একটা অর্ডার করিয়ে দিতে পারবো।

—তা ছাড়া, এই ম্যাপটা একবার দেখুন স্যার, কত সস্তায় কত ভাল ভাল প্লট বিক্রী হচ্ছে। শিউলিবাড়ির চমৎকার জল-হাওয়ার কথাটা আপনারও জানা আছে নিশ্চয়। সুতরাং যদি একটু প্রচার করে দেন যে......।

—কিসের প্রচার?

—আমার ইচ্ছে, বাঙালীরা এখানে এসে যেন জমি কেনেন আর বাড়ি করেন।

—ভাল কথা বলেছেন। আমার মনে হয় ......হ্যাঁ,......রামরাজাতলার যশোদাবাবুকে জানালে কাজ হতে পারে; ভদ্রলোক রটনা করতে খুব পোক্ত।...দিন আপনার ম্যাপটা।

মাটিসাহেবের মাটি-কাটা ঠিকেদারীর কাজও বেড়েছে; কারণ, সিলুয়াডিতে আরও দুটো নতুন কলিয়ারী চালু হয়েছে। নতুন নতুন আরও রাস্তা খুলতে হবে। সিলুয়াডি রোডের আট মাইলের পোস্ট থেকে এদিকে উনিশ মাইলের পোস্ট পর্যন্ত নতুন কাঁকর আর মাটি ফেলতে হবে। রাস্তাটা চওড়া না করলে কয়লাবোঝাই মোটর ট্রাক চলতে পারবে না।

দুবিয়া সিমেণ্ট কারখানার জন্যেও জঙ্গলের ভিতরে তিনটে ছোট-বড় সড়ক খুলতে হচ্ছে। মাটি কাটাবার ঠিকে পেয়েছেন মাটিসাহেব। একটা সড়ক চালু হয়ে গিয়েছে। দিন-রাত চুণাপাথরের বোঝাই হয়ে মোটর ট্রাক নতুন সড়কে ছুটতে শুরু করেছে।

মাটি কাটার কাজটাকে হাসিতে খুশিতে, গানেতে আর ছড়াতে ভরে দিয়েছেন মাটি-সাহেব। আগে শুধু নিজেই মুণ্ডারি ভাষায় গান গেয়ে মাটি-কাটা কুলির দলের ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়িকে মাতাতেন। আজকাল একটা নতুন কাণ্ড করেছেন, বাংলা গান গেয়ে মুণ্ডা আর ওরাওঁ কুলির দলকে খুশি করছেন। হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো—মাটিসাহেবের গানটা শুনে শুনে ওরাও গানটাকে যেন গলায় গেঁথে নিয়েছে। এক একদিন, শালবনের মাথায় যখন বিকেলের রোদ একটু ম্লান হয়ে আসে, তখন মাটিসাহেবের গান শুনতে পেয়ে যত ছোকরা টিংগো আর বুকুজুরু হাতের কোদাল নামিয়ে রেখে ব্যস্তভাবে ছুটে আসে। মাটিসাহেবের সেই হরি দিন তো গেল'র সঙ্গে গলা মিশিয়ে একজন ছোকরা আর দুজন টিংগো গান গায়, আর একজন কুজুজুর হয়তো মাদল বাজাতে শুরু করে।

মাটিসাহেবের বাগানটা যেন চাঁপাকলার জঙ্গল। চুঁচড়োর সরকারী কৃষির অফিসে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিয়ে পাঁচশো চাঁপা কলার চারা আনিয়েছিলেন মাটিসাহেব। কিছু বিলিয়েছেন মুণ্ডাদের গাঁয়ে গাঁয়ে, কিছু শিউলিবাড়িতে, আর বাকিটা নিজের বাগানে পুঁতেছেন। মাটিসাহেবের বাগানের প্রথম পাকা কলার কাঁদি কালীবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাটিসাহেব; তার পরের মাসেই প্রায় পঞ্চাশ কাঁদি কলা বেচে আর দশ কাঁদি কলা শিউলিবাড়ির ঘরে ঘরে বিলিয়ে, চেঁচিয়ে উঠেছিলেন মাটিসাহেব—আসছে বছরেই দেখতে পাবে নিরু, রাঁচির পাইকারেরা আর শেওড়াফুলি যাবে না; এই শিউলিবাড়ির বাজারেই চাঁপা-কলা কিনতে ছুটে আসবে।

নিরুপমা হাসে—তোমার কই মাছের অবস্থা কি দাঁড়ালো?

—খুব ভাল অবস্থা। শিগগির দেখতে পাবে, শিউলিবাড়ির বাজারে কইমাছ উঠেছে।

বছর দুই আগে লালগোলা থেকে একদল জেলে আর দশ হাজার কই মাছের চারা আনিয়ে ঝুমরা রাজের চারটে ঝিলের জলে ছেড়েছিল বিজনবিহারী। দেখে এসেছে বিজনবিহারী, সে কই এখন বেশ বড় হয়েছে; শালুকের ডাঁটা ছিঁড়ে তছনছ কাণ্ড করছে কইয়ের ঝাঁক।

প্রায় তিনটে মাস ধরে সন্ধ্যা থেকে শুরু করে সারারাত পর্যন্ত হাত চালিয়ে একটা জাল বুনেছে বিজনবিহারী, কইধরা জাল। সকাল বেলায় জালটাকে হরতকীর কষে চুবিয়ে চুবিয়ে আর ব্যস্তস্বরে ডাক দেয় বিজনবিহারী—নিরু, তুমি কোথায়?

—এই তো।

—তুমিও তো এসব কাজ কিছু-কিছু করতে পার, নিরু।

—আমি?

—হ্যাঁ।

—আমি কই মাছ ধরবো?

—আরে না; এসব কাজ মানে একটু-আধটু শখের কাজ; তব মানে শিউলিবাড়ির মেয়েগুলোকে অন্তত আলপনা আঁকবার কায়দাটা শিখিয়ে দিতে পার তো।

নিরুপমার ঠাট্টার চোখ দুটো করুণ হয়ে যায়। মানুষটা যে-কাজের কথা বলছে, সেটা যে মানুষটার আত্মার একটা ব্রত হয়ে উঠেছে। এই মাটি-কাটা খাটুনির মধ্যেও সর্বক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখছে, একটা হারানো জগতের যত ফুল ফল আর কইমাছকে ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছে আর খাটছে। এই তো, সেদিন বিন্ধ্যাচলী এসে বলে গেল বলেই জানতে পেরেছে নিরুপমা, বাঙালীবাবু আজকাল রোজ একবার গিয়ে রাজমোহিনীর বাপকে ক্ষীরমোহন আর সরপুরিয়া তৈরী করা শেখাচ্ছে। হাঁ দিদি; বাঙালী মিঠাইভি তোহর ঐসন মিঠি বা!

বলতে ইচ্ছে করেছিল, কিন্তু বলতে পারেনি নিরুপমা, আমি একটুও মিষ্টি নই বিন্ধ্যাচলী, মিষ্টি তোমাদের ঐ বাঙালীবাবু, ওর স্বপ্নটাও মিষ্টি। শিউলিবাড়ির পাথুরে মাটিকে মিষ্টি করে দেবার জন্য ও শুধু একাই খাটছে; আমি একটা অপদার্থ; আমার কোন গুণ নেই যে ওকে সাহায্য করতে পারি।

বিজনবিহারীর হাতের জালটার দিকে তাকিয়ে নিরুপমা বলে—তুমি এখন ওটা রেখে দাও লক্ষ্মী; একটু জিরোও।

—জিরোলে চলবে কেন?

—আমাকে বলে দাও কি করতে হবে, সব করে দিচ্ছি।

—কিন্তু আমি যে কথাটা বললাম......।

—শুনেছি। রাজমোহিনীর বিয়েতে আমি নিজেই গিয়ে আলপনা এঁকে দিয়ে আসবো।

—অ্যাঁ? রাজমোহিনীর বিয়ে? কত বয়স হলো রাজমোহিনীর?

—তা মন্দ কি, ষোল-সতর হবে। ওদের মতে একটু বেশি বয়স হয়ে গেছে।

—তাহলে আমাদের নন্দুর কত বয়স হলো?

—তের পার করেছে নন্দু।

—তা হলে তো নন্দুর বিয়ের কথাটা এখন থেকেই ভাবতে হয়।

—ভাবা তো উচিত। বলতে গিয়ে নিরুপমার চোখের পাতা যেন চমকে কেঁপে ওঠে, আর মুখটাও গম্ভীর হয়ে যায়।

—নিশ্চয় উচিত। বলতে বলতে হাত ধুয়ে নিয়ে আর হেসে হেসে বাগান দেখতে চলে যায় বিজনবিহারী।

বোধহয় বলতে চেয়েছে বিজনবিহারী, ভাবা উচিত নিশ্চয়; কিন্তু ভাবনা করা নিশ্চয় উচিত নয়। সুনন্দার বিয়ে দিতে হবে; কল্পনাটা যেন নিজেরই খুশিতে হেসে উঠেছে। বিজনবিহারীর চোখের দৃষ্টি আর গলার স্বরে অদ্ভুত এক স্নেহাক্ত আনন্দ উথলে উঠেছে। তাই স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে বাগানের কাজে ব্যস্ত হবার জন্য চলে গেল বিজনবিহারী।

না, নিরুপমাও আর ভাবনা করে মনের ভার বাড়াতে চায় না। ভাবনা করবার কোন দরকার হয় না। ঐ মানুষটা যে ভাবনা জয় করবার যোদ্ধা, আর ভরসা তৈরী করবার কারিগর। অনেকবার এমন হয়েছে; সুনন্দার মুখটাকে নিজের হাতে সাবান দিয়ে ধুয়ে, চোখে কাজল বুলিয়ে, কপালের উপর ছোট্ট একটা কুংকুমের তারা এঁকে দিতে গিয়ে হঠাৎ নিরুপমার চোখের হাসি গম্ভীর হয়ে গেছে; যেন আচমকা একটা কালো-ছায়াকে দেখতে পেয়েছে নিরুপমা। কিন্তু......না, ভুল দেখেছে নিরুপমা। বিজনবিহারীর মুখের অবাধ হাসিটা যেন স্ফটিকজলের হাসি, নিরুপমার চোখের সব গম্ভীরতা ধুয়ে দিয়ে চলে যায়। না, ঐ কালোছায়াটা কালো বটে, ছায়াও বটে। কিন্তু অন্ধকারের কালো নয়; ওটা শিবপুকুরের ডাঙার বুকের সেই তাল-বনের ছায়ার মত একটা কাজলমায়ার কালো; চড়কের মেলা দেখতে যারা দূর গাঁয়ে যায়, তাদের মাঝপথের আর মাঝবেলার শান্তি হলো ঐ তালবনের কালোছায়া।

রাজমোহিনীর বিয়েতে আলপনা এঁকেছে নিরুপমা। কিন্তু এই একটি আলপনা দেখে শিউলিবাড়ির যেন চোখ ভরেনি। লালাদের

বাড়ির বউ আর মেয়েরা বারবার এসেছে; নিরুপমার কাছে আলপনা আঁকা শিখেছে।

— ওরা মোচা রাঁধতে জানে না নিরু; মোচাগুলোকে জঞ্জাল মনে করে ফেলে দেয়। তুমি যদি ওদের একটু শিখিয়ে দাও, তবে ভাল হয়। বিজনবিহারীর ইচ্ছের কথাটা যেদিন শুনতে পেল নিরুপমা, তারপর বোধ-হয় তিনটে মাসও পার হয়নি, ভাত খেতে বসে এক বাটি মোচার ঘণ্টের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী—ঘণ্টর চেহারা খুব খুলেছে দেখছি।

নিরুপমা হাসে—মুখে দিয়ে নিয়ে বল, কেমন হয়েছে?

মোচার ঘণ্ট মুখে দিয়ে বিজনবিহারী আরও খুশি হয়। —চমৎকার।

নিরুপমা—কিন্তু আমি রাঁধিনি।

—আঁ? কে রেঁধেছে?

—ফুলনবাবুর ছেলের বউ পার্বতী রেঁধে পাঠিয়েছে।

—কি আশ্চর্য। কিন্তু......মনে হচ্ছে, কেউ যেন পার্বতীকে শিখিয়ে দিয়েছে।

—তা তো বটেই।

—কে শেখালো?

—তুমি যাকে বলেছিলে, সেই শিখিয়েছে।

নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটা পরম কৃতার্থতার আনন্দে চোখ বড় করে হাসতে থাকে বিজনবিহারী—তাই বল।

নিরুপমা — শত্রুঘ্ন বাবুর মেয়েও এসেছিল।

—কেন?

—বাঙ্গালী রান্না শিখতে চায়।

—শিখিয়েছ?

—হাঁ।

—কি শেখালে?

—ফোড়ন দিয়ে চাল্তের অম্বল।

—খুব ভাল করেছ। ফোড়নের রান্না ওরা একেবারেই জানে না; তা ছাড়া চালতে যে খাওয়া যায়, তাও জানতো না।

—নন্দুও একটা কাণ্ড করেছে।

—কি করলো নন্দু?

—লালাদের বাড়ির বুড়িদের অবশ্য রাজি করাতে পারেনি নন্দু, কিন্তু বউগুলোকে আর মেয়েগুলোকে বাঙ্গালী ধরনে শাড়ি-পরা ধরিয়েছে।

—বল কি? চেঁচিয়ে ওঠে বিজনবিহারী।

—এমন কি বিন্ধ্যাচলীকেও একদিন...। হেসে ফেলে নিরুপমা।

ওকি? বিন্ধ্যাচলীই যে কথা বলছে। যেন একটা হাসির ঝংকার লুটোপুটি খেতে খেতে এগিয়ে আসছে—অব তো আমি নন্দুয়ার শাশুড়িকে সাথ বাংলা বলতে পারবে।

একেবারে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় বিন্ধ্যাচলী। দুফেরতা দিয়ে শাড়ি পরা আর আঁচল দোলানো একটা মূর্তি। বিজনবিহারীকে দেখতে পেয়েই জিভ কেটে লজ্জিত আতঙ্কের মত ছুটে পালিয়ে যায়।

কাঁথা সেলাই করছিল নিরুপমা। পাল-তোলা নৌকা নদীর জলে ভাসছে—নক্সাটার নদীর জলের ঢেউগুলো নীল সুতোর, নৌকাটা লাল সুতোর। বাকি সবটা সাদা সুতো দিয়ে পিঁপড়ে-সারি ফোঁড়ের সেলাই। মাটিসাহেবের বাড়ির কাঁথা দেখে হরি রাজ-পুতের মা আশ্চর্য হয়—আহা! কী সুন্দর জিনিস! কেমন করে বানালে, এ নন্দুকে মাঈ?

নিরুপমা—শিখবেন?

—শিখিয়ে দেবে তবে তো শিখবো।

একটা বছর ধরে নিরুপমার ঘরে সারাটা দুপুর বসে বসে, একা হরি রাজপুতের মা নয়, ফুলনবাবুর ছেলের বউ আর লালাদের মেয়েরাও কাঁথা সেলাই করেছে। নিরুপমা, বলতে গেলে, একরকম হাতে ধরে সবাইকে কাঁথা সেলাইয়ের কাজ শিখিয়েছে।

আর একটা বছর পার হতেই শিউলি-বাড়ির জীবনে আরও একটা উৎসবের মত কাণ্ড করে ফেললো যে, সে হলো খেজুর রসের পায়েস। বিজনবিহারীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেয়ে স্কুল কমিটির সবাই যেদিন খেজুর রসের পায়েস খেল, বলতে গেলে সেদিন থেকেই উৎসবটা শুরু হয়েছিল। শীতের পুরো তিনটে মাস ধরে, যেমন রাম-সিংহাসনের বাড়িতে, তেমনই ফুলনবাবুর আর লালাদের বাড়িতে খেজুর রসের পায়েস রাঁধবার ধুম পড়ে গেল। বুঝিয়ে দিয়ে-ছিল বিজনবিহারী—আগে বেশ ঘন করে রস জ্বাল দিয়ে নেবেন, তারপর ভিন্ন করে দুধে চাল ছেড়ে দিয়ে জ্বাল দেবেন; বেশ একটু ক্ষীর-ক্ষীর হলে তাতে রস ঢেলে দিয়ে, শেষে এলাচ গুঁড়ো ফেলে দিয়ে......।

রমাসুন্দরী বেঙ্গলি প্রাইমারী স্কুলের নামটারও একটা উন্নতি হয়েছে। ওটা এখন রমাসুন্দরী বেঙ্গলি মাইনর স্কুল। মাইনর স্কুলে শুধু ছেলেরা পড়ে, কাজেই নতুন করে একটা প্রাইমারী স্কুল করতে হয়েছে—শিউলিবাড়ি প্রাইমারী স্কুল; প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন ফুলনবাবু।

মাইনর স্কুলের ছাত্রের সংখ্যা দুশোরও বেশি। তার মানে এই সাত বছর ধরে প্রতি বছরে প্রায় পঁচিশ জন করে ছাত্র বেড়েছে। ছজন নতুন টিচার এসেছে। শুধু এক হিন্দী টিচার ছাড়া আর সবাই বাঙ্গালী। প্রেসিডেণ্ট বিজনবিহারী বাঙালী টিচারদের সবাইকে অনুরোধ করেছিলেন, আপনারা ফ্যামিলি নিয়ে আসুন। বাসা ভাড়ার জন্য মাসে তিন টাকার বেশি লাগবে না। লালাদের পাড়াতে পাঁচ-ছটা বাড়ি খালি পড়ে আছে। আমি বলে দিলে সস্তায় ভাড়া দিতে রাজি হয়ে যাবে লালারা।

ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন টিচারেরা। থার্ড টিচার পুলক দত্তের কাণ্ড দেখে খুব খুশি হয়েছেন প্রেসিডেণ্ট। মাইনে পঁচিশ টাকা, বয়সেও ছেলেমানুষ বললেই চলে, সংসারের দায় বলতে কি বোঝায় আর বুঝি কত, তাও বোধ হয় জানে না; তবু অন্ধ বিধবা মা, একটা বোন আর তিনটে ভাইকে দেশ থেকে আনিয়েছে পুলক। হেড মাস্টার দীনবন্ধুবাবু কিন্তু এরই মধ্যে তিন কাঠা জমি কিনে দুটো ঘর তুলে ফেলেছেন।

কিন্তু ওদিকে, স্টেশনের পুব দিকের সৌখীন জমির সব প্লট ছাপিয়ে, পঞ্চাশটারও বেশি বাড়ি উঠেছে, আরও উঠছে। কলকাতার তিন ব্যারিস্টারের বাড়ি, বর্ধমানের এক জমিদারের বাড়ি, হুগলীর দুই ডাক্তারের বাড়ি। কলিয়ারীর বাঙালী স্টাফেরও অনেকে বাড়ি করে ফেলেছেন। রাঁচির মারোয়াড়ীরা যে-সব বাড়ি তৈরী করেছেন, সেগুলির বেশির ভাগই ভাড়া খাটে। আর ভাড়াটেদের বেশির ভাগই বাঙ্গালী। পুজোর সময়, আর শীতের সময়, হাওয়া-বদলের বাঙালীরা সবচেয়ে বেশি ভিড় করে। কোন বাড়ি আর খালি থাকে না।

শিউলিবাড়ির এই সৌখিন উপনিবেশ, যার নাম ঝুমরা কলোনি, তার কলরবের মধ্যেও মাটিসাহেবের নামটা প্রায় সব সময় বেজেই চলেছে। মাটিসাহেব কি বললেন? মাটিসাহেব কি ধোপা যোগাড় করে দিতে পারলেন? মাটিসাহেবকে বললেই তো হয়, বাসক পাতা আনিয়ে দিতে পারবেন। ঝুনুর জন্যে একজন টিউটর দরকার ছিল; কই? মাটিসাহেব কি ব্যবস্থা করলেন বুঝতে পারছি না। এবার কিন্তু মাটিসাহেব সত্যিই খুব বিশ্বাসী একটা চাকর যোগাড় করে দিয়েছেন। শুনলাম, আজ বিধুবাবুর বাড়িতে ধুনুরী পাঠিয়েছিলেন মাটি-সাহেব।। আমি অপেক্ষায় আছি, মাটি-সাহেবের বাড়িতে হরিণের মাংসের ফীস্ট খেয়ে তারপর কলকাতা রওনা হব। পিনি-মার দাঁতের ব্যথার একটা চমৎকার দেশী ওষুধ এনে দিয়েছেন মাটিসাহেব। মিনতির

হারের লকেটটার একটা পাথর খুলে গেছে, কে জানে মশাই কে সেট করবে? মাটি-সাহেব তো বললেন, ভাল স্যাকরা আছে। যাই হোক, শুনতে পেলাম, মাটি সাহেব এবার উঠে পড়ে লেগেছেন, ক্লাবটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়।

শিউলিবাড়ি ক্লাব। একটা ঘরে দুটো আলমারিতে বাংলা বই ঠাসা; আর, একটা ঘরে তাস, দাবা আর ক্যারম। বারান্দার সামনে ছোট এক টুকরো মাঠের উপর ব্যাডমিণ্টন। শুধু এক শিউলিবাড়ি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মাটিসাহেবের জীবনের যে পুরো পাঁচটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, আর বয়সটা পঞ্চাশ পার হয়ে আরও পাঁচ বছর এগিয়ে গিয়েছে, এই হুঁসও বোধহয় মাটিসাহেবের নেই। ক্লাবের সেক্রেটারী হয়েছে যে, ব্যাডমিণ্টনে কলেজ চ্যাম্পিয়ন মোহিত ঘোষ; মাটিসাহেবের প্রায় অর্ধেক বয়সের এমন একটি কাজের মানুষ থাকতেও ক্লাবের বাড়ি তৈরী থেকে শুরু করে সতরঞ্চি কেনা পর্যন্ত সব দরকারের খোরাক যোগাড় করতে গিয়ে ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট মাটিসাহেবকেই একটা রসিদ বই পকেটে নিয়ে ছুটতে হয়েছে, কখনও সিজুয়াডি কোলিয়ারীর সাহেবের কাছে, কখনও বা দুধিয়া সিমেণ্ট কারখানার আগরওয়ালার কাছে। সিজুয়াডির সাহেব আর দুধিয়ার আগরওয়ালা যদিও তিন টাকা তিন টাকা মোট ছ' টাকা দান করেছিলেন, আর নতুন বাঙালী আগন্তুকেরা দান করেছিলেন মোট ছাপ্পান্ন টাকা চার আনা, কিন্তু মাটিসাহেবকে সেজন্য একটুও বিচলিত বা চিন্তিত হতে দেখা যায়নি। রসিদ বইটা পকেটেই থাকে; পথে যেতে যার সঙ্গে দেখা হয়, তার কাছেই চেয়ে বসেন, দু-আনা চার-আনা যা-ই হোক, শিউলিবাড়ির ক্লাব ফণ্ডে কিছু দিন মশাই, দিন স্যার, দিজিয়ে লালাজী, দেহো হো মাহাতো, এয়াম কে হিয়াঁ মে!

এস্টিমেট বলছে আটশো টাকা চাই, কিন্তু এত চেষ্টা করেও যোগাড় হয়েছে শুধু দুশো ষোল টাকা এগার আনা। বিজনবিহারী হাসেন—ক্লাবটা বেশ ভোগাবে বলে মনে হচ্ছে।

নিরুপমা আশ্চর্য হয়—কোথায় ক্লাব?

বিজনবিহারী—কোথাও নেই; সেইজন্যেই তো বলছি; ক্লাবের বাড়ি তৈরীর জন্য মাত্র দুশো ষোল টাকা এগার আনা চাঁদা উঠেই বাস, একেবারে থেমে গিয়েছে। অথচ আরও প্রায় ছ'শো টাকা চাই।

নিরুপমা—ভাল হয়েছে।

—কি বললে?

—ওসব এখন থেমে যেতে দাও।

—তুমি তো এক কথায় নিষ্পত্তি করে দিলে। কিন্তু এতদূর এগিয়ে যেয়ে কি থেমে গেলে চলে?

—না থেমে উপায় কি? এত টাকা তুমি পাবে কোথায়?

বিজনবিহারী হাসেন—পাওয়ার সুবিধে আছে বলেই ভাবছি। ফুলনবাবু হ্যাণ্ডনোটে তিন শো টাকা দিতে রাজি আছেন; আর... আর ধর এ-বছরের সব অড়হর আর মকাই বেচে দিলে আরও দেড়শো টাকা হবে। বাকি রইল দেড়শো টাকা; সে-টাকা...সেটা তো তোমার কাছ থেকেই ধার পেতে পারি।

নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসছেন বিজনবিহারী, শিউলিবাড়ির মাটিসাহেব, যে-মানুষটার বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছে; মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে হচ্ছে; আর, গত বছরের ধানবেচা টাকা থেকে মাত্র ঐ দেড়শো টাকা বাঁচিয়ে স্ত্রীর কাছে জমা রেখেছেন, মেয়ের গলার একটা সোনার হারের জন্য।

একটি কথাও না বলে ঘরের ভিতরে গিয়ে আর বাক্স খুলে দেড়শো টাকার ছোট্ট পুঁটুলিটাকে বিজনবিহারীর হাতের কাছে ফেলে দিয়ে চলে যান নিরুপমা।

এ তো প্রায় পাঁচ বছর আগের একটা ঘটনা। কিন্তু পাঁচ বছরেও নিরুপমার কাছে সেই দেড়শো টাকা দেনার একটা টাকাও শোধ করতে পারেননি বিজনবিহারী। এই পাঁচ বছরের মধ্যে সেই টাকার কথা নিয়ে একটিও কথা বলেননি নিরুপমা। বিজনবিহারী অবশ্য প্রতি মাসে অন্তত দুবার করে বলেছেন—মনে আছে, মনে আছে নিরু; তোমার টাকা আমি পাই-পাই শোধ করে দেব।

শোধ করতে পারতেন বোধহয় বিজনবিহারী, যদি একটু জিরোতে জানতেন কিংবা থামতে পারতেন। শেষ জানা নেই, যেন এই রকম একটি পথে মাটিসাহেবের যত ইচ্ছার চেষ্টার আর কল্পনার প্রাণটা এগিয়ে চলেছে। মাথার অনেকখানি সাদা

হয়ে গিয়েছে: বড়-বড় একজোড়া গোঁফ যেন ঠোঁটের ফাঁকের শান্ত হাসিটাকে অদ্ভুত একটা ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে। মাথায় শোলার হ্যাট, পিঠে বন্দুক, পায়ে বুট, গায়ে খাকি কামিজ আর প্যাণ্ট, মার্টিসাহেব তাঁর ছুটোছুটির জীবনের চিরকেলে সহচর সেই সাইকেলের সঙ্গে আজও যেন ছুটেই চলেছেন; এ সড়কের শেষ মাইল পোস্ট আর কতদূরে? কিংবা সত্যিই আছে কিনা, প্রশ্নটা যেন মার্টিসাহেবের জীবনের কোন প্রশ্নই নয়।

মাটি কাটা ঠিকেদারীর বিলের টাকা, ধানবেচা টাকা, কলাবেচা পেপেঁবেচা টাকা; এই পাঁচ বছরে টাকা তো বার বার এসেছে। কিন্তু নিরুপমার পাওনা মিটিয়ে দেবার সুযোগ পেলেন কোথায় বিজনবিহারী?

ক্লাবের বাড়ি তৈরী হয়ে যাবার পর, ক্লাব চালু হবার পর, আর সন্ধ্যার ক্লাবঘরে দাবার হল্লা হৈ-হৈ করে ওঠবারও পর, পাঁচটা বছর ধরে যেন আর-একটা মানত পালন করবার জন্যে ছুটোছুটি করেছেন আর টাকা খরচ করেছেন বিজনবিহারী।

রুদ্রকিশোর হকি শীল্ড। টুর্নামেণ্টে খেলতে টিম পাঠাবে সিলুয়াড়ি কোলিয়ারি, দুধিয়া সিমেণ্ট ওয়ার্কস, হুটুপা লুথেরীয়ান মিশন। তা ছাড়া আছে শিউলিবাড়ি ইলেভেন, আর গ্র্যাণ্ড হিরোজ, অর্থাৎ মার্টিসাহেবের মুণ্ডা কুলিদের দল থেকে বাছাই করা ছোকরাদের একটা টিম। শীল্ড কিনতে হয়েছে, মস্ত বড় একটা সামিয়ানা কিনতে হয়েছে, পঞ্চাশটা চেয়ার তৈরী করাতে হয়েছে; দুটো টীমের ইউনিফর্ম কিনতে হয়েছে। সব খরচ মার্টিসাহেবের।

ফুলনবাবুর কাছে গল্প করেছে রামসিংহাসন— মার্টিসাহেবের হিরদে! কেয়া কহে তসীলদারজী। যেন বাপের কোল-ঘেঁষা একটা বাচ্চার হৃদয়।

ফুলনবাবু—রুদ্রকিশোর কি মার্টিসাহেবের পিতাজীর নাম?

রামসিংহাসন—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি। কবে সেই ছেলেবেলায় বাপ মরে গেছেন, আজ ছেলের মাথার চুলও সাদা হয়ে গিয়েছে; তবু দেখুন, কী হিরদে, বাপের নামটিকেই যেন পুজো করছেন মার্টিসাহেব।

ফাইনাল খেলার দিন এস-ডি-ও এসেছিলেন। সিলুয়াড়ি কোলিয়ারীকে হারিয়ে দিয়ে শীল্ড পেল শিউলিবাড়ি ইলেভেন। এস-ডি-ও'র হাত থেকে শীল্ড উপহার নিয়ে শিউলিবাড়ি ইলেভেনের ক্যাপ্টেন সেই থার্ড টিচার পুষ্কর দত্ত যখন মাথা তুলে আর জয়ীর হাসি হেসে চারদিকের ভিড়ের দিকে তাকায়, তখন দেখতে পায় রামসিংহাসন, মার্টিসাহেব যেন ছেলেমানুষের মত ছটফট করছেন, আর চোখ দুটো হেসে-হেসে চিকচিক করছে।

সেদিন রামসিংহাসনের বউ বিন্ধ্যাচলীও আর-একজনের চোখ দুটোকে হাসতে দেখে চমকে উঠেছিল। অদ্ভুত হাসি; সন্ধ্যাতারার মত মিটিমিটি হাসি নয়; রাতের তারার মত ঝিকঝিক করে হাসছে। রামসিংহাসনের বাড়ির সামনের সড়কের উপর শিউলিবাড়ি রাস্তা কমিটির সবচেয়ে পুরোনো ল্যাম্প-পোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সুনন্দা। পাশের শিমুলের একটা শাখা একগাদা লালফুলের ভারে নুয়ে গিয়ে সুনন্দার মাথার উপরে আস্তে আস্তে দুলছে। বিন্ধ্যাচলী তার ঘরের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছে, বাঙালীবাবুর মেয়ে নন্দুয়ার মুখটাও যেন শিমুলের ফুলের মত লালচে হয়ে ফুটে রয়েছে।

কি ব্যাপার? এই তো কিছুক্ষণ আগে বিন্ধ্যাচলীর কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল সুনন্দা। হঠাৎ সড়কের দিক থেকে একটা জয়ধ্বনির হর্ষ উথলে উঠে বাতাস শিউরে দিতেই সুনন্দা যেন ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেয়ে সড়কের এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। শিউলিবাড়ি ইলেভেনের জয় হোক— চলে যাচ্ছে একটা ভিড়ের মিছিল। আর রুদ্রকিশোর শীল্ড দু' হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে সবার আগে আগে চলেছে পুষ্কর।

তখনি একবার বাঙালীবাবুর বাড়িতে গিয়ে নন্দুয়ার মাকে একটা কথা বলবার জন্য যেন ছটফটিয়ে উঠেছিল বিন্ধ্যাচলী; কিন্তু যেতে পারেনি; বিন্ধ্যাচলীর ছটফটিয়ে ওঠা সেই ব্যাকুলতা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

একজনের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে সুনন্দা। রামসিংহাসন বলে, কুমেরা কলোনিতে থাকে এই ছোকরা বাঙালী, বেশ ভাল একটা চাকরি করে, আর মাঝে মাঝে বাঙালীবাবুর বাড়িতে যায়। ওরই নাম মোহিত, ক্লাবের হিসাব-টিসাব রাখে আর খুব বই পড়ে।

বিন্ধ্যাচলী—আমিও দেখেছি, কিন্তু বাঙালীবাবুর বাড়িতে ওর এত আসা-যাওয়া কেন?

রামসিংহাসন—নন্দুয়াকে পড়াতে আসে।

রামসিংহাসনের ধারণাটা খুব ভুল ধারণা নয়। বিজনবিহারীর বাড়িতে প্রায়ই আসে মোহিত। আসবার সময় একগাদা বই হাতে নিয়ে আসে, আর যাবার সময় একগাদা বই হাতে নিয়ে চলে যায়। সুতরাং, সম্পর্কটা পড়া-শোনার সম্পর্ক বলেই তো মনে হয়।

বিন্ধ্যাচলী অপ্রসন্নভাবে বলে—আমার কিন্তু দেখতে কেমন যেন লাগে।

রামসিংহাসন ধমক দেয়—চুপে রহো। যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলো না; সাবধান।

বিন্ধ্যাচলীর অপ্রসন্নতা ধমক খেয়েও দমে যায় না। রামসিংহাসন তখন শান্ত ভাষায় বুঝিয়ে দেয়।—নন্দুয়া তো তোমার রাজমোহিনীর মত একটা হালুয়াইয়ের মেয়ে নয়, বাঙালীবাবুর মেয়ে। ওদের একটু বেশি বয়সে বিয়ে হয়, আর অনেক লেখা-পড়াও শিখতে হয়।

বিন্ধ্যাচলী—আর কত বেশি বয়স হবে? নন্দুয়ার বয়স কত হলো জান?

—কত?

—হিসেব করে দেখ, আমার রাজমোহিনীর চেয়ে চার বছরের ছোট হলো নন্দুয়া।

চমকে ওঠে রামসিংহাসন—তবে তো প্রায় পঁচিশ হতে চললো নন্দুয়া। হায় রাম!

ঠিক কথা; রামসিংহাসনের মনের একটা বিস্ময় যেন আক্ষেপ করে উঠেছে; এত বয়স হয়ে গেল মেয়েটার; তবু বাঙালীবাবুর যেন কোন হুঁস নেই। অন্তত এক মাসের জন্য একবার দেশে গিয়ে মেয়ের বিয়েটা চুকিয়ে দিয়ে আসতে পারে; কিন্তু দেশে যাবার নামও করে না বাঙালীবাবু।

বিন্ধ্যাচলীর মনেরও এটা একটা বিস্ময়। নন্দুয়ার মা আরও অদ্ভুত মানুষ। নন্দুয়ার বিয়ের জন্য একটা সামান্য চিন্তার কথাও নন্দুয়ার মা'র মুখে কোনদিন শোনা গেল না। এত বয়স হয়েছে মেয়ের, তবু মেয়ে যেন কোলের মেয়েটি। একদিন দেখেছে বিন্ধ্যাচলী, নন্দুয়া একটা আসনের উপর বসে বই হাতে নিয়ে পড়ছে, আর নন্দুয়ার মা নিজের হাতে মেয়েকে ভাত খাইয়ে দিচ্ছেন। বাঙালীবাবুও সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে কি কাণ্ড করেন, সেটাও অনেকবার নিজের চোখে দেখেছে, আর নিজের কানে শুনেছে বিন্ধ্যাচলী। পঁচিশ বছর বয়সের মেয়েটা যেন পাঁচ বছর বয়সের একটা মেয়ে। ঘরের ভিতরে এদিকে ওদিকে ঘুরঘুর করেন বাঙালীবাবু, আর বাঙালীবাবুর মুখ থেকে যেন একটা আদুরে উৎসবের মত আবোল-তাবোল ভাষা ঝরে পড়তে থাকে— নন্দু নন্দু, এ বেটি নন্দুয়া, ও লক্ষ্মী মেয়ে, ও শ্রীমতী সুনন্দা, এক গেলাস জল খাওয়াও তো মা।

—দেখতে কী সুন্দরই না হয়েছে নন্দুয়া! বিন্ধ্যাচলী বলে।—চোখে পড়লে যে রাজা-মানুষও নন্দুয়াকে বিয়ে করতে চাইবে।

রামসিংহাসন বলে — এরকম একটা ব্যাপারও হয়ে গেছে।

—কি কি? কবে হলো? বিন্ধ্যাচলীর চোখ দুটো উৎসুক হয়ে জ্বলজ্বল করে।

—কুবেরকে চেন? হরচন্দ রায়ের ভাগিনা কুবের?

—হ্যাঁ।

জানে বিন্ধ্যাচলী, শিউলিবাড়ির কে-ই বা না জানে, সিংহানী পাহাড়ের কাছে নতুন কোলিয়ারি খুলেছেন যে পাঞ্জাবী বড়লোক হরচন্দ রায়, যাঁর একটা বাংলো স্টেশনের কাছে দেওদার বাগিচার ভিতরে নানা রঙে রঙীন হয়ে ঝলমল করে, তাঁরই ভগ্নীপতি হলেন এক রাজামানুষ। জলন্ধরে জায়গীরদারী আছে আর গয়াতে আছে জমিদারী। হরচন্দ রায়ের ভাগিনা কুবের পাটনাতে থেকে মস্ত বড় একটা কারবার চালায়। সেই কুবের শিউলিবাড়িতে এসেছিল। আর

বনবাণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙালীবাবুর মেয়ে সুনন্দাকে বিয়ে করবার জন্যে ফুলনবাবুর কাছে কথা পেড়েছিল।

—তারপর? তারপর কি হলো? প্রশ্ন করতে গিয়ে বিন্ধ্যাচলীর খুশির কৌতুহল যেন চেঁচিয়ে ওঠে।

রামসিংহাসন—তারপর আর কিছু হলো না। ফুলনবাবুর বউ নন্দুয়ার কাছে কথাটা বলেছিলেন; কিন্তু......।

বিন্ধ্যাচলী—নন্দুয়া কি বললে?

রামসিংহাসন—নন্দুয়া বলেছে; না, কভি নেহি।

বিন্ধ্যাচলী মাথা নাড়ে—তবে তো মনে হয়, ওহি, ওহি বা!

—কওন? কওন?

—মোহিত।

রামসিংহাসন একটা হাঁফ ছেড়ে নিয়ে বলে—হাঁ।

যে সত্য শুধু রামসিংহাসনের চোখে নয়; শিউলিবাড়ির আরও অনেকের চোখে ধরা পড়েছে, সেটা কি মাটিসাহেবের চোখে ধরা পড়েনি? যদিও মাটিসাহেবের বয়সটা ষাট বছর বয়স হতে চলেছে, মাথাটা সাদা হয়ে গিয়েছে; কিন্তু তাঁর চোখ দুটো তো এখনও আলো-মাখানো নীল আকাশের মত হাসে। সন্ধ্যার জঙ্গলের পথে সাইকেল চালিয়ে ছুটে যেতে এখনও যার চোখে কোন অন্ধকার ঠেকে না, এমনই যাঁর চোখের তেজ, সে মানুষ কি এখনও দেখতে পায়নি যে, মোহিতের হাত থেকে বই নেবার জন্য একটা আশার প্রতীক্ষায় কেমন ব্যাকুল হয়ে শিউলির আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায় সুনন্দা; আর সে-সময় সুনন্দার চোখের চাউনিটাও কেমন স্বপ্নালু হয়ে ওঠে?

নিরুপমার মনেও এটা একটা দুঃসহ বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা। এখনও কি চোখে পড়লো না মানুষটার; মেয়ের গলাটা যে শূন্য? মেয়ের বিয়ের জন্য ভাবনা করবার সময় কি এখনো আসেনি? যেন শিউলি-বাড়ির আকাশটার ইচ্ছার কাছে সব আশা সঁপে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছেন মেয়ের বাপ; মেয়ের অদৃষ্টের কি হবে, কি হতে পারে, আর কি হতে চলেছে; এসব যেন মানুষটার কাছে কোন প্রশ্নই নয়।

মেয়ের গলার জন্যে সোনার হার গড়াবার জন্য জমিয়ে রাখা সেই দেড়শো টাকার পুঁটলিটাকে যে এখনও নিরুপমার হাতে ফিরিয়ে দিতে পারেননি, সেজন্যেও কি বিজনবিহারীর মনে কোন আক্ষেপ আছে? একটুও না। তা না হলে, আজও কেন হেসে হেসে বলে দিতে পারেন, মনে আছে নিরু; সামনে একটা খরচের ধাক্কা আছে, সেটা সামলে নিতে পারলেই তোমার দেনা শোধ করে দেব।

বলতে ইচ্ছা করে নিরুপমার; ওটা আমার কাছে তোমার দেনা নয়; ওটা তোমার অদৃষ্টের কাছে তোমার দেনা। কিন্তু; বুকের ভিতরে মুখর হয়ে ওঠা এই দুরন্ত প্রতিবাদের শব্দটাকে যেন মুখ চেপে নীরব করে রেখে দেন নিরুপমা।

বিজনবিহারী তো আকাশের ইচ্ছার কাছে সব ছেড়ে দিয়ে আর নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটো-ছুটি করেন, কিন্তু নিরুপমার চোখ দুটো যে মাঝে মাঝে চমকে ওঠে আর একটা অন্ধ-কারের দিকে তাকিয়ে নিথর হয়ে যায়। সন্দেহ না করে পারেন না নিরুপমা, আর সন্দেহ করতেও বুক কাঁপে, বিজনবিহারীর এই নিশ্চিন্ততা যেন একটা অসহায়তার অলস ঘুম; একটা অক্ষমতার দুঃখ জোর করে ফাঁকির হাসি হাসছে। মেয়ের বিয়ে দিতে কোন চেষ্টাই করতে পারছেন না এই দুঃসাহসিক মাটিসাহেব; তাই মিথে নির্ভাবনার কথা দিয়ে ভয় চাপা দিতে চেষ্টা করছেন।

নিরুপমার অভিযোগ যতই বোবা হয়ে থাকুক না কেন, সে অভিযোগের রূপটাকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে পেরেছেন নিরুপমা। তবু বিজনবিহারী দেখতে পেয়েছেন কি না সন্দেহ। নিরুপমার হাতে শুধু একজোড়া শাঁখা ছাড়া আর কিছু নেই। দুলজোড়া খুলে নিয়ে মেয়ের কানে পরিয়ে দিয়েছেন; নিরুপমার ছগাছি সোনার চুড়ি, সেগুলোও সুনন্দারই হাতে উঠেছে।

হেসে ফেলেছিল সুনন্দা।—তুমি নিশ্চয়

বাবার ওপর রাগ করে এসব কাণ্ড করছো, মা।

নিরুপমা হাসতে চেষ্টা করেন।—ছিঃ, রাগ করবো কেন? আমার আর এসব জঞ্জাল গায়ে রাখতে ভাল লাগে না, লজ্জাও করে।

সুনন্দা আবার হাসে—বেশ কথা বললে! যদি জঞ্জালই মনে কর; তবে আমার গায়ে চাপাও কেন? আমিও কি একটা জঞ্জাল?

কেঁদে ফেলেন নিরুপমা; দু' হাতে মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেন—ছি ছি; এমন সর্বনেশে শক্ত কথা বলিসনি নন্দু; বলতে নেই।

সুনন্দা বলে—কিন্তু তুমি আমার বিয়ের কথা নিয়ে বাবাকে ব্যস্ত করে তুলতে চেষ্টা করো না মা।

নিরুপমা—কেন?

—কি দরকার!

—তার মানে কি? তোর বিয়ে হবে না?

—হবে বইকি।

—এর মানেই বা কি?

—এর মানে, ভাবনা করবার কোন দরকার নেই।

সুনন্দার মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন নিরুপমা। কি আশ্চর্য, মেয়েও যে ঠিক বাপের মত মনের জোরের গর্ব দেখিয়ে আর একবারে ভাবনাহীন হয়ে কথা বলছে! কিন্তু কেন?

সন্ধ্যাবেলা যখন বাড়িতে ফিরে আসেন বিজনবিহারী, আর, সুনন্দার গাল টিপে যত আবোল-তাবোল আদরের বোল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, তখন ডাক দেন নিরুপমা,—শুনছো?

—হ্যাঁ।

—শুনে যাও।

—কি ব্যাপার?

—নন্দু এসব কি কথা বলছে?

—কি কথা?

—বলছে, বিয়ে হবে, ভাবনা করবার কোন দরকার নেই।

—বলেছে নাকি?

—হ্যাঁ।

—তবে ঠিকই বলেছে।

—তার মানে?

—তার মানে, মোহিত নন্দুকে বিয়ে করতে চায়।

বিজনবিহারীর স্নিগ্ধ চোখে নতুন এক সূর্যোদয়ের আভা হাসছে। আর, মুখের উপর জয়গর্বের প্রসন্নতা। যেন জানাই ছিল বিজনবিহারীর, অলক্ষ্য একটা আশীর্বাদের হাত নন্দুর মাথায় ধানদূর্বা ছড়িয়ে দেবার জন্য তৈরী হয়েই আছে। ভাবনা করবার কিছু নেই। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে মনপ্রাণ আর শরীরটাকে একমুহূর্তের জন্যও জিরোতে না দিয়ে, যত সাধ স্বপ্ন আর আশার মাটি ফেলে ফেলে শিউলিবাড়ি নামে যে মায়ার দেশ নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন মাটিসাহেব, সে দেশের সব আলো-ছায়ার কাছে মাটিসাহেব যে সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধার মেয়েকে বরণ করে ঘরে তুলে নেবার মত মানুষ আছে। এখানেই আছে। এখানে শান্তর আর মন্তরকেও যে ডেকে এনে বিজনবিহারী তাঁর গায়ের জোরে জায়গা করে দিয়েছেন। সুনন্দার বিয়ে ঠিক হয়েছে জানতে পেলে চক্রবর্তী যে এখনই পাঁজি হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসবে। সেনবাবুর মেয়েরা বোধহয় এখনই শাঁখ বাজাতে শুরু করে দেবে। সুচেত সিং এখনি এক ঝুড়ি ফল পাঠিয়ে দেবে; হেডমাস্টার দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী উলু দিয়ে ফেলবে, আর রামসিংহাসনের বউ গলা খুলে গান গেয়ে উঠবে —কেকর ঘর চলি সীয়া, কেকর ঘর চলি! আর, থার্ড টিচার পুষ্করও বোধহয় ছুটে এসে খোঁজ নেবে, বিয়ের রাতে খাটতে চাইবে, ব্যান্ড পার্টি যদি আনবার দরকার হয়; তবে বলা মাত্র রাঁচি চলে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফিরে আসবে পুষ্কর।

নিরুপমা হাসেন—বিন্ধ্যাচলী সেদিন একটা অদ্ভুত কথা বলছিল।

বিজনবিহারী—কি?

নিরুপমা—হরচন্দ রায়ের ভাগনে [illegible] নাকি নন্দুকে বিয়ে করবার জন্যে......।

বিজনবিহারী—না না, কখখনো না। কি ভেবেছে হরচন্দ রায়, বাংলা দেশে কি মানুষ নেই?

নিরুপমা—সে কথা চুকে গিয়েছে। ফুলনবাবুর বউ একদিন নন্দুকেই কথাটা বলেছিল।

—তারপর?

—নন্দুই জবাব দিয়ে দিয়েছে, না।

বিজনবিহারীর মুখের হাসিতে সেই জয়গর্বের প্রসন্নতা যেন আরও নিবিড় হয়ে টলমল করে।—ওরা বুঝতে খুবই ভুল করেছে। আমি যে একটা খাঁটি বাঙালী, আর নন্দু যে মনেপ্রাণে একটা বাঙালী মেয়ে, এটা বোধহয় ওরা ঠিক বুঝতে পারেনি। যাই হোক......।

কি-যেন ভাবতে থাকেন বিজনবিহারী; আর চোখ-মুখের প্রসন্নতা আরও স্নিগ্ধ হয়ে উঠতে থাকে—আজকাল আমার কি মনে হয় জান, নিরু?

—কি?

—মোহিতের মুখটার দিকে যখন তাকিয়ে থাকি, তখন মনে হয়, আমাকে আর তোমাকে কেউ যেন ক্ষমা করে আর খুশি হয়ে একটা আশীর্বাদ পাঠিয়েছে।

—কি বললে? কে পাঠিয়েছে? নিরুপমার চোখ দুটো থর থর করে কেঁপে ওঠে।

বিজনবিহারী—ছোড়দা পাঠিয়েছে।

নিরুপমার চোখে যেন একটা অবুঝ শূন্যতা শুধু ফ্যালফ্যাল করে; কিছুই বুঝতে পারছেন না নিরুপমা, কি বলতে চাইছেন বিজনবিহারী। শিউলিবাড়ির এই জীবনে, এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম ছোড়দার কথাটা বিজনবিহারীর মুখে হঠাৎ ডুকরে উঠেছে।

নিরুপমা বলে—আজ হঠাৎ ছোড়দা কেন......।

এক হাতে সাদা মাথাটা, আর, এক হাতে ধবধবে ফর্সা বুকটাকে চেপে ধরে ষাট বছর বয়সের মাটিসাহেব হঠাৎ ছোট ছেলের মত চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন।—ছোড়দা আর নেই, নিরু। খবর পেলাম, কেষ্টনগরের কমলকিশোরবাবু, আজ পাঁচ বছর হলো মারা গেছেন।

নিরুপমা দু হাত দিয়ে চোখ মুখের উপর আঁচলটাকে শক্ত করে চেপে ধরে করুণ দুঃখের মত মৃদু একটা কান্নার স্বর চেপে রাখতে চেষ্টা করেন।

আতঙ্কিত হয়ে ছুটে আসে সুনন্দা। বিজনবিহারীর গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে —কি হলো বাবা? শিগ্গির বল, কি হলো?

বিজনবিহারী তখনি শান্ত হয়ে, আর ফুঁপিয়ে ওঠা বুকের কষ্টটাকে নিজেই হাত বুলিয়ে যেন ঘুমিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকেন—কে চলে গেছে; কিছুই বুঝতে পারলি না নন্দু।

—কে বাবা?

—তোর জেঠু রে নন্দু।

এ কেমন জেঠু? এত বড় মায়ার এক জেঠু পৃথিবীতে কোথাও ছিল, এ সত্য তো কোনদিন শুনতে পায়নি সুনন্দা।

শুনতে পায়নি, জানতে পায়নি, কেউ বলেনি, ভালই ছিল। আজও না শুনতে পেলে ভালই হতো। সুনন্দাকে তা হলে আজ দু' চোখ ভরে এত করুণ একটা বিস্ময়ের বেদনা নিয়ে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকাতে হতো না। বিজনবিহারীকেও এমন করুণ বিস্ময় বলে মনে হতো না। আজ নয়, সেই আট বছর বয়সের একটি দিনে, যেদিন চক্রবর্তী ঠাকুরের মেয়ে অঞ্জলির জন্য দেশের বাড়ি থেকে আমসত্ত্বের মোট্ট একটা পার্সেল এসেছিল, সেদিন নিরুপমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে যে সত্য জেনেছিল সুনন্দা, সেটা হলো একটা অদ্ভুত দুঃখের সত্য। দেশ থাকতেও দেশ নেই; আপনজন বলতে কেউ নেই। না রে নন্দু, তোর বাবার বাড়িতেও কেউ নেই, মামাবাড়িতেও কেউ নেই যে, তোকে আদর করে আমসত্ত্ব পাঠাবে।

সুনন্দা যেন ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করে।—আমার কেমন জেঠু, বাবা?

নিরুপমাও যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন—তোর আপন জেঠু।

সুনন্দা—কিন্তু......।

নিরুপমা—কিন্তু একটা খুব দুঃখের ঝগড়ার জন্য ভাইয়ে-ভাইয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, তাই তোর বাবার মুখে কোনদিন জেঠুর কথা শুনতে পারসনি।

সুনন্দা চলে যায়। খাটের উপরে উঠে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েন বিজনবিহারী। হাত-পা গুটিয়ে, মাথাটাকে কেমন-যেন অলসভাবে এক পাশে এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকেন। মাটিসাহেবের এই শক্ত পোক্ত চেহারাটা কি-অদ্ভুত একটা ছেলেমানুষী চেহারা!

নিরুপমা বলেন—আঃ, এ কি রকমের শোয়া? হাত-পা মেলে একটু টান হয়ে শোও; আমি বাতাস দিই।

চোখ দুটোকে যেন ছলছলিয়ে হাসতে থাকেন বিজনবিহারী। ষাট বছর বয়সের সাদা মাথাটাও অদ্ভুতভাবে দুলতে থাকে। —ইচ্ছে করছে, তোমার পিঠের কাছে মুখ গুঁজে দিয়ে শুয়ে থাকি।

পাখাটা হাতে তুলে নিয়ে জোরে-জোরে বিজনবিহারীর সেই চোখের উপর বাতাস দিতে থাকেন নিরুপমা। চোখ বন্ধ করে আর নিঝুম হয়ে পড়ে থাকেন বিজনবিহারী।

কিন্তু কতক্ষণ? বড়জোর এক মিনিট। নিরুপমা জানেন, বিজনবিহারীর এই এক মিনিটের নিঝুম হয়ে পড়ে থাকা স্তব্ধতা যে ধড়ফড়িয়ে জেগে ওঠারই লক্ষণ। বিজনবিহারীর দুরন্ত মাথাটা যেন স্বপ্নের একটা ছবিকে চকিত চক্ষে একবার দেখে নেবার জন্য এক মিনিটের জন্য শান্ত হয়, তারপরেই ব্যস্তভাবে কাজ খোঁজে।

কাজ হলো সেই সব কাজ; শিউলিবাড়ি ক্লাবের লাইব্রেরী ঘরে বিবেকানন্দের একটা ছবি দরকার। একবার দেখে আসা দরকার; মিসরাবু আর কুলীডিহার মেয়েগুলো মুড়ি ভাজতে পারলো কিনা? দুলাই ঝিলের কাশবোশ কত বড় হলো? স্টেশনের গাঙ্গুলীবাবু খবর দিয়েছেন, কাটোয়া থেকে একজন বাউল এসেছে, চমৎকার গান গায় আর নাচে। বললে কি রাজি হবে না কাটোয়ার বাউল, শিউলিবাড়িতেই একটা আখড়া করে থেকে যেতে?

তা ছাড়া আরও একটা কাজ আছে। ধড়-ফড়িয়ে উঠে বসেন বিজনবিহারী। নিরুপমা বলেন, কি হলো? উঠে পড়লে কেন?

—এখনি একবার ঘুরে আসি।

—কোথায়?

—এই ওখানে। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান কৈলাসবাবু আজ ফুলনবাবুর বাড়িতে এসেছেন।

নিরুপমা আর কোন প্রশ্ন করেন না। প্রশ্ন করে লাভ নেই। জিরোতে জানে না, থামতে জানে না, ঝিমোতে পারে না, এই রকম একটি স্বভাবের মানুষকে আর বেশি প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই।

প্রশ্ন না করলেও জানতে বেশি দেরি হয়নি নিরুপমার। মাত্র আর সাতটা দিন পরে, বাড়ি ফিরেই, যেন একটা কৃতার্থ খুশির উল্লাসের মত হেসে-চেঁচিয়ে হাঁক-ডাক করতে থাকেন বিজনবিহারী।—শুনছো? তুমি কোথায় নিরু? নন্দু আছিস নাকি?

নিরুপমা—কি?

সুনন্দা—কি হলো?

বিজনবিহারী—পুকুরটার নাম কমলসাগর হয়ে গেল।

হেসে হেসে চিকচিক করে বিজনবিহারীর চোখ।—পানীয় জলের জন্য যে পুকুরটা কাটিয়েছে জেলা বোর্ড; তার ঘাট তৈরীর সব খরচ আমি দিয়েছি। কাজেই কৈলাসবাবু আমার কথা রেখেছেন। আমার পছন্দমত নামটাকেই মেনে নিয়েছেন। তুই বুঝলি কিছু, নন্দু?

সুনন্দা—বুঝেছি।

—কি বুঝেছিস? কমলসাগরের কমল মানে কি? পদ্মফুল?

সুনন্দা হাসে—না, মানে হলো ঘেঁটুর নাম।

কমলসাগরের নতুন ঘাটের কাছে ছোট্ট একটি ল্যাম্পপোস্টের মাথায় টিমটিম করে কেরোসিনের বাতি জ্বলে। তার পাশেই দুটো কল্কে ফুলের গাছ। গাছের ছায়ার উপর লুটিয়ে পড়ে আছে বাসী ফুল। আর গাছের সেই ছায়ার কাছে আরও দুটো ছায়া; যাদের ছায়া তাদের চোখে আকাশ ছাপিয়ে উথলে পড়া পূর্ণচাঁদের আলোর মত খুশির আলো ঝলমল করে। মোহিত আর সুনন্দা।

একটা বাসী কল্কে ফুলকে জুতো দিয়ে চেপে আর চটকে দিয়ে মোহিত বলে—এগুলোই বোধহয় হলদে করবী।

সুনন্দা বলে—হবে। আমি তো এগুলোকে কল্কে ফুল বলে জানতাম।

মোহিত হাসে—এখন নতুন করে জানলে তো?

সুনন্দা—হ্যাঁ।

মোহিত—কি?

সুনন্দা—তুমি যা জানিয়ে দিলে।

মোহিত—কি জানলাম?

হেসে ওঠে সুনন্দা—হলদে করবী।

মোহিতও খুশি হয়ে বলে—সত্যিই, শিউলিবাড়ির অশিক্ষার মধ্যে থেকে থেকে তোমার ভাষাও যেন কেমনতর হয়ে গিয়েছিল।

সুনন্দার চোখে যেন বিচিত্র এক কৃতজ্ঞতার হর্ষ চমকে ওঠে।—তুমিই তো শুধরে দিয়েছ।

মোহিতের অভিযোগের কথা আর সুনন্দার কৃতজ্ঞতার কথা, দুইই বর্ণে বর্ণে সত্য। মোহিত যদি শিউলিবাড়িতে না আসতো, আর মাটিসাহেবের এই মেয়েকে এত ভালবেসে না ফেলতো, তবে সুনন্দা আজ শুধু চিঠি লিখে নয়; এই কমলসাগরের ঘাটের এই হলদে করবীর কাছে দাঁড়িয়ে মোহিতের কানের কাছে এমন কথা কখনই বলে দিতে পারতো না, আমি তো একটা মরচে-পড়া লোহা হয়ে এখানে পড়েছিলাম, মোহিত, তুমি পরশমণির মত আমাকে ছুঁয়ে দিয়ে আমাকে সোনা করে দিয়েছ। আমার প্রাণটা যে তোমার কাছে চিরকালের ঋণী হয়ে গেছে।

শিউলিবাড়িতে এসেছে মোহিত, যদিও চিরকাল শিউলিবাড়িতে থাকবার জন্যে আসেনি। তবু এই সত্য আবিষ্কার করেছে মোহিত, চিরকালের আপন করে নেবার মত একটা রূপের ছবি যেন এই শিউলিবাড়িতে আছে। বছরের পর বছর তো শুধু অদ্ভুত একটা ব্যাকুলতার নিঃশ্বাস চেপে আর দূরে থেকেই সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়েছে মোহিত। তারপর একটা বছর ধরে শুধু চিঠি লিখে লিখে যেন একটা স্বপ্নের কাছে আবেদন করেছে।—আমার ভালবাসাকে অপমান করো না সুনন্দা; যা হোক কিছু, একটা উত্তর দিও।

শেষে উত্তর দিয়েছিল সুনন্দা—আপনি দয়া করে আমাকে আর চিঠি লিখবেন না। আমার বড় ভয় করে।

সুনন্দার সেই ভয়ের চিঠিই যেন ভালবাসার পথের ভয়টাকে দূরে সরিয়ে দিল। ক্লাবের সেক্রেটারী মোহিত ঘোষ প্রেসিডেন্টের বাড়িতে এসে, প্রেসিডেন্টের মেয়ের হাতে এক গাদা বই তুলে দিয়ে চলে গেল। সেদিন বুকের সব নিঃশ্বাসের ভার দূর করে দিয়ে, সুনন্দার মুখের দিকে

অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে একটা কথাও বলে দিতে পেরেছিল মোহিত—আমাকে ভয় করবার কোন মানে হয় না সুনন্দা।

ঝুমরা কলোনিতে একটি বাংলো বাড়ি ভাড়া নিয়ে একাই থাকে মোহিত ঘোষ। ক্লাবটার উন্নতির জন্য অনেক চিন্তা করেছে এবং আজও করে। মোহিতের মন যেমন রুচিও তেমন, আর জীবনের ভঙ্গীটাও তেমনই পরিচ্ছন্ন। ক্লাবের জন্য যেটুকু কাজ করে, সেটাও একটা পরিচ্ছন্ন কাজ। মাঝে মাঝে সভা-সম্মেলন ডাকে মোহিত। সভার একমাত্র বক্তাও মোহিত। সেনবাবু আর গাঙ্গুলীবাবু আসেন। চক্রবর্তী আসেন। হেডমাস্টার দীনবন্ধু আর অন্য সব টিচারেরাও আসেন। আসে থার্ড টিচার পুষ্কর দত্ত। ফুলনবাবুও মাঝে মাঝে আসেন। এমন কি রামসিংহাসনও কয়েকবার এসেছে।

—আমাদের এই শিউলিবাড়ির সবই ভাল। সবই আছে এখানে। অভাব শুধু একটি; শিক্ষার অভাব।

মোহিতের বক্তৃতা শুনে ফুলনবাবু মাথা নেড়ে সায় দেন।—ঠিক কথা।

গাঙ্গুলীবাবু বলেন—খুব ঠিক কথা।

—সমস্যা এই যে, শিউলিবাড়ির মন এখনও এক যুগ পিছনে পড়ে আছে। আজকের দিনের চিন্তা ইচ্ছা রুচির কোন খবর রাখে না শিউলিবাড়ি।

একথাটাও বর্ণে বর্ণে সত্য। সভা শেষ হলে দীনবন্ধুবাবু আর সেনবাবু আলোচনা করেন, শিউলিবাড়ি যদি পিছিয়েই না থাকবে, তবে এখানে ঐ এক মোহিতের মত একটি ছেলে ছাড়া দ্বিতীয় এমন একটি ছেলেকে দেখতে পাওয়া যাবে না কেন, যে-ছেলের বিদ্যা বুদ্ধি আর চরিত্র দেখে গর্ব করতে পারে আর অনেক কিছু শিখতে পারে শিউলিবাড়ি?

চক্রবর্তী একটু চাপা-গলায় ফিসফিস করে গাঙ্গুলীবাবুর কাছে কি-যেন বললেন। গাঙ্গুলীবাবু হেসে ফেলেন—সেটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু একটা সমস্যা কি জানেন, পুষ্কর তো ঠিক এরকম শিক্ষিত ছেলে নয়; অন্য যতই গুণ থাকুক না কেন। শিউলিবাড়ির বাঙালীদের মান বাড়াবে, এমন যোগ্যতা পুষ্করের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

গাঙ্গুলীবাবু নিজের চোখে দেখেছেন, মোহিতের ঘরে একটি আলমারি ভর্তি কি-রকমের আর কত রকমের বই আছে।—দেখে আশ্চর্য হয়েছি দীনবন্ধুবাবু, এই বয়সের ছেলে যে এত বিদ্যে ভালবাসে, আমি আর কোথাও দেখিনি মশাই। হ্যাঁ, দেখেছিলাম বটে, আমাদের রামপুরহাটের চাটুজ্জে মশাইকে; ঘরভর্তি বইয়ের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পেনসনী প্রফেসর; মোহিতের মত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের একটা মানুষ তো নয়।

দীনবন্ধুবাবু—মোহিত বোধহয় এম-এ।

গাঙ্গুলীবাবু—হ্যাঁ।

—চাকরিটাও তো বেশ ভাল মাইনের চাকরি।

—না, ঠিক চাকরি নয়। হিসেব অডিট করার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করে মোহিত। ধরুন, শুধু এক সিলুয়াডি কোলিয়ারির হিসেব অডিট করে বছরে দেড় হাজার টাকা পায়। তা ছাড়া লুধিয়া সিমেণ্ট আছে, সিংহানি কোলিয়ারি আছে। সবারই কিছু না কিছু কাজ করে দেয় মোহিত। সব নিয়ে বেশ ভাল আয় হয়।

—বাঃ, চমৎকার ভাগ্যবান ছেলে।

—কৃতী ছেলে।

—কিন্তু......।

—কি?

—একা-একা ওভাবে পড়ে আছে কেন? বাপ-মা নেই?

—তা জানি না।

—কথা হলো, মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দার সঙ্গে সত্যিই কি......।

—তাও জানি না মশাই।

কিন্তু না জানবার আর কি যুক্তি আছে? কে না দেখেছে; সুনন্দা আর মোহিত কমলসাগরের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায় আর গল্প করে? কে না দেখেছে, মাটিসাহেবের বাড়ির বারান্দায় চেয়ারের উপর বসে আছে মোহিত, আর সুনন্দা ভিতর থেকে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বের হয়ে এসে মোহিতের কাছে দাঁড়িয়েছে?

শ্রাবণ শেষ হয়ে ভাদ্রের রোদ আর গুমোট যখন দেখা দিল, আর সারা শিউলিবাড়ির ঘরে ঘরে একটা জ্বরের উৎপাতও দুরন্ত হয়ে উঠলো, তখন ঝুমরা কলোনির প্রণববাবুর স্ত্রীও নিজের চোখে দেখতে পেয়েছেন, মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দা একাই হেঁটে হেঁটে সেই বাংলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকলো, যেটা হলো মোহিত অডিটারের বাংলো, যেটার বাইরের ঘরটা হলো অফিস ঘর; আর ভেতরের ঘরটা......কে জানে কি দেখেছেন বিরাজ মাসিমা......যে জন্যে ঘরটাকে একেবারে বাসরঘরের মত একটা সাজানো ঘর বলে তাঁর চোখে ঠেকেছে।

বিরাজ মাসিমার কাছ থেকেই জানতে পেলেন প্রণববাবুর স্ত্রী, মোহিতের জ্বর হয়েছে; তাই মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দা বার বার মোহিতকে দেখতে আসছে।

—কেন?

—কি করে বলবো বল? সুনন্দার হাতে অবশ্য মস্ত বড় একটা কাচের বাটি দেখলাম। বোধহয় সাগু, কিংবা পথ্যি-টথ্যি পৌঁছে দিল।

—কিন্তু এরকম সেবা-টেবার একটা মানে আছে তো?

—আছে বই কি। থাকলেই ভাল। বিরাজ মাসিমা তাঁর নাতিকে কোলে তুলে নিয়ে আবার ব্যস্তভাবে চলে যান।

কিন্তু ভাদ্রের গুমোট ভেঙে দিয়ে আশ্বিনের আকাশ যখন হেসে উঠছে, শিউলিবাড়ির কোন ঘরে যখন জ্বর-জ্বালা নেই, আর মোহিত অডিটারকেও যখন দেখা যায়, ব্যাডমিণ্টনের ব্যাট হাতে নিয়ে ক্লাবের দিক থেকে ব্যস্তভাবে হেঁটে নিজের বাংলোতে চলে যাচ্ছে, তখন তো কারও বাড়িতে সাগু বা পথ্যি-টথ্যি পৌঁছে দেবার দরকার নেই; তবে কেন মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দাকে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক মোহিতের বাংলোর দিকে যাবার রাস্তাটি ধরে একমনে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে?

বিরাজ মাসিমা বলেন—সবই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

প্রণববাবুর স্ত্রী বলেন—আমিও তো সবই বুঝেছি; কিন্তু বিয়েটা কবে?

বিরাজ মাসিমা—সে-সব কথা এখনো কিছুই শুনতে পাইনি।

মাটিসাহেবের মেয়ের সঙ্গে অনেকবার কথা বলেছেন প্রণববাবুর স্ত্রী, কথা বলেছেন বিরাজ মাসিমা; কিন্তু দুজনেই দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছেন, কি-রকম ভীরু আর লাজুক এই মেয়ে, যার বয়স তো অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশ হবে। যে কাণ্ডটাকে চোখের উপর দেখছেন, সে কাণ্ডটাকে দেখতে একটুও ভাল লাগে না, পছন্দ করেন না; কিন্তু মেয়েটাকে ভাল লাগে। বিরাজ মাসিমা নিজেও বলেছেন, কি আশ্চর্য, মেয়েটার ওপর আমার কিন্তু একটুও রাগ হয় না।

আজও আবার দুজনেই দেখতে পেয়েছেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন, তবু মাটিসাহেবের মেয়ে এতক্ষণ ওখানেই ছিল নিশ্চয়, তা না হলে ওদিক থেকে আসবে কেন?

প্রণববাবুর স্ত্রী হেসে-হেসে জিজ্ঞাসা করেন—লাহাবাবুদের বাড়িতে ঠাকুরের আরতি দেখতে গিয়েছিলে নিশ্চয়; দেখে কেমন লাগলো সুনন্দা?

চমকে ওঠে সুনন্দা—আজ্ঞে না; আমি তো ঠাকুরের আরতি দেখতে যাইনি।

বিরাজ মাসিমা বলেন—না না; সুনন্দা গিয়েছিল নিশিবাবুর ছেলের বউ মালতীর সঙ্গে গল্প করতে।

সুনন্দা—না, মালতীকে আমি তো চিনি না।

প্রণববাবুর স্ত্রী—তবে কোথায় গিয়েছিলে?

সুনন্দা—মোহিতবাবুর কাছে।

বিরাজ মাসিমা—মোহিতের মা এসেছেন বুঝি?

সুনন্দা—না। বলতে গিয়ে সুনন্দার মাথাটা যেন হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়তে চায়। দু' চোখে একটা ভীরু লজ্জার ভার টলমল করে। আর সারা মুখ লালচে হয়ে ওঠে।

প্রণববাবুর স্ত্রী যেন খুশি হয়ে হাসেন—তা বেশ। কিন্তু তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন?

বিরাজ মাসিমা—ভালই তো।

প্রণববাবুর স্ত্রী আবার হাসেন—বিয়েটা

করে হবে, তাই বল! ও'র ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগেই যদি বিয়েটা হয়; তবে তোমার বিয়েতে উলু দিয়ে তারপর কলকাতা ফিরবো।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা।

বিরাজ মাসিমা বলেন—আঃ, মেয়েটাকে আর লজ্জা দিও না হারুর মা; দিন ঠিক হলে জানতেই পারা যাবে। মাস্টারসাহেবের মেয়ের বিয়েতে কি শিউলিবাড়ির কারও নেমন্তন্ন বাদ যাবে? কারও না।

ঝুমরা কলোনির প্রণববাবুর স্ত্রী আর বিরাজ মাসিমার জিজ্ঞাসার কাছে আজ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি সুনন্দা। লাজুক মুখটাকে লুকোতে গিয়ে মাথাটা ঝুঁকে গিয়েছিল; মাথা পেতে যে ভাগ্যটাকে বরণ করে নিতে হবে, যেন তারই একটা শুভ সংকেত জানিয়ে দিতে পেরেছে সুনন্দা; যদিও একটিও কথা বলতে হয়নি। লোকের চোখের কাছে সুনন্দার এই প্রথম স্বীকৃতি। প্রণববাবুর স্ত্রী আর বিরাজ মাসিমার ধারণার উল্লাসটাকেও মাথা পেতে বরণ করে নিয়েছে সুনন্দা।

আশ্বিনের আকাশে অনেক তারা হাসছে। ঝুমরা কলোনির বাতাসে হাস্নুহানার গন্ধ মাঝে মাঝে উতলা হয়ে উঠছে। বসন্তলাল সাহেবের বাড়ির ফটকের আলোর কাছে মাধবীলতার ফুলগুলি যেন ফুটন্ত লালমণিকের থোকা হয়ে দুলছে। কাঁকরের রাস্তাটা ফুরিয়ে যায়, তবু মনে হয় সুনন্দার, ঝুমরা কলোনির হাস্নুহানার গন্ধ যেন এখনও নিঃশ্বাসের বাতাসে ছুটোছুটি করছে।

মোহিতের ভালবাসার কাছে মাথা পেতে দিতে হয়েছে; যেমন আজ, তেমনি সেদিনও, সেই প্রথম, সাগরে বাতি হাতে নিয়ে মোহিতের বিছানার কাছে যেদিন দাঁড়িয়েছিল সুনন্দা। তিন দিনের জ্বরে কি-ভয়ানক রোগা হয়ে গিয়েছিল মোহিতের সেই কালো-কালো বড়-বড় চোখ। কিন্তু মোহিতের সেই জ্বরের চোখে কি-অদ্ভুত পিপাসা ছটফট করে উঠেছিল। কত শক্ত করে হাতটা চেপে ধরলো মোহিত; আর অবুঝের মত কত কথাই না বললো। সত্যি, ভালবাসা একটা অবুঝ পিপাসাই বটে; হাস্নুহানার পাগল গন্ধের চেয়েও উতলা। তা না হলে সাগুর বাটির দিকে না তাকিয়ে সুনন্দার সেই ভীরু মুখের উপর সব পিপাসা ঢেলে দেবে কেন মোহিত? আর সুনন্দাই বা কেন হাত ছাড়িয়ে নিতে পারবে না?

সুনন্দাকে সরে যেতে দেয়নি মোহিত, সুনন্দাও সরে যায়নি। ভয়ে বুক কেঁপে উঠেছিল সুনন্দার; মনে হয়েছিল একটা সর্বনাশের উৎসব যেন সুনন্দার প্রাণটাকে মোহিতের বিছানার উপর লুটিয়ে দিয়ে

কিন্তু মোহিত যখন হেসে-হেসে নিজেরই হাতে সুনন্দার চোখের জল মুছে দিল, তখন সুনন্দার ভিজে চোখও হেসে উঠেছিল। মোহিতের মুখটা যে সান্ত্বনাময় একটা অঙ্গীকারের ফুল, মাধবীলতার ফুলের চেয়েও রঙীন হয়ে; লালমণিকের আভা ছড়িয়ে হাসছে।—আর আমাকে ভয় করলে কিংবা লজ্জা করলে যে আমার ভালবাসাকে অপমান করা হয়, সুনন্দা। ঠিকই, সুনন্দার মনের অবুঝ ভয় আর শরীরের অবুঝ লজ্জাটা বুঝতে পেরেছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে। যার ঘরে চিরকালের ঠাঁই নিতে হবে, তার ঘরে এসে প্রাণটা যদি একটু অসাবধান হয়ে যায়, তবে যাক না; ক্ষতি কি?

স্টেশন রোডের আলোগুলিও যেন আজ বড় বেশি ঝলমল করছে। এগিয়ে যেতে থাকে সুনন্দা। কিন্তু এ কি? কি সুন্দর সুরের একটা বাংলা গানের ভাষা বাতাসে ভেসে আসছে। আশ্বিনের আকাশটাও কি আজ গান গাইতে শুরু করেছে? কে গাইছে? কাদের গান এটা?

মোড় ঘুরে স্টেশন রোড ছেড়ে দিয়ে ধর্মশালা যাবার ছোট রাস্তাটার দিকেই এগিয়ে যেতে সুনন্দা, কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো। মোড়ের উপরে সড়কের পাশের একটি ঘরে ফুল আলো আমপাতা আর চাঁদমালায় সাজানো একটা উৎসব যেন গান গাইছে। ছোট্ট একটা দোকান ঘর। কিসের দোকান?

গ্রামোফোন আর রেকর্ডের একটি দোকান। দুটো আলমারি আর একটা টেবিল। চারটি চেয়ার। এক গোছা ধূপকাঠিও পুড়ে পুড়ে সুগন্ধের ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। টেবিলের উপর একটা ঝকঝকে গ্রামোফোন গলা খুলে গান গাইছে।

—আসুন না?

অদ্ভুত স্বরের একটা আহ্বানের ভাষা যেন আচমকা বেজে উঠেছে। চমকে ওঠে সুনন্দা।

সুনন্দার একেবারে চোখের কাছে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে কথা বলছে রমাসুন্দরী বেঙ্গলী গার্লস স্কুলের থার্ড টিচার পুষ্কর দত্ত।—আজ দোকান প্রতিষ্ঠা হলো। এই তো কিছুক্ষণ আগে পুজো শেষ করে চক্রবর্তী ঠাকুর চলে গেলেন।

সুনন্দাও হাসতে চেষ্টা করে—গানের রেকর্ডের দোকান বোধহয়।

পুষ্কর—হ্যাঁ। বাংলা হিন্দী এমন কি ইংরেজী রেকর্ডও আছে। তিনটে রেকর্ড কোম্পানির এজেন্সী পেয়েছি। সিন্দরীর সাহেবরা আজই প্রায় তিন শো টাকার রেকর্ডের অর্ডার দিয়েছেন।

সুনন্দা—আপনি কি তবে স্কুলের.........।

পুষ্কর—না না, স্কুলের কাজ তো ...। আমার দুটি ভাই আছে; ওরা সন্ধ্যাবেলা এসে ওসব ছুটি দেব। দেখা যাক, কি হয়।

সুনন্দা—আচ্ছা, আমি চলি।

পুষ্কর—দোকানটা একটু দেখবেন না?

সুনন্দা—না।

ব্যস্তভাবে চলে যায় সুনন্দা। কিন্তু রাস্তাটা কি বিশ্রী অন্ধকারে ভরে রয়েছে। পুষ্করের দোকানের আলোর দিকে এতক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকাটাই ভুল হয়েছে; তা না হলে চোখ দুটো এত ধাঁধিয়ে যেত না; আর চোখের সামনের এই রাস্তাটাকে এত অন্ধকারে ঢাকা একটা শূন্যতা বলেও মনে হতো না।

বাড়ি ফিরে গিয়ে অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে থেকে, তারপর অন্যমনার মত ঘরের ভিতরে অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে, যখন জানলাটার কাছে এগিয়ে এসে, আর অদ্ভুত একটা ক্লান্তির আবেশে অলস হয়ে যাওয়া হাত দুটোকে কোন মতে তুলে নিয়ে খোঁপা খুলতে থাকে সুনন্দা, তখন বাইরের বারান্দাতে একটা চকিত উল্লাসের শব্দ হো হো করে হেসে ওঠে। যেন একটা খুশির আবেগে গলে গিয়ে হাসছেন আর কথা বলছেন বিরাজবিহারী। সুনন্দার আনমনা চোখের দৃষ্টিতে দুঃসহ আর বিশ্রী

একটা সন্দেহও চমকে ওঠে। পুষ্কর দত্ত এসেছে বোধহয়।

যে এসেছিল সে এতক্ষণ চলে গেছে। তাই ঘরের ভিতরে ঢুকলেন বিজনবিহারী; আর সুনন্দারই দিকে তাকিয়ে যেন বুকভরা একটা খুশির হাসি উথলে দিলেন—পুষ্কর আমাকে উপহার দিয়ে গেল নন্দ; রামপ্রসাদী গানের পাঁচটা রেকর্ড।

রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে থাকেন বিজনবিহারী—ওঃ, পুষ্কর আমার খুব উপকার করলো। এতদিন ধরে রাগ করে শুধু ইংরেজী গানের যত হালালালা শুনেছি, কান পচে গিয়েছে।

তখনি গ্রামোফোনটার কাছে বসে রামপ্রসাদী গানের রেকর্ড বাজাতে শুরু করেন বিজনবিহারী। —আঃ, বলিহারি, কী মিষ্টি গান! এইবার পেটভরে বাংলা গান শোনা যাবে।

রামপ্রসাদী গান কখন থেমেছে, বোধহয় বুঝতে পারেনি সুনন্দা। কতক্ষণ ধরে চুপ করে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আশ্বিনের আকাশের তারা দেখেছে, তাও জানে না। এক গাদা জোনাকী যখন সুনন্দার গায়ের উপর পড়ে হুটোপুটি শুরু করে, তখন আনমনা আবেশটাই হঠাৎ চমকে উঠে ভেঙ্গে যায়। বুঝতে পারে সুনন্দা, বাবা খেতে বসেছেন; আর, মার সঙ্গে গল্প করছেন।

শুনতে একটুও ভাল লাগে না যে গল্প, সেই গল্পই শুরু করেছেন বাবা। পুষ্কর দত্তের যত কীর্তির আর বাহাদুরীর গল্প। —বেশ জোর আছে ছেলেটার; জেদও আছে, তেমনি খাটতেও পারে। এ ছেলে একদিন উন্নতি করবে।

জোরে একটা ঢেকুর তুলেছেন বিজনবিহারী। বুঝতে পারে সুনন্দা, বাবার খাওয়া শেষ হলো। কিন্তু, কি আশ্চর্য, গল্প শেষ করছেন না বাবা।

বিজনবিহারী বলেন—গত বছর কালীপুজোর সময় চমৎকার একটা কাণ্ড করে বসেছিল পুষ্কর। কোন মুণ্ডা গাঁয়ের একটাও মানুষ যেন কালীপুজো দেখতে না আসে, সে-জন্যে মিশনের ছোট ফাদার ভয়ানক জবর একটা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুষ্কর নিজে গিয়ে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে পাঁচশো মুণ্ডা ছেলে-মেয়ের একটা মিছিল নিয়ে এসে কালীবাড়ির আঙিনায় হাজির করেছিল। পুষ্করের ওপর মারধরেরও একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ঘাবড়ায়নি পুষ্কর।

এই পুষ্করী রামায়ণ এখন থামলে হয়। সুনন্দার চোখে একটা অস্বস্তির ভ্রুকুটি ছটফটিয়ে ওঠে। বারান্দায় গিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে; তাহলে এই গল্পের কোন শব্দ আর কানের কাছে পৌঁছতে পারবে না।

কি আশ্চর্য, মা'ও যে হেসে হেসে একটা অদ্ভুত কথা বলছেন—পুষ্করের স্বভাবটা দেখছি প্রায় তোমারই মত।

আর শুনতে ইচ্ছে করে না। নিরুপমার মৃদু হাসির শব্দটাও যেন মাইনর স্কুলের থার্ড টিচারের প্রশস্তির গুঞ্জন। বাবা আর মা দুজনের কেউই একটু বুঝে দেখছেন না যে, আজ এভাবে পুষ্কর দত্তের নামে এত গৌরবের কথা বললে যে ওদিকের একটা মানুষকে অপমান করা হয়। ভয় করে সুনন্দার, বারান্দায় গিয়ে বসে থাকলেও কোন লাভ হবে না। হয়তো শিউলিগুলোও পুষ্করের নামে জয়ধ্বনি করে সুনন্দার অস্বস্তির জ্বালাটাকে আরও দুঃসহ করে দেবে।

কমল সাগরের নতুন ঘাটের কাছে হলদে করবীর ছায়ার পাশে দাঁড়িয়ে মোহিতের সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে যেন একটা অস্বস্তির হাত এসে সুনন্দার মুখ চেপে ধরে আর ভাষা ভুল করিয়ে দেয়। না, এখানে আর নয়। জল নেবার জন্য যেখানে মানুষের ভিড়ের আনাগোনা লেগেই আছে, সেখানে ভালবাসার মন মুখ খুলে কথা বলতে বাধা পায়, বলতে পারে না।

কিন্তু আশ্চর্য, এই দু'মাসের মধ্যে কতবার কমল সাগরের ঘাটের এই হলদে করবীর কাছে দাঁড়িয়ে মোহিতের সঙ্গে গল্প করেছে সুনন্দা, কিন্তু কই, এরকম একটা অস্বস্তির কাঁটা তো সুনন্দার মনে বিঁধেনি? ভাবতে একটা রহস্য বলেই মনে হয়। কিসের অস্বস্তি কোথা থেকে আসছে?

ঘাটের পথে যারা আনাগোনা করে, তারাও কি কিছু জানে না? আর দেখেও কি কিছু বুঝতে পারে না? হতেই পারে না। আজ শিউলিবাড়ির কে না জানে যে, মাটিসাহেবের মেয়ের সঙ্গে মোহিত ডাক্তারের ভাব হয়েছে? খবরটা যে শিউলিবাড়ির সব আলোছায়াকে খুশির হাসিতে মুখর করে দেবার মত খবর। কিন্তু শিউলিবাড়ি যেন প্রচণ্ড একটা ধৈর্য ধরে খুশির হাসি চেপে রেখেছে। ঘাটের পথের লোকজন শুধু একবার তাকিয়ে দেখে আর চলে যায়; হলদে করবীর ছায়ার কাছে যেন কোন ঘটনাই নেই। খবরটা শুনে যার আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবার কথা, সেই চাচিজী, বিন্ধ্যাচলীও তো খবরটা জেনেছে। কিন্তু কই, চাচিজী তো একদিনও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল না। নন্দুয়া বেটির গলা জড়িয়ে ধরে গান গেয়ে উঠলো না। সন্দেহ হয়; মাটিসাহেবের মেয়ের সৌভাগ্যের খবর শুনে খুশি না হয়ে, বরং, যেন একটা হিংসের জ্বালা চাপা দেবার জন্য গম্ভীর হয়ে রয়েছে শিউলিবাড়ি।

সুনন্দা হাসে—চল, এখানে আর ভাল লাগে না।

মোহিত—কেন?

সুনন্দা—মনে হচ্ছে আমাদের দু'জনকে দেখতে ওদেরও ভাল লাগছে না।

মোহিতও হাসে—তাতে আমাদের কোন্ স্বর্গের বাতি নিভে যাবে?

সুনন্দা—তা তো বটে, কিন্তু বুঝতে পারছি না।

—কি?

—আমাকে কেউ হিংসে করছে, না তোমার ওপর কেউ রাগ করছে?

—তোমাকে হিংসে করবার একটা মানে হয়; কিন্তু আমার ওপর রাগ করবার তো কোন মানে হয় না।

—কেন?

—আমি কি তোমাদের শিউলিবাড়ির কারও চেয়ে ছোট?

—ছিঃ, তুমি আবার কেন রাগ করে কথা বলছো? কে না জানে যে, বাবা তো নিজের মুখে তিনবার বলেছেন, তুমি হলে শিউলিবাড়ির গর্ব।

মোহিত—আমার কি মনে হয় জান? সবাই একটু বেশি আশ্চর্য হয়েছে; যাকে বলে, একটু হতভম্ব হয়ে গেছে।

সুনন্দা—তাই তো মনে হয়।

মোহিতের চোখ জ্বলজ্বল করে হাসে—কিন্তু তুমি কি বল, সেটা তো জানতে পেলাম না।

সুনন্দার চোখ দুটো যেন একটা কৃতজ্ঞ মায়ার ভার সামলাতে না পেরে ছলছল করে। —আমাকে আর কেন মিছে জিজ্ঞেসা করছো? কলকাতার মেয়ের মত লেখাপড়া জানলে হয়তো বলে দিতে পারতাম; কিন্তু বলতে জানি না বলেই বলতে পারছি না। তুমিও জান না, আমাকে ভালবেসে তুমি আমাকে কত বড় মান দিয়েছো!

হেঁটে হেঁটে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে সুনন্দা আর মোহিত। এখান থেকে কমল সাগরের ঘাটের কাছের হলদে করবীটা দেখা যায় না, স্টেশন রোডের কোন দোকানের কলরবও শোনা যায় না। দু'পাশে শাল সেগুন আর দেওদারের বীথিকা, মাঝখানে ছায়াভরা রাঁচি রোড এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ঘুরে-ফিরে উধাও হয়ে গিয়েছে। যেন নিরিবিলি জগতের একটা ছায়াপথ পড়ে আছে এখানে। ভালবাসার দুটো হাত যদি এখানে, এই বিকেলের আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাউকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তবু উঁকি দিয়ে দেখবার মতও কোন বাধা এখানে নেই। সুনন্দাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মোহিত। সুনন্দা হাসে—তবু কিন্তু বুঝতে পারছি না, তুমি কেমন করে আমাকে এত ভালবাসতে পারলে?

মোহিত—এক কথায় বলে দিতে পারি।

সুনন্দা—বল।

মোহিত—তুমি শিউলিবাড়ির সেরা মেয়ে।

সুনন্দা—শিউলিবাড়ির সেরা মেয়ে আমি নই; কিন্তু তোমার তাই মনে হয়েছে।

মোহিত—হ্যাঁ। একই কথা হলো। এবার তুমি বল তো, শুনি।

সুনন্দা—কি?

মোহিত—আমাকে তুমি ভালবাসলে কেন?

সুনন্দা—এক কথায় বলে দিতে পারি।

মোহিত—বল।

সুনন্দা—আমারও মনে হয়েছে।

মোহিত—কি মনে হয়েছে?

সুনন্দার চোখ-মুখ ছাপিয়ে যেন একটা সুস্মিত অনুভবের আনন্দ উতলা হয়ে ঝরে পড়তে থাকে।—তুমি বাংলা দেশের সেরা ছেলে।

ভাবতে পারেনি সুনন্দা, সেই অস্বস্তিটা শুধু একবার এসে আর রামপ্রসাদী গানের পাঁচটা রেকর্ড বাবাকে উপহার দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে যাবে, আর কখনও আসবে না। বরং দুটো দিন ধরে সন্দেহময় একটা আতঙ্ক ভুগতে হয়েছিল। রামপ্রসাদী গানের রেকর্ড একটা চমৎকার ছুতো; সেই ছুতো ধরে এবার থেকে হয়তো রোজই আসবে পুষ্কর দত্ত। হয়তো শিউলির ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে; হয়তো মাটিসায়েবের মেয়ের মুখ দেখবার জন্যে পিপাসিতের মত জানালাটার দিকে তাকিয়ে থাকবে।

কিন্তু আসেনি পুষ্কর। সুনন্দার উদ্বিগ্ন মনটা যেন একটা হাঁপ ছেড়ে হালকা হয়ে গিয়েছে। আতঙ্কের কথাটা মনে পড়লেই মনটা যেন একটা লজ্জাও পেয়েছে। আকাশে মেঘ নেই, তবু বজ্রপাতের ভয়ে ভীরু হয়ে গিয়েছিল সুনন্দার প্রাণটা। এত বড় অস্বস্তিটা যে সত্যি একটা চমৎকার ঠাট্টা।

কিন্তু কি আশ্চর্য, স্বস্তিটাও যেন একটা চমৎকার শূন্যতা। চমকে ওঠে সুনন্দা। ভাবনাটার বেহায়াপনা দেখে নিজেরই উপর রাগ করে ছটফটিয়ে ওঠে সুনন্দার একটা নিশ্বাসের বাতাস। কুৎসিত ভাবনাটা যেন মোহিতের ভালবাসাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠকাচ্ছে; চোর যেমন লুকিয়ে লুকিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত মানুষের মাথার কাছ থেকে সিন্দুকের চাবি নিয়ে সরে যায়।

—মা শুনছো? হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাক দিতে গিয়েই গলার স্বরের আক্রোশটাকে সামলে নিয়ে, একটা লজ্জাতুর ব্যাকুলতার গুঞ্জনের মত মৃদুস্বরে ডাক দেয় সুনন্দা।

নিরুপমা—কি হলো?

সুনন্দা—কই, তোমরা যে কিছু বলছো না।

নিরুপমা—কি?

সুনন্দা—মোহিতবাবুকে কি তোমরা কেউ কিছু বলবে না?

নিরুপমা হাসেন; সুনন্দার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন—নিশ্চয় বলা হবে। তোর বাবার ইচ্ছে, বিয়েটা এই অঘ্রানেই চুকে যাক।

বাইরের বারান্দাতে একটা চেয়ার যেন ব্যস্তভাবে শব্দ করে ছটফটিয়ে উঠলো। তার পরেই চেঁচিয়ে উঠলো একটা উচ্ছল খুশির কণ্ঠস্বর। —হ্যাঁ, অঘ্রান মাসই সব চেয়ে ভাল মাস, নিরু। নলেন গুড় না পাওয়া যাক, খেজুরের নতুন রস তো পাওয়া যাবে। কোন অসুবিধে হবে না।

হেসে হেসে চলে যাচ্ছিলেন নিরুপমা। সুনন্দা বাধা দেয়—তুমি আজ আবার রান্নাঘরে ঢুকেছ কেন? তোমার না কাশি বেড়েছে?

নিরুপমা—তাতে কি হয়েছে?

সুনন্দা—না, তুমি চুপটি করে বসে থাক।

নিরুপমা—তুই রাঁধবি?

সুনন্দা—হ্যাঁ।

নিরুপমা—না; আজ বাদে কাল মেয়ের বিয়ে; মেয়ে আমার হাঁড়ি ঠেলতে চাইছেন। তা হবে না।

চেঁচিয়ে উঠলেন বিজনবিহারী—কখখনো না, নিরু। নন্দুকে এখন আর ওসব পাগলামি করতে দিও না। উনুনের আঁচ ভয়ানক বিশ্রী জিনিস, মুখের রং একেবারে কালচে করে দেয়।

বাইরের বারান্দাতে যেন একটা কলরবের ঝড় উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। এক গাদা ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ের কলরব। কলরবের ভাষাটা যেন একটা অভিযোগের ভাষা; কিংবা এক গাদা অভিমানের কাকলী।

চমকে ওঠে সুনন্দা। কলরবের মধ্যে সেই দুঃসহ অস্বস্তির নামটাই বার বার বেজে উঠছে—পুষ্করদা! পুষ্করদা!

কি হয়েছে? কারা এসেছে? ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় সুনন্দা। দেখতে পায়, যারা এসেছে, তারা বয়সে ও চেহারায় শিউলিবাড়ির জোরের পাখির মতই একগাদা কলরবের প্রাণ। সাত-আট-নয়-দশ বছরের বেশি বয়স কারও নয়; নতুন বস্তির, স্টেশন রোডের, আর কালীতলার যত ছেলে আর মেয়ে। চক্রবর্তী ঠাকুরের ছোট মেয়ে জয়ন্তী আছে, হেডমাস্টার দীনবন্ধুবাবুর মেয়ে মনোরমাও আছে। এমন কি আমাদের বাড়ির তিন-চারটে মেয়েও আছে।

শিউলিবাড়ি ক্লাবের প্রেসিডেণ্টের কাছে একটা অভিযোগ নিয়ে এসেছে ওরা। জয়ন্তী বলে—মোহিতবাবু বললেন, ক্লাবে আমাদের থিয়েটার করা চলবে না।

বিজনবিহারী—কিসের থিয়েটার?

মনোরমা বলে—পুষ্করদা আমাদের জন্যে একটা নাটক লিখে দিয়েছেন।

—অ্যাঁ? চমকে উঠেই হেসে ফেলেন বিজনবিহারী।—ভালই তো।

জয়ন্তী—কিছু ভাল হলো না। মোহিত বাবু বারণ করে দিয়েছেন।

বিজনবিহারী—বুঝলাম না।

মনোরমা—এবার পুজোতে আমরা ক্লাব-বাড়িতে থিয়েটার করবো ঠিক করেছিলাম, কিন্তু মোহিতবাবু বললেন, না, হবে না।

বিজনবিহারী—হবে হবে। কেন হবে না? নিশ্চয় হবে। তোমরা এখন বাড়ি যাও জয়ন্তী, আমি সব ঠিক করে দেব।

বিষণ্ণ অভিযোগের কলরব সেই মুহূর্তে খুশির কলরব হয়ে ছুটে চলে গেল। আর, ঘরের ভিতরে ঢুকে, জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে এইবার সুনন্দাও বুঝতে পারে; সুনন্দার সৌভাগ্যের সব কলরব স্তব্ধ করে দেবার জন্য একটা চক্রান্ত জেগে উঠেছে, তার নাম পুষ্কর দত্ত। রমাসুন্দরী মাইনর স্কুলের থার্ড টিচারের ফুসফুসে বেশ তো সাহস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মোহিতের বিদ্যাবুদ্ধির উপর বিদ্রূপ করে একটা নাটকই লিখে ফেলেছে। ভুল করেছে, ভয়ানক ভুল করেছে পুষ্কর দত্ত। আকাশ দিয়ে [illegible] চাঁদকে মাটির ধুলোতে নামিয়ে দেবে, এটা পাগলের কল্পনার আশা।

চক্রান্তের চেষ্টাটার রকম দেখে হেসে ফেলাও উচিত নয়। বোকা ছেলের লোভ যেমন বাগানের বাইরের একটা গাছের ফল ধরবার জন্য ভাঙা নড়বড়ে পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে আর হাত বাড়িয়ে আঁকুপাকু করে, এ-যেন তেমনই একটা করুণ লোভের চেষ্টা। এ চেষ্টাকে হেসে তুচ্ছ করাই উচিত।

সত্যিই, [illegible] হাসির দিকে ঘরের ভিতরে এই বদ্ধতার ভেতর থেকে হঠাৎ ব্যস্তভাবে বের হয়ে যায় সুনন্দা। কালীতলা পার হয়ে ছোট নদীর কিনারায় এসে বটের ছায়ার কাছে একলা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে। নুড়ি আর বালুর উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা রোগাটে স্রোত; স্রোতের জলের সঙ্গে একটা একলা জবা ফুল [illegible] ভেসে চলে যাচ্ছে। সুনন্দারও প্রাণটা যেন একটা একলা স্বপ্নের মত কোন নিরিবিলি সুন্দর জগতে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে চাইছে। আর ভাবতে ভাল লাগে না। সব ভাবনার উৎপাত থেকে ছাড়া পেতে চায় সুনন্দার ক্লান্ত প্রাণ। সুনন্দার মুখের এই হাসিটাও যেন হাঁপিয়ে পড়া একটা ক্লান্তির করুণ হাসি।

বাড়িতে ফিরে এসেই কিন্তু চমকে উঠতে হয়। সুনন্দার এই ক্লান্ত হাসির মুখটাও বিরক্ত হয়ে কেঁপে ওঠে। বুকের ভিতরে সেই অস্বস্তিটা আবার চিৎকার করে উঠতে চায়। কারণ, বিজনবিহারীর একটা

উৎফুল্ল হাসির শব্দ যেন চিৎকার করে উঠলো—পুষ্কর এসেছিল।

সুনন্দা—কেন?

—পুষ্কর খুব লজ্জিত।

—কেন?

—ক্লাব বাড়িতে থিয়েটার করবার জন্য পুষ্কর কাউকে পরামর্শ দেয়নি। জয়ন্তী আর মনোরমা, দুষ্ট দুটো নিজেরাই মতলব করে মোহিতকে গিয়ে ধরেছিল।

—কিন্তু নাটকটা তো পুষ্করবাবু লিখে দিয়েছেন।

—হ্যাঁ, সেজন্যে পুষ্কর বেচারা আরও লজ্জিত।

—কেন?

—পুষ্করের লেখা নাটক পড়ে মোহিত হেসেছে।

—তা, হাসবার মত ব্যাপার হলে মানুষ না হেসে পারবে কেন?

—হ্যাঁ, পুষ্করও সেটা বোঝে, সেজন্যেই জয়ন্তীকে বার বার বলে দিয়েছিল পুষ্কর, ওরা যেন পুষ্করের লেখা নাটক-ফাটক নিয়ে গিয়ে মোহিতকে বিরক্ত না করে।...এ কি? তোর চোখ-মুখ এ রকম ছলছল করছে কেন? খুব ঠান্ডা লাগিয়েছিস্ বুঝি?

সুনন্দা—হ্যাঁ।

বিজনবিহারী—গরম জলে চান করবি।

নিরুপমা তাঁর রান্নার ব্যস্ততা ছেড়ে দিয়ে ব্যস্তভাবে ছুটে আসেন। সুনন্দার কপালে হাত রাখেন—ঠিকই তো, মেয়ের কপাল যে ছমছম করছে! জ্বর বলেই তো মনে হচ্ছে।

বিজনবিহারী—ঠিক আছে; আমি তো এখনই বের হব, যাবার পথে সেনবাবুকে একটা খবর দিয়ে যাব, যেন এখনই এসে একবার দেখে যান।

ঠান্ডা লেগেছে ঠিকই, আর জ্বরও হয়েছে নিশ্চয়; কিন্তু শুধু সেই জন্যেই কি সুনন্দার চোখ-মুখ ছলছল করছে? গায়ে চাদর জড়িয়ে বিছানার উপর নিঝুম হয়ে পড়ে থাকলেও, প্রশ্নটা যেন ধূর্ত একটা ঠাট্টার মত সুনন্দার কানের কাছে ফিসফিস করছে। ছি ছি, পুষ্কর দত্তের চক্রান্তটা যে সুনন্দার একটা মিথ্যে রাগের মিথ্যে কল্পনা। পুষ্কর দত্ত যে নিছক একটা চেষ্টা-হীন নিরীহতা। একটা অলস অসার ছায়া মাত্র। মার্টিসাহেবের মেয়ের সৌভাগ্যের পথে কাঁটা পেতে রাখবার কোন গরজ ওর নেই।

মার্টিসাহেবের মেয়ের মুখের দিকে তাকাবার কোন গরজও কি কোনদিন ওর চোখে দেখা দিয়েছিল? কোনদিনও না। বছরের বারো মাসের মধ্যে অন্তত বারো বার মার্টিসাহেবের মেয়ের সঙ্গে থার্ড টিচার পুষ্কর দত্তের মুখোমুখি দেখা হয়েছে। কিন্তু সুনন্দার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাকুক, সুনন্দার মুখটাকে একটু ভাল করে দেখবার জন্যও তার চোখে কোন লোভের চেষ্টা ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। সেদিনও, রুদ্রকিশোর শীল্ড বুকে জড়িয়ে ধরে যখন মিছিলের আগে আগে হেঁটে চলে গিয়েছে ক্যাপটেন পুষ্কর দত্ত, তখনও তো দেখতে পায়নি সুনন্দা, সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কোন ছবির মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করেছে পুষ্কর দত্ত। এমন মানুষকে সন্দেহ করাও যে চোরের রাগের মত একটা বেহায়াপনা। রাগ করে নিজের মনটাকেই ঘেন্না করতে ইচ্ছে করে। আর জোর করে এই ঘেন্নাটাকেও ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। বিছানা ছেড়ে ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুনন্দা। গরম জল হয়ে গিয়ে থাকলে এখনই স্নান করে নিতে হবে।

সেনবাবু এসেছেন।—না না, কিচ্ছু ভাববার নেই; সামান্য সর্দি জ্বর।

দশটা বড়ি দিয়ে চলে গেলেন সেনবাবু। কিন্তু দশটা দিন পার হয়ে গেলেও, আর সুনন্দার চোখ-মুখের ছলছলে ভাব কেটে গিয়ে বেশ খোলা-মেলা একটা খুশির ভাব হেসে উঠলেও, সর্দি-জ্বরের ভাবটা যেন সুনন্দার গা থেকে ছেড়ে যেতে চায় না।

এই দশদিনের মধ্যে তিনবার এসেছে মোহিত। চাদর গায়ে জড়িয়ে আর বাইরের বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে মোহিতের সঙ্গে কথা বলেছে সুনন্দা। মোহিতকে চা এনে দিতেও ভুলে যায়নি সুনন্দা। আর মোহিতের দু' চোখের ব্যাকুলতাও যেন বিস্মিত হয়ে বার বার সুনন্দার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছে।—কি আশ্চর্য সুনন্দা!

—কি?

—জ্বরটা যে তোমাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

সুনন্দা হাসে—তাহ'লে জ্বরটা আরও দশটা দিন থাকুক, আরও সুন্দর হয়ে উঠি।

মোহিত বলে—না, তা নয়; তোমাকে দেখতে সত্যিই অদ্ভুত লাগছে, একেবারে নতুন মুখ বলেও মনে হচ্ছে; তাই মনের কথাটা বলেই দিলাম।

সুনন্দার মুখটা হঠাৎ বড় বেশি গম্ভীর হয়ে যায়, আর, যেন একটা দুরন্ত নিঃশ্বাসের আবেগ চেপে চেপে কথা বলে সুনন্দা—বাবার কাছে তুমি এখনও কথাটা বলছো না কেন?

সুনন্দার কথাটার মধ্যে যেন একটা অধীরতার ঝাঁজ লুকিয়ে আছে। বোধহয় সেটা মোহিতের কানেও ঠেকেছে। তাই বোধহয় মোহিতের মুখটা একটু করুণ হয়ে যায়।—তুমি যেদিন বলতে বলবে, সেদিনই বলে দেব।

—তাহ'লে আজই বল।

—বেশ।

চুলগুলি রুক্ষ হয়ে ফেঁপে উঠেছে। চোখ দুটো বেশ চকচকে হয়েছে। কাজল পড়েনি, শুধু চোখের কোল জুড়ে একটা কাজলা ছায়ার কালিমা, মুখটা একটু বেশি ভরাট, চোখের চাহনিটা ভার ভার; আর ঠোঁট দুটো বড় বেশি লালচে। আয়নার দিকে তাকাতে গিয়ে সুনন্দার নিজেরই চোখে মুখটাকে খুবই নতুন-নতুন ঠেকেছে। আর, ছোট্ট একটা বিস্ময়ের নিঃশ্বাসও বুকের ভিতরে ঠেকেছে। না, জ্বরের জন্য নয়; কোন সন্দেহ নেই, শরীরটারই একটা রহস্যের ভয়ে সুনন্দার মুখটা ভীরু হয়েছে বলেই এরকম সুন্দর হয়ে উঠেছে।

মোহিত যখন চলে যায়; তখন দূরের সিংহানী পাহাড়ের গায়ে ক্লান্ত বিকালের রোদ লালচে হয়ে গলে পড়েছে। জ্বরের শরীর চাদরে জড়িয়ে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছে সুনন্দা, সেটা সুনন্দার চোখও যেন বুঝতে পারছে না।

—কি ভাবছো নন্দু বহিন? যেন কল-কলিয়ে হেসে কথা বলছে একটা খুশির ঝর্ণা। চমকে ওঠে সুনন্দা।—তুমি কবে এলে রাজুদি?

রাজমোহিনী হাসে—আজ এসেছি। কিন্তু এ কি শুনেছি নন্দু? ঠিক তো?

সুনন্দা—ঠিক।

রাজমোহিনী আরও খুশি হয়ে হাসে।—কিন্তু এরই মধ্যে মুখটা এত সুন্দর করে ফেললে কেমন করে? দেখলে যে মহাদেবও পাগল হয়ে যাবে।

—কি বললে?

রাজমোহিনী ফিসফিস করে হাসে—বলছি, বিয়ের আগে তো মুখ এমন সুন্দর হয় না, বিয়ের পরে হয়।

চমকে ওঠে সুনন্দা—কি বললে?

—বলছি; বরের কথা ভেবেই যদি এত রূপ খুলে যায়, তবে বরের গা ছোঁয়ার পর কী রূপই না খুলবে।

সুনন্দার চোখ দুটো যেন স্তব্ধ হয়ে রাজমোহিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু রাজমোহিনীর খুশির মুখরতা থামতে চায় না।—রাগ করিস না নন্দু বহিন। সত্যি তোকে কোনদিন দেখতে এত সুন্দর লাগেনি।

চলে যায় রাজমোহিনী। বিকালের আলো সরে গিয়ে চোখের সামনে যে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে উঠছে, সেটাও বোধহয় সুনন্দার চোখে পড়ছে না।

নিরুপমা ডাকলেন—ভেতরে আয় নন্দু।

ঘরের ভিতরে গিয়ে আলোর সামনে একটা মোড়ার উপর বসে থেকেও যেন আলোটাকে

দেখতে পাচ্ছে না সুনন্দার উদাস দুটো কালো চোখ। নিরুপমা তিনবার এসে তিন বার কপালে হাত বুলিয়ে চলে গেলেন। সেই তিনটে স্নিগ্ধ ছোঁয়ার স্বাদও বোধহয় অনুভব করতে পারেনি সুনন্দার তপ্ত কপালটা। কিন্তু কান দুটো হঠাৎ চমকে উঠেছে। বাইরের বারান্দায় কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন বিজনবিহারী, আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে হেসে উঠছেন।

বুঝতে আর ভুল হবে কেন? পুষ্কর দত্ত এসেছে। পুষ্কর দত্ত তার একলা জীবনের যত সব সাহস আর চেষ্টার গল্প বলছে। এসব গল্পের সঙ্গে সুনন্দার অদৃষ্টের কোন সম্পর্ক নেই। এসব গল্প শোনবার জন্য সুনন্দার মনে এক ছিটে কৌতূহলও নেই। সেদিন রামপ্রসাদী গানের রেকর্ড এনেছিল; আজ হয়তো মীরাবাঈয়ের গানের রেকর্ড নিয়ে এসেছে। স্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্টকে খুশি করছে স্কুলের থার্ড টিচার। মুরুব্বীকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ঘুস দিয়ে খুশি করছে একটা উন্নতির মতলব। মার্টিসাহেবের মেয়ের জীবনের আনন্দকে বিরক্ত করবার কোন মতলব নয়।

বাইরে বারান্দাটা যখন নীরব হয়ে যায়, তারপর বোধহয় একটা মিনিটও পার হয় না; ঘরের ভিতরে ঢুকেই খুশির স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন বিজনবিহারী—একটা সুখবর আছে, নিরু!

নিরুপমা—বল।

বিজনবিহারী—পুষ্কর ঠিক আমার মতই একটা কাণ্ড করেছে।

—কিসের কাণ্ড?

—বর্ধমান থেকে এক বন্ধু ডাক্তারকে আনিয়ে শিউলিবাড়িতে বসিয়েছে পুষ্কর।

—ডাক্তার?

—হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। নতুন বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়ে ওষুধের একটা দোকানও করে ফেলেছে রাজীব ডাক্তার। পুষ্কর খুব সাহায্য করেছে। আজ, এই সন্ধ্যাতেই রাজীব ডাক্তারের ওষুধের দোকানে প্রতিষ্ঠার পুজো হয়ে গেল।

—ভাল হলো। রাজীব ডাক্তারের উন্নতি হোক।

—আরও ভাল কথা, পুষ্কর দুটো ওষুধ দিয়ে গেল। একটা ওষুধ সকালবেলার জন্যে, একটা সন্ধ্যাবেলার জন্যে।

—কিসের জন্যে?

—সুনন্দার জন্যে। রাজীব ডাক্তার বলেছে, দুদিনের মধ্যে সর্দিজ্বর ভাল করে দেবে এই ওষুধ।

বিজনবিহারীর হাতে সত্যিই দুটো শিশি। আলো পড়ে ছোট্ট কাচের শিশি দুটোও যেন ঝিকঝিকিয়ে হাসছে। কিন্তু সুনন্দার আতঙ্কিত চোখ দুটো শুধু কেঁপে কেঁপে দুটো নির্মম বিদ্রুপের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুকের ভিতরে অস্বস্তির জ্বালাটা বোধহয় আগুনের শিখা হয়ে জ্বলতে শুরু করেছে। না, অসম্ভব। পুষ্কর দত্তের চোরা উপকারের ঐ ওষুধ মুখে দিতে পারবে না সুনন্দা; ওষুধের শিশি দুটোকে এই মুহূর্তে জানালার বাইরে ঐ শক্ত অন্ধকারের গায়ে ছুঁড়ে আছাড় দিয়ে গুঁড়ো করে দিতে হবে।

সুনন্দার মুখের প্রশ্নটাও যেন যন্ত্রণাক্তের মত ছটফটিয়ে ওঠে। —তুমি কি পুষ্করবাবুকে ওষুধ দিয়ে যাবার জন্য বলেছিলে?

বিজনবিহারী—না, আমি তো কিছু বলিনি। আমিই বলবোই বা কেন?

দেয়ালের তাকের উপরে ওষুধের শিশি দুটোকে রেখে দিয়ে চলে যান বিজনবিহারী। সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমাও চলে যান। আর, সুনন্দার হঠাৎ-ক্ষুব্ধ আত্মাটা যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে শান্ত হয়ে যায়। একটা মিথ্যে ভয়ের সঙ্গে কোন্দল করবার লজ্জা। মাথাটা যেন নিজের ইচ্ছায় হেঁট হয়ে যেতে চাইছে। দুহাত তুলে কপালটাকে ঠেকিয়ে রেখে এই অলস মাথাটারই সব ভার ধরে রাখতে চেষ্টা করে সুনন্দা।

কোন সন্দেহ নেই, আবার ভাবতে ভুল করেছে সুনন্দার মন। পুষ্কর দত্তের প্রাণ আড়াল থেকে কারও মুখের ছবিকে ধ্যান করছে না। চেষ্টা করে নয়, খোঁজ করে নয়, উঁকি ঝুঁকি দিয়েও নয়, ভদ্রলোক বোধহয় হঠাৎ জয়ন্তী কিংবা মনোরমার মুখের কথা থেকে জানতে পেরে গিয়েছে, সুনন্দাদির জ্বর হয়েছে। তাই ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে।

ফুলনবাবুর ছেলের বউ পার্বতীর মুখ থেকেই একদিন গল্পটা শুনেছিল সুনন্দা। সেদিন সিনুরাউডি কালিয়ারী টিমকে হারিয়ে দিয়ে বৃদ্ধকিশোর হকি শিল্ড পেল শিউলিবাড়ি ইলেভেন; সেদিন পার্বতীর শ্বশুর ফুলনবাবু আহ্লাদে আটখানা হয়ে শিউলিবাড়ি ইলেভেনের ক্যাপ্টেন পুষ্করবাবুকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—ভগবান ইনসাফ! জিতা রহো পুষ্কর!

সর্দার সুচেত সিং পুষ্করের হাত ধরে আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—কৈসর-ই-শিউলিবাড়ি। খুশ রহো পুষ্কর।

আজ আবার এ ছাই গল্পটাকে বার বার মনে পড়ে কেন? মনে পড়িয়ে লাভই বা কি? গল্পটা যে আসতে অনেক দেরি করেছে। যদি আর একটা বছর আগে গল্পটা আসতে পারতো, তবে বোধহয়......।

আবার ভাবতে ভুল করছে সুনন্দা। একটা বছর আগে পুষ্করের মুখের দিকে তাকালেই বা কি লাভ হতো? কিছু না, সুনন্দার কপালের উপর কোন ফুলের পরাগ ঝরে পড়তো না। পুষ্কর দত্ত তো কোন আশা নিয়ে মার্টিসাহেবের মেয়ের মুখের দিকে তাকাতো না।

বুঝতে আর কোন অসুবিধাও নেই। বাংলা দেশের জোয়ান হয়ে আর শিউলিবাড়ির কৈসর হয়ে মানুষের উপকারের কাজে খেটে বেড়ায় যে মানুষটা, সেই মানুষটা মার্টিসাহেবের মেয়ের সর্দিজ্বরের ওষুধ এনে দিয়েছে। এই মাত্র। এর মধ্যে রাগ করবারই বা কি আছে? আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? এ ওষুধের মধ্যে অনুশা কোন সর্ত নেই, গোপন কোন দাবিও নেই। পুষ্কর দত্ত যদি আবার আসে, তবে বরং খুশি হয়ে আর হেসে হেসে বলে দেওয়াই উচিত, খুব ধন্যবাদ পুষ্করবাবু, খুব উপকার করলেন, আপনার ওষুধ খেয়েছি, জ্বরও সেরে গেছে।

জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে সুনন্দা, আর মুখটাও হাসতে শুরু করে দেয়। আর, চোখ দুটোও যেন নিরাতঙ্ক স্বস্তির সুখে স্নিগ্ধ হয়ে হাসতে থাকে।

—বাঃ, এতো বেশ মজার চোখ! সুনন্দার ঠোঁটের ফাঁকে স্বস্তির হাসিটাও হঠাৎ বিড়বিড় করে ওঠে। হাত তুলে চোখ দুটোকে ব্যস্তভাবে মুছে দিয়েই দেয়ালের তাকের কাছে এগিয়ে যায় সুনন্দা। সন্ধ্যাবেলায় খেতে হবে কোন্ ওষুধটা?

ওষুধের শিশির গায়ে কথাটা লেখাই আছে। ওষুধ খায় সুনন্দা। আর বুঝতেও পারে, মনের ভিতরে একটা লজ্জার বেদনা করুণ হয়ে হাসছে। ছি ছি, ভাগ্যের সব চেয়ে সুন্দর ইচ্ছার ভয়টা কি অদ্ভুত গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল! কোথা থেকে একটা মূর্খ সন্দেহ এসে মোহিতের নিশ্চিন্ত ভালবাসার মনটাকে যেন ধমক দিয়ে কথা বলতে চেয়েছিল।

জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা। এ সন্ধ্যা তো কোন অমাতিথির সন্ধ্যা নয়। চাঁদ ওঠবার কথা। কিন্তু আর কত দেরি? কুয়াশার উপর চাঁদের হাসি লুটিয়ে পড়বে কখন? মোহিত আসবে
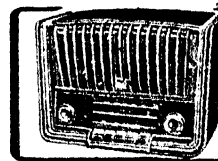
কখন? বাবার কাছে কথাটা বলবেই বা কখন?

সুনন্দার ভাগ্যের এই উৎফুল্ল কৌতূহলের সব ব্যস্ততাকে যেন হঠাৎ শান্ত করে দেবার জন্যই ভিতরের আঙিনায় একটা শাঁখ বেজে উঠলো; সেই সঙ্গে একটা কলরবের উৎসব। এগিয়ে যেয়ে দেখতে পায় সুনন্দা, মনোরমা আর জয়ন্তী কাড়াকাড়ি করে শাঁখ বাজাচ্ছে। দেখতে পায়, বাইরের বারান্দায় চক্রবর্তী ঠাকুর পাঁজি হাতে নিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন।

এগিয়ে আসে নিরুপমা। দু'হাতে মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেন। —মোহিত নিজেই বিয়ের কথা বলেছে। তাই দিন ঠিক করছেন চক্রবর্তী ঠাকুর।

কিন্তু আজ হঠাৎ এমন একটা বিষণ্ণ আর চিন্তিত চেহারা নিয়ে কেন বাড়ি ফিরলেন বিজনবিহারী, শিউলিবাড়ির এই মাটিসাহেব, যাঁর দুই চোখে এই পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একটা প্রসন্ন দুঃসাহসের সূর্য শুধু জ্বলজ্বল করে হেসেছে? আজকের অঘ্রাণের সন্ধ্যার কুয়াশার মধ্যেই বা কোন্ বিভীষিকার ছায়া দেখলেন, যেজন্যে মাটি-সাহেবের মত শক্ত-পোক্ত মানুষের হাত-পায়ের জোর শিথিল হয়ে যেতে পারে? বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েও সাইকেলের ঘণ্টি বাজাতে পারলেন না কেন? গলার জোরই বা কেন এত অলস হয়ে গেল, যে-জন্যে একটা ডাকও দিতে পারলেন না— আমি এসেছি নিরু? কিংবা—আমি এসেছি নন্দু!

বেশ তো হেসে-হেসে, আর যেন একটা বিপুল আহ্লাদের ঝড়ের মত শিউলিবাড়ির চারদিকে সাইকেল ছুটিয়ে ঘুরছিলেন বিজন-বিহারী। খোঁজ করে জেনেছেন, ঝুমরাগড়ের শুক্রবারের হাটে সরু চাল ওঠে; কুমার সাহেব বলেছেন, হাতিটাকে দু'দিনের জন্য দিতে পারবেন। সিলুয়াডি কলিয়ারির ওভারম্যান মজুমদার বলেছেন, আদরা থেকে চারজন ভাল জেলে আনিয়ে দিতে পারবেন; বড় ঝিলের সব কালবোশ ছেঁকে তুলতে পারা যাবে। পুষ্কর তো রাজি হয়েই আছে, বিয়ের দু'দিন আগেই রাঁচিতে গিয়ে ব্যান্ড-পার্টি সঙ্গে নিয়ে চলে আসবে। সুনন্দার বিয়ের উৎসবটাকে হর্ষে উল্লাসে ভরে দেবার কল্পনা নিয়ে বেশ তো ছুটোছুটি করছিল একটা বিপুল স্নেহের হৃৎপিণ্ড। কিন্তু আজ এমন কি ব্যাপার হলো, যে-জন্যে বাড়ি ফিরে এসেই একটা অসাড় ক্লান্তির মত খাটের উপর লুটিয়ে শুয়ে রইলেন বিজনবিহারী?

নিরুপমা বার বার জিজ্ঞেস করেন—কি হলো?

—কিছু না।

সুনন্দা বলে—কি [illegible], বাবা?

বিজনবিহারী হাসেন—কিছু না। শুধু একটু একলা হয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।

অনেক রাতে সুনন্দা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন মোহিতের উপহার সেই বইটাও সুনন্দার বুকের ওপর পড়ে থাকে, যে-বইটার পাতায় পাতায় ভালবাসার গান ঘুমিয়ে আছে। তখন ও-ঘরের ভিতরে নিরুপমা তাঁর ঘুমহারা দুটো চোখের উদ্বেগ শান্ত করে নিয়ে প্রশ্ন করেন—কি হয়েছে এবার বল।

বিজনবিহারীও খাটের উপর উঠে বসেন। জোরে জোরে হাই তোলেন, আর গা-মোড়া দিয়ে ষাট বছর বয়সের শক্ত-পোক্ত আত্মাটার সব অবসাদ যেন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হেসে ওঠেন—কিছুই নয়; করালীবাবু নামে যে ভদ্রলোক হাওয়া বদলের জন্য আজ এসেছেন, সেই ভদ্রলোক হঠাৎ কয়েকটা বাজে কথা বলে ফেললেন।

—কি কথা?

—ভদ্রলোক বললেন, উনি আমাকে চেনেন। কথা শুনেও মনে হলো, সত্যিই চেনেন।

—তুমি ভদ্রলোককে চেন না?

—তখন দেখে ঠিক চিনতে পারিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়তো একটি ছেলে, নাম করালীকান্ত, হয়তো সে-ই হবে। যাই হোক্......আর রাত করবো না, দাও কিছু খেয়ে নিই।

—কিন্তু কি বললেন করালীবাবু?

—বললেন, আমি নাকি একজন বিদ্রোহী, গা ঢাকা দেবার জন্য এখানে এসে একটা চমৎকার বনবাস বেছে নিয়েছি। শুনে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল, এই যা। তা ছাড়া আর কিছু নয়।

নিরুপমার চোখের তারা থরথর করে কাঁপতে থাকে; সেই কালোছায়াটা যেন নিরুপমার চোখ দুটোকে উপড়ে নেবার জন্য হিংস্র নখরে ভরা একটা থাবা তুলেছে।

হেসে ফেলেন বিজনবিহারী—করালী-বাবুর কথা বাদ দাও। আজ আর ওসব কথার কোন মানে হয় না।

বিজনবিহারীর আজকের এই হাসির শব্দটাও যে সেই নির্ভয় জীবনের প্রতিধ্বনি; যখনই সেই কালো-ছায়াটা কাছে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করেছে, তখনই বিজনবিহারীর বুকের ভিতরে যেন একটা সিংহের সাহস গরগর করে উঠেছে। আর, নিরুপমার কাছে বিজনবিহারীর এই হাসির শব্দটা যে একটা পরম সান্ত্বনার গান, শান্তি আর সম্মানের একটা নির্ভীক অঙ্গীকার; শোনা মাত্র শান্ত হয়ে গিয়েছে নিরুপমার কালোছায়াভীরু প্রাণটা।

আজও, নিরুপমার চোখের তারা আর কাঁপে না। আতঙ্কিত মনটা হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। ঠিকই, আজ আর ওসব কথার কোন মানে হয় না। করালীবাবুর কথাগুলি শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবের মান-সম্মান আর আনন্দের গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে পারবে না। সাধ্য নেই।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই যখন শুনতে পায় সুনন্দা, কাল রাতে বাবা ভাত খেয়েছিলেন, তখন সুনন্দারও চোখের তারা দুটো হেসে ওঠে।

—চলি বেটি নন্দুয়া! সুনন্দার পিঠে হাত বুলিয়ে আর হেসে হেসে বিজনবিহারী যখন তাঁর মাটিসাহেবী মূর্তিটি নিয়ে আর সাইকেল ছুটিয়ে চলে যান, তখন অঘ্রাণের সকালের সব কুয়াশা গলে গিয়েছে। রোদ মেখে শিউলিবাড়ির ঘাসের সব শিশির হাসছে।

সারা দুপুর ধরে রামসিংহাসনের চন্দনা শিস দেয়। কাটোয়ার সেই বাউল একবার এসে, গান গেয়ে আর সিধে নিয়ে চলে যায়।

বিকেলটা কিন্তু কাটতে চায় না। সুনন্দার চোখের দৃষ্টিটা উতলা হয়ে ওঠে, যেন বুকের ভিতরে হাসুনাহানার গন্ধ উতলা হয়ে উঠেছে। সেদিন যদি জয়ন্তী আর মনোরমা ওভাবে শাঁখ বাজিয়ে না ফেলতো তবে আজও বোধহয় একবার ঝুমরা কলোনি বেড়িয়ে আসতে পারতো সুনন্দা; এরকম অদ্ভুত একটা চক্ষুলজ্জার বাধা সুনন্দাকে এখানে অলস করে বসিয়ে রাখতে পারতো না। জানতে ইচ্ছে করে, আজ এখন এই বিকেলের আলোর দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে মোহিত?

বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই চমকে ওঠে সুনন্দা। যেন বিকালের আলোটাই হেসে উঠে সুনন্দার এই জিজ্ঞাসার উত্তরটা দিয়ে দিয়েছে। মোহিতের চাকর রঘুনাথ একটা চিঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চিঠি দিয়ে চলে যায় রঘুনাথ; আর চিঠি পড়েই সুনন্দার চোখের হাসি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মোহিতের চিঠিটা যেন একটা দুরন্ত আকুলতার আহ্বান। —এখনি একবার এস সুনন্দা; একটুও দেরি করো না।

—আমি একটু ঘুরে আসছি, মা।

ঘরের ভিতর থেকে নিরুপমা বলেন—এস।

মোহিতের এই ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়েও দস্তিদার সাহেবের ফটকের মাধবীলতার বিতান দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাধবীলতার গায়ে সত্যিই থোকা-থোকা ফুলের ঝালর দুলছে, না থোকা-থোকা ঠাট্টার ঝালর দুলছে? ও ফুলের আভা কি লালমাণিকের আভা, না লালচে আগুনের আভা? সুনন্দার চোখ দুটো যেন সব জ্ঞান আর সব বোধ হারিয়ে ফেলেছে। তাই ওভাবে এতক্ষণ-ধরে আর অপলক চোখে ঐ মাধবীলতার বিতানটার দিকে তাকিয়ে

থেকেও কিছু বুঝতে পারছে না সুনন্দা। মোহিত বলেছে, বিয়ে হবে না; বিয়ে হতে পারে না।

—কেন?

—না; করালীকাকা যে-কথা বললেন, তাতে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া উচিত নয় সুনন্দা।

—কে তোমার করালীকাকা?

—আমার বাবার খুড়তুতো ভাই, আমাদের কেষ্টনগরের কাকা।

—কি বলেছেন করালীকাকা?

—শুনে তোমার লাভ নেই। আমি বলবো না।

—লাভ আছে। কোথায় উনি?

—কেন?

—আমি তাঁরই কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো।

—উনি নেই। কাল এসেছিলেন, আজ সকালেই চলে গিয়েছেন।

—কেন?

—তোমার বাবার ভয়ে।

—তার মানে?

—তার মানে উনি শিউলিবাড়ির মাটি-সাহেবের দাপটের কথা জানতে পেরেছেন।

—একথারই বা কি মানে হয়?

—এখানে তোমার বাবা অনায়াসে করালী-কাকাকে লাঠিয়াল দিয়ে কেটে ফেলতে পারেন; মাটিসাহেবকে কেউ বাধা দেবে না, কেউ কিছু বলবে না।

—আমার বাবাকে এমন ভয়ানক বলে ধারণা হলো কেন তোমার করালীকাকার?

—তিনি তোমার বাবাকে চেনেন।

—চিনলে কি বাবাকে কেউ ভয়ানক বলে মনে করতে পারে?

—যাঁরা ভাল করে তোমার বাবাকে চেনেন, তাঁরা তোমার বাবাকে ভয়ানক বলেই মনে করবেন।

—মিথ্যে কথা। তোমার করালীকাকা ভয়ানক মিথ্যেবাদী।

—মাটিসাহেবই একটি ভয়ানক মিথ্যে।

—কি বললে?

—ঠিক কথা বলেছি, সুনন্দা। তুমি কিছু জান না বলেই রাগ করে আমার সঙ্গে এত তর্ক করছো।

—তুমি জানিয়ে দিতে ভয় পাচ্ছ কেন?

—ভয় নয়, মায়ার জন্যে জানাতে পারছি না।

—একটুও মায়ার দরকার নেই; তুমি এখনি জানিয়ে দাও। আমি দু'কান দিয়ে শুনবো।

—তবে শোন।

—বল।

—তোমার বাবা এক ভদ্রলোকের এক মিথ্যে ছেলে।

—কি?

—সে ভদ্রলোকের বিবাহিতা স্ত্রীর ছেলে নয়, একটা স্ত্রীলোকের ছেলে। আর তুমিও......।

—বল, চুপ করলে কেন?

—তুমিও তোমার বাবার একটি স্ত্রীলোকের মেয়ে, বিবাহিতা স্ত্রীর মেয়ে নও।

—বল, আর যা কিছু জান, সব বল। শুনতে বেশ লাগছে।

—যে বিধবাকে ঘরছাড়া করে নিয়ে এসে শিউলিবাড়িতে ঘর বেঁধেছেন তোমার বাবা, সেই বিধবা হলেন তোমার ঐ মা।

সারা শিউলিবাড়ি দাউ দাউ করে পুড়ছে; সেই সঙ্গে পুড়ছে আর ছাই হয়ে যাচ্ছে সুনন্দার চোখ মুখ আর ফুসফুস। জানালার গরাদটাকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে সুনন্দা। ঢিপ করে একটা শব্দ গুমরে ওঠে। মেজের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে সুনন্দার মাথাটা গুমরে উঠেছে। চেঁচিয়ে ওঠে মোহিত—সুনন্দা!

অঘ্রাণের সন্ধ্যার বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা, আর মোহিতও ঠাণ্ডা জলে তোয়ালে ভিজিয়ে সুনন্দার মাথা মুছে দিয়েছে। তাই সুনন্দার মূর্চ্ছাটাও যেন একটা হিমাক্ত ভয়ের ছোঁয়া লেগে শিউরে ওঠে। চোখ মেলে তাকায় সুনন্দা। কথাও বলে সুনন্দা।—কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে তোমার বাধা কোথায়? এখানে তো কেউ বাধা দেবে না। এখানেও তো চক্রবর্তী ঠাকুর আছেন, আশীর্বাদ করবার মানুষও আছে।

—ঠিক কথা; এখানে তোমার বাবার দাপটের ভয়ে যত শ্বশুর মশুর আর আশীর্বাদ সবাই নিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু তাতে তো আমার মন ভরবে না। ওটা একটা ঠাট্টার ব্যাপার হবে, কলকাতার ছাতুবাবু যেমন ঘটা করে বিড়ালের বিয়ে দিয়েছিলেন।

একেবারে সুস্থির হয়ে বসে, আর দুই চোখ অপলক করে মোহিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুনন্দা; মোহিত নয়, যেন সুনন্দার ভাগ্যের ঈশ্বর কথা বলছে। ঠিকই তো, মানুষের ছেলে এমন একটা মেয়ে-জন্তুকে বিয়ে করবে কেন? মানুষের ছেলের যে দেশ বাড়ি গাঁই গোত্র আছে। নিয়মের সন্তান হয়ে এমন একটা অনিয়মের প্রাণীকে বিয়ে করতে ভয় না করে পারবে কেন মোহিত?

মোহিত বলে—তুমি বোধহয় আমার কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে আমাকেই ভুল বুঝেছ? কথা হলো, তোমাকেই যদি ঘরে নিয়ে আসি, তবে বিয়ে করবার দরকার কি?

চমকে ওঠে সুনন্দা। মোহিতের কথার অর্থটা সত্যিই বুঝতে পারা যাচ্ছে। সুনন্দার অপলক চোখের উপর থেকে এতক্ষণের উদ্গত বাষ্পের আবরণও যেন হঠাৎ একটা চমক লেগে ছিঁড়ে যায়। চোখের শুকনো খটখটে তারা দুটো প্রখর হয়ে জ্বলতে থাকে।—কি বললে?

মোহিত—বলছি, আমি আমার ভালবাসার অপমান করতে পারবো না, তোমারও অপমান হতে দেব না। তুমি আমারই ঘরে আসবে; আমার কাছে থাকবে।

মাটিসাহেবের আদুরে মেয়ের হৃৎপিণ্ডটাকে কেউ যেন নর্দমার পাঁকের মধ্যে চেপে ধরে গলা টিপে ধরেছে। বোবার আর্তনাদের মত একটা যন্ত্রণার শব্দ যেন সুনন্দার গলা ছিঁড়ে দিয়ে ঠিকরে ওঠে—কি বললে মোহিত?

মোহিত—আমি আর এখানে থাকবো না সুনন্দা। আজই চলে যাব। আর তোমাকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।

—কোথায় যাবে?

—ধরে নাও, অনেক দূরে কোথাও। রায়-পুরে কিংবা নাগপুরে।

—কিন্তু আমি সেখানে কেন যাব?

—যদি আমাকে ভালবেসে থাক, তবে নিশ্চয় যাবে, যেতে হবে।

—আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে কি করবো?

—আমার কাছে আমার ঘরে থাকবে!

—কেমন করে থাকবো? চেঁচিয়ে ওঠে সুনন্দা।

—তোমার মা যেমন করে তোমার বাবার সঙ্গে রয়েছেন। মোহিতের শান্ত শিক্ষিত সরল ও অবিচলিত দুটো কৌতূহলের চক্ষু সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মাথা হেঁট করে ফুঁপিয়ে ওঠে সুনন্দা—উঃ, কি ভয়ানক সর্ত! কি কঠিন দাবি!

—সুনন্দা! সুনন্দার একটা হাত ধরে ডাক দেয় মোহিত। চমকে ওঠে সুনন্দা। সত্যিই যে একটা সান্ত্বনার হাত বলে মনে হয়। মুখ তুলে তাকিয়ে আরও আশ্চর্য হয়, মোহিতের দুই চোখ ছলছল করছে।

চুপ করে কি যেন ভাবে সুনন্দা; বোধহয়

ভাগ্যের একটা ভ্রূকুটিকে চূর্ণ করে দেবার জন্য সুনন্দার বুকের সব নিঃশ্বাস দুরন্ত একটা সাহস পেতে চাইছে। কিন্তু সুনন্দার সব নিঃশ্বাসের ভার হঠাৎ যেন শ্রান্ত হয়ে যায়। ভ্রূকুটিটাই বলছে, যেতেই যে হবে, উপায় নেই।

সুনন্দা বলে—বেশ। কখন যাবে?

মোহিত—শেষ রাত্রের ট্রেনে।

সুনন্দা—আমাকে কি করতে হবে?

মোহিত—তুমি স্টেশনে চলে আসবে।

সিংহানি কোলিয়ারীর বাঁশির শব্দটা শালবনের উপর দিয়ে ভেসে এসে ঘুমন্ত শিউলিবাড়ির বাতাসকেও একটু সজাগ করে দিয়ে মিলিয়ে গেল। কয়লার ট্রেনটারও চাকা-গড়ানির শব্দটা দূরে চলে গেল। কাজেই ধরে নিতে পারা যায়, রাতের প্রহর ফুরিয়ে আসছে, দুটো বেজে গিয়েছে।

নিরুপমার ঘুম হঠাৎ ভেঙে গিয়েছিল, তাই দেখতে পেলেন, ও-ঘরে একটা আলো জ্বলছে, আর সুনন্দাও পাশে নেই।

এত রাতে কি করছে মেয়েটা? আজ ভাত খাওয়ার পর যে-মেয়ে নিজেই গরজ করে বললো, আজ আমি তোমার কাছে শোব মা, সে-মেয়ের মনে আবার এ কেমন খেয়াল দেখা দিল? মায়ের পাশে শোবার লোভটা এরই মধ্যে মরে গেল? আর বই পড়বার লোভ হলো?

ও-ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যেয়ে আর উঁকি দিয়েই চমকে ওঠেন নিরুপমা। ফিরে এসে বিজনবিহারীর ঘুমন্ত বুকটাকে ঠেলা-ঠেলি করে, আর যেন একটা করুণ আতঙ্কের স্বর চেপে চেপে ডাক দিতে থাকেন—শুনছো? শিগগির ওঠো: নন্দু কি কাণ্ড করছে দেখ।

বিজনবিহারীও চমকে জেগে ওঠেন—কি হলো?

—নন্দু কি-যেন লিখছে আর কি-ভয়ানক কাঁদছে।

—কেন?

সত্যিই তো কেন? যে মেয়ে আজ রাতে ইচ্ছে করে বাবার পাতে ভাত খেয়েছে, ইচ্ছে করে মার গা ঘেঁষে ঘুমিয়েছে, আর আজই পার্শেল হয়ে এসেছে যে জিনিসটা, সেই নতুন সোনার হারটার দিকে তাকিয়েও খুশি হয়ে হেসেছে, সে মেয়ে ঘুম ছেড়ে দিয়ে এই নিষুত রাতে একলা ঘরে বসে বসে কাঁদবে কেন?

সুনন্দার কাছে গিয়ে দাঁড়ান বিজনবিহারী আর নিরুপমা।—কি লিখছিস নন্দু? বিজনবিহারী ডাকেন।

—কাঁদছিস কেন নন্দু? নিরুপমা ডাকেন।

লেখাটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আর চোখ মুছে নিয়ে সুনন্দা বলে—আমাকে এখনই চলে যেতে হবে, মা।

চমকে ওঠেন নিরুপমা—কোথায় যাবি?

সুনন্দা—মোহিত যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে।

বিজনবিহারী—কি বললি নন্দু?

সুনন্দা—আর জিজ্ঞেসা করো না, বাবা।

নিরুপমা—পাগলের মত কথা বলছিস কেন? এখন আবার মোহিত তোকে কোথায় নিয়ে যাবে? বিয়ের পর যাবে।

সুনন্দা—বিয়ে হবে না, মা।

নিরুপমা যেন সুনন্দার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সুনন্দাকে দুহাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকেন—কি হলো নন্দু? একথা কেন বলছিস নন্দু?

সুনন্দা—বিয়ে হতে পারে না।

নিরুপমা—কেন?

সুনন্দা—মোহিতের কাকা করালীবাবু যে-কথা বলে দিয়ে গেছেন, তারপর আর বিয়ে হতে পারে না।

নিরুপমা—করালীবাবু যা ইচ্ছে হয় তাই বলুক: কিন্তু মোহিত তো অবুঝ ছেলে নয়।

সুনন্দা—মোহিত খুব সবুঝ ছেলে: মোহিতই তোমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি নয়।

নিরুপমা—কিছুই বুঝতে পারছি না নন্দু। মোহিত তোকে বিয়ে করবে না, তবু তোকে নিয়ে যাবে, একি বিশ্রী কথা, কুৎসিত কথা, ভয়ংকর কথা বলছিস নন্দু?

সুনন্দা—তুমি বুঝতে পারবে না কেন?

নিরুপমা—আঁ? কি বললি?

সুনন্দা—বুঝে দেখ। তুমি যা করেছো, তোমার মেয়েও তাই করবে।

সুনন্দার মাথাটাকে দুহাত দিয়ে টেনে বুকের উপর চেপে ধরে হাঁপাতে থাকেন নিরুপমা—আমাকে ক্ষমা করে দে, নন্দু। আমার কথা ছেড়ে দে নন্দু: তুই যেতে পারবি না।

সুনন্দা—যেতেই হবে মা।

নিরুপমা—না না, কেন যাবি? কখ্খনো না।

সুনন্দা—অনেক সাহস করেছ, অনিয়মের মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করেছ আর পুরেছ। কিন্তু আর বোধহয় সাহস করতে পারবে না।

নিরুপমা—খুব সাহস আছে। চিরকাল পুষবো।

সুনন্দা—না পারবে না; মেয়ের কোলে একটা অনিয়মের ছেলেকে দেখতে পেলে, তাকে আদর করবার সাহস হবে না।

নিরুপমা—এ কি সর্বনেশে কথা বলছিস?

সুনন্দা—ভাগ্যের কথা বলছি। মরতে সাহস হচ্ছে না বলেই চলে যেতে হচ্ছে।

বিজনবিহারী বলেন—নন্দুকে ছেড়ে দাও নিরু। ওকে যেতে দাও।

বিজনবিহারীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে সুনন্দা।—আমি মরতেই যাচ্ছি বাবা; তুমি বাধা দিও না।

—না বাধা দেব না; কেন দেব? তুই ওঠ নন্দু। দু-হাত দিয়ে সুনন্দার হাত দুটোকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন বিজনবিহারী, আর টেনে তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন।

নিরুপমার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন বিজনবিহারী; গলার স্বর যেন শান্ত বজ্রের। —তুমি ওঘরে চলে যাও নিরু।

মুখটাকে দুহাতে শক্ত করে চেপে আর টলতে টলতে ও-ঘরের ভিতরে গিয়ে মেঝের উপর আছড়ে পড়েন নিরুপমা।

তারপর বিজনবিহারী; এদিকে-ওদিকে না পিছনে, কোন দিকে না তাকিয়ে, আস্তে আস্তে পা ফেলে, শুধু পায়ের তলার মেঝেটারই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ও-ঘরের ভিতরে গিয়ে খাটের উপর বসে পড়েন।

শিউলিবাড়ির রাতটাও যেন মরণঘুমে ঘুমিয়ে নিচ্ছে। নীরব নিরেট একটা স্তব্ধতা। ঐ ঘরে আর সেই বাতিটা জ্বলছে না। খোলা দরজা দিয়ে হিমেল কুয়াশা হুহু করে ঘরের ভিতরে ঢুকছে। কে জানে কখন চলে গিয়েছে সুনন্দা।

নিরুপমার তন্দ্রাটাও যেন একটা মূর্চ্ছা। কাঁদবার শক্তিটাও অসাড় হয়ে গিয়েছে। যেন একটা অভিশাপের পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন নিরুপমা।

কিন্তু মূর্চ্ছাটাও যেন আর নীরব হয়ে এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। তাই হঠাৎ একবার ধড়ফড় করে উঠে বসেন আর চোখ মেলে তাকান নিরুপমা। না, ওঘরে আর আলো নেই; কিন্তু এঘরে কেন আলো জ্বলছে? নিরুপমার সিধুর চোখ দুটো অবুঝের মত তাকিয়ে সারা ঘরের শূন্যতার অর্থটাকে যেন বুঝতে চেষ্টা করে। সে গেল কোথায়? খাটের উপরে চুপ করে বসেছিল যে পাথর মানুষটা?

চমকে ওঠে নিরুপমার অবুঝ চোখ। মানুষটা যে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে হাসছে। বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়েছে; এইবার টোটার মালাটার দিকে হাত বাড়িয়েছে।

ছুটে এসে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো টোটার মালাটা তুলে নিয়ে সরে যান নিরুপমা। টোটার মালাটাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে আর দু-হাত দিয়ে বুকের কাছে চেপে রেখে চেঁচিয়ে ওঠেন—তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মীটি। তুমি বন্দুক রেখে দাও।

বিজনবিহারী—একটা টোটা দাও, নিরু। আমি চলে যাই।

নিরুপমা—না।

বিজনবিহারী—আমি রাগ করে কথা বলছি না, নিরু। বিশ্বাস কর, কারও ওপর আজ আমার একটুও রাগ নেই।

কী শান্ত আর কত স্নিগ্ধ ও মৃদু একটি চেহারা! গায়ে গেঞ্জি, পায়ে চটি, ধুতির কোঁচাটাকে তুলে নিয়ে কোমরে গুঁজে দিয়েছেন। কাঁধ আর বুকের ফর্সা রঙটা ধবধব

করছে। মাথায় চুলের সব সাদাও আলো লেগে চিকচিক করছে। বিজনবিহারী যেন হেসে হেসে এই ঘরেরই একটা চমৎকার সাধের কাজ সেরে ফেলবার জন্য বন্দুটাকে আদর করে হাতে তুলে নিয়েছেন।

—ভাবতে শুধু আশ্চর্য লাগছে, নিরু। বুঝতেই পারছি না, কি-এমন ভুল-টুল করলাম যে-জন্যে আজও আমি চোরই রয়ে গেলাম। অ্যাঁ? আর, কি আশ্চর্য, ঠিক সময় বুঝে চলে এল সেই অভিশাপের রাগ। ধন্যি অভিশাপ রে বাবা!

হাসতে থাকেন বিজনবিহারী। যেন মন-খোলা প্রাণখোলা একটা ঠাট্টার হাসি, সে হাসির আড়ালে এক ফোঁটা ঝাঁঝ নেই, জ্বালা নেই, ধিক্কার নেই।

নিরুপমা বলেন—আমার একটা কথা শুনবে?

—বল।

—তুমি শুয়ে পড়।

বিজনবিহারী নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে তেমনই হাসিমুখে আর শান্ত স্বরে বলেন—তুমি আমার একটি কথা শুনবে?

—বল।

—আমার কাছে এসে বসো।

নিরুপমার উদ্বিগ্ন চোখ দুটো এইবার বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। বিজন-বিহারী ডাকেন—এস নিরু।

ঘর-সংসারের গম্ভীর ডাক নয়। চিন্তার ডাক নয়, কাজের ডাক নয়। যেন খেলার সাথীর ডাক। বিজনবিহারী তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনসঙ্গিনীর একটা অভিমানিনী অনিচ্ছা আর কৃপণতাকে তুচ্ছ করে ভুলিয়ে যেন বাজে খরচের জন্য একটি টাকা আদায় করে নেবার মতলবে আদরের সুরে কথা বলছেন।

নিরুপমা উঠে এসে খাটের কাছে দাঁড়ান। বিজনবিহারী তাঁর পাশের জায়গাটাকে দেখিয়ে দিয়ে নিরুপমাকে আরও স্নিগ্ধ স্বরে অনুরোধ করেন—এখানে বসো, আমার কাছে বসো নিরু।

নিরুপমা বসেন। বিজনবিহারী হাত পাতেন। যেন একটা মিষ্টি মায়ার কাছে, যে মায়া একটুতেই গলে যায়, তারই কাছে আবেদন করছেন বিজনবিহারী—দাও নিরু।

নিরুপমার মায়ার প্রাণ তবু যেন গলতে চায়না। আঁচল দিয়ে জড়ানো টোটার মালাটাকে আরও সাবধানে আর শক্ত করে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে রাখেন নিরুপমা।

বিজনবিহারী হাসেন—তুমি মিছে কেন কিপটেমি করছো, নিরু? বুঝতে পারছো না কেন, আমি যে শাস্তিটাকে জব্দ করে দিতে চাই। শিউলিবাড়ির মটিসাহেব মাথা হেঁট করেছে; একটা ভীতু কুষ্ঠরোগীর মত স্টেশন রোডের এক কিনারা ধরে চুপি-চুপি চলে যাচ্ছে, এমন মজার দৃশ্য তো সম্ভব নয়।

নিরুপমা তবু অবিচল।—না, তুমি আর যা-ই বল, ওকথা বলো না।

—না না। তুমি আমাকে বাধা দিয়ে বিরক্ত করো না। আমি কারও কাছে হার মানতে পারবো না নিরু; ভাল-ছেলেটি হয়ে যার-তার হাতে মার খাওয়ার জন্যে বেঁচে থাকা আমার পোষাবে না।

ষাট বছর বয়সের গলার স্বরের সঙ্গে যেন ষোল বছর বয়সের দুরন্ত বিজুর সেই বিদ্রোহের গর্জন আজও কথা বলছে। বিজন-বিহারীর শান্ত গলার স্বর সত্যিই এবার একটু দুরন্ত হয়ে উঠেছে। বুঝতে আর অসুবিধে নেই, বিজনবিহারীর এই দুরন্ত-পনা আজ আর কোন সান্ত্বনায় শান্ত হবার নয়।

নিরুপমা বলেন—তবে শুধু একটা টোটা চাইছো কেন? দুটো নাও।

বিজনবিহারী যেন একটু চমকে উঠলেন—কি বললে?

নিরুপমার চোখ দুটোও হঠাৎ যেন একটা আশার ছবি দেখতে পেয়েছে, তাই চোখের তারা দুটোতে অদ্ভুত এক ইচ্ছার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে হাসতে শুরু করেছে।

—আমিও যাব।

—কেন?

—কেন আবার কি? তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলে, তুমি এবার সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। শান্ত লোভীর মত আবার হাত পাতেন বিজনবিহারী—দাও, তাহলে দুটো টোটাই দাও।

বন্দুকের নলটাকে এক হাত দিয়ে টেনে নিয়ে আর নিজেরই বুকের কাছে ঠেকিয়ে রেখে, আর এক হাতে টোটার মালাটাকে বিজনবিহারীর কোলের উপর ফেলে দেন নিরুপমা।

বিজনবিহারী—ছিঃ, এরকম হুটোপুটি করো না নিরু। এতদিন যেমন আমাকে বিশ্বাস করেছো, তেমনই আজও বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে একলা ফেলে রেখে যাব না।

নিরুপমা যেন লজ্জিত হয়ে হাসেন; সত্যিই হাতটা হঠাৎ অবিশ্বাসী হয়ে বন্দুকের নলটাকে আঁকড়ে ধরেছে; যেন নিরুপমাকে একলা ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে না পারেন বিজনবিহারী। ছি ছি, কি বিশ্রী অবিশ্বাস, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নিরু-পমাকে বুকের কোটরে পুরে বেঁচে আছে যে-মানুষটা, সে কি নিরুপমাকে আজ ধুলোর উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারে?

—না না, অবিশ্বাস করছি না। বন্দুকটা ছেড়ে দিয়ে যেন একটা স্বস্তিময় নির্ভাবনার হাঁপ ছাড়েন নিরুপমা।

বিজনবিহারী—তোমাকে কেন মিথ্যিমিছি যত অপমান আর লজ্জার মধ্যে ফেলে রেখে যাব? কখ্খনো না। কিন্তু......।

দুটো টোটা আর বন্দুকটাকে দুজনের মাঝখানের ছোট্ট ব্যবধানটুকুর উপর শুইয়ে রেখে দিয়ে বিজনবিহারী এদিক-ওদিক তাকিয়ে কি-যেন ভাবেন।

নিরুপমা—কি খুঁজছো?

বিজনবিহারী—খুঁজছি না; ভাবছি, বিছানাটা রক্তে ভেসে গেলে কি ভাল দেখাবে? কাজটা ওঘরের মেজের উপর হলেই ভাল হতো নাকি?

নিরুপমা—না; ওঘরে নন্দুর ফটোটা রয়েছে।

বিজনবিহারী—ওঃ, না, তাহলে ওঘরে নয়।

নিরুপমা—আমি তো বলি, এই খাটের উপরেই ভাল। কিন্তু......।

বিজনবিহারী—কি?

নিরুপমা—আমাকে এখানে একা শুইয়ে রেখে তুমি আবার এদিকে-ওদিকে সরে গিয়ে পড়ে থেকো না।

বিজনবিহারী—না না, তা কি হয়! আমি ঠিক তোমার পাশেই শুয়ে পড়বো।

নিরুপমা—আমি তো দেখতে পাব না; কিন্তু আমার হাতটা তবু ধরে রেখো লক্ষ্মীটি, কেমন?

—নিশ্চয়। সে কথা কি আর বলতে হবে? নিরুপমার একটা হাত ধরেন বিজনবিহারী।

নিরুপমা—এখনই?

বিজনবিহারী—সেটা জেনে তোমার কি লাভ হবে বল? যখনই হোক, ভোর হবার আগেই হয়ে যাবে।

বিজনবিহারীর কাঁধের উপর মাথাটাকে এলিয়ে দেন নিরুপমা। বিজনবিহারী খুশি হয়ে বলেন—হ্যাঁ, এই ভাল। তুমি এবার চোখ বন্ধ করে একটু ঘুমিয়ে নাও।

নিরুপমা—তুমি কিন্তু আমাকে ঘুমের মধ্যেই......।

বিজনবিহারী—না না। ঘুম ভাঙবার পর।

নিরুপমা—হ্যাঁ, আমি চোখ মেলে তোমাকে একবার দেখবো, তারপর। মনে থাকে যেন।

বিজনবিহারী—নিশ্চয়।

বিজনবিহারীর কাঁধের উপর নিরুপমার মাথাটা, যেন একটা নিশ্চিন্ত ঘুমের

স্বপ্নভার ঢলে পড়ে থাকে। বিজনবিহারীও তাঁর একটা হাত নিরুপমার কাঁধে তুলে দিয়েছেন। দু'জনের মাঝখানে যেন একটা ফুলমালা আর দুটো ফুল—একটা বন্দুক আর দুটো টোটা। আর ঘরটা যেন বাসরঘর। শিউলিবাড়ির ষাট বছর বয়সের মাটিসাহেব আর তাঁর পঞ্চান্ন বছর বয়সের জীবনসহচরী যেন কেষ্টনগরের বিজু আর শিবপুকুরের কাজলী হয়ে বাসরঘর খেলছে। খোলা দরজা দিয়ে অঘ্রাণের কুয়াশা হুহু করে ঘরের ভিতরে ঢুকছে; কিন্তু বাতিটা নিভছে না।

অঘ্রাণের কুয়াশা কিন্তু এরই মধ্যে সুনন্দার খোঁপার উপর কুচি-কুচি শিশির ছড়িয়ে দিয়েছে। সুনন্দার গায়ে শাড়িটাও স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে।

শিউলিবাড়ির স্টেশন নয়; দূরের সিগন্যালের লাল চোখটা যেখানে ঘোলা রক্তের আভার মত কুয়াশার বুকের একটা ক্ষত হয়ে জ্বলছে, সেখানে রেল লাইনের পাশে একটা মাথাভাঙা মরা শিমুলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দা।

ঠিকই, স্টেশনেরই দিকে এগিয়ে গিয়েছিল সুনন্দা। কিন্তু স্টেশনের মাথার উপরের বড় আলোটার দিকে চোখ পড়তেই সুনন্দার চোখ দুটো যেন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। থমকে দাঁড়িয়েছিল সুনন্দা। সেই ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখ দুটোও কিছুক্ষণ ধরে দপ্ দপ্ করে জ্বলেছিল।

না, ঐ আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া যেমন আর দূরের ঐ অন্ধকারের লাইনের উপর মাথা পেতে পড়ে থাকাও তেমনি, দুইই মরণ। শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবের মানসম্মানের প্রাণটা তাঁর মেয়ের এই দুই মরণের কোন একটি মরণ দেখতে পেলে একই যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে মরে যাবে। এভাবে মানুষের ছেলের সঙ্গে চলে গেলে অমানুষের মেয়ের প্রাণটাও কি সম্মানের বাঁচা বাঁচতে পারবে? না, অসম্ভব! দুরাশার চেয়েও মিথ্যে আশা! তুমি বিজনবিহারী নও মোহিত, আর আমিও নিরুপমা নই। মাটিসাহেবের পায়ের ধুলোতে যে সাহস আছে, তোমার বুকেও সে সাহস নেই। নিরুপমার ছায়ার বুকটাতে যে ভালবাসা আছে, আমার এই রক্তমাংসের বুকের ভিতরেও সে ভালবাসা নেই। না, শুধু এই শরীরটার একটা গোপন লজ্জার ভয়ে তোমার মত মানুষের ঘরে গিয়ে পড়ে থাকবার কোন মানে হয় না। একটা অনিয়মের মেয়ের প্রাণের সঙ্গে আরএকটা যে অনিয়মের প্রাণ লুকিয়ে আছে, সেটাও চলে যাক। কাঁটা আর কাঁটার ফুল এক সঙ্গেই মরে যাক। কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব না। কখখনো না। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমাকে ভয় করে; তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। তোমার কাছে থাকা মানে একটা চমৎকার রঙচঙে ভীরুতার দাসী হয়ে পড়ে থাকা।

না, দুইই সমান অসম্মানের মরণ কেন হবে? তোমার সঙ্গে চলে যাওয়া মরণের চেয়ে ঐ অন্ধকারের এক কোণে রেললাইনের উপর মাথা পেতে দিয়ে মরে পড়ে থাকা বরং সম্মানের মরণ। তোমার মত আলোর জ্বালার কাছে মরে যাওয়ার চেয়ে ঢের ভাল।

স্টেশনের আলোটাকে যেন একটা ঘেন্নার ভ্রূকুটি দিয়ে তুচ্ছ করে দপ্ দপ্ করেছে সুনন্দার দুই চোখ। তার পরেই এই অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছে; যেখানে একটা মাথাভাঙা মরা শিমুল একলা দাঁড়িয়ে আছে, আর শিশিরে ভিজে গিয়ে পিছল হয়ে গিয়েছে রেললাইন।

শেষ রাতের ট্রেনটা আসছে বোধ হয়। অনেক দূরে, ঘুমন্ত শালবনের বুকের গভীরে যেন একটা গম্ভীর শব্দের মিহি বোল গুরুগুরু করে বাজছে। আঁচল দিয়ে কোমরটাকে শক্ত করে জড়িয়ে বাঁধে সুনন্দা। দু' পা এগিয়ে যেয়ে, শান্ত প্রতীক্ষার একটা আবছায়া হয়ে আর কান পেতে যেন অঘ্রাণের কুয়াশার একটা গান শুনতে থাকে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সুনন্দার একেবারে চোখের কাছে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় একটা ছায়া।—বাড়ি ফিরে চলুন।

এ আবার কোন্ রহস্যের দাবি এসে কথা বলছে? এ সময়ে, এখানে, অঘ্রাণের শেষরাতের এই হিমেল কুয়াশার ভিতরে এ কোন্ শাসনের ধমক কেমন করে কখন এসে আর কতক্ষণ ধরে লুকিয়েছিল? পুষ্কর দত্ত যে সত্যিই শিউলিবাড়ির একটা রাতজাগা চক্রান্ত। সুনন্দার দুঃসাহসের চোখ দুটো আশ্চর্য হয়ে আর ভয় পেয়ে চমকে ওঠে; কাঁপতে থাকে।

ঠিকই, বেশ মৃদুস্বরে কথা বলছে একটা চক্রান্তের মন।—আমি হঠাৎ এসে পড়িনি। ইচ্ছে করেই এসেছি। আমি আজ এই জন্যে তৈরী হয়েই ছিলাম।

সুনন্দার হঠাৎ-ভীরু মূর্তিটা এবার পাথরের মূর্তির মত কঠোর হয়ে ওঠে। কথা বলে না সুনন্দা। পুষ্করের শক্ত ছায়াটাকে যেন একটা নীরব তুচ্ছতার আঘাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু কুয়াশার মধ্যে যেন বিনীত একটা অনুরোধ কথা বলতে থাকে।—আপনি আশ্চর্য হবেন না, ভয় পাবেন না।

তবু কথা বলে না সুনন্দা। কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু শুনতে পায়, এবার যেন একটা দুশ্চিন্তার প্রাণ কথা বলছে।—আমার আজ সন্দেহ হয়েছিল, আপনি এরকম একটা কাণ্ড করতে চাইবেন।

সুনন্দার নিরুত্তর মূর্তিটা একটুও বিচলিত হয় না।

এবার যেন ভয়ানক একটা সবজান্তা আত্মা মায়া করে কথা বলতে শুরু করেছে।—আপনি মোহিতবাবুর ব্যবহারে দুঃখ পেয়ে যা করতে চাইছেন, সেটা আপনার বাবার আর মা'র অপমান। আপনারও অপমান।

সুনন্দার মাথায় যেন হঠাৎ একটা ঝিম ধরে যায়। চোখ দুটোও চমকে ওঠে। কী সাংঘাতিক এই পুষ্কর দত্তের চোখ আর কান; যেন আড়ালে আড়ি পেতে সুনন্দার ভালবাসার বিপদের সব ভাষা শুনেছে, সব ঘটনা দেখেছে।

যেন কথা বলছে একটা ভুল বুঝিয়ে দেওয়া সান্ত্বনা।—মোহিতবাবু তাঁর করালীকাকার কাছ থেকে একটা গল্প শুনে খুব অন্যায় আর খুব ভুল করলেন; কিন্তু সেজন্যে আপনিও ভুল করবেন কেন?

সুনন্দার বুকের ভিতরে একটা আর্তনাদ গুমরে উঠতে চায়। কিন্তু জোর করে ঠোঁট চেপে রেখে আর নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা।

কি আশ্চর্য, যেন সতর্কচক্ষু একটা পাহারার প্রাণ কথা বলছে।—আপনার ঘরে রাত দুটোর সময় আলো জ্বলতে দেখেই মনে হলো, আপনি একটা গণ্ডগোল বাধিয়েছেন।

যন্ত্রণাভরা একটা নিঃশ্বাসকে ঢোক গিলে শান্ত করতে চেষ্টা করে সুনন্দা।

অঘ্রাণের কুয়াশাটা এবার যেন বেশ কাঁপিয়ে স্বরে আক্ষেপ করছে।—আপনি আজ আপনার বাবা আর মাকে যে-সব কথা বললেন, সেগুলো খুব অন্যায় কথা, খুব বাজে কথা।

সুনন্দার চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। সবই কুয়াশা বলে মনে হয়। কিন্তু শুনতে কোন অসুবিধে নেই; বেশ স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, যেন দুরন্ত একটা সন্দেহের প্রাণ কথা বলছে।—আপনি সত্যি ঘর ছেড়ে চলে এলেন দেখে আমাকেও অগত্যা আপনার পিছু পিছু আসতে হলো। যাই হোক, তবু খুশি হলাম যে, স্টেশনে গেলেন না।

সুনন্দার হৃৎপিণ্ডটাই শিউরে ওঠে; তবু কথা বলতে পারে না। দুর্বহ একটা বিস্ময়ের ভার সহ্য করতে গিয়ে চোখ বন্ধ করে সুনন্দা।

কিন্তু কথা বলছে একটা স্নিগ্ধ আবেদন।—আপনি এখানে এসেও খুব ভুল করেছেন। বাড়ি চলুন।

সুনন্দার নিঃশ্বাসের বাতাসটা যেন ফুঁপিয়ে হেসে উঠতে চায়। কিন্তু সে নিঃশ্বাসকেও সামলে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা।

এবার যেন একটা লজ্জিত কৈফিয়তের প্রাণ এলোমেলো ভাষায় কথা বলতে থাকে।—অবশ্য আপনাকে এখানে আসতে না দিয়ে ওখানে বাড়ির কাছেই বাধা দেব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু ভয়ও ছিল, আপনি আমার কথা শুনবেন না। উল্টো হয়তো আমাকেও

সন্দেহ করবেন। তা ছাড়া, তখন বোধহয় আপনাকে এত কথা বলতেও পারতাম না।

কথা বলে সুনন্দা; একটা শুকনো পাথরের গলার শান্ত আর ঠাণ্ডা স্বর।—আপনি চলে যান।

পুষ্কর—না।

সুনন্দা—আমি একজনের সঙ্গে চলে যাব, তাতে আপনি বাধা দেবেন কেন?

পুষ্কর—চলে তো যাননি।

—যদি যেতাম, তবে?

—তবে বাধা দিতাম।

—কেমন ক'রে? মোহিতবাবুকে ছুরি মারতেন?

—দরকার বুঝলে মারতাম!

—দরকার বুঝলে আমাকেও বোধহয়...।

—কথা বাড়াবেন না। বাড়ি চলুন।

—না। আপনি যান।

—আমি যাব না।

—কেন যাবেন না? তুচ্ছ মানুষের একটা তুচ্ছ মেয়েকে তুচ্ছ ক'রে চলে যেতে আপনারই বা বাধছে কেন?

—আমি কাউকে তুচ্ছ করি না।

—শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবকে আপনি তুচ্ছ করেন না?

—সে খোঁজে আপনার দরকার কি?

—মাটিসাহেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করবার সাহস আপনার আছে? তিনি তো আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

—সাহস নেই; অভ্যোস আছে।

—কিন্তু আর কি সে অভ্যোস থাকবে?

—তার মানে?

—করালীবাবুর কাছ থেকে খবর শুনে মাটিসাহেবকে চিনতে পারবার পরেও কি সে অভ্যোস থাকবে?

—ও-খবর আমি পাঁচ বছর আগেই জেনেছি।

চমকে ওঠে সুনন্দা। বুকটাকে খুব জোরে ব্যথা দিয়ে ছোট্ট একটা আনন্দ যেন চমকে উঠেছে। আস্তে একটা হাঁপ ছাড়ে সুনন্দা—কিন্তু আমাকে তো তুচ্ছ করতে পারেন।

—না। কোনদিন তুচ্ছ করিনি, আজও করি না।

—কবে থেকে তুচ্ছ করেননি?

—জানি না। বোধহয় যেদিন প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকে।

—একথা এতদিন বলেননি কেন?

—বলতে ইচ্ছে করেনি।

—আজ বললেন কেন?

—তুমি জিজ্ঞেস করলে বলে।

দু'হাত তুলে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে সুনন্দা; মাটিসাহেবের মেয়ের বুকটার এতক্ষণের সব পাথুরেপণা যেন দুঃসহ একটা বিস্ময়ের কান্না চাপতে গিয়ে গলে গিয়েছে। পুষ্কর দত্ত নয়; যেন এটা যে ঘুম-হারা এক যখের ভালবাসা কথা বলছে। দিন মাস বছর পার হয়েছে, যখের সজাগ চোখ যেন একটা গুপ্তধনের উপর পাহারা রেখেছে। সে গুপ্তধন আজ ধুলো হয়ে যাবে বুঝতে পেরে বিচলিত হয়েছে যখের প্রাণ। বাঃ, মাটিসাহেবের মেয়ের ভাগ্যের উপর আর-এক অদ্ভুত ঠাট্টার আঘাত। গল্পের সেই কাঠুরিয়া মেয়েটার ভাগ্যের মত; নদীর জলে যখন ডুবে যাচ্ছে মেয়েটা, তখন কোথা থেকে এক রাজপুত্তুর ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠলেন—আমি যে এতদিন তোমারই কথা ভেবেছি।

সুনন্দা—কিন্তু আজ আমাকে তুচ্ছ করুন, আপনি যান। আমি যাব না। আমি ফিরে গেলে কারও কোন ভাল হবে না।

পুষ্কর—সবারই ভাল হবে। তোমারও ভাল হবে।

সুনন্দা—কেমন করে?

পুষ্কর—যেমন ক'রে সব মেয়ের ভাল হয়। বাপ-মার কাছে থাকবে তারপর... একদিন স্বামীর ঘরে চ'লে যাবে।

যেন তীব্র একটা ধিক্কার চাপতে গিয়ে শিউরে ওঠে সুনন্দার গলার স্বর—চুপ! চুপ করুন পুষ্করবাবু। আমাকে কেউ মানুষের মেয়ে বলে মনে করবে না, মন্তর পড়ে হাত ধরবে না, স্ত্রী বলে মেনেও নিতে পারবে না।

—খুব পারবে।

—কেউ পারবে না। আপনিও পারবেন না।

—তুমি বললেই পারবো।

—পারবেন না।

হেসে ফেলে পুষ্কর—সত্যি কথাটা কিন্তু বলতে পারছো না সুনন্দা।

—কি কথা?

—তুমিই পারবে না।

—কেন?

—তোমার ইচ্ছে নেই। কোনদিন যাকে ভাল লাগেনি, তাকে বিয়ে করতে তোমার ইচ্ছে না হওয়াই তো উচিত।

সুনন্দার গলার কাছে যেন করুণ একটা দীর্ঘশ্বাস আটকে গিয়ে হাঁসফাঁস করে। —কোনদিন ভাল লেগেছিল কি না জানি না, কিন্তু আজ তোমায় পা ছুঁয়ে বলতে পারি, বেঁচে থাকতে পারলে তোমার কাছেই যেতে চাইতাম।

পুষ্কর দত্তের বুকটাও বোধহয় চমকে উঠে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের আবেশে টলমল করে উঠেছে। তাই গলার স্বরও নিবিড় হয়ে যায়। —তবে তো তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। চল সুনন্দা।

—না।

—আমিই তো ডাকছি, চল।

—তোমার ডাক শুনেও আমি যেতে পারবো না পুষ্কর। আমাকে ক্ষমা কর।

—কেন?

—বলতে পারবো না। তুমি বুঝে নাও, আর একটি কথাও না বলে চলে যাও।

—আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না।

সুনন্দা যেন নিঃশ্বাসের সব শব্দ থামিয়ে দিয়ে; বুকের ভিতরে ধুকপুক করছে যে কুণ্ঠার জ্বালাটা, দম বন্ধ করে সেটাকেও নিভিয়ে দিয়ে, আর দু'হাত দিয়ে দু'মুঠো কুয়াশাকে খিমচে ধরে নিয়ে, নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে—সব বুঝেও এটুকু বুঝতে পারছো না কেন? আমার মরা শরীরটাও যে লুকোতে পারবে না, ময়নাঘরের ডাক্তার যে দেখেই বুঝে ফেলবে আর হেসে ফেলবে, মাটিসাহেবের মেয়ে পেটে একটা কলঙ্ক নিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

—কি বললে? পুষ্করের গলাটা কেঁপে ওঠে। পুষ্কর দত্তের প্রশ্নটা যেন ধক্ করে জ্বলে-ওঠা একটা ব্যথিত বিস্ময়ের প্রশ্ন।

সুনন্দার চোখ দুটো এইবার অপলক হয়ে, যেন একটা চমৎকার কৌতুকের অন্তিম দেখার জন্য জ্বলজ্বল করতে থাকে। এখনি দেখতে পাবে সুনন্দা, মাটিসাহেবের মেয়েকে একটা ভয়াল মেয়ে-জন্তু বলে মনে করে জওয়ান-ই-বঙ্গালের ভালবাসার মুখরতা কত ভয় পেয়ে কেমনতর বোবা হয়ে যায়; শিউলিবাড়ির কেসর কেমন করে দু' পা পিছিয়ে গিয়েই ছুটে পালিয়ে যায়।

কিন্তু কেঁপে ওঠে সুনন্দার অপলক চোখ। দু' পা এগিয়ে এসে সুনন্দার একেবারে চোখের কাছে দাঁড়িয়েছে পুষ্কর। —বুঝেছি। সব বুঝেও কিন্তু তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে। বিশ্বাস কর সুনন্দা।

—কি বললে?

—তোমাকে হাত ধরে এখনই টেনে নিয়ে গিয়ে চক্রবর্তী ঠাকুরকে এখনই বলে দিতে ইচ্ছে করছে, দিন ঠিক করুন।

শেষ রাতের কুয়াশাময় আকাশ যেন হঠাৎ জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে। শান্ত ঘুমন্ত শালবন যেন স্বপ্নলোকের মায়াবন। পুষ্করের দিকে একটা হাত এগিয়ে দিয়ে সুনন্দার করুণ মূর্তিটা হঠাৎ বিহ্বল হয়ে টলতে থাকে। —তবু ঘেন্না করতে পারলে না?

—না। সুনন্দার হাত ধরে পুষ্কর। কাছে টেনে নেয়। বুকে চেপে ধরে। সুনন্দার শিশিরভেজা মাথাটার উপর হাত বোলাতে থাকে পুষ্কর। একটা আদুরে অক্লান্তার হাত একটা ফুলের গায়ের ধুলো মুছে দিচ্ছে।

শালবনের মায়া-কুয়াশার গায়ে দুটো আলোর চোখ ভেসে উঠেছে, সিগন্যালের হাতছানিও ঝুপ করে একটা শব্দ করে সবুজ
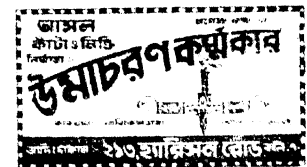
আলো ভাসিয়েছে। এসে পড়েছে ট্রেন, এসে পড়েছে একটা কাপুরুষ ইচ্ছার হর্ষ, একটা অপমানের ব্যস্ততা।

সুনন্দা বলে—চল।

পুষ্কর বলে—চল।

সুনন্দা—কিন্তু না, ওদিকে নয়, স্টেশন হয়ে যেতে পারবো না।

পুষ্কর—কেন?

সুনন্দা—ওখানে যে একজন মানুষের ছেলে বসে আছেন, মাটিসাহেবের মেয়ের গ্লাস নিয়ে যাবার জন্য।

হেসে ওঠে পুষ্কর—মোহিতবাবু রাত আটটার মোটরবাসে চলে গিয়েছেন।

—চমৎকার! হেসে ফেলে সুনন্দা। হেসে ফেলেছে একটা দুঃসহ কৌতুকের সমাপ্তি। হেসে ফেলেছে শিউলিবাড়ির হিমেল নীরবতা।

কিন্তু সেই মুহূর্তে মাটিসাহেবের মেয়ের আত্মাটা যেন ছটফটিয়ে ওঠে আর কেঁদে ফেলে! নিশির ডাকে ঘরছাড়া একটা পাগল ভুলের প্রাণ শিউলিবাড়ির একটা ক্ষমার হাত পা বুকে আর কোলের কাছে ছুটে গিয়ে লুটিয়ে-পুটিয়ে আদর নেবার জন্য ছটফটিয়ে উঠেছে। চোখ মুছে নিয়েই পুষ্করের একটা হাত ধরে টান দেয় সুনন্দা—শিগগির চল।

খোলা দরজার বাইরে এখনও কুয়াশামাখা অন্ধকার থমকে আছে। শিউলিবাড়ির কোন ঘুম-ভাঙা পাখিও ডেকে ওঠেনি। কিন্তু চোখ মেলে তাকিয়েছে নিরুপমা।

ভোর হয়নি, তবু নিরুপমার চোখ দুটো যেন ভোরের আলোর দুটি চোখ হয়ে বিজন-বিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। খাটের উপর বিজনবিহারীর পাশে শান্ত হয়ে বসে আছেন নিরুপমা।

টোটাভরা বন্দুকটাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরেছেন বিজনবিহারী। যেন একটু শান্ত হয়ে, একটু যত্ন নিয়ে, আর অনেক মায়া নিয়ে একটা সুন্দর সাধের কাজ করবার জন্য তৈরী হয়েছে স্বপ্নচারী এক কারিগরের হাত!

কিন্তু বাধা দিল খোলা দরজাটা। পুষ্কর আর সুনন্দা, যেন দুটো ব্যস্ত উদ্বেগ এক-সঙ্গে ঘরের ভিতরে ঢুকে, আর কালিমাখা জ্বলন্ত বাতিটার দিকে তাকিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। থমকে দাঁড়ায় দুটো নিদারুণ বিস্ময়।

ছুটে গিয়ে নিরুপমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে সুনন্দা—আমি কোথাও যাইনি মা। তোমার পায়ে পড়ি মা, ভাল করে তাকিয়ে দেখ, আমি এসেছি। এই তো আমি।

পুষ্কর এগিয়ে এসে বিজনবিহারীর হাত ধরে। বন্দুকটাকে তুলে নিয়ে খাটের তলায় ফেলে দেয়। —আপনি এখন ঘরের বাইরে গিয়ে বসুন। আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিন।

সুনন্দা এগিয়ে এসে আলোয়ানটাকে বিজনবিহারীর গায়ে জড়িয়ে দেয়।

বিজনবিহারী আর নিরুপমা, দুজনের দু জোড়া শান্ত আর অচঞ্চল চোখ যেন ভিন জগতের দুটি মানুষের চোখ। সে চোখে কোন প্রতিচ্ছায়া পড়ছে না। কিংবা বাইরে থেকে হঠাৎ যেন দুজন নতুন আগন্তুক এসে বিজনবিহারী আর নিরুপমার স্বপ্নের ঘরে ঢুকেছে। বিজনবিহারী আর নিরুপমার ঘুমের চোখ তাই তাদের চিনতে পারছে না।

পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন নিরুপমা। সুনন্দা বলে—তুমি শুয়ে পড় মা, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

বিজনবিহারীও পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পুষ্কর বলে—ভোর হয়ে গিয়েছে। চলুন, বাইরে যাই।

খোলা দরজার দিকে চোখ তুলে বাইরের আকাশটার দিকে একবার তাকালেন বিজন-বিহারী। তারপর পুষ্করের সঙ্গেই আস্তে আস্তে হেঁটে বাইরের বারান্দায় এসে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়েন।

পুষ্কর বলে—আমি তবে এখন যাই।

বিজনবিহারী বলেন—এস।

ভোরের পাখি ডাকছে। ঘরের ভিতরে খাটের উপর ক্লান্ত শিশুর মত নিবিড় ঘুমের কোলে যেন ঢলে পড়ে থাকেন নিরুপমা। রান্নাঘরের ভিতরে ঠুং-ঠাং করে চা তৈরী করে সুনন্দা। আর, বাইরের বারান্দায় বসে বিজনবিহারীর চোখ দুটো ভোরের আলোর সঙ্গে যেন আস্তে আস্তে জেগে উঠতে আর হেসে উঠতে থাকে।

সকালবেলার রোদ ঝলমল করে। অনেক দূরে, সিংহানি পাহাড়ের গায়ে যে এক টুকরো সাদা কুয়াশা মাকড়সার জালের মত লেপটে ছিল, সেটাও গলে গেল। রামসিংহা-সনের বউ বিন্ধ্যাচলীর উচ্ছল উল্লাসের মূর্তিটা হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, বিজনবিহারীকে দেখতে পেয়ে মাথার কাপড় টানে, তার পরেই তিন লাফে ঘরের ভিতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ওঠে—পূজারীবাবুর মেয়ে জয়ন্তী এ কি কথা বলছে দিদি?

ধড়ফড় করে জেগে ওঠেন নিরুপমা—কি?

বিন্ধ্যাচলী—পুষ্করের সঙ্গে নন্দুয়া বেটির বিয়ে?

নিরুপমা—কে বলেছে?

বিন্ধ্যাচলী—পুষ্কর বলেছে।

সুনন্দা এসে বলে—হ্যাঁ, চাচিজী।

ঘরের ভিতরে যেমন বিন্ধ্যাচলীর খুশির হাসি ছড়িয়ে গড়িয়ে ছুটোছুটি করে, তেমনই ঘরের বাইরেও এক একটা খুশির হাসি হঠাৎ এসে এসে বিজনবিহারীর বারান্দাটাকে হাসিয়ে দিয়ে চলে যায়। খবরটাকে যেন সারা শিউলিবাড়ির প্রাণ খুশি হয়ে অভ্যর্থনা করছে।

সর্দার সুচেত সিং আসেন আর হাসেন। —বড় ভাল খবর মাটিসাহেব। শুনে খুব খুশি হয়েছি।

ফুলনবাবু আসেন—খুব ভাল হলো মাটি সাহেব। পুষ্কর বড় ভাল ছেলে।

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী আর সেনবাবুর স্ত্রী ব্যস্তভাবে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। —মিষ্টি কই নিরুদি? আজ কিন্তু শুধু আপনার মেয়ের মিষ্টি মুখটি দেখেই ফিরে যাব না।

জয়ন্তী আর মনোরমা, সেই সঙ্গে একদল ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে এসে বারান্দার উপরে বিজনবিহারীকে ঘিরে ধরে। জয়ন্তী বলে—আমরা কিন্তু সুনন্দাদির বিয়েতে থিয়েটার করবো।...বল না মনু।

মনোরমা বলে—জয়ন্তী হলো নাগলতা, আর আমি হলাম কাশ্মীরের রাজা চক্রবর্মা।...তুই বল না জয়ন্তী।

জয়ন্তী—সত্যিই বলতে কান্না পায়। নাগলতা বলছে: দাও দুঃখ, দাও ক্লেশ, দাও চিতাবহ্নিজ্বালা, সকলি সহিব হাসিমুখে; কিন্তু ঘৃণা নাহি সহিবে পরাণে কভু।

নিরুপমা এসে বিজনবিহারীর কাছে দাঁড়ান—শুনেছো?

বিজনবিহারী হাসেন—শুনেছি।

এত শান্ত হয়ে হাসতে গিয়েও ষাট বছর বয়সের চোখ দুটো ছটফট করে ওঠে। চোখের পাতা ভিজে যায়। যেন গলে গিয়েছে দুরন্ত একটা অভিমান।

মুখটাও যে নিতান্ত একটা ছেলে-মানুষের মুখ। শিউলিবাড়ির অঘ্রাণের আকাশটার দিকে পিপাসিতের মত তাকিয়ে আছেন বিজনবিহারী। দেখে সন্দেহ হয় নিরুপমার, আর সন্দেহ করতে গিয়ে চোখ দুটোও ঝাপসা হয়ে যায়; যেন ষোল বছর বয়সের বিজুর প্রাণ একটা স্বপ্নের পথে হাঁটা দিয়ে ফিরে চলেছে।

যেন দীঘনগরের রাস্তা শেষ হয়ে গেল, ধানক্ষেতের ফুরফুরে হাওয়া পিছনে পড়ে রইল। জলঙ্গীর জল ছলছল করে, একটা একলা নৌকার বৈঠা ঝুপঝুপ করে, মুচি-পাড়ার কুকুর জেগে উঠে ঘুর-ঘুর করে। কেষ্টনগরের আকাশের ঝিকিমিকি তারা নিভছে। পথের আলো নিভছে। ভোর হয়েছে। ঐ তো বাড়িটা। চেঁচিয়ে ডাকছে বিজু—আমি এসেছি ছোড়দা।
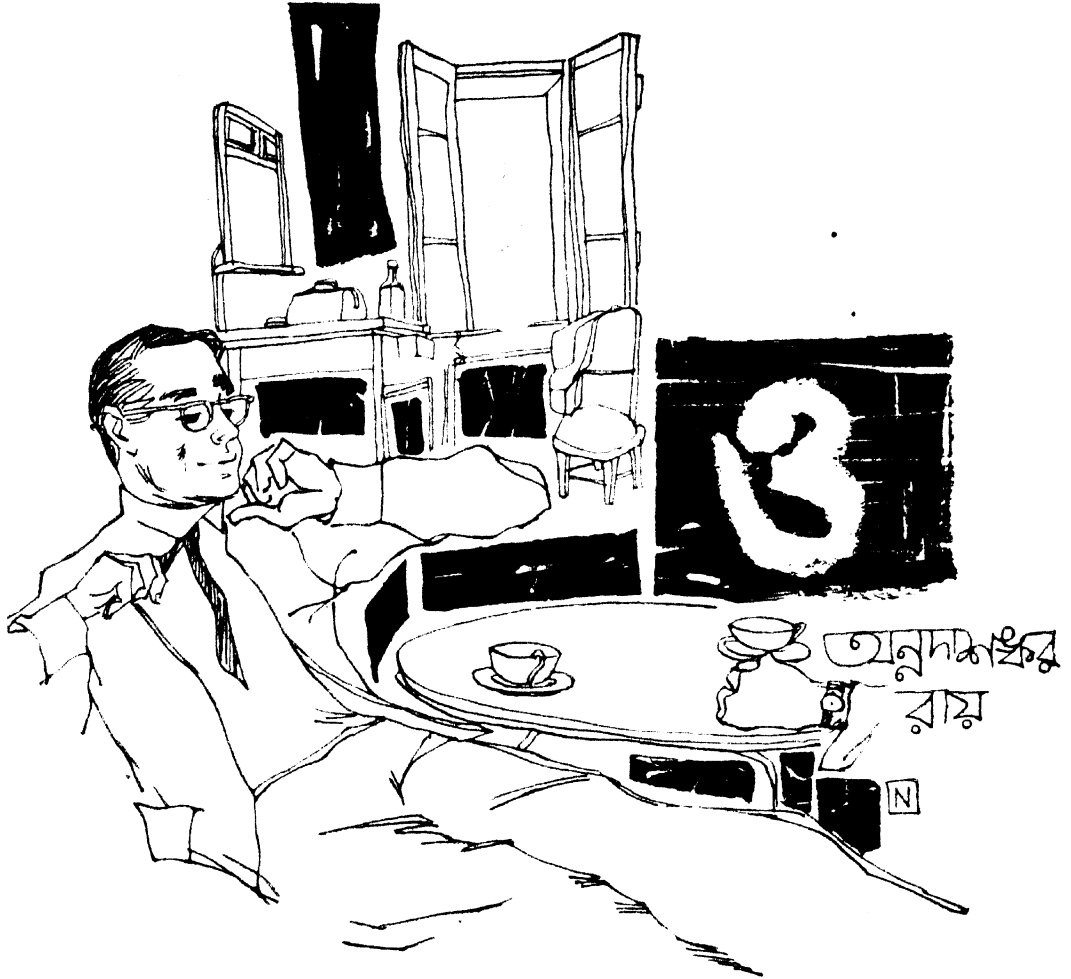
মার্কারের সঙ্গে বিলিয়ার্ডস খেলতে খেলতে প্রিন্সিপাল সাহেব দারুণ একটা 'ব্রেক' করলেন। কিন্তু এর জন্যে তাঁকে বাহবা দেবার জন্যে সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে মার্কার ভিন্ন আর কেউ ছিল না।

"শাবাশ, হুজুর! শাবাশ! বহুৎ ফাস্ট কিলাস!" মার্কার তাঁকে হাসামুখে অভিনন্দন জানাল। তাঁর কাছ থেকে তাঁর কিউ চেয়ে নিয়ে চক ঘষতে লাগল ওর ডগায়।

"কিন্তু আজ জজ সাহেবের এত দেরি হচ্ছে কেন?" প্রিন্সিপাল সাহেব তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্বিতীয় কি তৃতীয়বার এই প্রশ্ন করলেন।

মার্কার বলল, "শায়দ মালুম হোতা কি জজ সাব আজ নেহি আওয়েঙ্গে হুজুর।" পরবর্তী প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা না করেই উত্তর দিল, "বড়া জবর খুনী মামলা, হুজুর।"

খুনী মামলা শুনে প্রিন্সিপাল বিস্মিত হলেন না, কিন্তু জজ সাহেব আসবেন না শুনে খেলা থেকে তাঁর মন উঠে গেল। মার্কারের সঙ্গে কাঁহাতক খেলা যায়। সে যেন তাঁকে জিতিয়ে দেবে বলে বদ্ধপরিকর। ওই 'ব্রেক'টা তা বলে মার্কারের অনুগ্রহে নয়। কিন্তু মজা হচ্ছে এই। জজ সাহেবের সঙ্গে খেলবার সময় এত বড় একটা 'ব্রেক' হয় না।

এবার মার্কারের পালা। সে ওস্তাদ লোক। ছেলেবেলা থেকে এই কর্ম করে আসছে। একবার আস্তে আলগোছে কিউ ছুঁইয়ে দেয়, অমনি খেলার টেবিলের সবুজ মসৃণ আস্তরণের উপর দিয়ে সাদা বল গড়িয়ে যায় ধীর মন্থর গতিতে। অব্যর্থ তার টিপ। পট করতে চায় পট হয়, ইন অফ করতে চায় ইন অফ, ক্যানন করতে চায় ক্যানন। কিন্তু ইচ্ছে করেই সে পয়েন্ট সংখ্যা বাড়তে দেয় না। প্রিন্সিপালকে হারিয়ে দেওয়া তার পলিসি নয়। সে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে পৌঁছিয়ে থাকে।

মার্কারের সঙ্গে খেলে প্রিন্সিপাল সাহেব জয়ী হন, কিন্তু জয়গৌরব পান না। সেদিন আরো কিছুক্ষণ খেলে তিনি কিউ ফেরৎ দিলেন। মার্কার একটু সকাল সকাল বাড়ি যাবার তালে ছিল। একগাল হেসে হাসি চেপে বলল, "বড়ি আফসোসকি বাত হুজুর। জজ সাব আজ আনেওয়ালা নেহি হ্যায়।"

তারপর সেলাম ঠুকে পুছল, "হুজুরকা ওয়াস্তে?"

প্রিন্সিপাল নিজেই নিজেকে পান করাচ্ছেন। হুকুম করলেন, "পানী।"

"বহুৎ খুব" বলে মার্কার সেলাম ঠুকে অদৃশ্য হলো।

এমন সময় শোনা গেল বাইরে মোটরের আওয়াজ। মার্কার সেই দিকেই ছুটল।

"হ্যালো, প্রিন্সিপাল।"

"হ্যালো, জজ।"

দুজনে দুজনের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। দুজনেই উৎফুল্ল। কিন্তু সব চেয়ে

উৎফুল্ল হলো মার্কার। যদিও সব চেয়ে দুঃখিত। হয়েছে এখন তার বাড়ী যাওয়া। জজ সাহেব আর প্রিন্সিপাল সাহেব একসঙ্গে খেলতে শুরু করলে রাত দশটার আগে ছুটি মিলবে না। একটু সরে দাঁড়িয়ে থেকে একবার এ'কে "শাবাশ" ও একবার ও'কে "বাহ বাহ" দিতে হবে। মাঝে মাঝে কিউ হাতে নিয়ে চক মাখিয়ে দিতে হবে। ডাকলে খেলা দেখিয়ে দিতে হবে। ঝগড়া বাধলে আমপায়ার হতে হবে। আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর পৌছতে হবে, "হুজুরেকা ওয়াস্তে?" নেপথ্য থেকে নিয়ে আসতে হবে ফরমাসী পানীয়।

জজ আর প্রিন্সিপাল দুজনে দুটো কিউ বেছে নিয়েই হাঁক ছাড়লেন, "মার্কার!" তা শুনে মার্কার সেলাম ঠুকে হাজির হতেই এককণ্ঠে বললেন, "পুছো।"

বেচারা পড়ে গেল উভয়সংকটে। যদি জজ সাহেবকে পহিলে পোছে তা হলে তার মানে দাঁড়ায় সে প্রিন্সিপাল সাহেবের হুকুম পহিলে মানে। আর যদি প্রিন্সিপাল সাহেবকে আগে প্রশ্ন করে তবে তার কাছে জজ সাহেবের আদেশ অগ্রগণ্য। বহুকালের মার্কার। চাকরিটা এক কথায় যাবে না। তবু কাজ কী কাউকে চটিয়ে? সাহেবসুবোদের মেহেরবানীতে তার ছেলে ভাইপো ভাগনে জামাই কেউ বসে নেই। শীতের এই ক'মাস পরে হুজুরদের আপিসে "পাঙখা পুলার" দরকার হবে। তখন জ্ঞাতিদের জন্যে দরবার করতে হবে তো।

মার্কার জানত যে প্রিন্সিপাল সাহেব যদিও বিদ্বানশ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে তবু জজ সাহেব হলেন দণ্ডমুণ্ডের মালিক। চাইকি ফাঁসি দিতে সমর্থ। স্বএলাকায় তাঁকেই পূজা করতে হয়।

"হুজুরেকা ওয়াস্তে?" সে প্রিন্সিপাল সাহেবকেই আগে পুছল।

তিনি হেসে ফেললেন। যা ভেবেছিলেন তাই। বললেন, "নেম্বু পানী।"

জজ বললেন, "জিন।"

এর পরে দুজনে খেলায় মেতে গেলেন। তাঁদের মুখে কেবল খেলার বুলি। মতভেদ হলে মার্কারকে ডাকেন। সেক্ষেত্রে তার বাক্যই আপ্ত বাক্য। সে তখন কারো মুখ চেয়ে রায় দেয় না। তারও একটা কোড আছে। তার দিকে তাকালেই বোঝা যায় সে তার মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন। জান গেলেও সে তার মহিমা থেকে বিচ্যুত হবে না। অন্যায় করে জজ সাহেবকে জিতিয়ে দেবে না। যদিও তার মাইনে হয়তো জজের মাইনের শতাংশ। সাহেবরা তাকে চটাতে সাহস পান না। সে যদি চাকরি ছেড়ে দেয় আর ও-রকম ওস্তাদ পাওয়া যাবে না।

সেদিন খেলা কিন্তু জমল না। জজ অন্যমনস্ক ছিলেন। তাঁর কিউ বার বার বল ছুঁতে গিয়ে কুশন ছোঁয় কিংবা তাঁর বল অপর বলকে ছুঁতে না পেয়ে ভ্রষ্ট হয়। মার্কার পয়েন্টের হিশেব রাখে। বোর্ডের দিকে নজর পড়লে তিনি শিউরে ওঠেন। মাইনাস টোয়েণ্টি। তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, "নো লাক।"

"ব্যাপার কী, সুর?" প্রিন্সিপাল বললেন, "তুমি যে একেবারেই খেলছ না?"

"আর বল কেন, মৈত্র।" জজ বললেন পাংশুমুখে, "যেখানে একজনের প্রাণ নিয়ে টানাটানি সেখানে আরেকজন খেলা করবে কোন্ সুখে? খেলতে পারো তোমরা মাস্টাররা। তোমরাই ভাগ্যবান।"

প্রিন্সিপাল প্রতিবাদ করলেন। বললেন, "মানুষকে ফাঁসী দিতে সকলেই পারে, কিন্তু মানুষের ছেলেকে মানুষ করে দিতে পারে ক'জন! অথচ মজুরি কিনা তাদেরি সব চেয়ে কম!"

"ফাঁসী দিতে সকলেই পারে!" জজ আশ্চর্য হলেন। 'বাইশ লাখ লোকের এই দুই জেলায় মাত্র একজনকেই সে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমি হলুম ওয়ান ইন টু মিলিয়ানস।"

মাথার চুল চামরের মতো সাদা আর নরম। কিন্তু বয়স এমন কিছু হয়নি। সবে চল্লিশের কোঠায় পড়েছে। আঁটসাঁট মুখমণ্ডল। ঠোঁট জবাফুলের মতো রাঙা। সিভিলিয়ান মানুষ পান খান না। এ রঙ কৃত্রিম নয়। চেহারাও বাঙালীর পক্ষে অসাধারণ ফরসা। তিন চার বছর অন্তর অন্তর বিলেত ঘুরে আসা অভ্যাস। বিয়ে করেননি। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেন, "হাতে কিছু জমলে তো বিয়ে করার কথা ভাবব।"

ওদিকে প্রিন্সিপাল হচ্ছেন গ্রাস উইডোয়ার। তাঁর স্ত্রী থাকেন কলকাতায় ছেলেমেয়ে নিয়ে। ভদ্রলোক প্রেসিডেন্সী কলেজে দীর্ঘকাল থাকার পর এই প্রথম প্রিন্সিপাল পদ পেয়ে মফঃস্বলে বদলি হয়েছেন। যদি ভালো না লাগে তবে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন। নাই বা হলো প্রমোশন। আর যদি ভালো লাগে তা হলে সবাইকে নিয়ে আসবেন। একদা লণ্ডনে পড়েছেন। সে সময় জজ ছিলেন তাঁর সমকালীন ছাত্র।

"তোমার অত মাথাব্যথা কিসের?" প্রিন্সিপাল বললেন জজের শুভ্র কেশের উপর কটাক্ষ করে, "সিদ্ধান্তটা তো তুমি করতে যাচ্ছ না হে। করবে জুরি। জুরি যদি বলে আসামী ৩০২ ধারা অনুসারে অপরাধী আর তুমি যদি একমত হও তাহলে আইনে বলে দিয়েছে তুমি তাকে ফাঁসী দেবে। যদি না তুমি তার অপরাধ লাঘব করার মতো কোনো অবস্থা দেখতে পাও। সেক্ষেত্রে তুমি দ্বীপান্তরের আদেশ দেবে। এই পর্যন্ত তোমার স্বাধীনতা। যেখানে স্বাধীনতা নেই সেখানে দায়িত্ব নেই। যেখানে যতটুকু স্বাধীনতা সেখানে ততটুকু দায়িত্ব।"

মৈত্র কিছুদিন ব্যারিস্টারি করেছিলেন। পসার জমেনি। ধাতটা পণ্ডিতের। ভালো ডিগ্রী ছিল। ডি পি আই'র সঙ্গে দেখা করতে না করতেই অমনি নিযুক্তি পত্র এলো। সিদ্ধান্তটা তিনি সরকারী চাকরির বয়স পেরিয়ে যাবার আগেই নিয়েছিলেন। নইলে তাঁর মুখেও শোনা যেত "আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু, হায়" মাইকেলের মতো।

তর্ক করতে করতে তাঁরা টেবিল ছেড়ে কিন্তু কিউ হাতে করে অদূরে উঁচু বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন। মার্কার ধরে নিল যে তাঁরা একটু পরে নেমে এসে খেলা চালিয়ে যাবেন। কাশতে কাশতে সে বাইরে গেল জজ সাহেবের শোফারের সঙ্গে গল্প করতে।

"হায়, বন্ধু!" জজ বললেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "যদি অত সহজ হতো! কী করে আমি তোমাকে বোঝাব যে বিচারের পরিণামের জন্যে জুরির চেয়ে আমার দায়িত্ব বেশী। তোমার কথায় মনে পড়ল আর একজনের কথা। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাকে মারবার তাকে শ্রীভগবান স্বয়ং মেরে রেখেছেন। হে অর্জুন, তুমি শুধু তাঁর হাতের অস্ত্র। নিমিত্তমাত্রো ভব সব্যসাচী।"

"ওই গীতার বচনই শেষ কথা। সমস্ত দায় ওই [illegible] ভগবানের। তোমার আমার কিসের দায়? অত বেশী সিরিয়োরিয়াস হতে যাই কেন আমরা? প্রতিদিন এ জগতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরছে। একটা মানুষ বেশী মরলে কী আসে যায়!" প্রিন্সিপাল উদাসীনভাবে বললেন।

"মরবে মরুক। কিন্তু অন্যের হাত দিয়ে কেন মরবে? কপালের দোষে মরতে পারে। কিন্তু বিচারের দোষে কেন মরবে? একজনও নির্দোষ ব্যক্তি যেন শাস্তি না পায় এই আমাদের [illegible] সেই মূলনীতির সংরক্ষণ। মাথাব্যথা আমার হবে না তো কার হবে? আমি এটাকে সিরিয়াসভাবে নিই।" জজ নাছোড়বান্দা।

"বেশ। তোমার ভাবনা তোমার। মাঝখান থেকে আমার সন্ধ্যাটা মাটি। মার্কার! মার্কার ব্যাটা ভাগল কোথায়?" প্রিন্সিপাল হাঁক দিলেন।

মার্কার পাগড়ি খুলে রেখে আরাম করছিল। পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে ছুটে এলো। তখন প্রিন্সিপাল বললেন, "পুছো।"

"না, না। এবার তোমার পালা নয়। আমার পালা। মার্কার!" জজ ইঙ্গিত করতেই মার্কার তাঁর আদেশ মান্য করল। প্রিন্সিপালের পাশে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

মৈত্র বললেন, "নারঙ্গী।"

আর সুর চাইলেন ছোটা পেগ।

দুজনে দুজনকে "চীয়ারিও" জানিয়ে পানীয় তুলে মুখে ছোঁয়ালেন। কিন্তু সেই উচ্চাসন থেকে নামবার নাম করলেন না। মার্কার বেচারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

হঠাৎ মার্কারের মুখের উপর নজর পড়ায় অন্তর্যামী জজ অনুমানে বুঝলেন তার মনের ভাষা। ডান হাত উঠিয়ে বললেন, "ব্যস!"

সে তখন সাহেবদের হাত থেকে কিউ দুটি নিয়ে প্রাচীরে লগ্ন করল। আর টেবিলের উপর বলগুলোকে সাজিয়ে রাখল। আর টেবিলের উপরকার কড়া আলোর বাতির সুইচ টিপে নিবিয়ে দিল। তা সত্ত্বেও সে বিদায় নিতে পারে না, যতক্ষণ সাহেবরা ক্লাবে থাকেন ও পানীয় ফরমাস করেন। ন'টা এখনো বাজেনি। তবু মনে হয় গভীর রাত। নিঝুম শহর।

তার দশা দেখে জজ বললেন, "মৈত্র, এখন এ বেচারাকে আটকে রেখে আমাদের কী লাভ? ক্লাবে তো আজকাল কেউ আসতেই চান না টেনিসের পরে।" ইংরেজীতে যোগ করলেন, "কিসের টানে আসবেন? মোহিনী শক্তি কোথায়? স্টেশনে উপস্থিত মহিলারা সকলেই পর্দা। ইন্ডিয়ানাইজেশনের পরিণাম।"

"এবং ইসলামাইজেশনের।" মৈত্রও বললেন ইংরেজীতে। "কিন্তু সেই একমাত্র কারণ নয়, স্যর। তুমি বিয়ে করনি। সিভিল সার্জনও চিরকুমার। তোমরাও যদি ও-ভাবে শত্রুতা কর তা হলে ক্লাব উঠে যেতে কতক্ষণ? আমি তো মনে করি সমাজও উঠে যাবে।"

জজ হেসে বললেন, "হা হা! আমরা করছি শত্রুতা! চল হে চল। আমার ওখানে চল। খেতে খেতে গল্প করা যাবে। ডিনারে আজ তুমি আমার অতিথি হলে ধন্য হব।"

মার্কারকে ছুটি দিয়ে দুই বন্ধু মোটরে উঠে বসলেন।

২

খেতে খেতে নিম্নস্বরে আজে বাজে কথা হলো। তার পর কফির পেয়ালা হাতে করে দুজনে গিয়ে বসলেন ফায়ারপ্লেসের ধারে। শীত পড়েছিল সে কথা ঠিক। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা স্যর সাহেবের [illegible] অভ্যাস। আগুন পোহাতে পোহাতে তিনি রেডিওতে বি বি সির সঙ্গীত শুনতে ভালোবাসেন। তাঁর পায়ের কাছে তাঁর প্রিয় কুকুর জ্যাক।

"আচ্ছা, মৈত্র", স্যর পুনঃ প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন, "তুমি নিজে ফাঁসী দিতে পারো? মানে জজ হলে তুমি ফাঁসীর হুকুম দিতে পারবে?"

"আলবৎ।" মৈত্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "আমি তো দিচ্ছিনে। দিচ্ছে আইন। দেশের সরকার যদি ক্যাপিটাল সেনটেন্স রহিত করে আমিও দেব না।"

"কিন্তু সেই তিনিও, যিনি আমাকে নিমিত্তমাত্র হতে উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনিও দেখলুম আমার প্রশ্ন শুনে পেছিয়ে গেলেন। বললেন, না, আমি পারবনে। তার পর আমাকে এক কাহিনী শোনালেন। তাঁর নিজের জীবনের কাহিনী।" এই বলে জজ আবার অন্যমনস্ক হলেন। তাঁর স্মৃতি ফিরে গেল জজিয়তীর প্রথম দিনগুলিতে।

"মামলাটা তো আমার কোর্টের নয়। খুঁটিনাটি আমার মনে নেই।" তিনি একটু একটু করে স্মরণ করে বলতে থাকলেন থেমে থেমে, এখানে ওখানে শুধরে দিতে দিতে, নিজেই নিজের প্রতিবাদ করতে করতে। মোটামুটি দাঁড়াল এই রকম।

নিয়োগী সাহেব যখন রাজশাহী জেলার দায়রা জজ তখন তাঁর আদালতে এক খুনী মামলা আসে। ইংরেজ মোল্লা খুন হয়েছে। আসামী আর কেউ নয়, তার বেটা গোপাল মোল্লা। গোপালের বয়স আঠারো উনিশ হবে। মা নেই। আদুরে দুলাল। সে যা চায় তাই পায়। কখনো বাপের মুখে "না" উত্তর পায়নি। মহা শৌখীন ছোকরা গোপাল। গ্রামে এক আলকাপ দল গড়েছে। এক রকম যাত্রার দল। রাত দিন ওই নিয়ে থাকে। তার সুন্দর রূপ আর সুন্দর কণ্ঠ কত মেয়েকে যে আকর্ষণ করে! তাদের স্বামীরা শত্রু হয়। কিন্তু গোপাল ছেলেটা সৎ। কেউ তাকে সে দোষ দিতে পারে না।

এমন যে গোপাল সে একদিন বায়না ধরল নিকা করবে। কাকে? না সোনাভানকে। অসমবয়সিনী রসবতী বিধবা। চার দিকে দুর্নাম। কিন্তু বহু সম্পত্তির মালিক। তাই তার প্রার্থীও অনেক। প্রস্তাবটা শুনে ইংরেজ বলল, "না।" গোপাল বিগড়ে গেল। ইংরেজ এখনো দিব্য জোয়ান। তারও প্রচুর সম্পত্তি। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর। গোপালকে বাঁচানোর জন্যে গোপালের বাপ করে বসল সোনাভানকে নিকা। ভেবেছিল গোপাল তার কপালকে মেনে নিয়ে আর একটি লক্ষ্মী মেয়েকে বিয়ে করবে। কিন্তু গোপাল বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে ভিন্ন গাঁয়ে গিয়ে দেওয়ানা হলো। আলকাপের ভার নিল তার ইয়ার কালু।

সুখেই ঘর করছিল ইংরেজ মোল্লা। আর একটি বেটাও হয়েছিল তার। একদিন অন্ধকার রাত্রে কে একজন তার ঘরে ঢুকে তাকে হেঁসো দিয়ে মেরে খুন করে। ইংরেজ চেঁচিয়ে ওঠে, গোপাল, তুই! চিৎকার শুনে পাড়ার লোক ছুটে আসে। দেখে ইংরেজ অজ্ঞান। একটু পরেই সে মারা যায়। গোপালকে তারা কেউ দেখেনি, কিন্তু তারাও শুনেছিল ইংরেজের চিৎকার, "গোপাল, তুই!" সোনাভান সে সময় ছিল না। আলকাপ শুনতে গেছল। গোপালকে গ্রেপ্তার করা হয় পরের দিন আলকাপ দলের আখড়ায়। সে বলে, আমি তো ও-বাড়ি চিরদিনের মতো ছেড়েছি। আমি কেন যাব? কিন্তু অবস্থাঘটিত প্রমাণ তার বিরুদ্ধে। একখানা রুমাল কুড়িয়ে পাওয়া গেল। সেখানা গোপালকে দিয়েছিল সোনাভান। তাতে রক্তের দাগ ছিল।

খুনী মামলায় জুরি সাধারণত ঝুঁকি নিতে চায় না। একেবারে খালাস দিতে কুণ্ঠা বোধ করলে ৩০২ ধারাকে দাঁড় করায় ৩০৪ ধারার কোঠে কিংবা খাতে। এ মামলায় জুরি ইচ্ছা করলে অপরাধের গুরুত্ব কমিয়ে আনতে পারত, কিন্তু ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করল। পাবলিক প্রোসিকিউটার তাদের ভালো করে ভজিয়েছিলেন যে, বৌ

মারা গেলে বৌ হয়, ছেলে মারা গেলে ছেলে হয়, কিন্তু বাপ মারা গেলে বাপ আবার হয় না। পিতৃহত্যার মতো দুষ্কর্ম আর নেই। গোপাল যদি সংমাকে পাবার আশায় এমন গর্হিত কাজ করে না থাকে তবে আপনারা তাকে খালাস দিন, যদি আপনাদের মনে যুক্তিসংগত সন্দেহ থাকে তবে সন্দেহের সুফল দিন। কিন্তু পাবলিক প্রোসিকিউটার নাটকীয় ভংগীতে বলেছিলেন, ইংরেজ মোল্লাকে যে হত্যা করেছে সে যদি তার পুত্র গোপাল ভিন্ন আর কেউ না হয়ে থাকে তা হলে, তিনি চোখে জল এনে ফেলে জুরির সামনে চোখ মুছতে মুছতে বলেছিলেন, আপনাদের কর্তব্য অতি কঠোর। কোনো রকম কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেবেন না। গোপাল গেলেও ইংরেজের বংশলোপ হবে না। আপনারা শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান। বিজ্ঞের কাছে একটি শব্দই যথেষ্ট।

মৈত্র আর ধৈর্য ধরতে পারছিলেন না বললেন, "তারপর বিচারক নিশ্চয় তার বয়স বিবেচনা করে তাকে ফাঁসী দিলেন না। দ্বীপান্তর দিলেন।"

"না, বন্ধু। গোপাল আর গোপাল নয়। সে সাবালক হয়েছে। সাবালকের ছাড় নেই। মাফ নেই। নিয়োগী জুরির সংগে একমত হয়ে গোপালকে চরম দণ্ড দিলেন। ভালো উকীল দিলে হয়তো ছেলেটা বেঁচে যেত। কিন্তু আসামীর মামা গরীব লোক। সে সরে দাঁড়ায়। সরকারী ডিফেন্স প্যানেল থেকে যথারীতি একজন উকীল দেওয়া হয়। সরকারী খরচে সামান্য ফী। ভালো উকীলরা কেউ সে প্যানেলে নাম দেন না। যাকে উকীল দেওয়া হয়েছিল তিনি পাবলিক প্রোসিকিউটারের সামনে দাঁড়াবার অযোগ্য। নিয়োগী কী করতে পারেন? ফাঁসীই দিলেন।" সুর বললেন করুণ সুরে।

"আহা! ফাঁসী!" মৈত্র শিউরে উঠলেন। "হাইকোর্ট কনফার্ম করল?"

"শোন তারপর কী হলো। আসামী কাঁদল না, কাটল না। নীরবে দণ্ড গ্রহণ করল। শুধু একবার আসমানের দিকে হাত জোড় করে তাকাল। এর পরে আরম্ভ হলো বিচারকের বিচার। তিনি বাংলোয় ফিরে গিয়ে অন্য কাজে মন লাগাতে পারলেন না। তাঁর আহারে রুচি নেই। তিনি দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠেন, আর ঘুমোতে পারেন না। তাঁর নিজের শান্তির জন্যে তিনি দিন কয়েক পরে জেলখানা পরিদর্শনের ছলে গোপালের সংগে কথা বলতে যান। বলেন, গোপাল, তোমার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু কী করব, বল। আমারও তো ধর্মভয় আছে। গোপাল বলে, ধর্মাবতার, কেয়ামতের দিন খোদাতালা আমার বিচার করবেন। সাক্ষীদেরও জুরি সাহেবানেরও। ধর্মাবতারেরও। নিয়োগী তাড়াকে গিয়ে বলেন, গোপাল, তুমি আপীল কর। গোপাল বলেন, নিজের বাপ যাকে, মেয়ে রেখেছে সে কি আপীলে বাঁচবে, ধর্মাবতার! আর মরতেই আমি চাই। যে-মেয়ে আমার সংমা হয়েছে তার সংগে কি নিকে বসা যায়! খালাস হলেও আমি মুখ দেখাতে পারতুম না, ধর্মাবতার। লোকে বিশ্বাস করত যে সংমাকে নিকা করার জন্যে আমিই আমার বাপজানকে মেরেছি।"

মৈত্র কণ্ঠক্ষেপ করলেন। "এরই নাম ঈডিপাস কমপ্লেক্স।"

সুর বলতে লাগলেন, "ছেলেটির কথা-বার্তায় এমন একটা সত্যের ঝংকার ছিল যে নিয়োগীর মনে হলো আর সকলে অভিনয় করে গেছে, শুধু গোপাল তা করেনি। তিনি স্থানকাল ভুলে তাকে মিনতি করে বললেন, গোপাল, তুমি একবার শুধু বল আসলে কী হয়েছিল। গোপাল বলল, খোদায় মালুম। আমি তো সেখানে যাইনি। রুমালটা সোনাভান আমাকে দিয়েছিল নিকার আগে, আমি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসি নিকার পরে। তাতে রক্ত কী করে এলো খোদা জানেন। এর পরে গোপাল চুপ করে। নিয়োগীও আর তাকে খোঁচান না। কিন্তু সেই যে তাঁর মাথায় পোকা ঢুকল সে পোকা সেইখানেই থেকে গেল। তিনি সরকারকে চিঠি লিখলেন যে তিনি ছুটি নিতে চান। ছুটির পর আর যেন তাঁকে জজ করা না হয়। করলে তাঁর নার্ভাস ব্রেকডাউন হবে।"

মৈত্র বললেন, "তাঁর মতো লোকের জজ না হওয়াই ভালো। যে যা বলে তাই তিনি বিশ্বাস করবেন। আরে, ফাঁসীর কয়েদী তো অমন কথা বলবেই।"

"ফাঁসীর কয়েদী", সুর বললেন, "আপীল করে না কোথাও শুনেছ এ কথা?"

"তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল গোপাল আপীল করেনি?" মৈত্র পাল্টা সুধালেন।

"না, বন্ধু। গোপাল আপীল করেনি। এটা এমন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার যে কেবল নিয়োগী কেন, অনেকের মনেই ধোঁকা লেগেছিল। পাবলিক প্রোসিকিউটারও পরে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। কিন্তু শোন তার পরে কী হলো। নিয়োগী ছুটি পেলেন, কিন্তু ছুটির পরে তাঁকে সেই জেলারই কলেক্টর পদে অফিসিয়েট করতে বলা হলো। তিনি তার সুযোগ নিয়ে ট্যুরে ফেললেন বদল-গাছি থানায়। পাহাড়পুরের স্তূপ পরিদর্শন করবেন। সরেজমিনে গিয়ে হারুনল রশিদের মতো ছদ্মবেশে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। দফাদার চৌকিদারদের মুখেই শুনলেন যে হালিম মির্ধা এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছে। বাপকে আর বেটাকে। সোনাভান আর তার সম্পত্তির লোভে। কাজিয়া একটা অনেক দিন থেকে চলছিল। নিকার আগে সোনাভানের জমিজমা তারই হেফাজতে ছিল। তার বিবি না থাকলে সোনাভান তার সংগেই নিকা বসত। তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিল ইংরেজ মোল্লা। তলে তলে ফন্দী আঁটছিল। একদিন অন্ধকার রাত্রে 'বাপজান' বলে ঘরে ঢুকে ইংরেজকে নিকাশ করল। ঘুমের ঘোরে ইংরেজ চেঁচিয়ে উঠল, 'গোপাল, তুই!' সোনাভান ছিল না। সাক্ষীরা আসবার আগে হালিম অন্তর্ধান।"

মৈত্র ব্যংগ করে বললেন, "গাঁজা। গাঁজা। বদলগাছিতে তো গাঁজার চাষ হয় শুনেছি। নিয়োগীকেও গাঁজা খাইয়ে দিয়েছে। তার পর?"

"হালিম অনেক দিন নিরুদ্দেশ ছিল। গোপালের সাজা হওয়ার পর সে আবার গ্রামে ফিরে এসেছে, কিন্তু গ্রামের লোক তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। সে খুব সাবধানে চলাফেরা করছে। গোপালের ফাঁসী হয়ে গেলে পরে সোনাভানকে নিকা করবে। নিয়োগী সাহেব যখন সদরে ফিরলেন তখন তাঁর ১০২ ডিগ্রী জ্বর। সেই জ্বর নিয়েই তিনি নতুন জজের বাড়ি গিয়ে দেখা করলেন। বললেন, এখনো সময় আছে। ছেলেটার যাতে ফাঁসী না হয় তার জন্যে আসুন আমরা চেষ্টা করি। নতুন জজ ম্যাকগ্রেগর কি রাজী হন! বললেন, কেসটা আমি করিনি। আমার কোনো লোকাস স্ট্যাণ্ডাই নেই। আর আপনিও এখন জজ নন। আপনি ফাংটাস অফিসিও। কাগজ-পত্র হাইকোর্টে চলে গেছে। প্রাণদণ্ড তাঁরা হয়তো কনফার্ম করবেন না। তাহলে তো ছেলেটা মরছে না। তা শুনে নিয়োগী বললেন, যদি কনফার্ম করে তখন যে খুব দেরি হয়ে গিয়ে থাকবে। ম্যাকগ্রেগর বললেন, তখন গভর্নরের কাছে করুণা ভিক্ষা করলে তিনি তার বয়স বিবেচনা করে প্রাণ-দণ্ড মকুব করবেন। এর নজির আছে। নিয়োগী বললেন, যে মানুষ আপীল করল না সে কি মার্সি পিটিশন দেবে? তাহলে তো স্বীকার করে নেওয়া হয় যে সেই তার বাপকে খুন করেছে। ম্যাকগ্রেগর বললেন, স্বীকার তাকে করতেই হবে। যদি প্রাণে বাঁচতে চায়। চৌদ্দ বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। জীবন নতুন করে আরম্ভ করার পক্ষে ত্রিশ বছর এমন কিছু বেশী বয়স নয়। চাষীর ছেলে। অন্য কোনো গ্রামে গিয়ে বাস করলে কেই বা তাকে সমাজে ঠেলবে!"

"হাঁ। ম্যাকগ্রেগরই জজ হবার যোগ্য।" মৈত্র তারিফ করে বললেন। "তার পর?"

"তার পর যা হবার তাই হলো। হাইকোর্ট দেখল গোপাল আপীল করেনি। কেউ তার হয়ে একটি কথাও বলবার জন্যে দাঁড়ায়নি। প্রাণদণ্ড কনফার্ম করল। তা শুনে নিয়োগী আবার গোপালের সংগে জেলখানায় গিয়ে কথা বললেন। সে মার্সি পিটিশন দিতে নারাজ হলো। যে দোষ করেনি সে কেন করুণা ভিক্ষা করবে? তখন নিয়োগী একটা অভূতপূর্ব কাজ করলেন। ক্রাউন্সিয়াল সেক্রেটারিকে চিঠি লিখে সব কথা জানালেন।

উত্তর এলো, আদালতের বাইরে ভূতপূর্ব জজ যদি কিছু শুনে থাকেন তবে সেটার উপর কোনো য়্যাকশন নেওয়া যায় না। মার্সি পিটিশন না দিলে ধরে নেওয়া হবে যে দণ্ডিত ব্যক্তি অননুতপ্ত। সুতরাং করুণার অযোগ্য। নিয়োগী হাল ছেড়ে দিলেন। ফাঁসীর আগেই তাঁর অস্থায়ী কার্যকাল শেষ হয়ে যায়। তিনি অন্যত্র বদলি হন। তার পর তিনি মদ ধরলেন, রেস ধরলেন। উপরন্তু গীতা ধরলেন। আশা করলেন এইসব করলে তিনি বাঁচবেন।"

মৈত্র বিস্মিত হয়ে সুধালেন, "কেন? তিনি কি বাঁচলেন না?"

"আহা! শোনই না সবটা!" সুরে বলতে লাগলেন, "আমার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম আলাপ তখন তিনি কমিশনার পদে অফিসিয়েট করছেন। না বাঁচলে কি কেউ এতদূর উন্নতি করতে পারে! আমি যখন তাঁকে বলি যে জজের কাজ আমার ভালো লাগে না, অথচ বংশের পদ হচ্ছে দিল্লীকা লাড্ডু, যা খেয়ে আমি পশতাচ্ছি, তখন তিনিই আমাকে উপদেশ দেন, নিমিত্তমাত্রো ভব সব্যসাচী। কিন্তু তাঁর নিজের জবানীতে তাঁর জাজিয়তীর গল্প শুনে আমার মনে ভয় ঢুকল যে আমিও হয়তো তাঁরই মতো কোনো নিরপরাধীকে ফাঁসী দিয়ে আজীবন পশতাব। তাই ফাঁসীর মামলা আমার কোর্টে এলেই আমি গীতা খুলে বসি। কিন্তু তাতে কোনো শান্তি বা সান্ত্বনা পাইনে। ঈশ্বর বলে কেউ আছেন কি না তর্কের বিষয়। তাঁর হাতের যন্ত্র বলে নিজেকে ঘুম পাড়াতে পারিনে। জজকে সমস্তক্ষণ হুঁশিয়ার থাকতে হয়। পাছে কোনো নির্দোষের সাজা হয়। প্রাণদণ্ড দূরের কথা, কারাদণ্ডই বা কেন হবে? বিচারটা যতদিন চলে ততদিন আমার সোয়াস্তি নেই। যেন বিচারটা আসামীর নয়, আমার নিজের। বিচার শেষ হলে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু মনে একটা সংশয় থেকে যায়। কে জানে প্রকৃত সত্য কী? পাইলেট যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যীশুর বিচারের সময়। পাইলেটের মতো আমিও অজ্ঞেয়বাদী। কই, সাক্ষাৎ ভগবানের পুত্রকে দেখেও তিনি তো ভগবদ্‌বিশ্বাসী হননি। আসলে কী হয়েছিল তা আমার জানবার উপায় নেই। আমি অসহায়। তাই যদি না জানতে পেলুম তো কেবল দণ্ডমুণ্ডের নিমিত্ত হয়ে আমার কী লাভ!"

"তোমার লাভ না হোক, সমাজের লাভ।" মৈত্র সে বিষয়ে সুনিশ্চিত।

"হাঁ। একদিক থেকে সেটা ঠিক। বিচারের একটা ঠাট বজায় না রাখলে লোকে আইনকে নিজেদের হাতে নেবে। প্রত্যেকেই হবে এক একজন দণ্ডদাতা ও জল্লাদ। কিন্তু আমি চাই নিশ্চিতি। শতকরা এক শ' ভাগ নিশ্চিতি। যাকে সাজা দিলুম সে যে আরেকজন গোপাল নয় এই নিশ্চিতি। অবশ্য গোপালের মতো আমি আর একজনকেও দেখিনি যে আপীল করবে না, মার্সি পিটিশন দেবে না, কেয়ামতের উপর বিচারের ভার ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্বেগে মরবে। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি যে জেলা থেকে বিদায় নেবার আগে নিয়োগী আরো একবার জেলখানায় গিয়ে গোপালের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এবার তাকে কাতর কণ্ঠে বলেছিলেন, গোপাল, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। আমিও সামান্য একজন ভ্রান্তিশীল মানুষ। ভুলচুক তো মানুষমাত্রেরই হয়। গোপাল বলে, ধর্মাবতার, আপনার কী দোষ যে ক্ষমা করব? রাখে আল্লা মারে কে? মারে আল্লা রাখে কে? খোদা আপনাকে দোয়া করুন। আপনি লাটসাহেব হোন।"

"ছেলেটা সত্যি বড় ভালো বলতে হবে।" স্বীকার করলেন মৈত্র।

"কোয়াইট রাইট।" সুরে অন্যমনস্কভাবে বললেন, "কিন্তু কী ট্র্যাজিক! কেন এ রকম হয়? মানুষ কী করতে এ জগতে আসে? কী করে? কেন শাস্তি পায়? সে শাস্তি কি ইহজন্মের কর্মফল? না পরজন্মের জের? না পরবর্তী জন্মের প্রস্তুতি? যারা পরজন্ম বা পরকাল মানে না তাদের তুমি বুঝে দিচ্ছ কী বলে?"

৩

মৈত্র মৌন হয়ে বসে রইলেন। তখন সুরে বললেন, "আজ খুব ভালো মিউজিক আছে হে। বি বি সি ধরব?"

মৈত্র হাত নেড়ে বললেন, "না, থাক।"

থমথমে পরিস্থিতি। কিছুক্ষণ পরে মৈত্র নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন, "সুরে, তুমি এইবার একটি বিয়ে কর।"

"কেন, বল দেখি? তোমাকে কেউ ঘটকালি করতে বলেছে?"

"না হে। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। চুল পেকে শন হয়েছে বটে, কিন্তু শরীর শক্ত আছে। এ বয়সে কত লোক বিয়ে করেছে। করে সুখী হচ্ছে।"

"হা হা! তোমাকে বলিনি মিসেস নিয়োগী আমাকে কী বলেছিলেন।"

মৈত্র থতমত খেয়ে সুধালেন, "কী বলেছিলেন?"

"বলেছিলেন, অভিলাষ, আমাকে দিদি বলে যখন ডেকেছ তখন সেই সুবাদে একটা কথা বলি। বিয়ে কোরো না। বৌটা বাঁচবে।"

"য়্যাঁ! তাই নাকি?"

"শুধু এই নয়। পরে একদিন তিনি সোজা আমার বাংলোয় এসে হাজির। বললেন, অভিলাষ, তোমার কাছে লীগ্যাল অ্যাডভাইস চাইতে এসেছি। উকীল বাড়ি যেতে লজ্জা করে। তা ছাড়া তুমি আমার ভাই। ভাইয়ের কাছে লজ্জা কিসের? তোমার আপন দিদিকে তুমি এ অবস্থায় যা করতে বলতে আমাকেও তাই করতে বলবে আশা করি।"

"ব্যাপার!" মৈত্র চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"শোনো। মিসেস নিয়োগী বললেন, অভিলাষ, ওঁর পরিবর্তনের জন্যে আমি

আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এতদিনে বুঝতে পেরেছি আমি ফেল। মদ আর রেস হলেও ক্ষমা করা যায়। কিন্তু নিজের দেশকে উনি ইংরেজের পায়ে বিকিয়ে দিচ্ছেন। ও'র সরকারীনথিপত্র আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছি। ও'র প্রশ্রয় পেয়ে অধীনস্থরা অবাধে দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছে। আমি বললে উনি রাগ করেন। আমি জানতে চাই ডিভোর্সের এটা একটা গ্রাউন্ড হতে পারে কি না।"

মৈত্র চমকে উঠলেন। বললেন, "না। না। এ হতেই পারে না। এ অসম্ভব।"

"আমিও তাঁকে সেই কথাই বোঝাই। বরং একটু ভয় দেখিয়ে দিই। স্বামীর সরকারী নথিপত্র লুকিয়ে লুকিয়ে পড়াও একটা গ্রাউন্ড হতে পারে।" সুর মুচকি হাসলেন।

মৈত্রর মুখ শুকিয়ে গেল। "কা-কাজটা খু-খুবই খারাপ। কি-কিন্তু তা বলে ডি-ডিভোর্স হতে পারে নাকি? না, তুমি আমার লেগ পুল করছ? তুমি জানো আমি ডিভোর্সের শত্রু!"

সুর বললেন, "আমার উদ্দেশ্য তুমি ধরতে পারোনি, মৈত্র। আমি চাইনি যে আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন পরামর্শদাতার জীবন আরো দুর্বহ হয়। ডিভোর্সের আমি লেশমাত্র প্রশ্রয় দিইনি। তোমার সমাজ আমার হাতে নিরাপদ।"

"আমি হলে কী করতুম বলি।" মৈত্র কথার সূত্র নিজের হাতে নিলেন। "আমি ভদ্রমহিলার মনোবিশ্লেষণ করতুম। কেন তিনি তাঁর স্বামীর উপর এতদূর বিরক্ত যে পরের কাছে যান বিবাহবিচ্ছেদের পরামর্শ চাইতে? এর মূলে কী আছে? দেশ-ঘটিত পরস্পরাবিরোধী চিন্তা না অন্য কিছু ঘটিত সন্দেহ?"

"ঐ যাঃ! পণ্ডিতী আরম্ভ হলো!" সুর হেসে উঠলেন। "একজন বিপন্ন হয়ে এসেছেন মুক্তির উপায় খুঁজতে। আমি বসে মনোবিশ্লেষণ করব পাণ্ডিত্যিক সত্যানির্ণয় করতে। আমি যদি তোমার মতো মনোবিশ্লেষণ করতে যেতুম তা হলে হয়তো কত কী জট আবিষ্কার করতুম। ওই যেমন একটু আগে বলছিলে ঈডিপাস কমপ্লেক্স। তেমনি তোমাদের ফর্দে আর কী কী কমপ্লেকস আছে জানিনে। হয়তো জুপিটার কমপ্লেকস।"

দুজনেই হাসতে লাগলেন। হাসি থামলে সুর বললেন, "তা ছাড়া সত্য বলতে আমি যা বুঝি তা অন্য জিনিস। গোপালের হয়তো ইডিপাস কমপ্লেকস ছিল। যদি সে আদৌ খুন করে থাকে। কিন্তু আমি যদি তার বিচারক হতুম আমি তোমার মতো মনোবিশ্লেষণ করতুম না। আমার সত্যানির্ণয়ের পদ্ধতি নয় ওটা। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে সিচুয়েশনটা কী? সিচুয়েশনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিটা কী? এক একটা সিচুয়েশন এমন যে তার পরিণতি ট্র্যাজিক না হয়ে পারে না। তার থেকে উদ্ধারের অপর কোনো পন্থা নেই। মানুষ অনেক সময় খুন করে ফাঁসী যায় উদ্ধারের আর কোনো পন্থা খুঁজে না পেয়ে। সিচুয়েশনটা কী তা তো জজকে বিশ্বাস করে কেউ বলবে না, বলতে জানেও না। তাদের চোখে আমি কালান্তক যম। আসলে আমি মানুষের বন্ধু। যাকে ফাঁসী দিই তাকে মনে মনে বুকে জড়িয়ে ধরি। ওর চেয়ে ভয়ংকর দণ্ড তো নেই। তবু ওই দণ্ড আমি প্রেমের সঙ্গে উচ্চারণ করি। আমার চোখে সব খুনীই গোপাল। কেয়ামতের দিন তার প্রকৃত বিচার হবে। এ যা হলো তা সমাজের প্রয়োজনে। সমাজ-বিহিত পদ্ধতিতে।"

মৈত্র আবেগে আপ্লুত হয়ে সুরের হাতে চাপ দিলেন। কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ। তারপর চটকা ভাঙল। মৈত্র সুধালেন, "শেষ পর্যন্ত হলোটা কী? ডিভোর্স না সেপারেশন?"

"কোনোটাই না।" সুর একটু থেমে বললেন। "আরো বছর সাতেক তাঁরা এক সঙ্গেই কাটালেন। তার পরে—" সুরের সুর বিকৃত হয়ে এলো।

"বল, বল, বলেই ফ্যাল!" মৈত্রর কৌতূহল উদগ্র।

"ভদ্রলোক একদিন মাঝরাত্রে রাস্তার ধারে নর্দামায় পড়ে মারা যান। শুনেছি মদের নেশায়।" বলতে বলতে কণ্ঠরোধ হলো সুরের।

"আহা! মারা যান!" মৈত্র অভিভূত হলেন। মনে হলো তন্দ্রায় অভিভূত।

বন্ধুকে এক ধাক্কা দিয়ে সুর বললেন, "তা হলে দেখতে পাচ্ছ বিবাহ সর্বরোগহর নয়। নারীও পুরুষকে রক্ষা করতে পারে না। গীতাও না। আমি চিন্তা করে এর একটিমাত্র সমাধান পেয়েছি। এ রকম বিপজ্জনক কাজ না করা। এর চেয়ে কয়লার খনিতে নামা কম বিপজ্জনক। কিন্তু আমি যদি কয়লার খাদে নামি আমার হাত ধরতে কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে রাজী হবেন না। অমন একটি হাতি পুষতে আমিই বা কেমন করে পারব! তোমার ভদ্রারা আমাকে খনিতে নামতে দেখেন না। কিন্তু তার চেয়েও যা বিপজ্জনক সেই জজ কলেক্টরের কাজে নামতে দিয়ে পরে মই কেড়ে নেবেন। জজ হয়ে আমি হয়তো দশটা অপরাধীর সঙ্গে একটা নিরপরাধীকেও জেলে পাঠাব বা ফাঁসিতে ঝোলাব। কলেক্টর হয়ে আমি হয়তো দুরন্ত জনতার উপর গুলী চালানোর হুকুম দেব। মরবে কয়েকটা পাজী লোকের সঙ্গে এক আধটি নিরীহ ছেলে কি মেয়ে। অমনি আমার সহধর্মিণী বাম হবেন। কী করে তাঁকে বোঝাব যে আমি মানুষটা খারাপ নই, আমার পেশাটা খারাপ! পারলে আমি ইস্তফা দিয়ে সরে যেতুম। তার পরে যদি ফকিরের সঙ্গে ফকিরণী হয়ে গাছতলায় বাস করতে কেউ রাজী হতেন তা হলে বিয়ে করা যেত।"

৪

মৈত্র তন্ময় হয়ে শুনেছিলেন। ওদিকে ফায়ার প্লেসের আগুন নিবু নিবু করছিল। সুর তার উপর আরো কয়লা চাপিয়ে তাকে তেজ করে তুললেন। ও যেন ওঁর নিজের জীবনের প্রতীক।

"এখন তোমার কথাই শোনা যাক। যদি তোমার কোনো কাজে লাগতে পারি।" বললেন মৈত্র ওঁকে আবার স্থির হয়ে বসতে দেখে।

"থ্যাংক ইউ, মাই ফ্রেন্ড। কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। গীতার সব কথা না হোক একটি বচন আমি মানি। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।"

এর পরে দুজনেই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ। কখন এক সময় সুর আপন মনে বলতে আরম্ভ করলেন, তাঁর আত্মকাহিনী। মৈত্র শুনতে লাগলেন বিনা কণ্ঠক্ষেপে।

"লণ্ডনে যখন তোমার সঙ্গে পড়তুম তখন কি সংসারের খবর কিছু জানতুম! তখন আমার একমাত্র ধ্যান ছিল ভালো পাশ করে ভালো চাকরি নিয়ে দেশে ফিরতে হবে। বুড়ো বাপকে রেহাই দিতে হবে। আমার জন্যে কি তিনি শেষে ফতুর হবেন। তখন তত খতিয়ে দেখিনি কোন্ চাকরিতে মনের শান্তি, কোনটাতে অপ্রসাদ। আই সি এস হয়ে যেদিন বাবাকে পুত্রদায় থেকে অব্যাহতি দিই সেদিন এই ভেবে আমার আনন্দ হয়েছিল যে, এখন থেকে আমি স্বাধীন। যথাকালে দেশে ফিরে চাকরিতে যোগ দিই। ভালোই লাগে। একমাত্র কাঁটা রাজনৈতিক মনোমালিন্য। ওদের পলিসি আমি ক্যারি আউট করতে কুণ্ঠিত দেখে ওরাই আমাকে জজ করে দেয়। আমি তার ফলে আরো স্বাধীন।

"কিন্তু ক্রমেই আমার প্রতীতি হতে থাকে যে আমি আমার মনের স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলছি। রাতদিন যাদের নিয়ে আমার কারবার তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা খুন কিংবা ডাকাতি কিংবা নারীধর্ষণ করেছে। সমাজের সব চেয়ে পঙ্কিল স্তরের জীব তারা। তাদের মামলা হাতে নিয়েছে যারা তারাও হাতে পায়ে সারা গায়ে পাঁক মেখেছে। এক এক সময় মুখের সঙ্গে মুখ মিলিয়ে দেখেছি। কোন্‌টা ক্রিমিনালের আর কোন্‌টা পুলিসের তা নিয়ে ধাঁধায় পড়েছি। জেলখানায় গিয়ে দেখেছি জেল ওয়ার্ডারদের মুখও জেল কয়েদীদের মতো। উকিলের মুখ দেখেও ধোঁকা লেগেছে। পোশাক ভিন্ন। মুখ অভিন্ন। ক্রাইম যাকেই ছোঁয় তাকেই ক্রিমিনালের চেহারা দেয়। এই সর্বব্যাপী পাঁকের মধ্যে আমি কেমন করে পাঁকাল মাছ হব? আমার নিজের চেহারা দেখি আয়নায়। ভয় পেয়ে যাই।

"একদিন বোর্ড অফ রেভিনিউর মেম্বর ও'নীল এলেন আমার স্টেশনে। এককালে আমার উপরওয়ালা ছিলেন। আমার দেখা হলো। কথায় কথায় বললেন, সেন, জজিং তোমার ভালো লাগে? আমার ধারণা ছিল তোমার অভিরুচি শাসনে। উত্তর দিলুম, আপনার অনুমান ঠিক। কিন্তু ফিরে যেতেও আমি চাইনে। ও'নীল চলে গেলেন। কিন্তু কথাটা আমার মন থেকে গেল না। শাসন বিভাগ থেকে সরে আসার পরও আমি তার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে কম চেষ্টা করিনি। ধাতটা আমার এক্‌জিকিউটিভ। কিন্তু চার বছরে একটা ছেদ পড়ে গেছল। ফিরে গেলে আমি জোড় মেলাতে পারতুম না। রাজনৈতিক মনোমালিন্য তো চরমে উঠেছিল। কেবল ইংরেজে বাঙালীতে নয়। হিন্দুতে মুসলমানে।

"তবু ক্রিমিনালদের সঙ্গে ক্রিমিনাল বনে যাবার চেয়ে এই অশান্তির মধ্যে ফিরে যাওয়াও ভালো। চীফ সেক্রেটারীকে চিঠি লিখলুম একদিন। আমাকে কি চিরকাল জজিং করতে হবে? আমার রুচির বিরুদ্ধে? তিনিও আমার পুরোনো অতিথি। সহানুভূতির সঙ্গে উত্তর দিলেন, তোমার সম্বন্ধে কাগজপত্র আনিয়ে দেখলুম। আগে থেকেই ঠিক হয়ে রয়েছে যে তোমার স্থান জুডিসিয়ালে। তোমার পছন্দ হোক আর নাই হোক এই হচ্ছে তোমার বরাদ্দ। ভালো জজেরও তো দরকার। আশা করি তুমি এটা স্বীকার করবে যে ব্যক্তিগত অভিরুচির চেয়ে পাবলিক ইণ্টারেস্ট বড়। তোমার সাফল্য কামনা করি।

"মনটাকে মানাতে আমার কত কাল যে লেগে গেল! কেমন করে যে পারলুম! একবার ভেবে দেখ। মড়ার মাথার খুলি পর্যন্ত কোনো কোনো কেসে আলামৎ হয়। শুক্র আর শোণিত মাখা কাপড় জামা তো আকসার। আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে হয় সেসব। নাড়াচাড়া করে পুলিসের লোক। ডাক্তার এসে বলে যান মৃতদেহের অঙ্গে কী কী জখম ছিল। ব্যবচ্ছেদের পর কোন্ কোন্ অর্গানে কী কী লক্ষণ দেখা গেল। কী কী বস্তু পাওয়া গেল। আমাকেই স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করতে হয়। বীভৎস সব খুঁটিনাটি। তার চেয়েও বীভৎস বলাৎকারের মামলায় স্ত্রী অঙ্গের রিপোর্ট! ডাক্তারের মুখে তবু সহ্য হয়। নারীর মুখে পাশবিক অত্যাচারের আদ্যোপান্ত বিবরণ! উকিলেরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করে ৩৭৬ ধারার অত্যাবশ্যক উপাদান আছে কি না। অন্তর্ভেদ ঘটেছে কি না। আমার ইচ্ছা করে উকিলদের ধরে চাবকাতে। সতী মেয়েকেও তারা প্রতিপন্ন করতে চায় অসতী। যেন অসতী হলে তার অনিচ্ছা থাকতে মানা। যেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে-কোনো পশু তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এর পিছনে ক্রিয়া করছে আমাদের বৈষম্যময় সামাজিক মূল্যবোধ। একবার যে অভাগিনীর পদস্খলন হয়েছে যে-কোনো দিন যে-কেউ তার উপর আক্রমণ করলেও সেটা হবে সম্মতিসূচক। পুরুষ কিন্তু হাজার পদস্খলন সত্ত্বেও আইনের দ্বারা সুরক্ষিত।

"এখন এই সব হতভাগিনী মেয়েদের এই বৈষম্যময় সমাজে আমি ভিন্ন আর কে রক্ষক আছে? এই বাইশ লক্ষ লোকের মাঝে? শুধু ওদের নয়। যারা একবার চুরি করে দাগী হয়েছে কেউ কি তাদের বিশ্বাস করে স্বাভাবিক কাজকর্ম দেয়? অগত্যা আবার চুরি করতে হয় তাদের। দ্বিতীয় বার চুরি করলেই ডবল সাজা। অনেক সময় দেখা যায় দ্বিতীয় অপরাধটা প্রথম অপরাধের তুলনায় লঘু। তবু আমাদের হাকিমরা চোখ বুজে প্রথম দণ্ডটাকে দ্বিগুণিত করে দেন। আপিলে আমি দণ্ড হ্রাস করি। বলি, লোকটার পাওনা যদি হয় ছ মাস হাকিম তার পূর্ব অপরাধের কথা স্মরণ করে এক বছর দিতে পারেন। কিন্তু পূর্ব অপরাধের জন্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন হাকিমের হাতে সে হয়তো পেয়েছিল দশ মাস। সেটাকে কলের মতো নির্বিচারে দ্বিগুণিত করে বিশ মাস করলে বর্তমান অপরাধের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না। হাকিমরা করবেন কী! কোর্ট সাবইনস্পেক্টর তাঁদের তাই বুঝিয়েছেন। আমি যখনি সুযোগ পাই সাজা কমিয়ে দিই আর পুলিসের অভিশাপ কুড়োই। একটা প্রতিষ্ঠানও খাড়া করি কয়েদীদের জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর স্বাভাবিক কাজকর্ম জোটানোর আশায়। দেখি কেউ ওদের কাজ দেবে না। দিলে পুলিস পিছনে লাগবে। তা ছাড়া দাগী চোরকে বিশ্বাস কী! কোন্ দিন আবার চুরি করে পালাবে! তখন পুলিসে খবর দিলে পুলিস বলবে, কেমন? সাবধান করেছিলুম কি না? সাহস করে আমিই মালী রাখি। কোন্ দিন আমাকে বোকা বানাবে! পুলিস সাহেব বলবেন, রাইটলি সার্ভড! আরে কুকুরের ল্যাজ কখনো সিধে হয়!

"সমাজে ভালো জজেরও দরকার আছে। কিন্তু এই বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। চাই আরো একটা বিশ্বাস। সেটা না থাকলে আমার মতো লোকের পক্ষে বেঁচে থাকাই এক যন্ত্রণা। জগতে যা কিছু কুৎসিত, যা কিছু মিথ্যা, যা কিছু কু তাই নিয়ে আমার কারবার। জগৎ সম্বন্ধে আমার ধারণা কি তা বলে এই যে, এ জগতে সুন্দর নেই, সত্য নেই, সু নেই? আমার এই নরকবাস থেকে অনুমান করা শক্ত যে স্বর্গ বলে কিছু থাকতে পারে বা ঈশ্বর বলে কেউ থাকতে পারেন। মানুষ আছে তা তো প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু মানুষের চেহারা দেখে কি বিশ্বাস হয় যে, ভগবান তাকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর আপনার আদলে? তাঁর উপর পিতৃত্ব আরোপ করবার মতো কী এমন প্রমাণ আছে?

"অল্পবয়স থেকেই আমি সৌন্দর্যদেবীর অন্বেষক। বিউটি আমার কাছে কথার কথা নয়। ওকে আমি প্রথম যৌবনে সর্বঘটে দেখতে চাইতুম। আভাসও পেতুম ওর

আঁচলের। ওর অলকের। কিন্তু এই নরক-পুরীতে কোথায় ওর হাতছানি? কোথায় ওর চাউনি? আমার জজিয়তীর জীবনে প্রায়ই হাহুতাশ করেছি। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে গেছি। দশ বছর পরে এই সম্প্রতি আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলেছে। এতদিনে আমার প্রত্যয় হয়েছে। ও আছে।

"ও আছে। ওর পথ গেছে এই ক্লেদের ভিতর দিয়ে। এই আস্তাকুঁড়ের উপর দিয়ে। এইসব মাজা-ভাঙা পুরুষের, এইসব পড়ে-যাওয়া নারীর দ্বারা আচ্ছন্ন গিরিসংকট দিয়ে। ওর পথ হচ্ছে এই পথ। এই পথে আমি ওর পথেরই পথিক হয়েছি। ওরই দর্শন পাব বলে। ও আমার আগে আগে চলেছে। উড়ে চলেছে মাটি না ছুঁয়ে ক্লেদ না ছুঁয়ে অন্তরীক্ষে। ও যেন সূর্যকন্যা তপতী। আর আমি ওকে ধরবার জন্যে মাটিতে পা ফেলে জলকাদায় নেমে ডাঙায় পা তুলে ছুটে চলেছি ভূতলে। আমি যেন রাজা সংবরণ। দৃষ্টি আমার ঊর্ধ্বমুখীন। ওর আর আমার উভয়েরই পথ এই ভীষণ কুৎসিত অশুভ অমাবস্যার ছায়াপথ।

"ও যেন আমার চোখে ধুলো ছুঁড়ে মারে, যাতে আমি ওকে দেখতে না পাই, চিনতে না পারি। কিংবা ধুলো আপনি ওড়ে ওর গতি-বেগের হাওয়ায়। আমি অন্ধকার দেখি। সেই অন্ধকারের নাম নিষ্ঠুর বাস্তব। যে বাস্তব আমাকে নিত্য অভিভূত করে নিত্য নূতন অপরাধে। এই তো সেদিন আমার কোর্টে এলো এক তরুণী জননী। নিজের হাতে নিজের শিশুর গলা টিপে মেরেছে। তার আগে এসেছিল এক বধূ। বধূকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় এক পোড়োবাড়িতে। সেখানে তার নিদ্রিত অবস্থায় তাকে বলি দেয়। মুণ্ডুটা পুঁতে রাখে নদীর বালিতে। এবার যে এসেছে তার কথা বলব না। কেসটা সাব জুডিস। কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবেরই অভিনব প্রকাশ। স্তব্ধ হয়ে ভাবি এই তমসার অপর পারে কি ও আছে? ডাকলে কি ওর সাড়া পাব? চোখ মেলে আমি ওর দেখা পাইনে। তবু চোখ আমার ওর উপরেই। এর উপরে নয়।

"না। তোমার এই নিষ্ঠুর বাস্তব আমার দৃষ্টি হরণ করে না। দৃষ্টিকে পীড়া দেয় যদিও। আমার দৃষ্টি একে প্রতিনিয়ত অতিক্রম করে। আমার মন একে ছাড়িয়ে যায়। আমার পা একে মাড়িয়ে যায়। এর সম্বন্ধে আমার মোহ নেই। আমি একে ভাল-বাসিনে। একে ভাল বলিনে। শুধু একে মেনে নিই। একদা আমার পণ ছিল বিনা পরীক্ষায় কিছুই মেনে নেব না। না ঈশ্বর, না পরকাল, না পুনর্জন্ম। এখনো গীতার মূল তত্ত্ব মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু অর্জুনের মতো আমিও সভয়ে উচ্চারণ করি, দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টৈব কালা-নলসন্নিভানি দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম। বাকীটুকু বাদ দিই।

"নিষ্ঠুর বাস্তব, তোমাকে আমি মানি। কিন্তু তুমিই শেষ কথা নও। তোমাকে আমার চোখের উপর ছুঁড়ে মেরেছে যে, আমার দৃষ্টি তারই প্রতি নিবদ্ধ। সে করালদশনা নয়। তার মুখ কালানলসন্নিভ নয়। 'সে' বললে কেমন পর পর ঠেকে। তাই 'সে' না বলে আমি বলি 'ও'। ও আমার একান্তই আপন। আমি ওর। ওর সঙ্গেও আমার নিত্য সম্পর্ক। এমন দিন যায় না যেদিন আমি ওর উড়ে চলার ধ্বনি শুনতে না পাই। আদালতের চাপা কোলাহলকে ছাপিয়ে ওঠে ওর পলায়নধ্বনি। আমি এজলাস ছেড়ে উঠে যেতে পারিনে। আমার আসনের সঙ্গে আমি গাঁথা। আমার দুই কানই সাক্ষীর বা আসামীর দিকে। পাবলিক প্রোসিকিউটার বা আসামীর উকিলের দিকে। তবু কেমন করে কানে এসে বাজে অন্তরালবর্তিনীর নূপুর শিঞ্জন। আছে, আছে। আরো একজন আছে। যে এদের সকলের প্রতিবাদরূপিণী। যে এদের কারো চেয়ে কম বাস্তব নয়, কম প্রমূর্ত নয়। যাকে ধরতে জানলে ধরা যায়। ছুঁতে জানলে ছোঁয়া যায়।

"নিয়োগীর উনি তাঁকে নর্দমার থেকে বাঁচাতে পারেননি। আমার ও আমাকে কর্দম থেকে বাঁচিয়েছে। আমি যে বেঁচেআছি এটা ওরই কল্যাণে। বিয়ের বৌ যা পারে না ও তা পারে। কেন তা হলে আমি বিয়ের কথা ভাবতে চাইব! তোমরা এমন কী জিতেছ! আমি এমন কী হেরেছি! আমার শুভ্র কেশ আমার শ্বেত পতাকা নয়। আমি পরাজয় স্বীকার করিনি। নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে আমার নিত্য সংঘর্ষ। তা সত্ত্বেও আমি অপরাজিত। আপন ভুজবলে নয়। ওর রক্ষাকবচ ধারণ করে। পুরুষ চায় রণে অপরাজয়। যে-নারী তাকে অপরাজিত থাকতে সহায়তা করে সেই তার এষা। সে যদি পার্থিব নারী না হয় তাতে কী আসে যায়!

"মৈত্র, তুমি হয়তো ভাবছ আমি কী হত-ভাগ্য! আমাকে চালতার অম্বল রেঁধে খাওয়াবার কেউ নেই। বাবুর্চিটা মুস্তো পর্যন্ত রাঁধতে জানে না। পাটনার লাটভবনে লর্ড সিনহার মতো আমি হাজার সাহেব সাজলেও আমার রসনাটি তো বাঙালীর। আমিও এককালে নিজেকে হতভাগ্য মনে করেছি। কিসে এ দশা থেকে পরিত্রাণ পাই তার উপায় অন্বেষণ করেছি। বিবাহের মধ্যে পরিত্রাণের কূলকিনারা পাইনি। মানুষ তো কেবল রুটি খেয়ে বাঁচে না। তেমনি পুরুষ তো কেবল বৌ পেয়ে বাঁচে না। তাকে তার জীবনের দুই দিক মেলাতে হয়। সুন্দরের সঙ্গে কুৎসিতের। শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের। আমার জীবনে আমি কোনো মতেই দুই দিক মেলাতে পারিনি। তাই ঐশ্বর্যের মধ্যেও জ্বলেছি। অবশেষে একপ্রকার পরিত্রাণের পন্থা পেয়েছি। এখন আমার সে-জ্বালা নেই। আমি শান্ত। আমার পরিত্রাণের পন্থা পলায়নে নয়, পলায়মানার পশ্চাদ্ধাবনে।"

৫

রাত হয়েছিল। তন্দ্রায় জড়িত কণ্ঠে মৈত্র বললেন, "সুর, তুমি আজ আমাকে কী এক আজব রূপকথা শোনালে! এমন বানাতেও পারো!"

সুর একটু হাসলেন। বললেন, "তা কাহিনীটা লাগল কেমন?"

"স্রেফ ফাঁকি দিলে।" মৈত্র বললেন হাই তুলতে তুলতে। "আমি আশা করেছিলুম তোমার জীবনের প্রচ্ছন্ন করুণ রোমান্স শুনতে পাব। তার কথা, যাকে তুমি বিয়ে করতে চেয়েছিলে, পাওনি বলে অবিবাহিত রয়েছ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে আছে। এদেশে না হোক ওদেশে। 'সে' একদিন 'ও' হবে কি না জানিনে, কিন্তু তোমার 'ও' যাকে বলেছ ও তার বিকল্প নয়। আচ্ছা, আজ তবে আসি।"

"হবে না। হবে না। 'সে' তার স্থান ছেড়ে দিয়েছে। 'ও' আমার নয়ন জুড়েছে ও জুড়িয়েছে। আচ্ছা, শুনতে চাও তো শোনাব আরেক দিন।" এই বলে সুর তাঁকে মোটরে তুলে দিতে চললেন।

শোফারকে হুকুম দিলেন, "প্রিন্সিপাল সাবকা কোঠি।"

বেয়ারা এসে তাঁর সান্ধ্য পোশাক খুলে নিল। পরিয়ে দিল শোবার পায়জামা। এখন রাত জেগে মামলার নথি পড়া।

সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে উত্তর ভারতের কয়েকটি শহর হঠাৎ অসামান্য গুরুত্ব লাভ করেছিল। এই সব শহরের মধ্যে দিল্লি, লখ্‌নৌ আর কানপুর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য অনেক আগে থেকেই শহর তিনটির গুরুত্ব ছিল, কিন্তু এখন সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে তা আরো বেড়ে গেল। কিন্তু এ তিনের মধ্যেও যদি আগেপিছে করতে হয়, তবে কানপুরকে বসাতে হয় সকলের আগে। এই বিষয়টি বুঝবার সঙ্গে আমাদের কাহিনীটি জড়িত। তাই আর একটু খুলে বলি বিষয়টি। দিল্লি ও লখনৌর গুরুত্ব, একটি হচ্ছে বাদশার রাজধানী, আর একটি অযোধ্যার নবাবের, কোম্পানি যাকে king বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, বাদশাকে ছেড়ে দিলে হিন্দুস্থানের অপর একজন king বা রাজার রাজ-ধানী। এদের গুরুত্ব রাজনৈতিক। অবশ্য কানপুরেরও যে একটু রাজনৈতিক গুরুত্ব না ছিল তা নয়, কানপুরের কাছে বিঠুরে দীর্ঘকাল ছিলেন নির্বাসিত পেশবা, এখনো আছেন তাঁর পোষ্যপুত্র নানা সাহেব যিনি কিনা বিদ্রোহের একজন নায়ক। কিন্তু কানপুরের গুরুত্বের আসল কারণ রাজনৈতিক নয়। কলকাতা থেকে দিল্লি ও লখনৌ যাওয়ার পথের মধ্যে কানপুর—যেন পথরোধ করে পড়ে রয়েছে। কানপুর হস্তগত না হলে দিল্লি ও লখ্‌নৌর পথ বন্ধ, পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব ভারত বিচ্ছিন্ন। এই কারণেই এই শহরটি বারে বারে হাত বদলিয়েছে। সিপাহি যুদ্ধের রণভূগোল বা স্ট্র্যাটেজিতে কানপুরের গুরুত্ব ইংরেজ বুঝেছিল, সিপাহি পক্ষ বুঝতে পেরেছিল মনে হয় না। সিপাহি পক্ষ কানপুরের গুরুত্ব বুঝতে পারলে দিল্লি ও লখ্‌নৌকে অগ্রাধিকার না দিয়ে কানপুর রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগ করতো। তা তারা করেনি। সিপাহিদের পরাজয়ের এটি একটি প্রধান কারণ। তার বদলে তারা দিল্লি ও লখ্‌নৌর রাজনৈতিক মূলধনের উপরে খুব বেশি ভরসা স্থাপন করেছিল। যুদ্ধ ব্যাপারে রাজনীতির কাছে রণনীতিকে খর্ব করলে যা সচরাচর ঘটে থাকে, তাই ঘটলো সিপাহীদের বেলাতেও। অনেকের বীরত্ব ও ত্যাগ স্বীকার সত্ত্বেও হ'ল তারা পরাজিত। এই পর্যন্ত ভূমিকা। পাঠকে হয়তো ভাবতে পারেন যে, কি প্রয়োজন ছিল এর! তারপর যখন শুনবেন যে, আমার গল্পের বিষয় একটি কাকাতুয়া পাখি তখন হয়তো আবার ভাবতে পারেন ধান ভানতে শিবের গীত। কাকাতুয়া পাখির সঙ্গে রণনীতির কি সম্বন্ধ! এ সংসারে কোন্ সূত্রের সঙ্গে যে কোন্ সূত্র জড়িয়ে যায় কে বলতে পারে? Rome-এর দুর্গ Capitol রক্ষার ইতিহাসের সঙ্গে যদি কয়েকটা রাজ-হাঁস জড়িত হতে পারে কানপুরের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের কাকাতুয়া পাখির জড়িত হওয়াকে অবাস্তব মনে হতে যাবে কেন? যাই হোক বাস্তব অবাস্তবতার দায়িত্ব লেখকের নয়—তার দায়িত্ব কাহিনীটি বিবৃত করা।

সেকালে কানপুর শহরে মামুদের হোটেল নামে একটি বিখ্যাত হোটেল ছিল। মামুদের হোটেল নাম হলেও তার মালিক মামুদ নয়, কোন কালে কোন মামুদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল কি না, তাও কেউ জানে না, শুধু সবাই দেখে যে ঐ নামে হোটেলটি চলে আসছে। তার মালিক একজন য়িহুদি, নাম দানিয়েল। দানিয়েল চতুর ব্যবসায়ী, বহুদূর সম্ভব আড়ালে থাকে সে, হিন্দু কর্মচারী চাকরবাকর খানসামা দিয়ে কাজ চালায়। দানিয়েলের ব্যবসাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল সিপাহি বিদ্রোহের অরাজকতা আরম্ভ হয়ে গেলে। যখন সমস্ত কানপুর শহরে শান্তি, শৃংখলা ও শাসন লোপ পেলো, দেখা গেল যে, মামুদের হোটেলে আগের মতোই কাজ চলছে, শান্তি, শৃংখলা ও শাসনের কোন অভাব নেই। বারে বারে শহর হাত বদলিয়েছে, প্রথমে সিপাহি, তারপরে ইংরেজ, তারপরে আবার সিপাহি এবং অবশেষে আবার ইংরেজ পালাক্রমে এসেছে আর গিয়েছে—মামুদের হোটেলের অস্তিত্ব ও কার্যক্রম সমান চলেছে,

কখনো একদিনের জন্যেও ছেদ পড়েনি। কেবল অবস্থাভেদে একটি পরিবর্তন হতো, তা-ও কেমন অনায়াসে, কেমন নিঃশব্দে, কেমন বিনা প্রতিবাদে। সেখানে কখনো উড়েছে নানা সাহেবের নিশান, কখনো কোম্পানির। বদলটা দানিয়েলের ইঙ্গিতেই হতো, দুই রকম নিশানই সে সংগ্রহ করে ছিল। অনেকে সন্দেহ করে যে আরো অনেক রকম নিশান যেমন, বাদশাহী নিশান, নেপালের জঙ্গ বাহাদুরের নিশান, অযোধ্যার নবাবের নিশান প্রভৃতিও সে সংগ্রহ করে হাতের কাছে রেখে দিয়েছিল। অরাজকদেশে 'অনাগত বিধাতা' হয়ে জীবনযাপন করাই শ্রেয়। নিশান বদলের সময় হলেই দানিয়েল হেঁকে বলতো, আরে সুরজপ্রসাদ, কোম্পানির ঝাণ্ডা খাড়া কর ভাইয়া, নানা সাহেবের রাজ তো শেষ হইয়ে গেল।

অমনি সুরজপ্রসাদ নানা সাহেবের নিশান নামিয়ে ফেলে কোম্পানির নিশান উড়িয়ে দিত।

আবার কখনো বা, আরে সুরজপ্রসাদ মালুম হচ্ছে কোম্পানির রাজ বুঝি শেষ হইয়ে গেল, ঝাণ্ডা বদল কর ভাইয়া।

সুরজপ্রসাদ যথাদিষ্ট করে।

মামুদের হোটেল নিরপেক্ষ 'নোম্যান্স-ল্যান্ড', এখানে কখনো কোম্পানির ফৌজের হেড কোয়ার্টার; কখনো সিপাহি ফৌজের হেড কোয়ার্টার। এখানে খদ্দেরের প্রয়োজন বোধে নিষিদ্ধ গোস্ত ও সিদ্ধ শাকসব্জি সরবরাহ করা হয়। দানিয়েল বলে ব্যবসায়ীর দেশ নাই, জাত নাই, শত্রু নাই, সে নিরপেক্ষ। নিরপেক্ষতার জন্যেই হোক আর এমন সুবিধা মতো বাসস্থান আর নাই বলেই হোক কোন পক্ষ মামুদের হোটেলের উপরে উপদ্রব করেনি, আর মামুদের হোটেল মানে দানিয়েল সর্বদা প্রবল পক্ষের কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছে। যার হাতে ডাণ্ডা, ঝাণ্ডা তার কাছে দেশ ঠাণ্ডা—এই ছিল দানিয়েলের সিদ্ধিমন্ত্র। এ হেন মামুদের হোটেলের বারান্দায় দাঁড়ের উপরে পায়ে শিকলি বাঁধা হয়ে উপবিষ্ট একটি প্রবীণ কাকাতুয়া, যে নাকি আমাদের গল্পের নায়ক। একজন খদ্দের হোটেলের দেনা শোধ করতে না পেরে তার বদলে এই পাখিটি দিয়েছিল দানিয়েলকে। সেই থেকে, তা বেশ কিছু-দিন হল, কাকাতুয়াটি রয়ে গিয়েছে মামুদের হোটেলে। পাখিটা সুরজপ্রসাদের বড় পেয়ারের, সে রাম নাম, কৃষ্ণ নাম বলতে শিখিয়েছিল তাকে। সকাল বেলা স্নানাহার সেরে সে যখন ঝুঁটি বাগিয়ে গম্ভীরভাবে বসে থাকতো, মনে হতো বাড়ির বুড়ো কর্তা। ভয়ে এগোতে চাইতো না কাছে ছেলের দল। আবার যখন কথা বলতো, সবাই বলতো, আর জন্মে ও নিশ্চয় মানুষ ছিল, পাখির মুখে এমন স্পষ্ট কথা বড় শুনতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ছিল ওর হাসিটা। কে শিখিয়েছিল ঐ হাসি তাকে। সুরজ-প্রসাদ বলে, ওটা হাসির মতো শুনতে হলেও হাসি নয়, পাখির গলার একরকম আওয়াজ। হাসি হোক আর গলার আওয়াজ হোক, কেউ শেখাক বা স্বভাবলব্ধ হোক ঐ হাসিতে দিনের বেলাতে চমকে উঠতো লোকে—আর নির্জন গভীর রাতে ঐ হাসি শ্রোতার অন্তরাত্মার মধ্যে কাঁপন জাগিয়ে দিত—ও যেন রহস্যময় অদৃষ্টের বিদ্রূপের হাসি।

॥ ২ ॥

কানপুর শহর এখন নানা সাহেবের অর্থাৎ সিপাহিদের অধীনে, অবস্থা সম্পূর্ণ অরাজক। জেনারেল হুইলার আর সাহেবের দল গঙ্গার ঘাটে নিহত হয়েছে। মেম সাহেবের দল আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বন্দী জীবন যাপন করছে বিবিঘরে। তাদের নিয়ে কি করা যায়? নানা সাহেবের ইচ্ছা যেমন আছে তেমনি থাক, সুযোগ হলে ইংরাজের শিবিরে পাঠিয়ে দিলেই চলবে। কিন্তু আজিমুল্লা খাঁ আর জুবেদি বিবির ইচ্ছা অন্য রকম।

এরা দুইজন কে? আজিমুল্লা খাঁ সিপাহি পক্ষের একজন প্রধান ব্যক্তি, নানার পরামর্শ-দাতা অমাত্য। জুবেদি বিবি কে? রঙ্গমঞ্চের উপরে যে অভিনেতা থাকে, লোকে দেখতে পায় তাকেই কিন্তু পর্দার আড়ালে বসে যারা সুতো টানে, ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের খবর রাখে কে?

আজিমুল্লা যখন বলতো বিবি, তোমার এত সাহস, এত বুদ্ধি, তুমি এগিয়ে এস না কেন।

জুবেদি বলতো মিঞা সাহেব আমরা চিরকাল পর্দানশিন, এখনই বা পর্দার বাইরে যাবো কেন?

কেন বুঝতে পারছ না? লোকে তোমাকে নানা সাহেবের সুবাদে নানী সাহেবা বলবে, কাজেও তো তাই।

নানার নানী হয়ে সুখ আছে কি?

তবে কিসে সুখ!

সে তুমি জানো মিঞা।

তারপরে বলে এখন তামাশা রাখো, বিবি-গুলোকে খুন না করতে পারা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

অস্বস্তি কেন?

দেখছ না, এখন পর্যন্ত নানা সাহেব দুই নৌকায় পা রেখে চলছে, আমাদেরও বলছে সাবাস আবার গোপনে গোপনে ইংরেজকেও চিঠি পাঠিয়ে বলছে ঘাবড়াও মৎ। এখন তার হাত দুটো বিবিদের রক্তে রাঙিয়ে দিতে পারলে আর ভাবনার কারণ থাকে না।

আজিমুল্লা তার হাতখানা ধরে বলল, জুবেদি তোমার এত বুদ্ধি।

এই রে আবার আরম্ভ হল, তোমার এত বুদ্ধি, এত রূপ, এমন যৌবন। ওসব অনেক শুনেছি, চলো এখন নানা সাহেবের কাছে।

রাত তখন গভীর, নানা সাহেব মামুদের হোটেলের হল ঘরটার প্রকাণ্ড ফরাসের উপরে তাকিয়ে আশ্রয় করে চিন্তা মগ্ন। আজিমুল্লা আর জুবেদি অনেকক্ষণ হ'ল ওকে পীড়া-পীড়ি শুরু করে দিয়েছে।

আজিমুল্লা বলছে মহারাজ একবার মুখের হুকুমটা দিন তারপরে আর ভাবতে হবে না।

খাঁ সাহেব দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, হুকুম দেওয়ার পর থেকেই ভাবনার সূত্রপাত হয়।

নানা সাহেবের পায়ের কাছে বসেছিল জুবেদি। সে নানা সাহেবের পা দুখানা কোলের উপরে তুলে নিয়ে বলল, মারাঠা রাজ্যের মহারাজ বলে এই পায়ে প্রণাম করে সুখ নেই, কবে যে হিন্দুস্থানের বাদশা বলে এই পায়ে কুর্নিশ করতে পারবো।

সে শখ যদি থাকে, তবে দিল্লি যাও না, তখ্‌তে তাঁবিয়তে আছেন বাহাদুর শা।

সে তো কেবল নামেই বাদশা।

আর আমার নামে তোমরা দুজন বাদশা আর বেগম।

দুজনে সমস্বরে বলে ওঠে তোবা তোবা। মহারাজ আমরা আপনার হুকুমের নফর।

না আজিমুল্লা খাঁ, না জুবেদি বিবি, তোমরা আমার হুকুমের মনিব। আমার মুখ থেকে হুকুমটা বের করে নিয়ে মনিবি করতে চাও।

তোবা, তোবা।

আপনি যে হুকুম দেবেন আমরা তাই তামিল করবো।

তবে শোন, নারী ও শিশুহত্যার হুকুম আমার দ্বারা হবে না।

শত্রুপক্ষের নারী ও শিশু হলেও হবে না?

এমন কোথায় হয়েছে বলো।

কেন হবে না! খোদ বাদশার হুকুমে দিল্লিতে অনেক বিবি অনেক ছেলেমেয়ে নিহত হয়েছে।

হয়েছে জানি, কিন্তু কাজটা ভালো হয়নি। আমরা খবর পেয়েছি, ইংরেজও অনেক পুরবাসী আওরত ও ছেলেমেয়ে হত্যা করেছে।

তবে সেটাও ভালো হয়নি।

সবাই যদি খারাপ কাজ করে থাকে আপনিও না হয় করলেন। যুদ্ধ তো শাস্ত্র-পাঠ নয়।

কোন্ শাস্ত্রে এমন উপদেশ দিয়েছে শুনি।

এদেশের কোন্ শাস্ত্র পরাধীনতার পরে লিখিত হয়েছে। শুনুন মহারাজ, যুদ্ধ, বিপ্লব, মহামারী প্রভৃতি আপদকালে সাধারণ বিধিনিষেধ চলে না।

তার মানে ঐ বিবিগুলোকে আর ছেলে-মেয়েদের হত্যা করতে হবে। কেন, শুনি।

ইংরেজ ভয় পাবে।

আজিমুল্লা খাঁ তুমি না ইংলণ্ড ঘুরে এসেছ। ইংরেজকে চিনেছ মনে হয় না। এই হত্যাকাণ্ডটি হলে আপসের পথটি বন্ধ হবে। হবে। তাই হুকুমটিতে তোমাদের বড় প্রয়োজন, না।

বড় কোমল স্থানে হাত পড়েছে বুঝতে পেরে জুবেদি বিবি প্রসংগ ঘুরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে বলল, ঐ বিবিরা যদি মেয়েছেলে হয়, তবে মর্দ কে! ওরা প্রত্যেকে পালোয়ানের বাপ।

রাত্রি আড়াই প্রহরের ঘড়ি বেজে যায়—মীমাংসা হয় না তর্কের।

এবারে আজিমুল্লা খাঁ আর জুবেদি বিবি দুজনেই সুর চড়িয়েছে।

মহারাজ, অনেক করে সিপাহিদের শান্ত রেখেছি, কিন্তু বোধ করি আর বেশি দিন পারবো না।

এই হুমকি দিয়েই নিরস্ত্র সাহেবগুলোকে খুন করিয়েছ, এখন আবার চাও অসহায় মেয়েগুলোকে খুন করতে।

কি করবো মহারাজ, এ যে যুদ্ধ!

তার মানে?

তার মানে যে করেই হোক সিপাহিদের খুশি রাখতে হবে।

যেমন করেই হোক!

যেমন করেই হোক, মহারাজ।

অধর্ম করেও?

পেশবার রাজ্য কেড়ে নেওয়া বুঝি ধর্ম, পেশবার বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া বুঝি ধর্ম, হিন্দুস্থানের বাদশাহী জুড়ে বসা বুঝি ধর্ম!

তাই বলে অসহায় মেয়ে আর শিশু!

আপনি তো মারছেন না, আপনি তো দেখছেন না, আপনি তো জানছেন না।

কেবল আপনার নামে হচ্ছে, কি বলো?

জুবেদি বাক্যে মধু ঢেলে দিয়ে বলে মহারাজ আপনাকে বাতাস করছি, আপনি ঘুমোন, কালকে না হয় আবার চিন্তা করে দেখবেন।

জুবেদি তোমার মনটি এমন কোমল, তুমি কঠিন হুকুম চাও কেন?

মহারাজ দামস্কাসের তলোয়ার দেখেননি, যেমন কোমল তেমনি তীক্ষ্ম! তারপরে বলে, মহারাজ আপনি যদি তীক্ষ্ম হতেন, তবে আমার শুধু কোমল হলেই চলতো।

বেশ তো তীক্ষ্মই না হয় হচ্ছি, কি চাও, একখানা হুকুম তো?

না মহারাজ, আপনার মুখের আধখানা হুকুমই যথেষ্ট।

সে আধখানা কি রকম হলে সন্তুষ্ট হও, শুনি!

মহারাজ, মোরাদাবাদী খরমুজার এ আধখানাও যেমন মিষ্ট, ও আধখানাও তেমনি মিষ্ট।

বুঝেছি, বুঝেছি, এখন কি রকম আধখানা চাও বলো—

আমার কি মহারাজাকে পরামর্শ দানের যোগ্যতা আছে! তোমরা যেমন ভালো বোঝ তেমনি করগে, মোট কথা যুদ্ধে জেতা চাই, এমনি কিছু বললেই যথেষ্ট।

বেশ তবে তাই বললাম।

এবারে আজিমুল্লা খাঁ আনন্দে বলে উঠল, এই তো হিন্দুস্থানের বাদশার যোগ্য হুকুম! মহারাজ, পাপ, অন্যায়, অধর্ম, এসব দিদি বুড়িদের ছেলে ভোলানো কেচ্ছা!

জুবেদি মধুরে গরলে জড়িত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, এতদিনে মহারাজের হিন্দুস্থানের বাদশাহীর পথ সুগম হল—

অসহায় শিশু ও নারীর রক্ত দিয়ে—

হাঃ হাঃ হাঃ!

হাঃ হাঃ হাঃ!

কে হাসে বলে চমকে উঠল নানা সাহেব।

কেউ না মহারাজ—ঐ কাকাতুয়াটা।

তাই বলো, বলে নানা সাহেব।

পাখি বোঝা সত্ত্বেও তার বুকের ভিতরে কাঁপতে থাকে। আর বাইরে অন্ধকারের মধ্যে রহস্যময় অদৃষ্টের নির্ঝর থেকে ধ্বনির লহরী উদ্‌গত হতেই থাকে—

হাঃ হাঃ হাঃ!

হাঃ হাঃ হাঃ

॥ ৩ ॥

এবারে কানপুর ইংরাজের অধিকারে।

মামুদের হোটেলের হল ঘরটাতে তাকিয়া ফরাসের বদলে চেয়ার টেবিল কোচ।

স্যার কলিন ক্যাম্পবেল ইংরেজ পক্ষের প্রধান সেনাপতি। তাঁর উপরে হুকুম ছিল যে, লখ্‌নৌ শহরে অবরুদ্ধ ইংরেজ সৈন্য ও তার নারীদের উদ্ধার করে আনতে হবে, যাতে সেখানে আর কানপুরের হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না ঘটতে পারে। কানপুর থেকে লখ্‌নৌর দূরত্ব চল্লিশ মাইল পথ। কানপুরের নীচে নৌকার সাঁকোয় গঙ্গা পেরিয়ে লখ্‌নৌ যাওয়ার পথ। স্যার কলিন দেখলো যে, কানপুরের দিকের সেতুমুখ যথেষ্ট সুরক্ষিত নয়, অল্প আয়াসেই শত্রুসৈন্য অধিকার করে নিতে পারে। সেতুটি হস্তচ্যুত হলে বা ভগ্ন হলে লখ্‌নৌ শহরের সংগে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ইংরেজ সৈন্য বিপদগ্রস্ত হতে পারে। সেতুমুখ সুরক্ষিত করা আশু প্রয়োজন। কিন্তু কিছু বাধাও আছে। সেতুমুখের কাছেই একটি পুরাতন শিবমন্দির। সেটি না ভাঙলে সেতুমুখ সুরক্ষণ সম্ভব নয়।

বারুদ দিয়ে শিবমন্দির উড়িয়ে দেওয়া হবে সংবাদ পাওয়ামাত্র শহরে চাপা উত্তেজনা দেখা দিল। সিপাহি পক্ষ এখন নিতান্তই নিস্তেজ, তবু যাদের সহানুভূতি সেই দিকে তারা ইশারায় বলাবলি শুরু করলো আরে যারা চর্বি মাখানো টোটা দিয়ে জাত মারতে চায়, তাদের কাছে আবার শিবমন্দিরের পবিত্রতা।

ওরি মধ্যে আবার যাদের সাহস বেশি তারা বলল, দিক না একবার উড়িয়ে মন্দির, বাবা ত্রিশূল নিয়ে যখন বেরোবেন, তখন ম্লেচ্ছগুলো পালাবার পথ পাবে না।
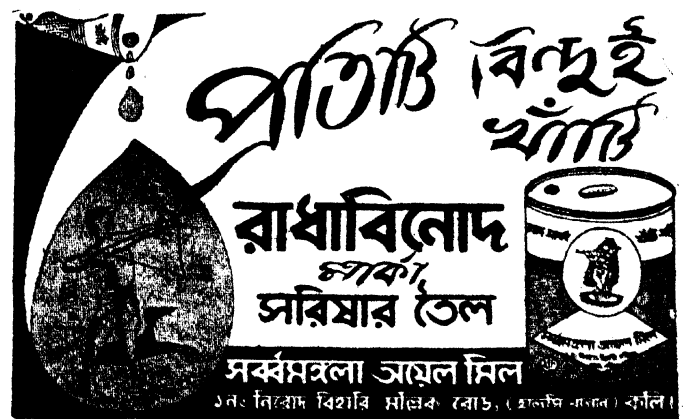
কিন্তু অধিকাংশেরই অভিজ্ঞতা এই যে সাংসারিক ফল লাভের পক্ষে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিকের চেয়ে আধিভৌতিকের মূল্য অধিক। তাই তারা একটি ডেপুটেশনে গিয়ে উপস্থিত হল স্যার কলিনের দরবারে অর্থাৎ মামুদের হোটেলের সেই হল ঘরটাতে। ডেপুটেশনের প্রধান পূজারী, পাণ্ডা ও ব্রাহ্মণের দল, সংগে উপযুক্ত দোভাষী।

স্যার কলিন ক্যাম্পবেল তাদের কথা মন দিয়ে শুনে বলল, দেখো তোমাদের অনুরোধ অবশ্যই আমি রক্ষা করতাম, যদি জানতাম যে বিবিঘরের অসহায় শিশু আর নারীদের রক্ষার জন্য এতটুকু চেষ্টা তোমরা করেছিলে, অন্তত মুখের কথাতেও প্রতিবাদ করেছিলে জানতে পারলেও রক্ষা করতাম তোমাদের মন্দিরটা।

কী উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে সবাই নীরব হয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরে একজন বলল, কি করবো হুজুর, সিপাহিরা আমাদের কথা শোনে না।

তবু তারাই তোমাদের দেশের লোক।

আর আপনারা তো হুজুর দেশের রাজা।

তখন তো সিপাহিরাজকেই মেনে নিয়েছিলে।

না মেনে উপায় কি হুজুর, সিপাহিলোক বেবাক ডাকু।

একথা কি তখন মনে হয়েছিল?

মনে বরাবর হয়েছে হুজুর।

মুখে বলেছিলে?

বললেও শুনতো না।

তোমাদের দেশের লোকে যদি না শোনে, তবে আমরাই যা শুনবো এমন কেন আশা করছ!

হুজুরে কী যে বলছেন! কোথায় ডাকু আর চোট্টা সিপাহিলোক আর কোথায় কোম্পানি রাজ।

নানা সাহেবও কি ডাকু আর চোট্টা!

নানা সাহেবজীর নিজের কথা খাটতো না —ঐ আজিমুল্লা খাঁ যা বলতো তাই হতো।

দোষ যারই হোক, তার জন্যে কোম্পানি-রাজ নিজের ক্ষতি করবে কেন?

ক্ষতি কেন করবে হুজুর! ঐ একটা মন্দিরের বদলে শহরের যে-কোন দশটা ইমারত ভাঙবার হুকুম দিন।

তাতে আমার কি লাভ হবে! ঐ মন্দির না ভাঙলে সাঁকো কমজোর হয়ে থাকবে। আমি দুঃখিত যে তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না।

অগত্যা ডেপুটেশন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরে গেল।

স্যার কলিন ক্যাম্পবেল আপাদমস্তক জঙ্গী লোক। সামরিক প্রয়োজনের চেয়ে বড় কিছু নেই তার চোখে—ঐ উদ্দেশ্যে গীর্জা, মসজিদ, মন্দির, সমস্ত সমান নির্বিকারভাবে উড়িয়ে দিতে পারে সে। আবার বিনা প্রয়োজনে পথের কুকুরটাকে মারতে সে রাজি নয়—কুকুরের প্রতি দয়ায় নয়, বারুদ অপচয় হবে বলে। সতীচৌরা ঘাটের শিবমন্দির উড়িয়ে দেওয়ার হুকুম সে দিয়েছে, ওখানে গীর্জা থাকলেও হুকুম দিতে বাধতো না তার।

ডেপুটেশন চলে গেলে মিস্টার রস্টক শুধালো—কি স্থির করলেন স্যার কলিন।

নূতন করে আর কি স্থির করবো—রণ-নীতির নিত্য আচরণ তো নির্ধারিত আছেই, সেতুমুখের বাধাটা অপসারিত হবে, সেটা মন্দির কি গীর্জা অবান্তর।

আদৌ অবান্তর নয় স্যার কলিন, গীর্জা আর এই পৌত্তলিকদের মন্দির এক পর্যায়-ভুক্ত নয়, ওটা উড়িয়ে দেওয়াতে তুমি কিছু পুণ্য অর্জন করবে।

একটা লড়াই ফতে করবার সুগৌরবের তুলনায় তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

ছিঃ ছিঃ এমন কথা মনে ভাবলেও মুখে বলতে নেই।

স্যার কলিন বলে, আমরা জঙ্গীলোকেরা মুখে মনে এক।

সেইজন্যেই এই ঘোর পৌত্তলিক দেশের আজো এই হেনস্থা, একশ বছর খৃষ্টানী শাসনের পরেও এখনো কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

এবারে মিঃ রস্টকের কিছু পরিচয় না দিলে পাঠকের প্রতি অবিচার হবে। পাঠক ইতিমধ্যেই নিশ্চয় ভাবতে শুরু করেছেন যে রস্টক পাদ্রী। ভুল হল। তার পিতামহ পাদ্রী ছিল। তার পাদ্রীপনা একপুরুষ ডিঙিয়ে পৌত্রে এসে বেশ কায়েম হয়ে বসেছে। মিস্টার রস্টক স্বভাবপাদ্রী। সিপাহি বিদ্রোহ বেধে উঠলে খৃষ্টানরাজ কিভাবে পৌত্তলিক-দের দমিত করে দেখবার উদ্দেশ্যে সুদূর শ্বেতদ্বীপ থেকে ভারতে এসেছে। আজ মাস দুই এদেশে পৌঁছে খৃষ্টানী ফৌজের আচরণ দেখে বড়ই হতাশ হয়েছে স্বভাব-পাদ্রী রস্টক সাহেব। এরা বিদ্রোহ দমনে যেমন তৎপর পৌত্তলিকতা উৎপাটনে তেমন নয়। মন্দির ভাঙতে গেলেই এদের বারুদের অভাব ঘটে। রস্টক আজ মাস দুই প্রধান সেনাপতি স্যার কলিনের পিছু পিছু আছে। ডেপুটেশনের প্রতি তার মনোভাব দেখে খুশী হতে পারেনি। মন্দির ভাঙাটাই যথেষ্ট নয়—একটা মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভাঙা হচ্ছে এই কথাটা প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

স্যার কলিন বলে সেতুমুখ সংরক্ষণ, লখনৌ থেকে অবরুদ্ধ নরনারীদের উদ্ধার এর চেয়ে মহত্তর উদ্দেশ্য আর কি হতে পারে!

কি হতে পারে? পৌত্তলিকদের মন্দির আর বিগ্রহ ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া।

সামরিক প্রয়োজনে তা কখনো কখনো করতে হয়—কিন্তু বিনা প্রয়োজনে এক ছটাক বারুদ নষ্ট করতে আমি রাজি নই

রস্টক সাথেদ বলে ওঠে, ধিক্ তোমার খৃষ্টানী মনোভাবকে স্যার কলিন। তারপরে একটু থেমে আবার শুরু করে, স্যার কলিন তোমরা যদি ভেবে থাকো যে, বারুদ, বন্দুক, গুলি দিয়ে এদের শাসন করবে, তবে মস্ত ভুল করবে।

তবে, কি করতে হবে?

তবে কি করতে হবে? পৌত্তলিকতার বন্যা এই হিন্দুস্থান, উড়িয়ে দাও এর সব মন্দিরগুলো।

মিস্টার রস্টক, আজ যে এই বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত হতে হয়েছে এর কারণ কি জানো?

তুমিই বলো স্যার কলিন।

এদেশের হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্র-দায়ের ফৌজের ধারনা হয়েছিল যে, চর্বি মেশানো কার্তুজ ব্যবহার করতে বাধ্য করে কোম্পানি ওদের ধর্মভ্রষ্ট করতে চায়।

শুনেছি।

তবে?

চর্বি মাখানো কার্তুজ ব্যবহার করলে যে ধর্ম নষ্ট হয়, তা যত্ন করে রক্ষা করবার মতো নয়।

এটা তোমার মত।

তোমার মত কি ভিন্ন?

আধিদৈবিক বিষয়ে আমরা কোন মত পোষণ করিনে, আমাদের কারবার আধি-ভৌতিক নিয়ে।

সেটা গৌরবের কথা নয়—তবু তোমাকে ধন্যবাদ যে ঐ ভার্টি মন্দিরটা ভাঙতে সম্মত হয়েছ।

বাধ্য হয়ে।

এতে কেবল তোমার সেতুপথ সুগম হবে না, সুগম হবে সত্যধর্মের পথ, হিন্দুস্থান এবারে সত্য সত্যই দেবস্থান হয়ে উঠবে।

এমন সময়ে হঠাৎ উত্তরাকাশ প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল, স্যার কলিন ক্যাম্পবেল ঘড়ি বের করে দেখে নিয়ে বলল—সময় মতোই হয়েছে।

তার কথা শেষ হতে না হতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চৌচির হয়ে ফেটে গেল রাত্রির নিস্তব্ধতা।

ভগবানকে ধন্যবাদ যে আর একটা কু-সংস্কারের কেল্লা ভূপাতিত হয়ে পৌত্তলিক-দের মুক্তির পথ সুগম করে দিল।

হাঃ হাঃ হাঃ

হাঃ হাঃ হাঃ

কে হাসে, কে, কে হাসে বলে ভীত ত্রস্ত রস্টক চীৎকার করে উঠল।

স্যার কলিন বলল, ব্যস্ত হয়ো না, ওটা একটা পাখি মাত্র!

পাখি মাত্র! তাই হবে।

রস্টক নিশ্চিন্ত হল কিনা জানিনে, কিন্তু তখনো সেই হাসি রহস্যময় কোন্ অতল গহ্বর থেকে নিদারুণ বিদ্রূপের মতো পাক খেয়ে খেয়ে উত্থিত হতে থাকলো

হাঃ হাঃ হাঃ।

হাঃ হাঃ হাঃ।

॥ ৪ ॥

কানপুর এবার স্থায়ীভাবে ইংরেজের দখলে এসেছে। লখনৌ ইংরেজের হস্তগত হয়েছে, দিল্লি তো অনেক আগেই হয়েছে। স্যার কলিন ক্যাম্পবেল পরাজিত সিপাহি সৈন্য দলকে তাড়া করে নেপালের সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে—সিপাহিরা এখন হয় ছত্রভঙ্গ, নয় পরাজিত। হিন্দুস্থান সিপাহি-প্রভাব বিমুক্ত।

কানপুরের মামুদের হোটেলের সেই হল

ঘরটিতে পূর্বোক্ত মিস্টার রস্টক ও মিস্টার রাসেল সিপাহি বিদ্রোহপ্রসঙ্গে হিন্দুস্থানে ইংরাজ শাসনের ফলাফল আলোচনায় নিযুক্ত। এখন রাত্রি অনেক, আগামীকল্য প্রাতঃকালে মিস্টার রাসেল ইংলন্ডগামী জাহাজে চাপবার উদ্দেশ্যে কলকাতা রওনা হবে। মিস্টার উইলিয়াম হবওয়ার্ড রাসেল ইংলন্ডের বিখ্যাত টাইমস পত্রের সংবাদদাতারূপে সিপাহি বিদ্রোহের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে এদেশে এসেছিলেন, এক বছরের উপর ইংরাজ ফৌজের সঙ্গে নানা স্থানে ভ্রমণ করেছেন—তাঁর সাংবাদিক চোখ এমন অনেক কিছু দেখেছে যা জঙ্গী আদমির বা ইংরাজ কর্মচারীদের চোখে পড়েনি। ইংরাজ শাসনের সুফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চয় হতে পারেননি। রস্টকের ধারণা অন্য রকম, সে ধারণা কি রকম তা আগেই প্রকাশ পেয়েছে।

মিস্টার রস্টক বলছিল—রাসেল, আজকার ছন্নছাড়া কানপুর দেখে কানপুরের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারবে না। যুদ্ধের আগেকার কানপুর দেখলে বুঝতে পারতে ইংরাজ কানপুরের জন্যে তথা হিন্দুস্থানের জন্যে কি করেছিল।

রাসেল বলছিল, স্বীকার করছি যে, যুদ্ধে বারংবার হাত বদলাবার ফলে কানপুরের আজ দুর্দশা, কিন্তু আমি ঠিক সে কথা ভাবছি না।

তবে ঠিক কি ভাবছ শুনতে পারি কি?

ইংরাজ শাসনের সুফল সম্বন্ধে আমি তেমন নিঃসন্দেহ নই।

বিস্মিত রস্টক বলে—নিঃসন্দেহ নও? কেন আমরা কি সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে শিশু সন্তান নিক্ষেপ বন্ধ করিনি? আমরা কি পিণ্ডারী ঠগ প্রভৃতি দস্যুদের অত্যাচার দূর করিনি? তুমি কি ইংরেজের কীর্তিস্বরূপ গঙ্গার খাল, রেলপথ দেখনি?

অবশ্যই দেখেছি, কিন্তু আরো কিছু দেখেছি যার স্মৃতি ভুলতে পারছি না। কলকাতা থেকে কানপুর আসতে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করেছি যার দুই দিকে কুঁড়ে ঘর আর নিরন্ন, বুভুক্ষু, ভিক্ষুকের দল।

এ হচ্ছে যুদ্ধের পরিণাম!

না, মিঃ রস্টক, এ হচ্ছে কোম্পানির শাসনের ফল। অবশ্য যুদ্ধের পরিণামও চোখে পড়েছে—গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুই দিকে বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত দুর্গন্ধিত সিপাহিদের মৃতদেহ। আমার বেশ মনে আছে একদিন এক ঘণ্টার পথে এমন বিয়াল্লিশটা মৃতদেহ গুণেছিলাম।

বিদ্রোহের দণ্ড!

সমস্ত দেশ যেখানে বিদ্রোহী শাসক সেখানে সুনামের দাবী করবে কিসের জোরে।

অস্ত্রের জোরে, মিস্টার রাসেল, অস্ত্রের জোরে।

তবে তাকে শাসন বলে দাবী করো না মিস্টার রস্টক, বলো সঙ্ঘবদ্ধ দস্যুতা।

তার পরে বলে, মানুষ স্বভাবত দস্যু, এদেশে নয়, বিদেশে নয়, কোন দেশেই নয়। তবু যখন তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে, বুঝতে হবে শাসনের মধ্যে গলদ আছে।

বিদ্রূপের সুরে রস্টক শুধালো হে কলমবীর, জানতে পাই কি, কি সেই গলদ!

কোম্পানি এদেশে শাসক নয়,—নিতান্তই এডভেঞ্চারার, ন্যূনতম ব্যয়ে প্রভূততম বিত্ত সঞ্চয় কোম্পানির পেশা।

ধিক তোমার দেশদ্রোহী রসনাকে।

ধীরে বন্ধু ধীরে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, অবধান করো। ক' মাস আগ্রা গিয়েছিলাম, দেখলাম বিশ্ববিখ্যাত তাজ। কিন্তু প্রথমেই কি চোখে পড়লো জানো? শ্বেত পাথরের গম্বুজের পাশে, কার্নিসের ফাঁকে একটি বটগাছের চারা গজিয়েছে। পাঠান, মোগল হিন্দুদের আমলে এমন লজ্জাকর অবহেলা ঘটতেই পারতো না।

কেন, জাঠ, মারাঠা, শিখ, আফগান প্রভৃতি কি মোগল সৌন্দর্যসৌধগুলোর মূল্যবান অলংকার সব অপহরণ করেনি?

তারা নিজেদের শাসক বলে দাবী করেনি।

হাসালে মিঃ রাসেল, তুমি হাসালে! এত বড় হিন্দুস্থানে এক বছরের উপরে ঘুরে কার্নিসের ঐ বটের চারা দেখে গেলে। ওতেই প্রমাণ হয়ে গেল যে, কোম্পানির শাসন ব্যর্থ।

ঐ অতটুকু বটের চারাও দেখেছি—আবার এত বড় যুদ্ধটাও দেখলাম।

যুদ্ধ কোথায়? বিদ্রোহ।

য়ুরোপে ঘটলে মহাযুদ্ধ বলে অভিহিত হতো, বিদ্রোহ বলে একে তুচ্ছ করলেই প্রমাণ হয় যে, হিন্দুস্থানে এখনো আমরা শাসকের পদবী অধিকার করতে পারিনি, ক্লাইভের আমলেও যেমন এডভেঞ্চারার ছিলাম এখনো তাই আছি। দেখো না কেন, এদেশের প্রাচীন সব কীর্তি, মন্দির, মসজিদ, সৌধ অট্টালিকা, দীঘি, সরোবর, নগর, গ্রাম আমাদের শাসনের ফলে ধ্বংস প্রায়। দেশের লোক তার জবাব দিয়েছে আমাদের সিভিল লাইন, বাংলো, ব্যারাক, হোটেল পুড়িয়ে দিয়ে। খুব অন্যায় করেছে কি! গঙ্গার খাল আর রেলপথের কথা তুমি তুলেছিলে, সেই সঙ্গে টেলিগ্রাফ তারের কথাও তুলতে পারতে—কিন্তু একবার ভেবে দেখো—এই সব খাল, রেল, টেলিগ্রাফের তার হিন্দুস্থানের প্রাচীন কীর্তির শ্মশানের উপর দিয়ে কি যায়নি! আমরা যাতায়াতের সুবিধার জন্যে নূতন পথ তৈরি করেছি—কিন্তু তা আমাদের, শাসকদের সুবিধার জন্যে! আমি বিশ্বস্তসূত্রে খবর সংগ্রহ করেছি কলকাতা থেকে পনর ষোল মাইল দূরে কোন পথ নেই বললেই চলে। কেন?

সেখানে আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন করে না বলে।

তুমি কি এই সব কথা দেশে গিয়ে রটাবে নাকি?

না। স্যার হেনরি লরেন্সের মুখে যা শুনেছি তাই লিখবো—লিখবো যে স্যার হেনরি লরেন্সের মতো লোকের অভিমত এই যে, কোম্পানির শাসনে প্রজাদের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়নি, মোটের উপরে তারা আগেকার চেয়ে বেশি কষ্টে আছে।

এ যে তুমি সেকেলে বার্ক, শেরিডানকেও ছাড়িয়ে গেলে।

তা যদি হয়, তবে তার একমাত্র কারণ কোম্পানি সেকেলে ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

তাজ্জব করলে হে! তা কোম্পানির প্রতি তোমার সুসমাচারটা কি শুনতে পাই কি?

সুসমাচার দেবার আমি কে? ইতিহাস একমাত্র সুসমাচারদাতা!

তা তোমার ইতিহাস কি বলে শুনি।

ইতিহাস এই কথা বলে যে, ন্যায়নিষ্ঠায় ইংরাজের শাসন যদি পূর্বতন শাসকদের ছাড়িয়ে যেতে না পারে, তবে অস্ত্রবলে এদেশ শাসন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তাতে এমনই বা কি ক্ষতি?

ক্ষতি এই যে, অস্ত্রবলে শাসন করবার হিসাবের খাতাটার যেদিন জমার পাতা দেখা যাবে যে, ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে গিয়েছে। তখন সেদিন সেই সর্বনাশা হিসাবের চাপে জাত হিসাবী ইংরাজকে এই সাধের, শখের সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করে সাতসমুদ্র তের নদীর পারের দেশে ফিরে যেতে হবে।

শুনলাম তোমার কথা, তবে আমিও শেষ কথাটা বলে নিই। প্রয়োজন হলে বাহুবলেই আমরা এদেশ চিরকাল শাসন করবো—হিন্দুস্থানে ইংরাজ শাসন অজর অমর অক্ষয় হয়ে বিরাজ করবে।

মিস্টার রস্টক হয়তো এটাই ইতিহাসের শেষ কথা নয়!

এমন সময়ে অন্ধকারকে তীক্ষ্ণ করাতে বিদীর্ণ করে শব্দ উঠল—

হাঃ হাঃ হাঃ

হাঃ হাঃ হাঃ

রাসেল কাকাতুয়ার খবর রাখতো না, চমকে উঠে বলল—ও কি?

রস্টক বলল ভয় পেয়ো না—একটা পাখি মাত্র।

কি জানি কি মনে করে রাসেল আপন মনে বলে উঠল—হিন্দুস্থানের পাখি।

নিষ্ঠুর অদৃষ্টের বিদ্রূপের মতো তখনো সেই রহস্যময় তীক্ষ্ণ কর্কশ হাসি অন্ধকারকে চিরে ফেলতে ফেলতে ধ্বনিত হচ্ছিল—

হাঃ হাঃ হাঃ

হাঃ হাঃ হাঃ

মিত্র দম্পতি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

অদ্ভুত বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে কুকুরটা। হাঁ, অ্যালসেশিয়ান টেরিয়ার, নইলে অত তীক্ষ্ণধী আর কোন্ কুকুর হবে? বেঙ্গল পুলিসের কুকুর দুটোর অনুকরণে নামও দেওয়া হয়েছে। ওরা স্বামী স্ত্রী কি জানি না, আমাদের জোড়াটা কিন্তু তাই। পুরুষটার নাম মিত্র, মেয়েটার নাম রীতা।

কিন্তু নামকরণ অনেক পরের কথা, দুটো একসঙ্গে আসেওনি বাড়িতে। প্রথমে এল মিত্র। অন্য নামেই চলছিল, ট্রেনিংও পাচ্ছিল বাঙালীর বাড়িতে সাধারণভাবে যেমন ট্রেনিং পেয়ে থাকে কুকুরে; শেকহ্যান্ড করা, বল ধরে আনা, লাফানো—এই সব; তারপর তালিম যখন প্রায় সম্পূর্ণ, বেঙ্গল পুলিসের মিত্রর কীর্তিকলাপ প্রকাশিত হোল খবরের কাগজগুলোয়। ছেলেদের ঝোঁক গেল ঘুরে, ঐ লাইন ধরেই শিক্ষা দিতে হবে এটাকে।

বেশ ফল পাওয়া যেতে লাগল। বেশ অনেকখানি চৌহদ্দি নিয়ে আমাদের চক-ঘর প্রতিবেশীর বাড়ি। ঘর-দুয়োর ছাড়া, গলিঘুঁচি, বাগান, ডোবা, ঝোপঝাড় সব কিছুই আছে, শিক্ষাপ্রাঙ্গণটি বেশ ভালোই পাওয়া গেল। ওরাই চোর সাজে, কোন একটা জিনিস একটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখে আসে, "চোরের" রুমাল বা গায়ের জামা হলে আরও ভালো; তারপর "চোরকে" সেইখানে বসিয়ে এসে কুকুরটাকে সেটা শুঁকিয়ে ছেড়ে দেয়। মাটি শুঁকতে-শুঁকতে, হাওয়া শুঁকতে-শুঁকতে ঠিক হাজির হয় যথাস্থানে। দাঁড়িয়ে পড়ে একবার মাথা ঘুরিয়ে মুখের দিকে চায়, সেটা ভাষায় রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়—এই মানুষ আর এই জিনিস তো? তারপর ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে এগিয়ে এসে নিজের বকশিশটা নিয়ে নেয়; বিস্কুট, এক টুকরা পাঁউরুটি, একখানা রুটি, যা পায়। অল্পে খুশী জন্তুই তো।

অবশ্য একদিনেই হল না। প্রথমটা সোজা রাস্তা ধরেই আরম্ভ করতে হল। ভুল হতে হতে সেটা আয়ত্তে এসে গেলে আঁকাবাঁকা পথ। তারপর ঝোপ-ঝাড় বাগানের মধ্য দিয়ে। প্রথমে "চোর"সুদ্ধ বসিয়ে রাখা; গন্ধটা থাকে টাটকা, নাকে ধরা পড়ে ভালো করে। এর পর "চোরকে" সরিয়ে শুধু চোরাই মাল লুকিয়ে রেখেও ফল পাওয়া যেতে লাগল। প্রথম প্রথম ওপরেই ফেলে রাখা হত জিনিসটা, তারপর মাটিতে পুঁতে রেখে দেখা গেল মাটি আঁচড়াচ্ছে। শেষ অবধি যখন পুকুরের মধ্যেও ফেলে রেখে দেখা গেল কিনারায় গিয়ে ঘেউ-ঘেউ করছে আর ঘুরে-ঘুরে চাইছে তখন বোঝা গেল শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে মিত্রর।

একদিন পাড়ায় একটা ছিঁচকে চোরও ধরা পড়ল। নাম বেরিয়ে গেল মিত্রর।

এরপর কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপার হল যা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং যাতে সবাই অতিমাত্রায় হতচকিত হয়ে গেলাম। হঠাৎ উল্টে ছিঁচকে চোরের উপদ্রব শুরু হয়ে গেল। ও বালাই আমাদের এদিকে মোটেই ছিল না; সিঁদেল চোরেরও নয়, পাড়াটা মোটামুটি সুরক্ষিত। তা শুরু হোল তো একেবারে আমাদের বাড়ি থেকেই। কুকুর সর্বদা বেঁধে রাখাটা আমি পছন্দ করি না, বড় বেশি বদমেজাজী হয়ে পড়ে; তবুও সকাল-বিকেলে যখন লোকের যাওয়া-আসা বেশি তখন বেঁধেই রাখা হত; খুলেই দিতে বললাম। বিশেষ ফল হল না।

কয়েক দিন সে একটু কমল মনে হল সেটা আমাদের জন্যেই। কাউকে যেতে না বলাতে বটে সেজন্য সবাইকে একটু তো সতর্কই থাকতে হল। একটু অভ্যস্ত হয়ে যেতে যখন আর নজর রাখার আর দরকার হল না, আবার চুরির হিড়িক পড়ে গেল।

ছিঁচকে চোরেরই কাণ্ড।

প্রথমে হঠাৎ একটা পেতলের হাতা অদৃশ্য হোল, তারপর একটা তোয়ালে, আবার দুদিন পরে একটা ছোরা; এদিকে সাবধান হয়ে পড়তে হাঁসের ঘর থেকে ডিম চুরি গেল দুদিন; তারপর দিন চারেক বাদ দিয়ে একটা গোটা হাঁস।

প্রতিবেশীর বাড়িতেও চারিয়ে পড়ল উপদ্রবটা। সামান্য জিনিস; মাছ-মাংস কিনে আনবার থলিটা; এক বাড়ি থেকে এক গোছা পরোটা; খোলা জানলার ধারে রাখা ছিল, ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে এসে খাবে। অপর এক বাড়িতে খোলা জানলার ধারে সদ্য কাটা একটা মাছ-মাংস রাঁধবার কারি-পাউডারের টিন। ধাঁধা লাগিয়ে দিল সবাইকে; কুকুরটা পুরো তালিম পেয়ে কোথায় পাড়া আরও নিরুপদ্রব হবে, না, এই কাণ্ড। বেড়েও চলেছে নিত্য।

তারপর একদিন ধরা পড়ল, নিতান্ত আকস্মিকভাবে।

জ্যৈষ্ঠ মাস, বৃষ্টি নেই, পুকুরের জল হুহু করে শুকিয়ে আসছে, হঠাৎ একদিন নজরে পড়ল গোলাপী রঙের যে তোয়ালেটা পাওয়া যাচ্ছিল না, সেটা ধারে একটুখানি জলের মধ্যে পড়ে রয়েছে, যেন খানিক-খানিক চিবুনো। ছেলেদের মনে পড়ে গেল ঐখান-টাতেই কি একটা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল

কুকুরটাকে যখন তালিম দেওয়া হচ্ছে। তাই থেকেই সন্দেহটা ওর ওপরই গিয়ে পড়ল। খোঁজ নিয়ে দেখাও গেল সন্দেহটা মিছে নয়, যেখানে যেখানে রাখা হোত লুকিয়ে সব জায়গা থেকে একটা না একটা কিছু বেরুলই. পেতলের হাতাটা, থলিটা, কারি পাউডারের টিনটা। টিনটা পাওয়া গেল একটা ঝোপেরই মধ্যে। কটা বাড়ির খিড়কির দিকে বলে ওদিকটা কেউ বড় একটা যায় না; দেখা গেল সেইখানে হাঁসের পালকও কিছু কিছু রয়েছে ছড়ানো, এবং ডিমের খোসা।

কারি-পাউডার আর এ দুটো এক সঙ্গে পাওয়া যেতে কয়েকজন যে ওর বুদ্ধির অতিরিক্ত প্রশংসা করল, সেটা অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে নয়, তবে গোয়েন্দা তোয়ের করতে গিয়ে যে আমরা একটি অতি চতুর তস্করই গড়ে তুলেছি এ বিষয়ে আর কারুর মতভেদের অবসর রইল না।

এর ওপর আরও খানিকটা আলোকসম্পাত করলেন আমার এক বন্ধু। কাহিনীটা শুনে একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন—"ওহে দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখতে দাও। চুরির আইটেম গুলো যেমন বিক্ষিপ্ত বলে মনে হচ্ছে তেমন হয়তো নয়—একটা যেন সূত্র চলে গেছে সবগুলো ভেদ করে। হাঁস, ডিম, পরোটা, কারি-পাউডার; আর কি কি বললে?"

"একটা হাতা, একটা মাছ আনবার থলে, একটা ছোরা, একটা তোয়ালে।"

"থলেটা বেশ মিলে যাচ্ছে। তোয়ালে, ছোরা আর হাতার ইতিহাসটা বলতে পার?"

খোঁজ নিয়ে পাওয়া গেল ইতিহাস। নিষিদ্ধ পাখির মাংস রাঁধবার জন্যে হেলেদের এক সেট আলাদা বাসন আছে, কাটবার জন্যে একটা ছোরাও। সেদিন মাংস রেঁধে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের ডেকে ওরা একটা প্রীতি-ভোজের আয়োজন করেছিল। রাত্রিবেলা কি করে ছোরা আর হাতাটা অমার্জিত অবস্থায়ই পড়ে থাকে বাইরের কলতলায়। আর পাওয়া যায় নি। যখন পরে পাওয়া গেল তখনও প্রায় সেই অবস্থায়ই, খানিকটা চাটা-চোটা, কিন্তু নোংরাই।

তোয়ালেটারও সম্বন্ধ টের পাওয়া গেল ঐ প্রীতিভোজের সঙ্গেই। সবাই আঁচিয়ে হাত মুছে ছিল, অস্পৃশ্য বলেই একটা দিন বারান্দার এক কোণে অবহেলায় পড়েছিল, তারপর সাবান দিয়ে কাচবার জন্যে খোঁজ নিতে আর পাওয়া যায় নি।

একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে বললেন—"হয়েছে, সমস্তটাই প্রীতিভোজেরই ব্যাপার একটা।"

বললাম—"বুঝলাম না। হাঁস ডিম কারি-পাউডার, (ডেকচির কথা বাদ দিলামই), হাতা দিয়ে মিশিয়ে নেড়েচেড়ে ভোজ সাঙ্গ করে তোয়ালেয় হাত-মুখ মুছবে? কুকুরটা অবশ্য বুদ্ধিমান, কিন্তু......"

"না, অত বুদ্ধির ক্রেডিট দিচ্ছি না। তবে এটা তো বুঝতে পারছ সবগুলোর সঙ্গেই খাবারের সম্পর্ক রয়েছে। হাঁস-ডিম তো সোজাসুজি খাবারই, ছোরা, হাতা, তোয়ালেও যে খাবারের গন্ধ পেয়েই সরিয়েছে, এতে কোন সন্দেহ আছে তোমার?"

মিলিয়ে দেখতে বাধ্য হলাম বৈকি।

চুপ করে ভাবছি; বেশ একটা কৌতুকও অনুভব করছি, উনি বললেন—"কিন্তু এই বাহ্য, আমি প্রীতিভোজের কথা বললাম অন্য কারণে।"

আমি প্রশ্নের দৃষ্টিতে চাইতে বললেন—"নিজে খাওয়া সে তো প্রীতিভোজ নয়। আমার মনে হয় There is a lady in the affair. সেটা কিছু রোমান্স আরম্ভ করেছে। কেন, তোমার সেই রংলাল কুকুরটার কথা

তো মনে পড়া উচিত, কি করে তার সঙ্গিনীকে এটা-ওটা দিয়ে তোয়াজ করত..."

আমার দৃষ্টিতে একটু কৌতুকের ভাব ফুটে উঠতে দেখে বললেন—"ও তো আর স্নো এসেন্স জোগাবে না গো। খাবার দিয়ে মন পাওয়ার চেষ্টা করছে। কতকগুলো তো খাবারই—হাঁস, ডিম, মাংস, কারি-পাউডারটাকেও ঐ পর্যায়ে ফেলে বিশেষ কিছু ভুল করে নি। বাকি থাকে ছোরা, হাতা, থালে, তোয়ালে। প্রথম দুটো লেহার মধ্যে ধরা যায়, চাটলে কিছু যাবেই পাওয়া; বাকি দুটো চিবিয়ে চুষলে কিছু রস পাওয়া যাবে কি না পরীক্ষা দেখাতে নিয়ে গিয়ে কি আর এমন অন্যায় করেছে বেচারি? তোমার ওখানে নিজে সে রাজভোগে রয়েছে সেটা তো তাকে জোগাতে পারছে না।"

"তাহলে উপায় এখন?"—চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করলাম আমি; বললাম—"লেডির পাল্লায় পড়ে কত বড় বড় রাজা ফকির হয়েছে, আমি গরীব গেরস্থ, এ বেটা যদি এইভাবে [illegible] থাকে......"

ভাবছিলেনই চোখ বুজে, বললেন—"মনে হয় যেন একটা উপায় আছে।"

"কী?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"লেডি বাইরের কারুর [illegible] থাকে [illegible] [illegible] নিয়ে [illegible] [illegible] একটা নেই।"

[illegible] ঐ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চেষ্টা। একটা [illegible] [illegible] না।"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইয়েছে।

চমৎকার ফল পাওয়া গেল। [illegible] জেগেটা যে এক দিনেই গেল এমন নয়। তবে কিছু না একটা গোলমাল বাধছে সংসারে এটা স্বাভাবিক মনে নিয়ে শুধু [illegible] বিলম্ব হোল না রবির। [illegible] থেকে [illegible] পেয়ে একদিন প্রতিবেশিনীদের এমন শিক্ষা দিল যে তাকে আপনাদের জন্যই প্রণয় চিন্তা ত্যাগ করে এ বেলাটা ছেড়ে দিতে হল। দেখা গেল এ ব্যাপারে টিয়াও শেষ পর্যন্ত গৃহিণীর পক্ষ অবলম্বন করে নিজের দিক থেকেও দু-চারটা আঁচড়-কামড় দিল বসিয়ে।

সুবুদ্ধির পরিচয়ই বলতে হবে না?

এরপর ওদের সংসার পালের হাওয়ায় নৌকার মতো তরতরিয়ে ভেসে চলল।

রীতাটা আরও তীক্ষ্ণধী। মানুষের নির্দেশের সঙ্গে স্বামীর প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখে গোয়েন্দাগিরিতে কিছুদিনের মধ্যে ওকেও গেল ছাড়িয়ে।

প্রায় বছর খানেক কেটে গেল। পাড়ায় শান্তি, ঘরে শান্তি, ওদের দাম্পত্য-জীবনেও অভঙ্গ শান্তি।

তারপর হঠাৎ আবার সেই উৎপাত আরম্ভ হয়ে গেল। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, এবার লক্ষ্যস্থল হল আমাদের ছোট নাতনীটি। তার একটি ভেলভেটের পেনি উধাও হোল প্রথমে। না, তাতে মাছ-মাংসের কোন গন্ধ তো থাকবার কথা নয়, তবে তার মা বলে দুধ খাওয়ার সময় খানিকটা পড়ে গিয়েছিল রাত্তিরে, বারান্দার এক কোণে ফেলে রেখেছিল পরদিন সকালে কেচে দেবে বলে। এর পর ওর দুটো খেলনা হারিয়ে গেল, একটা রবারের ইঁদুর আর একটা সেলুলয়েডের মোটর গাড়ি। রবারের পুতুলে মাংস-জাতীয় একটা গন্ধ পাওয়ার কথা অবশ্য চিবুলে হয়তো ঐ রবারের স্বাদও খানিকটা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেলুলয়েডের মোটর কিসের গন্ধ দেবার জন্য? এর যদি বলা যায় রবারের-[illegible] সঙ্গে মিশে একটা [illegible] গন্ধ [illegible] [illegible] কল্পনাশক্তিকে [illegible] নয় কি?

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] নেই।

নইলে সে [illegible] [illegible] হাত দেবে, কারুর ঘাড়ে দুটো মাথা আছে?

আত্মরক্ষিতার [illegible] হচ্ছে, One-man dog, অর্থাৎ একটি মাত্র মানুষকে চেনে এমন কুকুর। রবির চেনে খুকিকে। মেয়ে বলেই নিশ্চয় ওদিকে যতই কড়া হোক, মনটা বড় কোমল। প্রায় মাস ছয়েকটি থেকে ওর সঙ্গ নিয়ে আছে, ওকে নিয়েই খেলা, ওকেই আগলে থাকা। বড় হয়ে উঠে অত্যাচারও লাগিয়েছে খুকি, ল্যাজ ধরে টানা, নরম গায়ের ওপর পিঠ দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা, এমন কি মাঝ

পর্যন্ত, খুকুর মেজাজ এবং খেলার তার-তম্যে। সব মুখ বুজে সহ্য করে, স্নেহটা কখনও কখনও প্রবল হয়ে জিভের রসে উথলে ওঠে, টেনে টেনে চেটে দেয়; হাত পা, পিঠ মুখ। এদিকে ক'দিন থেকে আর পারছে না। বাগানের এক প্রান্তে নিজেদেরই ছোট ঘরটিতে পড়ে থাকে। নেহাত যখন পারে না থাকতে, উঠে আসে। মাটি হাওয়া শুঁকে শুঁকে হাজির হয় যেখানে খুকু রয়েছে; ন্যাজ নেড়ে গা চেটে খোঁজ খবর নিয়ে আবার চলে যায়। তাও সাধারণত সন্ধ্যার পরই; দিনের তাতটা কমে গেলে।

দুদিন থেকে এটাও গেছে কমে, আর এই দুদিনের মধ্যেই জিনিসগুলিও অন্তর্ধান হয়েছে।

এর মধ্যে একদিন মিতার সেই আগেকার সঙ্গিনীকেও দেখা গেল; সন্দিগ্ধভাবে খানিকটা গা-ঢাকা দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। ওটা যে মিতারই কীর্তি এতে আর কারুর কোন সংশয় রইল না।

ওর জায়গা সবার জানাই হয়ে গেছে। তন্ন তন্ন করে খোঁজা গেল; কিন্তু ফল হল না। বেটার কেমন বুদ্ধির দৌড়, নূতন নূতন সম্ভাব্য স্থানেও সন্ধান নেওয়া হল, কোনও পাত্তাই নেই।

মুশকিল এইখানে যে, পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে নিজের চুরি ধরে দিতে নিজে কোন সাহায্য করবে না কুকুরটা, যেন দিব্যি করা আছে।

ওদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল খুকুর পিসি; বলল—"ও আরও বের করে দেবে না তার হেতু, রীতার ওপর আক্রোশ করেই তো এইটে করছে, বড়-না ভালবাসত খুকুকে সে। ও আঁতুড় থেকে না বেরুনো পর্যন্ত কেউ ওকে শায়েস্তা করতে পারবে না। ও কুকুরের ঐ একটি মুগুর।"

তবে, অতদিন অপেক্ষা করতে হল না। হাজার বুদ্ধি হক, মানুষের বুদ্ধি তো তার কাছে হার খেয়ে যাবে না।

জটীল সমস্যার সমাধানটা এমন কিছু জটীলও নয়। খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। রীতার খাবার তার ঘরেই দিয়ে আসা হচ্ছে, খেয়ে আসতে পারে সেখান থেকে, তাই বেঁধেও রাখা হোল।

চব্বিশ ঘণ্টাও গেল না। বারোটার পর থেকে সমস্ত দিনরাত নিরম্বু উপোস, তারপর সকালেই চেষ্টা করা গেল। ছেলেরাই করল। খাবারটা অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশি লোভনীয় করেই ভোরের করে একটা পাত্রে নিয়ে নিল। তারপর একটা রবারের খেলনাই ওর নাকের কাছে ধরে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিতটা দিয়ে চেনটা খুলে হাতে নিয়ে নিল। মিতা একটু চেষ্টা করল আগে খাবারটা নাগালে আদায় করবার, তারপর চেনে টান দিল।

প্রথমে বাড়ির ভেতরেই গেল; পেছনে পেছনে চেন ধরে একজন চলছে, আর সবাই সঙ্গে আছে। খুকু যেখানে সাধারণত খেলে সেখানে একবার রেখে দিয়ে খেলনাটা তুলে নিয়েছিল ওরা। মিতা মাটির খুব কাছে নাক দিয়ে ঘুরে ফিরে শুঁকল জায়গাটা, তারপর রাস্তা ধরল।

বারান্দা থেকে উঠোন, উঠোন থেকে বাইরে—ঐরকম মাটি আর হাওয়া শুঁকতে শুঁকতে। তারপর বাগানের রাস্তা ধরে হনহন করে এগিয়ে গিয়ে নিজেদের ঘরের সামনে দাঁড়াতেই, ভেতর থেকে "গোঁ!!......" করে একটা চাপা গর্জন উঠল। রীতা দাঁড়িয়ে উঠেছে। যার পাঁচটি বাচ্চা বোধ হয় কাল সন্ধ্যার দিকেই কখন হয়েছে স্তন পান করছিল, গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ল গা থেকে। গোটা দুই পড়ল খুকুর সেই মখমলের পোনিটার ওপর। পাশেই তার খেলনা দুটো, এখন অবশ্য রীতার ছেলে-মেয়েদের। খেলনা হিসাবেই সংগ্রহ করা, কি অমিয়-গন্ধের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের জন্য, রীতাই জানে।

মিতা আর একপাও এগোল না। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে এল। শুধু তাই নয়, এরপর হাসেনার জন্য গোয়েন্দাগিরি একেবারে ছেড়ে দিলে। উপোস করিয়ে মেরে কোনমতেই আর রাজি করান গেল না। নিশ্চয় ভাবল—পরের উপকার করতে গিয়ে আবার কখন কি ভুল করে নিজের ঘর ভেঙে বসুক আর কি!

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ

শ্রীনন্দলাল বসু

সেকালের অদূরদর্শী মুরুব্বিরা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেছেন চালে আর ডালে মিশিয়ে। মুসলমানে আর হিন্দুতে। এর কানাচে ওর ঘর। ওর উঠান দিয়ে এর বাড়ি যাবার পথ। কে হিন্দু, কে মুসলমান —এখন বাছাবাছি ও ভাগাভাগির দিন এসে গেল। র‍্যাডক্লিফ সাহেব বিলেত থেকে বাটোয়ারা করতে এসে ভেবে পাচ্ছেন না, লাইনটা কোনখান দিয়ে টানবেন। টালবাহানা হচ্ছে, সঠিক সীমানা আজও এসে পৌঁছয় না।

জেলা খুলনা, থানা মুলঘর, গ্রাম খাস-বুনো। পূর্ণচন্দ্র সমাদ্দার ও খোরশেদ খাঁ পড়শি মানুষ। নিতান্তই এবাড়ি-ওবাড়ি, মাঝখানে শুধু একটা বাঁশবন। খোরশেদের বাড়ির পোষা মুরগি চলে আসে পূর্ণর চৌকিশালে, ছিটকে-পড়া ধান-চাল খুঁটে খুঁটে খায়। পূর্ণর মা রে-রে করে ওঠেন: জাতধর্ম কিছু রইল না, বাস উঠিয়ে তবে ছাড়বে ওরা। খোরশেদের বউ বেকুব হয়ে ছুটে এসে মুরগি তাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে তোলে। আবার কালীপুজোর সন্ধ্যা থেকে পূর্ণর কালীঘরে একসঙ্গে চারটে ঢাক ড্যাড্যাং-ড্যাড্যাং করে। দু-কানে হাত চাপা দিয়ে খোরশেদ আর পাঁচজন মাতব্বর ডেকে বলে, টেকা হয়েছে দিন, ঢাকে কাঠি দিয়ে মেজকর্তা সেইটে জানান দিচ্ছে। আর

চলে না, বাস্তুভিটে ছাড়তে হল এবার। তোমরা কেউ যদি পাঁচ-দশ কাঠা ভুঁই দাও, ঘরের চাল খুলে নিয়ে সেইখানে চেপে পড়ি।

এমনই চলছে আজ আট-দশ বছর। বাস তোলে না কেউ। রাগের মাথায় বলে, পরক্ষণে ভুলে যায়। কিন্তু এবারে তা নয়। বাস সত্যি সত্যি তুলতে হবে। পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের কথাবার্তা উঠতেই যা কাণ্ড হয়ে গেলে তো এক পক্ষ অন্য পক্ষকে কেটে কুচি কুচি করবে। তবে কোন পক্ষ কাদের কাটবে, সেই হল কথা। অন্যান্য জেলা সম্পর্কে লোকে যা হোক একটা আন্দাজ করে নিয়েছে,—কিন্তু এই খুলনা জেলাটার ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। একদিন শোনা গেল, হিন্দুস্থানে দিয়ে দিয়েছে—যেহেতু গুণতিতে হিন্দু বেশি এ-জেলায়। মুসলমানের মধ্যে সাজ-সাজ পড়ে যায়: কোন্ দিকে নৌকো ভাসাবে—ফরিদপুর না বাখরগঞ্জ? পরের দিন আবার উল্টো খবর: খুলনা দিয়েছে পাকিস্তানে। কলকাতা যাবার পর নদী সমুদ্র সুন্দরবন ও ব্যাপার-বাণিজ্যের এমন এলাকাটাও যদি চলে যায়, পূর্ব-পাকিস্তানের রইল তবে কি? সেই বিবেচনায় চুকিয়ে দিয়েছে। হিন্দুর মুখ শুকনো। শলা-পরামর্শ: কোথাকার টিকিট কাটবে—বনগাঁ-দত্তপুকুর, না আরও এগিয়ে একেবারে খাস কলকাতা?

পাকা খবর আসে আসে—আসে না। বাইরে কিন্তু যেমন তেমনি। পূর্ণ সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা হল খোরশেদ খাঁর—

সেলাম আলেকুম মেজকর্তা।

সুখে থাক।

দেখা হলেই সেলাম এবং সুখে থাকার আশীর্বাদ চিরদিনের। দুই মুখের হাসি পর্যন্ত ঠিক যেমনধারা হয়ে আসছে।

পূর্ণ জিজ্ঞাসা করেন, ছেলের সাদি করে দিচ্ছ খোরশেদ?

এ মাসে হল না, সেই অঘ্রাণে। হলে কি আর জানবে না? তদ্দিন অবিশ্যি থাক যদি তোমরা।

থাকব না তো কোথায় যাব? সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে বুড়োবয়সে কোন চুলোয় যাব মরতে?

কী সর্বনাশ, টের পেয়ে গেল নাকি? সশঙ্কিত পূর্ণ সমাদ্দার ভাবছেন, চর এসে নিশ্চয় কিছু শুনে গেছে। আরও সতর্ক হয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। আরও গভীর রাত্রে। বাড়ির ছেলেপুলেকেও বিশ্বাস নেই। তারা ঘুমিয়ে গেলে তার পরে।

রাত দুপুরে বিরাশি বছরের বুড়ো দ্বারিক হালদার আসেন লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে। নৃপতি সেন আসেন। হাজরা মজুমদার ও অধীর সাহা আসে।

নৃপতি বলে, জায়গাজমি দেখে এলাম ইছামতীর ওপারে। বেতের জঙ্গল, বুনো-শুয়োরে আস্তানা—সেইসব জায়গার এখন কাঠা হিসাবে দর হাঁকছে। কারো সর্বনাশ, কারো পৌষমাস—বেটাদের চক্ষুপর্দা নেই।

দ্বারিক ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন: দেখ, অন্তিমে গঙ্গাপ্রাপ্তি চাই নি কখনো। বাপঠাকুরদা মুক্তগাঙের শ্মশানে গেছেন—বুড়ো হাড় কখানা ভেবেছিলাম তাঁদের জায়গায় নিয়ে গিয়ে পোড়াবে। কিন্তু ভবিতব্য আলাদা। কোথায় কোন আঘাটা-ভাগাড়ে মরে থাকব, শিয়াল-শকুনে ঠোকরে খাবে।

পূর্ণ ভিতর দিকে বাঁধাছাঁদায় ব্যস্ত ছিলেন। তামাক সেজে নিয়ে এসে এঁদের হুঁকোয় বসিয়ে দিলেন। তারপর দ্বারিক ও নৃপতিকে গড় হয়ে প্রণাম করলেন।

দ্বারিকের চোখ ছলছল করে: চললে তা হলে?

হাঁ খুড়োমশায়। পাকিস্তান হয়ে গেলে তখন আর যাওয়ার পথ থাকবে না। আনসার বাহিনী এখনই উড়ুপে বেড়াচ্ছে। বিরাটিতে মাসতুতো ভাই আছে। সে খবর পাঠিয়েছে, গিয়ে পড়লে যা-হোক একটা ব্যবস্থা হবে। চিঠি ছুঁড়ে জায়গা-জমি হয় না।

নৃপতি বললেন, যাও চলে সহায় পেয়েছ যখন। কখন যাচ্ছ?

দিনমানে সকলের চোখের সামনে পারব না। আজ সারারাত গোছগাছ করে রাখি, রওনা কাল রাত্রে। হয়তো এটা হিন্দুস্থানেই থেকে যাবে। তখন ফিরে আসব। ঘরদোর তো বেচে দিয়ে যাচ্ছিনে, কী বলেন?

হাজরা মজুমদার নিজের চিন্তায় মগ্ন আছে এক পাশে। পূর্ণ তার হাত দু-খানা জড়িয়ে ধরলেন: কাঁঠালগাছ নিয়ে দু-বছর মামলা করেছি তোমার সঙ্গে। দোষ-অপরাধ মনে রেখ না হাজরা-ভাই। বাগান-ভরা আম-কাঁঠাল, পুকুর ভরা মাছ—নিয়ে থুয়ে খেও সমস্ত। আজেবাজে মানুষের বদলে তোমরা স্বজাত যদি খাও, অনেক শান্তি।

সেই সময়টা ওদিকেও বাঁশবন ছাড়িয়ে খোরশেদ খাঁর দলিজঘরে মাতব্বরদের বৈঠক বসেছে। সর্বনেশে কাণ্ড! সামাদ গাজি স্বকর্ণে শুনে এসে তবে বলছে। বিলপারের নামোবা তৈরি—লাঠিতে তেল মাখাচ্ছে, নতুন হাঁড়িতে ঘষে ঘষে শড়কি চকচকে করেছে। খুলনা হিন্দুস্থানে—এই খবরটুকুর জন্য শুধু অপেক্ষা। হুড়মুড় করে এসে পড়ে মেরেধরে ঘর জ্বালিয়ে সমভূম করে যাবে।

কথার মাঝখানে খোরশেদ খাঁ পূর্ণর বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে সতর্ক করে দেয়: আস্তে ভাই, শব্দ কোরো না। দুষমন ওখানে। শলা-পরামর্শ করছি—টের পেলে এক্ষুণি বিলপারে খবর দিয়ে দেবে। ফরমান আসা অবধি সবুর করবে না।

সামাদ বলে, ফরমানে যা-ই আসুক, আমি এখন বরিশালে নানার বাড়ি গিয়ে থাকিগে। হিন্দুস্থান হয়ে গেলে কোন বেটাকে তখন আর গাঙ পার হতে দেবে না।

খোরশেদ বলে, কিন্তু তোর ক্ষেত নিড়ানোর কী? এমন খাসা ধান হয়েছে—নিড়ানো না হলে ঘাসবনে বরবাদ করে দেবে।

সামাদ বলে, খোদাতালার উপর ফেলে যাচ্ছি। জানে বাঁচলে তবে তো ধান!

সকালবেলা সমাদ্দার-বাড়ির বাচ্চা ছেলে নন্তু বাঁশতলায় এসে খোরশেদের ছোট মেয়েটাকে চাপা গলায় ডাকছে, এই হাসনা, শোন্—

হাসনা এল। নন্তুর হাতে গুলতি আর রামসীতার মস্তবড় মাটির পুতুল।

কাছে আয়, একটা কথা বলি। অন্য কাউকে বলবিনে। খবরদার!

গোপন কথা শোনবার জন্য হাসনা ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল: কাউকে বলব না।

আজ রাতে গাঁ ছেড়ে আমরা চলে যাচ্ছি।

হাসনা অবাক হয়ে বলে, কেন রে?

থাকলে মোসলমানে মেরে ফেলবে। বাবা দ্বারিক-দাদু সব বলাবলি করছিল। আমি শুনে নিয়েছি।

হাসনা অপ্রত্যয়ের ভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, দূর! মারবে তো হিঁদুতে। আব্বা বলছিল মার কাছে। আমি তখন শুনেছি।

নন্তু বলে, মিথ্যে কথা। তোর শোনা ভুল—

দু-রকমও হতে পারে।—একটু ভেবে নিয়ে হাসনা জোর দিয়ে বলে, ঠিক তাই। বাঘে মারে আবার কুমিরেও তো মারে। মোসলমান মারে বলে হিঁদু বুঝি মারতে পারে না? আচ্ছা, হিঁদু কেমন রে নন্তু—তুই দেখেছিস?

নন্তু বলে, কী বোকা রে! দেখলেই তো মেরে ফেলবে।

মোসলমান? মানে, বেটাছেলে—নানান জায়গায় যাস কিনা তুই!

সে-ও তো এক কথাই হল। কিছু দেখি নি। বাবা রে, না দেখতে হয় যেন কখনো!

তারপরে যে জন্যে নন্তু এই সাত সকালে চলে এসেছে। বলে, এই পুতুল আর গুলতি তোকে দিলাম হাসনা। বাবা নিতে দিচ্ছে না, জিনিসপত্তর অনেক হয়ে গেল কিনা।

পুলকিত হাসনা দু-হাতে নিয়ে নিল। বলে, দাঁড়া একটু নন্তু, রেখে আসি। সাঁ করে দৌড় দিল। ফিরে এসেছে জলছবি নিয়ে। বলে, দোরে বেচতে এসেছিল, দু-আনার কিনলাম। তা নাকি হিঁদুর ঠাকুর সব। আব্বা খাতার পাতায় মারতে দেবে না। তোকে দিলাম নন্তু। সেরে সামলে রাখিস, বাড়ির কাউকে দেখাসনে। দেখতে পেলে বকবে।

দাম্পত্য-সীমান্তে

সতীনাথ ভাদুড়ী

মাছি ছেঁকে দুর্গন্ধ ক্ষতের গন্ধ পেয়ে। নিবারণও চেষ্টা-তদবির করে বদলি হয়েছিল আজবপুর পোস্টাফিসে। ডাক-তার-বিভাগের খবর, সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় পার্সেল, বিলি না হয়ে ফেরত যায়, এই পোস্টাফিস থেকে।

সত্যিই আজব জায়গা আজবপুর। আধখানা পড়ে ভারতে, আধখানা নেপালে। নেপালের লোক এই স্টেশন থেকে রেলগাড়িতে চড়ে; এখানকার পোস্টাফিসে চিঠি ফেলতে আসে। এখানকার লোক নেপালে বাজার করতে যায়; মদ খেতে যায়। কাজেই এখানকার লোকের চালচলনও অন্যরকমের। এরা ভোজালি দিয়ে তরকারী কোটে; পুলিসের লোক দেখলে ভয় পায় না; আবগারী-বিভাগের লোক দেখলে হেসে পানের দোকানে নিয়ে যায়। এইরকম আবহাওয়াই নিবারণ পোস্টমাস্টারের পছন্দ।

অসীমার পছন্দ নয়; কিন্তু উপায় কি। যেমন মানুষের হাতে মা বাপ তাকে সঁপে দিয়েছে! ছোটবেলায় ঠাকমা নাতনীকে ঠাট্টা করে বলতেন—দেখিস, তোর সঙ্গে এমন বরের বিয়ে দেবো যে, সে রাতে মদ খেয়ে এসে তোকে ঠ্যাঙাপেটা করবে। অসীমা বলত—ইস্! ঝাঁটা-মেরে তাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবো না!' তার কপালে ঠাকমার কথাই ফলল শেষ অবধি। বিয়ের পর প্রথম যেদিন জানতে পারে স্বামীর নেশা করার কথা, সেদিন খুব কেঁদেছিল। এমন সুন্দর যার চেহারা, সে মানুষে আবার মদ খায়!

তারপর গত সাত বছরে আরও কত কি জেনেছে, কত কি শিখেছে, কত কি করেছে। যার স্বামীর নেশার খরচ মাইনের চেয়েও বেশী, তাকে অনেক কিছু নতুন করে শিখতে হয়। ইচ্ছা থাক, আর নাই থাক।

এখানকার লোকে পোস্টমাস্টারকে মাস্টার-সাহাব বলে। সেইজন্যই বোধহয় সে প্রথম রাত্রিতেই স্ত্রীর উপর মাস্টারি ফলিয়েছিল, শিখিয়ে পড়িয়ে তাকে একটু চালাক-চতুর করে নেবার সদুদ্দেশ্যে। বলেছিল, "ছোটলোকদের সঙ্গে খবরদার আলাপ কর না। আলাপ পরিচয় করতে হয় ত বড়লোকের সঙ্গে। যার হাতে কিছু আছে, তার হাত থেকেই না কিছু আসতে পারে। আমল না পেলেও বড়লোকের বাড়ির আড্ডার এক কোণায় আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি প্রত্যহ খবরের কাগজের উপর মুখ গুঁজে। সময়ে কাজে লেগেছে।"

তখনই অসীমার মনে হয়েছিল—এমন কার্তিকের মত যার চেহারা, স্বভাব তার এমন কেন? আগে থেকে এত মতলব ফেঁদে কি সবাই কাজ করতে পারে?

যে স্বামী প্রথম রাত্রিতেই এই কথা বলে, সে যে শুধু মুখের উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত থাকবে না, এ জানা কথা। এখানে আসবার পরই নেপাল-বাজারের শেঠজীকে একদিন

বাড়িতে এনে পরিচয় করিয়ে দিল অসীমার সংগে। তারপর একটু চায়ের জল চড়াতে বলে বেরিয়ে গেল থলে নিয়ে বাজার করতে। ফিরল ঘণ্টা দুয়েক পর।

উপরওয়ালা 'ইন্সপেক্শন'এ এলে, তার জন্যও হুবহু এই ব্যবস্থা।

এ স্বামীকে চিনতে কি কারও দেরি লাগে। সব চেয়ে খারাপ লাগে তার সম্বন্ধে স্বামীর এই নিস্পৃহতার ভাব। সে দেখতে সুরূপা নয়। সেই জনাই বোধহয় তার মনের এই দিকটা আরও বেশী স্পর্শাতুর। তবে নিবারণ রাত্রিতে আটটার মধ্যে বাড়ি ফেরে, এত দুঃখের মধ্যেও এইটাই তার একমাত্র সান্ত্বনা।

কিন্তু আজ হল কি?

সমীর ঠাকুরপো সেই সাড়ে সাতটা থেকে যাই যাই করছে। সে বলেছে—"বস না। এত কি বাড়ি যাবার জন্য তাড়া পড়েছে! তবুতো এখনও বিয়ে করনি। তোমার দাদাকে আসতে দাও, তারপর যেও।"

বেশ লাগে তার সমীর ঠাকুরপোর সংগে গল্প করতে। রেলস্টেশনের মালবাবুর ভাই। আই কম পাস করে চাকরির চেষ্টা করছে। রোজ আসে। রান্নাঘরে বসে বউদির সংগে গল্প করে।

আটটা বাজল, নটা বাজল। তবু নিবারণের ফেরবার নাম নাই। অসীমা জানে যে নিবারণ আজ আলোয়ান মুড়ি দিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ আজ কিছু কাঁচা পয়সা সে হাতে পাবে। সেইজন্যই দেরি হচ্ছে নাতো? ছ বছরের ছেলে ফনটে; সে অত রাত্ পর্যন্ত জেগে থাকতে পারবে কেন। খাওয়া হলে, সবাই এল শোবার ঘরে। ঘরের কোণায় স্বামীর খাবার ঢেকে রেখে আবার তারা বসল সুখ দুঃখের গল্প করতে। জিমি কুকুরটা অনবরত ডাকছে।

দশটা বাজল। তবু নিবারণ আসে না। মশারির ভিতর কেন যেন ফনটের ঘুম আসছে না আজ কিছুতেই।

"কটায় যাও তুমি রোজ ঠাকুরপো?"

"ঘরে রুটি ঢাকা থাকে, যখন খুশি যাই।"

"তবে আর এত উসখুস করছ কেন, যাবার জন্য?"

"না, অনেক রাত হল। দাদার আজ হল কি?"

"কে জানে! কোথাও কোন ড্রেনেটেনে পড়ে রয়েছে বোধহয়!"

কথার মধ্যে বিরক্তি সুস্পষ্ট। নিবারণের মদ খাওয়ার কথা এখানে সবাই জানে। একথা বলতে সমীর ঠাকুরপোর কাছে লজ্জা নাই। পাছে আবার সমীর নিবারণের বাইরে রাত কাটানর অন্য অর্থ করে নেয়, সেইজন্যই অসীমা মদ খাওয়ার দিকটার উপর জোর দিয়ে কথাটা বলল। স্বামী বাইরে রাত-কাটায়, একথার জানাজানিতে শুধু বাইরের লোকের কাছেই লজ্জা নয়, নিজের কাছেও নিজে ছোট হয়ে যেতে হয়।

হঠাৎ অসীমার খেয়াল হল যে, ফনটের সম্মুখে তার বাপের মদ খাওয়ার গল্প করাটা ঠিক নয়। "চল ঠাকুরপো, আমরা ওঘরে গিয়ে বসি। কিরে ফনটে তোর ভয় করবে না তো আমরা ওঘরে গিয়ে বসলে? মাঝের দরজা তো খোলাই থাকল।"

মাঝের দরজা খুলে তারা গিয়ে বসল পোস্টাফিসের ঘরে। "জিমি! চুপ করলি না! জ্বালাতন!"

এই মানসিক অবস্থা; এমন দরদী শ্রোতা; নিজের দুঃখের কথা বলবার সময় অসীমার চোখের জল বাধা মানেনি। এগারটার পর সে নিজে থেকেই সমীরকে চলে যেতে বলে-ছিল। যাবার সময় সমীর আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিল—"দাদা রাত্রিতে আসবেন ঠিকই। বারোটা, একটা হতে পারে।"

"সে তো নিশ্চয়ই।"

বলে নিজের কানেই বেখাপ লাগল কথাটা। এত জোর দিয়ে ওকথা বলবার কোন দরকার ছিল না। শুধু সমীরকে কেন, নিজের মনকেও সে ফাঁকি দিতে চায়। নিজেকে স্তোক দেবার জন্য ঘরের আলোটা শোবার আগে নেবাল না। নেবানর অর্থ হত, নিবারণ যে আজ আসবেও না, খাবেও না, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ।......খাটের তলায় ইঁদুর খুটখুট করে। ডাকঘরে ঘড়ি বাজে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে কত কি ভাবে; আর চোখের জলে বালিশ ভেজে সারারাত।......পণ মূল্যের অতিরিক্ত তার কি আর কোন দামই নাই স্বামীর চোখে?...... স্বামী সব চেয়ে বেশী ভালবাসে মদ। তার-পর টাকা। কিন্তু তারপর?......

জিমিটারও আজ হল কি? সেও সারা-রাত ডেকে ডেকে সারা।

শেষ রাত্রিতে চোখের পাতা কখন যেন বুজে এসেছিল। ঘুম ভাঙল হঠাৎ। এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। ফনটে হাত দিয়ে ঠেলছে। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ। মনের তিক্ততা ঘুমিয়েও কাটেনি। কড়ানাড়ার শব্দের অধীর রূঢ়তা, মেজাজ আরও খারাপ করে দেয় অসীমার।

"জেগে রয়েছিস—উঠে দরজাটা খুলে দিতে পারিস না! বুড়ো ধাড়ি ছেলে!"

চুল ধরে টানাটা এত অপ্রত্যাশিত এই ভোরবেলাতে যে ফনটে কাঁদতে ভুলে গেল। ...রামদেনীর মা কড়া নাড়লে এর আগে ওতো কতদিন মাকে ডেকে তুলে দিয়েছে। তার-জন্য কোনদিন তো মাকে রাগ করতে দেখেনি।......মশারি থেকে বেরিয়ে, দুমদুম করে পা ফেলে মা দরজা খুলে দিতে গেল। খটাং করে শব্দ হল। রাগ করে খিল খুললে ওই রকম শব্দ হয়। জিমিটা নিশ্চয়ই ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। ওকি! মা এমন দৌড়িয়ে ঘরে ঢুকল কেন? বিড়াল আসেনি তো। ...মা খপ করে একখান পুরনো খবরের কাগজ টেনে নিল। ঢাকা তুলে বাবার জন্য রাখা ভাতগুলোকে খবরের কাগজের উপর ঢালছে। খবরের কাগজে আবার ভাত রাখে নাকি লোকে? জিমির জন্য নিশ্চয়ই। মা আড়চোখে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। মা মিছামিছি ভয় পাচ্ছে, জিমি বুঝি এখনই ঘরে ঢুকে ওই ভাত খেয়ে নেবে। জিমি যে চলে গিয়েছে বাইরে।......

মশারির ভিতর থেকে ফনটে সব দেখছে। যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। মার কাণ্ড-কারখানা আজ সে ঠিক বুঝতে পারছে না। ......একমুঠো ভাত মা আবার থালায় রাখল। ডাল তরকারি দিয়ে মেখে সেই ভাতের দলাটাকে সারা থালার উপর একবার বুলিয়ে নিচ্ছে। ডাঁটা চড়চড়িটা থালার একপাশে রেখে আঙুল দিয়ে একটু ছড়িয়ে দিল। মা দরজার দিকে তাকাচ্ছে ভয়ে ভয়ে। একবার মশারির দিকেও তাকাল। ওকি! মা ডাঁটা চিবুচ্ছে! এই সাতসকালে! বাসি-মুখে! ভুল দেখছে নাকি সে? না, ওই তো ডাঁটার ছিবড়ে বার করে থালার ওপর রাখলে। মা তার মশারির দিকে তাকাচ্ছে। এরকম সময় মার দিকে তাকাতে নাই; লজ্জা পাবে। তাই ফনটে চোখ ফেরাল জানলার দিকে রামদেনীর মা আসছে জানলার দিকে।......

অসীমা সত্যিই তাকিয়েছিল মশারির দিকে। সে দেখছিল, বাইরে থেকে বোঝা যায় নাকি, এখন মশারির ভিতর কে আছে, না আছে। না। যাক! তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছে কোথায় অসীমা। মুহূর্তের মধ্যে সে কতদিক সামলাবে! তার মত অবস্থায় যে পড়েছে সে-ই জানে। সে বুঝতে পারেনি যে দরজার কড়া নাড়ছিল রাম-দেনীর মা। ভেবেছিল বুঝি ফনটের বাবা। হঠাৎ ঘুম ভাঙবার পর ঠাহর পায়নি। ভাগ্যে ঠিকে ঝি রামদেনীর মা কোনদিনই শোবারঘরে ঢোকে না।

জল খানিকটা মেঝেতে ফেলে, ডাল-তরকারি-মাখানো হাতটা ডুবিয়ে ধুয়ে নিল গ্লাসের মধ্যে অসীমা। রামদেনীর মা দোর-গোড়ায়। এঁটো থালাবাসনগুলো তার হাতে দেবার সময় অসীমা চোখ নামিয়ে নেয়। কুয়াতলায় মুখ ধুতে যাবার আগে শোবার-ঘরের দরজা আবজে দিতে ভোলে না। স্বামী রাত্রিতে ফেরেনি এই কথাটা ঝিকে জানতে দিতে চায় না সে।

বীরবাহাদুর নেপালী বাইরে থেকে ডাকে "মাইজী!"

এই ডাকঘরের ঠিকানায় নেপালী এলাকার যে সমস্ত চিঠিপত্র আসে, সেগুলোকে ঘরোয়া ব্যবস্থায় বিলি করবার জন্য বীরবাহাদুর প্রত্যহ নিয়ে যায়। তার কাঁধে ডাকের ঝুলি। জিমি লেজ নাড়তে নাড়তে তার গায়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। রামদেনীর মা কাজ সেরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বীরবাহাদুরকে বলে গেল —"আজ বোধহয় একটু দেরি হবে মাস্টার-সাহেবের। এখনও ঘুমুচ্ছে। কাল রাতে

বোধহয় চলেছে খুব।" বোতল থেকে মদ ঢালবার মুদ্রা দেখিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায়।

অসীমা এসে দাঁড়িয়েছে।

"বীরবাহাদুর, তুই একটু ঘুরে ঘেরে আয়।"

ঠোঁটের কোণায় হাসি এনে চোখের ইশারায় বীরবাহাদুরে বুঝিয়ে দিল যে রামদেনীর মা বহুদূরে চলে গিয়েছে; অত সাবধান হয়ে কথা বলবার দরকার আর নাই।

"মাস্টারসাহেবের কথাতেই তাড়াতাড়ি এলাম সাইকেলে। তিনি আধঘন্টার মধ্যেই পেণছে যাবেন। হে'টে আসছেন কিনা।"

কেন তাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়েছে সেকথার কোন মূল্য নাই অসীমার কাছে।

"দেখা হল কোথায়, মাস্টারসাহেবের সঙ্গে?" জিজ্ঞাসা করবার সময় কুণ্ঠায় বীরবাহাদুরের মুখের দিকে সে তাকাতে পারে না।

"আমার বাড়িতেই তো তিনি সারারাত।"

মনটা হালকা হালকা লাগে।

"সারা-রাত?"

বীরবাহাদুর অধৈর্য হয়ে পড়েছে। মাথায় তার গুরুদায়িত্ব। ডাকের থলে থেকে একটা পার্সেল বার করতে করতে বলে—"এটাকে দেবার জন্য কাল রাতেও একবার এসেছিলাম।"

"রাত্রিতে? কটার সময়? কেন? খুব দরকারী নাকি?"

দরকারী না হলে কি আর অত রাতে নিয়ে এসেছিলাম। মাস্টারসাহেব তখন নেশায় চুর। উনি কি তখন আসতে পারেন।"

"তবে রাত্রিতে দিলি না কেন?"

একটু দ্বিধাজড়িত স্বরে সে বলল—"দেখলাম ডাকঘরের মধ্যে আপনি আর মালবাবুর ভাই গল্প করছেন। বাইরের লোকের সম্মুখে তো জিনিসটা দিতে পারি না আপনার হাতে। রাতদুপুরে পোস্টাফিসের সম্মুখে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও বিপদ আছে। তাই চলে যেতে হল। গিয়ে মাস্টারসাহেবকে বলতেই তিনি চটে আগুন মালবাবুর ভাইয়ের উপর। ওই নেশার মধ্যেও, জ্ঞান টনটনে। বলে ভোজালি লে আও বীরবাহাদুর! অভী লে আও! খুন করব ছোঁড়াটাকে আমি! কী চীৎকার! সে কি সামলান যায়!"

শিহর খেলে গেল অসীমার সারাদেহে। বহু আকাঙ্ক্ষিত অথচ অনাস্বাদিত একটা জিনিসের স্বাদ সে পাচ্ছে। খুব ভাল লাগছে শুনতে। ও থামল কেন। আরও বলুক।

ভয়ের অভিনয় করে সে বলে—"তাই নাকি! ওরে বাবারে! তাহলে কী হবে! তাহলে আমি কী করি! তখনই আসছিল নাকি ভোজালি নিয়ে?"

বীরবাহাদুর এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়। "না না, কিছু ভাববেন না, মাইজী। নেশায় যে মানুষ হাঁটতে পারছে না, সে মানুষ তখন আসছে ভোজালি নিয়ে মারতে! আপনিও যেমন!"

"না না বীরবাহাদুর। যত নেশাই করুক, জ্ঞান মাস্টারসাহেবের টনটনে থাকে। জানিতো তাকে।"

"থাকে তো থাকে!"

তাড়া দিয়ে উঠেছে বীরবাহাদুর। বাড়িতে আগুন লাগলেও বাজে গল্প করা ছাড়বে না এই মেয়েমানুষের জাতটা! সে কাজের কথা পাড়ে।

"এই নিন মাইজী পার্সেলটা। সব ঠিক করা আছে। আপনি শুধু সেলাইটা করে রেখে দিন এখনই। একটুও দেরি করবেন না। মাস্টারসাহেব এই এলেন বলে। এসেই সেলাইয়ের উপরের গালা মোহরগুলো ঠিক করে বসিয়ে দেবেন। শেঠজী রাত দশটার সময় মাস্টারসাহেবের কাছে একটা জরুরী খবর পাঠিয়েছিলেন। সেইজন্যই না এত তাড়া।"

জরুরী খবর? আর বলতে হবে না। মুহূর্তের মধ্যে অসীমা বুঝে গিয়েছে খবরটা কিসের। কেনই বা বীরবাহাদুরকে নিবারণ তখনই পাঠিয়েছিল। অন্যবার মত অবস্থা থাকলে নিজেই আসত। ইনস্পেকশন অফিসার ডাকঘর খুলবার সময়ের আগে বোধ হয় আসবেন না। অফিসারদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয়, সব অসীমার জানা। পার্সেলটা সেলাই করতে আধঘণ্টাও সময় লাগবে না।

"ফনটে জামাজুতো পড়েন! বীরবাহাদুর ফনটেকে একটু বেড়াতে নিয়ে যা তো!"

অসীমা ঘরে ঢুকল চুল আঁচড়ে শাড়ি বদলে নিতে। চায়ের জল একটু পরে চড়ালেই হবে।

কিন্তু সময় আর পাওয়া গেল না। নবে সেলাই করতে বসেছে পার্সেলটা—মোটরগাড়ি এসে থামল পোস্টাফিসের সম্মুখে। একখান ছোট, একখান বড় গাড়ি! এতো কেবল 'ইনসপেকশন'এর উপরওয়ালা নয়! এ যে অনেক লোক! ডাকবিভাগের অফিসার; আবগারী বিভাগের অফিসার; পুলিসের অফিসার; নিবারণ নিজে; পুলিস কনস্টেবল! পথে দেখা হয়ে গিয়ে থাকবে নিবারণের সঙ্গে। তাহলে তো স্বামীর সমূহ বিপদ! এত বড় বিপদের মুখে অসীমা কোনদিন পড়েনি। হে মা কালী, বাঁচাও! ভয়ে কি করবে ঠিক করতে পারে না। পার্সেলের ভিতরের গাঁজার পুঁটুলিটাকে সে কয়লাগাদার নীচে রাখে। পার্সেলের উপরের ন্যাকড়ার মোড়কটাকে উনুনের মধ্যে ফেলে দেয়। হে মা কালী, গালা আর ন্যাকড়াপোড়া গন্ধটা যেন হাওয়ায় পোস্টাফিসের উলটো দিকে উড়ে যায়! এখন একবার নিবারণের সঙ্গে একলা দেখা করতে পারলে সুবিধা হত। বাড়ি ঘিরে ফেলেছে পুলিসে। পাঁচ-পাঁচটি লোক জমতে আরম্ভ হয়েছে। নিবারণ অফিসারদের বলছে—অফিসের চাবি বাড়িতেই আছে; সে সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি গাড়ি থেকে বার হয়ে যাবার সময়; বাড়ির ভিতর দিয়েও পোস্টাফিসের ঘরে ঢোকবার আর একটা দরজা আছে; বাড়িতে আছে স্ত্রী আর একটি ছয় বছরের ছেলে; আর বাইরের লোকের মধ্যে আসে ঠিকেঝি রামদেনীর মা। পুলিস এখন স্ত্রীর সঙ্গে নিবারণকে দেখা করতে দিতে রাজী নয়। একজন এসে অসীমার কাছ থেকে পোস্টাফিসের চাবি চেয়ে নিয়ে গেল।

ডাকঘরে টেবিলে দুটি চায়ের কাপ। 'এ আবার এখানে কোত্থেকে এল।' বলেই নিবারণ কাপ দুটোকে টেবিলের নীচে নামিয়ে রাখল।

অফিসাররা পার্সেল সংক্রান্ত খাতাপত্র দেখতে চাইলেন।

"কালকের তারিখে, এই যে এত নম্বরের পার্সেল সম্বন্ধে লিখেছেন—এই নামের কোন ব্যক্তি ওখানে নাই—এটা- আজ কলকাতায় ফেরত পাঠান হবে প্রেরককে দেখি সেই পার্সেলটা।"

সিন্দুক থেকে সেটাকে বার করে দিতে গেল নিবারণ। শেষকালে মুখ কাঁচুমাচু করে করে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

পাশের ঘর থেকে অসীমা সব শুনতে পাচ্ছে। নিবারণ নিজেই প্রথম কথা তুলল —নিশ্চয়ই পার্সেলটা কেউ চুরি করেছে। তার মনে আছে যে সে কাল পার্সেলটা সিন্দুকে রেখেছিল। তারপর সারারাত সে বাড়িতে ছিল না। বাইরের তালা যখন ভাঙ্গা নয়, তখন চোর নিশ্চয়ই ঢুকেছে বাড়ির ভিতর দিক দিয়ে।

বীরবাহাদুরের কাছ থেকে স্বামীর সম্বন্ধে নতুন একটা খবর পাবার পর থেকে, অসীমার মনে নতুন নেশা লেগেছে। আসন্ন বিপদের মুখেও সে নেশার আমেজ কাটেনি। মাঝের খোলা দরজা দিয়ে নিবারণের চোখ-মুখের ভাব সে একবার দেখে নিল। মনে হল যেন ঈর্ষার রেশের সন্ধান পাচ্ছে সেখানে। বাড়ির হাটে তার নিজের ফেলা নিজের মূল্যের প্রথম স্বীকৃতি।

অফিসাররা এইবার বাড়ির ভিতর ঢুকলেন অসীমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য। তার বেশভূষার আড়ম্বর প্রথমেই তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"কাল বিকালের পর থেকে পোস্টাফিসের ঘরে কেউ ঢুকেছিল?"

"না।"

স্বামীর চোখের লেখা দেখবার নেশা তখন অসীমাকে পেয়ে বসেছে।

হাঁ হাঁ করে উঠেছে নিবারণ, কি বলতে হবে, স্ত্রীকে তার ইঙ্গিত দেবার জন্য।

"মেয়েমানুষ। ভয়ে মিছে কথা বলছে হুজুর।"

"মিছে কেন হতে যাবে। কেউ ঢোকেনি ওঘরে।"

"কেউ ঢোকেনি তো দুটো চায়ের কাপ কেন ছিল টেবিলের উপর?"

চটে উঠেছে নিবারণ।

"ও কালকে দুপুরের। তুমি যে দুপেয়ালা চা খেয়েছিলে একসঙ্গে।"

ঘরের বাক্স পেঁটরা সার্চ করা হল। অফিসার শুধু বললেন—"নতুন নতুন জরিদার বেনারসী শাড়ী আপনার অনেকগুলো দেখছি।"

"হাঁ, ওগুলো বিয়ের সময় পাওয়া।"

এছাড়া আর কোন কথা বার করা গেল না অসীমার মুখ থেকে। ফনটেকে ডাকা হল।

টফি, লজেঞ্জুস খেয়ে, সে বলল যে সমীর কাকা কালবাড়িতে মার সঙ্গে ওঘরে গল্প করছিল, আর মা মাতালের ভয়ে কাঁদছিল। বাসিমুখে চাটা চিবোনোর কথা যে বলতে নাই তা সে জানে। দারোগার প্রশ্নের উত্তরে রঞ্জনের মা বলল যে, কাল রাত্রিতে সমীর এখানে ছিল।

"তাহলে আপনাদের স্বামী স্ত্রী দুজনকেই থানায় যেতে হয় আমাদের সঙ্গে। আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।"

ফনটেকে অফিসার গাড়ীর সম্মুখে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন। অসীমা আর নিবারণ বসল ভ্যানের পিছন দিকে। পথ থেকে পুলিস সমীরকেও ভ্যানে তুলে নিল। সে বসল এক অন্যদিককার বেঞ্চে। সবাই নির্বাক। ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলেছে। সে ধুলো খেতে খেতে মালবাবু সাইকেল চালিয়ে আসছেন গাড়ির পিছনে পিছনে। সমীর গাড়ির বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার বেঞ্চের দিকটায় ছায়া; আর অসীমাদের বেঞ্চের দিকটায় রোদ্দুর পড়ছে। হঠাৎ অসীমা উঠে সেই বেঞ্চটাতে গিয়ে বসল। ভাবে মনে হল যে সে রোদের হাত থেকে বাঁচতে চায়। বসবার সময় অসীমা স্থির লক্ষ্য রেখেছে নিবারণের চোখের উপর। নিবারণও তার দিকে তাকিয়ে। যাতে পুলিসরা না দেখতে পায় সেইজন্য সে হাত-খানা বেঞ্চের নীচে নামিয়ে স্ত্রীকে ইশারা করল সমীরের দিকে আরও ঘেঁষে বসতে। স্বামীর উপস্থিতবুদ্ধির প্রশংসাসূচক ব্যঞ্জনাও তার চোখমুখে নির্লজ্জ ছাপ ফেলেছে। ঈর্ষার চিহ্নও নাই সেখানে।

যা ভাবতে ভাল লাগে, সেইটাকেই সত্যি বলে ধরে নিয়েছিল এতক্ষণ অসীমা। এতক্ষণে মিথ্যেভুলের নেশা কাটে। চূড়ান্ত অপমানে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে।

"কেন, ওর কাছে ঘেঁষে বসব কেন? হুকুম?" অসীমা এসে ধপ করে বসল নিবারণের পাশে। তারপর আবার উঠে দাঁড়াল গাড়ীর পার্টিশনের লোহার জাফরি ধরে।

"শুনেছেন পুলিসসাহেব, এই লোকটাই চুরি করেছে—এই ঠগ, জোচ্চোর, মাতালটা। অন্যর ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়, আমাকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলিয়ে। সব সত্যি কথা বলব আমি। আমার জেল হয় হোক। কলকাতার লোকদের সঙ্গে এর, আর নেপালবাজারের শেঠজীর সাট আছে। যেসব লোক সাত-জন্মেও এখানকার নয়, তাদের নামে কলকাতা থেকে পার্সেল আসে। এখানে সে নামের লোক পাওয়া যাবে কোথায়। ফেরত যায় সেসব পার্সেল। পার্সেলে আসে রেশমী শাড়ী, টাকা, আরও কত কি। সেসব এই মাতালটার মজুরি। সেটা বার করে নিয়ে ওরা পার্সেলের মধ্যে ভরে দেয় নেপালের সস্তা গাঁজা। যে গাঁজার দাম নেপালে চার পয়সা, তার দাম কলকাতায় দেড় টাকা। কলকাতা থেকে যে মিথ্যা পার্সেল পাঠায় সেই আবার গাঁজাভরা পার্সেল ফেরত পায়। অনেক দিন থেকে এই করে আসছে এরা। আমার মুখ বন্ধ করবার জন্য আমাকে দিয়ে গাঁজা ভরা পার্সেল সেলাই করায়। যাদের হাতে এত লোকজন, যারা সিলমোহর বাঁচিয়ে সেলাই কাটতে জানে, তারা কি আর সেলাই করবার একটা লোক পেত না ইচ্ছা করলে। শুধু আমার মুখ বন্ধ করবার জন্য আমায় রেশমী শাড়ী দিয়েছে। লোকটা কি কম বদমাইস! তিন বছর পরে কি করবে সেসব ওর আজকে থেকে ছককাটা থাকে! একটা কথাও লুকোবো না আমি হুজুর। গলায় পাথর বেঁধে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে মা-বাপে! বিয়ে না ছাই! ইচ্ছা করে যেখানে দুচোখ যায় চলে যেতে! পারিনি শুধু ফনটের মুখ চেয়ে। জেলে ওকে আমার কাছে থাকতে দেবেন পুলিসসাহেব! তাহলেই আমি সব সত্যি কথা বলব।"......

এতক্ষণে নিবারণ কথা বলল।

"কি পরিমাণ বদ দেখছেন তো হুজুর মেয়েমানুষটা। নাগরকে বাঁচিয়ে স্বামীকে জেলে পুরতে চায়।" তার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন পর্যন্ত নাই।
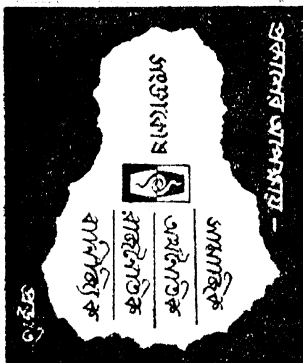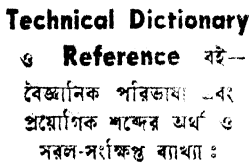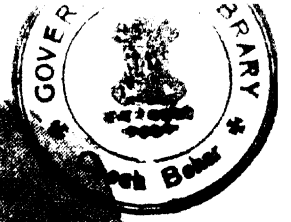
মিস্টার রিচার্ড বললেন—গল্পটা গোড়া থেকে বলবো, না শেষ থেকে বলবো?

কলকাতা থেকে বম্বে যাবার পথেই মিস্টার রিচার্ডের সঙ্গে আলাপ। মাত্র চার ঘণ্টার আলাপ। দমদম থেকে উড়তে শুরু করেছিলাম সন্ধ্যে ছ'টার সময়। ভাইকাউন্ট-এর ভেতরে মিস্টার রিচার্ডের সিট-নম্বার ছিল থ্রি-সি, আর আমার থ্রি-ডি। একেবারে পাশাপাশি। মিস্টার রিচার্ডের বোধহয় গল্প করবার মেজাজ ছিল তখন। তিনিই প্রথম আরম্ভ করেছিলেন।

বলেছিলেন—আর ইউ এ ভেজিটারিয়ান? আপনি কি নিরামিষভোজী?

আমি নিরামিষভোজী কি না, তা নিয়ে মিস্টার রিচার্ডের মাথা ঘামানোর কথা নয়। বুঝেছিলাম তিনি গল্প করতে চান পাশের লোকের সঙ্গে। তারপর আস্তে আস্তে অনেক কথা উঠলো। ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে। তেরো বছরে কী কী উন্নতি অবনতি হয়েছে, কী কী হয়নি, তারই ছোটো কথা সব। এ-সব বিদেশীদের মুখরোচক আলোচনা। এই প্রথম ইণ্ডিয়ায় এসেছেন মিস্টার রিচার্ড। গৌতম বুদ্ধের দেশ, শ্রীচৈতন্যের দেশ, স্বামী বিবেকানন্দের দেশ, ল্যাণ্ড অব টেম্পলস। দি গ্রেট ইণ্ডিয়া। ওদিকে কাশ্মীর আর এদিকে কুমারিকা, দি হিমালয়াজ আর দি গ্যাঞ্জেস। বেনারসের সাধু, মথুরার পাণ্ডা, কলকাতার ভিখারী, দিল্লীর [illegible], ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গ। সব দেখা শেষ করে এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে উঠেছিলেন। এখন ফিরে যাচ্ছেন নিজের দেশে, আমেরিকায়।

কলকাতার নাম শুনেই একটু কৌতূহল হলো।

জিজ্ঞেস করলাম—কলকাতা কেমন লাগলো আপনার?

মিস্টার রিচার্ড আমার দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন—বলবো?

বললাম—বলুন না—

মিস্টার রিচার্ড বললেন—গল্পটা গোড়া থেকে বলবো, না শেষ থেকে বলবো?

আমেরিকা

বিমল মিত্র

বললাম—তার মানে?

মিস্টার রিচার্ড বললেন—মাত্র এক দিন ছিলাম কলকাতার হোটেলে, এক দিনের অভিজ্ঞতায় কোনও দেশ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, কিন্তু প্রথম দিনেই একটা ঘটনা ঘটেছিল—সেই ঘটনাটা বললেই আপনি একটা স্টোরি পেয়ে যাবেন—কারণ শেষটা আমার আর দেখা হয়নি—

বললাম—তা হলে গোড়া থেকেই বলুন—

মিস্টার রিচার্ড বললেন—ঘটনাটা ঘটলো প্রথম নাইটে। প্লেন এসে পৌঁছেছিল বিকেল চারটের সময়। এরোড্রোম থেকে সোজা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। বিরাট হোটেল, আগে থেকেই আমার রিজার্ভ করা ছিল রুম। বয়, বাবুর্চি, ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার, বেয়ারার সবাইকে দেখলাম—দেখলাম সবাই খুব কেয়ার নিলে আমার—আমি কী খাই, আমি কী খেতে ভালবাসি, আমি হট্ না কোল্ড কী খাবার পছন্দ করি, আমার কখন কী দরকার, সব খবর তারা জিজ্ঞেস করে নিলে—! বিকেল বেলা বেড়াতে গেলাম সিটিতে। গেলাম হগ্ মার্কেটে, দু একটা জিনিসপত্র কিনলাম—দেখলাম বেংগলীজ আর ফানি পিপল্! ফরেনারদের তারা দেবতা মনে করে এখনও, এই ইণ্ডিপেনডেনসের তেরো বছর পরেও—

মিস্টার রিচার্ড এবার একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিলেন—

বললাম—তারপর?

মিস্টার রিচার্ড বলতে লাগলেন—চমৎকার লাগলো এই ক্যালকাটা আপনাদের—আগেকার সেই সেকেণ্ড সিটি ইন দি ব্রিটিশ এম্পায়ার! পশ্চিম দিকে অত বড় মাঠ, সিটির হার্টের মধ্যে এত বড় খোলা মাঠ কোথাও দেখিনি! গভর্নরস্ হাউসও দেখলাম! আপনাদের গ্রেট্ মহাটমা গানটি বলেছিলেন ইণ্ডিপেনডেনসের পরে ওটা মিউজিয়াম করে দেওয়া হবে! ভেবেছিলাম মিউজিয়ামটা দেখতে যাবো। আমার বেংগলী গাইড বললে—তা নাকি হয়নি। তা না হয়েছে ভালই হয়েছে—এতদিন স্ট্রাগল্ করে এখন একটু আরাম করাই ন্যাচারাল্, শুনলাম আগেকার সবই আছে, সেই গার্ড অব অনার, সেই আট ঘোড়ার বডিগার্ড, সেই এ-ডি-কং, ব্রিটিশ লিগেসির যা কিছু, সব ইণ্ডিয়ানরা পুরো দমে ভোগ করছে—। বড় আনন্দ হলো দেখে—অবশ্য দেখলাম আপনারা ময়দান থেকে জেনারেল আউটরামের স্ট্যাচুটা সরিয়ে দিয়েছেন, দিয়ে সেখানে মহাটমা গানটির স্ট্যাচু বসিয়ে দিয়েছেন—ভেরি গুড, ভেরি গুড—ভারি আনন্দ হলো ক্যালকাটা দেখে—। এতদিন মিস মেয়ো আর আলডাস হাক্সলির বইতে যা পড়েছি, দেখলাম সব মিথ্যে, সব প্রোপাগাণ্ডা—সব ভিলিফিকেশন—আমি সন্ধ্যে বেলা টেরাসের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিটি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম—কবে একদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই সিটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, আজ এতদিন পরে কোথায় রইল সেই ব্রিটিশ জাত—আর কোথায় রইল সেই কুইন ভিক্টোরিয়া, যিনি একে ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে নিয়ে একে জাতে তুলে নিলেন। হিস্ট্রিতে পড়েছি সেদিন নাকি কুইন ভিক্টোরিয়াকে ইণ্ডিয়ানরা 'মা' বলে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিল—! আজ সেই কান্ট্রি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়েছে—এটা বৃটেনেরও প্রাইড ইণ্ডিয়ারও গ্লোরি—চমৎকার, বিউটিফুল—

—তারপর?

—তারপর ডিনারের পর নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছি। শোবার আগে আমার বয় আমাকে কফি দিয়ে গেছে। গাইড-বুকটা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কত রাত মনে নেই, দরজায় একটা নক্ পড়লো। মনে হলো কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে—। প্রথমে মনে হলো ভুল শুনেছি! খানিক পরে আবার একটা নক্—

উঠে পড়লাম। দরজার ভেতর থেকে বললাম—কে? হু'জ দ্যাট্?

খানিকক্ষণ চুপ চাপ!

উত্তর না পেয়ে আমি দরজা খুললাম। দেখি আমার বয় হুকুমালী।

হুকুম আলি মাথা নিচু করে সেলাম করতে লাগলো বার-বার। বিকেল থেকেই হুকুমালী আমার সেবা করছে। বড় ওবিডিয়েন্ট সার্ভেণ্ট। বুঝলাম ব্রিটিশ-আমলের ফরেনারদের সার্ভ করে করে হুকুমালী আদব-কায়দায় দুরস্ত হয়ে গেছে।

হুকুমালী বললে—হুজুর, গোস্তাকি মাফ হয়—

—কী হুকুমালী? ক্যায়া মাঙতা?

হুকুমালী বললে—একজন সাহেব হুজুরের সঙ্গে মোলাকাত্ করতে চায়—

—কোন্ সাহেব?

এতক্ষণ দেখতে পাইনি। টেরাসের কোণে অন্ধকারে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। এতক্ষণে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আমেরিকান হাওয়াই কোট আর ট্রাউজার পরা, ইয়ং ম্যান অব সে থার্টি—বড় জোড় তিরিশ বছর বয়েস হবে। গায়ের রং ব্ল্যাক ট্যান। হাতে একটা লেদার পোর্টফোলিও ব্যাগ! কাছে এসেই বললে—গুড ইভনিং স্যার,—গুড ইভনিং—

বললাম—গুড ইভনিং! ইয়েস?

ইয়ং ম্যান বললে—ডু ইউ ওয়াণ্ট আর্টিস্ট স্যার? আপনি আর্টিস্ট চান?

—আর্টিস্ট!

আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। আর্টিস্ট! কীসের আর্টিস্ট! কীসের আর্ট! ছবি আঁকবার জন্যে? আমার ছবি আঁকবে! পোর্ট্রেট! কিছুই বুঝতে পারলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম—আর্টিস্ট?

ইয়ং ম্যান বললে—ভেরি গুড আর্টিস্ট স্যার, ইয়ং অ্যাণ্ড বিউটিফুল—

—তার মানে?

ইয়ং ম্যান বললে—গার্লস স্যার—কলেজ গার্লস—এই ছবি আছে আমার কাছে, এই দেখুন—

বলে পোর্টফোলিও ব্যাগটা খুলে একগাদা ফোটোগ্রাফস্ বার করলে। একগাদা মেয়েদের ছবি। ইয়ং সুইট গার্লস। চমৎকার চেহারা, ওয়েল ড্রেসড্, প্রায় ডজন খানেক—

ছবিগুলো দেখিয়ে বলতে লাগলো—যাকে আপনার ইচ্ছে, পছন্দ করতে পারেন, যাকে ইচ্ছে! সবাই রেসপেকটেব্‌ল সোসাইটির গার্ল, এই দেখুন, এ হচ্ছে মিস সোমিতা, এর বয়েস নাইনটিন, এর বয়েস সেভেনটিন, আর এই যে দেখছেন বব্ করা চুল, এ হলো পাঞ্জাবী গার্ল—সব রকম আর্টিস্ট পাবেন আমার কাছে, চাইনিজ, বার্মিজ, বেংগলী, অল ভ্যারাইটিজ—

আমি চুপ করে আছি দেখে ইয়ং ম্যান আরো বলতে লাগলো—অন্য এজেণ্টরাও আপনার কাছে হয়ত আসবে, হয়ত অনেক রকম পিকচার দেখাবে, তবে কী জানেন, আমার কাছে আপনি কোনও ডিজঅনেস্টি পাবেন না—তা ছাড়া আমার স্টক-এর সঙ্গে অন্য এজেণ্টদের স্টক-এর তুলনা করলে আপনি নিজেই তফাৎটা ধরতে পারবেন—আপনি ফরেনার, আপনাকে ঠকিয়ে অন্তত ইণ্ডিয়ার বদনাম করবো না আমি—

তারপর ছবিগুলো নাড়তে নাড়তে আবার বলতে লাগলো—আপনি হয়ত আমার কথা শুনে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না, ভাবছেন আপনাকে বিদেশী পেয়ে হয়ত আমি এই রাত্তির বেলা ঠকিয়ে দেব, আসলে এ-লাইনে সবাই-ই ঠকায়, তবে আমি নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি এইটুকু যে, আমি ভদ্রলোকের ছেলে, আর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির একজন গ্র্যাজুয়েট—

বলে ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বার করলে। বার করে আমার হাতে এগিয়ে দিলে।

দেখলাম—কার্ডটায় লেখা রয়েছে— A. C. Chakraverty, Artist Supplier.

হনুমালী তখনও দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। সে এবার সাহস পেয়ে কাছে এগিয়ে এল।

বললে—হুজুর, এ-সাহেব বরাবর এই হোটেলের সাহেবদের সেবা করে আসছে, আজ পর্যন্ত ফ্রান্স ইংলণ্ড, আমেরিকা থেকে যত সাহেব এসেছে, সকলকে ইনিই আর্টিস্ট সাপ্লাই করেছে—

চক্রবর্তী বললে—এরা সব জানে স্যার, এদের সঙ্গে আমার বহুদিনের কারবার, আমার কাছে কোনও ক্রু পাবেন না—বিশ্বাস করে একবার আমাকে টেস্ট করে দেখুন, তারপর কার্ড তো আপনার কাছে, রইলই—

মনে মনে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম তখন। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট, ইয়ং ক্যালকাটার চেহারা ও এ-প্রফেসনে এলো কেন— কত দেশে ঘুরেছি, কায়রো, বেইরুট, তেহরান, সিঙ্গাপুর, ফার ইস্ট, মিডল ইস্টের সব শহর দেখেছি, বাদেও কলকাতার হোটেলে কাটিয়েছি। কিন্তু এমন ঘটনা তো কখনও ঘটেনি। এই হোটেলের ভেতরে।

আমি চুপ করে আছি দেখে চক্রবর্তী যেন উৎসাহ পেয়ে গেল হঠাৎ।

বললে—রেট সম্বন্ধে আপনি ভাববেন না, আমার ফিক্সড্ রেট বটে, কিন্তু কম্পারেটিভলি চীপ—ঘরের সঙ্গে, ঘণ্টা পিছু পঞ্চাশ টাকা, ফিফটি রুপীজ—

আমি হঠাৎ বললাম—হোটেলের ম্যানেজারের পারমিশন আছে?

আমার কথাটা শুনে ইয়ং ম্যান যেন চমকে উঠলো।

বললে—পারমিশন?

—হ্যাঁ, তুমি যে এই আর্টিস্টের ব্যবসা করছো, হোটেলের ভেতরে ঢুকেছ, ম্যানেজার জানে এটা? ম্যানেজারের অনুমতি আছে?

চক্রবর্তী কী বলবে বুঝতে পারলে না। এবার একবার হনুমালীর মুখের দিকে চাইলে।

বললে—স্যার, এর জন্যে আর পারমিশনের কী দরকার?

—পারমিশন আছে কি না তাই বলো?

আমার গলার আওয়াজে যেন পাজলড্ হয়ে গেল ছোকরা। একটু থতমত খেয়ে গেল। বুঝুন, কী তাজ্জব কাণ্ড আপনাদের হোটেলের ভেতর। টুরিস্টরা আসে ইণ্ডিয়া দেখতে, সবাই জানে তাদের হাতে অনেক টাকা থাকে। টুরিস্ট দেখলেই সবাই সব জিনিসের চড়া দর হাঁকে। সেটার তবু কারণ বুঝতে পারি। সব ইস্টার্ন দেশেই সেটা আছে। তাতে তেমন কিছু দোষ নেই। কিন্তু খাস ক্যালকাটার রেসপেকটেবল্ হোটেলের মধ্যে এ কী কাণ্ড বলুন তো। আবার বলছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট! আবার বলছে কলেজ-গার্ল, রেসপেকটেবল্ সোসাইটির গার্ল! আমার তখনই সন্দেহ হয়েছে! এ-ও নিশ্চয়ই ব্লাফ। আমাকে টুরিস্ট পেয়ে ব্লাফ দিচ্ছে! রাস্তায় ফুটপাথে এ-রকম ঘটনা ঘটে, তা স্বাভাবিক! কিন্তু একেবারে হোটেলের ভেতরে। তবে কি সেন্নার

আছে সকলের! ম্যানেজার, বয়, বাবুর্চি সবাই জড়িত!

আবার বললাম—পারমিশন আছে কি না, বলো শিগগির? কুইক্—

এবার যেন ছোকরা ভয় পেয়ে একটু পেছিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

হনুকুমালী এতক্ষণ কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে টপ্ করে কোন্ দিকে উধাও হয়ে গেল।

ছোকরাও পালিয়ে যায় দেখে আমি খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলেছি।

বললাম—চলো, ম্যানেজারের কাছে চলো, চলো শিগ্গির—

আমার মূর্তি দেখে ছোকরা ভয়ে শুকিয়ে গেল। মনে হলো যেন কেঁদে ফেলবে।

বললে—আমাকে ছাড়ুন স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন স্যার, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি স্যার—

—নো, নেভার!

বলে ছোকরার হাতটা আরো জোরে চেপে ধরলাম। আমার জোরের সঙ্গে পাবরে কেন? আমার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে ছটফট করতে লাগলো সে।

বললাম—তোমাকে আমি পুলিসে হ্যান্ড-ওভার করে দেব, চলো—

ছোকরা বলতে লাগলো—ছাড়ুন স্যার, প্লিজ, আমি আর কোনও দিন আপনার কাছে আসবো না—কথা দিচ্ছি স্যার—

সেই রাত্রের অন্ধকারের মধ্যেও যেন তার মুখটা করুণ হয়ে উঠলো বড়। বড় প্যাথেটিক সে-চেহারা। বড় অসহায়। বুঝলাম এ-ও এদের একরকম ছল্। আমার সামনে এমনি কথা দিয়ে পরের রাত্রে আবার কোনও টুরিস্টের ঘরে গিয়ে নক্ করবে। আবার তাকে জিজ্ঞেস করবে—ডু ইউ ওয়াণ্ট আর্টিস্ট স্যার? আবার পোর্টফোলিও থেকে ছবি বার করে স্যাম্পেল দেখাবে। এ-রকম ঘটনা আমাদের আমেরিকায় চলে। সেখানে এর চেয়েও বীভৎস কাণ্ড হয়। কিন্তু এখানে, এই ইণ্ডিয়ায়? এ যে আমাদের কাছে ল্যাণ্ড অব লর্ড চৈতন্য, ল্যাণ্ড অব গোটম বুড্ঢ, ল্যাণ্ড অব মহাত্মা গান্ধি!

জিজ্ঞেস করলাম—কী করে ঢুকলে তুমি এই হোটেলে? এত রাত্রে?

ছোকরা সবিনয়ে স্বীকার করলে। বললে—হনুকুমালীকে বখ্শিস্ দিয়ে—

—কত বখ্শিস্ দিয়েছ?

ছোকরা বললে—এক টাকা—

তারপর একটু থেমে বললে—আমায় আপনি ছেড়ে দিন প্লিজ, আমি কথা দিচ্ছি আর কখনও আসবো না—বিশ্বাস করুন, আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট, অভাবে পড়ে আমি এ-কাজ করেছি—আমার ছেলেমেয়েরা সব ক'দিন ধরে খেতে পাচ্ছে না, আমার ওয়াইফের টি বি—আমার......

বুঝলাম এ-সমস্ত ছল্। এ-সমস্ত বাঁধা বুলি। যখনই ধরা পড়ে যায়, তখনই এই সব বুলি আওড়ায়।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি যে গ্র্যাজুয়েট, তোমার সার্টিফিকেট আছে? তোমার ডিগ্রী আছে? আমাকে দেখাতে পারবে?

—হ্যাঁ স্যার, দেখাবো, আমি কালকে নিজে এসে আপনাকে দেখিয়ে যাবো!

ভাবলাম আমাকে বোকা পেয়েছে। কাল কি আর ছোকরার পাত্তা পাওয়া যাবে!

বললাম—কাল দেখালে চলবে না, আজই দেখাতে হবে!

—আজ?

বললাম—হ্যাঁ, আজই—

ছোকরা বললে—কিন্তু এখন যে অনেক রাত, এত রাত্রে আমি কী করে দেখাবো আপনাকে স্যার? আমার কাছে তো নেই, সে আমার বাড়িতে আছে—

বললাম—আমি তোমার বাড়িতেই যাবো—চলো—

আমার বাড়িতে যাবেন? এত রাত্তিরে?

বললাম—তুমি যে মিথ্যে কথা বলছো না তার প্রমাণ কী? আজ রাত্রেই তোমার বাড়িতে গিয়ে দেখে আসবো—চলো—

ছোকরা যেন কী ভাবলে খানিকক্ষণ। বললে—আপনি যাবেন?

বললাম—হ্যাঁ যাবো, ট্যাক্সি ভাড়া আমি দেব, তোমায় সেজন্যে ভাবতে হবে না। তোমার কথা যদি মিথ্যে হয় তো আমি তোমায় পুলিসে ধরিয়ে দেব—বি কেয়ারফুল।

ছোকরা বললে—কিন্তু আমি তো আপনাকে আমার কার্ড দেখালাম—

আমারও রাগ হয়ে যাচ্ছিল তখন। বললাম—কথা বলে সময় নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই—আইদার তুমি আমাকে তোমার কথার প্রমাণ দাও, নয়ত তোমাকে আমি পুলিসে হ্যাণ্ড-ওভার করে দেব—

—চলুন।

শেষে সত্যিই রাজি হয়ে গেল ছোকরা। বললে—আপনার কিন্তু অনেক রাত হয়ে যাবে, আমার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূর—

তা হোক, তবু আমার যেন কেমন জিদ চেপে গেল। মনে হলো যখন ইণ্ডিয়ায় এসেছি এখানকার আসল লাইফের সঙ্গে খাঁটি পরিচয় হয়ে যাক্। সমস্ত হোটেলের বোর্ডাররা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু নিচের লাউঞ্জ থেকে নাচের গানের শব্দ আসছে। ও-সব আমি অনেক দেখেছি। ইণ্ডিয়ায় এসে ওয়েস্টার্ন

নাচ-গানের ওপর কোনও আকর্ষণ আমার তখন নেই, আমি আমেরিকান। এসেছি ইণ্ডিয়ায়—ইণ্ডিয়া দেখবার জন্যে তখন ব্যস্ত। দেখবো লর্ড চৈতন্যের দেশকে, দেখবো লর্ড বুদ্ধের দেশকে। দেখবো ফ্রি ইণ্ডিয়াকে।

তখনও চক্রবর্তীর হাতটা ধরে আছি। হাতটা থর থর করে কাঁপছে তখনও। কী পাতলা হাত। মনে হলো একটা মোচড় দিয়ে যেন হাতটা ভেঙে ফেলা যায়। যেন ভাল পেট ভরে খেতেও পায় না। তবু মনে হলো যদি পালিয়ে যায়। যদি পুলিসের ভয়ে আমার হাত ছাড়িয়ে রাত্রির অন্ধকারে হারিয়ে যায়। তখন কি আর কোথাও খুঁজে পাবো আমি একে।

দরোয়ান ট্যাক্সি ডেকে দিলে।

ট্যাক্সিতে চড়ে চক্রবর্তীকে বললাম—কোন্ দিকে যেতে হবে ওকে বলে দাও—

চক্রবর্তীর মুখ দিয়ে যেন কোনও কথা বেরোচ্ছে না তখনও। ট্যাক্সিওয়ালা চক্রবর্তীর চেনা মনে হলো। সে জানে কোথায় যেতে হবে। বহুদিন বহু টুরিস্টকে নিয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন পাড়ায়। ভেবেছে আমিও তেমনি একজন টুরিস্ট। আমিও যথা-নির্দিষ্ট জায়গায় যাবো, তারপর যথা রীতি ঘণ্টা দু-এক সেখানে কাটিয়ে চলে আসবো। চক্রবর্তীকে তার কমিশন দেব। ট্যাক্সিওয়ালাকেও মোটা বখশিস্ দেব। যা সবাই দিয়ে থাকে। যা নিয়ম আর কি! তাই ট্যাক্সিওয়ালাও লম্বা স্যালিউট করেছিল আমাকে।

এ-সব আমার জানা ছিল। তাই চক্রবর্তীকে বললাম—তুমি ওকে ডেস্টিনেশন বলে দাও চক্রবর্তী—

চক্রবর্তী ড্রাইভারকে জায়গার নাম বলে দিলে। ট্যাক্সি হু হু করে চলতে লাগলো।

চক্রবর্তী হঠাৎ কথা বললে।

বললে—স্যার, আপনার কিন্তু কষ্ট হবে খুব—

বললাম—কেন, কষ্ট হবে কেন?

—সে অনেক দূর?

বললাম—কতদূর?

চক্রবর্তী বললে—সে টালিগঞ্জ বলে একটা জায়গা—

টালিগঞ্জ! আমার গাইড-বুকটা খুললাম। আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। নামটা কোথাও পেলাম না। তাতে বোটানিক্যাল গার্ডেন্‌স্, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, লেকস্, জু-গার্ডেন, গানটি-ঘাট, মিউজিয়াম—সব নাম আছে, কিন্তু টালিগঞ্জের নাম নেই।

বললাম—টালিগঞ্জ কি কলকাতার বাইরে?

চক্রবর্তী বললে—না স্যার, কলকাতার মধ্যে—

—কলকাতার মধ্যে তো গাইড-বুক-এ নাম নেই কেন?

চক্রবর্তী বললে—সেখানে যে টুরিস্টরা কেউ যায় না স্যার! টুরিস্টদের দেখবার মতন জায়গা নয় যে সেটা—

তা হবে! হয়ত সুবার্ব! শহরের ব্যাক-ওয়ার্ড এরিয়া। টুরিস্টদের সে-সব জায়গা না-দেখানোই ভাল।

খানিক পরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি এত প্রফেশন থাকতে এ প্রফেশন নিলে কেন?

চক্রবর্তী বললে—আমি চাকরি করতাম স্যার আগে, গভর্নমেন্ট অফিস চাকরি করতাম, দেড় শো টাকা মাইনে পেতাম—তারপর আমার চাকরি গেল—

—কেন?

চক্রবর্তী বললে—একবার অফিসে স্ট্রাইক হলো, আমিও ধর্মঘট করেছিলাম, আমার টেম্পোরারী চাকরি ছিল, আমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলে। বললে, আমি নাকি ডিসটারবিং এলিমেন্ট। বললে—আমি নাকি কমিউনিস্ট—

চক্রবর্তীর মুখের দিকে চাইলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কমিউনিস্ট নাকি?

—না স্যার, আমি কমিউনিস্ট নই স্যার, আমি শপথ করে বলছি আপনাকে, আমি কমিউনিস্ট নই। আপ্ অন্ গড্ বলছি। আমার ওপর রাগ ছিল আমার অফিসারের। আমি দেখতাম আমাদের অফিসাররা অফিসের স্টেশন-ওয়াগন্ নিয়ে পিক্‌নিক্ করতে যায়, অফিসের চাপরাশি-দের নিজের বাড়িতে নিয়ে বাটনা বাটায়, জল তোলায়, রান্না করায়—তবু আমি কোনও দিন কিছু বলিনি! আমি জানতাম আমাদের ক্লার্ক হতেই জন্ম হয়েছে, আর বড়লোকের ছেলেদের মিনিস্টারদের রিলেটিভদের অফিসার হবার জন্যে জন্ম! তা-ও আমি কিছু বলিনি। তবু আমি কিছু বলিনি। কারণ আমার তো টেম্পোরারী চাকরি, আমার বিধবা বুড়ী মা আছে সংসারে—আমার ওআইফ্ আছে, দুটো মাইনর ছেলেমেয়ে আছে—আমার ও-সব কথা বলা ক্রাইম—

—তবু তোমার চাকরি গেল?

—হ্যাঁ স্যার, বিশ্বাস করুন, আমি সাত বছর চাকরি করার পরও টেম্পোরারী ছিলাম, তখনও আমার কনফার্মেশন হয়নি, তাই আমার চাকরি গেল। চাকরিও গেল, আর পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছিলাম স্ট্রাইক-ফাণ্ডে, তা-ও গেল—

বুঝলাম সমস্তই ছলনা! সমস্তই মিথ্যে কথা! সাত বছর চাকরি করার পরও কেউ টেম্পোরারী থাকতে পারে? আর শুধু স্ট্রাইক করার অপরাধেও কারো চাকরি খতম হতে পারে না। পাঁচ টাকা স্ট্রাইক-ফণ্ডে চাঁদা দিলেও খতম্ হতে পারে না। তোমরা আমাদের আমেরিকাকে যত বড় ক্যাপিট্যালিস্টদের দেশই বলো, সেখানেও স্ট্রাইক করার জন্যে, ধর্মঘট করার জন্যে চাকরি যায় না। আমি মনে মনে বুঝলাম ছোকরা আমাকে ব্লাফ দিচ্ছে।

তবু মুখে কিছু বললাম না। জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

—তারপর স্যার অনেক দরখাস্ত করলাম অনেক জায়গায়। কোথাও চাকরি পেলাম না। আর কতদিন না-খেয়ে থাকবো! কতদিন ধার করে চালাবো! ধারও কেউ দেয় না আর। বন্ধু-বান্ধবদের তো সকলেরই প্রায় আমার মত অবস্থা! শেষে আমার ওআইফ-এর সিরীয়াস অসুখ হলো। একদিন উপায় না-দেখে ডাক্তার ডাকলাম। তখন রোগের খুব বাড়াবাড়ি। ডাক্তার দেখে বললে টি বি—

আবার ব্লাফ! বুঝলাম ছোকরা ফরেন টুরিস্ট পেয়ে আমার সহানুভূতি আদায় করবার চেষ্টা করছে! আমি এদের চিনি!

—তারপর?

—তারপর এই এজেন্সিটা পেলাম।

বললাম—এজেন্সি মানে?

চক্রবর্তী বললে—হাফ পার্সেণ্ট আমি পাই কি না। টোট্যাল ইনকামের ওপর আমি পাই হাফ পার্সেণ্ট, বাকিটা জমা দিতে হয় অফিসে গিয়ে—

—তোমার কি অফিস আছে?

—হ্যাঁ স্যার, আমি তো মাত্র কমিশন এজেণ্ট। মোটা প্রফিট্ তাদেরই—

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় তোমার অফিস? তারা কারা?

চক্রবর্তী হঠাৎ খুব বিনীত গলায় বললে—তাঁদের আমি নাম বলতে পারবো না স্যার—এক্সকিউজ্ মি—

—কেন?

—না স্যার, আমাকে মাফ করবেন, তাদের নাম-ঠিকানা আমি কিছুতেই বলতে পারবো না। আমাকে কেটে ফেললেও না। তাঁরা আমার বিপদের দিনে কাজ দিয়ে সাহায্য করেছেন, অনেক উপকার করেছেন, নইলে এতদিনে আমি পথে বসতাম, তাঁদের নাম আমাকে বলতে বলবেন না স্যার, আমার অধর্ম হবে তাহলে—তাছাড়া আপনি তো চলে যাবেন, তারপর আমাকে কে বাঁচাবে?

ট্যাক্সি চলছিল হু হু করে। কোথায় চলেছি, কোন্ দিকে চলেছি কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। আমার গাইড-বুকে এ-দিককার কোনও নির্দেশ নেই।

জিজ্ঞেস করলাম—আর কতদূর?

—আর বেশি দূর নয় স্যার, এসে গেছি—এবার বাঁয়ে চলো সর্দারজী।

তারপর একটু থেমে বললে—বাড়ি তো যাচ্ছি, কিন্তু গিয়ে যে কী দেখবো বুঝতে পারছি না স্যার—

—কেন?

চক্রবর্তী বললে—সেই সকাল সাতটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি স্যার, দেখেছিলাম আমার ওআইফের তখন খুব জ্বর, আজ মা বলেছিল ডাক্তার ডেকে আনতে, বেরোবার সময় বলেছিলাম ডাক্তার ডেকে আনবো—তা সকাল থেকে যেখানে গেছি, সেখানেই শুধু হাতে ফিরে এসেছি। ভোর বেলাই মিস্টার আগরওয়ালার কাছে গিয়েছিলাম। গিয়ে বললাম—খুব ভাল আর্টিস্ট আছে, একবার দেখুন শুধু—তা কিছুতেই শুনলেন না। তিনি বললেন, তাঁর অন্য এনগেজমেণ্ট আছে—

অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলো চক্রবর্তী। কালকাটার সব বড় বড় লোক, বড় বড় মিলওনারস্, বড় বড় মার্চেণ্টস। সকলে চক্রবর্তীর ক্লায়েণ্ট। সকলের কাছেই গিয়ে হাজির হলো। সেই একই কথা, এক প্রস্তাব। ভাগ্য যেদিন খারাপ হয়, সেদিন এই রকমই হয়। চক্রবর্তীর মনে হলো টাকার যেদিন তার সবচেয়ে বেশি দরকার সেইদিন ভাগ্য যেন তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে সবচেয়ে বেশি। শেষকালে সারা কালকাটা ঘুরেছে চক্রবর্তী, কোথাও কিছু কাজ মেলেনি। সব জায়গা থেকেই খালি-হাতে ফিরতে হয়েছে তাকে। ভোর বেলা বেরিয়েছে, তারপর সারা দিন আর খাওয়া হলো না। সারা দিনটাই উপোষ করে কেটে গেল চক্রবর্তীর।

চক্রবর্তী বললে—অথচ টাকা না হলে আমার চলবে না, শেষে হতাশ হয়ে যখন বাড়ি ফিরবো কি না ভাবছি, হঠাৎ মনে হলো আপনার হোটেলের ভেতরে গিয়ে একবার খবর নিয়ে দেখি কেউ নতুন টুরিস্ট আছে কি না। হুকুমালী বললে—আজ বিকেলেই একজন আমেরিকান টুরিস্ট এসেছে। তাকে একটা টাকার লোভ দেখিয়ে ফেলে আপনার...

বললাম—ডোণ্ট ট্রাই টু ব্লাফ মি, আমাকে ধাপ্পা দিতে চেষ্টা কোর না—আমি তোমাকে এখনও পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি, তোমার কান্না শুনে আমি ভুলবো না, আমি আমেরিকান—

চক্রবর্তী বললে কেঁদে—আপনাকে ভোলাতে চেষ্টা করছি না স্যার, কান্না শুনলে আজকাল ইণ্ডিয়ানরাও ভোলে না স্যার, বিশ্বাস করুন স্যার, আমি আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলবো না, জেলে যেতে আমার একটুও আপত্তি নেই, কিন্তু আমি জেলে গেলে যে মা, বউ, ছেলেমেয়ে সবাই মারা যাবে স্যার—বিলিভ মি, ভগবানের নামে শপথ করে বলছি—

বলতে বলতে চক্রবর্তী হঠাৎ ড্রাইভারকে বললে—থামো—

ট্যাক্সিটা থেমে গেল।

চক্রবর্তী বললে—নেমে আসুন স্যার,
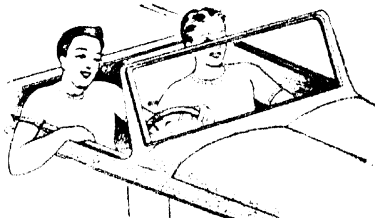
এখানটায় বড় কাদা, গাড়ি ভেতরে যাবে না, আর মিনিট পাঁচেক হাঁটতে হবে—

সে এক অদ্ভুত জায়গা। ক্যালকাটা সিটির মধ্যে যে অমন জায়গা আছে, তা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না, না দেখলে। চৌরঙ্গীর হোটেলের টেরাসে বসে সে-জায়গার স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব।

চক্রবর্তী বললে—আপনি এখানে একটু দাঁড়ান, আমি নিজে সার্টিফিকেটটা এনে দেখাচ্ছি—

কথাটা শুনে আমি চক্রবর্তীর কোটটা চেপে ধরলাম। আমার মনে হলো ছোকরা এবার সত্যিই পালিয়ে যাবার মতলব করছে। বললাম—নো নো আই ডোন্ট বিলিভ ইউ—আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না, আমি যাবো তোমার সঙ্গে—

—তাহলে আসুন—

বলে চক্রবর্তী আমার আগে আগে চলতে লাগলো। আর আমি তার পেছনে। অন্ধকার রাত। দু-একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো আমাদের দেখে। কয়েকটা গরু রাস্তার ওপর বসে বসে জাবর কাটছে। রিস্ট-ওয়াচটার দিকে চেয়ে মনে হলো রাত বোধহয় তখন দেড়টা—মিড-নাইট—

হঠাৎ চক্রবর্তী পেছন ফিরলে।

বললে—একটা কথা কিন্তু রাখতে হবে স্যার—

আবার চমক। আবার ধাক্কা! ভাবলাম এই মিডল-ক্লাস বেঙ্গলীকে আর তৈরি স্লাই—এদের মতো চালিয়াৎ জাত আর দুনিয়ায় দুটি নেই। কিন্তু আমিও অ্যাডামান্ট—আমিও নাছোড়বান্দা। ভাবলাম যা থাকে কপালে, আমি এর শেষ দেখবোই—

বললাম—কী কথা?

—দেখুন, বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মাকে বলেছিলুম যে, আমি অফিস থেকে আসবার সময় ডাক্তার নিয়ে আসবো। তা আমি আপনাকে দেখিয়ে বললো—এই ডাক্তার এনেছি—

বাঙালীদের ধাপ্পাবাজির কাছে হার মানবো না, এই প্রতিজ্ঞা করেই বললাম—ঠিক আছে, চলো—

—আর একটা কথা!

চক্রবর্তী আবার থমকে দাঁড়াল।

বললে আর একটা কথা, আপনি যেন বলে দেবেন না যে আমি এই আর্টিস্ট-সাপ্লাই-এর কমিশন-এজেন্সি করি।

—কেন? তারা জানে না?

—না স্যার, কেউ জানে না! আমার মা জানে না, ওআইফ জানে না, ছেলেমেয়েরা জানে না। এমন কি পাড়ার লোকরাও জানে না—তারা জানে আমি ইনসিওরেন্সের এজেন্সি করি—

বললাম—ঠিক আছে, তোমার কথাই রইল—

আমি তখন যে-কোনও অবস্থার জন্যেই তৈরি হয়ে রয়েছি। সুতরাং আমি আপত্তি করবো কেন?

চক্রবর্তী একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলো।

—মা, মা—ওমা—

ভেতর থেকে একটি ফিমেল-ভয়েস্ শোনা গেল।

—কে? খোকা? খোকা এলি?

আমি বাঙলা জানি না। তবু আন্দাজ করতে পারলাম।

দরজা খুলতেই দেখি একজন বুড়ী হাতে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই যেন বিব্রত হয়ে গেল। বুঝলাম—চক্রবর্তীর মাদার।

মা বললে—হ্যাঁ রে, এই এত রাত্তির করতে হয়? আমি এদিকে ভেবে-ভেবে অস্থির, বৌমা ছটফট করছে—এই এখন একটু ঘুমলো—

চক্রবর্তী বললে—আপিসের কাজে একটু দেরি হয়ে গেল মা—

বলে চক্রবর্তী ভেতরে ঢুকলো। আমার দিকে চেয়ে বললে—আসুন স্যার—

তারপর মা'র দিকে চেয়ে বললে—এই ডাক্তারবাবুকে একেবারে ডেকে নিয়ে এলাম মা—

চক্রবর্তীর মা আমার দিকে চেয়ে দেখলে একবার ভালো করে। তারপর বললে—হ্যাঁ রে খোকা, তুই সাহেব ডাক্তার আবার নিয়ে এলি কেন, আমাদের পাড়ার ফণি ডাক্তারকে ডাকলেই হতো—হোমিওপ্যাথিতেও তো রোগ ভাল হচ্ছে আজকাল—

—তা হোক মা,—

বলে আমাকে চক্রবর্তী ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। আমি ঘরের ভেতরের চেহারাটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ঘরের মেঝের ওপর ছোট ছোট দুটো বেবি শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে। খালি গা, কমপ্লিটলি নেকেড। বুকের পাঁজরাগুলো গোনা যায়। আর তক্ত-পোষের ওপর বিছানায় চক্রবর্তীর ওআইফ শুয়ে আছে। চোখ দুটো আধ-বোজা। বেশি বয়েস নয়—কিন্তু সমস্ত মুখখানা যেন রক্ত-হীন—ব্লাডলেস। কী প্যাথেটিক সিন। পৃথিবীতে এ-রকম দৃশ্য যে থাকতে পারে, তা আমেরিকানরা ভাবতেও পারে না—কল্পনা করতেও পারে না। একটা ঘরের মধ্যেই সমস্ত। সমস্ত সংসারটা যেন সেই একখানা ঘরের মধ্যেই শেষ। যেন বিশ্বাস, হাওয়া, প্রাণ, আনন্দ, যন্ত্রণা সব একটা ঘরের চারটে দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

চক্রবর্তী হঠাৎ বললে মা ট্রাঙ্কের চাবিটা দাও তো—

মা চাবিটা দিয়ে বললে—ট্রাঙ্কের চাবিটা আবার কী করবি এখন?

—একটা জিনিস বার করবো।

বিছানার এক কোণে ওপর-ওপর ট্রাঙ্ক সাজানো ছিল দুটো। চক্রবর্তী বিছানার ওপর উঠে চাবি দিয়ে ট্রাঙ্ক খুললে। তারপর ভেতর থেকে সব জিনিসপত্র বার করতে লাগলো একে একে। নানা বাজে জিনিসের স্তূপ। অনেক খুঁজে অনেক চেষ্টা করে বললে—এই যে পেয়েছি স্যার—পেয়েছি—

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বি-এ ডিগ্রী-খানা গোল করে একটা কাগজে সযত্নে মোড়া ছিল। সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিলে চক্রবর্তী।

আমি সেটা হাতে নিয়ে কিন্তু আর খুলে দেখলাম না। আর খুলে দেখতে প্রবৃত্তিও হলো না। আমি যেন তখন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছি। আমায় যেন কেউ আফিম খাইয়েছে। আমার যেন সেখান থেকে আর নড়বার ক্ষমতাও নেই। অস্থি-চর্মসার একটা শরীর। প্রাণ তাতে আছে কি নেই বোঝা যায় না। শরীরটা কুঁচকে বেঁকে শুয়ে আছে। মনে হলো ও যেন চক্রবর্তীর ওআইফ নয়। ও যেন একজন টি বি পেসেন্ট নয়। একটা উদ্ধত নোট-অব-ইনটারোগেশন! বিংশ-শতাব্দীর মডার্ন সভ্যতার সামনে যেন একটা সুতীক্ষ্ণ নোট-অব্-ইনটারোগেশন ছাড়া আর কিছু নয়।

চক্রবর্তী আমার কাছে সরে এল এবার।

বললে—ওটা খুলে দেখুন স্যার—দেখবেন জেনুইন ডিগ্রী—ভাইস-চ্যান্সেলারের সই আছে নিচেয়—

আমি তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম ঘরের মধ্যে।

চক্রবর্তী চুপি চুপি বললে—আপনি একটা কিছু কথা বলুন স্যার, নইলে আমার মা'র সন্দেহ হবে—

হঠাৎ একটা বেবি কেঁদে উঠলো। চক্রবর্তীর মা গিয়ে কোলে নিয়ে ভুলোতে আরম্ভ করেছে। তৎক্ষণে তার কান্না শুনে আর একটা কাঁদতে শুরু করলো। সেই কান্নায় যেন সমস্ত পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো সেই রাত দেড়টার সময়। ভুলে গেলাম আমি আমেরিকান। ভুলে গেলাম আমি টুরিস্ট, ভুলে গেলাম আমি ফরেনার। ভুলে গেলাম এ আমার প্রোগ্রামের বাইরে। ভুলে গেলাম আমার গাইড-বুকে এ-জায়গার নির্দেশ-সূত্র নেই। তবু সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম।

—স্যার!

চক্রবর্তীর গলার আওয়াজে আমি যেন আবার আমার সেন্স ফিরে পেলাম।

বললাম—এসো বাইরে এসো—

চক্রবর্তী বাইরে এল আমার পেছন-পেছন।

বললাম—তোমার ওআইফকে হসপিট্যালে পাঠাও না কেন? এ-রোগীকে কি বাড়িতে রাখতে আছে! এক ঘরে ছেলেমেয়ে-মা সবাই থাকো, এটাও তো ডেঞ্জারাস—

চক্রবর্তী বললে—হসপিট্যালে আমার কারো সঙ্গে জানা-শোনা নেই স্যার—কোনও

মিনিস্টার যদি একটু লিখে দেন, তাহলেই হয়ে যায়—কিংবা কোনও এম-এল-এ—

আমি আর কী বলবো। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম—প্রায় সাতশো টাকা রয়েছে। তাড়াতাড়ি টাকাগুলো চক্রবর্তীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম—এই টাকাগুলো নাও চক্রবর্তী, চক্রবর্তী, কিপ্ ইট্, তোমার ওআইফের চিকিৎসা কোর—

টাকাটা চক্রবর্তীর হাতে জোর করে গুঁজে দিলাম।

চক্রবর্তী কিছুতেই নেবে না। বললে—আমি এ নিতে পারবো না স্যার, এ আপনি কী করছেন—?

শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে তাকে টাকাটা দিয়ে আমি আবার ফিরে এলাম ট্যাক্সিটার কাছে। ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়েছিলাম।

চক্রবর্তী আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। আমি বললাম—আচ্ছা, তোমার ওআইফ ছেলেমেয়েদের খেতে দাও না কেন?

চক্রবর্তী হাসলো এতক্ষণে। বললে—ফ্রান্সের রানীও একবার ওই কথা বলেছিল স্যার, বইতে পড়েছি—

আমি বললাম—না, আমি সে-কথা বলছি না—আমেরিকা থেকে আমরা লক্ষ লক্ষ টন গম, চাল, পাউডার-মিল্ক পাঠাই ইণ্ডিয়াতে—সে-সব তো তোমাদের জন্যেই পাঠাই, তা খাও না কেন?

চক্রবর্তী একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে—খবরের কাগজে পড়েছি আপনারা পাঠান—

বুঝলাম ঠিক জায়গায় পৌঁছায় না সেগুলো।

বললাম—ঠিক আছে, কাল ছ'টার সময় আমি চলে যাচ্ছি ক্যালকাটা ছেড়ে, তুমি তিনটের সময় আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারো? পজিটিভলি ঠিক তিনটের সময়? ইউ মাস্ট!

চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করলে—কেন, কী জন্যে বলছেন?

—আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে চাই, আরো কিছু টাকা। যা ছিল কাছে তা তোমাকে দিয়ে গেলাম, কালকে হোটেলে তোমাকে আরো তিন শো দিতে পারি! আই ওয়াণ্ট টু হেল্প ইউ—

চক্রবর্তী কিন্তু-কিন্তু করছিল, কিন্তু আমি তাকে রাজি করালাম জোর করে।

ট্যাক্সির ভেতরে আর একবার মনে করিয়ে দিলাম—ঠিক তিনটের সময় এসো কিন্তু, আমি ওয়েট করবো তোমার জন্যে—ঠিক তিনটে—

ঘড়িতে দেখলাম—রাত তখন হাফ-পাস্ট্ টু। আড়াইটে কাঁটায়-কাঁটায়।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙতে দেরি হলো। সকালে আর কোথাও বেরোলুম না। হুকুম-আলি সামনে আসতে একটু সংকোচ করছিল। কিন্তু খানিক পরে সে-সংকোচ কেটে গেল। যে-সব জায়গা দেখবো বলে ঠিক করেছিলাম সে-সব কিছুই দেখা হলো না। হুগলী-রিভার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বোটানিক্যাল গার্ডেন্‌স, লেইকস্, রেস কোর্স গার্ডেন-ঘাট—কিছুই গেলাম না। রাতে যে-বিউটিফুল ক্যালকাটা দেখেছি, তার কাছে আর সব যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। শুধু টেরাসের ওপর দাঁড়িয়ে গভর্নর্‌স্ হাউসটা দেখতে লাগলাম একদৃষ্টে। আর সামনে ময়দান। ফোর্ট উইলিয়ম, পলাশী গেট—

যথারীতি ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ খেয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম ঘরের মধ্যে। আমার গাইড এসে ফিরে গেল।

বললাম—আমি নিজেই সাইট্-সীয়িং করে এসেছি—

হুকুমালিও দু-একবার উঁকি মেরে দেখে গেল।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম—তিনটে বাজে। চক্রবর্তী আসবে। বাকি তিনশো টাকা রেডি করে রেখে দিয়েছি পকেটে।

আর যেন দেরি সয় না। ঘড়ির দিকে আবার চেয়ে দেখলাম তিনটে বেজে গেছে। তিনটে পনেরো। তিনটে কুড়ি। থ্রি-থার্টি!

আমি উঠলাম। আর দেরি করা যায় না। এবার এয়ারপোর্টের বাস আসবে। প্লেন ছাড়বে ছ'টায়। তার আগেই তৈরি হয়ে নিতে হবে।

হঠাৎ হুকুমালি এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম—কে চিঠি দিলে?

হুকুমালি বললে একজন বাবু এসে নিচে ম্যানেজারের কাছে চিঠিটা দিয়ে গেছে। চিঠিটা সিল করা। খাম ছিঁড়তেই অবাক হয়ে গেলাম। ভেতরে আমার দেওয়া সেই সাতশো টাকা। সাতটা একশ' টাকার নোট। আর সঙ্গে একটা চিঠি। লিখেছে এ সি চক্রবর্তী—আর্টিস্ট সাপ্লায়ার।

লিখেছে—

ডিয়ার স্যর,

কালকে আপনার দেওয়া সাতশো টাকা ফেরৎ পাঠালাম পত্রবাহক মারফৎ। আজকে তিনটের সময় আপনার সঙ্গে দেখা করবার প্রতিশ্রুতিও রাখতে পারলাম না। কারণ কাল শেষ রাত্রের দিকে আমার স্ত্রী মারা গেছে। আপনাকে ধন্যবাদ। ইতি—

এই। এইটুকু শুধু। আর কিছু নয়।

আমি চিঠিখানা আর টাকাগুলো হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছু ভাবতে পারলাম না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আমার যেন জ্ঞান ফিরে এল। হঠাৎ খেয়াল হলো সাড়ে চারটে বেজেছে। হোটেলের সামনে এয়ারপোর্টের বাস এসে পৌঁছেছে। হুকুমালি আমার সুটকেস নিয়ে নেমে চলে গেল।

বললাম—তারপর?

মিস্টার রিচার্ড বললেন—তারপর তো এই যাচ্ছি—।

তারপর হঠাৎ যেন বড় এক্সাইটেড হয়ে উঠলেন মিস্টার রিচার্ড।

বললেন—কিন্তু আমি আজ আপনাকে বলে যাচ্ছি—দিস্ ইজ্ রং, দিস্ ইজ্ ক্রিমিন্যাল—এ অন্যায়, এ সত্যি পাপ—এ অ্যামিটির কোনও দাম নেই মডার্ন পৃথিবীতে—দিস ইজ রং—দিস্ ইজ্ ক্রিমিন্যালি রং—

মিস্টার রিচার্ডের চিৎকারে আশেপাশের অন্য সীট থেকে সবাই আমাদের দিকে চেয়ে দেখলে। কিন্তু আমি চুপ করে রইলাম। যোল হাজার ফুট ওপরে উঠে মাটির পৃথিবীর মানুষের সমস্যা নিয়ে ভাবাও যেন বিলাসিতা বলে মনে হলো আমার কাছে। এই দামী ডিনার আর লেমন-স্কোয়াশ খেতে খেতে দেশের কথা নিয়ে তর্ক করাও যেন অপরাধ। চোখের জল ফেলাও ক্রাইম! আমি চুপ করে রইলাম তাই।

অনেকক্ষণ পরে মিস্টার রিচার্ড আবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা একটা কথার জবাব দিন তো?

—কী?

—আমরা যে লক্ষ লক্ষ টন হুইট, রাইস আর পাউডার-মিল্ক পাঠাই ইণ্ডিয়ার গরীব লোকদের জন্যে, সেগুলো কারা নেয়? সেগুলো গরীবদের হাতে পৌঁছয় না কেন? কে তারা? হু আর দে?

এরই বা আমি কী জবাব দেব! প্লেনের ভেতরে আমরা সবাই তো দামী দামী কোট-স্যুট-টাই-ট্রাউজার পরে বসে আছি। সবাই মোটা দাম দিয়ে টিকিট কিনেছি। কিনে লেমন-স্কোয়াশ খেয়েছি, টফি খেয়েছি, ডিনার খেয়েছি। ডিনারের পর কফিও খেয়েছি। আমাদের কী অধিকার আছে এ-আলোচনা করবার। ভাবলাম বলি—সাহেব, তুমি ক'দিনের জন্যে কলকাতা দেখে গিয়েই তোমার এই অবস্থা, আর আমরা জন্ম কাটিয়েছি কলকাতায়, মনুষ্যত্বের এ-অপমান আমরা প্রতি মুহূর্তে দেখছি। তাই আমাদের চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে, আমাদের গায়ের চামড়া মোটা হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ও-সব কথা থাক, এসো, অন্য কথা বলি—লেট্ আস্ টক্ শপ্—

কিন্তু সে-সব কথাও বললাম না।

সামনে আলো জ্বলে উঠলো—আলোর মধ্যে লেখা ফুটে উঠলো—ফ্যাসেন ইয়োর বেল্টস্—

আমরা যে-যার নিজের নিজের পেটে বেল্ট্ বেঁধে নিলাম।

বাইরে চেয়ে দেখলাম—বম্বে সিটির আলোগুলো হীরের টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। প্লেন নামতে শুরু করেছে। স্যান্টাক্রুজে পৌঁছে গেলাম এক-মুহূর্তের মধ্যে।

অমনোনীতা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সুখেন্দু বললে, যা খাওয়ালেন বৌদি—ও: লোকেনের বিয়েতে আসতে পারিনি, তার পাঁচগুণ ক্ষতিপূরণ করে দিলেন। এখন মোর নড়াতে পর্যন্ত ইচ্ছে করছে না।

লোকেনের স্ত্রী মণিকা খুশী হয়ে হেসে বললে, বেশ তো, আজকের রাতটা থেকে যান না এখানেই। কাল সকালে চা খেয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন।

—সর্বনাশ! —মুঠোর ভেতর দুটো পান তুলে নিয়ে সুখেন্দু বললে, তা হলে সারা রাত মা-র আর ঘুম হবে না। বুড়ো বাপটাকে লালবাজার আর হাসপাতাল দৌড়োদৌড়ি করিয়ে ছাড়বে। বোন দুটোর বিয়ে হয়ে গিয়ে এই মুশকিল হয়েছে আমার। তিনজনের স্নেহটা একাই সইতে হচ্ছে আমাকে।

লোকেন বললে, ভালোই তো হয়েছে তোর।

—হুঁ। কিন্তু ভালোটা বেশি হলে আবার অত্যাচারে দাঁড়িয়ে যায়। —পান দুটোকে মুখে পুরে দিয়ে জিভের ডগায় খানিকটা চুন ছুঁইয়ে সুখেন্দু বললে, অশেষ ধন্যবাদ বৌদি, আজ আসি তা হলে।

—চল, এগিয়ে দিই তোকে—পায়ে একটা চটি গলিয়ে লোকেন সুখেন্দুর সঙ্গ নিলে।

রাত দশটার কাছাকাছি। পথটা প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। লেকের দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক আসছে—নারকেল গাছ-গুলোতে খুশীর মর্মর। চলতে চলতে নিজেকে ভালো লাগল লোকেনের, ভালো লাগল সুখেন্দুকে।

—এবার বল, কেমন দেখলে আমার বৌকে —পরিতৃপ্ত মৃদু গলায় লোকেন জানতে চাইল।

—চমৎকার। —সুখেন্দু হাসল: কন্‌-গ্রাচুলেশন্‌স্‌। কিন্তু আমি একটা মজার কথা ভাবছিলুম।

—মজার কথা?

—ঠিক তাই। —একটু নিচু হয়ে মুখ থেকে খানিকটা পানের পিক ফেলে দিয়ে সুখেন্দু বললে, বিয়ের আগে তোর স্ত্রী ছিলেন মণিকা মল্লিক, তাই নয়?

লোকেনের ভুরু দুটো কোঁচকালো একবার। মনের নিরঙ্কুশ খুশীটা কোথাও খোঁচা খেলো একটুখানি।

—হুঁ। কী হয়েছে তাতে?

—বলছি। ওঁর বাবা রিজেণ্ট পার্কে বাড়ি করেছেন কয়েক বছর হল, এক দাদা পশ্চিমে প্রফেসারী করেন।

—অনেক খবরই তো জানিস দেখছি। —সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে লোকেনের ভুরু দুটো আরো কাছাকাছি এগিয়ে এল: তুই চিনিস নাকি ওঁদের? কিন্তু কই, সে রকম তো মনে হল না দেখে।

—না-না, আমি চিনব কোত্থেকে? দুলালের কাছে শুনেছি সব। ওঁর ফটোও সে আমায় দেখিয়েছিল।

ফোটো দেখিয়েছিল—দুলাল! —সঙ্গে সঙ্গে লোকেনের চোখের সামনে এই রাত, এই হাওয়া, এতক্ষণের খুশী যেন একটা কবন্ধ অন্ধকারে পরিণত হল: আমাদের দুলাল চৌধুরী? যে তিনমাস হল মোটর অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছে?

—সে-ই বটে।

লোকেন দাঁড়িয়ে পড়ল। লোহার মতো একটা শক্ত মুঠোয় এমনভাবে সুখেনের বাঁ হাতটা চেপে ধরল যে ঘড়িটা মটমট করে উঠল। সেই কবন্ধ অন্ধকারের ভেতর থেকে চাপা মেঘের ডাকের মতো বেরিয়ে এল লোকেনের স্বর: কী বলতে চাস সুখেন্দু—কী বলতে চাইছিস তুই?

একবারের জন্যে থমকে গেল সুখেন্দু, তারপর হেসে উঠল হা-হা করে। গলা ছেড়ে দিয়ে।

—পাগল হলি নাকি লোকেন? আরে না—না। তুই যা ভাবছিস সে-সব কিছুই নয়। তা যদি হত তা হলে কি আমি এ-সমস্ত কথা বলতে যেতুম তোকে? বিয়ের এক মাস না হতেই তোর ঘর ভাঙতে চাইব—আমাকে কি এইরকম একটা স্কাউণ্ড্রেল্‌ মনে করলি তুই?

অপ্রতিভ হয়ে সুখেন্দুর হাত ছেড়ে দিলে লোকেন।

—না, মানে—ইয়ে, দুলাল মণিকার ফোটো পেলে কী করে? আত্মীয়তা ছিল? কিন্তু আত্মীয় হলেও একটা ফোটো নিয়ে—

—তুই একটা রাবিশ! —সুখেন্দু ধমকে উঠল: কিছু বলতে দিচ্ছিস না—নিজেই স্পেকুলেশন করছিস। আরে, দুলালের সঙ্গে মণিকা দেবীর বিয়ের একটা প্রস্তাব এসেছিল। স্রেফ অভিভাবকদের পক্ষ থেকে —তাতে ওদের দুজনের কোনো ভূমিকা ছিল না—চিনতও না কেউ কাউকে। সেই সময়েই দুলাল ছবিটা দেখিয়েছিল আমাকে।

—বিয়ে হল না কেন? —লোকেন স্বস্তির শ্বাস ফেলল: দরে বনল না বোধ হয়?

—উঁহু, তা নয়। দরে মিলেছিল, ঠিকুজী কুষ্ঠীর অমিল হয় নি, দু পক্ষেরই আগ্রহ ছিল প্রচুর। কিন্তু দুলালই বেঁকে বসল। বললে,—না কিছুতেই নয়।

—কেন? —লোকেনের চোখদুটো জ্বলে উঠল এবার: কেন আপত্তি করল দুলাল?

সুখেন্দু হাসল: কেন আর? তুই ওকে বিয়ে করবি বলে।

—ঠাট্টা নয়, আই অ্যাম সীরিয়াস। —সুখেন্দুর কাঁধে হাত রেখে, সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে, লোকেন জানতে চাইল: মণিকার মতো মেয়েকে দুলাল কেন অপছন্দ করল? আর কাউকে ভালোবাসত?

—ভালোবাসলে তো বলতই সে কথা। মেয়ে দেখতেও নিশ্চয়ই যেত না।

—তা হলে? —লোকেনের মুখের ভেতর দাঁতগুলো হঠাৎ কট্ কট্ করে উঠল: নিজে কী এমন আউটস্ট্যান্ডিং ছেলে যে—যার জন্যে মণিকাকেও তার মনে ধরল না? হোয়াই?

সুখেন্দু বিরক্ত বোধ করল। মনে হল, কথাটা তুলেই সে বোকামি করেছে। দেঁতো হেসে বললে, আচ্ছা জ্বালা তো! হোয়াই—সে আমি কেমন করে জানব! হয়তো কোনো মিস্ ইউনিভার্সকে বিয়ে করবার তাল ছিল তার, হয়তো সন্ন্যাসী হওয়ার পরিকল্পনা ভাঁজছিল মনে মনে। কিন্তু আজ আর তার কাছ থেকে কোনো কথা জানবার উপায় নেই—হি ইজ্ ডেড্ অ্যান্ড গন! আমি ভাবছিলুম ইডিয়টটার দুর্ভাগ্য—এমন চমৎকার মেয়েকে হেলায় হারালো! আবার মণিকা দেবীর ভাগ্যটাও দ্যাখ—বিয়েটা তখন হয়ে গেলে ইন্ দি কোর্স অফ্ এ মান্থ্ ভদ্রমহিলা বিধবা হতেন। এই সবের জন্যেই অদৃষ্ট মানতে হয়—বুঝলি!

লোকেনের উত্তেজিত শিরাগুলো শিথিল হয়ে আসছিল আস্তে আস্তে। লেকের দিক থেকে দক্ষিণের হাওয়া। নিয়নের আলোর সঙ্গে জ্যোৎস্নার রঙ মিশেছে। কখন কয়েক ফোঁটা ঘাম জমে উঠেছিল কপালে, বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে মুছে ফেলল লোকেন।

—যা বলেছিস, অদৃষ্টই বটে

—দেরির আর মোর থিংস—লোকেনের কিছু বলতে বলতে হাত তুলে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামালো সুখেন্দু। চট্ করে উঠে পড়ে বললে, চলি ভাই—অনেক রাত হয়ে গেল। মা হয়তো জানলা ধরে দাঁড়িয়ে আছে—হয়তো এতক্ষণ বাবাকে রওনা করে দিয়েছে হাসপাতালের দিকে। আচ্ছা—গুড্ নাইট! কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্ এগেন!

ট্যাক্সিটা এগিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল একটা বাঁক ঘুরে।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল লোকেন। দক্ষিণের হাওয়া তার মাথার চুলগুলোকে নিয়ে খেলা করতে লাগল। কী বিশ্রীভাবে সাসপেন্স তৈরি করছিল সুখেন্দু, সমানে পীড়ন করছিল নার্ভগুলোকে। শেষপর্যন্ত ফিউ-সীবিক। বিয়ের কথা উঠেছিল—দুলাল রাজী হয়নি, ব্যাস! কেন হয়নি সে-কথা দুলাল ছাড়া পৃথিবীর আর কেউই জানে না। বাট হি ইজ ডেড্ অ্যান্ড গন!

চুলোয় যাক দুলাল—গর্দভ! মণিকা সুন্দরী, মণিকা গ্রাজুয়েট, মণিকা ভালো গান গাইতে পারে, কথায়, ব্যবহারে চমৎকার একটি মেয়ে। বাড়ির সবাই খুশী হয়েছে—বন্ধুরা অভিনন্দন জানিয়েছে। আর দুলাল কিনা—

কী এমন অদ্বিতীয় পুরুষ ছিল দুলাল? একসঙ্গেই তো পড়ত আশুতোষ কলেজে। সাধারণভাবে পাস কোর্সে বি-এ পাশ করেছিল, মামার সুপারিশে শ-তিনেক টাকার একটা চাকরির জোগাড় করেছিল এল-আই-সিতে। গুণের মধ্যে বেশ লম্বা চওড়া ছিল চেহারা, আর ভালো ভলিবল খেলতে পারত। তাতেই নিজেকে সে এমন কি সুপারম্যান বলে ঠাওরালো যে মণিকার মতো মেয়েও তার চোখে ধরল না?

—ট্র্যাশ!

জাহান্নমে যাক দুলাল—অবশ্য তার বলবার আগেই গেছে। নিজের সৌভাগ্যে লোকেন মনে মনে একটা বেলুনের মতো ফুলে উঠতে চাইল। দুলাল মরে গেল বলেই তো তার ভাগ্যে মণিকা [illegible] সামনে একখানা [illegible] দেখলেই সবাই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। ঠিকই বলেছে সুখেন্দু—অদৃষ্টই মানা উচিত। হঠাৎ কিছুতেই মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল দুলাল। [illegible] বিয়েটা [illegible]—

[illegible] কী সর্বনাশ—[illegible] ব্যাপারটা! মণিকা [illegible] নির্বাসিত [illegible] হত, একাদশী করতে হত। রুক্ষ বিষণ্ণ চেহারা—দু চোখ [illegible] হয়েছে সব সময়—

অসম্ভব!

লোকেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। মণিকার [illegible] যেন [illegible] মূর্তিটাকে সামনে দেখতে পাচ্ছে, এমনিভাবে দুহাতে চোখ চেপে ধরল।

বিশ্রী! একেবারেই বিশ্রী!

কিন্তু কী যে অস্বস্তি—রাতে লোকেনের ভালো করে ঘুম হল না। বিছানায় নরম পরিচ্ছন্ন বিছানাটিতে ছারপোকা থাকবার কথা নয়—তবু সারা গায়ে লাগল কী যেন তাকে কামড়াচ্ছে। মাথার বালিশ গরম হয়ে উঠে কানের কাছে জ্বালা করতে লাগল—বার কয়েক উল্টে নিতে হল বালিশটাকে। গরম বেশি ছিল না, খোলা জানলা দিয়ে দক্ষিণ-বাতাসের উদ্দাম স্রোত আসছিল—তবু বিছানা ছেড়ে উঠে পাখার রেগুলেটার তিনের ঘর পর্যন্ত ঠেলে দিলে লোকেন।

রাত প্রায় দুটো পর্যন্ত ঘুমোবার নিরর্থক চেষ্টা করে বিছানা ছাড়ল শেষ পর্যন্ত। জল খেলো এক গ্লাস, ইজি চেয়ারটাকে টেনে নিলে জানলার ধারে, তারপর একটা সিগারেট ধরালো। চোখের পাতা খচ্ খচ্ করছে—যেন কতগুলো বালির কণা জমে রয়েছে তাদের নিচে। জিভটা বিস্বাদ। সিগারেট ভালো লাগছিল না—তবু খানিকটা কটু ধোঁয়া গিলে চলল বিকৃত মুখে।

বিয়ে হয়েছে দু-মাসের কিছু বেশি হল। কিন্তু মণিকা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত অভিযোগের একটি কারণ খুঁজে পায়নি লোকেন—একটিও নয়। কেবল রূপসী বিদুষী বলে নয়—স্নেহে, সেবায়, ভালোবাসায় একেবারে ভরে দিয়েছে লোকেনকে। এর বেশি মানুষ আর কী চায়—কীই বা চাইতে পারে!

নীল নাইট-ল্যাম্পটা জ্বলছে। একাদশীর জ্যোৎস্নার মতো কোমল স্নিগ্ধতা। ঘরময় ড্রেসিং টেবিল, বোতলে কাপড়ের আলমারি [illegible] সব যেন ঘুমের মধ্যে আবছা। পাখার হাওয়ায় থেকে থেকে ক্যালেন্ডারের পাতাটা [illegible] উঠছে—হঠাৎ মনে হয় কেউ ঘুমের ভেতর ফিসফিস করে উঠছে। ঘুম-ঘুম-ঘুম। কিন্তু লোকেন ঘুমোতে পারছে না।

[illegible] মানুষের মন ছুঁয়ে ছিল।

আচ্ছা—দুলাল কেন পছন্দ করল না এই মেয়েকে?

একেবারে পরমা সুন্দরী হয়তো নয়; কিন্তু সাধারণ বাঙালীর সংসারে হাজারেও এমন একটি মেয়ে পাওয়া যায় না। [illegible] সঙ্গে নিয়েছে [illegible]—কিন্তু সে ব্যাপারে উচ্ছ্বাস নেই, [illegible]। মিষ্টি গলার গলা—সুন্দর হাতের রান্না—এই তো সন্ধ্যেবেলা সে রান্নার কত তারিফ করে গেল সুখেন্দু। একটা অপরূপ মাধুর্য দিয়ে এই দুটি মাস সে লোকেনকে একেবারে মগ্ন করে রেখেছে।

তা হলে দুলাল—

দুলাল একটা ইডিয়ট্। মণিকার মতো মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল—এই তার চোদ্দপুরুষের ভাগ্য। কী এমন অসাধারণ পুরুষ ছিল সে? টেনে বুনে পাস-কোর্সে পাশ—এক-আধটু টুকলি না করেছিল তা-ও জোর করে বলা যায় না। গুণের মধ্যে চেহারাটা ছিল বেশ লম্বা-চওড়া—আর হ্যাঁ, ভলিবল সে ভালোই খেলত। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কোনো সূক্ষ্ম রিউমার সহজে তার মাথায় ঢুকত না—সবাইকার হাসি থামবার পর হঠাৎ চমকে দিয়ে হেসে উঠত বেয়াড়া মোটা গলায়। একটুতেই তাকে চটিয়ে দেওয়া যেত আর চটলেই তোতলামি বেরুতে শুরু করত তার মুখ দিয়ে। রেস্তোরাঁয় ঢুকলে গোটা

চারেক কাটলেটের কমে তার পেট ভরত না। স্থূলে, নীরেট, পেটুকদাস।

হাতের সিগারেট নিবে গিয়েছিল, জানলা দিয়ে বাইরে সেটাকে ছুড়ে দিলে লোকেন। চোখের পাতা জ্বালা করছে—কয়েকটা ধুলোর কণা যেন বিঁধে আছে মনে হয়। শুকনো ঠোঁটে সিগারেটটা আঠার মতো আটকে গিয়েছিল, টেনে খুলতে গিয়ে পাতলা চামড়া বোধ হয় ছিঁড়ে গেছে একটু-খানি—চিনচিনে যন্ত্রণার সঙ্গে রক্তের নোনা আস্বাদ টের পেলো লোকেন। দুলালের ওপর একটা নিরর্থক অন্ধ ক্রোধ তার মনের মধ্যে জমে উঠতে লাগল।

গোটা চারেক কাটলেট একসঙ্গে খেত দুলাল এবং কী কদর্যভাবেই খেত। সবটাই যেন ছিল আদিম। কলেজ জীবনে সেটা ভালো করে লক্ষ্য করেনি, কিন্তু এই বিনিদ্র বিস্বাদ রাত্রে সমস্তটাই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল—যেন অতিরিক্ত স্পষ্ট আর অর্থবহ হয়ে দেখা দিল লোকেনের কাছে। মাড়ির দুপাশে দুটো ক্যানাইন টিথের মতো দাঁত—তাই দিয়ে টেনে টেনে মাংস ছিঁড়ত কুকুরের মতো—যখন হাড় চিবুত তখন কড়কড় করে আওয়াজ উঠত, একটা তীব্র আনন্দে ঘোলা-ঘোলা হয়ে যেত গোলগোল চোখ। সিগারেট ধরত [illegible]—টান লাগাতো গাঁজার কলকের মতো। প্রায়ই একটা রং-জ্বলা নীলচে কোট পরে আসত—নৌকোর মতো একজোড়া বেটপ্ শু পরে করিডোর কাঁপিয়ে চলাফেরা করত।

সেই দুলাল চৌধুরী। তার সঙ্গে মণিকার বিয়ে! বিউটি অ্যান্ড দি বীস্ট আর কাকে বলে!

আর কী স্পর্ধা—সেই দুলাল মণিকাকে পছন্দ করল না!

না—এতদিন লোকেনের কোনো রাগ ছিল না দুলালের ওপর। আরো দশজন সাধারণ সহপাঠীর মতোই একটা আলগা বন্ধুত্ব—একটু ইয়ার্কি, সামান্য সহানুভূতির সম্পর্ক। কিন্তু আজ রাতে—অনিদ্রার জ্বালাধরা চোখে, মাথার ভেতরে ক্রমশ জমাট-হয়ে-ওঠা একরাশ পাষাণভার অনুভব করতে করতে, আর চামড়া ছিঁড়ে যাওয়া ঠোঁটের এক-একটা যন্ত্রণার ঝিলিকে তার দুলালকে যেমন বীভৎস, তেমনি বর্বর মনে হতে লাগল। কোনো অসম্ভব উপায়ে দুলাল এই মুহূর্তে সামনে এসে দাঁড়ালে লোকেন তার কোটের কলার চেপে ধরত, জিজ্ঞাসা করত—

কিন্তু কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার উপায় রাখেনি দুলাল। গ্রান্ড-ট্রাংক রোডে বোঝাই পাটের লরীর সঙ্গে গাড়িটার ধাক্কা লেগেছিল। লোকেন শুনেছিল, স্টিয়ারিঙের চাপে বুকের পাঁজর ভেঙে বিঁধে গিয়েছিল হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। একটা হাত প্রায় খসে গিয়েছিল কাঁধ থেকে, টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল পায়ের হাড়। ইট্ ওয়াজ এ হরিবল্ মেস!

যেমন ইডিয়ট ছিল—তেমনি ইডিয়টের মতো মরেছে—পরিতৃপ্তভাবে এই কথাটা ভাবতে গিয়ে লোকেন লজ্জা পেলো। না—এমন করে ভাবাটা ঠিক হচ্ছে না, দুলালের জন্যে তার সহানুভূতি বোধ করা উচিত। মাত্র চব্বিশ বছর বয়েসে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে সে মারা গেল—তার মা-বাপ ভাই-বোন কত আশা করে ছিল তার ওপর। দুলাল বেঁচে থাকলে তাদের লাভ ছিল, কিন্তু লোকেনের কোনো ক্ষতি ছিল না। কেবল যদি মণিকার ব্যাপারটা—

রাবিশ!

আবার বড় করে একটা হাই তুলল লোকেন—একাদশীর নরম জ্যোৎস্নার মতো নীলিম আলোয় দেখতে পেলো, ঘড়ির কাঁটা পৌনে তিনটের কাছাকাছি! উঃ—এইসব আবোল তাবোল ভেবে সারাটা রাত সে জেগেই কাটিয়ে দিলে নাকি! কপাল দপদপ করছে, ঘাড়ের ওপর একটা প্রচণ্ড ভারের চাপে মাথাটা ঝুলে পড়তে চাইছে, চোখের পাতায় এবার বালির কণা নয়—কাঁটা বিঁধছে খচখচ করে। একি পাগলামি করছে লোকেন—কোনো মানে হয় এর?

টলতে টলতে এগিয়ে গেল বিছানায়—

শরীরটাকে ছেড়ে দিলে। মণিকা ঘুমের ঘোরে কাছে সরে এল, লোকেনের আকর্ষণে তার বুকের মধ্যে এসে নরম ছোট একটা পাখির মতো জড়িয়ে গেল। মণিকার চুলের মৃদু গন্ধের নেশায় কখন লোকেনের চেতনা আচ্ছন্ন হল, দুলালের দুঃস্বপ্নটা একাদশীর জ্যোৎস্নার মতো কোমল আলোটির ভেতরে গলে গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে।

—কত ঘুমোবে আর? সাড়ে আটটা বাজল যে।

লোকেন চোখ মেলল। মাথার ওপর মনিকার আঙুলের স্নিগ্ধ ছোঁয়া।

—সাড়ে আটটা? —লোকেন হাই তুলল: কাল রাত্রে ইনসমনিয়া হয়ে—

—হবেই তো ইনসমনিয়া। কাল যখন বসে বসে সুখেন্দুবাবুর সঙ্গে অত সিগারেট খেয়েছ, তখনই বুঝেছি। কেন অনর্থক অমন করে একরাশ ধোঁয়া গেলো বলো দেখি?

সুখেন্দু। মাথার ভেতরে ছুঁচ বিঁধল যেন। আবার সব মনে পড়ে গেছে! সেই দুলাল চৌধুরী।

মণিকার মুখে কোথাও কি কোনো ত্রুটি আছে? নাকটা কি বড্ড বেশি চাপা—আর একটু টিকোলো হলে ভালো হত? চোখের তারা কি তেমন কালো নয়— একটু কটাব দিকেই? মণিকা কি আর একটু মোট হলে—

—কী দেখছ অমন করে আমার দিকে?

দারুণ লজ্জায় উঠে বসল লোকেন। রবারের চটিটা পায়ে গলিয়ে কলঘরের দিকে যেতে যেতে বললে, শিগ্‌গির চা দাও—মুখ ধুয়ে আসছি আমি।

চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা লাগতে অনেকটা স্বাভাবিক হল লোকেন—যেন একটা কুয়াশা সরে গেল মন থেকে। দুলাল চৌধুরী—একটা ইডিয়ট! মণিকাকে সে বিয়ে করতে রাজী হয়নি কেন—এ কথার উত্তর পাওয়াটা এমন আর কী কঠিন। ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। ভয়ে পিছিয়ে গেছে দুলাল। হ্যাঁ, ভয়েই। বুঝেছে মণিকার সে যোগ্য নয়। যে দুলাল অমন বিশ্রী জান্তব ভাবে কাটলেট খায়—চটে গেলেই যার তোতলামো বেরিয়ে আসে, প্রকাণ্ড পায়ে বেঢপ এক জোড়া জুতো পরে যে হাতির মতো হাঁটে—তার সাধ্য কি মণিকাকে বিয়ে করতে সাহস পায়! মানে মানেই সরে গেছে দুলাল—উপযুক্ত পুরুষ লোকেন এগিয়ে এসেছে বীরের মতো।

তোয়ালে দিয়ে নাক-মুখ খুব ভালো করে রগড়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে লোকেন ঘরে ফিরল। নিজের ভেতরে একটা শক্তি—একটা পৌরুষের উত্তাপ অনুভব করছে সে। এ-যুগে স্বয়ম্বর সভার প্রথা নেই, কিন্তু থাকলে—। থাকলে সকলের মাঝখানে মণিকা এগিয়ে আসত তার দিকে, তারই গলায় পরিয়ে দিত বরমালা, আর দুলালের দল ম্লান হয়ে লুকিয়ে যেত সভার ভিড়ে।

বীর গৌরবের এই পুলকটুকু অনুভব করতে করতেই চা খেল লোকেন, গল্প করল মণিকার সঙ্গে, খবরের কাগজ পড়ল, স্নান খাওয়া শেষ করে বেরুল অফিসে। এই সময়টার ভেতরে কোথাও কোনো গোলমাল ছিল না; কাজ করেছে, হাসিঠাট্টা করেছে, চা খেয়েছে, সিগারেট টেনেছে। তারপর ক্যানিং স্ট্রীট থেকে কিছু মার্কেটিং সেরে ডালহৌসি স্কোয়ারে এসে ট্রামে চপবার পরেও সে বেশ খুশীই ছিল। কিন্তু ট্রাম যখন এসপ্ল্যানেড ছাড়িয়ে ময়দানের পাশ ধরে দক্ষিণমুখো ছুটতে লাগল, যখন রোদ ডুবে গিয়ে শান্ত ছায়া নামতে লাগল চারদিকে, যখন গাছগুলোতে ঘরে ফেরা কাকের দল চেঁচামেচি শুরু করে দিলে, তখন, একেবারে সামনের সীটে, পশ্চিমের জানলার ধারে বসেও লোকেন অস্বস্তিতে পীড়িত হয়ে উঠল।

কথাটা ঠিক একবারেই যে মনে এল, তা নয়। পাশের মাঠে একটু একটু করে ছায়া নামার মতো প্রথমে খানিকটা ধোঁয়ার মতো কী যেন কোথায় দেখা দিল, যেন একটা ভুলে-যাওয়া কথাকে মনে করবার চেষ্টায় একবার ভুরু কোঁচকালে লোকেন, তারপর নিচের গদিটার যেন একটা স্প্রীং উঠে পড়েছে এমনি অনুভূতি হল, তারও পরে ক্লান্ত মস্তিষ্কের মধ্যে সেই ধোঁয়াটা কালো মেঘ হয়ে ঘনিয়ে এল, আর বজ্রবিদ্যুতের মতো চমকে উঠল দুলাল চৌধুরী।

শুধু কমপ্লেক্স? কেবল ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সেই এমন করে পেছিয়ে গেল দুলাল? কোনো পুরুষ কি কখনো মেয়েদের কাছে এমনভাবে পেছিয়ে গেছে কোনোদিন? উলটোটাই বরং হয়। বরং—

—কী আশ্চর্য! —একটা নিঃশব্দ স্বগতোক্তি করলে লোকেন। মাথা খারাপ হচ্ছে নাকি তার? শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিলে, ফিরে তাকালো পাশের ভদ্রলোকের দিকে। তাঁর হাতে ভাঁজকরা একখানা খবরের কাগজ।

—কাগজটা একটু দেখব মশাই?

—নিশ্চয়, নিন—নিন—

হাতে-হাতে ময়লা হওয়া, ভাঁজ পড়ে যাওয়া কাগজ। খবরগুলো সকালেই লোকেনের পড়া হয়ে গেছে। তবু এলোমেলো ভাবে পেছন থেকে উলটে চলল। আসামের সংবাদ, খেলার খবর, বেলজিয়াম কংগো, ক্যানাল ওয়াটার ডিসপ্যুট—ল কোর্ট,

রিপোর্টস, সিনেমার পাতা, আকাশবাণী প্রোগ্রাম, ওয়াণ্টেড্—ম্যাট্রিমোনিয়াল!

ম্যাট্রিমোনিয়াল—পাত্রী চাই! এবং, আবার সেই ভাবনা। ঘুরে ফিরে ঠিক একজায়গাতেই পৌঁছানো!

আশ্চর্য! লোকেনের কপালের দুপাশে শিরাগুলো কাঁপতে লাগল। এ কি ব্যাধি পেয়ে বসেছে তাকে! সুখেন্দুটা একটা রাস্কেল! এক পেট গিলে শেষকালে এইরকম নিমকহারামি! এ কথাগুলো যেন বলতে গেল ওকে কী দরকার ছিল?

কিছুই নয়—হয়তো নেহাতই খেয়াল! মেয়েটিকে তোমাদের সকলেরই পছন্দ হয়েছে? হতে পারে। কিন্তু আমার ভালো লাগছে না—আমার মনে ধরছে না কিছুতেই। কেন? জানি না। জবাব দিতে পারব না। এমনিই। ভালো লাগা-না-লাগা আমার নিজের ইচ্ছের ওপরেই নির্ভর করে; সেজন্যে কারো কাছে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে আমি ন্যায়ত বাধ্য নই। ব্যাস্।

দুলালের খানিকটা কল্পিত সংকল্প মনে মনে আওড়ালো লোকেন। মানুষ তো সংসারে এমন অনেক কাজই প্রত্যেকদিন করে চলেছে যার কোনো যুক্তি নেই কোনো লজিক দিয়ে যাকে বোঝানো যায় না। পৃথিবীবিখ্যাত, নোবেল্-প্রাইজ পাওয়া এমন উপন্যাসও তো আছে যা পড়ে লোকেনের একেবারেই ভালো লাগেনি। কেন লাগেনি—সে কথার উত্তর লোকেন জানে না, কোনো অবচেতনার অন্ধকারে হয়তো বা সে রহস্য লুকিয়ে আছে।

কিন্তু ব্যাপারটা হল দুলালকে নিয়ে। যে দুলাল স্থূল, যে বৈষয়িক, যে ভলিবল খেলে আর দু হাতে ধরে কাটলেটে কামড় দেয়, কোনো সূক্ষ্ম হিউমার তুললে যে ঘোলা ঘোলা গোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে—সে কি ঠিক এমন করে নিজের মনের খেয়ালের কাছে হার মানবে? সুন্দরী, বিদুষী—সব দিক থেকে চমৎকার মেয়ে—দুলালের পক্ষে তো হাতে স্বর্গ বলতে গেলে। অবচেতনার ওপর বরাত দিয়ে সে দুলাল বলতে পারবেঃ আমার ভালো লাগছে না—তাই বিয়ে করব না? যে দুলালের মধ্যে কোনো আর্টিস্ট্ নেই, কোনো গভীরতাও নেই, যার মনের ভেতরে আর একটা মন থেকে থেকে যাওয়া-আসা করে না—সে কি—?

তা হলে—

তা হলে? দুলালের কাছ থেকে আর জবাব মিলবে না। মরে গেছে দুলাল। গন্ধর গুড্। কেন আরো কিছুদিন আগেই মরল না লোকটা? অ্যাক্সিডেণ্টটা তো ছ' মাস আগেও হতে পারত!

দুহাতে মাথা চেপে ধরে বসে রইল লোকেন। শয়তানের কারখানা তৈরি হয়েছে যেন মগজের ভেতর। এসব পাগলামো ভোলা দরকার। বাড়ি ফিরে আজ সে ব্রান্ডের পেগ-তে

মণিকাকে নিয়ে সিনেমায় যাবে। মণিকা আমার—আমার জন্যেই সে পৃথিবীতে এসেছে। সেই অদৃশ্য বিধানেই সরে গেছে দুলাল—তাকে যেতেই হত।

ফ্ল্যাটের ছোট্ট দক্ষিণের বারান্দায় চা খাচ্ছিল দুজনে। মণিকাকে সিনেমায় যাওয়ার কথা বলতে গিয়েই একটা চিন্তা থমকে উঠল লোকেনের।

আচ্ছা—এমন তো হতে পারে, দুলালের মেয়েলি শাস্ত্রের ওপর বিশ্বাস ছিল! অসম্ভব নয়, দুলালের মতো বেরসিক স্থূল ধরনের ছেলে ওসব মানতেও পারে। মণিকার কপাল কি একটু বেশি উঁচু—যাকে উঁচ-কপালী বলে? কিংবা চিরুন চিরুন দাঁত—যা নাকি অতি অলক্ষণের নমুনা?

চায়ের পেয়ালা ভুলে গিয়ে লোকেন চোখ তুলে তাকিয়ে রইল মণিকার দিকে। কপালটা যেন সত্যিই একটু বেশি চওড়া—কিন্তু সে কি টেনে খোঁপা বেঁধেছে বলে? আর দাঁত? হাসলে দাঁতগুলো যে ঠিক কিরকম দেখায় লোকেন কিছুতেই তা মনে করতে পারল না?

—কী হল? চেয়ে আছো কেন অমন করে? কিছু বলবে?

বুকের ভেতর থেকে যেন একটা ঝড় উঠে আসতে চাইল, অনেক চেষ্টায় সেটাকে থামালো লোকেন। নির্বোধ ভঙ্গিতে হাসতে চেষ্টা করল।

—তোমাকে দেখছিলুম।

মণিকা ব্যাপারটা বুঝল অন্যভাবে। লজ্জায় রাঙা হল গাল, মুখ নামিয়ে বললে, কী পাগলামো যে করো!

পাগলামোই বটে। চাপা বন্ধ ঠোঁটের ভেতর একবার দাঁতে দাঁত ঘষল লোকেন। না—এভাবে কিছুতেই চলতে পারে না। মনের এই ভারটাকে তার যেমন করে হোক নামানো দরকার। মরে গিয়ে দুলাল যেন একটা প্রেতাত্মার মতো তার কাঁধের ওপর চেপে বসেছে—যেমন ভাবেই হোক—সেটাকে তার বিদায় করতেই হবে।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে লোকেন একটা সিগারেট ধরালো। মণিকাকে সিনেমায় যাওয়ার কথাটা বলতে যাচ্ছিল, তার বদলে ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল: তুমি দুলাল চৌধুরীকে চিনতে মণি?

—দুলাল চৌধুরী?

জিজ্ঞেস করেই অনুতপ্ত হয়েছিল লোকেন, কিন্তু কথাটা আর ফিরিয়ে নেওয়া গেল না। যখন নগ্নভাবে কথাটা এসেই পড়েছে, তখন একটা ফয়সালা করে নেওয়াই ভালো। নাহলে এক মুহূর্তের জন্যেও সে শান্তি পাবে না।

—কোন্ দুলাল চৌধুরী? —মণিকা আবার জানতে চাইল, ভুরু কুঁচকে উঠল তার।

—সেই যে—গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে লোকেন বললে, যার সঙ্গে তোমার একবার সম্বন্ধ—

লজ্জা পেয়ে মণিকা হাসল: বুঝতে পেরেছি। কালীঘাট থাকতেন ভদ্রলোক—ব্যাঙ্ক না ইনসিয়োরেন্সে কাজ করতেন। তুমি কি তাঁকে—

—হ্যাঁ, আমার ক্লাসমেট ছিল। শুনেছি, দু পক্ষের কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েও বিয়ে ভেঙে যায়। কী হয়েছিল?

বলতে বলতেই লোকেন টের পাচ্ছিল, এই দক্ষিণের বারান্দা, এই চায়ের পেয়ালা আর সন্ধ্যার বাতাস, মণিকার মতো স্ত্রী আর দু মাসের দাম্পত্য জীবন—সব কিছুকে সে বেসুরো করে তুলেছে। তবু নিজের মনকে সে ফেরাতে পারল না, কথাটাকে শেষ পর্যন্ত বলে তারপরে সে থামল।

মণিকার মুখের চেহারা বদলালো। ভয়ের চমক দুলে গেল চোখের তারায়।

—হঠাৎ এসব কথা এল কেন?

—এমনিই—কোনো কারণ নেই। বিয়েটা ভেঙে গেল কেন মণি?

মণিকা চোখ নামালো। ভীত, চাপা গলায় বললে, শুনেছি, ভদ্রলোকের শেষপর্যন্ত আমায় পছন্দ হয়নি।

—কেন পছন্দ হয়নি? —অকারণে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লোকেন: সেই অপদার্থ ইডিয়টটা কি হেলেন অব্ ট্রয়কে বিয়ে করতে চেয়েছিল? ভেবেছিল স্বর্গ থেকে মেনকা রম্ভা, তিলোত্তমা নেমে আসবে ওর জন্যে? তোমাকে ও এতবড় অপমান করতে কেমন করে সাহস পেলো তাই ভাবছি।

আরো আশ্চর্য হল মণিকা, আরো এক-রাশ গভীর ভয় এসে জড়ো হল চোখের তারায়।

——এতদিন পরে তা নিয়ে রাগ করছ কেন তুমি? এ অপমান বাঙালী মেয়েকে সইতেই হয়। আমি তো এমন অসাধারণ কিছু নই। তোমার আমাকে পছন্দ হয়েছে বলেই কি—

—বিনয় কোরো না মণি। তুমি সত্যিই অসাধারণ। রাস্কেল দুলাল তোমার পায়ের ধুলোরও যোগ্য নয়। মরে গিয়ে বেঁচেছে স্কাউণ্ড্রেলটা—নইলে—

মণিকা বাধা দিয়ে বললে, মারা গেছেন দুলালবাবু?

—হ্যাঁ, একটা মোটর অ্যাক্সিডেন্টে। বেঁচে থাকলে আমি গিয়ে ওর দুটো [illegible] উড়িয়ে দিয়ে আসতুম!

—মরা মানুষের সম্বন্ধে [illegible] [illegible] হলে নাকি তুমি?—মণিকা চেয়ার থেকে উঠে এলো। লোকেনের চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে দু-হাতে ওর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, আমি বুঝেছি। কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি, তাই তোমার নার্ভগুলো ইরিটেটেড্ হয়ে আছে। আজ তাড়াতাড়ি খাইয়ে তোমার আমি ঘুম পাড়িয়ে দেব—কেমন?

লোকেন চোখ বুজে রইল। মণিকার বিশ্বস্ত বুকের নরম আশ্রয়ের ভেতরে সমস্ত ভুলে নিশ্চিন্ত হতে চাইল সে। ভাবতে চেষ্টা করল দুলাল চৌধুরী বলে কেউ নেই, কেউ কোনোদিন ছিল না। কিন্তু—

কিন্তু আবার একটা দুঃস্বপ্নের রাত। আবার ইনসমনিয়া।

ঘুম আসছে না—ঘুম আসবে না। সেই ইজি চেয়ারটায়, নীল বালবের নরম জ্যোৎস্নায়, সিগারেট ধরাতে গিয়ে তার গোড়াটা চিবিয়ে ফেলল লোকেন। কাঁচা তামাকের কটু স্বাদে ভরে উঠল মুখটা।

উঠে দাঁড়ালো লোকেন। ধীরে ধীরে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো—তাকালো মণিকার মুখের দিকে।

সুন্দর, সরল, নিশ্চিন্ত। ঘরের নীলচে আলোয় করুণ ক্লান্ত ঘুমের মধ্যে এলিয়ে আছে। কোনো কথা বোঝবার উপায় নেই—ঘুমের নরম রেখাগুলি থেকে কোনো সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করা যায় না।

কেন পিছিয়ে গেল দুলাল? মণিকার জীবনের কোনো ভয়ঙ্কর গোপন গোপন ইতিহাস জানতে পেরেছিল সে? যে ইতি-হাস মণিকা কোনোদিনই বলবে না—যে ইতিহাস একমাত্র দুলাল ছাড়া আর কেউ জানত না—দুলালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যা চিরদিনের মতোই চাপা পড়ে গেছে?

হাত দুটো একটা আদিম ইচ্ছার তাড়নায় নিশপিশ করে উঠল। [illegible] দিয়ে, মণিকাকে জাগিয়ে তুলে, চিৎকার করে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করল: বলো—বলো—দুলাল যা জানত—সব আমায় বলো। নইলে—নইলে—

কিন্তু কিছুই বলতে পারল না লোকেন—টলতে টলতে আবার নিজের চেয়ারটায় ফিরে এলো। আর অনুভব করতে লাগল: একটা দুরারোগ্য, নিষ্ঠুর ব্যাধির কীট তার হৃৎ-পিণ্ডে বাসা বেঁধেছে। এরপর থেকে দিনের পর দিন সেই বীজাণুরা তাকে তিলে তিলে খেয়ে চলবে, সে আর বাঁচতে পারবে না—তার আর পরিত্রাণ নেই।

ঘরের গোল ঘড়িটায় দুটো বাজল। [illegible] রোমকূপগুলো দিয়ে ঘামের ফোঁটা [illegible] মতো, মণিকার নিঃশ্বাসের শব্দে মনে হতে লাগল—ঘরের ভেতরে কোথায় একটা লুকোনো সাপ একটানা ফুঁসে চলেছে—সেটাকে দেখতে পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

সমুদ্র

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

সেই রাত্রে আমি ঘুমোতে পারিনি। বা বলা যায় আমি ঘুমোতে চাইনি। যেন দু তিনবার আমার চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছিল। জোর করে চোখ খুলে রেখেছি। তাতে ফল হয়েছে। আর ঘুম আসেনি। জেগে থেকে রাত্রির ভয়ংকর শব্দ শুনেছি, অন্ধকারের গর্জন। যেন অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে একটা মেঘ দূরে কোথাও মাটির কাছে নেমে এসে সারাক্ষণ গুরগুর করে ডাকছিল। কান পেতে গভীর গম্ভীর শব্দটা শুনেছি। বার বার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। হয়তো সেই শব্দ শুনতে আমি জেগে ছিলাম। আমার মনে হয়েছে, পৃথিবীটাকে কেউ নতুন করে তৈরী করছে; ঢালাই গড়াইয়ের কাজ চলেছে; বা অদৃশ্য কোনো শক্তি এই সৃষ্টি ভেঙে দিচ্ছে—দূর থেকে ভাঙার কাজ আরম্ভ হয়েছে, ভাঙতে ভাঙতে ক্রমে এখানে চলে আসবে সেই শব্দ। এই ঘরের ভিত ভাঙবে, দেয়াল ভাঙবে। ভয়ে বুক কাঁপছিল। বুক কাঁপছিল; আবার আশ্চর্য এক সুখ একটা নিশ্চিন্ততা নিয়ে আমি কান পেতে ছিলাম। নতুন সৃষ্টির শব্দ শুনতে, নতুন ধ্বংসের গর্জন শুনতে কার না ভাল লাগে। কষ্ট হচ্ছিল হেনার জন্য। বেচারা

সেই শব্দ শুনছে না। অথবা যদি সন্ধ্যার দিকে শুনে থাকে বুঝতে পারেনি এই শব্দ কেন, কোথায়। না হলে তখন আলোর নীচে বসে ভাত খেতে খেতে দুবার চমকে উঠে ও আমার মুখের দিকে তাকাবে কেন। তারপর এক সময় ওর চোখের ঝিলিক নিভে গেছে ভুরুর বাঁক সোজা হয়ে গেছে; হেসে বলছিলঃ 'প্লেন!' উত্তর দিইনি প্রশ্নের। অনুকম্পার দৃষ্টি নিয়ে ওর থুতনির রেখা চোয়ালের ঢালুর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল হেনাকে এখানে না আনলেই ভাল হত। বেচারাকে এখন কত ছোট দেখাচ্ছে। অকাতরে ঘুমোচ্ছে ও। হাত পা গুটিয়ে পেটের কাছে নিয়ে গেছে। তারপর ওকে ভুলে গেলাম। ভেবে অবাক হচ্ছিলাম এখানে এসে হেনাকে আমি কত সহজে ভুলে থাকতে পারছি। এখানে, রাত দুটো যখন, সিগারেট ধরাতে দেশলাই জেবলে ঘড়ি দেখে নিয়ে ভাবলাম, স্ত্রীকে একলা ঘুমোতে দিয়ে কেমন সুড়সুড় করে বিছানা ছেড়ে আমি জানালার কাছে ছুটে আসতে পেরেছি। অন্ধকার ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে দূরের শব্দ শুনছি, কাছের শব্দ শুনছি। ভাত খেতে খেতে হেনা বলছিলঃ 'বিচ্ছিরি বাতাস! ঘরের পিছনে বুঝি ঝাউ গাছ আছে। তাই এত সোঁ সোঁ।' দ্বিতীয়বার ওকে অনুকম্পা করেছিলাম। ঈশ্বরের আশীর্বাদ, মনে মনে বললাম, এমন চট করে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে আর আমি জেগে থেকে দূর সমুদ্রের গভীর নিস্বন, নিকট সমুদ্রের উত্তাল উচ্ছ্বাস শুনব। আমরা যে সমুদ্রের কত কাছে রয়েছি, কথাটা ভুলে গিয়ে কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে বিছানার গর্তে নিশ্চিন্ত আরামে একটি মেয়েকে ঘুমোতে দেখে ঘৃণা হচ্ছিল। বলতে কি প্রথম রাত্রেই মনে হয়েছে আমি বড় —অনেক বড়: সৃষ্টি ও লয়ের গূঢ় গম্ভীর শব্দ শোনার অধিকার আমারই আছে, তোমার নেই; তুমি ছোট—অনেক ছোট: সমুদ্রকে তুমি বোঝ না, চেন না। প্লেনের শব্দ বাতাসের সোঁ সোঁ—তা বটে! কেবল কান পেতে শোনা না, জানালার বাইরে চোখ মেলে দিয়ে আমি বিরাটের আশ্চর্য রূপ দেখে নিলাম। তারা খচিত আকাশের নীচে দিগন্ত বিসারী অন্ধকারের সে কী ভয়ংকর আলোড়ন! দূরে কি হচ্ছে বোঝা যায় না, দেখা যায় না—এখানে, তীরের কাছে, না আরো দূরে, যেন স্পন্দমান কম্পমান অন্ধকার ফেটে ফেটে রাশি রাশি ফুলের স্তবক হয়ে আমাদের কাছে ছুটে আসতে চাইছে। কিন্তু আসে কি? আসে না। আমাদের কাছে আসবার আগে তারা মিলিয়ে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায়। যেন মানুষকে ভয়, অভিশপ্ত মানুষের নিশ্বাসকে ভয়। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে অগাধ উত্তাল ফেনোচ্ছল ভয়ংকর সুন্দরকে প্রণাম করলাম। সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া হেনাকে আবছা অন্ধকারে একটা খরগোসের মতো দেখাচ্ছিল। ও যে মানুষ—কলকাতার ঝামাপুকুর লেনের দোতলার কোনো ফ্ল্যাটের এক তেজস্বিনী মহিলা, সমুদ্রতীরের এই ছোট ঘরের বিছানাটার দিকে তাকিয়ে সে কথা কে বলবে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুশোচনায় বুক ভার হয়ে উঠল। যেন আমি নিজেকে করুণা করতে আরম্ভ করলাম। ওই ঘুমন্ত খরগোসের বুকের স্পন্দন দেখতে, হৃদপিণ্ডের ধুকধুক শুনতে আমি কত রাত্রে ওর গাত্রাবাস সরিয়ে বোকার মতো তাকিয়ে রয়েছি, কান পেতে থেকেছি! দেহ-সমুদ্র দেহ-সমুদ্র! কত মূঢ় উচ্ছ্বাস বিবর্ণ ইচ্ছার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে মানুষ তৃপ্তি পায়, আমি তৃপ্ত ছিলাম। চিন্তা করে প্রায় মরে যেতে ইচ্ছা করছিল। চোখে জল এল। সমুদ্র আমার অতীতকে এমন করে তুচ্ছ করে দেবে কে জানতো। ঘুমের ঘোরে হেনা বিড়বিড় করছিল। ঝামাপুকুরের বাড়িতে আমি তৎক্ষণাৎ আলো জেবলে ওর ঠোঁট পরীক্ষা করতাম—দেখতাম হাসি জেগেছে, কি কান্নার বাঁকাচোরা রেখা জেগেছে ঠোঁটে। সুখের স্বপ্ন দেখছে কি দুঃখের। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি সেসব কিছুই করলাম না। বিছানার কাছে গিয়ে একটা পোকা হাটকাবার প্ল্যান থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে যেন নিষ্ক্রীয় কঠিন থেকে শক্ত হাতে জানালার গরাদ চেপে ধরে বাইরে চোখ ফেরালাম। হাওয়ার বেগ বাড়ছে, সমুদ্র উত্তাল হয়েছে; সফেন তরঙ্গ ক্রুদ্ধ গর্জন করে তীরের দিকে ছুটে আসছে—একটা এল, ভাঙল, আবার একটা; আবার, আবার, আবার......কত কোটি বছর ধরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এভাবে ছুটে আসছে, গর্জন করছে, হাসছে, ভেঙে গুঁড়িয়ে রেণু রেণু হয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে অতল অনন্ত অন্ধকারে। মনে পড়ল, এই সেই অশান্ত উন্দাম—স্ত্রীকে উদ্ধার করতে যেতে রামচন্দ্র নিষ্ঠুর তীর মেরে একে শাসন করতে চেয়েছিল। সীতা-উদ্ধার হয়েছিল। কিন্তু শান্তি পেয়েছিল কি শ্রীরাম? কেন পায়নি, কোথা থেকে অভিশাপ এসে লাগল সেদিনের সেই দাম্পত্য-জীবনে? বার বার মনে হতে লাগল প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছিল, সমুদ্র ক্ষমা করতে পারেনি ওদের। হেনার জন্য এমন কাজ করতে পারব কি আমি? শক্তি নেই। কিন্তু শক্তি থাকলেও আমি একাজ করব না। বরং ওই রুদ্রের কাছে নিজেকে কীটানুকীট—প্রায় একটা বুদ্বুদের মতো ক্ষীণায়ু কল্পনা করতে ভাল লাগছিল। ইচ্ছা করছিল, ঘরের বাইরে, ওই বালির বিছানায় একটা ঝিনুক হয়ে আমি অনন্তকাল শুয়ে থাকি। হেনা নেই, সংসারে আর কেউ নেই। যেন এমনও ইচ্ছা করছিল সকাল হতে সরাসরি ওকে জানিয়ে দেব, তুমি ফিরে যাও আমি এখানে থেকে যাব। বরং আমি যতক্ষণ কাছে আছ আমার সমুদ্রদর্শন হবে না, সাগরে অবগাহন অসম্পূর্ণ থাকবে। তোমার উপস্থিতি পীড়াদায়ক, একটা অতিরিক্ত বোঝা বিশেষ। তা তো বটেই, সমুদ্র থেকে হেনা আমার কাছে বেশি প্রিয় না, আমি রাম নই। শুনে হেনা কী বলবে, অভিমানে মুখ কালো হয়ে যাবে—না কি ঠাট্টা ভেবে উচ্চকিত হেসে উঠবে? চিন্তা করতে পর্যন্ত সেরাত্রে আমার খারাপ লাগছিল।

পরদিন সকাল হতে আবার মামার দর্শন পাওয়া গেল। চোখে সাংঘাতিক পুরু লেন্স, গায়ে আধময়লা খদ্দরের হাফ-শার্ট, পায়ে টায়ারের মোটা চপ্পল। মানুষটাকে দেখেই মনে হল রাত্রে ঘুমোয়নি। চোখের কোলে কালি, কপালে অসংখ্য রেখা, হাঁটা ও কথা... বলার মধ্যে ক্লান্তি। আমাদের দুজনকে দেখে কপালে হাত ঠেকিয়ে হাসছে: মনে হল দাঁতের মাথাগুলি এসিডে খেয়ে ফেলেছে, তার ওপর পান দোক্তার কালো লালচে ছোপ। মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে, অল্পসল্প যা আছে, মাস ছয়েকের মধ্যে সে কটাও অদৃশ্য হবে অনুমান করতে কষ্ট হল না। মানুষ উপোস থাকলে বা আধপেটা খেয়ে খেয়ে দিন কাটালে যে চেহারা ধরে মামাকে দেখে তা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা নয়। ভাতের অভাব মামার নেই, একটা হোটেলের কর্মকর্তা সে—হয়তো অসুখবিসুখ কিছু থাকতে পারে চিন্তা করলাম। আর এদিকে আমার সব দুশ্চিন্তা ঝাঁকুনি দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে যেন মামা কাছে এসে হেসে আমার কাঁধ ধরে প্রচণ্ড নাড়া দিলঃ 'কি মশাই, কেমন ছিলেন, রাত্রে ঘুমোতে পেরেছিলেন?'

'চমৎকার ঘর হয়েছে আমাদের—আমি তো সেই সন্ধ্যাবেলা চোখ বুজেছি আর এই সকাল হতে চোখ খুললাম।' হাতের বটুয়া দুলিয়ে হেনা হাসছিল। আমি নীরব। যেন হেনার দিকে চোখ পড়তে মামা একটা হোঁচট খেল। অসম্ভব না। কাল গাড়ির রাস্তায় আসতে আসতে বেশকস প্রসাধনের দিকে নজর দেবার সময় ও সুযোগ ছিল না—বরং ধোঁয়ায় কালিতে কাপড়চোপড় ময়লা হবে আশঙ্কা করে হেনা আধময়লা শাড়ি ও ব্লাউজ পরে এখানে এসে নেমেছিল। বলতে কি, ও যখন রিক্সা থেকে নেমে মামাদের হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, ওর আলুথালু চুল ও শুকনো মুখখানা দেখে আমার মনে হচ্ছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওর বয়স অনেক বেড়ে গেছে; না কি সেই চেহারা ওর আসল চেহারা, সেই বয়স ওর আসল বয়স ধরে নিয়ে মামা এখন কাঁচকাঁচা মুখ সুবেশিনী হেনাকে দেখে এমন থমকে গেল। যেন ওর কাজল বুলানো চোখের উজ্জ্বল ধারালো দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মামা সমুদ্রের দিকে মুখ ঘোরাল। কাজেই আমাকে মুখ খুলতে হল—জানি না, হয়তো অপরিচ্ছন্ন চেহারার রুগ্নদেহ ছোটখাট মানুষটাকে খুশী করতে হঠাৎ আমি বলে ফেললাম, 'আমি মোটেই ঘুমোতে পারিনি।'

'কেন, কেন মশাই ঘুম হল না?' মামা

আমার চোখ দেখলে। 'এমন ভাল ঘর দেখে দিলাম—একেবারে সমুদ্রের ওপর!'

একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললাম। অপাঙ্গে হেনাকে দেখলাম। তারপর, যেন হেনা শুনতে না পায় এমন নীচু গলায় বললাম, 'ঢেউ—ঢেউয়ের শব্দে ঘুম হয়নি।' বস্তুত আমার ও মামার কথা শুনতে হেনা এদিকে তাকিয়ে নেই, একটু দূরে বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির ওপর ঝিনুক ও শঙ্খের দোকান নিয়ে বসেছে লোকটা—একটু একটু করে সেদিকে এগোচ্ছে ও। দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। এবং অবাক হলাম মামার গলার স্বরটাও সঙ্গে সঙ্গে আবার কেমন ঝরঝরে হয়ে গেছে।

'সমুদ্রের শব্দে ঘুম হয়নি, কেমন না?' পুরু লেন্সের ওপারে দৃষ্টিটা ঝিকিয়ে তুলে মামা অল্প শব্দ করে হাসল। 'আমিও রাতে ঘুমোতে পারি না।'

'কোন দিন না?'

'কুড়ি বছর।'

চুপ থেকে মানুষটার চোখের কোলের কালি, গালের গর্ত, কপালের কুঁচকানো চামড়া, এমন কি হাত পায়ের মোটা শিরাগুলি পর্যন্ত নতুন করে দেখলাম।

'অবাক হয়ে গেলেন?' মামার ভাঙাচোরা ময়লা দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল, বেশ বড় করে হেসে মাড়টা ঈষৎ বাঁক করে বলল, 'কুড়ি বছর রাত জেগে জলের দুরন্ত ঢেউয়ের আছাড় শুনে আসছি।'

হেনা বটুয়া খুলে টাকা বার করছে। যেন এর মধ্যেই দুটো বড় শঙ্খ ও কিছু ঝিনুক শামুক কিনে ফেলেছে ও।

'যাক গে, আর কোনো কষ্ট হয়নি তো।'

'না—' মৃদু গলায় বললাম, 'আর ঘুম হয়নি বলে যে কষ্ট হচ্ছিল বা এখন হচ্ছে তাও না। ভাল লাগছিল শব্দগুলি শুনতে। আমি ইচ্ছা করে জেগে ছিলাম।'

'হুঁ।' মামা আর হাসল না, বরং একটু গম্ভীর হয়ে গেল; পাছে ঘাটের দিকে চোখ ফেরালে আমার স্ত্রীকে দেখতে হয়, তাই সেদিকে না তাকিয়ে ডান দিকের বালির ওপর চোখ রাখল লোকটা, আর কেমন জানি অস্পষ্ট অপরিচ্ছন্ন গলায় বলল, 'প্রথম প্রথম ইচ্ছা করে জোর করে রাত জাগতে হয়—তারপর আপনা থেকে চোখের পাতা খুলে থাকে—তখন সমুদ্রের ডাক ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। আর তখন......'

শেষের কথা কয়টা বোঝা গেল না। দূরে একটা রিক্সা দাঁড়িয়েছে। বেডিং সুটকেস দেখে মামা টের পেল নতুন যাত্রী। যেন পাঁড়-মরি করে যাত্রী ধরতে সেদিকে ছুটেছে। অবশ্য একটু দূরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা হাত তুলে আমাকে আশ্বাস দিয়ে গেল, আবার দেখা হবে। ঘাড় কাত করে আমি হাসলাম। মামা আবার ছুটেছে।

'কি কথা হচ্ছিল এতক্ষণ?'

'কেন?' অবাক হয়ে হেনার মুখ দেখলাম। হাতের শামুক শঙ্খগুলি আমার চোখের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করে ও, কিন্তু উৎসাহ নেই এমন ভান করে আমি জলের দিকে চোখ ফেরাই।

'বাজে লোক, ঐ শাঁখওয়ালা বলছিল; যেমন ওর চেহারা তেমনি চরিত্র।' একটু চুপ থেকে হেনা আবার বলল, 'কেমন বিচ্ছিরি করে তাকাচ্ছিল তখন।'

'কিন্তু একবার তাকিয়েই তো সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে'—আমার বলতে ইচ্ছা করল, 'তা ছাড়া আমাদের ঘর খুঁজে দিয়েছে যখন লোকটা—কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে।' বললাম না কিছু। আস্তে আস্তে এগোই। হেনা আমার সঙ্গে হাঁটছে হঠাৎ ভুলে থাকতে চাইলাম। এত বড় সাগরবেলায় দাঁড়িয়েও একটি পুরুষের তাকানোর সমালোচনা করতে, তার চরিত্রের নিন্দা করতে হেনার বাধছে না ভেবে মনটা বিষিয়ে উঠল। যা আশঙ্কা করেছিলাম। মেয়েরা কখনই মনের ক্ষুদ্রতা ঢাকতে পারে না। বিরাটের কাছে এসে তোমার কি লাভ হল মেয়ে। হাতে দাঁত ঘষে ভিতরের রাগ চেপে রাখলাম। আর, যেন ঈশ্বরের দয়া, যেন আমার সব বিদ্বেষ রাগ ধুইয়ে দিতে বড় মেঘের টুকরোটা সরে গিয়ে আকাশ মাটি জল সোনার রৌদ্রে ঝলমল করে উঠল। হাতঘড়ি দেখলাম। দেড়ঘণ্টা আগে সূর্যোদয় হয়েছে। কিন্তু রোদ ছিল না। জগাখল
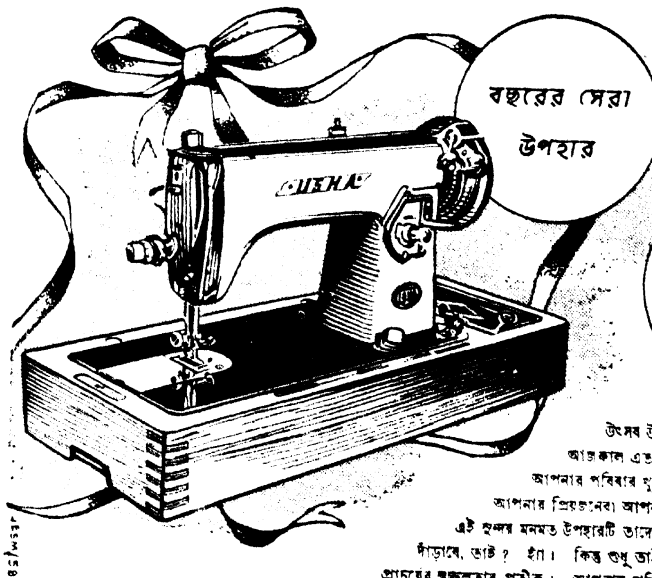
শাথর হয়ে মেঘটা পূর্বাকাশ অন্ধকার করে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল। আমার হৃদপিণ্ড এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। এতক্ষণ সীসার রঙের জল ছাড়া চোখের সামনে আর কিছু ছিল না। এখন দিগন্ত ঘেঁষে সমুদ্র গাঢ় নীল রঙ ধরেছে, মাঝের জলে সবুজের ছোপ, বর্ষার পরে নতুন ঘাস গজানো পলিমাটির যে-রং ধরে; আর একটু কাছের জল গৈরিক। উত্তাল অশান্ত ক্ষিপ্ত প্রখর। রূপার মুকুট পরে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে। একটা বড় ঢেউ বালির ওপর এতটা দুধ ছড়িয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।

'আমি স্নান করব না। ভীষণ ভয় করবে জলে নামতে।'

'না-ই বা করলে।' হেনার দিকে মুখ না ঘুরিয়ে উত্তর করলাম।

'হাঙর কুমীর কত কী আছে কে জানে!' হেনা বিড়বিড় করছিল। আমি নীরব। দূরে কালো কালো ফুটকি। এই ডুবে যাচ্ছে এই ভেসে উঠছে। 'ডিঙি নিয়ে জেলেরা মাছ ধরছে, তাই না?' হেনার অবাক চোখ জোড়া দেখতে আমার একটুও ইচ্ছা করছিল না। একটু থেমে থেকে পরে ও বলল, 'কাল রাত্তিরে কিন্তু তোমার মামার হোটেলে সমুদ্রের মাছ খেতে দেয়নি।'

'না, ওটা চিল্কার চিংড়ি ছিল।' গম্ভীর গলায় বললাম। 'সমুদ্রের মাছ খেয়ে কাজ নেই, পেটের অসুখ করবে।'

'ঠাট্টা করছ!' হেনা হাসল। তার বটুয়ার ভিতর ঝিনুকগুলো ঝনঝন করে বেজে উঠল। 'অথচ সবাই সমুদ্রের মাছ খেতে চায়, খুব মিষ্টি।' ওর গলায় আদুরে সুর ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কঠিন গলায় বললাম, 'তা সমুদ্রে নেমে স্নান করলেও তো ভাল লাগে। কিন্তু হাঙর-কুমীরের ভয়ে সবাই কি নামতে সাহস পায়।'

হেনা চুপ করে গেল। আহত হল। বিস্তৃত বিস্ফারিত জলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওকে আঘাত করতে পেরে আমার যে কী ভাল লাগছিল। তখন ভিড় বেড়ে গেছে জলের কিনারে। হাঁটু জলে, কোমর জলে, কেউ গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে, আর সাহস পাচ্ছে না এগোতে—ঢেউয়ের ধাক্কায় কাত হয়ে যাচ্ছে, নুয়ে পড়ছে; কেউ কেউ তলিয়ে গিয়ে আবার ভেসে উঠে যেন খাবি খেতে খেতে কোনোরকমে স্নান সেরে ছুটতে ছুটতে তীরে উঠে এল। সাদা টুপি পরা কালো কুচকুচে শরীর নুলিয়ার শক্ত মুঠোর ভিতর আটকা পড়ে সুন্দর মেয়েটা হাঁসফাঁস করছে; বেগোচ্ছল বিশাল ঢেউ হা হা করে ছুটে আসছে। মেয়ে ভয়ে চোখ বুজল আর সেই মুহূর্তে নুলিয়া ওর বেণীসমেত ছোট্ট মাথাটা জলের নীচে ঠেসে ধরল। আর্তনাদ করে উঠল কি ও, না ঢেউ সরে গেছে—নুলিয়ার কঠিন বাহুর ওপর ফরসা নরম শরীরের ভর রেখে ভিজা সপসপে শায়া ব্লাউজ নিয়ে রূপসী মাতালের মতো টলতে টলতে হাসতে হাসতে তীরে উঠে আসছে। কে ওকে মাতাল করল—নুলিয়ার হাতের ঝাঁকুনি? ঢেউয়ের একটা মাত্র দোলা? বালির বিছানায় বসে পুরুষ হাসছে। হয়তো স্বামী, হয়তো সঙ্গী। ব্যস্ত হাতে শুকনো শাড়ি ব্লাউজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বোধ করি হেনা সেই মুহূর্তে ফিসফিসে গলায় কিছু একটা মন্তব্য করছিল; আমি অন্যদিকে চোখ সরিয়েছি, গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম মোটা ভুঁড়ির ভদ্রলোক হাঁটুজলে কেমন ভয়ে ভয়ে একটা ডুব দিয়ে পাকা চুলে একরাশ বালি নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ওপরে উঠে এল। সমুদ্রকে এত ভয়! ভদ্রলোককে চিনলাম। আমাদের কলকাতার সাকিরা স্ট্রীটের এক প্রতিপত্তিশালী ব্যারিস্টার বেন। ডাঙায় তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ; রাস্তার মানুষকে হতচকিত করে দিয়ে দুরন্ত বেগে গাড়ি ছুটিয়ে চলে—সমুদ্রের কাছে শিশু, অসহায় শিশু!

'আমি ওদিকে যাচ্ছি।'

'তাই যাও।'

ঝিনুক খুঁজতে লেগে গেছে ও। শরীর বেঁকিয়ে লম্বা ঘাড় নুইয়ে হেনা বালু খামচাতে খামচাতে এগিয়ে যায়। স্বস্তি বোধ করি। লবণগন্ধী হাওয়ায় ওর বেণী দুলছে, আঁচল উড়ছে। উড়ুক। চিন্তা করলাম, সমুদ্রের ধারে এসে একবার যার ঝিনুক শামুক কুড়োবার নেশায় পেয়ে বসে সারাক্ষণ বুঝি তাকে বালুর ওপর চোখ রেখে চলতে হয় ছুটতে হয়; ঢেউয়ের নাচ জলের রং ফেরা তার আর দেখতে হয় না। মন্দ কি! মনে মনে হাসলাম। সমুদ্র অনেক ছোট জিনিস ঠেলে ঠেলে তীরে তুলে দিচ্ছে। যাদের ছোট মন তারা ওসব নিয়ে মেতে থাকুক। হেনা, তোমার জন্য শামুকের খোলস, মাছের কাঁটা, জলের নীচের মরা গাছের শিকড় —কি জলের অন্ধকারে নিহত ভক্ষিত আর কোনো জীবের নখ দাঁত হাড়; যা সমুদ্রের কাছে অপবিত্র উচ্ছিষ্ট অনাবশ্যক। দু-হাতে সব কুড়িয়ে আঁচলে ও থলে বোঝাই করে নিয়ে এস। কাল রাত্রির মতো আজ আবার স্বচ্ছ দিনের আলোয় ঝামাপুকুর লেনের মেয়েটিকে অনুকম্পা করতে করতে ওপরে উঠে এলাম।

মামা। আমাকে দেখতে পেয়ে চায়ের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে খর্বকায় মানুষটি। না কি আমাকে এখানে পাবে আশা করে আগে থাকতেই দাঁড়িয়ে ছিল। বলতে গেলে প্রায় ঢেউয়ের বাড়ি এসে লাগে এখানে। জলের এত কাছে আর একটিও চায়ের দোকান নেই বলে কাল দুপুরে হেনাকে নিয়ে এখানে প্রথম চা খেতে ঢুকেছিলাম। দোকানের আটপৌরে চেহারা দেখে হেনা নাক সিঁটকিয়েছিল। অথচ এ দোকানে না ঢুকলে কাল মামার সঙ্গে পরিচয় হত না। এবং হোটেলে ঘর পাওয়া শক্ত হত।

'কি মশাই এর মধ্যেই উঠে এলেন?'

জোরে ঘাড় কাত করলাম।

'চায়ের পিপাসা পেয়েছে।'

'তাই বলুন, চা-খোর মানুষের ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা চাই।' দোকানে ঢুকে মামা হাঁকডাক শুরু করে দিল: 'কই রে, বাবুকে ভাল করে চা বানিয়ে দে। বসুন।'

একটা বেঞ্চির ওপর আমি বসলাম। মামা পাশে বসল।

'এই চায়ের দোকানও আমার ভাগ্নের।'

কথা শুনতে আমি তার চোখের দিকে তাকাই। কোটরগত রাতজাগা চোখ দুটো কুঁচকে মামা মিটিমিটি হাসে।

'হোটেল করার পরামর্শ দিয়েছিলাম আমি। আমার পরামর্শ মত কাজ করে লাভ হয়েছে কিনা একবার বীরেনকে জিজ্ঞেস করুন না। সাত বছরে দু'খানা বাড়ি কিনেছে বীচের ওপর। তার আগে অবশ্য এই চায়ের দোকান। চামড়ার দোকান ছিল এটা। হরিণ আর সাপের চামড়ার জুতো ব্যাগ তৈরী করে বেচত ব্যাটা। যুদ্ধের সময় চামড়ার টান পড়ে। আসলে পুঁজি কম ছিল মুচির। না হলে তখনই তো ফেঁপে ওঠার সময় গেছে। চার টাকার ব্যাগ চৌদ্দ টাকা, দশ টাকার জুতো বত্রিশ টাকায় বিকিয়েছে। তা ক্যাপিটাল না থাকলে কি দিয়ে কি হবে। দোকান বেচে পড়ল। আমি বীরেনকে বললাম দোকানটা রেখে দিতে—চমৎকার চায়ের দোকান হবে—কিছুতেই শুনবে না কথা. শেষটায় রাজী হল যদিও; কি, এই দোকানই তো ভাগ্নের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। হুঁ, চায়ের দোকানের টাকায় হোটেল—আর

হোটেল খুলে সাত বছরের মাথায় বাঁচের ওপর দু দু-খানা পাকা বাড়ি।'

মামা চুপ করল। চা এসে গেল। আমার জন্য পুরো কাপ, মামার জন্য 'একটুখানি।'

'লিভারটা একেবারে গেছে। চা সহ্য হয় না। দেখলেই অবশ্য খেতে ইচ্ছে করে, তাই অই এক চুমুক—আমার কড়া অর্ডার আছে চা চাইলে কখনই এর বেশি দিবিনে।' কাপে চুমুক দিয়ে মামা বলল, 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম, আজ বড়লোক হয়ে বীরেন আমার সঙ্গে ডাক করে কথা বলে না; না বলুক, আমি চিরকাল তোমার উপকার করে এসেছি—তোমার ভালটা দেখে এসেছি যখন আজও করব, করছি, দেখছি—তখন দেখলেন তো, চেঞ্জার এসে নামল আর অমনি খপ্ করে ধরে ফেললাম—দিলাম পাঠিয়ে প্যারাডাইজে।'

হেসে মৃদু গলায় বললাম, 'দেখছি।' এখন বুঝতে পারলাম সবাই একে 'মামা' ডাকে কেন। হোটেলের মালিকের মামা কাজেই বোর্ডারদেরও মামা—তারপর বুঝি সেই ডাক আস্তে আস্তে এখনকার রিক্সাওয়ালা, মুদি, পানবিড়ির দোকানের মানুষদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। ভাবছিলাম আর স্থির দৃষ্টি মেলে সামনের টেবিলে অপলকে জল দেখছিলাম, শব্দ শুনছিলাম। দূরের সমুদ্র সুন্দর কি কাছের—কোন্‌টা আপনার ভাল লাগে?'

চমকে উঠলাম। আমার মতো কথা বন্ধ রেখে মামাও হঠাৎ জল দেখছিল। লেন্সের ওপিঠে ফ্যাকাশে চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে। প্রশ্নটা অতর্কিত। কিন্তু এত ভাল লাগল। মৃদু মৃদু হাসছে রোগা মানুষটা; এবার আমার চোখ দেখছে।

'বলুন, ষোল ঘণ্টার বেশি এখানে কাটিয়ে দিলেন তো। দূরের সমুদ্র টানছে আপনাকে, না বালির ওপর আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে ক্ষ্যাপা ঢেউ—সেগুলো?' চুপ করে রইলাম। যেন নতুন করে রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। কাল অন্ধকারের সমুদ্রে দেখে ঢেউয়ের শব্দ শুনে যেমন হয়েছিল। কেন ঠিক করতে পারছিলাম না, আকাশের কোল ঘেঁষে শুয়ে থাকা শান্ত গম্ভীর নীল রহস্যে ভরা দূরের সমুদ্রকে আমি বেশি ভালবাসব, কি এখানে তীরের কাছের তরল হাস্যোচ্ছল শুভ্র ফেনা-বিকীর্ণ বালিতে বিক্ষিপ্ত মুখর তরঙ্গমালা।

'ঠিক করতে পারছি না।' অসহায়ের মতো মামার দিকে তাকাই।

'তাই বলুন।' মামা তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে একটা শব্দ করল। 'চট্ করে এর উত্তর দেওয়া যায় না। যারা দেয় তারা না বুঝে বলে। হুঁ—পুরো দু বছর লেগেছিল আমার এ-প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করতে—হা-হা।'

কিন্তু আমি তার হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না। অবাক হয়ে ভাবছিলাম সমুদ্র নিয়ে রোগা মানুষটা তা হলে রাত দিনই অনেক কিছু ভাবছে। কুড়ি বছর রাত জেগে ঢেউয়ের গর্জন শুনছে তখন বলছিল না?

'কে রে, আর একটুখানি দিবি।' দোকানের প্রৌঢ় কর্মচারীটির দিকে মামাকে সকাতরে তাকাতে দেখে অবশ্য আমার হাসি পেল। লিভারের রুগী এইমাত্র চা খেয়ে আবার চা চাইছে। হাসলাম এবং এ-ও লক্ষ্য করলাম কর্মচারীর চেহারা নিদারুণ অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। ফিনাইলের ন্যাতা বুলিয়ে সে ওপাশের টেবিলটা মুছছিল। ওখানকার যত মাছি তাড়া খেয়ে আমাদের কাছে চলে এল।

'কি, তুই যেন রাগ করলি নীলাম্বর।' কর্মচারীর মনের ভাব বুঝে ফেলে মামা গলাটাকে আরো করুণ করে ফেলল। 'দে দে—পয়সা দেব, আমি তোদের ক্ষতি করব না। তোর মনিব দু-বেলা দু কাপ বরাদ্দ করে দিয়েছে আমার জন্য—কিন্তু অতিরিক্ত যেটা খাচ্ছি তার জন্য কি আমি দাম দিই না।'

হাতের ন্যাতা ফেলে রেখে নীলাম্বর গজ

গজ করে উঠল। 'আপনার কাছে পয়সা চাইছে কে—আপনার ভাগ্নের দোকান—যত খুশি খেয়ে যান। কিন্তু সময় অসময় আছে তো—এখন বেলা দশটা বাজে, ধোয়া মোছার কাজ করব কি চা বানাব।'

মামা আমার চোখ দেখল।

'বুঝলেন তো। আসলে বীরেন বারণ করেঃ চা চাইলেই মামাকে চা দিবি নে। আমি বুঝি—সাতচল্লিশ বছর বয়স হল এমন সাদা কথাটা বুঝব না! বীরেন এখন আমাকে পছন্দ করে না। না করুক। কিন্তু আমি তার উপকারই করে যাব, তার ভালটাই দেখব; আমি হোটেলের যত বোর্ডার যোগাড় করি—'

কথা শেষ হল না। নীলাম্বর ঠক্ করে পেয়ালাটা মামার সামনে রাখল। চা পেয়ে মামার মুখ উজ্জ্বল হল, তৎক্ষণাৎ একটা চুমুক দিয়ে সরস গলায় বলে চললঃ 'হ্যাঁ, বলছিলাম, তা বলে তোমার এদিকের বিষয় সম্পত্তি, ব্যাঙ্কে বা কি পরিমাণ হার্ড ক্যাশ আছে সে-সবের খোঁজ আমি রাখি না—দরকার নেই আমার রাখবার—আমি ভিখিরি আছি, আছি—আমার যদি ওসবের দিকে নজর থাকত, লোভ থাকত তো নিজে একটা হোটেল বা রেস্টুরেণ্ট খুলে বসতে পারতাম না কি? কুড়ি বছর হল এখানে আছি—না, কিছুই আমাকে টানল না; কিছুই আমার দরকার নেই—খাই না খাই, ছেঁড়া কাপড় পরলাম না পরলাম, একবার চিন্তা করি না—' ক্লান্ত শীর্ণ হাতটা সমুদ্রের দিকে তুলে ধরে মানুষটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'আমি আছি আর সে আছে—আর কিছু চাই না, দরকার নেই।'

হাসলাম আর কেমন যেন একটু শ্রদ্ধার চোখে, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, কবি বা দার্শনিকের দিকে মানুষ যেমন তাকায়, রোগা মানুষটাকে আর একবার দেখে নিয়ে তার মতো আমিও স্থির দৃষ্টি মেলে সমুদ্র দেখতে লাগলাম।

দূরের গাঢ় নীল ফিকে হয়ে গেছে। উজ্জ্বল রৌদ্র বুকে নিয়ে সমুদ্র এখন অন্য রূপ ধরেছে; যেন কিছু গলানো সীসা, কিছু রূপা হয়ে গিয়ে ওদিকের রাশি রাশি জল গর্জন করতে করতে এদিকে ছুটে আসছে। 'লক্ষ্য করেছেন—রূপা ও সীসার সঙ্গে খানিকটা জাফরান রঙের মিশেল আছে।'

মামার দিকে চোখ না ফিরিয়ে আমি ঘাড় কাত করলাম। 'রোদের তেজ যত বাড়ছে তত তার বিক্রম বাড়ছে।' হাসল মামা।

'তাই।' বললাম, 'মেছো ডিঙ্গিগুলো আর দেখছি না।'

'সব উঠে এসেছে।' নাকের একটা শব্দ করে নোংরা দাঁতগুলি ছড়িয়ে দিয়ে লোকটা বুঝি ভিতরের উল্লাস প্রকাশ করল। 'আর কতক্ষণ—এখন ওখানে থাকলে আছাড় মেরে ডিঙ্গি ফাটিয়ে ফালা ফালা করে দেবে না! ওর সঙ্গে কি আর চব্বিশ ঘণ্টা ইয়ার্কি চলে।'

কথাটা বুকের মধ্যে গেঁথে রইল। 'চব্বিশ ঘণ্টা ইয়ার্কি চলবে না বলে তো এখন আর দূরে কাছে একটা মানুষকে জলে নেমে স্নান করতে দেখছি না।' চিন্তা করলাম। বালুতট প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে। বালুর ওপর ভেঙ্গে পড়া শব্দের ঝড় খরতর হয়ে উঠছে। কিন্তু তটের গায়ে আঘাত করেও সে শান্তি পাচ্ছে না, যেন তৎক্ষণাৎ এতটা করে ভালবাসার ফেনা, সান্ত্বনার শুভ্র প্রলেপ বুলিয়ে দিতে এক একটা ঢেউ জল ছেড়ে কতদূর পর্যন্ত উঠে আসছে। মহত্তের যা গুণ! কাউকে আঘাত দিতে নেই, হিংসা করতে নেই; প্রেম—ভালবাসা যত পার বিলিয়ে যাও। বালুর ওপর লুটিয়ে পড়ে সাদা সাদা ফেনার আবেগময় চুম্বন এঁকে দিয়ে ঢেউগুলি আবার নেমে যায়।

'আমার মনে হয়, কাছের জল দেখছেন, বালু ছিটানো ঢেউ।'

মনের কথা লোকটা কি করে টের পেল; অবাক হয়ে ঘাড় কাত করে হাসলাম। 'তাই, ফেনাগুলো দেখছি—যুঁইফুলের মতো সাদা।'

'এখন কিছুকাল ফেনা দেখেই কাটবে, আর ঘোলা জলের মাতলামি।' মামা গম্ভীর হয়ে বলল, 'তারপর আর এখানে চোখ থাকবে না আর ক'দিন পর আপনার চোখ আর কোথাও সরে যাবে।'

দূরের সমুদ্র! আমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কেননা, পাশের মানুষটির গাঢ় দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বর হঠাৎ এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করল যে, কথা বা হাসি কোনটাই যেন তখন মানাত না। চুপ করে দিগন্তে ধূসর নীল বিস্ফারের দিকে তাকিয়ে রইলাম আর গুরুগুরু শব্দ শুনলাম। না, কেবল দেখা নয়, শোনা নয়, বুকের ভিতর কি যেন হাহাকার করে উঠল। যেন আমার কি নেই, হারিয়ে গেছে—না কি সারা জীবন যা চেয়েছি তা আজও পাইনি বলে হৃদপিণ্ড মোচড় দিয়ে উঠল। আমার কানের কাছে অপরিচ্ছন্ন রেখাসংকুল মুখটা সরিয়ে এনে মামা ফিসফিস করে উঠল, 'আপনার রক্তের মধ্যে ওই শব্দ চলে যাবে—মগজের ভিতর ছবিটা আটকা পড়বে—আজ না, ক'দিন তাকিয়ে থাকুন—তখন আর কোনো কাজকর্ম ভাল লাগবে না, চোখের ঘুম উধাও হবে, ক্ষুধা কমে যাবে—'

'ভয়ংকর নেশা।' বিড়বিড় করে বললাম। ভাল লাগছিল, আবার ভয়ও করছিল শুনতে। অত্যন্ত আস্তে কথা বলছিলাম দুজন। যেন এসব জোরে বলতে নেই, অন্যকে শুনতে দিতে নেই।

'ক'দিন আছেন এখানে?'

'সাতদিন—তারপর ছুটি ফুরিয়ে যাবে।' মামার চোখের দিকে তাকাই। যেন বিশ্বাস করতে পারল না আমার কথা, এমনভাবে মানুষটা মাথা নাড়ল।

'হুঁ, ওই সাতদিন চোদ্দদিন হয়ে যাবে—চোদ্দদিন দেখতে দেখতে মাসে গিয়ে দাঁড়াবে—মাস বছর।' একটু থেমে মামা শেষ করলঃ 'আমি চব্বিশ ঘণ্টার ছুটি নিয়ে এসেছিলাম সমুদ্র দেখতে—চব্বিশ ঘণ্টা আজ কুড়ি বছর হতে চলল।'

অবিশ্বাস করার কিছু নেই। ফ্যাল ফ্যাল করে মানুষটাকে দেখছিলাম। একদিন চাকরি করত তা হলে, বিয়ে থা করেছিল কি? কিন্তু সেসব প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছিল না, মনে হল অবান্তর—শুধু সমুদ্র আর সমুদ্রের ধারের রুগ্ন জীর্ণ মানুষটাই সত্য—মাঝখানে আর কিছু নেই, থাকা উচিত নয়; কি, আমারও কি কাল প্রথম রাত্রেই মনে হয়নি যদি আমিও এই গর্জমান স্পন্দমান ভয়ংকর সুন্দরের সামনে হারিয়ে যাই—হারিয়ে যেতে পারতাম—

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় মামা। চোখে মুখে বিরক্তির চিহ্ন। একটু আগের মুগ্ধ আবিষ্ট ভাবটা কেটে গেছে।

'কি হল?' আস্তে শুধাই। কথার উত্তর দিচ্ছি না বলে কি রাগ করল, ভাবলাম—

'নাঃ, মশাই, আর দেখা হল না—ভাল লাগছে না।'

'কেন', জলের দিকে চোখ ফেরাই, তারপর আবার মানুষটার মুখ দেখি। বুঝতে পারি না।

'আপনার ওই যুঁই ফুলের মতো সাদা ফেনার দিকে এখন আর চোখ রাখা যায় না।'

'কেন?' একটা বড় ঢোক গিললাম। একটু হাসতে চেষ্টা করলাম।

'কেন আবার কি, ফুলের ওপর যদি একটা মাছি বসে থাকে আপনার ভাল লাগবে?' অসমান ময়লা দাঁতগুলি ছড়িয়ে দিয়ে লোকটা রীতিমত ভেংচি কাটল: 'কতক্ষণ সেই ফুলের দিকে আপনি তাকাবেন বলুন —ঐ, ঐ দেখুন।' আঙুল তুলে মামা আমাকে সামনের রৌদ্রখচিত সুন্দর বালুতট দেখাল: বালুর ওপর ছুটে ছুটে আসছে দুধ রং ফেনা; নির্জন শূন্য—আর কেউ নেই ওখানে স্নান করতে, ঢেউ দেখতে; না আছে —একজন, একটি মেয়ে; মেঘের টুকরো হয়ে সিল্কের আঁচল উড়ছে, বেণী দুলছে। একটা বেশ বড়মতন ফেনা পর পর দুবার ছুটে এসে ওর আলতা ছোপানো পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিলে। খিল খিল করে হাসছে হেনা। ঢেউ সরে যেতে আবার একটু এগোয়, নুয়ে ঝিনুক কুড়ায়; এবার আগের চেয়েও বড় হয়ে রামধনুর মতো বেঁকে দ্রুত ধাবমান ফেনার উচ্ছ্বাস ওকে আক্রমণ করে—কিন্তু ছুঁতে পারে না, ছুটে যেন শুকনো বালুর ওপর উঠে আসে আর খিল খিল করে হাসে। যেন সমুদ্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেসে ভেঙে কুটি কুটি হতে চাইছে ও।

'ইয়ার্কি করা হচ্ছে, তামাশা চলছে সমুদ্রের সঙ্গে।' আমার দিকে তাকায় না মামা, ওদিকে চোখ রেখে রাগে গজগজ করে। আমি নীরব। লজ্জায় চোখ তুলতে পারছি না। সত্যি তো, এত হাসবার কি আছে, মনে মনে বললাম, সমুদ্র দেখে মানুষ যেখানে বিমূঢ় বিস্মিত সেখানে হেনার এই চাপল্য কত অশোভন, কেমন অসংগত ঠেকছিল! ফুলের গায়ে মাছি—ঢেউয়ের মাথার পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার গায়ে আলতা পরা পা, ঠেকিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার তুলে আনা আর ছুটে পিছনে সরে আসা! উপমাটা মনে প্রাণে আমাকে অনুমোদন করতে হল। রাগে দুঃখে ছটফট করছিলাম। আমার মনের অবস্থা মামা বুঝতে পেরেছিল কি, নিশ্চয় চেহারা দেখে অনুমান করতে তার কষ্ট হয়নি, মুখটা কানের কাছে সরিয়ে এনে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এমন সেজেগুজে জলের কাছে যাওয়াটাও কিন্তু ঠিক না মশাই,—তখনই আপনাকে আমি বলব ভেবেছিলাম।'

যেন একটা সতর্কবাণী, একটা অনিশ্চিত আতঙ্কের ইশারা! পুরো লেন্সের ওপিঠের বিবর্ণ চোখ দুটোর দিকে আমি একবার মাত্র দৃষ্টি বুলিয়ে আবার জলের দিকে চোখ ফেরালাম। 'চলি দেখা হবে।' বিড়বিড় করে বলতে বলতে লোকটা বেরিয়ে গেল। একটু স্বস্তিবোধ করলাম বৈকি তখনকার মতো। সিল্কের আঁচল উড়িয়ে বেণী দুলিয়ে সমুদ্রকে সামনে রেখে হেনার ছুটোছুটি, নির্বোধ হাসি আর একজন না দেখুক, তৃতীয় একটি প্রাণীর চোখে না পড়ুক, মনে মনে আমি তাই চাইছিলাম। একটা বিজাতীয় ক্রোধ, অপরিসীম ঘৃণা বুকের মধ্যে চেপে রেখে চিন্তা করছিলাম রং করা ঠোঁটের বিচ্ছুরিত হাসির বিদ্রূপ ছড়িয়ে কাজল বুলানো চোখের কুটিল কটাক্ষ হেনে প্রমত্ত ভয়ংকর সমুদ্রকে অপদস্থ করার ধৃষ্টতা চিরদিনের মতো থামিয়ে দিতে হেনাকে কী শিক্ষা দেওয়া যায়!

'বুঝলেন মশাই, সুবিধের লোক নয়—ওর সঙ্গে মেলামেশা কম করবেন।' নীলাম্বর। মামা দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে টেবিলের কাপ সরাতে লোকটা এসে পাশে দাঁড়ায়। অবাক হয়ে ওর চোখ দেখি।

'কে, কার কথা বলছ?' প্রশ্ন করতে করতে অবশ্য বুঝে গেলাম কর্মচারীটির এই আক্রোশ কার উপর। যখন তখন চা করে দেওয়ার দুঃখ সে কিছুতেই ভুলতে পারে না নিশ্চয়। অল্প হাসলাম।

'কেন, আমার তো মনে হয় বেশ ভাল লোক, দিনের বেলা সমুদ্র দেখে আর রাত জেগে ঢেউয়ের শব্দ শোনে—ওই তো কাজ ওর।'

'পাজী মশাই, মহাপাজী—বীরেনবাবু ভাল মানুষ বলে দুবেলা দু মুঠ ভাত দেয় —অন্য লোক হলে ওকে ঘাড়ে ধরে কবে বার করে দিত।'

'কেন, হোটেলের বোর্ডার টোর্ডার যোগাড় করে দেয় তো শুনি।' প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু চুপ করে রইলাম। বিষয়ী ব্যবসায়ী বীরেনবাবুর কাছে—তার কর্মচারীর কাছে মাঝে মাঝে দু একটি খদ্দের বা বোর্ডার যোগাড় করে দেওয়ার মূল্য কতখানি! যে লোক সারাদিন বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ায়, সমুদ্রের ঢেউ গুণে সময় কাটায় সে লোক তাদের চোখে মহা অপদার্থ বা পাজী হওয়া বিচিত্র না। 'শালা মাতাল শালা নেশাখোর।' টেবিল সাফ করতে করতে নীলাম্বর নিজের মনে গজগজ করে। কিন্তু বলতে কি, এইমাত্র যে আমার পাশে বসে ছিল —কাছের সমুদ্র আর দূরের সমুদ্রের রহস্য ব্যাখ্যা করতে যার জুড়ি নেই, যার কথা শুনে সমুদ্রকে আরও নিবিড় করে চিনতে চলেছি, ভালবাসতে আরম্ভ করেছি সে মাতাল নেশাখোর জানতে পেরে আমি এতটুকু বিচলিত হইনি। বরং চিন্তা করলাম, মদ বা গাঁজা টেনেও যদি সে নেশা করে, মাতলামি করে সেই নেশা তার কতক্ষণের। বরং বলা যায়, যে-নেশার টানে আজ কুড়ি বছর মানুষটা সব ছেড়ে এখানে পড়ে আছে সেটাই তার আসল নেশা; সেই ভয়ংকর নেশা বুঝতে পারার ক্ষমতা বীরেনের নেই, চায়ের দোকানের কর্মচারী টাকপড়া নীলাম্বরের নেই, হয়তো আর কারোরই নেই; আমি ব্যতিক্রম এবং এইজন্য ভিতরে ভিতরে গৌরববোধ করলাম। কবি শিল্পী সাধকের সংখ্যা এই জগতে খুব বেশী কি? চিন্তা করে নীলাম্বরের চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল সফেন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ উন্মুক্ত সমুদ্র দেখতে, ঝড়ো লোনা হাওয়ার বুক পুড়ে নেশায় আতুর হতে ছুটে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

হুঁ, এক সময় শাড়ির আধখানা ভিজিয়ে বালি মাখানো পা দুটো টেনে টেনে হেনা যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল আমি ঘৃণায় অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আঁচলের খুঁটে আবার এতগুলি ঝিনুক বেঁধে এনেছিল ও; ঘাম তেলতেলে মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল, চোখের কোলের কাজল ফিকে হয়ে গিয়ে সেখানে বুঝি চাপ চাপ ক্লান্তি ঝুলছিল। শিউরে উঠেছিলাম। নারীর এই দলিত মথিত ক্লান্ত বিপর্যস্ত রূপের সঙ্গে কি আমি পরিচিত ছিলাম না, বড় বেশি পরিচিত ছিলাম বলে রৌদ্রালোকিত প্রশান্ত বালুবেলার পবিত্র পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার করে দিয়ে ঝামাপুকুরের বাড়ির গাঢ় রাত্রির নৈঃশব্দগুলি আমার চোখের সামনে ঝুলছিল, বিছানার ছবিটা মনে পড়ছিল। ভয়ে প্রায় চিৎকার
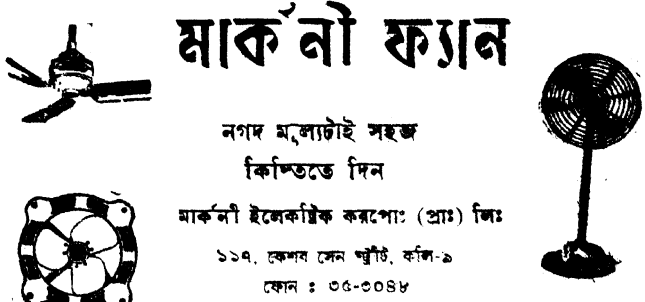
করে উঠেছিলাম; এক মায়াবিনী ডাইনী সমুদ্রের ধার পর্যন্ত আমাকে ধাওয়া করে ছুটে এসেছে!

'তুমি যাও, ঘরে ফিরে যাও!' কণ্ঠস্বরের বিকৃতি নিজের কানেও লাগল, কিন্তু তখন উপায় ছিল না।

'তুমি যাবে না? বেলা হল, কখন খাবে।' চমক নেই ভয় নেই কুণ্ঠা নেই। সেই পরিমিত সংক্ষিপ্ত নিস্তরঙ্গ ধূসর দিনগুলির ডাক। আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। এখানে এসেও খাওয়ার ডাক!

'তুমি যাও, কাপড় চোপড় বদলাবে তো, না কি?' কোনোরকমে উত্তর সেরে গরম বালুর উপর জোরে জোরে হাঁটতে লাগলাম। ঢেউয়ের শব্দে ওর কণ্ঠস্বর চাপা পড়বে চিন্তা করে দূরে সরে গেলাম।

ওর সাধ মিটেছিল। সমুদ্রের মাছ দিয়ে পেট ভরে ভাত খেয়ে নিটোল একটা ঘুমের ভিতর দিয়ে সারাটা দুপুর কাটিয়ে দিতে পেরেছিল। ঢেউয়ের শব্দে ঘুম ভাঙবে ভয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে রেখেছিল। প্রতিবাদ করিনি। কেননা, চোখে জল দেখতে না পারলেও জলের গর্জন আমার রক্তের মধ্যে বাজছিল, জলের ছবি মগজের ভিতর আটকা পড়ে গিয়েছিল। শিয়রের পাশে ঝিনুক শামুকগুলি ছড়িয়ে রেখে ঘুমোচ্ছিল হেনা। ইচ্ছা করছিল সবগুলি তুলে ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিই। কি, আমি সহ্য করতে পারছিলাম না এগুলিও ওর সঙ্গে ট্রেনে চড়ে খুব শিগগিরই কলকাতায় ফিরে যাবে, হাওড়া স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি চাপবে। তারপর এক ছুটে ঝামাপুকুর লেন। তারপর কাচ-পরানো আলমারীর তাক। না, তখন আর হেনার সময় নেই ওদের দিকে তাকাবার। আফিসের রান্না নামছে না। আর একবার একটু জোরে ছড়ছড় শব্দ করে কলের জলটা বন্ধ হয়ে গেল। ছাই রঙা আকাশ। মানুষের গরম নিশ্বাস আর ঘামের গন্ধের মধ্যে ট্রামের এক কোণায় একটু জায়গা। তারপর লিফট-এর সোঁ সোঁ। তারপর? তারপর আর কিছু নেই। সমুদ্র অনেক দূরে। ঢেউয়ের গভীর নিস্বন স্তব্ধ। ঝকঝকে বালির বিছানায় রুপালী ফেনার উচ্ছ্বাস অতীতের স্বপ্ন হয়ে আছে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম। যেন কর্তব্য স্থির করতে পারছি না। হেনার মাথার কাছে দেওয়ালের ছবিটার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকি।

ঘুম থেকে উঠেই সকলের আগে ও খোঁজ করে চিরুনির, চুলের কাঁটার।

'আমি জানি না।'

'পাউডারের কৌটো গেল কোথায়?'

'আমি দেখি নি।'

'বা—রে, আমার লিপস্টিক কাজললতা বা কে সরালে।'

'সত্যি আমি বলতে পারব না।' অনুনয়ের চোখে স্ত্রীর মুখ দেখি। একটু বেশী গম্ভীর থেকে দেওয়ালের ছবিটার দিকে চোখ ফেরাই।

'অবাক কাণ্ড তো! ঘরে কি চোর ঢুকেছিল।' হেনা বিড়বিড় করে; আঙুলের ওপর ভর দিয়ে গলা টান করে উঁকি দিয়ে দিয়ে দেওয়ালের তাক দুটো দেখল ও, তারপর হাঁটু মুড়ে পিঠ বেঁকিয়ে খাটের নীচ দেখে শেষ করল। 'না, কোথাও নেই—ওখানে আলতার শিশিটা ছিল—নেই। বিচ্ছিরি কাণ্ড তো।'

ঘুরে ও আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

মুখের পেশী কঠিন করে আমি মনোযোগ দিয়ে নিজের হাতের নখ দেখি চামড়া দেখি।

'কি হল, তুমি চুপ করে যে?'

'আমি কি জানি?' ভয়ে ভয়ে চোখ তুললাম।

'তুমি লুকিয়েছ, নিশ্চয় তুমি।'

'সত্যি না।'

'উঁহু, আর কে আসবে এঘরে—দরজার ছিটকিনি আটকানো—তুমি চেয়ারে বসে ঢুলছ। শোবার সময় আমি কানের রিং দুটো খুলে টিপয়ের ওপর রেখেছিলাম—দ্যাখো, ঠিক ওখানে রয়ে গেছে। আর চোর এসে কিনা সোনা রেখে আলতা লিপস্টিক নিয়ে গেল। আর, চোর ঢুকবেই বা কি করে।' হেনা আমার কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দেয়: 'তুমি তুমি—দুষ্টোমি করে—' কাজটা কাঁচা হয়ে গেছে। আর গম্ভীর হয়ে থাকাও অর্থহীন, বরং হেসে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ। হাসলাম।

'কোথায় রেখেছ, কি আশ্চর্য—এমন কাজ করে তুমি এতক্ষণ চুপ থাকতে পার!' হাসির ঝলক তুলে হেনা আমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তার আগেই আমি শার্টের নীচে লুকোনো কোলের ওপর জড়ো করা চিরুনি চুলের কাঁটা আলতা লিপস্টিক বের করে দিই। এবার হেনা হাসতে হাসতে মেঝের ওপর ভেঙে পড়ল, এলো খোঁপা ভেঙে গিয়ে চুলের রাশ কালো কালো ঢেউয়ের মতো সাদা নরম পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চট করে চোখটা সরিয়ে নিই, বুকের ভিতর ধাক্কা লাগে, অপরাধী মনে হয় নিজেকে; সেকেণ্ডের জন্যও কি আমি আমার ঘরের কাছের প্রচণ্ড প্রমত্ত যুগযুগান্তের বিস্ময় ভয়ংকর সুন্দর পবিত্র সমুদ্রতরঙ্গকে ভুলতে চেয়েছিলাম। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে জানালার পাল্লাগুলি খুলে দিলাম। হেনা তৎক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে; আঁচল সামলে নিয়ে চিরুনি দিয়ে ও চুল আঁচড়ায়। টের পেয়ে আমি আর ওদিকে তাকাই না।

'হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেলে যে?'

'এমনি।'

'এসব লুকিয়েছিলে কেন?'

'এমনি।'

'এখানে এসে মাঝে মাঝে তোমার কী যে হচ্ছে—তখন বীচ্-এ কত বড় এক ধমক—'

'ধমক দিই নি তো, বলছিলাম তুমি যাও, আমি আসছি।'

'ও, তাই নাকি—আমি ভাবলাম—' হাসির শব্দ।

'কি ভেবেছিলে শুনি।' সমুদ্রকে পিছনে রেখে ঘুরে দাঁড়াতে হল। ঢেউয়ের শব্দ ওর হাসির শব্দে চাপা পড়ে যায়। অনুভব করি মাথাটা আবার গরম হয়ে উঠছে। এমন ভাবে কতকাল চলবে মনে ঠিক করতে না পেরে হতভম্বের মতো ওর মুখ দেখি, শুধু দেখি। সুযোগ পেয়ে নারী অপরূপ ভ্রূভঙ্গি করে: 'তাকিয়ে কী দেখছ?'

'কিছু না।'

'নিশ্চয় দেখছ, আমাকে দেখছ।' প্রতিশোধ তুলতে ঠোঁটের হাসি নিভিয়ে হেনা গম্ভীর হয়ে ওঠে: 'তা আমায় দেখে দরকার কি—দূরে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখ, সমুদ্র আমার চেয়ে সুন্দর।'

এরপর আর আঘাত করা চলে না চিন্তা করে অনুকম্পার হাসি দু চোখে বুলিয়ে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলাম, 'তা সেজে-গুজে কোথায় বেরোনো হচ্ছে।'

'আমি সেজেগুজে বেরোই তুমি চাও না—কেমন, তাই তো এসব লুকিয়েছিলে।' দাঁত দিয়ে ফিতা কামড়ে ধরে ও বেণীর গলায় ফাঁস পরায়, তারপর ফিতাটা মুখ থেকে আলগা করে দেয়: 'না কি এটা কলকাতা না বলে আমার সাজতে গুজতে মানা—এখানে কেবল তুমি আছ আর জল আছে আর তোমার ঐ কুৎসিত দর্শন মামাটি আছে, তাই যথেষ্ট—' একটু চুপ করল ও, হাতের আরশি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সদ্যরচিত খোঁপাটি দেখল, তারপর: 'আমি ভাবতেই পারি না বেছে বেছে তুমি ঐ বাজে চরিত্রের ছোটলোকের মতো দেখতে মানুষটার সঙ্গে কি করে মিশে যেতে পারলে—একটা ঘণ্টা ওর সঙ্গে বসে চায়ের দোকানে গল্প করে কাটালে, আমি কি লক্ষ্য করিনি।'

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদ করলাম না, চুপ করে গেলাম, যেমন তখন চায়ের দোকানের নীলাম্বরের কথা শুনে চুপ

অন্য কোনোখানে

শ্রীনন্দলাল বসু

মুদ্রণ : অনুশীলন প্রেস

থেকেছি। কিন্তু নীলাম্বর না বুঝুক হেনা বুঝত, পৃথিবীর যে মানুষ প্রথম ঈশ্বরের কথা বলতে গিয়েছিল সে বাজে চরিত্রের ছিল, ছোটলোক ছিল, আকাশের গ্রহনক্ষত্রের রহস্য যে বোঝাতে চেয়েছিল সে উন্মাদ ছিল, অপরাধী ছিল—হোটেল-রক্ষক বীরেনবাবুর মামার মুখে সমুদ্র ছাড়া কথা নেই, অগাধ বিস্তৃত ধূসর নীল ছাড়া চোখে আর কোনো রং নেই, স্বপ্ন নেই, কাজেই—

'আমি এখন মন্দির দেখতে যাব, বুঝলে, মন্দির দেখা হয়নি—এ-বেলা আর বীচ্-এ যাব না।'

'তাই যাও।' অস্ফুটে বললাম। আমার গায়ে যেন দক্ষিণের হাওয়া লাগল। এখানে এসে ত্রিশ ঘণ্টা পর আমি নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করতে লাগলাম।

1

আকাশের আলো নিভে যাচ্ছে, সমুদ্র সীসার রং ধরেছে; কাজের সীসা গলে গলে তরল রূপো হয়ে সোঁ সোঁ শব্দ করে অবিশ্রাম ছুটে আসছে। ম্রিয়মাণ রৌদ্রের গন্ধ লবণের গন্ধ গায়ে মেখে ঢেউয়ের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হুহু বাতাস বইছে, আমি নড়ছি না, আমার পিছনের শুকনো বালু উড়ছে। সামনের বালু লোনাজল খেয়ে ভারি হয়ে শুয়ে আছে, বাতাস তাকে নড়াতে পারে না। সেই ভারি ভিজা বালুর ওপর পায়ের দাগ নেই, কোনো দাগ নেই—মসৃণ গাঢ় অকলঙ্ক নিটোল; জল সরে গিয়ে এই বুঝি পৃথিবীর প্রথম মাটি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে মনে করা যায়; আর আমার ঠিক পিছনে কত কোটি পায়ের চিহ্ন পড়ে বালু ক্ষত বিক্ষত—যুবকের পায়ের দাগ যুবতীর পায়ের ছাপ; কত লক্ষ বৃদ্ধ বৃদ্ধা শিশু কিশোর কিশোরী না হেঁটে গেছে এর ওপর দিয়ে। মনে হতে পারে সব মানুষ বুঝি এখানে এসে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গেছে; মনে হতে পারে সব মানুষ সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিল, তারপর যার যেখানে যাবার চলে গেছে। আসলেও কি তাই নয়, ভাবলাম, মানুষ আসে মানুষ যায়, আর নগ্ন নির্জন সমুদ্র একভাবে ফুঁসে চলেছে। তার মধ্যে জীবনের চঞ্চলতা আছে, প্রাণের ঔজ্জ্বল্য আছে, আবার মৃত্যুর নিষ্ঠুর নিরবয়ব অন্ধকার অতলস্পর্শ গর্ভ জুড়ে লক্ষ ষড়যন্ত্রের আবর্ত তৈরী করে চলেছে।

'কি দেখছেন, কাকে খুঁজছেন?'

'আপনাকে।'

'আমি তো এখানেই আছি মশাই', হাল্কা শীর্ণ হাত দুটো আমার কাঁধের ওপর তুলে দিয়ে বীরেনবাবুর মামা হাসল। 'লক্ষ্য করছিলাম সব চলে গেল, অন্ধকার হয়ে গেল, আপনি একলা, ঘুরে ঘুরে জল দেখছেন কেবল।'

'ভাল লাগছে, আবার ভয়ও করছে।' অল্প হাসলাম।

'তা করবে, আরো কিছুদিন যাক, আমার মতো যেদিন আর পিছুটান থাকবে না সেদিন আর ভয় ডর থাকবে না।'

গাঢ় নিশ্বাস ফেললাম। একটা কি পায়ে লাগল।

'ডাব—' মামা নাকের শব্দ করে হাসল, খুব ভাল লাগল না হাসিটা, কিন্তু তা হলেও কথাগুলি শোনার মতনঃ 'কেউ নিবেদন করেছিল আর কি—সমুদ্র দেখতে এলেই তো ফল ফুল ছুঁড়ে দেওয়ার ধুম পড়ে যায়।'

'কিন্তু রাখল না তো উপহার, সমুদ্র আবার ওটা বালুর ওপর রেখে গেছে।' বিড়বিড় করে বললাম।

'সমুদ্র এসব রাখে না—কিন্তু মানুষ কি তা বোঝে!' একটু চুপ থেকে লোকটা আস্তে আস্তে বলল, 'কেন রাখবে আপনিই বলুন—ডাবটার মধ্যে কি আছে—না শাঁস না জল, সবে ফুল কেটে বেরিয়েছিল হয়তো, ওই ফল আপনি খাবেন না—আমিও না। খাওয়া যায় না। কাজেই সমুদ্র ফিরিয়ে দিয়েছে। ফুল? ফুল বেলপাতা, আপনি চিবিয়ে খান, না আমি খাই? কিন্তু মূর্খের দল এসবই ঢেউয়ের মাথায় ছেড়ে দিয়ে ভাবে অনেক কিছু দিলাম।'

'তা তো বটেই।' সায় না দিয়ে পারলাম না।

'পাহাড়ের দেবতা না, মাটির ঠাকুর না—মানুষ হল সাংঘাতিক জীবন্ত একজন কেউ।'

চুপ করে শুনলাম। তারা ছড়ানো আকাশের নীচে কালো জলের অশ্রান্ত গর্জন একথাই কি মনে করিয়ে দিচ্ছে, ভাবলাম। আমি জীবন্ত, আমি ভয়ংকর—

'আমি যখনই বালুর ওপর বেড়াতে আসি পকেটে করে কিছু মাছভাজা, কেক্ পাউ-রুটি বা আর কিছু খাবার নিয়ে আসি।'

হাসছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এত জোরে আমার কাঁধে ঝাঁকুনি লাগল যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হল রোগা মানুষটার শরীরে এত বল!

'কি, বিশ্বাস করছেন না? আমার আপনার মতো তার ক্ষুধা আছে, লোভ আছে, ইচ্ছা রুচি সব কিছু। ওই দেখুন কেমন রাক্ষসের মতো হাঁ নিয়ে ছুটে ছুটে আসছে।'

হাসি মিলিয়ে গেল, বুকের ভিতর দুব-দুব করছিল। গাঢ় জমাট অন্ধকার কেটে ফালা ফালা করে দিয়ে ভয়াল বিশাল ঢেউ এত বড় এক একটা হাঁ নিয়ে ছুটে আসছে, অস্বীকার করবে কে?

'আপনি তখন বলছিলেন যুঁইফুল—সাদা যুঁইয়ের মালা মাথায় জড়িয়ে ওরা আপনাকে আমাকে ভালবাসতে আসে। তা তো বটেই—একটু ভাল করে নজর দিয়ে দেখুন, ফুল কি সাদা শক্ত ধারালো দাঁত ওগুলো।'

অস্বস্তি বোধ করছিলাম। না, আমি মেনে নিতে পেরেছিলাম রুপালী ফেনা না, কোমল ফুল না; ঝকঝকে মসৃণ নিষ্ঠুর কঠিন দাঁতের সারি মেলে ধরে ওরা আসছে, একটার পিছনে আর একটা, আর একটা, আর একটা—আমার পাশের মানুষটা আবার নাকের শব্দ করে হাসছে। যেন খিনখিনে হাসিটা আমার মগজের ভিতর আটকা পড়ে যাবে। মেরুদাঁড়ায় শিহরণ অনুভব করলাম। আমার কাঁধের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিচ্ছে না কেন, মুহূর্তের জন্য তা-ও চিন্তা করলাম।

'কি মশাই, একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন, মুখে রা নেই—খামকা কথা বলছি?'

'না না না।' প্রতিবাদের সুর তুললাম, স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলাম। 'তা তো বটেই। তার ক্ষুধা আছে, লোভ আছে, সাধ রুচি সব—।'

'হ্যাঁ, তাই তো বলছিলাম, ধানদূর্বা বেলপাতাও খাবে না সে— ফুলকচি ভাব পেয়ারাও খাবে না—আমি যখনই বীচ্-এ আসি, পকেটে করে মাছভাজা, সিঙ্গাড়া, রুটি, কেক্, ডিমের বড়া নিয়ে আসি।' চুপ করল মামা। এবার কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নেয় বলে ভাল লাগে। কিন্তু বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে কি যেন ভাবছিল মানুষটা। বালু পার হয়ে দুজন আস্তে আস্তে শক্ত উঁচু তীরের দিকে এগোই। আমিই প্রস্তাব দিয়েছিলাম। রাত হলে হোটেলের গেট্ বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিরুক্তি না করে মামা উঠে আসতে রাজী হয়। অথবা গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে এবং আমাকে সেটা বলতে হবে ভেবে যেন চুপ করে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার আর ঢেউয়ের শব্দ পিছনে রেখে রাস্তার আলোর কাছে এসে গেছি যখন মামা বলল, 'ওই আমার নেশা, সমুদ্রকে খাওয়ানো—ওরা ধান-দূর্বা ফুল বেলপাতা দেয় বলে আমি ওদের মূর্খ বলি, পাগল বলি—উল্টে আমাকে ওরা বলতে ছাড়ে না, হ্যাঁ আমি বাজে—সৃষ্টি-ছাড়া মানুষ; পাজী বদমায়েস, কেউ কেউ বলে—'

'কেন, আপনি তো—' হঠাৎ কি বলতে থেমে গেলাম। আশ্চর্য অনুভব শক্তি লোকটার। আমার চোখে চোখ রেখে হাসল। আলো অন্ধকারে কপালের ভাঁজগুলি খরতর হয়ে ফুটে উঠছিল।

'ঠিক বলেছেন, কারো তো অনিষ্ট করিনি—নিজের খেয়াল নিয়ে নিজে চলি। কিন্তু কি করবেন মশাই, মানুষ তাতেও আপনাকে রেহাই দেবে না। ঠিকই বলেছেন। আমার ভাগ্নে বীরেন। আর সে অনেক পয়সার মালিক আর সেই গরমে আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অবহেলা; হ্যাঁ, আমার ওপর সে চটে আছে কেন জানেন—জানেন না।'

'কাল শুনব।'

'আরে মশাই এ কি সমুদ্রের গর্জন—আজ কাল পরশু, সারাজীবন শুনলেও শেষ হবে না! আমার কথা একটুখানি, ওই বলতে বলতে ফুরিয়ে যাবে, শুনুন। কল-কাতা থেকে অ্যালসেসিয়ানের বাচ্চা কিনে এনেছিল বীরেন। কত আদর যত্ন পয়সা খরচ কুকুরের জন্য। হঠাৎ বাচ্চাটা একদিন হারিয়ে গেল! বিস্তর খোঁজাখুঁজি করা হল পাওয়া গেল না—এখন বীরেন সন্দেহ করছে আমাকে—হ্যাঁ তার মামাকে।'

'কেন? আপনি কুকুর দিয়ে কি করবেন?'

'আর কি।' খিনখিনে নাকের হাসিটা আবার কানের কাছে, মুখের কাছে ছড়িয়ে দিল লোকটা: 'ওই ওখানে দিয়ে দিয়েছি।' গর্জমান অন্ধকার সমুদ্রের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে মামা শেষ করল: 'বীরেন আমাকে দিয়ে বিশ্রী সন্দেহটা করছে—আজ চার বছর—অথচ সে জানে, ভাল করে জানে, মাছটা ডিমটা রুটি-কেকটা ছাড়া অন্য কিছু আমি কোনো দিন ওকে খেতে দিইনি। আচ্ছা চলি মশাই, কথায় কথায় অনেক রাত হল।'

আজ আমাকে স্বীকার করতেই হবে। একটা কিছু আমার মধ্যে সংক্রামিত করে দিতে পেরেছিল লোকটা। আবার সারা রাত জেগে কাটালাম। বাইরে অন্ধকার বালুর ওপারের শব্দের ঝড় যত না শুনেছি, লোভী নিষ্ঠুর অতৃপ্ত অশান্ত ঢেউয়ের দাঁতালো ভয়ংকর চেহারা যত না দেখেছি তার চেয়ে আমি বেশি দেখেছি আমার বিছানায় কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা একটা নরম তুলতুলে শরীর। আলোটা জ্বলছিল। ইচ্ছা করে জ্বালিয়ে রেখেছিলাম। তা নিয়েও অবশ্য রাগারাগি হয়ে গেছে। আমি আমার ভাতের থালা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। হেনার খাওয়া আগেই হয়ে গিয়ে-ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল ও। মন্দির দেখতে বিস্তর হাঁটতে হয়েছিল: 'ক্লান্ত।'

'তুমি খেয়ে নাও।'

'তুমি?'

বিরক্ত হয়ে হাত তুলে তাকে চুপ করতে বলেছিলাম। যেন কথা বললে আমার বাইরের সোঁ সোঁ শব্দ শোনার ব্যাঘাত হবে। হাসছিল ও। 'রাত বারোটা পর্যন্ত বীচ্-এ কাটিয়ে এসে এখনো তোমার জানালায় দাঁড়িয়ে জল দেখতে হবে, ঢেউয়ের গর্জন শুনতে হবে। উঃ, আমার তো একদিনেই ক্লান্তি লাগছে—জল কত দেখা যায়—ওই একঘেয়ে শব্দ কত শোনা যায়।'

'চুপ চুপ—তুমি খেয়ে নাও।'

অগত্যা ও খেয়ে নিয়েছিল। খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। আমার জন্য চোখ বুজতে কষ্ট হচ্ছিল টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার তখনো খাওয়া হয়নি, ঘর অন্ধকার করতে বলতে পারে না। ওর একটা পা বিছানার ওপর টান করে ছড়িয়ে দেওয়া। আর একটা পা তুলে রেখেছিল। শায়ার লেস্ হাঁটুর কাছে উঠে গিয়েছিল। হাঁটুটা একটু একটু করে আন্দোলিত করছিল ও, আর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলোর ডুমটা দেখছিল, আমাকে দেখছিল। হাঁটু তুলে রাখার দরুন পায়ের নরম মাংসল ডিমের ছবিটা আমার চোখে পড়েছে, দুবার চোখে পড়েছে; কি, তখন থেকেই আমার মাথাটা গরম হচ্ছিল। আমার মগজের ভিতর সমুদ্র ফুঁসে মরছে, সাদা ঝকঝকে ধারালো দাঁতের হাঁ নিয়ে অসংখ্য ঢেউ ছুটে ছুটে আসছে, আর সাদা ধবধবে শায়ার নীচে হেনার পায়ের নরম মাংস কাঁপছিল। আর ঠিক তখনই কিনা ও হাই তুলে ঘুমের ছোপ-লাগা লালচে চোখ দুটো করুণ করে আমার দিকে মেলে ধরে বলছিল, 'ওই বাজে লোকটার সঙ্গে মিশে মিশে তোমার এমন হয়েছে— জলের নেশা ধরে গেছে।'

উত্তর করিনি। মহৎকে ভালবাসতে, বিরাটের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দিতে সংযম অভ্যাসের দরকার, যেন চিন্তা কর-ছিলাম; তাই হেনার কথায় কান দেব না বলে চুপ করে ছিলাম। কিন্তু ও চুপ থাকেনি আবার কথা বলছিল। ঘুমের জলে ভিজে ওঠা ভার ভার কথা: 'ভয়ংকর নিষ্ঠুর ওই মামা লোকটা, পাশের ঘরের মহিলা বল-ছিলেন, ওর সঙ্গে আপনার কর্তাকে মিশতে দিচ্ছেন কেন।'

আমার সংযম আর রইল না। পাশের কামরার মহিলার সংগে হেনা মন্দির দেখতে গিয়েছিল মনে পড়ল।

'তোমার ঘুম পেয়েছে তাই আবোল তাবোল বকছ, আমি খেয়ে আলো নিবিয়ে তোমার পাশে শুয়ে পড়ি তাই চাইছ।'

ধমক দিয়ে উঠেছিলাম। লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠেছিলাম।

'কেন নিষ্ঠুর কেন, কি করেছে ও!' ছুটে বিছানার কাছে চলে গেছি। ধমক খেয়ে, আমার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে চুপ করে ছিল ও। না কি সমুদ্র-পাগল সৃষ্টিছাড়া লোকটার নিষ্ঠুরতার কথা আমার কানে তুলতে নেই, পাশের ঘরের মহিলার সেরকম কিছু নির্দেশ ছিল? কথাটা পরে চিন্তা করেছি। হেনা আর চোখের পাতা খুলেছিল না। আমি রাগ করে ভাতের থালা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলেছি। আলোটা তেমনি জ্বলছিল। গজ গজ করছিলাম: 'এটা কলকাতার বাসা না—সকাল সকাল খেলাম আর ঘর অন্ধকার করে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। তবে আর বাইরে বেড়াতে আসা কেন।' শেষের কথাটা নরম গলায় বলেছিলাম। কিন্তু বেচারা আর চোখ খোলেনি। তাই চাইছিলাম। আলো জ্বলেছিল। জানালার বাইরে অন্ধকার সমুদ্র গোঁ গোঁ করছিল। আমার মাথায় তখন একটা কুকুর ছানা, নরম মাংস। আমি পরিষ্কার দেখছিলাম হোটেল থেকে ওটাকে চুরি করে নিয়ে বীরেনবাবুর মামা সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছে। অট্টহাসা করে সকলের বড় ঢেউটা ছুটে এসে ওটাকে তুলে নিয়ে গেল। তাই বলছিলাম, রোগা মানুষটা আমার রক্তের মধ্যে কি যেন সংক্রামিত করে দিয়েছিল, না হলে বাইরের উন্মত্ত অশান্ত গর্জন শুনতে শুনতে নেশাতুরের মতো আমি এক সময় বিছানার কাছে সরে যাব কেন। হেনার পায়ের নরম মাংসল ডিমটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছিলাম, যেন কতটা নরম নখ বসিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, ঘুমের মধ্যেই যন্ত্রণায় ও উঃ করে উঠেছিল, তখনি হাত সরিয়ে এনেছি যদিও।

পরদিন খুব সকালে উঠে হেনা কোন্ এক সাধুবাবার আশ্রম দেখতে বেরিয়ে গেল। সম্ভবত পাশের ঘরের মহিলাও সংগে গেল। মনটা হাল্কা লাগছিল। রাত্রির ওই ঘটনার পর কেমন করে ও আমার দিকে তাকাত, আমি ওর দিকে তাকাতাম—সেই সমস্যা ভোরের নরম আলোয় ওর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সংগে সংগে মিটে গেল। ঘরের দিক থেকে মন হাল্কা লাগছিল, কিন্তু বাইরের ছবি দেখে মন ভার হয়ে রইল। আকাশের চেহারা মেঘে মেঘে মন্থর বিষণ্ণ হয়ে আছে। সমুদ্রের রঙেরও পরিবর্তন নেই। কোথায় সেই সবুজ ছোপ, নীল নয়নাভিরাম ময়ূরকণ্ঠী রং, রুপালী ঢেউয়ের ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল জাফরান ছটা! দূরের জল কাছের জল এক রং—ছাই রং। যেন সেইজন্যই সমুদ্রকে আরো ভয়ংকর লাগছিল। হাসি উচ্ছ্বাসের বালাই নেই—কেবল ক্রোধ, কেবল গর্জন আলোড়ন ছাড়া আর কিছু জানে না সে। কিন্তু আমার মন আরো খারাপ লাগছিল লোকটাকে একবারও কোথাও দেখতে পেলাম না বলে। না কি সমুদ্র যেদিন এই চেহারা ধরে সেদিন মামা তার ধারে কাছে থাকে না—কেবল রৌদ্রের দিনের মুহুর্মুহু রং ফেরার রহস্য বলতে, কি রাত্রির অন্ধকারের হিংস্র উন্মত্ত কোলাহলের অর্থ খুঁজে বার করতে তার উৎসাহ? কোথায় গেল! বালুর ওপর অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলাম। একবার পূর্বে, পশ্চিমে অনেক দূর হেঁটে গেলাম। কেউ নেই। সমুদ্র আজ মেজাজ খারাপ করে আছে দেখে স্নান করবে দূরে থাক মানুষ যেন জলের কাছে ঘেঁষতেই সাহস পাচ্ছে না—একটি দুটি মুখ দেখা গেল, ঢেউয়ের অবস্থা দেখে দূরে থেকেই তারা বিদায় নিয়েছে। মাছ ধরতে জেলেরা আসেনি। মামাকে পাওয়া

গেল না। হতাশ হয়ে এক সময় সেই চায়ের দোকানে ফিরে এলাম। না, সেখানে নেই। আজ চা খেতেই আসেনি বীরেনবাবুর মামা। 'হয়তো রাত্রে খুব টেনেছিল এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।' চা তৈরী করতে-করতে নীলাম্বর বলছিল, 'নেহাৎ মামা—তাই পারছে না, না হলে কবে বাবু জুতো পেটা করে বেটাকে তাড়িয়ে দিত।' কান ছিল না তার কথায়; উদাস শূন্য চোখে বিবর্ণ ঢেউ-গুলির মাতামাতি দেখছিলাম। আমার পাশে একটা লোক নেই—কানের কাছে মুখ এনে এগিয়ে খাওয়া ময়লা দাঁত বের করে কথা বলছে না। তাই সমুদ্রকে অপরিচিত ঠেক-ছিল, দুর্বোধ ঠেকছিল। দুদিনেই মানুষটা আমাকে সমুদ্রের কত কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আজ একটা সকালের মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। যেন আর পাঁচ জনের চোখ দিয়ে আমি জল দেখছি জলের একঘেয়ে শব্দ শুনছি। যেন আর একটা বেলার মধ্যেই আমি হেনার মতো 'বোরিং' বলে সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেব। হয়তো আর যে কদিন আছি বাঁচ্-এ বেড়ানোর কথা ভুলে গিয়ে ঘুরে ঘুরে মঠ মন্দির আশ্রম দেখব। মুখের ভিতরটা তেতো তেতো ঠেকছিল। দূরের ধূসর রেখাটা ক্রমে কালো হয়ে আসছে। গুরুগুরু শব্দটা, গভীর—মন্থরতর হয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। হাওয়ার বেগ বাড়ছে, ওপরের মেঘ ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে। ঝড় উঠল কি? কিন্তু বললে কেউ বিশ্বাস করত না, আমি চায়ের দোকানের বেঞ্চির ওপর বসে তখন ঢুলছিলাম।

কতক্ষণ এভাবে বসে বসে ঘুমোচ্ছিলাম কে জানে; বোধ করি নীলাম্বরের পেয়ালা পিরিচ ধোয়ার শব্দে এক সময় ধড়মড় করে জেগে মেরু দাঁড়া টান করে সোজা হয়ে বসলাম, আর তখন চোখের পাতা টান টান করে মেলে ধরে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে আমি বাইরেটা দেখলাম; স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল; এক ফোঁটা মেঘ নেই আকাশে, হাওয়ায় সব ঝেঁটিয়ে কোনদিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে—একটা প্রকাণ্ড নীল পেয়ালা উপুড় হয়ে আছে মাথার ওপর, সামুদ্রের ওপর, আর সেই পেয়ালা থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে চাঁপা রঙের রৌদ্র। আর সেই রোদ শুষে নিতে লুঠ করে নিতে ঢেউদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে; তারা কলরব করছে, ছুটছে; ঠেলাঠেলি করে একে অন্যের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে ফেটে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে রূপোর গুঁড়োর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। মাঝখানে সবুজের ছোপ। দূরের জল কোমল নীল; যেন দিগন্ত ছুঁয়ে আছে বলে নীল পেয়ালা থেকে চুঁইয়ে পড়া সবটুকু আলো শুষে নিতে পেরে ওখানের জল শান্ত গম্ভীর হয়ে আছে।

এখন হয়তো মামাকে দেখতে পাব। তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বালুর ঢালু বেয়ে খানিকটা ছুটে আর এগোতে পারলাম না, পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেল। নিজের চোখ দুটোকে আবার যেন বিশ্বাস করতে বাধছে; ওপরে রৌদ্র-গাঢ় স্তব্ধ আকাশ, সামনে ফেনশীর্ষ লক্ষ লক্ষ ঢেউ, ডাইনে বাঁয়ে পিছনে উত্তপ্ত প্রখর ঝকঝকে বালুরাশি—আর কেউ নেই, আর কিছু চোখে পড়ল না; কেবল একজন—একটি মূর্তি। বেণীটা দুলছে, শরতের এক টুকরো সাদা মেঘ হয়ে আঁচলটা উড়ছে। কি, একবার আমার মনে হল সমুদ্র, আকাশ ও মরুভূমির মতো বিশাল বালুবেলার এই নগ্ন নির্জন ভয়ংকর সুন্দর পরিবেশ ছাড়া আর কোথাও ওকে মানায় না—মানান উচিত না।

হেনা খিলখিল করে হাসছে। এত বড় একটা ফেনার ঝলক ওর পায়ের কাছে ছুটে আসে; আলতা পরা পায়ের পাতা ভিজে যয়। যেন ইচ্ছা করে ফেনার দুধে ও-পা ডুবিয়ে রাখছে। কাল তা করেনি, পারেনি, সাহস পায়নি—ঢেউ ছুটে আসার আগে ও ছুটে পালিয়ে এসেছে, ভ্রুকুটি করেছে সমুদ্রকে, ঢেউ সরে যেতে ঝিনুক কুড়িয়েছে। আজ অন্যরকম। ঝিনুকে কুড়োতে মন নেই, জলের স্পর্শে ওর বুঝি রোমাঞ্চ জাগছে; অসহ্য পুলকে হেনা হাসছে। ভাল লাগল দেখে। আমার মনে পড়ে না, প্রথম রাতে আমার স্পর্শ—পুরুষ-স্পর্শ এত আনন্দ দিতে পেরেছিল তাকে। শায়াশাড়ি কুঁচকে দলা করে হাঁটুর কাছে তুলে ধরেছে ও। নিটোল সুবলিত সোনার রঙের পা দুটো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার মনে পড়ে না, এখন, বালির বিছানায়, ঢেউয়ের মুখে ওর পা দুটো যেমন সুকুমার লোভনীয় চেহারা ধরেছে আমাদের ঘরের বিছানায় তার হাজারভাগের এক ভাগ সুশ্রী লাবণ্যযুক্ত মনে হয়েছে কোনোদিন। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল, যেন নেশা ধরতে আরম্ভ করেছে আমার, টের পেলাম। একটু একটু করে এগোই। হাঁটু থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত সুঠাম বাঁকা রেখায় কামনার আশ্চর্য রামধনু ফুটিয়ে হেনাও জলের দিকে পা বাড়ায়।

'আর একটু—আর এক পা এগিয়ে যাও।'

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ও ফিক করে হাসল।

'ভয় করে।'

'আমি আছি ভয় কি।

তুমি আমার হাত ধর।'

আমি ওর হাত ধরলাম।

'ইস কত বড় ঢেউ!' ভয়ে চোখ বোজে ও।

'ঢেউ এখানে আসছে নাকি।' ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে ওকে সামনের দিকে ঠেলে দিই। মুঠ আলগা করি না যদিও, কেননা আঁকশির মতো বাঁকানো শক্ত আঙুলগুলি দিয়ে আমি বার বার ওর বাহু ও গ্রীবার নরম মসৃণ মাংস অনুভব করছিলাম, অনুভব করতে ভাল লাগছিল। বালুর শেষ প্রান্তে চলে গেছি আমরা। আমাদের সামনে শুধু সমুদ্র ছাড়া আর কিছু নেই; সাদা কঠিন হিংস্র দাঁতের হাঁ নিয়ে সোঁ সোঁ করে ছুটে আসছে ঢেউ, পিছনে আর একটা, আর একটা...

'এই করছ কি!'

ভয়ে আঁতকে ওঠে ও, যেন হৃদপিণ্ডের ধাক্কা আমার হাতে এসে লাগে। 'একেবারে ছেলেমানুষ!' নরম গলায় ধমক দিলাম, 'আমি তো ধরে রয়েছি ভয় কি—'

'না না'—যেন হেনার হঠাৎ কি মনে পড়ে, বিদ্যুতের মতো শরীরে ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে ও ঘুরে দাঁড়ায়, আমার চোখ দেখে, তারপর বুঝি আমার পিছনে বালুর দিকে চোখ পড়তে ও রীতিমত আর্তনাদ করে ওঠে: 'যা ভেবেছি তাই, ওই তো শয়তান দাঁড়িয়ে আছে, হাসছে—ওর পরামর্শ শুনে তুমি এমন কাজ করতে চাইছ—'

'কি রকম—' অস্ফুট ভয়ের গলায় বলতে গেছি, তার আগেই হাতের মুঠ ছাড়িয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে হেনা ওপরে উঠে গেল; এবার আমি ঘুরে দাঁড়াই। হেনা কাঁপছে, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখ, যেন চোখে জল এসে গেল। আর তখন লক্ষ্য করলাম কালো রুগ্ন অপরিচ্ছন্ন চেহারার সেই মানুষটা—বীরেনবাবুর মামা হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। আমাদের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের দেখে সে হেসেছিল কি? জানি না। দেখলাম দড়ি দিয়ে বাঁধা একতাল কাঁকড়ার মতো কি যেন হাতে ঝুলিয়ে লোকটা ওপরে উঠে যাচ্ছে।

মনে আছে সেই সন্ধ্যায় ট্রেন যখন সাক্ষী-গোপাল স্টেশনে এসে দাঁড়ায় তখন আমি স্বাভাবিক হতে পেরেছিলাম, সহজ হতে পেরেছিলাম। হেনার হাতে মিষ্টির ঠোঙাটা তুলে দিয়ে বললাম, 'কিন্তু তুমি আমার বলতে পারতে, জানিয়ে দিতে পারতে লোকটা এমন ভয়ংকর নিষ্ঠুর—স্ত্রীকে সমুদ্রে ঠেলে দিয়েছিল।'

হেনা হঠাৎ উত্তর করল না, জানালার বাইরে অন্ধকার দেখল, তারপর আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে মৃদু হাসল: 'বলিনি—বলতে ভয় করছিল—কি জানি যদি ওর রোগের ছোঁয়াচ তোমাকে পেয়ে বসে—' একটু থেমে পরে ও বলল, 'সমুদ্র দেখে এমন পাগল হয়ে উঠেছিলে!'

চুপ থেকে জানালার বাইরে চোখ রাখলাম। অস্বীকার করব কেমন করে। সত্যি কি আমার মধ্যে একটা কিছুর সংক্রমণ আরম্ভ হয়েছিল না। আর ঢেউয়ের গর্জন নেই। ঝিঁঝি ডাকছিল। ঝিঁঝির ডাক ও নারিকেল পাতার মৃদু মর্মর শুনতে শুনতে নিশ্চিন্ত হয়ে সিগারেট ধরালাম।

আমরা তখন কত ছোট। পণ্ডিতের পাঠশালাটা তখন সবে প্রাইমারী ইস্কুল হয়েছে। কেউ যখন জিগ্যেস করত, বেশ বুক ফুলিয়ে বলতাম, ইস্কুলে যাচ্ছি। 'পাঠশালা' বলতে লজ্জা হত। কিন্তু মাস্টার মশাইকে গাঁয়ের সকলের মতই 'পণ্ডিত' বলতাম।

ইস্কুল বসত রায়দের বৈঠকখানায়, মাদুর-বিছনো মেঝেতে নয়, কাঁঠালকাঠের বেঞ্চি আর ডেস্কে।

ইস্কুলের সামনে নতুন পুকুর। কবে নতুন ছিল কে জানে, জ্ঞান হয়ে অবধি কচুরীপানা আর দামশ্যাওলার বুকে থাকা পুরনো চেহারাটাই আমরা দেখে আসছি। মাঝে মাঝে শুধু শালুক ফুটত, চাটুজ্জেদের গৌরীর খোঁপা-বাঁধা মাথাটার মত গর্বে খাড়া হয়ে উঠত দু-দশটা কচুরীপানার ফুল। কচুরীপানার ফুলের রঙটা বড় সুন্দর লাগত আমার। নীলচে বেগুনী ঝকঝকে রঙ, আর গড়নটা কী সুন্দর। চাটুজ্জেদের কাছারি বাড়ির একটা ঘরে ধুলো-ঢাকা একটা ঝাড়লণ্ঠন দেখেছিলাম, ঠিক সেই ঝাড়লণ্ঠনটার মত।

পণ্ডিত আমাদের আঁক কষতে দিয়ে হাটে যেত। আর আমরা হুল্লোড় শুরু করতাম। আচমকা চুপ করতাম এক-একদিন, পণ্ডিত মশাইকে আসতে দেখে। রায়দের বৈঠকখানাটা ছিল গাড়া গাঁথনি। কাদা দিয়ে বসানো ইঁটের দেয়াল, তার গায়ে কলিচুনে

ঝাপটা। আর পিছনে ছিল পণ্ডিতের বাড়ি—কাদার দেয়াল, খড়ের ছাউনি। দরকার পড়লেই পণ্ডিতমাসী এসে বলত, "সিধরের দোকান থেকে এক ছটাক তেল এনে দে না বাবা!" কিংবা তেজপাতা, মরিচ।

এনে দিতাম। তারপর ঠায় বসে থাকতাম নতুন পুকুরের দিকে তাকিয়ে। খোলামকুচি ছুঁড়তাম লুকিয়ে লুকিয়ে, আর বলতাম, "দেখলি, একটা মাছ ঘাই মারলো, খুব মাছ আছে পুকুরটাতে।"

ছিপ নিয়ে বসতাম ছুটির দিনে। কোথায় মাছ! জীবনে কেউ -পানা সাফ করায়নি, পোনা ফেলেনি। মাছ হবে কোত্থেকে!

হোক বা না-হোক, আরেকজন এসে ছিপ নিয়ে বসত। চাটুজ্জেদের অবনীজ্যাঠা। আমরা বলতাম বুনোজ্যাঠা। সবাই বলত। বুনো নাম হয়েছিল কেন, জানি না। হয়ত একমুখ দাড়ি-গোঁফ আর নোংরা শতচ্ছিন্ন জামাকাপড়ের জন্যে।

নতুন পুকুরের ওপাড়েই দেওয়ান-বাড়ি। চাটুজ্জেদের কে কবে দেওয়ান হয়েছিলেন, তিনিই বানিয়েছিলেন ওই বিরাট দোতলা দালানটা। এত বড় দালান এ তল্লাটের কোন গাঁয়েই ছিল না। সারি সারি জানলা, সারি সারি দরজা। আর কপাটগুলো যেমন বড়, তেমনি মজবুত। কাঠের ওপর অসংখ্য লোহার গুলি বসানো। কিন্তু সংস্কারের অভাবে চাটুজ্জেদের এই কাছারি-বাড়ির অর্ধেক ঢেকে গিয়েছিল ঝোপ-জঙ্গলে। উত্তরের ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়েছে একটা অশথ-গাছ। পুবদিকটার খানিকটা ভেঙে পড়েছে, রাশি রাশি ইঁট স্তূপীকৃত হয়ে আছে। বৃষ্টিতে ভিজে, শ্যাওলা পড়ে ইঁটগুলোর রঙ হয়ে গিয়েছিল কালো। রাত্তিরে হঠাৎ ঢিবিটা দেখলে ভয় করত, গা ছমছম করত।

ভয়ে গা ছমছম করবার মতই দেখাত দেওয়ানবাড়িটা। সন্ধ্যের পর আলো জ্বলতে দেখা যেত না। এত বড় বাড়ি—তার মালিক বুনোজ্যাঠা। বুনোজ্যাঠা, তার বউ—আমরা অবশ্য জ্যাঠাইমা বলতাম না, বলতাম চাটুজ্জেবউ, আর তার দুটো ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে গৌরী।

বাড়িটার গহ্বরে কোথায় কোন্ প্রান্তে যে ওরা থাকত, একটা হারিকেন লণ্ঠন জ্বলত কি জ্বলত না, আমরা আলো দেখতে পেতাম না কোনদিন। শুধু এক-একদিন রাত্তিরে দেওয়ান বাড়ির দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে আসত—ঠুকঠুক, ঠুকঠুক।

কেউ বলত ভূত, কেউ বলত পেঁচা, নয়ত চামচিকে। চামচিকে ছিলও অবশ্য অগুনতি। দুর্গন্ধে বাড়ির ভেতর ঢোকে কার সাধ্যি!

যে কারণেই শব্দটা হোক না কেন, সন্ধ্যের পর আমরা আর ওপথ দিয়ে হাঁটতাম না। পাড়াগাঁয়ে এমনিতেই সন্ধ্যের পর নিষুতি রাত, চারিদিক নিস্তব্ধ। তার ওপর যদি ছায়া-ছায়া দৈত্যের মত ওই পোড়ো বাড়িটা থেকে ঠুকঠুক ঠুকঠুক শব্দ ভেসে আসে, ভয় পাবারই কথা।

দিনের বেলায় অবশ্য ভয় করত না। দু-একজন মুনিষ-মানুষ ঢুকত বাড়িটায়, বেরিয়ে আসত। বুনোজ্যাঠাকে দেখতে পেতাম, গৌরীকে।

গৌরীর এক ভাই দেপুরের বড় ইস্কুলে পড়ত, বোর্ডিংয়ে থেকে। কদাচিৎ আসত সে, ছুটিছাটায়। আরেক ভাই পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে ডাংগুলি খেলত, বিড়ি খেত, জুয়া খেলত মেলার সময়।

গৌরী মেয়েটাকে আমার খুব ভাল লাগত। ডুরে শাড়ি, দু হাতে একগাছা করে রুলি, কানে মাকড়ি। কিন্তু নাকটা টিকোলো ছিল বলে খুব রাসভারী লাগত। কেমন যেন গরবিনী গরবিনী ভাব ফুটত ওর গরবিনী পোশাকেও।

বলতো, আমরা ত বড়লোক!

বড়লোক কাদের বলে, কত টাকা থাকলে বড়লোক হয়, আমি তখন জানতাম না। তবে চাটুজ্জেরা যে বড়লোক তা বুঝতাম। কারণ, অত বড় দালান ও-তল্লাটে আর-একটাও ছিল না। পোড়ো বাড়ি হলেও দোতলা দালান ত বটে। তাছাড়া শুনতাম, ওদের নাকি অনেক সোনাদানা লুকনো আছে সিন্দুকে! কোন্ নবাবের দেওয়ান ছিল ওদের বংশের কে যেন, সেই থেকেই নাকি ওরা বড়লোক।

বিশ্বাসও করতাম। তবু মনে হত, বুনোজ্যাঠা বড্ড কঞ্জুষ। এত টাকা তার, অথচ এমন নোংরা ছেঁড়া পোশাক পরে কেন! আর একদিকের দেয়াল ভেঙে পড়ায় ছাদের আধখানা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে যখন, সারিয়ে নেয় না কেন! রাজমিস্ত্রী না পাওয়া যায় বোশেখ মাসে যখন দল বেঁধে ঘরামীরা আসে, দড়ি কাস্তে হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি টহল দিয়ে যায়, তখন তাদের দিয়ে খড়ের ছাউনিও ত করিয়ে নিতে পারে। আর কিছু না হোক, বৃষ্টি ত আটকাবে।

কিন্তু সে-সব দিকে লক্ষ্যই ছিল না বুনো-জ্যাঠার। এমন কী মাঠে চাষ দেখতেও যেত না।

বলত, ও-সব আমার পোষায়, হাজার হোক দেওয়ান বাড়ির ছেলে আমি।

শুনে সবাই ঠোঁট টিপে হাসত, আড়ালে ঠাট্টা করত।

বুনোজ্যাঠা ভ্রূক্ষেপও করত না। হয় ছিপ নিয়ে বসত নতুন পুকুরের পাড়ে, আর নয়ত বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াত, ইঁটের পাঁজার ওপর দিয়ে।

ভোরবেলায় বিশেষ করে, প্রায়ই দেখতাম বুনোজ্যাঠা কী যেন খুঁজছে ভেঙে-পড়া ইঁটের পাঁজায়।

একদিন সকালে নিমের ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে বুনোজ্যাঠাকে দূর থেকে দেখে এগিয়ে গেলাম। দেখি না, কী খুঁজছে ভাঙা ইঁটের স্তূপে!

বুনোজ্যাঠা আমাকে বোধ হয় দেখতেই পায়নি। হঠাৎ চমকে উঠল আমার পায়ের শব্দে, ফিরে তাকাল, আর এমন ভাবে তাকাল আমার দিকে, যেন ভয় পেয়েছে।

তারপরই পাগলের মত ছুটে এল আমার কাছে।

মুহূর্তের মধ্যে একটা লোকের চেহারা যে এত বদলে যেতে পারে ভাবাই যায় না।

চোখ দুটো লাল ছিল, আরো বড় বড় হয়ে উঠল। তার সারা শরীর যেন তখন ফুলে ফুলে উঠছে।

ছুটে এসেই পাগলের মত চিৎকার করে উঠল।—বেরো বেরো, বেরো এখান থেকে।

একটা কী বিচ্ছিরি গালাগালও দিল বোধ হয়।

আমি ত হতভম্ব। লোকটা কি বদলে গেল নাকি? এত চেনাজানা, ও-বাড়িতে কতদিনের যাওয়া-আসা, ছিপ ফেলে পাশা-পাশি বসি, কত কথা বলে অন্য সময়, আর সেই মানুষ হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেন।

বললাম, বুনোজ্যাঠা, আমি! আমি মিতু।

কিন্তু বুনোজ্যাঠার মুখের ভাব বদলাল না এতটুকু। আমাকে ধাক্কা দিয়ে আরেকটু হলে হয়ত ফেলেই দিত।

কিছু বুঝতে না পেরে আমি সরে এলাম। চোখ ঠেলে অভিমানে জল এল। চলে আসতে আসতে একবার পিছন ফিরে তাকালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখাচোখি হল গৌরীর সঙ্গে। দেখলাম, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গৌরী। চোখোচোখি হতেই হাতের ইশারায় আমাকে চলে যেতে বলল।

চলে এলাম বটে, কিন্তু রহস্যটা গেল মনের মধ্যে। বুনোজ্যাঠা হঠাৎ আমাকে দেখে চমকে উঠল কেন? ভয় পাবারই বা কি ছিল।

আর রেগে গিয়ে আমাকে তাড়িয়েই বা দিল কেন?

পাড়াগাঁয়ের ছেলে, জন্ম থেকে ভূত আর খুনখারাবির গল্প শুনে আসছি। তাই আমার হঠাৎ মনে হল, বুনোজ্যাঠা নিশ্চয় একটা খুনটুন করেছে। ওই ইঁটের পাঁজায় লুকিয়ে রেখেছে খুন করে।

কিন্তু কাকে খুন করল? চাটুজ্জেবউকে?

দূর থেকে বার বার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, চাটুজ্জেবউকে দেখা যায় কিনা! বেঁচে আছে কিনা!

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা গোপন রাখতে পারলাম না। দু-একজন সঙ্গী-সাথীকে বলে ফেললাম সকালের ঘটনাটা। ওরাও বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করল।

বললে, উঁহু, চাটুজ্জ্যেবউ বেঁচে আছে। ও নিশ্চয় অন্য কাউকে খুন করেছে। সকালে ওই ইঁটের পাঁজায় রোজই ত বুনোজ্যাঠা ঘুরে বেড়ায়।

তবে?

ঠিক করলাম, ও-বাড়িতে ভূতই থাক্ আর দৈত্যদানোই থাক্, রাত্তিরে গিয়ে দেখব ত, কী ব্যাপার।

রতি ছেলেটা পড়ত আমাদের সঙ্গে, কিন্তু বয়সে ছিল তিন-চার বছরের বড়। ও হাটের নাপিতকে ডেকে লুকিয়ে দাড়ি কামাত, চেহারাটাও ছিল লম্বাচওড়া। দুবেলা মুগুর ভাঁজত, ভিজে ছোলা খেত।

সব শুনে রতি বললে, ঠিক আছে, যাব আজ রাত্তিরে। দেখবো কী ব্যাপার।

এমনিতেই রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া সারতে দেরি হত আমাদের। আর খাওয়ার পরও মা রান্নাঘর ধুত, হেঁসেল সাজাত।

খাওয়াদাওয়ার পর সবাই শুয়ে পড়ল, আমি চুপি চুপি উঠে এসে উঁকি দিয়ে দেখলাম, রান্নাঘরে একটা কুপি জ্বলছে, মা ঝাঁটা নিয়ে সপসপ করে রান্না ঘর ধুচ্ছে।

সুতরাং মার কাজ সারা হতে হতে ফিরে এলেই চলবে।

বেরিয়ে পড়লাম অন্ধকারে, বাজ-পড়া খেজুরগাছটার উদ্দেশে। রতি বলেছিল, ওখানেই থাকবে ও।

সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতেই মুখের ওপর দুবার টর্চ পড়ল। বুঝলাম, রতি এসে অপেক্ষা করছে।

সাহসে বুক ফুলিয়ে দেওয়ানবাড়ির দিকে পা চালালাম দুজনে। রতি একটা মোটা লাঠি নিয়ে এসেছিল। আমিও একটা আনলে পারতাম। অভাবে হাফ-প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পেন্সিল-কাটা ছুরিটা ছুঁয়ে রইলাম। লোহা ত বটে, ছুঁয়ে থাকলে ভূতপ্রেতরাও ভয় পায়।

পা টিপে টিপে চলেছি দুজনে, কিন্তু শুকনো পাতাগুলো পায়ের চাপে মর্মর করে উঠছে, ঝিঁঝি ডাকছে। জোনাকির সারি জ্বলছে নিভছে। দূরে কোথায় একটা কুকুর বিকট চিৎকার করে উঠল বার কয়েক।

এমন সময় আমরা দুজনেই হঠাৎ থেমে পড়লাম একই সঙ্গে।

রতি বললে, "দেখেছিস!"

বললাম, "দেখেছি।"

আর-কিছুই নয়, দেওয়ান বাড়ির ইঁটের স্তূপ পার হয়ে এঁকেবেঁকে দুলে দুলে এগিয়ে গেল একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন।
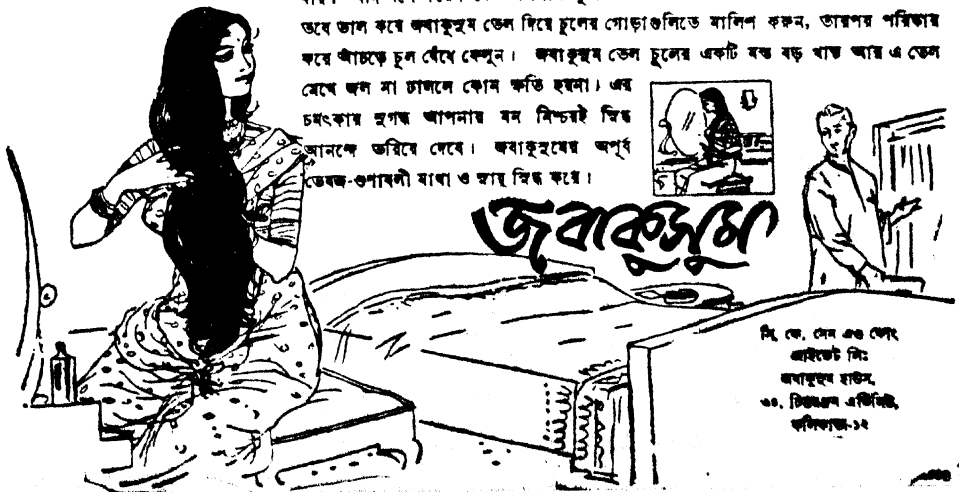
লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় শুধু এইটুকু বোঝা গেল, আলোটা একটা লোকের হাতে ঝুলছে।

কিন্তু কে লোকটা ? , বুনোজ্যাঠা ?

দূরে থেকে চেনা গেল না, দেখাল ঠিক একটা দস্যুর মত। পরক্ষণেই আতঙ্কে চমকে উঠেছিলাম ভূত দেখেছি মনে করে। কিন্তু না। আসলে লণ্ঠনের আলোয় লোকটার ছায়াটা বিরাট দৈত্যের আকার নিয়ে দেওয়ান বাড়ির দেয়ালে লেপটে গিয়েছিল।

লণ্ঠন লক্ষ্য করে এবার পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম। আর কাছাকাছি পৌঁছতেই কানে এল সেই ঠক্‌ঠক্ শব্দ।

দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম।

দাড়িগোঁফে-ঢাকা বুনোজ্যাঠার মুখখানা বীভৎস দেখাচ্ছে! চোখ দুটো গরুর চোখের মত অন্ধকারেও জ্বলছে। কিন্তু এ কি করছে বুনোজ্যাঠা!

দেওয়ান বাড়ির ভেঙে-পড়া ঘরগুলোর পুবে যে-দেওয়ালটা দিব্যি মজবুত রয়েছে, পালেস্তারাও খসেনি, সেই দেয়ালে ঘন ঘন শাবল মারছে। একটার পর একটা ইঁট খসে পড়ছে। এক-একবার দেয়ালের গায়ে শাবলের মাথাটা ঠুকে ঠুকে কান পেতে শুনছে, আর তারপরই জোরে জোরে শাবলের ঘা মারছে দেয়ালে।

রতির হাতটা পিঠে পড়তেই চমকে উঠেছিলাম। রতি ফিসফিস করে বললে "চ।"

বললাম, "কোথায় ?"

"বাড়ি চ।"

ফিরে এলাম দুজনে। ফেরার পথে রতি শুধু বললে, "বুঝে নিয়েছি।"

"কী বল্ ত ?"

রতি হেসে বললে, "মোহর খুঁজছে।"

দিন দশেক পরের কথা। মরাইতলার ছায়ায় বসে বসে অংক কষছি, মাছের পোনা বেচতে এসেছে কটা লোক, বড় বড় ডেকচি সাজিয়ে বসে বাবার সংগে দর কষাকষি করছে।

মা উঠোনের দাঁড়িতে ভিজে কাপড় মেলতে মেলতে বলছে, "ওদের পোনা নিও না, বোয়াল মেশানো থাকে, সব মাছ খেয়ে শেষ করে দেবে", এমন সময় একটা মুনিষ এসে খবরটা দিলে।

বললে, "কর্তা, চাটুজ্জেদের আরেকটা দেয়াল ভেঙে পড়ল আজ।"

বাবা হাসল, মা হাসল। অর্থাৎ এ আর নতুন খবর কী, একে একে সবই ত ভেঙে পড়বে।

বাবা বলল, "কোন্ মান্ধাতা আমলের বাড়ি, সারাবে না, ফাঁক ফোকরগুলোয় চুন সিমেণ্ট দেবে না মাঝে মাঝে, ভেঙে পড়বে না ত কী হবে!"

মা বলল, "আমাদের ছাতের ফাটলটা দেখালে না ত রাজমিস্ত্রী আনিয়ে!"

চাটুজ্জেদের বাড়ি থেকে কথাটা ঘুরে ঘুরে এল আমাদের বাড়িতে, আর তার সূত্র ধরেই আরেকটু হলেই হয়ত কথা-কাটাকাটি শুরু হত বাবা-মার মধ্যে।

আমি এদিকে আসল রহস্যটা বলব কি বলব না ভাবতে ভাবতে বলেই ফেললাম।

বললাম, "তোমরা কিছু জান না, বাড়ির দেয়াল ত বুনোজ্যাঠা নিজেই শাবল মেরে মেরে ভাঙে!"

মা কাপড় মিলে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়াল। চোখ পাকিয়ে বললে, "তোকে বলে গেছে, নিজে ভাঙে ?"

বললাম, "বলে যাবে কেন, দেখে এসেছি। রতিকে জিগ্যেস ক'রো, বুনোজ্যাঠা মোহর খোঁজে।"

"সে কি রে!" বাবা মা দুজনেই হেসে উঠেছিল প্রথমটা।

কিন্তু বাবা অবিশ্বাস করল না। বললে, "হতে পারে, সবারই ত ধারণা দেওয়ান বাড়ির দেয়ালে ঘড়া ঘড়া মোহর গাঁথা আছে, অবনের বাপ না ঠাকুরদা একবার নাকি পেয়েছিল..."

মা হেসে ফেলল।—"তা বলে একটার পর একটা দেয়াল ভেঙে চলেছে, না জেনেশুনে ?"

এরপর থেকে আমরাও হাসাহাসি করতাম বুনোজ্যাঠার বুদ্ধি সম্পর্কে।

গৌরীকে একবার ঠাট্টা করে বলেছিলাম। শুনে রেগে গিয়েছিল। বলেছিল, "ঘরে মোহর পোঁতা থাকবে, আর ভিক্ষে করে খাব, না? তা হলেই সকলে বুদ্ধিমান বলবে ?"

বলেই দপদপ করে পা ফেলে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু খানিক পরেই ফিরে এসেছিল আবার। রাগ কোথায়, তখন একেবারে অন্য চেহারা।

ফিসফিস করে বলেছিল, "নিতুদা, তুমি কাউকে বলো না কিন্তু।"

বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করেছিলাম, "কী ?"

"মোহরের কথা। বাবা জানতে পারলে ভাববে আমি বলেছি, তা হলে..."

তাহলে যে গৌরীকে খুন করে ফেলবে বুনোজ্যাঠা তা টের পেয়েছিলাম সেই যেদিন মেলার বেলায় আমাকে ঠেলতে ঠেলতে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আর গৌরী ইশারায় চলে যেতে বলেছিল আমাকে।

বলার সুযোগও আর হয়নি।

কারণ তার কিছুদিন পরেই ছোটকাকা আমাকে নিয়ে এল কলকাতায়, গাঁয়ের ইস্কুলে পড়াশুনো হচ্ছে না বলে।

আর কলকাতার নেশায় এমন পেয়ে বসল আমাকে, যে ছুটিছাটাতেও গাঁয়ে ফিরতে ইচ্ছে হত না। পড়াশুনোর ক্ষতি হবে এই অজুহাতে কলকাতাতেই থাকতাম। যদি বা যেতাম দু-চার দিনের জন্যে, বাড়ির বাইরে বের হতাম না বড়-একটা, মিশতাম না কারও সংগে। মনে হত, রতিটতির মত ছেলেগুলো মেলামেশা করার যোগ্যই নয়।

তাই দেওয়ানবাড়ির কটা দেয়াল ভেঙে পড়ল, কখানা ঘর রইল, লক্ষ্যই করিনি কোনদিন।

ম্যাট্রিক পাস করে সেবার গাঁয়ে ফিরলাম। সেইবারই প্রথম দেখলাম। দেখে চমকে উঠলাম।

দেওয়ানবাড়ির সবটাই তখন ইঁটের স্তূপ। একটি দুটি ঘর কোনরকমে টিঁকে আছে। আর ইঁটের ওপর রীতিমত গাছ গজিয়েছে দু-চারটে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। মন খারাপ হয়ে গেল যত না বুনোজ্যাঠার জন্যে, তার চেয়ে বেশী গৌরীর জন্যে।

মা বলত, "চাটুজ্জেদের গৌরীর আর বিয়ে দিতে পারবে না ওরা।"

বলত, দুঃখও করত। তলে তলে দু-একটা সম্বন্ধর চেষ্টাও করত মা। কিন্তু পণের টাকা না দিতে পারলে, লুকনো মোহরের গল্প শুনে ত কেউ বিয়ে দেবে না।

হঠাৎ আমার গৌরীকে দেখতে ইচ্ছে হল। কতদিন দেখিনি। কী জানি, এখন দেখে চিনতে পারব কিনা! আমাকে সে চিনতে পারবে কিনা।

একবার ভাবলাম, যাই বুনোজ্যাঠাদের বাড়ি। দু-একটা কথা বলে আসি গৌরীর সংগে, গৌরীর মার সংগে।

কিন্তু অনেককাল দেখাসাক্ষাৎ নেই বলেই কেমন লজ্জা-লজ্জা করল। যেতে পারলাম না। ভাবলাম থাক, মাকেই বরং বলব গৌরীকে ডেকে পাঠাতে।

পরক্ষণেই মনে হল, ডেকে পাঠানো কি উচিত হবে, ডাকলেও আসবে সে! কে জানে, এতদিনে কত বড় হয়েছে, কত বদলে গেছে।

ভাবতে ভাবতেই খিড়কি পার হয়ে বাড়ি ঢুকেছি, অমনি মেয়েটা ঘুরে বসলো।

প্রথমটা লক্ষ্য করিনি। মনে হয়েছিল, পাড়ার কেউ রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে মার সংগে গল্প করছে।

কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই চিনতে পারলাম। বললাম, "গৌরী না ?"

গৌরী ওর বড় বড় চোখ দুটো তুলে আমার দিকে এক পলক চেয়েই মাথা হেঁট

করল, তারপর পায়ের বুড়ো আঙুলে দাওয়ার মাটি খোঁচাতে খোঁচাতে বললে, "কী ভাগ্যি আমার, চিনতে পেরেছ?"

আমি হাসলাম, মা হাসল।

গৌরী কিন্তু মুখ তুলে তাকাতে পারল না। মুখ নিচু করেই বললে, "ভেবেছিলাম কলকাতার বাবুরা পাড়াগাঁয়ের লোকদের চিনতে চায় না।"

আমি ততক্ষণে লজ্জা আর অস্বস্তি কাটিয়ে উঠেছি। বললাম, "এদিকে ত দেখছি লজ্জাবতী লতা, অথচ মুখে ত বিছুটি লেগে রয়েছে।"

মা ধমক দিল।—"ও এসেছে তোর সঙ্গে দেখা করতে, আর তুই কিনা ঝগড়া শুরু করলি!"

বলে থালাবাসন নিয়ে মা বেরিয়ে গেল, ঘাটে ধুয়ে আনতে।

আর আমি ভাল করে তাকালাম গৌরীর দিকে।

সত্যি বদলে গেছে গৌরী। সেই ছোট্ট মেয়েটির সারা দেহের ভাঁজে ভাঁজে পরিপূর্ণতা এসেছে। কৈশোরের প্রগলভ বন্যা যেন বিদায় মুহূর্তে ওর শরীরে যৌবনের পলিমাটি লেপে দিয়ে গেছে। সেই চঞ্চল চোখ দুটি যেন শান্ত আর শীতল, শীতল আর গভীর।

চোখ তুলে তাকাল গৌরী। কৌতুকের দৃষ্টিটা যেন কৌতূহলের দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

ওর স্থির শান্ত-দৃষ্টিটা একটা বিরাট জালের মত আমার চারদিকে বিছিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে টেনে তুলতে চাইছে যেন। হৃদয়ের গভীর থেকে কিছু খুঁজে বের করতে চাইছে।

আর আমার সমস্ত মন কেমন এক বিচিত্র অনুভূতিতে কেঁপে উঠল। মনে হল, আমি যেন নতুন কিছু আবিষ্কার করেছি, নতুন করে আবিষ্কার করেছি।

প্রেম নয়। একেই বোধ হয় মোহ বলে। যৌবনের উত্তপ্ত আকর্ষণ। আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন ওর শরীরের রেখায় রেখায় যৌবনের লুব্ধ ইশারা খুঁজে বেড়াল।

আবেগের কণ্ঠে হয়ত কিছু বলেও বসতাম।

সেই মুহূর্তেই থালাবাসন হাতে মা ফিরে এল, তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "ও মা, তোরা ঠায় দাঁড়িয়ে আছিস তখন থেকে! গৌরী, যা নিতুকে পিঁড়িটা সরিয়ে দে।"

গৌরীকে অপ্রতিভ দেখাল। তাড়াতাড়ি পিঁড়িটা এনে দিল ও।

তারপর দু একটা ছোট ছোট প্রশ্ন আর উত্তর।

এক সময় চলে গেল গৌরী, ফিসফিস করে মার কানে কী বলে গেল।

আর মা বলল, "তোকে একটা কাজ করতে হবে নিতু।"

"কী?"

"গৌরীর বাবাকে গিয়ে বোঝাতে হবে। গাঁয়ের কারও কথা ত নিল না। তাই গৌরী বলছিল, তুই কলকাতার লোক হয়ে গেছিস, একটা পাস করেছিস, তুই বললে হয়ত শুনবে।"

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কী কথা?"

মা এবার কৌতুকের হাসি হাসল। বললে, ওর বাপ ত দেখেছিস বদ্ধ পাগল, একে একে বাড়িটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল, এদিকে দেওয়ানবাড়ির ছেলে বলে গর্ব কম নয়। দেপুরের অনাদি, ওই যে মুদিখানা আছে বলরামপুর ইস্টিশেনে, তার সঙ্গে গৌরীর বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু বিয়ে দেবে না তোদের বুনো-জ্যাঠা।"

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "অনাদি? খালি গায়ে লুঙি পরে বসে থাকে মুদিখানায়, তার সঙ্গে গৌরীর বিয়ে? একটা অশিক্ষিত চাষা..."

মা হেসে বলল, "তুইও দেখছি ওর বাপের মতই বলছিস। দেওয়ানবাড়ির মেয়ে গৌরী ঠিকই, কিন্তু কী আছে তাদের এখন? বিয়ে দিতে পারবে আর ও-মেয়ের?"

বললাম, "গৌরীর কী মত?"

মা হাসল।—"সেই কথাই ত বলতে এসেছিল। ওর খুব মত আছে, বললে—'মাসিমা, তবু ত খেয়ে-পরে থাকতে পাব, বিয়ে না হলে যে বাপের বাড়িতে ভাইরা পরে আর খেতে পরতেও দেবে না'।"

আশ্চর্য, কথাটা শুনে সহানুভূতি জাগল না, বরং অকারণ একটা আক্রোশ হল গৌরীর ওপর। কিংবা অকারণ নয় হয়ত।

রেগে গিয়ে বললাম, "তা কী করতে হবে আমাকে?"

মা আমার রাগ দেখে হাসল। বললে, "গৌরী বলছিল, ওর বাপকে গিয়ে তুই একবার বুঝিয়ে বলে আয়, গৌরীর ওখানে বিয়ে দিতে যেন অমত না করে।"

বেশ, তাই হবে। যাব দেওয়ানবাড়িতে, বুনোজ্যাঠাকে বলে আসব। মনে মনে অদ্ভুত একটা আত্মনিপীড়নের আনন্দ পেলাম। শুধু কি তাই? মনে হল, গৌরীকেও যেন কষ্ট দেওয়া হবে। মুদিখানার অনাদিকে বিয়ে করতে তার যখন এত সাধ, করুক বিয়ে।

গৌরী কি ভেবেছে, আমি তাকে এক মুহূর্তের দেখাসাক্ষাতে ভালবেসে ফেলেছি! একটা কিশোরী মেয়েকে হঠাৎ যৌবনের ঘাটে দেখলে কার না ভাল লাগে, কার না মনে রোমাঞ্চ হয়! কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলাম বলেই কি ভালবেসে ফেলেছি নাকি!

নিজের বোকামিতে নিজেই হেসে ফেললাম এক সময়, কী সব ভাবছি এত শত! গৌরী হয়ত এত কথা ভাবেইনি, ও শুধু অনাদিকে বিয়ে করে খাওয়া-পরার সমস্যা মেটাতে চায়। কিংবা কে জানে, অনাদিকে ও হয়ত..."

সত্যি সত্যি একদিন সন্ধ্যেবেলায় চলে গেলাম দেওয়ানবাড়িতে। হাতে একটা টর্চ নিয়ে।

দেওয়ানবাড়ির তখন আর কতটুকুই বা অবশিষ্ট আছে! দুখানা ঘর বোধ হয়।

ডাক শুনে গৌরীর মা বেরিয়ে এল। বললে, "এস নিতু, এস।"

ছোট ছোট দুখানা ঘর, একটা লণ্ঠন জ্বলছে, এক পাশে উনুন। রান্না করছিল হয়ত গৌরী, একটা আসন পেতে দিল।

এ-কথা সে-কথায় চাটুজ্জেমাসী বললে, "গৌরীর বাবা একটু বেরিয়ে গেছে, একটু বসো নিতু, এখনই আসবে।"

তারপর রেকাবিতে করে দুটো নাড়ু আর এক গ্লাস জল এনে আমার সামনে রেখে পাখার বাতাস করতে লাগল।

পাখার বাতাস করতে করতে একবার পাখাটা আমার গায়ে লাগতেই ঠক করে সেটা মাটিতে ঠুকে চাটুজ্জেমাসী বললে, "তুমি ওঁকে বুঝিয়ে বলো নিতু, তোমার কথা রাখতে পারে। সেইজন্যেই গৌরীকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।"

বললাম, "সেইজন্যেই ত এসেছি।" তারপর হেসে ফেলে তাকালাম গৌরীর মুখের দিকে। বললাম, "গৌরীর বিয়েতে কিন্তু আমি ছুটি নিয়ে আসব, যখনই হোক।"

গৌরী দুটো বড় বড় ক্লান্ত চোখ তুলে তাকাল আমার মুখের দিকে, তার বিষন্ন মুখের ওপর একটা হাল্কা খুশির হাসি চমকে উঠে মিলিয়ে গেল।

চাটুজ্জে মাসীর চেয়ে গৌরীর উৎসাহই যেন বেশী। বার বার বাইরের দরজার দিকে তাকাচ্ছিল ও, বুনোজ্যাঠার পায়ের শব্দ শুনতে পাবার আশায়। কিছু একটা শব্দ হলেই কোন একটা কাজের অছিলায় বাইরে উঁকি দিয়ে আসছিল।

কিন্তু বনোজ্যাঠা অনেক রাত পর্যন্ত ফিরল না। এদিকে ওই আধা-অন্ধকার ঘরের গুমোটে বসে থাকতেও অসহ্য লাগছিল।

এক সময় উঠে পড়ে বললাম, "আজ থাক, কাল আবার আসব মাসীমা।"

চাটুজ্জে মাসী আরেকটু অপেক্ষা করতে বলল, শেষে আমার অনিচ্ছা বুঝতে পেরে বললে, "কাল সকালে একবারটি এসো তা হলে।"

বললাম, "আসব।"

গৌরী লণ্ঠন হাতে নিয়ে , সঙ্গে সঙ্গে আসছিল, বললাম, "আলো লাগবে না, টর্চ আছে।"

লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে দিল গৌরী, তারপর জড়োসড়ো হয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল। বাড়ির সামনের রাস্তাটা অবধি।

গৌরী বললে, "এসো কিন্তু।"

"আসবো। চলি আজ..."

বিদায় নিয়েও কিন্তু পা বাড়াতে পারলাম না। থেমে পড়লাম। ফিরে দাঁড়ালাম।

আবছা-অন্ধকারে আমরা কেউ কাউকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। শুধু ছায়া-ছায়া দুটো শরীর চুপচাপ কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কারও মুখে কোন কথা নেই। কিংবা কে জানে, দু'জনের মনেই হয়ত একই কথা। দুজনেই হয়ত পরস্পরকে আমরা কিছু বলতে চাইছিলাম।

হঠাৎ কী হল, নিজেই বুঝলাম না। গৌরীর একখানা হাত টেনে নিলাম মুঠোর মধ্যে, চেপে ধরলাম। থরথর করে আবেগে কেঁপে উঠলাম আমি, আর স্পষ্ট অনুভব করলাম, গৌরীর হাতখানাও যেন কাঁপছে। শুধু স্পর্শের মধ্যে দিয়ে আমরা কী যেন বলতে চাইলাম, নির্বাক অনুভূতির ভাষায় পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে কী এক প্রতিশ্রুতি আদায় করলাম।

হয়ত বলেছিলাম, আমি আছি।

হয়ত শুনেছিলাম, আমি থাকব।

তারপর এক সময় হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়েছিল গৌরী। অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। তাই বুঝতে পারিনি গৌরীর দু চোখে সেদিন কী ছিল। জল? না, লজ্জা!

জানতে পারিনি, কোনদিনই জানতে পারব না।

পরের দিন ইচ্ছে করেই বনোজ্যাঠার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। কলকাতায় চলে এসে একবার শুধু একটা মামুলি চিঠি লিখেছিলাম চাটুজ্জেমাসীকে। উত্তর পাইনি।

তারপর ধীরে ধীরে গ্রামের কথা, গৌরীর কথা মন থেকে মুছে গিয়েছিল। শুধু যৌবনের প্রথম রোমাঞ্চের সুরটুকু মাঝে মাঝে ক্ষীণস্বরে বেজে উঠত।

বছর দুই পরে আবার যখন গ্রামে ফিরলাম, গৌরীকে মনে পড়ল। কিন্তু মাকে তার কথা জিগ্যেস করতে কেমন যেন লজ্জা হল।

ভোরবেলায় উঠেই সেই ছোটবেলাকার মত নিমের কাঠি ভেঙে নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে নতুন পুকুরের পাশ দিয়ে দেওয়ানবাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু বেশীদূর আর এগোতে হল না। চমকে উঠলাম সেদিকে তাকিয়ে।

সেই অবশিষ্ট ঘর দুখানাও আর নেই। শুধুই ভাঙা পুরনো ইঁটের স্তূপ। শ্যাওলা আর ঝোপ, ফাঁকে ফাঁকে কচি বট অশথের চারা উঠেছে।

কিছুই নেই? কিছুই রাখেনি বনোজ্যাঠা?

তাড়াতাড়ি ফিরে এসে জিগ্যেস করলাম, "বনোজ্যাঠারা কোথায় উঠে গেছে মা? ঘর তুলেছে নতুন?"

"ঘর?" মা অবাক হয়ে তাকাল আমার মুখের দিকে। বললে, "শুনিসনি তুই?"

"কী? কই শুনিনি ত কিছু।"

মার চোখ ছলছল করে উঠল। বলল, "কেউ জানে না রে, কেউ জানে না, কোথায় যে লুকিয়ে লুকিয়ে চলে গেল।"

খানিক চুপ করে থেকে আবার বলল, "দেওয়ানবাড়িটা পড়ে যাবার পর রায়দের বৈঠকখানাটা ওদের থাকতে দিয়েছিল, ইস্কুল ত উঠে গেছে নতুন বাড়িতে..."

"তারপর?"

মা চোখ মুছল।—"দেওয়ানবাড়ির এত নাম, তাদের কিনা থাকতে হচ্ছে রায়দের বৈঠকখানায়, তাই লজ্জায় মুখ দেখাত না গৌরীর বাবা। একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে কখন যে চলে গেল, কোথায় গেল, কেউ খবরই পেল না।"

সমস্ত বুক নিঙড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। একটা কথাও বলতে পারলাম না। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ইচ্ছে হল, জিগ্যেস করি, গৌরীর বিয়ে হয়েছিল? অন্যদির সঙ্গে, না আর কোথাও?

কিন্তু পারলাম না। মনে হল, এই একটা প্রশ্নের মধ্যেই হয়ত আমার মনের গভীরের সমস্ত দুর্বলতাটুকু ধরা পড়ে যাবে। মনে হল, এর চেয়ে অপ্রিয় কোন কথা যদি শুনতে পাই, যদি শুনি, গৌরীর বিয়ে হয়নি, গৌরীই শেষে বিয়েতে মত দেয়নি, তাহলে হয়ত নিজের কাছে চিরকালের জন্যে অপরাধী থেকে যাব।

তাই সমস্ত জ্বালাটুকু সেদিন নীরবে সহ্য করেছিলাম।

কিন্তু সব জ্বালা ধীরে ধীরে মুছে যায়, সব স্মৃতি সময়ের প্রলেপে ধুয়ে যায়।

গৌরীকে ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম বনোজ্যাঠাকে। লুকনো মোহরের লোভে যে মানুষটা অত বড় দেওয়ানবাড়িটা ধুলোয় মিশিয়ে দিল। যে মানুষটা একদিন নিঃস্বতার লজ্জায় গাঁ থেকে মুখ লুকিয়ে পালিয়ে গেল।

কে জানত, এত বছর বাদে বনোজ্যাঠাকে আবার মনে পড়বে!

এই কলকাতারই এক অভিজাত পল্লীতে সহকর্মী বন্ধু নতুন বাড়ি তুলছে। তার গর্বের এবং গৌরবের কিছুটা অংশ দেবার জন্যেই হয়ত নতুন বাড়িটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল সে।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েই বাড়িটা দেখাল যাতে বাড়ির বিরাটত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারি।

তাকিয়ে দেখছিলাম বাড়িখানা। চারপাশে বাঁশের ভারা বাঁধা আছে, দেয়ালে প্লাস্টার করা হচ্ছে। মিস্ত্রীরা কাজ করছে।

হঠাৎ বন্ধু বললে, "ওই যে রাজমিস্ত্রীটাকে দেখছ? হাতে কর্নিক নিয়ে পলেস্তারা লাগানো দেখিয়ে দিচ্ছে..."

দেখলাম। দেখে চমকে উঠলাম। পরনে লুঙি আর ফতুয়া। একমুখ দাড়ি গোঁফ, হুবহু সেই চেহারা!

বন্ধু বললে, কলকাতায় তিনখানা বাড়ি ওর, অগাধ টাকার মালিক। রাজমিস্ত্রী ছিল, এখন বড় ঠিকাদার। কিন্তু এখনও নিজের হাতে কর্নিক নিয়ে কাজ করে।"

আরও কী যেন সব বললে বন্ধুটি, আমার কানে গেল না। আমি শুধু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। ঠিক সেই মুখ, সেই চেহারা। এতটুকু তফাৎ নেই।

এগিয়ে গেলাম তার দিকে, ডাকলাম, "অবনীজ্যাঠা!"

বনোজ্যাঠা নামটা মুখে আনতে বাধল।

বন্ধু হেসে বললে, "কে অবনীজ্যাঠা আপনার? ও ত বড়ে মিঞা।"

একেবারে সামনাসামনি আসতেই ভুল ভাঙল। না, বনোজ্যাঠা নয়। অথচ দূরে থেকে দেখে মনে হয়েছিল হুবহু বনোজ্যাঠা।

আমার অপ্রতিভ ভাবটা দূর করবার জন্যে বন্ধু তার উদ্দেশে বললেন, "বড়ে মিঞা, এখনও নিজের হাতে কাজ করছ? এবার ছুটি নাও।"

বড়ে মিঞা হাসল, একমুখ গোঁফ-দাড়ির ফাঁকে চোখ দুটো তার খুশিতে নেচে উঠল একবার।

তারপর হাতের কর্ণিকটা দেখিয়ে বললে, "আমি ছুটি নিলে কী হবে বাবুসাব, কর্ণিক ছুটি নেবে না।"

আবার হাসল সে, পরিষ্কার উর্দুতে কী যেন বললে।

বন্ধুকে প্রশ্ন করলাম, "কী বলল?"

বন্ধু বাংলা করে বললে, "ও বলছে, পৃথিবীর সর্বত্র গুপ্তধন ছড়িয়ে আছে, সেরা গুপ্তধন এই কর্ণিক।"

মার্কিনী স্বয়ম্বরা

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

যতদিন না ঠিকমত কোন একটা হদিস মিলছে ততদিন খুঁজে যেতেই হবে। সে আপনি নিজেই খুঁজুন কিম্বা আপনার জন্যে কেউ এসে খুঁজে দিক। এই অরূপ রতন উদ্ধার করার আর এক নাম বর খোঁজা কিম্বা বউ খোঁজা। চোর-পুলিস খোঁজার মত যা অবিরাম চলছে, যেমন আগেও চলত এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতেও সমানভাবে চলবে। আগেকার দিনে রাজারাজড়ার ঘরে মেয়ে বড় হলে পিতৃদেব মেয়ের স্বয়ম্বরা বসাতেন। দূর দূর জায়গা থেকে রাজা, রাজপুত্তুর, মন্ত্রিপুত্তুর, কোটালপুত্তুর, সদাগরপুত্তুরেরা সব আসত। যশোমতী রূপবতী কন্যা আড়চোখে ছেলে দেখে কাঁপা হাতে মালা দিয়ে বরণ করত। সেদিন এখন আর নেই। এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়ের বাবাকে মেয়ের বিয়ে দিতে ঘোড়দৌড়ে নামতে হয়। বিয়ে করা আর ডারবীর টিকিট কেনা প্রায় এক। সাধ্যমত বর মিলল তো ভাল, নয়তো ছোটো, আরো ছোটো যতক্ষণ না এক বিন্দু পাচ্ছ, অবিরাম ছোটো। এ সব ক্ষেত্রে মেয়ের পছন্দের আগে বাবার পছন্দ হওয়া দরকার। অবশ্য ইদানীং দেখা যাচ্ছে যাদের পছন্দ অপছন্দ বড় কথা তারাই মাঝেসাঝে ব্যবস্থাটা পাকা করে নিতে সক্ষম হচ্ছে।

কিন্তু মার্কিন দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে বর খোঁজা আর বউ খোঁজা পরস্মৈপদী ব্যাপার নয়। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যৎসামান্য জ্ঞান হয়েই অন্বেষণ শুরু হয়ে যায়—ঠিক একটা ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাসের মত বহু দিন ধরে ধারাবাহিকভাবে দেখাদেখি, চেনাচেনি, বাসাবাসি চলল। আমেরিকার আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে দিনের মধ্যে যতবার শুনবেন ডলার, ততবার আর একটি কথা শুনে হকচকিয়ে যাবেন—ডেটিং ডেটিং আর ডেটিং। এ দেশে প্রকৃতির বিধান, মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি। তাই সব মেয়েদের পক্ষে (একই সঙ্গে) বরলাভ সম্ভব নয়। সাপলাই আর ডিমাণ্ডের বোঝাপড়াতে দেখা যায় আপিসে, রেস্তোরাঁয়, বাসে, মাটির তলায় ট্রেনে সর্বত্র অবিবাহিতা মেয়ের দৃষ্টি যৌবনকাতর হৃদয়ে মিলন সুখালস। এ বিধির ছাড় নেই। বড়ঘর, মেজঘর, ছোটঘর সব ঘরের মেয়েদের পক্ষে সেই এক প্রতিযোগিতা। সবচেয়ে সেরা ছেলেটিকে কৌশলে পাঁচজনের কাছ থেকে কি করে সরিয়ে নিজের করে ঘরে তুলতে হবে। মাছের ঝোল ভাত খাওয়া লোকের চোখে এই ডেটিংকে বলতে ইচ্ছা করে এ যেন ডাঙ্গায় ছিপ ধরে জলের মাছ ধরবার অনুরূপ কোন হবি। চায়ের টেবিলে, কাজের টেবিলে, বারের টেবিলে সর্বত্র বঁড়শি ফেলা আছে কখন বুঝি বা ফাতনা নেচে ওঠে। সবাই সচেতন।

এখানকার বাবা মা তাঁদের ছেলেমেয়েদের প্রাক্‌বিবাহ এই "মাছ ধরার হবিতে" যথেষ্ট আগ্রহী। প্রত্যেক বাবা মা-র মনস্কাম যে নিজের মেয়েটির একখানি সুপুত্তুর জুটুক। যে বাবা-মার মেয়ের ঘন ঘন ডেট্ হয় তাঁদের গর্ব এবং আনন্দ খুব। আর যে বাবা-মার মেয়ের ডেট্ হয় না, তাঁদের মনোকষ্ট এবং অশান্তি সমান। আমেরিকান বাবা-মা মেয়ের আঠারো বছর পূর্ণ হলে 'ডেবুতান্ত বল' দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। নিজেদের পকেটের দৌড়ের উপর এই নাচের আসরের পরিধির হ্রস্ব-দীর্ঘ ঘটে। যাঁদের পয়সা আছে তাঁরা বহু লোক নেমতন্ন করে জমজমাট আসর করেন, যাঁদের নেই তাঁদের পক্ষে খুদে আসরই যথেষ্ট। এই সব 'ডেবুতান্ত বল' দেবার অর্থ আর পাঁচজনকে জানান মেয়ে সেয়ানা হয়েছে, এবার সে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একলা বাইরে যাতায়াত করতে পারবে, তার পছন্দ অপছন্দের মূল্য আছে। একলা থেকে দোকলা হবার সময় ঘনিয়ে আসছে।

ল্যাবোরেটরির স্টান্‌লী বলে ছোকরাটি নেহাত বালখিল্য। এখন সবে ওর পাখা বার হয়েছে, দু-চারজন বান্ধবী হয়েছে, তাদের নিয়ে কখনও সন্ধ্যায় বার হয়। সেদিন গল্পের ছলে বলছিল—বান্ধবীদের চেয়ে তাদের মা-রাই দেখি আমায় আরও বেশি পছন্দ করেন। রাত্রে বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় সেখানে মেয়েরা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে বিদায় জানাতে যায় আর তাদের মায়েরা সস্নেহে ঘরেতে এনে বসান, কফি খাওয়ান। চলে আসার সময় 'আবার এস' বলে

আমন্ত্রণের কথা মনে করিয়ে দেন। মেয়ে কিন্তু চুপচাপ।

নিউ ইয়র্কের একাধিক সংবাদপত্রে ডেট্ সম্বন্ধে স্বনামে, বা বেনামে বহু প্রশ্ন দেখা যায়। এক একটা বিভাগে এই প্রশ্নোত্তরের আসর চলে। সেখানে ডেটের ভাবনা ভেবে মা-ও প্রশ্ন করছেন, মেয়েও প্রশ্ন করছে এবং ছেলেও। কোন একটি বিশেষ খ্যাতনামা দৈনিকের এমন একটি দপ্তর চালান মিস ব্রেক। একজন মেয়ে যে সবেমাত্র ডেট-এ বার হচ্ছে তার ভাবনার অন্ত নেই, সে প্রশ্ন তুলেছে :

"মিস ব্রেক, রাত্রে ডেট শেষ হবার পর যখন আমায় বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয় তখন আমার বিদায় দেবার শেষ কথাটি 'মিষ্টিমুখ' করে কি জানান উচিত?"

এর উত্তরে মিস ব্রেক অভয় দিয়ে বললেন "দরজার ঢোকবার মুখে দাঁড়িয়ে মেয়েদের গুড্ নাইট পর্যন্ত করাটাই রীতি, এর উপর যদি আরও কিছু অতর্কিতে এসে পড়ে তো এসে পড়বে। তার ভাবনা ভাবলে ভাবনার কখনও শেষ হবে না।"

এ ত গেল এক অনভিজ্ঞ তরুণীর বিদায় সম্ভাষণ জানানর রীতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রশ্ন। কখনও কখনও মেয়ের মায়েরা এমন দুঃসাহসিক প্রশ্নের অবতারণা করেন তা শুনলে পরে মেয়ে পর্যন্ত ক্ষেপে ওঠে। সেই রকম একটি :

"আমার মেয়ে যে ছেলেটির সঙ্গে গত এক বছর ডেট করছে তার সামর্থ্য ও সংগতি দেখে আমার বিশেষ ভরসা হয় না ওরা বিয়ে হলে সুখী হবে। অথচ আমার মেয়ে পাগল-পারা। ওই ছেলেটি এখন ট্রেনিংএ শহরের বাইরে রয়েছে। এই ফাঁকে মেয়েকে বলছি আরও দু-চারজন অন্য ছেলের সঙ্গে শনি-রবিবার ডেট করতে। মেয়ে রাজি হয় না। আপনি কি বলেন?"

মিস ব্রেক কি বলেন সেটা আমাদের জানা বড় কথা নয়, কিন্তু মার বিদঘুটে প্রশ্নটা তো জানলুম।

ডেটিং-এর আর এক নাম মৃগতৃষ্ণা। কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে একজন আর একজনের সান্নিধ্য লাভ করে। ঘরের বাইরে ছেলে-মেয়েরা সান্ধ্য অবসর বিনোদন করে। এক প্রহরের জন্য রাজারানী হওয়ার রিহারসাল। একই মেয়ে বিভিন্ন দিনে একাধিক ছেলের সঙ্গে এবং একই ছেলে বিভিন্ন দিনে একাধিক মেয়ের সঙ্গে ডেট করে থাকে। মেয়েরা অফেনসিভ্, ছেলেরা ডিফেনসিভ্। কারণ মেয়েরা কিছুদিন ডেট-এ বার হয়েই ঘর বাঁধার কথা তোলে। ছেলেদের উড়ু-উড়ু ভাব। অত তাড়া কিসের? এই তো সবে শুরু। নিছক প্রমোদ বিতরণের পালা নয়, কিছুদিন যেতে যেতে অনেকজন থেকে একজনের দিকে মর্জি পড়ে। তখন এই নির্দিষ্টজনকে 'স্টেডি' বলা হয়। যে দুজন ছেলে এবং মেয়ে স্টেডি যাচ্ছে তাদের

'মিষ্টিমুখ'

ভবিষ্যতে বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 'স্টেডি'টা কোয়ার্টার ফাইনাল। এনগেজমেণ্ট হল সেমি ফাইনাল; ম্যারেজটা চ্যারিটি ফাইনাল খেলা। কিন্তু এই ফাইনাল ম্যাচ অনেকের সঙ্গে অনেকের খেলা হবার আগেই সব গোলমাল হয়ে যায়। একটি ছেলে একটি মেয়ে চার বছর স্টেডি চলে যেই এনগেজড্ হল অমনি তাদের মধ্যে গোল বাধল। ছেলেটি মেয়েটিকে একটি হীরের আংটি দিয়েছিল। এখন মায়াজাল ছিঁড়ে যাবার পর ছেলেটি তার দেওয়া হীরের আংটিটি ফেরত চায়, মেয়েটি কোনমতে
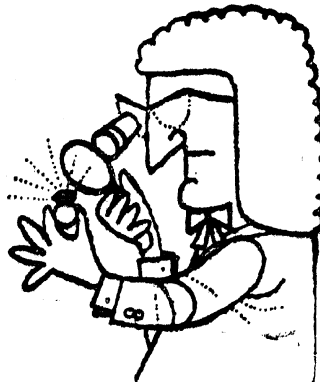
আংটি কিসের

ফেরত দেবে না। বলে, তোমার আংটি কিসের? I have earned it.

এখন আংটি কার তা বিচার করতে কোর্ট পর্যন্ত মামলা গড়াচ্ছে।

আর একটা জিনিস প্রায়ই দেখা যায়, দুজন আন্তরিক বন্ধুর বান্ধবী উলটে পালটে যায়। এর বান্ধবী ওর হল, ওর এর। বন্ধু এলিয়ট রবিনস্কে একাধিকবার বলতে শুনেছি যে, এস্থার-এর সঙ্গে ওর এক সহপাঠীর সূত্রে আলাপ। বক্তব্যটা অনেকটা এই রকম: She was my boy friend's girl friend but he was not her boy friend.
সামাজিক জীবনে এই রকম এলিয়ট-এসথার পরিণয়ের মত বহু পারমুটেশন কম্বিনেশন ঘটে।

আমেরিকার জজও এই ডেট সম্বন্ধে কতখানি সচেতন তা একবার দেখুন। কিছুদিন হল গ্যাম্বেল বেনিডিক্ট নামে একজন কিশোরীকে হঠাৎ নিউ ইয়র্কের বাড়ি থেকে পাওয়া যায় না। রেমিনটন টাইপরাইটারের সম্পত্তির সে অংশীদার। কত কত পয়সার সে মালিক। সারা আমেরিকা তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেলা হল কোথায়ও কিন্তু গ্যামবিকে পাওয়া গেল না। তারপর আস্তে আস্তে লোকমুখে শোনা যায় গ্যাম্বি এখন এই পৃথিবীর অমরাবতী প্যারীতে এক রোমানিয়ান মধ্যবয়স্ক বিবাহিত ভদ্রলোকের (শ্রীযুক্ত আঁদ্রে পারাম-বানুর) সঙ্গে উধাও হয়েছে। গ্যামবির এত পয়সা তাই ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলামেশাটা ওর আত্মীয়স্বজন পছন্দ করতে পারেনি। গ্যামবির ভাই প্যারিস দৌড়ে গ্যামবিকে বুঝিয়ে আবার নিউ ইয়র্কে ফিরিয়ে আনে। গ্যামবির মা নেই। দিদিমা কোর্টের কাছে আর্জি করলেন ওর দৈনন্দিন গতিবিধি যাতে কোর্ট থেকে নিয়ন্ত্রিত করে দেওয়া হয় অন্ততঃ যতদিন না গ্যামবি প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে উঠছে।

জজ যে রায় দিলেন সেটিই দেখবার। তার মধ্যে 'এই এই করবে', 'এই এই করবে না' ছিল। সবচেয়ে মজার জিনিস যা লক্ষ্যণীয় তা হল অন্যদিন রাত্রি দশটার ভিতর এবং কেবল শনি-রবিবার রাত্রি বারটার ভিতর বাইরে থেকে সান্ধ্য অবসর চুকিয়ে গ্যামবিকে ঘরে ফিরে আসলেই চলবে। অবিবাহিতা তরুণী কিন্তু বিভাবরী মধ্যবয়স্কা!!

বলে নেওয়া ভাল গ্যামবির এতেও তর সয়নি। কিছুদিন যেতে না যেতে ও আবার নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে অন্য আর এক স্টেটে গিয়ে আঁদ্রে পারামবানুকে বিয়ে করে।

এদেশে আসবেন অথচ প্রিন্সটন বিশ্ব-বিদ্যালয় দেখবেন না, তা হতেই পারে না। আইনস্টাইন এখানে ছিলেন। ওপেনহাইমার প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এখানে এখন রয়েছেন। কিন্তু প্রিন্সটন শুধুই ছেলেদের

বিদ্যায়তন। এখানে কারও মাদাম কুরী হবার জো নেই। ক্লাসে মেয়ে ভর্তি করার কানুন নেই। কিন্তু প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সে রসে মোটেই বঞ্চিত নয়। একবার শনিবার রবিবার যদি কখনও প্রিন্সটন যান তাহলে দেখতে পাবেন বাস ভর্তি হয়ে সব ডেট আসছে আশপাশের মেয়ে কলেজ থেকে। মায় নিউ ইয়র্ক থেকেও। প্রিন্সটন স্টেশনে ডেট আসা ও যাওয়ার মুহূর্তটা জীবন-নাটকের একটি রোমাঞ্চকর দৃশ্য। এই গাড়ি ভর্তি হয়ে যখন মেয়ে ডেটরা আসে তখন তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক 'ব্লাইন্ড ডেট' থাকে। ব্লাইন্ড ডেট অর্থে কানামাছি ভোঁ ভোঁ। অর্থাৎ এদের মিলন-আশা-তরীখানি তখনও কান্ডারীবিহীন। মন বধূর বেশে এসেছে, কিন্তু রাজা কে তা তারা তখনও জানে না। স্টেশনে যদি অচিনপুরের কোন রাজা মেলে।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ অধ্যাপক বন্ধুর কাছে যে গল্পটি শুনেছিলুম তা আপনাদের না জানিয়ে পারছি না। আগেই বলেছি এখানে কো-এডুকেশন নেই। বন্ধু অধ্যাপক সাপ্তাহিক পরীক্ষার কাগজ দেখছেন সেদিন। একটি ছাত্র তার লেখার তলায় ক্ষমা ভিক্ষা করে লিখেছে যে, এ সপ্তাহে তার লেখা ভাল হয়নি, কারণ এই সপ্তাহে

I was out for the first time with a wonderful blonde and I have not yet recovered from the magic shock.

মাস্টারমশাই ততোধিক রসিক। তাঁর মন্তব্যের তলায় লিখেছেন—

Magic Shock

You have never written so well before!!

ঘটক আছে কি না জানি না, তবে আমাদের দেশের মত পত্রিকায় পাত্র চাই, পাত্রী চাই বিজ্ঞাপন দেখা যায়। একজন কুলীন আমেরিকান পাত্রীর খোঁজে নিজের গুণপনা যা জাহির করেছেন তা শুনলে আপনি কি বলবেন ভাবছি। নিজে কেমন নাগর তা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন :

> অনুরাগে বেড়ালের মত ঠিক আমি মিউমিউ করি—রাগে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ—আকাশে উড়তে পারি (পাইলটের লাইসেন্স আছে)—জলে তীরবেগে ছুটতে পারি (নিজের বোট আছে)—অত্যধিক প্রেমানুরক্ত—মেয়েরা আমার আরাধ্যা (তাদের কাচ্চাবাচ্চা থাকলেও কোন খেদ নেই)—কোন দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতার ভার আমার কাছে অসহনীয় নয়—শুধু একজন সুন্দরীর টেলিফোন কিম্বা চিঠি কিম্বা ডাক যদি পাই—আমি অযত্নের জন্য অতি শীঘ্র বোধহয় শুকিয়ে মরে যাব—আমি আপস্টেটে থাকি—তুমি কোথায় ওগো, তুমি কোথায়?

এই বিজ্ঞাপনের তলায় নাম-ধাম টেলিফোন নম্বর দেওয়া ছিল। এই ভদ্রলোকের অস্থিরতা অনুমান করে কোন সহৃদয়া এগিয়ে এসেছিলেন কি না সে খবর জানবার উপায় আমাদের নেই। কিন্তু আর একজন মা-র করুণ-হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠেছে তাঁর ছেলে যে মেয়েটির সংগে ডেট করছিল তা অকস্মাৎ ভেংগে যাবার জন্যে। তিনি সান্ত্বনা চেয়ে এক কাগজের প্রশ্নোত্তর দপ্তরের কর্মীকে জানিয়েছেন যে, তাঁর ছেলের 'ডেট' কাজ করত এক বিউটি সেলুনে। প্রতি মাসে মেয়েটি তাঁর চুল যত্ন করে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে যেত। ওর হাতের কাজের সংগে অন্য কারুর তুলনা করা যায় না। এমন কি পয়সা দিয়েও কোথায় গিয়ে এত সুন্দর চুল করা সম্ভব নয়। ছেলের সংগে তার অবনিবনা হওয়া থেকে ও আর মহিলার দরজা কখনও মাড়ায়নি। এখন তাঁর চুলের দশা কি হবে তাই বলুন?
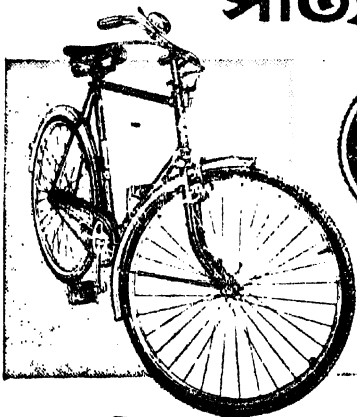
পূর্বপুরুষদের দান

তখনো ইতিহাস লেখা হয়নি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষ যে ফসল প্রথম ফলাতে সুরু করেছিল তা হচ্ছে বার্লি। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগেকার মিশরের মিনার-এর যে ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে যে শস্যের নিদর্শন রয়েছে তা বার্লি বলেই পণ্ডিতেরা বলেন। তাছাড়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী ও স্যাভয়ের প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতেও বার্লির প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। খৃষ্টজন্মের ২৭০০ বছর আগে সম্রাট সেংনুঙ এর চাষ সুরু করেছিলেন চীনে।

আমাদের সংস্কৃত পুরাণ ও শাস্ত্রাদিতে যবের উল্লেখ রয়েছে। মহেঞ্জোদড়োয় সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের মধ্যেও জানা গেছে যে বার্লির ফলন খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বছর আগে ভারতবর্ষে ছিল। বেদে যবের উল্লেখ থেকে আরো মনে হয় ধান বা গম চাষের অনেক আগেই ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য ছিল বার্লিশস্য। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বার্লির পুষ্টিকর গুণগুলির কথা জানতেন। পালা-পার্বণ ও উৎসবে এবং প্রাত্যহিক আহার্য ও পানীয় হিসেবে বার্লির ব্যবহার ছিল। এই কারণে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বার্লিশস্য একাত্ম হ'য়ে আছে।

আজো বার্লি মানুষের একটি বিশিষ্ট খাদ্য। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে অসংখ্য মানুষ বার্লির পানীয় দিয়েই জীবনধারণ করে। বার্লি-শস্য থেকে উৎপন্ন পার্ল বার্লি ও গুঁড়ো বার্লি সহজে হজম হয় এবং শারীর ক্রিয়ার সহায়ক ব'লে রুগ্নদের জন্যেই এর বহুল ব্যবহার।

শস্য উৎপাদন পদ্ধতি ও যান্ত্রিক উন্নয়নের ফলে বার্লির চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। 'পিউরিটি বার্লি' প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ-এর সর্বাধুনিক কারখানায় উঁচুজাতের বার্লিশস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বার্লি তৈরী হয়। এই জন্যেই 'পিউরিটি বার্লি' রুগ্ন, শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। যুবা ও বৃদ্ধরাও এই বার্লি খেয়ে উপকার পান।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ (ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

PTY 3084

চাঁদ

সুশীল রায়
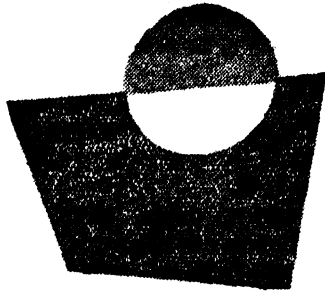
যখন সমস্ত আকাশের আশ্চর্য উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে, আমার ইচ্ছেটা তখনই প্রবল হয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে, সকলকে নিয়ে যাই সেই চন্দনপুরে। সকলকে নিয়ে গিয়ে ভীষণ একটা উৎসব করি সেখানে।

রাসপূর্ণিমার সেই রাত্রিটা আমার কাছে একটা ভয়ংকর রাত্রি হয়ে আছে। সেদিনকার চাঁদের গা থেকে যেমন প্রচুর জ্যোৎস্না ঝরেছিল, এমন বুঝি আর ঝরেনি কখনো।

সেই জ্যোৎস্নায় আমি সেদিন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। সে পাগলামি আজ পর্যন্ত সারল না।

আমার শ্বশুরবাড়ির দেশ চন্দনপুর, মল্লিকার পিত্রালয়।

খোকার তখন তিন বছর বয়স। দেখতে হয়েছিল কেমন জানেন? ওই চাঁদেরই মত। তার নাম রেখেছিলাম—

কিন্তু সে কথা থাক্।

মল্লিকা এক-এক সময় জিজ্ঞাসা করত, "ওগো, বলো না, আমাদের খোকা দেখতে কেমন হয়েছে?"

বলতাম, "তোমার মত।"

"মুখটা কেমন?"

বলতাম, "চাঁদের মত।"

"আর চোখ?"

একটু চুপ করে থাকতাম, কিসের মতন হয়েছে বললে মল্লিকা খুশী হবে, বুঝতে পারতাম না। ভাবতাম।

"বলোই-না!"

বলতাম, "আমার মত।"

একটা নিশ্বাস ফেলত মল্লিকা, বলত, "আমার মত বুঝি তবে কিছুই পায়নি?"

বলতাম, "পেয়েছে।"

"কি?"

"হাসিটা।"

মল্লিকার চোখ ছিল না, কিন্তু সে অভাবটা সে পুষিয়ে দিয়েছিল তার হাসি দিয়ে।

যে তার হাসি দেখেছে, সেই বলেছে, 'সুন্দর। ফুলের মত মিষ্টি।'

মল্লিকার চোখ ছিল। তাদের বাড়ি চন্দনপুরে, আর আমার বাড়ি বৃন্দাবনচকে। জায়গা দুটো খুব দূরে দূরে না। মাইল-তিনের তফাতে। জলঙ্গী নদীটা যেখানে পদ্মার সঙ্গে মিশেছে—তারই কাছে আমাদের বাড়ি। আমাদের ভালোবাসাটা তাই বুঝি পদ্মার স্রোতের মত তেজী, আর তা গভীরও বুঝি পদ্মার মত।

আমরা দু-জনে ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলেছি। বাল্যকালের প্রেম যাকে বলে তা আমাদের মধ্যে এতটুকু ছিল না। চন্দনপুরে যখনই বেড়াতে গিয়েছি, তখনই পেয়েছি এই সঙ্গীকে। এই খেলার সঙ্গী যে জীবনে কখনো জীবনসঙ্গিনী হবে, কখনো তা ভাবিনি।

কিন্তু ঘটনায় তা ঘটে গেল।

আমরা দুজনে সত্যিই খুব অন্তরঙ্গ ছিলাম। কখনো ছুটে চলে যেতাম মাঠ পার হয়ে অনেক দূরে—ছুটতে ছুটতে গিয়ে নামতাম নদীর ঢালু পাড় ধরে, ঝাঁপিয়ে গিয়ে উঠতাম নৌকোতে।

বলতাম, "মাঝি, এ নৌকো কোথায় যাবে।"

বুড়ো মাঝি হেসে মল্লিকার দিকে চেয়ে বলত, "তুমি যাবে কোথায় দিদি-ঠাকরান?"

মল্লিকা বলে উঠত, "তুমি কোথায় যাবে, বলোই-না।"

"আমি যাব? আমি যাব নারায়ণগঞ্জ।"

তার মুখের দিকে চেয়ে থাকত মল্লিকা, যেন জিজ্ঞাসা করছে, কতদূরে, কতদূরে সেই দেশটা।

মাঝি-বুড়ো বুঝি বুঝতে পারত তার জিজ্ঞাসাটা, বলত, "অনেক দূরে সেই দেশ। জলঙ্গী পার হয়ে পড়ব গিয়ে জংলী নদীতে—"

"সেটা আবার কি গো—"

"পদ্মা। যেখানে এত বড় বড় ঢেউ, এমনি মস্ত মস্ত পাক, বাতাসের তোড়ে আর সোতের টানে যেখানে নৌকো চলে সাঁই সাঁই করে।"

কি বুঝত কে জানে। হাততালি দিয়ে উঠত মল্লিকা।

তার মুখের দিকে চেয়ে থাকত বুড়ো মাঝি অবাক হয়ে, বলত, "এ তো মেয়ে মেয়ে নয়।"

আকাশে যেমন ভেসে বেড়ায় হাল্কা মেঘেরা, অবিকল সেইভাবে নদীর জলে ভেসে বেড়ায় পাল-তোলা হাল্কা নৌকো। ওরই মধ্যে গজেন্দ্রগমনে ভাসতে ভাসতে চলে ভারী গহনার নৌকো।

বুড়ো মাঝিটার নাম আজ মনে নেই। কিন্তু তার কথাটা মনে আছে।—এ তো মেয়ে মেয়ে নয়।

জলঙ্গীর প্রায় ওপারে চারঘাট। আমার মামা সেখানে পাটকলের ম্যানেজার। বৃন্দাবন-চকে আমার লেখাপড়া হচ্ছে না বলে মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন মামার কাছে।

মামার কাছে এসে দেখলাম মস্ত মজা। আদুরে ভাগনেটি এখানে লাই পাচ্ছি খুব।

পদ্মা থেকে একটা শাখা-নদী বেরিয়েছে, নাম বড়ল। শীতকালে লাফ দিয়ে পার হওয়া যায় এই নদী, কিন্তু বর্ষার দিনে তার চেহারাই আলাদা—ঢেউয়েরা দুই পাড়ে অনবরত আছড়াআছড়ি করে।

আমারও যেন এই বড়ল নদীর মত অবস্থা হল। বৃন্দাবনচকে যদি-বা একটু নির্জীব ছিলাম, এখানে এসে আমার দাপাদাপি বেড়ে গেল। সারাদিন বড়লের বুকেই কাটাই। কখনো বুক-সাঁতার কখনো চিত-সাঁতার, কখনো-বা নৌকো নিয়ে পদ্মার মুখের দিকে যাত্রা করা। আবার, কখনো ওপারে গিয়ে সরদার পুলিস-ট্রেনিং মাঠে নেমে দৌড়োদৌড়ি।

কিন্তু আমার মামা বড় কড়া মামা। আদর দিতে রাজি, কিন্তু আশকারা দিতে চান না। শরীরও তাঁর এত বড়-সড় এবং রংও এমন কালো কুচকুচে যে, যখন তিনি রাগ করে শক্ত হয়ে দাঁড়ান, মনে হয় বুঝি যমদূত।

এখানে আসা-এস্তোক এক পাতা বিদ্যে আমার বাড়েনি দেখে তিনি একদিন ডাকলেন আমাকে, "লোকেন, লোকেন।"

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, "দেখছি, লেখাপড়া তোমার হবে না। তোমাকে পুলিস-ট্রেনিংএ ভরতি করে দেব ঠিক করেছি।"

ভয় পেলাম। মামাটা বড় কঠিন মানুষ। আমাকে পুলিস করার ইচ্ছে যদি তিনি করে থাকেন তাহলে তা করেই ছাড়বেন।

আমিও শক্ত হয়ে, কাঠ হয়ে, কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে আমার আপত্তি জানালাম। কালো কুচকুচে গোঁফের ফাঁক দিয়ে সাদা দাঁত দেখা গেল, একটু হেসে মামা বললেন, "ডাকাত।"

ওই আদুরে ডাক শুনে আমার চোখ ছল-ছল করে উঠল। মামা বললেন, "থাক্। তোকে আমি পড়াব। শহরের ইস্কুলে ভর্তি করে দেব।"

চারঘাট থেকে একদিন ইস্টিমারে চাপলাম। পদ্মার বুকের উপর দিয়ে ঝিকঝিক করে চলল সেই জলের গাড়ি।

রামপুর বোয়ালিয়ায় এলাম। এখানকার ইস্কুলে আমার ছাত্রজীবন আরম্ভ হল। কয়েক বছর এখানে পড়ে আমি ম্যাট্রিক পাস করলাম, কলেজে ঢুকলাম। এর মধ্যে চারঘাটে গিয়েছি, কিন্তু বৃন্দাবনচকে যাওয়া হয়নি। ছুটির মধ্যে মাও আসতেন চারঘাটে। তাঁর একমাত্র ছেলে আমি, আমার উপর টান বোধ হয় সেইজন্যেই তাঁর এত। আমার বাবা গত হয়েছেন কবে আমার মনে নেই। শুনেছি, আমার বয়স নাকি তখন সবে দেড় বছর।

অনেকদিন দেশে যাইনি। কিন্তু সেবার গেলাম। পুজোর ছুটিতে। মল্লিকার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু এখানকার মাটিতে পা দেওয়া মাত্র মনে হল তার কথা।

মাকে বললাম, "মা, চন্দনপুরে যাব কাল।"

আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মা বললেন, "যাবি। তাড়া কি। ছুটি তো এখানো অনেকদিন আছে।"

মনে পড়ে গেল অনেক কথা, অনেক দিন আগের কথা। যতই মনে পড়তে লাগল ততই যাওয়ার আগ্রহ বাড়তে লাগল।

মা বললেন, "এখন কি আগের মত ছোটটি আছিস? এখন অমন হুট করে যেতে নেই।"

মা যতই বাধা দিতে লাগলেন আমার রোখ বাড়তে লাগল ততই। আর বাধা মানলাম না। আমি এই লম্বা পথটা পায়ে হেঁটে এসে হাজির হলাম চন্দনপুরে।

গোলাঘরের গা দিয়ে একটু এগিয়েই ওদের উঠোনে যাওয়ার দরজা, সেখান থেকে ডাক দিলাম, "মল্লিকা, মল্লিকা।"

চালে বসে খড় গুঁজছে করামি। উঁচুতে বসে সে বলল, "কে গো তুমি? কাকে চাই?"

বললাম, "মল্লিকাকে।"

বলতে বলতেই ভিতরের উঠোনে গিয়ে পৌঁছলাম, ডাক দিলাম, "মল্লিকা।"

বুঝি চুল বাঁধছিল, গামছা দিয়ে আঁট করে মাথাটা বাঁধা, ঘর থেকে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে।

চমক লাগল। চেনা মনে হল। মনে হল, সত্যি, এ তো মেয়ে মেয়ে নয়। মস্ত বড় হয়ে গিয়েছে, যেমন চোখ তেমনি চুল, তেমনি সব, তেমনি সব।

গলার স্বর নামিয়ে, আস্তে বললাম, "চিনতে পারছ না বুঝি? আমি লোকেন।"

তার মা বুঝি চাল ঝাড়ছিলেন, কুলো হাতে নিয়েই তিনি ঘরের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে যেন চাঁদ হাতে পেলেন, এইভাবে বললেন, "কে রে তুই? তুই-না লোকেন! ওরে, কত বড় হয়েছিস রে। কত ডাগরটা! বোস বোস।"

বসলাম। অনেক আদর-আপ্যায়নও হল। কিন্তু যার জন্যে এখানে আসা, সে অমন আড়ালে বসে কেন!

আমারও কেমন জড়তা এসে গিয়েছে। আমিও আর ডাকতে পারছি নে তাকে। তার কথা বলতেও পারছিনে।

একবার মাত্র দেখলাম উঠোনটা পার হয়ে যে বুঝি চলে গেল পুকুরঘাটে।

ব্যস। এই পর্যন্ত। আমি আবার ফিরে গেলাম রামপুর-বোয়ালিয়ায়। এখানে এসে বার বারই আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে হত চন্দনপুরে।

মা বুঝি বুঝেছিলেন আমার মনের কথা। বলতেন, "ওদের জোত-জমা আছে কত। ওরা কি আমাদের মত গরিবঘরে—"

যেন কিছু বুঝতে পারিনি এইভাবে বলেছি, "কিসের কথা বলছ মা?"

মা বলতেন, "না। কিছু না। অন্য কথা।"

খুব গোপনে হলেও আমি জানতে পেরে-ছিলাম যে, মা তাঁর এই আদুরে ছেলেটির মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরে ওদের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ওরা নাকি বিশেষ গরজ দেখায়নি। একথা শুনে আমার জানতে ইচ্ছে হয়েছিল মল্লিকা কিছু বলেছে কিনা। সে যে কিছুই বলেনি ও বলতে পারে না—একথা জেনেও আমার জানার ইচ্ছে জাগত মল্লিকার মনের কথাটা কি।

ক্রমশ ব্যাপারটি অনেক ঘোরালো হয়ে গিয়েছিল। মল্লিকার বাবা-মা নাকি সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন। এই কথা শুনে আমার জেদ যেন বেড়ে গেল।

ছুটিতে মা চারঘাটে এসেছিলেন। আমাকে তিনি অযথাই আশীর্বাদ করলেন, বললেন, "বিদ্বান হ, বড় হ—তবেই মানুষে মানবে।"

মার দু-চোখ ছলছল করে উঠল।

আমি বড় হবার কোনো চেষ্টা করিনি। নিজের মনে বড় হচ্ছি, অর্থাৎ বয়স বাড়ছে। কলেজের পড়াও শেষ হয়ে এল।

অনেক রকমের বই পড়লাম। প্রফেসরদের অনেক লেকচার শুনলাম। জীবনটা নাকি

উপন্যাসের চেয়েও অদ্ভুত। উপন্যাসে অনেক অঘটনের কথা লেখা হয়, কিন্তু জীবনের অঘটন নাকি তার চেয়েও বিচিত্র।

আমি অবশেষে সেই খেলার সঙ্গীকে আমার জীবনসঙ্গিনী করে নিয়েছি। কারো বাধা মানিনি, মায়ের চোখের জল না, মামার কড়া শাসন না। বিয়ে করেছি আমি মল্লিকে। মল্লিকাকে ধন্য করে দিয়েছি আমি।

মস্ত দুটি চকচকে চোখে অপলক চেয়ে থাকে আমার দিকে মল্লিকা। আমিও তার চোখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ নামাই। মনে হয়, সত্যি, এ তো মেয়েমেয়ে নয়।

মল্লিকা বলে, "শোনো।"

তার কাছে গিয়ে বসি।

সে চাপা গলায় ব্যাকুল ভাবে বলে, "কই, কোথায় তুমি।"

বলি, "এই তো।"

তার হাতের উপর হাত রাখি।

সে বলে, "কেউ শুনছে না তো কিছু? কেউ দেখছে না তো কিছু।"

উত্তর দিই নে। মল্লিকা বলে, "সত্যি বলো, আগের মত আমাকে তেমনি ভালোবাস তুমি?"

"না বাসব কেন। এ কথা উঠল কিসে?"

"না। এমনি। খুব অহংকার হয়েছিল কিনা আমাদের। তোমাকে মানুষ বলে ভাবিনি। গোলা-ভরা ধান নেই তোমার, বাথান-ভরা গাই নেই, তোমার ক্ষেত নেই, তোমার খামার নেই—"

বলতে বলতে সে আমার মাথায় হাত বুলাল, হাতটা নামিয়ে আমার বুকের উপর এনে বলল, "কিন্তু তোমার একটা জিনিস যে আছে। তার দাম দেবে কে?"

"কিসের কথা বলছ?"

"হৃদয়।"

মল্লিকা মাথা নীচু করল। বুঝি কাঁদছে সে।

বললাম, "ছি। ছেলেমানুষি কোরো না।"

তার মনে আক্ষেপ জমে ছিল প্রচুর। সুবিধে পেলেই সে সেই আক্ষেপ জানাত এইভাবে। হয়তো এইভাবে সে জানাত তার কৃতজ্ঞতাও।

কিন্তু এর জন্যে কৃতজ্ঞতা কেন। তাকে আমি ভালোবেসেছি, তাকে আমি বিয়ে করেছি। এর মধ্যে উদারতাই-বা কোথায়, মহত্ত্বই-বা কোথায়।

আমাদের খোকাটি যখন হল, আমি তখন একটু রেহাই পেলাম। এখন মল্লিকা তার খোকাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মাঝে-মাঝেই আমাকে ডাকে, বলে, "কেমন দেখতে হয়েছে বলো।"

সেই খোকা কলায় কলায় বেড়ে তিন বছরের হল। গরিব ঘরের ছেলে, কিন্তু দেখতে যেন রাজপুত্রটি।

বৃন্দাবনচকের বাড়ির চারদিকে গাছপালা। ভরদুপুরে চারদিক নিস্তব্ধ। একটা পাখি অনবরত কি-যেন বলে বলে ডাকছে।

মল্লিকা হেসে ফেলল, বলল, "খোকা হোক, খোকা হোক—এক রব গলায়। খোকা তো হয়েইছে। অন্য ডাক ডাকতে কি হয়?"

দু-তিন দিন বাদে পাখির ডাক শুনে চেঁচিয়ে উঠল, মল্লিকা, বলল, "তাড়াও তাড়াও—ওকে তাড়িয়ে দাও।"

কান পেতে শুনলাম—পাখিটা ডাকছে, চোখ গেল।

মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল, "এত পাখি ডাকে কেন? এটা কি কাল?"

বললাম, "বসন্তকাল।"

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল মল্লিকা, যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে সে। আতঙ্কে যেন শিউরে উঠেছে।

বুঝতে পারলাম, ও-কথা উচ্চারণ না করাই ভালো। মল্লিকার জীবনের ওটা একটা

অভিশাপ। ও তাই সহ্য করতে পারে না ঐ নামটিই।

বসন্ত কেটে যায়, কেটে যায় গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ।

মল্লিকাকে নিয়ে তার পিত্রালয়ে এসেছি। এখন এ-বাড়িতে আমার খুব খাতির। লোকেনের মতন লোক নাকি আর হয় না।

আকাশে সেদিন দুরন্ত পূর্ণিমা উঠেছে, বাতাসে হিমের হাওয়া। খোকার হাত ধরে মল্লিকা এসে বলল, "চলো।"

"কোথায়?"

"বাইরে। আজ নাকি ভীষণ জ্যোৎস্না উঠেছে, এই জ্যোৎস্নায় একটু বেড়াব বাইরে। যখন প্রায় এই খোকার মতন ছোট ছিলাম, তখন তোমার সঙ্গে বেড়াতাম যেখানে, সেই মাঠে আর ময়দানে, চলো একটু ঘুরি।"

মল্লিকার মনের মধ্যে গ্লানি আছে, তার কথার বিরুদ্ধে গেলে গ্লানি বাড়বে। রাজি হলাম।

প্রকাণ্ড মাঠ, যেন চারদিকের দিগন্ত ছুঁয়েছে চার হাত দিয়ে। আমরা তিনজনে সেখানে বসলাম। চাঁদ যেন পিচকারি দিয়ে দিয়ে জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে। চারদিক আলোয় আলোময়।

আমরা বসে কথা বলছি, খোকাও বুঝি চাঁদের হাসি দেখে খুশীতে আত্মহারা। সে খেলে বেড়াচ্ছে, দৌড়চ্ছে, পাক খাচ্ছে।

মল্লিকা বলল, "তোমার চোখ দিয়ে জ্যোৎস্না দেখছি আমি। কি চমৎকার এই রাত্রিটা, তাই না?"

আমিও জ্যোৎস্না দেখতে লাগলাম তার চোখে। তার সাদা ধবধবে চোখের উপরে জ্যোৎস্নার স্পষ্ট ছায়া পড়েছে।

আমার হাত নিবিড়ভাবে চেপে ধরে সে বলল, "সত্যি বলো, চাঁদকে সাক্ষী করে বলো—আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছ, না, কৃপা করে।"

তার হাতের উপরে যথেষ্ট চাপ দিয়ে কানে কানে বললাম, "কি মনে হয় বলো তো?"

মল্লিকা ফিসফিস করে বলল, "ভালোবেসে।"

বলেই আমার কোলের মধ্যে মাথা দিয়ে সে যেন আনন্দে গলে যেতে লাগল।

কতক্ষণ সময় কেটে চলেছে, হিসাব করিনি আমরা। যখন হিসাব করতে চেষ্টা করলাম তখন খুবই হিম পড়তে আরম্ভ করেছে।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম। মল্লিকা বলল, "খোকাকে ডাক।"

চারদিকে আলোর বন্যা। চারদিকে তাকালাম। কিন্তু খোকা নেই। চারদিকে দৌড় দিলাম। খোকা নেই।

"খোকা, খোকা, খোকা।" চীৎকার করে বেড়ালাম। খোকা নেই।

মল্লিকা আমার সঙ্গে চীৎকার করে উঠল, "খোকা, খোকা খোকা।" খোকা নেই।

আমাদের গলার স্বরে ছুটে এল লোকজন। লাঠি হাতে, এই আলোর মধ্যেও হারিকেন-হাতে এসে গেল লোকজন।

খোকা কই।

ছুটে বেড়াচ্ছিল সে, খেলে বেড়াচ্ছিল। যাবে কোথায়।

মাঠের সঙ্গে এক হয়ে আছে পানায় ঢাকা জলাটা—সেদিকে সকলে তাকাল।

কয়েকজন নেমে গেল জলে। লাঠি দিয়ে কেচে পানা সরিয়ে ফেলল।

পাওয়া গেল খোকাকে। হিম শরীর তার। দম তার বন্ধ।

মল্লিকা তার পাথুরে চোখে অপলক সেই-দিকে চেয়ে থেকে আমার হাত চেপে ধরল, ঝাঁকি দিল আমার হাতে, বলল, "অন্ধ। দেখতে পেলে না তুমি? তুমি অন্ধ, তুমি অন্ধ, তুমি অন্ধ।"

এই জ্যোৎস্নার মধ্যেও আমার চারদিক অন্ধকার ঠেকল। মল্লিকার কথার প্রতিবাদ করলাম না। আমার মাথাটার মধ্যে কেমন যেন করে উঠল।

সেই রাত্রেই আমি চন্দনপুর ছেড়েছি। আর যাইনি। মল্লিকার সঙ্গেও আর দেখা নেই। সে কেমন আছে?
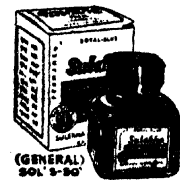
বন্দিনী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নানা বয়সী মেয়ে আর কাচ্চাবাচ্চায় ছোট লেডীজ পার্কটা ভরে গেছে। তবু কোনরকমে একটি বেঞ্চ দখল করে বসে দুই সখী সারা বিকেল ধরে সুখ-দুঃখের গল্প করছিল। দুজনে কলেজে একসঙ্গে পড়ত। অনসূয়া রায় বছর দুই হল বি এ পাস করে সরকারী অফিসে ঢুকেছে। শ্রীলেখা ঘোষালও পরীক্ষা দিয়েছিল, কিন্তু পাস করতে পারেনি। তবে রেজাল্ট বেরোবার আগেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। স্বামীকে সহায় করে সে আরো একবার পরীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু একই ফল। মানে একই রকমের বিফলতা। শ্রীলেখার সংকল্প সে আরো একবার পরীক্ষা দেবে। কিন্তু তার স্বামীর তাতে সায় নেই। অরুণ নাকি বলেছে 'এ অবস্থায় রিস্‌ক না নেওয়াই ভালো। মাস চারেক পরেই তো তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।' বন্ধুর পরিপুষ্ট দেহের দিকে চেয়ে অনসূয়া একটু হাসল, 'আমি তাই বলি। তোর কাজ নেই আর ওসব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে। বেশ তো আছিস। সংসারের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ-র পর এম এ ডিগ্রী নিতে যাচ্ছিস। তোর আর ভাবনা কি।'

অনসূয়ার হাসি, কথা আর তাকাবার মানে বুঝতে পেরে শ্রীলেখা একটু লজ্জিত হল। শাড়ির আঁচলটা ভালো করে একটু টেনে বসল, তারপর বন্ধুকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, 'যাঃ ফাজিল কোথাকার। তুই কেবল আমার সুখটাই দেখলি, দুঃখটা বুঝতে পারলিনে। যাই বলিস, আজকালকার মেয়েদের স্বামী-সংসার একদিকে আর নিজের ক্যারিয়ার একদিকে। তুই নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করে নিয়েছিস।'

অনসূয়া বলল, 'ছাই ক্যারিয়ার। কেরানী-গিরি আবার একটা ক্যারিয়ার নাকি। তাও তো এবার স্ট্রাইকের জন্যে যেতে বসেছিল।'

শ্রীলেখা বলল, 'যাই হোক, ঝামেলা তো মিটে গেছে। চাকরিতে তোর প্রসপেক্ট আছে।

ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে চাই কি তুই অফিসার গ্রেডে চলে যেতে পারিস। আমি খাঁচার পাখি। পড়াশুনো যদি না হয় আমার যা হবার হয়ে গেল। আর তুই মুক্ত পাখি। অফিসের ওই সময়টুকু ছাড়া তুই যেখানে খুশি উড়ে বেড়াতে পারিস।'

অনসূয়া বলল, 'উড়ে বেড়াবার জ্বালা আছে রে। ব্যাধ তীর-ধনু হাতে পিছনে পিছনে লেগেই আছে। তীরের ডগায় বিঁধে যে কোন মুহূর্তে ধুলোর মধ্যে, কাদার মধ্যে ফেলে দিতে পারে।'

শ্রীলেখা আরও ঘন হয়ে বসে সখীর চিবুক তুলে ধরল, 'আহাহা, কি সুখের ভয়রে। ধুলোয় ফেলবে কেন, পুষ্পশরে যারা বেঁধে রক্তাক্ত পাখিকে তারা বুকেই তুলে নেয়। তারপর—' শ্রীলেখা এবার অনসূয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'তুলে নিয়ে ঠোঁট দিয়ে আদর করে। পাখি ছাড়া ব্যাধেরও তো দুটো ঠোঁট আছে।'

মুখ সরিয়ে এনে শ্রীলেখা এবার জিজ্ঞাসা করল, 'বল না অনু, সে ব্যাধ তোর কোথায়। অফিসে না অফিসের বাইরে।'

অনসূয়া বিষণ্ণ গম্ভীরভাবে বলল, 'তুই যা ভাবছিস তা নয়। ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তোকে আর একদিন বলব।'

শ্রীলেখা ভাবল অনসূয়া বড় চাপা মেয়ে। দু' বছর একসঙ্গে পড়ে সে ওকে চিনেছে। যারা বুদ্ধিমতী তারা বোধ হয় চাপাই হয়। শুধু বুদ্ধিমতী নয়, অনসূয়া সুন্দরীও। কালোর ওপর সুশ্রী ছিপছিপে চেহারা। টানা নাক-চোখ। বলতে কইতে পারে। ওকে ভালোবাসবার জন্যে ছেলেরা পাগল হবে না কেন। শ্রীলেখা সুন্দরী নয়। রং ফর্সা হলেও বেঁটে মোটা। তারপর আবার মুখচোরা। তাই দায় হিসাবে বাপের ঘাড়ে পড়েছিল। তিনি প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা দেনা করে মেয়েকে পাত্রস্থ করেছেন। শ্রীলেখার ভারি লজ্জা হয় এজন্যে। অনসূয়াকে এ লজ্জা পেতে হবে না। এ দুঃখ ভোগ করতে হবে না। ওকে যে নেবে সে শুধু ভালোবেসেই নেবে। ভালোবাসা ছাড়া সে ওর কাছে আর কিছুই চাইবে না। আহা সে কী সুখ।

'কে সে? বল না অনু?'

শ্রীলেখা আবার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল। অনসূয়া এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'বললাম তো আর একদিন বলব।'

শ্রীলেখা মুখভার করে বলল, 'ও আচ্ছা। না বলতে চাস না বললি। না বললে আমি তো আর জোর করে তোর পেট থেকে কথা বের করে নিতে পারব না।'

'গোপন কথা বুঝি পেটে থাকে?' অনসূয়া একটু হাসল।

কিন্তু শ্রীলেখা হাসল না। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে।

বন্ধুর দেখার বস্তুটি কী লক্ষ্য করতে গিয়ে দুটি পামগাছের আড়ালে পুরোন কনভেন্ট স্কুলটা চোখে পড়ল অনসূয়ার, এদিককার জানলাগুলি বন্ধ। বোধ হয় রাস্তার ধার বলেই এই সতর্কতা। কিন্তু বাড়ির জানলা বন্ধ হলেও স্মৃতির দুয়ার এরই মধ্যে খুলে গেছে অনসূয়ার। ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস টেন—চারটি বছর সে ওই কনভেন্ট স্কুলে কাটিয়ে দিয়ে গেছে। কৈশোরের প্রথম তারুণ্যের পর কত সুখ-দুঃখের আনন্দ-আহ্লাদের স্মৃতি ওই স্কুল-বাড়িটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কত মেয়ের সঙ্গে আলাপ বন্ধুত্ব আর ঝগড়া করেছে দিনরাত। তারা আজ কোথায়। সেই সব দিন-গুলিই বা কোথায়। কত টিচারের স্নেহ পেয়েছে, বকুনি খেয়েছে। কাউকে ভালো-বেসেছে, কাউকে দেখতে পারেনি। তাদের সঙ্গেও অনসূয়ার জীবনের আর কোন যোগ নেই। যোগ নেই তবু মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে রতনদির কথা। আশ্চর্য, তাঁর কথা মাঝে মাঝে কেন এত বেশি করে মনে পড়ে অনসূয়ার? তাঁর স্মৃতি তো সুখের স্মৃতি নয়, শুভ আর সুন্দর জীবনের স্মারক নয়।

'এই শ্রীলেখা, শোন।'

বন্ধুর কাঁধ ধরে নাড়া দিল অনসূয়া। শ্রীলেখা মুখ ফিরাল, 'কী বলছিস?'

'ওই কনভেন্ট স্কুলের সাদা বাড়টা চিনিস? মানে কোন মিস্ট্রেস কি ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ টালাপ হয়েছে? তোরা তো ছ' মাস হলো এ পাড়ায় এসেছিস।'

শ্রীলেখা মুখভার করে বলল, 'না ভাই আমার তো স্কুল-কলেজের পাট চুকেই গেছে। আমার আর ওসব জেনে কী হবে।'

অনসূয়া একটু হেসে বলল, 'তাই নাকি? জানিস, ওই কনভেন্টে আমি ছেলেবেলার অনেকদিন কাটিয়েছি। অনেক বছর।'

শ্রীলেখা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোর ছেলে-বেলার কথা কে শুনতে চাইছে অনু?'

অনসূয়া বলল, 'আমার ছেলেবেলার জীবন বুঝি আর আমার জীবন নয়? শোন, ওখানে আমাদের একজন মিস্ট্রেস ছিলেন রতনদি। মিস সরকার। পুরো নাম রত্নমালা সরকার। আমরা যখন তাঁকে দেখি তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। তবু সেই বয়সেও তিনি দেখতে যে কী সুন্দর ছিলেন তোকে কি বলব।'

শ্রীলেখা বাধা দিয়ে বলল, 'তোর কিছু বলতে হবে না। চল এবার উঠি। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। ও'র ফিরবার সময় হয়েছে। শাশুড়ী নিশ্চয়ই আমায় খোঁজা-খুঁজি শুরু করে দিয়েছেন। চল বরং বাড়িতে গিয়ে এবার এক কাপ চা খাবি। তারপর যদি তোর সময় হয় আর ইচ্ছে থাকে ও'র সঙ্গে আলাপ করে যাবি।'

অনসূয়া বলল, 'নিশ্চয়ই আলাপ করব। বিয়ের সময় তো আর সে সুযোগ হয়নি। কিন্তু এখান থেকে তোদের বাড়ি তো মোটে দু মিনিটের পথ। ওই তো দেখা যাচ্ছে। তোর বর এসে নিশ্চয়ই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তোর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকবে। আর যদি বেশি ভাবুক হয়, হাতছানিও দিতে পারে। তখন আমরা একছুটে ওখানে গিয়ে পৌঁছব। ঈস, কী ছুটোছুটিই না তখন করেছি। জানিস আমি খুব ছুটতে পারতাম। এখনো পারি। রতনদির কাছে কী বকুনিই না খেয়েছি দুষ্টুমি আর দুরন্ত-পনার জন্যে। রোজ তাঁর ব্ল্যাক বুকে আমার নাম উঠত। শুধু কি আমার? কারো নামই বাদ যেত না। বোর্ডিং হাউসে তখন আমরা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন ছিলাম। ছোট বড় সব মেয়েকেই তিনি কালো দাগে দাগিয়েছেন। অস্থির হোসনে। বোস আর একটু। আর মিনিট পাঁচ-সাত নিশ্চয়ই অরুণবাবু তোর বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবেন।'

'হ্যাঁ, দেখতে সুন্দরী হলে কী হবে রতনদির মন ভালো ছিল না। কী কড়া মেজাজ আর কী নিষ্ঠুর স্বভাবই যে তাঁর ছিল তুই ভাবতেও পারবিনে। আমরা মেয়েরা ছিলাম তাঁর কাছে মশা আর ছারপোকার মত। যদি পারতেন তিনি আমাদের টিপে মারতেন। এমন একজন জাঁদরেল মেয়ে-মানুষের হাতে বোর্ডিং হাউসের সব রকম কর্তৃত্ব যে কী করে গিয়ে পড়েছিল তা জানিনে। স্কুলে পজিশনের দিক থেকে তিনি হেড মিস্ট্রেস তো দূরের কথা, সেকেন্ড কি থার্ড টিচারও ছিলেন না। বোর্ডিং হাউসের সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদও তাঁকে কেউ দেয়নি। আমার মনে হয়, তিনি নিজেই সব জোর করে দখল করেছিলেন।

বয়সে ছিলেন তিনি সবচেয়ে বড়ো। কনভেন্টে এসেছেন ও সবাইর আগে। তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার মত জোর কারো ছিল না। সে চেষ্টাও বোধ হয় কেউ করেননি। হেড মিস্ট্রেস মিস পামার ছিলেন শান্তশিষ্ট নির্বিবাদী মানুষ। স্কুলের কাজ আর নিজের পড়াশুনো নিয়েই থাকতেন। লেখার অভ্যাসও তাঁর ছিল। থিয়োলজির ওপর তাঁর অনেক আর্টিকেল শুধু মিশনারি পত্রিকায় নয়, অন্য কাগজেও বেরোত। সেকেন্ড টিচার রেবাদির ইণ্টারেস্ট ছিল সাহিত্যে। তিনি ইংরেজী নভেল নাটক পড়তে ভালোবাসতেন। থার্ড টিচার সুনন্দাদির ঝোঁক ছিল খেলাধুলো আর গার্ডেনিংএ। তিনি মেয়েদের নিয়ে টেনিস ব্যাডমিণ্টন খেলতেন। আমরাও তাঁকে খুব পছন্দ করতাম। কিন্তু বলব কি ভাই। আমাদের বুড়ী রতনদির আর কোন কিছুতে ইনটারেস্ট ছিল না। না ধর্মে, না সাহিত্যে, না সেলাই বোনায়, না খেলাধুলোয়। কিন্তু মানুষের তো একটা না একটা অকুপেশন চাই। বুড়ীর কাজ ছিল ছোটবড় সব মেয়ের পিছু লাগায়। ও'র কলীগদেরও তিনি ছেড়ে দিতেন না। তাঁদের পিছনেও তিনি গোয়েন্দাগিরি করতেন। একজনের কথা আর একজনের কানে লাগাতেন। একজনের অযথা নিন্দা আর একজনের কাছে করা ছিল তাঁর চিরকালের অভ্যাস। তিনি হয়তো ভাবতেন এই করে করে তিনি কারো কারো শ্রদ্ধাভক্তি ভালোবাসা পাবেন। কিন্তু তাই কি আর পাওয়া যায়? দিদিমণিদের কেউ তাঁকে বিশ্বাস করতেন না, শ্রদ্ধা করতেন না, তবে ভয় করতেন। আর সহ্য করে যেতেন। কনভেন্টের অথরিটির সঙ্গে তাঁর কিসের একটু বাধ্যবাধকতা ছিল আমরা কেউ জানিনে। আড়ালে আবডালে দিদিমণিদের মধ্যে কেউ তাঁকে বলতেন শাশুড়ী আবার কেউ বা বলতেন দিদিশাশুড়ী। সামনে কেউ কিছু বলতে সাহস পেতেন না। যদি তিনি এসব শুনতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর আদরের পুত্রের বউ আর নাতবউদের জিভের ডগা আর নাকের ডগা বঁটি দিয়ে কেটে ছেড়ে দিতেন।

একেই তো কনভেন্টের বাঁধাধরা রুটিন লাইফ। তারপর রতনদির এই অত্যাচারে আমরা ত্রাহি ত্রাহি করছিলাম। আমাদের ভোর পাঁচটায় উঠতে হত। তারপর হাতমুখ ধুয়ে নিজেদের জায়গায় বসে প্রেয়ার। তারপর পড়তে বসা। নাওয়ার ঘণ্টা পড়লে নাওয়া, খাওয়ার ঘণ্টায় খেতে যাওয়া। চারটে পর্যন্ত স্কুল। তারপর জলযোগ। তারপর খেলতে যাওয়া। কনভেন্টের উঁচু পাঁচিলঘেরা মাঠ আছে। সেই মাঠে দিদিমণিদের ইচ্ছেমত আমাদের খেলতে হবে।

কোনদিন কোন খেলা হবে তাও শুনেছি আমাদের স্পোর্টসের সুনন্দাদি নয় রতনদিই ওপর থেকে সব ঠিক করে দিতেন। যিনি জীবনে কোনদিন বল ধরেননি, র‍্যাকেট ছুঁয়ে দেখেননি, তবু অন্য রুটিনের মত তাঁর হাতেই ছিল খেলার রুটিনের সুতো। তিনি সুতো নাড়তেন আর আমরা ছোট-বড় পুতুলের দল নাচতাম, ফিরতাম, ঘুরতাম, ছুটতাম। আচ্ছা বল তো শ্রীলেখা, এ ধরনের খেলায় কি আনন্দ পাওয়া যায়? অন্যের ইচ্ছেমত পড়া যায়, কাজ করা যায়, কিন্তু খেলাটা যার যার নিজের ইচ্ছেয় হওয়াই তো ভালো। নিজের ইচ্ছেয় না খেলাটাও খেলা। কিন্তু তা হবার জো ছিল না। একেবারে অসুস্থ হয়ে শুয়ে না পড়লে খেলতে আমাদের যেতেই হত।

সেবার একদিন আমি আর আমার পাশের সীটের বেলা নন্দী যুক্তি করে ঠিক করলাম আমরা খেলতে যাব না। আমরা দুজন তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। বেলা আমার চেয়ে দেখতে ছোটখাটো হলেও বয়সে দু বছরের বড়। মনে মনে তরুণী। আরো দু বছর আগে থেকে সে নভেল পড়ছে আর প্রেমে পড়েছে। তুই শুনে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছিস। সেই প্রমিলরাজ্যে প্রেম আবার কার সঙ্গে। অবাক হবারই কথা। ছুটি-ছাটায় যখন কনভেণ্ট থেকে বাড়িতে যেতাম সেই সময় ছাড়া অন্য কোন সময় আমরা পুরুষের—তা সে বালকই হোক, যুবকই হোক, বৃদ্ধই হোক কারোরই নাম শুনতাম না, গন্ধ পেতাম না, দাড়ি-গোঁফ দেখতাম না। অবশ্য দিদিমণিদের কারো কারো ঠোঁটে গোঁফের আভাস ছিল—সেই মেয়েলি গোঁফ বাদে। এই অবস্থায় কি করে প্রেম সম্ভব। কিন্তু বেলা ছিল অসাধারণ মেয়ে। ও ছুটিতে যখন বাড়ি যেত পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে আসত। কেউ বা দাদার বন্ধু, কেউ বা বোনের প্রাইভেট টিউটর, কেউ বা জামাইবাবুর ভাই। যার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভাব জমত তার সঙ্গে চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া করত। ডাকে না। ডাকের সব চিঠি রতনদি সেনসর করে দিতেন। চিঠি আনাগোনার অন্য একটি সুড়ঙ্গপথ ছিল। যে সব মেয়ে বাইরে থেকে স্কুলে পড়তে আসত তাদের কেউ কেউ ছিল বেলার কুট-

নৈতিক দূতী। তারা বই খাতার মধ্যে লুকিয়ে এসব চিঠি নিয়ে আসত নিয়ে যেত। এই দুঃসাহসিক কাজের বদলে তারা বেলার কাছ থেকে লজেন্স বিস্কিট কি নগদ পয়সা টয়সা পেত।

"আমি বেলাকে অনেকবার সাবধান করে দিয়েছি, 'বেলা অত ঝুঁকি নিতে যাসনে। কবে ধরা পড়বি আর রতনদি তোকে ফাঁসিতে লটকে ছাড়বে।'

বেলা বলেছে, 'দূর বুড়ী আমার সঙ্গে চালাকিতে পারবে নাকি? রতনদি হাঁটে ডালে ডালে আমি হাঁটি পাতায় পাতায়।'

এই সাহস কেবল বেলার একারই ছিল না। ওর দলে আমাদের ডরমিটারির অন্তত আরো দু-তিনজন মেয়ে ছিল। তবে তাদের সঙ্গে আমার তেমন ভাব ছিল না।

আমি আর বেলা যে সেদিন খেলতে গেলাম না তার কারণ দুখানি চোরাই নভেল আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। নির্জন ঘরে বসে আমরা তা পড়ব। আর বেলার বন্ধু সমীর দাস যে চিঠি পাঠিয়েছে আমরা দুজনে মিলে তার জবাব দেব। আমাকে না হলে বেলার চিঠি লেখা হত না। নিজের হাতের লেখার জন্যেও ওর ভারি লজ্জা ছিল। তাই আমাকেই সব করে দিতে হত। কে নাকি বলেছিল আমার হাতে অমুকে এসে তামাক খেয়ে গেছে, বেলাও তেমনি আমার হাতে প্রেম করত। পরে বুঝেছিলাম, ভিতরে ভিতরে ওর আরো একটু মতলব ছিল। যদি ধরা পড়ে আমাকেও জড়িয়ে নিতে পারবে।

সেদিন আমরা খেলতে নামলাম না। জ্বরের ভান করে সেই বোশেখ মাসের গরমেও মোটা চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলাম।

ডরমিটারি একেবারে খালি। একটি মেয়ে তো ভাল, একটি মাছিও কোথাও নেই। স্কুলের ছুটির পর দিদিমণিরা যে যাঁর বেড়াচ্ছেন, বুনছেন, বই পড়ছেন, চিঠি লিখছেন। বেলা আর আমি স্প্রীংয়ের খাটে উঠে বসে গল্প করতে লাগলাম। বেলা প্রাণ ভরে তার ভালবাসার গল্প বলে গেল। ওর মন আজ বড় উদার। বেলা বলল, 'হাঁ করে তুই কেবল আমার কথাই শুনছিস। তুই নিজেও লভে পড়না অনু। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

আমি হেসে বললাম, 'না ভাই, তার আর দরকার নেই। একা তোর প্রেমের জ্বালাতেই আমি অস্থির। এর পর যদি নিজেও পড়ি আর উপায় থাকবে না।'

তুই তো জানিস লেখা, স্কুলে কেন কলেজ লাইফেও মকর কেতন আমার কাছে শুধু কৌতুকের কেতনই ছিলেন। যারা প্রেমে পড়ত আর ছটফট করত তাদের দেখে আমার হাসি পেত।

সমীরের চিঠিটার কী জবাব দেওয়া যায় তাই নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে হঠাৎ দেখি চোখ দুটি কপালে তুলে বেলা একেবারে চুপ করে গেছে।

আর কেউ নয়, ছায়ামূর্তির মত রতনদি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর পায়ে সাদা রবারের জুতো, তা পরে কনভেণ্টের ঘরে বারান্দায়, করিডোরে নিঃশব্দে তিনি ঘুরে বেড়ান। তাঁর গায়ে ওই গরমের মধ্যেও ফুলহাতা জামা, পরনে কালোপেড়ে মিহি শাড়ি, ঘন রুপালী চুলের রাশ কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। এই বয়সেও তাঁর গায়ের সে কী রং, টিকোল নাক, পাতলা ঠোঁট, টানা টানা ভুরু। আজ এতকাল বাদে তোর কাছে তাঁর রূপের বর্ণনা দিতে পারছি, কিন্তু সেদিন নিশ্চয়ই তাঁর রূপ দেখিনি। সেদিন এক ডাইনী বুড়ীকে হঠাৎ সামনে দেখে আমরা আঁতকে উঠেছিলাম। তাঁর কোটরে বসা চোখ দুটি জ্বলছিল।

'কী করছ তোমরা?'

বেলা অস্ফুট গলায় বলল, 'আমাদের জ্বর হয়েছে।'

'এই বুঝি জ্বরের নমুনা?'

'আজ্ঞে, নার্সকে জিজ্ঞেস করুন।'

ডাক্তার দূরে থাকতেন। কিন্তু নার্স আমাদের কনভেণ্টের মধ্যেই ছিল। আমাদের অসুখ বিসুখ হলে দেখবে, সেবাশুশ্রূষা করবে এই ছিল ব্যবস্থা। কিন্তু মুখ খিঁচুনির ভয়ে তার হাতের সেবা আমরা কেউ চাইতাম না। তবু বেলা নার্সকে মাঝে মাঝে দু-এক টাকা দিয়ে বশ করেছিল। কিন্তু রতনদি যে তার কথা বিশ্বাস না করে নিজেই আমাদের জ্বর যাচাই করতে আসবেন তা কে জানত?

রতনদি এসে আমার কপালে হাত রাখলেন। সাদা, লম্বা লম্বা রোগাটে আঙুল। ডাইনীর আঙুলের ছোঁয়ায় আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল।

রতনদি বললেন, 'হুঁ।'

তারপর বেলার কপালে ফের সেই হাত-খানা রাখলেন। কিন্তু তার আগেই জ্বরের জ্বালা আর প্রেমের জ্বালা সব জুড়িয়ে ফেলে বেলা একেবারে বরফ হয়ে রয়েছে। রতনদি তাপ পাবেন কোথায়? তবু তিনি নার্সকে হুকুম দিলেন, 'থার্মোমিটারটা দাও তো।'

নার্স ভয়ে ভয়ে থার্মোমিটারটা তাঁর হাতে এগিয়ে দিল।

রতনদি চাদরটা উলটে ফেলতেই সমীরের দেওয়া নভেলখানা বেরিয়ে পড়ল।

রতনদি বললেন, 'হুঁ। এই জ্বর তোমাদের!'

তা সত্ত্বেও থার্মোমিটার বগলে লাগিয়ে আমাদের দুজনেরই টেম্পারেচার নিলেন। আমি লর্ড ক্রাইস্টকে মনে মনে ডাকতে লাগলাম। বেলা হিন্দু মেয়ে। তেত্রিশ কোটির মধ্যে ও অন্তত [illegible] জনের নাম

জপ করল। কিন্তু কিছুতেই আমাদের টেম্পারেচার সাড়ে সাতানব্বইয়ের ওপরে উঠল না।

রতনদি নার্সকে বললেন, 'ওদের দুজনকে 'সিক রুম'-এ নিয়ে যাও।'

নার্স বলল, 'আজ্ঞে ওরা তো—'

রতনদি তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'যা বলছি তাই করো। ওরা যখন অসুস্থ, ওদের 'সিক রুম'-এ নিয়ে রাখাই ভাল।'

আমরা বললাম, 'রতনদি এবারকার মত আমাদের মাফ করুন।'

তিনি বললেন, 'মাফের কোন কথাই ওঠে না। **You are diseased you require proper treatment.**

'সিক রুম' ছিল আমাদের কাছে বিভীষিকা। সত্যি সত্যি অসুস্থ হলেও আমরা কেউ সেখানে যেতে চাইতাম না। আমাদের নার্স ঠিক ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল ছিল না। তার রণচণ্ডীর মূর্তিই সেখানে আমরা দেখেছি। যেমন তার কড়া ওষুধ, তেমনি কড়া মেজাজ আর তেমনি বিশ্রী পথ্য। তবু সেই 'হেল'-এ রতনদি আমাদের ঠেলে পাঠালেন। মিথ্যে বলবার শাস্তি আমরা সেখানে দেড় দিন থেকে ভোগ করলাম।

রেবাদি, সুনন্দাদিরা শুনেছি আমাদের পক্ষ নিয়ে একটু বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু রতনদি তাঁদের কাউকে আমল দেননি। ধমক দিয়ে বলেছেন তোমাদের প্রশ্রয় পেয়ে পেয়েই ওরা এমন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

তারপর থেকে আমাকে আর বেলাকে রতনদি খুব চোখে চোখে রাখতে লাগলেন। অন্য ঘরে বেলার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি ভয়ে ওর সংগে কথাই-বলিনে। তবু রতনদি আমার দিকে কী রকম চোখ করে তাকান। দেখতে ভয় লাগে। তিনি যেন আমার অসৎ বুদ্ধির তলা পর্যন্ত দেখে নিতে চান।

বেলার কিন্তু এততেও শিক্ষা হল না। সে তেমনি চিঠি চালাচালি করতে লাগল। তার পর একদিন আয়ার হাতে ধরা পড়ে গেল। রতনদি গোপনে গোপনে আয়াকে গোয়েন্দা হিসেবে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। একখানা চিঠির সূত্র ধরে বেলার সব চিঠি তার বাক্সের তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল। আমি ওকে চিঠিগুলি পুড়িয়ে ফেলতে বলে-ছিলাম। বেলা জবাব দিয়েছিল, 'ও কথা বলিসনে ভাই। ভাবলেই আমার বুকের মধ্যে পুড়ে যায়।'

কিন্তু চিঠিগুলি আবিষ্কার করে রতনদি নিজেই পুড়িয়েছিলেন। কিছুদিন বাদে বেলার বাবা এসে তাকে নিয়ে গেলেন। আমরা বললাম, ও বেঁচে গেল।

অবাধ্যতার জন্যে ছোটখাট চুরি কি দুষ্টুমির জন্যে রতনদি এমন আরো দু-তিনটি মেয়েকে কনভেন্ট ছাড়া করে-ছিলেন।

এরপর থেকে কনভেন্টে কড়াকড়ি আরো বেড়েই গেল। মেয়েতে মেয়েতে যে বন্ধুত্ব তাও রতনদি পছন্দ করতেন না। আমার মনে হয়, যে কোন দুজনের মধ্যে কোনরকম ঘনিষ্ঠতা দেখলেই তাঁর এক ধরনের হিংসে হত। তিনি টিচার আর ছাত্রীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সহ্য করতে পারতেন না। ওপরের ক্লাসের কোন মেয়ের সংগে নীচের ক্লাসের কোন মেয়ের মেলামেশা দেখলে আপত্তি করতেন। তাতেও নাকি খারাপ হবার ভয় আছে।

রতনদি ফুল ভালবাসতেন না, কবিতা ভালবাসতেন না, চাঁদের আলো থেকে মুখ লুকিয়ে থাকতেন। পৃথিবীর যা কিছু কোমলতা কমনীয়তা তার ওপর তিনি যেন খড়্গহস্ত ছিলেন।

আমাদের কনভেন্টের লনে কতরকমের ফুল ফুটত। বড় বড় ডালিয়া, ক্যানা, নানা জাতের নানা রঙের লিলি। দেশী ফুলের মধ্যে জুঁই, বেল, চামেলি। সুনন্দাদি নানা জাতের গোলাপও এনেছিলেন। কিন্তু আমরা কেউ সেসব ফুল তুলতে পারতাম না। রতনদির ধারণা ছিল, ফুল মেয়েদের মনের নরম মাটিকে আরো বেশি নরম করে দেবে। আর সেই মাটিতে যত সব অবাঞ্ছিত আগাছা জন্মাবে। একটি মেয়ে খোঁপায় ফুল পরেছিল বলে তার ফাইন হয়ে গেল। তারপর থেকে খোঁপা বাঁধা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আমরা চুল শুধু বিনুনি করে রাখতাম। কখনো দুটি, কখনো একটি।

একবার আমাদের হেড-মিস্ট্রেস মেয়েদের ডেকে বলেছিলেন, 'তোমরা এই বাগানের ফুলের মত সুন্দর হও, পবিত্র হও।'

তা শুনে রতনদি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'হেড-মিস্ট্রেস জানেন না, ফুলের কীটগুলি তাঁর ডরমিটারিতে গিজ গিজ করছে।'

যত দিন যেতে লাগল রতনদির মেজাজ তত খিটখিটে হয়ে উঠল। রাগ বাড়ল, বকুনির মাত্রা বাড়ল। রেবাদি আর এক স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। সুনন্দাদি বিয়ে করে কনভেন্ট ছেড়ে দিলেন। তাই নিয়ে বুড়ীর কি গজগজানি। সুনন্দাদি নাকি আগে থেকেই খারাপ ছিল।

এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। রতনদির দুটি বড় পুতুল ছিল, কে যেন তা চুরি করে নিয়ে গেল। আমরা সন্দেহ করলাম, নতুন আয়াটারই এই কীর্তি। সে সোনার লোভে দুটো পুতুলকে সরিয়েছে। পুতুল দুটিকে রতনদি সোনা দিয়ে সাজিয়ে রাখতেন। কখনো শাড়ি পরাতেন, কখনো ধুতি

পরাতেন। আদর করে ডাকতেন, 'আমার নূপুর ঝুমুর।' আয়া কিন্তু কিছুতেই দোষ স্বীকার করল না। রতনদি তাকে অনেক বকলেন, ভয় দেখালেন, লোভ দেখালেন, কিন্তু নূপুর ঝুমুরকে পাওয়া গেল না।

রতনদি দোতলায় পূর্বদিকের সবচেয়ে নির্জন আর ছোট ঘরটিতে থাকতেন। জিনিসপত্রে বোঝাই বড় একটা ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেস তালাবন্ধ করে তিনি খাটের তলায় রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু পুতুল দুটি যে কাঁচের আলমারিটায় থাকত, তাতে তিনি চাবি দিতেন না। মেয়েদের খবরদারি আর শাসন-শাস্তির ফাঁকে তিনি যখনই ঘরে আসতেন সঙ্গে সঙ্গে আলমারি খুলে পুতুল দুটিকে আদর করতেন। তাদের গয়না বদলাতেন, বেশ পালটে দিতেন। তিনি তাঁর শাসন আর স্নেহকে একেবারে আলাদা দুটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন। শাসনের ভাগ পড়েছিল আমাদের ভাগ্যে আর নিষ্প্রাণ পুতুল দুটির ভাগে ছিল তাঁর অগাধ স্নেহ। কিন্তু সব তাঁর গোপন ছিল। এই নিয়ে কেউ কোন ঠাট্টা-তামাশা করলে তিনি চটে উঠতেন। তবু ব্যাপারটা সবাই জানত। দিদিমণিরা বলতেন, 'রতনদির হৃদয়ের সমস্ত মধু ওই পুতুল দুটি চুরি করে নিয়েছে। আমাদের জন্যে হুল ছাড়া আর কিছুই নেই।'

এই পুতুল দুটির বয়স যে কত ছিল তা কেউ ঠিক করে বলতে পারত না। কেউ বলত বিশ বছর, কেউ বলত তিরিশ বছর, কেউ বলত আরো বেশি।

পুতুল দুটি চুরি যাওয়ায় রতনদি একেবারে ক্ষেপে গেলেন। মারমূর্তি হয়ে হেড-মিস্ট্রেসের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, বললেন, 'পুলিসে খবর দাও।'

হেড-মিস্ট্রেস শান্তভাবে বললেন, 'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে পুলিস টুলিস ডাকলে কনভেন্টের সুনাম নষ্ট হবে। আমরা টাকা দিচ্ছি, আপনি বরং আর দুটি পুতুল কিনে নিন।'

এতে রতনদি আরো ক্ষেপে গেলেন, 'কী, তোমাদের এত টাকার জোর হয়েছে আমাকে টাকার লোভ দেখাও। আমি তোমাদের প্রত্যেকের বাক্স প্যাটরা তল্লাসী করব। ছাত্রীই হোক আর টিচারই হোক, কাউকে বাদ দেব না। আয়া, নার্স, মেট্রন সব আমার সঙ্গে এসো। আমি সব সার্চ করব।'

কিন্তু কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দিল না। সবাই হেডমিস্ট্রেসের ইঙ্গিতে দূরে সরে রইল। কোন ছাত্রী কি কোন টিচার তাঁর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না।

রতনদি চেঁচিয়ে কেঁদেকেটে সারা কনভেন্টকে অস্থির করে তুললেন, 'তোরা সবাই আমার শত্রু। আমি এতদিন শত্রু-পুরীতে বাস করে এসেছি। আজ বুঝতে পারলাম।'

রাগ করে রতনদি নিজেই পুলিস ডাকতে যাচ্ছিলেন, সিঁড়ি থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাঁকে তুলে এনে তাঁর নিজের ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল। জ্ঞান অবশ্য তাঁর খানিক বাদেই ফিরে এল। কিন্তু শোকে দুঃখে তিনি সেই যে বিছানা নিলেন, আর উঠতে পারলেন না।

তাঁর ঘর থেকে আমাদের ডরমিটারি বেশ দূরে। তবু অনেক রাত্রে আমরা তাঁর কান্না শুনতে পেতাম, 'আমার নূপুর ঝুমুররে, আমার নূপুর ঝুমুররে।'

সেই কান্না শুনে আমাদের বুকের ভিতরটা হিম হয়ে যেত। এতদিন তাঁর শাসনকে ভয় করেছি। আজ তাঁর কান্নাকে তার চেয়েও বেশি ভয়। অগুন্তি মেয়ে থাকতাম আমাদের ডরমিটারিতে। কিন্তু অনেক রাত্রে আলাদা আলাদা মশারির তলায় শুয়ে আমাদের মনে হত আমরা প্রত্যেকে একা। আমাদের যেন কেউ নেই! বাপ, মা বাড়িঘর ছেড়ে যেন কতদূরে আমরা এসে পড়েছি। ছোট ছোট সাদা মশারিতে ভরা বিরাট সে ঘরটা এক সাগরের মত। সেই সাগরে আমরা আলাদা, আলাদা একেকটা দ্বীপ। আমাদের চারদিকে অবুঝ অফুরন্ত কান্নার ঢেউ 'আমার নূপুর ঝুমুর রে, আমার নূপুর ঝুমুর রে।'

রতনদির হার্ট ডিজিজ বাড়ল, রক্ত আমাশয় বাড়ল। তারপর তাঁকে কলকাতার বড় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

কিছুদিন বাদে আমাদের স্কুল গরমের জন্যে ছুটি হয়ে গেল। স্কুল খোলার সাত দিন আগে রতনদি মারা গেলেন।

আমরা ভেবেছিলাম আমাদের চার্চের লাগা গ্রেভইয়ার্ডে খুব জাঁকজমক করে আমরা তাঁর সমাধি দেব। তাঁর জন্যে এপিটাফ লেখা হয়েছিল, মার্বেলের স্লাব কেনা হয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর ডেড-বডিই শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। কনভেন্টের ছুটির মধ্যে তিনি মারা গেছেন। টিচাররা কেউ কাছাকাছি ছিলেন না। রতনদির আত্মীয়-স্বজনের কারো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আন-ক্লেমড্ বডি বলে হাসপাতালের অথরিটি কোথায় তাঁর শব সরিয়ে দিয়েছেন কে জানে।

আমাদের হেডমিস্ট্রেস দেশ থেকে ফিরে এসে খুব রাগ করে হাসপাতালকে কড়া চিঠি দিলেন। কেস করবেন বলে ভয় দেখালেন। কিন্তু তখন যা হবার তা হয়ে গেছে।

রতনদি যে মারা গেলেন তার চেয়েও তাঁর দেহটা যে আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল সেই দুঃখটাই আমাদের মনে বেশি করে বাজল। তিনি আমাদের হাতের মাটি নিলেন না, ফুলের তোড়া নিলেন না, যেন পরম অভিমানে তাঁর দেহসুদ্ধ আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেলেন।

তবু আমরা তাঁর জন্যে প্রেয়ার করলাম তাঁর আত্মার সদ্গতি কামনা করলাম। মিটিং-হলে টিচাররা কনভেন্টের জন্যে তাঁর ত্যাগ সেবা আরো নানারকম গুণের কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা দিলেন। আর আমরা মেয়েরা ওকে লুকিয়ে কেন জানিনে, চোখের জল ফেললাম।

রতনদি মারা যাওয়ার পরে পুরোন টিচারদের মুখে, বুড়ো মালীর মুখে তাঁর সম্বন্ধে গল্প শুনেছিলাম। প্রথম যৌবনে রতনদি নাকি কাকে ভালোবেসেছিলেন কিন্তু সে ভালোবাসা ফিরে পাননি। অবশ্য কোন প্রমাণ নেই। সবই কিংবদন্তী।

কিন্তু আমার মনে হয় অন্যরকমও হতে পারে শ্রীলেখা। এমন ভালোবাসাও জীবনে আসে হয়তো তা ভালোবাসা নয় শুধু প্যাশন—যা সহ্য করা যায় না। আবার সহ্য না করলে আর একটা দিক হয়তো একটা পুরো সংসার ধ্বংস হয়ে যায়। অতৃপ্ত তৃষ্ণা যেমন হৃদয়কে শুকিয়ে দেয়, বিতৃষ্ণাও তেমনি। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় শ্রীলেখা একটা মাস্টারি-টাস্টারি নিয়ে ফের এই কনভেন্টে এসে লুকোই। কিন্তু ভয় হয় যদি "আমি আর একটি রতনদি হয়ে উঠি!"

অনসূয়া থামল।

পার্কে এখন আর কেউ নেই। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উৎরে গেছে। অন্ধকার এবার ঘন হয়ে উঠল। চারদিকের গাছপালাগুলির উপর কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। কানের কাছে মশার গুনগুনানির আর বিরাম নেই। কিন্তু শ্রীলেখার কিছুই যেন খেয়াল ছিল না। যার জন্যে এত কৌতূহল অনসূয়ার সেই শেষ আত্মোদঘাটনও তার কানে যায়নি। অবাক হয়ে শ্রীলেখা শুধু রতনদির কথাই ভাবছিল। পৃথিবীতে এত সুখ, এত শান্তি, তবু একেকটি জীবন কেন এমন মরুভূমি হয়ে যায়, পাগলের প্রলাপের মত কেন একেবারেই তার কোন অর্থ থাকে না।

একটি বর্ষার সন্ধ্যা

প্রতিভা বসু

দেখা হয়ে গেল অকস্মাৎ।

প্লেন থেকে নেমে এলালতা লাহিড়ী এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। দাদাদের টেলিগ্রাম ক'রে এসেছেন। নিশ্চয়ই তাঁরা আসবেন কেউ। বিকেল গাঢ় হ'য়ে এসেছে, বর্ষার বেলা, এইমাত্র এক পশলা হ'য়ে থামলো, আকাশে মেঘের ভার। একটু অপেক্ষা করলেন তিনি, দাঁড়ালেন, তারপর এক কাপ কফি খেয়ে নেবার কথা ভাবলেন। প্লেনের প্যাসেঞ্জার নিয়ে যে বাস কলকাতা যাবে, হাত নেড়ে বারণ করলেন তাদের।

কলকাতা আসছেন বহুকাল পরে। কলকাতা কেন, দেশেই আসছেন প্রায় বছর দশেক বিদেশে কাটিয়ে। তার মধ্যে কলকাতা তো আরোই অচেনা। বাবা ছিলেন সিভিল সার্জন, মফস্বলে ঘুরে ঘুরে জীবনের অপরাহ্ন বেলায় অবসর নিয়ে যখন কলকাতা এসে স্থায়ী হলেন, এলার তখন পনেরো বছর বয়েস। পনেরো থেকে একুশ, মাত্র এই ছ' বছরের পরিচয় তার কলকাতার সঙ্গে। তা-ও একাদিক্রমে নয়। থাকতেন দার্জিলিং বোর্ডিংয়ে, সেখান থেকে ছুটিছাটায় আসা, এইমাত্র। ওখান থেকেই সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করে বি এ পড়তে কলকাতায় এলেন।

সে সব কবেকার কথা। ধু ধু স্মৃতিমাত্র। কতো বদল হ'য়ে গেছে তারপরে, মানুষ বদলেছে, শহর বদলেছে, কাঁচা চুল পাকা হ'য়েছে, কালো চোখ ধূসর হ'য়েছে, নরম মন শক্ত হ'য়েছে, শক্ত মন আর্দ্র হ'য়েছে—আরো কতো কী!

কিন্তু এই ভদ্রলোকটি এইমাত্র যাঁর দিকে চোখ পড়ে এলালতা থমকে গেছেন বয়স তো কম হ'লো না, হিসেব করলে চল্লিশ ছুঁয়েছে বৈকি। তবু কী ঘন চুল, কী স্বাস্থ্য, কী ঝকঝকে চোখের দৃষ্টি। যেন সেই পঁচিশ বছরের যুবকটিই আছেন। না কি, বয়েস হ'য়ে, ভরাট হ'য়ে, তার চেয়েও বেশী যুবক হ'য়েছেন। দশ এগারো বছরের ব্যবধান, খুব কিছু কম তো নয়, না চিনলেও বলবার কিছু ছিলো না, অথচ—

এলালতার মতো ভদ্রলোকও কাউকে খুঁজছিলেন বোধ হয়। এয়ার পোর্ট ফাঁকা হ'য়ে যাবার পরেও দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, যাঁর আসবার কথা ছিলো, সে আসেনি, তাকেই ভাবছেন নিশ্চয়ই। মুখখানা রীতিমতো বিষণ্ণ হ'য়ে উঠেছে। কে সে? কার জন্য এই ব্যাকুল প্রতীক্ষা—এলালতা আড়চোখে তাকিয়ে মনে মনে উচ্চারণ করলেন। এখন ফিরে যাচ্ছেন মন্থর পায়ে, এলালতাকে পাশ কাটিয়ে গেলেন। চকিতে একবার তাকিয়েছিলেন, কিন্তু চিনতে পেরেছেন বলে মনে হ'লো না। অথবা ইচ্ছে ক'রেই চিনলেন না। না চেনারই কথা, না চেনাই স্বাভাবিক।

এলালতার এটাই মস্ত দোষ, চেনা লোককে কিছুতেই ভুলতে পারেন না। ঠিক মনে থাকে। মনে না থাকলে জীবনের অনেকগুলো বছর খামোকা নষ্ট করতেন না।

সন্ধে হ'য়ে গেল। দমদম এয়ারপোর্ট সুন্দরী হ'য়ে উঠলো আলোক সজ্জায়। এলালতা লাহিড়ী, যার বয়েস চৌত্রিশ, যিনি চব্বিশ বছর বয়সে নাইজেরিয়াতে চলে গিয়েছিলেন চাকরী করতে, যিনি একাদিক্রমে সাত বছর আমেরিকায় কাটিয়ে পুরো দশ বছর পরে দেশে ফিরছেন, এক আমেরিকান ফার্মেই মস্ত চাকরী নিয়ে, তিনি হঠাৎ যেন ভারি অসহায় বোধ করলেন নিজেকে। শ্রাবণ মাস, ঝুপ ক'রে কখন এক ঝাঁক বৃষ্টি পড়বে কিছু ঠিক নেই. যেখানে যাবেন তার ঠিকানা জানা আছে বটে, কিন্তু পথ জানা নেই। রিজেণ্ট পার্ক কোথায়? নাম শুনেছেন বলেও তো মনে পড়ে না। চিঠিতে জেনেছেন আপিস থেকে সেখানেই তাঁর বাসস্থান ঠিক করা হ'য়েছে। বন্ধু ফ্রিডরিক সাহেব, যিনি ছ' মাস আগে এই একই ফার্মে চীফ ইঞ্জিনিয়রের পোস্ট নিয়ে এসেছেন, তিনিই ঠিক ক'রে রেখেছেন সব। চাকরীও তিনিই ঠিক করেছেন। ফ্রিডরিকের সঙ্গে এলালতার আমেরিকাতেই আলাপ। চার বছরের পরিচয়, এই পরিচয়কে ফ্রিডরিক এখন আরো গভীরে নিয়ে যেতে চান। প্রস্তাবটা উত্থাপিত হ'য়েছে আমেরিকা থাকতেই, এলালতা এতোদিন মনস্থির করতে পারেননি। এবার স্বদেশে ফিরবার আগ্রহে রাজী হ'য়ে এসেছেন।

এলালতারই ভুল হ'য়েছে, ফ্রিডরিককে জানানো উচিত ছিলো যে নির্দিষ্ট তারিখের এক সপ্তাহ আগেই এসে পৌঁছুচ্ছেন তিনি। আসলে এলালতা ভেবেছিলেন এই সপ্তাহটা দাদাদের সঙ্গে কাটিয়ে সমস্ত মনোমালিন্য ঘুচিয়ে তারপর আলাদা বাড়িতে যাবেন। কিন্তু দাদারা কেউ এলেন না কেন? কতো তো আগ্রহ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন সব বারে বারে, অন্তত মেজদা মেজবৌদিরতো না আসার কোনোই কারণ নেই। তবে কি ও'রা চিঠিটা পাননি, টেলিগ্রামটা পাননি, না কি তিনিই তারিখ লিখতে কোনোরকম ভুল করেছেন। যা অন্যমনস্ক স্বভাব।

দাদারা চলে গেছেন সব দক্ষিণ অঞ্চলে। বড়োজন লেক প্লেস, মেজ আর ছোটো সাদার্ন এ্যাভিনিউ। পৈতৃক বাড়ি ছিলো মানিকতলা ব্রীজের ধারে, মস্ত পুরোনো বাড়ি। দাদাদের কারোই সে বাড়ি বা সে পাড়া পছন্দ ছিলো না। তাই বোধহয় বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রী ক'রে যে যার অংশ নিয়ে পছন্দ মতো জায়গায় চলে গেছে। বিশদ ক'রে কোনো খবরই জানেন না এলালতা। চিঠিতে অত খবর লেখেনি কেউ। আর চিঠিই বা বছরে ক'খানা। বাবা বেঁচে থাকতে তবু যা ছিলো, তারপরে তো তাও গেছে। মা থাকলে সব জানা যেতো। অবিশ্যি মা বেঁচে থাকলে সব কিছুই অন্যরকম হ'তো। সে কি এমনভাবে পালাতেই পারতো কোনোদিন?

কিন্তু একটা ট্যাক্সীও তো দেখছেন না। এ রকম অবস্থা হবে জানলে তিনি প্যাসেঞ্জার বাসটা কক্ষনো ছাড়তেন না। এখন কলকাতা গিয়ে পৌঁছোনোই তো মহা সমস্যা হয়ে উঠলো। এলালতা হেঁটে হেঁটে এদিক ওদিক ঘুরলেন, ব্যাগ খুলে ঠিকানাটা পড়তে লাগলেন।

ভদ্রলোক ধীরেআস্তে গাড়িতে উঠলেন এসে। উঠেও দেরি করলেন স্টার্ট দিতে। মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলা অসুবিধেয় পড়েছেন একটু। কোথায় যাবেন? কলকাতা পর্যন্ত যদি যেতে চান নিয়ে যেতে পারেন তিনি। প্যাসেঞ্জার বাসটা ছেড়ে দিলেন কেন? নিশ্চয়ই গাড়ি নিয়ে কারো আসবার কথা ছিলো। বোধহয় জানেন না যানবাহনের এখন কী কষ্ট এখানে! এদিকে বর্ষার সন্ধ্যা, এখনি তো রাত ঘনিয়ে এসেছে, এরপরে ট্যাক্সী পাওয়া তো আরো দুষ্কর, পেলেও একা একা—

একা একা তো তাঁর কী? এসব মেয়েরা যেন একাকে কতো ভয় পায়। আর পেলে পাবে। তাঁর দায়িত্ব কিসের! তবে ভদ্রতা আছে একটা, এই যা। হাজার হোক, তিনি একজন পুরুষ তো! এভাবে এমন নিশ্চিন্তে একজন মহিলাকে ফেলে যাওয়া তাঁর পক্ষে অন্যায়। ভালোও দেখায় না।

তিনি এসেছিলেন তাঁর মনোনীতাকে রিসিভ করতে। সে আসেনি। এলে এসব লক্ষ্য করারও অবকাশ হতো না, এমন ঝামেলাতেও পড়তে হতো না। কিন্তু এলো না কেন? আবার তার কী কাজ পড়ে গেল?

ছুটি তো নিয়েছে অন্তত চার পাঁচদিন আগে। কী কর্তব্যকর্মে ব্যস্ত হলো আবার? মানুষটা একেবারে হাড়ে হাড়ে মাস্টার। মাস্টারির জায়গা ছেড়ে নড়তেই চায় না। এতোই যদি চাকরীর মায়া, তবে আর এই বুড়ো বয়সে বিয়ে করা কেন? বেশ তো ছিলো!

অনিন্দিতার বয়স আটতিরিশ তার নিজের উনচল্লিশ ছাড়াই ছাড়াই। আসলে দুই সমান বয়সী ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার একের কাছে অপরের আত্মসমর্পণের বাসনা। নিঃসঙ্গ জীবনের অবসান। সত্যিই নিঃসঙ্গ। অল্প বয়সে চারদিকেই সুখের সম্ভার ছড়িয়ে থাকে। হাঁটা যায়, খাটা যায়, অনিয়মে অত্যাচারে এক করে দেয়া যায় দিন আর রাত। বয়স ভারি হলেই ক্লান্তি আসে। মন শান্তি চায়, ঘর চায়, গৃহিনী চায়। এই বুড়ো বয়সে অনিন্দিতা আর তাঁর সংসার পাতার ইচ্ছেটুকুরও এই ইতিহাস। অনিন্দিতাকে তিনি বহুকাল আগেই চিনতেন, নতুন করে দেখা হলো তিন মাস আগে। ছুটিতে দিল্লি গিয়েছিলেন দাদার কাছে, হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তাঁর দাদার বাড়ি আর অনিন্দিতার বাড়ি একেবারে পাশাপাশি। দেখা হয়ে বেশ লাগলো। কারুকে গ্রহণ করবার জন্য মন দুজনেরই তৈরী ছিলো, নির্ভরের আশায় উৎসুক ছিলো, প্রেম করবার আগেই বিয়ে করবার কথাটা পাকা হয়ে গেল। সেটারই দরকার এখন। একজন স্ত্রীলোকহীন জীবন তাঁর কাছেও যেমন অসহ্য মনে হচ্ছিলো, একজন পুরুষহীন জীবন অনিন্দিতার কাছেও ঠিক তাই। তার চেয়েও বেশী। প্রায়-চল্লিশ কুমারী মেয়ের নিঃসঙ্গতা চল্লিশোত্তর ভদ্রলোকের চেয়ে অনেক বেশী অসহায়।

প্রশান্ত সেনের, মানে এই ভদ্রলোকের যদ্দিন মা বেঁচেছিলেন, কোনো অসুবিধে ছিলো না। বাড়িটা বাড়িই ছিলো। নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, অতিথি, অভ্যাগত, ভালোবাসা, ভালোলাগা, কিছুরই অভাব হয়নি। তিন বোন পালা করে আসতো, থাকতো, দাদাও আসতেন। মা ছিলেন সব কিছুরই কেন্দ্র। মা মারা যেতে বড়োই অসুবিধেয় পড়ে গেছেন তিনি। বাড়িটা শূন্য হয়ে গেছে, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে। ভালো লাগে না। কলেজ করে বাড়ি ফেরার কোনো মানে থাকে না। এসেই বেরিয়ে যান তক্ষুনি। বোনেরাও আর আসে না, দাদা আসেন না। ছুটি হলে এখন তিনিই ছোটেন সকলের কাছে। এই ছুটিতে এই বোন, সেই ছুটিতে সেই বোন, তারপরের ছুটিতে দাদা—এই করে করেই তিনটা বছর কাটলো। এখন অনিন্দিতা এসে ঘরদুয়োর গুছিয়ে বসুক, আধপাকা চুলে সিঁদুর পড়ে তার আয়ু বাড়াক, যত্নহীন জীবনে শৃঙ্খলা এনে দিনগুলো আনন্দময় করে তুলুক। চিঠিতে তিনি তাই লিখেছিলেন। লিখেছিলেন, 'কলকাতায় চেষ্টা চরিত্র করে চাকরী না হয় পরে জোটানো যাবে, আপাতত এ চাকরীটা ছাড়ো, বিয়েটা হয়ে যাক।' অনিন্দিতা জবাব দিয়েছে, 'পাগল হয়েছেন আজকালকার একটা চাকরী ছাড়লে আর একটা পাওয়া এতোই সহজ মনে করেন? ব্যস্ত হবেন না, আমি সবদিক বজায় রেখেই কাজ করবো। ছুটি না নিয়ে নিয়ে অনেক ছুটি আমার পাওনা হয়েছে। জুলাই-আগস্ট দুটো মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবো। সেই সময়ে কলকাতা গিয়ে রেজিস্ট্রেশনও হবে, দুটো মাস থাকাও হবে। তারপর আপনি চেষ্টা করলে মাস কয়েকের মধ্যে ওখানে চাকরী পেতে পারবো, এবং এখানকার কাজে রিজাইন দেবো।'

প্রশান্ত সেন এই চিঠি পেয়ে একটু রাগ করলেন, লিখলেন, 'না হয় নাই-বা চাকরী করলে। আমি তো নেহাৎ অযোগ্য নই, চার অঙ্কের একটা মাইনে মাস গেলেই পাই। বাড়িটা ছোটো হলেও নিজের, গাড়িও আছে

একখানা। তোমার চাকরী না করলে উপবাস করতে হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

অনিন্দিতা লিখলো, 'দু'চার দিনের মধ্যেই যাচ্ছি, আপনার সব কথার জবাব গিয়েই দেবো। যাবার আগে টেলিগ্রাম করবো। ইতিমধ্যে আপনি রেজিস্ট্রেশনের নোটিশ দিয়ে রাখবেন।'

'শুনুন।'

ভাবতে ভাবতে ভদ্রলোক অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, মহিলাটির গলা শুনে চমকে ফিরে তাকালেন। নিজেকে সামলে নিয়ে তাকালেন। নিজেকে সামনে নিয়ে বললেন 'আমাকে বলছেন?'

না, মহিলাটির চোখে মুখে পরিচয়ের কোনো চিহ্ন লেখা নেই। ভালোই হয়েছে। ভোলাই ভালো। যতো ভুলে থাকা যায়, ততোই নিরাপদ। তাঁর নিজের স্বভাবটা যদি এ রকম হতো! স্মরণশক্তি নামক পদার্থটা যদি আর একটু কম থাকতো। তা দশ এগারো বছরের ব্যবধান তো নিতান্ত কম নয়; চিনতে না পারাই স্বাভাবিক। অথচ তিনি চিনলেন। ঠিক চিনতে পারলেন। মহিলাটির চেহারাকেও এজন্য ধন্যবাদ দিতে হয়। আশ্চর্য! বয়স তো কম হলো না, হিসেব করলে, না কোন তেত্রিশ চৌত্রিশ হবে। এখনো কেমন মাথাভরা চুল, কেমন সুঠাম সতেজ চেহারা, মসৃণ গায়ের রং। সাজ-সজ্জাটা অবিশ্যি বদলে ফেলেছে। আগে ছাঁটা চুল ছিলো, রং করা মুখ ছিলো, পালিশ করা নখ ছিলো। জর্জেট শিফন জড়ানো খাটো ব্লাউসে, আঁটো শরীরে, বাঙালী মেয়ে ভাবে সাধ্য কার। দেশে বিদেশী সেজে ধোঁকা লাগাতো, এখন বোধহয় বিদেশে দিশী সেজে ধোঁকা লাগায়। এই তো এদের স্বভাব। নইলে এলালতা লাহিড়ী হঠাৎ তাঁতের শাড়ি পরে, খোঁপা বেঁধে বাঙালী হতে যাবেন কোন দুঃখে?

সেবার যখন নিমন্ত্রিত অধ্যাপক হয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন, শুনেছিলেন এই মহিলার কথা। নিউ ইয়র্কে ছিলো। সাহেবিয়ানায় আর কয় ধাপ উঁচুতে উঠেছে, কৌতূহল হয়েছিলো দেখবার। দেখেননি, বরং এড়িয়ে যাবার জন্য সেই শহর থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়েছিলেন। অথচ কী ভবিতব্য। এতোদিন পরে ঠিক দেখাটি হয়ে গেল। আর কোথায়? না, এরোড্রমে। যেন অনিন্দিতাকে নয়, এই মহিলাটিকেই রিসিভ করতে এসেছিলেন তিনি। ঈশ! আজ অনিন্দিতা কেন এলো না? কেন তাকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারলেন না এর নাকের ডগা দিয়ে।

'আপনি কি কলকাতা যাচ্ছেন?'

এলালতা গাড়ির কাছে এসে বিপন্ন ভঙ্গিতে তাকালেন।

প্রশান্ত সেন পাথরের মতো মুখ করে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

'আমি পথঘাট ভালো চিনি না, একটা ট্যাক্সিও দেখছিনা, আপনার যদি অসুবিধে না হয়—'

'বেশ। কতদূর যেতে চান আপনি?'

'আপনি কদ্দূর যাবেন?'

'সেটা অবান্তর। এই প্লেনে আমার স্ত্রীর আসবার কথা ছিলো, তাঁকে নিতেই—'

'স্ত্রী! আপনার স্ত্রী!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। উঠুন।'

পাশের দরজা খুলে দিলেন প্রশান্ত সেন 'যেখানে নামতে হবে বলবেন, নামিয়ে দেব।'

'অনেক ধন্যবাদ। চৌরঙ্গী পর্যন্ত যেতে পারলেই আমার হবে।'

চৌরঙ্গী! চৌরঙ্গী কেন? মুখে নয়, মনে মনে ভাবলেন। মানিকতলার বাসিন্দা বলেই তো জানতাম। আমেরিকা ফেরতা হয়ে বুঝি মানিকতলা পোষাচ্ছে না। চৌরঙ্গীর হোটেলে উঠতে হবে? মুখে বললেন, 'ঠিক আছে'।

গাড়িতে উঠতে একটু যেন পা কাঁপলো এলালতার। ভদ্রলোকটির পাশে বসতে একটু নার্ভাস লাগলো। মনের এই দুর্বলতাকে আমল দিতে চাইলেন না, কবে একটুখানি কী চেনাজানা ছিলো, বিয়ে থাওয়া করে এক-জনের স্বামী হয়ে কোনকালে সে অতীত মুছে ফেলেছে লোকটা, তা নিয়ে তাঁর মতো একজন কৃতী মহিলার এতোটা সংকোচিত হবার কী আছে? ঈশ। ফ্রেডারিককে কেন আসতে লিখলেন না, মস্ত গাড়ি চড়ে এর পাশ কাটিয়ে কেমন চলে যেতে পারতেন। বেশ হতো।

'আমার স্বামীকে একটা সারপ্রাইজ দেবো ভেবেছিলাম', আলগোছে জানালা ঘেঁষে ভদ্র-লোকের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে গুছিয়ে বসলেন এলালতা, 'সেইজন্যেই তারিখের আগে এসে পৌঁছলাম, ভাবতেও পারিনি এয়ারপোর্টে এসে এমন স্ট্র্যানডেড হয়ে পড়বো। মিছি-মিছি আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

'স্বামী! আপনার স্বামী!' গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে হাতটা একটু থামলো। পর-মুহূর্তেই একটু বেশী প্রফুল্ল ভঙ্গিতে বললেন, 'উনি বুঝি কলকাতাতেই থাকেন? আর আপনি।'

'আমি এবার থেকে থাকবো। এতোদিন বিদেশে ছিলাম।'

'ও'।

'আপনার স্ত্রীর কোথা থেকে আসবার কথা ছিলো?'

'দিল্লি। উনি ওখানে মেয়ে কলেজের প্রফেসার।'

'ও'

গাড়ি বোঁ করে এরোড্রমের কম্পাউণ্ড পার হয়ে রাস্তায় পড়লো। প্রশান্ত সেন আড়-চোখে এলালতাকে দেখলেন একবার। বাঁ হাতে কপাল থেকে উড়ন্ত লকটা সরিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আগের মতো। একটা চেনা মানুষ যতোই অচেনা হয়ে থাক, ভঙ্গিগুলো

ঠিক মনে থাকে, মনে পড়ে। চোখের সামনে দেখলে স্মৃতিশক্তিটা প্রবল হয়ে উঠতে চায়। চোখ ফিরিয়ে ঠোঁট কামড়ালেন।

এলালতার আড়ণ্ট লাগছে ভদ্রলোকের কাছ থেকে উপকার নিতে। কিন্তু কী করবেন। উপায় ছিলো না। সত্যিই কি ছিলো না? মনের ভিতরে তলিয়ে দেখলে কী দেখতে পাবেন? সারা পৃথিবী ঘুরতেও যার সংগীর দরকার হয় না, সাহায্যের দরকার হয় না, হঠাৎ কলকাতার দমদম এরার পোর্টে এসে দিশাহারা হ'য়ে গেলেন। কখনোই না। আসলে কোথায় যেন একটা দাবী আছে, একটা অহেতুক প্রতিহিংসা। অন্ত একটা গাড়ি ক'রে লোকটা কলকাতাতেই যাবে, আর তিনি, একজন ভদ্রমহিলা একটা ট্যাক্সীর জন্য হন্যে হ'য়ে মরবেন, এটা হয় না। ভদ্রলোকটির নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো। দিব্যি তো ঘুরছিলেন, ফিরছিলেন, পাইপ টানছিলেন। স্ত্রীর বিরহে কাতর হ'য়ে হা হুতাশ করছিলেন। এই ভদ্রতাটুকু করতে পারতেন তো। নিজের স্ত্রীটিকে ছাড়া যেন আর কারো দিকে চোখ পড়ে না। স্ত্রী এলেন না, অমনি কাপুরুষের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগলো। বাজে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, পাইপটি দাঁতে চেপে, সামনের দিকে তাকিয়ে ঠিক আগের মতো ক'রেই গাড়ি চালাচ্ছে। চুলগুলো এলো-মেলো হ'য়ে ঢেউ তুলছে বাতাসে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কী র‍্যাশ চালাচ্ছে একেবারে আগের মতো। চেনা মানুষ, যতো অচেনাই হ'য়ে যাক না, ভঙ্গিগুলো দেখলে মনটা যেন কেমন দুর্বল হ'য়ে পড়ে। অথচ—

'চৌরংগীতে কোথায় নামবেন আপনি?'

'নেমে পড়বো যেখানে হোক, সেখানে তো আর যানবাহনের অভাব নেই। আপনার সুবিধে মতো যে কোনো জায়গায় পার্ক করবেন।'

'ও, তা হ'লে চৌরংগীতেই আপনার গন্তব্যস্থান নয়। সেখান থেকে অন্যত্র যেতে হবে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'রিজেণ্ট পার্ক বলে একটা জায়গা আছে, জানেন?'

'রিজেণ্ট পার্ক! ও বাবা, সে যে কলকাতার আর এক প্রান্তে। আপনি সেখানে যাবেন?'

'তাই তো ভাবছি। অবিশ্যি আরো দু'টো জায়গায়ও যেতে পারি, আমার দাদারা থাকেন সেখানে। আমি নিজে একটা জায়গা চিনি না, আন্দাজই নেই কোনো।'

'তা হ'লে।'

'ট্যাক্সীওয়ালাকেই কাণ্ডারী করবো। নম্বর তো জানি, খুঁজে খুঁজে বার করা যাবে।'

'স্বামীকে না হয় সারপ্রাইজ দিচ্ছেন, তা বলে, দাদাদের কাউকে আসতে বলেন নি কেন?'

'বলেছিলাম, কেন আসেন নি তাতো জানিনে।'

'টেলিগ্রাম করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তা হ'লে পান নি।'

'না পাবার কথা নয়, অনেক আগে করেছি।'

'আজকাল টেলিগ্রাম ঠিক মতো আসে না। প্রায়ই গোলমাল হয়।'

'আপনি তো ঠিকমতো পেয়েছেন। আপনার স্ত্রীও নিশ্চয়ই টেলিগ্রাম করে-ছিলেন।'

'উনি দেশের হালচাল জানেন, কিন্তু আগেই করেছেন, যাতে সময় মতো পেতে পারি।'

'উনি না আসাতে আপনার নিশ্চয়ই খুব মন খারাপ হ'য়েছে।'

'তা তো একটু হ'য়েইছে।'

'মাঝখান থেকে আর একজনকে নিয়ে বিব্রত হ'তে হ'লো।'

'বিব্রত কেন। এতোটা রাস্তা একা ফিরতাম, তবু একজন সংগী পাওয়া গেল কথা বলবার।'

'সংগী হ'লেই তো হয় না, সংগটা কেমন সেটাও নিশ্চয় বিবেচ্য।'

'তা বটে।'

একটা গরুর গাড়ির সংগে ধাক্কা খেতে খেতে পাশ কাটালেন প্রশান্ত সেন। দেখতে দেখতে এসে গেছেন দমদম ব্রীজের কাছে, নীরব নির্জন রাস্তাটা ফুরোলো বলে। গাড়ির স্পীডটা হঠাৎ অসম্ভব কমিয়ে দিলেন।

একটা ঝাঁকানি খেয়ে সোজা হ'য়ে বসলেন এলালতা। ছি, প্রায় গায়ের উপর পড়ে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক কি ভাবলেন কে জানে। কিন্তু গন্ধ মাখার অভ্যেসটা দেখছি ঠিক আছে। সেই পুরনো গন্ধ। পুরনো সব কিছুই তা হ'লে উপড়ে ফেলেননি। অন্তত আর কারো পছন্দ করা গন্ধটা—

'ল্যাগলো?' প্রশান্ত সেন তাকালেন।

'না, না।' এলালতা চোখ নামালেন।

'কী সুন্দর ফিতের মতো পথ, না?'

'হ্যাঁ।'

'কখনো এ রাস্তায় এসেছেন বলে মনে করতে পারেন?'

'আপনি এসেছেন?'

'ভাবতেই মন কেমন ক'রে।'

'ইয়ে, মানে, কোনো স্মৃতি আছে বোধ হয়।'

'অনেক, অনেক।'

'বাস্তবের চেয়ে স্মৃতিই ভালো, কী বলেন?'

'জানি না। আপনার কী মনে হয়?'

'আমি দেখুন বহুকাল দেশ ছাড়া। ভেবেছিলাম সব ছবিই বুঝি মুছে গেছে, কিন্তু এখন—এখন—'

'কী?'

'এই রাস্তাটা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে কোনো কোনো ছবির রং এতো পাকা যে হাজার প্রলেপেও জীবন থেকে সে রং উচ্ছেদ করা যায় না, তার চেয়ে সাঁতার কেটে সমুদ্র পার হওয়াও হয়তো সম্ভব।'

'তাই কি?'

'সকলের স্মৃতি শক্তি অবিশ্যি সমান থাকে না, আমার কাছে যা সত্য, আপনার কাছে তা নাও হ'তে পারে।'

জবাব দিলেন না প্রশান্ত সেন। গাড়ির স্পীড হাজার কমিয়েও তাকিয়ে দেখলেন কলকাতার জনারণ্যে এসে পৌঁছুতে আশানুরূপ দেরি করতে পারেননি।

দেখতে দেখতে চৌরঙ্গী এসে গেল।

'তা হলে এসপ্লেনেডেই পার্ক করি, কী বলেন?'

'তাই করুন।'

'যেতে পারবেন তো?'

'কেন পারবো না।'

'সাড়ে আটটা বাজে।'

'শহরের পক্ষে সন্ধ্যা।'

'তাই তো।'

'বরং এই ঠিকানাগুলো দেখে যদি পথটা একটু বলে দেন—' ব্যাগ থেকে ঠিকানা বার করলেন এলালতা 'যেটা সহজগম্য সেটাতেই যাবো।' প্রশান্ত সেন গাড়ি থামিয়ে আলোর তলায় তাকিয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন অনেকক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইলেন, তারপর হতাশভংগিতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আমার তো মনে হচ্ছে না, একটা ট্যাক্সীওলার ভরসায় এই রাত ক'রে এই জটিল ঠিকানা খুঁজে বেড়ানো উচিত হবে আপনার পক্ষে।'

'তা হ'লে?'

'বলেন তো আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।'

'না, না, সে কি হয়?'

'আপনি ইচ্ছে করলেই হয়।'

'আমার অমন অন্যায় ইচ্ছের প্রশ্রয় আমিই বা দেব কেন, আপনিই বা শুনবেন কেন?'

'হাজার হোক, আমি একজন পুরুষ মানুষ, যে কোনো মেয়ে সম্পর্কেই মনে মনে একটা দায়িত্ব বহন করি। এই রাত ক'রে আপনি কোথায় আপনার ঠিকানা খুঁজে ঘুরে বেড়াবেন, আর আমি নিশ্চিন্ত মনে আমার বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে ঘুম লাগাবো, অতোটা ইরেসপনসেবল নই।'

'তা হ'লে আজ রাতটা আমি এ পাড়ার কোনো হোটেলেই কাটাই।'

'আপনার ইচ্ছে।'

নেমে পড়লেন এলালতা। সংগে হালকা একটা ফাইবারের চেন টানা স্যুটকেস, একটা পোর্টফোলিও আর একটা এটাশি। মাল আসছে জাহাজে। প্রশান্ত সেনও সংগে সংগে নামলেন, পিছন থেকে জিনিসগুলো নামাবার জন্য ঢাকনাটা তুলে ধ'রে চারদিকে তাকালেন একটা কুলির আশায়। কী যে হ'লো এলালতার, কেন যে হঠাৎ রেগে গেলেন কে জানে, প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন প্রশান্তকে, হ্যাঁচকা টানে নিজেই নামিয়ে নিলেন জিনিসগুলো, একটা চলন্ত ট্যাক্সীর পিছনে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ডেকে থামিয়ে ফিরে এলেন মাল তুলতে।

হাসলেন প্রশান্ত সেন, 'কী হ'লো।'

'অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে—' ফর্সা রং লাল হ'য়ে গেছে। এও ঠিক আগের মতো, মনে মনে ভাবলেন প্রশান্ত সেন, রাগের কোনো কার্যকারণ নেই। এখন যদি সত্যি সত্যি ট্যাক্সীতে মাল উঠিয়ে ছেড়ে দেন, আস্তো থাকবে না সারারাত। খাবে না ঘুমোবে না, কিচ্ছু না। যতোই দূরে হ'য়ে যাক, পর হ'য়ে যাক, অপরিচিত হ'য়ে যাক, জেনে শুনে মানুষটাকে তো আর কষ্ট দিতে পারেন না। তাছাড়া, এখন গিয়ে কোথায় কোন হোটেলে উঠবে তারও তো ঠিক নেই। আগে থেকে বন্দোবস্ত না করলে হয় নাকি কিছু?

মালের উপর হাত রেখে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'একটা আবেদন আছে—'

'বলুন।' গম্ভীর হ'য়ে অন্যদিকে তাকাতে গিয়েও দৃষ্টিটা এদিকেই ফিরে এলো এলালতার।

'ট্যাক্সীটা বিদায় দিন।'

'কেন।'

'যদি আমাকে ঐ তিন মণ ওজনের পাঞ্জাবী ট্যাক্সীওয়ালাটার চাইতে বেশী অবিশ্বাসী মনে না করেন, তাহলে আমিই আপনাকে আপনার স্বামীগৃহে পৌঁছে দেবার সম্মানটা গ্রহণ করি।'

ঠোঁটের কোণে হাসলেন এলালতা, 'আমার স্বামীগৃহে পৌঁছে দেবার গরজ না দেখিয়ে

আপনার স্ত্রীর গৃহেওত' একটা রাত আতিথ্য গ্রহণ করতে বলতে পারেন।'

'আমি বললেই কি আপনি থাকতে পারবেন?'

'পরীক্ষা ক'রে দেখুন না।'

'এর চেয়ে ভাগ্য আর আমি কী ভাবতে পারি।'

'তাই নাকি।'

'ঠিক তাই।'

হাত নেড়ে ট্যাক্সীর ড্রাইভারকে কাছে ডাকলেন প্রশান্ত সেন. পকেট থেকে মানি-ব্যাগ বার ক'রে পুরো একটা টাকা দিয়ে বিদায় দিলেন। জিনিসগুলো আবার গাড়ির ক্যারিয়ারে তুলে দিয়ে বসলেন এসে গাড়িতে।

গাড়ি আবার ছুটলো মুখ ঘুরিয়ে উত্তরে, এলালতা বললেন, 'আজকাল কি ঐ দিকে থাকা হয় নাকি। 'নিজের বাড়িটা কী হলো? স্ত্রীর পছন্দ নয়?'

একটু জ্বালা তা হ'লে এখনো অবশিষ্ট আছে হৃদয়ে। কিন্তু জ্বালা কি তারও নেই? তারই তো বেশী। প্রশান্ত সেন হাসির টোল ফেললেন চোখে. 'যে কোনো একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে রাত কাটিয়ে সকালে ফিরে গিয়ে স্বামীকে কী কৈফিয়ৎ দেবেন?'

'বলবো, লোকটি স্ত্রীর বিরহে অত্যন্ত কাতর ছিলো বলে, এক রাত সান্ত্বনা দিয়ে এলাম।'

'তিনি যদি উদার হ'য়ে বরাবরের জন্য সান্ত্বনা দিতে পাঠিয়ে দেন?'

'কী আর করা যাবে।'

'তারপর?'

'তারপর অনেকগুলো কথা বলবো, যে কথাগুলো না বললে একজন লোক চিরদিনই ভুল বুঝবে।'

'সময় লাগবে অনেক।'

'অন্য কারো আপত্তি না থাকলে, আমার সময়ের অভাব হবে না।'

গাড়ি আবার দক্ষিণে ঘুরলো।

'তা হ'লে বাড়িই ফিরে যাই। অত কথা কি পথে বলা যাবে?'

'তবে এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন?'

'দমদমের রাস্তায়। সেই যে মানিকতলা থেকে একজনকে নিয়ে অনেক, অনেক সন্ধ্যা পাগলের মতো এলোমেলো ঘুরেছি, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছি, গাছের ছায়ায় রুমাল বিছিয়ে বসেছি—'

এলালতা মাথা নিচু করলেন।

গাড়ি ধরমতলার রাস্তা ছেড়ে চৌরঙ্গীতে পড়লো, চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে এলগিন রোডের মুখে এসে ডাইনে বাঁক নিল।

সেই হরিশ মুখার্জি রোড। হরিশ মুখার্জি রোডের ছোটো একতলা বাড়ি। কিছু কিছু বদলেছে। বাড়ির সামনেকার প্লাস্টারহীন দেয়ালগুলো ধূসর রংয়ে আবৃত হ'য়েছে, শিকের জানালায় গ্রিল লাগানো। সুন্দর দেখাচ্ছে। খোলা বারান্দাটা আবার বাহারি ফুলের টবে সজ্জিত। পিলার বেয়ে ঘন সবুজ লতা উঠে গেছে ছাদে। শুধু গাড়িই নয়, প্রশান্ত সেনের বাড়িটিও সুন্দর হ'য়েছে।

কিন্তু মা? মা কোথায়? এইমাত্র মনে পড়লো তাঁর কথা। সঙ্গে সঙ্গে এলা দু' পা এগিয়ে সাত পা পিছিয়ে গেল।

এতোকাল পরে দেশে ফিরে মানুষটাকে হঠাৎ চোখে দেখে হৃদয়ে যতো আলোড়নই উঠুক না কেন, তাই বলে ঐ ভদ্রমহিলার কাছে দাঁড়াতে পারবে না সে। শেষ দিনের কথা মনে আছে তার, ছেলেকে লুকিয়ে সাদা ধবধবে থানধুতি সিল্কের চাদর গায়ে জড়িয়ে তিনি এলালতার বাপের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেছিলেন এলালতার সঙ্গে। হাত জড়িয়ে ধ'রে মিটমাট ক'রে ফেলতে বলেছিলেন। এলালতার সাহেবী মেজাজের বাবা অভ্যর্থনা দূরে থাকুক, চোখের কোণে তাকিয়েও দেখেননি মহিলাকে, ব্যারিস্টার দাদা রক্ত চক্ষু ক'রে বলেছিলেন, 'ও সব বাজে চেষ্টা আর করবেন না, যদি করেন তা হ'লে তার জন্যেও আমি আইনের সাহায্য নেবো। সেটা নিশ্চয়ই সম্মানের হবে না।'

সজল চোখে সন্তানের বয়সী উদ্ধত ব্যারিস্টারের দিকে তাকিয়ে তিনি স্বভাবোচিত শান্ত স্বরে বলেছিলেন 'বাবা, আমার বয়স হ'য়েছে, আমি জানি এসব কিছু নয়, আজকের জেদ কালকে জল হ'য়ে যায়। তা নিয়ে কে এরকম একটা মর্মান্তিক ব্যবস্থা করে। সেটা কি কারো পক্ষেই মঙ্গলজনক।'

এবার ড্রেসিং গাউনে ঢেউ তুলে বাবা নিজে এগিয়ে এলেন 'মার্জনা করুন' বিনীত ভদ্র-লোকের মতো যুক্তকর হ'লেন তিনি, 'মেয়েকে আমি শীগ্গিরই আবার বিয়ে দেব, পাত্র ঠিক আছে, আপনি দয়া ক'রে আসুন।'

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ভদ্র-মহিলা, এলালতা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে-ছিলেন, কী জানি কেন সেদিন মনটা তার বিকল হ'য়ে গিয়েছিলো।

অথচ কী সামান্য ব্যাপার। ভালো মনেও পড়ছে না কারণটা।

দাদা বললেন, 'লোফার।'

বাবা বললেন, 'হি ইজ এ রাফ।'

সে নিজে বললো রাস্টিক।

কেবল মেজদার নতুন বৌ বললো, 'এ রকম আর দেখিনি।'

রেগে গিয়ে এলালতা বলেছিলেন, 'কী দ্যাখোনি।'

'দাদার কথা ছেড়ে দিলুম, বাবা কী ক'রে তোমাদের তালে কথা বলছেন। হাজার হোক তাঁর তো মেয়ে। এটা তো খুব সুখের নয়।'

'নিশ্চয় সুখের।' ডক্টর লাহিড়ীর স্পয়েল্ড চাইল্ড এলালতা ঘাড় ছাটা চুলে ঝাঁকি দিয়ে, সরু চোখে তাকিয়ে, সরু কোমরে হিল্লোল তুলে সরে এসেছিলো ব্যালকনিতে। তাদের সাহেবী সমাজে যতোটা চড়ানো সম্ভব ততোটাই গলা চড়িয়ে বলেছিলো, 'আমার স্বাধীনতায় যে কেউ হস্তক্ষেপ করবে তাকেই আমি উপড়ে দেবো। কেন, আমি কি কারো দাসী যে মন জুগিয়ে চলতে হবে! আমার খুশি আমি রাত ক'রে বাড়ি ফিরবো, যাকে পছন্দ তার সঙ্গে ঘুরবো, নাচবো, পার্টিতে যাবো—'

আসল শত্রু দাদা। হাতে ধ'রে কোথায় নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তাকে। আর নির্বোধ এলালতা তলিয়ে যেতে যেতেও ভেবেছে সেই দাদাই তার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। আর বাবা! বাবাকে কী বলবেন বুঝতে পারেন না এলালতা। টাকার লোভ কি মানুষের সন্তানের মঙ্গলের চেয়েও বেশী।

রুচিই বা কী! একজন সদ্বংশজাত বাঙালী ভদ্রলোক, কী ভেবে সবচেয়ে বেশী গৌরবান্বিত হচ্ছেন, না, মেয়ে তার দার্জিলিং বোর্ডিংয়ে থেকে মেম হ'য়েছে, একটা বাংলা বলতে তিনটে হোঁচট খাচ্ছে। আর তারি মধ্যে বি এ পড়তে পড়তে কী সর্বনাশটাই না ঘটালো। একটা কলেজের সামান্য মাইনের লেকচারার কী মন্ত্রই না দিল। শেষ পর্যন্ত অবাধ্য মেয়ে কিছু মানলো না। লুকিয়ে পালিয়ে খুন হ'য়ে গিয়ে যা করবার ক'রে বসলো। একটা প্রতিহিংসা আছে না? বাপেরও আছে, ছেলেরও আছে। বাবা আর দাদা! একজন আর একজনের প্রতিমূর্তি। ঐ ধুতি পাঞ্জাবী পরা ঠান্ডা মাস্টারটাকে কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারেন নি, সমকক্ষ ভাবতে পারেন নি, গুরুজনোচিত ব্যবহার ক'রে সৌজন্য দেখাতে পারেননি। আর মাস্টারটিই কি কম গোঁয়ার? চেহারাটি ভালো মানুষের মতো, চরিত্রটি ইস্পাত।

উঁচু সমাজে কিছু নামডাক ছিলো এলালতার। এলালতাকে বেয়ে দাদা তার ব্যারিস্টারি জীবনের সুমহান বৃক্ষে আরোহণ করতে চেয়েছিলেন, হাত ফসকে বেরিয়ে গেল মেয়ে। তা হোক, ছেলেমানুষ বই তো নয়, জোর করে কিছু নাই বা হলো, ছল, বল, কৌশল, এ সব তো আছে?

মাত্র তিন বছরের ব্যবধানেই সব সম্ভব হলো। মনের অগোচরে পাপ নেই, দাদার কোটিপতি বন্ধুটির মোহে, দাদার মিথ্যা প্ররোচনায় এলালতা অনেক দূরে গড়িয়ে-ছিলেন। কিন্তু যেদিন দু' পক্ষের সম্মতিতে সব ছিন্ন হয়ে গেল, দাদা আর বাবা ভোজ দিলেন বাড়িতে, বন্ধুটি পদতলে আছড়ে পড়ে নেশার ঘোরে কাঁদতে লাগলো ভেউ ভেউ করে, এলালতা যেন একটা ধাক্কা খেয়ে

জেগে উঠলেন। চারদিকে তাকিয়ে যেন অন্ধকার দেখলেন সব। মেজ বৌদি বাঁকা হেসে বললেন, 'শেষে রাম তাড়িয়ে রাবণ! ভালো, যার যেমন অভিরুচি।'

মাস কয়েকের মধ্যেই এলালতা অতিষ্ঠ বোধ করলেন। বাবা আর দাদা উঠে-পড়ে লেগেছেন বিয়ে দিতে। শেয়ার মার্কেটে ঘোরাঘুরি করে মস্ত ঘা খেয়েছেন দুজনে, ধার করেছেন প্রচুর, শুধু দাদার সেই কোটি-পতি অবাঙালী বন্ধুই নয়, আরো কয়েক-জন পা বাড়িয়ে আছে সেই ধার শোধ করতে উৎসুক হয়ে। কিন্তু বিনিময় তো চাই!

কোনো এক বিনিদ্র রাতে, একজন মানুষকে ভাবতে ভাবতে, শেষে এই বাড়িটায় চলে এসেছিলো এলালতা, তালাচাবি বন্ধ বাড়িটা তাকে আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল। খবর নিয়ে জানা গেল গৃহস্বামী তাঁর মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন। বাড়ি ফিরে আরো জানা গেল, তার গতিবিধি বিষয়ে সন্দিহান হয়েছেন বাবা আর দাদা। দাদার স্ত্রী চর নিযুক্ত হয়েছেন পাহারা দেবার জন্য। প্রশ্রয় দিয়ে মেয়েকে লাহিড়ি সাহেব অনেক দূর নিয়ে গিয়েছেন, আর না। এবার শক্ত হাতে বাঁধন পরাবেন।

'ভালো চাও তো পালাও।' মেজ বৌদির পরামর্শ। 'চাকরি বাকরি নিয়ে স্বাধীন হয়ে বাড়ি ছাড়ো। পা হড়কে একবার পাঁকে পড়লে আর উদ্ধার নেই।'

সমান বয়সী মেজ বৌদি। এক সময়ে খুব ভাব হয়েছিল দুজনে। মেজ বৌদি সাহায্য না করলে কি সেদিনের সেই এলালতা আজকের এই এলালতায় পরিণত হতে পারতো।

'আসুন।' বারান্দায় উঠে সামনের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে প্রশান্ত সেন অভ্যর্থনা জানালেন, 'খুব অগোছালো বাড়ি, নিন্দে করবেন না ফিরে গিয়ে।'

'নোংরা থেকে স্ত্রীর বিরহটা খুব ঘটা করে প্রমাণ করছেন বোধ হয়।' দূর থেকেই কথা ছুড়লেন এলালতা।

'ঠিক তাই।'

'আমি তো জানতাম, মা নামেও একজন মহিলা এ বাড়িতে বাস করেন।'

'না, এ বাড়ি আর তার দখলে নেই।' ছোট্ট একটি নিশ্বাস পড়লো প্রশান্তর।

'দখলটা হস্তান্তরিত হয়েছে তাহলে?' এলালতা বড়ো বড়ো গরম নিশ্বাস মিলেন।

'ডাক এলে কি দখল আঁকড়ে থাকার প্রশ্ন ওঠে।'

'মানে।'

'মানে, তিনি নেই। তিনি মৃত।'

'মা মারা গেছেন!'

'তিন বছর।'

'তিন বছর!' এলালতা চুপ করে রইলেন একটু, গলার পাতলা চামড়াটা একটু কাঁপলো। 'জানানো উচিত মনে করেন নি দোষ হয়।'

'কাকে জানাবো?'

'আমি তো আর মরে যাইনি, আমারো তো একটা হৃদয় মন বলে পদার্থ আছে।'

'আছে নাকি?'

'আপনার চেয়ে অন্তত বেশী।'

'শুনে সুখী হলুম। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তর্ক করে রাত বাড়িয়ে লাভ কী, যদি অনুগ্রহ করে পদধূলি দিয়ে অভাজনকে কৃতার্থ করেন তা হলে ঘরে এসে বসুন, আর নয়তো—'

'নয়তো কী?'

'যথাস্থানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।'

'থাক, এমনিতেই যথেষ্ট কৃতজ্ঞ করেছেন—'

গামছা কাঁধে পুরনো চাকর যোগেন এসে ঢুকলো গেট দিয়ে। হাতে কিছু পোঁটলা পুঁটলি। বোঝা গেল দোকানে গিয়েছিল। এলালতাকে দেখে চট করে চিনতে পারেনি বোধহয়। পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল 'বৌমা না?'

যেন কতোদূরে থেকে ভেসে এল পুরনো বৌমা ডাকটা, ভুলে যাওয়া সুরে গুনগুনিয়ে উঠলো মনের মধ্যে। ডাকসাইটে মহিলা অফিসার এলালতা লাহিড়ি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে তাকালেন, 'ওমা, যোগেন! তুমি এখনো আছো?' অকৃত্রিম খুশির মেয়েলি সুরে বেরোল গলা দিয়ে।

খুশি যোগেনও কম হলো না, বুড়ো মুখে অসংখ্য দাগ ফেলে গাল ভরে হাসল, 'তোমাদের ছেড়ে কোথায় আর যাব বলো? মা তো দিব্যি পাড়ি দিলেন।'

'ভালো আছো?'

'এতদিন ছিলাম না, এবার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরলেন, আর আমার ভাবনা কী।'

চকিতে প্রশান্ত সেনের সঙ্গে চোখো-চোখি হয়ে গেল এলালতার। এলালতা গরম বোধ করলেন। অদ্ভুত পরিস্থিতিটাকে হালকা করার জন্য অতিরিক্ত সহজ হয়ে দ্রুতপায়ে উঠে এলেন বারান্দায়, প্রশান্ত সেনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যোগেনের পিছনে পিছনে ঢুকে গেলেন ভিতরে।

'কদিন ধরে আবার রান্নার লোকটা পালিয়েছে—' খাবার ঘর সংলগ্ন রান্নাঘরের দরজায় সব নামিয়ে খেদ করলো যোগেন, 'এই বুড়ো শরীরে একলা সব। কোন দিক সামলাই বলো? নতুন একটাকে ধরে এনেছি, হাবার একশেষ। এই তো দ্যাখো না, দোকান থেকে ময়দা আর চিনি আনতে পাঠিয়েছিলুম, আটা আর সর্ষের তেল এনে হাজির করেছে। কী করি, আবার ছুটলুম নিজে। জানো বৌমা, মা গেছেন পর থেকে একবার দেশে পর্যন্ত যেতে পারিনি।'

'কেন?'

'কেমন করে যাবো। সংসার দেখবে কে?'

'যার সংসার।' কথাটা এলালতা অন্য অর্থে বলেছিল, যোগেন বুঝল না। সরল ভাবে বলল, 'তার কথা আর বলো না। কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি স্বভাবটা তো জানি। এমন উদাস মানুষ আর দেখিনি বাপু। তুমি যাবার পরে বছর খানেক তো ছুটি নিয়ে ঘুরে ঘুরেই কাটালো, তারপর যাও-বা একটু ঠাণ্ডা হলো, মা গিয়ে একে-বারে চমৎকার। না আছে খাওয়ার ঠিক, না আছে পরার ঠিক, এই এলো এই বেরুলো, এই—'

'না না, আমি সে কথা বলছি না।' ঠোঁট কামড়ালেন এলালতা, 'আমি বলছিলাম—' সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকালেন, 'মানে—আর কোনো মেয়ে নেই বাড়িতে?'

'কে থাকবে? আগে দিদিরা আসতেন, মা গেছেন পরে তারাও আর শূন্য বাড়িতে আসেন না। যাক, এতদিনে আমার দায়িত্ব চুকলো। আমি যে কী খুশি হয়েছি—'

'আজকে তোমার দাদাবাবু তবে কাকে আনতে দমদম গিয়েছিলেন?'
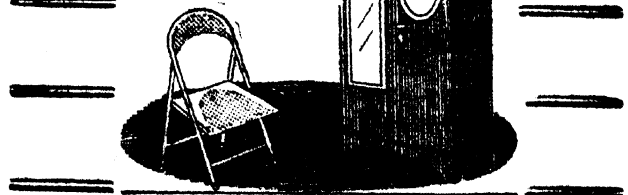
'সে আমি জানি না। হবে কেউ বন্ধু-বান্ধব। তার তো বন্ধু নিয়েই কারবার।'

'তাকে নিয়ে বাড়িতে আসার কথা ছিলো না?'

'কই না তো?'

'কিছু বলেন নি?'

'আমাকে শুধু বলে গেছেন, ফিরতে একটু দেরি হবে। সে যে তোমাকে নিয়ে ফিরবে তা কি আমি জানি? তা হলে ঘর-বাড়ি সাজিয়ে রাখতুম না? খাবার-দাবার ঠিক করে ওই রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম না!'

হাসতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল যোগেন, 'আহা, আজ মা যদি জীবিত থাকতেন! দ্যাখো দেখি, কতটা ময়দা মাখবো।'

এতক্ষণে এলালতা খেয়াল করলেন, কথা বলতে বলতে গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতেই তিনি অন্দরে ঢুকেছেন, একেবারে রান্নাঘরের দরজায়। একটু কুণ্ঠিত হলেন। অন্যায় হয়েছে বৈকি। এ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোবার অধিকার আর তো নেই তাঁর। কিন্তু যোগেনের কাছে সেটা প্রকাশ করতে আরো কুণ্ঠা হলো। তাতে কি, মানুষ তো প্রতিবেশীর বাড়িতেও বেড়াতে আসে! তা ছাড়া আইন আদালতের খবর হয়তো যোগেন জানেই না। কে বলবে তাকে? খুব গৌরবের ঘটনা তো নয়। মা আর ছেলে নিশ্চয়ই চেপে গেছেন, নিশ্চয়ই আজেবাজে অন্য সব কৈফিয়ত দিয়েছেন।

'মা তোমাকে বসে বসে রান্না শেখাতেন মনে আছে?'

'খুব।'

'কী ভালোই বাসতেন।'

'সব মনে আছে।'

'তুমি যখন আর এলেই না, একদিন মার কী কান্না। আমি বললাম, আমাকে একবার যেতে দাও দেখি মা, বাপ তাকে কেমন করে আটকে রাখে দেখে আসি।'

'গেলে না কেন?'

'বাব্বা, দাদাবাবু এমন করে একবার তাকালেন, আমার হয়ে গেল।'

'দাদাবাবুর বুঝি ইচ্ছে ছিলো না আমাকে নিয়ে আসার?'

'থাকলে তো আনতেই পারতো। তারই জিনিস, সে জোর করলে থাকতে পারতে তুমি?'

'ঠিক।'

'ঘরে ঘরে মানুষের কতো মন কষাকষি হয়, না হয় রাগ করে চলেই গিয়েছিলে, ছেলেমানুষ বই তো নয়। তা, আমার কথা আর কে শোনে।' যোগেন গলা খাটো করল, 'বুঝলে মা, সবই হচ্ছে একটা জেদাজেদির ব্যাপার। নইলে ঐ বৌ পাগল মানুষ— তোমাকে বলব কি, সেই সময়ে দাদাবাবুর অবস্থাটা যদি তুমি দেখতে—'

'যোগেন', বসবার ঘর থেকে প্রশান্ত সেনের গম্ভীর গলার ডাক এসে পৌঁছল রান্নাঘরের দরজায়। যোগেন দ্রুত হাতে ময়দা মাখার কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি চাকি-বেলুন নিয়ে বসে মুখ তুলে জবাব দিল, 'এই যে, এখুনি হয়ে যাবে—'

'তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, তাড়াতাড়ি দু' কাপ চা করে দাও।'

'কেন, এতো তাড়াহুড়োর কী আছে? আর তো বেরুচ্ছো না।'

'হ্যাঁ বেরুবো। তোমাকে কথা বলতে হবে না, তাড়াতাড়ি করো।'

যোগেন এবার গজর গজর করল, 'না, কথা বলবো কেন, রাতদিন একা বাড়িতে বসে মুখ বুজে মরবো। তোমার আর কি, হুড়-মুড়িয়ে আসবে আর যাবে—তা বাপু এতোদিন না হয় মন ছিলো না বাড়িতে, আজ তো আর তা নয়, আজ আবার বেরুনো কী! নাও, তুমি যাও তো বৌমা ও-ঘরে, আসলে তো তোমাকেই ডাকছে।'

এলালতার মুখে এক ঝলক রক্ত উঠল।

এলালতা কিন্তু ও-ঘরে গেলেন না, ও-ঘরের পাশ দিয়ে সন্তর্পণে আলো না জ্বালা শোবার ঘরের আধো অন্ধকারে এসে দাঁড়ালেন। বিশুদ্ধ মেয়েলী কৌতূহল। নইলে কেউ এরকম কারো শোবার ঘরে ঢোকে? নিজেকে প্রায় চোরের মতো মনে হলো। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন সব। সেই জোড়া খাট, বেঁটে আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, হোয়াট নট—আশ্চর্য! একটু কি এধার ওধারও করতে হয় না আসবাবগুলো? নাকি কোনো স্মৃতির সৌরভ ধরে রেখেছেন ভদ্রলোক! হোয়াট-নটের মাথায় ছবিটা পর্যন্ত! এলালতার বুকটা ভারি হয়ে উঠলো। ঘরটার পরিচিত গন্ধে অস্থির বোধ করলেন তিনি।

এ ঘরে বসে থাকতে থাকতে প্রশান্ত সেন ভাবলেন, ভদ্রমহিলা তো বেশ, কেমন সুন্দর অন্যের বাড়ির রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকে বসলেন। কক্ষনো উচিত না। রীতিমতো অভদ্রতা। কেন, উনি কি এ বাড়ির গৃহিণী! আর আমি এ ঘরে, ড্রইং রুমের শোভা বৃদ্ধি করে একা একা পরের মতো বসে আছি। কিন্তু মহিলার মতলবটা কী? সত্যি কি এখানে রাত কাটাবেন নাকি? খেলা তো অনেক দেখিয়েছেন, এ আবার কী ধরনের নতুন লীলা। উনি কি মনে করেন, প্রশান্ত সেন একটা কথাও ভুলতে পেরেছেন? এতোই ক্ষীণ তাঁর স্মরণশক্তি? সমস্ত ছিন্ন হয়ে যাবার পরে যেদিন কোর্ট থেকে একটা মৃত্যুর মতো যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে এসেছিলেন, তার চেতনা কি এতোই অস্পষ্ট? আবার একটা চিঠি লেখা হয়েছিল! তলায় স্বাক্ষর ছিল না, উপরে ঠিকানা ছিল না, ভিতরে সম্বোধন ছিল না। ভাষার কী লালিত্য, 'ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চললাম। জানি, আর কখনো দেখা হবে না, তবু বলি, পারো তো ক্ষমা করো। প্রার্থনা করো যেন সেই ক্ষমতা যোগ্য হয়ে উঠতে পারি!'

সেই সময়ে কলকাতা ছিলেন না তিনি, ফিরে এসে ছ' মাস পরে পেয়েছিলেন সেই চিঠি! নিষ্ঠুর, তুমি কি জানো, কতো বিনিদ্র রাতের সাক্ষী হয়ে এখনো সেই চিঠি আমার আলমারির দেরাজে অক্ষত অবস্থায় শুয়ে আছে! এখনো, আজকেও, সেই তোমার জন্য আমার আজ বাদে কাল যে মেয়েকে বিয়ে করবো, তাকে আর ভাবতে ভালো লাগছে না!

প্রশান্ত সেন উঠলেন, রান্নাঘরের দিকে যেতে গিয়েও, এলেন শোবার ঘরের দিকে। স্নানটা সেরে নেয়া যাক, চা হতে হতে জামা কাপড়গুলো বদলে নেয়া যাক।

ঘরের আলো জেবলে প্রায় চমকে উঠে পিছিয়ে এলেন। তাঁর নিঃসংগ ঘরের নিঃসংগ শয্যার একক বিছানার অন্ধকারে এভাবে এলালতাকে বসে থাকতে দেখে অবাক না হয়ে পারলেন না। সংবৃত হয়ে এলালতাও তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। চোখে চোখে তাকিয়ে কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত। অপ্রস্তুত হেসে এলা বললেন, 'আপনার বাড়িঘর দেখছিলাম। রাতটা তো কাটাতে হবে।'

'কী দেখলেন?' প্রশান্ত সেন দরজার ফ্রেমে ছবি হয়ে দাঁড়ালেন।

'সবই ঠিক আছে।'

'ধন্যবাদ।'

'কেবল গৃহস্বামীটি নিতান্ত কাপুরুষ।'

'কেন?'

'যে গেছে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার বীরত্বটুকুও নেই।'

'আপনি হলে কী করতেন?'

'আমি কি যেতেই দিতাম!'

'শরীরের জোর খাটিয়ে কি কেউ মন ধরতে পারে?'

'পারা উচিত।'

'সেই ঔচিত্য যদি আজ প্রয়োগ করি?'

'বুঝবো পৌরুষ আছে।'

'আর সেই ভদ্রলোক?'

'কে আবার!'

'যাকে সারপ্রাইজ দিতে আপনি এতো হাজার মাইল দৌড়ে এসেছেন।'

আগের মতো ঠোঁট গোল করে হাসলেন এলালতা, 'ও হরি, তা বুঝি এখনো বাকি আছে!'

'মানে!'

'কিছু না।' এলালতা পাশ কাটিয়ে চেষ্টা করলেন বেরিয়ে যেতে। হঠাৎ সব ভুলে, প্রশান্ত সেন সবলে তাকে টেনে আনলেন কাছে, চুম্বন করলেন, ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, 'যদি আর যেতে না দিই, কী করতে পারো তুমি! কী করতে পারো?'

'চা দিয়েছি।'

খবরটা বলতে দরজা পর্যন্ত এসে মাথা নিচু করে সরে গেল যোগেন।

আমি কখনও সমুদ্র দেখিনি। না কোন দিন না।

সেই এখনও-যুবতী মেয়েটি তখন আস্তে আস্তে এই ক'টি কথা উচ্চারণ করতে পারত।(১)

হয়ত করতও। যদি ঠিক তখনই পিছনে সময় বুঝে একটা মালগাড়ি আর একটাকে ধাক্কা না দিত। এবং পাশে-বসা যুবকটি হাতের সিগারেট ফেলে দেবার আগে বিশ্রী গলায় কেশে না উঠত। তবু এ-ও ঠিক, সিগারেট থেকে খানিকটা ধোঁয়াও ছড়াচ্ছিল, আর সেই আবছায়া নেশা-নেশা ভাব কাটাতেই মেয়েটি হাতটা পাখার মত নেড়ে ধোঁয়া সরাতে গেল, হাত ছেলেটির হাতে যথোচিত ঠেকলও, দুজনেই কাঁপল, মেয়েটির ভিতরটা দুলে উঠল, এবং অন্তত সেই মুহূর্তে নিজেকে সে সমুদ্র বলে ভাবল।

সমুদ্র যদিও দেখেনি। তার দোলা আছে জানত।

যুবকের কোলে হাত রেখে তাই সেই

---

(১) পারত, নিজে থেকে না ঘটে এই গল্প আমিই ঘটালে। অর্থাৎ গল্প না হয়ে এটি নাটক হলে। তা-হলে এই স্ট্যাণ্ডের সন্ধ্যা সীনে আঁকা হয়ে পিছনে ঝুলত। ওপারের চটকলের চিমনি বাদ যেত। পাখি থাকত—মাথার ওপরে অশ্বত্থের ডালে, কিন্তু নীচের বেঞ্চটা তারা নোংরা আর সাদা করতে পারত না। "কোন দিন সমুদ্র দেখিনি"—খেদ যোগচিহ্ন দীর্ঘশ্বাস যোগচিহ্ন সাধ যোগচিহ্ন হতাশায় তৈরি কয়েকটি কথা সন্ধ্যার আকাশে তারার মত ফুটত। সেই কথায় অন্ধকার—যে-অন্ধকার কয়েকটি নৌকোর শরীর নিয়ে ঘাটে চুপচাপ নোঙর করে আছে—দুলে উঠত। কিন্তু আসলে রুমাল নষ্ট করে বেঞ্চ সাফ করে বসতে হয়েছিল বলে মেয়েটি বিরক্ত। সে পাশের যুবকটির অস্তিত্ব ভুলে সামনের ছায়া-ছায়া জাহাজটা দেখছিল। চেনবাঁধা কুকুরের মত, পোষমানা, নিরীহ, তবু থেকে থেকে অস্থির গলায় জাহাজটা ডেকে উঠছে।

সমুদ্র, চৌবাচ্চা, পেয়ালা

সন্তোষকুমার ঘোষ

যুবতী বলল, "তুমি ত দেখেছ—সমুদ্র এই নদীর চেয়ে অনেক চওড়া, না?"

"অনেক, অনেক। কোন তুলনাই হয় না।" যদিও যুবক, তদুপরি প্রেমিক, তবু ছেলেটি পাশের মেয়েটি, যাকে নিয়ে সে নদীর ধারে এসেছে, যাতে টের না পায় এতটা বিরক্ত। অশ্বত্থের ছায়ায় ঢাকনা-পরা বেঞ্চিতে বসে ওর যেন একটা কাঁচ বউ-বউ ভাব এসেছে। যুবকটির মনে যা এল, মুখ ফুটে তা বলা সম্ভব হলে মেয়েটি শুনতে পেত—"ন্যাকামি! এম-এ পাস মেয়ে তুমি, সমুদ্র দেখে থাকো বা না থাকো, তার সাইজ নিশ্চয়ই তোমার আন্দাজ আছে!"

"সমুদ্র অপার, অগাধ—না?" এম-এ পাস অথচ তখন ন্যাকামিতে পাওয়া মেয়েটি যেন পড়া বুঝে নিতে চাইল, আর ছেলেটি—যদিও সে মাত্র পাস-কোর্সে বি-এ তবু এই সেদিনও ত পেশাদার প্রাইভেট টিউটর ছিল?—সেই অভ্যস্ত নিপুণতা দিয়ে বোঝাল, "অনন্ত, অপার। তবে সাদা চোখে তার কতটা বা দেখি। মাইল কয়েক? মনে হয়, একটা চাকার আধখানা সমুদ্রকে বেড় দিয়ে রেখেছে। দূরাদয়শ্চক্রনিভ—পড়নি?"

মেয়েটি ছাত্রীবৎ বলল, "পড়েছি।"

ছেলেটি পকেটে হাত ঢুকিয়ে চিনেবাদাম খুঁজল, পেল না, না পেয়ে প্রার্থীর মত তাকাল মেয়েটির দিকে। মেয়েটি হাসল। ছিল ছাত্রী, সঙ্গে সঙ্গে যেন বরদাত্রী, এমনভাবে হাতের মুঠো আলগা করে সঙ্গীকে তিনটে বাদাম দান করল।

"আর আছে?"

"আর নেই।"

কথার পিঠে আপনা থেকেই কথা এমনভাবে জুড়ে গেল যে, মনে হল, মেলানো—মেলানো। কোথায় যেন অনেকবার শোনা ই লাইন ক'টি, কোন্ কবিতায় যেন পড়া। আর আছে? আর নেই। তার পরের লাইন কী? মনে পড়ল না। অথচ দু'জনেই স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, ওরাই প্রথম এই কয়টি কথা তৈরি করল না, ওদের আগে আরও অনেকে ঠিক এইভাবে বলেছে, সন্ধ্যার পর এই গাছের ছায়ায় যারাই এসে বসে, তারাই বলে। বলতে হয়। বিয়ের পিঁড়িতে বসলেই পুরনো মন্ত্র আওড়ানোর মত।

হাতের ব্যাগের মুখ অল্প ফাঁক করে মেয়েটি দু'টি ডুবুরি আঙুল নামিয়ে আরও বাদাম খুঁজছিল। যুবকটি দেখছিল। হাত বাড়াতেই মেয়েটি ঝুঁকে পড়ল। না, না। ক্ষুণ্ণ ছেলেটি সরে গেল। শরীর ছুঁতে দেবে, ব্যাগটাকে দেবে না। তোমাদের চোখে রহস্য, বুকে রহস্য, জানি (মানে, পড়েছি)। রহস্য কি ওই থলেতেও?

মেয়েটির সাবধানতায় ক্ষুণ্ণ যুবক আরও ভাবছিল—রহস্য ত কত। দিদিমাকে কৌটো খুলে দাঁতে মিশি দিতে দেখেছি, তোমরাও থলে খুলে তেমনই মুখে রূপের গুঁড়ো বুলিয়ে নাও। একটা কমপ্যাক্ট, একটা পাফ, ব্যস। রুজটুজ বোধ হয় নেই, ওসব মেমদের আর মেমজন্য মেয়েদেরই থাকে। স্যানিটারি, প্রিকশনারি আরও কত না জানি কী, বলতে পারব না।

আরও দুটো বাদাম খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। খোসা ছাড়িয়ে মেয়েটি বলল, "হাঁ কর।" টুপ করে ফেলে দিতে গেলেও কড়ে আঙুলে যুবকটির দাঁত বসে গেল।(২)

আঙুলে ফুঁ দিতে দিতে মেয়েটি বলল, 'এটা কী হল?'

ছেলেটি।—'আসলের সঙ্গে সুদ।'

জাহাজটা তখন ডেকে উঠল, যে-নৌকোগুলো তাকে মাছির মত ছেঁকে ধরেছিল, তারা ছটফট করল, আর মেয়েটির আবার মনে পড়ল সমুদ্রের কথা। কূল নেই, পার নেই। এসব ত পুরনো। ও নতুন কিছু বলুক।

নতুন কিছু? ছেলেটি চুপ করে ভাবল। —"অত বড় আস্ত আকাশটা ঝাঁপ দিয়ে মরেছে সমুদ্রের জলে। জলের তলায় তার মরা দেহটা পড়ে আছে চিত হয়ে।"

"আর?"

"আর জানি না।"(৩)

পাখিরা ঘরে ফিরছিল। নদীর এপার-ওপার দুই-ই একটু-একটু করে অস্পষ্ট হয়ে এল। সেই অফিস-বাড়িটা এখন অনেক দূরে সরে গিয়েছে। হল ঘর, সারি সারি চেয়ার, ডেস্ক, শেলফ, পাখা। করিডর ক্যানটিন। বাঁকানো, প্যাঁচানো সিঁড়ি। আকাশে কত তারা জানি না। ওই সিঁড়িটায় ক'টা ধাপ কোন দিন জানব না।

সেই রাস্তাটাও এখান থেকে ঢের দূরে, যুবকটি ভাবছিল, যেখান থেকে নিশানার আলো পলকে পলকে লাল থেকে হলদে, সবুজ, আবার হলদে আবার লাল, হলুদ-সবুজ-লাল-হলুদ... হতে থাকে, মিনিটে কতবার কী জানি, ট্রাম না পেয়ে, বাসে উঠতে না পেরে, মিছিমিছি গোনবার চেষ্টা না করে, শেষ পর্যন্ত আমরা এই রূপকথার পুরীতে চলে এসেছি।

মেয়েটি তখনও সমুদ্রের কথাই ভাবছিল। জলপরী দেখনি?

—দেখেছি। জলের, না মাটির জানি না। কস্ট্যুম-পরা।

এই পর্যন্ত বলেই সে থামল। তার চোখের সামনে কোমলে কঠিনে মেশানো কয়েকটি শরীর ভেসে উঠেছিল, পাড়ের তাল-নারকেলের গুঁড়ির মত। কিন্তু সে-কথা এই আটাশ বছরের তখনও-কতকটা-যুবতী মেয়েটিকে বলতে বাধল। ওর এই বিকেল বেলায় তাল বা ডাবের কথা তুলে ওকে ব্যথা দিয়ে লাভ কী।

চেনবাঁধা কুকুরের মত জাহাজটা ডাকছিল। জাহাজটা আবার সাগরে যেতে চায়, মেয়েটি সেই ভাঙা-ভাঙা বাঁশির ভাষা বুঝল। যাবে, শেকল খুলে ও একদিন ঠিক পালাবে। আমি যাব না। সমুদ্র আজও দেখলাম না। কোনদিন হয়ত দেখাও হবে না।

অশ্বত্থের পাতার ছায়ায় যেন নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়ে মেয়েটি কেঁপে উঠল, সঙ্গীর হাতের মুঠোয় হাত গুঁজে দিয়ে খুব অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'বল না, আর একটু বল। সেখানে বুঝি খালি ঢেউ, খালি গর্জন?'

'ঢেউ আর গর্জন। একটা রেলের ইঞ্জিন হরদম যেন ইস্টিম ছাড়ছে।'

"অশান্ত, মাতাল, উদ্দাম প্রণয়ী বা এই রকম কিছু নয়?" মেয়েটি যেন আহত হল।

যুবকটি কিছু বলল না।(৪)। বলা আর কতটুকু যায়, কতটুকু বলার বা অর্থ হয়। সেই ধু-ধু বালির কথা? যেখানে মেয়েরা বিছানার মত-না, তার চেয়েও নির্লজ্জ? তার চেয়ে সূর্যোদয়ের কথা যদি বলি—রোজ সকালে কে যেন জ্বলন্ত গোলাকে ভলিবলের মত ঘুষি মেরে ওপরে ছুঁড়ে দেয়—ওর হয়ত ভাল লাগবে।

তখনই পিছনে মালগাড়ির ঠোকাঠুকিতে চমকে উঠে, কিংবা চমকে ওঠার মত করে, মেয়েটি এদিকে সরে বসল, কিন্তু ঢলে পড়ল না। যুবকটি তাকাল মেয়েটির দিকে। ওর গলায় সরু সাদা এই মালা, এতক্ষণ দেখিনি ত! কিন্তু শিকেয় তোলার মত করে বুক অত উঁচুতে বাঁধা কেন, নিজেকে বেড়ালের মত লোভী লাগছে, ঠোঁট আর আঙুলের ডগা সুড়সুড়, ডান পা বাঁ পায়ের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে বসলুম, আর অস্বস্তি নেই। একটা শাড়িতে জড়ানো ওর শরীর, তবু দুটো হাঁটুকেই আলাদা করে টের পাচ্ছি।

"পাখি গুনছ?"

"আরে, না, না।"

"ওরা বাসায় ফিরছে। সারা দিন পরে।" মেয়েটি স্বগত বলল। "আমরা এখনও বাসায় ফিরিনি।"

"আমাদের বাসাই বা কই?"

"এগুলো কী পাখি?"

"জানি না। পাখি চিনি না। কাক-টাক

(২) অন্ধকার ছিল বলেই যুবকটির পক্ষে এ-কাজ সম্ভব হল। নইলে নখের নোংরা চোখে পড়ত।

(৩) সত্যিকার ভাবুক হলে যুবকটি আর-একটু বলতে পারত। যেমন, "আর সমুদ্রের মত ঝিনুক আকাশের শরীরের তারাগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ঝিনুকের পেটে শক্ত হয়ে এই সব তারাই মুক্তো হবে।"

(৪) কেন না, তার মনে দ্বিতীয় যে-উপমা এসেছিল সেটা আরও নীরস। —ডাঙার মাটি টেন উপরওলা অফিসার আর সমুদ্র তার কেরানী, একের পর এক ফাইল পেশ করছে আর অফিসার পড়ে বা না পড়ে, সই দিয়ে বা না দিয়ে ফেরত পাঠাচ্ছে।

হবে আর কী।" বলেই যুবকটি আড়চোখে চাইল। দোয়েল-শ্যামা এই সব বললে ও কি বেশি খুশী হত? হঠাৎ জোর হাওয়া দিয়েছে, মাথায় কাপড় তুলে দিয়েছে মেয়েটি, ওর বড়দি, বউদি ছোট মাসি ইত্যাদি যেমন দেয়, ওকে খুব নরম, ভীরু সুখী-সুখী লাগছে। দাঁত বের করে খুব সুন্দর করে হাসতে চাইছে—ও সমুদ্র-সমুদ্র করছিল, ওকে বলব নাকি যে, সমুদ্রের রাশি রাশি ফেনাকেও কখনও-কখনও টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মত দেখায়।

"চল উঠি।"

—"চল।"

পিছন ফিরে ওরা পা-পা করে চলতে শুরু করল, আর খানিক পরে সেই শহরটা তার আলো, ভিড় আর হট্টগোল নিয়ে ছুটে এসে ওদের চাপা দিল। চেনা চায়ের দোকানটা ওদের ডেকে নিল ঠিক। পর্দা সরিয়ে খুপরিটাও ওরা খুঁজে নিল।

"কী খাবে?"(৫)

"শুধু চা।"

"আমার কিন্তু খিদে পেয়েছে।"

"বেশ ত তুমি খাও না!"

"তা হয় না। দুজনের জন্যেই কাটলেট বলি?"

"বল।"

"কেমন কাটলেট?"

"ভাল—ভালই ত। তোমাকে আমি একদিন নিজের হাতে তৈরি করে খাওয়াব।"

"কবে?"(৬)

"এক দিন—এক দিন, যে-দিন সময় হবে।"

মেয়েটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছিল 'এক দিন, এক দিন'; কোন্ দিন সে একরকম বুঝিয়েই দিচ্ছিল।

ছেলেটি বলল, 'সে-দিন আর কবে হবে?'

মেয়েটি : হবেই তুমি দেখো। খুড়ির রেজাল্ট বেরুবে এ-মাসেই। খোকনও সেই অ্যাপ্রেণ্টিসশিপটা পেয়ে যাবে বলে খুব আশা করছে। তা-হলে—তা-হলেই তো আমার ছুটি। তা-ছাড়া তখনও তো আমরা মাঝে মাঝে মাকে কিছু-কিছু করে দিতে পারব—পারব না?

—"পারব।"

—"দুজনের রোজগার, প্রথম দু-চার বছরে আমাদেরই বা খরচ এমন বেশি কী! তত দিনে ওরা দাঁড়িয়ে যাবে। দরকার হলে ওরাই আমাদের দেবে। তুমি জান না, দিদির ওপরে খোকনের কত টান!"

কাটলেটের হাড় চুষছিল ছেলেটি, মাথার ওপর পাখা ঘুরছিল, মুখে সমীচীন হাসি ফুটিয়ে মন দিয়ে শুনছিল।

—বাবার পেনসনের কিছু ত আছেই, খোকন কিছু আনবে, খুকুও চাকরি নেবে। আমাকে ছুটি দিতে ওরা সব করবে, দেখো। এটুকু কষ্ট খুকু করবে। আমি আটাশ বছর ধরে করলাম, খুকু দু' চার বছর করবে না? ওর বয়স এই তো মোটে কুড়ি।

সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে এতক্ষণ উসখুস করছিল ছেলেটি, হঠাৎ বুকপকেটে একটা লজ্, বাসী, কবেযেনকেনা সিগারেট খুঁজে পেয়ে তার আহ্লাদ হল। আরও খানিক বসতে আপত্তি ছিল না। পণ্ডিতের গলা নকল করে বলল, দেখ, কিছু নেই, কিন্তু এই টানটুকু আছে বলেই আমরা টিকে আছি, আমাদের সংসার টিকে আছে।

—"আমরা কিন্তু ঘটা করব না। পুরুত-টুরুত কিচ্ছু না। চুপচাপ নাম সই করে চলে আসব। তুমি দু-চারজন বন্ধুকে চাও ত বলো। আমি বান্ধবীদের একজনকেও বলব না। ওরা ত সব হিংসুটে। শুধু খুকুকে বলতে পারি।"

—"তাই বোলো।"

—"নোটিশ পুজোর আগেই দেব কিন্তু।"

—"পুজোর আগেই? যদি স্ট্রাইক হয়?"

মেয়েটির মুখে মেঘ ঘনিয়ে এল। "হবে নাকি!"

"হবে বলেই ত শুনছি।"

"হলে হবে। কী আর করা যাবে। আমি বলছি, যদি না হয়, তবে।"

"তবে ত ঠিকই রইল।"

"ঠিক ত?"

"ঠিক।"

মেঘ কাটল, উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, কাপড়ের কুঁচি দেখে নিল। ব্যাগ ঝুলিয়ে দিল কাঁধে। "নাম সই-টই হয়ে গেলে আমরা ছুটি নিয়ে প্রথমে কোথায় যাব বলো ত?"

"কোথায়?"

মেয়েটি বলল "সমুদ্রে।"

পকেটে হাত ঢুকিয়ে সাত সিকে পয়সা নিয়ে ছেলেটি তখন নাড়াচাড়া করছিল।(৭)

— দুই —

"আজ অফিসে যাব না" ভোরবেলা ঘুম ভেঙে এ-কথা কবে বলেছিল মেয়েটি?—বোধহয় এক মাস পরে।—বলেই যেখানে রোদ্দুর পড়েছে সেখান থেকে বালিশটা সরিয়ে বিছানার একপাশে রেখেছিল। গলা অবধি টেনে দিয়েছিল চাদরটা।—শুধু চোখ দুটো খোলা রেখে আকাশ দেখছিল। কাঁচ বাতাবি লেবুর রঙ, বাতাবি ত এই সময়েই ওঠে বাবা বাজার থেকে আনে না কেন। কেমন ধোয়া-ধোয়া ভাব আজকের আকাশের, কখন বৃষ্টি নামল, কখন থামল, কিছু টের পেলাম না ত।

আজ অফিসে যাব না। শুয়ে থাকব, গড়াব, হাই তুলব, যতক্ষণ খুশি। সকালের কাগজ ছোঁব না। চা জুড়োতে দেব। সন্দেশ—শোনপাপড়ি, ছেলেটা রোজ হাঁকে। কেন হাঁকে, কেউ কি ওকে দাঁড় করিয়ে কিছু কেনে।

"ইলা, উঠবিনে?"

মা। বড় বড় চোখ-মেলে ইলা (মেয়েটির নাম তা-হলে ইলা) মাকে দেখল। আবদারের ধরনে বলল—উঁহু। আটাশ বছরকে দুই দিয়ে ভাগ করে নিল।

"অফিসের বেলা হয়ে যাবে না?"

"আজ অফিস নেই।"

"নেই?" মা নাক কুঁচকে বাতাসে কেন বারুদ পেলেন, "কিসের ছুটি!"

"আমাদের আজ স্ট্রাইক। আমরা সকলে সই করে দিয়ে এসেছি, জানো না?"

"কী জানি, আমার এ-সব ভাল ঠেকছে না।"

(৫) অনুক্তাংশ : পকেটে সাত সিকে মাত্র আছে।

(৬) অর্থাৎ কোন্ জন্মে।

(৭) অনুক্তাংশ : পাঁচ সিকে শর্ট আছে। ওর দিল্ এখন যা দরিয়া, নিশ্চয়ই বাকীটা দিয়ে দেবে।

"তুমি কিছু ভেব না"—ভিতু, ভিতু কোথাকার, ইলা বলল মনে মনে; প্রকাশ্যে—"চা হয়নি মা?"

"আনছি।"

গরম-গরম চা। আজ জিভ পুড়িয়ে লাভ কী। বুকের নিচে বালিশ টেনে ইলা উপুড় হয়ে ফুঁ দিল। কাঁপছে। বাড়িয়ে দেখার কাচ-লাগানো যন্ত্রটা থাকলে এই কাঁপুনিই ঢেউয়ের মত দেখাত। ফুঁ দিয়ে আমি ঢেউ তুললুম। সমুদ্রে ফুঁ দেয় কে?

অফিস নেই, কিছু করবারও নেই। আজ যদি ওর সঙ্গে দেখা হত! কাল বলে রাখিনি যে। বলা থাকলে সেই নদীর ধারে কিংবা অন্য কোথাও—

ওর ছাই সময় হত না যে। উনি যে আবার লীডার হয়েছেন। দিনরাত ঘোরাঘুরি, লেকচার, পিকেটিং। বিছানা না নিলে বাঁচি। গাল ফুলিয়ে ভারী ভারী গলায় ও যখন বলতে শুরু করে "বন্ধুগণ—" তখন মজা লাগে কিন্তু। মানুষটাই বদলে যায়।

—এই খুকু!

বোনকে দেখতে পেয়ে ইলা ডাকল। —এই দুটো আঙুলের মধ্যে যেটা হয় ধরবি। হঠাৎ, কিছু না ভেবে, বুঝলি?

—বুঝেছি।

—কী বুঝেছিস?

—তোমার বর আসবে।

হতচ্ছাড়ি, ইলা বলল, হতচ্ছাড়ি। একেবারে পাকা মেয়ে। বকতে গিয়েও হেসে ফেলল;—দূর ওসব নয়, স্ট্রাইক। আমাদের স্ট্রাইক সাকসেসফুল হবে।

—হলে?

—হলে আবার কী। গ্রেড উঁচু হবে, ডি-এ বাড়বে। এখন ক'টা রে?

—সাড়ে সাত।

—ওরে বাবা, তা-হলে ত উঠতে হয়। এর পর খোকন ঢুকলে বাথরুম ত খালি পাব না। ঘণ্টা খানেকের ধাক্কা। তুই ঢুকলেও। তোরা দু'জনেই সমান। ছেলেবেলা থেকেই জল ঘাঁটা অভ্যেস। আগে কী করতিস মনে নেই? চৌবাচ্চার জল তোলপাড় করে কাগজের নৌকো ছাড়তিস।

—চমৎকার ঢেউ হয় দিদি।

—ঘোড়ার ডিম হয়। তবু ত তোরা আসল ঢেউ দেখিসনি।

—তুমিই যেন দেখেছ কত!

—আমি দেখব। চোখ বুজে ইলা ধীরে ধীরে বলল, আমি দেখবই। দেখিস!

আবার ছায়া পড়ল ঘরে। মা। সকাল থেকেই মা কেমন-কেমন, যেন মেঘলা আকাশের নকল করছে।

—ইলু, তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সত্যিই অফিস কামাই করবি তুই? যদি একটা গোলমাল হয়—তোর বাবাও বলছিল কাগজে কী-সব বেরিয়েছে। তোর ত বিপদ হবেই, ওর পেনসনের টাকা নিয়েও যদি টানাটানি করে?

বাবাকে একবার কাসতে শোনা গেল। ওই কাসিটার মানে ইলা জানে। বাবা মার কথায় সায় দিচ্ছেন।

কতকটা ওদের হাত থেকে ছাড়া পেতেই ইলা কলঘরের দিকে গেল। এ-ঘরটা ঠাণ্ডা এখানে নিজেকে কতকটা পাওয়া যায়। তা-ছাড়া সকাল বেলাতেই হালকা হতে না পারা —বিশ্রী। মুখ তিতো-তিতো লাগে, গোটা দিনটাও তিতো হয়ে যায়। (জীবন-দর্শনও বদলে যায় নাকি! জীবন কাকে বলে, দর্শনই বা কী)।

—ইলু, ইলু। মা জোরে জোরে কলঘরের কপাটে ধাক্কা দিচ্ছিলেন। —তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয় ত।

আবার কী ঝঞ্ঝাট বাধল কে জানে, এরা আমাকে একটুও একলা থাকতে দেবে না নাকি। তাড়াতাড়ি পেটিকোটের ওপরে

কোনরকমে ওড়নার মত অসাবধানে শাড়িটা জড়িয়ে ইলা বেরিয়ে এল।

—হয়েছে কী?

সেই মেঘলা-আকাশ মুখ মার। থমথমে সুরে বলল, খুকু পাস করেনি, ইলু।

করেনি! ইলার এইমাত্র স্নান করে ওঠা মুখ পলকে শুকিয়ে গেল। —কী করে জানলে?

—তোর বাবা দেখে এল যে! বাজারে গিয়েছিল, বই বেরিয়েছে, গলির মোড়ে ওরা কাড়াকাড়ি করে দেখছিল, তোর বাবা নিজের চোখে দেখে এসেছে।

—ঠিক দেখেছে?

—খারাপ খবর কি ভুল হয়, মা?

—খুকু কোথায়? ঘরের দিকে যেতে যেতে ইলা জিজ্ঞাসা করল।

—কাঁদছে বোধহয় কোথাও বসে।

—কাঁদুক। ইলা দুপদাপ পা ফেলে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

খুকু কাঁদছিল সত্যিই। আলনার পিছনে বসে। ইলা ওর মাথায় হাত রাখল। —চুপ কর্। কেঁদে কী লাভ হবে? বরং দেখ যদি আসছে বছর—

সনাতন সান্ত্বনা, ইলা তবু একবার থেমে গেল। 'আসছে বছর'—কথাটা উচ্চারণ করতেই ওর মনের ভিতরেই আর-এক মন চটপট অঙ্ক কষে ফেলছিল। এক বছর। তার মানে দশ ইনটু বারো। কোর্স বদলালে আর-এক সেট বই। ছোটখাটো হরেক খাতে চাঁদা। তারপর ফীজ—আরও এক দফা।(৮)

জোর করে ছোট-ছোট অঙ্কগুলোকে চাপা দিয়ে ইলা খুকুকে টেনে তুলল। —ছিঃ, কাঁদতে নেই। 'ইয়েট অ্যানাদার ডে'-র টিকিট কেটে নিয়ে আসি চল্। খুব ভাল ছবি।

গোঁ ধরে খুকু বলল, তুমি যাও, আমি যাব না। লোকে বলবে কী?

ইলু, তোর চিঠি। মা বাইরে দাঁড়িয়েই বললেন।

—কার চিঠি? রেখে দাও ওখানে।

—রেখে দিলে হবে না। লোকটা জবাব নেবে বলে দাঁড়িয়ে আছে।

বিরক্ত হয়ে ইলা বলল, দাও দেখি।

পড়ল ইলা, দু' বার—তিন বার।

—কী করবি ঠিক করলি? মার কথায় চমকে উঠল ইলা। পাহারাদারের মত মা সামনেই খাড়া, তার খেয়াল ছিল না। গম্ভীর গলায় ইলা বলল, এ-চিঠি তবে পড়েছ তুমি?

—পড়ে আমি আর কী বুঝব। তোর বাবা খুলেছেন। কী করবি, যাবি তো?

—যাব না। চিরকুটটাকে মুচড়ে মুচড়ে একটা গুলির মত পাকিয়ে ফেলল ইলা। স্থির গলায় বলল, যাব না।

—যাবি না?

—না—না—না। হঠাৎ এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল বলে ইলার নিজেরই লজ্জা হল।

—বড় সাহেব নিজে হাতে চিঠি লিখেছেন, তাঁর কথা অমান্য করবি?

—না করে উপায় নেই, মা। আমি যে সবার সংগে সই দিয়েছি। তার দাম কী তুমি বুঝবে না।

—না, আমি ত কিছুই বুঝব না। তোরা ভাবিস আমি অন্ধ, আমি কালা, আমি ন্যালা। কিছুই বুঝি না? ওই যে ছেলেটা কাল সন্ধ্যা থেকে বিছানায় চুপচাপ পড়ে আছে,·কেন তাও আমি বুঝিনি ভেবেছিস?

—কেন, মা।

—তোমাকে খোলাখুলি বলি বাছা, অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ না কী পাবে বলে আশা করে বসেছিল, সেটা ওর হয়নি। কাল কোথা থেকে খবর জেনে এসেছে।

—হ-য়-নি। জানালার শিক ধরে ইলা সামলে নিল নিজেকে। —ওটা যে একেবারে ঠিকঠাক ছিল, তবু হল না?

মা বললেন, হল না। তারপর তুমিও এই পাগলামি ধরেছ। সংসারে তুমি বড় ছেলের মত, তোমারও যদি একটু বিবেচনা না থাকে—বুড়ো বাপটা ওদিকে তবে কি ভিক্ষে করতে বেরুবে?

মা! তীক্ষ্ণ গলায় ফলার মত শেষ কথাটা বিঁধে নিয়ে ইলা যেন আকাশে ছুড়ে দিল। পরমুহূর্তেই নেতিয়ে পড়ে আস্তে আস্তে বলল, মা, আমি যাব।

এগিয়ে এসেছেন মা, ওর মাথায় হাত রেখেছেন, ইলা টের পাচ্ছে। বিড়বিড় করে মা কী আউড়ে চলেছেন, তাও শোনা যাচ্ছে কি? মা বুঝি বলছেন, যাওয়াই ত উচিত মা। বড় সাহেব নিজে থেকে গাড়ি পাঠাতে চেয়েছেন, না গেলে সে বড় বিশ্রী ব্যাপার হত।

গেলেও কম বিশ্রী ব্যাপার হবে না। গেটের বাইরে ওরা থাকবে, টিটকারি দেবে, পচা ফলটলও কিছু ছুড়ে মারতে পারে—কিন্তু মাকে এ-সব বলা বৃথা।

ইলা বলল, তাড়াতাড়ি ভাত বেড়ে দাও, আমি চট করে কাপড়টা বদলে আসি।

তুমি শিক্ষিত, তুমি বুদ্ধিমতী। আমি মা, আমি আশীর্বাদ করছি, ইলু, তোমার কত উন্নতি হয় দেখো।

যতক্ষণ গাড়িতে, ততক্ষণ কাঠ হয়ে বসে ছিল ইলা আর বুকের ওপর হাত জড়ো করে প্রার্থনা করছিল। আর যা হয় হোক, যে-খুশি সে শিস দিক, হাসুক বা কাসুক, সে যেন গেটে না থাকে, যেন না থাকে।

[তিন]

—মিছিমিছি এতদূর টেনে আনলে, সময় একটুও নেই আমার।

—আমাকে একটু সময় দিতেই হবে।

—সাড়ে ছ'টা বাজল, ট্রাইস্যানি আছে।

(৮) শুধু এই যোগ আর গুণফল মেলাতে হল বলেই ইলা থামেনি। সেই মনেরও নীচে আর এক মন আছে। খুকুর চোখের টিপটিপ নোনতা জলের ছোঁয়া পেতেই সে শিউরে উঠেছে। এক বছর! অজস্র নোনতা জল দিয়ে যে অন্ধোরাত্রি টলে, সেই সমুদ্র আরও কতদূরে পিছিয়ে গেল?
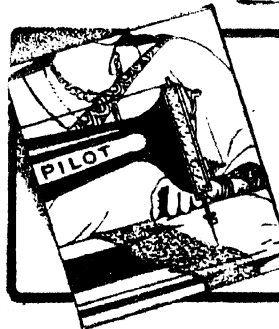
আপাতত ওই ত ভরসা, চাকরি আছে কি নেই তা-ই এখনও জানি না।

—তা হোক, আজ চার দিন ধরে দ্যুটো কথা বলতে চেষ্টা করে তোমাকে ধরতে পেরেছি। যা বলতে চাই, তোমাকে শুনতেই হবে।

—শুনতে, ইলা, আমার কিছু বাকী নেই। তুমি বড় সাহেবের পি-এ সেকশনে গেছ—খাস-মহলে গ্রেড নিশ্চয়ই বেড়েছে?

ছেলেটি টেরছা চোখে চেয়ে আছে, চোখ জ্বলছে।

—না, তুমি সব শোননি। শোননি, খুকু ফেল করেছে, খোকনের চাকরিটা হয়নি।

ছেলেটি চুপ করে রইল। চাকরি ত তারও যাব-যাব। অথচ—হঠাৎ হিংস্র হয়ে ছেলেটি বলে উঠল, জান, ওই সেকসনে আমারই প্রোমশান পাবার কথা ছিল, ডিপার্টমেণ্টাল একজামিনে পাসও করে রেখেছিলাম!

—জানি। তুমি বলেছিলে।

—ছি, ইলা, ছি, তুমি এমন ট্রেচারি করবে ভাবতে পারিনি। তুমি না সই দিয়েছিলে? হাঁপাচ্ছিল সে, খুব জোর দিয়ে বলছিল।—পিছন থেকে ছুরি মারতে পারে যে, তাকে নিয়েই কিনা আমি ঘর বাঁধতে চেয়েছিলাম।

হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল ইলা; হাত বাড়িয়ে ছেলেটির মুখে চাপা দিয়ে বলল, চুপ কর। সেই স্পর্শে সত্যিই সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল ছেলেটি। জুতো দিয়ে মাটি ঘষতে থাকল। আড়চোখে তাকাতেই মেয়েটির গলায় সরু সাদা হারটা চোখে পড়ল।

—বড়সাহেবের বখশিস নাকি! বলে উঠল বিশ্রী, তেতো গলায়।

—তুমিই দেখ না, কী। ইলা ওর হাতটা টেনে নিয়ে রাখল গলায়। —ঘষে দ্যাখো।

মালা নয়, ঘাম শুকিয়ে গিয়ে গলার ভাঁজে শুকনো একটা দাগ পড়েছে। বোধ হয় পাউডারের। ছেলেটি লজ্জিত হল।(৯) ইলার একটা হাত ছিল কোলে(১০), সেটাকে নিয়ে, আস্তে আস্তে খেলা করতে করতে ছেলেটি বলল, 'দেখ আমার মাথার ঠিক নেই, তোমাকে তাই যা-তা বলেছি। চাকরির ব্যাপার ত তুমিই সব জান। মেজদা হঠাৎ বদলি হয়ে বাইরে গেছেন, সংসার শূনো ঝুলছে। জোরহাট থেকে পিসীমারা এসে পড়েছেন—মাথায় যার আকাশ ভেঙে পড়ে, তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।(১১)

ওকে থামিয়ে দিতেই ইলা বলল, 'এই নাও।'

—কী? চমকে উঠে ছেলেটি বলল, 'চিনেবাদাম? আজও? দাও।

জাহাজটা গলা ছেড়ে ডাকছে। সেদিনেরটাই কিনা কে জানে। জাহাজ কি এতদিন এক ঘাটে বাঁধা থাকে?

হঠাৎ ছেলেটি বলল, আজ মাসের কত তারিখ?

—একুশে। মনে আছে, আজই আমাদের নোটিস দেবার তারিখ ছিল?

—নোটিস, কিসের নোটিস?

—মনে নেই?

মনে পড়ল। উসখুস করে একটু দূরে সরে বসল ছেলেটি। অল্প হেসে বলল, 'আমি তা ভাবছিলাম না। আজ একুশে। মাসের এখনও ন' দশ দিন বাকী।(১২)

ওর মনে পড়েনি, ও সরে বসেছে, তার মানে কী, ইলা ভাবছিল। মানে কি এই—সব ফুরিয়ে গেছে, নোটিস আর কোন দিনই দেবে না? আজ নাই বা হল, খুকু ফেল করেছে, আজ আমারও উপায় নেই, না-হয় এক বছরই বসে রইলাম, কিন্তু তার পরেও না?

ওকে খুব ক্লান্ত, সুন্দর, ভেঙে-পড়া লাগছে। আমাকে ও হিংসা করে। স্বীকার করবে না, কিন্তু আসলে ওর মনের বোটা ভাব সেটা ত হিংসেই। রাগে ও গরর্-গরর করছে, যেন মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি।

—এবারে চল।

—হ্যাঁ চল। অস্পষ্টভাবে হেসে ইলা বলল, তোমার আবার ট্যুইশানির দেরি হয়ে যাচ্ছে!

অন্যমনস্ক যুবকটির কোন্ জুতো কোন্ পায়ের ঠিক ছিল না। ইলা দেখিয়ে দিতে ঠিক করে নিল। ওর কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়াল ইলা। খুব নিচু গলায় বলল,—দ্যাখ, তোমাকে একটা কথা বলব, কিছু মনে কোর না। তুমি ত ভাল করে কিছু ভাঙবে না। আমার সেই থেকে মনে হচ্ছে, তোমার হাত বোধ হয় খালি—কিছু টাকার খুব দরকার। তাই, না? আমার কাছেও অবিশ্যি বিশেষ নেই—তবু অল্প কিছু যদি দিই, ধরো দশ কি পনেরো টাকা, নেবে?

যুবক উত্তর দিল না। ইলা বলল, লুকিয়ে প্রোমোশন নিয়েছি বলে এত রাগ? না-হয় ধারই নিলে? পরে শোধ দিও, সুবিধামত। বলে ওর ব্যাগ খুলল। তিনটে খসখসে পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিল ছেলেটির বুক-পকেটে।

ছেলেটি বিরস গলায় বলল, 'এবার চল।'

'এই শেষ?' পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইলা ভাবছিল, 'এই ভাল। সব দিতে পারি এমন ভালবাসা আমাদের কই, আলাদা-আলাদা সংসার যে; আমার ওরও। চাকরিতে আমরা একজন আর-একজনকে হিংসে করব, পারলে ডিঙিয়ে যাব। অথচ আমার অল্পস্বল্প কিছু দরকার হলে ও দেবে, ও ঠেকে গেলে আমি দেব। এ-ও ত ভালবাসাই। ছোট্ট পেয়ালা। মাঝে মাঝে অবসর হলে, নদীর ধারে এই বেঞ্চটাতে খানিক সময় কাটিয়ে যাব।

আর কিছু ইলা ঠিক তখনই ভাবতে পারছিল না। পুরনো ভাবনার রেশটাই তাই টেনে নিয়ে মনে মনে বলল, 'নদী ছাড়া গতিই বা কী। বুঝতে ত আর বাকী নেই, আমরা কখনও সমুদ্র হতে পারব না, সমুদ্রে কোনদিন যাবও না। তবু—তবু সমুদ্রে যাবার কথা ভাবব।'

---

(৯) নাটক হলে এখানে একটা অ্যাকশন থাকত, আর কিছু উদ্বেল সংলাপ। যথা, ছেলেটি হঠাৎ হাঁটু মুড়ে ওপর দিকে চেয়ে বলে উঠত, ইলা! ইলার চোখ টলমল করত, বলত, 'কী!' —'এস, পুরনোকে আমরা মুছে ফেলি।' সেই সন্ধ্যা, সেই নদীর ধার; এক দিকে লজ্জা, অন্য দিকে অনুতাপ—দুজনের মিলে যেতে কোন বাধা হত না।

(১০) অন্য দিন টানাটানি করতে হয়, আজ ইলা নিজেই রেখেছিল উপযাচিকা হয়ে।

(১১) তা-ছাড়া, আমি কাকে দোষ দিচ্ছি, ছেলেটি এর পরের অংশটা মনে মনে ভাবছিল—আমিও কি মাথা নীচু করে অফিসের দরজা দিয়ে ফের ঢুকিনি! ও জানে না, দরকার হলে আমি হয়ত বণ্ড-ও সই করব।

(১২) এ-মাসের মাইনে পাব কিনা কে জানে। পুরো মাসের ত পাবই না। তারপর—? আগস্ট মাসে কত দিন যেন, ত্রিশ, না একত্রিশ; ধরাধরি কিংবা দরাদরি করে একটু কমানো যায় না?

পলাতকা

বিমল কর

12.30

কুয়াতলায় বাঁধানো পাড়ের ওপর বিকেলের শাড়ি, সেমিজ গামছা সাবানের বাক্স পড়েছিল।

চাবির গোছাটা ছিল ডুমুরতলায়।

বেলা পড়ে গেলে ও চুল বেঁধেছিল; চিরুনির আগায় করে সিঁদুর দিয়েছিল সিঁথিতে। ঘরটা আরও একবার ঝাড়ামোছা করে বিছানা গুছিয়ে বড় চাদরটা পরিপাটি পেতে দিয়েছিল। ততক্ষণে বিকেল মরেছে। হেমন্তের ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যে নামছিল। ও গা ধুতে কুয়াতলায় চলে গেল।

কুয়াতলার দিকটা বড় নির্জন, ভীষণ স্তব্ধ। কয়েকটা পেঁপে গাছ, মরা আধমরা কলাগাছের ঝোপ, একটি নিষ্পত্র হরিতকী। তারপরই পাঁচিল। পাঁচিলের পর উঁচুনীচু মাঠ, মাঠের পর বন, বনের পর পাহাড়।

ডুমুরগাছটা প্রায় বাড়ির সামনের দিকে। শোবার ঘরের গায়ে গায়ে। ডুমুরতলা থেকে বাড়ির ফটক পঁচিশ তিরিশ পা।

শাড়ি সেমিজ গামছা সাবান খুঁজতে হয়নি। লণ্ঠন হাতে কুয়াপাড়ে আসতেই সব পাশাপাশি সাজানো রয়েছে দেখা গেল।

ডুমুরতলায় চাবির গোছাটা চোখে পড়েছিল বসন্তবাবুর। লণ্ঠন হাতে উনি বাড়ির আশপাশ দেখছিলেন।

যামিনী তন্ন তন্ন করে প্রথমে বাড়ির ভেতরটা খুঁজেছিল, পরে বাড়ির বাইরেটাও। কোথাও না পেয়ে কুয়ার মধ্যে টর্চ ফেলে ফেলে অনেকক্ষণ দেখেছিল। কুয়ার মধ্যে অন্ধকার এবং জল দুই শান্ত হয়ে যামিনীর আলোর খোঁচা খেল; কথা বলল না।

তারপর যামিনী কলাঝোপ পাঁচিল সব খুঁটিয়ে দেখে পাঁচিল টপকাল। মাঠে মাঠে অনেকক্ষণ খুঁজল। বার কয়েক নাম ধরেও ডাকল। ডাকবার সময় প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, তার গলার স্বর অনিলার কানে যাচ্ছে। কেন মনে হচ্ছিল, যামিনী বুঝতে পারছিল না।

আর এর পরও যামিনী বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল না। সারাটা রাতই প্রায় কুয়োর জলে টর্চের আলো ফেলে বসে থাকল। যদি ভেসে ওঠে শরীরটা! অঘ্রাণের শীত হিম তাকে কাঁপিয়ে তুলছিল, উদ্বেগ দুশ্চিন্তা ভয় তাকে অসাড় অবশ করে ফেলছিল। রাত্রির নিস্তব্ধতা এবং ব্যাপ্ত শূন্যতার মধ্যে তার চেতনা নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত যামিনী ক্লান্ত ফৌজদারের মতন বসে থাকল।

পরের দিন সকালেও অনিলার দেহ কুয়ার জলে ভেসে উঠল না। কুয়ার জল শান্ত।

সন্ধ্যেবেলা বসন্তবাবু বললেন,'না; বউমা কুয়ায় ডোবে নি।'

যামিনী বলল, 'রেলেও কাটা পড়েনি।'

'না—' বসন্তবাবু আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন; গলার স্বর শিথিল, হতাশ। অল্প বিরতির পর বললেন, 'কিছু বুঝতে পারছি না। হয়ত কোথাও চলে গেছে।'

'পালিয়েছে।' যামিনী বারান্দার থামের অন্ধকারে সরে গেল।

বসন্তবাবু ছেলের গলার স্বরে প্রচণ্ড ঘৃণা এবং জ্বালা অনুভব করতে পারলেন।

[পরবর্তী কয়েক দিন]

যামিনী স্ত্রীর বাক্স হাতড়ে কিছু চিঠি পেয়েছিল। তোয়ালে জড়ানো বিয়ের বেনারসীর তলায় নেপথালিনের গন্ধ লাগা চিঠি। চিঠিগুলো যামিনীর। বিয়ের পর পর লেখা। দু চারখানা চিঠি যামিনী চোখ বুলিয়ে দেখল। একটায় লেখা ছিল: আর ত পারি না, বাপের বাড়িতে কিসের সুখে যে মেয়েরা থাকে কে জানে! কবে তুমি আসছ?

কবে তুমি আসছ? যামিনী জানলার দিকে তাকাল। ডুমুরগাছের একটি শাখার

তলায় ছোট ভাই রুণু দেওয়ালির দিন ফানুস ঝুলিয়েছিল। ছেঁড়া ফাটা পোড়া ফানুসের মাথাটুকু এখনও ঝুলছে। যামিনী দেখল।)

বসন্তবাবু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কয়েকজনকে চিঠি লিখে অপেক্ষা করছিলেন। অন্তর্ধানের কথাটা স্পষ্ট করে লেখেননি, ঘুরিয়ে লিখেছিলেনঃ বউমা এখন এখানে নেই।

যামিনীর বোন বাসন্তী বউদির শাড়ি জামা চুলের ফিতে পাউডারের কৌটো সব গুছিয়ে রেখে দিয়েছিল। নিতান্ত দায়ে পড়ে শুধু চিরুনিটা নিয়েছিল—বড় কাঁটার চিরুনি।

ছেলেমানুষ রুণু কথাটা রাষ্ট্র করে বেড়ায় —এই ভয়ে যামিনী ভাইকে বাড়ির বাইরে যেতে বারণ করে দিয়েছিল। রুণু কুয়াতলায় ডুমুরতলায় ঘুরত, দূরে রেল লাইনে ট্রেনের শব্দ শুনলে ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

[মালান্তে]

অনিলা সম্পর্কে কোনো চিঠি বসন্তবাবুর কাছে আসেনি।

যামিনী স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল, অনিলার কথা তার পরিচিত অপরিচিত সবাই জেনে গেছে। মুখে কেউ কিছু বলে না। মা মারা যাবার পর কাছা পরে কম্বলের আসন হাতে পথে বেরুলে প্রথম প্রথম পরিচিতরা অবাক হয়ে দেখত একটু, তারপর কাছে এসে শুধত, 'এ কি?' অপরিচিতরা কিছু বলত না, শুধু দেখত। যামিনী বুঝতে পারত, তার বাড়ির শোক সর্ববোধ্য হয়েছে। ...অনিলা চলে যাওয়ার পর যামিনী সকলের চোখে সেই রকম বিস্ময় দেখল, কিন্তু শোক দেখল না। মনে হল, অতিপরিচিতরা এ-ব্যাপারে লজ্জিত, পরিচিতরা কৌতূহলী। অপরিচিতরা হাসে, আঙুল দিয়ে তাকে দেখায়। একদিন কে যেন ওকে দেখে গান শুরু করেছিল ঃ যামিনী না যেতে পালালে হে......।

বাসন্তী বউদির কয়েকটা জিনিসই পর পর নিয়ে নিল। পাউডারের কৌটো, মাথার তেল, হালকা ছোট লেপ এবং বাহারী চটিটাও।

রুণু ট্রেনের শব্দের জন্যে আর কান পাতত না। স্কুলে যেত, খেলতে ছুটত। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলত, বউদির মার কাছে গেছে। কথাটা দিদি তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল।

[সময় প্রবাহ......]

বসন্তবাবু সকাল সন্ধ্যে মাইলখানেক করে হাঁটেন। সকালে খবরের কাগজ পড়েন, সন্ধ্যায় ভাগবত। ঘুমের জন্যে শোবার আগে কবিরাজী তেল মাখেন ব্রহ্মতালুতে, জল দেন। এবং রাত্রে তন্দ্রার ঘোরে মাঝে মাঝে বলেন, বউমা আমার দুধ অত ঘন করো না......

যামিনী তার ওষুধের দোকান আরও বাড়িয়েছে খানিক। আরও বেশি করে আলো দিয়েছে, সাইনবোর্ডটা নতুন করে লিখিয়েছে। এখন দোকানে আসার সময় প্যাণ্ট পরে আসে, গায়ে বুশ শার্ট। খুব সিগারেট খায়। একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধিয়েছে। বাড়িতে নিজের শোবার ঘরটা পালটে ফেলেছে আগাগোড়া। ডুমুরতলার দিকে বড় বড় জানলা করিয়েছে দুটো—শার্সি দেওয়া জানলা। দক্ষিণের দিকে দরজাটা বড় করিয়ে নিয়েছে। কয়েকটা আসবাবের অদল বদলও চোখে পড়ে। ঘরটা যেন কত খোলামেলা তকতকে হয়ে উঠেছে।

বাসন্তী সকালে একটু ব্যস্ত, তারপর সারাটা দিনই প্রায় হালকা হয়ে আছে। রান্নার জন্যে বামুনদি এসেছে, ঘরের কাজ করার জন্যে মঙ্গলা। বাবার কাছে একটু আধটু বসে থাকা ছাড়া বাকিটা সময় বিছানায় লুটোচ্ছে, গল্পের বই পড়ছে। এবং কোনোদিন দুপুরে কোনোদিন রাত্রে বসে মাল্লার ছোড়দাকে ছোট ছোট চিঠি লিখছে।

রুণু স্কুলে স্কাউট হয়েছে। পোশাক, স্কার্ফ, বাঁশি, দড়ি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত।

[অতঃপর]

চার চামচ ওটস্ খাবার পর বসন্তবাবু জলের গ্লাস তুলে নিলেন।

'আরও একটু খান—'

'পারি না, মা। কেমন বিস্বাদ লাগে যেন—'

'ও-সব কিছু না। খুব উপকারী জিনিস। দশটা দিন খেলেই দেখবেন—'

'দশ দিন—' বসন্তবাবু একটু যেন কৃত্রিম ভয়ে ভয়ে তাকালেন। জলের গ্লাসটা নামাতে হল না। ও হাত থেকে নিয়ে নামিয়ে রাখল। চামচটা আবার হাতে তুলে দিল বসন্তবাবুর।

বসন্তবাবু ওটসের প্লেটে চামচ ডুবিয়ে নাড়তে লাগলেন।

'খাওয়া হয়ে গেলে আপনাকে রোদে গিয়ে বসতে হবে।'

'রোদে—!'

'আপনি রোদে পা রেখে বসবেন, আমি মালিশ করে দেব।'

'বাতের মালিশ?'

'না, এক রকম ওষুধ। ও দিয়ে গেছে।'

বসন্তবাবু তাকালেন। বেতের ছোট্ট মোড়ায় বসে আছে তপতী। মাথার কাপড় অনেকখানি নেমে গেছে ঘাড়ের দিকে। নতুন কোরা তাঁতের শাড়ি। রঙটা টকটক করছে। তপতীর সম্পূর্ণ মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন বসন্তবাবু। এ-পাশের ফরসা গালে কালশিরার দাগ পড়ে গেছে আঁচিলের মতন। এক পলক বুঝি দাগটা দেখলেন বসন্তবাবু। চোখ ফিরিয়ে নিলেন। প্রগাঢ় তৃপ্তির জারকে যেন মন জরে যাচ্ছিল। সামনে মাঘের রোদ। রোদও যেন টল টল করছিল।

'বউমা—'

তপতী মাথায় কাপড় টেনে তাকাল।

বসন্তবাবু দু চামচ ওটস্ খেয়ে তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, 'এই জিনিসটা না হয় খাব। যামিনী তোমায় আর কি কি খাওয়াতে বলেছে বল ত?'

তপতী মুখ নীচু করল। বসন্তবাবু দেখলেন, নতুন সিঁদুরের রেখাটি কত মোটা, কত অনিপুণ। কপালে দাগ লেগেছে, চুলে বিন্দু বিন্দু ছড়িয়ে আছে। নিশ্চিন্ত নির্ভার পরম শান্তির হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠল।

যামিনী একটু সকাল সকাল দোকান থেকে চলে আসছে আজকাল। আসবার সময় 'মালতী কুটিরের' সামনে দাঁড়িয়ে মালির কাছ থেকে ফুল নেয়, বকশিস করে। বাড়িতে পা দিয়ে ঈষৎ গলা তুলে একটা কিছু বলে, কোনো রকমের একটা শব্দ সংকেতের মতন যথাস্থানে পৌঁছে দেয়, তারপর নিজের ঘরে চলে যায়। বাতিটা উজ্জ্বল করতে, ফুলগুলো রাখতে, জুতো খুলে চটিটা পায়ে দিতে যেটুকু সময়—ততক্ষণে তপতী ঘরে এসে পড়েছে।

'চা—?' যামিনী স্ত্রীর দিকে খুশী চোখে চেয়ে থাকে।

'খাও। যা শীত। ঠাণ্ডা লাগিয়ে ফিরলে।'

'তুমি কিছু গায়ে দাওনি?'

'বাড়ির মধ্যে কি আবার গায়ে দেব'

'বাড়ির মধ্যে শীত নেই—?' যামিনী সকৌতুক হাসে।

'রান্নাঘরে ছিলাম।'

'উনুন তাতছিলে?'

'আমার অত শীত নেই।'......
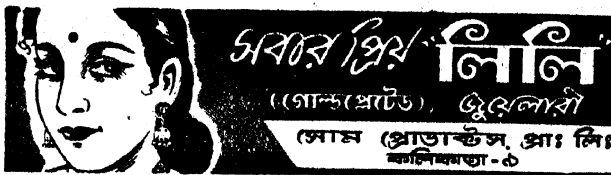
'কই, রাত্তিরে ত তা মনে হয় না। একেবারে একাই দখল করে থাক।'

'কাকে ?'

'আমাকে।'

'অসভ্য !'

'তবে লেপকে—'

'যাঃ......মিথ্যে কথা।' তপতী স্বামীকে কটাক্ষ করল।

'বেশ, আজ দেখিয়ে দেব।'

'দিও।'

সুশ্রী কোমল স্নিগ্ধ স্ত্রীর দিকে যামিনী কয়েক পলক চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে, 'কই, দেখি আজ কেমন করে খোঁপা বাঁধলে !'

'যাঃ—'

'কি ?'

'রোজ রোজ আবার খোঁপা কি দেখাব !'

'দেখি না।'

'না। কি যে তোমার শখ। বউ মানুষ কত রকমের আর খোঁপা বাঁধে। একই রকম বেঁধেছি।' তপতী যেন ঘাড় থেকে কাপড়টা তুলে খোঁপা আড়াল করতে চাইল।

যামিনী উঠল, বউয়ের খোঁপা দেখল, একটি গোলাপ গুঁজে দিল সযত্নে, গভীর করে চুমু খেল। বলল, 'ফুলটা ত কুল-কাঁটা নয় যে তোমায় বিঁধবে।'

ঘোমটা দিয়ে খোঁপা ঢাকতে ঢাকতে তপতী কৃত্রিম অনিচ্ছার সুরে বলল, 'সব সময় কি আর কাপড় থাকে মাথায়, পড়ে যায়। ছোড়দি দেখে, হাসে। বাবাও দেখতে পান।'

'দেখুক।' যামিনী সিগারেট ধরাল।

বাসন্তী পানের পিচ ফেলল। গাঁদাফুলের ঝোপে লালের ছিটে লাগল। তপতী ঘাসের ওপর পিচ ফেলল। ঘাস আরক্ত হল। বাসন্তীর এলো চুল, তপতী চুলের আগায় মোটা গিঁট দিয়ে পুঁটলি করে ঝুলিয়ে রেখেছে। দুপুরের রোদে ডুমুরতলা দিয়ে খানিক হেঁটে গেল দুজনে। এদিক ওদিক ঘুরল একটু। নীল আকাশের তলায় চিল উড়ছে দেখল। হাই তুলল তপতী বার কয়।

'বাব্বা, এত হাই তুলছ কেন ?'

তপতী সলজ্জ হাসল।

'রাত্রে ঘুমোও না ?' বাসন্তী চাপা ঠোঁটে হাসল।

'ঘুমবো না কেন—!' তপতী বাসন্তীর চোখে চোখে তাকাতে পারল না।

'কি করে জানব, আমি ত আর দেখতে যাচ্ছি না। বড্ড কালি পড়ে যাচ্ছে যেন তোমার চোখে—'

'আহা—' তপতী ঠোঁট কেটে ভৎসনার মতন শব্দ করল।

'আহা নয়, আয়নায় দেখবে চল।'

'দেখেছি।'

'দেখেছ !......তা দেখছ, তোমার ত আবার আমাদের মতন বাক্সে কাচের আয়না নয়, অন্য আয়না, একেবারে জ্যান্ত......' বাসন্তী মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলছিল রঙ্গ করে।

'এই ছোড়দি, অসভ্যতা করো না।' তপতী ধমক দেবার মতন করে বলল, 'আমি না তোমার গুরুজন।'

'ইস্......' বাসন্তী ঠোঁট ঝুলিয়ে মজার শব্দ করল।

শীতের রোদে ঘুরতে ঘুরতে ওরা বাড়ির সামনে দিয়ে এবার পিছনে চলে এসেছে। কুয়াতলার পাশে সিমেণ্টের চাতাল। খট্ খট্ করছে শুকনো। কলাঝোপের কাছে কুকুরটা শুয়ে। কাক ডাকছিল। ফর ফর করে চড়ুইগুলো চারপাশে উড়ছে, বসছে ভাত খুঁটছে।

কুয়াতলার কাছে এসে তপতী বলল, 'তোমাদের কুয়ার জলটা খুব মিষ্টি।'

'অনেকটা গর্ত যে!' বাসন্তী কুয়াপাড়ে হাত রেখে একটু ঝুঁকল।

'জালের ওপর কত পাতা!' তপতী কুয়ার ওপরকার পাতা জালে উড়ে আসা পাতা দেখতে দেখতে বলল।

'পাতাটাতা আর কুয়ায় পড়ে না বলেই জলটা পরিষ্কার থাকে।......আগে বড্ড যা তা পড়ত।' বাসন্তী কুয়াপাড় থেকে মুখ সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তপতী কুয়াপাড়ে বসেছে।

বাসন্তী বলল, 'আমারও ঘুম পাচ্ছে, বউদি। চল শুইগে যাই।'

পেঁপেগাছের দিকে তাকিয়েছিল তপতী। বলল, 'আমার একদিন কুয়াতলায় চান করতে ইচ্ছে করে।'

'অত ইচ্ছেয় দরকার নেই; ওঠো।' বাসন্তী আঙুল দিয়ে রান্নাঘরের দিকে কলঘরটা দেখিয়ে দিল; বলল, 'কলঘরে যে জলে চান করো সে ত এই একই জল।'

তপতী উঠল। আবার হাই উঠছে তার।

রুণু এইট ক্লাসে উঠেছে বলে বউদির কাছে মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরতে শিখল। দাদা তার জন্যে এক মাস্টার রাখছে শুনে ভীষণ রাগ তার দাদার ওপর। বউদিকে উকিল ধরেছে, হাফ ইয়ার্লির পর মাস্টার রাখে সবাই। তুমি দাদাকে বল। এখন আমার মাস্টার চাই না। এই মাস্টারটা আবার কালা। তুমি বল বউদি, লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি।

'কালা মাস্টারই ত ভাল।' তপতী হাসে। 'তুমি ভুলই পড় আর যাই পড় বুঝতে পারবে না।'

'কি—কি—? বুঝতে পারবে না—!' রুণুর চোখ ধকধকিয়ে উঠল, 'কালারা ভীষণ চালাক। কালা সেজে থাকে। সব শুনতে পায়।'

'তোমার মাথা—!' তপতী হাসে।

'কালারা শুনতে পায় না?' রুণু বউদির হাসি গ্রাহ্য করল না, বরং উত্তেজিত হল যেন।

'কি করে শুনবে বল না তুমি।' তপতী মজা পাবার হাসি হাসছিল।

'আমি জানি।' রুণুর গলার স্বর দৃঢ়।

'তুমি কিচ্ছু জানো না।'

'আমি মিথ্যে কথা বলছি!' রুণুকে ভীষণ অসন্তুষ্ট আহত উত্তেজিত মনে হল। বার কয়েক গলায় কি রকম অদ্ভুত একটা আ—আ—শব্দ করে বলল, 'আগের বউদি ত কালা ছিল। আমি একদিন বলেছিলাম, কালার নিকুচি করেছে। তখখুনি শুনতে পেয়ে আমায় মেরেছিল।'

তপতী বিকেলের চা তৈরি করছিল। শ্বশুরের জন্যে কাপে চা ঢালতে গিয়ে কেমন যেন হাতটা নড়ে চা পড়ল মেঝেতে। রুণু পাশে বসে বিকেলের জলখাবার খাচ্ছে। তপতীর মনে হল, চায়ের রঙটা বড্ড ফিকে দেখাচ্ছে। পেয়ালার ঢালা চা আবার কাচের কেটলিতে ঢেলে ফেলল। এক মুঠো চায়ের পাতা দিল। আরও এক মুঠো।

'তুমি......' তপতী কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

রুণু লুচির মধ্যে গোটা একটা আলু মুড়ে মুখে পুরল। বউদির দিকে চেয়ে আছে। কি বলবে বউদি সেই প্রত্যাশায়।

তপতী রুণুর সেই দৃষ্টির কাছে হঠাৎ কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। রুণু যেন তাকে বলছে, আমি ঠিক বলেছি, তুমি কিছু জানো না; জানো না।

'বউদিকে এ-সব কথা বলতে নেই, তুমি জানতে না?' তপতী বিরক্ত অসন্তুষ্ট গম্ভীর গলায় বলল।

'বাঃ!' রুণু সবিস্ময়ে শব্দ করল।

'কি? বাঃ কি—?'

'দাদা বলত, দিদিও বলত।'

তপতীর মনে হল সে এতক্ষণ প্রাণপণে কি যেন রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে, আর পারছে না, তার কোনো এক ধরনের সংযম শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

'বলুক। তা বলে তুমি বলবে?' তপতী মুখ নীচু করে চা ঢালতে শুরু করল।

'আমি একদিনই শুধু বলেছিলাম।' রুণু কেন যেন দোষ করে মাপ চাওয়ার সুরে বলল।

ঘর নীরব। অপরাহ্নের আলো এ-ঘরে আসে না। কড়িকাঠের কাছ বরাবর স্কাই-লাইটের ভেতর দিয়ে এক ফালি আলো এসে শুধু ওপর দেওয়ালে পড়ে আছে। মাছি নেই মৌমাছি নেই, তবু সারাটা ঘরে কি যেন ভ্রমরের মতন গুঞ্জন করছিল।

রুণু এতক্ষণে ঢকঢক করে গ্লাসের পুরো জলটাই খেয়ে ফেলল। খেয়ে উঠছিল। তপতী তাকাল।

'চা খাবে?' গলার স্বর অনেকটা মোলায়েম তপতীর।

'খাব।' রুণু সঙ্গে সঙ্গে বলল। চায়ের বড্ড লোভ তার। সহজে কেউ দিতে চায় না।

'তবে আঁচিয়ে এস। আমি বাবাকে চা দিয়ে আসছি।'

চায়ের রঙ দেখে মনে হচ্ছিল ভীষণ কড়া হয়ে গেছে। বিষ বিষ যেন। শ্বশুরের চায়ে অনেকখানি দুধ ঢেলে দিল তপতী। রঙটা অন্যরকম হয়ে গেল।

শ্বশুরকে চা দিয়ে ফিরে এসে বসল তপতী। রুণু বসে আছে।

রুণুর চায়ে বেশি করে চিনি দুধ মিশিয়ে দিতে দিতে তপতী শুধলো, 'দিদি কোথায়?'

'কাপড় কাচতে গেছে।'

'নাও—' রুণুর দিকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিল তপতী। নিজের জন্যে চা ঢালতে লাগল।

জিবের শব্দ করে আরাম টেনে টেনে রুণু চা খাচ্ছিল।

'তেতো লাগছে না?' তপতী শুধলো।

'একটু......'

'আর একটু দুধ দেব?'

'না।'

তপতী দু চুমুক চা খেয়ে কিছুক্ষণ রুণুর দিকে কেমন অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে থাকল। চামচে করে চায়ের একটা পাতা তুলে নিল কাপ থেকে। ঘরে সেই ভোমরার গুঞ্জনটা ঘুরছে।

'রুণু?'

'কি?'

'আগের বউদি তোমায় ভালবাসত না?' তপতী নীচু গলায় যেন রুণুর সঙ্গে বন্ধুর মতন গল্প করছে এমনভাবে বলল।

রুণু বউদির দিকে বিব্রত হয়ে তাকিয়ে থাকল। যেন প্রশ্নটার জবাব তার জানা ছিল, কিন্তু অনেক দিনের পুরোনো পড়া বলে ঠিক মনে করতে পারছে না।

তপতী অপেক্ষা করল। কেমন একটু মায়া হল রুণুর ওপর। 'ভালবাসত না তোমায় তেমন, না—?'

'বাসত।' রুণু বলল।

তপতী একটু যেন থমকে গেল। আর-এক ঢোক চা খেল। 'আমার চেয়ে বেশি?'

রুণু জবাব দিল না। এ-প্রশ্নটা তার পক্ষে একেবারে নতুন শেখা অঙ্কের মতন। ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না।

'আগের বউদিকে ওরা আর কি বলত?' তপতী শুধলো।

'বকার কথা—?

'হ্যাঁ।'

'অনেক কিছু, বলত। আমার মনে নেই!'

'কিচ্ছু না?'

'কালা বলত।'

'আর?'

'কালো মা কালী বলত।'

'নাকি? খুব কালো ছিল?'

'আমার মতন।'

'তুমি আবার কালো কোথায়!'

রুণুর কথাটা বেশ মনোমত হল। লাজুক মুখে হাসল, একটু। 'তোমার মতন ফরসা কেউ না, বউদি।'

'তাই না কি।'

'হ্যাঁ......' রুণু মাথা নুইয়ে নাড়ল। 'যারা যত পুণ্য করে তারা তত ফরসা হয়।' পরম নিশ্চিন্তে রুণু বলল।

তপতী অবাক। ঠোঁটের গোড়ায় হাসি ফেলে বলল, 'কে বলল তোমায়?'

'পান্ডেজী।'

'সে কে—?'

'আমাদের স্কুলের হিন্দী টিচার। ধবধব করছে গায়ের রঙ—সাহেবদের মতন। মাছ মাংস কিচ্ছু খায় না। খালি পুজো করে। তেলক কাটে। পান্ডেজী খুব পুণ্যবান।' পান্ডেজীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে রুণু একটু দম নিল। 'পান্ডেজী বলে 'সাচ্ বাতমে পুণ্যম।'

তপতী আঁচল মুখে তুলল। হাসি মুছল। 'ঠিক বলে পান্ডেজী। যে যত সত্যি কথা বলে সে তত ফরসা হয়। সত্যি কথা বলা জানেই ত পুণ্য।'

বউদির কথায় রুণুর বিশ্বাস যেন আরও মজবুত হল। মনে মনে ভেবে দেখল, স্কুলে দু চারটে মিথ্যে কথা সে রোজই বলে। না বললে তার অনেক পুণ্য হত।

'তোমার আগের বউদিকে আর কি বলত ওরা?' তপতী শুধলো। এবং তপতী প্রায় নিঃসংশয় হল, রুণু যা বলবে সব সত্যি, সত্যি কথা।

রুণু এতক্ষণে বউদির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে যেন। তবু প্রশ্নটা তাকে খানিক এলোমেলো করে দিল। কত কি বলত, রুণুর কি মনে আছে, না রুণু বুঝেছে সব!

'বাবা বলত, বোকা।' রুণু যেন বাবা কি বলত ভাবল একটু। 'একদিন বাবা বউদির ওপর খুব রেগে গিয়ে বলেছিল, মাথায় গোলমাল আছে.....পাগল।'

'তোমার দাদা কি বলত?' তপতী বেহুঁশের মতন প্রশ্ন করল।

'দাদা বকত।'

'গালাগাল দিত?'

'দিত।' রুণু মাথা হেলিয়ে সায় দিল।

'মারধোর করত?'

'দাদা—' রুণু তখনও আগের কথা ভাবছে, গালাগালের কথা, বলল, 'দাদা বউদিকে ভূত বলত, মুখ্যু বলত।' কথাটা বলে রুণু থামল, কি যেন মনে এসেও আসছে না এমন মুখ করে তপতীর দিকে চেয়ে থাকল।

তপতী বিরক্তি বোধ করছিল রুণুর ওপর। যেন রুণুর এই বিস্মৃতি অনুচিত। আগ্রহ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে এখন তপতী অধীর, উত্তেজিত। রুণুর চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছিল না।

'দাদা—' রুণু আচমকা বলল, 'দাদা একদিন বউদিকে মেরেছিল, মশারির লাঠি ভেঙে গিয়েছিল—' কথাটা বলতে বলতে রুণুর গলার স্বর মোটা ভীত হয়ে উঠেছিল, চোখ করুণ দেখাচ্ছিল, ঢোক গিলে গিলে কথাটা শেষ করল, 'বউদিকে খেতে দেয়নি, ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।'

তপতী অসাড়ে বসেছিল। এই ঝাপসা ছায়াঘন ঘরে কেমন যেন নির্জন নিস্তব্ধতা এল। স্কাইলাইটের আলোটুকুও চলে গেছে। মিটসেফের কাছে এসে পোষা বেড়ালটা ক্ষীণ গলায় কাঁদল, চলে গেল, তার ঝোলা পেটের ভার বয়ে নিয়ে যেতে আর পারছে না। তপতী দূরে রাস্তায় গরুর গাড়ির চাকার কান্না কান্না শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল। বাসন্তী গা ধুয়ে আসছে। তার পায়ের শব্দ এবং খুক খুক পোশাকি কাশিও কানে গেল।

'তোমার দিদি কি বলত, রুণু?'

'কিপ্টে, ছোটলোক, চামার......'

তপতীর হুঁশ ছিল না। গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে বলল, 'আর তোমার বউদি?'

'বউদি বলত, তোমাদের আমি জব্দ করব।'

'জব্দ করব বলত?'

'হ্যাঁ, বলত। সবাইকে জব্দ করব বলত।'

তপতী আর কিছু শুধলো না।

[স্বগত]

কোনো এক দিন তপতী স্বপ্নে দেখল, কোন এক রেল স্টেশনে ঘুটঘুটে অন্ধকারে একটা গাড়ি এল। কামরার বাইরে বাতি নেই। 'জানানা' কামরায় টিমির মতন বাতি জ্বলছিল দরজার মাথায়। একটি মেয়ে দরজা খুলে উঠল। তপতী মানুষ জন না দেখে, অত ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভয় পেয়ে জানানা কামরার সামনে এসে মেয়েটিকে বারণ করতে যাচ্ছিল, এ-গাড়িতে যেও না, এ-গাড়ি ওঠার নয়, হঠাৎ দেখল, জানানা কামরার মাথার ওপর 'জানানা' লেখা নেই, মেয়ের ছবি আঁকা নেই। গোটা গোটা করে শুধু লেখা আছেঃ 'স্বাগত'।

তপতী লেখাটা পড়ছিল, বুঝছিল বুঝছিল না, কামরার হাতল ধরে দু ধাপ উঠে লেখার তলায় যেন আরও স্পষ্ট করে কি দেখতে যাচ্ছিল, দরজাটা আধ খোলা—এমন সময় গাড়ি ছেড়ে দিল। তপতী নামতে যাচ্ছিল, ট্রেন হু হু করে চলতে শুরু করল, নামতে পরল না, ভয় পেয়ে হাতল আঁকড়ে থাকল।

কামরার মেয়েটি তাকে ডেকে নিল। দরজা বন্ধ করল।

মেয়েটির গায়ের রঙ কালো। মুখ বড় নরম। চোখ যেন ঘুমে জড়িয়ে আছে। চিবুকটা তোলা শক্ত, নীচের ঠোঁট চাপা। ভীষণ জেদি দেখায়। মাথায় ঘোমটা, পরনে ডুরে শাড়ি, মাথায় সিঁদুর, খালি পা।

'ভাগ্যিস নামতে যাওনি।' মেয়েটি বলল।

'আমি ত যাব না।' তপতী বলল, 'আপনাকে নামতে বলতে এসেছিলুম।'

মেয়েটি যেন প্রথমে ঠিক শুনতে পেল না, তাকিয়ে থাকল। তপতী আবার জোরে জোরে বলল কথাগুলো। 'আপনাকে নামতে বলতে এসেছিলাম।'

'আমাকে? কেন—?'

'এ-গাড়িতে চড়ে ভুল করেছেন।'

'ভুল!' মেয়েটি যেন গ্রাহ্য করল না।

'এ-গাড়ি যাবে না। আমাদের গাড়ি এটা নয়।' তপতী বোঝাবার চেষ্টা করল, 'লোকজন একেবারে নেই।'

'আছে, আছে। অনেক লোকজন আছে। শান্তিতে সব ঘুমোচ্ছে।' মেয়েটি যেন তপতীর ওপর বিরক্ত হয়ে বলল।

শান্তিতে ঘুমোচ্ছে! তপতী অবাক। প্রাণের কোথাও চিহ্ন পর্যন্ত নেই বলে শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। আশ্চর্য!......পাগল—একেবারে পাগল। তপতী করুণায় যেন হাসল মনে মনে।

'আপনি কোথায় যাবেন—?' মেয়েটির দিকে কয়েক পলক চেয়ে, কয়েক পলক তার খালি পা, নিতান্ত আটপৌরে ময়লা শাড়িটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তপতী শুধলো।

কি—,

'কোথায় যাবেন আপনি?'

'মরতে।' ঠোঁট দাঁত শক্ত করে বলল মেয়েটি। বলল আর খর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল তপতীর দিকে।

'ম—র—তে!'

'জুড়োতে গো, জ্বালা জুড়োতে।' মেয়েটির চোখ ফুলকির মতন ঠিকরে উঠছিল। 'মরে শান্তি।......এ-সংসারে বাঁচার মতন জ্বালা নেই, কাটা কই মাছের মতন জ্বলতে হয়।'

তপতী ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু তখন তার কেমন মনে হচ্ছিল, ও মেয়েটি তার কিছু করতে পারবে না। কিচ্ছু না। মেয়েটির গলা হাত কপালের সিঁদুরের দিকে চেয়ে তপতী বলল, 'আপনি মরবেন কেন?'

'বললাম ত।' মেয়েটি ভীষণ বিরক্তির মুখ করল।

'স্বামী–

'জব্দ হবে।' মেয়েটির চোখে যেন শিখা জ্বলে উঠল, মুখে অসহ্য ঘৃণ্য আক্রোশ। 'ওদের সবাইকে আমি জব্দ করব—সেই বুড়ো তার ছেলেমেয়ে—সবাইকে।'

তপতী 'জব্দ' কথাটা শোনার পর যেন কয়েক পলক মনের মধ্যে ঘোলা জল হাতড়াল। তারপর প্রাণান্ত পরিশ্রমে জলের ওপর মাথা তুলল। স্পষ্ট চোখে মেয়েটিকে দেখল, দেখল, অপলকে দেখল।

'আপনি না থাকলে সবাই খুব জব্দ হবে, না—!' তপতী আস্তে আস্তে বলল, মেয়েটির চোখে চোখ রেখে, যেন জবাবটা দেবার আগে ওকে প্রচুর সময় দিচ্ছে কথাটা বোঝবার।

'হবে না? নিশ্চই হবে।' মেয়েটি বিন্দুমাত্র সময় নিল না, দৃঢ় নিঃসংশয় গলায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। 'ওরা সবাই জব্দ হবে—, আর আমি বাঁচব, শান্তি পাব।'...... বলতে বলতে মুখ ঘুরিয়ে নিল মেয়েটি, মাথার কাপড় খুলে ফেলল। টান করে বাঁধা চুলের খোঁপা দেখতে পেল তপতী।

মেয়েটি তারপর বিড় বিড় করে কি বলছিল। তপতীর কানে আসছিল না। মেয়েটির মৌচাকের মতন খোঁপা দেখতে দেখতে, তার মাথা গাল গলা ডুরে শাড়ি দেখতে দেখতে, একবার শুধু শুনল, মেয়েটি বলছে বুড়োর দুধ জ্বাল,...তারপর শুনল 'জব্দ'...তারপর শুনল 'শান্তি পাব'। আর কিছু শুনল না তপতী, দেখল না। কামরাটা যেন অন্ধকার করে কেউ চলে গেল।

অন্ধকারের পর—কতক্ষণ পর তপতী বুঝতে পারল না, কিন্তু দেখল, সে বেঞ্চিতে বসে আছে, যামিনীর হাতে একটা তালপাতার বাঁশি।...তারপর যামিনী থাকল না; শ্বশুরমশাই বাসন্তী রঙ, প্লাটফর্মের সিঁড়ি ওভারব্রিজ এবং বেশ আলো দেখতে পেয়ে তপতী যামিনীকে ডাকল। যামিনী মাল-ওজনের যন্ত্রটার ওপর এক পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তালপাতার বাঁশিটা বরের টোপর হয়ে গেল। আসছি বলে ইঙ্গিত করে যামিনী যেন পান সিগারেট কিনতে বা কুলী ডাকতে গেল।

সেই মেয়েটি কখন তার পাশে এসে বসে আছে। তপতী চিনতে পারল। অনিলা। তার দিকে চেয়ে চেয়ে অনিলার গাল ঠোঁট মুচড়ে মুচড়ে হাসি ফুটছিল। ও কেন হাসছে তপতী বুঝতে পারল না। অনিলা কথা বলল। (খুব সুখে আছ?) আছি, তপতী মাথা নাড়ল। (লোকটা তোমায় বাপের বাড়ি যেতে দিতে চায় না, না—?) না, চায় না, তপতী মাথা নাড়ল। (আমাকেও যেতে দিতে চাইত না।......তোমায় মাঝে মাঝে রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠিয়ে বলে না, ওগো এক গ্লাস জল দাও?) হ্যাঁ, বলে; তপতী মাথা নাড়ল। (আমায়ও বলত।......বুড়োর দুধ খুব ঘন করে জ্বাল দিতে বারণ করে না বুড়ো?) হ্যাঁ, তপতী সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল। (আমাকেও বলত।......বুড়োর প্রাণে একটু দয়ামায়া আছে।......ছোট ছেলেটার খুব দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হয় ত?) হয়, খুবই হয়, তপতী মাথা নাড়ল। অনিলা একটু চুপ করে থাকল। (মেয়েটার মন ভাল, তবে মুখ ভাল না। বড্ড আদেখলা। শাড়িটাড়ি পরতে চায় না তোমার?) চায়, প্রায়ই চায়। (আমারও চাইত।......বেশ জব্দ করেছি সকলকে—আর কেউ কিছু চাইবে না। কম কষ্ট দিয়েছে আমায়। হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে।) অনিলা গায়ের আঁচল টেনে উঠে পড়ল। প্লাটফর্মে একটু হৈ চৈ শোনা যাচ্ছিল। তপতী সামনে তাকাল, যামিনী টোপরটা মাথায় পরে বরসাজে আসছে। যামিনীকে সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ঘুম ভাঙার পর তপতী তন্দ্রায় জাগরণে চেতনায় এবং অর্ধচেতনায় গাড়ির কামরার কথাটা ভাবল প্রথমে। 'স্বাগত' লেখাটা আর টিমটিমে আলোটা তার তখনও যেন চোখে পড়ছিল।

ঈষৎ অস্বস্তির শব্দ করে শরীরে ক্লান্তির কুণ্ডলী পাকাল তপতী। তারপর এক সময় চোখের পাতা খুলল, খুলেই বন্ধ করল, আবার খুলল। বার কয়েক যেন চোখ খুলে এবং বন্ধ করে নিজের অস্তিত্বে এবং চেতনায় ফিরে এসে আস্তে করে উঠে বসল।

প্রত্যুষের ফরসায় ঘরটা দেখল। ডুমুরতলার দিকে শার্সি দেওয়া বড় বড় জানলা দিয়ে চৈত্রের বাতাস আসছে। ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ বাতাস। হাই তুলল তপতী। কপালের ওপর থেকে বিচ্যুত চুলগুলি কানের পাশে হাতে করে টেনে তুলে দিল। পাশ বালিশটার ওপর কনুই রেখে স্বামীর দিকে তাকাল একবার।

যামিনী, ঠোঁটের ফাঁক থেকে সোনা বাঁধানো দাঁতের ভগ্নাংশ দেখা যাচ্ছিল। গালে এক জায়গায় ছোট্ট একটা আঁচিল। বুকের ওপরটায় গেঞ্জিতে তপতীর সিঁদুরের দাগ লেগে আছে।

প্রথমে স্বামীর বুকে আলতো করে হাত রাখল তপতী, তারপর আস্তে করে মাথা রাখল, গালে স্পর্শ এবং কানে স্বামীর হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

সেই শব্দ শুনতে শুনতে, চোখের তারা ডুমুরতলার জানলার দিকে রেখে তপতী মনে মনে অনিলাকে ডাকল, বলল, এরা কেউ জব্দ হয় নি। তুমি মরেছ, এরা তোমার গয়না বেচে দিয়ে দোকান বাড়িয়েছে, ঘর সাজিয়েছে, বিয়ে করেছে, সুখে শান্তিতে বেঁচে আছে।

তপতীর চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। দুর্বোধ্য এক যন্ত্রণা এবং কান্না বুক থেকে পাকা ফোড়ার মতন টনটন করে গলায় উঠে এল। সেই পরম কান্নার আবেগ চাপতে চাপতে তপতী আরও একবার বলল: তুমি তুমি শান্তিও পাওনি। যেখানে মাটি নেই সেখানে আবার ঘট গড়ে কে! তুমি বোকা, বোকা, বোকা।

যামিনীর বুকে মাথা ঘষে ঘষে চৈত্রের ভোরে তপতী অনিলার জন্যে কাঁদছিল।

সমরেশ বসু

ভয় করে? না। আনন্দ হয়? না। রক্তের মধ্যে একটা ঘূর্ণি লাগে। মদের মত, মদের নেশার মত। রক্তের মধ্যে একটা ভয়ংকর দাপাদাপি শুরু হয়। যতক্ষণ হাসিটা বাজে, ততক্ষণ নয়। তারপরে। যখন হাসিটা থামে। গল্‌গল্‌ করে হাঁড়িয়া গলায় ঢেলে দেবার পরে, একটু শ্বাসবন্ধ করে থাকা, একটু ঝিম মেরে থাকা, তিক্ত ঝাঁজ স্বাদটাকে একটু ধাতস্ত করে নেবার পরে যেমন হয়, সেইরকম।

তারপরে যেরকম পুবে ঝড়টা আসে ওই পুব-উত্তরের নীল গাই রং ভুটিয়া পাহাড়ের লাখ ভেরী বাজিয়ে। থালঝোরা অরণ্যের কোমরে একটা নিষ্ঠুর হ্যাচকা দিয়ে। আর এই গোটা আপার টুণ্ডু রেঞ্জের খয়ের-শিশু-শালের ঠোকাঠুকি দাপাদাপি গর্জন শুরু হয়, সেইরকম। সেই রকম, কিন্তু শব্দ নেই। সেইরকম, কিন্তু অবিচল স্থির।

হুঁ, আমার বুকটা জংগল। বরহম্ ভাবে, আমার প্রাণটা, আমার মনটা জঙ্গল। আমি জঙ্গল। হুই উদ্‌লাঝোরা, হুই চাপরামারি, হুই নাগরাকাটা, হিলাঝোরা, টুণ্ডু আর পাং-ঝোরার উতরাইয়ের মাটি শিকড়ের থাবায় থাবায় জড়িয়ে ধরা অন্ধকার জংগলের মত তার বুকটা। ঝড়ের তাণ্ডবে খ্যাপা জঙ্গলের মত। বুকের মধ্যে গর্জায় দাপায় নিঃশব্দে।

হাসিটা জানে, ওর লহরে ঝড় আছে। দাপানি আছে, গর্জানি আছে। যে হাসে, সে রূপে প্রথম ঢল খাওয়া নদীর মত। হাট করে গা খুলে না রাখতে পারলেও, পাঁচ নুড়ি নিয়ে, পাঁচ ফুল খেলতে বসলে বেমানান হত না। কিন্তু বাণ খেয়েছে রাঙি। রাঙি ওর নাম। সবাই ডাকে রাঙ্গি। বিশবরষের প্রথম বাণ খেয়ে, ওই অচেতন হাসিটি হাসতে শিখেছে পুরুষের দিকে তাকিয়ে।

লুংগিটাকেই টেনে কাছা করতে গিয়ে যার লোমশ উরত খোলা, হাফ সার্ট গায়ে, অঙ্কুশ নিয়ে রাঙির হাতির কাঁধে-বসা লোকটি রাঙির বর। নাম দুলাল।

দুলালের গা ঘেঁষে বসে আছে রাঙি। দুলালও ফিরে ফিরে দেখছে বরহমকে। জানেন সে এখনো হাসছে। সারবন্দ পাঁচটি হাতীর দু' নম্বরের পিঠে সে দুলছে, আর হাসছে। অবহেলায় পা' ছড়িয়ে, হাতীর পিঠে, হাতের ভর দিয়ে বসে আছে। যেন বিছানার ওপর বসে আছে এলিয়ে। সিঁথিটা তার বাঁকা। একটু সিঁদুর ছোঁয়ানো আছে সেখানে। নীল ডোরা শাড়িতে গাছকোমর বাঁধা। খাটো লাল জামাটা কোমর অবধি আসেনি। কাঁধ থেকে নামতে গিয়েই বোধহয় ফেটে গেছে। না কি জামাটাই ছেঁড়া পুরনো। নিটোল শক্ত হাতে গোছা গোছা রঙীন কাঁচের চুড়ি। নাকে একটি ঝুটো পাথর বসানো পিতলের নাকছাবি। বয়সে আষাঢ়। রূপে

কী যেন বলছে রাঙিকে দুর্বোধ্য ভাষায়। আর রাঙি, বিশাল পশুটার দোলায়িত পিঠের ওপর পা ছড়িয়ে, পিছন ফিরে বসে হাসছে। দুটো হাতির পিছনে, একলা বরহম্। সবচেয়ে উঁচু শালের মাথায় হানা বিদ্যুতের মত রাঙির চোখ হানছে বরহম্কে।

হুঁ, আমি চাল্‌সার জঙ্গল। বাজ কেন জঙ্গল পোড়ায়, আমি জানি না। ভয় করে না। সুখ হয় না। হুই গরুবাথানের বুক গড়িয়ে যেমন লাখ্ ‘ডালু’র তেড়ে আসা ঝড় নামে, তেমনি একটা মাতন লাগে বরহমের বুকে। তার মরতে ইচ্ছে করে। বলি দেবার কালে ঢাকের শেষ মাতনের কাঠি বাজে তার হৃৎপিণ্ডে। এটা যদি ভয়, তবে ভয়। এটা যদি সুখ, তবে সুখ।

আই, আমি একটা হটাবাহার মানুষ হে। এই পাঁচটা হাতীর মত, পিলখানার ছাপ মারা আমার সারা গায়ে। পাগলা হাতীর মত। এ চা বাগানের দেশে আমাকে কেউ ঠাঁই দেবে না। দুটো পয়সা মজুরি বাড়াবার জেদ আমি সবার আগে করেছিলাম। ওই উঁচুতে চালোনির বাগানে। পাথর ভাঙে, আমার পিঠ ভাঙে না। কাঠ পোড়ে, আমার শরীর পোড়ে না। হাতি খ্যাদার মত করে ধরেছিল আমাকে। মেরে ফেলে দিয়েছিল জঙ্গলের খাদে। তবু বাঁচতে দেখে, বাগান থেকে বাগানে হটাবাহার ঘোষণা করে দিয়েছিল।

কোনো বাগান আর কাজ দেবে না। বরহম্ মুণ্ডা হটাবাহার। ফরেস্টের বাবু বলে, ‘তুই হটাবাহার?’ ‘হুঁ।’ তবে কাজ নাই বাগানের ম্যানেজার গোসা করবে।’ জঙ্গলের কাঠ-কাটা ঠিকাদার জিজ্ঞেস করে, ‘তুই হটাবাহার?’ হুঁ, ‘তবে কাজ নাই তুই লোক ভাল না।’

জঙ্গলটা অজগর। তার পাকে পাকে আমার মরণ দেখলাম। ওঝার কাজ করলে হীরালাল। আমার ধর্মবাপ। এক কুপ্ ওভারশিয়ার। কাঠ কাটা ঠিকাদার তার হুকুমে চলে। এ গাছ কেটো না। এ গাছ কাটো। সরকারের হুকুম তার মুখে। সে জঙ্গল চেনে। আট মাস কাজ, চার মাস বসা। বেতন পঞ্চাশ। কাজে ওভারশিয়ার। জাতে কোচ্। তিনপুরুষের জঙ্গলে বাস। এখন এই চালসায় আছে কিছু খেত জমি। আর কিছু নেই। বউ ছিল একটি। কোন্ এক ভাটিয়ার (চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত বাঙালীকেই বোধহয় বোঝায়) সঙ্গে নাকি পালিয়ে গেছে। সে নিজে কখনো বলে না। লোকে বলে।

এই হীরালাল, বরহমের ধর্মবাপ।

হুঁ, আমার ধর্মবাপ। যে জন্ম দেয়, তার চেয়ে বেশী। লোকটা হাঁড়িয়া না হলে থাকতে পারে না। পচুই ছাড়া চলে না। একটা ফোলা ফোলা মুখ। লাল লাল। কয়েক গাছি গোঁফ। তাও পাকা। ছোট ছোট দুটি চোখ, জ্বল্‌জ্বল করে। চিতা বাঘের মত ঘুরে বেড়ায় বনে বনে। সেই প্রথম চোখ তুলে তাকিয়েছিল বরহমের দিকে। বলেছিল, হেই, তুই হটাবাহার?

—হুঁ।

—বাগান কাজ দেয় না?

—না।

—ফরেস্ট কাজ দেয় না?

—না।

—ঠিকাদার?

—না।

—বউ বাচ্চা আছে নাকি?

—না, কিছু নাই।

—তুই হটাবাহার?

—হুঁ।

—তুই আমার কাছে থাক। আমার ভাত খা। আমার কাপড় পর। আমার জোতজমি দ্যাখ্, বসত কর। পেটভাতা পাবি। কি রে হটাবাহার, রাজী?

কোনো জবাব দিতে পারেনি বরহম্। বাইরের লোকের কাছে সারা রাত মার খাওয়া মোষ যেমন নিজের প্রভুর কাছে এসে দাঁড়ায়, তেমনি করে দাঁড়িয়েছিল। সেই দিন সেই সময়েই মনে মনে বলেছিল, আমার ধর্মবাপ তুমি। আই বাপ্, তুমিও কি একটা হটাবাহার? সে কোন্ বাগানের দুনিয়ায়? কোন্ বনের সংসার থেকে? আমি দেখলাম, তুমি যেন কিসের শোধ নিচ্ছ আমাকে ঠাঁই দিয়ে। প্রতিশোধ। হুঁ, তুমি রাজা হটাবাহার। এইটা জীবন।

হে মা, তোর গান আমার মনে পড়ে। তোর কথা আমার মনে পড়ে। আমার জন্ম দিয়েছিলি তুই বিন্নাগুড়ির বাগানে। আমার মাতৃভূমি জঙ্গলের রূপকথা তুই শোনাতিস্ বাগানের পাতা টিপতে টিপতে: সে এক দেশ! অনেক অনেক অ-নে-ক দূরে। অনেক উঁচু দান্তাবুরু, তার চেয়ে উঁচু ছাগতুবুরু (বুরু-পাহাড়) দেশ। বুরুগুলো সব আসমান ছোঁয়া শাল-পিয়াল কুসুম ছাওয়া আঁধার জঙ্গল। (ছোটনাগপুরের অরণ্য পর্বতময় অঞ্চল) লোকে বলে সরকারি বন। ছাগতুর নীচে ছিল এক গাড়া (পাহাড়ী সরু নদী)। নাম তার রায়ুর গাড়া। তার জল ছিল অমৃতের মত। হাতী, বাঘ, হরিণ, ময়ূর, মানুষমানুষী, সবাই আমরা খেতাম সেই জল। সেখানে আমার জন্ম। সেইখানে আমি প্রথম স্বপ্ন দেখি তোকে। কারণ সেখানে আমি বড় হয়েছি। সেইখানে প্রথম যোয়ান শুকরমকে দেখে আমি মেয়ে হয়েছি। কিন্তু শুকরমকে পেলাম না। এক বন থেকে আর এক বনে এলাম। চা-বাগানের কাজে। স্বপ্ন আমার ফললো, তোকে পেলাম। কিন্তু আমার জীবন বদলাল না। হেই আমার সোনা মাণিক,

> নে জীবোন গাতিড্
> নে জীবোন কাহী নামেগা॥

জীবন আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এ জীবন আর বদল হবে না। কান্‌সা পিতল ফোবঃ জান রে। কান্‌সা পিতল বদল নামেগা। কাঁসা পিতল ভাঙলে, জানিস্ বদল করা যায়। নে জীবোন কাহী বদলাওে।

মায়ের মিঠে গলার গুনগুনানি বেজে উঠেছিল তার কানে। সে মনে মনে বলেছিল, হে মা, আমি তোমার পেট থেকে প্রথম হটাবাহার হয়েছি। আর এই আমার ধর্মবাপ। মন বলছে, যেন রাজা হটাবাহার। এর আর বুঝি কোনদিন বদল হবে না।

আই আমি একটা হটাবাহার মানুষ। আমার বুকে কেন দক্ষিণ বন হিসাঝোরার ঝড়? সকলের মাথা ছাড়ানো শাল গাছটা কি আমি? হাতী পোষার বউয়ের চোখের চিকুর কেন হানে বরহম্কে? জান বুঝি, তার হাসিতে ঝড় ওঠে একটা জঙ্গলে, তাই?

হুঁ আমার বুকটা হুই পুবের ডাইনা জঙ্গল। কিন্তু দুলালের বিদ্রূপ-দর্পিত চোখের আড়ালে ওটা কী? একটা শাণিত অঙ্কুশের মত? যেন বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর বেয়নেট বন্দুকধারী পাহারাদারের মত?

আইন হক্ খুন।

আইন হক্ খুন একেবারে প্রথম হাতীটার পিঠে বসে আছে আরো গম্ভীর, আরো ভার নিয়ে। কাঁচা পাকা দাড়িওয়ালা, মাথার চুল

ছোট করে ছাঁটা, পেটা পেটা কালো শরীরে একটা ছেঁড়া ঝোলা জামা গায়ে হাতীর দোলায় দুলছে মাহীন্দর। রাঙির বাবা।

কিন্তু রাঙি এক হাত থেকে আর এক হাতে ভার বদলায়। কোমর নতুন নতুন বাঁকে বেঁকে ওঠে। চোখের নজর আড় করে, ঠোঁট কুঁচকে ভ্যাংচায়।

আর ঝড় ওঠে। ঝড় কি আইন মানে, না হক মানে, না খুন মানে? ঝড় কি অংকুশ মানে, না ম্যানেজারের বাংলোর পাহারাদার মানে? বরহমের বিশাল কালো শক্ত শরীরটা খাড়া হয়ে ওঠে। বুকের ঝড় চকিত হয় চোখে। সে চোখ ফেরাতে পারে না রাঙির ওপর থেকে। একটা শব্দহীন আর্তনাদ বাজে তার কানে। আই বরহম্, তোর বুক ফেটে যায়।

পরমুহূর্তেই তার বুকের মধ্যে ধর্ম-বাপের ডাক শুনতে পায়, আই, আই রে হটা-বাহার, ফিরে যাবার মতলব তোর। এইবার মরবি। মরণ ঘনিয়েছে তোর।

হুঁ, এইটা মরণ। বরহমের যেন মরতে ইচ্ছা করে। কারণ জীবনটা আর ফিরবে না।

সেই উঁচু জায়গাটায় এসে হাতীগুলো দাঁড়াল। মূর্তি নদীর পারে। যেখানে হাতী-গুলিকে প্রায়ই চরতে নিয়ে আসা হয়।

কার্তিক মাস। আকাশ নীল। ঘর ছাড়া উদাস মন সাদা মেঘ দু এক টুকরো এখানে ওখানে। পশ্চিম-উত্তরের আকাশে গেছে সুর্য। দার্জিলিংএর ধূসর অবয়ব দেখা যায়।

ডান দিকে নদী বাঁয়ে বাঁক নিয়ে নেমে গেছে। কাঁচা রাস্তাটার বাঁয়ে ঘন শাল বন। গভীর, অন্ধকার নীরন্ধ্র যেন। নদী-সঙ্গী হয়ে নেমে গেছে। দার্জিলিংএর রোদ বর্শার মত খোঁচা খোঁচা হয়ে ঢুকছে, বনের খানে খানে।

হাতী থেকে নামতে গিয়ে থামল বরহম্। মাহীন্দর নামছে না। তাই দুলাল রাঙিও নামছে না। নদীর কূল ধরে, লোমশ ভ্রূ কুঁচকে মাহীন্দর তাকিয়ে রইল দক্ষিণের জংগলে।

একটা হাতী ডাকল, কংক্!

মাহীন্দর ফিরে তাকাল। বরহম্ দেখল, তার আগের হাতীটা ডাকছে। সারির চার নম্বর। চামড়ায় এখনো ভাজ পড়েনি একটু। গায়ে এখনো অল্প বয়স -অর্জুন গাছের বাঁধুনি আর চেকনাই। বয়স নাকি মোটে বিয়াল্লিশ। আষাঢ় পেরনো যৌবন হস্তিনীটার, শাওনের অকূল। নাম দিলালী। বরহম্ কালিনীর পিঠে। দিলালীর আগে সুলতান। রাঙি আর দুলাল রাজার পিঠে। মাহীন্দরের অংকুশ ঠেকে আছে পাঠানের কাঁধে। এই ওদের নাম।

দিলালীর ডাক শুনে মাহীন্দর ফিরে তাকাল। কোথা থেকে একটা ছুটকো বাতাসে তার দাড়িতে লাগল ঝাপ্টা। মাহীন্দর হেসে উঠল।

দুর্বোধ্য হিটাগাংএর ভাষায় আরো কিছু মগ-সুর দিয়ে জিজ্ঞেস করল দুলাল, হল কী?

মাহীন্দর বলল, একটা চমক লাগল হে। দিলালীটাও ডাকল। কিন্তু, কিছু নয়। অই বরহম্!

—হুঁ।

—আর যাওয়া যায়?

—হুঁ। যত খুশি।

—কুনঠাই?

—পাংঝোরা, খরিয়ার, কাকুরজিলোরা, সুল্লাপাড়া, ভোকোলমারদি, ধূপঝোরা,...... হুই দেখা যায়।

দেখা যায়? বাপ বেটি জামাই, তিন-জনেই দূরে দিগন্তব্যাপী দক্ষিণের ঢালু জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইল।

দুলাল বলল, দেখা যায়?

—হুঁ দেখা যায়। আমি দেখতে পাই। হুই যায় চালসার রেল লাইন পুব-পশ্চিমে। আওরি লাম, সুল্লাপাড়া হাটের রাস্তাটা মিলবে। বন বাংলা আছে। রাস্তাটা পুবে গেছে। কাকুরজিলোরা আর ভোকোলমারদির বাঁচে। তবে নদীটা মিলবে, জলঢকা।

—জলঢকা?

দুলাল আবার জিজ্ঞেস করল।

—হুঁ। নদী। অখনও জল অনেক। রেল লাইনটার কোলে রাস্তা। উঁচায় রয় লাগরা কাটা। সেলকাপাড়া আর টুন্ডু, পার হলে চাঙমারি। বাঁচে কারণ—

—কারণ?

—হুঁ, জায়গার নাম।

—সব দেখা যায়?

বিদ্রূপে বেঁকে উঠল দুলালের গোঁফ। কিন্তু দেখতে পায় বরহম্। চোখ বুজলেও দেখতে পায়। এই গোটা অরণ্য অঞ্চলের প্রতিটি রেজ তার চেনা। পায়ে পায়ে ঘোরা।

—হুঁ, চোখে ভাসে।

—চোখে জাদু আছে নাকি?

রাঙি হেসে উঠল খিলখিল করে। বরহমের আর জবাব দেওয়া হল না। জাদু দেখতে লাগল সে। রাঙির কালো চোখের ছটায়। ঠোঁটের ওপর চাপা দেওয়া ঘোরানো হাতে। তালুতে মেহেদী রং বাহারে। আষাঢ় অংগে অংগে শাওনের বাণ লক্ষণ দেখে।

হুঁ আমার চোখে জাদু লেগেছে। রাঙির লাল জামাটা আমি জগতের রক্তের মত দেখি। কাপড়ের নীল ডোরাগুলিকে দেখি জগৎ জড়ানো শত পাক নাড়ি। আই আমি মায়ের পেট থেকে প্রথম হটাবাহার হয়েছি। আবার আমার ফিরতে ইচ্ছা করে। হেই ধর্মবাপ, আমার মরতে ইচ্ছা করে। আবার যেতে ইচ্ছা করে ফিরে রক্তে নাড়িতে। হুঁ, এ হটা-বাহারটার চোখে জাদু লেগেছে হে।

একটা তীব্র গর্জনে সংবিৎ ফিরল বরহমের। মাহীন্দরের চোখে খ্যাপা কুড়ো চিতার অংগার ঝিলিক। দুলালের চোখে সুতীক্ষ্ম অংকুশ উদ্যত। মাহীন্দরের ডাক গর্জন হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেউ কিছু বলল না। মাহীন্দর পাঠানকে চালাল দক্ষিণে। পিছে রাজা। সুলতান দিলালী কালিনী পরে পরে।

তবু রাঙির শরীর কাঁপছে হাসির চাপা

হিল্লোলে। বাপের স্নেহ উথলে ওঠে মেয়ের হাসিতে। বরের সোহাগ উল্সে ওঠে বউয়ের হাসির লহরে। কিন্তু আমার বুকটা খাই-রান্তির জঙ্গল। সেখানে ঝড় ওঠে। ঝড় কি কান্নর গর্জন মানে?

কালো বন, লাল নদী। মাঝের পথ ধরে দক্ষিণে এগিয়ে চলে আগে মাহীন্দর। বলল, আরো কয়খান রশি ঘুর দিয়া আসি।

দুলাল বলল, চলেন।

হুঁ, এই পথে, আট মাস আগে, আরো নীচে প্রথম জঙ্গল হয়েছিল বরহমের বুক। ঝড় লেগেছিল জঙ্গলে। আরো নীচে। বামন-ডাঙার নীচে, নাথোয়ার বাগানের ওপরে, ধূপগুড়ি থেকে যে-কাঁচা রাস্তা ওপরে উঠে, পুবে বাঁক নিয়ে চলে গেছে। ভুটান সীমান্তে। সেই রাস্তা। ডাইনা আর জলঢাকা নদী যেখানে প্রায় গলাগলি করতে গিয়ে করেনি, সেইখানে। ডেয়ো ঢাকনা ঘর গৃহ-স্থালী, ছাগল মুরগী পায়রা, বউ বেটা বেটি জামাই, মাহীন্দরের গোটা সংসার পাঁচ হাতীর পিঠে।

—হো-ই, ছাইলসা বন-বাংলত্ যাইমু। রাস্তা কোন্ দিকে?

চাল্সার বন-বাংলায় যাবে। হা করে তাকিয়েছিল হটাবাহার লোকটা। কোথা থেকে আসছে এরা।—কুথা থিকা আসিলা হে। মাহুত বটে?

—হাঁ। ছাটিগাঁ। পিলখানা, সরকারি পিল-খানা থেকে আসছি। হুকুমপত্তর আছে। হুকুমপত্র? তা থাকতে পারে। হাতীর পিঠে সংসার দেখছিল বরহম্ তাকিয়ে তাকিয়ে। একটা বাচ্চা কাঁদছিল টাঁ টাঁ করে। তার-পরেই, হিলিবিলি বিজলি মালা ঝলকে উঠেছিল। ছোট একটা কেউটের মত রাঙির কপালে পাক দিয়ে পড়েছিল এক গুছি রুক্ষ চুল। বন রং বরহমের দিকে তাকিয়েছিল। সাদা ঝকঝকে দাঁতে হেসে উঠেছিল চোখা-চোখি হতেই।

হাসিটা যখন বেজেছিল, ততক্ষণ শক্ত করে থাকতে হয়েছিল। তারপরে আর বাধা মানেনি। ফাল্গুনের সকালবেলায় বুক যেন ডাইনার শালবন হয়ে উঠেছিল। ঝড় উঠে-ছিল। দাপিয়েছিল বুকের মধ্যে। মনে মনে বলেছিল, আই আমি একটা হটাবাহার মানুষ হে। আমার বুকে কেন ঝড় উঠল?

জোত জমিনের কাজ ছিল না। বরহম্ ধর্মবাপের কাছে ছুটি নিয়ে, চাল চিঁড়ে বেঁধে, ঘুরতে ঘুরতে হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়েছিল নাথোয়া। চেনালোক পুরনো লোকদের সঙ্গে একটু একথা সেকথা বলা-বলি করার জন্য। সে বলেছিল, পথ দেখায়ে লিয়ে যেতে পারি। চালসা আমার জায়গা।

মাহীন্দর একমুহূর্ত ভেবেছিল। চোখা-চোখি করেছিল দুলালের সঙ্গে। তারপরে একটা মোটা কাছি হাতীর পিঠের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে বলেছিল, আস।

দাঁড় ধরে উঠতে গিয়ে আবার একবার তাকিয়েছিল রাঙির দিকে। আন মান বোঝার বয়স কোথায়? রাঙির চোখের তারায় যেন বাজী ধরেছিল তার প্রবৃত্তি। তার প্রবৃত্তি আবার খিলখিলিয়ে উঠেছিল জয়ের উল্লাসে।

হে মা, তোর গান আমার মনে পড়েনি। নে জীবোন কাহী বদলাও। আমি পথ থেকে ফিরলাম। পথ ভুলিয়ে ডেকে নিয়ে যাওয়া—বাগিয়া বোঙার মায়া হাতছানি দেখল হটাবাহারটা। নাথোয়ার জঙ্গলের ঝড় প্রথম দাপিয়ে পড়ল আমার বুকে।

তারপর কথাবার্তা, জিজ্ঞেসাবাদ। কী জন্যে আসা এই চালসায়? লড়াইয়ের ভয়ে, বিদেশী দখলদারের আশংকায়। চাটগাঁ দখল হলে, সম্পত্তি যেন না যায় শত্রুর হাতে। তাই
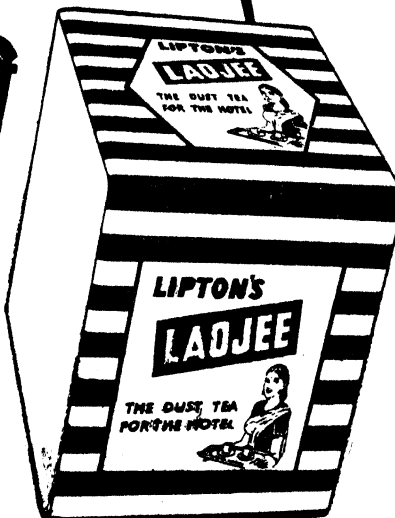
সময় থাকতে সরকার তার হাতী পাঠিয়ে দিয়েছিল তরাইয়ের গভীর অরণ্যে। বোমার আঘাতে এই অস্থাবর সম্পত্তি নাশ যাতে না হয়।

হ্যঁ, এদের এক সাল আগে থেকেই লোক আসছিল। সারবন্দী ট্রাক আর ফৌজ আসছিল। সেই সঙ্গে অনেক মানুষ। দূর দূর শহরের ভীত আতঙ্কিত মানুষের দল আসছিল বনের আশেপাশে।

হীরালাল বলেছিল, সব শালা জঙ্গলে পলায়ে আসছে।

—ক্যানে, উয়াদের ডর নাই জঙ্গলে?

—না, অখন আর নাই।

—বাঘের ভয় নাই?

—নাঃ।

—ক্যানে? সাপ হাতী ভালু, কুহুর ডর নাই? জংলী কুত্তা মুতে দেয় যদিন গায়ে?

—না, ওদের এখন আর জঙ্গলের কিছুকে ভয় নাই। তার চে' বড় ভয় এখন শহরে। তাই জঙ্গলে চলে আসছে সব।

—ক্যানে আই বাপ্, উয়ারা হটাবাহার নিকিরে?

এক রাশ পচুইয়ের গন্ধ ছেড়ে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে উঠেছিল হীরালাল।—আই রে শালা, অই রে ব্যাটা!

হাসি থামতে চায়নি হীরালালের। যদিও বরহমের মনে কোনো দিন প্রশ্ন জাগেনি, এক-ই লোককে একজন শালা আর ব্যাটা বলতে পারে কি না। হীরালাল বলেছিল, তা মিছে বলিস নাই। ওরা তাড়া খেয়ে আসছে এখানে। শহরে আর ঠাঁই নাই।

তারপর? আরো কথাবার্তা হয়েছিল মাহীন্দরের সঙ্গে। তারপর আর কী? সরকার মাইনে দেবে। যতদিন থাকতে বলবে চালসায়, ততদিন থাকতে হবে। যুদ্ধ থেমে গেলে, জিতে গেলে, আবার ফিরে যাওয়া। জাত কী? মাহুত? না। হাতীপোষা বলা যায়। আর ধর্ম? চৌকো তাবিজ আছে গলায়। সিঁদুর মাখা লক্ষ্মীর ছবি আছে পুঁটলিতে। মুরগী আছে খাঁচায় কিন্তু ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালা ছিল রাঙির মা লক্ষ্মীর গলায়। তবু দাড়ি ছিল, মেহেদী ছিল মেয়েমানুষদের হাতে। সুরমা ছিল চোখে। বাঁকা সিঁথেয় হায়া যায়নি। কিন্তু সিঁদুরের প্রতি টান আছে রক্তে। পীর আছে, সত্যনারায়ণের সত্য আছে।

পাঁচ হাতী আর পরিবার নিয়ে বেরিয়েছিল মাহীন্দর কার্তিকের শুরুতে। চাটগাঁ থেকে দার্জিলিংএর তরাই। পৌঁছেছিল ফাল্গুনের শেষে। নদনদী পাহাড় আর কত গ্রাম শহর ডিঙিয়ে এসেছিল। সরকারের হুকুম। পথে কত লোক হাতী দেখেছিল। কত বউ জোকার দিয়েছিল। কত ছেলেমেয়েরা পিছনে পিছনে চীৎকার করেছিল, হাতী হাতী, পায়ের তলায় বোড়োই বী—চি!......

সরকারের হুকুমনামা দেখেছিলেন চালসার রেঞ্জার সাহেব। আগে থেকে হুকুম ছিল জলপাইগুড়ির ডিভিসনাল অফিস থেকে। বন-বাংলার কাছেই, হাতী আর হাতীপোষাদের ঠাঁই করে দিতে হয়েছিল।

ঠাঁই হয়েছিল। সংসার গোছানো হয়েছিল হাতী পোষাদের। কিন্তু পাঁচ নুড়ি নিয়ে বসে, পাঁচ ফুলের খেলা খেলেনি রাঙি। শাওন যে আসে? আষাঢ়ের বিস্তার বুকে ভবিষ্যতের কোন্ খেলার রঙ্গ? বাণের আগে জলঢাকার কলকলানিতে কী শোনা যায়? দুলালের বুকের পাথর পাড় ছপছপিয়ে, আরো উঁচু পাড়ের মাটি ভাসাতে চাইছিল রাঙি। হাসিটা আর থামেনি। অঙ্গার দপদপিয়ে উঠেছিল মাহীন্দর আর দুলালের চোখে।

হ্যঁ, আমার প্রাণটা, আমার মনটা জঙ্গল হয়ে উঠেছিল। মেঘ গুড়্গুড় দুপুরে, তাই, ঝিঁ ঝিঁ ডাকা-জঙ্গলে, গা ভরতি চার পাঁচটা জোঁক নিয়ে রাঙি আলোমালো করে বরহমের গায়ে এসে পড়েছিল। আন না মান না, লতা জড়িয়ে ধরেছিল। কোথায় গিয়ে ঢুকেছিল বুঝি কোন্ কোমর ডোবা জলা জংলায়। একটি একটি করে জোঁক টেনে টেনে তুলে দিয়েছিল বরহম্। তারপর রক্তাক্ত শরীরটা রাঙির কেঁপে কেঁপে উঠেছিল হাসিতে। ভয় নয়, চোখে বিদ্যুৎ হেনে, থম্ ধরা জঙ্গলটাকে যেন একটা ঝটকায় দুলিয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল।

আই আমার বুকটা গোটা তরাইয়ের জঙ্গল মা। তোমার গান আমি ভুলে গেলাম। চিতা-বেরুনো-সাঁঝবেলায় বড় গাছের ডালে উঠে রাঙি নামতে পারেনি। ডাক দিয়েঁ বলেছিল, 'অই, অই মানুষটা, আমি নামতে পারি না।' হোই করজুয়ানা! এই বরহমকে শক্তি দাও। নইলে রাঙি উঠতে পেরেছিল, আমার কাঁধে পা না দিয়ে নামতে পারে নাই। সাঁঝবেলার চালসা 'জঙ্গলের কালো পাতা লাল হয়ে উঠেছিল রাঙির হাসিতে। হেসে বলেছিল, 'যেন পাঠানের কান্দা।' যেন হাতী পাঠানের কাঁধ।

হ্যঁ, ক্যানে রাঙি? আমি একটা হটাবাহার। আমার মরণ ক্যানে তোর হাতে নিস্? আ! আ! মায়ের শরীর থেকে কেন

হটাবাহার হয়েছি? এত জঙগল কেন জঙ্গাল মাটিতে? কুসুম পাতা কেন লাল হল। নাগানিশা ফুল কেন ফুটল? আ! আ! রাঙির জীবনটা রাঙির। তার জীবনের নিয়মের শিকল বুঝি এমনি ঝনঝনিয়ে বাজে, এমনি করে মারে আমাকে।

হীরালাল খেঁকিয়ে উঠেছিল।—তুই হাতী চরাতে কেন যাস ওদের সংগে?

হেই ধর্মবাপ আমি থাকতে পারি না।

তুই জোতজমি দেখিস না।

আই বাপ্ আমার মন পড়ে যায়।

তুই মরবি রে হটাবাহার?

হু, তাই মরণ কাটি পড়ে ঢাকের পিঠে।

—কংক্! কংক্!

সংবিৎ ফিরল বরহমের। চকিত হল মাহীন্দর। দিলালী ডাকছে। কালো বন লাল নদী। তার মাঝখানে দিলালী দাঁড়িয়ে পড়তে চাইল। সারি থেকে একটু সরে গেছে বাঁ দিকে। কেন?

মূর্তি নদীর জলে বাঁকা রোদ। তার ছটা লেগেছে গাছে গাছে। খরিয়ার বন্দর জঙ্গল যেন নিথর হয়ে গেল। শুধু ঝিঁ ঝিঁর ডাক। মাহীন্দর বলল, কী হল দিলালীর?

সেই মুহূর্তেই পাঠানের সর্বাংগ আন্দোলিত হল। সে ডাক দিল, কুররর—কুররর—কুররর—কংকো!

হাতীর দল যেন বিচলিত হয়ে উঠল। কেবল দিলালী ছাড়া। সহসা দেখা গেল, সামনের পথে, ঘন কৃষ্ণনীল বন্য ঐরাবতের আবির্ভাব। নিভাজ নিটোল বলিষ্ঠ শরীরে তার সূর্যছটায় যেন নীল কিরণ ধারা চলকে যাচ্ছে। দূর ভুটিয়া পাহাড়ে যেন রোদ পড়েছে। শাণিত সূচ্যগ্র দুই দাঁতে তার বিঁধে রেখেছে সূর্যকে।
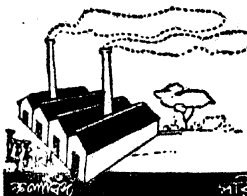
তারপর আরো। গভীর শালবনের ভিতর থেকে দলে দলে বেরিয়ে এসে পথরোধ করল বন্য হাতীর পাল।

পাঠান পিছনে হটল। আর পাঠান রাজা সুলতান, তিনজনেই চিৎকার করে উঠল। সেই সঙ্গে মাহীন্দরও, হেই দুলাল, দিলালীকে সামলাও। ছিনালটার মতলব ভাল না।

মিথ্যে নয়। দিলালী দল থেকে সরে গেছে। তার চোখে কোথাও ভয় ও রাগের চিহ্ন নেই।

বরহমের ভয় করছিল না। বন্য হাতীর সামনে জীবনে সে অনেকবার পড়েছে। কিন্তু তার বুকের ঝড় দ্বিগুণ হল। আই দিলালী! ভালবাসার সাধ তোর। মন পাগল করেছিস্?

দুলাল রাজাকে চালিয়ে একেবারে দিলালীর ঘাড়ে এনে ফেলেছে। মাহীন্দর ততক্ষণে পাঠানের পিঠ থেকে বিচুলীর বড় গদীটা তুলেছে টেনে।

বন্য হাতীর দল বিচলিত নয় একটুও। কিন্তু আক্রমণের উদ্যোগ নেই একেবারেই। বরং যেন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে, অবাক হয়ে, এই পোষা অকালবৃদ্ধ ধূসর কোঁচকানো চামড়া স্বজাতীদের দেখতে লাগল। যাদের গায়ে তারা মানুষের গায়ের দুর্গন্ধ পাচ্ছিল। দুর্গন্ধ মানুষের গায়ে, মাংসাশী পশুদের মতই। কারণ মানুষ মাংসাশী।

কিন্তু এদিককার চিৎকার একটুও থামল না। রাজা পাঠান সুলতান, মাহীন্দর দুলাল রাঙি, সমানে চিৎকার করে চলেছে। দুলাল রাজাকে দিয়ে ঠেসে দিলালীর মুখ ঘুরিয়ে দিল উল্টো দিকে। মাহীন্দরের হাতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল বিচুলীর গদী।

বন্য হাতীর দল যেন একটু চকিত হল। কিন্তু ছোটাছুটি করল না। আস্তে আস্তে অদৃশ্য হল বনের মধ্যে। কেবল তেমনি স্থির অবিচলিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেই দাঁতালো ঘন কালো বিশাল হাতীটি। সে দলের সংগে অদৃশ্য হল না।

আই বাপ, তুই যেন এই উঁচানীচা টুন্ডু দেশের রাজা। এত হাতী দেখেছি। তোকে তো কোনো দিন কোথাও দেখিনি।

ততক্ষণে পাঁচ হাতী উল্টো দিকে ফিরে চলেছে। পাঠান আর রাজার মাঝখানে দিলালী।

দিলালী আবার ডাকল, কংক্!

মুহূর্তে পাঠান আর রাজা যেন ক্রুদ্ধ হুংকারে প্রতিবাদ করে উঠল।—রিং কং! কুররর!

মাহীন্দর চীৎকার করে বলে উঠল, দিলালী অনেক আগে টের পেয়েছিল। তাই আমার চমক লেগেছিল তখন। যেন কী শুনলাম আচমকা। কী যেন দেখলাম।

দুলাল বলল, কিন্তু কালো দাঁতালোটা এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—থাকুক। জল্দি, জল্দি চল্।

হ্‌, ঠায় খাড়া হয়ে রয়েছে বুনো দাঁতালো। শুঁড় নীচে। কুলো কান নড়ছে একটু একটু। কিন্তু স্থির। যেন দল ভুলে গেছে। বন ভুলে গেছে। বরহমের মনে হল, বুনো দাঁতালোটার দু' চোখে বুঝি পলক নেই। ক্যানে? উয়ার বুকে কি থরিয়ার জঙ্গলের ঝড় লেগেছে?

কাঁচের চুড়ির ঝনাৎকারে ফিরে তাকাল বরহম্। রাঙির দুটি চোখ। দুটি ঠোঁটে মূর্তি নদীর ধনুক-বাঁক। অমন করে হেসে, কী দেখছে সে? বুনো দাঁতালোকে, না বরহমকে।

রাঙি বলে উঠল, আ মরি কী সং! বুনোটা যে ঠায় খাড়া রইল।

দুলাল বলল, শালার খোয়ারি হয়েছে।

বরহমের চোখে চোখ রেখে, খিল্‌খিল করে হেসে উঠল রাঙি। বর আর বাপের সামনে সে বরহমের সঙ্গে কথা বলে না। শুধু চোখের তারায় বেঁধে। শুধু ঠোঁটের কুঞ্চনে মোচড়ায়।

বরহম্ গলার শির ফুলিয়ে একটা আদিম চিৎকারে গান গেয়ে উঠল,

কুম্বার চাটু পোবঅ জান রে
কুম্বাব ন্তানে কা রুয়াড়া।
নে জীবোন গাতিড।......

আই রে হটাবাহার কুমারের মাটির কলসী ভাঙলে আর তা কখনো ফিরে আসে না। জীবনটা আর ফিরবে না।

গান নয়, যেন বুকের ঝড়কে শাসাতে লাগল বরহম্। স্তব্ধ করতে চাইল। কিন্তু রাঙি আবো হেসে উঠল বরহমের সেই বিকট চিৎকার শুনে। দুলাল তার দেশীভাষায় বলে উঠল, ও ব্যাটার খোয়ারি হয়েছে দেখছি।

পরমুহূর্তেই সে চিৎকার করে মাহীন্দরকে বলল, হেই বাবা, বুনো দাঁতালোটা আসছে পিছে পিছে।

বরহম্ দেখল। আসছে সেই বিশাল নীল হাতী, খুব ধীরে ধীরে। তবু তার চিৎকার থামল না; নে জীবোন কাহী বদলাওো। নে জীবোন কাহী নামোগা।

তার দুর্বোধ্য চিৎকারে আর মাহীন্দর দুলালের অংকুশের আঘাতে হাতীর দল দৌড়ুতে আরম্ভ করেছে। দিলালীকে মাঝে রেখে, ছুটেছে সবাই।

বন-বাংলার সীমানায় এসে শ্লথগতি হল হাতীগুলি। বুনো হাতীটা অদৃশ্য হয়ে গেছে আবার। কিন্তু আমার বুকের ঝড় কেন বাড়ছে? হে মা, আমি একটা হটাবাহার মানুষ। আমার বুকের তরাই জুড়ে এ কি পাগলা ঝড়?

বাংলার একটু দূরেই মাহীন্দর আর পাঁচ হাতীর আস্তানা। কিন্তু তারা বাংলোর সীমানায় ঢুকে, রেঞ্জারবাবুর সঙ্গে বুনো হাতীর গল্প শুরু করল। বরহম্ কালিনীর পিঠ থেকে নেমে ছুটল ঘরে। মাহীন্দরের আস্তানার পাশে, নয়ানজুলির ওপারে হীরা-লালের ঘর। বলদ দুটিকে আগে মাঠ থেকে নিয়ে এল বরহম্। খেতে দিল তাদের গোয়ালে ঢুকিয়ে। তারপর চাল ধুয়ে, ভাত বসাল কাঠের উনুনে।

একটু পরেই অন্ধকার নামল। জোনাকিরা ডাকের সংকেতে জ্বলে উঠল ঝিকিমিকি করে। রাঙির হাতে টিমটিমে হ্যারিকেন ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল তাদের ঘরের আশেপাশে। মায়ের কাজ করে দিচ্ছে। প্যাকাটি এনে দিচ্ছে। জল তুলে আনছে কুয়ো থেকে। আর চারদিক খোলা বড় টিনের শেডের পাথর ও গাছের গুঁড়ির শিকলের সঙ্গে দিলালীদের বাঁধছে শ্বশুর-জামাই।

বরহমের কালো শরীরে চ্যালা কাঠের আগুন নেচে বেড়াচ্ছে। তার মুখে, তার মাথায় আগুন খেলা করছে।

হ্‌, ঝড় কেন বাড়ছে আমার বুকে? সে দেখল, টিমটিমে আলোটা এগিয়ে আসছে। আসতে আসতে থামল নয়নজুলির কাছে, মান্দারের তলায়। কোমর বেয়ে, বুকে উঠল আলোটা। আই, রাঙির লাল জামাটা আমি রক্তের মত দেখি। আলোটা মুখের ওপর উঠল। এই জগতটা আমি রাঙির মুখে দেখি। ফিরে যাবার ডাক দিল আমাকে রাঙির চোখ।

বরহম্ নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। আর পিছন থেকে ডাক শুনল, যাস্ না।

হীরালাল এসেছে কখন, দেখেনি বরহম্। ধর্মবাপ ডাকল তাকে। রাজা হটাবাহারের ডাক।

যাব না?

না, নিয়ম নাই রে হটাবাহার।

আই বাপ, আমার মন মানে না আজ।

আজ তুই বুনো দাঁতাল হয়েছিস্।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে তাকাল বরহম্।

—বুনো দাঁতাল?

হ্যাঁ।

তবে কি ওই বুনো দাঁতালটা ঝড় বাড়িয়েছে আজ বরহমের বুকে? দিলালীর মধ্যে সে রাঙিকে দেখতে পেয়েছে?

আই ধরম বাবা, দিলালী ক্যানে বুনো দাঁতালটাকে পায় না হে?

না, বুনো দাঁতালটা পাবে না দিলালীকে। নিয়ম নাই।

ক্যানে নিয়ম নাই।

এইটা জীবন।

বরহম্ দেখল, রাঙি শুকনো কাঠের বোঝা বুকে জড়িয়ে ফিরে চলেছে।

আই বাপ, নে জীবোন কাহী নামোগা। তবে মন কেন হল রে?

আরে ব্যাটা, তাই তুই হটাবাহার হয়েছিস্।

হ্‌, তাই বরহম্ হটাবাহার। উনুনের আগুন উসকে দিল সে। ঘরের ভিতরে রাখা পচুইয়ের ভাঁড় নিয়ে বসল হীরালাল।

তাই বরহম্ হটাবাহার। কিন্তু সে চিৎকার করে গেয়ে উঠল,

কাচীম লেলে মদা গীসোতবা?
এনাচী অবেনেবেন উড়ুক্ত তনা?

দেখছ না, ফুল ফুটছে। এ জন্যে তোমরা চিন্তা করছ কেন? কেন চিন্তা করছে বরহম্? সে আবার ফিরে যাবে কুসুমে ফুলে লতায় গন্ধে, রক্তে নাড়িতে।

বরহমকে পচুই খেতে দিল হীরালাল। রাত গভীর হল। ঘুমিয়ে পড়ল প্রতি-বেশীরা। শেয়াল চিতারা বেরুল শিকারে। কার বুকে ঘুমায় রাঙি?

হীরালাল খেল। খেয়ে মাটির ওপর পড়েই ঘুমোতে লাগল। আর কেবলি ঘুমন্ত বিড়বিড় করল, এই, আমি চিরদিন দরজার বাইরে। আমি চিরদিন দরজার বাইরে প'ড়ে আছি।

যেন কপাটে ধাক্কা দিতে দিতে, মাথা কুটতে কুটতে, লোকটা জ্বলে মরছে। হাঁপিয়ে উঠছে। লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আই ধর্মবাপ, আমি জানি তুমি রাজা হটাবাহার। আমি একটা হাটবাহার মানুষ। কিন্তু নিয়মটা যদি জীবন, আমি জীবন কেন মানি?

সাহসা তরাইয়ের আদিম অন্ধকার খান্ খান্ হল তীক্ষ্ণ ভীত ক্রুদ্ধ ধাতব ঝংকার বৃংহিতে।—রিং কং রিং কং, কঙ্কো কঙ্কো! ......শিকল উঠল বেজে ঝন্‌ঝনিয়ে। মাহীন্দ্-রের ঘরে সোরগোল উঠল। রেঞ্জারবাবু আর কর্মচারীরা জেগে উঠল হৈ চৈ করে।

অন্ধকারের মধ্যেও বরহম্ স্পষ্ট দেখতে পেল সেই বুনো দাঁতালকে। সে এসেছে। আকাশ আড়াল করে সে দাঁড়িয়েছে টিনের শেডের সামনে। নক্ষত্র বিদ্ধ হয়ে আছে তার দাঁতে। দিলালীর কাছে এসেছে সে। পাঠান আর রাজার মাঝখানে, পাষাণে শিকলে বাঁধা দুলালী। বোঝা গেল, তার শক্তিশালী শুঁড় পিছন থেকে আঘাত করছে পোষা পুরুষদের।

ইতিমধ্যেই বাতি বেরুল। আগুন জ্বলল। টিন বাজল একটা আদিম ভীরু শব্দে, ট্যাম্ ট্যাম্ ট্যাম্......মানুষের চিৎকার ভেদ করে, রেঞ্জারবাবুর ছররা গুলীর বন্দুকটা ধমকে উঠল, ঠাস্ ঠাস্। বরহম্ দেখল সেই বিশাল কৃষ্ণ বুনো দাঁতালের গায়ে, ছররা গুলী যেন, ভুট্টার খৈএর মত ছিটকে চলে গেল। কিন্তু মানুষের ভিড় দেখে পালাতে হল তাকে। যাবার আগে, পাঠানের গায়ে তার দাঁত রক্তাক্ত গভীর ক্ষত রেখে গেল।

শুধু দিলালী স্থির যেন নিস্পৃহ। হয় তো গাঢ় অন্ধকারে বনের গভীরে তার দৃষ্টি শুধু অনুসরণ করছে! শুধু অন্বেষণ করছে মুক্ত অরণ্য, স্বাধীন জীবন অশেষ মিলন। কঠিন দাঁতের সোহাগ বুঝি তার চামড়ার অনুভবে।

সোরগোল কমল। কিন্তু চোখে চোখে ভয়। সবাই জড় হল রেঞ্জারবাবুকে ঘিরে। নিঃশব্দ পায়ে বরহম্ গিয়ে দাঁড়াল সকলের পিছনে। হীরালালের সাড় নেই।

সকলের ভয়, আবার যদি রাত্রেই আসে। এ অভিসারের সময় কখন কীভাবে আসবে, কেউ জানে না।

ক্যানে, বুনো দাঁতালটা দিলালীকে শুঁড়ে জড়াতে পাবে না?

রেঞ্জারবাবুর খোঁচা ভ্রুর তলায় বিদ্যুৎ হানল। বললেন, আর কয়েকটা দিন দেখা যাক কী করে। এখনো সময় হয়নি।

কিসের সময় হয়নি এখনো? রেঞ্জারবাবুর চোখে, ঠোঁটের কোণে কঠিন দৃঢ়তা। বরহম্ রাঙিকে দেখল। ঘুম ভাঙা চোখে ত্রাস। আলুথালু কাপড়। রাঙি বরহমের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। কী দেখছে রাঙি? বুনো দাঁতালকে?

বরহম্ হঠাৎ এগিয়ে এল।—আই রেঞ্জার-বাবু আমি একটা কথা বলি। উয়াকে খালাস করে দেন।

—কাকে?

—দিলালীকে।

—কেন?

—উয়াদের মনটা চায়।

রেঞ্জারবাবু হেসে উঠলেন। সবাই হেসে উঠল। এমন উদ্ভট অনিয়মের কথা কেউ কোনো দিন শোনেনি।

কিন্তু দুলাল হাসেনি। তার দু চোখে যেন পাঠানের রাগ। বরের চোখে রাগ। তাই বুঝি রাঙিও হাসেনি। দুলাল হাত ঝটকা দিয়ে বলল, ওসব আইনে নাই।

আইনে নাই? আইনে কী আছে?

দুলাল যেন রাগে গর্জে উঠল, ও শালাকে মরতে হবে। আইনে আছে।

আইনে আছে। আইন হক খুন, তিনে মিলে, দুলালের চোখে জিঘাংসা। বাংলোর ম্যানেজারের বন্দুক তার হাতে উদ্যত। হটো, হটো, আর এক পা নয়।

হে মা, ছাগদুবুরুর ইচ্ছেটা তরাইয়ের রক্ত দিয়ে গড়া। এ আইনটা আমি জানি না। জীবনটা যদি আইন, তবে আমি জীবন কেন রাখি?

ধান ক্ষেতে টহল দিয়ে, চালসা ইস্টিশনের ওপরে, মেটেলির পথে উঁচু চড়াইতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল বরহম্। দূরে, দূরে লোয়ার
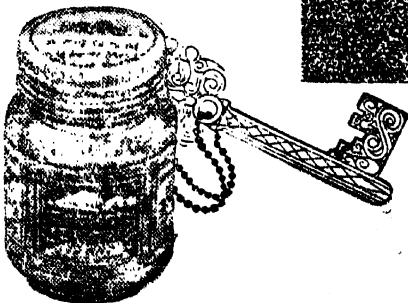
টংশু রেঞ্জ আকাশে গিয়ে মিশেছে। ভুটান ডিঙিয়ে সূর্যটা এখন তরাইয়ের মাথায়। ছায়া ছোট হয়ে গেছে। সবখানে রোদ। ওই চালসার বনে। বনে ঢাকা বন-বাংলার সীমানায়। ডাহুকি পাখী ডাকছে।

মাঠে কাজ নেই। আমনের পাকার অপেক্ষা। হীরালাল হয় তো বনে গেছে। বরহম্ দাঁড়াল উঁচু চড়াইয়ে। নীচে রেল লাইন। তার পরে বন। চালসার বন। ডাহুকি ডাকছে।

আই আমি একটা হটাবাহার মানুষ। আমার বুকে কেন ঝড় উঠল? উদলাঝোরার কালো বুকে, জলঢাকার লাল বুকে? আ! আমি তোর গান আর গাইব না মা। ফুল ফুটেছে, তোমরা দেখনি? কাচীম লে লে মদা গাঁসোতবা?

পথ ছেড়ে, জঙ্গল মাড়িয়ে হুড়মুড় করে নামতে লাগল বরহম্। বুনো দাঁতালটা নাকি? ফুল ফুটেছে, তোমরা দেখনি? আমাকে ফিরতে হবে। দুলালের চোখে আমি চোখা খোঁচা অংকুশ দেখেছি। আমার ঘাড় দিয়ে তার অংকুশের ধার দেখতে হবে। তার অংকুশটা আইন। জীবনটা যদি আইন, তবে জীবন কেন থাকে?

রাঙি থমকে দাঁড়াল। ঘরের পিছনে, ধূপি ধূপি পাতা রোয়াইলের তলায় ঘুরে ঘুরে, খুদ ছড়িয়ে ছড়িয়ে সে বাদশাকে খাওয়াচ্ছিল। ধবধবে শাদা, লাল টকটকে ঝুঁটি, দস্যি মোরগটা তার প্রিয় বাদশা। রাঙি থমকে দাঁড়াল। হেসে উঠতে গিয়ে যেন ত্রাসে মুখে চাপা দিল আঁচল। তবু দুটি অস্পষ্ট নিক্কন বাজল। দুবার তাকাল ঘরের দিকে ফিরে। সেখানে শ্বশুর জামাইয়ের গলা শোনা যাচ্ছে। তামাকের গন্ধ আসছে বাতাসে। বাতাসে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল বরহম্। মোরগটা কক্‌কিয়ে উঠল। সরে গেল দূরে। রাঙি ঘরের দিকে তাকাল আবার।

আই, আমি একটা হটাবাহার রাঙি। আমার মায়ের পেট থেকে প্রথম হটাবাহার। ওই রাজা হটাবাহারটার মত, আমিও পড়ে আছি। আমি আর এ যন্ত্রণা সইতে পারি না। তুই আমাকে ডেকেছিস। আমি বুন্তে ফিরে যেতে চাই।

বরহম নিঃশব্দ আকুতি দু' চোখে ভরে, আরো দু' পা এগুল।

বাণ ছোঁড়া ধুলোর মত, রাঙি খুদ ছুঁড়ে মারল বরহমের গায়ে। মেরে ঘরের দিকে তাকাল। তারপর হাসল ঠোঁট টিপে। জামা নেই, চুল খোলা, অবাধ্য আঁচলে নদীর বাঁধ ভাঙো ভাঙো। দূর্বা ঘাসের ওপর নিঃশব্দ পা ফেলে ফেলে রাঙি বাংলোর দিকে এগুল। বাংলোর দিকে, যেখানে সেগুনের কিছু চারা গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝিরিঝিরি জঙ্গল যেখানে।

বরহম্ দেখল। সে যেন মরণের হোমন ডাক শুনতে পেল।

দুলাল। হয় তো বিজনে বউয়ের খোঁজে এসেছিল। কিংবা একটা চমক খেয়েছিল রক্তে।—কী চাই? ঘরের পাছে কী আছে হে?

আড় চোখে সে দেখল রাঙির দিকে।

রাঙি ফিরে তাকাল না। এ যেন সেই হস্তিনীটা। দুই মত্ত হস্তীর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সময়ে যে আলস্যে গায়ের পোকা বাছে শুঁড় দিয়ে। কচি পাতা খায় চিবিয়ে চিবিয়ে। সংকোচ হয় তো আছে, ভয় নেই রাঙির।

কী চায় বরহম্? যা চায়, তাই সে বলল। চলে যাওয়া রাঙির দিকে একবার তাকিয়ে বলল, দিলালীটাকে খালাস দিয়ে দাও। উয়াদের মন—

কথা শেষ হবার আগেই দুলালের গলায় ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল, হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!

—ক্যানে?

মাহীন্দর ছুটে এল।—কী হয়েছে, কী ব্যাপার?

রাঙির মা এল শিশু কোলে করে। যে শিশুর নাম রাখা হয়েছে চালসা। কারণ চালসায় এসে ছেলেটা পেটে এসেছিল। এখানেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

আইন আর হকের দাবিতে লাফিয়ে বরহমের কাছে এল দুলাল। চিৎকার করে বলল, হেই বাবা, ওকে হুঁশিয়ার কর।

কিন্তু একটু নড়ল না বরহম্। হীরালালের ছেঁড়া খাকী হাফ প্যান্ট আর ছিন্ন-ভিন্ন খাকী সার্টে ওর কালো কুচকুচে শরীর ঢাকা পড়েনি। গজ চোখের দৃষ্টি রাখল দুলালের চোখে চোখে। বলল, ক্যানে হে?

বরহমের চোখের দিকে তাকিয়ে আঘাত করতে পারল না দুলাল। সে আরো জোরে চেঁচিয়ে বলল, মনে করেছিস, আইন নেই?

রেঞ্জারের অফিসের লোকজন এসে পড়ল। —কী হয়েছে অ্যাঁ? দিলালীকে ছেড়ে দিতে বলে? দুর্বোধ্য লাগে সকলের। হটাবাহারটা নেশা করেছে নাকি? খেপে গেল নাকি একেবারে?

সবাইকে ঠেলে সরিয়ে এল হীরালাল।—অই, শালা, অই হটাবাহার।

গোল লাল চোখ হীরালালের জ্বলছে। মুখটা এখন আরো ফুলে উঠেছে। সকাল থেকে নেশা করেছে সে। থাবা বাড়িয়ে বরহমের জামাটা ধরে টানল।—আয়, ব্যাটা ঘরে আয়। মরণের সাধ হয়েছে তোর?

টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘরে। ঘর মানেই ধান। কোনো গোলা নেই। ঘরের মধ্যেই ধান, সিদ্ধ করে রাখা। তার মধ্যেই ঠাঁই, ঘর গৃহস্থালী। বরহম্‌কে ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিল সে।

—অই, তুই ফিরে যেতে চাস?

—হুঁ।

—তুই হটাবাহার না?

—হুঁ।

—তুই জানিস না, লড়লে হটাবাহার হয়?

—হুঁ।

—আর ভালবাসলে? আইন তোকে শেষবার মারবে। আগে হটাবাহার, তারপরে মরণ।

—হুঁ। আই বাপ, আমি আর বাইরে থাকতে পারি না।

—থাকতে হবে। সবাই আছে।

—তবে, আই বাপ, তবে যে সবাই ভালবাসে?

—না। নাঃ। ও মরণটার সুখ কেউ জানে না। খেলা করে। ভালবাসার খেলা। তুই ধান ব্যাচ্। পয়সা নে। পয়সা নিয়ে মালবাজারে যা। ভালবাসা খেলে আয়।

বরহম্ আর্তনাদ করে উঠল, না। আই ধরমবাবা, পারব না।

—তবে তুই বুনো দাঁতাল হোস না। হাঁড়িয়া খা। নতুন ধান উঠলে মাঠে যা। কাজ কর। ভালবাসিস না। ভালবাসলে হাটাবাহার। ভালবাসলে মরণ। ভালবাসা নিয়ম নয়। আইন নয়।

চুপ করে রইল বরহম্। তবে ঝড় কেন উঠল?

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনো নামেনি। ঠিক দুলালের মত চিৎকার করে উঠল পাঠান।—কী, কী চাইরে তোর শয়তান। কুররর... কুবরর, রিং কং রিং কং।

সেই কৃষ্ণ নীল বুনো দাঁতাল। একেবারে টিনের শেডের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পোষা পুরুষগুলি চীৎকার করে উঠল। কিন্তু বুনো দাঁতালের শুঁড় গিয়ে ঠেকল দিলালীর গায়ে। যাবে তো? তোমার জন্যে এসেছি।

দিলালী শুঁড় দিয়ে স্পর্শ করল বুনো দাঁতালের শুঁড়।—মুক্ত কর। আমাকে মুক্ত কর এই পাষাণ শিকল থেকে।

সুলতান শুঁড় ছুঁড়ে মারল বুনো দাঁতালকে। ইতিমধ্যে চিৎকার, টিন বাজানো, রেঞ্জারবাবুর ছররা গুলী। সুলতানের গায়ে একটি সুদীর্ঘ রক্তাক্ত দাগ টেনে দিয়ে, ছুটে অদৃশ্য হল বুনো দাঁতাল।

তবে ঝড় কেন উঠল? লড়লে হটাবাহার। ভালবাসলে মরণ। কিন্তু ফুল ফুটেছে তোমরা দেখনি? আমি ফিরে যাব।

রাত গভীর। হীরালাল ঘুমোয়। রাত্রি কী করে? শ্বশুর জামাই আগুন জ্বালিয়ে বসে আছে বাইরে। মশালের আলো।

নাড়িতে রক্তে ফুলে গাছে আকাশে মাটিতে ফিরে যাব।

সহসা যেন কেউ পিচ্‌কারি থেকে জল ছিটিয়ে দিল মশালের আর কাঠের আগুনে। অন্ধকার হয়ে গেল। আকাশ জুড়ে সেই বুনো দাঁতাল আবার এসেছে। শুঁড় ভরে নিয়ে এসেছে। জল।

মাহীন্দর আর দুলাল চিৎকার করে দৌড়ে পালাল। আবার টিন বাজল। আবার মানুষের চিৎকার। পোষা কাপুরুষের ভীরু বৃংহিত, রিং কং রিং কং......

পরমুহূর্তেই একটি তীব্র গর্জন, কঙ্ক্! আর টিনের শেড যেন মড়মড় করে উঠল। আবার ছররা, আবার আগুন।

ক্রোধে ও ঘৃণায় বুনো দাঁতাল এসে দাঁড়াল খোলা জায়গায়। ছোট ছোট জীবগুলি যেখানে মাছির মত ভ্যান্ ভ্যান্ করছিল। একবার দেখল সবাইকে। তারপরে অদৃশ্য হল অন্ধকারে।

কিন্তু ভোর হবার আগে আবার বুনো দাঁতাল। টিনের শেডের একটা মোটা খুঁটি মট্‌মট্ শব্দে ভেঙে পড়ল। ঢেউ টিনে শব্দ হল প্রচণ্ড মেঘগর্জনের মত। যেদিকটায় পাঠান আছে, সেই দিকের থাম ভেঙে পড়ল।

আবার চিৎকার। বুনো দাঁতাল ঘুরে দাঁড়াল। যেখানে মাহীন্দর আর দুলাল আগুন নিয়ে বসেছিল, সেই দিকে ছুটে গেল। ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিল ঘরের বেড়ার গায়ে। ঘরটা কেঁপে উঠল।

মাহীন্দর চিৎকার করে বলল, হেই লক্ষ্মী, চিৎকার করিস না, সাড়া দিস না ঘর থেকে। ছেলেমেয়ে সামলে রাখ্।

বুনো দাঁতাল সরে এল আবার শেডের দিকে। হাতী আর মানুষের কলরবে চালসার জঙ্গল বিমূঢ় হয়ে গেল। বুনো দাঁতালও বিমূঢ়। সহসা সে রেঞ্জারবাবুর ছররা গুলীর বন্দুকটা লক্ষ্য করে ছুটল। বন্দুক পড়ে গেল হাত থেকে। রেঞ্জারবাবু ছুটলেন দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে।

ফিরে এল আবার বিশাল কালো রুদ্রটা। শেডের মধ্যে ঢুকেই তার তীক্ষ্ম দাঁত অনেকখানি বিদ্ধ করল পাঠানকে। দাঁত খুলে নেওয়া মাত্র রক্ত ছুটল ফিন্‌কি দিয়ে। পাঠান যেন মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। চোখে তার বিভীষিকা। দাঁতালের শুঁড় গিয়ে পড়ল দিলালীর পা বাঁধা শিকলে।

হেই বুনো দাঁতাল, দিলালীকে তুই নিয়ে যা।

—পারবে না।

হীরালাল যেন নির্বিকার গলায় গুঙিয়ে উঠল।—ও মরবে।

—মরবে?

—হাঁ, হটাবাহার হবে।

—হটাবাহার হবে?

—হাঁ।

জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে দিল দুলাল দাঁতালের গায়ে। চিৎকার করে বলল, শিকল ছিঁড়েছে, শিকল।

আগুন গায়ে লাগতেই বুনো দাঁতাল ফিরল। কঙ্ক্, কঙ্কো!...ঘৃণিত আগুন। বিশাল দেহ নিয়ে সে ছায়ার মত দ্রুত অদৃশ্য হল।

তারপরে পাঠানের পরিচর্যা। বাংলোতে স্থানান্তরিত করা হল মাহীন্দরের পরি-

বারকে। আবার যদি আক্রমণ হয়, এ ঘরটা হয় তো ছাড়বে না।

কিন্তু সারাদিন ধরে বনের পথ আর মাঠ-ঘাট বস্তি থেকে সংবাদ আসতে লাগল, বুনো দাঁতালের খ্যাপামির।

—আই বাপ, এটা কী ধরম রে? বুনো দাঁতাল ক্যানে পায় না দিলালীকে?

—নিয়ম নেই। অই, নিয়ম নেই। তুই তোর মা'র গানটা ভুলে গেছিস্?

—নে জীবোন গাতিড। নে জবোন কাহী মামোগা।

—তুই গানটা গা।

—না।

—তুই বুনো দাঁতাল হতে চাস?

—আই বাপ, কাচীম লে লে মদা গাঁসোতবা। আমি ফুলে যাব।

—ফুলে যাবি?

—হুঁ। মাটিতে আসমানে যাব। আমি গাছ হব। আমি রক্তে মিশে যাব।

হীরালাল চীৎকার করে ওঠে, অই, তুই বুনো দাঁতাল হবি?

বরহম্ চুপ করে। সে রাত্তির কথা শুনতে চায়। রাত্তি জানে, সে বুনো দাঁতাল হবে কি না।

রাত্রের মধ্যে চারবার আক্রমণ করল বুনো দাঁতাল। পরদিন, দিনের বেলাতেও সেই অভিসারের রুদ্র অভিযান শুরু হল।

রেঞ্জারবাবুর জীপ ছুটল জলপাইগুড়ি। ডিভিসনাল অফিসের ঘোষণাপত্র নিল আগে, বুনো দাঁতাল আউট ল। পশুরক্ষা আইনের আওতা থেকে সে বহিষ্কৃত। ভালবেসে দুর্বিনীত হয়েছে পশুটা।

অই দ্যাখ্, বুনো দাঁতাল হটাবাহার হয়ে গেছে!

—হটাবাহার?

—হাঁ, হটাবাহার। হটাবাহার হলে কী হয়?

—সবাই তাকে মারে। খেতে দেয় না। কাজ দেয় না।

—এবার ওকে মারবে।

—ক্যানে, উয়ার একটা ধরম বাবা নাই?

পচুইয়ের হাঁড়িটা মুখে ঠেকিয়ে বীভৎস গলায় ঘোষণা করল হীরালাল, না।

—কোনো রাজা হটাবাহার নাই ওর?

—না। ও ভালবেসেছে। ও মরবে।

মরবে। হটাবাহার দাঁতালটা এবার মরবে। পরদিন সকালবেলা এল চা বাগানের দুই সাহেব। অগ্রহায়ণের রোদ ওদের গায়ে লাল আগুনের মত দেখাল। বড় বড় দুটি বন্দুক ওদের হাতে। আইন নিয়ে এসেছে ওরা খুনের জিঘাংসা খুশী হয়ে উঠেছে ওদের চোখে।

ওরা জিজ্ঞেস করল, কোন্‌খান দিয়ে সে আসে?

বন থেকে যে পথ বাংলোয় ঢুকেছে। সেই পথে।

কখন আসে?

যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে।

বাংলোর সীমানা থেকে সবাইকে সরিয়ে দেওয়া হল। চার হাতীকে সরিয়ে দেওয়া হল টিনের শেড থেকে। শুধু দিলালী রইল। কারণ বুনো দাঁতালটা দিলালীকে চায়। তার-পর লাল লাল মানুষ দুটি কোথায় অদৃশ্য হল। শুধু ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে লাগল। ঝিঁ ঝিঁ'র ডাকের সঙ্গে শুধু দিলালীর প্রতীক্ষা স্তব্ধ হয়ে রইল। শুধু প্রতীক্ষা, সেই বিশাল কৃষ্ণনীল প্রাণের দয়িতের।

বরহম্ ছটফটিয়ে উঠল ঘরের মধ্যে। হীরালাল তাকে ধরে রাখল।—অই, হটা-বাহার, তুই তোর মরণটা দেখ।

—না। আমার বুকের ধুকধুকিটা চলে।

—এটা তোর মরণ। তুই দেখ্। ওই দেখ, বুনো দাঁতালটা আসছে।

আসছে। কিন্তু পদক্ষেপ ধীর। সন্দিগ্ধ, অস্বস্তিকর। কিন্তু অপ্রতিরোধ্য আগমন। কংক, কুররর।—দিলালী, বিপদ কিছু আছে?

কংক্! কংক্! আছে।

থাকবেই। তবু আসতে হবে। কারণ ভালবেসে সে বন্ধুদের দলচ্যুত। আইনের আশ্রয়চ্যুত। হয় তো শত্রুরা আরো অনেক ষড়যন্ত্র করেছে। হয়তো এই মুহূর্তে পা ধসে যাবে। পড়ে যেতে হবে কোনো গভীর গর্তে। কিংবা একটা গাছ-ই ফাঁদ হয়ে জড়িয়ে ধরবে। কিংবা অদৃশ্য থেকে ছুটে আসা সেই মৃত্যুর হুল—

অটোমেটিক সাইড হ্যামার গর্জে উঠল দু দিক থেকে। একমুহূর্ত থমকে গেল বুনো দাঁতাল। মনে হল তার হৃৎপিণ্ডে যেন কিসে কামড়ে ধরল। সে চোখ তুলে দেখল দিলালীর দিকে। সে ছুটল দিলালীকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু সাইড হ্যামারের গর্জন থামল না। অগুনতি অসংখ্য শব্দে চালসার বন কাঁপল। সমস্ত পাখী উড়ল আকাশে। অরণ্যের সারা জীবজগতে ছুটোছুটি পড়ে গেল বুঝি।

বুনো দাঁতালের গলায় দুর্বোধ্য চিৎকার উঠল, আংক্! আংক! কিন্তু সে থামল না। ছুটল। ছুটতে ছুটতে, টিনের শেডের মধ্যে ঢুকল। তখন বিশাল কালো শরীরের জায়গায় জায়গায় রক্তের ফিনিক। বুনো দাঁতালটা মুখ থুবড়ে পড়ল দিলালীর পায়ের ওপর।

দিলালী একবার ডাকল, কংক! শুঁড় বাড়িয়ে দিল বুনো দাঁতালের গায়ে। তার পাষাণ শিকলের মুক্তি শেষ নিশ্বাস ফেলছে। তার এলায়িত শুঁড়ের উষ্ণ নিশ্বাস, দিলালীর পায়ে লাগছে।

উৎসবের কলরোল ফেটে পড়ল বাংলোর উঠোনে।

হীরালাল পচুইয়ের ভাঁড়টা বরহমের মুখে উপুড় করে ধরল। মুখের মধ্যে গেল কিছু, কিছু বাইরে গড়িয়ে পড়ল।

হীরালালের গলা কোলা ব্যাংএর মত শোনাল, হটাবাহারটা মরল। তুই দেখলি?

—হুঁ। দেখলাম।

—এটা তোর মরণ।

—না, আমার বুকের ধুকধুকিটা চলে। আমি রাঙির কাছে যাব।

—রাঙি একটা মানুষ।

—হুঁ রাঙি একটা মানুষ। আই বাপ, মনের মানুষ হে।

—মনের মানুষ?

—হুঁ, মনের মানুষ। আমি রাঙির কাছে যাব।

হীরালালের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ে উঠল। সে যেন বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকাল বরহমের দিকে। যেন ভয় পেয়ে, চাপা গলায় বলল, তবে তুই যাস না। আই হটাবাহার, তুই তোর মাঁয় গানটা গা।

—ক্যানে? আই বাপ?

—না, তুই কখনো ফিরতে পারবি না। তোকে বাইরে পড়ে থাকতে হবে। তোকে কপাটে কপাটে নাড়া দিয়ে ঘুরতে হবে। তুই মরবি না।

বরহম্ প্রায় চীৎকার করে উঠল, ক্যানে?

—না। মনের মানুষ নাই জগতে।

—আই বাপ, বলিস না।

—না নাই।

বরহম্ ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রাঙি? কোথায় রাঙি? হত্যা উৎসবের ভিড়ের মধ্যে গেল না সে। ওখানে রাঙি নেই। রাঙি কোথায়?

আই, আমি একটা হটাবাহার হে। ঝড় লেগেছে। সেই বাতাসে ভর করে আমি ফিরে যেতে চাই। হে মা, তোর গান আমি গাইব না।

রাঙি কোথায়? ওই ওখানে, ভিড়ের বাইরে। সেগুনে চারার জঙ্গলে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকা নির্জনে। কেন? দিলালীর কান্নাটা কাঁদছে রাঙি?

রাঙি আরো ঘন ঝোপে ঝাড়ে গেল। আরো, যেখানে বারোমাসের সন্ধ্যাচণ্ডী মলিন হয়ে আছে দিনের আলোয়। শেষ ঘাস ফুল যেখানে বিবর্ণ হয়েছে অগ্রহায়ণে।

রাঙি চোখ তুলে তাকাল বরহমের দিকে। হাসল। এ হাসি নিঃশব্দ। এ হাসির কোনো ভূমিকা নেই। এ হাসির কোনো পাড় ভাসানো উচ্চ তরঙ্গ নেই। এ হাসি পাড় ডোবানো, নিঃশব্দ। এ হাসি আকণ্ঠ। এ হাসি তার-পায়ে শুধু চোখের জলে গড়িয়ে পড়তে পারে নিঃশব্দে।

রাঙি দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল বরহমকে। নির্ভয়ে জড়িয়ে ধরল, একটি পরম পাওয়ার গম্ভীর সোহাগে ও গভীর স্নেহে। কিন্তু বুনো দাঁতালের শক্তি কোথায় বরহমের হাতে। তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। সে জানু পেতে বসল রাঙির পায়ের কাছে।

রাঙিও বসল। চোখে চোখে তাকাল বরহমের।

আই হটাবাহার, তোর বুকে ঝড়, তুই বোবা কেন হয়ে গেলি।

রাঙির মেহেদী রাঙানো হাত তরাইয়ের বন্য বিশাল শক্ত শরীরটায় বুলিয়ে দিল। তার চোখে জল দেখা দিল। তবু সে হাসল। সে তরাইয়ের প্রান্ত পাথরে ঠোঁট ছোঁয়াল। এ কোন্ রাঙি। রাঙি তবু নিঃশব্দে হাসল?

তারপর রাঙি চোখের ইশারায় দেখিয়ে দিল বাংলোর দিকে। বরহম্ দেখল, বুনো দাঁতালের দাঁত দুটি কাটা হয়ে গেছে। তার সর্বাঙ্গে রক্ত। ছোট্ট চোখ দুটি উদ্দীপ্ত। যেন সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে আছে দিলালীর দিকে। সে কাত হয়ে পড়ে আছে। তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে, দিলালী আর রাজা টেনে নিয়ে চলেছে। মাটি হেঁচড়ে হেঁচড়ে, রক্তাক্ত পাহাড়টাকে টেনে নিয়ে চলেছে। ফেলে দিয়ে আসবে দূরে, অনেক দূরে। পশুপাখীতে খাবে। তারপরে হাড়গুলি ছাড়িয়ে নিয়ে অবশিষ্ট পুঁতে দেওয়া হবে মাটিতে।

রাঙি আঙুল তুলে বলল, দেখেছ?

বরহম্ বলল, হুঁ রাঙি!

রাঙি তার মেহেদী রাঙানো হাতে মুঠো করে ধরতে চাইল বরহমের আরণ্যক পাথর শরীর। বিশাল থাবা দুটি আছড়ে ফেলল তার বুকের চূড়ায়। তারপর চুপি চুপি যেন বলল, চলে যাও, চলে যাও।

—কুথা হে রাঙি?

—যেখানে তোমার খুশি।

—আই রাঙি আমার মরণ হল না। রাঙির শ্বাস দ্রুত হল। তারপরে রুদ্ধ হল। রাঙি বড় হতে লাগল। শরীর ছাড়িয়ে, ছাড়িয়ে, উঠে উঠে, অনেক উঁচু থেকে বলল, সনসারে শরীলটা না মরে? মনের মরণ নাই।

রাঙি চলে গেল ঘরের দিকে। বরহম্ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে চলে যেতে বলেছে। আই হটাবাহার! রাঙি একটা মানুষ। মনের মানুষ হে। আই হটাবাহার, তুই তোর মায়ের গানটা গা। আই আমি একটা হটাবাহার, কিন্তু মানুষ। আমি আমার মায়ের গানটা গাই,

নে জীবোন কাতী নামোগা।
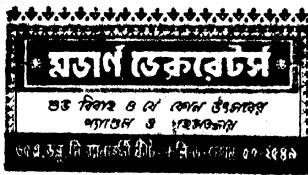
কারণ, জীবনটা সেই দরদের মত, যে দরদটা কখনো সারে না।

একজন মরছে আর পাঁচজন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাকে মরতে দেখছে। যে মরছে সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতেও অল্প অল্প হাসছে। আর যারা দেখছে তাদের মধ্যে চারজন আধ-ময়লা ধুতির খুঁট ভিজে চোখে বুলিয়ে নিচ্ছে।

পাঁচজনের মধ্যে একজন মেয়ে। তার বয়স বছর চব্বিশ-পঁচিশ তো বটেই। কান্না-কান্না মুখ। কিন্তু কাঁদতে সাহস পাচ্ছে না। ঘাড় বেঁকিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। কাঁদলে নাকি তাকে ভাল দেখায় না—একথা আজ যে মরছে সে তাকে সুস্থ অবস্থায় বলেছে অনেকবার। তাই বুকটা হু-হু করে উঠলেও ঠিক এই মুহূর্তে কান্নার ইচ্ছে সে অনেক কষ্টে দমন করে রাখে।

প্রথম যেদিন এ পাড়ায় এসেছিল শীতাংশু সেদিন তার গায়ে এসেন্সের গন্ধ ছিল। দামী পোশাক। হাতে বিলিতি মদের দামী বোতল। আর জানলার সিকে কপাল ঠেকিয়ে দেখেছিল রেবা একটা গাড়িও দাঁড়িয়েছিল বাইরে।

দু-চারজন বন্ধু নিয়ে সটান রেবার ঘরেই ঢুকে পড়েছিল শতীতাংশ। জ্বলজ্বলে মুখ। উস্কোখুস্কো চুল। কাঁজতে চকচকে ঘাড় আর পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে শীতাংশু ওপরে উঠেছিল। তার সেই গানের রেশ আজও কানে লেগে আছে রেবার।

বোতল শেষ হতে না হতেই দশটা-সাড়ে দশটার মধ্যে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল শীতাংশুর বন্ধুর দল। গাড়িটা তাহলে তার নয়। হঠাৎ যেন নিভে গিয়েছিল রেবা। একটু অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল শীতাংশুর দিকে।

কি দেখছ?

গাড়ি চলে গেল, বাড়ি যাবেন কেমন করে?

যাব না। এখানে থাকব—তক্তপোষের ওপর গড়িয়ে পড়ে শীতাংশু বলেছিল।

কিন্তু রাতে আমি ঘরে লোক রাখি না—

মদের ঘোরে শীতাংশুর লাল চোখ দুটো আরও যেন লাল হয়ে উঠেছিল রেবার কথা শুনে। একটা পাশ বালিশের ওপর কনুই

রেখে ঘাড় বেঁকিয়ে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, কত চাই?

কিন্তু রেবার উত্তরের অপেক্ষা করেনি শীতাংশু। কাঁপা-কাঁপা আঙুলে পাঞ্জাবির বোতাম খুলেছিল, হাত থেকে ঘড়ি খুলেছিল আর পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, এই নাও।

পুলিসে ধরিয়ে দেবেন না তো কাল সকালে?

আমার অত সময় নেই, পাশ ফিরে পাশ বালিশটা আঁকড়ে ধরেছিল শীতাংশু, ঘুমোতে দাও। আর বিরক্ত করো না আমাকে। আলোটাও নিভিয়ে দাও—

সুইচ টিপে দিয়ে শতরঞ্চির ওপর অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসেছিল রেবা। বড় রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার আওয়াজ নেই। শুধু মাঝে মাঝে হু-হু বাসের দমকা চঞ্চলতা। আর পানের দোকানে মাতালের কর্কশ এলোমেলো গলার স্বর।

পাশের নতুন মেয়েটার ঘর থেকে এখনও গান ভেসে আসছে। সিঁড়িতে লোক ওঠা-নামার দুপ দুপ শব্দ। শীতাংশুকে রেবার ঘর থেকে শেষ অবধি বেরুতে না দেখে এতক্ষণে নিশ্চয়ই তাকে গালাগাল দিতে দিতে ফিরে গেছে এ-পাড়ার বাঁশের কারবারী মন্মথ, রেসুড়ে নরু, বাড়ির দালাল গদাই আর বিটলে। কিংবা অন্য কারুর ঘরে গিয়ে ঢুকেছে কিনা কে জানে!

পরদিন একটু বেলায় ঘুম ভাঙল শীতাংশুর। ঘরে তাজা রোদ্দুর লুটোপুটি খাচ্ছে তখন। আর ততক্ষণে রেবার স্নান হয়ে গেছে। একটা সাদা শাড়ি পরেছে সে। গাঢ় টিপ দিয়েছে কপালে। পাউডারের দাগ লেগে আছে গলায়।

ঘুম ভাঙতেই খাট থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছিল শীতাংশু। তার পাঞ্জাবিতে বোতাম লাগানো। হাতে ঘড়ি বাঁধা। বুক-পকেটে নোটের তাড়া যেমনকার তেমন। বিস্ময়ের উত্তেজনায় তখন সে অবাক হয়ে রেবার পা থেকে মাথা অবধি দেখে নিয়েছিল।

এসব ফিরিয়ে দিলে যে?

কুড়ি টাকা রেখে নিয়েছি।

রেবাকে আদর করে কতগুলো নোট আবার তার হাতে গুঁজে শীতাংশু বলেছিল, এগুলো রাখ। আমি আবার আসব।

খিল খিল করে হেসে উঠেছিল রেবা, আগাম দিচ্ছেন?

দেয়ালে টাঙানো গোল আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে শীতাংশু হেসেছিল, জমা রাখছি—

বউ সব টাকা কেড়ে নেয় বুঝি?

আমার টাকা সে ছোঁয় না। বড়লোক শ্বশুর। তার ভাবনা কি—ভোরবেলা বাসি-মুখে একটু বেশি কথা বলে ফেলে শীতাংশু, আমার রেস-লটারির টাকা মদ-মেয়েমানুষেই যায়—

বাঃ, সাবাস! বাহাবা দিয়েছিল রেবা।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মাথা তুলে হঠাৎ ওপরে তাকিয়ে শীতাংশু জিজ্ঞেস করেছিল, কি নাম তোমার?

রেবা।

খাসা! আমার বউ-এর নামও রেবা। কিন্তু কত তফাৎ! তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে যায় শীতাংশু।

কিন্তু যাবার সময় যেকথা বলে গেল শীতাংশু তার অর্থ নিয়ে অনেকক্ষণ মাথা ঘামাল রেবা। 'তফাৎ' কথাটা উচ্চারণ করে কি বুঝিয়ে গেল সে? এটা রেবার নিন্দে না প্রশংসা? হঠাৎ আশ্চর্য এক তৃপ্তির স্বাদ মনের মধ্যে সে পায়। শীতাংশু বলে গেছে আবার আসবে। নাকের কাছে করকরে নোটগুলো নিয়ে গন্ধ শোঁকে রেবা। তারপর তার ঘরের পাশের একফালি বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

তখন রাস্তার ওপারে নড়বড়ে টেবিল আর পায়া ভাঙা কাঠের চেয়ার দিয়ে সাজানো ছোট চায়ের দোকানটায় বসে চা আর বাসি নোনতা বিস্কুট খাচ্ছে মন্মথ বিটলে নরু আর গদাই। কিন্তু তাদের চারজোড়া চোখই রেবার বারান্দার দিকে। কোন আহাম্মকের জন্যে কাল সারারাতের মধ্যে তারা একবারও ঢুকতে পায়নি রেবার ঘরে—আজ সকালে তার চেহারাটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে বোধহয় একবার দেখতে চায়।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সেই চায়ের দোকানেই অবসন্ন দেহটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল শীতাংশু। ওদের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল একবার। যেন ওরা কতকালের চেনা। আর ওরা—মানে মন্মথ বিটলে নরু আর গদাই হাঁ হয়ে গিয়েছিল শীতাংশুর বনেদী চেহারা দেখে। কল্পনা করতে পারেনি যে এমন উঁচু দরের মানুষ এসে রাত কাটাবে রেবারাণীর ঘরে। আরও অবকা হল যখন বেপরোয়া শীতাংশু এই টিমটিমে চায়ের দোকানে চা খেতে এল তাদের পাশে বসে। ভাল চায়ের দোকানের অভাব আছে নাকি বড় রাস্তার মোড়ে।

সরে-সরে বসেছিল ওরা। শীতাংশুর মতো মানুষকে ওদের মধ্যে দেখে অস্বস্তি অনুভব করেছিল। নিজে উঠে দাঁড়িয়ে ভাল চেয়ারটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে মন্মথ বলেছিল, বসুন স্যার।

বাঃ, হা-হা করে হেসে উঠেছিল শীতাংশু, আপনি উঠে দাঁড়ালেন যে? এত খাতির কেন আমাকে? ওদের প্রত্যেককে এক-একটা করে ভাল সিগ্রেট খাইয়েছিল সেদিন শীতাংশু। জমিয়ে গল্প করেছিল বেলা এগারোটা অবধি। আর আসবার আগে ওদের সকলকে সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা রেবার ঘরে নেমন্তন্ন করেছিল।

কে জানে আসবে কি-না। বড়লোকের খেয়াল হয়তো একদিনেই মিটে গেছে। আজ গিয়ে উঠেছে অন্য কারুর ঘরে। সন্ধ্যার ঝোঁকে রেবার ঘরে বসে সস্তা সিগ্রেট টানতে টানতে অসহিষ্ণু মন্মথ এদিক-ওদিক তাকায়। রেসুড়ে নরু পাতলা টিপসের বইটা থেকে মাথা তুলতে চায় না। বিটলে আর গদাই একফালি বারান্দায় যায় আর আসে।

বেলফুলের মালা খোঁপায় জড়িয়েছে আজ রেবা। বিছানার চাদর কেচে ঝকঝকে করে রেখেছে। কিন্তু কোথায় শীতাংশু! বিটলে আর গদাই-এর মতো রেবাও বারান্দায় যায় আর আসে। ঝুঁকে পড়ে নিচের রাস্তা দেখে। কত রিক্সা আসে ঠুনঠুন। ট্যাক্সির ভোঁ ভোঁ। চোরের মতো চারপাশে তাকাতে তাকাতে এই বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে কত রোগা-মোটা মানুষ। কিন্তু শীতাংশু আসে না।

রেসের বই থেকে চোখ তুলে খুকখুক করে হাসে রেসুড়ে নরু, তোমার বড়লোক কাপ্তেন আর আসবে না রেবারাণী—

উঃ, বললেই হল, চোখ নাচিয়ে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে রেবা, মানুষ চিনিনা আমি? ঠিক আসবে দেখো—

রেবার রকম দেখে রেসের বইটা চটাস করে শতরঞ্চির ওপর রাখে নরু, মনটা তোমার এখনও বড়ই কাঁচা—

হঠাৎ হৈ হৈ করে ওঠে বিটলে আর গদাই, এসেছে—এসেছে!

ঝপ করে উঠে দাঁড়ায় বাঁশের কারবারী আধবুড়ো মন্মথ। রেসের বইটা তাড়াতাড়ি পকেটে ভরে নেয় নরু। খুশির বিদ্যুৎ খেলে

ধায় রেবার চোখে। বিটলে আর গদাই ছুটে এসে দরজা খোলে। আজ দুটো বিলিতি মদের বোতল শীতাংশুর হাতে। খাবারের খুব বড় একটা বাক্স। তবে যেন টলতে টলতে ঘরে ঢোকে সে।

আসুন স্যার আসুন—মন্মথ বোতল দুটো ধরে। নরু খাবারের বাক্সটা নেয়। খুশিতে দিশাহারা রেবা পরিষ্কার বিছানাটা হাত দিয়ে ঝেড়ে ঠিকঠাক করে দেয়।

কিন্তু শতরঞ্চির ওপরেই আজ বসে পড়ে শীতাংশু। সকলের দিকে তাকিয়ে হাসে। দু প্যাকেট তাস আর দামী সিগ্রেটের টিন বের করে রাখে মাঝখানে। অনেক খুচরো পয়সা বের করে রেবার হাতে তুলে দেয়, খেলার সময় লাগবে। এগুলো রাখো। আর একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে দিয়ে বলে, সোডা আনাও।

এমনি করেই প্রথম-প্রথম শীতাংশু আসর জমায় রেবার ঘরে। মন্মথর গলা ধরে মদ খায়। নরুর হাত ধরে রেসে যায়। বিটলে আর গদাই-এর সঙ্গে নানা জায়গায় গিয়ে জুয়ো খেলে। আর প্রায় রোজই রেবার ঘরে কিম্বা সেই চায়ের দোকানে গল্পাবাজি করে বন্ধুত্ব জাহির করে এদের সঙ্গে।

এর মধ্যে একদিন বাড়ির দালাল গদাই খবর আনল। সে ঠিকানা জোগাড় করে চুপি-চাপে গিয়ে শীতাংশুর বাপের বাড়িটা দেখে এসেছে। আর বাপ! সে দুই হাত মেলে দিয়েও সেই বাড়ির বিশালত্ব এদের কিছুতেই যেন বোঝাতে পারে না, তিনতলা বাড়ি। দু-তিনখানা বড় বড় মোটরগাড়ি। গেটের কাছে দাড়ি-পাগড়িওলা ইয়া লম্বা দারোয়ান। বুঝলি রে বিটলে, লক্ষ্মী প্রতিমার মতো বউ আমাদের শীতাংশু স্যারের—

ধরা গলায় রেবা জিজ্ঞেস করে, বলি বউ দেখলে কেমন করে?

বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। আন্দাজে বুঝলাম। সরকারের মস্ত বড় চাকরি করে স্যারের বাপ।

স্যারের দিল আছে, বিড়িতে ফু দিয়ে মন্মথ বলে, আমাদের চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি যে অমন মানুষ ঘাড়ে হাত দিয়ে কথা বলে আমাদের—

বাধা দিয়ে রেবা হঠাৎ বলে ওঠে, ওর বউ-এর নামও রেবা কিন্তু।

তাই নাকি? গলা ফাটিয়ে হেসে ওঠে রেসুড়ে নরু, তাই অত ইয়ে তোমার সঙ্গে—হেঁ হেঁ হেঁ—

ধমকে ওঠে মন্মথ, এই চোপ!

তারপর এই শীতাংশু হঠাৎ একদিন তল্পীতল্পা নিয়ে সটান এসে হাজির হল রেবার ঘরে। স্যুটকেশ আর হোল্ডল তক্ত-পোষের তলায় ঠেলে দিয়ে বলল, বরাবরের জন্যে থাকতে এলাম। এই নাও যা এনেছি সব টাকা রইল তোমার জিম্মায়। আমিও রইলাম—

ভাল কথা, থাকুন না, রেবা হাসল মুখ ফিরিয়ে। বাপ কিম্বা বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া করে হয়তো দুদিনের জন্যে এসেছে। তারপর আবার ফিরে যাবে যথাসময়। এখন যে কদিন থাকবে থাক। আপত্তি করবে কেন রেবা। বরং শীতাংশুর সারাদিন রাত এখানে থাকবার জন্যে এই বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের কাছে রেবার দাম বেড়ে যাবে অনেক। এমন মানুষ কজন পায়।

কিন্তু ঝগড়াও মিটল না আর শীতাংশুও ফিরে গেল না তার বাপের বাড়িতে। এখানেই খায়। এখানেই ঘুমোয়। রেস-জুয়ো খেলে যা পায় তুলে দেয় রেবার হাতে। যখন কিছু পায় না তখন টাকা ধার নেয় মন্মথ নরু গদাই আর বিটলের কাছ থেকে। কিন্তু রেবার ব্যবসায় তখন বাধাও সৃষ্টি করে না। তার কাছে লোক এলে সে বাইরে চলে যায়। অনেক রাতে ফিরে এসে দরজায় ধাক্কা দেয়, টক টক—

দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে রেবা বলে, এস গো—

লোক চলে গেছে?

কখন! যত্ন করে রেবা তখন পাশে বসে খাওয়ায় শীতাংশুকে।

তারপর যা হয় তাই। সারাদিন পেটে হাত দিয়ে ধোঁকে শীতাংশু। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে যায়। রেবার খাটে গড়াতে গড়াতে চিৎকার করে। লিভারে ব্যথা। কি হয়েছে কে জানে। সহজে সারবে না। রেবা করুণ মুখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। একটা কথাও বলে না।

ওদিকে মন্মথর টনক নড়ে, কি রে নরু, বিটলে গদাই, স্যার ভুগবে চোখের সামনে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবি তোরা? কত করেছে আমাদের জন্যে এর মধ্যেই ভুলে গেলি নাকি বেইমানের দল?

তৎপর হয়ে উঠে সকলে বলে, বল না মন্মথদা, কি করতে হবে?

ভাল একটা ডাক্তার তো ডাকতে হয় আগে। সকলে মিলে তার টাকা আর ওষুধের দাম জোগাব—কেমন রাজি আছিস তোরা সকলে? বল?

ওরা দরদ ভরা স্বরে বলে, স্যারের বিপদে করবার জন্যে রাজি থাকব না? কী বল মন্মথদা।

তখন ওরা একসঙ্গেই যায় বড় রাস্তার ওপারে এক বিলাত-ফেরত বড় ডাক্তারের বাড়িতে। ওদের চেহারা দেখে নাক সিটকে ডাক্তার জানায় যে বত্রিশ টাকা তার ভিজিট। ওরা একটু ভাবে। নিজেদের মধ্যে কি বলা-বলি করে। তারপর মুখ তুলে মন্মথ ডাক্তারকে বলে, তাই দেব। চলুন আমাদের সঙ্গে।

তবুও ওদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখে ডাক্তার। দু-পাঁচটা রুগি দেখে। একে-তাকে টেলিফোন করে। আর যেন কতই অনিচ্ছায় এক সময় মুখে বিরক্তি নিয়ে এদের সঙ্গে রাস্তায় নেমে বলে, আমার গাড়ি খারাপ। ট্যাক্সি ডাকতে হবে।

এই তো—দু পা এগুলোই বাড়ি—মন্মথ ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে।

মন্মথর কথা শুনে ভুরু কুঁচকে আরও বিরক্ত হয়ে ডাক্তার এগিয়ে যায়। আর ভরা বিকেলেও সিঁড়ি দিয়ে সেই বাড়িটার দোতলায় উঠতে উঠতে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায় এদের দিকে। কি এদের মতলব? টাকাটা ঠিক-ঠিক দেবে তো? বুকের ভেতরটাও একবার ছাঁৎ করে ওঠে বিলেত-ফেরৎ মোটা ডাক্তারের। কিন্তু রেবার ঘরে ঢুকে শীতাংশুকে দেখে বিস্ময়ের প্রবল তোড়ে ডাক্তারের মুখটা অন্যরকম দেখায়।

সব ব্যাপার বুঝে নিতে দেরি হয় না তার।

ডাক্তার ডাকল কে? কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করে শীতাংশু।

ভয়ে ভয়ে মন্মথ বলে, আমরা।

কেন? কে ডাক্তার ডাকতে বলেছে? কে পয়সা দেবে? কে ওষুধ আনবে?

মন্মথ শীতাংশুর একটা হাত ধরে বলে, আপনি কিছু ভাববেন না স্যার—আমরা সব ব্যবস্থা করব—

বিছানার ওপর উঠে বসে শীতাংশু, খবরদার। আরে, আমি মরবই—আমি মরতেই চাই। ডাক্তারকে যে পয়সা খাওয়াবে তা দিয়ে আমাকে মদ খাওয়াও না ভাই—

মদ খাওয়া আপনার বারণ স্যার—

কোন রাস্কেল সেকথা বলে? রেবা থাকতে আমার ভাবনা কি, তোমরা পাশে থাকতে আমার মরতে দুঃখ কি। ডাক্তার-বাবু, আপনি যান। আমার কিছু হয়নি, এরা শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিল—

কিন্তু, ভুরু কুঁচকে মোটা ডাক্তার বলে, অনেক রুগি ফিরিয়ে দিয়ে আমি এসেছি—আমার অত সময় নেই মশাই। যা-হয় একটা ব্যবস্থা করুন—

মন্মথ তাড়াতাড়ি টাকা গুঁজে দেয় ডাক্তারের হাতে। জানে শীতাংশুকে বুঝিয়ে কোন ফল হবে না। মেজাজ ঠিক নেই এখন স্যারের। বোধহয় ডাক্তারের চেহারা দেখেই ক্ষেপে গেছে। এরা সকলেই লক্ষ্য করেছে যে ফিটফাট কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক দেখলেই মেজাজটা আজকাল আশ্চর্য রকম বিগড়ে যায় শীতাংশুর।

বেশ, মিনতি করে রেবা বলে, ডাক্তার দেখাবে না—না দেখাও। কিন্তু হাসপাতালে যেতে দোষটা কি শুনি?

ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে শীতাংশু বলে, তুমিও আমায় তাড়িয়ে দেবে রেবা?

ও কি কথা! সেরে ওঠার দরকার নেই?

না না না, এপাশ-ওপাশ করে শীতাংশু, বাপের নাম বলতে হবে না হাসপাতালে গেলে? মরি তাও স্বীকার—এ মুখ দিয়ে বাপের নাম উচ্চারণ করতে পারব না। সে-হিম্মৎ আছে আমার—

কিন্তু স্যার, বাপের নাম উচ্চারণ করলে ক্ষেতি কি এসময়?

বলি, শালার বাপ আমার নাম উচ্চারণ করে? আমার পরিচয় দেয়? কখনও দিয়েছে?

এ সময় ঠিক দেবেন, বিড়বিড় করে ওঠে মন্মথ।

ছাই দেবে! তোমরা ওদের চেন না। দয়া-মায়া-প্রাণ কিছু নেই ওদের, একটা প্রচণ্ড আক্রোশ শীতাংশুর গলার নিচের সবুজ-সবুজ শিরা টান-টান করে দেয়।

মুখ ফসকে হঠাৎ বলে ফেলে রেসুড়ে নরু, কিন্তু তাই বলে স্যার আপনার মতো বড়-মানুষ একটা বেশ্যার ঘরে—

তক্তপোষের ওপর ভীষণ জোরে ঘুঁসি মেরে ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মতো চিৎকার করে ওঠে শীতাংশু, কাকে বেশ্যা বলছ? এই রেবাকে? চোখের মাথা খেয়েছ তোমরা সব। বেশ্যা যদি বলতে হয় আমার বউকে বল। আমি কিছু করি না—আমি লেখাপড়া শিখিনি—আমি টাকা রোজগার করি না বলে সে কখনও আমার ভালবাসার কোন দাম দেয়নি—মানুষ বলে গ্রাহ্য করেনি আমাকে। আর আমার বাপের টাকা আছে বলে—

কানে আঙুল দিয়ে মন্মথ বলে, ছি ছি স্যার—

হা-হা করে হেসে ওঠে শীতাংশু, আর শুনবে? ফের আমাকে বড়মানুষ-ফানুস বলবে তো হাতাহাতি হয়ে যাবে তোমাদের সঙ্গে বলে দিলাম। বড়মানুষের মুখে লাথি! কুত্তার মতো আমাকে বানিয়ে তুলে-ছিল ওরা। আরে, লেখাপড়া সকলের হয়? আমার না-হয় হয়নি। তা বলে পাঁচজনের সামনে দিনের মধ্যে হাজার বার আমাকে বংশের কলঙ্ক বলে গালাগাল করা। দিনরাত শুধু অক্ষম অযোগ্য বলে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার ফন্দী। বসে-বসে বাড়ির অন্ন ধ্বংস করার কোন অধিকার নাকি আমার নেই —চোখ দুটো হঠাৎ বড় হয়ে যায় শীতাংশুর। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, কেন, বিড়ির দোকানে কাজ করতে চাইনি আমি? সেলাই-এর কল বিক্রী করার কাজ নিতে চাইনি? উঁহুঁহুঁ —তাতেও ওদের আপত্তি। বড়-লোকের মান যাবে তাহলে—

নরু বিচলিত হয়ে বলে, থাক স্যার থাক। বেশি কথা বললে আপনার শরীরটা আরও বেশি খারাপ হয়ে পড়বে—

কিন্তু তার কথা যেন কানে শুনতে পায়নি এমনভাবে শীতাংশু বলে যায়, আমি মাতাল বদমাইস রেসুড়ে—আর আমার বাপ আপিসের সাহেব-সুবো নিয়ে মদ খায় না? নেশার ঝোঁকে আমার মার পেটে লাথি দিয়ে তাকে মেরে ফেলেনি? বিধবার সম্পত্তি মেরে বড় বড় বাড়ি হাঁকায়নি?

এবার মন্মথ হাত চেপে ধরে শীতাংশুর। মিনতি করে বলে, থামুন স্যার থামুন। মাথাটা বড়ই গরম হয়েছে আপনার।

এবার শীতাংশুও হেসে বলে, নেশা না করলে মাথায় রক্ত চড়ে যায় আমার—

যাই হোক, ধমকের সুরে রেবা বলে, যত-দিন না সেরে ওঠ ততদিন আর এক ফোঁটা মদও খেতে পাবে না তুমি তা বলে দিলাম—

শোন নরু, হঠাৎ মুখে গাম্ভীর্যের করুণ ছায়া ফুটিয়ে শীতাংশু বলে, একে তুমি বেশ্যা বল? একটা পয়সাও তো এখন আমি রেবাকে আর দিতে পারি না, তবে ও কেন এত যত্ন করে আমাকে? সকলের সামনে রেবার হাত ধরে টেনে তাকে কাছে বসিয়ে সে বলে, এ হল আমার অনেক জন্মের আসল বউ—

লজ্জা পেয়ে রেবা বলে, ভাগ।

কিন্তু যতই নিন্দে করুক শীতাংশু তার বাপের আর বউ-এর—যা খুশি তাই বলুক —এরা তো হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে তাকে এমন করে মরতে দিতে পারে না। এমন একটা দামী প্রাণ বেঘোরে শেষ হয়ে গেলে কে দায়ী হবে? পরে কোন কৈফিয়ৎ সাজিয়ে এরা দাঁড়াবে এদের প্রিয় স্যারের বাপের সামনে। তার চেয়ে স্যারকে কিছু না জানিয়ে চুপেচাপে তার বাপ আর বউকে একটা খবর পাঠানো ভাল। ছেলের এমন অবস্থা শুনলে স্থির থাকতে পারে কোন বাপ। কোন বউ ছটফট না করে। ডাক্তার ডাকতে দেবে না শীতাংশু, হাসপাতালে যাবে না, কোন চিকিৎসা করাতে দেবে না—এদের চোখের সামনে পচে-পচে অল্পে-অল্পে একটা লোক মরবে—তা কি হয়।

গদাই—যে একা শীতাংশুর বাড়ি দেখে এসেছিল—এ কাজের ভার নিয়ে তারই যাওয়া ঠিক হল সেখানে। কিন্তু মুখ অন্ধকার করে ফিরে এল সে। অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারে না। রেবার ঘরে তখন লোক এসেছে। শীতাংশু গিয়ে বসে আছে ছাদে। তাই চায়ের দোকানের একদিকে বসে এরা ফিসফিস করে আলোচনা করে। তখন কাছা-কাছি কোথায় কে লোহা পেটাচ্ছে, ঠং ঠং—আর একটা হিন্দী গানের কড়া সুর ভেসে আসছে।

বল বল রে গদাই—মন্মথ ঝ‍ুকে পড়ে তার মুখের সামনে।

দম নিয়ে রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে গদাই বলে, কিছু হল না। মারতে বাকি রেখেছিল আমাকে—

কে?

স্যারে বাপ। স্যারের বউ।

সব কথা খুলে বলনা ভাল করে ছাই—ধমকে ওঠে মন্মথ।

আরে তেমন বাড়িতে ঢোকা কি সোজা ব্যাপার? শালার দারোয়ান যেতেই দেয় না ভেতরে—শেষে স্যারের নাম করে তো দাঁড়াই কর্তার সামনে। হুমকি দিয়ে কর্তা জিজ্ঞেস করে, কে স্যার? ঢোঁক গিলে তখন আমি নাম বলি। আর বলি, বড় কষ্টে আছে। সে-চেহারা দেখা যায় না আরে ভাই, চোখে-মুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে তুলে গদাই বলে, মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতে ভয়ানক ধমক দিলে আমাকে। ছেলেকে গালাগালি দিয়ে বললে, রাস্কেলের নাম করবে না আমার সামনে। মরুক সোয়াইন—আর কি বলব ভাই, অবাক হবার ভঙ্গিতে গালে হাত দেয় গদাই, কর্তার জোরালো গলা পেয়ে স্যারের বউ এল ঘরে বুঝলি?

তারপর? বউ কি বলে তা বল—

আমার পা থেকে মাথা তক চেয়ে নিল। ওরে বাপ! চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। কর্তা বলল তাকে, এই যে তোমার স্বামীর বন্ধু—চটাস করে চটি দিয়ে বউ তখন এমন জোরে মাটিতে আওয়াজ করল যে বুক ধুকপুক করতে লাগল ভাই—

বুদ্ধু কোথাকার! নরু গদাইএর ঘাড় ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলে, তার সোয়ামীর অসুখের কথাটা বলতে পারলি না এক ফাঁকে?

বলব না তো কি, রাগ দেখিয়ে গদাই বলে, তাই বলতেই তো গিয়েছিলাম রে—

বাজে বকিস না গদাই। ঠিক-ঠিক বল চটপট?

পুলিসের মতো আমাকে জিজ্ঞাসা করে স্যারের বউ, কোথা থেকে আসছ? বললাম ঠিকানা। আবার বললাম স্যারের বেয়াড়া রোগের কথা—কিন্তু আর শোনে কে! ফুঁসতে ফুঁসতে চিৎকার ছাড়ে স্যারের বউ, কোথায় কে মরছে তা শোনবার জন্যে কেন যাকে-তাকে গেটের ভেতর ঢুকতে দেওয়া হয়? আর বাজখাঁই গলায় কর্তা তখুনি হেঁকে ওঠে, দারোয়ান—সেই ডাক শুনেই ভাই আমি দে চম্পট—

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না। গদাই কাশে। বিটলে চায়ের কাপটা ঠেলে দেয়। অবাক হয়ে নরু তাকায় মন্মথর দিকে। আর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মন্মথ বলে, তাহলে স্যার যা বলে তা ঠিক।

সায় দিয়ে গদাই বলে, খুব ঠিক।

লোক চলে গেছে রেবার ঘর থেকে। সে এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। আজ বোধহয় আর কাউকে ঘরে ঢুকতে দেবে না সে। হাতছানি দিয়ে এদের ডাকে। তারপর ছাদে গিয়ে শীতাংশুকে ডেকে আনবে। রাস্তা থেকে বেগুনি-ফুলুরি ভাজার শব্দ আসে ছ্যাঁক-ছ্যাঁক। আর একটা ছোকরা সাইকেল চালিয়ে শিস দিতে দিতে ওপরে তাকিয়ে ইসারা করে রেবাকে।

চায়ের দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসে মন্মথর দল।

সেই শীতাংশু রেবার ঘরে অল্প অল্প করে নিভে যাচ্ছে। চোখের নিচে কালি। কপালে রেখার ভিড়। গালের ওপরে হাড়টা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যন্ত্রণায় এপাশ-ওপাশ করছে শীতাংশু কিন্তু যখনই এই পাঁচজনের চোখে চোখ পড়ছে তখনই এক অদ্ভুত ধরনের তৃপ্তির হাসি হাসছে সে—যে-হাসির অর্থ এদের কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য। তাই এরা ভিজে চোখে দাঁড়িয়ে আছে আর সব কাজ ছেড়ে সেবা করছে শীতাংশুর।

ঘরের মধ্যে গুমোট গরম। দুপুর গড়িয়ে এল। নির্জীব ফ্যাকাশে দিন। পাশেই বাঁশ-পট্টির মোষ দুটো থেমে থেমে গলা ছেড়ে ডাকছে। বাঁশ চেরার শব্দ আসছে চিড়্‌র্‌ চিড়্‌র্‌। আর ধুঁকতে ধুঁকতে হাসছে শীতাংশু। আকাশে মেঘ আছে বোধহয়। দূরের ল্যাম্পপোস্টের ওপর থেকে একটা কাক ঘাড় কাৎ করে তাকিয়ে আছে এদিকেই।

এই মন্মথদা, হঠাৎ ডেকে ওঠে শীতাংশু, কি হল তোমাদের? এই গদাই নরু বিটলে—সেই গানটা গা না রে একবার—সেই যে—আমি থানার লেখাই ডাইরী—

ধরা গলায় মন্মথ বলে, স্যার—

আঃ—গলা দিয়ে বিরক্তির একটা আওয়াজ বের করে শীতাংশু, খালি স্যার আর স্যার! বলি মনিব নাকি আমি তোমাদের—অ্যাঁ? নাম ধরে ডাকতে পার না আমাকে?

শীতাংশু দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে মন্মথ বলে, কি অপরাধ আমাদের শীতাংশু? চিকিৎসা করাতে দিলে না কেন? কেন এমন করে নিজেকে মারলে?

ফোঁপাতে ফোঁপাতে রেবা সেই একই প্রশ্ন করে, কেন?

তখন তৃপ্তির হাসি আরও অনেক ভাল করে হাসে শীতাংশু, খোলসটা বদলাব মন্মথদা, বাপের নাম একেবারে ঘুচিয়ে দেব, কয়েক মিনিট ধরে সে হাঁপায়, আরে আমি মরছি নাকি? আমি তো বেঁচে যাচ্ছি—শালারা বলে, আমি জুয়াড়ী রেসুড়ে মাতাল বদমাইস—ওরা ঘেন্নায় তাড়িয়ে দিল আর তোমরা বুক দিয়ে সেবা করলে! পাপকে প্রণাম! পাপ না করলে চেনাশোনা হত নাকি আমার তোমাদের সঙ্গে—এই রেবা, অমন কালো মুখ কেন? চোখ মোছ শিগগির—মন্মথর একটা হাত ধরে রেবার কোলে গড়িয়ে পড়ে জোরে-জোরে হাসে শীতাংশু।

মদ না খেয়েও এমন আবোল-তাবোল বকছে কেন শীতাংশু! রেবা লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খাওয়ায়নি তো তাকে! মন্মথ কৌশলে শীতাংশুর নাকের কাছে মুখ এনে

সব ব্যাপার বুঝে নিতে দেরি হয় না তার।

ডাক্তার ডাকল কে? কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করে শীতাংশু।

ভয়ে ভয়ে মন্মথ বলে, আমরা।

কেন? কে ডাক্তার ডাকতে বলেছে? কে পয়সা দেবে? কে ওষুধ আনবে?

মন্মথ শীতাংশুর একটা হাত ধরে বলে, আপনি কিছু ভাববেন না স্যার—আমরা সব ব্যবস্থা করব—

বিছানার ওপর উঠে বসে শীতাংশু, খবরদার। আরে, আমি মরবই—আমি মরতেই চাই। ডাক্তারকে যে পয়সা খাওয়াবে তা দিয়ে আমাকে মদ খাওয়াও না ভাই—

মদ খাওয়া আপনার বারণ স্যার—

কোন রাস্কেল সেকথা বলে? রেবা থাকতে আমার ভাবনা কি, তোমরা পাশে থাকতে আমার মরতে দুঃখ কি। ডাক্তার-বাবু, আপনি যান। আমার কিছু হয়নি, এরা শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিল—

কিন্তু, ভুরু কুঁচকে মোটা ডাক্তার বলে, অনেক রুগী ফিরিয়ে দিয়ে আমি এসেছি—আমার অত সময় নেই মশাই। যা-হয় একটা ব্যবস্থা করুন—

মন্মথ তাড়াতাড়ি টাকা গুঁজে দেয় ডাক্তারের হাতে। জানে শীতাংশুকে বুঝিয়ে কোন ফল হবে না। মেজাজ ঠিক নেই এখন স্যারের। বোধহয় ডাক্তারের চেহারা দেখেই ক্ষেপে গেছে। এরা সকলেই লক্ষ্য করেছে যে ফিটফাট কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক দেখলেই মেজাজটা আজকাল আশ্চর্য রকম বিগড়ে যায় শীতাংশুর।

বেশ, মিনতি করে রেবা বলে, ডাক্তার দেখাবে না—না দেখাও। কিন্তু হাসপাতালে যেতে দোষটা কি শুনি?

ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে শীতাংশু বলে, তুমিও আমায় তাড়িয়ে দেবে রেবা?

ও কি কথা! সেরে ওঠার দরকার নেই?

না না না, এপাশ-ওপাশ করে শীতাংশু, বাপের নাম বলতে হবে না হাসপাতালে গেলে? মরি তাও স্বীকার—এ মুখ দিয়ে বাপের নাম উচ্চারণ করতে পারব না। সে-হিম্মৎ আছে আমার—

কিন্তু স্যার, বাপের নাম উচ্চারণ করলে ক্ষেতি কি এসময়?

বলি, শালার বাপ আমার নাম উচ্চারণ করে? আমার পরিচয় দেয়? কখনও দিয়েছে?

এ সময় ঠিক দেবেন, বিড়বিড় করে ওঠে মন্মথ।

ছাই দেবে! তোমরা ওদের চেন না। দয়া-মায়া-প্রাণ কিছু নেই ওদের, একটা প্রচণ্ড আক্রোশ শীতাংশুর গলার নিচের সবুজ-সবুজ শিরা টান-টান করে দেয়।

মুখ ফসকে হঠাৎ বলে ফেলে রেসুড়ে নরু, কিন্তু তাই বলে স্যার আপনার মতো বড়-মানুষ একটা বেশ্যার ঘরে—

তক্তাপোষের ওপর ভীষণ জোরে ঘুঁসি মেরে ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মতো চিৎকার করে ওঠে শীতাংশু, কাকে বেশ্যা বলছ? এই রেবাকে? চোখের মাথা খেয়েছ তোমরা সব। বেশ্যা যদি বলতে হয় আমার বউকে বল। আমি কিছু করি না—আমি লেখাপড়া শিখিনি—আমি টাকা রোজগার করি না বলে সে কখনও আমার ভালবাসার কোন দাম দেয়নি—মানুষ বলে গ্রাহ্য করেনি আমাকে। আর আমার বাপের টাকা আছে বলে—

কানে আঙুল দিয়ে মন্মথ বলে, ছি ছি স্যার—

হা-হা করে হেসে ওঠে শীতাংশু, আর শুনবে? ফের আমাকে বড়মানুষ-ফানুস বলবে তো হাতাহাতি হয়ে যাবে তোমাদের সঙ্গে বলে দিলাম। বড়মানুষের মুখে লাথি! কুত্তার মতো আমাকে বানিয়ে তুলে-ছিল ওরা। আরে, লেখাপড়া সকলের হয়? আমার না-হয় হয়নি। তা বলে পাঁচজনের সামনে দিনের মধ্যে হাজার বার আমাকে বংশের কলঙ্ক বলে গালাগাল করা। দিনরাত শুধু অক্ষম অযোগ্য বলে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার ফন্দী। বসে-বসে বাড়ির অন্ন ধ্বংস করার কোন অধিকার নাকি আমার নেই—চোখ দুটো হঠাৎ বড় হয়ে যায় শীতাংশুর। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, কেন, ঘড়ির দোকানে কাজ করতে চাইনি আমি? সেলাই-এর কল বিক্রী করার কাজ নিতে চাইনি? উঁহুহু —তাতেও ওদের আপত্তি। বড়-লোকের মান যাবে তাহলে—

নরু বিচলিত হয়ে বলে, থাক স্যার থাক। বেশি কথা বললে আপনার শরীরটা আরও বেশি খারাপ হয়ে পড়বে—

কিন্তু তার কথা যেন কানে শুনতে পায়নি এমনভাবে শীতাংশু বলে যায়, আমি মাতাল বদমাইস রেসুড়ে—আর আমার বাপ আপিসের সাহেব-সুবো নিয়ে মদ খায় না? নেশার ঝোঁকে আমার মার পেটে লাথি দিয়ে তাকে মেরে ফেলেনি? বিধবার সম্পত্তি মেরে বড় বড় বাড়ি হাঁকায়নি?

এবার মন্মথ হাত চেপে ধরে শীতাংশুর। মিনতি করে বলে, থামুন স্যার থামুন। মাথাটা বড়ই গরম হয়েছে আপনার।

এবার শীতাংশুও হেসে বলে, নেশা না করলে মাথায় রক্ত চড়ে যায় আমার—

যাই হোক, ধমকের সুরে রেবা বলে, যত-দিন না সেরে ওঠ ততদিন আর এক ফোঁটা মদও খেতে পাবে না তুমি তা বলে দিলাম—

শোন নরু, হঠাৎ মুখে গাম্ভীর্যের করুণ ছায়া ফুটিয়ে শীতাংশু বলে, একে তুমি বেশ্যা বল? একটা পয়সাও তো এখন আমি রেবাকে আর দিতে পারি না, তবে ও কেন এত যত্ন করে আমাকে! সকলের সামনে রেবার হাত ধরে টেনে তাকে কাছে বসিয়ে সে বলে, এ হল আমার অনেক জন্মের আসল বউ—

লজ্জা পেয়ে রেবা বলে, ভাগ।

কিন্তু যতই নিন্দে করুক শীতাংশু তার বাপের আর বউ-এর—যা খুশি তাই বলুক—এরা তো হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে তাকে এমন করে মরতে দিতে পারে না। এমন একটা দামী প্রাণ বেঘোরে শেষ হয়ে গেলে কে দায়ী হবে? পরে কোন কৈফিয়ৎ সাজিয়ে এরা দাঁড়াবে এদের প্রিয় স্যারের বাপের সামনে। তার চেয়ে স্যারকে কিছু না জানিয়ে চুপেচাপে তার বাপ আর বউকে একটা খবর পাঠানো ভাল। ছেলের এমন অবস্থা শুনলে স্থির থাকতে পারে কোন বাপ। কোন বউ ছটফট না করে। ডাক্তার ডাকতে দেবে না শীতাংশু, হাসপাতালে যাবে না, কোন চিকিৎসা করাতে দেবে না—এদের চোখের সামনে পচে-পচে অল্পে-অল্পে একটা লোক মরবে—তা কি হয়।

গদাই—যে একা শীতাংশুর বাড়ি দেখে এসেছিল—এ কাজের ভার নিয়ে তারই যাওয়া ঠিক হল সেখানে। কিন্তু মুখ অন্ধকার করে ফিরে এল সে। অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারে না। রেবার ঘরে তখন লোক এসেছে। শীতাংশু গিয়ে বসে আছে ছাদে। তাই চায়ের দোকানের একদিকে বসে এরা ফিসফিস করে আলোচনা করে। তখন কাছা-কাছি কোথায় কে লোহা পেটাচ্ছে, ঠং ঠং—আর একটা হিন্দী গানের কড়া সুর ভেসে আসছে।

বল বল রে গদাই—মন্মথ ঝুঁকে পড়ে তার মুখের সামনে।

দম নিয়ে রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে গদাই বলে, কিছু হল না। মারতে বাকি রেখেছিল আমাকে—

কে?

স্যারে বাপ। স্যারের বউ।

সব কথা খুলে বলনা ভাল করে ছাই—ধমকে ওঠে মন্মথ।

আরে তেমন বাড়িতে ঢোকা কি সোজা ব্যাপার? শালার দারোয়ান যেতেই দেয় না ভেতরে—শেষে স্যারের নাম করে তো দাঁড়াই কর্তার সামনে। হুমকি দিয়ে কর্তা জিজ্ঞেস করে, কে স্যার? ঢোক গিলে তখন আমি নাম বলি। আর বলি, বড় কষ্টে আছে। সে-চেহারা দেখা যায় না—আরে ভাই, চোখে-মুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে তুলে গদাই বলে, মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতে ভয়ানক ধমক দিলে আমাকে। ছেলেকে গালাগালি দিয়ে বললে, রাস্কেলের নাম করবে না আমার সামনে। মরুক সোয়াইন—আর কি বলব ভাই, অবাক হবার ভঙ্গিতে গালে হাত দেয় গদাই, কর্তার জোরালো গলা পেয়ে স্যারের বউ এল ঘরে বুঝলি?

তারপর? বউ কি বলে তা বল—

আমার পা থেকে মাথা তক চেয়ে নিল। ওরে বাপ! চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। কর্তা বলল তাকে, এই যে তোমার স্বামীর বন্ধু—চটাস করে চটি দিয়ে বউ তখন এমন জোরে মাটিতে আওয়াজ করল যে বুক ধুকপুক করতে লাগল ভাই—

বন্ধু কোথাকার! নরু গদাইএর ঘাড় ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলে, তার সোয়ামীর অসুখের কথাটা বলতে পারলি না এক ফাঁকে?

বলব না তো কি, রাগ দেখিয়ে গদাই বলে, তাই বলতেই তো গিয়েছিলাম রে—

বাজে বকিস না গদাই। ঠিক-ঠিক বল চটপট?

পুলিসের মতো আমাকে জিজ্ঞাসা করে স্যারের বউ, কোথা থেকে আসছ? বললাম ঠিকানা। আবার বললাম স্যারের বেয়াড়া রোগের কথা—কিন্তু আর শোনে কে! ফুঁসতে ফুঁসতে চিৎকার ছাড়ে স্যারের বউ, কোথায় কে মরছে তা শোনবার জন্যে কেন যাকে-তাকে গেটের ভেতর ঢুকতে দেওয়া হয়? আর বাজখাঁই গলায় কর্তা তখুনি হেঁকে ওঠে, দারোয়ান—সেই ডাক শুনেই ভাই আমি দে চম্পট—

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না। গদাই কাশে। বিটলে চায়ের কাপটা ঠেলে দেয়। অবাক হয়ে নরু তাকায় মন্মথর দিকে। আর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মন্মথ বলে; তাহলে স্যার যা বলে তা ঠিক।

সায় দিয়ে গদাই বলে, খুব ঠিক।

লোক চলে গেছে রেবার ঘর থেকে। সে এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। আজ বোধহয় আর কাউকে ঘরে ঢুকতে দেবে না সে। হাতছানি দিয়ে এদের ডাকে। তারপর ছাদে গিয়ে শীতাংশুকে ডেকে আনবে। রাস্তা থেকে বেগুনি-ফুলুরি ভাজার শব্দ আসে ছ্যাঁক-ছ্যাঁক। আর একটা ছোকরা সাইকেল চালিয়ে শিষ দিতে দিতে ওপরে তাকিয়ে ইসারা করে রেবাকে।

চায়ের দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসে মন্মথর দল।

সেই শীতাংশু রেবার ঘরে অল্প অল্প করে নিভে যাচ্ছে। চোখের নিচে কালি। কপালে রেখার ভিড়। গালের ওপরে হাড়টা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যন্ত্রণায় এপাশ-ওপাশ করছে শীতাংশু কিন্তু যখনই এই পাঁচজনের চোখে চোখ পড়ছে তখনই এক অদ্ভুত ধরনের তৃপ্তির হাসি হাসছে সে—যে-হাসির অর্থ এদের কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য। তাই এরা ভিজে চোখে দাঁড়িয়ে আছে আর সব কাজ ছেড়ে সেবা করছে শীতাংশুর।

ঘরের মধ্যে গুমোট গরম। দুপুর গড়িয়ে এল। নির্জীব ফ্যাকাশে দিন। পাশেই বাঁশ-পার্টির মোষ দুটো থেমে থেমে গলা ছেড়ে ডাকছে। বাঁশ চেরার শব্দ আসছে চিড়ুর চিড়ুর। আর ধুঁকতে ধুঁকতে হাসছে শীতাংশু। আকাশে মেঘ আছে বোধহয়। দূরের ল্যাম্পপোস্টের ওপর থেকে একটা কাক ঘাড় কাৎ করে তাকিয়ে আছে এদিকেই।

এই মন্মথদা, হঠাৎ ডেকে ওঠে শীতাংশু, কি হল তোমাদের? এই গদাই নরু বিটলে—সেই গানটা গা না রে একবার—সেই যে—আমি থানার লেখাই ডাইরী—

ধরা গলায় মন্মথ বলে, স্যার—

আঃ—গলা দিয়ে বিরক্তির একটা আওয়াজ বের করে শীতাংশু, খালি স্যার আর স্যার! বলি মনিব নাকি আমি তোমাদের—অ্যাঁ? নাম ধরে ডাকতে পার না আমাকে?

শীতাংশু দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে মন্মথ বলে, কি অপরাধ আমাদের শীতাংশু? চিকিৎসা করাতে দিলে না কেন? কেন এমন করে নিজেকে মারলে?

ফোঁপাতে ফোঁপাতে রেবা সেই একই প্রশ্ন করে, কেন?

তখন তৃপ্তির হাসি আরও অনেক ভাল করে হাসে শীতাংশু, খোলসটা বদলাব মন্মথদা, বাপের নাম একেবারে ঘুচিয়ে দেব, কয়েক মিনিট ধরে সে হাঁপায়, আরে আমি মরছি নাকি? আমি তো বেঁচে যাচ্ছি—শালারা বলে, আমি জুয়াড়ী রেসুড়ে মাতাল বদমাইস—ওরা ঘেন্নায় তাড়িয়ে দিল আর তোমরা বুক দিয়ে সেবা করলে! পাপকে প্রণাম! পাপ না করলে চেনাশোনা হত নাকি আমার তোমাদের সঙ্গে—এই রেবা, অমন কালো মুখ কেন? চোখ মোছ শিগগির—মন্মথর একটা হাত ধরে রেবার কোলে গড়িয়ে পড়ে জোরে-জোরে হাসে শীতাংশু।

মদ না খেয়েও এমন আবোল-তাবোল বকছে কেন শীতাংশু! রেবা লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খাওয়ায়নি তো তাকে! মন্মথ কৌশলে শীতাংশুর নাকের কাছে মুখ এনে

গন্ধ শোঁকে। না, মদের গন্ধ নেই। তবে? মাথায় গোলমাল হচ্ছে নাকি তার। চোখের তারা দুটো বড় হয়ে যাচ্ছে যেন।

মন্মথদা, বাঁচবার উগ্র নেশায় যেন ছটফট করে ওঠে শীতাংশু, আমি আবার আসব—দেখো—ঠিক বলছি। তোমাদের ঘরে জন্মাব—তুমি দাদা—নরু গদাই বিটলে আমার ছোট ভাই আর রেবারাণী আমার সত্যিকারের বউ হবে। কোন পাপ না করেই তখন জন্ম থেকে আমার তোমাদের সঙ্গে চেনাশোনা হবে। হবে না? বল?

হবে শীতাংশু, ভিজে দৃঢ়স্বরে মন্মথ বলে।

আর তখন—শক্ত করে পেট চেপে ধরে শীতাংশু বলে, তোমাকে আমাকে যারা মানুষ বলে ধরে না—বুঝলে মন্মথদা, চৈত্র মাসে ধাঙড়রা লাঠি পেটা করে যেমন রাস্তার কুকুর মারে তেমন করে তাদের পিটিয়ে মারব—

হ্যাঁ।

ঠোঁটের কাছে ফেনা গড়িয়ে পড়ে শীতাংশুর। গলা টান-টান হয়ে যায় যন্ত্রণায় আর ঠিক তখনই সে হা-হা করে হেসে ওঠে, ওরা জব্দ করতে পারল আমাকে? আর আমি? শালার বাপ আর বউকে কেমন জব্দ করে গেলাম—উত্তেজনায় লাফাবার ভঙ্গি করে শীতাংশু।

কিন্তু হঠাৎ তার নিথর দেহটা রেবার কোল থেকে গড়িয়ে পড়ে শতরঞ্চির ওপর। তবু মন্মথর নির্দেশে প্রাণ আছে কি-না নিঃসন্দেহ হবার জন্যে বিটলে আর গদাই ছুটে যায় মোড়ের ডাক্তারখানায়। প্যাণ্ট শার্ট পরা একটা ছোকরা ডাক্তারকে ধরে আনে।

কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।

হালকা শরীর শীতাংশুর। ভুগে ভুগে আরও হালকা হয়ে গেছে। বেশি লোকের দরকার নেই। ওরাই নিয়ে যেতে পারবে শ্মশানে। কিন্তু তোড়জোড় করতে বেশ দেরি হল। সন্ধ্যে হয়-হয়। খালি গায়ে গামছা বেঁধে কাঁধ দেবার জন্যে তৈরি হয় মন্মথ নরু গদাই বিটলে। চায়ের দোকান থেকে আরও দু-একজন এসে জুটেছে।

ঘরের বাইরে অনেক মেয়ের ভিড়। আজ তাদের ঠোঁটে রঙ নেই। খোঁপায় বেলফুলের মালা নেই। চোখে জল আছে কিনা অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না। মৃতদেহ লক্ষ্য করে ওরা বারবার কপালে হাত ঠেকায়।

শীতাংশু নেই। কিন্তু মন্মথ নরু গদাই বিটলে—এদের কারুর চোখে এক ফোঁটা জলও নেই। দেহটা চোখের সামনে পড়ে আছে, আর শীতাংশুর বনেদী প্রাণটা মিশে গেছে এদের দৈন্যজর্জর পোড় খাওয়া প্রাণের সঙ্গে। আশ্চর্য এক তেজের স্বাদ ওরা অনুভব করে মনের মধ্যে। আর হঠাৎ সকলে একসঙ্গে ফুঁসে উঠতে চায়। কাদের উদ্দেশে কে জানে!

কিন্তু হরিবোল দিয়ে মৃতদেহ কাঁধে তোলবার ঠিক আগে-আগে মস্ত এক গাড়ি এসে দাঁড়ায় সেই বাড়ির দরজায় আর গটগট করে ওপরে উঠে আসে পাঁচ ছয়জন ষণ্ডা-মার্কা ছেলের দল। সঙ্গে দুপুর বেলার সেই ছোকরা ডাক্তার।

ওরা এসে ঝুঁকে পড়ে শীতাংশুর মৃত-দেহের ওপর। একটু পরে নাক কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর চোখের ইসারা করে একজন আর একজনকে। নিচু হয়ে দেহ কাঁধে তুলে নিতে যায়।

প্রথমে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল মন্মথর দল। বুঝতে পারেনি কোথা থেকে এত লোক এসে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। এখন হঠাৎ যেন জ্ঞান ফিরে পেয়ে ধমকের কর্কশ স্বরে ওদের বাধা দেয়।

কি ব্যাপার?

আঙুল দেখিয়ে মৃতদেহ দেখিয়ে একজন বলে, আমরা শ্মশানে নিয়ে যাব।

আপনারা কারা? কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

ওরে মণ্টু, মন্মথকে ব্যঙ্গ করে একজন বলে, জেরার চোটে অস্থির যে রে—

ঘাড় বেঁকিয়ে মণ্টু মন্মথর দিকে তাকায়, আমরা শীতাংশুবাবুর বাবার কাছ থেকে আসছি—

তা সেখানেই ফিরে যান, বাধা দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে নরু, যখন মানুষটা বেঁচেছিল তখন আসতে পারেন নি?

শাট আপ!

রুখে দাঁড়ায় বিটলে আর গদাই, আমাদের স্যারের দেহে হাত দিলে এ বাড়ি থেকে আপনাদের কোনটাকে জ্যান্ত বার হতে হবে না তা বলে দিলাম।

চিৎকার করে ওদের একজন বলে, এখুনি এখানে পুলিস নিয়ে আসবার ক্ষমতা আমাদের আছে তা জানেন?

যেন শীতাংশুর নিশ্বাস গায়ে লাগে মন্মথর। মৃতদেহটা যেন মাথা ঝাঁকিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে চায়। পেশী দুটো ফুলে ওঠে মন্মথর। আর শীতাংশুর প্রাণের সব-টুকু তেজ চারিয়ে যায় তার শিরায় শিরায়।

ডাকুন পুলিস। একটা মোকাবিলা হয়ে যাক। আমরা নিয়ে যাব শ্মশানে বাস। বাপের নাম করত না কখনও আমাদের স্যার—এখন ফোঁপর-দালালী করতে এসেছে বেহায়া বাপের বাড়ির লোক। ভাগ—শালারা ভাগ!

খবরদার, মুখ সামলে কথা বলো—ঘুসি পাকিয়ে সব চেয়ে জোয়ান মণ্টু এগিয়ে আসে।

হাত গুটিয়ে ফেলেছিল নরু। লাথি মারবার জন্যে পা তুলেছিল মন্মথ। আর এক মুহূর্ত হলেই লাফ দিয়ে মণ্টুর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত বিটলে আর গদাই। কিন্তু গলা ছেড়ে খুব জোরে হঠাৎ হেসে ওঠে রেবা। ওরা সকলে একসঙ্গে চমকে ফিরে তাকায় তার দিকে।

হাসতে হাসতেই রেবা বলে ওঠে মন্মথ নরু গদাই আর বিটলেকে, কেমন লোক গো তোমরা যে মড়া নিয়ে যুদ্ধ কর? নিয়ে যাক মড়া যার খুশি। জ্যান্ত মানুষটাকে নেবার সাধ্যি ছিল কারুর? সে-মানুষটা তো আমাদের গো—

ঠিক, ঠিক। মন্মথ বলে। নরু বলে। গদাই আর বিটলেও বলে। ওরা ইশারায় শীতাংশুর বাপের বাড়ির লোকদের মৃতদেহ নিয়ে যেতে বলে। কয়েক মিনিট ইতস্তত করে মণ্টুর দল। তারপর ধরাধরি করে খাটিয়া কাঁধে তুলে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

ওদের সঙ্গে শ্মশানে যেতে এদের পা সরে না। এরা ঠায় রেবার ঘরেই দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। আর ওরা খুব তাড়াতাড়ি এই সরু গলিটা পার হয়ে শ্মশানের দিকে যায়। লজ্জায় বোধহয় হরিবোল দিতে পারে না এ পাড়ার চলতে চলতে। বড় রাস্তায় পড়ে নিয়ম রক্ষার খাতিরে হয়তো ওরা সমস্বরে বলে উঠবে, বল হরি-হরিবোল!

কিন্তু রেবার বুক-ভাঙা কান্নার আওয়াজে সে-ধ্বনি এদের কারুর কানে পৌঁছবে না।

যমুনাবাঈ একটি কথাও বললে না। শুধু একবার মুখ তুলে চেয়েই চোখ নীচু করে আগের মতন হাতটা প্রসারিত করে দিল পরিচারিকার সামনে। হাতের চেটোয় মেহদীপাতা ডলে দিচ্ছিল পরিচারিকা।

যমুনাবাঈয়ের ঘরের সামনের অপরিসর বারান্দা দিয়ে গুলাবীবাঈ চলে গেল। নীচে যাবার এটাই একমাত্র পথ নয় একথা যমুনাবাঈ যেমন জানে, তেমনই জানে গুলাবীবাঈ। কিন্তু এ পথ দিয়েই ইদানীং তার যাওয়া আসাটা একটু বেড়েছে। একলা নয় গুলাবীবাঈ, বাঁয়ার সঙ্গে ডুগির মতন উনাওয়ের লছমী প্রসাদও থাকে। প্রায় প্রৌঢ় লছমীপ্রসাদ, কিন্তু অথর্ব নয়। না অর্থে, না সামর্থ্যে।

লছমীপ্রসাদের কথা মনে হ'লেই যমুনাবাঈয়ের বুকটা যেন জ্বালা করে ওঠে। শুধু কি বুক, সর্বদেহ, অন্তরাত্মা পর্যন্ত।

আ, কি করছিস জানকী, বুড়ী হয়েছিস, চোখে দেখতে পাস না, তবু তোর কাজ করার শখ। দেখতো কব্জির ওপরে কি রকম দাগ লাগিয়ে দিলি?

যমুনাবাঈ তিরিক্ষে গলায় পরিচারিকাকে ধমক দিয়ে উঠল। অপ্রস্তুত জানকী কুতকুতে দুটি চোখের ভয়ার্ত দৃষ্টি মনিবানীর ওপর রাখল। দু এক মুহূর্ত, তারপর মাথা দুলিয়ে কি বলল একটি বর্ণও যমুনাবাঈয়ের কানে গেল না।

যমুনাবাঈয়ের মনে হ'ল জানকীর দৃষ্টিতে যেন আপসোসের লেশমাত্র নেই, সে যেন দৃষ্টি দিয়ে এই কথাই বলতে চাইল, বুড়ী বুঝি আমি একলাই হয়েছি? তোমার চামড়া টান-টান আছে? জৌলুস আছে চোখের! যে চোখের তেরচা চাউনিতে ফয়জাবাদের সাহেবজান আজী বাঁধা ছিলেন দেউড়ীতে, আরার বুলাকীভাই, কানপুরের ব্রিজকুমার শুকলার নিত্য যাওয়া-আসা ছিল গান শুনতে এসে লক্ষ্ণৌয়ের আমীর হোসেন মাটি কামড়ে পড়েছিলেন, তিন বছরের মধ্যে মাটি ছেড়ে ওঠেননি, সে চোখের আজ এ হাল? মেয়েকে দেখে সে চোখের জ্যোতি ঈর্ষায় নীল হ'য়েই মরা হরিণের চোখের মতন নিষ্প্রভ হয়ে যায় কেন?

কেন? কেন? যমুনাবাঈ নিজেকে প্রশ্ন করলে, জানকীকে বিদায় দিয়ে। কারণ এ দুনিয়া পাপের ভারে টলমল করছে। মানুষের মুখোশ পরে চারদিকে কিলবিল করছে ইবলিসের বাচ্চারা। দয়া, মায়া, মমতা, সব শুকিয়ে এই পাথরের দেয়ালের মতন হ'য়ে গেছে। মাথা ঠুকলে মাথাই ফুলবে, সান্ত্বনার হাত এগিয়ে আসবে না।

অথচ পেটের মেয়ে গুলাবী বাঈ। যমুনাবাঈয়ের রক্তমাংসে গড়া। প্রথমে নাম ছিল সাকিনা, কিন্তু রঙের জেল্লা আর চেহারার বাহার দেখে কামতাপ্রসাদ নাম রেখেছিলেন, গুলাব। গুলাবী বাঈ।

সাসারামের কামতাপ্রসাদ। বিরাট জমিদারী। সারাটা জীবন রূপোর আলবোলার নলে মুখ দিয়ে দৌলতটা অম্বুরী তামাকের মতন ফুঁকেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার ওপর ব্যবসা ছিল। তামাকপাতা আর কাঁচা মশলা। কারবারের ব্যাপারেই লক্ষ্ণৌ এসেছিলেন, সওদা শেষ করে ফেরার পথে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

টাঙ্গাওয়ালার কাঁধে হাত দিয়ে তাকেও থামিয়ে দিয়েছিলেন।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ঠুংরীর মিঠে সুর। একেবারে লক্ষ্ণৌয়ের খানদানী জিনিস। এর রকমফের নানা জায়গায় শুনেছেন, কিন্তু এমন অবিমিশ্র জিনিস কোথাও নয়। ঠুংরী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কামতাপ্রসাদ টাঙ্গা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছিলেন। নামতে গিয়ে একটা হাত কেটে দরদরিয়ে রক্তস্রোত নেমেছিল, গ্রাহ্যই করেননি।

পরে অবশ্য যমুনাবাঈ লক্ষ্য করাতে বলেছিলেন, ওই খুনটুকুই আপনার নজরানা বিবিসায়েব। এ জিনিসের মূল্য রূপেয়ায় হয় না। হবার নয়।

বসে বসে সারারাত কেবল ঠুংরী শুনেছিলেন। শেষদিকে তবলচী গুপ্ত সায়েব হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। দু হাত মুঠো করে বলেছিলেন, হাম ঠক গয়া রাজাসায়েব। হামকো ছুটি দিজিয়ে।

হাত নেড়ে কামতাপ্রসাদ তাঁকে বিদায় দিয়ে নিজে তবলা নিয়ে বসেছিলেন। ভোরের দিকে যমুনা বাঈও আর পারেনি। আসরের ওপর লুটিয়ে পড়েছে।

টাঙ্গাওয়ালা অপেক্ষা করে করে ফিরে গিয়েছিল। কামতাপ্রসাদের দোস্তের টাঙ্গা।

কামতাপ্রসাদ বহুদিন সাসারামে ফেরেননি। ছেলে নিতে এসেছে, জামাই এসেছে, খাজাঞ্চী এসেছে বহুবার, সবাইকে হাঁকিয়ে দিয়েছেন।

যমুনা বাঈ তাঁর স্বর্গ, তাঁর ইহকাল। এমন গলা যার, তার পায় জীবন লুটিয়ে দিলে জীবনের দাম বাড়ে। যমুনা বাঈকে ছাড়া দুনিয়ার কোন কিছু চাননি কামতাপ্রসাদ।

সেই সময় গুলাবীর জন্ম হয়। টুকটুকে ফুলের মতন মেয়ে।

গুলাবী মার গলা পেয়েছিল, আর বাপের মেজাজ।

গুলাবী যখন বছর চারেকের তখন কামতাপ্রসাদ একবার বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন।

টেলিগ্রাম এসেছিল সাসারাম থেকে। স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়।

টেলিগ্রামটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে সারারাত কামতাপ্রসাদ পায়চারি করেছিলেন। যমুনা বাঈও সে রাতে চোখ বোজে নি।

মাঝে মাঝে পায়চারি থামিয়ে যমুনা বাঈয়ের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি করি বলো তো যমুনা? তুমি একটা বুদ্ধি দাও।

যমুনা তাকে সাসারামে যেতেই বলেছিল। ভোর রাতে তাই ঠিক হয়েছিল। কামতাপ্রসাদ একবার সাসারাম ঘুরেই আসবেন।

যমুনা বাঈয়ের সঙ্গে কথা বলে, গুলাবীকে আদর করে কামতাপ্রসাদ সকালের ট্রেনেই চলে গিয়েছিলেন।

আর তিনি আসেননি। কামতাপ্রসাদ যে [illegible] না, এ যেন যমুনা বাঈয়ের জানা ছিল। লোকটাকে একবার আয়ত্তের মধ্যে পেলে বাড়ির লোক কিছুতেই ছেড়ে দেবে না, এমন পরিবেশে দেয়ও না।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন। একটা, একটা করে সাতদিন কাটল। আর নিজেকে চাপতে পারে নি যমুনাবাঈ। বিছানায় উপুড় হ'য়ে পড়ে অঝোর ধারায় কেঁদেছিল। বাঈজির ভালবাসতে নেই। একথা অনেকবার অনেক-জনের মুখে যমুনা বাঈ শুনেছে, কিন্তু ভালবাসা কি ফরমাস দেওয়া কোন গান, যে শখ হ'ল গাইলাম, আবার ভাল না লাগে তো শরীর খারাপের অজুহাতে সেলাম জানিয়ে এড়িয়ে গেলাম! এর আদি নেই, অন্ত নেই, কেবল একটা নিরন্তর প্রবাহ। মানুষকে ভাসিয়ে অতলে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

যমুনাবাঈয়ের দেখাদেখি গুলাবীও কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। ঠিক মার মতন কপাল চাপড়ে চাপড়ে। আধঘণ্টা পর মার মতনই ওড়না দিয়ে চোখ মুছে জানলার চিকের আড়ালে চুপচাপ গিয়ে বসেছিল।

যমুনা বাঈ খুব আশা করেছিল একটা চিঠি অন্তত কামতাপ্রসাদ লিখবেন, কিন্তু না, কিছু না। কামতাপ্রসাদ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

যমুনা বাঈ চুপি চুপি একবার একটা খৎ লিখে দারোয়ানকে পাঠিয়েছিল। পাত্তা জানা ছিল না, কিন্তু এটুকু বুঝেছিল, রহিস আদমি, সাসারামে সবাই একডাকে চিনবে। স্টেশনে গিয়ে একবার নাম করলেই হবে।

কামতাপ্রসাদের ঠিকানা মিলেছিল, কিন্তু আর কিছু নয়। দরোয়ান ঘাড় হেঁট করে ফিরে এসেছিল। বাড়িতে ঢোকার সুবিধা হয় নি। বাড়ির সবাই বলেছে বাবুর খুব বেমারী। এখন মোলাকাৎ করা চলবে না।

যমুনা বাঈ আর চেষ্টা করে নি। গুলাবী বাঈ কিন্তু বাপের কথা একবার জিজ্ঞাসা করে নি। বরং যমুনা বাঈ যখন জিজ্ঞাসা করেছে বাপের জন্য তোর মন কেমন করছে না গুলাব?

মেয়ে মাথা নেড়েছে, না, দিল খারাপ হবে কেন। বাবা তো আমার জন্য খসম আনতে গেছে। ভাল খসম পেলেই ফিরে আসবে।

কামতাপ্রসাদ যে আর আসবেন না সে খবরও যমুনা বাঈ কয়েকদিন পরেই পেয়েছিল। তবলচীর মারফৎ।

হাতের খবরের কাগজটা যমুনা বাঈয়ের দিকে এগিয়ে বলেছিল, বড় খারাপ খবর, বিবিসায়েব।

হাত বাড়িয়ে যমুনা বাঈ খবরের কাগজটা নিয়েছিল কিন্তু খারাপ খবরের হদিশটা যেন আগেই পেয়ে গিয়েছিল।

পিছনের পাতাতেই কামতাপ্রসাদের ছবি আর লাইন তিনেক খবর। যমুনা বাঈ কাগজের ওপর আছড়ে পড়েছিল। এবার কিন্তু গুলাবী কাঁদে নি। খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে কামতাপ্রসাদের ছবিটা একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করেছিল।

যমুনা বাঈ শোক ভুলেছিল। স্মৃতি

আঁকড়ে বসে থাকলে বাঈজীর চলে না। চোখ মুছতে হয়। ওড়না, ঘাগড়া, কাঁচুলী সবই পরতে হয়। বেলকুঁড়ির মালাও জড়াতে হয় কবরীতে। ঠুংরী, গজল, খেয়ালে আসর জমাতে হয়। পুরনো দীর্ঘশ্বাসের হাওয়ায় নতুন আসরের বাতির শিখা কেঁপে উঠলেই সর্বনাশ।

কামতাপ্রসাদ নেই, রায়বেরিলীর উমাশংকর রয়েছেন। তিনপুরুষ ধরে রাজা খেতাব পাওয়া বংশ। বাপ মারা গেছে ছ' মাস হয় নি, শোক ভোলাবার জন্য দোস্তরা যমুনা বাঈয়ের আসরে নিয়ে এসেছে।

সযত্নে যমুনা বাঈ পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নিল। নাচ ঠিক নয়, শুধু পায়ে তাল দেওয়া। গানের কথাগুলো পায়ের বোলে ফোটানো।

তখন কাঁচা বয়স যমুনা বাঈয়ের। কামতাপ্রসাদের সঙ্গে মনের মিল ছিল, কিন্তু বয়সের নয়। সেটা কামতাপ্রসাদও বুঝতেন, তাই যমুনা বাঈকে নিয়ে বাইরে বেরোতেন না।

কিন্তু উমাশংকরের নিত্য নতুন ফরমায়েস। গোমতীর ধারে চাঁদের আলোয় গানের আসর, কিংবা দল বেঁধে বেড়ান ছত্র মঞ্জিলের বাগানে, কিংবা শুধু দুজনে শের নাজ্জাফের কবরখানায়।

দিনগুলো ভালই কাটছিল, বিপত্তি বাধাল গুলাবী।

যমুনা বাঈয়ের কাছে এসে আব্দার ধরেছিল, আমি লেখাপড়া শিখব মা। তারা, নওরোজ, ওদের মতন।

যমুনা বাঈ মনে মনে ঠিক করছিল নাম করা এক ওস্তাদের হাতে মেয়েকে তুলে দেবে। নাড়া বেঁধে দেবে তার কাছে। বরোদার গর্গপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ রয়েছেন। অপূর্ব গলার কাজ, তানলয়ের ওস্তাদ। কোন এক আসরে তাঁর মিঞাকি মল্লার শুনে যমুনা বাঈ অবাক হয়ে গিয়েছিল। তানসেনের ঘরানা। মাঠে ঘাটে মুক্তা ছড়ান না, নাড়াও বাঁধেন না যার তার সঙ্গে, কিন্তু যমুনা বাঈ হাতে পায়ে ধরে কোনরকমে রাজী করাবে।

গর্গপ্রসাদের অসুবিধা থাকে, আনোখী বাঈ রয়েছে। লোকে বলে চক কা বুলবুল। বয়স চল্লিশের কোঠায়, কিন্তু আশ্চর্য, দেহের ওপর জরা আলতো দু এক পোঁচ ছোপ হয়ত লাগিয়েছে, গলার সুর ছুঁতে পারে নি। যেমনি মিহি, তেমনই সুরেলা।

মোট কথা যমুনা বাঈয়ের ইচ্ছা মেয়েকে সত্যিকারের খানদানী গান শেখাবেন। শুধু রহিস-পাগল করা মিঠে বুলি নয়।

নয়নামে নিদ ভর দে সখি অথবা থোরি থোরি বিজুরি। এই ধরণের হালকা গানে পথচলতি পথিককে উন্মনা করা যায় কিংবা কোথাকার ছোট তালুকদারকে। এসব ছোট হাতে গুলাবীকে যমুনা বাঈ ছাড়বে না। এমন এক মানুষের হাতে দেবে যে গানের কদর বোঝে। রানীর হালে রাখবে গুলাবীকে।

তাই যমুনা বাঈ হেসে মেয়েকে বলেছিল, আমাদের ঘরে পড়াশোনা করতে নেই মা।

পড়াশোনা করতে নেই? দু চোখে অবিশ্বাসের দীপ্তি ফুটিয়ে গুলাবী ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তেজী ঘোড়ার মতন।

এই দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখে যমুনা বাঈয়ের আর একজনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। ছোট ছোট সাংসারিক বাদবিবাদ হলে ঠিক এইভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াতেন কামতাপ্রসাদ। দাঁড়ানর ধরণেই বোঝা যেত, ও বেঁকানো ঘাড় সহজে নোয়ানো যাবে না।

না, মা, আমাদের গানবাজনা করতে হয়। নাচ শিখতে হয়। লেখাপড়া শেখার আমাদের সময় কই, আর দরকারই বা কি।

হুঁ, রাঙা দুটো ঠোঁট ফুলিয়ে দু চোখের অদ্ভুত ভঙ্গী করে গুলাবী সরে গেছে সেখান থেকে।

চেয়ে চেয়ে যমুনা বাঈয়ের আশা আর

মেটে নি। এমনই ভ্রূভঙ্গী আর এমনই চাউনিতে মসনদের মালিক বদলাতে পারে, গোটা জমিদারীর পাট্টা হাত বদল করে। এমন খুপসুরৎ মেয়ে এ তল্লাটে নেই। বয়সকালে আসরে ঝড় তুলবে গুলাবী।

যমুনা বাঈ ভেবেছিল ব্যাপারটা বুঝি মিটে গেছে, কিন্তু এক সন্ধ্যায় মেয়ের ঘরের বারান্দায় পা দিয়েই অবাক।

থামে হেলান দিয়ে গুলাবী বসে। কোলের ওপর খোলা একটা বই। পাশে আরো গোটা কতক। খেয়াল নেই মেয়ের। আঙুল দিয়ে দিয়ে অস্ফুটকণ্ঠে পড়ছে, আলিফ, বে, তে।

গুলাবী।

মার গলার স্বরে গুলাবী চমকে উঠেছিল।

তুমি গানবাজনা শিখবে না?

না।

তবে, কি করবে?

ওদের মতন হব।

কাদের মতন।

ওই যে সব মেয়েরা সাইকেল চড়ে বাদশাবাগের দিকে যায় তাদের মত।

বুঝল যমুনা বাঈ। যে সব মেয়ে বাড়ির সামনে দিয়ে কলেজে যায়, গুলাবী তাদের কথা বলছে।

একটি কথাও না বলে যমুনা বাঈ চলে এসেছিল সেখান থেকে। চলে গিয়েছিল বটে কিন্তু তার পরের দিনই গুলাবীকে নাড়া বেঁধে দিয়েছিল পণ্ডিত অম্বিকা প্রসাদের কাছে। নাচ আর গান দুইয়েরই ওস্তাদ। এ পাড়ায় অনেকেরই শুরু তাঁর কাছে। গানের বুলি আর নাচের বোল প্রথম ফুটেছিল তাঁরই শিক্ষকতায়।

গম্ভীর মুখে গুলাবী আচকান পরেছিল, চোস্ত পায়জামা, পায়ে ঘুঙুর বেঁধেছিল। কথক নাচের পোশাক।

সাজ শেষ হতে কেবল মাকে বলেছিল, এই তাহ'লে আমাকে হ'তে হবে মা।

যমুনা বাঈ স্পষ্ট বলেছিল, হ্যাঁ, বাঈজীর মেয়েকে বাঈজীই হ'তে হয়।

আর একটি কথাও গুলাবী বলে নি। কত বয়স তার তখন? বড় জোর দশ। সেই বয়স থেকে বাঈজী হবার আপ্রাণ সাধনা শুরু করেছিল। দেহে, মনে, প্রাণে।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা রান্নাঘরে ঢুকে জ্বলন্ত উনানের মধ্যে নতুন কেনা বইগুলো ফেলে দিয়ে এসেছিল।

সেই থেকে একটি মুহূর্ত বুঝি গুলাবী বাঈ নষ্ট করে নি। ভোরে উঠে নাচের জন্য তৈরী করেছে নিজেকে। শুধু কথক নয়, কথক, কথাকলি, ভারত নাট্যম। দুপুরে একটু বিশ্রাম। অপরাহ্ন থেকে গানের রেওয়াজ। শুধু গান নয়, রাগরাগিণী নিয়ে আলাপ, আলোচনা, বিশ্লেষণ।

মাঝে মাঝে যমুনা বাঈ বলেছে, গুলাবী একটু বিশ্রাম নে। খাটুনী বড় বেশী হচ্ছে।

তানপুরায় সুর বাঁধতে বাঁধতে গুলাবী বলেছে, বাঈজীর মেয়ের আবার বিশ্রাম কি মা। পুরো তৈরী না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেই।

আর কথা বলে নি যমুনা বাঈ, তবে এটুকু বুঝতে পেরেছিল মেয়ে যেন খুব আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে মায়ের কাছ থেকে। খাওয়া, বসা, শোওয়া সবই এক সঙ্গে, তবু ওরই মধ্যে তিল তিল করে দুজনের মাঝখানে যেন একটা অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে উঠছে। গান, বাজনা ছাড়া কোন কথাতে গুলাবী আগ্রহ প্রকাশ করে না। এক বিছানায় শোয় বটে কিন্তু আগের মতন নিশ্চিন্তভাবে মায়ের বুকের কাছে ছেড়ে দেয় না নিজেকে। শয্যার অন্য প্রান্তে শক্ত কাঠ হয়ে শুয়ে থাকে।

চেষ্টার অন্ত নেই যমুনা বাঈয়ের। মেয়ের কাছে আসবার।

তোর শরীরটা কী খারাপ গুলাবী?

বালাই ষাট, শরীর খারাপ হতে যাবে কিসের জন্য? গুলাবী ভ্রূ বঙ্কিম করেছে, দেখবে আজ সারারাত তোমায় ঠুংরী
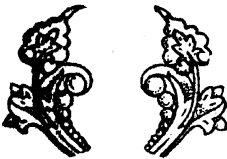
শোনাবো? কিংবা পটদীপ রাগে খেয়াল? সেদিন যেটা শিখেছি ওস্তাদের কাছে? শরীর খারাপ হোক শত্রুর।

ক্রমে সেই দিন এল।

সকাল থেকে আসর ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করা চলছিল। কিংখাবের তাকিয়া। রঙীন জাজিম। ঝকঝকে রুপোর আতরদান। গবাক্ষে গবাক্ষে রঙীন পর্দা। প্রচুর ফুলের সমারোহ। চৌকাখানা থেকেও নানা আহার্যের গন্ধ। বাড়ির পরিচারিকা, দরোয়ান সবাইয়ের নতুন পোশাকের বাহার।

নিজের ঘরে বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় গুলাবী সব দেখছিল। কারণটা যে একেবারে বোঝেনি তা নয়, কিন্তু আজকাল সব কিছুতে যেমন একটা নিস্পৃহ ভাব, তেমনই ভাবেই চুপচাপ বসেছিল।

যমুনা বাঈ ঘরে ঢুকল নাস্তার একটু আগে।

আজ তোর উপোস গুলাবী। এই শরবত-টুকু খেয়ে নে।

গুলাবী আড়চোখে মাকে দেখল। মার পরনেও নতুন সাজ। শুধু নতুন সাজই নয়, মনে হ'ল, নতুন দু একটা গহণাও যেন অঙ্গে উঠেছে। খুব হাসিখুশী দেখাচ্ছে যমুনা বাঈকে।

যমুনা বাঈ ভেবেছিল মেয়ে উপবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করবে, ঘরদুয়ার সংস্কারের মানে। কিন্তু না, কিছুই না। যমুনা বাঈয়ের হাত থেকে শরবতের গ্লাসটা টেনে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে সামনের তে-পায়ার ওপর রেখে দিল গ্লাসটা।

তবু নিজের থেকেই যমুনা বাঈ জিজ্ঞাসা করল, আজ বাড়িতে কি হবে বলত?

শুয়ে শুয়ে চোখ না খুলেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুলাবী বাঈ উত্তর দিয়েছিল, আজ আমি পুরোপুরি বাঈজি হব, মা।

দুটো চোখ যমুনা বাঈয়ের জন্বলা করে উঠেছিল। সারা মুখে রক্তের ঝলক।

মেহাৎ মেয়ে বড় হয়ে গেছে, নয়ত আগের দিনের ছোট্ট গুলাবী থাকলে ঠিক পায়ের মখমলের চটি খুলে মেয়ের দু' গালে ঠাস ঠাস করে বসিয়ে দিত। কি ভেবেছে কি মনে? কথায় কথায় সময় নেই অসময় নেই, এমনি করে অপমান করবে তাকে। যমুনা বাঈ যেমন বাঈজী, গুলাবীও তো ঠিক তেমনই বাঈজীর মেয়ে। এমনভাব দেখায় গুলাবী যেন যমুনা বাঈ তাকে কোন ভদ্রঘর থেকে ফুসলে ফাসলে এই ব্যবসায় নামিয়েছে। লেখাপড়া শিখবে মেয়ে। লেখাপড়া শিখে দিগগজ পণ্ডিত হবে। বাবুভাইদের পাশা-পাশি বসে কলম চালাবে। খুব মান বাড়বে তাতে, অনেক দৌলত আসবে।

লেখাপড়াজানা মেয়েও যমুনা বাঈ কম দেখে নি। মাসে মাসে দু একজন তাদের দরজাতেও আসে। চাঁদার খাতা নিয়ে। কোন স্কুলের চাঁদা, কিংবা মেয়েদের কোন ক্লাবের পত্তন হচ্ছে, তার জন্য কিছু অর্থ।

চোখের কোলে কালি, আধময়লা পোশাক, নাকের ওপর জোর-পাওয়ার চশমা, চুলের বালাই নেই। কোনরকমে যেন ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছে।

এইরকমভাবে বুঝি বাঁচতে সাধ গুলাবীর?

এমন দিনে যমুনা বাঈয়ের মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। সারাটা দিন আর মেয়ের ঘরের দিকে এল না।

বিকেল হ'তেই একবার আসতে হ'ল, কিন্তু ঘরে ঢুকতে পারল না, দরজা বন্ধ।

কড়ানাড়ার উত্তরে পরিচারিকা ভিতর থেকে বলল, গুলাবী বাঈ সাজছে। একটু দেরী হবে।

তবু ভাল। যমুনা বাঈয়ের বুকটা হাল্কা হ'ল। ভেবেছিল, মেয়ের যা স্বভাব, শেষ-মুহূর্তে হয়ত বেঁকে বসবে। না, আমি বেরোব না ঘর থেকে। আমি আসরে যাব না। তা হ'লে জহর খেয়ে আত্মহত্যা করতে হ'ত যমুনা বাঈকে। বড় বড় রইস আদমীর সামনে বেইজ্জতির একশেষ হ'ত।

দরজা খুলতেই যমুনা বাঈ অবাক হয়ে গিয়েছিল।

তারা বাঈজী সন্দেহ নেই, কিন্তু পথে নেমে যারা সঙ্গী ডাকে তাদের সগোত্র নয়। আচারে, আচরণে একটা শালীনতা থাকে। মানুষকে আকর্ষণ করে শিল্পকলার মাধ্যমে, গানের সুরে, নাচের তালে। আপাত-উদ্দেশ্য যাই থাক, সব কিছু ভব্যতার রেশমী-রুমালে মোড়া।

গুলাবী বাঈয়ের পরণে চুড়িদার পায়জামা, গাঢ় নীল রংয়ের বুটিদার ঘাগরা, পাতলা চোলী। ভিতরে উদ্ধত অন্তর্বাস সুস্পষ্ট। কাজলের টানে আকর্ণ ভ্রূ, ঢলঢল দুটি মদির চোখ, প্রসাধনে দুটি গাল আরক্ত।

এক নজরে দেখেই যমুনা বাঈ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

মুজরো শুরু হয়েছিল সাতটায়।

উপায় নেই, আরও একবার যমুনা বাঈকে মেয়ের কাছে যেতে হয়েছিল। মেয়ের হাত ধরে আসরে নিয়ে যাবার জন্য। এটাই প্রথম দিনের রেওয়াজ।

ওড়নার তলা থেকে একটা ফটো বের করেছিল যমুনা বাঈ। কামতাপ্রসাদের ছবি। মেয়ের সামনে ছবিটা রেখে বলেছিল, যাবার আগে একবার প্রণাম করে যেতে।

গুলাবী একবার ছবির দিকে আর একবার আড়চোখে যমুনা বাঈয়ের দিকে চেয়ে আতর-দান থেকে সারা গায়ে আতর ঢালতে ঢালতে বলেছিল, আমি মনে মনে গুরুজীকে প্রণাম করে নিয়েছি মা। চল, আসরে যাবার বোধহয় সময় হ'ল।

রাগে যমুনাবাঈ হাতের ছবিটা প্রায় দুমড়ে ফেলেছিল, খেয়াল হতে সেটা ওড়নার মধ্যে রেখে দিল। গুলাবীর আড়চোখের দৃষ্টির বুঝি একটাই মানে হয়। কত আর ফটো জমিয়ে রাখবে যমুনাবাঈ? জীবনে কামতাপ্রসাদই কি শেষবন্দর? রায়বেরিলীর

উমাশঙ্কর, কানপুরের ব্রিজকুমার শুক্লা, একেবারে আনকোরা ফৈজাবাদের কুমার বাহাদুর। তরঙ্গের পর তরঙ্গ, তাই বিশেষ কোন তরঙ্গকে চিহ্নিত করে রাখার প্রয়াস কেন যমুনাবাঈয়ের?

কিন্তু ভুল করেছে গুলাবী। যমুনা-বাঈয়ের মনের মানুষ বলে নয়, গুলাবীর জন্মদাতা বলেই এমন একটা দিনে প্রণাম করতে বলেছিল। প্রণাম করা না করা গুলাবীর ইচ্ছা, তাতে যমুনাবাঈয়ের কোন ক্ষতি নেই।

আসরে প্রথমে ওস্তাদজীর একটা গান হয়েছিল। গান ঠিক নয়, স্তোত্রবিশেষ। উৎসবের দেবতাকে আহ্বান করে আশীষ-ভিক্ষা। তারপর যমুনাবাঈয়ের গান। প্রথমে গজল, তারপর দাদরা। কিন্তু দুটোই তেমন জমল না। বার বার তাল কেটে গেল, বুকের মধ্যে যেন যথেষ্ট হাওয়া নেই। কিছুতেই যমুনাবাঈ দম নিতে পারল না। শ্রোতাদের মধ্যে একটু যেন অসন্তোষের গুঞ্জনও শোনা গেল। এমন আসরটা মাটি।

তবলচী বলেই ফেলেছিল মুখ ফুটে। বিবিসায়েবার তবিয়ৎ বোধ হয় ঠিক নেই?

যমুনাবাঈ কোন কথা বলেনি। বিবর্ণ মুখে সরে এসেছে আসর থেকে। তানপুরায় হেলান দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গীতে বসেছে।

তারপর গুলাবীবাঈয়ের পালা। আজকের আসরের আসল আকর্ষণ।

ঠুংরি দিয়ে গুলাবীবাঈ শুরু করেছিল। বাদলরাতে চোখে ঘুম নেই। কেয়াকদমের গন্ধে শুধু বাতাস নয়, হৃদয়ও মদির। প্রিয়তম এমন মেঘের লগ্নে তুমি কোথা? তুমি না থাকলে নিদ্রাহীন এ রাতের কোথায় সার্থকতা!

ঘুরে ফিরে বার দুয়েক গুলাবী গানটা গাইল, নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে। ভারী হয়ে উঠল ঘরের বাতাস। ফাল্গুনের রাতে কোথা থেকে বাদলের গন্ধ এসে মিশল। লক্ষ্ণৌয়ের চকের প্রান্তে কেয়াকদমঘেরা এক বনপথের ইশারা জেগে উঠল। অপূর্ব কণ্ঠ-লালিত্য, স্বরের আরোহ-অবরোহ, মীড়, গমক আর মূর্ছনা।

সব চমৎকার, কেবল ওই অঙ্গভঙ্গী বাদে।

হাঁটুর ওপর মুখ রেখে নিস্পন্দ হয়ে যমুনাবাঈ শুনেছিল। মেয়ে নয়, আর এক বাঈজী যেন আসর মাৎ করার চেষ্টা করছে। রূপে যৌবনে কণ্ঠে পুরোনো ক্ষয়ে যাওয়া এক বাঈজীকে আস্তে আস্তে হটিয়ে দিচ্ছে তার আসন থেকে।

কিন্তু মায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজেকে কোথায় নামাচ্ছে গুলাবী? কোন অতলে?

গানের ঠিক বিশেষ কলিতে ওড়না সরে গেল কাঁধ থেকে। দু-হাত পিছনে নিয়ে ঘোরাতেই উন্মুক্ত যৌবন আরও প্রকট হল, আরও দুর্বার। শেষদিকে গুলাবী হাঁটু মুড়ে উঠে বসল। গানের তালে তালে সারা শরীর দোলাতে শুরু করেছিল। বিলোল কটাক্ষে বিদ্যুতের ঝিলিক বর্ষিত হয়েছিল আসরের বিশেষ লোকেদের ওপর।

মেয়ের লজ্জা ঢাকতে যমুনাবাঈ নিজের মুখে ওড়না চাপা দিয়েছিল। কিন্তু আসরের প্রত্যেকটি লোকের চোখের পাতা পড়েনি। নিশ্বাসের একটু শব্দও শোনা যায়নি। সব যেন অসাড়, অনড়।

সব চেয়ে যমুনাবাঈয়ের আশ্চর্য লেগে-ছিল উমাশঙ্করের দিকে চোখ পড়তে।

মার্গসংগীত নিয়ে যমুনাবাঈয়ের ওস্তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতেন উমাশঙ্কর। কোন কোন আদিম উৎস থেকে কিভাবে বিভিন্ন ঘরানার মাধ্যমে, বিভিন্ন গায়কীর কলাকৌশলে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী পরিবর্তিত হতে হতে কি রূপ নিত তার বিশ্লেষণ করতেন বসে। দেখে শুনে মনে হত গানের সমঝদার লোক। প্রকৃত সমঝদার। অথচ গুলাবীবাঈয়ের চটুল সংগীতেই মজগুল হয়ে গেছেন। শুধু কি সংগীতে, গুলাবীর নবোদ্ভিন্ন যৌবনও, তাঁকে কম আকৃষ্ট করেনি।

অনেকগুলো গান গেয়ে গুলাবী নিষ্কৃতি পেয়েছিল। প্রত্যেকটি গানের হালকা সুর, হালকা কথা আর গুলাবীর আদিরসাশ্রিত ভঙ্গী।

সাবাস, কেয়াবৎ প্রভৃতি অফুরন্ত সাধু-বাদের মধ্য দিয়ে আসর শেষ হয়েছিল। ক্লান্ত গুলাবী সকলকে কুর্নিশ করে উঠে গিয়েছিল।

তার সামনের রুপোর থালে নোটের স্তূপ। বসে বসে যমুনাবাঈ লক্ষ্য করেছে, প্রথম নোটটা ছুঁড়েছিলেন উমাশঙ্কর। একশ টাকার নোট।

পরের দিন গুলাবীবাঈ নিজে এসেছিল যমুনাবাঈয়ের কাছে। আগের রাতের রং তখনও তার ঠোঁটে আর গালে। চোখের চাউনিতে লাস্যের আভাস।

কালকের আসর কেমন লাগল মা?

উত্তর দিতে গিয়েও যমুনাবাঈ থেমে গিয়ে-ছিল। মানুষ যে এত নির্লজ্জ হতে পারে তা যেন তার ধারণারও বাইরে।

তুই আমার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিস গুলাবী। তোর জন্য লোকের কাছে আমার মুখ দেখান দায় হয়ে উঠেছে।

এ তোমার অন্যায় হিংসা মা। আমার প্রশংসা যে তুমি সহ্য করতে পারছিলে না তা কাল রাতে তোমার মুখচোখের চেহারা দেখেই মালুম হয়েছিল আমার।

হিংসা, যমুনাবাঈ জ্বলে উঠেছিল, তোকে হিংসা করবে কারা জানিস গুলাবী, চকের গলিতে রং মেখে যারা দাঁড়িয়ে থাকে, তারা। যমুনাবাঈ নয়।

জ্ঞান নেই যমুনাবাঈয়ের। মেয়ে নয় যেন উঠতি আর এক বাঈজীর সঙ্গে ঝগড়া করছে যমুনাবাঈ।

একটা হাত দিয়ে আর একটা হাতের রং ওঠাতে ওঠাতে নির্বিকার গলায় গুলাবী বলেছিল, ওদের সঙ্গে আমাদের তফাতটা কি খুব বেশী মা? পাঁকের আবার জাতভেদ! ডোবার পাঁকও যা, নালার পাঁকও তাই।

বুঝেছিল যমুনাবাঈ মেয়ে পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করার জন্য তৈরী হয়ে এসেছে। কথকাটাকাটি করে শুধু নিজের মেজাজই খারাপ হবে।

আস্তে আস্তে যমুনাবাঈ উঠে গিয়েছিল মেয়ের সামনে থেকে। যেতে যেতেই কিন্তু কানে গিয়েছিল গুলাবীর তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ। অনেকগুলো ঝাড়লণ্ঠন যেন দমকা হাওয়ায় ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

আশ্চর্য হবার আরও বাকি ছিল যমুনাবাঈয়ের।

সেদিন বিকেলে যমুনাবাঈয়ের সঙ্গে দু একটা কথাবার্তার পরই উমাশঙ্কর গুলাবীর খোঁজ করেছিলেন।

নিরাসক্ত গলায় যমুনাবাঈ বলেছিল, কি জানি, গুলাবী বোধ হয় ঘরেই আছে।

একবার দেখা করে আসি। তুমি বস একটু।

ছড়িতে ভর দিয়ে উমাশঙ্কর উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

গুলাবী ঘরেই ছিল। উমাশংকর দরজায় টোকা দিতেই উঠে এসে একগাল হেসে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিল, কি বরাত আমার। আপনি আমার দরজায়?

কাল অতটুকুতে আমার মন ভরেনি। তাই তোমার কাছে আবার এসেছি।

অধীনীর ভাগ্য। তসরিফ রাখুন। আপনার মতন ইমানদার লোকের কি তরিবৎ আমি করতে পারি, বলুন?

এই কটা কথাই যমুনাবাঈয়ের কানে গিয়েছিল। আর শুনতে পায়নি। গুলাবী দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

অবাক হয়ে গিয়েছিল যমুনাবাঈ। এই সস্তা দরের ছলা, কলা, ভঙ্গী গুলাবী কোথা থেকে আয়ত্ত করল? কোন নরক থেকে?

সারা দুনিয়ার ওপর যমুনাবাঈয়ের মনটা ঘৃণায় বিষিয়ে উঠল। বড় বড় কথা মানুষগুলোর। সংসারের জ্বালা জুড়াতে এখানে আসে। আর কিছু নয়। গান আর বাজনা। সুর আর তাল, এই নিয়েই মসগুল থাকতে চায়। কিন্তু এই তো তাদের আসল রূপ। এখানে আসে মাংসের আকর্ষণে। দেহের লোভে। নয়তো উমাশংকর এমনি করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যমুনাবাঈকে ফেলে কখনও গুলাবীর ঘরে পড়ে থাকেন!

নতুন লোক এল যমুনাবাঈয়ে ঘরে। মীরাটের ত্রিদিব মালহোত্র। এখানে ম্যারিস মিউজিক কলেজে গান শিখত, একটি বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ঠুংরি শুনতে এসেছিল যমুনাবাঈয়ের কাছে।

ততদিনে উমাশংকরের নেশাও কেটে গেছে। মা আর মেয়ের শিকল কেটে তিনি নিজের মুলুকে উধাও।

ত্রিদিবকে যত্ন করে বসিয়ে যমুনাবাঈ পর পর তিনখানা ঠুংরি শুনিয়েছিল। মাঝরাত পর্যন্ত।

ত্রিদিব পরের দিন আবার এসেছিল। তারপরের দিনও।

প্রথম দিনের পোশাক দেখে যমুনাবাঈ কিছু বুঝতে পারেনি। এমনই সাধারণ ছাত্র। পরণে পায়জামা, সেরওয়ানি। তারপরের দিন ত্রিদিব এসেছিল দামী পোশাক পরে। নিজেদের পরিচয়ও দিয়েছিল। বাপের অগাধ সম্পত্তি মীরাটে। কানপুরে দু দুটো কাপড়ের মিল। ত্রিদিব একমাত্র সন্তান।

পরিচয় পেয়ে যমুনাবাঈয়ের ভাল লেগেছিল। সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘরে গান শোনার এমন রোগ হয় বটে কিন্তু তাতে সর্বনাশই হয়। বাপের রক্তওঠা টাকা কোন রকমে সংগ্রহ করে বাঈজীদের পায়ে উজাড় করে অনেকে ঢালে কিন্তু কতটুকু তার পরিমাপ। দুটো ঠুংরি, একটা গজল আর একটা দাদরাতেই প্রায় শেষ হ'য়ে যায়। তাতে না বাঈজীর মন ভরে, না শ্রোতার। এ পথ হল রহীস আদমিদের পথ, এ শখও তাই। অঢেল রুপেয়া থাকবে, আকাশ ছোঁয়া ইজ্জত, তাই সারাজীবন ধরে বাঈজীদের থালায় দিতে হবে। সারাটা জীবন জড়িয়ে যাবে গানের মিহি স্বপ্ন-সুতোয়।

বিপর্যয় ঘটল চারদিনের দিন।

ত্রিদিব সেদিন একটু বেলাবেলি এসেছিল। তখনও যমুনাবাঈ তৈরী হয়নি। একলা একলা বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল, ভেতরে এত্তেলা পাঠিয়ে। হঠাৎ গানের সুর। গান নয় আমন্ত্রণ। একটা যৌবন অনাদৃত, অনাঘ্রাত পড়ে আছে, সমঝদার কেউ কি নেই, সার্থক করে তোলে যৌবনবাহার সেই দেহ।

ত্রিদিব বিচলিত হ'য়ে পড়েছিল। একই ঘরে দু বাঈজী থাকে না, এক মশনদে দুজন বাদশা যেমন নয়। কিন্তু খুব কাছ থেকে আসছে গলার স্বর।

মাথায় ওড়না আঁটতে আঁটতে যমুনাবাঈয়ের কানেও সে গানের স্বর পৌঁছেছিল, সঙ্গে সঙ্গে আরক্ত হয়ে উঠেছিল তার মুখচোখ।

এ রেওয়াজ নয়। কখনও কেউ করে না। একজনের মানুষ এভাবে সুরের ইশারায় ডাকে না আর একজন। গুলাবী তাই করছে। এটুকু যমুনাবাঈ লক্ষ্য করেছে। ত্রিদিব আসার পর থেকেই গুলাবীর চাঞ্চল্য বেড়েছে। অকারণে ঘুঙুর বাজিয়ে বারান্দা দিয়ে যাতায়াত, মুখে হালকা গানের কলি। যমুনাবাঈ এক সময়ে উঠে বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। ত্রিদিব খেয়াল করেনি। যমুনাবাঈয়ের গানে সে বুঁদ হয়েছিল।

আড়ালে, আবডালে গুলাবী সুবিধা করতে পারেনি বলে, এবার সে সোজাসুজি আসরে নেমেছে।

যমুনাবাঈ তাড়াতাড়ি ওড়না এ'টে মেয়ের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গুলাবী। গুলাবী।

গুলাবী এলোমেলো অবস্থায় খাটে শুয়েছিল, সেইভাবে মার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কি মা?

কি শুরু করেছিস কি?

কপট বিস্ময়ে চোখদুটো বিস্ফারিত করে গুলাবী উত্তর দিয়েছিল, কি করেছি।

এই অসময়ে চীৎকার।

চীৎকার নয় মা, গান।

কিন্তু তাই বা কেন। আমার ঘরে মেহমান রয়েছে। সে এখানে এসেছে আমার গান শুনতে। কি ভাববে লোকটা?

চুমকি বসানো ওড়নার প্রান্তটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে গুলাবী বলেছিল, সে ভাববে এই বাড়িতেই আর একজন আছে, যার গলা আরো মিষ্টি, বয়স আরও কাঁচা।

একটা হাত সজোরে তুলেই কি ভেবে যমুনাবাঈ নিজেকে সামলে নিয়েছিল। দাঁতে দাঁতে চেপে বলেছিল, গুলাবী, এ বাড়ি আমার।

আলবৎ। কবে আমি এ নিয়ে আপত্তি করেছি মা।

জানিস, ইচ্ছা করলে এ বাড়ি থেকে তোকে দূর করে দিতে পারি?

সঙ্গে সঙ্গে গুলাবী ঘাড় নেড়েছে, হ্যাঁ, পার বৈকি। নিশ্চয় পার। তাড়াবার দিন দুয়েক আগে বল, আমায় গোছগাছ করে নিতে হবে তো।

যমুনাবাঈ আর দাঁড়ায়নি। আসরে চলে এসেছিল।

আসরেও সেই একই ব্যাপার।

ত্রিদিব জিজ্ঞাসা করেছিল, কে গান করছে?

বল না, আমার পাগলী মেয়ে, তানপুরা টেনে নিতে নিতে যমুনাবাঈ উত্তর দিয়েছিল।

পাগলী?

হ্যাঁ, মাথার একটু গোলমাল আছে।

আর বেশী কিছু বলার অবসর দেয়নি যমুনাবাঈ। গান শুরু করেছিল। একটার পর একটা। একটু বিরতি নয়, কি জানি সেই বিরতির ফাঁকে যদি গুলাবী বাঈ এসে ঢোকে। গুলাবী বাঈ সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে চায় ত্রিদিব মালহোত্র!

এত করেও কিন্তু যমুনাবাঈ শেষ রক্ষা করতে পারেনি।

ত্রিদিবের সঙ্গে গুলাবীবাঈয়ের দেখা হয়ে গিয়েছিল।

গুলাবী যেন তৈরী ছিল। ত্রিদিবের টাঙ্গা থামতেই নেমে গিয়েছিল। সিঁড়িতে দুজনের দেখা।

প্রথমে গুলাবী দু হাত জোড় করে নমস্কার করেছিল। হেসে বলেছিল, আমি গুলাবী। গুলাবী বাঈ। যমুনাবাঈয়ের মেয়ে।

ত্রিদিব নমস্কার ফেরত দিয়েছিল কিন্তু চোখের পলক ফেলতে পারেনি।

আপনি, আপনি গান করেন মাঝে মাঝে? ত্রিদিব জিজ্ঞাসা করেছিল।

নিজের মনে গাই। আকাশের মেঘকে শোনাই, গোমতীর জলকে। আর শোনাবার মানুষ কই আমার? গুলাবী অপাঙ্গে ত্রিদিবের দিকে চেয়ে হেসেছিল।

সে কি কথা। অমন গানের শ্রোতা নেই? বেশ এবার থেকে আমি শুনব। বলবেন, কখন আপনার সময় হবে?

আপনার সময় আমার সময়। যে কোন-দিন বিকেলে তশরিফ নিয়ে আসবেন।

ত্রিদিবও সরে গেল যমুনাবাঈয়ের ঘর থেকে। প্রথমে যমুনাবাঈয়ের অনুমতি নিয়ে। দু একখানা গান শোনার আশায়। তারপর বরাবরের মতন। এও যেন যমুনা-বাঈয়ের জানা। এর একমাত্র প্রতিকার এখান থেকে গুলাবীকে হঠানো। স্পষ্ট তাকে বলে দেওয়া, রূপ আছে, যৌবন আছে, কণ্ঠ আছে, এই বেলা অন্য গাছে বাসা বাঁধ। এখানে আর নয়। এমনই করে বুকের ওপর বসে সর্বনাশ করতে দেবে না যমুনাবাঈ।

কিন্তু মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ানোর অসুবিধা আছে। বয়স হচ্ছে যমুনাবাঈয়ের। আজকাল নাচতে একেবারেই পারে না, এক-টানা গাইতেও বুকে হাঁপ ধরে। কোন রকমে একটা গান শেষ করে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একাধিকবার গাইবার দম পায় না। চুলের মাঝে মাঝে রুপের রং লাগছে। গালে, কপালে অস্পষ্ট রেখা। হাজার কমলালেবুর খোসা ঘসেও সেসব দাগ উঠছে না। এর মানে যমুনাবাঈয়ের অজানা নয়।

এই বয়সে সম্বল রোজগারী মেয়ে। শেষ জীবনটা তার উপার্জনেই হেলান দিতে হয়। এ ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

কাজেই গুলাবীবাঈকে সহ্য করা ছাড়া আর করার কিছু নেই যমুনাবাঈয়ের। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে তার যত ঔদ্ধত্য, অশালীনতা, সব সহ্য করতে হবে।

কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল যমুনাবাঈয়ের। ত্রিদব মালহোত্র মারা গিয়েছিল। শেষ দিকে রোজ সন্ধ্যার গা গরম হ'ত, খুকখুকে কাসি, তারপর একদিন জমাট রক্ত গড়িয়ে পড়ল ঠোঁটের দু পাশ দিয়ে কবিরাজ বলে-ছিলেন, রাজযক্ষ্মা। তারপর মাসখানেক বোধ হয় বেঁচেছিল।

যমুনাবাঈ, গুলাবী কেউই আর খোঁজ রাখেনি।

ত্রিদিবের পর এসেছিল উনাওয়ের লছমী-প্রসাদ।

একই ইতিহাস। প্রথমে যমুনাবাঈয়ের ঘরে। পর পর দিন পনেরো চলল গানের আসর। লছমীপ্রসাদ নিজেও গুণী লোক। বীণাতে গুর্জরী টোড়ি বাজিয়ে শোনাল। পটদীপ রাগে খেয়াল।

পনের দিনের দিন ছন্দ পতন হয়েছিল।

সবে যমুনাবাঈ গান শুরু করছে, হাতুড়ী দিয়ে তবলাটা ঠিক করছিল লছমীপ্রসাদ, গুলাবী এসে ঘরে ঢুকল।

মা, আলমারীর চাবিটা কোথায় জানো?

মেয়ের আলমারীর চাবি জন্মে মায়ের কাছে থাকে না। কেন এভাবে গুলাবী আচমকা আসরে ঢুকল অজানা নয় যমুনা-বাঈয়ের। যমুনাবাঈয়ের সঙ্গে কথা বললে হবে কি, গুলাবীর নজর লছমীপ্রসাদের দিকে। দু চোখে মদির চাউনি।

ব্যস, ভাঙন ধরল। একটা গান শোনার পরেই লছমীপ্রসাদ উঠে পড়েছিল। মাথা ধরার অজুহাতে।

এরপরের ব্যাপারটুকুও যমুনাবাঈয়ের কণ্ঠস্থ। যমুনাবাঈয়ের ঘরে একটু বসেই লছমীপ্রসাদ ছটফট করেছিল। হাতের ছড়িটা আঙুলের ফাঁকে ঘোরাতে ঘোরাতে গুলাবী বাঈয়ের খোঁজ নিয়েছিল। গোঁফে হাত বোলাতে বোলাতে যমুনাবাঈয়ের দিকে চেয়ে বলেছিল, গলাটা ভারি মিঠে গুলাবীর। ঠিকমত তালিম পেলে বয়সকালে মেয়ে মাকেও ছাড়িয়ে যাবে।

এসব কথা অর্ধেকের বেশী যমুনাবাঈয়ের কানে যায়নি। এটুকু বুঝেছে, এসব শুধু ছলছুতো, ও ঘর থেকে ও ঘরে যাবার।

কিন্তু আর নয়। যেমন করেই হোক আটকাতে হবে গুলাবীকে। তা না হলে কোন মেহমান যমুনাবাঈয়ের ঘরে থাকবে না। বয়স দিয়ে, চাউনি দিয়ে, রুপ দিয়ে বোকা মাছির মতন গুলাবী তাদের টেনে নিয়ে যাবে নিজের জালে।

নিজের মানুষকে আটকে রাখতে পারে না, বাঈজীর কাছে এর চেয়ে লজ্জার আর কিছু নেই।

দিন দশেকের মধ্যে যমুনাবাঈ মন ঠিক করে ফেলেছিল। ঝগড়া নয়, তর্ক নয়, সোজা কথাটা গুলাবীকে বলে দেবে। এক বাড়িতে দুজন বাঈজীর থাকা সম্ভব নয়। এভাবে থাকা রেওয়াজও নয়। মা আর মেয়ে নয় তারা, দুজন বাঈজী। ঠিক তেমনি ব্যবহারই করছে গুলাবী। বাড়ি যখন যমুনাবাঈয়ের, তখন গুলাবীকে অন্যত্র সরে যেতে বলার পুরো অধিকার তার আছে।

লছমীপ্রসাদ গুলাবীর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই যমুনাবাঈ মেয়ের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

গুলাবী কাপড় বদলাচ্ছিল, মাকে দেখে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার লছমী-প্রসাদকে আমি ডাকিনি। নিজে থেকে বুড়ো এসেছে। জ্বালাতন করে মারছে কদিন। বাড়ি থেকে যেতে বলার আগে খুব শক্ত কতকগুলো কথা যমুনাবাঈ মুখস্থ করে এসেছিল। সাধ মিটিয়ে অনেকগুলো কড়া কড়া কথা বলবে গুলাবীকে। এতদিন ধরে মুখ বুজে সব কিছু অপমান সহ্য করার উত্তর। চীৎকার করে, পাড়া জাগিয়ে নয়, খুব আস্তে, একটি একটি করে নারাঙ্গীর কোয়া ছাড়ানর মতন। বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলবে মেয়েকে।

কিন্তু যমুনাবাঈ একটি কথাও বলতে পারল না। সামনের দর্পণে গুলাবীর সমস্ত অবয়বের ছায়াটা প্রতিফলিত হয়েছে। আশ্চর্য এত শীঘ্র ভাঙন এসেছে দেহে? রংয়ে, কাজলে, সুর্মা-আতরে, চোলি-কাঁচুলীতে তৈরী যৌবনের ঘোর মেহমানদের নেশা ধরিয়ে দিয়েছে, ঘণ্টাখানেকের জন্য বেহুঁস করে দিয়েছে তাদের। কিন্তু কতদিন? যৌবন নিয়ে দু হাতে গুলাবী ছিনিমিনি খেলেছে, যমুনাবাঈয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে এই যৌবনকে পণ রেখেছে, ভাবেনি, একদিন দেহে ঢল নামবে। জোয়ারের বেগ কমবে। অত্যাচারে, অনাচারে দ্রুত বয়সের ভার আসবে শরীরে।

হঠাৎ যমুনাবাঈয়ের মনে পড়ে গেল। রুকিনীবাঈয়ের মেয়ে আত্তরীবাঈ। রুকিনীবাঈ যমুনাবাঈয়ের সম্পর্কে বোন। একবার হিসাব করে নিল যমুনাবাঈ। কত বয়স হবে আত্তরীর। পনেরো কি ষোল। অনেকবার রুকিনী বোনকে অনুরোধ করেছে মেয়েকে যমুনার কাছে রাখবার জন্য। যমুনাবাঈ ভীড় বাড়াতে রাজী হয়নি। এইবার, এতদিন পরে যমুনাবাঈ মন ঠিক করে ফেলল। ফৈজাবাদ থেকে আত্তরীকে নিয়ে আসবে।

সব ঝুট। গান, বাজনা, নাচ, কোন দাম নেই এসবের। মানুষ শুধু বয়স চায়। যৌবন টলমল দেহ। সবাই তাই। রায়-বেরিলির উমাশংকর, মীরাটের ত্রিদিব মাল-হোত্র, উনাওয়ের লছমীপ্রসাদ। এরা মুখে বড় বড় কথা বলে, রাগরাগিনী নিয়ে বিশ্লেষণ, দেহাতীত ভালবাসার কথা, বিভিন্ন মার্গ সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা। কিন্তু সব মিছে। এসবের তলার শুধু বুভুক্ষু দৃষ্টি দিয়ে বয়স খোঁজে সবাই। কাঁচা বয়স।

এই কাঁচা বয়সই যমুনাবাঈ আমদানী করবে। যে অস্ত্র গুলাবী মার সঙ্গে প্রতি-যোগিতার ব্যবহার করছে, সেই অস্ত্রেই যমুনাবাঈ তাকে ঘায়েল করবে।

প্রত্যাশী

প্রভাত দেবসরকার
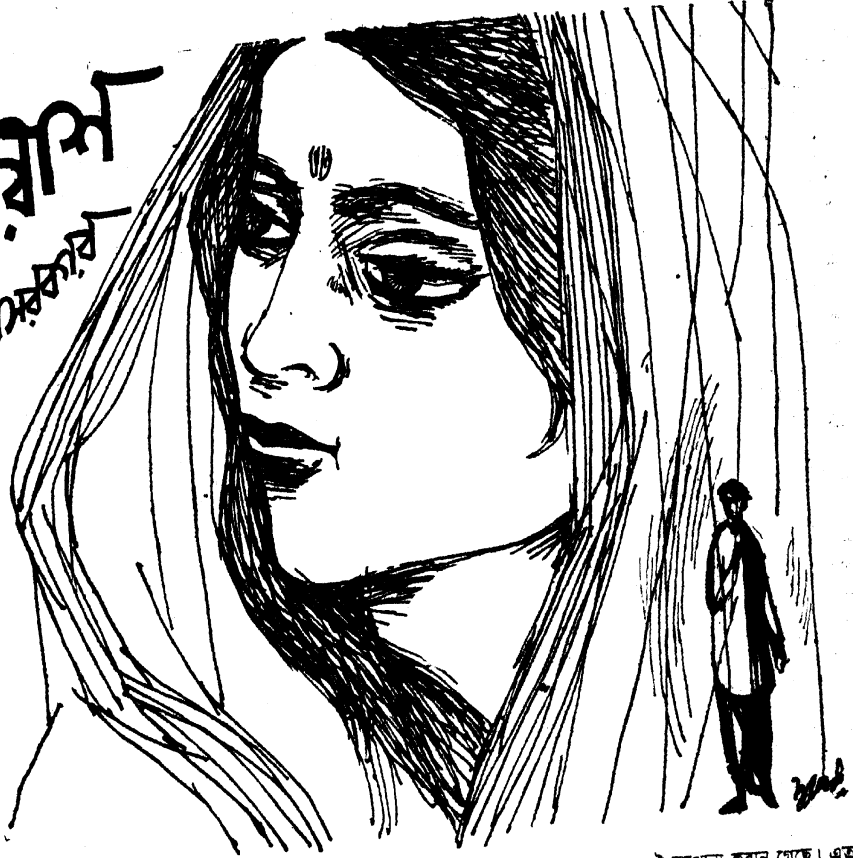
আজও! মাথার দিকে আনলায় ঝোলান পাঞ্জাবিটা উদ্বন্ধনের মত। ওপাশে কুলুংগিতে অন্ধকার নিশ্চুপ, মাটির ঠাকুরের মুখ-ঢাকা ছেঁড়া নেকড়ার পর্দায়।

সুমতি হাত রাখল। দম বন্ধ করল। পাঞ্জাবির পকেটটা গেল কোথায়? না, ভয়ের কোন কারণ নেই—তেমনি পাশ ফিরে অমল শুয়ে আছে। সহজে ঘুম ভাঙবে না মনে হয়।

তবু ঘাড়টা ফিরিয়ে চোখ দুটো সজাগ রাখলে সুমতি. ডান হাতে পকেট হাতড়াতে লাগল। মরে যেন কাঠ হয়ে গেছে পাঞ্জাবিটা!

আজ দুদিন লক্ষ্য করছে সুমতি. ঘুমটা যেন বেড়েছে অমলের। ভোর থেকে তেমন আর তাড়া নেই চায়ের জন্যে। চা এ ন এখন সুমতিকেই চেঁচিয়ে ডাকতে হয়। ঘুম ভাঙাতে হয়।

নিশ্চিন্ত মানুষের ঘুম বুঝি বেশি, ভাবনা না থাকলেই বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকা যায় বেলা দুপুর পর্যন্ত। পাশের বাড়ির সুধাকান্ত বাবুর ঘুম কম নাকি? ভদ্রলোক আচ্ছা ঘুমতে পারেন. সুমতির এক ঘর কাজকর্ম চুকে গেলে ভদ্রলোক এসে ঘুম-চোখে জানালায় বসেন—হাই তোলেন, খবরের কাগজখানার ধীরে সুস্থে ভাঁজ খোলেন! সে-সময় অমল স্নানের জন্যে প্রস্তুত হয়। কোন ভাবনাই নেই সুধাকান্তবাবুর, কলকাতায় তিনখানা বাড়ি, একটা বড় কারবার লোহার কড়ি-বরগার, অমলই এক-দিন সুমতিকে বলেছে—ও'দের কথা বাদ দাও!

সেই রকম ঘুমে পেয়েছে অমলকে? না ডাকলে ওঠে না, বেলা ছটা-সাতটা হ'য়ে গেলেও অকাতর!. ভাবনা-চিন্তাব সব শেষ হয়ে গেছে—কিচ্ছু নেই আর?

হাতটা অবশ হয়ে গেল। মুঠোটা মরণ কামড়ের মত শক্ত যেন। চোখের দৃষ্টিতে ফুলঝুরির স্ফুলিঙ্গ যেন! তেমনি নিঃসাড়, নিস্পন্দ খাটের মানুষটা। নিশ্চিন্ত!

সুমতি রুদ্ধশ্বাসে এসে রান্নাঘরে দাঁড়াল। আড়মোড়া ঘরটার কানা চোখটা যেন পিট্ পিট্ করছে। শোবার ঘরের চেয়েও অন্ধকার—আলো জেবলে ভাতের ফুট দেখতে হয়! চারদণ্ড রান্নাঘরে যদি স্থির হয়ে বসা যায়, গলদঘর্ম। পিঠে আবের মত দ্বিতীয় পরি-কল্পনা এই রান্নাঘর। বাড়িওয়ালাকে বলে বলে তবে এই ঘরখানা করান গেছে। এতদিন তোলা উনুনে দালানের এক পাশে রান্নাবান্না করে নিতে হতো সুমতিকে।

আজও!

দম ছেড়ে হাতের মুঠো খুলে সুমতি বিমূঢ় হয়ে গেল। চোখ দুটো কর্ কর্ করে বাষ্পাকুল হয়ে উঠলো। পাঁচ আনার বদলে পাঁচ টাকা! কাল, পরশু আর আজ, পর পর তিন দিন! আর্থিক স্বচ্ছলতা সুমতি কামনা করে. প্রতিমুহূর্তের চিন্তায় একটি মাত্র প্রার্থনা নিরুপায় সহনশীলতায় উচ্চারিত হয়—আর কিছু চাই না, শান্তিতে দুবেলা দুটি যেন খেতে-পরতে পাই ঠাকুর! আর হিসেব করে চলতে পারা যায় না!

অনেক, অনেক ভাবনা! সব থেকে বিরক্তি-কর আর অশান্তিকর এই সকালের ভাবনা। এখনি উঠে সব খাই-খাই করবে, যেন কাল রাতে সব উপোস গেছে, ওদের শুকিয়ে রাখা হয়েছে!

তেমনি বিরক্ত হয় অমল! সত্যি রোজ রোজ পাওনাদারের মত গিয়ে তার সামনে দাঁড়াতে লজ্জা করে সুমতির। কুঁকড়ে-বাঁকিয়ে, এদিক-ওদিক দেখে তবে এই পাঁচ

আনার মিল করতে হয়। পারলে সুমতি অমলের কাছে ছেলেমেয়ের প্রাতরাশের জন্যে পয়সা চায় না। লুকোন-ছাপান পয়সা থেকে চালিয়ে দেয়। যখন আর চলে না, অচল মনে হয়, তখন এসে অমলের সামনে দাঁড়ায়।

মেজাজ এমনি তিরিক্ষি হয়ে থাকে অমলের। খাটের ওপর বসে খবরের কাগজ নাড়তে নাড়তে বলে, জামার পকেটে দেখ!

দেখে সুমতি। উল্টে-পাল্টে, নেড়ে-চেড়ে, তন্ন তন্ন করে। পাঁচ আনার আর পুরোন হয় না!

এবারে একেবারে তেরিয়া হয়ে ওঠে অমল, খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খাট থেকে নেমে এসে বলে, জ্বালাতন! সক্কাল বেলা আচ্ছা মুশকিল!

সুমতি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আরো নটা পয়সা চাই!

অমল একটা সিকি দিয়ে বলে, এই নাও আর জ্বালাতন করো না!

পয়সাটা নিয়ে সুমতি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। যেন সব দোষ তার। অপরাধী সে।

এ পর্যন্ত পাঁচ আনার হিসাব কিন্তু ঠিক মিলিয়ে দিয়েছে অমল, যতই রাগ করুক, আর জ্বালাতন হোক, মুশকিলে পড়ুক! যে পকেট হাতড়ে আর একটা পয়সা পায়নি সুমতি, সেই পকেটেই বাকি পয়সা মিলেছে—অমলই বার করেছে। ওর হিসাবের কড়ি কোন দিন এদিক-ওদিক হয়নি, ঘড়ির পকেটের কোন্ কোণে যে লুকোন থাকে সিকিটা, আধুলিটা কি একটা কাগজের নোট ভাঁজ-করা, সংসার খরচের জন্যে চোর তো কোন্ ছার সুমতি সারাদিন চেষ্টা করলে বার করতে পারবে না। এত হুঁশিয়ার আর সজাগ অমলের মন পয়সাকড়ি সম্বন্ধে!

কিন্তু আশ্চর্য, আজ অমলের যেন খেয়াল নেই, দু পাঁচ টাকায় ওর কিছু যায় আসে না, গ্রাহ্যই করে না! অন্য দিন হলে কি তুমুল কান্ড বাধাত অমল, দু একটা পয়সার গরমিলে কি অশান্তির সৃষ্টি করতো—যেন চার পাশে চোর-ছেঁচড়ের সংগে বাস করছে! এই দীনতা থেকে ভগবান বাঁচিয়ে দাও—অর্থ কৃচ্ছ্রতার জন্যে মরে মরে একি বাঁচা! আজ বেঁচেছে?

সমস্ত মন, সমস্ত দেহ যেন অবশ হ'য়ে গেছে সুমতির। কত অর্থহীন এই অর্থ, পাঁচ টাকার যার মূল্য—আগামী পনের দিন যা তাকে নিশ্চিন্ত করতে পারবে! প্রায় বিবর্ণ, নেতার মত নোট্‌টা, ছুঁতে ঘেন্না করে! সংসারে বুঝি এই একটি জিনিস আছে যার ঔজ্জ্বল্য ছোটবড়, উচ্চ-নীচ, কেবল অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে। বহু ব্যবহারেও যার কদর কমে না, বর্ণ ম্লান হয় না! আপাত দৃষ্টির ম্লানিমা যার মনকে প্রভাবিত করে না, মূল্যায়নে আজ-কাল-পরশু একই থাকে।

যাক। গত দুদিনের টাকার অনেকটা অংশ সরিয়ে রেখেছে সুমতি। তাই থেকে আজ খরচ করবে। পুরো দশ টাকাই জমবে। কতদিন ধরে কত চেষ্টা করে দশটা পয়সা কখনো জমাতে পারেনি সুমতি। এই বিশ বছরের অভিজ্ঞতায় অর্থের নাগালটা কেবল মরীচিকার মত মনে হ'য়েছে।

নোটটা আর একবার নেড়ে-চেড়ে দেখলে সুমতি। চোখের সামনে তুলে ধরতে কেমন যেন ভ্যাপসা একটা গন্ধ নাকে লাগল। অনেক আগে, যখন মাসের প্রথম দিন মাইনে পেয়ে অমল টাকাগুলো এনে সুমতির হাতে দিত—কি খেয়ালে টাকাগুলো শুঁকে দেখতো সুমতি, কেমন সোঁদা-সোঁদা গন্ধ যেন।

কত ঠাট্টা করতো অমল। লজ্জায় পড়তো সুমতি। তবু গন্ধটা ভাল লাগত, নতুন নোটের গন্ধ খুড় ভাল লাগত সুমতির।

অমল বলতো, 'টাকার গন্ধ ভাল নয়।'

সুমতি চুপ করে টাকাগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, মনে মনে হাসতো বুঝি অমলের গাম্ভীর্য পূর্ণ উক্তিতে।

কেমন ভ্যাপ্‌সানি গন্ধ, সত্যি বুঝি ভাল নয়। দরকার নেই, যেখানকার টাকা সেখানে

রেখে আসবে সুমতি। অনেক পয়সা হাতে আছে ছেলেদের জল-খাবার ব্যবস্থা করবার।

না, দুর্বার একটা লোভ সুমতিকে পেয়ে বসেছে। উঠউঠি আজ তিনদিন সে অমল ওঠবার আগেই তার পকেট সন্ধান করছে। হাতে পয়সা থাকতেও সে প্রতিদিনের অভ্যাস মত চায়ের পাতা ভিজিয়ে প্রাতরাশের রসদের জন্যে এসে দাঁড়িয়েছে, অপেক্ষা করেছে অমলের হাত তোলা বরাদ্দের জন্যে। অমল ওঠেনি, তাই সাহস করে তার পকেটে হাত দিয়েছে, আর কি বিস্মিত আর বিমূঢ় হ'য়ে গেছে। অমন একখানা নয়, আরো দু-চারখানা নোট অমলের পকেট ভর্তি। বলি বলি করেও কিছু বলেনি সুমতি স্বামীকে তারপর, সকাল পেরিয়ে দুপুর, দুপুর শেষ হ'য়ে বিকেল, বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যে, তারপর কত রাত, কত জল্পনা! চার টাকা এগার আনা মনের সংগোপনে ভীরু আকাঙ্ক্ষায় ধরে রেখেছিল সুমতি। একবারও অমলকে জিজ্ঞেস করেনি।

তাছাড়া অন্যদিনের মত নয়, সুমতি লক্ষ্য করেছিল, অমন যেন বড় ক্লান্ত, চোখে ঘুম নিয়ে বাড়ি ফিরেছে! সেই যে শুয়েছে আর জাগেনি, ওঠেনি অমল। বেহুঁশ! ভয়ে ভয়ে সুমতি সাড়া করেনি।

আশাতীত!

ছেলে-মেয়েরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করলে। বরাদ্দ দুখানি বিস্কুট-মার্কা জিলাপী নয় কেবল, সংগে আরো দুটি নিমকি পানের খিলির মত।

সুমতি বললে, অত করে দেখবার কি আছে, পাচ্ছ যাও সব!

সকলেই নিঃশব্দে খাচ্ছে, কিন্তু সবিস্ময়ে তারা বারবার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখছে—আশ্চর্য মায়ের মুখের বদল হ'য়েছে, কত স্মিত, কল্যাণময়ী মা যেন, কত তৃপ্তি যেন অনুলিপ্ত মায়ের দৃষ্টিতে। খুশীও!

মনে মনে হাসলে সুমতি ছেলেমেয়েদের মুখের ভাব দেখে। যেন উপোসী কাঙাল সব! বাপ-মার স্বচ্ছল অবস্থা বিশ্বাস করে না। যেন ওরা চোর পাওনার বেশি পেয়ে।

নিজেও খাবারের অংশ ভেঙে মুখে দিলে সুমতি ছেলেদের সামনে। চায়ের সংগে বেশ লাগে নিমকি!

আরো অবাক হয় ওরা! কল্পনাতীত যেন মায়ের খাওয়াটা—অংশ-ভাগ প্রাতরাশের। ভুলে কোনদিন তারা মাকে চায়ের সংগে আর কিছু মুখে তুলতে দেখেনি, হয়তো ইচ্ছে করেই মা খায়নি, হয়তো কোনদিন কুলতে পারেনি। শুধু চা-ই মা গিলেছে নিঃশব্দে। হাসি মুখে!

কিন্তু আজ হাসি-মুখের যেন ব্যাখ্যা হয় না মায়ের। মাও তাদের সংগে সকালের চায়ে স্বচ্ছন্দে 'সলিড' কিছু খাচ্ছেন।

বড় ছেলেকে সুমতি বললে, আজ একটিন মাখন কিনে নিয়ে আসিস, কাল থেকে রুটি-মাখন টোস্ট খাবি সব! জিলিপিতে পেট ভরে না!

আরো অবাক তারা মায়ের কথা শুনে। একজন বুঝি বিষম খেলে আশু সৌভাগ্যের অভিনন্দনে! মাখন সে তো কি সুধাস্বাদ যেন—খুব নরম, খুব মিষ্টি!

সবচেয়ে ছোট যেটি, কোল-পোঁছা মেয়েটি চোখ বড় বড় করে বললে, আমি খাব মা মাঁখুম-ম!

সুমতি হেসে বললে, সবাই খাবে। জিলিপি খেলে পেটে ক্রিমি হয়!

ছোট পুষু বললে, বিচ্ছিরি! মিষ্টি খালি!

অতঃপর অম্ল-মধুর সবতাতেই! লুকিয়ে লুকিয়ে যেন ব্যবস্থা করে সুমতি। বড় ছেলে বাজার করে পয়সা ফেরত দিলে বলে, পয়সা ফিরিয়ে আনিস কেন রোজ, একটু বেশি করে মাছ আনতে পারিস না? কে তোকে বলেছে বাজারের পয়সা ফেরত আনতে?

প্রবীর মার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চায়। নতুন কথা বলছে মা আজ। এই দুদিন আগেও দেড় টাকার হিসাব দিতে সে হিমসিম খেয়ে গেছে, একবার বাবার কাছে, একবার মার কাছে। দেড় টাকায় গুছিয়ে সব জিনিস আনতে পারেনি বলে বাবা কত যেন বিরক্ত হ'য়েছেন—অত বড় ছেলে বাজার করতে শিখলো না, মাছের পয়সা শাকে, শাকের পয়সা মাছে করেছে। আর শিখবে কবে? কেবল গিলতে শিখেছে!

ওর মধ্যে আবার পয়সা ফেরত চাই! ওর থেকে বিকালের জল-খাবারের ব্যবস্থা হওয়া চাই। অনেক সোজা তার চেয়ে পাটি গণিতের অংক, জ্যামিতির ত্রিভুজ-চতুর্ভুজের রহস্য ভেদ করা।

দেড় টাকা থেকে দু-টাকা, তা থেকে আবার আড়াই টাকা—পয়সা ফিরবে না তো কি! প্রায় এক টাকাই ফিরিয়ে এনেছে প্রবীর।

সুমতি বললে, কপি-টপি এখন কত কি তো বাজারে উঠেছে! আনতে পারিস না? সেই এক ঘেয়ে আলু-পটল-মাছ! আর কিছু কি মানুষ খায় না?

আমতা আমতা করে প্রবীর বললে, সে-সব অনেক দাম যে!

সুমতি ছেলেকে ধমকালে, হোক, আনবি। বাহাদুরি করে তোকে পয়সা ফেরত আনতে হবে না! একটু যদি বুদ্ধি থাকে ছেলের!

সত্যি, এই কদিনে বুদ্ধি কেমন গুলিয়ে গেছে প্রবীরের। মার কথার কোন অর্থ উপলব্ধি করতে পারছে না। এত বুদ্ধি খাটিয়ে বাজার করেও খ্যাতি নেই।

সবে চায়ে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে অমল রান্নাঘর দিয়ে কলতলায় যাচ্ছিল। মা-ছেলের মোকাবিলার সামনে এসে ছেলেকে উদ্দেশ্য করে অমল বললে, তর্কের কি আছে? মা যা বলছে শুনো। ক' পয়সার বাজার তার আবার ফেরত কেন? সব খরচ করো!

প্রবীর আরো অবাক হয় বাবার রায়ে। কোথায় সে কার সংগে তর্ক করছিল, বাবা যে তাকে দোষারোপ ক'রলেন?

তর্ক প্রবীর করতে পারে। আজ ভাল খেয়ে কাল উপোস যাবে নাকি? হাতে পয়সা আছে বলে সব খরচ করতে হ'বে? তারপর যখন পয়সা থাকবে না—

ও'রা আজ সব ভুলে গেছেন! এই সেদিনও মাসের শেষে কতদিন খবরের কাগজ বিক্রি করে বাজারের পয়সা যোগাতে হ'য়েছে—মায়ের চোখের জলে বাবা কথায় লংকা ছিটিয়েছেন। শুধু ডাল-ভাত কতদিন

উদরস্থ করতে হয়েছে নির্বিবাদে। আজ বড় বড়লোক হ'য়ে গেছেন!

বড় অবাক লাগে ভাবতে। বাবাকে যেন আর চেনাই যায় না, অনেক দূরে উনি সরে গেছেন সবার থেকে! সকাল সকাল বাড়ি ফিরে আর তাদের নিয়ে বসেন না, চেঁচামেচি করেন না। প্রায় নীরব হ'য়ে গেছেন। রাতে কখন ফেরেন কে জানে। সব যেন ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছেন। মায়ের ওপর কর্তৃত্ব!

মার মেজাজও বোঝা যায় না। কি যেন একটা মতলবে উনি সারাদিন তন্ময় হ'য়ে আছেন। কেবল পয়সা-কড়ি নিয়ে নাড়া-চাড়া করছেন! অদ্ভুত একটা আত্মপ্রসাদে বিভোর যেন। কিন্তু এ পয়সা হঠাৎ এল কোত্থেকে? বাবা কি খুব বড় চাকুরে হ'য়ে গেছেন? ভগবান হঠাৎ এত সদয় হ'য়েছেন তাদের ওপর?

ওরা ভাই-বোনে লক্ষ্য করেছে মা-বাবার পরিবর্তন, প্রতিদিনের জীবন, নিজেদের মধ্যে জল্পনা করেছে কি হ'তে পারে কারণ। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে ওরা।

ছেলেমেয়ের ভাব দেখে সুমতির কি মনে হ'য়েছিল। একদিন প্রাতরাশের সময় ছেলেমেয়েদের বললে, জান, তোমাদের বাবা খুব বড় হয়ে গেছেন। অনেক টাকা মাইনে বেড়েছে। এবার তোমরা সব ভাল করে লেখাপড়া কর কেমন? কাল থেকে মাস্টার আসবে!

পাঁউরুটি টোস্ট, জেলি-মাখন, নিত্য ভিন্ন রকম রসনা তৃপ্তির—পাশের বাড়ির চেয়ে কম কি সে?

আশ মিটিয়ে মা তাদের রোজ সকালে খাওয়াচ্ছেন। বাবার পদোন্নতি না হ'লে কখনো এমন সম্ভব!

মেজ ছেলে সুধীর বললে, বাবা অফিসার হ'য়েছে বুঝি?

প্রস্তুত ছিল না সুমতি। ছেলের প্রশ্নে হঠাৎ যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়। সত্যি উনি কি হ'য়েছেন, নিজেও বুঝি স্পষ্ট করে জানে না সুমতি। জিজ্ঞেসও করেনি অমলকে। আর কখন জিজ্ঞেস করবে? আগে তবু সুখ-দুঃখের কথা দিন-রাতের কোন এক সময় গভীর সমবেদনায় দুজনে মুখোমুখি বসে আলোচনা করতো, এখন তো সময়ই হয় না অমলের। তাছাড়া বড় ভয় করে সুমতির অমলকে। যেচে পড়ে আর যেন কিছু বলা যায় না মানুষটাকে সংসার সম্বন্ধে—ভাবনা তো সে কিছু রাখেনি! এমন শান্তি কোনদিন স্বামীর কাছে প্রত্যাশা করেনি সুমতি!

সুমতি মিয়োন সুরে বললে, হাঁ।

সব ছোট মেয়েটি বললে, আমাদের কেলাসের শিবানীর মামাও আপিসার, জান মা!

প্রবীর একটু মাতব্বরি করলে, অফিসার কাকে বলে বল দিকি?

সে-কথাটা কেউ জানে না। পদ এবং অর্থের মাপটা কি এবং কতখানি।

প্রবীর বললে, পাঁচশো টাকার ওপর যারা মাইনে পায় আর যাদের সই-এ চাকরি হয় তারাই আপিসার!

খুব অবাক মানে আর ছেলে-মেয়েরা। একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা যেন ঘটে গেছে তাদের ভাগ্যে, তাদের সংসারে। তাদের বাবা অনেক বড় হ'য়ে গেছেন! লোকের চাকরি দিতে পারেন ইচ্ছে করলে, একটা সই কেবল! আর কেউ পারবে নাকি—

যেন ভূত দেখে সব বিহ্বল হল। ছেলে-মেয়েরা যে যেখানে পারলে সরে গেল। সুমতি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে, অমল কখন এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছে ওদের মাঝখানে।

সুমতি উঠে সয়ে যাচ্ছিল। অমল হাত নেড়ে ডাকলে। কেমন অশরীরী যেন ডাকের ভঙ্গীটা।

চোখ দুটো বড় লাল যেন, দৃষ্টি বরফ-চাপান মাছের মত অপলক, স্থির।

বিকৃত কণ্ঠে অমল বললে, একটু নেবুর জল কর তো!

সুমতি প্রতিপ্রশ্ন করবার আগেই অমল শোবার ঘরে ফিরে গেল। আজ হঠাৎ যেন সুমতি লক্ষ্য করলে, অমলের পদক্ষেপ স্থির নয়।

একটু বুঝি অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল সুমতি বিপরীত কি ভেবে। বার বার অমলের ডাকে সম্বিত ফিরল—'ক ঘণ্টা লাগে একটু নেবুর জল করতে?'

এই প্রথম যেন অমল নিজ স্বভাবে ফিরে এল অনেকদিন পরে। সুমতি ভয় পেলে।...

আজকাল ঘুম আসতে যেমন দেরী লাগে তেমনি আবার ঘুম ভেঙে গেলে কিছুতে জোড়া লাগে না। একটা যন্ত্রণার মত মনে হয় জেগে বিছানায় পড়ে থাকা।

সুমতি বিছানা থেকে নেমে এল। খুট করে আলো জ্বাললে। অমল দিব্যি অঘোরে ঘুমচ্ছে। বিছানার প্রায় সবটুকু জুড়ে আছে। আজকাল একা খাটে কুলোয় না। এই সেদিনও প্রায় সব কটিকে নিয়ে এক ঘরে গুতোগুতি করে শুতো সুমতি। খাটের বিছানায় দুতিনজন শুতো! সব শেষেরটিও আজ মা-বাবার কাছে ঘেঁষে না, দিদি-দাদাদের সঙ্গে ভাব করেছে। কে জানে কোলেরটির জন্যে এমন হয় কি না—প্রায় মাঝরাতে সুমতি জেগে ওঠে, ঘুম ভেঙে যায়। মনে করতে পারে না সুমতি, আগে এমনি ঘুম ভেঙে গেলে কি করতো, কতক্ষণ এমনি যন্ত্রণা কিছু ভোগ করতো কিনা, কি ভাবতো আর ঘুম না আসা পর্যন্ত। পূর্বের কিছু যেন মনে পড়ে না।

এখন ঘুম ভাঙলেই বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ করে ওঠে যেন। তারপর ধড়ফড় করে কিছুক্ষণ!

খাট থেকে নেমে থুপি হ'য়ে বসে দৃষ্টিটা খাটের তলায় চালিয়ে দিলে সুমতি। কি অন্ধকার তলাটা অতল স্পর্শ যেন।

হাঁটু মুড়ে বাক্সটা টেনে আনে সুমতি। একটা পাথর যেন। দিন দিন যেন ভারি হ'চ্ছে।

এক এক করে চোখের দেখা দেখে নেয় সুমতি। না, সব ঠিক আছে। এই সোনা, এই দানা, এই নোটের গোছা আর এই একটা পাশ বই পোস্টাপিসের!

ঘুমের ওষুধ ভালই মাঝ রাতে! সমস্ত অনুভূতি আচ্ছন্ন করে অদ্ভুত তন্ময়তা বোধ করে সুমতি। আরো, আরো এই বাক্স ভর্তি হ'য়ে গড়িয়ে পড়ে না?

রমণীয় বলেই রমণী—

সৌন্দর্য্যই রমণীর প্রকৃতি। মাধুর্য্যই এই রূপায়িত প্রকৃতি, এই রূপায়ণের জন্যই শিল্পীর সৃষ্টি।

অলঙ্কারই মাধুর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহা ভারতীয় নারীত্বের সুমহান ঐতিহ্যময় উত্তরাধিকার। সে জন্য অলঙ্কার শিল্পীরাই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ।

গিনি সোনা বলিতে এম, বি, সরকারই বুঝায়। এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স ও তাহাদের কারখানা, এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নারীত্বের—ভারতীয় নারীর শাশ্বত সৌন্দর্য্যের সেবায় নিয়োজিত।

অলঙ্কার শিল্পে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের সমন্বয় চিরস্থায়ী। অতীতের সুমহান ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আজকের রুচি ও কলা কৌশল। এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স অলঙ্কার শিল্পে অতীতের ঐতিহ্য আর পরিবর্তনশীল রুচির সমন্বয় সাধনে গৌরবের অধিকারী। চিরাচরিত সম্পদ হিসাবে আমাদিগের প্রস্তুত অলঙ্কারই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অভিজাত রুচির প্রকৃত সমন্বয়। ইহাই এম, বি, সরকার এণ্ড সন্সের কৃতিত্ব এবং ইহাই অলঙ্কার শিল্পে নবরূপ সাধনায় ও রুচিবোধের সঞ্চয় করিয়াছে।

১৬৮/সি, ১৬৮/সি/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
গ্রাম: বালিশর—ফোন: ৩৪-৪৪৬৬
২০০/২সি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯
শোরুমের পুরাতন ঠিকানা:
১২৪, ১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে।
গ্রাম-জামসেদপুর, ফোন-জামসেদপুর—সিটি-২৫৫৮এ

ফোন: ৩৪-১৭৬১
গ্রাম—ব্রিলিয়াণ্টস্

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স

গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট

B.B

ক' পয়সা আর নিতে পারে সে রোজ অমলের অজান্তে!

মনে হয়, কদিন যেন বেশ খেয়াল করে চলছে অমল পয়সাকড়ি সম্বন্ধে! পকেট হাতড়ালে আর তেমন করে হাত ভর্তি হয় না।

তবু যা করে নিয়েছে অনেক হিসাব করলে। ভগবান!

সুমতি নিজের মনে যেন কেঁদে ওঠে। আরো অমল বড়লোক হোক, আরো তাদের বাড়-বাড়ন্ত হোক ঠাকুর! আরো দাও তুমি!

আশ্চর্য, হঠাৎ ছুঁচ ফোটার মত কথাটা যেন মনে হয়। কোথা থেকে এত টাকা পায় অমল রোজ? চাকরিতে কত বড় হ'য়েছে অমল?

কিছু জানে না সুমতি। সেদিন মিথ্যে বলেছিল ছেলেমেয়েদের। অফিসার! কেমন যেন ইচ্ছে করেনি জিজ্ঞেস করতে, যেন জানলে ভাল লাগবে না, জানা উচিত নয়। অমলও নিজে থেকে কিছু বলেনি। কি দরকার!

চোখ মুছলে নতুন গহনাগুলো ঝলমল করে। হিরণ্ময় পাত্রে মানুষের যে অশ্রু ধরা থাকে, তার কি অর্থ করা যায়? সুখের মাপ আর কি দিয়ে হ'তে পারে?

চুপ করে ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে বসে থাকে সুমতি।

'ওখানে কি করচো!' হঠাৎ অমল জেগে উঠে জিজ্ঞেস করলে।

তাড়াতাড়ি বাক্সটা বন্ধ করে ভাল মেয়ের মত সুমতি বিছানায় উঠে এল।

অমল বললে, আলোটা নিবেয়ে দাও, চোখে লাগছে।

অন্ধকারে স্বামীর বক্ষলগ্ন হ'য়ে নিজেকে একান্তভাবে মিশিয়ে দিয়ে সুমতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইলে। এই রাতের গভীরে জাগন্ত পুরুষ মানুষের মনে যেটুকু কামনার উদ্রেক হয়, তার সবটুকু পূরণ করে দেয়।

পরিতৃপ্ত অমল বললে, এক গ্লাস জল দাও।

অসহ্য আনন্দে, ভবিষ্যৎ সুখের সুদৃঢ় সম্ভাবনায় সুমতি নিশ্চিন্ত ঘুমের আরাধনা করে। কিন্তু ঘুম আসে না চোখে। অমলের স্পর্শটা কি ঘুমের ব্যাঘাত করছে? কে জানে...

প্রথম কদিন সুমতি বুঝতে পারেনি। তারপর আস্তে আস্তে ব্যাপারটা বোধগম্য হল। বেশ ব্যস্ত আজকাল অমল। সেই আগের মত ভোর বেলায় উঠেই কোথায় যেন চলে যায়, খানিক পরে হন্তদন্ত হ'য়ে ফিরে এসে কোনরকমে চান করে নাকে-মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়ে আবার। খুব তাড়াতাড়ি ফেরে আজকাল আপিস থেকে।

এমন মুশকিল হ'য়েছে, বাজারের পয়সাটা পর্যন্ত চেয়ে নেবার সময় থাকে না। সুমতিকে পুঁজি ভেঙে সংসার চালাতে হয়।

হোক। সময় মত একদিন সুদে-আসলে উসুল করে নেবে। জানে না কি আর সুমতি, ঠিক অমল ভেবেছে (জানচুল আছে লোকটার) টাকা-পয়সা সারছেছে সুমতি। আর কিছু না, কাজের ভান কেবল! সুমতিও চালাক মেয়ে, ঠেকে শিখেছে—ঘুষ আর সংসারে দেবে না।

কিন্তু সময় হ'লেও সাহস হয় না। ক'দিন ধরেটা আমরা করে রেখেছে অমল। কি যেন চিন্তায় আছে। বড়লোক হ'লে বুঝি মানুষের অমন চিন্তা হয়, অমন গম্ভীর হ'য়ে থাকে—বড় মানুষী মেজাজ! সুমতিও বড়লোকের বউ, তার মেজাজ আরো উচ্চ-গ্রামে বাঁধা হ'বে না কেন। দুজনেই যেন রেশারেশি আরম্ভ করেছে, নির্বাক গাম্ভীর্য বাজায় রাখার।

না, আরো কারা যেন ক'দিন এল গেল। অমলের বন্ধুবান্ধব বুঝি। কোনকালে কেউ ছিল না এক সংসার ছাড়া, আজ কত লোক জুটেছে! কিন্তু ঠিক কি বন্ধুত্বের আগমন! না, বোধ হয়।

সব না বুঝলেও, কানে না করলেও, সুমতির মনে হয় ওরা বিশেষ একটা বিষয় নিয়ে সলাপরামর্শ করে। একই লোক তাহ'লে বার বার আসে কেন? আন্দাজ করবার চেষ্টা করে সুমতি, কি হ'তে পারে—কেন ওরা আসে?

সাহস করে একদিন অমলকে জিজ্ঞেস ক'রলে সুমতি। ওরা রোজ রোজ আসে, কারা?

অমল উত্তরই দিলে না। খুব পেড়া-পিড়িতে একদিন বললে, তোমার অত আগ্রহ কেন? বন্ধুবান্ধব আবার কে!

বিশ্বাস হয় না সুমতির। কিছু একটা আছে বুঝি এর মধ্যে। চুপ করে গেলেও সন্দেহটা থাকে।

আর একদিন। অনেক বেলা হ'য়ে গেছে। নটা, দশটা এগারটা বেজে গেল। অমলের খবরের কাগজ পড়া আর শেষ হয় না। মুখ আর মন যেন জড়িয়ে গেছে খবরের কাগজের লেখার সঙ্গে। একদিন নয়, পর পর দুদিন, তিনদিন, চারদিন!

সুমতি জিজ্ঞেস করলে, অফিস যাবে না?
অমল নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, না।
কেন? তেমনি সন্দিগ্ধ সুমতি।
ছুটি নিয়েছি! অমল বললে।

কিন্তু ছুটিরও শেষ আছে মানুষের! তারপরও যে অমল নড়ে না! বাজার-হাটের পয়সা পর্যন্ত দেয় না। যেন অফিস যখন নেই তখন খাওয়া-দাওয়াও নেই! সুমতিরও চাইতে কেমন লজ্জা করে। অনেক পয়সা লোকটার সে সরিয়েছে গোপনে। অমল যদি আর কোনদিন হাত তুলে কিছু না দেয়ও কোন ক্ষতি হ'বে না, অচল হ'বে না সংসার। ঠিক আছে, সুমতি কিছু বলবে না মুখ ফুটে! চলুক, ক'দিন চলে।

এখন আবার একটুতেই ঘুমের ব্যাঘাত হয় সুমতির। এত পাতলা হ'য়েছে ঘুমটা বলবার নয়। প্রায় সারারাত জেগে কাটানর সামিল! কি যে মাথার মধ্যে চিন্তা ঢুকেছে, প্রায় আতঙ্কের মত। অনেক চেষ্টা করে সুমতি ভাবনাগুলোকে সরিয়ে দেবার, উৎখাত করবার। জানালার বাইরে ঐ যে তারাটা জ্বলজ্বল করছে ওর মত কেবল জ্বলতে পারে না সুমতি নিজের মনে? তার কি দরকার এত ভাববার? কেনই বা এত ভাবনা? অকারণ নয় কি?

হয়তো। বিছানা থেকে নেমে এল সুমতি। খাটের তলা থেকে বাক্সটা টেনে আনলে, ডালাটা খুললে—অদ্ভুত একটা গন্ধ নাকে এল। সমস্ত অনুভূতি যেন ভোঁতা হ'য়ে গেল। বাক্স টানার শব্দটা ঝিঁ-ঝিঁর মত কানে ঘুরছে!

সব ঠিক আছে। মনে মনে যেন খুশী হয়ে ওঠে সুমতি। আর কাউকে ভয় করে না সে, ঐশ্বর্যশালিনী! এই-ই চেয়েছিল

সুমতি চিরজীবন, সংসারে ঢোকা থেকে—তার চিরকালের কামনা!

হঠাৎ চমকে উঠলো সুমতি। চোখ বুজিয়ে কেমন শব্দ করতে চাইলে, আতঙ্কগ্রস্ত! ঘরে চোর ঢুকেছিল নাকি! সুমতি গোঁ-গোঁ করে বলতে চাইলে, চেঁচাতে চাইলে,—চোর! চোর! চোর!

অমল অপ্রস্তুত হ'য়ে বললে, আমি! আমি! আঁ, চেঁচাচ্ছ কেন?

বিশ্বাস হল না যেন সুমতির। চোর নয় তা হ'লে! আচ্ছা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে! বুকটা এখনো ধড়াস ধড়াস করছে!

কখন ঘুম থেকে উঠে এসে অমল পাশে বসেছে।

বাক্সের ডালায় হাত রেখে অনুনয়ের সুরে অমল বললে, একটা কথা তোমাকে বলবো ভেবেচি।

গহনার বাক্সটা যেন নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিতে চায় সুমতি, যেন স্বামীর মনের কথাটা বুঝতে পেরেছে।

রুদ্ধশ্বাসে অমল বললে, তোমার গয়না-গুলো দাও, আমাকে বাঁচাও!

চোখ তুলে চাইলে সুমতি স্বামীর মুখের দিকে। মুখটা যেন শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে। ফোলান বেলুন হঠাৎ চুপসে গেছে।

সুমতি বললে, কি হ'য়েচে?

অমল বললে, আমার জেল হ'বে যা ছিল সব দিয়েচি, আর কিছু নেই মামলা চালাবার।

মামলা! কেন? কি হ'য়েছে? কেঁদে ফেলতে চায় সুমতি!

ঘুষের দায়ে পড়েচি! চাকরি যাবে, জেল হ'বে! মামলায় না জিতলে চোর সাব্যস্ত হব। অমল কাকুতি করলে।

কোন উত্তর করলে না সুমতি। যেন বধির হ'য়ে গেছে সে।

তোমার গয়নাগুলো দাও। বাঁচাও! বাক্সর ডালাটা আঁকড়ে ধরে অমল।

স্বামীর হাতটা এক ঝটকায় ঠেলে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সুমতি, না, না! কখখোন না! আমি দোবো না কিছুতে!

আমার জেল হ'বে! অমল বললে।

হোক, তুমি জেল যাও, ফাঁসি যাও, যা খুশি কর! এ আমি তোমাকে কিছুতে দোবো না। তুমি লোভ করো না এর ওপর! সুমতি কেঁদে ফেললে।

অমল জোর করবার চেষ্টা করলে বাক্সটা টানতে লাগল সজোরে।

সুমতি স্বামীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউ-মাউ করে উঠলো—নিজে যা পার কর, ওতে হাত দিও না বলচি, খবরদার! ভাল হ'বে না।

গুটি গুটি উঠে এসে অমল বিছানায় ওপর বসল। হিরণ্ময় পাত্রে অশ্রু জমা হল অঝোরে।

তারা ঠিক করলো চুরি করবে। চুরি নয় ডাকাতি।

পরামর্শ হচ্ছিল সুপ্রভা সরকারের বাড়ির নীচের তলার একটা ছোট কামরায়। উপর থেকে অতিথিদের হল্লা শোনা যাচ্ছে। ককটেল পার্টির পাঁচমিশালী হৈচৈ। সুপ্রভা সরকার আজ অনেককে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে. সকলেই সমাজের উঁচু স্তরের লোক; গাড়ির মালিক, ঝকঝকে তাদের সাজপোশাক। আর পার্টির অঙ্গ-হানির ভয়ে যাদের বারণ করেছে বড় হল ঘরে ঢুকতে, তারাই নীচে বসে মতলব আঁটছে। ডাকাতির মতলব।

সুপ্রভা সরকার বিধবা। কিন্তু সুন্দরী। বয়স খুব বেশী হলে পঁয়ত্রিশ। দেখলে অবশ্য আরও কম মনে হয়। প্রচুর সম্পত্তি। সবই ছিল স্বামীর। এখন তার। কোল-কাতার শহরে অন্তত আটখানা বাড়ি, প্রত্যেকটি ভালো ভালো বাছাই করা জায়গায়, ভাড়াও তেমনি মোটা অঙ্কের, তাছাড়া নগদ টাকা আর গয়নার ওজনও কম নয়।

আশ্চর্য বরাত সুপ্রভার। গরীবের মেয়ে, চাকরি করতো কোন এক ট্রাভেল এজেন্সিতে, হঠাৎ নজরে পড়ে গেল এক বড়লোক বাবুর। তিনিই ব্যারিস্টার সরকার। কিছুদিন আলাপের পরই বিয়ে হল। দাম্পত্য জীবন সুখের হয়েছিল কিনা বলা মুশকিল। তবে বিয়ের পর বেশীদিন তিনি বাঁচেননি। মাত্র তিন বছর।

ক' বছর আগের কুমারী সুপ্রভা ঘোষের সঙ্গে আজকের বিধবা সুপ্রভা সরকারের তুলনা করতে গেলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। কুমারী সুপ্রভা স্বভাবত চঞ্চলা হলেও মোটেই সে বিধবা সুপ্রভার মত ছিল না। কুমারী সুপ্রভার সরু সিঁথি দেখে যূথি অনাঘ্রাতা বলে কারুর মনে হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু বিধবা সুপ্রভার ঘন কালো কেশের মাঝে সাদা সিঁথির আকর্ষণ অনেকের কাছে দুর্নিবার বলে মনে হয়। এখন আর সুপ্রভা সরকার আগের মত রঙীন শাড়ি পরে না। নানারকম সিল্কের সাদা শাড়িই তার একমাত্র অঙ্গসজ্জা, কিন্তু এতে যেন তাকে আরও সুন্দর দেখায়। আরও লোভনীয়। একবার তার সঙ্গে আলাপ হলে সহজে কেউ ভুলতে পারে না। আর একবার দেখা করার জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে থাকে।

দ্বিতীয়বার বিয়ে করার উপায় ছিল না সুপ্রভার, কারণ ব্যারিস্টার স্বামী দান করে গেছেন তাঁর সব সম্পত্তি কোন এক দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে; তবে শর্ত এই, যতদিন বিধবা সুপ্রভা সরকার বেঁচে থাকবে ততদিন সে এ সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে। জোর দিয়ে গেছেন তিনি 'বিধবা' শব্দটার উপর। সুতরাং এতখানি সম্পত্তির মোহ কাটিয়ে 'সধবা' হবার দুর্বুদ্ধি সুপ্রভার মোটেই হয়নি, কারণ সে বুঝেছিল ধনী বিধবা যুবতী হিসেবে সে আজকের ইঙ্গবঙ্গ সমাজে যতজন পুরুষকে নিয়ে খেলা করতে পারবে তা মোটেও সম্ভব হবে না কোন সংসারের গৃহিণী হয়ে। এ জগতে এক জাতের নারী আছে যারা আর পাঁচজনকে খেলাতে ভালবাসে, তাইতেই তাদের আনন্দ। সুপ্রভা সরকার নিঃসন্দেহে সেই শ্রেণীর মেয়ে।

সুপ্রভা সরকারের ব্যবহারে সকলের চেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছে ওর আত্মীয়েরা, বিশেষ করে তিনজন। দুই সহোদর আর এক মামা। তিনজনেই অকৃতদার। ব্যারিস্টার সরকার মারা যেতেই তারা তিনজনে এসে-ছিল সুপ্রভার কাছে, তাকে এই গভীর শোকে সান্ত্বনা দিতে, তাকে দেখা শুনো করতে। হয়তো মনের কোণে লুকোনো ইচ্ছে ছিল এইভাবে সুপ্রভার ভালমন্দ দেখাশুনো করতে করতে তারা একদিন সুপ্রভার বিরাট সম্পত্তি তদারক করারও সুযোগ পাবে। কিন্তু তা আর হ'ল না।

রাখাল ঘোষ সুপ্রভার দাদা। কোন মনোহারী দোকানে অল্প বেতনের কাজ করতো। চাকরি ছেড়ে ছুটে এল বিধবা বোনের কাছে জমিয়ে বসার লোভে।

সুপ্রভা তাকে দেখে ম্লান হেসে বলল ভালই হয়েছে দাদা তুমি যখন এসে পড়েছ

বাজার পত্তরগুলো তুমিই দেখো, বেয়ারা বাবুর্চিদের ওপর আর ওসব ছেড়ে রাখতে চাই না।

রাখাল না বুঝেই পুলকিত হয়, সেসব আর তোকে ভাবতে হবে না। আমি সব সামলে নেবো। একটি পয়সাও বাজে খরচ হতে দেব না।

সুপ্রভার ছোট ভাই দুলাল কিছুতেই স্কুলের গণ্ডী পেরতে না পেরে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন। চেষ্টা করছিল ফিলিমে নামবার, স্টুডিওর আশে পাশে ঘোরাঘুরিও করেছে তবে সুবিধে করতে পারেনি।

তাকে দেখে সুপ্রভা বললে, বরাবরই তো তুই ফিটফাট থাকতে ভালো বাসতিস, তোর ওপর ভার রইল বাড়ি ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখার। জানিস তো নোংরা আমি একদম সহ্য করতে পারি না।

দুলাল বোধ হয় খুব খুশী হতে পারে না, বলে, আমার সংগে চাকর বাকর থাকবে তো? সুপ্রভা হাসে। এ হাসির অর্থ দুলাল বুঝতে পারে না।

কিন্তু সবচেয়ে বিপদে পড়লেন অশোক মামা। যতদিন হাতে পয়সা ছিল রেস খেলে আর মদ গিলে দিব্যি স্ফূর্তিতে কাটিয়েছেন। অবস্থা খারাপ হবার পর থেকেই, আস্তানা গেড়েছেন রাখালদের বাসায়। পিতৃহীন ভাগ্নে ভাগ্নীদের অভিভাবক হবার অছিলায়। দুলালকে ছবিতে নামাবার চেষ্টা তাঁরই ছিল সবচেয়ে বেশী। যদিও তাতে সফল হননি। কিন্তু সফল হয়েছিলেন সুপ্রভার বেলায়। তাকে চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন নিজে। ব্যারিস্টার সরকারের সংগে যখন সুপ্রভার প্রাণের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তখন সুপ্রভাকে তার মায়ের অমতে সবরকম সাহায্য করেছেন এই অশোক মামাই। অতএব অশোক মামা বেশ জানতেন আর কাউকে না হলেও তাঁকে সুপ্রভা নিশ্চয়ই মাথায় করে রাখবে।

কিন্তু সুপ্রভা যখন সহজ গলায় বল্লে, অশোক মামা তোমাকে একেবারে নতুন কাজ দেবো, যা তুমি কখনও করোনি।

অশোক মামা ভাবলেন ভাগ্নী ঠাট্টা করছে, হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কি কাজ রে?

—আমার বাগানটা তোমায় দেখাশোনা করতে হবে।

—বাগান!

—দেখছো তো, কতখানি জমি, কত গাছ, কত ফুল। ও'র বড় শখ ছিল বাগানের, তাই চারটে মালী রেখেছিলেন। আমি বাবা অতগুলো লোক পুষতে পারব না।

অশোক মামা শঙ্কিত না হয়ে পারেন না, আমি মালীর কাজ করবো? তুই কি বলছিস রে?

সুপ্রভার চোখ দুটো হাসে, অর্থপূর্ণ হাসি। তিনজনকে কাছে ডেকে নিয়ে চাপা গলায় বলে, তোমরা কিছু বোঝ না, আগে এ বাড়ির পুরোন লোকগুলোকে বিদায় করি। তবেতো সব কিছু আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে।

এতক্ষণে তিনজনে বোঝে, সুপ্রভার তারিফ করে বলে, সত্যিই তুমি বুদ্ধিমতী।

কিন্তু সুপ্রভা সরকারের বুদ্ধি যে কত প্রখর তা বুঝতে আরও কিছুদিন সময় লাগলো এদের। ব্যারিস্টার মারা যাবার একমাসের মধ্যে পুরোন লোকজনদের সুপ্রভা বিদায় করে দিল অথচ সে জায়গায় নতুন লোক আর সে নিল না। সত্যি সত্যিই খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেললো সুপ্রভা।

এতদিন মামা ভাগ্নেতে মন দিয়ে কাজ করছিল আর লক্ষ্য করছিল কি করে সুপ্রভা এ বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে উঠছে। ভাবছিল এবার তাদেরও সুদিন আসছে। ক্রমে তারাও জাঁকিয়ে বসবে। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে সুপ্রভা. কিছুতেই তার হাতের মুঠো আলগা করল না। একবার যাকে তার মধ্যে ঢুকিয়েছে আর তাকে মুক্তি দিল না।

অতিষ্ঠ হলেন অশোক মামা, অসহ্য মনে হল রাখাল আর দুলালের। কতদিন আর তারা বাজার সরকারের কাজ করবে। খাওয়া থাকা বাদে মাস গেলে মাত্র পঞ্চাশ টাকা হাত খরচা দেয় সুপ্রভা, বলে. আর তোমাদের কি দরকার বল? বিয়ে থা' করনি পঞ্চাশ টাকায় বেশ চলবে।

কথা শুনে তিনজনেই হতাশ হয়ে পড়ে, তাই বলে আমাদের সাধ আহ্লাদ—

সুপ্রভা থামিয়ে দিয়ে বলে, সে সব পরে হবে।

—তার মানে. আমাদের এরকম চাকরের মতই থাকতে হবে নাকি?

—তোমরা মিথ্যে রাগ করছো, বাড়িতে আমরা ছাড়া কে আছে, কে তোমাদের চাকর ভাবছে। দুলাল বিদ্রোহ করে. ভাবে মেজাজ দেখালে হয়ত কোন কাজ হতে পারে। তাই বেশ নাটকীয়ভাবে বলে, যা হোক, আমাদের একটা ব্যবস্থা কর, তা না হলে আমরা এখানে আর থাকব না।

সুপ্রভা নির্দয় কণ্ঠে উত্তর দেয়. তাতে আমার খুব একটা অসুবিধে হবে না। তোমাদের সাহায্যে যে কাজ করার দরকার ছিল তা হয়ে গেছে। পুরোন লোকগুলোকে বিদায় করে দিয়েছি, এখন থাকতে ইচ্ছে না করলে অনায়াসে তোমরা যেতে পার, আমি আটকাবো না।

সুপ্রভা দুটো আঙ্গুল মুখে পুরে চুষতে লাগলো লজেন্সের মতো।

বিপদে পড়লো ওরা তিনজনেই. যাবো বললেই বা তারা যাবে কোথায়? এখানে তবু খাওয়া পরার ভাবনা নেই। বাইরে গেলেই তো আবার সেই অন্নচিন্তা। অগত্যা এ অপমান তারা মুখ বুজে সহ্য করলো. আর বুঝলো চালে তাদের মারাত্মক ভুল হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত সুপ্রভা মেজাজ দেখিয়ে কোন কথা বলেনি, বরং সম্মান রেখেই চলেছে, কিন্তু আজ সে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, এ বাড়ির মালিকান সে একাই, কারুর ঔদ্ধত্য সে সহ্য করবে না।

তবু মুখ বুজে সহ্য করারও তো একটা সীমা আছে। কতদিন আর তারা এভাবে বেঁচে মরে থাকবে, সুপ্রভার স্বেচ্ছাচারিতা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে। বিশেষ করে বাড়ির ভেতরে থেকে তারা যখন নিজেদের চোখে দেখতে পাচ্ছে. লোককে খাইয়ে. পার্টি দিয়ে অকারণে কত টাকা নষ্ট করছে সুপ্রভা অথচ তাদের হাতখরচের বেলা একটা পয়সাও সে বাড়াচ্ছে না। তারা দেখেছে সুপ্রভার খামখেয়ালী মেজাজ। কতজন বন্ধু হিসাবে এ বাড়িতে ঢুকে শেষ পর্যন্ত শত্রু হয়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। আজকে যে সুপ্রভার প্রিয়পাত্র কালই হয়ত তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ কোন কথা বলার উপায় নেই।

এতদিন ধিকি ধিকি করে যে বিক্ষোভের আগুন জ্বলছিল তাদের মনে আজ যেন তা হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। আজকেই এই পার্টির দিনে। ফুলদানীগুলো ঠিক জায়গা মত সাজিয়ে রাখতে রাখতে সুপ্রভা তিনজনকে ডেকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে. আজ অনেক নামজাদা বড়লোক আসবে. দেখো, কোন বাজে লোক না ফস করে ঢুকে পড়ে।

অশোক মামা বিরক্তি গোপন না করে বলেন, এত বড় অদ্ভুত কথা, বাজে লোক কি কাজের লোক তা আমরা বুঝব কি করে! সকলে তো একই রকম পোশাক পরে।

—আহা, চেহারা দেখে বুঝতে পারবে না?

—বেশ কথা বলছো যাহোক, তুমিই বলো না চেহারা দেখে কেউ বুঝতে পারে যে আমরা এ বাড়ির বেয়ারা?

সুপ্রভা ইচ্ছে করেই ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়, বলে, দেখো, আবার লোকজন এসে পড়লে তোমরা হলঘরের কাছে হাঁ করে 'ধিনি কেস্ট'র মত দাঁড়িয়ে থেকো না, সবাই তোমাদের দেখে হাসে।

অশোক মামা কথার চিমটি কাটেন, আমরাও যে তোমাদের দেখে হাসি।

—আঃ বাজে বোক না, ধমকে ওঠে সুপ্রভা, যা বলছি শোন। চুপচাপ নিজেদের ঘরে বসে থাকবে, এই আমার হুকুম।

আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সুলতানা রাজিয়ার মত সুপ্রভা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সুপ্রভার কথা তারা অগ্রাহ্য করেনি। বিকেল থেকে নীচের ছোট্ট ঘরে বন্দী হয়ে বসে আছে। তবে চুপচাপ নয়। উপর থেকে পার্টির হৈ হল্লা যতই কানে ভেসে আসছে, তারা তত গভীর মনোযোগ দিয়ে আলোচনা করছে কিভাবে এ দাসত্বের অবসান ঘটানো যায়, কি করে সুপ্রভার আওতা এড়িয়ে বাইরে গিয়ে ভদ্রলোকের মত বাস করা যায়।

দুলাল জানালার কাছে মুখ গোঁজ করে বসেছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললে, মামা, তোমার জন্যেই আমাদের এই অবস্থা হয়েছে। এ বাড়িতে ঢোকাই আমাদের উচিত হয়নি।

অশোক মামা অন্য কথা ভাবছিলেন। তবু উত্তর দিলেন, কি করে বুঝবো সুপ্রভা এতখানি বদলে যাবে।

—টাকা পেলে সবাই বদলে যায়, দুলাল

দার্শনিকের মত কথা বলে, আমি পেলে আমিও বদলাতাম, তুমি পেলে তুমিও।

রাখাল চেয়ারে বসে এদের কথা শুনছিল, বললে, একটা কোন উপায় খুঁজে বার করতেই হবে, আর বেশীদিন এইভাবে পড়ে থাকলে সুপ্রভা হাত দিয়ে আমাদের গলা কাটবে।

দুলাল ফোঁস ফোঁস করে, তার আর বাকি রেখেছে কি?

রাখাল বোঝাবার চেষ্টা করে, ইচ্ছে করলেই ও আমাদের কিছু বেশী টাকা দিতে পারে। ওর অগাধ সম্পত্তি কে ভোগ করবে, মরে গেলেই তো সব চলে যাবে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে।

—তবুও আমাদের দেবে না, আমরা যেন ওর চক্ষুশূল।

—একটা কাজ করতে পারিস, এতক্ষণে কথা বললেন অশোক মামা, চোখ দুটো তার জ্বল জ্বল করছে, তবে ঐ দস্যি মেয়ে জব্দ হয়।

দু' ভাই মামার কথায় উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, কি কাজ?

—চুরি।

দুজনেই বিস্মিত হয়, চুরি।

—হ্যাঁ, সুপ্রভার গয়না, নগদ টাকা, যা ও বাড়িতে রাখে তাও কম করে হবে পনের হাজার টাকা। সরাতে পারলে আমাদের তিনজনের জীবন দিব্যি কেটে যাবে।

দুলাল ভয়ে ভয়ে বলে, যদি ধরা পড়ে যাই।

রাখাল পরিণতিটা বুঝিয়ে দেয়, বাকী জীবনটা হাজত বাস। সুপ্রভা আমাদের মাপ করবে না, ওকে তো আমি চিনি।

অশোক মামার গলা উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে, সুপ্রভা এখনও আমাকে চেনে না। ও চলে ডালে ডালে, আমি চলি পাতায় পাতায়।

দুই ভাগ্নেই মামার কথা শোনার জন্যে কাছে এগিয়ে আসে। তিনজনে মিলে গুজ গুজ করে কথা বলে। ওপরের পার্টির কথা তারা ভুলে যায়, একটা ভাবনাই শুধু সেই ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঠিক ভাবনা নয়, চক্রান্ত। চুরির চক্রান্ত।

বক্তা অশোক মামা, গলা হারমোনিয়ামের নীচের পর্দায়। বলছে, অভিনয় করতে হবে, ডাকাতির অভিনয়। আমাদের মধ্যে দুজন হাত পা বাঁধা অবস্থায় ঘরের মধ্যে পড়ে থাকবে, জিনিসপত্র সব বিশৃংখল, চারিদিক ছড়ানো। কোন একটা জানালা ভাংগা যেখান দিয়ে ডাকাতরা পালিয়েছে বলবো। সংগে নিয়ে গেছে সুপ্রভার গয়না আর নগদ টাকা।

কথা শেষ করেই অশোক মামা নেপোলিয়ানের মত সগর্বে অন্যদের দিকে তাকাল। ভাগ্নেরা কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা করে। সবটা যেন পরিষ্কার হয় না, জিজ্ঞেস করে, আর তৃতীয় জন? সে কি করবে?

অশোক মামা সোজা উত্তর না দিয়ে বলেন, কোন একদিন বিকেল বেলা সুপ্রভা বেরিয়ে যাবার পর, রাখাল আমার আর দুলালের হাত পা ভাল করে বেঁধে গয়না আর টাকার ব্যাগ নিয়ে চলে যাবে বাজারে। রোজই ও ঐ সময় বাজারে যায়, অতএব ওকে সন্দেহ করার কিছু নেই! সুপ্রভা বাড়ি ফিরে এসে দেখবে আমাদের অসহায় অবস্থা। তাকে আমরা বলব পাঁচজন গুণ্ডা এসে আমাদের বন্দী করেছে, পুলিসের তদন্ত হলেও তারা আমাদের ধরতে পারবে না।

রাখাল রুদ্ধনিঃশ্বাসে কথা শুনছিল, জিজ্ঞেস করে, যদি সে রাত্রে সুপ্রভা ফিরতে দেরী করে?

অশোক মামা তখুনি উত্তর দেন, এমন একটা বিকেল আমাদের বেছে নিতে হবে, যেদিন ওর সকাল সকাল ফেরবার কথা। আমি চাই রাখাল ফেরার আগে সুপ্রভা নিজে এসে বাড়ির অবস্থা দেখুক, তাহলে ডাকাতি বলে প্রমাণ করার কোন অসুবিধেই হবে না।

অশোক মামা যেন ছক কেটে পরিষ্কার

করে ভাগ্নেদের বুঝিয়ে দেন এ চুরির বাহাদুরি কোথায়, এতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

দুলালের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাহলে কবে আমরা এ কাজ করব?

অশোক মামা দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, যত শীঘ্র সম্ভব। সুযোগ পেলে কাল পরশু যে কোনদিন। এ দাসত্ব অসহ্য।

দুই ভাগ্নেই তাতে সায় দেয়, সত্যিই অসহ্য।

সে রাত্রে তিনজনে মিলে যে পরামর্শ করেছিল তা কাজে রূপান্তরিত করার সুযোগ পেল প্রায় এক সপ্তাহ বাদে। বিকেলবেলা বেরবার সময় সুপ্রভা বলে গেল সে আজ রাত নটার শোতে কোন বন্ধুর সঙ্গে ছবি দেখতে যাবে। অতএব সাড়ে আটটায় তার খাবার তৈরি চাই। বাড়ি ফিরবে সে আটটার সময়। রান্না করার বাবুর্চি জ্বরে পড়ে দুদিন থেকে আসছে না বলেই সুপ্রভা খাবার কথা এদের কাছে বলে গেল।

সুপ্রভা বেরিয়ে যেতেই এরা তিনজনে তৎপর হয়ে ওঠে। এরকম সুযোগ আর কোনদিন পাওয়া যাবে কিনা বলা শক্ত। মালী সকাল বেলা কাজ করে চলে যায়, বিকেলে থাকে না। তার মধ্যেই এদের কাজ গুছিয়ে রাখতে হবে। হাতে প্রায় দু' ঘণ্টা সময়।

সত্যিই এসব বিষয়ে অশোক মামার বুদ্ধির কোন তুলনা হয় না। একটুকু হড়বড় না করে দুই ভাগ্নেকে সঙ্গে নিয়ে একটির পর একটি কাজ তিনি করে যান ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত। প্রথমেই সুপ্রভার শোবার ঘরের জিনিসপত্রগুলো চারদিকে ছড়িয়ে ফেলা হল। ভাঙা হল দু চারটে কাঁচের জিনিস? কোনরকম শব্দ না করে হাতের ছাপ না রেখে। সুপ্রভা কখনও একটা দেরাজে তার যাবতীয় গয়না পত্তর জমিয়ে রাখত না। বরং ছড়িয়ে রাখত দু' তিনটে আলমারিতে। সবগুলোই তারা ভাঙল, কোন রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে গয়না আর টাকাগুলো বেঁধে রাখল একটা পুঁটলিতে। রাখাল যাবার সময় বাজারের থলির মধ্যে করে ভরে নিয়ে চলে যাবে। নীচে নেমে এসে ভাঙা হল কাঁচের জানালা, বলা হবে যেখান দিয়ে ডাকাতরা পালিয়েছে। তার পেছনে মাঠের ওপর ফেলা হল অনেকগুলো পায়ের ছাপ, অথচ কোনটাই যাতে স্পষ্ট বোঝা না যায়।

সব কাজ ভাল করে তদারক করে নিয়ে অশোক মামা খুশী হয়ে বল্লেন, এবার তোরা দুজনে মিলে আমার হাত পা ভাল করে বেঁধে মুখে ন্যাকড়া গুঁজে এখানটা ফেলে রাখ। তারপর রাখাল তুই বাঁধবি দুলালকে।

কাজ ঠিক মতই হচ্ছিল, অশোক মামা আর দুলালকে বেঁধে ফেলে রাখাল জিজ্ঞেস করে, দেখদিকি এখন নড়তে চড়তে পারছ কিনা, দুলাল মুখ কুঁচকে বলে, হাতটায় বড় লাগছেরে দাদা, একটু আলগা করে দে। অশোক মামা ধমকে দেন, তা একটু লাগবে বৈকি, আমার পাটা কি কম টন টন করছে, কিন্তু এ না হলে পুলিস বিশ্বাস করবে কেন ডাকাতরা সত্যি সত্যি আমাদের বেঁধেছে।

কিন্তু তিনজনেরই কথা থেমে গেল। কান খাড়া করে শুনল গেটের মধ্যে গাড়ি ঢুকছে। সুপ্রভার গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে গেল তিনজনের মুখ। এত তাড়াতাড়ি সুপ্রভা ফিরে আসবে ওরা কেউই ভাবতে পারেনি।

ভয়ে রাখালের গলা শুকিয়ে যায়, কুঁই কুঁই করে জিজ্ঞেস করে, এখন কি করবো অশোক মামা!

অশোক মামা বিচক্ষণের মত বলেন, আমাদের মুখে ন্যাকড়া গুঁজে দিয়ে তুই জানালা দিয়ে পালা।

কিন্তু বলা যত সহজ কাজে করা তত সহজ নয়। রাখাল তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে, চোখের সামনে ন্যাকড়া থাকলেও খুঁজে পাচ্ছে না; যাও বা পেল হড়বড় করে দুলালের মুখে গুঁজতে গিয়ে, তার গলার মধ্যেই চালিয়ে দিল প্রায়। বেচারি দুলাল, কেশে মরে আর কি।

এদের মধ্যে একমাত্র কাজের লোক অশোক মামা, অথচ তারই হাত পা বাঁধা। ভদ্রলোক জালে পড়া সিংহের মত করুণ গর্জন করেন, তোর পাল্লায় পড়ে সবাই ধরা পড়ে যাব দেখছি। পালা, পালা, ছুটে পালা।

রাখালের চোখে জল এসে পড়ে, তবুও জিজ্ঞেস করে, কিন্তু গয়নাগুলো?

—নিতে গেলেই ধরা পড়ে যাবি রে মুখ্যু।

পেশীবহুল
দুটি হাত দৃঢ়ভাবে
লাঙ্গল ধরেছে মাটির বুকে—
কঠিন ইস্পাতের ফলা ধরিত্রীর বুক
গভীর ভাবে কেটে চলেছে। ইস্পাতের
তাড়নায় উদ্বেল মাটি বীজ ধারণের জন্য
উন্মুখ হয়ে উঠেছে। পদ্ধতিটি পুরা-
কালের সন্দেহ নেই কিন্তু আজ নবীন
ইস্পাত এসে যোগ দিয়েছে
কৃষিকর্মে। পুরনো ভঙ্গুর কাঠের
লাঙ্গলের স্থান গ্রহণ করেছে
ইস্পাতের লাঙ্গল। কম পরিশ্রমে
বেশী ফসল এনে দিচ্ছে চাষীর ঘরে।
শীঘ্রই ট্র্যাক্টরের প্রচণ্ড শক্তির
সাহায্যে মাটির বুক ভরে উঠবে
ফসলের প্রাচুর্যে। এই সমৃদ্ধি
চাষী-কর্মী নির্বিশেষে দেশের
জনসাধারণের জীবনধারণের
মান উন্নত করে তুলবে।
প্রত্যেকের জন্য আরও বেশী
ইস্পাত—এই একটি মাত্র
উদ্দেশ্য সাধনেই 'ইস্কো'র সমস্ত
শক্তি আজ নিয়োজিত।
আপনাদের সেবার মাধ্যমে সমগ্র
জাতির সেবা আমরা করছি ;
আমাদের গর্ব তো সেখানেই।
ইস্পাত
মানেই
আরো খাদ্য
দি ইণ্ডিয়ান আয়রন
অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি
লিমিটেড
INDIAN IISCO STEEL
IIC-77 BEN

রাখাল আর দ্বিরুক্তি করল না, দুজনের মুখে বেশ খানিকটা কাপড় গুঁজে দিয়ে জানালা টপকে পালিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে থেকে চাবি খুলে ঘরে ঢুকলো সুপ্রভা। ঘর অন্ধকার, আলো জেলে অশোক মামা আর দুলালের অবস্থা দেখে শুধু যে সে বিস্মিত হল তাই নয়, রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে চারদিকে ছোটাছুটি আরম্ভ করল। অশোক মামার মুখের কাপড় সরিয়ে ডাকাতির কথা শুনেই সে ছুটল উপরে নিজের ঘরে, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে চীৎকার করে বলল, সর্বনাশ হয়েছে, আমার গয়না পত্তর, টাকাকড়ি সব নিয়ে পালিয়েছে।

অশোক মামা হাঁফাতে হাঁফাতে বলেন, দুজন লোক তো সারাক্ষণ ঐ ঘরের মধ্যেই বসেছিল।

সুপ্রভার আর শোনার ধৈর্য থাকে না। তখুনি পুলিসকে ফোন করে আসার জন্যে।

অশোক মামা বলেন, আমাদের বাঁধনগুলো খুলে দে বাবা, বড় কষ্ট হচ্ছে।

সুপ্রভা অনুনয় করে বলে, আর একটু কষ্ট করতে হবে অশোক মামা, পুলিস এসে দেখুক তোমাদের কিভাবে বেঁধে রেখে ওরা পালিয়েছে।

যথাসময়ে পুলিস এসে অশোক মামাদের মুক্ত করে জবানবন্দী লিখে নিল। সমস্ত বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখে যাবার সময় সুপ্রভাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে গেল, ঘাবড়াবেন না, যথাসাধ্য আমরা চেষ্টা করবো। হয়ত বমাল সমেত চোর ধরা পড়ে যাবে।

সুপ্রভার চোখ ছল ছল করে ওঠে, বলে টাকার কথা আমি ভাবছি না, যা গেছে যাক, কিন্তু ঐ গয়নাগুলোর সঙ্গে যে কত স্মৃতি জড়ানো আছে, তা আপনাদের কি করে বোঝাব। ব্যারিস্টার সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বেছে বেছে আমার জন্যে ঐগুলো কিনেছিলেন। সে কথা কি আমি ভুলতে পারি।

কিছুদিন ধরে পুলিসের তদন্ত চললেও তারা বাড়ির লোকজনকে সন্দেহ করেনি। ধরেই নিয়েছিল এ বাইরের লোকের কাজ। পুলিস রেহাই দিল বটে, তবু এরা তিনজন শান্তি পেল না। নিজেদের মধ্যে সন্দেহের দুর্ভেদ্য মেঘ জমে উঠল। সকলের মাথাতেই প্লেনের প্রপেলারের মত ঐ একটা প্রশ্নই ঘুরছে, কে সরিয়েছে ঐ গয়নার পুঁটলি?

অশোক মামা আর দুলাল ভেবেছিল নিশ্চয় রাখালই পালাবার সময় ওটা নিয়ে গেছে। এতখানি পরিশ্রম যে পণ্ড হয়নি তা ভেবে মনে মনে ওরা খুশী হয়েছিল, কিন্তু রাখাল রাজার থেকে ফিরে এসে জানালো গয়না ও সরায়নি, খালি হাতেই এখান থেকে পালিয়েছিল, ওরা শুধু হতাশই হল না, রাখালকে সন্দেহ করতে শুরু করলো।

রাখাল যেন আকাশ থেকে পড়ে, তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছো না?

দুলাল হিটলারী ভঙ্গীতে উত্তর দেয়, না।

রাখাল গরুর মত নিরীহ মুখ করে বলে, কিন্তু আমি তো তোমাদের সামনে এই জানালা দিয়ে পালিয়ে গেলাম। উপরে তো উঠিই নি। কখন পোঁটলা সরাব? অশোক মামার চোখ পেশাদারী গোয়েন্দার মত ছোট হয়ে আসে, বলেন, প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু পুলিস আসার পর উপরে গিয়ে দেখলাম সুপ্রভার চানের ঘর খোলা। তার পাশেই লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। এঘর থেকে বেরিয়ে তুমি যে ঐ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠনি কে বলতে পারে?

রাখাল হাঁফাতে থাকে, যেন তার দম ফুরিয়ে গেছে, বলে, বিশ্বাস কর, আমি প্রাণের ভয়ে মাটিতে নেমেই ছুটে পালিয়েছি। আবার উপরে যাবার কথা আমি ভাবতেও পারিনি।

দুলাল রাত জাগা পেঁচার মত প্রশ্ন করে, তাহলে গয়না সরালো কে?

রাখাল অন্যমনস্ক স্বরে উত্তর দেয়, আমি কি করে জানব।

অবিশ্বাসের বীজ একবার মনের মধ্যে উপ্ত হলে কিছুতেই তা উপড়ে ফেলা যায় না। তাই নীচের ঐ ছোট্ট ঘরে চলে সারাক্ষণই গুজগুজ ফুসফুস। একজন আরেকজনকে সন্দেহ করে। সেদিন অশোক মামা ঘরে ছিল না।

এ সুযোগ রাখাল ছাড়ে না, দুলালের কাছে গিয়ে বিষ ওগরানো গলায় বলে; মিথ্যে তুই আমাকে সন্দেহ করছিস, আমি তোর দাদা, তোকে ফাঁকি দিতে যাব কেন? দুলাল মিষ্টি কথায় ভোলবার ছেলে নয়, পাশ না করলে কি হবে, ইতিহাসের জ্ঞান ওর টনটনে। জিজ্ঞেস করে, তবে ঔরঙ্গজেব কেন ভাইদের ফাঁকি দিয়েছিল?

রাখাল সে কথা উড়িয়ে দেয়, ওসব নবাব বাদশার কথা ছেড়ে দে।

—কিন্তু পোঁটলাটা গেল কোথায়?

রাখাল সেই কথাই বলতে এসেছিল, ভিলেনের মত ভুরু দুটোকে এক জায়গায় টেনে এনে ফিস ফিস করে বলে, আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে অশোক মামাকে।

দুলালের সত্যি সত্যি হেঁচকি ওঠে, কি বলছিস দাদা।

রাখাল ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে. এ চুরির বুদ্ধি আমাদের কে দিয়েছিল? অশোক মামা নিজে, কিন্তু কেন? নিশ্চয় তার কোন মতলব ছিল। কে বলতে পারে আমরা যখন জিনিসপত্রগুলো উল্টো পাল্টা করার জন্যে নীচের ঘরে ব্যস্ত ছিলাম সেই সুযোগে কোন সময় অশোক মামা পুঁটলিটা সরিয়ে রেখেছিল, পরে পুলিসরা চলে যাবার পর অন্য কোথাও নিয়ে গেছে।

দুলাল জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়, কিছু আশ্চর্য নয়, মামা সব পারে। মামা তো নয়, শকুনি মামা।

রাখাল ইন্ধন যোগায়, দেখছিস না সেই দিনের পর থেকে ও কিরকম চঞ্চল, কেমন যেন আতঙ্কভরা চেহারা।

আজ ওকে ধরতে হবে।

যে কথা সেই কাজ! রাতের অন্ধকারে দুই ভাগ্নে চেপে ধরলো অশোক মামাকে, সত্যি করে বল এর ভেতরে তোমার কোন কারসাজী আছে কিনা।

অশোক মামা সিংহ্র হয়ে ওঠেন, এ বুদ্ধি কে ঢোকালো মাথায়?

রাখাল ভয় না পাবার চেষ্টা করে, তবু তাকে তোতলামিতে ধরে। বলে, আ-আ-মি। অশোক মামা রাখালের চোখের দিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সেখানে কি যেন পড়ে নিয়ে বলেন, ভেবেছিলে তুমি ঠিক লাইনে, তবে একটু ভুল হয়ে গেছে।

—কিরকম?

—চুরি দিন কোন সময়ই আমি একলা ছিলাম না। ভেবে দেখ রাখাল, তোমার সঙ্গে সারাক্ষণই আমি নীচে কাজ করেছি। কিন্তু একজন কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের সঙ্গে ছিল না। অশোক মামা দুলালের দিকে বিড়ালের মত ওত পাতেন।

দুলাল প্রথমটা বুঝতে পারে না, পরক্ষণেই ইঁদুরের মত কুঁকড়ে যায়, চিৎকার করে ওঠে, তুমি এখন আমার পেছনে লাগছো?

অশোক মামা গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেন, আমরা যখন নীচে, তুমি একবার উপরে গিয়েছিলে, ছেঁড়া ন্যাকড়া আনার জন্যে। কি যাওনি?

দুলাল হাঁফাতে শুরু করে, অনুভব করে তার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমা হয়েছে। বলে, সে তো মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্যে।

—আমরা তখন কেউ ঘড়ি দেখিনি। সে সময়ের মধ্যে যে তুমি গয়না সরিয়ে ফেলনি কে বলতে পারে?

—না আমি কিছু জানি না। আমি চুরি করিনি। দুলাল অন্য দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পায়, তার গলা কাঁপতে থাকে, তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছো না, আমি নির্দোষ।

আশ্চর্য ওরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারলো না। সকলের চোখেই সন্দেহের ছায়া। শান্তিহীন দুঃসহ জীবন।

তবু ওরা চুপ করে রইলো। মনে মনে ঠিক করলো পুলিসের হ্যাঙ্গামা মিটলেই যে যার এখান থেকে সরে পড়বে, প্রয়োজন হলে আত্মগোপন করে থাকবে, কিন্তু খুঁজে বার করবেই কে মিথ্যে বলছে। কে অনাদের ফাঁক দিয়ে গয়না সরিয়ে রেখেছে, কিছুতেই তাকে ছাড়া হবে না।

মাসখানেক বাদের কথা। তিনজনেই যখন সন্দেহের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে, সুপ্রভা তাদের ডেকে পাঠান উপরে। তিনজনকেই বসতে বলল চেয়ারে, তাদের হাতে ধরিয়ে দিল তিনটে বড় খাম।

—কি আছে এতে?

সুপ্রভা হাসতে হাসতে বলে, খুলেই দেখ না।

প্রত্যেকের খামেই পাঁচশ টাকার নোট। ওরা তিনজনেই বিস্মিত হয়। অশোক মামা তবুও ঠুকে কথা বলেন, হঠাৎ এত দয়া?

সুপ্রভা কিন্তু চটলো না, খুশী হয়েই বলে, অনেকগুলো টাকা আজ পেয়েছি কিনা।

—টাকা! তেলা মাথায় আবার কে তেল ঢাললো?

সুপ্রভা বাঁ হাত দিয়ে খোঁপার কাঁটা-গুলো ঠিক জায়গায় গুঁজে দিতে দিতে স্বচ্ছন্দে বলে, গয়নাগুলো চুরি গেছে বলে বীমা কোম্পানী ত্রিশ হাজার টাকা দিয়েছে। ভাগ্যিস ওগুলো ইনসিওর করে রেখে-ছিলাম।

হতভম্ব রাখাল প্রশ্ন না করে পারে না পুলিস তবু চোরকে ধরতে পারলো না?

সুপ্রভা হাসলো, বিজয়িনীর হাসি, ধরতে পারবেও না কোনদিন। সগর্বে সে উঠে দাঁড়ালো, লঘুছন্দে চলে গেল পাশের ঘরে।

তিনজনেরই চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে গেল, বুঝতে বাকি রইল না কে গয়নার পুঁটলি সরিয়ে ছিল। হাত পা বাঁধা অবস্থায় তারা যখন পড়েছিল নীচের ঘরে, গয়নার পোঁটলা ছিল বাড়িতেই, রাখাল নিয়ে যেতে পারেনি। সুপ্রভা ওপরে গিয়ে তা দেখতে পায়। সে বুদ্ধিমতী। বীমা কোম্পানীকে ধোঁকা দেবার এ সুযোগ সে হাত ছাড়া করেনি। ত্রিশ হাজার টাকা উপরি লাভ হয়েছে বলেই খুশী হয়ে টাকা ওদের বকশিশ দিয়েছে।

কিন্তু?

তিনজনেই ভয় পায়। সুপ্রভা বুঝতে পারেনি তো যে তারাই ডাকাতির মতলব করেছিল?

বোধ হয় না, নইলে বকশিশের সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দিত সবাইকে।

এইটুকুই যা সান্ত্বনা।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

মূল্য: ৩্ টাকা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারাকিন স্ট্রীট, কলিকাতা--১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

ইস্পাত
মানেই
আরো খাদ্য
পেশীবহুল
দুটি হাত দৃঢ়ভাবে
লাঙ্গল ধরেছে মাটির বুকে—
কঠিন ইস্পাতের ফলা ধরিত্রীর বুক
গভীর ভাবে কেটে চলেছে। ইস্পাতের
তাড়নায় উদ্বেল মাটি বীজ ধারণের জন্য
উন্মুখ হয়ে উঠেছে। পদ্ধতিটি পুরা-
কালের সন্দেহ নেই কিন্তু আজ নবীন
ইস্পাত এসে যোগ দিয়েছে
কৃষিকর্মে। পুরনো ভঙ্গুর কাঠের
লাঙ্গলের স্থান গ্রহণ করেছে
ইস্পাতের লাঙ্গল। কম পরিশ্রমে
বেশী ফসল এনে দিচ্ছে চাষীর ঘরে।
শীঘ্রই ট্র্যাক্টরের প্রচণ্ড শক্তির
সাহায্যে মাটির বুক ভরে উঠবে
ফসলের প্রাচুর্যে। এই সমৃদ্ধি
চাষী-কর্মী নির্বিশেষে দেশের
জনসাধারণের জীবনধারণের
মান উন্নত করে তুলবে।
প্রত্যেকের জন্য আরও বেশী
ইস্পাত—এই একটি মাত্র
উদ্দেশ্য সাধনেই 'ইস্কো'র সমস্ত
শক্তি আজ নিয়োজিত।
আপনাদের সেবার মাধ্যমে সমগ্র
জাতির সেবা আমরা করছি;
আমাদের গর্ব তো সেখানেই।
দি ইণ্ডিয়ান আয়রন
অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি
লিমিটেড
INDIAN IISCO STEEL

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা

সেণ্ট্রিপিটাল
হাউস সার্ভিস
পাম্প নলকূপ,
অগভীর কূপ ও
রিজার্ভারের জন্য
হ্যাণ্ড পাম্প
লিফ্‌ট, ফোর্স ও
ডিপ ওয়েল টাইপ
MAYA
মায়া
যে ট্রেড নামের
উপর আপনি
নির্ভর করতে পারেন
লিপি ক্রাউন
ফলিও সাইজ
প্রিণ্টিং মেশিন
ট্রেডল ও
শক্তিচালিত
প্রেসিসন
পিলার
ড্রিলিং মেশিন—১/২" ও ১১/৪" ড্রিলিং
ক্যাপাসিটি
নন-ফেরাস
টিল্‌টিং
ফার্নেস
—ঘণ্টায় ২০০ পাঃ
ও ৪০০ পাঃ
মেল্টিং ক্যাপাসিটি
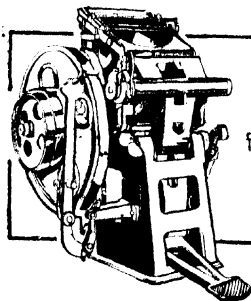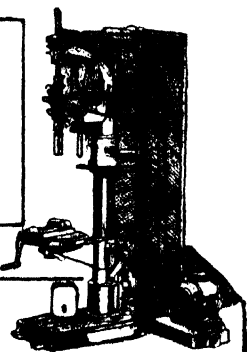
বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

শিশু বলে অবহেলা করবেন না

ওরাই জাতির ভবিষ্যৎ

শিশুদের সর্দি-কাশিকে সামান্য ব'লে উপেক্ষা করবেন না। ওই সামান্যই একদিন শিশুদের স্বাস্থ্যকে নষ্ট ক'রে ফেলতে পারে। ওদের নিয়মিত খাঁটি তাল-মিছরী খেতে দিন। তাল-মিছরী শিশুদের দেহের পুষ্টির সহায়তা করে ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

দুলালের তালমিছরী

প্রস্তুতকারক: শ্রীদুলাল চন্দ্র ভড়
৪, দত্তপাড়া লেন, কলিকাতা-৬
ফোন: ৩৩-৫৬৭৩

"হিজ মাস্টার্স ভয়েস"

উড়িষ্যার পট

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী

রাম মহারানা

মহিষাসুরনির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥

ব্লক ও মুদ্রণ : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে

এসো মা দশভূজে দশপ্রহরণধারিণি জননি, এসো মা গৃহে এসো। দেবগণ তোমাকে নন্দন-কাননের কুসুমের দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দিব্য-গন্ধানুলেপনে তোমাকে করিয়াছিলেন অর্চনা। তাঁহারা দিব্য ধূপে তোমার আরতি করিয়াছিলেন। অভাজন আমরা। আমরা তেমন উপচার কোথায় পাইব মা? মহিষাসুরের প্রভুত্বে পড়িয়া, দেবতাদের সর্ববিধ সম্পদ হইতে আমরা যে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি। তুমি সকলের জননী। আমরা সকলে তোমার সন্তান। সকলকে বুকে জড়াইয়া লইয়া তুমি রহিয়াছ; সকলের কল্যাণকল্পে সতত জাগ্রত রহিয়াছে তোমার দৃষ্টি। আমরা এ সত্য বিস্মৃত হইয়াছি। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকেই আমরা জীবনে সার করিয়া বুঝিয়াছি। নিজেদের মান, যশ, প্রতিষ্ঠার দায়ই আমাদের ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। তোমার সন্তানগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য আমাদের চিত্তে বেদনা নাই, নাই তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের আত্মভাবনা। আমরা তোমার দুঃখ বুঝি না মা! মাতৃস্নেহবিবর্জিত বঞ্চিত আমাদের ধিক্কৃত এই জীবনের দৈন্য তুমি দূর কর জননি। এসো শরণাগত দীনার্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে, তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ করো। দুর্গতি-নাশিনী দুর্গারূপে বঙ্গের অঙ্গন আলো করিয়া তুমি আসিয়া দাঁড়াও। আমরা সকল সন্তান মিলিয়া মা, মা বলিয়া তোমার কাছে ছুটিয়া যাইব। সন্তান-স্নেহে উন্মাদিনী তোমার রূপ সুধা আমরা নয়ন ভরিয়া পান করিব। গাহিব আমরা তোমারই জয়। আমরা হৃদয়ের রক্ত-পদ্মে অর্ঘোপহার রচনা করিয়া তোমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিব। আমাদের সাধ পূর্ণ কর মা।

॥ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়কে লিখিত ॥

[শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর। যৌবনে তিনি বহু বৎসর শান্তিনিকেতনের সাথে জড়িত ছিলেন ও কবিগুরুর সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। আশ্রমের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের জমিদারী কার্যেও তিনি দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদান কালেই তিনি একদিন পাড়ি জমান সুদূর আমেরিকার উদ্দেশ্যে। সেখানে ইলিনয় (Illinois) বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি লাভ করে, ডেট্রয়েট-এ বিখ্যাত ফোর্ড কারখানায় কিছুদিন হাতেকলমে শিক্ষালাভ করেন।

আমেরিকা প্রত্যাগত কর্মবহুল জীবনে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল কবির শেষজীবন পর্যন্ত। শান্তিনিকেতনের বৈদ্যুতিকরণ এবং সেখানে টেকনিকাল বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে কবিগুরু যে বরাবর বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতেন তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে নিম্নে প্রকাশিত কতকগুলি চিঠিতে। বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞান ব্যতিরেকে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে এবং রবীন্দ্রনাথ যে সে বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন তারও পরিচায়ক এই চিঠিগুলি। শান্তিনিকেতনে টেকনিকাল বিভাগ খুলতে তাই তিনি ক্রমাগত তাড়া দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত রায়কে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের জীবনাবসান হয় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর।

কতকগুলি চিঠি তারিখবিহীন। তবে সেইসব চিঠিতে সমসাময়িক ঘটনাবলীর যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার থেকে আনুমানিক তারিখ নির্ণয় করা কঠিন নয়। চিঠিতে বিশেষ চিহ্নদ্বারা যথাস্থানে তার উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিগুলি শ্রীযুক্ত রায়ের পত্নী শ্রীযুক্তা মৃণালিনী দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

ওঁ

16, More's Garden,
Cheyne Walk, S.W.

কল্যাণীয়েষু,

আমি যখন অর্শের অপারেশন করিয়ে Nursing Home-এ শয্যাগত হয়ে পড়ে আছি এমন সময় ব্রুক্‌স[১] সাহেবের কাছ থেকে তোমার আকস্মিক অপঘাতের[২] খবর পেয়ে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলুম—কিন্তু তার অনতিকাল পরেই চিঠি পাওয়া গেল যে তুমি বিপদ উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমার উপর ঈশ্বরের কৃপা আছে—তিনি বারম্বার অগ্নির ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমার ভিতরকার সোনাটিকে উজ্জ্বলতর করচেন, তিনি আঘাতের ভিতর দিয়েই তোমাকে আদর করচেন। এই দারুণ ঘটনার ভিতর দিয়ে তুমি সেই দূর প্রবাসে কত দয়া কত সেবা কত যত্ন পেলে। যখন আপনার লোকের কাছ থেকে আমরা আদর পাই তখন তার মূল্য আমরা বুঝিনে—কিন্তু যখন নিঃসম্পর্ক বিদেশী দুঃখের দিনে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ায় তখন মানুষ যে মানুষের কত কাছে সে কথা অত্যন্ত নিবিড় করে বুঝতে পারি—সব মানুষের হৃদয়াসন মিলে দিয়ে সেই যে এক ভগবান প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন—বাইরের প্রভেদ নিয়ে আমরা মিথ্যা বিবাদ করে বেড়াই। সেই এককে সকল ভেদের মধ্য দিয়ে আমরা সাধন করব এই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হোক্। ঈশ্বর তোমাকে বিদেশে এনে ফেলে আঘাত দিয়ে সেই এক প্রেমের পরম আনন্দধামে আকর্ষণ করেছেন—তুমি ধন্য হয়েছ। তুমি এর আগেই আক্ষেপ করে লিখেছিলে, কর্মের আবর্তের মধ্যে ভগবানকে স্মরণ করবার অবকাশ ঘটে না—এবার তিনি তোমার কর্মের চক্রের ঠিক মাঝখানে এসে তোমাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন এখন অনেকদিন তুমি তাঁকে ভুলতে পারবে না। কর্মের ঠিক মাঝখানেই তাঁকে স্মরণ করতে পারবে। তিনি তোমাকে এবার জীবনমৃত্যুর সাগরসংগমে তীর্থস্নান করিয়ে এনেছেন—তোমার চিত্ত থেকে কর্মের ধূলি ধৌত হয়ে গেল—আবার একবার আপাদমস্তক নির্মল হয়ে তুমি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে—কর্ম তোমাকে অনেকদিন পর্যন্ত আর ভোলাতে পারবে না। জীবন সংগ্রামে তুমি জয়ী হবে, দুঃখ ও মৃত্যু তোমাকে অভিভূত করতে পারবে না—এবার সেই জয়তিলক ঈশ্বর তোমার ললাটে অঙ্কিত করে দিয়েছেন।

ব্রুক্‌স সাহেবকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ো। Boyer[৩] আমাকে তোমার খবর দিয়ে একখানি চিঠি লিখেছেন সে জন্যে আমার অকৃত্রিম ধন্যবাদ তাঁকে দিয়ো। আমি কাল প্রায় চার সপ্তাহ পরে Nursing Home থেকে বেরিয়েছি—এখনো সম্পূর্ণ বললাভ করি নি। তুমি যখন সুস্থ হবে তোমার খবর জানিয়ো। আমরা হয়ত সপ্তাহ দুয়েক পরে Continent-এ যাব—অতএব Thomas Cook-এর care-এ Ludgate Circus লণ্ডনে আমাকে চিঠি দিয়ো। [১৯১৪ ?]

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(১) ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক।
(২) আমেরিকা থাকাকালীন শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় আকস্মিক ট্রেনদুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত হন।
(৩) ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন অধ্যাপক।

ওঁ

16, More's Garden,
Cheyne Walk, S.W.

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পড়ে বোধ হল আমার শেষ চিঠিখানি এখনো তোমার হস্তগত হয় নি। আমি সেটা Brookes-এর care-এ পাঠিয়েছিলুম তিনি অন্যত্র আছেন বলে বোধ হয় তোমার পেতে দেরী হচ্চে।

জীবনে যে ঘটনায় কঠোর আঘাতের মধ্যে কেবলমাত্র আমরা আঘাতকে দেখি নে, তার ভিতর দিয়ে জীবনের চির-সত্যকে আমরা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাই তার মত এমন অমূল্য অভিজ্ঞতা আর কিছু হতে পারে না। এ যে ঘা মেরে তোমার জানলা খুলে দিলে সেই খোলা প্রবেশ পথ দিয়ে হঠাৎ তোমার ঘর আলোয় ভরে গেল এবং সেই সঙ্গে তোমার বন্ধু তোমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। না হয় গেল তোমার আগল ভেঙে—সে লোকসানের কথা কে মনে রাখবে? তোমাকে যে তিনি কত রকম করে চেতন করাচ্চেন তাই দেখে আমি আশ্চর্য হচ্চি। এ সংসারে আঘাত ত অনেকের দ্বারেই আসে কিন্তু সবাই ত জাগে না। তোমার মধ্যে একটি জাগবার মানুষ আছে বলেই তোমার কাছে কোনো দুঃখ ব্যর্থ হচ্চে না। তোমার সেই নিজের ভিতরকার সত্যপুরুষের পরিচয় তুমি যতই পাচ্চ ততই ধন্য হচ্চ। যিনি তোমার কপালে এবার দুঃখের জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন তিনি তোমার জীবনকে চিরদিন জয়যুক্ত করুন এই আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি।

আমার এখানে আর চলচে না। মনে অনুভব করছি এখানে আমার কাজ শেষ হয়েছে। কাজ যখন সাধনার চেয়ে বড় হয়ে উঠতে চায় তখন তাকে ঝেঁটিয়ে ফেলে বেরিয়ে পড়বার সময় আসে—আমার সেই সময় এসেছে। সেই জন্যে মনের মধ্যে কেবলি তাড়া আসচে। আর বিলম্ব করলে চলবে না এবার সমুদ্রপারের আয়োজন করতে হচ্চে। খুব সম্ভব আমরা আগামী ১১ই সেপ্টেম্বরে এখান থেকে বিদায় হব। আমার বইগুলো অক্টোবরে বের হবে—কিন্তু তার জন্যে হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকলে চলবে না। একদিন তোমাদের সঙ্গে ভারতবর্ষে দেখা হবে সেই জন্যে অপেক্ষা করে রইলুম। সোমেন্দ্রকে১ আমার আশীর্বাদ জানিয়ো। [১৯১৪?]

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১) আগরতলার সোমেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্মণ

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

বঙ্কিম, তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলুম। শান্তিনিকেতনে টেকনিকাল বিভাগ খুলতে ইচ্ছা করি এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে অনেক পরামর্শ করবার আছে। তুমি যে কাজে রথীর সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্চ—তাতেও শান্তিনিকেতনের ছেলেরা অনেক শিখতে পারবে। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এক জায়গায় যদি আমরা যে-কোন-একটা কারখানা খুলতে পারি, তাহলে সর্বদা তার সঙ্গে পরিচয় ঘটাতেই ছেলেদের যথার্থ উপকার হতে পারবে। কি রকম কারখানা এবং তার খরচ কি রকম তার একটা প্ল্যান এবং এস্টিমেট তোমাকে তৈরি করতে হবে। এখানে এসে অবধি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছি। তোমাকে ভাল করে চিঠি লেখবার সময় পাব এমন আশামাত্র নেই। আগামী এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই রকম কান্ড চলবে। তার পরে ছুটি পেলে কোথায় যাব কে জানে? যদি ততদিনে যুদ্ধ থেমে যায় তবে য়ুরোপে যেতে হবে, তা নইলে আবার চীন জাপান হয়ে ভারতবর্ষে যাব।

তুমি ভারতবর্ষে রওনা হবার আগে বেশ ভালরকম পাস-পোর্ট নিয়ে যেয়ো। এখান থেকে এবং জাপান থেকে। নইলে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

মুকুল১ তোমাকে সমস্ত বিস্তারিত খবর দিয়ে চিঠি লিখবে। ইতি— [১৯১৬?]

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ শিল্পী—মুকুলচন্দ্র দে

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি শুনে উদ্বিগ্ন হলুম। একবার তুমি শিকাগোতে গিয়ে কোনো হাসপাতালে ভালরকম চিকিৎসার চেষ্টা করবে নাকি? যদি এটা স্থায়ী হয় তাহলে দেশে ফিরে এলে কষ্ট পাবে।

রথীর চিঠিতে বোধহয় খবর পেয়েছ আমরা এখানে টেকনিকেল বিভাগ খুলতে চাই। তুমি যদি যোগ দিতে পার তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে এ কাজে লাগি। এটাকে যদি লাভের করে তুলতে পার তাহলে সেটা তোমার কাজে লাগতে পারবে। বোধহয় এ জন্যে কিছু মূলধন ফেলবার মত সঙ্গতি আমাদের জুটবে। তুমি কবে ফিরতে পার আমাকে জানিয়ো।

বিদ্যালয়ের অনেক পরিবর্তন দেখতে পাবে। সকলের চেয়ে প্রধান খবর এই যে আমাদের বিদ্যালয়ে এণ্ড্রুজ১ এবং পিয়ার্সন২ যোগ দিয়েছেন। এঁরা মহদাশয় লোক। এঁরা যে কাজ করচেন তারই ত দাম যথেষ্ট তার উপরে এঁরা যে আশ্চর্যরকম আত্মত্যাগ করচেন আমাদের পক্ষে সে একটা মস্ত দৃষ্টান্ত।

সীমোরদের৩ প্রতি আমার আন্তরিক প্রীতি অভিবাদন জানিয়ো। মিসেস সীমোরের কাছে আমরা যে আত্মীয়ের মত ব্যবহার পেয়েছি সে কোনোদিন ভুলব না। আমার বড় ইচ্ছা করে যদি তাঁরা কোনোক্রমে এখানে আসতে পারেন। এখানে আমাদের ঘরের মধ্যে তাঁদের আতিথ্য করতে পারলে আমার সাধ মেটে।

আমি রথীদের সুরুলের বাড়িতে বসে তোমাকে লিখচি। এই বাড়িটিকে সুরম্য করে তুলতে রথী লেগে গেছেন। ফিরে এসে এই একটা নতুন জিনিস দেখতে পাবে। [১৯১৫?]

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১) রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষের পরম সুহৃদ ছিলেন।
(২) ইনিও বিলেত থেকে আসেন শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করতে ও কবিগুরুর সাহচর্য লাভ করতে।
(৩) আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও তাঁর পত্নী।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

আমি Bomanji-কে১ তোমার কথা বলেছিলুম। তিনি বলেছেন তিনি তোমাকে খুঁজে বের করবেন। তার চেয়ে তুমিই তাঁকে খুঁজে বের কোরো। লোকটির জ্বলন্ত উৎসাহ। তাই তাঁকে আমার ভারি ভাল লেগেছে। ইনিই Home Rule League-এ লক্ষ টাকা দান করেচেন। এঁর সঙ্গে আলাপ

হলে তুমি সম্ভবত ওখানকার সম্ভ্রান্ত দলের সঙ্গে ভিড়তে পারবে। তাহলে তোমার তেমন একলা বোধ হবে না। আমাদের দেশের লোকেরা খুব ছোট গণ্ডীর মধ্যে বাস করে—তাদের জীবনের ক্ষেত্রটা যে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। এই জন্যেই তারা ঘুরে ফিরে কেবল নিজের মাইনে নিজের সংসার এই কথাটার মধ্যেই এসে পড়ে। তাদের ভবিষ্যৎটা অত্যন্ত একটা সরু গলি এবং একটুখানি গিয়েই থেমেচে। তাদের চারদিকের লোকেরা খুব বড় করে আকাঙ্ক্ষা করতে এবং বড় করে সাধন করতেই জানে না—কেননা তারা ডোবার মাছের মত অল্প জলেই মানুষ—তাদের বেশী দূরে চলবার মাংসপেশিটাই দুর্বল হয়ে গেছে—এই জন্য নিজের ছোট কেন্দ্রটা ছেড়ে চলতে সাহস পায় না। কাজেই এখানে উপযুক্ত সঙ্গী অভাবে তোমরা ত কষ্ট পাবেই। এমনি করে একলা একলা ভাবেই চিরদিন ত কাটিয়ে এলুম—আমাদের একরকম সয়ে গেছে—তোমাদেরও হয়ত ক্রমে সয়ে যাবে।

কিছুদিন হল একটা বক্তৃতা দিয়েছি সে খবর নিশ্চয়ই কিছু কিছু পেয়েচ। দুই সভায় দুবার বলতে হয়েছিল। প্রবন্ধটা ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে ও ভারতীতে বেরিয়েচে। সেটা হয়ত এতোদিনে পড়েচ।

বেলার[২] শরীরটা ভাল নেই বলে উদ্বিগ্ন আছি। কাল পরশুর মধ্যে আবার আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। ইতি ১১ই ভাদ্র ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(১) বোম্বাই-এর জনৈক ধনী পার্সী ব্যবসায়ী।
(২) কবিগুরুর কন্যা

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

অনেকদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমি ইতিমধ্যে পিঠাপুরমের রাজার ওখানে গিয়াছিলাম। কাল ফিরিয়া আসিয়াছি। বিদ্যালয়ের অনেক উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। রথী সেখানে গিয়া একটা টেক্‌নিকাল বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে ইলেক্‌ট্রিক আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে—একটা Smithy খোলা হইয়াছে—আরো অনেক প্রকারের আয়োজন হইতেছে। আমি নিজে প্রত্যহ তিন ক্লাসের ইংরেজি অধ্যাপনার ভার লইয়াছি। কাজকর্ম ভালই চলিতেছে, আশা করি তোমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য ওখানে উন্নতি লাভ করিতেছে। ইতি ২০ অক্টোবর ১৯১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

শিবপুর কলেজে সুরেন্দ্র মৈত্র (ডাক্তার মৈত্রের দাদা) অধ্যাপক আছেন। তুমি তাঁর কাছে গেলেই সমস্ত বিবরণ জানতে পারবে। তিনি তোমাকে হয়ত বা চেনেন, কেননা এক সময়ে তিনি সস্ত্রীক অনেকদিন এখানে ছিলেন। যাই হোক, আশ্রমের নাম করলেই তিনি তোমাকে যথেষ্ট সমাদর করবেন সন্দেহ নেই। ইতি ৯ কার্তিক ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

শরীর অসুস্থ আছে বলে আজকাল প্রায় শুয়েই থাক্‌তে হয়। নববর্ষের উৎসবের কাজ সুসম্পন্ন হয়ে গেছে।

এখানে টেক্‌নিকাল বিভাগের আয়োজন কিছু কিছু হয়েছে—যন্ত্রও এসেচে—কেবল চালনা ও শিক্ষাদান করবার লোকের অভাব। প্র—বলে একজন national college-র লোককে রাখা হয়েছিল—তিনি honest নন, তাঁকে বিদায় করতে হয়েচে। বিদ্যুৎ আলোর ব্যবস্থা সেই কারণেই পড়ে আছে। তুমি একবার ছুটি উপলক্ষ্যে কয়েকদিনের জন্যে এসে যদি আমাদের পরামর্শ দিয়ে যাও তাহলে বড় ভাল হয়।

এবার পঁচিশে বৈশাখের পরে আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ হবে। কোন মতে একবার আসতে পার?

তোমার ঘরে শিশুর নূতন আবির্ভাব হয়েচে শুনে বড় আনন্দিত হলুম। ঈশ্বর নবকুমার এবং তার প্রসূতির কল্যাণ করুন। তুমি আমার বর্ষারম্ভের আন্তরিক আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ৪ বৈশাখ ১৩২[illegible]

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবতা যে চায় পরিতে গলায়
মানুষের গাঁথা মালা,
মাটির কোলেতে তাই রেখে যায়
আপন ফুলের ডালা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দার্জিলিং-দৃশ্য

শিল্পী ঃ শ্রীনন্দলাল বসু

শ্রীঅলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে
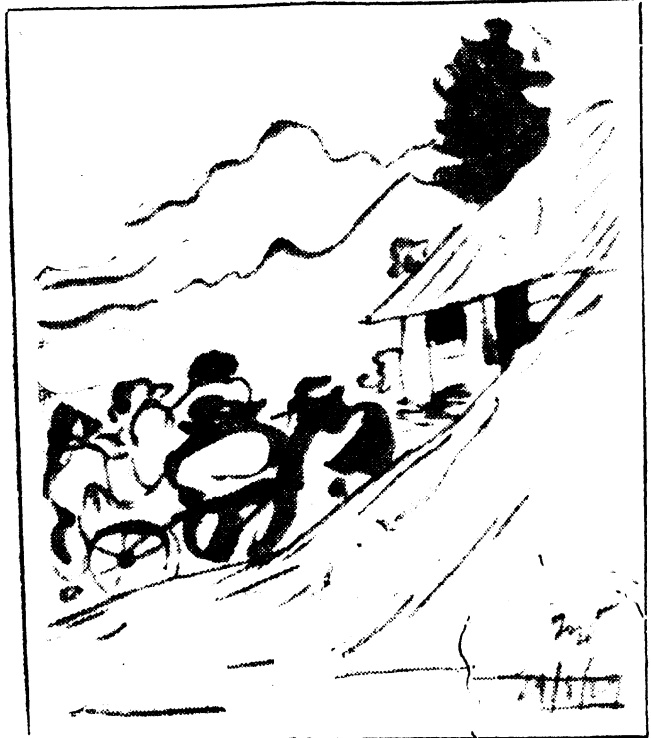
পৌরাণিক যাত্রা ॥ । নারদ-পর্বত সংবাদ

(গন্ধর্বগণ, চারণগণ ও দোহারগণের গীত)

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা,
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরো তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

॥ ইতি যাত্রারম্ভ ॥

(প্রথম)

(পর্বত মুনি ও পার্বতীয়াগণ, নৈপাল অনুচরগণ সকলের গীত)

রাজে রাজে তুহিন সাজে,
হিমগিরিরাজ সাজে
কিরীটে চন্দ্রবিভা
অভ্রভেদী রাজে—স্তব্ধ বরণিমা
ডমরু বাজে, মেঘবিতানে দেবদারু কাননে
কাননে নির্ঝরে—দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি
ঝির ঝির রিমি ঝিমি।
গুরু গুরু গুরু গুরু
গুরু গম্ভীর শ্রী
দিবাবিভাবরী রাজে—

(নৈপালী পাহাড়িনীদের গীত)

গোরিয়া গোরি সবজ সবজ
লীনিম লীনিম

হিমিয়া গিরি—
হো হিম খণ্ডারে
শীলি মাধুরী।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ ॥ অয়মহম্ ভোঃ ভো পর্বতঃ। ওহে পর্বত ভো নৈপালগণ!

পর্বত ॥ আঃ স্বাগতম্ দেবঋষি স্বাগতম।

সকলে ॥ দেবর্ষি, স্বাগত স্বাগত, নমোতি।

(সকলের গীত)

ভাল আছেন্ত ভাল আছেন্ত
মন প্রাণ তো আছে শান্ত
বসেন আসনে ত্রিলোক ভ্রমণে
আছেন দেহতে শ্রান্ত একান্ত।

পাষাণী ॥ রাজসভা নাহি শোভে বিনা গুণীজন।

নারদ ॥ বিনা রাজসভা গুণী না শোভে কখন॥

নির্ঝরিণী ॥ আজ নৃত্যগীত কারণ আপনি আরম্ভন।

নারদ ॥ তোমার মধুর স্বাগত সম্ভাষণে পথশ্রম দূর হল; চলুক তোমাদের শিশিরোৎসব

পর্বত ॥ শিশিরোৎসব কি? পর্বতের এই তো বসন্ত উৎসবের কাল।

(পর্বত ও সহচরীদের গীত)

শশাঙ্ক ভাতি শিশিরীকৃতম্
তুষার সংঘাত নিপাত নিহারিত
কালম্ শিশিরাহবয়ম্!
বিপাণ্ডুর তারাগণ চারু-ভূষণা
শিশির সময় এষা
সান্দ্র তুষার শীতলা
চিত্তং রময়ন্তি সাম্প্রতম
বায়বঃ পুষ্পাসব মোদিতাঃ
প্রকাম কালাগুরু ধূপবাসিতাঃ
প্রেয়সে শ্রেয়সে বোংস্তু নিত্যম;
পিবন্তু মদাম মদনীয়মুত্তমম্ ।

(পানপাত্র প্রদান)

নারদ ॥ বিজয়তু

পর্বত ॥ বিজয়তু, বিজয়তু—

(সহচরী ও সকলের গীত)

পিবতু পিবতু মধুমাতি
রোল বোলত মধুকরপাতি
রঙ্গে হো রঙ মাতি;
ভাতি উজোড় মধুরাতি
চকোর পিকহু পঞ্চম গাতি
পিও পিও বোলন্তু

পিবতু পিবতু
মধুমাস যাতি।

পর্বত ॥ দেবর্ষি, বীণা কোথায়, বীণা কোথায়? হোক্ না—সুতন্ত্রী গীতম্ শুচৌ নিশীথে—

নারদ ॥ পাহাড়ে বসন্তে খরতর বাতাসে বীণা আমার জর্জরিতা হয়ে মেষচর্ম মুড়ি দিয়েছেন আমারি মত।

পর্বত ॥ পিবতু পিবতু। (মধুপান)

(নৃত্যকারীদের গীত)

মহুরীর সৌরভ চহ্দুধার ঘনটায়
মৌমাছি ভোমরা উড়ি উড়ি গুঞ্জরায়
রোউদে ফুকরায় বহু কথা কহুটি
মউলে বউলে মৌ ভরে মিঠি মিঠি॥

(অন্যদের গীত)

বাজে ঝিনি কংকন কিঙ্কিনী
নিঝরে নিঝরে, মঞ্জির রিনি রিনি
কুসুম সুবাস ভরে দিগে দিগন্তরে
বনে বনান্তরে
যেন কোন মন্তরে অন্তর লয় জিনি।

পর্বত ॥ নৈপালগণ, যাও গৃহীত তাম্বুলে বিলেপন স্রজ্জা সকলে তুঙ্গভদ্রা প্রাসাদে অতিথি সংকারের আয়োজন কর। আমরা এই শীলাতলে বিশ্রম্ভালাপ করি। পায়াণি, নির্ঝরিণী, আসব দান কর।

(আসবপাত্র দান)

নারদ ॥ অহো, প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাসবিকম্পিত মধু—এ আমার অদৃষ্টে নাই দেখি কোন কালে।

পর্বত ॥ মুনিবর, হঠাৎ নিরাশ হবার কারণ তো দেখিনে।

নারদ ॥ কে জানে, এই পর্বতের হাওয়াতে কি রকম মস্তিষ্ক যেন ঘূর্ণায়মান করে দিয়েছে। রামগিরি আর অলকাপুরী এই দুটোর মধ্যে মনটা দোদুল্যমান হচ্ছে। হা হন্ত! প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস-বিকম্পিত মধু!

পর্বত ॥ তোমার লক্ষণ তো ভালো বোধ হচ্ছে না। একটা কিছু ব্যবস্থা করা আবশ্যক অতি সত্বরে। চল, তুঙ্গভদ্রা মঠে, কটা দিন নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদে ব্যাপৃত রাখ মনটা!

(সহচরীদের গীত)

হাতে আছে মোহন বাঁশী,
কাছে যারে ভালোবাসি;
দিশি দিশি ফুলে ফুলে
লালে লাল লাল রে,
আর কিবা চাই রে।
চোখ ভোলে মন ভোলে;
হেসে খেলে দিন চলে
কোন ফাঁকে রাত কাটে
ভেবে কুল না পাই রে!

নারদ ॥ ওহে পর্বত, পাহাড়ে বসন্তে হাড়ে হাড়ে জর্জরিত হলেম। মৃত্যুঞ্জয়েরই সয় না তো আমার। আমি চলি মর্ত্য-লোকে নেমে।

পর্বত ॥ আ কুত্র গন্তব্যম্, চল তুঙ্গভদ্রা প্রাসাদে আমার অতিথি হবে। সহচরী-গণ, পথ দেখাও তুঙ্গভদ্রা প্রাসাদের।

(সহচরীদের পথ প্রদর্শন)

পর্বত ॥ অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।

নারদ ॥ এবম্ভবতু, এবম্ভবতু, ওহে পর্বত তোমার এখানে দর্শনীয় যা—

পর্বত ॥ সে হবে দেখা অম্বরীশের আশ্রমে গিয়ে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(শ্রীমতী ও সখীগণের প্রবেশ)

সখী ॥ ওগো রাজনন্দিনী শ্রীমতী চেয়ে দেখ—

(গীত)

মধুঋতু এল ধরণী মাঝে,
হেলে দোলে লতা মোহন সাজে।
অমৃত বরষে মৃদু সমীর,
পরাণ লভয়ে মৃত শরীর।
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়,
ঝরিয়া পড়িছে বকুল তায়।
মধু মালতীর ফুটেছে কলি,
চারিদিকে তার ঘুরিয়া অলি—
গুন গুনাইছে নব রসিক;
পহরে পহরে কুহরে পিক।
ফুলের কে পায় কূল কিনারা,
অগনন যেন গগন তারা।
কেহ বা দোলে কেহ বা ঝোলে
কেহ বা মুখের ঘোমটা খোলে,
রাশি রাশি ফুলে ভরিল সাজি
ঘরে ফিরি চল—আর না আজি॥

শ্রীমতী ॥ বসন্তে কানন আজি কুসুমে কুসুম
এ দুদিন কোকিলের চক্ষে
নাহি ঘুম।

সখী ॥ আরে রাম, অবিরাম কুহু কুহু কুহু
কৃপা করি ওহে পিক
ক্ষান্ত হও মুহু।

সখী ॥ শেষ রাত্রে পঞ্চম সপ্তমে যখন চড়ে
শিয়রের গোড়ায় ডাকাত যেন পড়ে।

শ্রীমতী ॥ হুহুশ্বাস ছাড়িল দক্ষিণ
দিক্ বধূ
কুহুস্বরে অমনি উত্তর দিল মধু।

সখী ॥ তোমার মধুর পায়ে করি আমি গড়
ফুল কাঁপ কাড়ি নিল
গালে মারি চড়

সখী ॥ বদলি দিলেন যাহা কদলীরই তাই
বকুল আম্রমুকুল ভস্ম আর ছাই।

(হরহরি বাবার প্রবেশ)

বাবাজী ॥ হরহরি বোম্ বোম্ বোম্ হরহরি! শ্রীমতী, সখীগণ, পুষ্পচয়ন হচ্ছে বুঝি? উত্তম, উত্তম! আমাকে দর্শন করে ত্রস্ত বিত্রস্ত হবার কি প্রয়োজন! আনন্দ রহো, আনন্দ রহো, ফুল তোল—সিদ্ধি সাধ্যেমতামস্তু প্রসাদাৎ তস্য ধূর্জটে জাহ্নবী যেন লেখেব যম্মূর্দ্ধনী
শশিনঃ কলাঃ।

নীরব কেন—নীরব কেন সকলে?
পবন প্রবল বেগে হও প্রবাহিত
বিদ্যুৎ করিয়া দাও সবে চমকিত
করিতে থাকহ শব্দ ময়ূরের দল
ঢালহ প্রবল বেগে জলদের জল।
চুপ রইলে কেন সখীরা? বল হরহরি বোম্ বোম্!

সখী ॥ তোমার বচন শেলে মর্মে পেয়ে ব্যথা
মৃতপ্রায় কোকিলের
স্ফুরিছে না কথা।

সখী ॥ নৃত্য গীতে ক্ষান্ত দিল
নিকুঞ্জের লতা॥

হরহরি ॥ ডমরু বাজিয়ে চলি শোন দেখতো কেমন লাগে!
আয়রে ভূতিয়াগণ আনন্দ কর্ আনন্দ কর্।

(ভূতিয়াগণের নৃত্য গীত)

বোম্ বোম্ হরহরি গোম্......
ড়িড়িম্ ড়িড়িম্ ডিডিম্ ডিডিম্
চক্করু চক্করু চমরী চমরু
ডিমি ডিম্ ডম্বরু ভোম্ ভোম্ গোম্...
ভবম্ ভোম্ হর্‌হরি...ই ই......

ভূতিয়া ॥ হু কুন্দ-বদনী, হু কৌমুদ্রী সিড়ি পাত্রটা কঁহা থুবিলা—জলদী আব!

শ্রীমতী ॥ সখি—ঘোর করি এল মেঘ
শ্যামাইয়া তরু
বাজিয়া উঠিল আর মেঘের ডমরু।
চল কুটিরে ফিরি!

সখী ॥ কই মেঘ? ওঃ তাইতো—
করিয়া আইল মেঘ এ যে বিলক্ষণ
চিকুর হানিছে ওই ভালো না লক্ষণ।

(উভয়ের প্রস্থান)

হরহরি ॥ কোথায় মেঘ কোথায় কি? বলি বুদ্ধিশীলা তুমি তো হলে শ্রীমন্তীর প্রধানা সখী, আমাকে দেখলেই শ্রীমন্তী অন্তরালে যান কেন বল তো? ওর জন্মাবার পূর্বে থেকে অম্বরীশ আর আমাতে বন্ধুত্ব। আমাকে তো ভয় করার কোন কারণ নেই।

বুদ্ধি ॥ আপনার ঐ ডমরুধ্বনি শুনলেই ও পালায়। হরহরি বোম্ বোম্ শুনলে পর্বতের হৃৎকম্প হয়, ও তো মানুষ। তাতে আবার হরিভক্ত।

হরহরি ॥ হাঃ হাঃ হাঃ হরহরি বোম্ বোম্! বুঝেছি, বুঝেছি বুদ্ধিশীলা, শ্রীমন্তী একেবারে বালিকা। ভূতের দলকে ওর সামনে বার করা নয়! অম্বরীশ বললেন ওকে একটু আনন্দে রাখতে, তাই তো এদের ডেকে আনলেম রাস্তা থেকে। যাও বাপু, তোমরা আমার হরহরি মঠে গিয়ে সিদ্ধি পান করগে মনের আনন্দে। আর ওদের ডাকা নয়। বুঝেছ বুদ্ধিশীলা, একটা কথা শুনলেম,—শ্রীমন্তীর নাকি স্বয়ম্বর হচ্ছে?

বুদ্ধি ॥ স্বয়ম্বর ঠিক নয়, নারদ পর্বত দুজনে রাজার কাছে রাজকন্যাকে প্রার্থনা করেছেন।

অম্বরীশ ॥ আমি তো তাঁদের কন্যাদানে স্বীকৃত হয়েছি।

হরহরি ॥ স্বয়ম্বর ব্যাপার! রাজা কি বলেন--?

বুদ্ধি ॥ রাজা বলেছেন, একটি মাত্র কন্যা আমার, আপনাদের দুজনের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বরণ করতে পারে—যদি তাঁর মনোমত হন আপনারা।

হরহরি ॥ সভাতে তাহলে একটা গোল-যোগের সম্ভাবনা দেখছি। দেখ, বোধ হয় শ্রীমন্তী এই কারণে অন্যমনা আছেন। পূর্বে তো আমার সঙ্গে দিব্য হাস্য পরিহাস করতেন।

বুদ্ধি ॥ ঐ নারদ আর পর্বতের প্রার্থনা শুনে অবধি ঐ রকম হয়েছেন রাজ-কন্যা।

হরহরি ॥ হুম্, ওর মন না জেনে অম্বরীশের হঠাৎ স্বয়ম্বরের প্রস্তাবে মত দেওয়াটা নিবুদ্ধিতার কাজ হয়েছে। কি বল বুদ্ধিশীলা? শিশু-কাল থেকে হরি আরাধনা করছে শ্রীমন্তী—একমাত্র হরিই ওর উপযুক্ত পাত্র হতে পারেন। দেখ, আমি আজই যাচ্ছি হরিদ্বার, তুমি ইতিমধ্যে শ্রীমন্তীকে আশ্বাস দাওগে—বোলো স্বয়ম্বর সভায় ভূতিয়াগণকে নিয়ে আমি দ্বার আগলে থাকব। নারদ আর পর্বত গোলযোগ করেছে কি দক্ষ-যজ্ঞ করে ছেড়েছি। কিন্তু হরিদ্বার যাবার পূর্বে শ্রীমন্তীর মনোভাব স্পষ্ট জানা যায় কি প্রকারে?

বুদ্ধি ॥ আমার সঙ্গে আসুন ঐ বকুলতলায়, ওদের কথাবার্তা অন্তরাল থেকে শুনে যান।

হরহরি ॥ এ ছাড়া উপায় কি? চল, তুমি অগ্রসর হও। আমি আসছি।

(বুদ্ধির নেপথ্যে গমন)

(অম্বরীশের প্রবেশ)

অম্বরীশ ॥ প্রণমামি—

হরহরি ॥ শতং জীবতু, সর্বার্থ সিদ্ধিরস্তু, হরহরি বোম্ বোম্। একটা দ্বিতীয় দক্ষ যজ্ঞ করে তুললে দেখছি হে রাজন্ ঐ নারদ আর পর্বতকে নিয়ে।

অম্বরীশ ॥ কেন কেন অমন কথা বলেন কেন? আমি তো তাঁদের কন্যা-দানে স্বীকৃত হয়েছি—সব দিক বিবেচনা করে।

হরহরি ॥ কেবল শ্রীমন্তীর কথাটা একবার ভেবে দেখনি। উচিত ছিল প্রথমে ওর মন পরীক্ষা করা।

অম্বরীশ ॥ শ্রীমতীর কাছে কিছুই তো গোপন রাখিনি।

হরহরি ॥ শ্রীমন্তী সুশীলা—পিতার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে না তা জানি। কিন্তু তার মনের কথাটা তো তুমি জানবার চেষ্টাও করনি—হরি আরাধনাতেই ব্যস্ত থাক্। ধর যদি অন্য কাহাকেও—

অম্বরীশ ॥ আপনার কথায় আমার চৈতন্য হল। আমি একেবারেই ভাবিনি ও বিষয়টা।

হরহরি ॥ ধর যদি আমাকেই সে চেয়ে বসে, তখন—?

অম্বরীশ ॥ সে হয় না, শ্রীমন্তী পরম-বৈষ্ণবী। হরিভজনা থেকে শিবও তাকে নিরস্ত করতে পারেন না।

হরহরি ॥ দেবমায়া তুমি কি বোঝো? ওদের দুজনের মধ্যে যদি কেউ নামাবলী তুলসীধারী সেজে আসে তখন?

অম্বরীশ ॥ বলেন, আমি কি করতে পারি? শ্রীমতী সম্প্রদান-কাল-প্রাপ্তা, তাকে উপযুক্ত বরে দিতে পারলেই আমার চিন্তা দূর হয়—নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত মনে হরি আরাধনা করি। আমি আপনার শরণাগত, আমাকে উপদেশ করেন কিরূপ কি করা। এ যে বিষম দুশ্চিন্তায় পড়লেম।

হরহরি ॥ স্থিরোভব! দেখ আমার আশ্রমটিতে তোমরা এসে অবধি বড় আনন্দে আছি। শ্রীমন্তীর হাতে পুষ্পে ফলে তরুলতায় সুন্দর হয়ে উঠেছে এ স্থান। আমি তার শুভ-কামনা করেই আসছি। সেই কারণে

বলছি—তার মনোভাব জানা প্রয়োজন সম্প্রদানের পূর্বে। আমি বুদ্ধিশীলার সঙ্গে পরামর্শ করেছি—অন্তরাল থেকে তাদের কথাবার্তা শোনার—তুমি চল আমার সঙ্গে—ভাবছো কি? যদি শ্রীমন্তী আমাকে চেয়ে বসে? সে ভয় কোরো না—পরীক্ষা হয়ে গেছে—ডমরু আর হরহরি ধ্বনি শুনে সে দূরে পলায়ন করেছে। চল বিলম্বোনালম্।

অম্বরীশ ॥ যেরূপ আদেশ।

(উভয়ের প্রস্থান)

(শ্রীমতী ও সখীগণের প্রবেশ)

শ্রীমতী ॥ ঝিলের ওপারে ওই বকুলের গাছ—

সখী ॥ বকুল গাছ কই?

সখী ॥ যখনি উঠিছে জাগি বাতাস দখিনে
আসিছে বকুল গন্ধ,
গাছ তো দেখিনে

শ্রীমতী ॥ ঐ শোনো না বকুলের শাখায় কোকিল ডাক দিচ্ছে।

সখী ॥ আঃ এখানেও কুহি কুহি! যেমন বোল গাছ, কুকিলও তেমনি ধাঁচ।

(গীত)

আর কুহিলা না ডাইয়ো
বঁধু আছেন বিদেশৎ
খৎ না লিখেন ছমাসৎ
বধুর লাগি মোর কলিজা
জ্বলি জ্বলি যাই লো॥

সখী ॥ বকুল নয়ন শূলে কর্ণশূলে পিক
জেগেছে বিরহ জ্বর
ভাল না গতিক।

শ্রীমতী ॥ কবি যায় ডুবে রয় রস অতি গাঢ়,
তাহা যদি ভঙ্গ কর,
সঙ্গ মোর ছাড়।

বুদ্ধি ॥ সে কি রাজনন্দিনী, তোমাকে কি আমরা ছাড়তে পারি, তোমার কিসে মনোমত হয় সেই তো আমাদের চেষ্টা।

সখী ॥ কুটজার কথাই অমনি; যা বলবার নয় তাই বলে বসে। থির হ, তোর আবার বিরহ!

বুদ্ধি ॥ কৌমুদী, তুই একটা ভালো কথা শোনা তো লক্ষ্মী!

সখী ॥ আমাকে আগে ডাগে কেন? 'আগে ডাগে যেতে নেই মোড়লী করে'। ঐ কুটজা রাজকুমারীর মন ভারি করে দিয়েছে—ঐ আগে গান করুক!

কুটজা ॥ কি জানি ভাই আমরা হলেম পাহাড়তলীর মেয়ে—রাজার মেয়ের মন হাল্কি করাতে শিখিনি—না জানি গান, না জানি কথা! গো রাজনন্দিনী, দাসীকে ক্ষেমা কর, ছিরিচরণের দাসী করে রেখো—

(গীত)

আসি রাজবালা গো
আবার আসিব সময় পেলে
আমি পরাধিনী দাসী
মনের কথা কইতে আসি
রেখো আমায় ভালো বাসি
দিও না চরণে ঠেলে।

চরণ ছাড়া কোরো না ছিমতী! ওলো, সখী আমি কি তোমা ছাড়া রইতে পারি গো—

(গীত)

আমি রাজকুমারীর দাসীই রবো
যা বলিবেন তাই শুনিব
আমার দুঃখ তাঁরে কবো
তেনার দুঃখের ভাগী হবো
হাতে হাতে পান জোগাবো
বলেন যদি বিনোদিনী
বিনোদ বেণী বেঁধে দেবো।

—ওমা; কথা নেই যে গো—ক্ষেমা কর।

শ্রীমতী ॥ একি গান হলো? ভালো গান না গাইলে ক্ষমা নেই।

কুটজা ॥ আমরা কি তোমাদের মত গান জানি গো। যাত্রার গান শিখেছি তাই গাই—

(গীত)

সখি, আর ভালো লাগে না লাগে না
এ প্রবাসেতে আর মন বসে না
কোকিলে সদা হুংকারে ভ্রমরা তাহে গুঞ্জারে
অনিল হানে তীর
বিরহী প্রাণ বাঁচে না বাঁচে না।

শ্রীমতী ॥ এ তো তোর নিজের কথাই হলো—নতুন গান, কি কথা বল।

কুটজা ॥ নিজের কথা ছাড়া আর কার কথা বলব গো?

বুদ্ধি ॥ কেন যে ছমাস খৎ লেখেনি তার।

কুটজা ॥ সে যে কোন দূর দেশে আছে, বাতাসেও তার খবর পাইনে রাজকুমারী কেমন করে তোমাকে জানাই? এই তরুলতা ফুল পাতারা দুঃখের কথা বলাবলি করে তাই শুনি আর কাঁদি—কুঞ্জপানে যে দিকে চাই ফিরাইয়া আঁখি সুখময় কুঞ্জবন অন্ধকার দেখি!

শ্রীমতী ॥ অন্ধকার দেখিস কি? এখন যে চারিদিকে ফুলে ফুলে প্রফুল্ল!

বুদ্ধি ॥ ফুলের কে পায় কুল কিনারা
অগনন যেন গগনতারা
তরো-বেতরো রঙ বে-রঙ
শতেক ফুলের শতেক ঢঙ
কেহ বা দোলে কেহ বা ঝোলে
কেহ বা মুখের ঘোমটা খোলে

শ্রীমতী ॥ কেহ বা ছড়ায় কনক রেণু
রাখাল যেথায় বাজায় বেণু॥

কুটজা ॥ কি জানি রাজনন্দিনী, আমার উটজা,—আমার ছোট বোনটি বিয়ে হয়ে চলে গেল, সেই রাত্তিরটি খালি আমার চোখে থেকে থেকে ভাসে, সেই কথাই মনে পড়ে, আমি কুঞ্জবন অন্ধকার দেখি যেন অমাবশ্যার রাত—বাতাসটি পর্যন্ত নেই।

কৌমুদী ॥ সেকি অন্ধকার কি লো? ফুটফুটে চাঁদনী—দখিনে হাওয়া—

(গীত)

ফোটা যূথী ফুলেরই বনে
বিবাগী হাওয়া
ঝরা সেঁউতির গন্ধ বহে
করে আসা যাওয়া
অকারণে।
চাঁদনী রাতি শীতল ভাতি
রচিল মায়া
জলেরি ধারায় কোন কিনারায়
বাজিছে বাঁশী ক্ষণে ক্ষণে
রহে রহে অকারণে॥

কুটজা ॥ কি জানি ভাই! সারা বরষ প্রায় হতে চললো, তোমাদের সঙ্গে ফুল তুলে মালা গাঁথলেম। কিন্তু ফুলেরা আমাকে দুঃখুই জানালে—সুখের কথা তো বললে না।

শ্রীমতী ॥ সেইটাই না হয় গেয়ে বল্ না।

কুটজা ॥ গান ভালো পারিনে, অনুমতি কর, আমি কথায় গেঁথে বলি—

(ছড়া)

কদম্বের পুষ্প বলেন, দুঃখ লাগে প্রাণে,
সাজিয়া দুলিব কবে গোবিন্দের কানে?
কবরীর পুষ্প বলেন, ব্যথা বাজে মনে,
আর কি মোরে রাখবেন হরি চূড়ার সাজনে?
অধোমুখী দুঃখী হয়ে কয় কমল ফুল
(হায়) আমায় দেখে হ'ত তারা
চিত্তে বেয়াকুল।
পদ্ম বলেন, কবে পাবো চরণপদ্মে স্থান
একাসনে দুজনের হেরিব বয়ান?

বুদ্ধি ॥ দেখ গে, তোর কথা শুনে রাজকুমারীর চোখে জল এলো—কাঁদিচেন—

(কুটজার গীত)

রাজকুমারী বদন ভারি
রাগত কেন দাসীর প্রতি হও
ক্ষেমা দে আমায়—ধরি দুটি পায়
হোক নিষ্কৃতি
সখীর সনে হরষ মনে
সম্প্রতি কথা কও।
কও তো মিষ্টি কথা
তোমার দেশের মিষ্টি কথা
নীরব কেনে রও।
শুনিয়ে দিয়ে যাও—
মনোহারি মিষ্টি বুলি কোথায় তুমি পাও!
জানতে যদি পাই,
তোমার দেশে মিষ্টি কথা শিখতে চলে যাই
বল তো মনের মতোন একটি কথা!

কুটজা ॥ রাগ কোরো না রাজকুমারী!

শ্রীমতী ॥ না না শোন সখি, আমি তোকে একটা গান শিখিয়ে দিই—

(গীত)

শ্রীধর নারায়ণ বিষ্ণু দুসরা ন কোই।
মেরো প্রাণপতি সোই॥

তাত মাত ভ্রাত বন্ধু সখী সহেলী
আপনা নহি কোই।
অঁসুবন জল সীঁচ সীঁচ রোই রোই
সখী একলী প্রেম বেলি বোই॥

(নেপথ্যে) হরহরি বোম্ বোম্, আনন্দ রহো আনন্দ রহো

শ্রীমতী ॥ ভেবেছিনু বৃষ্টি হবে, ঠিক তাই হলো

(হরহরি ও অম্বরীশের প্রবেশ)

হরহরি ॥ শ্রীমন্তী, ঝড় এসে পথ রোধ করেছে, এইখানে নিরাপদ অবস্থান কর। অম্বরীশ, তুমি এদের নিয়ে এই গিরি গুহায় আশ্রয় নাও। আমি আমার দলবল নিয়ে প্রহরীর কাজ করি। নির্ভয়ে অবস্থান কর, ক্ষণকালের মধ্যে পর্বতের ঝঞ্ঝা স্থির হবে।

অম্বরীশ ॥ শ্রীমতী, প্রণাম কর, আশ্রয়দাতা উপাস্য ইনি।

(প্রণাম)

হরহরি ॥ শিব শিব শিব—মনস্কামনা সিদ্ধ হোক। বুদ্ধিশীলা, শ্রীমন্তী ললিত কোমল রূপই দেখেছেন শ্রীহরির। এবারে একবার দেখে নিন্ হরিহরের মিলিত রূপটা—নূতন সুরে বাঁধা হোক মনের তন্ত্রী, কি বল? এস আনন্দ কর তোমরাও, ওরে রে ভূতিয়াগণ—

(গীত)

ফিরে বাঁধা হোক তার,
ফিরে ফিরে ফিরে ফিরে
ও পন্থবীণার সুরে বেসুরে
উঠুক ঝংকার
অদূরে দূরে দূরে অদূরে।
গিরিপুরে সুর পারাবার পারে॥
দিয়ে মূর্চ্ছনা, দিয়ে টংকার-ঝন্‌ঝনা
বাজুক বাঁশী, বাজুক কাশী,
বাজুক ডংকা আর
বাজুক জগঝম্প, শংখ—অসংখ্য অসংখ্য।
সেতার, সারংগ, জলতরংগ,
বিজয়-দুন্দুভি-অনিবার।
জয় ঘন্টা—ঠন ঠন, ঝন ঝন, রণ রণ—
বার বার॥

(ভূতিয়াদের নৃত্য গীত)

ঘন ঘন ঘোষে ঘর্ঘর ঝন্‌ঝা
ঝন্ ঝন্ রণ রণ কাঁসর ঘন্টা
ডাকিনী ঝম্পে, ডমরু ডম্ফে
জল থল কম্পে—থমকে প্রাণটা
ঝটতি গতি অতি অসম্বৃত
বিদ্যুল্লসিত ধ্বনিত ঝংকৃত
গিরিথল মর্দিত
ঝামর ডাগর অতি প্রচণ্ড গতি
ঝটিকা চণ্ডা॥

(হরহরির গীত)

বেগে রথে চলিল বীর বাতাস
ভয়ে ঝুঁকে পড়িল নীল আকাশ
ঢেকে নিল নীল তিমির
লাগিল বিষম ত্রাস—দিকবিদিকে।

(সকলের নৃত্য গীত)

রে রে অঞ্জন বরণী ঘোরে প্রভঞ্জনী
নৃত্য করে
দৃপ্ত তেজে অম্বরে সঞ্চরে
ধরা কাঁপে থর থরে
ধরাধর ভেঙে পড়ে
ঝরে দিকে দিকে দিকতারা
মহাকাশে বিলসে—ঝঞ্ঝা উদ্দণ্ডা

অম্বরীশ ॥ নির্ভয় হও চেয়ে দেখ—
গগনে মগন হৈল রুদ্ররস,
বিদ্যুৎ নিভিয়া গেল প্রশান্তে হৈল দিক দশ
ছিন্ন মেঘ মাঝে
তারাগণ হাসে
ভীরু দিগাঙ্গনাগণে বিতরি সাহস।

হরহরি ॥ শিব শিব বর উঠে নভোময়
পুষ্পরাশি পড়িল মেদিনী জুড়ি
উঠে জয় জয়
বাজিল দুন্দুভি সিন্ধু যেন ক্ষুভি

'ওগো রংগদেবী, রংগদেবী রঙন ফুলে রঙ তোমার'

নদনদী গিরিশির
উল্কা রাজি রাজিতা হারে ফেরে উন্মাদিনী॥

সকলে ॥ হরহরি বোম্ বোম্—

(ভূতিয়াদের মশাল নৃত্য গীত)

ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচন্দ্র মালিকে।
লীহ লীহ লোল জীহ্ জট্ট জাল জালিকে॥
লট্ট পট্ট অট্ট অট্ট ঘোর হাস্য হাসিকে।
সিংহভাব ঘোরারাব নৃত্য গীত তালিকে।
ত্রাহি ত্রাহি পাহি পাহি কাল রাত্রি রাজিকে।
হরহরি বোম্ বোম্!

অম্বরীশ ॥ রুদ্ররস হুঙ্কারিল দুরজয়
দিক অন্ধকার করি
ঘন ঘন ঘন গরজয়
দুরন্ত প্রবল মারুতের দল
উপড়ায় বনস্পতি যেন তৃণচয়।

হরহরি ॥ দেখ চেয়ে শ্রীমন্তী, ওধারে তুষার মণ্ডিত গিরিশ্রেণী, এধারে মেঘান্ধকার বনরাজি। হরিহরের অপরূপ লীলা—হরহরি বোম্ বোম্—আনন্দ রহো আনন্দ রহো।

বেলা মনে খেলা করি ধীরে গরজয়॥
ও পদ্মলীলা শ্রীমন্তী, ও সখীগণ রংগদেবীকে দেখে নাও। রঙে রঙে রংগীন বনে বনে ফিরছেন তিনি—বরণ ডালা পুষ্পমালায় সাজিয়ে দেখে নাও শ্রীমন্তী।

(শ্রীমতী ও সখীগণের গীত)

ওগো রংগদেবী, রংগদেবী
রঙন ফুলে রঙ তোমার
বরণ মনোহরণ, চরণে চমৎকার
গো রংগদেবী
সন্ধ্যা যূথী ফুলের হার
বরণডালায় প্রদীপ ঝলে
রূপবতী রূপখানি তোমার
দুখ-ভুলানো॥

(মালাকরীর প্রবেশ)

হরহরি ॥ ও মালাকরী, শ্রীমন্তীকে সাজিয়ে দাও রংগস্বামীর প্রসাদী মালায়।

(মালাকরী ও সখীগণের গীত)

এ কোন ফ‍ুলের মালা কে দিয়েছে
তোমার গলে
চলে যেতে ছন্দে তালে রহে রহে রহে দোলে
দোলে হাওয়ায় হাওয়ায় এ কোন মালা
অপরাজিতার বরণ-ডালা
নীলিম-নীল-মানিক ঝলে—তোমার গলে
কানের দ‍ুলে আলো উছলে—রয়ে রয়ে।

হরহরি ॥ মালাকরী, শ্রীমন্তীকে সখীগণের সঙ্গে আশ্রমের স‌ুগম পথ দেখাও—

মেঘৈর্মেদ‍ুরমম্বরম বনভুবশ্যামাস্তমালদ্রুমৈ
নক্তম
ভীর‍ু রয়ম্ গ‍ৃহম্ প্রাপয়—
যাও সকলে আশ্রমের পথ ধর—
শিবাস্ত‍ু তে পন্থানঃ
(শ্রীমতী ও সখীগণের প্রস্থান)

অম্বরীশ ॥ শ্রীমতীর মনোভাব তো বোঝা গেল—এখন উপায় কি? পর্বত আর নারদকে ঠেকাই কি প্রকারে? দ‍ুজনেই যে সংগোপনে শ্রীমতী সম্প্রদানের আদেশ জানিয়েছেন।

হরহরি ॥ স্বয়ম্বর সভাতে আর কোন লোক-পাল, দিকপাল, দেবতা যক্ষ রক্ষ গন্ধর্বকে আমন্ত্রণ করা তো চলে না—কিং কর্তব্য—চল বিবেচনা করি।

অম্বরীশ ॥ আমি তো কিংকর্তব্যবিম‍ূঢ় প্রায়। ইন্দ্র এসেছিলেন বরদান করতে —তাঁকেও প্রত্যাখ্যান করেছি বিষ্ণ‍ুর ভরসায়।

হরহরি ॥ সেই জন্যেই মেঘবাহন নানা ঝড় ঝাপটা পাঠিয়ে নানা উৎপাত শ‍ুর‍ু করেছেন। নিশ্চয় তিনি চুকোপ হয়ে কিছ‍ু আশ্রমপীড়া ঘটাচ্ছেন।

অম্বরীশ ॥ কি করি বলেন? আমি এক-মাত্র বিষ্ণ‍ুর উপাসনা করি—ইন্দ্রের কাছে বর গ্রহণ করতে পারিনে!

হরহরি ॥ তা জানি, চল আশ্রমে, উপেন্দ্রের কৃপাভিক্ষা কর! ঐ দেখ না, সন্ধ্যা মেঘ ভেদ করে—

উড়িল আকাশে বিহগরাজ বিস্তারি
বিশাল পক্ষ,
যথা নভোদেশে গর‍ুত্মান, মহাছায়া
পড়িল ভূতলে,
আবরি আশ্রম বন গিরি নদী নদ।—
সাহস ধর সাহস ধর; হরহরি বোম্ বোম্
ভরসা রাখ।
(উভয়ের প্রস্থান)

— তৃতীয় দৃশ্য —

(নারদ ও পর্বতের প্রবেশ)

নারদ ॥ ওঃ পর্বত। উত্তুঙ্গে পথে যাতায়াত-বশাৎ নিঃশ্বাসাঃ প্রচুরী ভবন্তি। এই শীলাতলে উপবেশামি। ওঃ দ‍ৃষ্টি চলছে না! প্রদোষে একেই তো নিহতঃ পন্থা তার উপরে অতিরিক্ত মধ‍ুপানে দ‍ৃষ্টি জাড্যম‍ুপেতি। আর কত দ‍ূরে তুঙ্গভদ্রা?

পর্বত ॥ ঐ তো দেখা যায়—পশ্যং মে প্রাসাদ শিখরং—যাত্রাপথের শেষে শীতকিরণ মৌক্তিক মালার ন্যায় যেন আকাশ হতে খসে গিরিশিরে একটি কমলের উপরে শয়ান রয়েছে।

নারদ ॥ এ যে একেবারে উত্তর মেঘের মধ্যে এনে ফেললে দেখি। এককালে রাম-গিরি আর অলকাপ‍ুরীর ছোট সংস্করণ চন্দ্র-মণি-শিলা আর সোনার ইঁটে গেঁথে তুলেছ। কিন্তু একটি অধিকারিণী বিনা সব শ‍ূন্যে বোধহয় —একটি যক্ষিণী ছিল যক্ষরাজের সেই না নির্বাসিতের ঘর বাড়ি, হাঁড়ি কুঁড়ি মায় পালিত কপোত ময়‍ূরগ‍ুলোকেও আগলে ছিল। তোমার আছে কেবল নৈপালির দল, আর গর্ভস্থিত কঙ্কাল হ‍ুতোশনকুণ্ড মদ্যভাণ্ড।

পর্বত ॥ নাই কি বল?, অভ্রংলীহ প্রাসাদ, চিত্রবিচিত্র হর্ম্যতল, নিত্যভাস্বং কলাপ ভবনশিখীর অন‍ুর‍ূপে পরিচারিণীগণ, কুন্দবদনী কৌম‍ুদী প্রভৃতয়ঃ, ইন্দ্রনীল-মণি-রচিত ক্রীড়াপর্বতে স্বর্ণকদলী গ‍ৃহ, মরকতসোপানবদ্ধ হিম সরোবর তাতে রাজহংসী আর—

নারদ ॥ আর কি বল? শ‍ুধ‍ু একটি তন্বীশ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বা-ধরোষ্ঠীর অভাব—এই না? আমি শীতে জর্জর হচ্ছি মধ‍ুপান সত্ত্বেও। বিদায় দাও, এইখান থেকেই মর্ত-লোকের দিকে নেমে পড়ি।

পর্বত ॥ তুঙ্গভদ্রায় শীতের ভয় নাই। নির‍ুদ্ধবাতায়নমন্দিরেন্দরে হ‍ুতাশন তপ্ত গর্ভস্থিত ম‍ুড়ে তোমায় কুহেলি-কার স্পর্শ থেকে বীণাযন্ত্রের মতো যত্নে রাখবো।—যাবার এত ত্বরা কি?

নারদ ॥ ত্বরা তোমারও করা প্রয়োজন। অম্বরীশের আশ্রমে সময়ে উপস্থিত হওয়া চাই তো।

পর্বত ॥ অম্বরীশ তো শ্রীমতী সম্প্রদানে মতই করেছে—সেজন্যে ব্যস্ততার কারণ কি?

নারদ ॥ বোঝ না, বোঝ না, ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি কিম্বা আমাদের প্রভু নারায়ণটি যদি একবার খবর পান তো সব পণ্ড। মন্ত্রগ‍ুপ্তি আর ত্বরা দ‍ুই অত্যাবশ্যক। বিলম্বে কার্যহানি স্যাৎ!

পর্বত ॥ আমি তো বলি বিলম্বে কার্য সিদ্ধি!

নারদ ॥ তবে তুমি যতকাল পার বিলম্ব কর —আমি চললেম অগ্রসর হয়ে।

পর্বত ॥ তোমাকেও বিলম্ব করতে হবে—যখন আমি যাবো, তুমিও যাবে—অগ্রসর হতে দিচ্ছিনে একপাও তুঙ্গ-ভদ্রা ছেড়ে, আমাকে এড়িয়ে।

নারদ ॥ আমি কি তোমার বন্দী? অতিথি নয়?

পর্বত ॥ যা ভেবে নাও।

নারদ ॥ তুমি দেখেছ শ্রীমতীকে?

পর্বত ॥ দেখেছি—

(গীত)

র‍ূপ ঝলমল র‍ূপের পিদ‍ুম
বাতাসে-ঢলা অগ্নিশিখা।
—তুমি দেখেছ?

নারদ ॥ দেখেছি—

(গীত)

ও সে কমলাফ‍ুলের বনের রাণী
শ্যামল কমল পত্রে লিখা।

পর্বত ॥ অর‍ূপ লোকের র‍ূপের
স্বপন সে যেন

নারদ ॥ সে যেন, সে যেন—!!

পর্বত ॥ তুমি কি ভাবো তোমাকে তার মনে ধরবে?—অস্থি গ্রন্থি বিঘটিত বীণা দণ্ডবৎ তোমার দেহযষ্ঠিকে সে দ‍ূরে থেকে দণ্ডবৎ দেবে। ব‍ৃথা প্রতিযোগিতার চেষ্টা করছ আমার সঙ্গে।

নারদ ॥ ধ‍ুস্তর পাণ্ডুর তোমার পর্বতাকৃতি দেহ সে প্রদক্ষিণ করে চলে যাবে, ফিরেও দেখবে না পশ্চাতে! আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঠেকানো তোমার কর্ম নয়।

পর্বত ॥ দেখা যাবে।

নারদ ॥ দেখা যাক্।

(উভয়ের গীত)

দেখা যাবে দেখা যাক্ কি হয় কি হয়
জয় কিম্বা পরাজয়।
নারদ আমি বিরোধ বাধাই
তুড়ি মারিতে ত্রিলোক নাচাই
অচল পর্বত আমি অনড়
আমারে ভড়কানো কঠিন বড়
অটল প্রতিজ্ঞা টলিবার নয়
দেখা যাবে দেখা যাক কি হয়।
জয় নিশ্চয় নিশ্চয়, নিশ্চয় পরাজয়॥
(উভয়ের মধ‍ু পান)

নারদ ॥ এই কথা— শ্রীমতীর আশা পরি-ত্যাগ কর।

পর্বত ॥ মাম বিরমত‍ু—থাম থাম ও কথাই নয়।

নারদ ॥ বিরমত‍ু ভাগিনীস‍ুত! মাতুলের বৈরাচরণ কোরো না হে ভাগিনেয়, নিব‍ৃত্ত হও।

পর্বত ॥ নহি নহি!

নারদ ॥ নহি নহি! এই রইল তোমার আতিথ্য গ্রহণ।

পর্বত ॥ এই রইল তোমার সঙ্গে মধ‍ুপান।

(অবধ‍ূতের প্রবেশ)

অবধ‍ূত ॥ হরহরি হর্বোল হর্বোল হরহরি হরহরি।

(গীত)

বড় গোল বেধেছে,
গাছে একটি বেল পেকেছে,
দ‍ুটো কাকে ঝটাপটি তাই লেগেছে
দ‍ুই দ‍ুস‍ুমন্ত একটি শকুন্তলা;

এবারে কি হয় যায় না বলা
গোলে হরিবোল বড় গণ্ডগোল
গোলকপতির ধাঁধা জেগেছে!
হরহরি বোম্ বোম্!

নারদ ॥ কোয়ম?

পর্বত ॥ কস্তম্?

অবধূত ॥ অবধূত বা অদ্ভুত—যাই বল।

নারদ ॥ চলেছ কুত্র?

পর্বত ॥ আসছ-ই বা কোথা থেকে?

নারদ ॥ ব্রূহি কীদৃশ ব্যাপার?

অবধূত ॥ তুমি আমায় ঠাউরেছো কি হে? রাজারাজড়া নিয়ে কথা—বললেই প্রকাশ করবো? তুমি কোথাকার কে, কে জানে তা! চেহারা তো দেখছি গোলাঙ্গুলের প্রায়!

পর্বত ॥ হাঃ হাঃ, ঠিক বলেছ—গোলাঙ্গুল! বুদ্ধি ও গবয়! গোলাঙ্গুলে—হাঃ হাঃ!

অবধূত ॥ কে হে তুমি গুরুজনের সামনে চপলতা কর— মর্কট কোথাকার!

নারদ ॥ গোলাঙ্গুলের আত্মীয় সলাঙ্গুলে শাখামৃগ! ঠিক হয়েছে, উপযুক্ত হয়েছে!

অবধূত ॥ আরে তোমরা তো দুটোতেই দেখি বড় চপল—

গুরুজনের সম্মুখে চাপল্য পরিহাস
করিছ জগতে পাবে বড় উপহাস॥

হাস্য পরিহাস রাখ, পরিচয় দাও কে তোমরা।

পর্বত ॥ আমি পর্বত মুনি!

নারদ ॥ আমি ব্রহ্মার মানস পুত্র!

অবধূত ॥ আর বলতে হবে না, তোমার দেখা পাওয়া গেল যাত্রার আয়োজন করেই—এ বড় শুভ লক্ষণ।

নারদ ॥ যাত্রা করছো কোথায় সেইটে বল না।

অবধূত ॥ ঐ পর্বতের একেবারে মস্তক মাড়িয়ে চক্রধরের ওখানে শ্রীমন্তীর অবস্থার একটা ব্যবস্থা করে আসতেই যাত্রা করে বেরিয়েছি।

নারদ ॥ শ্রীমতীর অবস্থার ব্যবস্থা—চক্রধর—এ সব কি কও?

পর্বত ॥ কোন পীড়াদি—

অবধূত ॥ দেহ থাকলেই তার পীড়া আছে, তার উপর আশ্রমবাস—আশ্রমপীড়া আছেই লেগে, ইন্দ্রদেবের কৃপায়। বজ্রপাত অকস্মাৎ হচ্ছেই যেদিন থেকে অম্বরীশ তাঁর বর প্রতিগ্রহ করতে অস্বীকার করেছেন।

নারদ ॥ পরম বৈষ্ণব অম্বরীশ—তিনি কখনো ইন্দ্রের বরদান গ্রাহ্য করেন না।

পর্বত ॥ শুধু বরদান নয় ইন্দ্রকে তো জানা আছে, কন্যা সম্প্রদান নয় একটা কিছু গূঢ় উদ্দেশ্য ছিলই ছিল—

পরের অনিষ্ট ইষ্ট করার বেলায়
বড়জনের পেটের কথা পেটেই থেকে যায়।

নারদ ॥ আরে শুনতেই দাও কথাটা এঁর। বাগাড়ম্বর করা তোমার একটা কুঅভ্যাস—ওটা ত্যাগ কর।

শরতে মেঘের ডাক বৃথায় যেমন
কথার বড়াই করা নিস্ফল তেমন।

'আমি ব্রহ্মার মানসপুত্র'

সিদ্ধির আর মদের ঝোঁকে কল্পনা করে নিলেই হল ইন্দ্র এসেছিলেন সীতাহরণের পালা গাইতে অম্বরীশের আশ্রমে।

পর্বত ॥ তবে কি ইন্দ্রত্ব যাবার ভয়ে ছুটে এসেছিলেন ঘুষঘাষ দিয়ে খুশী করতে শ্বশুর মশায়কে?

অবধূত ॥ ওহে তুমি তো দেখি গাঁজাখোরের মত কথা কও। শ্বশুর সম্বোধন করছ কাকে সম্প্রদানের পূর্বেই।

নারদ ॥ মামার শ্বশুর, উনি বাধাতে চললেন সম্পর্ক ভাগ্নে হয়ে তাঁর সঙ্গে—

পর্বত ॥ ওহে গোলাঙ্গুল শোন—

মনে মনে মনোরথ কল্পনা করিয়া
যে জন তাহাতে ওঠে আহ্লাদে মাতিয়া
অশেষ লাঞ্ছনাভোগ করে সেই জন
শক্তু ভাণ্ড ভগ্ন করি ব্রাহ্মণ যেমন।

নারদ ॥ আবার ব্রাহ্মণকে নিয়ে পড়লে?

অবধূত ॥ রাখ তোমাদের লংকা ভাগ। কথাটা বলতেই দাও—শ্রীমতী সম্প্রদানে তোমরা দুটিতেই বাধিয়েছ গোল—তাঁর পীড়ার কারণও বটে তাই।

পর্বত ॥ গোল কি? আমাদের দুজনের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা—

নারদ ॥ ওঁকে না মনে ধরে থাকে তো বললেই চুকে যায়—আমার দিক থেকে যেমন তেমনি পর্বতের দিক থেকেও আপত্তি উঠবে না।

পর্বত ॥ আমারও তো ঐ একই কথা।

অবধূত ॥ কিন্তু শ্রীমন্তীর দিক থেকে কথাটা একেবারে শিং বাঁকিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে।

নারদ ॥ এ হতেই পারে না

পর্বত ॥ আঃ থাম, ঘটনাটা শুনি!

অবধূত ॥ শ্রীমন্তী, জানইতো ভীরুস্বভাবা! কে জানে, কোন দেবতা তাঁকে স্বপ্ন পাঠালেন, অমনি হঠাৎ তিন রাত্রি ধরে ঠিক একই সময়ে দেখতে থাকলেন শ্রীমন্তী, যেন—

মানুষ কি জানোয়ার বুঝে ওঠা ভার
দুই মূর্তি দেখা দিল সম্মুখে
কিম্ভূত কিমাকার
ওষ্ঠ মাস ঠেলি, দন্ত আছে মেলি
চিমসিয়া অঙ্গুলিতে বক্র নখধার॥

নারদ ॥ বানর টানর কিছু হবে—এই পর্বতে তো তারা জোড়া জোড়া আছে।

পর্বত ॥ আমি ঠিক ঐ প্রকারের বনমানুষ এই কাছেই দেখছি।

অবধূত ॥ সেই দুটোই হবে বোধহয়; কিন্তু ওর মধ্যে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে বানর দুটো কথা কয় আর বলে শ্রীমন্তীকে—'যদি বিয়ের নাম কর তো দুইগালে দুজনে চড়াবো!' ভইয়ানক ব্যাঘাৎ পড়ে গেছে সম্প্রদানে! বিয়েই করতে চায় না, বানরের হাতে পড়ার ভয়ে শ্রীমন্তী! দুঃস্বপ্ন দেখে অবধি বিয়ের নামে তার দাঁত কপাটি লাগছে। চলেছি তাই চক্রধরের তাগা কবচ কি মাদুলী আনতে সন্ধান করে।

পর্বত ॥ ও সবে কিছু হবে না! চক্রধরের চক্রও হতে পারে এই দুঃস্বপ্ন! শ্রীমতীর উপর তাঁর টাঁক আছে।

নারদ ॥ আমার বোধহয় বজ্রধরের কাজ এটা—ও ভারি চতুর ছদ্মবেশ ধরতে।

পর্বত ॥ দেখ অবধূত, এই চিন্তামণি দিলেম, শ্রীমতীর গলায় বেঁধে দাওগা দুশ্চিন্তা দূর হবে—একেবারে স্বয়ং বিষ্ণুর দেওয়া এই মণি বিষ্ণুতৈলের কাজ করবে। বিষ্ণু নিজের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুরী থেকে এটি খুলে দিয়েছেন—জানো!

নারদ ॥ ওহে চিন্তামণিতে চিন্তা বাড়বে বই

তাড়াবে না! দুশ্চিন্তা গিয়ে সুচিন্তা এত প্রবল হবে যে তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি। রাম রাম—ও ধারণ করে—

(গীত)

চিন্তামণি চরণাম্বুজ-রজ,
চিত ভুখা ভুখা রহো
জপত রহো নাম
ছোড় দে চিন্তা সম্সার কি
সব কাম ছোড়ত রহো
সুখ দুখা মিটাবনী।

ধারন করলেই হল চিন্তামণি? ভুখ ভুখা রহো—আরো রুগ্নাশীর্ণাবিশীর্ণা হয়ে শেষ —আমি দিচ্ছি অব্যর্থ কবচ, ধর এই দৈবী বীণারআয়স্-তার! এইটি একটু লাল সুতো জড়িয়ে রক্ষা বন্ধন করে দাও গে শ্রীমতীর শ্রীহস্তে!

পর্বত ॥ লোহার বালা পাগলকেই পরায়! তুমি উন্মাদের মত কি কাজ করছ? চিন্তামণির তুল্য কিছু নয়। ওহে অবধূত, ও সব ফেলে দাও।

অবধূত—বাপুহে এই নাও তোমার চিন্তামণি, এই নাও তার তামার। পথটা দেখিয়ে দাও, চক্রধরের কাছে চলে যাই —তাঁর প্রতিই যখন বিশ্বাস শ্রীমতীর তখন একটু হরিচন্দন কি তুলসীর শিকড়েই কাজ হয়ে যেতে পারে। ও কবচ তাগা থাক্—রাজরাজড়ার কারখানা ভালো মন্দ কিছু হলে আমারি হাতে পড়বে দড়ি। কোন পথে যাই চক্রধরের ওখানে?

নারদ ॥ চলে যাও না পর্বতের উত্তরে যেখানে একটা মর্কট মুক্তামালা দাঁতে কাটছে।

পর্বত ॥ চলে যাও দক্ষিণে, যে ধারে দেখ একটা মুখ-পোড়া আগুনেবর্ণ লাঙ্গুল চালনা করছে একটা বাঁশের কচা হাতে —যেন মস্ত বীণকার!

অবধূত ॥ এবম্ভবতু, এবম্ভবতু! উত্তরে দক্ষিণে—দক্ষিণে উত্তরে—মুখপোড়া মর্কট—মর্কট মুখপোড়া! নাঃ চলা হল না বাপু, তোমরা দুটিতে আগে সর, তবে চলবো। মর্কট মুখপোড়া দুই-ই অযাত্রা! বসে যেতে হল একটু—

(গীত)

পোস্ত আর সিদ্ধি,
বুদ্ধি করুক বৃদ্ধি।
তাতে হয় ধুতুরা জড়ি,
আহিফেন দু-চার ভরি,
লাভ করি বিভূতি রিদ্ধি।

নারদ ॥ গুলিখোর!

পর্বত ॥ গেঁজেল!

অবধূত ॥ মাতাল!—একে বানর তায় মদ খেয়েছে! বানরাঃ কিং ন নশ্যান্তি, কিং ন জল্পন্তি মদ্যপাঃ!

নারদ ও পর্বত ॥ আমরা বানর? আমরা মাতাল? বটে! নৈপালগর্গ— লাগাও!

অবধূত ॥ আমি গেঁজেল, গুলিখোর? বটে! কোথায়রে ভূতিয়াগণ,—লাগাও!

(দুই দলের ছদ্মাক গীত)

উত্তরেতে গন্ধমাদন পর্বত চলে উড়ে
দক্ষিণেতে লাঙ্গুলে দাহন লঙ্কা
জ্বলে পুড়ে।
বোম্ বোম্ হরহরি এবম্ভবতু এবম্ভবিতম্
ধুন্ধুমোরম সত্বরেতে ॥

নারদ ॥ লেগে যাক্ লেগে যাক্ যা শত্রুর পরে পরে।

(নারদের নৃত্য গীত)

লগড় ঝগড় লাগ ঝমা ঝম্
ধুধুধু ধুম্ ধমা ধম্
লঙ্কা দাহন গন্ধমাদন
তান্ডব ধরে ধুন্ধুমোরম
এক দলে নর, অপরে বানর
এ দাঁত খিচাও ও মারো চাপড়
শনির দৃষ্টি হলাক ছিষ্টি
নরে বানরে লড় একদম্—চিড়ি বিড়ি।
লাগ্ ঝমা ঝম ঝামাকিড়ি
দন্তে দিয়া গিট্কিরি
দম নিয়া তিড়ি বিড়ি
চানা চিবা কিড়িমিড়ি
লাগড় ঝগড়—লাগ ঝমা ঝম্॥

(সকলের গীত)

তাল ঠোকাঠুকি পাওতাড়া
বাও কষাকষি প্যাঁচমারা
দাঁত খিঁচিমিটি চোখ রাঙ্গারাঙ্গি
কোস্তাকুস্তি ধস্তাধস্তি
লাতালাতি কিলাকিলি
চড়চাপড় আঁচড় কামড়—
রক্তারক্তি ছেঁড়াছিঁড়ি
মস্তক চর্বণ ধীরে ধীরে ॥

(অবধূতের শৃঙ্গবাদন নৃত্য গীত)

পালা ঃ

হাতাহাতি লাথালাথি ছেড়ে পালাঃ
শিঙ্গে দে ফুকে, রামশিঙ্গে দে ফুঁকে
নেচে চল শিঙ্গে ফোঁকার তালে তালে
লাফে লাফে তাল ঠুকে দিয়ে পালাঃ ॥

(শৃঙ্গবাদন নারদ ও পর্বত ছাড়া সকলের প্রস্থান)

নারদ ॥ ওঃ মেরে একেবারে পিষে দিয়ে গেছে।

পর্বত ॥ পিসে কি, মেসো করে ছেড়েছে। উত্থানশক্তি রহিত! ভূতের মার দিয়েছে!

নারদ ॥ এ সহজ অবধূত নয়। তিন কর্তার কেউ হবেন বোধহয়!

পর্বত ॥ ও তিনে এক একে তিন! আর তিলার্ধ বিলম্ব নয়।

নারদ ॥ নারায়ণ, নারায়ণ, চল বৈকুণ্ঠে আশ্রয় নিইগা প্রলয় কান্ড বাধলো দেখি।

(গীত)

দেখি ঘোর অন্ধকার!
বরজে গরজে মেঘ বারম্বার॥
উঠে প্রচন্ড পবন,
ছিন্নভিন্ন করে বন
শিহরে আতঙ্কে প্রাণ কাঁপে বারম্বার।
হুহুংকার বজ্রশব্দ,
পশুপক্ষী রয় স্তব্ধ—
চকিত তড়িত করে অন্ধতা বিস্তার
ছুটিল জল তরঙ্গ,
বৃষিল যেন তুরঙ্গ
আতঙ্কে হতেছে ভঙ্গ ভরসা আমার।

পর্বত ॥ একমাত্র ভরসা নারায়ণ—চল চম্প দিই তাঁর কাছে।

নারদ ॥ শ্রীমতী—

পর্বত ॥ যাকগে শ্রীমতী! বিশ্রী কান্ড হ উঠেছে, চল পালাই। যঃ পলায়তি জীবতি। আবার না ফিরে আ অবধূতের ভূতের দল।

(গীত)

ভূতের ঘরে বাস করা হল দায়
আমি জ্বলে মলেম পাঁচ ভূতের জ্বালায়
এ যে ভূতের সংসার ভূতের ব্যাপার
ভূতে ঘাড়ে চড়ে ভুতুড়ে কিলায়
কিছু না দেখি ভূত ছাড়া
অদ্ভুত ভূতের বেড়া
ওরে ভূতে জড়ীভূত করলে আমায়॥

(নারদের গীত)

এ ঘোর আঁধার পথে হায়
কিমতে পাইব নিস্ত
আমি চলতে নারি কি বা করি
শরণ লব বল কা
একে পথ নাকি যায় চেনা
তাতে ভূত পেরেতে মাঝ পথেতে
দিয়েছে হা
মাথায় বাড়ি দিয়ে ঘাড় ভাঙিয়ে
করতে চায় সংহার॥

—চল তোমার কথাই ঠিক—যাক শ্রীমতী! সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজ পন্ডিতঃ। রোসো ঢেঁকিটা চড়ি—অ কোমর গেছে।

(ঢেঁকি চাপ

(নৃত্য গীত)

এ যে ঢেঁকি চড়া হল দায়
ডানে চালাইতে ঢেঁকি বামে যেতে চায়
ঢেঁকি যেতো মনোহর যেন হয়-বর
কাজ দিতো বিস্তর অশ্বশালায় তিন প
গিয়াছে চীন তাতারে ঝিন্দ নেপালে
বিন্ধাচলে ঘোষ পাড়ায়
এ যে সে চলতে হেলে, মাথা চালে
অনিচ্ছাতে ঘাড় বাঁকায়॥

পর্বত ॥ ঢেঁকি বনে ফেলে চল পায়ে পা চম্পট দিই—

(গীত)

চাচা জানটারে বাঁচা
সোজাসুজি চম্পট দিয়ে
হাঁটা পথে প্রাণ বাঁচিয়ে
দৌড় দাও না চোঁচা ॥

শ্রীমতীর কথা প্রকাশ হয়ে পড় গোপনে সম্প্রদানের আশা নেই। দেবত ঝুঁকেছেন বোধ হচ্ছে।

নারদ ॥ আর গয়ং গচ্ছ করা নয়। প্রভুকে সব খুলে বলে যাতে কাজের সুসার হয় চেষ্টা দেখি চল।

পর্বত ॥ আমি একটু বিশ্রাম করে যাবো তুংগভদ্রায়। তুমি অগ্রসর হও। প্রণমামি।

নারদ ॥ জীবতু—চলি—

(গীত)

এপাটি বাড়াই ওপায়ে দাঁড়াই
এইভাবে চলি বুদ্ধিমান,
শাস্ত্রে বলেছে—একেই চলা
অন্যভাবে চলা, চলার ভান।
এক পা আকাশে এক পা মাটিতে
এইভাবে যদি না চাও হাঁটিতে
হবে পপাত চ হঠাৎ মাটিতে
মাথাটি ফাটিয়া যাইবে প্রাণ॥

(পর্বতের গীত)

এক পা আগাই এক পা পিছাই
এই ভাবে যাই বুদ্ধিমান
আগে আছে কি বিচারি দেখি
তবে পা বাড়াই অতি সাবধান॥

(নারদ পর্বত উভয়ের গীত)

ডান পা চলুক বাম পা রহুক
বাম পা চলুক রহুক ডান
বুঝি সুঝি চল গুটি গুটি চল
এইখান হতে সেই খান।

দেহটা গেছে একেবারে—শেওড়ুর ঠাসা
তুবড়ি় এককালে।

(উভয়ের প্রস্থান ইতি তৃতীয় দৃশ্য।

চতুর্থ দৃশ্য

(ঐরাবত ও গরুড়ের প্রবেশ, গরুড়ের ছোলা ভক্ষণ গীত)

হরি হে তোমার পোষা পাখি
বল আর কতকাল তোলা ছোলা
খাওয়াইয়ে দেবে ফাঁকি?
বাটি পুরে ছোলা দিয়ে
আড়ায় রাখলে ঝুলাইয়ে।
মুদিত করে থাকি আঁখি
ইচ্ছা হয় উড়ে চলা
পেয়েই দায়ে হরি বলা—
হাঁকাহাঁকি চিরে গলা
স্বজাতির বোল শুনিয়ে
ক্যাচর ম্যাচর করে ডাকি!

—ওহে ঐরাবত ঝিমোলে নাকি? আর তো ভাই ছোলাকলা খেয়ে প্রাণ বাঁচে না। একটা গজ কচ্ছপের যুদ্ধ বাধে তো বাঁচি!

ঐরাবত ॥ তা হলে তো আমি আগে গেছি! ও কামনা আর কোরো না, ইন্দ্রদেবের কৃপায় রসদের অভাব নেই আমার। আমি বরং আরো পাঁচ মণ ছোলা নিজে থেকে দেবো তোমায়। যুদ্ধের নাম আর কোরো না।

গরুড় ॥ এ হে দেখছ না, সব দেবতারা জটলা করে আজ কদিন থেকে কি একটা চক্র পাকাচ্ছে। দেখে নিও একটা কান্ড মান্ড না ঘটে যায় না।

ঐরাবত ॥ ভুশুন্ডির কাছে শুধোলে হয় না ভিতরের খবর?

গরুড় ॥ ভিতরের খবর পেঁচি বুড়ীর কাছে পেলেম—নরে বানরে রামলীলে না কি একটা কিসের যাত্রা-মাত্রা হবে। নর বানরের মুখোশের ফরমাশ হয়েছে বিশ্বকর্মার উপরে।

ঐরাবত ॥ আমি ও কানাঘুষো শুনেছি সাতকান্ড—বুঝছিনে কিছু। শুনেছি ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ছোটখাটো সব দেবতারা সাজছেন বানর আর কর্তারা কজন নর।

গরুড় ॥ চুপি চুপি বলি শোন, কাউকে বোলো না।—আমাদের ঠাকরুণটিকে জানকী না সীতে কি সাজিয়ে পাতাল-প্রবেশ করানোর চেষ্টায় ছিলেন ঠাকুরটি। তিনি সাফ্ না করে বসেছেন। এখন সীতের খোঁজ পড়ে গেছে। ঝগড়া বেধে গেছে কর্তা-গিন্নীতে! নারদ আর পর্বত গেছেন রাজা অম্বরীশের কন্যে শ্রীমতীর সংগে ঘটকালী পাকাতে।

ঐরাবত ॥ শুনেছি পরমা সুন্দরী!

গরুড় ॥ কে জানে ভাই সুন্দরী বান্দরী বুঝিনে—

খেঁদা হোক বোঁচা হোক সব সইতে পারি
ঐ নাক তুলে কথা কবে সেই দুঃখেই মরি।

শেষ দেবতার বাহন থেকে নামতে হল মানুষে বইতে ঘাড়ে করে! যাক্ ছেড়ে দাও ও সব কথা। ঐ দেখ বিশ্বকর্মা আসছেন মুখোস বহে।

(বিশ্বকর্মার প্রবেশ ও গীত)

বল রাম রাম রাম প্রাণারাম
রাম প্রাণারাম প্রাণারাম রাম
অবিরাম অভিরাম
রামভংগর রামচন্দর
বলরাম আজ কাল পরশু
রাম বলে চল॥

ঐরাবত ॥ প্রণমামি ঠাকুর, এ আবার কি নাম শুরু করলে?

বিশ্ব ॥ এবারে রামাবতার হবে, তারি উদ্যোগ হচ্ছে, দেখছ না নর বানরের মুখোশ!

গরুড় ॥ লেজুড় থাকবে না?

বিশ্ব ॥ থাকবে বইকি, না হলে সাজবে কেন?

(পদ্য)

দেবতা নর, নর বানর, বানর দেবতা
এই হল সাজের আসল ভেদটা।
চেয়ে দেখ গণেশের ধেয়ানে
সাজের সুক্ষ্ম বুঝহ সেয়ানে
দশটা আনন বিশটা হাত
এবারে সাজের কিস্তি মাৎ
বোঝ রামলীলার সাজের মর্ম
পন্ডিতের নয় শিল্পীর কর্ম।

গরুড় ॥ এবারে রং লাগাবে খুব দেখছি।

বিশ্ব ॥ সব বানর সাজিয়ে তবে নিস্তার। রঙের কথা বল কেন? লাল নীল গয় গবাক্ষ নরে বানরে রঙে রঙে ছয়লাপ—ফুল ফুটে যাবে দেখবে। চলি ভিতরে—নারায়ণ, নারায়ণ!

(প্রস্থান)

গরুড় ॥ ওহে ঐরাবত, ঐ দেখ আবার কে আসেন! পর্বত মুনি বোধ হচ্ছে—উঠে দাঁড়াও।

ঐরাবত ॥ অ্যাঃ, একটু বসেছি—ওঠালে! এ যে দেখছি আমারি একজন গজগীর চেহারা।

(পর্বত মুনির প্রবেশ)

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তম
লক্ষীঃ সরস্বতীং বন্দে
যতো জয় মুদীরয়েৎ॥

গরুড় ॥ রাম রাম, চলে যান ভিতরে

(পর্বতের প্রস্থান ও নারদের প্রবেশ)

নারদ ॥ আবার রাম কে হে? নতুন কায়দা দেখছি যে! দুয়োরে আবার হাতি বাঁধা হল কবে থেকে?

গরুড় ॥ রামরাজাতলা হয়ে উঠল বলে বৈকুণ্ঠপুরী। যান, ভিতরে গিয়ে দেখেন—এইমাত্র পর্বত ঢুকেছেন।

নারদ ॥ আমি চললেম সোজা লক্ষ্মী মন্দিরে।

ঐরাবত ॥ আর বোধহয় কেউ আসছেন না।

গরুড় ॥ ওরে বাপ্! স্বয়ং বোম ভোলানাথ, সংগে এক রাজা আর কুমারীর দল। দরজা খোলো পথ ছেড়ে দাঁড়াও!

(হরহরি, অম্বরীশ, শ্রীমতী, সখীগণ ও দলবল ছুতিয়ার প্রবেশ)

(গীত)

বংশীধর পিনাকধর গঙ্গাধর গিরিধর
জটাধর মকুটধর রাজত হরিহর
—হরহরি বোম্ বোম্—
চন্দনধর ভস্মধর পীতাম্বর বাঘাম্বর
চক্রধর ত্রিশূলধর নরহর শঙ্কর
সুধাধর বিষধর গরুড়াসন বৃষবাহন
কৃপাকর কৃপাকর শিরপর
—হরহরি বোম্ বোম্।

(প্রস্থান)

গরুড় ॥ বলি অ নন্দিকেশর, ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?

ঐরাবত ॥ শিবের বিয়ে টিয়ে নাকি?

নন্দিকেশর ॥ কে জানে ভাই, কি যে হচ্ছে কিচ্ছু বুঝছিনে!

ঐরাবত ॥ আর বোধহয় আসতে কেউ বাকি নেই?

গরুড় ॥ এলেও আর দোর খুলছেন না, সুধর্মা! সভা বসার ঘন্টা পলো: চল 'বিশ্রাম বেদব্যাসের' করি, কিছুক্ষণের জন্য।

(ঘন্টা ধ্বনি নেপথ্যে। পর্বত ও বিশ্বকর্মার প্রবেশ)

বিশ্ব ॥ দেখহে পর্বত, শ্রীমতীকে তুমি নিজের জন্যে চেয়ে বসলে, এ তো

অন্যায় হল, এতে করে দেবকার্যে ব্যাঘাত হবে। এবারে অংশাবতার—লক্ষ্মীর অংশ শ্রীমতীকে সীতা করার কথা! এখন কি করা হয়? যাক সে কথা, যা করেছ তার চারা নেই—এখন কি চাও বল।

পর্বত ॥ তুঙ্গভদ্রায় ঘর বেঁধেছি, ঘরণী করে শ্রীমতীকে রাখবো সেখানে—তোমাকে বেশ করে ঘরখানা চিত্রবিচিত্র করে দিতে হবে।

বিশ্ব ॥ নারদও যে একটা রাজভবন চান!

পর্বত ॥ মামার ধাপ্পায় ভুলো না, ঠকবে। কাজ করিয়ে শেষ মজুরী দিতে বীণ ঘাড়ে করে বেরোবে ভিক্ষেতে। আমার চেয়েও বেশী ক্ষেপেছেন আমার মামা। তিনিও বসেছেন চেয়ে শ্রীমতীকে!

বিশ্ব ॥ লক্ষ্মী সদয় আছেন নারদের প্রতি—নিশ্চয়ই অনেক কিছু পাবেন যৌতুক।

পর্বত ॥ এ তো তোমার বিষম ভুল নারদ। গুণবান বটে কিন্তু চেহারা মর্কটবৎ।

বিশ্ব ॥ তথাস্তু, কিন্তু দেখো নারদকে এ বিষয় ভেঙো না যে আমি তোমার কাজ নিয়েছি।

পর্বত ॥ যথাজ্ঞাপতি। যত শীঘ্র হয় শিল্পীদের পাঠান। ভিত্তি চিত্রণে তুঙ্গভদ্রায় মর্কট একটা আঁকা চাই। ঐ যে নারদ আসছেন—আমি নড়ি।

(পর্বতের প্রস্থান ও নারদের প্রবেশ ও গীত)

রে বীণে ওউরে বীণে তুমি আমায় ভুলো না
হরিনাম বিনে ওউরে বীণে অন্য সুরও
ভুলো না।

বিশ্ব ॥ রাখ বীণাবাদ্য রাখ—খবর বল!

নারদ ॥ মালক্ষ্মীকে সমস্ত জানিয়ে এসেছি। অম্বরীশ আমাকে শ্রীমতী সম্প্রদান করতে চেয়েছেন শুনে বড়ই আনন্দিতা হয়েছেন। ভাবী বধূমাতার রূপ-গুণের কথা এতক্ষণ শুনছিলেন।

বিশ্ব ॥ বলি, বিবাহ যে করবে সম্বলের মধ্যে তোমার তো ঐ বীণা!

নারদ ॥ মালক্ষ্মী সহায় আছেন, আপনি আছেন মুরুব্বি, সে ভাবনা করিনে, ভাবনা ছিল এক পর্বত আমার ভাগিয়েনটিকে নিয়ে। সে বিষয়েও মালক্ষ্মী নিশ্চিন্ত করেছেন।

বিশ্ব ॥ কিরকম, খুলে বল তো শুনি।

নারদ ॥ বর চেয়ে নিয়েছি সভাস্থলে পর্বতকে দেখবেন শ্রীমতী একটি গোলাঙ্গুলবৎ।

বিশ্ব ॥ হর হর হল ভালো। দেখ পর্বতকে এ কথা জানতে দিও না সে আবার বর চেয়ে বসলে গোলযোগ বাধতে পারে। দেখ, অম্বরীশ শ্রীমতী দুজনকেই এখানে আনিয়েছি। শুভকার্য এক্ষণেই সম্পাদন হবে। দেবতাদেরও আনিয়েছি সাক্ষীরূপে।

নারদ ॥ অ্যাঁ, সেই অবধূতেকে আনাননি তো? কাজটা চুপে চুপে হলেই ভালো হত মর্তলোকে গিয়ে।

বিশ্ব ॥ অবধূত কারে কও? স্বয়ং শিব তাদের সঙ্গে এসেছেন। তাঁর ইচ্ছে সকলের সামনে শ্রীমতী সম্প্রদান।

নারদ ॥ এই তো গোল বাধিয়েছেন! হঠাৎ চুকোপ হয়ে সভা না পণ্ড করেন। জানেন তো ও'র অবস্থা সব সময় ঠিক—ওর নাম কি—থাকেন না।

বিশ্ব ॥ তোমাদের দুজনকে একটি কাজ করতে হবে। জানো তো এবার রামাবতার পালা।

নারদ ॥ সেই জন্যেই তো গিয়েছিলেম সীতার সন্ধানে।

বিশ্ব ॥ সে কাজ তো পণ্ড করলে। নিজের কাজেই ফিরলে অনর্থক।

নারদ ॥ পণ্ড কি আর হল? অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে সীতা পাওয়া দুস্কর হবে না, কাজ চালানো গোছের এনে দেবো খুঁজে রামলীলার পূর্বেই। এই তো সূত্রপাত হচ্ছে মাত্র!

বিশ্ব ॥ তাই বলছি দেখ, দেবতারা রাম-লীলার লংকাকাণ্ডের মহলা দেবেন এখনি। আমি বেশভূষা মুখোশাদি প্রস্তুত করে এনেছি। কিন্তু বানরদের ভাবভঙ্গি দেবতাদের দেখা নেই, তুমি আর পর্বত দুজনে এ বিষয়ে তাঁদের কিছু শিক্ষা দিতে হবে। মর্তলোকের বানর নানারকম দেখেছ তো?

নারদ ॥ তা আমরা খুব পারব। প্রচুর লাঙ্গুল আস্ফালন, দন্ত খিঁচিমিচি আর বহুবারম্ভে লঘুক্রিয়া! ভাগ্নেকে চাই কিন্তু।

বিশ্ব ॥ বেশ, গৃহে যাও। দেবতারা সাজ-ছেন। পর্বতকে নিয়ে আমিও আসছি। সেজে নাও গে। যথা সময়ে রাম-লীলার মহলা দেওয়া চাই।

নারদ ॥ যথাজ্ঞাপয়তি। যথানিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

(নারদের প্রস্থান ও হরহরি বাবার প্রবেশ)

হরহরি ॥ হরহরি বোম্ বোম্ হরিবোল হরিবোল! দেখছ বিশ্বকর্মা রাম-চন্দ্রের সীতাকে হাজির করে দিলাম লক্ষ্মী মন্দিরে। আর সুদর্শনকে বলেছি অম্বরীশের খবরদারি করতে। পর্বত আর নারদ কি ঝঞ্ঝাটই বাধিয়ে-ছিল? প্রায় বেহাত করেছিল শ্রীমতীকে! অম্বরীশ ব্রহ্মসাপের ভয়ে সম্প্রদানেই রাজি! যাক্ একটা ফাঁড়া কেটেছে।

বিশ্ব ॥ ফাঁড়া আর কাটলো কোথায়? পর্বত নারদ দুজনেই এখানেই উপস্থিত হয়েছেন।

হরহরি ॥ ঢুকতে দিলে কেন নষ্ট দুটোকে? —সিংহদ্বার বন্ধ রাখা উচিত ছিল।

বিশ্ব ॥ সিংহ থাকলে তো হতো। একা গরুড় কত দিকে ঠেকায়?

হরহরি ॥ আমার দলটা আগে পাঠালেই হতো ভূতের মার দিয়ে দুটোকে পেড়ে ফেলে এলেম। অথচ ঠেলে এল এ পর্যন্ত তাও আবার আমার আগে। ভবিতব্য সীতাকে দেখে রাবণটা সমুদ্র-পার থেকে কি প্রচণ্ড আকর্ষণে আসবে ছুটে তার একটু আভাস পাচ্ছি এদের কাণ্ড দেখে। একটু দয়া হচ্ছে ঋষি দুটোর উপরে হে বিশ্বকর্মা।

বিশ্ব ॥ পর্বত আগেই এসে কৃপা ভিক্ষা করে নিয়েছে, বরদান করে চুকেছেন। আপনি আর বেশী দয়া—

হরহরি ॥ কৃপা করে বসে আছেন ইতি-মধ্যেই?

বিশ্ব ॥ লক্ষ্মীরও প্রসাদ পেয়ে গেছেন নারদ, শুনলেম।

হরহরি ॥ লক্ষ্মী নারায়ণকে চেনা ভার! নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারতে এমন দুটি নেই। আর পরের মাথার কাঁঠাল ভাঙ্গতে নারদ আর পর্বতের জুড়ি পাওয়া দায়। কি বরদানটা হল শুনি?

বিশ্ব ॥ কানে কানে বলি শোনেন—এবমেবম্ ...সভাস্থলে শ্রীমতী দেখবেন একটি গোলাঙ্গুলে একটি মর্কট। আমরা দেখব যথা নারদ তথা পর্বত!

হরহরি ॥ ওহে আমিও তো তাহলে বর দিয়ে বসে আছি, শোন...এবমেবম্...একে-বারে একম্ভবতু এবম্ভবিতব্য করে ছেড়ে দিয়েছি! দেখ, ন ভূত ন ভবিষ্যতি কোথা থেকে কি ঘটনা হয়ে গেলো। তোমার বিশ্বকর্মা চেলাকে বলে দাও গা মুখোশ দুটো বেশ করে বানিয়ে দেয়, সহজে যেন না খুলে পড়ে।

বিশ্ব ॥ রামলীলা শেষ হওয়া পর্যন্ত তো খুলবে না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন।

হরহরি ॥ রামের মুখোশটা কিরূপ হচ্ছে দেখি! ক্ষত্রিয় বর্ণ লালমুখো হওয়া চাই তো। আনো না হে সুদর্শন!

বিশ্ব ॥ লক্ষ্মী লাল মুখ দেখতে পারেন না। হয় নীল নয় সবুজ হওয়া চাই।

(সুদর্শনের মুখোশ নিয়ে প্রবেশ)

হরহরি ॥ ইকি! তুলসীপাতার রং হয়েছে যে, এ চলবে না। একেবারে রেমো-সবুজ করতে হবে। এবারে কড়া অবতার। রাক্ষস নিয়ে কারখানা। কড়া রং চাই রামের—না হলে নল নীল গয় গবাক্ষের সঙ্গে মিলে যাবে। তোমার কাণ্ডজ্ঞান যদি কিছু থাকে।

বিশ্ব ॥ রামচন্দ্রের বয়স যেমন যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি তেমনি মুখোশের বর্ণও কোমল থেকে ক্রমে কড়ি তারপরে একে-বারে রেমো-সবুজের ছড়াছড়ি যাতে হয় এই ভাবেই রংটা দেওয়া গেছে।

হরহরি ॥ ভালো ভালো! ঠিক রামের মত আর এক মুখোশ—এটা কার?

বিশ্ব ॥ এটা হল পরশুরামের।

হরহরি ॥ প্রায় এক দেখছি! দেখো বদলা-বদলি না হয়! রামেরটা সুদর্শনের কাছে রাখ। কুঠারী কিম্বা পরশুর কাছে দাও গে অন্যটা। ওহে, রাবণের কি রকম দশমুণ্ডু মুখোশটা গড়লে চল দেখি গে।

বিশ্ব ॥ আজ গড়া হয়ে গেল নর বানরের কাল থেকে রাক্ষসদের নিয়ে পড়বো।

হরহরি ॥ আমারটা কিরূপে গড়লে?

বিশ্ব ॥ আপনার আর প্রয়োজন হবে না এ অবতারে।

হরহরি ॥ ওগো হবে! সাতকাণ্ডে সবাই সাজবে, আমি বাদ যাবো—এ হবে না। তাহলে বাল্মীকির রামায়ণ আমি চলতেই দেবো না। আমার গণেশ আছেন তাকে দিয়ে লেখাবো রাম যাত্রা! তুমি একটা মুখোশ রাখবে—আমার—বীরভদ্দর গোছের। রাবণ বধে আমি নামছি বাল্মীকি লিখুন আর নাই লিখুন। চল একবার দেখিগে সাজ ঘরটা ঘুরে। সুদর্শন তুমি যাও সুধর্মা সভাতে শ্রীমতী স্বয়ম্বরের আয়োজন কর। আমি সংবাদ পাঠালেই উপস্থিত হতে হবে নারায়ণকে নিয়ে। একেবারে নটবর বেশ চাই বুঝলে! সুদর্শন, মালক্ষ্মীকে বল গা আমি চাই বিষ্ণুকে শ্রীমতী বরণ করেন; না হলে সীতা হরণ পালাই বাদ পড়বে। রাবণ বধও হবে না, কিচ্‌কিন্ধা কাণ্ডও ব্যর্থ! যাও বিলম্ব কোরো না।

(সুদর্শনের প্রস্থান)

(দুই দল নর বানরের প্রবেশ)

॥ বৈতালিক গীত ॥

এক ডালে নর অপরে বানর
কেহ ভাঙে ডাল কেহ ভাঙে ফল
বৃক্ষ বলে—'ওরে বাছা
কেন পাড় কাঁচা ডাঁসা
পাকিলে দিবরে আপনি।'
কে শোনে বৃক্ষের কথা
কে শোনে বৃক্ষের বাণী।
এ ধারে নর ও ধারে বানর
এ বলে আয় ও বলে সর
এ তাল ঠোকে ও ঝাঁপাই ছোড়ে
জোরে জোরে
এ মারে চাপড় ও মারে কামড়।

বিশ্ব ॥ নাও সকলে দুই ভাগে দাঁড়াও—নর্তন কুর্দন অভ্যাস কর।

পর্বত ॥ ওহে বিশ্বকর্মা, নারদ মামার কি বেশ করলে? মুখে একটু কুল কাঠ পোড়া ঘষে দাও—মর্কটের মুখ লাল হয় কখনো?

নারদ ॥ তুমি আর বোকো না ভাগ্নে, ও ঠিক হয়েছে। ওহে বিশ্বকর্মা, গোলাঙ্গুল-টার লেজের গোড়ার বেশ খানিক লাল লেপে দাও—আর এক গালে চুন আর এক গালে কালী।

বিশ্ব ॥ নাও নাও, স্বয়ম্বরের সময় হয়ে এল, বানর ফটকের নাচ-গানটা সেরে নাও। ওহে ও নারদ, ও পর্বত। দেখিয়ে দাও দেবতাদের বানরের দাপট কি প্রকার হওয়া চাই।

নারদ ॥ প্রথমে দেখেন দলে দলে কি ভাবে আনন্দ কোলাহল করে একত্রীভূত হচ্ছে বানর কটক রং চং মেখে—

(গীত)

এ ছররর ছররর হোলি হো রঙে মাতি
লপটি ঝপটি চপেটা চাপটি
কিচি-কিচ্চি চিল্ল-চিলাতি
কিয়াঁকারা কিয়াঁকারা
টিঁহিহাঁহাঁ টিঁহিহাঁহাঁ
খপাখপ্ খপাখপ্ লফালফ্ আতি যাতি
ছরর ওখর ওখর উকু উকু উপ্ উপ্ গাতি॥

পর্বত ॥ এইবার সাগর লম্ফন করা শিখে নাও।

(নৃত্য ও গীত)

করে ভূকুটী ভঙ্গী ত্রিকুটী জঙ্গী
সাগর লঙ্ঘি যান—
উলটি পালটি আকাশে উত্থান
পিছে পড়ে রণ সঙ্গী।
সাগর উছলান—তরজি গরজি চান।
করে ভূকুটী ভঙ্গী বিভীষণ মূর্চ্ছা যান,
খেয়ে পটকান॥
লঙ্কাপুরে দশানন কম্পমান,
ইন্দ্রজিতে ধমকান,
হয়ে হতমান আগুন সমান।
ধরাসনে কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যান।
মন্দোদরী চান হতভম্ব॥

নারদ ॥ এইবার লড়ায়ের সূত্রপাত দেখে নাও। সেতুবন্ধ পার হচ্ছে সুগ্রীব জাম্বুবানের কটক স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস করতে।

(গীত)

ওরে ভাই নাইরে শঙ্কা খাওরে লঙ্কা
চিবাইয়ে মুড়ির সাথে
ভাই ভাই এক ঠাঁই—মারো টান
পাথর শিলে যার যার ল্যাজে হাতে
শুধু মুখে জয়রাম বল
গন্ধমাদন অবহেলে তোলো!
ভাই লক্ষ্মণ পলো শক্তি শেলে
মারো ডঙ্কা কিলাইয়ে হাতে হাতে

(উভয়ের নৃত্য গীত)

দাও উল্লম্ফণ প্রোল্লম্ফণ
বাহ্বাস্ফোটন দন্ত কড়মড়
চড় চাপড়, আঁচড় কামড়
খামচি খাম্‌চা—
খামকা কেচে গামছা
লম্বা ধর ছেড়ে লঙ্কা
অযোধ্যাতে ছাতে ছাতে
ডঙ্কা মেরে যাও ঘাটে মাঠে॥

(ডঙ্কা বাদ্য সকলের—শাঁখ ঘন্টা কাঁসর ইত্যাদি, কুশীলবের গীতবাদ্য ঘন ঘন যথা ইচ্ছা—খোল ঢোল তথা বাজনার বোল, কুশীলব বাল্মিকীর গীত)

জয় জয় রাম সীতা রাম
গুহক চণ্ডাল দণ্ডক বন
সূর্পনখার নাশাকর্তন—জটাই বধ—
সীতাহরণ—একদম!
কিচ্‌কিন্দে কাণ্ড—বালি বধ—
সেতু বন্ধন।
লঙ্কাদাহন—গন্ধমাদন—মেঘনাদ বধ—
রাবণপতন।
চিত্রকূটে ভরত মিলন,
সাত কাণ্ড করে সীতা বর্জন—
অশ্বমেধের ধুমধাম॥

(নেপথ্যে) হরহরি বোম্ বোম্ হরহরি বোম্ বোম্।

বৈতালিক ॥ সকলে সভাস্থ হন,—দেবতা দেবর্ষিগণ।

নারদ ॥ চল চল বিলম্বেনালম্।

পর্বত ॥ বিলম্বে কার্যহানি স্যাৎ।

(সকলের প্রস্থান)

(সূতমাগধগণের প্রবেশ)

১ম ॥ চেয়ে দেখ অন্তঃরীক্ষে
গোধূলির রেখা
এখনো ভাতি মৃদু সুমেরু উপরে
—দীপ্ত অন্ধকার যথা।
রচিয়াছে বিষ্ণুমায়া মহাসভা
অর্ধেক দিগন্ত জুড়ি
সুমেরু শিখর প্রায়—সুবর্ণ দ্যুতি।
একাদশ মণ্ডলীতে বিন্যাসিয়া
স্তম্ভশ্রেণী রচিয়াছে মহাসন
পক্ষীন্দ্র গরুড় বিস্তারিয়া পাখা যেন
দেখিতে তেমতি অপূর্ব গঠন।

২য় ॥ ঝকিছে কিরণোচ্ছ্বাস
দিগন্ত ব্যাপিয়া ধ্বজ কলসে
পতাকার মাল্যদামে উপবীতাকারে।
সেজেছেন মহারাজ অম্বরীশ
বান্ধি কটি কটিবন্ধে
দক্ষিণে সূর্যের মণ্ডলবৎ
চক্ররাজ সুদর্শন
বামে কাল ভৈরব শূলে হস্তে।

৩য় ॥ ত্রিলোক সাক্ষাতে আজি শুভক্ষণে
স্বয়ম্বরা হইলা শ্রীমতী
মনোসুখে বরিলা লাবণ্যরাণী
যথা জনকনন্দিনী রঘুকুলরাজে।

(নেপথ্যে শঙ্খ ধ্বনি—চারণগণের প্রবেশ)

১ম ॥ শঙ্খনাদ সম্বলিত মাঙ্গলিক তূর্য-ধ্বনিতে সমস্ত দিগন্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল!

২য় ॥ অগুরুসার সমুত্থিত ধূপধূম দর্শনে ও তূর্যনিনাদ শ্রবণে কৈলাসের প্রান্ত-বাসী শিখিকুল মেঘনাদ বোধে উন্মত্ত নৃত্য আরম্ভ করিল।

৩য় ॥ অনন্তর মনোহর পদ্মপলাশ লোচন শাস্ত্রবিধানানুসারে অভিষেককৃত্য সমাপন করিয়া, বেশবিন্যাস কুশল ভৃত্যগণ কর্তৃক বিরচিত স্বয়ম্বরোপযোগী অভিরাম বেশভুষা পরিধান পূর্বক কোপ দণ্ড হস্ত মন্থরগমনে স্বয়ম্বর সভায় গমন করিলেন।

৪র্থ ॥ এমন সময় সর্বাঙ্গসুন্দরী স্বয়ম্বর কন্যা অম্বরীশ দুহিতা শ্রীমতী বিবাহোপযোগী বেশভূষা ধারণ করিয়া পরিজন বেষ্টিত নরবাহিত চতুর্দোলায় আরোহণ পূর্বক মঞ্চশ্রেণীর মধ্যস্থিত রাজপথে প্রবেশ করিলেন।

(শঙ্খধ্বনি)

(ঐরাবত ও নন্দিকেশরের প্রবেশ)

ঐরাবত ॥ তারপর কি হল বলে চল।

নন্দি ॥ কোথাকার ষণ্ডামার্ক ভাট তোমরা—থামো কেন, বলে চল।

১ম চারণ ॥ রাত্রিকালে সঞ্চারিণী দীপশিখা অতিক্রম করিয়া গেলে, রাজপথস্থিত অট্টালিকাসমূহ যেরূপ তিমিরাচ্ছন্ন বোধ হইয়া থাকে তদ্রূপ পতিম্বরা শ্রীমতী পরেপরে লোকপালগণকে অতিক্রম করিয়া গেলেন—অমনি একে একে তাঁহারা বিষণ্ণ হইয়া বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া নিষ্প্রভ হইতে থাকিলেন।

ঐরাবত ॥ আমাদের কর্তা ফাঁকে পড়লেন নাকি?—বল না হে, বলে চল না।

২য় চারণ ॥ অনন্তর পরিচারিণী বুদ্ধিশীলা সেই পূর্ণচন্দ্রবদনা শ্রীমতীকে বিপক্ষ-পক্ষ-বিঘাতন অঙ্গদভূষিত ভুজ মহেন্দ্র-শৈল সদৃশ বলবান মহেন্দ্র সমীপে উপস্থিত করিয়া বলিলেন—

ঐরাবত ॥ কি কি বললেন?—বলে ফেল না।

২য় ॥ যা না বলবার তাই—ইন্দ্রের মাথা হেঁট!

ঐরাবত ॥ সোমপান করে করে ফুলে ঢোল হয়েছেন কর্তা। পছন্দ হয় কখনো? অরগুণ নেই বরগুণ আছে যথেষ্ট!

নন্দি ॥ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, বজ্রাঘাত করে বসবে রেগে!—হ্যাঁ তুমিও যেমন হস্তি-মূর্খ! বলি, নারদের আর পর্বতের হলো কি?

(নেপথ্যে ঝনঝন শঙ্খ ইত্যাদি)

ঐরাবত ॥ আরে বাস্, অকস্মাৎ বজ্রাঘাত!

নন্দি ॥ আলোটা দপ্ করে তেজে জ্বলেই ঝপ করেই নিবলো যে—কই ভাটেরা গেল কোথায়?

ঐরাবত ॥ সরে এসো, মাথার উপরে তারা-মারা খসে পড়লেই গেছি।

নন্দি ॥ আমি তো বলেছি, এ শুধু বিবাহ ঘটনা নয়, একটা কিছু অবতার-টবতার হবার পূর্বাভাস।

ঐরাবত ॥ ঐ আবার জ্বলে—ঐ আবার নেবে ঐ ঐ ঐ—হতে লাগলো কি ভাই?

নন্দি ॥ বার বার চার বার হল! গরুড় কোথায় কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ঐরাবত ॥ গোলকধাম তো নয় গোলকধাঁধা—কে কোন দিকে ঘুরছে তার ঠিক নেই! ফোকর একটা নেই যে গলে পালাই।

নন্দি ॥ শিং ভোঁতা হয়ে যায়—এমন অয়স্কান্ত মণি দিয়ে গাঁথা দেওয়াল।

ঐরাবত ॥ আমার ভাই বড় ভয় করছে—সব দেখ শুনশান্ স্তব্ধ!

নন্দি ॥ বাতাসটা কেবল নানা শব্দের চর্বিত চর্বণ করে চলেছে। গরুড় কোথায়?—গরুড়? ও গরুন্দা ও ভুষুণ্ডিকাকা!

(নেপথ্যে ভীষণ ঝনঝনা। ঘোর অন্ধকার)

ঐরাবত ॥ আর গরুন্দা—

(উভয়ের মূর্চ্ছা)

(ভূশণ্ডি ও গরুড়ের প্রবেশ। অন্ধকার)

গরুড় ॥ কই এখানে তো কেউ নেই?

ভূশণ্ডি ॥ কাকা করে ডাকলো—নেই কি? আমি কি কালা হয়েছি? দেখ না, আশপাশ হাতড়ে।

গরুড় ॥ এ দুটো কি পড়ে? অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না—তাকিয়া বোধ হচ্ছে!

ঐরাবত ॥ উঁঃ, কাতুকুতু দিও না—আমরা মূর্চ্ছিত হয়েছি।

ভূশণ্ডি ॥ আরে ওঠো না! সপ্তকাণ্ড রামায়ণ হয়ে গেল—এতক্ষণে হলেন মূর্চ্ছিত!

গরুড় ॥ কুচ্ছিৎ কাণ্ড হয়ে গেছে—শাপ শাপান্ত, খালি প্রাণান্ত হতে বাকি!

নন্দি ॥ ভইয়ানক ব্যাপার!

ঐরাবত ॥ কি? কি?

গরুড় ॥ দেবর্ষি আর পর্বত আর আমাদের কর্তাতে লেগে গেছে ঝুলোঝুলি শ্রীমতীকে নিয়ে। দেখবি তো চল!

ঐরাবত ॥ ও বাবা, রাজায় রাজায় লড়াই হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়—আমি ওর মধ্যে নেই!

নন্দি ॥ আমি বাবা সাধু সন্নেসী, ও সবের মধ্যে নেই। নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গীনাং শস্ত্রপাণিনাং বিশ্বাস নৈব কর্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। আমি সব বুঝি বাবা। বোম্ মহাদেব!—

(গীত)

পোস্ত আর সিদ্ধি
সাধু সন্ন্যাসীর বুদ্ধি করুক বৃদ্ধি।
বনশি বল ব
ধতুরা পিষি শিলে বাট
পাত্রে ধর বিভূতি রিদ্ধি॥

(নেপথ্যে)—হরহরিবোম্

নন্দি ॥ আড়াল হও কর্তারা আসছেন বোধ-হয়।

(নেপথ্যে)—জয় জয় রাম—

(সহচরীদের গীত)

আয় সারি সারি মিথিলার নারী
সোনার গাগরী ভরিয়ে জলে
হুলুধ্বনি দিয়ে আয় আয় ধেয়ে
আয়লো সকলে দেখলো চেয়ে॥

(গণেশ ও বাদ্যকরগণের গীত)

ধির কুট ধির কুট বাজিয়ে যানা
ইহা গচ্ছ উহা গচ্ছ
মিছে করছ তানা নানা!

যেনতেন প্রকারেণ নেচে যানা
যথা ইচ্ছা নেইকো মানা।

(প্রস্থান)

(বিশ্বকর্মা ও অবধূতের প্রবেশ)

বিশ্ব ॥ পুরুহূত প্রভৃতয়ঃ সুরকার্যোদ্যতং সুরাঃ অংশৈরণুযথুর্বিষ্ণুং পুষ্টো-র্বায়ুমিব দ্রুমাঃ।

অবধূত ॥ বলি ও ভূশণ্ডি, ও গরুড়, ও নন্দি ও—তুমি কে, গণেশ নাকি?

ঐরাবত ॥ আজ্ঞে আমি ঐরাবত।

অবধূত ॥ তাই বল! তোমরা বসে কেন? রামাবতার হচ্ছেন, দেখবে না—চলে এস!

(প্রস্থান)

ঐরাবত ॥ শ্রীমতী সম্প্রদান হতে হতেই অবতার?

নন্দি ॥ শোন কেন কর্তার কথা—সিদ্ধির ঝোঁকে কি দেখতে কি দেখেছেন!

(শ্রীমতীর সহচরীদের গীত)

আয় তোরা কেউ দেখবি যদি
রাম রূপে দেখবি আয়
যেমন শরৎশশী পড়ল খসি
নব-ঘন মিশেছে তায়
একটি অঙ্গ মেঘের বরণ,
একটি যেন চাঁদের কিরণ
সই গো, তাতে চাঁদ বলে ধায় চকোরী,
—মেঘ বলে চাতকী ধায়॥

গরুড় ॥ ও গো ও কুটুম্বিনী, কি' খবর গো?

১ ॥ ওগো আমাদের রাজকন্যে শ্রীমতী ঠাকুরের গলায় মালা দিয়েছে।

ভূশণ্ডি ॥ কোন ঠাকুর? নারদ না পর্বত?

২ ॥ না গো না, নারায়ণ ঠাকুর—আয় লো আয়।

গরুড় ॥ থামো না, শুনি বেওরাটা—যাও কোথা!

৩ ॥ অযুদ্ধেতে!

(প্রস্থান সহচরীদের)

ঐরাবত ॥ কম নয় তো কুটুমবাড়ির এরা—যুদ্ধে গেল কোমর বেঁধে।

নন্দি ॥ অযুদ্ধেতে গেল, শুনলিনা! ওরা তেমন বোকা নয়। মানুষী ওরা যুদ্ধে যাবে না আরো কিছু।—ওই সিদ্ধি আর বুদ্ধি, বাবার দুই চেড়ি আসছেন।

ঐরাবত ॥ আসছে দেখ যেন গজগামিনী চলন দেখ—

(গীত)

কঁহি বাজা রহি ছয়জী ছেটিং লুম্ভিজীয়ো
বিচ্ছুয়া ছম্ ছম্ চুড়ুয়া চম্ চম্
ঝাঝর ঝম্ ঝম্।
গজগমনী মহল চেড়িসে ঠম্ ঠম্ ঠম্ ঠম্
পগ ধরিয়ে রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্॥
ভুঁইকম্প ধরিয়ে আসছে দেখ!

(সিদ্ধি বুদ্ধির প্রবেশ)

(গীত)

কি কররে মন মিথ্যে ভাবনা
চিত্তের ভ্রমে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করো না
চলরে চরণ শ্রীরামের শ্রীচরণ
দরশন করিয়ে হবে সিন্ধ কামনা।

নন্দি ॥ ও সিদ্ধি, ও বুদ্ধি বলি ব্যাপারটা কয়ে যাও।

বুদ্ধি ॥ ও ভাটরা আসছে শুধাও ওদের।

সিদ্ধি ॥ চল আর দাঁড়াস্ নে।

(প্রস্থান)

নন্দি ॥ ইস্ দেমাকে পা পড়ে না। আমরা মনিবের চাকরি করি বলেই কি হেঁপজি পেঁপজি? সিদ্ধিতে বুদ্ধিতে মিলে বুদ্ধিনাশ করলে কর্তার।

গরুড় ॥ ঐ যে আসছে আমাদের প্যাঁচা-মুখী!

(লক্ষ্মী প্যাঁচার গীত)

রামকে চিন্তে পারা ভার
ভজে ইন্দ্রচন্দ্র পদারবিন্দ
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন তার
রাম সীতে ভার নাশিতে
অবনীতে অবতার

গরুড় ॥ বসে যাও।

প্যাঁচা ॥ চল্লেম লক্ষ্মী ঠাকরুণকে খবর দিতে।

ভুশণ্ডি ॥ বল না শুনি কথাটা কি হল।

প্যাঁচা ॥ ভাটেরা আসছে ওদের কাছে শোনো।

(প্রস্থান)

(ভাটেদের প্রবেশ ও গীত)

রাম সীতে যুগলেতে কি শোভা হল
উজ্জ্বল নীল গিরিবরে যেন,
কণকলতা বেড়িল।
আসি সব প্রতিবাসী
হের রামসীতা রূপরাশি
যুগল শশী উদয় হলেন
অযোধ্যা করতে আলো।
সুরশংকা বিনাশিতে রাবণকুল নাশিতে
ভূসুতা হইবেন সীতে জনক ভবনে।
অযোধ্যায় জন্মাবেন রাম
দশরথ পাঠাবেন বনে
চৌদ্দ বৎসর
সপ্তকান্ড হলে পর
প্রত্যাবর্তন বৈকুণ্ঠ সদনে।

ঐরাবত ॥ বলি যাও কোথায়? সভাতে কি কান্ড হল তাই বল আগাগোড়া।

(ভাটেদের উক্তি)

১ ॥ মহাতেজা মহী মহেন্দ্র মহারাজা অম্বরীশ, প্রিয় দর্শন সুদর্শন কর্তৃক রক্ষিত হইয়া চতুঃ-সমুদ্র-বিস্তৃতা পৃথিবী শাসন করিয়া কাল যাপন করিতে ছিলেন।

২ ॥ ক্রমে তাঁহার সর্বলক্ষণ শোভিতা শ্রীমতী নামে বিখ্যাতা দেবমায়ার ন্যায় শোভনা কন্যা সম্প্রদান কালে পদার্পণ করিলেন।

৩ ॥ এই সময়ে শ্রীমান নারদ ও মহাদ্যুতি পর্বত মুনি রাজা অম্বরীশের গৃহে আগমন করিলেন।

৪ ॥ মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ রাজকন্যা শ্রীমতীকে প্রার্থনা করিয়া রাজাকে অনুজ্ঞা করিলেন—হে ধর্মাত্মন আমাকে নির্জনে আহ্বান করিয়া এই কন্যা সম্প্রদান কর। পর্বতও রাজাকে তাহাই কহিলেন।

১ ॥ রাজা ব্রহ্মশাপ ভয়ে পীড়িত হইয়া দুই মুনিকে প্রণাম করতঃ কহিলেন—হে নারদ, হে পর্বত আপনারা উভয়েই আমার কন্যা প্রার্থনা করিতেছেন, কি করিব? এই কন্যা যদি আপনাদিগের মধ্যে একজনকে বরণ করেন তাহা হইলে আমি কন্যা দান করিতে পারি—নচেৎ আমার অন্য শক্তি নাই।

২ ॥ অনন্তর মুনিসত্তম নারদ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া হৃষিকেশকে নির্জনে পাইয়া কহিলেন, আমি শ্রীমতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি, আপনার ভৃত্য তপোধন শ্রীমান পর্বতও তাঁহাকে ইচ্ছা করিতেছেন। হে জগন্নাথ যদি আমার প্রিয় সাধন করিতে ইচ্ছা করেন তবে পর্বতের মুখ যেন বানরের ন্যায় দৃষ্ট হয়। শ্রীমতী যে রূপ দেখিবে অন্যে যেন সে রূপ না দেখে। গোবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, তাহাই হইবে।

৩ ॥ নারদ প্রস্থান করিলে পর্বতও মাধবকে নির্জনে পাইয়া বলিলেন—নারদের মুখ যাহাতে গোলাঙ্গুলের ন্যায় দৃষ্ট হয় তাহাই করুন। গোবিন্দ বলিলেন, তাহাই হউক!

গরুড় ॥ বিশ্বকর্মার মুখোস আনার অর্থ বুঝলে হে ঐরাবত—তারপর?

১ ॥ সমৃদ্ধিসম্পন্না শ্রেষ্ঠ মণিরত্নে চিত্রিতা সভায় আসন বিস্তৃত এবং মালা-চন্দনাদি রক্ষিত হইল। সুররাজ সকল সেই সভায় আগমন করিলেন।

২ ॥ মহামুনি নারদ পর্বতের সহিত আগমন করিলেন।

৩ ॥ সকলে উপবেশন করিলে পর, ভূপতি সেই সুগঠনা শুভাননা কন্যা শ্রীমতীকে লইয়া সভাতে প্রবেশ করিলেন, অনেক কামিনী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসিয়াছিল।

ঐরাবত ॥ সভা অনেক দেখা গেছে—তারপর আসল ঘটনা কও।

নন্দি ॥ সভাতো নয়—ভেড়ার গোয়ালে আগুন ধরিয়ে কেবল ঢ্যোং এ্যাং ওম্বা রবে কি যে বকে আর আগুনে ঘি ঢালে ঋষিগুলো কে জানে। আমাদেরও তো এককালে বিয়ে থাওয়া শ্রাদ্ধশান্তি হয়েছিল—হয়ও এখনো।

গরুড় ॥ তুমি আর বোলো না, যখন হাম্বা রব করে ঘাড় বাঁকিয়ে ল্যাজ পাকিয়ে বম্ বম্ তান্ডব শব্দে কর, তখন কাশীতে ভূমিকম্প ঘটে—সিংহ পর্যন্ত জল খেতে বিষম খায়!

নন্দি ॥ আরে ভাই তাই বলে কি সর্বদা ভালো লাগে? তুমিই বলনা—

(গীত)

অম্ অম্ অম্বা, দিনরাত ভালো লাগে না
স্বল্প তথায় বহবশ্চ বিঘ্না
দিনরাত ট্যাং ট্যাং ঘণ্টার পরে ঘণ্টা
কত সয় বা
অজা যুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে
বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥

ভুশণ্ডি ॥ থাম না বাবা, এ কি যে সে ব্যাপার! একটা অবতার হতে চলেছে ধুমধাম হবে না? শুনতে দাও কথাটা। কামিনী তার মা গেল সভাস্থলে—তারপর?

১ ॥ তারপর আর কি, রাজা বল্লেন, বৎসে শ্রীমতী, এই নারদ আর এই পর্বত ঋষি, যাকে ইচ্ছা হয় মালা দাও। শ্রীমতী সোনার মালা হাতে দুই ঋষির চেহারা দেখেই অধোবদন।

২ ॥ সখীরা কেউ বলে, দিয়ে ফেল নারদের গলায়, কেউ বলে পর্বতের।

৩ ॥ শ্রীমতী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে।

৪ ॥ রাজাতো অবাক—বলি শ্রীমতী, লগ্ন বয়ে যায়, হলো কি তোমার?

১ ॥ শ্রীমতী বলেন, পিতে, কোথায় ঋষি? দুটি নর-বানর দেখছি, ওদের মধ্যে দেখছি—

২ ॥ রাজা বলেন, দেখচো কি?

৩ ॥ শ্রীমতী বলেন, একজন বর বসিয়া আছেন, তাঁহার বয়স ষোড়শ বর্ষ; তিনি সমুদয় আভরণে ভূষিত, তাঁহার বর্ণ অতসী কুসুমের তুল্য, বাহু দীর্ঘ, লোচন বিস্তৃত, বক্ষস্থল উন্নত। তিনি সুন্দর, স্বর্ণের ও অগ্নির কিরণের ন্যায় কিরণবিশিষ্ট করযুগলে শোভা পাইতেছেন, তিনি সুবর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া আছেন, তাঁহার নখের রঙ সুন্দর, হস্ত পথোদরের ন্যায়, তিনি কমলানন পদ্মলোচন, কমলচরণ পদ্মহৃদয় পদ্মনাভ। শোভা তাঁহাকে আবরণ করিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া কুন্দ-কুট্মল-দন্ত বিকাশ করিয়া অত্যন্ত হাসিতেছেন এবং দক্ষিণ পানি বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। আমি উধর্বগত এই শুভছত্র দর্শন করিতেছি।

ঐরাবত ॥ এই মজিয়েছে—এ আমার কর্তার কাজ।

গরুড় ॥ রঙ্গ বাধে বুঝি—এ আমার কর্তাটি না হয়ে যায় না।

নন্দি ॥ তারপর? তার পর?

১ ॥ উধর্বদেশে শুভছত্র দেখছ না, আমার রন্ধ্রগত শনিকে দেখছ—এই বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল অম্বরীশ।

২ ॥ পর্বত চান আমার মুখে, মামা চান পর্বতপ্রমাণ ভাগ্যের দিকে।

৩ ॥ সভাসুদ্ধ স্তম্ভিত আকাশে চেয়ে বসে।

নন্দি ॥ আমাদের কর্তা শিবনেত্র হলেন তো?

৪ ॥ নারদ ছাড়বার পাত্র নয়—শুধোলেন, শ্রীমতী ঠিক বল যাকে দেখছ তার কটা হাত?

১ ॥ কন্যা বল্লেন, দুই হাত। নারদ চুপ, মাথা চুলকান।

২ ॥ পর্বত শুধোলেন, তাঁর বক্ষস্থলে কিছু চিহ্ন দেখলে, হাতেই বা কি রয়েছে বলতো!

৩ ॥ কন্যা কইলেন—তাঁর বক্ষস্থলে পঞ্চরূপা—পুষ্প, পত্র, স্বচ্ছ ফল ও মূলে রচিতা অনুত্তমা মালা এবং হস্তে ধনুর্বাণ।

৪ ॥ এই না শুনে, কী আমরা বানর? এই বলে রাগে ফুলতে থাকলেন দুই ঋষি।

১ ॥ রাজা যত বলেন, ভদ্রমহোদয়গণ, ঠাণ্ডা হোন, ততই বৃদ্ধি দাঁত কড়মড়ি ভ্রূকুটি!

২ ॥ দুজনে বলেন, রাজা, এ তোমারই কাজ, গোলযোগের উৎপত্তি করেছ তুমি! সরে দাঁড়াও মাঝে থেকে,—শ্রীমতী ভালো করে দেখুন, আমরা যা আছি তাই; আমাদেরই একজনকে তিনি বরণ করুন।

৩ ॥ রাজা তো কাঁপতে কাঁপতে পশ্চাৎপদ দশ হাত তফাতে।

৪ ॥ শ্রীমতী তখন কলাপাতের মত কম্পান্বিত কলেবরা, কি করেন, মালা নিয়ে দুই মুনির মাঝে দেখলেন—পূর্ববৎ। দু-পাশে দুই বানর, মধ্যিখানে নরবর।—বস্ মাঝের মানুষটিই পেলেন মালা।

১ ॥ সবাই দেখলে শূন্যেভরে মালা দুলছে, তারপরে, শ্রীমতী সুদ্ধু অদৃশ্য!

ঐরাবত ॥ অ্যাঁ দুলতে দুলতে অদৃশ্য! বল কি!

২ ॥ অদৃশ্য আর হতে দিলে? নারদ এক লম্ফে ধরে ফেল্লে মালা।

৩ ॥ বস! বাসুদেব পাশে শ্রীমতী সভাস্থলে প্রকাশ।

৪ ॥ দুই মুনি মারমূর্তি হয়ে বাসুদেবকে বল্লেন, আপনি বঞ্চনা করে শ্রীমতীকে বরণ করেছেন।

১ ॥ বাসুদেব বলেন, অমন কথা বোলো না, বঞ্চনাও করিনি, হরণও করিনি—শ্রীমতী স্বইচ্ছায় বরণ করেছে আমাকে।

২ ॥ নারদ অমনি নারায়ণের এক কানে পর্বত আর এক কানে চুপি চুপি বল্লেন বঞ্চনা করেননি তো মুখের মুখোশ দুটো খুলেও খুল্লো না কেন?

৩ ॥ বাসুদেব কানে কানে বল্লেন তোমরাই তো চেয়েছিলে বর এ ওর মন্দ চেষ্টায়।

৪ ॥ তখন না অবধূত এক উঠে ত্রিশূলে হাতে বল্লেন—পরের জন্য ফাঁদ পাতিলে আপনাকেই সেই ফাঁদে পড়িতে হয়। দুর্বিনীত, দূরে হও তোমরা!

নন্দি ॥ ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে, উপযুক্ত হয়েছে—শিবের সামনে চালাকি চলবে না বাবা!

(গীত)

এখন মুখের মুখট খোল
মুখট খুলে টোপর পরো
গোধূলির লগন বুঝি ভেস্তো হ'ল
যেমন বুদ্ধি তেমনি শুদ্ধি
এইবারে তো শিক্ষে হল
হর হরি বোম্ বোম্ বল।

ভূশণ্ডি ॥ নেচেই চল্লো—শুনি শেষটা।

১ ॥ শিবের ধমক খেয়ে নারদ আর পর্বত চেপে ধরলেন অম্বরীশকে—আর কথা নেই—ব্রহ্মশাপ।

২ ॥ অমনি মহাতামস বিকট মূর্তি উদয়—রাজাকে গ্রাস করতে চারিদিক অন্ধকার।

ঐরাবত ॥ হঠাৎ অন্ধকারের মানে পাওয়া গেল এতক্ষণে—বাপ্!

৩ ॥ এমন সময় ছাড়লেন বিষ্ণুচক্র বাসুদেব, মহাতামস পিছিয়ে গিয়ে পড়লো দুই মুনির ঘাড়ে একেবারে।

গরুড় ॥ বেশ হয়েছে। মেয়ের বিয়ে দিতে ভোগ দেখ রাজার!

নন্দি ॥ বেচারা উলুখড় গিয়েছিল মারা—মুনিদুটো করলে কি!

৪ ॥ দৌড়য় আর শাপ শাপান্ত করে বিষ্ণুকে শ্রীমতীকে — রামসীতারূপে যাও পৃথিবীতে, রাক্ষসে ধরবে শ্রীমতীকে, আমাদের মত কেঁদে ফিরতে হবে তোমায়। বানরের সঙ্গে ভাব করে তবে উদ্ধার করতে হবে সীতা।

গরুড় ॥ বাপ্‌রে রাগ তো সহজ নয়!

ঐরাবত ॥ বাড়া ভাতে ছাই পড়ল রাগবে না।

নন্দি ॥ যা বলেছ, ঋষিদুটোরই যত অপরাধ হলো আর কর্তারা কেউ একবার দুবার বিয়ে করেও ক্ষান্ত নন!

ঐরাবত ॥ আমার কর্তাটি—ঐ দেখ কারা আসে, আবার আলো নেবে বুঝি, দপ্‌দপ্ করছে।

(হঠাৎ অন্ধকার)

(নারদ, পর্বতের ও মহাতামসের প্রবেশ)

নারদ ॥ ও সুদর্শন, থামো বাবা অত তাড়া কর না।

পর্বত ॥ কোথায় নিয়ে চল্লে হে মহাতামস?

(মহাতামস ও সুদর্শন)

গম্ভীর পাতাল! যথা কালরাত্রিকরালবদনা
বিস্তারে একাধিপত্য
শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা দিবানিশি
ফাটি রোষে;
ঘোর নীল বিবর্ণ অনলশিখাসংঘ আলোড়িয়া
দাপাদাপি করে দেশময়
তমোহস্ত এড়াইতে—প্রাণ
যথা কালের কবল।

মুনিরা ও অন্য সকলে ॥ ত্রাহি ত্রাহি

(গীত)

কৃপাংকুরু কমলাক্ষ রক্ষ এ দীন পামরে
গতিবিহীন ভেবে দীন বঞ্চনা কর না মোরে
কমল চরণ দেহি কমলা কৃপণতা কর না
ঐ পদাশ্রিত দাস তোমারই
শুন গো মা ধরা কুমারী
পদে পদে দোষ আমারি
বাঁচাও বলি মিনতি করে।

(নেপথ্যে)—হর হরি বোম্ বোম্—নিরস্ত হও সুদর্শন, মহাতামস পরিত্যাগ কর পর্বতকে।

(সকলের তিরোভাব, আলোর প্রকাশ)

পর্বত ॥ আর কেন মামা চল আমার তুঙ্গভদ্রা মঠে।

নারদ ॥ রাখ তোমার তুঙ্গভদ্রা, আর বিয়ের নাম নয়।

পর্বত ॥ যত দিন না দেহ পতন হয় ততদিন ও নাম আর নয়, কী বল মামা!

নারদ ॥ উপযুক্ত ভাগ্নের মত কথা বললে এতক্ষণে। এ যেন স্বপ্ন দেখে উঠলেম।

পর্বত ॥ যে পর্বত, সেই পর্বত।

নারদ ॥ এ স্বপ্ন না মায়া না সত্য! দেখ চেয়ে কী চমৎকার নয়নাভিরাম রমণীয় দৃশ্য।

(গীত—নারদের)

পশ্য পশ্চিমদিগন্তলম্বিনা
নির্মিতং কথমিদমা বিবস্বতা
দীর্ঘা প্রতিময়া সরোম্ভনাম্
তাপনীয়মিব সেতুবন্ধম্।

(পর্বতের গীত)

দূরমগ্ন পরিমেয় রশ্মিনা
বারুণী দিগরুণেন ভানুনা
ভাতি কেশরবতেব মণ্ডিতা
বন্ধুজীব কুসুমেন কন্যকা।

নারদ ॥ ঐ দেখ, পশ্চিম দিকপ্রান্তে সূর্যদেব, জলরাশির উপরে যেন নিজ কিরণ-মণ্ডিত করে একটি স্বর্ণসেতুবন্ধন করেছেন।

পর্বত ॥ পশ্চিম দিক অল্প রশ্মিবিশিষ্ট দিবাকর করে অরুণিমা রঞ্জিত, কেশর-সংযুক্ত বন্ধুজীব কুসুমের দ্বারা যেন বিভূষিতা কন্যকার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

(গীত)

উন্নতেষু শশিনঃ প্রভাস্থিমাঃ
নিম্নঃ সংশ্রয়পরংনিশাতমঃ

নারদ ॥ চন্দ্ররশ্মি ঊর্ধ্বদেশে উঠিল, নিশার অন্ধকার নিম্নে পড়িল।

পর্বত ॥ পর্বতের উন্নতাবনত ভাবহেতু সতিমিরা চন্দ্রিকা মদমত্ত হস্তীর অঙ্গে চিত্ররচনার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

(গীত)

সান্ধ্যাস্তমিতশেষমাতকম্
রক্তলেখমপরাবিভর্তিদিক্

সম্পরায়বসুধাসশোণিতং
মণ্ডলাগ্রমিবতির্যগুত্থিতম্।

নারদ ॥ সন্ধ্যায় দিক অস্তমান আতপের শেষ রক্তলেখা রঞ্জিত হইল, মণ্ডলাগ্রের ন্যায় তির্যকভাবে উত্থিত সন্ধ্যারাগমোহিত-আকাশ যেন অপর একটি যুদ্ধক্ষেত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।

(গীত)

যামিনীদিবসসন্ধি সম্ভবে
তেজসিব্যবহিতে সুমেরুণা
এতদন্ধতামসম্ নিরঙ্কুশং
গিরিকন্দরেষু বিজৃম্ভতে।

পর্বত ॥ দিনযামিনীর সন্ধিজাত তেজঃ সুমেরু কর্তৃক ব্যবহৃত হইলে দিকে দিকে গিরিকন্দরে নিরঙ্কুশ অন্ধতামস মুখব্যাদন করিতেছে।

(গীত)

নোর্ধমীক্ষণগতির্ণচাপ্যধো
নাভিতোননপুরতোনপৃষ্ঠতঃ
লোকএবতিমিরৌমবেষ্টিতোগর্ভবাসইব
বর্ততি নিশি।

নারদ ॥ নিশা আগতা, ঊর্ধ্ব অধঃ পার্শ্ব অগ্র ও পশ্চাৎ কোনদিকেই দৃষ্টি চলে না, এই লোক যেন তিমিররূপ জরায়ু-বেষ্টিত গর্ভবাসে অবস্থান করিতেছে।

(গীত)

শুদ্ধমাবিলমবস্থিতমচলম্ বক্রম্‌মাঞ্জঃ
গুণান্বিতম্ চ যৎ
সর্বমেবতমসাসমীকৃতম্ ধিঙ্
মহত্তমসমতাং হৃতান্তরম্

পর্বত ॥ যাহা বিশুদ্ধ, যাহা আবিল, যাহা অচল, যাহা সচল, যাহা বক্র, যাহা সরল, সবই অন্ধকার আসিয়া এক করিয়া দিল। মহতে ও অসতে প্রভেদ হরণ করিল ধিক্ সেই মহাতামসকে।

(প্রবেশ—অবধূতের গীত)

পশ্যদিঙ্‌মুখম্ কেতকৈরিবরজভিরাবৃতম্
নূনমুদ্যয়তি যজ্ঞানাংপতিঃ
শার্বরন্ধতমসোনিষিদ্ধয়ে।

অবধূত ॥ ঐ দেখ, দিঙ্‌মুখ কেতকীপুষ্প-পরাগরাশির দ্বারায় আবৃত বোধ হইতেছে। নিশ্চয়ই বিভাবরীর অন্ধকার বারণ করিতে সোমদেব উদিত হইতেছেন। আমারও সন্ধ্যানিয়ম-বিধির অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত।

(প্রস্থান)

নারদ ॥ ত্বমুহূর্তমনুগন্তুমর্হসি প্রস্তুতায় নিয়মায় মামপি—অনুমতি কর আমিও নিয়মিত সন্ধ্যাক্রিয়ানুষ্ঠানাদি করি গিয়া।

পর্বত ॥ ত্বাং বিনোদনিপুণে, জনো বিনোদয়িস্যতি—বিনোদ বিষয়ে নিপুণ সহচর তোমার চিত্ত বিনোদন করিবে, চলে এস তুঙ্গভদ্রায়।

(উভয়ের প্রস্থান)

(কুটজার প্রবেশ—গীতআলোক মালার)

ফুল ফুললো অশোক কাঞ্চণী
ফুল নে গো রাজনন্দিনী
নাও গো মালা রাজনন্দিনী
বন পোড়া যেন হরিণী
অন্তরে জ্বলি দিনরজনী
আমি আঁ কী দিব তোরে
বান্ধা রইলাম জন্ম ভোরে
দাসীরে তোমার ক্ষমা কর
মালা ধর ঠাকুরাণী
সুচিকণী বনশোভনী
তবু দেখা নেই, তবু দেখা নেই,
আসি আর যাই ফিরে ফিরে।

(গীত)

থাকি থাকি শুনি বাঁশি বেজে যায়
কে যেন আপন জনায় মিনতি মানায়
বাতাসে বাতাসে বিনতি জানায়
আসি যাই আসি আসি
পরব শেষ বলে বাঁশিরে উদাসী
বাঁশি কয় পরব শেষ
যেতে হয় আপন দেশ
কয় বাঁশি মালা যে হয় বাসি
বাতাসেতে মিলায়।

(প্রস্থান)

(দূরে ঘণ্টা সন্ধ্যা শেষের)

—ইতি খতম শ্রীমন্তী সম্প্রদান পালা—

লেখা আর আঁকা
তব মনোবিহঙ্গের
এই দুটি পাখা।
ধরণীর ধূলিপথ ত্যক্ত হয় হোক্
আকাশে রহিল মুক্ত তব মুক্তিলোক॥
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বপ্নে মাতৃপূজা

বঙ্কিমচন্দ্র সেন

কমলাকান্ত স্বপ্নে মাতৃ-পূজা দর্শন করিয়াছিলেন। আমরা কমলাকান্ত নহি। তবু স্বপ্নে মাতৃ-পূজা দেখিলাম। অভাবনীয় ব্যাপার নয় কি? প্রকৃতপক্ষে কমলাকান্তই শুধু স্বপ্ন দেখে নাই, স্বপ্ন আমরাও দেখিয়া থাকি। আমাদের স্বপ্ন তত্ত্বে দাঁড়ায় না, মিথ্যায় পরিণত হয়। কমলাকান্ত ঋষি। বিশ্বের মূলীভূত বীজকে যাঁহারা নিজভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেই সূত্রে বিশ্বের আশ্রয়স্বরূপকে যাঁহারা রূপ দিয়াছেন, ঋষি বলিতে তাঁহাদিগকে বুঝায়। কমলাকান্ত বিশ্বেশ্বরী যিনি, আমাদের দৃষ্টিতে তাঁহার অপরূপ রূপ-মাধুরী উন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি বাঙালী জাতির জননীরূপে তাঁহার অদ্বয় চিন্ময়-রসের সংস্পর্শে আমাদিগকে উজ্জীবিত করিয়াছেন, এ ক্ষমতা সাধারণের নাই। প্রকৃতপক্ষে এ দেশের মনীষিগণ ঋষিদের যিনি ঋষভ তাঁহারও উপরে ঋষিদের স্থান দিয়াছেন। দেবী মাহাত্ম্য বা চণ্ডীর নারায়ণী-স্তুতিতে দেবগণ কর্তৃক মায়ের সর্বোত্তম মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হইয়াছে। শুম্ভ-নিশুম্ভ নিধন প্রাপ্ত হইলে দেবতারা জগজ্জননীর এই স্তুতিতে বন্দনা করেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, মা তোমার আশ্রয় পাইলে মানুষের কোন বিপদ থাকে না। কিন্তু তুমি সর্বাশ্রয়স্বরূপিণী হইয়াও তুমি কাহাকেও আশ্রয় দিতে পার না। তোমার আশ্রিতজনেরই হাতে সকলকে আশ্রয়দানের অধিকার রহিয়াছে। মায়ের চেয়ে মায়ের ভক্তের মাহাত্ম্য অধিক। দেবতারা তাঁহাদের মহিমা এমনই বাড়াইয়াছেন। উক্ত স্তোত্রের অন্যত্র তাঁহারা বলিয়াছেন, মা, তুমি বিশ্বেশ্বরী, ব্রহ্মাদি দেবগণেরও তুমি বন্দনীয়া। তোমার ভক্তগণই বিশ্বের আশ্রয় স্বরূপ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সে ক্ষমতা নাই। মাতৃভক্ত কমলাকান্তের নেশা আমাদের চোখে লাগিয়া গিয়াছিল বলিয়াই আমাদের এমন অঘটন ঘটে, আমরাও মাতৃ-পূজার স্বপ্ন দেখি, ইহাই বুঝিতে হয়।

কেমন সে স্বপ্ন, স্বপ্নে কি দেখিলাম? দেখিলাম, আমাদের অঙ্গন জুড়িয়া মাতৃ-পূজা আরম্ভ হইয়াছে। বড় পূজায় বড় আনন্দ শুরু হইয়াছে। মা আসিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড মাঝে কে আনিল মাকে? জগতের মূল কারণস্বরূপে যিনি গুণাতীতা, আবার যিনি ত্রিগুণা, গুণতত্ত্ব বুদ্ধিস্তরে অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি বিদ্যমান থাকিতে কেহই যাঁহাকে জানিতে পারে না। হরিহরাদি দেবতারাও যে মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাঁহাকে বাঙালীর কাছে এমন করিয়া ব্যক্ত করিল কে? মাতৃ-মাধুর্যের সে রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইবার অধিকার কাহার আছে? তিনি অবিচিন্ত্যা, তিনি মহাব্রতা। ব্রহ্ম-গ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া তবে সেখানে যাইতে হয়, মাকে পাইতে হয়। আমরা তেমন সাধনা করি নাই। প্রথম চরিত্র, মধ্যম চরিত্র, উত্তর চরিত্রে উদ্দীপিত মাতৃবীর্য, অবিদ্যায় আচ্ছন্ন আমাদের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সন্তানের জন্য মায়ের সংগ্রাম-লীলা প্রত্যক্ষ করিব এ অধিকারও আমাদের নাই। অবীর্যে অভিভূত আমরা সিংহ বাহিনীর সিংহতত্ত্ব আমাদের উপলব্ধির বাহিরে, তাঁহার খড়্গের খেলায় বিদ্যুতের ঝলকে আমাদের দৃষ্টি ঝলসিয়া যায়। আমরা ভীত এবং ত্রস্ত হইয়া পড়ি। তবু দেখিতেছি বাঙালী আমরা, মায়ের পূজার অধিকার আমরা পাইয়াছি। আমরা মায়ের অখিলরসামৃত মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের ব্রহ্ম-গ্রন্থি ভেদ করিয়া মাধুরীর এমন আপ্যায়ন লইয়া মা আমাদের কাছে আসিয়াছেন। অধিভূত ক্ষুদ্রস্বার্থে আমরা অভিভূত। অনিত্য বিষয়ে আমাদের মনের সর্বতোভাবে সংস্থিতি—এই যে ক্ষিতিতত্ত্ব, করুণার প্লাবনে ইহার অচলায়তন ভাঙ্গিয়া দিয়া মা তাঁহার আত্মভাবে আমাদের সংশ্রয় দিয়াছেন। মধুকৈটভ-বিধ্বংসী মায়ের বরদা-মূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জননীর এমন সংশ্রয়ে আমরা অভয়ত্বে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছি। আমাদের হৃদয়-পদ্ম ঊর্ধ্বমুখী হইয়া মায়ের অনন্ত অব্যয় মাধুরী পান করিবার জন্য পটলদল বিস্তার করিয়াছে। ভক্তগণের আনন্দ বিধানকারী মায়ের মহিষা-সুর নির্ণাশ লীলার বিলাস চাতুর্যের স্পর্শ আমরা অনুভব করিয়াছি। ইহারও ঊর্ধ্বে —মাতৃচরণে আত্মদান, মাতৃসেবাসিন্ধুতে নিমজ্জন। আমাদের মন, আমাদের বুদ্ধির পক্ষে অনধিগম্য সে তত্ত্ব। মা সেখানে দুর্গতিহারিণী দুর্গা নহেন। দুঃখকে ডরাইলে মাতৃমাধুর্যের সেই অখণ্ড, অনন্ত-রসের সংবেদন উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। দুঃখের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে রাজ্যে যাইতে হয়। কণ্টকাকীর্ণ সে পথ। ধরণীর ধূলি রক্তসিক্ত করিয়া সে পথে অগ্রসর হইতে হয়। মায়ের সেই বেদীমূলে যাইতে হইলে রক্তাম্বুধি মন্থন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আমরা দেখিয়াছি মায়ের সে লীলা। খড়্গপ্রভা নিকরে বিস্ফুরিত মায়ের মুখের মধুর হাসি দুর্গমাখ্য মহাসুরকে দলন করিয়া আমাদের অন্তরে তীব্র সংবেগ উদ্দীপ্ত করিয়াছে। বাঙালী হৃদয়ের রক্ত-পদ্মে মায়ের চরণে অর্ঘোপহার দিয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভক্তচিত্তের সংবেদনে মায়ের এখানে আবির্ভাব এবং সেই আবির্ভাব, তাঁহার অবতার বিশেষের নয়; অবতারা-বলীর বীজস্বরূপে নিজ বীর্য মাধুর্যে তাঁহার এখানে অভিব্যক্তি। আমরা মাকে তাঁহার চিদৈশ্বর্যের সমগ্র মাধুর্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, বিদ্যা, ধন, বীর্য, সিদ্ধি সব লইয়া পাইতেছি, পাইয়াছি বিশ্ব এবং বিশ্বতীতা তাঁহার অখণ্ড এবং অপরিচ্ছিন্ন লাবণ্যের চৈতন্যময় সত্তায়। বাঙালীর যিনি দুর্গা মধ্যমচরিতে মহিষ-মর্দিনী নহেন, তিনি অখণ্ডৈক রসামৃত-কলেবরা, মায়ের অদ্বয় এবং চিন্ময়স্বরূপ। প্রথম চরিত্রের বীজ রক্তদন্তিকা, দ্বিতীয় চরিত্রের বীজ দুর্গা এবং তৃতীয় চরিত্রের বীজ ভ্রামরী, এই সমগ্র লইয়া তিনি নিজ। প্রথম চরিত্রের নন্দা, দ্বিতীয়ের শাকম্ভরী, তৃতীয়ের ভীমা, এ সবই তাঁহার অংশ; তিনি সর্ব অবতংস। "দ্বিতীয়া কা মমাপরা"—বাঙালীর দুর্গাদেবী এমনই পরাৎপর-স্বরূপা। মাতৃভক্তের সংবেদনে—মায়ের সর্ব-ভাবে আমাদের এখানে তাঁর আবির্ভাব—ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক—আলো করিয়া বরণীয় তাঁহার এই ভর্গ। বাঙালীর অন্তর আপনার বেদনায় গলাইয়া মা এখানে আসিয়াছেন এবং মায়ের এই আত্মসংবেদনে ভক্তের প্রত্যক্ষানুভূতিই আলম্বনস্বরূপে কার্য করিয়াছে, শাস্ত্রযুক্তি নয়। সর্ববিধ কর্মসংস্কার হইতে আমাদের মনকে মুক্ত করিয়া সাক্ষাৎ সম্পর্কে মায়ের বেদনায় আমাদের অন্তর তাঁহারা গলাইয়া দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মায়ের জন্য বেদনা হইলেই মাকে পাওয়া যায়। ফলতঃ বুদ্ধির কসরত খাটাইয়া মাতৃতত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। মা আমাদের বিশ্বজননী, সুতরাং মায়ের জন্য বেদনার অর্থ—সকলের জন্য বেদনা। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে এই বেদনার প্রতি-ফলনে প্রাণময় যে সূক্ষ্ম কম্পন অনুভূত হয়—তাহাকে বেদান্তাদিশাস্ত্রে মেধা বলিয়া

অভিহিত করা হইয়াছে। মেধা বিশ্বাচী অর্থাৎ সর্ববেদ্যাবগাহনক্ষমা। মেধা সকলের বেদনায় আমাদের অন্তরকে ডুবাইয়া যিনি সকলের আত্মা তাঁহার রূপটি দেখায়। এই রূপই মায়ের দুর্গা রূপ। মহামুনি চরক বলেন, "মতি আগামিকা জ্ঞেয়া, বুদ্ধিঃ তৎকালপূর্বিকা, প্রজ্ঞা অতীতকালস্য, মেধা তু ত্রিকালাত্মিকা"। ত্রিকাল সত্য বাঙালীর দুর্গাতত্ত্ব। ঋষিকণ্ঠে শুনিলাম—"মেধাহসি দেবি বিদিতাখিল-শাস্ত্রসারা"— গুরু-মুখোচ্চারিত মন্ত্রের শ্রবণে এবং মাতৃভক্ত স্বরূপে তাঁহার সংবেদনে ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ। 'দুর্গাসি দুর্গভবসাগর নৌরসঙ্গা'—গুরুর অনুগতির সূত্রে সমাস্থ সম্বন্ধের উদ্দীপিততে বিষ্ণুগ্রন্থিভেদে পরে চিদানন্দময়ী মায়ের লীলার অনুভূতি। অবশেষে কামকলার খেলা। "শ্রীঃ কৈটভারি-হৃদয়ৈক-কৃতাধিবাসা গৌরী ত্বমেব শশিমৌলি-কৃতপ্রতিষ্ঠা" —পরম পুরুষ এবং পরমা প্রকৃতির মিলন-মাধুর্যের পরমবীর্যে রুদ্রগ্রন্থিভেদ। অধিভূত, অধিযজ্ঞ এবং অধিদৈব—ত্রিবৃৎ স্বরূপে মায়ের এইরূপে সন্তানকে বরণ। "ধরতে গেলে রূপের আলো লুকিয়ে বায় ওংকারে", এমনই চমৎকার ব্যাপার। স্বপ্নে মায়ের সেই অপরূপ রূপ দেখিলাম। ডুব দিলাম সেই রূপের সাগরে। ক্ষণেকের জন্য সেই চমক, পলকের মধ্যে মায়ের দিব্যমূর্তি দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল—আঁধারের উপর আঁধার আমাদের চারদিক ঘিরিয়া ফেলিল। উৎকট সে কি নিদারুণ বিভীষিকা। পাতালের তল হইতে কোটি কোটি কৃষ্ণকায় দৈত্যদানব উঠিতে থাকিল। হিংস্র—অতি হিংস্র তাহারা। ভীষণ তাহাদের নখর দশন। তাহারা বিপুল বলে আমাদের কণ্ঠ অবরুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। মহাভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সুখের স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। জাগিয়া উঠিলাম। বুঝিলাম আমাদের দুর্গতি। বর্তমান প্রতিবেশের সম্বন্ধে আমাদের সংজ্ঞা সঞ্চারিত হইল। নিজের অবস্থা বুঝিলাম। এ কি কোথায় ছিলাম, আসিয়া পড়িয়াছি কোথায়? সমগ্র জাতির নৈতিক অধোগতি আমরা উপলব্ধি করিলাম। আমাদের অন্তর জুড়িয়া উঠিল হাহাকার।

দুর্গতিহারিণী দুর্গে — শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত

পল্বল

অজিত দত্ত

আমিও তো আকাশ ছিলাম—
নীলোজ্জ্বল স্বচ্ছ মুক্ত কাকলী-মুখর অবিরাম।
আমিও তো কোনো একদিন
বিস্তারে ঔদার্যে হর্ষে দীপ্ত অমলিন
পৃথিবী আবৃত ক'রে রেখেছি এ-হৃদয়ের তলে।
তারপর অকস্মাৎ কী খেয়ালে, কোন্ কৌতূহলে
মেঘে মেঘে ঢেকে দিয়ে পরিপূর্ণ বক্ষের প্রসার,
ডেকে এনে কেশঘন নিবিড় আঁধার,
একটি তারাকে আমি ফোটালাম সমস্ত আকাশে,
একটি আলোর রেখা জ্বালালাম হৃদয়ের পাশে।
তারপর কী করে জানে কে
তারাটা হারিয়ে গেছে, মেঘে আজো বুক আছে ঢেকে।

আমিও তো ছিলাম উদ্দাম মহানদী।
উদ্বেল প্রপাত থেকে অতলান্ত সমুদ্র অবধি
প্রসারে তৃপ্তিতে সুখে সম্পূর্ণ ছিলাম।
তারপর কী খেয়ালে একগুচ্ছ ফুল ফোটালাম
নতুন মাটিতে এক চর পেতে। সে চর কখন
দিগন্ত-বিস্তৃত হল, হল এক সীমাহীন বন।
সে অরণ্যে আজ আর নেই ফুলফল,
ঊর্মিহীন, গতিহারা, নদী আজ সংকীর্ণ পল্বল॥

প্রার্থনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

প্রার্থনার মতো এক স্বর
করুণ কাতর
ওঠে মন হতে।
যৌবনের উচ্ছ্বসিত স্রোতে
ধ্বনি তার যায় না ত শোনা।
তার সে সোচ্চার আনাগোনা
প্রৌঢ়তার ঘরে।
সে প্রার্থনা প্রেম নয় প্রমার মতন
তার জন্যে যেন অকাতরে
বহুদূরে যেতে পারে মন।
দূরযানী প্রার্থনা আমার
যৌবনের শেষে এসে তোমাকে জানাই নমস্কার।

রেফ্যুজি ক্যাম্পে

মণীশ ঘটক

অনেক ঝড়ের পর মেঘেদের ভিরকুটি পেরিয়ে,
হাওয়ার মাতন আর তর্জন গর্জন এড়িয়ে,
কবরখানার ধারে দীঘল ভুতুড়ে ঝাউ সার সার
যেখানটা ফিস্‌ফাস নিঃশ্বাস ফেলে শুধু বারবার;
অনেক ভয়ের মতো যতো বাধা থমথম করছে,
দপ্ করে বেঁচে উঠে অনেক জোনাকি ফের মরছে;
আলেয়ার লণ্ঠন পথ বলে নিতে চায় বিপথে
গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি আঁধারেরা বসে যায় ঝিমোতে
সেই রাজ্যের এক ধ্বসে পড়া পাঁচিলের আড়ালে
টিপে টিপে আলগোছে বাধো বাধো পা দুখানি বাড়ালে;
আঁচলায় আধোঢাকা জলভরা এক চোখে তাকালে,
ঘোলাটে হাসির নীলে আরেকটা চোখে জাদু মাখালে!
সবাই বলল ওই তৃতীয়ার চাঁদ বুঝি উঠ্‌ছে—
আমি দেখি মার বুকে অসহায়া মেয়ে মাথা কুট্‌ছে॥

বেলা প'ড়ে এসেছে

অরুণ মিত্র

বেলা প'ড়ে এসেছে। ভিটের উপর থেকে আশ্চর্যভাবে আলো স'রে গেল আর তার শাড়ীতে জড়ো হল অনেক ছায়া। দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে সমস্ত মাঠটাকে সে নরম হতে দেখল। সামনের যে-খাত রোদের গর্জনে ভ'রে ছিল, সেখানে মৃদু গলা ফুটছে। যেন কেউ নতুন ঘনিষ্ঠতার দিকে ঠোঁট খুলেছে।

ধাপের উপর আস্তে পা রেখে সে নামল। তারপর পশ্চিমের গাঢ় রঙকে দুলিয়ে দুলিয়ে সীমানা পর্যন্ত হেঁটে গেল। বার বার ঐ পর্যন্ত সে গিয়েছে। বিদায়ের জন্যে, অভ্যর্থনার জন্যে। অজ্ঞাত সময়টাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখা টেনেছে একবার রোদ, একবার ছায়া। আবার সে ওখানে গিয়ে দাঁড়াল। ভয় এবং প্রত্যাশার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড চূড়াটাকে দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা অদৃশ্য হয়েছে। আবছা উৎরাই বেয়ে কারা নামছে, তার মনে হল।

যে-কয়েকটা পাখি ডানা গুটিয়ে মাটিতে এসে বসেছিল, হাত নেড়ে সে তাদের আবার উড়িয়ে দিল ছায়ার পথে, অন্ধকারের দিকে।

এখন শীত

দিনেশ দাস

হেমন্তের জটিলতা মুছে গেলে মাঠ থেকে
শীত এল অতি সংক্ষেপে,
সাধারণ আলোয়ান মুড়িসুড়ি দিয়ে,
রুক্ষ মাঠে খোঁচা খোঁচা শুকনো ধানের গোড়া মাড়িয়ে মাড়িয়ে।

কোথাও হয়তো জ্বলে টিপ্ টিপ্
এক-আধটি মরসুমী ফুলের প্রদীপ:
পরিচিত ফুল সব ঝ'রে গেছে প্রায়,
ক্বচিৎ কেউবা মুখ নীচু ক'রে মৌন প্রার্থনায়।

জানাচেনা পাখি সব উড়ে গেছে কখন নিঃসাড়ে
বারেবারে
হলুদ ঘাসেতে শুনি বাতাসের বিষণ্ণ বিলাপ,
আর তবে গান গেয়ে কী হবে? কী লাভ?

তবু ক্ষ্যাপা মন মনে-মনে
সময়ের ওপারেতে অন্য কোনো সময়ের পদধ্বনি শোনে:
যে-বসন্ত পৃথিবীতে কখনো আসেনি
তারি প্রতীক্ষায় কাল গোণে।
এখন শীতের মেঘে আকাশ নিঝ্‌ঝুম:
এখনি নামবে তোড়ে শীতের বর্ষণ,
বর্ষার পাখির মত আমিও ঘুমাব সারাক্ষণ
সকল সময়:
হয়তো এ শেষ ঘুম—
শেষ অনুভূতি হবে জানি ভয়,
শেষ শ্বাস শুধু দীর্ঘশ্বাস,
শেষ আলো অনন্ত আকাশ॥

প্রেম

আনন্দ বাগচী

স্খলিত অরণ্যে দেহ চিত্রতম, শুয়ে আছো দর্পিতা রমণী
ছিন্নভিন্ন সময়ের হৃদয় হরণ করে যুবতীর মত,
সমস্ত সংসার জুড়ে মেঘভার, বৃষ্টি পড়ে আষাঢ়ে শ্রাবণে।
কোথাও দর্পণ আছে, মনে মনে ভাবি
যেখানে তোমার ছায়া
আত্মজীবনীর খসড়া আঁকে।
লতাগুল্ম চতুর্দিকে, পিপাসিতা হরিণী আমার
মৃত্যু-জলাশয়ে ছায়া দেখ,
যুবক অফিস যাচ্ছে, গৃহস্থালী রাজধানী জুড়ে
কাঁচের টুকরোর মত পড়ে আছে সাবধানে
পা রেখো শ্রীরাধা।

বৃষ্টিতে নিজের মুখ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অরণ্য, আকাশ, পাখি, অন্তহীন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—
আকাশ, সমুদ্র, মাটি, অন্তহীন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—
সমুদ্র, অরণ্য, পাখি, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
যতই ঘোরাও, আমি কী নতুন দেখব জাদুকর?

যেন দূরদেশে কোন্ প্রভাতবেলায়
যেতে গিয়ে আবার ফিরেছি
আজন্ম নদীর ধারে, পরিচিত বৃষ্টির ভিতর।
যেন সব চেনা লাগে। ফুল, পাতা, কিউমুলাস মেঘের জানালা,
সটান সহজ বৃক্ষ, গ্রামের সুন্দরী, আর
নানাবিধ গম্বুজ মিনার।
যেন যত দৃশ্য দেখি আয়নার ভিতরে,
উদ্ভিদ, মানুষ, মেঘ, বিকেলবেলার নদী—
বৃষ্টির ভিতরে সব দেখা হয়, সব
নিজের মুখের মতো পরিচিত। আমি
এই পরিচিত দৃশ্য কতবার দেখব জাদুকর?

আয়নায় জলের স্রোত, অন্তহীন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—
উদ্ভিদ, মানুষ, মেঘ, অন্তহীন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—
হাতের আমলকীমালা, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
যতই ঘোরাও, আমি কী নতুন দেখব জাদুকর?

বৃষ্টির ভিতরে সব দেখি যেন, আমি
আজন্ম নদীর ধারে, প্রাচীন ছায়ায়
পাহাড়, গম্বুজ, মেঘ, গ্রামের বালিকা,
দেবালয়, নদীজলে বশংবদ দৃশ্যের গাগরি
দেখে যাই, যেন সব বৃষ্টির ভিতরে দেখে যাই।
যখন প্রত্যেকে আজ দ্বিতীয় স্বদেশে
চলেছে, তখনও দেখি আয়নার ভিতরে জলধারা
নেমেছে রক্তের মতো। যাবতীয় পুরানো দৃশ্যের
ললাটে রক্তের ধারা বহে যায়। আমি
পুরানো আয়নার কাঁচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
নিজের রক্তাক্ত মুখ কত আর দেখব জাদুকর?

পদধ্বনি

আলোক সরকার

পাখিটা গিয়েছে মরে, খাঁচাটা রয়েছে। রোজ ভোরবেলা
কেন রাখি ভিজে ছোলা ভাঁড়ের ভিতর।
নতুন একটা পাখি কিনে আনো, আগামী রথের মেলা
প্রায় এসে গেলো। পাখি আমি কিনবো না।

চৈত্রের দুপুরবেলা পক্ষহীন সমস্ত প্রহর
ভ'রে কারা হাওয়ার অঞ্জলি রাখে, পাতা জ্বালে ঝড়ায় ওড়ায়
চিনেছি তাদের মুখ—পদধ্বনি রক্তের স্পন্দনে যায় শোনা।

কে দেবে?

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অনেক রাত। বৃষ্টি হয়ে গেছে
মনে হয় তারা-নিংড়োনো জল দেবদারুর গাছে-গাছে
চিকচিক করছে।
হঠাৎ-হঠাৎ আসে চকিত মনের সমারোহ
অসীম রাজত্ব তার
দেখলে বুক দুরদুর করে। সেই গুরুভার
কার কাছে নামাবো?

তুফান উঠেছে সমুদ্রে
ছোট্ট ডিঙি মাতালের মতো দুলছে
—কোথায় চায় যেতে? তীরে না অনন্ত শূন্যেতায়?
যেখানে ঢুলছে
এক খামখেয়ালী ঈশ্বর
ঈশ্বর
মানুষের কণ্ঠস্বর
বোবা হয়ে ঢুলছে
কথা বলতে চায়, পারে না,
কোন অব্যক্ত ব্যথায় চুপিচুপি মাথা খুঁড়ছে
আজকের এই অনেক রাতে
তারা-নিংড়োনো জলের অস্পষ্ট আলোতে।

তাই ভাবলাম তার কথা
কে সে? —সেইটেই কথার কথা।
তবু ভাবলাম আর ভাবলাম
ভালো করে জানলাম
আজকের এই অবাক মুহূর্তের আলো আর অন্ধকারের জাদু
সেই তাকে একেবারেই স্পর্শ করেনি।
কে যেন বললো: 'কী তোমার পাগলামি!
ঘুমোও, ভালো করে ঘুমোও।'
আমিও তো তাই
চাই।
কিন্তু চাইলেই যে পাওয়া যায় না
হে ঈশ্বর, তুমিও সে-কথা জানো।
তুমিও তো শোনো রাতভোর কুকুরের কান্না
আর সত্তার কষ্টিপাথরের মতো গুহা থেকে সেই কথা:

আর না, আর না।

অনেক রাত। বৃষ্টি হয়ে গেছে। তারা-নিংড়োনো আলো
সময়টা না-আলো না-কালো।
এখন ঘুমতে হবে
কিন্তু ঘুম কে দেবে, কে দেবে?

বিষ্টি

হরপ্রসাদ মিত্র

প্রতীক্ষার শেষ সিঁড়ি ছুঁয়েছিল মন,
তারপরে
বিষ্টি এলো, বিষ্টি এলো,
মনে মনে বিষ্টির আরাম।
ধনী ও নির্ধন, জ্ঞানী, অজ্ঞান ও সপ্রেম, নির্মম
কতো-যে বিমিশ্র মনে
লাগলো এ বিষ্টির সুবাস!

যে ছিল, এখন নেই—বিষ্টি সেই উত্তাপের শেষ,
কাফিখানা অন্ধকার, ঠান্ডা ছাই
ভিজুক, ভিজুক।
নামুক রাস্তায় নদী মেঘ থেকে সহজ স্বভাবে
মহাত্মার মৃত্যু হলে পথে পথে
যেমন জনতা—
স্ত্রীলোক, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবক ও কিশোর অনেক
তেমনি বিষ্টির স্রোতে ছেদ যদি না ঘটে,
কি ভয়?

বিষ্টির লক্ষ্য তো একই,
—সংসারের হৃদয় জুড়োনো
কিছু রাস্তা ভাঙে তাতে, কিছু বাঁধ

ডানার শব্দ

শঙ্খ ঘোষ

সবাই প্রস্তুত আছো? থুত্থুরি শাখার কাঁপা বুকে
শব্দ হয়, শ্বাস ফেলে উড়ে যায় পাখি।
সবাই প্রস্তুত আছো? গম্‌গম্‌ গম্‌গম্‌ ছায়া
সর্বদিকে ঘন রাত। এসো, হাতে হাত রাখো। ও কে
চলে গেল যেন? এক দুই তিন চার গুণে রাখি, সব গুণে রাখি,
এসো, হাতে হাত রাখো। সবাই প্রস্তুত থাকো পতিপুত্রজায়া
সবাই। কেউ কি দূরে চলে গেল আমাদের ফেলে?
কারো মুখ দেখা যায় না, ওরে তোরা সব ছেলে
ছুটে চলে আয়, ওরে আয়, এই পাহাড়ের নিচে
পুরোনো গাছের গুঁড়ি, রাত বড়ো ঘন হয়ে এলো, চলে আয়।
ঝর্ঝর ডানার শব্দ। ঈশ্বর ঈশ্বর
বলে কেউ ডাক দিল। দ্রুত নেচে
ঝুমঝুম ঝুমঝুম যেন চলে আসে কারা, দাও, সব হাত দাও হাতে।
সকলের কণ্ঠ হতে চলে যায় স্বর,
পাহাড়ে ফ্যাকাশে স্বর ঘুম হয়ে লেগে থাকে যেন মাঝরাতে
যেন আমাদের মধ্যে চুপ করে চলে যাবে কেউ সাবধানে
যেন কেউ চলে যাবে, যেন যাবে, শাখায় শাখায়
নড়েচড়ে উড়ে যায় পাখি, উড়ে যায়, উড়ে চলে যায়।

শুধু এই ভূমিটুকু, মনে রেখো আর নেই,
আর কিছু নেই কোনোখানে!

মাথুর

অরুণকুমার সরকার

ও প্রেমিক, তুমি কোথায় যাচ্ছো, শোনো,
অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছি তোমায় দেখব ব'লে।
দ্যাখো কত ভিড় জমেছে পথের পাশে, বারান্দায়,
মধ্যিখানে আমিও আছি, আমাকে দেখবে না?
দ্যাখো আমায়, দ্যাখো, প্রেমিক, কাতর আমার মুখ
একতরফা ভালোবাসায় মন যে ভরে না
এই যে আমি, আমায় দ্যাখো।

ওদের হাতে মালা, প্রেমিক, আমার শূন্য হাত;
ওরা রঙের ঢেউ তুলেছে, আমি ছিন্নবাস।
কিন্তু ওরা ভিড়ের, ওরা তোমার কেউ না।
আমি তোমার, তোমার শুধু, আমি তোমার।

আমি তোমায় ভালোবাসি, প্রেমিক, আমায় দ্যাখো।
হৃদয় জুড়ে গন্ধ আমার, পূর্ণ আমার প্রাণ,
বুকের মধ্যে টকটকে লাল রঙ।
ওদের শুধু দেখতে আসা, ভাসতে আসা নয়।
এই যে আমি, রুদ্ধ জোয়ার, প্রেমিক, আমায় নাও।

বোধন

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ভাঙো, চুরমার করো ওই তৃষ্ণাহীন শব্দের পাহাড়;
এমন নিস্তব্ধ আমি বাংলাদেশ কখনো দেখিনি।
যত সুর গান হয় সব যেন শ্রদ্ধায় প্রাচীন
কবির নিদ্রিত বুক দগ্ধ করা প্রতিভার নীরব প্রহার।
কোন অভিমান নেই, অন্ধকারে বিপরীত ভয়াল ভ্রমণে
হিংস্র কোন আবিষ্কার শরীরে চিহ্নিত আর করে না ফাল্গুন।
আজ ব্যবহৃত সব শব্দের ওপর অপলক
রয়েছে নিশ্চল বসে শতাব্দীর স্থবির শকুন।

আকাশ অম্লান উঁচু এত মৃতদেহের দ্বিধায়
এত স্মৃতি হে বিষাদ, নিসর্গে, নারীর প্রেমে; অথচ গরিমা
কখনো পারবে না ছুঁতে ততদূর স্থির উচ্চতায়
মেঘে রৌদ্রে অস্থির নীলিমা: শুধু তুমি প্রতীক্ষায় থাকো, তুমি
শিল্পের অদেখা দুঃখে চীৎকার করে ওঠো: তুমি
এত স্তব্ধ বাংলাদেশ কখনো দেখিনি এর আগে।

ভাঙো, চুরমার করো,
যদি ধ্বংসের ভেতরে কোন শব্দের দেবতা জাগে।

জন্মের অঙ্কুর থেকে

জগন্নাথ চক্রবর্তী

জন্মের অঙ্কুর থেকে জন্মের অঙ্কুর
একটি অলক্তপথ কার্পেটের মতো ক'রে পাতা।
সংসার—
কিছুটা ধুলো, কিছু ফুল, কিছু ভুল বোঝা,
অনেক অগাধ স্নেহ; অনেক বৃষ্টিতে ভেজা সুর।

সংসার—
অসংখ্য তারে বাঁধা সেই বীণাটিকে নিয়ে
আমরা ঝঙ্কার খুঁজি,
আঙুলের লজ্জা দিয়ে শিহরণ শিকারের মতো
অন্ধ সুখে;
কখনো অবাক হয়ে আকাশের রং দেখি
নীলাম্বরী মনটাকে দেখি,
তারপর আবিষ্কৃত নিজের মনের রঙে
পথের কার্পেটটাকে রাঙাই।

গাছের শিকড়ে কতো জল জমে,
মুখর ফুলেরা হতবাক্,
গঙ্গার নরম জলে কাঁপে মোমবাতি,
ধুলো, ফুল, ভুল বোঝা, এবং অগাধ স্নেহ
তার মাঝে আলো জ্বলে, মোম গলে পড়ে,
সন্ধ্যায় অতিথি আসে ঘরে।
চোখের আলোয় চোখ বন্ধুতার ছবি খোঁজে
যেন ক্যামেরায়,
যেন বা নতুন কোনো হৃদয়ের মহাদেশে
হীরকের খনি খুঁজে পেয়ে
হঠাৎ-আলোয় মুগ্ধ যৌবন গর্বিত, অন্ধ, আনন্দিত।

সংসার—
অসংখ্যবার জন্মের অঙ্কুর থেকে অভিজ্ঞান নিয়ে
কার্পেটে তরঙ্গ তুলে হেঁটে যায় জন্মের অঙ্কুরে
ভালবাসা,
নীড় থেকে নীড়ে।
ধুলো, ফুল, ভুলবোঝা,
অগাধ স্নেহের সব রেশ
নতুন বৃষ্টির মধ্যে বাজে,
করুণা-রঙীন পথে ফিরে ফিরে আসে
অনন্তকালের সেই মুগ্ধ সুর—
জন্মের অঙ্কুর থেকে জন্মের অঙ্কুর!

এই যন্ত্রণা

রাজলক্ষ্মী দেবী

মর্মান্তিক কাঁটাগুলি ধন্য ক'রে এই রক্তগোলাপের ঝাড়
একবার জানিয়েছে সত্তা-র স্বাক্ষর। তবু আবার, আবার
ভিক্ষুক বসন্ত যদি হাত পাতে, —যদি তার অর্বাচীন দাবী
বর্ণে, গন্ধে, যন্ত্রণায় ফোটায় শতেক ফুল,—তারা কি প্রলাপী?

তা'হলে সুন্দর বুঝি শেষ হবে পিরামিডে, গীর্জার চূড়ায়?
তাহ'লে গম্ভীর বুঝি শেষ হবে জ্যামিতি ও পরিমিতি গুণে?
পবিত্রের সুকঠিন কিমাশ্চর্য শিলালিপি নিঃশেষে ফুরায়—
তখনো বসন্ত এসে জেবলে দেবে প্রাণটাকে ফুলের আগুনে।

আশ্চর্যের শেষ হবে আকাশটা ছোঁবে যেই, সিঁড়ি হবে পার
জানাশোনা গম্বুজের। অবিনাশী সময়ের করাতে কী ধার,
আনন্দেরো শেষ হবে,—বুদ্বুদে ফুরিয়ে যাবে ইন্দ্রধনু মন।
যন্ত্রণার শেষ নেই,—যন্ত্রণা-ই শেষ সত্য, সে-ই তো জীবন।

তীর্থের তিমিরে

চিত্ত ঘোষ

তীর্থের তিমিরে চলো। বলবান দুর্গমতা জয়ী
কিছুকিছু বিকীরণ সাময়িক, পরিশুদ্ধ দল
প্রস্তর ধবল, হিম। আজন্মের মোহিনী প্রণয়ী
রেখে গেছে শিলাভার ধৌতধারা মুখের আদল,
স্মৃতির পল্লবছায়া, নদীর নিভৃত নীল বারি।
যজ্ঞে অগ্নি ধূমালোক অনিঃশেষ দৃশ্যহীন বলি
সমগ্র আঁধারপুঞ্জে, মেঘমালা বিদ্যুৎলহরী
প্রান্তরের বৃক্ষ বন, শহরের জন্ম-অন্ধ গলি।

নিরবধি সূর্যতাপ জলশূন্যে সমুদ্র শুকোয়:
গড়ে তোলে গুহামুখ, উচ্চচূড়া গম্ভীর পাথার।
দু চোখে প্রবল চিত্র দূরান্তরে সমুদ্র কোথায়!
সংগীতের মূর্চ্ছনায় নিয়োজিত নিমগ্ন পাথার।
পর্বতে মিলায় ধ্বনি, ঘনবনবেষ্টিত কুহকে
রোদ ঝরে, রাত্রি ঝরে, বৃষ্টি ঝরে ঝরকে ঝরকে॥

অদৃশ্য দর্পণ

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

হে অমল ধ্বনিপুঞ্জ, হে বিপুল গাঢ় অন্ধকার,
অদৃশ্য দর্পণে প্রতিবিম্বিত হে বিষণ্ণ প্রতীক,
দ্যাখো, কোন ক্ষমাহীন যন্ত্রণায় বিকেলবেলার
নীল রৌদ্র মুছে নিয়ে সহসা উত্তাল দশদিক।
দশদিক অন্ধকার। শুধু হাওয়া, উন্মাদ, বিহ্বল,
উলঙ্গ উল্লাসে ব্যাপ্ত: সন্ধ্যার নিরালা দুই হাতে
টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে দিয়ে অসহ্য প্রবল
আক্রোশে বিক্ষুব্ধ মাথা রেখেছে রাত্রির জানালাতে।

রাত্রির জানলায় হাওয়া, অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার,
উত্তাল দশদিক জুড়ে ধ্বনিপুঞ্জে অমল যন্ত্রণা,
অদৃশ্য দর্পণে প্রতিবিম্বিত হে বিষণ্ণ প্রতীক
এ-কার রক্তাক্ত মুখ জ্বলে ওঠে, এ-কোন্ অপার
নিষ্ঠুর নির্লজ্জ আলো, বিদ্যুতের দীপ্ত অগ্নিকণা।
স্মৃতি, চতুর্দিকে স্মৃতি, মুখ ঢাকো, নিঃসঙ্গ প্রেমিক॥

আলোর ভিতরে চোর আছে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ধিকিধিকি সন্দেহের আগুনে উঠলো জ্বলে
পাড়াপড়শীর ঝাউবনে:
শহরের আশেপাশে পাহাড়ে পাহাড় মাথা ঘষে,
কাকে যে আহুতি দেবে কৌতূহলের হুতাশনে।

কাকে যেন কাছে পেলে বিঁধে ফেলবে দারুণ বল্লমে,
তার আগে একটি দুরূহ কথা প্রশ্ন করবে:
"কাকে তুমি ভালোবাসো? কাকে ভালোবেসে পূর্ণোদ্যমে
রোজ রাত্রে চিঠি লেখো ছোটো-ছোটো খরোষ্ঠী হরফে?
উত্তর পাও না ব'লে মরমে-মরমে
ম'রে তো আছোই তুমি, আমাদের হাতে আজ সম্পূর্ণ মরবে।

"তুমি অতিশয় মূর্খ, যার হাতে চিঠি ফেলতে দাও,
সে-কিশোর দু-তিন কাহন
পারিতোষিকের লোভে বিকিয়েই দিতে পারে গাঁও,
অথবা নিজের ছোটোবোন;
আমরা দোভাষী ডেকে তোমার সমগ্র পত্রাবলী
প'ড়ে ফেলে ব'সে আছি, আমাদের মত জানতে চাও?

"তোমার বিশ্বাস যদি মেনে নিই, তবে আমাদের
মেনে নিতে হয় মৃত্যু, আশু অন্তর্জলি;
কারণ, তোমার কাছে দুঃখ-আস্বাদের
অর্থ শুধু পরিশুদ্ধ হয়ে যাওয়া, শুদ্ধতার জের
টেনে তুমি নিতে চাও প্রেমে, পরিণয়ে, পুংশ্চলী
রমণীর সন্তানপ্রসবে; এ যে উন্মাদ কাকলি!

"তাছাড়া তোমার লক্ষ্য স'রে যায়, যায় স'রে-স'রে।
কিছুতে সন্তুষ্ট নও, নরোত্তম সাজো
ঐশ্বরিক অসন্তোষে; তুমি আমাদের হাত ধ'রে
পার ক'রে দিতে চাও যেখানে বিরাজো,
অথবা যেখানে নিজে যাবে তুমি—আশ্বিনের ভোরে।
তুমি যাও, আমরা থাকি ঋতুপরিবর্তনে, নগরে"—

ধিকিধিকি সন্দেহের আগুনে শহর
জ্বলে যায়। স্নায়ুযুদ্ধ। বৃদ্ধনিয়োজিত
যুবসম্প্রদায় ঘোরে, আলোর ভিতরে আছে চোর,
খুঁজে হাওয়াকেই করে প্রহারে-প্রহারে জর্জরিত॥

আরণ্য

সুনীলকুমার নন্দী

পাতায় সবুজ স্রোত, গাছে গাছে বয়—
শিশুর সারল্যে দুষ্ট অরণ্য বিস্ময়
দেখতে দেখতে মাথা তোলে যৌবন নির্ভয়।

সাবধানে পা ফেলে এসো, এখনো সকাল
বিস্তর দূরের পাড়ি: অরণ্যে নাকাল
বুড়ো চাঁদ, সেও দেখো কামনায় লাল।

ঘরেও ফুলদানি একি অরণ্যের ঘ্রাণ
ছড়ায়, বিবশ অঙ্গে কূলভাঙা টান
টাল খায়, ছিঁড়ে ফেলে বিশুদ্ধ বিধান।

অঙ্গে অঙ্গে সারা রাত অরণ্য সন্ধান।

শোকসভায় এক সন্ধ্যা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এইখানে বসবে এসো, অবিনাশ, বেদনার পাশের চেয়ারে
সাবধান, ছুঁয়োনা ওকে, ও বড় নশ্বর স্রোতে ভেসে যেতে চেয়ে
রূপোলী আলোর চোখে থমকে আছে, উন্মোচিত চুলে
ক্ষণিক আঙুল রেখে ও যেন রক্তাক্ত সন্ধ্যা
দৃশ্যমান করে
ওর দৃষ্টি, আমি জানি, বড় ভয়ংকর লক্ষ্যভেদী। সরে এসো,
অবিনাশ, স্পর্শ করো না, সাবধান!

সভাপতি বড় ক্রুদ্ধ, দেশ কাল বাণিজ্য সন্ততি
হুড়োহুড়ি করে মঞ্চে, সিগারেট খেতে উঠে গেল তিন জন
গত রাত্রে ঝড়ে ভাঙা গোলাপের ডাল থেকে ফুলগুলি ছিঁড়ে
কে শূন্যে রেখেছে গেঁথে? ফুলে বড় বিস্মরণ আসে
কে কোথায় জেগে আছে সকাল না গোধূলির শিয়রের
কাছে, ভুল হয়; চোখে ভাসে সহস্র নিয়তি।
(প্রতিটি বক্তার জন্য পুনরায় শোকসভা করে যেতে হবে একদিন)

চল আমরা বাইরে যাই, অবিনাশ, আমাদের মত্ত কণ্ঠস্বরে
অজস্র গম্ভীর মুখে বিঘ্ন রেখা ফোটে।
বেদনা ওখানে থাক, একা স্তব্ধ, স্বপ্নদষ্ট, স্থির
ওর এত উগ্র রূপ, অমন উজ্জ্বল শাড়ি আজ আমাদের সঙ্গে
বড় বেমানান,
তার চেয়ে শনিবার ওকে নিয়ে পেনেটিতে স-উপকরণ
বেলেল্লা নষ্টামি করে কিছুক্ষণ কাটবে চমৎকার।

চল আমরা বাইরে যাই শঙ্কিত শোভায়, অন্ধকারে
হলুদ শস্যের ক্ষেতে ভ্রমে বন্ধ কৃষকের মত
বহুদিন ভূমিকম্পে কাঁপেনি ধরিত্রী তাই মাথার উপরে
কেঁপে ওঠে চকিতে আকাশ—
চতুর্দিকে গর্জমান লক্ষ লক্ষ জীবিত নিঃশ্বাস
কেমন উদ্ভ্রান্ত করে, একদা উদ্ভ্রান্ত হয়েছিল
আমাদের সঙ্গে যেতে ঠিক এই পথে হিরণ্ময়।
হিরণ্ময়, হিরণ্ময়, নাম ধরে ডেকে ওঠে
গোলাপের ভিতরে বিস্ময়।
দন্তশূলে কষ্ট পেলে লোকে বড় পরিহাস করে
তার চেয়ে মৃত্যু আরও লঘু মনে হয়।

একটি প্রেমের কবিতা

গোবিন্দ চক্রবর্তী

মনে আছে—ভুলিনি কিছুই।
হে তুমি কাঞ্চনশাখা
যে-উতল জল ছুঁই-ছুঁই!
আমি জল, সেই নীল জল।
প্রেমে যে হেলবে আরো বাঁকা—
আমারো নেই সে সাধ্য
হাত ধরি অথবা পিছুই।
মুখোমুখি চেয়ে তাই হৃদয় বিকল।
কিছুই ভুলিনি—আছে মনে।
সে স্মৃতিই তীরের আর্দ্রতা
বিছানো যা তৃণ-আবরণে।
যত কিছু হৃদয়ের কথা
স্রোতে, মেঘে ভাসে তা হাওয়ায়।
পাখিদেরো ইতস্তত আসা ও যাওয়ায়—
সাজায় কিছুটা পদ্মলতা,
বাজে বাকি নিশীথের তারার স্পন্দনে।

অমিল মেলে না জানি, জানি।
নিষেধ না-মানা এই পৃথিবীর মত
শিয়রে অজান্তে নীল চাঁদ ডেকে আনি।
তবু যদি অসতর্ক কখনো নিমেষে
জোয়ার-সাহসী বুক আসে কূল ঘেঁষে
লাগবেই পিছনে না কি টান?
অমাবস্যা—কৃষ্ণপক্ষ—অদৃশ্য উজান!

তবু বুঝি একদিন একান্ত অবাক—
ভুল হয় ছকে-ফেলা যা-কিছু না আঁক।
সে ঝড় হঠাৎই দেয় দোলা
এবং আসেও সেই বান—
নতুন সৃষ্টির সাধে
যখন উত্তরে মুখ রুদ্রই ফেরান।

তখন হতেও পারে—জলাও সাগর।
তখন আমিই এসে হয়ত বা নতজানু
জড়াব কোমর,
অথবা হে আজন্মের সাধ!
তুমিই ঝাঁপাবে আগে বুকের উপর।

নৈশবিলাপ

আরতি দাস

যে ঘুম লুকিয়ে থাকে উলূকের
নিরীহ কোটরে
অজাত ভ্রূণের চোখে যে আঁধার
জননী জঠরে,
গলির বেকার ছেলে একতোলা
আফিঙের ঝোঁকে
শেষঘুমে শেষবার হেলা করে
যে অভিভাবকে
সেই ঘুম এনে দাও এ জীবনে
মৃত্যুর স্বাদ।

কে চায় অমর হতে? যদি এই
জলধি অগাধ
মন্থনে সুধা ভরে, সুরাসুর
যার খুশি নাও।
যাতনাই শেষ কথা, নিরাময়
ঘুম এনে দাও।
আহা, সে সোনার মেয়ে পায়ে বাজে
রুম্ ঝুম্ ঝুম্
মিঠেসুর সেধে যায় ঘরে ঘরে
ঘুম চাই, ঘুম।

॥ ১ ॥

জীর্ণ ভবনে রোগশয্যার আসনে র'য়েছি লগ্ন;
সম্মুখে আমার বিরাট বিটপী, শাখা-প্রশাখায় ভগ্ন।
খোলা জানালায় আঁখি তুলে তারে
যতো দেখি, তত বিস্ময় বাড়ে!
তারি পানে চেয়ে তন্ময়তায় তারি রূপে হই মগ্ন।

তারি রূপে আমি হই একাকার, মিশে যাই তারি সঙ্গে;
সে আমায় রাখে অসীম ধৈর্যে, অচল-চলার ভঙ্গে।
ভগ্নশাখায় নবশাখা ধরি'
নবপল্লবে ওঠে মর্মরি!
রোগ-যন্ত্রণা ভুলে যাই তার বিশাল-প্রভুস-রঙ্গে।

সে যে সাবিত্রীনন্দনতরু, জানে না তিমিরশঙ্কা;
অবনীতে পায় পাবনীমায়ের সৌরপীযূসগঙ্গা।
পাখি-প্রজাপতি-জোনাকির দল
যাচে তারি কাছে প্রাণের অনল;
মূলশিখা তার জ্বালে পাতালের জড়পর্বতজঙ্ঘা।

যত ঝরে ফুল, তত সে ফুটায়, রচে কুসুমের স্বর্গ;
বিপুলবীর্যে মহাশক্তির পূজায় সাজায় অর্ঘ।
অসীমাকাশের রবিশশীতারা
রাখে তারি শাখে কিরণের ধারা:
তারি বিভাসের সঙ্গ লভিল আলোর দেবতাবর্গ।

তারি সাথে আমি মহাশক্তির সাধনে অবিচ্ছিন্ন,
কোনো মুহূর্তে-মুকুল আমার রাখি না অনুদ্ভিন্ন।
যত পাই বাধা, বিদীর্ণ করি;
আঁধারে দুলাই জ্যোতিমঞ্জরী!
আমার প্রগতি কোনো বিপদের আঘাতে হবে না খিন্ন।

॥ ২ ॥

শহরের বুকে প্রাচীরঘেরা এ সাধের সদন গড়িয়া,
কোন্ ধনী ছিল? চলে গেছে তার স্বপন সাঙ্গ করিয়া।
আমি এ বাগানবাড়িতে এসেছি
কত দিন আগে, তাও ভুলে গেছি!
ভুলে গেছি আমি রোগশয্যায় কতকাল আছি পড়িয়া।

কতকাল আছি মনে নাই! তবু মনে হয় কোন্ অতীতে
আমিও ছিলাম ভবন-বাহিরে জন-প্রবাহের নদীতে।
শত তরঙ্গে কাঁদিয়া-হাসিয়া
অধীর ধারায় যেতাম ভাসিয়া
কলকল্লোলে ফেনিলোচ্ছল কালাবর্তের গতিতে।

মহানগরীর বিজনমর্মে এই মালঞ্চ লভিলাম,
ঐ বিটপীর স্তব্ধ-গভীর-গতির মন্ত্র জপিলাম।
এখানেও আসে ঝঞ্ঝা, প্লাবন;
ঘনায় দেহের দুর্যোগ-ক্ষণ;
অটলশাখীর সংকাশে তাই মোর সম্বিত সঁপিলাম।

ঋতুরঙ্গের ফুলতরুদল ক্ষণিকবিকাশে জ্বলিয়া
ঐ অতিকায় বনস্পতির কাছে আসে, যায় চলিয়া।
গেল হলিহক, ডালিয়া গিয়েছে,
সূর্যমুখীর প্রদীপ নিবেছে;
বৃদ্ধবকুল রাখে তার ফুল কালের কবল দলিয়া।

কালের কবলমুক্ত পূজারী কখনো হ'বে না ক্ষুণ্ণ,
ভবিষ্যতের অসীমেও র'বে আমার পূজার পুণ্য।
আমার শাখীর শ্যামল আসনে
অখিলময়ীর সমুদ্ভাসনে
ইহকালে আমি পূর্ণ কোরেছি অনাদিকালের শূন্য।

॥ ৩ ॥

প্রাচীর-তোরণে স্তম্ভের চূড়া সহসা ভাঙিয়া পড়িল!
ছিঁড়িয়া উড়িল পত্রপুঞ্জ, ধুলোয় ভবন ভরিল।
ঐ প্রকাণ্ড-পাদপ-রসাল
এই উদ্যানে আছে এতকাল,
প্রবল ঝড়ের সংঘাতে তারে ভূমিলুণ্ঠিত করিল।

খণ্ডিত হ'ল তরুণ-সিমুলে শিথিল মূলের বন্ধন;
ছিন্ন-ভিন্ন মাধবীবিতান! ধূলিসাৎ হয় চন্দন।
বজ্রকঠিনমূল-প্রবন্ধে
প্রাচীন বকুল নাচে আনন্দে!
শাখা ভাঙে, তবু করে প্রলয়ের সমীরসিন্ধু মন্থন।

তারি মন্থনসঞ্জাত সুধা লভিয়া আমার চিত্তে,
এই দুর্বল তনু ভরি' ওঠে দুর্দমতার বিত্তে।
করাল মৃত্যুসংকটে তাই
অমরাত্মার বার্তা বিলাই,
আহত জীবনে পঙ্গুচরণে মাতি অনাহত নৃত্যে।

সম্মুখ-সমরে পরাজিত হ'ল প্রবল পরাক্রান্ত
কালবৈশাখী: বিটপীনটেশ হ'ল নর্তন-ক্ষান্ত।
আরো একবার প্রাণ নিতে এল
যমরাজ, তবু হার মেনে গেল:
আরো কতবার দলিব আমার মরণের শিখরান্ত।

আরো কতবার সর্বজয়ার বৈজয়ন্তী উড়াবো;
মৃন্ময়তায় অমরকুসুম ফুটাবো, ঝরাবো, কুড়াবো।
ঐ তরুনীলকণ্ঠে বরিয়া
হলাহলরাশি রূপান্তরিয়া
আরো কতবার মানবলোকের অমৃতের আশা পুরাবো।

॥ ৪ ॥

নিকষ-শৈলশিখরের মত ভূমিতলে তার কাণ্ড:
কালোশিলাবৎ-বল্কলে গড়া প্রাণ-অশনির ভাণ্ড।
বিদ্যুৎ-বিভা সবুজে-সাদায়
লভিয়াছি তার পুষ্পে-পাতায়!
অরুণবর্ণফলে করতলে লভিয়াছি ব্রহ্মাণ্ড।

এল মহামারীবন্যার স্রোতে গরলগামিনী যামিনী!
আমার শোণিতে সঙ্গম সাধি' অবক্ষয়ের কামিনী
মোর প্রশ্বাসযন্ত্রে জড়ায়!
তবু আমি জ্বালি তার জড়িমায়—
রাখি' বিটপীর সঞ্জীবনীর শাশ্বতসৌদামিনী।

স্পর্শে আমার প্রিয়পরিজন হ'বে বুঝি আয়ুনিঃস্ব!
আয়ুর্বেদীয় নির্দেশে তাই হ'য়ে আছি অস্পৃশ্য।
'যারা ভালোবাসো, এসো, দূর থেকে
আমায় দেখার ক্ষণে যাও দেখে
ঐ অবিচল বৃদ্ধবকুলে আমার স্বরূপদৃশ্য।'

স্বরূপদৃশ্যবিটপী দেখিয়া, দেখেছি পরমহর্ষে:
আছে বিশ্বের অজেয়সত্তা মোর বিকাশের স্পর্শে

মলিন কায়ায় অম্লান আমি,
গণ্ডির মাঝে অনন্তগামী;
আছি প্রচণ্ড প্রতিকূলতায় আমার অচলাদর্শে।

ঐ তরুতেই আছে মোর মাঝে জগৎ-বীণার যন্ত্রী,
আছে পৃথিবীর জীবন-গতির মরণ-ব্যাধির হন্ত্রী।
মোর পরমায়ু দেহরক্ষায়
যাবে না, যাবে না রাজযক্ষ্মায়;
মোর প্রাণবায়ু বকুলবৃক্ষে বাজাবে বিজয়তন্ত্রী।

॥ ৫ ॥

এই আবাসেই রচিতে রচিতে আকাশময়ীর স্তবগান,
বকুল ঝরণে লভিয়াছি তারি অবতরণের অবদান।
কত দুঃসহদিবসে আমার
বরাভয়পাণি দেখি অভয়ার;
দুঃস্বপনের কত বিভাবরী নিমেষেই করি অবসান।

যারা মাঝে মাঝে আসে মোর কাছে এই উদ্যানসদনে,
তারা শুধু দেখে মোর দেহগত উত্থানে আর পতনে।
কেহ বলে, "তুমি উঠিয়া দুদিন,
আবার হ'য়েছ শয্যায় লীন!"
কেহ বলে, "যাও স্যানিটোরিয়ামে, আপনারে রাখো যতনে।"

আমি মনে মনে বলি, ভালো আছি, এখানেই আমি রহিব
সর্বংসহা বসুধার মত হাসিমুখে সব সহিব;
আমি রাখিয়াছি মর্তমরুতে
নন্দনতরু বকুলতরুতে;
আমি পার্থিবমুকুলমালায় পারিজাতমালা বহিব।

শ্রীরামকৃষ্ণকথা মনে পড়ে, "বিড়ালশিশুর মত হও,
মা তোমাকে রাখে যেখানে যখন, সেখানে থাকার ব্রত লও।"
'জগৎ-গুরু'র লিখিত লিপির
কথা যেন শুনি, "হ'য়ো না অধীর,
একাসনে বসি' মহেশ্বরীর শরণ-সাধনে রত রও।"

স্থির বিশ্বাসে আমার সাধনা, প্রতি নিঃশ্বাসে সিদ্ধি!
এই ভবনেই গাঁথিয়া আমার আসনবেদীর ভিত্তি
ভুবনেশ্বরী তরুমূলাধারে
গোপনে ধারণ করেন আমারে,
তরুশাখাময় সম্পদে হয় আমার বিকাশ বৃদ্ধি।

॥ ৬ ॥

চিরন্তনীর প্রেরণাবাহিনী আমারে হেথায় আনিতে
কবিকণ্ঠের শ্রীঅরবিন্দ-নমস্কৃতির বাণীতে
মন্দ্রপ্রবাহে দিয়েছিল মোর
জয়যাত্রার প্রভাত-প্রহর,
মহাঝঙ্কার তুলেছিল এই জীবনযন্ত্রখানিতে।

সেই ঝঙ্কারে এখানে এসেছি, আজো শুনি সেই ঝঙ্কার!
সে-লেখার প্রতি অক্ষরে দেখি মূর্ত অজয়-ওঙ্কার।
'কবিগুরু' মোর সুপ্তি হরিয়া,
যুগগুরু—বলি' বরণ করিয়া—
যাঁরে দেখালেন, তনুর ধনুতে লভিয়াছি তাঁরি টঙ্কার।

সেই হ'তে এই আশ্রমে আছি; এই পুরাতন ভবনে
মোর জাগ্রত-স্বপনে দেখেছি কত শশাঙ্কে, তপনে।
রবীন্দ্র শতবর্ষ প্রভায়
আমার পঞ্চাশোর্ধ্ব শোভায়
সৌরাচলের শিখী দোলে আজি চন্দ্রাচলের পবনে।

তার বিচিত্রপাখার পরশে দিল সে আমায় কী-চেতন!
দিল নন্দিত নাটের নিলয়, সুরের শান্তিনিকেতন।
মহাময়ূরের নর্তনে তাই
মোর যৌবনস্মৃতিরথে যাই,
শালবীথিপথে আমার বকুলফুলরাশি করি নিবেদন।

সহসা তীব্রনিনাদ উঠিল মোটরকারের হর্নে,
চিকিৎসকের আগমন-ধ্বনি চকিতে পশিল কর্ণে।
অন্তরে তবু তরুর শাখায়
নিখিল রমার শিখী নাচে-গায়,
কলাপ দুলায় শতবরষের রবিরঞ্জিত স্বর্ণে।

॥ ৭ ॥

ইঞ্জেক্সান দিয়ে 'সান্যাল' আমায় শুধান হাসিয়া,
"কবি, ভালো আছো" বলেন সেবিকা 'নিপুর্ণিকা' রায় আসিয়া,
"রুগী আছে ভালো, তবু বকে ভুল!"
আমি বলি, পাই অকূলেও কূল,
বকুলফুলের তরী-নির্ভরে তুফানেও চলি ভাসিয়া।

দুয়ারে দাঁড়ান মোর প্রতিবেশী কবি 'রবীন্দ্র খান্না',
তাঁর গজলের জহরতমালা আমায় না-দিয়ে যান না।
উর্দুজবান থেমে গেলে তাঁর,
আমি দেই তাঁকে বকুলশাখার
কুসুমের হীরা, কুঁড়ির মুকুতা, পাতার সবুজপান্না।

'বিদ্যাব্রতে'র ফোটোস্টুডিয়ো মুখরিত হয় অদূরে,
রেডিয়োর চাবি খুলে দিতে দেখি তার 'ঊর্মিলা'-বধূরে।
দিল্লি-সিলোন-লণ্ডন হ'তে
আসে ধ্বনিধারা সংগীতস্রোতে!
আমার বকুলসুরভির বেণু বাজিল নীরবে, মধুরে।

বসনে-ভূষণে রঞ্জিত-রূপে আসে নগরীর নাগরী,
আসে দিবালোকে আলেখ্য নিতে বিলাস-নিশার জাগরী।
ফোটোগ্রাফারের কথা যায় শোনা
"মেঘে ঢাকে আলো, ফোটো তুলবো না!"
বকুলতলায় ভাঙে হতাশায় রতিমদিরার গাগরী।

বকুলতলায় কার দুটি আঁখি আশার আলোয় ঝলকে!
সদ্যস্নাতা, শুভ্রবসনা এসেছে মুক্ত অলকে।
আনমনে বলে, "ঝরে কত ফুল,
কুড়াবো লক্ষ্মীপূজার বকুল।"
আমার দেখার ক্যামেরায় তার ফোটো উঠে যায় পলকে।

॥ ৮ ॥

এই তরুতলে লভি' অভিনব অবলোকনের দৃষ্টি
মানসনয়নে উদ্ভাসি' ওঠে নিত্য নূতন সৃষ্টি।
নব-নব-তারা সৃজনের সাথে
কে ফোটায় ফুল বকুলশাখাতে!
মোর সুরে ঝরে কার রাগিণীর অঝোর পুষ্পবৃষ্টি।

ধূসরধূলায় শ্যাম-অভিযান নীলিমার পানে তুলেছে,
যেন মহাযোগী মাটির আসনে মাটির বাসনা ভুলেছে;
রসাতল হ'তে যেন নাগপতি
সাধে ওরি সাথে সমুর্ধ্বগতি,
বিশালশাখীর বহুশাখাশিরে সহস্রফণা দুলেছে।

অম্বরভেদী মহামহীরুহে আমার প্রকাশপন্থা,
তারি প্রসূনের সৌরভে মোর স্বভাব স্বর্গগন্ধা।
তারি আলো আর ছায়ার সীমায়
দেখেছি অসীমা অবতীর্ণায়!
অসীমার হাসি এনেছে আমার উদয়শশীর সন্ধ্যা।

আয়ুর অচলে পার হ'য়ে চলি অর্ধশতক শৃঙ্গ!
মোর ফুলে মধু পায়নি, পাবে না মর্তকামনাভৃঙ্গ;
সরস্বতীর পরশের অলি
পেয়েছে আমার পুষ্পাঞ্জলি;
দেবীদুর্গার বাহন হ'য়েছে আমার বিটপীসিংহ।

ভগ্নশাখায় নবশাখা দোলে! নিশীথিনী নিস্তন্দ্র!
অদিতির বরে উঠেছে আমার জন্মতিথির চন্দ্র।
চিরপূর্ণিমাধাত্রী আমায়
ঐ সনাতনতরুতে সাজায়!
আমি চন্দ্রিতবকুল ঝরাই, জপি কৌমুদীমন্ত্র।

নামটীকা

(১) 'জগৎ-গুরু'—শ্রীঅরবিন্দ।
(২) 'কবিগুরু'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৩) 'সান্যাল'—প্ল্যাস্টিক সার্জারিতে সিদ্ধহস্ত প্রখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক শ্রীপ্রভাতকুমার সান্যাল।
(৪) 'নিপুর্ণিকা রায়'—লেখকের ভগিনী ও সেবাদাত্রী শ্রীমতী অপর্ণা রায়ের দ্বিতীয় নাম নিপুর্ণিকা।
(৫) 'রবীন্দ্র খান্না'—শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক বিদ্যায়তনের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ও উর্দুভাষার কবি শ্রীরবীন্দ্র খান্না।
(৬) 'বিদ্যাব্রত'—লেখকের প্রতিবেশী ও শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের বিখ্যাত ফোটোশিল্পী শ্রীবিদ্যাব্রত।
(৭) 'ঊর্মিলা'—ফোটোশিল্পী শ্রীবিদ্যাব্রতের পত্নী শ্রীমতী ঊর্মিলা দেবী।

আহা! আশ্রমের সেই অভিভাবকটি আজ কোথায় যিনি বিতর্কের মাঝখানে খোঁচা দিয়ে বলেছিলেন, "আপনার কী, মশায়! আপনি তো একদিন ডেরা ডাণ্ডা তুলে সরে পড়বেন। আমাদের, মশায়, এখানে স্টেক আছে।"

জানলেন না তিনি কিসের স্মৃতি তিনি জাগিয়ে দিলেন। কেমন হোম-সিক করে তুললেন সুমনকে। বাড়ির জন্যে নয়। ডেরার জন্যে। কতকাল সে ডেরা ফেলেনি, ডেরায় রাত কাটায়নি, ভোর হলে ডেরা ডাণ্ডা তোলেনি। তাঁবুতে যে একবার বাস করেছে সে কি চাইবে কখনো দালানে খাঁচার পাখী হতে।

না। রাজপ্রাসাদেও না। কলকাতার যখন পত্তন হয়নি, ইংরেজরা যখন ওড়িশার উপকূলে ঠাঁই খুঁজছে, তখন কে একজন ইংরেজ সওদাগর মহানদীর মোহানার কাছে জাহাজ ভিড়িয়ে পায়ে হেঁটে কটক যান মোগল সুবাদারকে কুর্নিশ জানাতে। লক্ষ্য করেন যে রাজপ্রাসাদ শূন্য পড়ে আছে। হিন্দু রাজাদের নির্মিতি। আর সুবাদার বিরাজ করছেন তাঁবুতে। জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, "রাজপ্রাসাদ যাঁরা তৈরি করিয়েছিলেন তাঁরা নিজেদের সুবিধের জন্যে করিয়েছিলেন।। আমার সুবিধে হয় না তাতে। তাঁবুতেই আমার সুখ। আমরা যোদ্ধা।"

তাঁবুর জন্যে হোম-সিক বোধ করে সুমন। তার মনে পড়ে যায় সেসব দিন। আর অমনি মন কেমন করে। বিশাল সরকারী ভবনে বাস করেও সে সুখী হয়নি। সুখী হয়েছে হাতায় তাঁবু খাটিয়ে তাতে সুবাদারের মতো কায়ক্লেশে দিন কাটিয়ে। মাঝে মাঝে তাঁবু নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সফরে। নদীর ধারে বা নির্জন প্রান্তরে ডেরা ফেলেছে। এক এক জায়গায় এক এক রাত। কিংবা একই জায়গায় রাতের পর রাত। ভোরে উঠে হুকুম দিয়েছে, ডেরা উঠাও।

জাহাজে পনেরো দিন কাটিয়ে মাটিতে পা দিতে যেমন আশ্চর্য লাগে তেমনি অপরূপ লাগে তাঁবুতে কয়েক হপ্তা থেকে কুঠিতে পা দিতে। এ অভিজ্ঞতা যাদের হয়নি তাদের সমঝানো শক্ত যে তাঁবুতে বাস করা যেন জলে ভাসমান থাকা। কোথাও যেন কূল নেই। কোথাও যেন মূল নেই। সেও একপ্রকার সমুদ্রযাত্রা। যার রক্তে সৈন্ধব লবণ আছে সে কি চাইবে একঠাঁই চিরদিনের মতো খুঁটি গাড়তে? হায় রে স্টেক!

সুমনের মনে পড়ে যায় আর মন কেমন করে।

• •

"বাব্বা সারা শীতকালটা তাঁবুতে থাকতে হবে। উঃ! ঠাণ্ডায় জমে যাব যে! এই সেটেলমেণ্ট ক্যাম্প থেকে কি পরিত্রাণ নেই!" আক্ষেপ করেছিল সুমন। ভেবে-

ছিল আগের বারের মতো টেনিস খেলে বিলিয়ার্ডস খেলে কাটাবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বে যেতে হলো তাকে ও তার বন্ধুকে। এক একটা সুইস কটেজ তাঁবুতে তাদেরই মতো দু' দু'জনের ব্যবস্থা। গ্রাম-প্রান্তের খোলা ময়দান জুড়ে বিস্তীর্ণ শিবির। বহু অফিসার। বহুতর সাঙ্গো-পাঙ্গ। দিনের বেলা কাজ। রাতের বেলা আড্ডা। তারপর তাঁবুর ভিতরে কিংবা বাইরে ক্যাম্পখাট পেতে ঘুম।

একটু একটু করে শৈত্যবোধ কমে যায়। তখন এত বড় শীতকাতুরে যে সুমন সেই শোয় তাঁবুর বাইরে ক্যাম্পখাট পেতে শিশিরে ভিজতে ভিজতে। সর্দি লাগবে না? লাগল সর্দি। দমল না তবু সুমন। একবার বাইরে ক্যাম্প খাটে শোবার সুখ যে আস্বাদন করেছে সে কি সহজে ভিতরে ঢুকে দরজা দিতে চায়! তা না করলে আবার বন্ধুর ঘুম আসবে না। শেষে একটা আপোসের মতো হয়। এক দরজা খোলা রেখে সুমন শোয় ভিতরে। আর এক দরজায় ঝাঁপ দিয়ে প্রদোষ।

একমাস পরে বড় ক্যাম্প ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রদোষ আর সুমন তাদের সেই তাঁবুতেই থাকে, কিন্তু স্থানান্তরে। ডাক বাংলোর হাতায়। দিনমান কেটে যায় গ্রামে গ্রামে আমিনদের সঙ্গে। খানাপুরি বুঝারত করতে। রাত্রে আড্ডা দেবার জন্যে সঙ্গী একমাত্র প্রদোষ। জমে না। সেও শনিবারে শনিবারে কলকাতা পালায়। রবিবার কলকাতায় ঘোরে। রাত্রে পেট্রোমাক্স জ্বালিয়ে বই কাগজ পড়তে বসে সুমন। কিংবা স্ত্রীকে চিঠি লেখে। এমনি করে তিন মাস অতীত হয়। তারপর তাঁবু গুটিয়ে নিজেদের জেলার সদরে প্রত্যাবর্তন। সেখান থেকে বদলি।

সুমনের বদলি হলো উত্তরবঙ্গের একটা মহকুমায়। মহকুমায় সেই সর্বময় কর্তা। ক্ষমতা ও স্বাধীনতা যথেষ্ট। যখন খুশি সফরে বেরোতে পারে। জেলা শাসকের অনুমতি নিতে হয় না। যদি না মহকুমার বাইরে যেতে হয় ব্যক্তিগত কাজে। কিংবা জেলার বাইরে যেতে হয় যে কোনো কাজে। সফরের উপলক্ষ আপনি জুটে যায়। আর কিছু না হোক থানা পরিদর্শন, ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন, ডাক্তারখানা বা স্কুল পরি-দর্শন তো আছেই। কিন্তু সফরে যাবে যে, থাকবে কোথায়! ডাক বাংলোর সংখ্যা কম। জমিদারের অতিথি হতে তার নিজের আপত্তি। রাত্রিবাস না করে ফিরে এলে লোকের সঙ্গে ভালো করে চেনাশোনা হয় না। শুধু বুড়ী ছুঁয়ে আসা যায়।

নেজারত পরিদর্শন করতে গিয়ে সুমন দেখে গোটা দুই পিণ্ডাকার পদার্থ রয়েছে। নাজির বললেন, "কাবুলী পাল তাঁবু।" তোলাও সোজা, বয়ে নিয়ে যেতে গাড়ি লাগে না। যে কোনো অপরিসর জায়গায় তাঁবু খাটানো যায়। কিন্তু মুশকিল হলো গোসলের বন্দোবস্ত নেই। যদি না ওই কাজের জন্যে আস্ত একটা তাঁবু বয়ে বেড়াতে হয়। হাকিমরা তাই কেউ কাবুলী পাল নিয়ে বেরোন না। ও জিনিস চলে চাকরদের ব্যবহারের জন্যে, হাকিমদের সুইস কটেজের গাধাবোট হয়ে।

"সুইস কটেজ নেই?" একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে সুমন।

"সুইস কটেজ?" নাজিরবাবু মাথা চুলকিয়ে বলেন, "ছিল একটা। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ জেলার সদরে পড়ে আছে। কালেক্টার সাহেব একবার চেয়ে নিয়েছিলেন শিকারের জন্যে। ফেরত দেননি। ইওর অনারের আগে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও ফেরত দিতে অনুরোধ করেন নি। কে জানে যদি সাহেব চটে যান। আর দরকারই বা কী, সার! সর্বত্র জমিদারদের বাড়ি বা কাছারি। একটা চিরকুট লিখে আমার হাতে দিলে আমিই জমিদারদের ম্যানেজারদের পাঠিয়ে দেব। সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। এইটেই দস্তুর।"

সুমন মাথা নেড়ে বলল, "না, না, এটা খুব ভালো দস্তুর নয়। অত বেশী জমিদার নির্ভর হলে আমি তাদের অত্যাচার দমন করতে পারব না। না করলে প্রজারা দলবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করবে। তখন প্রজাদের কী করে ঠেকাই? ডাণ্ডা দিয়ে? পাশের মহকুমায় যে কাণ্ডটা হচ্ছে আমার মহকুমায় তার বীজ বুনতে দেব না। এখানকার প্রজারা লক্ষ্মী বলতে হবে। সর্বস্বান্ত হয়ে দেওয়ানী মামলাই চালিয়ে এসেছে। লাঠি চালায়নি। আমি তাদের আস্থা হারাতে চাইনে। কাজেই আপনি আজকেই সুইস কটেজের জন্যে লোক পাঠান সদরে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি আধা সরকারীভাবে কালেক্টার সাহেবকে।"

এতদিন চিঠি লেখা হয়ে আসছিল "ডিয়ার সার" বলে। ডেমি অফিসিয়াল চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে সুমন লিখল, "মাইডিয়ার মেটল্যান্ড।" লিখল, "এই প্রজা আন্দোলনের দিনে প্রজাদের যত কাছা-কাছি যাওয়া যায় আইন ও শৃঙ্খলা রাখা তত বেশী সুগম হয়। তা ছাড়া এ মহকুমায় কতকগুলি দুর্গম স্থানও আছে। অতএব দয়া করে যদি সুইস কটেজ তাঁবুটি—"

সুমন তার মহকুমার ভার নেবার আগেই মেটল্যান্ড তাকে চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ করেছিলেন সদরে তাঁর অতিথি হতে ও তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে। সে তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি। মাফ চেয়ে সোজা মহকুমায় এসে চার্জ নিয়েছে। অবসর [illegible]

"মাইডিয়ার পল", মেটল্যান্ড জবাব দিলেন, "আপনার সুইস কটেজ আর আমার অ্যাপোলজি এক সঙ্গে যাচ্ছে। আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমি সুখী ও বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করছি যে আপনি এরই মধ্যে এ জেলার মূল সমস্যাটার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। একটু ফাঁক পেলেই আমার এখানে চলে আসবেন।"

পাশের মহকুমাতেই সে সময় প্রজা আন্দোলন জোর চলছিল। মেটল্যান্ড তাই নিয়ে হয়রান হচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর সমাধানটা সুমনের মনঃপূত নয়। তিনি জমিদারদের দিকে। অথচ প্রজাদেরও থামাতে পারেন না। তাদের দাবীগুলো ন্যায্য। ভেদবুদ্ধির বীজ বোনার জন্যে একজন মুসলিম সাব ডেপুটিকে বকুৎসায় বসিয়েছিলেন আর জমিদারকে দিয়ে আবেদন করিয়ে জমিদারীটিকে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে নিয়েছিলেন। হাঁ, হিন্দু জমিদার। থাকেন বেনারসে না গাজীপুরে। প্রজাদের কোনোদিন চোখেও দেখেননি। নায়েব গোমস্তা ও ম্যানেজার লুটে খায়। লুটের ভাগ দেয়। তারাও হিন্দু। তা বলে কি ওটা হিন্দু মুসলিম সমস্যা?

সুইস কটেজ তো এলো। কিন্তু বর্ষা-কাল যে বিদায় হয় না। রাস্তাঘাট খারাপ। মোটর চলে না। গোরুর গাড়িও খাদে পড়লে উঠতে চায় না। সফরগুলো তাই হাতীর পিঠে চড়ে করতে হয়। কিংবা পাল্কি বেয়ারাদের কাঁধে চড়ে। আর নয়তো দাঁড় টানা হাউসবোটে। জমিদার-দেরই স্মরণ করতে হয়। এই তো তাঁরা চান। জমিদারকে লিখতে হয় না, ম্যানেজারকে বলে পাঠানোই যথেষ্ট। অমনি হাজির হয় হাতী চাইলে হাতী, পাল্কি চাইলে পাল্কি, হাউসবোট চাইলে হাউস-বোট। কালেক্টারের নিজের ঘোড়া আছে, সুমনের ঘোড়া নেই, পরের ঘোড়ায় চড়তে তার ভয় করে।

সুইস কটেজ তার বাংলোর হাতায় খাটানো হয়, যেদিন আকাশভরা রোদ। সুমন তাতে গিয়ে বিশ্রাম করে। সেখান থেকে চেয়ে নদীর দৃশ্য দেখে। পাশেই ক্ষীণকায়া যবুনা নদী। যমুনা নয়। পণ্ডিতম্মন্যরা বলেন যৌবনা থেকে যবুনা। নদীর ধারে মাছ ধরার ফাঁদ পাতা। হরেক রকমের। বাঁশের তৈরি। তার মধ্যে গাছের ডাল ও পাতা। ঘোলা জল। জলের তোড় দারুণ। হিমালয় তো খুব বেশী দূরে নয়। সুমন মাঝে মাঝে জলে নামে, সাঁতরায়। তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

নদীতে নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ানোর যে আনন্দ তার তুলনায় হাতী কিছু নয়, পাল্কি কিছু নয়, মোটর তো একটা বাজে জিনিস, দরকার ছাড়া তার আর কোনো মূল্য নেই। নদী আর সমুদ্র এদের

পেয়েছে। নদীর স্বাদও যে না পেয়েছে তা নয়। কিন্তু এমন অজস্রভাবে নয়। যমুনা গিয়ে যোগ দিয়েছে আত্রাইর সংগে। পণ্ডিতম্মন্যরা বলেন আত্রেয়ী। অত ক্ষীণকায়া নয়, তবু ছোটর মধ্যে গণ্য। কিন্তু কী সুন্দর! হাউসবোট চলল যমুনা নদী দিয়ে ভাঁটির স্রোতে, তারপর আত্রাই নদী ধরে উজান স্রোতে। নন্দনালী থানা। পাঁজরভাঙা। বুড়ীদহ। মাঝিদের কষ্ট হচ্ছে আর সময়ও লাগছে বিস্তর। গুন টানতে হচ্ছে তো। দু'ধারে লোক জমে গেছে হাউসবোট দেখতে কি হাকিমকে দেখতে। বোট যে ধার ঘেঁষে যায় সে ধারে হুড়োহুড়ি। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সাহেব এসেছেন সেলাম জানাতে।

"মাত্র আধ মাইলটাক রাস্তা। ওই যে! এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। সাইকেল তো এ সময় চলবে না। মোষের গাড়ি পর্যন্ত অচল। হুজুর চৌকিদারদের কাঁধে বসে যাবেন। কিন্তু একবার পায়ের ধুলো দেওয়া চাই। দিবারে লাগবে।" সুমন শুনে গলে যায়। স্ত্রীকে একা বোটে রেখে বেরিয়ে পড়ে পায়ে হেঁটেই। তার সংগে কেউ পাল্লা দিতে পারে না।

"হুজুর বাহাদুর হাঁটছেন!" এক অপরকে বলে অবিশ্বাস ভরে। যেন এই প্রথম দেখল। "হুজুর বাহাদুর কি পারবেন!" অপর মন্তব্য করে। অবিশ্বাসভরে।

আধ মাইল না কচু! ঝাড়া চার মাইল। তাও জল কাদার ভিতর দিয়ে। ভাগ্যিস হাফপ্যান্ট পরে নেমেছিল। প্রেসিডেন্টের বাড়িতেই ইউনিয়ন বোর্ড আপিস। খাতাপত্র দেখে আর তহবিল মেলায়। একটু চা কি ডাবের জল খায়। আর সব সরিয়ে রাখে।

"দেখেন, সার, আমাদের অবস্থাটা দেখেন। এই যে দাঁড়া এ আমাদের সর্বনাশ করল। তামাম এরিয়ার ফসল বিলকুল সাফ!" কে একজন মাতবর উঠে নিবেদন করে। "ফী বছর এই বিপত্তি! এ দাঁড়া বাঁধতে হবে। নইলে আমরা ফকির হয়ে যাব, হুজুর।" এই বলে আশি বছর বয়সের সেই বৃদ্ধ কাঁদতে শুরু করে দেয়। অমনি ছেলে বুড়ো জোয়ান সকলের চোখে পানি। কী হয়েছে। না "সদবার দাঁড়া" ওদের ফসল খেয়েছে।

"কে কে দাঁড়া বাঁধার পক্ষে? হাত তোল। হাত তোল।" আস্তান মোল্লার ডাক শুনে দু' হাজার হাত ওঠে। "খালি হাত তুললে হবে না। গতর খাটিয়ে দাঁড়া বাঁধতে হবে। বাঁধবারে লাগবে।" তাতেও দু'হাজার লোক রাজী।

"দেখেন, হুজুর, দেখেন। বেবাক লোক দাঁড়া বাঁধার জন্যে তৈয়ার। আমরাই চাঁদা তুলে চিঁড়ে দই খাওয়াব। গরমেণ্টোর এক পয়সা লাগবে না। খালি একটা হুকুম লাগবে হুজুরের। তোমরা দাঁড়া বাঁধো। ব্যস! অমনি দাঁড়াবাঁধা হয়ে যাবে। বাঁধের উপর হাতী চালিয়ে মাড়াই করব। হুজুর চড়বেন সে হাতীতে।" বলে বায় বুড়ো আস্তান মোল্লা। সায় দেয় জনতা।

সুমন বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কী। দাঁড়া বলতে সে জানে কাঁকড়ার দাঁড়া। প্রেসিডেন্ট মিঞা তাকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন আত্রাই নদী থেকে একটা খাল ঢুকেছে গাঁয়ের মাঠে। খালটা মানুষেরই কাটা। কতকগুলো স্বার্থপর লোক নিজেদের জমিনে পানি আনার জন্যে রাতারাতি লুকিয়ে খাল কাটে। এটা বছর পাঁচেক আগেকার ঘটনা। সে বছর ফসল ভালোই হয়। কেউ মাথা ঘামায় না। তারপর থেকে খাল ক্রমে রাক্ষুসে আকার নিয়েছে। এখন আর সে 'খাল' নয়। 'দাঁড়া'। যেখান থেকে বেরিয়েছে সেখানে একটা বাঁধ দিতে হবে। অবশ্য এই বর্ষাকালে নয়। পরের বছর গ্রীষ্মকালে।

সুমন কথা দেয় না। বলে, "আমার আগে যিনি ছিলেন তিনি কেন হুকুম দেননি খোঁজ নিয়ে দেখি। আপিসে ফাইল আছে নিশ্চয়।"

"কাগজপত্র আমরাও কিছু কিছু এনেছি, হুজুর। দেখতে মেহেরবানী হয়।" এই বলে মস্ত এক বস্তানী কাগজ দাখিল করে আস্তান। সুমন উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে আবেদন ও নিবেদন ক্রমে রাক্ষুসে আকার ধারণ করেছে। মোল্লার দৌড় শুধু সার্কেল অফিসার অবধি নয়। প্রত্যেকটি ধাপ ডিঙিয়ে সে খোদ লাটসাহেব পর্যন্ত গেছে। কিন্তু লাটসাহেবের যে সেচ বিভাগটি আছে সেটি সব প্রস্তাব বানচাল করে দিয়েছে। সেচ বিভাগের মতে বাঁধ দেওয়া দেশের পক্ষে অনিষ্টকর। যত বেশী ফ্লাশিং হয় তত ভালো। নদীর জল যে অকারণে বয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ছে এতে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে পলিমাটি থেকে। আর সমুদ্রের কণ্টিনেন্টাল শেলফ দিন দিন বাড়ছে। সেখান থেকে পলিমাটি ঢুকছে জোয়ারের মুখে হুগলী নদীতে। জাহাজ চলাচলের বিঘ্ন হচ্ছে।

চিঠিপত্রের নকল পড়ে সুমন দেখল লড়াইটা সেচ বিভাগের সংগে। বলল, "আচ্ছা, আমি উপরে চিঠি লিখছি। ও'রা যদি পরিদর্শনে আসেন আমি ও'দের সংগে আবার আসব। বাঁধ দেওয়ার দায়িত্ব ও'দেরি নিতে হবে।"

হাউসবোটে ফিরতেই প্রৌঢ় চাপরাশি আসমৎ জুতো খুলে দিতে এগিয়ে এলো। হুজুরকে পায়ে হাঁটতে দেখাও তার নসীবে ছিল! হুজুর হাঁটবেন এ কি কখনো হয়। বললেই আগে থেকে হাতী মোতায়েন রাখা হতো। নিদেনপক্ষে ঘোড়া। জমিদারবাবুরা কার জন্যে ওসব জন্তু পুষছেন! তাঁরা তো থাকেন কলকাতা শহরে।

আসমতের আক্ষেপ এই যে, কতকগুলো বেয়াদব প্রজা জমিদারের সংগে দেওয়ানী আদালতে লড়ে তাঁকেও জেরবার করেছে, নিজেরাও জেরবার হয়েছে। তাদেরি সর্দার ওই আস্তান মোল্লা শেষ কাণ্ডে হুজুর বাহাদুরকে পায়ে হাঁটিয়েছে। গেল রাজ্য, গেল মান! এর পরে তাকে এস ডি ও সাহেবের চাপরাশি বলে কে ছেরধা ভক্তি করবে!

ওদিকে মোল্লার দল হাউসবোটের সংগে সংগে চলে। • আর কূল থেকে কেবলি সেলাম করতে থাকে। "আবার কবে আসবেন, মালিক! দাঁড়া যে আমাদের খেয়ে খতম করল, মা-বাপ! একবার হুকুম দিলে আমরাই ওকে খতম করব, হুজুর বাহাদুর।"

বুড়ীদহ থেকে দিন কয়েক বাদে ফেরবার পথে আবার সেই সব লোকের ফরিয়াদ। এবার ওরা মালা হাতে এসেছে। সংগে রকমারি উপহার। সুমন নেয় না। কেবল মালাটি নেয়। মালাটি নয়, মালা দুটি। একটি তার গৃহিণীর জন্যে। তাদের বিশেষ অনুরোধে তিনিও বোট থেকে বেরিয়ে এসে দর্শন দেন। জয়ধ্বনি ওঠে।

আস্তান মোল্লা তাঁর উপর, সুমনের উপর, খোদার দোয়া প্রার্থনা করে। সেই কুলবৃদ্ধের দোয়া প্রার্থনা নত মস্তকে গ্রহণ করেন তাঁরা। আস্তান তাঁকেও ভজাতে চেষ্টা করে। বলে, "কোরানে আছে ইন্দর-রাজ আসমান থেকে পানি দেন। সে পানি

কি প্রজাদের সর্বনাশের জন্যে? জমিদার যত না সর্বনাশ করেছে-তার চেয়ে বেশী করছে এই দাঁড়া আর ওই বাতরাজ।"

"বাতরাজ"! কই, সুমনরা কোনোদিন নামও শোনেনি ও-রকম কোনো রাজার। বাতরাজ নদীর জলেই ভাসছিল। তাকে চিনতে দেরি হলো না। কচুরিপানা বা জার্মান পানা। প্রথম মহাযুদ্ধ বা জার্মান যুদ্ধের সময় ইংরেজ রাজের শত্রু জার্মান রাজ ওই পানা দক্ষিণের নদী নালায় ছেড়ে দিয়ে যায়। এতদিনে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছে।

"বাতরাজ ধ্বংস করতে হবে, হুজুর।" আস্তান মোল্লা পোঁ ধরে! তার সঙ্গে সুর মেলায় হাজার হাজার লোক। এমন কি আসমৎ ফকির চাপরাশিও।

জমিদারের নায়েব চিন্তাহরণবাবু পাঁজর-ভাঙা কাছারিতে সুমনকে নামাতে পারেননি। কী মনে করে তিনি আলাদা একখানা নৌকোয় হাউসবোটের অনুগমন করছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, "ইওর অনার, এ তল্লাটের ওয়াটার হায়াসিন্থ ধ্বংস করার জন্যে আমার প্রোপ্রাইটর দু'শ টাকা চাঁদা দিতে রেডি।" তারপর প্রজাদের বাংলা করে বুঝিয়ে দিলেন জার্মান পানা হলো রাজাপ্রজা উভয়ের শত্রু। জমিদারের জয়ধ্বনি উঠল।

সুমন কথা দিল যে কচুরিপানার বিনাশ-কার্যে অগ্রণী হবে গ্রীষ্মকালে। জয়ধ্বনি।

হাউসবোটের যতই কুহক থাকুক সে তো গৃহ নয়। সুইস কটেজ হলো হোম। তাঁবুতে ঢুকলে মনে হয় ঘরে ফিরেছি। যদিও হোম কম্ফর্ট যাকে বলে তার নামগন্ধ নেই তাতে। সুমন ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করে কবে শীত পড়বে। সুইস কটেজ নিয়ে বেরোতে পারবে।

শীত যদি বা পড়ল, মাটির জল কাদা শুকোতে চাইল না। রাস্তার মাঝে মাঝে খাদ, খাদে জল জমে রয়েছে। না চলে গাড়ি, না চলে নৌকো। তাঁবু তা হলে পারাপার করবে কী করে? মানুষ না হয় বাঁশের পুল দিয়ে পার হলো। কিংবা পায়ে কাদা মেখে। সাইকেল কাঁধে নিয়ে।

সুমন তাই সুইস কটেজ বিনা সফর করে। সাধারণত হাতীর পিঠে। সেই-ভাবে তাকে যেতে হলো সব চেয়ে দূরে অবস্থিত নিয়ামতপুর থানায়। বন্দুকের লাইসেন্স পরীক্ষা করতে। সেখানে গিয়ে শুনল তার পূর্ববর্তীরা বিগত দশ পনেরো বছরের মধ্যে কদাচিৎ নিয়ামতপুরে এসেছেন বন্দুক দেখতে। নিয়ামতপুরের লোকদের বন্দুক দেখাতে বলেছেন মান্দা থানায়। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ হাতী ছাড়া অন্য যানবাহন নেই। আর হাতী সকলের সয় না। তা ছাড়া রাজ কাটাবার মতো ডাকবাংলা নেই। থানা ইন্স্পেকশন রুমে সব রকম বন্দোবস্ত নেই।

ফল হয়েছে এই যে জোতদারদের সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘর্ষ বেধে গেছে। অধিকাংশ জমি ছোটনাগপুরের মতো পাহাড়ে। কষ্ট করে ফসল ফলাতে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান রাজী নয়। তাই দূরে থেকে সাঁওতাল এসে চাষযোগ্য করে। চাষযোগ্য করতেও দশ বারো বছর লেগে যায়। এমনি কঠিন মাটি। জলের এমনি অভাব। কিন্তু যেই চাষযোগ্য হলো অমনি ঝগড়া বাধল। জোতদার বলে, জমি আমার, তোমরা উঠে যাও। সাঁওতালরা বলে, জমি আমাদের দখলে। তোমরা খাজনা ধার্য কর। নামমাত্র খাজনা দিতে পারি। কিন্তু উঠে যাব না আমরা। জোতদারের লোভ বেড়ে গেছে রবি ফসলের রূপ দেখে। কাজেই কথা কাটাকাটি থেকে মাথা ফাটা-ফাটি।

এ অঞ্চলে বেশ কিছুদিন সফর করা দরকার। চমৎকার আবহাওয়া। পাল রাজাদের কীর্তি চারদিকে। সুমনের খুবই সাধ। কিন্তু সুইস কটেজের কর্ম নয়। আবার একদিন হাতীতে করে সাঁওতালদের মাঝখানে গিয়ে হাজির হলো। দু'পক্ষের কথা শুনল। কালেক্টার সাহেবও এসে-ছিলেন সদর থেকে। আরেক হাতীতে চড়ে। সাঁওতাল নারী তাঁর সামনে দাঁড়িয়েই সাঁওতাল পুরুষদের উত্তেজনা যোগায়। সাহেব লাল হয়ে গিয়ে বলেন, "এই হচ্ছে মূল। পুরুষের মনে আগুন ধরিয়ে দেয় এর উক্তি? একে না সরাতে পারলে এ আগুন নিববে না।"

সুমন কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করার দায়িত্ব নিল না। কালেক্টারই কলকাটি নাড়লেন। ততদিনে গান্ধীজী বিলেতের রাউন্ড টেবল কনফারেন্স থেকে ফিরছেন ও সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ হয়েছেন। কালেক্টারের হাতে অর্ডিনান্সের ব্রহ্মাস্ত্র ছিল। সাঁওতাল বহিষ্কার অনায়াসসাধ্য হলো। সুমনের কী! তবু তার মনে ব্যথা লাগল। কে করল জমি তৈরি! কে করল জমি ভোগ।

নিয়ামতপুরে আবার একদিন যেতে হবে। স্থির করে ফেলল সুমন। কিন্তু কবে ও কেমন করে তা শিকেয় তোলা রইল। আপাতত অন্যান্য অঞ্চলগুলো দেখে নিতে চায়। খোঁজ নিয়ে জানতে পেলো কেউ বড় একটা অভ্যন্তরে যাননি। গেলে সুগম জায়গায় গেছেন। অর্ধেকের উপর ইউনিয়নে মহকুমা হাকিমের পা পড়েনি বহুকাল। রাস্তা নেই। থাকবার জায়গা নেই। লোকের অভাব অভিযোগ কেই বা শুনছে! কেই বা তার প্রতিকার করছে! সার্কেল অফিসারও বছরে একদিন গিয়ে অডিট করে আসেন।

সুইস কটেজ নিয়ে সুমন খুব বেশী দূর এগোতে পারল না। কিন্তু যে ক'টি জায়গায় ডেরা ফেলল তার থেকে একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ হলো।

সুইস কটেজ হলো এমন এক তাঁবু যাকে নিত্য নিত্য বয়ে বেড়ানো যায় না। তেমন করতে গেলে সব সুখ মাটি হয়। তাই তাঁবুকে পিছনে রেখে রোজ দশ পনেরো মাইল সাইকেলে করে যায়, দুপুরে ফিরে আসে। বিকেলটা তাঁবুতে বসেই কাজ করে, দর্শনার্থীদের দর্শন দেয়। সন্ধ্যাবেলা ডাক এসে হাজির হয়। পিয়ন দিয়ে পাঠিয়ে দেন নাজিরবাবু। জরুরি ফাইল বা সদরের সঙ্গে করেসপণ্ডেন্স। সেই সঙ্গে একখানা খবরের কাগজও থাকে। আর থাকে রুটি মাখন কি সেই জাতীয় রসদ।

পেট্রোমাক্স জ্বালিয়ে রাত জাগে সুমন। পিয়ন যাতে সকালে রওনা হতে পারে ডাক নিয়ে। ক্যাম্প নিস্তব্ধ। আর সকলে ঘুমিয়ে। পালা করে পাহারা দেয় স্থানীয় চৌকিদার। কাঠ যোগাড় করে সারারাত ধুনি জ্বালায়। একটা গোরুর গাড়ির ছই হয় তাদের তাঁবু। চাপরাশি ইত্যাদির জন্যে কাবুলী পাল। পেট্রোমাক্স নিবে আসে। সুমন শুতে যায়।

হিসেব করলে দেখা যায় এক একটা দিনে অনেকদিনের কাজ হয়েছে। পুরোনো মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে, পুরোনো ফাইল পরিষ্কার হয়েছে। সরেজমিনে তদন্ত হয়েছে। গ্রামের লোকের সঙ্গে মেলামেশা হয়েছে। তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। অভাব অভিযোগের তো অন্ত নেই। নোটবই ভরে গেছে তাদের দাবী-দাওয়ায়। কিছুই হয়তো করতে পারবে না, তবু শুনেছে যে এতেই তারা খুশী। দেখেছে যে এতেই তারা কৃতার্থ। "দেখেন, সার, দেখেন, আমাদের অবস্থাটা দেখেন মেহেরবানী করে।"

তারপর একদিন আসে ডেরা ডাণ্ডা তুলে মহকুমা শহরে ফেরার দিন। তাকে বিদায় দিতে আসে গাঁয়ের লোক। যে পথ দিয়ে যায় সে পথেও জড় হয় ভিন গাঁয়ের জনতা। মণ্ডল প্রধানরা এগিয়ে এসে সেলাম করে বলেন, "আবার আসবেন, হুজুর। গরিবদের মনে রাখবেন।"

কিন্তু আবার আসা কি চারটিখানি কথা! শহরে ফিরে গিয়ে দেখে মামলা মোকদ্দমা জমে পাহাড় হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে কাজের স্তূপ। তার জন্যে অপেক্ষা করছেন পদস্থ ব্যক্তিরা। তাঁরা তো তাঁবুতে গিয়ে দেখা করবেন না। জেলখানা পরিদর্শন সপ্তাহে দু'বার কি তিনবার না করলে নয়। ট্রেজারির উপরেও নজর রাখতে হয়। পুলিসের রিপোর্ট প্রতিদিন আসে, তাকেই নাড়ীর খবর রাখতে হয় সারা মহকুমার।

চিন্তার সঙ্গে কতটুকুই বা সময় কাটে! সে বলে, "কোথাও তো তোমার কাজের কমতি দেখছিনে। যেমন কাছারিতে তেমনি বাসায়, যেমন হেডকোয়ার্টার্সে তেমনি

ম্প। তোমার কি রবিবার বলেও কিছু ? ছুটির দিনেও ছুটোছুটি করতে কেন ?"

কী করি! একরাশ মিটিং পরিচালনা তে হয়। কোথায় আমি নেই। আমি বটে। আমি তো ছাড়তে চাই। কমলি ড় না। আমি যদি একদিন না যাই াহাতি বেধে যায়। আমার সামনেই দন যা ঘটে গেল! কলিমুদ্দিন সাহেব জুদ্দিন সাহেবকে গর্জন করে বলেন, আর এ লায়ার! মফিজুদ্দিন সাহেব দিয়ে উঠে বলেন, ইউ আর—ইউ আর এ র! আমি না থাকলে সেদিন কারবালার রভিনয় হতো।" সুমন হাসে।

ফব্রুয়ারি মাসে হেড ক্লার্ক একদিন ভয়ে। নিবেদন করলেন যে সুইস কটেজ রে নিয়ে যাবার মতো টাকা নেই কন্টি-ন্সির খাতে। সদরে লিখে অতিরিক্ত রি আনিয়ে নিতে হবে। সুমন চিঠি খল। কিন্তু সদরেরও তখন হাত পা। সরকার নির্দেশ দিয়েছেন ব্যয়-ক্ষেপ করতে। নামমাত্র কিছু মঞ্জুর লা।

তা দিয়ে সুইস কটেজ বয়ে নিয়ে যাওয়া না। তা হলে কি ডেরা ফেলা হবে সুমনের মাথায় খেলে গেল একটা ইডিয়া। সুইস কটেজের বদলে গোটা কাবুলী পাল নিয়ে বেরোলে কেমন ? একটাতে শোওয়া, একটাতে নাওয়া। রাশি ইত্যাদির জন্যে ভাবতে হবে না। া আর কোথাও মাথা গুঁজবে। গাড়ির গ্রাম থেকে ধার করবে। তাদের জন্যে নের তাঁবু নিয়ে ঘোরা আটকাবে ? তা কখনো হয়! অনেকগুলো দুর্গম নিয়ন এখনো পরিদর্শন করা বাকী। বার দাঁড়া, বাতরাজ খাঁড়ার মতো ঝুলছে। কাবুলী পাল তাঁবুতে মহকুমা শাসক বাস ছেন এটা একটা দেখবার মতো দৃশ্য ট। আসমৎ চাপরাশির সুধু মাথা ট! আসলে হয়েছিল এই যে সুমনের জর নেশা ধরে গেছল। সে তাঁবুতে তে যেমন ভালোবাসে জেলা বোর্ডের বাংলোয় বা জমিদারের অতিথিশালায় ান নয়। নিজের তাঁবু থাকতে সে কেন রর ছাদের তলায় শোবে ? এস ডি ও হেবের ক্যাম্প—এর একটা মহিমা আছে। দুটো কাবুলী পাল হলেও এস ডি ও হেবের ক্যাম্প তো বটে। যদিও তিনি বপ্রাণে আরব বেদুইন।

কাবুলী পাল নিয়ে সফরে বেরিয়ে সে রো দুয়েক জায়গা ঘুরে ঠাকুরমন্দিরায় ৌছল। সেখানে রামনবমীর মেলা। চন্দ্রের মন্দির সাধারণত দেখা যায় না এ শ। তাই তীর্থযাত্রীরা এসেছে নানা ন্ত থেকে। পশ্চিমাই বেশি। কিন্তু জন যদি ঢুকতে গেল তো একশ'জন তার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাদের পিছনে এক হাজারজন ঠেলা দিচ্ছে। তাদের পিছনে আস্ত একটা জনতা। একে তো সংকীর্ণ দ্বার, তার উপর দ্বাররক্ষীর দস্তুরি। সুমন শুনতে পেলো মন্দিরের ভূসম্পত্তি যদিও প্রচুর তবু সেবায়েতেরা অর্থাৎ জমিদার বংশীয়রা যাত্রী-দের প্রণামীতে টাকায় ছ'আনা ভাগ বসায়, পুরোহিত বসায় টাকায় দু'আনা। আর দারোয়ানেরা দর্শনি আদায় করে মাথা-পিছু এক পয়সা বা দু'পয়সা বা তারো বেশী। ঘাটের নীলামের মতো দ্বারেরও নীলাম হয়। যে সব চেয়ে উঁচু ডাক দেয় সেই দ্বারের ইজারা পায়। তার কাছ থেকে আরো ডাক দিয়ে মেলার সময় ইজারা নেয় অন্য লোক। ধর্মের মতো অর্থকরী আর কী আছে! অনর্থকরীও!

মেলায় শান্তি ও স্বাস্থ্যরক্ষা কিন্তু সরকারের ও জেলা বোর্ডের কর্তব্য। সুমন দিন দুই থেকে যা করবার তা করে অন্যত্র চলল। বোরো ধানের সেচের জল নিয়ে দুই গ্রামের চাষীদের মধ্যে একটা পুরোনো কাজিয়া ছিল। মারামারির উপক্রম। সুমন গেল মিটিয়ে দিতে। দাঁড়িয়ে থেকে জলের ব্যবস্থা করে দিল। তখন আর শত্রুতা নয়। তখন বন্ধুতা। সুমন তা দেখে সাত্ত্বিক আনন্দ পায়। সুখে নিদ্রা যায়।

এর পরে কয়েক জায়গা ঘুরে সুমন গেল সদরার দাঁড়া দেখতে। সে বিষয়ে বহুদিন ধরে সেচ বিভাগের সঙ্গে পত্রালাপ চলছিল। তাঁদের সঙ্গে আপোসের চেষ্টা করছিলেন মেটেল্যান্ড স্বয়ং। যাতে আস্তান মোল্লার দল হতাশ হয়ে কংগ্রেসে যোগ না দেয়। সেচ বিভাগের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে বাঁধের গায়ে একটা স্লুইস গেট থাকবে। ইচ্ছামত জল নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যাবে। সেচ বিভাগ কতরকম টেকনিকাল প্রশ্ন তোলে। তারপরে খেলে তুরুপের তাস। জল নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে একটা লোককে পুষতে হবে তো ? এই ব্যয়সংকোচের দিনে তার খরচ জোগাবে কে ?

এমন সময় বদলি হয়ে যান মেটেল্যান্ড। তাঁর স্থলে আসেন ব্যানার্জি। তিনি বলেন, "গবর্নমেন্ট আমাদের মাইনের থেকে কাটতে আরম্ভ করেছে। এ বছর কোনো আশা নেই, পাল। মোল্লার দলকে সবুর করতে হবে। তা ছাড়া এমনি তো করতে হতোই। স্লুইস গেট কি একদিনে হয় ? প্ল্যান হবে, এস্টিমেট হবে—"

মোল্লার দল সুমনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছল। শ্রম ওরাই যোগাবে। অর্থ চাঁদা করে তোলা হবে। বাঁধটা আপাতত হয়ে যাক। পরের বছর না হয় স্লুইস গেট হবে। সেচ বিভাগের কথাও থাকুক, গ্রামবাসীর কথাও থাকুক। কে কে শ্রমদান করবে আস্তান তার একটা তালিকা তৈরি করে ফেলেছিল। তাতে হাজার কয়েক নাম। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির মাটি কোপাতে হবে এক একজনকে। মাটি কেটে নিজের বাঁকে করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে বাঁধের জায়গায়। কাজও শুরু হয়ে গেছল। কালবৈশাখীর দিন আসন্ন। তার আগে বাঁধের কাজ সারা হওয়া চাই। নইলে ডবল খাটুনি। মোল্লা আশি বছরের বুড়ো, কিন্তু তার তৎপরতা জোয়ান পুরুষের মতো। হুকুম করছে, তদারক করছে, চোখ রাঙাচ্ছে, "বাপু বাছা" বলে তোয়াজও করছে।

"হুজুরকে এক কোপ মাটি কাটতে হবে। কাটবারে লাগবে।" মোল্লা বলে সুমনকে অভ্যর্থনা জানিয়ে। জনতারও সেই ইচ্ছা।

সুমন কোদাল ধরে মাঠে নামে। এক কোপ দিতে না দিতেই মোল্লা তার হাত থেকে কোদালটা কেড়ে নেয়। "এইবার আমার পালা।" সেও কোপ মারে।

দেখতে দেখতে হাজার হাজার কোদাল হাজার হাজার চৌকা মাটি কাটে। সুমন অবশ্য বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। সরে গিয়ে গাছতলায় বসে। সার্কেল অফিসার ইসমাইল তার স্থান পূরণ করেন। তিনিও মাটি কোপান।

দিনের বেলা দিব্যি গরম। তাই সুমন

তাঁবুতে যায় না, বাইরে কোনো এক গাছ-তলায় বা স্কুল ঘরে বসে টিফিন খায়। সন্ধ্যা-বেলা তাঁবুতে গিয়ে গায়ে জল ঢালে। কাপড় ছাড়ে। রাতের কাপড় পরে আহারে বসে। তারপর এক সময় বাতি নিবিয়ে ক্যাম্প খাটে গা ঢেলে দেয়।

আসমতের উপর বরাত দেওয়া আছে সে তার নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে তাঁবু খাটাবে, সুমনের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় বসে থাকবে না। শুধু এইটুকু মনে রাখবে যে এলাকাটি যেন হয় খোলা-মেলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বসতি থেকে একটু বিচ্ছিন্ন। যাতে প্রাইভেসী থাকে। আসমৎ এ বিষয়ে অবহিত থাকে। সুখলালও তাকে অবহিত করে দেয়। রান্নার লোক সুখলাল। চেহারায় পোশাকে নামে হিন্দু। ধর্মে মুসলমান।

সেদিন বেশ একটু রাত করেই সুমন তাঁবুতে গেল। আগে থেকে জানত না কোথায় খাটানো হয়েছে। জায়গাটা অচেনা। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল চৌকিদার দফাদার। বড় একটা গ্রাম। তার মাঝখানেই তাঁবু। পাশেই গৃহস্থের বাড়ি। প্রাইভেসী বলতে বিশেষ কিছু নেই। খোলামেলা তো নয়ই। গোময় ও গোমূত্রের গন্ধ। মশা উঠছে।

"এ তুমি করেছ কী, আসমৎ! তোমার এমন মতিভ্রম তো এর আগে দেখিনি" সুমন অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে। পাছে এত লোকের সামনে আসমতের সম্মান হানি হয়।

"এ গেরামে ধারে কাছে এর চেয়ে ভালো জায়গা নেই, হুজুর। ভিন গাঁয়ে আবার ভদ্দরলোকের বাস নেই। রাতবিরেতে কখন কী দরকার হয়!" আসমৎ কৈফিয়ৎ দেয় আর আসমানের দিকে তাকায়।

সুমন সেদিন ক্লান্ত ছিল। সকাল সকাল শুতে গেল। পাড়াগাঁয়ের লোক কেরোসিনের অভাবে আরো আগে শয্যা নেয়। গ্রাম নিস্তব্ধ। হাঁক ছাড়ে শুধু শেয়াল আর চৌকিদার।

মাঝ রাত্রে হঠাৎ সোরগোল শুনে ঘুম ভেঙে যায় সুমনের। ব্যাপার কী! কেউ উত্তর দেবার আগেই আকাশ উত্তর দেয় বজ্রকণ্ঠে। মাথার উপর বিদ্যুৎ ফণা তুলেছে। ঝড়ের মাতন এসে তাঁবুকে উড়িয়ে নিতে চায়। ধরে রাখতে চেষ্টা করছে গলা শুনে মনে হয় আসমৎ, সুখলাল, চৌকিদার, দফাদার। ডাণ্ডা পড়ত আর একটু হলেই সুমনের ঘাড়ে।

ভাগ্যিস টর্চ ছিল হাতের কাছে। আলো জ্বালিয়ে বুঝতে পারল সুমন কাবুলী পাল এবার হবে পাল-তোলা নৌকো। ভেসে যাবে বৃষ্টির জলে। এই সেই প্রতীক্ষিত কালবৈশাখী। এর মধ্যেই জলের ঝাপটা গায়ে এসে লাগতে আরম্ভ করেছে। পোশাক পরার সময়টুকুনও নেই। রাতের কাপড়েই আশ্রয়ের জন্যে দৌড় দিতে হবে। দৌড়! দৌড়! ছাতা তো কেউ বুদ্ধি করে আনেনি। ভিজতে ভিজতে দৌড়। অন্ধকারে যে যেখানে পারে আশ্রয় নেয়। সুমন ওঠে অজানা এক গৃহস্থের বাইরের বারান্দায়। তার টর্চের আলো দেখে আসমৎ তাকে খুঁজে বার করে। সেও পোশাক পরার অবকাশ পায়নি।

একেই বলে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। "অভদ্র বরিষা কাল। হরিণ চাটে বাঘের গাল।" মহকুমা হাকিমের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চাপরাশি বাবুর্চি চৌকিদার। অচেনা অজানা গ্রামবাসী। তাঁবু কাত। বালিশ বিছানা ক্যাম্পখাট ও মশারি তারা সবাই মিলে বয়ে এনেছিল। সুটকেস ইত্যাদিও। রান্নার সরঞ্জাম কিন্তু ভিজে গেছে। চাল ডাল চিনি নুন সব একাকার। আসমৎ আর সুখলাল তাই নিয়ে হায় হায় করছিল।

সেই আঁধার রাতে কখন এক সময় হারিকেনের লণ্ঠন হাতে গৃহস্থের আবির্ভাব। ভদ্রলোক সোজাসুজি সুমনকে বলতে সাহস পেলেন না, কথাটা বললেন আসমতের কানে কানে। আসমতের গায়ে উর্দি নেই, কিন্তু মাথার পাগড়ি ঠিক আছে। তার থেকে চিনতে পারা যায় যে সেই এস ডি ও সাহেবের আর্দালী।

"হুজুর বাহাদুর," আসমৎ নিবেদন পায়, "এমন করে দাঁড়িয়ে রইলে গেরস্তের অকল্যাণ হয়। বৃষ্টি ধরে গেলেও তাঁবু তো আর খাটানো যাবে না। বেবাক ভিজে গেছে। ভিতরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করতে আজ্ঞে হয়।"

হিন্দুর বাড়ি। সুমন জানত না যে ওই একখানাই বড় ঘর। আর ওটা শোবার ঘর। আর ওতে সারি সারি মশারি ও বিছানা। ঘরে ঢুকে দেখল কোনোটাতে ছেলে, কোনোটাতে মেয়ে, কোনোটাতে তাদের মা। এক কোণে একটু ফাঁক ছিল। সেখানে বিছানা পাততে পারা যায়। ভদ্রলোক তারই আয়োজনে ছিলেন। তাঁর গৃহিণী ছিলেন লজ্জায় ঘোমটা টেনে পালাবার তালে। কিন্তু পালাবেন কোথায়? ঢেঁকিঘরে না রান্নাঘরে না ঠাকুরঘরে? বৃষ্টিতে ওদিকের দরজা খোলা দায়। মা গেলে কোলের ছেলেটিকেও নিয়ে যাবেন। মশারিও খুলতে হবে তো?

সুমন বলে, "আমার জন্যে আপনাদের ঘুম মাটি হলে আমারও ঘুম হবে না, মশায়। আপনারা যে যার বিছানায় যান। অনুমতি দিলে আমার নিজের বিছানাটা ক্যাম্প খাট সুদ্ধু ভিতরে আনিয়ে নিতে পারি। মশারি খাটানোই রয়েছে। ক্যাম্পখাট কতটুকুনই বা জায়গা জুড়বে!"

যে আজ্ঞা। অজানা অচেনা এক গৃহস্থ পরিবারের একজন হয়ে তাঁদের সঙ্গে রাত কাটায় সুমন। একই শোবার ঘরে। প্রায় গা ঘেঁষে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বাইরে ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ বজ্র। আসমতরা কেউ ঢেঁকিঘরে কেউ বারান্দায় আত্মরক্ষা করে।

পরেরদিন বেলা করে সুমনের ঘুম ভাঙে। চেয়ে দেখে সে আছে তার নিজের তাঁবুতে নয়। কে জানে কার শোবার ঘরে। কিন্তু সে ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে। "আসমৎ" "সুখলাল" বলে হাঁক ছাড়ে। কিন্তু ওরা কেউ ঢুকতে সাহস পায় না হিন্দুর শয়নকক্ষে। যাঁর বাড়ি তিনিও না। সুমন বাইরে গিয়ে তাঁকে ডেকে কৃতজ্ঞতা জানায়। চমৎকার রোদ উঠেছে। গত রাত্রের দুর্যোগের চিহ্ন মাত্র নেই।

আবার ভিতরে ঢুকে সুমন পোশাক পরে নেয়। একটা বিশেষ প্রয়োজনে তাকে এগিয়ে যেতে হয়। বাড়ির বাইরে, গ্রামের বাইরে, দূরে, আরো দূরে।

বীটবংশ ও গ্রীনিচ গ্রাম

বুদ্ধদেব বসু

সপ্তাহে অন্তত তিন দিন, কখনো বা একই দিনে দু-বার, আমাকে আসতে হয় খানে। এই যেখানে ফিফথ এভিনিউ আরম্ভ য়েছে, পার্কের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে পাঁচ নম্বর াস্‌গুলো, গারিবাল্ডির মূর্তির তলায় খেলা রছে কুকুরের সঙ্গে বালক, আর রাস্তায় লেছে ছাত্রছাত্রী—মুখর দলে, ঘনিষ্ঠ যুগলে, হয়তো কোর্তার তলায় কবি হবার উচ্চাশা য়ে, একা। এ-ই ওয়াশিংটন স্কোয়ার, াকে হেনরি জেমস বিখ্যাত ক'রে গেছেন, ার তিন দিক জুড়ে ন্যু ইয়র্ক বিশ্ব-দ্যালয়ের সারি-সারি অট্টালিকা দাঁড়িয়ে, ার যার দক্ষিণ প্রান্তে গ্রীনিচ গ্রাম এ'কে-'কে ছড়িয়ে আছে। এর এক বর্গ াইলের মধ্যে ন্যু ইয়র্কের অধিকাংশ ুস্তক-প্রকাশকের দপ্তর, যে-সব পত্রিকা গ্রণী বা 'আভাঁ-গার্দ', তাদেরও াস্তানা এখানে; শিল্পী, সাহিত্যিক, দ্রোহীর পাড়া এটা; দরিদ্র ও তরুণ ুদ্ধিজীবীর; যাদের সব পারিবারিক সম্বন্ধ ছন্ন হয়েছে সেই সব নিঃসঙ্গ মানুষের; কংবা যারা বিবাহিত ও আয়ের দিক থেকে ুস্থির হ'য়েও কম খরচে মনঃপূত াবহাওয়া পেতে চায়, তাদের পাড়া। ন্তত এই 'গ্রাম' সম্বন্ধে এটাই কংবদন্তী।

আমার কর্মস্থল এটা, যারা বেড়াতে আসে াদের নর্মস্থল। বছর যখন বসন্তে পা লো তখন থেকে দেখছি বাস্‌-বোঝাই ্যুরিস্ট চলেছে এ-সব পথ দিয়ে; ক্যানসাস, টক্সাস, কলোরাডো বা আইডাহো থেকে সেছে তারা, কেউ-কেউ হয়তো এই প্রথম ড়ো শহর' দেখলো। ন্যু ইয়র্কের তারকা-চহ্নিত দ্রষ্টব্যের মধ্যে এও একটি—এই াম'; কেননা 'দি ভিলেজ' মানেই বাহেমিয়া, প্যারিসের 'বাম তীরে'র ইয়াঙ্কি করণ; কেননা জীবন এখানে প্রথামুক্ত, াচরণ স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন, বেশবাস আলু-ালু; শ্বেত-কৃষ্ণে বা ধনী-দরিদ্রে ভেদ নেই খানে, শিল্পকলার মর্যাদা স্বপ্রকাশ: এখানে ত্রিশ জাত একই টেবিলে কালো কফি বা নছক ভডকা পান ক'রে থাকে, আর ঘড়িতে াত এলিয়ে পড়লেও কাফের দরজা বন্ধ হ'য়ে ায় না। তাছাড়া, এটাই সেই চরণভূমি, যেখানে বীটবংশের মুমুক্ষুরা ধ্যানে বসেন, কবিতা লেখেন ও জ্যাজ-বাদ্য সহযোগে তা প'ড়ে শোনান, অবস্থা বুঝে Zen অথবা হেরয়িনের শরণ নেন—এবং কদাচিৎ হয়তো আহার ক'রে নিদ্রাও যান। অন্তত, এই সবই এর বিষয়ে কিংবদন্তী।

যা-কিছু শোনা যায় তা সত্য নাও হ'তে পারে, কিন্তু মানতেই হবে এই পাড়ার চরিত্র আলাদা। তিনটে এভিনিউ আর অনেক-গুলো স্ট্রীট জড়িয়ে এর ব্যাপ্তি, কিন্তু মানহাটানের অন্যান্য অংশের মতো এর ভূগোল জ্যামিতিক নয়: আট স্ট্রীট, সাত স্ট্রীট...পাঁচ...তিন—তারপরেই নম্বরের বদলে রাস্তার নাম শুরু হ'য়ে গেলো, দেখা দিলো ঋজুতার বদলে বঙ্কিমা; এভিনিউ ছেড়ে ভিতরে এলে অলিগলি বেশ জটিল, আর নামকরণ এমন খেয়ালি যে অনেক সময় ট্যাক্সিওলাও ঠিকানা খুঁজে পায় না... বিস্তর বেগ পেতে হয়েছিলো আমাকে, আট বছর আগে এক সন্ধ্যায়, এই 'গ্রামে' ই. ই. কামিংস-এর বাসা আবিষ্কার করতে। কেউ জানে না প্যাচিন প্লেস কোথায়, কেউ তার নাম পর্যন্ত শোনেনি, কানামাছির মতো একই পথে ঘুরছি; অবশেষে ট্যাক্সিওলা যখন অসহিষ্ণু আর আমি প্রায় হতাশ, তখন বলতে গেলে দৈবাৎ তার খোঁজ পাওয়া গেলো। প্রায় ডিনারের সময়ে, প্রাচ্য জাতির সময়জ্ঞানহীনতার আবহমান অপবাদ মাথায় নিয়ে চায়ের নিমন্ত্রণে পৌঁছলুম। ন্যু ইয়র্ক শহরে, যেখানে শুধু গুনতে জানলে আর দিক চিনলে যে-কোনো ঠিকানা বের করা যায়—সেখানে এই!

আর সত্যিও, খাশ ভিলেজে ঢুকলে হঠাৎ প্রায় মনে হয় না ন্যু ইয়র্কে আছি। সরু-সরু পথ, বাড়িগুলো দোতলা বা তেতলা মাত্র উঁচু, কোনো-কোনোটা দেড়শো বা দু-শো বছরের পুরোনো, কোনোটায় হয়তো অ্যালেন পো একবার এসে উঠেছিলেন। স্টুডিও, বইয়ের দোকান, কফির আড্ডা, ঘরোয়া চেহারার রেস্তোরাঁ, কিছুটা উন্নাসিক ও সাহিত্যিক ধরনের নাইট-ক্লাব, আর ছোটো-ছোটো শৌখিন দ্রব্যের দোকান, যেখানে হয়তো সাজানো আছে জাপানি মাদুর, তিব্বতি ঘণ্টা, আফ্রিকার মুখোশ, দিনেমারদেশের কাঠের কাজ, আর সবচেয়ে হালফ্যাশনের ভারতীয় তাঁতে-বোনা রেশম—এমন মোটা আর আকাঁড়া তার চেহারা যে দেখলে চট মনে হয়। আর রাস্তায়—শিথিল, অলস, উদ্দেশ্যহীন, যথেচ্ছচারী ভিড়।

ভিড়ের মধ্যে বীটবংশকে শনাক্ত করা সহজ। মেয়েরা পরে কালো মোজা, লম্বা চুল রাখে, লিপস্টিক মাখে না; আর পুরুষেরা রাখে দাড়ি আর ঘাড়-বেয়ে-নামা লম্বা চুল, তীব্রতম শীতে ছাড়া টুপি কিংবা ওভার-কোট পরে না; জামা, জুতো বা দেহের পরিচ্ছন্নতাসাধন তাদের হিশেবে অনাচার। কুলপি-বরফের খাপের মতো সরু আর আঁটো তাদের পাৎলুন, ঊর্ধ্ববাস একটা মোটা চেন-টানা কোর্তায় সীমিত; চুল চিরুনির সম্পর্করহিত। এ-ই হ'লো শাস্ত্রীয় বা ঠিকুজি-মেলানো বীট, গ্রীনিচ গ্রামে যে-কোনো সময়ে এদের দেখা যায়, কিন্তু শুধু এদেরই দেখা যায় না। আছেন তাঁরাও, যাঁদের বয়ঃপ্রভাবে মাথা ঠাণ্ডা হ'য়ে থাকলেও স্বভাবদোষে কৌতূহল মেটেনি, কিংবা যাঁরা আপেক্ষিক তারুণ্য সত্ত্বেও এখনো 'ভদ্রলোক' হ'তে লজ্জিত নন। আর আছে, এই দুই প্রান্তের মধ্যে, অনেকগুলো সূক্ষ্ম স্তরভেদ: আধা-বীট, হবু-বীট, ছিলুম-বীট, ছদ্ম-বীট, হ'তে-পারতুম-বীট, ইত্যাদি; আর সংখ্যায় এই মাঝারিরাই মহত্তম। এদের মধ্যে সকলেই চুল-দাড়ি রাখে না, কারো বা মস্তক নিষ্কেশ, কেউ এমনকি নেকটাই পর্যন্ত বাঁধে; কিন্তু এদের চলাফেরা ও দৃষ্টিপাতের উদাসীন ভঙ্গি দেখেই চেনা যায় এদের; কাফেতে ব'সে নতনেত্রে সুগভীরভাবে চিন্তা করে এরা, কিংবা এক পেয়ালা রাম্‌গন্ধী চা সামনে রেখে বেদান্তের সূত্র আওড়ায়;—শুধু যে পরমাত্মাই সত্য আর জগৎ মিথ্যা, এই কথাটা সদ্য আবিষ্কার ক'রে এরা যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে, ভাবখানা কিছুটা এই রকম।

এই সেদিনও ঢিলেঢোলা কাপড় ছিলো ফ্যাশন: আঁটো পাৎলুনের উদ্ভব হ'লো কোথায় এবং কবে থেকে? অনুসন্ধান ক'রে এই প্রশ্নের কোনো সঠিক জবাব পাইনি। কেউ বলেছেন, সূক্ষ্মমুখ জুতোর মতো এরও জন্মস্থল সাম্প্রতিক ইটালি, কারো মতে এটা ন্যু ইয়র্কেরই আবিষ্কার। সে যা-ই হোক, ফ্যাশনটা আজ নিখিলপশ্চিমে স্বীকৃত; আটলান্টিকের দুই তটবর্তী দুই

মহাদেশে যেখানেই গিয়েছি এর ব্যত্যয় দেখিনি; ছাত্র ও যুবকদের পাৎলুন সর্বত্র কৃশ ও ঋজু, অনেক সময় কাটিতে বা গল্পফেও ভাঁজ থাকে না, তাদের খাটো কোর্তা কণ্ঠপ্রকাশক, আর উচ্ছল চুল অবিন্যস্ত। চল্লিশের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স তাদেরও পরিচ্ছদ পূর্বের তুলনায় অপরিসর; বয়স্করা কিছুটা রক্ষণশীল হ'লেও কাল-স্পর্শ ঠেকাতে পারেননি। প্রথম গিয়ে এই রকমই চমক লাগে মহিলাদের মাথার দিকে তাকালে : হঠাৎ মনে হয়, আট ঘণ্টা সুখ-নিদ্রার পরে আয়নার দিকে দৃক্‌পাত না-ক'রে এইমাত্র তাঁরা উঠে এসেছেন, কিংবা কেশপ্রক্ষালনের পর ভুলে গেছেন প্রসাধন করতে। অনভিজ্ঞের এমনি ভুল হয় প্রথমে, কিন্তু মনোযোগী হ'লেই ধরা পড়ে যে এই আপাতিক অবিন্যাসই তাঁদের পরম বিন্যাস; এই যে হেলাফেলার ভঙ্গি, এই যে ঈষৎকৃষ্ণ, পীতাভ, তাম্র বা পট্টবর্ণ অলকদামের বিশৃঙ্খলা, এই যে এলোমেলো গ্রন্থি, ঘূর্ণি ও কুঞ্চন—যার ফলে কারো হয়তো একদিকে কপাল প্রায় ঢেকে গেছে, আর অন্য কারো চাঁদির উপরে অপ্রত্যাশিত ফণা দুলছে মনে হয়—বুঝতে দেরি হয় না যে এই সবই সুচিন্তিত ও বহুযত্নসাধিত, এ-ই হচ্ছে সর্বাধুনিক 'হেয়ার-ডু', রূপচর্চার পরাকাষ্ঠা, সম্ভবত কেশশিল্পীর মূল্যবান পরিচর্যার দ্বারা সম্পন্ন। এতেও আছে ছন্দ, আছে শ্রী, আর তা আছে ব'লেই ধরে নেয়া যায় যে জাপানি অথবা বঙ্গীয় ললনার ভূতপূর্ব বিরাট কবরীর মতোই এও একটা বিশেষ শৈলী—যা মানুষের বুদ্ধি ও প্রযত্ন ভিন্ন সাধিত হ'তে পারে না।

তাহ'লে কি বীটবংশীয়রা প্রবর্তক, না অনুকারক; তাদেরই সংক্রাম কি সমাজের সব স্তরে পৌঁচেছে, না কি তারাও অন্য সকলের মতো সেই সব নিয়ন্তাদের অধীন, যারা অদৃশ্য ও অনেক সময় অনামা থেকে ফ্যাশনের ফর্মান জারি করেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, কিন্তু এটুকু বুঝি যে বীটনিকরা প্রক্ষিপ্ত নয়, এবং ফ্যাশন জিনিশটা শ্রদ্ধেয়। স্থান, কাল ও অবস্থার এক বিশেষ সন্নিপাতের ফলে সমাজের মধ্যে যখন যে-বিশেষ হাওয়া দেয়, চলতি ভাষায় তাকেই বলে ফ্যাশন; সেটাকে বলতে পারি যুগের মেজাজ, ইতিহাসের তরঙ্গ, সেটা বুদ্বুদের মতো দু-দিন পরে মিলিয়ে যাবে ব'লে আজকের দিনে কম সত্য নয়, আর মিলিয়ে গিয়েও আগামী দিনে কিছু উদ্বৃত্ত তা রেখে যাবে। আমাদের তুলনায় পশ্চিমী সমাজ অনেক বেশি সচল ও পরিবর্তনশীল, ব্যক্তিরাও অনেক বেশি আত্মচেতন, তাই ফ্যাশনের প্রভাব এখানে দুর্জয়; জীবনের ছোটো-বড়ো এমন-কোনো বিভাগ নেই যেখানে তা ব্যাপ্ত হ'য়ে না পড়ে; কাপড়ের ছাঁট, চুলের কায়দা, আসবাবপত্র, লোকাচার, [illegible] এই সমস্ত [illegible] মধ্যেই একটা সামঞ্জস্য ধরা পড়ে যেন, এবং যে-অবিচ্ছিন্ন ও অদৃশ্য সূত্রটি এদের সম্পৃক্ত ক'রে রাখে তারই নাম ফ্যাশন বললে ভুল হয় না। তা আপনার আমার পছন্দ হয় কি না হয় সে-কথা অবান্তর, কেননা সেটাকে উপেক্ষা করলে যা বাকি থাকে তা কতগুলো নির্বস্তুক ধারণা শুধু:—সেই ধারণাগুলো—অর্থাৎ লোকেরা অস্পষ্টভাবে যা ভাবছে, যা চাচ্ছে অথবা হ'তে চাচ্ছে—সেগুলোকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের ভাষায় এরাই তর্জমা ক'রে দেয়—এই চুলের ডৌল, কাপড়ের কায়দা, গ্রীনিচ গ্রামে বীটবংশের মিছিল।

মানতেই হবে যে ফ্যাশনের জন্যও লিপো-র কবিতা পড়া ভালো, মডিগলিয়ানির ছবি দেখা ভালো, ফ্যাশনের জন্যও স্বীকার করা ভালো যে মানুষের আত্মা আছে, আর তার তৃপ্তির পক্ষে আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট নয়। এবং এই স্বীকৃতি গ্রীনিচ গ্রামে অবিরল ও অপর্যাপ্তভাবে দৃশ্যমান। এই ছোটো পাড়াটুকুর মধ্যে বইয়ের দোকান যত আছে, আমার বিশ্বাস অবশিষ্ট সমগ্র নিউ ইয়র্কে তত নেই; সপ্তাহে প্রতিদিন রাত্তির বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে এই দোকান-গুলো, তাদের কর্মীরা প্রায় সকলেই বীট-বেশধারী ও বয়সে তরুণ, হয়তো তারা ছাত্র-ছাত্রী বা কেউ হয়তো দুটো-চারটে পদ্য লিখে ফেলেছে। এ-সব দোকানের ভিতরে ঢুকলে, বা বাইরে দাঁড়িয়ে কাচের জানলায় তাকালেও, স্বীকার না-ক'রে উপায় থাকে না যে সমকালীন জগৎ-সভ্যতায় আমেরিকার যা অন্যতম প্রধান ও গরীয়ান দান, তা এই পেপার-ব্যাক্ পুস্তকমালা, আবহমান বিশ্ব-সাহিত্যের সুলভ সংস্করণ, বহু দেশ ও শতাব্দীব্যাপী এই সর্বজনভোগ্য শ্রীক্ষেত্র। বিশেষত আমার মতো কেউ, যার নানা দেশের সাহিত্যে হানা দেবার অভ্যেস আছে, অথচ হানা দেবার উপযুক্ত নতুন বই স্বদেশে যে তেমন বেশি খুঁজে পায় না—পথের ধারে এ-রকম কোনো দোকান দেখলে তার চলা স্তব্ধ হ'য়ে যায়, চোখ বিস্ফারিত, মন কম্পমান। যে-সব বই বহুকাল ধ'রে পড়তে চেয়েছি কিন্তু হাতের কাছে পাইনি, যে-সব বইয়ের শুধু নাম শুনেছি কিন্তু চোখে দেখিনি কখনো, বিরল এবং দুষ্প্রাপ্য জ্ঞানে যে-সব বইয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম—সব আছে এখানে, সাহিত্যের কোনো বিভাগ বাদ পড়েনি, মৃত ও জীবিত প্রায় সমস্ত সভ্য ভাষার গ্রন্থগুলি ইংরেজিতে সংকলিত হ'য়ে পর্যায়বদ্ধ—অল্প কিছু সিকি-আধুলি পকেটে থাকলেই দু-একখানা সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফেরা যায়। চলতিকালের বই—যা নিয়ে সবাই কথা বলছে বা ভাবছে বলা উচিত; বা চিরায়ত বই—সফোক্লিস বা দান্তে ধরা যাক—যাকে 'ভালো' বলে মানতে হলে প'ড়ে দেখারও দরকার হয় না আর : এই [illegible] এদেরই মধ্যে আবদ্ধ নয়; যা দুষ্প্রাপ্য, যা বিশেষ, যার দোকানপাট অনেকদিন আগে উঠে গেছে, কিংবা অন্য কোনো অনুরাগ বা চর্চার ফলেই যা নিয়ে কৌতূহলী হওয়া সম্ভব, এমন পুঁথিও অগুনতি আছে ছড়িয়ে : এক বাটি আইসক্রীমের দামে ভাসারির 'শিল্পীদের জীবনী', বা মধ্য-যুগের 'পশুতত্ত্ব' হয়তো; কফি-আর-স্যান্ড-উইচের খরচে শ্রীমতী মুরাসাকির 'গেঞ্জি-কাহিনী', বা পিসেমস্কির 'এক হাজার আত্মা'। আমার পক্ষে অবিশ্বাস্য এই প্রাচুর্য, এবং প্রায় দুঃসহ; কেননা আমার চোখ যতক্ষণে মলাটগুলোর উপর দিয়ে দৌড়ে যায়, ততক্ষণে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে অনেক ছেঁড়া সুতো, হারানো গরজ, ভুলে-যাওয়া ভাবনা : জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে যত আগ্রহ অনুভব করে-ছিলাম, এবং যেগুলো খাদ্য না-পেয়ে ম'রে গিয়েছিলো—সব ফিরে এসে একসঙ্গে দংশন করে আমাকে, ভেবে পাই না কোনটাকে ফেলে কোনটার দাবি মেটাই। এখন কথাটা এই : এই কাগজের নৌকোগুলো কিছু-কিছু নতুন যাত্রীকে কি নতুন দেশে অনবরত ভিড়িয়ে দিচ্ছে না? যত লক্ষ পাঠক এদের প্রতি বছরে, তা থেকে, আমরা নিশ্চয়ই ধ'রে নিতে পারি, এক হাজার, বা একশো, বা পঞ্চাশ, বা অন্তত দশজন মানুষ সত্যি ধরা প'ড়ে যাবে কবিতার চক্রান্তে, নতুন ছন্দে বাজবে তাদের হৃৎপিণ্ড, নতুন চোখে দেখবে তারা জগৎটাকে—আর নিজেদেরকেও? অতএব, এই গ্রীনিচ গ্রামে যদি শিল্পকলাই 'ফ্যাশনেবল' হয়, যদি এইটাই হয় নিউ ইয়র্কের সেই পাড়া যেখানে কবিতার বই থরে-থরে অলঙ্কৃত, আর রঙ্গমঞ্চে নাচ, গান, হল্লার বদলে ব্রেখ্‌ট আর আন্তন চেখভ উন্মীল—তাহ'লে আর ফ্যাশনের নিন্দে করি কেমন ক'রে?

টাইমস স্কোয়ার ভালোই লেগেছিলো আমার, প্রথম যেবার সেপ্টেম্বরের এক রাত্রি নিউ ইয়র্কে কাটিয়েছিলাম। তার উগ্রতা, আলো আর বিজ্ঞাপনের চীৎকার, তার দুর্ধর্ষ দেখানোপনা—এগুলোকে, আমার মনে হয়ে-ছিলো, অর্থ দিয়েছে ব্রডওয়ের জনস্রোত—ঘন, অনবচ্ছিন্ন, রাত্রি-দিনের বিভেদভঞ্জন জনস্রোত। অন্যান্য অসংখ্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে আমি যেন এই বিরাট, চঞ্চল, নিদ্রাহীন নগরের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারবো—এমনি আমার মনে হয়েছিলো তখন। কিন্তু এবার আমাকে টাইমস স্কোয়ার নিরাশ করলে। সব তেমনি আছে : শুধু পথে নেই লোক, নেই উৎসাহ, জঙ্গমতা। শীতের তরাসে সবাই কি আশ্রয় নিয়েছে ঘরে, ড্রাগ-স্টোরে, বা সাব-ওয়ের বিবরে? না কি শনিবার মানে প্রমোদ আর নেই, অনেকেই বাসা নিচ্ছে ঘণ্টাখানেক ট্রেনের আন্দাজ দূরে, বা নিতে বাধ্য হচ্ছে, কেননা সন্তানসমেত দম্পতির পক্ষে ম্যান-হাটানে ফ্ল্যাট পাওয়া প্রায় অসম্ভব?...কিন্তু

যেদিন, দু-তিন সপ্তাহের ব্যবধানে, একটু বেশি রাত্রে 'গ্রামে' এলাম, সেদিনও ছিলো শনিবার, ঠাণ্ডাও কনকনে, তবু দেখলাম রাস্তায় ভিড় নিবিড়, চারদিকে স্বাচ্ছন্দ্য ও গতি: যেন এক অনুচ্চারিত নিমন্ত্রণের উত্তরে দলে-দলে নানা রকম মানুষ এসে মিলেছে এখানে, আমাদের দেশের খোলা হাওয়ার মেলার মতো আবহাওয়া যেন, কারো কিছু বাধ্যতা নেই, ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই, হাসছে, কথা বলছে, বা দাঁড়িয়ে আছে জানলার কাচে তুলুস-লোত্রেকের কোনো ছাপা ছবির দিকে তাকিয়ে। একটি তরুণী নিয়ে এসেছে পিঠে বেঁধে তার শিশুকে; একজন লোকের কাঁধের উপর খেলা করছে এক ক্ষুদ্রকায় বাঁদর :—এই শহরে, যেখানে শিশু বিরল, আর পশুরা সব চিহ্নিত ও মর্যাদাবান সেখানে দুটি অপ্রত্যাশিত অবোধ প্রাণীর বিহ্বল চোখ যেন এক হারানো স্বর্গের স্মৃতি এনে দিচ্ছে তাদের মনে, যারা ক্লান্ত আজ নিয়মে ও নিরাপত্তায়, অথচ তার অভাবও ঠিক সইতে পারে না। হয়তো অনেক বেদনা প্রচ্ছন্ন আছে এই ফুটপাতে : নষ্ট আশা, ভাঙা বাসা, দীর্ণ জীবন;—কিন্তু সেই ব্যর্থতাকে এরা যেহেতু সাহস ক'রে মেনে নিচ্ছে ও প্রকাশ করছে, তাই মনে হয় প্রাণ এখানে ব'য়ে চলেছে অবাধে, ভিড়ের মধ্যে, পথের মোড়ে-মোড়ে, উচ্ছল।

সন্দেহ নেই, এখানকার পথে, দোকানে, রেস্তোরাঁয় সঞ্চরণ করলে ভিন্ন একটা স্বাদ পাওয়া যায়, যা বিশেষভাবে ন্যুয়র্কীয় ও চলতি কালের, অথচ যা বিদেশীর অভিজ্ঞতার মধ্যে সহজে ধরা দেয়। চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না, বরং কাছে টেনে নেয়, এটাই এর প্রধান গুণ। ঋতু যখন মৃদু হ'য়ে এলো, তখন দেখেছি গ্রীনিচ গ্রাম চিত্রকলার অনুশীলনে উচ্ছল; যেন সারা পাড়া জুড়ে বসেছে আঁকিয়ে ছেলেমেয়েরা; কেউ তারা স্টুডিওতে ব্যস্ত, তাদের সামনে বিশেষ ভঙ্গিতে পেশাদার মডেলেরা স্থির, আরো অনেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে; কেউ তারা ফুটপাতেই চেয়ার পেতে বসে গেছে; এক ডলার বা দেড় ডলার দিলে তক্ষুনি আপনার পোর্ট্রেট এ'কে দেবে প্যাস্টেলে, কিছু অধিক মূল্যে তামার ফলকে সাদৃশ্য তুলে দেবে। স্টুডিও, ছবির দোকান, প্রদর্শনী; শিল্পগুরুদের শস্তা প্রিন্ট, নব্যতম মার্কিনীদের মৌলিক নমুনা, একপাশে হয়তো কফির কাউন্টার, সিগারেটের কল, ঘোরানো তাকে পেপার-ব্যাক বই, আর সর্বত্র অলস ভিড় কৌতূহলে ছড়ানো : ফাঁকে-ফাঁকে কাফে, ইটালিয়ান আর হিস্পানি রেস্তোরাঁ, রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে কোনো অদ্ভুত নামের নাইট-ক্লাব; ঢুকলে হঠাৎ অন্ধকারে মনে হয় কোনো ডাইনির গুহা বুঝি এটা; কিন্তু ভয় পাবেন না, জায়গাটা আসলে খুব নিরীহ, কাব্যরোগে আক্রান্ত ছেলে-ছোকরাদের আড্ডা আরকি, সেইজন্যেই টেবিলে নেই কাপড়, চেয়ারগুলো নড়বড়ে, দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলোতে আপনি যাকে অর্থ বলেন তা খুঁজে পাবেন না; একটু বসুন, ইচ্ছে হয় তো কান পাতুন ওদের গানবাজনায় বা কবিতা পড়ায়, যদি এক পেয়ালা চা পর্যন্ত না-নিয়ে উঠে চ'লে যান তো কেউ কিছু বলবে না : সব মিলিয়ে, রাত্রিটি বেশ সজীব ও স্বচ্ছন্দ। শুনতে বেশ ভালো লাগছে তো? কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতেই হ'লো যে এই ছবির উল্টো পিঠও আছে। 'দি ভিলেজে'র মধ্যেই এমন কফিখানা পাবেন যেখানে এক পেয়ালা কফির মূল্য আধ ডলার, আরো আধ ডলার পারিতোষিক দেয়া নিয়ম; এই অগ্নিমূল্যের কারণ বোধহয় এই যে কফির বাটি আপনার টেবিলে যারা এনে দেয় সেই মেয়েদের পরনে থাকে আঁটো, স্বচ্ছ, তিমিরকৃষ্ণ ইজের, মুখে গাঢ় পাণ্ডুতার প্রলেপ, আর চোখে—ঠিক বলতে পারবো না, কিন্তু মনে হয় সুর্মার কলিমা। এবং এখানেও আছে এমন নাইট-ক্লাব (অন্তত নামত তা-ই), যাতে ঢুকতে হ'লেই কিছু মূল্য দিতে হয়, আর ঢোকার পরে, কিছু খান বা না খান, মাথা-পিছু একটা খরচ ধ'রে নেয়; এক বাঙালি বন্ধুর সঙ্গে সেখানে

গিয়ে দেখি, দেয়ালগুলো কালো কাপড়ে ঢেকে দিয়েছে, পরিচারিকারা কৃষ্ণবসনা, শ্লথ-গমনা ও স্তব্ধবদনী, একদিকে প্রায় পুরো দেয়াল জুড়ে যে-কালিমালিপ্ত ছবিখানা ঝুলছে তার উদ্দেশ্য যেন অতিথির মনে ভীতিসঞ্চার। আর অতিথিরা প্রায় সকলেই নীরব ও নতদৃষ্টি, যেন কোনো শুদ্ধিগৃহে আত্মার ক্ষালন করা হচ্ছে, এমনি আবহাওয়া সেখানে, আর ঐ যে নিগ্রো যুবকটি মাইক্রোফোনের সামনে খাতা খুলে স্বরচিত কবিতা প'ড়ে যাচ্ছে, তাও বোধহয় আমাদের কোনো অজ্ঞাত পাপের জন্য শাস্তিবিধান। বোঝা অবশ্য শক্ত নয় যে ঐ শোকাচ্ছাদ, আলোর ম্লানিমা ও চিত্রিত সন্ত্রাস, ঐ অন্তহীন ও ক্লান্তিকর কবিতা —এ-সবই জায়গাটার আকর্ষণ; লোকেরা অধিক ব্যয়ে নারাজ হচ্ছে না যেহেতু তারা 'আর্ট'-এর উপাসক, অন্তত নিজেদের বিষয়ে তাদের এই ধারণা এমন মজবুত যে 'আর্ট'-নামাঙ্কিত অদ্ভুতেও তাদের আপত্তি নেই। এমনি কয়েকটা লক্ষণ দেখে সন্দেহ জাগে, বুঝি গ্রীনিচ গ্রামও দেখানোপনা বা ব্যাবসাদারি থেকে মুক্ত নয় একেবারে: এর যে কোনো ব্রডওয়ে-মার্কা বাবুগিরি নেই সেটাই এর জৌলুশ, কিংবা যেন এর অনুশীলিত অনটনই এর আড়ম্বর : সন্দেহ জাগে, এখানে শিল্পকলার চর্চা যেটুকু আছে তার চেয়েও বেশি আছে কিনা ভান; যাকে সরল বাংলায় 'কাব্যিয়ানা' বলে। কিন্তু—যদি ভান কিছুটা থাকেও, তাতেই বা কী এসে যায়? আবার বলি : ভালো জিনিশের ভানও অ-ভালো নয়, তবে মার্কিন জীবনের একটা অসুবিধে এই যে কোনো ভালোই অবহেলিত হ'তে পারে না, পারে না নিজের মনে ও নিজের ধরনে প'ড়ে থাকতে বা গ'ড়ে উঠতে; তা চোখে প'ড়ে যায় যূথের, আশ্রিত হয় সংঘের দ্বারা; ফলত, যা স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে আরম্ভ হয়েছিলো তার পরিণতি ঘটে—অন্য অনেক-কিছুর মতোই—একটি বহুল-প্রচারিত 'আকর্ষণে' বা পণ্যদ্রব্যে। এর উদাহরণ আমাদের গ্রীনিচ গ্রাম, যে বড্ড বেশি জেনে ফেলেছে সে রমণীয়, যার মুখপত্র-স্বরূপ দু-দুটো সাপ্তাহিক কাগজ চলছে আজ, যার ইতিহাস-ভূগোলের বিবরণপূর্ণ অনেকগুলো বই পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে। আর-এক উদাহরণ; খাঁটি বীটবংশের কবিরা;—অন্তত গিন্সবার্গের সঙ্গে দেখা হবার পর তা-ই আমার মনে হ'লো।

* * *

লম্বা নন, বরং বেঁটের দিকে, ছিপছিপে শরীর, গায়ের রং হলদে-ঘেঁষা ম্লান, চোখে চশমা, নেহাৎ 'ভদ্রলোক'দের মতোই দাড়ি-গোঁফ কামানো, পরিষ্কার সিঁথি-কাটা চুল কিন্তু মাথা নোওয়ালে ছোট্ট টাক দেখা যায় : অর্থাৎ চেহারায় শাস্ত্রসম্মত লক্ষণ একটিও নেই, যদিও পালিশহীন জুতো, ইস্ত্রিহীন প্যান্ট আর গায়ের গলা-খোলা কোর্তায় গোষ্ঠীচেতনার পরিচয় আছে;—এ-ই হলেন অ্যালেন গিন্সবার্গ, বীটবংশের এক নম্বর কবি, কেরুয়াকের পরেই আদি বীট যিনি, আর কেরুয়াকের সঙ্গে এই উন্মুখর আন্দোলনের স্রষ্টা। এ'র সঙ্গে আমার প্রথম যেখানে দেখা হ'লো, সেখানে গুণীমানী অতিথি ছিলেন অনেক, আর গৃহকর্ত্রী ছিলেন এমন এক মহিলা যাঁর বন্ধুতা তিন মহাদেশে পরিকীর্ণ, এবং যাঁর ড্রয়িংরুমে অনেক, অনেক নতুন বন্ধুতার সূত্রপাত হয়েছে। এই রকমের বড়ো পার্টিতে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু অনেকের সঙ্গেই কথা বলা সম্ভব হয় না; গিন্সবার্গ যখন ভাং অথবা চরস নিয়ে তর্ক ক'রে-ক'রে উত্তেজিত হচ্ছেন, বা প্রতিপক্ষীয় কোনো মহিলার পৃষ্ঠে কুশান তুলে আঘাত করছেন যখন, আমি ততক্ষণে জাপানি সাহিত্য বিষয়ে আমার জ্ঞানের অভাব কিঞ্চিৎ পরিপূরণের চেষ্টা করছি, বা কাউকে হয়তো বোঝাতে চাচ্ছি ভারতীয়ের পক্ষে ইংরেজি ভাষায় কাব্যরচনা কেন প্রায় সম্ভবপরতার পরপারে। গিন্স-বার্গের সঙ্গে আমার কয়েক মিনিটের বেশি কথা হ'লো না সেই সন্ধ্যায়। প্রথমেই তিনি অধুনাবিস্তৃত ভারতীয় সোমরসের প্রসঙ্গ অবতারণা করলেন; আমি বললুম খুব সম্ভব সেটা ফরাশি বা ইটালিয়ান ওয়াইনের মতোই নিরীহ দ্রাক্ষারসমাত্র ছিলো, কিন্তু আমার এই অনুমানে গিন্সবার্গের তৃপ্তি হ'লো না। শুনলুম, তিনি তিন দিন পরেই য়োরোপে পাড়ি দিচ্ছেন, সেখান থেকে—যে ক'রে হোক—কোনো-একদিন ভারতবর্ষে পৌঁছবেন। 'আমেরিকার পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কবি এখন ভারতের পথে—কেরুয়াক, আমি—' দুঃখের বিষয়, অন্য তিনটি নাম আমার মনে নেই। এই ব'লে, চশমার পিছন থেকে বড়ো-বড়ো সরল চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে পরের দিন রাত্রে আমাদের সঙ্গে খেতে বললুম। 'আমার এই বন্ধুকে নিয়ে আসতে পারি?' 'নিশ্চয়ই।'

গিন্সবার্গকে কখনো কোথাও একা দেখা যায় না; তাঁর সারাক্ষণের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হ'লো পীটর, পিটার অর্লভস্কি; শুনেছি ইনিও নাকি কবিতা লেখেন এবং বীট-সমাজে 'প্রিমিটিভ' ব'লে আখ্যাত। কেমন ঢিলে আর লম্বামতো চেহারা এ'র, মুখে-চোখে কোনো সাড়া নেই যেন, মুখের ভাষা ব্যাকরণ মেনে চলে না, উচ্চারণও অস্পষ্ট। এ'র বিষয়ে বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু গিন্সবার্গকে দেখে, তাঁর কথাবার্তা শুনে, আমার মন নিঃসাড় হ'য়ে রইলো না; আমাকে মানতে হ'লো যে বীটরা সম্প্রদায় হিশেবে যেমনই হোক না, এই মানুষটির আকর্ষণশক্তি আছে।

'আপনি গাঁজা খেয়েছেন?' গিন্সবার্গের প্রথম প্রশ্ন আমাকে। 'সে কী? কখনো খাননি?...হ্যাঁ, আমি নেশা করি বইকি—মাঝে-মাঝে—যখন মেক্সিকোতে কি দক্ষিণ আমেরিকায় বেড়াতে যাই—কোথায় পাবো বলুন সে-সব জিনিশ এখানে, এমন দেশ যে হুইস্কির মতো সাংঘাতিক বিষ ঘরে-ঘরে চলতে দেয় আর, ঢুকতে দেয় না নির্দোষ

মারিহুয়ানা! আপনার দেশে তো কত রকম আছে—ভাং, চরস, সিদ্ধি : ও-সব ভালো নয় বলছেন, কেন ভালো নয়? জানেন আমি কী চাই? আমি চাই প্রেরণা, চাই স্বর্গ খুলে যাক আমার সামনে, আমি ভগবানকে চাই। আমার "Howl" কবিতা এক বৈঠকে লিখেছিলাম, শুক্রবার রাত্তিরে আরম্ভ ক'রে যখন শেষ করলাম তখন রবিবার সকাল। না, আমি যা লিখি তা কখনো কাটি না, বদলাই না কিছু, কোনো মাজা-ঘষা করি না, আমার যখন আসে তখন অমনি আসে। একবার ছেলেবেলায়, আমি কলম্বিয়ার ছাত্র তখন, ব্লেকের কবিতা পড়ছিলাম ব'সে-ব'সে—"Ah sunflower! weary of time"—অনেকক্ষণ ধ'রে পড়ছি—হঠাৎ আমার মনে হ'লো ব্লেক নিজে আমাকে তাঁর কবিতা প'ড়ে শোনাচ্ছেন, স্পষ্ট তাঁর গলায় একটি, দুটি, তিনটি কবিতা শুনলাম আমি। পরদিন বন্ধুদের কাছে যখন সে-কথা বললাম কলম্বিয়ায় হৈ-চৈ প'ড়ে উঠলো, প্রোফেসররা ভাবলে আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছি, আমাকে আট মাস এক মানসিক চিকিৎসালয়ে আটকে রাখলে।

না, আমি "ভিলেজে" থাকি না—ওটা বাজে হ'য়ে গেছে আজকাল, যাকে বলে দোকানদারি তা-ই চলছে. আমার পক্ষে অসম্ভব খরচ ওখানে। আমি থাকি বাওয়ারির কাছে—আপনারা কখনো সেখানে যান না—নিগ্রো, পুয়ের্টো-রিকান, সত্যিকার গরিবদের পাড়া সেটা—আর আমাদেরও মনোমতো আস্তানা। আমার অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া পঞ্চাশ ডলার, তিন-চারজন একসঙ্গে থাকি ব'লে আরো অনেক শস্তা পড়ে। না—আমি আর-কোনো কর্ম করি না, কেউই তা করি না আমরা, এইভাবেই থাকি। আমার "Howl" ষাট হাজার কপি বিক্রি হয়েছে, মাঝে-মাঝে কবিতা প'ড়ে টাকা পাই, মোটের উপর মাসে দেড়শো বা দু-শো ডলার আয় হয় আমার, তাইতেই চ'লে যায়, বা চালিয়ে দিই। লোকে বলে আমার কবিতার মানে হয় না—জানেন আমার উত্তর কী? লস এঞ্জেলসে এক সভায় কবিতা পড়ছি একদিন; শ্রোতাদের একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—"আপনি কী বলতে চাচ্ছেন বুঝিয়ে বলুন!" "বলতে চাচ্ছি—এই!" ব'লে আস্তে-আস্তে সব জামা-কাপড় খুলে ফেলে ওদের সামনে দাঁড়ালুম আমি। আমার কবিতা কানে শুনতে হয়, কেরুয়াকের গদ্যও তা-ই। এই যে আমার নতুন বই এনেছি আপনার জন্য—"Kaddish"—এটা আমার দ্বিতীয় বই, এই-মাত্র বেরোলো, আর এই বীট অ্যান্থলজিটা : আপনি কেরুয়াক পড়েননি? আশ্চর্য গদ্য, আশ্চর্য ছন্দ ভাষার—একটু প'ড়ে শোনাই আপনাকে, শুনছেন?—এই আমেরিকায় যে-নতুন ইংরেজি ভাষা জন্মেছে, আর সেই ভাষা ঠিক যেমন ক'রে মুখে-মুখে উচ্চারণ করে লোকেরা, তার তাল, তার ধ্বনি, তার স্পন্দন, সব অবিকল ধরা পড়েছে কেরুয়াকের লেখায়, আর প্রথম তাঁরই লেখায় ধরা পড়েছে।...হ্যাঁ, কেরুয়াকও যাচ্ছেন য়োরোপে, তবে ঠিক এক্ষুনি নয়, পীট আর আমি বুধবারে ছাড়ছি এখান থেকে : প্রথমে প্যারিস, তারপর—জানি না। কিন্তু এ-কথা ঠিক জানবেন যে সারা পথ হাঁটতে হ'লেও ভারতবর্ষে আমরা একদিন পৌঁছবোই, আপনাদের সঙ্গে কলকাতায় আবার দেখা হবে।'

যা বলা হচ্ছে তার জন্যে ততটা নয়, যে-ভাবে বলা হচ্ছে বা যে-মানুষটি বলছেন, তারই জন্যে এঁর সমস্ত কথা বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনছিলুম আমি। বীটদের বিষয়ে, আর সবচেয়ে বেশি গিন্সবার্গ বিষয়ে, যে-সব কাহিনী প্রচলিত আছে : তাঁদের সমাজদ্বেষ; মারিহুয়ানা, কোকেন ও গঞ্জিকায় আসক্তি; তাঁদের অস্বভাবী যৌন আচরণ;—সেই সব রোমাঞ্চকার সঙ্গে গিন্সবার্গ মানুষটিকে আমি কিছুতেই মেলাতে পারলুম না। বরং এই রুশ-ইহুদি-মার্কিন-মিশ্রিত যুবকটিতে আমি যা পেলুম তাকে বলতে পারি প্রায় প্রাচ্য মৃদুতা, এক সুকুমার মুখশ্রী, বড়ো-বড়ো চোখের দৃষ্টি সরল ও নিষ্পাপ, কণ্ঠস্বর নম্র, বাচন শান্ত, অঙ্গভঙ্গি কোমল; কোনো কথাতেই তিলতম ভান বা আত্মম্ভরিতা নেই, আছে এক স্বভাবসিদ্ধ, হয়তো প্রায় শৈশবধর্মী, বিশ্বাসের আভাস। আমি বুঝতে পারলুম, এঁর মধ্যে অন্ততপক্ষে সন্ধানটা খাঁটি, অন্তত এক ফোঁটা পবিত্র অনল ইনি পেয়েছেন। তাছাড়া এঁর সরল স্বভাব, আর বয়সের তারুণ্য—এই দুয়ের মিলনে গিন্সবার্গকে আমার তেমনি মনে হ'লো, যাতে কিনা "ছেলেটি" ব'লে উল্লেখ করলে ভুল হয় না, বাংলায় কথা বলা সম্ভব হ'লে আমি নিশ্চয়ই তাঁকে "তুমি" বলতুম। অর্থাৎ মানুষটির বিষয়ে আমার যা অনুভূতি হ'লো, বাংলা ভাষায় তাকেই বোধহয় স্নেহ বলে।

• • •

'Beat', 'Beatitude' : এই দুটি শব্দের যমকে এঁদের নামকরণ; বীটবংশ বলতে চান যে তাঁরা সমাজের কাছে স্বেচ্ছায় হেরে গেছেন, এবং তাঁরা পুণ্যের পিয়াসী। এক সাংবাদিক একবার বিদ্রূপ ক'রে এঁদের যে-আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই 'beatnik'ও এখন মার্কিনী শব্দকোষের অন্তর্ভূত। আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সান ফ্রান্সিস্কোতে, তখন ১৯৫৬ সাল; মাত্র পাঁচ বছরে এই 'পরাজিত'রা যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহদাকার দেশে যে-রকমভাবে জয়ী হয়েছেন, তার তুলনা সাহিত্যের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া শক্ত। এঁরা নিজেদের বিদ্রোহী বলেন কিন্তু বিপ্লবী বলেন না, আর এখানেই ইংলণ্ডের রাগি ছোকরাদের সঙ্গে এঁদের তফাৎ। যাঁদের বলা হয় রাগি ছোকরা, তাঁদের অস্তিত্ব শ্রেণীভেদনির্ভর; ইংলণ্ডের অনুচ্চ শ্রেণীর
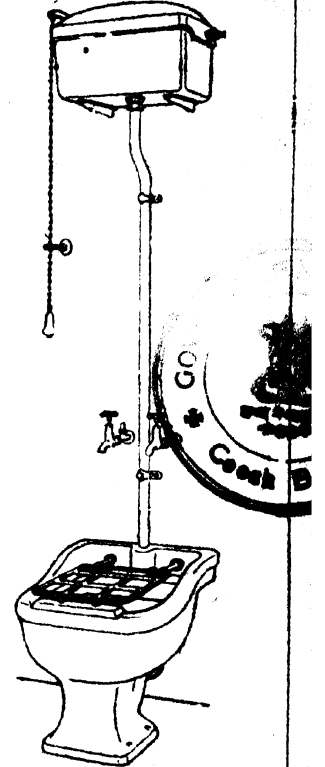
প্রতিবাদ, প্রতিক্রিয়া, বা প্রতিশোধের বাহন তাঁরা; যে-সব যুবক মেধাবী হ'য়েও জন্ম-দোষে 'লাল-ইট' বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্বাচীন আঙিনায় আবদ্ধ থেকেছেন, পৌঁছতে পারেননি অক্সফোর্ডে বা কেম্ব্রিজে, এই গোষ্ঠী তাঁদেরই দ্বারা গঠিত; এঁদের রাগের লক্ষ্য সমাজ, যা তাঁদের প্রস্তাবিত পথে চলতে রাজি হচ্ছে না : অর্থাৎ, প্রথম যুগের রোমান্টিকদের মতো, এঁরাও সমাজ-সংস্কারে উৎসাহী। কিন্তু আমেরিকার প্রায় শ্রেণীহীন সমাজে এ-রকম ক্রোধের স্থান নেই, সেখানে বিদ্রোহ শুধু বিমুখতার নামান্তর হ'তে পারে। বীট কবিদের ঘোষণাও তা-ই : সমাজ তাঁদের মতে এতই ঘৃণ্য যে তার সঙ্গে বৈরিতার সম্বন্ধ স্থাপনও অসম্ভব; শুধু বিশেষ-কোনো দেশ-কালের নয়, যে-কোনো সমাজই পরিত্যাজ্য। অতএব তাঁদের সুচিন্তিত নীতি হ'লো সামাজিক অনুজ্ঞা-লঙ্ঘন : বিবাহ, পরিবার, প্রজনন, গার্হস্থ্য, শিষ্টাচার, রাষ্ট্র অথবা ধর্মযাজনার সংস্রব—এই সব প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার পরম প্রত্যাখ্যানেই এঁদের সার্থকতা। এঁদের বস্তিবাস, মাদকসেবন, পর্যটকবৃত্তি, যৌন অনাচার, অর্থকরী কর্মের প্রতি বিবমিষা—সবই এই প্রত্যাখ্যানের বিভিন্ন অঙ্গ; এগুলো তাঁদের পক্ষে কষ্টকর হ'লেও কর্তব্য, কেননা তাঁদের ধারণায় বুদ্ধ ও খৃষ্ট দু-জনেই ছিলেন নগ্নপদ ভবঘুরে 'বীটনিক', অতএব এই পথে ভিন্ন মোক্ষলাভের আশা নেই। যদি দেশ হ'তো ভারত, আর কাল হ'তো কয়েক শতক আগে, তাহলে, আমার মনে হয়, এঁরা চিহ্নিত হতেন নতুন একটি সাধক-সম্প্রদায়রূপে, হয়তো এঁরা তান্ত্রিক মার্গে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে চ'লে যেতেন; নিতান্তই বিশ শতকের প্রতীচীতে জন্মেছেন ব'লে অগত্যা এঁদের ক্রিয়াকলাপ শুধু কাব্যরচনায় আবদ্ধ থাকছে।

সুখের বিষয়, সর্বদাই যা হ'য়ে থাকে, বীট-নীতি ও বীট-ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নেই। গিন্সবার্গ যেমন অশাস্ত্রীয়ভাবে শ্মশ্রু-হীন ও চিরুনির দ্বারা স্পৃষ্ট, তেমনি তাঁর কাব্যকেও বীটতন্ত্রের বিরোধী বলা যায়। মার্কিন বন্ধুদের মুখে শুনেছিলাম যে বীটরা তাঁদের পিতামাতাকে ঘৃণা ক'রে থাকেন : কথাটার আমি এই অর্থ করেছিলাম যে নিরন্তর নির্বাণকামনার প্রভাবে তাঁরা জন্মেছেন ব'লে খিন্ন হ'য়ে আছেন, তাই জন্মের হেতুদ্বয়কে ক্ষমা করতে পারেন না। কিন্তু গিন্সবার্গের "Kaddish" (ঐ হিব্রু শব্দের অর্থ : শোকার্তের প্রার্থনা)—খুলে দেখি, কবিতাটি আর-কিছু নয় : তাঁর মৃত মাতার স্মরণে এক উদ্বেল শোকোচ্ছ্বাস। আঁরি মিশো, যিনি ত্রিশ বছর আগে 'মায়ের ছেলে' বাঙালি জাতিকে ফরাশি ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছিলেন, তিনি এই কবিতাটি পড়লে দেখবেন যে ষাট সালের এক ইয়াঙ্কি কবির কাছে আদ্রতম বাঙালিও মাতৃপূজায় পরাস্ত। এবং মা অর্থ যেহেতু গৃহ ও পারিবারিক বন্ধন, তাই কেমন ক'রে বলি যে গিন্সবার্গ সর্বান্তঃকরণে অনিকেত বা উন্মূল?

আমার নিজের অবশ্য মনে হয় না যে সমাজকে ত্যাগ করলেই আত্মার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, এবং মাদকের দ্বারা পশুপতির প্রসাদ যদি বা পাওয়া যায়, সরস্বতীর বর-লাভ হয় কিনা সে-বিষয়েও আমার সংশয় দুর্মর। কিন্তু, হয়তো খুব ভুল করবো না, যদি বলি যে বীটতন্ত্রের মূল কথাটি আমি ধরতে পেরেছি। মার্কিন সমাজ আজ সংঘ-বদ্ধতার এমন একটি চরমে পৌঁচেছে যে কোনো-একদিক থেকে বিদ্রোহ না-জাগলে অস্বাভাবিক হ'তো। তারই প্রবক্তা এই বীট-বংশ : অত্যন্ত বেশি সংস্থা, অত্যন্ত বেশি স্বাস্থ্য, অত্যন্ত বেশি বীমা, ছোটো-বড়ো সমস্ত ব্যাপারে অত্যন্ত বেশি ব্যবস্থাপনা—এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এঁদের, যা রচনার প্রান্ত ছাপিয়ে জীবনের মধ্যেও ঘূর্ণিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, সাহিত্যে এই বিদ্রোহ ব্যাপারটা নতুন নয়; রোমান্টিকদের সময় থেকে ডাডা ও এজরা পাউণ্ড পর্যন্ত কয়েকটা বড়ো, আর অনেকগুলো ছোটো ছোটো ঢেউ আমরা উঠতে দেখেছি; বীটবংশের ধরনধারন তাই চেনা লাগছে; এদের যন্ত্রপাতিও আগে

দেখিনি তা নয়। বিদ্রোহের দ্বারা, পূর্ববর্তী আরো অনেকের মতো, তাঁরা সাহিত্যে কিছু টাটকা হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন, অন্তত এই কারণে আমার তাঁদের সমর্থন করতে বাধে না।

কিন্তু হায়, এই বিবেকপীড়িত, গণতান্ত্রিক বিশ-শতকী প্রতীচীতে বিদ্রোহ ক'রে সার্থক হবার উপায় নেই; যুদ্ধে জেতা বড্ড বেশি সহজ হ'য়ে গেছে। আজকের দিনের সমাজে যাঁরা শক্তিশালী, তাঁরা নিজেদের বুদ্ধির উপর আস্থা হারিয়েছেন; ইতিহাস তাঁদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে; এখন তাঁরা পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্তে বদ্ধপরিকর। আর অনাহারে মরতে পারবে না কোনো তরুণ কবি, নাস্তিকতা বা মুক্ত প্রেম প্রচার করলেও পারবে না কোনো প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হ'তে, পূর্বাচরিত প্রতিটি প্রথা লঙ্ঘন করলেও হ'তে পারবে না সনাতনীদের নিন্দাভাজন। 'অবহেলিত প্রতিভা' সম্ভাবনার অতীত হ'য়ে গেছে; বরং কবিত্বশক্তির অংকুরোদ্গম চোখে পড়ামাত্র প্রবীণ মান্যজনেরা বরমাল্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন। জাতি, গোত্র, শিক্ষা, বয়ঃক্রম, ছন্দের পটুতা বা অপটুতা, ব্যাকরণের শুদ্ধি বা অশুদ্ধি—এই সব পুরাতন সূত্রের উপর নির্ভর ক'রে পূর্বযুগের 'কোয়ার্টার্লি রিভিয়ু'র দলবল যে-ধরনের সমালোচনা লিখতেন—ধরা যাক মূঢ়ের মতো, অন্ধের মতোই লিখতেন—তার একটা ভালো দিক এই ছিলো যে, আঘাতের ফলে বিদ্রোহীদের শক্তি বেড়ে যেতো। কিন্তু এখন কোনো অজ্ঞাতকুলশীল যুবক, যে নিজেকে কবি ব'লে ঘোষণা করছে, তাকে মনে-মনে উন্মাদ ব'লে সন্দেহ করলেও প্রকাশ্যে কেউ পীড়ন করবেন না; বরং, তার রচনা যদি প্রলাপের মতো শোনায়, তাহ'লেই তার রাতারাতি করতালিলাভের সম্ভাবনা বেশি। 'কে জানে—আমরা আজ বুঝতে পারছি না, কিন্তু যদি বা হয় আর-এক ব্লেক, আর-এক শেলি বা কীটস, বা নতুন এক ডি. এইচ.' লরেন্স! নিন্দে ক'রে কি ভাবীকালের জন্য অনপনেয় কলঙ্ক রেখে যাবো!' লেডি চ্যাটার্লিজ লভার' ও 'ইউলিসিস'এর বিরুদ্ধে সমাজের আক্রোশ ও আক্রমণ ছিলো উদ্ধত, আজ সেই আক্রমণকারীদের কৃপার চোখে দেখি আমরা, কিন্তু 'Howl'-এর প্রথম প্রকাশের পরে সান ফ্রানসিস্কোর যে-সব সুনীতিরক্ষক গুরুজন তার বিরুদ্ধে অশ্লীলতা'র অভিযোগ এনেছিলেন, বিচারকের মন্তব্য আঘাত করলো তাঁদেরই, সর্বসমক্ষে তাঁরা নির্বোধ ও হাস্যাস্পদ ব'লে প্রতিপন্ন হলেন। এ-ই হ'লো, সমকালীন কল্যাণ-রাষ্ট্রে সমাজের ও সমালোচনার ধারা;' এ'র দ্বারা প্রথম লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হন ডিলান টমাস, যাঁর সম্বন্ধে এ-রকম সন্দেহ করা যায় যে বিরতিহীন মদ্যপ হ'য়েই তিনি অধিকতর খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সনাতনী গোঁড়ামি, তা ইংলণ্ডের মতো দেশেও এতদূর পর্যন্ত ভেঙে গেছে যে ঐ দ্বীপ আজ ক্ষুদ্র কবিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত, এবং রাগি ছোকরারা আলালের ঘরের দুলাল হ'য়ে বিরাজমান। আর আমেরিকার বীট কবিরা? তাঁরা তো আজ ড্রয়িংরুমের অলংকার, মিলিয়ন-কাটতি পত্রিকায় তাঁদের জীবনী আর ছবি বেরোয়, তাঁদের রচনার সংকলন সম্পাদনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক; আর সেই পুস্তকে থাকে তাঁদের 'জীবনদর্শনে'র ব্যাখ্যা, ব্যবহৃত পরিভাষার নির্ঘণ্ট, গ্রন্থপঞ্জি, তাঁদের বিষয়ে প্রকাশিত আলোচনার সূচি, এমনকি ছাত্রদের জন্য সম্ভবপর প্রশ্নমালা। তাঁরা কে কোথায় থাকেন, সপ্তাহে ক-দিন আহার করেন বা করেন না, তাঁদের দেহে অস্নানজনিত দুর্গন্ধের প্রবাদ কতদূর সত্য—এই সবই আজ লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত, বলতে গেলে গবেষণার বিষয়। এই সমাজত্যাগী বাউণ্ডুলেদের ঘিরে পূর্ণতেজে বিজ্ঞাপন জ্বলছে।

• 'মনে প'ড়ে গেলো এক রূপকথা ঢের আগেকার!' ঢের নয়, রূপকথাও নয়, মাত্র একশো বছর আগেকার সত্য ঘটনা। ঋণে ও ব্যর্থতায় জর্জর, শার্ল বোদলেয়ার পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছেন প্যারিসের শস্তা ছেড়ে শস্তাতর হোটেলে। ব্রাসেলসে লণ্ডনে প্রণয়-ঘৃণার গোপন যুদ্ধ শেষ ক'রে র‍্যাঁবো আবিসিনিয়ায় উধাও, আর ভেরলেন বোহেমিয়ায় অন্তর্হিত। রোগে ও দারিদ্র্যে নষ্ট হয়েছে এঁদের দেহ-মন, পরিষ্কার বিছানায় শুতে হ'লে হাসপাতালে যেতে হয়েছে; বহু মিনতি সত্ত্বেও এক ছত্র প্রশংসা লেখেননি স্যাঁৎ-ব্যোভ; মা, বোন, স্ত্রী যথোচিতভাবে বিমুখ হয়েছেন। এঁদের দিকে ফিরে তাকায়নি সমাজ, সাল'র অধিকর্ত্রীদের স্নেহ-দৃষ্টি পড়েনি, এঁদের নাম অনুচ্চারিত থেকে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে; এঁদের রচনা ছাপা হয়নি সহজে, বা ছাপা হ'লেও বিক্রি হয়নি, বা কিছু বিক্রি হ'লেও কখনো পায়নি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠাবানের অনুমোদন: ভিক্টর উগোর বিপুল খ্যাতি ও উপার্জন, গোতিয়েরের সম্মত নেতৃপদ—তার তুলনায় কী নগণ্য এঁরা, কী রিক্ত ও ধ্বনিহীন। অথচ এঁরাই, এঁদের স্বোপার্জিত দুঃখের নেপথ্য থেকে, জনতার অজ্ঞাতে, বৃত নির্বাসনদশায়, পাশ্চাত্ত্য কবিতার জন্মান্তরসাধন করলেন। এঁরাই: উগো নন, গোতিয়ে নন, সমালোচক স্যাঁৎ-ব্যোভ নন। কিন্তু এই রকমই তো হওয়া উচিত, এটাই ঠিক সংগত, বিদ্রোহী হ'লে সমাজের প্রত্যাঘাত তো সইতেই হবে; যে-কবি সত্যি নতুন তাঁর বিষয়ে সমকালীন সমাজের বৈরিতাকেই আমরা স্বীকৃতি ব'লে ধ'রে নিতে পারি। আজকের দিনে পশ্চিমী সমাজ প্রত্যাঘাতে পরাঙ্মুখ ব'লেই বিদ্রোহের আর অর্থ নেই সেখানে, তার ধার ক'য়ে-ক'য়ে এমন হয়েছে যে সেটাই এখন কৃতিত্বের রাজপথ। অশীতিপর ফ্রস্টের পরেই আজ আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত কবি সবেমাত্র তিরিশ-পেরোনো অ্যালেন গিন্সবার্গ, আর এই খ্যাতির নির্ভর এক-আধুলি দামের একটি মাত্র চটি কবিতার বই। তিনি কোথাও কবিতা পাঠ করলে ঘরে আর ভিড় ধরে না; লোকেরা এখনই বলাবলি করছে যে 'ওয়েইস্ট ল্যাণ্ডে'র পরে 'হাওল'-এর মতো প্রতিপত্তিশালী কবিতা ইংরেজি ভাষায় আর লেখা হয়নি। মজার ব্যাপার, এবং কিছুটা করুণও: যা-কিছু প্রাতিষ্ঠানিক তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে এই বীট কবিরা নিজেরাই এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেন, তাই তাঁদের বিদ্রোহী আর বলা যায় না; আশঙ্কা জাগে, তাঁদের হৃদয়ের 'অকথ্য আগুন' অবশেষে না ব্রডওয়ের নিয়ন-বাতিতে পর্যবসিত হয়, কিংবা দু-চারটি চকমকি জ্বেলেই নিবে যায়। কেননা কবিদের যা সবচেয়ে বড়ো শত্রু, তা দারিদ্র্য নয়, অবহেলা নয়, উৎপীড়নও নয়—তা অত্যধিক সাফল্য, তা বহুবিস্তৃত বিজ্ঞাপন।

লেখক হওয়া সহজ, দেশ-এর আগের আগের পূজো সংখ্যায় সেই বিষয়ে আমি লিখেছি, এবার আমি তার উল্টো গাইব। সহজ হওয়া একজন লেখকের কাহিনী বলব আজ আমি আপনাদের!

লেখক হওয়া যতই সহজ হোক, লেখকের পক্ষে সহজ হওয়া মোটেই তত সোজা নয়। জীবনের বিষয়ে যাই লিখুন না, জীবনের সঙ্গে তিনি মিশ খান না কখনই; খেতে পারেন না। জলের মধ্যে দুধ যেভাবে মিশে যায় সেইভাবে জীবনের সঙ্গে মিশতে পারেন না তিনি, তেলে জলে যেমন মিশ খায় না অনেকটা সেই রকম। তেলের মতই জলের ওপর ভাসতে থাকেন সব সময়। আর সত্যি বলতে কি, লেখক মাত্রেরই একটু তেল আছে।

কোনো লেখকের লেখা আপনার ভালো লাগে বলে তাঁর সঙ্গে ভাব জমাতে যাবেন না যেন—লেখকের অভাবেই তাঁর লেখা আপনার ভালো লাগে। ভাবতে গেলে লেখকের সম্বন্ধে আপনার ধারণা পাল্টে যাবে যদি মিশতে যান। কাছাকাছি গেলে তাঁর ঐ তেল আপনার চোখে লাগবে, চোখ জ্বালা করবে। এবং ঐ তেলের দ্বারাই তিনি পিছলে যাবেন, আপনি তাঁর সঙ্গে মিশতে পারবেন না। এমন কি, তার ফলে তারপরে তাঁর লেখাও আপনার বিস্বাদ লাগতে পারে। তাতে লোকসান উভয়তই—যেমন লেখকের তেমনি আপনারও।

গোরুর দুধ খেতে মিষ্টি বলে গোরুর সঙ্গে মিশতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। কেননা দুধ ছাড়াও গোরুর আরো আরো জিনিস আছে। যেমন তার শিং। গোরুর গুঁতোর অবদান তার দুধের মতন তেমন উপাদেয় নাও হতে পারে।

জীবনের সঙ্গে মিশে যাওয়া সহজ নয়, বিশেষ করে কোনো লেখকের পক্ষে। তাঁদের স্বাতন্ত্র্যবোধ, তাঁদের ব্যক্তিসত্তাই তাঁদের মিশতে দেয় না—ওপর ওপর ভাসিয়ে রাখে—জীবনজলে জলাঞ্জলি যাওয়া হয় না তাঁদের। জীবন থেকে অদূরে দাঁড়িয়ে তাঁরা জীবনকে দেখেন, লেখেন। আর তাই বোধহয় নিয়ম। কেননা, তা না করে তিনি যদি সাধারণ লোকের মতই জীবনের সঙ্গে একেবারে মিশে যান তাহলে তাদের মতনই তার অথৈ জলে তাঁকেও হাবুডুবু খেতে হবে, জীবন-কাহিনী লেখা আর হবে না।

অনেকটা সেই ব্রহ্মাস্বাদের মতই। জীবনে কেউ যদি ব্রহ্মের স্বাদ পায় তার কথা অপর কাউকে জানাতে পারে না—জীবন-ব্রহ্মের আস্বাদ পেলেও ঠিক সেই রকম। তাই ওপর ওপর দেখে ওপর ওপর চেখেই লেখে চালাক লেখক। জীবনের অতলে তলিয়ে যাবার সাহস তার হয় না আর (ঐ তেল আছে বলেই) শক্তিও হয়ত তার নেই।

কিন্তু ডুবতে পারে ভাসতেও পারে এমন ডুবুরি লেখকও আছে বইকি! জীবনের অতল গর্ভ থেকে দুর্লভ মণিরত্ন এনে তাঁরা আমাদের উপহার দেন। তাঁরা যেমন চিনি খান তেমনি চিনি হয়ে যান তেমনি চিনির সঙ্গে আমাদের চিনিয়েও দিতে পারেন আবার। তৈলঙ্গস্বামীর ধারা নন তাঁরা, বরং রামকৃষ্ণদেবের ধরণ—ব্রহ্মকে চাখতেও

পারেন চাখাতেও পারেন—অবশ্য, বাক্যের অতীতকে যতটা বাক্যের ইঙ্গিতে বাঁধা যায়।

সেই লোকোত্তর লেখকদের একজন, বিভূতিভূষণ। 'বড় কঠিন সাধনা যার বড় সহজ সুর।' তাঁর সাধনার ইতিহাস আমি জানিনে, তবে তাঁর সহজ সুরের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম। কিছু কিছু।

ভদ্রলোকের শিং ছিল না। তাঁর সঙ্গে মিশতে গেলে শিং দরজায় গুঁতো খেয়ে ফিরতে হত না, সটান তাঁর রঙমহলে যাওয়া যেত—যেখানে তিনি রঙে রেখায় জীবনকে, জীবনের সঙ্গে আপনাকে এঁকে চলেছেন। (এখানে, এই আপনাকে মানে যেমন তাঁর নিজেকে তেমনি আপনাকে আমাকেও) যেখানে জীবন এবং জীবনশিল্পী এক। তাঁর সঙ্গে মিশলে যেন জীবনের সঙ্গ পাওয়া যেত, মনে হত তিনি যেন প্রত্যক্ষ জীবনেরই অঙ্গ। জীবনের অন্তরঙ্গ যেন। এবং তিনি সবার সঙ্গেই জীবনের মত অন্তরঙ্গ হতে পারতেন। যেমন তিনি জীবনের সঙ্গে আর প্রকৃতির সঙ্গে মিশেছিলেন তেমনি তিনি প্রকৃতি আর জীবনের-সঙ্গে-মিশে ছিলেন।

প্রত্যেক লেখকই নিজের কবর খুঁড়ে থাকেন—তাঁর নিজের কলমে। তাঁর নিজের সৃষ্টির কবরে তিনি সমাহিত—অহমিকার ব্যক্তিত্ব-সীমার গণ্ডীতে খণ্ডিত, মৃত। বিভূতিভূষণের শিল্পীর অহঙ্কার ছিল না আদৌ, নিজের লেখালেখির বাইরেও তিনি বাঁচতে জানতেন—তাঁর শক্তিমত্তা আর তাঁর ব্যক্তিসত্তা তাঁর আশ্চর্য প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। লেখার মতন জীবনের মধ্যেও তিনি বেঁচেছিলেন, লেখক হয়েও তিনি ছিলেন জীবন্ত।

বিভূতিভূষণ তাঁর লেখনী দিয়ে খনির থেকে হীরে জহর তুলে এনেছেন, কিন্তু সেই খনির গর্ভে আপনাকে সমাধিস্থ না করে। জহর তুলে আনারই ব্রত ছিল তাঁর—কিন্তু জহরব্রত করেননি কোনদিন। নিজের মহিমার আগুনে ভস্মসাৎ হয়ে যাননি তিনি। তাঁর প্রকৃতির মতই, আর যে প্রকৃতিকে তিনি ভালোবাসতেন তার মতনই তিনি চিরকাল সবুজ থেকে গেছেন।

শিল্পত্বকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারাতেই যেমন যথার্থ শিল্প, তেমনি নিজের ব্যক্তিত্বের মহিমাকে লুকোতে পারলেই শিল্পীর সত্যিকার বাহাদুরি। শিল্পী স্রষ্টার সগোত্র। কিন্তু স্রষ্টার সাযুজ্যলাভ করেও সিদ্ধ সাধক যেমন সমাধির স্তর থেকে নেমে এসে সাধারণ হতে পারেন তেমনি সিদ্ধ লেখকের পক্ষেই নিজের লেখনীর সমাধির থেকে উঠে স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব। বিভূতি-ভূষণ ছিলেন তেমনি এক সিদ্ধ লেখক। তাঁর সৃষ্টির চূড়ার থেকে নেমে সমতলে তিনি সবার সঙ্গে সমান হতে পারতেন। সাধারণের সঙ্গে সহজ হয়ে মিশবার কী আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর।

টাকাই হচ্ছে মানুষের কষ্টিপাথর। টাকার পিঠে ঘষেই চেনা যায় মানুষকে। খাঁটি না মেকি বোঝা যায় সেই সময়। আমি যখন কষ্টের পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছি তখনই খাঁটি মানুষটির দেখা মিলল, বিভূতিবাবুর আসল পরিচয় পেলাম।

জীবন সংগ্রাম সবাইকেই এককালে

চেক্ দেখেই তাঁর সুখ

করতে হয়। কিন্তু সাহিত্যিকের বেলায়, (বেশির ভাগের ভাগ্যেই বলছি) সে সংগ্রাম সারাজীবনের। প্রথম লেখাতেই দিগ্বিজয় করে যশ ও সাচ্ছল্যের মালিক হয়েছেন এমন লেখক আর কজন! তখনকার দিনে জন-তিনেকই এমন ছিলেন, নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র, আর বিভূতিভূষণ। সেই লিখে খাওয়া আর খেয়ে লেখার দিনে (এখনও প্রায় তাই আমার; কেননা বই থেকে আর কটাকা উপায় হয়!) অকস্মাৎ এমন এক সংকট এল যে কাবুলিওলার কাছে পেলেও ধার করি! বিভূতিবাবু জানতে পেরে বললেন, কাবুলি-ওলার কাছে নিতে যাবেন কেন, তাদের বেজায় চড়া সুদ, আমি আপনাকে ধার দিচ্ছি—কত চাই আপনার? তখনো তাঁর সঙ্গে আমার এমন কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়নি যে নিজেকে তাঁর বন্ধু বলে গণ্য করতে পারি—তখনই তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব লাভে আমাকে ধন্য হতে হল। বলা বাহুল্য, খুব বেশি চাইতে আমার সাহস হয়নি, পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিলাম মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে পেলাম। বলেছিলাম তাঁর এ ঋণ আমি জীবনে শুধতে পারব না। পারিওনি।

এমন অনেককেই তিনি দিয়েছেন। বদান্য লোকেরা যেমন দানের দ্বারা অন্যকে বধ করেন তিনি তার ধার দিয়ে যেতেন না, তিনি ধার বলে দিয়ে তার আত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতেন। মুখের কথাতেই দিতেন কিম্বা একটা প্রোনোটের মতনও লেখা হত হয়ত কখনো কখনো, বাঁধা ধরা একটা সুদও থাকত হয়ত বা—কিন্তু সে টাকা কোনোদিনই উদ্ধার হত না। উদ্ধারের জন্য তিনি কখনো মাথা ঘামাতেন বলেও মনে হয় না। বিপন্নকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে টাকাগুলো অমনি করে বিলিয়েই দিতেন বলতে গেলে।

টাকার প্রতি তাঁর টান ছিল বটে, কিন্তু আসক্তি ছিল না একদম। টাকা পেলেই তিনি খুশী, টাকা এলেই সুখী, কিন্তু তারপরে সেই টাকা নিজের জন্যে নানাভাবে খরচ করে যে আরো নানান সুখ আনা যায় তা তাঁর জানা ছিল না। বিলাস ব্যসন তাঁর অগোচর

ছিল। [illegible] তাঁকে দেখিনি কোনোদিন।

সাদাসিধে জামা কাপড়েই তাঁকে দেখতাম—যে কালে ফাঁকা পকেটে সিল্কের ধোঁকা গায়ে চড়িয়ে বোকার মতন আমি বেরিয়েছি। মনের মধ্যে সন্ন্যাসী ছিল তাঁর।

শোনা যায় লেখার দক্ষিণা বইয়ের রয়্যালটি বাবদে যেসব চেক পেতেন সেসব নাকি কদাচই তিনি ভাঙাতেন। চেক দেখেই তাঁর সুখ, কিন্তু তাকে টাকায় ভাঙিয়ে রসগোল্লায় সন্দেশে (কিম্বা চপ কাটলেটেই বলুন) আনিয়ে কোনো সুষমাময়ীর সম্পর্শে সৌন্দর্যসুধার স্বর্গ বানিয়ে যে চেখে দেখতে হয় সে ধারণা তাঁর ছিল না। তাঁর মনের ভেতর যে বৈরাগী ছিল সেই তাঁকে বাধা দিত বোধহয়।

নিজের জন্যে ব্যয় না করলেও পরের প্রয়োজনে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন সর্বদাই। একজনকে বইয়ের দোকান করতে টাকা দিয়েছিলেন সে দোকান উঠে গেছে; আরেকজনকে ছাপাখানা চালাবার জন্য তো মোটা টাকাই, সে প্রেস চলল না; একটা লোককে পাইস হোটেল খুলবার মূলধন যোগালেন, সে হোটেলে যতই আদর্শ হোক, তার ডালভাতের মতই হজম হয়ে গেল একদিন। এমনি অনেক।

আমার নেয়া পঞ্চাশ টাকাও আমি ফিরিয়ে দিতে পারিনি। উপায়ও ছিল আমার যেমন গাদা গাদা তেমনি ছিল তাঁর তাগাদা—দুদিকেই নাস্তি। পথে ঘাটে কি সাহিত্যিক রমেশবাবুর বৈঠকে কতোবার তো দেখা হত—কিন্তু টাকার কথা তিনি ভুলেও তুলতেন না। আমিই বরং যদি কদাচ কখনো তুলেছি, তুলতে গেছি, তার আঁচ পেতেই আচ্ছা সে হবে হবে বলে সে কথা তিনি তক্ষুনি চেপে দিয়েছেন। অবশ্যি, আমি তো ছিলাম এক সেয়ানাখাতক, তাঁর সঙ্গে। দেখা হলেই, সে কথার যাতে উত্থাপনই না হয়, এমন কি আমার দিক থেকেও—তার ব্যবস্থা করতাম। দু চার পয়সার তেলে ভাজা কি চিনেবাদাম তাঁর মুখে তুলে দিয়ে—তাঁর এবং আমার দুজনের মুখেই যুগপৎ—সে প্রসঙ্গের মুখবন্ধ করতাম। সেই সামান্য উপহারেই তিনি খুশী, তার বেশি উপচার লাগত না। শিশুর মতই সদানন্দ ছিলেন বিভূতিবাবু, তেমনি আশুতোষ।

তাঁর সেই চেকগুলি, শোনা যায় যে শেষ পর্যন্ত উইয়েই নাকি খেয়ে গেল। উইদের কিছুতেই চেক করা গেল না সেই ভূরি-ভোজের থেকে। খাতক WE, আর সেই খাদক উই—কারো ওপর কি তিনি কোনো ক্ষোভ নিয়ে গেছেন? আমার তো মনে হয় না। কোনো ভোল নেই, ভেল্কি নেই, পোজ নেই কোনো-রকম, গেরুয়ার চটক নেই, মুখে নেই গীতার বুকনি অথচ অন্তরে সন্ন্যাসী এই অসাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষের মধ্যে

দু চার পয়সার তেলে ভাজা মুখে তুলে

তাদেরই একজন হয়ে দক্ষিণ বাতাসের মতন বয়ে গেছেন।

জীবন আর প্রকৃতি তাঁর কাছে এক হয়ে গেছল—জীবনরসিক বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মধ্যে রস পেয়েছেন। ফুলপাতা বৃক্ষলতা তাঁর প্রিয় ছিল। বনবাদাড় গাছপালা ঝোপ-ঝাড় অরণ্য পাহাড়—এইসব তিনি ভালো-বাসতেন। ফাঁক পেলেই প্রকৃতির কোলে ছুটে যেতেন তিনি—জনতার ভীড়ের থেকে বনতার গভীরে ছড়িয়ে দিতেন আপনাকে। প্রকৃতির রূপ রসে তিনি ছিলেন তন্ময়। প্রকৃতির মধ্যে যে কী রহস্য আছে আমি তো

নতুন জুতো কিনতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম—

জানিনে, কিন্তু তাঁর ছিল এই রহস্যময় প্রকৃতি।

কিন্তু রহস্য বোঝার প্রকৃতিও দেখেছি তাঁর। দিলখোলা আত্মভোলা। 'প্রকৃতি-রসিকের রসিক প্রকৃতি' বলে তাঁকে ঠাট্টা করে একদা আমি এক হাসির গল্প লিখে-ছিলাম। ছাপা হবার পর পড়তে দিলাম তাঁকে—পড়ে তাঁর কী ফূর্তি! যেমন ছিলেন তিনি প্রকৃতিরসিক তেমনি একজন প্রকৃত রসিক।

বলেছি তো, বিলাসিতা করতে তিনি জানতেন না। তালিমারা জুতো পরে আধ-ময়লা জামাকাপড়ে চালিয়ে দিতেন তিনি। একবার তাঁকে এক জোড়া নতুন জুতো কিনতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

'নতুন জুতো আপনার পায়ে উঠল, কী ভাগ্যি!' বললাম আমি।

'সাধে কি কিনছি ভাই! বাধ্য হয়েই।'

'কি রকম?'

'অমুক কাগজে লেখা দিয়েছি, সেখান থেকে টাকা আদায় করতে জুতো ছিঁড়ে যায় বলে! তাই নতুন জুতো কিনতে হল।'

আরেকবার পশ্চিম থেকে সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা তাঁকে আমন্ত্রণ করতে এসেছিল। প্রথম শ্রেণীর ট্রেন ভাড়া তাঁর হাতে দিয়ে অধিবেশনে যাবার জন্যে তাঁরা বিশেষ করে সাধলেন।

'যাব তো ভাই, কিন্তু তার ভাড়া কই?' বললেন তাঁদের বিভূতিবাবু।

'কেন, এই যে আপনার হাতে দিলুম এইমাত্র।' তাঁরা একটু বিস্মিতই হয়েছেন বলতে কি!

'এতো আসবার ভাড়া। যাবার ভাড়া কই?'

'ওতেই যাবেন আপনি। আসার সময় আপনাকে টিকিট কেটে গাড়িতে তুলে দেব। কিছু ভাববেন না, আমরা তো আছি।'

'না ভায়ারা, তোমরা তখন কোথাও নেই।' জানালেন তাঁদের বিভূতিবাবু: 'দুর্গো পুজোর বেলায় হয় যেমন। ঘটা করে বোধন, অধিবেশন, ঘণ্টা নাড়া কোনটারই ঘাটতি নেই, কিন্তু বিসর্জন হয়ে গেলে তারপর আর পুরুতদের কারো দেখা পাওয়া যায় না। সভা হয়ে যাবার পর তখন আর কোথায় অভ্যর্থনা সমিতি, কোথায় ভলান্টিয়ার কোথায় কে! কারো টিকির দেখা নেই। তখন তোমাদের কারো পাত্তা পাওয়া যাবে না। তখন নিজের বোঁচকা নিজের ঘাড়ে করে গাঁটের কড়িতে থাড় কেলাসের টিকিট কেটে বাড়ি ফিরতে হবে। কাঁদতে কাঁদতে।'

'না না, তা হবে না। তা কি হয়? আসার সময়ও ফাস্‌কেলাসের ট্রেন ভাড়া আপনি পাবেন।' তাঁরা আশ্বাস দেন।

'আসার ভাড়া তো আমি পেয়েই গেছি। হাতেই আছে আমার। তাহলে ভাই, তোমরা কিছু মনে কোরো না; আমি এসেই রইলাম।'

মণিবন্ধ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'বেশ ঘর।' চারদিকে তাকিয়ে অরিন্দম ভরাট গলায় বললে।

'হ্যাঁ, দু দুটো জানলা আছে। আলো-হাওয়া যথেষ্ট।' বাড়িওলা সুখলাল বললে।

'তবে একটু যেন ছোট।' একটু যেন খুঁটিয়ে দেখল অরিন্দম। প্রথম সম্ভাষের উদারতায় একটু বা ভাটা পড়ল।

'আর সামনে একফালি বারান্দা আছে। এটাও আপনি পাবেন।'

'বারান্দায় দরকার নেই।' জানলা দিয়ে তাকিয়ে চিলতে বারান্দাটা একবার দেখল অরিন্দম। বললে, 'এ তো রাস্তার ধারের ঘর নয় যে বারান্দায় বসে রাস্তা দেখব।'

'না, তবে দরকার হলে বারান্দার খানিকটা ঘিরে নিয়ে রান্নাঘর করতে পারবেন।' বদান্য ভঙ্গিতে বললে সুখলাল।

'না, রান্নাঘর দরকার হবে না।'

'খাওয়াদাওয়া?'

'সেটা বাইরে কোথাও সেরে নেব। কাছেই, রাস্তায়, রেস্টোরেন্ট আছে দেখেছি, সেখানে সকালের-বিকেলের চা-টোস্টটা হয়ে যাবে।' হঠাৎ কী একটা জরুরী কথা মনে পড়তেই অরিন্দম চঞ্চল হয়ে উঠল: 'বাথরুম? বাথরুমটা কোথায়?'

'এই কাছেই।' জায়গাটা দেখিয়ে দিল সুখলাল। বললে, 'তবে এটা কমন বাথরুম।'

'কমন?' নিশ্বাসের জন্যে বাতাস যেন কিছু কম পড়ল অরিন্দমের। 'কার কার মধ্যে কমন?'

'নিচে এক-ঘরের আরেক ভাড়াটে আছে—তারা আর আপনারা।' কিছুই খিঁচ ধরবার নেই এমনি সহজ-সরল ভাব করল সুখলাল।

'ওরা কজন?'

'স্বামী, স্ত্রী আর একটি বাচ্চা।'

'বাচ্চা?' একটু বা চমকাল অরিন্দম। 'পশুপাখিদেরই বাচ্চা হয় শুনেছি।'

'তা আর বলেন কেন?' হাসল সখলাল: 'ছেলের নামও বাচ্চু মেয়ের নামও বাচ্চু। তা আপনার কটি?'

'আমার?' অরিন্দম শূন্যে হাত ঘোরাল। 'আমি বিয়েই করিনি।'

'তাহলে আপনি একা থাকবেন?'

'সম্পূর্ণ।'

'বা, তাহলে আর আপনার ভাবনা কী?' সুখলাল বললে, 'আপনার হেসেখেলে দিন যাবে।' পরে কথার সুরে একটু সন্দেহের খাদ মেশাল: 'আপনি কী করেন?'

'আপনাকে গোড়াতে বললাম কী!' হাসল অরিন্দম। 'আমি মেডিকেল কলেজের সিনিয়র ছাত্র। পড়াশোনার জন্যে একটি নিরিবিলি ঘর চাই। ঘরটা যে রাস্তার থেকে দূরে, একটু ভেতরের দিকে হল, এটা ভালোই হল। যখন-তখন যে কেউ এসে উঁকিঝুঁকি মারতে পারবে না। মন দিয়ে লেখাপড়া করা যাবে।'

শুধু লেখাপড়ার জন্যে গোটা একটা ঘর নেওয়া, একটু বাড়াবাড়ি মনে হল সুখলালের। বললে, 'সিনিয়র ছাত্র যখন, একটু-আধটু প্র্যাকটিসও হয় বোধ হয়?'

'প্র্যাকটিস?' স্তম্ভিত হবার ভাব করল অরিন্দম।

'এই ছোটখাটো অসুখে ওষুধ-টোষুধ দেওয়া, ছুঁচ ফোঁড়া, অপারেশনের পর ড্রেস করা—পারেন না?'

'তা আর কোন না পারি? কেন, আপনার বাড়িতে কোনো কেস আছে?'

'এখন নেই, কিন্তু হতে কতক্ষণ?'

'তা আছি যখন হাতের কাছে, বলবেন দরকার হলে—'

একটু যা আশ্বস্তই বোধ করল সুখলাল। কিন্তু তাই বলে এক পয়সা ভাড়া কমাল না। সেলামিও নিল ভারী হাতে।

আপত্তি করে লাভ নেই। সস্তায় ঘর কই কলকাতায়?

তা মন্দ নয় একরকম। একটু হয়তো ছোট হল। তা কতটুকু আর নড়াচড়া? ছোটই তো ভালো। ছন্দোবন্ধ। বাথরুমটা কমন বলে যা অসুবিধে। তা ভাব করে ভাগ করে নিতে পারলে বাধবে না। একখানা ঘরের টেনান্সিতে একটা আস্ত বাথরুম পাওয়া যাবে এ কোরানে-পুরাণে লেখেনি।

পরদিন সকালের দিকে একটা ঠেলায় করে মালপত্র নিয়ে এল অরিন্দম। মালপত্রের মধ্যে একটা ক্যাম্প খাট, একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা ট্রাংক ভর্তি বইখাতা আর ওষুধপত্র। আর হোল্ড-অল সতরঞ্চিতে জড়ানো একটা হতচ্ছাড়া বিছানা। আরো একটা সুটকেস আছে। ওটায় বুঝি জামা-কাপড়।

কুলি দুটোই গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ে গেল কোনোরকম।

সুখলাল নেমে এসেছে। তদারকির ভঙ্গিতে বললে, 'একটা চাকর রাখবেন না?'

'চাকর দিয়ে কী হবে?'

'ঝাটপাট দেবে কে?'

'ওসব আমি একাই পারব।' সুস্থ দেহে বল ফোটাল অরিন্দম। 'চিরদিন হস্টেলে থেকে মানুষ। এসব মুখস্ত। হস্টেলের চাকর আর কত করে। সব আমিই পারব।'

কত পারবে নমুনা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ঘরময় নোংরার বিন্দুমাত্র কিনারা হয়নি। বিশৃংখলাগুলিও তাকিয়ে আছে অসহায়ের মত।

মরুক গে, ভাড়াটের ভাবনা আমি ভাবি কেন?

তবু আপিসফেরত একবার উঁকি না মেরে পারল না সুখলাল। উঁকি মেরেই একেবারে তাজ্জব বনে গেল।

ঘরের ভোল একেবারে বদলে গিয়েছে। জানলা-দরজায় পর্দা ঝুলছে। ক্যাম্বিশের খাটটা নেই, বারান্দায় বরখাস্ত হয়েছে। তার বদলে একটি মজবুত তক্তপোশ পড়েছে, তার উপরে নিভাঁজ সাদার প্রসন্ন বিছানা। টেবিলের উপর চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া ঢাকনি, তার উপর বইগুলি সযত্নে সাজানো। ট্রাংক-বাক্সগুলি পরিপাটি করে রাখা। আচ্ছাদন করা। র‍্যাকেটে, হ্যাংগারে ঝুলছে শার্ট-প্যাণ্ট।

'আসব?' ভেতরে ঢোকবার কোনো শরীরী বারণ নেই, তবু এক মুহূর্ত দ্বিধা করল সুখলাল।

বই পড়ছিল অরিন্দম, মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখ তুলে হাসল। বললে, 'আসুন'।

'এ কী, এ যে একেবারে ভোজবাজি হয়ে গিয়েছে দেখছি।' ঘরের চারদিকে বিহ্বল চোখ ফেলল সুখলাল। 'কী করে হল বলুন তো।'

লোকটাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, তাই বইয়ে নিবিষ্ট থেকে অরিন্দম বললে, 'কেন, নিজে করলুম।'

'নিজে করলেন! নিজের হাতে!' সুখলাল তবু যেন বিশ্বাস করতে চায় না।

'হ্যাঁ, এ ডাক্তারের অপারেশন!' চোখ তুলে অজানতে একবার হেসে নিয়েই অরিন্দম আবার বইয়ে মন দিল।

যাক গে, মরুকগে, আমার মাস মাস ভাড়া পেলেই হল। লোকটা কী করে না করে পড়ে না পড়ে তা দিয়ে আমার হবে কী!

সুখলাল চলে গেলে আলো-না-জ্বালা সন্ধ্যায় নতুন পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ল অরিন্দম। অগাধ সাদায় বিস্তীর্ণ ডুব দিলে।

'কী সুন্দর তোমার চোখদুটো। যেন পরিষ্কার পুকুরের জলে দুটো কালো মাছ টলটল করছে! আর যখন তুমি মুচকে হাস তখন তোমার উপরঠোঁটের খাঁজটুকুতে যে ছোট্ট মিষ্টি গর্ত হয়, ইচ্ছে করে—'

'কী বিচ্ছিরি যে লাগে যখন তুমি এরকম করে কথা কও।'

'একটা বৃষ্টির জল-পড়া কাঠের বেঞ্চির আধখানটায় বসে বলছি কিনা, তাই বিচ্ছিরি শোনাচ্ছে। কিন্তু যদি একটি নিরিবিলি ঘর হত, খাট হত, বিছানা হত, তুমি একটি অচ্ছিন্ন রজনীগন্ধার মত শুয়ে থাকতে—,

'এসব কথা তোমাকে একটুও মানায় না।'

'কে বললে? খুব মানায়।'

'তুমি না ডাক্তার?'

'এখনো পুরোপুরি হইনি।'

'বেশি বাকিও নেই।'

'বা, তাই বলে ডাক্তার কবি হবে না? কোনো কোনো মুহূর্তেও হবে না?'

'যে সব জানে', নন্দিনী ঠোঁটের খাঁজে সেই গর্ত ফেলল, 'সে জানাশোনার মত করে বলবে।'

'স্নায়ুতন্তু জানলেই কি দেহের সমস্ত রহস্য জানা হয়ে যায়? কী বুদ্ধি! ঘি দেখতে-শুনতে কেমন জানলেই কি ঘি খেতে কেমন বলতে পারো? মোটকথা', অরিন্দম বললে হাসিমুখে, 'ও কথাটা যদি একটা নিরিবিলি ঘরে বসে বলতে পারতাম, তোমার আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে, বিছানায় তোমার পাশে বসে, তা হলে দেখতে কথাটা কী চমৎকার শোনাত! একটুও বিচ্ছিরি বলতে না।'

'সত্যি যদি একটা নিরিবিলি ঘর পেতাম!' কান্নার মত করে উথলে উঠল নন্দিনী।

'সত্যি।' অরিন্দমও ধ্বনি তুলল।

সুস্থ হয়ে দু দণ্ড কোথাও বসে আলাপ করা যায় না। স্বাধীনতার পর মানুষই যা একটু বেড়েছে, কোথাও স্থান নেই। সর্বত্র ভিড় আর লোকচক্ষু। ট্যাক্সি নিলে হয়, কিন্তু অত পয়সা কোথায়? তা ছাড়া যে কথা আসলে মন্থর ও মদির তা কি একটা ঊর্ধ্ব-শ্বাস চলন্ত রাস্তায় বসে সম্ভব? আর যে রাস্তা অল্পায়ু? সিনেমাতে যেতে পারে বটে কিন্তু আলাপের অবকাশ কোথায়? এক মাঠ আছে, কিন্তু সেখানে গুন্ডার ভয়। নয়তো পুলিসের।

সত্যি একটা ঘর দরকার। নির্জন ঘর। মুক্তি দিয়ে তৈরি, নিভৃতি দিয়ে ঘেরা।

প্রাণ ভরে প্রাণ ঢেলে আলাপ পর্যন্ত করা যাচ্ছে না।

'কিন্তু সেই নিরিবিলি ঘরে, চার দেয়ালের খোলা মাঠে আলাপ না শেষে প্রলাপ হয়ে ওঠে।' গূঢ় কটাক্ষে তাকাল নন্দিনী।

'তা তো উঠতেই পারে।' সরল মুখ করে বললে অরিন্দম।

দুজনেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা অন্ধকার গহ্বরের পারে দুজনে দাঁড়াল মুখোমুখি।

এই যদি সমস্যা, তবে সাধারণভাবে মিটিয়ে নিলেই হয়। বিয়ের আপিসে গিয়ে দিলেই হয় নোটিশ!

ছি, ছি, কী লজ্জা! কী লজ্জা! লোকে বলবে কী!

'আমি একটা ছাত্র, এখনো বেরোইনি কলেজ থেকে, আমি কিনা এক নার্সকে বিয়ে করে বসেছি! সকলে আমাকে বক দেখাবে, আমার পিছনে শুধু হাততালি নয়, ক্যানেস্তারা পিটবে।' অরিন্দম শিউরে ওঠার ভাব করল। 'ডাক্তার হয়ে বেরুলে বরং কথা ছিল।'

'আর আমার কথা তো জানো, আমার ভাইয়ের ইঞ্জিনীয়র হয়ে বেরুতে আরো বছর দেড়েক বাকি। ওর সব খরচ আমি দিই। ও মানুষ হয়ে চাকরি পেলে পরেই আমি ছুটি পাই। তার আগে নয়।'

'সুতরাং, সন্দেহ কি, বিয়ের জন্যে এখুনি আমরা প্রস্তুত নই।' সায় দিল অরিন্দম।

'অন্তত দু বছরের মুলতুবি।' করুণ করে শ্বাস ফেলল নন্দিনী।

'ততদিনেও আমার প্র্যাকটিসের প-এর ফলা বসবে কিনা ঠিক নেই। বলতে পারো চার বছর।'

'অসম্ভব।' চোখ নামাল নন্দিনী।

'অসম্ভব এত দিন বসে থাকা। তীর্থ-কাকের মত অনর্থক ঘুর ঘুর করা। এস আমরা একটা ঘর নিই।'

'আমরা?' নন্দিনী জোয়ার আসবার আগেকার নদীর মত কুলকুল করে উঠল।

'তুমি থাকবে না। তুমি শুধু মাঝে মাঝে আসবে।'

অরিন্দম স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হল। ঘরটা তার নামেই নেওয়া হবে। কিন্তু ভাড়ার

মধ্যে বেশিটাই বইতে হবে নন্দিনীকে। অরিন্দমের স্কলারশিপের টাকা আছে, তা-ছাড়া যে টাকা সে আনে বাড়ির থেকে, সব সে ঢালবে অকাতরে। তারো উপর, কোনো প্র্যাকটিসিং ডাক্তারের সঙ্গে সামিল হয়ে সে কিছু ছেঁড়াফোঁড়া বাঁধাছাঁদার কাজ করে টাকা কামাবে। টাকার জন্যে আটকাবে না।

'তা আটকাবে না। কিন্তু', দুই চোখে ভয় পুরল নন্দিনী। 'কিন্তু যদি বিপদ হয়?'

'তা তো হতেই পারে!'

'হতেই পারে?' নন্দিনীর কাছে অরিন্দমের এ ভঙ্গিটা যেন আরো ভয়ের।

'তুমিই বলো, পারে না?'

চুপ করে রইল নন্দিনী।

'কিন্তু তা হবে কেন, আমরা হতে দেব কেন? আমরা সাবধান হব।' অরিন্দম দৃঢ় অথচ নিরাসক্ত গলায় বললে, 'তাতে সরকারী আশীর্বাদ থাকবে। সরকারই তো কত হুঁশিয়ারী প্রচার করছে শহরে-গাঁয়ে, কত শেখাচ্ছে রীতিনীতি—'

'তবু', ভুবনমোহন হাসি হাসল নন্দিনী। 'ভাগ্যের রসিকতা তো জানো। হঠাৎ ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা।'

'তখন বিয়ে করে ফেলব।' উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হল অরিন্দম।

তারপর সহসা আবার দুজনে নির্বাক হয়ে গেল।

'তাছাড়া আরো একটা উপায় আছে।' বললে অরিন্দম।

অনুমান করতে পেরে অতি নিগূঢ়ে শিউরে উঠল নন্দিনী।

অরিন্দম বললে, 'যেখানে বন্ধ করা বৈধ হচ্ছে, সেখানে নষ্ট করাও বৈধ হবে। আজ না হয়, কদিন পরে হবে।' নন্দিনীর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল অরিন্দম। 'তা ছাড়া আমাদের ভাবনা কী। আমাদের জন্যে বিয়েই তো আছে, সকল বিপদের ত্রাণ।'

পড়া পাখির মত শুকনো স্বরে প্রতিধ্বনি করল নন্দিনী: 'সকল অগতির আশ্রয়। কিন্তু—'

না, তবু তাদের একটা ঘর হোক। এখানে-ওখানে ওরা আর ঠুকরে-ঠুকরে বেড়াতে পারে না। ফিরতে পারে না গরু-চোরের মত। নির্জনে পাশাপাশি একটু বসলেই লোকের সন্দেহ। কত কষ্ট করে কর্মের অরণ্য থেকে দুটো-চারটে সোনার মুহূর্ত চুরি করে আনা, তা এমনি অকারণে ছড়িয়ে দিতে হবে ধুলোয়, এ অসহ্য।

না, একটা ঘর হোক। একটা অনঞ্জন নির্জনতার মালিক হোক তারা। দরজার খিল আর জানলার ছিটকিনির উপর একলা ওদেরই প্রভুত্ব থাক। প্রভুত্ব থাক আলোর সুইচের উপর। কেউ কিছু বলতে পারবে না, উঁকিঝুঁকি মারতে পারবে না, তাড়া দিয়ে ফেরাতে পারবে না এখানে-ওখানে।

'যত রাজ্যের কথা আছে বলা যাবে প্রাণ ভরে।' দীপ্ত কণ্ঠে বললে অরিন্দম।

'আর হাসা যাবে মন খুলে।' খিলখিল করে হেসে উঠল নন্দিনী।

'বই পড়া যাবে একসঙ্গে। গান গেয়ে ওঠারও বাধা নেই।'

'চুপ করেও থাকা যাবে কখনো-কখনো।'

'কিন্তু কী কী করা যাবে না তাও বলো।' চোখের কোণে হাসল অরিন্দম।

'তুমি বলো।'

'যদি সন্ধ্যেয় আস আর ঝমঝম বৃষ্টি নামে, তোমাকে আর তোমার হস্টেলে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না।' গম্ভীর-গম্ভীর মুখ করল অরিন্দম।

'তাতে চমকাবে না কেউ।' নন্দিনী নিশ্চিন্ত মুখে বললে।

'চমকাবে না?'

'মানে উদ্বিগ্ন হবে না। প্রাইভেট নার্সের পক্ষে কল পেয়ে বাইরে রাত কাটানো কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।' তরল হাসির ঝাপ্টা

দিল নন্দিনী। 'লোকে ভাববে কোন এক রুগীর নার্সিং করতে গিয়েছি—।'

না, ঘর হোক। দূরে-দূরে আর থাকা যায় না। দিনান্তে না চোখে দেখে, কথা শুনে, একটু বা না স্পর্শ করে। সাগর সেঁচে যে কটা মাণিক পাওয়া যায়, যে কটা মুহূর্তের মাণিক, তাই কুড়িয়ে নিই দুই হাতে।

বর্তমান অবস্থা যেটুকু ঘনিষ্ঠতা অনুমোদন করে তাই বা কম কী!

তারা বিজ্ঞানের মানুষ। তারা অবহিত। অপ্রমত্ত। বুদ্ধিমান। তাদের জ্ঞান শোনা কথায় নয়, পুঁথিতে নয়, তাদের জ্ঞান হাতেকলমে। তাদের ভয় নেই।

'নাও, কটা টাকা রাখো।' ব্যাগ খুলে কটা টাকা দিল নন্দিনী।

গুনে দেখে অরিন্দম বললে, 'এত লাগবে কেন? সবতো একরকম দিয়েছি মিটিয়ে।'

'তবু রাখো তোমার কাছে।'

'তুমি কত করছ!'

'আর তুমি করছ না? কী খাচ্ছদাচ্ছ তা কে জানে!' স্নেহে আর্দ্র হল নন্দিনী। 'আগে তবু তো অনেকের মাঝখানে ছিলে, দেখবার শোনবার লোক ছিল, এখন একেবারে একা। আমি আর কতটুকু থাকি, থাকতে পারি! কষ্ট আর কী তুমিই কম করছ।'

'ভালোবাসার জন্যে সব করা যায়।' বললে অরিন্দম।

'এ তো আমারও কথা।'

মেয়ের কলঙ্ক মেয়ে ছাড়া আর কে ধরে। কে রটায়!

একতলার অন্য ঘরের ভাড়াটের যে বউ সেই প্রথম চোখ কুঁচকোলো। বললে স্বামীকে। আর স্বামী তুলল সুখলালের কানে।

ইতি-উতি করে সুখলালও দেখল কে একটা মেয়ে চুপিচুপি আসে যায়।

বাইরে থেকে গলা খাঁখরে একদিন ঘরে ঢুকল সুখলাল।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না। যে স্ত্রীলোকটি আপনার কাছে আসে সে কে?'

রাগে অরিন্দমের মাথাটা টং করে উঠল। যে হোক সে, আপনার কী মাথাব্যথা? এমনিভাবেই এসেছিল উত্তরটা। কিন্তু অনুত্তেজিত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই সরল মুখে বললে, 'কে আবার! আমার স্ত্রী।'

'স্ত্রী?' প্রায় বসে পড়ল সুখলাল। 'তার তো কোন লক্ষণ দেখি না।'

'কী আবার লক্ষণ দেখবেন?'

'স্ত্রীতো, একসঙ্গে থাকে না কেন?'

'তার অন্য কারণ আছে।'

'স্ত্রীতো, সব সময়েই ফিসির-ফিসির কেন আপনাদের? চেঁচামেচি নেই কেন?'

অবাক হল অরিন্দম। 'স্ত্রী হলে চেঁচামেচি করতে হবে?'

'নিশ্চয়ই।' সুখলাল জোর দিয়ে বললে, 'ঝগড়া চেঁচামেচি হলেই তো বুঝতে পারি স্বামী-স্ত্রী।'

'যা খুশি আপনি বুঝুন।' আর সহ্য করতে পারল না অরিন্দম, ঝাঁজ প্রকাশ করে ফেলল।

'আমরা বুঝেছি।' সুখলালও রুক্ষ হল। 'পাশের ভদ্রলোক খবর নিয়ে জেনেছেন মেয়েটা একটা নার্স।'

'তাতে কী?' মুখিয়ে উঠল অরিন্দম। 'নার্স কি স্ত্রী হতে পারে না?'

'তা পারবে না কেন? কিন্তু ও আপনার বিবাহিতা স্ত্রী নয়।'

'বেশ তো, অবিবাহিতা স্ত্রী, ভাবী স্ত্রী। তাতে কী হল?' মেজাজ আরো চড়ল অরিন্দমের।

'দেখুন, ভদ্রপাড়ায় এসব বেচাল চলবে না। শাক দিয়ে ঢেকে চলবে না মাছ খাওয়া।' সুখলাল খিঁচিয়ে উঠল। 'অন্য পাড়ায় ঘর দেখুন।'

'দেখেছি।' সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল অরিন্দম।

সব শুনে ম্লান হয়ে গেল নন্দিনী।

তা একটু জানাজানি হবেই, তা গায়ে মাখলে চলে না। কিন্তু বাড়িওলা কী করতে পারে? একবার ভাড়া দিয়ে উচ্ছেদ করা মুখের কথা নয়। এক নার্স ঘরে আসে সেটা কোনো উচ্ছেদের কারণ হতে পারে না। আর যেখানেই থাকো সর্ব অবস্থায়ই সরিকদার ভাড়াটে কালকেউটে।

'চলো অনন্ত চলো।' নন্দিনী স্বরে বুঝি একটি আকুলতা আনল।

'না, না, ভয় কিসের। কারু সাধ্য নেই আমাদের তাড়ায়।' বললে অরিন্দম, 'আর লোকে কী বলে না বলে, বয়ে গেল!'

'তবু কী রকম যেন অস্বস্তি লাগে।' কান্না-কান্না মুখ করল নন্দিনীঃ 'পাপ-পাপ মনে হয়।'

'পাপ?' এক মুহূর্তে হিম হয়ে রইল অরিন্দম।

'পাশের বাড়ির বউটা এমনভাবে তাকায় যেন আমি কত মন্দ, কত জঘন্য।' নন্দিনী হাসতে চেয়েও পারল না হাসতে। 'গলি দিয়ে যখন ঢুকি পাড়ার বেকার ছোঁড়াগুলি পিছু নেয়, টিটকারি দেয়। কিছুতেই সহজ হতে পারি না। শুধু উপেক্ষা করলেই চলে না, সময়-সময় উদ্ধতও হতে হয়। সেই উদ্ধত হবার জোর পাইনে, সত্যের জোর। শুধু পালিয়ে-পালিয়ে আসি, পালিয়ে-পালিয়ে যাই। এটা ঠিক নয়।'

'না, না, খুব ঠিক।'

'ঘরের আগে এখানে-ওখানে যখন দেখা হত, তার চেয়েও এখন বেশি নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। ও ঘরে থাকে, বলতে কেমন সুন্দর শোনায়; কিন্তু ও ঘরে আসে, কী বিচ্ছিরি! কেন ঘরে থাকতে পাব না?'

'তুমি তা হলে কী বলতে চাও?' অরিন্দম অস্থির হয়ে উঠল।

'তুমি একটা ফ্ল্যাট নাও।' এতক্ষণে হাসতে পারল নন্দিনী। 'আমরা নিয়ত বাস করব।'

একটা দু' কামরা ফ্ল্যাট। নেবার সময় বলবে, আমরা স্বামী-স্ত্রী, দুটি মাত্র প্রাণী। তাহলেই নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া যাবে। প্রথম থেকেই এ রবটা চালু হলে আর কেউ নাক ঢোকাতে আসবে না।

এ যে দেখছি ছাগলের কল্যাণে মোষ মানা। কথার ভয়ে খরচে তলানো।

'আসল কারণটা অন্য।' মিষ্টি করে হাসল নন্দিনী।

'অন্য?' একটু কি সন্দিগ্ধ হল অরিন্দম।

'অন্য মানে একটা ঘরে আর ভরে না, একটা সংসার পেতে ইচ্ছে করে।'

'সংসার?'

'তোমার করে না? একসঙ্গে থাকা একসঙ্গে ওঠাবসা, খাওয়াদাওয়া—সকাল, সন্ধে, রাত—তোমার করে না?' নন্দিনী ঝলমল করে উঠল। 'কৃপণ মুঠটা ইচ্ছে করে না খুলতে?'

'অত বড় খরচ চলবে কী করে?'

'দুজনে চালাব। পারব না?'

'খুব পারব।' নন্দিনীর দু হাত সবলে আঁকড়ে ধরল অরিন্দম।

ফ্ল্যাটে ঢোকবার আগে অরিন্দম বললে, 'কপালে-মাথায় এক ঝলক সিঁদুর দিয়ে নেবে নাকি?'

'সিঁদুরে এলার্জি' হয়। মেডিকেল গ্রাউণ্ডেই পরি না। প্রতিবেশিনীরা জিজ্ঞেস করলে বলব স্বচ্ছন্দে।' হাসল নন্দিনী।

'তবু—'

'না, সেই দিন পরব।' গভীর করে তাকাল নন্দিনী। 'আর সেদিনই প্রথম বিয়ে হবে।'

অনেক হুজ্জুত করে দু কামরার একটা ফ্ল্যাট পেয়েছে অরিন্দম। একখানি শোবার আরেকখানি বসবার ঘর। রান্নাঘর। ভাঁড়ার। একটা সুন্দর বাথরুম।

এ যেন বিস্তীর্ণ হবার শিথিল হবার অগাধ হবার নিমন্ত্রণ। চকিতে সমস্ত প্রতিষ্ঠা ভুলিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র।

না, বিচ্যুত হবে না কেউ। একটুখানির জন্যে পড়বে না চূড়া থেকে।

ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে হেঁটে যাবে, কাটা পড়বে না।

কিন্তু ফ্ল্যাট চালানো চারটিখানি কথা নয়। অভাবে দুজনে আঁধার দেখল চারদিক।

প্রাণপণ খাটছে দুজনে। অরিন্দম পড়ছে, আবার পড়াচ্ছে, ডাক্তারদের ল্যাংবোট হয়ে চ'ড়ছে এখানে-ওখানে। রোজগারের খামারে ইঁদুরের গর্ত খ'ড়ছে।

'তোমার এবার শেষ পরীক্ষা। তুমি তাতেই একান্ত হও। আমি এদিক সব ম্যানেজ করছি।' তারপর কথার সুরে আদর মেশাল নন্দিনী। 'তুমি বেরিয়ে এসে একটা চাকরিবাকরি নিলেই আমাদের দৈন্য যায়।'

'আমরা মুক্ত হই।'

তারপর একদিন নন্দিনী বললে, 'মফঃস্বলে একটা কল পেয়েছি, যাব?'

'মফঃস্বলে?'

'রাজস্থানে। এক রাজারাজড়ার ছেলের অসুখ, দীর্ঘ দিনের মেয়াদী চাকরি, অনেক-অনেক টাকা।'

কীরকম একটা যেন ক্লান্তির সুর বাজল। চমকে তাকাল অরিন্দম। বললে, 'তোমার এই নতুন সংসার ফেলে পালাবে বিভুঁয়ে?'

ঠিক এরকম ভাবে না বললেও পারত। নন্দিনী কি আর ইচ্ছে করে যেতে চাচ্ছে? টাকার কি দুর্ধর্ষ প্রয়োজন নেই তাদের? আর টাকার জন্যে মানুষে প্রত্যন্তে পর্যন্ত যায়। নন্দিনীকে যে নিরস্ত করবে অরিন্দমের কি টাকা আছে? প্রভুত্ব আছে?

'তারপর তোমার এখানে এত রুগী, এদের দেখে কে?'

অরিন্দম বুঝি নিজেকেও সেই দলে ফেলল। নইলে নন্দিনী অমন করুণ করে হাসল কেন?

যেন কী একটা অভ্যাসের মধ্যে এসে পড়েছে। যেন অন্য কোথাও সে যেতে চায়। অনেক খোলামেলার মধ্যে। যেখানে অনেক মাঠ অনক হাওয়া অনেক জল।

তারপর সেদিন সন্ধ্যায় কে [illegible] যুবক এসে কল দিল নন্দিনীকে।

'আপনি একবার গিয়েছিলেন [illegible] ডাক্তার মজুমদারের পেশেণ্ট। [illegible] মজুমদারই আবার পাঠিয়েছেন [illegible] কাছে।'

'বাড়িটা কোথায় বলুন তো?' [illegible] ঝাপসাকে স্পষ্ট করতে চাইল নন্দিনী।

ভদ্রলোক রাস্তার নাম করল।

'ও, বুঝেছি। চলুন।'

সারাদিন ডিউটি করে এসেছে, [illegible] রাতে আর না বেরুনোই উচিত। [illegible] বলতে চাইল অরিন্দম। পারল না [illegible]। এখন যে টাকার দুর্দম প্রয়োজন। এখন [illegible] আর ছোট একটা ঘর নয়, এখন [illegible] সংসার।

রাতে বুঝি আর ফিরবে না নন্দিনী। পাশের ফ্ল্যাটে কী একটা শব্দ করা [illegible] কিনেছে, ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। [illegible] ঘুমুতে পাচ্ছে না অরিন্দম। সেই যে [illegible] পেয়ে বাইরে রাত কাটানোর কথা [illegible] অরিন্দমকে, অরিন্দমের ঘরে এসে রাত কাটাত, তাই এখন কাঁটার মত বিঁধতে লাগল সর্বাঙ্গে।

পরদিন সকালে বাড়ি ফিরলেও অরিন্দম জিজ্ঞেস করতে পারল না, কে রুগী, কী করে রাত কাটালে?

নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল মনে হল, নিঃস্বত্ব মনে হল। নিষ্প্রতাপ মনে হল।

একটা জবাবদিহি নেবারও তার অধিকার নেই।

সন্ধ্যের সময় আবার সেই যুবক এসে উপস্থিত। 'আপনাকে ডাক্তার মজুমদার আবার চেয়েছেন।'

'হ্যাঁ, যাব। গাড়ি নিয়ে এসেছেন?'

কিছু টাকাকড়ি দিয়ে গেল অরিন্দমকে। কী কটা খরচের হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিল।
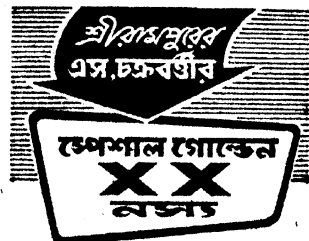
বললে, 'আজ রাত্রেও ফিরতে পারব না হয়তো।'

বিনিদ্র রাত কাটায় শুয়ে না কাটিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোই ভালো। দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল অরিন্দম।

ডাক্তার মজুমদারকে সে চেনে। সেদিকে যাবার দরকার নেই। কী যেন রাস্তাটা বলে গিয়েছিল ভদ্রলোক। সেদিকে পা বাড়াল অরিন্দম। বাড়ির নম্বরটা জানে না। না জানুক, তীক্ষ্ম চোখের সন্ধানী আলোতেই সে বার করবে রহস্য।

এখন রাত কটা?

ঠিক। ঠিক দেখতে পেয়েছে অরিন্দম। একটা বাড়ির দরজায় একটা ট্যাক্সি দাঁড়ানো। কেউ এল, না, যাবে?

যাবে।

দূরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অরিন্দম। দেখল ট্যাক্সিতে নন্দিনী উঠল। পাশে উঠল সেই ভদ্রলোক। তারপর ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল হর্ন বাজিয়ে।

ঘড়ির দিকে তাকাল অরিন্দম। একে আর তুমি রাত বলতে পারো না। এখন মোটে সাড়ে আটটা। একে আর নৈশভ্রমণ বলা যায় না। বলতে হয় সান্ধ্যবিহার।

কিন্তু, আশ্চর্য, দু ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এল নন্দিনী।

'কী, আজ সারা রাত থাকতে হল না?' নিজের স্বরে নিজেই চমকাল অরিন্দম।

'এখনকারমত বিপদ তো কেটে গিয়েছে। পরে আবার ডাক্তার মজুমদার যদি তলব করেন!' হাসিমুখে হালকা হতে লাগল নন্দিনী।

'তাই এখনকারমত বুঝি ছাড়া পেলে!' স্বরটাকে এখনো সোজা করতে পারছে না অরিন্দম।

'কিন্তু জানো তাড়াতাড়িতে পুরো ফি-টা নিয়ে আসা হয়নি।' তখনো মৃদু-মৃদু হাসছে নন্দিনী।

এটার উপরেও কথা বলার ছিল, কিন্তু অরিন্দম আর কথা বললে না। চুপ করে রইল।

তারপর রাত যখন বারোটা, পাশের বাড়িতে ঘড়ি বাজছে, হঠাৎ নন্দিনীর মনে হল ঐ শব্দ কটা যেন তার শরীরের গভীরে গিয়ে বাজছে, বাজছে স্নায়ুতন্তুর অণুতে-রেণুতে। এ কী আনন্দ, না, আতঙ্ক, বুঝতে পারল না নন্দিনী। মনে হল সমস্ত সৌরজগৎ থেকে গ্রহনক্ষত্র কক্ষচ্যুত হয়ে গেল, একটা ক্ষুদ্রের মধ্যে প্রলয়ের আগুন নিয়ে দেখা দিল মহাত্রাস।

'এ তুমি কী করলে!' কেঁদে উঠল নন্দিনী।

অরিন্দম হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল। পরিহাসের সুরেই বললে, 'আর তোমাকে ছেড়ে দেওয়া নয়। আর কিছু বাকি রাখা নয় কিছুতেই।'

পরদিন সকালে সেই ভদ্রলোক আবার হাজির।

এক মুঠ টাকা দিল নন্দিনীকে। বললে, 'তাড়াতাড়িতে আপনার টাকাটা কাল দেওয়া হয়নি। কিন্তু যাই বলুন, আপনার জন্যেই ছেলে পেলুম। আপনি তখন নিজে ট্যাক্সি করে ডাক্তার মজুমদারকে ডাকতে গিয়েছিলেন বলেই তিনি কেসটার সিরিয়াসনেস বুঝলেন। এলেন চটপট। আমার স্ত্রী বাঁচল। সুপ্রসব হল। আচ্ছা, আসি।' চলে গেল ভদ্রলোক।

ম্লান হতে লাগল নন্দিনী।

ম্লানতর অরিন্দম।

বললে, 'তার জন্যে তুমি এত ভাবছ কেন? ডাক্তার মজুমদারকে গিয়েই বলি। তিনিই গোপনে সব ব্যবস্থা করতে পারবেন।'

'না।'

'ডাক্তার মজুমদারের ক্লিনিকে না যাও, এত ঘাবড়াবার কী হয়েছে, তোমার সেই অকূলের কূল, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে চলো।' বীর-বীর ভাব করল অরিন্দম। সমস্ত ক্ষতির পূরণ হয়ে যাবে।'

'না।' দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নন্দিনী।

'বা, একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে আমাদের প্রতিশ্রুতির মধ্যে এ অবকাশ তো ছিল—'

'না, না, দুর্ঘটনা নয়।' কান্নায় আরো উচ্ছ্বসিত হল নন্দিনী।

তারপর একদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে নন্দিনীকে দেখতে পেল না অরিন্দম। সম্ভাব্য সময় অতিক্রম হয়ে যাবার পরেও নয়।

তখন ঘরের মধ্যেই এটা-ওটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল অরিন্দম। এত খোঁজাখুঁজি করবার কী আছে, টেবিলের উপর চাপা দেওয়া এইতো রেখে গিয়েছে চিঠি।

আর্ত ভীত চোখে পড়তে লাগল অরিন্দম।

'আমাকে খুঁজো না। আমি মরতে চললাম। তোমার ঘরে শুয়েও মরতে পারতাম। কিন্তু তোমার ঘরে মরলে জানি, তুমি আবার বিশ্বাসঘাতকতা করতে। আমার কপালে-মাথায় সিঁদুর মাখিয়ে দিতে। আমাকে আমার অপাপ কৌমার্যে মরতে দিতে না। খোঁজ কোরো না আমার, আমাকে পাবে না কোনোদিন।'

উদ্‌ভ্রান্তের মত রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল অরিন্দম। ট্যাক্সি নিল। এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। কিন্তু কোথায় যাবে? কোথায় খুঁজবে? থানায়? হাসপাতালে? রেল স্টেশনে?

এমনও হতে পারে শেষ পর্যন্ত আত্ম-হত্যার সংকল্প সে ত্যাগ করল, যেমন আসে তেমনিই ফিরে এল বাড়ি!

অরিন্দম ট্যাক্সিকে বললে, ফিরে চলো।
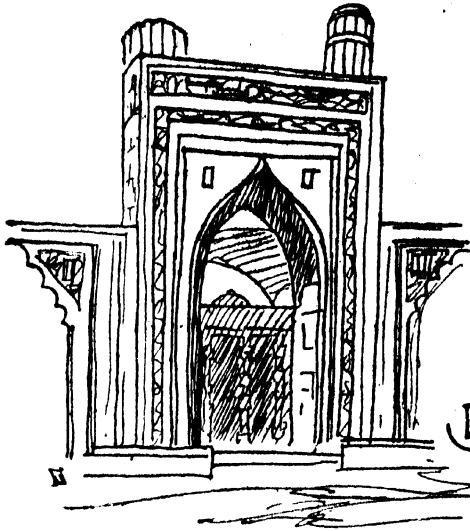
পায়ে-পায়ে

প্রবোধকুমার সান্যাল

পূর্ব রাজস্থানে হেমন্তের হাওয়া উঠেছিল। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে রাত্রের দিকে। ঘুমের ঘোরে গা থেকে চাদরখানা সরে গেলে একটু কুঁকড়ে শুতে হয়। আজমেরের দিকে যাচ্ছিলুম।

আজমের এখনও দূরে। কিন্তু জয়পুর আজও, অর্থাৎ ঊনত্রিশ বছর পরেও, সেই প্রাচীন রোমাঞ্চ নিয়ে আসে! এই নগরীর রঙ্গীন বর্ণবৈচিত্র্য একদা আমার তরুণ মনকে পেয়ে বসেছিল, সে কথা ভুলিনি। আজ ভয় হল, আধুনিককালের নগর সম্প্রসারণের হুজুগে জয়পুরের সেই বর্ণাঢ্যতার সর্বনাশ হয়েছে কিনা। জয়পুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বহুবর্ণা রূপনগরীর সার্থক পরিকল্পনা এবং এই নগরীর প্রতি-অঙ্গ নির্মাণের মধ্যে শিল্প ও সৌন্দর্যের সমাবেশ!

নেমে এলুম জয়পুরে। সময় ছিল না নামবার, দরকার ছিল না নতুন করে কিছু জানবার। কিন্তু পুরনো বন্ধুর বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করে যাওয়া মন্দ কি? সেইজন্য জহুরী বাজারের ভিতর দিয়ে ঘোরাফেরার সময় নিজের মনেই যেন প্রশ্ন করছিলুম, ভাল আছ ত? সেই তুমি আর আমি, সেই হাওয়া-মহল আর নাহারগড়, সেই সুপ্রাচীন অম্বর আর সেই গলতা যাবার পথ,—তোমরা ভাল ত? মাঝখানে গিয়েছে কত দুঃখ দুর্ভাগ্যের কাহিনী, কত যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, কত ঝঞ্ঝা ও বিপর্যয়,—বোধহয় তেমন ক'রে ধাক্কা তোমার ওপর লাগেনি! তুমি ভালই আছ, বন্ধু!

এক্কা ও টাঙ্গাগুলিকে এককালে নানা-রঙের সজ্জা দিয়ে সুসজ্জিত করা হত। ঝালর ঝুলতো রঙ্গীন, পিতলের হাতল ও আঙ্গট, ঘেরাটোপটি সুচিত্রিত, ঘোড়াটির গলায় ঝুলতো ঘন্টা, মাথার উপরে ময়ূরের পালক এবং তার সঙ্গে ঘুঙ্গুর। এক্কাই হোক আর টাঙ্গাই হোক,—সামনে দিয়ে মধুর ঘুঙ্গুরের আওয়াজ তুলে তারা ঝলমল ক'রে চলে যেত। পথের দু পাশে দেখতে পেতুম রঙ্গীন ঘাগরা ঘুরিয়ে ময়ূরের মতো মাথায় রূপোর ঝুঁটি বেঁধে গান গেয়ে চলে যেত পসারিনী রাজপুতানী মেয়েরা। এরা আজও আছে, কিন্তু এদের উপর স্পর্শ করেছে আধুনিক কাল। এদের রুচি বদলেছে, পুরনো কালের আলঙ্কারিক রীতি তার বৈশিষ্ট্য খুইয়েছে, জীবনযাত্রার সেই পুরনো ছাঁচও আর দাঁড়িয়ে নেই। সামন্ত যুগ যেন তার যাবার আগে শেষবেলাকার পাওনা বুঝে প'ড়ে নিচ্ছে।

মোটর বাস চলছে জয়পুরের রাস্তায়, আমার কাছে এটি নতুন। অম্বরে গিয়ে হেঁটে পৌঁছতে দুঘণ্টারও বেশি লেগে যেত; এখন আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয়। অম্বর প্রাসাদের নীচে সেই সুদীর্ঘ সরোবরে আজও তেমনি অম্বরের ছায়াটি পড়ে, ঘন-নীল আকাশটিও তার সঙ্গে প্রতিবিম্বিত হয়। ইতিহাস নাকি এই কথা বলে, দ্বাদশ শতাব্দীতে অযোধ্যা থেকে একদল রাজপুত এসে স্থানীয় নরপতির হাত থেকে এই পার্বত্য নগরী ছিনিয়ে নেয়। তাদের রাজার নাম অম্বরীশ। কেউ বা বলে, অম্বিকেশ্বর শিবের নাম থেকে অম্বর নামটির উৎপত্তি।

আরাবল্লীর অনুচ্চ একটি টিলা পাহাড়ের উপর অম্বর দুর্গটি রাজা মানসিং নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন সপ্তদশ শতাব্দীতে। এটি শেষ করেন প্রায় একশ' বছর পরে রাজা জয়সিং। জয়সিংয়ের আমলে এই অম্বর প্রাসাদটি ভাস্কর্যে, চিত্রণে, শিল্পায়নে এবং ঐশ্বর্য সম্পদে ঝলমল করতে থাকে। এই বিরাট প্রাসাদটিকে রাষ্ট্রবিবর্তনের অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে দুর্গটি নির্মিত হয় সেটির নাম দেওয়া হয়েছিল জয়গড়। মেবার ওরফে উদয়পুরের কথা আমার মনে আছে, কিন্তু অম্বরের মতো এমন রাজকীয় মহিমা অন্যত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

ওর মধ্যেই গলা বাড়িয়ে প্রাসাদের মধ্যে যশোরেশ্বরীর নতুন শ্বেতপাথরের মন্দিরটিকে দেখে নিলুম। দেবী অষ্টাদশ-ভুজা,—এখন এঁর বর্তমান নাম হয়েছে শিলাদেবী। প্রাক্তন যশোরেশ্বরী একদা বাঙ্গালীর হাতে ছিল,—কিন্তু কোনও একটি চৌর্যব্যাপারের নিষ্পত্তিস্বরূপ এর দায়িত্ব বাঙ্গালী পূজারীদের হাত থেকে সরকারি দায়িত্বে গিয়ে পড়ে। এই অপরূপ ভাস্কর্য ও কারুকার্য সমন্বিত মন্দিরটি আধুনিক রাজস্থানী নক্সায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়।

কিন্তু গোবিন্দজীর মন্দিরটি বৈষ্ণব বাঙ্গালী পূজারীদের তত্ত্বাবধানে আজও রয়েছে। বাঙ্গালী বটে, তবে তাঁরা রাজস্থানী ভাষাভাষী বললে ভুল হয় না। বাঙ্গলা ভাষা তাঁরা একটু যেন থতিয়েই বলেন। ব্যাকরণ যথেষ্ট শুদ্ধ হয় না। এক একটি শব্দের ব্যাখ্যা ভিন্ন রকমের। সম্রাট আকবরের কালে রাজা মানসিংয়ের সহায়তায় বাঙ্গালীরাই একদিন বৃন্দাবনের মূল গোবিন্দজীকে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দজীর মন্দিরের অদূরে জগৎপ্রতিষ্ঠ মানমন্দিরটি—যেটির নাম 'যন্তর-মন্তর'—সেটি মহাকালের সকল শাসন উপেক্ষা করে তেমনি দাঁড়িয়ে। জয়সিং ছিলেন গণিতবিদ্ এবং জ্যোতির্বিদ্যা-বিশারদ। তিনি পর পর পাঁচটি মানমন্দির

দিল্লী, কাশী, মথুরা, উজ্জয়িনী এবং জয়পুরে নির্মাণ করেন। এদের মধ্যে জয়পুরের এইটি শ্রেষ্ঠ এবং সর্ববৃহৎ। এই সূত্রে অপর একটি মানমন্দিরের ছবি মনে পড়ছে। সেটিও অবিকল এই ডিজাইনে নির্মিত। সেটি দেখেছিলুম মধ্য এশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ শহর সমরকন্দে। ভারত ইতিহাসে কুখ্যাত তৈমুরলঙ্গের পৌত্র উলুকবেগ ছিলেন পণ্ডিত, গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ। তিনি তাঁর রাজত্বকালে পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমরকন্দ শহরের উপকণ্ঠে একটি টিলার উপর এই মানমন্দিরটি স্থাপন করেন। অতঃপর কালক্রমে সমরকন্দের রাজত্ব রসাতলে যায়, এবং তৈমুরের অন্যান্য পৌত্রের দ্বারা তিনি হত হন। উলুকবেগের মৃত্যুর পর থেকে এই মানমন্দিরটি বোধ করি মাটি চাপা পড়তে থাকে। একালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়ার জার নিকোলাসের স্বৈরাচারী রাজত্বকালে একদল দেশপ্রেমিক রুশ যুবক বিপ্লব প্রচেষ্টার অভিযোগে মধ্য এশিয়ার মরুলোকে নির্বাসিত হন। যুবকটি ছিলেন একজন অধ্যাপক, এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় তিনি পান ডক্টরেট। তিনি ঘুরতে ঘুরতে এসে সমরকন্দে পৌঁছন, এবং উলুকবেগ নির্মিত এই মানমন্দিরটি আবিষ্কার করেন।

সমরকন্দের সেই মানমন্দিরটির সঙ্গে জয়পুরেরটির সাদৃশ্য দেখে আমি সত্যই বিস্ময়বোধ করেছিলুম। পঞ্চদশ শতাব্দীর উলুকবেগ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর জয়সিং—এই দুইয়ের সংযোগ কোথায় এবং কি প্রকার—সেটি ঐতিহাসিকরা বলবেন।

জয়পুরের মানমন্দিরের পাশেই রাজপ্রাসাদটি আজও তেমনি উন্নতশির। প্রিন্স য়্যালবার্ট মিউজিয়ম ওরফে জয়পুরের যাদুঘরে নানাসময়ে নানা বিচিত্র সামগ্রী এসে পৌঁছেছে। কিন্তু এর মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। মিসর দেশে এই স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয় যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের সাতশ' আশি বছর আগে! অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি মারা গেছে আজ থেকে দু' হাজার সাতশ' পঁচাত্তর বছর আগে। তার মৃতদেহটিকে সর্বপ্রথমে একটি লম্বা কাঠের বাক্সে রাখা হয়। সেই বাক্সটির মাপ অনুযায়ী আরেকটি মনুষ্যাকৃতি কাষ্ঠাবরণ নির্মাণ করে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির ভিতরে সযত্নে গচ্ছিত করা হয়। উপরিভাগে একটি নারীদেহের চিত্র প্লাস্টার করা। শবদেহটির পায়ের দুটি পাতা রয়েছে বাইরে। পায়ের কয়েকটি আঙুলে দেখতে পাচ্ছি। সেগুলি কালক্রমে জীর্ণ হয়েছে, কিন্তু কিছু একটা আস্তরের গুণে দেহ থেকে আঙুলগুলি আজও খসে পড়েনি। এই 'মমি'টি মিসর দেশ থেকে সোজাসুজি আনা হয়েছে। সমগ্র যাদুঘরে এই মমিটিই দর্শকদের ঔৎসুক্য আকর্ষণ করে সর্বাধিক পরিমাণে।

আমার দাঁড়াবার সময় ছিল না। তবুও জয়পুরের সুপ্রসিদ্ধ এবং অদ্বিতীয় চিকিৎসক ডাঃ গিরিজানাথ সেনের জন্য একবার থমকিয়ে দাঁড়ালুম। ইনি জয়পুরের প্রাক্তন মহারাজার প্রধান মন্ত্রী স্বর্গত সংসারচন্দ্র সেনের পৌত্র, এবং সুলেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবীর সহোদর। স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা, ডাঃ সেন হলেন জয়পুরের 'বিধান রায়!!' ইনি আপন যোগ্যতা ও কর্মশক্তির বলে গভর্নমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের নানাবিধ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেছেন। এই সেন পরিবার দিল্লী এবং জয়পুরে অদ্যাবধি বিশেষ প্রভাবশালী।

বোধ হয় ত্রিশ বত্রিশ বছর পরে গিরিজার সঙ্গে দেখা। সেই এককালের ছাত্রজীবন! সে পড়াশুনো করেছে কলকাতায়। কবে তার প্রতিষ্ঠা হল, কবে সে প্রভাবশালী হয়ে উঠল, কবে সে মস্ত সংসারের অভিভাবক হয়ে পুত্রকন্যাকে মানুষ করে তুলল,—এসব আনুপূর্বিক জানতে পারিনি। কিন্তু পরস্পরের সাক্ষাতের 'পর উভয়ে যখন আলিঙ্গনাবদ্ধ হলুম, দেখলুম গিরিজার কোনও পরিবর্তনই হয়নি!

পরদিন সন্ধ্যার গাড়িতে জয়পুর ছেড়ে আজমেরে যখন এসে নামলুম, রাত তখনও দশটা বাজেনি।

সামন্ত যুগের প্রকৃতির সঙ্গে একালের সংঘাত বেধে উঠেছে সমগ্র রাজস্থানে। আজমের তার একটি বড় সাক্ষী। জয়পুর পেরিয়ে যাবার পর থেকে আজও ছোটি

চোখে পড়ে সেটি সর্বব্যাপী শুষ্কতা। এককালে প্রান্তরে-প্রান্তরে বন্য হরিণের পাল এবং ময়ূর-ময়ূরীরা চ'রে বেড়াত। রেলগাড়ির আওয়াজে হরিণের পাল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড় দিত। আজ মাঠে মাঠে একটি হরিণও চোখে পড়ে না। ময়ূরেরা পথঘাটে আর ঘোরে না,—তারা থাকে বনবাগান আর ঝোপ জঙ্গলের নিরিবিলি ছায়ায়,—অনেকটা যেন লোকচক্ষুর বাইরে।

আধুনিক যন্ত্রযুগের ধাক্কা এসেছে আজমের শহরে। জলবিদ্যুতের কারখানার আয়োজন চলছে, খাল বিল আসছে, কলকারখানা ব'সে যাচ্ছে মরুময়দানে, বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠা চলছে, উপনগরী নির্মিত হচ্ছে একটির পর একটি,—প্রাণের আগুন দপদপ করছে আজমের শহরের সর্বত্র। সামনে তারাগড় পাহাড়। সেই পাহাড়ের উপরে গিয়ে দাঁড়ালে শুধু আজমের নয় রাজস্থানের অনেকখানি চোখে পড়ে। তেত্রিশ বছর আগেকার আজমের আজ স্বপ্নকথা মাত্র। আজ মহানূতন ডাক দিয়েছে যেন সবাইকে,—জীবনের সর্বব্যাপী চঞ্চলতা যেন প্রবল চেহারায় দেখা দিয়েছে। আরাবল্লীর সর্বত্র যে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিরোধিতা ছিল, সেটাকে জয় করার জন্য সবাই যেন উঠে পড়ে লেগেছে।

তবু পুরনো ইতিহাস এখনও মোছেনি। সম্রাট আকবর নির্মাণ করেছিলেন তারাগড় দুর্গ,—এটি এখনও মহাকালকে উপেক্ষা করে চলেছে। এর চার কোণে চারটি বিরাট প্রশস্ত মিনার। নগরের উপরে দাঁড়িয়ে তারাগড় দুর্গের বিশাল তোরণদ্বার আজও পর্যটকদের বিস্ময়াহত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মোগল যুগের ভাস্কর্য ও স্থপতিশিল্প আজও অম্লান হয়ে রয়েছে। একথা এখনও আজমেরবাসীরা ভোলেনি, একাদশ শতাব্দীতে গজনীর মামুদ শাহ, এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘোরী সমগ্র আজমেরকে লুণ্ঠন করে প্রায় সর্বস্বান্ত করেছিলেন! কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবর আজমের শহরটিকে ছোটখাটো একটি রাজধানীতে পরিণত করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই বোধ করি আজমের অঞ্চলে ধীরে ধীরে ইসলাম সভ্যতার সঞ্চার হতে থাকে। তাতার, আরব, তুর্কি, ইরানী, পাঠান,—এরা এসেছে অল্পে অল্পে, জায়গা নিয়েছে অতি ধীরগতিতে। আজমের শহরের উপান্তে বোধ করি এদেরই একটি শাখা যে সুপ্রসিদ্ধ বৃহৎ মসজিদটি নির্মাণ করে সেটি দেশী এবং বিদেশীদের চোখে আজও আনে বিস্ময়। এটি স্থাপত্য শিল্পের একটি মহৎ নিদর্শন। এর নামটি বেশ কৌতুকপ্রদ,—"আড়হাই দিন্‌কা ঝোপড়া।' অর্থাৎ 'আড়াই দিনের আস্তানা।'

কবে কোন্ যুগে কা'রা আরাবল্লীর কোলে বালুপাথর খুঁড়ে বিরাট একটি কৃত্রিম সরোবর বানিয়ে আজমের শহরের রুক্ষ স্বভাবকে স্নিগ্ধ সজল ক'রে তুলেছিল, সেই সংবাদ আমার জানা নেই। কিন্তু এর নাম "অন্নসায়র" রেখেছিল কেন, এটি বুঝতে বিলম্ব হয় না। পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান এই অন্নসাগরের তীরে শ্বেতমর্মরের বিশ্রাম প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং তার নামকরণ করেন, 'দৌলৎ বাগ।' এই মনোরম প্রাসাদটি ওই আরাবল্লীবেষ্টিত অন্নসায়র সরোবরটিকে যে রাজকীয় মহিমা দান করেছে, সেটি পরম রমণীয়। এইটি আজ আজমেরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করছে।

সন্ধ্যার দিকে জনতা পরিকীর্ণ একটি মস্ত বাজার-হাটের পথে এসে ঢুকলুম। চারিদিকে যেমনই লোকবসতি, তেমনি পণ্য-বিপণি বেসাতির জটলা। সেই ভিড়ের ভিতর দিয়ে এসে সংকীর্ণ একটি পথের কোণে উপস্থিত হলুম। সামনে কয়েকটি সিঁড়ি বেয়ে উঠলে 'খাজা দরগার' সুবিশাল তোরণদ্বার। ফতেপুর সিক্রির বুলান্দ দরওয়াজার কথা মনে আছে, তাজমহলের গেটটির কথা ভুলিনি,—ওই যার সামনেই লর্ড কার্জনের দেওয়া ঝাড় লণ্ঠনটা আজও ঝুলছে! দিল্লীর জুম্মা মসজিদ মনে মনে দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি আহমেদাবাদের সেই রানী সিপরির মসজিদ, দেখতে পাচ্ছি দৌলতাবাদের ছবি! আমার বেশ মনে পড়ে খাজা দরগা বা 'দরগা শরিফের' প্রবেশপথটি দেখে আমি কতক্ষণের জন্য অভিভূত হয়ে ছিলুম। এবার আজমের আসার প্রধান আকর্ষণ ছিল এই মুসলিম তীর্থদর্শন।

এমন একটি অভাবনীয় পরিবেশের মাঝখানে এসে দাঁড়াব আগে ঠিক ভাবা ছিল না। কিন্তু এই দরগার ভিতরে আমার প্রবেশাধিকার আছে কিনা আগে এটি জানা দরকার। আমাদের তরুণ বয়সে 'লরেন্স অফ আরাবিয়ার' রোমাঞ্চকর সংবাদ আমরা পড়তুম। তিনি ছদ্মবেশে মক্কাতীর্থে যান, কেননা মক্কায় নাকি অ-মুসলমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ বলেই বোধকরি আমার মধ্যেও একদা একটা তাড়না এসেছিল, আমিও যাব মক্কায়,—দেখে আসব সেখানকার অপরূপ দৃশ্য! সেই তাড়না আজও আছে আমার মনে।

আমার সংকুচিত এবং আড়ষ্টভাবকে লক্ষ্য ক'রে জনৈক মৌলবী এগিয়ে এলেন হাসিমুখে। আমি আমার জাতি পরিচয়

বিস্ময়ে। তিনি তেমনি প্রসন্ন মুখে সম্ভাষণ করে বললেন, এখানে সকল জাতি এবং সকল ধর্মের অবারিত প্রবেশাধিকার! নিঃসঙ্কোচে ভিতরে আসুন,—না না, জুতো ছাড়ার দরকার নেই, সোজা চলে আসুন আমার সঙ্গে।

পুরনো সংস্কারবশতই একটু অবাধ্য হলুম। জুতোটা ছেড়েই রেখে গেলুম নীচের সিঁড়িতে। জুতোটা নতুন; তা হোক।

এটি বোধ করি ভারতের সর্বপ্রধান মুসলিম তীর্থ। অনেকে বলেন, এই খাজাসাহেব দরগা বা দরগা-ই-শরিফ—ভারতের মক্কা! কিন্তু এর সত্যাসত্য নির্ণয় করা বা বিচার করার মতো বিদ্যা আমার কম। শুধু ভিতরে গিয়ে পদে পদে আমার এই কথাই মনে হচ্ছিল, এই তীর্থকেন্দ্রটি না দেখলে আমার রাজস্থান ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যেত।

সাড়ে সাতশত' বছর আগে পাঠান রাজত্বের প্রারম্ভকাল কিনা, ঠিক আমার মনে নেই। তবে পৃথ্বিরাজ-জয়চাঁদের যুগ শেষ হবার পর ভারত রাষ্ট্রের কর্তৃত্বলোকে তখন একটি শূন্যতা বিরাজ করছে। সেইকালে মধ্য-প্রাচ্যে যে সাধক এবং মহাপুরুষ সর্বজন-প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর নাম খাজা মুইনুদ্দিন চিস্তি। এই দরগা-ই-শরিফ তাঁরই সমাধিক্ষেত্র। শুধু রাজস্থান বা ভারতবর্ষ বা আজকের পাকিস্তান নয়,—এই পবিত্র এবং পুণ্যময় সমাধিক্ষেত্রটি দর্শনের জন্য মধ্যপ্রাচ্য এবং নিকটপ্রাচ্য থেকেও ধর্ম-পরায়ণ মুসলমানরা ভারতে আসেন। শোনা গেল প্রতি বছরে একটি বিশেষ সময়ে এখানে মস্ত উৎসবের আয়োজন হয়।

দিল্লীতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। দাসবংশের প্রথম আমল। কুতুবুদ্দিনের পর বোধ করি ইলতুতমিস,—সেই সময়কার কথা। সেই থেকে এই খাজা মুইনুদ্দিনকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে দিল্লীর প্রত্যেকটি রাজবংশ। দাস, খিলজি, তোগলক, সৈয়দ, লোদি,—কে নয়? আলাউদ্দিন থেকে আরম্ভ করে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গ-জেব, নিজাম, রামপুরের নবাব, উদয়পুর ও জয়পুরের মহারাজা,—সবাই একে একে যুগে যুগে এই খাজা দরগার সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। এক একজনের নামে এক একটি তোরণ নির্মিত হয়েছে।

প্রথমটা আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। ভিতরে যেন একটি ক্ষুদ্র শহর। কোথাও গান, কোথাও কথকতা, কোথাও বক্তৃতা, কোথাও বা প্রচুর কর্মব্যস্ততা। এটি সাধারণ দিন, কিন্তু যেন উৎসবের তিথি। ভিতরে মসজিদ, বড় বড় কক্ষ, বিশাল এক একটি গম্বুজ। সন্ধ্যার আলোয় চারি-দিকের মূল্যবান ও বর্ণাঢ্য পাথর জ্যোতি বিকীর্ণ করছে। সামনে মস্ত গদি। প্রকাণ্ড বিছানার উপর যাঁরা বসে রয়েছেন তাঁদের দেখে সম্ভ্রম জাগে। সেখানে বহু-লোক। আতর, গোলাপ, ধূপ, ধুনো, কুঙ্কুম চন্দন ফুল এবং বিভিন্ন সুগন্ধির বাতাস বইছে। আমার গাইড সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন, কি প্রকার পুজো আপনি দিতে চান?

আমার জীবনে এটি নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমি যে একটি শ্রেষ্ঠ মুসলিম তীর্থে এসে এই অভিজ্ঞতা লাভ করলুম, এতেই আমার আনন্দ। সুতরাং মুখে বললুম, আপনাদের যেরূপ নিয়ম আছে তাই করুন?

গাইড সাহেব বললেন, আপনি আড়াই টাকা এখানে জমা দিন।

আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলুম। তিনি বললেন, এবার আসুন আমার সঙ্গে।

আমার মনে পড়ছিল রুক্মিণী-দ্বারকার মন্দিরের কথা; ভাবছিলুম মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির; মনে আসছিল শ্রীক্ষেত্র। সকল তীর্থে প্রায় একই কথা। খৃষ্টানদের বেলাতেও সেই রেভারেণ্ড, বৌদ্ধের বেলায় ভিক্ষু, হিন্দুর বেলায় পাণ্ডা-পুরোহিত, এখানে মৌলবী বা মৌলানা।

একটা অবাস্তব স্বপ্নলোকের মধ্যে আমি যেন এসে পড়েছিলুম। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল সমাধি মন্দিরের ভিতরে। সে কক্ষটি তেমন বড় নয়। মূল সমাধিটি রেলিং ঘেরা, উপর দিকটি মনিমুক্তা জড়োয়া ও জহরতের দ্বারা আবৃত। স্বর্ণ ও রৌপের বৃহৎ সম্ভার সর্বত্র। কিন্তু হীরা, মুক্তা, চুনি, পান্না এবং অন্যান্য জহরৎ সমস্ত কক্ষটিকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। তাদেরই মাঝখানে লাল, কালো, রক্তনীল, পীত-লোহিত প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের মখমলের সঙ্গে জড়োয়া জহরতাদির যে দীপ্তি ও জ্যোতির্লেখন সেই কক্ষে ক্ষণে ক্ষণে উদ্‌ভাসিত হচ্ছিল,—আমি সেজন্য দিশাহারা বোধ করছিলুম। বলা বাহুল্য, আমিও সকলের সঙ্গে সেই সমাধি প্রদক্ষিণ শুরু ক'রে দিলুম। কেউ যদি তখন আমার কানে কানে বলত, এই মূল সমাধি মন্দিরের কক্ষটিতে কোটি কোটি টাকার হীরামুক্তা জহরৎ বর্তমান, আমি অবিশ্বাস করতুম না। বরং সমগ্র দরগা-ই-শরীফ পর্যবেক্ষণ করে এই কথাই মনে হয়েছিল, সমস্তটা মিলিয়ে কত কোটি টাকার সম্পদ হতে পারে তার পরিমাপও কেউ জানে না! সেদিন সন্ধ্যায় মাত্র এক ঘণ্টায় এই সুবৃহৎ দরগার প্রত্যেকটি মহল দেখে শেষ করা সম্ভব ছিল না। এটি যেন এক বিরাট দুর্গ, এবং এই প্রাকারবেষ্টিত দুর্গে দশ বিশ হাজার নর-নারী অতি অনায়াসে ঘোরাফেরা করতে পারে।

ফিরবার পথের একপাশে একটি অন্ন-ভোগের ক্ষেত্র দেখলুম। সেখানে দুটি সুবৃহৎ রান্নার কড়াই দেখে থমকিয়ে গেলুম। সেই দু'টি বৃহদাকার কড়াইয়ের মাপ কি প্রকার সেটি বোঝাবার জন্য এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কড়াই দুটিতে এক-সঙ্গে মোট একশ' আশী মণ চাউলের ভাত ফোটে। পালপার্বণ উপলক্ষ্যে সেই অন্ন ও তার উপযুক্ত ব্যঞ্জন সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। একজন বয়স্ক ব্যক্তি অনায়াসে একটি কড়াইয়ের মধ্যে সাঁতার কাটতে পারে।

এত বড় বিরাট একটি সমাধিসৌধ এমন একটি জনবহুল সংকীর্ণ পথের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে তার জগৎজোড়া খ্যাতি নিয়ে,—এটি ভাবতে সেদিন আমার ভাল লাগেনি।

নিজের জীবনের উপর দিয়ে যখন নিজেরই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে,—তখন তার কৌতুক খানিকটা উপভোগ করি বৈকি। তেত্রিশ বছর আগে আজমেরে প্রথমবার পদার্পণ করেছিলুম, কিন্তু সেদিন চোখ খুলে দেখিনি আজমের কেমন! শুধু সেই আজমেরের পথের ভিতর দিয়ে আরাবল্লী পেরিয়ে পুষ্কর সরোবর এবং তার অপর পারবর্তী সাবিত্রী পাহাড় দেখে সেদিন চলে গিয়েছিলুম। মাঝখানে কেবল মনে আছে সেকালের সেই কর্কশ ধূলিরুক্ষ কঙ্কর প্রস্তরাকীর্ণ আরাবল্লীর জনহীন পথ। সেদিন একা ছিলুম না, দলবলের সঙ্গে ছিলুম। কিন্তু একথা মনে আছে, ওই জনশূন্য প্রাণীশূন্য এবং তৃণাদিশূন্য আরাবল্লীর মরুপাথরের জটলা পেরিয়ে রাজ-স্থানী ডাকাতরা আসত যাত্রীদেরকে লুটে করতে! সেদিন ওই আট নয় মাইল পথ অতিক্রম করার জন্য টাঙ্গাগাড়ির চালক পর্যন্ত প্রাণপণ ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড় পেরিয়ে যাবার সময় এই কথা বলত, আপনারা যাত্রীরা এবার একটু সজাগ সতর্ক হয়ে বসুন, এ পথটা তেমন নিরাপদ নয়।

কী কারণে নিরাপদ নয়, এটি জানবার চেষ্টা না ক'রে ওই গাড়ির মধ্যেই যাত্রীরা দুর্গানাম জপ আরম্ভ করে দিত। পাথুরে পথের নাম ছিল চাটান, এবং সেই চাটানের উপর দিয়ে ঘড়ঘড়িয়ে ছুটত টাঙ্গাগাড়ি। শীর্ণ ঘোড়াগুলি সেদিন মার খেতে খেতে আধমরা হত! পথের সর্বত্র খানা খোন্দল, পাথরের বড় বড় ডেলা, বালুর রাশি, অসমান উঁচু-নীচু,—আট মাইল পথ পেরোতে লাগত চার ঘণ্টারও বেশি। রুক্ষ ও আরক্তিম আরাবল্লীর চেহারা দেখে সেদিন ভয় করত বলেই পাণ্ডারা জানিয়ে দিত, 'পুষ্কর দুষ্কর!' পথটি কষ্টসাধ্য ছিল বলেই বোধ করি তীর্থের মাহাত্ম্য স্বীকৃত হত!

স্টেশনের দোতলার রেস্ট হাউস থেকে সকালের দিকে প্রথম চোখে পড়ল, আজ-মেরের বৃহৎ প্রাচীন রক্তিম দুর্গ, 'তারা কিল্লা!' তারই উপর সেই পুরাতন কালের প্রাসাদ,—যার জৌলস নেই বটে, কিন্তু শক্তি আজও দৃঢ়। এই দুর্গটি এখন সরকারি কাজে ব্যবহৃত হয়। আজমেরের চতুর্দিকে

আরাবল্লী গিরিশ্রেণীর যেন শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। বালু, কাঁকর, পাথর, গহ্বর ও অন্তহীন ধূলিরাশির দিকে চেয়ে বার বার মনে হয়, পৃথিবীর কোনও ভূভাগে আরাবল্লীর মতো এমন নিষ্প্রয়োজনীয় গিরি-শ্রেণী আর নেই। এই গিরিশ্রেণীর আদি, অন্ত, মধ্য—কোনটারই যেন কোনও সঠিক পরিমাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজস্থানে, পাঞ্জাবে বা মধ্যভারতে এই আরাবল্লীর শিরা উপশিরা যেখানেই ছড়িয়েছে, সেখানেই যেন এক একটি শহর এরই অনুপ্রবেশের ফলে শ্রীহীন হয়ে উঠেছে। এই আরাবল্লীর জন্য দিল্লীর নগর-পরিকল্পনা কিরূপ ব্যাহত হচ্ছে এবং জলনিকাশের সমস্যা কিরূপ জটিল হয়ে উঠেছে, ভুক্তভোগীরা সেটি জানেন। বর্ষার দিনে দিল্লীর দুরবস্থার কথা কে না জানে।

সেই আজমের আজকে আর নেই। তার খোল-নলচে গেছে পাল্টিয়ে। চারিদিকে যেন মনোরম উদ্যান-নগরী গড়ে উঠেছে,—যেমনটি দেখে এলুম নতুন কালের জয়পুরে। যতদূর এদিক ওদিক চেয়ে দেখো, প্রান্তরের সেই রুক্ষতা হারিয়ে গেছে, এসেছে সবুজের শ্যামলাভা। বড় বড় প্রাসাদ উঠেছে, অজস্র জলের ব্যবস্থা হয়েছে,—মানুষ এসে পৌঁছিয়েছে যুগান্তরে। পূর্বে রাজস্থানের দিকে তাকালে আজকে আর চোখ জ্বালা করে না, বরং জুড়িয়ে যায় দুই চোখ।

আজকে পিচঢালা চিক্কণ ও মসৃণ রাজপথ দিয়ে মোটরবাস যাচ্ছে পুষ্করে। সেই একই পথ,—তবু সেই পথ নয়! রাখালী যেন হয়ে উঠেছে রাজরানী,—ভাগ্য তার ফিরেছে যেন যাদুমন্ত্রে! কোথায় মিলিয়ে গেছে সেই চাটান, সেই শীর্ণ ঘোড়াটানা টাঙ্গা, সেই ভয় আর উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তা! চার ঘণ্টার টাঙ্গাপথ,—যেন দেখতে না দেখতেই শেষ হয়ে গেল! আগে পুষ্কর ছিল একটি তীর্থ গ্রাম, একটি বস্তিমাত্র,—যেখানকার বালুপাথরের স্তূপের আশেপাশে ঘুরে বেড়াত অগণিত ময়ূর নেড়িকুকুরের মতো, এবং যাত্রীদের হাত থেকে ছোঁ মেরে পুরির ঠোঙ্গা কেড়ে নিয়ে যেত। আজ একটি ময়ূর কোথাও নেই! বালুপাথরের চিহ্নমাত্র নেই এই ছোট্ট শহরটিতে। প্রাণ ধারনের উপযোগী যে দু'একটি খাবারের দোকান এখানে ওখানে টিমটিম করত, আজ তাদের জায়গায় ব'সে গেছে মস্ত বাজার, বড় বড় মহাজনী গদি, পণ্য বিপণির ছড়াছড়ি চারি-দিকে। সমগ্র পুষ্করদিঘীর চতুর্দিকে বিরাট এক একটি অট্টালিকা দাঁড়িয়ে উঠেছে। পাথরের সিঁড়ি বাঁধানো সুদীর্ঘ সোপান-শ্রেণী সমগ্র পুষ্করকে যেন বেষ্টন ক'রে রেখেছে। সেই দারিদ্র্য ও জনবিরলতা, সেই নিরানন্দ ও নিঃসঙ্গ নৈরাশ্য কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পুষ্কর শহরটির পরিচ্ছন্ন পথঘাটগুলি যেন চেখে-চেখে বেড়াবার বাসনা হচ্ছিল। এখানকার হাজার হাজার নরনারী ত' চলতি কালের মানুষ! ওদের মধ্যে আমিই যেন কেবল জানি এই পুষ্করের সেকালের ইতিহাস! আজকের মতো ইলেকট্রিক ছিল না সেদিন। সন্ধ্যার পর তেলের আলো জ্বলত টিমটিম ক'রে। বড় বড় কুমীর ঘাটের নীচে এসে ওত পেতে থাকত, এবং সুবিধা পাবামাত্রই যখন কোনও অসতর্ক যাত্রীর ঠ্যাংটি ধ'রে অগাধ জলে তলিয়ে যেত, তখন শোকাকুল সহযাত্রীরা এই বলে বিলাপ করত যে, কুম্ভীর-রূপী স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুই উক্ত পাপীকে প্রপঞ্চময় মিথ্যা মায়ার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে মোক্ষলাভের পথে নিয়ে গেছেন! পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যফল!

ব্রহ্মা এবং গায়ত্রীর মন্দির দেখে আমি অবাক। মস্ত বাগান চারিদিকে। মার্বেল পাথরের বিরাট মন্দির, নাটমন্দির তার কোলে। মনে পড়ছে ব্রহ্মা আর গায়ত্রীর অন্ন জুটত না একদিন! কাপড়ের টুকরোর অভাবে ওদের মান রক্ষা হত না! প্যাঁড়া আর ফুল, বড় জোর দুটো পোকাধরা মেওয়া, তিন-আঙ্গুলে গোটা দুই আলো-চাল,—এই ছিল স্বামীস্ত্রীর ভোজ্য! জীর্ণ মন্দিরের ফাটলে ছিল বট-অশ্বত্থের শিকড়ের জটলা। যাত্রীদের দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। দরিদ্র পান্ডারা ছিনেজোঁকের মতো লেগে থাকত যাত্রীদের সঙ্গে। পুজো সারা হত দু'চার আনায়, না হয় দুটো টাকায়। কিন্তু 'সুফল' লাভের দরুণ মাথা পিছু বেশ কয়েকটি টাকা না দিলে পুষ্কর থেকে একদা বেরোনো কঠিন ছিল!

আজ ব্রহ্মা এবং গায়ত্রী ভিতর থেকে হাসছেন! মর্মরনির্মিত অট্টালিকা। ষোড়শ উপচারে অন্ন। অঙ্গে অঙ্গে জড়োয়া অলঙ্কার। রঙ্গীন রেশমের পোশাক। প্রজাপতি ব্রহ্মার চেহারায় আত্মগৌরবের দীপ্তি! সেদিন আর নেই! ঐশ্বর্যে, আড়ম্বরে, আভিজাত্যে, আত্মাভিমানে,—স্বামীস্ত্রীর চেহারা যেন দপদপ করছে! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ও'দেরও অবস্থা ফিরেছে!

আমি ভুলিনি সেই এককালের শীর্ণ প্রসন্নমুখ বৃদ্ধ পান্ডা শ্যামসুন্দরকে। দরিদ্র ঝুপসি একটি ঘরে সেই শ্বেতশ্মশ্রুশোভিত বৃদ্ধ আমাদের সকলকে একদা নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছিল। এ ছাড়া আমাদের ফাই-ফরমাস এবং দেখাশোনা করার জন্য একটি তরুণী পরিচারিকা নিযুক্ত করেছিল। সেই বৃদ্ধ ছিল বিশেষ পণ্ডিত, স্বল্পে তুষ্ট, মধুর প্রকৃতি এবং স্নেহশীল। আজ নিশ্চয় সে কোথাও নেই, কিন্তু পুষ্কর তীরবর্তী সেই ঝুপসি ঘরখানা এবার খুঁজে পেলুম না! ঘাটের ধারে বসলুম, পাথরের সিঁড়িতে গা এলিয়ে একটু গড়িয়ে নিলুম। কিন্তু মোটা একখানা খাতা নিয়ে আজ কাছে আর কেউ এলো না, পাপের ভয় এবং পুণ্যের লোভ কেউ দেখাল না, ব্রহ্মা ও গায়ত্রীর পুজো কেউ চাইল না! শুধু টেবিল পাতা বড় বড় হোটেলে—যেখানে সাংঘাতিক কলরব তুলে রেডিয়ো-লাউড-স্পীকারে বোম্বাই সিনেমার কামসঙ্গীত গাওনা চলছে,—সেখানকার বয়-রা আমাকে বেশ ভোজন রসিক খরিদ্দার মনে ক'রে হাতছানি দিয়ে ডাকছে!

বৃদ্ধ শ্যামসুন্দর একদা আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল পুষ্করের ওপারে কিয়দ্দূরবর্তী সাবিত্রী পাহাড়ে। বালুপাথরে আকীর্ণ সেটি মরুভূমির পথ, বালুর মধ্যে বড় বড় মোটা ছুঁচের মতো কাঁটা,—সে কাঁটা অবিশ্রান্ত পায়ের তলায় ফুটতে থাকে। জুতো পায়ে হাঁটলে বালুর মধ্যে জুতো ডোবে,—তখন সবটাই অচল। খালি পায়ে হাঁটলে কথায় কথায় রক্তপাত! কৌতুকের বিষয় এই, মাইলখানেক মাত্র ওই মরুপথ, পাহাড়ের চূড়া অবধি হয়ত আর মাইল দেড়েক,—কিন্তু সেদিন ওই মরুপথটি যথেষ্ট সহজসাধ্য ছিল না! যারা প্রত্যুষ-কালে গিয়ে সাবিত্রী দর্শন ক'রে ফিরে আসত, তারা লাভবান হত সকল দিকে। বেলা আটটার পর মরুভূমির রৌদ্র হয়ে ওঠে প্রখর এবং কষ্টদায়ক।

আমাকে যেতে হল বেলা দশটার পর। রৌদ্র তখন টা টা করে উঠেছে। মাঠের পথে নেমে বুঝলুম, এটি পুষ্কর নগরীর বহি-প্রান্ত—এটি এখনও উন্নয়ন পরিকল্পনার

াজতার আসেনি। প্রথম দিকে বালু-পাথরের পরিমাণ আগের চেয়ে কিছু যেন । কিন্তু পথ তেমনি কষ্টদায়ক। তরুণ শই বয়সের প্রবলতর উদ্দীপনা এবং লোহ আজ নেই, সেজন্য গতি আমার কছু মন্থর। কিন্তু ঔৎসুক্যের মৃত্যু কি য়েছে? স্থির থাকতে দেয় না কেন ন্তহীন সেই আদিম কৌতূহল? মন তমনি ছুটে চলে, কিন্তু দেহ তার' সঙ্গে উতে গিয়ে জন্তুর মতো জিহ্বাগ্র বার রে হাঁপায়।

পায়ের তলাকার বালু বেশ গরম হয়ে য়েছে। রৌদ্রের ঝাঁঝ প্রখরতর হয়ে ওঠে দ্রে তপ্ত বাষ্পে। জয়শলমেরের দিগন্ত াড়া 'থর' মরুভূমির মধ্যেও দেখেছি, য্য উদয় হবার অল্পকালের মধ্যে গরম হয়ে ঠে মরুশ্বাস। রতনগড়-বিকানেরে তাই, াধপুর-ফালোদি বা পোকারণেও তাই। াজ আমার সুবিধা ছিল এই, সাবিত্রীর থে এখন জনপ্রাণী কেউ নেই। সুতরাং আর নির্বন্ধিতা নিয়ে কোথাও া উঠছে না! আমি একাই ছিলুম। কিন্তু রৌদ্রদগ্ধ মরুপথ ঃসঙ্গ হলে মন যেন কেমন হম করতে থাকে। ওই বালু পাথরের তর থেকেই পথের দু পাশে দুটি বৃহৎ ও অশ্বত্থ তাদের দীর্ঘ ছায়া বিস্তার ক'রে ছে। ওর পরে আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। সামনের দিকে পাহাড়ের চূড়ার উপরে শুধু দেখা যায় সাবিত্রীর শ্বেতবর্ণের মন্দিরটি। উচ্চতায় মোটামুটি হয়ত পাঁচশ' ফুট হবে। হয়ত বা তার চেয়ে কম। কিন্তু চড়াই পথটি কষ্টদায়ক।

প্রথম যাদের সঙ্গে এই পাহাড়ে এসে-ছিলুম তাদের অনেকেই আজ জীবিত নেই। এই পথে দুঃখ এবং আনন্দ ছিল, সেই জন্য পুরাতন স্মৃতির সঙ্গে একটি সজল মধুর বেদনা জড়িয়ে রয়েছে। আজ এই কর্কশ বন্ধুর প্রস্তর জটলা অতিক্রম ক'রে উপরে উঠবার সময় সেই সেদিনের মানুষেরা অশরীরী ছায়ার মতো যেন আমার সঙ্গ নিয়েছিল! এই অগ্নিক্ষরা রৌদ্রের তপ্ত-শ্বাসের মধ্যে আমি যেন সেই তাদের সকরুণ স্নেহস্পর্শ লাভ করছিলুম। চারিদিকের দিগন্ত জোড়া বালুসমুদ্রের মাঝখানে এই রুক্ষস্বভাব ও ক্লান্তিদায়ক সাবিত্রী পাহাড়ের চড়াইপথের এক একটি ধাপ ধীরে ধীরে বেয়ে এক সময়ে উপরে উঠে এলুম। রৌদ্রের খরতাপে ঘর্মাক্ত হয়েছিলুম।

মন্দিরের চত্বরটি সমতল। এটি ক্ষুদ্র একটি মালভূমি। একপাশে পূজারীদের বসবাসের জন্য ছোট দু'একটি ঘর। আশে-পাশে কয়েকটি গাছপালার ছায়া স্নেহাশ্রয়ের মতো এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি গিয়ে সাবিত্রীর ছোট মন্দিরটির সামনে দাঁড়ালুম। সেই সেকালে এই একই সুশ্বেতা দেবীমূর্তিটি দেখে গিয়েছিলুম! সেই অম্লান ও সুন্দর দুটি স্ফটিকের চক্ষু, মুখখানিতে তেমনি প্রসন্ন মধুর হাসি। এই ছাঁদের সকল মূর্তি নির্মিত হয় জয়পুরে, এবং এদের বলা হয় জয়পুরী মূর্তি। মন্দিরের প্রবেশ পথে বহু বাঙ্গালী যাত্রীর নাম ও ঠিকানা খোদিত রয়েছে। বাঙ্গালী সমাজে সাবিত্রীর স্পর্শকরা শাখা-সিঁদুর ও নোয়া বিশেষভাবে সমাদৃত। সাবিত্রীর বামপার্শ্বে মহাশ্বেতার সুন্দর একটি মূর্তি।

ছোট ঘরটি থেকে এক অতি বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন। আমি পরিশ্রান্ত, তিনি বোধ করি বুঝতে পেরেছিলেন। আতস কাঁচের চশমা তাঁর চোখে। তিনি গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে সামান্য মিষ্টান্ন এবং একলোটা ঠাণ্ডা জল নিয়ে এলেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে আমার প্রণামী নিবেদন করলুম। তিনি বললেন, বেটা, ঠেণ্ডে হো যাও!—ওই গাছ-তলায় মুখ হাত ধোবার জল আছে! ছায়ার তলায় গিয়ে একটু বিশ্রাম করে নাওগে।

আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলুম। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে যখন সামনে দাঁড়ালুম তখন বৃদ্ধা বললেন, আমার ছেলে এখানে পূজারী! অব মেবে লড়কেভি বুড়চে বন গৈ! মেরে উমর শ' বর্ষ হোতা হ্যায়।

প্রশ্ন করলুম, আপনি কতদিন এখানে আছেন?

বৃদ্ধা হাসিমুখে বললেন, বাস, এবার যাবার ডাক আসবে! বেটা, আমি এখানে সত্তর বছর আছি!

এতক্ষণে আমার সংশয় ঘুচল। একদা যখন আমার জননীর সঙ্গে প্রথম এখানে এসেছিলুম, এই মহিলাকেই তখন প্রবীণ বয়স্কা দেখে গিয়েছিলুম! ঝাপসা-ঝাপসা মনে পড়ছে বটে।

উপরে জলের সরবরাহ কোথাও নেই! জল আসে নীচের পুষ্কর সরোবর থেকে। পানীয় জল প্রতি কলসের মূল্য আট আনা পড়ে। সুতরাং আমি স্বেচ্ছায় একটি সম্পূর্ণ দিনের পক্ষে প্রয়োজনীয় জলের ব্যয়ভার বহন করলুম। যে সকল যাত্রী প্রভাতকালে এখানে এসে সারাদিনমান অতিবাহিত করতে চান তাঁদের আহারাদি ও বিশ্রাম নেবার যথাসম্ভব ব্যবস্থা আছে। উপর থেকে পুষ্করের ছবিটি সুন্দর দেখা যায়।

ঘণ্টাখানেক পরে প্রখর মধ্যাহ্ন রৌদ্রেই ফিরব মনে করে যখন বৃদ্ধার নিকট বিদায় নিয়ে নামছিলুম, তখন ডানদিকে পাথরের ফাটলের ধারে কয়েকটি বন্যচারার জটলার মধ্যে পতঙ্গের গুঞ্জন শুনে থমকিয়ে গেলুম। বিশ্বচরাচরের উপর মধ্যাহ্নের সূর্য তখন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। দিবা-ভাগে পৃথিবী এমন নিশ্চুপ, এমন স্তব্ধ নিশ্চুপ—মরুপর্বতের উপর না এলে হয়ত সেটি বোঝা যায় না। এই সর্বব্যাপী নৈঃশব্দ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সহসা মনে হল, পতঙ্গের পরিচিত গুঞ্জন ঠিক এটি নয়, —এর মধ্যে একটি ঐকতানিক বাদ্য নিহিত। সুতরাং রৌদ্র একটু বাঁচিয়ে পাথরের চাটানের উপর বসলুম।

একটি কাঁটা ফুলের ছোট গাছের পাতায় ছোট ছোট নীল, হলুদ ও সবুজ বর্ণের পাঁচ-সাতটি ফড়িং বসেছে। একটি তার মধ্যে অতি মিহি মিষ্ট আওয়াজ তুলছে, অন্যটি তাল দিচ্ছে। তৃতীয়টি বাঁশী, চতুর্থটি হারমোনিয়াম, পঞ্চমটি ঝুমুর ঝুম, ষষ্ঠটি জলতরঙ্গ, সপ্তমটি করতাল, অষ্টমটি...

আমি শুধু অভিভূত নয়,—দিশাহারা! ওদের মধ্যে এক এক সময়ে একটি দুটি উড়ে যাচ্ছে, আবার দু'একটি এসে ব'সে পড়ছে! প্রতিটি পতঙ্গের আওয়াজের মধ্যে সুরের এই সঙ্গতি এবং বৈচিত্র্য, অপরপক্ষে এই ঐকতানিক সুষমা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা,—আমাকে যেন এই মরুপ্রকৃতির আরেকটি রহস্যতোরণের সামনে এনে বসিয়ে দিল। এ আমার নতুন অভিজ্ঞতা!

কোথাও যাবার তাড়া আমার নেই। সুতরাং গায়ের জামাটা খুলে চাটানের উপর পেতে একটু গড়িয়ে নিই ততক্ষণ। গাছ-গুলির ছায়ার নীচে হাওয়া দিয়েছে ফুর-ফুরিয়ে। পতঙ্গদলের ঐকতানবাদ্য কিছু-কালের জন্য মন্ত্রপাঠ করুক আমার কানে কানে। চোখ বুজে শুনি।
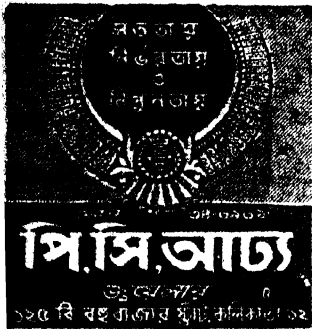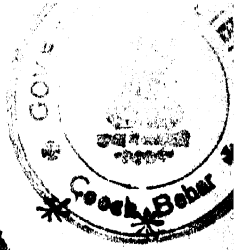
স্বপ্নলীনা

আশাপূর্ণা দেবী

একটু আগে ঘড়ি দেখেছে কঙ্কা। রাত আড়াইটে।

বিমানের মাথার কাছ থেকে আস্তে উঠে এল, গলির দিকের জানলাটা খুলে দাঁড়াল। নীচের তলার ঘর, জানলাটায় তারের জাল, তবু বিমান খুলতে দেয় না। বলে, জানলার নীচের খোলা ড্রেন থেকে গ্যাস উঠে ওর জীবনীশক্তি কমিয়ে দেবে।

জীবনীশক্তি!

জানলার দিক থেকে বিমানের দিকে একবার চোখ ফেরাল কঙ্কা।

পা থেকে গলা পর্যন্ত চাদর ঢাকা রয়েছে বিমানের, কঙ্কাই ঢেকে দিয়েছে একটু আগে। ঢেকে দিয়ে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে পাতলা ওই চাদরটার নীচে ঠিক যেখানটায় বিমানের হৃৎপিন্ডটা সেখানটা সামান্যতমও একটু ওঠাপড়া করছে কিনা। চাদরটা নড়ে নড়ে উঠছে কিনা।

না, নড়ছে না।

অদ্ভুত রকমের স্থির হয়ে গেছে যেন।

আর একবার ভাবল, জীবনীশক্তি!

হাসল একটু।

আবার মুখ ফেরাল গলির দিকে।

কঙ্কার জীবনীশক্তি এত প্রচুর কেন! কঙ্কা যে সারাজীবন খোলা ড্রেনের মুখোমুখি বসে আছে, তার পাঁক থেকে নিশ্বাস নিচ্ছে, তবুও কঙ্কার জীবনীশক্তি কমে যাচ্ছে না। তবুও সমস্ত দিন অকথ্য পরিশ্রম করে, সমস্ত রাত জেগে ঘুরে বেড়াতে পারে কঙ্কা।

রাত আড়াইটে।

সাহাবাড়ির ছাতের পাঁচিলের কোণ থেকে আস্তে উঁকি মারল সে। ক্ষয়রোগগ্রস্ত পান্ডুর মুখে এক চিলতে মৃত বিবর্ণ হাসি হেসে ইশারায় হাতছানি দিল কঙ্কাবতীকে।

কঙ্কা দেখতে পেল সেই পান্ডুর মুখের বিবর্ণ হাসিটা যেন অশরীরী আত্মার হতাশ নিশ্বাসের মত ছড়িয়ে পড়ল সাহাবাড়ির ছাত থেকে মল্লিকদের ভাঙা দেয়ালে, বিমলাদের রোয়াকের কিনারায়। আরো নেমে এল। কঙ্কাদের জানলার নীচের কাঁচা নর্দমার অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

আজ রাত আড়াইটে।

সব দিন একরকম না। দুটো, আড়াইটে, তিনটে যেদিন যখন সময় হয় তার, এমনি করে ছাতের কোণ থেকে ইশারা করে কঙ্কাকে।

কঙ্কা আস্তে পা টিপে ছাতে উঠে যায়। সে বলে, আমার এই অসুখ মুখটা দেখতেই তুমি ভালবাসো দেখি, আমি যেদিন ভাল থাকি, অনেক হাসতে পারি, সেদিন তো কই আমার দিকে তাকাও না। অনবরত বিমানের ওই গাল বসা চোখ কোটরে পড়া রোগে কুৎসিত মুখটা দেখতে দেখতে ওইটেই বুঝি অভ্যাস হয়ে গেছে তোমার? উজ্জ্বল কিছু ঝকঝকে কিছু সহ্য করতে পার না!

কঙ্কা কিছু বলে না।

শুধু স্বপ্নাচ্ছন্নের মতন তাকিয়ে থাকে। না, মাঝে মাঝে কিছু ভাবেও কঙ্কা। ভাঙা-চোরা এবড়ো-খেবড়ো আলসের ঘেরা ওদের ওই একতলা ঘরের ছাতটায় স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ঘুরতে ঘুরতে ভাবে, সাহাদের বাড়ির ছাতের কোন থেকে নিঃশব্দ পায়ে কে যেন নেমে আসছে, মুখ দেখা যাচ্ছে না তার, আগাগোড়া কেমন যেন একটা কালো কাপড়ে মোড়া। সে নেমে এল, কঙ্কার ওই তারের জাল ঘেরা জানলার নীচে থমকে দাঁড়াল, দেখল কঙ্কা ঘরে নেই, বিমান শুয়ে আছে। ঘুমচ্ছে ঘুমের ওষুধ খেয়ে। ওর পাতলা প্লাস্টিকের চাদরের মত টান্ টান্ পাতলা চামড়া ঢাকা হাড়ের খাঁচাখানার মধ্যে হৃৎপিন্ডটা ধুক ধুক করছে।

কঙ্কা ঘরে নেই তা তো দেখেই এসেছে কালো কাপড় মুড়ি দেওয়া লোকটা। দেখে এসেছে ছাতে বেড়াচ্ছে কঙ্কা। তাই সাহস বেড়েছে।

জানলার ধার থেকে অদ্ভুত কৌশলে ঢুকে গেল ও ঘরের মধ্যে। বিমানের মাথার কাছে দাঁড়াল, বিমান টের পেল না। ও ছায়ার মত হালকা হাতখানা বাড়াল, বিমান জানতে পারল না, ধুক ধুক করা হৃৎপিণ্ডটা মুঠোয় করে চেপে ধরল, চাপ দিল, আরও চাপ দিল, হিঁচড়ে টানল, ছিঁড়ে তুলে আনল। তারপর মুঠোয় চেপে নিয়ে যেমন করে এসেছিল তেমনি করে বেরিয়ে গেল।

বিমান বুঝতে পারল না।

অনেকক্ষণ পরে কঙ্কা নীচে নামল। ঘরে ঢুকল, বিমানের মাথার কাছে দাঁড়াল একটুক্ষণ, তারপর হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠল,—'ও মাগো, কখন এমন হল, আমি তো বুঝতে পারিনি!'

ওর চীৎকারে সবাই উঠে এল বাড়ির মধ্যে থেকে। অনেকে ছুটে এল বাড়ির বাইরে থেকে। সবাই বলল, 'আহা চোরের মতন কখন এসে অমূল্য ধন চুরি করে নিয়ে গেল বোমা!'

ছাতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এই সব ভাবে কঙ্কা। অগাধ ছাত নয়, দু'খানি ঘরের মাথা। এরই এক কোণে আবার গোছানো তরঙ্গিনীর সংসারের কয়লার গুঁড়ো, নারকেলের মালা, তালের আঁটি, আখের খোলা, ভাগ করে করে জড় করা আছে।

ওইগুলো বাঁচিয়ে হাত কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি।

কিন্তু ভাবনাটাকে যত ইচ্ছে দৌড় করাতে তো আর জায়গা লাগে না। আরো পাঠিয়ে দেয় কঙ্কা ভাবনাটাকে। ভাবে তারপর কঙ্কাও এক রাতে অমনি কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে গলির দিকের দরজাটা খুলে ফেলবে, ছায়ামূর্তির মত নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে দৌড়তে থাকবে ঘুমন্ত রাস্তার ওপর দিয়ে।

দৌড়বে শুধু দৌড়বে।

কোথায় গিয়ে থামবে তা জানে না। আর ভাবতে পারে না। আকাশের ওই মরা মরা আলোর ওপর নতুন দিনের আলোর আভাস এসে পড়ে। কোথায় যেন কাক ডাকতে থাকে বিশ্রী সুরে। রাস্তায় জল দেবার সাড়া পাওয়া যায়। ময়লা ফেলা গাড়িগুলোর চাকার শব্দ ওঠে।

কঙ্কা নেমে আসে।

বিমানের ঘরে ঢোকে।

আর কোথা যাবে, আর ঘর নেই। আর একটা ঘরে তরঙ্গিনী আর বিজয় তিন-চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে শুয়ে আছে। অনেকটা বেলা না হলে ও ঘরের দরজা খুলবে না।

হ্যাঁ, আরও একটা ঘর আছে বটে, রান্না-ঘর। রাতের রান্না আর খাওয়ার কদর্য কুৎসিত চিহ্ন নিয়ে পড়ে আছে। একটু পরে ঠিকে ঝিটা এসে ওই নোংরা নোংরা বাসনগুলো ঝনঝন করে টেনে নামাবে, ঝাঁটার শব্দ তুলে জল ঢেলে ঢেলে ঘরের মেজেটা ধোবে, তারপর কখন এক সময় যেন চেঁচিয়ে ডাক দেবে—'অ ছোটবৌদি, উনুন ধরে খাঁ খাঁ করছে যে গো!'

কঙ্কা ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলবে, 'যাচ্ছি', তারপর বিমানের হাতে তোয়ালেটা ধরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ওর মুখ ধোওয়ার জল ভর্তি পিকদানিটা তুলে নিয়ে স্নানের ঘরে চলে যাবে।

বিমান পিছন থেকে বিশ্রী ভাঙা গলায় বলবে, 'এত রান্নার তাড়া কিসের! এত পিণ্ডি গেলে কে?'

তা ওর কথাটা কেউ শুনতে পায় না।

তরঙ্গিনী তখনও ওঠে না।

তরঙ্গিনী কেন উঠবে? খোলা ড্রেনের গা ঘেঁষা এই ইঁট বার করা একতলা বাড়িটার সাম্রাজ্ঞী নয় সে? এ সংসারের যত কিছু খরচ, সব বিজয়ের টাকায় নয়?

কিন্তু আজকের কথা আলাদা

আজ একটু আগে বিমানের গায়ের চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে দিয়েছে কঙ্কা, মাথার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, ঢাকা দেওয়া চাদরের নীচে, ঠিক যেখানে বিমানের হৃৎপিণ্ডটা ধুক ধুক করতো সেখানটা কি রকম অদ্ভুতভাবে শান্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু, 'ও মাগো, কি করে এমন হল গো' বলে চেঁচিয়ে ওঠেনি কঙ্কা। উঠবেও না এখন। এই রাত আড়াইটে থেকে সেই ভোর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নিথর থমথমে রোমাঞ্চময় সময়টুকু আস্তে আস্তে বুঝে বুঝে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করবে কঙ্কা।

ছাতে উঠে গেল কঙ্কা।

আস্তে পা টিপে।

সাহাদের বাড়ির ছাতের কোণটা আরো কাছাকাছি এল। কঙ্কাকে যে ইশারায় হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, সে নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে কঙ্কার দিকে চেয়ে রইল।

কঙ্কার মনে হ'ল ও দৃষ্টি কি ব্যঙ্গের? না কি শুধু সকরুণ মমতার?

ও দৃষ্টি কি বলছে, 'কঙ্কা, তুমি এইবেলা পালাও।' বলছে 'কঙ্কা, পৃথিবী বড় শক্ত ঠাঁই, হয়তো আর কোনদিন পালাতে পারবে না তুমি।'

কিন্তু না, কঙ্কা আর ভয় খাবে না।

ও অনুভব করতে পাচ্ছে, এরপর গলির দিকের দরজাটা যখন ইচ্ছে খুলতে পারবে। ঘরে কেউ তাকিয়ে থাকবে না তো কঙ্কার দিকে!

বিমানের সরু চৌকিতে পাতা বিছানাটা ফেলে দেবার পর আর কিছু পাতা হবে না চৌকিটায়।
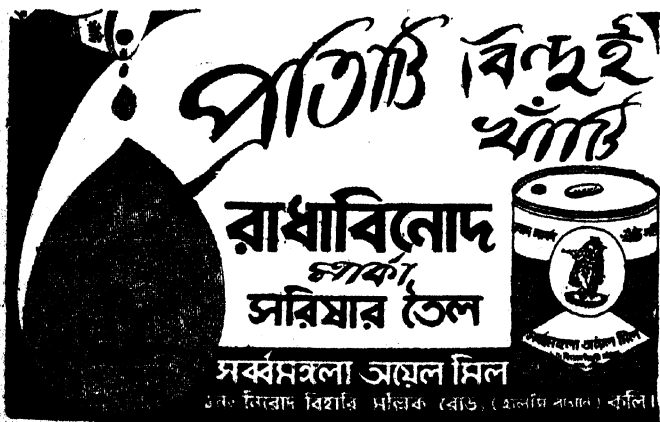
দরজাটা খুলে রেখে এসে আর একবার শুধু চৌকিটায় বসবে কঙ্কা, আস্তে নিজেকেই বলবে, 'আমি চেষ্টা করেছিলাম, অনেক চেষ্টা করেছিলাম।'

এ সমস্তই তো এরপর কঙ্কার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। তবে এখন এই অদ্ভুত রোমাঞ্চময় সময়টুকু বুঝে বুঝে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবে না কেন কঙ্কা?

সাহাদের বাড়ির দিকের আলশেয় মুখ রেখে দাঁড়াল কঙ্কা। দেখল সেই ক্ষয়-রোগগ্রস্ত পাণ্ডুর মুখটা কোথায় যেন সরে গেছে। ওদের চিলেকোঠার আড়ালে না কোথায়।

দেখল সাহাদের মেজ বৌয়ের ঘরে মৃদু ঘুমন্ত নীল আলো জ্বলছে। দেখল ঘরের সীলিঙে বনবন করে পাখা ঘুরছে। ওই হাওয়ার ঠেলাঠেলিতে জানলার নেটের পর্দাটা উড়ছে।

জানলার ধারেই মেজ বৌয়ের বাপের বাড়ির পাওয়া বিয়ের খাট, মোটা মোটা ছত্রি, ভারী ভারী বাজু, কালচে লাল গাঢ়

মেহগিনি পালিশ। তাতে সাদা ধবধবে, বিলিতি নেটের মশারি ঝুলছে। বাতাসে দুলছে, উড়ছে, তবু ভিতরের রহস্য ভেদ হয়ে পড়ছে না। মশারির ঝালরে ভারী ভারী সুতোয় বোনা লেস্।

চোখ ঠিকরোতে ঠিকরোতে চোখে জ্বালা করে উঠলেও কিছু দেখা যায় না। তা এখন আর দেখতে চেষ্টাও করে না কঙ্কা, আগে করতো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকত।

তখন বিমানের অসুখ করেনি।

তখন সারারাত বিমানের মাথার কাছে বসে থাকতে হ'ত না কঙ্কাকে। বিমান তখন অর্ধেক দিন রাতে ফিরত না।

তখন মাঝে মাঝে সাহাদের মেজ বৌ ওদের খিড়কির দরজা খুলে পচাগলি ডিঙিয়ে এ বাড়ি বেড়াতে আসত। হাতি-পাড় শাড়ী পরা ভারীসাড়ি দেহখানি নিয়ে এসে বসে বলত, 'দেখতে এলাম ভাই তোমাকে। জলজ্যান্ত দুদুটো পাশ করা মেয়েমানুষ কেমন দেখতে হয় তাই দেখতে এলুম।'

সেই দেখতে আসাটা অবশ্য ছল, দেখাতেই আসত মেজ বৌ। গহনা কাপড়, স্বামীর সোহাগ। দেখাত, আর মুহূর্তে মুহূর্তে বিস্ময়ের পাথারে ডুবে যেত। বলত, 'ওমা খাট পালংক কিছু নেই তোমার? কেন ভাই বিয়ের সময় হয়নি? দেননি তোমার বাবা? কী আশ্চর্য! খাট বিছানা শাড়ী গহনা না দিলে আবার বিয়ে হয়?'

আবার বলত, 'বিমানবাবু কাল অত রাতে কোথা থেকে ফিরলেন ভাই? নেমন্তন্নে গেছলেন বুঝি? আমরা তো অবাক! রাত দুটো বেজে গেছে, তখন বিমানবাবু দোর ঠেলাঠেলি করছেন।'

কঙ্কা বলত, 'কি কাণ্ড, আপনারাও অত রাত অবধি জেগে ছিলেন? বাড়িতে তো তাহলে আপনাদের দ্বারোয়ান না রাখলেও চলে।'

সাহাদের মেজ বৌ রাগ করে উঠে যেত।

কিন্তু বেশীদিন রাগ করে থাকতে পারত না। নতুন কোনও গহনা গড়ান হলেই রাগ ভেঙে চলে আসতে হতো তাকে। দুটো পাশ করা মেয়েকে নইলে পেড়ে ফেলবে কিসের জোরে?

এসে বসত আর বলত, 'তুমি তো আর যাবে না ভাই, আমিই এলাম মান খুইয়ে।'

এখন আর সাহাদের মেজ বৌ আসে না।

বিমানের অসুখে ওইটুকুই লাভ। পাড়ার কেউ আর আসে না।

বিমানের অসুখটা যে নোংরা কুৎসিত ইতর! ভদ্র সভ্য পরিচ্ছন্ন তরঙ্গিনী নাক কুঁচকে কুঁচকে পাড়ায় পাড়ায় জানিয়ে এসেছে সে খবর।

কিন্তু কঙ্কা জানে কাল ওরা সবাই আসবে। বিমানের ওই গলা পর্যন্ত ঢাকা চাদরটা টেনে মুখ পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া হয়েছে, এ খবর পেলে সবাই আসবে।

সাহাদের মেজ বৌ বলবে, 'ওমা এত অসুখ করেছিল? কই টের পাইনি তো! ডাক্তারের গাড়ি টাড়ি আসা চোখেই পড়েনি। তা কোন কোন ডাক্তার দেখল ভাই?'

আর বিমলা এসে বলবে, 'আহা, সামান্য দুগাছি কাঁচের চুড়িতেও কত শোভা ছিল। তা একগাছা করে হাতে কিছু রেখ বৌদি নইলে বড্ড যেন খাঁ খাঁ করে!'

মল্লিক গিন্নি ওকে কিছু বলবেন না, তরঙ্গিনীকে বলবেন। উনি তরঙ্গিনীর বন্ধু।

তরঙ্গিনী এসে বলবে, 'যা হবার তা তো হয়েই গেল ছোট বৌ, তা বলে না খেয়ে তো আর চিরকাল থাকতে পারবে না? উঠতেও হবে, মুখে দিতেও হবে। ঘরে বসে থেকে আর কি করবে বল? ওঠো, তবু কাজে-কর্মে মনটা ভাল থাকবে।'

এসব কথা কেউ কোনদিন বলেনি কঙ্কাকে, তবু কঙ্কা জানে, কাল থেকে ওরা এইসব বলবে।

কিন্তু কঙ্কা তো আর এই খোলা ড্রেনের গা ঘেঁষা তারের জাল ঢাকা জানলাটায় দাঁড়িয়ে থাকবে না তখন। গলির দিকের দরজাটা খুলে নেমে যাবে। নেমে গিয়ে দৌড়বে, কেবল দৌড়বে। জীবনটাকে নিয়ে যা খুশি করবে।

সবই কঙ্কার হাতের মুঠোয় এসে গেছে এখন। যে কঙ্কার প্রচুর জীবনীশক্তি আছে। সারাজীবন পাঁক থেকে নিশ্বাস নিয়েও যার সে শক্তি ফুরোয়নি।

সাহাদের বাড়ির দিক থেকে সরে এল কঙ্কা। সিঁড়ির ঘরের দেয়ালটায় পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল।

নীচের তলার ঘরটার কথা কিছুতেই আর ভাববে না ঠিক করেছে, তবু কি করে যেন ঘুরে ফিরে সেইটাই মনে পড়ছে।

এখন রাত আড়াইটে, কি তিনটে, কি জানি কত! হয়তো আরও বেশী। হয়তো এই এক্ষুনি রাস্তায় জল দেবার শব্দ পাওয়া যাবে। বিশ্রী সুরে কোথায় যেন কাক ডেকে উঠবে। আর ময়লা ফেলা গাড়িগুলো ঝড়াং ঝড়াং করে ঘুমন্ত শহরের চেতনায় ধাক্কা মারবে।

কিন্তু তখন রাত ছিল মাত্র বারোটা।

তরঙ্গিনী আর বিজয় দরজায় খিল দিয়েছিল, অনেকক্ষণ আগে। এ ঘর থেকেও বিজয়ের নাক ডাকার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

বিমান মশায় ছটফট করছিল।

মশারির ভেতর শোবার উপায় নেই বিমানের—নাকি দম বন্ধ হয়ে আসে। অনেকদিন ভেবেছে কঙ্কা একদিন জোর করে মশারিটা টাঙিয়ে দিয়ে দেখবে, সত্যিই বিমানের ওই ধুক্ ধুক্ করা দমটা বন্ধ হয়ে যায় কিনা।

কিন্তু কিছুতেই সেইটা আর দেখা হয়ে ওঠেনি কঙ্কার। বিমান তার ওই হাড়ের খাঁচাখানার মধ্যে এখনো যেটুকু জীবনীশক্তি আগলে রেখে দিয়েছে তার জোরেই কঙ্কার হাত থেকে পাখার বাতাস খায়, যতক্ষণ না ঘুম আসে।

কিন্তু সবদিনই কি ঘুম আসে?

আসে না।

ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে হয়।

কিন্তু আশ্চর্য, গোড়ায় কিছুতেই সে ওষুধ খেতে চায় না। যেন কঙ্কাকে খাটাবার জন্যেই, নিজে যতক্ষণ পারবে কষ্ট সইবে।

কঙ্কা শিশিটায় হাত দিতে গেলেই খিঁচিয়ে ওঠে বিমান। কর্কশ গলায় বলে, 'হয়ে গেল? পতিব্রতা সতীর পতিসেবা হয়ে গেল? আর পাঁচ মিনিট বাতাস করলে হাত ক্ষয়ে যাবে?'

কঙ্কা আবার পাখাখানা তুলে নেয়।

আজও তাই নিয়েছিল।

গরম আর মশা দুইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল সেই আধভাঙা পাখাটা দিয়ে।

বিমান বলল, 'জল দাও।'

কঙ্কা উঠল, জল দিল।

বিমান বলল, 'গায়ের ঢাকাটা খুলে দাও।'

কঙ্কা খুলে দিল ঢাকাটা।

আরো খানিকক্ষণ উঃ আঃ করল বিমান। তারপর হঠাৎ রেগে উঠে বলল, 'দাও, চুলোর ছাই ওষুধটাই গিলিয়ে দাও।'

কঙ্কা উঠল। ওষুধের শিশিটা আনল। জল নিল। দেখল ওষুধটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। নতুন এসেছে, প্রায় পুরো শিশিই রয়েছে।

'এত দেরী কিসের?' খেঁকিয়ে উঠল বিমান, 'ওষুধে মন্তর পড়ছ নাকি?'

কঙ্কা কথা বলল না, ঢেলে দিল বিমানের মুখে।

ওষুধ খেল বিমান। মুখটা একবার বিকৃত করল। 'চাদরটা পায়ে ঢেকে দাও' বলল খিঁচিয়ে।

একটু নীরবতা।

চোখটা জড়িয়ে এসেছে বিমানের, জড়িয়ে জড়িয়ে কি যেন বলছে, কঙ্কা হাতের পাখা থামিয়ে দেখছে, রেগে উঠছে কিনা বিমান।

রেগে উঠছে না।

কাঠ হয়ে বসে আছে কঙ্কা, দেখছে গায়ে মশা বসলে নড়ে উঠছে কিনা বিমান। নড়ে উঠছে না।

মশারিটা টাঙিয়ে দেবে কঙ্কা?

আজকে দেখবে পরীক্ষা করে?

না, মশারি কঙ্কা টাঙাল না।

সকাল বেলা তরঙ্গিনী ঢুকবে এ ঘরে, বিজয় ঢুকবে। বলবে, 'মশারি কে টাঙাল?' বলবে 'মশারির মধ্যে শুলে ওর দমবন্ধ হয়ে আসে না?'

তাই শুধু বসে থাকল কঙ্কা।

নিজের নিশ্বাসটাও সহজভাবে ফেলছে না, পাছে বিমানের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিটা ধরা না পড়ে।

একটু পরেই স্তব্ধ হয়ে গেল বিমান। শান্ত হয়ে গেল। সেই হাড়ের খাঁচার মধ্যেকার পাখীটা আর নড়ল না।

কঙ্কা ওর পায়ের কাছ থেকে চাদরটা টেনে গলা অবধি ঢাকা দিয়ে দিল। দেহের সমস্ত স্নায়ুকে চোখের দৃষ্টিতে কেন্দ্রী-ভূত করে তাকিয়ে রইল! নিঃসন্দেহ হল।

তখন ঘড়ির দিকে তাকাল কঙ্কা।

দেখল রাত আড়াইটে।

গলির দিকের জানলাটা খুলল। দেখল সাহাদের বাড়ির ছাত থেকে কৃষ্ণা-অষ্টমীর পান্ডুর চাঁদের মরা আলো অশরীরী আত্মার হতাশ নিশ্বাসের মত ছড়িয়ে পড়েছে মল্লিকদের ভাঙা দেওয়ালে, বিমলাদের রোয়াকের ধারে, কঙ্কাদের জানলার নীচের খোলা ড্রেনে।

ছাতে উঠে গেল কঙ্কা আস্তে পা টিপে।

এখন সিঁড়ির ঘরের দেওয়ালে পিঠ ঠেসিয়ে বসে সব দেখতে পাচ্ছে। নিজেকেও দেখছে। দূরে থেকে, সিনেমার ছবির মত।

এইবার কি তবে নীচে নেমে যাবে কঙ্কা? সকাল না হতেই? ঘরে ঢুকেই চীৎকার করে উঠবে 'ও মা গো। এমন কখন হল গো?'

অনেক লোক ছুটে আসবে সে কান্নায়।

বারবার উচ্চারণ করতে লাগল কঙ্কা ওই কথাটা। আস্তে, জোরে, তাড়াতাড়ি, থেমে থেমে।

কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না।

কানে খট্ খট্ করে বাজছে।

বেসুরো হয়ে যাচ্ছে।

তবে কি নেমে গিয়ে, ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা গোটানো মাদুরটাকে টেনে নিয়ে মাটিতে বিছিয়ে শুয়ে পড়বে? ঠিকে ঝিটা যখন ডাক দেবে 'অ ছোটবৌদি, উনুনটা যে জ্বলে খাঁ খাঁ করছে—' তখন সাড়া দেবে না। ভয়ঙ্কর গভীরভাবে ঘুমিয়ে থাকবে।

ঝি আবার ডাকবে।

তখন তরঙ্গিনী উঠবে বিরক্ত হয়ে। এ ঘরের দরজায় এসে বলবেন, 'হ্যাঁ গা ছোট বৌ, আক্কেলটা কি তোমার? এখনো পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছ? এক উনুন কয়লা পুড়ে গেল! এ কী মরণ ঘুম ঘুমনো গো!

বলেই সত্যিই তেমন ঘুমওলা মানুষটার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠে বলবে 'ঠাকুরপো!' আর তক্ষুনি আবার চিলের মত চেঁচিয়ে ডাকবে 'ও গো, শীগগির একবার এ ঘরে এসো তো।'

বিজয় ছুটে আসবে।

কঙ্কা তখন হঠাৎ জেগে ওঠার মত উঠে বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে।

একদণ্ডে পাড়ার লোকে বাড়ি ভরে যাবে বিজয়ের হাউমাউ চীৎকারে, আর তরঙ্গিনীর মড়া কান্নায়। পাড়ার লোক বলবে, 'হ্যাঁ, ভাই ভাজ ভালবাসতো বটে লোকটাকে। ওই তো গুণের অবতার ভাই!'

পাড়ার লোক আরও বলবে 'বৌটার কী কাঠ প্রাণ গো, কাঁদল না!'

তা বলুক। এই পদ্ধতিটাই সোজা মনে হল কঙ্কার। উঠল কঙ্কা। সিঁড়ির মুখের কাছে দাঁড়াল। ঘুটঘুটে করছে অন্ধকার। কঙ্কা একটু আগে ওই সিঁড়িটা দিয়েই উঠে এসেছে ভেবে অবাক হয়ে গেল, পিছিয়ে এল!

চোখ বুজে নামবে?

কিন্তু শুধুই তো সিঁড়িটা পার হওয়া নয়। কঙ্কাকে গিয়ে সেই ঘরেই তো ঢুকতে হবে, যে ঘরে একটা শক্ত কাঠ হয়ে যাওয়া মানুষ শুয়ে আছে—চাদর ঢাকা দিয়ে। যে মানুষটাকে এখন আর মশা কামড়াচ্ছে না। যার এখন গরমও হচ্ছে না। গায়ের চাদরটা মুখ অবধি ঢেকে দিলেও হবে না।

না, না, ওঘরে গিয়ে ঢুকতে পারবে না এখন কঙ্কা।

রাত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবেই কঙ্কাকে। ভোর হলে নেমে গিয়ে তরঙ্গিনীকে চেঁচিয়ে ডাক দেবে 'ও দিদি, শীগগির এসো একবার, দেখ বুঝি সর্বনাশ—'

তরঙ্গিনী ছুটে আসবে। কেঁদে উঠবে। জিগ্যেস করতে ভুলে যাবে, 'তুমি কোথায় ছিলে ছোটবৌ!'

তবে এখন একটু শুয়ে নিতে পারে কঙ্কা।

ছাতের মেজেটা ধুলো ভর্তি।

তা হোক; দেয়াল ঘেঁষে গুটিসুটি শুয়ে পড়ল কঙ্কা।

কিন্তু কঙ্কা তো ভাবেনি ঘুমবে।

তবু এত ভয়ঙ্কর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল কি করে? ঘুমের ওষুধ না খেয়েও।

কখন যে রাস্তায় জল দেওয়ার শব্দ উঠে শেষ হয়েছে, কখন কাকগুলো বিশ্রী বিশ্রী করে ডেকেছে, আর কখন ময়লা ফেলা গাড়িগুলো ঝড়াং ঝড়াং আওয়াজ তুলে শহরের ঘুমন্ত চেতনায় আঘাত হেনে বেড়িয়েছে, কিছুই টের পায় নি।

টের পায় নি কখন পুবের আকাশ থেকে খানিকটা সাদা রঙের রোদ কঙ্কার গায়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ কে কোথায়। যেন একটা কাচের বাসন ভেঙে ফেলল! খনখন করে শব্দ উঠল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল কঙ্কা।

কাচের বাসন নয়, তরঙ্গিনীর বড়মেয়ের গলা।

'ধন্যি বটে ছোটকাকীমা, এইখানে পড়ে মজা করে ঘুম মারছো! ওদিকে ছোটকাকা ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোবার জল না পেয়ে রেগে হাত-পা ছুঁড়ছে!'

অভিনয় নয়, সত্যি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে কঙ্কা।

তরঙ্গিনীর মেয়ে ফের বলে, 'ওঃ ঘুমের ঘোর কাটেনি বুঝি এখনো? কথা মগজে ঢুকছে না? ছোটকাকা উঠে মুখ ধোবার জল না পেয়ে রাগারাগি করছে, বুঝতে পেরেছ?'

গায়ের আঁচলটা ঠিক করে নেয় কঙ্কা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় তাড়াতাড়ি। মনে মনে বলে, 'আমি জানতাম! আমি জানতাম! এই রকমই একটা কিছু হবে জানতাম আমি। গলির দরজা খুলে দৌড়ে পালান আমার হবে না।'

নীচে এসে ঘরে ঢুকল।

বিমান ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ছিলে কোথায় এতক্ষণ? একটা রোগা মানুষ যে গলা শুকিয়ে মরে যাচ্ছে তার খেয়াল থাকে না?'

কঙ্কা কথা বলল না।

পিকদানিটা এগিয়ে দিল। কলাই করা মগে করে জল দিল টেবিলে, মাজন দিল। তোয়ালে দিল। তারপর সেল্ফের ওপর সাজানো ওষুধের শিশিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল। ঘুমের ওষুধের শিশিটা নতুন এসেছে। প্রায় পুরো শিশিই রয়েছে।

শিশিটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে উঠল কঙ্কা, 'চেষ্টা করেছিলাম! অনেক চেষ্টা করেছিলাম আমি!'

Puja Greetings
AFGHAN SNOW
AFGHAN SNOW
AN IDEAL DAY CREAM
TIGHTLY AFTER
আফগান স্নো
প্রসাধন দ্রব্য
ই. এস. পাটনওয়ালা, ৬২, কনট রোড, বোম্বাই—২৭ (ভারত)

[এই উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক]

প্রথমে মনে হয় সাদা জাজিমের ওপর যেন কালো তিল ছড়ানো।

তিল গুলোর নড়া চড়া দেখে বোঝা যায় তিল নয় পোকা। অসংখ্য পোকায় সাদা চাদর ছেয়ে গেছে। প্রথমে তিলের মত পোকারই আধিপত্য ছিল। সে আধিপত্য বেশীক্ষণ থাকে না। আরো নানা জাতের পোকা ক্রমশ দেখা দেয়। ঘুরে ঘুরে, একাকাঁড়ি, ফড়িং, ঝিঁঝি, আরো কত জাতের পোকা তার নামও জানা নেই। তার ভেতর ডেও পিঁপড়েরাও এসে হানা দিচ্ছে এখন।

এ যেন পোকাদেরই সভা।

মানুষজনের বিরলতায় অন্তত তাই মনে হয়।

সভা আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল সন্ধ্যে সাতটায়। এখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। জন বারো লোক মাত্র এদিকে ওদিকে অসংলগ্নভাবে ছড়িয়ে বসে আছে। যেন এলোমেলো খাপছাড়া কটা অক্ষর, কোন অর্থের সংগতিতে যারা একত্র নয়। ওধারে একটি সাজানো চৌকির ওপর বাঁধানো ফটোটা রাখা তার ওপর কয়েক গাছা মোটা গোড়ের মালা। তার সামনে দুটি ফুলদানিতে রজনীগন্ধা। বেশ পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা। কোন বহুনাড়ম্বর নেই।

কিন্তু তাই বলে এ সভা এমন ফাঁকা হবে এটা ভাবা যায় নি।

বর্ষার দিন। বিকেল থেকে সমানে খানিকক্ষণ আগে পর্যন্ত বৃষ্টি পড়েছে বটে, কিন্তু তাতেও এই বারো তেরোটি লোক ছাড়া আর কারুর আসবার উৎসাহ হয়নি এটা বিশ্বাস করা শক্ত।

বছর দশেক আগেকার একটা ছবি আপনা থেকেই মনে ভেসে ওঠে। এমনি একটি হল ঘরেরই সভা। এই রকমই মেঝের ওপর ঢালাও শতরঞ্চি আর চাদর বিছানো। কিন্তু

পোকাদের নয় মানুষের ভীড়েই সেখানে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। বাইরের দরজাগুলোতে পর্যন্ত ঠেলাঠেলি ঠাসাঠাসি।

যার নামে সেদিনকার ওই ঠেলাঠেলি তারই মালা ঝোলানো ছবিটা সভার শিয়রের দিকে আজ বসানো।

ছবিটাও কয়েক বছর আগের তোলা। ভালো হাতের তোলাই হবে। মুখটা যেন জীবন্ত। চোখের দৃষ্টির সেই ঈষৎ বিষণ্ণ কৌতুকের আভাসটুকু পর্যন্ত ধরা পড়েছে।

সে কৌতুক যেন এই সভার প্রহসনের দিকে চেয়েই আজ ফুটে উঠেছে ভাবতে ইচ্ছে করে।

সাতটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট হল।

সেই বারোজন,—না আরো দুজন এই এলেন।

বৃষ্টি আবার বাইরে পড়তে শুরু করেছে নিশ্চয়। নবাগত দুজনেই ভেজা ছাতা মুড়ে কোথায় রাখবেন ঠিক করতেই যেন দিশাহারা। সভায় নয় যেন কোন স্টেশনের ওয়েটিং রুমে তাঁরা হঠাৎ ঢুকে পড়েছেন।

পোকার উপদ্রব আরো বাড়ছে।

ছাড়া ছাড়া ভাবে সামনের ফটোর দিকে মুখ করে যাঁরা বসেছেন তাঁরা সবাই একটু উসখুস করছেন। পোকার অত্যাচারেই বোধহয়।

সভার উদ্যোক্তাদের দুজন ওদিকে কি পরামর্শ করছেন। হাতঘড়ির দিকে তাকান দেখে মনে হয় আর দেরী করা তাঁরা উচিত মনে করছেন না।

আরো একজন বাইরে থেকে এলেন। বয়স্কা মহিলা। হ্যাঁ, পরিচিত-ই। ছাতা নেই সঙ্গে। বেশ ভিজেই গেছেন।

মাথার ভিজে আঁচলটা খুলে কাছে-ই এসে বসলেন। এ দিকে আরো দু'একজন মেয়ে বসেছেন বলে বোধহয়।

খানিক এদিক ওদিকে তাকিয়ে হঠাৎ চোখ ফেরালেন অবাক হয়ে—কে জয়া না!

জয়া শুধু মাথাটা নাড়ল। উত্তর দিলে না।

কিন্তু তাতে প্রশ্ন থামল না।—কতক্ষণ এসেছ?

এই খানিকক্ষণ।—জয়া ইচ্ছে করেই মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখে উত্তর দিলে।

ভদ্রমহিলা কি বুঝলেন বলা যায় না। কিন্তু আর কিছু প্রশ্ন করলেন না।

জয়া নিশ্চিন্ত হল। ভদ্রমহিলা তাকে অভদ্র ভাবলেন নিশ্চয়। তা ভাবুন। কারুর সঙ্গে আলাপ করবার প্রবৃত্তি তার এখন নেই। ভদ্রমহিলার নামটা মনে পড়ছে না। কিন্তু কোথায় কি সূত্রে পরিচয় সবই মনে আছে। সে স্মৃতিটা খুব মধুর নয়।

ভদ্রমহিলার তাকে চিনতে পারা কিন্তু আশ্চর্য! সবাই ত বলে সে নাকি এই ক'বছরে এমন বদলে গেছে যে চেনা-ই যায় না। এখানে আরো দু' চারটে পরিচিত মুখ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রতিধ্বনি ফেরে

তার চোখে পড়েছে। তাঁরা কিন্তু কেউ তাকে চিনেছেন বলে মনে হয় না। অন্ততঃ তাঁদের ব্যবহারে তা প্রকাশ পায় নি।

এই না চেনাতেই অবশ্য সে খুশী। সে অপরিচিতের মতই এখানে উপস্থিত থাকতে চায়। আসবার আগে মনে তার যেটুকু দ্বিধা ছিল তা পাছে কেউ তাকে চেনে এই ভয়েই।

এসেছে সে অবশ্য অনেকক্ষণ। সাতটার অনেক আগেই।

হলঘর তখন প্রায় ফাঁকা। উদ্যোক্তাদের একজন তখন ফুলদানিতে রজনীগন্ধা সাজাচ্ছেন।

জয়া তাঁকে চিনেছিল। কিন্তু বিপিনবাবু যে চেনেন নি তা তাঁর কথাতেই বোঝা গেছল। একটু কুণ্ঠিতভাবে বলেছিলেন,—বসুন। যা বৃষ্টি, আজ সভা ঠিক সময়ে আরম্ভ করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।

জয়া কোন উত্তর না দিয়ে একেবারে পেছনের দিকে গিয়ে একা একা বসেছিল। বসে বসে পোকাদের ভীড় বাড়াই দেখেছিল।

একটি দুটি করে লোক আসার ধরনে সভার পরিণাম বুঝে একবার ভেবেছিল উঠেই চলে যাবে। কিন্তু যেতে পারে নি খানিকটা আলস্যে, খানিকটা শোভনতার খাতিরে কিংবা করুণাতেই বলা যেতে পারে।

কেন যে এল তাই নিজেকে প্রশ্ন করেছে অবশ্য অনেকভাবে।

সত্যি তার এ সভায় আসার কি প্রয়োজন ছিল?

যে মানুষটার জন্যে এই সভা সে যেমন পৃথিবী থেকে মুছে গেছে, সেও ত তেমনি অনেক আগে-ই মুছে গেছে সে মানুষটার জীবন থেকে।

সেই মুছে যাওয়ার কোন গোপন ক্ষোভই কি তাকে টেনে এনেছে এখানে!

না, জয়ার মন তা স্বীকার করে না কিছুতেই।

থেকে থেকে দৃষ্টিটা ওই সামনের ছবিটার ওপরই গিয়ে পড়ছে অবশ্য। কিন্তু সেই চেয়ে দেখার মধ্যে কোন বেদনা নেই জ্বালাও নয়।

যা আছে—না, যা আছে তা অবশ্য জয়া কিছুতেই স্পষ্ট করে তুলতে পারে না নিজের কাছে। স্পষ্ট করে তুলতে চায়ও না বোধহয়।

নিরুপায় হয়ে বিপিনবাবু সভার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

জয়া হাত ঘড়িটার দিকে তাকাল। পৌনে আটটা।

বিপিনবাবু যা বলছেন, সব ঠিক শুনতে পাচ্ছে না মনোযোগের অভাবেই বোধহয়। ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটা কথা কানে যাচ্ছে। গোটা কতক মামুলি বিশেষণ, গতানুগতিক উচ্ছ্বাস, আর ফিরে ফিরে একটা নাম,—উমাপতি, উমাপতি—

বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ—নিজের অজান্তেই বুঝি জয়া গুণতে শুরু করেছিল।

মাত্র পঁচিশজন শ্রোতার কানে আজ এই প্রায়-ফাঁকা হল ঘরে ওই নাম ধ্বনিত হচ্ছে দেখে হাসিপায় না, দুঃখ হয়!

উমাপতি ঘোষাল!

একদিন ওই নাম লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে বলে তার নিজেরও কি মনে হয় নি?

সে কবে? মন সেই অতীতে চলে যাবার পথেই বাধা পেল।

বিপিনবাবুর পর আরেক জন বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়েছেন। জয়া এঁকেও চেনে।

একদিন ভালো করে-ই চিনত।

নিশীথবাবু তখন এমন বৃদ্ধ হয়ে ভেঙে পড়েন নি। মাথায় সাদা চুল, কিন্তু দেহে যৌবনের শক্তি ও উৎসাহ।

নিশীথবাবুর মারফতই উমাপতির সংগে পরিচয় হয়েছিল।

সে কোন্ উমাপতি?

নিশীথবাবু মামুলী বক্তৃতা দিচ্ছেন না। তাঁর কণ্ঠে আবেগ কিন্তু ভাষায় গভীর আন্তরিকতা।

কি বলছেন তিনি, গাঢ় কণ্ঠে?—উমাপতি ঘোষালের স্মৃতিসভায় আমায় দুটো কথা বলবার জন্যে দাঁড়াতে হয়েছে এটা ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিদ্রূপ, কিন্তু মুষ্টিমেয় কটি অনুরাগী আজ এই দীন সভায় উমাপতির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি জানাতে যে সমবেত হয়েছে এটা ভাগ্যের পরিহাস আমি মনে করি না; এ পরিহাস উমাপতির নিজেরই, পরিহাস আমাদের সংগে, এই যুগের সংগে, মূঢ় উদাসীন জনসমাজের সংগে। করুণ হতাশ পরিহাস। এক অশ্চর্য মিছিলের মশাল সে জ্বালাতে চেয়েছিল, তা পারেনি বলে নিজের শিখায় নিজেকেই সে ভস্মীভূত করে গেছে। কোন চিহ্ন যেন তার কোথাও না থাকে।

নিশীথবাবু তাঁর দিক থেকে সত্য ভাষণই হয়ত দিচ্ছেন, তবু জয়ার চীৎকার করে প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা করে,—না, না কিছুই তোমরা জান না। কেউ তোমরা চেন নি উমাপতিকে!

অসীম কলম থামাল।

নিশীথবাবু বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। তা দিন। যতটুকু লিখেছে তাই যথেষ্ট। এইটেই সাজিয়ে গুছিয়ে আধ কলম করে দেওয়া যাবে অনায়াসে।

এখন উঠে পড়তে পারলে হয়। অফিসে গিয়ে কপিটা দিতে পারলেই আজকের মত ছুটি। সভার দু'চারজন গণ্যমান্যের নাম দিতে পারলে ভালো হ'ত। কিন্তু এক নিশীথবাবু ছাড়া আর কাউকে ত দেখছে না।

বিপিন ঘোষের নামটা দেওয়া যায়। কিন্তু দেবার দরকার ই বা কি?

এদিক ওদিক চাইতে আর একটা মুখ চোখে পড়ল। নীরজা দেবী না! নীরজা দেবী এই সভায় এসেছেন! উমাপতি ঘোষালের স্মৃতিসভায়!

দু' বছরও ত এখনও হয়নি।

উমাপতি ঘোষালের প্রতিষ্ঠার মঞ্চ ধূলিসাৎ করতে শেষ চরম আঘাত যিনি দিয়েছিলেন এই কি সেই নীরজা দেবী?

অসীমকে ভালো করে আর একবার লক্ষ্য করতে হয়।

হ্যাঁ, সেই নীরজা দেবীই। চেহারা একটু বদলেছে, কিন্তু তার চেয়ে একেবারে পাল্টে গিয়েছে বেশ-ভূষা-প্রসাধন। তাই প্রথমটা চিনতে কষ্ট হয়।

ঠিক হয়েছে। কপির হুকটা অসীম মনে মনে পাল্টে ফেললে। না মামুলী কিছু নয়। সভার বিবরণটা অন্যভাবে বেশ সাজান যাবে। অন্য সুর দিয়ে।
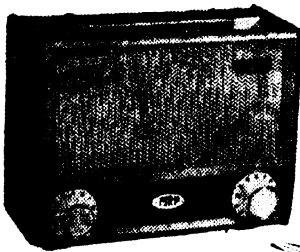
এই শ্রোতাবিরল প্রশস্ত হলঘর। এই

বৃষ্টির বিষণ্ণ রাত। এই অখ্যাত নগণ্য মুষ্টিমেয় সভাসদদের মধ্যে নিশীথ পাত্রের মত অশীতিপর আদর্শোন্মাদ এক বৃদ্ধ আর নীরজা দেবীর মত......

নীরজা দেবীর মত কি?

নীরজা দেবীর মত উমাপতির জীবনের পরম শনি? না ঠিক হ'ল না। উদ্ভাসিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ থেকে উমাপতি ঘোষালের করুণ আত্ম-নির্বাসনের যিনি মূল, সেই নীরজা দেবী!

থাক এখন। এই ধরনের একটা কিছু গুছিয়ে লেখা যাবে পরে।

জামার আস্তিনের মধ্যে একটা পোকা ঢোকাতে অসীমকে খানিক বিব্রত হতে হ'ল।

পোকাটা বার করে নেবার পর মনে হ'ল, এই পোকাগুলোর কথাও থাকবে।

না, কপিটা মন্দ হবে না। নিউজ এডিটর রামবাবু এই সভার ভারটা দেওয়ার সময় সত্যিই মনটা খুঁত খুঁত করেছিল।

এই তার উঠতি মরসুম। দু চারটে লেখা ইতিমধ্যেই কর্তাদের নজরে পড়েছে। এই সময় এ ধরনের একটা বরাত পেয়ে তাই খারাপ লেগেছিল একটু।

উমাপতি ঘোষাল তো হতে-পারতদের দলের একটা ভুলে-যাওয়া নাম। যবনিকা-পড়া একটা নাটক। নিবে যাওয়া আগুনের ছাইগাদা।

তাঁর শোকসভা সম্বন্ধে কি-ই-বা লেখা যাবে মনে হয়েছিল। সভায় এসে আরো হতাশ হয়েছিল সভার চেহারা দেখে। প্রথমে হতাশ তারপর উদাসীন। যাকগে যাক। যেমন তেমন কিছু লিখে দিলেই চলবে। সকাল সকাল ছুটি পাওয়াটাই বড় হয়ে উঠেছিল তখন।

এখন মনে হচ্ছে এই সামান্য মশলা থেকেই নতুন ধরনের কিছু বানিয়ে তোলা যাবে। আধ কলমই বা কেন? পুরো এক কলম হলেও রামবাবু আপত্তি করবেন না নিশ্চয়। লেখাটা শুধু যদি উতরোয়।

নীরজা দেবীর সঙ্গে অবশ্য একটু দেখা করে নিতে হবে! তাঁর কথার ঠিক মত ফোড়ন দিতে পারলে লেখাটা খুলবে-ই।

এখন সভাটা যে শেষ হলে হয়।

নিশীথবাবু থেমেছেন। তাঁর জায়গায় অচেনা কে একজন উঠেছে বলতে। অচেনা ও অবান্তর।

ওকি! নীরজা দেবী যে উঠে চলে যাচ্ছেন! সভার মাঝখানেই চলে যাচ্ছেন।

অসীম আর দ্বিধা করলে না। উঠে পড়ে তাঁর পিছু নিলে।

ওপরের হলঘরে সভা। নীরজা দেবীকে সেই সিঁড়ির তলায় গাড়ি বারান্দায় গিয়ে ধরতে পারলো। নীরজা দেবী তখন তাঁর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন।

শুনছেন!

নীরজা দেবী একটু ভ্রূকুটি করে ফিরে তাকালেন।

এ ভ্রূকুটিতে দমবার ছেলে অসীম নয়। এই বয়সেই অনেক বেয়াড়া বাঁকাচোরাকে বশ মানাতে সে শিখেছে।

এগিয়ে গিয়ে ঠিক মাত্রামাফিক হাসিটি টেনে সে কাগজের নামের সঙ্গে নিজের পরিচয় দিলে।

কাগজের নামেই কাজ হয়ে গেল বোধহয়।

নীরজা দেবীর চোখের ভ্রূকুটি মিলিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন—কি চান? কণ্ঠে প্রসন্নতা না থাক রূঢ়তা নেই।

এখানে দাঁড়িয়ে বলব,—অসীম বিনীত, একটু যদি সময় দেন!

সোফারের খুলে ধরা দরজাটার দিকে তাকিয়ে নীরজা দেবী বললেন, বেশ আসুন তাহলে।

নীরজা দেবী নিজেই আগে গিয়ে উঠলেন। তাঁর পিছু পিছু অসীম। বড় দামী গাড়ি কিন্তু সেকেলে। নরম গদিটার কোমল অভ্যর্থনায় তাই সামান্য একটু ত্রুটি বসার সঙ্গে সঙ্গেই অসীম টের পেল। গদিতে একটা তালি আছে নিশ্চয়। সেইটেই উরুর নিচে ফুটছে।

ওপরে সভা তখনও চলছে।

কে একজন উঠে যাকে বলে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছেন। ভাষার পঙ্গুতা আর বক্তব্যের অভাব পূরণ করে দিতে চাচ্ছেন কণ্ঠের জোরে। পঁচিশ জনের সভা নয় যেন মনুমেণ্টের তলায় বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়েছেন।

জয়ার অসহ্য লাগে।

তবু উঠে যেতে পারে না। শ্রোতাবিরল হয়ে এ সভা আরো পরিহাস-করুণ হয়ে উঠবে সে কথা ভেবে যে ওঠে না তা নয়; উমাপতির ছবিটার ওই বিষণ্ণ কৌতুকের দৃষ্টিই যেন তাকে ধরে রেখেছে। যেন বলছে, অত তাড়া কিসের? প্রহসনটা শেষ পর্যন্ত দেখে যাও।

কিন্তু সত্যিই কি প্রহসন? এই পঁচিশ-জনের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচজনও সত্যিকার কিছুর টানে এসেছে, তা সে শ্রদ্ধাভক্তি বা বিদ্বেষ যাই হোক।

আর সে হিসেবে সব স্মৃতি-সভাতেই তো কোথায় একটা প্রহসনের আভাস আছে। মহাকালকে উপেক্ষা করার করুণ ব্যর্থ চেষ্টার হাস্যকর প্রহসন। স্মৃতি নয় স্রোতই সব। সেই স্রোতই আছে ও থাকবে। নাম দিয়ে যা চিহ্নিত, তা শুধু একটা ঢেউ-এর ছলকানি। হয়ত একটা জলবিম্ব তুলে খানিকক্ষণ ভাসিয়ে রাখতে পারে মাত্র। তারপর সব একাকার। স্রোতকেই শুধু তাই সমৃদ্ধ করা যায়। তাইতেই একমাত্র সার্থকতা।

কথাগুলো তার নিজের নয়। উমাপতির কাছেই শুনেছিল মনে হচ্ছে। কিন্তু ঠিক এই ভাষায় নয়।

কথাগুলোও কি এই?

জোর করে বলতে পারবে না। উমাপতির সব কথা অত স্পষ্ট বোঝা যায় না। জয়া অন্ততঃ পারত না।

কথা উমাপতি খুব বেশী বলতই বা কোথায়? না, বলত বটে এক এক দিন। হঠাৎ যেন সেদিন কথার ঝড় উঠত তার মনে। অনেক দিনের অনেক রুদ্ধ কথার অগ্ন্যুদ্গার। তারপর আবার সব শান্ত।

প্রথম যেদিন দেখা পেয়েছিল, সেদিন অন্ততঃ উমাপতি একটা কথাও তার সঙ্গে বলেনি মনে আছে।

নিশীথ পাত্রই নিয়ে গেছলেন।

উমাপতির সেই কাগজের অফিস। কলকাতার অতি প্রাচীন একটি পাড়ায় নোংরা সংকীর্ণ গলির ভেতর বোধহয় সিপাই যুদ্ধের আমলের একটি জীর্ণ বাড়ির অপ্রশস্ত একটি দোতালার ঘর। শ্রী সৌষ্ঠব কোথাও নেই। না বাইরে না ভেতরে। একটা তক্তপোষ কটা টিনের চেয়ার, একটা ছোট বেঞ্চি, আর একদিকে একটা সস্তা কাঠের টেবিলের ওধারে একটা টুল। সেই টুলের ওপরই বসে উমাপতি কাজ করে। দরকারী ও অদরকারী ছেঁড়া ও আস্ত কাগজপত্রে আর লোকের ভীড়ে ঘরে তিল ধারনের জায়গা নেই। যেমন ঘরের চেহারা তেমনি মানুষ-গুলোরও। মানুষ বলতে ছেলে ছোকরাই বেশী। কিন্তু কি সব বকাটে বাউন্ডুলে হাঘরের মত দেখতে। এরা সব এখানে এসে জুটেছে কি করে? এরাই কি উমাপতির আসল বাহন? জয়ার বেশ খারাপ লেগেছিল।

নিশীথ আর জয়া ঘরে ঢুকতে টেবিলের এধারের ছোট বেঞ্চিটা ছেড়ে দুজন উঠে দাঁড়িয়েছিল।

উমাপতি নিশীথবাবুকে দেখে একটু হেসে অভ্যর্থনা করেছিল, আসুন প্রপিতামহ।

বেঞ্চিতে তারা দুজন বসবার পর উমাপতি আবার বলেছিল—ভারত গুরুদেব কি সত্যিই অস্ত্র ধারণ করবেন না?

জয়া পরে জেনেছিল নিশীথবাবু সম্বন্ধে উমাপতির এটা পুরনো রসিকতা। নিশীথ-বাবুকে তখনই সে প্রপিতামহ ভীষ্ম বলে সম্বোধন করে। পরিহাসের সুরে শ্রদ্ধা জানাবার এই ধরনটাই উমাপতির নিজস্ব।

উমাপতির চোখে তখনও সেই কৌতুকের দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তা তখনো বিষণ্ণ নয়।

নিশীথবাবু জয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এ মেয়েটি তোমার কঠোর সমা-লোচক, তোমার বিরুদ্ধে ওর অনেক অভিযোগ। তাই ওকে নিয়ে এলাম।

উমাপতি তার দিকে চেয়ে একটু হেসে-ছিল মাত্র। কিছু বলে নি।

নিশীথবাবু আবার বলেছিলেন, ওর বেশ লেখার হাত আছে। তবে তোমার কাগজে বোধহয় লিখতে রাজি হবে না।

উমাপতি তখনও জয়াকে কিছু বলে

নিশীথবাবুকেই সম্বোধন করে বলেছিল—আপনি আমার দুর্গে সব শত্রু ঢোকাচ্ছেন!

নিশীথবাবু হেসেছিলেন। তাঁর সেই প্রাণখোলা ঘরের ছাদ ফাটান হাসি। তারপর বলেছিলেন, লুকিয়ে চুরি করে তো নয়, বলে কয়েই ঢোকাচ্ছি। শত্রু না হলে তোমার যে আবার সাড়া জাগে না। আর তা ছাড়া বাইরের চেয়ে ঘরে শত্রু পুষে রাখা ভালো। সসর্পে চ গৃহে বাস—তেই ত বাঁচার উত্তেজনা।

নিশীথবাবু আবার হেসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে উমাপতির চেলা চামুণ্ডারাও।

উমাপতি শুধু হাসেনি। কেমন অদ্ভুত-ভাবে জয়ার দিকে খানিক চেয়ে থেকেছিল। হার মানবে না বলে জয়াও চোখের দৃষ্টি ফেরায়নি। সটান সোজা জেদ করে চেয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অস্বস্তির তার সীমা ছিল না অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মনে আছে।

বাইরে থেকে রাজনীতির রাজ্যের কেষ্ট বিষ্টু না হোক শ্রীদাম সুদাম গোছের একজন অসায় কথার মোড় ও সকলের মনোযোগ অন্য দিকে যাওয়ায় সে যেন বেঁচে গেছল।

উঠে এসেছিল কিছুক্ষণ বাদে নিশীথবাবুর সঙ্গেই।

নিশীথবাবু যাবার সময় বলেছিলেন, শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করে দিলাম। এখন ইচ্ছে হয়ত বোঝাপড়া কোরো।

ব্যস। প্রথম দিন ওইটুকুই।

জয়া চমকে বর্তমানে ফিরে আসে। সভা ত শেষ হয়ে এসেছে।

বিপিন ঘোষ উমাপতির স্থায়ীভাবে

স্মৃতি রক্ষার জন্যে কি একটা প্রস্তাব করেছেন। নিশীথবাবু তাতে প্রতিবাদ করছেন প্রবলভাবে। উমাপতির এরকমভাবে কোন স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা যেন না হয় এই তাঁর বক্তব্য। এরকম আয়োজন তার স্মৃতির প্রতি অপমান। উমাপতি নিজে এসবে বিশ্বাস করত না শুধু নয়, একান্ত বিরোধী ছিল।

নিশীথবাবুরই জয় হল।

সভা শেষ হয়ে সবাই উঠে যাচ্ছে একে একে। জয়াও উঠল।

বাইরে বৃষ্টিটা যেন থেমেছে মনে হচ্ছে।

সিঁড়ির দিকে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। নিশীথবাবুকে ধরে ধরে আনা হচ্ছে। সত্যিই শরীরটা তাঁর এবার ভেঙে পড়েছে। হাঁটার ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে পায়ে আর তেমন জোর পান না। কারুর ওপর ভর দিয়ে চলতে হয়।

কিন্তু শরীর ভাঙলেও মনটা যে ভাঙেনি তা ত তাঁর বক্তৃতাতেই টের পাওয়া গেল।

ইন্দ্রিয়গুলোও যে সজাগ আছে, তাঁর প্রমাণ পেতেও দেরী হল না।

জয়া এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল, নিশীথবাবুর রাস্তা করে দেবার জন্যে। আড়ালে যাবার দরকার বোধ করেনি। বিশেষ কেউই যখন তাকে চিনতে পারেনি, তখন নিশীথবাবু বার্ধক্যের ক্ষীণ দৃষ্টিতে কি আর তাকে চিনতে পারবেন!

কিন্তু নিশীথবাবুই পারলেন।

দুপাশে দুজনের ওপর ভর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আরো দুচার জন যারা আসছিল তারাও থামল একটু বিস্মিত হয়ে।

নিশীথবাবুর মুখে কোন কথা নেই শুধু নীরবে জয়ার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আর চুপ করে থাকা চলে না।

জয়া নিচু হয়ে নিশীথবাবুর পায়ের ধুলো নিলে।

নিশীথবাবু নিঃশব্দে তার মাথায় হাত দিয়ে আবার সহায়দের ওপর ভর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সিঁড়ির প্রথম ধাপে নেমেই কি মনে করে ফিরে দাঁড়ালেন।

জয়ার দিকেই তাকিয়ে বললেন—আয় আমার সঙ্গে।

আমি...আমায় যেতে বলছেন......? জয়ার কণ্ঠে সত্যিকার দ্বিধা ও সংকোচ।

হ্যাঁ তোকেই আসতে বলছি, বলছি না হুকুম করছি। আয়।

আর কোনো আপত্তি চলল না। জয়াকে তাঁর পেছনেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে হল।

গাড়িতে উঠে বসবার পর যে অনুভূতিটা হয়েছিল নীরজা দেবীর বাড়িতে গিয়ে বৈঠকখানায় বসার পরও সেটা সংশোধন করবার কারণ ঘটল না।

প্রকাণ্ড প্রাসাদগোছের বাড়ি। সদর রাস্তার ধারে গেট আছে, গেট দিয়ে এক দিক দিয়ে গাড়ি ঢোকবার ও গাড়িবারান্দার নিচে দিয়ে আর এক দিক দিয়ে বার হবার কাঁকর ফেলা রাস্তা আছে। সে অর্ধ-বৃত্তাকার রাস্তার ধারে পাতাবাহার ও অন্যান্য নানা ফুলগাছের সারও আছে গন্ধে না হোক এই বাদলার রাতে ধীরে ধীরে ঘুরে যাওয়া মোটরের হেড লাইটে অন্তত তার পরিচয় পাওয়া যায়। সদর দেউড়িতে দারোয়ান আছে, গাড়ি বারান্দার নিচেও সসম্ভ্রমে এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরার উর্দি পরা বেয়ারা। সেখান থেকে বৈঠকখানায় গিয়ে বসলে সারা দেওয়ালে দেখবার মত ছবি আছে। আছে কোণে কোণে পাথরের আর ব্রোঞ্জের মূর্তি। আর নানা সম্ভবত দামী ও বিরল দেশ-বিদেশের শিল্পের টুকিটাকি। আছে এ ঘরের সঙ্গে বেমানান, বেশ পুরানো ফ্যাশানের অথচ আরাম দেওয়া সোফা সেটি, আর ঘরের মাঝখানে শ্বেত-পাথরের টেবিল।

অর্থাৎ সবই প্রায় আছে। তবু কি যেন নেই।

সব কিছুই যেন কেমন স্তিমিত কুণ্ঠিত, বর্তমানের সামনে নিজেদের মেলে ধরার সমীচীনতা সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত।

অসীম একটি প্রশস্ত সোফায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে এই কথাই ভাবছিল।

নীরজা দেবী তাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে সম্ভবত বেশ পরিবর্তনের জন্যেই ভেতরে গেছেন।

ইতিমধ্যে একজন বেয়ারা এসে ছোট একটি টিপয় কাছে টেনে দিয়ে তার ওপর চায়ের সরঞ্জাম সমেত ট্রে-টা রেখে গেছে। ট্রে-তে শৌখীন ঢাকনা মুড়ি দেওয়া টী-পট থেকে পেয়ালা চামচ চিনির আর দুধের বাটি পর্যন্ত সব কিছুতেই বনেদী রুচির ছাপ। বনেদী কিন্তু কেমন একটু ফ্যাকাশে জীর্ণতার আভাস।

অসীম চায়ের ট্রে-তে হাত দেয়নি। নীরজা দেবী ঘরে ঢুকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলেন—কই চা নেননি এখনো?

বলার ধরনে শুষ্কতাও নেই যেমন তেমনি অনুরোধের আতিশয্যও।

এখন আবার চা পাঠালেন কেন? অসীম সম্মান রাখতে ওঠবার ভঙ্গি করে বললে।

বসুন। বসুন। অসীমেরই সোফার অন্য প্রান্তে বসে নীরজা দেবী বললেন, স্মৃতি-সভায় গিয়ে ত আর চা জোটেনি। তাই পাঠালাম। চা কি খান না?

খাই। বলে আর দ্বিরুক্তি না করে টিকোসি তুলে অসীম পেয়ালায় চা ঢালল। এখানে লৌকিকতায় সময় নষ্ট করলে তার আসল কাজ পিছিয়ে যাবে। কপি শেষ করে বাড়ি যেতে দেরী হয়ে যাবে অনেক। ভদ্রতার খাতিরে তবু একবার বললে, পেয়ালা ত দেখছি একটাই। আপনার?
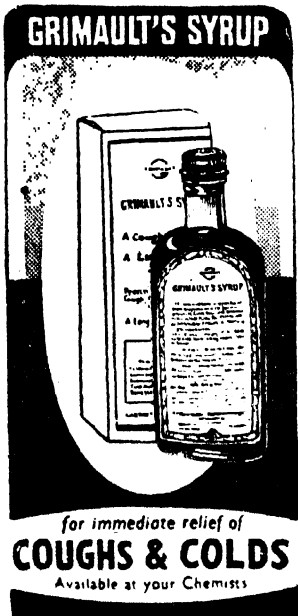
আমি চা খাই না। সহজভাবেই কথাটা বলে নীরজা দেবী যেভাবে তার দিকে তাকালেন তাতে বোঝা গেল জেরার জন্যে তিনি এখন প্রস্তুত।

অসীমকেই কি কি কেমন ভাবে জিজ্ঞাসা করবে মনের মধ্যে গুছিয়ে নেবার জন্যে একটু সময় নিতে হল। সাহায্য পাওয়া গেল চায়ের পেয়ালাটা থেকেই। দুধ চিনি মিশিয়ে সেটা নাড়তে নাড়তে সে ভূমিকাটাও তৈরী করে ফেলে নীরজা দেবীর দিকে ফিরল।

নীরজা দেবী বেশ পরিবর্তন করেই এসেছেন। কিন্তু সে পরিবর্তন লক্ষ্য করবার মত কিছু নয়। যা পরে সভায় গেছলেন তারই মত দামী অথচ সাদাসিধে চেহারার একটি শাড়ি। না বদলে এলেও কোন ক্ষতি ছিল না। অনেক কালের অভ্যাসের দোষেই বোধ হয় বদলাতে হয়েছে।

পোশাক না বদলালেও নীরজা দেবী আর কিছু বদলে এসেছেন স্পষ্টই।

সেটা তাঁর ভঙ্গি।

সেই ঈষৎ অবজ্ঞার কাঠিন্য আর নেই, তার জায়গায় একটু সহজ প্রসন্নতা।

অসীম তারই সুযোগ নিয়ে শুরু করল, দেখুন, আপনাকে যেটুকু জ্বালাতন করছি তাতেই আমার বাধছে। কিন্তু বুঝতেই ত পারছেন (অসীম তার সেই পেটেণ্ট অনেক সাধনায় নিখুঁত করে তোলা অব্যর্থ অমায়িক হাসিটি মুখে টানল) খবরের কাগজে চাকরি করি। দু-চারটে নতুন কিছু যদি রিপোর্টে না দিতে পারি তাহলে কর্তাদের কাছে আর কদর থাকে না। উমাপতি ঘোষাল সম্বন্ধে আপনার মত কে আর জানে বলুন.........

নীরজা দেবী বাধা দিলেন,—হয়ত আমার মত সৌভাগ্য আরো কারুর কারুর হয়েছে।

হেসে এ বাধাটাকে পাশ কাটিয়ে অসীম অন্য রাস্তা নিলে,—কিন্তু যদি বা সেরকম কেউ থাকেন তাঁদের চেয়ে আপনার কথার দাম যে অনেক বেশী। যেমন আপনি যে আজ এই স্মৃতিসভায় গেছলেন তাই একটা শিরোনামা দেওয়ার খবর। এই সঙ্গে উমাপতি ঘোষালের জীবনের দু একটা রিপোর্টে দেওয়ার মত খবর যদি জানান...

অসীম কথাটা অসমাপ্তই রাখলে যেন কি বলবে ঠিক করতে না পেরে থতমত খেয়ে। এই থতমত ভাবটা সে অনেক জায়গায় কাজ হাসিল করতে লাগায়।

নীরজা দেবী সেটা লক্ষ্য করলেন কিনা তা কিন্তু বোঝা গেল না।

বললেন,—আপনাদের খবরের কাগজে যা দেওয়া যায় তা বোধহয় আমার চেয়ে আপনি বেশী জানেন।

গলায় রূঢ়তা নেই, কিন্তু একটু যেন বিদ্রূপের আভাস।

অসীম একটু প্রমাদ গণল মনে মনে। যতটা সোজা শিকার ভেবেছিল তা নয় বোঝা যাচ্ছে। পাঁয়তাড়া কষতে কিন্তু আর বেশী সময় দেওয়া যায় না।

একটু বিমূঢ় ভাব দেখিয়ে বললে,—আপনার চেয়ে আমি বেশী জানি!

আপনি কেন আরো অনেকেই জানে। তার ওপর আপনি 'ত খবরের কাগজের লোক! উমাপতি ঘোষাল যে আঠারো বছর বয়সে বিপ্লবী হিসেবে দ্বীপান্তরে গেছলেন, তিনি যে......

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে অসীম বললে,—না, না ওসব খবরের কথা বলছি না। ওসব 'ত সবাই জানে। তাঁর শেষ জীবনের কিছু খবর চাইছিলাম। যে জীবনটা তাঁর ধীরে ধীরে লোকচক্ষের নেপথ্যে হারিয়ে গেছে, যে জীবনের কথা আপনার চেয়ে বেশী কেউ জানে না বলে আমার বিশ্বাস।

অসীম উৎসুক ভাবে নীরজা দেবীর দিকে চাইল।

নীরজা দেবী তবু নিরুত্তর। কিরকম একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে অসীমের দিকে চেয়ে আছেন।

অসীম আর একটু ব্যাকুলতা ঢালল গলায়, —আপনাকে সোজাসুজি কোন প্রশ্ন তাই আমি করছি না। সে ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনি যা জানেন নিজে থেকে তার যেটুকু বলবেন তাতেই আমি কৃতার্থ হব।

নীরজা দেবী এবার একটু হাসলেন, তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বললেন,—আপনি খবরের কাগজে ছাপবার মশলা চাইছেন! কিন্তু আমি যা জানি তাত খবরের কাগজে ছাপা যাবে না।

কেন?—অসীম এবার সত্যিই বিমূঢ়।

কেন?—নীরজা দেবীর মুখের হাসিটা ধীরে ধীরে যেন ক্রূর হয়ে উঠল,—যেহেতু আমি ছাড়া আর কেউ সাক্ষী না থাকায় সে সব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আর বিশ্বাস যদি করে তাহলে উমাপতি ঘোষালের যে ছবিটা প্রায় মুছে গিয়েও মানুষের মনে কিছুটা এখনো টিকে আছে তা একেবারে বদলে যাবে। সেই বদলে যাওয়াটা আমি চাই না।

এ আবার কি হেঁয়ালি? এতক্ষণ ধরে ধন্না দিয়ে সাধাসাধনাটা কি তাহলে পণ্ডশ্রম! সহজে বিচলিত হওয়া যার স্বভাব নয় সেই অসীম একটু যেন ধৈর্য হারালো। কিন্তু ধৈর্য হারালে 'ত চলবে না। এতখানি সময় অপব্যয়ের বদলে একটু কিছু আদায় না করে নিয়ে যেতে পারলে ত নিজের কাছেই সে ছোট হয়ে যাবে। তার সমস্ত অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে নিজের ক্ষমতাতেই তা[র] অবিশ্বাস আসবে।

নিজেকে সামলে নিয়ে অসীম যথাসম্ভব দ্বিধাগ্রস্তের ভান করে বললে,—আপনি কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না। উমাপতি ঘোষালের জীবনের শেষ কটা বছর সম্বন্ধে সত্যে মিথ্যা মিশিয়ে কিছু রটনা অনেকেই আমরা শুনেছি। কিন্তু ওই টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারটা ছাড়া অন্য কিছু ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। তাঁর এমন কি কিছু গ্লানির ব্যাপার সত্যিই ছিল যা এখন প্রকাশ পেলে......

নীরজা দেবী অসীমকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে হঠাৎ অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠলেন। তারপর হাসতে হাসতেই বললেন, —গ্লানি! খবরের কাগজের লোক হয়ে আপনি উমাপতির গ্লানির কথা জিজ্ঞেস করছেন? গ্লানি যাকে আপনারা বলেন তা কি তাঁর আগের জীবনে কখনো ছিল না?

অসীম কিছু বলবার মত ভেবে ওঠবার আগেই নীরজা দেবী আবার বললেন,—একটা নতুন খবর শুধু আপনাকে দিতে পারি কাজে লাগাবার মত। দেউলে বলে নাম লেখাবার পরও উমাপতি আমার সব পাওনা শোধ করে দিয়েছিলেন। কি করে দিয়েছিলেন তা জানি না—কিন্তু শোধ করেছিলেন কড়ায় গণ্ডায়।

এ কথা ত কেউ জানে না।—অসীম অভিভূতের মত বললে,—আপনিও ত জানান নি।

না জানাই নি।—নীরজা দেবী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন,—জানানো আমার দায় নয়। তা ছাড়া—তা ছাড়া উমাপতিরই বারণ ছিল।

উমাপতিরই বারণ ছিল? নিজের দুর্নামটা দূর করার বদলে তিনি নিজেই সেটা জাগিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন?

নীরজা দেবীর এ বিষয়ে বক্তব্যটা শোনবার সৌভাগ্য আর অসীমের হল না।

সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী একটি মেয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকলে,—মা! আজ উমাপতির স্মৃতিসভা ছিল! তুমি গিয়েছিলে?

অসীম যথারীতি উঠে দাঁড়িয়েছে তখন।

নীরজা দেবী কন্যাকে বোধহয় থামাবার উদ্দেশ্যেই তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—এই আমার মেয়ে মলি মানে মলয়া আর ইনি হলেন একজন সাংবাদিক শ্রী......

অসীম তখন ভদ্রতার নমস্কারে হাত তুলেছে। নিজেই নামটা বললে,—অসীম রাহা।

মলি বা মলয়া অগ্রাহ্যের সঙ্গে হাত দুটো তুলল কি না তুলল বোঝা গেল না। অসীমকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে তেমনি তীক্ষ্ণ অভিযোগের স্বরে মার দিকে ফিরে বললে,—কই আমায় ত বলো নি!

নীরজা দেবী একটু অস্বস্তির সঙ্গেই অসীমের দিকে চকিতে একবার চাইলেন।

কই কিছু বলছ না যে!—মলয়ার গলার ঝংকারে মনে হল অসীম তার কাছে ঘরের একটা আসবাবপত্রের বেশী কিছু নয়।

গতিক বুঝে অসীম নিজেই বিদায় নেবার

ব্যবস্থা করলে,—আচ্ছা আমি তাহলে এখন আসি নীরজা দেবী। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। নমস্কার। নমস্কার মলয়া দেবী।

নীরজা দেবী হাত তুলেই বিদায় নমস্কার জানালেন।

মলয়ার হাত উঠল না। শুধু মুখে একটা দ্রুত জড়িত নমস্কারের মত শব্দ অস্পষ্টভাবে শোনা গেল।

অসীম ততক্ষণে বাইরের গাড়ি বারান্দার নিচে পৌঁছে গিয়েছে।

আজকের সন্ধ্যাটা তার একেবারে ব্যর্থই গেল। কিন্তু সত্যি সম্পূর্ণ ব্যর্থ কি?

একেবারে সব চেয়ে হালফ্যাশানের শৌখিন মহিলাদের কাগজ থেকে যেন সদ্য বেরিয়ে আসা, এমন একটি বিশেষ আধুনিকার সে দেখা পেয়েছে যার আজকের আকস্মিক ও অদম্য রাগ ও উত্তেজনার পেছনে কিছু রহস্য না থেকে পারে না। সে রহস্য খুঁড়ে বার করবার জন্যে তার সমস্ত ঔদ্ধত্য ও তাচ্ছিল্য অনায়াসে সহ্য করা বোধহয় যায়।

মলয়া সুন্দরী বটে, কিন্তু যুবতী তাকে আর বেশী দিন বলা যাবে মনে হয় না। কুড়ির চেয়ে ত্রিশেরই সে কাছাকাছি সন্দেহ নেই।

উমাপতির স্মৃতিসভায় যাওয়ার জন্যে যার বিরুদ্ধে তার অত তীব্র অভিযোগ কেন?

নীরজা দেবী পরলোকগত উমাপতির কোনো সংস্রবে থাকেন তা পছন্দ করে না বলে-ই কি?

কিন্তু গলার ওই ঝঙ্কারটা সামান্য একটু অপছন্দের সঙ্গে মেলানো কি যায়?

তাহলে আসল রহস্যটা কোথায়?

যেখানেই থাকুক অসীম রাহা তা খুঁড়ে বার করবেই। আজকের দিনের ব্যর্থতা তার দরকার ছিল। এই ব্যর্থতার শোধ সে তুলবে।

কে জানে কাঁচ কুড়োতে গিয়ে হীরের খনিরই সে সন্ধান পেয়েছে কি না!

নিশীথ পাত্র এখনো তাঁর সেই পুরনো বাড়িটিতেই আছেন যে বাড়িতে তাঁর সঙ্গে জয়ার প্রথম পরিচয় হয়েছিল।

শহরের এক প্রান্তে বাড়িটি এখনও তেমনি আছে। সেই টিনের চাল দেওয়া দুটি ছোট ছোট ঘর আর সামনে লাল সিমেন্টের রক। ঘর দুটির চারিধারে দেওয়াল ঘেরা উঠোন। উঠোনের এক কোণে গোয়াল আর একদিকে টালিতে ছাওয়া ছোট্ট একটি রান্নাঘর আর টিউব ওয়েল।
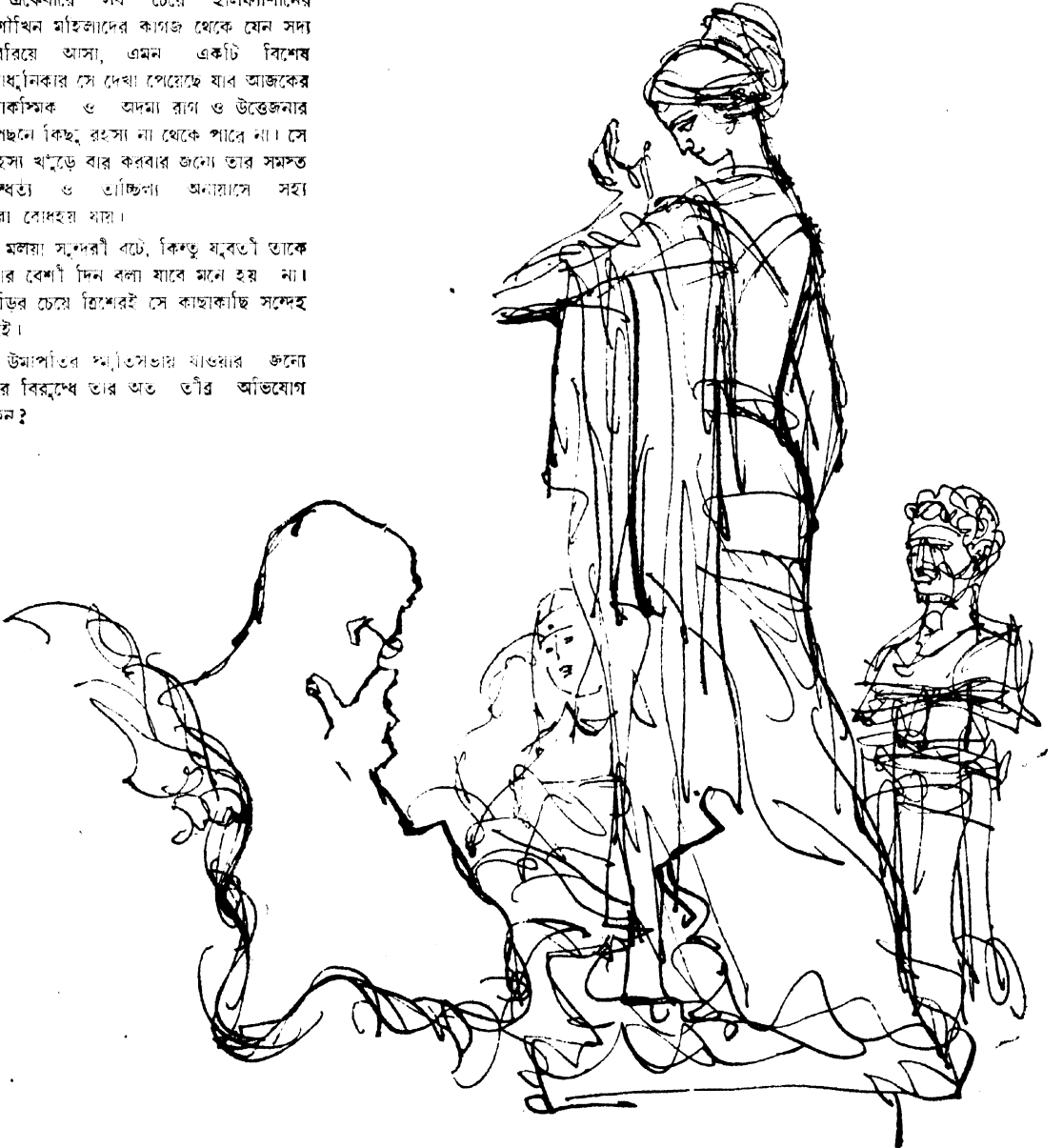
কি রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে অসীমের দিকে চেয়ে আছেন

এই টিউবওয়েলটাই যা নতুন। আগে ছিল একটা পাতকুয়া।

পাতকুয়াটি ছাড়া বাড়িটির আর বিশেষ কিছু অদল বদল হয় নি। কিন্তু বাড়িটি না বদলালেও পাড়াটা সম্পূর্ণভাবে বদলেছে। সে ফাঁকা মাঠের নির্জনতা আর নেই। চারিধারে ছোট বড় নানা ছাঁদের নতুন নতুন বাড়ি। সবই কোঠা বাড়ি এবং প্রায় প্রত্যেকটিই দোতালা কি তেতালা। নিশীথ পাত্রের বাড়িটিই হংসো মধ্যে বকের মত এখন এ অঞ্চলে বেমানান।

সে যুগে যখন শহর ছেড়ে এত দূরে এসে প্রায় বন জঙ্গল মাঠের মধ্যে নিশীথ পাত্র বাসা বেঁধেছিলেন, তখন শুভানুধ্যায়ীরা অনেকে অনুযোগ করে বলেছে।—এই বন-বাদাড়ে এসে শেষে বাড়ি করলেন! শহরে আর জায়গা ছিল না!

নিশীথ পাত্র হেসে বলতেন,—থাকবে না কেন? সে তোমাদের মত শহুরেদের জন্যে। আমি গাঁইয়া মানুষ, ত্রিশ বছর বয়সে প্রথম কলকাতা দেখেছি। আমি ওখানে থাকলে কোনদিন গাড়ি চাপাই পড়ে মরব আর তোমাদের শহরে আমার যদি বা জায়গা হয় আমার এই গরু ছাগল হাঁসের জায়গা মিলবে কি?

এখন যারা অনুযোগ করে তারা সবই প্রায় অনুগত ভক্তের দল। নিশীথ পাত্রের সমবয়সীরা বেশীর ভাগ একে একে এ জীবন থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। যে দু' চারজন আছেন তাঁদের উৎসাহ করে এতদূর আসার ক্ষমতা নেই।

এখন যারা অনুগত তারা আর বন-জঙ্গলে থাকার কথা বলে না। বলে, বাড়িটা ভেঙে একটা দোতালা দালান তুলুন পাত্র দা। বড় বেমানান লাগে এ পাড়ায়।

হ্যাঁ আমি দোতালা তুলে এ বয়সে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতেই মারা যাই এই তোরা চাস্!—বলে নিশীথ পাত্র হাসেন।

আচ্ছা আর কিছু না করেন, টিনের চালটা পাল্টে অন্তত পাকা ছাদ করুন। লোকে যে আপনাকে কঞ্জুস্ বলে।

বলে না কি?—নিশীথ পাত্রের সেই নিজস্ব ছাদফাটানো হাসি এখনো শোনা যায়,—চোর জোচ্চোর কালোবাজারী ত বলে না। তোদের কোন ভাবনা নেই। মরবার সময় কোথায় টাকা পুঁতে রেখেছি সব বলে যাবো। খুঁড়ে বার করে নিস্।

নিশীথ পাত্র কঞ্জুস হন বা না হন তাঁর যে টাকার আণ্ডিল আছে এ গুজব জয়া সেই প্রথম পরিচয়ের সময়েই শুনেছিল। থাকা আর আশ্চর্যই বা কি! দেশে যে তাঁর বিরাট প্রায় ছোটখাট রাজবাড়ির সম্পত্তি তিনি ছেড়ে এসেছেন এ কথা কে না জানত। সে সম্পত্তির কিছু আয় কি তাঁর ভাগে এখনো আসে না! সে আয়ের ছিটে ফোঁটা-তেই ত টাকার পাহাড় জমবার কথা। অত টাকা নিয়ে সত্যি নিশীথ পাত্র করেন কি? শুধু কৃপণের মত জমিয়েই যান! তাঁর চাল চলন প্রকৃতির সঙ্গে এই কৃপণতা কিন্তু মেলে না।

তাঁর চরিত্রের আর আচরণের অনেক কিছুতেই অমনি গরমিল। জয়া সেই প্রথম পরিচয়ের সময়েই বুঝতে পেরে কৌতূহলী হয়েছিল।

নিশীথ পাত্র আজীবন ব্রহ্মচারী নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ। এমন মানুষের নীতিবোধ অত্যন্ত কঠোর ও অনমনীয় হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর সংস্পর্শে যারা এসেছে তাদের কারুর কারুর যে ধরনের স্খলন পতন তিনি অকাতরে উপেক্ষা করে গেছেন তা প্রায় বিশ্বাসাতীত।

তিনি নিজে অহিংসা বাদী দেশ সেবক। কিন্তু তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের মধ্যে কোন মতের লোকই বাদ নেই।

সারাজীবন ঘনিষ্ঠভাবে দেশের সমস্ত বড় বড় নেতার সঙ্গে যুক্ত থেকেও সুযোগের দিনে তিনি একটি সামান্য পদগৌরবও কখনও নিতে রাজি হন নি। অসামান্য জনপ্রিয়তা ও প্রভাব সত্ত্বেও কোন নির্বাচনেও কখনো দাঁড়ান নি।

গাড়িতে নিশীথ পাত্রের পাশে বসে আসতে আসতে জয়া এই সব কথাই ভাব-ছিল।

অনেক দিন এ জগৎ থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু খবর দু' একটা তা সত্ত্বেও পায় বই কি?

নিশীথ পাত্র যে কয়েকবছর আগে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল থেকেও সরে দাঁড়িয়ে-ছেন আজীবন সংশ্রবের পর সে খবরও সে জানে।

কয়েক বছর আগে, মানে কবে?

উমাপতির সেই চরম লাঞ্ছনার সময় থেকেই কি?

অনুগত ভক্তের দল গাড়িতে নিশীথ পাত্রের দরজা পর্যন্ত পোঁছে দিয়ে যায়। বাড়িতে ঢুকতে সাহায্য করবার জন্যে দুজন এগিয়ে এসেছিল। নিশীথ পাত্রই তাদের নিরস্ত করলেন। বললেন,—না না জয়া আছে। ওই টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে। কিরে, পারবি ত?

জয়া মৃদু হেসে বললে—পারব।

নিশীথ পাত্রের মনের ইচ্ছাটা বুঝে অনু-গতের দল চলে গেল।

জয়ার কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ির ভেতর যেতে যেতে নিশীথ পাত্র বললেন,—তোর ফিরতে একটু রাত হয়ে যাবে। তাতে আর কি হয়েছে? এখন ত জমজমাট পাড়া। সেই ভুশণ্ডীর মাঠ যখন ছিল তখনই ত কতবার রাত দুপুরে ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করতে করতে এখান থেকে একা গেছিস্!

জয়া উত্তর না দিয়ে হাসল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল বলে, সে জয়া কি আর আছে?

সে জয়া আর সত্যিই কি নেই? তাই ত মনে হয়।

কোথায় গেল সে জয়া, কোথায় কবে গেল হারিয়ে?

জায়গা তারিখ বলতে পারবে না, কিন্তু একদিন হারিয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

না, একদিনে হারায় নি, হারিয়ে গেছে ধীরে ধীরে যেমন করে বুঝি অনেকেরই উৎসুক নির্ভীক জীবনের সূচনা হারিয়ে যায়। হারিয়ে যায় হতাশার ক্লান্তিতে, নিজের প্রতি, নিজের সমস্ত গভীর প্রেরণার প্রতি অবিশ্বাসে। কখনো আবার লোভের মধ্যেও হারায়, সুলভ সাফল্যের উত্তেজনার মধ্যে, প্রতিষ্ঠা খ্যাতির নেশার আচ্ছন্নতায়।

জয়া হারিয়ে গেছে ব্রতভঙ্গের মসৃণ স্খলে সার্থকতার পথে নয়, শুধু হতাশার ক্লান্তিতেও বলা চলে না। তার আত্ম-বিলুপ্তি ঘটেছে কেমন একটা সংশয়ের স্তিমিত গোধূলি জগতে যেখানে পথের স্থির নিশানা সব মুছে একাকার হয়ে যায়, যেখানে চলার সার্থকতা সম্বন্ধেই সন্দেহ আসে, এগিয়ে যাওয়া আর পিছিয়ে থাকার মানেই যায় গুলিয়ে।

আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত একটি মেয়ে মফস্বলের এক নগণ্য শহর থেকে কলকাতায় পড়তে এসেছিল। থাকত মেয়েদের হোস্টেলে। অধ্যাপকদের চমকে দিত বুদ্ধির তীক্ষ্ম ঝিলিকে, বন্ধু সহপাঠিনী, সঙ্গীদের প্রাণের প্রাচুর্যে।

তার ভেতরে এক উদাস বন্যাবেগ, যা কোন্ পথ যে নেবে তাই নির্ণয় করতে পারে না।

দিগ্বিদিকে তাই সে হানা দেয় নির্বিচার উচ্ছলতায়।

আর্টস নিয়ে পড়তে এসেছিল কলেজে। বদলে নিল বিজ্ঞান। তখনকার দিনে অত অসুবিধা কি কড়াকড়ি ছিল না। বললে, বিজ্ঞানই এ যুগের ধর্ম। সে ডাক্তারী পড়বে। ডাক্তারী পড়ে মেয়েরা শুধু দাই-গিরিই করে। সেরকম ডাক্তার নয় পুরুষ-দের ক্ষেত্রে পাল্লা দেওয়া ডাক্তার। তবে গবেষণা নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতে চায় না। সে সেবা করতে চায় সেই গ্রামাঞ্চলে যেখানে ডাক্তারী শেখার মজুরী ওঠে না বলে কেউ নিরুপায় না হলে যেতে নারাজ।

এসব তখনকার দিনের মামুলী আদর্শবাদ ছাড়া অবশ্য কিছু নয়।

কিন্তু তার সব উৎসাহ আদর্শ এমন মামুলি নয়।

শাড়ী ছেড়ে সালোয়ার পাঞ্জাবি পরে একদিন কলেজে গেল। এখন সেটা অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু তখন একেবারে আচমকা বলে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। আপত্তি উঠল কোথাও কোথাও। ঠাট্টা বিদ্রূপও। সে গ্রাহ্যই করলে না। বললে,—ঢিলে পোশাক বলেই এদেশের মেয়েরা অমন ঢিলে

নাসতনেতে। চুলটাও একদিন ছেঁটে ছোট করে ফেললে। বব্ নয়, কারণ তার তারিবৎ সে জানবে কোথা থেকে। এ বিষয়েও তার বক্তব্য হল যে, চুলের প্রসাধনেই অর্ধেক সময় যদি যায় ত আর কিছু ভাবকে কখন।

একদিন কিন্তু নিজেই আবার এসব ছেড়ে শাড়ি ধরে চুল বাড়তে দিলে। বললে, —এ ধরনের বিদ্রোহে একটা বাহাদুরীর মোহ থাকে। তাতে হুজুক যতটা হয় কাজ হয় না। বিদ্রোহ করতে হলে বড় কিছু নিয়ে করা দরকার। এসব সস্তা চালাকি যাদের আর কিছু করবার নেই তাদের জন্যে।

অন্য যা কিছুই করুক পড়াশোনা সে অবহেলা করেনি কখনো। কলেজের প্রথম ধাপ সে সসম্মানেই পেরিয়ে গেল। কিন্তু তার পরেই বাধল গোল। প্রথমে যে হোস্টেলে থাকত তার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ ছোটখাট নিয়ম কানুন নিয়ে। জয়া ঔদ্ধত্য দেখাল না কারুর বিরুদ্ধে কিন্তু হোস্টেল ছেড়ে দিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে উঠল। তখনকার দিনে সেটাও অবিশ্বাস্য। হোটেলে থাকা নিয়েও কথা উঠল। কলেজ কর্তৃপক্ষের কানে কথাটা গেল। মেয়েদের কোন আত্মীয় অভিভাবকের বাড়ি কি নির্দিষ্ট হোস্টেলে ছাড়া আর কোথাও থাকবার নিয়ম নেই।

জয়া কলেজই ছেড়ে দিলে হঠাৎ সকলকে অবাক করে।

তখনও নিঃসম্বল নয় বলেই সেটা করতে পেরেছিল। প্রচুর না হোক দিন চালাবার মত আর্থিক সঙ্গতি তার তখন ছিল। বাপ মা ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন। মানুষ হয়েছে মামার বাড়িতে। অকালে মারা গেলেও বাবা তার ভরণপোষণ, লেখা-পড়া শেখা ও বিবাহের খরচের জন্যে বেশ কিছু রেখে গেছেন। মামার বাড়ি থেকে একটা মাসোহারা তাই থেকে আসত। সেইটেই তার স্বাধীনতার ভিত্তি।

কিন্তু সে ভিত্তিও বেশীদিন রইল না। কলেজ ছেড়ে দেওয়ার কথা শুনে মামা অসন্তুষ্ট হয়ে চিঠি লিখলেন, অবিলম্বে আবার কলেজে ভর্তি হতে বললেন।

জয়া কথা রাখল না। মামা লিখে পাঠালেন, কলেজে যদি ভর্তি না হয় জয়া যেন দেশে ফিরে আসে। জয়া তাও গেল না।

মামা একটু ভয় দেখাবার জন্যেই লিখলেন, ফিরে না এলে জয়ার মাসোহারা তিনি আর পাঠাতে পারবেন না। জয়ার পরলোকগত পিতার অন্তরের বাসনার কথা মনে রেখেই তাঁকে এ কাজ করতে হবে।

চিঠিতে ভয় দেখালেও যথাসময়ে তিনি মাসিক বরাদ্দ পাঠালেন।

জয়া সেটা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিলে। নিজের দিন চালাবার একটা উপায় সে তখনই করে ফেলেছে।

করপোরেশন স্কুলের একটা চাকরি।

দু' তিন দফা টাকা ফেরত যাওয়ার পর মামা ব্যাকুল হয়ে কলকাতায় এলেন তাকে বোঝাতে।

জয়া রাগারাগি করল না, মামাকে অসম্মানও না। শুধু দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিলে,—এখন তার কোন মাসোহারার দরকার নেই। আর এক বছর বাদেই সে সাবালিকা হবে। তখন ত পাবে সবকিছুই।

মামাকে দুঃখও দিল না। তাঁর সঙ্গে একবার দেশে গিয়েও ঘুরে এল।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা তার টলল না। আর কলেজে সে পড়বে না।

মামা মামীমা বিয়ের কথা পাড়লেন। সে হেসে সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। মামাত বোন পেড়াপীড়ি করায় মিথ্যে করে বানিয়ে বললে।—বিয়ে তার একজনের সঙ্গে ঠিক হয়ে আছে। ভদ্রলোক বিলেতে গেছেন বড় চাকরীর ট্রেনিং নিতে। ফিরে এলেই শুভকার্য সম্পন্ন হবে।

স্কুলের চাকরির খাটুনি নেই এমন নয়। কিন্তু খাটুনি জয়া গ্রাহ্য করে না। আরো অজস্র কাজে সে নিজেকে ঢেলে দিলে। মেয়েদের একটা সাঁতার শেখবার ব্যবস্থা তখন হয়েছে। সেখানে ভর্তি হল সাঁতার শিখতে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হঠাৎ সংস্কৃত নিয়ে মেতে উঠল। সংস্কৃত না জানলে ভারতবর্ষের আত্মাকেই জানা যায় না এই তার তখন মত! একজন প্রবীণ পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে একেবারে ভারতীয় দর্শনের পাঠ নিতে শুরু করলে।

তখনই সে একটু আধটু লিখতে আরম্ভ করেছে। মেয়েলী মিষ্টি লেখায় তার ঘৃণা। সাধারণ গল্প উপন্যাস কবিতা নয়, জোড়ালো ঝাঁঝালো অথচ তথ্যবহুল প্রবন্ধ। সমাজ রাজনীতি সবকিছু নিয়ে।

সেই সময়ে নিশীথবাবুর সঙ্গে পরিচয়। মস্ত বড় পণ্ডিত কি নামকরা কর্মী নয়, দেখলে অতি সাধারণ সহজ মানুষ মনে হয়।

কিন্তু প্রথম পরিচয়েই জয়া মুগ্ধ হয়ে গেল। বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভারও ওপরের একটা কিছু এমন আছে যাতে মানুষকে দেবতা ভাবতে ইচ্ছা হয়। সেটা কী বুঝিয়ে বলতে পারা যায় না। কিন্তু সেই জিনিসই নিশীথ পালের মধ্যে পেয়ে সে অভিভূত। তাঁর কাছে গিয়ে বসলে সংযত শক্তি ও বিশাল প্রশান্তির এমন একটা সমন্বয় অনুভব করা যায় যার তুলনা অভ্রভেদী পাহাড় কি অকূল সমুদ্রের মত প্রাকৃতিক বিস্ময়ের মধ্যেই শুধু মেলে।

কেউ যা পারে নি জয়ার সেই মতবদল

নিশীথ পাত্রই করালেন। জয়া আবার পড়তে রাজী হল। বিজ্ঞান নয়, আর্টসেরই প্রাইভেট ছাত্রী হিসাবে পরীক্ষা দিলে। উত্তীর্ণও হল সসম্মানে।

মামা মারা গেলেন সেই সময়েই।

সাবালিকা হয়ে জয়া তখন তার পৈতৃক টাকা হাতে পেয়েছে। মামাত বোনের বিয়েতেই তার বেশ কিছু নিজে খরচ করলে। বাকিটা জমা করে রেখে দিলে ব্যাঙ্কে দীর্ঘদিনের মেয়াদে।

নিশীথ পাত্রই সে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, শুধু টাকার পেছনে ছোটাও যেমন খারাপ টাকাকে ঘেন্না করাও তেমনি। প্রয়োজনের বেশী টাকা যদি পাস্ তা তোর কাছে গচ্ছিত আছে মনে করিস। আর খবরদার, কাউকে যেন কিছু কখনো দয়ার দান করিস নি।

কেন একথা বলেছিলেন ঠিক বুঝতে পারেনি তখন।

সে কতকাল আগের কথা।

উমাপতি ঘোষালের নাম তখন সবে নানাদিকে ধ্বনিত হতে শুরু করেছে। দীর্ঘ নির্বাসনের বিস্মৃতি বিলীন দিগন্ত থেকে প্রতিদিন উজ্জ্বলতর হয়ে তিনি মধ্য আকাশের দিকে উঠে আসছেন। কি উত্তেজনা তখন আকাশে বাতাসে। শুধু উমাপতিই তার একমাত্র কারণ নয়।

তাকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে নিশীথ পাত্র সেইসব দিনের কথাই হয়ত বলবেন, জয়া ভেবেছিল।

স্মৃতির রোমন্থন নিশীথ পাত্রের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলেই অবশ্য সে জানত। কিন্তু বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে আনুষঙ্গিক কিছু দুর্বলতা আসা ত স্বাভাবিক। তা ছাড়া আজকের দিনে নিশীথ পাত্র যে একটু বেশী বিচলিত হয়েছেন তা ত গোড়া থেকেই বোঝা গেছে।

নিশীথবাবু কিন্তু সেসব কথার ধার দিয়েই গেলেন না।

ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিচু চওড়া চৌকির মত আসনের ওপর বসিয়ে দেবার পর শ্রীহরি বলে হাঁক দিলেন।

শ্রীহরি এসে দাঁড়াতে শুধু বললেন,—বুঝেছিস ত!

শ্রীহরি খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি-ওয়ালা ফোকলা মুখে এক গাল হেসে বললে,—আজ্ঞে বুঝেছি। জয়া দিদিমণি আজ খেয়ে যাবেন এখানে!

জয়া অবাক হয়ে বললে,—তুমি আমায় চিনতে পেরেছ শ্রীহরি। আমার নামটাও মনে রেখেছ?

আমি কেন ভুলে যাব দিদিমণি! আমার ত আপনাদের মত একরাশ বই কেতাব মুখস্থ রাখতে হয় না যে এসব ভুলে যাবো।—বলে শ্রীহরি চলে গেল।

শ্রীহরি নিশীথ পাত্রের অনেক কালের পুরনো লোক। তাঁকে দেখাশোনা করবার একমাত্র লোক বলা যায়। আর লোকজন যা থাকে তারা অস্থায়ী। শুধু শ্রীহরিই চিরন্তন।

নিশীথ পাত্র তখনকার দিনে ঠাট্টা করে বলতেন,—তোকে কেন এখানে কাজ দিয়েছি জানিস্ শ্রীহরি?

আজ্ঞে জানি বই কি!—শ্রীহরি তখন গম্ভীর হয়ে বলত,—এমন তামুক সাজতে কেউ পারবেক নাই।

শ্রীহরির গাইয়া টান তখনও যায় নি। তার কথায় সবাই হেসে উঠত। নিশীথ পাত্র রাগের ছলে বলতেন,—ওঃ হতভাগার দেমাক দেখো! এমন তামুক সাজতে কেউ পারবে না! আমি তামাক খাই হতভাগা!

আজ্ঞে আমার হাতের সাজা একবার খেয়ে দেখেন কেনে? আর ছাড়তে পারবেন নাই।

আচ্ছা। আচ্ছা তোর হাতের সাজা তামাকের ধোঁয়াতেই এমন সুনামটা কালি লাগাবখন! কিন্তু তোকে সে জন্যে কাজ দিই নি। দিয়েছি শুধু তোর নামটুকুর জন্যে। দিনে দুশবার তোকে ত ডাকতে হয়। যদি অজামিলের মত ওই নাম ডাকেই তরে যাই।—বলে নিশীথ পাত্র তাঁর সেই নিজস্ব প্রাণখোলা হাসি হাসতেন।

শ্রীহরি ঠিক বুঝতে না পেরে কেমন একটু ভ্রূকুটি করে চলে যেত।

তখন শ্রীহরির ভালো করে দাড়ি গোঁফও গজায় নি। আজ সে নিশীথবাবুর কাছেই বুড়ো হতে চলেছে।

এতদিন অমন অনেক কাজের লোক হয়ত টিকে থাকে অনেক বাড়িতেই। কিন্তু শ্রীহরির বেলা সেটা একটু আশ্চর্য।

শ্রীহরির পেছনের একটু ইতিহাস আছে, ভয় পাওয়ার মত ইতিহাস।

জয়া নিশীথবাবুর কাছেই শুনেছিল। নিশীথ পাত্র একদিন হাসতে হাসতে কাকে বলেছিলেন,—ওকে একটু সাবধানে ঠাট্টা বিদ্রূপ কোরো কিন্তু। আমার ঠাট্টাতেই ও এক এক সময়ে চোখ রাঙা করে ফেলে। একটার জায়গায় দুটো খুন করে ফেলতে ওর কতক্ষণ!

একটার জায়গায় দুটো!—সবাই অবাক হয়েছিল।

ও, তোমরা বুঝি জানো না। ও যে খুনের মামলায় খালাস আসামী। আমিই চেষ্টা চরিত্র করে খালাস করিয়েছিলাম।

নিশীথ পাত্র তারপর সংক্ষেপে কাহিনীটা বলেছেন। শ্রীহরি দেশের কোন এক জমি-দারী কোম্পানীর বড় কর্তার খাস চাকর ছিল। সে জমিদারী কোম্পানীর অংশীদার আবার ছিল—বেশীর ভাগ সাহেবসুবো। যেমন জবরদস্ত কোম্পানী, তেমনি সাংঘাতিক তার বড়কর্তা। এদেশী হয়েও সে মনিবদের চেয়ে বেশী কড়া। একদিন সেই বড়কর্তাকে তাঁর শোবার ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। লোহার ডাণ্ড দিয়ে কে তার খুলি দু টুকরো করে দিয়েছে। বড়কর্তার বাংলোয় থাকত শুধু শ্রীহরি। সে তখন ফেরারী। ফেরারী হয়ে আর কদিন থাকবে! শ্রীহরি ধরা পড়ল। তার বিচারও হল। কিন্তু প্রত্যক্ষ সাক্ষীর আর প্রমাণের অভাবে কোনরকমে বিচারে সে ছাড়া পেলে।

তাহলে ওই যে মেরেছে তার কোন প্রমাণ নেই?—একজন আশ্বস্ত হবার জন্যেই বলেছিলে।

না, প্রমাণ কিছু নেই।—বলে মাথা নেড়ে যেভাবে নিশীথ পাত্র হেসেছিলেন তাতে আসল ব্যাপারটা বুঝতে কারুর বাকি ছিল না।

জয়াই সন্ত্রস্ত হয়ে বলেছিল,—আর ওই খুনেকে আপনি ডেকে এনে ঘরে পুষেছেন!

না, না এ অত্যন্ত অন্যায়!—অন্যেরাও সমর্থন করেছিল।

নিশীথ পাত্র হেসে বলেছিলেন,—পুষলে ত বাঘই পুষতে হয়। খরগোশ পুষে সুখটা কি?

বাঘই যদি হয় তাহলে সেও নিশীথ পাত্রের সঙ্গে থেকে তার স্বভাব বদলে বশ হয়েছে বলতে হবে।

নেহাৎ দুচারজন যারা জানে তারা ছাড়া শ্রীহরির এ ইতিহাস কেউ তার চেহারায় কি ব্যবহারে কল্পনা করতেও পারবে না।

নিশীথ পাত্রকে কিছুটা বুঝতে হলে শ্রীহরিকে কিন্তু বাদ দেওয়া যায় না।

শ্রীহরি চলে যাবার পর জয়া মৃদু আপত্তি জানিয়ে একবার বললে,—আপনাকে বলা অবশ্য বৃথা। কিন্তু খেয়ে দেয়ে যেতে কত রাত হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন।

তা আর পারছি না। খুব পারছি। কিন্তু এতদিন যে আসিস নি এ তার শাস্তি। আমি ত ভেবেছিলাম তুই মরেই গেছিস, কি বিয়ে থা করে সংসারী হয়েছিস্। এখন বুঝছি ভুল।

বিয়ে থা করে সংসারী যে হই নি তা কি করে জানলেন?—জয়া হাল্কা সুরে বলবার চেষ্টা করলে।

জানলাম বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করিস নি বলে। তা ছাড়া তোর চেহারাই বলে দিচ্ছে ও বরাত তোর হয় নি।

বরাতই যদি হয় তাহলেও বিয়ের কথা কি চেহারায় লেখা থাকে?—হেসে জিজ্ঞাসা করলে জয়া।

থাকে রে থাকে। দুঃখের বিয়ে হলেও থাকে, সুখের হলেও। পৃথিবীতে কারুর সঙ্গে যে নিজেকে বাঁধতে পারলি নে সে তোর চোখ দুটোই জানিয়ে দিচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে জয়া প্রায় ধরা গলায় বললে,—না বিয়ে থা করি নি নিশীথদা। আপনার প্রথম কথাই সত্যি। আমি সত্যিই মরে গেছি। মরে গেছি বলেই আর আসতে পারি নি।

নিশীথ পাত্র কিন্তু কিছুতেই সুরটাকে

গাঢ় হতে দিলেন না। হেসে সেটাকে লঘু করে দিয়ে বললেন,—মরে গেলেও আসবি। পেত্নী হয়ে আসবি। আমি ত আজকাল ভূত পেত্নী নিয়েই থাকি রে। নিজেই যে কবে ভূত হয়ে গেছি বুঝতে পারি নি।

এই ধরনের আধা পরিহাসের আলাপই শেষ পর্যন্ত।

নিশীথ পাত্র একবার ভুলেও কোন পুরানো কথায় ফিরে গেলেন না।

কিন্তু শেষ বেদনার আঘাতটা তিনি যেন জোর করে চেপে রেখে দিয়েছিলেন, বিদায়ের মুহূর্তের জন্যে। তাঁর অনিচ্ছাতেও যেন হঠাৎ তা প্রকাশ পেয়ে গেল।

খাইয়ে দাইয়ে গাড়ি ডাকিয়ে বাড়ি পাঠাবার সময় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন,—তুই খবর পাস নি একথা আমি বিশ্বাস করি না। পেয়ে থাকলে একবার শুধু গিয়ে দাঁড়াতে পারতিস। একেবারে নিভে যাওয়ার আগে শুধু একটা কথাই বলেছিল,—বলেছিল অতি কষ্টে শরীরের সমস্ত ফুরিয়ে আসা শক্তি যেন সংগ্রহ করে,—ভালোই হয়েছে জয়া আসে নি।

বিপিন ঘোষ সকালে উঠে বিছানায় শুয়ে শুয়েই খবরের কাগজগুলো দেখছিল। হ্যা প্রায় সব কাগজেই কিছু না কিছু বিবরণ দিয়েছে। কেউ সাধারণ শিরোনামায় ছোট হরফে। কেউ বা একটু ফলাও করে। বড় দুটি কাগজের একটিতে সম্পাদকীয় হিসেবেও একটা প্যারা আছে। মামুলি ছাঁচে ঢালা। কতকটা বেগার ঠেলা গোছের। কিন্তু অন্যটিতে সম্পাদকীয় না দিলেও স্মৃতিসভার বিবরণটিকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছে। দু কলম জোড়া হেড লাইন। বিবরণও প্রায় পুরো এক কলম।

লেখাটা ভালো। সেই অসীম রাহা কালো ছোকরার লেখা বলেই মনে হয়। অসীম রাহা সভায় যে এসেছিল তা বিপিন ঘোষ লক্ষ্য করেছে।

অসীম রাহা বিবরণটা সাজিয়েছে কায়দায়। নিশীথ পাত্রের কথাগুলোকেই সব চেয়ে মর্যাদা দিয়ে সভার লোক না হওয়াটাকেই ইঙ্গিতময় করে তুলেছে। উপস্থিতদের মধ্যে বিপিন ঘোষের নাম দেয় নি। উদ্যোক্তা হিসেবেও নয়।

তা না দিক। বিপিন ঘোষ ওই প্রভৃতির আগে নাম বসাবার জন্যে ব্যাকুল নয়। এখন নেপথ্যে থাকতেও তার আপত্তি নেই। শুধু তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলেই হল।

উমাপতি ঘোষালকে আবার একটা কিংবদন্তী করে তুলতে হবে।

সে কিংবদন্তীতে শুধু নিষ্কলুষ উজ্জ্বলতা যদি না থাকে তাতেই বা ক্ষতি কি?

আলোছায়া দিয়েই সে ছবি আঁকা হোক। সব সুদ্ধ জড়িয়ে একটা রহস্যের কুজ্ঝটিকা।

সাবধানে ধীরে ধীরে বিপিন ঘোষ তার অভিযানে অগ্রসর হবে। তার হাতে যথেষ্ট মশলা আছে। একটু একটু করে সে তা ছাড়বে।

প্রথমে কয়েকটা চিঠি। আজ যারা ক্ষমতা প্রতিপত্তির শিখরে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে তাদেরই কয়েক জনের কাছে প্রায় নির্দোষ কয়েকটা চিঠি। সেগুলো শুধু জমি তৈরী করবার জন্যে, ইঙ্গিত দেবার জন্যে যে এর পর আরো আছে।

টনক অনেকেরই তাতে নড়বে নিশ্চয়। অন্তত উপেক্ষা করতে পারবে না নির্বিকার ভাবে।

কাউকে কাউকে ছুটে আসতেই হবে তার কাছে প্রতিষ্ঠার ভিতও পর্যন্ত ধ্বসে যাবার ভয়ে।

সেই সুযোগের জন্যে বিপিন ঘোষ অপেক্ষা করে আছে। সে সুযোগকে যতখানি সম্ভব নিংড়ে সে নেবেই। ছোট লাভের লোভে অস্থির হয়ে কিছু করবে না। অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করবে পুরো দাম আদায় করবার জন্যে।

উমাপতি ঘোষাল প্রায় ভুলে যাওয়া একটা নাম। তা বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে বলে অনেকে এখন নিঃশঙ্ক নিশ্চিন্ত। উমাপতি ঘোষাল বেঁচে থাকতেই অনেকের হিসেব নিকেশের খাতা থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছিলেন। খারিজ করবার উৎসাহ উমাপতিই দিয়েছিলেন নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে নিয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর হিসাবের খাতাটাই বাতিল হয়ে গেছে মনে করা স্বাভাবিক।

বিপিন ঘোষ বুঝিয়ে দেবে যে জীবিত উমাপতির চেয়ে মৃত উমাপতির দাম কত বেশী।

উমাপতি তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত কাগজপত্র মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে পুড়িয়ে দিতে বলে গিয়েছিলেন বিপিন ঘোষকে।

বিপিন ঘোষ তা দেয় নি। উমাপতিকে কথা দেওয়ার সময়েই মনে মনে এ সংকল্প সে করে নিয়েছিল।

উমাপতির সমস্ত ব্যক্তিগত কাগজপত্র জিনিস ভালো করে খুঁজে দেখবার এখনো সে সময় পায় নি। ওপর ওপর একটু নেড়ে চেড়ে যা পেয়েছে তাই বড় কম মূল্যবান নয়। যা পেয়েছে তার চেয়ে অনেক দামী জিনিস এখনো নিশ্চয় অনাবিষ্কৃত আছে।

তাতে কয়েকটা লুপ্ত সূত্রের অন্তত সন্ধান পাওয়া যাবে বলে তার বিশ্বাস। সেই সূত্র ধরে অপ্রত্যাশিত কিছুতে পৌঁছে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

নীরজা দেবীর সঙ্গে এখন একবার যোগাযোগ করলে মন্দ হয় না। কাল নীরজা দেবী যে সভায় এসেছিলেন তা তার দৃষ্টি এড়ায় নি। সভা শেষ হবার আগেই যে উঠে গেছেন তাও।

কেন তিনি এ সভায় এসেছিলেন তা আর কেউ অনুমান করতে না পারুক সে পারে বোধহয়।

এই স্মৃতিসভা সম্পর্কেই নীরজা দেবীর সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে। এখন আর নীরজা দেবী উদ্ধতভাবে দরজা থেকে ফিরিয়ে দেবেন বলে মনে হয় না। ফিরিয়ে দেবার কথা যাতে ভাবতেই না পারেন সে ব্যবস্থা করেই সে যাবে।

প্রথমে শুধু একটু ফোন করা,—উমাপতিবাবুর রেখে যাওয়া জিনিসপত্র সব আমায় দেখতে হচ্ছে। আপনার কাছে দামী হতে পারে এমন কিছু কিছু তার মধ্যে পাচ্ছি। সেগুলো কি আপনি ফেরত চান?

না ফোন চলবে না। বিপিন ঘোষের নাম শুনে হয়ত ফোন ধরতেই চাইবেন না।

চিঠি। ছোট একটি সাধারণ চিঠি। তাতে বিনীতভাবে জানান যে, উমাপতি ঘোষালের কাগজপত্র ও অন্যান্য জিনিসের মধ্যে নীরজা দেবীর কাছে মূল্যবান হতে পারে এমন কিছু কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে। নীরজা
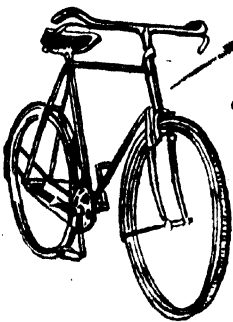
কি বলতে চেয়েছিলেন ভুলে গেছেন বোধহয়

দেবী ইচ্ছা করলে সেগুলি চেয়ে পাঠাতে পারেন।

বিপিন ঘোষ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। চিঠিটা আজকেই লিখে ফেলা দরকার।

রামবাবু অসীম রাহাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। নিউজ এডিটর রামবাবু।

দুপুরে অফিসে এসে রামবাবুর ঘরে একবার কাজ বুঝে নিতে যাওয়া নিয়ম। অসীম নিজে থেকেই যেত।

কিন্তু আজ অফিসে নিজেদের ঘরে গিয়ে বসতে না বসতেই খবর পেয়েছে রামবাবু তাকে খুঁজছেন। এলেই দেখা করতে বলেছেন।

অসীম একটু উদ্বিগ্ন হয়েই গেল। হঠাৎ এমন জরুরী তলবের মানে কি? বড় কোন কাজের বরাত দেওয়াও হতে পারে অবশ্য। কিন্তু রামবাবুর চরিত্র ত তেমন নয়। উত্তেজিত অস্থির হওয়া কাকে বলে তিনি জানেন না। সব কিছুরই ওপর তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি আছে, কিন্তু প্রথম পাতা জুড়ে শিরোনামা দেওয়ায় খবর পেয়েও যেমন, অতি তুচ্ছ সাতের পাতার নিচের চার লাইনের পাদপূরণের বেলাতেও তেমনি নির্বিকার।

এখুনি ছুটে যাওয়ার মত ব্যাপার হলে তার জন্যে অপেক্ষা করতেন না। সে আসার আগেই কাউকে এতক্ষণে পাঠিয়ে দিতেন।

যাক, হাতে পাঁজি থাকতে মঙ্গলবার কেন? যা জানবার এখুনি ত জানা যাবে।

অসীম কাটা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে। রামবাবু একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার যে ছাপা শীটটায় লাল পেন্সিলের দাগ লাগাচ্ছিলেন তাতেই মনোনিবেশ করেন।

বসতে বলার ভদ্রতা টদ্রতার তিনি ধার ধারেন না। ইচ্ছে হয় বোসো না হয় দাঁড়িয়ে থাকো। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। অসীম নিজে থেকেই সামনের একটা চেয়ারে বসে।

যা জানবার তা কিন্তু তখুনি জানা যায় না।

রামবাবু দাগ মারা সেরে কলিংবেল টেপেন। বেয়ারা এসে দাঁড়াতে তার হাতে কাজগটা দিয়ে তার পর অসীমের দিকে মুখ তুলে তাকান। তাকিয়ে খানিকটা চুপ করেই থাকেন। কি বলতে চেয়েছিলেন যেন ভুলে গেছেন মনে হয়।

কিছু যে তিনি ভোলেন না অসীম তা জানে। তাঁর দরকারী কথা বলার ওইটে ভূমিকা। ভাষায় কিছু বলার বদলে নীরবতা।

অসীম অপেক্ষা করে।

কাল কপি দিতে দেরী হয়েছিল?—রামবাবুর এটা ঠিক প্রশ্ন নয় উক্তি। আসল বক্তব্যও এটা নিশ্চয় নয়।

একটু হয়েছিল। সভা থেকে আর এক

জায়গায় গেছলাম বিশেষ কিছু পাওয়া যায় কি না দেখতে।—অসীম সহজভাবে বলার চেষ্টা করে।

কোথায় অসীম গেছল তা রামবাবু ছাড়া আর কেউ হয়ত প্রশ্ন করত। রামবাবু তা করেন না। আবার একটু নীরব থেকে বললেন,—লেখাটা বড় হয়ে গেছে। এক কলম কমার দরকার ছিল না।

এইটেই কি আসল বক্তব্য? অসীম ঠিক বুঝতে পারে না। কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করে বলে,—আমি তাহলে ভুল বুঝেছিলাম। ভেবেছিলাম নামটা যখন লোকে প্রায় ভুলেই গেছে তখন শেষবার স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে একটু বেশী কিছু দেওয়া বোধহয় দরকার।

বেশী কিছু দিতে পেরেছ কি?

না, তা অবশ্য পারিনি। কিছু কিছু এমন আছে যা দেওয়া যায় না বলেই মনে হয়েছে। আবার কয়েকটা ব্যাপার ভালো করে খোঁজ না নিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

ভালো করে খোঁজ নিতে পারবে? তেমন সূত্র কিছু পেয়েছ?

অসীম একটু অবাক হয়ে বলে,—হ্যাঁ তা পেয়েছি। খোঁজ করতেও পারব। কিন্তু আর কি তার দরকার হবে?

হবে। ছাপবার জন্যে নয়। লোকে যা ভুলে গেছে তা ভুলেই যাক। কিন্তু আমাদের নিজেদের জন্যে সময় থাকতে যা কিছু পাওয়া যায় সংগ্রহ করে রাখতে হবে। পারবে?

অসীমকে একটু ভেবে উত্তর দিতে হয়। বলে,—কত দিনের মধ্যে চাই?

যত দিনের মধ্যে পারো। ধরাবাঁধা সময় নেই।

রামবাবুর কথার ধরনে ও বেল টেপায় বোঝা গেল যা বলবার তিনি শেষ করেছেন।

অসীম উঠে বেরিয়ে গেল। মনটা তার একটু দমেই গেছে তখন। উমাপতি ঘোষালের কাহিনী তন্ন তন্ন করে খুঁজতে তার আপত্তি নেই। বরং আগ্রহই হয়েছিল গতকাল নীরজা দেবীর সংগে সাক্ষাতের পর। কিন্তু যা মুদ্রিত পৃষ্ঠার মুখ দেখবে না, গোপনে লোকচক্ষুর আড়ালে কোন দেরাজের খোপে চাপা হয়ে থাকবে তার সম্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ সে অনুভব করে না। সে জাহির করতে চায় নিজের ক্ষমতাকে, চমকে দিতে চায় পাঠক সাধারণকে। সেই চমক লাগানোর ভেতর দিয়েই তার উন্নতির সোপান। যে কাজের কথা কাউকে জানান যাবে না তা'ত এক হিসেবে পণ্ডশ্রম মাত্র। রামবাবু ও কর্তৃপক্ষ হয়ত খুশি হবেন, কিন্তু সে খুশির নগদ মূল্য কিছু পাওয়া যাবে কি?

উমাপতি ঘোষালের স্মৃতি সভায় যাওয়াটাই তার জীবনের অশুভ যোগ বলে মনে হয়।

জয়া স্কুলের কাজ সেরে বাসায় ফিরছে।

বাসে অসম্ভব ভীড় নিত্যকার মত। এ ভীড় তার সয়ে গেছে। অন্যদিন সে খেয়ালও করে না। কিন্তু আজ যেন অসহ্য মনে হচ্ছে। অসহ্য আজ সব কিছুই লেগেছে। স্কুলে গিয়ে এতটুকু কাজে মন দিতে পারেনি। শুধু যন্ত্র চালিতের মত পড়িয়ে গেছে। অন্যমনস্কও হয়ে গেছে তার মধ্যে। একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলছে,—আমার খাতাটা দেখবেন না?

জয়ার খেয়াল হয়েছে। মেয়েরা খাতার লেখা দেখতে দিয়েছিল। একটা তার মধ্যে দেখা বাদ পড়েছে।

ভুল আরো দু একটাও হয়েছে। সেগুলো ঠিক অন্যমনস্কতার দরুণ নয়। মনটা কেমন ক্লান্ত অসাড় হয়ে আছে বলে। ক্লান্ত অসাড় হয়েছে আজ সকাল থেকে অপরিতৃপ্তভাবে অগভীর ঘুম থেকে ওঠার পর। এ অবসাদ আসা স্বাভাবিক হয়ত। প্রচণ্ড ঝড়ের পর একটা শূন্যময় প্রশান্তির মত।

প্রচণ্ড ঝড়ই কাল সারারাত সত্যিই গেছে। বিনিদ্র রাত কাটায়নি, কিন্তু সে বিক্ষুব্ধ আচ্ছন্নতার চেয়ে বুঝি অনিদ্রাও ভালো।

নিশীথ পাত্রকে বলেছিল জয়া মরে গেছে। নিজেও সে কথা সে বিশ্বাস করত। কিন্তু জানত না যে মৃত্যুর মাঝে হারিয়ে যাওয়া অতীত আবার জেগে উঠতে পারে শবসাধনার মন্ত্রে।

সেই মরে যাওয়া জয়াই কাল সারারাত সমস্ত হৃদয় চেতনা আলোড়িত করে রেখেছে।

কিসে সে জাগল? নিশীথ পাত্রের সেই শেষ একটি কথায়! ভালোই হয়েছে জয়া আসেনি। ওই একটি কথাই শব-সাধনার মন্ত্র!

প্রচণ্ড আলোড়নে সে মন্ত্র স্মৃতির গভীর অতলতায় গিয়ে নাড়া দিয়েছে। বিলুপ্ত নিশ্চিহ্ন সব স্তর খুলিয়ে উঠেছে আবার। কখনো জাগরণে কখনো স্বপ্নে। অতীতের ছায়ামূর্তিরা বেরিয়ে এসেছে বিস্মরণের পর্দার পর পর্দা সরিয়ে।

বাসের ভিড় আরো বাড়ছে।

মেয়েদের সীটেই সে জায়গা পেয়েছে কিন্তু ভেতরের দিকে জানলার ধারে নয় মাঝখানের পথটার পাশে।

প্রত্যেকবার বাস থামা ও ছাড়ার ঝাঁকানিতে মাঝখানে ঘেঁষাঘেঁষি করে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের কেউ কেউ একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়ছেন।

একজন যেন একটু ইচ্ছে করেই বেশী বেসামাল হয়ে যাচ্ছেন।

জয়া একটু ভ্রূকুটি করে তাঁর দিকে কবার তাকাল। ভদ্রলোকের—ভদ্রলোক ছাড়া আর কি বলা যায়—দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কিন্তু পারল না। তিনি যেন নির্লিপ্তভাবে অন্য দিকে চেয়ে আছেন।

জয়া ভেতরের দিকে যথাসম্ভব আরেকটু ঘেঁষে বসবার চেষ্টা করলে ভদ্রলোকের স্পর্শ এড়াতে। সরবে প্রতিবাদ জানান যায়। কিন্তু কি হবে ও সব গোলমাল করে! এসব ব্যাপারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলেও গ্লানির ছোঁয়াচ বাঁচান যায় না।

ভেতরের দিকে ঘেঁষে বসবার সংগে সংগে অবশ্য কথাটা তার মনে হয়েছিল।
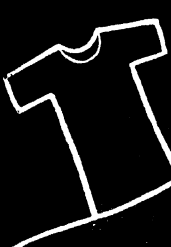
এ জয়া সে জয়া নয়।

সে জয়া কিন্তু কাল এসেছিল, এসেছিল তার প্রাণের প্রচণ্ড বেগ নিয়ে। এসে যেন তাকে নির্মম কঠিন প্রশ্ন করেছিল,—কেন আমায় হারিয়ে যেতে দিলে?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়নি আজকের জয়া।

সেদিনের জয়া হলে এই অভদ্রতা নীরবে মেনে নিত না। ভয় করত না কেলেঙ্কারী

কি গ্লানির। মনে যা সত্য বলে বোঝে তা প্রকাশ করতে তার দ্বিধা সঙ্কোচ ছিল না।

সেই জয়াই নিশীথবাবুর কাছে একদিন উমাপতি ঘোষালের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে সাহস করেছিল। উমাপতি তখন তার কাগজ বার করেছে। আবালবৃদ্ধ বিশেষ করে তরুণের দল মেতে উঠতে শুরু করেছে তাকে নিয়ে।

জয়া তীব্রভাবেই বলেছিল,—বুঝি না আপনাদের উমাপতি ঘোষালকে নিয়ে এই মাতামাতি। তাঁকেও বুঝি না। এক যুগ দ্বীপান্তরে কাটিয়ে তিনি কি শুধু এই সিদ্ধি নিয়ে ফিরলেন? বিপ্লবীর কি এই পরিণতি?

নাঃ—ভদ্রলোক বড় বাড়াবাড়ি করছেন।

জয়া উঠে দাঁড়াল একটু শিক্ষা দেবার ইচ্ছে নিয়েই। কিন্তু ক্লান্তি লাগল তাতেও, কেমন একটা ঘৃণা। কিছু না বলে জয়া বাস থেকে নেমেই গেল পরের স্টপে। অনেকক্ষণ ধরেই নামবার কথা ভাবছিল। এই অসহ্য ভিড়ের ঠেলাঠেলি সহ্য করার চেয়ে হেঁটে যাওয়াও ভালো, অন্তত আজকের দিনটায়।

আকাশের চেহারা ভালো নয়। একটু এখন থেমেছে কিন্তু যে কোন মুহূর্তে আবার নামতে পারে। তা নামুক। সে হেঁটেই যাবে। না হয় বৃষ্টির তোড় বাড়লে কোথাও কিছুক্ষণের জন্যে আশ্রয় নেবে, তবু নিজের সঙ্গে একা ত থাকতে পারে।

জয়া হাঁটতে শুরু করলে।

একবার মনে হল এখান থেকে আজও আবার নিশীথ পাত্রের কাছে যায়। কিন্তু কেমন দ্বিধা হল। বুঝি তার সঙ্গে আশঙ্কাও।

যেটুকু শুনেছে তাতেই সমস্ত দিন রাত্রি তার ক্ষতবিক্ষত। আরো কি শুনবে গিয়ে কে জানে? হয়ত নিজের দুর্বলতা দমন করতে পারবে না। নিজেই আরও কিছু জিজ্ঞাসা করে বসবে।

জিজ্ঞাসা যে তার সত্যি অনেক।

সে শুধু সে সব জিজ্ঞাসা স্তব্ধ করে রেখে দিয়েছে তাই। অন্তত কাল পর্যন্ত স্তব্ধ করে রাখতে পেরেছিল বলেই তার ধারণা।

সে জয়া কিন্তু কোন জিজ্ঞাসাই দমন করে রাখতে জানত না। সঙ্কোচ ছিল না তার কোন মতামত সাহস করে জানাতে।

উমাপতির বিরুদ্ধে সেদিন যা তার মনে হয়েছিল বিনা দ্বিধায় বলেছে।

নিশীথ পাত্র তার দিকে প্রসন্ন স্নেহের দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিলেন,—উমাপতির সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে? দেখেছিস তাকে?

দেখবার দরকার নেই। ইচ্ছেও নেই।—জয়া উদ্ধতভাবেই বলেছিল,—তাঁর লেখা পড়েই তাঁকে বুঝেছি।

লেখা পড়েই একটা মানুষকে চেনা যায়!

—নিশীথ পাত্র হেসেছিলেন,—মানুষ কতটুকু ভগ্নাংশ লেখায় প্রকাশ করতে পারে? রথী মহারথী লেখকেরা পর্যন্ত নয়।

একটু থেমে আবার হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—উমাপতির লেখায় কি তোর খারাপ লাগে?

সব।—অম্লান বদনে বলেছিল জয়া,—আন্দামান থেকে উনি নতুন বাণী নিয়ে এসেছেন, সুস্থ হও সুন্দর হও। তলোয়ারের ফলাকেই লাঙ্গল বানাতে হয়। যে গড়তে জানে না তার ভাঙবার অধিকার নেই। ঘরের দীপের দাম যার কাছে নেই বোমার বারুদে ঠাসার সে অনধিকারী।—এসব কথা যেন কেউ কখনো আমরা শুনিনি।

শুনেছিস কিন্তু উমাপতির মত মানুষের কাছে নয়। কথা সাজাতে অনেকেই পারে, কিন্তু উমাপতি নিজের জীবনকে মশালের মত জ্বালিয়ে এসব কথা বুঝতে শিখেছে।

জয়া তবু মানতে চায়নি। বলেছিল,—এসব আপনাদের উচ্ছ্বাস। সতেরো না আঠারো বছর বয়সে ত ধরা পড়েছিল। হুজুকে পড়ে অনেকে অমন ওই বয়সে দারুণ কিছু একটা করতে চায়। তারপর আন্দামানের ঘানি টেনে শিরদাঁড়া বেঁকে গিয়েছে। এখন শুধু আয়েশ শান্তি খুঁজে দর্শনের বুলি ধরেছেন।

এ কথার জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিশীথবাবু হঠাৎ বলেছিলেন,—চ তোকে উমাপতির কাছে নিয়ে যাই।

কেন?

একবার দেখেই আসবি চল না। ভয়ের ত কিছু নেই।—নিশীথ পাত্র হেসেছিলেন।

ভয়ের কথাতেই জয়া গরম হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল,—বেশ চলুন আজই।

তারপর সেই প্রথম উমাপতির কাগজের অফিসে গিয়ে তাকে দেখা। যে দেখায় উমাপতি একটি কথাও তার সঙ্গে বলেনি।

মুখে কিছু না বললেও তার দিকে অদ্ভুতভাবে চেয়েছিল একবার। সে দৃষ্টির জবাবও দিয়েছিল জয়া, দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু নিজের কাছেই স্বীকার করেছিল পরে যে হার তাকেই মানতে হয়েছে। কিসের হার তা বোঝাতে পারবে না, কিন্তু উমাপতিকে তুচ্ছ করবার ক্ষমতা যে তার নেই সেটুকু ভালো করেই টের পেয়েছিল।

বৃষ্টিটা আবার জোরেই নামল। কাছাকাছি তেমন কোন আশ্রয় নেই। কিছু দূরে একটা ট্রামের শেড। একটু পা চালিয়ে জয়া তার নিচেই গিয়ে আশ্রয় নিলে।

এখানে আবার সেই ভীড়। তবে বাসের চেয়ে ভদ্রই বলতে হবে। দুটি মিস্ত্রী-গোছের চেহারা পোশাকের ছোকরা নিজেরা সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দিলে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পেছনে তাদের আলাপ শোনা যাচ্ছে। ভাষায় তাদের শালীনতা নেই কিন্তু মনে আছে বোধহয়।

উমাপতির সঙ্গে সেই দিনটার কথা মনে পড়ে গেল।

উমাপতি তখন শহর ছাড়িয়ে বহু দূরে প্রায় একটা জংলা জলার মধ্যে থাকে। জায়গাটার বেশী ভাগই জলা। সুপারী নারকেল ঘেরা সামান্য একটু উঁচু জমি তারই মাঝখানে দ্বীপের মত।

বড় রাস্তা থেকে প্রথমে একটা কাঁচা সরু দুদিকের ধেনো জমির সীমানা দেওয়া পাড়ের পথ দিয়ে অনেকখানি যেতে হয়। তারপর সেখান থেকেও বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো দিয়ে মাঝখানের দ্বীপটুকুর মত জায়গায়। সেইখানেই টালিতে ছাওয়া একটা মাটির কুঁড়ে উমাপতি তুলেছিল থাকবার জন্যে।

উমাপতি জায়গাটার নাম দিয়েছিল তার আন্দামান।

জয়াই ঠাট্টা করে বলত,—আন্দামানের সাধ এখনো আপনার মেটেনি। এতদিন বাদে দেশে ফিরেও আন্দামানের জন্যে প্রাণ কাঁদে!

উমাপতি হেসে হেঁয়ালি করে বলত,—আন্দামানে যে সত্যি গেছে সে কি আর ফিরতে পারে। আন্দামান তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে যে!

মানে যাই হোক জয়া হাসত।

হ্যাঁ তখন উমাপতিকে ঠাট্টা করতে পারার মত কাছাকাছি সে এসেছে। ঠাট্টা শুধু কেন আঘাতও।

সেটাও এমনি বৃষ্টির দিন মনে আছে। উমাপতি কি খেয়ালে শহর থেকে জয়াকে তার আন্দামানে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। অবাক হলেও জয়া আপত্তি করেনি।

উমাপতি নিজে ট্রেনে করে কাছাকাছি একটা স্টেশনে নেমে হেঁটেই সাধারণত তার আস্তানায় যেত। সেদিন জয়ার খাতিরেই একটা ট্যাক্সি করেছিল।

রাস্তায় অসাবধানী এক পথিককে প্রায় চাপা দিতে দিতে কোনরকমে বাঁচিয়ে ট্যাক্সি-ড্রাইভার তার নিজস্ব ভাষায় অশ্লীল

কুৎসিতভাবে গাল দিয়ে উঠেছিল মনের ঝাল মেটাতে।

জয়া আগুন হয়ে উঠে তাকে ধমক দিতে উমাপতি হেসে ফেলেছিল বেশ জোরেই।

হাসছেন যে বড়!—জয়া সরোষে তার দিকে তাকিয়েছিল।

হাসছি তোমার যাকে বলে শুনীর কান দেখে। ওই কটা খাঁটি সাচ্চা শব্দেই ছ্যাঁকা লেগে গেল।

খাঁটি সাচ্চা শব্দ!—জয়া তীব্রস্বরে বলেছিল,—কি বলেছে আপনি শুনেছেন!

শুনেছি। দেহতত্ত্বের কয়েকটা নির্ভেজাল সত্য যা অকাতরে গালাগালের ভেতর দিয়ে বার করে দেয় বলে ওদের মনে পচা কাদা বড় একটা জমতে পায় না। ভণ্ডদের অবশ্য মনের মধ্যেই ও কাদা পাক খায়। তা ছাড়া আমাদের মত ভাষার সম্পদ ওদের আমরা এখনো পেতে দিইনি তাই আমরা যা ঢেকে ঢুকে বিস্তারিত করে প্রকাশ করি ওরা তা কড়া ঝাঁঝ দিয়ে সারে।

কোন উত্তর না দিয়ে জয়া অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল।

তারপর হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণ করেছিল,—আপনি নিজেও ভণ্ডদের একজন তা জানেন?

আঘাতটা সত্যিই অপ্রত্যাশিত।

উমাপতির মুখে হাসি ফুটেছিল তাই একটু দেরীতে।

হেসেই বলেছিল,—তুমি যদি বুঝে থাকো তাহলে নিশ্চয়ই তাই। নিজের স্বরূপ নিজে কজন বুঝতে পারে!

আপনারা অন্তত পারেন। শুধু বুঝেও না বোঝার ভান করছেন। আপনি কেন আমাকেই সঙ্গে করে আপনার সেই আন্দামানে নিয়ে যেতে ব্যাকুল? আপনি সন্ন্যাসীর ভড়ং করে থাকেন কিন্তু মেয়েদের সঙ্গ চান! আমার মত সামান্য একটু চটক আর বয়স থাকলে ত কথা নেই। আমার সঙ্গ পবার জন্যে কেন আপনি লালায়িত জানেন না?

উমাপতির মুখটা সত্যিই কি রকম হয়ে গিয়েছিল। তারপর তার কণ্ঠ দিয়ে চাপা গাঢ় জমানো আর্তনাদের মত যা বার হয়েছিল তা যেন অন্য কারো স্বর।

মুখটা জয়ার দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে সে বলেছিল,—জানি, সত্যিই জানি জয়া। মেয়েদের সঙ্গ আমি চাই। তোমার সঙ্গের চেয়ে কাম্য আমার কিছু নেই এখন। কিন্তু বিশ্বাস করো সন্ন্যাসীর ভড়ং আমি করি না। আমার আসল নকল সব ভক্ত আর অনুগতেরা তাদের নিজেদের স্বার্থে গোঁড়ামিতে ওই মিথ্যে ছদ্মবেশে আমায় সাজিয়ে রেখেছে। আমি সায় দিই না, প্রতিবাদও করি না, কিন্তু প্রথম যৌবনের দিনে আন্দামান যার হাড় মজ্জা শুকিয়ে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, জীবনের জন্যে, সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের জন্যে কি তার আকুল তৃষ্ণা তা তোমায় শুধু যদি বোঝাতে পারতাম!

জয়া স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বিস্ময়ে বেদনায় অনুশোচনায়।

উমাপতির এই চেহারা সে কবার মাত্র দেখেছে।

কিন্তু এ ত অনেক পরের কথা। তার আগে অন্য ইতিহাস আছে উমাপতির অত কাছে গিয়ে পেঁছোবার।

বৃষ্টি ধরেছে। মেঘলা আকাশে সন্ধ্যার বিষণ্ণতা আরো গাঢ়। রাস্তার বাতিগুলো এই মুহূর্তে জ্বলে উঠল। ভিজে রাস্তার ওপর সে আলো যেন উপচে পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। এবার বাসার দিকে রওনা হওয়া যায়। কিন্তু জয়ার কিছুতেই সেখানে ফিরতে ইচ্ছে করে না। তার সেই ঘরটির মধ্যে গত রাত্রের আরেক সত্তা যেন অপেক্ষা করে আছে তাকে অসংখ্য প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করবার জন্যে।

অনেক রাত, সারারাত যদি সে এই শহরের নির্জন পথে পথে একা একা ঘুরে বেড়াতে পারত, একদিন যেমন বেড়িয়েছিল।

কিন্তু সেদিন সে একা ছিল না।

সে কি তারই নিজের কাহিনী?

নীরজা দেবী চিঠিটা পড়লেন। একবার নয় অনেকবার।

তারপর চশমাটা খুলে রেখে ভ্রূকুঞ্চিত করে কঠিন মুখে সামনের দেয়ালে টাঙান ছবিটার দিকেই চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ছবিটা কমলদ'র বড় তরফের পরলোকগত রাজশেখর চৌধুরীর পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র। কিন্তু নীরজা দেবী তাঁর স্বর্গীয় স্বামীর ছবি দেখতে তন্ময় বা তার অতি প্রকট খুঁতগুলি লক্ষ্য করে বিরক্ত বোধহয় নয়। ছবিটা তাঁর চোখে ছায়া ফেললেও মনে তার কোন ছাপ তখন নেই।

নীরজা দেবী সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে সংবরণ করবার চেষ্টা করছেন। তাঁর প্রকৃতিতে বারুদের মশলা আছে তিনি ভালো করেই জানেন, এক মুহূর্তে দপ করে তিনি জ্বলে ওঠেন। তাঁর মনের আকস্মিক দুর্বার বেগ কোন শাসন তখন মানে না। জীবনে এই উন্দামতা আর জেদের জন্যে অনেক খেসারত তাঁকে দিতে হয়েছে। যৌবনে সে মূল্য দিয়েও নিজেকে শাসন করবার প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেননি। কিন্তু তখন যা করেছেন এখন আর তা করা যায় না। নিজের জন্যে এবং তার চেয়ে বেশী মলয়ার জন্যে তাঁকে হিসাব করতে বসতে হয় নিজেকে সংযত করে।

চিঠিটা পড়ে তিনি রাগে কেঁপে উঠেছিলেন। আগুন জ্বলে উঠেছিল মাথার মধ্যে। এ চিঠির মোলায়েম ভাষার মধ্যে কি সর্পিল উদ্দেশ্য যে লুকোন তা তাঁর বুঝতে দেরী হয়নি। প্রচ্ছন্ন চাপ দিয়ে তাঁকে যতদূর সম্ভব নিংড়ে নেওয়া। নেপথ্যে খড়্গটা ঝুলিয়ে রেখে অঙ্গুলি হেলনে তাঁকে ওঠান বসানো।

প্রথম মুহূর্তে ইচ্ছে হয়েছিল তৎক্ষণাৎ গাড়ি নিয়ে গিয়ে সেই নীচ কীটানুকীটটাকে উচিত শিক্ষা কিছু দিয়ে আসতে।

তারপর চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে।

কিন্তু দুটোর কোনটাই তিনি করলেন না। নিজেকে সংযত করে স্থিরভাবে ভেবে দেখে বুঝলেন উত্তেজিত অস্থির হলে এখানে চলবে না।

শিক্ষাই যদি বিপিন ঘোষকে দিতে হয় তাহলে অনেক দিক বিচার করে সাবধানে অগ্রসর হতে হবে।

বিপিন ঘোষকে তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে দেওয়াই চলবে না। সে নিশ্চিন্ত নিরাপদ নিজেকে মনে করুক, আশান্বিত হোক সাফল্য সম্বন্ধে।

বিপিন ঘোষ কী পেয়েছে? কোন অস্ত্রের জোরে তার এত সাহস?

নীরজা দেবী মনে করবার চেষ্টা করলেন।

সব মনে করা শক্ত। পরিণাম ভেবে আটঘাট বেঁধে ত কিছু করেননি। তা তাঁর স্বভাবেই নেই। তা ছাড়া করবেনই বা কেন? আর যার কাছেই হোক উমাপতি ঘোষালের সঙ্গে হিসেব করে ব্যবহার করার কোন প্রশ্নই আসেনি।

চেষ্টা করলেই কি হিসেব করতে পারতেন! সে কি দুর্বার স্রোতের সব দিন! জীবনে প্রথম যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়বার মত কিছু পেয়েছিলেন। একটা আশ্চর্য জোয়ার নিজের মধ্যে।

অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে নিজের মনের খেয়ালে এমন ঝাঁপ দিয়ে আগেও কতবার পড়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গে এ আত্মনিমজ্জনের অনেক তফাৎ। আত্মনিমজ্জন ত নয় এ আত্মোৎসর্গ। তেমনি একটা পবিত্র অনুভূতিই তাঁর মনের মধ্যে পেয়েছেন।

উমাপতির সব কথা ভালো করে বোঝেননি। শুধু স্থির একটা প্রত্যয় জেগেছে যে, এক আশ্চর্য রূপান্তর ঘটাবার জন্যে তার অসাধ্য সাধনা। রূপান্তর তার নিজের সত্তারই, সেই সঙ্গে তার পরিধির মধ্যে যারা আছে তারা যদি সংক্রামিত হয়।

বাতুলের হাস্যকর চেষ্টা। এ সমালোচনা শোনেননি এমন নয়। কিন্তু নিজের মনে কোন সংশয় কোনদিন জাগেনি। বরং এই কথাই ভেবেছেন যে সব আশ্চর্য অমানুষিক
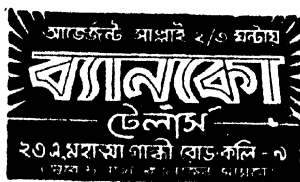
সাধনা ত বাতুলেরাই করতে অগ্রসর হয়। ইতিহাসের পথ তাদেরই ব্যর্থ কঙ্কাল দিয়ে বাঁধানো।

তারপর কোথা থেকে কি হয়ে গেল।

সে পবিত্র অনুভূতি কি হারিয়ে গেল? না তাও ত নয়। কিন্তু তার চেয়ে প্রবল হয়ে উঠল আর কিছু। তা যে কি নিজের কাছেও স্বীকার তখনও করেননি। এখনও করতে চান না।

স্বীকার না করবার জন্যে, নিজেকে স্পষ্ট করে না দেখতে চাওয়ার জন্যেই ওই বিদ্রোহ।

বিদ্রোহ ত নয় বিষোদ্গার। সে তাঁর নিজেরই মনের অতলের বিষ বলে তখন কিন্তু সত্যিই বোঝেননি।

এখন অবশ্য মাঝে মাঝে আত্মবিচারের একটা বেগ আসে। একটা কিসের যন্ত্রণা।

সেই যন্ত্রণাই সেদিন উমাপতির স্মৃতি সভায় তাঁকে টেনে নিয়ে গেছল। হঠাৎ চলে গিয়েছিলেন। স্মৃতি সভার ভীড় বাড়াতে নয়। কিসের একটা অদম্য আকর্ষণে।

না গেলেই ভালো করতেন। ওই খবরের কাগজের সেই ছোকরা তাহলে সঙ্গে আসার আর সুযোগ পেত না, আর মলয়ার সঙ্গে ওই দৃশ্যের সূচনাটুকুও দেখে যেতে পারত না।

কী অস্বস্তিই না হয়েছিল। যেন নিভৃতের বিস্রস্ত বেশবাস হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে অন্যের দৃশ্যগোচর হয়ে গেছে। দেহের নয় মনের আবরণের বিস্রস্ততা।

ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য অবশ্য করা যায়। তাই করবার চেষ্টা করেছেন। কী ভাবতে পারে ওই ছোকরা? মা ও মেয়ের মধ্যে ঠিক মধুর সম্পর্ক নয়? মার সম্মান রাখতে মেয়ে জানে না। এত বড় পরিবারে মেয়ে উদ্ধত উগ্র দুর্বিনীত?

তাই যদি ভাবে ত ভাবুক। কিন্তু ওই ভেবে অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করেও মনের অস্বস্তিটা যায় না কেন? অস্বস্তির মূলে আরো গভীর কোথাও বলে? সত্যিই তার কারণ একটা আছে অস্বীকার করতে পারেন না বলে?

মলয়া সেদিন ড্রইংরুমে অপরিচিত একজনের সামনেই অমন অসংযত হয়ে উঠবে কল্পনা করতেই পারেননি। পারলে নিশ্চয় ওই খবরের কাগজের ছোকরা—কি নাম—হ্যাঁ রাহা, রাহাকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসতেন না। কিন্তু তাকে সঙ্গে আসবার অনুমতিই দিয়েছিলেন কেন? সেইটেই দুর্বোধ। কিছু কি সত্যি তাকে বলতে চেয়েছিলেন? না তা চাননি, কিন্তু মনের অগোচরে কোথায় যেন অস্পষ্ট একটা বাসনা ছিল,—কেউ তাঁকে প্রশ্ন করুক এই বাসনা। প্রশ্নে তাঁকে জর্জরিত করে তুলুক এমনও বুঝি অর্থহীন একটা অভিলাষ। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে সাহস নেই বলেই কি এই যন্ত্রণা-বিলাসের আগ্রহ?

মলয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া এখনও হয়নি।

মলয়ার অভিযোগের উত্তরও দিতে পারেননি কিছু।

রাহা চলে যাবার পর মলয়া আরো উগ্র নির্মম হয়ে উঠেছিল,—তুমি কোন মুখে ওই সভায় গিয়েছিলে! তোমার বিচার-বিবেচনা নেই, কোনকালে ছিল না, কিন্তু লজ্জা বলেও কি কিছু নেই। কাল খবরের কাগজে খবর বেরুবে। উমাপতি ঘোষালের স্মৃতি সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ফলাও করে' নীরজা দেবীর নাম। কমলদ'র বড় তরফের সেই স্বনামধন্যা নীরজা চৌধুরীর।

নীরজা দেবী কিছুই বলতে পারেননি।

মলয়া জ্বালাময় দৃষ্টিতে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি ঝড়ের মতই ঘর থেকে বার হয়ে গেছল!

পরের দিন খবরের কাগজে অবশ্য কোথাও তাঁর নাম দেখেননি।

অসীম রাহার বিবরণেও তাঁর উল্লেখ নেই!

অসীম রাহার এটা কি অনুগ্রহ না অবজ্ঞা?

খবরের কাগজে নাম না থাকলেও সমস্ত মন তাঁর সেই থেকে অস্থির হয়ে আছে।

মলয়ার সেই প্রায় হিংস্র মাত্রাছাড়ানো ভর্ৎসনায় তিনি আহত অবশ্যই হয়েছেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন মলয়ারই জন্যে। তার মনের কোথায় একটা ক্ষতের দাগ যেন কিছুতেই মিলিয়ে যাচ্ছে না। এখনো তার পেছনের চেয়ে সামনের জীবনই অনেক বেশী প্রসারিত ও সম্ভাবনাময়। যে কোন ক্ষত ত তার অনায়াসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা।

কিন্তু তা গেলে কারণে অকারণে এই আকস্মিক বিস্ফোরণ কি দেখা দিত! এই উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খলতা!

হ্যাঁ উচ্ছৃঙ্খলতাই। নিজের কাছে গোপন করে লাভ নেই যে মলয়ার প্রাত্যহিক জীবন শোভনতা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে উগ্র উত্তেজনার পথই বেছে নিচ্ছে।

সব চেয়ে মর্মান্তিক এই যে নিজের মনে অস্পষ্ট এক অনুশোচনায় দগ্ধ হওয়া ছাড়া তাঁর করবার কিছু নেই। তিনি পঙ্গু নিরুপায়। নিজের কন্যার ওপর সমস্ত স্নেহের অধিকারও তাঁর যেন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে অনুচ্চারিত কোন অভিযোগে।

শাসন করবার, বাধা দেবার অধিকার তাঁর নেই, তবু নির্লিপ্ত হয়েও তিনি থাকতে পারবেন না। অন্তত মলয়ার জীবনে তাঁর কোন আঘাত যাতে গিয়ে না পৌঁছোয় তার জন্যে সর্বস্ব পণ করেও তাঁকে যুঝতে হবে।

সেই জন্যেই বিপিন ঘোষ সম্বন্ধে এত সাবধান হওয়ার প্রয়োজন।

বিপিন ঘোষ কোন অস্ত্রকে প্রধান মনে করেছে তা তিনি জানেন না। হয়ত সেও আশাতিরিক্ত কিছুর স্বপ্ন দেখেছে। হয়ত এমন কিছুই সে পায়নি যা তাঁর পক্ষে গ্লানির কারণ হয়ে উঠতে পারে। শুধু তাঁর প্রতিক্রিয়া কি হয় তা বোঝবার জন্যে সে প্রচ্ছন্ন একটু হুমকি দিয়েছে।

প্রতিক্রিয়া যে কি তা বিপিনকে বুঝতে তিনি দেবেন না।

কিন্তু তাকে একটু উৎসাহিত হবার কারণও যোগাবেন। তার জন্যে তার সঙ্গে ফোনে একটু কথা বললেই বা ক্ষতি কি? একটু বিস্মিত বিমূঢ়ভাবে আলাপ করা।—আপনার চিঠি পেলাম। ভালো বুঝতে পারলাম না আপনার বক্তব্যটা। এদিন আসুন না। হ্যাঁ বিকেলে চা খেতেও ত আসতে পারেন আপনার অফিসের পরে!

বিপিন কোন একটা অফিসে কাজ করে তিনি জানেন। নামটা এখন মনে পড়ছে না। কিন্তু তাঁর পুরানো ডায়েরীতে লেখা আছে মনে হচ্ছে।

নীরজা দেবী পুরানো ডায়েরীটা খুঁজতে ওঠেন। ডায়েরীটা তিনি হারাননি, আর বিপিন ঘোষও আশা করা যায় তার সেই চাকরীতে এখনো বহাল আছে।

ফোন অফিসেই করতে হবে, কারণ বিপিন কোথায় থাকে যদিও তিনি জানেন, সেখানে কোন ফোন নেই।

অসীম তার হাত ঘড়িটা দেখল। সাতটা বাজতে দশ মিনিট। আরো মিনিট দশেক সে অপেক্ষা করবে। তারপর আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। খবর তার ভুল হতে পারে
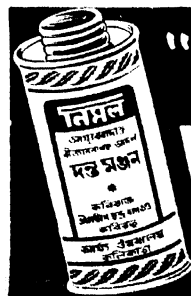
না। এখানে আসাটা অনিশ্চিত হতে পারে কিন্তু এলে সাতটার আগেই আসবে।

এলে তার নজর এড়িয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা নেই। মোটরটাই তাকে চিনিয়ে দেবে। শহরের যে কোন জায়গায় মোটরের মেলা থেকে সেটাকে আলাদা করে নেওয়া যায়।

এখানে অবশ্য মোটরেরই মেলা। পার্ক করবার আর জায়গা নেই বললেই হয়। এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত সে বার কয়েক টহল দিয়ে এসেছে সমস্ত গাড়িগুলোই ভালো করে লক্ষ্য করে।

না, সে গাড়ি এই-সারি সারি অপেক্ষা করা মোটরের মেলার মধ্যে নেই।

ওপারের বিখ্যাত হোটেলটার সামনে সজাগ দৃষ্টি রেখে অসীম তাই এপারের ট্রাম স্টপটার কাছে পায়চারি করছে।

কেউ লক্ষ্য করলে কৌতূহলী হত নিশ্চয়।

ট্রামের পর ট্রাম আসছে যাচ্ছে। ভীড় তাতে যথেষ্ট। কিন্তু তবু না ওঠা যায় এমন নয়। কিন্তু কোন ট্রামই যেন তার মনঃপূত নয়।

যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি আসবার ভয় না থাকলে এই জায়গাটার একটা আকর্ষণ আছে সন্দেহ নেই।

রাস্তার একদিকে শহরের উৎসব-বেশ। বড় হোটেলের সামনের প্রশস্ত ফুটপাথটা একটা উজ্জ্বল নিমন্ত্রণ। দোতালার লম্বা স্নিগ্ধ আলোকিত বারান্দাটা অর্ধস্ফুটে উত্তেজনায় ইঙ্গিতময়। ক্ষণে ক্ষণে রং পাল্টানো নিয়ন-লিপিগুলোর নির্লজ্জ কটাক্ষ।

আর এপারে আলোর ফিকে ছিটে ছড়ানো দীঘিটার কালো জল ছাড়িয়ে বহু দূরের প্রশস্ত রাস্তার স্থির ও দ্রুত ধাবমান বর্তিকা-বিন্দুতে আরো গাঢ় করে তোলা একাকার আকাশ ও প্রান্তরের অন্ধকার অসীম রাত্রি-নিবিড়তা।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে দিনের সেই লক্ষ সংঘাত সংঘর্ষ আশানিরাশা উল্লাস যন্ত্রণার ঘূর্ণিপাকের নগরে আছি বলে মনে হয় না। মনে হয় প্রতি রাত্রে এ নগরও যেন কোন আশ্চর্য অভিসারে বার হয়।

একদিন এই বিচিত্র রহস্য-নগরীর গীতি-কাব্যের কবি হবে এই ছিল অসীম বাহার সাধ। সে সাধের চূর্ণ সব কণা তার উর্ধ্বশ্বাস সাফল্য সন্ধানের পথে কোথায় পিছনে ছড়িয়ে আছে। তার অদম্য সংকল্পের রথ এখন অন্য এক সিদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে ধাবমান। যে সিদ্ধি সুলভ খ্যাতির, নিশ্চিন্ত প্রাচুর্যের।

মনের মধ্যে কোথায় একটা অব্যক্ত ভৎর্সনা কি এখনো অনুভব করে? করলেও তাকে প্রশ্রয় দিতে অসীম রাজি নয়।

সাফল্য বলতে সবাই যা বোঝে তাই সে উপাস্য করেছে। দেবতার বদলে হয়ত অপদেবতা। কিন্তু তার নিজের নিষ্ঠায় কোন দ্বিধার দোলা সে রাখবে না। রেখে কোন লাভও নেই আর। ফিরে যাবার পথ তার রুদ্ধ। এই নগরের রহস্য বিস্ময়কে ছন্দে দুলিয়ে চিরন্তন করার সাধনা তার জন্যে নয়, তার বদলে সে খবরের কাগজের পাতায় উত্তেজনার ঢেউ তুলবে দুদণ্ডের জন্যে। পাঠকেরা অসুস্থ আগ্রহের যে চমকপ্রদ বিবরণ পড়ে পরের দিন ভুলে যায় তারই নতুন নতুন ঝাঁঝালো উপাদান সংগ্রহ ও সাজানো তার কাজ।

অসীম রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াল পার হবার জন্যে। ওপারে হোটেলের ধারে সেই মোটরটাই এতক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে।

হলদে আলোটা নিভে লাল হতে না হতেই সে দ্রুত পায়ে ওপারে গিয়ে পৌছোল।

গাড়ির আরোহীরা ততক্ষণে হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। তাতে কিছু আসে যায় না। যেখানেই তারা বসুক অসীমের খুঁজে নিতে অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া বসবার একটি নির্দিষ্ট জায়গাই তাদের আছে এ খবরও তার জানা।

অসীম হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে উঠল। উঠবার পথে দরোয়ান তাকে সেলাম করেছে। আজ তার সেলাম করবার মতই পোশাক। বড় হোটেলের দরোয়ানেরা চেনা হলে হয়ত মুখের দিকে চায়। নইলে তারা পোশাকই দেখে। পোশাক তারা বোঝে।

এ হোটেল অবশ্য তার একেবারে অচেনা নয়। মাঝে মাঝে তাকে অন্য কাজেও এখানে আসতে হয়েছে। চেনা বয়ও একজন মিলল। অসীম তখন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একানে একটি ছোট টেবিল বেছে নিলে। না, ওদের খুব কাছে নয়। ওদের টেবিল একেবারে বারান্দার রেলিংএর ধারে। অসীমের অন্য প্রান্তে। মাঝখানে আরো একটা দুটো টেবিলের ব্যবধান আছে। কিন্তু দৃষ্টির আড়াল নেই।

এখনো অত্যন্ত সংযত শালীন পরিবেশ। রাত সবে শুরু। পরে এই পরিচ্ছন্ন শান্তি হয়ত থাকবে না। কিন্তু অসীম তার আগেই উঠে যাবে। উদ্দাম হয়ে ওঠা পর্যন্ত চালিয়ে যাবার তার প্রবৃত্তিও নেই সংগতিও নয়। তাকে সবই লোক দেখান করতে হবে, কিন্তু হিসেব করে।

রামবাবুর কাছেই উদ্দেশ্যটা বলার পর রসদ পেয়েছে এ নৈশ অভিযানের। পেয়ে একটু বিস্মিত যে হয়নি তা নয়। রামবাবু কি কাগজের তহবিল থেকে দিয়েছেন? তা ত সম্ভব বলে মনে হয় না। তাহলে রামবাবুর এ বদান্যতার অর্থ কি। কী তাঁর এতে স্বার্থ?

এটাও একটা রহস্য।

আজ তার বিশেষ কিছু করবার নেই। শুধু তার উপস্থিতিটা যদি একটু গোচর করে রাখতে পারে তাহলেই যথেষ্ট। আজ শুধু ভূমিকা। পরবর্তী অধ্যায়ের জন্যে ধৈর্য ধরা। কিন্তু মজুরী পোষাবার মত পরবর্তী অধ্যায় কি কিছু পাবে? দেখাই যাক।

ভাগ্য তার একটু সুপ্রসন্ন। সুবেশ সুপুরুষ এক ভদ্রলোক এদিকের বারান্দায় এসে বসবার জায়গা খুঁজছেন। অসীম তাঁকে চেনে। কিন্তু নিজে থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলে না শোভনতার খাতিরে।

ভদ্রলোকই তাকে দেখতে পেয়ে তারই টেবিলের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বললেন —আপত্তি নেই আশা করি।

আপত্তি? বরং এ ত আমার সৌভাগ্য।—যথোচিত লৌকিকতা বিনিময় করে অসীম হাসল।

বয় কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

অসীম ভদ্রতা করে বললে,—বলুন। কি দেবে?

বলছি!—ভদ্রলোক হাসলেন,—কিন্তু টেবিলটা আমার মনে রাখবেন।

অসীম এইটেই আশা করেছিল। তবু প্রতিবাদের ভান করলে,—তা কখনো হয়! টেবিলটা আমারই। আপনি অতিথি।

হ্যাঁ অতিথি। কিন্তু যেহেতু অনাহূত তাই সাধারণ নিয়মটা উল্টে যাবে। এ টেবিল ছেড়ে উঠে যাই তা নিশ্চয় চান না!

মোটেই না।—অসীমকে হেসে জানাতে হ'ল।

তাহলে সুবোধ বালকের মত যা বলছি মেনে নেবেন।—ভদ্রলোক সমস্যাটা এক কথায় মিটিয়ে দিয়ে বয়কে তাঁর ফরমাশ জানালেন। জানালেন দুজনের জন্যেই।

এটা কি ভালো হ'ল মিঃ পাল?—অসীম মৃদু অনুযোগ জানালে নাম ধরে। এতক্ষণে নামটা তার মনে পড়েছে। মুখটা যদিও চেনা, এবং কোথায় কি সূত্রে দেখা হয়েছে তাও আগেই স্মরণ করতে পেরেছে, তবু নামটা সম্বন্ধে কিছুতেই এতক্ষণ স্থির নিশ্চয় হতে পারছিল না। তার জন্যে একটু অস্বস্তিও বোধ করছিল।

পাল অসীমের অনুযোগ অগ্রাহ্য করে বললেন,—তারপর আপনাকে ত এসব জগতে বড় একটা দেখি না। এখানে ত পানীয়ের গুণে কখনো সখনো কারুর পদ-স্খলনের বেশী বড় ঘটনা কিছু ঘটে না! অপোগণ্ড অকালকুষ্মাণ্ড ও পাষণ্ডদের অর্থ ও স্বাস্থ্য নাশই এখানকার একমাত্র খবর। সে খবরে আপনার কলম উঠবে কি?

পালের মাপ অসীম ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছে। মনেও পড়েছে আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে। পৈত্রিক বেশ কিছু আছে। তারই জোরে বড় একটা বিদেশী যন্ত্রপাতি আমদানির কারবারের প্রধান অংশীদার। এসব কারবারের কিছু ভেতরের খবর নেবার জন্যে কিছুদিন যোগাযোগ করতে হয়েছিল। নিজেকে কেওকেটা বলে

মনে করেন। বাকচাতুর্যেরও একটা অভিমান আছে। সুতরাং এ রকম দুচারটে বাছা বাছা সরস বুলি শুনতে হবে মাঝে মাঝে। তা হোক। একেই কাজে লাগাতে হবে।

অসীম বেশ সরবে হেসে পালের বাক-চাতুর্যের মর্যাদা দিলে, তারপর বললে,—কলমের কালি হাতের বদলে মনেও মাঝে মাঝে লাগে তা জানেন! সেই কালি ধুতেই কখনো-সখনো আসতে হয়।

চমৎকার! চমৎকার!—পাল তারিফ করলেন,—খুব খাঁটি কথা বলেছেন। মনের কালি ধোয়ার আশাতেই এখানে আসা, সে কালি কলম থেকেই লাগুক কিংবা আর কিছু থেকে।

বয় এসে তখন টেবিলে পানীয় রেখে গেছে।

অসীম ওদিকের টেবিলের দিকে যেন হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় একটু বিস্মিতভাবে বললে,—আচ্ছা ওদিকের টেবিলের ওই মেয়েটি মানে ভদ্রমহিলাকে যেন চেনা চেনা লাগছে।

পাল তখন তাঁর পাত্রে এক চুমুক দিয়েছেন। পাত্রটা টেবিলে আবার নামিয়ে রেখে বললেন।—অমার্জনীয়! অমার্জনীয়।

অসীম বিমূঢ়তার ভান করলে।—অপরাধটা বুঝতে পারলাম না।

পারলেন না! আপনি চেনা চেনা লাগছে বললেন, তাও ঝানু সাংবাদিক হয়ে। মিস মলি চৌধুরী আপনার কাছে শুধু চেনা চেনা! পূর্ণিমার চাঁদ দেখেও ত আপনি বলবেন তাহলে, কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে!

পাল নিজেই হেসে টেবিল মাত করলেন।

অপ্রত্যাশিতভাবে তাতেও এমন কাজ হবে কে জানত। আজ অসীম রায়ের বৃহস্পতি তুঙ্গ।

ওদিকের টেবিল থেকে মলি চৌধুরীই ভ্রুকুটি করে তাদের দিকে তাকাল। সংগী দুজনকে চাপা গলায় কি যেন বলছেও মনে হল।

মিস চৌধুরী কিন্তু আপনাকেই লক্ষ্য করছেন মিঃ পাল!—অসীম উদ্বিগ্ন হবার ভান করে জানালে,—আপনার হাসি নিয়েই কি যেন বলছেন মনে হচ্ছে।

হাসিটার হেতু জানলে কি বলেন তাহলে দেখা যাক!—হাসতে হাসতেই পাত্রটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে নিঃশেষ করে পাল সত্যিই উঠে পড়লেন।

অসীম একটু সন্ত্রস্ত হয়নি এমন নয়। ঠিক এইভাবে যোগাযোগটা সে চায়নি। তবু এখন বাধা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা।

পাল ও টেবিলের দলের সংগে বেশ ভালোভাবেই পরিচিত বোঝা যাচ্ছে। হাসতে হাসতে যা বলছেন তারও কয়েকটা কথা কানে আসছে,—তাহলে হাসিটা মাপ করেছেন...ভদ্রলোককে বড় অপ্রস্তুত করেছি ...অনুমতি তাহলে দিচ্ছেন...পৃথিবীতে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করাই আমার ব্রত।

তারপর আবার হাসি।

বয়দের সে টেবিলে আরো দুটো চেয়ার লাগাবার ব্যস্ততা আর পালের হাসতে হাসতে তার দিকে আসা দেখেই অসীম ব্যাপারটা তখন অনুমান করে ফেলেছে। পাল এসে দাঁড়াতেই কিন্তু যথোচিত কুণ্ঠিত হবার ভান করে বললে,—আচ্ছা আমাকে এভাবে অপ্রস্তুত করা কি আপনার ভালো হল!

অপ্রস্তুত যদি হয়ে থাকেন তাহলে এবার প্রস্তুত হ'ন।—পাল ভাষার প্যাঁচ দেখাবার এ সুযোগ ছাড়লেন না,—স্বয়ং মলি চৌধুরী আপনার সংগে আলাপ করতে উৎসুক।

আমার পরিচয় কিছু দিয়েছেন না কি?—অসীমের উদ্বেগটা এবার আন্তরিক।

এখনো দেবার সুযোগ হয়নি।

তাহলে অনুগ্রহ করে আর দেবেন না। শুধু আপনার পরিচিত এইটুকু গৌরবই আমার যথেষ্ট হবে!

তথাস্তু।—বলে পাল অভয় দিলেন।

অভ্যর্থনাটা ভদ্রতা সংগতই হ'ল। পাল পরিচয় করিয়ে দিলেন। মলি চৌধুরী নামটা উচ্চারণ করে একটু থামলেন। সবাই হাসল। মলি চৌধুরীর মুখেও কি একটু প্রসন্ন কৌতুকের আভাস? ঠিক বোঝা গেল না। মলি চৌধুরীর সংগী দুজনেরও পরিচয় পাওয়া গেল। একজন কি যেন ভট্টাচার্য। বিখ্যাত সদাগরী জাহাজ কোম্পানীর বড় অফিসার। কদিনের জন্যে কলকাতার বন্দরে এসেছে, আর একজন শুধু একটা নাম। হিমাদ্রিনারায়ণ ভঞ্জরায়ই যেন শুনল। নামের পেছনে এমন ইতিহাস বা ঐশ্বর্য নিশ্চয় আছে যাতে নামটাই তার যথেষ্ট পরিচয় বলে মনে হল।

নমস্কার বিনিময় করে পালের সংগে অসীমও আসন নিয়ে বসল। তারপর যতদূর সম্ভব অনুগৃহীত ভাব করে বললে,—দেখুন আমার অজ্ঞতার জন্যে লজ্জিত হওয়াই আমার উচিত। কিন্তু তা ঠিক হতে পারছি না। এই অজ্ঞতার দরুণই ত আপনাদের, বিশেষ করে আপনার সংগে পরিচয়ের সৌভাগ্য হল।

কথাগুলো মলি চৌধুরীর দিকে দৃষ্টি রেখেই বলা।

মলি চৌধুরী সত্যিই এবার হাসল। হাসিটা মধুরই বলা উচিত। সে রাত্রের মলি চৌধুরীর মুখে অন্তত এ হাসি কল্পনা করা যেত না।

মলি চৌধুরী হেসে বললে, আশা করি সৌভাগ্য হিসেবেই এটা মনে রাখবেন!

কথাটা কেমন অর্থহীন নয় কি? শুনে অন্তত একটু অবাক হতে হয়।

অবাক হ'তে হ'ল মলি চৌধুরীর পরের ব্যবহারেও। আসর তখন সবে জমতে শুরু করেছে। পানীয়ের গুণে মনপ্রাণ না হোক সবার মুখ খুলেছে। মলি চৌধুরী হঠাৎ

আমি নীরবে উঠে দাঁড়িয়ে মলি চৌধুরীর অনুসরণ করি

টেবিল থেকে উঠে পড়ে বললে,—আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু আমায় এখন যাবার অনুমতি দিতে হবে।

সবাই বিস্মিত প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। বিশেষ করে ভঞ্জরায়।

কিন্তু মলি চৌধুরী অটল,—অবুঝ হোয়ো না হিমাদ্রি। অন্যায় অনুরোধ করো না। তোমরা চালাও।

সকলকে বিমূঢ় করে টেবিল ছেড়ে চলে যেতে গিয়ে মলি আবার ফিরে দাঁড়াল,—আপনিও আসুন না মিঃ রাহা। এ আসরে আপনার খুব উৎসাহ আছে বলে ত মনে হয় না।

কথাটা এমন অপ্রত্যাশিত অবিশ্বাস্য যে অসীমের মনে হল শুনতেই বোধহয় তার ভুল হয়েছে কিছু। অন্যেরাও তখন স্তম্ভিত নির্বাক।

কই আসুন।—এবারে অনুরোধ নয় আদেশই।

অসীম নীরবে উঠে দাঁড়িয়ে মলি চৌধুরীকে অনুসরণ করলে। অন্যদের কাছে ভদ্রতার খাতিরে বিদায় নেওয়াটাও তার হ'ল না।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে হোটেলের সামনের ফুটপাথে। সেখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না।

মলি চৌধুরীকে দেখেই দরোয়ান ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওপার থেকে ড্রাইভারেরও গাড়ি নিয়ে আসতে দেরী হল না।

এবার মলি চৌধুরী যা করে বসল তাও বিমূঢ় করবার মত।

ড্রাইভারকে হঠাৎ ছুটি দিয়ে নিজেই চালকের আসনে গিয়ে বসল। অসীমের দিকে ফিরে বললে, 'আসুন'।

এটা খাস মার্কিন গাড়ি। বাঁ দিকে ড্রাইভারের বসবার জায়গা। অসীমকে তাই ঘুরে ওদিকে গিয়ে উঠতে হ'ল। এই ঘুরে যাওয়াটাও বুঝি তৎপর্যময়। গাড়িটার বিশেষত্বের দরুণ নয়, ঘুরে যেতে বাধ্য হওয়া যেন মলি চৌধুরীরই অভিপ্রায়ে। এইটুকুর ভেতরই তার সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন একটা অবজ্ঞামিশ্রিত অনুগ্রহের ইঙ্গিত।

ঘুরে গিয়ে বসাটা অসীমের কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত দিক দিয়ে কাজে লাগে। আত্মস্থ অবিচলিত নিজেকে মনে করার যত গর্বই থাক মলি চৌধুরীর খানিক আগের আকস্মিক ব্যবহারে সে একটু বিহ্বলই হয়ে পড়েছিল সন্দেহ নেই। এই ঘুরে গিয়ে বসবার মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে তার ভারসাম্য ফিরে পাবার সে সময় পায়। মলি চৌধুরীর যে কোন খেয়ালকে সকৌতুক নির্লিপ্ততার সঙ্গে নেবার জন্যে সে এখন প্রস্তুত।

কিন্তু তার আত্মবিশ্বাসে আরো একটা নাড়া খাওয়া যে বাকি সে আর কি করে জানবে।

মলি চৌধুরী নিপুণ হাতে সবেগে গাড়িটা চালিয়ে রাস্তার ট্রাফিক লাইটগুলোর শাসন পলকের ভগ্নাংশে যেন অবজ্ঞা ভরে ব্যর্থ করে দিয়ে সোজা গঙ্গার ধারের একটি

নির্জন জায়গায় এসে ইচ্ছে করেই যেন একটা ঝাঁকানি দিয়ে হঠাৎ থামালে।

ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিয়ে তারপর পেছনে হেলান দিয়ে নিজেকে এলিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বললে,—জায়গাটা কেমন? যথেষ্ট নির্জন নয় কি?

অসীমও তখন প্রস্তুত। বললে,—নির্জন কিন্তু নিরাপদ নয়!

কেন? গুন্ডারা হানা দিতে পারে?

তা' ত পারেই। গুন্ডাদের শাসন করা যাঁদের কাজ তাঁরাও নীতিধর্মের ধারক হয়ে কখনো কখনো অনুগ্রহের দৃষ্টি দেন শুনেছি।

শুধু শুনেছেন! একবার না হয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হবে।—মলি চৌধুরী হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে অসীমের দিকে ফিরে বললে, —শিকারের পেছনে লুকিয়ে ধাওয়া করছিলেন। শিকার নিজেই আপনার সামনে এসে ধরা দিয়েছে। এবারে কি বাণ ছাড়বেন ছাড়ুন।

কথাগুলো এখনো কিছুটা পরিহাসের সুরে বলা। সুতরাং এখনো লুকোচুরির খেলা করা চলে। অসীমও লঘুস্বরে বললে, —আপনাকে শিকার করবার স্পর্ধা আমার হবে একথা ভাবতে পারলেন কি করে? আমার ত ছেলেখেলার তীরধনুক সম্বল। তা দিয়ে বড় জোর চড়ুই শালিককে তাগ করা যায়। বনের হরিণী আমার স্বপ্নেরও বাইরে।

আপনার বিনয় উপভোগ করলাম। কিন্তু আমারই একটু বলার ভুল হয়েছে। শিকার যে আমি নই তা আমিও জানি আপনিও জানেন। আমায় দিয়ে শুধু আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান। তাই করবার সুযোগই আপনাকে দিতে এলাম।

গলার স্বরটা এখন একটু কঠিন হয়েছে। অসীম নিজেকে প্রস্তুত করবার জন্যে আর একটু সময় নিলে কথাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে, —আপনি আমার কি পরিচয় জানেন—আমি ঠিক জানি না......

আপনার সঠিক পরিচয়ই জানি।—মলি চৌধুরী বাধা দিলে।—আপনার কাছে আমি চেনা চেনা হতে পারি, কিন্তু আপনাকে আমি ভালো করেই চিনি। তা ছাড়া আমার স্মৃতিশক্তিটা দুর্বল ভাবছেন কেন?

অসীম আবার হালকা হবার চেষ্টা করলে। একটু হেসে বললে,—যে অবস্থায় সেদিন কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমায় দেখেছিলেন তাতে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির চেহারা আপনার মনে থাকবে ভাবি নি।

সেদিনের আগেই আপনাকে দেখেছি। আপনার কীর্তিকলাপও কিছু কিছু জানি।—স্বরটা প্রায় রূঢ়।

আমার কীর্তিকলাপ! আপনি জানেন! —অসীমের বিস্ময়টা এবার সম্পূর্ণ ভান নয়।

হ্যাঁ জানি। জানবার সৌভাগ্য হয়েছে। কিছুদিন আগে জাল ওষুধের ব্যবসার নাড়ি-নক্ষত্র জানিয়ে দিয়ে দেশের লোককে চমকে দিয়েছিলেন। এবার আর কি জাল ধরতে বেরিয়েছেন?

শুধু কেবল জালের পেছনেই ছুটি, ভাবছেন কেন? আসল খাঁটি জিনিসের সন্ধানেও কি আমাদের ফিরতে নেই!

ফিরতে মানা নেই। কিন্তু তা থেকে রসালো ঝাঁঝালো 'ত কিছু গাজিয়ে তোলা যায় না। সুতরাং ওসব বস্তুতে আপনাদের অরুচি।—মলি চৌধুরীর কণ্ঠে ঘৃণারই আভাস যেন।

আপনি কিন্তু আমায় ভুল বুঝেছেন!

ভুল বুঝে থাকলে আমি দুঃখিত।—মলি চৌধুরী হঠাৎ কি ভেবে হেসে উঠল। তারপর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে বললে,—ভুলটা আপনি সংশোধন করে দিতেও ত পারেন?

কি করে?—অসীমের প্রশ্নটা সরল।

কেন?—মলি চৌধুরীর গলায় সেই কৌতুকে বিদ্রূপে মেশানো সুর।—আমার সঙ্গে একটু প্রেম করবার চেষ্টা করে? সুযোগ ত আপনার অবাধ। আপনি যদি হাতটা বাড়িয়ে আমাকে কাছেও টানেন আমি বড়জোর একটু বাধা দিতে পারব। কিন্তু চিৎকার করে লোক ডাকতে পারব না। ডাকলেও কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। আমারই গাড়িতে নিজে চালিয়ে আমি আপনাকে এই নির্জন জায়গায় এনেছি। আমিই যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছি তার সাক্ষীরও অভাব হবে না। এ সুযোগটাও আপনি নিতে পারছেন না, শহরের অনেক ধারালো শাঁসালো তরুণের মাথা যে এখনো ঘুরিয়ে দিচ্ছে তেমন একজন সুন্দরী—সুন্দরীই বা নয় কেন—মেয়েকে এমন অসহায়ভাবে বেকায়দায় পেয়ে। আপনার বয়স ত এমন কিছু বেশী মনে হয় না, চেহারাটাও চলনসই, কিন্তু খবরের কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে ভেতরটা কি কাগজের মতই নীরস শুকনো হয়ে গেছে নাকি?

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা অনর্গল স্রোতে বলে গিয়ে—মলি চৌধুরী হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করলে। সাধারণ কৌতুকের হাসি নয়। প্রায় অপ্রকৃতিস্থ হিস্টিরিয়ার হাসি।

অসীম সত্যিই স্তম্ভিত।

যেমন আচমকা হাসতে শুরু করেছিল তেমনি হঠাৎ হাসি থামিয়ে ইঞ্জিনের চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়ে মলি চৌধুরী শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে,—প্রহসন ঢের হয়েছে। এবার চলুন আপনাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে যাই। আপনার কাগজের অফিসেই যাবেন নিশ্চয়।

অসীম জবাব দিল না। ড্যাসবোর্ডের মৃদু আলোতেই মলি চৌধুরীর চোখের পাতায় যেন জলের ফোঁটা দেখা যাচ্ছে মনে হল। কিংবা হয়ত তার মনের ভুল।

মলি চৌধুরীই আবার বললে,—ভাবছেন কেন এমন প্রহসন করলাম, কেমন? আপনার সন্ধোটায় এত তোড়জোড় একেবারেই মাটি হল।

না তা কেন ভাবব!—অসীম প্রতিবাদ করে আরো কিছু হয়ত বলত, মলি চৌধুরী তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে,—ভয় নেই একেবারে তা হবে না। আপনার খাঁই যত বড়ই হোক একটা খবর অন্তত আপনাকে দিচ্ছি যা পেলে আপনার মত মানুষের বর্তে যাওয়া উচিত। উমাপতির বিষয়েই আপনি ইতিহাসের মশলা খুঁজে বেড়াচ্ছেন ত? আকাশ পাতাল যার জন্যে চষে ফেলতে পারতেন তেমনি একটা মশলা আপনাকে অযাচিতভাবে দিচ্ছি, দেবার জন্যেই এখানে এসেছি। শুনুন উমাপতি ঘোষালকে আমি ভালবাসতাম, যে ভালবাসা সব বিচার ভাসিয়ে দেয় —স্থানকাল পাত্র ভুলিয়ে দেয় সেই ভালবাসা। আরও জেনে রাখুন পাথরের দেবতাকে ভালবাসছি জেনেই এমন করে ভালবেসেছিলাম। ব্যস্ আপনার কল্পনার অতীত নিশ্চয় কিছু পেয়েছেন, আর কখনও আমায় বিরক্ত করবেন না, আমার পিছু নেবেন না। আমাদের বাড়িতেও আপনার ছায়া যেন না পড়ে।

মোটরটা গর্জন করে মলি চৌধুরীর দুরন্ত রাগের জ্বালার মতই রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আজ ছুটির দিন।

জয়া সারাদিন বাড়ি থেকে বার হয়নি। বার হবার উৎসাহই বোধ করেনি। সারাদিন আজ আকাশের মুখ ভার। সারাদিন থেকে থেকে বৃষ্টি পড়ছে।

বৃষ্টি হলে অসুবিধে বড় কম হয় না। একটি ছোট ঘর আর বারান্দা নিয়ে জয়ার বাসা। ঘর আর বারান্দাটা দোতালার। কিন্তু রান্নাঘর কল সব নিচে। বাড়িওয়ালা সপরিবারে নিচেই থাকেন। তাঁরই রান্নাঘরের মাঝখানে একটা দেয়াল তুলে জয়ার জন্যে খানিকটা জায়গা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কলঘর ইত্যাদি এজমালি।

নিচে নামবার সিঁড়িটা উদোম, ওপরে ঢাকা নয়। বর্ষার দিন নামতে উঠতে ভিজে যেতে হয়।

জয়া আজ রান্নাঘরে যায়ই নি। সকালে স্নানটান করেই ওপরে উঠে এসেছে। ওপরে এসে চা-টা স্টোভেই করে নিয়েছে। দুপুরেও নিচের ঠিকে ঝিকে দিয়ে বাজার থেকে কিছু খাবার আনিয়ে খেয়েছে। রাত্তিরে যা হোক দেখা যাবে।

এমন ব্যবস্থা তার নতুন নয়। আগেও অনেক বার করেছে। ছাত্রীদের পরীক্ষার অনেকগুলো খাতা জমে আছে। আজ সেগুলো সেরে ফেলাই তার সংকল্প।

খাতা দেখা কিন্তু কিছুতেই এগুচ্ছে না। মনে হচ্ছে নম্বর দিতে যেন ভুলটুল হয়ে যাচ্ছে। জয়া এ বিষয়ে অত্যন্ত কর্তব্য-

পরায়ণ ন্যায়নিষ্ঠ। পাছে অবিচার হয় এই ভয়ে সে অত্যন্ত সাবধান।

কিন্তু আজ উত্তরগুলো যেন ঠিক মত বিচার করতেই পারছে না। আজ কেন কদিন থেকেই এই মনোযোগের অভাব। কবে থেকে তা জন্য ইচ্ছে করেই হিসেব করতে চায় না।

খোলা খাতাটা মুড়ে অন্য সবগুলোর সঙ্গে সরিয়ে চাপা দিয়ে রেখে দেয়। থাক্ এখন জোর করে দেখবার চেষ্টা করলে ভুল আরো বেশী হবে। দৃষ্টিটা খাতার ওপর থেকে বাইরেই চলে যাচ্ছে।

এ ঘরের একটি মাত্র সুবিধে এই যে, সামনে অনেক খানি ফাঁকা পাওয়া যায়। দক্ষিণে কটা টিনের চালাঘর। বাড়িওয়ালারই সম্পত্তি। গরীব কঘর গৃহস্থ সেখানে ভাড়া করে থাকে। সেই টিনের চালা আর তার আশপাশের কলা পেঁপে গাছের মাথার ওপর দিয়ে বড় দীঘিটার ওপার পর্যন্ত দেখা যায়। সামনের দিকটাই শুধু এই টিনের সব চালা ঘরে আড়াল। নইলে দীঘিটার বাকি সবটুকুই চোখের সামনে অবারিত।

আজ থেকে থেকে বৃষ্টি পড়া বাদলার আকাশের ম্লান আলোয় দীঘিটার যেন রূপান্তর হয়েছে। ওপারের ভাঙা বাঁধানো ঘাটটায় আজ আর লোকজন নেই বাদলার দরুণ। অন্যদিন দুপুর বেলাতেও ফাঁকা থাকে না একেবারে। এ তল্লাটের সঙ্গতি-হীন মানুষদের কাছে এই দীঘিটিই একটা পরম আশীর্বাদ। স্নান করবার বাসন-কোষণ ধোবার, রান্নার, খাবার জলও নেবার। অন্য দিন তাই ভিড় লেগে থাকে সারাদিন। দীঘির জলটাও যে নোংরা হয়ে এসেছে সংস্কারের অভাবে তা লক্ষ্য না করে পারা যায় না।

আজ কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটায় রোমাঞ্চিত দীঘির জল যেন সে সব গ্লানি মলিনতা ভুলে গিয়েছে। শুধু একটা রহস্যময় প্রশান্তি তার ওপর প্রসারিত। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় খানিকটা জল শিহরিত হয়ে উঠছে মাত্র এখানে সেখানে, নইলে একটা ঈষৎ স্বচ্ছ রহস্য যবনিকার অবিরাম আনন্দ স্পন্দন।

এইটুকুই তার বিলাস, এইটুকুতেই তার ক্ষণিক আত্মবিস্মরণ। এই দীঘির দৃশ্য-টুকুর লোভেই অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও এই বাসা ভাড়া নিয়েছিল মনে আছে। তার-পর অসুবিধা বেড়েছে। বাড়িওয়ালার সঙ্গে তেমন বনিবনাও নেই। তবু এ বাসাটা ছাড়তে মন ওঠে নি। ওই দীঘিটাই হয়ত তাকে বেঁধে রাখবার একমাত্র কারণ নয়। কিন্তু সেইটেই প্রধান।

ওপরের এই নিজের ঘরটিতে এলে অন্তত সে একলা হবার আশা করতে পারে। আশা সব সময়ে পূর্ণ হয় না। বাড়িওয়ালা-দের আসা যাওয়া ইদানীং মনকষাকষির দরুণ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু ছাত্রীরা কি স্কুলের সহকর্মীদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে এসে উপস্থিত হয়। ভদ্রতার খাতিরে তাদের আপ্যায়নও করতে হয়। পৃথিবীতে কারুর সঙ্গ সে যে আর চায় না সে কথা কেমন করে কাকে জানাবে!

এ বাসায় কতদিন তার কাটল? তা এক যুগ বলেই মনে হয়। উমাপতির সেই কাগজটা উঠে যাবার কিছুকাল পরই। উমা-পতি তার 'আন্দামান' থেকে বেরিয়ে এসে আবার এক কাজের উৎসাহের আকস্মিক জোয়ারে হঠাৎ নির্বাচন যুদ্ধে দাঁড়াবে ঠিক করেছিল। সে কি বিশৃঙ্খল উত্তেজনা আর ব্যস্ততার দিনই গিয়েছে।

জয়াও প্রথমটা মেতে উঠেছিল। সারা-দিন সেই লোকের ভীড়, অভিযানের নানান দিকের ব্যবস্থা, উমাপতির সঙ্গে এখানে সেখানে সভায় যাওয়া।

উমাপতির কাছে তখন রথী মহারথীরা আনাগোনা করছেন তাকে ছোট বড় নানা দলে টানবার জন্যে।

উমাপতি রাজি হয় নি কোন দলের সঙ্গে নিজের নাম জড়াতে। সে একাই তার দল ও দলের নেতা। যাঁরা বোঝাতে আসতেন তাঁদের সে বলত,—আপনাদের অনেক কথা আছে বলবার, আমার শুধু একটা কথা। সেই একটা কথা আমি একলাই বলতে চাই যত ক্ষীণই আমার কণ্ঠ হোক। সেই একটা কথা বলবার অধিকার আমায় যদি দেশের লোক দেয় তাহলেই আমি কৃতার্থ।

দেশের লোকের কাছে প্রথম দিকেই সাড়া যা পাওয়া গিয়েছিল তাও প্রায় আশাতীত। উমাপতি ঘোষালের আবেদন আর পাঁচজনের মত নয়। সে বড় বড় ময়দানে পার্কে বিরাট কোন সভা ডাকে না। কোথাও কোন গলির মোড়ে, কারুর বাড়ির উঠোনে বড় জোর ছোটখাট পার্কে তার সভা। দীর্ঘ বক্তৃতা নয়, আস্ফালন উচ্ছ্বাস নয়, চিৎকার নয়। দৃঢ়কণ্ঠে কয়েকটি শুধু কথা,—কি করব আমায় জিজ্ঞাসা করবেন না। স্রোত বুঝে নৌকোর হাল ধরতে হয়। আমার কাছে আশ্বাস চাইবেন না। আমায় বিশ্বাস করতে পারেন কি না তাই বিচার করে দেখুন। আমি আকাশের চাঁদ পেড়ে দেব না শুধু আমার যা হক্ তা দেব না কাউকে কেড়ে নিতে। আমার হক্ ই আপনার হক্ আপনাদের সকলের।

বিশ্বাস লোকে করেছিল। ভয় পেয়েছিল বিরুদ্ধপক্ষ। উমাপতি ঘোষালের কোন সম্বলই নিজের ছিল না। কিন্তু নির্বাচনে দাঁড়ান শূন্যে ঝুলিতে হয় না। কিছু অন্তত রসদ দরকার হয়। সেই রসদ যোগাবার ভার স্বেচ্ছায় অযাচিতভাবে দু একজন উৎসাহী ভক্ত নিয়েছিল।

বিপক্ষ দলের ফন্দিফিকিরে তাদের মধ্যে ভাঙন ধরল প্রথম। একজন গা ঢাকা দিলে বেমালুম।

উমাপতির গ্রাহ্য নেই। শুধু টাকার জোরে নির্বাচনের সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায়—এ ধারণাই সে পাল্টে দেবে। জনসাধারণকেই আত্মবিশ্বাসে অটল করতে হবে। তাদের আত্মসম্মান জাগাতে হবে। গণতন্ত্রের কোন মানেই হয় না গোড়াতেই যদি তার গলদ হয়। গোড়া হল প্রত্যেকটি মানুষ নিজে। তার সততা, তার সৎসাহসই হল সব কিছুর ভিত্তি। সে যদি নিজেকে ফাঁকি দেয় তাহলে গোটা কাঠামোটাই ফাক্কিকার। ফাঁকি সে ইচ্ছে করে সবসময়ে দেয় না। ফাঁকা বুলির মোহে পড়ে প্রতারিত হয়। তাই কথাকে নয়, মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস করবার মত মানুষ খুঁজতে হবে।

এই সময়ে একজন পাহাড়ের মত অটল আশ্বাস দিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন অযাচিত ভাবে।

নিশীথ পাত্র।

নিশীথ পাত্র অন্য দলের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু বিনা দ্বিধায় প্রকাশ্যভাবে তিনি উমা-পতিকে সমর্থন করেছেন শুধু তাঁর উপস্থিতি দিয়ে।

নিশীথ পাত্র কোন সভায় দাঁড়িয়ে কিছু কখনো বলেন নি। কিন্তু তাঁকে ঘরে বাইরে অধিকাংশ জায়গায় উমাপতির পাশে দেখা গিয়েছে।

সেই শুভ্রকেশ সৌম্যমূর্তি তাপস, চেহারা চরিত্র সব কিছুতে যাঁকে উমাপতির সম্পূর্ণ বিপরীত বলা যায়।

উমাপতি যেন একটা প্রচণ্ড বহ্নি-বিস্ফোরণের বেগ নিজের মধ্যে সংবরণ করে নিয়ে ফিরছে। তার মুখে চোখে চলায় ফেরায় তারই তীব্র ছটা যেন লুকোন যায় না।

উমাপতির তখন মাথায় অবিন্যস্ত দীর্ঘ চুল, এক মুখ দাড়ি। নাতিদীর্ঘ রোগাটে দেহ নমনীয় অথচ বজ্রকঠিন ইস্পাত দিয়ে তৈরী মনে হয়। মুখের মধ্যে চোখ দুটো যেন বেমানান। দীর্ঘায়িত চোখ নয়। কিন্তু তার মধ্যে দুর্বোধ রহস্যময়তার সঙ্গে একটা ক্ষুধিত আবেগ কি করে যেন মিশে আছে।

উমাপতির চোখের অন্য রূপও জয়া দেখেছে। তার চোখ সত্যিই বুঝি তার সত্তার মুকুর ছিল। ভেতরের আলোড়ন উত্তেজনা সে চোখে কেমন করে প্রতিফলিত হয়ে উঠত। আবার কখন সে দৃষ্টি কৌতুক প্রসন্নতার আভাস দিয়ে শান্ত সমাহিত হয়ে যেত।

তখন উমাপতির মধ্যে একটা আলোড়নের পর্ব চলেছে।

সে আলোড়ন শুধু এই রাজনীতিতে নামা নিয়েই নয়।

রাজনীতিতে নামা কিন্তু বিপর্যয়ই ডেকে এনেছে। কল্পনাও যেদিক থেকে করা যায় নি সেদিক থেকে নিচের পাঁক ঘুলিয়ে উঠেছে। আপনা থেকে ঘুলিয়ে ওঠেনি

যাদের স্বার্থ আছে তারাই ঘুলিয়ে তুলেছে সময় বুঝে।

গোড়ায় একটু কানাঘুষো শোনা গেছে। তারপর প্রকাশ্য চিঠি খবরের কাগজে। প্রথমে যে চিঠি বেরিয়েছে তা এমন মারাত্মক কিছু নয়। জনৈক পাঠক প্রশ্ন করেছে, উমাপতি ঘোষালের সমর্থকদের সম্বন্ধে। নাম না করেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে জানতে চেয়েছে যে উমাপতি ঘোষালের নির্বাচন আন্দোলনের মোটা ব্যয় যিনি জোগাচ্ছেন তিনি কুখ্যাত দেশদ্রোহী পর্বের দল থেকে বিতাড়িত একজন উচ্ছৃঙ্খল ধনী-সন্তান কি না!

কথাটা অর্ধ সত্য। তাই কিছুটা গোল বাধিয়েছে।

দলছাড়া একজন স্বাধীনচেতা সুপরিচিত ব্যক্তি সত্যিই উমাপতিকে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি ধনীও বটে ব্যক্তিগত চরিত্রও হয়ত তাঁর নিষ্কলঙ্ক নয়। কিন্তু তাঁর কাছে কণামাত্র অর্থ সাহায্যও উমাপতি নেন নি।

উমাপতি এ চিঠির প্রতিবাদ পর্যন্ত করে নি ঘৃণায়। মিথ্যা কুৎসার ধোঁয়া আপনিই মিলিয়ে গেছে কিছুদিন বাদে।

কিন্তু নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষেরা আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে।

প্রথমে ইঙ্গিত ইশারা তারপর স্পষ্ট কলঙ্ক লেপন করেছে উমাপতির নিজের চরিত্রে। কুৎসিত ভাষায় ইস্তাহার ছাপিয়ে বিলি করেছে। উমাপতির ব্যক্তিগত জীবনই তার আলোচ্য। লিখেছে উমাপতি ঘোষালের একটি নিভৃত গোপন গোকুল আছে সে কথা সবাই জানে কি? উমাপতির 'আন্দামান'-কেই মিথ্যা রংচং-এর প্রলেপ লাগিয়ে বর্ণনা করেছে। বলেছে উমাপতি সেখানে রাসলীলা করে, আর জনসাধারণের কথা ভাববার সময় পাবেন কি?

একটার পর একটা এরকম জঘন্য কুৎসা মাখানো কাগজ ছেপে ছড়িয়েছে।

শেষের দিকে একটা কাগজে জয়ার নাম দিতেও পেছপাও হয় নি।

কে এই জয়া নামে মেয়েটি?—সাধারণের কাছে প্রশ্ন তুলেছে।—এ মেয়েটির সঙ্গে উমাপতিকে প্রায় সর্বত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে দেখা যায় কেন? বুঝে নাও যে জানো সন্ধান!

জয়া স্তম্ভিত হয়েছে। উমাপতি কিন্তু তখনও নির্বিকার।

কিন্তু বিপক্ষের এ ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হয় নি।

উমাপতির ছোট অন্তরঙ্গ সভার ভেতর থেকেও একজন হঠাৎ একদিন টিট্‌কারি দিয়ে উঠেছে।—জয় জোড়ের পায়রা কি! ও ধনীটি কে বাবা?

সেদিন সভায় যারা উপস্থিত তাদের অনেকেই রেগে লোকটাকে বার করে দিয়েছে। কিন্তু তারপর উল্টো দিকেই হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

উমাপতির সঙ্গে আরেক সভায় গিয়ে দেখেছে বড় করে একটা পোস্টারের মত কাগজে লাল কালিতে লেখা—উমাপতি না উপপতি।

সেইদিন উমাপতির এমন এক অগ্নিমূর্তি জয়া দেখেছে যা কোনদিন ভোলবার নয়।

সেই লেখাটা সামনে ধরে রেখে উমাপতি বলে গেছে তার কথা। বক্তৃতা নয় আগ্নেয়গিরির লাভা স্রোত। এই সমাজ এই দেশ এই সব কৃমিকীটের মত মানুষ সম্বন্ধেই তার অগ্ন্যুদ্গার।

তার সে ভাষণে বুঝি পাহাড় টলে যায়। সমবেত জনতার মনেও আগুন ধরে গেছে। তারা নিজেরা এগিয়ে এসে সে কাগজ পুড়িয়ে বারবার স্বতঃস্ফূর্ত জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছে।

উমাপতি সেদিন জয়ী হয়েছে।

কিন্তু জয়া সে সভা থেকে ফিরে এসেছে একেবারে যেন অন্য মানুষ হয়ে। তার ভেতরটা কে যেন চুরমার করে দিয়েছে, জগৎটাই ওলটপালট হয়ে গেছে।

উমাপতির এ সাময়িক জয়ে সে কোন সান্ত্বনা পায় নি। কি দাম এই ক্ষণিক সাফল্যের?

পরাজয়ও এখানে যেমন অর্থহীন জয়ও তাই।

একটা অন্ধ বিচারহীন জড় প্রবাহ। ঢেউ-এর মাথায় আকাশে তুলতে ও যেমন, তলার পাঁকে চুবিয়ে মারতেও তেমনি বেশী কিছু লাগে না। বেশীক্ষণও নয়।

এই প্রবাহের অচেতনতা যতদিন না দূর করতে পারছে ততদিন কিছুতে কিছু হবে না। একা উমাপতি ঘোষালের সাধ্য তা নয়। উমাপতি হয়ত বৃথাই নিজেকে বলি দিচ্ছে।

উমাপতি নিজেকে উৎসর্গ করতে চায় করুক। সে বাধা দেবার কে? বাধাও দেবে না, তার লজ্জার ভার হয়েও থাকবে না।

জয়া একেবারে নিজেকে অপসারিত করে দিয়েছিল উমাপতির জগৎ থেকে। এক মুহূর্তে কোন চিহ্ন না রেখে।

সেই তখনই এই বাসাটি খুঁজে বার করে এক রাত্রের মধ্যে উঠে এসেছিল, কোন ঠিকানা না রেখে। মর্মান্তিক ভাবে তখন সে আহত, দেহে, মনে, আর আত্মা বলে যদি কিছু থাকে তাতেও।

তার সেই ক্ষতগুলি নিয়ে সে একটু নির্জনে নিজেকে নির্বাসিত করতে চেয়েছে—সকলের চোখের অন্তরালে। আহত পশু যেমন করে তার গোপন গুহায় গিয়ে শয্যা নেয় তেমনি।

এ ক্ষত কি শুধু এই নোংরা নীচ রাজনীতির জগতের বিষাক্ত শরের?

না, তা নয়। তবে এই শেষ আঘাতই তার জর্জর সত্তাকে একেবারে যেন ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

বিস্ময়ের কথা এই যে, নিজের বেদনা জর্জরতা এতদিন বুঝি সে নিজেই ভালো করে উপলব্ধি করেনি। কিংবা স্বীকার করতে চায় নি নিজের মনের কাছে স্পষ্ট করে।

উমাপতির নতুন উদ্দীপনা তাই সে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল নিজের মধ্যে। একটা দুঃসাধ্য সাধনের নেশায় নিজেকে মাতিয়ে ভুলে থাকতে চেয়েছিল আর সব কিছু। কিন্তু পারল কই! নিজের ক্ষতবিক্ষত চেহারাটা নিজের কাছে আর আড়াল রাখা গেল না।

কবে থেকে এই বেদনা বোধের সূত্রপাত? সন তারিখ ধরে বলতে পারবে না। উমাপতির কাগজ যখন প্রায় ওঠে ওঠে, ধীরে ধীরে নিজেই যখন সে পত্রিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে তার সেই 'আন্দামানে' এক এক ঝোঁকে দীর্ঘদিনের জন্যে আত্মগোপন করতে শুরু করেছে তখন থেকেই সন্দেহ নেই।

নাম না থাকলেও জয়া-ই তখন কাগজের প্রায় সব কিছুই দেখে। দেখতে হয় বাধ্য হয়ে। উমাপতি এক আধদিন এসে হঠাৎ একেবারে বহুদিনের জন্যে নিখোঁজ হয়ে যায়। জয়া অনুযোগ করলে কথা দেয় নিয়মিত আসবার। কিন্তু কথা রাখে না।

কাগজ চালান এদিকে দায় হয়ে উঠেছে। চারিদিকে দেনা বাড়ছে। প্রেসের দেনা, কাগজের ব্যবসাদারের দেনা। কাগজের বিক্রি তখনও কমেনি। কিন্তু বিজ্ঞাপন সংগ্রহের ব্যবস্থা অত্যন্ত অগোছালো। যাও বিজ্ঞাপন আছে তার মূল্য আদায় ঠিক মত হয় না। একা জয়ার পক্ষে এত সব কিছু করা সম্ভব নয়। সাহায্য করবার আছে কেউ কেউ। কিন্তু তাদের প্রায় সকলেরই শখের চাকরি। প্রথম দিকে যারা ভীড় করেছিল তাদের অনেকের উৎসাহে ভাঁটা পড়ায় সরে গেছে। উমাপতির নিজের ঔদাসীন্যেও অনেকে নিরুৎসাহ হয়ে বিদায় নিয়েছে। পারে নি শুধু জয়া। সে একদিন বিরুদ্ধ সমালোচক হিসেবেই এসেছিল। কিন্তু তার পর কবে কি করে জড়িয়ে পড়েছে সে আরেক ইতিহাস।

অদম্য জেদ জয়ার চরিত্রের একটা প্রধান লক্ষণ। কাগজটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পর সে দুর্যোগ দেখে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে নি। কিন্তু অনিয়মিত ভাবে বেরুতে বেরুতে কাগজটার ক্রমশ প্রায় অচল অবস্থা হয়ে পড়েছে। কাগজের দেনা নিয়ে এমন একটা সমস্যা উঠেছে যে, এখুনি তার মীমাংসা না করলে নয়।

অনেকদিন উমাপতির দেখা নেই।

জয়া নিজেই একদিন অধৈর্য হয়ে গেছে তার সেই সুদূর আস্তানায়, সেই আন্দামানে।

এই বুঝি তার তৃতীয়বার সেখানে যাওয়া। নিজে থেকে যাওয়া এই প্রথম। এর আগে উমাপতির সঙ্গেই গেছে দুবার। গেছে উমাপতিরই অনুরোধে।

পথ সে চেনে। কিন্তু এবার যেন আরো বেশী দুর্গম মনে হয়েছে।

তখনও এমনি বর্ষার দিন।

বাস থেকে যেখানে নেমেছে সেখান থেকে গন্তব্য দিকটা স্থির করতে অসুবিধায় পড়েছে। বাসের কণ্ডাক্টারকে জিজ্ঞাসা করেছিল। সে বাস যে সব জায়গায় থামে সেই সব ঘাঁটির নামটাম জানে। এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করতে পারে নি। বাসের এ ক্ষেত থেকে ও ক্ষেতে বইবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে নালা কাটা।

পথটাও সেদিন অনেক দূর মনে হয়েছে। যাবার অসুবিধের জন্যে বোধহয়। কিংবা আগে উমাপতির সঙ্গে গল্প করতে করতে গেছে বলে খেয়াল করে নি।

বেশ কিছুটা হাঁটবার পর সেই জলা পেয়েছে, আর জলার মধ্যে সেই দ্বীপটুকু।

বাঁশের নড়বড়ে সাঁকোর ওপর দিয়ে

আপনে পাগলাবাবুকে খোঁজ করতি এয়েছিলেন

দুচার জন যাত্রী একটু আধটু ভাসাভাসা হদিস দিতে পেরেছে মাত্র।

এর আগে ক'বারই উমাপতির সঙ্গে গাড়িতে এসেছিল বলে এই অসুবিধা।

তবু শেষ পর্যন্ত জয়া পথ খুঁজে বার করেছে। বর্ষার দিনে সে পথ এমন দুর্গম হবে শুধু কল্পনা করতে পারে নি। বড় রাস্তা থেকে দুধারের ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে কাঁচা আলের পথ। জলে কাদায় পেছল। মাঝে মাঝে আবার বর্ষার জল দুচার জন যাত্রী একটু-আধটু ভাসাভাসা উদ্বেগ অধৈর্য আর পথের এই কষ্ট যেন ভুলে গিয়ে কেমন একটা উত্তেজনাই অনুভব করেছে। উমাপতিকে চমকে দেবার একটা ছেলেমানুষী আগ্রহ।

কিন্তু কোথায় উমাপতি?

ঘর ত আসলে একটা। চারিদিকের জলার মধ্যেও দ্বীপও ওইটুকু।

কোথাও উমাপতি নেই।

ঘরের দরজা বন্ধ নয়। উমাপতির দরজা বন্ধ করবার দরকার হয় না। দরজায় খিলই নেই বন্ধ করবার।

ঘরে আগেও যেমন দেখে গেছে তেমনি কোনরকমে দিন কাটাবার নেহাৎ না হলে যা নয় সেই যৎসামান্য উপকরণ।

কম্বল আর গেরুয়া চাদর বেছানো একটি দড়ির খাটিয়া। একটা কেরোসিন কাঠের টুল আর ছোট টেবিল। দড়ির আলনায় ঝোলানো কটা ধুতি-পাঞ্জাবি। এক কোণে একটা সরা ঢাকা মাটির কলসির ওপর একটা কাঁচের গ্লাস। পাশের ছোট ঘরটায় রান্না-বান্নার অতি সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা। একটা কেরোসিনের স্টোভ, একটা এলুমিনিয়মের ডেকচি আর ফ্রাই প্যান, চীনে মাটির কটা বড় ছোট ডিশ আর পেয়ালা। কেরোসিনের বোতলটা এক কোণে রাখা তার পাশে দুটো হ্যারিকেন লণ্ঠন। একটা জলের বালতি, একটা টিনের মগ আর এক পাশে চাল ডাল নুন তেলের কটা হাঁড়ি-কুঁড়ি শিশি। কাপড়কাচা সাবান তোয়ালেও আছে।

সব কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে গোছানো। বিছানার চাদর থেকে আলনায় ঝোলান ধুতি-পাঞ্জাবি সব কাচা পরিষ্কার। বাইরে থেকে দেখে যাকে অত্যন্ত এলোমেলো অগোছালো মনে হয় তার এও একটা অপ্রত্যাশিত অজানা দিক।

অত্যন্ত আশাহত হয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে অসহায় বোধ করার দরুণই বোধহয় জয়া অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখে-ছিল। দেখতে দেখতে দুর্বোধ একটা অস্পষ্ট ব্যথা ও কেন যে অনুভব করেছিল কে জানে!

পোঁছতেই বিকেল হয়ে গেছে। মেঘলা আকাশ খানিক বাদেই অন্ধকার হয়ে আসবে। আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা যায় না। একটা চিঠি লিখে রেখে যাবার জন্যে টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজ নিয়েছে। কিন্তু কি ভেবে আর লেখেনি। এখানে আসার কোন চিহ্ন না রেখেই বেরিয়ে পড়েছে।

সেই জল-কাদার পিচ্ছিল পথ দিয়ে সন্তর্পণে ফেরবার সময়ই একটি মাত্র মানুষের সঙ্গে এতক্ষণে দেখা হয়েছে। চাষীগোছের মানুষ।

তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবারও দরকার হয়নি। বিস্ময়ে কৌতূহলে জয়াকে লক্ষ্য করতে করতে তাকে পার হয়ে গিয়ে সে আবার ফিরে দাঁড়িয়েছে।

নিজে থেকেই বলেছে, আপনে পাগলা-বাবুকে খোঁজ করতি এয়েছিলেন?

পাগলাবাবু যে কার সম্মানের আখ্যা হতে পারে তা বুঝতে জয়ার অসুবিধে হয়নি। হাসি চেপে সে জিজ্ঞাসা করেছে,—হাঁ তিনি কোথায়? ঘরে ত নেই দেখলাম।

তেনাকে যে দুপর বেলায় কোথা নিয়ে গেল! জব্বর একখানা হাওয়াগাড়ি এসে হুই হোথা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল।

একটু চুপ করে থেকে জয়া নিরর্থক জেনেও প্রশ্নটা না করে পারেনি,—কে এসেছিল মোটরে, জানো?

আমি চাষাভুষো মানুষ! আমি জানব কেমনে? কোথাকার রানী-টানি হবে নিশ্চয়। তেনার ডেরাইভারকে আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে গেনু যে!

জয়া আর কোন প্রশ্ন করেনি। নিঃশব্দে ফিরে গিয়ে রাস্তার ধারে ফিরতি বাসের জন্যে অপেক্ষা করেছিল।

উমাপতিকেও দেখা হবার পরও সে কোন প্রশ্ন করেনি।

দেখা তার পর দিনই হয়েছিল কাগজের অফিসেই। উমাপতি এসেছিল নিজে থেকেই।

কাগজের সমস্যা সম্বন্ধেই উমাপতির সঙ্গে আলোচনা করেছিল। সমস্যা যা দাঁড়িয়েছে সমস্তই জানিয়েছিল। কাগজের ও প্রেসের দেনার দায়ে হয় কাগজ বন্ধ করতে হবে, নয় প্রেসের মালিক যে প্রস্তাব করেছেন তাতে রাজী হতে হবে। প্রেসের মালিক অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে জানিয়েছেন যে, তাঁর পক্ষে আর কাগজ ছেপে দেওয়ার ভার নেওয়া সম্ভব নয়। তবে উমাপতিবাবু যদি কাগজটা সম্পূর্ণ তাঁর হাতে ছেড়ে দেন তাহলে তিনি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারেন চালাবার। কাগজের দেনা-টেনা যা আছে তার সব দায় প্রেসের মালিকই নেবেন। সে দিকে উমাপতিবাবুকে কিছু ভাবতে হবে না। কাগজ যেমন আছে তেমনি তাঁরই থাকবে। শুধু নিয়মমত দেখাশোনার অভাবে যে সমস্ত গোলমাল হচ্ছে তা বন্ধ করবার চেষ্টায় ব্যবসার দিকটা প্রেসের মালিক নিজের হাতে নিয়ে একবার দেখতে চান। উমাপতির কাছে এসব কথা তুলতে সংকোচ হয় বলেই জয়ার মারফৎ এই নিবেদন।

উমাপতি সমস্ত শুনে খানিক চুপ করে থেকে জয়াকেই জিজ্ঞাসা করেছিল,—তোমার কি মত?

এ প্রস্তাবে রাজী হলে দোষ কি?—বলেছিল জয়া,—সত্যিই ব্যবসার দিকটাত আমরা বুঝি না। সেদিকটা ঠিকমত দেখা-শুনা হলে কাগজটা চলতে পারে।

হ্যাঁ ব্যবসা হিসেবে চলতে পারে!—বলে উমাপতি যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

শুধু ব্যবসা হিসেবে কেন? কাগজ ত আমাদেরই হাতে। আসল যা জিনিস তা যা ছিল তাই থাকবে।

তা থাকে না। উমাপতি একটু হেসে বলেছিল, তেল যে জোগায় সলতে কমান-বাড়ানো তারই হাতে।

ওটা শুধু উপমা হল।—জয়া তর্ক করেছিল,—শুনতে ভালো, কিন্তু সম্পূর্ণ খাটে না। তাছাড়া আপনার উপমাতেই বলি, তেল না হলে সলতে ত নিবে যাবে।

তাই যাক। ধার-করা তেলে জ্বলার চেয়ে নেবা ভালো।

যে কাগজের জন্যে এত কিছু করলেন, এতদিনের যা ধ্যানজ্ঞান তা উঠে গেলেও আপনার দুঃখ নেই!

দুঃখ আছে। কিন্তু তা মেনে নিতে হয়। —উমাপতি গভীর স্বরেই বলেছিল,—আমাদের এ কাগজ চিরদিন চলবার জন্যে নয়। এ কোন দলের কাগজ নয়, কোন স্বার্থ কি লাভের লোভ এর পেছনে নেই। কোথাও কোন ফাঁকির রফা দিয়ে এ কাগজ চালাবার চেষ্টায় গ্লানি ছাড়া আর কিছু মিলবে না। নিববে জেনেই এ-দীপ জ্বেলেছিলাম। যদি কোথাও একটু আলো দিতে পেরে থাকে তাই যথেষ্ট।

জয়া তবু বুঝতে চায়নি। বলেছিল একটু কঠিনভাবেই,—আসলে আপনার ক্লান্তি এসেছে, নিজের ওপর বিশ্বাস আপনি হারিয়েছেন। এসব কথা শুধু নিজেকে আপনার স্তোক দেওয়া।

আঘাতটা অপ্রত্যাশিতভাবে রূঢ় সন্দেহ নেই। জয়া নিজেও বিস্মিত হয়েছিল নিজের আকস্মিক ধৃষ্টতায়।

সেই জন্যেই কি উমাপতি নীরবে কেমন একটা বিষণ্ণ কৌতুকের দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল?

উমাপতির চোখে বিষণ্ণ কৌতুকের দৃষ্টি সেই বুঝি প্রথম দেখেছিল জয়া।

নিজের গ্লানির অস্বস্তিটা অস্বীকার করবার জন্যেই জয়া থামতে পারেনি। উমাপতির নীরবতার মর্যাদা না রেখে আবার প্রশ্ন তুলেছিল, কাগজ উঠে গেলে তার দেনা শোধের কি ব্যবস্থা হবে সেই সম্পর্কে। উমাপতি সে দেনা নিজেই শোধ করবেন জানিয়েছিলেন শান্তভাবে। তাঁর বিপ্লবী জীবন ও দ্বীপান্তরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে দুটি বই তখন বাজারে খুব ভালোভাবে চলছে। তারই আয়ে সব দেনা শোধ করে দিতে পারবে বলেছিল।

দিয়েওছিল তাই শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু সে পরের কথা।

সেদিন জয়া নিজের ভেতরকার কি দুর্জ্ঞেয় ক্ষোভে জ্বালায় উমাপতির এ আশ্বাসে পর্যন্ত ঈষৎ অবিশ্বাসের হাসি হেসে চলে আসতে দ্বিধা করেনি।

উমাপতিকে খুঁজতে যাওয়ার কথা সে জানায় নি ইচ্ছে করেই।

উমাপতি নিজেই জানতে পেরেছিল। বোধহয় সেই চাষী লোকটির কাছে। উমাপতির ছোটখাট ফায়-ফরমাজ খাটার কাজ সেই লোকটিই করে বলে জয়া পরে জেনেছিল।

উমাপতি একটা চিঠি লিখেছিল জয়াকে তার সেই আগের ঠিকানায়।

সে চিঠিটা কি এখনো আছে? বোধহয় না। আগের বাড়ি ছেড়ে এখানে আসবার সময় অনেক কিছুই সে নির্মমভাবে নষ্ট করে ফেলেছিল,—স্মৃতিকে যা কিছু চঞ্চল করে তুলতে পারে প্রায় সবই।

এ চিঠিটা কিন্তু থাকলে ভালো হত। উমাপতির এই প্রথম চিঠি তার কাছে। চিঠি না লিখে উমাপতি নিজেই যেতে পারত তার সেই আগের বাসায়। সে বাসা তার অচেনা নয়। কিন্তু উমাপতি না গিয়ে শুধু চিঠি পাঠিয়েছিল।

চিঠিটা নিজে যাওয়ার চেয়ে অনেক তাৎপর্যময় বলেই বোধহয়।

চিঠিতে যা লিখেছিল নিজে এলেও উমাপতি সে কথা সম্ভবত বলতে পারত না। পারলেও বলত না। যাকে স্বল্পবাক্ বলে উমাপতি তা নয়। তবে তার কথার উৎস সাধারণত রুদ্ধ হয়েই থাকে।

চিঠির ভাষা এতদিন বাদে সব মনে আছে কি? না তা নেই। তবে সুরটা আছে, আছে তার বিশেষ অপ্রত্যাশিত কাতরতাটুকু।

জয়া, মনে মনে ত ভাবি কিছুই চাইব না। কিন্তু তবু অযাচিতভাবে যে এসেছিল তাকে কিছুক্ষণের জন্যে একান্তে পাওয়া থেকে ভাগ্যদোষে যে বঞ্চিত হয়েছি সে দুঃখে সব কিছু বিস্বাদ হয়ে যায় কেন? তুমি যে সেদিন এসে আমায় না পেয়ে ফিরে গেছ সে কথা আমায় জানাওনি। রাগ করেই

জানাওনি বলে ধরে নিচ্ছি, আর সেই রাগটুকুরই মনগড়া ব্যাখ্যা করে যেটুকু পারি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছি। কাগজ ত উঠে গেল। আমার দায়িত্বহীনতায় হতাশ ও বিরক্ত হয়ে হঠাৎ যে আবার একদিন আমায় খুঁজতে আসবে সে সম্ভাবনাও আর রইল না। আমার কাগজের বন্ধ্যা মরুতে তোমার অনেক শক্তি, সময়, উৎসাহ বৃথা অপব্যয় করিয়েছি। কাগজের ঋণ যেমন করে পারি শোধ করব, কিন্তু তোমার ঋণ—এইটুকু লিখেই থামলাম। ইচ্ছে করলে ও জায়গাটা কেটে দিতে পারতাম একেবারে পড়া না যায় এমনভাবে কালি দিয়ে জেবড়ে। কিন্তু লিখে যে ফেলেছি সে অন্যায়টুকু গোপন করবার চেষ্টা করব না। ঋণ বললে তুমি যা করেছ তাকে অনেক ছোট করা হয় আমি জানি। বিশ্বাস করো ঋণও যদি বলি, তবু পৃথিবীতে শুধু তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকতে আমার লজ্জা নেই। এ চিঠির সঙ্গে আমার চরিত্র যা বুঝেছ তার মিল যদি না পাও তাহলে আশ্চর্য হয়ো না। নিজেরাও নিজেদের কাছে কত দিকে অনাবিষ্কৃত আমরা নয় কি?

আশ্চর্য মনে করতে গিয়ে চিঠিটা ত প্রায় নির্ভুলভাবে মনে পড়ছে। চিঠির লেখাগুলো যেন চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠছে। চিঠিটা কি এমনই গাঁথা হয়ে গেছে মনের মধ্যে?

কি করেছিল সে চিঠি পেয়ে?

কিছুই করেনি কয়েকদিন। কাগজের অফিসে কদিন যেতে হয়েছিল অবশ্য তারপর। কাগজ তুলে দেওয়ারও কিছু ঝামেলা আছে। এত ঘনিষ্ঠ সংস্রব একেবারে হঠাৎ ছিঁড়ে দিয়ে নিজের দায়িত্বটুকু এড়াতে চায়নি।

সেখানে অবশ্য উমাপতির সঙ্গে দেখা হয়েছে। আলাপ-আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু সে অন্য উমাপতি অন্য জয়া। যে উমাপতি ওই চিঠি লিখেছে আর যে জয়ার সে চিঠি পড়ে নিজের ঘরের নিভৃতে অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে প্রায় অহেতুক অশ্রুতে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে, তারা যেন সেখানে অনুপস্থিত। কথায় ত নয়ই কোন অসতর্ক-ভঙ্গিতেও একবার সে প্রসঙ্গের ইঙ্গিত কেউ করেনি।

হিসেবপত্র চোকানো, বই-কাগজ আসবাব ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এইসব স্থূলে কাজ মোটামুটিভাবে সারা হয়েছে। তারপর পূর্ণচ্ছেদ টানা হয়েছে সব কিছুর ওপর।

অফিসঘর একেবারে খালি করে বাড়িওয়ালার হাতে ছেড়ে দিয়ে—সব শেষ করে আসার দিন সাধারণভাবে দুজনের ছাড়াছাড়ি হলে কিছু পরস্পরকে নিশ্চয় তারা বলত, কিন্তু নেপথ্যে কোথায় একটা উদ্বেলতার আভাস আছে বলেই প্রকাশ্যে তারা নিতান্ত শুষ্ক নীরসভাবে কয়েকদিনের ঘটনাচক্রে মিলিত সহকর্মীর মত বিদায় নিয়েছে।

সেই বিদায় নেওয়াই যদি সত্য হ'ত!

তা হ'ল কই! জয়া একদিন সেই কাদায় পিছল অপ্রশস্ত আলের পথে নিজেকে হাঁটতে দেখে নিজেই যেন অবাক হয়েছে। এ যেন তার স্বেচ্ছায় সচেতন মনে আসা নয়। অর্ধেক পথ গিয়েও মনে হয়েছে এখনও ফিরে গেলে পারে। কেউ তার এ আসার কথা জানতে পারবে না। তার এ অবাধ্য মনের ক্ষণিক দুর্বলতার সাক্ষী থাকবে সে শুধু নিজেই।

তবু ফিরতে পারেনি।

সেখানে পৌঁছে যা ভেবেছিল বা ভয় করেছিল তার কিছুই হয়নি কিন্তু।

উমাপতি সেদিন একা নয়। তার ছোট ঘর অন্য অতিথি অভ্যাগতে প্রায় ভর্তি বলা চলে।

মান্যগণ্য দুজন সুপরিচিত রাজনীতির মানুষ তাঁদের এক একজন করে চেলা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। কাছাকাছি কোন আশ্রমের গৈরিকধারী একজন সন্ন্যাসীও পায়ের ধুলো দিয়েছেন। ঘরে তাঁদের বসবারই জায়গার অভাব।

জয়াকে দেখে রাজনীতির গণমান্যেরা ভ্রূকুটি করে চেয়েছিলেন। সন্ন্যাসীঠাকুরের মুখে স্মিত হাস্য দেখা গেছল, আর উমাপতি বেশ একটু উচ্ছ্বসিত আতিশয্যের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তারই যেন অপেক্ষা করছিল এমনভাবে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

এসো এসো জয়া। আমি ত ভাবলাম তুমি আজ আর এলেই না।

প্রথমটা একটু বিমূঢ় হয়ে গেলেও জয়ার সামলে নিতে দেরী হয়নি। পাছে সে কোনরকম অপ্রস্তুত বোধ করে তার জন্যে উমাপতির ব্যাকুলতাজনিত অপলাপটুকুতেও সে কৃতজ্ঞ বোধ করেছিল।

তারপর সেদিন......

জয়ার স্মৃতিচারণে বাধা পড়ে। সিঁড়ি দিয়ে কে উঠে আসছে।

ছুটির দিনে এই অবেলায় কে তার কাছে আসতে পারে!

সিঁড়ির উপরে যে আসছে তাকে দেখা যাবার আগেই জয়া খানিকটা অনুমান করে নেয়। অনুমান তার ঠিক। তাদের স্কুলের একজন সহকর্মিনীই এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। কেন যে এসেছে এবং আজ যে আসার সম্ভাবনা আছে, তা আগেই কিছুটা জানা ছিল। ভুলে গিয়েছিল নিজের মনের ভাবনায়।

মেয়েটির নাম সবিতা। বয়স খুব বেশী নয়। তার চেয়ে অনেক ছোট। বছর কয়েক হ'ল তাদের স্কুলে কাজ করছে। মাস কয়েক ধরেই তার বিয়ের কথা নিয়ে শিক্ষয়িত্রীদের নিজেদের মধ্যে হাসিকৌতুক চলছিল। কিছুদিন আগে জানা গিয়েছে যে, তার বিয়ের তারিখ স্থির। ভালবাসার বিয়ে। বাড়ির মতের বিরুদ্ধে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বিয়ে করছে। রেজেস্ট্রি করে বিয়ে। শুধু অসবর্ণ বিয়ে বলে নয়, অন্য হ্যাঙ্গামা বাঁচাবা[র] জন্যে। বিয়েতে ছেলের দিক দিয়ে যদি ব[া] কেউ আসে সবিতার বাড়ি থেকে কে[উ] আসবে না। তার বাবা অত্যন্ত গোঁড়[া] সেকেলে। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছে[ন] এই পর্যন্ত। স্কুলে কাজ নেওয়াটা সমর্থ[ন] করেননি শুধু বিয়ের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি বলেই নিরুপায় হয়ে চুপ করে থেকেছেন। কিন্তু মেয়ে নিজের বিয়ে নিজেই স্থির করবার পর তার আর মুখদর্শন করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। সবিতা এখন মেয়েদের হোস্টেলেই আছে। সেখান থেকেই রেজেস্ট্রি অফিস ও তারপর বাসার অভাবে স্বামীর সঙ্গে আপাতত এক হোটেলে গিয়ে থাকবে। বরপক্ষ কন্যাপক্ষের অভাবে স্কুলের সহকর্মিনীদেরই সহায় হয়ে দাঁড়াতে হবে। সবিতা নিজেই নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। সলজ্জভাবে একটা ছাপানো চিঠিও জয়ার হাতে দিয়ে বলে,—যেতে হবে কিন্তু জয়াদি!

নিশ্চয় যাবো।—জয়া আন্তরিক স্নেহের হাসি হাসে।

সবিতাকে সত্যিই যেন আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে। দেখতে সে সত্যিই ভালো নয়। নেহাৎ সাদামাটা চেহারা। কিন্তু সেই চেহারাই কিসের একটা অপূর্ব আভায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

এই ত জীবন, এই ত প্রেম, এই ত গল্প! খুব সাধারণ মামুলী গল্পও নয়।

বৈচিত্র্য আছে, ব্যতিক্রম আছে, আছে বিদ্রোহ উত্তেজনার উপাদান। এই দিয়েই ত পরম সন্তোষে নিজের জীবনের কি ছাপানো বইএর সত্যিকার কি কাল্পনিক কাহিনী বুনে চলা যায়। অল্পবিস্তর সবাই ত তাই করে। শুধু নিয়তির চিহ্নিত দু একজন কোন দুর্বোধ অভিশাপে কাহিনীর এই ছকের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারে না কিছুতেই।

জয়ার কি সবিতাকে দেখে তার সৌভাগ্যে অস্ফুট একটু ঈর্ষা হয়? কিংবা করুণা?

না। ও সব কিছুই সত্যি নয়। যথার্থ একটি মমতাই জয়া অনুভব করে এই সহজ সরল স্বাভাবিক মেয়েটির জন্যে। প্রার্থনার যদি কোন দাম থাকে তাহলে অন্তর থেকে প্রার্থনা করে সবিতা স্বামী নিয়ে সংসার নিয়ে সুখী হোক। সুখ বলতে সবাই যা বোঝে সেই সুখ। কি দরকার সুখের স্বরূপ তলিয়ে বোঝবার চেষ্টায়, কি লাভ যেখানে যা মধুর যবনিকা ফেলা আছে তা সরিয়ে উঁকি দেবার ধৃষ্টতায়?

সবিতা নিজে থেকেই বিয়ের পর কি কি তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পরিকল্পনা আছে বলে যায়। জয়ার সহানুভূতির উত্তাপই তাকে অলক্ষ্যে উৎসাহ দেয় নিশ্চয়।

জয়া আগ্রহের সঙ্গে প্রসন্ন মুখে শোনবার চেষ্টা করে।

কিন্তু তবু মন তার কখন নিজের অজ্ঞাতেই এই বর্তমানকে ছাড়িয়ে চলে যায়।

কফির পেয়ালায় চামচ নেড়ে চৌকো চিনির ডেলা দুটো গুলিয়ে নিতে নিতে এদিক ওদিক চেয়ে বিপিন ঘোষ বেশ একটু ভারিক্কী চালেই বললে,—কতদিন বাদে এলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে কিছুই যেন বদলায়নি। বারান্দার এই টবগুলোর ঠিক ওই ফুলগুলোই যেন দেখেছিলাম।

নীরজা দেবী রুপোর চিমটে দিয়ে বিপিন ঘোষের প্লেটে পেস্ট্রী তুলে দিতে দিতে একটু নীরবে হাসলেন মাত্র।

মনে মনে অবশ্য বললেন, তোমার অনেক বেয়াদবি সহ্য করতে আজ প্রস্তুত হয়ে আছি, সুতরাং বলে যাও বিপিন ঘোষ। কিন্তু ওপরের এই টেরেসে এসে বসে কফি খাবার সৌভাগ্য তোমার কোনদিন হয়নি। ওই বৈঠকখানা ঘরেই জোড় হস্ত হনুমানের মত বসে থাকতে। টেরেসে কোনদিন পদার্পণ করবার অধিকার পেয়েছিলে বলে ত মনে হয় না।

আমি কি ভাবছিলাম জানেন নীরজা দেবী!—বিপিন ঘোষ একটু থেমে নিজের ভাবনাটাকে গুরুত্ব দিয়ে নীরজা দেবীর দিকে তাকাল।

নীরজা দেবীও পেস্ট্রী দেওয়া প্লেটটা বিপিন ঘোষের দিকে এগিয়ে দিয়ে যথোচিত আগ্রহ দেখিয়ে চোখ তুললেন।

ভাবছিলাম,—বিপিন ঘোষ তার মূল্যবান ভাবনাটাকে প্রকাশ করল,—কিছু বদলালেই বরং আশ্চর্য হতাম। নিজেকে যেমন নিজের চারপাশের সব কিছুকে তেমনি কোন আশ্চর্য আরকে অজর করে রাখবার কৌশল যে আপনার জানা! আপনার কিছুই বদলায় না।

বিপিন ঘোষ নিজের দামী কথাটা নিজেই হেসে উপভোগ করলে।

নীরজা দেবীও হাসলেন। হেসে যেন প্রশংসাটুকুতে কুণ্ঠিত হয়ে বললেন,—কিন্তু না বদলানো কি ভালো? সময়কে যারা হার মানায় সময় তাকে ক্ষমা করে না বলেই শুনেছি। একদিন সুদে আসলে প্রতিশোধ নেয়।

বিপিন ঘোষের পক্ষে কথাগুলো একটি বেশী সূক্ষ্মতার দিকে চলে যাচ্ছে যেন। বিপিনের সেটা পছন্দ নয়। সে একটু মোটা সুরে নামিয়ে এনে বললে,—ভুল, নীরজা দেবী ভুল। সময়'ত আর মানুষ নয় যে হার মেনে আক্রোশ পুষে রাখবে। তবে সে মানুষও ত দেখেছেন হারের খেলাও যে হাসিমুখে অম্লান বদনে খেলে চলে যায়। মনে কোনো জ্বালাই তার থাকে না।

যাক। বিপিন ঘোষ মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। কথাটাকে কোনরকমে ঠিক অভিপ্রেত দিকে ঘোরানো গেছে। কী করে যথাস্থানে পেঁছোবে তার জন্যে একটু ভাবনাই ছিল। ভয় হচ্ছিল এইসব সাজানো কথার মারপ্যাঁচের খেলা খেলতে গিয়ে আসল উদ্দেশ্যই না পিছিয়ে দিতে হয়। এখন অন্তত নাগালের মধ্যে লক্ষ্যটা এনে ফেলা গেছে।

নীরজা দেবী কিন্তু না বোঝার ভানই করলেন।

কার কথা বলছেন?—নীরজা সত্যিই যেন বিস্মিত।

কার কথা বলছি আপনি জিজ্ঞাসা করছেন? বিপিন ঘোষ বেশ ক্ষুণ্ণ।

ওঃ উমাপতির কথা বলছেন!—নীরজা দেবী যেন এতক্ষণে ধরতে পারলেন,—সত্যিই আমি ভাবতে পারিনি। কারণ—কারণ তাঁকে ঠিক আমাদের মত মানুষের মাপ দিয়ে বিচার করার কথা মনেই আসে না। তাঁকে এসব প্রসঙ্গে বোধহয় না আনাই ভালো।

বিপিন ঘোষ একটু প্রমাদ গণল। এ সুরটাও ত সুবিধের নয়। কথার মোড় একেবারে অন্য দিকে ফিরে যাবে।

ব্যস্ত হয়ে বলল,—ঠিকই বলেছেন, কিন্তু তাঁর কথা আপনা থেকেই এসে যায় যে। আপনি ত জানেন, শেষ কটা বছর একে একে সবাই যখন তাঁকে ছেড়ে গেছে তখন প্রায় একা তাঁর পাশে থাকার সৌভাগ্য আমারই হয়েছে।

আর সেই সৌভাগ্য এখন কিভাবে তুমি ভাঙিয়ে নিতে চাইছ তা উমাপতি যদি জানতে পারতেন! নীরজা দেবী মনে মনেই বললেন।

মুখে বললেন,—হ্যাঁ অন্তত আর কাউকে কাছে তিনি ডাকতে চাননি বলেই শুনেছি।

ডাকতে চাননি কেন তাও হয়ত জানেন! —বিপিন সুযোগটা চেপে ধরল,—ডাকবার মত মানুষ তিনি কাউকে দেখেননি। মানুষ সম্বন্ধেই তিনি হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। নিজে হাত বাড়িয়ে যাদের কাছে টেনেছিলেন তাদের কাছেই যে আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা কল্পনা করা যায় না।

আপনার সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না বিপিনবাবু!—নীরজা দেবী হেসে প্রতিবাদ জানালেন,—নিজের ব্যক্তিগত আঘাতটাই বড় করে দেখবেন এরকম মানুষ তিনি ছিলেন না বোধহয়। হতাশ তিনি যদি হয়ে থাকেন তার অন্য কারণ আছে। হয়ত তাঁর নিজের ভেতরেই অবসাদ এসেছিল। এ দেশের মানুষের নিজস্ব মানবিক মূল্যে সম্বন্ধেই তাঁর সংশয় জেগেছিল।

অবসাদ এসেছিল সত্যিই, কিন্তু তা ওই যা বললেন ওই সংশয়েরই প্রতিক্রিয়া। আর সে সংশয় ত কি বলে, হাওয়ায় ভাসা ভাবনা থেকে আসেনি। সামনে যাদের দেখেছেন, যাদের সংস্রবে এসেছেন তারাই ওই সংশয় তাঁর মনে জাগিয়েছে।

বিপিন ঘোষ বেশ একটু পরিতৃপ্তভাবেই থামল। এইবার আসল তীরটা নিক্ষেপ করা যাবে।

কিন্তু তাকে একেবারে বিস্মিত দিশাহারা করে নীরজা দেবী বললেন,—আপনি তাঁর শেষ জীবনের বিষয়ে একটা বই'ত তাহলে লিখলে পারেন বিপিনবাবু! যা আর কেউ জানে না এমন অনেক উপাদান নিশ্চয়ই আপনার হাতে আছে। অনেক গুপ্ত তথ্য আপনি দিতে পারেন, খুলে দিতে পারবেন অনেকের মুখোস!

এরকম বই আপনি লিখতে বলেন!—বিপিন বিমূঢ়ভাবে শুধু বলতে পারল।

বলব না কেন? উমাপতি বেঁচে থেকে যা করতে চেয়েছিলেন তার কিছুই করে উঠতে পারেননি সম্পূর্ণভাবে। তাঁর মৃত্যুতে তবু একটা বড় কাজ হোক। অন্তত একটু সাড়া ত পড়বে। দু চারটে বড় বড় ফোঁপরা গাছের শেকড়ও উপড়ে যদি বা না যায় নড়বে নিশ্চয়ই।

বিপিন ঘোষের সব কিছু গুলিয়ে গেছে। হাতের কেকটা অনেকক্ষণ ধরে হাতেই ধরা আছে। প্লেটে সেটা নামিয়ে রাখতেও ভুলে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা বানচাল হয়ে যাচ্ছে সে

উমাপতির এ অদ্ভুত দুর্বলতার কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এও তাঁর শেষ জীবনের আত্মপীড়নের একটা পদ্ধতি, এইটুকু শুধু কল্পনা করে নেওয়া যায় বটে। নিজেকে লোক-চক্ষে হেয় করে তোলাও যাঁর একটা কৌতুক মনে হয়েছিল, বিপিন ঘোষের সান্নিধ্য সহ্য করাও তেমনি তাঁর অস্বাভাবিক যন্ত্রণা বিলাস হয়ত।

বিপিন ঘোষ নিজে এ ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করে না। তার কুটিল কপট মন ও ভাবাবেগের কুজ্ঝটিকাহীন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়েই সে বোঝে এ বিচিত্র মনোভাব ওরকম মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যারও বাইরে। উমাপতির মত মানুষের ওইখানেই বিশেষত্ব। ধর্মন্যায় নীতিতে যাকে বর্জন করার সুস্পষ্ট নির্দেশ তাকেও অকাতরে আশ্রয় না দিলে নিজের কাছে তাঁরা ছোট হয়ে যান।

উমাপতি ঘোষাল যীশু অবশ্য নন, কিন্তু সেই বা আদর্শ জুডাস হতে পারল কই!

ছোটখাট অসাধুতা ও কপট স্বার্থসিদ্ধি পর্যন্তই ত তার দৌড়। চরম বিশ্বাসঘাতকতায় নিজেকে চির অভিশপ্ত নরকস্থ করে' উমাপতিকে আরেক মহিমায় মণ্ডিত করতেও ত সে পারত!

কেনই বা তা পারেনি?

না পারাটাও তার মনে ক্ষোভ হয়ে মাঝে মাঝে জাগে কেন?

কুটিল স্বার্থসর্বস্ব একান্ত বাস্তবনিষ্ঠ বিপিন ঘোষও এসব প্রশ্নে মাঝে মাঝে জর্জর হয়।

রামবাবু আবার অসীম রাহাকে ডেকেছেন। অফিসে নয়, ছুটির দিনে তাঁর বাড়িতে।

রামবাবুর ছুটি বলে অবশ্য কিছু নেই। হপ্তায় একটা দিন শুধু অফিসে নিজের কামরায় গিয়ে বড় একটা বসেন না এই পর্যন্ত। কাগজ ত বার হয় প্রতিদিনই। রামবাবুর কাজের তাই কামাই নেই। অফিসে যেদিন না যান বাড়িটাই সেদিন অফিস হয়। অফিসের লোকেদের ডাক পড়লে হাজিরা দিতে হয় সেখানে। ফোনে আদেশ নির্দেশ চলে সারাক্ষণই।

এখনও রামবাবু ফোন ধরে বসে আছেন তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে। অসীম অপেক্ষা করে বসে আছে কাছেই একটি ভাঙা বেতের চেয়ারে তাঁর ফোনের আলাপ শেষ হবার জন্যে। অফিস থেকে একটা জরুরী বিবরণ পড়ে শোনাচ্ছে। রামবাবুর সাইক্লোপিয়নের হাতে বিবরণটা পাবার জন্যে অপেক্ষা করবার ধৈর্য নেই। ফোনেই শুনে নিচ্ছেন মাঝে মাঝে হুঁ হাঁ দিয়ে।

পড়ে শোনাচ্ছেন নিশ্চয় বিশ্বনাথবাবু। পদমর্যাদায় রামবাবুর পরেই তাঁর স্থান, কিন্তু স্বাধীন ভাবে কোন কিছু রামবাবুর অনুপস্থিতিতেও তাঁর করার সাহস নেই। রামবাবুর ভয়ে নয়। কারণ রামবাবু জবরদস্ত নন মোটেই। তাঁর অনুমোদন ছাড়া কোন কিছু হবে না এমন লিখিত অলিখিত কোন নির্দেশও তাঁর নেই। তবু তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার সুযোগ থাকলে তাঁকে বাদ দিয়ে কিছু করা অফিসের সকলেরই প্রায় কল্পনাতীত। তাঁর ওপর নির্ভর করাটা সহকর্মীদের প্রায় মজ্জাগত হয়ে গেছে। রামবাবু পারেনও বটে সমস্ত ঝক্কি মাথায় নিতে। কাজ ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই। এককালে দেশের কাজ করেছেন, জেল খেটেছেন। এখন খবরের কাগজই ধ্যানজ্ঞান। ছেলেপুলে পুষ্যি ইত্যাদি নিয়ে বেশ বড় সংসার। কিন্তু সে সংসারে তিনিই যেন বাইরের লোক। এই ঘরটি আর অফিসটি শুধু চেনেন।

এই রামবাবুই কিন্তু উমাপতি ঘোষালের জীবনের লুপ্ত বিস্মৃত সমস্ত বিবরণ উদ্ধার করবার জন্যে ব্যাকুল। তাও খবরের কাগজের প্রয়োজনে নয়। এ তথ্যটা অসীম রাহা খুব সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কার করেছে খাজাঞ্চীবাবুর সঙ্গে এমনি সাধারণ আলাপের মধ্যে। ভাউচার সই করে আগেকার কিছু রাহা খরচা আদায় করতে গেছল। কথায় কথায় বলেছে, বড় বিলটা কিন্তু শীগগিরই পাচ্ছেন। খাজাঞ্চীবাবু অবাক হয়ে বলেছেন, আপনার আবার বড় বিল কিসের?

ওই যেটার আগাম নেওয়া আছে!—অসীম সন্দিগ্ধ হয়েই বোঝাতে চেষ্টা করেছে।

বুঝতে পারলাম না ত!—খাজাঞ্চীবাবু অন্য কাজে মন দিয়েছেন। অসীমও আর কিছু ভাঙেনি। যে সন্দেহটা তার গোড়া থেকেই হয়েছিল, সেটা দৃঢ় হয়েছে এইবারে। রামবাবু তাকে ইতিমধ্যে খরচপত্র হিসেবে যা দিয়েছেন তা তাহলে নিজে থেকেই!

রামবাবুর এ অনাবশ্যক কৌতূহল কেন যার জন্যে নিজে থেকে খরচা করতে তিনি প্রস্তুত?

আজকে ছুটির দিনে বাড়িতে ডেকে পাঠাতেও অসীম রামবাবুর আগ্রহের তীব্রতা খানিকটা অনুমান করতে পেরেছে। অফিসের কাজে তার মত রিপোর্টারকে বাড়িতে ডাকবার কথা নয়।

রামবাবুর ফোনের কাজ এতক্ষণে শেষ হ'ল। জরুরী বিবরণটা সম্বন্ধে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে ফোন নামিয়ে তিনি অসীমের দিকে ফিরলেন।

ফিরেও কিছুক্ষণ তার দিকে কি ভাবতে ভাবতে যেন অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন।

ভাবলেশহীন মুখ। কিছু বোঝবার জো নেই ভালো কথা বলবেন, না মন্দ।

অসীমের কিন্তু মনে হল যে ওই মুখোশের মত মুখের আড়ালেও কিছু একটা দ্বিধার দোলা চলছে। সেটা কি তাকে এখানে ডাকার জন্যে? কাগজের কাজে ছাড়া অফিসের সংশ্রব তিনি রাখেন না বলেই জানে। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্যে কারুর বিন্দুমাত্র সাহায্য নেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। নিজের পদমর্যাদার নির্দোষ কোন সুবিধাও তিনি অধীনস্থ কারুর কাছে নেন না। আজকে তাকে যে ডেকেছেন তার মধ্যে ব্যক্তিগত কিছু স্বার্থ আছে বলেই কি এই দ্বিধা?

উমাপতি ঘোষালের জীবন রহস্য সন্ধানে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ কেন থাকবে?

রামবাবুর চোখের দৃষ্টিটা অসীমের ওপর স্থির হল। বললেন,—তুমি ছুটির দরখাস্ত করেছ দেখলাম।

হ্যাঁ, ছুটি অনেকদিন নিইনি। তা ছাড়া যে কাজটা দিয়েছেন সেটা যত সহজ হবে ভেবেছিলাম তত নয়। কিছুদিন আর সব কিছু ফেলে লেগে থাকা দরকার মনে হচ্ছে।

রামবাবু এ বিষয়ে কোন মন্তব্য না করে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করলেন,—কাজটায় কি কোন উৎসাহ পাচ্ছ না?

অসীম একটু চুপ করে রইল। কদিন আগে হলে বলত,—বিশেষ কিছু না। কিন্তু এখন তা আর সত্যি বলতে পারে না। তবু একটু রেখে ঢেকেই বললে,—না, খারাপ লাগছে না। তবে এ যেন প্রায় প্রত্নতত্ত্বের কাজ। অনেক কিছু মাটি থেকে খুঁড়ে বার করে পাঠোদ্ধার করতে হবে।

এইটুকু বলে অসীম আবার চুপ করল। শেষকালে বলতে চেয়েছিল,—কিন্তু করে লাভ কি?

রামবাবু নিজেই তার অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিলেন,—এ কাজে নামও কিছু পাবে না, আর্থিক কোন সুবিধেও। তবু এ বেগারের কাজ কাউকে না কাউকে করতে হয়।

অফিসের রামবাবু আর নিজের বাড়ির এই ছোট ঘরটির রামবাবু এক, একথাটা তাহলে সম্পূর্ণ সত্য নয়। অফিসের রামবাবুর মুখে এ ধরনের কথা কেউ শুনেছে বলে মনে হয় না।

রামবাবু পরের কথাগুলিতে তাকে আরো বিস্মিত করে দিলেন। ধীরে ধীরে যেন নিজের মনেই সামনের জানলাটার দিকে চেয়ে বললেন,—ঘটা করে লেখবার মত অনেক জীবন আছে। তাদের সরকারী জীবনী লেখবার লোকও। উমাপতি ঘোষালকে নিয়ে লেখবার তারা কোন উৎসাহ পাবে না। তার সাফল্যের সিঁড়ি ত ওপর দিয়ে উঠে যায়নি নিচের দিকে ব্যর্থতাতেই নেমে গেছে। তার বিস্তারিত জীবনীও আমি তোমার কাছে চাইছি না। চাইছি তার ব্যর্থতার রহস্য তোমায় দিয়ে খোঁজ করাতে। এ সন্ধান তোমায় নাম অর্থ না দিক একেবারে নিষ্ফল হয়ত হবে না।

সেই ভাবলেশহীন মুখ, নিরুত্তাপ কণ্ঠ। কিন্তু এ সম্পূর্ণ অন্য রামবাবু। কাগজে

খবর সাজানোর বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্যই যার ইষ্টমন্ত্র সে রামবাবুর মুখোশের পেছনে এই মানুষটা লুকিয়ে আছে কে ভাবতে পেরেছিল!

অসীম অভিভূত হয়েই কিছু বলতে পারলে না।

রামবাবুই একটু থেমে তাঁর কথা শেষ করলেন,—আমাদের কাগজের কাজ যে এটা নয় তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ। সত্যি যদি ভালো না লাগে তাহলে ছেড়ে দিতে পারো। তবে তুমিই এ ভার নেওয়ার উপযুক্ত বলে আমার মনে হয়েছে।

তার প্রতি এ বিশ্বাসে কৃতজ্ঞতা জানানোই ভদ্রতাসঙ্গত ছিল। কিন্তু সম্পর্কটা এখন অধীন ও প্রধানের কৃত্রিম শিষ্টাচারের ওপরে উঠেছে বিশ্বাস করেই অসীম প্রশ্ন করতে পারলে,—কেন?

রামবাবুর নতুন পরিচয় পেয়ে এতক্ষণ কমবেশী বিস্মিতই হয়েছে, এবার তাঁর উত্তরটা তাকে স্তম্ভিত করে দিলে।

তুমিও স্বধর্মভ্রষ্ট বলে। স্বধর্ম ত্যাগ করেও তুমি ভিতরের ক্ষোভ একেবারে মুছে ফেলতে পারনি বলে! কবি হতে চাওয়ার যন্ত্রণা তুমি একেবারে ভোলনি বলে!

মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন নেই, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরেরও। কিন্তু কি গাঢ় উত্তাপ কথাগুলোর মধ্যে!

স্তব্ধ হয়ে অসীম খানিকক্ষণ বসে রইল।

তারপর শান্তভাবে বললে,—একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারছি না। আপনার উমাপতি সম্বন্ধে এ আগ্রহ কেন?

রামবাবু এ প্রশ্নটা ধৃষ্টতাও মনে করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর উত্তর শুনে তা মনে হ'ল না। স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরেই বললেন,—জবাবটা এখন দিলাম না। তোমার সন্ধান চালিয়ে যাও। নিজেই হয়ত কিছুটা জানতে পারবে!

রামবাবু আবার ফোন তুলে নিয়ে নম্বর ঘোরাতে শুরু করলেন।

এখন বসে থাকা না থাকা অসীমের ইচ্ছে। অসীম নমস্কার জানিয়ে উঠেই গেল।

জয়া বাস থেকে নামল।

মনে হ'ল ঠিক জায়গাতেই নেমেছে। কম দিনের কথা ত নয়। স্মৃতির রহস্য বড় দুর্বোধ। অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটি নির্ভুল-ভাবে তা ধরে রাখে আবার অতি মূল্যবান স্থান কি ঘটনাও ঝাপসা করে দেয়।

নামবার জায়গাটা সঠিক মনে না থাকা কিছু আশ্চর্য নয়। বাসে করে কবারই বা এসেছে। আর এসেও নামবার জায়গাটা সেদিন গৌণই ছিল।

এ বারে বাসেও কাউকে জিজ্ঞাসা করেনি কিছু। করে লাভ নেই। তার স্মৃতি-তীর্থের ঠিকানা তখনই কে জানত যে এত-দিন বাদে মনে করে রাখবে! ঠিকানা তাকে নিজেই খুঁজে বার করতে হবে।

এখানে আসাটাও একটা অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত খেয়াল। অপ্রত্যাশিত কিন্তু অদম্য। স্কুলের নামকরা একজন পৃষ্ঠ-পোষকের মৃত্যুতে স্কুল বসবার পরেই ছুটি হয়ে গেছে। স্কুল থেকে বেরিয়ে বাসায় ফিরতে আর ইচ্ছে হয়নি। যাবে তাহলে কোথায়? অন্তরঙ্গ বন্ধু তার সত্যিই কেউ নেই। এক মামাতো বোন মীরার বাড়িতে যেতে পারে। মীরার স্বামী এখন কল-কাতাতেই বদলী হয়েছে। গুটি-পাঁচেক পিঠোপিঠি ছেলেমেয়ে নিয়ে মীরার জম-জমাট সংসার। কিন্তু সেখানে যেতে মন চায় না। মীরার আদর যত্ন আগ্রহ সত্ত্বেও কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করে। এই সুখী সংসারের পরিবেশে খাপছাড়া হওয়ার অস্বস্তি।

পারতপক্ষে সেখানে যায় না। আজ ত ভাবতেই পারছে না সেই ছেলেমেয়েদের আদরের বড় মাসী হয়ে বসে মীরার অনু-যোগের সুরে বলা সংসারের উচ্ছ্বসিত খুঁটিনাটি বিবরণ শুনে বেলাটা কাটিয়ে দেবার কথা।

হঠাৎ মনের অতল থেকে এই অদ্ভুত ইচ্ছাটা যেন ঢেউ দিয়ে উঠল।

উঠল বোধহয় রাস্তার বাসটাকে দেখে। শহরের সরকারী বাস নয়, গুড়ের নাগরীর মত মানুষ বোঝাই করে প্রতি মুহূর্তে ভেঙে পড়ার ভয়ে কাতরাতে কাতরাতে সমস্ত রাস্তাকে সচকিত করে যে সব হতভাগা যানবাহন শহর ছাড়িয়ে দূরের পথে যায় সেই রকম একটা বাস।

বাসটা দেখেই নির্জন দ্বীপের মত ভূমিখণ্ডের কথা মনে পড়ল। এখুনি যেন সেখানে একবার না গেলে নয় এমনি অদম্য একটা বাসনা জাগল মনে।

কয়েক বছরেই বাসের নম্বর অনেক অদল বদল হয়েছে। খোঁজ খোঁজ করে ওদিকে কোন বাস যায় সেটুকু শুধু জানতে হ'ল। তারপর সত্যিই উঠে বসল একটাতে।

অসহ্য ভীড়। ঝাঁকানি আর দোলায় শরীরের ওপর দিয়ে একটা দ্বন্দ্ব চলে যেন সারাক্ষণ। কিন্তু আজ সত্যিই তার খুব খারাপ লাগেনি। এ যেন একরকমের জন-তরঙ্গ। তার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার একটা বিচিত্র স্বাদ আছে, যে স্বাদটা না পেলে বর্তমান যুগটাকে ঠিকমত চেনা যায় না।

বর্তমান যুগকে চেনার আগ্রহে সে অবশ্য বাসে ওঠেনি। যেতে যেতে ওই অনুভূতিটা এক সময়ে জেগেছিল মাত্র।

বাস থেকে নেমেই অবশ্য সত্যিকার তৃপ্তি পেল।

চোখের সামনে এই অবারিত আকাশ পৃথিবীর বিস্তার ত ভুলেই থাকে তার শহুরে জীবনে। এর মধ্যে মুক্তির যে প্রকাশ আছে সেটা হয়ত অলীক। এই নির্জন রাস্তাও গিয়ে ঠেলাঠেলি হানাহানি গঞ্জেই পৌঁছেছে, এই নবাঙ্কুরশ্যামল দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেও মানুষের লোভ ও দম্ভ তাদের ঘাঁটি বসিয়েছে, তবু এই ক্ষণিক বিভ্রমটুকুর মূল্যে কম নয়। জীবনটা যে শুধু ভিত গাড়বার আর দেয়াল তোলবার জন্যে নয় একবার অন্তত সেই কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

উমাপতিরই কথার প্রতিধ্বনি এটা। একদিন তার এই 'আন্দামানে'ই এই ধরনের কথা বলেছিল। বলেছিল, গাছের শেকড় চোখে দেখা যায়, মানুষের তা যায় না। মাটিতে শেকড় না চালিয়ে আমাদের উপায় নেই। তবু শেকড়টাকে মাঝে মাঝে ভুলতে হয় আকাশে ডালপালা মেলে ছড়িয়ে ঝড়ের আশায়। ঝড়ে পাতা ছিঁড়ে যে উড়ে যায় সেটা গাছের সত্যিকার মুক্তি নয়। কিন্তু সেই মুক্তির ছলনাটারও দাম আছে।

আন্দামানের রাস্তাটা এখন খুঁজে বার করবে কি করে?

ওপর ওপর দেখে ত মনে হচ্ছে জায়গাটার

বিশেষ কিছু বদল হয়নি। শহরের লুব্ধ বাহু এখনও এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারেনি।

ভুল জায়গায় কি তাহলে নেমেছে?

আকাশে মেঘ আছে কিন্তু বড় বড় ফাটল আছে দুপুরের প্রখর রৌদ্র ঝরে পড়ার। বেশ গরম বোধ হচ্ছে খানিকটা হেঁটেই। তবু জায়গাটা খুঁজে বার করতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত বার করতেও পারল। সফল হবার পর মনে হ'ল সত্যিই খুঁজে না পেলেই ভালো ছিল। তার স্বপ্ন স্মৃতিটা অটুট রেখেই অন্তত সে ফিরে যেতে পারত।

সেই সরু কাঁচা আলের রাস্তাটা ঠিকই আছে, কিন্তু সেই বাঁশ বাঁধা সাঁকোও নেই, সেই দ্বীপটুকুর ওপরকার কুটীরটাও—

আগাছার জঙ্গলে জায়গাটা ছেয়ে গেছে, তারই মধ্যে মাটির কটা ছোট ঢিবি আর বাঁশ বাঁকারীর পোড়ো চালের কাঠামোটা যে উঁকি দিচ্ছে তাই বোধহয় সে কুটীরের ধ্বংসাবশেষ। বাঁশের পোলটা না থাকায় সেখানে যাওয়া যায় না! গিয়েও কোন লাভ নেই। শুধু সাপখোপের বাসাই হয়ে আছে এখন।

অনেকক্ষণ তবু সেই দিকে চেয়ে জয়া দাঁড়িয়ে রইল। এই চেয়ে থাকার একটা যন্ত্রণা আছে, অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট যন্ত্রণা। নিজের অতীতের জন্যে দুঃখ হতাশা বা অনুশোচনা, এ সব কিছু নয়, শুধু নৈর্ব্যক্তিক একটা বেদনাবোধ সমস্ত জীবন আর সৃষ্টির অর্থহীনতার জন্যেই যেন।

জয়ার হঠাৎ মনে হ'ল কে জানে এই যন্ত্রণাটা পাওয়ার জন্যেই সে এখানে আসতে চেয়েছিল কি না। নিজের মনের অগোচরে তাই ছিল তার উদ্দেশ্য হয়ত।

সরু কাঁচা পথটায় ফিরে যেতে যেতে সেই দিনটার কথা মনে পড়ে আবার, যেদিন বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে উমাপতির ঘরে অপ্রত্যাশিত ভীড় দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল।

উমাপতি তার আসাটা সহজ করে দিতে চেয়েছিল একটু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে, কিন্তু জয়ার আড়ষ্টতা অনেকক্ষণ কাটেনি।

উমাপতির সেদিন আরেক চেহারা। হাস্যে পরিহাসে তার সে প্রাণোচ্ছলতা দেখলে মনে হয় যেন এমনি মজলিস জমানোতেই তার সব চেয়ে আনন্দ।

রাজনীতির হোমরা চোমরাদের সঙ্গে সে কৌতুকের কথা কাটাকাটি করেছে, সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আলোচনা করেছে মাঝে মাঝে রসিকতার ফোড়ন দিয়ে। তার কথায় খোঁচা অবশ্য ছিল, কিন্তু তা এমন সরসতায় মাখানো যে সামনে অন্তত কেউ অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে বোঝা যায়নি।

রাজনীতির চাঁইরা স্পষ্টই তাকে নিজেদের দলে টানবার জন্যে এসেছিলেন।

এই তাকিয়ে থাকার ভিতর একটা অনির্দিষ্ট যন্ত্রণা আছে

নির্বাচনের তখনো অনেক দেরী, কিন্তু দলে টানাটানির লড়াই শুরু হয়ে গেছে। উমাপতি রাজি হলে বড় একটা দল তাকেই কাঁধে তুলে নিতে প্রস্তুত। উমাপতিকে কিছু ভাবতে হবে না। খরচ জোগানো থেকে খাটা খাটুনি সবই দল থেকে করা হবে।

উমাপতি হেসে বলেছে, ভাবনার কোন দরকারই থাকবে না বলছেন!

বড় চাঁই জোর দিয়ে বলেছেন,—নিশ্চয়ই।

নির্বাচনের আগেও না পরেও না?—উমাপতি বেশ গম্ভীর হয়েই জিজ্ঞাসা করেছে।

দলপতিরা ঠিক বুঝতে না পেরে বলেছেন,—পরে আবার কি ভাবনা! জিত ত আপনার অবধারিত। আমাদের নিশানা নিয়ে নামলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও সাধ্য নেই আপনাকে হারায়।

সেই কথাই ত বলছি,—উমাপতি এবার হেসেছে,—আমায় শুধু নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়ের মালাটা নিতে হবে। তার আগে পরে যা ভাববার আপনারাই ভাববেন! আপনারা মানে আপনাদের দল।

চাঁইরা নির্বোধ নন। তাঁরাও হেসে উমাপতিকে আশ্বাস দিয়েছেন,—দল মানে ত আপনিও।

ওই ও টাতেই যে আমার আপত্তি। ও নয়, হ্রস্ব ই ধরে বসে থাকা আমার এক বদস্বভাব। দল বাঁধা তাই আর হবে না।

যেন এটা নিছক রসিকতা এমনভাবে হেসে উঠে উমাপতি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সম্বোধন করে তারপর বলেছে,—আপনি কি বলেন সাধুজি! আমিই সব নষ্টের মূল, আবার আমিই সব। তাই নয়?

সন্ন্যাসী ঠাকুর সুযোগ পেয়ে বলেছেন,—আমি থেকে তুমি। তুমি থেকে তিনি। তাঁকে জানবার জন্যেই আমি দরকার।

সন্ন্যাসী ঠাকুর আরো অনেক গভীর দার্শনিক তত্ত্ব শুনিয়েছেন।

বুঝতেও পারেনি, ভালোও লাগেনি জয়ার!

কিন্তু তখন উঠে আসা যায় না। বাধ্য হয়েই তাকে থাকতে হয়েছে।

উমাপতি জয়ার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে। এক সময়ে বলেছে, তুমি আমাদের একটু চা খাওয়াও না জয়া দেবী। নিজের হাতে তৈরী করতে গেলে চা যে কেমন করে পাচন হয়ে যায় বুঝতে পারি না। দেখি তোমাদের শ্রীহস্তের স্পর্শে চায়ের পাতা একটু কোমল আর সরস হন কি না!

জয়া কৃতজ্ঞ হয়ে পাশের ঘরে উঠে গেছে।

পাশের অপ্রশস্ত রান্না ঘরটায় গিয়ে চা করবার জন্যে স্টোভটা ধরিয়েও যেন অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে। স্টোভের কর্কশ আওয়াজটাও তার কাছে তখন কাম্য। চারিধারে শব্দের একটা আবরণ দিয়ে স্টোভটা তাকে একরকমের নিভৃতি দিয়েছে অন্তত।

কেন সে এত ক্ষুব্ধ নিজেকে জয়া প্রশ্ন করেছে। কি আশা করে তাহলে সে এসেছিল? উমাপতিকে একেবারে একলা পাওয়ার? পেলেই বা কি হ'ত? কথাতে তর্ক হ'ত হয়ত, মত-বিরোধ উগ্র হয়ে উঠত তার দিক থেকে, আগেও দু একবার যেমন হয়েছে। কিংবা হয়ত এসব কিছুই হ'ত না। এসে হয়ত দেখত উমাপতির মাঝে মাঝে যেমন হয় সেই নীরব আত্ম-নিমগ্নতার পালা চলেছে। উমাপতি সাদর সম্ভাষণও

ধরণীতে অন্ধকার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্লক ও মুদ্রণঃ স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজন্যে

জানাত—আনন্দও প্রকাশ করত তার আসায় কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে তাকে অনুপস্থিতই মনে হত। কি একটা অব্যক্ত বেদনা নিয়ে এক সময়ে জয়া ফিরে যেত।

এখন উমাপতি মৌনের বদলে মুখর। তবু সেই কুজ্ঝটিকার মত নিরবয়ব নামহীন একটা ব্যথা কেন তার সমস্ত মনে ছড়িয়ে আছে! সেই সংগে একটা অস্পষ্ট ভর্ৎসনা নিজেকেই।

চায়ের জল ফুটে ওঠবার পর স্টোভ নেবাতে হয়েছে। ও ঘরের কথাবার্তা আবার কানে এসেছে।

উমাপতি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে নিয়ে পড়েছে। বলেছে,—সাধন ভজন করবার চেষ্টা দিন-কতক করেছিলাম সাধুজী। মনে হচ্ছিল বেশ কয়েকটা ধাপ বুঝি পেরিয়েই এসেছি। ধোঁয়া সরে গিয়ে আলো বুঝি দেখা যায় যায়। ভয়ে সব ছেড়ে দিলাম একদিন। চট করে ছোটখাট একটা পাপ করে ফেললাম।

সাধুজি ছাড়া সবাই একটু আধটু হেসেছেন।

একজন জিজ্ঞাসা করেছেন,—ভয় পেয়ে পাপ করলেন কি রকম?

ভয় পেলাম পাছে সত্যিই মোক্ষ হয়ে যায়, তাহলে ত ফেরার রাস্তা বন্ধ। আর জন্ম জন্মান্তর হবে না, এ মজার দুনিয়ায় হাসতে কাঁদতে জ্বলতে জ্বালাতে আর আসতে পারব না। তাই যা হোক একটা পাপ করে পাকতে ওঠা ঘুঁটি কাঁচিয়ে নিলাম। পাপটাও কি বলে দিই। আমার মতই রাজ-অতিথি এক সংগীর সংগে না বলে কম্বল বদল। আমারটা পুরানো তারটা নতুন।

অন্যেরা হেসেছেন। সাধুজি শুধু বলেছেন সসম্ভ্রমে,—এ পরিহাস আপনাকেই সাজে। আপনি স্বভাবমুক্ত তা বুঝিনি বলে লজ্জা পাচ্ছি।

উমাপতি কি জবাব দিত বলা যায় না। জয়া চা নিয়ে ঢোকায় সে প্রসংগ চাপা পড়েছে। যথেষ্ট পেয়ালার অভাব জয়াকে বাটি গেলাস যা ছিল নিয়ে আসতে হয়েছে চা ঢেলে দেবার জন্যেই।

রাজনীতির জগতের একজন তারিফ করে বলেছেন,—বাঃ পাঁচন কোথায়? চা ত ভালোই।

তাহলে জয়া দেবীর হাতের গুণ বুঝুন! উমাপতি সোৎসাহে জয়ার হয়ে হঠাৎ ওকালতি করেছে,—আমার নামটা আপনাদের খাতায় তুলতে চাইছেন, তার বদলে জয়া দেবীকে একটা কাজের মত কাজ দিতে পারেন? ওর হাতে শুধু চায়ের পাতাই কোমল হয়ে গলে না, ভিজে কাঠেও আগুন ধরে। ওর ওই আগুনের ছোঁয়ায় মশাল জ্বালিয়ে নিতে পারেন ইচ্ছে করলে। মশাল না জ্বালাতে দিলে পাছে অগ্নিকাণ্ড হয়ে যায় এই আমার ভাবনা।

জয়া লজ্জায় রাগে অপমানে ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। নিজেকে সামলাতে পারবে না ভয়েই সে কেটলিটা নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেছে।

কথাটা পরিহাসের সুরেই নিয়ে একজন চাঁই বলেছেন,—অগ্নিকাণ্ডের ভয়েই বুঝি আমাদের ওপর চালান করছেন!

না সে ভয়ে নয়,—উমাপতির স্বরটা হঠাৎ রূঢ় ও কঠিন শুনিয়েছে,—আমার এই চালাঘর জ্বললে কতটুকু আর লোকসান হবে। আপনাদের ওপর করুণা করেই চালান করছি ভাববেন না। ঘর জ্বালাবার কি মশাল জ্বলবার কোন আগুনই ত আপনাদের নেই মনে হয়।

এরপর আসর আর তেমন জমেনি।

সাংগপাংগ সমেত চাঁইরা আগে বিদায় নিয়েছেন। তারপর সন্ন্যাসী ঠাকুর। সন্ন্যাসী ঠাকুর চলে যাবার সময় উমাপতি বলেছে,—আমায় সত্যিই ক্ষমা করবেন সাধুজি। যা বুঝি না তা নিয়ে রসিকতা করা আমার অন্যায় হয়েছে।

অন্যায় আপনার নয় আমার। আপনাকে আমি চিনতে পারিনি।—বলে সন্ন্যাসী ঠাকুর প্রসন্নভাবে হেসে বিদায় নিয়েছেন।

জয়াও তাঁর প্রায় পিছু পিছুই যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে।

যেও না।—বলেছে উমাপতি। কঠিন আদেশের সুরই প্রায়।

জয়া অগ্নিমূর্তি হয়েই ফিরে দাঁড়িয়েছে, —আমার যাওয়া না-যাওয়া কি আপনার মর্জির ওপর নির্ভর করে নাকি? সে অধিকার আপনাকে দিয়েছি বলে ত মনে পড়ে না।

এই তীব্র জ্বালাময় আঘাতও সম্পূর্ণে অগ্রাহ্য করে উমাপতি বলেছে শান্ত গম্ভীর স্বরে,—তুমি নির্বোধ নও জয়া। সস্তা নাটকের নায়িকা হওয়া তোমায় মানায় না!

জয়া তবুও থামেনি। তিক্ত কণ্ঠে বলেছে, না, নাটক মানায় শুধু আপনাকে! ইচ্ছে-মত রাজা মন্ত্রী ভাঁড় সব আপনি সাজতে পারেন। হাততালি দেবার দর্শক পেলেই আপনার অভিনয় বেশী খোলে। কিন্তু আপনার মুগ্ধ দর্শক হবার আমার কোন বাসনা নেই, আপনার বিদ্রুপের ধার পরীক্ষা করবার নিশানা হয়েও আমি ধন্য হতে পারব না।

উমাপতি এ কথার কোন জবাব দেয়নি। অত্যন্ত আহত দৃষ্টিতে তার দিকে খানিক চেয়ে থেকে নীরবে এগিয়ে এসে হঠাৎ তার হাতটা ধরে একটু টেনে কাছের টুলটার ওপর বসিয়ে দিয়েছে।

স্তম্ভিত বিহ্বল হয়েই কি জয়া কোন বাধাই আর দিতে পারেনি!

তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেছে মনে হয়েছে।

হঠাৎ বুকের কোন অতল থেকে অদম্য কান্না তার উথলে উঠেছে। সামনের উমাপতির বিছানাটার ওপর মুখ গুঁজে সে কান্না সে দমন করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সফল হয়নি।

উমাপতি তার পিছনেই তখন দাঁড়িয়ে। জয়াকে শান্ত করবার কোন চেষ্টা সে করেনি। বলেনি একটা কথাও।

অনেকক্ষণ বাদে জয়া বিছানা থেকে মুখ তুলে চোখ মুছেছে। উমাপতির দিকে তবু ফেরেনি।

উমাপতি তখনও নীরব।

জয়াই প্রথম শক্তি সঞ্চয় করে উমাপতির দিকে ফিরে বসে ম্লান কুণ্ঠিত স্বরে বলেছে —আমায় আজ যেতে দাও।

উমাপতির মুখের দিকে তখনও সে চোখ তুলে তাকায়নি।

তাই দিলাম।—উমাপতির গাঢ় স্বর যেন কোন দূরে থেকে ভেসে এসেছে,—আজ তোমায় থাকতে বলার সাহসও আমার আর নেই। নিজেদের ওপর বিশ্বাসের অভাবে নয় জয়া, সমাজের মুখ চেয়েও নয়, শুধু পাছে এই দুর্লভ মুহূর্তটি দীর্ঘ করে তোলবার অতিরিক্ত আগ্রহে ম্লান হয়ে যায় এই ভয়ে।

জয়া উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে গেছল। উমাপতিও এসেছিল তার সংগে।

বেরিয়ে এসেও জয়া তখুনি চলে যেতে পারেনি। বাঁশের সাঁকোটার ওপর দু পা গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। উমাপতি কিছু দূরে পাড়ের ওপর থেকে তার দিকে চেয়ে আছে। কেউই কোন কথা আর বলেনি।

বিস্তীর্ণ জলা আর ধান ক্ষেতের ওপর দিনের আলো তখন ম্লান হয়ে আসছে। সমস্ত আকাশেই বুঝি নিরুপায় বিচ্ছেদের একটা বিষণ্ণ কাতরতা। জলার ওপরকার দীর্ঘ ঘাসগুলো হঠাৎ ওঠা একটা হাওয়ায় একটু কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেছল, তাদেরই মত শেষ একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে যাওয়ার বেদনায়।

জয়ার মনে হয়েছিল এই মুহূর্তটা যদি কোন অলৌকিক যাদুতে অচল করে ধরে রাখা যেত। এই মুহূর্ত আর এই ছবি, যে ছবির মধ্যে তারা চিরকালের মত স্থির নিস্পন্দভাবে আঁকা।

কাছে যারা কোনদিনই যেতে পারবে না, এই বিদ্যুৎ চঞ্চল দূরত্বটাই তাদের চিরন্তন হয়ে থাক। এর বেশীও নয় কমও নয় কিছু।

অনেক দূরে একটা বাসের ঘন ঘন হর্নই শোনা যাচ্ছে মনে হয়েছিল।

শহরে ফিরে যাবার বিরল সেই যান যার রূঢ় নীরস আহ্বান উপেক্ষা করা যায় না, যে নির্বিকারভাবে ধোঁয়া ধুলোয় মলিন প্রত্যহের জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

আজও বড় রাস্তায় নেমে একটা গাছের ছায়ায় জয়াকে সেই বাসের জন্যেই অপেক্ষা করতে হ'ল।

সেদিন বাস যখন পেয়েছিল তখন প্রায়

অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাসটাই যেন তারপর পেছনে সমস্ত পথ প্রান্তর ও স্মৃতি অন্ধকারে মুছে দিতে দিতে ছুটে চলেছিল।

আজ অন্ধকার নয় প্রখর দ্বিপ্রহরের মেঘ-ভাঙা রোদ্দুরের আলো। কিন্তু তবু মনে হয় বাসটা সেই দূর অতীতের ফিরে যাওয়ার অন্ধকার রাত্রিই বুকে করে নিয়ে আজও আসছে। পেছনের নলের নোংরা ঘন গ্যাসের ধোঁয়ার সঙ্গে এখুনি সেই নিবিড় রাত্রি ছড়িয়ে দেবে অন্তরে বাইরে সর্বত্র।

অসীম রাহা অবাক।

তার ফোন এসেছে।

ফোন আসাটা কিছু অভাবনীয় নয়। অফিসে অমন অজস্র আসে। বন্ধুবান্ধবের ত বটেই, তা ছাড়া লেখার তারিফ জানিয়ে কিংবা লেখারই জন্যে শাসিয়ে, লেখা যাদের ভালো লাগে বা জ্বালা ধরায় তাদের কাছ থেকে।

কিন্তু এখন ত তাকে অফিসেই পাবার কথা নয়। ক'দিন আগেই সে ছুটি নিয়েছে। আজ এসেছিল শুধু মাইনেটা নেওয়ার জন্যে। অসময়েই এসেছে। যারা তাকে ফোন করে বা করতে পারে তারা জানে যে বেলা তিনটের আগে অফিসে তাকে পাওয়া যায় না।

এখন ত বারোটা!

তা ছাড়া ফোনে যে ডাকছে সে একটু রহস্যেই নিজেকে আবৃত করতে চায়। প্রথমত মহিলা দ্বিতীয়ত পরিচয় দিতে নারাজ। অপারেটর জিজ্ঞাসা করায় বলেছে, পরিচয় তাঁকেই দেব। আপনাদের অফিসটা কি ব্রহ্মচর্যাশ্রম যে মেয়েদের ফোন এলে ধরা বারণ!

অফিসে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ফোনের ডাক তার কাছে না পৌঁছোতেই পারত। অপারেটর এ সময়ে তাকে পাওয়া যায় না জেনে সে কথা বলে ফোন কেটেই দিতে যাচ্ছিল। অনুতোষ ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত থাকায় বারণ করেছে। অনুতোষ অসীমকে মাইনে নিয়ে ক্যান্টিনের দিকে যেতে দেখেছিল। তাই সে নিজেই ফোনটা নিয়ে কে ফোন করছে জানতে চেয়েছে। তাতে ওই উত্তর পেয়েই উৎসুক হয়ে উঠেছে একটু। নইলে হয়ত নিজে তাকে ক্যান্টিনে খুঁজতে আসার পরিশ্রমটুকু স্বীকার করত না।

আপাতত অনুতোষের কাছেই অসীম খবর নিচ্ছিল বিস্ময়ের সঙ্গে একটু বিরক্তি নিয়েই।

অনুতোষ অবশ্য রহস্যটার ওপর রং চড়িয়ে পরিহাস করছিল।

অসীম কিন্তু ভাবনাতেই পড়েছে তখন। সে অফিসে নেই বলে ফোনটা কেটে দিতে বলবে কিনা স্থির করতে পারছিল না। কিন্তু কৌতূহলটাই জয়ী হ'ল শেষ পর্যন্ত।

ফোনটা গিয়ে ধরার পর সত্যিই বিস্ময়ের অবধি রইল না। কৌতূহল যে জয় করতে পারেনি সেটা ভাগ্য বলেই মনে হয়।

ও প্রান্তের কণ্ঠটা তখন ঝাঁঝালো।—কে? মিঃ রাহা? কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছেন জানেন?

কি করে জানব?—অসীম একটু ব্যঙ্গের সুরেই বললে,—খবর পেয়েই ছুটে আসছি। আপনি ফোন করবেন জানলে ফোনটা কানে লাগিয়েই অবশ্য বসে থাকতাম। ফোন করে কে আমায় ধন্য করছেন এবার একটু জানতে পারি কি?

এখনো বুঝতে পারেননি!—স্বরটা এবার কৌতুকের।

একটু অনুমান করতে পারছি মাত্র। কিন্তু অনুমানটা বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছে না। নিজেকে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ বলেই জানতাম। হঠাৎ এ ক'দিনের মধ্যে কি জাতে উঠে গেলাম নাকি? এত অনুগ্রহ কেন বলুন ত!

বিদ্রূপটা সম্পূর্ণ বৃথাই গেল মনে হ'ল ওদিকের নির্বিকার প্রায়-ধমক দিয়ে কথা বলার ধরনে।

লেখেন ত বেশ! কথা এত বাজে বলেন কেন? শুনুন। উমাপতির একটা ছবি দেখবেন? এখুনি এলে দেখাতে পারি!

উমাপতির ছবি আমি অনেক দেখেছি।—অসীম ইচ্ছে করেই গলাটাকে একটু কর্কশই হতে দিলে।

সে সব ছবি নয়!—আবার ঝংকার শোনা গেল,—সে সব ছবি হ'লে আপনাকে ডাকতাম? এ একটা পোরট্রেট। ভেবে-ছিলাম হারিয়ে গেছে। হঠাৎ পেয়ে গেলাম। তাই ভাবলাম আপনার উমাপতি সম্বন্ধে যখন এত আগ্রহ, আপনাকেই একবার ডেকে দেখাই।

অশেষ ধন্যবাদ! কিন্তু আমার আগ্রহ উমাপতির জীবন সম্বন্ধে আছে বলে তাঁর পোরট্রেট দেখবার জন্যেও থাকবে, ভাবলেন কি করে?

আগ্রহ না থাকে আসবেন না। আর যদি থাকে এখুনি এই ঠিকানায় আসতে পারেন।

ঠিকানাটা দেবার পরই ওধারের ফোনটা নামবার আওয়াজ পাওয়া গেল।

না গেলেও পারত, এবং তাহলে যা সয়েছে ক'বারের সাক্ষাতে সংঘর্ষে তার একটু জবাব দেওয়া যেত বোধহয়।

কিন্তু অসীম রাহা না গিয়ে পারল না।

ঠিকানাটা দ্রুত কণ্ঠে ফোনে একবারই মাত্র শুনেছে। সেইটুকুই যথেষ্ট। বলা মাত্র সে বুঝতে পেরেছে। জায়গাটা তার জানা।

শহরের মাঝখানে আগেকার খাস সাহেবী পাড়ায় বাগান ঘেরা একটি সেকেলে বড় বাড়ির এক অংশের দুটি বড় বড় ঘর। একেবারে হালের উঠতি একটি ছোট শিল্পী-গোষ্ঠীর সেইটি আস্তানা। এরা বেশীর ভাগই সব কিছু সেকেলে সংস্কার-ভাঙা বিদ্রোহী। বিশুদ্ধ বস্তু-নিরপেক্ষ ছবির আদর্শ অনুসরণ করে ফেরে।

দু একবার এখানে ছবির প্রদর্শনী দেখতে এসেছে। শিল্পীদের দু একজন অগ্রণী তার পরিচিত। মলি চৌধুরীকে এদের মধ্যে কোনদিন অবশ্য দেখেনি। এই ঠিকানা দেওয়ায় তাই বিস্মিত যেমন তেমনি একটু চিন্তিতও হয়েছিল কি রকম ছবি দেখতে হবে ভেবে।

তবে সত্যিই ছবি দেখার আকর্ষণে সে কি এসেছে?

মলি চৌধুরীরও তাকে ডাকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছবি দেখান কিনা কে জানে!

অসীমকে খোঁজাখুঁজি করতে হ'ল না। ট্যাক্সি থেকে নামতে না নামতে মলিকেই প্রদর্শনীর বড় হল ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। আজকের সাজটায় উগ্রতা যেন একটু কম।

আসুন। জানতাম, না এসে পারবেন না!—মলি চৌধুরীর হাসিটা বিদ্রূপের কিন্তু নয়।

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে মলিকে অনুসরণ করতে করতে অসীম বললে,—জানবেন না কেন? কোন টোপে কোন মাছ জব্দ ঝানু শিকারী মাত্রেই জানে।

মলি চৌধুরী ধমক দিয়ে উঠল,—অকৃতজ্ঞ হয়ে যা তা গালাগাল দেবেন না। তাহলে কড়া কথা শুনবেন। কি আপনি আহামরি মাছ যে আপনাকে টোপ ফেলে শিকার করতে হবে মলি চৌধুরীকে! একটু উপকার করতে চাইলাম দয়া করে, তার এই প্রতিদান!

হল ঘরটার ভেতর দিয়ে পাশের অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরটায় তখন তারা পৌঁছেছে। দুটো ঘরই এখন নির্জন। শিল্পীদের জমায়েত হবার এটা সময় নয়। একজন বেয়ারা ছাড়া আর কাউকে কোথাও দেখা গেল না।

বেয়ারা একদিকে কতকগুলো বাঁধানো ছবি দেয়ালের ধারে সাজিয়ে রাখছিল। তাদের দেখে বেরিয়ে যাবার পর অসীম বললে,—হঠাৎ দয়াটা কেন উথলে উঠল জানতে পারলে প্রতিদানটা উচিত মত দেবার চেষ্টা করতে পারি।

দয়া হঠাৎই উথলে ওঠে, আর অপাত্রেই বেশীর ভাগ। বসুন।—বলে ঘরের এক-দিকের ক'টি বিচিত্র আকারের আসনের দিকে মলি অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

মলির সঙ্গে অসীমকেও বসতে হল, সামনা সামনি দুটি আসনে। আসনগুলি চেহারায় যত চমকদার বসবার পক্ষে তত আরামপ্রদ নয়। তা না হোক, এ ঘরের চারদিকের দেয়াল যে সব ছবিতে প্রায় ঢাকা তাদের মধ্যে আসনগুলিতে বেমানান লাগে না। তা ছাড়া ওগুলির চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন বসবার জায়গা নজরে পড়ল না। ঘরটি শিল্পী গোষ্ঠীর ছবির সংগ্রহাগার হিসেবেই

প্রধানত ব্যবহৃত হয় বোঝা গেল। ইচ্ছে করলে কোন শিল্পী এখানে বসেও সাধনা যাতে করতে পারেন এক কোণে তারও ব্যবস্থা রয়েছে। সে ব্যবস্থা মেঝের ওপর।

ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অসীম একটু হেসে বললে,—অপাত্র হিসেবে এখন আপনার দয়ার নমুনাটা একটু দেখতে পারি? কি রকম উদ্‌গ্রীব হয়ে এসেছি বুঝতেই পারছেন!

প্রথমে তাহলে অত ভড়ং করেছিলেন কেন?

করেছিলাম বোধহয় একটু হতবুদ্ধি হয়ে। কোন মলি চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছি বুঝতে না পেরে?

তার মানে?—মলি চৌধুরীর মুখে রাগের ভান।

মানে, এক রাত্রে যিনি ইস্পাতের ফলা, আরেক দুপুরেই তিনিই করুণার নদী হতে পারেন এটা ভাবতে পারিনি।

মলি চৌধুরী উচ্চৈস্বরে হেসে উঠল। সরল সংগীতময় হাসি,—পিয়ানোর ওপর লঘু নিপুণ স্পর্শ দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত।

হাসি থামিয়ে বললে,—সে রাতের কথা আপনি এখনো ভুলতে পারেননি?

ভোলা কি যায়!—অসীমের গলার স্বর খুব হাল্কা নয়।

নাই বা ভুললেন।—মলি চৌধুরীকেও গম্ভীর মনে হল,—মনে করুন এ আরেক মলি চৌধুরীর সঙ্গে নতুন পরিচয় করছেন। তাতে বোধহয় আপত্তি নেই?

না, তা নেই।—অসীম এবার হাসল,—আশা করি রাতের সে মলি চৌধুরী হঠাৎ ফনা তুলে উঠবে না!

না তা উঠবে না।—মলি চৌধুরীর চোখ দুটো কেমন জ্বলে উঠল,—যেখানে সে নিজেকে লুকোতে চায় সেখানে তাকে নাড়া না দিলে সে ফণা তোলে না।

দুজনেই খানিকক্ষণ নীরব।

মলিই প্রথম হেসে উঠে ঘরের ভারী হাওয়াটা হাল্কা করে দিয়ে বললে,—যাক বোঝাপড়া একরকম একটা এখন হয়ে গেছে, এবার আপনাকে ছবিটা দেখাই।

মলি উঠে দাঁড়াতে অসীম একটু কৃত্রিম আতঙ্কে ঘরের দেয়ালগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বললে,—বুঝতে পারব ত? উমাপতি বলে চেনা যাবে আশা করি।

যাবে! যাবে!—মলি উঠে গিয়ে দেয়ালের ধারে সাজিয়ে রাখা ছবিগুলির ভেতর থেকে একটি তুলে নিয়ে এসে অসীমের সামনের নিচু বিচিত্র টেবিলটার ওপর রেখে বললে,—এ অ্যাবস্ট্র্যাক্ট পেন্টিং নয়, দস্তুরমত ব্যাকরণসম্মত তেল রংএর ছবি। উমাপতি ঘোষালের ভেতরটা না ধরা পড়ুক বাইরেটা চেনা যায়।

অসীম উত্তর দিলে না!

ছবিটার দিকে সত্যিই সবিস্ময়ে সে তখন চেয়ে আছে।

উমাপতি ঘোষালকে সে কয়েকবার দেখেছে, তাঁর আলোকচিত্রের কথা না হয় নাই ধরল। কিন্তু উচ্চস্তরের কোন শিল্পকর্ম বা বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এ ছবিতে এমন কিছু আছে যা বিস্ময় জাগায়।

সেই এমন কিছুটা কি ঠিক বুঝতে না পেরে অসীম জিজ্ঞাসা করলে,—এ ছবি কার আঁকা?

আমার!—বলে মলি চৌধুরী এই প্রথম বুঝি একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসল। বললে,—উমাপতির সঙ্গে পরিচয় হবার কিছুদিন বাদেই নিজের খেয়ালে এটা এঁকে-ছিলাম। তারপর ভুলেই গিয়েছিলাম ছবিটার কথা। এখানকার পুরানো বাতিল অনেক ছবির মধ্যে থেকে হঠাৎ কাল আবিষ্কার করলাম। আবিষ্কার করে মনে হ'ল ছবিটা আপনাকে দেখালে মন্দ হয় না।

আমার কথা মনে পড়ার জন্যে কৃতজ্ঞ?

দোহাই? ও সব শুকনো ভদ্রতাগুলো এখন রাখুন!—মলি চৌধুরী সত্যিই আহত স্বরে বললে,—আমার ছবি আঁকার বাহাদুরী দেখাতে আপনাকে ডাকিনি এটুকু বিশ্বাস করতে পারেন। ছবিটা কিছুই হয়নি আমি জানি তবু আপনি যা খুঁজছেন এ ছবি দেখলে হয়ত তার কিছু হদিস পাবেন। এমন এক উমাপতি ঘোষালকে এ ছবিতে ফোটাতে চেয়েছিলাম যাকে আর কেউ দেখেনি বলেই আমার ধারণা।

শিল্পীরা যখন দেখে তাদের প্রত্যেকের সব দেখাই এমনি অনন্য হয় না কি?—অসীম মৃদু একটু প্রতিবাদ জানাল প্রশ্নের ছলে।

না, না, আপনাকে আমিই বোধহয় বোঝাতে পারছি না, আমার কথাটা।—
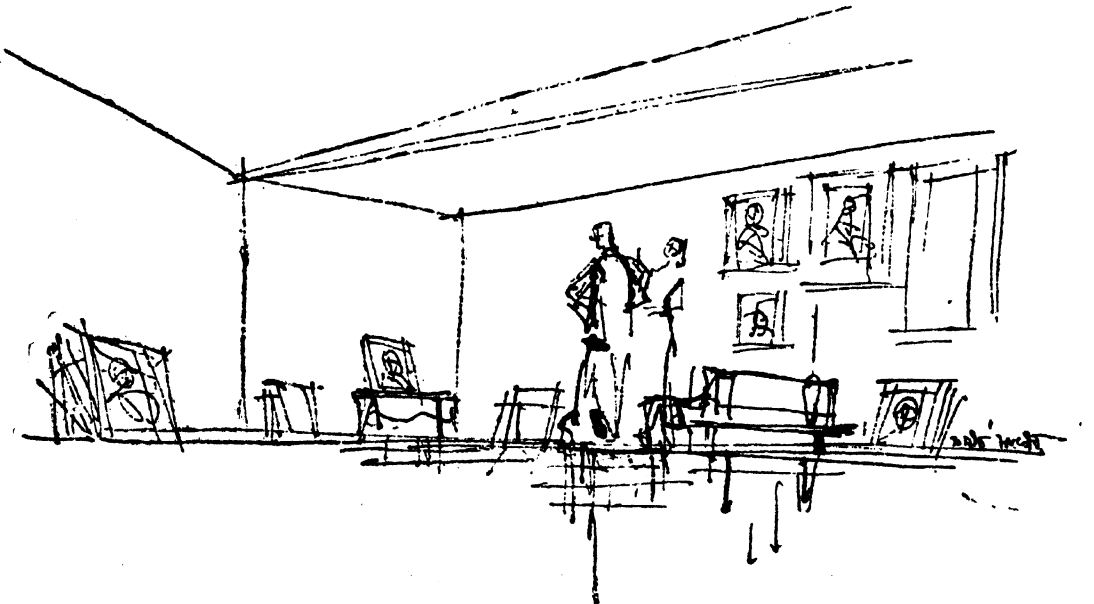
কই কিছু বললেন না যে?

মলি চৌধুরীকে কেমন অস্থির মনে হ'ল,—এ ছবিতে উমাপতির সাধারণ সাদৃশ্যের বাইরে আর কিছুই কি পেলেন না?

অসীম রাহা তখন পেয়েছে। মুখে কিছু না বললেও নাতিনিপুণ হাতের ছবিতেও যা বিস্ময় জাগায় সেই এমন কিছুর রহস্য সে তখন বুঝতে পেরেছে।

এ ছবি উমাপতির নয়, মলয়ার। তারই উদ্দাম উদ্বেল হৃদয়ের হতাশ এক আকুলতার ছবি।

মলি চৌধুরী নিজে কি সে কথা জানে না?

জানুক বা না জানুক তাকে হঠাৎ এ ছবি দেখাবার জন্যে আগ্রহ কেন?

সেদিনকার রাত্রের সেই ব্যবহারের তিক্ত জ্বালা একটু ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা? একটু অনুশোচনা? কিন্তু মলি চৌধুরীকে সে জাতের মেয়ে ত মনে হয় না। অনুশোচনা কিছু হলেও তা প্রকাশ করবার গরজ তার না থাকবারই কথা।

তাহলে সত্যিই কি মলি চৌধুরীর মধ্যে দুই বিরোধী সত্তা বিদ্যমান! রাতে যে মলি চৌধুরী দিনে সে মলয়া? এরকম ভিন্ন ভিন্ন সত্তা অনেকের মধ্যেই হয়ত থাকে, কিন্তু তা এত স্পষ্ট, পরস্পরের সঙ্গে এমন সম্পর্কহীন নয়।

উমাপতির প্রতিকৃতির মধ্যে কাকে খুঁজে পাওয়া যায়? রাতের সেই মলি চৌধুরীকে না দিনের এই মলয়াকে?

এ প্রশ্নটা হয়ত অবান্তর অর্থহীন। মলি চৌধুরী এ ছবি আঁকবার পর তার কথা ভুলেই গিয়েছিল বলেছে। ভুলে যাওয়াটা যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে কেমন করে ভুলতে পারে সেইটেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন নয় কি?

ভুলে যেতে চাওয়াও ত ভুলে যাওয়ার ছলনা করে কখনো কখনো।

কিছু বলছেন না যে!

অসীমের নীরবতা একটু দীর্ঘ হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু অধৈর্যের বদলে কেমন একটা কাতরতাই যেন প্রকাশ পেল মলি চৌধুরীর কণ্ঠে।

যা বলতে চাই নিজের মনেই সেটা ঠিক স্পষ্ট করে তুলতে পারছি না।—অসীম সম্পূর্ণ সত্য গোপন করলে না,—ছবিটার কথা ত আপনি ভুলেই গিয়েছিলেন বলছেন। এটা আমি নিয়ে যেতে পারি?

অত, ভনিতা করবার দরকার নেই।—মলি চৌধুরী সহজ হয়ে হেসে উঠল,—আপনাকে দেবার জন্যেই ডেকেছি। স্বার্থ বা অসুস্থ কৌতূহল, কারণ যাই হোক তবু ত একজন উমাপতিকে মনে করে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে!

একটু থেমে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বরে মলি চৌধুরী বললে,—কিন্তু আপনাকে একটু সাবধানও না করে পারছি না, উমাপতির মত মানুষকে খুঁজতে যাওয়ার বিড়ম্বনা আছে।

ছবিটা নিয়ে কিছুক্ষণ বাদেই অসীম বিদায় নিয়েছিল সেদিন।

যেতে যেতে তার মনে হয়েছিল সেদিন রাত্রে যে উগ্র ঘৃণাময়ী মেয়েটিকে জেনেছিল তার চেয়ে দিনের আলোর এই প্রায়-স্নিগ্ধ মেয়েটি অনেক বেশী দুর্বোধ।

শ্রীহরির কথাতেই বিপিন ঘোষ বাইরের দাওয়ায় ভাঙা তক্তপোষটার ওপর বসে অপেক্ষা করে।

নিশীথ পাত্র কিছুক্ষণ বাদেই আসবেন। বিপিন ঘোষকে তিনি বসিয়ে রাখতে বলে গেছেন শ্রীহরিকে।

নিশীথ পাত্রের এই বসিয়ে রাখতে বলাটা এমন অস্বাভাবিক যে বিশ্বাস করতে মন সহজে চায় না। বিপিন ঘোষ বাড়িতে এসে যতক্ষণ খুশি বসে থাকতে পারে, নিশীথ পাত্র তাকে সহ্য করবেন নিশ্চয়, কিন্তু তাঁর নিজে থেকে বিপিন ঘোষকে ধরে রাখার নির্দেশ দিয়ে যাওয়াটা প্রায় কল্পনাতীত। নিশীথ পাত্রের সঙ্গে তার সে রকম সম্পর্ক কোনদিনই নয়।

বিপিন ঘোষ নিজেকে চেনে এবং সেই সঙ্গে তাকে যারা চিনে ফেলেছে তাদেরও।

নিশীথ পাত্র তাকে চেনেন বিপিন ঘোষ ভালো করেই বোঝে।

তবু তাকে নিজের গরজেই নিশীথ পাত্রের কাছে মাঝে মাঝে আসতে হয়। গরজটা অবশ্য সব সময়ে প্রত্যক্ষ স্থূল স্বার্থের নয়। নিশীথ পাত্রের কাছে মাঝে মাঝে সে যে আসে এটা লোকের চোখে পড়ারও একটা পরোক্ষ মূল্য আছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ স্থূল ও সূক্ষ্ম স্বার্থ ছাড়া আর কোন কারণ কি নেই যা বিপিন ঘোষের মত মানুষকে নিশীথ পাত্রের এই টিনের চালার বাড়িতে টেনে আনে?

আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বিপিন ঘোষের কাছেও তা দুর্বোধ। উমাপতি ঘোষালের মৃত্যুর পর থেকে অন্তত সে বেশ ঘনঘনই এখানে এসেছে এবং সব সময়ে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়।

কে জানে এটা হয়ত তার একরকমের বিশ্রামের জায়গা যেখানে তার কপট মনকে সজাগ হয়ে সারাক্ষণ সেজে থাকতে হয় না, যেখানে তার সত্যকার পরিচয় জানা সত্ত্বেও দরজা কোন সময়ে বন্ধ হবে না সে জানে।

নীরজা দেবীর কাছে হার মেনে সেদিন অস্ফুট এমনি একটা তাগিদেই নিশীথ পাত্রের কাছে এসেছিল। নিশীথ পাত্রের বাড়িতে সেদিন প্রায় মেলা বসেছে। তাঁর দেশগাঁয়ের এক পাল মেয়ে পুরুষ গঙ্গাস্নান কালীমাতা দর্শনের সঙ্গে কলকাতা ভ্রমণ সারবার জন্যে তাঁর আস্তানাতেই এসে উঠেছে।

এরকম মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে অনাহূত অতিথি সমাগম হয়।

উঠোনে দাওয়ায় কোথাও তখন আর জায়গা থাকে না দাঁড়াবার।

দরজা থেকেই ভীড় দেখে বিপিন ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু এসে একবার দেখা না করে চলে যেতে মন চায়নি। তাই ভীড় ঠেলে নিশীথ পাত্রের ঘরেই গিয়ে ঢুকেছিল।

সেখানেও ভীড়। তবে অন্যরকম। একজন ডাক্তার বসে বিছানায় শায়িত নিশীথ পাত্রের রক্তের চাপ পরীক্ষা করছেন। ছোট বড় কয়েকজন তাদেরই দলের কর্মী উদ্বিগ্নভাবে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছেন।

ডাক্তার পরীক্ষা শেষ করে যন্ত্রটা বন্ধ করতে করতে গম্ভীর মুখে কিছু বোধহয় বলতে যাচ্ছিলেন।

তার আগেই নিশীথ পাত্র সকৌতুক মুখভঙ্গি করে বলেছিলেন,—বড় সঙীন অবস্থা, না ডাক্তার! ওরে তোদের নন্দ খুড়ো এবার বুঝি পটল তোলে!

তারপর সেই প্রাণখোলা ছাদ ফাটানো হাসি।

ডাক্তার শশব্যস্ত হয়ে বলেছিলেন,—ওকি, করছেন কি? ওরকমভাবে হাসবেন না!

নিশীথ পাত্র হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হবার ভান করেছিলেন,—হাসতে মানা করছ ডাক্তার? হাসলে রক্তটা হঠাৎ ছলকে উঠে হৃদপিণ্ডটা ফাঁসিয়ে দিতে পারে, না?

কোনরকম বেশী উত্তেজনা পরিশ্রম, যাকে বলে হঠাৎ চাঞ্চল্য আপনার পক্ষে ভালো নয়।—ডাক্তার বোঝাবার চেষ্টা করেছিল।

তাহলে কি ভালো বলতো ত? শুধু অসাড় হয়ে শুয়ে শুয়ে বেঁচে থাকা? আরে হাসিই যদি বন্ধ হোলো তা হলে বাঁচার দরকারটা কি!—বলতে বলতেই আবার সেই হাসি।

ডাক্তার হতাশভাবে বলেছিল,—আপনি যদি কোন কথা না শোনেন তাহলে আমরা নাচার!

নাচার আমিও ডাক্তার,—নিশীথ পাত্র আবার গম্ভীর হয়েই বলেছিলেন,—ক'টা বছর পরমায়ু বাড়াবার জন্যে তোমাদের কথা আর শুনতে পারব না। তোমার যা করবার করো, বলবার বলো, আমারও যা করবার করি। এই আমাদের আপোস। তুমি রেগে মেগে গিয়ে গোটাকতক বিদঘুটে ওষুধ গুলে পাঠাতে পারো অবশ্য?

হাসতে হাসতেই তারপর ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে নিশীথ পাত্র অন্য সকলের দিকে ফিরেছিলেন।

বলেছিলেন, বেঁচে বেঁচে বাঁচাটাও রোগ হয়ে দাঁড়ায় তা জানিস? আমার তাই হয়েছে। ডাক্তারের কল যা বলে বলুক, সহজে মরব বলে আশা হয় না। আমার জ্ঞান থাকতে আর ডাক্তার ডাকিস না কিন্তু।

অনুগত ভক্তদের মৃদু প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বিপিনকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন হেসে,—কি কাঁধ দিতে এসেছিলে নাকি? বাধিত করতে পারলাম না হে! তবে

পারলেও তোমার ও পলকা কাঁধে কি আমার ভার সইবে!

কথাটায় প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত কিছু থাকতেও পারে।

নিশীথ পাত্রের বদলে আর কেউ হ'লে বিপিন ঘোষ জুৎসই জবাবই দিত বোধহয়। বলত,—আপনার ভারে পলকা কাঁধ যদি ভাঙে সে'ত সৌভাগ্য।

কিন্তু নিশীথ পাত্রকে পরিহাসচ্ছলেও এটুকু খোশামুদি করতে কোথায় বাধে।

উত্তর না দিয়ে সে তাই হেসেছিল একটু। খানিক বাদে বিদায় নিয়ে বলেছিল,—আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল। আরেক দিন আসব।

নিশীথ পাত্র হাঁও বলেননি নাও নয়। কোনদিনই বলেন না।

তবু আজ তার আসা তিনি কি আগে থাকতেই অনুমান করে রেখেছিলেন? ঠিক আজকের দিনেই না হোক, সে ইতিমধ্যে আসবেই জেনে, নিজে সে সময়ে উপস্থিত না থাকলে তাকে বসিয়ে রাখবার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন অন্তত।

বিপিন ঘোষকে নিশীথ পাত্রের এমন কি দরকার?

তাঁর ত কাউকে দরকার হয় না কখনো। বিপিন ঘোষের মত মানুষকে অন্তত কখনো নয়। ভেবে ভেবে রহস্যটার কোন কুল কিনারা পায় না বিপিন।

তার নিজের কিছু কথা ছিল বটে বলবার। কিন্তু এমন কিছু জরুরী নয় যে আজ না বললেই চলে না। অন্যদিন এমন এসে বাড়িতে নিশীথ পাত্রকে না পেলে সে ফিরেই যেত।

আজ কিন্তু ঔৎসুক্যের চেয়ে উদ্বেগই নিয়ে বসে থাকতে হয়।

নিশীথ পাত্র কী আজ এমন কিছু বলবেন যা আগে কখনও বলেননি?

ইচ্ছে করলে অনেক আগেই অনেক শক্ত কথা তিনি বলতে পারতেন। কিন্তু তা যখন বলেননি তাহলে এমন কি নতুন কথা তার সম্বন্ধে শুনেছেন যার জন্যে তাকে বসিয়ে রাখার এই অপ্রত্যাশিত নির্দেশ?

এতদিন বাদে নিশীথ পাত্র যদি সত্যি সত্যিই প্রকাশ্যভাবে তার ওপর বিরূপ হন তাহলে তার কিছু ক্ষতি ও অসুবিধে হতে পারে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তাও না মেনে নিয়ে উপায় কি! নিজেকে সংশোধন করবার কোন বাসনা তার নেই। নিজের সংকল্প থেকেও টলবার।

নিশীথ পাত্র ফিরে আসবার পরও রহস্যটা কিন্তু পরিষ্কার হয় না। তিনি যাদের সঙ্গে ফেরেন তাদের একজন তার পরিচিত। হাইকোর্টের একজন অ্যাটর্নি। নিশীথ পাত্রের এই বাড়িতেই আগেও দেখেছে। রাজনীতির সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখেন।

অ্যাটর্নি ভদ্রলোকই নিশীথবাবুকে নিজের গাড়িতে এনে বাড়ির ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যান। যাবার সময় একটা মোটা ফোলিও ব্যাগ নিশীথবাবুর কাছে রেখে যান।

ব্যাপারটা অত্যন্ত গোলমেলে ঠেকে বিপিনের। তাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার সঙ্গে এ সবের কোন সম্বন্ধ না থাকবারই কথা। তবু অস্বস্তি একটু হয় বই কি!

সঙ্গীরা চলে যাবার পর নিশীথবাবু কেমন একটু অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকান বলে বিপিনের মনে হয়। হয়ত তার মনেরই ভুল।

বিপিনবাবু দাওয়ার ওপর তার কাছেই তক্তপোষে বসেছেন।

নিজের অস্বস্তিটা ঢাকবার জন্যেই বিপিন বলে,—শ্রীহরির কাছে শুনলাম আপনি আমায় অপেক্ষা করতে বলেছেন।

হ্যাঁ বলেছিলাম, এলে বসিয়ে রাখিস। তা এসেছ কতক্ষণ?

ঘণ্টা দেড়েক হবে।—বলে বিপিন একটু উৎসুকভাবেই নিশীথ পাত্রের দিকে তাকায়।

কিন্তু তিনি একবার শুধু হুঁ বলে চুপ করে ফোলিও ব্যাগটার ভেতর থেকে কটা টাইপ করা কাগজ বার করাতেই ব্যস্ত হ'ন।

বিপিন বাধ্য হয়ে নিজের কথাটাই পাড়ে, —আপনাকে একটা কথা কদিন ধরেই বলতে চাইছি। আপনি সেদিন সভায় উমাপতির স্মৃতিরক্ষার জন্যে কিছু করবার দরকার নেই বললেন, কিন্তু আমি একটু মুশকিলে পড়েছি।

কাগজগুলো বার করে তক্তপোষের ওপরই উল্টে রেখে নিশীথ পাত্র বললেন,—কি মুশকিল?

আমি ত' এবার অন্তত কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাব ভাবছি। কোথায় যাবো, কোথায় থাকব কিছু ঠিক নেই। উমাপতির বইটই থেকে কাগজপত্রটত্র যা আছে সেগুলোর কি ব্যবস্থা করব? ওঁর নামে একটা লাইব্রেরী গোছের কিছু করলেও সেখানে রেখে দেওয়া যেত।

রাখবার দরকার কি! সব পুড়িয়ে দাও না।

পুড়িয়ে দেব!—বিপিন চমকে ওঠে, নিশীথ পাত্র উমাপতির শেষ ইচ্ছারই না জেনে কি করে প্রতিধ্বনি করলেন ভেবে না পেয়ে।

পুড়িয়ে দিতে চাও না?—নিশীথ পাত্র তার দিকে চেয়ে হাসেন,—ও সবের ভেতর আমাদের মত অনেকের মৃত্যুবান আছে বলে ত আমার ধারণা। কিন্তু সেগুলো কি কাজে লাগান যাবে? গেলেও কতই বা ওগুলো থেকে আদায় হতে পারে?

যাই ভেবে রেখে থাকুক নিশীথ পাত্রের মুখে এরকম কথা শোনবার জন্যে বিপিন ঘোষ প্রস্তুত ছিল না। ক্ষণিকের জন্যে অন্তত সে কেমন হকচকিয়ে যায়। তারপর নিজেকে কোনরকমে সামলে বলে,—আপনি যা বলছেন...

তা তোমার মাথাতেই আসেনি। এলেও খুব অন্যায় কিছু নয়। কতকগুলো মুখোশ টান মেরে খুলতে লোভ ত হতেই পারে। তার ওপর যদি উপরি লাভ কিছু থাকে। কিন্তু ঝামেলাও আছে অনেক।

এবার বিপিন ঘোষ কোন কথাই আর বলতে পারে না। গুম হয়ে বসে থাকে।

নিশীথ পাত্রই টাইপ করা কাগজের তাড়াটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন,—শোন, যে-জন্যে তোমায় বসিয়ে রেখেছি। এই কাগজগুলো নিয়ে যাও। আজ ভালো করে পড়ে বুঝে কাল সকালেই আবার আসবে।

এ কিসের কাগজ? আইন আদালতের ব্যাপার মনে হচ্ছে?—বিপিন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। তবে এখানে নয়। বাসায় গিয়ে ধীরে সুস্থে পড়বে। তুমি ত' এখনও উমাপতির সেই বাসাতেই আছো?

হ্যাঁ। এই মাসটা পর্যন্ত আছি। বাড়ি-ওয়ালা নোটিশ দিয়েছে অনেক আগেই, এই মাসের শেষেই ছাড়তে হবে।

একমাসের মধ্যে কত কি হতে পারে কেউ জানে!—বলে নিশীথ পাত্র যেন অকারণে হাসতে থাকেন। সেই হাসির শব্দ কানে নিয়েই বিপিন ঘোষ বেরিয়ে যায়।

এই মাত্র ছেলেটি চলে গেল।

বেশ চমৎকার ছেলে। বুদ্ধিমান সপ্রতিভ অথচ অত্যন্ত ভদ্র। মুখে একটা তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা আছে। এ যুগের এরকম ছেলে দেখলে আনন্দ হয়।

কি নাম যেন? অসীম রাহা, হ্যাঁ অসীম রাহাই নাম।

প্রথমে বেশ রাগ ও বিরক্তই হয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে। স্কুলেই একটা শ্লিপ পাঠিয়েছিল হাতে লিখে।—'আপনার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে একটু দেখা করতে চাই। অসীম রাহা।

স্লিপটা দেখে জয়া অবাক হয়েছিল, বিরক্তও। কে অসীম রাহা? কোনো অসীম রাহাকে সে চেনে না। তার সঙ্গে বা কি দরকার থাকতে পারে?

তবু রূঢ় হয়ে ফিরিয়ে দিতে পারেনি। কমন রুমে ডাকতে বলেছিল।

চেহারা দেখে অন্তত ভয়টা গেছল! না কোন প্রকাশকের ক্যানভ্যাসার নয়। বই ধরাবার উমেদারী করতে আসেনি। যারা সে উদ্দেশ্যে আসে যেমন সাজপোশাকই হোক দেখলেই চেনা যায়।

তার আরজি শুনে কিন্তু যেমন বিস্মিত তেমনি আবার একটি উত্যক্তও হয়েছিল।

দীর্ঘ কোন ভূমিকা না করে ছেলেটি স্বল্প কথায় তার উদ্দেশ্য জানিয়েছিল। উমাপতি ঘোষাল সম্বন্ধে তার কাছে কিছু শুনতে চায়।

কথাটা শুনেই জয়ার মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল আপনা থেকেই। উমাপতি ঘোষালের কথা জানবার এ আগ্রহ কেন? কি অধিকারে? তার কাছেই বা আসবার মানে কি? তার সংশ্রবের কথা জানতে পারলই বা কি করে?

সেই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিল।

উমাপতি ঘোষালের কথা জানতে আমার কাছে আসার মানে কি? আমার খোঁজই বা পেলেন কোথায়?

একটা সূত্র ধরে যেতে যেতে আরেক সূত্রের সন্ধান মেলে।—অসীম বিনীতভাবে হেসে বলেছিল,—সব সূত্রেই ত কোথাও না কোথাও জড়ানো। আপনার ঠিকানা জোগাড় করতে অবশ্য বেশ অসুবিধা হয়েছে।

কিন্তু এসব অসুবিধা কেন ঘাড়ে নিচ্ছেন? উমাপতি ঘোষালের কথা জেনে কি হবে?

কিছুই হবে না।—অসীমের গলায় একটা আন্তরিকতার সুর পেয়েছিল জয়া,—আমার একটা কৌতূহল। আমাদের যখন বোঝবার বয়স হয়েছে, তখন উমাপতি ঘোষালের নাম আমাদের আকাশে প্রায় আগুনের অক্ষরে লেখা। সে নাম কেন কি করে মুছে গেল এমন করে তাই আমি বোঝবার চেষ্টা করছি।

সে বোঝবার চেষ্টায় আমার কাছে কি সাহায্য পাবেন আশা করেন? কি করে কেন সে নাম মুছে গেল সে রহস্যের মীমাংসা কি আমি করে দেব?—জয়ার কণ্ঠস্বরে এখন আর বিরক্তি নেই, বরং একটু সহানুভূতি।

আপনি করে দেবেন না জানি। তবে আপনাদের কাছ থেকে টুকরো জানাগুলো নিয়ে জুড়তে জুড়তে হয়ত উত্তরটা বেরিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু আমি কতটুকুই বা আপনাকে বলতে পারব।—বলেছিল জয়া, কিন্তু সেই সঙ্গে পরের দিন ছুটির পর তার বাসায় যেতে বলে ঠিকানাও দিয়েছিল।

সত্যি কতটুকুই বা জয়া বলতে পেরেছে! কতটুকু বলা বা তার পক্ষে সম্ভব?

উমাপতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবার কথা বলেছে, বলেছে তার সেই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত হওয়ার কথা। উমাপতি তখন কিভাবে কাগজ চালিয়েছে, কেমন করে কখনো ঝড়ের বেগে লিখেছে আবার কখনো কলম দিয়ে একটা আঁচড় টানতে চায়নি, উমাপতির দৈনন্দিন জীবন তখন কিরকম ছিল এই সবেরই একটা বিবরণ দিয়ে গেছে জয়া।

অসীম রাহাকে এই বয়সেই অত্যন্ত স্থির ধীর বিচক্ষণ মনে হয়েছে জয়ার। অসীম অযথা কৌতূহল প্রকাশ করেনি, অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলেনি। কিন্তু বাহ্যিক বিবরণের পেছনে যা অব্যক্ত তাও কিছু অনুমান করতে পেরেছে বলে মনে হয়।

ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নেবার সময় সে বলে গেছে শুধু,—উমাপতি ঘোষাল নির্বাচন সংগ্রামে নেমেও কেন শেষ মুহূর্তে হঠাৎ সরে দাঁড়ান এ রহস্যের বোধ হয় কখনো মীমাংসা হবে না।

জয়া চুপ করে থেকেছে। আর কিছু সে বলতে চায় না, বলতে পারে না।

সেই দিনের কথা কি কাউকে বলা সম্ভব, আত্মগোপনের জন্যে এই নতুন বাসার এক-দিনের চেষ্টায় উঠে আসা সত্ত্বেও যেদিন উমাপতি তার খোঁজ করে এখানে এসেছিল?

ওই সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল ওই সামনের দরজাটা আড়াল করে।

জয়া মুখ তুলে চেয়ে কিন্তু চমকে ওঠেনি। সে যেন জানত, অবচেতন মনের কোন গূঢ় রহস্য-সংকেতে জানত উমাপতির সঙ্গে এমনি করে দেখা একবার হবেই।

খোলা দরজাটা যেন একটা ছবির ফ্রেম। আর উমাপতির দু কাঁধের ওপর আসন্ন সন্ধ্যার যে রক্তাভ আকাশের অংশটুকু দেখা গেছে তা যেন উমাপতিরই গহন সত্তা থেকে বিচ্ছুরিত আভা।

উমাপতির মুখটা ভালো করে দেখা যায়নি। শুধু অনুভব করা গেছে তার উপস্থিতির গাঢ়তাটুকু।

অনেকক্ষণ,—কতক্ষণ মনে নেই—উমাপতি আঁকা ছবির মতই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে-ছিল দরজায়। তারপর ঘরের ভেতর এসে জয়ার খাটটার ওপরই বসেছিল।

জয়া তখন কাজ করার ছোট টেবিলটা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

উমাপতিই প্রথম কথা বলেছিল।

বাসাটা ত বেশ খুঁজে বার করেছ!

জয়া তখনও নীরব। জিজ্ঞাসা করতে পারত, কিন্তু তুমি আমায় খুঁজে বার করলে কি করে? কেন? সে প্রশ্ন যেন অর্থহীন মনে হয়েছে।

উমাপতি আবার বলেছিল,—ভালোই করেছ চলে এসে। এমনি শক্ত হয়েই যেন থাকতে পারো।

এ কথারও উত্তর হয় না। তবু জয়া এই সাক্ষাতের দুঃসহ আলোড়নকে অস্বীকার করবার জন্যে সহজ হবার চেষ্টা করে বলেছিল,—আপনাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। একটু চা করব?

উমাপতি হেসেছিল। বলেছিল, তাই করো। তোমায় অতিথি সৎকারের পুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাই না। কিন্তু অতিথিকে শুধু চা দিয়েই বিদায় করবে?

কত উত্তরই এ কথার দেওয়া যেত। বলতে পারত, অতিথির সত্যকার প্রয়োজন কিছুর আছে যদি জানতে পারতাম তাহলে তা দেবার জন্যে নিজেকে একজন যে দেউলে করতেও পারত তা তুমি কেমন করে জানবে! কিন্তু তোমার চাওয়া পাওয়ার হদিস তুমি নিজেই হয়ত জানো না, তা আমি জানব কি করে? তাই ত সেই অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা থেকে জর্জর হয়ে সরে আসবার চেষ্টা করেছি।

কি বলেছিল তার বদলে? বলেছিল,—না শুধু চা কেন! আর কিছু আনাচ্ছি!

কথাটার স্থূল তুচ্ছতা তার নিজের হৃদয়ের ওপরই যেন কশাঘাত করেছিল।

না তার দরকার হবে না।—উমাপতি তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে হেসে বলেছিল,—তুমি চা-ই করো শুধু। আমি তোমার বিছানাটায় ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নিই।

সত্যি সত্যিই উমাপতি তার সেই বিছানার ওপর শুয়ে পড়েছিল। বালিশটা মাথায়

দেবার তর সয়নি। জয়াই বালিশটা এনে মাথার তলায় গুঁজে দিয়েছিল।

জয়া শুধু চা করেনি। বাড়িওয়ালার ঝিকে দিয়ে বাইরে থেকে খাবার আনাতে পারত, কিন্তু তা না আনিয়ে নিজেই তাড়াতাড়ি করে ময়দা মেখে বেলে কটা নিমকি ভেজেছিল প্রথমে।

সময় পেয়ে আরো কিছু করতে পেরেছিল। উমাপতি বালিশে মাথা দিতে না দিতেই ঘুমের মধ্যে ডুবে গেছে, যেন কতদিন কতরাত সে ঘুমোয়নি। তার এই নিশ্চিন্ত ঘুমটুকুর জন্যেই যেন সে আজ জয়ার এই নিভৃত আত্মগোপনের নীড়টি খুঁজে বার করেছে।

কি অদ্ভুত যে অনুভূতি সেদিন হয়েছিল আজও যেন হৃদয়ের সঙ্গে তা জড়িয়ে আছে বলে জয়ার মনে হয়। তবু তা আনন্দ না বেদনা, গর্ব না গ্লানি জয়া বোঝাতে পারবে না কাউকে।

বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে তখনও মনোমালিন্য হয়নি। গৃহিণী মাঝে মাঝে গল্পগুজব করতে ওপরে আসেন। আজও হয়ত আসতে পারেন, এবং এসে অপরিচিত একজন পুরুষকে জয়ার বিছানায় নিদ্রিত দেখে কি না ভাবতে পারেন জেনেও ভয়ের বদলে একটা কেমন উল্লাসের উত্তেজনাই সে অনুভব করেছিল। কলঙ্ক দিয়েই তার এই দুর্লভ মুহূর্তটি চিহ্নিত হয়ে থাক। এই ঘটনাটুকু মিথ্যা কুৎসার উপাদান হয়ে থাকলেও যেন তার কি এক অস্বাভাবিক তৃপ্তি।

কিছুই অবশ্য তেমন হয়নি।

এক সময়ে উমাপতি নিজেই ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। তারপর অবাক হয়ে বলেছে, সত্যিই তাহলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!

এখনো সন্দেহ হচ্ছে? ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখুন না।

ঘড়িতে তখন প্রায় দশটা বাজে। সেদিকে চেয়ে উমাপতি বলেছে,—তাই ত! তোমার চা নিশ্চয় ঠান্ডা হয়ে গেছে।

তা হয়েছে। কিন্তু আর একবার করতে কতক্ষণ। কিন্তু এখন আর চা খাবেন? তার বদলে...

উমাপতি বাধা দিয়ে বলেছে,—না, না খাই যদি চা-ই খাব। কিন্তু তুমি আমায় ডাকোনি কেন জয়া?

অমন অগাধে একটা মানুষ ঘুমোলে তাকে ডাকা যায়!

কিন্তু এখনও আমি যদি নিজে থেকে না উঠতাম, যদি অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আমার না ভাঙত!

জয়া ম্লান মুখে একটু হেসেছে, তারপর বলেছে,—কি হলে কি হ'ত তা নিয়ে ভেবে লাভ কি? আপনি ত সারারাত সত্যি ঘুমিয়ে থাকেননি।

না তা থাকি নি।—উমাপতি হঠাৎ হেসে উঠেছে,—ঘুমের মধ্যেও কোথায় নিজেকে পাহারা দিচ্ছিলাম বোধহয়।

জয়া আবার চা তৈরী করেছিল। উমাপতিকে আসন পেতে বসিয়ে খাইয়েওছিল, শুধু নিমকি নয়, লুচি তরকারীও সেই সঙ্গে। সময় পেয়েই তৈরী করেছিল এসব।

উমাপতি অত্যন্ত তৃপ্তি করে খেয়েছিল। খেতে খেতে হেসে বলেছিল,—তোমরা কাছে বসে খাওয়ালে ক্ষিদেটা এত বেড়ে যায় কেন বলো ত?

পরিহাসের সুরটাই ধরে রাখবার চেষ্টায় জয়া বলেছিল,—ওটা ক্ষিদে বাড়া নয়, বেশী খেয়ে মেয়েদের একটু তোষামোদ। আপনারা জানেন মেয়েরা ওতে গলে যায়।

আর তোমরাও জানো,—উমাপতি হাসতে হাসতে বলেছিল,—পুরুষদের হৃদয়ের খিড়কি এই পেটের ভেতর দিয়ে। তেমন যত্ন করে খাওয়াতে পারলে জব্দ হয় না এমন পুরুষ নেই। তোমাদের শরৎবাবু তাইত দ্যাখ না দ্যাখ মেয়েদের খাওয়াতে বসিয়ে দিতেন।

রাস্তাটা যদি অত সোজাই হ'ত।—বলে জয়া হঠাৎ জলের গেলাসটা আবার ভরে দেবার ছুতোয় উঠে গিয়েছিল।

খাওয়া দাওয়ার পর হাতমুখ ধুয়ে জয়ার এগিয়ে দেওয়া তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে উমাপতি বলেছিল,—এবার চলি জয়া।

জয়া মৃদুস্বরে মুখের দিকে না তাকিয়েই বলেছিল, আচ্ছা।

লঘু পরিহাসের ক্ষীণ রেশটা মুছে গিয়ে ঘরের আবহাওয়াটা আবার ভারী হয়ে গিয়েছে তখন।

মশলার কৌটো থেকে দুটো লবঙ্গ তুলে নিতে নিতে উমাপতিও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিল,—কি যেন একটা কথা তোমায় বলব বলে এত খোঁজ করে তোমার এখানে এসেছিলাম। তা আর বলা হ'ল না। কথাটা যেন মনের মধ্যে গুলিয়ে গেছে। স্পষ্ট করে তুলতে পারছি না।

ঘুমিয়েই বোধহয় সেটা ঝাপসা হয়ে গেছে।—চেষ্টা করে আনা পরিহাসের সুরটা জয়ার কানেই করুণ শুনিয়েছিল।

জয়ার দিকে নীরবে একবার চেয়ে উমাপতি সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছিল নামবার জন্যে।

হঠাৎ জয়া বলেছিল,—দাঁড়ান। আমিও আসছি।

তুমি!—অবাক হয়ে উমাপতি ফিরে দাঁড়িয়েছিল। তারপর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল, না না তোমার আসবার দরকার নেই। রাস্তা আমি চিনি।

আপনাকে পথ চেনাতে আমি যাচ্ছি না। সে স্পর্ধা আমার নেই।—জোর করে হেসে জুতোটা পায়ে গলাতে গলাতে জয়া বলেছিল,—সারাদিন ঘরেই আছি। একটু ঘুরে আসব।

একটু ঘুরে আসা আর হয়নি। ঘুরেছিল সারারাতই। সেই তার সারারাত উমাপতির সঙ্গে ঘোরা। শেষ দেখাও উমাপতির সঙ্গে।

সারারাত ঘোরবার উদ্দেশ্য নিয়ে বার হয়নি সত্যিই। উমাপতি চলে যাবার পর ঘরের শূন্যতাটা অনুমান করে যেন অস্থির হয়েই বেরিয়ে পড়েছিল মনটাকে শান্ত করে আনবার জন্যে।

এ অঞ্চল তখন আরো নির্জন ছিল। তাদের ছোট পাড়াটা ছাড়িয়ে গেলেই বড় রাস্তা। নতুন তৈরী হয়েছে। ছাড়া ছাড়া দূরে দূরে এক আধটা বাড়ি অন্ধকারের মধ্যে দ্বীপের মত জেগে আছে। রাস্তায় লোক চলাচল অত রাত্রে নেই বললে হয়। মাঝে মাঝে বড় জোর একটা টানা রিকশা ঠুন ঠুন করতে করতে চারিদিকের ঘুমন্ত স্তব্ধতাকে একটু তরল করে চলে যাচ্ছে।

অনেক দূর তারা নীরবে পাশাপাশি হেঁটেছিল। সেই নির্জন রাস্তা যেখানে নতুন বসানো বাজারের কাছে এসে সজাগ হয়ে উঠেছে সে মোড় ছাড়িয়ে, তলায় যার নদীর বদলে অসংখ্য রেলের লাইনের সর্পিল জটিলতা সেই পোল পেরিয়ে, আসল আদি শহর যেখানে শুরু হয়েছে সেখান পর্যন্ত।

সেইখানে পৌঁছে উমাপতি বলেছিল,—এইবার তোমাকে ফিরতে হয় জয়া। আমি একটা ট্যাক্সি ঠিক করে দিচ্ছি।

ট্যাক্সি কিন্তু পাওয়া যায়নি।

যাও বা পাওয়া গেছে অতদূরে ও অঞ্চলে যেতে রাজি হয়নি।

হেঁটেই ফিরতে হবে মনে হচ্ছে।—জয়া হেসে বলেছিল,—রিকশায় ত' আমি চড়ি না জানেন।

হ্যাঁ, তোমার ও কুসংস্কারের কথা জানি। সবাই আমরা কারুর না কারুর মাথায় পা হয়ত মেনে চলছি, কিন্তু চোখে দেখে মানুষকে বাহন করতে পারব না।

তোমাকে তা পারতেও বলছি না।—উমাপতি হেসেছিল,—চলো পেঁছেই দিয়ে আসি তাহলে। একা তোমার ও পথে যাওয়া চলবে না।

আবার আপনি অতদূর যাবেন আমার

নির্জন শহরের একটা নিরুদ্বেগ রাতই আমাদের সম্বল হয়ে থাক

দিয়ে মানুষের পিরামিড তৈরী করে রেখেছি, সেটা চোখে দেখা যায় না বলে শুধু সহাই নয়, জ্ঞানে অজ্ঞানে সমর্থনও করি। কিন্তু সে পিরামিড ভাঙতে হাত না তুলে যত বাহাদুরী এই চাক্ষুষ মানুষকে বাহন করতে আপত্তি জানিয়ে।

যতই গালমন্দ দিন আপনি জানেন আমার আপত্তি যুক্তির নয় মনের অবুঝ দুর্বলতার। চোখের যা আড়াল এমন অনেক অন্যায়ই জন্যে?—কথাটা বলেই জয়া চমকে উঠেছিল মনের মধ্যে। কথাটা থেকে তার অজান্তেই অনভিপ্রেত একটা ব্যথার স্ফুলিঙ্গ কেমন করে যেন ছিটকে বেরিয়েছে।

উমাপতিও একটু চুপ করে থেকে বলেছিল,—একবার না হয় তাই গেলাম।

তবু ফেরা হয়নি। কয়েক পা গিয়ে জয়াই বলেছিল,—পেঁছেই যখন দেবেন তখন আর একটু পরে গেলে ক্ষতি কি?

ওইটুকুই শুধু বলেছিল। উহ্য কথাটা বলতে পারেনি। বলতে পারেনি যে বাসায় ফিরে যেতে মন বিদ্রোহ করছে। ইচ্ছে করছে রাত্রের এই শহরের মধ্যে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যেতে।

উমাপতি কি বুঝে বলা যায় না আপত্তি করেনি। শুধু বলেছিল,—অনেক রাত হ'ল। তুমি ত' খেয়েও আসোনি। আমার ত' ঘুম খাওয়া সবই হয়েছে।

ঘুম খাওয়া ত রোজই আছে।—হেসেছিল জয়া,—একটা রাত না হয় আলাদাই হোক না।

মনে মনে বলেছিল,—তুমিও বাঁধা পড়বার জন্যে তৈরী হওনি, আমিও বাঁধবার জন্যে। ঘর আমাদের জন্যে নয়, আলো আঁধারী এই নির্জন শহরের একটা নিরুদ্বেগ রাতই আমাদের সম্বল হয়ে থাক।

উমাপতি আর কিছু বলেনি।

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে কখন একটা নির্জন পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে বসেছিল। ওপরে নির্মেঘ আকাশে তারাদের উৎসব চলেছে। চারিদিকের শহরের আলোগুলো তারই বিদ্রূপ বলে মনে হচ্ছে।

উমাপতি নগরের ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্তব্ধতার সঙ্গেই সুর মিলিয়ে এক সময়ে বলেছিল,—আমি চলে যাচ্ছি জয়া। কোথায় কতদিনের জন্যে জানি না। আজ তোমার বাসা খুঁজতে যাওয়া থেকেই আমার চলা শুরু। কাজের মধ্যে নিজেকে মাতিয়ে তুলতে গিয়ে হার মানলাম, নিজের আন্দামান তৈরী করে নিজেকে নির্বাসিত করেও কিছু হ'ল না। পথে পথে নিরুদ্দেশ হয়ে ঘুরে বেরিয়ে একবার দেখব কি খুঁজছি তা বুঝি কিনা।

পার্কের পাশের রাস্তায় একটা উধর্বশ্বাস মোটরকে নগরের গূঢ় যন্ত্রণার আকস্মিক তীব্র শিহরের মত মিলিয়ে যেতে দিয়ে উমাপতি আবার বলেছিল,—আমি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছি বোধহয় জানো। খুশী হয়েছে অনেকে, দুঃখিত কেউ কেউ, অনেকে শুধু অবাক। তুমি কি হয়েছ আমি জানতে চাই না জয়া, কেন আমি সরে দাঁড়ালাম তুমিও তা জানতে চাও না, আমার ধারণা। পরস্পরের কাছে ওইটুকুই যেন আমাদের অজানা রইল এমনি একটা ভ্রান্তি-বিলাস নিয়েই চলে যেতে চাই।

আবার স্তব্ধতা নেমেছে সব কিছুর ওপর।

জয়ার মনে হয়েছে তারা পাশাপাশি আর বসে নেই। স্তব্ধ অন্ধকারের স্রোত ইতিমধ্যেই তাদের দুই সুদূর তীরের দিকে বয়ে নিয়ে চলেছে।

সে স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে লাভ নেই।

অনেকক্ষণ বাদে আরেক জয়া যেন উঠে দাঁড়িয়েছে বেঞ্চি থেকে। অপরিচিত কার কণ্ঠে বলেছে, চলুন, ভোর হতে আর বোধ-

হয় দেরী নেই। এখন গেলে প্রথম ট্রেনটা ধরা যাবে।

জয়া যেখানে বাসা নিয়েছে ট্রেনেও সে অঞ্চলে যাওয়া যায়। স্টেশন থেকে একটু দূরে হয় এই যা।

প্রথম ট্রেনটা সেদিন ধরতে পেরেছিল।

তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। ট্রেনটা ছাড়বার পর স্টেশনের অস্বাভাবিক আলো থেকে যেন আবছা এক অন্ধকারের জগতেই হারিয়ে যাচ্ছে মনে হয়েছিল।

উমাপতিকে দেখা গেছল অনেক দূর পর্যন্ত। প্রায় নির্জন স্টেশনের আলোকিত প্ল্যাটফর্মে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নীরজা দেবী বিস্মিত হয়ে বারান্দা থেকে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। ভঞ্জরায়ের গাড়ি নিচে থেকে ফিরে গেল একা ভঞ্জ রায়কে নিয়েই। মলয়া তার সঙ্গে আজ নেই। সে ঘর থেকে বারই হয়নি।

বারান্দাটা ঘুরে নিজের ঘরে যেতে দেখতে পেলেন মলয়ার ঘরে আলো জ্বলছে।

মলয়া আজ তার নিত্যনিয়মিত রাতের টহলে যে বার হয়নি তার জন্যে একটু তৃপ্তির সঙ্গে একটা দুর্ভাবনাও মিশে আছে। প্রতিদিনের নিয়মের এ ব্যতিক্রমের মানে কি? মলয়ার কিছু হয়নি ত?

তার ঘরে খোঁজ করতে যাওয়ার সাহস নেই। কে জানে কি রূঢ় আঘাত তার কাছে পেতে হবে! কতদিন হয়ে গেল মা মেয়ে দুজনে এক বাড়িতেই অপরিচিতের মত দিন কাটাচ্ছেন। কথা যে কখনও হয় না তা নয়। কিন্তু সে নেহাৎ দুচারটে প্রয়োজনের কথা। তা না হলে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা দুজনের মাঝখানে। সে নীরবতা সেই রাত্রের মত কখনো কয়েক মুহূর্তের বিস্ফোরণে ভেঙে যায় মাত্র। তারপর নীরব দূরত্ব আরো যেন বেড়ে যায়।

বাড়ির পরিচারক পরিচারিকার কাছে খোঁজ নিতে সম্মানে বাঁধে। তবু নিরুপায় হয়ে নীরজা দেবী যতদূর সম্ভব সাবধানী কৌশলে খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা না করে পারেন না, আর পারেন না প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই বারান্দায় মলয়ার বেরিয়ে যাওয়াটুকু দেখতে না দাঁড়িয়ে।

দাঁড়িয়ে দেখাটুকুই সার। শুধু একটা নিরুপায় হতাশার অনুভূতি।

কিছুই করবার নেই শুধু দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা ছাড়া।

মন্দের ভালো এইটুকু যে ভঞ্জরায়ই নিত্যকার সঙ্গী। ছেলেটি এমনিতে মন্দ নয়। ভদ্র সুদর্শন সম্বংশের। কিন্তু ওই পর্যন্তই। জীবন বলতে বোঝে সন্ধ্যা থেকে যত রাত পর্যন্ত সম্ভব একটানা উন্মত্ত উৎসব। সমস্ত দিনটা তারই প্রস্তুতি।

মলয়া কি করে দিনের পর দিন এই জীবন এই সংসর্গ সহ্য করে! শুধু বুঝি একটা দুরন্ত অসুস্থ জেদ, তারই মধ্যে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে নীরজা দেবীকে আহত করবার একটা বাসনা।

প্রথম প্রথম নীরজা দেবী চেষ্টা করেছেন বাধা দেবার। বোঝাবার চেষ্টা করেছেন সস্নেহে. মলয়া গ্রাহ্যও করেনি। নীরজা দেবী কঠিন হয়ে দেখেছেন। ফল আরো বিপরীত হয়েছে। মলয়ার উদ্দামতা যেন বেড়ে গিয়েছে!

একদিন সরকার মশাইএর হাত দিয়ে মলয়া চিঠি পাঠিয়েছে মার কাছে। মলয়ার কিছু টাকা চাই।

এরকম চিঠি প্রায়ই নীরজা দেবী পান, সরকার মশাইএর মারফৎ। চিঠির দাবী পূরণে বিলম্ব হয় না।

সেদিনকার দাবীটা একটু অযৌক্তিক। টাকার অংকটা মাত্রা ছাড়া।

নীরজা দেবী একটু ভাবতে সময় নিয়ে তখনকার মত সরকার মশাইকে যেতে বলছেন। খানিক বাদে মলয়াই নিজে এসেছে মার ঘরে। ক্রুদ্ধ উত্তেজিতভাবে নয় শান্ত কঠিন পাথরের মূর্তির মত।

এসে শুধু জিজ্ঞাসা করেছে নীরস শুষ্ক কণ্ঠে,—টাকাটা দেওয়ার অসুবিধা আছে তোমার?

নীরজা দেবীই সেদিন উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন,—হ্যাঁ আছে। সব কিছুর একটা সীমা থাকা উচিত। তোমার এই উচ্ছৃংখলতারও। এত টাকা তোমার কি জন্যে দরকার হয়? যে সব অপদার্থের সঙ্গে ঘোরো তারা'ত খোলামকুচির মত পৈতৃক পয়সা ওড়ায় শুনেছি!

ঠিকই শুনেছ।—কঠিন চাপা স্বরে মলয়া বলেছে, শুধু মলি চৌধুরী পদার্থ বা অপদার্থ কারো পৈতৃক পয়সায় উচ্ছৃংখলতা করে না, এইটুকু ভাবতে পারোনি! টাকা তোমার কাছে চেয়ে পাঠাই শুধু তোমার সম্মান বাঁচাতে। নইলে কমল'দ এস্টেট থেকে আমার কি প্রাপ্য আমি জানি। এখন থেকে যা দরকার সরকার মশাইকেই মজুদ রাখতে বলব।

মলয়া ঘর থেকে দৃঢ় পদে বেরিয়ে গেছে।

নীরজা দেবী বিমূঢ় বেদনায় স্তব্ধ হয়ে বসে থেকেছেন।

নিজেকেই তিনি অপরাধী করেন মনে মনে। এ শাস্তি তাঁর বুঝি প্রাপ্য ছিল।

এতদিন বাদে নিজের সেদিনের চেহারাটা নিজের কাছে আর যেন আড়াল করে রাখা যায় না।

অথচ সেদিন নিজেকে কি কিছুই পারেননি বুঝতে!

সত্যিই বোধহয় পারেননি।

মনের মধ্যে একটা শ্রদ্ধা বিস্ময় উত্তেজনার বেগ ছিল। উমাপতি ঘোষালের নাম শুনেছেন। উমাপতি ও তার সেই যুগের সঙ্গীদের কিংবদন্তীর রহস্যে জড়ান নাম। শুনেছিলেন পরলোকগত রাজশেখর চৌধুরীর কাছেও। স্বামীর প্রথম যৌবনের এই সংশ্রবটুকুই তাঁর মনে যেটুকু শ্রদ্ধা জাগিয়েছে।

আরো কোন কোন ধনীর সন্তানের মত সে যুগে রাজশেখর চৌধুরীও নেপথ্য থেকে অগ্নিমন্ত্রের সাধকদের কিছু কিছু সাহায্য তখন করেছিলেন। সংস্পর্শে এসেছিলেন উমাপতি ঘোষালের।

তার জন্যে তেমন কিছু বিপদে পড়তে হয়নি। যেমন করেই হোক সে গোপন ও নিতান্ত ক্ষীণ সম্পর্ক সেদিনকার রাজশক্তির দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

রাজশেখরের মনে কিন্তু এই অধ্যায়টুকু একেবারে হারিয়ে যায়নি। তিনি কখনো-সখনো অতি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গদের কাছে এসব কথা বলেছেন। বলেছেন হয়ত আত্মগরিমার খাতিরেই। কিন্তু নীরজা দেবীর সেদিনের উত্তেজনাপ্রবণ মন তাতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

তারপর অনেক কিছু ঘটে গেছে জীবনে ও পৃথিবীতে।

উমাপতি ঘোষাল দীর্ঘ নির্বাসনের পর ফিরে এসেছে। একদিন হঠাৎ কি খেয়ালে নীরজা দেবী খোঁজ-খবর নিয়ে উমাপতিকে একবার তাঁদের বাড়িতে আনবার জন্যে নিজেই তার সেই দুরদুর্গম আস্তানায় গিয়েছেন। রাজশেখরের নাম শুনে উমাপতি আপত্তি করেন নি একবার যেতে।

সেদিন কিন্তু কিছুই এমন হয় নি তার দিক থেকে স্বাভাবিক ও সাধারণ একটু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা ছাড়া।

স্বামীর কাছে সে যুগের কি কি কাহিনী শুনেছেন উমাপতির কাছে বলতে পেরে নীরজা দেবী ধন্য হয়েছেন। একদিন বধূ-

জীবনেও সব কিছু বিসর্জন দিয়ে মৃত্যু-জয়ীদের সংগে গিয়ে মিলে নিজেকে উৎসর্গ করবার কি উন্মাদনা তাঁর মধ্যে এসেছিল সে কথা না বলে পারেন নি। উমাপতিরই লেখা একটি চিঠি স্বামী ও তাঁর মৃত্যুর পর নীরজা দেবী নিজে কি সযত্নে রক্ষা করে আসছেন তা জানিয়ে সে চিঠিটি এনে দেখিয়েছেন। নেহাৎ নির্দোষ চিঠি—কিন্তু উমাপতির হাতের লেখা বলে তাঁর কাছে সেটি অমূল্য একথা বলতে ভোলেন নি।

উমাপতি অবশ্য প্রথম নীরবে সব শুনে পরে একটু হেসেছিল। বলেছিল,—মনের মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে যা এ'কে রেখেছেন তাতে কল্পনার রংটাই প্রধান। একদিন সে রংএর দরকারও ছিল। কিন্তু আজ তা ধুয়ে-মুছে দেখবার সময় হয়েছে। বোমা যেদিন ফাটবার ফেটেছিল, আজ তার খোলসটাকে মাথায় তুলে রাখার কোন মানে নেই।

উমাপতির এ কথার তেমন কোন মূল্য দেন নি। বোঝবার চেষ্টাও করেন নি ভালো করে।

মলয়াকে নিয়ে এসেছিলেন উমাপতির কাছে তার আশীর্বাদ নিতে।

মলয়া সেদিন কিন্তু খুব খুশি-মনে আসে নি। বরং একটু আপত্তিই জানিয়েছিল। তার আপত্তিতেও যেন উমাপতির কথার প্রতিধ্বনি ছিল।

তোমাদের এই গুরুপুজোর বাতিক আমি বুঝি না। উমাপতি ঘোষালদের সেদিনের কথা শুনতে ভালো, কিন্তু তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে আজ কি হাত-পা গজাবে!

শেষ পর্যন্ত মলয়া অবশ্য গেছল, কিন্তু উমাপতির পায়ের ধুলো নেয় নি।

সেদিনের পর উমাপতির সংগে আর কোন যোগাযোগ হয় নি বহুদিন। একটু-আধটু খবর রেখেছেন মাত্র। উমাপতির কাগজ উঠে যাবার খবর। তাঁর নির্বাচনে দাঁড়ান ও শেষ মুহূর্তে সরে যাওয়ার বিস্ময়। একদিন যাবো-যাবো করেও আর যাওয়া হয় নি। কেমন একটা সংকোচই হয়েছে।

আগ্রায় সেকেন্দ্রায় অমন করে দেখা যদি না হোত আবার!

মেয়েকে নিয়ে উত্তর ভারত ঘুরতে বেরিয়েছিলেন।

হঠাৎ সেকেন্দ্রায় উমাপতিকে দেখে চমকে গিয়েছিলেন। সেকেন্দ্রায় 'গাইডে'র সুললিত উর্দুর বর্ণনা শুনতে শুনতে সবাই যা দেখে বেড়ায় সে সব দেখার সময়ে নয়। সব দেখা সেরে বেরিয়ে আসবার সময়ে একেবারে বাইরের চারটি তোরণের মধ্যে একটির দিকে দৃষ্টি পড়ায় থমক দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

তোরণের নিচে দাঁড়িয়ে উমাপতি বাইরের দিকে চেয়ে আছে।

দূর থেকে প্রথম উমাপতি বলে ঠিক চিনতে পারেন নি। কিন্তু কেন যে একটা কৌতূহল হয়েছিল আজও বুঝতে পারেন না। বোধ হয় দূরে থেকেও উমাপতির চেহারা পোশাক আর দাঁড়িয়ে থাকবার ধরনে এমন কিছু দেখা গেছল যা দুর্বোধভাবে আকর্ষণ করেছিল।

মলয়ার সংগে গাইডকে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

গাইড বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, ওদিকে ধু ধু শুখনো পাথুরে মাঠ ছাড়া কিছু দেখবার নেই। তার কথায় কান দেন নি।

কাছে গিয়ে উমাপতিকে চিনতে পেরেছিলেন।

উমাপতিও ফিরে দাঁড়িয়েছিল পদশব্দ পেয়ে।

নীরজা দেবীর আগে মলয়াই জিজ্ঞাসা করেছিল হেসে—এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন! শুধু ত যাকে বলে আধা মরু-প্রান্তর।

সেই মরু-প্রান্তরই দেখছিলাম।—বলেছিল উমাপতি,—আমার ত মনে হয় এই মরু-প্রান্তরের সংগে না মিলিয়ে দেখলে সেকেন্দ্রার মত সে যুগের কোন স্থাপত্যের সত্যিকার মানে পাওয়া যায় না, গলা আর বুকের যেটুকু খোলা তা বাদ দিয়ে যেমন তোমার লকেটটার। তখন মানুষের সময়ও যেমন ছিল অফুরন্ত, জায়গাও তেমনি ছিল অঢেল। তাই উদার বিস্তৃতিকে তারা যেন স্থাপত্যের নিঃসংগ ঢেউএ সার্থক করত। চারিধারে শহর বসে গেলে এ সেকেন্দ্রার আর কোন মহিমা থাকবে না।

হঠাৎ নিজেই হেসে উঠে উমাপতি বলেছিল,—ওই যা ভুলেই গেছলাম যে, আপনাদের সংগে গাইড আছে। অনেকদিন বক্তৃতা না দিয়ে জিভটাও বোধ হয় উসখুস করছিল। তা আপনারা কবে এসেছেন?

শেষ প্রশ্নটা নীরজা দেবীকে।

এই কাল বিকেলে। বলে নীরজা দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—আপনি কোথায় উঠেছেন?

উঠি নি কোথাও।—উমাপতি একটু হেসেছিলেন,—প্ল্যাটফর্মে নেমেছিলাম, আবার ট্রেনেই হয়ত গিয়ে উঠব।

নীরজা দেবী অবশ্য চেহারা পোশাক দেখে আগেই খানিকটা সেইরকম অনুমান করেছিলেন। মাথার লম্বা চুলগুলো প্রায় জটা হবার উপক্রম, এক মুখ দাড়ি। কাঁধে একটা বৈরাগীদের মত লম্বা ঝোলা। ধুতি-পাঞ্জাবি কিন্তু ওরই মধ্যে অন্তত কাচা পরিস্কার। পায়ের চপ্পলটা শুধু ছেঁড়া।

নীরজা দেবী হঠাৎ বলেছিলেন,—ট্রেনে উঠবেন কেন, আমাদের সংগে চলুন না!

আশ্চর্যের বিষয়, মলয়াও তাতে সায় দিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন, আপনার কাছে সব নতুন ব্যাখ্যা শুনতে চাই।

উমাপতি নীরবে খানিক তাদের দিকে চেয়ে থেকে বলেছিল,—নতুন কিছু শোনাতে পারি না পারি, আপাতত এ নিমন্ত্রণে না বলতে পারলাম না। দুঃখকষ্ট কিছুদিন ধরে কম করি নি, তাই মনে মনে একটু ভোগের লালসা হয়েছে বুঝতে পারছি।

নীরজা দেবী দিল্লী থেকে ভাড়া করে আনা ঝকঝকে স্টেশন ওয়াগনে উমাপতিকে তুলে তারপর তাঁদের হোটেলেই নিয়ে গেছলেন। উমাপতির জন্যে আলাদা একটি ঘরের ব্যবস্থা করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি।

সেই দিন বিকেলেই উমাপতির সংগে তাঁকেও মলয়া অবাক করে দিয়েছিল। কখন বেরিয়ে সে ভালো ধুতি আর সিল্কের কাপড় কিনে এনেছে! হোটেলের মারফৎ দর্জিও ডাকিয়েছে। নীরজা দেবীকে সংগে করে সেই সব নিয়ে সে উমাপতিকে তার ঘরে গিয়ে পাকড়াও করেছিল। বলেছিল,—ভোগের লালসা অপূর্ণ রাখতে নেই। নিন, উঠুন মাপ দিন। কাল সকালের মধ্যেই আপনার পাঞ্জাবি তৈরী হয়ে যাবে বলেছে। ধুতি কিনেই এনেছি। জুতোও এখুনি আমার সংগে বেরিয়ে কিনতে হবে।

উমাপতি কিছুতেই আপত্তি করে নি। এ যেন তার নতুন রকমের একটা অভিজ্ঞতা।

মলয়ার আবদার অত্যাচার হয়ে উঠলেও সে হাসিমুখে সহ্য করেছে।

মলয়া উমাপতিকে চুল ছাঁটিয়ে দাড়ি-গোঁফ কামাতে পর্যন্ত বাধ্য করেছিল। সব হয়ে যাবার পর বলেছিল,—দেখুন দিকি কি জংগলে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন!

উমাপতি হেসে বলেছিল,—লুকিয়ে ছিলাম বলে তবু একটু রহস্য ছিল। প্রকাশ্যে বেরিয়ে যে ধরা পড়ে গেলাম!

মোটেই ধরা পড়েন নি! আপনার চেহারাটা যে অসাধারণ তা আপনাকে কোন মেয়ে বলে নি? বলবে আর কোথা থেকে! আন্দামানে গিয়ে ত আর বলে আসতে পারে না!

মলয়ার হাল্কা ছেলেমানুষী চাপল্যে পাছে উমাপতি ভুল বুঝে অসন্তুষ্ট হয় নীরজা দেবীর এই ছিল ভয়। মলয়াকে মৃদু ভর্ৎসনাও করেছেন এই নিয়ে মাঝে মাঝে

কি জঙ্গলে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন

গোপনে.—কি যা তা বলিস ও'কে বলত। উনি কি তোর ঠাট্টা-ইয়ার্কি'র পাত্র!

মলয়াই তাতে উল্টো ধমক দিয়ে বলেছে,—তুমি থামো ত মা। ও'র ভেতরেও যে একটা মানুষ আছে আমাদের মত, সেইটে সবাই মিলে তোমরা ভক্তি আর ভয় দিয়ে চাপা দিয়ে রাখতে চাও।

উমাপতি সত্যিই কখনো কিছু মনে করেছে বলে অন্তত বোঝা যায় নি। বরং মলয়ার আবদারে অত্যাচারে তার একটা সহজ স্নেহশীল নতুন চেহারাই ফুটে উঠেছে।

স্টেশন-ওয়াগনে তারা উত্তর ভারতের অনেক জায়গাই ঘুরেছে প্রায় এক মাস ধরে।

এক মাস ধরে উমাপতির অবিরাম সঙ্গ পেয়ে নীরজা দেবী নিজের মধ্যে কি একটা আশ্চর্য রূপান্তর লক্ষ্য করেছেন। জীবনে যেন একটা নতুন তপস্যার আকুলতা এসেছে। একটা কঠিন কিছু, দুঃসাধ্য কিছু করবার অস্থিরতা।

ধর্মেকর্মে তেমন বিশ্বাস থাকলে, কি উমাপতির কাছে সমর্থন পাবেন জানলে হয়ত ব্রত-উপবাস আর কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনায় মন দিতেন।

উমাপতির সাহচর্য পেয়ে মনের ও ধরনের রূপান্তর হওয়া বাইরের দিক দিয়ে বিচার করলে একটু বিস্ময়কর।

উমাপতি গুরুর আসনে নিজেকে এক-দিনের জন্যেও বসায় নি। আদেশ-উপদেশ যাকে বলে তা কিছুই দেয় নি। বরং সে যেন নিজেকে ভ্রাম্যমান জীবনের একটা অনায়াস বিলাসের মধ্যে ভাসিয়ে রাখতে চেয়েছে বলেই মনে হয়েছে। মলয়ার সমস্ত খেয়ালখুশিতে সে সায় দেয় নি শুধু উৎসাহও দেখিয়েছে কখনো কখনো। বিনা প্রতিবাদে বিনা দ্বিধায় সে তাদের আদর-পরিচর্যা সবই গ্রহণ করেছে, অনায়াসে তাদের দৈনন্দিন ধারার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছে, যেন এই নিশ্চিন্ত প্রাচুর্যেই সে চিরদিন অভ্যস্ত, এই ছন্দে জীবন কাটাতে যেন সে প্রস্তুত।

তবু বাইরের এ সহজ উপভোগের স্রোতে গা ভাসান উমাপতির আড়ালে আর একটি দুর্জ্ঞেয় গভীর মানুষকে নীরজা দেবী মাঝে মাঝে চকিতে যেন আবিষ্কার করেছেন। হয়ত ভোরবেলায় উঠে দেখা কোন শৈল-নিবাসের নামকরা হোটেলের বারান্দায় নিস্তব্ধ পর্বতশ্রেণীর দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি ততোধিক সমাহিত একটি নিঃসঙ্গ আবছা

মুহূর্তে, কখনো ট্রেনের সর্বোচ্চ শ্রেণীর কামরায় জানলার ধারে বসে কথা বলতে বলতে অকস্মাৎ সুদূরে হারিয়ে-যাওয়া একটি দৃষ্টিতে, কখনো মলয়ার সঙ্গে ছেলেমানুষী লঘু হাস্য-পরিহাসে মেতে থাকা উপস্থিতির মধ্যেই।

উমাপতির সেই অগোচর সত্তার বিদ্যুৎ-স্পর্শই নিজের মধ্যে কেমন করে পেয়েছেন বলে নীরজা দেবীর মনে হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাকে বলা যায় তেমন কিছুতে সেই ভ্রাম্যমাণ দিনগুলিতে উমাপতির কেমন একটা যেন বিরাগই ছিল। সেরকম প্রসঙ্গ আপনা থেকে এসে পড়লেও সে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যেত বলে মনে হয়।

হৃষীকেশের কাছেই বোধ হয় কোথায় একটি চমৎকার আশ্রম সবাই মিলে দেখতে যাওয়া হয়েছিল একদিন। ফেরার পথে নীরজা দেবী মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, সত্যিই যেন স্বর্গ মনে হল।

সেই দিন শুধু যেন হঠাৎ একটু উত্যক্ত হয়ে উমাপতি বলেছিল,—স্বর্গ! স্বর্গ! সবাই শুধু স্বর্গ গড়তে চায়। হয় নরক, নয় স্বর্গ, তাছাড়া যেন মর্ত্য বলে কিছু নেই। পারে ত গড়ুক দেখি, এমন আশ্রম যা মর্ত্য কাকে বলে তার হদিস দেবে। সেখানে ব্যভিচারেরও প্রশ্রয় নেই আবার গেরুয়া পরে সব ত্যাগ করে শুধু পরমার্থ চিন্তাই সার করতে হয় না।

উমাপতি নিজের উত্তেজনায় নিজেই যেন বিস্মিত হয়ে চুপ করে গিয়েছিল। হেসে যেন ব্যাপারটাকে হাল্কা করবার জন্যেই বলেছিল,—আশ্রমের ঘি দুধগুলো খাঁটি কিন্তু। সাধুসন্তদের ঐহিক চেহারাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

নীরজা দেবী সেদিন কিছু বলেননি আর, কোন প্রশ্ন তোলেননি, কিন্তু তাঁর মনে একটি বীজ সেইদিনই নিঃশব্দে অঙ্কুর মেলেছিল তিনি জানেন।

সেই বীজ থেকেই দেশে ফিরে গিয়ে উমাপতিকে কেন্দ্র করে সেই বিচিত্র দুঃসাহসিক উদ্যোগ।

উমাপতি প্রথমে কিছুতেই রাজী হয়নি এ প্রচেষ্টার মধ্যে থাকতে। কতবার হেসে বলেছে,—ও আমার একটা আবছা ধোঁয়াটে কল্পনা, নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। হঠাৎ একমুহূর্তের খেয়ালে কি বলতে কি বলেছিলাম। ও পাগলামি যদি করতে চান করুন, আমাকে জড়াতে চাইবেন না। আমার স্পর্শ থাকলে ও পরিকল্পনার ব্যর্থতা অবধারিত। আমি ছুঁলে সাজান বাগান শুকিয়ে যাবে এই আমার নিয়তি।

নীরজা দেবী কিন্তু নাছোড়বান্দা। জানিয়েছিলেন,—ওই নিয়তি জেনেই আমাদের যাত্রা শুরু। এ ত আমরা ব্যবসা করতে কি কারখানা বসাতে যাচ্ছি না যে লাভ-লোকসান সফলতা বিফলতা কষে দেখে নামব। অসাধ্য সাধনের একটা নিষ্ফল চেষ্টাই হোক না এটা, কি ঠিক করতে চাই, তাও না বুঝলে এগিয়ে যাওয়ার বাতুলতা। আমাদের আশা ভাবনা স্বপ্নই আমাদের পথ নিত্যনতুন করে তৈরী করুক। আপনি যেমন ইচ্ছে আলগোছেই থাকবেন, কিন্তু আপনার খেয়ালকে আশ্রয় করেই যা কিছু গড়ে উঠবে, সে খেয়াল যেমনই হোক। নিজেকে একবার মাত্র নিঃশেষে উৎসর্গ করবার এ সুযোগ থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না।

ভাষা একটু ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু এই ধরনের আবেদনই জানিয়েছিলেন। চিঠিতেই মনে আছে।

উমাপতি তখন তার 'আন্দামান' ছেড়ে এসে শহরের একপ্রান্তে বাগানঘেরা একটি ছোট বাড়িতে থাকে। বিপিন ঘোষ তার কিছু কাল আগে থেকেই উমাপতির কাছে এসে জুটেছে একেবারে অচ্ছেদ্যভাবে।

বিপিন ঘোষকে গোড়া থেকেই নীরজা দেবীর ভালো লাগেনি, তার বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি নম্রতা অমায়িকতা সত্ত্বেও। বিপিন ঘোষই কিন্তু প্রথম দিকে তাঁর প্রধান সহায় হয়েছিল। উমাপতির কল্পনাকে বাস্তবের হিসাবনিকাশের মধ্যে রূপ দেবার কি এক দুর্লভ ক্ষমতা যেন তার আয়ত্ত।

উমাপতির প্রকৃতির মধ্যে দুটো বিস্ময়কর বিরোধী ঢেউ ছিল। নির্লিপ্ততার অবসাদ এক মুহূর্তে উত্তেজনার তরঙ্গে উদ্বেল হয়ে উঠত।

তাই হয়েছিল এই ব্যাপারে। ঔদাসীন্য নিরাসক্তি দূরে ফেলে দিয়ে হঠাৎ একদিন উমাপতি প্রায় মেতে উঠেছিল বলা যায়। কৃতিত্বটা বিপিন ঘোষেরই অনেকখানি। এক হিসেবে দিনের পর দিন সেই কানের কাছে মন্ত্র দিয়েছে, উমাপতির নিজের মন্ত্রই।

স্পষ্ট কোন পরিকল্পনা তখনও হয়নি। কিন্তু উমাপতি ঘোষালকেই সামনে রেখে শহর থেকে কিছু দূরে ছোটখাট গ্রাম বসাবার মত বেশ কিছুটা জমি নেওয়া হয়েছিল। নীরজা দেবীর টাকাতেই প্রধানত। তখনও কলকাতার আশেপাশের জমি এমন দুর্লভ দুর্মূল্য হয়ে ওঠেনি। সেখানে উপনিবেশ বসান হবে, বাছাই করা মানুষের উপনিবেশ, যাদের প্রতিবেশীত্ব এক নতুন আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যারা মোক্ষের স্বর্গ চায় না, যারা মর্ত্যের মানুষ হয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের এক গভীর ধ্রুব ভিত্তি সন্ধান করে।

নীরজা দেবী নিজে পরিকল্পনাটা এই রকম বুঝেছিলেন, উমাপতির ব্যাখ্যা এটা নয়।

উমাপতি কোন দিন বিশদভাবে ব্যাখ্যা কিছু করেনি, শুধু মাঝে মাঝে তার মনের ভাবনার ইঙ্গিত তার কথায় কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে।

উমাপতি বলেছে,—পৃথিবীতে অনেক অসাম্য,—অর্থের ক্ষমতার, সুযোগের। সেসব অসাম্য দূর করলেই কি সব সমস্যা মিটে যায়! অসাম্য দূর করবার পরীক্ষা অনেক হয়েছে ও হবে, কিন্তু তার সঙ্গে সব সাম্য যা না হলে বৃথা হয়ে যায়, জীবনের পূর্ণতার সেই আদর্শ খুঁজে যেতে হবে। এ খোঁজার অবশ্য শেষ নেই এক পূর্ণতার ধারণা, আরেক মহত্তর পূর্ণতায় পৌঁছোবার ধাপ মাত্র। তবু এই খোঁজাই সব।

কখনও বলেছে,—অসাধুতা অসত্য শঠতার বিরুদ্ধে সমস্ত নিখুঁত আইনের চেয়ে একটা সৎ মানুষের দাম অনেক বেশী। একটা গ্রামের চেহারা বদলাতে পারলে হয়ত সত্যিই পৃথিবী বদলে দেওয়া যায়।

বলেছে,—মানুষকে দেবতা করতে চাইলে দানবকেও স্বীকার করতে হয়। তার বদলে মানুষ মানুষ হোক, তার ক্ষুধায় বেদনায় গ্লানিতে স্বপ্নে দুরাশায়। স্বপ্ন আর দুরাশাই তাকে সমস্ত গ্লানি থেকে উদ্ধার করবে। এমন একটা মর্ত্য-কোণ যদি গড়া যায়, যেখানে মাটির কঠিন দাবি মেটাতে আকাশের স্বপ্ন আড়াল হয়ে যায় না! লোকে কলমের চারা এনে বাগানে পোতে, তার বদলে মানুষের বীজ পুঁতে দেখা যাক্ না ছোট্ট একটা উপনিবেশে!

উমাপতির নিজের বাগানঘেরা ছোট বাড়িটায় নীরজা দেবীকে প্রায় নিত্যই তখন দেখা গেছে। নীরজা দেবী আর মলয়াকে। সব সময়ে একসঙ্গেই নয়।

বাইরে থেকে ঘরে আসবার পর মলয়াও তখন কেমন বদলাতে শুরু করেছে। সে পরিবর্তন কিন্তু নীরজা দেবী তেমন লক্ষ্য করেননি প্রথম। লক্ষ্য করবার সময়ই কোথা ছিল তাঁর!

শুধু তার সেই চাপল্য কেটে গিয়ে উমাপতির সঙ্গে ব্যবহারে ছেলেমানুষী লঘু খামখেয়ালীর বদলে একটা কেমন সংযম ও গাম্ভীর্য আসছে, এইটুকুই নীরজা দেবীর চোখে পড়েছিল। তাতে তিনি মনে মনে খুশীই হয়েছিলেন।

মলয়ার অবশ্য এই সব পরিকল্পনায় কোন উৎসাহ ছিল না।

উমাপতির সামনেই সে স্পষ্ট বলেছে,

কতবার,—এরা সবাই মিলে আপনাকে কি বানিয়ে ছাড়ছে আপনি বুঝতে পারছেন! মানুষকে আপনি দেবতা করতে চান না, আর এরা আপনাকেই দেবতা করে তুলছে। আপনি মর্ত্যের স্বপ্ন দেখছেন আর এরা নিজের নিজের স্বর্গ নিয়েই মত্ত। আমার মা-ই অবশ্য প্রধান পাণ্ডা। এখনও কিন্তু বলছি সাবধান হন।

সকলে অবশ্য তার কথায় হেসেছে।

কখনো আবার বলেছে,—আপনি মর্ত্যের মানুষ চান। নিজে একটু মর্ত্যে নেমে আসুন দেখি। স্বর্গেও নয়, মর্ত্যেও নয়, ত্রিশঙ্কু হয়ে যেখানে আছেন, সেখান থেকে যদি আপনাকে নামাতে পারতাম!

উমাপতি সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে হেসেছে। বলেছে,— আমি যে ত্রিশঙ্কু তা তাহলে ধরে ফেলেছ! আমার নিজেরও তাই কেমন সন্দেহ হয়।

নির্দিষ্ট ছক বেঁধে না হোক কিছু কিছু কাজ তখন শুরু হয়ে গেছে। অগ্রসর হতে হতে অদলবদল হতে পারে এমন কাজ। জায়গাটা মোটামুটি পরিষ্কার করা হয়েছে, মাঝামাঝি একটা মজা ঝিল কাটা চলছে বড় দীঘি করবার জন্যে। রাস্তাঘাট কোথায় কি রকম হবে তার দাগ কাটাকাটি চলছে। কিছু কিছু নানা দেশের গাছের চারা কোথাও কোথাও বসানও হয়েছে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে।

আসল পরিকল্পনা অবশ্য তখনও সম্পূর্ণ দানা বাঁধেনি। নীরজা দেবী সেটাকে অস্পষ্টই খানিকটা থাকতে দিয়েছেন উমাপতির মনের গতি বুঝে। কাজ এগুবার সঙ্গে সঙ্গে উমাপতির চিন্তা ভাবনার মতই সবকিছু ক্রমশ স্পষ্ট রূপ নিক না কেন! তাঁরা ত ঠিকাদারী কাজ হাসিল করতে নামেননি যে, বাঁধাধরা একটা দায় যত সংক্ষেপে যত সুলভে সম্ভব সেরে ফেলবেন! শিল্পকর্মের মত আঁকা মোছা ভাঙা গড়ার ভেতর দিয়ে সমস্ত পরিকল্পনাটা মূর্ত হোক। তাতে কিছু পরিশ্রম কিছু অর্থব্যয় হয়ত বৃথা হয়ে যাবে, কিন্তু যান্ত্রিকের বদলে জীবন্ত সত্তা যে প্রতিষ্ঠানকে দিতে চাইছেন, তার পক্ষে এইটেই ত স্বাভাবিক।

উমাপতি একেবারে সব ভার নিজের হাতে নিয়ে কিছু না করুক, সেই সব কিছুর প্রাণকেন্দ্র। উপনিবেশের নামে যে তহবিলটা মজুদ করা হয়েছিল তা নাড়াচাড়া করতে উমাপতির স্বাক্ষরটা সর্বাগ্রে লাগবে এই ব্যবস্থাটুকুতে নীরজা দেবীই জোর করে উমাপতিকে রাজী করিয়েছিলেন।

উমাপতিকে প্রায়ই তখন নীরজা দেবী নিজের গাড়িতেই উপনিবেশের কাজকর্ম দেখাতে নিয়ে যেতেন। মলয়া কখনও সঙ্গে থাকত, কখনও থাকত না।

থাকলে উল্টোপাল্টা কথাই বলত। বলত, —মার ব্যবসাবুদ্ধি টনটনে। আপনাকে ভাঙিয়ে চমৎকার একটা ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্কীম করিয়ে নিচ্ছেন। পরে ওই সব জমি ভাগা দিয়ে চড়া দামে যাতে বিক্রী করা যায়।

উমাপতি হেসে বলত,—সেও ত মন্দের ভালো। স্বপ্নগুলো একেবারে মাঠে মারা যাবে না।

কোন দিন বা মলয়া প্রশ্ন তুলত,—লাঙল দিয়ে জমি ত তৈরী করছেন, কি বীজ ফেলবেন ওখানে শুনি? মানুষের ত ধান গম যবের মত মার্কামারা বীজ নেই যে যা জেনে রুইবেন তেমনি ফসল দেবে! আমের আঁটি পুঁতে হয়ত আমড়াও ফলবে না।

এ রকম প্রশ্নে কিন্তু উমাপতি হাসত না। বরং কিরকম যেন গম্ভীর অন্যমনস্ক হয়ে যেত। কখনো বা বলত, সমস্যাটা তুমি ঠিকই ধরেছ মলয়া। মানুষের বেলা বীজ না মাটি-জল-হাওয়া কোনটা বড় তা সত্যিই বলা যায় না। তবু চেষ্টা করতে দোষ কি!

'এক কাজ করলে হয় না?—মলয়া মার দিকে কটাক্ষ করেই বলছে মনে হ'ত,—লটারী করে যদি বাসিন্দা বাছাই করেন কেমন হয়। এক টাকার টিকিটে মর্ত্যকোণ! তারপর আপনাদের আর যারা টিকিট কিনবে তাদের বরাত—'

নীরজা দেবী একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলতেন হয়ত,—এটা হাসি ঠাট্টার ব্যাপার নয় মলয়া!

হাসি ঠাট্টা করছি না মা!—মলয়া সত্যিই গম্ভীর হয়ে বলত, তোমাদের মর্ত্যকোণের জন্যে মানুষ বাছাই নিজেদের বিচারের চেয়ে ভাগ্যের চাকার ওপর ছেড়ে দিলে বেশী ভুল বোধহয় হবে না।

উমাপতি অপ্রত্যাশিতভাবে মলয়ার কথাতেই সায় দিয়ে বলত, ঠিকই বলেছ মলয়া, বিচারের কাঁটা মাপই বা আমরা জানি। তাই বাছাই-এর ওপর জোর না দিয়ে মানুষের মনে যাতে পোকা না ধরে সেই সুস্থ পরিবেশটুকু তৈরী করবার চেষ্টা করেই আমরা আশায় দিন গুণব।

নীরজা দেবীর এ ধরনের আলাপ আলোচনা ভাল লাগত না। মনে হত একটা পবিত্র ব্রতের প্রতিজ্ঞা যেন এখনো অকারণে সংশয়ের দোলায় দোলান হচ্ছে। মলয়ার ছেলেমানুষীতে উমাপতি যেন একটু অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

এই প্রশ্রয় দেওয়াটাই সেদিন অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল।

নীরজা দেবী গাড়ি নিয়ে উমাপতিকে তুলতে গিয়ে দেখেছিলেন মলয়া তাঁর আগেই সেখানে উপস্থিত।

উমাপতি কোথাও আজ আর যেতে পাবেন না সরাসরিই সে বলে গিয়েছিল মাকে।

মলয়া উমাপতির ছবি আঁকতে তখনই বসে গেছে সাজসরঞ্জাম নিয়ে।

মনের বিরক্তিটা চেপে নীরজা দেবী বলেছিলেন—কাজের ক্ষতি করে এই সকালেই ছবি না আঁকলে নয়? ছবি আঁকা ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না। যখন হোক আঁকতে বসলেই ত হয়!

তা হয় না মা!—মলয়া যেন অবুঝ কাউকে করুণা করে বোঝাবার ধরনে বলেছিল,—সকাল বেলাই মানুষের ভেতরকার চেহারাটা তবু কিছুটা স্বচ্ছ থাকে। তারপর সারাদিনের ধোঁয়া ধুলোর গ্লানিতে তা দাগী হয়ে যায়, ঢাকা পড়ে। সকাল বেলা তাই আঁকতে বসাটা অন্তত দরকার।

মেয়ের সঙ্গে নীরজা দেবী আর তর্ক করেননি। মেয়েকে চেনেন বলেই বুঝেছেন তর্ক করে এখন কোন লাভ নেই। উমাপতিকেই একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে বলেছেন,—আপনিও দরকারী কাজ ফেলে এই ছেলেমানুষীতে রাজী হয়ে গেলেন!

উমাপতি কিছু বলেনি। কিন্তু তার মুখে ঈষৎ কৌতুকের হাসির সঙ্গে একটা কেমন গভীর বিষণ্ণতার আভাসই কি তখন দেখেছিলেন? ঠিক বুঝতে পারেন নি তখনও, এখনও পারেন না।

উমাপতির হয়ে মলয়াই তুলির একটা টান শেষ করে' সেটা বিচার করতে করতে মার দিকে না চেয়ে বলেছিল,—এ কাজটাও কম দরকারী নয় মা।

নীরজা দেবী আর নিজেকে সংবরণ করতে পারেন নি। একটু তিক্ত স্বরেই বলেছিলেন,—দরকারী যদি হয়, তাহলে বড় আঁকিয়ে কাউকে ডাকালেই ত হয়!

না, তা হয় না। মলয়া তাঁর কথাটার কোন মূল্যই দেয়নি,—তারা অনেক ভালো আঁকবে নিশ্চয়। কিন্তু আমার দেখাটা পাবে কোথায়?

বেশ তোমাদের ছবি আঁকাই তাহলে চলুক!—বলে নীরজা দেবী একলাই
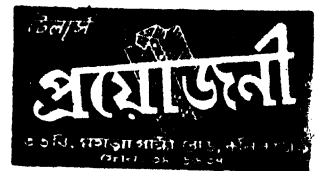
কাজের জায়গায় চলে গিয়েছিলেন বিপিন ঘোষকে নিয়ে।

তারপর নিজেকে অবশ্য সামলে নিয়েছিলেন। মলয়ার এ খেয়ালে বাধা দেবার আর চেষ্টা করেননি। উমাপতিকে কিছুদিন তারপর বাদ দিয়েই কাজ করতে হয়েছে। শুধু ছবি আঁকার ব্যাপারে নয়, আরেকটা গুরুতর বিষয় নিয়েও উমাপতিকে তখন সময় দিতে হচ্ছে। দেশের বড় একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে, অসন্তোষ বিশৃঙ্খলা তখন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দল ছেড়ে না বেরিয়ে তারই ভেতরে থেকে কয়েকজন বিদ্রোহী একটা ছোট গোষ্ঠী তৈরী করবার আয়োজন করছে। ওপরওয়ালাদের অবিচার অনাচার দূর করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। তারা উমাপতিকেই সে গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিতে উৎসুক। প্রস্তাবটা বিপিন ঘোষের মারফতই এসেছে। সে-ই এ ব্যাপারে উৎসাহী।

নিজের দিক থেকে কোন আগ্রহ না দেখালেও উমাপতিকে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতে হয়েছে। যারা আসা-যাওয়া করেছে এই ব্যাপারে তাদের সরাসরি দরজা থেকে ফিরিয়ে দিতেও পারেনি।

এই সময়েই মলয়াকে চিত্রকলার প্রাণকেন্দ্রগুলিতে ঘুরিয়ে আনবার জন্যে ইওরোপে পাঠাবার কথা উমাপতির সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন নীরজা দেবী।

উমাপতি মন দিয়ে শুনেছিল কিন্তু শেষে একটু সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিল, —ও কি এখন যাবে?

কেন, যাবে না কেন? —নীরজা দেবী যেন বিস্মিত হয়েছিলেন,—ও নিজেই ত যেতে চেয়েছিল কিছুদিন আগে। ছবি আঁকার ওপর যখন এত টান তখন একবার ঘুরে আসাই ত উচিত। সেখানকার জীবন্ত স্রোতের একটু ছোঁয়া লাগলেও ত নতুন করে ফুটে উঠতে পারে।

উমাপতিকে নীরব দেখে আবার বলেছিলেন নীরজা দেবী,—আপনার সায় আছে জানলেই যাবে। আপনি একটু বলে দেখুন না।

বেশ তাই বলব।—উমাপতি রাজী হয়েছিল।

কিন্তু উল্টো ফল হয়েছিল উমাপতির কথায়।

মলয়া হেসে উঠেছিল বটে, কিন্তু তার কথায় কি একটা জ্বালা খুব প্রচ্ছন্ন থাকেনি। বলেছিল,—আপনিও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন!

ষড়যন্ত্র!—নীরজা দেবী স্তম্ভিত হয়েছিলেন। উমাপতিও বিস্মিত।

হ্যাঁ,—মলয়া হাসতে হাসতেই বলেছিল,—আমায় ধরে বেঁধে একটা মস্ত আঁকিয়ে করে তোলবার ষড়যন্ত্র। আমি আঁকিয়ে হতে চাই কে বললে? আর চাইলেই ইওরোপ যেতে হবে কেন? ওখানে গেলে কি নতুন হাত পা গজায়!

তুমিই ত যাবার জন্যে অস্থির হয়েছিলে এক সময়ে!—নীরজা দেবী আহত স্বরে বলেছিলেন।

তখন হয়েছিলাম, এখন নই। অস্থিরতা মানেই তাই।—বলে মলয়া হেসেছিল।

নীরজা দেবী সে হাসিতে একটা অস্ফুট বিমূঢ় বেদনা অনুভব করেছিলেন।

কিছুদিন বাদেই নতুন দল যারা গড়তে চেয়েছিল তাদের নেতৃত্ব নিতে উমাপতি অস্বীকার করে।

এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভেতরও মলয়ার কিছু হাত ছিল মনে হয়।

একদিন ত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর কয়েকজনের সামনে উমাপতিকেই সে বেশ একটু বিব্রত করে তুলেছিল বলে নীরজা দেবীর ধারণা। সাধারণত নীরজা দেবী এসব আলাপ-আলোচনার মধ্যে থাকতেন না। সেদিন উমাপতিকে দিয়ে গোটাকতক দরকারী কাগজপত্র সই করাতে এসে আটকে গেছলেন।

আলোচনার মধ্যে মলয়া কখন নিঃশব্দে এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করেন নি।

তার হাসির শব্দে হঠাৎ চমকে উঠেছিলেন আরো অনেকের মত।

নবাগতদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল বিস্মিতভাবে,—হাসছেন কেন মিস চৌধুরী?

হাসছি আপনাদের বোকামি দেখে!—হাসি থামিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে মলয়া বলেছিল, —আতসবাজিকে আপনারা মশাল করতে চাইছেন! উমাপতি ঘোষালের মধ্যে বোমার মত ফাটবার, কি হাউই-এর মত আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে আকাশকে কয়েক মুহূর্ত চমকে দেবার বারুদ আছে, কিন্তু মশাল হয়ে জ্বলবার মশলা নেই, তাও আপনারা বোঝেন না?

সকলকে অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে মলয়া ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল।

একটু হেসে অনেকে সহজ হবার চেষ্টা করেছিলেন তারপরে, কিন্তু আলোচনা আর জমেনি।

মলয়াকে বিপিন ঘোষই তারপর এক সময়ে নীরজা দেবীর সামনে কপট খোশামুদির সুরে বলেছিল,—আপনি ত চমৎকার কথা বলতে পারেন মলয়া দেবী! ঠিক যেন বই-এ লেখা সাজান কথা!

বই-এ লেখা কথার মতই সাজিয়েছি যে ক'দিন ধরে!—তিক্ত বিদ্রূপের সঙ্গে বলেছিল মলয়া,—সকলকে একবার ঝাঁকানি দিয়ে চমকে দেব ব'লে।

উদ্দেশ্য?—বিপিন ঘোষের অবাক হওয়ার মধ্যে আর কপটতা ছিল না।

উদ্দেশ্য, আপনারা সবাই মিলে যাকে নিজের নিজের সুবিধে মত ভাঙিয়ে নিতে চাইছেন তাকে বাঁচানো। উমাপতি ঘোষাল যে গদগদ উচ্ছ্বাসে গর্বে শোনাবার মত ফাঁপানো একটা কিংবদন্তী, কি ঝাণ্ডায় ঝোলাবার মত একটা রঙচঙে নাম নয়, আরো কিছু, সে-কথা তাকেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

উমাপতি কি স্মরণ করেছিল বলা যায় না, কিন্তু নতুন দলের পাণ্ডাদের তার অসম্মতি জানিয়ে দিয়েছিল।

নীরজা দেবী সেই সময় থেকেই বোধ হয় দুর্বোধ একটা অস্থিরতা অনুভব করেছিলেন মনের মধ্যে। কেমন যেন অপরাধী মনে হয়েছিল নিজেকে। নিজেকে বুঝিয়ে ছিলেন, একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছেন না বলেই এই গ্লানি।

গড়ভুরশুনার মেজ কুমারের সঙ্গে মলয়ার বিয়ের প্রস্তাবটা তখনই এসেছিল। নীরজা দেবীর মনে হয়েছিল এর চেয়ে ভালো সমাধান বুঝি আর হতে পারে না। বড় বনেদী বংশ কিন্তু পড়তির বদলে বরং উঠতি। জমিদারীর সঞ্চিত সম্পদ শিল্পে বাণিজ্যে খাটিয়ে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে ও তুলছে। সেকেলে গোঁড়াও নয়, শিক্ষায় দীক্ষায়, চালচলনে তাঁদের মতই আধুনিক। মেজ কুমার কিছুদিন আগে বিদেশের শিক্ষা শেষ করে ফিরেছে, দেখতে শুনতেও ভাল। রাজযোটক আর কাকে বলে?

নীরজা দেবীর নিজের মনে কোন দ্বিধা সংশয় ছিল না, শুধু উমাপতিকে একবার জানাতে গিয়েছিলেন তাঁকে খুশী করবার জন্যেই।

উমাপতির কথায় একেবারে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন।

পাত্রপক্ষকে কথা দিয়েছেন?—একটু যেন সন্ত্রস্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিল উমাপতি।

একরকম কথা দেওয়াই ধরতে পারেন।—নীরজা দেবী এ প্রশ্নের মানেটা বুঝতে পারেন নি।

ভালো করেন নি।—বলে উমাপতি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

কেন?—নিজের অজ্ঞাতেই নীরজা দেবীর গলার স্বর তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছিল।

মলয়া ত এ বিয়ে করবে না।—উমাপতির স্বর সত্যিই ব্যথিত।

করবে না! করবে, কি না করবে আপনি আগে থাকতে কি করে জানবেন? এখনও তাকে কিছু জানাইও নি পর্যন্তই

তাহলে আর জানাবেন না।

এসব আপনি কি বলছেন!—নীরজা দেবী গলার স্বর নামিয়ে রাখতে পারেন নি, —মলয়ার বিয়েতে আপনি খুশী নন! আপনি চান না সুপাত্রে তার বিয়ে হোক?

আমার চাওয়া না চাওয়ায় কিছু আসে যায় না।—বিষণ্ণ কৌতুকের সঙ্গে বলেছিল উমাপতি,—মলয়া এখন বিয়ে করতে রাজী হবে না এইটুকু আমি জানি। তাকে কিছু তাই না বলাই ভালো।

আপনার কথা আমি মানতে পারলাম না। মাপ করবেন। এ বিয়ে আমি দেব-ই।—বলে নীরজা দেবী উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন যাবার জন্যে।

উমাপতি ক্লান্তভাবে বলেছিল,—আপনি কিন্তু খুব ভুল করছেন। বুঝতে পারছেন না সে একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে। জেদ করে তা ভাঙতে গেলে ক্ষতি হবে বড় বেশী।

এ কথার উত্তর পর্যন্ত না দিয়ে নীরজা দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছলেন।

উমাপতির কথাই সত্য হয়েছিল।

মলয়া ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল মার কথা শুনে! গলায় বিষ ঢেলে বলেছিল,—আমার বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাও, না? কিন্তু সে নিশ্চিন্ত সুখ তোমায় আমি দেব না, জেনে রাখো। তোমার উমাপতি ঘোষালকে দিয়ে একবার বলিয়ে অবশ্য দেখতে পারো!

উমাপতিকে বলবার জন্যে অনুরোধ করতে নয়, তার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ জানাতেই নীরজা দেবী গেছলেন। বলেছিলেন,—আপনিই সব-কিছুর মূলে। আপনিই প্রশ্রয় দিয়ে ওকে এত বাড়িয়েছেন। আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এ বিয়েতে আপত্তি করার সাহস ও আপনার কাছেই পেয়েছে বলে আমার সন্দেহ। আজ থেকে এখানে ওর আসা আমি বন্ধ করলাম।

তাতে কিছু লাভ হবে না।—উমাপতি হেসেছিলেন—আমি এখানে থাকলে কোন নিষেধ ওকে আটকে রাখতে পারবে না। ও আসবেই। তাই আমি নিজেই না জানিয়ে কোথাও চলে যাব ঠিক করেছি।

না জানিয়ে চলে যাবেন!—রাগ না হতাশা, বিস্ময় না আকুলতা কি যে সমস্ত

যা বলতে চেয়েছে তা ঠিক বলা হল কিনা—

হৃদয়কে মথিত করে তুলেছিল নীরজা দেবী বুঝতে পারেন নি। সমস্ত সংযম হারিয়ে প্রায় চীৎকার করে বলেছিলেন,—আর এখানকার কাজ?

সে কাজ আর হবে না।—উমাপতির কণ্ঠ শান্ত দৃঢ়।

আর হবে না! মুখের একটা কথা খসিয়ে দিয়েই আপনি নির্বিকার! আপনার ফাঁকিতে ভুলে কী এ পর্যন্ত করেছি জানেন? জানেন কত টাকা এই কাজে ঢেলেছি?—দুঃসহ কী জ্বালায় নীরজা দেবী তাঁর মজ্জাগত শালীনতাও হারিয়ে ফেলেছিলেন।

উমাপতি তবু শান্ত অবিচলিত। বলেছিল,—সবই জানি। কিন্তু এক কুল বাঁচাতে, আর এক কুলের লোকসান ত মেনে নিতেই হবে।

তার মানে মলয়াকে এখানে আসতে না দিলে আপনি সবকিছু অকাতরে ভাসিয়ে দিয়ে চলেই যাবেন!

উমাপতি অনেকক্ষণ কোন উত্তর দেয়নি। তারপর প্রায় স্নিগ্ধ স্বরে বলেছিল—আপনি আজ বাড়ি ফিরে যান নীরজা দেবী। পরে আর একদিন আবার আসবেন। তখন যা বলবার বলব।

কি বলবার আছে শোনবার জন্যে পরে কোনদিন নীরজা দেবী আর যান নি।

মলয়াই একদিন তাঁকে এসে জিজ্ঞাসা করেছে,—তুমি উমাপতি ঘোষালের বিরুদ্ধে নালিশ করেছ মা? বলেছ, তোমায় ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে আজগুবি পরিকল্পনার নামে তিনি অজস্র টাকা নিয়েছেন?

মলয়ার স্বর তুষারশীতল। কোন উত্তাপ তাতে নেই।

নীরজা দেবী কিন্তু চেষ্টা করেও কণ্ঠকে সংযত করতে পারেন নি। প্রায় চীৎকার করে বলেছেন,—হ্যাঁ তাই বলেছি। এ সব ভণ্ড শয়তানের মুখোশ খুলে দেওয়াও দরকার!

বেশ করেছ মা! বেশ করেছ! উমাপতি ঘোষালের মত মানুষের এই শাস্তিই দরকার ছিল।

মলয়া ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে গেছে, আর একটি কথাও না বলে।

আদালতে মামলা উঠেছে তারপর। মামলা বেশীদূর গড়ায় নি। উমাপতি নিজে এসে সব অভিযোগ মেনে নিয়েছে, মেনে নিয়েছে সমস্ত দায়িত্ব ঋণ পরিশোধের।

উমাপতির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। মলয়াও সেখানে যাবার কোনদিন নাম করেনি।

তার বদলে আরেক উদ্দাম স্রোতে সে যেন অনায়াসে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

আজ এই প্রথম তার ব্যতিক্রম দেখলেন নীরজা দেবী। সমস্ত মনটা আকুল হয়ে উঠছে ময়লার ঘরে একবার যাবার জন্যে। শুধু দুটো কথা তার সঙ্গে বলার জন্যে।

কি কথা বলবেন তা জানেন না। যা হলে হয়ত সত্যিই মার্জনা চাইবেন মেয়ের কাছে। হয়ত তাও নয়, শুধু তার মাথায় হাত দিয়ে নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন।

মলয়ার ঘরের আলোটা তাঁকে যেন অভয় দিয়ে ডাকছে। তবু সাহস হয় না যেতে।

কি করছে মলয়া তার ঘরে তার দৈনন্দিন নিয়ম ভেঙে?

নিজেরই লেখা একটি চিঠির দিকে সে চেয়ে আছে। চিঠিটা লিখেছে এই খানিক আগে। লিখেছে অসীম রাহার কাছে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি। কিন্তু লিখে ঠিক যেন সন্তুষ্ট হতে পারে নি। যা বলতে

চেয়েছে ঠিক বলা হ'ল কিনা সন্দেহ হচ্ছে।

লিখেছে.—উমাপতির ছবিটা আপনাকে দিয়েছি। আপনিও দু'দিন দেখে ফেরত দেবেন বলেছেন। ফেরত দিতে আর আপনাকে হবে না। তার বদলে আমার একটা অনুরোধ যদি রাখেন, বাধিত হ'ব। ছবিটা পুড়িয়ে ফেলবেন। নিজে যা আমার উচিত ছিল অথচ পারিনি, তাই আপনাকে দিয়ে করাতে চাইছি। হয়ত তাহলে অতীতের কুহক থেকে আমি মুক্তি পাব। এ চিঠিটাও ছবির সঙ্গেই পুড়িয়ে দেবেন।

মলয়া চিঠিটা খামের মধ্যে ভরছে।

হয়ত কাল সকালে সত্যিই পাঠিয়ে দেবে।

বিপিন ঘোষ বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে নিশীথ পাত্রের কাছে যায় পরের দিন সকালবেলা।

টাইপ করা কাগজগুলো নিশীথ পাত্রের সামনে রেখে বলে.—এ আপনি কি করছেন? এ ত নিছক পাগলামি! এত টাকা এমন-ভাবে কেউ নষ্ট করার ব্যবস্থা করে, তাও দলিল দস্তাবেজ ক'রে?

নিশীথ পাত্রের মত যার ভীমরতি ধরেছে সে করে!—নিশীথ পাত্র সকৌতুকে তার দিকে তাকান,—ভালো করে সব পড়ে দেখেছ ত?

দেখেছি। আপনার অনেক টাকা আছে শুনেছি, সন্দেহও করেছি। কিন্তু তা যে প্রায় কুবেরের ভাণ্ডার তা ভাবতেও পারিনি। এই টাকা কোন সৎকাজে দান করা যেত না!

কি সৎকাজ?—নিশীথ পাত্রের চোখে যেন ছেলেমানুষী দুষ্টুমির হাসি,—হাসপাতাল? স্কুল কলেজ? তার জন্যে দান করবার অনেক লোক আছে। কিন্তু আমি যে কাজে দিচ্ছি তার জন্যে কেউ কানাকড়িও দেবে না।

কানাকড়ি দেওয়াও যে জলাঞ্জলি। যেখানে যা নির্বাচনের লড়াই হবে তাতে সৎ ও স্বাধীন লোক যাতে দাঁড়ায় তা দেখবার জন্যে ও তার খরচ জোগাবার জন্যে আপনি ট্রাস্ট করে টাকা রেখে যাচ্ছেন!

কলুর বলদের যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে সে হাড় চামড়াগুলো কার নামে উইল করে যেত জানিস? ওই কলুর জন্যেই যাতে তার সুমতি হয়। সারাজীবন রাজ-নীতির ঘানিই টেনেছি, তাই ও ছাড়া আমার ভাবনা নেই কিছু মরার পরেও।—নিশীথ পাত্রের গলার স্বরটা এবার ভারী মনে হয়।

কিন্তু সৎ ও স্বাধীন লোক খুঁজে বার করবে কে?—বিপিন ঘোষ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

তুই।—নিশীথ পাত্র বিপিনকে আজ প্রথম অন্তরঙ্গ সম্ভাষণের মর্যাদা দেন।

বিহ্বল বিস্ময়ে বিপিনের মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কোন কথা বার হয় না। তারপর জড়িত স্বরে সে বলবার চেষ্টা করে,—আমি...? আমায়...?

হ্যাঁ, তোকেই ট্রাস্টী করে সব ভার দিয়ে যাচ্ছি। সই সাবুদ আজই সেরে ফেলতে হবে।

কিন্তু আমায় বিশ্বাস করে,...বিপিনের চোখের সামনে সব কিছু দুলছে মনে হয়। কথাটা সে শেষ করতে পারে না।

হ্যাঁ তোকেই বিশ্বাস করে সব দিয়ে যাচ্ছি। ভাবছিস, এত টাকার লোভ তুই সামলাবি কি করে! সুবিধে পেলেই ফাঁকি দিয়ে ঝুলি ভরবি। পারবি না। সারা-জীবন তুই শুধু ফাঁকি দেবার পাঁয়তাড়াই কষলি, কিন্তু স্রেফ নিজেকে ছাড়া কা'কে আর কতটুকু ফাঁকি দিতে পেরেছিস! নইলে উমাপতির বানচাল নৌকো তুই আঁকড়ে বসে থাকতিস না।

কিন্তু আমি কি এ ভার নেবার যোগ্য?—প্রায় অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করে বিপিন।

তোর চেয়ে যোগ্য ত কাউকে খুঁজে পেলাম না। নিজেকে যে চোর বলে চিনেছে, তার চেয়ে হুঁশিয়ার আর কেউ নেই।

নিশীথ পাত্রের সেই ছাদ-ফাটানো হাসি আর থামতে চায় না।

অসীম রাহার দু' মাসের ছুটি শেষ হয়েছে।

তবু সে অফিসে ফিরে যায়নি।

এ দু' মাস তার যেন নেশার ভেতর দিয়ে কেটে গেছে। নেশা গোড়ায় ছিল না। যত দিন গেছে তত নেশা যেন বেড়েছে। একটিমাত্র ধ্যান-জ্ঞান নিয়ে সে কোথায় না গেছে, কি না খুঁজেছে। আগের যুগের পুলিসের লোক থেকে, যার বিন্দুমাত্র সংস্রব ছিল সেই অগ্নিযুগের সঙ্গে সকলের সন্ধান করেছে, পুরানো বই, পত্রিকা, খবরের কাগজ থেকে যেখানে যে দপ্তরের নথীপত্র ফাইল ঘাটবার সুযোগ পেয়েছে ঘেঁটেছে।

কাজ তার শেষ হয়নি, তবু আর কিছু করবার বাসনা তার নেই। কাজ অসমাপ্ত রেখেই সে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

রামবাবুর কাছেও বিশদ কোন বিবরণ সে পাঠায় নি। পাঠিয়েছে শুধু একটি চিঠি।

চিঠিটি দীর্ঘ নয়।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি যে ভার দিয়েছিলেন তা সম্পন্ন করতে পারলাম না বলে মার্জনা চাইছি। উমাপতি ঘোষাল সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি বটে, কিন্তু তথ্য দিয়ে কোন জীবনেরই সত্য জানা যায় কিনা এ সন্দেহই ক্রমশ বেড়েছে।

একটি তথ্য হয়ত আপনার কাছে মূল্য-বান হতে পারে। তাই সেইটিই শুধু জানাচ্ছি। অগ্নিযুগে অভিরাম সেন নামে একজন বড় পুলিস অফিসার বিপ্লবীদের ফাঁদ পেতে ধরতে গিয়ে নিজেই সেই ফাঁদে পড়ে প্রাণ হারান। পুলিসের গুপ্ত ফাঁদের খবর বিপ্লবীদের কাছে পেশছে দিয়েছিল অভিরাম সেনেরই ছোট ভাই। নাম ছিল সম্ভবত বিরাম সেন। অভিরাম সেনের মৃত্যুর পর বিরাম সেন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বিপ্লবীদের দলেও তাকে আর দেখা যায়নি। এমন প্রমাণও কিছু কিছু পাওয়া যায় যে, অভিরাম সেনের মৃত্যুর বেলা যেমন, উমা-পতি ঘোষালের ধরা পড়ার মূলেও তেমনি এই বিরাম সেনের হাত ছিল। দাদার মৃত্যুর জন্যে দায়ী হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত উমাপতি ঘোষালকে ধরিয়ে দিয়েই হয়ত সে করতে চেয়েছিল। বিরাম সেনের ইতিহাস অনু-সরণ করতে পারতাম কিন্তু উৎসাহ পাইনি।

আপনি উমাপতির ব্যর্থতার রহস্য জানতে চেয়েছিলেন। তিনি ব্যর্থ কি না তাই আমার কাছে রহস্য হয়েই রইল।

অফিসে আমার পদত্যাগের পত্র পাঠালাম।

উমাপতিকে খুঁজতে গিয়ে নিজেকে কিছুটা খুঁজে পেয়েছি মনে হচ্ছে।

আর একবার এই গ্রন্থজটিল রহস্য-নগরীর কবি হবার চেষ্টা করে দেখব। ব্যর্থ হলে আপনার অফিসের দরজা একেবারে বন্ধ থাকবে না এইটুকু আশা।

স্নেহধন্য

অসীম রাহা

কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে?
অশেষ হয়ে সেই তো আছে এই ভুবনে।।

এই কাহিনীতে আদৌ স্থান কাল পাত্র-পাত্রীর প্রকৃত নাম বদল করিয়া লিখিতেছি।—

মহারাজ সূর্যশেখর শত্রু জয় করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়াছেন। মরুভূমির পরপারে নির্জিত শত্রু মাথা নত করিয়াছে। মহারাজ সূর্যশেখর সহস্র বন্দী ও সহস্র বন্দিনী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে সাধারণ মানুষও আছে, আবার অভিজাত বংশের যুবক-যুবতীও আছে। বড় সুন্দর আকৃতি এই বন্দী-বন্দিনীদের: রজতশুভ্র দেহবর্ণ, স্বর্ণাভ কেশ। যুবতীদের দিকে একবার চাহিলে চোখ ফেরানো যায় না।

মহারাজ ঘোষণা করিয়াছেন, একশত বন্দী ও একশত বন্দিনী তিনি স্বয়ং বাছিয়া লইবেন; বাকি যাহা থাকিবে, প্রধান সেনাপতি হইতে নিম্নতম নায়ক পর্যন্ত সকলে পদমর্যাদা অনুযায়ী ভাগ করিয়া লইবে। উপরন্তু লুণ্ঠিত ধনরত্ন যাহা সঙ্গে আসিয়াছে তাহাও ভাগ-বাঁটোয়ারা হইবে।

একদিন অপরাহ্ণে উত্তরায়ণের সূর্য মরুপ্রান্তর প্রজ্জ্বলিত করিয়া অস্তোন্মুখ হইয়াছে এমন সময় বিজয়ী বাহিনী রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল। পুরোভাগে মহারাজ সূর্যশেখরের চিত্রবিচিত্র শ্যেনলাঞ্ছন চতুর্দোলা, তাহার পশ্চাতে শিবিকা ও দোলিকায় সেনাপতির দল, তারপর বন্দী-বন্দিনীর শ্রেণী এবং লুণ্ঠিত ধনরত্নবাহী যানবাহন। সর্বশেষে বিপুল সৈন্যবাহিনী।

কিন্তু আজ আর সদলবলে পুরপ্রবেশের সময় নাই; মহারাজ স্বনির্বাচিত বন্দি-বন্দিনীদের লইয়া ডঙ্কা বাজাইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। সেনাপতিরাও নগরে যাইতেছেন; তাঁহারা কাল প্রাতে আসিয়া বন্দী-বন্দিনী বাছাই করিয়া লইয়া যাইবেন। কেবল সৈন্যদল ধনরত্ন ও বন্দী-বন্দিনীদের রক্ষকরূপে রহিল। কাল প্রাতে ধনরত্ন ভাগ হইবে, সৈনিকেরা যে-যার অংশ লইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিবে।

একজন কনিষ্ঠ সেনানীর নাম সোমভদ্র। বয়স একুশ বাইশ, বলিষ্ঠ দেহ, তাম্রফলকের ন্যায় দেহবর্ণ; সুন্দর আকৃতি। রাজধানীতেই তাহার গৃহ, তাহার পিতা একজন মধ্যশ্রেণীর ভদ্র গৃহস্থ। সোমভদ্র এই প্রথম যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল; যুদ্ধে সে অসীম পরাক্রম দেখাইয়াছে, প্রধান সেনানায়কদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে, মহারাজের ভীমকান্ত মুখের প্রসন্ন হাস্য তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু আজ গৃহের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া যখন সকলের মন গৃহের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে তখনও তাহার প্রাণে শান্তি নাই। গৃহের কথা স্মরণ হইলেই তাহার মন শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। গৃহে পিতামাতা আছেন, কনিষ্ঠা ভগিনী শফরী এবং বালক-ভ্রাতা শোনভদ্র আছে; ক্ষুদ্র সংসার। কিন্তু সোমভদ্রের সব চেয়ে ভয় শফরীকে। শফরী শুধুই তাহার অনুজা নয়—

উদ্‌ভ্রান্তভাবে সৈন্য সমাবেশের প্রান্তভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে সোমভদ্র গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। সৈন্যদল শত্রু বিজয় করিয়া ফিরিয়াছে, তাহাদের মনে চিন্তা নাই; তাহারা উচ্চকণ্ঠে গান গাহিতেছে, নিজেদের মধ্যে হুড়াহুড়ি করিতেছে। কাল প্রাতে তাহারা বেতন পাইবে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ পাইবে; হয়তো দুই একটি দাসদাসী পাইবে, তারপর মহানন্দে গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু সোমভদ্রের অবস্থা অন্যরূপ; তাহার মন দুইদিকে টানিতেছে। সম্মুখে নীয়মান পতাকার ন্যায় তাহার মন পিছনদিকে তাকাইয়া আছে।

শত্রু বিজয় করিয়া ফিরিবার পথে সহস্র বন্দিনীর মধ্যে একটি বন্দিনীর কাছে সোমভদ্র হৃদয় হারাইয়াছে। ইহা কেবলমাত্র দৈহিক আকর্ষণ নয়, গভীরতর বস্তু। বন্দিনীর নাম মেরুকা; শুভ্রশিখা দীপবর্তিকার ন্যায় তার রূপ, বন্দিনীর ছিন্ন-গলিত বস্ত্রাবরণ ভেদ করিয়া রূপশিখা স্ফুরিত হইতেছে। নীল চোখে কঠিন সহিষ্ণুতা। সে উচ্চবংশের কন্যা, দৈবনিগ্রহে বিজাতীয় শত্রুর কবলিত হইয়া স্বজন হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত, পৃথিবীতে আপন বলিতে তাহার কেহ নাই; সে এখন নির্মম শত্রুর পণ্যবস্তু। কিন্তু এই মহা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়াও মেরুকা মনের স্থৈর্য হারায় নাই।

বন্দিনীদের মধ্যে সুন্দরী অনেক আছে, সকলেই সুন্দরী ও যুবতী; কারণ বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী যুবতীদেরই হরণ করিয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু সোমভদ্র একমাত্র মেরুকাকে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে। প্রত্যাবর্তনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতে দুজনে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়াছে; চেনাশোনা হইয়াছে, দুই চারিটি সংক্ষিপ্ত কথার বিনিময় হইয়াছে, দুজনে পরস্পরের নাম জানিয়াছে, অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত জানিয়াছে। সোমভদ্র কিন্তু নিজের মনের কথা মেরুকাকে বলে নাই; বলিবার প্রয়োজন হয় নাই, সোমভদ্রের চোখের ভাষা মেরুকা বুঝিয়াছে।

কিন্তু আজ যাত্রাপথের প্রান্তে পৌঁছিয়া আর নীরব থাকা চলে না, মনের কথা মুখের ভাষায় প্রকাশ করা প্রয়োজন। তাই সোমভদ্রের মন এত বিভ্রান্ত। হৃদয়ে আবেগ আছে, শান্তি নাই। পথের প্রান্তে নয়, সে যেন ত্রিভুজ পথের কোণবিন্দুতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সেনাপতিরা সকলে চলিয়া গিয়াছেন। সূর্য অস্তগামী; সৈনিকেরা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া রাত্রির আহারের উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে। সোমভদ্রের প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। সে সহসা মনঃস্থির করিয়া বন্দিনীদের সাময়িক উপনিবেশের দিকে চলিল।

বন্দী ও বন্দিনীদের পৃথক অবরোধ। সৈন্যযূথের বিশ্রাম কালে দোলা-শকটাদি বাহনগুলিকে পর পর সাজাইয়া দুইটি পরিবেষ্টন নির্মিত হয়, একটিতে বন্দীগণ ও অপরটিকে বন্দিনীগণ থাকে। এই শকটব্যূহের মধ্যে রাজা ও দুই তিনজন প্রধান সেনাপতি ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। সোমভদ্র শকট-ব্যূহের বহির্দেশ ঘিরিয়া ধীর পদে পরিক্রমণ আরম্ভ করিল।

আবেষ্টনীর মধ্যে বন্দিনী মেয়েরা দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের দৃষ্টি বাহিরের দিকে। কাহারও চোখে আতঙ্ক, কাহারও চোখে নীরব অশ্রুর ধারা। কেহ বা নিয়তির ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিয়া উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও দৃষ্টি সম্মুখে ভীম নগর-তোরণের উপর নিবদ্ধ, কাহারও চক্ষু পশ্চাতে অদৃশ্য মাতৃভূমির দিকে প্রসারিত। তাহাদের সম্মিলিত মনের নিপীড়িত আকাঙ্ক্ষা কে নির্ণয় করিবে?

আবেষ্টনীর পশ্চাদ্ভাগে মেরুকা দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার চোখের দৃষ্টি সম্মুখেও নয়, পশ্চাতেও নয়; মনে হয় আপন মনের গহন জটিলতার মধ্যে তাহার চক্ষুদুটি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সোমভদ্র তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল; মাঝখানে একটি শকটের ব্যবধান। কিন্তু মেরুকা তাহাকে দেখিতে পাইল না। সোমভদ্র কিয়ৎকাল একাগ্র চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া অবরুদ্ধ স্বরে ডাকিল—'মেরুকা!'

চকিতে মেরুকার চক্ষু বহির্মুখী হইল। সে ক্ষণকাল স্তিমিত নেত্রে সোমভদ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, 'সেনানী সোমভদ্র।'

শকটের উপর ঝুঁকিয়া সোমভদ্র প্রশ্ন করিল- 'মেরুকা, তুমি কি ভাবছিলে?'

মেরুকা আকাশের পানে চাহিল। এক ঝাঁক পাখি কলকূজন করিয়া বাসায় ফিরিতেছে। মেরুকা ধীরে ধীরে বলিল,—'কি ভাবছিলাম—জানি না। বোধহয় নিজের নিয়তির কথা ভাবছিলাম।'

উদ্গত আবেগ দমন করিয়া সোমভদ্র বলিল, 'মেরুকা, তুমি আশা হারিও না।'

মেরুকা বলিল,—'যেদিন বন্দিনী হয়েছি সেদিন থেকে আশা আশঙ্কা দুইই ত্যাগ করেছি। শুধু ভাবি, আমার নিয়তি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, ঝড়ের মুখে মরুভূমির বালুকণা কোন্ সমুদ্রের জলে ডুবে যাবে।'

তাহার নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বরে যে অপারিসীম হতাশা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা সোমভদ্রের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল, সে মেরুকার পানে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আবেগ স্খলিত স্বরে বলিল,—'মেরুকা, তুমি আমার ভগিনী! আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

দীর্ঘকাল নীরব থাকিয়া মেরুকা বলিল,—'ভগিনী! তোমাদের দেশে ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ হয়! আমাদের দেশে হয় না। কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতা নও, তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, আমি স্বর্গ হাতে পাব।'

মেরুকার শুষ্ক চক্ষু সহসা বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, সে সোমভদ্রের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। শকটের দুই পার হইতে আঙুলে আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি হইল।

সোমভদ্র বলিল,—'আমি কাল প্রত্যূষে আসব। একটি বন্দিনী আমার প্রাপ্য। আমি তোমাকে বেছে নেব, তারপরে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তোমাকে বিয়ে করব।'

মেরুকার অধর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে কথা বলিতে পারিল না, কেবল দুর্দম আকাঙ্ক্ষা ভরা চোখে সোমভদ্রের পানে চাহিয়া রহিল।

সোমভদ্র যখন নিজ গৃহের সম্মুখীন হইল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে, অদূরস্থ নদীর নিস্তরঙ্গ নীল জলে অস্তরাগের খেলা চলিতেছে। গৃহ প্রাঙ্গণের দ্বারে তাহার পিতা মাতা, ভগিনী শফরী ও বালক ভ্রাতা শ্যেনভদ্র দাঁড়াইয়া। সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে সোমভদ্রের উপর পড়িল। মায়ের মুখে হাসি, চোখে জল; পিতার মুখ স্ফুরিত-গম্ভীর। শ্যেনভদ্র ছুটিয়া দাদার কাছে যাইবার উপক্রম করিলে পিতা তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিলেন। কেবল শফরীকে কেহ আটকাইল না। সোমভদ্রকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার অগ্রাধিকার তাহারই।

শফরীর বয়স সতেরো। রূপ ও যৌবন মিলিয়া সাবলীল স্বর্ণাভ শফরীর মতই তাহার দেহ। সে লঘুপদে ছুটিয়া গিয়া সোমভদ্রের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, গ্রীবার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া গদ্গদ্ স্বরে ডাকিল—'ভাই!'

ক্ষণকালের জন্য সোমভদ্রের মনে হইল, তাহার সন্তাপ শান্ত হইয়াছে, অঙ্গ জুড়াইয়া গিয়াছে, দেহমন ভরিয়া একটি পরিতৃপ্ত আনন্দ সুগন্ধি ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে শফরীর স্কন্ধ জড়াইয়া লইল।

শফরী মুখ তুলিল। দুই চক্ষে আনন্দ বিকীর্ণ করিয়া সোমভদ্রের অধরের কাছে অধর ধরিল। বলিল,—'চুমু খাও।'

সোমভদ্রের মন আবার অশান্ত হইয়া উঠিল। শফরীকে বলিতে হইবে, মেরুকার কথা বলিতে হইবে। সে শফরীর অধরে অধর স্পর্শ করিয়া বলিল,—'শফরি, তুমি ভাল আছ?'

শফরী বলিল,—'উঃ, কতদিন পরে তুমি ফিরে এলে!'

সোমভদ্র লঘু হাসিয়া বলিল,—'যদি না ফিরে আসতাম? যদি যুদ্ধে মরে যেতাম!'

শফরীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, সে বুভুক্ষু চক্ষে কিছুক্ষণ সোমভদ্রের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'তাহলে—তাহলে আমিও মরে যেতাম।'

না, আর নয়, এ প্রসঙ্গ আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। সোমভদ্র নিজেকে শফরীর বাহুমুক্ত করিয়া বলিল,—'না, তুমি মরে যেতে কেন? কিছুদিন হয়তো আমার জন্য দুঃখ করতে, তারপর অন্য কারুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হত। শফরি—'

তাহার কথা শেষ হইল না, শ্যেনভদ্র পিতার হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়া বন-বিড়ালের মত তাহার পৃষ্ঠে লাফাইয়া পড়িল, হাঁচোড় পাঁচোড় করিয়া তাহার স্কন্ধে উঠিয়া বসিল। শ্যেনভদ্রের বয়স দশ বছর।

তিনজনে হাসিতে হাসিতে মাতাপিতার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সোমভদ্র নতজানু হইয়া মাতাপিতাকে অভিবাদন করিল। শফরীর চক্ষু সারাক্ষণ সোমভদ্রের মুখের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। সোমভদ্রের আচরণে কোথায় যেন বিকলতা রহিয়াছে; সে তাহাকে ভগিনী বলিয়া ডাকে নাই, শফরী বলিয়া ডাকিয়াছে। কেন?—

বাড়িতে অনাড়ম্বর উৎসবের হাওয়া। প্রাঙ্গণে বাঁধা শ্বেত গর্দভটি ঘন ঘন কর্ণ আন্দোলিত করিয়া কোমল চক্ষে চাহিয়া সোমভদ্রকে সম্ভাষণ জানাইয়াছে, গরু ছাগল ও মেষ নিজ নিজ ভাষায় সংবর্ধনা করিয়াছে। মা রন্ধনশালাতে গিয়াছেন, শফরী তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। পিতা প্রীতিবিম্বিত মুখে প্রাঙ্গণ-বেদীর উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। কেবল শ্যেনভদ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গ ছাড়ে নাই, ছায়ার মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে এবং নানা প্রশ্ন করিয়া তাহার মন আরও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সন্ধ্যার পর আহারের সময় সকলে সমবেত হইলে সোমভদ্র তাহার যুদ্ধযাত্রার অনেক বিচিত্র কাহিনী বলিল। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিল। তারপর মাতা ক্লান্ত সোমভদ্রকে শয়ন করিতে পাঠাইলেন। শ্যেনভদ্র শফরীর কোলে মাথা রাখিয়া নিদ্রালু হইয়াছিল, সে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া আসিল; ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মাতাপিতা ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিয়া বিবাহের আলোচনা করিতেছেন। সোমভদ্র ও শফরী বড় হইয়াছে; সোমভদ্র যুদ্ধে কীর্তি অর্জন করিয়া ফিরিয়াছে, এখন আর বিলম্ব করিয়া লাভ নাই, যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন। কালই পিতা মন্দিরে গিয়া পুরোহিতের সহিত দিন ক্ষণ স্থির করিয়া আসিবেন।

শফরী দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্তা শুনিল। তাঁহাদের স্বর ক্রমশ গাঢ় ও স্মৃতিমধুর হইয়া আসিল; তখন শফরী শয়ন করিতে গেল। নিজের শয়ন কক্ষে যাইবার আগে একবার সোমভদ্রের কক্ষে উঁকি মারিল।

ঘরের কোণে প্রদীপের নিষ্কম্প শিখা মৃদু আলোক বিতরণ করিতেছে। সোমভদ্র শয্যায় শুইয়া আছে। তাহার একটি বাহু চোখের উপর ন্যস্ত; নিশ্চয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শফরী চাহিয়া চাহিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল। তাহার হৃদয়ে একটি প্রশ্ন বারংবার কাঁটার মত ফুটিতে লাগিল—কেন? কেন সোমভদ্র তাহাকে ভগিনী বলিয়া ডাকিল না? তবে কি সে আর তাহাকে ভালবাসে না? তবে কি—?

শফরী নিজ কক্ষে গিয়া শয়ন করিল, কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। গৃহ নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছে, বাহিরে নদীতীরে ক্বচিৎ হংস বা সারসের উচ্চকিত ধ্বনি শুনা যাইতেছে। নগর সুপ্ত, গৃহ সুপ্ত; কেবল শফরী জাগিয়া আছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে শফরী উঠিল। অন্ধকারে ধীরে ধীরে সোমভদ্রের কক্ষের দিকে চলিল। ঘরের কোণে দীপশিখাটি ক্ষুদ্র হইয়া আসিয়াছে, সোমভদ্র পূর্ববৎ চক্ষের উপর বাহু রাখিয়া শুইয়া আছে। শফরী নিঃশব্দে তাহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার

বুকে দুরন্ত ব্যাকুলতা আলোড়িত হইয়া উঠিল। আমার প্রিয়তম! আমার ভাই! এক রক্ত, এক দেহ; আমরা পরস্পরের হয়ে জন্মেছি, পরস্পরের জন্যে বড় হয়েছি, আমাদের মাঝখানে ব্যবধান নেই। আমরা কি কখনো আলাদা হতে পারি!

শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া শফরী সোমভদ্রের বুকের মাঝখানে অতি সন্তর্পণে চুম্বন করিল।

সোমভদ্র তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে শয্যায় পড়িয়া ছিল, চমকিয়া জাগিয়া উঠিল।

আজ গৃহে ফিরিবার পর হইতে সে সকলের কাছে মেরুকার কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারে নাই; মেরুকার নাম কণ্ঠ পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। মনে হইয়াছে, মেরুকার নাম উচ্চারণ করিলেই গৃহের এই শান্ত আনন্দময় পরিমণ্ডল চূর্ণ হইয়া যাইবে। সতেরো বছর পূর্বে শফরী যেদিন জন্মগ্রহণ করে সেইদিন হইতে স্থির হইয়া আছে তাহারা দু'জনে স্বামী-স্ত্রী। দু'জনে এক সঙ্গে বড় হইয়াছে, কেহ অন্য কথা ভাবিতেও পারে নাই। তারপর যুদ্ধ যাত্রা। কোথা হইতে বন্দিনী মেরুকা আসিয়া তাহার হৃদয় হরণ করিয়া লইল। সোমভদ্র প্রাণমন দিয়া মেরুকাকে ভালবাসিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। কিন্তু গৃহে ফিরিবার পর পিতামাতার মুখের পানে চাহিয়া, শফরীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার মনে অপরাধের গ্লানি আসিয়াছে, মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিতে পারে নাই। গৃহে ফিরিয়াই সকলের মনে আঘাত দিতে তাহার মন সরে নাই।

কিন্তু একথা বেশীক্ষণ লুকাইয়া রাখা চলিবে না। কাল প্রাতেই সে মেরুকাকে আনিতে যাইবে; মেরুকাকে লইয়া গৃহে ফিরিবার পর কিছুই আর অজ্ঞাত থাকিবে না। পিতামাতা তখন কি করিবেন, শফরী কি করিবে কিছুই অনুমান করা যায় না। তার চেয়ে আগেই কথাটা জানাইয়া রাখা ভাল। পিতামাতা যদি অমত করেন তখন মেরুকাকে লইয়া সে অন্যত্র ঘর বাঁধিবে। তাহার অর্থের অভাব নাই; সে যোদ্ধা, যুদ্ধে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে, অর্থও প্রচুর অর্জন করিবে—

তবু সে বলিতে পারে নাই। বিক্ষুব্ধ মন লইয়া সে শয়ন করিতে গিয়াছিল। তারপর তন্দ্রার ঘোরে সে পিতামাতা ও শফরীর সঙ্গে তর্ক করিয়াছে, স্বপ্নে মেরুকাকে ভগিনী বলিয়া চুম্বন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে —এইভাবে অর্ধেক রাত্রি কাটিয়াছে।

শফরীর চুম্বনে ঘুম ভাঙিয়া সে উঠিয়া বসিল। চোখের জড়িমা দূর হইলে দেখিল, মেরুকা নয়, শফরী। তাহার মন অপ্রত্যাশিতভাবে স্বস্থ ও নিরুদ্বেগ হইল। শফরী একাকিনী, তাহাকে সে সব কথা বলিতে পারিবে। শফরীর সহিত তাহার মনের একটি সংযোগ আছে, নাড়ীর যোগ, শফরী তাহার মনের কথা বুঝিতে পারে। তাহাকে মেরুকার কথা বলিলে সে বুঝিবে।

সোমভদ্র শফরীর হাত ধরিয়া তাহাকে শয্যার পাশে বসাইল, চুপি চুপি বলিল,— 'শফরী, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

শফরী তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল,—'কি কথা?'

প্রায় আলিঙ্গনবদ্ধভাবে বসিয়া দু'জনের মধ্যে হ্রস্বকণ্ঠে কথা হইতে লাগিল। জোরে কথা বলিলে মা-বাবার ঘুম ভাঙিয়া যাইতে পারে।

সোমভদ্র বলিল,—'আমি একটা মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছি। কী সুন্দর মেয়ে, একবার দেখলে তুইও ভালবেসে ফেলবি।'

সোমভদ্রের বাহুবেষ্টনের মধ্যে শফরীর দেহ শক্ত হইয়া উঠিল,—'কে সে?'

সোমভদ্র বলিল,—'তার নাম মেরুকা, যাদের আমরা যুদ্ধে বন্দিনী করে এনেছি তাদেরই একজন। বন্দিনী হলেও উঁচু ঘরের মেয়ে। আমি তাকে বোন বলে ডেকেছি, তাকেই বিয়ে করব।'

শফরীর মেরুযষ্টি লৌহশঙ্কুর ন্যায় ঋজু হইয়া রহিল, সে ধীরে ধীরে বলিল,— 'তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু সে তো তোমার সত্যিকার বোন নয়।'

সোমভদ্র বলিল,—'নাই বা হল সত্যিকার বোন। যার সঙ্গে ভালবাসা হয় সেই তো বোন। ভেবে দ্যাখ, যার সত্যিকার বোন নেই তার কী হয়? সে তো বাইরের মেয়েকে বিয়ে করে। আমিও তেমনি বাইরের মেয়েকে বিয়ে করব।'

শফরীর জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে সে বলিল,—'কিন্তু ওর তো ঘর নেই। ওকে নিয়ে তুমি যাবে কোথায়?'

'অবশ্য স্ত্রীর ঘরেই স্বামীকে যেতে হয়। কিন্তু ওর যখন ঘর নেই তখন বাবাকে বলব এই বাড়িতেই আমাদের স্থান দিতে। তা যদি তিনি না দেন তখন আলাদা ঘর বাঁধব।'

'আর আমি? আমার কি হবে?' কথাগুলি শফরী অতিকষ্টে কণ্ঠ হইতে বাহির করিল।

সোমভদ্র তাহার কণ্ঠস্বরের মর্মান্তিক শুষ্কতা লক্ষ্য করিল না, সাগ্রহে বলিল,— তুইও আমার মতন বাইরে বিয়ে করবি। শাস্ত্রে বলেছে মাঝে মাঝে বাইরে বিয়ে করতে হয়, নইলে বংশের অধোগতি হয়। কিন্তু তুই যদি নিতান্তই বাইরের মানুষকে ঘরে না আনতে চাস—তাহলে শ্যেনভদ্র তো রয়েছে। দু'চার বছরের মধ্যে ও জোয়ান হয়ে উঠবে—'

শফরী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল—'আমি যদি বিয়ে না করি তাতেই বা ক্ষতি কি? তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই কর।—আচ্ছা, এবার ঘুমোও।'

সোমভদ্র তাহার হাত টানিয়া বলিল,— 'আমি ভোর না হতেই চলে যাব মেরুকাকে আনতে। মা-বাবাকে তুই কথাটা শুনিয়ে রাখিস।'

'আচ্ছা—'শফরী তাহার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। সোমভদ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে আবার শয়ন করিল। এ ভালই হইল পিতামাতাকে নিজের মুখে কিছু বলিতে হইবে না।

শফরী নিজের কক্ষে ফিরিয়া গেল, অনেকক্ষণ শয্যায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। মন বুদ্ধি অবশ হইয়া গিয়াছিল, আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল; তখন সে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

তাহার হৃদয় হিংসায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কোথাকার একটা ঘৃণ্য বিজাতীয়া বন্দিনী রূপের লোভ দেখাইয়া তাহার ভাইকে ভুলাইয়া লইবে! না না, আমি দিব না। আমার ধন আমি দিব না, তার চেয়ে—

শয্যা হইতে উঠিয়া শফরী দেওয়ালের কুলঙ্গী হইতে একটি শল্য তুলিয়া লইল। পিত্তল নির্মিত তীক্ষ্ণধার শল্য। শফরীর পিতা একজন অতি নিপুণ ধাতুশিল্পী, তিনি এই শল্যটি স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া কন্যাকে উপহার দিয়াছিলেন। শফরী শল্যটির সূক্ষ্ম অগ্র নিজের বুকের

মাঝখানে ফুটাইয়া পরখ করিল, তারপর আবার শয্যায় আসিয়া বসিল।

সোমভদ্র নিজ শয্যায় ঘুমাইতেছে। তাহার মন ওই মায়াবিনী রাক্ষসীর রূপে নিমজ্জিত হইয়া আছে; হয়তো ঘুমাইয়া তাহাকে স্বপ্ন দেখিতেছে। কাল সকালেই সে রাক্ষসীকে আনিতে যাইবে। না না, তার পূর্বেই—। সোমভদ্রের বুকের মাঝখানে, যেখানে সে চুম্বন করিয়াছিল, ঠিক সেইখানে এই শল্য বসাইয়া দিবে; তারপর শল্য নিজের বুকে বিঁধিয়া দিয়া দুজনে এক সঙ্গে পরলোকে যাইবে। জন্মাবধি যে বন্ধন আরম্ভ হইয়াছিল, মৃত্যুর পরও তাহা ছিন্ন হইবে না। একই তরণীতে হাত ধরাধরি করিয়া তাহারা মৃত্যু-নদীর খরস্রোত পার হইবে।

শফরী দৃঢ়মুষ্টিতে শল্য ধরিয়া সোমভদ্রের শয্যাপাশে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার নিশ্চিত নিদ্রিত মুখের পানে চাহিল। সহসা অদম্য রোদনের বেগ তাহার বক্ষ হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। অতি কষ্টে বাষ্পোচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া সে ফিরিয়া গেল, নিজের শয্যায় পড়িয়া অশ্রুর উৎস মুক্ত করিয়া দিল। না, সোমভদ্রের বুকে সে শল্য বিঁধিতে পারিবে না।

শুইয়া শুইয়া অসহায়ভাবে সে মেরুকাকে গালি দিতে লাগিল—রাক্ষসী! পিশাচী! ডাকিনী!—পিশাচী! রাক্ষসী! ডাকিনী!

নদীতীর হইতে একটা সারসের কেংকার ভাসিয়া আসিল। শফরীর মনে হইল, সারস বলিল—ডাকিনী!

ডাকিনী! এতক্ষণ শফরীর স্মরণ ছিল না, নদীতীরে শর-কান্ডের কুটিরে এক ডাকিনী বাস করে। ডাকিনী তন্ত্রমন্ত্র জানে, মারণ বশীকরণ জানে। শফরী নদীতীরে তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছে, দু'একবার কথাও বলিয়াছে; শীর্ণ কৃষ্ণকায়া বিকট-দশনা বৃদ্ধা, প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় বাস করে। কিন্তু রাত্রে তাহার কাছে লোক আসে, যাহারা মন্ত্রৌষধির বলে গোপন অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চায় তাহারা অন্ধকারে গা ঢাকিয়া চুপি চুপি ডাকিনীর কাছে আসে।

শফরী ক্ষণকাল নিশ্চল বসিয়া রহিল। তারপর উঠিয়া নিঃশব্দে গৃহের বাহির হইল। তীক্ষ্ম শল্যটি বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া লইল। সে ডাকিনীর কাছে যাইবে, ডাকিনীর মন্ত্রবলে শত্রু নিপাত করিবে।

গৃহ হইতে অল্প দূরে শরবনের মধ্যে ডাকিনীর কুটির; কুটিরের মাঝখানে মাটির উপর অঙ্গার কুন্ড। কিন্তু অঙ্গারের রক্তাভ আলোকে কুটির মধ্যে মানুষ দেখা যাইতেছে না।

শফরী শঙ্কিত বক্ষে দ্বারের বাহিরে কয়দ্দূরে আসিয়া দাঁড়াইল; বেশী কাছে যাইতে ভয় করে। সে কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল,—'ডাকিনি!'

যেন মন্ত্রবলে ডাকিনী তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল; বিকট হাসিয়া বলিল,—'বিদেশিনী তোর ভাইএর মন কেড়ে নিয়েছে, তাই এসেছিস?'

শফরী ভয় ভুলিয়া গেল, ডাকিনীর হাত ধরিয়া আবেগভরে বলিল,—'হ্যাঁ ডাকিনি, তুই আমার ভাইকে ফিরিয়ে দে।'

ডাকিনীর আঙুলে দীর্ঘ নখ, সে নখযুক্ত আঙুল শফরীর মুখে বুলাইয়া বলিল,—'ভাই ওমনি পাওয়া যায় না। কি দিবি?'

শফরী বলিল,—'তুই যা বলবি তাই দেব।'

'বুকের রক্ত দিতে পারবি?'

'পারব।'

'তবে তাই দে।' বলিয়া ডাকিনী শফরীর বুকের সামনে নিজ করতল গণ্ডূষ করিয়া ধরিল।

শফরী শল্য বাহির করিয়া নিজের বুকে আঁচড় কাটিল, দরদর করিয়া রক্ত ডাকিনীর গণ্ডূষে পড়িতে লাগিল। গণ্ডূষ পূর্ণ হইলে ডাকিনী বলিল,—'এতেই হবে। তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি।'

সে কুটিরে প্রবেশ করিল। শফরী রক্তক্ষরিত বক্ষে বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, অঙ্গার-কুন্ডের সম্মুখে নতজানু হইয়া ডাকিনী পূর্ণ করতল আগুনের উপর উপুড় করিয়া দিল। অগ্নি ক্ষণকাল স্তিমিত হইয়া রহিল, তারপর দপ করিয়া শিখা তুলিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ডাকিনী তখন মন্ত্র পড়িতে পড়িতে বামাবর্তে অগ্নি পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শফরী কম্প্রবক্ষে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

অগ্নিশিখা প্রশমিত হইলে ডাকিনী ধুনী হইতে এক টিপ ভস্ম লইয়া শফরীর কাছে ফিরিয়া আসিল, বলিল,—'ভয় নেই, ভাইকে ফিরে পাবি। বিদেশিনী তোর ভাইকে কেড়ে নিতে পারবে না।'

রুদ্ধশ্বাসে শফরী বলিল,—'পারবে না?'

'না, আমার মন্তর মিথ্যে হয় না।—এই ভস্ম বুকের কাটায় লাগিয়ে দে, কাটা জুড়ে যাবে।'

ভস্ম লইয়া শফরী বুকে মাখিল; মনে হইল ভস্ম নয়, চন্দন। ডাকিনী তখন বলিল,—'এবার আমায় কি দিবি বল।'

'তোমায় কী দেব?' ডাকিনীকে শফরীর অদেয় কিছুই ছিল না, কিন্তু সঙ্গে যে কিছুই নাই! সে অমূল্য শল্যটি ডাকিনীর হাতে দিয়া বলিল,—এই নাও। আমার বাবা আমার জন্যে নিজের হাতে গড়ে দিয়েছেন, সারা দেশে এর জোড়া নেই।'

'দে দে—' শল্য লইয়া ডাকিনী কুটিরে ফিরিয়া গেল। শফরী দেখিল, সে শল্যটি আগুনের কাছে ধরিয়া লোলুপ চক্ষে দেখিতেছে এবং শিশুর মত খিলখিল করিয়া হাসিতেছে।

টলমল উদ্বেল হৃদয়ে শফরী গৃহে ফিরিয়া গেল। আশার উৎকণ্ঠায় সারা রাত্রি শয্যায় পড়িয়া জাগিয়া রহিল।

বন্দিনীদের অবরোধে মেরুকাও সারা রাত্রি ঘুমায় নাই। ঊষার উদয়ে সোমভদ্র আসিবে, তাহার প্রতীক্ষায় জাগিয়া আছে। গৃহহীনা বন্দিনী গৃহ পাইবে, স্বামী পাইবে, মেষছাগের মত দাসীহাটে বিক্রীত হইতে হইবে না। তাই আশার উৎকণ্ঠায় তাহার চক্ষে ঘুম নাই।

ঊর্ধ্বে নক্ষত্রগুলি ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিল, আকাশের অগ্নিকোণে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি সূর্যোদয়ের পূর্বে উদিত হইলে নদীতে জল বাড়ে, সেই নক্ষত্রটি দপদপ করিতে লাগিল। ক্রমে সে-নক্ষত্রটিও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল; প্রত্যূষের ধূসর আলো অলক্ষিতে পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

সোমভদ্র কিন্তু আসিল না। মেরুকার ব্যাকুল চক্ষু নগর-দ্বারের দিকে চাহিয়া আছে—ঐ বুঝি সে আসিতেছে! ঐ বুঝি সোমভদ্র!

কিন্তু না, যাহারা আসিতেছে তাহাদের মধ্যে সোমভদ্র নাই। অন্যান্য সেনাপতিরা আসিতেছেন, তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়া বাছাই করিয়া নির্ধারিত সংখ্যক বন্দি-বন্দিনী লইয়া যাইবেন। সকলের সঙ্গে বহু সশস্ত্র রক্ষী।

সূর্যোদয় হইলে সেনাপতিরা বন্দিনীদের অবরোধে প্রবেশ করিলেন। আর আশা নাই। মেরুকার বুক ফাটিয়া নিঃশ্বাস বাহির হইল। যুদ্ধে বন্দিনী ক্রীতদাসীর ভাগ্য এত শীঘ্র সুপ্রসন্ন হইবে, ইহা সে কেমন করিয়া আশা করিয়াছিল? ছিন্নমূল লতায় কি ফুল ফোটে!

মেরুকা মনে মনে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন কল্পনা করিল। একজন মাংসলোলুপ সেনাপতি তাহাকে লইয়া যাইবেন। কিছুদিন পরে তাহার ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ হইলে তিনি তাহাকে দাসীহাটে বিক্রয় করিবেন। কোনও মধ্যবিত্ত ব্যক্তি তাহার ক্লান্ত-যৌবন দেহটা ক্রয় করিবে। আবার কিছুকাল পরে সেও তাহাকে কোনও দরিদ্র কৃষকের কাছে বিক্রয় করিবে। তারপর একদিন তাহার ভগ্নজীর্ণ দেহটা নদীর গর্ভে সমাধি লাভ করিবে। ইহাই তাহার জীবনের সুনিশ্চিত পরিণাম।

অমোঘভল্ল নামক এক সেনাপতি মেরুকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বয়স অনুমান চল্লিশ, দৃঢ় গঠন মাংসল দেহ, ললাটে গভীর অস্ত্রক্ষত চিহ্ন, চক্ষে কর্তৃত্বের অভিমান। আঠারো বছর হইতে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, জীবনে সারবস্তু কেবল দুইটি আছে: শত্রুর শোণিত এবং নারীর যৌবন। মেরুকার দেহ নিরাবরণ করিয়া তিনি ভোগপ্রবীণ দৃষ্টিতে

নিরীক্ষণ করিলেন, চিবুক ধরিয়া তাহার মুখ তুলিয়া চোখের উপর চোখ রাখিয়া সহজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'নাম কি?'

তুষারশীতল কণ্ঠে মেরুকা নাম বলিল।

অমোঘভল্ল প্রশ্ন করিলেন, 'হাসতে জানে?'

অন্তরে বিদ্বেষের তুষানল জ্বালিয়া মেরুকা দশন প্রান্ত উন্মোচিত করিয়া মুখে হাসির ভঙ্গিমা করিল।

সেনাপতি অমোঘভল্ল সন্তুষ্ট হইলেন। মেরুকার কণ্ঠস্বর মিষ্ট, দন্তপংক্তি সুন্দর। তিনি দুইজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, 'একে আমার প্রমোদ-বাটিকায় নিয়ে যাও।'

মেরুকা একবার চোখ তুলিয়া মহানায়ক অমোঘভল্লের পানে চাহিল, তারপর নিঃশব্দে দুই ভৃত্যের মধ্যবর্তিনী হইয়া দাঁড়াইল। ভৃত্যেরা তাহার দেহে একখণ্ড লঘু উত্তরীয় জড়াইয়া দিল।

•

সোমভদ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

শফরীর সহিত কথা বলিবার পর তাহার মন নিরুদ্বেগ হইয়াছিল, সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। একেবারে ঘুম ভাঙিল যখন সূর্যোদয় হইতেছে। সে কিছুক্ষণ জড়বৎ বসিয়া রহিল, তারপর স্মৃতি-শক্তি ফিরিয়া আসিলে হঠাৎ মুখে অব্যক্ত শব্দ করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

সেনাপতি অমোঘভল্লের ভৃত্যদ্বয় মেরুকাকে দোলায় তুলিবার উদ্যোগ করিতে-ছিল এমন সময় সোমভদ্র সৈন্যব্যূহের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

'মেরুকা!'

মেরুকা উচ্চকিত হইয়া দেখিল সোমভদ্র ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে। তাহার অন্তরের সমস্ত হতাশা কঠিন-তিক্ত বিদ্বেষে পরিণত হইল, চক্ষু হিমশীতল উপলখণ্ডের ন্যায় নিষ্প্রাণ হইয়া গেল। সে সোমভদ্রের দিকে পিছন ফিরিয়া দোলায় আরোহণের উপক্রম করিল।

সোমভদ্র ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, 'মেরুকা! তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

সেনাপতি অমোঘভল্লের ভৃত্যেরা সোম-ভদ্রকে চিনিত না, একজন রূঢ়হস্তে তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল,—'সাবধান! দূরে থাকো।'

সোমভদ্র ক্রোধ-দীপ্ত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিল,—'আমি সেনানায়ক সোম-ভদ্র। তোমরা কে? একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

নাম শুনিয়া ভৃত্যেরা নরম হইল, বলিল, 'আমরা মহানায়ক অমোঘভল্ল মহাশয়ের ভৃত্য। মহানায়ক এই বন্দিনীকে নির্বাচন করেছেন। তাই ওকে তাঁর প্রমোদ-বাটিকায় নিয়ে যাচ্ছি।'

মেরুকা তখন দোলায় উঠিয়া বসিয়াছে, দারুগঠিত মূর্তির ন্যায় দেহ কঠিন করিয়া বসিয়া আছে। সোমভদ্র একবার তাহার পানে চাহিল, একবার ভৃত্যদের পানে চাহিল। তার-পর দৃঢ় আদেশের সুরে বলিল,—'তোমরা দাঁড়াও, চলে যেও না। আমি মহানায়ক অমোঘভল্লের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি।'

সোমভদ্র দ্রুত ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যদ্বয় ফাঁপরে পড়িয়া কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে মন্ত্রণা করিল, তারপর দোলা তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। তাহাদের কাছে প্রভুর আদেশই গরিষ্ঠ।

দোলার মধ্যে মেরুকা দারু-পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া রহিল। নিয়তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নাই, তাহাতে নিয়তি আরও নিষ্ঠুর হইয়া ওঠে। হয়তো এই বৃষস্কন্ধ প্রবীণ যোদ্ধার অন্তরে দয়া-মায়া আছে, হয়তো সে চিরদিনের জন্য তাঁহার গৃহে আশ্রয় পাইবে, হয়তো—হয়তো—

দূর্বাঘাসের মত আশা মরিয়াও মরে না। বুদ্ধির দর্পণে অনিবার্য ভবিষ্যৎ দেখিয়াও মরিতে চায় না।—

সোমভদ্র বন্দিনীদের আবেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মহানায়ক অমোঘভল্ল একটি বন্দিনীর বস্ত্র মোচন করিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতেছেন। তিনি পাঁচটি বন্দিনী পাইবেন, এটি দ্বিতীয়। সোমভদ্রকে আসিতে দেখিয়া অমোঘভল্ল পরম সমাদরের সহিত তাহাকে সম্বোধন করিলেন,—'দেখ তো সোমভদ্র, এই বন্দিনীটাকে বেশ শক্ত-সমর্থ মনে হচ্ছে। আমার বিহার-নৌকার দাঁড় টানতে পারবে?'

সোমভদ্র একবার বন্দিনীর প্রতি কটাক্ষ-পাত করিয়া নিরুৎসুক কণ্ঠে বলিল, 'পারবে।' তারপর ব্যগ্রস্বরে কহিল, 'মহা-নায়ক, আপনার সঙ্গে আমার আড়ালে একটা কথা আছে।'

মহানায়ক অমোঘভল্ল ঈষৎ বিস্ময়ে একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'কি কথা?'

সোমভদ্র অধর লেহন করিয়া বলিল, 'মহানায়ক, যে-বন্দিনীকে আপনার ভৃত্যেরা নিয়ে যাচ্ছে, সে—সে—'

অমোঘভল্ল বলিলেন, 'যে বন্দিনীটার নাম মেরুকা তার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ মহানায়ক। মেরুকা—আমি—আমি তাকে নিতে চাই। তাকে—'

অমোঘভল্ল উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, 'এখন আর হয় না বন্ধু। আমি তাকে হস্ত-গত করেছি। জানো তো, যে আগে আসে সে আগে পায়।'

সোমভদ্র বলিল, 'কিন্তু—আপনি আমাকে এই অনুগ্রহ করুন ভদ্র। আমি মেরুকাকে বিবাহ করতে চাই।'

অমোঘভল্লের হাসামুখ সহসা গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন, 'বিবাহ! তুমি একটা বিদেশিনী বন্দিনীকে বিবাহ করতে চাও!'

সোমভদ্র অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'হ্যাঁ মহা-নায়ক, আমার হৃদয় মেরুকাকে চায়। আমি তাকে বিয়ে করে সংসার পাততে চাই।'

অমোঘভল্ল ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তোমার গৃহে ভগিনী নাই?'

সোমভদ্র চক্ষু নত করিয়া বলিল, 'আছে ভদ্র'।

'যুবতী ভগিনী? বিবাহযোগ্যা?'

'হ্যাঁ ভদ্র।'

অমোঘভল্ল তখন গভীর ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন, 'ধিক সোমভদ্র! গৃহে বিবাহযোগ্যা যুবতী ভগিনী থাকতে তুমি একটা অজ্ঞাত-কুলশীলা অজ্ঞাতচরিত্রা বন্দিনীকে বিবাহ করতে চাও! ওরা তো দু' দিনের সম্ভোগের সামগ্রী, ওরা কি ভগিনীর পদ অধিকার

করার যোগ্য? তুমি সম্বংশজাত, তুমি রাজ্যের একজন সেনানায়ক; তুমি যদি এমন কু দৃষ্টান্ত স্থাপন কর, তাহলে সামান্য লোকে কী করবে? জাতির সংস্কৃতি বিজাতীয় ভাবের বন্যায় ভেসে যাবে। তাছাড়া তুমিও সুখী হতে পারবে না। যার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ নেই, সে কি কখনো হৃদয়ের আত্মীয় হতে পারে? সে কি গৃহের গৃহিণী হতে পারে?'

কিন্তু উপদেশ বাক্যে সোমভদ্রের রুচি নাই। সে ত্বরান্বিত কণ্ঠে বলিল, 'মহানায়ক অনুগ্রহ করুন, মেরুকাকে দান করুন।'

অমোঘভল্ল দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'কখনই না। তুমি উন্মত্ত, জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়েছ; তোমাকে প্রশ্রয় দিলে তোমারই সর্বনাশ হবে। যাও, গৃহে ফিরে যাও, আপন ভগিনীকে বিবাহ কর।'

সোমভদ্র কিছুক্ষণ বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার অন্তর বিদ্রোহ করিতে চাহিল; কিন্তু সে যোদ্ধা, আদেশ লঙ্ঘনে অনভ্যস্ত। সে টলিতে টলিতে ফিরিয়া চলিল।

অমোঘভল্ল সদয়কণ্ঠে তাহাকে ডাকিলেন, 'শোনো সোমভদ্র।'

সোমভদ্র আবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অমোঘভল্ল সস্নেহে তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, হতাশ হয়ো না। চুপি চুপি একটা কথা বলি শোনো। দু' মাস পরে হোক ছ' মাস পরে হোক মেরুকাকে আমি বিক্রি করব। তখন যদি তুমি ওকে চাও, তাহলে তোমার হাতেই ওকে বিক্রি করব, অন্য কাউকে দেব না। ইতিমধ্যে তুমি তোমার ভগিনীকে বিবাহ করে সংসারী হও। কেমন?'

সোমভদ্র আর সেখানে দাঁড়াইল না।

অদূরে শক্ত-সমর্থ বন্দিনীটা এতক্ষণ নগ্ন-দেহে অপেক্ষা করিতেছিল, মহানায়ক অমোঘভল্ল হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে ফিরিয়া গেলেন।

ওদিকে শুষ্ক চক্ষু মেলিয়া শফরী শয্যায় পড়িয়া ছিল। সূর্যোদয় কালে সোমভদ্র যখন ছুটিয়া গৃহ হইত বাহির হইয়া গেল, তখন সে দুঃস্বপ্নময় চিন্তার জাল সরাইয়া শয্যা হইতে উঠিল। ইতিমধ্যে পিতামাতাও জাগিয়াছেন। শফরী তাঁহাদের কাছে গিয়া সোমভদ্রের সঙ্কল্পের কথা জানাইল, তারপর সহসা মায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাতাপিতা প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তারপর মাতা শফরীকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সান্ত্বনা দিতে গিয়া নিজেই অসংবৃত হইয়া পড়িলেন। পিতার মাথায় ঝাঁকে ঝাঁকে দুশ্চিন্তা আসিয়া জুটিল। সোমভদ্র বয়ঃপ্রাপ্ত এবং স্বাধীন, তাহাকে শাসন করা যায় না...বিজাতীয়া নারীকে বিবাহ করিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে... এরূপ বিবাহ কখনো সুখের হয় না; মিশ্র রক্তের সন্তানসন্ততি কখনো ভাল হয় না, উন্মার্গগামী হয়......এদিকে শফরীর কি হইবে...শ্যেনভদ্র নিতান্ত বালক; অগ্রজার সহিত অনুজের বিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও বাঞ্ছনীয় নয়...বাহিরের পাত্র ঘরে ডাকিয়া আনিতে হইবে: ধাতুপ্রকৃতির বিষমতায় সংসারের সুখশান্তি নষ্ট হইবে; খাল কাটিয়া কুমীর আনা এবং বাহিরের জামাতা ঘরে আনা একই কথা...সোমভদ্র এ কী করিল! অন্ধমোহের বশে সুখের সংসার ছারখার করিয়া দিল!

সকলের মনে বিষণ্ণ ব্যাকুলতা, সকলের দৃষ্টি বাহিরের দিকে। ওই বুঝি বধূর হাত ধরিয়া সোমভদ্র আসিতেছে। শফরী ভাবিতেছে, বধূকে দেখিয়া সে কী করিবে? সংযম হারাইবে না তো?

কিন্তু প্রভাত বহিয়া গেল, সোমভদ্র ফিরিল না। সকলের মন উৎকণ্ঠিত; শফরীর মনে ক্ষীণ আশা ঝিকমিক করিতে লাগিল— তবে কি ডাকিনীর মন্ত্রতন্ত্র ফলিয়াছে! তবে কি—?

দ্বিপ্রহরেও যখন সোমভদ্র ফিরিল না, তখন পিতা চিন্তিত মুখে তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। মাতা শঙ্কা-ভরা বুকে রন্ধনশালায় গেলেন। শফরী অঙ্গনে ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর হঠাৎ তাহার বুক সন্ত্রাসে চমকিয়া উঠিল। বাল্যকাল হইতে সোমভদ্রের অভ্যাস ছিল, যখনই কোনও কারণে তাহার মন খারাপ হইত, তখনই সে নদীর ধারে গিয়া বসিয়া থাকিত। একবার শফরীর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল— বড় শান্ত শীতল ওই নদীর জল। যেদিন এ পৃথিবী আর ভাল লাগবে না, সেদিন ওর তলায় গিয়ে শুয়ে থাকব।

আতঙ্ক-শরবিদ্ধ হৃদয় লইয়া শফরী হরিণীর মত নদীতীরে ছুটিল।

জলের কিনারে একটি বালিয়াড়ির আড়ালে সোমভদ্র পাশ ফিরিয়া শয়ান রহিয়াছে, অলস হস্তে নুড়ি কুড়াইয়া একটি একটি করিয়া জলে ফেলিতেছে। শফরী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, সে দেখিতে পাইল না। অন্তরের অতল গুহায় ডুবিয়া আছে।

শফরী মৃদু গদগদ স্বরে ডাকিল, 'ভাই!'

সোমভদ্রের নিরুৎসুক চক্ষু শফরীর দিকে ফিরিল। শফরীর বুকের মাঝখানে কাটা দাগের উপর দৃষ্টি পড়িল। সে বলিল— 'কি করে কেটে গেল?'

শফরী ভঙ্গুর হাসিয়া বলিল, 'কাটেনি। ঘুমের ঘোরে নখ দিয়ে আঁচড়ে ফেলেছি। চল, বাড়ি চল।'

সোমভদ্রের চোখে একটু সচেতনতা দেখা দিল, সে বলিল—'বাড়ি? কেন?'

'সারাদিন খাওনি। এস।' শফরী সোমভদ্রকে কোনও প্রশ্ন করিল না, শুধু হাত বাড়াইয়া দিল। সোমভদ্র হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আর কোনও কথা না বলিয়া শফরীর পাশে পাশে বাড়ির দিকে চলিল।

কয়েক মাস পরে একদিন অপরাহ্ণে শফরী অঙ্গনের দ্বারের কাছে ঘোরাঘুরি করিতেছিল। প্রাতঃকালে সোমভদ্র কয়েকজন বন্ধুর সহিত নদীর পরপারে মৃগয়ায় গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।

দূরে সোমভদ্রকে আসিতে দেখা গেল। তাহার স্কন্ধে ধনু, পৃষ্ঠে মৃত হরিণ-শিশু, মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। শফরী হর্ষসূচক শব্দ করিয়া তীরের মত তাহার দিকে ছুটিল। পিতামাতা অঙ্গনের বেদিকার উপর বসিয়াছিলেন, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। সোমভদ্র আসিতেছে।

শফরীকে আসিতে দেখিয়া সোমভদ্র দাঁড়াইল; ধনু ও হরিণ মাটিতে নামাইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিল। শফরী নীড়-প্রত্যাশী পাখির মত তাহার বাহুবেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করিল। বহুদিন পরে সে সোমভদ্রের মুখে সেই পুরাতন অকুণ্ঠ হাসি দেখিয়াছে। এতদিন পরে বিদেশিনী কুহকিনীর মোহজাল ছিঁড়িয়া সোমভদ্র তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে।

শফরী মুখ তুলিয়া ক্ষুধিত চক্ষে সোমভদ্রের পানে চাহিল। সোমভদ্র তাহার অধরে চক্ষে ললাটে চুম্বন করিল। শফরী দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল, 'বলো ভগিনী—বলো বহিন—বলো বোন।'

সোমভদ্র বলিল, 'ভগিনী—বহিন—বোন।'

অতঃপর মন শান্ত হইলে শফরী ধনু ও হরিণ তুলিয়া লইল। দুজনে গৃহে প্রবেশ করিল।

সোমভদ্র পিতার সম্মুখে গিয়া সলজ্জ অনুযোগের স্বরে বলিল,—'বাবা, আমাদের বিয়ে দেবে কবে?'

পিতা সচকিতে পুত্র ও কন্যার মুখের পানে চাহিলেন, তারপর কোমল গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'এখনি পুরোহিতের কাছে যাচ্ছি।'

সোমভদ্র ও শফরী গৃহের অভ্যন্তরে চলিয়া গেল। পিতামাতা পরস্পরের পানে চাহিয়া হাসিলেন। মাতার চক্ষু আনন্দে বাষ্পাচ্ছন্ন হইল।

তাঁহারাও ভ্রাতা-ভগিনী।

এইবার কাহিনীর স্থান কাল বলা যেতে পারে। ঘটনাস্থল প্রাচীন মিশর; ঘটনাকাল আজ হইতে অনুমান পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। মিশরবাসীরা তখন চক্রযানের ব্যবহার জানিত না, লৌহ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, অশ্বের সহিত মনুষ্য জাতির পরিচয় ছিল না। যে মানুষগুলির কাহিনী লিখিলাম, তাহারা কিন্তু আমাদের মতই মানুষ ছিল।
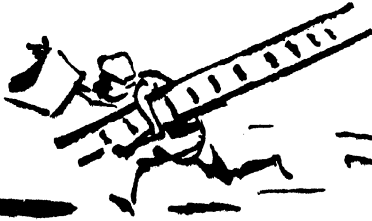
আমি বুঝেছিলাম গোবর্ধনকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ভালো কাজ করেনি অক্ষয়।

গোড়ার কথাটা একটু না বলে দিলে ঠিক-মতো বুঝতে পারা যাবে না। মথুরোবাবু ছিলেন আমাদের স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার। সেকেলে আদর্শপ্রিয় মানুষ। তাঁর আদর্শ ছিলেন আবার আচার্য পি সি রায়। ফলে, বাঙালী জাতটা ব্যবসায় নামছে না এই নিয়ে তিনি বরাবর মনোকষ্ট পেয়ে গেছেন। অন্য-বিধ, অর্থাৎ সাংসারিক কষ্টও। স্কুল-শিক্ষকের সামান্য যা আয় তারও খানিকটা ছোটখাটো ব্যবসার পরীক্ষায় নষ্ট হয়ে যেত; আচার্য রায়ের আদর্শটাই নিয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তববুদ্ধিটা পান নি মাস্টারমশাই। শুধু তাই নয়, গত বৎসর যখন মারা গেলেন, দেখা গেল কিছু ঋণও রেখে গেছেন।

পরিবারের মধ্যে এখন ওঁর স্ত্রী, দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। প্রথম স্ত্রী নিঃসন্তান মারা যাওয়ার পর এগুলি দ্বিতীয় সংসারের সন্তান, সুতরাং নাবালকই। বড়টি কন্যা, তার নীচে পর পর তিনটি পুত্র, তার মধ্যে বড়টি এই স্কুলেই ওপরের ক্লাশে পড়ছে, এই বৎসরই পরীক্ষা দেবে।

ভদ্রাসনটি নিজের, তা ভিন্ন শেষের দিকে ওঁর কয়েকজন অনুগত ছাত্র আমরা ভবিষ্যৎ ভেবে চেষ্টাচরিত্র ক'রে কিছু চাষের জমি করিয়ে দিই। এর পর উনি মারা যেতে ছেলে স্বদেশ উপার্জনক্ষম না হওয়া পর্যন্ত একটা বৃত্তিরও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় স্কুল থেকে। ছেলে তিনটিও সবাই স্কুলে ফ্রি। চলে যাচ্ছে একরকম ক'রে।

আরও ভালোভাবেই চলতে পারত, কিন্তু আদর্শপ্রিয় স্বামীর আদর্শ গৃহিণী এর অতিরিক্ত সাহায্য কারুর কাছে নিতে একে-বারেই নারাজ। যাই হোক, তাতে বিশেষ ক্ষতি হচ্ছিল না, কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল কন্যা মৈত্রেয়ীর বিবাহের সময়। বিবাহযোগ্যা হয়েছে, ওটিকে পার করতে পারলে গুরু-মা খানিকটা হাল্‌কা হন, মাস্টারমশাইয়ের বাৎসরিক কাজটা হয়ে গেলে আমরা কথাটা তুললাম এবং ওঁর সম্মতি নিয়ে একটি পাত্র স্থিরও করে ফেললাম। ছেলেটি ভালোই, সে-হিসেবে খরচও কম। তবু বিবাহের খরচই তো, দু' দিকের হিসাব ক'রে দেখা গেল, হাজার তিনেকের কমে হবে না।

গুরুমা শুনে বললেন—"বেশ বাবা, তোমরাই তো সব করছ, আমার আর কে আছে? দাঁড়িয়ে থেকে ক'রে দাও আমায় দায়ে খালাস।"

একটু হেসে বললেন—"বাবার দেওয়া গলার চিকটা আর আটগাছা চুড়ি অনেক কষ্টে ব্যবসার গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। চুড়ি ক'গাছা ইচ্ছে আছে স্বদেশের বৌয়ের মুখ-দেখার জন্যে রেখে দিই। চিকটা এদিকে থাক, ভারিও আছে।"

খরচের দিকটা যে একটা সমস্যা দাঁড়াবে, জানাই। কুণ্ঠিতভাবে বললাম—"ওদিকটাও আপনিই ভাববেন মা? আমাদের ওপরই ছেড়ে দিন না।"

ইঙ্গিতটা আরও একটু স্পষ্ট করে দিয়ে বললাম—"তিনি নেই, একটু যে সেবা করব সে-সুযোগ তো দিলেন না। আমরা বল-ছিলাম—চিক, চুড়ি—দুই-ই থাক না। আপনার সাধ—স্বদেশের পর স্বরাজের বৌ আছে, তারপর..."

"সম্ভব কি ক'রে বাবা—দুটোই রেখে দিলে? জমিটার অবিশ্যি দাম পাওয়া যাবে—কলোনী করছে, তাদের দিয়ে দিলে—কিন্তু সবটুকু বেচে দিলে চলবে?—যারা বাড়িতে রইল তাদের মুখে একমুঠো করে ভাত দিতে হবে তো?"

একদিনে হলো না। কয়েকদিন গিয়ে অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করানো গেল গুরু-মা'কে। বললাম—আমরা তাঁর ছাত্র, স্বদেশ-স্বরাজের মতোই তাঁর সন্তান, সুতরাং আমাদের অধিকার আছে। তবু তো বাড়ি-বাড়ি ঘুরে চাঁদা তোলা নয়, নিতান্তই কয়েকজনের মধ্যে, যারা সমর্থ এবং শ্রদ্ধান্বিত। রাজি হলেন, তবে পুরোপুরি নয়; একটা রফা গোছের। চিকটা নিতে হবে। বাকি হাজার দুয়েকের কিছু ওপর যে-টাকাটা থাকে সেটার ভারই রইল আমাদের ক'জনের ওপর।

আমরা যারা ছিলাম একদিন একসঙ্গে বসে সব ঠিক করে ফেললাম। পঞ্চাশের ওপর যার যা সামর্থ্য সে-অনুযায়ী দেবে। একটা কাঁচা খসড়াও করে ফেলে দেওয়া গেল, বেশ সহজেই উঠে যায় টাকাটা।

এসব কাজে গোবর্ধনের মতো দক্ষ এবং উৎসাহী আর কেউ নেই। তাকে ডেকে নিলাম। চাঁদাগুলো সংগ্রহ করা থেকে শুরু হবে তার কাজ।

সমস্ত ব্যাপারটুকুর পটভূমিকা এই।

যখন অক্ষয়ের কাছে গেল গোবর, আমি সেখানেই, একটা কাজ ছিল তার সঙ্গে। অক্ষয়ও আমাদের মতোই মাস্টারমশাইয়ের ছাত্র, এবং একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর আদর্শ ছাত্র হিসাবে তার স্থান আর সবার ওপরেই। ওঁর অনুপ্রেরণায় আমাদের মধ্যে যারা ব্যবসা, কৃষি প্রভৃতি স্বাধীন উপ-জীবিকার দিকে গিয়ে সফলতা লাভ করেছে, অক্ষয় শুধু তাদের মধ্যে অন্যতম নয়, বিশিষ্টতম। কঠিন অধ্যবসায় এবং অন্তর্দৃষ্টির বলে, সামান্য পুঁজি হাতে ক'রে ও এখন কলকাতার শহরতলীতে একটি বেশ মাঝারিগোছের রাসায়নিক কারখানার মালিক। কালি, কয়েক রকম অ্যাসিড এবং সাবান, স্নো, পাউডার, কেশতৈল প্রভৃতি উৎপাদন করে বেশ টাকা জমিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু অত্যন্ত হিসেবী এবং কৃপণ, যাকে একেবারে চশমখোর বলা যায়। ইচ্ছা করলে ও সমস্ত ব্যয়ভারটা বহন করতে পারে, তবু আমরা ওর নামে শ'-খানেকের বেশি কৌলীন এবং সেটা সম্বন্ধেও সবার সন্দেহই আছে।

একটা কথা বলা দরকার। কার্যোপলক্ষে অক্ষয়কে বেশিভাগ কলকাতাতেই থাকতে হয়, তবে আমাদের এটাও তো বেশি দূর নয়, আসে মাঝে মাঝে, নূতন বাড়িটাও এখানেই করেছে। মৈত্রেয়ীর বিবাহ নিয়ে আমাদের যখন প্ল্যান আঁটা হচ্ছিল, চাঁদা ফেলা হচ্ছিল, ও তখন বাইরেই।

অক্ষয়ের কারখানার জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চলেছে কেশতৈলটা, নাম দিয়েছে মেঘ-কুন্তল। বস্তুত, এইটের জোরেই ও দাঁড়িয়ে গেছে এবং এইটেই আর সবগুলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি যে অক্ষয়ের কাছে গিয়েছি তা সম্পূর্ণ অন্য-এক কাজে। চাঁদার কথা তুলতে আমার এমনিই বড় অস্বস্তি বোধ হয়, অক্ষয়-জাতীয় লোকের কাছে তো আরও জিভ যেন জড়িয়ে যায়। তবু মনে করেছিলাম সুযোগ পেলে শেষের দিকে তুলব কথাটা, তার আগেই গোবর এসে উপস্থিত হলো। এবং অক্ষয়ের দুটি পায়ে হাত বুলিয়ে কপালে ঠেকিয়ে পাশে একটা মোড়ায় বসল।

হাতে চাঁদার খাতাটা। নজর পড়তেই মুখটা একটু শুকিয়ে গেছে অক্ষয়ের, বলল —"কি, হঠাৎ এত প্রণামের ঘটা যে গোবর্ধন বাবুর?"

"অনেকদিন পরে এলেন, ভাবলাম একবার গিয়ে আশীর্বাদটা নিয়ে আসি। ঐটুকুই তো পুঁজি আমাদের, কাকা, এমনিতে তো কিছু হবে না।"—বেশ সপ্রতিভভাবেই বলল গোবর।

অক্ষয় বলল, "তা আশীর্বাদ তো আছেই, দীর্ঘজীবী হও......"

"ও আশীর্বাদ আর করবেন না কাকা। প্রণাম ক'রে শুধু ধমক খেতে বেঁচে থাকা তো!"

একটু হেসে ফেলতে হলো, নগদা-নগদিই তো। অক্ষয়ও একটু কাষ্ঠহাসি হাসল। বলল—"না, না, ধমক কিসের?...তা, কি খবর?"

"দাদা কিছু বলেন নি?"—আমার দিকে চাইল গোবর। আমি একটু হেসে শুধু ভূমিকা ক'রে দেওয়ার মতো ক'রে বললাম—

"তুমিই বলো না; খাতা তো তোমার কাছেই।"

"চাঁদার খাতাই কাকা। মাস্টারমশাইয়ের মেয়ের বিয়ের জোগাড়যন্ত্র হচ্ছে..."

"কে মাস্টারমশাই?"

"সরকারী মাস্টারমশাই বলতে এখানে আর কে আছেন—ছিলেন বলাই ঠিক—মথুরা মাস্টারমশাই। তাঁর মেয়ে মিতুর—মানে, মৈত্রেয়ীর বিয়ে..."

একশ টাকা!!

"তা চাঁদা ক'রে কেন?"

"আর উপায় কি বলুন? কোন উপার্জন নেই, মেয়েটি বড়ও হয়ে উঠেছে। আর সে-হিসেবে বলতে গেলে ঠিক চাঁদাও তো নয়। ও'র ছাত্রেরা যাঁরা বড় হয়েছেন গুরুদক্ষিণা হিসেবে নিজেদের মধ্যে টাকাটা তুলে দিয়ে দিচ্ছেন বিয়েটা। তা আপনার মতন কৃতী কেউ হননিও তো।"

"তোমাদের ঐ এক কথা, মস্ত বড় কৃতী হয়েছি। অথচ বাজারের অবস্থা যে কী যাচ্ছে! ... তোমাকেও পাকড়েছে তো শৈলেন?"

"বাদ দেওয়ার পাত্র গোবর?"—একটু হেসেই বললাম আমি।

একটু মুখ নীচু ক'রে ভাবল অক্ষয়। তারপর ভাবভঙ্গি বদলে ফেলে একটু যেন নরম হয়েই বলল—"কি জানো গোবর?—একটা সময় সত্যিই এসেছিল যখন মাস্টারমশাইয়ের এ কাজটুকু নিজেই ক'রে দিতে পারতাম, এ-চাঁদার লজ্জাটা আর পেতে দিতাম না গুরু-মাকে—হ্যাঁ, গুরুদক্ষিণা বলো, যাই বলো, চাঁদা ভিন্ন আর কি? কিন্তু বাজার অতি খারাপ, রীতিমতো একটা ক্রাইসিস্ যাচ্ছে ব্যবসায় এখন..."

"সেটা জেনেই আপনার নামে সেইরকম ধরা হয়েছে কাকা।" ওর কথা শুনতে শুনতেই খাতাটা খুলছিল গোবর, বাড়িয়ে ধ'রে বলল—"এই দেখুন না।"

"একশ' টাকা!!"—একেবারে শিউরে উঠল অক্ষয়। বলল—"এই তোমার 'সেইরকম' ধরা? ক্রাইসিস্ যাচ্ছে জেনেও?"

চুপ ক'রে পাতাগুলো উল্টে উল্টে দেখে মুখটা আরও অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল অক্ষয়ের। বন্ধ ক'রে খাতাটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়েই বলল—"নাঃ, আমার নাম তোলাই অন্যায় হয়েছে গোবর।...যা লিখেছ, সবাইকে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে লিখেছ?"

"এমনি পারি কাকা?"

"এই তো আমার বেলায় করেছ।"—একটু রেগেই বলল অক্ষয়। সঙ্গে সঙ্গে একটু নরম হয়ে যেন মিনতির ভঙ্গিতেই বলল—"না গোবর, ঐ তো বললাম—এক সময় একলার ঘাড়েই সবটুকু তুলে নিতে পারতাম—তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছিলাম, দক্ষিণাটা হোতও তাঁর উপযোগী। এখন—এখন আমার দ্বারা কোন মতেই হবে না..."

"কত লিখব, তাই বলুন।"

"এখন, নেহাৎ তুমি যখন এসেছ—" বাইরের দিকে চেয়ে সারা বাজারের বর্তমান অবস্থাটা যেন হিসাব ক'রে নিয়ে বলল—"তা ভিন্ন কাজও মাস্টারমশাইয়েরই—তা গোটা পঁচিশ টাকা লিখে নাও আমার নামে—নিয়েই যাও না হয়..."

উঠতে যাচ্ছিল, তার আগে গোবরই একটু হেসে উঠতে উঠতে বলল—"তাঁর দক্ষিণাটা ভিক্ষেয় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে না কাকা?"

—আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

গলির মোড়ে আমার জন্য অপেক্ষাই করছিল গোবর, দেখা হ'লে সঙ্গ নিয়ে একটু অনুযোগের স্বরেই বলল—

"আপনি রয়েছেন তল্লাশ নিয়েই গিয়ে উপস্থিত হলাম, অথচ একটা কথা বললেন না দাদা।"

বললাম, "বেরোয় কথা মুখ দিয়ে ঐসব শুনে গোবর, বল্ না? ঘেন্না ধ'রে যায় না—মাস্টারমশাইয়ের কাজ—স্রেফ বাজার দেখিয়ে গেল হে! পারল!"

একটু হাসল গোবর, যেন একটু খুশী হয়েই বলল—"যাক, আপনারও ঘেন্না ধ'রে তাহলে বাঁচলাম।"

হেসে বললাম, "আর একটা কথা বলি গোবর। চাঁদা তুলতে গিয়ে তুমিও যেন চটিয়েই চললে ওকে।"

"আপনার কাছেও অবিচার দাদা? ওঁর দিকটা দেখলেন না, গোড়া থেকেই।"

বললাম, "ও তো আছেই, তায় চাঁদার খাতা হাতে দেখেছে।"

"তাহলে আসল কথাটা বলি দাদা।"—দাঁড়িয়েই পড়ল গোবর, একটা মোড়ের মাথায়

এসে পড়েছি, দুজনে দুদিকে যাব, বলল—"টাকা বের করবার হদিসটা আপনি জানেন না দাদা, ও পাপ তো করতে হলো না। কোথাও পায়ে ধরতে হয়, কোথাও আবার চোখ না রাঙালে চলে না। তার ওপর গোড়াতেই মনটা খিঁচড়ে দিলেন তো—দেখলেনই। কেন খোশামোদ করতে যাই দাদা? ওঁরই কপাল মন্দ বলতে হবে, শ'খানেক দিয়েই নিষ্কৃতি পেতেন, তার জায়গায়..."

"করবে তুমি আদায়!" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি। গোবর হেসে বলল, "অন্তত এর ডবল তো বটেই, তার কমে রাজি হতে যাব কি দুঃখে বলুন?"

"কি ক'রে?"

গোবর খপ ক'রে নীচু হয়ে পায়ে হাত বুলিয়ে মাথায় দিল, বলল, "পায়ের ধুলো দিন। একটা প্ল্যান উঁকি মারছে, তবু আর একটু পরিষ্কার হোক মাথাটা। তবে, নিশ্চিন্দি থাকুন আপনি।...যাই বদ্যিপাড়ার দিকটা একবার ঘুরে আসিগে।"

দিন সাতেক আর দেখা নেই গোবর্ধনের। তারপর একদিন সকালে বারান্দায় ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে কাগজ পড়ছি, খাতাটা হাতে করে এসে উপস্থিত হলো। বললাম, "কি হে, গোবর্ধন যে একেবারে অন্তর্ধান হয়েছিলে?"

আসতে-যেতে প্রণামটা পায়ে হাত দিয়েই করে, মাথা তোলে না। সেরে নিয়ে একটা মোড়ায় বসতে বসতে বলল, "মনে করলাম, পাপের দিকটা আগে শেষই ক'রে নিই, তার-পর একেবারে গিয়ে শুদ্ধ হওয়া যাবে। সাকসেসফুল দাদা!"

"উঠছে চাঁদাগুলো? আর তো সময়ই নেই।"

"বাড়তির দিকেই দাদা।"

"তার মানে?"—প্রশ্ন করলাম আমি।

"দশ পার্সেণ্ট বাড়িয়ে দিতে হবে দাদা আপনাদের সবাইকে, আমি ছাড়ছি নে।"—আব্দারের টোনে বলে একটু নড়ে বসল গোবর, বলল, "কাঠ থেকে রস বের করেছি, মিতুটা দাদা-দাদা ক'রে, কাজটা একটু ভালো ক'রেই..."

"দিয়েছে অক্ষয় তাহলে!"—প্রবাদটার অর্থ খুঁজছিলাম আমি, স্পষ্ট হয়ে যেতেই প্রশ্নটা করলাম। একটু লজ্জিতভাবে হেসে মুখটা নীচু ক'রে রইল, তারপর শুরু করল—

"ক'দিন যে আসতে পারি নি দাদা, বেশ খানিকটা খাটুনি গেছে; খাটুনির চেয়ে ফিকির-ফাঁন্দ, ঘোরাঘুরি বলাই ঠিক। প্রথমত, ফটোটা বের করতে হলো বাড়ি থেকে, পাশ কাটিয়েই বের করা তো, টের পেলে তো নিজেদের গলা কাটা পড়ার জন্যে দেবে না। তারপর আর্টিস্ট খুঁজে বের করা, তারপর ঠিক লাগসই-মাফিক জায়গাটা বের
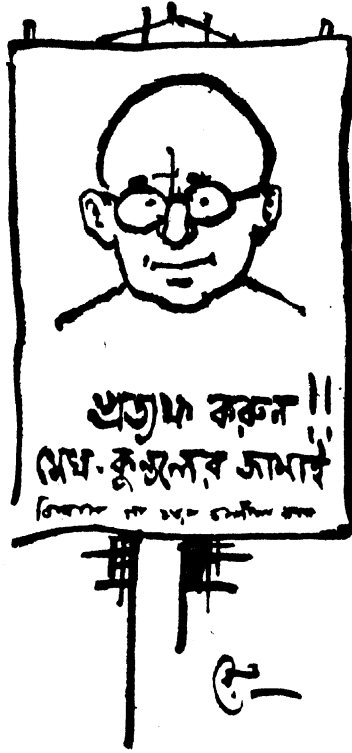
করতেও পুরো একটা দিন কেটে গেল কলকাতায়। ট্যাক্সি ক'রে ঘোরা নয় তো দাদা, দুটি পা। ঘুরে ঘুরে যখন জবাব দিচ্ছে, খানিকটা ট্রাম, কি বাস, নেহাৎ ঠাণ্ডা করবার জন্যে। একটাই আপাতত, তবু তো গোটা-কতক দেখে রাখতে হয়। শেষে অনেক ঘুরে ফিরে বাগবাজারের মোড়ে একটা জায়গা ঠিক করলাম।

কলকাতা শহরটাকে বোধ হয় খুব ভালো করে জানা নেই দাদার। না থাকে সেই ভালো; তবে আমার তো খানিকটা করতেই হয় ঘাঁটাঘাঁটি। একেবারে জাত-কলকাতা বলতে হয় তো পয়লা নম্বর বাগবাজার, তার-পরেই শ্যামবাজার। বড়বাজার লেন-দেন নিয়ে মশগুল, অন্যদিকে ঘুরে চাইবার ফুরসত নেই, কলেজস্কোয়ার লেখাপড়া, বই-খাতা, চৌরঙ্গী খেলাধুলো, বালিগঞ্জ তার লেক, বাগবাজার-শ্যামবাজার হুজুগ, সব মিলিয়ে কলকাতার যা মূলধন। জায়গাটা বাছবার আর একটা কারণ, অক্ষর কাকাদের কলকাতার আফিসটা কাছাকাছি পড়ে, কথাটা গিয়ে পৌঁছুতে দেরি হবে না। তারপর, স্থান-মাহাত্ম্য বোঝেন তো, নৈলে ব্যবসাটা অত ফলাও করলেনই বা কি করে?—ঐখানটাই দেখলাম ও'দের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপনটাও রয়েছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তেলেরটাই ওখানে আসল। হুজুগে-মাথা গরমের জায়গাই তো; বোঝেন। বেশ বড় একটা সাইনবোর্ডে দিব্যি ফলাও করে একটা ছবি। তার সঙ্গে বোধ হয় কোন নাম-করা সাহিত্যিককেও পাকড়াও করে "মেঘকুন্তল"-এর জয়জয়কার! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম, মনে মনে বললাম—এই জায়গা।

আজকাল পাড়ায় হাতে—লেখা ম্যাগা-জিনের ধুম পড়ে গেছে, নিশ্চয় নজরে পড়েছে দাদার। সাহিত্য কিছু বুঝি না, কবিতাতো বুঝতে পারলেই বোকা, তবে দেখেছি ছবিগুলো প্রায়ই আঁকে ভালো। নামটা আর করব না, তাদেরই একটি ছোকরাকে ধরলাম—না হলে পয়সা পাচ্ছি অত কোথায় দাদা? বললাম—ভাই এই ফটো; একটি বড় কাগজে এর একটা বেশ বড় দেখে আউট লাইন ছবি এ'কে এই বাজারে রং দিয়ে ভরে দিতে হবে, দেখছই তো বেশি খাটতে হবে না তোমায়—শুধু ড্রয়িংটা আর একটানা একটা রং। দেখছই তো কোন হাঙ্গাম নেই ফটোর।

আমি প্রশ্নের দৃষ্টিতে চাইতে গোবর বলল—"সে বলছি দাদা। একটু আমড়া-গাছি করতে রাজি হয়ে গেল। চারখানা করে ডবল ফুলস্কেপ জুড়ে গোটা দুয়েক ঢাউস্ কাগজ নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে, পরের-দিনই ফিনিশ্ করে দিয়ে দেয় ছোকরা। ব্যাগটার মধ্যে নিয়েই ঘুরেছিলাম।

সন্ধ্যের খানিকটা আগে দাদা, এদিক থেকে ফুরসত হয়ে বাগবাজারের হুজুগ যখন পুরোমাত্রায়। সামনের পার্কটা ছেলেয়-বুড়োয় ভরে গেছে, রাস্তায় অকাজের ভিড়; বিশেষ করে ভিড় জমে উঠছে বিজ্ঞাপন-গুলোর সামনে। যা দরকার আমার।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে কথাটা যে বলেছে তা দেখলাম ঠিকই দাদা। নিজের দ্বারা তো হওয়ার নয়, একটা লোক খুঁজ-ছিলামই এমন সময় সিঁড়ি, সিনেমা-বিজ্ঞাপনের বাণ্ডিল আর লেই গোলা নিয়ে সশরীরে স্বয়ং এসে উপস্থিত। বললাম 'বাপু, বিশেষ দরকার কোম্পানীর, একটা টাকা দিচ্ছি, তুমি এইটেও ওই বোর্ডের নীচে ছবিটার পাশে এ'টে দাও।

"আপনি ভাবছেন চেহারাটা আঁকিয়ে গালমন্দর তুবড়ি ছুটিয়েছি।" জিভ কাটল গোবর, বলল, "কী দরকার দাদা? তা ছাড়া

কাকা বলে আসছি, গুরুজনও তো। সাঁটা হয়ে গেল।

তারপরেই আর কি। দেখেছেন তো লেই লাগিয়ে কাগজগুলো সাঁটতে সাঁটতে যেন ডাক গাড়ি ছুটিয়ে চলে বেটারা। ও-ও গেছে সিঁড়ি কাঁধে করে—পড়ার ধুম পড়ে গেল—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে—ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—মুখিয়ে রয়েছে সবাই তো হুজুগের জন্যে—

'প্রত্যক্ষ করুন! মেঘ-কুন্তলের জামাই!! না-বিশ্বাস হয়—দেখে আসুন! জোড়া-সাঁকো! চোদ্দ নম্বর চিনু গোস্বামীর গলি!'

আর কিছু নয় দাদা। সাহিত্যিক নইতো; ম্যালা আসবে কোথা থেকে? কিন্তু কাজ হলো। ভিড় জমে গেল বিশ থেকে পঞ্চাশ, পঞ্চাশ থেকে দুশো, দুশো থেকে হাজার। দেখতে দেখতে যেন সাগরের জল ফুলে উঠছে দাদা। তা যশটা তো ভাণ্ডার নয়, যশটা হলো মেঘকুন্তল—মানে অক্ষয় কাকার জামাইয়েরই। কপাল থেকে যত দূর দৃষ্টি যায়, ওপরে, ডাইনে, বাঁয়ে—শুধু টাক, টাক, আর টাক। যেন মরুভূমিটা পড়ে রয়েছে। বেচারি অনেক আশা করে মেঘ-কুন্তলের শরণাপন্ন হয়েছিল—এখন করছেও ঐ কাজ,

দেখো বাপু, কাজটায় যেন খুঁত না থাকে কিছু

অক্ষয় কাকা ম্যানেজার করে দিয়েছেন তো ফ্যাক্টরীর, কিন্তু একগাছাও চুল তো হাসিল হলো না।

দূরে আলতো ভাবে দাঁড়িয়ে যখন সাতটা তেত্রিশেরটা ধরবার জন্যে ফিরছি, তখন সারা তল্লাটটা গমগম করছে। আবার কাছেই পার্কটাও রয়েছে তো।

ঐ একটাতেই কাজ হয়ে গেল দাদা, আপনাদের আশীর্বাদে।

আজ এই খানিক আগে ডেকে পাঠিয়েছিলেন অক্ষয়কাকা। দৃষ্টিতে সন্দেহ যে লেগে রয়েছে সেটা বেশই স্পষ্ট, তবে ও কথা আর একেবারেই তুললেন না।...'এই যে, এসে গেছ গোবর, বোস বোস'। ওহে, সেদিন ফ্যাক্টরীর একটা সমিস্যে নিয়ে রয়েছি, ঠিক সেই সময় তুমি এসে হাজির। মাথার ঠিক ছিল না, কি বলতে কি বলেছি।...কতবড় একটা সৌভাগ্য মাস্টার মশাইয়ের একটু সেবা করতে পারছি: তুমি নিঃস্বার্থ হয়ে চেষ্টা করছ বলেই তো। নাও এই টাকাটা, পকেটে পকেটেই ঘুরছে—মনটা বড় খারাপ হয়ে রয়েছে তো। দেখো বাপু, কাজটায় যেন খুঁত না থাকে কিছু। রয়েছিই তো সবাই আমরা।'

এই দুশ একান্নটি টাকা দাদা, আনকোরা নোট। মনে হয় না ভক্তির সঙ্গে দিলু বেশ খোলসা করেই দিয়েছেন?"
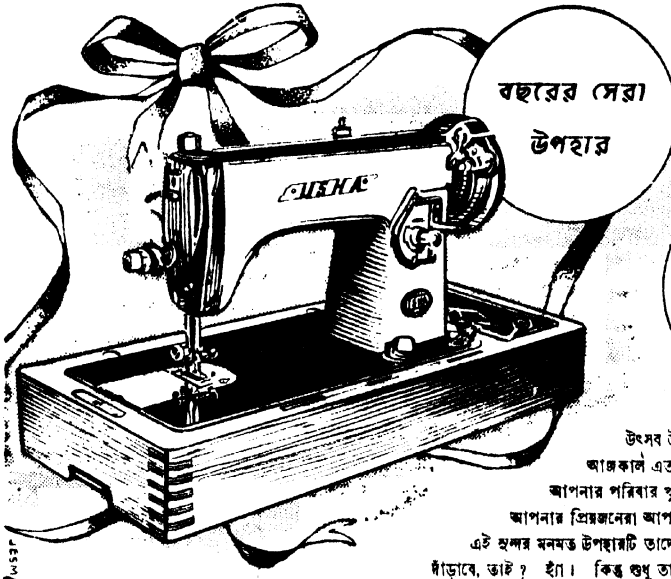
মনিহারী স্কুলের নূতন শিক্ষক আসিয়াছিলেন শ্রীনাথবাবু। অনেক-দিন আগেকার কথা। তখন মনিহারী স্কুল হাই স্কুল হয় নাই, মাইনর স্কুল ছিল। মাইনর স্কুলেরও সমৃদ্ধি ছিল না কোনও। মাটির দেওয়াল খড়ের চাল। এটাও হইয়াছিল পণ্ডিত দুর্গা ওঝার বদান্যতায়। পণ্ডিত দুর্গা ওঝা পণ্ডিত ছিলেন না, মহাপণ্ডিত ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার অক্ষর-পরিচয় পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু কৃতী পুরুষ ছিলেন তিনি। সামান্য রেলওয়ে পয়েন্টস্‌ম্যান রূপে কর্ম-জীবন আরম্ভ হইয়াছিল তাঁহার, সে চাকরি অবশ্য বেশী দিন তিনি করেন নাই। চাকরি ছাড়িয়া ব্যবসা ধরিয়াছিলেন। গোলাদারি ব্যবসা। কর্মজীবন যখন তাঁহার শেষ হইল তখন দেখা গেল তিনি হাজার বিঘা জমি, ব্যাঙ্কে কয়েক লক্ষ টাকা এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসা রাখিয়া গিয়াছেন। মনিহারী গ্রামের ডাক্তারের ছোট ভাই চারুবাবুকে খুব ভক্তি করিতেন দুর্গা ওঝা। চারুবাবু সত্যই ভক্তি করিবার মতো লোক। অত্যন্ত স্নেহ-শীল এবং পরোপকার করিবার জন্য ব্যস্ত। গ্রামের মধ্যে তিনিই ছিলেন বোধহয় একমাত্র লোক যিনি সেকালের এফ-এ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। বহু লোকের ইংরেজি চিঠিপত্র তিনি পড়িয়া দিতেন এবং উত্তরও লিখিয়া দিতেন। দুর্গা ওঝা রেলের কুলি কন্‌ট্র্যাক্‌ট লইয়া ছিলেন। সুতরাং অনেক ইংরেজি চিঠি আসিত তাঁহার কাছে। চারু-বাবুই সব চিঠি পড়িয়া জবাব দিতেন। চারুবাবুকে এই সব কারণে খুব শ্রদ্ধা করিতেন দুর্গা ওঝা। চারুবাবুর রস-বোধ ছিল, তিনিই নিরক্ষর দুর্গা ওঝাকে পণ্ডিত আখ্যা দিয়াছিলেন। মনিহারীর অপার প্রাইমারি স্কুলকে যখন মাইনার স্কুল করি-বার চেষ্টা হইতেছিল তখন কর্তৃপক্ষ বলিলেন মাইনার স্কুলের নিজস্ব বাড়ি হইলে তাঁহারা মাইনার স্কুল করিবার অনুমতি দিবেন। অপার প্রাইমারি স্কুলটি বসিত গ্রামের দুর্গাস্থানে। সেখানে মাইনার স্কুল হওয়া অসম্ভব। স্কুল গৃহের জন্য চাঁদার খাতা খোলা হইল। কিন্তু মাস তিনেক চেষ্টার পরও কোনও সন্তোষজনক ফল দেখা গেল না। পাশাপাশি দশখানি গ্রাম হইতে মাত্র পঞ্চাশ টাকার প্রতিশ্রুতি মিলিল। চারুবাবু দুর্গা ওঝাকে বলিলেন, 'এখানে যদি মাইনার স্কুল হত আমিই হয়তো হেড-মাস্টার হতে পারতাম।' দুর্গা ওঝা বলিলেন —স্কুল হলে আপনি থাকবেন? বেশ, আমিই স্কুল করিয়ে দেব। যদিও মাটির দেওয়াল এবং খড়ের চাল তবু ওঝাজির প্রায় হাজার দুই টাকা খরচ হইয়াছিল শুনিয়াছি।

এই স্কুলে শ্রীনাথবাবু শিক্ষক হইয়া আসিয়াছিলেন। হেড পণ্ডিত। বেতন কাগজে কলমে মাসিক কুড়ি টাকা। কিন্তু তাঁহাকে দেওয়া হইত ষোল টাকা। এই শর্তেই তিনি চাকুরি লইয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট টাকা দিতেন না, ছাত্র সংখ্যাও বেশী ছিল না। অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিয়মিত দিতেন না। যাঁহার মাসে মাত্র চার আনা করিয়া দিবার কথা, দেখা যাইত তাঁহারও কাছে দশ বারো টাকা বাকী পড়িয়াছে। সুতরাং বাধ্য হইয়াই শিক্ষকদের বেতন কমাইতে হইয়াছিল। চারুবাবু বহু-কাল বিনা বেতনেই কাজ করিয়াছিলেন।

শ্রীনাথবাবুর বাড়ি ছিল বীরভূম জেলার কোন গ্রামে। নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পাশ। অদ্ভুত চেহারা ছিল ভদ্রলোকের। সর্বাঙ্গের চামড়া কেমন যেন ঢিলা, একেবারেই আঁটসাঁট নয়। কপালে বহু রেখা। ভুরুর চামড়া ঝুলিয়া প্রায় চোখের উপর পড়িয়াছে। গালের চামড়াও ঝোলা-ঝোলা। কান দুইটা অস্বাভাবিক লম্বা। তাঁহাকে দেখিয়া মানুষ বলিয়া মনে হইত না, মনে হইত কোনও জন্তু বুঝি। হাসিলে মুখটা আরও কদর্য, হইয়া উঠিত, রাগিলে আরও ভীষণ। তাঁহার ঢিলা চামড়া দেখিয়া সন্দেহ হইত এককালে তিনি সম্ভবত বেশ মোটাসোটা ছিলেন। কোনও

কারণে চামড়ার নীচের চর্বি লোপ পাওয়াতে চেহারাটা এইরূপ হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার পড়াইবার ধরনটা ছিল একটু নূতন ধরনের। বাংলা পড়াইতেন। বাংলায় 'রচনা' একটা প্রধান বিষয়। ক্লাসে একটা ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "কানাই, গ্রীষ্মকাল সম্বন্ধে রচনা লিখতে বললে কি কি লিখবে বল।"

কানাই যথাসাধ্য বলিয়া গেল। কোন কোন মাসকে গ্রীষ্মকাল বলে, আকাশের কোথায় সূর্য থাকিলে গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হয়। গ্রীষ্মকালের কি কি অসুবিধা, কোন দেশে গ্রীষ্মকাল কত দিন থাকে—এই সব।

"তুমি তো আসল কথাই বলছ না। গ্রীষ্মকালের উপকারিতা কি—"

কানাই মাথা চুলকাইয়া বলিল, "গ্রীষ্মকালে স্কুলের ছুটি হয়—"

শ্রীনাথ পণ্ডিতের মুখ আরও কদর্য হইয়া গেল। তিনি হাসিয়া ফেলিলেন।

"তা হয় বটে, কিন্তু তাতে তো তোমাদেরই খালি সুবিধা হয়, আর কারো তো হয় না। যাতে সকলের উপকার হয় সেইটেই উপকারিতার মধ্যে ধরতে হবে। গ্রীষ্মকালের আর কি উপকারিতা আছে বল—"

একটি ছেলে বলিল—"গ্রীষ্মকালে নদীর জল, পুকুরের জল, সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে আকাশে ওঠে। তার থেকে মেঘ হয়ে বৃষ্টি হয়—"

শ্রীনাথ পণ্ডিত ধমকাইয়া উঠিলেন।

"তোমার খুব দূরদৃষ্টি আছে দেখছি। বস। আসল কথাটা কেউ বলছ না কেন—"

ঘনশ্যাম মাথা চুলকাইয়া বলিল—"গ্রীষ্মকালে আম হয়—"

কথাটা শ্রীনাথ পণ্ডিত যেন লুফিয়া লইলেন।

"হ্যাঁ—। এইবার আসল কথাটি বল। গ্রীষ্মকালে আম হয়, কত রকম, কত সুন্দর। বোম্বাই আম, ল্যাংড়া আম, কিষণ ভোগ, ভরত ভোগ ক্ষীরস পাতি। কামড়ে খাও, চুষে খাও, শুধু খাও, দুধ দিয়ে খাও, ক্ষীর দিয়ে খাও—"

শ্রীনাথ পণ্ডিত বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। চেয়ারের উপর বসিয়া দুলিতেন।

"গ্রীষ্মকালে আর কি ফল হয়—"

"লিচু—"

"হ্যাঁ—লিচু, লিচু। ইয়া বড় বড় রসে ভরা লিচু। যেমন রং, তেমনি খেতে—"

শ্রীনাথ পণ্ডিতের চোখ বুজিয়া যাইত। মনে হইত সত্যই বুঝি তিনি একটা লিচু মুখে পুরিয়াছেন।

কোথাকার লিচু সব চেয়ে ভালো বলতো—"

কেহই বলিতে পারিত না।

"মজঃফরপুরের। মজঃফরপুরের লিচুর তুলনা নেই। যেমন স্বাদ তেমনি গন্ধ। সাইজ বড়, ছোট আঁটি। তোমাদের পীরবাবার পাহাড়ের সামনে যে জাম গাছ তার জাম খেয়েছ কখনও?"

একাধিক বালক উত্তর দিল, "খেয়েছি—"

"কি রকম খেতে?"

"ভালো—"

"ভালো বললে কিছুই বলা হয় না। বল—তোফা। ইয়া বড় বড় গুবরে পোকার মতো চেহারা, শাঁসে ভরতি" এইভাবে শ্রীনাথ পণ্ডিত বিভিন্ন ঋতুর 'উপকারিতা' পড়াইতেন। বর্ষাকালের উপকারিতা কি? আম কাঁটাল বিশেষ করিয়া সিঁপিয়া ও শুকুল আম। শরৎকালের উপকারিতা তাল, বড় বড় তাল। তাহার পরই পূজো। পূজোয় কত প্রকার সুখাদ্য খাইবার সুযোগ আসে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিতেন। শরৎকালে ইলিশ মাছেরও প্রাদুর্ভাব হয়। বিশেষ করিয়া ভাদ্র মাসে। এই প্রসংগে পদ্মার ইলিশের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন তিনি। হেমন্তকালের উপকারিতা কি? অনেকেই জানিত না। শ্রীনাথ বলিয়া দিতেন, কমলালেবু। বড় বড় কমলালেবু বাজারে আসে তখন। শীতকালে? মাছ। বড় বড় রুই কাতলা, মৃগেল মাছে বাজার ভরিয়া যায়। চিংড়িও অনেক। গলদা চিংড়ির বর্ণনা গদগদ ভাষায় করিতেন। বসন্ত কালে? সজিনা ডাঁটা, আর কচি আমের সমারোহ। চচ্চড়ি আর কাঁচা আমের ঝোল কত খাইবে খাও না।

ভূগোলও পড়াইতেন তিনি। কোন স্থান কিসের জন্য বিখ্যাত তাহা পড়াইতে হইত। কিন্তু তাঁহার বিবরণ পুস্তকের বিবরণের সহিত মিলিত না। বহরমপুর কিসের জন্য বিখ্যাত? সিল্কের জন্য নয়, ভালো পানতোয়ার জন্য। বর্ধমান? মহারাজার জন্য নয়, সীতাভোগ, মিহিদানার জন্য। মালদহের মটকার জন্য তাহাকে মনে করিয়া রাখিবার দরকার নাই। মটকা আরও অনেক জায়গায় হয়। মালদহ প্রণম্য আমের জন্য এবং খাজার জন্য। শান্তিপুরকে মনে রাখিতে হইবে শাড়ির জন্য নয়, সর-ভাজার জন্য। দেওঘরকে প্যাড়ার জন্য, বৈদ্যনাথের জন্য নয়। আমাদের দেশে শিব প্রতি শহরে প্রতি গ্রামে গিজগিজ করিতেছে। এই জন্যই কাশীর আসল মাহাত্ম্য তাহার বেগুনে, পেয়ারায় এবং ল্যাংড়া আমে, বিশ্বনাথে নয়। ভাগলপুরের তসরের কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু ভাগলপুরের বালুসাই আর জরদালু আমের তুলনা মেলে কি? কে বলিল লক্ষ্ণৌ শহর জরির কাজের জন্য বিখ্যাত? লক্ষ্ণৌ শহরের গৌরব তাহার খরমুজ, তরমুজ এবং দশেরি আম। মন্দারে মধুসূদন আছেন বটে। কিন্তু মন্দারের জল যে একবার খাইয়াছে সে কি মন্দারকে ভুলিবে কখনও? শ্রীনাথ পণ্ডিতের দৃষ্টিকোণ বাস্তবধর্মী ছিল স্বীকার করিতেই হইবে। ধার্মিকও ছিলেন তিনি। শরীরং আদ্যং খলু ধর্মসাধনং এই মন্ত্রেই বিশ্বাস করিতেন। শরীর সুস্থ না থাকিলে কোনও ধর্মই পালন করা যায় না, আর শরীর সুস্থ রাখিবার প্রধান উপকরণ খাদ্য, সুখাদ্য। একবার মনিহারীর হাটের উপর এক সন্ন্যাসী আসিয়া বক্তৃতা দিতে ছিলেন। জীর্ণ শীর্ণ চেহারা সন্ন্যাসীটির, কোটরগত চক্ষু, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। বক্তৃতায় তিনি বলিতেছিলেন—ব্রহ্মচর্যই আসল। ব্রহ্মচর্য না করিলে শরীর টিঁকিবে না। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীনাথ পণ্ডিত উঠিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর যাহা বলিলেন তাহা জ্ঞানগর্ভ আধ্যাত্মিক বাণী। কিন্তু আমি একটি সাধারণ ছোট কথা আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। ব্রহ্মচর্যই করুন, অথবা লাম্পট্যই করুন, পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে হইবে। না খাইলে শরীর টিঁকিবে না।"

শ্রীনাথ পণ্ডিত নিজে কিন্তু ভালো খাইতে পাইতেন না। স্কুলের ষোল টাকা বেতন পাইবামাত্র তাহা বাড়ি পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল খগেন মোয়ারের বাড়িতে। বিনিময়ে সকাল-সন্ধ্যা তাঁহাদের বাড়িতে গিয়া তাহাদের জমিদারি সেরেস্তায় কাগজপত্র তাঁহাকে লিখিতে হইত। সেখানে খাওয়া বিশেষ সুবিধার ছিল না। ডাল ভাত এবং একটা ভাজা এবং কচিৎ কখনও একটা শাকসবজীর তরকারি। তাঁহারা অবশ্য রোজই 'দহি' দিতেন। কিন্তু তাহাতে এত ধোঁয়া-গন্ধ যে শ্রীনাথ পণ্ডিত তাহা খাইতে পারিতেন না।

একদিন অবশ্য তিনি ভাল খাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। নবাবগঞ্জের জমিদার ফুদ্দি সিংয়ের বাড়িতে, তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে। বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন তিনি। কলিকাতা শহর হইতে রাঁধুনী এবং ময়রা আসিয়াছিল।

মনিহারী গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং স্কুলের মাস্টার পণ্ডিতরা সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীনাথ পণ্ডিত সকলের সহিত মহা-উৎসাহে গেলেন সেখানে। হাঁটিয়াই গিয়াছিলেন, নবাবগঞ্জ মনিহারী হইতে মাত্র দুই মাইল। কিন্তু ফিরিলেন তিনি চারিজন লোকের স্কন্ধে! আহারের পরই তাঁহার ভেদবমি শুরু হয়। তাঁহার খাওয়ার বহর দেখিয়া সকলের না কি তাক লাগিয়া গিয়াছিল।

তাঁহার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় তাঁহার জিনিসপত্রাদি লইতে আসিয়াছিল। তাঁহার মুখে জানা গেল শ্রীনাথ পণ্ডিত এককালে বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার কোন অভাব ছিল না। হঠাৎ ব্যাংক ফেল করিয়া তিনি সর্বস্বান্ত হন। বাধ্য হইয়া তাই এই চাকুরিটি লইয়াছিলেন।

যা হলে হতে পারতো
কুন্দনন্দিনীর বিষপান
প্রমথনাথ বিশী

কুন্দনন্দিনী বিষ খেয়েছে, সংবাদ পাওয়ামাত্র সকলে তার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, সূর্যমুখী, কমলমণি, নগেন্দ্রনাথ এবং আর আর সকলে। তারা দেখলো যে, ছিন্নলতিকার মতো সুন্দর দেহ ভূপতিত, শয্যায় নয় খালি মেঝের উপরে, পাশে শূন্য বিষের কৌটা। সূর্যমুখী অশ্রুনেত্রে বলে উঠল, বোন, এ-সর্বনাশ করতে গেলে কেন?

কুন্দ বলল, দিদি, এ-সংসারে একজন লোক বেশি হ'য়ে গিয়েছে, তাই বারে বারে হিসাবে এমন গরমিল হচ্ছে। তুমি বিবাগী হ'য়ে বের হ'য়ে যাওয়ার পরে দেখা গেল যে, সংসার ভাঙে ভাঙে, কাজেই বুঝতে পারা গেল যে, সে অতিরিক্ত লোকটি তুমি নও। কাজেই আমি, তাই চলেছি।

বাক্কুণ্ঠিত সুন্দর মুখে এমন কথা শুনে সবাই অবাক হ'য়ে গেল, বুঝলো যে, সুন্দর মুখ দিয়ে সর্বজ্ঞ মৃত্যু কথা কইছে। প্রখর বুদ্ধিমতী কমলমণি বুঝলো যে, হীরা বিষ জুগিয়েছে। হীরাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

নগেন্দ্রনাথ পাষাণ মূর্তির মতো নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। সে ভাবছিল, সংসারে সুখের ব্যাপারে ভ্রম সংশোধন সম্ভব নয়। সূর্যমুখীতে সুখ নেই ভেবে কুন্দনন্দিনীকে দিয়ে ভ্রম সংশোধন করতে গিয়েই এই মহাবিপত্তিটি সে বাধিয়েছে।

এমন সময়ে গাঁয়ের সরকারী ডাক্তারখানার ডাক্তারবাবু এসে উপস্থিত হলেন। কুন্দ বিষ খেয়েছে শুনেবামাত্র কমল ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছিল। ডাক্তারবাবুর বিদ্যা ফিভার মিকশ্চার বিতরণ অবধি। তিনি ঘরে ঢুকেই বললেন, কোন ভয় নাই ভগবানকে ডাকুন। ডাক্তার যখন ভগবানকে ডাকতে বলে আর বাঘে যখন ধান খায়, তখন বুঝতে হবে সত্যই দুঃসময়। ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা ক'রে বললেন, মেডিকেল কালেজে আমরা যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছি, তার কিছুই নেই এখানকার ডিসপেন্সারিতে, নতুবা এ-রুগী সারিয়ে তুলতে কতক্ষণ! বলা বাহুল্য, কলেজ স্ট্রীট দিয়ে যাতায়াত ছাড়া মেডিকেল কলেজের ধারে কাছেও তিনি যাননি।

সকলে যখন কুন্দর আরোগ্যের আশা ছেড়ে দিয়েছে, এমন সময়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক ব্যাপার ঘটলো। হেমচন্দ্র বসু নগেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী, কলিকাতায় কর্ম করেন, কয়েক দিনের জন্যে গ্রামে এসেছেন, সঙ্গে এসেছে তাঁর বন্ধু রমেশচন্দ্র নাগ, মেডিকেল কলেজের পাশ-করা বিচক্ষণ ডাক্তার।

তিনি ঘরে ঢুকে বললেন, নগেন্দ্রবাবু, বিনা ডাকেই এলাম, দুঃসময়ে ডাকের অপেক্ষা করতে নেই।

তারপরে রমেশবাবুকে দেখিয়ে বললেন যে, ইনি আমার বিশেষ বন্ধু, পাশ-করা অভিজ্ঞ ডাক্তার। যদি অনুমতি করেন তো ইনি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

নগেন্দ্রনাথ বলল, বিলক্ষণ! এ আর বলতে। আপনাদের বিশেষ অনুগ্রহ যে, আপনারা এসেছেন।

রমেশবাবু বিষের কৌটা পরীক্ষা ক'রে বললেন যে, আফিঙ ছিল, ভয় নেই, হয়তো পারবো।

তখন তিনি রোগিণীর মুখের ভিতরে নল চালিয়ে দিয়ে যথারীতি পাম্প করতে শুরু করলেন। আফিঙ তখনো রক্তস্রোতে মেশে নি, পাকস্থলীতেই ছিল, অল্পে অল্পে নিঃসারিত হতে লাগলো। এইভাবে দীর্ঘকাল পাম্প করবার পরে যখন শুধু জল উঠতে লাগলো, রমেশবাবু বললেন, যাক্ এবারের মতো রক্ষা পেলেন। এবারে এঁকে আপনারা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গরম দুধ পান করতে দিন, আর ভয়ের কারণ নেই।

তারপরে বললেন, আজকের দিনটা মুহ্যমান হ'য়ে থাকতে পারেন, কিন্তু কালকেই বেশ সতেজ হ'য়ে উঠবেন।

এই বলে তিনি, হেমবাবু, নগেন্দ্রনাথ ও সরকারী ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, রইলো কেবল মেয়েরা। বের হওয়ার আগে সরকারী ডাক্তার মন্তব্য করলেন, যন্ত্রে করে কাম, হয় মর্দের নাম, ওসব যন্ত্রপাতি পেলে আমিও পারতাম। ভারি তো ডাক্তার, কলকাতায় কেউ নামও জানে না।

॥ ২ ॥

কুন্দনন্দিনী সেরে উঠতেই নূতন সমস্যা দেখা দিল।

সূর্যমুখী বলল, কুন্দ আমার ছোট বোন, এই সংসারেই থাকবে।

নগেন্দ্রনাথ বলল, তা হতেই পারে না।

সূর্যমুখী শুধায়, তবে ঐ অসহায় মেয়ে কোথায় যাবে?

যেখানে সুবিধা বোধ করে যাক, উচিত মাসোহারার বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।

ওর আর আছে কে যে, সেখানে যাবে।

সে দায়িত্ব আমার নয়।

সে কি কথা, ওকে তুমি কি বিয়ে করোনি?

ভুল করেছিলাম সূর্যমুখী।

তোমার ভুলের দায় ও কেন বহন করতে যাবে?

তর্কের মীমাংসা হয় না, হওয়ারও নয়। রূপের মোহ যখন ভাঙে, অবশিষ্ট থাকে মাংসপিণ্ড, তার বীভৎস চেহারা মানুষকে ক্ষিপ্ত ক'রে তোলে, সে অবস্থায় হত্যা, আত্মহত্যা কিছুই অসম্ভব নয় তার পক্ষে।

কুন্দনন্দিনী এখনো শয্যাশায়িতা, মাঝে মাঝে আসে সূর্যমুখী আর কমলমণি। আরো একটি পদধ্বনির আশায় হয়তো কুন্দ উৎকর্ণ কিন্তু সে পদধ্বনি আর বাজে না। সে একা একা শুয়ে ভাবে, সদয় মৃত্যুও তার প্রতি নির্দয়। বিষপান ক'রে কঠিন সমস্যার সরল সমাধান সে করতে গিয়েছিল—তাও হল না তার ভাগ্যে।

চিন্তায় প্রবীণতা লাভ করলে সে বুঝতে পারতো সংসারে কঠিন সমস্যার সরল সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু সে এত বোঝে না, তাই শুয়ে শুয়ে কাঁদে। কোন কোন লোক সংসারে কাঁদতেই এসেছে। কুন্দ তাদেরই একজন।

দত্ত পরিবারের কঠিনতম সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো কুন্দনন্দিনী। যে নগেন্দ্রনাথ একদিন তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সূর্যমুখীকে উপেক্ষা করে তাকে বিবাহ করেছিল আজ সে বিরূপ। আর যে সূর্যমুখী আত্ম-ধিক্কারে নিজ হাতে গড়া সংসার ত্যাগ করে-ছিল—আজ সে-ই হচ্ছে কুন্দর একমাত্র নির্ভর। সংসারে এ-ও এক বিচিত্র হের-ফের। ভবিতব্যের হাত কখন যে পাশায় কী দান নিক্ষেপ করবে তা কেউ বলতে পারে না।

অবস্থা যখন বেশ জটিল হয়ে উঠেছে তখন কমলমণি বলল, দাদা, বৌদি, শোন, তোমরা ধীরে সুস্থে বসে সমস্যার সমাধান করো। আমি আপাতত কুন্দকে নিয়ে কলকাতায় চললাম।

নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখী একযোগে বলে উঠল—সে কী!

এ ছাড়া তো উপায় নেই। মেয়েটা তো পথে পড়ে মরতে পারে না।

নগেন্দ্র বলল, কিন্তু শ্রীশবাবুর তো মত নেওয়া চাই।

দাদা আমাদের সংসারে স্বামীস্ত্রীর দুই মত নয়।

কথাটা নগেন্দ্র ও সূর্যমুখী দুজনকেই বিঁধলো। দুজনেই দীর্ঘনিশ্বাস চেপে ভাবল তাদের সংসারেও একদিন এই রকম ছিল।

কমলমণির যে কথা সেই কাজ। দিন তিনেকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে নিয়ে সে কলকাতা রওনা হল। যাওয়ার সময় বলে গেল—দাদা, বৌদি, তোমাদের মতে মিল হলে ওকে আনিয়ে নিয়ো—আমি চিরকাল ওকে আটকে রাখতে চাইনে।

কলকাতা যাওয়ার প্রস্তাবে কুন্দ আপত্তি করেনি। সে সূর্যমুখীকে প্রণাম করে প্রস্তুত হল। আশা করেছিল এই উপলক্ষ্যে একবার নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু কুন্দর সে আশা সফল হল না। বিদায় কালে নগেন্দ্রনাথ দুটো কথা বলা দূরে থাক দেখা পর্যন্ত করলো না।

নগেন্দ্রনাথ, তুমি বড় দুর্বল।

॥ ৩ ॥

কমলমণিদের কলকাতার বাড়িতে মাঝে মাঝে বিদ্যাসাগর মশায় আসেন। যেদিন তাঁর শুভাগমন হয় কর্তা-গিন্নি-শিশু এবং ঝি-চাকরের ভেদ দূর হয়ে যায়, বিদ্যা-সাগরের কাছে সকলেই সমান, কারণ তিনি সকলের চেয়ে অনেক বড়। কমলমণি গোড়াতে তাকে মামাবাবু বলে ডাকবার চেষ্টা করেছিল তাতে তিনি বলেছিলেন, দূর মাগী আমি হলেম গিয়ে কিনা তোর বাপের শালা! তার চেয়ে পিসেমশাই বল্ না কেন। তাই পিসেমশাই ডাকটাই চালু হল। আগে কমলমণির শিশুপুত্র সতীশ তাঁর কাছে ঘেষত না। বর্ণপরিচয় নামে যে পুস্তিকা-খানি তার সকাল সন্ধ্যার ত্রাস ঐ ব্যক্তি তার লেখক। এমন লোকের কাছে থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ—বানান জিজ্ঞাসা করতে কতক্ষণ। কিন্তু অল্পদিনেই চুম্বকের টানে তাকে ধরা দিতে হল। এখন সে বিদ্যা-সাগরের বড় অনুরক্ত, এলে ছাড়তে চায় না।

কমল বলে এখন যা তো, ও'কে একটু জিরোতে দে।

সতীশ বলে আমি কি দাদুর সঙ্গে কুস্তি করছি—ঐ তো জিরোচ্ছেন।

বিদ্যাসাগর বলেন—হল তো। তারপরে বলেন জানিস কমল এই ছোট ছেলেমেয়েদের

সঙ্গে আমার বেশ মিল হয়—কিন্তু বড় হয়ে উঠলেই দূরে দূরে থাকে।

কমল বলে আপনাকে ভয় করে কিনা।

সতীশ শুধায়, দাদু তুমি যেমনটি গল্প করছ তেমন লেখ না কেন?

তাও লিখিরে বড় হলে পড়বি'

কবে বড়ো হব শুধায় সতীশ।

আর দেরী নেই, হলি বলে।

তারপর থেকে বিদ্যাসাগর এলেই সতীশ শুধাতো দাদু বড় হয়েছি কি?

বিদ্যাসাগর তাকে দুই হাতে উঁচু করে ধরে তুলে বলতেন এই তো বড় হয়েছিস।

তোমার চেয়েও?

নইলে আর বড় কি? জানিস দাদু বাংলা দেশে এক তুই ছাড়া আর কেউ আমাকে বড় বলে স্বীকার করে না।

নিজের বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি সতীশ গম্ভীর ভাবে শোনে। কিন্তু বিস্মিত হয় পিতামাতার ব্যবহারে। তারা এমন হেসে উঠল কেন? কেন বিদ্যাসাগর কি বড় নয়, সতীশ কি বুদ্ধিমান নয়?

সেদিন বিদ্যাসাগর মশায় এলে কমলমণির ইঙ্গিতে কুন্দনন্দিনী এসে তাঁকে প্রণাম করলো। তিনি আগে কখনো তাকে দেখেন নি, জিজ্ঞাসু নেত্রে কমলমণির দিকে চাইলেন। কুন্দ প্রস্থান করলে শুধালেন কমল, এই মূর্তিমতী করুণাটি কে?

কমল ধীরে ধীরে কুন্দর জীবন বৃত্তান্ত বিবৃত করলো। সমস্ত কথা শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে তিনি বললেন কমল, মানুষের ভালো করবো বলেই ভালো করা যায় না—তার সমস্যা বড় জটিল। এই দেখ্‌ না কেন, আমি বিধবা বিবাহ সমর্থন করি আবার বহু বিবাহ সহ্য করতে পারিনে। এই একটি মেয়ের জীবনে দুটো পরীক্ষাই হয়ে গেল, এক সঙ্গে বিধবা বিবাহ আর বহু বিবাহ। বিষফল তো ফললো।

কমল কুণ্ঠিতভাবে বলে, অমৃত ফলও তো ফলতে পারতো।

নারে না, আর যেখানেই ফলুক এখানে ফলবে না, এ যে বিষবৃক্ষের দেশ। এখন মনে হচ্ছে বঙ্কিমের কথাই ঠিক।

এতক্ষণ যেন তিনি স্বগত উক্তি করছিলেন, এবারে সম্বিত পেয়ে বললেন—এখন তুই কি করবি মেয়েটাকে নিয়ে।

তাই তো ভাবনায় পড়েছি পিসেমশাই, স্বামীর সংসারে ওর যে আর স্থান হবে আশা হয় না।

সেদিন কথাটা ঐ পর্যন্ত হয়ে রইলো। কয়েক দিন পরে তিনি এসে বললেন, দেখ্‌ কমল, ঐ মেয়েটার মুখ মনে পড়ে ক'রাত ঘুমোতে পারিনি। কি গতি হবে ঐ কাঁচা মেয়েটার। আচ্ছা কমল ওকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দে না কেন, মদনের দুই মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দমালা পড়ে সেখানে। তোদের বাড়ির গাড়ি ক'রে পেঁাছে দেবে আবার নিয়ে আসবে। কি বলিস।

কমল বল্‌ল—এর আবার বলাবলি কি, আপনার হুকুম। এই কি যথেষ্ট নয়!

বিদ্যাসাগর তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, নারে পাগলি না, হুকুম হাকিমের লোক আমি নই। লেখাপড়া শিখলে কোন বালিকা বিদ্যালয়ে চাকুরি করে খেতে পারবে।

খেতে কি আর আমরা দিতে পারিনে পিসেমশাই।

তোরা দিতে পারিস, কিন্তু ও নেবে কেন? পরের গলগ্রহ হওয়ার মতো জ্বালা আর নেই রে।

ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রস্তাবে কুন্দ আপত্তি করলো না, ভাবলো অহোরাত্রিব্যাপী দুঃখের হাত থেকে খানিকটা সময় রক্ষা পাওয়া যাবে তো। তারপরে কখনো যদি ভগবান প্রসন্ন হন ভালোই, নতুবা কোথাও
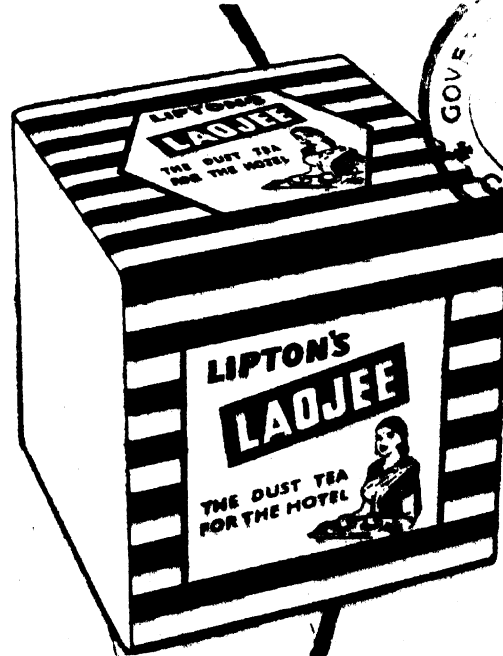
কোন বালিকা বিদ্যালয়ে চাকুরী করে জীবন কাটিয়ে দেবে।

সে ভাবে মানুষের জীবন কতই বা দীর্ঘ, অর্ধেক তো কেটেই গেল।

কুন্দনন্দিনী বেথুন স্কুলে ভর্তি হল।

॥ ৪ ॥

সূর্যমুখী নগেন্দ্রনাথকে প্রায়ই বলে থাকে, যা হওয়ার তা হয়েছে। এবার কুন্দকে আনিয়ে নাও।

নগেন্দ্র বলে না তা হয় না।

না হওয়ার কারণ কি। আমি তো আপত্তি করছি না।

ওকে বিয়ে করবার সময়েও তো তুমি আপত্তি করোনি।

আপত্তি করলেও তুমি করতে।

এখনো তাই, আপত্তি না করলেও আমি আনবো না। সেবারেও তোমার অবাধ্য হয়েছিলাম, এবারেও হব। সূর্যমুখী তার চেয়ে এক কাজ করো ওকে মাসে মাসে কিছু করে টাকা পাঠিয়ে দিয়ো।

সূর্যমুখী বলে, যে স্বামীর ঘর করতে পারলো না স্বামীর টাকা সে নেবে কেন? আর কমলমণির কি টাকার অভাব আছে? তা ছাড়া, দুবার আমি টাকা পাঠিয়েছিলাম কমল ফেরত পাঠিয়েছে, লিখেছে কুন্দ টাকা নিতে অস্বীকার করেছে।

আমাকে বলোনি কেন?

বললেই বা কি করতে!

তা বটে বলে চুপ করে যায় নগেন্দ্রনাথ।

সংসারের ঘটনাগুলো পেন্সিলের লেখা হলে রবার ঘষে তুলে দেওয়া সম্ভব হতো, এ যে, সুগভীর কালির আঁচড়, কাটতে গেলে আরো ধেবড়ে যায়। নগেন্দ্রনাথের কুন্দ-ঘটিত মনস্তত্ত্ব কী ঠিক জানিনে। কিন্তু একদিন যেমন অন্ধ অনুরাগ অনুভব করেছিল তার প্রতি আজ তেমনি এক প্রকার অন্ধবিদ্বেষ অনুভব করে তার প্রতি। যে সূর্য আলোতে সব উজ্জ্বল করে তোলে, সময় বিশেষে সেই সূর্যোদয়েই কুয়াশায় সব আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

একদিন সূর্যমুখী বললে, শুনেছ কুন্দ বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

ভালোই হয়েছে, বলে নগেন্দ্রনাথ, আমার টাকা না নেয় কোথাও শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে খেতে পারবে।

তারপরে বলে, কিন্তু হঠাৎ বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিল কে?

স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশায়।

বিদ্যাসাগরের নামে নগেন্দ্র গম্ভীর হয়ে যায়। বিধবা কুন্দকে বিবাহ করবার আগে তাঁর নাম যেমন কানে সুধা ঢেলে দিত—এখন তেমনি বিষবিন্দু বর্ষণ করে।

সেদিন আর কথা জমে না।

ওদিকে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কুন্দ মনে মনে ভারি আরাম পাচ্ছে। প্রথম প্রথম খুব লজ্জা করতো, বয়স বেশি, বিবাহিত। শেষে লক্ষ্য করলো যে তার চেয়েও বেশি বয়সের মেয়ে অনেক আছে, আর অনেকে যে শুধু বিবাহিত তা-ই নয়, ২।৩ ছেলের মা, একজন তো রীতিমতো শাশুড়ী, নাকে নথ দিয়ে গালে পান গুঁজে, দোক্তার কৌটো হাতে হাতী পাড় শাড়ী পরে আসে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দমালার সঙ্গেই তার প্রথম পরিচয় হয়—কিন্তু তারা কেমন মুখচোরা, আলাপ বেশি দূর এগোয়নি।

কমলমণি ভাবে লেখাপড়া হোক না হোক ঐ নিয়ে মেতে থাকবে, ঐটুকুই লাভ। কিন্তু লেখাপড়ার একটা নিজস্ব আকর্ষণও তো আছে—ক্রমে কুন্দ সেই আকর্ষণে মেতে উঠলো আর বছরের পরে বছর পরীক্ষাগুলো ভালোভাবেই পাশ করে যেতে লাগলো।

এই সময়ে একদিন কমলমণির মুখে শুনলো যে সূর্যমুখীর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। সেদিন আর পড়াশুনায় তার মন লাগলো না। বুকের মধ্যে কেমন একটা মোচড় অনুভব করলো, সে কি ঈর্ষায় না স্নেহের ক্ষুধায় বুঝতে পারে না সে। শুধু বোঝে দু চোখে জলধারার আর বিরাম নেই। নগেন্দ্রনাথের কথা কি তার মনে পড়ে না? অবশ্যই পড়ে। রূপকথায় শুনেছিল সে, মায়াপুরীর উত্তর দিকের জানলাটা খুলতে নিষেধ ছিল রাজকন্যার, খুললেই নাকি মহা বিপদ। সেই থেকে মনের উত্তর দিকের জানলাটা সে খোলে না, যে দিকে নাকি নগেন্দ্রনাথের স্মৃতি। খোলে না বটে, কিন্তু কখনো কখনো ফাঁকফোকর দিয়ে তাকিয়ে দেখে, তখনি চোখ নামিয়ে নেয়—একি আলোর ঝলমলানি, সমস্ত আকাশটা যেন উচ্চ সুরে আহত বীণার তন্ত্রের মতো কাঁপছে। তখনি দ্বিগুণ উৎসাহে চারুপাঠের হুরুভুজের ও পান্থপাদপের রহস্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সহ্য করতে পারে না সে সীতার বনবাস। যে দুঃখ নিজ মনে সে চেপে রেখেছে বাল্মীকি সীতার বেনামে তাই লিখে গিয়েছেন নাকি? তবে তার কেবলি মনে পড়ে মেঘনাদবধ কাব্যের সীতার উক্তি—"হে দারুণ বিধি, কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?" মানুষ নিজের দায় দায়িত্ব ভগবানের উপরে চাপিয়ে স্বস্তি অনুভব করে। আর কোন কারণে না হোক—অন্তত এই জন্যেও ভগবানের অস্তিত্বের আবশ্যক আছে।

অবশেষে বেথুন বিদ্যালয়ের পড়া কুন্দর সমাপ্ত হল, শেষ পরীক্ষাটি কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলো সে। সেই সুসংবাদটি, এক হাঁড়ি সন্দেশ আর ইংরাজি বাংলা অনেকগুলি বই নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন বিদ্যাসাগর মশায়।

সতীশ এখন বড় হয়েছে, আগে হলে সন্দেশের হাঁড়িটা ধরে টান দিতো, তার বদলে এখন সে একখানা ইংরাজি বই ওল্টাতে লাগলো।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝতে পারছিস? পাছে বানান জিজ্ঞাসা করে ভেবে সতীশ বলল, না।

বুঝবি কি করে তোর মনটা যে হাঁড়ির মধ্যে। নে খোল্।

আনন্দ সন্দেশ বিতরণের পালা শেষ হলে বিদ্যাসাগর বললেন শ্রীশচন্দ্র কুন্দর তো পড়া শেষ হল, এবার ওকে কোন বালিকা

চন্দ্রমীড় রামকিংকর

মুদ্রণঃ অনুশীলন প্রেস

বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করে দিই—কি বলো।

শ্রীশচন্দ্র স্বল্পভাষী লোক, সংসারে কথা বলবার দায়িত্ব কমলমণির উপরে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত আছে। তাই বিদ্যাসাগরের প্রশ্নের উত্তরে কমলমণির দিকে চাইলো।

সে কি পিসেমশায়, মেয়েছেলে আবার পড়াবে, সে কি কথা।

কেন, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধ করতে পারলো আর কুন্দ ছোট ছোট মেয়েদের পড়াতে পারবে না!

একা একা কোথায় থাকবে?

বিদ্যালয় তো বনের মধ্যে হয় না যে, একা থাকবে। আর একা থাকতে না হয় অস্থানে না পড়ে সে দায়িত্ব তো আমার। কি বল কুন্দনন্দিনী রাজি তো? বিদ্যালয়ের কাছেই ছোট একটি বাসা ঠিক করে দেবো, একটি ঝি নিযুক্ত করে দেবো—কেমন? ছুটি হলে চলে আসবে কলকাতায়। কি বলো?

কুন্দ তখনি রাজি—তবু বলল দিদি যা বলেন......

কমলমণি বলল আমি কি পিসেমশাইর উপরে কথা বলতে পারি।

কুন্দনন্দিনীর চাকুরি করতে যাওয়াই স্থির হল।

এত দুঃখের মধ্যে কুন্দর আনন্দের অবধি নেই। ছোট একটি বাসা হবে, বিশ্বস্ত ঝি হবে, পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে না, নিজের সংসারে কর্ত্রীত্ব করবে—এ কি কম সুখের কথা। যদিচ সংসারের প্রধান উপাদানটারই অভাব, শিবহীন যজ্ঞ—তবু তো যজ্ঞ বটে। কুন্দ বিদায় নেবার সময় বলেছিল, দিদি সংবাদটা গোবিন্দপুরে জানিয়ো না, ও'রা লজ্জা পাবেন। কমল সে অনুরোধ রক্ষা করে নি, সূর্যমুখীকে সব জানিয়ে ছিল।

॥ ৫ ॥

প্রকাণ্ড একটা জংশন স্টেশনের প্রশস্ত প্ল্যাটফরমে একটি সুবেশ সুন্দর বালক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ক্রমে সে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতীক্ষাগারের সম্মুখে এসে পড়লো, ঘরের বাইরে এক রাশ পোঁটলা পুঁটলি বিছানা বাক্স ইত্যাদি স্তূপীকৃত। হঠাৎ একটি বাক্সের উপরে নজর পড়ায় সে চমকে উঠল, কালো রঙের বাক্সের উপরে ইংরাজি হরফে লিখিত "মিসেস নগেন্দ্রনাথ দত্ত"। নগেন্দ্রনাথ দত্ত তার পিতার নাম, তবে কি ঐ নামে আরও লোক আছে! তার ভারি মজা লাগলো। প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষাগার থেকে মাকে টেনে নিয়ে এলো, দেখো মা, কেমন মজা, বাবার নামে আরো লোক আছে। মা বললে তা এমন আর আশ্চর্য কি, এক নাম কি দুজনের হয় না?

তবু দেখবে চলো।

এই দেখো "মিসেস নগেন্দ্রনাথ দত্ত" অর্থাৎ নগেন্দ্রনাথ দত্তর পত্নী।

তারপরে বললে আমি ভাবতাম তুমিই একমাত্র "মিসেস নগেন্দ্রনাথ দত্ত।"

সূর্যমুখী পড়লো নামের নীচে ইংরাজিতে লিখিত আছে "হেড মিসট্রেস।"

সূর্যমুখীর আগেই সন্দেহ হয়েছিল যে এ কুন্দনন্দিনী, "হেড মিসট্রেস" দেখবার পরে আর সন্দেহ রইলো না, আর বুঝলো কাছেই কোথাও সে আছে।

তখন সূর্যমুখী বলল নরেন, তুই ওয়েটিং-রুমে যা, মালপত্র সব আলগা পড়ে আছে, আর দেখিস তোর বাবাকে জাগাসনে। আমি এক্ষুনি আসছি।

নরেন দূরে যেতেই সে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতীক্ষাগারে ঢুকলো আর ঢুকেই দেখতে পেলো একটি বেঞ্চিতে কুন্দনন্দিনী একাকী উপবিষ্ট।

অপ্রত্যাশিত ভাবে সূর্যমুখীকে দেখে বিস্মিত কুন্দ "দিদি এখানে তুমি"—বলে এগিয়ে এসে প্রণাম করলো।

সূর্যমুখী কিছু বলতে যাচ্ছিল, অন্তরায় হল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ। সূর্যমুখীর চোখে জল দেখে কুন্দরও চোখে জল গড়াতে লাগলো। ভাগ্যিস ঘরে তখন আর যাত্রী ছিল না।

দিদি চোখের জল মোছো—হঠাৎ কেউ এসে পড়লে কি ভাববে।

বললে বটে কিন্তু কারো চোখের জল তো থামলো না। চোখের জল বড় অবুঝ।

দিদি তোমরা কোথায় চলেছ?

তীর্থ করতে গিয়েছিলাম—এখন বাড়ি ফিরছি। কুন্দর সাহস হল না জিজ্ঞাসা করে সঙ্গে আর কে আছে।

তুমি কোথায় যাচ্ছ কুন্দ?

পুজোর ছুটির শেষে ইস্কুলে ফিরে চলেছি, এখানে ছোট লাইনের গাড়িতে উঠবো।

এমনি করেই কি জীবন কাটাবে।

জীবন তো কেটেই গেল দিদি—বয়স তো কম হল না।

সূর্যমুখী এবারে চেয়ে দেখলো নিটোল সুডোল শিশির বিন্দুটির মতো তার মুখমণ্ডল, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি করুণ, তেমনি পবিত্র। মনে মনে সে স্বীকার করলো কুন্দ সুন্দরী। স্ত্রীলোকে যখন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য স্বীকার করে তখন বুঝতে হবে সৌন্দর্য কিছু অসাধারণ।

কুন্দ তুমি কি আমাদের ভুলে গিয়েছ?

এই আমাদের শব্দে কাদের বোঝায়, বিশেষ করে কাকে বোঝায় এ বিষয়ে দুই পক্ষের কারো মনে সন্দেহ ছিল না।

কুন্দ বলল, ভুলিনি দিদি কেবল ছাই চাপা দিয়ে রেখেছি।

তবে ও'কে একবার ডাকি।

কুন্দর বুকের ভিতরে স্বপ্নের প্রাসাদ ভূমিকম্পে নড়ে উঠল। কিন্তু তখনি আত্ম সম্বরণ করে বলল, না, না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি।

এমন সময়ে কুলি মাথায় পাগড়ী জড়াতে জড়াতে এসে বলল মাঈজি গাড়ির টাইম হইয়ে গেল।

চল্ বাবা, মালগুলো মাথায় নে।

তারপরে নত হয়ে সূর্যমুখীর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল আসি দিদি। নরেনকে—আশীর্বাদ জানালাম (সূর্যমুখীর ছেলের নাম কমলমণির পত্রে জেনেছিল)।

এই বলে অবিচলিত পদে কুলীর পিছু পিছু ছোট লাইনের গাড়ির দিকে চললো—একবারও পিছে ফিরে তাকাল না।

সূর্যমুখী কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপরে চোখ মুছে রওনা হল প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষাগারের দিকে। এমন সময় শুনতে পেলো একটা তীক্ষ্ম, তীব্র এঞ্জিনের বাঁশী—বুঝলো ছোট লাইনের গাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

প্রতীক্ষাগারে পেঁাছতেই পাছে পিতার ঘুম ভাঙে পাশ ফিরে মৃদুস্বরে নরেন শুধালো, ও কে মা?

সূর্যমুখীর কণ্ঠের কাছ অবধি এসেছিল "তোমার ছোট মা"—কিন্তু তখনি সেটা গিলে ফেলে বললে—চিনিনে। এক নামে কি দুজন লোক হয় না?

নরেন বলল সে কথা তো আমি আগেই বলেছিলাম।
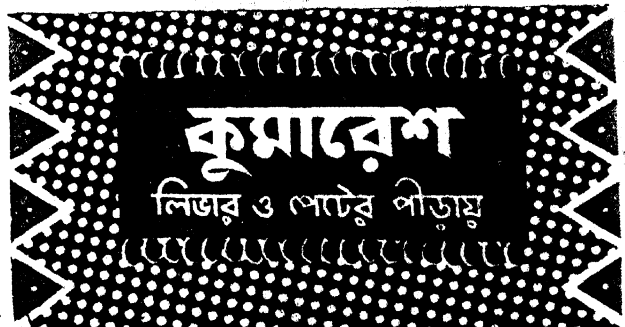
"গুঞ্জরি তান
উঠিল তোমার
সোনার বীণার তারে"
শ্বেত শুভ্র কাশের বনে হাওয়ার দোলায়
মালতী-শেফালীর বিকীর্ণ সুরভে,
মরালের ছন্দিত ডানায় আর অবারিত
নীল আকাশে ঝংকার উঠেছে শারদ-
লক্ষ্মীর বীণায়। প্রতি বছর এই শুভমুহূর্ত-
টিকে আমরা স্মরণীয় করে রাখতে চাই
আমাদের জীবনে। 'ঝংকার' রেডিওর
সুরের স্পন্দনে এই আনন্দ আপনার
কাছে আরো বিমূর্ত হয়ে উঠবে।
ঝংকার
রেডিও
JHANKAR
অপূর্ব ম্যাগনাটোন-সহ
পূর্বাঞ্চলের একমাত্র পরিবেশক:—
রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস্ প্রাইভেট লিঃ
ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা—১

কালকাসুন্দে আর হেড়াঞ্চির জঙ্গল, চারপোতায় উঁচু উঁচু ভিটে, দিনদুপুরে শিয়াল, ঐ দেখুন লেজ তুলে পালাচ্ছে—মিত্তির মশায়দের ভদ্রাসন ছিল এটা! দুই ভাই প্রিয়নাথ মিত্তির আর হৃদয়নাথ মিত্তির—দুজনেই কাজকর্মে বাইরে থাকতেন। ভিটেয় সন্ধ্যে দেখাবার জন্য বিধবা বড় বোন মোহিনী ছিলেন, হৃদয় তাঁর নামে তিন টাকা করে পাঠাতেন মাসে মাসে।

প্রিয়নাথের মেয়ের বিয়ে ঠিক হল এই সময়—আমাদের এখন যিনি কিরণমালা বউদি। পাত্র আমাদেরই পাড়ার ভূষণ ঘোষ। পাত্র হিসাবে ভূষণ-দা এমন-কিছু আহা-মরি নন। তবে বংশটা ভাল, মধ্যাংশ কুলীন। কাঠের কাজ করেন—সাদা কথায় যার নাম ছুতোর-মিস্ত্রি। এর উপরে ছোটখাট একটু দোকানও আছে বাড়িতে। প্রিয়নাথেরও মেয়ে পাঁচ-পাঁচটা—সবে এই পয়লা নম্বরে হাত পড়ছে। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করেন অনেক দূরের এক চাষীপ্রধান গাঁয়ে। রোগী দেখে সিকিটা আধুলিটার বেশি মেলে না। তবে ঘর বেঁধে দিয়েছে তারা ডাক্তারবাবু যাতে মেয়েছেলে নিয়ে থাকতে পারেন। হাটখোলার উপর একটু ডাক্তারখানার বন্দোবস্তও করে দিয়েছে। কলাটা মুলোটা যার বাড়ি যা ফলে, ডাক্তারবাবুকে একটা-দুটো খেতে দিয়ে যায়। নতুন ধান গোলায় তুলবার মুখে, যার যেমন ক্ষমতা, ধানও দিয়ে যায় দু-এক খুঁচি করে। এমনি করে চলে যায় একরকম। এহেন লোকের জামাই হতে কি আর রাজাবাহাদুর নবীনকণ্ঠ গলায় মালা ঝুলিয়ে এসে বসবেন! ভূষণ ঘোষই বেশ ভাল।

বিয়ের দু-হপ্তা আগে দুখানা গরুর গাড়ি করে প্রিয়নাথেরা সবসুদ্ধ এসে পড়লেন। তার দু-দিন পরে ছোট ভাই হৃদয়নাথ। অল্প বয়সে সংসার গত হবার পরে হৃদয় আর বিয়ে-থাওয়া করেন নি। এই কারণে হাতে-গাঁটে দু-পয়সা হয়েছে, শোনা যায়। মিত্তিরবাড়ি এমনই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন মোহিনী পিসি। উঠানে সিঁদুরটুকু পড়লে তুলে নেওয়া যায়। হৃদয় এসে পড়ে বাড়ির সীমানার মধ্যে ঘাসের অঙ্কুরটুকু থাকতে দিলেন না। তিন-চারটে অস্থায়ী ঘর উঠে গেল এদিকে-সেদিকে। ঘর আর কি— লাউ-কুমড়োর মাচার মতো ক'খানা বাঁশের খুঁটির উপর আচ্ছাদন এক-একটা। কাঁচা তালপাতার ছাউনি। এইসব ঘরের কোনটায় ভোজের রসুইবাস ও লুচিভাজা হবে। কোনটায় বেহারা-বাজনদারের আস্তানা। কাজের বাড়ি আত্মীয়-কুটুম্বর কথা ছেড়ে দিন—আজে-বাজে লোকের জন্যই বা কত জায়গার দরকার। হৃদয় এসে তাই একেবারে ধুম-ধাড়াক্কা লাগিয়ে দিয়েছেন। একলা একটি বিধবা মানুষ গাঁয়ের এক কোণে পড়ে থাকতেন, উঁকি দিয়েও দেখতে আসত না কেউ, আজকে মানুষজনে গমগম করছে সেই মিত্তিরবাড়ি।

আবার আমাদের পাড়ার ভূষণ-দা'র বাড়িতেও অমনি। প্রিয়নাথ এসে পড়ার পর থেকে ভূষণ-দা আর কাজকর্মে বেরোননি। বিয়ের বরপাত্তর যতই হোক। ছোট্ট গ্রাম আমাদের,—এপাড়া ওপাড়ার দূরে কিছু নয়। বরের বাড়ি থেকে চেঁচিয়ে ডাক দিলে মিত্তিরবাড়ির লোক শুনতে পাবে। তা হলেও পাল্কির ব্যবস্থা—পাল্কি চড়ে বর বিয়েবাড়ি যাবে। পাল্কির সঙ্গে বরযাত্রীরা। ঢোল-কাঁসি-শানাই বাজবে। চরকিবাজি হাউইবাজি পুড়বে, গেঁটে বন্দুক দুড়ুমদাড়াম আওয়াজ করবে। বিয়ের ব্যাপারে ঠিক যেমনটি হতে হয়। মায়ের এক ছেলে হলেন ভূষণ ঘোষ—মায়ের সেই-রকম ইচ্ছে। আর কুলোকে বলে, ভূষণের নিজের ইচ্ছে ষোল আনার উপর আঠার আনা—মায়ের নাম করে বলে বেড়াচ্ছে। সেটা অন্যায় কিছু নয়। বর হওয়া জীবনে এই একবার।. (একাধিক-বারও হয় কেউ কেউ। পাড়াগাঁয়ের কথাই আছে—ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার ঘোড়া মরে। ঘোড়া মরলে মোটা টাকা ব্যয় করে নতুন ঘোড়া কিনতে হবে, নয়তো পাড়াগাঁয়ের

জলকাদার পথে খোঁড়া হয়ে বসে থাক। আর, বউ মরল তো মজাসে মাথায় টোপর চড়িয়ে বরপাত্তর সেজে পণের বাবদ নগদ টাকা বাজিয়ে নিয়ে নতুন বউ ঘরে এনে তোল। কিন্তু এমন মজা ক'টা লোকের ভাগ্যে ঘটে বলুন?) অতএব একদিনের এই নবাবিয়ানার তিলেক প্রমাণ খুঁত থাকতে দেবেন না ভূষণ-দা।

বড্ড কাছের বিয়েবাড়ি—বেহারারা পাল্কি কাঁধে তুলতে না তুলতেই তো পৌঁছে যাবে। পাল্কি চলে তাই উল্টোদিকে গড়-ভাঙার হাটে, সেখান থেকে সাতনলার খাল অবধি। তিনটে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ঘণ্টা-খানেক পরে বিয়েবাড়ি পৌঁছবে। সর্বক্ষণ ও হো—এ-হে—ডাক ছেড়ে চলেছে বেহারারা, লহমার তরে মুখ বন্ধ করবে না, এই রকম চুক্তি। কপালে চন্দনের ফোঁটা ভূষণ ঘোষ, পরনে চেলির জোড়। পাল্কির মধ্যে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তিনি সর্দার-বেহারার উপর হাঁক দিয়ে উঠছেন: মিইয়ে যাচ্ছ কেন পাঁচু সর্দার, হল কি তোমাদের? চেঁচিয়ে গলা ফাটাক বেহারারা, পথে পথে ভিড় জমুক। তিন গাঁয়ের লোক যে ভূষণকে বাইশ ধরে কাঠ কোপাতে আর তক্তায় রেঁদা ঘষতে দেখে, বর হয়ে তার বাহারখানা দেখে নিক আজকের দিনে।

শুধু বর কেন, দেখবার বস্তু বর-যাত্রীরাও। ধামা কাঁধে নিয়ে কেরোসিনের বোতল হাতে ঝুলিয়ে এই পথে সকলে হাট করতে যায়। হয়তো বা পথের ধারে বসে পড়ল কারো কলকে থেকে দু-টান টেনে যাবার আশায়। তারাই সব, আজকে দেখ, ফুলকোঁচা-দেওয়া কাপড় পরে গায়ে পিরান সেঁটে মাথায় টেড়ি ফুলিয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে জুতো পায়ে ভদ্র হয়ে চলেছে। গৃহস্থবাড়ির মেয়ে-বউ অবধি বেরিয়ে হুড়কোর ধারে এসে অবাক হয়ে দেখছে।

বরের সঙ্গে সঙ্গে জেঠামশায় আমাকেও হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। বেশী দূর নয়, হরিতলা অবধি। তার বেশী ছেলেমানুষ হাঁটতে পারব কেন? হরিতলা থেকে সোজা এই বিয়েবাড়ি। বাইরের মানুষ তেমন কেউ নেই তখন। ছোট্ট গ্রামের গোনাগুনতি মানুষগুলো। বরযাত্রীর দলে ভিড়ে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে। ফিরে এসে আবার কন্যাযাত্রী হবে কতক কতক। প্রিয়-নাথ কী কাজে ছিলেন। জিভ বাড়িয়ে ঠোঁট চেটে নেওয়া তাঁর মুদ্রাদোষ, এবং কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত বুলানো। কাজ ফেলে ঠোঁট চাটতে চাটতে হন্তদন্ত হয়ে আহ্বান করলেন: আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক গরিবের বাড়ি। তামাক দে রে। বসুন, পান নিয়ে আসি—

হবে এখন, ব্যস্ত কিসের মিত্তির-জা?

তার আগেই প্রিয়নাথ সরে গেছেন। দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। বাড়ির এক পাশে

দোচালা ঘরখানা।. গেছেন তো গেছেনই, বেরুবার নাম নেই। জেঠামশায় তীক্ষ্ণ-চোখে তাকাচ্ছেন। ঘরটা যেন এই বিয়ে-বাড়ির ভিতরেই নয়। কাজের যাবতীয় লোকসব ভিন্ন দিকে। নতুন তৈরি চালাঘরে লুচি ভেজে ভেজে ডোল ভরতি করছে তারা, বড় বড় গামলায় নানা পদের তরকারি বয়ে এনে কলাপাতা ঢাকা দিয়ে রাখছে। ভোজের সময় লাগবে। তিন-চারটে সরার খোলে তুষ-কেরোসিন জেবলে দিনমান ওদিকটা। আর এই দোচালা ঘরে প্রদীপ আছে বোধ-হয় একটা। কাচাঁনির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মিটিমিটি একটু আলো দেখা যায়।

হঠাৎ প্রিয়নাথ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভাঁড়ারে গিয়ে পান এনে দিলেন। দিয়েই আবার উধাও। নিমন্ত্রতেরা আসতে লেগেছেন এবার, হৃদয় তাঁদের আসন-বসন করছেন। সাড়া পেয়ে প্রিয়নাথ ছুটে বেরিয়ে আসেন, দু-এক কথা বলে আবার ঘরে যান।

বরের পাল্কি এসে গেল। সোরগোল পড়েছে। ভূষণ-দা'কে ধরে নিয়ে বরাসনে বসিয়ে দিল। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখি এবার। চেহারাই যেন আলাদা— কথা বলতে ভরসা হচ্ছে না। জেঠামশায় গ্রামের জ্যেষ্ঠ, এবং ভূষণ-দা'র জ্ঞাতিও বটে। পাকেপ্রকারে তাঁকেই এক রকম বরকর্তা হতে হল। বিয়েথাওয়া চুকে গেল যথাবিধি। বর-কনে ঘরে গিয়ে উঠেছে, পাতা করছে।

এইবার—এইবার। দিনমানে চার-পাঁচ বার বিয়েবাড়ি উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছি। বড় বড় কাতলা মাছ দরমার উপর ফেলে নারকেলের মালা ঘষে আঁশ ছাড়াচ্ছে—দেখলাম। আর একবার দেখলাম, টিনে করে সন্দেশ দিয়ে গেল—সন্দেশ গোল গোল করে পাকাচ্ছে দু-তিন জনে। কখন সন্ধ্যে হবে, বিয়েবাড়ি এসে জাপটে বসব—দিন যেন আর কাটতে চাচ্ছিল না। এতক্ষণে সুবর্ণক্ষণ সমাগত।

ঠিক সেই সময়ে জেঠামশায় উঠে পড়ে আমার হাত ধরে টানলেন : বাড়ি চল।

ভাল রে ভাল! উঠান ঝাটপাট দিয়েছে। আঁটি আঁটি কলার পাতা এনে ফেলছে। পাতা হবে এইবার। উঠানের সেই দিকে না গিয়ে জেঠামশায় বাইরের পথে টেনে নিয়ে চললেন : বিয়েথাওয়া হয়ে গেল, চল এবারে।

চোখে জল আসবার মতো, তা হলেও টানের চোটে যেতে হয় গুটি গুটি। একটা থমথমে ভাব চতুর্দিকে। খবর চলে গেছে বুঝি প্রিয়নাথের কাছে। সেই দোচালা ঘরের ভিতর থেকে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে জেঠামশায়ের পথ আটকালেন : কী ঘাট হয়েছে বলুন বেহাই। বাড়ি থেকে অভুক্ত চলে যাবেন, সেটা কিছুতে হবে না।

উদ্বেগে ঘন ঘন ঠোঁট চাটছেন, দাড়ি থেকে হাত আর তোলেন না। জেঠামশায় বলেন, বড্ড দেমাক তোমার প্রিয়নাথ। গাঁয়ের উপর বাস করতে এসেছ, একটিবার কারও কাছে গেলে না। যিনি নেমন্তন্নে কে তোমার বাড়ি খেতে যাবে? সর, পথ দাও—

নতুন কুটুম্বিতা সত্ত্বেও জেঠামশায় তাঁকে বেহাই বলে সম্বোধন করলেন না। সকাতরে প্রিয়নাথ বলেন, মুরুব্বি মানুষ, কত কাজ-কর্ম করে এলেন এ যাবৎ—আপনাকে বলতে গেলে ছোট মুখে বড় কথার মতো শোনায়। নেমন্তন্নর ব্যাপার আজ তো নয়। আজকে আপনারা বরযাত্রী, বরপক্ষের নেমন্তন্নে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। আমাদের নেমন্তন্ন কাল বাসিবিয়ের ভোজে। জোড়হাতে জনে জনের কাছে বলে আসব। ধরুন, এক গ্রাম না হয়ে ভিন্ন জায়গা থেকেই যদি বর আসত—

জেঠামশায় শেষ করতে দেন না, নিয়মের ফাঁক ধরে ফেলেছেন : ভিন্ন জায়গা নয় বলেই তো! ছোট্ট একটুখানি গাঁয়ের ব্যাপার—কে বরযাত্রী আর কে কন্যাযাত্রী তুমিই বা সেটা মালুম পাচ্ছ কি করে? আমার কথাই ধর। সম্পর্কে ভূষণের জেঠা হই, কিন্তু হিসাব করলে তোমার সঙ্গেও কি একটা-কিছু বেরুবে না? বলি, প্রিয়নাথ গাঁয়ে ঘরে থাকে না, কন্যাদায়টা কাটিয়ে দিয়ে আসি ওর। কন্যাযাত্রীই আমি—দেখলে না, বরের পিছন ধরে না এসে সোজাসুজি [illegible]

এলাম। তা শুভকর্ম চুকেবুকে গেল—আর কেন, বাড়ি চলে যাই এবার—

যুক্তিতে প্রিয়নাথকে ধূলিসাৎ করে আত্ম-প্রসাদে ডগমগ হয়ে জেঠামশায় চতুর্দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাঁক দিয়ে উঠলেন: কে কে যাচ্ছ আর, উঠে এস—

পনের-বিশ জন উঠে দাঁড়াল। তুমুল ব্যাপার। জেঠামশায় বুঝিয়ে দেবার পর হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, প্রিয়নাথ কী অপমানটা করেছেন তাদের সকলের। প্রিয়নাথের দিকে শুধু বাড়ির লোকজন এবং তাঁর একটি-দুটি নিকট-আত্মীয়। এবং এই আমরা ছেলে-পুলের দল। আমাদের মনের কথা—অপমান করে থাকেন তো পাল্লাপাল্লি দিয়ে আরও বেশী করে খেয়ে মিত্তির মশায়কে জব্দ করে যাব।

সকলেই দুষছে প্রিয়নাথকে: সত্যিই তো! বাসিবিয়ের জন্য মুলতুবি না রেখে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসা উচিত ছিল। একই লোক বরযাত্রী কন্যাযাত্রী দুই-ই যদি হয়, তোমার তাতে কী লোকসান? পাতা তো একখানার বেশী দু-খানা নিয়ে বসত না কেউ!

প্রিয়নাথ হাত জড়িয়ে ধরলেন জেঠা-মশায়ের: গ্রামের মাথা আপনি—প্রবীণ, বিচক্ষণ। দোষত্রুটি আপনি যদি মাপ না করেন, কার কাছে যাব বলুন।

হাত ছেড়ে দিয়ে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। পা দুটো জড়িয়ে ধরতে যান—

এমনি সময় হৃদয় সেই দোচালা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডাকলেন, দাদা, শিগগির এস একবার।

প্রিয়নাথ কানে নেন না। কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল, ছেলেটার অসুখ। পাঁচ মেয়ের পর একমাত্র ছেলে প্রিয়নাথের। সুখময় কাকা জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরের মধ্যে কি প্রিয়নাথ?

প্রিয়নাথ জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বললেন, ও কিছু না। খোকার জ্বরটা বেড়েছে একটু। মাথার নিচে মানকচুর পাতা দিয়ে জলের ধারা করতে বলেছি—সেটা পারছে না ওরা, দেখিয়ে দিতে হবে।

তারপর আসল কথায় এলেন আবার। জেঠামশায়ের দিক মুখ করে প্রায় কান্নার সুরে বলেন, মাপ করেছেন বেহাই? পাতা করতে ওদের বলে দিই?

জেঠামশায় চুপ করে রইলেন। চটপট পাতা করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। চারজনে ধরে লুচির ডোল এনে রাখল ভোজের জায়গার পাশে। তাকিয়ে দেখে নিয়ে সকলে বলাবলি করে, যখন মাপ চাইলেন, একরকম পায়ে ধরে মাপ চাওয়া—এর উপরে আবার কি! কন্যাদায় বলে ভদ্রলোককে ফাঁসি দিতে হবে নাকি?

একে দুয়ে পাতায় বসে যাচ্ছে। জেঠা-মশায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, আমি সতৃষ্ণ নয়নে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। সকলে বসে পড়েছে যখন, ভেবেচিন্তে তিনিও রায় দিলেন: বসিগে চল।

খুব খাওয়াদাওয়া। রাগ করেছিলাম বলে খাতির আরও যেন বেশী আমাদের এই দলের। সবাই তটস্থ। মাছ একখানা চাইলে এক গণ্ডা দিয়ে যাচ্ছে। দইয়ের মাথা খেতে ভাল—হাঁড়ির সিঁকি আন্দাজ দেবার পর বলছে, তলানি দিসনে রে, নতুন হাঁড়ি নিয়ে আয়। কিন্তু প্রিয়নাথ কোথায়? চাবাভুষোর গাঁয়ে থেকে ভদ্রতা-বোধ একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। কর্মকর্তার এই সময়ে তো জোড়হাতে ঘুরে ঘুরে দেখাশোনা করা উচিত। হাত-পা ধরে সকলকে খেতে বসিয়ে দিয়ে কোথায় তিনি মুখ লুকিয়ে বসে রইলেন? ডাক প্রিয়নাথকে। বাড়ির কর্তাকে সামনে এসে বিনয়-বচন বলতে হয়।

খোঁজই পাওয়া গেল না। খোঁজ হল, ভোজ সেরে যেইমাত্র সকলে পানের খিলি হাতে নিয়েছি। এবং মাঝের কুঠুরিতে মেয়েদের হাসিমস্করার মধ্যে বর-কনের যৌতুক খেলা শুরু হয়েছে। দোচালা ঘরের ভিতরে প্রিয়নাথের স্ত্রী আর্তনাদ করে উঠলেন। প্রিয়নাথ নিজে নাম শোনাচ্ছেন: হরেরাম হরেরাম, রাম রাম হরে হরে—

পাঁচ মেয়ের পরে ছেলে। একমাত্র বংশ-ধর। নাম শোনাচ্ছেন কাকেই বা! অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। প্রিয়নাথ হাঁটুর উপর মরা ছেলে রেখে এতক্ষণ একনজরে তাকিয়ে-ছিলেন, সামাজিক পংক্তিভোজন নির্বিঘ্নে সমাধা হল কিনা। আর প্রিয়নাথের স্ত্রী উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে-ছিলেন। এক একবার একটু নড়ে চড়ে ওঠেন, গোঙানির মতন একটু যা আওয়াজ বেরিয়ে আসে—প্রিয়নাথ চাপা গলায় অমনি তাড়া দিয়ে ওঠেন: আঃ, কী হচ্ছে!

চরণদাস এম.এল.এ

সতীনাথ ভাদুড়ী

মা-বাপের কাছ থেকে পাওয়া নাম চরণ দাস। একসময় লোকে ভালবেসে ডাকত চরণদাসজী বলে। পরিস্থিতি বদলেছে। আজকাল সরকারী দপ্তরে তাঁর নাম শ্রীচরণ দাস, এম-এল-এ। সাধারণ লোকের মধ্যে যারা নিজেদের ইংরাজী-জানা ভাবে, তারা আজকাল ডাকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব বলে; আর যাদের ইংরাজী জানবার কোনরকম দাবি নাই তারা ডাকে মায়লে-জী বলে। এই উচ্চারণ-বিকৃতি কোন রকম দুরভিসন্ধিজাত নয়।

সেই মায়লেজী এসেছেন তাঁর পুরনো অফিসে। পার্টি অফিস। তাঁর সেকালকার কর্মকেন্দ্র। বছর চারেক পরে এই এলেন স্টেশন থেকে, রিকশাতে করে।

ফ্যাসাদ! লটারির টিকিট না কিনলে লটারিতে টাকা পাবার উপায় নাই; ভোটে না দাঁড়ালে এম-এল-এ হবার উপায় নাই।

আর এম এল এ না হতে পারলে? সে কথা আর বলে কাজ কী!

যখন পৌঁছলেন তখন সবে ভোর হয়েছে।

"নমস্তে লখনলালজী!"

"আরে! ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব যে! নমস্তে!"

"সব ভালতো?"

"হাঁ। আপনার কুশল বলুন! একেবারে কোন খবর না দিয়ে যে?"

"এই এলাম আপনাদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে।"

"তা বেশ করেছেন। আসাই তো উচিত। 'হায়-কমাণ্ড' হুড়ো দিয়েছে বুঝি?"

এম-এল-এ সাহেব এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। লখনলাল ধরেছে ঠিকই। 'হাই-কম্যাণ্ড' নামের এক খামখেয়ালী, সর্বপ্রতাপশালী ভগবানকে তিনি ভয় করেন। সেই হাইকম্যাণ্ড নাকি বলেছেন যে আসল ভগবান হচ্ছেন ভোটার। নারায়ণের চেয়েও বড়, নরনারায়ণ। ভোটারদের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক কম তাঁকে নাকি আসছে বার আর এম-এল-এ করা হবে না। শুনেই ছুটে এসেছেন তিনি নকল ভগবান ছেড়ে আসল ভগবানের শরণে। লখনলাল একসময় ছিল তাঁর শাগরেদ; এখন প্রতি মাসে তাঁর কাছ থেকে পঞ্চাশটা করে টাকা নেয়, এবং প্রতিদিন তাঁর ইয়েমিয়েলিয়েগিরি ঘোচাবার হুমকি দেখায়। তাঁর অপরাধ তিনি দশ-বারো বছর থেকে সপরিবারে রাজধানীতে থাকেন; এখানে আসেন কম। এখানকার যেসব কর্মীদের তিনি এক সময় নিজে হাতে গড়েপিটে মানুষ করে তুলেছিলেন, তাদের সবগুলোর আজ পাখা গজিয়েছে। সবগুলোর ওই একই ধুয়ো—তিনি নাকি এম-এল-এ হবার পর থেকে এখানকার ভোটারদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না। এরা সবাই মাসে বিশ দিন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে রাজধানীতে 'এম-এল-এ কোয়ার্টার্স'এ তাঁর অন্ন ধ্বংস করে, হাইকোর্টে নিজেদের মোকদ্দমার তদ্বির করে, আর সরকারী দপ্তর থেকে নানারকম অন্যায় সুবিধা পাইয়ে দেবার জন্য তাঁকে জ্বালিয়ে মারে এর পরিবর্তে, পান থেকে চুন খসলে, ফ্যাসা-

তাঁর প্রাপ্য! তাদের মন জুগিয়ে চলতে হয় তাঁকে অষ্টপ্রহর! ঘেন্না ধরে গেল একেবারে! কিন্তু উপায় কি!

এরই নাম পরিস্থিতি। তাঁদের অভিধানের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত শব্দ। মত বদলাবার অজুহাত হিসাবে কাজে লাগে কিনা কথাটা।

ঝোলা আর কম্বলটা রিকশা থেকে নামিয়ে, রিকশাওয়ালাকে আট আনা পয়সা দিতেই সে 'জয় গুরু' বলে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। লখনলালজী হাসছেন।

"আর চার আনা পয়সা দিয়ে দেন ওকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব। আজকাল বারো আনা করে রেট হয়ে গিয়েছে। আপনি সেই চার বছর আগেকার রেটই জানেন কিনা।"

অপ্রস্তুত হয়ে এম-এল-এ সাহেব আর চার আনা পয়সা বার করে দিলেন। পয়সা নিয়ে রিকশাওয়ালা 'জয় গুরু' বলে চলে গেল।

লখনলাল তাঁর ঝোলা আর কম্বল তুলে নিয়ে ঘরে রাখতে যাচ্ছিল।

"আহা করেন কী লখনলালজী! ভারী তো জিনিস।"

এম-এল-এ সাহেব তার হাত থেকে নিজের জিনিসগুলো কেড়ে নিয়ে, ঘরের মধ্যে রাখলেন।

"জন-সম্পর্ক বাড়াবার প্রোগ্রামে আসবার সময় হোল্ড-অল্ আর স্যুটকেস না এনে ঠিকই করেছেন ইয়েমিয়েলিয়ে-সাহাব।"

তার চোখে দুষ্টুমির হাসি। সে বোঝে সব। সাধে কি আর তাকে মাসে পঞ্চাশটা করে টাকা দিতে হয়।

"যে কাজে এসেছি সে কাজের দিক দিয়ে দেখতে গেলে লোকজনের সম্মুখে আমাকে বারবার এম-এল-এ-সাহেব বলে না ডাকাই ভাল, তাই না? আপনাদের কাছে তো আমি সেই পুরনো চরণ দাসই আছি এখনও।"

"শুধু চরণ দাস নয়; আপনি এখন এসেছেন ভোটারদের চরণে আশ্রয় নেবার জন্য। আপনার নাম এখন হওয়া উচিত ভোটার-চরণ-দাস। বোলো একবার ভোটার-চরণ দাসজীকী জয়!"

চীৎকারে আর উচ্চহাসিতে ঘরের সকলের ঘুম ভাঙল। কে একজন যেন 'জয় গুরু' বলে চোখের পাতা খুলল। পাশের বালিশের লোকটি তার মুখ চেপে ধরেছে—"আমাদের সেক্যুলার সংবিধান"—এই কথা বলে হাসতে হাসতে।

বচ্কন্ মহতো লাফিয়ে উঠেছে খাটিয়া ছেড়ে।

"আরে মায়লেজী যে! নমস্তে! কখন? কবে? কোথায় উঠেছেন? সার্কিট হাউসে না ডাকবাংলোয়?"

চরণ দাস ঠিক করে রেখেছেন যে এখানে কারও কথায় বিরক্তি প্রকাশ করবেন না। এদের বলার উদ্দেশ্য যে তিনি এখানে কখনও এসে ওঠেন নি গত কয়েক বছরের মধ্যে। দুইবার মন্ত্রীদের সঙ্গে এসেছিলেন দুই দিনের জন্য; তখন উঠেছিলেন সার্কিট হাউস-এ। সেই খোঁটাই বোধহয় এরা দিচ্ছে এখন।

বললে, "এখানেই এসে উঠলাম।"

"কেন? বাড়ি ভাড়া আদায় করতে নাকি?"

খোঁচা না দিয়ে কথা বলতে জানে না এরা। তাঁর এখানকার পৈতৃক বসতবাড়িটা তিনি গভর্নমেণ্টকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন বছর কয়েক হল। এখানকার লোকে ভাল চোখে দেখেনি জিনিসটাকে। কোন জিনিস তলিয়ে দেখে না এরা। রাজধানীতে পরিবার নিয়ে থাকেন; ছেলেমেয়েরা সেখানকার স্কুল-কলেজে ভরতি হয়েছে। যা আয় তাতে দুই জায়গায় বাড়ির খরচ চালানো শক্ত, সেইজন্য এখানকার বাড়ি গভর্নমেণ্টকে ভাড়া দিয়ে দিতে হয়েছে। এই সামান্য কথাটা বুঝবে না এরা।

"না, এমনি আপনাদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে এলাম।"

"ক' দিনের প্রোগ্রাম মায়লেজীর?"

"দেখি তো।"

"এক আধদিনের বেশী কি আর থাকতে পারবেন এখানে!"

"কী যে বলেন!"

ব্যথা পান এম-এল-এ সাহেব। এরা ভাবে তিনি ইচ্ছা করে এখানে আসেন না। ভুল ধারণা। ইচ্ছা থাকে, কিন্তু হয়ে ওঠে না। কতবার ঠিক করেছেন আসবেন; কিন্তু একটা না একটা বাধা এসে পড়ায় হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া অন্য কথাও আছে এর মধ্যে। বারো বছর বড় শহরে থাকবার পর ছেলেমেয়েরা আর এখানে ফিরে আসতে চায় না। ছোট-ছেলেটার জন্ম রাজধানীতে; এখানকার শিয়ালের ডাকে রাত্রিতে ভয় করবে, এই হচ্ছে তার মায়ের ধারণা। স্ত্রীর পুরনো অম্বলের ব্যাধিটাও রাজধানীতে গিয়ে সেরেছে। এইসব নানা কারণ মিলিয়ে এখানে আসা হয়ে ওঠে না। সবচেয়ে তাঁর আশ্চর্য লাগে যে সেখানকার শহুরে সমাজের বন্ধুবান্ধবরা আজও তাঁকে পাড়াগেঁয়ে ভাবে; আর এখানকার লোকে অপবাদ দেয় যে তিনি আচারে ব্যবহারে সম্পূর্ণ শহুরে হয়ে গিয়েছেন। তাঁর দশ বছরের মেয়েটার পর্যন্ত রাজধানীতে জন্মাবার অধিকারে, বান্ধবীদের সম্মুখে বাবার গ্রাম্য আচরণে, লজ্জা লজ্জা করে।

"আচ্ছা, পরে সব কথা হবে; এখন মুখ হাত ধুয়ে নিন, মায়লেজী। দাঁতন তো আপনার দরকার নাই?"

প্রশ্নের উত্তর দিল লখনলাল—"হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁতনের দরকার বইকি। উনি দাঁত মাজবার বুরুশ আনলেও এখানে ব্যবহার করবেন না। এ যাত্রায় উনি একেবারে পুরনো চরণদাসজী সেজেছেন। নিছক ভোটার-চরণ-দাসজী।"

বাগে পেলে, রেখে ঢেকে কথা বলতে এরা জানে না। বাধ্য হয়ে এ রসিকতায় এম-এল-এ সাহেবকেও হাসতে হয় এদের সঙ্গে সঙ্গে।

"আচ্ছা আমি আসছি একটু এদিক ওদিক ঘুরে।"

দাঁতন নিয়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে তিনি বার হলেন অফিস থেকে।

বচ্কন্ মহতো রসিকতা করে—"আরম্ভ হয়ে গেল মায়লেজীর জনসম্পর্ক স্থাপনার প্রোগ্রাম।"

লখনলালজী ফোড়ন দেয়—"সে তো আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বোলো একবার ভোটার-চরণ-দাসজী কী জয়।"

ভোরবেলায় দাঁতন করতে করতে এম-এল-এ সাহেব পাড়ার লোকজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ সহজভাবে মেলামেশা করে নিতে চান। ইচ্ছা করলেও কি এখানকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলা যায়! নাড়ীর টান যে। গায়ের ময়লা নয় যে ইচ্ছা হলেই ডলে ফেলে দেবে!

ও কে আসছে—সুনরা না? খুব হন হন করে চলেছে সে!

"নমস্তে সুন্দরলালজী!"

"জয়গুরু! আরে আপনি! আমি চিনতেই পারিনি।"

"খবর সব ভাল ত?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা চলি। জয় গুরু!"

তেমনি হন হন করেই সুনরা চলে গেল। ব্যস্ত এবং একটু অন্যমনস্ক ভাব তার। এম-এল-এ সাহেব ভেবেছিলেন যে তার কাছ থেকে কথায় কথায় জেনে নেবেন পাড়ায় এখন কে অসুস্থ আছে। তারপর কিছু ফল পথ্য কিনে নিয়ে অন্য সময় রুগীর বাড়িতে যাবেন। কিন্তু কথা বলবার সুযোগ পাওয়া গেল না সুনরার সঙ্গে, একটু ক্ষুণ্ণ হলেন তিনি। ঠিক এরকমটা আশা করেন নি। লখনলালের দল রাজধানীতে তাঁর কাছে প্রায়ই বলত যে এখানকার পরিস্থিতি বদলেছে; রাজনীতিক মিটিং-এ লোকজন হয় না; লীডাররা গেলে তাঁদের মালার জন্য গৃহস্থবাড়ি থেকে গাঁদা ফুল পাওয়া পর্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি এসব কথা বিশ্বাস করতেন না; ভাবতেন লখনলালরা বোধহয় তাঁকে মোচড় দিয়ে আরও কিছু বেশী টাকা আদায় করতে চায়। সুনরার এখনকার হাবভাবে মনে হ'ল যে কথাটার মধ্যে কিছু সত্য থাকতেও পারে।

একটি ছোট ছেলে ছুটছে। মনে মনে ঠিক করা ছিল যে ছোট ছেলে দেখলেই গাল টিপে আদর করবেন; আর তার চেয়ে ছোট হলে কোলে নিয়ে লজেনস্ খেতে দেবেন। পকেট ভরতি করে তিনি লজেনস্ টফি নিয়েছেন। হেসে ছেলেটাকে ডাকলেন। সে

ফিরেও তাকাল না। ছুটে চলেছে রাস্তা ধরে। একটু হতাশ হলেন।

বারো বছরের অনভ্যাসে, পথের ধুলো-কাঁকরের উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে। কাঁটার ভয়ে, ভাংগা কাচের টুকরোর ভয়ে, একটু সাবধান হয়ে পা টিপে টিপে হাঁটছেন। আগেকার জীবনের খালি পায়ে চলাফেরার সেই সাবলীলতা আর ফিরে আসবার নয়। 'হুক্-ওয়র্ম'-এর ভয় সেকালে কখনও হয়নি। নিজের অজ্ঞাতে কখন থেকে যেন নাকে কাপড় দিয়ে চলছিলেন। লোটা হাতে একজনকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি হাতটা নামিয়ে নিলেন। বিরসা আসছে এগিয়ে। তাঁকে চেনবার চেষ্টা করল; অন্তত চাউনি দেখে তাই মনে হয়। বিড়বিড় করে কি একটা স্তোত্র বলছে সে।

"নমস্তে বৃহস্পতিজী!"

"জয় গুরু! মায়লেজী? আমি চিনতেই পারছিলাম না। খালি গায়ে খালি পায়ে আপনাকে দেখব ভাবিনি কি না।"

"খবর ভাল ত সব?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা এখন আসি। জয় গুরু!"

বিড় বিড় করে স্তোত্রপাঠ করতে করতে সে চলে গেল। অল্পতে মুষড়ে পড়বার লোক তিনি নন। তবু বর্তমান পরিস্থিতির খারাপ দিকটা মনে না এনে পারলেন না। এখানকার লোকে তাঁকে চিরকাল কত ভালবাসত। আগেকার জীবনে সেইটাই ছিল তাঁর পুঁজি। পরের জীবনটুকু ভেবেছিলেন সেই পুঁজি ভাঙিয়েই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তা আর বোধহয় তাঁর কপালে নাই! সন্দেহ হল, লখনলালজীরাই তাঁর বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যা প্রচার করেনি তো, এখানকার লোকজনের মধ্যে? কিছু বলা যায় না। তার নিজেরই ইচ্ছা থাকতে পারে এই নির্বাচনক্ষেত্র থেকে এম-এল-এ-র জন্য দাঁড়াবার! হাই-কম্যাণ্ডের কাছেও চুপি চুপি তাঁর বিরুদ্ধে লাগায় নি তো কিছু? ভগবান জানেন!

একজন বর্ষীয়সী মহিলা হাতে একটা পাতার ঠোঙায় কি যেন নিয়ে, ধানের ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে চলেছেন যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে।

চরণদাসজী চশমাটা খুলে রেখে এসেছেন; তাই দূরের জিনিস দেখতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। তিরুথার মা বলেই মনে হচ্ছে যেন ওঁকে। হ্যাঁ, ঠিকই তাই।

"ও চাচী! কোথায় এই সকালে এত তাড়াতাড়ি?"

বৃদ্ধাটি মাথার কাপড় টেনে দিয়ে আরও তাড়াতাড়ি হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

"ও চাচী! তীর্থানন্দের খবর ভাল তো? নাতিপুতিরা সব ভাল তো? চিনতে পারছেন না? আমি চরণা।"

কী বুঝলেন, না বুঝলেন তিনিই জানেন। দেখা গেল তাঁর গতি দ্রুততর হয়েছে। পাটের ক্ষেতের পাশ দিয়ে বেরিয়ে ফুলের সাজি হাতে করে একটি মহিলা 'জয় গুরু' বলে তাঁকে অভিবাদন করায় তিনিও 'জয় গুরু' বলে মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালেন। কি যেন কথা হ'ল। দুইজনেই একবার চরণদাসজীর দিকে তাকালেন। তারপর দুই জনেই একই পথে এগিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে সত্যই চিন্তান্বিত হলেন এম-এল-এ সাহেব। জনসম্পর্ক স্থাপনার কাজটা যত সহজ ভেবেছিলেন, তত সহজ নয়।

লাঠিতে ভর দিয়ে চথুরি চলেছে। সে এমনিতেই একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক চিরকাল। একটু ইতস্তত করে তাকে ডাকলেন তিনি। ছেলেবেলায় লোকটা তাঁদের বাড়ির মোষ চরাত। সে দাঁড়াল—একটু অবাক হয়ে।

"জয় গুরু! ও আপনি! চিনতে পারিনি। রাজধানীর জল দেখছি খুব ভাল। গুরুদেবের কৃপায় আপনার গায়ে বেশ মাস লেগেছে। লাগবারই তো কথা। ভোরে উঠে দাঁতন করতে করতে খালি পায়ে বেড়াবার

পুরনো অভ্যাস এখনও আপনি রেখেছেন দেখছি। সেও ভাল।"

"আরে চধুরি, মানুষ কি আর বদলায়। যে যেমন ছিল তেমনিই থাকে।"

"এ কী কথা বলছেন আপনি মায়লেজী। মানুষ বদলায় না? কত রত্নাকর ডাকাত বদলে মুনি ঋষি হয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, সেই রকম গুরুর মত গুরুর কৃপা চাই। এ কথা আমার গুরুদেবের মুখে রাতদিন শুনেছি। আমাদের গুরুদেব তো মানুষ নন—তিনি দেবতা—ঠাকুর—ভগবান! জয় গুরু!"

লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে সে চলে গেল, তাঁকে আর এ সম্বন্ধে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে। বোঝা গেল যে গল্প করে নষ্ট করবার মত সময় তার হাতে তখন নাই। সে দাঁড়িয়েছিল শুধু একটু জিরিয়ে নেবার জন্য। মানুষ যে বদলায় সে কথা আর এম-এল-এ-সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আর যিনি চধুরির মুখে গুরুমাহাত্ম্যের বুলি ফোটাতে পারেন, তিনি যে মূককে বাচাল ও পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করাতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি।

আরও যে কয়জনের সঙ্গে দেখা হ'ল, সকলেরই হাবভাব এই একই ধরনের। সকলেই ব্যস্ত। কেউ তাঁকে বিশেষ আমল দিচ্ছে না। নিজের সুখদুঃখের কথা, দশের অবস্থার কথা, পৃথিবীর রাজনীতির কথা, রকেট, অ্যাটম্ বোমা, আবহাওয়া, ফসলের অবস্থা—প্রত্যাশিত বিষয়গুলোর উপর কোন কথা কেউ তোলেনি। গালাগাল পর্যন্ত কেউ দিল না। কারও কি কিছু চাইবার নাই? —ছেলের চাকরি, 'বাস' চালাবার অনুমতিপত্র, রাস্তায় মাটি ফেলবার ঠিকা, সরকারী লোন, সিমেণ্ট, বন্দুকের লাইসেন্স, মেয়ের বৃত্তি? 'ইলেকশন'-এর বছরে নির্বাচনপ্রার্থীর কাছ থেকে কিছুই চাইবার নাই? ঠিক করে এসেছিলেন, যে যা চাইবে তাকেই সে সম্বন্ধে যথাযোগ্য স্থানে একখানা করে সুপারিশের চিঠি দেবেন, আর আশ্বাস দেবেন প্রাণপণে চেষ্টা করবার। কেউ কিছু চায়নি। তব কি এরা সবাই বুঝে গিয়েছে যে, তাঁর চিঠিতে সরকারী মহলে কোন ফল হয় না! যাঁদের কাছে তিনি চিঠি দেন তাঁদের সকলের কাছে আগে থেকে বলা আছে যে এসব সুপারিশপত্রের উপর কোন গুরুত্ব দেবার দরকার নাই। তাঁর এই চালাকি কি এরা ধরে ফেলেছে? লোকে আজকাল চালাক হয়ে উঠছে। সকলে জেনে গিয়েছে যে সরকারী অফিসাররাও আজকাল আর এম-এল-এ'দের কথায় কোন গুরুত্ব দেয় না। আশকারা পাচ্ছে উপর থেকে! গত কয়বছরের মধ্যে সত্যিই এখানকার লোকজন যেন একটু বদলেছে! এই পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে, এখানকার জীবনের স্বাভাবিক মন্থর গতি, আগেকার তুলনায় দ্রুততর হয়েছে। কর্মব্যস্ততা বেড়েছে। এইটুকুই আশার কথা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল সম্বন্ধে যারা সন্দিগ্ধ, তাদের সম্মুখে সুবিধামত এই দৃষ্টান্তটা তুলে ধরতে হবে, ভোটের মরসুমের বক্তৃতায়।

নিজের জন্মভূমি ও কর্মক্ষেত্রের লোকজনের কাছ থেকে পাওয়া প্রাথমিক অভ্যর্থনা আশানুরূপ না হওয়ায়, একটু ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি অফিসে ফিরে এলেন। নিজের দুশ্চিন্তার কথাটা মুখ ফুটে বলতে বাধে অফিসের কর্মীদের কাছে। না বলতেই বুঝে নিয়েছে, এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লখনলাল আর বচ্‌কন্ মহতো।

"ঘাবড়াবার দরকার নাই ইয়েমিয়েলিয়ে-সাহাব। সব 'অওল রায়েট' হয়ে যাবে। জলখাবার খাওয়ার সময় সবাই মিলে বসে কেমনভাবে এগুতে হবে তারই একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলতে হবে। আপনি শুধু বার্কারদের (ওয়ার্কার) উপর বিশ্বাস রাখুন।"

"আর একটা কথা মায়লেজী—আসরে নেমে পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করবেন না। তাহলে আসছে বছর ভূতপূর্ব মায়লে হয়ে যাবেন নির্ঘাত দেখে নেবেন!"

এদের সব কথা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

সেকালকার মত সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি ছোলাভাজা, চিড়াভাজা ও পিঁয়াজের বড়ার জলখাবার খেতে বসলেন। আজ তিনি উদার হস্ত; জলখাবারের খরচটা আজ তাঁরই। আরম্ভ হয়ে গেল, খোশগল্পের মধ্যে দিয়ে কাজের কথা।

ভোটার। ভোটার। ভোটার। কেবল ভোটারদের কথা। কটর্ মটর্ করে ছোলা চিবুবার শব্দ এই গল্পের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে চলেছে। সাব্যস্ত হয়ে গেল—পাবলিক্ অবুঝ, জনতা খামখেয়ালী, জনসাধারণ নিমকহারাম। ভোটারদের তালিকায় যাদের নাম আছে তারাই শুধু মানুষ; বাকি সকলে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে আছে অন্যায়ভাবে।

স্ত্রী-ভোটারদের লখনলালজী বলে ভোটারী। এই ভোটারীদের নিয়ে তুমুল মতদ্বৈধ বাধল লখনলাল আর বচ্‌কন্ মহতোর মধ্যে। বোঝা গেল, জনসম্পর্ক বাড়াবার কার্যপ্রণালী স্থির করবার পথেও বাধা প্রচুর।

এম-এল-এ-সাহেবের ধৈর্যের পুঁজি তার চেয়েও বেশী। কথার মোড় ঘোরাবার জন্য তিনি বললেন—

"মোষের গলার ঘণ্টার এই আওয়াজটা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।"

বহু বড় বড় আবিষ্কারের সূচনা ঘটেছিল দৈবক্রমে। এখানকার ভোটার ভোটারীদের মনের চাবিকাঠির সন্ধানও পাওয়া গেল এই অবান্তর প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে।

"মোষের গলার ঘণ্টার আওয়াজ? বলছেন কী আপনি! দশ বছর রাজধানীতে থেকে আপনি একেবারে পরদেশী হয়ে গিয়েছেন। এ যে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ ভাল করে শুনুন। বুঝতে পারছেন না?"

"হ্যাঁ এইবার বুঝতে পারছি। আপনাদের চেঁচামেচির মধ্যে আগে এত ভাল করে শুনতে পাইনি। পুজোটুজো আছে নাকি কোথাও?"

"তা জানেন না?"

"এর কথাই তো আপনাকে বলে আসছি তিন বছর থেকে।"

"সকালের আরতি।"

"অষ্টপ্রহর মচ্ছব। সকাল বিকাল নাই এর মধ্যে।"

"প্র্যাকটিশ বেশ জমিয়ে নিয়েছেন স্বামীজী তিন বছরের মধ্যে।"

"যাঁকে দশজনে ভক্তি করে, তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করা ঠিক নয়।"

"ঠাট্টা করছি কই? যাঁর গা দিয়ে ভক্তরা জ্যোতি বার হতে দেখে, তাঁকে নিয়ে আমি ঠাট্টা করতে পারি?"

"তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমাধিস্থ থাকেন, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে।"

"আর উপরের গবাক্ষ দিয়ে ধোঁয়া বার হয়।"

"গোলমেলে ধোঁয়া নয়। নির্দোষ ধোঁয়া। অম্বুরী তামাকের গন্ধওয়ালা ধোঁয়া।"

"ভক্তরা সেই ধোঁয়া নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেবার জন্য বাইরে কাতারে কাতারে বসে থাকে।"

"সগন্ধি রেচক ও কুম্ভক। যোগ-সাধনার সৌরভ।"

সহকর্মীদের মধ্যে এই সব কথা-কাটাকাটি চলে অনেকক্ষণ। এম-এল-এ সাহেব একটাও কথা বলেননি এর মধ্যে। শুধু শুনছেন ও পরিস্থিতি বোঝবার চেষ্টা করছেন।

সব শুনে মনে হল, এতদিন সহকর্মীরা এখানকার সম্বন্ধে যে সব খবর দিয়েছিল, সেগুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। জগদ্‌গুরু শ্রীসহস্রানন্দ স্বামী বছর তিনেক থেকে এখানে আশ্রম খুলে বসেছেন। তিনি সিদ্ধ-পুরুষ এবং এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। এই জন্যই সকলে উঠতে বসতে 'জয় গুরু' বলে, এই জন্যই রাজনৈতিক দলের নেতারা এখানে এসে ফুলের মালা পান না; এই জন্যই খানিক আগে সকলে তাঁর আশ্রমের দিকে ছুটেছিল। জিলাপীর লোভে ছুটেছিল ছেলেপিলেরা, গুরুদেবের দর্শন পাবার লোভে ছুটেছিল বয়স্করা। আশ্রমে দুপুরে ধর্মগ্রন্থ পাঠ হয়, আর সন্ধ্যাবেলায় হয় কীর্তন। স্বামীজী নিজের সাধন-ভজন নিয়ে থাকেন। তিনি ফল-মূল ছাড়া আর কিছু খান না, এবং টাকা-পয়সা স্পর্শ করেন না। তাঁর নামে সবাই পাগল এবং তাঁর জন্য প্রাণ দিতে পারে না এমন লোক

এখানে নাই। তিনি ছুঁলে রোগ সেরে যায়। তাঁর বাকসিদ্ধির খ্যাতি অন্য জেলাতেও নাকি পৌঁছেছে। এ ছাড়া সিদ্ধ-পুরুষের অন্যান্য বিভূতিও তাঁর আছে।

এই সব জ্ঞাতব্য তথ্য একত্র করবার পর চরণদাসজী বসলেন সহকর্মীদের সংগে ভোটারদের স্বপক্ষে টানবার কৌশল ঠিক করবার জন্য। হঠাৎ জমাট আলোচনায় বাধা পড়ল।

"আসুন মৌলবী-সাহেব।"

"আদাব! আদাব ভাইসাহেব!"

এখানে এই প্রথম লোকের সংগে দেখা হল, যিনি 'জয়গুরু' বললেন না। একটু আশ্বস্ত হলেন চরণ দাসজী।

বেশ ভারিক্কে গোছের দাড়ি-সম্বলিত, ভারিক্কে প্রকৃতির লোক মৌলবীসাহেব। চাকরি করেন। এখানে বদলি হয়ে এসেছেন কিছুদিন আগে। থাকেন মৌলবীটোলা নামক পাড়ায়। এখন তিনি এখানে এসেছেন, সামান্য একটু কষ্ট দেবার জন্য পার্টি অফিসের লোকজনদের।

মৌলবীসাহেবের হাবভাব কথাবার্তা বেশ কেতাদুরস্ত। অতি বিনয়ের সংগে জানালেন যে পার্টি অফিসের লোকজনের সময়ের মূল্য তিনি জানেন। সেই বহুমূল্য সময় নষ্টের হেতু হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছেন তিনি সরকারী চাকরির কল্যাণে। তিনি এসেছেন সরকারী লোক-গণনার কাজে।

"না না, চিড়ে ভাজা আনবার দরকার নাই। আপানারা খান। সকালে নাস্তা করে তবে আমি বেরিয়েছি বাসা থেকে।"

এখানকার অফিসের স্থায়ী লোকজনের নাম ধাম তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। বেশ গুছিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে প্রত্যেক ব্যক্তির খুঁটিনাটি বিবরণ লিখে ছাপা 'ফর্ম'গুলো ভরলেন। কাজের শৃংখলা আছে তাঁর।

তারপর এম এল এ সাহেবকে অতি নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"হুজুরের নামও কি এখান থেকেই লেখা হবে?"

অতি নির্দোষ প্রশ্ন; কিন্তু চরণদাস এম এল এ-র মনের এক অতি স্পর্শাতুর জায়গায় আঘাত লাগে। সহকর্মীদের সহস্র বিদ্রূপ তিনি সহ্য করতে রাজী আছেন; কিন্তু সরকারী কর্মচারীর ধৃষ্টতা বরদাস্ত করবার পাত্র তিনি নন।

"এখানে লেখা হবে না তো, আবার কোথা থেকে লেখা হবে!"

"আপনি এখন আর এখানে থাকেন না তো; সেইজন্য জিজ্ঞাসা করলাম হুজুরের কাছে।"

"আমার ঘর-বাড়ি সব এখানে! আমি এখানকার বাসিন্দা নই?"

"আপনার বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন কিনা; তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম কথাটা।"

"বসতবাড়ি ভাড়া দিয়েছি বলে ভোটার-তালিকায় নাম থাকবে না আমার?"

"গোস্তাকি মাপ করবেন হুজুর; ভোটার-তালিকার সংগে আদম-শুমারির কোন সম্বন্ধ নাই।"

"আচ্ছা, যথেষ্ট হয়েছে! আইনচঞ্চু-মশাই এবার থামুন আপনি! সরকারী নিয়ম-কানুন আর শেখাতে হবে না আমাকে, আপনার!"

"তোবা! তোবা! হুজুরকে কানুন শেখাব আমি? আমরা হুকুমের চাকর মাত্র; আপনারাই তো কানুন তৈরী করেন। আপনি যদি এখানকার আদম-শুমরের মধ্যে নাম দিতে চান, তবে তাই হবে। যেখানে ইচ্ছা আপনি নাম দিতে পারেন।"

এম এল এ সাহেবের মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ জাগে। মৌলবীসাহেবটি তাঁর রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর দলের লোক নয়তো?
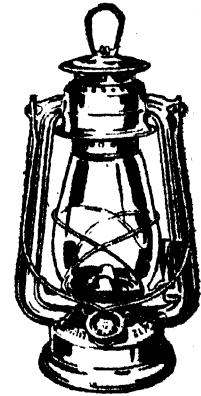
"তবে এতক্ষণ এত আইন-কানুন ঝাড়ছিলেন কেন! তিন পয়সা মাইনের চাকরি, আর লম্বা লম্বা কথা।"

"আপনি গণ্যমান্য ব্যক্তি। ভদ্রলোকের ভাষায় কথা বলা উচিত আপনার।"

"মুখ সামলে কথা বল বলছি! আমাকে অভদ্র বলা! এখানকার সেন্সাস অফিসার কে? তোমার চাকরি আমি খাব—এই বলে রাখলাম! সরকারী মহলে সে প্রতিপত্তিটুকু আমি রাখি, বুঝলে!"

"সব বুঝেছি; আর বোঝাতে হবে না। এখন বলুন আপনার নাম!"

কলম হাতে নিয়ে, 'ফর্ম' সম্মুখে রেখে, উত্তরের প্রতীক্ষা করছেন মৌলবীসাহেব। এম এল এ-সাহেব নিরুত্তর, লোকটির ধৃষ্টতা দেখে। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করছে—যেন জানে না।

"জীবিকা?"

এম এল এ নিরুত্তর।

"বিবাহিত না অবিবাহিত?"

উত্তর দিলেন না চরণদাসজী।

"বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নাকি? বৈজ্ঞানিকদের আলাদা কার্ড আছে।"

আর থাকতে পারলেন না চরণদাস এম এল এ।

"বেয়াদব লোকদের বৈজ্ঞানিকভাবে মেরে শায়েস্তা করতে আমি বিশেষজ্ঞ।"

আস্তিন গুটিয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দলের লোকরা তাঁকে ধরে ফেলল।

মৌলবীসাহেব ধীর কণ্ঠে উপস্থিত অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—"ইনি আমার লোকগণনার কাজ অসম্ভব করে তুলেছেন; অপমান করেছেন; মারধরের হুমকি দেখিয়েছেন; চাকরি খাওয়ার ভয় দেখিয়েছেন। শুধু নাম-ধাম বলতেই অস্বীকার করেননি—একজন সরকারী কর্মচারীকে তাঁর আইনসংগত সরকারী কাজে বাধা দিয়েছেন। আপনারা সবাই সাক্ষী। আমি আজই এ'র বিরুদ্ধে কোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করব।"

"নালিশ দায়ের করবার হুমকি দেখায়! জনসাধারণের প্রতিনিধিকে! ছাড় তোমরা ওকে ঘাড় ধরে বার করে দিচ্ছি এখনই!"

তাঁর আস্ফালনে কান না দিয়ে, সহকর্মীরা এম এল এ সাহেবকে জাপটে ধরে রেখেছে।

মৌলবীসাহেব ধীরে-সুস্থে নিজের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে, গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। চোখমুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ব্যঞ্জনা বেশ স্পষ্ট।

এম এল এ সাহেবের দাপাদাপি তখনও থামেনি। ঘরের মধ্যে থেকেই তিনি চীৎকার করছেন—"ভেবেছেন আমি আপনাকে চিনিনি। পুলিসে খবর দেবো আমিও!"

লখনলাল বলে—"করছেন কি আপনি ইয়েমইয়েলিয়ে-সাহাব! সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত মেজাজ দেখাচ্ছেন। ভোটার-ভোটারীরা মনে করবে কী!"

দুই একটা চিন্তার রেখা যেন পড়ল তাঁর কপালে। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর দাপাদাপি সব বন্ধ হয়ে গেল। চাপা গলায় বচকন মহতোর দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন—'ইলেকশানটা একবার হয়ে যেতে দাও। তারপর এই মৌলবীটাকে নাকখত দিইয়ে ছাড়ব।"

তারপর আবার সকলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে বসলেন ভোটারদের মন পাবার আশু উপায় সম্বন্ধে। আলোচনা যেখানে স্থগিত কথা হয়েছিল, ঠিক তার পর থেকে আরম্ভ হল। অর্থাৎ গুরুদেবের প্রসংগ থেকে। সর্ববাদিসম্মতভাবে স্থির হয়ে গেল যে 'স্লোগান' পালটাতে হবে। স্বামী সহস্রানন্দকে লক্ষ্য করেই এগুতে হবে অতি সতর্কতার সংগে। ভোটার-চরণদাসকে হতে হবে গুরুচরণদাস। এইবার স্নানাহারের জন্য উঠতে হয়। লখনলালজী জয়ধ্বনি দিল—"বোলো একবার গুরুচরণদাসজীকী জয়!" "সব 'অওল রায়েট' হয়ে যাবে—Don't ঘাবড়াও গুরুচরণদাসজী।"

বিকালের দিকে এম এল এ সাহেব, লখনলাল, আর বচকন মহতো, ফল মূল, পেঁড়া, সন্দেশের ভেট নিয়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে গিয়ে হাজির জগদ্গুরু শ্রীসহস্রানন্দের আশ্রমে।

আজ বোধহয় আশ্রমে কোন এক বিশেষ পর্বের দিন। গেটের দুই পাশে কলাগাছ পোঁতা হয়েছে। সম্মুখের রাস্তা, কম্পাউন্ড, বারান্দা লোকে-লোকারণ্য। ভক্ত স্ত্রী পুরুষ বালকবালিকা, দর্শক প্রার্থীর ভিড় ঠেলে ঠেলে ভিতরে ঢোকা শক্ত। কিন্তু আনন্দ-উৎসবের দিনের লোকজনের সেই প্রাণবন্ত লীলা-চাঞ্চল্য এখানে অনুপস্থিত। গুরুদেবের সাধন-ভজনের ব্যাঘাত হবে বলে কি এখানে কথাবার্তা বলা বারণ? প্রশ্নভরা চাউনি নিয়ে এম এল এ সাহেব তাকালেন নিজের সংগীদের দিকে। লখনলালজীও তাঁরই মত বিস্মিত হয়েছে। তার কাছেও জিনিসটা অপ্রত্যাশিত। অঘটন কিছু ঘটল নাকি? বিষাদের ছায়া? স্বামীজী কি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন? সকলের মুখ-চোখে উৎকণ্ঠার ছাপ কেন? আজকে এখানে আসাই বুঝি বার্থ হল। এখানকার প্রাপ্তবয়স্করা সকলেই যে তাঁর ভোটার। সকলেই তাঁর পরিচিত; তারাও নিশ্চয়ই তাঁকে চেনে; কিন্তু কারও মুখে সে পরিচিতির সাড় নাই। কিছু জানবার কৌতূহলটুকুও যেন এরা হারিয়েছে। এ-রকম পীঠস্থানে কারো কাছ থেকে কোন রকম সম্মান পাবার আশা নিয়ে তিনি আসেননি। তবু হেসে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে, নিরুত্তর থেকে শুধু ড্যাবড্যাব করে তাকানো, এ জিনিস তাঁর কল্পনারও বাইরের। সম্মুখের এই ভদ্রলোকের মেজ ছেলেটি—তাঁর চেষ্টাতেই গত বছর মেডিকেল কলেজে ভরতি হতে পেরেছে। পাশেই এই যে লোকটি মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে, একে দুই বছর আগে তিনি 'কণ্ট্রোল'-এর গমের দোকান পাইয়ে দিয়েছিলেন। যারা চোখ বুজে, হাত জোড় করে বসে রয়েছে, তারা না হয় দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু এরা তো দেখতে পাচ্ছে তাঁকে। দেখেও না দেখবার ভান করছে কেন এরা? লোক চরিয়েই খান তিনি। রাজনীতিক জীবনে বহু লোকের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয় প্রত্যহ। কেউ হাঁ করবার আগেই তিনি বুঝে যান লোকটা কী বলবে। কিন্তু এখানকার এতগুলি ভোটার 'ভোটারীর' হঠাৎ কী হল সেইটা বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারছেন না। সবাই মিলে তাঁকে একঘরে করে, তাঁর সংগে কথা বন্ধ করবার পণ করেছে নাকি? বোঝা যাচ্ছে না কিছু। একটা আচমকা আঘাতে এরা সকলে যেন থ হয়ে গিয়েছে। নইলে এরাও তো দেখা যাচ্ছে তাঁরই মত ফল-মূল মিষ্টির থালা সাজিয়ে এনেছিস। কারো কারো হাতে আবার টিফিন-কেরিয়ার! রান্না করা জিনিস নাকি ওর মধ্যে? স্বামীজী তো শুধু ফল-মূল খান! ওগুলো বোধ হয় তাহলে তাঁর সংগীদের জন্য।

অবস্থা প্রতিকূল দেখে পিছপা হবার লোক তিনি নন। চোখ বুজে, দরাজ গলায় 'জয় গুরুদেব' বলে চেঁচিয়ে উঠে, সম্মুখের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে সাষ্টাংগ প্রণাম করলেন। সমবেত ভক্তবৃন্দ চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল। আচম্বিতে দৈববাণী হলেই এক বোধহয় এখানকার ঝিমিয়ে পড়া পরিবেশ এরকমভাবে হঠাৎ জেগে উঠতে পারত। মূক ভক্তবৃন্দ হঠাৎ যেন তাদের কণ্ঠস্বর আর মনের বল ফিরে পেল। সমবেত কণ্ঠস্বরে গুরুদেবের জয়ধ্বনি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। 'ভোটারীদের' মিহিগলা সুর মেলাচ্ছে ভোটারদের মোটা গলার সংগে। জনতার উৎসাহ ও উদ্দীপনার আবেশ-লাগা এই সামূহিক কণ্ঠস্বর, এম এল এ সাহেবের অতি পরিচিত।

নিদারুণ সঙ্কটে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভক্তবৃন্দ হঠাৎ একটা আঁকড়ে ধরবার মত ধ্বনির আশ্রয় পেয়ে বর্তে গিয়েছে।

পবন অনুকূল। ভক্তবৃন্দের সশ্রদ্ধ, সপ্রশংস-দৃষ্টি চরণদাসজী অনুভব করতে পারছেন তাঁর সর্বশরীরে। বিমল আনন্দের উল্লাস লেগেছে তাঁর মুখমণ্ডলে। এতক্ষণে তিনি চোখ খুললেন। সত্যিই সবাই তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। সে দৃষ্টিতে পরিচিতির আভাস আবার জেগেছে। সকলে যেন এতক্ষণে চিনতে পারল তাঁকে, এখানকার গণ্যমান্য

ইয়েমিয়েলিয়েসাহাব বলে। তাদের গোষ্ঠী-রই একজন। গুরুভাই। আপনার জন। বড় ভাই। ইয়েমিয়েলিয়ে-ভাইয়া। এ'র সঙ্গে প্রাণ-খুলে কথা বলা চলে।

চরণদাসজী বললেন—"জয় গুরু!"

মেডিকাল কলেজের ছাত্রটির পিতা 'জয় গুরু' বলে প্রত্যাভিবাদন করে, আরও কাছে ঘে'ষে এলেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্য।

চরণদাসজীরা প্রোগ্রাম করেছিলেন যে, এখানে এসেই নাটকীয়ভাবে সহস্রানন্দ স্বামীর পা জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু এখানে পৌ'ছবার পর, স্বামীজীর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে হতাশ হয়েছিলেন। এখন মনের বল ফিরে পেয়েছেন।

ভদ্রলোকটি এম এল এ সাহেবকে বললেন—"ফল-মূল মিষ্টিগুলো আপনি ওই সম্মুখের বারান্দায় রেখে দিন। কোনও জিনিস গোলমল হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সে বিষয়ে।"

"দর্শন পাওয়া যাবে না এখন?"

"সন্দেহ। কথা আছে এর মধ্যে। শোনেননি আপনি এখনও?"

"না তো!"

কণ্ট্রোলের দোকানধারী লোকটি এরই মধ্যে কখন যেন তাঁর গা ঘে'ষে এসে দাঁড়িয়েছে, তাঁর সঙ্গে একটি কথা বলতে পাবার লোভে।

"মায়লে-ভাই, বিপদে পড়ে আপনার কথাই আমাদের মনে পড়ছিল এতক্ষণ।"

"আমার কথা? মায়লে আমি ঠিকই; পথের ময়লা; ড্রেনের ময়লা। অতি নগণ্য মায়লে আমি। আমাকে আপনারা স্মরণ করতে পারেন এতো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন আদেশ করুন। সামান্য কাঠবেরালিও শ্রীরামচন্দ্রজীকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিল। এই নগণ্য মায়লেও যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করবে না। ফলাফল গুরুদেবের হাতে। জয় গুরুদেব!"

সকলে বলল 'জয় গুরুদেব!'

তারপর মায়লেভাই এ'দের মুখে সব শুনলেন। উৎকট পরিস্থিতি। সমূহ বিপদ। সব বুঝি যায়। ত্রিভুবন রসাতলে গেল বুঝি এইবার! তাঁর দরকার নাই, দরকার আমাদের! নিজেদের প্রয়োজনেই আমরা ভগবানকে আঁকড়ে থাকি। নর রূপ নিয়েছেন বলেই কি আমরা ভগবানকে নিয়ে যা নয় তাই করতে পারি? আমাদের চোখের সম্মুখে ভগবানকে টেনে পাঁকে ফেলা হবে; আর আমরা তাই প্যটপ্যট করে তাকিয়ে দেখবো কেবল? যশ, মান, ধর্ম কর্ম, ভাল মন্দ সব কিছুরই ভার মায়লে-ভাইয়ের হাতে স'পে দিয়ে ভেবেছিলাম পাঁচ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত থাকব, কিন্তু আপনি আমাদের মধ্যে থাকতে এখানে এ কী অনর্থ! সংকটে পড়লে আমরা সকলে গুরুদেবের স্মরণ নিতে অভ্যস্ত। একমাত্র সেইখানেই প্রাণ খুলে নিজের সব কথা বলা যায়; বলে বুকের বোঝা হাল্কা করা যায়। তারপর তাঁর আদেশমত চলে, বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারা যায়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে উপায় যে নাই। এ কথা যে তাঁর কাছে তুলতে বাধে। গুরুদেবের কাছে কিছু বলতে বাধা উচিত নয়—তবু বাধে; দুর্বল মানুষ আমরা। অবশ্য তিনি জানতে পারেন সব; হয়ত তিনিই আমাদের দিয়ে এ-কথা আপনাকে বলাচ্ছেন। নিদ্রায় জাগরণে সব সময় যে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে আমাদের উপর। এ কৃপাটুকু না থাকলে কি আমরা বাঁচি! আপনি তো শুধু এখানকার মায়লে নন আপনি যে ব্যথার ব্যথী। আপনি যে ভক্ত লোক, সে কথা আর কে জানে না দাদা!"

"আমাকে অর ভক্ত বলে লজ্জা দিও না ভাই। ভক্ত হওয়া কি চাট্টিখানি কথা। না আছে সে মন, না আছে সে সময়। সাধে কি লোকে আমাদের মায়লে বলে।"

মায়লে ভাই তারপর সব শুনলেন। এ'দের বিপদের যথার্থ প্রকৃতিটা বুঝতে একটু সময় লাগল, তাঁর মত বুদ্ধিমান লোকেরও। বোঝবার পর স্তম্ভিত হলেন। এতো শুধু ভক্তের অনুরোধ নয়; এযে ভোটার ভোটারদিদের আদেশ! বললেন—"এতো কারও একার বিপদ নয়; বিপদ যে সমগ্র গোষ্ঠীর। এ বিপদ আমার, আপনার, সকলকার। সমাজের বিপদ; দেশের বিপদ। আমি তো সমাজের বাইরের লোক নই—আমি যে আপনাদেরই একজন। আমি কি চুপ করে বসে থাকতে পারি, এ-কথা আপনাদের মুখে শোনবার পর?"

স্ত্রী-পুরুষ সকলে মায়লে ভাইয়ের কাছে আসতে চায়, সকলে তাঁর মুখের আশ্বাসবাণী শুনতে চায়। সকলে এমনভাবে তাঁকে ঘিরে ধরেছে যে নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম।

তিনি আশ্বাস দিলেন—"চেষ্টার ত্রুটি আমি রাখব না। এর জন্য দিল্লী পর্যন্ত যদি যেতে হয় তা আমি যাব।"

লখনলাল ভরসা দিল—"সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত আমরা লড়ব।"

বচকন মহতো চে'চিয়ে বলল—"দরকার হলে অনশন করব আমরা সেন্সাস অফিসারের বাড়ির দোরগোড়ায়। সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করে দেবো সেন্সাস অফিসে। আরও কত কি আমরা করতে পারি। চাই শুধু আপনাদের নৈতিক সমর্থন। আপনাদের চোখে আজ যে আগুন

দেখতে পাচ্ছি, সেই আগুন আমরা ছড়িয়ে দেবো সারা দেশে।"

পায়ের ঠোকর মেরে তাকে থামাতে হয়। বক্তৃতা একবার আরম্ভ করলে সে থামতে জানে না।

লখনলাল জয়ধ্বনি দিল—"বোলো একবার শ্রীসহস্রানন্দ স্বামীজিকী জয়!"

বচকন মহতো হাত তুলে লাফিয়ে উঠে ইনকিলাব জিন্দাবাদের ধরনে চেঁচাল—"ঔর ভী একবার বোলো গুরু মহারাজ কী জয়!"

লখনলাল বলল "এ সম্বন্ধে এখন একটা কাজের প্রোগ্রাম ঠিক করতে হয়।"

বচকন মহতো এ কথায় সায় দিল। "প্যারে ভাইয়ো আওর বহনে! আমি প্রস্তাব করছি যে আপনারা সকলে যে যেখানে আছেন বসে পড়ুন। তারপর পাঁচ মিনিট শ্রীগুরুজী ভগবানের ধ্যান করুন, চোখ বুজে। আমরা ততক্ষণ একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলি। আপনাদের ধ্যানের একাগ্রতার উপরই আমাদের প্রোগ্রামের সাফল্য নির্ভর করবে।"

"ইয়েমিয়েলিয়ে-সাহাব আর আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।"

"শান্তি! শান্তি!"

সকলে চোখ বুজে বসেছে। সম্মুখের ঘরের বন্ধ দরজা মনে হ'ল যেন ইঞ্চিখানেক ফাঁক হ'ল। ধোঁয়া বার হচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে। অম্বুরী তামাকের সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়ে উঠেছে। নিমীলিতচক্ষু ভক্তবৃন্দ আসন্ন সংকট থেকে উদ্ধার পাবার আশ্বাস পাচ্ছে প্রতিবার নিশ্বাসের সঙ্গে এই সৌরভ বুকে টেনে নেবার সময়।

ফিস ফিস করে পরামর্শ হচ্ছে নূতন প্রোগ্রাম সম্বন্ধে। পরিস্থিতি বদলেছে সে বিষয়ে কারও মতদ্বৈধ নাই। "স্লোগান পাল্টাতে হবে ইয়েমিয়েলিয়ে-সাহাব।"

চরণদাসজী বললেন—"গুড় দিয়েই যদি মাছি মরে তবে আর তিত ওষুধ ব্যবহার করবার দরকার কি!"

লখনলাল বলে—"গুরুচরণদাসজীকে এবার হতে হবে মৌলবীচরণদাস। এ না করে উপায় নাই।" সর্বসম্মতভাবে প্রোগ্রাম স্বীকৃত হয়ে গেল। বচকন মহতো চেঁচাল—"বোলো একবার—"।

পাছে আবার বেফাঁস কিছু বলে ফেলে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি পাদপূরণ করে দিল লখনলাল—"গুরু-চরণ-কমলো কী জয়!"

এই জয়-ধ্বনি ভক্তদের ধ্যান ভাঙ্গাবার নোটিস। 'রেডি! আর দেরী করবার সময় নাই মোটেই! সব 'অওল রায়েট' হয়ে যাবে! শুধু "বোলো একবার—সহস্রানন্দ স্বামীজী কী জয়!"

অগণিত নরনারীর মিছিল বার হ'ল সহস্রানন্দ স্বামীর আশ্রমের গেট থেকে। সবচেয়ে আগে আগে চলেছেন চরণদাসজী। সকলেই চিন্তাভারাক্রান্ত; শুধু লখন-লালজী ও বচকন মহতো বাদে। তাদের আশ্বাসে কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তাই সকলে গুরুদেবের নাম স্মরণ করতে করতে চলেছে। এ সংসারে তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছু যে হবার উপায় নাই! আর ভরসা, মায়লে ভাইয়া (মায়লেদা)!

মায়লে-ভাইয়া নিজে কিন্তু মেটেই ভরসা পাচ্ছেন না। মৌলবীটোলার কাছে গিয়ে এক গাছতলায় এই নীরব শোক-মিছিলকে থামতে বলল লখনলাল।

"এখান থেকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব একাই যাবেন সেই বদ মৌলবীটার বাড়িতে।"

"প্যারে ভাইয়ো ঔর বহনে! মায়লেজীর উদ্দেশ্য যাতে সফল হয়, সেজন্য আসুন আমরা সকলে মিলে ততক্ষণ এই গাছতলায় বসে গুরুদেবের নাম জপ করি। জয় গুরু, জয় গুরু; মায়লেজী আর দেরী করবেন না আপনি।"

বহু রকম বিষয়ের তদ্বির এম এল এ সাহেব জীবনে করেছেন। কিন্তু এ বড় কঠিন ঠাঁই! চরণদাসজীর পা কাঁপছে। হাইকম্যাণ্ডের নাম স্মরণ করেও মনে বল পাচ্ছেন না তিনি। মৌলবীসাহেব বাড়ির বারান্দায় গড়গড়া টানছিলেন! দা-কাটা তামাকের গন্ধ অনেক দূর থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়ালেন মৌলবীসাহেব।

"আসুন, আসুন, এম এল এ সাহেব। সেলামালেকুম!"

ব্যাপারটা ভালভাবে বোঝবার আগেই, চরণদাসজী গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তাঁর পায়ের উপর। বেশ করে জড়িয়ে ধরেছেন পাজামাসম্বলিত পা দুখান। "করেন কি, করেন কি, এম এল এ সাহেব!"

তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না—যতক্ষণ না মৌলবীসাহেব কথা দিচ্ছেন যে, তাঁর একটা অনুরোধ রাখবেন।

"না না, আপনি আমার গরীবখানায় পদার্পণ করেছেন তা'তেই হয়ে গিয়েছে। সে পুরনো কথা আর তোলবার দরকার নেই। ছাড়ুন! উঠুন উঠুন। এই চেয়ারে বসুন!"

"না, আপনি আগে কথা দেন।"

"বলছি তো। আপনি এসেছেন সেই যথেষ্ট। আর মাপ চাইতে হবে না। রাগের মাথায় লোকে কত সময় কত কি বলে ফেলে। সে সব কথা কি ভদ্রলোকে মনের মধ্যে গিঁঠ দিয়ে বেঁধে রাখে চিরকালের জন্য?"

"আপনি কথা দেন, আগে"।

"কেন আমায় লজ্জা দিচ্ছেন বারবার। যা হবার হয়ে গিয়েছে। পা ছাড়ুন!"

কথা আদায় করে চরণদাসজী উঠে দাঁড়ালেন। জানালেন—"এখানকার সকলে আজ অতি বিচলিত। এত বড় বিপদ তাদের জীবনে কখনও আসেনি। এ বিপদ থেকে সকলকে উদ্ধার করতে পারেন, একমাত্র আপনি। রাখলে রাখতে পারেন, মারলে মারতে পারেন।"

"আমি?"

"হ্যাঁ, আপনি।"

"খোদা হাফেজ! বলেন কী!"

সন্দিগ্ধ মৌলবীসাহেব জোরে জোরে নিশ্বাস টানলেন দুইবার, এম এল এ সাহেবের মুখ থেকে কোনরকম গোলমেলে গন্ধ বার হচ্ছে কিনা, তাই পরখ করবার জন্য। না পেয়ে উদ্বিগ্ন হলেন আরও বেশী।

"বলছি। বলবো বলেই তো এসেছি। এক কথায় বলবার মত নয় ব্যাপারটা। খোদা আপনার মঙ্গল করবেন। আজ আপনি সামান্য ব্যক্তি নন। এতগুলি লোকের জীবন-মরণ স্বর্গ-নরক নির্ভর করছে আপনার কলমের এক খোঁচার উপর। সবাই আপনার মুখ চেয়ে রয়েছে।"

"বলুন না, কি করতে হবে।"

এতক্ষণে চরণদাসজী আসল কাজের কথাটা পাড়লেন। গলার স্বর কাঁপছে। মৌলবীসাহেবের বিবেকে বাধতে পারে; সেইটাই তাঁর আসল ভয়।

"মৌলবীসাহেব, আজ সকালে আপনি স্বামী সহস্রানন্দের আশ্রমে গিয়েছিলেন লোক গণনার কাজে। সেই সম্বন্ধেই কথাটা। সেখানে আশ্রমের বাসিন্দাদের গোনবার সময় স্বামীজীকেও গুণে ফেলেছেন। আপনার ফাইলে মানুষদের মধ্যে থেকে তাঁর নামটা কেটে দিতে হবে। তিনি তো মানুষ নন, তিনি যে দেবতা, তিনি যে ভগবান!"

মৌলবীসাহেবের অন্যমনস্কভাবে দাড়ি চুলকানো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

আগা আহমদের প্রাণ অতিষ্ঠ। এক ফোঁটা মেয়ে তার বউ মালিকা খানমটা—ফুঁ দিলে উড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু সেই যে সাতসকাল ভোর বেলা থেকে ক্যাট্‌ক্যাট্‌ আরম্ভ করে তার থেকে আগা আহমদের নিষ্কৃতি নেই। 'মিনষে', 'হাড়হাভাতে', 'ডাকরা'—হেন গাল নেই যেটা আগা আহমদকে দিনে নিদেন পঞ্চাশ বার শুনতে হয় না। আর গয়না-গাটি নিয়ে গঞ্জনা—সে তো নিত্যিকার রুটি পনীর। এবং সেই সামান্য রুটি পনীর-টুকুও যদি ভালো করে আগা আহমদের সামনে ধরতো তবুও না হয় সে সব কিছু চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিত, কিন্তু সে রুটিও অধিকাংশ দিন পোড়া, এবং পনীরের উপরে যে মসনে পড়েছে সেটা চেঁচে দেবার গরজও বীবীজানের নেই? আগা আহমদ দিন-মজুর; খিদে পায় বড্ডই।

ব্যাপারটা চরমে পেঁছল বিয়ের বিশ বছর পর একদিন যখন আগা আহমদ কি একটা খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, মালিকা খানম নিজের খাবার জন্য লুকিয়ে রেখেছে মুরমুরে রুটি, ভেজা-ভেজা কাবাব, টনটনে সেদ্ধ ডিম এবং তেলতেলে আচার!

সে রাত্রে আগা আহমদ খেল না। বউ ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'ও আমার লবাব-পুত্তুরে রে—রুটি পনীর ও'য়ার রোচে না। কোথায় পাব আমি কাবাব আণ্ডা আমার আগা-জানের জন্যে—'

সেই কাবাব আণ্ডা! যা বউ নিজে খেয়েছে!

স্থির করলো, ওকে খুন করবে। নূতন করে তালাক দিয়ে লাভ নেই। অন্তত একশ' বার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মালিকা খানম মুখ বেঁকিয়ে আপন কাজে চলে যায়। ওরা থাকে বনের পাশে—পাড়াপ্রতিবেশীও কেউ নেই যে মালিকা খানমকে এসে বলবে, 'তোমার স্বামী যখন তোমাকে তালাক দিয়েছে তখন তার পর ওর সংগে সহবাস ব্যভিচার।' আর থাকলেই বা কি হত? কেউ কি আর সাহস করে আসত? আগা আহমদের মনে পড়ল গত পনেরো বছরের মধ্যে কেউ তাদের বাড়িতে আসেনি।

শুয়ে শুয়ে সমস্ত রাত ধরে আগা আহমদ প্ল্যান করলো, খুন করা যায় কি প্রকারে।

সকাল বেলা বনে গিয়ে খুঁড়লো গভীর একটা গর্ত। তার উপর কঞ্চি কাঠ ফেলে উপরটা সাজিয়ে দিল লতা পাতা দিয়ে।

বিকেলের ঝোঁকে বউকে বললে, 'গা টা ম্যাজ ম্যাজ করছে। একটু বেড়াতে যাবে?'

বউ তো খল খল করে হাসলে চোঁচা দশটি মিনিট। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোঙ্ক্রাবো, মা—মিনষের পেরাণে আবার সোয়াগ জেগেছে।'

আগা আহমদ নাছোড়বান্দা। বহু মেহন্নৎ করে গা গতর পানি করে গর্তটা তৈরী করেছে।

বউ রাজী হল। বেড়াতে নিয়ে গেল বনে। কৌশলে বউকে স্টিয়ার করে করে গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে দিলে এক মোক্ষম ধাক্কা। তার পর ফের বাঁশ-কঞ্চি লতাপাতা সহযোগে গর্তটি উত্তমরূপে ঢেকে দিয়ে আগা আহমদ তার পীর-মুরশীদকে 'শুকুরিয়া' জানাতে জানাতে বাড়ি ফিরল।

রান্না করতে গিয়ে বাড়িতে অনেক-কিছুই আবিষ্কৃত হল। হালুয়া, মোরব্বা, তিন রকমের আচার, ইস্তেক উত্তম হরিণের মাংসের শুটকি। পরমানন্দে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আগা রান্নাবান্না সেরে আহারাদি সমাপন করলে। ক্যাটক্যাটানি না শুনে না শুনে আজ তোর চোখে নিদ্রা আসবে—এ-কথাটা যত বার ভাবে ততই তার চিত্তাকাশে পুলকের হিল্লোল জেগে ওঠে।

পরদিন কিন্তু আগা আহমদের শান্ত মনের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। হাজার হোক্‌—তার বউতো বটে। তাকে ওরকম মেরে ফেলাটা—? বিয়ের সময় হজরৎ মুহম্মদের নামে সে কি শপথ নেয় নি যে তাকে আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ করবে? কিন্তু ওদিকে আবার সেই দুশ্‌মন্‌টাকে ফের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে তো মন চায় না।

এ অবস্থায় আর পাঁচজন যা করে আগা আহমদও তাই করলে। 'যাক্‌গে, ছাই, গিয়ে দেখেই আসি না, বেটী গর্তের ভিতর আছে কি রকম। সেই দেখে মনস্থির করা যাবে।'

ও আমার লবাবপুত্তুর রে—

গর্তের মুখের পাতা সরাতেই ভিতর থেকে পরিত্রাহি চিৎকার! 'আল্লার ওয়াস্তে রসুলের ওয়াস্তে আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।' কিন্তু কী আশ্চর্য! এতো মালিকা খানমের গলা নয়। আরো পাতা সরিয়ে ভালো করে তাকিয়ে আগা আহম্মদ দেখে—বাপরে বাপ, এ্যাব্বড়া কালো-নাগ, কুলো-পানা-চক্কর-গোখরো সাপ! সে তখনো

চেঁচাচ্ছে, 'বাঁচাও, বাঁচাও, আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব, লক্ষ টাকা দেব, আমি গুপ্তধনের সন্ধান জানি; আমি তোমাকে রাজা করে দেব।'

সম্বিতে ফিরে আগা আহমদের হাসিও পেল। সাপকে বললে, 'না তুমি তো কত লোকের প্রাণ নির্ভয়ে হরণ করো—নিজের প্রাণটা দিতে অত ভয় কিসের?'

ঘেন্নার সঙ্গে সাপ বললে, 'ধ্যত্তর তোর প্রাণ! প্রাণ বাঁচাতে কে কাকে সাধছে! আমাকে বাঁচাও এই দুশমন শয়তানের হাত থেকে। এই রমণীর হাত থেকে।' তারপর ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, 'মা গো মা, সমস্ত রাত কী ক্যাটক্যাট কী বকাটাই না দিয়েছে। আমি ভ্যাকরা, আমি মন্দা মিনষে হয়ে একটা অবলা—হ্যাঁ অবলাই বটে—নারীকে কোনো সাহায্য করছি নে, গর্ত থেকে বের-বার কোনো পথ খুঁজছি নে, আমি একটা অপদার্থ, ষাঁড়ের গোবর। আমি—'

আগা আহমদ বললে, 'তা ওকে একটা ছোবল দিয়ে খতম করে দিলে না কেন?'

চিল চ্যাঁচানি ছেড়ে সাপ বললে, 'আমি ছোবল মারব ওকে! ওর গায়ে যা বিষ তা দিয়ে সাত লক্ষ কালনাগিনী তৈরী হতে পারে। ছোবল মারলে সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়তুম না? সারাতো কোন ওঝা? ওসব পাগলাম রাখো। আমাকে তুমি গর্ত থেকে তোলো। তোমাকে অনেক ধনদৌলত দেব। পশুপক্ষী সাপ-বিচ্ছুর বাদশা সুলেমানের কসম।'

রূপকথা নয় সত্য ঘটনা বলে দেখা গেল মালিকা খানমেরও অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে—এক রাত্রি সর্পের সঙ্গে সহবাস করার ফলে। কারণ এতক্ষণ ধরে একটিবারও স্বামীকে কোনো কড়া কথা বলেনি। এটা একটা রেকর্ড, কারণ ফুল-শয্যার রাত্রেও নাকি সে মাত্র তিনটি মিনিট চুপ করে থেকেই ক্যাটক্যাটানি আরম্ভ করে দিয়েছিল।

মালিকা খানম মাথা নিচু করে বললে, 'ওরা গুপ্তধনের সন্ধান জানে।'

আমাদের আগা আহমদের টাকার লোভ ছিল মারাত্মক। সাপকে সুলেমানের তিন কসম খাইয়ে গর্ত থেকে তুলে নিল। বউকেও তুলতে হল—সেও শুধরে গেছে জানিয়ে অনেক কিরে কসম কেটেছিল।

সাপ বললে, 'গুপ্তধন আছে উত্তর মেরুতে—বহু দূরের পথ। তার চেয়ে

প্রসন্ন বদান্যতায়......

অনেক সহজের পথ তোমাকে বাংলে দিচ্ছি। শহর কোতয়ালের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরবো আমি। কেউ আমাকে ছাড়াবার জন্য কাছে আসতে গেলেই মেয়েকে মারতে যাবো ছোবল। তুমি আসা মাত্রই আমি সুড়সুড় করে সরে পড়বো—তোমাকে দেবে বিস্তর এনাম, এন্তের ধন-দৌলত। কিন্তু খবরদার, ঐ একবার। অতি লোভ করতে যেয়ো না।'

ভূতের মুখে রাম নাম?
সাপের দ্বারা ভালো কাম?

শহরে এমনই তুল-কালাম কাণ্ড যে তিন দিন যেতে না যেতে সেই বনের প্রান্তে আগা আহমদের কানে পর্যন্ত এসে পৌঁছল কোতয়াল-নন্দিনীর জীবন-মরণ সমস্যার কথা। তিন দিন ধরে তিনি অচৈতন্য। গলা জড়িয়ে কাল-নাগ ফোঁস ফোঁস করছে। কোতয়াল লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তবু সাপুড়েরাও নাকি কাছে ঘেঁষছে না, বলছে উনি মা মনসার বাপ।

প্রথমটায় তো আগা আহমদকে কেউ পাত্তাই দেয় না। আরে, ওঝা-বদ্যি হদ্দ হল, এখন ফার্সী পড়ে আগা? কী বা বেশ, কী বা ছিরি।

কোতয়ালের কানে কিন্তু খবর গেল,
বন থেকে এসেছে ওঝা
পেটে এলেম বোঝা বোঝা।

ছবি-চেহারা দেখে তিনিও বিশেষ ভরসা পেলেন না। কিন্তু তখন তিনি শ্মশান-চিকিৎসার জন্য তৈরী—সে চিকিৎসা ডোমই করুক, চাঁড়ালও সই।

তার পর যা হওয়ার কথা ছিল তাই হল। 'ওঝা' আগা আহমদ ঘরে ঢোকামাত্রই সেই কাল-নাগ কোথা দিয়ে যে বেরিয়ে গেল কেউ টেরটি পর্যন্ত পেল না। কোতয়াল নন্দিনী উঠে বসেছেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। ভীষণ দর্শন কোতয়াল সাহেবের চেহারা প্রসন্ন বদান্যতায় মোলায়েম হয়ে গিয়েছে। আগাকে লক্ষ টাকা তো দিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে তাকে করে দিলেন তার বাড়ির পাশের বনের ফরেস্ট্ অফিসার। এইবার আগা দুবেলা প্রাণ ভরে বাচ্চা হরিণের মাংস খেতে পারবে।

আগা সুখে আছে। সোনাদানা পরে মালিকা খানমও অন্য ভুবনে চরছেন—ক্যাটক্যাট করে কে? তা ছাড়া এখন তার বিস্তর দাসী-বাঁদী। ওদের তম্বী-তম্বা করতে করতেই দিন কেটে যায়। কর্তাও বৈঠকখানায় ইয়ার-বক্সী নিয়ে।

ওমা! এক মাস যেতে না যেতে খবর রটলো, উজীর সাহেবের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে একটা সাপ। কোন সাপ?—সেই সাপটাই হবে, আর কোন্‌টা?

এবারে দশ লাখ টাকার এনাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ পেয়াদা-নফর ছুটেছে আগা আহমদের বাড়ির দিকে,

হাতের কাছে ওঝা
সহজ হল খোঁজা।

কিন্তু আগা আহমদের বিলক্ষণ স্মরণে ছিল, কাল-নাগ খবরদার করে দিয়েছে, অতি লোভ ভালো না,— সাপ সরাতে একবারের বেশী না যায়। সে যতই অমত জানায়, ইয়ার বক্সী ততই বলে, 'হুজুরের কী কপাল! বাপ-মার আশীর্বাদ না থাকলে এমন ধারা কখনো হয়।'

আগাকে জোর করে পাল্কীতে তুলে দেওয়া হল।

এবারে সাপ জ্বলজ্বল করে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার খাই বড্ড বেড়েছে —না? তোমাকে না পইপই করে বারণ করেছিলুম, একবারের বেশী আসবে না। তবু যে এসেছ? তা সে থাক্‌গে—তুমি আমার উপকার করেছ বলে তোমাকে এবারের মত ছেড়ে দিলুম। কিন্তু এই শেষ বার। আর যদি আসো, তবে তোমাকে মারবো ছোবল। তিন সত্যি।'

দশ লাখ টাকা এবং তার সঙ্গে পাঁচ শ ঘোড়ার মনসব পেয়েও নওয়াব আগা আহমদের দিল-জান সাহারার মত শুকিয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে জল নামে না, পেটে রুটি সয় না। কাল নাগ আবার কখন কোথায় কি করে বসে আর সে ছোবল খেয়ে মরে। স্থির করলো, ভিন্ দেশে পালাবে।

ঠিক সেই দিনই স্বয়ং কোতয়াল সাহেব এসে উপস্থিত। বিস্তর আদর-আপ্যায়ন,
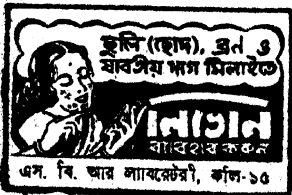
এবার জড়িয়ে ধরেছে শাহজাদীর গলা

এসেছিস, হতভাগা? এবারে আর আমার কথার নড়চড় হবে না। তোর দুই চোখে দুই ছোবল মেরে ঢেলে দেব আমার কুল্লে বিষ।'

আগা আহমদ অতি বিনীত কণ্ঠে বললে, 'আমি টাকার লোভে আসিনি। তুমি আমাকে অগুণতি দৌলত দিয়েছো। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তাই তোমার একটা উপকার করতে এলুম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, শুনলুম, তুমি এখানে। ওদিকে সকালবেলা বীবী মালিকা খানম আমাকে বলছিলেন তিনি রাজকন্যাকে সেলাম করতে আসছেন। বোধ হয় এক্ষুনি এসে পড়বেন। তুমি তো ও'কে চেনো,—হে', হে'—তাই ভাবলুম, তোমাকে খবরটা দিয়ে উপকারটাই না কেন করি। তুমি আমার—'

'বাপরে, মারে' চিৎকার শোনা গেল। কোন্ দিক দিয়ে যে কাল-নাগ অদৃশ্য হল আগা আহমদ পর্যন্ত বুঝতে পারলো না।

এর'পর আগা আহম্মদ শান্তিতেই জীবন যাপন করেছিল।

গল্পটি নানা দেশে নানা ছলে, নানা রূপে প্রচলিত আছে। আমি শুনেছিলুম এক ইরানী সদাগরের কাছ থেকে, সরাইয়ের চারপাঈ-তে শুয়ে শুয়ে।

কাহিনী শেষ করে সদাগর শুধোলেন, 'গল্পটার 'মরাল' কি, বলো তো।'

আমি বললুম, 'সে তো সোজা। রমনী যে কি রকম খাণ্ডারী হতে পারে তারই উদাহরণ। এ-দুনিয়ার নানা ঋষি নানা মুনি তো এই কীর্তনই গেয়ে গেছেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সদাগর বললেন, 'তা তো বটেই। কিন্তু জানো, ইরানী গল্পে অনেক সময় দুটো করে 'মরাল' থাকে। এই যে-রকম হাতীর দুজোড়া দাঁত থাকে। একটা দেখাবার, একটা চিবোবার। দেখাবার 'মরাল'-টা তুমি ঠিকই দেখেছ। অন্য 'মরাল'টা গভীরঃ—খল যদি বাধ্য হয়ে, কিংবা যে-কোনো কারণেই হোক, তোমার উপকার করে তবে সে উপকার কদাচ গ্রহণ করবে না। কারণ খল তার পরই চেষ্টায় লেগে যাবে, তোমাকে ধনেপ্রাণে বিনাশ করবার জন্য, যাতে করে তুমি সেই উপকারটি উপভোগ না করতে পারো।

অবশ্য তোমার বাড়িতে যদি মালিকা খানমের মত বিষ থাকে তবে অন্য কথা।

কিন্তু প্রশ্ন, ক'জনের আছে ও-রকম বউ?'

হস্তচুম্বন-কণ্ঠালিঙ্গন। কোতয়াল সাহেব গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই নওয়াব সাহেব, তোমার কী কপাল! তামাম দেশের চোখের মণি, দিলের রোশনী রাজকুমারীর প্রাণ উদ্ধার করে তুমি হয়ে যাবে দেশের মাথার মুকুট। চলো শিগ্‌গির! সেই হারামজাদা কাল-নাগ এবার জড়িয়ে ধরেছে শাহজাদীর গলা।'

নওয়াব আগা আহমদ জড়িয়ে ধরলেন কোতয়ালের পা। হাউহাউ করে কে'দে নিবেদন করলে সে কোন্ ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে পড়েছে।

কোতয়ালদের হৃদয় মাখম দিয়ে গড়া থাকে না। ব্যাপারটা বুঝে নিতেই শহর-দারোগাকে হুকুম দিলেন, 'চিড়িয়া বন্ধ করো পিঞ্জরামে'।'

পাল্কিতে নওয়াব আগা আহমদ। দু পাশের লোক তার জয়ধ্বনি জিন্দাবাদ করছে। এক ঝরোকা থেকে কোতয়াল-নন্দিনী, অন্য ঝরোকা থেকে উজীর-জাদী তাঞ্জামের উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ করলেন।

আগা আহমদ মুদ্রিত নয়নে মুর্শীদ-মৌলার নাম আর ইষ্টমন্ত্র জপছে।

স্বয়ং বাদশা তাকে হাতে ধরে রাজকুমারীর দোরের কাছে নিয়ে এলেন।

আগা আহমদ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কাল-নাগ হুংকার দিয়ে উঠলো, 'আবার

ভাবলুম তোমাকে খবরটা দিয়ে.....

ট্রেন এখানে থামবার কথা নয়, তবু থামল। হাতের বইটা থেকে চোখ তুলে অলস কৌতূহলে আমি একবার বাইরের দিকে তাকালুম।

লাইনের ডান পাশে ঝাঁকড়াচুলো রাক্ষসের মাথার মতো পাহাড়টার ওপর সূর্যটা কেবল নেমে গেছে তখন। আকাশের কোনায় কোনায় জড়িয়ে থাকা মেঘের গায়ে লাল-নীল-হলুদ-কমলা রঙের মাখামাখি। সেই রঙ মেখে তিন-চারটে শকুন উড়ে বেড়াচ্ছে—যেন নিজেদের চওড়া চওড়া কালো ডানায় রাত্রিকে বয়ে আনছে তারা। মনে হল, আকাশটা এখন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি হয়ে উঠেছে।

ছবিটাই দেখছিলুম, হঠাৎ দুটো কুকুর ঝগড়া করে উঠল বাঁ দিকে, অর্থাৎ স্টেশনের ধারটায়। একটা আসন্ন দীর্ঘছায়ার ওপর পাঁচমিশালী রঙের খেয়ালী ছোঁয়া লেগে ছোট্ট স্টেশনটাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সাদা জিনের পোশাক পরা জন দুই রেলের কর্মচারী দাঁড়িয়েছিল দুটো ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো, একজন কুলি একটা সবুজ ফ্ল্যাগ্ নিয়ে যাচ্ছিল শাঁ-শাঁ করে শ্বাস টানতে থাকা এঞ্জিনের দিকে, আর পাশের কামরায় কারা যেন মোটা গলায় ইংরেজিতে তর্ক করছিল।

নির্জন স্টেশনে হঠাৎ থেমে পড়া মেল্ ট্রেনের সেই আশ্চর্য নিঃসঙ্গতার ভেতরে, একা একটি 'কুপে'তে বসে বসে, সেই ছায়ার সঙ্গে শেষ আলোর খেয়ালীপনার মধ্যে, স্টেশনের নামটা আমি দেখতে পেলুম। দুই যুগেরও পরে আমি আবার নতুন করে নামটাকে পড়লুম—হিন্দীতে, ইংরেজিতে। তৎক্ষণাৎ আমার মনে হল, এখুনি আমি আরতিদিকে দেখতে পাব কলকে ফুল গাছটার তলায়—সেই বাঁধানো বেঞ্চিটার ওপর বসে কোঁচড় থেকে একটার পর একটা বাদাম খেয়ে চলেছে।

ছবিটা ভালো করে ফোটবার আগেই মেল ট্রেন ছাড়ল। পার হল সেই ছোট কালভার্টটা, যেখানে দুপাশে তালিমারা তাঁবু ফেলে কুলি গ্যাং লাইন সারাচ্ছে আর যার জন্যে এই অকুলীন স্টেশনে মেল ট্রেনকেও পাঁচ মিনিটের জন্যে দাঁড়াতে হয়েছিল। আস্তে আস্তে ট্রেনের স্পীড্ বাড়তে লাগল, আবার শুরু হল চাকায়-রডে-চেনে সেই শব্দের ঝড়, দীর্ঘ ছায়াটা আরো ঘন হল আর তার মধ্যে ম্যাজিকের মতো মিলিয়ে গেল সন্ধ্যার রঙেরা, কখন যে একটা সাদা ঝলক দেখিয়ে হারিয়ে গেল সুবর্ণরেখা—অসংখ্য কালো কালো গাছপালার ভেতরে এক হয়ে রইল সেই মহুয়ার বনটা—আমি টেরও পেলুম না।

এখন অন্ধকারের বুক চিরে একটানা

চলতে থাকুক মেল ট্রেনটা। এখন সব একাকার—এখন সব রাত্রির আড়াল দিয়ে ঢাকা। শুধু সেই পেছনে ফেলে আসা এক চিলতে স্টেশনে—যা আমার চোখের সামনে অবনীন্দ্রনাথের ছবি হয়ে আছে—তার ওপর একখানা মুখ ফুটে উঠুক।

আরতিদির মুখ।

এই পথ দিয়ে আরো অনেকবার আমি গেছি। দিনের জাগরণে বই-কাগজ পড়তে পড়তে, রাতের অন্ধকারে কখনো স্বপ্ন-জড়ানো, কখনো স্বপ্নহীন ঘুমের অবসরে। দুই যুগের সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই স্টেশনটার অস্তিত্ব আমি ভুলে গিয়েছিলুম—মেল ট্রেনের গতিতে সাদা-কালো ধোঁয়ার মতো এর নামটা দু-তিন সেকেণ্ডের ভেতরে পাক খেয়ে মিলিয়ে যেত। কিন্তু আজ হঠাৎ গাড়িটা এইখানে থামল। আর বেলা-শেষের আকাশটা লাল-নীল-হলুদ-কমলা রঙের খেলায় অবনীন্দ্রনাথের ছবি হয়ে গেল। আমার চশমার লেন্সের ভেতর দিয়ে রঙিন ফোটোগ্রাফের মতো চিন্তায় এসে স্থির হল, আর তার ওপর ফুটে উঠল আরতিদির মুখ।

না—কেবল আরতিদি নয়। একটা ভালুক। আকাশের কোনায় যে কালো মেঘের টুকরোটা গুঁড়ি মেরে বসেছিল, সেটাও আমার মনে হল, সেই পঁচিশ বছর আগেকার ছবিটা ফুটে উঠবে বলেই এমনি করে আজ শেষ বিকেলের রঙ ছড়িয়েছিল, এমনিভাবে মেল-ট্রেনটা এখানে থেমে গিয়েছিল আর দুটো কুকুরের ঝগড়ায় আমি স্টেশনের দিকটাতে মুখ ফিরিয়ে ছিলুম। সময়ের হাতে যে ছবির পটটা একভাবে গুটিয়ে চলেছে কখন তার মাঝখান থেকে একটা অংশ হঠাৎ খসে পড়েছিল, কয়েক মিনিটের জন্যে আমি তাকে দেখে নিলুম আর একবার। যেদিন ওই ছবির এক কোনায় একটি ছোট বিন্দুর মতো আমারও জায়গা ছিল—সেদিন ছবিটা যে ঠিক কী দাঁড়াচ্ছে তা বোঝবার শক্তি আমার ছিল না। আজ নিজের ভেতরে—অথচ নিজে আড়াল করে নিয়ে, সেই রঙিন ফোটোগ্রাফটাকে আমি সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি।

বয়েস কত আর তখন? বারোর বেশি নয়। ক্লাস সেভেনের ছাত্র।

উত্তর বাংলার যে শহরটায় তখন থাকি, সে জায়গাটা ম্যালেরিয়ার জন্যে স্বনামধন্য। বছরে অন্তত চার মাস ম্যালেরিয়ায় ভোগা প্রায় স্বাভাবিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। খেলতে খেলতে জ্বর আসত, ক্লাসের পড়া বলতে দাঁড়িয়ে অনুভব করতুম আমার সমস্ত শরীরটা যেন উত্তর মেরুর তরল বরফের ভেতর অসহ্য শীতার্ততায় তলিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ দিন জ্বরে ভুগে যেদিন ভাত খাওয়ার আশায় সকাল থেকে ধর্না দিয়ে বসে আছি আর মা আমার জন্যে কই মাছের ঝোল চাপিয়েছেন—কখন আচমকা কাঁপুনি উঠত সারা গায়ে, উঠোনের পুরোনো চৌকিটায় গিয়ে বসতুম রোদের ভেতরে, ধীরে ধীরে জ্বরের ঘোরে তলিয়ে যেত চেতনা, আমার কপালের ওপর হাত রেখে মা-র চোখের জল টপটপ করে ঝরে পড়ত। দু-হাতে আমার ইনজেকশনের অগণিত সূচীবেধ—সমস্ত পেটটা পিলে এবং কুইনিনে আচ্ছন্ন—যেন পাহাড়ের টিলার ওপর মূর্তিমান সিনকোনা প্ল্যান্টেশন।

তখন একদিন ছোট মামা এসে বললেন, দিদি, এ হচ্ছে কী, মেরে ফেলবি নাকি ছেলেটাকে? আমি কালই ওকে নিয়ে যাব আমার সঙ্গে। খাসা জায়গা, দিব্যি জল-হাওয়া—এক মাসে ভালো হয়ে যাবে।

মা বললেন, হাফ-ইয়ার্লি হোক, পুজোর ছুটি হয়ে যাক—তবে তো।

ছোট মামা গোঁয়ার মানুষ। তিনবারের বার থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। কিন্তু ফুটবল মাঠে তাঁর পায়ে বল পড়লে ও-পক্ষের গোলে বিপর্যয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাই রেলের সাহেবদের বিপক্ষে ফাইন্যাল খেলতে গিয়ে কেবল শীল্ড্ই নিয়ে আসেননি—রেলের চাকরিও এনেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

রেগে ছোট মামা বললেন, দুত্তোর হাফ-ইয়ার্লি। রোগা টিকটিকির মতো ছেলে—পরীক্ষা নিয়ে ধুয়ে খাবে? দুদিন পরে পরীক্ষা আর প্রাইজই থাকবে, ছেলে আর থাকবে না। আমি একে নিয়ে চললুম—দেখি তুই আর তোর কর্তা কেমন করে ঠেকাস্!

যা বললেন তাই করলেন। আর জীবনে সেই প্রথম আমি এতটা পথ এক সঙ্গে রেল গাড়িতে চড়লুম। টেলিগ্রাফের তারে কত পাখি, রেলের নয়ানজুলিতে কত সাপ, কত পাহাড় আর নদী দেখতে দেখতে, কত স্টেশনে পুরী-মিঠাই-আলুর তরকারী খেতে খেতে এইখানে এসে আমি পৌঁছলুম।

ডান দিকের জংলা পাহাড়টা সকালের আলোয় তখন সবুজ আর সুন্দর হয়ে ছিল। হলদে কলকে ফুল ঝরে পড়েছিল বাঁধানো বেঞ্চি আর প্ল্যাটফর্মের লাল কাঁকরের ওপর। ট্রেন থেকে নামবার পরে নীল উর্দিপরা কুলিটা একটা লাইন-ক্লিয়ার হাতে নিয়ে সেলাম করেছিল। আর গেটে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি টিকেট চাননি আমাদের কাছে, কেবল বলেছিলেন, ভালো ছিলে তো অমল? সঙ্গে এটি কে?

—আমার ছোট ভাগ্নে পরেশদা।

—ভাগ্নে?—পরেশদা—পরে জেনেছিলুম স্টেশনের বড়োবাবু—হেসে বলেছিলেন, স্পোর্টস্‌ম্যান মামার একি ভাগ্নে—আঁ! এ যে বেজায় রোগা দেখছি। কী খোকা—বাবা-মা বুঝি তোমায় কিছু খেতে দেন না?

কাঁচা পাকা গোঁফ, হাসিতে চকচকে মুখ, গোলগাল চেহারার মানুষ। বেশ লেগেছিল।

ছোট মামা বলেছিলেন, খেতে দেবে না কেন? প্রচুর খাচ্ছে—কুইনিন, কাল মেঘ, পাইরেক্স, ডি গুপ্ত। ম্যালেরিয়ায় ভুগে সারা হয়ে গেল। তাই জোর করে নিয়ে এসেছি এখানে।

—ভালো করেছো, খুব ভালো। এখানকার জলে হাওয়ায় তিন দিনেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

তখনো আমার মামাতো ভাই লোটনের জন্ম হয়নি—মামাতো বোন টুটুলেরও না। ছোট্ট রেলওয়ে কোয়ার্টারে থাকেন ছোট মামা আর ছোট মামী। পাশের কোয়ার্টারে থাকেন স্টেশন মাস্টার পরেশবাবু, তাঁর স্ত্রী—যাঁকে আমি বলতুম বড় মামীমা আর তাঁদের মেয়ে আরতিদি।

আরতিদি আমার চাইতে তিন-চার বছরের বড়ো ছিল খুব সম্ভব। শামলা রঙ, একটু রোগা আর লম্বাটে, পিঠ ছাপিয়ে পড়া অনেক চুল আর বড়ো বড়ো টানা টানা চোখ। পরেশবাবুর বদলির চাকরির জন্যে লেখা-পড়া বেশি করতে পারেনি, ক্লাশ সিক্সে উঠে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। আমি সেভেনে পড়ছি জেনে ভারী লজ্জা পেয়েছিল মনে আছে—তিন চারদিন আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলেনি। কিন্তু লেখাপড়া না-ই হোক, হার্মোনিয়াম বাজিয়ে বেশ গান গাইতে পারত। রোজ সন্ধ্যে বেলায় হার্মোনিয়াম নিয়ে বসত, কখনো গাইত: 'কৃষ্ণ মুরারি শ্যাম গিরিধারী', কখনো বা গাইত: 'বাদল বাউল বাজায়-বাজায়-বাজায় রে বাজায় রে একতারা।' পরের গানটা শুনতে বেশ ভালো লাগত আমার।

তারপর আস্তে আস্তে কখন যে আরতিদির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল মনেও পড়ে না। আর ভাব না হয়েই বা উপায় কী? আরতিদিরও তো কোনো সঙ্গী-সাথী ছিল না। স্টেশনের একটু পেছনে মোটে তিনটে দোকান। একটাতে হরিয়ার মা জাঁতা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছাতু পিষত আর কী একটা গান গাইত: 'কাঁহা রহলি হো রামা।' আর একটা দোকান ছিল লছমনপরসাদ হালুয়াইয়ের—সে পুরী আর বোঁদে ভাজত, লাড্ডু বানাত আর কুঁদরুর তরকারী তৈরী করত। আর মোতিলালের দোকানে পান-সিগারেট চাল-ডাল সাবান এই সব বিক্রি হত। মোতিলালের মেয়ে রামরতিয়া মধ্যে মধ্যে ঝুঁটি বেঁধে আর একটা লাল টুকটুকে শাড়ী পরে আরতিদির কাছে আসত। কিন্তু বেশিক্ষণ সে-ও থাকতে পারত না—বাপের দোকানে জোগান দিতে হত তাকে।

কাজেই আমি আর আরতিদি।

বর্ষা শেষ হয়ে গেছে—নীল আর নীল আকাশ। স্টেশনের বাঁ-পাশে বুড়ো রাক্ষসের মতো পাহাড়টা ঘন সবুজ। দূরে দূরে লাল মাটির ওপর পায়ে-চলা পথের রেখার শেষে শাল-মহুয়া-নিম-পলাশ-আমের ছায়ায় সাঁওতালী বস্তি। স্টেশন থেকে খানিকটা

মাঠের দিকে এগোলে উঁচু পাড়ওলা একটা পুরানো পুকুর—তাতে অনেক পদ্ম ফুটেছে আর পদ্মপাতার ওপর বাঁকা বাঁকা চোখের দাগ ফেলে চলে বেড়াচ্ছে জলপিপির দল, টুকটুক করে পোকা ধরে খাচ্ছে। পুকুরের ওপারে একটা ভাঙা মন্দির—তাকে ঘিরে ঘিরে কাশফুল ফুটেছে।

হরিয়ার মা খালি ছাতুই তৈরী করত না—চীনে বাদাম আর চানা ভাজাও বিক্রি করত। আমি আর আরতিদি কখনো দু পয়সার বাদাম আর কখনো চানা ভাজা কিনে নিয়ে খেতে খেতে দূরে চলে যেতুম। কোনো-দিন গিয়ে বসতুম মন্দিরটার পাশে, আমি জলপিপিদের ঢিল মারতুম—আরতিদি কাঁচপোকা খুঁজত। কোনোদিন রেল লাইন করে যেতে যেতে তার পাশে পাশে দেখতুম কোথায় আছে লাটা, গিলে আর কুঁচ ফল। মাঝে মাঝে বাঁদর-লাঠির গাছ থেকে মোটা গলায় ময়না ডেকে উঠত, টেলিগ্রাফের তার জুড়ে বসে টিয়ার দল মাথা নেড়ে আর পাখা ঝেড়ে কিসের যেন কমিটি করত, কখনো দেখতুম কাঁটা গাছে পতাকার মতো উড়ছে সাপের ছেঁড়া খোলোস, কখনো বা চোখে পড়ত রেল লাইনে কাটা-পড়া গোখরা সাপ শুকিয়ে দড়ি পাকিয়ে আছে।

আরতিদি গলা ছেড়ে গান গাইত : 'বাঁধ না তরীখানি আমারি এ নদীকূলে।' শুনে চমকে উঠে শিমুল গাছের ডাল থেকে একটা শংখচিল আকাশে ডানা মেলত।

নদীর কথায় আমার মনে পড়ত। বলতুম, চলো না আরতিদি—একদিন সুবর্ণরেখা নদী দেখে আসি।

—না-না, সে অনেক দূর।

—হোক অনেক দূর। এমনি রেল লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব।

—না, যেতে নেই সেখানে।—আরতিদি ভয় পেতো : বাবা বারণ করে দিয়েছে। সেখানে জংগল তার ওপর আমি যে বড়ো হয়ে গেছি—আসছে ফাল্গুন মাসেই যে আমার বিয়ে হবে।

একটু ফাঁক পেলেই আরতিদি নিজের বিয়ের গল্প চুপি চুপি বলত আমাকে। আমি ক্লাশ সেভেনে পড়ি, বিয়ের কথা শুনলে লজ্জা হত মনে, প্রথম দিন তো ভারী অসভ্যই মনে হয়েছিল আরতিদিকে। তার-পর শুনতে শুনতে ক্রমে অভ্যাস হয়ে গিয়ে-ছিল—আরতিদি কেমন ঘুম-ঘুম চোখে বলে যেত আর আমি কান পেতে রূপকথার গল্পের মতো শুনে যেতুম।

আরতিদির যার সংগে বিয়ে হবে তার নাম মণীশ সেন। আরতিদি বলত : এই যাঃ—বরের নাম করে ফেললুম। কিন্তু এখনো তো বিয়ে হয়নি—নাম করতে দোষ নেই—না রে?

আমার জানা ছিল না। তবু মাথা নেড়ে বলতুম, না, দোষ নেই।

—আমার দাদার সংগে কলকাতার কলেজে বি-এ পড়ে, জানিস? ওর কাকা আবার জংশন স্টেশনের বড়বাবু, খুব মোটা আর ভীষণ গম্ভীর। সেই তো এসে আমায় দেখে গেছে। বাবা বলছিল, মণীশ নাকি মোটেই ওর কাকার মতো নয়—খুব সুন্দর আর মিষ্টি চেহারা। কিরকম চেহারা হতে পারে তুই-ই বলতো অপু?

শুনে আমি দাঁড়িয়ে পড়তুম। রেল লাইনের তারের বেড়ার লোহার খুঁটিতে যে মোটা একটা বহুরূপী আমাদের দেখে রেগে গিয়ে বার বার রঙ্ বদলাচ্ছে, তাকে দেখতে দেখতে আমি মণীশের চেহারাটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করতুম।

আরতিদি ব্যস্ত হয়ে বলত : এই, এই—বুকে একটুখানি থুথু দে! নইলে ওরা রক্ত চুষে খায়—তা জানিস?

বহুরূপীর হাত থেকে রক্ত বাঁচাবার ব্যবস্থা হয়ে গেলে আরতিদি আমায় আবার জিজ্ঞেস করত : কই, আমার বরের চেহারা কেমন হবে বললি না তো?

আমার ঠাকুরমা-র ঝুলির রাজপুত্রদের ছবি মনে পড়ত। সেই যাত্রার মতোই পোশাক, কোমরে তলোয়ার, মাথার উষ্ণীষে জ্বলজ্বল করছে গজমোতি। কিন্তু রাজপুত্রেরা একালে গল্পেই থাকে, বর হয়ে কখনো কারো বিয়ে করতে আসে না। আমি ভেবে-চিন্তে একটি মাত্র আদর্শ মানুষকেই দেখতে পেতুম চোখের সামনে।

—আমার ছোট মামার মতো।

—ধেৎ, তোর কোনো বুদ্ধি নেই—আরতিদি মুখ বাঁকাতো।

এইবার আমার রাগ হয়ে যেত। বলতুম, কেন—আমার ছোট মামা কি দেখতে খারাপ?

—না-না, অমল কাকা দেখতে খুব খারাপ নয়। কিন্তু ভারী কাঠখোট্টা আর চোয়াড়ে। আমার পছন্দ হয় না।

—তোমার পছন্দ না হয় তো বয়েই গেল।

আরতিদি একটুখানি হাসত—জবাব দিত না। আবার টেলিগ্রাফের তারে পাখি দেখতে দেখতে, কুঁচ আর গিলে কুড়োতে কুড়োতে, কাটা-পড়া শুকনো সাপ পেরিয়ে স্লিপার গুনে গুনে আমরা স্টেশনে ফিরে আসতুম। তারপর কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিতুম সেই বাঁধানো বেঞ্চিটার ওপর আর দুটো-একটা গাঢ় হলুদ রঙের কল্কে ফুল আমাদের গায়ে ঝরে পড়ত।

সামনে রোদে ঝকঝক করত রেলের লাইন। পাহাড়টার গায়ে সাদা-সাদা কয়েকটা ধুনসের
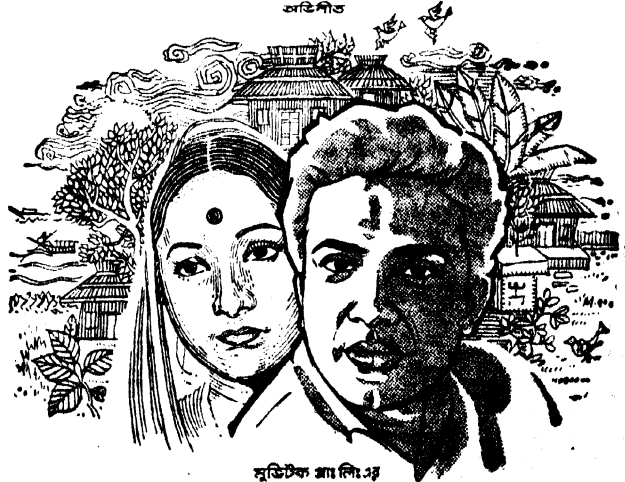
দাগ চকচক করত। সাঁওতাল বস্তির নিম-মহুয়া-আম-পলাশের ওপর দিয়ে, মাঠের ঘাস দুলিয়ে গন্ধ ভরা বাতাস এসে মুখে চোখে আছড়ে পড়ত।

ঠুন-ঠুন্-ঠুনাৎ করে একটা মালগাড়ির ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে কুলি হাজারী এসে আরতিদিকে বলত : দিদিমণি—বহুৎ বেলা হোয়ে গেল। মাইজী গোঁসা করেছে—বুলাচ্ছে তোমাকে।

বুড়ো হাজারীকে জিভ বের করে ভেংচি কাটত আরতিদি : বুলাচ্ছে তো বেশ করেছে —তোমার কী! আমি যাব না।

তবু আরতিদি উঠে দাঁড়াত। এক মাথা চুল উড়িয়ে ছুটত বাড়ির দিকে। আর ছুটতে ছুটতে মুখ ফিরিয়ে আমাকে বলে যেত : যাচ্ছি-ই-ই—

মাঝে মাঝে ও বাড়ির পাঁচিল পেরিয়ে বড় মামীমার গলা কানে আসত : এত বড় মেয়ে—রাত দিন টো-টো! সংসারের কুটোখানা ভেঙেও দুখানা করতে পারো না—না?

—বা রে, আমি কী করব? অঞ্জুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলুম তো!

—হুঁ, যত দোষ এখন ওই একরত্তি ঠান্ডা ছেলেটার ঘাড়ে। তোমাকে তো আমি আর চিনিনে। হোক বিয়ে, যাও শ্বশুর-বাড়ি—কী হবে দেখে নিয়ো তখন। শাশুড়ী লম্বা লম্বা ঠ্যাং দুখানা ভেঙে দেবে একেবারে।

আরতিদি কী জবাব দিত আর শুনতে পেতুম না।

কিন্তু বড় মামীমা মুখে যা-ই বলুন—আরতিদির এই ঘুরে ঘুরে বেড়ানোতে বিশেষ বাধা কোথাও ছিল না। পরেশবাবু তো হেসেই জিজ্ঞেস করতেন : কি হে জোড়া কলম্বাস, নতুন আবিষ্কার-টাবিষ্কার কিছু হল? বড় মামীমা একমাত্র মেয়ের ওপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারতেন না—তা ছাড়া হয়তো ভাবতেন দু-দিন বাদেই তো বিয়ে হয়ে যাবে।

বেশ কাটছিল দিনগুলো। মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো তো ছিলই, তা ছাড়াও অবাধ গতি ছিল বড়মামীমার ঘরে। সব সময়েই কিছু না কিছু খাবার তৈরি থাকত আমার জন্যে। কখনো লুচি দিয়ে গরম পায়েস, কখনো বা কচুরি আর আলুর দম।

বড় মামীমার ঘরে আরো একটা সুন্দর জিনিস ছিল। কাচের আলমারিতে সারি সারি পুতুল।

কৃষ্ণনগরের মূর্তি, নকুল কলা-আম, সেলুলয়েডের ছোট বড় ডল, সমুদ্রের রঙিন কড়ি আর—আর একটা ভালুক।

আমার তখন বারো বছর বয়েস, ক্লাস সেভেনে পড়ি। এমন কি একটা এয়ারগান পর্যন্ত আছে—তার ছর্‌রা দিয়ে চড়ুই পাখিকে চমকে দেওয়া যায়। আমি তখন জানি পুতুল মেয়েদের খেলার জিনিস—পুরুষ মানুষের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আলমারির সেই ভালুকটার দিকে তাকিয়ে মন আমার মুগ্ধ হয়ে যেত।

গলায় লাল একটি সিলকের রিবন বাঁধা কুচকুচে কালো রঙের ভালুক। গায়ের লোমগুলো পর্যন্ত চিকচিক করত। পুঁতির চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করে চেয়ে দেখত আমাদের।

আরতিদি বলত : ওটা বিলিতী পুতুল। মা শখ করে কলকাতার সায়েবী দোকান থেকে কিনে এনেছে।

একদিন বলেছিলুম, একটু বের করো না আরতিদি। গায়ে হাত দিয়ে দেখি।

আরতিদি জবাব দিয়েছিল, বের করলে ময়লা লাগবে। মা ভারী রাগ করবে তা হলে।

কাচের ভেতর দিয়ে সেই আশ্চর্য সুন্দর ভালুকটাকে আমরা এক মনে দেখতুম দুজনে।

—ভালুকটা খুব মিষ্টি—না রে?

—হুঁ—খুব মিষ্টি।

—ওটা কী ভালুক বল্‌তো?

আমি একদিন ভেবে-চিন্তে বলেছিলুম বোধ হয় গোল্‌ডিলকের তিন ভালুকদের একজন।

—গোল্‌ডিলক?—আরতিদি অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল : সে আবার কি রে?

আরতিদির অজ্ঞতায় আর নিজের জ্ঞানের গৌরবে গল্পটা বলতে আমার খুব ভালো লেগেছিল সেদিন। চোখ খুব বড়ো বড়ো করে আরতিদি শুনেছিল প্রথমটা। শেষে বিরক্ত হয়ে গেল।

—দুৎ, বাজে গল্প। ও ভালুকটা ওদের কেউ নয়।

—তবে কে ও?

আরতিদি একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিল বড় মামীমা কত দূরে আছেন। তারপর আমার কানে কানে বলেছিল, তুই কিছু বুঝতে পারিস নি। কী সুন্দর দেখছিস না? ও নিশ্চয় বর ভালুক—বিয়ে করতে যাবে।

তারপর আমরা হয়তো স্টেশনে চলে এসেছি। সামনে দিয়ে একটা মেল-ট্রেন হয়তো ছুটে যেত ঝড় জাগিয়ে—আমাদের ছোট স্টেশনটাকে দেখেও যেন দেখতে পেতো না। ট্রেনের শব্দটা অনেক দূরে চলে গেলে, আর না-দেখা সুবর্ণরেখার ব্রীজের ওপর থেকে তার গুমগুম আওয়াজ ভেসে এলে, আর দু-একটা হলদে রঙের কল্‌কে ফুল আমাদের গায়ে মাথায় ঝরে পড়লে তখন আরতিদি বলত : জানিস, রাতের বেলা ঘরে যখন মিটমিট করে লণ্ঠন জ্বলে আর আমার ঘুম আসে না—তখন মশারির ফাঁক দিয়ে আমি ভালুকটাকে দেখি।

—দেখতে পাও?

—পাই বই কি!—আরতিদির চোখ ঘোর-ঘোর হয়ে আসত : ঠিক দেখি, কাচের আলমারি থেকে কখন টুক্ করে ওটা বাইরে বেরিয়ে এল। পরনে জড়িপাড় কাপড়—হাতে দর্পণ—

বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করতুম, দর্পণ কী? আয়না?

—চুপ কর্, বিরক্ত করিস নি—আরতিদি আবার স্বপ্নটাকে গুছিয়ে আনত : পায়ে সাদা নাগ্‌রা জুতো—মাথায় ময়ূর দেওয়া টোপর। টপ করে বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠে যেন বললে, কেমন দেখছ আমায়? পছন্দ হয়?

—যাঃ, মিথ্যে কথা।—আমি প্রতিবাদ করতুম।

—মিথ্যে কথা বইকি!—আরতিদি খামোকা চটে যেত : তুই ভীষণ বোকা। কিছু বুঝতে পারিস না।

আমি অভিমানে চুপ করে যেতুম, একটা কল্‌কে ফুল কুড়িয়ে নিয়ে তার হলুদে রস দিয়ে ছবি আঁকতে চাইতুম সিমেন্টের বেঞ্চিটার ওপর। আরতিদির খোঁপাটা বেশ হত, কিন্তু মুখটা কিছুতেই হতে চাইত না। আর আরতিদি কী ভাবত সে-ই জানে। কখনো পাহাড়টাকে দেখত, কখনো মেঘকে—

কখনো বা চকচকে রেলের লাইন দুটোকে। এর ভেতরে কোন্ সময় ওর খোঁপার ওপর একটা কলকে ফুল এসে আটকে যেত টেরও পেত না।

হঠাৎ এক সময় দাঁড়িয়ে উঠে বলত : চল —দীঘির পার থেকে বেড়িয়ে আসি।

আমি হয়তো আরতিদির মুখ আঁকার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে একটা বেড়াল আঁকছি তখন। বলতুম, না।

—রাগ হল? বোকা বলেছি সেই জন্যে?

জবাব দিতুম না।

—তুই যে ভারী ছেলেমানুষ! একদম কিছু বুঝতে পারিস্‌নে। আচ্ছা আচ্ছা—আমার ঘাট হয়েছে, আর কোনোদিন বোকা বলব না তোকে। চল—হরিয়ার মার দোকান থেকে ছোলাভাজা কিনে খাইগে।

এরপরে আর রাগ থাকে?

শেষ পর্যন্ত সেই ঘটনাটা ঘটল।

রেল লাইন ধরে সকালের নরম রোদে তেমনি চলেছি দুজনে। দু ধারে তেমনি পাখি, তেমনি করে কুল গাছের গায়ে জড়ানো স্বর্ণলতার জাল, তেমনি করে একটা কাটা গোখরো সাপ রোদ্দুরে দড়ি পাকিয়ে আছে লাইনের ওপর। আরতিদি বেশি কথা বলছে না, কেবল গুনগুন করে গান গাইছে : "মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর, নমো নম, নমো নম—"

আমি পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে চকমকি ঠুকছিলুম। সাদা পাথরেই আগুনের ফুলকি ঠিকরে বেরোয় সে আমি বেশ লক্ষ্য করে দেখেছি। এই দিনের বেলায় আগুন বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু ঠোকার পরে মধ্যে মধ্যে পাথর শুঁকে দেখছিলুম বেশ মিষ্টি একটা গন্ধকের মতো গন্ধ বেরুচ্ছে। ওইটেই পরীক্ষা। ওই গন্ধ থাকলেই সন্ধ্যের পরে চমৎকার ফুলকি ছুটবে বোঝা যায়।

আরতিদি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

—এই, জানিস?

—কী হয়েছে?

—কাল সন্ধেবেলা যখন চিঠি এল, তখন তার ভেতর দাদা একটা ফোটো পাঠিয়েছে।

আমি পাথর ঠুকতে ঠুকতে বললুম, কার ফোটো?

আরতিদি পাথর দুটো কেড়ে নিলে আমার হাত থেকে। বললে, যাঃ—এই জন্যেই তোকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। কিচ্ছু শুনছিস না, এক নাগাড়ে সমানে পাথর ঘট্‌ঘট্ করছিস।

কাতর হয়ে বললুম, পাথর ফেলে দিয়ো না, অনেক কষ্টে দুটো বড়ো বড়ো চকমকি পেয়েছি। কার ফোটোর কথা যেন বলছিলে—বলো না? আমি তো শুনছিই।

আরতিদির টানাটানা চোখ দুটোকে খুব সুন্দর দেখালো তখন। কারু শোনবার সম্ভাবনা ছিল না, তবু নরম গলায় চুপি চুপি বললে, মণীশ সেনের ফোটো।

—সত্যি?

চকমকির কথা আমি ভুলে গেলুম। মণীশ সেনের সম্বন্ধে এতদিন টুকরো-টুকরো কথা শুনতে পেতুম, বিয়ের ব্যাপার নিয়ে মনের ভেতর যে লজ্জাটা ছিল কখন কেটে গিয়েছিল সেটা, আধখানা শোনা রূপ-কথার মতো একটা অতৃপ্ত কৌতূহল কখন যে জেগে উঠেছিল নিজেই তা জানতে পারিনি। আমি আবার বললুম, সত্যি?

—সত্যি রে, সত্যি। ওরা দল বেঁধে শিবপুরের বাগানে পিকনিক করতে গিয়েছিল, পাঁচ সাত জন মিলে ফোটো তুলেছে সেখানে। দাদা তাই পাঠিয়েছে একটা। লিখেছে, আমার বাঁ-ধারে মণীশ।

—কেমন দেখতে?

—খুব মিষ্টি। গলায় চাদর জড়ানো, মাথায় কোঁকড়া চুল। অত ছোট ছবি তো—তবুও কেমন চকচক করছে চোখদুটো। এত ছেলের ভেতরেও ও-ই সব চাইতে সুন্দর দেখতে।

আরতিদির চোখ ঘুম-ঘুম হয়ে এল।

—আমাকে দেখাবে না ছবিটা?

—দেখাব। মা-র বাক্সে তোলা আছে, চুরি করে এনে তোকে দেখাব এক সময়।—তারপর হঠাৎ আরতিদি বললে, এই অঞ্জু, যাবি?

—ফিরে যাব বলছ?

আরতিদির ঘুম চোখের ওপর কিসের যে আলো পড়ল জানি না। বললে, না ফিরে যাওয়ার কথা বলছি না। সুবর্ণরেখা দেখতে যাবি?

—সে কি! সেখানে যেতে যে তোমার বারণ আছে!

—থাকগে বারণ। ভীষণ যেতে ইচ্ছে করছে আজ—ভারী ভালো লাগছে যেতে। কেউ তো জানতে পারবে না—চল্ না।

আমার ভয় কাটল না, কিন্তু নিষেধ ভেঙে খুশীতে খুশীতে অনেক দূর বেড়িয়ে আসার উত্তেজনা ভয়ের চাইতেও বড়ো হয়ে উঠল। বললুম, বেশ তো চলো। কিন্তু দেরী হয়ে গেলে বকবে না?

—বকুক না। প্রায়ই তো বকে।

—চলো তবে।

সেই রেল লাইন ধরে আমরা চললুম। শরতের রোদ একটু একটু করে ধারালো হয়ে উঠতে লাগল, দেখলুম আকাশে নীলকণ্ঠ পাখি উড়ছে, সেই দীঘিটার ধারে ভাঙা মন্দিরটাকে ঘিরে কঁটাই বা কাশফুল—এদিকে মাঠের পর মাঠ একেবারে বুড়ীর চুলের মতো সাদা হয়ে রয়েছে। একটা বট-গাছের মাথায় লাল মতো কী যেন হাওয়ায় উড়ছে, প্রথমে ভাবলুম ঘুড়ি, পরে দেখি কারা যেন একটা লাল নিশান বেঁধে দিয়ে গেছে। একটা শেয়ালও দেখলুম লাইনের ধারে, ঘোড়ার মতো মোটা ল্যাজ পেছনের দুপায়ের মধ্যে গুঁজে নিয়ে দুড়দুড় করে দৌড়ে পালালো—ঠিক মনে হল একটা গেরুয়া রঙের কাপড় কাছা দিয়ে পরেছে।

ভারী হাসি পাচ্ছিল। আরতিদিকে শেয়ালটার কথা বলতে যাচ্ছি, আরতিদি তখন বললে, ওই দ্যাখ্ সুবর্ণরেখা!

সত্যি তো—সুবর্ণরেখাই তো বটে। দুপাশে উঁচু উঁচু লোহার ত্রিভুজ দেওয়া (আমি তখন জ্যামিতির চার পাঁচটা থিয়োরেম পড়েছি) একটা লাল রঙের পুল। তার নীচে অনেকটা শুকনো আর খানিকটা ভিজে ভিজে লাল রঙের বালি। সেই বালি পার হয়ে কুলকুল করে সুবর্ণরেখা বয়ে চলেছে। ছোট্ট নদীটা—তবু ভরা আশ্বিনে কেমন দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠছে, ব্রীজের থামের গায়ে ঘা দিয়ে তৈরী করছে সাদা সাদা ফেনার ঘূর্ণি—সোঁ সোঁ করে একটানা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে জলের।

কী নির্জন চারদিক—কী হাওয়া! খানিকক্ষণ এক মনে জল দেখলুম আমরা। তারপর আরতিদি বললে, আয়, নেমে বেড়িয়ে আসি।

ব্রীজের পাশ দিয়ে ঢালু পথ ছিল, তাই
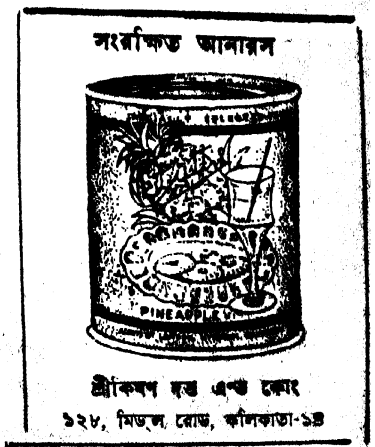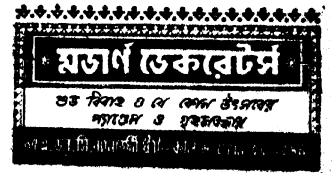
দিয়ে আমরা নীচে নামলুম। কী হাওয়া—কী হাওয়া! আরতির খোঁপা বাঁধা ছিল, নইলে ওর খোলা চুল নৌকোর পালের মতো ফুলে উঠে ওকে আকাশে উড়িয়ে নিত—এমনি মনে হল আমার। আমরা জলের কাছে গেলুম, ঠান্ডা জলে পা ডুবিয়ে দেখলুম, কয়েকটা ঝিনুক কুড়িয়ে নিলুম, আঁজলা আঁজলা করে বালি উড়িয়ে দিলুম বাতাসে। তিনটে হট্টিটি পাখি নদীর ধারে বোধ হয় গল্প করছিল, বিরক্ত হয়ে উড়ে গেল তারা।

পেছনেই মস্ত একটা মহুয়া বন মাতলামি করছিল ডাল নাচিয়ে, পাতা কাঁপিয়ে। নদীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কখন বনটাকে আমরা দেখছিলুম জানি না। আরতিদি গান গাইছিল : 'বাদল বাউল বাজায় বাজায় বাজায় রে বাজায় রে একতারা।' আচমকা গান থামিয়ে হাততালি দিয়ে বললে, খরগোস—খরগোস!

—কই—কই—কোথায় খরগোস?

—ওই যে লম্বা লম্বা কান খাড়া করে, হাত জুড়ে ভালো মানুষের মতো তাকিয়ে আছে? ওই তো ঝোপের পাশে—সাদা ফুটফুটে, দেখছিস না?

দেখলুম। আর সঙ্গে সঙ্গেই খরগোস ছুটল। দুটো তিনটে বড়ো বড়ো লাফ দিয়ে সোজা মহুয়াবনের দিকে।

—পালালো—পালালো! শিগ্‌গির চল্—ধরি ওটাকে—

নদীর ধার ছেড়ে, শরতের হাওয়ায় উড়ে যাওয়া বুনো হাঁসের দুটো পালকের মতো আমরা মহুয়া বনের ভেতরে ছুটে গেলুম। পরিষ্কার বন, ঢেউ খেলানো লাল মাটি, ঝোপঝাড় নেই বললেই চলে। পাতায় পাতায় কী আশ্চর্য শব্দ, আর কী নির্জন—কী নির্জন ঠান্ডা ছায়া! ছুটতে ছুটতে কতদূর এগিয়েছি জানি না, খরগোসটা কত দূরে চলে যেতে যেতে আবার দু পা জুড়ে আমাদের দেখছে, আমি আর আরতিদি হাসছি আর হাঁপাচ্ছি, তখন—

তখন যেখানে দু-তিনটে গাছ এক সঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে, তার পেছন থেকে কালোমতন কী একটা বেরিয়ে এল। প্রথমে মনে হয়েছিল বড়ো একটা কালো কুকুর, কিন্তু হঠাৎ সেটা দু-পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর এক মুখ সাদা ধারালো দাঁত বের করে বললে, গররর্—

আরতিদি বোবার মতো বিকৃত চিৎকার করে উঠল একটা। তারপর বললে, অজু, পালা পালা! ভালুক!

ভালুক!

আমরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলুম। এক মুহূর্তেই একরাশ বিশ্রী দাঁতে, গায়ের কর্কশ কালো কালো রোঁয়ায়, থাবার বড়ো বড়ো বাঁকা নোখে মৃত্যুর বিভীষিকাকে চিনতে পেরেছি আমরা। ঢেউ খেলানো লাল মাটির ওপর দিয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে পাগলের মতো ছুটেছি দুজনে, ফেনা উঠছে মুখ দিয়ে। আরতিদি সমানে চিৎকার করছে : ভালুক—ভালুক! আর পেছনে শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত দ্রুত পায়ের শব্দ—এসে পড়ছে, ক্রমশই কাছে আসছে! আর শক্ত মাটিতে বাঁকা বাঁকা নোখে কড়ি বাজানোর মতো আওয়াজ উঠছে : কড়্‌কড়্—ঝম্—ঝম্—কড়্‌কড়্—

—হৈ-হৈ-হৈ—কী হৈছে ইথানে?

কোত্থেকে সামনে দেখা দিল এক দল শিকারী সাঁওতাল। কাঁধে তীর ধনুক—হাতে রক্তমাখা খরগোস। তারা আরো কী বললে আমি শুনতে পেলুম না। একজন লোহার মতো শক্ত বুকের ভেতর আমাকে টেনে নিলে, আর আরতিদি সোজা লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর।

মেল ট্রেন ছুটেছে। বিকেলের পাঁচরঙা আলোয় অবনীন্দ্রনাথের ছবিটা মনের মধ্যে দেখছি এখনো। তার ওপর একখানা মুখ ফুটে আছে। আরতিদির মুখ।

বাড়িতে ফিরে তাড়সে জ্বর হয়েছিল আরতিদির। তিনদিন ধরে চমকে চমকে উঠে বারবার প্রলাপ বকেছিল : ওই যে ভালুকটা আসছে! না না—আমি মণীশ সেনকে বিয়ে করব না, কক্ষণো বিয়ে করব না।

সেই হঠাৎ-থামা স্টেশনে, সেই হঠাৎ আলোয় এইটুকু মাত্র ছবিই ফুটে আছে। তারপর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কবে যে আমি ওখান থেকে চলে এসেছিলুম তা আর দেখতে পাচ্ছি না। ছাব্বিশ বছরের অমাবস্যা দৃষ্টিরোধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে।

কাচের আলমারিতে লাল রিবন বাঁধা ভালুক আর ছোট একটা গ্রুপ ফোটোতে গলায় চাদর জড়ানো মণীশ সেন। রাত্রির বুক চিরে ছুটন্ত ট্রেনের চেনে-রডে-চাকায় ঝঙ্কার উঠছে। বাইরের একাকার নিশীথ-স্রোতে চোখ মেলে দিয়ে, একা কামরায় বসে বসে ভাবছি, আলমারির ভালুকটা মহুয়া বনে যে মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল, তেমনি করেই কি আরতিদির জীবনে ফোটো থেকে নেমে এসেছিল মণীশ সেন? দুটো কি এক হতে পারে? দুটো কি এক হতে পারে না?

কিন্তু হঠাৎ-ফোটা সেই রঙিন ছবিটার চার পাশে অনন্ত অন্ধকার। ছাব্বিশ বছরের অন্ধকার।

হাত-কাটা মহাবীর এখনও বেঁচে আছে। কয়েক বছর আগেও তাকে বহাল তবিয়তে থাকতে দেখে এসেছি। ঠিক সেই আগেকার মত বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে বিড়ি ধরে টানে। এখনও বুড়ো বেশ মজবুত। কত-কাল হলো ফরেস্টের চাকরি থেকে রিটায়ার করেছে, কিন্তু শরীর এতটুকু টস্‌কায় নি।

শনিচরী বাজারে মহাবীরকে সবাই চিনতো। সেই যুগে পঞ্চাশ টাকা করে মাসোহারা পেত সরকার থেকে। পেনসন্ নয়, মাসোহারা। ওই মাসোহারার জন্যেই শনিচরী বাজারে খাতির ছিল মহাবীরের।

জিজ্ঞেস করলাম—চিনতে পারো মহাবীর?

মহাবীর সসম্ভ্রমে সামনের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বললে—বসুন হুজুর, বসুন—

কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম মহাবীর আমাকে আসলে চিনতে পারেনি। বড় বিনয়ী ভদ্র মানুষ এই মহাবীর। ফরেস্টের চাকরিতেও খুব নাম-যশ ছিল মহাবীরের। চাকরির জীবনে কত রাজা-মহারাজা কত লাটসাহেবের সঙ্গে মেলামেশা করেছে মহাবীর। ওয়াট্‌কিনস্ সাহেবও মহাবীরকে ভারি ভালবাসতো। ফরেস্ট অফিসে অত বড় বীর নাকি ছিল না মহাবীরের মত।

খানিকক্ষণ ভাল করে নজর করে বললে—কোথায় দেখেছি বলুন তো হুজুর, আপনাকে?

বললাম—আমি সেই সেক্‌শান্ অফিসার, নাগপুরে তোমার ডেরায় গিয়েছিলাম, মনে নেই?

এতক্ষণে যেন চিনতে পারলে মহাবীর। চিনতে পারুক আর না-পারুক, আবার নতুন করে সেলাম করলে।

বললাম—তুমি এখনো সেই মাসোহারা পাচ্ছো মহাবীর?

মহাবীর সহজে এক-কথায় এর জবাব দিলে না। বললে—কী কাণ্ড হয়েছে এখানে, শুনেছেন তো হুজুর? আমার সব্বোনাশ হয়ে গেছে—

আমি একটু অবাক হলাম। বললাম—কী কাণ্ড হয়েছে?

মহাবীর যেন শোকে মুহ্যমান হয়ে গেল। বললে—হিন্দুস্তান আজাদী হয়ে গেছে হুজুর, আপনি শোনেন নি কিছু?

বললাম—হ্যাঁ, সে তো পুরোন খবর। ব্রিটিশ রাজত্ব চলে গেছে, সাহেবরা চলে গেছে;—তুমি জানতে না এতদিন?

মহাবীর যেন হতাশ হয়ে গেছে মনে হলো। বললে—কিন্তু কেন গেল হুজুর? দুনিয়ায় তো ইংরেজদের মত ভালো লোক আর নেই, ওয়াটকিন্‌স্ সাহেবের মত অত ভালো লোক ক'টা আছে হিন্দুস্তানে, বলুন হুজুর?

বললাম—ও-কথা বোল না মহাবীর, যে

স্বাধীন হয়েছে তাতে তো আমাদেরই ভালো হবে। আমরাই তো ভালো খেতে পরতে পারবো! আগে যে-টাকা বিদেশে চলে যেত এখন থেকে তা তো আর যাবে না। তারপর জিনিসপত্তরের দামও আরো সস্তা হবে দিন-দিন—। আর কয়েকটা বছর একটু কষ্ট করে থাকলেই...

মহাবীর আমার কথাগুলো শুনতে শুনতে যেন হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছিল। বললে —আপনি থামুন হুজুর, আপনি থামুন—

হঠাৎ মহাবীরের মুখখানা দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। সেই শান্ত শিষ্ট লোকটা যেন হঠাৎ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো এক মুহূর্তে। আমি না হয়ে অন্যে কেউ হলে হয়ত বাঁ হাতখানা দিয়ে এক ঘুঁষি মারতো। কিন্তু তখনি সামলে নিয়েছে নিজেকে। আর কোনও কথা বললে না।

অনেকদিন পরে এসেছিলাম। কী কথা বলতে গিয়ে কী কথা বলে ফেললাম ঠিক বুঝতে পারিনি। কোথায় আঘাত দিয়ে ফেলেছি, তাও বুঝতে পারিনি। এ যেন আর সেই আগেকার মহাবীর আর নেই। সেই আগেকার মত বাঁ হাত দিয়ে বিড়ি ধরে খাচ্ছে বটে, সেই আগেকার মতই শক্ত-সমর্থ রয়েছে বটে, কিন্তু মহাবীর যেন সেই মহাবীর নেই—

নাইডু বললে—মহাবীর এবার কী কাণ্ড করেছিল জানেন? এবার কুইন্ এলিজাবেথ যখন ইণ্ডিয়ায় এসেছিল, তখন মহাবীর নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে বোম্বাইতে গিয়েছিল।

—কেন?

নাইডু বললে—কুইন্ এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করতে! কিন্তু ওকে দেখা করতে দেবে কেন ওরা? কেউ যেতে দেয় না ওকে রানীর কাছে। শেষে পুলিশ-টুলিশ ওকে মেরে ধরে একাকার করে দিয়েছিল। তারা দুদিন জেলের হাজতে পুরে রেখেছিল ওকে। শেষে রানী চলে যাবার পর ওকে ছেড়ে দিয়েছে—

আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ঘটনাটার কথা শুনে। বললাম—কিন্তু দেখা করতে গিয়েছিল কেন ও?

নাইডু বললে—রানীর কাছে একটা দরখাস্ত দিতে, কুইনের পূর্বপুরুষই তো ওকে পঞ্চাশ টাকা করে মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিল। আর তা ছাড়া, মহাবীরের ধারণা ইংরেজদের মত ভাল জাত আর দুনিয়ায় নেই। ইংরেজরা থাকলে আজকে মহাবীরের এই দুর্দশা হতো না—

মনে আছে এই নাইডুই আমায় বহুদিন আগে এই মহাবীরের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। আমি যখন বিলাসপুরে প্রথম যাই, তখন কাজে-অকাজে নাগপুরে প্রায়ই যেতে হোত।

নাইডু একদিন বললে—চলুন একজন মহাবীরের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই—

তখন মহাবীরকে আমি দেখিনি। ফরেস্ট অফিসের সাধারণ গার্ড একজন। অফিসের সামনে সামান্য একটা খুলিতে থাকে। তারই মধ্যে বউ ছেলে-মেয়ে সবাই। বেশ বেঁটে খাটো মানুষটা। আগে অমর-কণ্টকের ফরেস্টে কাজ করেছে। কতবার কত বিপদের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে মহাবীর।

নাইডু বলেছিল—তোমার সেই বাঘের গল্পটা বলো মহাবীর—ইনি শুনতে চান্—এখানকার সেকশন্ অফিসার—

তারপর আমার দিকে চেয়ে নাইডু বললে —দেখছেন তো মহাবীরের ডান হাতটা নেই—

মহাবীর নাইডুর কথা শুনে বললে—এই কাটা হাতই আমার লক্ষ্মী হুজুর, এই কাটা হাতের জন্যেই আমার বিবির গায়ে চাঁদির গয়না হয়েছে, আমার বাচ্চার হাসুলী হয়েছে—

বলে বাঁ হাতটা ডানদিকের কাটা হাতটার ওপর বুলোতে লাগলো।

নাইডু বললো—বলো মহাবীর, তোমার সেই বাঘের গল্পটা বলো বাবুজীকে,—শুনিয়ে দাও গল্পটা—

আমি বললাম—হাতটা কাটলো কী করে?

মহাবীর বললে—হনুমানজীর দয়া হুজুর, হনুমানজীর কিরপা না হলে কারো হাত কাটতে পারে না। হনুমানজীর দয়া, আর বাদশাজাদার দয়া না হলে কেন কাটবে হাত?

নাইডুকে জিজ্ঞেস করলাম—বাদশাজাদা কে?

নাইডু বুঝিয়ে দিলে আমাকে। বললে—প্রিন্স অব্ ওয়েলস্। সেবার ইংলণ্ডের প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ইণ্ডিয়াতে এসেছিল না, সেই তারই কথা বলছে—

তা সেই প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ যখন ইণ্ডিয়ায় এসেছিল, এ তখনকার গল্প। ওয়াট্‌কিনস্ সাহেব তখন ফরেস্টার। ভারি ভালবাসতো মহাবীরকে। ওয়াট্‌কিনস্ একদিন ডাকলে মহাবীরকে।—

—মহাবীর?

মহাবীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে সেলাম করলে—হুজুর—

যখন যে-কেউ ফরেস্টে শিকারে আসতো, তখন মহাবীরেরই ডাক পড়তো। বরোদার গাইকোয়াড় আসবে শিকার করতে, ডাকো মহাবীরকে। হায়দরাবাদের নিজাম আসবে, তাও মহাবীর। মহাবীর ছাড়া কাজ চলে না ওয়াট্‌কিনস্ সাহেবের শিকারের আগের দিন মাচা বাঁধা হবে। মহারাজাদের থাকবার বসবার কোনও অসুবিধে হয় কি না তাও সাহেবের সঙ্গে দেখতে যাবে মহাবীর। কোথায় কিল্ থাকবে, কোথায় কীসের ওপর বসবে মহারাজা সব ব্যবস্থা ওয়াট্‌কিনস্ সাহেব নিজে তদারক করবে আগের দিন। মাচার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে বাইনাকুলার নিয়ে দেখবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর সব দেখা শেষ করার পর মহাবীরের দিকে চেয়ে সাহেব জিজ্ঞেস করবে—ইজ্ দ্যাট্ অল্ রাইট্—সব ঠিক হ্যায় মহাবীর?

ফরেস্টার সাহেবের আরো অনেক লোক আছে। ডেপুটি আছে, রেঞ্জার সাহেব আছে। তাদের কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। জিজ্ঞেস করবে শুধু মহাবীরকে। মহাবীর মত দিলেই ওয়াট্‌কিনস্ সাহেব খুশী। আর কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই।

মহাবীর বললে—সাহেব আমার দেবতা হুজুর, দেবতা—

নাইডু বললে—তারপর? তারপর কী হলো বলো?

মহাবীর বললে—তারপর সাহেবের কাছে গিয়ে সেলাম করে দাঁড়াতেই সাহেব বললে—মহাবীর, এবার তোমাকেই সব করতে হবে, প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ আসছে এখানে, ফরেস্টে শিকার করতে—

আসছে তো, কিন্তু শিকার যদি না জোটে! বাদশাজাদা আসবে ইণ্ডিয়ায়, চারদিকে সারকুলার পড়ে গেছে। প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে গেছে। প্রথমে বোম্বে, বোম্বে থেকে দিল্লী। তারপর নাগপুর, তারপর বরোদা, ক্যালকাটা, ম্যাড্রাস, হায়দরাবাদ, আরো অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখবে। এ-সব বরাবরের রীতি। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মাথায় বজ্রাঘাত হবার অবস্থা। ভাইসরয় থেকে সুরু করে গভর্নর, চীফ সেক্রেটারীরা সবাই ব্যতিব্যস্ত। বিরাট রোলস্ রয়েস কেনা হয়েছে ইণ্ডিয়ার টাকায়। সেই গাড়িতে করে এসে নামবে, নাগপুরে। সেখান থেকে লাল কার্পেট পাতা হবে গভর্নরস্ হাউস্ পর্যন্ত। গার্ড-অব্-অনার দেখবে, লাঞ্চ খাবে, আরো কত কী। সেখান থেকে আসবে ফরেস্টে। এসে ফরেস্টের মাচার ওপর উঠবে। সি পি'র গভর্নর থাকবে সেখানে, ইণ্ডিয়ার ভাইসরয় থাকবে।

ওয়াটকিনস্ সাহেবের রাত্রেও ঘুম নেই। গভর্নরস্ হাউস থেকে টেলিফোনে পর টেলিফোন আসে।

সাহেব কথা বলে টেলিফোনে আর হাতের কাছে চার-পাঁচজন উদগ্রীব হয়ে থাকে। সামনে বিরাট ব্লু-প্রিন্ট চার্ট। সব রাস্তা-টার নক্সা আঁকা হয়ে গেছে। সেদিন আর সে-রাস্তা দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া লোকজন কিছুই চলবে না। স্কুল-কলেজ সমস্ত ছুটি। সারা নাগপুরে হৈ-হৈ কাণ্ড পড়ে গেছে।

প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ আসবার ছ'মাস আগে থেকেই তোড় জোড় চলছে। কিন্তু আর বেশি দেরি নেই।

মহাবীর বললে—সব কাজ হতো আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনতুম হুজুর, সব দেখতুম—। আমাদের খুলিগুলোতে রং

লাগানো হলো, আমাদের দপ্তরের চেয়ার টেবিল পালিশ হলো—।

শেষে সাহেব একদিন অফিসে একলা বসে বসে কাজ করছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকলে। বললে—মহাবীর—

কাছে গিয়ে বললাম—হুজুর—

সাহেব আমার দিকে চেয়ে বললে—ফরেস্টে টাইগার পাওয়া যাবে তো মহাবীর?

বললাম—হুজুর এতবড় বালাঘাট রেঞ্জ, ওদিকে বালাঘাট আর এদিকে ছিন্দোয়াড়া—এত বড় ফরেস্ট, বাঘ পাওয়া যাবে না, কী বলেন হুজুর?

—কিন্তু যদি না পাওয়া যায়, সে বড় ডিস্‌গ্রেস্, সরম্ কী বাত্—

সাহেব আমার সঙ্গে ইংরিজী বাত্ বলতো আবার হিন্দীও বলতো।

বললাম—জরুর মিলবে সাহেব—

কিন্তু আহা, কী দেবতা মানুষ ছিল সেই ওয়াট্‌কিনস্ সাহেব। বাঘ যদি না মারা পড়ে তো সাহেবেরও লজ্জা, লাট-সাহেবেরও লজ্জা, আমারও লজ্জা! তাই খবর পাঠানো হলো জঙ্গলে-জঙ্গলে। তখন শীতকাল। খবর এল বালাঘাট থেকে যে বাঘ মিলবে কি না ঠিক করে বলা যায় না। ছিন্দোয়াড়া থেকে খবর এল বাঘ একটা আগেই দেখা গেল জঙ্গলে। জঙ্গলের ভেতরে একটা জলার ধারে পায়ের দাগ দেখা গেছে। বিট্ দিলে নিশ্চয়ই মিলবে। সাহেব যেন কিছু না ভাবেন।

ওয়াট্‌কিনস্ সাহেব নিজে গেলেন জঙ্গলে। নিজে গিয়ে পায়ের দাগগুলো দেখলেন। জলার ধারে বেশ স্পষ্ট ছাপ পড়েছে পায়ের। ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুললেন। সেই ছবি নিয়ে আবার লাট-সাহেবের বাড়িতে গেলেন। সে-ছবি লাট-সাহেব দেখলেন। তাঁর সেক্রেটারি দেখলেন। সবাই-ই ভাল করে দেখলেন। কিন্তু তবু সন্দেহ ঘুচলো না কারো। শেষ পর্যন্ত যদি বিট্ দিয়েও বাঘ সামনে না আসে। তখন যে লাটসাহেবের চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে! ওয়ার্টকিন্‌সন্ সাহেবেরও চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে? বিলেতের পার্লা-মেন্টে যদি কথা ওঠে এই নিয়ে? এত বড় বাদ্‌শাজাদা গেল শিকার করতে, আর শিকার না পেয়ে বে-ইজ্জত হয়ে গেল। তখন যে বড় লাটসাহেবেরও বে-ইজ্জত হয়ে যাবার পালা।

লাটসাহেব বললেন—নো. নো. ওয়াট্‌-কিনস্, ও রিস্ক নেওয়া উচিত নয়—

ওয়ার্টকিনস্ সাহেব বললেন—না, ইয়োর মেজেস্টি, আমার মনে হচ্ছে বাঘ আসবেই—

—অল্ রাইট্, তাহলে ভাইস্‌রয়ের চীফ্ সেক্রেটারিকে রেফার করা যাক্—

তা তখনি রেফার করা হলো দিল্লীতে। কন্‌ফিডেনসিয়াল লেটার। স্পেশ্যাল মেসেঞ্জার দিয়ে পাঠানো হলো সে-চিঠি প্লেনে করে। ভীষণ আর্জেন্ট্ অ্যাফেয়ার।

এ ফেমিন্ নয় যে দু'দিন সবুর করতে পারে। দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না, চাকরি পাচ্ছে না, সে-সব ব্যাপার তবু চিঠি লিখেও চলতে পারে। কিন্তু এ হলো রয়্যাল প্রেস্টিজের প্রশ্ন। ইণ্ডিয়ার প্রজারা একদিন বা এক মাস খেতে না পেলে রয়্যাল প্রেস্টিজের কিছু ক্ষতি হয় না, কিন্তু রাজার ছেলে স্বয়ং নিজে অনুগ্রহ করে ইণ্ডিয়ায় পদধূলি দিচ্ছেন আর বে-ইজ্জত হয়ে চলে যাবেন, এ তো হতে পারে না। ইণ্ডিয়ার নেটিভ্‌রা বলবে কী? বলবে—দুয়ো। বলবে—এত বড় একটা এম্পায়ারের মালিক, আর সেই-ই কিনা একটা সামান্য টাইগার মারতে পারলে না। তা হলে তোমরা আছো কী করতে হে? তোমাদের তাহলে মাইনে দিয়ে লাভ?

দিল্লীর আই-সি-এস্ সেক্রেটারিও সাবধান করে দিলেন।—নো নো, নো রিস্ক শুড্ বি টেকন্। এ ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। ইণ্ডিয়ান য়্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের ওপর একটা ব্ল্যাক্ স্পট্ পড়বে। ওতে দরকার নেই। অন্য অল্‌টারনেটিভ্ ব্যবস্থা করে রেখো—

ওয়াট্‌কিনস্ সাহেবেরও ক'দিন খুব দুশ্চিন্তায় কাটলো।

মহাবীর বললে—সাহেব আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতেই আমি বললুম—হুজুর একটা বাত্ আছে—

সাহেব বললে—কী?

আমি বললুম—আমরা রাজার জন্যে জান্ দেব হুজুর, তবু রাজার বে-ইজ্জত হতে দেব না—

সাহেব বললে—না মহাবীর, ভাইসরয়ের সেক্রেটারি নতুন আই-সি-এস্, তিনি রাজি হচ্ছেন না—

তা শেষ পর্যন্ত সেই অন্য বন্দোবস্তই করা হলো। চিঠি লেখা হলো এক পার্শি মার্চেন্ট্‌কে। পার্শি মার্চেন্ট্ জুনোয়ারের কারবার করতো। তারাপোরেওয়ালা সাহেব টেলিগ্রাম পেয়েই চলে এলেন। তাঁর কাছে অর্ডার দিলেই বাঘ, সিংহ, হাতী, গণ্ডার, হনুমান সব পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়া থেকে সাপ্লাই করে বিলেতের চিড়িয়াখানায়।

তারাপোরেওয়ালা সাহেব বললে—রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার একটা সাপ্লাই করতে পারবো, কিন্তু দাম একটু বেশি পড়বে—

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—কত দাম?

তারাপোরেওয়ালা সাহেব বললে—ফিফ্‌টি থাউজেণ্ড্ চিপ্‌স্—পঞ্চাশ হাজার টাকা।

—কিন্তু বেশি তেজী হলে চলবে না, যেন গুলী মারবার আগেই প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌সের গায়ে ঝাঁপিয়ে না পড়ে—।

সেই ব্যবস্থাই হলো। বেশ জোয়ান একটা বাঘ কেনা হলো পঞ্চাশ হাজার টাকায়। ফরেস্ট গার্ডদের ওপর হুকুম জারি হলো যেন কড়া নজর রাখে চারদিকে। সেই বাঘ সাত দিন আগে রাত্তির বেলায় এনে ছেড়ে দেওয়া হলো জঙ্গলে। কোথাকার কোন্ জঙ্গলের বাঘ, এতদিন খাঁচায় বন্ধ ছিল, এখন আবার ছাড়া পেয়েছে। ছাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে এক লাফে শাল গাছের জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এক মুহূর্তে পলকের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠলো চোখের সামনে।

ওয়ার্টকিন্‌স্ সাহেব নিশ্চিন্ত হলেন। যাক্, এতদিনে একটু নিশ্চিন্তে রাত্রে ঘুম হবে। কন্‌ফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট গেল দিল্লীতে ভাইস্‌রয়ের সেক্রেটারির কাছে। সব রেডি, আর কোনও ভাবনা নেই।

মহাবীর গল্প করছিল তার দাওয়ায় বসে। আমাদের জন্যে তার মেয়ে চা দিয়ে গেল বাটি করে।

মহাবীর বললে—চা খান্ হুজুর—

বলে নিজেও বাঁ হাত দিয়ে বাটিটা মুখে তুলে নিলে।

নাইডু বললে—তারপর? তারপর কী হলো বলো মহাবীর?

—হুজুর, তখন আমার এই মেয়ে হয়েছে। এই ঝুমুরি। ঝুমুরির মা বললে—দেখো, তোমার যেন কিছু বিপদ না হয়। একটু সাবধানে থেকো।

আমি বললুম—আমার আবার কী বিপদ হবে। রাজার সঙ্গে বাঘ শিকার করবো,

এও তো একরকমের নসীব হুজুর। এ রকম নসীব কজনের হয়—

তা ঝুমুরির মা'র কথায় আমি হেসেছিলুম হুজুর। হাসবো না কি কাঁদবো? আমার তখন সাত টাকা তনখা। সাত টাকা মাইনে পাই আমি। সাত টাকায় আমার হেসে খেলে চলে যায়। সাত টাকায় আমি আমার সংসার চালাচ্ছি। আর তো কোনও খরচ নেই। তা সেই যেদিন রাজার শিকারে আসবার কথা সেদিন আমার উর্দি পরে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি আমার দপ্তরে। অনেক লোক এসে জড়ো হয়েছে। সকাল থেকেই রাস্তায় ভিড়ে ভিড়। পুলিশ-পাহারা এসেছে চৌকি থেকে। আমার ছাড় ছিল। সেই ছাড় দেখিয়ে আমি ভেতরে গেলুম।

ওয়াট্‌কিন্‌স্‌ সাহেব আমাকে দেখেই কাছে ডাকলে। বললে—মহাবীর এসে গেছ?

বললাম—হ্যাঁ, হুজুর—

সাহেব বললে—খুব হুঁশিয়ার থাকবে মহাবীর, খুব হুঁশিয়ার—

বললাম—ঠিক আছে হুজুর—

সাহেব আবার বললে—তুমি ঠিক মাচার নিচেয় গার্ড দেবে, টাইগারটা বড় তেজী, জঙ্গলে ঢুকেই কাল রাত্রে তিনটে সম্বর মেরে ফেলেছে—তারাপোরেওয়ালা বড় তেজী বাঘ দিয়ে গেছে—

সত্যিই পাহাড়ের কোলে তিনটে সম্বর মেরে ফেলে গিয়েছিল বাঘটা। তারপর আর তার কোনও সন্ধান কেউ জানে না। সারা জঙ্গলে আর তাকে দেখা যায় নি। দশ-বারো মাইল জায়গার মধ্যে বন-জঙ্গল ঝোপ্‌ঝাড় আর শাল মহুয়ার ভীড়ে কোথায় যে সে লুকিয়ে আছে, কেউ তা জানে না। সারা জঙ্গলে তোলপাড় করেছে বিট্‌-ওয়ালারা। তারা নজর রাখতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনও হদিস নেই।

শেষে একটু পরেই পাঁচপায় নম্বর রেঞ্জের বুধুয়া এসে খবর দিলে—বাঘের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।

ওয়াট্‌কিনস সাহেব শুনে খুশী হলো। ঠিক হলো বিটের লোক ছিন্দোয়াড়ার পশ্চিম রেঞ্জ ঘুরে বাঘটাকে তাড়াতে তাড়াতে নিয়ে আসবে ঠিক মাচার সামনে—আর মাচার ওপর থেকে রাজাবাহাদুর বন্দুক ছুঁড়ে শেষ বারের মত সাবাড় করে দেবেন।

মাচাটাও হয়েছিল বিরাট। ওপরে প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌ থাকবে। দিল্লী থেকে বড়লাট সাহেবের সেক্রেটারি সাহেব থাকবে। নাগপুরের ছোটলাট সাহেব থাকবে। আর থাকবে সব বিলিতি বিলিতি সাহেব!

মহাবীর বললে—আমি তো সকলকে চিনি না হুজুর আমি বিটের লোকদের সাজিয়ে দিয়ে নিজে মাচার নিচে গিয়ে বসলাম। সেখানে তিন-মানুষ চার-মানুষ ঘাস। ঘাসের আড়ালে বন্দুকটা নিয়ে রেডি হয়ে রইলাম। লাটসাহেব গিয়ে ওপরে উঠলেন। রাজাবাহাদুরও উঠলেন। সবাই উঠলেন। পঁচিশ হাত উঁচু মাচা। চারদিকে জলা জঙ্গল। তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। শীতের ঠান্ডায় হিম্‌ হয়ে আসছে হাত-পা। আমি চুপ করে সেই ঠান্ডার ভেতরে ঘাসের আড়ালে বসে আছি। ওয়াটকিনস্‌ সাহেব হুকুম দিয়েছিল সবাইকে যেন বন্দুক না ছোঁড়ে কেউ। ছুঁড়বে শুধু রাজাবাহাদুর—

নাইডু বললে—রাজাবাহাদুর কেন বলছো মহাবীর?

—আজ্ঞে হুজুর, আপনারা যাকে প্রিন্স্‌ অব্‌ ওয়েলস্‌ বলেন আমরা তাকেই রাজাবাহাদুর বলি। আসলে তো তিনিই আমাদের রাজা হুজুর—

—তারপর?

মহাবীর বললে—সারাদিন ধরে নাগপুরের মহল্লায় মহল্লায় চৌকিতে চৌকিতে হল্লা চলেছে। এমন বরাত আর কবে হবে হুজুর। দুনিয়াতে রাজার দর্শন কার মেলে এমন করে? আর আমার মতন এমন সামনা-সামনি? তখনও আমার বুকটা দুর দুর করে কাঁপছে হুজুর। আমি আমার বন্দুকটা নিয়ে সামনে তাগ্‌ করে বসে আছি—বাঘ যদি এগিয়ে আসে, বাঘ যদি রাজাবাহাদুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করে তো ফাঁকা আওয়াজ করবো, তবু বাঘকে মারতে পারবো না—। ওয়াট্‌কিনস্‌ সাহেব বারণ করে দিয়েছে।

তা সে এক দিন গেছে হুজুর আমার। আমার চাকরিতে এই রাজা-দেখা সেই-ই প্রথম আর সেই-ই শেষ হুজুর। আহা, কী চেহারা। রাজাবাহাদুরের চেহারা যেন দেব্‌তার মত হুজুর! দেবতার মত। সেখানে বসে বসে ঝুমুরির মার কথা মনে পড়লো। আহা, ঝুমুরির মা তো রাজাবাহাদুরকে দেখতে পেলে না।

একটা মটর গাড়ি থেকে নেমে রাজাবাহাদুর রাত্তির বেলা মাচায় উঠেছিল, খানা-পিনার পর সবাই গিয়ে হাজির ছিল সেখানে।

ওয়াটকিনসাহেব নিচেয় এসে আর একবার সাবধান করে দিলে আমাকে। বললে—মহাবীর রেডি?

বললাম—হাঁ হুজুর, সব রেডি—

—সিগন্যাল্‌ দিই?

—হাঁ হুজুর—

বিজলী-ঘন্টা বাজিয়ে দিলে সাহেব। আর সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে টিন্‌ পেটাতে লাগলো বিট্‌ ওয়ালারা। ঢাঁই ঢাঁই করে বিটের লোক ক্যানেস্তারার টিন্‌ পেটাতে লাগলো চারদিকে। ঢাক-ঢোল-সব বাজা শুরু হয়ে গেল। বালাঘাট রেঞ্জের দিক থেকে ছিন্দোয়াড়া পর্যন্ত সবাই লাইন ধরে বিট দিতে লাগলো। মাচার ওপরে তখন বন্দুক উঁচিয়ে রাজা বাহাদুর বসে আছেন।

অনেকক্ষণ কোনও সাড়া শব্দ নেই। যে-যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। রাত বাড়ছে। এদিক-ওদিক থেকে কএকটা পাখী ডেকে ওঠে। একটা হায়না দৌড়ে চলে যায় সামনে দিয়ে। জঙ্গলের মধ্যে হুজুর রাত ঠিক ঠাহর করা যায় না তেমন। তার ওপর জোঁক আছে। আমরা যারা ফরেস্ট-গার্ড তারা জঙ্গলে ঢোকবার সময় পায়ে ওষুধ মেখে ঢুকি। কিন্তু হাজার ওষুধই মাখি, মশা, পোকা-মাকড়ের কামড় তো তারলে থাকবেই। তা হুজুর, রাজার জন্যে জীবনও দেয় কতলোক—আর যদি তেমন রাজা হয় তো কথাই নেই।

কিন্তু টাইগারের দেখা নেই। তারাপোরেওয়ালা সাহেব যে কী ডোবান ডোবালে।

ওদিকে মশাল জ্বালিয়ে ড্যাং ড্যাং শব্দ করে ঢোল বাজাতে বাজাতে বীট্‌ ওয়ালারা এগিয়ে আসছে। ঘিরে ফেলছে জঙ্গলটা। ওদিকটায় আগুনের ঘের দেখা যেতে আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ হলো।

আমি তো তৈরিই ছিলুম হুজুর। আমি আরো মজবুত করে বন্দুকটা চেপে ধরে তাগ্‌ করে রইলুম। হঠাৎ দেখি একশো গজ দূরে দুটো চোখ জ্বলছে। আগুনের ভাঁটার মত। গোল ঠান্ডা আগুনের ভাঁটা যেন।

আমার মাথার ওপর তখন রাজাবাহাদুররা সবাই চুপচাপ্‌। ভাবছিলাম, কই, এখনও গুলীর আওয়াজ হচ্ছে না তো? এত দেরি করছে কেন ওরা? ওয়াটকিন্‌স্‌ সাহেব কী করছে? এই তো সুযোগ! এর পর একটু দেরি করলেই যে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে! পঁচিশ ফুট মাচার ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে বাঘটা! তখন যে সর্বনাশ হয়ে যাবে সমস্ত!

কই! এখনও দেরি করছে কেন?

ওদিকে মশালের আলো আরো কাছে আসছে। ঢোল বাজানোর ড্যাং ড্যাং শব্দ কানে আসছে স্পষ্ট! আর বেশি দেরি সইবে না তারাপোরেওয়ালা সাহেবের বাঘ! আমি শক্ত করে বন্দুকটা ধরে তাগ্‌ করে রইলুম। যেন না মাচার ওপর ঝাঁপ্‌ দিতে পারে। ঝাঁপ্‌ দিতে চেষ্টা করলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া টিপ্‌বো।

কিন্তু ওয়াট্‌কিনস্‌ সাহেব মানা করে দিয়েছে। রাজার বাঘ। রাজার জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে তারাপোরেওয়ালা সাহেবের কাছ থেকে। রাজার বাঘকে কারো মারবার এক্তিয়ার নেই। রাজার নামে কেনা বাঘ রাজাই মারবে।

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল......

গল্প শুনতে শুনতে আমরা তখন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।

নাইডু বললে—তারপর, মহাবীর? তারপর কী হলো?

মহাবীর বলেছিল—অন্ধকার হয়ে এল হুজুর, লণ্ঠনটা আনতে বলি ঝুমরিকে—

আমি বললাম—না না, আলোর দরকার নেই, এই অন্ধকারই ভালো, তারপর কী হলো, বলো?

মহাবীর বললে—হুজুর, আপনারা আমার খোলীতে এসেছেন এত দূরে থেকে, আমি আপনাদের কোনও খাতির করতে পারলুম না, আজকে আমার বাড়িতে রোটি খেয়ে যান হুজুর—

নাইডু বললে—না মহাবীর তোমাকে সে-জন্যে কিছু ভাবতে হবে না! আমরা এখানে এসেছি অফিসের কাজে, তাই আমার বন্ধুকে বলেছিলাম তোমার সেই বাঘের গল্পটা শোনাবো!

মহাবীর বললে—হুজুর, রাজার দয়াতেই তো বেঁচে আছি হুজুর, রাজাবাহাদুর না-থাকলে আমার এই চাকরিতে কি পেট ভরতো! বড় ভাল রাজা আমাদের হুজুর—বড় ভাল। আমার এই যে বাঁ হাতটা দেখছেন হুজুর, এই বাঁ হাতটার এই কনুইতে রাজা-বাহাদুর নিজের হাত ঠেকিয়েছিল। আমাকে এখনও পঞ্চাশ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

বলে একটা হাত কপালে ঠেকিয়ে রাজার উদ্দেশে প্রণাম করলে মহাবীর।

নাইডু বললে—তা ও-সব কথা থাক, তার-পর কী হলো, বলো?

তারপর মহাবীর তখনও সেই জলা-ঘাসের ভেতর বন্দুক উঁচিয়ে পাথরের স্ট্যাচুর মত কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর ওদিকে মশালের আলো আরো জোর হয়ে কাছে আসছে। চিৎকার আসছে বিট্-ওয়ালাদের।

হঠাৎ মহাবীরের মনে হলো যেন বাঘটা তাকে দেখতে পেয়েছে। এত কাছে একজন জ্যান্ত মানুষ তাকে লক্ষ্য করে বন্দুক উঁচিয়ে আছে—এটা যেন এতক্ষণ বাঘের নজরে পড়েনি। বাঘটা সোজা এবার মহা-বীরের দিকে চাইলে।

কিন্তু তখনও গুলীর আওয়াজ হচ্ছে না ওপর থেকে! তখনও কোনও সাড়া শব্দ নেই—

হঠাৎ বাঘটা এক লাফ দিয়েছে...

মহাবীরের তখন আর জ্ঞান নেই।

নাইডু জিজ্ঞেস করলে—তারপর? তার-পরেরটা বলো?

মহাবীর বললে—আমি তখন হাসপাতালে হুজুর। কী হয়েছিল জঙ্গলে তা আর আমার তখন মনে নেই। আমার ডান হাত-টায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। ডাক্তারবাবু বললে—আমার ডান হাতটা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। বাঘটাকে নাকি আমি গুলী করেছিলুম, আর বাঘটাও নাকি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে-ছিল, পড়ে আমার ডান হাতটা কামড়ে দিয়ে-ছিল—

পরদিন একটু জ্ঞান হতেই ওয়াট্‌কিনস্ সাহেব এল হাসপাতালে।

আমি তখন ভয়ে ভয়ে কাঁপছি। ঝুমরির মাও ঝুমরিকে নিয়ে আমার পাশে বসে-ছিল। তার আদমী এত দিন কাজ করছে, এমন বিপদ কখনও ঘটেনি হুজুর। ক'দিন ধরে ঝুমরির মা খায়নি, রান্না করেনি। তার ওপর শুনেছে যে আমার চাকরি চলে যাবে। রাজার বাঘকে মারার জন্যে চাকরি যাওয়াই তো উচিত ছিল হুজুর! চাকরি গেলেই তো ভালো হতো আমার! আমি কাউকে সে-জন্যে দোষ দিতে পারতুম না।

ওয়াট্‌কিনস্ সাহেব হাসপাতালে আসতেই আমি বাঁ হাতে সাহেবের পায়ের জুতো চেপে ধরলুম হুজুর। বললুম—আমার কসুর মাফ্ করুন হুজুর, আমি দোষ করেছি হুজুর, আমার নোকরি চলে গেলে আমি বাল্-বাচ্ছা নিয়ে উপোষ করবো হুজুর—

ওয়াট্‌কিনস্ সাহেবের রাগ তখনও যায় নি।

বললে—তুমি কেন টাইগারটাকে মারলে? তুমি জানো না রয়্যাল প্রেস্টিজ্ চলে গেল তোমার জন্যে?

বাঁ হাত দিয়ে সাহেবের পা চেপে ধরে আবার বললুম—আমার কসুর হয়ে গেছে হুজুর, আমায় মাফ্ করুন—

সাহেব আমার অবস্থাটা যেন বুঝলে। বললে—তোমাদের বার বার বলেছিলুম না রাজার বাঘকে তোমরা প্রাণ গেলেও মারবে না। তবু কেন মারলে তুমি?

আমি চুপ করে রইলুম। সাহেব গড় গড় করে অনেক কথা শুনিয়ে দিলে। কিন্তু সাহেব মানুষ তো, হিন্দুস্তানী হলে আমায় গুলী করে মারতো হুজুর, নির্ঘাৎ গুলী করে মারতো। কিন্তু সাহেব লোকেরা মুখে যাই বলুক, মনে মনে ভালো। শুনলে বিশ্বাস করবেন না হুজুর, সাহেব আমার নোকরি খেলে না, কিছু না। খানিকক্ষণ খুব বকাবকি করে চলে গেল।

তারপর শুনলুম সেই তারাপোরেওয়ালা সাহেবের মরা বাঘের সামনে রাজা দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছে। সেই ছবি আবার ছাপা হয়েছে সাহেবদের কোন কোন কাগজে। দুনিয়ার সব জায়গায় বাহবা-বাহবা পড়ে গেছে রাজার বাঘ মারার কাহিনী শুনে। রাজা নাকি একলা নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে গভীর জঙ্গলের মধ্যে রাত জেগে বাঘ-টাকে মেরেছে। প্রকাণ্ড বাঘ। এই বাঘ-টাকে মারবার জন্যে হিন্দুস্থানের সমস্ত রাজা-মহারাজা সবাই এতদিন চেষ্টার কসুর করেনি। এতদিনে দুনিয়ার রাজার হাতে নিপাত হলো।

বললাম—তারপর?

মহাবীর বললে—তারপর হুজুর, এক কাণ্ড হলো। সেদিন হাসপাতালে আমি শুয়ে ছিলাম। আমার এ-হাতটা তখন কাটা হয়ে গেছে। অপারেশন্ করে দিয়েছে ডাক্তার সাহেব। হঠাৎ শুনলাম রাজাবাহাদুর আসছে হাসপাতাল দেখতে। হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব আমাকে এসে খবর দিলে। রাতারাতি হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমাকে ভাল কুর্তা, ভাল পাজামা পরিয়ে দিলে। বিছানায় নতুন চাদর পড়লো। ভাল ভাল দাওয়াই এসে গেল টেবিলের ওপর। ফল ফুলুরি এল। কামরা রং করা হলো। যেন রাতারাতি চেহারা পাল্‌টে গেল হাসপাতালের। আজ্ঞে, রাজার হোক, তামাম হিন্দুস্থানের রাজা তো। তাকে তো আর খারাপ জিনিস দেখাতে পারা যায় না। তিনি, হুজুর, মনে কষ্ট পাবেন। তিনি যদি জানতে পারেন যে তাঁর প্রজারা এত দুর্দশার মধ্যে আছে—তাহলে তাঁর মনে দুঃখু হবে যে।

নাইডু বললে—যাক্ গে, তারপর কী হলো,, বলো?

—আজ্ঞে, হুজুর, তারপর বুঝলুম আমাকে দেখতেই রাজাবাহাদুরের হাস-পাতালে আসা। আমি কেমন আছি তাই দেখতে। আমি তো সামান্য একজন লোক। আমি মরে গেলেই বা কী এসে যায়? আমি রাজাবাহাদুরের কাছে কী, বলুন না? কিন্তু রাজাবাহাদুরের দিল্ কত বড় দেখুন সেই অত বড় হিন্দুস্থানের রাজা হয়েও আমার কাছে এলেন হুজুর। সঙ্গে রানী-সাহেবও এলেন। আরো সব সাঙ্গ-পাঙ্গরা
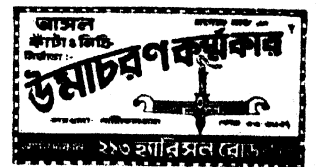
এলেন। বড়লাট বাহাদুর এলেন, ছোটলাট বাহাদুর এলেন। ওয়াটকিনস্ সাহেব এলেন। সকলে রাজাবাহাদুরকে বুঝিয়ে দিলে—কেমন করে আমি বাঘটা মেরেছি, কেন মেরেছি, নিজের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে রাজার বাঘ মেরে ফেলেছি।

কিন্তু তাজ্জব হবেন শুনে, রাজাবাহাদুর কিচ্ছু বললেন না আমাকে। আমার দিকে শুধু চাইলেন। আমার মনে হলো তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে হুজুর। এত দয়া হুজুর, রাজাবাহাদুরের। এমন দয়া আমি কারো কাছে পাইনি হুজুর। আমার মনে হলো আমি রাজাবাহাদুরের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ি। লুটিয়ে পড়ে বলি—আমাকে আপনি খুন করে ফেলুন হুজুর। আমাকে খুন করে আমার মুণ্ডুটা গুঁড়িয়ে দিন। আমার একটা হাত কেটেছে, আপনি আর একটা হাতও কেটে দিন—আমার অপরাধের মাফ্ নেই—

কিন্তু কী দয়ার শরীর জানেন! দুনিয়ার রাজা তো, তাই দিল্‌টাও সেইরকম। আমায় কিচ্ছু বললেন না হুজুর। আমার গায়ে ওয়াটকিনস্ সাহেব হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আর আমি বেকুবের মত ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলাম।

তারপর, পরের দিন আমার নামে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দিলে ছোটলাট সাহেব। রাজাবাহাদুর নাকি খুশী হয়ে আমাকে খেসারত পাঠিয়েছে। আর হুকুম হয়েছে—মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে মাসোহারা পাবো!

গল্প বলতে বলতে মহাবীর থামলে।

নাইডু বললে—তারপর?

—তারপর তো হুজুর এই নোকরি করছি, বেশ সুখেই সংসার করছি। আমার ঝুমরির বিয়ে দিয়েছি, এখনও চাকরি করছি। ওয়াট্‌কিনস্ সাহেব যাবার সময় বলে গিয়েছিল আমার নোকরি কখনও যাবে না। যতদিন মেহনত করবার ক্ষমতা থাকবে ততদিন আমার নোকরি থাকবে। আমার নোকরি কেউ খেতে পারবে না হুজুর, কেউ খেতে পারবে না। ওয়াট্‌কিনস্ সাহেবের পর কত সাহেব এসেছে হুজুর, কেউ আমার নোকরি খায়নি। কারোর খাবার ক্ষমতা নেই আমার নোকরি খায়। এ-সবই হয়েছে হুজুর রাজাবাহাদুরের দয়ায়, তার দয়াতেই বেঁচে আছি হুজুর। এখন তন্‌খাও পাচ্ছি, মাসোহারাও পাচ্ছি—আমার আর ভাবনা কী হুজুর—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বলেছিল—আপনারা বাঙালীরা হুজুর বড় বেওকুফ, রাজার মান দিতে জানেন না। অত বড় ইংরেজ রাজ, তাদের জজ্-ম্যাজিস্টর সাহেবদের আপনারা সবাই বে-ইজ্জত করেন—

আমি মহাবীরের কথায় অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

বললাম—সে কী? আমরা?

—হাঁ হুজুর, আপনারা, বাঙালীরা! আখ্‌বর পড়ি আমরা, আমরা এই নাগপুরে বসে সব খবর পাই, বাঙালী আদমী বড় বেওকুফ্। রাজার জাতকে তারা বে-ইজ্জতি করে। বোমা মারে, পিস্তল মারে, গুলী মারে—হাজারো ইংরেজকে তারা খুন করেছে—এখানে সব খবর পাই আমরা হুজুর—আমরা সব জানি—বাঙালীরা বেওকুফ্—

বললাম—সে তো দেশকে আজাদী করবার জন্যে মহাবীর—

মহাবীর বললে—আজাদী করে কী হবে হুজুর? হিন্দুস্তানী-রাজ কি ইংরেজ-রাজের চেয়ে ভাল হবে? এই ইংরেজ-রাজ আছে বলেই তো আমার চাকরি এখনও আছে হুজুর, ইংরেজ-রাজ না হলে হুজুর বাঘ মারার জন্যে আমায় গুলী করে মেরে ফেলতো কবে—

বলে কাটা ডান হাতটা ঘন ঘন নাড়তে লাগলো মহাবীর।

নাইডু চুপি চুপি বললে—চলুন, চলুন, চলে যাই আমরা, মহাবীর এবার আমাদের ওপর রেগে গেছে—বাঙালীদের ওপর ওর ভারি রাগ, ওই বোমা-বারুদ করে বলে—

তা এ-সব বহুদিন আগের কথা। তখন বিলাসপুরে প্রথম গিয়েছিলাম। তারপর বহুদিন কেটে গেছে। বহু অদল-বদল হয়েছে পৃথিবীর। ব্রিটিশ-রাজত্বই আর নেই। মোট কথা মানুষের ভূগোলে-ইতিহাসে-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অনেক ওলোট-পালট হয়ে গেছে। এতদিন পরে আবার বিলাসপুরে গিয়ে খোঁজ নিলাম মহাবীরের। অন্য অনেকেরই খোঁজ নিলাম। শেষকালে মহাবীরের কথাটা মনে পড়লো।

নাইডুকে জিজ্ঞেস করলাম—আর সেই মহাবীর? মহাবীর এখনও সেখানে আছে?

নাইডু নিজেই যেন ভুলে গিয়েছিল।

বললাম—সেই যে সেই রাজার বাঘ মেরেছিল, পঞ্চাশ টাকা করে মাসোহারা পেত?

এতক্ষণে যেন মনে পড়লো। বললে—সেই হাত-কাটা মহাবীর?

বললাম—হ্যাঁ, ব্রিটিশরা চলে যাবার পর তার এখনও চাকরি আছে? কত বয়েস হলো তার?

নাইডু বললে—না, স্যার, সে আর নেই সেখানে, তার চাকরি গেছে—এখন এখানে শনিচরী বাজারে থাকে—

—আর পঞ্চাশ টাকা মাসোহারা?

নাইডু বললে—তা ঠিক পাচ্ছে, তবে মহাবীর এবারে বড় ক্ষেপে গেছে—

—কেন?

নাইডু বললে—এবার কুইন এলিজাবেথ এসেছিল ইণ্ডিয়াতে। তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল মহাবীর বোম্বেতে—সেখানে ওকে ধরে জেলে পুরে দিয়েছিল, তাইতে খুব রেগে গেছে—

সেই সব কথাই বললাম মহাবীরকে।

বললাম—তুমি বোম্বাই গিয়েছিলে রানীর সঙ্গে দেখা করতে?

মহাবীর আরো রেগে গেল। বললে—আমি বলে দিচ্ছি হুজুর, রানীর সঙ্গে যদি একবার আমাকে দেখা করতে দিত হুজুর তো আমি সমস্ত বলে দিতুম—

—কী বলতে?

মহাবীর বললে—বলতাম আপনারা চলে যাবার পর হুজুর আমরা বড় কষ্টে আছি, আমাদের পেট চলছে না, আমাদের থাকবার ঘর-বাড়ি নেই, চোর বাটপাড়রা আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে. আপনারা আবার আসুন, হুজুর, আবার আপনারা এখানে এসে রাজা হয়ে বসুন—

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—কিন্তু আর কিছুদিন সহ্য করো না মহাবীর। সবে তো দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিছুদিন এমনি কষ্ট করে থাকো না। কিছুদিন না-খেয়ে না-পরে চালাও না। দেশে অনেক পাঁচশালা পরিকল্পনা হয়েছে, চারদিকে বাঁধ হয়েছে, ড্যাম্ হয়েছে, কিছুদিন বাদে দেখবে সব সস্তা হয়ে যাবে, সবাই খেয়ে-পরে সুখী হবে—

এবার মহাবীর ক্ষেপে গেল। বললে—আপনি বেরিয়ে যান হুজুর, বেরিয়ে যান এখান থেকে। আপনারা বাঙালীরাই তো যত নষ্টের গোড়া, আপনাদের বাঙালীরাই তো ইংরেজদের বোমা মেরেছে, গুলী মেরেছে, আপনাদের নেতাজীই তো যত কাণ্ড বাধালে—আপনি বেরিয়ে যান সামনে থেকে—আমাদের দুঃখ আপনারা বুঝবেন না—যান্—

বলে মহাবীর যেন তার কাটা হাতটা নিয়ে আমার দিকে তেড়ে এল।

আমিও উপায় না দেখে চলে এলাম সামনে থেকে। মনে মনে ভাবতে লাগলাম কেন এমন হলো! সেদিনকার অত রাজভক্ত নিরক্ষর সরলবুদ্ধি মহাবীর হঠাৎ কেন এমন রাজ-বিদ্বেষী হয়ে উঠলো? মহাবীরের নিজের দেশের লোকই তো দেশের রাজা হয়েছে, তবে কেন ক্ষেপে উঠলো এমন করে?

আজও বাসে মেয়েটির সঙ্গে সুব্রতের দেখা হয়ে গেল। ঠিক দেখা হওয়া বলা চলে না, দেখল সুব্রত। একতরফা দেখল। ও তো আর কোনদিকে চোখ তুলে তাকায় না। লেডীজ সীটে জানালার ধারে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে চোখের সামনে বই কি মাসিক পত্রটত্র একখানি খুলে ধরে। শীতের দিনে জাম্পার-টাম্পার কিছু একটা বোনে। এইভাবে সারাটা পথ কিছু না দেখে না শুনে কারো দিকে না তাকিয়ে ও একেবারে অফিসের সামনে গিয়ে নামে। একটু এগিয়ে গিয়ে বাস স্ট্যান্ড থেকে ওঠে বলে ওই জায়গাটি ওর বেশি হাতছাড়া হয় না। সীটটি যেন ওর রিজার্ভ করা আছে।

প্রায়ই দেখা হয় সুব্রতের. প্রায়ই দেখা হয়। দেখা তো হবেই। এই বাসটা তারও অফিসের বাস। এর পরের বাসে গেলে তাকে লেট হতে হয়। যেদিন ওকে দেখে না সুব্রত সেদিন কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে। মনে মনে ভাবে আজ কি কামাই করল, অসুখ বিসুখ হল? না কি অন্য বাসে চলে গেল। আবার এই একতরফা দেখার মধ্যেও অস্বস্তি বড় কম নেই। বিশেষ করে কোন চেনা মেয়েকে যদি এই-ভাবে দূর থেকে দেখতে হয়, কোন পরিচিতা মেয়ে যদি এমন করে সম্পূর্ণ অপরিচিতা হয়ে যায়। তাহলে তার দিকে চোখ পড়লে নিজেরই সম্ভ্রমবোধে লাগে, একটু অপমানের খোঁচা মনে গিয়ে পেঁছায়। সুব্রত চেষ্টা করে না দেখবার না তাকাবার। বেশির ভাগ দিনই সফল হয়। ট্রামে বাসে সে অবশ্য বই কি কাগজ পড়াটা পছন্দ করে না। তার মধ্যে একটু যেন লোক-দেখানো অধ্যয়নশীলতা আছে! সে যে অফিসে কি বাড়িতে খুবই কর্মব্যস্ত এই কথাটি ওই অভ্যাসের মধ্যে উচ্চারিত হয়। আসলে অত ব্যস্ততা. সুব্রতের নেই। ইচ্ছা করলে সে বাড়িতে পড়বার সময় পায়। কারো সঙ্গে বাজার দর, খেলার মাঠ কি রাজনীতির বাম দক্ষিণ পন্থা নিয়ে ট্রামে-বাসে আলোচনা করতেও তার রুচি হয় না। চেনাপরিচিত কেউ এসে পাশে বসলে কি কেউ পাশে বসতে দিলে তার সঙ্গে বড় জোর কুশল বিনিময়টুকু চলে। তারপর তাকে নীরব হতে দেখে সংগীকেও চুপ করতে হয়। তাই এক-হিসেবে ওই মেয়েটির মত সুব্রত বোসও বালিগঞ্জ থেকে ডালহৌসী স্কোয়ার পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথ নিঃসঙ্গভাবে যায় আসে। কিন্তু মন কি সবদিন অতখানি অবিচল, নির্বিকল্প আর সঙ্গহীন থাকে?

ওই মেয়েটি—ওই শ্যামলী দত্তের সঙ্গে বছর পাঁচেক আগে এই বাসেই একদিন আলাপ হয়েছিল। তখন দামী শাড়ি ছিল ওর পরনে। হাতের আংটিতে কানের ফুলে দামী পাথর বসানো ছিল। ও যে ধনীর ঘরের মেয়ে তা অতি উচ্চারিত না হলেও ওর চেহারায় ওর বসবার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল। মুখের কমনীয় কান্তিতে সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য লাবণ্যের মতই মিশে ছিল।

এখন অবশ্য সে অবস্থা ওদের আর নেই। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সুখ আর দুঃখ গাড়ির চাকার মত ঘোরে ওপর নিচ করে একথা ওদের বেলায় বড় বেশিরকম খেটে গেছে। আজ আর সেই দামী দামী শাড়ি-গয়না নেই। সাধারণ একখানা তাঁতের শাড়ি পরেই বেরিয়েছে শ্যামলী। এক হাতে ঘড়ি আর এক হাতে একটি বালা পরেছে আর কোথাও কোন ভূষণ রাখে নি। চেহারার মধ্যেও কেমন যেন একটু শুষ্কতা এসে গেছে। সে কি শুধু পাঁচ বছর বয়স বেড়েছে বলেই? অবশ্য সেই সঙ্গে ওর চেহারার তীক্ষ্ণতাও বেড়েছে। বাইরের প্রতিকূল

পৃথিবীর সঙ্গে বেশিরকম যুঝতে হলে মুখ চোখের যে তীব্রতা বাড়ে সেই তীব্রতা এসেছে ওর শরীরে। হয়তো বা মনেও। মুখ ত মনেরই প্রতিচ্ছবি।

তখনকার সঙ্গে এখনকার তুলনাটা বড় চোখে পড়ে, বড় বেশিরকম মনে হয় সুব্রতের। হওয়াটা যদিও উচিত নয়, অশোভনও। বাসভরতি এতগুলি যাত্রীর আর কারোরই বোধহয় সে সব দিনের কথা এমন করে মনে পড়ে না। আর সবাই সে কথা ভুলে গিয়ে বেঁচে গেছে। শহরের জীবনের কালস্রোত, ঘটনার স্রোত বড় প্রখর। সেই স্রোতে কে কবে হাবুডুবু খেয়েছে, কে কোথায় তলিয়ে গেছে, সে কথা বেশিদিন কে আর মনে করে রাখে। এমন কি পাড়া-পড়শীতেও রাখে না। কিন্তু আশ্চর্য, সুব্রত অমন করে ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারেনি। আর ওই শ্যামলী—সেও নিশ্চয়ই মনে করে রেখেছে। মনে রেখেছে বলেই সুব্রতের দিকে ও তাকায় না। বাসে ওঠা নামার সময় কি পথে-টথে কোথাও দেখা হয়ে গেলে, চোখে চোখ পড়লে মুখ নামিয়ে নেয়, কি ফিরিয়ে নেয়। চোখে কি ঠোঁটে একটুও হাসি ফোটে না। অথচ হাসলে ওকে কী চমৎকার দেখাত। পাতলা ঠোঁট, সুন্দর সুষম দাঁতের সারি। হাসলে এখনো নিশ্চয়ই ওকে সুন্দর দেখায়। সেবার এই বাসেই শ্যামলীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল সুব্রতের। সে যথারীতি তার অফিসে বেরিয়েছিল। আর শ্যামলী যাচ্ছিল ইউনিভার্সিটিতে। ওর হাতে ছিল সরু একটা নীল রঙের খাতা আর সেই সঙ্গে মোটা একখানা মনস্তত্বের বই। সুব্রত যাচ্ছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও বসেছিল একটি লেডীজ সীটের আধখানায়। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল।

শ্যামলী আরো একটু সরে গিয়ে সুব্রতের দিকে চেয়ে বলেছিল, 'বসুন।'

কালো চোখের সেই তাকাবার ভঙ্গি বড় ভালো লেগেছিল সুব্রতের, গলাটুকু বড় মিষ্টি শুনিয়েছিল। অবশ্য এই ধ্বনিটুকু শুনবার কথা ছিল না, ও শুধু চোখের ইশারায় বসতে বললেই পারত। এমন কি না তাকিয়ে, কিছু না বলেও বসতে বলা যেত। কিন্তু যেজন্যেই হোক সেদিন ওর মনে প্রচুর দাক্ষিণ্য ছিল।

সুব্রত পাশে বসে ইংরেজীতে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। চোখে আর একটু কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে দেখে, মুখখানা শুধু সুন্দরই নয় চেনাও। চেনা মানে অনেকবার দেখা। এই পাড়ারই মেয়ে। দেখেছে, পার্কে, লেকের ধারে, স্টেশনারি স্টোর্সের সামনে। আজ আরো কাছে বসে দেখা হল। সুব্রতের বিস্ময় দেখে মেয়েটি কি একটু হেসেছিল? যদি হেসে থাকে সে হাসি একটি চেনা মুখকে দেখতে পাওয়ার হাসি, যার সঙ্গে আলাপ ছিল না তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার স্বাচ্ছন্দ্যের হাসি। সুব্রতের চেহারাও তো একেবারে না চেয়ে দেখবার মত নয়।

তবু সেদিন শুধু স্মিত দৃষ্টি আর বিস্মিত দৃষ্টির বিনিময়ই হয়েছিল। কথা-বার্তা আর এগোয়নি। সুব্রত ইচ্ছা করলে যে আলাপকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারত তা নয়, কিন্তু নাগরিক রীতিতে বাধত।

তারপর আরো কিছুদিন শুধু পথেটথেই দেখাশোনা হল। সেই হাসি আর দৃষ্টির বিনিময়। কিন্তু তা শুধু একটি নিমেষের মধ্যেই শেষ হয় না। আড়ালে এসে তার মাধুর্য যেন আরো বেড়ে যায়। কিসের একটা মৃদু অস্পষ্ট প্রত্যাশা ভবিষ্যৎকালের মধ্যে পথের রেখা এঁকে দিতে দিতে এগোতে থাকে।

ততদিনে মেয়েটি কোন বাড়িতে থাকে, কোন্ বাড়ি থেকে বেরোয় সুব্রত তা লক্ষ্য করে দেখেছে। ইঞ্জিনীয়ার আর কে দত্তের

বাড়ি। দোতলা, দুগ্ধধবল রঙ। সামনে বাগান। তাতে অজস্র মরসুমী ফুল। বাঁ দিকে গ্যারেজ আছে। যে গ্যারেজ প্রায় শূন্যেই থাকত। অতি ব্যস্ত মিঃ দত্তকে নিয়ে সে সব সময় ঘোরাফেরা করত। তবু ও'দের ওই গাড়িতে উঠবার একদিন সুযোগ হয়েছিল সুব্রতের। অনেকদিন বাদে এলিটে ইংরেজী ছবি দেখতে গিয়েছিল, একটি বন্ধুর আসবার কথা ছিল। সে কথা রাখেনি। সেখানেও এই প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নাটকের আগেই এই নাটকীয় ঘটনাটুকু ঘটে যাওয়ায় সুব্রত অতিমাত্রায় খুশী হয়েছিল। নিশ্চয়ই সে তা চেপে রাখতে পারে নি। শ্যামলীর সঙ্গে তার এক ছোট ভাই ছিল প্রণব। বছর পনের যোল বয়স। শ্যামলী যে কোন বন্ধুর সঙ্গে না এসে ভাইয়ের সঙ্গে এসেছে তার জন্যে মনে মনে কৃতজ্ঞ হয়েছিল সুব্রত। ছবি আরম্ভ হওয়ার সামান্য দেরি ছিল। লবীতে বসে খানিকক্ষণ গল্প চলেছিল তিনজনের মধ্যে। সে গল্পের কোন মাথামুণ্ড ছিল না। তবু সুব্রতের মনে হয়েছিল ভিতরে গিয়ে আর দরকার নেই। ভিতরে গিয়ে এর চেয়ে বেশী কী আর দেখবে, এর চেয়ে মধুরতর কী আর শুনবে। বিশেষ করে যখন পাশাপাশি বসা যাবে না, শ্যামলীদের টিকেটের নম্বর আর সুব্রতের টিকেটের নম্বরের মধ্যে যখন অনেক গাণিতিক ব্যবধান আর সে টিকেট বদলে নেওয়ারও এখন উপায় নেই তখন আর ভিতরে গিয়ে লাভ কি।

তবু ভিতরে যেতে হয়েছিল। শ্যামলী বলেছিল, 'বেরিয়ে এসে কিন্তু দাঁড়াবেন। একসঙ্গে ফিরব।'

ছবিটা বাজে লাগছিল, বেরিয়ে আসবার জন্যেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সুব্রতের মন।

সেদিন বাসে কি ট্যাকসিতে আসতে হয়নি, শ্যামলীদের গাড়ি ছিল সঙ্গে। প্রণব বুদ্ধিমান ছেলে দিদির পাশে না বসে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসেছিল।

আর সারা পথ শ্যামলীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসতে পেরেছিল সুব্রত। ছবি শ্যামলীরও ভালো লাগে নি। কিন্তু এই যৌথযাত্রা যে, সব ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছে সে কথা অনুচ্চারিত থাকলেও অপ্রকাশিত ছিল না।

কথায় কথায় সুব্রত জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সেদিন দেখলাম আপনি সেতার নিয়ে যাচ্ছেন। কতদিন প্র্যাকটিস করছেন?'

শ্যামলী বলেছিল, 'বছর খানেক হল।'

'এক বছর! আপনি তাহলে আমার চেয়ে সাত মাসের সিনিয়র।'

শ্যামলী হেসে বলেছিল, 'আপনারও এসব আছে বুঝি? কতদিন বাজাচ্ছেন?'

সুব্রত বলেছিল, বাজানো ওকে বলে না। আফিস থেকে ফিরে এসে যেদিন খেয়াল হয় একটু টুংটাং করি। নির্মলবাবু ধমকান। বলেন আপনার মশাই একেবারেই মন নেই।'

শ্যামলী বলেছিল, 'নির্মলবাবু কে? নির্মল গুহঠাকুরতা?'

'হ্যাঁ। আপনি কী করে জানলেন।'

শ্যামলী বলেছিল, 'আমি যাঁর কাছে শিখি তিনি ও'র বন্ধু। ইস্তাক হোসেন।'

সুব্রত বলেছিল, 'বাঃ চমৎকার তো। এক বন্ধুর ছাত্রী আর এক বন্ধুর ছাত্র, আমাদের মধ্যে তাহলে কী সম্পর্ক হয় বলুন তো।'

শ্যামলী হেসে বলেছিল, 'আমি অত হিসেব করতে জানিনে। আপনি বসে বসে ভাবুন।'

ভাবার চেয়ে সেদিন নির্ভাবনায় কথা বলতেই ভালো লাগছিল সুব্রতের। জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি কি খুব রেয়াজ করেন?'

শ্যামলী বলেছিল, 'কই আর তেমন করতে পারি। সেতার নিয়ে বসতে দেখলেই বাবা ধমকান। ভয় দেখিয়ে বলেন, তুই ফেল

করবি। আগে পড়াশুনোটা সেরে নে তারপর যা খুশি তাই করিস।'

'আপনি বুঝি আপনার বাবার খুব বাধ্য মেয়ে?'

'অবাধ্য হবার কি জো আছে? বাবা আমাকে বড্ড ভালোবাসেন। আমাকে ছাড়া ওঁর এক মুহূর্ত চলে না। এই নিয়ে পিনুদের কী হিংসে।'

এই বেসুরো প্রসংগটা সুব্রত বেশিক্ষণ চলতে দেয়নি। তাড়াতাড়ি ফের রাগ-রাগিণীর প্রসংগ এনে ফেলেছিল।

চৌরংগী থেকে বালিগঞ্জের পথটা সেদিন বড়ই ছোট হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রতা আছে শ্যামলীদের। লেক টেম্পল রোডে সুব্রতদের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তাকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

সুব্রত বলেছিল, 'ভিতরে আসবেন না?'

শ্যামলী বলেছিল, 'না না আজ থাক, আজ বড় রাত হয়ে গেছে। আর একদিন আসব। কিন্তু তার আগে আপনার একদিন আসা উচিত।'

সুব্রত বলেছিল, 'বেশ তো যাব। কিন্তু একটি শর্ত আছে। আপনার বাজনা শোনাবেন।'

শ্যামলী বলেছিল, 'ওরে বাবা। আগে শিখে নি, তারপরে শোনাব। ওসব শর্তটর্ত থাকলে আপনাকে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।'

'একেবারে অনন্তকাল! অমন করে হতাশ করবেন না। ধৈর্যের অমন শক্ত পরীক্ষা নেবেন না।'

শ্যামলী মৃদু হেসেছিল, কোন কথা বলেনি।

তারপর সুব্রতের আর ওদের বাড়িতে যাওয়া হল না। ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। শ্যামলীর সংগে আলাপ পরিচয়ের কথা সুব্রতের মা কী করে টের পেয়েছিলেন জানা যায় না। বোধ হয় কোন বিশ্বস্ত বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকবে। তার অনেকদিন আগে থেকেই মা বিয়ে কর বিয়ে কর বলে সুব্রতকে উত্যক্ত করে তুলেছিলেন। বিয়ে করবে না এমন ধনুর্ভংগ পণ তার ছিল না। কিন্তু যাকে দেখবে তাকেই ঘরে তুলবে অত উদারতার অভাব ছিল। ইনকাম ট্যাক্সে অফিসার গ্রেডে চাকরিটি পাকা সুব্রতের। পৈতৃক দোতলা বাড়িটির একাই উত্তরাধিকারী। বোনের বিয়ে বাবাই দিয়ে গেছেন। ছেলের ওপর কোন দায় চাপিয়ে যাননি। এমন নির্ঝঞ্ঝাট সংসার সুলভ নয়। তাই ভালো ভালো সম্বন্ধই আসছিল। অনূঢ়া তরুণী মেয়েদের যে পরিমাণ ফোটো জমেছিল তা দিয়ে এক প্রদর্শনী খোলা যেত। কিন্তু দেখে শুনে সুব্রতের তেমন আগ্রহ হচ্ছিল না।

মা কেবলই ধমকাচ্ছিলেন, 'তুই কী চাস বলতো? অপ্সরী কিন্নরী না পটে আঁকা ছবি?'

সুব্রত বলেছিল, 'মা পটে আঁকা দিয়ে কী হবে। যে হেঁটেচলে বেড়াতে পারবে ঘরের কাজকর্মে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে, সেবাশুশ্রূষা করতে পারবে, তেমন একজনকে আনাই ভালো।'

কী করে মা দত্তদের সংগে যোগাযোগ করলেন তিনিই জানেন। খবর পাঠালেন ভবানীপুরে সুব্রতের কাকাকে। বাবার জেঠতুতো ভাই। আলাদা অন্ন হলেও প্রায়ই এসে খোঁজখবর নেন। এসব বিয়েচুড়োর ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ। কাকা এলেন, কাকীমা এলেন, খুড়তুতো বোন ইলা এল সংগে। দলবল নিয়ে ওরা গিয়ে মেয়ে দেখে এলেন। সুব্রতকেও দলে টানবার চেষ্টা করেছিলেন কাকীমা কিন্তু সে রাজী হল না। ইলা বলল, 'দাদা আর কী দেখবে। দাদার তো অনেকবার দেখা মেয়ে।'

সুব্রত বলেছিল, 'কে বলল তোকে।'

ইলা বলেছিল, 'অনেক গুপ্তচর আছে আমাদের। তোমরা একসংগে সিনেমা দেখেছ। ট্রামে বেড়িয়েছ, বাসে বেড়িয়েছ, ট্যাক্সিতে বেড়িয়েছ, কারে বেড়িয়েছ এখন শুধু প্লেনে আর রকেটে ভ্রমণ বাকি।'

সুব্রত বলেছিল, 'বিয়ের পর তুই বড় মুখরা হয়েছিস।'

ইলা জবাব দিয়েছিল, 'তুমি ঠিক উল্টোটি হবে দাদা, আমিও আগেই বলে রাখলাম। উপযুক্ত হাতে পড়লে আচ্ছা জব্দ হবে।'

মেয়ে দেখে সবারই পছন্দ হয়ে গেল। সুব্রত আগেই বলে দিয়েছিল, 'মা, কোনরকম দাবিদাওয়ার কথা যেন তোলা না হয়। ওসব আমি পছন্দ করিনে।'

মা বললেন, 'বুঝেছি বাপু। আমাকে আর বেশি বলতে হবে না। দাবিদাওয়া তো ভালো, তোমার যা অবস্থা ঘর থেকে টাকা খরচ করতেও তুমি এখন রাজী আছ।'

ওপক্ষেরও ছেলে দেখে অপছন্দ হল না শ্যামলীর বাবা মা দুজনেই এলেন চায়ের নিমন্ত্রণে। বাবা গুরুগম্ভীর রাশভারি মানুষ। খুবই ব্যস্ত। আধঘণ্টার বেশি সময় দিতে পারলেন না। আধ কাপ চা খেলেন। ডায়াবেটিস আছে বলে মিষ্টিটিষ্টি কিছু খেলেন না। ওই সময়টুকুর মধ্যেই জিজ্ঞাসা করে নিলেন অফিসে সুব্রতের কতদিনের চাকরি, কী রকম প্রসপেক্ট, বাবার ওকালতি পেশা কেন নিল না সুব্রত, ব্যবসাট্যাবসার দিকে ঝোঁক আছে কি না, কোন কোন কোম্পানীর শেয়ার কেনা আছে।

শ্যামলীর মা দোহারা চেহারার লজ্জাবতী মহিলা। তিনি সুব্রতের সংগে প্রায় কোন কথাই বললেন না। একটু আড়ালে বসে মার সংগে গল্প করলেন আর পানদোক্তা খেলেন।

ও'রা চলে গেলে সুব্রত মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী মনে হল মা। ইণ্টারভিউতে উতরে গিয়েছি তো?'

মা হেসে বললেন, 'আমার খোকার কী দুশ্চিন্তা! এত চিন্তা তো কলেজের পরীক্ষাগুলির সময় দেখিনি, চাকরির ইণ্টারভিউর সময়তেও দেখিনি। মনে তো হয় পাশ করেছ। চিন্তা তো ও'দেরও আছে। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। দুটির বিয়ে দিয়েছেন। আরো দুটি বাকি। ছেলেও বুঝি গুটি তিনেক। সবই ছোট ছোট। শ্যামলীর মা বলছিলেন ও'দের হাতে আরো নাকি ভালো সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু মেয়ে তার ভাইবোন বন্ধুদের কাছে যা বলেছে—।'

কী বলেছে সে কথাটুকু না বলে মা ফের আর একটু হাসলেন।

শুধু দিনক্ষণ ঠিক হওয়াই বাকি রইল। ওদের গুরুদেব গেছেন কাশীতে। তিনি ফিরে এলে পঞ্জিকা দেখবেন। হয় সামনের মাঘ ফাল্গুনে না হয় শ্যামলীর পরীক্ষার পর—।

কিন্তু শুভদিন আসবার আগেই অপ্রত্যাশিত অশুভ দিন এসে গেল। আর কে দত্তের বাড়িতে রাত্রে পুলিস এসে হানা দিল। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর সব অভিযোগ। বিশ্বাসভঙ্গ, জালিয়াতি, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র। সরকারী কণ্ট্রাক্ট নিয়ে যে সব কাজ তিনি করেছেন তাতে অনেক ফাঁকি ধরা পড়েছে। হিসাবের গরমিল হয়েছে লাখ খানেক টাকার।

সুব্রতের মা বললেন, 'কী বিশ্রী সব ব্যাপার বল তো।' সুব্রত গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'বিশ্রী বইকি।'

মামলা চলল বছর তিনেক ধরে। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে সেসনে, সেসন থেকে হাইকোর্টে। আপীলে সুবিধে হল না। কয়েকজনের গুরুতর রকমের শাস্তি হল। আর কে দত্ত পেলেন আড়াই বছরের আর আই।

সবাই স্তম্ভিত। এ কী ব্যাপার। অবশ্য অনেকে কানাঘুষো করতে লাগল এ ব্যাপার নতুন নয়, এবারই ধরা পড়েছেন।

সুব্রতদের সংগে তো তেমন আলাপ নেই। এই সব গোলমালের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা করলে ও'রা কীভাবে নেবেন বলা শক্ত। শুধু গোড়ার দিকে একবার খোঁজ নিতে গিয়েছিল সুব্রত। বলেছিল দেখা করবার হুকুম নেই। তখন ভিতরে যাচ্ছেন শুধু বড় বড় উকিল ব্যারিস্টার আর ও'দের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন। সুব্রত তাঁদের মধ্যে পড়ে না।

শ্যামলীর নামটা মুখে আনি আনি করেও আনতে পারেনি। সংকোচ বোধ করেছে।

এইসব দুর্যোগের মধ্যে কোন শুভকাজের কথা উঠতেই পারে না। তবু পরোক্ষভাবে অস্ফুটস্বরে উঠেছিল। শ্যামলীর সম্পর্কিত এক মামা এসে বলেছিলেন, 'কথাবার্তা যখন ঠিক হয়েই আছে তখন একটা দিনটিন দেখে—। অবশ্য খরচপত্রের জন্যে ভাবনা নেই। মেয়ের বিয়ের টাকা ও'রা আলাদা করে তুলে রেখেছেন।'

কিন্তু টাকাই তো সব নয়। এমন কি রূপবতী স্ত্রীও সব নয়। সামাজিক মানুষকে কুলশীল মানমর্যাদার কথাও ভাবতে হয়।

তাই প্রস্তাবটা আর এগোয় নি। সুব্রতের মা বলেছেন, 'অত ব্যস্ত হবার কী আছে। ও'দের বিপদ আপদটা কাটুক তারপর সব দেখা যাবে। এই সব ঝামেলা ঝঞ্ঝাট অশান্তির মধ্যে কারোরই তো মনের অবস্থা—।'

বিপদ আপদ কাটেনি। কারাভিকসনের ছ মাস পরেই মিঃ দত্ত হার্টফেল করে মারা গেছেন। ব্লাড প্রেসার নাকি আগে থেকেই ছিল। অবশ্য তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু স্বাভাবিক কিনা তা নিয়েও বেশ কিছুদিন ধরে আলাপ আলোচনা আর গবেষণা হয়েছিল পাড়ায়।

তারপর আস্তে আস্তে সব থেমে গেল। শোনা গেল ওদের গাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। মামলার খরচ মেটাবার জন্যে সমস্ত সঞ্চয়ই শেষ হয়েছে। কে যেন বলল বাড়িটাও পুরোপুরি দায়মুক্ত নয়। সবই অবশ্য বাইরে থেকে শোনা। ওদের কারো সংগেই আর দেখাসাক্ষাৎ হয় না সুব্রতের। শুধু সুব্রতের কেন তার জানাশোনা কারো সংগেই হয় না। ওরা যেন ওই বাড়িখানির মধ্যেই শেষ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। পাড়ার কাউকে ওরা ডাকে না, কারো বাড়িতেও ওরা যায় না। রাস্তায় কারো সংগে দেখাসাক্ষাৎ হলে নিজেরাই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

সুব্রতের এক বন্ধু শিবতোষ ওদের বাড়ির উল্টোদিকে থাকে। শিবুদের বাড়ি থেকে সবই দেখা যায়। মানে আগে যেত। এখন আর যায় না। শিবু বলে ওদের জানলা দরজা সব বন্ধ। যেন এক অবরুদ্ধ দুর্গ বানিয়ে রেখেছে। দুর্গই বটে।

একটি পাঞ্জাবী পরিবার ওদের দোতলাটি ভাড়া নিলেন। শুধু বুড়োবুড়ি। আর কেউ নেই, আর কোন ঝামেলা নেই। বোধহয় এইরকমই ওরা চেয়েছিল। নিজেরা নেমে এসেছে একতলার দু-তিনখানা ঘরে। আর কে দত্তের আশ্রিতের সংখ্যা কম ছিল না। তারা সব বিদায় নিয়েছে। শুধু যাদের আর কোথাও যাওয়ার যো নেই। তারাই আছে। পাঁচটি ছেলেমেয়ে আর তাদের মা। ভাইবোনদের মধ্যে শ্যামলীই এখন বড়।

শিবু বলত মেয়েটা বড় টাচি হয়ে গেছে। সুব্রত জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী রকম?'

'কেউ সামান্য কিছু বললে ওর মুখ কালো হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়। ওদের বাবার কোন দোষ ছিল বলে ওরা কেউ স্বীকার তো করেই না, বোধহয় বিশ্বাসও করে না। যারা ওদের বাবাকে সম্মান করতে পারবে না তাদের সংগে কথা বলতে পর্যন্ত অনিচ্ছুক। ফলে পাড়ায় ওদের কথা বলবার মত কেউ নেই।'
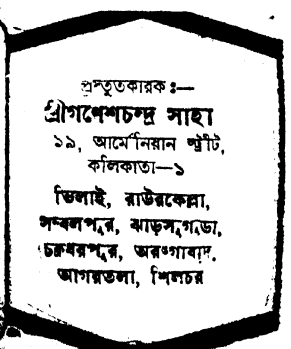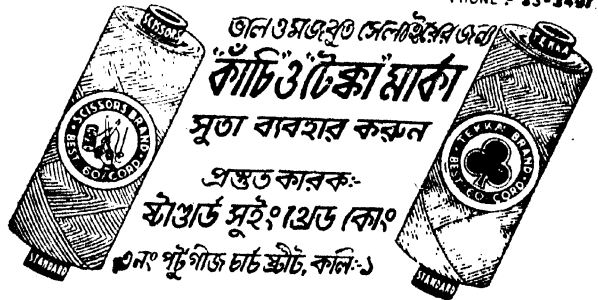
নেই যে তা সুব্রত জানে।

শিবু বলে, 'যাই বল একটা গোটা পরিবার অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক হয়ে গেল। একটা কমপ্লেক্স ঢুকে গেছে ওদের মধ্যে। কোথেকে—কার কোন একটু কথা হাসি কি তাকাবার ধরণ কি অন্য কোন ব্যবহারের ভিতর দিয়ে কোন নির্মম বিদ্রূপ, উপহাস, শ্লেষ, অপমান শেলের মত ছুটে আসবে, ওরা যেন সেই ভয়েই সব সময় অস্থির। ওদের দিকে ভয়ে আমি তাকাই না। ভয়টা সংক্রামক, কী বলো? ওদের এই ভয়, আমাকে মাঝে মাঝে বড্ড ভয় পাইয়ে দেয়।'

সুব্রত নিজেদের ড্রয়িংরুমে বসে গম্ভীর হয়ে শোনে, সিগারেট টানে বন্ধুর সিগারেট ধরিয়ে দেয়।

সিগারেটের ধোঁয়ায় শিবুর কবিত্বের উদ্রেক হয়, উপমা দিয়ে বলে, 'সারা বাড়িটা যেন এক শবাধার হয়ে রয়েছে।'

তারপর শিবুর বিশ্লেষণ আর খবর সরবরাহও একদিন থেমে যায়। ছুটিছাটার দিনে এসে সে অন্য কথা পাড়ে। ক্রিকেট, ফুটবল, সাহিত্য সিনেমা, রাজনীতি নানা বিষয়ে এই সবজান্তা বন্ধুটির উৎসাহ আছে। শুধু শিবুই নয়, রবিবারের সকালে আড্ডা দিতে আরো অনেকেই আসে। কেউ আর শ্যামলীদের কথা তোলে না। ওদের বাড়ির অত বড় মুখরোচক ঘটনা, ওদের অদ্ভুত জীবনযাত্রা সবই অতীতের, বহুকথিত জীর্ণ বস্তু। নতুন বিষয় আপনিই এসে পড়ে, পুরোন কাসুন্দি আপনিই চাপা পড়ে।

সবচেয়ে আশ্চর্য নিজেই সব ভুলে গেল। কবে কোন মেয়ের সঙ্গে তার ক'টি কথা হয়েছিল, কবে ভদ্রতা করে সে তাকে লিফট দিয়েছিল সে চিত্র চিরজীবন চোখের সামনে টানিয়ে রাখবার মত নয়। রাখতে চাইলেও রাখা যায় না।

তাই মা কাকীমা যখন বিয়ের জন্যে ফের পীড়াপীড়ি শুরু করলেন সুব্রত একসময় রাজী হয়ে গেল। নন্দিতাও স্বচ্ছন্দ ঘরের মেয়ে, দেখতে সুশ্রী, গ্রাজুয়েট। রবীন্দ্র-সংগীত জানে।

নিমন্ত্রণের চিঠি বিলি করবার সময় মা একবার বলেছিল 'আচ্ছা ওদের কি একখানা চিঠি—।'

সুব্রত মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ওদের মানে?'

মা আরো অস্পষ্টভাবে, আরো দ্বিধা-জড়িত গলায় বসেছিলেন, 'ওই ওদের কথা বলছি।'

সুব্রত ধমক দিয়ে বলেছিল, 'ছিঃ।'

তারপর কয়েকবার আর একটি মেয়ের কথা সুব্রতের মনে পড়েছিল। সম্বন্ধের কথা উঠবার পরেও একদিন বাস স্টপে শ্যামলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল সুব্রতের। সেদিন আর সে ভালো করে তাকাতে পারেনি, কথাও বলেনি, শুধু লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হেসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

ওর সঙ্গে সুব্রতের ওই শেষ শুভদৃষ্টি।

তারপর প্রায় বছরখানেক বাদে সুব্রত একদিন আবিষ্কার করল শ্যামলী তার সঙ্গে একই বাসে অফিসে যাচ্ছে। চেনা মেয়ে, পরিচিত মেয়ে। সহজ সৌজন্যে সুব্রত হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু সে হাসির বিনিময় তো মিললই না শ্যামলী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। নিজের বোকা বোকা সেই হাসিটুকু নিয়ে সুব্রত যে কী করবে ভেবে পেল না। প্রথমেই ভয় হল তার সেই নিরর্থক হাসি পাছে বাসের প্যাসেঞ্জারদের আর কেউ দেখে ফেলে থাকে। কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। সেই মূঢ় হাসিটুকু ঠোঁটের ওপর ভেসে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেছে। তারপর আর ওর দিকে তাকিয়ে কোনদিন হাসেনি সুব্রত। হাসবার সাহস পায়নি, এমন কি সরাসরি তাকাবার সাহসও আর নেই। কিসের একটা অপরাধবোধ তাকে ভিতরে ভিতরে দুর্বল করে দিয়েছে।

তবু চোখ দুটি সব সময় নিষেধ মানে না। আশ্চর্য নির্লজ্জতা। অপমানের ভয় নেই, সম্ভ্রম হারাবার ভয় নেই দুটি লজ্জাহীন চোখের।

একখানি বিমুখ মুখের দিকেও তারা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। তীব্রতায়, সংগ্রামে, সংঘাতে ও মুখ আরো এত সুন্দর হল কী করে?

শ্যামলী চাকরি করবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু এক দুর্ভেদ্য অদৃশ্য বর্ম নিজের চারদিকে এঁটে নিয়েছে। কারো কোন চোখের দৃষ্টিই আর ওকে গিয়ে বিঁধবে না। সে দৃষ্টি সহানুভূতিরই হোক, অনুকম্পারই হোক, করুণারই হোক, কামনারই হোক। সুব্রতের একমাত্র সান্ত্বনা ও শুধু তাকেই অস্বীকার করছে না, আশে-পাশের কাউকেই কোন কিছুকেই স্বীকৃতি দেবার ওর গরজ নেই।

দেখেশুনে সুব্রত ভাবে এই ক' বছরের মধ্যে কত বিচিত্র বিস্ময়কর বড় বড় ঘটনাই তো ঘটে গেল, এর পর ছোট একটু সামান্য কোন ঘটনা কি ঘটতে পারে না যাতে তাদের মধ্যে ফের সহজ প্রতিবেশীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেম নয়, ভালোবাসা নয়, এমন কি বন্ধুত্বও নয়। একই বাসে যেতে হলে দুটি পরিচিত নারী পুরুষের মধ্যে যে সাধারণ স্বীকৃতিটুকু দরকার, শুধু সেই-টুকু। যে মেয়ে জীবনযাত্রার সঙ্গিনী হতে পারত সারাটা পথ তার সঙ্গে একই বাসে গিয়েও সে সহযাত্রিণী হয় না। সুব্রত চেষ্টা করেও তা করতে পারে না। নিজের এই ব্যর্থতায় সুব্রত কোনদিন ওর ওপর রাগ করে, কোনদিন বা নিজের ওপর। পর মুহূর্তে এই নিষ্ফল অসহায় আক্রোশের জন্যে তার লজ্জাও হয়। কোনদিন বা সুব্রত ভাবে যখন ওর সিঁথিতেও সিঁদুর উঠবে, স্বচ্ছল সংসারে সুস্থ সুন্দর স্বামীর ভালোবাসায় ধন্য হবে, সন্তানের মা হবে তখন—হয়তো তখন এই উষর ধূসর মরুভূমি ফের তার সেই শ্যামলী হয়ে উঠলেও উঠতে পারে।
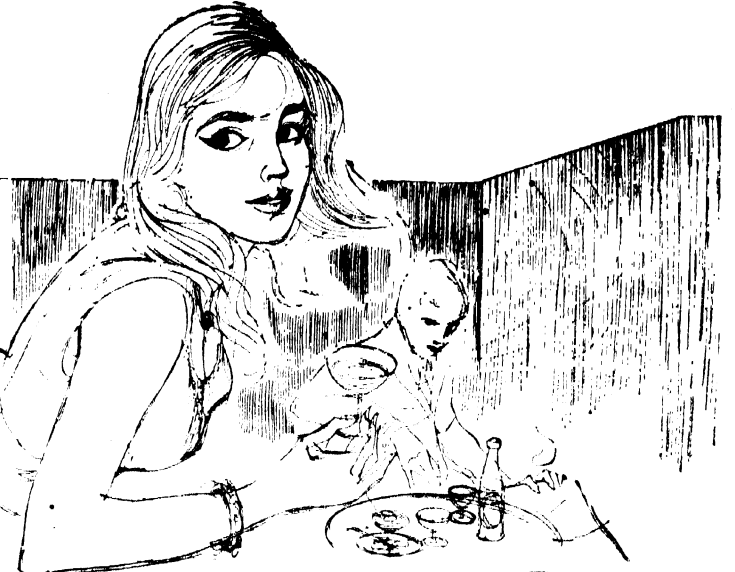
[এক]

ধরা যাক একটি লোক, যে কাজে কুশলী; লোকের চোখে তাদৃশ সৎ না হলেও সফল, ফলত সম্ভ্রান্ত। ধরা যাক......কিন্তু কোন গল্প এভাবে ধরা যায় কিনা সন্দেহ। বারাণসীধামে ব্রহ্মদত্ত নাম রাজা ছিলেন, কিংবা গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু ছিল— গল্পে গণেশ পুজোর এই রীতি একালে অচল।

তবু চেষ্টা করে দেখা যাক। ধরেছি যখন, খানিকটা তো এগিয়ে যাই।

ধরা যাক, এই লোকটি, যাকে এখন অনায়াসে বয়স্ক বলা চলে, ঘোর না হলেও সংসারী। একটি পরিবারের সে কর্তা, পুত্রার্থে দারপরিগ্রহ তার ব্যর্থ হয়নি। কর্মক্ষেত্রে সে মোটামুটি কৃতিত্ব অর্জন করেছিল প্রধানত পরিশ্রমের গুণে, দ্বিতীয়ত কপালের। হিতৈষী বন্ধুরা তৈল নামে তৃতীয় একটি পদার্থও যোগ করত।

এই লোকটি, বয়সের ভারে যে ভারিক্কী এবং গাল-গলার খাঁজে-ভাঁজে এখন দস্তুর মত গম্ভীর, যদি সেকালের হত, তার ভাবনা ছিল না।

তার বিষয় হত, আশয় হত; আইনত মতলব হাসিল করার জন্যে উকিল, বেআইনী বিনিয়োগের জন্য নীরোগ রক্ষিতা, আর ঘন করে জ্বাল দেবার উপযুক্ত দুধ সরবরাহের জন্য গোহালে অমায়িক গরু বাঁধা থাকত। ঐহিক সুখ-সামর্থ্যের নিমিত্ত সে নিয়মিত কবিরাজী বটিকা, সালসা ইত্যাদি সেবন করত, সেই সঙ্গে পারত্রিক শান্তির জন্য সদ্‌গুরুর সন্ধানও করে যেত। আরও পরিণত কালে সে নিশ্চয়ই পুকুর কাটাত, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করত, জলসত্র ইত্যাদি স্থাপনেও পরাঙমুখ হত না। অর্থাৎ কী পরিমাণ পুণ্যকীর্তি সে রেখে যাবে তা নির্ভর করত পাপপথে সে কত উপায় করেছে তার উপর। অবশেষে তার সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হলে তার শ্রাদ্ধাধিকারী যথারীতি তার নামে একটি বৃষ উৎসর্গ করে দিত; উচ্ছিষ্ট-উদ্বৃত্ত সম্পত্তির দখল নিত।

যদি আমাদের নায়ক একালের হত, কিন্তু শতকরা নিরানব্বুইজনের একজন, তবে সে নির্দিষ্ট সময়ে রিটায়ার করত, প্রভিডেণ্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি এবং যথাসময়ে মেচিওর হওয়া ইনসুরেন্সের টাকায় শহরতলীতে কিস্তি-বন্দী সুবিধায় জমি কিনত। নতুন বাড়ির একাংশে নিজে বাস করে অপর অংশে ভাড়াটে বসাত। ইতিমধ্যে ছেলেকে সে নিজের অফিসে ঢুকিয়েছে। সেই মাইনেয় এবং ভাড়ার টাকার যোগফলে আশ্বস্ত সে স্বচ্ছন্দে ধর্মকর্মে মতি দিতে পারত। কথকতা শ্রবণে এবং কনসেশন-রেটের সুযোগে তীর্থদর্শনেও বাধা হত না।

কিন্তু

ধরা যাক, আমাদের নায়ক নাগরিক, শতকরা নিরেনব্বুইয়ের ছক্-বহির্ভূত। আপাত-বিচারে সেও তৃপ্ত এবং সম্পূর্ণ এবং আপন মহলের অধীশ্বর। সে সর্ব-বিষয়ে আঁটসাট, ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী, কর্তব্য-পরায়ণ, এর প্রীতি ওর ভীতির পাত্র, সুতরাং স্বাভাবিক।

তবু তার নিজের স্বভাব তার নিজেরই অজানা থাকতে পারে। বেয়াড়া ঘোড়ার মত মাঝে মাঝে বিগড়ে গিয়েও বিবেক নামক চাবুকটিকে সে ডরাতে পারে। সদসৎ জ্ঞান তার টনটনে, অথচ সে প্রায়শ যা করে, করে থাকে, তা গর্হিত। অন্যে যখন তার সম্পর্কে অনায়াসে রায় দেয়, সে একান্তে হাসে। ঝানু কৌঁশুলির মত নিজেকে জেরায় জেরায় জেরবার করেও স্বরূপ সম্পর্কে সে যে সদুত্তর পায়নি।

এমন অবশ্যই হতে পারে, কোথাও একটা বল্টু তার আলগা আছে। এমন কোন স্নায়বিক ধারণা, যে ঘর তারই রচনা, সেই ঘরেরই দেয়াল-চাপা পড়ে তার মৃত্যু হবে? তার কামনা, ঘর থাকুক, কিন্তু তার দেয়াল আসলে পর্দা হক না!

"আমি অভ্যাসকে মনে করি শয়তান, মনুষ্যত্বনাশী। তাই, থেকে থেকে বিদ্রোহ করি।"

"আমি ইচ্ছাকে আমার ঈশ্বর করেছি।"

এই দ্বিবিধ মন্ত্রজপ করেও ঈপ্সিত শান্তি সে নাও পেতে পারে এবং মৃগয়ায় হতাশ হয়ে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হত (১) শান্তি যখন অলভ্য তখন সুখকেই সার করি না কেন। (২) শান্তিই প্রার্থনা-শেষের 'আমেন' কিনা, তাই বা কে জানে।

এই দার্শনিক মীমাংসায় উপনীত হয়েও যাতনা কিন্তু যেত না। কারণ তার্কিক বিচারের ক্লান্তি বড় জোর সাময়িক সান্ত্বনা আনে।

[দুই]

এই দিনটি তার জীবনের একটি নমুনা-মাত্র, ফুটন্ত হাঁড়ির একটি চাল।

"কত জ্বর?" তখনও সে বিছানা ছেড়ে ওঠেনি, উবে-যাওয়া ঘুমের তলানির মত পিচুটির ফোঁটা রগড়ে রগড়ে মুছে দিয়ে দৃষ্টিকে স্বচ্ছতর করেছে। কোমরের কাছে লুঙ্গির কষিটাকে কান মুচড়ে হুঁশিয়ার করেছে। কাত হয়ে পাশবালিশটাকে আরও আপন করে নিয়েছে।

শুয়ে শুয়েই সে সব দেখছিল, মাথা তোলার পরিশ্রম না করে শুধু চোখ ঘুরিয়ে যতটা দেখা যায়। হাই তুলতে তুলতে। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে। সীমা কখন উঠে গেছে সে টের পায়নি, কিন্তু এখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। পিঠের ওপর চুল ঢালা, এয়োতির বিজ্ঞাপন টিপটা মস্ত করে পরা। চোখের চাউনিতে তেমন বিস্ফারিত রহস্য এখন অবশ্য নেই, সুর্মাটুর্মা এখনও ছুঁইয়ে উঠতে সময় পায়নি। কিন্তু শাড়ি নিশ্চয় বদলে এসেছে, রাতকাপড়টা পরনে থাকলে গোড়ালির কাছ থেকে পিঠের আঁচল অবধি ভাঁজ ভাঁজ দাগ থাকত।

পাখা শেষ রাত্রি থেকেই বন্ধ, তবু অল্প অল্প আলোর ফুর্তি-লাগা হাওয়া ঘরে ঢুকছিল, দেয়ালের ক্যালেন্ডার থেকে স্ট্যান্ডের ফটো ইত্যাদি যেসব দৃশ্য স্থির এবং বিশ্বস্ত, তাদের অস্পষ্ট আর অনিশ্চিত করে দিচ্ছিল। খালি তেপায়ার ওপর রাখা ফুলগুলোয় এরই মধ্যে বাসী-বাসী ছোপ লাগল কেন, নিরন্তর নিকোটিন-শোঁকা আঙুলের মত কেমন হলদেটে, ফুল-গুলি আর একটু টাটকা আর তাজা থাকত যদি তা-হলে এই আলো-হাওয়ায় বুঁদ সকাল, পিঠে-ঢালা চুল, টিপ ইত্যাদি সমেত সাধ্বী বধূ, বাদামী কাঠের খাটে বিস্তারিত বিছানার আলস্য—এই সব মিলেএকটি শুদ্ধ মধুর গার্হস্থ্য চিত্র সম্পূর্ণ হত।

"কত জ্বর?" সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, এবং অনুভব করল গলা যথোচিত তীক্ষ্ণ হল না। ভোরবেলার বসা-বসা গলায় ঠিক ঔৎসুক্য ফোটে না।

জ্বর কিনা, কিংবা জ্বর কার—না বলে সে কিন্তু বলল, কত জ্বর। অর্থাৎ জিজ্ঞাসার দুটো ধাপ চুরি করল। তার কারণ, সে দেখতে পেয়েছিল, সীমা আলোর দিকে মুখ রেখে থার্মোমিটারটা অপলক চোখে পরীক্ষা করছে! সুতরাং ঘটনাটা জ্বর অবশ্যই, এবং কার এ প্রশ্নও অনাবশ্যক।

নিশ্চয়ই খোকার। ওই ছোট খাটে সেই শোয়।

"কত জ্বর?"

"একশো এক, পয়েন্ট..."

সদরে এক ঘড়ঘড়ে গাড়ির চাকার তলায় চাপা পড়ল বাকী শব্দ কয়টি, সেই লোকটি, এক্ষুনি যে কুঁড়েমির কয়েদী হয়ে আস্তে-আস্তে নাড়ানো পায়ের বুড়ো আঙুলে প্রাণের প্রমাণ দেখাচ্ছিল, সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

"দেখি, আমাকে দাও" বলে থার্মোমিটারটা এক রকম ছিনিয়ে নিল সে, ভুরু কুঁচকে জ্বরের দাগ দেখল ফেরত দিল হাত রাখল ছেলের কপালে রগ যেখানে তিরতির করে সেখানে আঙুল রাখল ক্লিষ্ট চিন্তিত মুখে তাকাল স্ত্রীর দিকে।

"কখন থেকে?"

"কী জানি, বোধহয় শেষ রাত। মাঝে মাঝে কঁকিয়ে উঠছিল, একবার জল চাইল, তখনই তো আমি টের পেলাম। উঠে দেখি, গা খুব গরম। পাখাটা বন্ধ করে দিলাম। সারারাত চলছিল, আজকাল আবার ভোরের দিকে হিম পড়ে।"

"একটুও টের পাইনি তো!"

"কী করে পাবে। সারারাত তো বেহুঁস হয়ে ছিলে?"

হয়ত নিছক বিবৃতি, অভিযোগ নয়। তবু কড়ায়ে তেল পড়ে মাছ ছাঁৎ করে উঠতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়বে, কাল গভীর রাত অবধি ক্লাব গেছে, ককটেল গেছে। সে বেহুঁস হয়ে না ঘুমোলে খোকার জ্বর হত না, যুক্তির দিক থেকে কথাটা যদিচ অবিশ্বাস্য তবু সে অস্থির হয়ে বলে উঠল—"আমি যাই, ডাক্তারের ওখানে যাই।"

"আরে না-না ওসব কিছু না।" ছুঁচে ওষুধ ভরতে ভরতে ডাক্তারবাবু অভয় দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি চটপট সব কাজ সেরেছেন। বুকে আঙুল ঠোকা, নল-ঠেকানো, পেট ফাঁপা কিনা পরখ করা। প্রথমে খোকাকে হাসালেন একটু সুড়সুড়ি দিয়ে। সুতরাং জিভ দেখতেও বেগ পেতে হল না। আলজিব দেখলেন চামচ দিয়ে। দেখি, দেখি! বা-বা, চমৎকার। লক্ষ্মী ছেলে। একটা ইঞ্জেকশন দেব শুধু। ছোট্ট একটা পিঁপড়ের কামড়। চোখ বুঁজে থাক, টেরও পাবে না। ব্যস, এই তো।

খোকা চীৎকার করে উঠল, একবারই। ডাক্তার তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে স্বর্গীয় হাসি স্প্রে করছিলেন। খোকা ওর মার কোলে মুখ লুকোলো।

সে সেই থেকে এক দৃষ্টে দেখছিল ডাক্তারকে, যিনি ততক্ষণ ব্যাগটায় সব সরঞ্জাম চটপট ভরে ফেলেছেন। হাত ধুয়েছেন বেসিনে। ভিজিটের টাকা আর ওষুধের দাম হাত পেতে নিলেন বটে, কিন্তু গুনলেন না, অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে আড়চোখে তাকিয়ে অথবা শুধুই আঙুলের অনুভবে বুঝতে পারলেন, কত। ডাক্তাররা এ-সব পারেন। নাড়ি ধরে যাঁরা জ্বর কত বোঝেন, তাঁরা স্রেফ ছুঁয়েই টাকার অঙ্ক টের পান।

'না-না। ও-সব কিছু না। নিউমোনিয়া-টিউমোনিয়া কী বলছেন যা-তা সব, ব্রঙ্কাইটিসও না। টাইফয়েডে টার্ন নিতে পারে? আরে দূর দূর, আপনাদের মাথা খারাপ হয়েছে, ভারী ভিতু আর নার্ভাস তো মশাই আপনি, কী করে একটা অফিস চালান? টাইফয়েডের ভয় থাকলে তো রক্ত নিতাম। পেট-টেট সব ঠিক আছে, বুকে সর্দি বসেছে একটু, ইঞ্জেকশন দিলাম, ঠিক হয়ে যাবে। তবে সাবধানে রাখবেন, আর ঠান্ডা যেন না লাগে।'

স্পীচ? মুখস্থ পার্ট? বোধহয় না। সফল স-পসার ডাক্তারদের ও-সব দরকার হয় না। এ নৈপুণ্য ও'দের সহজাত, অন্তত আয়ত্ত বিদ্যার অন্তর্গত।

ব্যাগটা ডাক্তারবাবুর গাড়িতে তুলে দিয়ে সে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ফের উঠে এল, জড়োসড়ো ভাব কেটে গেছে, শরীর অনেক হালকা।

ঘরে ঢুকেই অনেকখানি তাজা রোদ তার চোখে পড়ল। ভিজে ভোরের পর এখন সকাল, সেই সকালটা আলোর যাদুতে কখন সোনা হয়ে গেছে, জ্বলছে কাচের জলের-জার-এ, হাত ডুবিয়ে দিলে তার রঙ লেগে যাবে কবজি অবধি। আরও যত পাত্র আছে এ-ঘরে, সব ভরে আছে, মুঠো মুঠো রোদ ইচ্ছে হলে তুলে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ নেওয়া যায়।

খোকাও ঘুমন্ত। একটা জানালার পর্দা টেনে দিল সে, আর একটার টানল না। ওটা খোলা থাক। যে রোদ এই ঘরে সাহস নিয়ে এসেছে, তাকে একেবারে বরবাদ করতে তার ইচ্ছে হল না।

নির্ভয়, নির্ভার সে স্ত্রীর দিকে আজ এই প্রথম সোজাসুজি তাকাতে পারল। সহাস্যে বলল, "আজ সকাল থেকে এক ফোঁটা চাও পেটে পড়েনি, খেয়াল আছে?"

সীমা, অপ্রতিভ, বলল, "দিচ্ছি।"

সেই প্রয়োজন আর দৈনন্দিনতা ফিরে এল একে একে। যেগুলো আজ সকাল থেকে ধোবাবাড়ি যাবে বলে বাঁধা কাপড়ের পুঁটলির মত এক কোণে জবুথবু হয়ে ছিল। তারা মাথা চাড়া দিল। বাথরুম, মুখ ধোয়া, দাড়ি কামানো।

"দেখি, দেখি।" সীমা উঠে এল। পট করে টেনে তুলল একটি পাকা চুল।

সীমা তাকে নতুন করে দেয়, তরুণ করে রাখে। কৃতজ্ঞতার অ্যাসিডে পরিশুদ্ধ সে বাইরে পা বাড়াল। অফিসে লাঞ্চ খাবে।

"ওষুধ আনিয়ে নিয়েছ?"

"পরেশ আনতে গেছে।"

"টেম্পারেচার নিতে ভুলো না।"

"বেশি দেরি কোর না।"

"না। দুপুরে একবার টেলিফোনেও খোকার খবর নেব।"

সকালের রোদ, এখন আরও তাজা-মাজা ঝকঝকে, ওর ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডলের প্রতিটি রোমকূপ স্পর্শ করল। দেহে, সুতরাং মনেও, হর্ষ আনল। এবং

স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে উইন্ডস্ক্রীনের ওপার স্পষ্ট দেখতে পেয়ে সে নিশ্চিন্ত জানল, তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে। তার স্বগত : "কিছুই যায় না, মাঝে মাঝে ঝাপসা হয় মাত্র। নপুংসক ভোরের প্রভাবে সব কিমাকার দেখি। অবাস্তব ভয়ে আক্রান্ত হই।"

দরোয়ান টানটান সেলাম করল, লিফটম্যান দরজা খুলে দিল। জ্যামিতিক করিডরে একের পর এক সসম্ভ্রম মুখ, একটু হাসি বিলানো, একটু বা ঘাড় ঝলানো। দুষ্কৃত-কারীর গুলির মুখে রাস্তা আপনা থেকেই সাফ হয়ে যাচ্ছে, এ তুলনা এখানে খাটবে না।

খাসকামরা। শশব্যস্ত বেয়ারা ছুটে এসে পাখা খুলে দিল। যথারীতি, যথোচিত। এক গ্লাস জল এনে ঢাকা দিল। নিয়মমত।

তারপর ফাইল এবং সই এবং ফাইল এবং সই। আর টেলিফোন..."স্পীকিং!... হ্যালো, ইজ দ্যাট..."

বিজলী-ঘন্টিতে ঈষৎ চাপ।—"মিস স্মিথকো সেলাম দো।"

স্টেনো। সম্ভবত তরুণী, কিন্তু স্টেনোর বয়স লক্ষ্য করতে নেই। টেক ডাউন, প্লীজ—চিঠি।

ডিয়ার স্যর, ইয়োর লেটার নাম্বার... ডেটেড...

সে যখন থামছে এবং ভাবছে,আর মিস স্মিথ পেনসিল কামড়াচ্ছে, চেয়ে আছে তখন সে সহসা সচেতন হল। পাকা চুল টুল নিশ্চয় চিকচিক করছে না? নেই, যেটা ছিল সেটা উৎপাটিত। সীমার দূরদর্শিতা প্রশংসাযোগ্য। এত যত্ন যার, আমি মরলে আমাকে সে কি ম্যমি করে রাখবে? "মমির মত চিরন্তন"—সে মনে মনে এই বাক্যটি গঠন করল, একটু ধ্বনির ঢেউ উঠল বলে হৃষ্ট হল।

"লিখে দাও, উই আর এগ্রিয়েবল..."

ক্রিং ক্রিং।

"হ্যালো! না, না ভাই। ক্রিকেটের টিকেট এবার একটাও নেই। ইয়েস, টেক্ ডাউন, উই আর এগ্রিয়েবল বাট অ্যাফ্রেইড ইয়োর টার্মস উড নীড..."

ভিজিটিং স্লিপ।

না, দেখা হবে না। বলে দাও এখন ব্যস্ত। ফ্রাইটফুলি। আস্ক হিম টু কল লেটার...হ্যালো ইজ দ্যাট য়ু, রয় এগেন? করনপুরা কত বললে? আর শোন ভ্যালী? ঠিক আছে। আর কোন্‌টা? শোন। ইফ আই ওয়্যার য়ু...আমি নিতুম না। দেয়ার্স নাথিং ইন দোজ স্ক্রিপস। আই নো, আই নো, ডোন্ট টেল্ মী...

দরজার ওপর টোকা। কাম ইন প্লীজ। ও, সিদ্ধেশ্বর বাবু। হ্যাঁ, আপনাকে ডেকেছিলাম। এই স্টেটমেণ্টটা আপনার নয়? দেখুন তো এটা কাল টাইপ হবে, পরশু পেশ হবে......ডিস্‌গ্রেসফুল।

"স্যার, আই অ্যাম সরি।

"ইউ শাড বী।"।

সিদ্ধেশ্বর মাথা নীচু করে চলে যাচ্ছে। সে আড়চোখে দেখে হৃষ্ট হল। ও তার কঠিন মুখটাই দেখতে পেয়েছে। বাইরে গিয়ে কপালের ঘাম মুছবে। শালাও বলবে নাকি? বলতে পারে, তবে নিতান্তই নিজের কানেকানে।

অ্যাসট্রে আর একটি অর্ধপীত সিগারেটের আশ্রয় হল। ভাগাড়। হাড়গোড় গুণে বলে দিতে পারা যায়, এ পর্যন্ত ক'টা খেলাম। সিগারেটের সংখ্যা দিয়ে সময়ের পরিমাপ। দশ মিনিট পিছু একটা। দশ? না, বোধহয় পনেরো মিনিট।

পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে সে কেস-এ যত সিগারেট ধরে তত আনতে ফরমাস করল। চেঞ্জ ছুঁলো না। সবটাই বখশিস। বশংবদ বেয়ারার হাত কাঁপছে। মুঠিতে চেঞ্জ ভরা, তাই সেলাম ঠুকতেও পারছে না।

সিদ্ধেশ্বরও একটু আগে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গিয়েছিল। বেয়ারাও গেল। কিন্তু এ তার দক্ষিণ মুখ দেখতে পেয়েছে। রুদ্র যত্তে......

আসলে সে একটা কাটাকুটির অঙ্ক কষল, সে জানত। খয়রাতির ছোট্ট ইরেজারটা দিয়ে মূর্ত স্বরূপের কুকীর্তি ঘষে ঘষে মুছে ফেলা।

এর পর দুধে বিলক্ষণ জল আছে বুঝতে পেরেও সে যখন একটা টি-এ বিল পাস করে দিল, তখনই তার অবচেতনে যুদ্ধ-বিরতি।

আবার ভিজিটিং স্লিপ। সে তবু তাকিয়ে দেখল, কার্ড, না স্লিপ। চিরকুটমাত্র। না, দেখা হবেনা।

আশ্চর্য, আর একটা লোক এরই ফাঁকে ঢুকে গেছে। ও হ্যাঁ, চক্রবর্তী। সাসপেন্ডেড এমপ্লয়ী। কেসটা পেনডিং।

"বলেছিতো, বড় সাহেবের কাছে যান।"

"আর কোন সাহেব চিনি না স্যার... আপনি ইচ্ছে করলেই—"

একেবারে বিশুদ্ধ, ঘ্যানিতে প্রস্তুত বস্তু। শুধু 'আগ্'-মার্কাটা আছে কিনা দেখে নেবার উপায় নেই।

ইনটারনাল সিসটেম-এর টেলিফোনটা ভোমরার মত গলায় বেজে উঠল। বড় সাহেবের ডাক এসেছে। টেলিফোন; টেলিভিসন নয়, বড় সাহেব তাকে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, তবু মুখভঙ্গিকে সে দ্রুত মেরামত করে সব অবিনয় মুছে ফেলল। নতুন মেক-আপ। সামনে দেয়াল জোড়া আয়না থাকলে নিশ্চয় অন্য লোকের ছায়া পড়ত।

"ইয়েস স্যর, ইন-আ মিনিট স্যর।"

এই স্টেজ-এ যে আমীর, ও ঘরের স্টেজএ তারই বান্দার পার্ট। বহুরূপী ভোল-বদল করবে বইকি।

ছোট পার্ট, সুতরাং সময় বেশি নিল না। একটু পরেই সে করিডর দিয়ে ফিরছিল শিস দিতে দিতে। উৎফুল্ল বালকের প্রায় সে ভাবছিল, "আমি তবু ভাগ্যবান। 'আগ'-মার্কা বস্তু আমারও লাগে, কিন্তু কিনতে হয় না। এ-ঘরে বসে যা পাই, তারই খানিক ও-ঘরে গিয়ে ঢেলে দিয়ে আসি।"

ইতিমধ্যে টেবিলে রেসের বই এসেছিল। টাই ঢিলে করে, পাখা আরও জোরে চালাতে বলে এবং জলের গ্লাস আধখানা খালি করে সে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল। প্রথম বাজি কোন্ ঘোড়ার। ট্রিপল টোটের সেকেন্ড লেগ কোন্‌টা, পুল-এ যদি খেলা যায়! কিন্তু চ্যাটার্জি, চাকলাদার, আহুজো ওরা যে আজ খবর দিল না। দেখি, দেখি, সেরা ইভেণ্টটা দেখি। "ডার্ক থান্ডার" হট ফেভরিট। ইভন মনি, খেলে সুখ নেই। বাকী এই তিনটেই দেখছি সমান। কাকে ফেলে কাকে রাখি। স্বয়ংবরা কন্যাদের জ্বালা এর চেয়ে বেশি ছিল নাকি!

"জানি, তোমাকে ধরা যাবে" সাবিত্রী বলছিল লাঞ্চ আওয়ারে। এখানেই।

সে বলল, "আস্তে। সবাই শুনছে।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চেয়েছিল। সাবিত্রী হাঁপাচ্ছিল। রক্তমুখী, বোধহয় রোদ্রে অনেকটা পথ হেঁটেছে।

সে বলল, "কী খাবে।"

"যা খাওয়াও। তবে বেশি কিছু বোলো না যেন।

সুতরাং সে বেশি কিছুরই অর্ডার দিল। একজন সঙ্গী পাওয়া গেল বলে সে খুশীই হয়েছিল।

"কোথায় যাবে এর পরে? অফিস?"

"না। আজ হাফ-ডে। তুমি?"

"কাজ তো ছিল। দুটো পার্টির সঙ্গে দেখা হবার কথা আছে।"

"ও" সে নীরবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার যতরকম কসরত করা যায় করে গেল। এও টের পাচ্ছিল, লাভ নেই। এর প্রত্যেকটা কসরত সাবিত্রী আগে দেখেছে। নতুন কোন কসরত বার করতে হবে।

থুথু ফেলবে বলে সে উঠে গেল। এই জানালার ঠিক নীচেই সদর রাস্তা। সে ফিরে এসে বলল, "নীল বাসগুলো অভ্যাস হয়ে গেছে, কিন্তু লাল বাস দেখলে এখনও এখনও কেমন চনচন করে। টকটকে বলেই ওদের আরও তাজা টগবগে লাগে।"

কথাগুলো তার অনুভূতি থেকে এল, না সাবিত্রীকে নতুন ধরনের কথা শোনাবে বলে?

"চলো না, তবে লাল বাসেই চড়ি। দোতলায় উঠে খানিক ঘুরে বেড়াই।"

"তোমার তো কাজ আছে।"

"তুমি যদি বল, তা হলে আর যাই না।" মাথা নীচু করে সাবিত্রী ওর ব্যাগের ভিতরে কী খুঁজছিল।
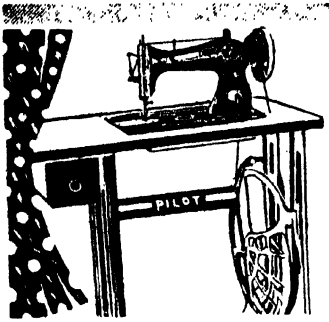
"আজ থাক। আমারও কাজ আছে। জরুরী।" বলে সে হাই তুলল। মিথ্যে কথা বলে তার অনুশোচনা হচ্ছিল। সাবিত্রী এত গোগ্রাসে না খেলেই পারত। বুঝিয়ে দিচ্ছে, ও খেটে খায়।

"তোমাদের মোটর ইনস্যুরেন্স-এর কাজ কেমন চলছে।"

"চলছে কই আর, মোটরই নেই। গবর্ণমেণ্টের ইমপোর্ট পলিসি—"

অসহ্য। মুখ খুলে খেলো রাজনীতির চেয়ে মুখ বুজে খেয়ে যাচ্ছিল, সেই ছিল ভাল।

খাচ্ছ, খেয়ে যাও। তোমার চুল উড়ুক, আমি দেখি। আঁচল খসে খসে পড়ুক, আমি নড়ে-চড়ে বসি। ঘেরা খুপরিতে এক সঙ্গে খেতে ভালই লাগল। তার দাম আমি দিতে রাজী আছি। বস্তুত ইতস্তত চেয়ে, গোয়েন্দার নজর নেই জেনে নিশ্চিত হয়ে বড় জোর এখানে তোমার হাতের ওপর হাত রাখতে পারি। সেজন্যে বাড়তি একটা কোর্স চাও, পাবে। বিলের টাকা আগাম চুকিয়ে আমি বরং উঠে যেতে পারলে বাঁচি।

ঈদৃশ ভাবনা যখন তার মনে তখনও সে পা চালান দিয়ে আর এক জোড়া পা খুঁজছিল। এবং অবশেষে সে যখন সাবিত্রীকে অফিসপাড়ায় ছেড়ে দিল, তখন সাবিত্রী খুব নরম গলায় বলল, "আজ তো হল না। আসছে শনিবার তবে। মনে থাকে যেন।"

সে প্রগাঢ় কণ্ঠে বলল, "থাকবে।" সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির বাইরে বাঁ হাত বাড়িয়ে সাবিত্রীকে "সো লং" বলে, ট্রাফিক সিপাইয়ের উদ্দেশে বাড়িয়ে দিল ডান হাত।

[তিন]

ললিতা বলল, "সত্যিই ভাল লাগল তো, নাকি আপনি বাড়িয়ে বলছেন।"

সেতারের শেষ ঝঙ্কার তখনও তার কানে বাজছিল। সে শুধু বলতে পারল, "সত্যিই আপনার হাত এমন চমৎকার।"

ললিতা হাতের উপর আঁচল টেনে দিল। সাদা খোলের শাড়ি, গাঢ় খয়েরি পাড়। কতক্ষণ সে তন্ময় হয়ে রইল। ফুলদানী থেকে ফুল তুলে নিল আবার রাখল, শেষে হাত দুটিকে পাপড়ির মত মেলে সেখানে চোখ রাখল।

দরজার নীল পর্দায় ঘরের রঙ এখন মলিন একটু একটু জোলো হাওয়ার ভিতরটা ভারী-ভারী। যেন এখানে আসবে সে জানত, তার সমস্ত সকাল আর দুপুর এই বিকেলের প্রস্তুতি। "এই ললিতা কাকে ভালবাসে? আমাকে তো না। আমি ভালবাসি কাকে? ললিতাকে তো না। তবু এই বিকেলটা ও আমার জন্যে রেখে দেয়, ভরে দেয়।"

"চলুন বাগানে যাবেন?"

খালি পায়ে ভিজে ঘাস ছপছপ করছিল কিন্তু ওর পায়ে কড়া-গোড়ালি জুতো। নরম মাটিতে গভীর দাগ বসছিল। সন্ধ্যায় ঈষৎ হলদে দেখতে একটা ফুল ললিতা চুলে পরল।

আর না, সে ভাবল, আমি এবার যাই। এই পর্যন্তই সব আলাদা, এর পর অন্ধকার সব ঢেকে দেবে। অন্ধকারে সব একাকার। চুরি করা এই বিকেলটা বিকেল হয়েই জমা থাক। একে আমি সকালের অবসাদ, দুপুরের কর্তব্য আর রাত্রির কালি দিয়ে লেপে দিতে চাই না।

"এবার কোথায় যাই", ময়দানের মাঝখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সে ভাবছিল। এবং চাকলাদাররা তাকে ওখানেই বন্দী করল। ফস করে হেডলাইট জ্বলে উঠল ওদের গাড়ির, ঠিক-ঠিক সনাক্ত করতেও পারল।

"কী হে, আজ রেসে যাওনি, এখানে লুকিয়ে রয়েছ?"

সে কী একটা জবাবদিহি করল, ওরা, শুনল না, হো-হো রবে উল্লাস অনর্গল করে দিল।

"ডিপ্রেসড? চল চল, শেরীতে।"

এত সহজে চাঙ্গা হবে সে ভাবেনি। মৃদু বাজনা তীব্র আলো তার ঝিমোনো কোষগুলিকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উদ্দীপ্ত করে তুলছিল। স্তম্ভিত হয়ে সে ক্ষণপরে টের পেল, মিস মাধুরী নামে যে মেয়েটা পরিচিত কাউকে খোঁজার অছিলায় একটু আগে ঢুকেছিল, সে কখন তার আর আহুজার মাঝখানে বসে পড়েছে। ও এমন প্রায়ই আসে, বসে, মাগনা মদ যে মিলিয়ে দেবে, সেই মক্কেলের লোভে।

সে ভেবে দেখল, তবু তো মন্দ লাগছে না। তার সাময়িক উত্তেজনার উৎস এই মেয়েটির নাতিপ্রচ্ছন্ন মাংসে, কিছু বা ফুসকুড়ির মত ছোটছোট বুড়বুড়ি তোলা গ্লাসে।

একটু পরে দেখল, অল্প-অল্প কাঁপা হাতে মেয়েটির ঠোঁটের কিনারায় তার নিজের গ্লাস তুলে দিচ্ছে। প্রতিদানে মিস মাধুরী একটি সিগারেট ধরিয়ে, একটি টান দিয়ে, তার ঠোঁটে গুঁজে দিল। একটু ভিজে সিগারেট, ডগায় লালচে ছোপ, কিন্তু টানতে মন্দ লাগল না।

চাকলদার বলল, "কী ব্রাদার, মুডী কেন। গ্লানি হচ্ছে?"

"গ্লানি?" সে বলল, "না।" স্বচ্ছপ্রায় গ্লাসের তলা অবধি তাকিয়ে সে কোথাও গ্লানির লেশমাত্র দেখতে পায়নি।

তবু সে উঠে দাঁড়াল। টলতে টলতে গেল টয়লেটে। এবং ফেরবার পথে করিডরের শেষ প্রান্তে টেলিফোন চোখে পড়তে যেন চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়িয়ে দিল হাত, নির্ভুল ডায়াল করে যন্ত্রটায় মুখ রেখে বলতে থাকল, "হ্যালো...ফোর সিক্স...? খোকা—খোকা কেমন আছে? ভাল? আঃ—" অব্যয়টি উৎসারিত হল তার অন্তস্তল থেকে।—"কী করছে এখন খোকা? ঘুমিয়ে পড়েছে? পড়েনি, এখনও জেগে আছে? তা-হলে ওকে আর-একটুখন জেগে থাকতে বলো না! আসছি, আমি এখুনি আসছি।"

টয়লেট-এ গিয়ে তলপেট, এবং টেলিফোন করে বিবেক, হালকা করে সুস্থির সে টেবিলে ফিরে এল। এসেই ব্যস্তভাবে ব্রীফ্-কেস্ গুছিয়ে নিয়ে হতবাক্ সঙ্গীদের হতাশ করে বলল, "গুড্ নাইট্!"

বন্ধুরা বলল, "সেকী! হ্যাভ্ 'নাদার, ওল্ বয়! ইয়োর লাস্ট।"

সে অস্থির গলায় বলে উঠল, "নো-নো-নো।" তরতর করে সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

গাড়িতে সে কেবলই স্পীড্ দিতে চাইছিল। সারাদিন যার ঘুরে গেছে লাট্টুর মত, সেই লোকটাও কিনা খোকা জেগে আছে শুনেই, তার নরম হাত-পা চটকানোর, আধো-আধো কথা শোনার লোভেই অস্থির হল!

[গল্প নয়, একটি চরিত্রই মাত্র হাজির করা গেল, এবং তার একটি দিন। লোকটি, সকালে সে উচাটন, দুপুরে কর্তব্যপরায়ণ, সন্ধ্যায় উন্মন। যার যা প্রাপ্য, তাকে সে তা দিয়েছে। তার অফিসকে কাজ। প্রণয়িনীকে লাঞ্চ। সংসারকে উৎকণ্ঠা। সাম্য-রক্ষার আশ্চর্য নৈপুণ্যে অবশ্যই সে আধুনিক।

তবু আত্মবিশ্লেষণে নিমগ্ন মুহূর্তে জোচ্চুরিকে সে ভারসাম্য বলছে কিনা এ-প্রশ্ন তার মনে উদয় হতে পারে। সেকালের কৃতী পুরুষ শুধু তার বাড়িকেই ফাঁকি দিত, সে ঠকাতে শিখেছে প্রণয়িনীকেও, তার আধুনিকতা তো এই? শেষ পর্যন্ত সে সাব্যস্ত করবে, তার পূর্ব পুরুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় কেন্দ্রবিন্দু থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতেন, সে বাঁধা পড়ে আছে, তফাত এইটুকু। পার্থক্যের মূলে কি তার বিবেক? তাও না। খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে এতদূর যে পেঁৗছেছে, সেই লোকটি অবশ্যই টের পাবে, আসলে তার সাহস নেই, লোক-নিন্দাকেই সে ভয় করে। কাপুরুষতাকে বিবেক নাম দিয়ে বেদীতে বসিয়েছে, একথা আবিষ্কার করা মাত্র লোকটি নিঃসম্বল আকুল হবে। শেষ মুহূর্তে টেলিফোনই বা করল কেন? তার কুকীর্তিতে খোকার কিছু হতে পারে, এই ভয়ে? পাপবোধ, অনুশোচনা এবং প্রায়শ্চিত্ত দিয়ে তারও বৃত্ত রচিত—এ-কথা আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে বারবার সে প্রশ্ন করবে, যুক্তিবাদ তবে তাকে দিল কী।]

বোরোলীন-বিধৃত লাবণ্য
বৃষ্টির দিন শেষ হোলো। আকাশ এখন স্বচ্ছ নীল। শরতের রৌদ্র-দীপ্ত উৎসবের দিন এলো উজ্জ্বল পরিবেশ নিয়ে।
আপনার-ও এখন নিজেকে আরো উজ্জ্বল করে তোলবার বাসনা। আপনার এই নব রূপায়ণে মৃদু-সুরভিত বোরোলীন ক্রীম উজ্জ্বলতম উপকরণ—আপনার প্রসাধনের অপরিহার্য্য অঙ্গ।
কোমল স্নিগ্ধ বোরোলীন ক্রীমের ভেষজগুণযুক্ত স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ধূলা আর রৌদ্রের হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করে আর আপনার স্বাভাবিক লাবণ্য ফিরিয়ে আনে। বোরোলীন-বিধৃত যে মাধুরী আপনাকে আকর্ষনীয় ও বিশিষ্ট করে তোলে। নিয়মিত বোরোলীনের প্রযত্নে নিজেকে লাবণ্যমণ্ডিত করুন।
ল্যানোলিন-যুক্ত মৃদু-সুরভিত বোরোলীন ফেস্ ক্রীম আজ প্রসাধনের এক অপরিহার্য্য উপকরণ।
BOROLINE
বোরোলীন
ভেষজগুণসম্পন্ন পরম প্রসাধন
জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লিঃ
১১/১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩

সিঁড়ির আলো জ্বলছে। তিনি খুশি হলেন। এখন তাঁকে চশমাটা খুলতে হবে। সিঁড়ির কাছে এসে চশমা জোড়া নাক থেকে তুলে ডাঁট দুটো পকেটে পুরে তিনি ওপরে ওঠেন।

সিঁড়িপথের অন্ধকার দূর করে দিয়ে ঘষা কাচের ডুমটা জ্বলছে, তাঁর ওপরে যাওয়ার সুবিধা হবে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁর খুশি হবার কারণ এটা ছাড়াও আর কিছু আছে। চশমা জোড়া সরিয়ে নিয়ে খোলা চোখে তিনি আলোর ডুমটার দিকে যখন তাকান তখন তাঁর কাছে সেটা একটা সুন্দর শাদা ফুল বলে মনে হয়। তিনি অনায়াসে ওটাকে বরফের ফুল বলেও ধরে নিতে পারেন; বা কখনো মনে করেন স্বর্গ থেকে বা সমুদ্রের তলা থেকে বা পরীর দেশ থেকে একটা আশ্চর্য মুক্তা চুরি করে এনে কেউ তাঁর বাড়ির সরু নিভৃত জায়গাটায় ঝুলিয়ে রেখেছে।

বস্তুত স্বর্গ বলে কিছু আছে কিনা তিনি জানেন না, আর যদি থেকেও থাকে সেখানে এত বড় মুক্তা পাওয়া যায় কিনা, বা সেটা কোন সমুদ্র যার তলায় প্রকাণ্ড একটা শুক্তি ছিল আর এই মুক্তাটা তার ভিতর লুকিয়ে ছিল বা পরীর দেশ বলতে লোকে কি বোঝে ভুবনবাবু সেসব নিয়ে মাথা ঘামান না। তিনি শুধু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার আগে নীচে দাঁড়িয়ে মনে করেন তাঁর এই সরু পথের ওপর একটা মুক্তা ঝুলছে, একটা বরফের ফুল জ্বলছে। এটাই তাঁর লাভ। একটু সময়ের জন্য মনটা স্বর্গ সমুদ্র পরীর দেশ নির্জন মেরু প্রান্তর ঘুরে আসে।

এই জন্যই একটু স্বপ্ন দেখতে, প্রখর চেতনার ওপর একটা সুখকর তন্দ্রার প্রলেপ বুলোতে তিনি চশমাজোড়া চোখ থেকে সরিয়ে ফেলেন।

ওপরে উঠেও তিনি সেটা চোখে পরেন না। এই অবস্থায় তিনি অন্দরে প্রবেশ করেন, নীহারের ঘরে ঢোকেন। টের পেয়ে নীহার শাদা হাল্কা শরীরটা গুটিয়ে নিয়ে খাটের ওপর উঠে বসে। শাড়ির আঁচলটা শায়ার ওপর টেনে দেয়। লতার মতন শীর্ণ বাহু দুটো ঈষৎ বেঁকিয়ে ওপরের দিকে তুলে ধরে খোঁপাটা ঠিক করে, আর হরিণের চোখের মতন কালো সজল বড় বড় দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে।

এখানেও ভুবন স্বপ্ন দেখেন। তাঁর খাটের ওপর এমন কেউ বসে আছে চুপ করে যার দেহ নেই, রক্তমাংস, হাড়মজ্জা কিছু নেই—কেবল আছে আলোর কয়েকটা রেখা। আলোক লতার একটা শরীর। আর আছে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জলীয় বাষ্পে পূর্ণ এক জোড়া প্রকাণ্ড চোখ। একটি পরী বসে আছে ভুবনবাবুর ঘরে। তার নাম নীহার নয়। ভুবনবাবুর স্ত্রী নয় সে। [illegible]

এমন একটা স্বপ্ন দেখতে তাঁর ভাল লাগে। দোরের কাছে শব্দ হয়। ভুবন বুঝতে পারেন তাঁর স্বপ্ন এখন ভাঙবে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে চশমাটা মুঠ করে ধরেন তিনি। ঐ অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে তাঁর ভাল লাগত। কিন্তু তাঁর ভাল লাগা স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সংসারের মন্দ লাগা দুঃস্বপ্ন দেখার অনিবার্য সংঘর্ষ-গুলি যে লেগেই আছে ভুবন এটাও জানেন। তাই ঘর থেকে ছুটে পালাতে গিয়েও শক্ত হয়ে দাঁড়ান। চশমা জোড়া নাকের ওপর বসিয়ে দেন। তিনি ভীরু নন, পলাতক হতে চান না। তাই হাত বাড়িয়ে মীরার হাত থেকে নীহারের জ্বরের চার্টটা তুলে নেন।

'আজ আবার টেম্পারেচার বেড়েছিল—দুটোর সময়।'

'তাই তো দেখছি।'

'অথচ সারাটা সকাল ভাল ছিল।'

'তাই তো দেখছি।' চার্ট থেকে চোখ তুলে ভুবন মেয়ের দিকে তাকান। একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলেন। তারপর আর কোন কথা না কয়ে কাগজটা মেয়ের হাতে ফিরিয়ে দেন।

পুব দিকটা খোলা। একটা বস্তী আছে নীচে। খোলার চাল টিনের চাল। কোনটাই দোতলার বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছয় না। তাই বারান্দায় দাঁড়ালে আকাশ চোখে পড়ে। চাঁদ উঠেছে। ত্রয়োদশীর চাঁদ। বৃত্তের কোথাও যদি অপূর্ণ থাকে চোখের চশমা সরিয়ে ফেললে সেটা বোঝা যায় না। মনে হয় পূর্ণ-চন্দ্র। কিন্তু ভুবন বারান্দার আরাম কেদারায় বসে চশমাটা হাতের মুঠোয় নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল গোলাকার পদার্থটাকে চাঁদ ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করতে ভালবাসেন। তাঁর মনে হয় ওটা ছানার তৈরী একটা সুখাদ্য, একটা বড় রাজভোগ। যেন হঠাৎ তিনি ওটার একটা বড় অংশ কামড় দিয়ে এখনি খেতে চাইছেন। সুখাদ্যটার জন্য তাঁর রসনা লালাসিক্ত হয়ে ওঠে। তিনি চিন্তা করেন ওই আলোর মিষ্টির কিছুটা অংশ পেটে গেলে তাঁর শ্রান্তি ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা দূর হয়ে যাবে। বেশ তাজা হয়ে উঠতে পারেন। অনেক রাত জেগে মোকদ্দমার কাগজগুলি দেখতে পারেন। কিন্তু তা তো আর সম্ভব হবে না, হাত বাড়িয়ে অত উঁচুয় বাদশাভোগটা নাগাল পাওয়া যাবে না, না যাক, তাকিয়ে থাকতে দোষ কি। চোখের সামনে একটা রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য রয়েছে কল্পনা করার মধ্যেও নেশা আছে।

ইদানীং এধরনের নেশাগুলি বাড়ছে।

সেদিন বাথরুমের দরজার কাছে তিনি সিমেন্টের ওপর লাল দাগটাকে একটা পলাশ ফুলের পাপড়ি কল্পনা করতে পেরেছিলেন, তারপর তাঁর মনে হয়েছিল মীরার লাল [illegible] রীবনের একটা অংশ বুঝি ওখানে পড়ে আছে। রীবনটাকে ছোট করতেই মেয়েটা কাঁচি দিয়ে কেটে ছোট টুকরোটা ওখানে ফেলে গেছে? তারপর তাঁর মনে হয়েছিল বাদল নিশ্চয় টফি কিনে খেয়েছিল। চকোলেটের লাল মোড়কটা ওখানে ফেলে রেখেছে। আর একটু হলে তিনি জুতোর ডগা দিয়ে ওটা নেড়েচেড়ে দেখতেন। তখনই অবশ্য মীরা ছুটে এসেছিল। মীরার কথা শুনে ভুবন চোখে চশমা লাগিয়ে রক্তের দাগটা দেখলেন। নীহারের গলা দিয়ে আবার রক্ত পড়ছে, মীরা বলছিল। ভুবন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফিনাইল লাইজল ঢেলে মীরা জায়গাটা পরিষ্কার করছিল।

ষাট পূর্তির পর থেকে ভুবনের দৃষ্টি-শক্তি এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেছে যে বস্তুর অবস্থানের দূরত্ব ভেদে রং রেখা আকৃতি বদলে গিয়ে সেটা এক এক সময় এক এক রূপ নিয়ে তাঁর চোখের সামনে ফুটে ওঠে। ডাক্তার চোখ পরীক্ষা করে লেন্স-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। চশমা চোখে পরার পর ভুবন অবশ্য কমলা-লেবুটাকে আর ফুলের তোড়া বলে ভুল করেন না, রক্তের দাগকে চকোলেটের লাল মোড়ক বলে ভুল করেন না। কিন্তু ভুল করার প্রয়োজন থাকে বৈকি মানুষের।

যেমন এখন, যদি আকাশের চাঁদটাকে খোলা চোখে তিনি একটা বড় রাজভোগ কল্পনা করে সেটাকে এক সময় না এক সময় উদরসাৎ করার লোভ ও ইচ্ছা নিয়ে এখানে বারান্দার নিভৃতে চুপ করে কিছু সময় কাটাতে পারেন সেটা কম লাভ কি। ভয় উদ্বেগ অশান্তি কোলাহল বিশৃঙ্খলা বিষণ্ণতা জীবনে লেগেই থাকবে। যদি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় চোখের চশমাটা সরিয়ে দিয়ে প্যাসেজের আলোর ডুমটাকে তিনি একটা আশ্চর্য মুক্তার মতন দেখেন ক্ষতি কি—বা ঘরে ঢুকে টি বি রুগিনী নীহারের শীর্ণ নীরক্ত শাদা শরীরটাকে হঠাৎ আধোকলতা বলে ভুল করেন!

কফির পেয়ালা হাত থেকে নামিয়ে রেখে ভুবন উঠে দাঁড়ান। আকাশের রাজভোগটা আর একটু ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। কাজেই আকারে সেটি ছোট হয়েছে। এখন ওটা না ভেঙে আস্ত মুখে পুরে দেওয়া যায় নাকি চিন্তা করে তিনি মনে মনে হাসেন ও বারান্দার রেলিং ধরে আস্তে আস্তে পায়চারী করেন।

'দাদু, তুমি হাসছ!'

ভুবন চমকে ওঠেন। কী তীব্র সূক্ষ্ম দৃষ্টি দশ বছরের ছেলের! তা হবে। আনকোরা নতুন চোখ। যেন দোকান থেকে এইমাত্র কিনে এনে মোড়ক খুলে দুটো মার্বেল ওই চোখের ভিতর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—এমন চকচক করছে কালো মণি দুটো। কাজেই ওই চোখ দিয়ে দাদুর মনে-মনে হাসিও তার দেখতে অসুবিধা হবার কথা না।

ভুবন এবার অত্যধিক খুশি হয়ে ঠোঁট ফাঁক করে পাকা ভুরু জোড়া নাচিয়ে হাসেন।

'হুঁ, তোমার সুন্দর রেলগাড়িটা দেখছি।'

তিনটে সিগারেটের বাক্স সুতোয় বেঁধে নাতি রেলগাড়ি বানিয়েছে। গাড়ি চালাবার সময় বাদল মুখ দিয়ে 'হুস হুস' শব্দ করছে, 'পি-পি' আওয়াজ বার করছে।

'আমার ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের দেখবে, দাদু?'

'দেখাও।' ভুবন রেলিং ধরে স্থির হয়ে দাঁড়ান।

ট্রেনের কামরা—অর্থাৎ সিগারেটের একটা বাক্স খোলা হল। এক রাশ শুকনো ডালিম পাতা বাক্সে বোঝাই করা হয়েছে। বাক্সটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কিছু শুকনো পাতা নীচে ঝরে পড়ল, কিছু হাওয়ায় উড়ে গেল, কিছু বাক্সের ভিতরে পড়ে রইল।

'চমৎকার চমৎকার!' ভুরু নাচিয়ে ভুবন আবার হাসেন, 'অনেক প্যাসেঞ্জার উঠেছে তোমার গাড়িতে।'

পি-পি...হুস্ হাস্—ট্রেন আবার ছুটল। সুতো বাঁধা সিগারেটের বাক্সগুলো টানতে টানতে বাদল বারান্দার অন্য প্রান্তে ছুটে গেল।

দেবশিশুর মতন নিষ্পাপ সরল মূর্তি। জগতের আনন্দ বাড়িয়ে তুলতে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। ক্রিড়ারত বালকের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ভুবন আবার ধীরে ধীরে পায়চারী করেন, চিন্তা করেন। তাঁর মুখের হাসি হঠাৎ মিলিয়ে গেছে। যেন একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে ভুবন বেঁচে গেলেন। নাতির রেলগাড়ি দেখতে চশমাটা প্রায় চোখে তুলতে গিয়েছিলেন। মক্কেলের কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখতে গেলে যেমনটি করেন।

তিনি ভুলে গিয়েছিলেন,মনোযোগ দিয়ে খেলনাটা পরীক্ষা করতে গেলে খেলনার মালিকের মুখটিও তাঁকে দেখতে হত। নথিপত্র দেখতে গিয়ে যেমন মক্কেলের মুখটা দেখেন, দেখতে হয় তাঁকে।

কিন্তু এই দেখার বিপদ কি তিনি জানেন না? তখন ঐ মুখ আর দেবশিশুর মুখ থাকবেনা। ওর সরল নিষ্পাপ চোখ দুটোর মধ্যে আর এক জোড়া চোখ দেখতে পাবেন তিনি, নাক চিবুক কপালের গড়ন আর একটা নাক চিবুক কপাল মনে করিয়ে দেবে। অথচ সেই মুখ সেই পাপ ছবি তিনি অহর্নিশি ভুলতে চাইছেন। ভুলতে পারল না বলে নীহার যক্ষ্মায় ভুগছে। ভুলতে গিয়ে বড় বেশি বুকের মধ্যে ধাক্কা লেগে-ছিল বলে বৌমা আত্মহত্যা করল। হুঁ, মাতালের জন্য, লম্পটের জন্য, বেশ্যাসক্ত স্বামীর জন্য। তারপর থেকে অবশ্য এ-বাড়ির প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে গেছে নৃপেনের। ভুবন বন্ধ করে দিয়েছেন। পরি-

বারের কলঙ্ক, সমাজের কলঙ্ক, পৃথিবীর কলঙ্ক বলে মনে করেন তিনি যাকে, তাকে পুত্র বলে স্বীকার করতেও আজ আর রাজি নন। কোথায় আছে কিরকম জীবন-যাপন করছে সে, ভুবন খোঁজ রাখেন না এবং প্রয়োজনও বোধ করেন না।

সেই মুখের সুস্পষ্ট আদল আছে বলে ভুবন ঐ বালকের দিকে তাকাতেও কেমন ভয় পান। কাজেই ভুল দৃষ্টি নিয়ে তিনি নাতির মুখ দেখেন। অনেক কিছু ভুলে থাকতে পারেন। যেমন বাড়ি ঢোকার সময় প্যাসেজের আলোর ডুমটার দিকে তিনি ভুল চোখে তাকান, ওঘরে ক্ষয় রুগিনী নীহারকে ভুল চোখে দেখেন, বারান্দায় বসে ভুল করে যেমন চাঁদটাকে দেখছিলেন। খুঁটিয়ে সব কিছু দেখার, দেখতে পাওয়ার লাভ আছে যেমন, লোকসানও প্রচুর আছে। আর কেউ কথাটা না জানুক, ভুবন জেনেছেন—তাই সংসারের কিছু কিছু জিনিস, কোনো কোনো মুখ দেখার সময় তিনি চশমাটা হাতের মুঠোয় নিয়ে নেন বা পকেটে পুরে রাখেন।

'তুমি কি আজ সুজির রুটি খাবে, বাবা?'

'হুঁ।' ভুবন মেয়ের দিকে চোখ তুললেন। 'আর শোন—' মীরা চলে যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়াল। ভুবন চশমা জোড়া চোখে পরলেন। এখন আর ছায়া দেখার দরকার নেই, এখানে তাঁর ভুল না করলেও চলে। ঐ একটি মুখ যাকে খুঁটিয়ে দেখতে তাঁর বিন্দুমাত্র ভয় নেই, শঙ্কা নেই।

'আমি আজ আর দুধটা খাব না, মা।'

'কেন?' মেয়ে বাবার কাছে সরে এল। 'দুধটা খেতে তোমার এত আপত্তি কেন।'

শাসন ও সোহাগ মিশে এক জোড়া চোখ কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, যেন একটু সময় কথা না কয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভুবন দেখেন। তারপর ঘাড়টা ঈষৎ কাত করে হাসেন।

'কাল রাত্রেও দুধরুটি খেয়েছি, রোজ দুধটা হজম করতে পারি না মা। কাল সকালে দই খাব, দই করে রাখিস।'

'তবে আজ মুগের জুস আর পেঁপের ডালনা দিয়ে সুজির রুটি খাও।'

খুশি হয়ে ভুবন অন্যদিকে ঘাড়টা হেলান।

'আমিও তাই বলছিলাম, আর শোন—'

মীরা চলে যাচ্ছিল, চোখ ফেরাল।

'একটু দুধ রাখিস। শিবতোষ আসবে। একটু কফি করে দিতে হবে ওকে, যদি চা খায় চা।'

মেয়ে মাথা গুঁজে চলে গেল ভিতরে, বাবার দিকে আর তাকাল না। ভুবন কারণটা বুঝলেন। অথচ শিবতোষ খুব ভাল মানুষ। ভাল বলে ভাল, এমন একটি ছেলে আজকের দিনে হয় না। কত আর বয়স হয়েছে। আটাশ ত্রিশ? এর মধ্যেই মাথার চুল উঠতে আরম্ভ করেছে, রোগা লম্বা চেহারা। পেট-রোগা, তাই এমন চেহারা। একদিন ভুবনের কাছে বলছিল। স্বাস্থ্যটা মোটেই ভাল থাকছে না। কী করে থাকবে। চাকরি টুইশন। ভেজাল খেয়ে এদিনে এত পরিশ্রম করে কটা লোকের শরীর টিঁকছে। অথচ উপায় নেই। বড় ভাইটি ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টে বছর তিন হয় মারা গেছে। চার পাঁচটি সন্তান রেখে গেছে। দাদার পরিবার, তার ওপর আছে বুড়োবাবা মা, ছোট ছোট ভাই-বোন। নিজেও বিবাহিত। একটা প্রকাণ্ড সংসার ঘাড়ে নিয়ে শিবতোষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করছে। অত্যন্ত ভদ্র অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির ছেলে। সোনার মানুষ। ভুবন বলেন। বছর দুই আগে শিবতোষের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। খুব বৃষ্টি পড়ছিল সেই রাত্রে। রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছিল। ভুবনবাবু আসছিলেন ভবানীপুর থেকে, শিবতোষও যেন ওদিক থেকে আসছিল। বৃষ্টির জন্য ট্রাম বন্ধ। দুজন চৌরঙ্গীর একটা দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। যদি ট্যাক্সি পাওয়া যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ। অর্থাৎ রাস্তায় আলাপ রাস্তার পরিচয়। ভুবনের খুব ভাল লেগেছিল ছেলেটিকে। শ্যামবাজার থাকে। নাম শিবতোষ—শিবতোষ গাঙ্গুলী। প্রায় একটা ঘণ্টা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে দুজন কথা বলেছিলেন।

বনবাবু যাবেন মাণিকতলা। কাজেই যদি
াক্সি পাওয়া যায়, এক ট্যাক্সিতে দুজন চলে
বে স্থির হয়ে গেল। তারপর অবশ্য জলে
জে বিশ মিনিট ছুটোছুটির পর শিব-
াষই ট্যাক্সি জোগাড় করেছিল। ছেলেটির
বহারে ভুবন এত বেশি প্রীত হন সেই
ত্রে যে, তিনি মাণিকতলা এসে তাঁর কাছ
কে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে তবে
াক্সি থেকে নেমেছিলেন, কি, না কাল
ধ্যায় অবশ্যই শিবতোষ তাঁর বাড়িতে এসে
খেয়ে যাবে। পরদিন সন্ধ্যায় অবশ্য শিব-
াষ আসেনি। এসেছিল তার পরদিন। কে
ানে, ভুবনের যেমন শিবতোষকে ভাল
াগল, শিবতোষেরও বুঝি ভুবনকে ভাল
াগল। কাজেই এক রাত্রে একত্র ট্যাক্সি করে
ড়ি ফেরা বা আর এক সন্ধ্যায় দুজনে একত্র
সে চা খাওয়া ও কথা বলার পর পরিচয়টা
ছে গেল না; শিবতোষ মাঝে মাঝে ভুবন-
বুকে দেখতে আসতে লাগল। ক্রমে
ম্পর্কটা এমন নিবিড় হল যে, এখন এক-
ন দুদিন অন্তর শিবতোষ অন্তত পনেরো
িনিট সময় হাতে নিয়ে এসেও ভুবনবাবুর
ৗাঁজ নিয়ে যায়। ইদানিং ঘনঘন আসার
কটা সুবিধাও হয়েছে। বিডন স্ট্রীটে
কটা টুইশন নিয়েছে শিবতোষ। ছেলে
ড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথে পরিতোষ একবার
-বাড়ি হয়ে যায়।

'তুমি জান বাবা, আমার জন্য তুমি ওকে
উটর রাখবে এই লোভে লোকটা ঘনঘন
ামাদের বাড়িতে আসে।' মেয়ের কথা শুনে
বন হেসেছিলেন। এটা যে মীরার ভুল
ারণা তিনি মেয়েকে তাও বুঝিয়ে দিয়ে-
ছলেন। কেন না শিবতোষ জানে মীরা স্কুল
াইন্যাল পাশ করেছে এবং মেয়েকে কলেজে

দেবার ইচ্ছাও ভুবনবাবুর নেই। খরচ
ইত্যাদির কথা চিন্তা করেই যে ভুবন মেয়েকে
আর পড়াবেন না সে কথাও তিনি শিব-
তোষকে খুলে বলেছেন। সুতরাং সেরকম
কোন লোভ বা ইচ্ছা নিয়ে শিবতোষ
এ বাড়ি আসে না। আসে মনের টানে, কেননা
শিবতোষ জেনে গেছে, ভুবনবাবুর জীবন কী
ভয়ংকর দুঃখময়। শিবতোষের জীবনও
দুঃখের। কত বড় একটা চাকুরে দাদা ট্রেন
দুর্ঘটনায় মারা গেল। সব ঈশ্বরের হাত।
তা না হলে ষাট বছর বয়সে রোজ সামলা
কাঁধে ফেলে ভুবনবাবু কোর্টে ছুটবেন কেন।
তেমনি ভারবাহী একটি বলদে পরিণত
হয়েছে ঐ হতভাগ্য যুবক। দুটি দুঃখী
লোক একত্র মিলিত হয়েছে। তাই একজনের
প্রতি আর একজনের টান, মমত্ববোধ।

'অত্যন্ত সচ্চরিত্র, অত্যন্ত নম্রস্বভাব।'
শিবতোষের কথা উঠলেই ভুবন বলেন। কিন্তু
মীরার ধারণা অন্যরকম। 'সচ্চরিত্র হতে
পারে, স্বভাবটা মোটেই নরম না, লোকটির
চোখ দেখলেই বোঝা যায় ভয়ংকর রাগী
এবং একগুঁয়ে। হয়তো এখানে তোমার
কাছে নরম হয়ে থাকে—আসলে ভীষণ জেদী
একরোখা ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ তোমার
ওই শিবতোষবাবু।' মেয়ের কথা শুনে ভুবন
চুপ করে থাকেন। তাঁর অবশ্য তখন বলতে
ইচ্ছা করে, শিবতোষের হাসির মধ্যে কথার
মধ্যে, তার তাকানোর ভিতর তিনি যে
কোনো দিনই সেরকম কিছু দেখতে পান না।
আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, ছেলে পড়ানো না
থাকলে পুরো দু ঘণ্টা এবাড়ির এই
বারান্দায় বসে শিবতোষ ভুবনের সঙ্গে গল্প
করে কাটিয়ে যায়। আগে আগে তিনি
মীরাকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু দেখা গেছে
শিবতোষের প্রসঙ্গ উঠলে মীরা এখনো
তেমনি গম্ভীর হয়ে থাকে। যতক্ষণ শিব-
তোষ ভুবনের সঙ্গে বসে কথা বলেন, মীরা
বারান্দার এদিকে আসে না। হয়তো ডাকলে
দু একবার এসে চা কি জল খাবারটা দিয়ে
যায়, এই পর্যন্ত। তা-ও মীরা মুখখানা এমন
শক্ত করে রাখে, ভুবন একটু লজ্জিত হন
বৈকি। কাজেই শিবতোষ থাকলে তিনি
মেয়েকে খুব বেশি একটা ডাকেনও না।

এদিকে একদিন ভুবন কি একটা কথায়,
হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'মানুষকে খুব
বেশি খুঁটিয়ে দেখতে নেই, তার কাছ থেকে
যেটুকু পেলাম, যতটা তাকে দেখলাম, এই
যথেষ্ট। মানুষের ভিতরে কি আছে সন্ধান
করতে গেলে বিপদ।'

'আহা, কত যেন সন্ধানী চোখ দিয়ে
তোমার শিবতোষবাবুকে আমি দেখছি।'
মীরা কেমন একটু রাগ করেছিল বাবার কথা
শুনে। 'সন্ধান করতে হয় না—মানুষের
চোখের দৃষ্টি চোয়ালের গড়ন বলে দেয়, সে
নিষ্ঠুর হবে কি নরম হবে। ওই লোকটা
যদি মানুষ খুন করেছে কোনদিন শুনি—
আমি তাতেও অবাক হব না।'

'ছি ছি।' ভুবন দাঁত দিয়ে জিভ কেটে-
ছিলেন। 'শুধু চোখ দেখে মুখ দেখে কোনো
মানুষ সম্পর্কে এমন ধারণা করা অন্যায়,
মা।' সেদিন সন্ধ্যার পর শিবতোষকে চা
দিতে মীরা আসেনি, ভুবনবাবুও ডাকেননি।
তিনি নিজে উঠে গিয়ে দুজনের জন্য দুটো
কাপ হাতে করে বারান্দায় ফিরে এসে-
ছিলেন।

'দাদু—নীচে কে কড়া নাড়ছে।'

'হুঁ, শিবতোষ এসেছে।' নাতির কথায়
ভুবন চমকে ওঠেন। আরাম কেদারা ছেড়ে
ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান। তারপর পুব থেকে
পশ্চিমের বারান্দায় ছুটে যান। যেদিকে
ওপরে ওঠার সিঁড়ি। আলোটা তখনো
জ্বলছে। শিবতোষ আসবে বলে সেটা
নেবানো হয়নি। রেলিংএর ওপর দিয়ে গলা
বাড়িয়ে সিঁড়ির দিকে ঝুঁকে পড়ে
ভুবন চিৎকার করে উঠলেনঃ 'সদর খোলা
আছে—তুমি চলে এসো শিবতোষ। ওপরে
চলে এসো।'

রোগা লম্বা একটি মানুষ ভিতরে ঢুকল।
সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল। মাথায়
অতি সামান্য চুলই অবশিষ্ট আছে। কপাল
পর্যন্ত একটা টাক চকচক করছে। গায়ের
রং ফর্সা ছিল এককালে বোঝা যায়—এখন
কেমন যেন জলে ধোয়া পাতলা ফ্যাকাশে
একটা চেহারা ধরেছে। নাকটা উঁচু। গালে
মাংস কম বলে চোয়ালের হাড় দুটো ভেসে
আছে—সমান আকৃতির চৌকোন দু টুকরো
ছোট কাঠের মতন, হারমোনিয়মের দুটো
রীডের মতন দেখায় চোয়ালের হাড়
দুটোকে। গায়ে ছিটের শার্ট। কাপড়ের
কোঁচাটা একদিকের পকেটে ঢোকানো। পায়ে
মোটা স্ট্র্যাপের রবারের চটি। তাই চটির
কোনো শব্দ হয় না। যেন হাওয়ায় ভাসতে
ভাসতে পাতলা রোগা মানুষটি পুবের
বারান্দায় চলে এল। একটা চেয়ার আগে
থাকতেই পাতা ছিল। শিবতোষ চেয়ারটায়
বসল, ভুবন তাঁর নির্দিষ্ট আরামকেদারা দখল
করলেন। মাঝখানে ছোট একটা টিপয়।
টিপয়ের ওপর লতাপাতার কাজ করা
ঢাকনার ধারগুলো হাওয়ায় নড়তে লাগল।
ভাদ্র মাস। প্রচুর পুবালী হাওয়া বইছিল।
ভুবন একবার রাজভোগের মত সুগোল
রসালো চাঁদটার দিকে তাকালেন। আর একটু
ওপরে উঠে গেছে চাঁদ। বেশ কিছুক্ষণ দু-
জনের নীরবে কাটল। পরে ভুবনই প্রথম
নীরবতা ভাঙলেন।

'তোমাকে আজ একটু বেশি ক্লান্ত
দেখাচ্ছে।'

উত্তর না দিয়ে শিবতোষ আকাশের চাঁদ
দেখল। ভুবন আবার প্রশ্ন করলেন। 'তোমার
বাবা কেমন আছেন আজ, প্রেশারটা?'

'ঐ একই রকম।' শিবতোষ ঘাড়
ফেরাল। তার বাবা অনেক দিনের রো-

প্রেসারের রুগী। 'কাকিমা আজ কেমন আছেন?'

'ঐ একই রকম।' ভুবন একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেললেন। শিবতোষ তাঁকে সরাসরি কাকাবাবু না ডাকলেও নীহারের প্রসঙ্গ উঠলে শিবতোষ কাকীমা কথাটাই ব্যবহার করে। 'আজ দুপুরের দিকে টেম্পারেচারটা আবার যেন একটু বাড়ল কেন।' আস্তে বললেন ভুবন।

শিবতোষ এই সম্পর্কে আর কিছু প্রশ্ন করে না।

কাজেই ভুবন থেমে গেলেন।

যেন হঠাৎ আবার একটু জোরে হাওয়া দিল। একসঙ্গে দুজন বাইরে আকাশের দিকে তাকালেন।

'হাওয়াটা ঠান্ড ঠান্ডা লাগছে, কোথায় যেন জল হয়েছে।' ভুবন অনেকটা নিজের মনে বললেন।

শিবতোষ এবারও নীরব। ডান হাতের দুটো আঙুল দিয়ে কপালের দুপাশের রগ টিপে ধরে এখন টিপয়ের ঢাকনাটা দেখছে।

'তোমার কি মাথা ধরেছে?' ভুবন এবার সতর্কভাবে প্রশ্ন করলেন। শিবতোষ নীরব। 'দাঁড়াও একটু কফির কথা বলি।' আরামকেদারা থেকে পিঠ আলগা করে ভুবন সোজা হয়ে বসলেন, তারপর পাশের পর্দাটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ডেকে বললেন, 'মীরা, শিবতোষকে আর আমাকে একটু কফি করে দাও, মা।'

'যাই।' মীরার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। যেন মনে হল কফি ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে আছে, এখনি ও নিয়ে আসছে। পেয়ালা পিরিচের একটা টুংটাং শব্দও শোনা গেল। ভিতরে ভিতরে ভুবন খুশী হন। মীরার মেজাজটা আজ তত খারাপ না যেন।

অনুমান মিথ্যা হল না। কফি এসে গেল। পেয়ালা দুটো টি-পয়ের ওপর নামিয়ে রাখল মীরা। অন্যদিন এ সময় শিবতোষ একবার চোখ তুলে মীরাকে দেখে। আজ সে তাকাল না। কপাল থেকে হাতটা নামাল বটে, কিন্তু ভুরুর কুঞ্চন পূর্ববৎ থেকে গেল এবং সেই অবস্থায় শিবতোষ মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল।

মীরার চিবুকের রেখা ও ভুরুর বাঁক লক্ষ্য করে ভুবন বুঝলেন, ওর মুখটা হঠাৎ শক্ত হয়ে যাচ্ছে। মেয়ে দাঁড়ায় না যদিও। আস্তে আস্তে পর্দা সরিয়ে ভিতরে অদৃশ্য হয়। ভুবন স্বস্তিবোধ করেন।

'তোমার কফি, শিবতোষ।' ভুবন হাত বাড়িয়ে একটা পেয়ালা টেনে নেন। শিবতোষের শরীর ঈষৎ নড়ে উঠল। পেয়ালার হাতলটা স্পর্শ করল সে এবং তারপরও প্রায় দু মিনিট একভাবে চুপ করে বসে রইল।

'চুমুক দাও, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।' কফি শেষ করে ভুবন তাঁর হাতের পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন, ছোট একটা ঢেকুর তুললেন ও চাঁদ দেখতে ঘাড়টা ওদিকে কাত করলেন।

'আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা ছিল!'

চমকে উঠলেন ভুবন। শিবতোষের গলার স্বরটা কেমন ভারি ও বিষণ্ণ। 'কি, বল!' ভুবন চেষ্টা করে সামান্য হাসলেন। 'আমাকে কোন কথা বলতে তোমার ইতস্তত করা ঠিক নয়।'

কিন্তু কথা না বলে শিবতোষ কফির পেয়ালায় চুমুক দিল, এক চুমুকে সবটা শেষ করল। পেয়ালা নামিয়ে রেখে পকেট থেকে রুমাল তুলে মুখ মুছল।

'তোমার অফিসের সেই গোলমালটা মিটে গেছে তো?' ভুবন হঠাৎ ভুরু কুঁচকালেন। শিবতোষ ঘাড় কাত করল।

'হ্যাঁ, ব্রাঞ্চ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এসে পড়াতে ব্যাপারটা সহজেই মিটে গেল।' শিবতোষ এবার সামান্য হাসল। 'না, সেসব কিছু না—আমি এসেছি আজ, আমি...আমি...' শিবতোষের গলার স্বর হঠাৎ কাঁপতে লাগল, তাঁর হাত কাঁপছে, কাঁপা হাত পকেটে ঢুকিয়ে একটা কাগজের মোড়ক বের করে সেটা ভুবনের সামনে শূন্য পেয়ালা দুটোর মাঝখানে রাখল। 'এটা আপনি রাখুন। রেখে—'

ভুবন মেরুদাঁড়া টান করে সোজা হয়ে বসেন, চশমাটা চোখে পরেন। 'কি ওটা—' হাত দিয়ে মোড়কটা স্পর্শ করেন না, হাত বাড়িয়ে একটা আঙুল সেদিকে প্রসারিত করে ধরেন মাত্র তিনি।

শিবতোষ মোড়কটা খুলে ফেলল। দেখা গেল একছড়া সোনার হার।

ভুরু টান করে ভুবন হারছড়া দেখেন, তখনো হাতে নেন না সেটা, এক মিনিট সেদিকে তাকিয়ে থেকে পরে শিবতোষের চোখ দেখেন।
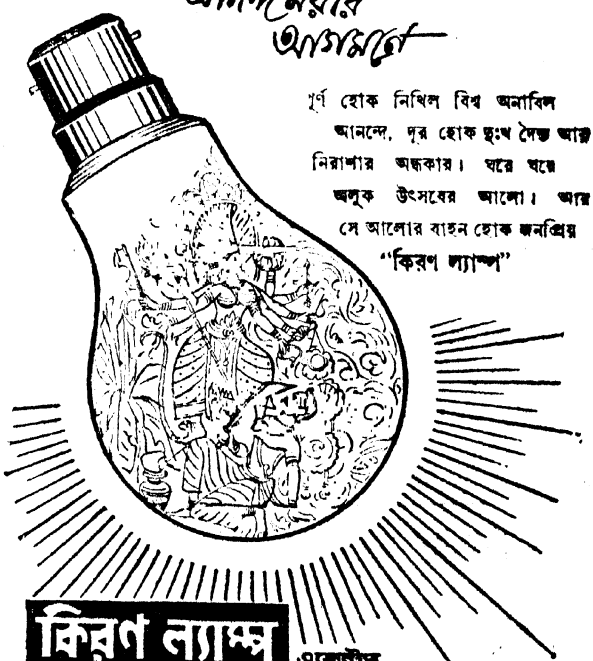
'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—হঠাৎ ওই সোনার চেন—' বিড়বিড় করতে থাকেন তিনি।

'হ্যাঁ, এটা রেখে কিছু টাকা চাইছি আপনার কাছে।' শিবতোষের গলার স্বর আর কাঁপছে না, ধীর সংযত তার মুখের ভাষা। 'বাবার কটা ইনজেকশন কেনা হচ্ছে না আজ কতদিন—একটা টনিক খাচ্ছিলেন, সেটাও ফুরিয়েছে আজ মাসের ওপর—ভেবেছি ওই হারটা আপনার কাছে রেখে কটা টাকা নিয়ে—'

ভুবন চোখ বুজলেন; দুঃখেও বটে, কিছুটা লজ্জায়ও বটে। আরো দুবার শিবতোষ তাঁর কাছ থেকে কিছু কিছু করে

টাকা ধার নিয়েছে। একটা টাকা সে শোধ করেছে, আর একটা এখনো পারেনি—আজ আবার টাকার দরকার, তাই কিনা, এমনি চাইতে সংকোচবোধ করছে বলে এই সোনার হার সংগে করে এনেছে শিবতোষ।

'ওটা নিয়ে যাও।' তেতোমতন একটা ঢোক গিললেন ভুবন। 'আমার নিজের কাছে টাকা নেই, তোমার মতন আর এক মাস্তুল-ভাংগা অভাগা আমি, অভাব লেগেই আছে, তুমি জান। তা হলেও কাল চেষ্টা করব, দেখি যদি কিছু জোগাড় করে এনে—' অবশেষে মৃদুমতন একটা হাসি টেনে আনতে চেষ্টা করলেন তিনি। 'এখন কি পরিমাণ টাকা হলে তোমার চলে?'

'না না, এটা রাখুন, আপনার ইতস্তত করার কিছু নেই।' আগের চেয়েও দৃঢ় শক্ত শোনাল শিবতোষের গলার স্বর। 'আমি ইচ্ছা করে নিয়ে এসেছি—আপনি এটা রেখে দিন।' কাগজশুদ্ধ সোনার হারটা ভুবনের দিকে আর একটু ঠেলে দিল সে।

ভুবন এবার রীতিমত বিরক্তবোধ করেন, ঠোঁটদুটো ফাঁক করে শিবতোষের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, কথা বলতে পারেন না।

'আমি জিনিসটা আপনার কাছে রেখে দিতেই নিয়ে এসেছি। যখন সুবিধা হয় টাকা দেবেন, না দিতে পারেন না দেবেন। কিন্তু ওটা আমি বাড়িতে রাখব না।' শিবতোষের গলার স্বর আবার কাঁপতে লাগল। দৃষ্টিটাও কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠল।

যেন কিছু একটা আন্দাজ করতে পারেন ভুবন। আর তাই সতর্কভাবে পা ফেলে এগোবার মতন আস্তে আস্তে কথা বলেন, 'ওটা কি—ওই হার কি তোমার—তোমার—'

'হ্যাঁ, রেবার—আমার স্ত্রীর।' হাতের মুঠ দুটো শক্ত করে ফেলল শিবতোষ। 'আমি তাকে এই হার গলায় পরতে দেব না—হার চুড়ি কিছুই পরতে দেব না। চুড়িগুলোও নিয়ে আসব—'

'ছি ছি ছি!' ভুবন এবার শক্ত হয়ে উঠলেন। 'এসব তুমি কী বলছ—হঠাৎ তুমি এমন—'

'হঠাৎ!' যেন ছেলেমানুষের মতন কথাটা বলে ফেলেছেন ভুবন, এমনভাবে শিবতোষ হাসতে লাগল: 'হঠাৎ? আপনি বলছেন হঠাৎ—হঠাৎ কিছু হয় না—হঠাৎ আমি কিছু করি না।'

মাথাটা নাড়তে লাগল শিবতোষ। ভুবনের দিকে না তাকিয়ে আকাশের চাঁদটা দেখতে লাগল সে।

ভুবন হতভম্ব হয়ে গেলেন। রোগা পাতলা নিরীহ একটা মানুষ কত রুক্ষ্ম নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে এবং তার কারণই বা কি থাকতে পারে, ভাবতে গিয়ে দু চার সেকেণ্ডের মধ্যে তিনি গলদঘর্ম হয়ে উঠলেন।

'এটা রইল।' শিবতোষ তেমনি উত্তেজিত অস্থির একটা ভঙ্গি করে উঠে দাঁড়াল। 'এই হার আপনার কাছে থাকবে—বুঝলেন।'

'শিবতোষ!' ভুবন উঠে দাঁড়ান। তাঁর গলার স্বর এখন কাঁপছিল। 'এই শিবতোষ—'

শিবতোষ ঘাড় ফেরায় না। সিঁড়ি-বারান্দার দিকে এগিয়ে চলেছে সে। পিছে পিছে ভুবনও এগোন।

'এটা নিয়ে যাও—এটা—' ভুবনের হাতের মুঠোয় মোড়কটা ধরা। যেন ভয়ংকর বিরক্ত হয়ে শিবতোষ ঘাড় ফেরাল, একটা সিঁড়িতে নেমে গেছে সে ইতিমধ্যে।

'কি বলছেন?'

'এটা নিয়ে যাও—এই হার আমি আমার কাছে রাখব না।' তিক্তস্বর ভুবনের।

'না রাখেন, জলে ফেলে দিন।' শিবতোষ সিঁড়ি ভাংগতে আবার ঘুরে দাঁড়াল। 'চরিত্রহীন মেয়ের গলায় আমি সোনার হার দেখতে চাই না।'

কথাটা ভুবন শুনলেন, শুনে আবার কেমন হতভম্ব হয়ে গেলেন। আর ঐ অবস্থায় রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখে চশমা থাকায় প্যাসেজের আলোর ডুমটাকে এখন অন্যরকম কিছু দেখলেন না তিনি। দেখছিলেন কেমন অস্থির উত্তেজনা নিয়ে শিবতোষ একটার পর একটা সিঁড়ি ভাংগছে। যেন হঠাৎ ভুল করে একসংগে দুটো সিঁড়ি ডিংগোতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। পাশের দেয়ালের সংগে কপালের ঠোকা লাগল।

বিচলিত হয়ে ভুবন নীচে নামবার জন্য সিঁড়ির দিকে পা বাড়ান, কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্থির হয়ে গেলেন, শক্ত হয়ে গেলেন। মীরা নীচে দাঁড়িয়ে। যেন সদর বন্ধ করবে বলে আগে থাকতেই সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ও।

আর তখন একটা অদ্ভুত দৃশ্য ভুবনের চোখে পড়ল। হুমড়ি খেয়ে শিবতোষ পড়ে গেল, কপালে আঘাত লাগল, অথচ মীরা তাকে ধরছে না উঠতে সাহায্য করছে না। কেমন নিস্পৃহ, নিরাসক্ত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। শিবতোষ কোনরকমে উঠে দাঁড়ায়, আঘাতের যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে, কপালের চামড়া ছড়ে গেল কি; না—জায়গাটা দেখতে দেখতে যেন ফুলে উঠেছে—আর সেই ফুলো জায়গাটা হাত দিয়ে চেপে ধরে শিবতোষ টলতে টলতে সদরের দিকে এগোচ্ছে। একবার, মাত্র একবারই করুণ বেদনাহত দুটি চোখের দৃষ্টি তুলে ধরে শিবতোষ মীরাকে দেখল। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে শিবতোষ যত না আঘাত পেল, তার চেয়ে যেন সহস্র গুণ বেশি আঘাত পেল এ-বাড়ির ঐ মেয়েটির ব্যবহারে। চশমা চোখে থাকার দরুণ ভুবন ওপরের রেলিং থেকে ঝুঁকে পড়ে দুটি মুখের প্রত্যেকটা রেখা ও রং পরিষ্কার দেখতে পেলেন।

শিবতোষের দিকে মীরা তাকাল না, যদি বা একবার তাকাল, দেখা গেল তার দুই চোখ থেকে ঘৃণা বিদ্বেষ তাচ্ছিল্য ক্রোধ সমানভাবে ঝরে পড়ছে—মমতা বা সহানুভূতির এতটুকু চিহ্ন নেই। তাই আর একবার সেদিকে চোখ না তুলে মাথা গুঁজে শিবতোষ আস্তে আস্তে সদর পার হয়ে রাস্তায় নেমে গেল। মীরা দরজা বন্ধ করে দিল। যেন কিছু একটা বুঝলেন ভুবন। গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে এধারের বারান্দায় চলে এলেন।

'দাদু, আমার ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের দেখবে না?'

'দেখাও।' ভুবন আবার স্থির হয়ে দাঁড়ান।

চটপটে হাতে বাদল সুতো বাঁধা সিগারেটের বাক্সগুলি খুলে ফেলল। ভুবন চমকে উঠলেন। শুকনো ডালিম পাতা না, কোথা থেকে এত এত বাদলাপোকা ধরে এনে নাতি প্রত্যেকটা বাক্সের মধ্যে পুরে তার রেলগাড়ির প্যাসেঞ্জার বানিয়েছে। এখন আর পোকাগুলি নীচে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে না বা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে না, সবগুলি মরে কাঠ হয়ে আছে।

'হি হি—অনেক প্যাসেঞ্জার আমার ট্রেনের, না দাদু?

চোখ থেকে চশমাটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে ভুবন সেটা হাতের মুঠোয় নিয়ে আরামকেদারায় ফিরে আসেন, তারপর ঘাড় তুলে আকাশ দেখেন। রজতশুভ্র চাঁদ আরো ওপরে উঠে এইটুকু হয়ে গেছে। এখন ওটাকে কিসের মতন দেখায় ভুবন চিন্তা করেন না, তাঁর ভীষণ মাথা ধরেছে। শিবতোষের মতন কপালের দুটো রগ আঙুল দিয়ে টিপে ধরে চুপ করে বসে থাকেন।

মন্ত্র

রমাপদ চৌধুরী

লালচাঁদ রোজাকে প্রথম দেখেছিলাম বেলাংডিহির ঝাঁপানে। আষাঢ় পঞ্চমীতে মেলা বসতো, লোক থিক থিক করতো মেলাতলায়। কাঁধের বাঁকে সাপের ঝাঁপি সাজিয়ে দূর দূর গাঁ থেকে আসতো বেদের দল। সাপ খেলাতে পুজো দিতে আসতো তারা বিষহরি জগৎগৌরী মায়ের থানে। আসতো গান গেয়ে, জরিবুটি বিষ-পাথর বেচে দু'পয়সা রোজগার করতে।

মদন মাল, লখাই সর্দার, কান্ত বেদে—ওরা সব তখন সারি দিয়ে বসেছে, সাপ খেলা দেখাচ্ছে সামনে লাল গামছা বিছিয়ে। যার যা ইচ্ছে দু'চার পয়সা ফেলে দিচ্ছে গামছায়, আর সিঁদুরটুপি সাপের ফণায় টোকা দিয়ে দিয়ে বাঁহাতের শূন্য মুঠিটা ডুগডুগির মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওস্তাদ একজন বলছে, আসল লাগ বটে গো, সিঁদুরটুপি লাগ। কামালো লাগ লয়।

অর্থাৎ বিষ কামানো সাপ নয়।

ওস্তাদকে বললাম, সাপের মন্তর শিখিয়ে দেবে ওস্তাদ?

সে হেসে উঠলো, তারপরই ইশারায় দেখিয়ে দিলো যার দিকে, কে জানতো সেই লালচাঁদ রোজা।

মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, বুক পর্যন্ত পাকা দাড়ি, গায়ে একটা গেরুয়া রঙে ছোপানো ফতুয়া, কোমরে শক্ত করে গিঁঠ দিয়ে বাঁধা

কাপড়টাও গেরুয়া রঙের, লুঙির মত করে পরা। কাঁধে একটা ঝোলা। আর চোখ দুটো তার জবাফুলের মত লাল, পাক দেয়া দড়ির মত শুকনো চেহারা।

লালচাঁদ কাছে আসতেই ফণা তোলা সাপটাকে ঝাঁপির ঢাকনায় চেপে দিয়ে দু'হাত কপালে ঠেকালো ওস্তাদ, বললে, গড় হই গো বাবাঠাকুর।

সঙ্গে সঙ্গে মদন মাল, লখাই সর্দার, কান্ত বেদেও বলে উঠলো, পেন্নাম গো বাবাঠাকুর পেন্নাম।

তারপর ওস্তাদ হেসে উঠে আমাকে দেখিয়ে বললে, লাগের মন্তর চায় গো ই খোকাবাবু।

আমার তখন কতই বা বয়স। তেরো কি চোদ্দ। বেলাংডিহির পাশের গাঁ পলাশ-বনিতে মামার বাড়িতে থেকে ইস্কুলে পড়ি। সাপের মন্তর শেখার তখন ভারী শখ।

লালচাঁদ হাসলো আমার দিকে তাকিয়ে। তারপর বললে, দিব, দিব বাপ, আসল লাগ চিনায় দিব, লাগবন্দী মন্তর শিখায় দিব। খড়ি গুণতে শিখায় দিব, বিষ লামানোর মন্তর শিখায় দিব, বিষপাথর চিনায় দিব। সাগরেদ হবি বাপ?

বলতে বলতে বটতলার দিকে চোখ পড়লো লালচাঁদের। বেদেনীর দল সেখানে তখন জটলা পাকিয়ে গান গাইছে। ভিড় করে শুনছে মেলার লোক।

সে গান শুনে আমরা ক' বন্ধু হেসেই খুন। কি গানের বাহার। কেবল মাঝে মাঝে ধুয়ো উঠছেঃ মরি হায় রে!

একটা বছর পনেরো বয়সের মেয়ে আবার নাচ জুড়ে দিয়েছে। নাচছে একবার করে আর গাইছেঃ

লাগের সাগর লাগর ডাগর
লদে লৌকা বায়রে!
মরি হায় রে!

লালচাঁদেরও চোখ পড়েছিল মেয়েটার দিকে। হঠাৎ হাসতে হাসতে ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনলো লালচাঁদ, বললে, ই কে বটে রে? লতুন লতুন লাগে?

কান্ত বেদে লজ্জায় মাথা নীচু করে হেসে হেসে বললে, আমার বেটি গো। পার্বতী!

—কান্তর বেটি তুই? পার্বতী? চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকালো লালচাঁদ, যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

না হবারই কথা। কারণ এক বছর আগে এই বিষহরির থানেই আমরাও দেখেছিলাম কান্ত বেদের মেয়েকে। একটা বছরে ও যে এত বড় হয়ে গেছে ভাবাই যায় না।

মেয়েটার গানের গলাও ছিল খুব মিষ্টি। সন্ধ্যের সময় আমরা ক' বন্ধু যখন গাঁয়ে ফিরছি, তখন ওর গলার সুর নকল করে আমরাও গাইছিঃ

কোলেতে লইয়ে মরা পতি
কলার মান্দাসে বেউলা সতী
বলে, মায়ের থানে আমি যাইরে!
জলে জলে ভেসসা চলে
পরাণে সতীর ডর লাইরে।

একটা করে কলি গেয়ে উঠি আর হেসে লুটোপুটি খাই।

কিন্তু লালচাঁদ রোজাকে কিছুতেই যেন মন থেকে মুছে ফেলতে পারি না। ওর সম্পর্কে কেমন একটা বিস্ময় আর কৌতূহল তখন আমাদের মনের মধ্যে চেয়ে বসে আছে।

লালচাঁদ রোজা, লালচাঁদ রোজা! চার-পাশের গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে যার কথা এতদিন শুনে এসেছি সেই মানুষটাকে এতদিনে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা?

গাঁয়ে ফিরে মামাকে মামীমাকে, গাঁয়ের সবাইকে, বিশেষ করে দিদিমাকে না শুনিয়ে স্বস্তি নেই যেন। চোরাদিঘির সামন্ত গিন্নী নাকি গলার হার খুলে দিয়েছিল লাল-চাঁদকে, তার ছেলেকে বাঁচিয়েছিল বলে। জনপুরের চাটুজ্যেরা দিয়েছিল গরদের

পাগড়ি আর একশো রূপোর টাকা। মোমিনগাঁয়ের ছোট হাজি দিয়েছিল দশ ভরি রূপোর রিকাবি ভর্তি টাকা আর শাল। আরো কত গল্প যে শুনতাম।

ভারী ইচ্ছে হত, লালচাঁদ কি করে বিষ নামায়, সাপে কাটা মানুষ বাঁচায়, নিজের চোখে দেখবার। কিন্তু আমার বাসনা যে এমনভাবে সফল হবে কে জানতো! এমনটি তো আমি চাই নি।

সেদিনের কথাটা বলতে গেলেই সমস্ত দৃশ্যটা যেন চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে।

আমি তখন সবে ইস্কুলে গিয়েছি। গাঁয়ের ইস্কুল, মাস্টারমশাইরা তখনো সকলে এসে পৌঁছন নি। আমরা সবাই হৈ চৈ করছি। হঠাৎ কে যেন ছুটতে ছুটতে এসে বললে, বীরু তোর দিদিমাকে লতায় কেটেছে!

লতায় কেটেছে? বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠলো। চোখ ঠেলে জল এলো। এত লোক থাকতে শেষে কিনা দিদিমাকে সাপে কাটলো?

ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এলাম। পিছনে পিছনে আরো অনেকে।

এসে দেখি ভিড় জমে গেছে উঠোনে। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম, কিন্তু আর এগোতে পারলাম না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল মরাইতলায়।

দেখলাম, রান্নাঘরের উঁচু দাওয়ায় খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে দিদিমা চুপচাপ বসে আছে মাথা নীচু করে। বাঁ হাতটার কাঁধ অবধি দড়ি দিয়ে এমন করে বাঁধা হয়েছে যে ফাঁকে ফাঁকে মাংস কেটে বেরিয়ে আসার উপক্রম।

মামাকে ধারে কাছে দেখতে পেলাম না, শুধু দেখলাম, পৈঠের ওপর বসে অঝোরে কাঁদছেন মামীমা, দুচোখের জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে।

গাঁয়ের লোক যার যা খুশি উপদেশ দিচ্ছে. দু'একজন হৈ চৈ করছে, আর সকলে চুপচাপ। ভয়ে আতঙ্কে যেন থমকে গেছে সকলে।

আমার বুকটাও তখন ধকধক করছে। কি হয়, কি হয়! এত লোকজন, কিন্তু সব মিলে কেমন একটা থমথমে ভাব।

আস্তে আস্তে শুনলাম সব খবর। পুজোয় বসেছিলেন দিদিমা। ঠাকুর ঘরের একপাশে চৌকির ওপর রাখা চালের বস্তা গুড়ের নাগরী। পুজো করতে করতে আনমনে বাঁ হাত বাড়িয়ে সেই চৌকির তলা থেকে পুজোর বাসন বের করতে গেছেন দিদিমা, অমন মনে হয়েছে কিসে যেন কামড়ে দিল। তখনও বুঝতে পারেন নি, বুঝতে পেরেছেন একটু পরেই চন্দ্রবোড়া সাপটাকে ধীরে ধীরে চৌকির তলা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে।

সাপটা চৌকাঠ পার হয়ে নতুনগোড়ে পুকুরটার দিকে চলে যেতেই চিৎকার করে উঠেছেন দিদিমা।—ও বৌ, বৌ, আমায় সাপে কামড়েছে, চন্দ্রবোড়া সাপে?

চন্দ্রবোড়ায় কেটেছে? তা হলে কি আর কোন আশা আছে? চোখ ঠেলে কান্না এলো আমার। ইচ্ছে হলো ছুটে যাই দিদিমার কাছে, মামীমার কাছে, জিগ্যেস করি সবাই যা বলাবলি করছে সত্যি কিনা। কিন্তু পারলাম না। সমস্ত পরিবেশটার মধ্যে কি যেন ছিল, তাই আমাকেও ভিড়ের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে চিৎকার উঠলো, জয় বিষহরি জগৎগৌরীর জয়!

রুক্ষ কর্কশ গলার চিৎকার ভেসে এলো বাইরের দরজা থেকে।

সবাই চমকে ফিরে তাকালো। আমিও।

আর পরমুহূর্তেই যাকে দেখতে পেলাম, একবারও আশা করি নি সে এই মুহূর্তে এসে পড়বে।

রোজা লালচাঁদ।

সেই বুক পর্যন্ত দাড়ি, গেরুয়া পাগড়ি, লাল চোখ আর পিঠে ঝোলা।

এসেই হাসি হাসি মুখে বললে, ডর নাই গো মাঠাকরুণ, ডর নাই। ওস্তাদের নিদ্দেশ, মা জগৎগৌরীর নিদ্দেশ, লাগে কেটেছে শুনলে সব ফেলে ছুট্যে আসতে হবে বাপ। কাঁদর পাড়ে খপর শুনেই ছুট্যে এয়েছি বাপ।

বলেই কাঁধের ঝোলা নামিয়ে খড়ি আর পাতা বের করে মাটির ওপর আঁকাজোক কাটতে শুরু করলে লালচাঁদ। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা গুঞ্জন উঠলো। মনের মধ্যে কেমন একটা খুশীর হাওয়া, একটা অদ্ভুত আনন্দ।

মনে হলো, জগৎগৌরী বিষহরি নিজেই যেন পাঠিয়ে দিয়েছেন লালচাঁদ রোজাকে। সকলের চোখেই এতক্ষণে আশা দেখা দিল। লালচাঁদ যখন এসে পৌঁছেছে তখন আর কোন ভয় নেই।

দিদিমাও একটু মুখ তুলে তাকালেন। সাপে কেটেছে, সে যেন দিদিমার নিজেরই লজ্জা। তাই মুখ নীচু করে এতক্ষণ বসে ছিলেন। লালচাঁদের কথা শুনে এবার মুখ তুলে তাকালেন। মনে হলো, দিদিমা যেন হাসলেন। সে-হাসিতে আশা আর আনন্দ খেলে গেল। যেন এতক্ষণে একটা ভরসা খুঁজে পেয়েছেন।

দিদিমার চেহারা ছিল খুব সুন্দর। যেমন লম্বা চওড়া, তেমনি ফর্সা। মাথায় চুল সব সাদা।

লালচাঁদ খড়ি পাতা শেষ করে তাই দিদিমার কাছে এগিয়ে এসে বললে, আ বাপ, তুমায় কাটলো চন্দবোড়া লাগে? সোনার পদ্ম রূপ যে মাগো, ই যে সাক্ষাৎ বিষহরি গৌরী মা আমার!

বলে ধীরে ধীরে উঠোনে দিদিমাকে শুইয়ে দিল লালচাঁদ। তারপর হাতের বাঁধন খুলে ঝোলা থেকে শিকড়বাকড় বের করে

ইস্পাত
ভারতের
শিল্পায়ণের
বনিয়াদ
দুর্গাপুর
ইস্পাত কারখানা
আপনাকে দেবে
পুল এবং ইমারত
নির্মাণের জন্য
ইস্পাত,
কৃষিকার্যের
সরঞ্জাম,
রেলওয়ের জন্য
স্লীপার, ফিশপ্লেট
এবং হুইল সেট।
ইস্কন
এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

বিষপাথরে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দিল কাটা জায়গায়।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের লোকরা বলে উঠলো, আর ভয় নেই। রোজার রাজা লালচাঁদ, ও যখন এসে গেছে আর ভয় নেই।

আমার মনও বললে, ভয় নেই।

ঝোলা থেকে এবার একটা নিমের ডাল বের করলে লালচাঁদ। তারপর দিদিমার মাথা থেকে পা অবধি সেটা বুলিয়ে বুলিয়ে মন্ত্র পড়তে শুরু করলে।

একবার করে পাতা বোলানো শেষ হয়, আর একটু করে আশা হয়।

সমস্ত গ্রাম যেন নিশ্চুপ, থমথম করছে চারদিক, আর তার মধ্যে লালচাঁদ মন্ত্র পড়েঃ

তেল তেল রায়ে তেল
বিষ উঠো লাগ উঠো
বিষহরি জগৎগোরী
লাগ বাঁধো, বিষ বাঁধো.....

এমনি একটা মন্ত্র পড়ে যায় লালচাঁদ, মাঝে মাঝে জরিবুটি বদলে দেয়। আর ক্রমাগত দিদিমার মাথা থেকে পা অবধি নিমের ডালটা বুলিয়ে বুলিয়ে বিষ নামাচ্ছে। কোদালের কোপে কোপে পুকুরের পাঁক তোলার চেয়েও বেশী পরিশ্রম যেন।

লালচাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দরদর করে ঘামছে লালচাঁদ, আর ক্রমশঃই যেন পাগলের মত হয়ে উঠছে। গলার স্বর উঠছে ক্রমে ক্রমে, নিস্তব্ধ বাড়িটা যেন কেঁপে উঠছে থেকে থেকে লালচাঁদের কর্কশ গলার মন্ত্রধ্বনিতে।

এমন সময় ছোটমামা ছুটতে ছুটতে ফিরে এলেন। সদরে গিয়েছিলেন ধানকল থেকে ধানবেচা টাকা আনতে। মাঝপথে খবর পেয়েই ফিরে এসেছেন।

ফিরে এসেই দিদিমার কাছে ছুটে গেলেন, কিন্তু তার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন ছোটমামা। কে যেন ছুটে গেল জল আর পাখা নিয়ে আসতে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরলো ছোটমামার।

শুধু হতাশ চোখে দিদিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মাকে সদরের ডাক্তারখানায় নিয়ে গেলে না কেন তোমরা?

লালচাঁদের কানে গেল কথাটা। বললে, বুলবেন না, উ কথা বুলবেন না ছোটকত্তা, মা বিষহরি পাপ লিবে। বলে আবার মন্ত্র পড়তে শুরু করলে।

দুপুর বিকেল হলো, বিকেল সন্ধ্যা।

শেষে একসময় বোঝা গেল, লালচাঁদের মন্ত্র মিথ্যে। লালচাঁদের বিষপাথর মিথ্যে।

পাশের গাঁয়ের ডাক্তার এসে পড়লেন। দিদিমার হাতখানা তুলে নিয়ে ধীরে ধীর নামিয়ে রাখলেন।

আমরা বুঝলাম, দিদিমা অনেক আগেই মারা গেছেন।

নিস্তব্ধ বাড়িটা আশায় আশায় এতক্ষণ থমকে চুপ করে ছিল, এবার সকলেই এক-সঙ্গে কেঁদে উঠলো।

আর লালচাঁদ হঠাৎ পাগলের মত চিৎকার করে বলে উঠলো, মা বিষহরি মিছা গো, জগৎগোরী মিছা। লাগবন্দী মিছা, বিষ লামানোর মন্তর মিছা। সোনার পদ্ম মাঠাকরুণেরে জিয়াইলো না গো, জিয়াইলো না।

বলে ধীরে ধীরে ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হন হন করে চলে গেল মাঠের আল ধরে। তখনো অঝোরে জল পড়ছে লালচাঁদের দু'চোখ বেয়ে।

এর পর আবার যে কোনদিন লালচাঁদের সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই পারি নি। ভাবতে পারিনি আমাদের গাঁয়ে এসেই ও ডেরা বাঁধবে।

আমাদের গাঁয়ের কাছাকাছি কোথাও ইস্কুল ছিল না বলেই মামা বাড়িতে গিয়ে থাকতাম। বছর তিনেক পরে আমাদের গাঁয়ে নতুন ইস্কুল হতেই ফিরে এলাম। আর ফিরে এসে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল লালচাঁদের সঙ্গে।

রায়পুকুরের পাড়ের অশথ গাছটার নীচে ভাঙা মাটির বাড়িটা এতদিন নির্জন পড়েছিল, খড়ের ছাউনি দেখে এগিয়ে গিয়েছিলাম কে আছে খোঁজ নিতে।

ডাকাডাকি শুনে প্রথম যে বেরিয়ে এলো তাকে প্রথমটা চিনতে পারি নি। কিন্তু তারপরই বুঝতে পারলাম। কান্ত বেদের মেয়ে পার্বতী, যাকে গান গাইতে দেখেছিলাম বেলাডাঙিহির ঝাঁপানে। শুধু বয়সটা বেড়েছে আরো, কিন্তু চেহারা ভেঙে পড়েছে।

ডাক শুনে লালচাঁদও বেরিয়ে এলো।

চমকে উঠে বললাম, লালচাঁদ তুমি?

লালচাঁদ হাসলো শুধু, জবাব দিলে না। বুঝলাম, ও আমাকে চিনতে পারে নি। চেনবার কথাও নয়।

কিন্তু পার্বতী এখানে কেন? লালচাঁদ কি......

জিগ্যেস করতেই লালচাঁদ হাসলো আবার, বললে, পার্বুতী রে বাপ, বেদের বেটি রোজার বউ হয়েছে।

কেন জানি না, মনটা বিষিয়ে উঠলো লালচাঁদের ওপর। হয়তো পার্বতীর মত বাচ্চা মেয়েটাকে বিয়ে করেছে বলে, হয়তো দিদিমাকে ও বাঁচাতে পারে নি বলে।

ফিরে এসে মাকে বললাম। বললাম, লালচাঁদ রোজাটা একটা জোচ্চোর। ঐ তো দিদিমাকে মেরে ফেলেছে। রোজা না আরো কিছু, সব বুজরুকি ওর।

আমার কেমন একটা ধারণাও হয়েছিল, লালচাঁদ জেনেশুনেই জোচ্চুরি করে বেড়ায়। টাকা রোজগারের ফন্দি। আর রাগ হতো ওই পার্বতী মেয়েটার ওপর।

মাঝে মাঝে বাড়ি বাড়ি চাল ভিক্ষে করতে আসতো পার্বতী।

একদিন মাকে বললাম, চাল দিও না ওকে।

পার্বতী হেসে বললে, কেনে, চাল দিবে নাই কেনে?

বললাম, তুই ওকে, ওই জোচ্চোরটাকে বিয়ে করলি কেন? তোদের জাতে লোক ছিল না?

পার্বতী হেসে উঠলো। হাত পা নেড়ে বলে উঠলো, বুলো না বুলো না, পেটে বিদ্যা লাই গো উঁদের, ভানুমতীর খেল দেখায় শুধু। কামালো লাগের মাথায় টোকা দিয়ে বলে আসল লাগ।

—আর লালচাঁদ সব জানে?

পার্বতী আবার হাসলো। বললে, উ

রোজা বটেন, ওস্তাদ বটেন। আসল লাগ চিনে উ, লাগবন্দী মন্তর জানে। উ খড়ি গুনতে জানেন গো, বিষ লামানোর মন্তর জানেন।

শুনে হেসে উঠলাম আমি, আর পার্বতী রেগে গেল। চাল ভিক্ষে না নিয়েই চলে গেল রাগে দপদপ করে পা ফেলে।

কিন্তু আমার বিস্ময় কাটলো না। তবে কি এই মোহে, এই অন্ধবিশ্বাসেই লালচাঁদের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে পার্বতী?

আর লালচাঁদ? দিদিমাকে যখন বাঁচাতে পারলো না তখনও বলেছিল, সব মন্ত্র মিথ্যে ওর। না কি তখন পালিয়ে আসার জন্যেই ওরকম অভিনয় করেছিল?

কিন্তু, না। শেষ অবধি লালচাঁদের বিশ্বাসেও হয়তো ফাটল ধরেছিল। তাই একদিন হঠাৎ কথায় কথায় প্রশ্ন করলে, হাসপাতালের ডাকতোরবাবু নাকি বিষ লামানোর মন্তর জানে, বাপ?

বললাম, হ্যাঁ, আজকাল সেই জন্যেই তো কেউ রোজা ডাকে না।

লালচাঁদ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, ঠিক বলেছেন গো বাপ, রোজার মন্তর মিছা বটে, রোজার মন্তর মিছা।

শুনে ভাবলাম, তবে কি সত্যিই এতদিন বুজরুকি দেখিয়ে গেছে ও? জোচ্চুরি করে গেছে জেনেশুনে?

আমার এ-প্রশ্নের জবাব যে এত তাড়াতাড়ি পাবো, কে জানতো।

সারা রাত বৃষ্টির পর ভোরের দিকে বৃষ্টিটা তখন একটু থেমেছে। হঠাৎ কোটালদের কে একজন এসে বললে, রোজার বউকে লতায় কেটেছে।

রোজার বউ পার্বতীকে? শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। অনুশোচনা হলো সেদিন তাকে গালাগালি দিয়েছিলাম বলে।

হরু কোটাল শুধু বললে, ক্যানেল হয়ে আজ্ঞে জল মিললো না, শুধু ট্যাক্সো দাও, আর পাহাড়ি সাপ লাও। সাপ ছিল না এ গাঁয়ে আজ্ঞে।

কিন্তু ওর কথা আমার কানে গেল না। ছুটতে ছুটতে চলে এলাম লালচাঁদের বাড়িতে। এসে দেখি জন দশেক লোক জুটে গেছে। আর লালচাঁদ কেবল তর্পাচ্ছে, বেদের বেটি রোজার বউ, সিঁদুরটুপি লাগ চিনলি না তুই? লাগে মাছ ভাবলি তুই, আ বাপ।

একটু একটু করে শুনলাম সব। ভোর বেলায় আরা থেকে মাছ তুলতে গিয়েছিল পার্বতী। আর ঘোলা জলে চিনতে পারেনি, মাছ ভেবে যেই ঝুড়িতে তুলতে গেছে, অমনি কামড় দিয়েছে একটা সিঁদুরটুপি সাপ।

ছুটতে ছুটতে ফিরে এসেছে। এসে বলেছে লালচাঁদকে।

দেখলাম, পার্বতী চুপচাপ বসে আছে দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। আর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে তার আঙুল থেকে। কাপড় ভিজে যাচ্ছে।

পণ্ডা কোটালকে বললাম, ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়। না, বরং হাসপাতালেই নিয়ে যা।

পণ্ডা বললে, গাড়ি জুতবো রোজা? সদরের হাসপাতালে নিয়ে যাবো?

বোকা বোকা চোখ মেলে আমাদের মুখের দিকে তাকালো লালচাঁদ। তারপর বললে, আ বাপ, উ কথা বুলেন না গো, মা বিষহরি জগৎগৌরী পাপ লিবে।

রেগে গিয়ে বললাম, অনেক তো মেরেছিস টাকা রোজগারের জন্যে, বউটাকে অন্তত বাঁচা।

শুনে হাসলো লালচাঁদ। তারপর ঝোলা থেকে জরিবুটি শিকড়বাকড় বের করতে করতে বললে, মা বিষহরির মন্তর কখুনও মিছা হয় গো বাপ, লাগবন্দী বিষ লামানোর মন্তর কখুনও মিছা হয়?

বলে, বিষপাথরে একটা শিকড় ঘষতে শুরু করলো।

তারাগুলো শীতে কাঁপছিল, জড়োসড়ো হয়ে আকাশতলায় এক পাশে বসে-ছিল। ও-পাশে অতিকৃশ চাঁদ। কুয়াশা ঘন হয়ে আছে। পৌষের আকাশ জ্যোতিহারা।

ধ্রুব কনকনে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে পুরু গরম মাফলারে গলা কান মাথা জড়াতে জড়াতে চারপাশ একবার ভাল করে দেখে নিল। ডাউন-প্লাটফর্ম তার মস্ত টিনের শেড্, দু-চারটি ক্লান্ত ঝাপসা বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অসাড়; ওভারব্রিজের সিঁড়িটা অন্ধকারের মোট নামিয়ে যেন বসে আছে ঠায়; একটি দুটি লালিত বৃক্ষ শীতে নির্জীব হয়ে দাঁড়িয়ে।

আপ্-প্লাটফর্মে ধ্রুব চায়ের স্টলের চৌকো উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে পর পর দু কাপ চা খেল। সর্বাঙ্গ আবৃত করে একটা ছোকরা তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে বসে ঢুলছে। যে মেল ট্রেনটায় ধ্রুব এসেছিল সেই ট্রেন এখন যোজন দূরে চলে গেছে; তার সঙ্গে যে দু চার জন নেমেছিল তাদের কেউ কেউ হি হি করতে করতে থার্ড ক্লাস বুকিং অফিসের দিকে যাত্রীশালায় গিয়ে ঢুকেছে; দু একজন অল্প একটু তফাতে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুমে ঢুকে পড়ে বিছানা বিছিয়ে নিয়েছে। এই প্লাটফর্ম এখন নির্জন। স্টেশনের অফিস কামরাগুলো নিস্তব্ধ, এ এস এম-এর অফিসটায় বাতি জ্বলছে, এক কোণে বস্তা পেতে জনা দু-চার কুলি আটক করা মালের মতন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

ধ্রুব তৈরী হয়ে নিল। লম্বা গরম কোটটার গলার বোতাম বন্ধ করল। হাতে হাতে ঘষল একটু। সিগারেট ধরাল, ভরা গলায় ধোঁয়া টানল, তারপর ছোট সুটকেশ বাঁ হাতে উঠিয়ে নিল।

তাকে অনেকটা হাঁটতে হবে, অনেকটা পথ; একটা টর্চ আনলে সুবিধে হত। ইদানীং তার টর্চের প্রয়োজন হয় না। সে কলকাতায় থাকে। তার আগে বর্ধমানে থাকবার সময় তার একটা টর্চ ছিল। ছেলেবেলায় কমলালেবু মুখে করে দৌড়ে ধ্রুব ফার্স্ট হয়েছিল, এবং তার কৃতিত্বের জন্যে একটা ভাল টর্চ পেয়েছিল। সেই টর্চের কথা এখন অকারণে মনে পড়ল ধ্রুবর। টর্চটা পরে মরচে পড়ে গলে গিয়েছিল।

ওভার ব্রিজের দিকে গেল না ধ্রুব। ও-রাস্তা দিয়ে যেতে হলে অনেক ঘুরে, কুকুরের তাড়া খেয়ে, বিশাল বিশাল গাছের তলায় জমা ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। এ-পথটা, যে-পথে ধ্রুব চলেছে, পথ নয়—বিপথ, প্লাটফর্ম শেষ করে ঢালুতে নামতে হবে, তারপর অজস্র রেল লাইন, পাথর, সিগন্যাল জয়েন্ট, তার। তবু এই পথ ধ্রুব নিল। রেলওয়ে ক্রসিংয়ের গেট পর্যন্ত ঝঞ্ঝাট, গেটের পর বড় রাস্তা, কাঁকরের রাস্তা।

প্লাটফর্মের প্রান্তে আসতেই ধ্রুব সচকিত হল। পাম্প-হাউসে ডায়নামো চলছে। সেই শব্দ। অব্যাহত নিঃশব্দতার মধ্যে শব্দটা এত স্পষ্ট প্রকম্পিত যে, ধ্রুব জলের ট্যাঁকি এবং বামনাকার যন্ত্র-গৃহের দিকে তাকিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করল, কোনো অস্বাভাবিকতা এখানে বিরাজিত কি না! দুর্গের স্তম্ভের মতন দীর্ঘ-দেহ কয়েকটি স্তম্ভ অন্ধকারে অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় কৃষ্ণবর্ণ জলাধার; ডায়নামো ধক্ ধক্ করে বাজছে, নিয়মিত ছন্দে বেজে যাচ্ছে। এই জলাধারের মাথার ওপর কুয়াশার মোটা রেশম জড়ানো শূন্যতা, আরও ঊর্দ্ধে ম্লান মুখ অতিকৃশ চাঁদ।

শীতের শনশনে হাওয়া মুখে লাগল। কাঁপল ধ্রুব, নাক যে বরফের কুচি হয়ে গেছে বুঝতে পারল। সিগারেটের মুখে যেটুকু আগুন আছে সেই আগুনের তাপ নাকে অনুভব করার জন্যে খুব দীর্ঘ করে ধোঁয়া টানল।

ডায়নামোর শব্দে প্রথমটায় কেমন বিচলিত হলেও এখন ধ্রুব তেমন অভাবনীয় কিছু আশা করল না। অমিয়া, তার মনে হল, অমিয়া বেঁচে আছে। বাঁচার অক্লান্ত পরি-শ্রমের পর, হয়ত সে ঘুমোচ্ছে।

ছাই গাদায় পা ডুবে গেল ধ্রুবর। এখানে রোজ ছাই জমে, রোজ। এঞ্জিনগুলো তাদের পরিত্যাজ্য আবর্জনা ফেলে যায়। জল নেবার স্থূল দেহ কলগুলো গাছের গুঁড়ির মতন দাঁড়িয়ে, তাদের মুখে লোহার শেকল বাঁধা জলের চোঙাগুলো ঝুলছে। অন্ধকারে ধ্রুবর মনে হল, এই লম্বা চোঙাগুলো তাকে এখানে দাঁড়াতে বলছে, দাঁড়িয়ে ছাই ঝেড়ে জল নিয়ে নতুন করে ঝম্প তৈরী করতে পরামর্শ দিচ্ছে।

ছাই গাদায় পা ডুবিয়ে কেমন একটা শব্দ করতে করতে ধ্রুব কয়েক পা এগিয়ে গেল। তার মনে হচ্ছিল, অমিয়া ছাই হয়ে যাবার পরও সে ঝেড়ে ফেলতে পারে নি, পুরোনো ব্যাপে এখনও সে চলছে। কেন চলছে? কেন?

এক[illegible] ঠাওর করে পথ দেখে নিল, [illegible] সময় যেমন কমলালেবু মুখে করে দৌড়ে ফিতে ছুঁতে পেরেছিল বলে সে একটা সুদৃশ্য টর্চ পেয়েছিল, তেমনি আর-এক সময় সে শিক্ষিত কুকুরের মতন মুখে করে একটা দ্রব্য কুড়িয়ে আনতে পেরেছিল বলে অমিয়াকে লাভ করেছিল। স্বভাবতই অমিয়া খুব প্রীত হয়েছিল। সদা-ক্রীত কাঁসার থালার মতন তাকে উজ্জ্বল ও বিচ্ছুরিত দেখাত। প্রত্যহ ব্যবহারে ব্যবহারে ঔজ্জ্বল্য মরে গেলেও অমিয়া মাঝে মাঝে একে পরিপাটি করে মেজে নেবার চেষ্টা করত, বোঝাতে চাইত সে ক্ষয়িত বা তার হৃদয় ব্যয়িত নয়।

ছাই গাদা থেকে পা উঠিয়ে নিল ধ্রুব। সামনে অন্ধকার। ডান দিকে ওয়েস্ট কেবিনের দোতলায় কাচের শার্সি টানা। ভেতরে বাতি জ্বলছে, সামনে দূরে শূন্যে কয়েকটা লাল বাতি যেন পেরেক দিয়ে কেউ পুঁতে রেখেছে।

শীতে দাঁত কনকন করছিল ধ্রুবর। সে কাঁপছিল. লাইনের পাথর মাড়িয়ে কাঠের স্লিপারে পা দেবার চেষ্টা করল। বেশ অবশ লাগছিল। ধ্রুবর মনে হল তার ঠাণ্ডা লেগে গেছে।

অমিয়ার জন্যে এই কষ্ট স্বীকার করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ এখন ধ্রুব খুঁজে পেল না। সে কেন এল, কেন?

আসবার সময় মীরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'হঠাৎ—?'

'একটু বাইরে যাব।'

'কোথায়?'

'আমার এক আত্মীয়ের কাছে।' ধ্রুব আত্মীয় বলেছিল, আত্মীয়া নয়।

'অসুখ?' মীরা উল বুনতে বুনতে ধ্রুবর মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন করে যেন বুঝতে পেরেছিল অসুখ না হলে এ-ভাবে ব্যস্ত হয়ে কেউ যায় না।

'বাড়াবাড়ি অসুখ। হয়ত বাঁচবে না।' ধ্রুব মীরার মাথার ও-পাশে হলুদ রঙের ক্যালেণ্ডার দেখছিল। ক্যালেণ্ডারে কোনো ধর্মীয় পুরুষের ছবি, অশ্ববাহিত রথে মেঘ-লোক দিয়ে চলেছে।

মীরা নীরবে কাঁঘর উল বুনে, বোনাটা কোলে রাখল। ধ্রুবর দিকে তাকাল, নোখের ডগায় সিঁথির কাছে কপাল একটু চুলকে নিল। 'কবে ফিরবে?'

ধ্রুব বলতে পারত, শীঘ্র—দু এক দিনের মধ্যেই। ধ্রুব কিছু বলে নি। তার মনে হয়েছিল, তার ফেরার ঠিক নেই। সে জানে না কবে ফিরবে। কেন মনে হয়েছিল কে জানে।

রেল-লাইনের স্লিপারে পা দিয়ে দিয়ে খানিকটা এল ধ্রুব। তার পা ঠিক মতন মাপ করে স্লিপারে পড়ছে না। শীতে শিরাগুলো সংকুচিত হয়ে আছে। বার দুই হোঁচট খেল, এবং বুঝতে পারল—অন্ধকারে এভাবে মাপা পায়ের পথ চলা উচিত না। সে পড়ে যেতে পারে।

লাইনের পাশে নেমে ধ্রুব আকাশের দিকে একবার তাকাল, চাঁদের আলো বাসি ফুলের রঙে সেজেছে, সেজে কুয়াশার পরদার আড়ালে বসে আছে।

উত্তর পূব দক্ষিণ পশ্চিম—কোন দিক থেকে যে ধারালো ক্ষিপ্র হাওয়া বয়ে যাচ্ছে ধ্রুব বুঝতে পারছিল না। শীতে তার দাঁতে দাঁত লাগছিল, মাংস থর থর করে কেঁপে উঠছিল, মনে হচ্ছিল তার শরীর এবং বস্ত্র সব ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে।

এ-সময় শূন্যে পেরেক দিয়ে আঁটা লাল আলোর একটি আলো যেন আচমকা খুলে গেল, গিয়ে সবুজ হল। ধ্রুব এ-যাবৎ এই আলোর কথা তেমন করে ভাবে নি, চার পাঁচটি লালের মধ্যে একটি আচমকা সবুজ হয়ে গেলে ধ্রুবর খেয়াল হল, এতক্ষণ তার পথের সামনে ওরা রক্তচক্ষু তুলে নিষেধ করছিল আসতে, একযোগে বাধা দিচ্ছিল; এখন সমবেত বাধার মধ্যে একজন যেন সদয় হল, স্বীকার করে নিল ধ্রুব আসতে পারে।

ধ্রুব যখন প্রথম অমিয়ার কাছে এসেছিল —তখনও এমনি উন্মুক্ত সুসজ্জিত বাধা ছিল। তার সামনে পথরোধ করে ওরা দাঁড়িয়েছিল, অমিয়ার প্রার্থীরা। এদের মধ্যে একজন ছিল চতুর, অন্যজন পারদর্শী, তৃতীয়জন সারবান, এবং চতুর্থ ইত্যাদি জনেরা কোনো না কোনো গুণে সমন্বিত।

'তোমার স্বয়ংবর সভায় আমি কি ছিলাম, অমিয়া?' ধ্রুব একদিন প্রশ্ন করেছিল।

'নল। নল রাজা।' অমিয়া হৃষ্ট তৃপ্ত চিত্তে বলেছিল।

'নল?' ধ্রুব চমকিত হয়েছিল।

'নয়ত তোমার গলায় মালা দিলাম কেন? আরও ত ছিল।'

ধ্রুব গৌরকান্তি নবনী-কোমল স্ত্রীকে স্নেহ করতে করতে এই গল্পটা স্ত্রীর মুখে নতুন করে শুনেছিল। অমিয়া বলে-ছিল, 'স্বয়ংবর সভায় দময়ন্তী কি করে নলকে চিনেছিল তুমি জান না?'

'মনে নেই।'

'আমি বলছি: মনে রেখ।' অমিয়া স্বামীর হাত নিজের হৃদপিণ্ডের কাছে টেনে নিয়ে, যেন হৃদয়কে কথা বলতে দিচ্ছে, এমন করে গল্পটা বলল: স্বয়ংবর সভায় চারজন দেবতা এসেছিল ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম। তারা নলের মূর্তি ধরে সভায় বসেছিল। দময়ন্তী চিনতে পারছিল না, কে দেবতা, কে নল। তারপর দময়ন্তীর প্রার্থনায় দেবতারা দেবরূপ ধরল। তখন দময়ন্তী দেখল, দেবতাদের গায়ে স্বেদ নেই, চক্ষু অপলক, মালা অম্লান, অঙ্গ ধূলিশূন্য, ভূমি স্পর্শ না করে তারা বসে আছে।

'আর নল?' ধ্রুব বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল।

'নলের ছায়া আছে, তার গলার মালা ম্লান, শরীরে ধুলো লেগে আছে, গায়ে স্বেদ, চোখে পলক পড়ছে। নল মাটি স্পর্শ করে বসে আছে।' অমিয়া আস্তে আস্তে বলল; বলে থামল একটু, ধ্রুবর গলার কাছে ঠোঁট রাখল, খুব চাপা গলায় বলল, 'গল্পটা মনে রেখ; মনে রেখ।'

ধ্রুব কিছুদিন এই গল্প মনে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এই সংসার গল্প মনে রাখার জায়গা নয়। বর্ধমান শহরে পুরোনো মরচে পড়া টিনের শেড বেঁধে নল সেজে

বসে থাকা যায় না। অমিয়া লক্ষ্য করে দেখে নি, ধ্রুবর ছায়া দিনে দিনে কী রকম জন্তুর মতন হয়ে যাচ্ছে, তার গলার মালা থেকে একে একে ফুল শুকিয়ে পড়ে গেছে এবং কখন সুতোটা ছিঁড়ে গেছে। সারা দিন মোটর কারখানায় প্রাণান্ত পরিশ্রম করে ফিরে আসার পর ধুলো এবং স্বেদ নয়—মোবিলে গ্রীজে পেট্রলে ময়লায়—ময়লায়—ধ্রুব ক্লেদাক্ত হয়ে থাকত।

আমি মাটি স্পর্শ করে ছিলাম না, মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম, তুমি কি দেখ নি? ধ্রুব কাতর যন্ত্রণাবিদ্ধ গলায় মনে মনে বলল। আমার সেই পতিত হতাশ চেহারা দেখে তোমার কখনও কি মনে হয় নি নলরাজার গল্পটা ভুলে যাওয়া উচিত।

ধ্রুব গল্পটা ভুলেছিল। বরং সে চাইত, অমিয়া এই প্রাচীন উপাখ্যানটি ভুলে গিয়ে ধ্রুব—ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার নামক মানুষটিকে দেখুক। অমিয়া কেন স্বীকার করে নেবে না 'মজুমদার মোটার ওয়ার্কস'-এর যে মানুষটি রাত করে বাড়ি ফিরে ম্লান ক্লান্ত কাতর মুখে বসে বসে মাথার চুল ছেঁড়ে সেই ধ্রুব মজুমদার তার স্বামী।

'তুমি দয়া করে আমাকে দেখ।' ধ্রুব বলেছিল, 'আমার যা আছে, আমি যা—সেটা দেখ।'

'তোমায় দেখছি না, ত কাকে দেখছি।'

'না, আমায় তুমি দেখছ না। আমি তোমার গল্পের রাজা নই।'

'আমার গল্পে রাজাটাকেই তুমি দেখেছ। ..যখন আর রাজার রাজ্যপাট ছিল না তখন থেকে তাকে দেখছ না কেন।'

ধ্রুব স্ত্রীর এই হেঁয়ালি, এই নির্বোধের বিশ্বাস বা স্বপ্নকে শেষে ঘৃণা করেছিল। তার রাগ হত, ভাবতে বিশ্রী লাগত যে, অমিয়া যখন দেখছে তাদের মাথার ওপর বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়েছে তখনও তার হুঁশ হচ্ছে না। একদিন খুব রূঢ় ভাবেই ধ্রুব বলেছিল, 'আমি যদি জানতাম আমার ভালবাসাকে তুমি শূন্যে ফানুস করে ঝুলিয়ে রাখবে—আমি তোমায় বিয়ে করতাম না।'

'আমি কোনো কিছু শূন্যে ঝুলিয়ে রাখি নি।'

'রেখেছ। তুমি বুঝবে না, তোমায় বোঝান যাবে না।'

ধ্রুবর মনে হয়েছিল অমিয়াকে বলে, বস্তুত সে একটা শিক্ষিত কুকুরের মতন অমিয়ার কাছে তার কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। অমিয়া তার আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য দেখিয়ে দিয়েছিল এবং ধ্রুব সেটা মুখে করে কুড়িয়ে এনে দিয়েছে।

কথাটা ধ্রুব বলে নি। হয়ত বলতে বেধেছিল। কিংবা ধ্রুব ভেবেছিল, বলে লাভ নেই।

একটা ট্রেন আসছে। সবুজ আলো পেয়েছে বলে ট্রেনটা এই জটিল ভবিষ্যতের দিকে তার মাথার মণি জেলে অক্লেশে চলে আসতে পারছে। ধ্রুব সামনে একটি আগন্তুক অন্ধকারের কপালে বাঁধা আলোর ফিনকি দেখতে পেল। এবং গুরুগুরু শব্দটা শুনতে লাগল।

শীত তাকে অর্ধ অজ্ঞান করেছে। বাতাসের ক্ষুরধার আঘাতগুলি ধ্রুব এখন কেমন অসাড় যন্ত্রণায় অনুভব করছিল। তার মনে হচ্ছিল, নিষ্ঠুর চন্দ্র, নির্দয় কুয়াশা এবং এই মৃত্যুসম শীত তাকে অমিয়ার কাছে পৌঁছতে দেবে না।

ধ্রুব আবার একটা সিগারেট ধরাল। দু চার পলকের মধ্যে বার ছয় গলা ভরতি করে করে ধোঁয়া টানল, দু হাত পাখির বাসা করে সিগারেটের আগুনটা তালুর মধ্যে রাখল, এবং আগত ট্রেনটার আলো লক্ষ্য করতে লাগল। শূন্যে এবং কুয়াশায় ফরসা আলো স্রোতের মত ঢেলে দিয়ে গাড়িটা আসছে। ধ্রুবর মনে হল, এই আলো থাকতে থাকতে সে খানিকটা এগিয়ে যেতে পারে। সুটকেশ উঠিয়ে নিল ধ্রুব।

মীরা। মীরার কথা চকিতে একবার মনে এল। মীরা ঘুমোচ্ছে। তুলোর লেপ তার গলা পর্যন্ত টানা। তার ঘরের জানলা বন্ধ। মীরার ঘরে শীত নেই, যেন পশমে মোড়া। এই ঘর ধ্রুবকে বার বার অন্যমনস্ক করে।

ট্রেনের গুরু গুরু ধ্বনি এই সুপ্ত স্তব্ধ চরাচরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। ধ্রুবর মনে হল, সে যেন এক সুবিশাল গুহার মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে আছে। তার চতুর্দিকে অনায়ত্ত অন্ধকারের প্রাচীর।

ট্রেনটা কাছে এল। তার চাকার ঘর্ষিত শব্দের গুরু গর্জন হঠাৎ স্থায়ী খাদে নেমে এল এবং ধাবমান এঞ্জিনের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ধ্রুব শুনতে পেল। এক পাশে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ধ্রুব। এঞ্জিনের কাটা দরজা দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের লালচে আভা, একটি দুটি আলোর বিন্দু এবং মনুষ্যছায়া ক্ষণিকের মতন দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল। মালগাড়িগুলো চোখের সামনে অবিরাম চলে যাচ্ছে। তাদের আকৃতি অবয়ব কিছুই ঠাওর করা যাচ্ছিল না, অন্ধকারে যেন কালো একটা পরদা ক্রমাগত তার চোখের সামনে কেউ গুটিয়ে নিচ্ছে।

অবশেষে সামনেটা পরিষ্কার হল। ট্রেন

"সাবধান দেবী দশভুজা,
মহিষাসুর আমি
দেবেন্দ্র বিজয়ী"
প্রতিবছর দুর্গাপূজার উৎসবে বাংলার
কোন এক গ্রামে যাত্রা গানের পালায় চন্দ্রমোহন
মহিষাসুরের পার্ট করে। সুগঠিত
স্বাস্থ্যবান, পেশীবহুল তার দেহ, একমাথা
মিশকালো বাবড়ীচুল নিয়ে, সে
যখন তার পাঠ উদাত্ত কণ্ঠে বলে, দর্শকদের
মধ্যে পড়ে হাততালি, উচ্ছ্বসিত
সে প্রশংসা পায় সকলের নিকট থেকে।
বহুবছর ধরেই চন্দ্রমোহন ওই পার্ট
করছে। আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়ে অনেক
কিছুই ওর বদলে গেছে। মাথার ওই
ঘনকালো বাবড়ীচুল ছাড়া। এর কারণ চন্দ্রমোহন
চুলে নিয়মিত ব্যবহার করে
লোমা
পৃথিবীর সর্বত্র প্রশংসিত হেয়ার
অয়েল ও হেয়ার ডার্কেনার
একমাত্র প্রতিনিধি ও রপ্তানীকারক :
এম. এম. কাম্বাটওয়ালা. আমেদাবাদ। (ভারত)
প্রতিনিধি : সি. নরোত্তম এ্যাণ্ড কোং বোম্বাই—২।

চলে গেছে। শব্দটা কানে বাজতে বাজতে এক সময় অতি ক্ষীণ হল, ক্রমে মিলিয়ে গেল, এবং স্তব্ধতা আবার যথারীতি ঘনীভূত হয়ে উঠল।

ফটকের কাছে এসে পড়েছিল ধ্রুব। আপাতত আর কয়েক পা, তারপর কাঁকরের চওড়া রাস্তা।

ধ্রুব যথাসম্ভব সাবধানে লাইন বাঁচিয়ে, সিগন্যালের তার টপকে ফটকের পাথর বাঁধানো জমিতে পা দিল।

আসবার সময় মীরাকে বলে এল হত, 'আমি অমিয়ার কাছে যাচ্ছি।'

'অমিয়া কে?' মীরা চোখ তুলে তাকাত; তার চোখে অফুরন্ত অবাক দৃষ্টি।

'আমার আত্মীয়া।'

'তোমার আত্মীয়া! কই, আগে শুনি নি ত!'

'বলা হয় নি।...তা ছাড়া তার থাকা না থাকা সমান।'

'কেন?' মীরা তার ঠোঁটের পুরু জায়গাটায় দাঁতের দাগ বসাত। মীরার ঠোঁটের এক জায়গায় বরবটির দানার মতন পুরু একটু মাংস আছে।

'সমান কেন—?' মীরা আবার বলত।

'সে অসুস্থ। সে আজ চার বছর ধরে অসুস্থ। প্রায় মৃত বলা যায়।' ধ্রুব মীরাকে যথাসম্ভব সংযত হয়ে বোঝাবার চেষ্টা করত, 'আমার সঙ্গে বহুকাল তার কোনো যোগাযোগ নেই।' যোগাযোগ নেই—কথাটা কি মিথ্যে হত!

মীরা দুঃখিত হত না। কিন্তু তার মুখে দুঃখের প্রসাধন থাকত। স্বভাবতই মীরার মুখে পাতলা করে দুঃখের একটি প্রলেপ মাখানো আছে। ফলে দুঃখিত না হলেও মীরাকে দুঃখিতের মতন দেখাত।

'তা হলে অযথা কেন যাবে? যোগাযোগ যখন নেই—' মীরা বুকের ওপর কাপড় একটু ছিমছাম করে নিত, 'এই শীতে অকারণ কষ্ট!'

ধ্রুবের আর ইচ্ছে করত না আসতে। মীরার সুরক্ষিত স্তনযুগলের আকর্ষণ তাকে নতুন আলমারির চাবির মতন প্রলোভিত করত। অথচ, এই সুরম্য দেহ-আসবাব ধ্রুবের কাছে পরক্ষণেই খুব ফাঁকা মনে হত।

'যাওয়া উচিত।' ধ্রুব আড়ষ্ট গলায় বলত, 'একবার যাওয়া উচিত।'

রাস্তায় উঠে ধ্রুব কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করল। তার পক্ষে এখন প্রতি মুহূর্তে পথ দেখে চলতে হবে না। সে সহজ পায়ে হাঁটতে পারে, তার পথ এখন সামনে প্রসারিত হয়ে আছে। মাঝে মাঝে একটি করে মিউনিসিপালিটির বাতি।

আকাশের দিকে তাকাল ধ্রুব। মনে হল, শীতে জড়সড় তারাগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে। কৃশকায় চাঁদ আরও ক্ষীণ হয়ে গেছে, এত ক্ষীণ যে প্রতি মুহূর্তে তার অপসারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

অনেকখানি পথ একা হেঁটে, পৌষের জর্জর শীতে হিম হয়ে, সর্বাঙ্গ অসাড় অজ্ঞান করে ধ্রুব শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছল।

অমিয়া নিদ্রিত ছিল। তার শিয়রে একটি মলিন বাতি জ্বলছিল। এক পাশে একটা কাঠের তক্তার ওপর শিশি বোতল স্তূপীকৃত হয়ে ছিল।

ঘরটা ছোট। খড়ের গন্ধ চুঁইয়ে পড়ছে মাথা দিয়ে, মাটির দেওয়াল ঠাণ্ডা। আলকাতরার রঙ দিয়ে অর্ধেকটা দেওয়াল কালো করে রাঙানো।

একটা জোনাকি ঘরের চটের শিলিঙের কাছে জ্বলছিল, বিন্দুর মতন নীল হয়ে উড়ে উড়ে জ্বলছিল।

বসার কোনো জায়গা খুঁজে পেল না ধ্রুব। এক কোণে একটা বেতের ভাঙা চেয়ারের ওপর কিছু বাসি শাড়ি জামা পড়ে আছে। এখানকার ঝি দরজা খুলে দিয়ে আবার কোথায় যেন চলে গেছে।

মলিন আলোয় অমিয়াকে কালির ফিকে রেখার মতন দেখাচ্ছে। ধ্রুব কান গলায় জড়ানো মাফলারটা খুলে ফেলল। তার একটা সিগারেট খাবার ইচ্ছে করছিল, খেল না।

ভাঙা বেতের চেয়ার থেকে শাড়ি জামা মাটিতে নামিয়ে রেখে ধ্রুব বসল। তাকে বসে থাকতে হবে। অমিয়ার ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে। এই অপেক্ষা ভীষণ ক্লান্তিকর, অসহ্য; তবু ধ্রুবের বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

বসে বসে ধ্রুব এই দীন ঘরের দেওয়ালে লেপা আলকাতরা দেখতে লাগল। এখানের মাটিতে বোধ হয় পোকা হয়, কিংবা...কিংবা কি হয় বুঝতে পারল না ধ্রুব। বীজাণু-হীনতার জন্যেও আলকাতরার প্রলেপ হতে পারে—ধ্রুবের মনে হল একবার।

জোনাকিটা উড়ছে। উড়ে উড়ে একবার অমিয়ার মুখের কাছে নেমে এসেছিল—তারপর কোনো গন্ধ পেয়ে উড়ে গেল।

ধ্রুবও একদিন সরে গিয়েছিল। অমিয়া তখন দুর্দিনের নখরাঘাতে নির্জীব হয়ে এসেছে। তবু তার বিশ্বাস, স্বামী তাকে বাঁচাবে। বাঁচানোর কোনো উপায় ছিল না ধ্রুবের। সে ক্রমাগত হেরে যাচ্ছিল।

'কি যে করব, আমি আর ভেবে পাচ্ছি না, অমিয়া।' ধ্রুব তখন বলত, 'বাড়ি বেচে দিয়ে ভুল করেছি। এই জায়গাটা বদমাশ আর নচ্ছারের জায়গা, আমায় এরা জব্দ করছে।'

'তুমি আর ধার নিয়ো না।'

'না নিয়ে উপায় নেই। প্রমথ দত্তরা বলছে, এ-সময় কারখানা গুটিয়ে দিলে সিংহীরা দুয়ো দেবে।'

'সংসারে কে তোমায় দুয়ো দেবে তার জেদে তুমি আরও ডুববে?'

'ডুবব। আমি ডুবব, তবু আমি ছাড়ব না।'

ধ্রুবের তখন মন্দ ভাগ্য, ধ্রুবের তখন ভয়ংকর অহমিকা, ধ্রুবের তখন রেষারেষির নেশা। সে দত্তদের কাছ থেকে দু হাত বাড়িয়ে ঋণ টেনে নিল।

ধ্রুবের কেমন বরাবরই দম্ভ ছিল সে প্রায় বিশ্বকর্মা। অথচ নিজের কারখানায় ধ্রুব লাটের মতন বসে থাকত, কারণ সে সিংহীদের দেখাতে চাইত, ধ্রুব তাদের চেয়ে ছোট নয়। সন্ধ্যে বেলায় দত্তদের সঙ্গে তার যে কথা হত, সেই কথা থেকে কারও বোঝার উপায় ছিল না, তার কারখানায় দু একটা খাঁচা খোলা বুড়ো মরা লরি ছাড়া আর কেউ তেল খায়, কলকব্জা মেরামতের জন্যে পড়ে থাকে।

মানুষ যেমন করে পা ফসকে খাড়া টিলা থেকে গড়িয়ে পড়লে আর পা রাখতে জায়গা পায় না, ধ্রুব তেমনি করে গড়িয়ে পড়ছিল। ধ্রুব জানত না, দত্তরা সিংহীদের সঙ্গে তলায় তলায় হাত মেলাচ্ছে। একদিন ধ্রুব সেটা জানতে পারল, কিন্তু ততদিনে বিশ্বকর্মা পুজোয় তার কারখানা পুড়েছে।

'শয়তানি।' ধ্রুব দাঁতে দাঁত চেপে অমিয়াকে বলল, 'আমি মামলা করব দত্তদের নামে।'

অবশ্য ধ্রুব মামলা করবার আগেই দত্তরা মামলা করেছিল।

'তোমার জেদ ছাড়ো।' অমিয়া বলেছিল, 'মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ, এ-কারখানা তুমি আর রাখতে পারবে না।'

'দেখি, রাখতে পারি কি না!'

ধ্রুব তার গরিমাকে প্রশ্রয় দিল। পোড়া ভাঙা তোবড়ানো টিন আবার নতুন করে বেঁধে নিল। বিশ্বকর্মা মিস্ত্রী হয়ে কালি ঝুলি মাখতে লাগল। সে ভেবেছিল তার নামে লোকে ছুটে আসবে। কেউ আসে নি। যা এল তার নাম আদালতের সমন। দত্তরা মামলায় জিতেছে। অমিয়া তখন রোগ শয্যায়। ময়রাপট্টির এক গলির মধ্যে বাস ধ্রুবদের।

ধ্রুব সর্বহারা নিঃস্বের মতন মুখ নিয়ে অনেক রাত্রে ফিরে এল। ধেনো মদ গিলেছে।

'তোমার রাজার রাজত্বটা সত্যি সত্যি গেল, অমিয়া।' ধ্রুব হাহাকার করে বলল।
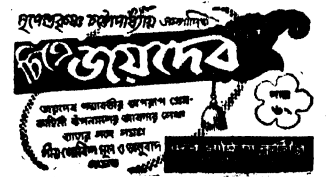
'যাক্।'

'যাক্—!'

'যাবে জানতুম।'

'এবার কি করবে?'

'তোমার ওপর ভরসা করে থাকব।'

'ভিখিরির ওপর ভরসা!' ধ্রুব নিজেকে নিজে পরিহাস করেছিল।

অমিয়া কিন্তু ভরসা করেই ছিল। তার তখন ভরসা করার মতন সময় নয়, তবু অমিয়া কোনোদিন বলল না, আমি ক'দিন বাবা-দাদার কাছে গিয়ে থাকি। ওখানে আমার চিকিৎসাটা অন্তত হবে।

ধ্রুবর মনে হত, অমিয়া তার নিজের বিশ্বাসের সততা দেখাচ্ছে। সে ধ্রুবর কথা গ্রাহ্য করছে না। সে ভেবে দেখছে না, গল্পটা শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে।

দত্তরা কারখানা নিয়ে নিল। তখন ধ্রুব সর্বস্বান্ত, অমিয়া প্রত্যহ রাত্রি-জ্বরে ভুগছে। শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার গলি আর কাঁচা বাড়িতে বাস। টর্চ জ্বেলে খিকথিকে নালি পেরিয়ে ময়লা টপকে টপকে বাড়ি আসতে হত। সিংহীরা তাকে চাকরি দিতে চেয়েছিল, ধ্রুব নেয় নি। পরিবর্তে সে দু-চার জন মিস্ত্রীর সঙ্গে মিশে ভাটিখানায় যেত এবং রাত্রে নেশা টুটে গেলে বিছানার ওপর উঠে বসে হাহাকার করত।

এই শহরে সে আর টিকতে পারছিল না। তার মনে হত সবাই তাকে অসম্মান করছে, করুণা করছে; তার দিকে তাকিয়ে দত্তরা হাসছে, সিংহীরা চুক্ চুক্ শব্দ করছে জিবে।

তখন ধ্রুব একদিন পালিয়ে যেতে চাইল। 'চলো, পালিয়ে যাই।'

'পালিয়ে—!' অমিয়া লণ্ঠনটা হাত বাড়িয়ে টেনে নেবার চেষ্টা করল।

'পালিয়ে নয়ত কি শোভাযাত্রা করে!' ধ্রুব রুক্ষ গলায় বলেছিল।

'আমি তোমার সঙ্গে সব জায়গায় যেতে রাজী; কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'পালিয়ে নয়।'

'পালিয়ে নয়!' ধ্রুব পরিহাস করে তিক্ত হাসি হেসেছিল, 'বেশ ত, তুমি যাচ্ছ ওই সিংহীদের বলো, তারা ফুলের মালা পরিয়ে রোশনাই আলো জেবলে শহর ঘুরিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

আবার একদিন ধ্রুব বলল, 'অমিয়া, আর নয়; চলো পালিয়ে যাই।'

'কোথায়?'

'যেখানে হোক। এ-ভাবে আর চলে না।'

'চলবে।'

'কোথ্ থেকে চলবে? তোমার এ-রকম অসুখ।'

'আমি সহ্য করে আছি। তুমি সহ্য করে থাক। তুমি নিজের ওপর ভরসা রাখো। একদিন আমরা পথ দেখতে পাব।'

'পাবে না, কোনোদিনই পাবে না। তুমি মরবে, আমাকেও মারবে।'

'ছি ছি, ও-কথা বলো না। তোমায় আমি রেখে যাব।'

অমিয়া বলেছিল, ধ্রুবকে সে রেখে যাবে; কিন্তু তার আগেই ধ্রুব পালাল। যাবার আগের দিন অমিয়ার হাত থেকে বিয়ের শেষ সম্বল আঙটিটা চেয়ে নিয়েছিল।

ধ্রুব ভেবেছিল, অমিয়া তার বাবার কাছে ফিরে যাবে। অমিয়ার বাবা এবং দাদারা বেঁচে ছিল তখন, তাদের সচ্ছলতা কম ছিল না। অমিয়া যায় নি।

এই নির্বুদ্ধিতা কেন হল অমিয়ার ধ্রুব জানে না। অমিয়া সম্ভবত এটুকুও বোঝে নি, ধ্রুব অমিয়ার ব্যাধিকেও ভয় পাচ্ছিল, তার মনে হচ্ছিল এ-ব্যাধি অমিয়াকে ও তাকে দুজনকেই মারবে। ধ্রুবর সাধ্য ছিল না, অমিয়াকে নীরোগ করে। তার কাছে এই ভার ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল—ভয়ঙ্কর।

আমি বাঁচব, আমার বাঁচা উচিত; আমি এই সাংঘাতিক করাতের মধ্যে গলা দিয়ে মরতে পারব না; আমার পক্ষে মূর্খের মতন বুক পেতে সংসারের ছররা খেয়ে বুক ঝাঁঝরা করা সম্ভব নয়—বস্তুত এই তীব্র আত্মবোধে নিজেকে রক্ষা করার বাসনায় ধ্রুব একদিন চলে গেল।

অমিয়া পড়ে থাকল।

তারপর চার বছর ধ্রুব বুদ্ধিমানের মতন নিজেকে বাঁচিয়েছে। সে আর বোকামি করে নি, দম্ভ দমন করে রেখেছে; সে চতুর হয়েছে। শঠতা সে আয়ত্ত করেছে। দত্তদের কাছে একদিন সে তার রাজত্ব বেচে দিতে পারে নি, শেষাবধি লড়েছে; আজ সে রাজ গরিমা বেচে দিয়েছে। প্রায় চল্লিশ বছরে পা দিয়ে ধ্রুব বুঝেছে, সংক্ষিপ্ত জীবন সংগ্রামে অপব্যয় করা নির্বুদ্ধিতা।

ধ্রুবর খেয়াল হল বাইরে কেমন ঝাপসা ফরসা। প্রথমে মনে হল, বুঝি চাঁদটা এতক্ষণে হাত দিয়ে কুয়াশার পরদা গুটিয়ে নিয়ে মুখ বাড়িয়েছে; পরক্ষণেই ধ্রুব বুঝতে পারল, রাত শেষ হয়ে আসছে।

বাইরে যে এত কুয়াশা জমেছিল সারা রাত ধরে ধ্রুব বুঝতে পারে নি। সব সাদা হয়ে গেছে। ভেজা পাতলা থানের মতন দেখাচ্ছে। কয়েকটা কাক ডাকল। ভোরের গলায় কাকগুলোও যেন নরম করে ডাকতে পারে।

আরও একটু আলো ফুটলে করবী ঝোপ দেখতে পেল ধ্রুব। হিমে সর্বাঙ্গ ভেজা। একটা স্থলপদ্ম। ফুল নেই।

ক্রমে পাখিরা ডাকল, গাছের পাতা নড়ে উঠল, শাখা কাঁপল।

অমিয়া চোখের পাতা খুলেছে ভেবে ধ্রুব চেয়ার ঠেলে শব্দ করে উঠল। কাছে এসে দাঁড়াল। অমিয়ার বুকের ওপর চাপানো লাল র‍্যাগটা বিবর্ণ, এক সারি কালো পিঁপড়ে তার গলার কাছ দিয়ে মুখে উঠে গেছে, চোখের পাতার ওপর দিয়ে কপালে চলে যাচ্ছে।

ধ্রুব দেখল, ঠিক বাইরের কুয়াশার মতন রঙ হয়ে গেছে অমিয়ার। কপালে রুক্ষ জট পড়ে যাওয়া চুল। সিঁথিতে অতি সামান্য ম্লান একটু সিঁদুর। বহুক্ষণ পূর্বে রক্তপাত হয়ে গেলে ধৌত ক্ষতস্থানে যেমন একটু রক্তের রেখা থাকে, অমিয়ার সিঁদুর সেই রকম দেখাচ্ছিল।

সহসা ধ্রুব ভয় পেল। অমিয়ার ঠোঁটে কয়েকটি কালো পিঁপড়ে, সিঁড়ি পেয়ে তারা নাকের কাছে উঠে গেল।

ধ্রুব হাত বাড়াল।

অমিয়া পৌষের প্রত্যুষকালের মতন কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে শুয়ে আছে।

ধ্রুবর হৃদপিণ্ড এই শীতলতা অনুভব করে কিছুক্ষণ অবশ হয়ে থাকল। তারপর সে ভোরের মাঠ দিয়ে একটি শীর্ণ গাভী চলে যেতে দেখল।

রোদের আভা দেখা দিল। দীনবন্ধু যক্ষ্মা-শালার খড়ের চালা দেওয়া অফিসে এসে ধ্রুব বলল, 'আমার এক আত্মীয়া কাল রাত্রে মারা গেছেন।...আপনারা কিছু দেখেন না।'

'মারা গেছে। কোন ঘর?'

'পুব দিকে, শেষের ঘরটা......'

'ও, বুঝেছি।' অফিসের লোকটা হাই তুলতে তুলতে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'সৎকারের ব্যবস্থা কে করবে? আপনি?'

ধ্রুব মাথা নোয়াল। হ্যাঁ।

নদী চরে শ্মশান। বালুকা চিকচিক করছিল। মধ্যাহ্ন রোদে পুড়ছিল। কাঠুরিয়া কাঠ কাটছিল। পাখি ডাকছিল। ধ্রুব গাছের ছায়ায় বসেছিল। অমিয়ার চিতা নিভে আসছে। তার কিছু ছাই বাতাসে উড়ছিল।

আকাশের রোদ সেবন করে কয়েকটা সাদা হাঁস চরে নেমে এল।

ধ্রুব সাদা হাঁস দেখছিল।

হাঁস দেখতে দেখতে তার নলের গল্প মনে পড়ছিল। অমিয়া বলেছিল: গল্পটা মনে রেখ। মনে রেখ।

আমার বয়স যখন আঠারো, আমি তখন বাড়ি থেকে পালাই। বাড়িতে আমার টান ছিল না কারও উপর। কারও উপর টান ছিল না, কারণ আমি জানতাম আমার উপর কারও টান নেই।

ডক্তারবাবু, আমার আর পালাতে ইচ্ছে করছে না। ডাক্তারবাবু, বলুন, আমি বাঁচব তো?

আমার নাম আপনাদের বলেছি—অভিলাষ। এর মানে নাকি ইচ্ছে?

আমার তাই কেমন ইচ্ছে হত; ইচ্ছে হত আমি বড় হব। কিন্তু যেখানে আমি থাকতাম, তার মানে, যেখান থেকে আমি পালিয়েছিলাম দশ বছর আগে—সেখানে থেকে বড় হওয়ার কোনো আশা ছিল না। আমার উপর টান ছিল না কারও। টান তো ছিলই না, তার উপর সকলে আমাকে ধমকাত। আমাকে দেখতে পারত না। কেন যে দেখতে পারত না বুঝতেই পারতাম না। আমাকে দেখতে কি খুব খারাপ? কই, এখন তো কেউ তা বলত না।

বাবা ছিলেন না, কিন্তু মা ছিলেন। কিন্তু সে-বাড়িতে মায়ের কোনো দাম ছিল না, কোনো কদরও না। মাকেও তারা জ্বালাত।

বাড়িটা হল মায়ের মামাতো দাদার। তার মানে, আমার মামাতো মামার বাড়ি সেটা। আমার এই মামা—খগেন জোয়ারদার—জলঙ্গী অঞ্চলের এক জাঁদরেল লোক। আমার ইচ্ছে হত, বড় হয়ে আরও জাঁদরেল

হতে হবে, মামাটাকে ঘায়েল করতে হবে। অনেক জমিজমা মামার, অনেক বাচ্চাকাচ্চা। আর ছিল এক পাল গোরু—তার জন্যে মস্ত-একটা বাথান। আমার মাকে দিয়ে ঐ বাথানের কাজ করাতো মামাটা। সারাদিন খাটত আমার মা। মায়ের দিনটা কাটত গোয়ালঘরেই। আমার দিকে তাকাবার সময় হত না মায়ের। মায়ের একমাত্র ছেলে আমি, রাত্রে আমাকে পাশে শুইয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে মা বলত—বড় হ।

কিন্তু বড় হব কী করে। মামার বাচ্চাকাচ্চাদের ভিড়ে আমি হারিয়ে যেতাম। মামার দাপটে কেঁচো হয়ে থাকতাম। মামার বাচ্চারা তো ঐ মামারই বাচ্চা, তারাও যেন এক-একটা মাগুর মাছ, গায়ে একটু গা লাগলেই হুল ফুটিয়ে দিত। পাঁচ বছর বয়সের অভিলাষ এসেছিল এই বাড়িতে, কিন্তু তার আঠারো বছর বয়স যখন পার হল তখনও যেন সে সেই পাঁচ বছরেরই শিশু। ইঁট দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলে চারা-গাছ কি বাড়ে, ডাক্তারবাবু? আমি একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিলাম।

আমার মামার বাড়িটা ছিল গোলায় ভরা। গুলিগোলার কথা বলছি নে—ধানের গোলা, ডালের গোলা। গোলগাল নধর চেহারা সেই গোলাগুলোর—অনেকটা আমার মামারই মত।

আমার ইচ্ছে হত—আমি বড় হব, আমি মস্ত হব, আমি বানাব অমনি গোলা।

সেই গোলা কিন্তু বানিয়েছিলাম, ডাক্তার-

বাবু। বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি না কিন্তু আমার গোলা, তার মাথা খড়ের ছাউনিতেও ছাওয়া নয়। আমার গোলা কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি, তার মাথা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। দু-পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে তার; আমার গোলার গলা জড়িয়ে আছে রেলিঙ—সেখানে দাঁড়িয়ে লাইন বেঁধে কাতারে কাতারে লোক টিকিট কেটে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখত আমার জীবনের পুঁজি, আমার ঐশ্বর্য।

আমার ঐশ্বর্যের নামটা আপনাকে বলি, তার নাম—

আচ্ছা থাক। কেবল বলুন, আমার বাঁচার আশা আছে কি না। মায়ের কাছ থেকে একবার পালিয়েছি, আর পালাতে ইচ্ছে করছে না।

আমার গোলার নাম—ওয়েল অব ডেথ। টিকটিকি যেমন দেয়ালের গা বেয়ে তরতর করে হাঁটে, আমার গোলার দেয়ালের গা বেয়ে আমি তেমনি চালাই মোটর-সাইকেল খড়-খড় শব্দ করে।

ওয়েল অব ডেথ কথাটার মানে নাকি মরণের পাতকুয়ো? হতে পারে এমনি মানে। ওই খেলা দেখানো অনেকটা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার মতই। প্রায়-খাড়া যে দেয়াল সেই দেয়াল বেয়ে ঘুরপাক খাওয়া খুব সোজা কাজ বলে আমি মনে করি নে। যদিও আমি ঐ খেলার একজন পাকা খেলোয়াড়। যখন আমরা পাক খাই, উপর থেকে যারা দেখে তাদেরই নাকি মাথা ঘুরে ওঠে, আর খেলা যারা দেখায় তাদের মাথার অবস্থা একবার ভাবুন।

আপনি দেখেছেন ডাক্তারবাবু, এ খেলা? যদি না দেখে থাকেন, আর যদি বেঁচে উঠি, তবে আপনাকে আমিই দেখাব। ভারি মজার খেলা কিন্তু।

এই মজার খেলায় আমি মজিয়ে নিয়েছিলাম চন্দনাকে।

যে নাম বলতে গিয়ে একটু আগে থেমে গিয়েছিলাম, এই সেই নাম। চন্দনা। একে আমি আমার জীবনের পুঁজি বলেছি, একে বলেছি আমার ঐশ্বর্য। ভুল করেছি, ডাক্তারবাবু? তাকে তো আপনি দেখেছেন।

আমি তাকে যেমন মনে করেছি, আপনি তেমন মনে না-ও করতে পারেন। এ তো চোখ দিয়ে দেখে যাচাই করার জিনিস না, এ যে মন দিয়ে ছেঁকে দেখার জিনিস।

আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে ওকে ছেঁকে দেখেছি। ওকে আমি ঐশ্বর্যই বলব। ওকে রোজগার করতে আমি আমার প্রাণমন বিলি করে দিয়েছি।

মেলায়-মেলায় এই মরণের খেলা দেখাচ্ছি আমি বছর-দুই। সব সময়ের সঙ্গী করে ওকে নিয়ে নিয়েছি, সেও ওই বছর-দুইয়ের কথা। এক-একটা মেলায় দুশো আড়াই শো কামাই। বছরে বারোটা মেলা জোটেই। মন্দ চলে না আমাদের দু জনের।

কিন্তু সুখের সংসারে শনি লাগে কেন, বুঝতে পারি না। আমাদের পিছনে এল সেই শনি—গ্র্যান্ড ন্যাশনাল সার্কাস পার্টির লায়ন-টেমার বলরাম।

সিংহকে বশ বানানো যার সাধ্যের বাইরে, বিজলি-চাবুক হাতে নিয়ে যাকে বশ করতে হয় সিংহ, সে কিনা মেয়েমানুষকে বশ করতে চায়! তার রকম দেখে হাসি পেল আমার।

চন্দনাকে বললাম, "ব্যাপার কি রে চন্দন্। লোকটা চায় কি?"

চন্দনা হাসল, বলল, "ন্যাকা। বুঝতে পারছ না কি চায় ও?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "তোকে?"

"না, তা কেন। তোমাকে। তোমার জন্যে ছুটে এতদূর এয়েছে।" চন্দনা ভঙ্গি করে হাসল।

বললাম, "বুঝেছি।"

আমরা তখন শান্তিপুরে ক্যাম্প করেছি। রাসের মেলায় দু পয়সা কামাবার লোভে। ন্যাশনাল সার্কাস নাকি তখন কাঁথির মাঠে তাঁবু গাড়ছে, সেই শীতে সেখানে তাদের খেলা শুরু হবে। কিন্তু সেই কাঁথির মাঠ থেকে বলরাম এসে গেছে শান্তিপুরের ঘাঁটিতে—আমার শান্তি নষ্ট করতে।

বললাম, "চন্দনা, সাবধান।"

"সাবধানই আছি গো।" চন্দনা তার শক্ত শরীরটা মোচড় দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "ভীতু। এত লোকের ভিড় ডিঙিয়ে যে চলেছে, এত চোখের চাউনি এড়িয়ে, একটা মানুষকে দেখে তাকে সাবধান হতে হবে কেন। ঐ বলরামটাকেই বলে এস—সাবধান।"
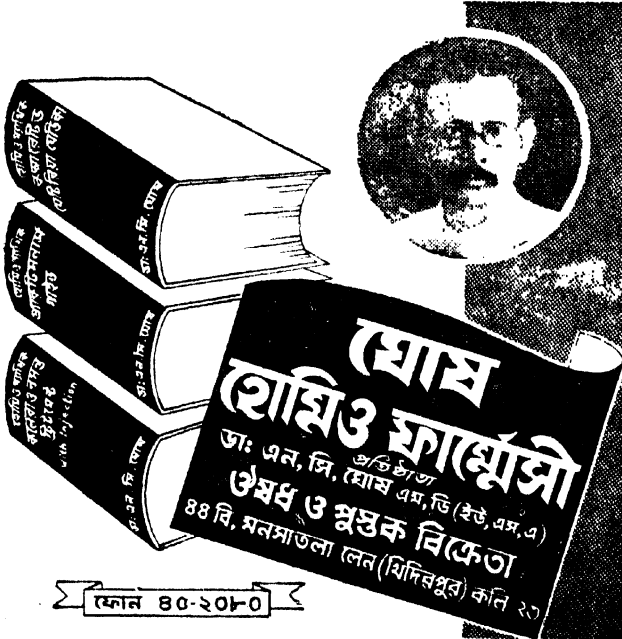
চন্দনাকে জড়িয়ে ধরে, তার কাঁধে আমার থুতনিটা ঘষে দিয়ে হেসে বললাম, "থ্যাংক ইউ।"

এটুকু ইংরেজী আমরা বলতাম।

বললাম, "বলরামের জানা উচিত, এটা বাঘ-সিংহের খাঁচা না। মরণের ফাঁদ। এ খেলার মধ্যে ফাঁকি নেই। এখানে ফাঁকা আওয়াজও নেই। আমাদের সাইকেলের যে শব্দ, সেটা একটা জ্যান্ত ইঞ্জিনেরই।"

চন্দনা হেসে বলল, "থ্যাংক ইউ।"

বলরামকে চিনি অনেক দিন থেকে। আঠারো বছর বয়সে আমি বাড়ি থেকে পালাই। তার এক বছর পর থেকেই চেনা-জানা হয় ঐ লোকটার সঙ্গে। ওকে প্রথম থেকেই আমার পছন্দ না। ওর রকম-সকম দেখেই ওকে বিশ্রী লাগত।

বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে বছর-খানেক আমি ঘুরে বেড়িয়েছি নানা জায়গায়। সে সব কথা খুঁটিনাটি করে আপনাকে এখন বলে কী লাভ! অনেক কষ্ট গিয়েছে, অনেক হয়রানি। অবশেষে পেলাম একটা আস্তানা।

গ্র্যান্ড ন্যাশনাল সার্কাস পার্টি তখন তাঁবু গেড়েছে হিলিতে। জলপাইগুড়ি কোচবিহার ধুবড়ি—নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে আমি হাজির হয়েছি হিলিতে।

এইখানেই আমার একটা হিল্লে হল। আমার স্বাস্থ্যটা তো দেখছেন—এ স্বাস্থ্য আমার বরাবরের। এই স্বাস্থ্য দেখেই বুঝি আমাকে পছন্দ করল সার্কাস পার্টির ম্যানেজার মিস্টার মর্গ্যান। কালো কুচকুচে রং সাহেবের। আশ্চর্য লাগল সাহেবের রং কালো দেখে। তার চেয়েও বেশী আশ্চর্য হলাম যখন সে আমার সব বৃত্তান্ত শুনে আমাকে নিতে রাজী হয়ে বলল "ইয়েস।"

আমি গেট-কীপার হয়ে ঢুকলাম সেই সার্কাস পার্টিতে। আমার মত লোকদেরই বুঝি তাদের পছন্দ—যার চাল নেই চুলো নেই, মায়া নেই, মমতা নেই।

কিন্তু বড় হওয়ার সাধ আমার আছে। মায়ের সাধ পূরণ করার ইচ্ছেও আমার কম না। আমি ধীরে ধীরে যোগ দিতে লাগলাম খেলায়। সাইকেলের খেলা দিয়েই আমার খেলা শুরু। দু চাকার সাইকেল, এক চাকার সাইকেল চালিয়ে অনেক খেলা দেখিয়েছি, অনেক হাততালি পেয়েছি। মিস্টার মর্গ্যানের হাতের চাপড় পেয়েছি পিঠে। তার পর ঘোড়ার পিঠে চড়েছি, সার্কাসের গোল চত্বরে ছুটে ছুটে পাক খাচ্ছে ঘোড়ার দল; সেই ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে উঠে ডিগবাজি খেয়েছি, একটা ঘোড়ার পিঠ থেকে আর-এক ঘোড়ার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছি—ব্যালান্স হারাইনি কখনো।

যা বলছিলাম। চন্দনার বয়স তখন দশ-এগারো। সে তখন ডিগবাজির খেলা দেখায়। আমি চিত হয়ে শুয়ে দুই পা উঁচু করে তার উপরে কাঠের মই খাড়া করে দাঁড় করাই, চন্দনা সেই মই বেয়ে বেয়ে একেবারে উঁচুতে উঠে যায়, সেখানে সে দুই হাতের উপর দাঁড়ায়। হাততালি পায়।

চন্দনার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল। খুব ভাব, ভীষণ ভাব। কিন্তু আমরা তো দুজনেই তখন ছোট, আমাদের এ ভাবের মধ্যে কোনো ভাবনা তখনও ঢোকেনি—আমাদেরও না, পার্টির অন্য কারও না।

কিন্তু লায়ন-টেমারের চোখের চাউনির মধ্যে একটু যেন আগুন দেখতাম। তার চলার ধরণের মধ্যে একটু যেন তাপ বোধ করতাম।

শহরে-শহরে মহকুমায়-মহকুমায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা। দিন যেমন কেটে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে বছরও। আমরা বড় হয়ে গিয়েছি। আমাদের যে ভাব ছিল
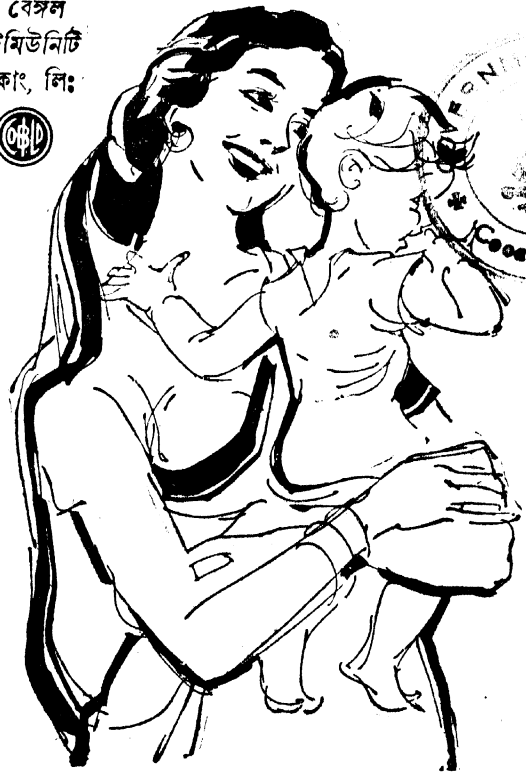
নির্ভাবনার, তার মধ্যে কখন যেন ভাবনা ঢুকে পড়েছে, টের পাই নি।

টের পেলাম সেদিন, যেদিন লায়ন-টেমার বলরাম একটা চাবুক হাতে নিয়ে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়াল।

সেবার আমাদের ক্যাম্প পড়েছে টাকিতে। ইছামতী নদীর কিনারে। ঘোড়াশালে ঘোড়া, হাতিশালে হাতি, বাঘ-সিংহ খাঁচায়। বিকেলের দিকে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আমরা দুজন দু পা এগিয়ে গিয়ে বসেছি নদীটার পাড়ে। আমরা কথা বলছিলাম দু-জনে। সব জীব খাঁচায় বন্দী, আমরা দুটো জীব এসেছি খাঁচার একটু বাইরে।

আমরা কথা বলছি। পিছনে কিসের শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখি—চাবুক হাতে বলরাম দাঁড়িয়ে। খেলা শুরু হতে দু ঘণ্টা বাকি, এরই মধ্যে তার সাজ পরা হয়ে গেছে। কালো প্যাণ্ট, কালো কোট—কোটটার প্রায় সবটাই মেডেলে ঢাকা, ছোট বড় গোল চৌকো—নানা রকমের মেডেল।

একটু চমকালাম। বললাম, "ইয়েস সার।"

উত্তরে সে বলল, "নো সার। দিস ওণ্ট ডু।"

আমি বললাম, "কি?"

সে বলল, "দিস ন্যাস্টি থিং।"

মানেই বুঝলাম না তার কথার। আমরা উঠে, ফিরে গেলাম ক্যাম্পে।

সেদিন খেলা দেখাতে গিয়ে মাঝে মাঝেই আমি যেন ব্যালান্স হারিয়ে ফেলেছি, তাই ভয় হচ্ছিল—মইয়ের ঐ উপর থেকে ছিটকে না পড়ে যায় চন্দনা।

জাপানি ছাতি হাতে নিয়ে চন্দনা যখন তারের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, লক্ষ্য করেছি, সেও যেন দু-একবার টাল সামলাতে পারেনি।

এতে আনন্দ হবার কথা না। কিন্তু স্বীকার করব, আমার একটু আনন্দ হয়েছিল। আনন্দ হয়েছিল এইজন্যে যে, চন্দনারও ব্যালান্স রাখতে যখন কষ্ট হচ্ছে তখন তার মনের অবস্থাও নিশ্চয় আমারই মত। বলরামের ঐ ব্যবহারে সেও তবে আমারই মত দুঃখ পেয়েছে।

দলে আরও অনেক মেয়ে আছে—বাণী আছে, মিনতি আছে, চাঁপা আছে, ফুল্লরা আছে। বলরামের যদি কিছু বলার থাকে তবে তাদের গিয়ে বলুক। আমরা না হয় মহাপাপ করেছি, কিন্তু তারা কোন্ ধোয়া তুলসীপাতা? সবই লক্ষ্য করি, সবই জানি। সবার ব্যাপারই জানি, ম্যানেজার মর্গ্যানের কাণ্ডও জানি, লায়ন-টেমারের ব্যাপারও অজানা না। বলরামকে চড় মেরেছিল কেন ফুল্লরা? বাণীকে দেখলেই সবাই অর্গ্যান বলে তাকে ঠাট্টা করে কেন?

আমি অভিলাষ শ্রীমানি, আমার দুর্বুদ্ধি না-থাকলেও বুদ্ধি নিশ্চয় আছে। বুঝতে তাই বাকি নেই কিছু।

টাকিতে আমাদের শো কেমন-যেন খাপ-ছাড়া হল। অন্তত আমার কাছে তাই মনে হল। খেলায় যেন প্রাণ নেই, প্রাণে যেন ব্যালান্স নেই।

শো শেষ হয়ে গেলে ফাঁকা গ্যালারির একেবারে উঁচুর ধাপে এক কোণে একা-একা বসে ভাবছি ওই লোকটার কথা। ভাবছি ও চায় কি। আজ যখন খাঁচার মধ্যে ঢুকে খেলা দেখাচ্ছিল, তখন সিংহী-দুটো কি রকম বিশ্রীভাবে মুখ ভ্যাংচালো ওকে, ঐভাবে চন্দনা তাকে একবার মুখ ভেংচে দিলে বেশ হয়।

এক কোণে একা বসে আছি এই প্রকাণ্ড ফাঁকায়, হঠাৎ ঘাড়ের কাছে কার-যেন নিশ্বাস লাগল, ফিরে চেয়ে দেখি চন্দনা। পিছন দিক থেকে খুঁটি বেয়ে সে উঠে এসেছে।

বললাম, "কি হল?"

সে বলল, "কিছু না। কি, ভাবা হচ্ছে কি?"

"ভাবছি ওর কথা। ভাবছি ও চায় কি।"

আমার একটা হাত চেপে ধরে চাপা হাসি হেসে চন্দনা বলল, "ও কি চায় তাও জানো না? ও চায় আমাকে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আর তুমি? তুমি কাকে চাও?"

"আমি? আমি কাউকে না।"

তার কথা শুনে ভালো লাগল না। কিন্তু তার কথায় কোনো ঘাও লাগল না মনে। কাউকে যখন চায় না সে, তখন বলরামকেও নিশ্চয়—

"নিশ্চয়। কাউকে চাই নে।" শক্ত শরীর বুঝি আরও শক্ত করল চন্দনা, শক্ত করে চেপে ধরল আমার হাত, বলল, "তোমাকেও না।"

একটা নিশ্বাস নিয়ে বললাম, "তবে এখানে এলে কেন?"

"ঐ কথা জানাতে।" চন্দনাও বুঝি একটা নিশ্বাস ফেলল, বলল, "যে কিছু বোঝে না, তাকে এমনি করেই বোঝাতে হয়। তুমি একটা—"

চমকে উঠলাম দুজনে একসঙ্গে, চেয়ে দেখি, তাঁবুর ত্রিপল সরিয়ে গ্যালারির নীচে এসে দাঁড়িয়েছে লায়ন-টেমার। অল্প আলোতেও স্পষ্ট দেখা গেল তাকে।

চন্দনা উঠে দাঁড়াল, গ্যালারির সব-কটা ধাপ একে একে মাড়িয়ে সে বেগে নেমে গেল, লায়ন-টেমারের গায়ের কাছ দিয়ে চলে গেল সে।

ফাঁকা এরেনায় ফটাস শব্দ করে একবার চাবুক কষল বলরাম। তার পর চলে গেল।

জীবনটা দুঃসহ হয়ে উঠল। মর্গ্যানের কানে অনেক কথা গিয়ে পৌঁছল। অনেক কৈফিয়ত দিতে হল আমাকে।

কিন্তু সার্কাসই দেখাব, না, বলরামকেই দেখব—এটা একটা বিষম সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। খেলা দেখাতে গিয়ে পা কাঁপে, চন্দনাকে কিছুক্ষণ না দেখলে বুক কাঁপে। এতটা কেঁপে-কেঁপে কাঁহাতক আর চলা-ফেরা করা যায়?

চন্দনাকে বললাম, "আমি চলে যাব।"

"কোথায়?"

"এ পার্টি ছেড়ে।"

চন্দনা আমার মুখের দিকে চেয়ে চোখে কি রকম একটা ভঙ্গি করে বলল, "নতুন কোনো পার্টি পেয়েছ বুঝি?"

বললাম, 'না। আর পার্টি চাই নে নিজেই খেলা দেখাব। চাই একটা পার্টনার।"

দু চোখ একটু ছোট করে চন্দনা বলল "বটে? বুকের পাটা তো খুব।"

আমরা ছেড়ে দিলাম গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কোনো কৈফিয়ত দিলাম না, কোনো কারণ দেখালাম না। কিন্তু আমাদের এই পার্টি ছাড়ার কারণটা তো কারো না জানার কথা না। লোকে সহজেই বুঝতে পারল, আমি আর চন্দনা মিলে কিছু-একটা চক্রান্ত করেছি।

আমাদের চক্রান্তটা কি, নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন, ডাক্তারবাবু। কারো ক্ষতি করার ইচ্ছে আমাদের ছিল না, আমাদের কেউ কোনো ক্ষতি করতে না পারে—তার জন্যেই আমাদের এই চক্রান্ত।

আমি আর চন্দনা চম্পট দিলাম। প্ল্যান আমার ছিল। ছ-সাত বছর গ্র্যান্ড ন্যাশনালে যে মাইনে পেয়েছি বড় হবার জন্যে তার মোটা অংশ জমিয়েছি, তাই টাকাও কিছু হাতে ছিল। এখন পেয়ে গেলাম পার্টনার। আর কার পরোয়া করব, বলুন।

সেকেণ্ডহ্যান্ড মোটরবাইক কিনলাম।

কুচকুচে একটি কলম আমার হাতে গ‍ুঁজে দিল। বললো, 'এটা আমার নিজের কলম। আমার নাম খোদাই আছে এতে। আমি জানি পথের দেখা এই ক্ষণিকের বন্ধ‍ুকে যদিবা কখনো ভোলো, কলমটি দেখলেই মনে পড়ে যাবে। 'নামটা পড়ে নিতে পারবে। আমার ডাক নাম মাস‍ু।'

আমি বললাম, 'মাস‍ু, তোমাকে আমি কখনো ভুলবো না, আমার এই দীর্ঘজীবনে এমন স‍ুন্দর বন্ধ‍ুতা আর কখনো আমি পাইনি, এমন পবিত্র ব্যবহার আমি কখনো দেখিনি।'

মাস‍ু বললো, 'ভারতীয় মেয়েরা অতুলনীয়।

আমি বললাম, 'জাপানী মেয়েরা স্বর্গীয়।

এরপরে আমি আর মাস‍ু রাত এগারোটা পর্যন্ত কতো কী যে গল্প করেছিলাম মনে নেই। মাস‍ু ভাঙাভাঙা ইংরিজিতে কথা বলছিলো, মাঝে মাঝে আটকে গেলে ছোট্ট একটি ডিকসেনারি খ‍ুলে, দেখে নিচ্ছিল বিশেষ শব্দটি। বিদায়ের সময় মাস‍ু পরের দিন কখন দেখা হবে জিজ্ঞেস করলো।

পরের দিনও সারাদিন এখানে-ওখানে আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণের পালা ছিলো। ফাঁক খ‍ুঁজে পাওয়া গেল না। খ‍ুব বিমর্ষ হলো সে। স‍ুদ‍ূর ভারতবর্ষের এককোণের এক বাংলাদেশের একটি নিতান্ত আটপৌরে মেয়ের জন্য তার এই কাতরতা দেখে আমি রোমাঞ্চিত হলাম। মাত্র দশদিনের জন্য এ-দেশে এসেছি আমরা, আমার স্বামীকে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন, আমি এসেছি সঙ্গে। চলেছি অবশ্য বহ‍ুদ‍ূরের পাল্লায়, এটি পথের নিমন্ত্রণ। বরং ঘরবাড়ি ছেলেমেয়ে ছেড়ে কেমন করে দিন কাটাবো তাই ভাবছিলাম, এই মমতায় আমার প্রায় চোখে জল এলো। সেই রাত্রে কিয়োটো হোটেলের দ‍ুগ্ধফেননিভ শয্যায় শ‍ুয়ে জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ হলাম।

বলাই বাহ‍ুল্য যে-কদিন ছিলাম, যেমন করে হোক কোনো না কোনো সময়ে আমি আর মাস‍ু একসঙ্গে হয়েছি। কখনো কিয়োটোর মন্দিরের মতো পরিচ্ছন্ন রাস্তায় দ‍ু পাশের ন‍ুয়েপড়া চেরীগাছের ফ‍ুলেভরা ডালের তলা দিয়ে হেঁটে-হেঁটে গল্প করেছি, কখনো কিয়োটো হোটেলের অগণিত, নানাবিধ চেহারার ইন্দ্রপ‍ুরীতুল্য বসবার ঘরে বসে সময় কাটিয়েছি, কখনো কোনো প‍ুরোনো জাপানী সরাইখানার অভ্যন্তরে টেম্প‍ুরা খেতে-খেতে আড্ডা জমিয়েছি।

মাস‍ু ধনীলোকের মেয়ে। তার বাবা কিমোনো ব্যবসায়ী। কিয়োটো এবং টোকিয়ো শহরে তাদের দ‍ুটি বিখ্যাত কিমোনোর দোকান আছে। টোকিয়োর দোকান মাস‍ুর বাবা দেখাশোনা করেন, কিয়োটোর দোকানে বসেন মাস‍ু আর মাস‍ুর মা। এখনকার জাপানী মেয়েরা জাপানীর চেয়ে আমেরিকান বেশি, তারা চুল ছেঁটে ফেলেছে, আঁটো ফ্রক ধরেছে, ম‍ুখে ইংরিজি ব‍ুলির খই ফ‍ুটছে। কিন্তু মাস‍ুর পোশাক তেমনি পা ঢাকা, পিঠে ওবি বাঁধা, ভারি কালো চুলের উঁচু খোঁপায় ম‍ুক্তোর লম্বা কাঁটা বসানো। গায়ের রং শাঁখের মতো সাদা, মস‍ৃণ, ম‍ুখের লাবণ্য জোয়ারের মতো, যখন ফ‍ুলো-ফ‍ুলো চেরা চোখে তাকিয়ে হাসে শিশ‍ুর চেয়েও পবিত্র দেখায়। মাস‍ুর বয়স সাতাশ, কিন্তু এখনো অবিবাহিত।

আমি বললুম, 'বিয়ে করবে না?' মাস‍ু বললো 'না।'

'কেন?'

অনেক বাধা আছে।

'কিসের বাধা? তুমি এতো স‍ুন্দর, এতো ভালো, বিয়ে না-করলে কতোগ‍ুলো লোক

বঞ্চিত হবে। তোমার মতো স্ত্রী, তোমার মতো মা—' মাসু এইখানে থামিয়ে দিল আমাকে। চোখ নিচু করে বললো 'অন্য কথা বলো।'

আমিও চুপ করে গেলাম, ভাবলাম, সত্যিই তো এসব ব্যক্তিগত কথায় আমার দরকার কী।

কিন্তু মাসুই একটু পরে আবার কথাটা তুললো, বললো 'জীবনে আমি দুটি মানুষকে ভালোবেসেছি। অবিশ্যি মা বাবা বা আত্মীয়ের কথা ধরছি না এর মধ্যে। এক-জনকে প্রেম দিয়েছি, একজনকে বন্ধুতা দিয়েছি।' বললাম, 'দুটোই খুব ভালো কথা। যাকে প্রেম দিয়েছ সেও নিশ্চয়ই তোমাকে প্রেম দিয়েছে, আর বন্ধু তো বন্ধুতা দেবেই।'

Zen মঠের ফুলেভরা ঘাসে ছাওয়া মাঠে বসে আমরা কথা বলছিলাম, মাসু একমুঠো দূর্বা হাতে তুলে নিল, ঘ্রাণ শুঁকলো, চুপ করে থেকে সজল চোখে তাকিয়ে বললো 'কিন্তু দুটোই আমার ব্যর্থ হয়েছে।'

'ব্যর্থ হয়েছে? কেন?'

'যাকে প্রেম দিয়েছি, সে প্রেম দিয়েছে অন্যকে, যাকে বন্ধুতা দিয়েছি, সে প্রেম দিয়েছে আমাকে।'

'বুঝিয়ে বলো।'

'তুমি বিদেশিনী, তবু আমি আজ তোমাকেই আমার মনের কথা বলবো। তুমি ভারতীয়, তুমি নিশ্চয়ই আমার দুঃখ বুঝবে। কিন্তু একটাই শুধু ভয়, তুমি লেখো।'

'সেটা কি ভয়ের?'

'ভয়ের বৈকি, যদি লিখে ফেলো।'

'ক্ষতি কী?'

'ছি, ছি, সবাই জেনে যাবে।'

'আমি বাংলা ভাষায় লিখি, তোমার কোনো ভয় করবার কারণ নেই।'

মাসু হাসলো। মাসুকে যে দেখেনি তাকে বোঝানো যাবে না সে হাসি কতো মধুর। বললো, 'তা লিখলেই বা কী হয়। লেখারই বিষয়। আমার জীবন বড়ো অদ্ভুত, বড়ো বেদনাময়। হাতের ঘড়ি দেখলো, 'আরো ঘণ্টা দুই আমরা একসঙ্গে আছি, তোমাকে আমি সব কথাই খুলে বলি। মনের ভার আর আমি না নামিয়ে পারছি না। বিশেষ করে আজ কয়েকদিন যাবৎ বড়ো বেশি অশান্তি যাচ্ছে। মজাটা কি জানো, ঈশ্বর সত্যি করুণাময়। আমার এই প্রচণ্ড অশান্তির সময়ে কেমন তোমাকে মিলিয়ে দিলেন। তোমাকে না-পেলে আমি বাঁচতাম না।

আমি অভিভূত হয়ে বললাম, 'মাসু, তুমি সত্যি আমাকে এতো বন্ধু ভাবো?' তেরচা চোখে তাকালো মাসু 'ভাবি না! তোমাকে প্রথম দেখেই তো আমি বুঝেছিলাম, যে-মনের সঙ্গে আমি মন মেলাতে পারি সে হচ্ছে এই। কিন্তু কী দুঃখ ভাবো, দুজন আমরা দুই দেশের। হয়তো জীবনে আর কোনোদিন তোমাকে আমি দেখবো না।'

'ও-কথা বোলো না। আমি তোমাকে মস্ত-মস্ত চিঠি লিখবো, তুমি নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে আসবে। মাসু তার হাতের মুঠোয় আমার হাত তুলে নিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলো। আমিও একটু সময় চুপ ক'রে রইলাম, তারপর বললাম, 'কী বলবে বলছিলে।'

'হ্যাঁ, বলবো।' এই বলে কোনো ভূমিকা না ক'রে মাসু আমাকে যে গল্পটা বললো তা এই—

মাসুর বাবার এক বন্ধু আছেন, তিনি কিয়োটোর সবচেয়ে বড়ো ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের স্বত্বাধিকারী। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। তার একটি ছেলের সঙ্গে খুব ছেলেবেলা থেকেই মাসুর বিয়ের ঠিক ছিলো। ছেলেটি চমৎকার, যেমন বিদ্যাবুদ্ধি সততা, তেমনি দেখতে সুন্দর। আশৈশব এক সঙ্গে খেলাধুলো মেলামেশা ক'রে বড়ো হ'য়ে উঠেছে দুজন, দুই পরিবার পাশাপাশি থাকতে-থাকতে আত্মীয়ের মতো হ'য়ে গেছে। বিয়ের কথাটা মাসু বা ছেলেটি অনেকদিন পর্যন্ত জানতো না, জানবার আগেই ছেলেটি একদিন তাকে প্রেম নিবেদন করলো। ছেলেটির নাম তোসিও হায়াসি। বাড়ির পিছন দিকের বাগান ঘেরা একটি চাতালে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো তারা। সেই বছর
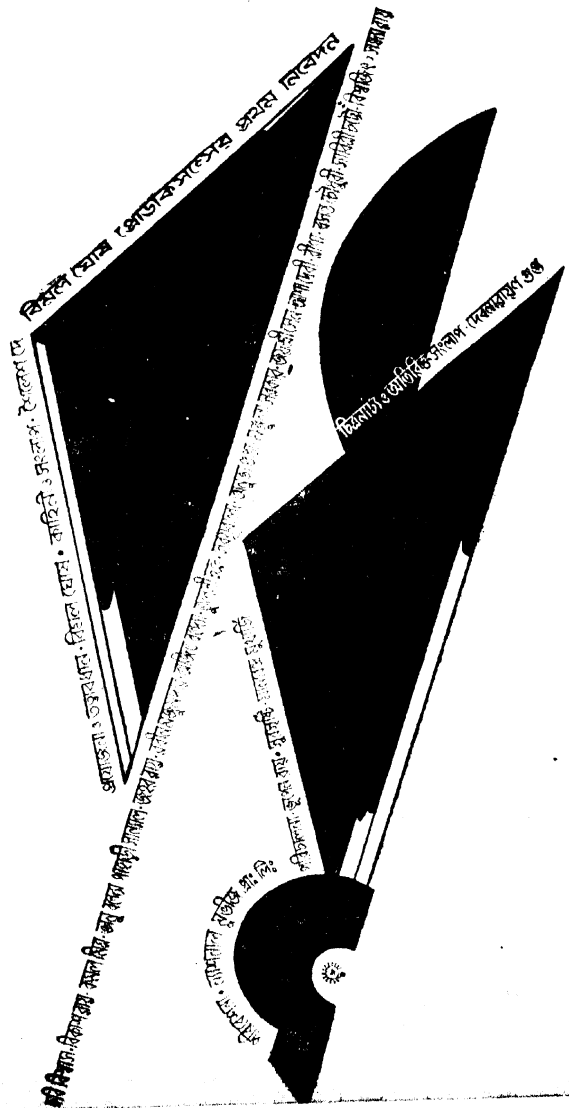
তাদের বাগানে অজস্র ফুল ফুটেছিলো, অজস্র প্রজাপতি এসেছিলো, তোসিও সেদিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার হৃদয় আজ এই বাগানের মতোই উদ্ভাসিত, রক্তকণিকারা এই প্রজাপতির মতোই অস্থির চঞ্চল, মাসু, আমার মাসু তুমি আমাকে ভালোবাস তো?'

তোসিও মাসুর চিরদিনের বন্ধু, তোসিওকে সে কি আজ ভালোবাসে? জ্ঞান হ'য়ে থেকেই তো সে-কথা সে জানে। তোসিওর জন্য সে কী না করতে পারে! কিন্তু তোসিওর কথা শুনে, তোসিওর গভীর দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সেদিন সে অনুভব করলো ভালোবাসার অনেক ধরন আছে, সব ধরন সকলের সংগে আসে না। তোসিও তার কাছে আজ যে ভালোবাসার আবেদন জানাচ্ছে সে ভালোবাসা মাসুর অন্তরে জন্ম নেয়নি। প্রথমটায় মাসু হাসবে ভেবেছিলো, পরে ওর কান্না পেলো। চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আমাদের দেশে ভালোবাসার বিয়ে প্রচলিত নেই, তা কি তুমি জানো না? গুরুজনরা এই ভালোবাসার কথা জেনে ফেললে আর কি আমরা দেখা করতে পারবো?'

তোসিও বললো, 'গুরুজনদের এখানে টেনে এনো না, এখানে তাঁদের জায়গা নেই, এখানে তুমি আর আমি। তুমি তোমার মনের কথা বলো।'

মাসু ভেবে পেলো না কী বলবে। মুখের দিকে প্রত্যাশাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তোসিও বললো, 'বুঝতে পেরেছি জবাব দিতে পারছো না তুমি, এবং সেটা লজ্জার জন্য নয়, আসলে নিজের মনের কথা তোমার জানা নেই ব'লে। ঠিক আছে, আমি আবার কাল দেখা করবো তোমার সংগে। এবার যাবার আগে তোমার মুখ থেকে এই কথাটা শুনে যাবো আমি।'

তোসিও পড়াশুনো করতো নিউইয়র্কে। বড়োলোকের ছেলেরা তাই করে এখানে। সেটা তাদের আভিজাত্যের লক্ষণ, তাদের ফ্যাশান। ছুটিতে-ছুটিতে আসে। এই দ্বিতীয় ছুটিতে এসেছে সে. দূরে গিয়েই হৃদয়ের এই ভাবটা উপলব্ধি করতে পেরেছে। সে যেবার প্রথম গিয়েছিলো, কেঁদে ভাসিয়েছিলো মাসু, মাসুর সব খালি হ'য়ে গিয়েছিলো। তোসিও যে তার আবাল্য বন্ধু। তোসিওকে ছেড়ে সে থাকবে কেমন ক'রে? আস্তে-আস্তে অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছিলো। অন্য বন্ধুবান্ধবের সংস্পর্শে সেই অভাববোধ কেটে গিয়েছিলো। কিন্তু তোসিওর যায়গায় কী ক'রে যাবে। মাসুর মতো বন্ধু তো সে একজনের বেশী দু'জনকে পেতে পারে না। দু'জনকে চাইতে পারে না, সে-ভাব তার আর কারো সংগে আসবেই না হৃদয়ে। মাসুর জায়গা শুধু মাসুর জন্যই, তার প্রাণমন মাসুতেই ভরা।

সেই রাত্রে মাসু ঘুমুতে পারলো না। সারারাত এ-পাশ ও-পাশ ক'রে কাটিয়ে দিল। পরের দিন যখন দেখা হবার সময় হলো ভয় করতে লাগলো তার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ নিয়েই চিরদিন যার সংগে দেখা করতে অভ্যস্ত সে মানুষ সেদিন তার ভয়ের কারণ হ'য়ে উঠলো। বলে বুকের ভিতরটা তোলপাড় করতে লাগলো। একটা দুর্বোধ্য কষ্টে অশান্ত হয়ে পড়লো। ভেবে চিন্তে একটা চিঠি লিখলো সে, লিখলো তুমি আমার কাছে যে প্রশ্নের জবাব চেয়েছো সে প্রশ্নের জবাব দেয়া আমার পক্ষে সহজ হচ্ছে না। এর একটা পরিণতি আছে, সে পরিণতিটা আমি কিছুতেই মনের সংগে গ্রহণ করতে না পেরে কেবলি বিধ্বস্ত হচ্ছি। আমাকে সময় দাও।'

চিঠিটা সে দেখা ক'রেই তোসিওর হাতে দিল। এক পলকে প'ড়ে ফেলে তোসিও খানিকক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো, তারপর একটি কথা না ব'লে চলে গেল। মাসু পিছনে-পিছনে গিয়ে বললো 'রাগ করলে?'

তোসিও বললো, 'না।'

'কাল আসবে তো?'

'না।'

'কেন?'

'কাল চ'লে যাবো।'

'কোথায়?'

'যেখানে থাকি।'

'তোমার তো এখন ছুটি।'

'এখানে থাকার আর আমার কোনো অর্থ হয় না।'

মাসু কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বললো, 'এতো-দিনের এতো ভালোবাসা কি ঐ একটা কথার উপরই নির্ভর করছিলো?'

তোসিও বললো, 'এতোদিন করছিলো না, এখন করছে।' এই ব'লে দ্রুত পায়ে ঘাস মাড়িয়ে একবারো ফিরে না তাকিয়ে নিজেদের আপেল বাগিচার মধ্যে ঢুকে গেল। পাশা-পাশি কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে মাসু তাকিয়ে রইলো। পরের দিন শোনা গেল বাবা মা কারো কথা না শুনে তোসিও নিউইয়র্কে চলে গেছে।

মাসুর বয়স তখন একুশ, মন্দ বয়স নয়, মাসুর মা বাবা এবার তার বিয়ে দিতে উদ্যোগী হলেন। আর এই প্রথম মাসু জানলো তোসিওর সংগেই বিয়ে ঠিক হয়ে আছে তার। সে যে কী বলবে, কী করবে কিছুই ভেবে ঠিক করতে পরলো না।

যা সহজ, যা সুন্দর, যা উৎকৃষ্ট, সবই মাসুর কাছে উপস্থিত করেছিলেন বিধাতা, মাসুর বিড়ম্বিত ভাগ্য তা গ্রহণ করতে পারলো না। তোসিও তার স্বামী হবে, সন্তানের পিতা হবে এ কথাটা ভাবতেই দাঁতে কাঁকর পড়লো তার। তবু বিয়ের

আয়োজনে বাধা হ'লো না। মেয়ের মতামতের কথা কোনো বাপ-মা ভাবে না এ দেশে, মাসুর বাপ-মাও ভাবলেন না, টেলিগ্রাম পেয়ে তোসিও চ'লে এলো। এসে সব শুনে গম্ভীর হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'মাসু কি রাজি হ'য়েছে?'

তোসিওর বাবা মিস্টার হায়াসি আর মা মিসেস হায়াসি ছেলের কথা শুনে থ হ'তে হ'তেও হ'লেন না। তাদের ছেলে আমেরিকা প্রবাসী তার মতামত অন্যরকম তো হবেই। তারা ঘুরিয়ে বললেন, 'তোমার মতো সচ্চরিত্র, বিদ্বান এবং সুপুরুষ স্বামীর জন্য একজন মেয়ের যতো প্রার্থনা দরকার, মাসু ঠিক ততো প্রার্থনা করেছিলো কিনা জানি না, তবে পেয়ে যে সে বর্তে যাবে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং তার মতামত নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

এ-কথায় তোসিও শান্ত হ'লো না, বললো, 'আমি নিজে একবার ওর সঙ্গে কথা বলবো!'

মিস্টার হায়াসি এবার দৃঢ় হ'য়ে বললেন, 'একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে নাকি?'

তোসিও বললো, 'জানি না। তবে বিয়ের আগে একবার ওর সঙ্গে আমি দেখা করবোই।'

'সেটা নিয়ম নয়।'

'যার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে খেলাধুলো ক'রে বড়ো হ'য়ে উঠেছি, তার সঙ্গে দেখা করার মধ্যে কী এত নিয়মের প্রশ্ন থাকতে পারে।'

সে এখন তোমার বন্ধু নয়, বাল্যসঙ্গী নয়, ভাবী স্ত্রী। বিয়ের আর দশদিন বাকি, এই দশদিন তোমাদের দেখাশুনো বন্ধ।'

মা বাবার মুখের উপর কথা বলা অভ্যেস নেই তোসিওর, চুপ ক'রে মাথা নামিয়ে উঠে গেল। কিন্তু সময় সুযোগ বুঝে বাইরে থেকে মাসুর কলেজে ফোন করলো। হঠাৎ তোসিওর গলা পেয়ে এতো ভালো লাগলো বিয়ে-টিয়ে সব ভুলে ঠিক আগের মতো সরল আবেগে মাসু তাকে সম্ভাষণ করলো। তার উপরই রাগ ক'রে তিন মাস আগে চ'লে গিয়েছিলো তোসিও, তিন মাস ধরে প্রতিদিন একবার-না-একবার তার কথা মাসুর মনে হ'য়েছে, তার হাসি মনে পড়েছে, তার কথা বলার ভঙ্গি মনে পড়েছে, তার দুষ্টুমি ক'রে খেপানোর কথা মনে পড়েছে, তার সঙ্গটা যে কত মধুর ছিলো সে কথা মনে ক'রে মাসুর বিস্বাদ লেগেছে জগৎটা। তোসিওর মতো একজন বন্ধু সংসারে বিরল। সেই বন্ধুকে হারাবার ব্যথায় সে অতিশয় কাতর হ'য়েছিলো।

তোসিও বললো, 'কেমন আছো?'

মাসু ব্যাকুল গলায় বললো, 'তুমি কেমন আছো?'

ও-পিঠ থেকে একটু হাসলো তোসিও। 'এই মুহূর্তে' মনে হচ্ছে তরী বোধ হয় কূলে ভিড়লো। মাসু, মাঝনদীতে বড়ো তুফান, ভেবেছিলাম তলিয়ে যাবো। তা হ'লে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি! কিসের! ও—' এবার বুঝতে পেরে গম্ভীর হ'লো মাসু। বুকের ভিতরটা গুড়গুড় ক'রে উঠলো। তোসিওর ভালোবাসার স্রোত যেদিকে প্রবহমান, সেই স্রোতে মাসুর বন্ধুতা ভাসতে চায় না। তোসিও তার অবচেতন মনে বোধহয় স্নেহময় ভাইয়ের আসন পেতে বসেছিলো তা নৈলে মাসুর মন এমন হবে কেন? কান্না পেয়ে গেল মাসুর।

তোসিও বললো,' কথা বলছো না কেন?'

'কী বলবো?'

'তুমি প্রস্তুত হয়েছো তো?'

'কী বিষয়ে?'

'বুঝতে পেরেও ভান করছো, আমি আমাদের বিয়ের কথা বলছি।' সময় নিয়ে মাসু বললো, 'আমার প্রস্তুতির উপর কি কিছু নির্ভর করছে?'

'বিয়েটা যখন তোমার—'

'কিন্তু আমি একজন মেয়ে আমার কথার মূল্য কী?'

অসহিষ্ণু হ'য়ে তোসিও বললো, 'বুঝেছি।'

'তোসিও।'

'আর কিছু বলবার দরকার নেই।'
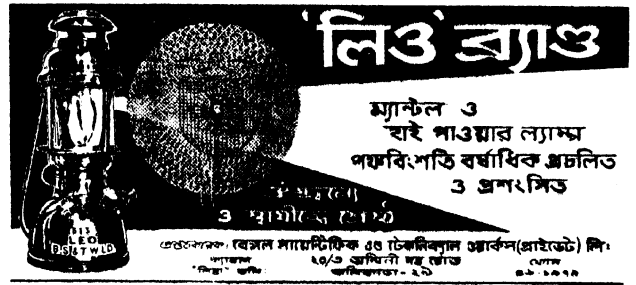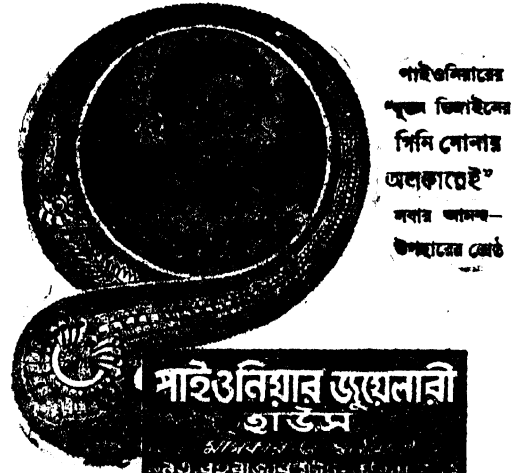
'আমাকে তুমি ক্ষমা করো, কিন্তু এই অপরাধে তুমি আমাকে তোমার বন্ধুতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোরো না।'

'মাসু, আমি যা পারি না তা আমি কেমন ক'রে করবো! তুমি আমাকে ম'রে যেতে বলো রাজি আছি, তুমি আমাকে একটা একটা ক'রে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলতে বলো হয়তো তাও আমি পারবো, কিন্তু হৃদয় ভরা প্রেম নিয়ে নিছক বন্ধুতার ভান ক'রে আর আমি তোমার কাছে দাঁড়াতে পারবো না। আমাকে বিদায় দাও।'

অশ্রুবাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মাসু ডাকলো, 'তোসিও।'

তোসিও ফোন ছেড়ে দিল।

আবার চ'লে গেলো তোসিও। হায়াসি

দম্পতি ছেলের ব্যবহারে মর্মাহত হ'লেন। মাসুর মা-বাবাকে মাসু নিজের অমতের কথা জানিয়ে তোসিওর উপর তাঁদের আক্রোশ নিবারণ করলো। নিভৃতে তার মা তাকে বললেন, 'কেন, তোর কিসের আপত্তি।'

মাসু বললো, 'জানি না।'

মা বললেন, 'এমন স্বামী কি একজন মেয়ে ইচ্ছে করলেই পেতে পারে? তোসিওর মতো গুণবান হৃদয়বান এবং ধনবান পাত্র আর আমি কোথায় পাব?

মাসু বললো, 'আমি কোনোদিন বিয়ে করবো না।'

সন্দেহ ক'রে মা বললেন, 'তুই কি গোপনে আর কারো সংগে মিশিস?'

'না।'

'তবে কেন ওকে ফিরিয়ে দিলি?'

'আমি ভাবতে পারি না, কিছুতেই ভাবতে পারি না মা।'

'ভাববার কী আছে এর মধ্যে?

'আছে, অনেক আছে। ও আমার স্বামী হ'লে অনেক কিছু ভাববার আছে, আমি তো জানোয়ার নই যে সব পারি। আর তোসিও তো রক্তমাংসের মানুষ। আমি পারবো না, মা, পারবো না।' খোলাখুলিভাবে এই কথা বলে মার কোলে উপুড় হ'য়ে শুয়ে কাঁদতে লাগলো মাসু। মাসুর মা মাসুর মনের এই অদ্ভুত ভাবের কোনো ব্যাখ্যা না-পেলেও দুঃখটা বুঝলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েকে শান্ত হ'তে বললেন তিনি।

দিন চলতে লাগলো খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। আট মাস পরে মাসুর বি এ পরীক্ষা হ'লো, পাশ ক'রে এম এ তে ভর্তি হ'লো সে। এই ছ'মাসে তোসিও আর আসেনি। বি এ পাশের খবর আসার সাতদিন আগে মাসুর জন্মদিন ছিলো, মূল্যবান উপহার এলো একটি নিউইয়র্ক থেকে, প্রেরকের নাম না থাকলেও কে পাঠিয়েছে বুঝতে দেরি হ'লো না। আবার সাতদিন পরে পাশ করা উপলক্ষ্যে আর একটি উপহার এলো।

তার এক বছর পরে তোসিও দেশে এলো মায়ের অসুখের খবর পেয়ে। কিন্তু সবাই বললো তোসিওকে দেখে বোঝা যায় না তার মায়ের অসুখ না তার নিজের অসুখ। অমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলের কী হাল হয়েছে। মিঃ হায়াসি ছেলেকে দেখে রাগ ভুলে বিমর্ষ হলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি কোনো অসুখ করেছে?'

তোসিও মৃদু হেসে জবাব দিল, 'না তো।'

'তবে এ রকম চেহারা হ'য়েছে কেন?'

'কী রকম?'

'তোমাকে আমি ডাক্তার দেখাবো।'

'তুমি বৃথা চিন্তা করছো।'

'তোমাকে আমি আর ফিরে যেতে দেবো না।'

'আমার থিসিস কমপ্লিট করতে আরো এক বছর বাকি।'

'ছেড়ে দাও।'

'তা কখনো হয়?

'খুব হয়। এ-বছরটা তোমার বিশ্রাম দরকার।'

চুপ ক'রে রইলো তোসিও।
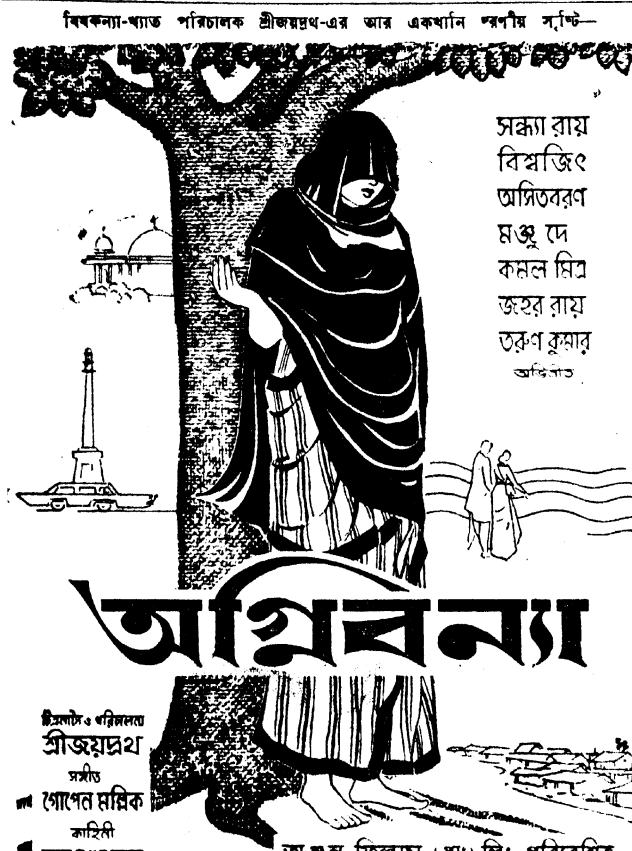
মায়ের অসুখ সেরে গেলেও সত্যিই তার যাওয়া হ'লো না। কেবলমাত্র পিতার আদেশের জন্যই নয়। একরাত্রে প্রবল জ্বর এলো তার। মাথার একটা অদ্ভুত যন্ত্রণায় সে মূহ্যমান হ'লো। আর সেই দুর্বল অবস্থায় তার মনের জোর রইলো না, অর্ধ জাগ্রত বোধ নিয়ে সে মাসুকে খুঁজতে লাগলো। মিসেস হায়াসি নিজে এসে ডেকে নিয়ে গেলেন তাকে।

প্রাণমন ঢেলে সেবা করলো মাসু, শুধু তাই নয় তোসিওর স্ত্রী হবার জন্যও নিজেকে প্রস্তুত করলো সে। মনকে বোঝালো, যে তোমার জন্য ধীরে-ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার জন্য তোমার কিছু ঋণ আছে, এবং তা তোমার পরিশোধ করা দরকার। আর যার জন্য তোমার মনে এতো শ্রদ্ধা ভালোবাসা তাকে গ্রহণ করতে এই দ্বিধা তোমার মনের একটা ব্যাধিমাত্র।

তোসিও সাতমাস পরে সুস্থ হ'য়ে পরিতৃপ্ত মন নিয়ে আবার চ'লে গেল নিউ-ইয়র্ক। কথা রইলো মাসু এম এ পাশ করলে, তার নিজের থিসিস শেষ হলে তারপর তারা বিয়ে করবে। এটা তাদের নিজেদের মধ্যে শর্ত হ'লো, বাপ মায়েরা কিছু জানলেন না।

কাটলো কিছুদিন। দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পেরে মাসু অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলো সেই সময়ে। মনে-মনে ভেবেছিলো, বিয়ে করলেই প্রেম হ'লেই এই শারীরিক শুচিতা

কেটে গিয়ে শান্তি পাবে সে। কিন্তু প্রেমে পড়া যে সত্যি কী ভীষণ, এবং তার মধ্যে শরীরের প্রাধান্য যে কতোখানি, সেটা সে প্রথম উপলব্ধি করলো এক জর্মান ভদ্রলোকের সংস্পর্শে এসে। ভদ্রলোক জরুরি সরকারি কাজে কিছুকালের জন্য জাপানে এসেছিলেন, আর জাপানে এলে জাপানী কিমোনো কেনে না এমন বিদেশী কেউ নেই। এক ছুটির দুপুরে, যখন একখানা বই হাতে নিয়ে সে তাদের বিশাল দোকানের একটি নির্জন কোণে উপন্যাসের সবচেয়ে জোরালো জায়গাটায় এসে পে'ছৈছে, এমন সময় সেই ভদ্রলোকটি এসে দাঁড়ালেন। ক্যাশিয়ার ছুটি নিয়েছে, টাকাটা মাসুকেই নিতে হবে। ভদ্রলোক গমগমে গলায় একটু অভিযোগ করলেন দোকানের লোকেরা তাঁর দিকে ভালো ক'রে মনোযোগ দিচ্ছে না বলে। বই-টই রেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো মাসু, নিজের অন্যমনস্কতার জন্য লজ্জিত হ'লো, মাথা নিচু ক'রে অনেকবার ক্ষমা চাইলো কিমোনোর দাম নিয়ে পঞ্চাশবার "আরিগাতো", "আরিগাতো" বলতে লাগলো। আরিগাতো মানে ধন্যবাদ। সব কথাতেই তাদের ধন্যবাদ বলা অভ্যেস। সেদিন তার মাত্রা ছাড়ালো। যাবার সময় ভদ্রলোক খুশী মনে বিদায় নিলেন। তিন-দিন পরে খুব অপ্রত্যাশিতভাবে কলেজের পথে আবার দেখা হ'য়ে গেল ভদ্রলোকের সঙ্গে। কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে তিনি দৃশ্য তুলে বেড়াচ্ছেন। মাসুকে দেখেই এগিয়ে এসে হাত ঝাঁকিয়ে সম্ভাষণ করলেন। মাসু অনুভব করলো ভদ্রলোকটি যেন একটু বেশি সময় নিলেন, হাত ঝাঁকাতে আর সেই সময়টুকু মাসুর বুকের তলায় ছোট্ট একটু কম্পন তুললো। মাসু বললো, 'ভালো?' ভদ্রলোক বললেন, 'খুব ভালো। আরো ভালো এই যে তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।' মাসু আবার 'আরিগাতো' বললো, খানিকটা পথ এক সঙ্গে হাঁটলো তারা, ভদ্রলোক জাপানী মেয়ের নমুনা হিসেবে মাসুর একটি ছবি তুলতে অনুমতি চাইলেন। মাসু গররাজি হবার কোনো কারণ দেখলো না।

এই সূত্রটি ধ'রেই আনাগোনা আরম্ভ হ'লো। ছবি দিতে আসা, ছবি তুলতে দেবার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একদিন নিমন্ত্রণ করা, তার আবার পাল্টা নিমন্ত্রণ—এইসব করতে-করতে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হ'লো। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল তারা প্রায়ই নির্ধারিত সময়ে দেখাশুনো করছে। মাসু বুঝতে পারলো তার দুর্বলতা, তার বিবেক তাকে অনেক ধমকালো কিন্তু শোধরাতে পারলো না। এই টান বড়ো ভীষণ টান মাসু প্রেমের শেষ সোপানে গিয়ে পে'ছিলো।

এদিকে চিঠি না-পেয়ে-পেয়ে অস্থির হ'য়ে উঠলো তোসিও, টেলিগ্রামের উপর টেলিগ্রাম আসতে লাগলো। মাসু যেমন বিব্রত হলো তেমনি বিরক্তও হ'লো। গুরুজনরা প্রশ্নে-প্রশ্নে অস্থির ক'রে তুললেন। তোসিও সম্পর্কে কবে যে কেমন ক'রে একটা দায়িত্ব-বোধ জন্মে গেছে মাসুর মাসু তা জানে না। বুকের একটা শিরাতে টান ধরলো। আর যাই করুক, তোসিওকে সে ঠকাতে পারে না। তোসিওকে বঞ্চনা করতে পারে না। রাত্রি-গুলো তার চোখের জলে ভেসে যেতে লাগলো, দিনগুলো প্রেমের স্রোতে। শেষে নিজের সঙ্গে একা হ'তেই তার ভয় আরম্ভ হ'লো। মনে হ'লো রাত্রি নামক কোনো বিশ্রামের সময় না থাকলে বুঝি বে'চে যেতো সে।

ভদ্রলোক ছ' মাসের জন্য এসেছিলেন, লেখালেখি ক'রে আপ্রাণ চেষ্টায় কাজের মেয়াদ আরো তিনমাস বাড়িয়ে নিলেন। বছরের শেষে তোসিও দেশে ফিরলো। সে বুদ্ধিমান ছেলে, মাসুর পরিবর্তন বুঝতে পেরেছিলো, কিন্তু এতটা ভাবেনি। এসে স্তম্ভিত হ'লো। কিন্তু কিছু বললো না, বলা তার স্বভাব নয়। এবার আর ফিরে

গেলো না সে, চুপচাপ বাড়িতেই দিন কাটাতে লাগলো। তার মা-বাবা তার বিয়ে দেবার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠলেন। তোসিওর মতামতের অপেক্ষা না রেখে দিগ্বিদিকে মেয়ে খুঁজতে লাগলেন। কিয়োটো শহরে হায়াসিরা বিখ্যাত পরিবার। তোসিও হায়াসি বিখ্যাত ছাত্র, মেয়ের বাপেরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ছেঁকে ধরলো, তোসিও বললো, 'সব ফিরিয়ে দাও, মেয়ে আমি নিজে পছন্দ করেছি।' 'কাকে? কাকে?' হায়াসি স্বামী-স্ত্রী হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, তোসিও বললো, 'সময় হ'লে বলবো।'

ছেলে তাদের সব বিষয়েই ভালো, যেমন বাধ্য, তেমন নম্র, কিন্তু এই এক বিষয়ে মা বাপকে উতলা করলো সে। উতলা অবিশ্যি নিজেই সবচেয়ে বেশি হ'লো, তার খাওয়ার ঠিক রইলো না, নাওয়ার ঠিক রইলো না, মাত্র তিন মাসের জন্য থিসিসটা কমপ্লিট করলো না, মাঝখান থেকে একটা ছোটো স্কুলে মাস্টারি নিয়ে বসলো। সারাদিন চুপচাপ নিজের ঘরে বসে থাকে, আর সময় মতো স্কুলে যায়। তোসিওকে ভালোবাসতো সবাই, বন্ধুরা তাকে প্রাণতুল্য ভাবতো। মাঝে মাঝে তারা এসে জোর করে নিয়ে যেতো এখানে-ওখানে, সিনেমায় অথবা থিয়েটারে। ঐ যাওয়া পর্যন্তই, প্রাণ-থাকতো না তাতে। তোসিওর মা-বাবার অশান্তির সীমা রইলো না। এবং কেউ কিছু না বললেও তারা বুঝে নিলেন এর মূল কারণ মাসু। দুই পরিবারের এতোদিনের বন্ধুতায় একটি অলক্ষ্য ফাটল ধরলো।

জর্মান ভদ্রলোকটির সঙ্গে মাসু যতোই প্রেমে আসক্ত হোক না কেন, তোসিওর কথা সে তা ব'লে মন থেকে উচ্ছেদ করতে পারলো না। কেন পারলো না তাও মাসু জানে না। খবরাখবর সবই তার কানে যায়, মন খারাপ হয়, নিজেকে ফেরাতে চেষ্টা করে; লাভ হয় না। কোনো এক বিকেলে মাসু যখন কলেজ থেকে একটা পার্কের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলো হঠাৎ তাকিয়ে দেখলো পড়ন্ত বেলার রোদে একটা নিচু গাছের তলায় একটি উঁচু-নিচু কৃত্রিম ছোট্ট পাহাড়ের একটি পাথরে তোসিও বসে আছে, এক ধাপ নিচে আর একটি পাথরে অন্য একটি বিদেশী মেয়ে। দৃশ্যটা বিকেলের সঙ্গে মিলিয়ে ছবির মতো। মাসু যেতে-যেতে হোঁচট খেলো, দাঁড়ালো, শেষে হন হন ক'রে চলে গেল। বাড়ি গিয়ে মনে হ'লো খিদে নেই, সন্ধ্যাবেলা বেরুতে গিয়ে মনে হ'লো শরীর খারাপ, নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে মনে হ'লো মানুষ জাতটার মতো বিশ্বাসঘাতক আর কেউ না।

তোসিওকে সে প্রায় দু' বছর পরে দেখলো, সত্যিই অনেকটা রোগা হ'য়েছে, মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত, গালের দাড়িও যথোচিত পরিচ্ছন্নভাবে কামানো নয়, তবু মনে হ'লো আগের চেয়ে দেখতে যেন অনেকটা বেশি সুন্দর হ'য়েছে। আর প্রণয়িনীটিকে সামনে নিয়ে মুখের যে রকম আত্মহারা ভাব ছিলো, সে রকম ভাব মাসু অন্তত কোনোদিন দেখেনি। পুরুষ জাতকে মাসু ধিক্কার দিলো, তাদের ভালোবাসার বড়াইয়ের মুখে ছাই দিল।

শুধু মাসুই নয়, এর পরে পরিচিতদের মধ্যে আরো অনেকে তোসিওকে নানা জায়গায় ঐ মেয়েটির সঙ্গেই ঘোরাফেরা করতে দেখলো। কিছুদিনের মধ্যে একটা চাপা ফিসফাসও আরম্ভ হ'লো, শোনা গেল মেয়েটি তোসিওর স্কুলেরই একজন শিক্ষয়িত্রী। সবাই ওয়াক থু করলো, বললো, শেষে নাকি তোসিও হায়াসি ঐ একটা কুচ্ছিত বিদেশী শিক্ষয়িত্রীর পাল্লায় প'ড়ে মাথা মুড়োলো। মনে মনে মাসুও ওয়াক থু না ক'রে পারলো না।

ততোদিনে জর্মান ভদ্রলোকটি নিজের দেশে চ'লে গিয়েছিলেন। আসলে ভদ্রলোকটি বিবাহিত, মাসুকে দেখার আগে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিলো না, আর মাসুকে দেখার পরে মাসুকে যতোটা ভালোবাসছেন স্ত্রীর প্রতি বর্তমানে তার চেয়ে অনেক কম আকর্ষণ অনুভব করলেও জীবন থেকে তাকে একেবারে বাদ দেবেন এরকম একটা কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। তার উপরে দুটি বাচ্চা আছে। সুতরাং মাসু বিষয়ে তার যতো দুর্বলতাই থাকুক আর বেশীদিন এখানে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হ'লো না। অথচ মাসুকে এভাবে রেখে নিজের দেশে ফিরে যেতে যথেষ্ট কষ্ট হলো তার। মাসুর ভাষায় ভদ্রলোকটি সৎ। মাসুর সঙ্গে পরিচয়ের অনতিপরেই তিনি মাসুকে স্ত্রীর কথা জানিয়েছিলেন। তবুও মাসু ভাসিয়ে দিয়েছিলো নিজেকে। জর্মান ভদ্রলোক নিয়মিত চিঠি লিখছিলেন তাকে, মাসুকে হয়তো তিনি অকারণে একটা অশান্তির মধ্যে ফেললেন এই ভেবে অনুতাপ করছিলেন, মাসু জবাব দিয়েছিলো অনুতাপ করবার কোনো কারণ নেই, কেননা মাসুর জীবনে এমন একটি বাধা আছে যার জন্য সেই জর্মান ভদ্রলোক যদি কখনো তার পানিপ্রার্থীও হতেন, মাসু নিজেই তার প্রতিবন্ধক হ'তো। মাসু শুধু তাকেই

না, আরো একজনকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসার প্রকৃতিটা যে কী তা অবিশ্যি সে জানে না। শুধু এটা জানে জীবনে তার সুখী হবার অধিকার নেই।

এরপরে সেই ভদ্রলোকের চিঠির সুর আস্তে আস্তে অন্যরকম হ'য়ে আসছিলো, তিনি তাকে সেই আর-একজন ভালোবাসার পাত্রটিকে বিয়ে ক'রে সুখী হ'তে উপদেশ দিচ্ছিলেন।

মাসুর মনে কিন্তু সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে শতস্মৃতি বিজড়িত দিনগুলো তখনো জ্বলজ্বল করছিলো, অথচ যে মুহূর্তে তোসিওর সঙ্গে অন্য একটি মেয়েকে যুক্ত হ'তে দেখলো, সব ভুলে গেল। যেন সর্বনাশ হ'য়ে গেল তার। পরীক্ষার আর বেশি বাকি ছিলো না, কিন্তু পরীক্ষা দিল না। অসুস্থতার ভান ক'রে পড়ে রইলো, বিছানায়। মা বাবার একমাত্র সন্তান সে, তার উপরে যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, যতো বিরক্তই হোন, বিশেষ কিছু বলতেও পারেন না। বাবা তো মোটামুটি টোকিয়োতেই থাকেন, তবে বেশি দেখেন না, বোঝেনও না, যতো যন্ত্রণা মার। এই ক'রে ক'রে আরো ছ'মাস কেটে গেল। তারপর একদিন শোনা গেল তোসিও বিয়ে করছে।

যেদিন খবরটা কানে পেঁছিলো, কাঁদতে-কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেললো মাসু। মাসুর মা রেগে গিয়ে বললেন, 'আর যদি তুমি বাড়াবাড়ি করো, আমি কালই তোমার বাবাকে আসতে টেলিগ্রাম করবো, তিনি এসে তোমাকে টোকিয়োতে নিয়ে যাবেন। আমি কিছুতেই তোমাকে আর এখানে রাখবো না।'

মার মনে মা রাগারাগি করতে লাগলেন, মাসুর মনে মাসু কাঁদতে লাগলো। শেষে একদিন নির্জনে তোসিওকে ফোন করলো সে। 'হ্যালো!'

'আমি মাসু।' বলতে গলা কাঁপলো তার।

'মা-সু!' ওপিঠের গলাও অকম্পিত শোনা গেলো না।

মাসু বললো 'আমার অভিনন্দন।'

তোসিও বললো, 'আরিগাতো!'

'আশা করি খুব সুখে আছো।'

'হয়তো।'

'ভাবী স্ত্রীটি নিশ্চয়ই মনোমতো হয়েছে।'

'তোমার কি আর কোনো জরুরি কথা আছে?'

'এগুলি কি যথেষ্ট জরুরি নয়?'

'না।'

'আজকাল তবে কী ধরনের কথা অথবা কার কথা তোমার বিশেষ জরুরি বলে বোধহয়।'

'মাসু, নিজেকে কোনো কারণেই ছোটো কোরো না।'

'এখন তো আমাকে তোমার ছোটোই মনে হবে।'

'কিছু মনে কোরো না, আমার ঘুম পেয়েছে, আমি ফোন ছেড়ে দিচ্ছি।'

রেগে অস্থির হয়ে মাসু নিজেই ফোন রেখে দিল।

কিন্তু সেই রাগ তাকে আরো উত্তপ্ত করলো, খানিকক্ষণ বিছানায় ছটফট করে আবার টেলিফোন তুললো সে।

'শোনো।'

'বলো।'

'এই তোমার মুখেই আমি অনেক বড়াই শুনেছিলাম।'

'আমাকে তুমি যতো অভদ্র ভাবো, হয়তো আমি ততোটা নই। বড়াই করা আমার স্বভাব নয়।'

'কেবল চুল-দাড়ি রেখে, ময়লা জামা-কাপড় পড়ে, পরীক্ষা না দিয়ে বিরহের বিজ্ঞাপন আঁটো, এই তো?'

তোসিও অভদ্র নয় সেটা তো নিশ্চয়ই। মাসুও যে অভদ্র এমন কথা মাসু কখনো ভাবেনি। কিন্তু কী যে তার মনের ভাব তোসিও সম্পর্কে তা সে এখনো এতো বছর পরেও বুঝতে পারে না। সেই সময়ে তার যেন কোনো জ্ঞানগম্যি ছিলো না, ভদ্রতা অভদ্রতার কোনো প্রশ্নই উঠলো না মনে। তোসিও তার, একান্ত তার, সেই দাবীতে যদি কেউ প্রতিবন্ধক হয় যে কোনো উপায়ে উচ্ছেদ করতেই হবে তাকে।

কিন্তু সব বিষয়েই তোসিও সংযত শান্ত।

মাস্‌ যখন তার চোখের সামনে অন্যের সংগে নির্লজ্জের মতো প্রেম ক'রে বেড়িয়েছে কই, তখন তো তোসিও এমন করেনি। অথচ তোসিওর যতো কষ্ট হ'য়েছে, ততো কষ্ট কি মাস্‌র কখনোই হ'তে পারে? নিজের মনের দৈন্য দেখে লজ্জিত হওয়া উচিত ছিলো মাস্‌র, কিন্তু হ'লো না। তোসিওর জবাব শোনবার জন্যে শক্ত হাতে ফোন ধরে রইলো।

একটু দেরি ক'রে যেন বেদনায় বিদীর্ণ হ'য়ে তোসিওর গলা ভেসে এলো, 'তুমি বড়ো নিষ্ঠুর।'

'আর তুমি?'

'হ'তে পারলে ভালো হতো।'

'তোমার নিজের ধারণায় তুমি যতো বড়ো, ততোবড়ো তুমি নও।'

'আমার ক্লান্ত লাগছে, আমাকে দয়া করো একটু, ফোনটা তুমি ছেড়ে দাও।'

'তাই দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে শুধু একটা কথা জানিয়ে দি, তোমার মতো বিশ্বাস ঘাতক দুনিয়ায় দু'টি নেই।'

ঘটাং ক'রে ফোন রেখে বিছানায় শুয়ে চোখের তপ্ত জলে বালিশ ভেজাতে লাগলো মাস্‌। তেইশ বছরের মাস্‌ তেরো বছরের বালিকার চেয়েও অবুঝ হ'য়ে গেল।

খুব আশ্চর্য, পরেরদিন ব্রেকফাস্ট ক'রে মা যখন দোকানে বসতে গেলেন, আর তাকে যখন গৃহকর্মের জন্য উঠতেই হ'লো, মন-খারাপ ক'রে বাগানে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলো তোসিও তাদের লতাঘেরা বাঁশের গেটটি খুলে ভিতরে এলো। দেখিনি ভাব ধ'রে অন্যদিকে তাকিয়েছিলো মাস্‌, তোসিও বললে, 'আমাকে ডেকেছো?'

মুখ ফিরিয়ে একবার তাকিয়েই মাস্‌ চোখ সরিয়ে বললো, 'না।'

'তবে যে তোমার মা আমাকে আসতে বললেন।'

'ও, মা বলেছেন তাই এসেছো। নিজে থেকে আসোনি।'

হেসে ফেললো তোসিও।

মাস্‌ বললো, 'খুব আনন্দ হয়েছে না? হাসি আর চাপতে পারছো না।'

'আনন্দই বটে। কিন্তু কী হয়েছে তোমার? শুনলাম কান্নাকাটি করছো, খাচ্ছো না, কেন? মিঃ কেলনার কি চিঠি-পত্র লিখছেন না অনেকদিন?'

তোসিওর মুখে মিঃ কেলনারের নাম উচ্চারণ হ'তে শুনে চমকে উঠলো মাস্‌। তার মুখ লাল হ'য়ে উঠলো, এ রকম নাম ধাম সবই যে তোসিওর জানা আছে সে কথাটা জানতো না সে। মুখে তার কথা ফুটলো না।

তোসিও বললো, 'তোমার মার একটা ভুল ধারণা হয়েছে এসব কান্নাকাটির মধ্যে আমার হয়তো একটা পার্ট আছে, সেটা যে কতো মিথ্যে কিছুতেই বলতে পারলাম না তাঁকে সে কথা। তাঁকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, কথা দিয়েছি ব'লেই এলাম। ভেবো না কোনো সুযোগ নেবার উদ্দেশ্য আছে আমার।'

মাস্‌ একেবারে চুপ।

'কিন্তু দুঃখ বেদনা কিছু-না-কিছু সকলেরই আছে' ঈষৎ উত্তেজিত তোসিও অন্যমনস্কভাবে একটা চন্দ্রমল্লিকার কুঁড়ি ছিঁড়ে ফেললো, 'যার-যারটা তার-তার কাছে সব সময়েই অন্যের চেয়ে বেশী মনে হয়, তবে সবচেয়ে আজ এইটাই আমার কাছে বেশি মর্মান্তিক লাগছে যে, তোমার এই বেদনার জন্য তোমার মা শেষ পর্যন্ত আমাকেই দায়ী মনে করলেন।'

মাস্‌ পাথরের মতো স্থির।

'কিন্তু যাক সে কথা' তোসিওর দীর্ঘ-শ্বাসটা চাপা রইলো না। 'তুমি ভেবো না, সেই ভদ্রলোক ভালো আছেন। আমাদের স্কুলে আমার এক বিদেশিনী বন্ধু আছেন, তিনি জাতিতে আমেরিকান, জার্মান ভদ্রলোকটিকে তিনি খুব ভালো ক'রেই চেনেন। ভদ্রলোকটির স্ত্রী এ'র মামাতো বোন, ভদ্রলোকটি নিজে জার্মান হ'লেও বিয়ে করেছেন একটি আমেরিকান মেয়েকে। ভদ্রলোক যখন এখানে ব'সে তোমাকে মনে রেখে স্ত্রীকে ভুলে থেকে কষ্ট দিচ্ছিলেন, তিনি তখন আমার বন্ধুকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন ব্যাপারটা কী।

আমার বন্ধু শুধু লিখে দিলেন, 'ভাবনার কিছু নেই।' আমার কাছে তিনি তোমার কথা শুনেছিলেন, মন খুলে শুধু এই বন্ধুটির কাছেই কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে সব আমি বলে ফেলেছিলাম। হাজার হোক আমিও তো মানুষের অতিরিক্ত কিছু নই।'

মাস্‌ দুঃখে লজ্জায় মিশে রইলো মাটিতে। তার কোনো কথা শোনার জন্য অপেক্ষা না-ক'রে তোসিও বিদায় নিল।

এরপরে তোসিওর সংগে আর মাস্‌র দেখা হয়নি। তোসিও আবার ফিরে গিয়েছিলো নিউইয়র্কে। এই চার বছরের মধ্যে আর আসেনি সে। তার বাবা-মা মধ্যে মধ্যে উড়ে গিয়ে ছেলেকে দেখে আসেন। ডক্টরেট হ'য়ে সে সেখানকার কলম্বিয়া য়ুনিভার-সিটিতে ছাত্র পড়াচ্ছে।

গল্প শেষ ক'রে মাস্‌ বিশীর্ণ রেখায় হাসলো, বললো, 'সুতরাং আমার কি আর বিয়ের প্রশ্ন আছে, না বয়স আছে।'

আমি বললাম দুটোই আছে।

'কী উপায়ে?' হাতের মুঠোয় চাপ দিয়ে কথায় ঠাট্টার সুর আনলো মাস্‌। বললাম 'সম্বন্ধ ক'রে। পাত্র হবেন তোসিও হায়াসি, কন্যা আমাদের মাৎসু-মোতো।'

'তারপর।' মাস্‌ কৌতুকে চোখ নাচালো। আমি তেমনি গম্ভীর থেকে বললাম, 'প্রস্তাবটা স্বয়ং কন্যাকেই পাঠাতে হবে পাত্রের কাছে, পাত্র গ্রহণ করলে আনুষ্ঠানিকভাবে মা বাবারা বিয়ে দেবেন এবং সেই বিয়ের দিনই তারা পরস্পরকে দেখবে তার আগে নয়।'

'আর পাত্র যদি রাজি না হয়?'

'মনে হচ্ছে, সেটা সম্ভাবনার পরপারে।'

'এতো বিশ্বাস!'

'নিজের মনকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখো না।'

মাৎসুমোতো অর্থপূর্ণভাবে হেসে উঠে দাঁড়ালো, বললো, 'গাড়ি এসে গেছে, চলো।'

পরেরদিন সকাল দশটায় কিয়োটো শহর ছেড়েছিলাম, এয়ার পোর্টে বিদায় দিতে এসে আলিংগনাবদ্ধ ক'রে মাস্‌ বললো 'তুমিই আমার আসল বন্ধু।' এই বলে চুমু খেলো। আমি সজল চোখে প্লেনে উঠতে-উঠতে ভাবলাম আমার কথাটা কি ভেবে মাস্‌র মনে ধরেছে? কী জানি।

ক্রীতদাস

॥ ইতিহাসের আলো-আঁধার থেকে ॥

সমরেশ বসু

আমি ক্রীতদাস।...

নটপুত্ত বললেন ফিস্‌ফিস্‌ করে। তাঁর নগ্ন পরিব্রাজক শিষ্যরা চলেছে সঙ্গে। আর জনতা।

—আমি অনুভব করেছি, আমি ক্রীতদাস।...

নটপুত্ত আপন মনে বলছেন, আর নিরন্তর পথ চলছেন। সূর্য পরিক্রমার দক্ষিণায়নের শেষ কাল সমাগত। অসহ্য শীত। তুষারলেহী উত্তরে বাতাস ঝড়ের মতো বেগে বইছে। ধুলো উড়ছে। নীল আকাশকে ধূসর করছে। আবছায়ার অস্পষ্টতা দিকে দিকে। গাছেরা নিষ্পত্র, যেন রুগ্ন নগ্ন অচেলকদের মতো। ফুল সম্ভার নেই। পাখিরা চলে গেছে সমুদ্র-সৈকতে, বঙ্গে, কলিঙ্গে, সিন্ধুতটে আর সুরাষ্ট্রে।

প্রবল বাতাস, শুকনো পাতা উড়ছে।
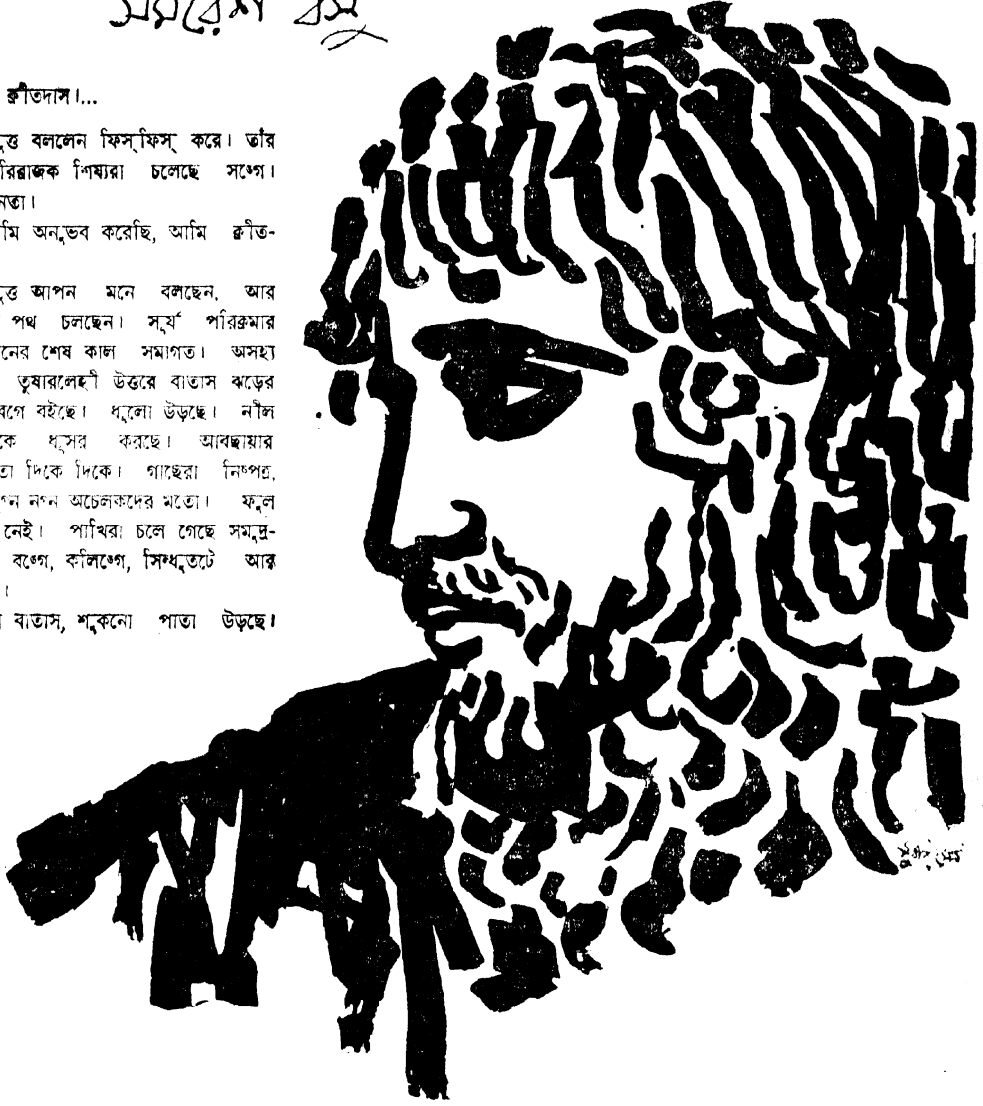
বাতাসও শুকনো, নহলাদের চামড়ার লিকলিকে কশা-র মতো। সহস্র কশা-র চাপা তর্জনের শব্দ। ধুলোয় আর পোকায় প্রান্তরগুলি আচ্ছন্ন। জনপদগুলি অস্পষ্ট। মানুষেরা ছায়া ছায়া। কারণ, সকলেই আগুন জ্বালছে, তাই ধোঁয়া হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় রাজপথের ওপরেই অগ্নি-কুণ্ড তৈরী করেছে গ্রামবাসীরা।

কিন্তু নটপুত্ত নির্বিকার। তাঁর বিশাল সুদীর্ঘ মূর্তি ধ্বজার মতো উন্নত। শক্ত কঠিন, আকাশস্পর্শী। তাঁর আজানু-লম্বিত জটা যদিও তিনি গাছের গুঁড়িতে রেখে তীক্ষ্ম পাথর খণ্ড দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছেন, তবু এখনো কাঁধ এবং গ্রীবায় জড়িয়ে আছে। ধুলোয় রং বিবর্ণ সেই জটার, আর পাথরের মতো হয়ে গেছে। গুম্ফ শ্মশ্রু যেন ঝড়-ভীড়ু সাপের মতো তাঁর গাল চিবুক গলা আঁকড়ে কুঁকড়ে রয়েছে। সেগুলি ধুলোয় আচ্ছাদিত। সন্ধ্যার ধূসর মেঘের মতো তার রং। তাঁর কাঁধ থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়া, ভেড়ার লোমের গোণক। বিস্রস্ত আলখাল্লার মতো তার দীর্ঘলোম মোটা গোণকটা শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠী নিজের গায়ের থেকে খুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন। চামড়ার বন্ধনী দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন গলার সঙ্গে। তাই পড়ে যায় নি কোথাও। সেটার রংও তাঁর জটা শ্মশ্রু গুম্ফের মতোই হয়েছে। কারণ, তাঁর চলা দশটি পূর্ণিমা অতিক্রম করে গেছে। শ্রাবস্তীর ধুলো রক্তিম। কপিলা-বস্তু ঘুরে এসেছেন। শাক্যরাজ্যের ধুলোও রক্তিম। বৈশালী এবং কোশাম্বী আর ঋষিপত্তন মৃগদাব-কাশীগ্রামের ধুলো ধূসর। তারই মিশ্রিত রং তাঁর সর্বাঙ্গে। তাঁর বিশাল সিংহের মতো লোমশ বুকে। বলিষ্ঠ হাতে পায়ে।

এখন তিনি চলেছেন দক্ষিণ-পূর্বে, রাজ-মার্গের উপর দিয়ে। শ্রেণিক তাঁর জামাতা-যৌতুক হিসেবে কোশলের কাছ থেকে কাশীগ্রাম লাভ করে এই পথ তৈরী করে-ছিলেন রাজগৃহ পর্যন্ত। তাঁর উজ্জ্বল বর্ণ আর সুন্দর দেহ, লোকে তাঁকে তাই বিম্বিসার বলত।

—আঃ! হে শ্রেণিক, আমি তোমাকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম না। হে শ্রেণিক, আমার কথা কি তোমার মনে পড়েছিল? সেই শেষ মুহূর্তে? সেই অন্ধকার ঘোর কুটিল রাত্রে, যে মুহূর্তে তোমার পুত্রের অস্ত্র তোমাকে প্রথম আঘাত করল। আর তারপরে ভিক্ষু দেবদত্তের অনুচরদের কুঠার?

বিড়বিড় করতে করতে নটপুত্ত সহসা আর্তগলায় চীৎকার করে উঠলেন, ওহো, প্রিয় শ্রেণিক!...অনুসরণকারী নগ্ন পরি-ব্রাজকেরা মুখ চাওয়াচায়ি করল। জনতার মধ্য থেকে কলরব উঠল, সেনিয় নেই।...... সেনিয় মরে এতদিনে ভূত হয়ে গেছে।...... সেনিয়কে ওরা...

গলাটা যেন কেউ টিপে ধরল। বাতাস থাবাড়ি দিল মুখে। একটা ফিস্ফিস্ শব্দ ছড়িয়ে পড়ল জনতার মধ্যে। চুপ! চুপ!...এর মধ্যে যে কেউ গুপ্তচর হতে পারে। তার কাছে এখুনি খবর চলে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ছাগচর্মিয়া।...... কিম্বা জ্যোৎমাল্! আই বাবা ভগবান্! হে বুদ্ধবাবা। হে নিগন্থবাবা! সে এখন হয় তো পাটলির গড়ে আছে। রাজগীরেও থাকতে পারে।

নটপুত্ত জানেন, ওরা অজাতশত্রুর কথা বলছে। হ্যাঁ পাটলিপুত্রে নতুন দুর্গ তৈরী করেছে সে। আর গুপ্তচর থাকলে ছাগ-চর্মিক শাস্তি হতে পারে। কানের কাছ থেকে গলা অবধি চামড়া ছিঁড়ে, দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে। নইলে জ্যোতিমাল। সারা গায়ে তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া।

একটা স্তব্ধতা নেমে এল। কেবল শীতার্ত নগ্ন পরিব্রাজকদের ঊর্ধ্বাঙ্গের রুক্ষ লোমশ পটিকা কাপড়ের খস্খস্, ভিক্ষাপাত্র ও জলপাত্রের ঠক্ঠক্ শব্দ। আর ধার্মিক জনতার হাতে খাদ্যভাণ্ডের ও জ্বলন্ত কাঠের পট্পট্ শব্দ। তারা সিদ্ধ-পুরুষ নটপুত্তকে নিজেদের গ্রামের শেষ পর্যন্ত সেবা করতে করতে এগিয়ে চলেছে। একটা গ্রাম শেষ হয়, আবার আর এক গ্রামের নরনারীরা ছুটে আসে।

কিন্তু নটপুত্ত অবিচলিত, বিকারহীন এগিয়ে চলেছেন। তিনি সেবা গ্রহণে বিরত। আশীর্বাদ উচ্চারণে নিরস্ত। তিনি ফিস্ফিস্ করে বললেন, হে শ্রেণিক, আমি ক্রীতদাস, আমি জানি। কিন্তু ভগবানেরা তোমার কাছে ছিলেন। আমি দেখলাম,

তোমার প্রতি উদ্যত কৃপাণের কাছে, তাঁরাও ক্রীতদাসের মতো নীরব, নতশির, অসহায়।

নটপুত্তের আকর্ণবিস্তৃত দীর্ঘপক্ষ্ম চোখ শুকনো। এক ফোঁটা জল নেই। তাঁর চোখের পাতা ধুলোয় বিবর্ণ। তাঁর দৃষ্টি সামনে, দূরে আকাশে নিবদ্ধ। সেখানে কোনো ব্যথার ছায়া নেই। রাগের বহ্নি নেই। আনন্দের উজ্জ্বলতা নেই। আছে আবিষ্কারের দূরে অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণতা, আর বিস্ময়।

আকাশের ধূসর দিকচক্রবালে মধ্য আকাশ-স্পর্শী বিশাল মেঘখণ্ডের মতো তাঁকে দেখাচ্ছে। মানুষের কল্পিত রুদ্র দেবতা তাঁকে বলা যাবে না। কারণ ভেরী ও ঝাঁঝরের তীব্র শব্দ নেই। দৈত্যও বলা যাবে না। গর্জন নেই। সারা আকাশের বুকে যেন খোঁচা খোঁচা এক অতিকায় মেঘখণ্ড। স্থির বিদ্যুৎ দুই চোখ। সংঘের ধ্বজ ও পতাকা তুলতে তিনি নিষেধ করেছেন পরিব্রাজকদের। নটপুত্ত নিজেই যেন ধ্বজ ও পতাকার মতো চলেছেন আকাশে মাথা ঠেকিয়ে।

নিয়মানুযায়ী অচেলকদের মতো তিনি বিলেপন করেন নি, বিভূ মাখেন নি। ধুলোয় তিনি বিভূষিত। রক্তের বিলেপন তাঁর দেহে। বৈশালীর হুতাশ বাতাসে, আর এই মাগধীয় রাজবংশের বিষসাপের ছোবলে, তাঁর চোখের চারপাশের রেখাগুলি ফেটে ফেটে রক্ত পড়ছে। তাঁর উন্নত নাসা ফেটে গেছে। নাকের পাশে, গভীর রেখায় আর ঠোঁটের কষ ফেটে রক্ত পড়ছে। গুম্ফ শ্মশ্রুতে লেগেছে। স্তম্ভ সদৃশ জংঘা জীর্ণ প্রাসাদের পাথরের মতো ফাটা। অনাবৃষ্টিতে চৌচির মাটির মতো পায়ের পাতায় রক্ত জমে গেছে। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে রক্তের দাগ। রক্তের দাগ মাটিতে লাগছে না। রুক্ষ শুকনো বাতাসে রক্ত মুহূর্তে শুকিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তিনি নির্বিকার। তাঁর গন্তব্য, বেভার, পাণ্ডব, বেপল্ল, গিজ্ঝকূট আর ইসিগিলি, পাঁচ পর্বত বেষ্টিত রাজগৃহ। বহু বছর পরে তিনি সেখানে প্রত্যাবর্তন করছেন। নির্গন্থ দশীয়, অর্থাৎ মাতৃপুত্র মহাবীরের সহধর্মী, সিদ্ধপুরুষ নগ্ন অচেলক, প্রাজ্ঞ নটপুত্ত বলে তাঁকে সারা দেশ জানে। কিন্তু শ্রাবস্তী থেকেই তিনি প্রায় মৌন। শিষ্য পরিব্রাজকদের উপদেশ দেন নি। ধর্ম আলোচনায় একবারও রত হন নি। সাংঘিক রীতিনীতি নিয়ম রক্ষা করেন নি। পরিব্রাজকেরা তাঁকে ঈশ্বরের চোখে দেখে। তাদের নীরব বিস্মিত জিজ্ঞাসার কোনো জবাব দেন নি। তারা দুঃখিত হয়েছে। তিনি সান্ত্বনা দেন নি। কাউকে সঙ্গে থাকতে বলেন নি। চলে যেতে বলেন নি।

বসন্তকালে কোশলে একবার তিনি কেঁদে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, আমি ক্রীতদাস।...

বৈশালীর অগ্নিবৃষ্টি ঝরা রৌদ্রে দাঁড়িয়ে হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, আহ্! আমি ক্রীতদাস। আমার সংশয় দূরে হয়ে যাচ্ছে।

এবং এখনো বলছেন আপন মনে রক্তাক্ত ঠোঁট নেড়ে নেড়ে, আমি জানতে পেরেছি, আমি ক্রীতদাস।...আর এইভাবে চলেছেন। এইভাবেই সারা পথ তার পিছু পিছু দলে দলে নরনারী এসেছে। এক দল থেমেছে, আর এক দল এসেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গৃহপতি ধনী, শ্রেষ্ঠী, আর সাধারণ জীবিকাশ্রয়ী জনতা। ধনী আর শ্রেষ্ঠী পুরুষ এবং মহিলারা সোনার বলয় আর কঙ্কণ, চন্দ্র আর মুদ্রা, মস্তক ও কণ্ঠহার তাঁর দেহলগ্ন গোণকে এঁটে দিয়েছে। এবং এখনো দিচ্ছে। তিনি তাকিয়ে দেখছেন না।

নটপুত্ত যেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কল্পিত স্বর্গের এক বিশাল দেবতা। আর তাঁর পশ্চাদ্‌গামী পরিব্রাজক ও জনতা যেন মর্তাকার ছায়া ছায়া দেবদূত।

তাঁকে দেখে সবাই চীৎকার করে উঠছে, ইনি গণাচারিয়া!

—আমি ক্রীতদাস!

মনে মনে বলছেন নটপুত্ত।

—ইনি মহাপরিব্রাজক নটপুত্ত।

—আমি ক্রীতদাস।......তিনি নিজেকে বলছেন।

—ইনি রক্ষিতেন্দ্রিয়! শীলসম্পন্ন!

নটপত্তু জানেন, মানুষ অভ্যাসে বলছে। প্রতিধ্বনি করছে। যেমন, ইনি মহারাজ। হাঁ ইনি মহারাজ। উনি প্রজাপালক। উনি প্রজাপালক। রক্ষাকর্তা! উনি রক্ষাকর্তা। গ্রামে এই সব পুরুষ ও নারীরা, কাজে ও খেলায় রত। কোথাও গ্রামের পথে, কোথাও রাজবর্ত্মের ওপরে। কিংবা ঘরের মধ্যে। আর নগরে।

অগ্নিকুণ্ডের পাশে কোথাও মেষ কিংবা কুক্কুট যুদ্ধ লাগিয়ে মজা দেখছে। কাঠের ফলকে পংক্তি খেলছে। কাঠের ফলক যাদের নেই, তারা আকাশে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে ঘর কেটে কল্পনায় খেলছে। মাটিতে ঘর কেটে দৌড়ে দৌড়ে খেলছে। বংকক খেলছে ছোট ছোট লাঙল দিয়ে। বাজি-করের কৌশল দেখছে। এমন কি দামামা বাজাচ্ছে। নৃত্য গীত বাদ্য প্রেক্ষা আখ্যান গান করছে।

ওরা অন্ধ খঞ্জদের অঙ্গবিকৃতি অনুকরণ করে খেলছে। আর বাজি ধরছে অপরের মনের ভাব বিষয় অনুমানের ওপর। কিংবা খেলুড়ির পিঠে কিছু এঁকে বা লিখে বাজি ধরছে।

নগরগুলিতে বাড়াবাড়ি সব থেকে বেশী। সেখানে অশ্ব-বৃষ-অজ-লড়াইয়ের খেলা চলেছে। অক্ষক্রীড়া আর তালপাতার বড় বড় চক্র ঘোরাচ্ছে। নয় তো বাঁশী বানিয়ে বাজাচ্ছে। অপরাধীর কপালের হাড় তুলে গরম সাঁড়াশি দিয়ে মস্তিষ্ক টেনে বের করা দেখতে যাচ্ছে ভিড় করে। আর সেই অবস্থাতে ছুটে আসছে নটপুত্তের পিছনে পিছনে। শীতার্ত সবাই মৌরির আর মদ্য-পান করছে। কামাসক্ত নরনারী নির্লজ্জ ব্যবহার করছে। কম্পি দম্পতিদের মৈথুনাসনের মতো বারবণিতারা নাগরদের কোল-লগ্না। অশ্লীল চিত্রপ্রদর্শন দেখছে অনেকে দল বেঁধে।

যারা অভিজাত আর ধার্মিক তারা চলেছে নিজেদের শৃঙ্খলায়, কিন্তু যে সব মহিলারা নটপুত্তকে দর্শনের জন্যে ছুটে আসছে, সেই সব যুবতীরা, ধনী যুবকেরা, কেউ কেউ মত্ততা প্রকাশ করছে। তাদের মুখের কাছে মৌমাছিরা গুনগুন্ করছে। তারা কেউ কেউ মদ্যপান করেছে। এবং নগ্ন-পরিব্রাজকদের দেখে কামাসক্ত হচ্ছে। আর ভাবছে, 'আমাদের পাপ হচ্ছে।' আর আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠছে, হে অর্হৎ! হে অন্তর্জ্ঞানী! আমাদের আশীর্বাদ করুন। আমাদের মঙ্গল করুন। হীনতা মার্জনা করুন।

আর কৃষকেরা, ক্ষৌরকারেরা, স্নাপকেরা, মোদক-মালাকার-রজক-নলকারেরা; গণক-মুদ্রিক, কুম্ভকারেরা; আর পশুপালকেরা, চেলক-চলক-পিণ্ডদায়কেরা, সকলেই কাজ ফেলে ছুটে আসছে। কারণ তাদের বুকের ভিতরের একটা অন্ধকার অপরিচিত জায়গা দুলে উঠছে। তারা প্রণত হচ্ছে। তারা চীৎকার করছে, ইনি তীর্থঙ্কর নটপুত্ত।

আমি ক্রীতদাস। আর সন্দেহ থাকছে না।

নটপুত্ত বলছেন, আর, মানুষের বিভিন্ন সত্তার যুগপৎ প্রকাশগুলি তাঁর অবচেতন অনুভূতিতে অনুভূত হচ্ছে।

আর যখন শববাহকেরা তাঁর সামনে পড়ছে, আত্মীয়স্বজনেরা যখন মিছিল করে প্রচলিত শোককথা বলে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে, 'তুমি এমন শত্রুতা করলে...' তখন নটপুত্তকে দেখে তারা স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপরে হঠাৎ চীৎকার করে উঠছে, হে ত্রিকালজ্ঞ! আপনার দর্শন পেয়ে এ মৃতের আত্মা স্বর্গলাভ করুক।

—স্বর্গ নাই। আমি ক্রীতদাস।...

নটপুত্ত বলছেন মনে মনে। শবের দিকে দৃকপাত করছেন না। দূর-নিবদ্ধ দৃষ্টি তাঁর অপলক। আর শববাহকেরা, আত্মীয়-স্বজনেরা নিবিষ্ট অনুসন্ধিৎসায় দেখছে। চুপিচুপি বলাবলি করছে নিজেরা, 'আই বাবা! দেখ উনি কী রকম দেখছেন। নরকের প্রহরীকে উনি চলে যাবার হুকুম

দিচ্ছেন। আর স্বর্গের দূতকে ডাকছেন। আমি স্পষ্ট দেখেছি, ও'র ঠোঁট নড়ছিল।

—নরক নাই। আমি ক্রীতদাস।...

নটপুত্র নিজেকে বলছেন। কিন্তু জনতা কিংবা পরিব্রাজকেরা শুনতে পাচ্ছে না। তিনি এখনো নিজেকে বলছেন। আর তাঁর সমগ্র ধ্যান পরিব্রজন কৃচ্ছ্রতাসাধন, সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা অবচেতনে ক্রিয়া করছে।

ভবিষ্যৎবাণী ব্যতিরেকেই বোধহয় হিম-প্রবাহ নেমেছে। সমগ্র ভূমি এবং আকাশ মেঘ ও কুজ্ঝটিকায় ছেয়ে যাচ্ছে। শিষ্য পরিব্রাজকেরা কেউ কেউ কাতরধ্বনি করছে। আর ভাবছে, 'আমার কষ্ট হচ্ছে, আমার মধ্যে পাপ আছে।' তখন তারা তীর্থঙ্কর নটপুত্রের ধ্যান করছে। কারণ তীর্থঙ্করই ঈশ্বর। আর কোনো কোনো পরিব্রাজক, যারা একটু বয়স্ক, সংঘ যাদের সিদ্ধিলাভ স্বীকার করেছে, তারা নিজেদের ইচ্ছায়, সেবাব্রতী মানুষদের অনুরোধে থেমে পড়ছে। আর ভাবছে, 'আমি পাপ করছি।' তবু সেবা গ্রহণ করছে, কারণ সে নিজেকে স্খলিত ভাবছে। আর তাই ধনী গৃহপতি যুবতী বিধবার বাড়িতে নানান প্রকার অদৃশ্যজীবী উপদ্রবকারীদের শান্তি-বিধানের জন্যে কপট নিগ্রন্থীয় উপাসনায় রত হচ্ছে। ভাবছে, 'আমি পাপ করছি।' আর তাই কামাসক্ত হয়ে পড়ছে এবং ভয়-জনিত কামনা অশক্ত। তাই যুদ্ধে পরাস্ত হচ্ছে, আর উপহাসের পাত্র হচ্ছে যুবতীর কাছে। 'এও পাপের ফল' ভাবছে, আর বিকারগ্রস্থ হয়ে অরণ্যে চলে যাচ্ছে।

নটপুত্র অবিচলিত চলেছেন। এখন প্রাচীন পাথরের গায়ে শ্যাওলার মতো রক্ত জমাট হয়ে যাচ্ছে তাঁর পায়ের ফাটলে। তাঁর সুগৌর গণ্ড আগুনে পোড়া তামার পাত্রের মতো হয়েছিল। এখন সেখানে রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে। আর কালো আকাশের পটে তাঁকে বিশাল একখণ্ড পিঙ্গলবর্ণ মেঘের মতো দেখাচ্ছে। আকাশ তার কুটিল হিংস্র থাবা নিয়ে যেন ভয়ে আরো ঊর্ধ্বে চলে যাচ্ছে। অবাক হয়ে, স্তব্ধ হয়ে যেন সেই বিশাল মূর্তিকে দেখছে।

সকলের হাতে জ্বলন্ত পিপ্পলের ডাল। যেন একটা আগুনের মিছিল।

ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা বিদ্রূপ করছে নটপুত্রকে. ইনি দিগম্বর, তাই ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন। আর চীৎকার করে হাসছে। নটপুত্র বলছেন, ঈশ্বর নাই। আমি ক্রীতদাস।...

—ইনি নাকি ঔপপাতিক।

আবার হাসি।

—এ'র বাবা ছিল না। মাও ছিল না। ইনি নাকি ঔপপাতিক।

—মানে অযোনিজ! হাঃ হাঃ হাঃ!...

নটপুত্র নির্বিকার। তিনি মনে মনে বলছেন, আমি যোনিজ, কামজ। ঔপপাতিক সত্তা কিছু নাই। আমি ক্রীতদাস।...

—তবে ইন্দ্র বরুণের দিব্যি গেলে বলছি, লোকটা খুব কষ্টসহিষ্ণু।

—আর তাই অজাতশত্রুর মন গলে যাবে।

—তারপর দেবদত্ত ভিক্ষু যেমন করে বিম্বিসারকে হত্যা করিয়েছিল, এও হয়তো উদায়ীকে দিয়ে তার বাপকে—

—চুপ! চুপ! গুপ্তপুরুষ সেইসব ছিনারের বাচ্চারা হয় তো আশেপাশে আছে।

—ওরে বাবা! চুপ! চুপ! শ্রাবস্তী-রাজ পর্যন্ত হার মেনে গেছে। নিজের ভাগ্নে অজাতশত্রুর সঙ্গে, নিজেরই বোনের বিয়ে পর্যন্ত দিতে হয়েছে।

—হ্যাঁ বাবা, সব চুপ। নইলে পঙ্গালপাঠ।

একটা চাপা আর্তধ্বনি করল পুরোহিতেরা। পঙ্গালপাঠ! আই বাবা! হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সারা শরীর মাংস রাশিতে পরিণত করা। দোহাইবাবা নটপুত্র, তোমার জয় হোক!

নটপুত্ত জানেন, উদায়ী অজাতশত্রুর ছেলে। আর অজাতশত্রুর একমাত্র ভয়, তার ছেলে কোনদিন তাকে গুপ্তহত্যা করবে। কারণ পিতাকে সে হত্যা করেছিল। আবার, হে শ্রেণিক, আবার তোমার কথা আমার মনে পড়ছে। যেদিন ঘোষিত হল, আমি তীর্থংকর হয়েছি, তারপরে আমি রাজগৃহে গিয়েছিলাম। তুমি আমার কাছে ধর্মের উপদেশ শুনতে এসেছিলে। আমি তখন মহাবীরের সমধর্মী। হে শ্রেণিক! আমি তোমাকে অবাস্তব উপদেশনা করেছিলাম। তারপর তুমি গৌতমের শরনাপন্ন হয়েছিলে। হে শ্রেণিক, সেই ঘোর কুটিল রাত্রে, যে মুহূর্তে তোমার দেহে প্রিয়তম পুত্রের অস্ত্র আঘাত করল, সেই মুহূর্তে তুমি জানলে, এ সংসারে ত্রাণকর্তা কেউ নাই।

আর একবার সশব্দে ফুকরে উঠলেন নটপুত্ত, ওহো, শ্রেণিক, আমরা সবাই ক্রীতদাস।...

কথা বোঝা গেল না। সবাই ভাবল, উনি কষ্টে আর্তনাদ করছেন। আগুন নিয়ে অনেকে তাঁর কাছে দৌড়ে এল। উনি একইভাবে চললেন। আর, ছদ্মবেশী তস্করেরা তাঁর দেহের কাছে ঘন হয়ে চলতে লাগল। তাঁকে স্পর্শ করে পুণ্য করার ভান করছে ওরা। গোণক থেকে সোনার অলংকার আর মুদ্রাগুলি তুলে নিতে চাইছে। কিন্তু ওদের ভয় করছে। কারণ ওদের পাপের সংস্কার আছে। হয় তো হাতটা এখুনি খসে পড়বে। জ্বলে যাবে। লোক এবং ভয়ের ঘাম-দরিয়ার স্রোতে ওরা ভেসে চলেছে।

নটপুত্তের অবচেতনে এগুলি অনুভূত হচ্ছে। আর তিনি বলছেন, ক্রীতদাস! আমি ক্রীতদাস!...আর নালন্দার রাজবর্ত্মে, হিমপ্রবাহের পর, নতুন রৌদ্র তখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। আর রাজবর্ত্মের উচ্চ চড়াইয়ের শীর্ষে, নটপুত্তকে মনে হল, এই মাত্র তিনি আকাশ থেকে অবতরণ করলেন। পিপ্পল আর দেবদারু আর কোশাম্বী গাছের উর্ধ্বআকাশে যেন তিনি ঠেকে আছেন। তিনি দাঁড়ালেন, আর সহসা চীৎকার করে বলে উঠলেন, আমি ভুজিষ্য নই!

পরিব্রাজকেরা থমকে গেল। জনতা স্তব্ধ। আর নালন্দার গ্রাম থেকে নরনারী ছুটে আসছে।

নটপুত্ত আবার চীৎকার করে উঠলেন, আমি ভুজিষ্য নই। আমি মুক্তদাস নই।

পরিব্রাজকেরা সমবেত গলায় বলে উঠল, আপনি তীর্থংকর, আপনি দেবতা।

বৈশালীর পরে এই প্রথম তিনি হাসলেন। বললেন, আমি ক্রীতদাস!...

নগ্ন পরিব্রাজকেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। রৌদ্রে তাদের আরাম লাগছিল। তারা মনে করল, তীর্থংকর, গণাচার্য নটপুত্ত নিশ্চয় ভিন্ন জগতের সঙ্গে কথা বলছেন। হয় তো স্বয়ং পার্শ্বনাথ এসেছেন। তাঁর কাছে। এবং তাঁর এই ধ্যানী দশা দেখে জনতা মাটিতে শুয়ে পড়ল।

নটপুত্ত রাজগৃহের দিকে এগিয়ে চললেন। আর মনে মনে বলতে লাগলেন, এই গ্রামেরই এক বৈশ্যের ঘরে আমি ক্রীতদাস ছিলাম। বাবা মাকে আমি অস্পষ্ট চিনি। বৈশ্যাকর্তা বলতেন, তাঁরা ছিলেন পরিব্রাজক ও পরি-

রাজিকা। গৃহিণী বলতেন, আমার বাবা ছিলেন নট। মা নটী। তাঁরা এই গ্রামে নাচ ও পট দেখিয়ে চলে যাবার সময়, আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। কারণ, তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। তখন আমার চার বছর বয়স। নারন্দার বণিকের গরু চরাতাম আমি, তাদের পরিচর্যা করতাম। বাবা মার কথা ভাবতে আমার ভাল লাগত। আমার কান্না পেত। আমাকে সবাই নটপুত্র বলে ডাকতেন। বাড়ির সকলেই স্নেহ করতেন। আমি কখনো জলে ছায়া দেখতাম না। সকলের মুখে শুনতাম, আমি সুন্দর। আমার মাথায় ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি, আর স্নিগ্ধ জলাশয়ের মতো আয়ত চোখ।...... আমার যখন সাত বছর বয়স, তখন গোশালের জ্যেষ্ঠ দাস, গোচারণ মাঠে কামুকের মতো ব্যবহার করেছিল। আমি গৃহকর্ত্রীকে বলে দিয়েছিলাম। তাতে গোশালের জ্যেষ্ঠ দাসের ভীষণ শাস্তি হয়েছিল। গরম লৌহদণ্ড দিয়ে তার প্রত্যঙ্গে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছিল। সে চীৎকার করে কেঁদেছিল। আমারও কান্না পেয়েছিল। গৃহিণী আমাকে অন্তঃপুরের কাজে রেখেছিলেন। তবু আমাকে আগলে রাখতে হত। সেই বৃহৎ অন্তঃপুরের মহিলা এবং দাসীরা কামুকীদের মতো ব্যবহার করত। গৃহিণী আমাকে ছেলের মতো রক্ষা করতেন।...তারপর চৌদ্দ বছর বয়সে আমি অন্তঃপুরের বাইরে, বাড়ির কাজে বহাল হই। আমি শুনতে পেতাম, আমার যদি ভালো কুল এবং শীল হত, তবে গৃহপতির কন্যা সুগন্ধার সংগে আমার বিয়ে হত। গৃহিণীই বিশেষভাবে একথা বলতেন তাঁর কন্যার সম্পর্কে। সুগন্ধা ছিল আমার বান্ধবীতুল্যা। সে ছিল কুসুমের মতো সুন্দর আর সুগন্ধযুক্তা। কিন্তু আয়েশ এবং আরাম আর মন্দ দাসী-দের সংগে থেকে থেকে, অল্প বয়সেই সে কামাতুরা হয়ে উঠেছিল। সে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দেবতা মনে করত, আর তাদের কাছ থেকে মন্ত্রপড়া ফুল নিয়ে দাসীদের সংগে বাজি খেলত। তার পিতার সংগে গূঢ়ভাবে ক্রীড়ারতা দাসীর কাছে কাহিনী শুনত। অশ্লীল পট দেখত। মৌরিয় পান করত। তখন তার চোখ ঠোঁট গাল রক্তবর্ণ হত আর দাপাদাপি করত। তখন দাসীরা আমাকে ডেকে নিয়ে যেত গৃহের নিম্নতল কুঠরিতে। প্রভুকন্যা আমাকে আদেশ করত তার সংগে লিপ্ত হতে। আমি আদেশ পালন করতে পারতাম না। আমার ঘৃণা হত না, একটা আবেগ আসত। কিন্তু একটা প্রতিরোধ আপনি গড়ে উঠত। আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকত। দাসীরা এবং অপরাপর মহিলারা হাসাহাসি করত। তারা আমাকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করত। সুগন্ধা আমাকে চুম্বন করত। আর রাগে সারা গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিত। আর আমার কান্না পেত।...সুগন্ধা আমাকে বিষ্ঠাভোজী বলে গালাগাল দিত। আমার কান্না পেত।...কিন্তু বহির্বাটিতে এসেও শান্তি পেলাম না। কাম এবং দ্বেষ আর হিংসা এবং স্বার্থ আমাকে জড়ীভূত করে ফেলেছিল। কঠিন পরিশ্রমী এবং অনাহারী গ্রামবাসী, অসহায় গৃহপালিত পশু, যজ্ঞের বলি এবং শক্তিমানদের উল্লাসের মধ্যে আমি দেখছিলাম, কেবল দুঃখ। কেন এসব আমি দেখেছিলাম, জানি না। আমার কান্না পেত।...আর তখনো গো-বৎসের মতো কেবলি মুখ তুলে তুলে আকাশের দিকে তাকাতাম। বাবা মাকে আমার দেখতে ইচ্ছা করত। আমার কান্না পেত। গৃহ-পতির অনুমতি নিয়ে আমি আবার

গোশালার কাজে ফিরে গিয়েছিলাম। আমার জড়ীভূত অবস্থায় সকলে বিদ্রূপ করত এবং করুণা করত। সেই সময় একদিন সন্ধ্যা-বেলা গোচারণ মাঠ থেকে ফিরে আমি বসে-ছিলাম গোশালের কাছেই। জানতাম না, আমার চোখে জল পড়ছিল। সহসা গৃহপতি কর্তা আমার সামনে এসে পড়লেন। কিন্তু আমি তাঁকে সম্মান করতে ভুলে গেলাম। আমি বসে রইলাম। গৃহপতি কর্তা দাঁড়ালেন আমার সামনে। জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছ কেন হে নটপুত্ত।

উনি কে, কে কথা বলছেন, দেখলাম না। আমি বললাম, বড় দুঃখ।

—কিসের?

—অসুন্দরের, অন্যায়ের, অসহায়তার, অনাহারের, অবিবেক আর অবিচারের।

—কোথায়?

—এই বিশ্বময়।

গৃহপতি কর্তা চলে গেলেন সহসা। গোশালার দাসেরা এসে আমাকে সজাগ করল। শাস্তির ভয় দেখাতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই গৃহপতি বাড়ির সকল নরনারী এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। এবং গৃহ-পতি কর্তা স্বয়ং। আমি দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম। গৃহপতি কর্তা আবার প্রশ্ন করলেন, নটপুত্তের কান্নার কারণ কী?

আমি আবার আমার কথার পুনরুক্তি করলাম। বললাম, প্রভু, আপনার কাছে শুনেছি, আপনি দেখেছেন, সমুদ্র অশেষ। এবং আকাশও অশেষ। দুঃখ সেইরকম দেখছি। এর হাত থেকে কি পরিত্রাণ নেই?

সহসা গৃহপতিকর্তা হাত জোড় করে বললেন, হে নটপুত্ত, আমি সামান্য মানুষ, আমি জানি না। হে নটপুত্ত, আপনি ভুজিষ্য। আপনি মুক্ত। আমরা দেখছি, আপনি পুজ্য।

আমি তাঁদের নিবারণ করতে পারলাম না। মনে হল, আমি দুঃখ মুক্তি করব। মুহূর্তে এ কথা নারন্দার গ্রামে রটে গেল। সেই সময়ে সেই গ্রামে এসেছিলেন একজন পার্শ্বনাথের পরিব্রাজক শিষ্য। আমি তাঁর সংগে প্রভুগৃহ ত্যাগ করেছিলাম। তারপর...

জনতা চীৎকার করে উঠল, তীর্থংকর নটপুত্ত রাজগৃহে ফিরে এসেছেন।

—আমি ক্রীতদাস।...

নটপুত্ত চীৎকার করে উঠলেন। সকলে চুপ হয়ে গেল। এর মানে কী? সকলেই নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। তাঁর শিষ্য নগ্ন পরিব্রাজকদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। সন্তোষজনক জবাব কেউ দিতে পারল না।

রাজগৃহের পাঁচ পর্বতের পাঁচটি চূড়া ভেসে উঠল আকাশে। রাজবর্ত্মের ওপর দিয়ে আর একটি সুউচ্চ চূড়ার মতো চলমান নটপুত্ত এগিয়ে আসছেন। তাঁর গোণক এখন বসন্ত বাতাসে উড়ছে। এখন তাঁর জমাট রক্ত গলছে আর স্বেদ বইছে শরীরে। পথের ওপরে পায়ের দাগ পড়ছে।

পাখিরা ফিরে আসছে। গাছে গাছে ফুলেরা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। অপ্রতিহত ভাবে জাগছে কিশলয়। নগরে আর উপকণ্ঠে নরনারীরা বেশভূষা করে বেরিয়েছে। বসন্তের আমেজে এমনিতেই সকলে বেশী ক্রীড়াসক্ত। নটপুত্তকে ঘিরে তাদের ভিড় বাড়তে লাগল।

অনেকে বলাবলি করতে লাগল, ইনি মণ্ডিত এবং বিভূষিত নন কেন? দণ্ড, নাড়িক, খড়্গ, ছত্র, কিছুই দেখতে পাই না কেন? এ'র শাস্তা তীর্থংকরের চিহ্নিত পাদুকাই বা কোথায়?

—আমি ত্যাগ করেছি।

নটপুত্ত দাঁড়ালেন। বেণুবন পার হয়ে, ইসিগিল্লি পর্বতের পাদদেশে, এক বৃহৎ কালো শিলাখণ্ডে হেলান দিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। পিংগল পাষাণের মতো বুক খুললেন। আর গোণক খুলে, কোমরে বেঁধে নগ্নতাকে আবরিত করলেন। আর চীৎকার করে বললেন, বন্ধুগণ, আমি সব ত্যাগ করেছি। আমি তোমাদের সত্য বলছি, আমার দাসত্ব ঘোচে নাই। আমি ক্রীতদাস।

কে যেন বলে উঠল, গিজ্ঝকূটে নির্গ্রন্থকে সংবাদ দাও।

আর একজন বলল, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিশ্চয় মস্তিষ্ক বিকারের বিষ খাইয়ে দিয়েছে। নইলে—

হঠাৎ একজন একটি ছোট পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে বলল, হে তীর্থংকর, আমি কৃষক সুদেব। আপনি আমাকে চেনেন। গভীর জংগলে একদিন আপনি আমাকে বাঘের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। ক্ষুধার্ত বাঘ আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে, আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিল। হে প্রভু! আপনি কিসের ক্রীতদাস?

নটপুত্ত বললেন, জন্মের হে সুদেব।

একটা স্তব্ধতা। জন্মের ক্রীতদাস? একটা গুঞ্জন চলতে লাগল। নটপুত্ত এক ধাপ উঠে দাঁড়ালেন। কালো শিলাখণ্ডের ওপরে তাঁর ছিন্নজট মাথা জেগে উঠল। তিনি উচ্চ কণ্ঠে বললেন, হাঁ, জন্মের। বন্ধুগণ, জন্ম, জরা শোক, দুঃখ, আর শেষতম মৃত্যুর ক্রীতদাস আমরা। সমগ্র মানুষেরা। এর কোনো নিবারণ নেই।...

নটপুত্তের দৃঢ় গলায় কথাগুলি যেন নিষ্ঠুর দৈববাণীর মতো শোনাল। একজন চীৎকার করে জিজ্ঞেস করল, ভগবান বুদ্ধের কি মৃত্যু হবে?

নটপুত্ত বললেন, অমোঘ মৃত্যু তাঁকেও গ্রাস করবে।

—আর মহাবীর নির্গ্রন্থ?

—মৃত্যু তাঁকেও গ্রাস করবে।

—তারপর?

—তারপর কিছুই নাই।

—স্বর্গ?

—নাই।

—নরক?

—নাই। স্বর্গ নাই, নরক নাই, মহা-নির্বাণ নাই।

আবার স্তব্ধতা। কে একজন কেঁদে উঠে চীৎকার করে উঠল, আমার ভয় লাগছে নটপুত্তকে। চল আমরা সরে পড়ি।

একজন ব্রাহ্মণ বলে উঠলেন, হে নটপুত্ত, তবে নিশ্চয় জন্মান্তর আছে?

নটপুত্ত হাত তুলে বললেন, নাই, জন্মান্তর নাই।

নগ্ন পরিব্রাজকেরা আর্তনাদ করে উঠল। কারা যেন হেসে উঠল। তারা বলে উঠল, ও'র মতে কিছুই নাই।

—মিথ্যা কথা।

নটপুত্ত চীৎকার করে বললেন, ওরা মিথ্যা কথা বলছে। জন্ম জরা শোক দুঃখ মৃত্যু আছে। আর আছে মানুষ আর এই জগত। চারিভূত বিশিষ্ট মানুষের এই দেহ। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কায়া পৃথিবীর কায়ায় প্রবেশ করে। কায়ার জল, পৃথিবীর জলে মিশে যায়। কায়ার তেজ পৃথিবীর তেজে প্রবেশ করে। কায়ার বায়ু, এই পৃথিবীর বায়ুতেই মেশে।

যেন একটা অসহ্য শূন্যতা সবাইকে গ্রাস করল। কেউ কেউ দৌড়ে পালাতে লাগল। কেউ কেউ গিজ্ঝকূটে মহাবীরের কাছে গেল। কেউ কেউ বেণুবনে বুদ্ধের কাছে গেল। কিন্তু কৌতূহলবশত—আরো অনেক লোক ভিড় করে আসতে লাগল। নগর অভ্যন্তর থেকে নরনারী আসতে লাগল। সেখানেও খবর পৌঁছেছে।

একজন বৌদ্ধ শ্রমণ উঠে দাঁড়ালেন পাথরের ওপরে। বললেন, হে তীর্থংকর নটপুত্ত, আমার কয়েকটি কথার জবাব দিন।

নটপুত্ত বললেন, হে কাষায়বস্ত্র পরিহিত মানুষ, আমি উদ্ধত নই। আপনি প্রশ্ন করুন।

এই প্রথম শ্রমণকে এমনি সম্বোধন শোনা গেল। কাষায়বস্ত্র পরিহিত মানুষ! শ্রমণ জিজ্ঞেস করলেন, যে ধ্যানের দ্বারা ভগবান বুদ্ধ কিংবা আপনার সমধর্মী মহাবীর সত্য প্রকাশ করেছেন, তা কি মিথ্যা?

নটপুত্ত দু হাত শিলাখণ্ডে বিস্তৃত করে দাঁড়ালেন। বললেন, তার আগে, হে বিচিত্র-বেশী নর, আপনাকে জানাই, ঋষিপত্তন-মৃগদাবে আমি যৌবনে ধ্যানস্থ ছিলাম। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমি নগ্ন, সত্য ও ধর্ম সন্ধানে অবিচলিত রয়েছি। ব্রহ্মচর্য ইন্দ্রিয়জয় ইত্যাদি যা বলা হয়, আমি সে সব পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনেছি, আর তাই আজ আমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।

সকলে দেখল, নটপুত্তের চোখে জল। সবাই বলাবলি করতে লাগল, উনি কাঁদছেন। সকলেই স্তব্ধ। আরো ঘন হয়ে আসতে লাগল। নটপুত্ত বললেন, বন্ধুগণ, সত্য নির্মম এবং মহৎ। আমি যখন তীর্থংকর, সংঘাচার্য, ত্রিভুবন ভ্রমণকারী বলে পূজ্য প্রশংসিত, তখন আমি জানলাম, ধ্যান নাই। উপাসনা নাই। তাই শ্রমণ নাই, ব্রাহ্মণ নাই, নির্গন্থ নাই, তীর্থংকর নাই। দেব নাই, দেবী নাই, মারভুবনও নাই। পরলোকও নাই। এ সকলই কল্পনা।

কল্পনা? চারদিকে গুঞ্জন উঠতে লাগল। এ সবই কল্পনা? শ্রমণ ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হলেন। তাঁর এসব কথা শোনা ভিক্ষু-নিয়ম বিরুদ্ধ।

নটপুত্ত চীৎকার করে বললেন, হাঁ, কল্পনা। ভয়জনিত কল্পনা। দেশ এবং কালের সমস্যায় কম্পিত এর কোনোটাই অমোঘ নয়। ধর্মার্থে দান নাই, গ্রহণ নাই। দান ভয়জনিত। গ্রহণ মিথ্যা অহংকার। যে ধ্যানী এবং তীর্থংকর বলেন, তিনি মাসকাল অন্ন গ্রহণ করেন নাই, শীতে ও গ্রীষ্মে নগ্ন ছিলেন, তাই তিনি অর্হত্ত লাভ করেছেন, তবে গত বৎসরে বৃজিরাজ্যের দুর্ভিক্ষের সময় সকল প্রজাই অর্হত্ত লাভ করেছিল। তারা মাসের পর মাস খায় নাই। গাছের ছালও লজ্জা নিবারণের জন্য জোটে নাই। আমি বলি, জন্ম জরা শোক দুঃখ মৃত্যুর মতোই ক্ষুধা অমোঘ। তার নিবারণ নাই।

এমন সময়ে একখণ্ড পাথর এসে নটপুত্তের কাঁধের কাছে কালো শিলাখণ্ডে আঘাত করল। ভেঙে চৌচির হল। অনেকে চীৎকার করে উঠল, কে? কে ছুঁড়লে?

নটপুত্তের ব্যাঘ্র-দমন চক্ষু শান্ত ও দূরগামী হল। তিনি বললেন, বন্ধুগণ! ওদের মারতে দাও। আমি জানি শ্রমণ ব্রাহ্মণ নির্গন্থ, কেউ আজ আমাকে এখানে রক্ষা করতে আসবেন না। জন্ম জরা শোক দুঃখ মৃত্যু ক্ষুধার মতোই সত্য আছে। মৃত্যুকে তুচ্ছ করেই আমি তা বলব।

আরো কয়েকটা পাথর এসে পড়ল। নটপুত্তের দেহ রক্তাক্ত হল। অগ্নিময় হল তাঁর পিঙ্গলদেহ। চারদিকে গোলমাল, ধস্তাধস্তি, ছুটোছুটি লেগে গেল। আর, নগ্ন পরিব্রাজকেরা সমবেত গলায় শাস্তার ধ্যান করতে লাগল।

নটপুত্ত চীৎকার করে বললেন, বন্ধুগণ, স্থির হও। আমি আরো বলছি।

—উনি আরো বলছেন।

—কী বলছেন ছাই কিছুই বুঝতে পারছি না।

—কিন্তু পাথর ছুঁড়ছে কারা?

—হে নটপুত্ত, আপনি পরিষ্কার করে বলুন, কী বলতে চান?

নটপুত্ত কালো শিলাখণ্ডের আরো এক ধাপ ওপরে উঠলেন।

—উঠবেন না, ওরা পাথর ছুঁড়বে। আপনাকে খুন করবে।

নটপুত্ত বললেন, বেদনার নিরোধ নাই। মৃত্যুই অমোঘ। ওদের মারতে দাও। বন্ধুগণ, সংসার ত্যাগের মধ্যে মহত্ত্ব নাই, ওর আর এক নাম পলায়নপরতা। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা দর্শন যারা চিরতরে দমন করে নাই, শুধু কামদমনকেই তারা ইন্দ্রিয়জয় নাম দিয়েছে। যদি কেউ বলে, এই ভূমিখণ্ডে অলগর্দ (সাপ) নাই, কারণ তা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না, ইন্দ্রিয়জয় সেইরূপই মিথ্যা। ইন্দ্রিয় জয় হয় না, দমন হয় না, নিয়ন্ত্রিত হয়।

একজন হি হি করে হেসে উঠে বলল, এই আমাদেরই মতো তা হলে?

কে একজন বজ্রকঠিন গলায় চীৎকার করে উঠল, চুপ! ও'কে বলতে দাও।

সবাই অবাক হয়ে দেখল, ইনি মহারাজ বিম্বিসারের কালের অপরাজেয় যোদ্ধা, মাগধ ক্ষত্রিয় বিম্বাধর। বর্তমানে যুদ্ধ-ব্যবসা-ত্যাগী।

নটপুত্ত বললেন, হাঁ, মানুষের মতো।

বিম্বাধর পাথরের ওপরে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, হে নায়ক নটপুত্ত, তবে কি কোনো ধর্ম নাই।

—আছে।

নটপুত্তের কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছিল। আর পিঙ্গল বুক ভেদ করে রক্ত পড়ছিল। হাত দিয়ে রক্ত নির্ঝর মুছে বললেন তিনি, আছে হে ক্ষত্রবীর বিম্বাধর। এক ধর্ম, মনুষ্য ধর্ম।

—কিন্তু হে নটপুত্ত, আপনি বলছেন, আমরা ক্রীতদাস।

—হাঁ, আমরা ক্রীতদাস। ক্রীতদাস জন্মের, জরার, শোকের, দুঃখের, বেদনার, মৃত্যুর। এর নিরোধ নাই, নিবৃত্তি নাই, জয় নাই। তাই এগুলির কাছে আমরা বিশ্বস্ত থাকব, মানব।

এমন সময়ে অশ্বসওয়ার উগ্রপুরুষ (রাজ-পুরুষ) কয়েকজন জনতার মধ্যে প্রবেশ করলেন। এবং দুইটি হাতী, উগ্রপুরুষদের নিয়ে, দুদিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগল। জনতা ছত্রভঙ্গ হতে লাগল। চীৎকার করতে লাগল, ছুটোছুটি করতে লাগল।

আর সেই মুহূর্তেই বসন্তের অকালবর্ষা চুপিচুপি উঠে এল আকাশে। মেঘ ডেকে উঠল। চিকুর হানা বাজ গর্জন করল। পঞ্চপর্বতে মহীরুহকুল সঘন স্বননে বিলুলিত হল।

বিম্বাধর চীৎকার করে বললেন, কী উপায়ে?

নটপুত্ত বললেন, মনুষ্যধর্মের দ্বারা।

—তার স্বরূপ কী?

নটপুত্তের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ম চীৎকারে চাপা পড়ে যেতে লাগল। তিনি চীৎকার করে বললেন, সাহস এবং সততা প্রত্যক্ষ কর্ম, প্রেম, মৈত্রেয় ও ঐক্য।

একটা সমবেত চীৎকার শোনা গেল, আবার বলুন। আবার বলুন। আমরা কিছু বুঝতে পারছি না।...তার আগেই উগ্রপুরুষের কণ্ঠ ধ্বনিত হল, হে তীর্থংকর নটপুত্ত, আপনি যা নাই বলেছেন, তা কল্পিত, এবং যা আছে বলেছেন, তা অমোঘ। কিন্তু আপনি রাজার বিষয় কিছুই বলেন নাই।

নটপুত্ত তাঁর রক্তাক্ত হাত তুলে বললেন, আমি তাও বলব, হে উগ্রপুরুষ, আমি বলব। যিনি জ্ঞানী, তিনি সকল কিছুই দর্শন করেন। তিনি যাকে নাই বলেন, তা পৃথিবীর বারংবার পরিবর্তনশীল রূপ দেখেই বলেন। যা আছে বলেন, তা অমোঘ প্রত্যক্ষেই বলেন। আমি বলি হে উগ্রপুরুষ, বৃজি, লিচ্ছবী, শাক্য গণতন্ত্রের প্রধানগণ যেমন অমোঘ নন, রূপান্তর আছে, রাজা তেমনি অমোঘ নন।...

উগ্রপুরুষগণ একযোগে চীৎকার করে বললেন, এবার আপনি স্তব্ধ হোন। বেদ এবং সংঘ এবং জিন আর রাজার নির্দেশে আমরা বলছি, আপনি দেশত্যাগ করুন।...

নটপুত্ত চলেছেন। আর সেই নগ্ন পরি-ব্রাজকেরা তাঁর সঙ্গে চলেছে। তাদের তিনি বারণ করেছিলেন সঙ্গে আসতে। তারা শোনে নি। তারা নটপুত্তকে ছাড়বে না।

নটপুত্ত দক্ষিণে, চোল রাজ্যের দিকে নেমে চলেছেন। ক্ষতদেহে তাঁকে শান্ত প্রশান্ত দেখাচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী যেন বর্ষা। বিদ্যুৎ এবং বজ্রপাত হচ্ছে।

পরিব্রাজকেরা মাঝে মাঝে ধর্মালোচনার মতোই জিজ্ঞাসা করছে, আমরা কী করব?

—লোহারের কাছে গিয়ে বংকক গ্রহণ কর, কৃষি ক্ষেত্রে যাও। কিংবা যে কোনো জীবিকাশ্রয়ী হও।

—আমরা কী করব?

—তোমরা স্ত্রী গ্রহণ কর, সংগীত কর, নৃত্য কর, উৎপাদন কর।

—আমরা কী করব?

—তোমরা সাহসের দ্বারা, সততার দ্বারা, প্রত্যক্ষ কর্মের দ্বারা, মানুষের সঙ্গে প্রেম-মৈত্রেয় ও ঐক্যের দ্বারা, জন্ম জরা শোক দুঃখ বেদনা মৃত্যুর সঙ্গে বিশ্বস্ততা স্থাপন কর।

এমন সময় জঙ্গলের পাশে নটপুত্ত দেখলেন, একটি অচৈতন্য দেহ পড়ে আছে। দেহটি নারীর এবং তিনি ভিক্ষুণী। মুণ্ডিতকেশিনী, কিন্তু নির্যাতিতা, অনাবরিতা। চীর ধলাবলুণ্ঠিত. ভিক্ষা-পাত্র কাছে নেই। তিনি অটুট দেহ, সুগৌরী।

নটপুত্ত তাঁকে চীবর পরালেন। দীর্ঘ সময় শুশ্রূষা করে, তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। ভিক্ষুণী জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথমে ভীতা হলেন। পরে বিস্মিত হলেন। তারপরে অধোবদনে রইলেন। একটু পরে সহসা মুখ তুলে বললেন, আপনি তীর্থংকর নটপুত্ত, আমি চিনেছি।

নটপুত্ত বললেন, আপনার পরিচয় আমার অজানা।

ভিক্ষুণী বললেন, আমি ছিলাম উক্কাচেলা বিদেহের শ্রেষ্ঠীকন্যা। এখন ভিক্ষুণী সুবিনীতা। আমি এই নির্জন বনে ধ্যানস্থা ছিলাম। এমন সময়ে একজন দুর্বৃত্ত—

সুবিনীতা চুপ করে গেলেন। নটপুত্ত বললেন, আপনি ধর্ষিতা। আমি দুঃখিত নারী।

নারী? সুবিনীতা ভিক্ষুণী। স্রোতাপত্তি ফল থেকে, তিনি আলয়বিহীনা। অর্হত্ত লাভে ধ্যানস্থা। কিন্তু নটপুত্তকে তিনি সে কথা বললেন না। বললেন, হাঁ আমি ধর্ষিতা।

নটপুত্ত বললেন, আপনি গোতমের কাছে যান।

—যেতে পারছি না।

—কেন? আপনার কোনো অপরাধ নেই।

—জানি। কিন্তু—

সুবিনীতা লজ্জায় এবং ব্যথায় পাংশু হলেন। বললেন, আপনাকে বলতে আমার দ্বিধা নেই, আপনি আমার সেবা করেছেন। সেই দুর্বৃত্তকে আমি ঘৃণা করেছি, কিন্তু আমার ইন্দ্রিয় আমার অনিচ্ছায় সুখপ্রাপ্ত হয়ে, আমাকে কলংকিত করেছে। হে ধার্মিক নটপুত্ত, দুর্বৃত্তের আক্রমণে আমার জ্ঞান লোপ পায় নাই, তজ্জনিত ইন্দ্রিয়ের অপ্রতিরোধ্য হর্ষোৎপাদনের লজ্জায় ও আতঙ্কে আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

বলে সুবিনীতা কাঁদতে লাগলেন। নটপুত্ত বললেন, আপনি বৃথা লজ্জিত এবং আতংকিত। মানুষ, সে যেই হোক, সকলের পক্ষেই তা অপ্রতিরোধ্য।

সুবিনীতা অবাক হয়ে তাকালেন। নটপুত্ত তাঁর সমগ্র কথা সুবিনীতার কাছে পুনরুক্তি করলেন।

বৃষ্টি বিদ্যুৎ মেঘগর্জনের মধ্যে নটপুত্ত কথা বললেন। কথা শেষ করে, তিনি উঠলেন। বিদায় চাইলেন।

সুবিনীতা বললেন, আমি আপনার সঙ্গে যাব?

—আপনার অভিরুচি।

—তবে আপনি দয়া করে আমাকে আপনার বিশাল বুকে তুলে নিন। আমি ক্লান্ত, অসুস্থ।

নটপুত্ত সুবিনীতাকে বুকে তুলে বৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ এবং বজ্র মাথায় করে এগিয়ে চললেন।

উজ্জীবন

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এই ঘরের এক কোণে যেখানে অল্প অল্প অন্ধকার সেখানে চোরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল দুলাল। তার মুখে কথা নেই। আর যেন কিছু করবারও নেই। তবুও সে সব কিছু দেখছিল বোবা একটা পশুর মতো। আর মাঝে মাঝে তার সমস্ত শরীর নাড়া দিয়ে কোথা থেকে কাঁপুনির এক-একটা প্রচণ্ড বেগ আসছিল। কিন্তু না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া এখন আর কিছুই করবার ক্ষমতা নেই তার।

এখন যা কিছু করবার সুধাই করবে। হেঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলবে পর্দা। দুম-দুম এদিক-ওদিক ছুঁড়ে মারবে ওদের দুজনের শখের অনেক ছোট বড় জিনিস। আর আপন মনে তার অক্ষম স্বামীর সম্পর্কে উচ্চারণ করে যাবে অনেক নির্মম কটু বিশেষণ। ভুল করে একবারও তাকাবে না অন্ধকার কোণে চোরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা দুলালের দিকে।

কিন্তু দুলাল দেখছিল সুধার ক্ষিপ্র হাতের ওঠা-নামা আর তাঁর শরীরের বিদ্যুৎ-গতি। আর ভাঙার এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে দেখতে মরে যেতে চাচ্ছিল-- নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চাচ্ছিল এই কাঠ-কাঠ আগুন-লাগা বীভৎস পৃথিবী থেকে।

হাতিবাগানের ছোট একটা গলির এই বাড়িতে আজই ওদের শেষ রাত। কাল খুব ভোরে—সামনের সস্তা চায়ের দোকান খোলবারও অনেক আগে হাওড়া স্টেশন থেকে একা সুধাকে ট্রেনে তুলে দেবে দুলাল। তারপর আবার ফিরে আসবে এখানে। থাকবার জন্যে নয়। তাদের সংসারের সব জিনিসগুলো তার এ বন্ধু ও বন্ধুর বাড়ি ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে। আবার কবে ওদের কাছ থেকে জিনিসগুলো ফিরিয়ে আনবে সেকথা জানে না দুলাল। আর বাপের বাড়ি থেকে আবার কবে সুধাকে কলকাতায় আনতে পারবে তাও তার জানা নেই। তাই থেকে থেকে সে কাঁপছিল।

ছোট হলেও একটা সাজানো সংসার দুলালের চোখের সামনে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। কিন্তু অন্ধ আক্রোশে উন্মাদ হয়ে যে ভাঙছে—আশ্চর্য, তার চোখে এক ফোঁটা জলও নেই। যেন খুব তাড়াতাড়ি ঠিক সময়ের অনেক আগে দুই হাতে সব চুরমার করে সুধা এখান থেকে চলে যেতে চায় তার অকর্মণ্য স্বামীর ছোঁয়া বাঁচাতে। যদি সে কাঁদত কিংবা করুণ একটা ছায়া ফুটে উঠত তার মুখে তাহলে হয়তো দুলাল সান্ত্বনার দু-একটা কথা বলতে পারত তাকে। কিন্তু অভাবে আর আক্রোশে চোখের সব জল শুকিয়ে গেছে বলে তাকে সে-অবসর দেয় না সুধা।

চুপচাপ দুলাল। আর এখন সারা ঘরে বোবা অন্ধকার। তার কাটা হয়ে গেছে বলে আজ জোরালো আলোর রেখা কাঁপবে না এখানে। জানলার কাছে মিটমিট করে একটা সরু মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা শিখা হেলছে দুলছে। সেই আলোয় তাড়াতাড়ি ভাঙার কাজ সারছে সুধা।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে আসে দুলালের। চমকে উঠে সে মোমবাতির অল্প আলোয় দেখে, সুধার হাত থেকে কি যেন একটা মেঝেতে পড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু জিনিসটা কি বোঝবার আগেই আবার দুমদুম শব্দ শোনে সে। ওগুলো হঠাৎ হাত থেকে পড়ে না সুধার। ইচ্ছে করেই আছড়ে আছড়ে সে এক-একটা শখের জিনিস ভাঙে। কৃষ্ণনগরের আহ্লাদী-পেহ্লাদী, পুরীর পুতুল, রথের মেলায় কেনা সুধার কত সাধের অনেক ছোট বড় মাটির খেলনা।

তখন দুলালের চোখ বড় হয়। ঠোঁট কাঁপে। আর জিভের জড়তাও কেটে যায়। সে এগিয়ে আসে সুধার কাছে। ভাঙা

গলায় আপত্তির সুর তোলে, ভাঙছ যে?

তার কথা শুনে আরও জোরে রাধা-কৃষ্ণের একটা যুগলমূর্তি দেয়ালে ছুঁড়ে মারে সুধা, ভাঙব না তো কি?

যেন ফিসফিস করে কথা বলে দুলাল, ওই ঝুড়িটার মধ্যে রাখলেই তো হয়। আমি তো কাল সকালেই—

তাকে বাধা দিয়ে চিৎকার করে ওঠে সুধা, ঝুড়ি ভারী হয়ে যাবে না তাহলে? কুলিগিরি করবার ক্ষমতা আছে নাকি তোমার? ওটা মাথায় নিয়ে একা-একা পৌঁছে দিতে পারবে বন্ধুর বাড়ি?
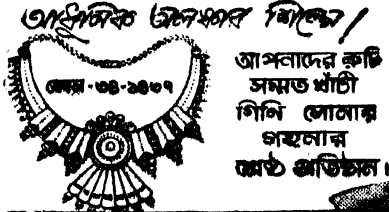
আরও আস্তে কথা বলে দুলাল, দু-একজন কুলি তো ডাকতেই হবে—

আগুনের ঝাঁঝের মতো কড়া স্বর বার হয় সুধার গলা চিরে, একটা কুলি না-হয় কমই ডাকলে—বুঝলে? আর যে পয়সাটা বাঁচবে তা দিয়ে আফিম কিনে খেও। তুমি না থাকলে বাপের বাড়িতে মানটা থাকবে আমার—

এবারেও সুধাকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা করে দুলাল, মোটে তো কয়েকটা মাস। এর মধ্যে একটা চাকরি জোগাড় করে নেবই আমি। তারপর আবার নতুন বাড়ি ঠিক করে—

খিলখিল করে অদ্ভুত হাসি হেসে ওঠে সুধা, দেখবে এক-এক করে শেয়াল-কুকুরেরও চাকরি হয়ে যাবে কোথাও না কোথাও, কিন্তু তোমার কখনও কিছু হবে না—

বিষাক্ত তীরের মতো সেই পুরানো কথা-গুলোই হয়তো আবার নতুন করে একে-একে দুলালের দিকে ছুঁড়ে মারত সুধা। কিন্তু দমকা হাওয়ার ঝাপটায় হঠাৎ দপ্ করে মোম-বাতির কাঁপা-কাঁপা শিখাটা নিভে যায়। ঘরের মধ্যে শুধু আঁজলা ভরে তুলে নেবার মতো নিকষ-কালো অন্ধকার। ওরা প্রথম-টায় চমকে ওঠে। কেউ কাউকে দেখতে পায় না। তারপর সুধা আন্দাজে আন্দাজে হাতের কাছের বাকি জিনিস ঝুড়ির মধ্যে ফেলে। রান্নাঘরের দেশলাই এনে ঠিক এই মুহূর্তে আবার মোমবাতিটা জ্বালিয়ে নেবার কোনই উৎসাহ থাকে না ওর।

আর যেন পা টিপে-টিপে দুলাল এসে দাঁড়ায় জানলার কাছে। সুধাকে দেশলাই এনে দেবার সাহস তার হয় না। আবার যদি চিৎকার করে ওঠে—যদি তাকে এক কথায় ঠেলে দিতে চায় মৃত্যুর জীবন্ত অন্ধকারে। এখন সুধার মুখে কোন কথাই বাধে না। তার মান বাঁচবার একমাত্র সমাধান—দুলালের মৃত্যু।

হাতিবাগানের দোতলার ঘরে দাঁড়িয়ে রাস্তা আর আকাশের দিকে তাকিয়ে বুক-চেরা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দুলাল। ঘরের মধ্যে ঠকঠক ঝপঝপ শব্দ। রাস্তায় ট্রাম-বাসের আওয়াজ। কর্মব্যস্ত মানুষের ভিড়। রিক্সাওয়ালা ঘণ্টা বাজায় ঠুং ঠুং। ট্যাক্সির হর্ন। ঝুড়ি মাথায় কুলি ছুটে ছুটে যায়। আর হাঁকে ফেরিওয়ালার দল। গরম মুড়ি। চানাচুর। ঘুগনি। আইস-ক্রীম।

শুধু দুলালেরই কিছু করবার নেই। হ্যাঁ, কর্মের জগতের সব দরজা বন্ধ তার জন্যে। আর একটা চাকরি জোগাড় করতে পারল না দুলাল। কোথায় না যেতে বাকি রেখেছে সে! কী না করতে চেয়েছে! কিন্তু তার জন্যে কোথাও কোন কাজ খালি নেই।
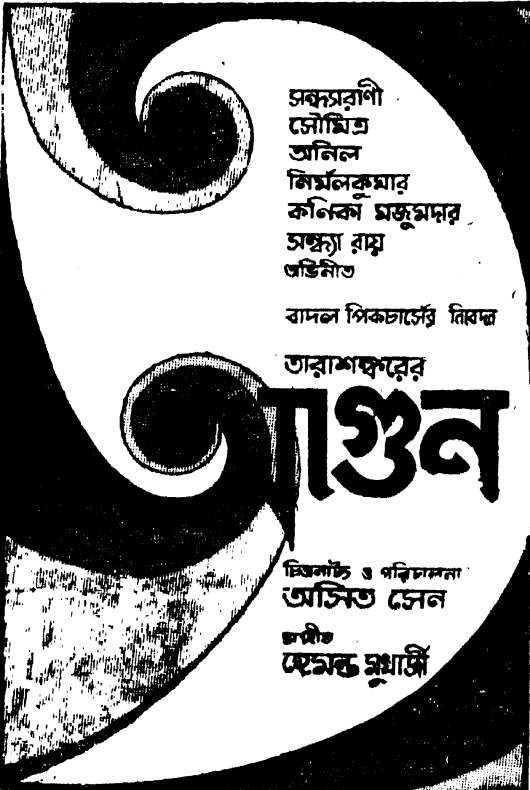
আশায়-আশায় শুধু নিরস উপবাসী দিন কেটেছে। শরীরের ঘাম ঝরেছে অনেক। জুতোর স্ট্র্যাপ ছিঁড়েছে কত! কিন্তু দেখতে দেখতে তার বিশ্রামের একমাত্র কোমল জায়গাটাও শুকনো খটখটে হয়ে উঠল—হারিয়ে গেল। এখন সুধাও তাকে বিশ্বাস করে না—এখন তার কাছেও সে ডাস্টবিনে ফেলে দেবার মতোই জঞ্জাল।

অকারণেই কাশি আসে দুলালের। বমি-বমি ভাব। মাথা ঘোরে। চোখ দুটো কটকট করে। ক্ষুধা নেই। তৃষ্ণা নেই। আর বেঁচে থাকবারও কোন সাধ নেই। দেহের মধ্যে থেকে নিজের প্রাণটাকে সে যেন উপড়ে নিতে চায়—যেমন করেই হোক। সে হারিয়ে যাবে—লুপ্ত হয়ে যাবে এ পৃথিবী থেকে। কোন চিহ্ন রাখবে না কোথাও। সে না থাকলে কারুর কোনই ক্ষতি হবে না।

অন্ধকারে ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে নিজের লুপ্ত হয়ে যাওয়ার দৃশ্যগুলো একে-একে কল্পনা করে দুলাল। না, সুধা চলে যাবার পর কোন জিনিসপত্র সে এখান থেকে সরাবে না। শুধু নিজের কাছে আফিসের দামটা রেখে বাকি পয়সা তুলে দেবে সুধার হাতে।

কাল ভোরে হাওড়া স্টেশন থেকে সুধার ট্রেন ছেড়ে দেয়ার পর আফিম পকেটে নিয়েই সে ফিরে আসবে এ বাড়িতে। এত কম ভাড়ায় কী সুন্দর ফ্ল্যাট! এমন বাড়ি আর আছে নাকি কোথাও কলকাতা শহরে। মৃত্যুর ঠিক আগে-আগেও এ বাড়ির ওপর পুরোপুরি মায়া কাটে না দুলালের। এ বাড়ি সে রাখতে পারল না অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু শেষ অবধি এ বাড়িই রাখবে তার প্রাণহীন দেহ।

দিনের আলোয় শূন্য ঘরের চারপাশে শুকনো চোখে তাকিয়ে দেখবে দুলাল। যেখানে তাদের ছবি টাঙানো ছিল—যেখানে সুধার ছোট আয়নাটা ঝুলছিল আর সস্তা সে টেবিলটার ওপর রেডিওটা ছিল। একে-একে সবই দেখবে দুলাল। সব কথাই ভাববে আবার। সুধার কথাও। হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত হয়েই ভাববে। কারণ তখন তাকে বিদ্রূপ করবার জন্যে কেউ থাকবে না কোথাও। আর হয় তো ততক্ষণে সুধাও পেঁৗছে যাবে তার বাপের বাড়ি। আর কাকে ভয় দুলালের।

কিন্তু শুধু একটা কথাই দুলাল ভুলতে পারবে না। আর কয়েক ঘণ্টা পর যখন আফিমের যন্ত্রণায় ফেনা উঠবে তার মুখ দিয়ে—গোঁ গোঁ কর্কশ আওয়াজ বার হবে—হয় তো মৃত্যুর অনেকদিন পর যখন তার পচা দেহের দুর্গন্ধে সচকিত হয়ে উঠবে পাড়ার লোক আর দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকবে পুলিস আর টেনে হেঁচড়ে তার বিকৃত দেহ নিয়ে যাবে লাস-কাটা ঘরে ছুরির আঁচড়ে চিরে-চিরে পরীক্ষার জন্যে—হ্যাঁ, তখনও দুলাল ভুলতে পারবে না যে সুধা তাকে বিশ্বাস করে না—তার কোন মূল্যই নেই স্ত্রীর কাছে।

সবই তো জানে সুধা। দুলালের চেষ্টার কি কোন ত্রুটি ছিল শেষদিন অবধি? রোদে জলে ঝড়ে নির্লজ্জ ভিক্ষুকের মতো এর কাছ থেকে ওর কাছে যাওয়ার কোন বিরাম ছিল না তার। প্রথম প্রথম আশা দিত সকলে। সমবেদনা জানাত। আবার দেখা করতে বলত—কিছুদিন পরে। আর তখন তাদের কথার ওপর নির্ভর করে দুলালেরও বিশ্বাস জন্মাত—উপায় একটা হবেই।

পেটে প্রচণ্ড খিদে আর পকেটে একটা পয়সা না থাকলেও সব ক্লান্তি ভুলে হাসি-হাসি মুখে সুধার সামনে দাঁড়াত দুলাল।

আর তার চেহারা দেখে আভরণহীন ক্লান্ত দেহটাকে যেন অনেক কষ্টে সোজা করত সুধা। ম্লান চোখ তুলে দুলালকে জিজ্ঞেস করত, কিছু হল?

বেশ জোর গলায় বলত দুলাল, আর একটু কষ্ট কর—এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

কি হবে? বসে পড়ত সুধা। বোধহয় তখন থেকেই আস্থা রাখতে পারত না দুলালের কথার ওপর।

চাকরি—চাকরি হবে—সুধার গায়ে একটা হাত রেখে তাকে আশ্বাস দিত দুলাল, আর মোটে কয়েকটা মাস একটু ধৈর্য ধর।

লম্বা একটা শ্বাস ছেড়ে গম্ভীর মুখে সুধা বলত, ধরব।

সুধা আশা ছেড়ে দিয়েছিল আগেই কিন্তু দুলাল ছাড়ল অনেক—অনেক পর। যারা তাকে দেখা করতে বলেছিল তারা আবার যেতে বলল তিন মাস পর। তারপর ছ মাস পর। তারপর আশ্বাসের বদলে দিল উপদেশ, ও বাড়িটা ছাড়ুন। স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিন বাপের বাড়ি। আগে খরচ তো কমান। যা দিনকাল, আপনার এত খরচ চালাবার মতো চাকরি পাওয়া খুবই কঠিন—একেবারে অসম্ভব বললেই চলে—

যদিও সামনে কঠিন অন্ধকার। মাথায় প্রবল যন্ত্রণা। আর ভাল করে খাওয়া জোটেনি পর পর অনেকদিন, তবুও দিশা না হারিয়ে ঠান্ডা স্বরে দুলাল নিজের পক্ষ টেনে কথা বলবার চেষ্টা করে, বাড়িটা যদি আপনি দেখেন—মোটে তিরিশ টাকায় আজকালকার দিনে অমন ফ্ল্যাট—একটু থামে ও। হাঁপায়। তারপর ভাঙা স্বরে আবার আস্তে আস্তে বলে, চাকরি আমার হয়তো একটা হবে কিন্তু অমন বাড়ি সারা জীবনে আর আমি পাব না। আর আমার স্ত্রীকে কোথায় পাঠাব বলুন—তার বাপের বাড়ির অবস্থাও তো এমন কিছু ভাল নয়।

কারুর কথা শুনতে পারেনি দুলাল তখন। কারুর উপদেশ মানতে পারেনি। আর বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাও ঘুরে যায়নি তার। যেমনভাবেই হোক না কেন, সে শুধু বাঁচতে চেয়েছিল। আর এতদিনের সব লজ্জা বিসর্জন দিয়ে হাতও পেতেছিল অনেকের কাছে। যে যেমন দিয়েছে তাই নিয়েছে ও। এক টাকা, দু টাকা, তিন টাকা, পাঁচ টাকা। এমন কি, মাঝে মাঝে খুচরো পয়সাও।

তারপর ওর কাছে বড় হয়ে উঠল চাকরির চেয়ে টাকা ধার করার ভাবনা। রোদ্দুরে শুকনো মুখে রাস্তা চলতে চলতে কিংবা অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ও শুধু ভাবত—কার কাছে যাওয়া যায়—কার কাছে টাকা পাওয়া যায়। চাকরির সন্ধান করবে না টাকার জোগাড় করবে ঠিক করতে না পেরে ও হাত-পা গুটিয়ে পার্কে বসেই কাটিয়ে দিয়েছে কতদিন। আর কড়া রোদে, বাড়ি ফিরে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছে সুধাকে, এইবার চাকরি হবেই।

যদিও কিছু না বললেও চলত সুধাকে। কারণ কৌতূহলের কোন আভাই ফুটে ওঠে না তার চোখে আজকাল। একটা যন্ত্রের মতো সে শুধু হাত-পা নাড়ে। তাকায় না দুলালের দিকে। কোন প্রশ্নও করে না। যেন আগাগোড়াই তাকে মিথ্যা বলে এসেছে দুলাল—যেন ইচ্ছে করেই কোন চেষ্টা করেনি।

সুধার থমথমে চেহারা দেখে মেজাজটা হঠাৎ বিগড়ে যেত দুলালের। সে বিড়বিড় করে উঠত, সারাদিন এমন কালো মুখ করে থাকবার কোন মানে হয়?

কে তোমাকে বলেছে আমার মুখের দিকে তাকাতে?

বেশ জোরে কথা বলত দুলাল, পরিশ্রম কার বেশী হচ্ছে? তোমার না আমার? সারাদিন ক্ষিধে পেটে নিয়ে ছত্রিশ জায়গায় ঘোরা—

মাথা দিয়ে ফুঁসে উঠত সুধা, আর আমি বুঝি পোলাউ-কালিয়া খেয়ে পায়ের ওপর পা তুলে সারাদিন আরাম করি তোমার সংসারে?

তা না করলেও, এমন কিছু বাহাদুরীও কর না। সব স্ত্রীই স্বামীর বিপদে তোমার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট সহ্য করে। আর তারা এমন খিটখিটও করে না।

চিৎকার করে উঠত সুধা, কে বলেছে তোমাকে আমার সংগে কথা বলতে? হঠাৎ গলাটা যেন ভিজে উঠত তার, নিজে তো পালিয়ে বেড়াও পাওনাদার এড়াতে আর ওরা কি বলে চিৎকার করে যায় জান—জান কি বলে গেছে বাড়িওলা?

দুলালের উত্তরের অপেক্ষা না করে সুধা বলে যেত, তোমার সংসারে তোমাকে একা রেখে একদিন ওই একটা পাওনাদারের সংগেই আমি চলে যাব—

তুমি সব পার—

আর তুমি কি পার শুনি? সারাদিন

বাইরে-বাইরে ঘুরে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বাড়ি ফিরে আমাকে বোকা বানাও—

সুধা!

থাম। আমি সব জানি। মিথ্যাবাদী কোথাকার—জল পড়ত না সুধার চোখ থেকে কিন্তু তবু সে তখন হাঁ হাঁ করে কাঁদত।

আর নিদারুণ আঘাতে যেন নড়বড়ে তক্ত-পোষের ওপর টলে পড়ত দুলাল। কথা বলতে পারত না সুধার সঙ্গে। ওদিকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সুধাও গড়িয়ে পড়ত ঠান্ডা মেঝেতে। যেন মুখ দেখতে চাইত না অকর্মণ্য স্বামীর। আর সুযোগ বুঝে তখন একটা সতর্ক কাক এদের দিকে দু-একবার ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে যেত রান্নাঘরের দিকে। কেননা ও নিশ্চিন্ত যে, কেউই ওকে বাধা দেবে না। তারপরই ডেকচির ঢাকনা উল্টে ফেলবার শব্দ। খাবলে-খাবলে ফেলে ছড়িয়ে ঠান্ডা কড়কড়ে ভাতগুলো খেত সেই কাক। যেন এরা দুজন দুদিকে পড়ে থাকা দুটো মৃতদেহ। কোন ভয় নেই কাকের।

কী বলবে সুধাকে দুলাল। এখন নিজেই সে ভেঙে পড়েছে।

আশা আর পাওয়া যায় না, টাকাও না। পাগলের মতো রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরতেও ওর আর ইচ্ছে করে না। এখনও শুধু যত উদ্ভট কল্পনা ভিড় করে ওর মাথায়। যদি হঠাৎ প্রচুর টাকা ও পেয়ে যায়। যদি উৎকট মড়কে কলকাতা শহরের সব লোক শেষ হয়ে যায় আর শুধু ওরা দুজন বেঁচে থাকে। ব্যাংকগুলো ফাঁকা। গয়নার দোকানে একটি লোকও নেই। কোথাও দেখা যায় না পুলিস। যা দরকার সবই রয়েছে এখানে-ওখানে ছড়ানো। খুশি মতো মুঠো মুঠো তুলে নাও।

কিন্তু পেটের যন্ত্রণায় এ বাড়ির মায়া দুলালের কেটে যায় হঠাৎ। না, এখানে আর থাকা চলবে না। একটা কিছু করতে হবে। এ ভাঙাচোরা সংসার একেবারে ভাঙতে হবে। সুধাকে পাঠাতেই হবে বাপের বাড়ি। চুরি করে, ধার করে কিংবা যেমন করে হোক তার রেল ভাড়া জোগাড় করে—পাঠাতেই হবে। মুদি আর ধারে জিনিস দেয় না। চাল চাইতে গেলে মুখ কালো করে চুপ করে থাকে আশেপাশের বউ আর গিন্নীর দল। কম ভাড়ার এই সুন্দর ফ্ল্যাটে কেমন করে আর বাস করতে পারে ওরা দুজন।

এ সংসার ভেঙে যাক—তবু যেন অনেক হাল্কা হবে দুলালের দেহ। মাথার মধ্যে একটা বিষাক্ত পোকা সারাদিন কটকট করবে না। তাকে খোঁচা মারবার জন্যে কেউ বসে থাকবে না বাড়িতে। যেদিন পয়সা থাকবে সেদিন সে পাইস হোটেলে গিয়ে খাবে আর পয়সা না থাকলে রাস্তার কলের জল খাবে—উপোস করে কাটাবে। তবু শান্তি থাকবে মনে। তার ক্ষতের জায়গায় কেউ কথার নুন ছিটোবে না। আর কলকাতা শহরে থাকবার জায়গার অভাব। এর উঠোনে, ওর বারান্দায়, পার্কে কিংবা ফুটপাথে সে ঠিক কাটিয়ে দেবে রাত। এখন কিছুতেই তার আর আপত্তি নেই। হঠাৎ এই জটিল পৃথিবীটাও অনেক সহজ হয়ে যায় দুলালের কাছে। এখন সুধাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে এ সংসার ভাঙতে পারলেই সে যেন নিশ্চিন্ত হয়।

কিন্তু সুধাকে কথাটা বলতে অনেক সময় নেয় দুলাল। ভয় পায়। ইতস্তত করে। হয় তো ও পাগলের মতো এই গ্রীষ্মের মধ্য রাত্রে হেসে উঠবে। কিংবা

ক্ষেপে উঠে চিৎকার করবে। বিদ্রূপে বিদ্রূপে ক্ষত-বিক্ষত করবে দুলালকে। আর তখন ধিক্কারের গ্লানিতে মরে যাবে সে।

তার চেয়ে থাক। কিছু বলবার দরকার নেই। কিছু করবারও দরকার নেই। একদিন দুলাল হঠাৎ আর বাড়ি ফিরে আসবে না। দূরের কোন আশ্রমে চলে যাবে সে। বৃন্দাবন কিংবা হরিদ্বারে। কিংবা কোন গহন অরণ্যে। মুখে দাড়ি। মাথায় জটা। পরনে গৈরিক বসন। যা হয় হোক সুধার। যা খুশি করুক সে। দুলাল না থাকলে তো তার কোনই ক্ষতি হবে না। আর হয়তো সে তখন প্রশ্রয় দিতে পারবে তার মনের কোন সুপ্ত ইচ্ছাকে। হ্যাঁ, তখনও আত্মহত্যার ইচ্ছেটা এত স্পষ্ট করে দেখা দেয়নি দুলালের মনে।

কিন্তু তবুও হঠাৎ সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে যায় দুলালের। ঠাণ্ডা হয়ে যায় দেহ। এক পা হাঁটবার শক্তি থাকে না। তখন খুব আস্তে সে ডাকে সুধাকে। যদিও সাড়া পাওয়া যায় না তবুও দুলাল জানে যে সে ঘুমোয়নি। ইচ্ছে করেই চুপ করে আছে। এখন এত সহজে ঘুম আসে নাকি ওর।

সুধা। আবার একটু জোরেই ভয়ে-ভয়ে ডাকে দুলাল।

বিরক্তির একটা ঝাঁক কেঁপে ওঠে তখন, কি?

কোন ভূমিকা না করেই দুলাল বলে, এ বাড়িটা পয়লা তারিখ থেকে ছেড়েই দি—কি বল?

কোন চুলোয় যাবে শুনি? এতটুকু দরদ নেই সুধার স্বরে।

তবুও আহত হয় না দুলাল এই মুহূর্তে। সুধার কোন দোষও দেখতে পায় না। তার আরও কাছে সরে আসে। মাথাটা মন্ত্রণায় জ্বলে গেলেও তার গায়ে একটা হাত রাখে। কিন্তু এক ঝাপটায় দুলালের হাতটা সরিয়ে দেয় সুধা।

এবারেও কোন প্রতিক্রিয়া হয় না দুলালের মরা মনে—তুমি কিছুদিন তোমার বাবার বাড়িতে গিয়ে থাক—

কিছুদিন না চিরদিন? দুলালের দেহটা দুই হাতে ঝাঁকিয়ে দেয় সুধা, আমার বাবার বাড়িটা কি একটা ধর্মশালা? ভিখিরীর মতো সেখানে যাবার কথা বলতে একটু লজ্জা হয় না তোমার? কেন, তোমার দিকের একটা লোকের কথাও কি ভেবে বের করতে পারলে না?

না। তুমি তো জান আমার কেউই নেই।

হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে বসে সুধা। জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলে। একবার বোধহয় কপালও চাপড়ায়। আর দুলালের দেহটা যেন কুঁকড়ে-কুঁকড়ে অনেক ছোট হয়ে যায়। নির্লজ্জ পরাজয়ের গ্লানিতে পঙ্গু হয়ে সে তাকাতে পারে না সুধার দিকে।

কোথায় নামিয়েছ তুমি আমাকে—মাঝরাতে ঘর কাঁপিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে সুধা, এমন কপালও হয় মানুষের! কিন্তু আর নয়, এবার হয় তুমি মর নয় আমি মরি। উঃ, আশ্চর্য, এমন অকর্মা মানুষও জন্মায় পৃথিবীতে। দু-দুটো বছরে কথার জাহাজ ভাসানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না গো!

ইচ্ছে করলে সুধাকেও আঘাত করতে পারত দুলাল। আরও অনেকের উদাহরণ দিয়ে তাকে ছোট করতে পারত। কিন্তু কোন শক্তি নেই দুলালের। মান-সম্ভ্রম দম্ভ—কিছু নেই। যা খুশি বলুক সুধা—সে চুপ করেই থাকবে। অন্য দিকে পাশ ফিরে চুপচাপ মড়ার মতো পড়ে থাকে দুলাল। কিন্তু থাকলে হবে কি, সুধা যেন তার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়েই চলে।

খুব ভোরবেলা হাওড়া স্টেশনে একটা ফাঁকা রেলের কামরায় বসে আছে ওরা দুজন। বেশী লোক নেই। ট্রেন ছাড়তে আর কিছুক্ষণ দেরি।

সুধার চোখ দুটো হিংস্র—ভয়ংকর। মাথার ঘোমটা খুলে পড়েছে কিন্তু খেয়াল নেই তার। দুলাল তাকে কয়েকবার চায়ের কথা বলেছিল—সে উত্তর দেয়নি। ফিরেও দেখেনি দুলালের দিকে।

আসবার আগে বাড়িটার দিকেও ফিরে তাকায়নি সুধা। পা দিয়ে সব সাধের জিনিসপত্র ঠেলে মাড়িয়ে গটগট করে ট্রাম লাইনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। আর একটা কাঠের পুতুলের মতো দুলাল এসেছে ওর পেছনে পেছনে।

তখন একবার মুখ টিপে হেসেছে দুলাল। আর একটু পরে এ বাড়িতে ফিরে এসে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে বলেই হেসেছে।

সকলে খুব জব্দ হবে এবার। সুধা। তার যত ভদ্র মিথ্যাবাদী বন্ধুর দল। আর পরশু সন্ধ্যার সেই কাবুলীটা। তার কাছ থেকেই সুধার যাবার ভাড়াটা জোগাড় করেছে দুলাল।

হাতিবাগান থেকে হাওড়া স্টেশনে আসবার সময় কিছুই টলাতে পারেনি দুলালের মন। ভোরের মিষ্টি হাওয়া, নরম আকাশ, এই পৃথিবীর মধুর একটা ঘ্রাণ—কিছু না। কারুর ওপর কোন আকর্ষণই অনুভব করেনি সে। বেঁচে থাকবার ক্ষীণ ইচ্ছেও মনে জাগেনি তার। বরং তাড়াতাড়ি মরবার জন্যে ছটফট করেছে মনে মনে। এই পৃথিবী থেকে পালাতে পারলেই সে যেন বেঁচে যায়।

এখন তাড়াতাড়ি সুধার ট্রেনটা ছাড়লেই হয়। সে সরে যাক দুলালের চোখের সামনে থেকে—কঠিন বীভৎস গোটা পৃথিবীটাই সরে যাক। শ্রবণ শিথিল হয়ে গেছে দুলালের আর দৃষ্টিও বোধহয় অন্ধ হয়ে গেছে। কাউকে দেখে না সে। কারুর কথা শোনে না।

কিন্তু এখন সুধা তাকে দেখে এক অদ্ভুত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে। দুলাল তাকে না দেখলেও সে দেখে। আর ঠিক তখন ট্রেন ছাড়ার চঞ্চলতা জাগে হাওড়া স্টেশনে। আকস্মিক চমকের ঝাপটায় দুলাল উঠে দাঁড়ায়। এবার তাকে নামতে হবে। সুধাকে কিছু না বলেই সে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

কোথায় যাচ্ছ?

সুধার রুক্ষ গলার স্বর শুনে ঘুরে দাঁড়ায় দুলাল, এখুনি গাড়ি ছাড়বে, মুখ নামিয়ে সে বলে, ওই যে ঘণ্টা দিয়েছে—

আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সুধার গলার স্বর, কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোন চুলোয়?

বাড়ি—

সব ভুলে এখানেও যেন বিদ্রূপের হাসি হাসে সুধা, উঃ, বাড়ি দেখানো হচ্ছে! বাড়ি আর আছে নাকি তোমার?

নেই যে সে কথা তো জানই। এত লোকের সামনে সুধার এই খোঁচা ভাল লাগে না দুলালের, কিন্তু জিনিসপত্রের একটা গতি তো করতে হবে—

হুইসেলের শব্দে চমকে উঠে সুধা বলে, কিছু করতে হবে না। কি করবে তুমি শুনি? স্বরে যেন ঝাঁজালো বিষ ঢালে সে, কি ক্ষমতা আছে তোমার?

তাহলে কি করব আমি এখন?

এখানে বস—

অসহায় দুলাল বিড়বিড় করে ওঠে, গাড়ি ছাড়ছে যে?

ছাড়ুক।

বাঃ, আমি কোথায় যাব?

আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে—

বিব্রত দুলাল বলে, তোমার বাবার বাড়িতে? এই অবস্থায়? না না, আমি পারব না—

বিষাক্ত সাপের মতো ফোঁস করে ওঠে সুধা, নিজের বেলায় দেখছি টনটনে জ্ঞান—আর আমাকে রাজরানীর মতো পাঠাবার বেলা সে কথা খেয়াল থাকে না? কেন, আমাকে সেখানে চিরকাল রাখার মতলব নাকি? খবরদার, দরজার দিকে পা বাড়াবে না—বস শিগগির।

কোন উপায় নেই দেখে সুধার পাশে বসে পড়ে দুলাল। গাড়ি দুলে ওঠে। বাইরে তাকিয়ে ছোট একটা নিশ্বাস ছেড়ে ও বলে, না না, ফিরে তো আসতেই হবে যত শিগগির হয় কিন্তু অত জিনিস পড়ে রইল—

ক মাসের ভাড়া বাকি খেয়াল আছে? ওসব বাড়িওলা তোমাকে দেবার জন্যে বসে আছে। মুখপোড়া ওগুলো নিয়ে নেবে বলে কত জিনিস যে ভেঙে দিয়েছি আমি! তুমি বোকা তাই কিছু ভাঙতে পারনি।

ধরা গলায় দুলাল বলে, আর কত ভাঙব!

সুধা কিছু বলতে চায়নি। কিন্তু হঠাৎ যেন তার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়, মহেশ্বর!

ট্রেনটা দুলে ওঠে। এগিয়ে যায়। এখনও ভয়ে সুধার দিকে তাকায় না দুলাল। কিন্তু ভোরের তাজা আলোয় তার চোখে ধাঁধা লেগে যায়। আর অনেক দিন পর এই প্রথম প্রচণ্ড ক্ষিধেয় তার বুক জ্বলে।

কিন্তু পরের স্টেশন আসতে এখনও অনেক দেরি।

যা অঙ্গে তা সঙ্গে

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

মেয়েদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কে বলুন তো? নিশ্চয়ই এমন কিছু জিনিস যা সদা-সর্বদা তাদের অংগে অংগে সংগে সংগে জড়িয়ে থাকে। কি এমন সে জিনিস? বাবার পদবী? তা তো বিয়ে হবার পর শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে নারকেল ছোবড়ার মত পড়ে থাকে। তবে আর কি হতে পারে? সোহাগ? সেও তো বজ্রবাঁধুনি ফসকা গেরো। তাহলে নিশ্চয়ই লঙ্কার আচার। তাতে তো আবার শুধুই ঝাল, এতটুকু নেই মিষ্টি।

Diamond is woman's best friend. এ আমার কথা নয়। অধিকাংশ মার্কিন মহিলারাই নাকি এমন মনোভাব হৃদয়ে ধারণ করে থাকেন। খরচায় যদি না কুলায় তা হলে অগত্যা সোনাদানা হলেও চলে। তাতেও ঘাটতি পড়লে নিজের অংগবাসের মত এমন মধুর পরশ বুলানো দরদী বন্ধু আর কে আছে—সব সময়ে যা নিজেকে মধুর ভাবে আগলে রাখে। অন্যান্য মহিলাদের মত আমেরিকান মহিলাদের হৃদয়ের ভিতরকার যে কামনার স্বর্ণখনি আছে সেখানে ইচ্ছার রত্ন উদ্ধার করলে দেখা যাবে হীরের সংগে 'মিংক্' কোট লাভের প্রত্যাশাও জ্বলজ্বল করছে।

লক্ষ্মীর চেয়েও ফ্যাশানের দেবী আরও বেশী চঞ্চলা—সেই সংগে একটু ট্যারা। তিনি যেখানেই থাকুন আর যেমন ভাবেই অধিষ্ঠান করুন তাঁর এক চোখ সর্বদা প্যারীর দিকে ফিরে আছে। ফ্যাশনের সূর্যোদয় প্যারীতে আর তার মধ্যগগনের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত নিউইয়র্ক। এই কথাই বোধহয় স্মরণ করে একজন ফরাসী বন্ধু-মান ফ্যাশন পটু? ফ্যাশনের এমন ফাঁদ নিউইয়র্কে এসে পাতলেন—যার ফলে জনা জনা মার্কিন মহিলা তাঁর জালে ধরা দিতে লাগলেন। মেয়েদের চোখে একান্ত লোভনীয় ও পরম কাম্য হল এই মিংক্ কোট। মিংক কোটের মধ্যে নিজের শরীরকে একবারও না গলাতে পারলে ইহজগতের

ইচ্ছা-রত্ন উদ্ধার

পরম বাঞ্ছিত কাজই আমেরিকান মহিলার জীবনে অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। কিন্তু মিংক্ কোটের যা দাম তাতে সাধারণের গায়ে এর ছোঁওয়া লাগলে ফোসকা পড়ে যাবার দাখিল। এখন উপায় তা হলে? তাই মার্কিন মেয়ে ভুলাবার জন্যে real imitation অর্থাৎ "আসলি-নকল" ফার কোট এখন চালু হয়েছে কাতারে কাতারে। ভারতীয় মুদ্রায় একখানি মিংক্ কোট কিনতে তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার বা তারও বেশী টাকা লাগে। ফরাসী দেশের জাক কাপ্লান সাচ্চা ফ্যাশন বিশারদ হয়ে বুঝতে পারলেন মেয়েদের প্যাসান কিসের জন্য। তিনি নিউ ইয়র্কে এসে রাতারাতি এই মিংক কোটের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। মুক্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন সবাই মিংক কোটের স্বপ্ন দেখছে বলে আপনাকেও দেখতে হবে এ কথা কে আপনাকে বলেছে? ফ্যাশনের মূল ফ্রেঞ্চ মন্ত্র : অনুকরণ নয়—প্রচলন। ফার কোটের এই রাজত্বে এখন নতুন কিছু আমদানি কর—এই হল কাপলানের আন্দোলন। উনি বলছেন নেকড়ের ছাল পর (Wolf fur coat); বানরের ছাল পর (monkey fur coat); নয়তো ভারতীয় বাঘছাল পর (Indian tiger fur); এই সব নতুন ধরনের ফার দেখতে মেয়ের দল তাঁর দোকান ভেংগে ফেলছেন। কিন্তু খানদানি মিংক্ ব্যবসায়ীরা পাল্টা বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করলেন—হিংস্র জন্তুর ফার পরে নিজেকে হিংস্র করে তোলাও মোটেই ফ্যাশন নয়।

কলকাতার সর্বেশ্বর রায় বলতো—এরা

বাঘছাল নিয়ে এখন ছেলেমানুষের মত বচসা করছে, এরা বাঘছালের আসল অর্থ বোঝে না। কেন আমাদের সংসারত্যাগী পুরুষেরা বাঘছালের ওপর আসন করে বসেন, তার কারণ কি এদের জানা আছে। কখনও না।

এতদিন জানতুম 'ভারতীয় কারির প্রশংসায়' আমেরিকানরা পঞ্চমুখ এখন দেখছি শাড়ীর প্রশংসায় শত সহস্র মুখ। এই ফ্যাশনের টানাপোড়েনের মধ্যে আমাদের শাড়ীর মন রাঙানো, চোখ ধাঁধানো ও মায়া জড়ান যে রূপ তা দেখে আমেরিকান মেয়েপুরুষেরা একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। ম্যানহার্টনের ফুটপাত দিয়ে কোন ভারতীয় মহিলা (বাঙালী হলে তো আর কথাই নেই!) চলে গেলে তার শাড়ীর নয়ন-রম্যতা দেখে এরা মনে করে তিনি যেন একটি 'যাদু কি পুরিয়া', গাউন পরে ক্লাউন সাজা যায় কিন্তু শাড়ীর মত মায়াবী মোড়কে নিজেকে আর কিছুতে মোড়া যায় না—একাধিক মার্কিন মহিলাই বলতে শুরু করেছেন। মনে মনে গর্ব হত—আমাদের অ্যাটম বম নেই, নাই-বা থাকলো—আছে শুধু এই কাণ্ডভরম। তাতেই ভরসা।

শাড়ী এত প্রিয় পরিচ্ছদ হয়েও তা এত রঙিন অনুভূতি বিস্তার করেও মুশকিল করেছে তার বিরাট দৈর্ঘ্যটাকে নিয়ে। এ-গা-রো হাত! এত বড় জিনিস যে তাকে স্বচ্ছন্দে গায়ের উপর নিয়ে কোমরে আটকে রেখে নির্ভাবনায় চলাফেরা করা মানে হিমসিম খেয়ে যাওয়া। এ যেন অ্যাটলানটিক সাগরের মত বিরাট কিছু জিনিসকে দিবা-রাত্রি কোমরে চড়িয়ে নিয়ে চলাফেরা করা। মার্কিনীরা কল্পনা করে আহা যদি টেপা বোতাম এবং জিপ ফাসনারের সাহায্যে শাড়ি গায়ে আবৃত রাখা যেত। সামনের দিকটা সাড়ির মত হবে পিছন দিকটা পিঠকাটা

যাদু কি পুরিয়া

গাউনের মত—"হাস-জারুর" মত বা কিছু। তবে বিশ্বাস করুন জিপ্ ফাসনার দেওয়া রেডিমেড শাড়ীর মত কিছু একটা পদার্থের আমদানি ইদানীং হয়েছে ইভনিং ড্রেস হিসাবে। মার্কিন মহিলারা মনে করেন দিনের বেলা কাজের মাঝে রাস্তা ঘাটে বাস্ততার সময় শাড়ী এমন জড়িয়ে ধরে যে শাড়ী সামলাতে প্রাণান্ত—কাজটা করাই তখন হয় দারুণ দায়। এমন কথাটা কত যে মিথ্যে তা প্রমাণ হল তারপরই যখন ইন্দ্রানী রহমান নিউ ইয়র্কের বারবিজোন প্লাজায় ভরত-নাট্যম দেখালেন। শাড়ি পরে চরণের এমন সে রণন? ওরা তাজ্জব বনে গেল—এও সম্ভব!! উৎসুক তাদের দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে তাঁকে অপলক নেত্রে বাঁধতে চাইলে। এই অনুষ্ঠানের পর বহুদিন গবেষণা চললো কেমন করে শাড়ী সুদ্ধ এই নৃত্যপটিয়সী মহিলা অক্লেশে চলতে পারলেন। একজন শাড়ী-ফ্যানের দৃঢ় ধারণা নিশ্চয়ই শিরীষ আঠার মত কোন জবর জিনিস দিয়ে ড্রেসিং রুমে ইন্দিরা রহমানের শাড়ী কোমরে আটকে দেওয়া হয়েছিল। তা না হলে......।

আমেরিকানদের ধারণা আমাদের মহিলারা শাড়ীকে আগলে রাখেন, শাড়ী মহিলাদের নয়। হায় রে ওরা জানে না শাড়ী গায়ে জড়ানোর মধ্যে প্রত্যেক মহিলার একটা করে বিশেষত্ব আছে—রুচিভেদে তার কত তারতম্য হয়। ওদের মুখে দৃষ্টি হরণ করতে যেমন তেমন করে হোক যারই হোক শাড়ী হলেই যথেষ্ট। আমরা নিউ ইয়র্কের যে চত্বরে গিয়ে উঠলুম—সেখানকার এপার্টমেন্টের কেয়ারটেকার হ্যারিসন প্রথম দর্শনেই বললেন—শীলাকে চেন, সে হল স্বপ্ন রাজ্যের অপ্সরী, হেঁটে গেলে তার শাড়ীর ছটায় এখানকার পথ আলো হয়ে যায়। সব্জি-ওলা, মাংসওলা, মাছওলা, মনিহারী দোকানের লোকটি, ড্রাইক্লিনিং লোকটির মুখে সেই এক কথা—"শীলার শাড়ী এক বিস্ময়", বহুদিন পর্যন্ত শীলাকে দেখতে পাওয়া গেল না—তার শাড়ীর প্রশংসাই শুধু শোনা যেতে লাগল। একদিন সত্যি সত্যিই পালে বাঘ পড়লো—হঠাৎ রাস্তায় একজন শাড়ী বেষ্টিতা এক রমণীর সঙ্গে সন্ধ্যার ঝোঁকে দেখা।

আপনিই শীলা?

হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন। কিন্তু কি করে বুঝলেন?

কেন আপনার শাড়ীর চমক দেখে।

যার জন্য এত উৎসুক আগ্রহ চারদিকে—তিনি আমায় এমন করে নিরাশ করলেন। ভাবছিলুম কোথায় ইন্দ্রের সভার কোন ছিটুতে-পড়া কারুর দর্শন পাব—এ যে চেড়ীর কাছাকাছি। কিন্তু তাঁর শাড়ীর বাহার অফুরন্ত। কলম্বো থেকে আগতা এই মহিলাটিকে দেখে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে আমেরিকানরা জবুলজবুলে মলাট দেখেই খুশী।

প্রিয়বান্ধব বোস যখন কলকাতা থেকে আমেরিকায় পড়তে এলো তখন লিন্ডসে স্ট্রীটের দোকানে সদ্য তৈরী সুট-প্যান্টের নীচে একখানি আনকোরা নতুন কাশ্মিরী সিল্কের শাড়ীও নিয়ে আসে। কে তাকে এ পরামর্শ দিয়েছিলো জানা নেই। তবে দেখা গেল এই শাড়ীর প্রলোভনে তার বান্ধবী সংখ্যা অচিরে দুজনের কাছাকাছিতে পৌঁছলো। কিন্তু নাম তার যাই হোক সে নিতান্ত অপ্রিয় বান্ধবের মত বান্ধবী-দের সঙ্গে ব্যবহার করল। দিচ্ছি, দেব, দিলুম করে তিনটি বছর প্রবাসে কাটিয়ে শাড়ীটি কারুর হস্তগত না করিয়ে বেমালুম নিয়ে বাড়ি ফেরত এলো। শুধু তাই? সে ধন্যি ছেলে। তার বাবা মা তারপর দেখে শুনে পছন্দ করে যে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে

দিলেন তাকেই বিয়ের পর প্রথম জন্মদিনে এই শাড়ী উপহার দিল আমেরিকা থেকে আনা উপহার হিসাবে।

বন্ধু মারে রোজেনবার্গ অন্য আমেরিকান-দের মত অত হাল্কা প্রকৃতির নয়। সে অনেক কিছু পড়ে, অনেক কিছু দেখে, অনেক কিছু ভাবে। চীন-জাপান ভারত-বর্ষের পুরানো ইতিহাস তাঁর ' উল্লাসের সামগ্রী। প্রাচী সে আবিষ্কার করতে চায়। একবার বেড়াতে যায় ত্রিনিদাদ। সেখানকার এক ভারতীয়ের দোকান থেকে স্ত্রী পার্লের জন্য একখানা সুন্দর ময়ূর-পঙ্খী রঙের বেনারসী শাড়ী কিনে আনে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত পার্লকে শাড়ীতে কেমন মানায় তা মারের দেখার সুযোগ হয় নি। শাড়ী তো হলো কিন্তু পরাবে কে? এক পার্টিতে আমাদের দু পরিবারের যাবার কথা ছিল। যাবার আগে মারে শাড়ী সমেত পার্লকে নিয়ে এলো আমাদের ওখানে। সেখান থেকে সেজেগুজে যাবার জন্য। মারের সঙ্গে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছি আর ভিতরে পার্লকে ঘিরে চলেছে...তোমায় সাজাবো যতনে...। তারপর সাজগোজ সেরে ওদের দুজনের আবির্ভাব। পার্টিতে যাওয়া হল। বলা বাহুল্য শাড়ী পরে পার্ল একটা বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চেয়ে বড় রকমের আর একটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। অতর্কিতে ফসকে তার শাড়ী কোমর ছেড়ে কারপেটে গিয়ে পেখম ধরলো। যিনি তাকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন তার অবস্থাটা একবার অনুমান করুন। মারে বললো, আমেরিকানদের কোমরে প্লাস-টার অব প্যারিস ছাড়া শাড়ী দাঁড়ায় না, দেখলে তো।
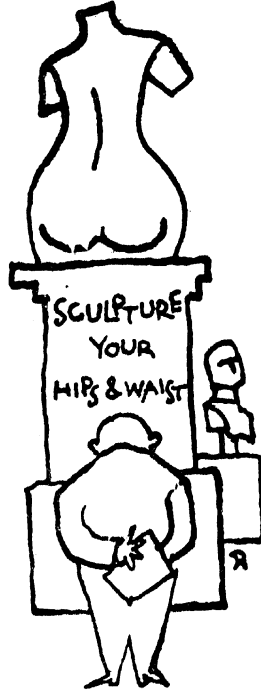
সে দিনের সে পার্টিতে শাড়ী নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা হল তার ইয়ত্তা নেই। পাশে যে মার্কিন ছোকরাটি ছিল সে প্রশ্ন করলো—সামারে তোমাদের দেশে মেয়েদের পোশাক কি? প্রশ্নটার মাথামুণ্ডু প্রথমে কিছু বুঝতে পারি নি। পরমুহূর্তে মনে পড়লো—ও বুঝেছি: সামারে এখানে তাঁরা পোশাক খাটো করতে করতে বেদিং স্যুটে এসে পৌঁছন। হায় হায় আমার কাছে যদি থাক তো ভবানী লাহার হেমেন মজুমদারের আঁকা তেমন কোন ছবি। হিলওয়ালা জুতো, কামানো ভুরু, এনামেল করা গাল, রঙ করা ঠোঁট আর সুইমিং সুট পরা জিরাফ জিরাফ ভঙ্গিতে হাঁটা দেখতে যারা অভ্যস্ত তাদের কাছে মন্থর গতিতে চলে-যাওয়া কোন সিক্ত বসনা। কি দৃষ্টি ফেরাতে পারবেন?

আর একজন বৃদ্ধ আধভোলা আমেরিকান প্রফেসর শুধিয়ে ছিলেন—পুরুষ ভারতীয়রা কেন সুট-প্যান্ট টাই পরে জানি না—তোমরাও শাড়ী পরলে পার। ন্যাশানাল ড্রেস।

—শাড়ী আমাদের জন্য নয়, আমাদের আছে ধুতি।

—Dhoti? Oh yes, I know roti.

বিলক্ষণ কোথায় ধোটি আর কোথায় রোটি। ভারতীয় রেস্তরাঁয় মেনুকার্ডে রুটি দেখা ও খাওয়ার পর এই অবস্থা। কিছুই এক ব্রহ্মের বিচিত্র প্রকাশ—তাই ধোতি আর রোটিতে কি আর প্রভেদ বল।

নিউ ইয়র্ক থেকে বাসে একবার নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া হচ্ছে। দীর্ঘ পথ। যে সব যাত্রী এক সঙ্গে চলেছে তাদের মধ্যে পরিচয় হয়। একজন সহযাত্রী ছিলেন মার্কিন দেশের বিচিত্র যন্ত্র রিলেকসাসাই-জার-এর সেলস ওম্যান। মহিলার কথা পড়েছি কারণ তিনিও একজন আদি ও অকৃত্রিম শাড়ী ফ্যান। তার কথা বলার আগে এই অদ্ভুত যন্ত্রটি কেমন অসাধ্য-সাধন করতে সক্ষম তাই বলি। হলিউডের চিত্রাভিনেত্রী, মডেল এবং যাবৎ সুন্দরীরা এই যন্ত্র ব্যবহার করে নিজেদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলেন। এই যন্ত্রটি শরীরের অনাচে কনাচে যেখানে সেখানে বসিয়ে ব্যবহার করলে সেই জায়গার চর্বি সরিয়ে দেওয়া যায়। প্রতিদিন ব্যায়াম করার মত এটিকে ব্যবহার করতে হয় অথচ ব্যায়ামের ক্লান্তি বা কষ্ট ভোগ করতে হয় না। কারণ যন্ত্রটি ইলেকট্রিকের সাহায্যে চলে। যন্ত্রটির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় Sculpture your hips and waist দেহ সৌকর্য অনুপম করে তোলার কাজে এর ব্যবহার হয় প্রচুর। যে মহিলার কথা বলছিলাম। উনি ব্যবসার খাতিরে যন্ত্র নিয়ে একাধিক ভারতীয় মহিলার কাছে গেছেন এবং তাঁরা আমেরিকান মহিলার অনুকরণে নিজেদের দেহ সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলতে এঁর সাহায্য নিয়েছেন। উনি শাড়ীর প্রশংসা করে বলছিলেন একবার ওঁকে যেতে হল একজন মারোয়াড়ী খরিদ্দারের কাছে। কিন্তু গিয়ে যা দেখলেন তাতে রিলেকসাসাইজার পাশে সরিয়ে রেখে মহিলাকে শাড়ীর ওপর নির্ভর করতে পরামর্শ দিলেন। ওঁর মতে রিলেকসাসাইজার যা না পারে শাড়ী তা পারে। শাড়ী যে মেদের পুকুর, পুকুর নয় অ্যাটল্যাণ্টিক লুকিয়ে চুরিয়ে ঢেকে রাখতে পারে তা তিনি আগে জানতেন না। শাড়ী হল এ পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছলনার বর্ম। মেদাধিক্য বা মেদাল্পতা রঙীন আচ্ছাদনে কোথায় তলিয়ে যায়।

আমেরিকানদের চোখে শাড়ী যখন এত কঠিন মরীচিকা হয়ে দেখা দিয়েছে তখন বালীগঞ্জের তিনজন ডেঁপো বাঙ্গালী ম্যাস-কেটিয়ার (মরে গেলেও যাদের নাম বলা যাবে না)—তাদের বন্ধু পত্নীদের কাছ থেকে ধার করে তিনখানা শাড়ী এনে এক মহাকাণ্ড করে বসলো। নিউ ইয়র্কের ফিফথ্ এভিনু দিয়ে তারা তিনজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি দুপুর বেলা শাড়ী পরে একই সঙ্গে কুইক মার্চ শুরু করে দিলো। তারা হেঁটে চলেছে আগে আগে—পিছনে পিছনে চলেছে বহু আমেরিকানদের বিস্ময় বিমুগ্ধ সপ্রশংস দৃষ্টির অনুসরণ। সেদিন

ঘুমের ওষুধ

নরেন্দ্র ঘোষ

অনিরুদ্ধ রায়ের পালঙেকর ওপর বসে ললিতমোহন ঝিমুচ্ছিল। তাঁতীবাগান লেন ঘেঁয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ির কয়লার ধোঁয়া তখন সরীসৃপ গতিতে শূন্যতার দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। গলিতে তখন অজানা, অদেখা মানুষদের পদশব্দ, অবোধ শিশুদের কোলাহল, টিউব-ওয়েলের চার-দিকে ঝি চাকরদের উৎকট রহস্যালাপ। সব মিলিয়ে এক অখণ্ড গুম্‌গুম্‌ শব্দ। অন্তহীন কালসমুদ্রের কল্‌কল্‌ ধ্বনি। ঘুম অথচ ঘুম নয় এমনি একটা মাঝামাঝি জায়গায় বিলম্বিত হয়ে ললিতমোহনের চেতনা যখন সেই শব্দের স্বাদ গ্রহণ করছিল তখন হঠাৎ ছেদ পড়ল।

বিজনবালা এক কাপ চা নিয়ে এসে পালঙেকর এক প্রান্তে বসে ব্যঙ্গের সুরে বলল, "বলি ধ্যান করছ নাকি?"

"অ্যাঁ!"

কালসমুদ্রের কুল থেকে সরে এল ললিত-মোহন, লাল চোখ মেলে হাসল, হাসতে গিয়ে ওপরের পাটির সামনের বাঁধানো দাঁত দুটো একটু নড়ে উঠল।

"কাল রাতেও ঘুম আসেনি বিজন—"

"ওমা তোমার হল কি তাহলে? রোজই তো ঐ একই কথা শুনি—বলি আজকাল মনপাখীকে কোন খাঁচায় বাঁধা রেখেছ?"

বিজনবালার দিকে হাসিমুখেই তাকাল ললিতমোহন। ছোট্টখাট্টো মানুষটি বিজন-বালা। বয়স প্রায় বিয়াল্লিশ হতে চলল কিন্তু দেখায় ছত্রিশের মত। নাক চোখ সাধারণ. ঠোঁটের রেখায় বাঁকা ধনুকের আভাস ছিল, কিন্তু ওপরের পাটির দাঁতগুলো একটু উঁচু বলে তার রেখাটা খুব নয়নাভিরাম নয়। রংটা ফরসা, টসটসে চামড়া বিজনবালার, সব মিলিয়ে একটা শ্রী আছে তার, যা এখনো টানে মনকে। গড়নে কাঠিন্য নেই বটে তবে প্রচুর মেদসমাগমও হয়নি। শরীরের তুলনায় বুকটা অসঙ্গতভাবে এখনো পুষ্ট। সেই দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ললিতমোহনের মনে উত্তাপ ঘনাল:

সে বলল, "মনপাখি চিরকাল একটি খাঁচাতেই তো ছিল বিজন"—

"কোথায় ?"

"বহু জায়গা ঘুরে সেই সোনার খাঁচা এখন তাঁতীবাগান লেনে থেমেছে"—

"যাও যাও—কালো ছোঁড়া ঠকের গোড়া।" অর্থাৎ ললিতমোহন দেখতে কালো।

"কালো, জগতের আলো।" ললিত-মোহন পাল্টা বলল।

ইস্—

"ইস্—কালো'র মনও কালো"—

"কালোর ওপর কিন্তু আর রঙ্ নেই বিজন"—

"ইস্, এত অহংকার!" বলেই হাত-পাখাটা তুলে নিয়ে বিজনবালা পিঠ থেকে শাড়ীর আঁচলটা একটু সরিয়ে ঘামাচি মারতে শুরু করল। ললিতমোহন চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিল। আবার তাকাল সে স্ত্রীর দিকে।

বিজনবালা বলল, "বাঁকা হয়ে গেল কেন ?"

"তোমারে নেহারি বলে।" একটু কবিতার সুরে বলল ললিতমোহন।

"কেন ? আমায় নতুন মনে হচ্ছে বুঝি ?"

"চির নতুন মনে হচ্ছে"—

"আহা হা"—

"বুঝলে ললিতা—"

"খবরদার, ও নামে ডাকবে না আমায়—ছিছিছি, ছেলেমেয়েরা শুনলে কী ভাববে ?"

"ভাববে যে বাপের রসবোধ আছে। আমার নাম ললিত তাই বৌকে ললিতা বলে ডাকি"—

"থাক্"—হঠাৎ বিজনবালা'র দুচোখ জ্বলে উঠল, "আর ন্যাকামি করতে হবে না"—

"অ্যাঁ!" বিষম খেতে খেতে বেঁচে গেল ললিতমোহন, বৌয়ের দিকে তাকিয়ে ভয় হল তার। বিজনবালা'র দু'চোখ ঠিকরে আগুন বেরোচ্ছে যেন। হঠাৎ বৌয়ের চোখ দুটো ভাল লাগল ললিতমোহনের, ভাল লাগাতে ভয়টা কমতে লাগল। ওদিকে বিজনবালা'র চোখের আগুন আবার নিভে গেল।

"রাগিও না, চা খাও"—সুরটা নরম করে বিজনবালা বলল। একটু হাসবারও চেষ্টা করল সেই সঙ্গে।

হাসি দেখে অভয় পেল ললিতমোহন, বলল, "একটা কথা বলব—কথা নয়, ছড়া—?"

"কি ?"

"বলব বলব মনে করি, বলতে লাগে ভয়, নির্ধনী পুরুষের কথা রয় কি না রয়।"

"মানে ?"

"তোমার দু'গাছা চুড়ি না হলেই আর নয়। "এই কাঁচের চুড়ি আর শাঁখা"—বলতে বলতেই থেমে গেল ললিতমোহন।

বাঁ হাত দিয়ে কপালে চাপড় মেরে বিজন-বালা বলল, "আ মরণ, কয়েদীর আবার বালা-খানা, আমার আবার গয়না"—

"না না—কথাটা এই"—

"কোন কথার আর দরকার নেই—ওরে আমার সোহাগ—হঠাৎ উঠে দুম্দুম্ পা ফেলে বিজনবালা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মুহূর্তের জন্য আবার ভয় ঘনিয়েছিল ললিতমোহনের মাথায়। সেখান থেকে একটা বিদ্যুতের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা শরীরে। যেমন জলে ঢিল পড়লে ঢেউ ছড়ায় চারদিকে তেমনি ভাবে বুকের ভেতর ধ্বক্ করে উঠে রক্ত ছড়াচ্ছিল চারদিকে। আর সমস্ত রোমকূপ দিয়ে কায়াহীন অসংখ্য ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মত একটা শব্দহীন শব্দ বেরিয়ে আসছে। একটা ঝাঁঝাঁ অনু-ভূতি। কিন্তু বিজনবালা যেতেই আবার সেই ডাক কমে গেল, সেই ঢেউ মিলিয়ে গেল। কিন্তু তবু না, আর ভয় পাবে না সে। ডাঃ চক্রবর্তী সাবধান করে দিয়েছেন। সেই সেদিন পার্কের মধ্যে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল সে। হঠাৎ। হঠাৎ এই পৃথিবীর

শব্দ স্পর্শ গন্ধ বর্ণ সব একাকার হয়ে এক বিচিত্র বেদনা হয়ে তার হৃদ্‌পিন্ডের নিভৃতে একটা বিষাক্ত ছুরির মত বারবার খোঁচা দিচ্ছিল। তারপর কিছু মনে ছিল না। জ্ঞান ফিরতে দেখেছিল পাশে দু'তিনজন অপরিচিত ছেলে। তারপর ডাঃ চক্রবর্তীকে বলেছিল। ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছেন। অতএব সাবধান। নির্বিকার হও, নিষ্কাম হও, নির্লিপ্ত হও। আঃ, বিজন চা তৈরি করে খুব যত্ন করে। চায়ের ব্যাপারে সে সত্যিকারের বড় শিল্পী। তার ললিতা। হাসি পায় বিজনের রাগের কথা ভেবে এখন। বিজন বোঝে না কেন যে আমরা আসলে সবাই শিশু। অমৃতস্য পুত্রাঃ। হুঁ, ঠাট্টা নয়, একটু ধ্যান করা উচিত। 'দিন গেল বৃথা কাজে, রাত্রি গেল নিদ্রে' ইত্যাদি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। বিজনকে কিন্তু সে তার অসুস্থতার কথা বলেনি। কি হবে বলে?

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ললিতমোহন চোখ বুজে কয়েক মিনিট ধ্যান করার চেষ্টা করতে লাগল। চোখের সামনে অন্ধকার। আশ্চর্য, কোন জ্যোতিই দেখা গেল না! ললিতমোহন হতাশ হল। আবার একাগ্র হল। এবার বিজনবালা বিবসনা হয়ে দাঁড়াল সেই চোখবোজা অন্ধকারে। বিজনবালার পেছনে এল আর একটি যুবতীর নগ্ন কায়া। সেই শান্তি। ছিঃ—ললিতমোহন চোখ মেলে উঠে দাঁড়াল। আশ্চর্য, সেই পাপের কথা এখনো সে ভুলতে পারছে না! হে ভগবান, আমার মন বড় নোংরা। ইস্, শরীরে কেমন যেন জড়তা, কেমন যেন বেদনা! রাতে ঘুম হয়নি। ঘুম হয় না তার। দিনেও নয়। তন্দ্রা আসে শুধু, ঝিমুনি আসে, ঘুম-ঘুম একটা নেশা এসেই আবার উড়ে যায়। ঘুমের ওষুধ চাইতে হবে আজ।

হঠাৎ মালকোচা মেরে অনিরুদ্ধ রায়ের পালঙ্কের ওপর ললিতমোহন সর্বাঙ্গাসন করতে শুরু করল। একটু এক্সারসাইজ করা উচিত। ব্যায়াম করলে, বেড়ালে, শ্রান্ত হলে হয়ত ঘুম আসবে। পাশের ঘরে ছোট ছেলে বাঁশী ওরফে অজিতমোহন এত পড়া শুরু করল। জানালা দিয়ে একফ সূর্যের আলো এসে পড়েছে। সূর্য 'জবাকুসুমসঙ্কাশ' নেই। পা দুটো ওপরে উঠেছে তো? তার ভুঁড়ি নেই, এক মস্ত বড় সুবিধে। কিন্তু বুকটা কে করছে যেন?

"কি হচ্ছে? বলি মাথা খারাপ হ নাকি? অ্যাঁ!

ধপাস্ করে পা দুটো পালঙ্কের ও ফেলে দিল ললিতমোহন, তারপর তড়া করে উঠে বসে বাঁধানো দাঁত দুটোকে নীচে দাঁত দিয়ে চেপে বসিয়ে বিজনবালার দিক সহাস্যে তাকাল।

"হেঁ হেঁ—একটু ব্যায়াম"—

"ওরে আমার শ্যামাকান্ত রে"—

"শ্যামাকান্ত না হলেও বিজনবালা প্রাণকান্ত তো?"

"ফের!"

"না না—আহা বোঝ না কেন? ঠাট্টা"—

"অমন ঠাট্টার মুখে ঝাড়ু"—ঘরের ভেতর

থেকে একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বিজনবালা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

চোপ্‌সানো বেলুনের মত অনিরুদ্ধ রায়ের পালঙ্কের ওপর বসে বসে হাঁপাতে লাগল ললিতমোহন। বুকের ভেতর যেন একটা পাখি ডানা ঝাপটাচ্ছে। খাঁচার পাখি। খাঁচাটা জীর্ণ হয়ে এসেছে। ঠাট্টার মুখে ঝাড়ু! বটে! স্ত্রীকে স্ত্রীর বোন বলে কয়েকবার মনে মনে সম্বোধন করল ললিত-মোহন। তারপর লজ্জা পেল। ছি ছি ছি তার অধঃপতন হয়েছে। কিন্তু রাগ হওয়া কি স্বাভাবিক নয়? ললিতমোহন আজ বেকার বলেই যে বিজনবালা কথায় কথায় রাগ করে তা কি সে বোঝে না? টাকা চাই? টাকা? রোজ ঠাকুরের ছবিতে ফুলতুলসী দেয় বিজনবালা তবু সে ভাবে না যে ঠাকুরই বলেছেন 'টাকা মাটি'! আশ্চর্য। টাকার পরিণতি কি তার সাক্ষী এই ঘরেই তো পড়ে আছে। এই পালঙ্ক—যার ওপর কাঁথার মত পাতলা তোশকের ওপর মোটা একটা সুজনী বিছিয়ে মেয়ের তৈরি ফুল-তোলা খোলে-ভরা প্রায় ইঁটের মত শক্ত বালিশে মাথা রেখে রোজ রাতে ঘুমোবার চেষ্টা করে ললিত-মোহন। অনিরুদ্ধ রায়ের পালঙ্ক—

"এই চুনি—একটা কাঁচা লঙ্কা দে তো" —স্বরাজের গলা শোনা গেল।

"দিই দাদা"—চুনির জবাব ভেসে এল।

স্বরাজ ওরফে কার্তিকমোহন বড় ছেলে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় জন্ম বলে ডাক নাম স্বরাজ। বয়স ছাব্বিশ। দেখতে শুনতে মন্দ নয়। আই এস সি ফেল করে দু'বছর বেকার থেকে অবশেষে বছর দুয়েক ধরে স্টেট বাসে টিকিট চেকার হয়েছে। এক-বছর ধরে সে-ই এ পরিবারের অন্নদাতা। শুধুই অন্ন। আর কিছু নয়। ময়ূর না থাকলেও কার্তিকমোহন এদিক ওদিক উড়ে বেড়াচ্ছে। অবস্থা অগত্যা কোণঠাসা জানোয়ারের মত। কিন্তু লাফাবার উপায় নেই। কার ওপর লাফাবে? এক বিজন-বালা আছে কিন্তু তার ওপর লাফাবে কি— তার দাপটে তো ললিতমোহনের আতা ফলের মত হৃদ্‌পিন্ডটা যখন তখন ভয়ে দুরুদুরু করে! বেকারের অনেক জ্বালা। এ সংসারে টাকা ছাড়া কোনো কিছুরই দাম নেই। অথচ 'টাকা মাটি'! যদি আজ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে থাকত তাহলে বেকার হলেও অন্য খাতির হত। কিন্তু হায়, ডান হাতের তালুতে বাহান্ন বছর বয়সেও হা-অন্নে'র রেখা। স্বরাজটা যে শিকলি কেটে পালাবে শিগ্গীরই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। চুনি ওরফে নিরুপমা'র বয়স একুশ হল। যৌবনের শ্রাবণ শেষ হয়ে ভাদ্র শুরু হল। সেকেন্ড ক্লাসে দু'বার ফেল করে দু'বছর ধরে তিল তিল করে বিজনবালার রক্ত শুষছে (বিজন বলে)। ললিতমোহন অবশ্য ভগবানের হাতেই সব ছেড়ে দিয়েছে। সব ভয় ভাবনা। কিন্তু তবু ভাবতে হয়, ভয় হয়, ঘুম আসে

না। মেয়েটা দেখতে ভালই শুধু উত্তরাধিকার-সূত্রে মায়ের কাছে থেকে ওপরের পাটির সামনের দুটো দাঁত একটু উ'চু। চোখে চোখে রাখে বিজনবালা তবু চোখের আড়ালে যায় চুনি। তার অনেক সই। গীতা, অরুন্ধতী, বিপাশা। বিজনবালা বকে আর যখন তখন বাইরে বেরিয়ে আড্ডা মারার জন্য শাসায়। কিন্তু চুনি নির্বিকার। কখনো গায় সে, কখনো হাসে মায়ের বকুনি শুনে। গলা ভাল নয় মেয়েটার, তবু গায়। গলা ভাল নয় বলে একটা সেতার কিনে দিয়েছিল ললিতমোহন। সেতার শেখাতে আসত পাড়ার প্রবীণ গানের মাস্টার বিনয়বাবু। মাসখানেক বাদে বিজনবালা বিনয়বাবুর আসা বন্ধ করে দিল—ভদ্রলোক নাকি অকারণে চুনির হাত ধরে সেতার শেখাবার চেষ্টা করত। তারপর চুনি নিজেই চেষ্টা করত আর তার ছি'ড়ত। অনেক তার বদল হবার পরেও চুনির হাতে সেতারটা আর ঝঙ্কার তোলেনি। মেয়েটার কোন বিদ্যেই হল না। এখন শুধুই বিয়েটা বাকী। অশ্চর্য বিজনবালা লুচ্চা বলল ললিতমোহনকে!—

অনিরুদ্ধ রায়ের খাটে বসে একটা বিড়ি ধরাল ললিতমোহন। টাকা চাই? আরে এই অনিরুদ্ধ রায়ের কি টাকার অভাব ছিল? সে ষাট বছর আগেকার কথা। তখন কলকাতার ভরা যৌবন। সেই যৌবনোচ্ছল শহরের অন্যতম ধনী ও শৌখীন মানুষ অনিরুদ্ধ রায়। ঘরে অপ্সরীর মত সুন্দরী স্ত্রী ও দুটি বাচ্চা। পৈত্রিক সম্পত্তিকে খেটেখুটে অগাধ করে তুলল অনিরুদ্ধ রায়। লাখ টাকা কোটির কাছাকাছি গেল। কোটি টাকার মত্ততা হঠাৎ একদিন অনিরুদ্ধ রায়ের রক্তে বিষ ছড়িয়ে দিল। বহুবর্ণ পাপের বিভ্রমে মুগ্ধ হয়ে বহুবিধ বিলাসব্যসনে মুঠো মুঠো টাকা ছড়াতে লাগল অনিরুদ্ধ রায়। পৃথিবীর বাছাই বাছাই রাজধানী থেকে এল নানা বস্ত্র, নানা অলঙ্কার ও নানা পানীয়। সেই সব অসংখ্য ভোগের সামগ্রীর মধ্যে একটি ছিল এই পালঙ্ক। রেঙ্গুন শহর থেকে মেহগনি কাঠের এই বিচিত্র পালঙ্কটির আমদানি হয়েছিল। তখনই নাকি এর দাম ছিল দু হাজার টাকা। আশ্চর্য, সেই অনিরুদ্ধ রায়ের কোটি টাকার শূন্যগুলি একে একে শূন্যে মেলাল, পালিয়ে গেল দালালেরা, বাঈজীরা ও রক্ষিতারা। দেনার দায়ে একদিন বিকিয়ে গেল সব মূল্যবান গয়না, আসবাব ও বাড়িঘর। কিন্তু এই পালঙ্কটিকে তবু ছাড়ল না অনিরুদ্ধ রায়। সতীসাধ্বী স্ত্রীকে এক রাতে খুব আদরে অবাক করে দিয়ে এই পালঙ্কেই ঘুমোল সে। তারপর মাঝরাতে হঠাৎ পিস্তলের শব্দে যখন ঘুম ভেঙে গেল তখন সেই পতিব্রতা সভয়ে দেখল যে এই পালঙ্কে বসেই আত্মহত্যা করেছে অনিরুদ্ধ রায়। শুভ্র বিছানা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।

সে ষাট বছর আগেকার কথা। তারপর এই পালঙ্ক ঘুরেছে নীলামওয়ালাদের হাতে হাতে। কেউ কিনতে চায়নি। এক আধজন কিনেছিল, তারপর আবার জলের দামে বেচে দিয়েছিল। ঘুরেছে আরো এদিক-ওদিক। বাঈজীর বাড়িতে, নাটকের ও ফিল্মের 'প্রপার্টি' হিসেবে। কিন্তু তাও খুব কম। কেউ নিতে চায় না, সবাই ভয় পায় এর অতীত শুনে। কিন্তু ললিতমোহন

ভয় পায়নি। সে প্রায় উনিশ-কুড়ি বছ আগেকার কথা। তখন মিলিটার অ্যাকাউণ্টসে কাজ করে ললিতমোহন ছিল আসামের এক এম ই এস ডিপোতে এক কনট্রাক্টর খুশী হয়ে দু' হাজার টাব ঘুষ দিয়েছিল। কাঁচা টাকার মধ্যে যে উ মদ লুকানো থাকে, সেই মদের নেশায় বাি ফিরে এসে হঠাৎ ঘর সাজাবার শখ হ ললিতমোহনের। এক দালালের পাল্লায় পদে

অনিরুদ্ধ রায়ের খাটটা মাত্র দুশো টাকায় কিনে আনল সে। বিজনবালা একটু রেগেছিল প্রথমে, কিন্তু তারপর শান্ত হয়ে গিয়েছিল পালঙ্কের সূক্ষ্ম কাজ দেখে। শিয়রের দিকটায় বহু ফনাযুক্ত একটি নাগমূর্তি। অপূর্ব সে-কাজ। মনে হয় যেন ফনাটা দুলে উঠবে এখুনি—এত জীবন্ত। দেখে ভয় লাগে। ভয় হয়েছিল বিজনবালার, তবু মুগ্ধ হয়েছিল। পালঙ্কের পায়ের দিকে ছিল দুটি বিবসনা পরীর মূর্তি। বছর দশেক আগে ছুতোর ডাকিয়ে পরীদের কেটে ফেলেছে বিজনবালা। ছেলেমেয়েরা অমন অসভ্য মূর্তি দেখলে নাকি খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু অনিরুদ্ধ রায়ের বৌ কি সেকথা ভাবত! কে!

"ললিতবাবু আছেন? অ' মশাই"—

বুকের ভেতরটাতে ধ্বক্ করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। বাড়িওয়ালা ডাকছে। কালিদাস বোস। মহা ঘোড়েল লোক, শয়তানের সেরা।

"বাবা"—বাঁশীর ডাক এল।

কি করবে ভেবে পায় না ললিতমোহন। বাঁশীটা ছেলে হয়ে এমন শত্তুরের কাজ করছে! উঠে দাঁড়াল সে। ভয়ে শরীরটা কাঁপতে শুরু করল। চার মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকী—বাপরে। কোথায় লুকোবে সে।

"কইরে বাঁশী—কোথায় তোর বাপ?" কালিদাস বোসের গলায় যেন বাঘের আক্রোশ। ভয়। যেন ঢেউয়ের মত ছড়াচ্ছে। রোমকূপে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক। ভয়—

"বাবা"—

"আরে কী বাবা-বাবা করছিসরে বাঁশী—উনি তো সেই কোন্ সকালে বেরিয়ে গেছেন"—বিজনবালার গলা শোনা গেল, "বোসমশাইকে বসবার জায়গা দে"—

কালিদাস বোসের, কর্কশ গলার ওপর একটু ভদ্রতার পাতলা প্রলেপ পড়ল, "না-না, বসবার সময় নেই—চার মাসের বাড়িভাড়া বাকী পড়লে আমার চলে কি করে? ললিতমোহনবাবুকে বলবেন কথাটা—আর দু' দিন দেখব আমি—তারপর কিন্তু শুনব না—হ্যাঁ" বলেই চটি জুতোর শব্দ তুলে কালিদাস বোস চলে গেল।

বিজনবালা ঘরের মধ্যে দ্রুতপদে এসে ডাকল, "কোথায় গেলে?"

তখন ভয়ের চোটে অনিরুদ্ধ রায়ের পালঙ্কের পেছনে, বহুফনাযুক্ত সেই নাগ-মূর্তির পেছনে বসে ছিল ললিতমোহন।

"এই যে আমি"—বলে বেরিয়ে এল সে।

"ছি ছি ছি—লজ্জা করে না!"

"অ্যাঁ!" ললিতমোহন আবার ধাক্কা খেল। বিজনবালার চোখে আবার আগুনের ফুলকি কেন?

"ছি ছি ছি—তোমার জন্যে আর কত মিছে কথা বলব—কত পাপ করব?" বিজনবালা কাঁপতে লাগল উত্তেজনায়। তার অতি-উচ্চ ও অতি-বিস্তৃত বুক বারবার ওঠানামা করতে লাগল।

"মিছে কথা বললে কেন?" হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে উঠল ললিতমোহন।

"বললাম কেন? বললে কোথায় মানটুকু থাকত শুনি? ইঃ, বলে না যে, 'এক পয়সার মুরোদ নেই, পাগড়ি বাঁধে তেড়া'—তাই হয়েছে"—

ঠিক সেই সময়ে স্বরাজ ওরফে কার্তিক-মোহন ঘরে ঢুকল তার খাকী জামা পরবার জন্যে। দরজার ও-পিঠে চুনি ওরফে নিরুপমার মুখ দেখা গেল। আতাফলের মত দেখতে যে হৃদ্‌পিণ্ড সেখান থেকে যেন গরম রক্ত তীরবেগে মাথার দিকে ছুটে গেল। দু' রগে সেই রক্তের উচ্ছ্বাস দপ্ দপ্

করতে লাগল ললিতমোহনের। দু' কানের পাতায় যেন একটা উত্তাপের ঢেউ এসে আছড়াতে লাগল।

"কি বললে? মুরদ নেই! —এ্যাঁ?"

"একশ'বার বলব—মিছে কথা বলে মান বাঁচালাম, তবু চোখরাঙানী! কি ভেবেছ তুমি?"

"তুমি অতি দজ্জাল স্ত্রীলোক—এক চড়ে তোমার"—

"কি মারবে? দেখি কত বড় বাপের বেটা তুমি"—

বিজনবালা তেড়ে এল। ললিতমোহনের তখন কোন জ্ঞান নেই! সে-ও হাত তুলে এগিয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্বরাজ চোখ পাকিয়ে এগিয়ে এল, গলা চড়িয়ে বলল, "কী হচ্ছে এসব আঁ? ছেলেমানুষি! মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলা?"

থমকে দাঁড়াল ললিতমোহন। ভয়ে। মাথার রক্ত হঠাৎ আবার যেন নীচে নেমে গেল। ভয়ের শিহরণ। রোমকূপে শব্দহীন ঝঙ্কার। পেছিয়ে গেল সে। বাঁশী এসেও ঢুকল ঘরে সেই সময়।

বিজনবালা ছেলেদের ভরসায় কেঁদে উঠল, "ওরে সারা জীবন এইভাবে গেলরে সোনা—কুকুর-বেড়ালের মত আমায়"—

কান্নার মধ্যেও কী অদ্ভুত হিংস্র বিজনবালার চোখ দুটো! বাঁশী আর স্বরাজের চোখেও এ কোন্ তীব্রতা! মারবে না তো? পালাও—

পালাল ললিতমোহন। তাঁতীবাগান লেন বেয়ে। যেন ন্যাজ গুটিয়ে কোনো বুড়ো কুকুর পালাচ্ছে এমনিভাবে।

গলির একটা বাঁকে গিয়ে থামল ললিতমোহন। বুকের ভেতরে হৃদপিণ্ডটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছে মনে হচ্ছে। এখনো ভয় করছে। তার এটা কোন্ দশা চলছে? নিশ্চয় রাহু কিংবা শনি। নইলে এ কী হল তার? ডিস্টিংশনে বি-এ পাশ করেছিল সে, মিলিটারী অ্যাকাউণ্টসে বিশ বছর কাজ করেছে সে, ছেলেমেয়েদের বড় করেছে—অথচ এ তার কী পরিণতি? ছেলে-বৌদের ভয় করছে সে! আশ্চর্য, কত সম্ভাবনাই না ছিল তার! কেউ কি আজ বিশ্বাস করবে যে, সে এককালে কবিতা লিখত! কোথায় গেল সেই লাল মলাটের খাতাটা? একটা কবিতাও নেই। একটা কবিতা মনেও নেই। না-না, একটা আছে... কবিতাটির নাম ছিল "মায়া"...কি যেন? 'এ এক জটিল তত্ত্ব'...হ্যাঁ......

এ এক জটিল তত্ত্ব—
চুরি করা মহাপাপ তবু চুরি করি,
হত্যা আরো বড় পাপ, তবু খুন করি,
শান্তি অনেক শ্রেয় তবু যুদ্ধ করি,
ভালোবেসে সুখ জানি তবু ঘৃণা করি।
জানি জানি জেনেশুনে তবু সংগোপনে
নিত্যদিন ভুল, ছল, অপরাধ করি,
পিঁপড়ের পেট টিপে চিনি বের করা
নীচতা অনেক জানি, উচ্চকণ্ঠে হাসি,......
কে হাসে?

ধারে তাকাল ললিতমোহন। দূরে নরেন মল্লিকের কুড়ি-একুশ বছরের চ্যাংড়া ছেলেটা গলিতে দাঁড়িয়ে তিন চাটুজ্জের চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়েটার সঙ্গে হাসাহাসি করছে। মেয়েটা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে হাতে একখানা বই। সেই বইটা ধরে ছেলেটা টানাটানি করছে আর হাসছে।

"ছাড় বলছি"—

"ন্না"—

"বই ছিঁড়ে যাবে—এই চিনু"—

"ন্না"—

ছি ছি ছি। কী দিনকাল পড়েছে! একটুও চক্ষুলজ্জা নেই! ঐ বই টানাটানি করার ছলে মেয়েটার হাতটা চেপে ধরেছে! আশ্চর্য। এ কোন্ যুগ? স্বাধীনতার যুগ। স্বাধীনতা চাই। ভারতবাসীর চাই, জগৎবাসীর চাই। পুরুষের চাই, নারীর চাই। সাম্যের গান গাই। বুড়ো-বুড়ী, ছোঁড়া-ছুঁড়ী, এমনকি, পেট থেকে সবে পড়েছে, এমন বাচ্চাদেরও চাই। স্বাধীনতা চাই—চুরি, চামারি ও ধর্ষণের, শোষণের ও শাসনের, চরিত্রহীনতা ও লাম্পট্যের, ইচ্ছেমত বিয়ে করার ও বিয়ে নাকচ করার, সব দেয়াল ভেঙে চৌচির করার—অসহ্য—

"এই—এই শোন"—

ছেলেটা তাকাল, "আমাকে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি"—

ছেলেটা ভুরু কুঁচকে বলল, "বলে ফেলুন"—

"তুমি এই বাড়ির ছেলে?"

"ঝেড়ে কাসুন না—অত জেরা কিসের?"

"বলছি যে, কথাই যদি বলতে চাও তো বাড়ির ভেতর গিয়ে বোস না বাবা—রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি"—

একপা এগিয়ে এল ছেলেটা, বলল, "তাতে আপনার কি?"

একপা পিছোল ললিতমোহন, "কি! উলটো তক্কো!"

"আলবৎ—আমি যাই করি না কেন, তাতে আপনার বাপের কি?"

"কি! তোমার এতদূর আস্পর্ধা!"

"আলবৎ—আমি আপনার বাপেরটা খাই যে ইয়ারকি মারতে এয়েছেন! ফের এসব অসভ্য কথা বললে এক ঘুষিতে সর্ষেফুল দেখিয়ে দেব"—বলতে বলতে ছেলেটা হন্ হন্ করে কাছে এসে গেল।

কি বিপদ! পেছু হটতে গিয়ে একটা নোনাধরা দেয়ালে ধাক্কা খেল ললিতমোহন। জানালার ওপাশে মেয়েটি হেসে উঠল।

"কি অইচে রে বিলু?" গলির এক-প্রান্তে দুটি আঠারো উনিশ বছরের ছেলেকে দেখা গেল। তাদেরই একজন বলল।

প্রথম ছোকরা অর্থাৎ বিলু বলল, "এই লোকটা যাতা বলচে মাইরি—আমি চিনুর সঙ্গে কথা বলচি তো এর কোন পাকাধানে মই দিয়েছি মাইরি—সুধো তো?"

ললিতমোহন তখন ভয় পেয়ে গেছে। হৃদ্‌পিণ্ড লাফাচ্ছে। শিরশির করে একটা বৃত্তাকার অনুভূতি ছড়াচ্ছে, ছড়াচ্ছে। 'ঝি' ঝি' ঝাঁ ঝাঁ। জিভ্‌টা শুকিয়ে আসছে।

"কি মশায় আপনি কেডা? অ্যাঁ?", দ্বিতীয় ছোকরা প্রশ্ন করল।

"কিছু না বাবা—বুঝতে চেষ্টা কর—মানে"—

"মানে খুব বুঝচি—ভাই বইনের লগে কথা কইত্যাছে তো আপনার পোড়ে ক্যান মশয়?"

"বুড়োকে মাপ চাইতে বল্ জগা—মাথায় আমার খুন চড়ে গেছে মাইরি"—

"ও মশায়—মাপ চাইয়া ফালান—অন্যায় করচেন আপনি—বড় পাপ মন আপনার"—জগা বলল।

ললিতমোহন ঢোক গিলে দ্রুত কণ্ঠে বলল, "আচ্ছা বাবারা—মাপ কর—তোমরা আমার ছেলের বয়সী—তবু বলছি"—

"থাউক থাউক—ঐ সব পুরানা কথা আর কপ্‌চাইবেন না—যান—" তৃতীয় ছোকরা বলল।

ললিতমোহন পালাল।

বিলু বলল, "চিনলি তো জগা?"

জগা বলল, "না—তুই চিনস বঙ্কা?"

তৃতীয় ওরফে বঙ্কা বলল, "বাঁশীর ববা।"

জগা বলল: "তাই নাকি?—তা বাঁশীই হউক আর কেলারিনেট হউক—কারো বাবারেই ছাইড়া কথা কমুনা ভাই—অন্যায় সইবার পারিনা আমি—হ-অ-অ"—

জানালার ওপাশ থেকে চিনু হেসে ভেংচাল, "হ-অ-অ-অ—হি হি হি"—

জগা ওরফে জগদীশ উত্তম কুমারের একটা পোজ নিয়ে চিনু ওরফে চন্দ্রার দিকে হাসি মুখে তাকাল।

এ কী লজ্জা! চিরকাল গুণ্ডো বদমায়েশ ছিল পৃথিবীতে, ছিল ছোকরাদের ঔদ্ধত্য। চিরকালই নবীনে ও প্রবীণে বিরোধ। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধের পর সব দেশেই ছেলের এমন হয়ে উঠেছে কেন? এটম বোমা? আণবিক বিষ? রেডিও অ্যাক্টিভিটি? আকাশ বাতাস কলুষিত? তাই কি? আজকের খবর কি? বেলগ্রেড কনফারেন্স? নিরপেক্ষ শক্তিদের বৈঠক। শান্তির দিবা-স্বপ্ন। দিবাস্বপ্ন? না, না, শান্তি চাই।

নুর আলী লেনে নিতাই সা'র মুদি দোকান। ঢাকা জেলা থেকে এসেছিল দশ বছর আগে, এখন নিঃশ্বাসটি ফেলবার সময় পায় না এত খরিদ্দারদের ভীড়।

"আসুন ললিতদা—পৃথিবীতো এবার টলমল হইয়া গিয়েছে"—ভাষার দিক দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে সংযুক্ত করার চেষ্টায় আছে নিতাই সা।

"কি হল নিতাইবাবু?"

"আর ললিতদা'—কাগজড়া পইড়াই দেখুনে কুরুশ্চেভ কি বলত্যাছে—ওরে ওই, হাত চালা মাণিক আমার। এই যে দাদা, দিলুম—নিবারণবাবু, দয়া কইরা একটু বসুন—ওরে ওই, হাত চালা সোনা আমার—তিন সের ভাজা মুগ"—

দোকানের বাইরে একটা বেঞ্চি। তাতে বসে পরেশবাবু ও অটলবিহারীবাবু। বিড়ির আদান প্রদান হ'তে হ'তে খবরের কাগজের প্রথম পাতার ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিল ললিতমোহন। তিন বছর বাদে আবার মিঃ ক্রুশ্চফ আণবিক পরীক্ষা শুরু করে দিয়েছেন। বার্লিন সমস্যা আরো গুরুতর হয়ে উঠল। পৃথিবীর শান্তি বিপন্ন। পৃথিবী ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ওদিকে বান্ধব মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে রেডিও বাজছে। অর্থাৎ রেডিও সিলোন। 'লাল লাল গাল'—অর্থাৎ রক্ রক্ রক্। তালের চোটে মনে হয় যেন একদল নরমাংসভূক একটি সভ্য মানুষকে ঝলসাতে ঝলসাতে মাতাল অবস্থায় নাচ-গান করছে। ওদিকে কানু গুহের চায়ের দোকানের সামনে একজন বোষ্টম মন্দিরা-বাজিয়ে গেয়ে চলেছে—'আসবো না আর ভবের বাজারে।'—রাস্তায় কারা ঝগড়া করছে—'শা-লা, কি ভেবেচ—অ্যাঁ?' গাড়ি যায় দু'একটা, রিক্‌শা যায় কয়েকটা। রক্ রক্ রক্—লাল লাল গাল—লাল লাল—।

"কি ললিতদা'—কি মনে অয়?"

"প্রত্যেকবারই জার্মানীকে নিয়েই ধ্বংস শুরু হয় ভাই"—

"তাহলে জ্যোতিষীদের কথাই ফলতে চলল দেখছি"—

"কুরুক্ষেত্রে ছিল সপ্তগ্রহ—এবার অষ্টগ্রহ—সারছেরে মশয় কি হবে কে জানে"—

"আবার এটম বোমা ফাটাতে শুরু করল"—

"এটম না হাইড্রোজেন কে জানে"—

"কি হবে, কে জানে? হয়ত আমরা মরতে শুরু কইরা দিয়েছি—কি বলেন ললিতদা—ওরে ওই, চিনির টুকরা আমার—হাত চালা"—

ভাল লাগে না ললিতমোহনের। নিতাই সা, পরেশবাবু আর অটলবিহারী আলোচনা করে। পৃথিবীতে এখনে ওখানে অসংখ্য চুলো তৈরি হচ্ছে। পূর্ব-প্রাচ্যে, বর্মায় ইন্দোনেশিয়ায়, তিব্বতে, হিমালয়ে, কাশ্মীরে গোয়াতে, মধ্য-প্রাচ্যে, আফ্রিকাতে, সর্বোপরি বার্লিনে। রক্ বক্ রক্—সাজো সাজো সাজো। আরো বিষ, আরো মৃত্যুর আবিষ্কার করো। মহাশূন্যে পাখি হয়ে ওড়ো, পৃথিবীতে আতসবাজী পুড়িয়ে দেখো। সাজো সাজো—শ্রীযুক্ত কেনেডি ও শ্রীযুক্ত ক্রুশ্চভ, শ্রীযুক্ত ম্যাকমিলন ও শ্রীযুক্ত দ্য গল্। লাল লাল গাল—লাল লা—পালাও—

গলিপথ বেয়ে বুড়ো কুকুর পালায়। ন্যাজ গুটিয়ে। ভয়ে ভয়ে। শরীরের ভেতর যেন কোনও অশান্ত শিশু অনবরত একটা সুইচ টিপছে। আলো জ্বলছে ও নিবছে,
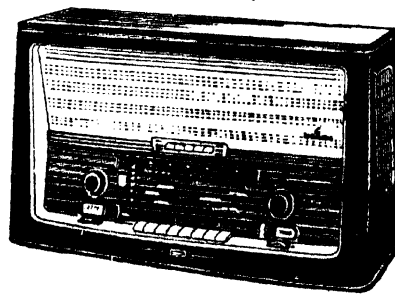
নিবছে ও জ্বলছে—ঝি' ঝাঁ ঝাঁ ঝি'—লাল লাল গাল—।

গলিতে অনেক মুখ। অনেক শব্দ। পিল পিল করছে মানুষ। বর্ষার কেঁচোর মত। একজন গামছা-পরিহিতা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক তার খাঁচার পাখিকে পড়াচ্ছে—'পড় বাবা আত্মারাম—রাধা কৃষ্ণ—রা-ধা—।' খোলার ঘরে 'কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ' যাত্রার মহলা হচ্ছে। টেকো বলাই শ্রীকৃষ্ণ সেজেছে। তিনটে ছোকরা কথা বলছে—'সুচিত্রা সেনের কি লেটেস্ট ছবি রে?'

এ গলি-সে গলি। এ রাস্তা সে রাস্তা। ভাদ্রের রোদ্দুরে ঘাম হয়। আজ পশুপতি বাবুর ওখানে যেতে হবে। বড় বাজারে কাপড়ের আড়ত আছে, তাছাড়া আমদানী-রপ্তানির ব্যবসা তাঁর। দেখা করতে বলেছেন। বিকেলে ড্যালহৌসীতে যাবে। দেখে নেবে বিজনবালাকে। কিন্তু ভয় হয় শুনে, পড়ে, দেখে। সব কি ভেঙ্গে যাচ্ছে? ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান। মহারাষ্ট্র ও গুজরাট, বাংলা ও আসাম, পাঞ্জাবী সুবা। চুলোয় যাক ভারতবর্ষ—ভরত ভাগ্যবিধাতা আমি তুমি প্রত্যেকে। সুতরাং এসো, টুকরো করি। আলাদা আলাদা হই। আসাম আসামীর, বাংলা বাঙালীর, বিহার বেহারীর ভারতবর্ষ কারো নয়। মারো মারো মারো, মুক্তিকে শৃঙ্খল কর, 'সত্যকে মিথ্যা করো, দেবতাকে দানব করো।' 'লাল লাল গাল'।

"পাকড়ো—পাকড়ো"—

কে যেন ছুটে পালাচ্ছে। পালালো। লোকটার হাতে ছোরা তাতে রক্ত।

"পাকড়ো—পাকড়ো"—

একজন ছুটে আসছে—রক্তাক্ত দেহে। সঙ্গে আরো চার পাঁচজন। রক্তমাখা লোকটা হঠাৎ থেমে গেল। আর চলতে পারছেনা সে। উঃ, কত রক্ত।

"কি হয়েছে? কি হয়েছে?"

"আর মসাই—পরকিয়া ব্যাপার"—

পালাও।

পার্কে গিয়ে হাঁপায় ললিতমোহন। ঘুম আসে না তার। কেন? সে ঘুমোতে চায়। অনেকক্ষণ ধরে ঘুমোতে চায়। ট্রাম যাচ্ছে দূরে। একটানা শব্দের ছন্দ—লাল লাল গাল। বাতাসে কিসের গন্ধ? ফুলের? না না, দুর্গন্ধ। হয়ত কোনও মরা কুকুর বেড়াল হবে। দূরে কয়েকটি ছেলে দাঁড়িয়ে জনস্রোত দেখছে—সেই স্রোত থেকে বেছে বেছে আরো কিছু দেখছে—চোখের তারাকে বঁড়শি করে রুই কাতলা খুঁজছে। ছোট্ট একটা বুক-স্টল। বইয়ের প্রচ্ছদে সুন্দরী মেয়েদের ছবি। আমেরিকান সভ্যতার অবদান। সেক্স। ললিতমোহনের চেয়ে তারও বাপের চেয়ে অনেক বেশী যৌন-জ্ঞান এখন কার্তিকমোহনের ওরফে স্বরাজের। শুধু ঐটুকুই। আর সব জ্ঞান বাদ দিয়ে চতুর্বর্গের একটি বর্গকে অতিকায় করে তুলেছে এই যুগ। কাম কাম কাম—লাল লাল গাল। যা ছিল এক মধুর রহস্য তা এখন নির্লজ্জ ঘোষণা। রক্ত টগবগ করে। রক্তে এ কোন বলাকার পাখা? পেছনে কার দীর্ঘশ্বাস? ঘুম চাই। সমুদ্রের তলাকার গভীর অন্ধকারের মত গভীর গভীর ঘুম। আর একটা চাকরি? যাতে বিজনবালা তার বুকের উদার বিস্তৃতির মধ্যে ললিতমোহনের মাথাটা রাখতে দেয়? কিন্তু কি আসে যায়? বাতাসে তান্ত্রিকদের যজ্ঞ-ভস্ম ভাসছে। শ্রীযুক্ত কেনেডি ও শ্রীযুক্ত ম্যাকমিলন, শ্রীযুক্ত দ্য গল ও শ্রীযুক্ত ক্রুশ্চেফ। তাঁরা পাশা খেলছেন। শ্রীযুক্ত মাও ও চৌ মানচিত্র দেখছেন। ইজরাইল ওল্ড টেস্টামেণ্ট ঘাঁটছেন। সাদা ও কালো বক্সিং লড়ছেন। সাহারাতে, মধ্য-এশিয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরে ও মহাশূন্যে, অণু ও পরমাণুতে একমেব

ব্রহ্ম প্রমাণিত হচ্ছেন। পণ্ডিত নেহরু খোল বাজাচ্ছেন। তাই বলে কি প্রেম দেব না? দোহারের দল গায়েগতরে ভালই। সর্বশ্রী টিটো নাসের সুকর্ণ প্রভৃতি। যাঁরা পাশা খেলছেন তাঁদের কাছে বিবেকানন্দকে পাঠালে হত। সোহং না বললে অহং-নাশ হবে না। হায় ললিতমোহন কুরুক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লন্ডন, প্যারী বার্লিন মস্কো পিকিং ও নয়াদিল্লি। সাজো সাজো—নানা শান্তি চাই। ফাটাও বোমা—না না মেরো না। পশ্চাতে কে হারে জেতে জানা নেই। সুতরাং এসো গাই—'লাল লাল গাল। এসো গাই —'দু' দিন বৈ তো নয়'। বোমা তো ফাটবেই—মহাশূন্যের মহাপথ বেয়ে বহু যোজনব্যাপী মৃত্যুপক্ষ বিস্তৃত করে মৃত্যু তো আসছেই—। অতএব খাও দাও যত পারো সেক্সের সাধনা করো। কারণ তুমি মরবে। ললিতমোহন তুমি মরবে মরবে —হাঃ হাঃ হাঃ—

"হাঃ হাঃ হাঃ" হঠাৎ হাসতে শুরু করল ললিতমোহন। হাসতে হাসতে ওপরের বাঁধানো দাঁত দু'টি খুলে পড়ল। সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছের একটা ডালে দুটো কাক বসে ছিল—ললিতমোহনের হাসির দমকে তারা কা-কা করে উড়ে গেল। একটা উড়িয়া রাঁধুনী (সম্প্রতি বেকার) কাছাকাছি একটা বেঞ্চিতে শুয়ে ছিল। সে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল হাসি শুনে, ললিতমোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে, হাসুছি কাঁই?" দূরে কে যেন নির্লিপ্ত কণ্ঠে মন্তব্য করল, "আরে পাগলো টাগলো হবে"—

পাগল! ওপরের বাঁধনো দাঁতকে নীচের দাঁত দিয়ে কট্ করে ওপরে বসিয়ে মুখ বন্ধ করল ললিতমোহন, তাকাল নিকটবর্তী বেঞ্চের লোকদের দিকে। ওরা তাকিয়ে আছে তার দিকে। কৌতূহলের সঙ্গে। ধুপ করে একটা শব্দ হল পেছনে। ঘুরে তাকাতেই ললিতমোহন দেখল যে একটা বল এসে পড়েছে পেছনে আর একটি আট দশ বছরের ছেলে সেটা নিতে এগিয়ে আসছে।

"এই টেবু, সামনে পাগল, যাসনে"—

ছেলেটা থমকে দাঁড়াল। ভয়ের সঙ্গে কৌতূহল মিশ্রিত চাউনি মেলে সে তাকাল আর একপা পেছিয়ে গেল। ললিতমোহন খেঁকিয়ে উঠল, "আমি পাগল নই"—

রাঁধুনী ততক্ষণে বিড়ি ধরিয়ে ফেলেছিল, সে বলল, "পাগল নয় তো হাসছিলেন কেনে?"

"আমার খুশি—ধোৎ"—

সবার চোখে কেমন যেন একটা চাউনি! যেন সবাই পাগল দেখছে। যেন একটু বিপজ্জনক মনে হলেই তাকে চেপে ধরে পাগলা-গারদে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে। ছেলেটা এখনো দেখছে তাকে। চোখ বড় বড় করে। ভয় লাগে। ভয়ের ঢেউ ছড়ায় রক্তে, মাংসে, পেশীতে, স্নায়ুতে শিরাতে—। ভয়। যদি সত্যি পাগল হয়ে যায় সে! যদি সত্যি পাগল হয়ে গিয়ে থাকে সে! পালাও—

"পাগলা পালাল মাইরি"—

পেছনে হাসির শব্দ শোনা গেল।

জোরে জোরে পা বাড়াল ললিতমোহন। আর প্রতিবাদ করবে না সে। তাহলে ওরা তাকে পাগল করেই ছাড়বে।

বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে উঠল ললিতমোহন। রোমকূপে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক থেমে আসছে। রাস্তায় ট্রাম বাস ট্যাক্সির স্রোত। শব্দ। আর মানুষের ভীড়। যেন কিলবিল করছে—এ-ত। ওপরে আকাশে মেঘের মালিন্য। চোখ জ্বালা করছে। মাথার পেছনে, ঘাড়ের ওপরে কেমন যেন দপ্ দপ্ করছে। যেন কেউ 'ডবল ভাস্' বাজাচ্ছে। রক্ রক্ রক। রগ দুটো টিপে ধরল ললিতমোহন। আঃ। ঘুমোলে হত। কিন্তু ঘুম কি আসবে? না বাড়ি যাবে না সে। বিজনবালাকে সে টের পাইয়ে দেবে। তাকে সবাই অপমান করে! সে—ললিতমোহন চৌধুরী সংব্রাহ্মণ, সুশিক্ষিত, বি এ। ১৯৩০ সালে ডিস্টিংশনে পাশ। তারপর স্বদেশী মনোভাবের জন্য সাত বছর মাস্টারি করেছে ইস্কুলে। লেট এ বি সি বি এ ট্র্যাংগল। তারপর বিশ বছর মিলিটারী একাউন্টস দপ্তরের কাজ। দু'হাজার টাকার ঘুষ। অনিরুদ্ধ রায়ের পালঙ্ক। তারপর চমনলাল মাড়োয়ারীর আমদানী রপ্তানির দপ্তরে ক্যাশিয়ার হওয়া। সেখানে কাজটা বেশ চলছিল। হঠাৎ এক বছর আগে স্বরাজ ওরফে কার্তিকমোহন এক ঝি'র মেয়েকে—। ছি ছি ছি। সেই ঝি এসে বেঁকে দাঁড়াল। শেষে চমনলালের ক্যাশ থেকে পাঁচশ টাকা দিয়ে সেই ঝি'কে (বেদানা দাসীকে) বশ করতে হয়। সে এক ফাঁড়া গেছে। সেই টাকার হিসেব নিয়ে কত গোলমাল

হয়েছিল। চমনলাল ঘুঘু লোক। ক'দিন বাদেই হিসেব চেয়ে বসে। বিজনবালাকে বুঝিয়ে বালা ও চুড়ি বিক্রি করে টাকা ভরতে ভরতেও আটদশদিন কেটে গেল। ফলে চমনলালের বুঝতে আর বাকী রইল না। হাতে পায়ে ধরাতে চমনলাল শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু ললিতমোহনকে চাকরি ছাড়তে হল। অথচ সেই স্বরাজ ওরফে কার্তিকমোহন আজ তাকে বলল, 'মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলা হচ্ছে!' ইঃ—যেন নিজে একজন সাংঘাতিক মরদ। খচ্চর কোথাকার। আশ্চর্য, ললিতমোহন একদা 'বন্দে মাতরম্' বলে মিছিলে চেঁচাত। এক কালে ললিতমোহন কবিতা লিখত......

এ এক জটিল তত্ত্ব।

চুরি করা মহাপাপ তবু চুরি করি,
হত্যা আরো বড় পাপ, তবু খুন করি—

কে হাসে?

ছুরির ফলার মত একটি যুবতী। তার সব কিছুতেই ধার। গায়ের শ্যামবর্ণ রংএ, দোহারা গড়নে, চোখের তারাতে, এলোচুলকে ঘাড়ের ওপর ফিতে দিয়ে গেরো বাঁধার ভংগীতে, সাধারণ একটা তাঁতের সাড়ীকেই আঁট করে পরে দেহরেখাকে প্রকট করার প্রয়াসে, দশ আংগুলের তীক্ষ্ণমুখ নখের ওপর রক্ত-লাল রং লাগানোতে—সব কিছুতেই বড় ধার। তা চোখে পড়বেই। দেখে অস্বস্তিবোধ হবেই। চোখে জ্বালা ধরবেই।

ললিতমোহন যেন দিনদুপুরে ভূত দেখল। তার চারদিকে হঠাৎ যেন বিদ্যুতের ভয়াবহ ঢেউ উঠল। তার আতাফলের মত হৃদপিণ্ডটা হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে তার সারা দেহে ভয়ের বার্তা ছড়িয়ে দিতে লাগল।

"আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছেন?" মেয়েটির লঘু ও অনুচ্চ হাসি ধ্বনিত হল।

"আঁ।" ললিতমোহন নিজেকে ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত থেকে টেনে তুলবার চেষ্টা করতে করতে একটা শব্দ করল।

মেয়েটি মুখ টিপে হাসল, "আমায় চিনতে পারছেন তো?"

"আঁ! হাঁ হাঁ—বাঃ—তুমি তো শান্তি"—

"হ্যাঁ, শান্তি ওরফে টুনু"—শান্তি হেসে বলল, "আপনার টুনু নামটাই বেশী পছন্দ না?"

"আঁ! হাঁ—ইয়ে, চললাম টুনু—কাজ আছে"—

"সে কি! দেখা হল আর সংগে সংগেই যাবেন? লজ্জা কিসের, আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার কথাই তো ভাবছিলেন আপনি—আমি মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।"

ভয়। রোমকূপে ঝিঁ ঝিঁ শব্দের শব্দহীন ডাক।

"কথা বলছেন না যে"—শান্তি আবার

বলল, "আমি দু'দিন ধরে আপনাকেই খু'জছি"—

'আমাকে? কেন?' শরীরের সব রক্ত ঘাম হয়ে যাচ্ছে ললিতমোহনের।

'দরকার আছে। এক কাপ চা খাওয়ান না।'

'না না, চা-টা খাবার সময় নেই আমার'—

'সময় নেই বললেই কি হয়—আমার কথা শোনার সময় হবে আপনার, ঝক্‌ঝকে ধারালো দাঁত মেলে ভারী সুন্দর হাসি হাসল শান্তি।

মরিয়ার মত ললিতমোহন বলল, 'বাজে কথা—আমি চললাম'—বলেই দুঃসাহসীর মত পা বাড়াল সে।

সংগে সংগে শান্তিও পা বাড়াল, বলল, 'পালাবেন না—তাহলে কিন্তু খপ্‌ করে হাত চেপে ধরব, লোকে দেখলে যা তা ভাববে—'

ললিতমোহন দাঁড়াল, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কি চাই বল।'

'চা খাওয়ান তবে বলব।' শান্তির চোখের তারাতে নিষ্ঠুর কৌতুক।

'পয়সা নেই এখন—মাইরি বলছি'—

'আমার কাছে আছে'—বলে শান্তি তার ছোট্ট হ্যান্ড ব্যাগটা দোলাল।

'চল।'

সামনেই 'অমৃত রেস্টুরেন্ট'। একেবারে ফাঁকা। সেখানে গিয়ে বসল ললিতমোহন। মুখোমুখি বসল শান্তি ওরফে টুনু।

'দু কাপ চা'—বেয়ারাকে বলল শান্তি।

ললিতমোহন রাস্তার দিকে তাকাল। কেউ দেখছে না তো? দোকানে আর কেউ নেই বটে, তবু আশ্বস্ত হতে পারে না সে। মনে হয় যেন চারদিকেই অসংখ্য চোখ। চেয়ার টেবিল, দেয়ালের মা-কালীর পট, দোকানের মালিক আর বেয়ারাটি—সবই একটা কদর্য কাহিনীর সন্ধান পেয়ে চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে।

'কি কথা বল শান্তি'—

'এক্ষুনি? চা আসুক, ততক্ষণে দু একটা মিষ্টি কথা'—

'শান্তি আমায় মাপ কর।' ললিতমোহনের গলা কেঁপে উঠল। শান্তি ফিক্‌ করে হাসল, 'মাপ করব! কে কাকে মাপ করে? আপনি বৌ থাকতেও যখন আমাকে বিছানায়'—

'চুপ কর চুপ কর'—চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল ললিতমোহন।

'ভয় পাচ্ছেন?'

'ভয়! কেন? না'—

'বেশ, আপনি বীরপুরুষ। তাহলে আপনার বৌয়ের সংগে দেখা করে একদিন যাচাই করতে হয় আপনার বীরত্বের দৌড়টা'—

'কি বলছ শান্তি!'

'বলছি যে, না হয় দু দিন দু ঘণ্টা করেই আমার সংগে ঘর করেছিলেন, তবু আমি আপনার বৌয়ের সতীন তো—আমাকে দেখলে তার কেমন লাগে'—

'কি চাই? তোমার কি চাই খুলে বল শান্তি'—

'টাকা। আজ রাতের মধ্যেই একশ টাকা চাই—পরশু আমার বাবার ক্যানসারের অপারেশন।'

'কিন্তু আমার কাছে একটা পয়সাও নেই শান্তি'—

'ব্যাংকে?'

'নেই—নেই—ছেলের পয়সায় খাচ্ছি—তুমি তো জানো যে প্রায় বছরখানেক ধরে আমি বেকার'—
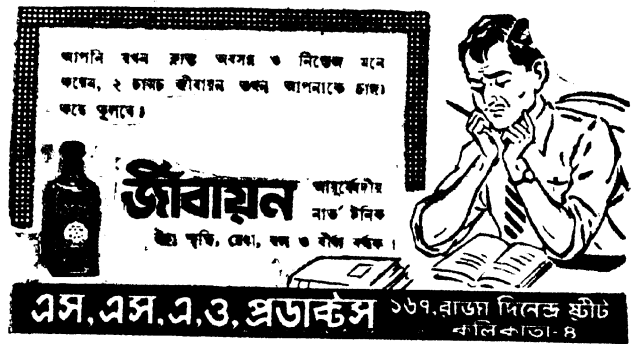
'কিন্তু চার মাস আগে তো টাকা দিয়েছিলেন?'

'তখনও ছিল কিছু হাতে। এখন নেই, বিশ্বাস করো।'

'না। বিশ্বাস করব না। আমার টাকা চাই-ই চাই।'

চা এল।

মাথা নীচু করে ভাবতে লাগল ললিতমোহন। শান্তির গা থেকে হালকা এসেন্সের

গন্ধ আসছে। শান্তি ঠোঁটে হাসির ছদ্ম-বেশে ক্রূরতার ঝলক। তার চোখের তলায় পাতালের ছায়া।

'কি ভাবছেন?'

'আঁ!'

'টাকা কিন্তু আমার চাই-ই'

'একবার নয়, তিন তিনবার এভাবে ভয় দেখিয়ে টাকা নিয়েছ শান্তি—সব মিলিয়ে চারশ টাকা'—

'কি বলতে চান আপনি?' শান্তি চায়ের কাপে চুমুক দিল।

'আর আমার ক্ষমতা নেই।'

'কি বলতে চান আপনি খুলে বলুন—পুলিসে যাবেন?'

'না না—ছিঃ'—

'লোক ডেকে অপমান করবেন আমায়?'

'ছি ছি—তাই কি বলছি'—

'তাহলে টাকা দেবেন বলছেন তো? আজ রাত দশটা—মনে রাখবেন, দশটা বাজতেই যদি টাকা না পাই, তাহলে আপনার বারোটা বাজাব কাল সকালে।'

ললিতমোহন কাঁপতে কাঁপতে উঠল।

'উঠছেন কোথায়?'

'যাই—আমি তোমার টাকার চেষ্টা করব—করব'—

'আচ্ছা চা-টা খেয়ে যান।'

'না—না আমি যাই'—

'মনে রাখবেন—টুনুকে ভুলবেন না'—শান্তি ধারালো দাঁত মেলে হাসল।

কিন্তু সে হাসি দেখল না ললিতমোহন। টলতে টলতে বাইরে বেরিয়েই চমকে উঠল সে। দূরে দেবেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। দেবেন দেখার আগেই উলটো দিকে পালাল ললিতমোহন।

ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে লাগল সে। খোঁড়া কুকুরের মত।

ভয়। কুৎসিত ভয়। প্রতিপদে ভয়। এক বছর আগেকার কথা। একটা চায়ের দোকানে রোজ সন্ধ্যেবেলা চা খেত ললিতমোহন। অতি সাধারণ একটু বিলাসিতা। সেখানেই দেবেনের সঙ্গে আলাপ। দেবেন দেশের দুর্দশার গল্প বলত। বলত রেফিউজী পরিবারদের গল্প। বলত নারীমাংস কত সুলভ হয়েছে কলকাতার অলিগলিতে। বলে বলে ইংগিতে লুব্ধ করার চেষ্টা করত। ললিতমোহন বুঝত, কিন্তু হেসে এড়াত। শেষে দেবেনের নেমন্তন্নে তার এক আত্মীয় বাড়িতে চা খেতে ও আলাপ করতে ঢুকল একদিন। শিয়ালদার কাছাকাছি। আত্মীয়টি ষাট বছরের বৃদ্ধ, তার চোখে ছানি। প্রেতিনীর মত একটি বৌ। শান্তি ছাড়া আরো দুটি দশ বারো বছরের ছেলে ও মেয়ে। দেশের দুরবস্থার কথা নিয়ে বেশ আড্ডা জমেছিল। শান্তি ওরফে টুনু চা খাইয়েছিল, তার সঙ্গে তেলে ভাজা। তারপর যখন বিদায় নিয়েছিল, তখন শান্তি বিচিত্র হেসে বলেছিল, 'আবার আসবেন।' পঞ্চাশ বছরের চোখ ললিতমোহনের—তাতে সব কিছু ধরা পড়েছিল। ঘরের মধ্যে ফুলতোলা টেবিলের ঢাকনা ও ভাঙা গেলাসে শুকনো রজনীগন্ধার ঢাকা-দেওয়া রিক্ততার ইতিহাস। ধরা পড়েছিল শান্তির লজ্জার অন্তরালবর্তী নিরুপায় নির্লজ্জতা। 'আসবেন'—সে বলেছিল—সে ডাকের মধ্যে শবরীর আহ্বান স্পষ্ট ধ্বনিত হয়েছিল। সে ডাককে ললিতমোহন শেষ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারেনি। নিস্তরঙ্গ জীবনে হঠাৎ তরঙ্গ উঠল, একঘেঁয়ে জীবনে বিপজ্জনক একটা অনুভূতির রোমাঞ্চ এল। তাঁতীবাগান লেনের কয়লার ধোঁয়া, বিজনবালার ক্রূরতা আর কার্তিকমোহনের উচ্ছৃংখলতা মনের মধ্যে যে অভিমান ও রিক্ততা জমিয়েছিল, তা চরমে উঠল একদিন। বিজনবালার সঙ্গে খুব ঝগড়া হল একদিন চমনলালের ওখানকার চাকরি যাবার পর। চায়ের দোকানে গিয়ে বসতেই দেবেন এল। জোর করে নিয়ে গেল চা খেতে শান্তিদের বাড়ি। সেদিন শান্তির বাপ-মা'রা ছিল না। শান্তি চা করতে গেল অন্য ঘরে। দেবেন কয়েক মিনিটবাদে সিগারেট কেনার অজুহাতে বেরিয়ে গেল। আর এল না। ওদিকে জোরে বৃষ্টি এল। এককালে কবিতা লিখত সেকথা মনে পড়ল ললিতমোহনের, জীবনের ব্যর্থতা-বোধ বিজনবালার জন্য আরো বেড়েছিল সেদিন। সমাজ-সংসার-মিছে-সব মনোভাবটাকে সেই ঘোর বৃষ্টি যেন আরো ষোলগুণ বাড়িয়ে দিল আর ঠিক সেই সময়েই গরম চা নিয়ে যেন ষোলকলার চাঁদের মত ঘরে এল শান্তি। ছি ছি ছি।
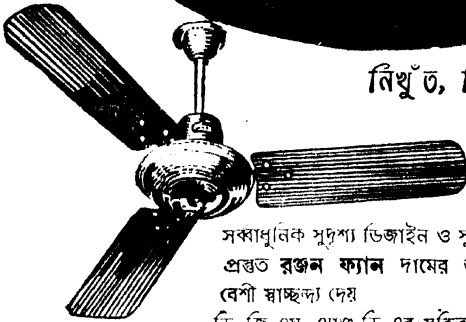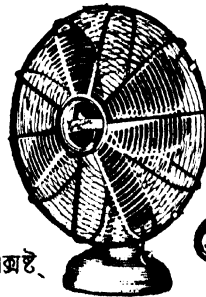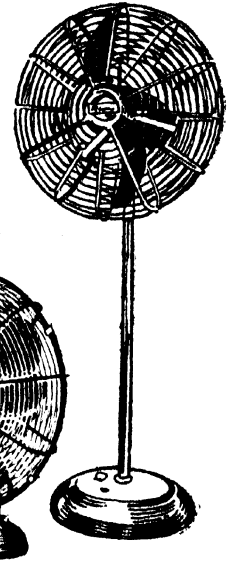
আত্মগ্লানির জ্বালাতে ... কয়েক জ্বলল সে, তারপর আবার এক ... একটা কামার্ত কুকুরের মত—ছি ছি ছি। ততদিনে সব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সমাজ সংসারের যুদ্ধোত্তর একটা ভয়ানক রূপ সে শান্তি ওরফে টুনুর মধ্যে দেখে নিয়েছিল। সেই রূপ আর কিছুদিন পরেই ভয়াবহ হয়ে উঠল। যেদিন শান্তি ও দেবেন প্রথম ভয় দেখিয়ে টাকা নিল—তারপর থেকে আজ পর্যন্ত—। ভয় করছে। কুৎসিত ভয় অক্ষমের, অপদার্থের, ক্লীবের ভয়।

ভেবেছিল বাড়ি যাবে না। তবু যেতে হল।

চুনি ওরফে নিরুপমা খেতে দিল বাপকে। চুনিকে কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে!

বিজনবালা একবার উঁকি মারল, তারপর বলল, 'আমি একটু পল্টনদের বাড়ি থেকে আসছি চুনি'—বলেই ললিতমোহনের দিকে তাকিয়ে একটু মুখ টিপে হেসে চলে গেল।

ললিতমোহনের শরীর জ্বলে গেল। কুঁচো চিংড়ির গন্ধে একটা কালো বেড়াল ঢুকল রান্নাঘরে। চুনি তাড়ালে সেটাকে।

'বাবা, আরো ভাত দিই?'

'না মা'—

'কিছুই খাচ্ছ না যে!' চুনির গলায় কেমন যেন ক্লান্তি।

'তোর কি হয়েছেরে চুনি?'

চুনি যেন চমকে উঠল, 'আঁ—কই, কিছু হয়নি তো।' বলেই মাথা নীচু করল সে।

চুনিকে বেশ দেখাচ্ছে তো! বুকটা বেদনায় টনটন করে, উঠল ললিতমোহনের। নিজের ওপর হঠাৎ প্রচন্ড ঘৃণা হল তার। এত বড় বড় ছেলেমেয়ে তার—ছি ছি ছি।

হাতমুখ ধুয়ে অনিরুদ্ধ রায়ের পালঙ্কের ওপর গিয়ে বসল ললিতমোহন। বিধ্বস্ত সে। মাথায় পরিষ্কার কোন চিন্তা নেই। দেশ, পৃথিবী, এটম বোমা, সব গুলিয়ে গেছে। শুধু একশ টাকার চিন্তা।

চোরের মতো এদিক ওদিক তাকাল। মনের মধ্যে একটা চোর উঠে দাঁড়াল, তাকাল সে বিজনবালার বাক্সের দিকে। তালাবন্ধ। চোখ জ্বালা করছে। ভাতের রস থেকে একটা ক্ষীণ ঝিমুনির ঝিরঝির স্রোত শরীরে বইছে। ঘুমোবার চেষ্টা করলে হত। কিন্তু উপায় নেই।

পা টিপে টিপে উঠল ললিতমোহন, বিছানার বালিশ সরিয়ে দেখতেই চাবির রিংটা পেল, তারপর দরজার দিকে এগোল। দরজাটা বন্ধ করে, বাক্সটা খুলে বিজনবালার শেষ সম্বল তার সোনার হারটা—। ভয় করছে—কিন্তু উপায় নেই—

'চুনি, তোর বাবা খেয়েছে?' বিজনবালার গলা শোনা গেল।

অনিরুদ্ধ রায়ের পালঙ্কে বহুফণাযুক্ত নাগের গায়ে ঠেস দিয়ে বসল ললিতমোহন। কি আছে তার ভাগ্যে?

বিজনবালা ঘরে ঢুকল, দরজাটা ভেজিয়ে তাকাল, হাসল।

'রাগ হয়েছে?'

ললিতমোহন জবাব দিল না।

বিজনবালা কাছে এসে দাঁড়াল, তারপর পালঙ্কের ওপর শুয়ে বলল ফিসফিস করে, 'বাবুর রাগ হয়েছে?'

কোনো জবাব না পেয়েও বিজনবালা দমল না বলল, 'পিঠটা একটু চুলকে দাও না গো'—

অসহ্য। ললিতমোহন উঠে দাঁড়াল। নিজের সুটকেস থেকে দুটো টাকা বের করল।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ড্যালহৌসী'—

বাইরে যেতেই একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। দরজার গোড়ায় চুনি কথা বলছে নেপাল দত্তের ছেলে অনিলের সঙ্গে। কথা বলছে আর চোখ মুছছে। তাকে দেখেই ছেলেটা হনহন করে চলতে লাগল আর চুনি কাঠ হয়ে দাঁড়াল।

'কি বলছিল রে অনিল?'

'বিপাশার খুব জ্বর—তাই—শুনে কান্না পাচ্ছিল'—

বটে! কিছু বলার নেই। হতেও পারে বা। ললিতমোহন গলি বেয়ে চলে গেল। কিন্তু ছবিটা কেমন যেন—না না, তার মনে আজ বিকারের বান ডেকেছে। থাক সব কিছু—একশ টাকা চাই—

বেলা একটা থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ড্যালহৌসী থেকে শ্যামবাজার আবার সেখান থেকে টালিগঞ্জ। দিনেশবাবু, সুরপতি বাড়ুজ্জে, সুশীল দত্ত, বলাই দা, পিসতুতো ভাই, মাসতুতো বোন, জীবন কাকা। সবাই স্পষ্টাক্ষরে বলল—'না'।

আকাশে গলিত সোনার আলো। তাতে ধোঁয়া। পায়ে ক্লান্তি। বুকের ভেতর ভয়ের গুটিপোকা। দূরে, অনেক দূরে কোথাও মহুয়া ফুলের মধু ঝরে পড়ছে। দূরে অনেক দূরে কোথাও মখমলের মত নরম ঘাসের বিস্তীর্ণ বিছানা আছে। দূরে, বহুদূরে কোথাও ঝিরঝির ঝরনা আছে। দূরে, সেই সব দূরের কোথাও

যদি ললিতমোহন ঘুমোতে পারত! সমুদ্রের তলাকার গভীর অন্ধকারের মত ঘুম। সবাই 'না' বলল। মাথার ওপর সর্বনাশ। ঘুম কি আর আসবে? না না, আসবে। তাকে ঘুমোতে হবে। ঘুমের প্রলেপে সব ব্যর্থতা, মূঢ়তা, অভাব ও লজ্জা দূর হয়ে যাবে।

বালিগঞ্জে পপুলার ফার্মাসীতে কাজ করে মাসতুতো ভাই অনাদি। তার কাছে গেল ললিতমোহন। অনেক বলে কয়ে ঘুমের ওষুধ নিল সে। স্লিপিং পিল। গোটা আটেক দিল অনাদি। দিন মানে আদায় করল ললিতমোহন।

'দেখো দাদা, একসঙ্গে সব কটা গিলে আমায় জেলে পাঠিও না কিন্তু'—অনাদি ঠাট্টা করল।

ললিতমোহন অদ্ভুত একটা হাসি হাসল। অনাদি সাদাসিধে মানুষ, সব হাসির মানে বোঝার মত বুদ্ধি তার নেই।

বুক পকেটে আটটা স্লিপিং পিল অষ্ট-সিদ্ধির প্রতিশ্রুতি জানাতে লাগল। চলতে চলতে বারবার বুক পকেটের ওপর হাত রেখে আশ্চর্য একটা রোমাঞ্চ অনুভব করতে করতে পশুপতিবাবুর ওখানে গিয়ে পৌঁছোল ললিতমোহন।

বড়লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া সহজ নয়' প্রায় দু ঘণ্টা বসতে হল। তারপর ডাক এল।

ঘরের ভেতর মদের গেলাস নিয়ে পশুপতিবাবু অভ্যর্থনা জানালো। তারপর ললিতমোহনকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন যে, তিনি রাজনীতি বোঝেন।

'হ্যাঁ ললিতবাবু, এটু চলবে নাকি?'

'আজ্ঞে না'—

'আরে এটুখানি'—

'আজ্ঞে না—'

পশুপতিবাবু নিজে খানিকটা মদ ঢক-ঢক করে গিললেন, তারপর আবার বলতে লাগলেন কথা। বাঙালীর বড় দুর্দিন। বাঙালী সর্বত্র মার খাচ্ছে। চুঃ চুঃ। পার্টি-শান। রিফিউজি। চুঃ চুঃ।

'হ্যাঁ ললিতবাবু'—

'আজ্ঞে?'

'তোমাদের ওদিকে রিফিউজি আছে?

'আজ্ঞে?'

'ইয়ে—মানে রিফিউজি মেয়েটেয়ে—মানে সাহায্য করা উচিত তো—বুঝলে না, দেখতে শুনতে ইয়ে'—

ভয়! সে যেন নীচে গড়িয়ে যাচ্ছে! বলবে নাকি শান্তির কথা? ছি ছি ছি—সে কোন পাতালে পৌঁছেছে!

'ললিতবাবু'—

'না'—

'অ্যাঁ?'

'না'—ললিতমোহন প্রায় চীৎকার করে উঠে দাঁড়াল, আমার একটা কাজের কথা বলেছিলেন আপনি'—

'মনে আছে। সরি—হবে না। ম্যানেজার অন্য লোক নিয়েছে'—

'কিন্তু আপনি যে'—

'জানি। বলেছিলাম। তা চেষ্টা করব—আমার মত কারণ হলেই খোঁজ নিয়ে যাবেন'—

খোঁড়া কুকুরের মত এবার নিজের পাপের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হল ললিতমোহনকে। নিরুপায় ও বিধ্বস্ত ভঙ্গীতে। বাইরের ঘরে দেবেন ছিল। শান্তিকে ডাকল সে।

শান্তি হাসল, 'দশটা তো এখনো বাজেনি'—

'টাকা পাইনি টুনু'—

শান্তি বলল, 'বসুন'—

"না—তোমাকে খুলেই বলি শান্তি। চেষ্টা করেও টাকা পাইনি আমি।"

শান্তি ভয়ে কুঁচকে তাকাল। বিজনবালার চেয়ে অনেক বেশী লোভনীয়া সে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শান্তি একবার তাকাল দেবেনের দিকে। দেবেন বলল, "কাল দুপুর পর্যন্ত সময় দিলে হয়—শেষ চেষ্টা করলে ললিতবাবুর ইজ্জত বেঁচে যাবে।"

ললিতমোহনের আত্মার মত হৃদ্‌পিণ্ড সজোরে লাফাতে লাগল। রোমকূপে কুৎসিত ভয় গলে গলে বেরোল, চুঁয়ে চুঁয়ে পড়তে লাগল।

তবু সে বলল, "কিন্তু ইজ্জতের ভয় আর আমার নেই দেবেন। আমি একটু আগেই পুলিসে ডায়েরী করিয়ে এসেছি"—

"কি!" দেবেন উঠে দাঁড়াল।

"হ্যাঁ—নামধাম এখনো বলিনি—কাল দুপুরের পর তোমরা যা করবে সেই অনুযায়ী আমিও যা হোক করব।"

যে কোন মুহূর্তে হয়ত ওরা লাফাবে, ছিঁড়ে ফেলবে ললিতমোহনকে। কিন্তু না, কিছুই করল না। মোহিনী বাঘিনীর মত স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে রইল শান্তি। দেবেন দ্বিধায় দুলতে লাগল।

"আমি চলি"—

শান্তি বলল, "যান, কিন্তু আপনাকে কাল পস্তাতে হবে।"

"না টুনু, আমি পস্তাব না!"

ললিতমোহন বেরিয়ে গেল। ভয়। দুর্নিবার ভয়। তবু ভয়ে ভয়ে এই অঙ্কের শেষে হাততালি পেয়েছে সে। বুকপকেটে গভীর ঘুমের আশ্বাস।

অনিরুদ্ধ রায়ের পালঙ্কে বসে, বিড়ি টানতে টানতে মনে হয় যে বহুফণাযুক্ত নাগ-মূর্তিটা দুলছে। বসে বসে শব্দ শোনে ললিতমোহন। বাঁশী পড়ছে, পাশের বাড়িতে জোরে জোরে কান্না হাসছে, দূরে কার বাড়িতে হেমন্তকুমার গাইছে, 'আর কতদূরে, বল মা'—। বাতাসে ধোঁয়া। আকাশে মেঘ ডাকছে। হাওয়া বইছে। হাওয়ায় কিসের হাহাকার? ভয়ে ভয়ে ভয়-না-পাওয়ার ভান করেই কি সে জিতে গেছে! কাল কি হবে? যা হবার হবে। আজ সে ঘুমোবে।

সব শব্দ কমে আসে। একে একে। একে একে ঘরের আলো নেবে। গলিতে কোনো এক মাতালের স্খলিত চীৎকার। জানালা দিয়ে দেখা যায়—বাইরে অন্ধকার।

দূরে কোথাও মহুয়ার গন্ধ আছে—এক-কালে সে কবিতা লিখত। চোখ জ্বলছে—আছে, ওষুধ আছে। আর একটু পরে।

ওঘরে ওরা শুল। কার্তিকমোহন ওরফে স্বরাজ, বাঁশী ওরফে অজিতমোহন, চুনি ওরফে নিরুপমা। হাসি পায়। তারও ছোটবেলায় আর একটা নাম ছিল। ললিত-মোহন ওরফে ভল্টু—কে?

বিজনবালা। সে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করছে। তার মুখ থমথম করছে। ধ্বক করে উঠল বুকের ভেতর। শাস্তিরা কি এসেছিল?

"শোন"—

বিজনবালা এসে কাছে বসল, বলল, "আমি বিষ খেয়ে মরব"—

"অ্যাঁ!" ভয়ে কুঁকড়ে গেল ললিত-মোহন। সে ধরা পড়ে গেছে।

"ওগো সব্বোনাশ হয়েছে"—

"কি? কি হয়েছে"—

"ওই অনিল ছোঁড়া চুনির সব্বোনাশ করেছে—ক'দিন ধরেই কেমন সন্দেহ হচ্ছিল, আজ বমি করা দেখে"—

বিজনবালা কাঁদতে লাগল। কাঁদলে বড় বিশ্রী দেখায় মানুষকে। তাই—তাই চুনিকে সুন্দর মনে হচ্ছে। সর্বনাশে রূপ বেড়েছে চুনির। বাহবা।

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল বিজনবালা, তার-পর ললিতমোহনের কথা শুনে শান্ত হল। ললিতমোহন পরদিনই চারপাঁচজনকে ধরে পুলিসে যাবে, অনিলকে বিয়ে করতে বাধ্য করবে। অনিলের যে সব প্রেমপত্র পাওয়া গেছে তাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভয় নেই। হঠাৎ যেন ডুবন্ত যুদ্ধ-জাহাজের কাপ্তেনের মত অকুতোভয় হয়ে উঠল ললিতমোহন। না না, এখনো তার পাপ-কাহিনী কেউ শোনেনি।

বিজনবালা শাড়ীর কসি আলগা করে পালঙ্কে শুল।

"শোবে না?" সে জিজ্ঞেস করল।

"না—আমি কয়েকটা দরখাস্ত লিখব।"

বিজনবালা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরল। খানিক বাদেই তার চোখে ঘুম নেমে এল।"

ললিতমোহনও ঘুমের জন্য তৈরি হয়। কিন্তু হঠাৎ নজর পড়ে বিজনবালার দিকে। বিজনবালা ওরফে ললিতা'র গায়ে ব্লাউজ নেই। তিরিশ বছরের জীবন-সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মমতা হয় তার। কেমন যেন তৃষ্ণা জন্মায়। নিদ্রাহীনতা, লজ্জা, ব্যর্থতা, মেয়ের সর্বনাশের সম্ভাবনা—সব কিছু হঠাৎ ভেসে গেল অতৃপ্ত রতির আক্রমণে।

বিজনবালা জাগল। জেগে প্রচণ্ড ঘৃণায় ধাক্কা মারল ললিতমোহনকে। তারপর অনিরুদ্ধ রায়ের পালঙ্কের ওপর বর্বর যুগের একটি অধ্যায় শুরু হয়ে শেষও হল। বিজনবালা জিতল, জিতে বলল, "লুচ্চা—
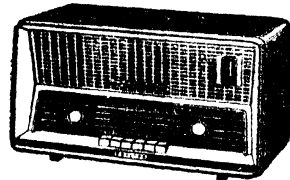
বেকার, অকর্মণ্য বাপ—লজ্জা করে না”—বলেই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওঘরে চুনির পাশে শুতে।

আহত কুকুরের মত অনিরুদ্ধ রায়ের পালঙ্কের ওপর বসে রইল ললিতমোহন। রাগে দাঁতে দাঁত পিষল সে। তার আলগা দাঁত কট্‌কট্‌ শব্দ করল। অনেকক্ষণ বসার পর সে উঠল, দরজা বন্ধ করল, জামার পকেট থেকে ঘুমের পিলগুলো ও এক গেলাস জল নিয়ে জাঁকিয়ে বসল। এখুনি? না, আরো একটু পরে। একটু ভগবানের নাম নিতে হবে। চোখ জ্বালা করছে। আলোটা নেবাল সে। আর ভয় নেই। অনাদির দয়ায় ঘুম আসবে আজ। একটি বিড়ি খেয়ে নিলে হয়।

অন্ধকারে বিড়ি টানে ললিতমোহন। তাঁতিবাগান লেন নিঃশব্দ হয়। বাইরে অন্ধকার। অন্ধকারেও ধোঁয়ার ধোঁয়াটে গন্ধ। আণবিক বোমা ফাটছে। দূরে ভাইয়াদের গান শুরু হয়েছে। 'রামা হো রামা হো'। ঢোল বাজছে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। রক্‌ রক্‌ রক্‌—'লাল লাল গাল'। ছাউনি পড়ছে পৃথিবীময়। চিরকাল খন্ডসত্য নিয়ে মারামারি করে মরে সবাই। এই কি নিয়তি! মুক্তির অস্ত্র শেষে শৃঙ্খল হয়। আজকের ত্রাণদাতা কাল মৃত্যুদাতা হয়। পৃথিবী ঘুরছে। তার চারদিকে ঘুরছে গ্যাগারিন টিটভ। মহাশূন্যে স্বর্গ নেই। সেখানে অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর সব মানুষের দুঃখ নাকি একদিন দূর হবে। কিন্তু ততদিন চুনির কি হবে? বাঁশীর? স্বরাজ এ সংসারের শিকলি কেটে গেলে বিজনবালার কি হবে? ললিতমোহনের চাকরি? বাহান্ন বছর বয়সে? আর দরকার নেই। অনেকদিন ঘুমোয়নি সে—অ-নে-ক বছর ভালো করে ঘুমোয়নি। আজ ঘুমোবে। ঘুমোলে সে ভয়ের হাত থেকে বাঁচবে। মর্যাদাহানির ভয়, অভাবের ভয়, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের ভয়, ব্যাধির ভয়, লালসার ভয়, পরস্পর-বিরোধী খন্ড খন্ড সত্যের ভয়, বিষবাষ্পের ভয়, আণবিক মৃত্যুর ভয়। ভয়, কুৎসিৎ ভয়ে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন। ভয়ের চোটে কেউ সত্য কথা বলে না, ভয়ে কেউ মাথা তোলে না। এ ভয়ের হাত এড়াতে হবে। সে ঘুমোবে। মহাসমুদ্রের তলাকার গভীর, গাঢ় অন্ধকারের মত ঘুম—ও কি?

হঠাৎ ললিতমোহনের আতাফলের মত হৃদ্‌পিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল গলা পর্যন্ত, একটা ছোরা দিয়ে কে যেন বুকের মধ্যে খোঁচাতে লাগল। ভয়। ভয়ের ঢেউ। ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের ডাক এতদিনে শোনা গেল—সে শব্দ একটা বিপুল বন্যার মত এগিয়ে আসতে লাগল। ললিতমোহন দেখল যে ঘরের মধ্যে দুটো আলোকবিন্দু। সেই বিন্দু দুটো ক্রমেই বড় হতে লাগল, বড় হতে হতে শেষে এক হয়ে গেল, তারপর নিবে গেল দপ করে। ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের ঐকতানও হঠাৎ থেমে গেল। অন্ধকার ক্রমেই গভীর ও গভীরতর হয়ে উঠল। দুটো হাত সামনের দিকে ছড়িয়ে কি যেন খুঁজল ললিতমোহন তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল কাত হয়ে—সামনের টিপয় থেকে জলের গেলাস আর ঘুমের ওষুধ মেঝেতে পড়ে গেল। কিন্তু তবু ঘুম এল ললিতমোহনের। অনন্ত নাগের ওপর শায়ীন ঘুমন্ত বিষ্ণুর মত। অনিরুদ্ধ রায়ের পালঙ্কে শুয়ে ললিতমোহনও ঘুমোল এবং নিরবধি কালসমুদ্রের গভীরতম প্রদেশের অন্ধকারকে অনুভব করল। আর সেই মহান অন্ধকারে ললিতমোহনের চৈতন্যের শেষ বিন্দুটি যখন একটি বৃত্তাকার ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল তখন ঘরের অন্ধকারে গা মিশিয়ে একটা কালো বেড়াল ডাকল—“মিঁয়াও”—
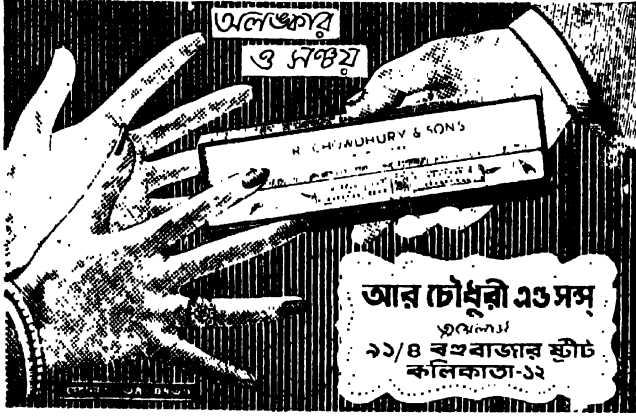
নভোগা

প্রভাত দেবসরকার
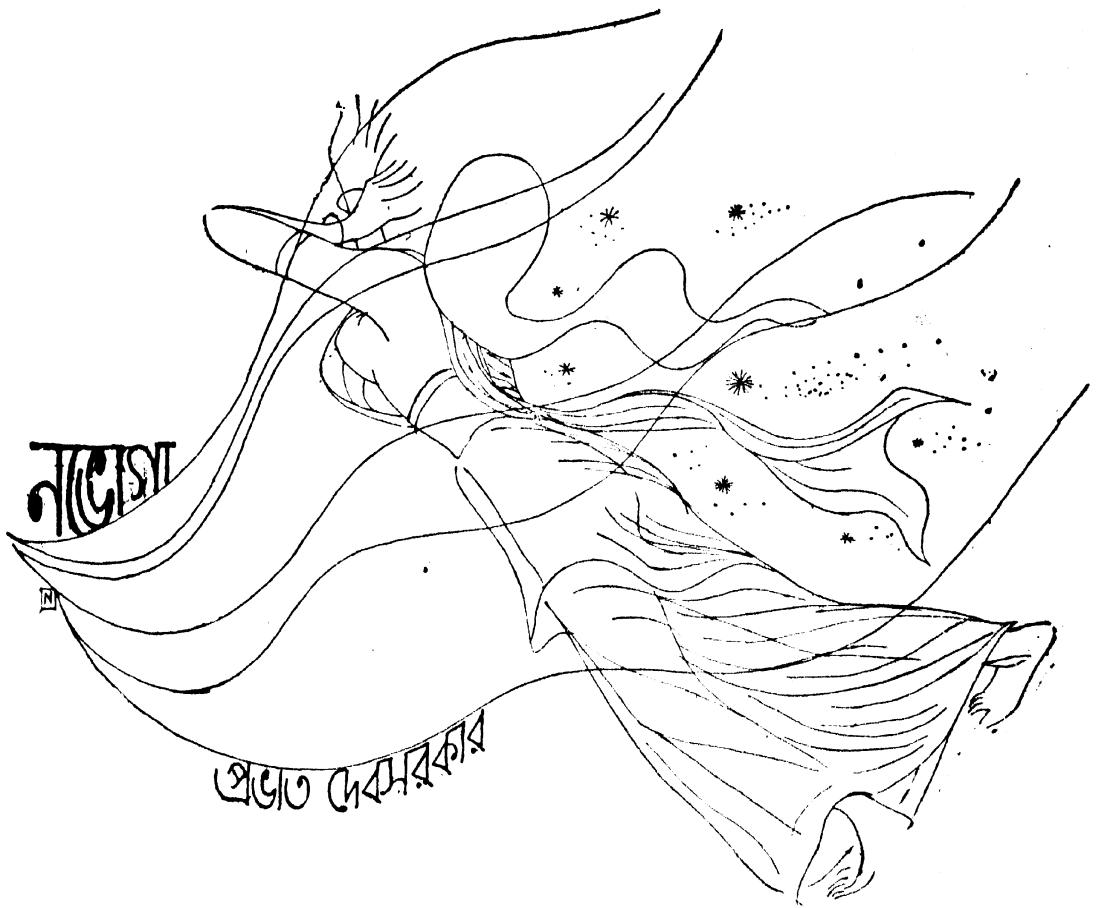
কদিন ধরে আকাশকে খুব বড় মনে হচ্ছে সুমিতার। আগে মনে হ'ত তার জানালার ধার দিয়ে ঐ গলিটার মুখ পর্যন্ত কেবল আকাশটার বিস্তৃতি; ঐ একই আকাশ তার চারপাশ ঘিরে বাড়ি থেকে স্কুল, তারপর কলেজ, পরিচিত পথ পরিক্রমার গণ্ডিটুকু বড় জোর—চোখ তুলে চেয়ে দেখে পরিমাপ করবার দরকারই হ'ত না!

সত্যি, কি বিশাল, অসীম এই আকাশ, দু চোখে ধরা যায় না! নীলু চাটুজ্জের গলির ওপারে বড় রাস্তা বলতে দু'ধারে সারবন্দী সেকেলে বাড়ির নিরবচ্ছিন্ন প্রাকার, হাঁপানী রুগীর শির-দাড়ার মত ট্রাম লাইনটা কেবল রাতদিন ঘড়ঘড় করছে! তাও পায়ে পায়ে ফুরিয়ে যায়, চোখ তুলে আকাশ দেখবার সময় পায়নি সুমিতা কোনদিন।

এখানে প্রাণ ভরে আকাশ দেখা যায়; আকাশের শেষ যেখানে সেখানে যেতে ইচ্ছে করে। সুমিতা সারাদিন কাচের জানালার সামনে বসে আকাশ দেখে। আকাশের ছায়ায় আশ্চর্য রঙ বদলায়—বসবার ঘরটার ক্ষণে ক্ষণে। মনে হয় না, সুমিতা এখানে চাকরি করতে এসেছে, ক্লান্তি আছে, বিরক্তি আছে, একঘেয়েমী আছে।

'ইয়েস মিস্!' কোন আকাশযাত্রী কখন নিঃশব্দে এসে কাউণ্টারের ওপারে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছে।

চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে সুমিতা অপ্রস্তুত হ'য়ে বলেছে, 'ইয়েস, এক্সকিউজ মি, হাউ ক্যান্ আই হেল্প ইউ?'

আকাশযাত্রী হেসে মুখের দিকে চেয়ে 'এয়ার প্যাসেজ' বুক করেছে। খুব বেশি নয় দিনে হয়তো পাঁচ-সাত জন যাত্রী আসে। আকাশের ঠিকানা চায়, পাসপোর্ট দেখিয়ে প্যাসেজ বুক করে চলে যায়। কতক্ষণ, তারপর চোখ ফিরিয়ে আবার আকাশ, অনন্ত আকাশ, উধাও আকাশ দেখা সারাদিন!

সহকর্মী গোমুশ্ জিজ্ঞেস করে, 'হোয়াট ড্যু ইউ লুক এ্যাট্ দি স্কাই মিস্ ডাটা?'

কোনদিন স্মিত হেসে মুখ ফিরিয়ে সুমিতা বলে, 'দি স্কাই ইজ্ বিউটিফুল!'

কোনদিন হয়তো চুপ করে থাকে গম্ভীর হয়ে। প্রশ্ন শুনে গোমুশ্-এর ওপর রাগ হয়, বড্ড বেশি কৌতূহল সহকর্মিণী সম্পর্কে—নিজের কাজ করলে পারে! অত মাথাব্যথা কেন?

কোনদিন সুমিতার হাসি নিবিয়ে দিয়ে গোমুশ্ বলে, 'সামটাইমস্ ইটস্ আগলি!'

কোন কোনদিন সত্যিই বিকালের দিকে আকাশ কাল হ'য়ে যায়, পাখিরা নেমে আসে, ঝড় ওঠে, দিগন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়! সুমিতার ভয় করে।

পরের দিন অফিসে এসে প্রথমেই সহকর্মীকে অনুরোধ করে সুমিতা, 'মিস্টার গোমুশ্ প্লিজ্ ডোণ্ট সে এ্যানিথিং এ্যাবাউট দি স্কাই! তোমার মুখে বিষ আছে, কাল বাড়ি ফিরতে কী কষ্ট!'

গোমুশ্ টেবিলে কাগজপত্র সাজিয়ে 'পেপার ওয়েট' নেড়ে বললে, 'আই নো, আই নো, দি স্কাই ইজ্ আগ্লি!'

সুমিতা রেগে গিয়ে বলে, 'হাউ কুড্ ইউ নো? কখখোন না! দি স্কাই ইজ বিউটিফুল আই নো!'

গোমুশ্ কিছু বলে না, টেবিলের ওপর দিনের খবরের কাগজখানা মেলে ধরে ইঙ্গিত করে। সুমিতা উঠে এলে বলে, 'সি! ইজ্ ইট্ বিউটিফুল?'

বীভৎস একটা ছবি প্লেন ক্র্যাশের আজকের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায়। উড়ো জাহাজের কঙ্কালটা কেবল চেনা যায়। আর সব কালি-পড়া ছাপ ছাপ!

গোমুশ্ পড়তে লাগল টেনে টেনেঃ

'থারটি ফোর ডেড্!...আইডেণ্টিফিকেশন ইম্‌পসিবল্......বার্নণ্ট বিয়ণ্ড রেক্‌গ্‌-নিশন!......ঘাস্টলি সিনস্ এ্যাট্ সাইট!'

মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করে সুমিতার উড়ো জাহাজ ধ্বংসের বিবরণ পড়তে পড়তে। আশ্চর্য এত বড় খবরটা আজ কাগজের তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। ঘুণাক্ষরে সে টের পায়নি ঊর্ধ্বাকাশে এতবড় একটা বিপর্যয় গত দুপুরে ঘটে গেছে! অসীম আকাশে মৃত্যুর খেলা কি ভয়ঙ্কর!

খানিক পরে সুমিতাকে চুপ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে দেখে গোমুশ্ বললে, 'কি ব্যাপার! আজ একেবারে চুপ-চাপ?'

যেন কিছু হয়নি, এমনি ভাবে চোখ তুলে সুমিতা বললে, 'কি আবার! কিছু না।'

হাতে কাজ ছিল না গোমুশের, আলাপের সুরে বললে, 'নো, সামথিং রঙ! আই নো!'

সুমিতা সহকর্মীকে ধমকে বললে, 'তুমি কিছু জান না। কেন বাজে বকছ!'

সহকর্মিণীর ধমক হাসিমুখে সহ্য করে গোমশ্ বললে, 'সি দি স্ক্রেচারাস্ স্কাই, হাউ ব্রাইট ইট্ ইজ নাউ!'

যেন আকাশের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে সুমিতার, পরম আত্মীয়ের নিন্দা যেন তার অসহ্য, বললে, 'হোয়াই ডু ইউ ব্লেম্ দি স্কাই! ইট ইজ নো ওয়ে রেসপনসিব্‌ল্ ফর দি রেক্!'

স্পষ্টই গোমুশ্ মানলে না। হাসতে লাগল। মাথা নেড়ে বললে, 'আই নো সি ইজ!'

খবরের কাগজটা খুলে সুমিতা বললে, 'এই তো লিখেছে, প্লেনটা যখন ওপরে ওঠে তখন একটা শকুনের ডানায় ধাক্কা লাগে—' (বিবরণ সম্পূর্ণ নেই এই পৃষ্ঠায়, সুমিতার পাতা ওল্টাতে সময় লাগে)।

গোমুশ্ বলে, 'কন্‌কক্‌টেড! শকুন প্লেনকে উল্টে দিয়েছে! ইট ইজ দি স্কাই আই নো!'

সুমিতা চুপ করে গেল। গোমুশের কেমন জাতক্রোধ আছে আকাশের ওপর।

খুব বড় এবং সুখ্যাত প্লেনটা। আকাশ বিহারে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে। প্রায় তুড়ি দিয়ে দূরত্বকে উড়িয়ে দিয়েছে। সে-ই কিনা সামান্য কারণে ভূপাতিত হয়ে এতগুলো লোকের জীবননাশের কারণ হল!

কিন্তু আকাশের কি দোষ? আকাশ কি করতে পারে? আকাশে উড্ডীন ঐ যন্ত্র-পাখীর পাখা যদি শক্ত না থাকে নভোচারণের বাসনা কেন? মাটিতে কি কোন যন্ত্রযান ধ্বংস আনে না! কত দুর্ঘটনাই তো হামেশাই ঘটে!

গুম হ'য়ে সুমিতা মনে মনে যুক্তি-গুলোকে যেন সাজিয়ে নেয়, কার পর কি বলবে ভেবে নেয়। রেজিস্টার খুলতে খুলতে বললে, 'দেখ মিস্টার গোমুশ্ রেল-মোটর-কল-কারখানা, রোজ কত অ্যাকসিডেণ্ট হচ্ছে,

কত লোক মরছে! তা হ'লে বল সব মাটির দোষ যেহেতু মাটিতে ওগুলো হচ্ছে!'

গোমুশ্ হেসে বললে, 'আমি তোমার যুক্তি মানতে পারছি না মিস্ ডাটা! আর্থ এন্ড স্কাই আর টু ডিফারেন্ট থিংস্!'

সুমিতা তর্ক করে বললে, 'কি করে? মানুষের চলাচলের পক্ষে দুটোই এক!'

তেমনি হেসে গোমুশ্ বললে, 'নেভার। একটা সলিড্ আর একটা হলো, আই মিন, শূন্য বায়ুস্তর!'

সুমিতা রেগে যায় গোমুশের যুক্তির আত্মপ্রত্যয় দেখে। বললে, 'তুমি আমার পয়েন্টই ধরতে পারছ না, আকাশ মাটির তফাৎ আমি জানি, কিন্তু সর্বনাশা দুর্ঘটনা দুটোতেই ঘটে, তার জন্যে যেমন লোকে মাটিকে দোষ দেয় না, তেমনি তুমি মিছে আকাশের দোষ দিতে পার না!'

গোমুশ্ হাসতে লাগল। আর প্রতিবাদ করলে না। কেমন যেন তার মনে হয়েছে এ মেয়েটি নিতান্তই আকাশ-পাগল। বললে বুঝবে না আকাশপথের বিপদটা কি, কোন ফাঁদে মানুষের সর্বনাশ!

'বরং—' সুমিতা বলতে গিয়ে থেমে গেল। পুশ-ডোর ঠেলে একজন সুবেশ, সুন্দর তরুণ ঘরে ঢুকলে। চোখ তুলে একটু যেন থমকে গেল সুমিতা।

পালিশকরা কাঠের কাউন্টারের সামনে এগিয়ে এসে সহাস্যে সপ্রতিভকণ্ঠে তরুণটি জিজ্ঞেস করলে, 'মেঘনাদ এয়ার ট্রাভেল এজেন্টের অফিস এটা নিশ্চয়ই?'

সুমিতা ঘাড় নাড়লে। মুখোমুখি হয়ে অধিকতর সপ্রতিভ কণ্ঠে তরুণটি বললে, 'আমার নামে দুখানা এয়ার প্যাসেজ বুক করবেন কি?' পাসপোর্ট দেখে সুমিতা গন্তব্য জিজ্ঞেস করলে। তরুণটি নাম বললে, পাসপোর্ট নেড়ে-চেড়ে জায়গাটা আন্দাজ করতে না পেরে সুমিতা এয়াররুটের বইয়ের পাতা উল্টে দেখতে লাগল ত্রস্ত দৃষ্টিতে, ঘাড়-গোঁজা অদ্ভুত একটা লাজুকতা বোধ করে। বুঝতে পারে তরুণটি তাকে লক্ষ্য করছে নিঃশব্দে।

একবার সামনে, একবার পিছনে, আবার সামনে, কখনও ভোকেবুলারির মাঝখানে সুমিতার চোখ আর হাতের ক্ষিপ্রতায় প্রার্থিত নামটা বার বার গুলিয়ে যয়।

তরুণটি তখন সুমিতার পিছনে দেওয়াল-জোড়া পৃথিবীর মানচিত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, চোখ টেনে টেনে দেখছে। এয়ার রুট সব মার্কা করা আছে। মনে হয় পৃথিবীটা জলে ভাসছে, পাখির ডানায় পরিক্রমা যত সহজ আর কিছুতে নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে পৃথিবীকে ছোট করে ফেলছে।

তখনও সুমিতা ঘাড়গুঁজে বই হাতড়াচ্ছে। গোমুশ্ গম্ভীর হ'য়ে মাল বুকিং-এর খাতাটায় চোখের দাগা বুলচ্ছে।

'পেলেন না জায়গাটা খ‍ুজে?' চোখ ফিরিয়ে তর‍ুণটি বললে।

'না, এই যে—' চোখ তুলে স‍ুমিতা চোখ নামিয়ে নিলে, বড় চোখে-পড়া দৃষ্টি তর‍ুণটির।

তখনও স‍ুমিতা প্যাসেজ ব‍ুকিং-এর খাতাটা ঘাটছে, পাতা উল্টে ঘেমে যাচ্ছে।

'ভারতীয় প্লেন তা হ'লে ওদিকে যায় না? ঠিক আছে, যে কোন প্লেনে প্যাসেজ ব‍ুক করে দিতে পারেন?' তর‍ুণটি যেন হতাশ হয়ে বলছে।

কাউণ্টারের ওধারে সহকর্মীর শরণাপন্ন হয়ে স‍ুমিতা বললে, 'মিস্টার গোমশ্‌ একট‍ু দেখে দিন না।'

চোখ না তুলেই গম্ভীরভাবে গোমশ্‌ বললে, 'সি মিডল্‌ ইস্ট, এয়্যার ইণ্টার-ন্যাশানাল।'

হঠাৎ আপাদমস্তক শিহরিত হ'য়ে কম্পিত হাতে এয়ার চার্টটা এগিয়ে ধরে স‍ুমিতা বললে, 'এই যে! এক্সকিউজ মি, কখানা বললেন? পাওয়া যাবে।'

ততক্ষণে তর‍ুণটি ঘরের একধারে সরে গিয়ে পৃথিবীর বিচিত্র মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করছে। পৃথিবীতে কত দেশ আছে অজানা, কত মান‍ুষ আছে অচেনা! মেঘনাদ এয়্যার ট্রাভেল অফিসটাও ছবির মত স‍ুন্দর পৃথিবীর এক কোণে। মাটি ফ‍ুঁড়ে কাচের আচ্ছাদনে ঘেরা আকাশ-আলোয় মাখামাখি ঘরটা এখন।

আর ঠিক এই ম‍ুহ‍ূর্তে স‍ূর্যাস্তের আভায় ঘর-দোর ভরে লালে-লাল হ'য়ে ওঠে। তর‍ুণটির ভ্রম হয়, বাঁধান-ছবি কোন এয়ার প্যাসেজ ব‍ুকিংরত ঐ তর‍ুণীটি কি না! মেঘনাদ এয়ার ট্রাভেল কোম্পানীর র‍ুচির প্রশংসা করতে হয়।

তর‍ুণটি চলে যেতে গোমশ্‌ চোখ ক‍ুঁচকে বললে, 'মিস্‌ ডাটা তুমি তো দেখলে না, হি ওয়াজ মোর ইণ্টারেস্টেড্‌ ইন ইউ দ্যান্‌ ব‍ুকিং দি প্যাসেজ! নাইস্‌ ফেলো!'

কপট ক্রোধে স‍ুমিতা প্রতিবাদ করলে, 'তুমি সবাইকে তাই মনে কর!'

গোমশ্‌ ম‍ুচকি হেসে বললে, 'সত্যি বলছি হি ওয়াজ ডিভাওয়ারিং বাই ল‍ুকিং! খেয়ে ফেলতো!'

স‍ুমিতা বললে, 'তুমি কেবল ঐরকম দেখ সবাইকে।'

হঠাৎ গলার স্বর গম্ভীর করে গোমশ্‌ বললে, 'আমার তো মনে হল, সে তোমাকে চেনে।'

অকারণে শিহরণ বোধ করে স‍ুমিতা ম‍ুখে বললে, 'যাঃ কি যা-তা বলচো!'

তেমনি চোখের কোণে হাসির ঝিলিক দিয়ে গোম‍্শ্‌ বললে, 'রিয়েলি?'

স‍ূর্য অস্ত গিয়ে এয়ার ব‍ুকিং অফিসে অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও ম‍ুখেচোখে তখনো কিছ‍ু রক্তিমাভা ছিল, সহকর্মী গোম‍্শের মন্তব্যে তা দ্বিগ‍ুণ আরক্ত হয়ে উঠল।......

[প‍ুষ‍্পদিদির পিসতুতো ভাই এই চাকরিটা যোগাড় করে দিয়েছেন। প‍ুষ‍্পদিদি আপন দিদি নয়, কিন্তু নিজের দিদি থাকলেও কেউ এবাজারে এমন চাকরির সংগ্রহ করে দিত না।

ডাঃ রায় অভিনিবেশ সহকারে 'এনার' স্টোভের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছেন।

পুষ্পদিদিরা খুব ভাল লোক, ও'দের আত্মীয়-স্বজন সবাই খুব ভাল। পুষ্পদি-দের বাড়ি ক'দিনই বা গেছে সুমিতা, কিন্তু পুষ্পদির সম্পর্কে সবাইকে সুমিতার চেনা হ'য়ে গেছে। যেন তাদেরই আত্মীয়ের মধ্যে। পুষ্পদিরই যত ভাবনা সুমিতার আই-এ পাশ করার পর। কতবার যে বলেছেন, আর তুই পাড়সনি সুমি, মা-বাবাকে একটু দেখ, মাসিমা বলছিলেন! বেশ তো খ'ুড়িয়ে খ'ুড়িয়ে আর নাই বা পড়লে, কিন্তু একটা কিছু করতে হবে তো! কি করবে? কি করে বাবা-মাকে দেখবে?

পুষ্পদি চাকরির করতে বলেছিলেন। সুমিতা বলেছিল, কোথায় চাকরি—অমনি বললেই হয় না! দাও না দেখে। যেন দেখাই ছিল। পুষ্পদিদের বাড়ি পুষ্পদির পিসতুতো ভাই হীতেন আসতো, তাকে বলে চাকরিটা যোগাড় করে দেন। পুষ্পদিদের বাড়িতে একদিন হীতেনই উপযাচক হ'য়ে বলেছিল, আপনি শুনলুম চাকরি করতে চান। আমার জানা একটি চাকরি আছে করবেন?

না করার কিছু নেই। পুষ্পদিরই সব ব্যবস্থা। তবু সুমিতা কিছু বলতে পারে নি মুখ ফুটে। তারপর হীতেনবাবু তাকে সঙ্গে নিয়ে যোগাযোগ করিয়ে তালিম দিয়ে চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছেন। হীতেন-বাবু খুবই সপ্রতিভ আর সদয় ছিল তার ওপর।

তারপর আর হীতেনবাবুর কোন খবর পাওয়া যায় নি। ছুটির দিনে পুষ্পদির বাড়িতে তাকে দেখা যায় নি। চাকরিদাতার সম্পর্কে খবর নিতে কেমন সংকোচ বোধ করেছে। পুষ্পদি জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেমন চাকরি করছিস রে সুমি? ভাল তো, খাটা-খাটুনি বেশি নেই? তোর মনের মত হয়েছে?

সুমিতা মাথা নেড়েছিল। খুব ভাল বলবার ইচ্ছে থাকলেও কৃতজ্ঞতায় কেমন যেন কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছিল। খুব ভাল পুষ্পদিরা, ওদের আত্মীয়-স্বজনরা—কে সুমিতা তার জন্যে এমন একটা ভাল চাকরি যোগাড় করে দিয়েছেন!

'হীতেনটা আজকাল আসে না। কি হয়েছে কে জানে!' কথা প্রসঙ্গে পুষ্পদি বলেছিলেন একদিন যেন, তিনি খুব রেগে আছেন ভাইয়ের ওপর।

কারণটা সুমিতাও জানে না। হীতেনবাবু তাকে চাকরিতে বসিয়ে গা আড়াল

আজই 'বাঘ' মার্কা সুপ্রারেজ ব্যাটারী কিনে আপনার টর্চে ভ'রে নিন। এতে আলোর তীব্রতা অনেক বেশী। বিশেষ প্রণালীতে এই ব্যাটারীটি তৈরী করা হ'য়েছে, এবং বহুদিন ব্যবহারেও অল্প শক্তি নষ্ট হয়, অথচ দামেও সস্তা।
অন্ধকারে অদ্বিতীয় সহায় 'বাঘ' মার্কা সুপ্রারেজ ব্যাটারী
SUPRARAYS
SUPER POWERED FLUID FREE CELL
'বাঘ মার্কা' সুপ্রারেজ
টর্চ ব্যাটারী
দি ফ্ল্যাসলাইট্স্ ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা।
সোল সেলিং এজেণ্ট্স্ : হাজী হামেদ হাজী আব্দুল্লা প্রাঃ লিঃ
৫, আমড়াতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১

দিয়েছেন, যেন বুঝতে পেরেছেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে সুমিতা বাড়াবাড়ি করবে। হয়তো ঠিকই ভেবেছেন। মা একদিন বলেছিলেন, পুষ্‌দির ভাইকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে, কেননা চাকরিটা তিনি করে দিয়েছেন। ছি ছি, পুষ্‌দির আত্মীয়রা অমন প্রত্যাশী নয়। যে ক'দিন হীতেনবাবুর সঙ্গে মিশেছে তাতে সুমিতা বেশ বুঝতে পেরেছে। বয়সে তরুণ হ'লেও বুদ্ধিতে এবং ব্যবহারে বেশ সংযত, বুদ্ধিমান!]

আজ রাতে ঘুম আসবার আগে, হঠাৎ কোন কারণ নেই, হীতেনবাবুর কথাই মনে পড়ছে সুমিতার। একদিন সত্যি হীতেনবাবু তার সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড্ হয়েছিলেন। খুব চেষ্টা করেছিলেন চাকরিটা যোগাড় করে দিতে। মনে করলে আজো সুমিতা লজ্জা পায়, কতদিন গাড়ি ভাড়ার পয়সাটা পর্যন্ত তিনি দিয়ে দিয়েছেন। একদিন হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছেন—কি করে বুঝতে পেরেছিলেন সুমিতার খুব খিদে পেয়েছে! প্রথমটা সুমিতা রাজী হয়নি হোটেলে ঢুকতে, লজ্জায় সংকোচে পা জড়িয়ে গিয়েছিল—একে তার চাকরির জন্যে চেষ্টা করছেন, কায়িক পরিশ্রম করছেন, আবার কেন পয়সা খরচ করবেন? না না! খাবার টেবিলে বসে হীতেনবাবু বলেছিলেন, 'বেশ, চাকরি হলে শোধ দিও।' আরো অনেক কথা হীতেনবাবুর সম্পর্কে মনে পড়ছে। মনে মনে অদ্ভুত একটা ভাব হত ভদ্রলোকের সান্নিধ্যে! গোমুশ্ আজকাল বড় ইয়াকি' করে তরুণ যুবক কেউ এয়ার প্যাসেজ বুক করতে এলে। যেন সবাই-ই সুমিতাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ছুতো করে টিকিট কাটতে আসে। বুকটা কেমন শিরশির করে—সত্যি ভদ্রলোককে আজ অনেকক্ষণ মিথ্যে মিথ্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল সুমিতা! পাঁচ মিনিটের কাজটা করতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছিল, ইচ্ছে করেই যেন ভুল হচ্ছিল, কিছুতেই হাতের কাছে পেয়েও জায়গাটা ধরতে পারছিল না, যেন পৃথিবীতে ও জায়গা বলে কিছু নেই! ভাগ্যিস গোমুশকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, নইলে—

'তোমাকে গিলছিল ভদ্রলোক সারাক্ষণ।' গোমুশ্ কৌতুক করে বলেছিল। কে জানে ভদ্রলোক অতদূরে কি করতে যাচ্ছেন, কখনো নাম শোনেনি সুমিতা। আবার ফিরে আসবেন তো? দৃষ্টির স্পর্শটা যেন এতক্ষণে এই নিভৃত শয্যায় বোধ করা যায়। সুমিতা রোমাঞ্চিত হয়।

গোমুশ্ হেসে হেসে বলেছিল, 'ভদ্রলোক কিন্তু বেশ হ্যান্ডসাম।' দুষ্টুমি করে আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি দেখোনি? দেখলে—'

গোমুশ্ সুমিতার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গিয়েছিল। সুমিতার চোখমুখ আরক্ত হ'য়ে রাগ-রাগ হয়ে উঠেছিল, কঠিন স্বরে বলেছিল, 'আমি দেখতে যাব কেন! মাইন্ড ইয়োর ওন বিজনেস্!'

কিন্তু দেখেছিল সুমিতা, ভদ্রলোক সত্যিই সুন্দর। খুব কম চোখে পড়ে অমন চেহারা কোন তরুণের। দেখবার মত! দূর-র কি সব ভাবছে আবোল তাবোল, অনেক রাত হয়ে গেল, ঘুম আসছে না কিছুতে! না আর ভাববে না অকারণ সুমিতা। নীলু চাটুজ্জের গলির ওপারের আকাশটা অনেক দূরে চলে গেছে। আকাশের শুরু নেই, শেষ

নেই—পৃথিবী ছাড়িয়েও কি আছে এই আকাশ? গোমশ্টা একেবারে বাজে, বলে আকাশ কুৎসিত!......

পরের দিন অফিসে আসতে বেশ দেরী হল। পুস্‌ডোর ঠেলে ঢুকতে গোমশ্ হৈ-হৈ করে উঠলো, 'মিস্ ডাটা কালকের প্যাসেঞ্জার কতবার তোমাকে খুঁজে গেছে!'

'গেছে গেছে!' কপালের ঘাম মুছে আপন সিটে বসে সুমিতা বললে, 'কে পাসেঞ্জার—কি দরকার?'

গোমশ্ বললে, 'কে আবার দ্যাট্ জেন্টল্ম্যান!'

বেন বিচলিত হবার কিছু নেই। সুমিতা কাগজপত্র খুলে কাজে মন দিলে। গোমশ্ কি ভেবেছে, মনে মনে রাগ করে সুমিতা। সকাল থেকেই ইয়ার্কি শুরু করেছে!

কিন্তু না, সত্যিই ভদ্রলোক আবার এলেন। পুস্-ডোর ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। সুমিতা চোখ তুলে দেখলে, চোখ নামিয়ে নিলে, মনে মনে কেমন যেন জড়তা বোধ করলে।

'একটা প্যাসেজ ক্যান্সেল হ'বে—রিফান্ড দেবেন কাইন্ডলি—' ভদ্রলোক কাউণ্টারের ওপারে দাঁড়িয়ে বললেন।

প্যাসেজ বুকিং-এর কাগজ চেয়ে মাথা নিচু করে সুমিতা বললে, 'দিন।'

সুমিতা আর একবারও মাথা তুলে দেখবার সময় পেল না, গোমশের কথামত ভদ্রলোক তাকে আজও গিলছেন কি না। রিফান্ড নয়, সাত-সতের জায়গায় কাটো-কোটো, লেখ, ছরকট। রাগ হয় বৈকি সুমিতার, ঘটা করে প্যাসেজ বুক করাই বা কেন, ক্যানসেল করাই বা কেন, যত সব অব্যবস্থিত চিত্ত!

টাকা ফেরত নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'এক্সকিউজ মি, অনেক ট্রাবল্ দিলুম আপনাকে।'

মুখে কিছু সৌজন্যসূচক উক্তি করতে পারলে না সুমিতা। মাথাটাও তুলতে পারলে না।

ভদ্রলোক চলে যেতে গোমশ্ আবার কৌতুক আরম্ভ করলে, 'ভদ্রলোকের তোমাকে পছন্দ হয়েছে মিস্ ডাটা, আই ওয়াজ মার্কিং অল দি টাইম।'

বেশ গম্ভীর হ'য়ে সুমিতা বললে, 'দ্যাটস্ নট ইওর লুক আউট!'

গোমশ্ মুখে মৃদু শিষ্ তুলে হাসতে লাগল। মেঘনাদ এয়ার ট্রাভেল এজেন্টের এই ব্রাঞ্চ অফিসে মাঝে মাঝে কত বিচিত্র জীব আসে। আরো বিচিত্র সহকর্মিণী ঐ মেয়েটি, হিউমার বোঝে না। দেখ না দেখ আকাশের দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে আছে। ঐ জানে সারাদিন ও কি দেখে!

দুপুরের দিকে কিছুক্ষণের জন্যে এদিকটা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যায়। এই সবে সামনের বড় রাস্তা দিয়ে যে ভারি লরীটা সশব্দে ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে চলে গেল

অনেক দূরে চলে গিয়েও যেন তার সাড়া আসে ঢেউ-শেষ তরঙ্গের মত। ভাল লাগে না মুখ বুজিয়ে কাজ করতে একা-একা।

গোমূশ্ সহকর্মিণীকে খুশী করতে বললে, 'আকাশটা আজ খুব পরিষ্কার! আয়নার মত রিফ্লেক্শান—'

কথার মাঝখানে গোমূশ্ থেমে গিয়ে সুমিতার উৎসুক মুখের দিকে চেয়ে দেখে। সুমিতা মুখ বাড়িয়ে সমাহিত হ'য়ে চেয়ে আছে। অদ্ভুত সুন্দর দেখতে লাগছে, আকাশ-প্রতিবিম্বে কাচের ব্যবধান ঘুচে গেছে।

'বিউটিফুল!' গোমূশ্ আপন মনে বলে ফেললে।

মুখ ফিরিয়ে হেসে সুমিতা জিজ্ঞেস করলে, 'কি বিউটিফুল?'

তাড়াতাড়ি গোমূশ্ বললে, 'আই মিন ইউ, অ্যান্ড নট দি স্কাই!'

কৌতুক হাস্যে সুমিতা বললে, 'বাইরের আকাশ কিন্তু খুব সুন্দর!' গোমূশ্ প্রতিবাদ করলে না।.....

গোমূশ্ উঠি-উঠি দুদিন অফিস কামাই করছে। এক হাতে দুজনের কাজ সুমিতাকে করতে হচ্ছে। হঠাৎ যেন কাজও বড় বেড়ে গেছে, একটা শেষ না করতে আর একটা এসে জড় হচ্ছে। চোখ তোলবার সময় নেই। মনে মনে রাগ হয় সহকর্মী গোমূশের ওপর। ঠিক বেছে বেছে এই সময় কামাই করলে। শুক্রবারে কি ভিড় জানে না!

'আমিও একদিন কামাই করবো।' মনে মনে সংকল্প করলে সুমিতা, বাঁ হাতে আন্দাজে চুলের পাতাটা ঠিক করলে।

'ইচ্ছে করলে খুব ছুটি নিতে পারে সে! গোমূশ্ কি ভাবে, ছুটি ভোগ করার তার সাধ্য নেই?' মনে মনে ভাবলে সুমিতা।

'কিছু না হোক, বাসে করে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াবে, এরোড্রোম যাবে, প্লেন ছাড়তে দেখবে।' মনে মনে ব্যবস্থাটা একরকম স্থির করে ফেললে সুমিতা ছুটির দিনের জন্যে। 'আর—'

সে-কথাটা সোচ্চারে ভাবতে চায় না সুমিতা। মনে মনে থাকাই ভাল। মনেই থাক। তবু অনেকবার কথাটা ভেবেছে সুমিতা. আজই মিডল্ ইস্টের প্লেনটা দম-দম থেকে টেক অফ্ করবে। শুধু শুধু কোন দরকার নেই, তবু কি মনে করে এয়ার বুকিং-এর লিস্টটা একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলে সুমিতা। হাত ঘড়িটা ঘুরিয়ে দেখলে—হঠাৎ মনে হল, সেকেণ্ডের কাটাটা আর নড়ছে না, মরা মাছির মত এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। একটু অবাক হয়ে চেয়ে থেকে উঠে দাঁড়াতে সামনের দেয়াল ঘড়িটার দিকে নজর পড়তে চোখটা কেমন যেন ধাঁধিয়ে গেল. একটা বিকট শব্দের ধাক্কায় যেন কানে তালা লেগে গেল। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গেল!

কাউণ্টার ধরে খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিলে সুমিতা। লক্ষ্য করে একজন এয়্যার প্যাসেঞ্জার বললে, 'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?'

সুমিতা চেয়ারে বসে স্বাভাবিক স্বরে বললে, 'না, ধন্যবাদ!'

শরীর খারাপ হবার কোনই কারণ নেই, কেন হঠাৎ এমন হল সুমিতা ভেবে ঠিক করতে পারলে না। মনের সংগে কি কোন সম্বন্ধ আছে শরীরের? হয়তো!......

পরের দিন গোমূশ্ অফিসে এসে সোৎ-সাহে খবরটা দিলে। কাল দমদমে দারুণ একটা এয়্যার ক্র্যাশ হয়েছে। ধূমকেতুর মত আকাশ উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল, আর কি শব্দ! বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে শোনা গিয়েছিল!

ছ্যাঁৎ করে মনে যেন ঘা লাগে। সুমিতা উৎসুক আগ্রহে জিজ্ঞেস করলে, 'কখন?'

খবরের কাগজটা নেড়েচেড়ে গোমূশ্ বললে, 'বেলা আড়াইটা তিনটে। কি আশ্চর্য, তুমি জান না, সবাই জানে!'

একান্ত গোপনে এয়ার বুকিং-এর লিস্টটা পরীক্ষা করতে করতে মাথা নিচু করেই সুমিতা শুষ্ক কণ্ঠে বললে, 'আমি জানি।'

সাগ্রহে গোমূশ্ বললে, 'এখানে দেখা গিয়েছিল বুঝি ফ্ল্যাশটা?'

হঠাৎ গোমূশ্ চোখ তুলে অবাক হ'য়ে গেল, সুমিতার মুখে একেবারে রক্ত নেই যেন, কাগজের মত সাদা দেখাচ্ছে—সুমিতা শূন্য দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে আছে।

আর কোন প্রশ্ন করবার আগেই কুণ্ঠিত কণ্ঠে অপরাধীর মত সুমিতা বললে, 'প্লেনটা মিডল ইস্টে যাচ্ছিল!' ধীরে বুকিং লিস্টটা ভাঁজ করে একধারে সরিয়ে রাখলে।

গোমূশ্ রুষ্ট কণ্ঠে বললে, 'এগেন দি ট্রেচারাস স্কাই হ্যাজ্ ইট! ব্ল্যাক্, আগ্লি, সোয়াইন!'

কিন্তু মেঘনাদ এয়ার ট্রাভেল এজেন্টস্ অফিসের বাইরে পরিষ্কার রোদে আকাশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
মূল্য তিন টাকা
[স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড]
শ্রী রামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতের গৃহিনীরা চিনতেন গাছগাছড়া

যাহা চুল ওঠা বন্ধ করে

চুল পাতলা হওয়া, মরামাস জমা, স্থানে স্থানে টাক পড়া—চুল পড়ে যাওয়ার এই সব লক্ষণে ভারতের মহিলারা তাঁদের নিজেদের ঘরে তৈরী ভেষজ কেশতৈল ব্যবহারে প্রায়ই বেশ সুফল পেতেন।

এখন এইরূপ ভেষজ কেশতৈল তৈরীর পদ্ধতি প্রায় লুপ্ত হয়েছে।

অবশ্য কেয়ো-কার্পিনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত এমন একটি ভেষজ তৈল পাওয়া যায় যাতে ঘন ও সুন্দর চুল জন্মাবার ও মাথা ঠাণ্ডা রাখবার সব উপাদানই আছে।

Keo-Karpin

মনোরম গন্ধযুক্ত

কেয়ো-কার্পিন

সুষ্ঠতর কেশচর্চ্চার জন্য ফলপ্রদ ভেষজ কেশতৈল
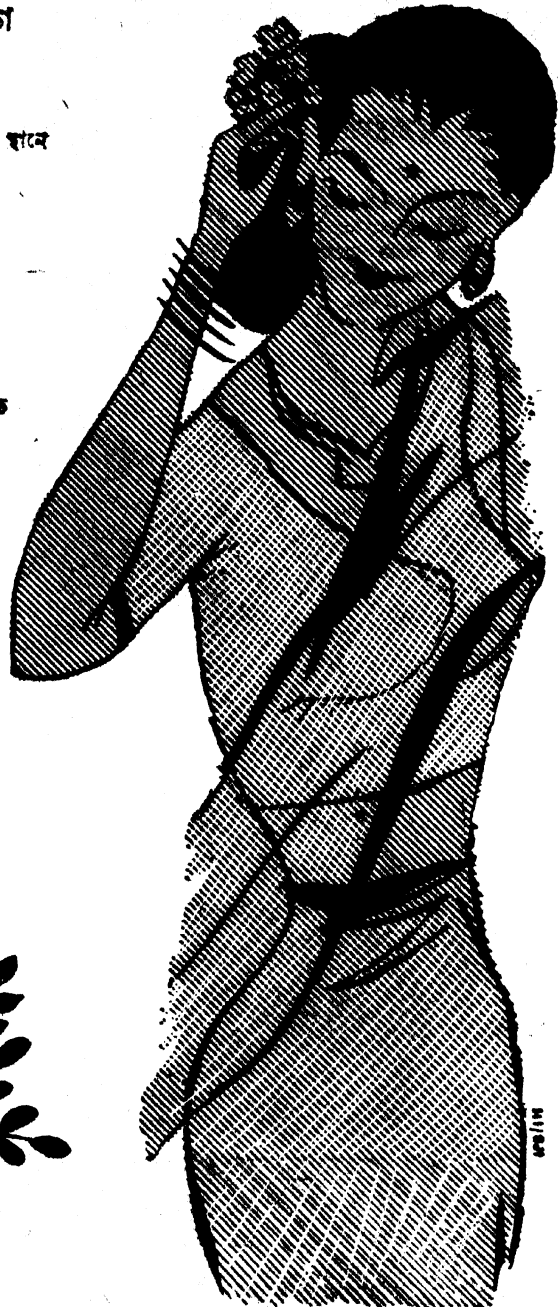
ডেজ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা • বম্বে • দিল্লী • মাদ্রাজ • পাটনা • গৌহাটি • কটক

সূচীপত্র

Cooch Behar

Just Out *New Book*

SPIRITUAL TEACHINGS OF SWAMI ABHEDANANDA Rs. 3|-

Shortly published New Book.

A HISTORY OF INDIAN MUSIC, Pt.I., Rs. 8|-
by
Swami Prajnanananda

SOME WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Title		Price
Mystery of Death	..	8 50
Life Beyond Death	..	7 00
True Psychology	..	6 00
Science of Psychic Phenomena	..	4 00
Attitude of Vedanta towards Religion	..	6 50
Philosophy & Religion	..	6 50
How to be a Yogi	..	5 00
Self-Knowledge	..	4 00
Reincarnation	..	2 00
Great Saviours of the World	..	8 00
Memoirs of Sri Ramakrishna	..	7 50
The Sayings of Sri Ramakrishna	..	3 00
Divine Heritage of Man	..	4 00
Swami Vivekananda and his Work	..	1 00
Doctrine of Karma	..	3 00
Yoga Psychology	..	10 00
The Vedanta Philosophy	..	3 00
Songs Divine	..	2 00
Spiritual Unfoldment	..	2 00
Ideal of Education	..	1 00
Human Affection and Divine Love	..	1 50
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	..	1 00
Religion of the Twentieth Century	..	0 75
Christian Science and Vedanta	..	0 75
Woman's Place in Hindu Religion	..	0 75

॥ স্বামী অভেদানন্দ ॥

প্রামাণ্য এই জীবনটি আমরা প্রতিটি ভক্ত ও জ্ঞানলিপ্সুকে পড়ার জন্য অনুরোধ জানাই। মূল্য: দেড় টাকা মাত্র।

॥ স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত ॥

মরণের পরে: লোকান্তরে সূক্ষ্মশরীরের আত্মার অস্তিত্ব থাকে—ইহা ই স্বামীজীর প্রতিপাদ্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে। বহু চিত্র সম্বলিত। মূল্য:—৫্।

পুনর্জন্মবাদ: বৈজ্ঞানিকের সুতীক্ষ্ন, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধিৎসা এবং যোগীর উপলব্ধি এই উভয় দিক হইতে বিচার করিয়া তত্ত্বদর্শী স্বামীজী আত্মার অস্তিত্ব ও অমরত্বের কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য: ২্।

যোগশিক্ষা: যোগ কি, হঠযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং বিশেষ করিয়া প্রাণায়াম প্রণালী বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা আলোচিত হইয়াছে। মূল্য: ২·৫০।

আত্মজ্ঞান: অমরত্ব ও আত্মা—প্রাণ, প্রজ্ঞা, জড় ও চৈতন্য—উপনিষদের যম ও নচিকেতা, গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্য ইন্দ্র ও বিরোচন—আত্মতত্ত্ব বিচার সগুণ ও নির্গুন ব্রহ্মের স্বরূপ—আধ্যাত্মিকা ও সর্বোপরি আত্মানুভূতির স্বরূপ কি? —এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। মূল্য: ২্।

শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম: শিক্ষার যথার্থ রূপ ও রহস্য, সমাজ কি ভাবে চলিলে দেশ, দশ ও জাতির কল্যাণ হইবে এবং 'ধর্ম' বলিতে প্রকৃত কি বুঝায় তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। মূল্য: ৪্।

আত্মবিকাশ: সরল ও সাবলীল ভাষায় আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য: ২্।

স্বামী বিবেকানন্দ: স্বামী বিবেকানন্দের গৌরবদীপ্ত ও বিস্ময়কর কর্মময় জীবনের প্রাণস্পর্শী বর্ণনা। মূল্য: ৫০ নঃ পঃ।

ভারতীয় সংস্কৃতি: ভারতবর্ষের শিক্ষাদীক্ষা, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ, সকল কিছুর খুঁটিনাটির বিবরণ। তৃতীয় নূতন মূল্য: ৬্।

মনের বিচিত্র রূপ: মনের সকল গোপন রহস্য প্রকাশ করিয়া শান্তি লাভের সন্ধান আছে গ্রন্থটিতে। মূল্য: তিন টাকা।

স্তোত্ররত্নাকর: শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীসারদাদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত সংস্কৃত স্তোত্র ও পদ্যে তাদের বঙ্গানুবাদ। **শাস্ত্রসঙ্গত** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের, শ্রীমা ও শ্রীগুরুর দৈনিক ও বিশেষ পূজা-পদ্ধতি এবং হোমসহ। মূল্য: ২।

হিন্দুনারী: শিক্ষা—ধর্মে ও বেদে নারীজাতির অধিকার—নারীজাতির উপনয়ন—নারীজাতির প্রব্রজ্যা ও ধর্মপ্রচার হিন্দুসমাজে বিবাহ-বিধি—রাষ্ট্রে ও সমাজে নারীর অধিকার — সাহিত্যে ও সমাজে অবদান—নারীজাতির প্রতি সমাজ ও শাস্ত্রের শ্রদ্ধা — সতীদাহ বৈদিক কিনা প্রভৃতি বিষয়ে এবং বর্তমান যুগে নারী-শিক্ষা কি প্রকার হওয়া উচিত স্বামিজী তাহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য: ৩·৫০।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

মন ও মানুষ
স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনের ঘটনা ও বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। স্বামী অভেদানন্দের জীবনী, গভীর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন চিন্তাধারার সমাবেশ। বিভিন্ন ছবি সংবলিত ৪৫০ পৃষ্ঠা ডিমাই। মূল্য: ৭্

অভেদানন্দ-দর্শন—স্বামী অভেদানন্দের দার্শনিক দার্শনিক মতবাদের তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত আলোচনা। মূল্য: ৮্

তীর্থরেণু—স্বামী অভেদানন্দের ক্লাশ-লেকচার তাঁর দার্শনিক মতে পরিচিতি। মূল্য: ৬্

শ্রীদুর্গা—(ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা)। মূল্য: ৩·৫০

রাগ ও রূপ—প্রথম ভাগ
পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রাগরাগিণীদের প্রাচীন ও বর্তমান রূপের বিস্তৃত পরিচয়। ধ্যান ও রাগমালা-চিত্র সম্বলিত। মূল্য: ১২্

দ্বিতীয় ভাগে আলোচিত হয়েছে
রাগরূপের অর্থ—উত্তর ভারতীয় সংগীত-পদ্ধতির কতকগুলি রাগের পরিচয়—কর্ণাটকী সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও গোবিন্দাচার্য ও বেংকটমখী প্রদর্শিত ৭২ ঠাটের রাগ-পরিচয় প্রভৃতি। রয়েল সাইজ, মূল্য: ১০্

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস
(সংগীত ও সংস্কৃতি)
(১ম ভাগ পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ)।
॥ পূর্বার্ধ ॥ বৈদিক যুগ। আসিম ও প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস। ছবি ও গ্রন্থপঞ্জী সম্বলিত।
॥ উত্তরার্ধ ॥ ক্লাসিক্যাল যুগ। খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত। আড়াই শতাধিক চিত্র-সম্বলিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য: ১০

Philosophy of Progress and Perfection
Rs. 8|-

CHRIST THE SAVIOUR : Rs. 2|-

Sangitasara-samgraha (critically Edited, with an Introduction by. Swami Prajnanananda) .. .. Rs 7.50

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদা দেবী সম্বন্ধীয় যাবতীয় বই এবং স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর ও সন্ন্যাসিবৃন্দের লিখিত যাবতীয় ইংরাজী ও বাংলা বই, ছবি ও ফটো পাওয়া যায়।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় লেখক	পৃষ্ঠা

মনে রাখবেন, 'মাজদা ল্যাম্পস্ অনেক বেশী উজ্জ্বল ও টেকসই'
MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA
একটি
AEI
উৎপাদন

যে-কোন সময়ে...
যে-কোন স্থানে...
যে-কোন অনুষ্ঠানে
আপনাকে সব চাইতে ভাল মানাবে
খাটাউ
ভয়েল-এ

ওড়িশার পট

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী

সুহাস দের সৌজন্যে

প্রচণ্ডদৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

ব্লক ও মুদ্রণ : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

* মাতৃপূজা *

বাঙালীর ঘরে মা আসিতেছেন। কেমন আমাদের এই মা? অগ্নিময়ী মা আমাদের। অগ্নিবর্ণা তিনি। জ্বলদগ্নি-জ্বালামালার মেখলায় মায়ের খেলা। সন্তানের জন্য তাপে মায়ের তপস্যা। এই তপঃ-প্রভাবে জ্বালাময়ী মায়ের ভাবে ডুব দিতে পারিলে তবে দেখা যায় মায়ের রূপ। প্রত্যক্ষতার এই বলই পরম বল। নহিলে সন্তানের অবীর্য দূর হয় না। মায়ের ছেলে যদি হইতে চাও তবে সন্তানের তাপে জননীর দীপ্ত এবং তপ্ত অগ্নিময় চিন্ময় বিগ্রহটি দেখিয়া লও। যদি মায়ের পূজা করিতে চাও মাতৃ-প্রেমের সন্তাপ-প্রভাবে তোমাদের প্রতি অঙ্গ জ্বালাইয়া তোল। দেবগণ তেমনভাবেই মায়ের পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নন্দনোদ্ভব কুসুমে করিয়াছিলেন মায়ের অর্চনা। অহিংসা সে পুষ্প, সে পুষ্প ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সে পুষ্প ক্ষমা, সৌহার্দ, সে পুষ্প প্রীতি। তাঁহারা দিব্যধূপে তাঁহার আরতি করিয়াছিলেন, দিব্যগন্ধে তাঁহার চরণে অর্ঘ্যোপচার প্রদান করিয়াছিলেন। অন্তরের সমগ্র শ্রদ্ধা লইয়া মায়ের পূজায় অগ্রসর হও। জাগিয়া ওঠ—যাও, ছুটিয়া যাও মায়ের টানে প্রাণের দানে। মায়ের আর্ত, পীড়িত, অসহায়, দুর্গত সন্তানদের দুঃখ দূর কর। তাহাদের অশ্রু মুছাইবার জন্য তোমাদের সর্বস্ব সমর্পণ কর। দুর্গতিহারিণী দুর্গা জাগিবেন। তাঁহার পদভরে পৃথিবী কাঁপিবে, ভূধর টলিবে, সপ্ত সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। অসুরের দল বিমর্দিত হইবে। দিক্‌চক্রবাল আঁধার হইতে মুক্ত হইবে। চারিদিকে ফুটিবে আলো। ইন্দুনিভাননী জননী আনন্দময়ী রূপে জাগিবেন। সন্তানকে কোলে বুকে করিয়া মায়ের মুখে হাসি ফুটিবে। দেবগণ জয়ধ্বনি করিবেন। বিশ্বজগৎ তোমাদের মায়ের জয়গান করিবে। তোমাদের মাতৃ-পূজা সার্থক হইবে।

মহাস্থবির

(চতুর্থ পর্ব থেকে)

আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে বোম্বাই শহর ছিল অন্যরকম। এই সময়ের মধ্যে তার আঙ্গিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তন যা হয়েছে তা দেখে সে সময়ে কি ছিল তার আন্দাজ করা যাবে না। সে সম্বন্ধে কিছু বললে হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আজ যেখানে মেরিন ড্রাইভের চওড়া রাস্তা ও প্রাসাদের মত বড় বড় বাড়ি দেখা যাচ্ছে সে সব জায়গা ছিল সমুদ্রগর্ভে। এত নাম-করা ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়াম—তাও ছিল জলের মধ্যে। বাড়ি-ঘরের এমন বাহার ছিল না বললেই হয়। বড় বড় পাঁচতলা ছ'তলা হেলে-পড়া বাড়ি। মাথায় খোলার চাল। সেগুলোকে বলা হতো চোল। তাতে সব রকমেরই লোক অসংখ্য বাস করত। হিন্দুরা প্রকাশ্যে মাছ-মাংস খেত না, তা তিনি মহারাষ্ট্রীয়ই হন বা গুজরাটীই হন। কোনো হিন্দু ইরাণীর দোকানে ঢুকত না।

তখনকার দিনে বোম্বাই শহরে হামেশাই এখানে সেখানে আগুন লাগত। মাথায় টুপি-বিহীন লোক রাস্তায় চলতে দেখলে লোকেরা দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে থাকত। আমাদের মাথায় টুপি নেই দেখে কতবার যে পুলিস-কনস্টেবল্ ধরে নিয়ে গিয়েছে থানায় তার ঠিকানা নেই। আরো কত বলব।

আমরা একবার শুনলুম—কোনো বিশেষ একটি চৌলে একজন বাঙালী ভদ্রলোক থাকেন। তিনি এখানে বড় চাকরি করেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত দয়ালু এবং কোনো বাঙালী সাহায্যপ্রার্থী হয়ে গেলে কখনো তাকে নিরাশ করেন না।

এমন দুর্লভ সংবাদ বহুদিন শুনিনি। রাত্রি পোয়াতে না পোয়াতে আমি আর পরিতোষ চললুম সেই বাড়ির উদ্দেশ্যে। শহরের এক কোণে হেলে-পড়া একটা চৌল—তারই পাঁচতলায় থাকেন ভদ্রলোক সপরিবারে। বাড়িটাতে গুজরাটী ভাড়াটেই বেশি। একতলায় দোকানপত্র আছে।

কোঁকাতে প্রতিটি শব্দের আদিবর্ণে একটি করে আনুনাসিক যোগ করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—কি জাত?

বললুম—আজ্ঞে, আমরা সচ্চাষী।

—দুই জনেই কি এক জাত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এ আমার মাসতুতো ভাই।

—রাঁধতে বাড়তে জানো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাল ভাত চচ্চড়ি—এই গেরস্ত বাড়ির রান্না।

—ব্যস! সোজা চ'লে যাও ঐ রান্না ঘরে। চাল-ডাল আছে। মশলা-পাতি বেটে নাও। বাড়ির কর্তা দশটায় আপিস যান। ওঁকে রোজ ঠিক সময়ে ভাত দিতে পারবে?

বললেন—দেখো, আমাদের সংসার ছোটো কিন্তু কাজ অনেক। রান্না-করা বাসন-মাজা ঘর ঝাঁট-দেওয়া। সব এখন মনে পড়ছে না—সব কাজই করতে হবে। খাবে দাবে আর ঐখানে বিছানা করে শুয়ে থাকবে। মাইনের নামটি কোরো না। বুঝলে?

বুঝলুম এবং বুঝে ফিরে যাচ্ছিলুম এমন সময় গিন্নী আবার চ্যাঁ চ্যাঁ করে জিজ্ঞাসা করলেন—কি নাম?

বললুম—আমার নাম প্রফুল্ল ঘোষ আর এর নাম বিশ্বনাথ সুর।

বন্ধু পরিতোষ নির্বিকার। সে তখন কানে একেবারেই শোনে না। এই নামের
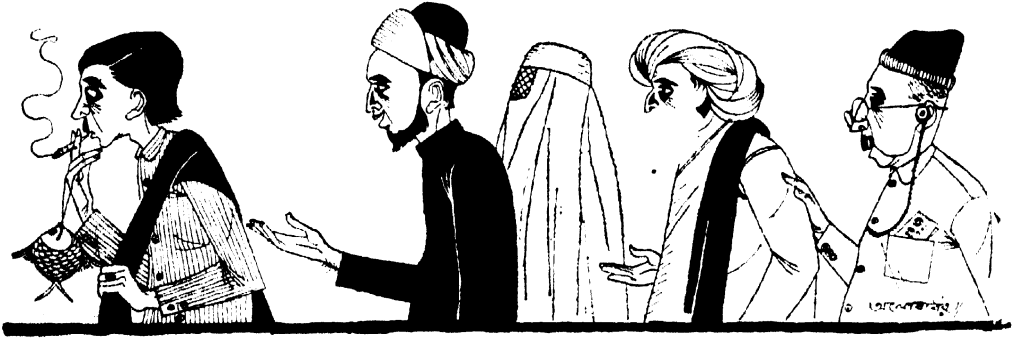
মাথায় টুপিবিহীন লোক রাস্তায় চলতে দেখলে লোকেরা দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে থাকত

জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে পাঁচতলায় গিয়ে উঠলুম। দরজাটা খোলা ছিল। উঁকি মেরে দেখলুম দূরে একটা ঘরে বোধহয় একখানা সাপ্তাহিক বসুমতী পেতে তার ওপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে ভদ্রলোক কাগজখানা পড়ছেন।

আমরা দুজনে হা-পিত্যেশ করে সেইদিকে তাকিয়ে রইলুম। কালো রোগা লম্বা মতন চেহারা। হঠাৎ একবার মুখ তুলে আমাদের দিকে চোখ পড়তেই তক্তাপোশ ছেড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলতে লাগলেন—এসেছো বাবা! এই ছ'মাস হল দুটোকে বিদেয় করেছি। আবার দুই মূর্তি হাজির। দেশে কি দুর্ভিক্ষ লেগেছে? কোথায় বাড়ি?

আমরা বললুম—আজ্ঞে বর্ধমান জেলায় কাটোয়া সাবডিভিসনে।

এমন সময় কোন এক ঘর থেকে নারী-কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। ভদ্রলোক সেইখান থেকেই চেঁচিয়ে উত্তর দিলেন—আজকাল জোড়ায় জোড়ায় আসচে।

এবার নারীকণ্ঠ স্পষ্টতর হয়ে উঠল—কোথায়? দেখি—ইদিকে পাঠিয়ে দাও।

ভদ্রলোক বললেন—ঐ ঘরে যাও। গিন্নী ডাকছেন।

গুটি গুটি সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। একটি নারী—বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে। রঙ ফরসা। স্বাস্থ্যবতী বলেই মনে হল। কোঁকাতে

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পারব।

—তো ব্যস্—গিয়ে শুরু কর। অন্য কথা পরে হবে। আমাকে যখন হয় খেতে দিও।

ফ্ল্যাটের রান্নাঘর। বেশ গুছোনো। উনুনের জায়গা রান্নাঘরের মধ্যেই। কল, ছোট চৌবাচ্চা, কয়লা রাখবার জায়গা—সবই বেশ গুছোনো। আমরা কেরোসিন তেল যোগাড় করে তখুনি উনুনে আগুন ধরিয়ে দিলুম। বাড়ির গিন্নী তখনো শুয়ে। গিয়ে বললুম—মা, চাল-ডাল মশলা-পাতি কোথায় আছে?

—হতভাগারা সেই ওটাকে তবে ছাড়লে। ব'লে দশাসিনটি ধরে চেষ্টা করে উঠলেন। তারপর আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এসে চাল-ডাল তেল-নুন ইত্যাদি সব দেখিয়ে দিয়ে ক্যাঁকাতে ক্যাঁকাতে পাশেই চানের ঘরে মুখ ধুতে লাগলেন।

কাঠকয়লায় উনুন, ধরতে সময় লাগল না। চাল ধুয়ে চড়িয়ে দিয়ে মশলা-বাটা ও অন্যান্য কাজে মন দিলুম। গিন্নী ততক্ষণে আবার শুয়ে পড়েছেন। খানিকক্ষণ বাদে গিন্নীর গলার আওয়াজ শুনতে পেলুম। চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে বলছেন—এই—এই—এই—

কাছে গিয়ে দেখি কর্তাও সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে বললেন—ও কোথায় ডেকে নিয়ে এসো—

পরিতোষকে ডেকে আনলুম। কর্তা

সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এক-তলায় না গিয়ে আর উপায় নেই। তবে সে ছিল ইঙ্গিতজ্ঞ। দু'চারবার বিশে বিশে—বিশ্বনাথ বলে ডাকতেই নতুন নামকরণ বুঝতে পারল।

ওদিকে ভাত ফুটে গেল। আলোচাল একটু তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়। ডাল চাপিয়ে দেওয়া গেল, কাঁচামুগের ডাল। সে আর হাতে কঙ্কণ' ততক্ষণে কর্তা চানটান করে জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে, রান্না রেডী?

বললুম—আজ্ঞে রেডী। আপনি ঘরে বসুন, সেইখানেই নিয়ে যাচ্ছি।

—আচ্ছা।

কর্তা তাঁর কামরায় চলে গেলেন। ভাত বেড়ে বাটিতে ডাল আর গেলাসে জল নিয়ে ঘরে গেলুম। কর্তার দেখলুম এঁটো কিংবা সকড়ির বালাই নেই। তিনি তক্তপোষের ওপরে বসেই খেতে আরম্ভ করে দিলেন। প্রথম গ্রাস মুখে তুলেই তিনি বললেন—এতো বেড়ে রেঁধেছিস রে!

বললুম—আজ্ঞে, ঘরে কিছু নেই—রাঁধতে পারলুম না। আজকে বাজারে গিয়ে তরকারী আর ডাল কিনে নিয়ে আসবো।

কর্তা বললেন—বলিস কি? তরকারি রাঁধবি?

—আজ্ঞে, চেষ্টা করে দেখবো। দেখুনই না।

কর্তা কোট পরে বিড়ি ধরিয়ে গিন্নীর

ঘরে ঢুকে কি সব ব'লে আপিসে বেরিয়ে গেলেন। তিনি চলে যাবার পর রান্নাঘর গুছিয়ে দুজনে গিন্নীকে গিয়ে বললুম—মা, এখন কি খাবেন?

তিনি বললেন—না, চান করবো, মুখ ধোবো, আমার খেতে সেই বারোটা।

—তাহ'লে আমাদের কিছু পয়সা দিন, আমরা বাজার থেকে তরকারি কিনে নিয়ে আসি।

গিন্নী বললেন—তরকারি রাঁধতে পারবি তো? কিসের তরকারি রাঁধবি?

—আলু-পটলের ডালনা।

গিন্নী কপালে করাঘাত ক'রে বললেন—একি তোদের বর্ধমান পেয়েছিস? এদেশে কি পটল পাওয়া যায়?

—পটল না পাওয়া যায় অন্য তরকারি তো আছে!

গিন্নী মাথার তলা থেকে একটা টাকা বার ক'রে দিয়ে বললেন—যাবার সময় দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাস। আর দুজনে যাচ্ছিস—একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস।

বাজারে যেতে যেতে দুজনে পরামর্শ করা গেল। ভগবান্ যখন দিন দিয়েছেন তখন তার সদ্ব্যবহার করতে হবে, আবার কবে তিনি পথে দাঁড় করাবেন কিছুই তার ঠিক নেই। পথে দুজনে মিলে স্থির করলুম যে দৈনিকের নানান্ কাজে অন্ততঃ আট আনা পয়সা সরিয়ে রাখতে হবে।

সেদিন বাজার করে ফিরে গিন্নীকে খাইয়ে নিজেরা খেয়ে সারা দুপুর ধরে ঘর-দোর ঝেঁটিয়ে জিনিসপত্র ঝেড়ে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে ফেললুম। আমাদের কাজ দেখে গিন্নীর সদাক্লিষ্ট মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর সেদিন রাত্রে কর্তাগিন্নী আমাদের শস্তায় দম খেয়ে প্রাণখোলা হাসিখুশি হয়ে উঠলেন।

মোট কথা কদিনেই আমরা তাঁদের একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে তো উঠলুমই, তার সঙ্গে আমাদের ব্যাঙ্কও বেশ মোটা হ'তে লাগল।

আমাদের ভাগ্যদাতার মাত্র সদাজাগ্রত বিশ্বাস। ভদ্রলোক সেখানে একটা বিজ্ঞাপিত

• মন্থরগতিতে ট্রাম যাচ্ছে
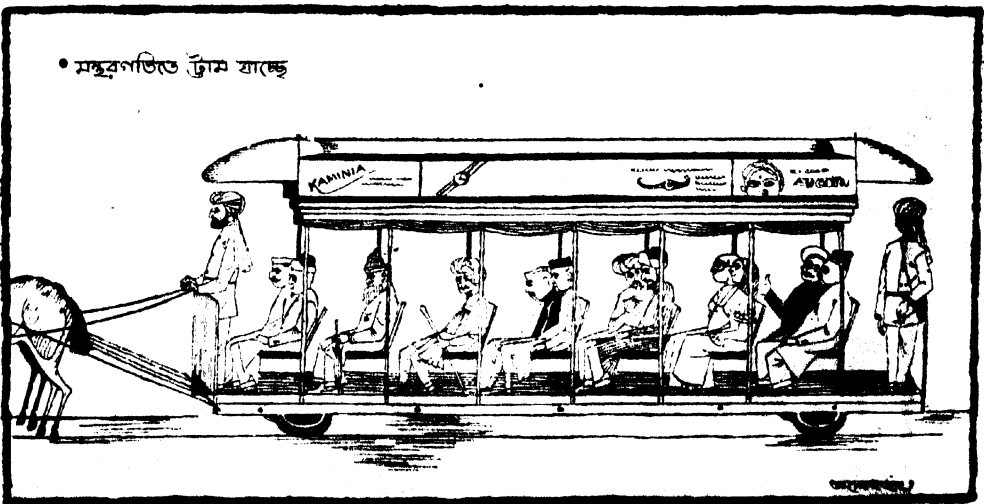
ওয়াদের আপিসে পাম্ফলেট লিখতেন। ইংরেজি বাংলা গুজরাটী মারাঠী ও হিন্দী ভাষায় তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। আপিসে বেশ মোটা মাইনে পেতেন। তাছাড়া ইন্সিওরেন্সের দালালি করতেন—তাতেও তাঁর ভালো রোজগার ছিল। ছুটির দিনে তাঁর আর নাইবার খাবার সময় থাকত না। কাপড়-চোপড়েরও কোনো বাবুয়ানি ছিল না। ধুতি কোট ও দুজোড়া জুতো ছিল তাঁর—যাতে কখনো কালি পড়ত না। আমরা এসে তার সংস্কার করলুম। দুটো পেন্টলান ছিল, বিশেষ বিশেষ দিনে সেগুলো পরতেন। সদানন্দ তাঁর নাম ছিল বটে, কিন্তু তিনি কেন জানি না সদাই নিরানন্দ থাকতেন। সন্ধ্যেবেলা বোতল-গেলাস নিয়ে বসতেন। এই সময়টা তাঁকে একটু প্রফুল্ল দেখতে পাওয়া যেত। তাঁর এই সান্ধ্য-আসরে গুজরাটী মারাঠী ও বাঙালী অনেকেই এসে জুটতেন। এই সব দিনে আমাদের অন্নদাতার প্রফুল্লতার মাত্রা একটু বেড়ে যেত।

এই আসরে একটি বাঙালী ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আসতেন এবং শ্যামাসংগীত গাইতেন। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর ছিল মধুর এবং গানগুলিও আমাদের ভালো লাগত। প্রত্যেক গানের আগে ভদ্রলোক "ম্যা ম্যা" বলে খানিকক্ষণ ভীষণ চেঁচাতেন। আমরা যে পরিবেশে জন্মেছিলুম সেখানে শ্যামা-সংগীতের বিশেষ প্রচলন ছিল না। বয়ো-বৃদ্ধির সংগে সংগে দেখেছি—শ্যামাসংগীত গাইবার আগে ঐরকম দু'চারবার "ম্যা ম্যা" বলে "চিক্কুর পাড়া"র রীতি আজও প্রচলিত আছে।

কর্তার এই সব সান্ধ্য-আসরের জন্য আমরা মাঝে মাঝে ইরাণীদের দোকান থেকে মাছ-মাংস কিনে এনে দিতুম। এই সব আহার্যে গিন্নীও বঞ্চিত হতেন না। মৎস-মাংসে তো বটেই—নিষিদ্ধ মাংসেও তাঁর অরুচি ছিল না।

আমাদের এই রকম কর্তাভজা ভাব দেখে মনিব-মশাই খুশী হয়ে প্রথম মাসেই আমাদের দু'টাকা ক'রে মাইনে ঠিক করে দিলেন। হোটেলে কাজ করবার সময় সকাল দশটা অবধি স্টেশনে থাকতে হতো—তারপর

সারাদিন ছিল ছুটি। এই অবসরের অধিকাংশ সময়ই আমরা রান্নাঘরে কাটাতুম। হোটেলে দু'বেলা কিমা রান্না হতো এবং এই বস্তুটি আমাদের খুবই প্রিয় ছিল। রান্না দেখে দেখে আমরাও কিমা তৈরি করতে শিখে-ছিলুম।

একদিন গিন্নীর কাছে কিমা রাঁধবার প্রস্তাব করে ফেললুম। গিন্নী তো প্রথমে শুনেই শিউরে উঠলেন এবং বললেন—ওরে বাবা, এ বাড়িতে এসব চলবে না।

আমরা বললুম— কেউ টের পাবে না, কিছুই গন্ধ বেরুবে না।

কর্তা আমাদের প্রস্তাব শুনে নিমরাজি হ'য়ে গেলেন। ব্যস, আর যায় কোথায়! একদিন কর্তাগিন্নীকে না জানিয়ে আমরা বোম্বাই এক সের অর্থাৎ আটাশ তোলা কিমা এনে দুপুরবেলা চড়িয়ে দিলুম।

সেদিন রাত্রে কিমা খেয়ে কর্তাগিন্নী যেমন অবাক হ'লেন তেমনি খুশীও হ'লেন। সেই থেকে কর্তাগিন্নীকে হঠাৎ অবাক এবং খুশী করে দেবার ইচ্ছে আমা-দের মনের মধ্যে জমা হতে লাগল। বোম্বাই শহরকে মাছের দেশ বললেই চলে। সেখান-কার বিখ্যাত মাছ—চাঁদামাছ যিনি পমফ্রেট নামে সর্বদেশাবিদিত এবং যেমন সুস্বাদু তেমনি অপর্যাপ্ত। তা ছাড়া ইলিশ চিংড়ি ইত্যাদিও প্রচুর পাওয়া যায়। ইরানীর দোকানে চাঁদামাছগুলোকে সেদ্ধ ক'রে এক-রকম নরম ক'রে ভাজে। তাই খাবার জন্যে সন্ধ্যের পর মাতালের দল সেখানে ভীড় জমায়। এইখান থেকে চাঁদা মাছ মধ্যে মধ্যে নিয়ে খাওয়া হতো বটে, কিন্তু আমাদের বাঙালীর জিহ্বা তাতে পরিতৃপ্ত হতো না। বেশ করে প্যাঁজ আর কাঁচা লংকা দিয়ে চাঁদামাছের তেল-ঝোল খাবার বাসনা মনের মধ্যে প্রায়ই গর্জে উঠত। একদিন কর্তা-মশায়ের কাছে এই মাছ নিয়ে আসবার প্রস্তাবও ক'রে ফেললুম। কর্তা তো শুনে লাফিয়ে উঠে বললেন—না, না—অমন কাজও করিসনি। এই ফ্ল্যাট ভাড়া নেবার সময় আমাকে মুচলেকা দিতে হয়েছে—এখানে কখনো মাছ ঢুকবে না। যদি ধরা পড়ি তো তৎক্ষণাৎ এ বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে।

ওখানকার কোন এক শেঠ সস্তায় গরিব নিরামিষভোজীরা যাতে থাকতে পারে সেই-জন্যে এই বাড়ি ঠিক করেছেন এবং নামমাত্র ভাড়ায় তাদের বাস করতে দেন। কাঁচালংকা দিয়ে চাঁদামাছ খাবার বাসনা তাই পরিত্যাগ করতেই হল।

সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যেই কর্তামশাই খেয়ে দেয়ে আপিসে চলে যেতেন। আমরা ইদিক-উদিক একটু আধটু কাজ শেষ করে ফেলতুম। গিন্নী শুয়ে গড়িয়ে এগারোটা সাড়ে-এগারোটার সময় উঠে স্নান ক'রে খেয়ে-দেয়ে আবার ক্যাঁকাতে ক্যাঁকাতে বিছানা নিতেন।
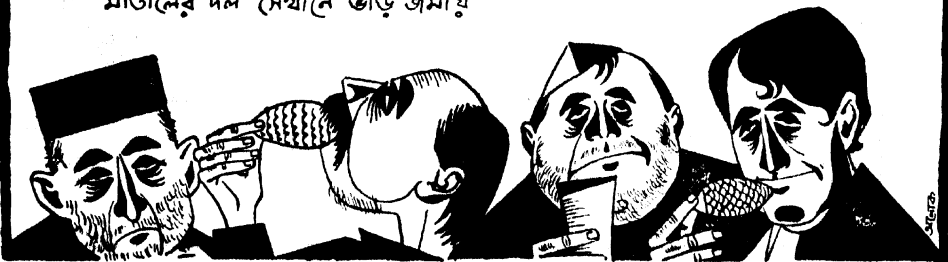
সারা দুপুরে কিছু করবার নেই। পরিতোষের সঙ্গে যে একটু গল্প করব তার উপায় নেই, কারণ তিনি ছোটকথা বড় একটা কানে তুলতে চান না। বাড়িতে একখানা সাপ্তাহিক বাংলা কাগজ আসত সেটা পড়বার ইচ্ছা হতো বটে, কিন্তু চাকরে খবরের কাগজ পড়ছে—এ দৃশ্য মনিবেরা সহ্য করতে পারবে কিনা সন্দেহ হতো। কাজেই সে সময়টা আমি খুঁটিনাটি কাজ করে বেড়াতুম।

সেদিন কি একটা কাজে দুপুরবেলা গিন্নীর ঘরে ঢুকে পড়েছিলুম; এ সময়টা তিনি প্রায়ই নিদ্রাগত হতেন। সেদিনে ঘরে যেতেই তিনি চোখ থেকে হাতখানা নাবিয়ে ফেললেন। দেখলুম তাঁর দুই চোখ থেকে অশ্রুধারা বয়ে চলেছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—একি মা! আপনি কাঁদছেন কেন?

তিনি কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে তুই গাঁজার দোকান চিনিস?

ভাবলুম—কি সর্বনাশ! গাঁজা দিয়ে কি হবে? কর্তা সন্ধ্যাবেলা মাল টানেন, গিন্নী কি দুপুরবেলা গাঁজা টানবেন? জিজ্ঞাসা করলুম—গাঁজা দিয়ে কি হবে মা?

তিনি বললেন—গাঁজার দোকানে আপিং বিক্রি হয় না! আমি তোকে দশটা টাকা দিচ্ছি, তুই আমায় এক ভরি আপিং কিনে এনে দে। বাকি টাকা তুই নিয়ে নে।

—আপিং দিয়ে কি হবে মা?

ভদ্রমহিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না—আমি আপিং খেয়ে মরব।

একবার মনে হল এক দৌড়ে এখান থেকে পালিয়ে যাই। ভদ্রমহিলা বলে চললেন—এই নির্বান্ধব পুরীতে সমস্ত জীবন ধরে এই যন্ত্রণা সহ্য করা যে কি পাপ, তা আর কি বলব! আমি জিজ্ঞাসা করলুম—গরম জলের সেঁক-টেঁক দিলে আরাম হয়?

গিন্নী বললেন—তা কখনো দিয়ে দেখিনি। তুই গরম জল করে দিতে পারিস?

কর্তার প্রসাদে বাড়িতে বোতলের অভাব ছিল না। তখুনি একটা বোতল ধুয়ে গরম জল করে বোতলের চারদিকে ন্যাকড়া দিয়ে মুড়ে গিন্নীর হাতে দিলুম। গিন্নী কাঁদতে কাঁদতে বোতলটা আমার হাত থেকে নিয়ে আমার সামনেই বোতলটা চেপে ধরলেন।

বললুম—রোগ পুষে রেখে লাভ কি মা! ডাক্তার ডেকে চিকিচ্ছে করান।

তিনি বললেন—দুবার হাসপাতালে গিয়েছিলুম। সেখানে সব পুরুষ ডাক্তার।

বললুম—সেখানে মেয়ে ডাক্তারও আছে।

তিনি বললেন—হ্যাঁ, তারা দেখেছে, কিন্তু শেষকালে পুরুষ ডাক্তারে দেখবে। তারা বলে দিয়েছে অস্ত্র করাতে হবে। আর পুরুষ ডাক্তারে অস্ত্র করবে! পুরুষ ডাক্তার দিয়ে দেখানোর চেয়েও এই যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে মরে যাওয়াই শ্রেয়।

কর্তা যে ঘরে থাকতেন, সে ঘরে রাস্তার

"ম্যা ম্যা" বলে খানিকক্ষণ ভীষণ চেঁচাতেন

দিকে একটা জানলা ছিল। মাঝে মাঝে দুপুরবেলা আমি সেই জানলার ধারে গিয়ে বসতুম। নিচে বিপুল জনস্রোত বয়ে চলেছে—বোম্বাই শহরে কোনো জায়গায় ভিড়ের কমতি নেই। অত উঁচু থেকে লোকগুলোকে দেখে মনে হতো কত ছোট। তারই ভেতর দিয়ে বিরাট সরীসৃপের মত মন্থরগতিতে ট্রাম যাচ্ছে। এই সব রাস্তায় ট্রামের গতি একেবারে বাঁধা!

দেখতে দেখতে বাইরের চিন্তা চলে যেত। নিজের মনে ভাবতে থাকতুম—এই বাড়িতে প্রায় পঞ্চাশটা ফ্ল্যাট আছে; প্রত্যেক ফ্ল্যাটেই একটা করে পরিবার। বিচিত্র তাদের সুখ-দুঃখের ইতিহাস। প্রত্যেক লোকেরই মনস্তত্ত্ব ভিন্ন। আমরা আজ যে পরিবারে আশ্রয় পেয়েছি তাদের কথা ভাবতুম।

কর্তাগিন্নীর এই সংসারে কেউ নেই।

নির্গয়েই তিনি দেহরক্ষা করবেন

কর্তার ইচ্ছা কাজকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে স্বামী-স্ত্রীতে কাশীতে গিয়ে বাস করবেন। গিন্নীর ইচ্ছা—অন্তত তিনি যা প্রকাশ করতেন—মৃত্যু এসে এখুনি তাঁকে গ্রাস করুক এবং কর্তা আর একটি বিবাহ করে সুখী হোন।

সংসারের চেহারা আমার চোখে দিনদিনই অন্য রূপ ধারণ করছিল। যে নেশার ঘোরে আমি সংসারকে দেখতুম ক্রমেই সেই নেশা কেটে যাচ্ছিল। আগে আমি এই দুনিয়াকে নিজের মনের মতন করে দেখতুম—সেটা ছিল আমার মনে পৃথিবীর ভাবমূর্তি। নেশা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নগ্ন চেহারা আমার চোখে ফুটে উঠত। বেশ বুঝতে পারছিলুম, অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা রূপকথাতেই থাকে, সংসারের কোথাও তার অস্তিত্ব নেই। কোনো বড় ব্যবসাদারের চোখে পড়ে গিয়ে তার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠে ভবিষ্যতে সেই ব্যবসার মালিক হয়ে ওঠা—ঐ আত্মজীবনীতেই পাওয়া যায়। বাস্তবে দেখতে লাগলুম—দেবার প্রবৃত্তি তাদের মধ্যেই প্রবল যাদের মধ্যে দেবার কিছু নেই! আর যাদের দেবার যথেষ্ট আছে নেবার প্রবৃত্তিই তাদের মধ্যে প্রবল। সংসারে রাজকন্যা ও রাজত্ব তো দূরের কথা একমুঠি ভিক্ষান্নও পাওয়া মুশকিল। চিন্তা হতো, যে বয়সে মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি তৈরি হয় সে বয়েস তো হেলায় ফুঁকে দিলুম। এখন কী করব! চিরকালই কি রান্না করে ও ঘর ঝাঁট দিয়েই জীবন কাটবে! তখন বুঝতে পারিনি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি সেই অবস্থাতেই গড়ে উঠছিল।

বাড়ির আত্মীয়স্বজন ও গুরুজনদের কথা মত এবং ইচ্ছা মত নিজেকে তৈরি করবার শপথ কতবার মনে মনে করেছি। কিন্তু কিছুতেই তা পারি নি। কী এক অদ্ভুত শক্তি আমাকে ঘরছাড়া করে বাইরের জনসমুদ্রে এনে ফেলত; এই শক্তিই আমার জীবনকে গড়ে তুলেছে তার মনের মতন করে। এই শক্তিকে আমি নিজের মনে যত স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি অন্য কেউ তা পেরেছে কি না তা জানি না।

মাঝে মাঝে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দারুন দুর্ভাবনা এই শক্তিকে চাপা দিত। একদিন পরিতোষের সঙ্গে পরামর্শ করে ভাই আগ্রার সত্যদাকে আমাদের বর্তমান জীবনের কথা লিখে পাঠালুম এবং তিনি আমাদের এই পংক থেকে উদ্ধার করবেন এই আশাও জানালুম।

ওদিকে আমাদের গ্যাঁড়াব্যাংক বেশ স্ফীত হয়ে উঠছিল। তিন মাস সময়ের মধ্যে প্রায় শতখানেক টাকা আমরা জমিয়ে ফেলেছিলুম।

কিছুদিন থেকে কর্তা ও গিন্নী দুজনের মুখেই শুনছিলুম যে, কর্তা তিন চারটে বড় বড় মক্কেল ধরেছেন এবং তাদের দিয়ে অনেক টাকা জীবনবীমা করাবার চেষ্টা

করছেন; যদি খেলিয়ে তুলতে পারেন, তবে কয়েক হাজার টাকা এখখুনি পাওয়া যাবে এবং পঁচিশ বছর ধরে মাসে মাসে বেশ মোটা রকমের আমদানি হবে। এই সব কাজে কর্তা-মশাই ইদানীং খুবই ব্যস্ত থাকতেন।

ইতিমধ্যে একদিন তিনি ঘোষণা করলেন, হরিদ্বার থেকে তাঁর গুরুদেব শীগগিরই আসছেন। লছমন ঝোলার পারে হিমালয় পাহাড়ে তাঁর আস্তানা—স্বর্গদ্বারে। হরিদ্বারেই তাঁর আস্তানা আছে। গুরুদেবের না কি অনেক বয়স হয়েছে। সে প্রায় দু'শোর কাছাকাছি। শীগগিরই তিনি দেহরক্ষা করবেন। তার আগে একবার নানান দেশ পরিভ্রমণ করছেন।

গুরুদেব সম্বন্ধে আমরা অনেক আজগুবী খবর শুনতে লাগলাম। ইতিমধ্যে তিনি একদিন স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। কর্তা নিজে গিয়ে তাঁকে স্টেশন থেকে নিয়ে এলেন।

ছোটখাট্ট মানুষটি, মাথায় সামান্য জটা চুড়ো করে বাঁধা। গায়ে নতুন মার্কিনের ছোট্টো একটা চাদর, কোমর থেকে হাঁটু অবধি নতুন কাপড়ে ঢাকা। শুনলুম গুরুদেব সাধারণত নেংটিই পরে থাকেন, জনসমাজে এলে ঐ রকম বেশ ধারণ করেন।

গুরুদেবের সঙ্গেই তাঁর একজন চেলা ছিল। চেলার বয়স অল্প। এই একুশ-বাইশ বছর হবে। মাথায় লাল লাল লম্বা লম্বা চুল। মনে হয় যেন মেহেদী-মাখানো হয়েছে। অল্প দাড়ি, দেহ রোগা।

কর্তা যে ঘরটায় থাকতেন, তার পাশে একটা ঘর ছিল। সেই ঘরে আগে থাকতে গুরুদেবের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কম্বলপাতা, বালিশ আনা ইত্যাদি সব তৈরি। গুরুদেব এসে অঙ্গ ও কটি থেকে নতুন বস্ত্র খুলে ফেলে কম্বলে বসে পড়লেন। একটু বারান্দা মত জায়গায় আমরা থাকতুম। তারই এক-পাশে চেলার থাকবার ব্যবস্থা হল এবং তারই এক কোণে ইঁট দিয়ে উনুন তৈরি করিয়ে গুরুদেবের রান্নার ব্যবস্থা করা হল।

ভারতবর্ষে তখনো সন্ন্যাসীর ছিল একটা বিপুল আকর্ষণ। সন্ন্যাসীর আগমন সংবাদ পেয়ে দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করল। তাদের সব পরে আসতে বলে তখনকার মতো তাড়িয়ে দেওয়া হল, কিন্তু বিকেল থেকে মেয়েদের আগমন আর বন্ধ করা গেল না।

অধিকাংশই গুজরাটী মহিলা। এসেই লম্বা হ'য়ে প্রণাম করেই বসে পড়ে। সন্ন্যাসী গুজরাটী ভাষা জানেন না, তারাও

হিন্দী ভাষা এক বর্ণও বুঝতে পারে না। সন্ন্যাসী মাতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করে উপদেশ দেন। তারাও ঘাড় নেড়ে এমন ভাব দেখায় যেন সবই বুঝতে পেরেছে। এই সব মহিলাদের অধিকাংশই এই বাড়িরই অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। সন্ন্যাসী দেখার পর্ব শেষ করে পুরুষেরা যেমন বাইরে বেরিয়ে যেতেন নারীরা কখনো তেমন করতেন না। তাঁদের কৌতূহল প্রবল। এই ঘরে কে শোয়, সন্ন্যাসী কি খান, কর্তা একলা শোয় কেন, বাড়ির গিন্নী কোথায় ইত্যাদি বলতে বলতে গিন্নীর ঘরে ঢুকে গেলেন। দুই পক্ষেই কথা চলতে লাগল—এ গুজরাটীতে ও বাংলায়; কেউই কারুর ভাষা জানে না—উত্তর-প্রত্যুত্তর চলতে লাগল। ঐ ফাঁকেই এক ঝলক উঁকি মেরে রান্না ঘরের বৃত্তান্ত সব জেনে নিয়ে বাথরুমটাও দেখা হয়ে গেল। এই রকম প্রায় রাত্রি দশটা অবধি চলতে লাগল।

সন্ন্যাসী আহার অতি স্বল্পই করতেন। সকালবেলায় এক পেয়ালা দুধ প্রায় আধ-ঘণ্টা ধরে ধীরে ধীরে পান করতেন। তাঁর জন্যে একটা নতুন বাটলোই এসেছিল, তাইতে বিকেলবেলায় আশি তোলার এক সের মোষের দুধ জ্বাল দেওয়া হতো। রাত্রি প্রায় দশটার সময় একখানি রুটি দিয়ে তিনি সেই দুধটুকু পান করতেন। চেলামহারাজকে রোজ সিধে দেওয়া হতো। ডাল আটা ঘি তরকারি।

সন্ন্যাসী রোজ বিকেলবেলা একটা বড় মার্বেলের আকারে হালুয়া খেতেন। একটা টিনের মধ্যে হালুয়া জমা করা থাকত, চেলা এসে খাইয়ে যেত। একদিন আমরা দুজনে সেখানে উপস্থিত ছিলুম। বোধহয় তাঁর পদসেবা করছিলুম। তিনি টিন থেকে দুটো কাবলী মটরের আকারের হালুয়া নিয়ে আমাদের দুজনকে দিয়ে বললেন—খা-খা।

চমৎকার খেতে লাগল; আধঘণ্টার মধ্যে বেশ নেশা বোধ হ'তে লাগল। পৃথিবী রঙিন হয়ে উঠল। ওদিকে ক্ষিদেও বেশ চনচনে হয়ে উঠল। চেলার কাছে শুনলুম সেটা গাঁজার হালুয়া। চেলাকেও দেখতুম রোজ বেশ একটি বড় গুলি নিয়ে গালে ফেলতেন।

আমরা দুজনে সন্ন্যাসীর দুই পদ সেবা করতুম। সন্ন্যাসী বলতেন—এরা বড় প্রেমিক বালক। অবিশ্যি মিনিট পাঁচ ছয় পা টেপার পরেই তিনি আদর করে আমাদের বলতেন। এবার যা—খেলতে যা।

গুরুদেব আসার পর থেকে গিন্নী বিছানা ছেড়ে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে এসে বসতেন। গুরুদেব তখন বলেছিলেন—তোর ব্যায়রাম সেরে যাবে। কর্তাগিন্নীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। এই ক' মাসে তাঁদের মুখে হাসি ফুটে উঠতে কখনো দেখিনি। গুরুদেব গিন্নীকে প্রতি সপ্তাহে সোমবারে বারো ঘণ্টা মৌনী থাকতে বলে দিলেন। কিছুদিন হই-হই হবার পর গুরুদেব চলে গেলেন পুণার দিকে। সেখানে উদাসীবাবার মঠে দিনকতক কাটিয়ে ফিরে যাবেন আবার তাঁর আশ্রমে। দিন দশেক খুব হই-হই হবার পর আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। গিন্নী নিলেন আবার তাঁর বিছানা—কর্তা তাঁর সেই কোণটি।

গুরুদেব বোধহয় বুধবারে চলে গেলেন। গিন্নীমার মৌনী থাকার কথা আমরা একেবারেই ভুলেই গিয়েছিলুম। পরের সোমবার

সকালে আমি রান্নাঘরে চা তৈরি করছি এমন সময় গিন্নীর চ্যাঁ চ্যাঁ চীৎকার কানে এসে পেৌঁছল। ছুটে তাঁর কাছে যেতেই দেখি খাটের সামনে পরিতোষ উজবুকের মতো দাঁড়িয়ে আছে আর গিন্নী চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে ইশারায় তাকে কি বলবার চেষ্টা করছেন। অন্য অন্য দিন গিন্নী সকালবেলায় কথার মাথায় একটা করে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কথা কইতেন, কিন্তু সেদিন সবটাই চন্দ্রবিন্দু শুনে চট করে মনে পড়ে গেল—আজ তাঁর মৌন থাকার দিন। তখুনি ছুটে গিয়ে চা এনে দিলুম। চা দেখে তখনকার মত চ্যাঁ

বোম্বাই শহরকে মাছের দেশ বললেই চলে

চ্যাঁ করা থামালেন বটে, কিন্তু সেদিন সারাদিন তিনি ঐ রকম চ্যাঁ চ্যাঁ করে কাটালেন। মনে হলো এ রকম নীরবতার চেয়েও সানুনাসিক সরবতা যে ছিল ভালো। যাই হোক বেলা পাঁচটার সময় তিনি মৌনতা ত্যাগ করলেন; তিনিও বাঁচলেন, আমরাও বাঁচলুম।

এই রকম দু তিন সপ্তাহ কাটবার পর একদিন কর্তা জানালেন—যে কটি মালদার লোককে বীমা করাবার চেষ্টা তিনি করছিলেন, সে কটির বিষয়ে তিনি কৃতকার্য হয়েছেন। একদিন আপিস থেকে দুটি তিনটি বন্ধু নিয়েই তিনি বাড়ি ফিরলেন। তাদের মধ্যে সেই গাইয়ে ভদ্রলোকও ছিলেন। ঘণ্টা দুয়েক খুব হুল্লোড় হল—ইরানীর দোকান থেকে চাঁদামাছ ও পাঁটার মাংস এলো। তারপর তাদের সামনেই আমাদের ডেকে কর্তা বললেন—একদিন বন্ধুবান্ধবদের ডেকে খাওয়াবো। তোরা মাংস রাঁধতে পারবি?

আমরা তো উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব পারবো।

পাঁচ-ছজন লোক খাবে। ঠিক হল ইরানীর দোকান থেকে ভাজা মাছ কিনে আনা হবে আর মাংসটা ঘরেই রান্না হবে। পাঁউরুটি দিয়ে খাওয়া হবে; আর জারকরস বলো, সোমরস বলো, সে তো আছেই। পাঁচ-ছজন নিমন্ত্রিত ও আমরা বাড়ির ক'জন। কত মাংস লাগবে হিসেব করে দেখা গেল অন্তত বোম্বাই দশ সের মাংস আনতেই হবে। রাঁধবার পাত্র কোথায় পাওয়া যাবে? গুরুদেব যখন ছিলেন, তখন আমাদের ওপরতলার বাসিন্দে এক কর্তাগিন্নীর সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। বললুম—আলুর দম বানাবো বলে একটা বড় পাত্র ওদের কাছ থেকে চেয়ে আনলেই হবে। তারপর ভালো করে মেজে দিলে কোনো গন্ধই থাকবে না। যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে আগে গিয়ে ওদের বাড়ির গিন্নীর কাছ থেকে একটা বড় পাত্র চেয়ে আনা হল। আজকাল অ্যালুমিনিয়ামের যেমন গোল লম্বা চোঙার মত ডেকচি হয়েছে, সেই রকম একটা পেতলের ডেকচি। ভেতর দিকটা কলাই করা। ওদের গিন্নী বলে দিলেন—দেখো কলাইটা যেন উঠে না যায়!

সকালবেলা দুই বন্ধুতে গিয়ে মাংস কিনে আনলাম। কাপড়ে ও তার পরে কাগজে মুড়ে নিয়ে এলুম। সকালবেলা রান্নাবান্না শেষ করে মশলা বেটে দই নিয়ে এসে মাংসতে মশলার সঙ্গে মাখিয়ে চাড়িয়ে দেওয়া গেল। এর আগে কিমা রাঁধার অভিজ্ঞতা ছিল—সে সময়ে বিশেষ কিছু গন্ধ বেরোয়নি। কিন্তু মাংস চড়াবার কিছুক্ষণ পরে গন্ধে চারদিক ভরপুর হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে দেখি মাংসের ঝোল সাদা দুধের মত হয়ে উঠেছে। একটুখানি চেখে দেখলুম—দারুন টক। তখুনি তাতে কতকটা চিনি ঢাললুম—ঢেলে আবার চাখলুম; দেখলুম কিছু সাম্যভাব এসেছে বটে, কিন্তু মাংস সেদ্ধ হয়নি।

পরিতোষ বললে—সুপুরি দিলে মাংস সেদ্ধ হয়।

সুপুরি কোথায় পাওয়া যায়! পানের পাট তো বাড়িতে নেই। সংসার খরচের টাকা আমাদের কাছেই থাকত। পরিতোষকে চার আনা দিয়ে বললুম—সুপুরি নিয়ে আয়।

পরিতোষ পানওয়ালার দোকান থেকে একরাশ চিকিসুপুরি নিয়ে এলো। লাল টকটকে তাদের চেহারা। সুপুরিগুলো ন্যাকড়ায় বেঁধে সেই পুঁটুলিটাও একটা ফালিতে [illegible]মাংসের ঝোলে নামিয়ে দেওয়া গেল [illegible] দেখতে সেই সুপুরির লাল রঙ বে[illegible]সের ঝোলের রঙ একেবারে খুনী লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সুপুরির পুঁটুলি তুলে ফেললুম। মাংস ফুটতে লাগল কিন্তু সেদ্ধ আর হয় না! ওদিকে যত জল শুকোতে লাগল, ততই ঠাণ্ডা জল ঢালতে লাগলুম। পাঁচ-ছ ঘণ্টা বাদে সেই অপূর্ব রান্না নামিয়ে আমরা হাঁপাতে লাগলুম। একটুখানি মাংস তারই মধ্যে চেখে ফেলা গেল—দেখলুম সে রকম মাংস জীবনে খাইনি! ইতিমধ্যে কর্তা একেবারে অভ্যাগতদের নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন। সোডা আমরা আগেই এনে রেখে-

লুম, যজ্ঞ শুরু হতে বিশেষ দেরি হল । মিনিট দশেকের মধ্যেই চেঁচামেচি কিডাক শুরু হয়ে গেল।

অভ্যাগতদের মধ্যে জনতিনেক বাঙালী র দুজন বোধ হয় মারাঠী ছিলেন। কাগজ ড়ে প্লেট তৈরি করে এক এক জনকে এক টা মাছ দেওয়া হল। তাঁরা পরমানন্দে ছের চাট দিয়ে আসব পান করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাংসের তলব পড়ল। গেলো বাটি বাড়িতে ছিল না। পাত্র-পাত্র ঘটি-বাটি গামলা-চায়ের-পেয়ালা াদি নিয়ে কোনোটিতে ঝোল কোনোটিতে মাংস নিয়ে দুই খানসামা ইন্দ্রসভায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। পাত্রগুলি নামিয়ে রাখতে না রাখতে সপাসপ শুরু হয়ে গেল। আঃ—উঃ—ইত্যাদি আরামব্যঞ্জক বিবিধ ধ্বনিতে গৃহ মুখরিত হয়ে উঠল। সকলেই বলতে লাগলেন—মাংস রান্না খুব চমৎকার হয়েছে।

কর্তার বুক ফুলে দশখানা। তিনি বললেন—দুবেটা খায় বেশি বটে, কিন্তু রাঁধে যা ভাই—একেবারে অমৃত!

আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা ছিল তার উল্টো। আমরা খেতুম কম কিন্তু রাঁধতুম অতি বিশ্রী। কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্তার ডাক পড়ল। তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে! আর আছে?

নিজেদের জন্যে ও গিন্নীর জন্যে খানিকটা মাংস আলাদা করে রেখেছিলুম। বললুম—সামান্য কিছু আছে।

একজন অতিথি বললেন—তাহলে নিয়ে এসো সেটুকু! কার জন্যে রেখেছ?

গিন্নীমাকে গিয়ে বললুম—আপনি এই বেলা খেয়ে নিন, না হলে কিছুই থাকবে না।

তাঁর জন্যে একটু রেখে বাকি সমস্তটি তাঁদের দিয়ে দিলুম।

রাত্রি দশটা নাগাদ অভ্যাগতেরা চলে গেলে মাছের কাঁটা, মাংসের হাড় যেখানে যত ছিল কাগজে পুঁটুলি করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসা হল। মাছ কিংবা মাংস যেদিনে আসত সেদিনেই এই কার্যটি করতে হত। কয়েক টুকরো পাউরুটি পড়েছিল তাই চিনি দিয়ে খেয়ে সে রাত্রে শুয়ে পড়লুম। পরের দিন ভোর বেলা উঠেই ডেকচি মাজা শুরু হয়ে গেল। গন্ধ আর কিছুতেই ছোটে না। শেষকালে পাত্রটা উপুড় করে জ্বলন্ত উনুনের ওপর ধরতে মনে হল গন্ধটা চলে গেছে। ডেকচিটা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে এসেই ভাত চড়িয়ে দিলুম। মনে পড়ে সেদিনটা ছিল শনিবার।

শনিবার দিন কর্তা একটু তাড়াতাড়ি আপিসে বেরুতেন। সেদিনও আমাদের তাড়া দিয়েছিলেন। ভাত আর একটা নিরামিষ তরকারি নাবিয়ে ডাল চড়িয়েছি এমন সময় আমাদের ফ্ল্যাটের বাইরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যে খানিকটা জায়গা ছিল সেখানে বহুজনের গোলমাল ও বচসা শুনতে পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই শুনলুম আমাদের মনিব উচ্চকণ্ঠে আমাদের ডাকছেন।

ডালটা তখনকার মত নাবিয়ে দুজনে বাইরে গিয়ে দেখলুম বাড়িওয়ালা শেঠ ও ভাড়াটেদের অনেক স্ত্রীপুরুষ সেখানে এসে জমেছে। আমরা বাইরে যেতেই একজন লোক সেই ভীড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে এই দুটোই কালকে মাংস কিনছিল।

বাড়িওয়ালা শেঠ আমাদের মনিবকে বলতে লাগলেন তুমি কথা দিয়েছিলে মাছ-মাংস তোমার এখানে হবে না; তাই তোমাকে বাড়িভাড়া দিয়েছিলুম। তুমি আজই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে চলে যাও। না হলে বিপদে পড়বে।

কর্তা কাঁচুমাচু হয়ে বলতে লাগলেন—আমি তো সকালে আপিসে চলে যাই, ভিশিতে (হিন্দু হোটেলে) খাই। রাত্তিরে সেখান থেকেই আমার ও স্ত্রীর খাবার নিয়ে আসি। আমার স্ত্রী রুগ্না। কোনোদিন খায়, কোনো দিন বা খায় না। এরা সারাদিন কি করে বলতে পারিনে তো!

আমরা বললুম—মাছ-মাংস আমরা খাইও না—রাঁধিও না।

আর একজন লোক বললে—এরা রোজ ইরানীর দোকানে ঢোকে। আমরা দেখেছি।

আমাদের মাথার ওপরে যে ভাড়াটেদের পাত্র আমরা নিয়ে এসেছিলুম তাদের বাড়ির কর্তার হাতে দেখলুম ডেকচিটা রয়েছে। ইনি বললেন—এই পাত্রে মাংস রেঁধেছে, এখনও গন্ধ ছাড়েনি।

বাড়িওয়ালা শেঠ আমাদের কর্তাকে বললেন—এখুনি এদের তাড়িয়ে দাও। নচেৎ তুমিও বিদেয় হও।

আমাদের কর্তা বললেন—ওরা এখনও অভুক্ত আছে; আজই খেয়ে দেয়ে চলে যাবে। আপনাদের সামনেই বলছি—

কর্তা আমাদের দিকে ফিরে বললেন—তোমরা আজই চলে যাও।

এক মুহূর্তেই ভাগ্যের কাঁটা ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—কিছুদিন পূর্বে মাংস খাওয়ার অপরাধে এক জায়গায় চাকরি গিয়েছিল। আজ মাংস রান্না করবার অপরাধে চাকরী চলে গেল।

ফিরে এসে আধসেদ্ধ ডাল উনুনে চড়িয়ে দিলুম। কর্তা গোঁজ হয়ে চান সেরে গিন্নীর ঘরে ঢুকে তাঁকে কি সব বলে না খেয়েই আপিসে চলে গেলেন। আমরা স্থির করেছিলুম বেলা তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় চলে যাব। গিন্নীমাকে চান করে নিতে বললুম। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে চান করে খেয়ে নিলেন। ইদানীং সংসার খরচের কিছু করে টাকা আমাদের কাছেই থাকত। তখনও গোটা পনেরো টাকা খরচ হয়নি। আমরা গিন্নীমাকে সেই টাকা ক'টা ফেরত দিতে গেলুম।

তিনি বললেন—ও টাকা তোদের কাছেই থাক। যদি কিছু দরকার লাগে খরচ করিস।

স্নান সেরে খেতে বসেছি এমন সময় পিয়ন এসে প্রফুল্ল ঘোষের নামে একখানা খাম দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি খুলে দেখলুম আগ্রা থেকে সত্যদা লিখেছেন—তোমরা কোথায় আছ? তোমাদের জন্যে কাজ ঠিক করে রেখেছি, শীগগির এসে যোগ দেবে।

আনন্দের চোটে ভালো খেতেই পারলুম না।

আমাদের গ্যাঁড়াব্যাংক খুলে দেখা গেল সেখানে এই ক'মাসে প্রায় একশ' তিরিশ টাকা জমেছে। তা ছাড়া গিন্নীমায়ের দেওয়া এই পনেরো টাকা যোগ হল। টাকাটা আধাআধি করে দু'জনের কাছায় বেঁধে নিলুম। কি জানি যদি চুরি যায় কিংবা কোনো রকমে খোয়া যায় তাহলে অন্তত অর্ধেক তো থাকবে! এই ক'মাসে আমাদের নিজেদেরও কিছু সম্পত্তি হয়েছিল। দু'খানা ছোট শতরঞ্চি, দুটো বিছানার চাদর, দুটো বালিশ, একজোড়া করে ধুতি আর দুটো জামা। আমরা ঠিক করেছিলুম রাত্তির ন'টায় জি আই পি'র দিল্লিযাত্রীর গাড়িতে আগ্রায় যাব। বেলা তিনটের সময় আমাদের সম্পত্তি বাঁধাছাঁদা করছি এমন সময় ধপ ধপ করে কর্তা আপিস থেকে ফিরে এলেন। তিনি সিধে নিজের ঘরে না গিয়ে একেবারে আমাদের কাছে এসে বললেন—কিরে! তোরা যাবার যোগাড় কচ্ছিস?

বললুম—হ্যাঁ।

কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় যাবি?

কর্তার মুখ দিয়ে তখন ভুরভুর করে মধুর গন্ধ বেরুচ্ছে। বললুম—দেখি কোথায় যাই।

কর্তা একটুখানি চুপ করে থেকে ধরাধরা গলায় বললেন—তোদের বিনে দোষে তাড়িয়ে দিচ্ছি। কিন্তু কি করব বাবা—উপায় নেই।

দেখলুম তাঁর দুই চোখে অশ্রু টলটল করছে। তিনি পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে দু'খানা দশ টাকার নোট আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—রেখে দে। যদি বোম্বাইয়ে থাকিস তাহলে মাঝে মাঝে দেখা করিস।

এই বলে তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে গিন্নীমার ঘরে গেলুম। দেখলুম তিনি মুখে হাত দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। বললুম—মা, আমরা যাচ্ছি।

তিনি কোনো কথা বললেন না। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম; কিন্তু তখনও তিনি নীরব রইলেন দেখে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

সারা জীবন তো চাকরি করেই খেতে হয়েছে। অন্যায়ভাবে তাড়িত হলেও এমন মনিব ও মনিব-পত্নী আর পাইনি।

সেইদিনই রাত্রি ন'টার ট্রেনে দু'খানা রাজা-কি-মণ্ডির টিকিট কেটে আমরা আগ্রা রওনা হলুম।

অন্নদাতার প্রফুল্লতার মাত্রা একটু বেড়ে যেত

১
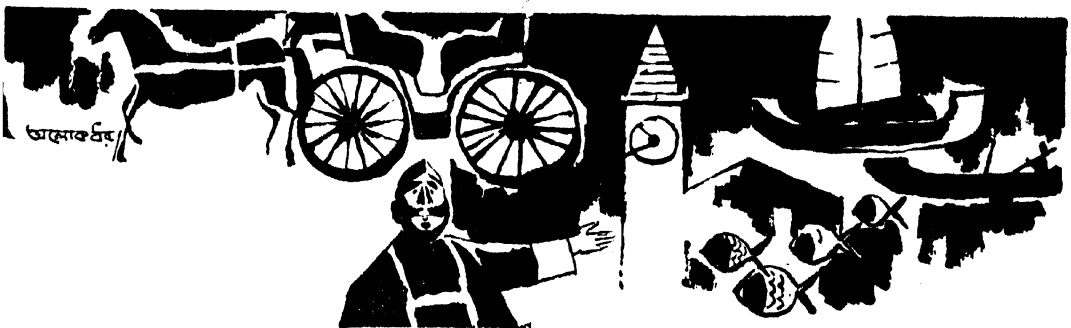
পলাশ, অশোক, কৃষ্ণচূড়া, কোকনদ, জবা, রঙ্গন, ক্রিমসন্‌ গ্লোরি, টকটকে-লাল-ডালিয়া, শোণিত-শোভা চন্দ্রমল্লিকা আর দুপহর চন্দ্রিকা সবাই হঠাৎ ভীড় করে এল লাল দোপাটির সঙ্গে। নবারুণের উজ্জ্বল লাল আলো তাদের উপর পড়ল। লজ্জিত নববধূর আরক্তিম কপোলের আভা আর চেলাঞ্চলের আভাস দুলে উঠল যেন চকিত চমকে। দোলের উৎসব ফাল্গুনের প্রগলভতায় সহসা যেন মূর্ত হল। লালে লাল হয়ে গেল মনের আকাশ। ছড়িয়ে পড়ল অজস্র, আবীর, কুঙ্কুম, আর সিন্দুরের অসংযত প্রলাপ। আগুন লেগে গেল।

...প্রথম দর্শন।

২

এর পর বাজল আশাবরী।

অকুণ্ঠ আশার অসীম প্রত্যাশা। উন্মুখ আগ্রহে লাল রূপান্তরিত হল কমলা রঙে। অগ্নিশিখায় জ্বলতে লাগল কমলা-রঙের কিরণ-কলাপ। শ্রাবণ সন্ধ্যাকাশের বর্ণ-বহুলতায় যে কমলা রঙ অনুগামী হয়ে থাকে লালের সঙ্গে, যা উড়ে উড়ে বেড়ায় কচিৎ-পথ-ভুলে-আসা চঞ্চল প্রজাপতির ক্ষণ-ভঙ্গুর লঘু ডানায় ভর করে, ল্যাসিয়া গোলাপের অর্দ্ধস্ফুট কুঁড়িতে যার স্বপ্ন, —সেই রং। আশার আশাবরীতে বাজতে লাগল সেই রঙের আকুতি। মনে হল যেন কমলা রঙের কুয়াশা নামছে চারদিকে। ওরং পাখীদের ঝাঁক এসেছে কি? তাদের কমলা-রঙের বুক যেন দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে কমলা রঙের ঝরনা ঝরছে। বেজে চলেছে আশাবরী। লাল কমলা রঙে হারিয়ে গেছে।

আবার সে এসেছিল।

দাঁড়িয়েছিল বাড়ির সামনে।

৩

সোনালী আলোর বান ডেকেছে।

শরতের রোদের সঙ্গে বিগলিত স্বর্ণের এ কি অপূর্ব শোভা। গলাগলি করে হাসছে কনকে ফুলের দল। ওদের অঙ্গের এ কনক-দ্যুতি তো আগে চোখে পড়েনি। ও কি, ওরা এসেছে? হলদে গোলাপ ওফেলিয়া আর লন্‌স্‌ডেল? কি হাসি ওদের মুখে। মনে হচ্ছে গোলাপ নয় যেন, মানুষ। কি আনন্দ, কি আনন্দ। স্বর্ণ-পক্ষ প্রজাপতিরা গান ধরেছে কাজল-গৌরীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে। শুধু কাজল-গৌরী নয়, ক্যানারিও এসেছে অসংখ্য। শিস দিচ্ছে তারা। সোনা পাখীর ঝাঁকও নামছে। সোনার মেঘ নামছে যেন। সুরে সুরে ভরে যাচ্ছে দশ দিক। রঙের সোনায়, সুরের সোনায়, গানের সোনায়, প্রাণের সোনায় স্বর্ণময় হয়ে গেল অন্তর-বাহির।

চিঠি এসেছে তার।

সুবাসিত, সরল, অনাড়ম্বর।

পড়ে প্রথমে অবাক হল, তারপরে আনন্দে ভরে উঠল বুক।

৪

সবুজে সবুজ।

কোথা ছিল এত সবুজ এতদিন! ফার্ন-পাতার কারুকার্যময় সবুজের সঙ্গে আরও যে কত সবুজের সমারোহ। তমাল তাল, কাঁঠাল বট, ক্যাকটাস্‌ করবী, চাঁপা শিরীষ, আরও কত নাম-না-জানা পাতার সবুজ এসে মিশেছে সেই চিরন্তন সবুজে যা বহন করে জীবন্ত প্রাণের বাণী, যার কণ্ঠে যৌবনের গান, যা অকুতোভয়, যা ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর, যা আরও চায়। আরও, আরও, আরও......।

সবুজের কুঞ্জবনে এসেছে টিয়া চন্দনার দল, এসেছে হরবোলা, এসেছে বাঁশপাতি। দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

আর একখানি চিঠি। এটিও খুলে পড়ল সাগ্রহে।

এটিও সুবাসিত।

৫

নীল-শাড়ি-পরা মেয়েটি এল তারপর।

আকাশ-নীল শাড়ি। চোখের তারাদুটিও নীলাভ। খোঁপায় দুলছে নীলাঙ্গিনী অপরাজিতা। কি অদ্ভুত হাসি তার মুখে, চাপা হাসি। হঠাৎ মনে হল, নীলনদের স্রোতে উজান বেয়ে নীল মেঘের বজরা থেকে নামল না কি ক্লিওপেট্রা সহসা? চোখের দৃষ্টিতে চকমক করছে চাপা হাসির ঝলক।

"নমস্কার—"

"নমস্কার। আপনাকে তো চিনতে পারছি না ঠিক।"

"চেনবার কথা নয়। নতুন এসেছি আমরা এ পাড়ায়। মাত্র সাত দিন। আপনাদের বাড়ির পাশেই আছি।"

"ও—"

"আচ্ছা, আপনার নামও কি মল্লিকা বসু?"

"হ্যাঁ। কেন বলুন তো"

"আমিও মল্লিকা বসু। আমার দুখানা চিঠি বোধহয় পিওন ভুল করে আপনাকে দিয়ে গেছে। বিকাশদার চিঠি—"

"ও, হ্যাঁ। আমি ভাবছিলুম কার চিঠি!"

গলাটা কেঁপে গেল একটু।

তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে এনে দিল চিঠি দুখানি।

"ধন্যবাদ—"

চিঠি দুটি নিয়ে চলে গেল সে নীলের ঢেউ তুলে।...নীল, নীল, নীল—নীল সাগর থই থই করছে চারিদিকে। বিষের মত নীল, বেদনার মতো নীল, মুষ্ট্যাহত ঠোঁটের মতো নীল।

হাতটা শুঁকে দেখল।

তখন চিঠির গন্ধ লেগে আছে হাতে।

৬

নীল ঘন হচ্ছে, জমছে।

শেষে ঘন-নীল।

ঘন নীল সাগর জমাট হয়ে যেন প্রসারিত হয়ে আছে আদিগন্ত। ঘন নীল, দুর্বহ ভয়ঙ্কর। ওগুলো কি উড়ছে? সোয়ালো পাখীর ঝাঁক! তাদেরও গা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে ঘন নীলের বিদ্যুৎকণা। ক্রমাগত উড়ছে, থামছে না। থামবে না।

তারা মোটরে পাশাপাশি চলে গেল তার বাড়ির সামনে দিয়ে। তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দুজনেই। দুজনেরই মুখে মুচকি হাসি।

৭

ঘন নীলের পর বেগুনির পালা।

ঘন-নীলের অন্তরে কি তুষানল জ্বলল? তারই তাপে কি ঘন নীল বেগুনি হয়ে গেল? লাল, হলদে, কমলা, সবুজ কোথায় গেল তারা! কোন মহাশূন্যে বিলীন হল।

সেদিন তারা দুজনেই এল।

হাতে একখানি রঙীন খাম।

খামের উপর লেখা "শুভ-বিবাহ"।

"আসবেন নিশ্চয়। 'ভায়োলেট ভিলা'তে হবে। বেশী দূর নয়। কাছেই। নমস্কার।"

চলে গেল।

৮

তার পর?

সব কালো।

ছেঁড়া চিঠি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

গোড়ার পাতা নেই, হয়ত শেষের পাতাটাও। ঠিকানা দেওয়া খামটারও চিহ্ন নেই কোথাও।

এ কীর্তি আমার পাঁচ বছরের ভাইপো রাজাবাবুর।

রাজাবাবু নতুন অ আ ক খ পড়তে শিখেছেন। ছাপার অক্ষরে বা হাতের লেখায় যা কিছু আছে সব কিছুর ওপর তাই তাঁর অধিকার জন্মেছে। আলমারী সেলফের বইটই ত সামলে রাখা দায় হয়েছে, চিঠিপত্র এলেও তাঁর হাত থেকে রক্ষা নেই।

চিঠিপত্র যখন যা আসে আমার টেবিলে গুছিয়ে রাখা হয়—রাজুবাবু জানেন। তিনি ইদানীং আমার কাজের সুসার করে দিচ্ছেন খাম খুলে চিঠিপত্র নিজেই আগে পরীক্ষা করে নিয়ে।

কাগজ কটা এইভাবেই চিঠি রাখবার জায়গায় পেয়েছিলাম।

আমার চিঠি ভেবেই পড়তে সুরু করেছিলাম অবসর মত কিন্তু কয়েক লাইন পড়েই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

এ চিঠি ত আমার নয়! আমার টেবিলে এ চিঠি এল কোথা থেকে?

খামটার খোঁজ করে পাই-নি। চিঠির ভেতরই কার চিঠি সে বিষয়ে কোন হদিস পাওয়া যায় কি না দেখবার জন্যে সমস্ত লেখাটা মন দিয়ে পড়েছিলাম। অন্যায় কৌতূহলও যে ছিল তা স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু হদিস তাতেও পাইনি।
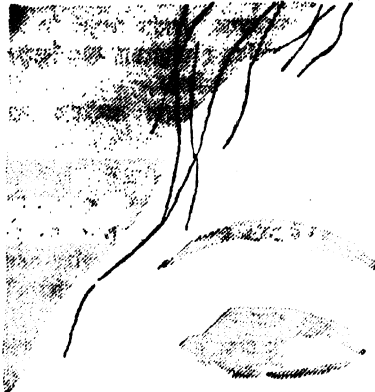
হদিস ওই কয়েকটি নাম। তাও পদবী নয়। তা দিয়ে এ চিঠি কে কাকে লিখেছে কিছু অনুমান করা কি সম্ভব?

খামটায় ঠিকানা ভুল ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ভুল ঠিকানা থেকেও কিছু একটা কিনারা বোধহয় করা যেত।

এখন সে রাস্তাও বন্ধ।

চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেও দিতে পারতাম কিন্তু মনে হ'ল তা উচিত নয়। অসাধারণ কিছু না হলেও এ চিঠির মধ্যে জীবনের বিচিত্র করুণ জটিলতার কিছু পরিচয় যেন আছে।

জীবনের অস্পষ্ট ছেঁড়া দলিল হিসেবেও কিছু মূল্য তার পাওনা।

চিঠি গল্প কি উপন্যাস নয়। বিশেষ করে যে চিঠি জীবনের পরম কোন ক্ষণকে হৃদয়ের উত্তাল কোন মুহূর্তে লেখা।

চিঠির মাঝে অনেক কিছুই উহ্য থাকে, অনেক কিছু অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট। ঘটনার ধারাবাহিকতা তার মধ্যে থাকবার নয়, ব্যাখ্যাও মেলে না অনেক কিছুর। অনেক কৌতূহল সেখানে অতৃপ্ত থেকে যায়। বিবরণের অভাব পূরণ করে নিতে হয় অনুমান দিয়ে।

এ চিঠি যে লিখেছে সেই রমা, যাকে লিখেছে সেই মহিম, যে-মেয়েটি এ চিঠির মধ্যে রহস্যের কুয়াশাতেই প্রায় ঢাকা থেকে গেছে তাদের কাউকেই পুরোপুরি চেনা যায় না। কাহিনীর ইতিহাস ভূগোল সবই অনেকখানি কল্পনা করে নিতে হয়।
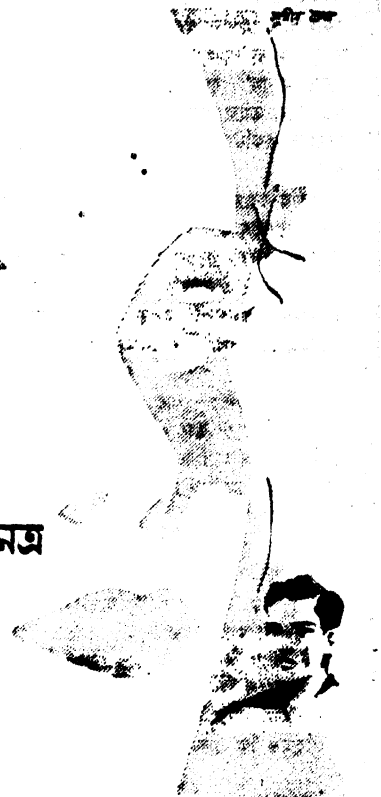
যেমন রমাদের বাড়িটাই ধরা যাক। কেমন ছিল সে বাড়িটা। ছোট বাড়ি অবশ্যই নয়। কারণ রমা যে ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত তা চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়। কিন্তু বাড়িটিতে দুটি আলাদা ভাড়াটে পরিবারও থাকে। মহিমদের অবস্থা তার মধ্যে হয়ত স্বচ্ছল। কিন্তু অনীতাদের দারিদ্র্য বেশ বোঝা যায়।

ভাবা যেতে পারে রমারা থাকে দোতলায় আর নিচের তলা দুভাগে দু পরিবারকে ভাড়া দেওয়া আছে। কিংবা ভাড়াটে আর মালিকের বাড়ি আলাদা হতে পারে, আলাদা কিন্তু পরস্পরের সংলগ্ন। কারণ এবাড়ি ওবাড়ির মধ্যে যাতায়াতের পরিচয় পাই।

রমা নিজেই এই দু-বাড়িতে যায় আসে। মহিমের সঙ্গে তার ছেলেবেলা থেকে জানা-শোনা। অনীতারা হয়ত তখনও এবাড়িতে আসেনি।

কিরকম মেয়ে রমা? কি তাহার চেহারা? বড়লোক বাপমায়ের একমাত্র মেয়ে। দম্ভ থাকে সে জানো মানে মনে। হয়ত রূপেরও গর্ব। মহিম সম্বন্ধে উদাসীন হতে পারে

না, আবার তার কাছে ধরা দিয়ে ছোট হতেও বাধে। অনুরাগটা তাই কি প্রকাশ পায় অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যরূপে! তার চেহারা কত-রকমই ভাবা যায়। সে কুৎসিং নয় নিশ্চয়ই। কোথাও উল্লেখ না থাকলেও রূপের গর্ব যেন চিঠির মধ্যে কোথায় উহ্য আছে। সে রূপ হয়ত মহার্ঘ পোষাকে অলংকারে একটু মাত্রাহীন ভাবে উগ্র। ঠিক সলজ্জ নম্র কোমল একটি মেয়ে হিসেবে রমাকে ভাবতে পারি না।

রমার বিয়ে হয়েছিল নিজেদের চেয়েও বড় ঘরে বলে মনে হয়। বেশী দিন স্বামী-সঙ্গ পায়নি। কয়েক বছর বাদেই স্বামীকে হারিয়েছে। ঐশ্বর্যের অহংকারই রমার জীবনের অভিশাপ। হয়ত পয়সা প্রতিপত্তি আভিজাত্যের খাতিরে নিজের চেয়ে অনেক বেশী বয়সের পাত্রকে বিয়ে করতে রমা রাজী হয়েছিল। পাত্র বিপত্নীকও ভাবা যায়। মহিম যে তার ঐশ্বর্যের শিখর থেকে প্রায় দৃষ্টি সীমার বাইরে রমা বোধহয় তাই বোঝাতে চেয়েছিল। হৃদয়ের কি বিচিত্র আত্মবিরোধ!

মহিম আর রমার ছেলেবেলা থেকে যৌবন পর্যন্ত অনেক দৃশ্য মনে মনে আঁকতে ইচ্ছা হয়। শৈশবের অকৃত্রিম সারল্য কবে কেমন করে ঘুচে গেল। যৌবনোদ্ধত একটি মেয়ে কি দুর্বোধ প্রেরণায় নিজের মুখ মুখোশে দিল ঢেকে? সে মুখোশও ত আত্মপীড়ন ছাড়া কিছু নয়।

মহিমও কি তখন থেকেই নিজের চারিধারে বেড়া তুলেছিল দুর্লঙ্ঘ্য অভিমান আর আত্মনিমগ্নতার! রমাদের ঐশ্বর্যের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াবার মত জীবনে উন্নতি করার সংকল্প কি তার তখন থেকেই সুরু? সেই সংকল্পের পেছনে তখনই কি ছিল তীব্র এক ধিক্কার, আকুলতার সঙ্গে বিরূপতা যা মিশিয়ে দিয়েছিল।

না, তার ইতিহাস অনীতার সঙ্গে জড়ানো?

কেমন মেয়ে এই অনীতা?

ভাবতে পারা যায় করুণ শান্ত অসহায় একটি মেয়ে, ছায়ার মত রমাকে যে অনুসরণ করে। রাজদ্বারে দণ্ডিত দরিদ্র বাপের মেয়ে হিসাবে যে সকলের করুণার ভিখারী। রমার শুধু নয় মহিমেরও।

কিংবা চাপা ও চতুর নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে দ্বিধাহীন, অভিনয়নিপুণ একটি মেয়ে হিসাবেও তাকে কল্পনা করা যায়। তাদের অভাবের সংসার, তার ওপর লেগে আছে কলঙ্কের ছাপ। তাকে অনেক কিছু নীরবে সহ্য করতে হয়, রমার সদম্ভ অনুগ্রহের দান নিতে হয় দীন হীনভাবে। মনে তার কি জ্বালা বা ক্ষোভ যে ধোঁয়ায় তা কেউ জানে না। সে নিজেও জানে না কি নিষ্ঠুর ঘটনাবর্তের সে বলি হতে চলেছে।

এ যেন কিছু আঁকা কিছু মোছা একটা ছবি কল্পনার তুলিতে যা সম্পূর্ণ করবার যথেষ্ট অবকাশ বর্তমান। কৌতূহলী পাঠককে শুধু সে সুযোগ দেবার জন্যে নয়, এ চিঠি যার উদ্দেশে লেখা সেই মহিমের চোখে পড়বার আশাতেও এ লেখা প্রকাশের ব্যবস্থা করলাম।

...তোমায় এবারে কতদিন আগে প্রথম ফোন করেছিলাম তোমার বোধ হয় মনে নেই—কিন্তু আমার আছে। ঠিক দু বছর আগে এই তারিখে। তোমার অফিসেই তোমায় ডেকেছিলাম। দিনের বেলায় তোমার কাজের ভিড়ের মাঝখানে। সেদিন তুমি প্রথমটা চিনতে পারো নি। তারপর অবশ্য নিষ্ঠুর হয়ে না চেনার ভাণ করো নি। তোমায় কাজের ছুতোয় একবার আমাদের বাড়ি আসতে বলেছিলাম। বলেছিলাম একটা সম্পত্তি নিয়ে মামলার ব্যাপারে তোমার পরামর্শ চাই। তুমি আপত্তি করোনি। কথা দিয়ে সময়মতই দেখা করতে এসেছিলে। মামলার ওকালতির লোভে যে আসোনি তা বুঝেছিলাম। আমার চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো মক্কেল তোমার দরজায় গিয়ে আজকাল ধন্না দেয়; আমি জানি। মামলার বিবরণ শুনে মনে মনে নিশ্চয় হেসেছিলে, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করো নি। শুধু বলেছিলে যে তুমি ফৌজদারী কোর্টের কাজ বেশী করো, তাই এ সব দেওয়ানী মামলার কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করানোই ভাল। তোমার বন্ধু একজন উকিলের নামও বলে দিয়েছিলে। ফোনে মামলার কথা যখন জানাই তখনই অবশ্য এ পরামর্শ দিতে পারতে। কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে চেয়েছিলে একবার, আমিও এখনকার মহিমকে। কিন্তু দুজনের দেখতে চাওয়ার কারণ আলাদা। তুমি দেখতে চেয়েছিলে দশ বছর আগের সেই দাম্ভিক স্বার্থপর মেয়েটা এখন কি অবস্থায় আছে। নিজের ঐশ্বর্য প্রতিপত্তি দেখিয়ে আমায় ছোট করতে আসো নি। সে রকম ছোট মন তোমার নয়। তুমি নিজের গাড়িতে না এসে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করেই এসেছিলে। আমায় ভাল করেই লক্ষ্য করেছিলে যতক্ষণ ছিলে, কিন্তু কোনো অস্বস্তিকর প্রশ্ন করো নি। আমার থান-পরা চেহারা দেখেও নয়। জিজ্ঞাসা করবার প্রবৃত্তি হয় নি হয়ত, কিংবা হয়ত আগেই জানতে। আমি অন্তত তাই মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আমাকে তুমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারো নি, গোপনে গোপনে আমার সব খবরই রেখেছ। সে ভুল ধারণা আমার সেই দিনই ভেঙেছিল অবশ্য। এই ভুল ধারণাটুকুই আমার মনের কথা ধরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আমি যে কেন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম তা আর সুতরাং ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। তুমিও সেদিন কি তা বুঝতে পারো নি? মনে হয়, পেরেছিলে। যদিও স্পষ্ট কোন কথাই হয়নি আমাদের মধ্যে। হওয়া সম্ভবও ছিল না। আমি তোমাকে আমার বাড়িটার ওপর নিচে সব

দেখিয়েছিলাম। দেখাবার কোন মানে হয় না। হেলাফেলা করবার মত বাড়ি বা তার সাজ-সজ্জা আসবাবপত্র নয়, কিন্তু এর চেয়ে অনেক ধনকুবেরের রাজপ্রাসাদ তুমি নিশ্চয় দেখেছ। বাড়ি ঘর দেখা শেষ করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে তুমি শুধু একটা কথা বলেছিলে যা আমি কৃপণের ধনের মত মনের মধ্যে পুঁজি করে রেখেছি। তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে—এই বাড়িতে তুমি একলা থাকো? আমি হেসে বলেছিলাম—একলা কেন? লোকজন দাসদাসী কি কিছু কম দেখছ? তুমি আমার মুখের দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে চেয়ে থেকে কি বলতে গিয়ে যেন বলো নি।

নিচের বসবার ঘরে অনেকক্ষণ তারপর তোমাকে জলখাবার খাওয়ানোর ছুতোয় ধরে রেখেছিলাম। ম্যানেজারবাবু তখন সেখানে ছিলেন। তাঁকে তোমার কাছে উকিল ঠিক করবার জন্যে যেতে বলেছিলাম। ম্যানেজার-বাবু অবাক হয়েছিলেন নিশ্চয়। আমাদের এস্টেটের মামলা মোকদ্দমা দেখবার ভালো লোকই আছে যথেষ্ট। একটা সামান্য মামলার জন্যে নতুন উকিলের ব্যবস্থা করতে তোমার মত ডাকসাইটে লোককে বাড়িতে আনিয়ে সাহায্য চাইব এটা তাঁর কাছে অভাবনীয়। হয়ত শুধু বড়মানুষী খেয়াল বলেই ধরে-ছিলেন কিংবা আর কিছু অনুমান করে-ছিলেন।

খাইয়ে দাইয়ে বাড়ির গাড়িতে তোমায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। গাড়িতে ওঠবার আগে শুধু না জিজ্ঞাসা করে পারি নি—বিয়ে-থা ত হলে আর করলে না!

দেয় কে?—বলে হেসে গাড়িতে উঠে-ছিলে।

ম্যানেজারবাবু তারপর তোমার কাছে আর যান নি। আমিই বারণ করেছিলাম।

তার বদলে আমিই তোমায় ফোন করে-ছিলাম আবার। দিনের বেলা নয় রাত্রে। তবে বেশী রাত্রে নয়। সন্ধ্যের পর তখন তুমি নিজের লাইব্রেরিতে বসে নথিপত্র ঘাঁটছ। সে রাত্রে আমার ফোন পেয়ে তুমি খুশী হয়েছ মনে হয়েছিল। হয়ত সেদিন মনটা তোমার ভালো ছিল। হয়ত শক্ত কোন কেস সেদিন জিতেছিলে কিংবা তোমাদের সেই পুরানো বাড়িওয়ালার অহংকারী মেয়েটার নিজে থেকে সেধে তোমার খোঁজ নেওয়ায় তোমারও অহমিকা একটু তৃপ্ত হয়েছিল। সেদিন তুমি কি বলেছিলে মনে আছে? বলেছিলে সুযোগসঙ্গতি এবং কাজ করবার বয়স ও সামর্থ্য যখন আছে তখন কোন বড় কাজের ভার আমার নেওয়া উচিত।

একটু বিদ্রূপ করেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম —কি বড় কাজ? ধর্মকর্ম? মঠ-মন্দির ধর্মশালা স্থাপনা করা না স্কুল-হাসপাতাল বসানো?

বলেছিলে, স্কুল হাসপাতালই বা নয় কেন? ওরকম আরো অনেক কাজই আছে যা নিয়ে মেতে থাকা যায়। জীবনে তন্ময় হবার মত একটা কিছু সকলেরই দরকার।

তোমার যেমন পয়সা আর ওকালতি?—খোঁচা দিয়েছিলাম।

তুমি একটু চুপ করে থেকে যেন অন্য রকম গলায় বলেছিলে, হ্যাঁ তাই।

তোমার গলার স্বরটা গাঢ় হবার কারণ বুঝেও যেন বুঝতে চাইনি। হেসে বলে-ছিলাম—আমায় ত ধর্মকর্ম কি সমাজসেবা করতে বলছ। তুমিও ত ঘর-সংসার করলে পারো। কতই বা তোমার বয়স! আমার চেয়ে বছর পাঁচের ত বড়। এ বয়সে আজ-কাল পুরুষেরা আখছার বিয়ে করে।

ইচ্ছে থাকলে করে। —বলে তুমি যেন প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চেয়েছিলে।

আমি তবু জোর করে ধরে থেকে বলে ছিলাম—তোমার ইচ্ছে করে না? কেন? সেই চোরেদের বাড়ির চোর মেয়েটার জন্যে?

কথাটা বলে ফেলেই শিউরে উঠেছিলাম। জিভটা যেন আমার নিজের কথার জ্বালাতেই ঝলসে গিয়েছিল। বুঝেছিলাম, এতকাল বাদে যেটুকু জোড় লেগেছিল তাও আবার কেটে গেল।

তুমি ইস্পাতের মত কঠিন আর বরফের মত ঠান্ডা গলায় বলেছিলে—সেই চোর মেয়েটা ত চুরির চরম প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে। আর তার কথা কেন? তা ছাড়া অনিতার এ অপবাদের বিরুদ্ধে তুমিই ত সব চেয়ে বেশী প্রতিবাদ করেছিলে বলে মনে পড়ছে।

ভুলটা সামলাবার বৃথা চেষ্টায় বলেছিলাম গলায় হাল্কা সুর এনে—তুমি ত আচ্ছা মানুষ! একটু ঠাট্টাও বোঝো না।

ঠাট্টা!—তুমি হেসেছিলে একটু তিক্ত-ভাবে। বলেছিলে—তোমার ঠাট্টা বড় বেশী সূক্ষ্ম তা হলে বলব, প্রায় অদৃশ্য ছুঁচের মত। আর জানো ত' আমি চিরকালই বেরসিক। মোটা হাসিঠাট্টাও কোন কালে ভালো বুঝতাম না। আচ্ছা আজ চলি।

তুমি ফোনটা নামিয়ে রেখেছিলে আর আমি একসঙ্গে তীব্র অনুশোচনা আর নিরুপায় আক্রোশে জ্বলে পুড়ে মরে-ছিলাম।

আর কোনদিন তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না।

আবার একদিন সন্ধ্যাবেলায় তোমায় ফোনে ডাকলাম। তুমি লাইব্রেরি ঘরে ছিলে না। তোমার জুনিয়ারই কেউ হবেন বোধ হয় জানালেন যে, তুমি অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে আছ।

শুনে অস্থির হয়ে উঠলাম। অত্যন্ত জরুরী দরকার বলে মিনতি করায় ফোনটা তোমার ঘরে দিতে ভদ্রলোক রাজী হলেন।

ভেবেছিলাম আমার গলা শুনেই ফোন

নামিয়ে রাখবে। কিন্তু তা রাখো নি। এখন মনে হচ্ছে যত বড় অপমানই হোক তাই করলে বুঝি আমার ভালো হত। দুঃসহ আনন্দ আর তীব্রতম যন্ত্রণা যার মধ্যে মেশানো সে সত্য তা হলে আর জানতে পারতাম না।

প্রথমেই তোমার অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তুমি তাচ্ছিল্যভরে জানিয়েছিলে, সামান্য একটু সর্দি-জ্বর মাত্র। ডাক্তাররা নেহাত ছাড়ে না তাই তাদের খুশী রাখতে একটু বিছানায় গড়াচ্ছ।'

তোমার কথার সুর শুনে আশ্বস্ত যেমন তেমনি অবাক হয়েছিলাম। সেদিনকার কথা যেন ভুলেই গেছ মনে হয়েছিল। কোনো তিক্ত রেশ তার আর নেই।

একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছিলাম—তোমার সর্দি হলে ত' আবার মাথায় বসে। জ্বর ছাড়লেও মাথার যন্ত্রণায় বিছানা ছেড়ে উঠতে পারো না।

তুমি হেসে বলেছিলে—মাথা এখন আইনের কচকচিতে বোঝাই। সর্দি বসবার জায়গা নেই। কিন্তু তোমার ত মনে আছে দেখছি।

তখনি কোন উত্তর দিতে পারি নি গলাটা ধরে এসেছিল বলে। আমার কি মনে আছে না আছে তা তুমি কি করে জানবে! একটু নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছি—যদি রাগ না করো একটা কথা বলি।

রাগ করি বা না করি, বলবার মত কথা হলে নিশ্চয় বলবে— তুমি কৌতুকের সুরেই বলেছিলে'

দ্বিধাভরে তখন বলেছি—সেদিন তোমাকে না বুঝে বড় বেশী আঘাত দিয়েছিলাম। কিন্তু যা বলতে চেয়েছিলাম সেটা বোধ হয় অন্যায় নয়। অনিতাকে তুমি ভুলতে পারো নি জানি, কিন্তু তুমি ত স্বপ্ন নিয়ে দিন কাটাবার মানুষ নও...

থামো।—হঠাৎ তীব্রস্বরে তুমি বাধা দিয়ে বলেছিলে—অনিতা! অনিতা! বুকের ভেতর তোমার লুকোনো আত্মগ্লানির ঘা। সেখানে বীজাণুর মত তুমি ওই স্মৃতির বিষ পুষে রেখেছ। তোমার কাছে ও নাম গ্লানির জপমালা হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে নয়। ও নাম ও স্মৃতি আমি ভুলতে চাই। মন থেকে মুছে ফেলে দিতে চাই একেবারে। আজ থেকে তুমি আর আমি এক পৃথিবীতে নেই বলে মনে করো। কোনো সংস্রব রাখবার আর চেষ্টা করো না। দুজনের জগৎ চিরকালের মত আলাদা হয়ে যাবে বলেই শেষ একটা কথা তোমাকে এতদিন বাদে জানাচ্ছি। আমার জীবন অনিতার জন্যে শূন্য করে রাখি নি। অনিতারা আমাদেরই মত তোমাদের আর এক ভাড়াটে। ছেলেবেলা থেকে তোমার মত তাকেও চিনি জানি। স্নেহ করবার মত, আমাদের চেয়েও দরিদ্র পরিবারের মায়া করবার মত একটি মেয়ের বেশী কিছু সে আমার কাছে ছিল না। তার ওপর স্নেহ মায়া ভালবাসা তোমারই ছিল জানতাম আমার চেয়ে অনেক বেশী। তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে আমাকে তুমি কতবার ছোট করবার চেষ্টা করেছ আমি ভুলি নি। তার প্রতি তোমার ব্যবহারে একদিন যেমন ঈর্ষায় একটু জ্বালার সঙ্গে কৌতুক অনুভব করেছি, আর একদিন তেমনি স্তম্ভিত হয়েছি। সে বিহ্বল বিমূঢ়তা তার পর তীব্র ঘৃণায় সমস্ত মন জর্জর করে দিয়েছে। হ্যাঁ রমা, যার জন্যে জীবন আমার শূন্য তার প্রতি ভালবাসা আমার যেমন দুর্বার, ঘৃণাও তেমনি সীমাহীন।

তুমি ফোনটা সশব্দে নামিয়ে দিয়েছিলে। সেই কর্কশ ঝঞ্জনার সঙ্গে সত্যিই আমাদের জগৎ ভেঙে চুরে দু টুকরো হয়ে গেছল।

তারপর আর কোনদিন তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি নি।

আজ কেন করছি?

প্রথমত, এ চিঠি যখন পাবে তখন সত্যিই এ পৃথিবীতে আর থাকব না বলে। না, স্বেচ্ছামৃত্যু নয়—দস্তুরমত চিকিৎসাশাস্ত্র-সম্মত আইনসঙ্গত রোগ।

আমার ঠিকানা আমি দিই নি, তবু ডাকঘরের ছাপ খুব অস্পষ্ট না হলে জায়গাটার নাম হয়ত জানতে পারবে। জানা না জানায় অবশ্য কিছু আসে যায় না। এখানে আমি অনেক দিন ধরেই আছি। বিষয়-সম্পত্তির কি করেছি তুমি হয়ত সত্যিই আর জানতে চাও না। কিন্তু তুমিই একদিন কোন বড় কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে বলেছিলে বলে, জানাচ্ছি। না, বিষয় সম্পত্তির কোন ব্যবস্থাই করি নি, ছোট বড় কোন কাজেই দান করি নি কিছু। একবার ইচ্ছে হয়েছিল তোমার নামেই সব লিখে দিয়ে যাই, কিন্তু সেটা পাছে প্রতিশোধের মত মনে হয় বলে তা শেষ পর্যন্ত করি নি। বিষয় আশয় যেমন ছিল তেমনি আছে। আমার পিতৃকুলে কেউ আর নেই তুমি জানো, শ্বশুরকুলেও তাই। তবু অতি দূর সম্পর্কের কেউ না কেউ আমার মৃত্যুর পর এই সম্পত্তি নিয়ে নিশ্চয় মারামারি কাটাকাটি করবে। তাই করুক। অহঙ্কার আর ঔদ্ধত্য উত্তুঙ্গে করে তুলে যা আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে সে বিষে যাদের লোভ তারাই বা রেহাই পাবে কেন?

এ চিঠি লেখার আসল কারণ এবার বলি। জীবনের শেষ মুহূর্তে তোমার কাছে সব স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া। কি করে জানি না, কিছুটা অবশ্য তুমি নিজেই অনুমান করেছিলে। অনিতার নাম যে আমার কাছে গ্লানির জপমালা এ কথা সেদিন বলাতেই বুঝেছি। কিন্তু সব কথা তুমি জানো না তাই একটা বড় ভুল তোমার মনে থেকে গেছে।

হ্যাঁ, আজ তোমার কাছে অকপটে স্বীকার করছি যে, অনিতার সেই সামান্য বিস্কুটের টিনের সেলাই আর পশম বোনার সরঞ্জামের বাক্সে আমার হাতের বালা পাওয়া ব্যাপারটা আমারই সাজানো। সযত্নে বেশ ভেবেচিন্তে ব্যাপারটা সাজিয়েছিলাম। কয়েক দিন আগে থাকতেই এক জোড়া বালার একটা হারিয়ে যাওয়ার কথা বাড়িতে জানিয়েছি। কানের দুল মাথার টিকলি এক আধগাছা চুড়ির মত ছোটখাট জিনিস অনেক দিন থেকেই আমার হারায়। আমি অগোছাল অসাবধানী বলে মা বাবা একটু আধটু বকাবকি ও ঝি চাকর বদলানো ছাড়া সে সব হারানো নিয়ে তেমন ব্যস্ত হন নি। বালাটা যাবার পর তাঁরা কিন্তু বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তখন তোমারই জন্যে উলের একটা সোয়েটার বুনছিলাম তোমার মনে আছে কি জানি না। একটা কাঁটা ইচ্ছে করে ভেঙে ফেলে একদিন সকালে অনিতাদের বাড়িতে আমাদের পুরানো ঝিকে পাঠালাম। বললাম, দশ নম্বর কাঁটাটা অনিতার বাক্স থেকে নিয়ে আয় ত। অনিতা তখন বাড়ি নেই জানতাম। তুমিই তখন মিল্ক সেণ্টারের কাজটা কোন বন্ধুকে ধরে করে তাকে পাইয়ে দিয়েছ। ঝি খানিক বাদে চোখ কপালে তুলে গোটা টিনের বাক্সটাই নিয়ে হাজির। তাই করবে জানতাম। বিস্কুটের টিনের সেই বাক্সে নানান খুঁটিনাটির মধ্যে আমার সেই বালাটাও রয়েছে। ঝির চেঁচামেচি থামাবার ভান করলাম। থামবার বদলে তা বাড়ল, বাড়িময় হুলস্থূল পড়ল। বাইরের লোকের না হোক তোমাদের কারুর জানতে বাকি রইল না। আমি অনিতার পক্ষ নিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, বালাটা হয়ত ভুলেই ওদের ওখানে ফেলে এসে থাকবে। তাতে আগুনে ঘি পড়ল শুধু। অনিতা কাজ সেরে আসবার পর সমস্ত শুনে একেবারে যেন পাথর হয়ে গেল। স্বীকার অস্বীকার কিছুই সে করলে না। তার মুখ দিয়ে একটি কথাও কেউ বার করতে পারলে না। তার সেই মুখ এখনো আমি ভুলতে পারি নি। সে মুখ দেখে আমি কেঁদেছিলাম। বিশ্বাস করো, সে কান্নাটা ভান নয়।

ব্যাপারটা ঘরাঘরি অবশ্য চাপা দেওয়া হল। অনিতারা বাড়ি ছেড়ে চলে গেল মাস খানেকের মধ্যেই। পাঁচ বছর আগে তার মারা যাওয়ার খবর তুমিও বোধ হয় পেয়েছ।

কেন এ কাজ করেছিলাম জিজ্ঞাসা কোরো না। বোঝাতে পারব না। শুধু একটা খবর তোমায় দিই যা তোমার কল্পনার বাইরে।

অনিতার সে বিস্কুটের বাক্সে শুধু আমার বালাটাই নয়, আমার সত্যিকার হারানো একটা কানের দুল আর দু গাছা চুড়িও ছিল। আগের দিন রাত্রে সুযোগ করে নিয়ে শুধু বালাটাই আমি কিন্তু তার মধ্যে রেখে এসেছিলাম......

এর পর আরো কিছু রমা দেবী লিখেছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু চিঠির শেষ পাতাটা ওই খানেই ছেঁড়া।

ছোট কর্তা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আভার বিবাহের সময় বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে কি একটা মতান্তর হইয়াছিল। কিন্তু দুই পক্ষই ভদ্রলোক, তাই মতান্তর ঝগড়ায় পরিণত হয় নাই। বরপক্ষ আভাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তারপর পনেরো বছর আভা আর পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে নাই। দুই পরিবারের মধ্যে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হইয়াছিল।

এই পনেরো বছরে দুই পরিবারেরই কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। কর্তারা গত হইয়াছেন, যুবকেরা বাড়ির কর্তা হইয়াছে। যাহারা ছোট ছিল তাহারা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছে। আভার বিবাহের সময় কি লইয়া মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল তাহাও বোধ করি কাহারও মনে নাই। তবু দুইপক্ষের মাঝখানে দূরত্বটা যেন মনোযোগের অভাবেই পূর্ববৎ রহিয়া গিয়াছিল।

আভার ছোট ভাই দেবু আভার চেয়ে সাত আট বছরের ছোট। তাহার বয়স এখন পঁচিশ ছাব্বিশ বছর; সে ফৌজি দলের লেফটেনেন্ট, উপস্থিত পুণায় আছে। হঠাৎ কর্মোপলক্ষে তাহাকে কয়েকদিনের জন্য

কলিকাতায় আসিতে হইল। এবং আসিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল, দিদির শ্বশুরবাড়ি কলিকাতায়।

দেবু জীবনটা যদিও পশ্চিমাঞ্চলেই কাটিয়েছে, তবু কলিকাতা তাহার অপরিচিত নয়। ছেলেবেলায় কয়েকবার আসিয়াছে। কিন্তু তখন সে স্বাধীন ছিল না, এখন স্বাধীন। দিদিকে দেখিবার জন্য তাহার মন উৎসুক হইয়া উঠিল।

দিদির শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা তাহার জানা ছিল, শোভাবাজারের নামজাদা গোষ্ঠী। সে হোটেলে জিনিসপত্র রাখিয়া বিকালবেলা বাহির হইল। অবশ্য দিদির শ্বশুরবাড়িতে সে সমাদর পাইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু নাই বা পাইল সমাদর। সে একবার দিদিকে দেখিয়াই চলিয়া আসিবে। দিদির বিবাহকালীন কচি মুখখানি তাহার মনে আঁকা আছে। দিদির চেহারা এখন কেমন হইয়াছে কে জানে। দেবুর চেহারা অনেক বদলাইয়া গিয়াছে, দিদি কখনই তাহাকে চিনিতে পারিবে না।

সাবেককালের দোতলা বাড়িটা বেশ বড়। কর্তারা দুই ভাই একান্নবর্তী ছিলেন। প্রায় দশ বছর আগে আভার শ্বশুর মারা গিয়াছিলেন, ছাপা দায়-জানানো পত্র দেবু দেখিয়াছিল। তারপর এ সংসারে কী ঘটিয়াছে সে জানে না। হয়তো একান্নবর্তীই আছে, ছোট কর্তা এখন বাড়ির কর্তা।

দেবু দ্বারের কড়া নাড়িল। ক্ষণকাল পরে দ্বার খুলিয়া দিল একটি মেয়ে, কিন্তু জংলী পোশাক পরা অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, সে দ্বার খোলা রাখিয়াই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল। দেবু অপ্রতিভভাবে খোলা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

বাড়িতে যে অনেকগুলি লোক থাকে এইবার তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। দুই চারিটি বয়ঃপ্রাপ্ত লোক এবং অনেকগুলি কুচোকাচা দ্বারের কাছে আসিয়া পরম কৌতূহলের সহিত দেবুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেবুর মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কি বলিয়া সে নিজের পরিচয় দিবে ভাবিয়া পাইল না।

'তোরা সরে যা' বলিয়া একটি গোলাকৃতি মহিলা দ্বারের কাছে উপস্থিত হইলেন, দেবুকে এক মুহূর্ত ভাল করিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'ওমা, দেবু এসেছিস! আয় আয়।'

তিনি দেবুর হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া লইয়া গেলেন এবং দেবুর গণ্ডদেশে সশব্দে চুম্বন করিলেন। দেবু লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, বুঝিল এই গোলাকৃতি মহিলাই তাহার দিদি। পনেরো বছরে দিদির স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইয়াছে।

আভা তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, 'কত বড় হয়েছিস রে! তার ওপর আবার মিলিটারি পোশাক। কিন্তু আমার চোখে কি ধুলো দিতে পারিস! দেখেই চিনেছি।'

দেবুকে লইয়া বাড়িতে সমাদরের সমারোহ পড়িয়া গেল। বাড়িতে লোক অনেক; শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী, দেবর, ননদ; আভা সকলের কাছে লইয়া গিয়া দেবুর পরিচয় করাইয়া দিল। দেবু দেখিল, আভাই বাড়ির গৃহিণী; তাহার শাশুড়ী খুড়শাশুড়ী ঠাকুরঘরে বসিয়া কেবল মালা জপ করেন।

ইতিমধ্যে আভার স্বামী পরিমলবাবু গৃহে ফিরিলেন। ইনি হাইকোর্টের উকিল। ভারি মজলিশী লোক, তিনি দেবুকে লইয়া মহানন্দে রঙ্গ রসিকতা শুরু করিয়া দিলেন। দেবু অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, এমন লোকগুলোর সঙ্গে এতদিন বিচ্ছেদ ছিল কি জন্য?

গল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আভা আসিয়া বলিল, 'দেবু, আজ তুই যেতে পাবি না। রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া করে এখানেই শুয়ে থাকবি। কাল সকালে যেখানে ইচ্ছে যাস।'

দেবু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, 'কিন্তু তোমাদের অসুবিধা হবে—'

'কিছু অসুবিধে হবে না।' আভা স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'ওপরে ছোট ঠাকুরের ঘরে দেবুর শোবার ব্যবস্থা করি।'

পরিমলবাবু চকিত হইয়া বলিলেন, 'বেশ তো।' স্বামি-স্ত্রীর চোখে চোখে কি একটা ইঙ্গিত খেলিয়া গেল দেবু ধরিতে পারিল না। সে বলিল, 'কিন্তু জামা কাপড় যে কিছু আনিনি।'

আভা বলিল, 'বাথরুমে জামা কাপড় রেখেছি। তুই যা, তোর মিলিটারি পোশাক ছেড়ে নে।'

দেবু বাথরুমে চলিয়া গেল। মুখ হাত ধুইয়া সাদা জামা কাপড় পরিয়া যখন ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল দিদি জামাই-বাবুর সঙ্গে চুপিচুপি কি কথা বলিতেছে। সে আসিতেই দিদি হাসিমুখে উঠিয়া চলিয়া গেল।

যে মেয়েটি দেবুকে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল সে বসিবার ঘরে আসিয়া চা-জলখাবার দিয়া গেল। মেয়েটির বয়স সতেরো কি আঠারো, রঙ ফরসা, ভাসা-ভাসা হাসিভরা চোখ। পরিমলবাবু বলিলেন, 'আমার খুড়তুতো বোন রানী।'

গল্প করিতে করিতে অনেক রাত হইয়া গেল, তখন পরিমলবাবু দেবুকে লইয়া রান্নাঘরে খাইতে বসিলেন। রানী লুচি বেলিয়া দিতেছে, আভা গরম গরম লুচি ভাজিয়া পাতে দিতে লাগিল। দেবু রানীর লুচি বেলা দেখিতে দেখিতে মনে মনে ভাবিল—বেশ মেয়েটা।

আহারের পর মুখ ধুইতে ধুইতে দেবু শুনিতে পাইল দিদি খাটো গলায় রানীকে বলিতেছে, 'ওপরে যা, ছোট ঠাকুরকে বল্ আমার ভাই এসেছে, আজ রাত্তিরের জন্যে ঘরটা যেন ছেড়ে দেন।'

শুনিয়া দেবু বুঝিল, তাহার জন্য কোনও বৃদ্ধকে কক্ষচ্যুত করা হইতেছে। সে মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিল, কিন্তু এখন আর আপত্তি করিয়া লাভ নাই।

রানী সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল এবং পরক্ষণেই নামিয়া আসিয়া আভার দিকে ঘাড় নাড়িল। আভা বলিল, 'দেবু, রাত হয়েছে, শুয়ে পড় গিয়ে। আমি বাপু মোটা মানুষ, সিঁড়ি ভাঙতে পারব না। রানী, তুই আর একবার ওপরে যা, দেবুকে ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আয়। লক্ষ্মীটি।'

রানী তখন দেবুর দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া আবার সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল, দেবু তাহার অনুসরণ করিল। সিঁড়ি বেশি চওড়া নয়, অর্ধপথ উঠিয়া বিপরীত মুখে ঘুরিয়া গিয়াছে। দেবু অর্ধপথ উঠিয়া দেখিল একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওপর হইতে নামিয়া আসিতেছেন। রানী সিঁড়ির মাঝখানের চত্বরে দাঁড়াইয়া পড়িল, দেবুও দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গায়ে বেগুনি রঙের বালাপোষ, পায়ে কটকি চটি। মাথার চুল সাদা। স্বল্পালোকে মুখ চোখ ভাল দেখা গেল না, তিনি দেবুর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

রানী আবার উপরে উঠিতে লাগিল, দেবু তাহার অনুগামী হইল। দ্বিতলে উঠিয়া রানী কোনও কথা বলিল না, কেবল আঙুল দিয়া একটা খোলা দরজা দেখাইয়া দিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল।

ঘরে আলো জ্বলিতেছে। দেবু ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরটি পরিপাটিভাবে সাজানো। খাটের উপর ধবধবে বিছানা পাতা, বিছানার পদপ্রান্তে একটি রঙীন সুজনি পাট করা রহিয়াছে। দেয়ালে একটি বড় ফটোগ্রাফ টাঙানো, দেবু কাছে গিয়া দেখিল, যে-বৃদ্ধ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন তাঁহারই ফটো। শান্ত প্রসন্ন মুখ, চোখের দৃষ্টি জীবন্ত। দিদি যাঁহাকে ছোট ঠাকুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল ইনি নিশ্চয় তিনিই।

কিন্তু ঘরের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। ঘরের বাতাস বদ্ধ, বাতাসে একটা মেটে-মেটে গন্ধ। অনেক দিন ঘর বন্ধ থাকিলে যেমন গন্ধ হয় সেইরূপ। দেবু জানালা খুলিয়া দিল, দ্বার ভেজাইয়া দিল; তারপর শয্যার পাশে বসিয়া সিগারেট ধরাইল। আজিকার নূতন অভিজ্ঞতাগুলি সে মনের মধ্যে গুছাইয়া লইতে চায়।

দিদি সুখে আছে, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। উঃ কি মোটাই হইয়াছে! কিন্তু মুখের ছেলেমানুষী ভাব এখনও যায় নাই। পরিমলবাবুও চমৎকার লোক। আর রানী! বাংলা দেশের মেয়ে-গুলো তো বেশ ভাল! ইহারা সকলেই সহজ স্বাভাবিক মানুষ, বড় সুখের একটি একান্নবর্তী পরিবার। দেবু নিশ্বাস ফেলিল, আবার কতদিনে ইহাদের সঙ্গে দেখা হইবে কে জানে!

সিগারেট শেষ করিয়া দেবু আলো নিবাইল, সুজনি গায়ে টানিয়া লইয়া শয়ন করিল। খোলা জানালা দিয়া রাস্তার আলো চোরের মত তির্যকভাবে হাত বাড়াইয়াছে, ঘর একেবারে অন্ধকার নয়। দেবু ঘুমাইয়া পড়িল।

ওদিকে আভা ও পরিমলবাবুও শয়ন করিয়াছিলেন। আভা উৎসুক কণ্ঠে বলিল, —'হ'লে কিন্তু বেশ হয়—না?'

পরিমলবাবু বলিলেন,—'দেবুকে নেড়ে-চেড়ে দেখলাম, ছেলেটা খুব ভাল।'

আভা গর্ব অনুভব করিয়া বলিল,—'আমার ভাই, ভাল ছেলে হবে না! এখন কাকা রাজি হলে হয়।'

পরিমলবাবু বলিলেন,—'হ্যাঁ, অনেক সম্বন্ধই তো করলাম, কিন্তু কাকার পছন্দ হল না। এবার দেখা যাক।' বলিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

রাত্রি আন্দাজ তিনটের সময় দেবুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে অনুভব করিল ঘরের মধ্যে কেহ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিয়া সে শয্যায় উঠিয়া বসিল; স্বল্পান্ধকারে মনে হইল কে যেন দরজা একটু ফাঁক করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া দেবু উঠিল। আলো জ্বালিয়া দেখিল ঘরে কেহ নাই, তখন সে দ্বারে হুড়কা লাগাইয়া আবার আলো নিবাইয়া শয়ন করিল।

দ্বিতীয়বার দেবুর ঘুম ভাঙিল তখন চারটে বাজিয়া গিয়াছে, ভোর হইয়া আসিতেছে। সে চোখ মেলিয়া দেখিল, যে-বৃদ্ধটিকে সে সিঁড়িতে দেখিয়াছিল তিনি শয্যার পাশে ঝুঁকিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। দেবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

শয্যা হইতে নামিয়া দেবু সুইচ টিপিয়া আবার আলো জ্বালিল। ঘরে কেহ নাই, দরজার হুড়কা পূর্ববৎ লাগানো রহিয়াছে।

দেবুর হঠাৎ গা ছমছম করিয়া উঠিল। সে হুড়কা খুলিয়া বাহিরে উঁকি মারিল। বাহিরেও কেহ নাই, বাড়ি সুপ্ত। তখন সে বৃদ্ধের ছবির পানে তাকাইল। বৃদ্ধ প্রসন্ন অপলক চক্ষে তাহার পানে তাকাইয়া আছেন।

সিগারেট ধরাইয়া দেবু জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কী ব্যাপার! ভূতুড়ে কান্ড নাকি! কিম্বা তাহারই স্নায়ুমন্ডল উত্তেজিত হইয়া অবাস্তব ভ্রান্তির সৃষ্টি করিতেছে?

জানালার পাশে একটা আরাম কেদারা ছিল, দেবু সিগারেট ফেলিয়া দিয়া তাহাতে লম্বা হইল। আর ঘুমের চেষ্টা বৃথা, ফরসা হইতে দেরি নাই।—

'হ্যাঁরে, রাত্তিরে কি ঘুম হয়নি?'

দেবু চোখ মেলিয়া দেখিল, ঘরে সকালের আলো ঝলমল করিতেছে; দিদি চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

চোখ মুছিয়া দেবু চায়ের পেয়ালা লইল, তাহাতে এক চুমুক দিয়া বলিল,—'দিদি, উনি কে?' বলিয়া দেয়ালে ফটোর দিকে আঙুল দেখাইল।

আভা থতমত খাইয়া বলিল,—'উনি? উনি আমার খুড়শ্বশুর ছিলেন, রানীর বাবা।'

দেবু বলিল,—'খুড়শ্বশুর ছিলেন—তার মানে?'

আভা থপ করিয়া মেঝেয় বসিয়া পড়িল, বলিল,—'দু'বছর আগে উনি মারা গেছেন—'

দেবু বলিয়া উঠিল,—'সে কি! ও'কে যে আমি কাল রাত্তিরে দেখেছি।'

'দেখেছিস!' আভা কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'মারা গেছেন বটে কিন্তু উনি আছেন। এই ঘরটা ও'র ছিল, এই ঘরেই আছেন। কোনো গন্ডগোল নেই; বাড়িতে অতিথি এলে ও'কে খবর দিলেই উনি ঘর ছেড়ে দেন।—তা তুই ভয় পাসনি তো?'

দেবু বলিল,—'নাঃ, ভয় পাব কেন। কিন্তু সত্যি আছেন? মানে, সত্যি মারা গেছেন? আমি যে চোখে দেখলাম।'

আভা ধীরে ধীরে বলিল,—'আমরা সবাই চোখে দেখেছি, ইচ্ছে করলেই উনি দেখা দিতে পারেন। তবে কথা বলেন না, ইশারায় নিজের কথা জানিয়ে দেন।—মৃত্যুর আগে রানীর বিয়ে দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিলেন, কিন্তু বিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। তারপর আমরা রানীর বিয়ের অনেক সম্বন্ধ এনেছি, কিন্তু ও'র পছন্দ হচ্ছে না।'

দেবু কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া বলিল—'কি মুশকিল!'

আভা তখন উৎসুক হইয়া বলিল,—'আজ কাকা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে তোকে ও'র খুব পছন্দ হয়েছে। তুই রানীকে বিয়ে করবি? কাকা জানিয়েছেন রানীর বিয়ে হয়ে গেলে উনি চলে যাবেন, আর এ বাড়িতে থাকবেন না। করবি বিয়ে? ভারি ভাল মেয়ে রে, অমন মেয়ে আজকালকার দিনে দেখা যায় না।'

দেবুর মাথাটা ঘুরপাক খাইতেছিল; সে দেওয়ালের পানে চোখ তুলিল। দেখিল বৃদ্ধের জীবন্ত চোখে যেন একটু হাসি খেলা করিতেছে।

একটা নাম-করা সওদাগরি আফিসের ওয়েটিং-রুম, যারা চাকরির বা অন্য কোন কাজে সাক্ষাৎকারের জন্য আসবে তাদের বসবার জন্য। ঘরটা বিশেষ বড় না হলেও নেহাত ছোটও নয়, যার জন্য দু-ধারে দু-খানা সিলিং-ফ্যানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এদিকে মেঝেয় নীল রঙের মোটা শতরঞ্জি বিছানো, দু'ধারে দুটো গোল টেবিল, চারিদিকে খান-চারেক করে চেয়ার। মাঝামাঝি একধারে দেয়াল ঘেঁষে একটা বেঞ্চি পাতা, লোক যদি বেশী হয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা হিসাবে। টেবিল দুটো খানিকটা তফাতে তফাতেই, একটাতে দুটি অ্যাশ-ট্রে বা সিগারেটের ছাই ঝাড়ার ডিবে আছে, এ ছাড়া স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন রকম নির্দেশ নেই।

একটা গোল দেয়াল-ঘড়িও আছে; তাতে চারটে বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে, তার মানে অফিস বন্ধ হতে আর মাত্র চল্লিশ মিনিট বাকি। উমেদারি বা অন্যবিধ প্রয়োজনের সাক্ষাৎকার প্রায় শেষ হয়ে গিয়ে মাত্র দুজন এখন অবশিষ্ট রয়েছে ঘরটার মধ্যে; একটি মেয়ে, তন্দ্রা। আর একটি যুবা, অনিমেষ। ওরা দুজনেই চাকরির উমেদারিতে এসেছে। অনিমেষ অ্যাকাউন্টস বিভাগে সহকারীর পদের জন্য, তন্দ্রা সেলস বা বিক্রয় বিভাগের স্টেনোগ্রাফারের পদের। একটি বেশ স্মার্ট লেডি স্টেনো চায় ওরা।

দুটোর সময় এসেছে তন্দ্রা; তখন থেকে একটি কথাই তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, 'স্মার্ট'। শর্টহ্যান্ড আর টাইপিংও ওর হাত খুবই দ্রুত, সেদিকে ও কাউকেই এগিয়ে যেতে দেবে না, এ-বিশ্বাস তার পুরোপুরিই আছে, তবে 'স্মার্ট' কথাটা যে বড় ধোঁয়াটে,—খুব চটপটে, চোখে-মুখে কথা ফুটছে? লজ্জা-সঙ্কোচের ধারে-কাছে দিয়েও যায় না, ওঠা-বসা চলা-ফেরার মধ্যে একটা মুক্ত চপলতা? আলাপ-পরিচয়েও নিঃসঙ্কোচ? শুধু নিঃসঙ্কোচই নয়—খানিকটা যেন এগিয়েই থাকা?

আবার একটা সীমারেখাও থাকবে, নইলে বেহায়া, বেপরোয়া। তা হলেই নাকচ।

একটু লাজুক মুখচোরা বলেই বদনাম আছে তন্দ্রার; কলেজে, তারপর কমার্শ্যাল ইনস্টিটিউট — যেখানে শর্টহ্যান্ড-টাইপিং শিখল—কোথাও এটা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু এবার অচল অবস্থা।...... এসেও পড়ল।

কি রকম লোকে নিচ্ছে ইন্টারভিউটা? বৃদ্ধ, কি মাঝবয়সী, কি আরও কম?

মেয়েদের সঙ্গেও ভাল করে আলাপ করতে পারে না। কেমন যেন একটা মনের দুর্বলতা দাঁড়িয়ে গেছে যে আজকাল সব মেয়েই 'স্মার্ট', ও-ই শুধু পেছনে পড়ে আছে; মুখ খুললেই ধরা পড়ে যাবে। তবুও চেষ্টা করছে বৈকি। অন্য চারজন মেয়ে ছিল, ওকে নিয়ে পাঁচজন। ও-ই খানিকটা ওপর-পড়া হয়ে আলাপ করেছে; মায়া বলে মেয়েটির সঙ্গে ভাবও করে ফেলেছে। এত অল্প সময়ে, আর এ-পরিবেশে, ওর পক্ষে একটা কৃতিত্বই। আর একটা আবিষ্কারও হল—সব মেয়েই স্মার্ট নয়; মায়া তো আবার ওকেও ছাড়িয়ে যায়।

খানিকটা যেন সাহসও এসে পড়েছে। বৃদ্ধ হোক, মাঝ-বয়সী হোক, কম-বয়সী হোক, ও পারবে। পারতে হবে যে। তন্দ্রা নিজের ওপরই চোখ রাঙিয়ে উঠল—না পার তো ঘরে ঘোমটা টেনে বসে থাকগে, তোমার এত বড় একটা আফিসে চাকরি করতে আসা কেন? পুরুষে গিজগিজ করছে।

নিজের কাছে ধমক খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল তন্দ্রা, নড়ে-চড়ে বসল।

তা হলে এই মানুষটি থেকেই মহলা শুরু করলে কেমন হয়?

একটু আড়চোখে চাইল তন্দ্রা। ঘাড় হেঁট করে একটা অ্যাশ-ট্রে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘোরাচ্ছে। আগেও কয়েকবার দৃষ্টি পড়েছে। কারুর সঙ্গে আলাপ করতে না দেখুক, বসে ছিল অন্তত সোজা হয়ে। তার মানে লাজুক; এই যে একটি ঘরে মাত্র ওরা দুজনে; আর ঘাড় তোলবার ক্ষমতা নেই। একে দিয়ে বেশ আরম্ভ করা যায়। একটু হেসে বলা—"আমাদের দুজনেরই দেখছি এক অবস্থা।" তার পরই আরম্ভ হয়ে যাবে আলাপ। না হয়, আরও একটু কিছু বললেই হবে—"আপনার কোন্ ডিপার্টমেণ্টে?"

দিতেই হবে একটা উত্তর।

বলে ফেলতেই যাচ্ছিল, কথাটা আটকে গেল গলায়। —"আমাদের দুজনেরই এক অবস্থা"। আলাপ নেই পরিচয় নেই, হঠাৎ দুজনকে একসঙ্গে করে নিয়ে একটা মন্তব্য!......একসঙ্গে করে নিয়ে দুজনকে! যতই ভাবছে, লজ্জায় যেন নিজের কাছেই যাচ্ছে গুটিয়ে। বলে ফেললেই হয়েছিল আর কি! কী মনে করত লোকটা!

প্রশ্নটাও আর করা হলো না। নিজেকে আবার চোখ রাঙিয়ে উঠল তন্দ্রা—"তোমার আর স্মার্ট হয়ে কাজ নেই, যেমন আছ তেমনি থাকো। কী লজ্জায় যে ফেলতে এক্ষুনি!"

লুব্ধ করল ও-দিককার পাখাটা, হঠাৎ ঘূর্ণি-বেগ কমে এসে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গিয়ে। ফিউজ হয়ে গেল, কি, কল বিগড়েছে। একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ, এমন দেখা যায় না; কে যেন হাতে তুলে দিল ওর। অসহ্য গরম, পাখাতেও যেন কুলায় না; এবার বেশ বলা যায়—"আপনি এদিকে চলে আসুন না, মিছিমিছি কষ্ট করে লাভ কি?"

শক্ত কি এমন?

আজই আসবার সময় মোটর-বাসে অভিজ্ঞতার কথাটা মনে পড়ে গেল। অনেকটা এই ধরনেরই পরিস্থিতি। বড় ভাল লেগেছিল। এখন মনে হচ্ছে, সেও যেন তারই অনুকরণের জন্য আগে থাকতে কে রচনা করে রেখেছিল, নইলে তার চোখের সামনেই ঘটবে কেন? তার পরেই এই একই ধরনের ব্যাপার।

একটি মেয়ে। একেবারে যাকে বলা যায় আপ-টু-ডেট। বাস স্টপে গটগট করে উঠে এসে লেডির সীটের সামনে দাঁড়াল। শুধু মাথা একটু নীচু করে সিধে চোখ ফেলে দাঁড়াল, কোন কথা নয়। ছিপছিপে, পায়ে

হিলতোলা জুতা, ঘাড় থেকে চুলগুলো ওপর দিকে তুলে আঁচড়ে মাথায় আঁট খোঁপা, সিধে দাঁড়াবার ভঙ্গি। আগা-পাস্তলা স্মার্ট, মায় নির্বাকতাটুকু পর্যন্ত। দুটি পুরুষ যারা বসে ছিল, আস্তে আস্তে উঠে সরে দাঁড়াতে বসে পড়ল; পিঠটা টেনে সোজা করে নিল।

চোখ ফেরাতে পারছে না তন্দ্রা। আফিসে নিশ্চয় ঠিক যেন এই রকমটিই চাইছে; হওয়া যায় না?

কয়েকটা স্টপের পর একটি যুবা উঠে এসে পাশে দাঁড়াল। সামনের দুটো বেঞ্চই মেয়েদের জন্য, চারটে করে সীট। একটা পুরোপুরি ভর্তি, একটাতে দুটো সীট খালি। মেয়েটি যুবককে বলল—"আপনি ওটায় তো বসতে পারেন একপাশে। যথেষ্ট জায়গা রয়েছে।"

বসে ছিল দুজন প্রৌঢ়া, তার মধ্যে এক-জন বিধবা, একজনের কোলে একটি কোলে করে থাকবার মতই মেয়ে। সেই ছিল এদিকে, কোল থেকে মেয়েটিকে তুলে পাশে বসিয়ে দিল। অর্থাৎ তার আপত্তি আছে। মেয়েটির দিকে একটু অপ্রসন্ন দৃষ্টি হেনেও সেটা স্পষ্ট করে দিল। যুবতী যুবকের দিকে চেয়ে বলল—"আপনি তা হলে এইখানেই বসুন।"

"আপনার অসুবিধে হবে।"—যুবক বলল। হওয়ার কথাও; বেচারা একটু স্থূলাঙ্গই। মেয়েটি যতটা পারল জায়গা ছেড়ে দিয়ে বলল—"কিছু না। বসুন আপনি।"

প্রৌঢ়া দুজন আড়ে চেয়ে ঠোঁট একটু কুঞ্চিত করল। তন্দ্রার মনে হলো মেয়েটির শিরদাঁড়া আরও সোজা হয়ে উঠেছে।

"আপনি না হয় এদিকে চলে আসুন না।"

—বেশ সহজ কণ্ঠেই বলতে পারল তন্দ্রা। যেমন আন্দাজ করেছিল, ছেলেটি সত্যই লাজুক; মাথাটা আরও একটু যেন নীচুই হয়ে গেল, যেন কোন রকমে অল্প একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যেন কোন রকমে বলতে পারল—"থাক, বেশ তো আছি।"

"বেশ কি করে বলি? এই রকম অসহ্য গরম, তার ওপর ওদিককার ফ্যানটাও বন্ধ হয়ে গেল।"

—এতগুলো কথা, কিন্তু বেশ সহজভাবেই বলে গেল তন্দ্রা। সেই স্মার্ট মেয়েটার আদর্শ সামনে ধরে রেখে বেশ বল পাচ্ছে মনে; তার ওপর নিশ্চয় অপর পক্ষের দুর্বলতাটুকুর জন্যও। বেশ একটু জোরের সঙ্গেই জুড়ে দিল—"না, চলেই আসুন আপনি।"

বিস্ময়ের কূল-কিনারা পাচ্ছে না তন্দ্রা। ছেলেটি উঠে আস্তে আস্তে এসে বসল এদিকে, শুধু মাঝে একটা চেয়ারের ব্যবধান

আপনার অসুবিধে হবে

রেখে। শুধু বিস্ময় নয়, আত্মপ্রসাদও, এক-জন পুরুষ, অপরিচিত, সে যে এক কথাতেই এত বাধ্য হয়ে যাবে, এ যে কল্পনাতীত!

কৌতুকও বোধ হচ্ছে, তার সঙ্গে মায়াও। এ ধরনের একটা মিশ্র অনুভূতি তার অভিজ্ঞতায় কখনও উপলব্ধি করেনি। কৌতুক, ছেলেটির পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, তার ওপর আবার একটা উড়ুনি। সওদাগরি আফিসে ইণ্টারভিউ দিতে এসেছে! বনগাঁ থেকে এসেছে, না, বাঁশবেড়ে থেকে... কথাটা ওদের কলেজের অনীতা বড্ড বেশী ব্যবহার করত—মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গিয়ে একটা হাসি গুরগুরিয়ে উঠছে পেটের মধ্যে।

এবার ও-ই কিছু একটা বলুক। একটা "ধন্যবাদ"-ও তো খসাল না মুখ থেকে। ঘন ঘন দৃষ্টি তুলে ওদিককার পাখাটার দিকে চাইছে, যেন একবার চলুক, পরিত্রাণ করুক ওকে এ-সংকট থেকে!

থাক, বেশ তো আছি

হাসি চেপে রাখা শক্ত হয়ে পড়েছে তন্দ্রার পক্ষে। সেজন্যও, আবার নিজেকে বেশ খানিকটা ওপরের স্তরের মনে হওয়ার জন্যও ওই আবার চালু করল কথা। প্রশ্ন করল—"আপনার কোন্ ডিপার্টমেণ্ট?"

"অ্যাকাউণ্টস। আপনার?"

তন্দ্রা মনে মনে বলল—তবু ভালো। উত্তর করল—"স্টেনোগ্রাফ।"

"ও!...কখন যে ডাকবে!"

"সত্যি। বড্ড দেরি করে নিচ্ছে ইণ্টার-ভিউগুলো।"

"আর আমরা দুজন পড়েও গেলাম সব শেষে। দেখুন না!"

—বেশ সহজও হয়ে এসেছে অনিমেষের কথাগুলো।

সঙ্গে সঙ্গে কিছুই বলতে পারল না তন্দ্রা। দুজন নিয়ে এই কথাটাই না ওই বলতে চেয়েছিল তখন? একটা ঢোঁক গিলতে হলো, তারপর অবশ্য হেসেই বলল—"এক যাত্রায় বেরিয়ে থাকব হয়তো।"

বলেই কিন্তু একটু চুপ করে যেতে হল; কেমন যেন হয়ে গেল না কথাটা?

অনিমেষ কখন বেশ সোজাসুজি হয়ে বসেছে। হেসেই বলল—"এখন যাত্রার শেষটা দুজনের পক্ষেই শুভ হলে হয়।"

একটু চুপ করে থেকে সাহস করে মুখটা তুলল তন্দ্রা। না, সে ধরনের ছেলেই নয়; ওর কথাটাও কোনও নিগূঢ় অর্থে ধরেনি, নিজেরটাও বলেনি কোনও নিগূঢ় অর্থে। বেশ হালকা হল মনটা। বেশ খানিকটা কথাও হলো, পরিচয় পরস্পরের, কিছু এদিক-ওদিকও। নেহাত বনগাঁ-বাঁশবেড়ে না হলেও কতকটা ঐ গোছেরই। সিউড়িতে বাবার বড় ব্যবসা আছে। কতকটা সেই সূত্রেই একটা সওদাগরি আফিসে ঢোকবার চেষ্টা ওর, এদের পদ্ধতিগুলো আয়ত্ত করার জন্যে। বরাবরের জন্য থাকার উদ্দেশ্য নেই।

"আর, আমার এসব ভালও লাগে না"—একটু হেসে, ক্লান্তভাবে বলল অনিমেষ।

"কেন?"—প্রশ্ন করল তন্দ্রা।

একটু লজ্জিত হয়ে চেয়ে রইল অনিমেষ। তন্দ্রা হেসে বলল—"বুঝেছি। বলি আমার আন্দাজটা?"

"বলুন।"—লজ্জিতভাবে হাসল অনিমেষ।

"লেখা-টেকার বাই...মানে, ঝোঁক আছে। ...নিশ্চয় কবি।"

অনিমেষ লজ্জিতভাবে হাসতেই লাগল। আরও একটু বেশী লজ্জিতই হয়ে।

তন্দ্রা বলল—"আরও বলি?—এটা আমার ভবিষ্যদ্বাণী।"

"বলুন।"

"করতেও হবে না কাজ এখানে আপনাকে। আপনার এই উড়ুনি আপনাকে রক্ষা করবে।"

খিল খিল করে হেসে উঠেছে, অনিমেষ আরও লজ্জিত হয়েই যোগ দিয়েছে,

আর্দালি এসে জানাল দুজনেরই ডাক হয়েছে ওদিকে।

মেসে ফিরে এসে গল্প করে যেন আশ মিটছে না তন্দ্রার।

সন্ধ্যার পর দোতলায় কমলার ঘরে মেসের মেয়েদের চা-পাঁপরের সঙ্গে একটা জটলা হয়, তন্দ্রা বলে যাচ্ছে নিজের অভিজ্ঞতার কথা। একটা গোটা পুরুষ মানুষকে নাজেহাল করে ছেড়েছে, যা বলেনি, যা করেনি তাও সব জুড়ে জুড়ে জমাট গল্প ফেঁদেছে। হাসির হুল্লোড় উঠছে মাঝে মাঝে। কমলা বলছে—"বিশ্বাস হয় না তন্দ্রা—মেয়েদের মধ্যেই তোর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, তুই একটা গোটা পুরুষ মানুষকে নিয়ে আঙুলের ডগায় চরকি ঘোরাবি অমন করে শক্ত বাপু বিশ্বাস করা......"

"ও মা! শুনছ কলি। কলি আবার পুরুষ হলো কবে!"

মুখটা গম্ভীর করে হঠাৎ এমনভাবে বলে উঠল চম্পা যে, আবার একটা হাসির লহর উঠল। তন্দ্রা বলল—"ও সত্যি কমলাদি। স্মার্ট বলে বাহাদুরি নিতে চাই না, তবে মানুষটা এতো লাজুক, এতো মুখচোরা যে তার সামনে এতো মিনমিনে বলো তো আমায়? ও আমিই যেন একটা পুরুষ মানুষ। দেখো না—ইণ্টারভিউ দিতে এসেছিস, গায়ে দিব্যি বুশ শার্ট থাকবে, ভাঁজ করা প্যাণ্ট, পায়ে স্ট্র্যাপ সু। তার জায়গায় কিনা জরিপাড়ের......"

পশ্চিমা চাকরটা উঠে এল, বলল—"একঠো বাবুলোক দেখা করতে এসেছে।"

"উড়ুনি, না, বুশ-শার্ট?"

—মনীষার লেখাপড়া প্রশ্নে আরও উচ্চকিত হয়ে উঠল হাসিটা এবার। কমলা বলল—"চুপ কর তোরা একটু বাপু, কী মনে করবে ভদ্রলোক?"

চাকরটাকে প্রশ্ন করল—"কার সঙ্গে দেখা করতে চায়?"

"কার সঙ্গেও নয়।"

বোকার মত অদ্ভুত উত্তরে সবার মুখে চাপা হাসিতে রাঙা হয়ে উঠল। কমলা বলল—"থাম, বুঝেছি। মেসেই কোন দরকার আছে বোধ হয়; বিশেষ কারুর সঙ্গে নয়। রোস্, দেখি।"

নীচে একটা ছোট বৈঠকখানার মত আছে। অনিমেষ বসেছিল একটা চেয়ারে, কমলা প্রবেশ করতে নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল। একটু থতমতই খেয়ে গেল কমলা, এর প্রসঙ্গই তো চলছিল, পোশাকে চিনে নিতেও দেরি হলো না। সামনে গিয়ে বলল—"বসুন। কার সঙ্গে দরকার?"

"মানে—দরকার কারুর সঙ্গে নেই—একটা ইয়ে হয়েছে—একটা ভুল নিশ্চয়—তাই মনে করলাম না হয়......"

থেমেই গেল গুলিয়ে ফেলে। ঠিক মিলে যাচ্ছে তন্দ্রার বর্ণনার সঙ্গে। কমলা অনেক কষ্টে মুখের সহজ ভাব বজায় রেখে বলল—"বলুন।"

অনিমেষ উড়ুনির ভেতর থেকে একখানা বই বের করল, একটা বাংলা নভেল। বলল—"কাল একটি......একজন ভদ্রমহিলা একটা আফিসে ইণ্টারভিউয়ে গিয়েছিলেন—আমারও ছিল—ফেরবার সময় দেখি টেবিলের নীচে এই বইটা পড়ে রয়েছে—
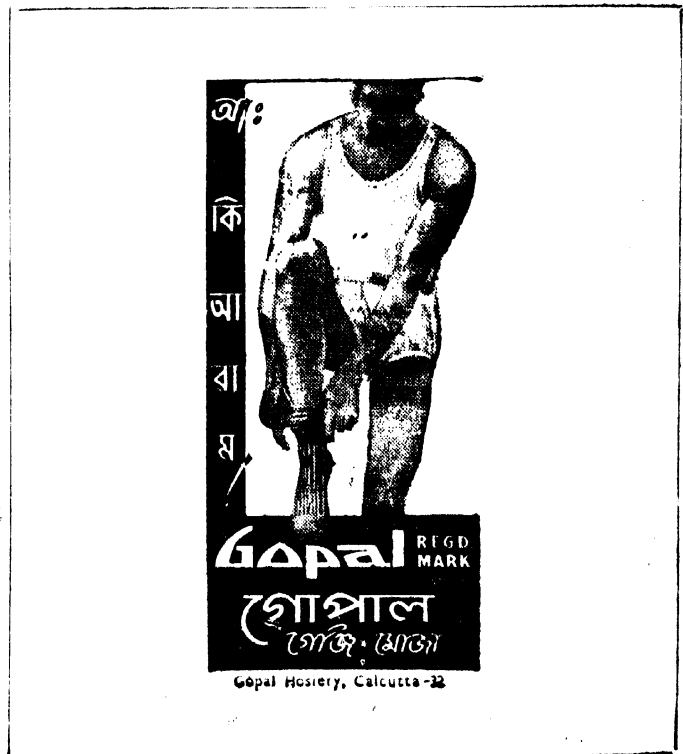
মনে করলাম তা হলে হয়তো তাঁরই—তাই—বলেছিলেন এই মেসে থাকেন—তাই ভাবলাম......"

"নিয়ে এসেছেন কণ্ট করে? নাম লেখা আছে তার?"

"তাঁর নাম তো জিজ্ঞেস করা হয়নি।"

কমলা মনে মনে বলল—'সে ক্ষমতা তোমার থাকলে তো।'

"তবে একটা আছে নাম।" অনিমেষ একটু থেমে জুড়ে দিল।

"দেখি।"

কমলা হাত বাড়িয়ে বইটা নিয়ে বলল—"না, ওর নাম সান্ত্বনা নয়, তন্দ্রা।...তাহলে কি করবেন?"

কি যেন আশা করেছিল অনিমেষ, শুষ্ক-কণ্ঠে বলল—"তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।" উঠে পড়ল। কমলাও উঠে পড়ল, বেশ একটু চিন্তিত। "আচ্ছা, তা'হলে..." বলে নমস্কারের জন্যে হাত তুলে তখনই থেমে গিয়ে বলল—"আপনি না হয় একটু বসুন দয়া করে। বইটাও দিন, দেখি ঐ নামে তন্দ্রার কোন বন্ধুই যদি থাকে।"

"আছেন তন্দ্রা দেবী?"

—চৌকাঠের বাইরে পা দিয়েছিল কমলা, ঘুরে দাঁড়াল। বেশ বোঝা যায় যে, ওর পেছন ফেরার সুযোগেই প্রশ্নটা করা। এক মুহূর্ত, তারপরেই উত্তর করল—"আছে; তবে শরীরটা ঠিক নেই। আপনি বসুন। এক্ষুনি আসছি আমি।"

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

ঠোঁটে আঙুল চেপেই ঘরে প্রবেশ করল কমলা; চোখ বড় বড় করে চাপা গলায় বলল—"উড়ুনিই!"

চুপ থাকবার ইঙ্গিত সত্ত্বেও—"আ!!" করে সবার কণ্ঠে একটা শব্দ উঠতে যাচ্ছিল, চোখ পাকিয়ে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিল কমলা। বলল—"তন্দ্রার জন্যেই এসেছে।"

"আমি যাব না বাবা!" হাত নেড়ে এমন সভয়ে বলে উঠল তন্দ্রা যে, সবাই মানা সত্ত্বেও চাপা গলায় খিলখিল করে হেসেই উঠল। বিপাশা প্রশ্ন করল—"বললে তন্দ্রার জন্যেই এসেছে?"

"যতই বলুক, আমি কিন্তু......"

"আঃ! চুপ করতো!" হাত তুলে থামিয়ে দিল কমলা, বলল—"জোর করে লজ্জা ভাঙিয়ে একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে এসে এখন..."

—শাড়ির ভেতর থেকে বইটা বের করে বলল—"এই বইটা কাল ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে ফেলে এসেছিস তুই?"

"আমি বই ফেলে আসবার মেয়ে!"

"বরং অন্য কিছু যদি ফেলে আসবার কথা......"

"আমি তাহলে চললাম বাপু।" মনীষার

টেবিলের নিচে এই বইটা পড়ে রয়েছে

টিপ্পনিতে রেগে উঠেই যাচ্ছিল তন্দ্রা, কমলা হাতটা ধরে বলল—"বোস্। সবটা শুনবি তবে তো।...এই মেয়ের মুখেই এতক্ষণ খই ফুটছিল! বুঝি না বাপু তোদের কান্ড।... বলছে বইটা টেবিলের নীচে কুড়িয়ে পেয়েছে। তোর বই মনে করে ফিরিয়ে দিতে এসেছে। নাম অবিশ্যি লেখা রয়েছে সান্ত্বনা——"

"আমি সান্ত্বনা?"

"কারুর যদি তাই মনে হয়।" চম্পা মন্তব্য করল।

কমলা বলল—"ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তন্দ্রার বই নয় দেখে, আমিই বসিয়ে এসেছি, বললাম—"দেখি, তন্দ্রার কোন বন্ধুর নামও

আমি সান্ত্বনা?

তো হতে পারে। রীতিমতো একটা সমস্যায় পড়ে গিয়ে..."

"কিছু সমস্যা নয়।" —মনীষা পাশেই বসেছিল, কাতরভাবে একটা হাত জড়িয়ে ধরল, বলল—"আমি বন্ধু সান্ত্বনা সাজছি, একবার দেখে আসতে দাও উড়ুনিকে কমলাদি।"

কাজের কথার এই শেষ পরিণাম দেখে সবাই আবার হেসে উঠেছে, কমলা বিরক্ত হয়েই বলে উঠল—"তাহলে আমিই উঠলাম এবার। কত বড় একটা সমস্যা, কতদিক থেকে ভেবে দেখতে হবে—ঐ একটা মেয়ে, দেখছিস কি রকম আবল-তাবল বকতে আরম্ভ করেছে, আর মুখে এতক্ষণ ফুলঝুরি ফেটে পড়ছিল। ওদিকে একটা ভদ্রলোক মিছিমিছি বই দেওয়ার ছুতো করে ছুটে এসেছে—বুঝছে লজ্জায় পড়ে যাবে, তবু......"

"হয়ে গেল তো দুটো দিক।" বিপাশা মন্তব্য করল এবার। মনীষা জুড়ে দিল—"এমন কিছু সমস্যাও নয়। বেশ স্পষ্টই—"

দুষ্টু মন্তব্যে আবার হাসিটা উঠতে যাচ্ছিল, কমলা মুখ গম্ভীর করে বলল—"না, আর ভেবে দেখবার কিছু নেই তো, দু'দিক হলেই হয়ে গেল! কলকাতা জায়গা—মেয়েদের মেস, একটা লোক একটা মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যে মতলব এ'টেছে এক নতুন রকম...এছাড়াও সমস্যা আছে।"

"বাবা, বাবাঃ!! কত টেনে টেনে বের করছেন যে কমলাদি!"

অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠল বিপাশা—"এমন একটা সহজ ব্যাপার, অথচ..."

"ধরে নিচ্ছি সহজ। তা, কর্তাদের কথাটা ভাবতে হবে না? তোমরা না হয় মডার্ন হয়েছ, কিছু মানছ না। না তন্দ্রা, তোমরা দুজনে অনেকখানি এগিয়েছ—আগে একটা মতলব করে নাম ঠিকানাটা জেনে নিতে দাও আমায়। আমার হেফাজতেই দিয়ে গেছেন তোমাদের; শেষে বদনাম কিনব? সব জোগাড়যন্ত্র করে ও'দের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে দাও আমায় আগে।"

চুপ করেই গেছে তন্দ্রা, মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে রেগে উঠল, বলল—"দ্যাখো কে এগিয়েছে, আর কার ঘাড়ে দোষ! না, আমি আর এর মধ্যে নেই বাপু। তোমাদের কাছে গল্প করতে গিয়েই ঘাট হয়েছে। উঠি।"

কাহিনীটা একরকম এইখানেই শেষ হয়ে গেল। ইণ্টারভিউ দুজনের মধ্যে কারুরই সফল হয়নি। অত মহলা দিয়েও তন্দ্রা সেখানে নার্ভাস হয়ে পড়েছিল; মহলা দেওয়াটাই কারণ কিনা কে জানে? অনিমেষের বেলায় তন্দ্রার ভবিষ্যৎ বাণীটাই খেটে গেছে; ওর উড়ুনিই হলো বৈরী।

তবে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ওদের দুজনের যাত্রাটা সেদিন শুভই হয়েছিল।

অন্নদাশঙ্কর রায়
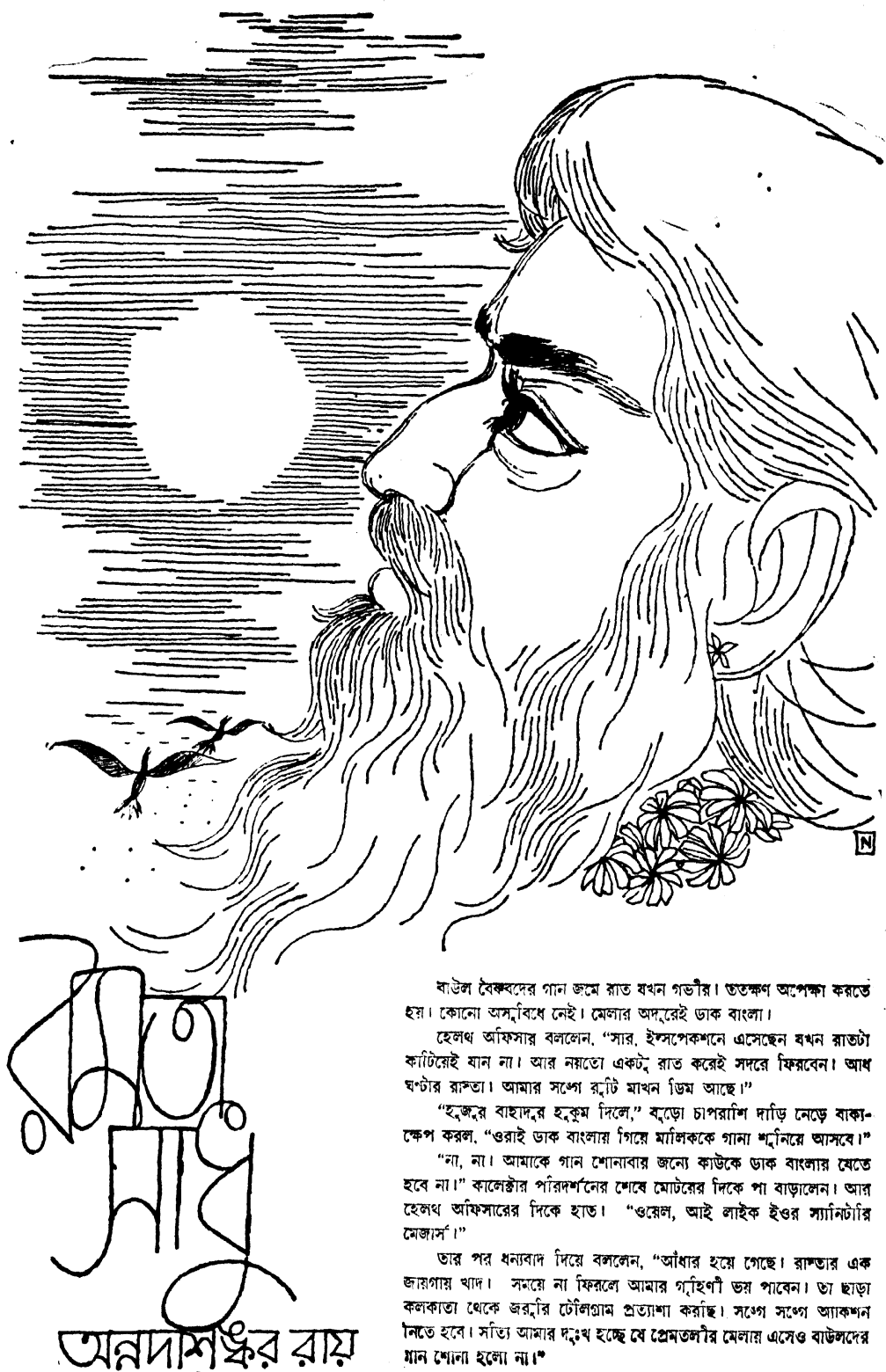
বাউল বৈষ্ণবদের গান জমে রাত যখন গভীর। ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। কোনো অসুবিধে নেই। মেলার অদূরেই ডাক বাংলা।

হেলথ অফিসার বললেন, "সার, ইন্সপেকশনে এসেছেন যখন রাতটা কাটিয়েই যান না। আর নয়তো একটু রাত করেই সদরে ফিরবেন। আধ ঘণ্টার রাস্তা। আমার সঙ্গে রুটি মাখন ডিম আছে।"

"হুজুর বাহাদুর হুকুম দিলে," বুড়ো চাপরাশি দাড়ি নেড়ে বাক্য-ক্ষেপ করল, "ওরাই ডাক বাংলায় গিয়ে মালিককে গানা শুনিয়ে আসবে।"

"না, না। আমাকে গান শোনাবার জন্যে কাউকে ডাক বাংলায় যেতে হবে না।" কালেক্টার পরিদর্শনের শেষে মোটরের দিকে পা বাড়ালেন। আর হেলথ অফিসারের দিকে হাত। "ওয়েল, আই লাইক ইওর স্যানিটারি মেজার্স।"

তার পর ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, "আঁধার হয়ে গেছে। রাস্তার এক জায়গায় খাদ। সময়ে না ফিরলে আমার গৃহিণী ভয় পাবেন। তা ছাড়া কলকাতা থেকে জরুরি টেলিগ্রাম প্রত্যাশা করছি। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিতে হবে। সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে যে প্রেমতলীর মেলায় এসেও বাউলদের গান শোনা হলো না।"

হেলথ অফিসার নাছোড়বান্দা। বললেন, "আচ্ছা, অন্তত একখানা গান শুনে যান। এখনো ঠিক জমেনি। বাউলদের আমি খোঁচাব না। কিন্তু ওই যে ওখানে দুই মূর্তি সাধু নেমেছেন ওঁদের একজনকে আমি চিনি। নিবেদন করলেই গান ধরবেন।"

কালেক্টার ঘড়ি দেখে বললেন, "পনেরো মিনিট।"

"ওদের একজন কে তা যদি বলি আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করবেন, সার?" হেলথ অফিসার চলতে চলতে বলতে লাগলেন, "দেয়ার আর মোর থিংস—"

তাঁর অভিপ্রায় ব্যাপারটাকে আগে রহস্যময় করে তুলে তার পর রহস্যভেদ করা। কিন্তু বুড়ো জমাদার তাঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে ফস্ করে বলল, "রাজার ছেলে, হুজুর।"

ডাক্তার তা শুনে আহত সুরে বললেন, "তবে তুমিই বল। আমি থামি।"

কালেক্টার তাঁর চাপরাশিকে আদেশ করলেন মোটর পাহারা দিতে। আর এগিয়ে গেলেন হেলথ অফিসারের সঙ্গে পা তুলে পা ফেলে। চলতে চলতে বাকীটুকুও শুনলেন। নিয়ামৎপুরের মেজকুমার। নবাবী আমলের খানদানী বংশ। যখের ধন পেয়ে নাকি বরাত ফিরে যায়। এখন আর সে ধনদৌলৎ নেই। তবু যা আছে তাই বা খায় কে? বড় ঘরেই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরাও কম যান না। পাঁঠাকাটার জমিদারবংশ। কী যে হলো কেউ বলতে পারে না। মেজকুমার নিরুদ্দেশ। অনেক বছর পরে এই মেলাতেই আবার আবির্ভাব। সন্ন্যাসীর বেশ।

"বুঝেছি। আরেক ভাওয়াল সন্ন্যাসী।" মন্তব্য করলেন কালেক্টার।

"না, সার। এ'র কোনো দাবী নেই। ইনি থাকতে আসেননি। বছরে দু'বছরে একবার আসেন, মেলায় ঘোরেন, পূর্বাশ্রমের পরিচয় দেন না, জমিদারির ছায়া মাড়ান না। আবার উধাও হয়ে যান। শুনেছি পশ্চিমে থাকেন। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানায় নয়।" হেলথ অফিসার থামলেন।

গাছতলায় আসন পেতে দুই সাধু বসেছিলেন। ছাড়া ছাড়া ভাবে। তাঁদের ঘিরে বেশ কয়েকজন দর্শক দাঁড়িয়েছিল। তত্ত্বকথা হচ্ছিল। বলছিলেন অপর সাধু। জটাধারী। সাধু রাজকুমারের জটা নেই। কিন্তু লম্বা চুল। দুজনেরই মুখে গোঁফ দাড়ি। গলায় মালা। হারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় মালুম হচ্ছিল না কিসের।

হেলথ অফিসার ভিক্ষাপাত্রে একটা টাকা রাখতেই সাধুদের দৃষ্টি তাঁর উপর পড়ল। সাধু রাজকুমার বললেন, "এই যে, আপনি! ভালো আছেন তো?"

কালেক্টার তাঁর সঙ্গীর কানে কানে বললেন, "আমার পরিচয় না জানালে সুখী হব।"

সাধুর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার উত্তরে হেলথ অফিসার বললেন, "ইনি আমার বন্ধু। গান শুনতে এসেছেন। যদি দয়া হয়—"

সাধুরা অমনি গান জুড়ে দিলেন। তাতে ভক্তিরস যতখানি ছিল গীতসুধা তার সিকি-ভাগও ছিল না। নিতান্ত মামুলী ও বেসুরো। ফাটা কাঁসীর মতো গলা একজনের, কুমারের তো ফুটো হাঁড়ির মতো।

কালেক্টার হেলথ অফিসারকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বোঝালেন যে তিনি অসহিষ্ণু। গানটাকে শেষ হতেও তিনি দেবেন না। ওদিকে গাইয়েদেরও খেয়াল নেই যে শেষ করতে হবে। সিকিটা আধুলিটা এ ধার থেকে ও ধার থেকে পড়তে থাকল।

কালেক্টার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিতেই উঠে এলো একখানা দশ টাকার নোট। সবে ধন নীলমণি। ওর চেয়ে ছোট কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না। দশ দশটা টাকা সাধুসেবায় লাগাতে তাঁর বিলক্ষণ অনিচ্ছা ছিল। অথচ কিছু না দিলেও ভালো দেখায় না। নিজের মান ও রাজকুমারের মান রক্ষার জন্যে ওই দশ টাকার নোটখানাই হাত থেকে খসালেন।

ভজন থামিয়ে অপর সাধু বললেন, "বাবা, তোমার কৃষ্ণে মতি হোক। রাধারানী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

সাধু রাজকুমার জীবনে অনেক পেয়েছেন। তাঁর চোখে দশটা টাকা এমন কিছু নয়। বললেন, "যা দিলেন তা শতগুণ হয়ে ফিরে আসবে।"

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসার সময় হেলথ অফিসার বললেন, "ছি! অতগুলো টাকা অমন করে নষ্ট করতে আছে! খাবে তো গাঁজা। ওই জটাধারীটা গাঁজার উপরেই থাকে। কুমারও গাঁজা ধরেছেন। অমন সুন্দর শরীর কালো হয়ে গেছে। এই রাত্রেই ওই দশটা টাকা পুড়ে ছাই হবে।"

কালেক্টার হাসলেন। "আপনি বরং এক কাজ করুন। ওঁদের কাছে ফিরে গিয়ে দশ টাকা আন্দাজের তত্ত্বকথা উশুল করে নিন। কিংবা গান।"

সত্যি তাই হলো। হেলথ অফিসার কালেক্টারকে মোটরে তুলে দিয়ে আবার সেখানে গিয়ে সাধুদের সঙ্গে জাঁকিয়ে বসলেন ও এক ফাঁকে প্রশ্ন করলেন, "মুক্ত আত্মার সঙ্গে মৃত আত্মার প্রভেদ কী?"

কালেক্টার বাড়ি ফিরে গিয়ে টেলিগ্রামের খোঁজ করতেই শুনতে পেলেন খোদ পোস্ট-মাস্টার মশায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তখন গাড়ি পাঠাতে হলো ডাকঘরে। মাস্টার মশায় তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত, কিন্তু যে টেলিগ্রামের জন্যে অপেক্ষা সে টেলিগ্রাম নিয়ে নয়। বললেন, "সার, এ মেসেজ অন্য লোকের নামে। ডেলিভার করতে আমি বাধ্য। কিন্তু মনে হলো আপনাকে একবার দেখানো উচিত। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই আমাকে ফেরৎ দিতে আজ্ঞা হয়।"

টেলিগ্রাম পড়ে কালেক্টারের চক্ষুস্থির। "হুঁ। ধন্যবাদ" এ ছাড়া আর কিছু তাঁর মুখ দিয়ে বার হলো না।

"সার, কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। নইলে চাকরি যাবে আমার। কে জানে কোথায় বদলি করে দেবে!" মাস্টার মশায় দাঁড়িয়েই থাকলেন।

"বসুন।" কালেক্টার তাঁকে অভয় দিলেন। তৃতীয় কোনো ব্যক্তি জানবে না। টেলিগ্রাম-খানা ফেরৎ দিয়ে বললেন, "ডেলিভার করতে পারেন।"

মেলা থেকে খুশি মনেই ফিরেছিলেন কালেক্টার। কিন্তু টেলিগ্রামখানা পড়ে তাঁর মনটা গেল বিগড়ে। অবাধ্য ছাত্রদের তলে তলে উৎসাহ দিচ্ছেন কে? না জনপ্রিয় প্রধান উজীর! এই দুমুখো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলবে কী করে? চালাবে কে? দশ বছর যদি এ রকম চলে তো দেশ অরাজক হবে।

"অত বিমর্ষ কেন? কী দেখে এলে মেলায়?" জানতে চাইলেন গৃহিণী।

তখন তাঁকে শোনাতে হলো সন্ন্যাসী রাজ-পুত্রের কাহিনী। যতটুকু জানা ছিল। শুনে তিনিও বিমর্ষ হলেন। "বেচারি বউরানীর জন্যে দুঃখ হয়।"

"কিন্তু জটাধারী একটা চমৎকার কথা বলেছেন। রাধারানী আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।" কর্তা বললেন রসিয়ে রসিয়ে।

"ওমা, তাই নাকি! শুনে আমার হিংসে হচ্ছে।" গৃহিণী বললেন মুখ বেঁকিয়ে। "তুমিও ভেক নিয়ে বৃন্দাবনে চলে যাবে না তো?"

কর্তা তাঁর মুখখানিকে দুই হাতে সোজা করে ধরে বললেন, "আমার রাধারানী কি আর কেউ? তুমিই সেই। সে-ই তুমি।"

(২)

পরের দিন কালেক্টার কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। দুপুরবেলা আহারের পর কুঠিতেই ফাইল নিয়ে বসলেন। পরে এক সময় কাছারিতে গিয়ে আপীল শুনবেন।

কাজের মাঝখানে বুড়ো চাপরাশি ঘরে ঢুকে সেলাম ঠুকল। "হুজুর বাহাদুরের ফুরসং হবে না বলে হাজার বোঝালেও বুঝবেন না। কী করি! রাজার ছেলেকে তো হাঁকিয়ে দিতে পারিনে। সেই যে কালকের সেই সাধু রাজকুমার।"

কালেক্টার মুখ তুলে তাঁর কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ককে বললেন, "অশ্বিনীবাবু, আপনি কি একটু ও ঘরে গিয়ে টাইপ করবেন? লোকটিকে আমি মিনিট পাঁচেক সময় দেব।"

দিনের আলোয় দেখা গেল সাধুর বয়স চল্লিশের কোঠায়। সুপুরুষ এককালে ছিলেন, এখনো তার রেশ আছে চেহারায়। কিন্তু পোড় খেয়ে বিবর্ণ ও শীর্ণ। হাত বাড়িয়ে দিতেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরে এমন ঝাঁকানি দিলেন যেন কতকাল পরে এ সৌভাগ্য

তাঁর হলো। অনভ্যস্ত ইংরেজীতে বললেন, "সরি টু ডিস্‌টার্ব ইওর অনার।"

এমন মানুষকে এতক্ষণ বাইরে আটকিয়ে রাখা হয়েছে বলে কালেক্টার দুঃখিত হয়ে বললেন, "আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি, মহারাজ ?"

"মহারাজ বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না, সার।" সাধুজী মিনতি করলেন। "কাল আমি আপনাকে চিনতে পারি নি, আপনাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করি নি। না জেনে অপরাধ করেছি, তাই মাফ চাইতে এসেছি। সাধুদের উপর আপনার অপার কৃপা। আপনার সঙ্গও সাধুসঙ্গ। আপনি পুণ্যবান পুরুষ।"

"দেখুন, ওসব কিছু নয়।" কালেক্টার বললেন, তাঁর ভুল ধারণা দূর করতে। "আপনি একজন সাধু বলে আমি আপনার দর্শন পেতে যাই নি। বাউলদের গান শুনতে আমি ভালোবাসি, হেলথ অফিসার এটা জানতেন বলে আপনার গান শুনতে আমাকে নিয়ে যান। সময় থাকলে অনেক রাত পর্যন্ত থেকে আরো অনেকের গান শুনতুম। কিন্তু সদরে কাজ ছিল।"

সাধু তা শুনে পুলকিত হলেন না। একটু সঙ্কোচের সঙ্গে শুধোলেন, "যদি কিছু না মনে করেন, একখানা গান শুনেই দশ-দশটা টাকা দান করা একটু বিচিত্র নয় কি ? তবে কি আপনি জানতে পেরেছিলেন আমি কে ছিলুম ? কিছু মনে করবেন না, সার। মনে একটা খটকা বেধেছে বলেই আপনাকে বিরক্ত করছি।"

"পেরেছিলুম বইকি।" কালেক্টার মুচকি হেসে বললেন, "ওই যে ইস্পাতের আলমারি দেখছেন ওর একটা ডালায় আছে নিয়ামৎপুর রাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কাল রাত্রে মিলিয়ে দেখেছি, মিলে গেছে। আপনিই সেই নিরুদ্দিষ্ট কুমার যাঁকে পরে সন্ন্যাসীর বেশে আবিষ্কার করা যায়। আর একটা ভাওয়াল মামলার জন্যে আমরা সেই অবধি দিন গুনছি।"

"হরি! হরি!" সাধু চমকে উঠলেন। "মামলা করবে কে! আমি! তেমন বাসনা আমার কোনো দিন হয় নি। কেনই বা হবে ? যখন আমি নিজের ইচ্ছায় সংসার ছেড়েছি। কিন্তু ওই খবরটা ভুল। নিরুদ্দিষ্ট আমি হই নি।"

"ত্রিযুগীনারায়ণ কার নাম ?" কালেক্টার জেরা করতে শুরু করলেন।

"আমারি নাম—ছিল। ও নাম একদিন খারিজ হয়ে যায়। নিজের হাতে নিজের সপিন্ডীকরণ করি। নামটা গেছে, রূপটা যায় নি, এই হয়েছে আমার কাল। সেইজন্যে জন্মভূমিতে পা দিতে সাহস হয় না। এলেই ধরা পড়ে যাই। কেউ না কেউ আমাকে দেখে চিনতে পারে। তা বলে কি চিরজীবন পশ্চিমেই কাটাতে হবে ? বাংলার মাটি বাংলার জলের স্বাদ পাব না ? বাংলা ভুলে যাচ্ছি, কথাবার্তায় হিন্দী টান। এটাও কি সন্ন্যাসের শামিল ? তাই তো আমি বছরে একবার শীতকালে আসি, মেলায় ঘুরি। হেঁড়ে গলায় বাংলা গান গাই।" সাধু বললেন একান্ত বিনয়ের সঙ্গে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে কালেক্টার ভুরু কোঁচকালেন। "আচ্ছা, পূর্বাশ্রমের কথা বললে কি পাপ হয় ? যদি না হয় তবে কাগজপত্র ঠিক করে নেওয়ার এই হচ্ছে সুযোগ। আপনি কি নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, না সকলের জ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করেছিলেন ?"

"পূর্বাশ্রমের কথা বলতে বাধা আছে তা ঠিক। তবে এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দোষের নয়। নিরুদ্দিষ্ট আমি হই নি। ওটা সত্যের অপলাপ। আমি স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করেছি। এইটেই সত্য।" সাধু ঝোঁক দিয়ে বললেন।

"ওটা কিন্তু আমার প্রশ্নের সোজা উত্তর হলো না। সকলের জ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করেছিলেন কি আপনি ? এই আমার প্রশ্ন।" কালেক্টার জেরা করলেন।

"তা হলে সব কথা খুলে বলতে হয়। বলব ?" সাধু অনুমতি চাইলেন।

"বলুন। কিন্তু সংক্ষেপে বলা চাই।" শর্ত আরোপ করলেন কালেক্টার।

"আচ্ছা, একটু ভাবতে সময় দিন। পনেরো বছর আগেকার কথা। সব কি ছাই মনে আছে ? পিছন ফিরে তাকাই নি কখনো। এই প্রথমবার তাকাচ্ছি।" বলে সাধু স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেন।

কালেক্টার চুপ করে বসে রইলেন না। দেরাজ থেকে চাবি নিয়ে স্বহস্তে ইস্পাতের আলমারি খুললেন। বার করে আনলেন একখানা বাঁধানো মোটা পুঁথি। মহারানীর আমলের। সেকালের কালেক্টার সাহেবরা স্টীলের পেন দিয়ে লিখতেন। একালের হাকিমরা লিখেছেন ফাউণ্টেন পেন দিয়ে। ইদানীং কোনো কোনো অফিসার টাইপরাইটারে লিখে বা লিখিয়ে আলাদা কাগজ এঁটেছেন।

কালেক্টার পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটি জায়গায় এসে লাল কালির দাগ দিলেন। বললেন, "আগে যা লেখা হয়ে গেছে তা তো কেটে দিতে পারি নে। সে অধিকার আমার নেই। তার গায়ে তারকাচিহ্ন দিয়ে তার তলায় একটা পরিশিষ্ট যোগ করছি। পরে যাঁরা আসবেন তাঁরা দুটোই পড়বেন।"

(৩)

"অনেক সময় দেখা যায়", সাধু বলতে আরম্ভ করলেন, "সন্ন্যাসী যারা হয় তারা জীবনে বড় রকম একটা দাগা পেয়েছে। শোক কিংবা শক। আমার জীবনে তেমন কিছু ঘটে নি। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে বাড়ির লোকের সঙ্গে বনিবনা হয় নি, ঝগড়া করে পালিয়ে গেছে। রাগের মাথায় ভেক নিয়েছে। আমার বেলা সেটাও সত্য নয়। বর্তমানকালে লোকহিতের জন্যে সন্ন্যাস নিয়েছেন যাঁরা তাঁরা আমার নমস্য। আমি কিন্তু তাঁদের একজন নই। অথবা চোর ডাকাত খুনীও নই যে পুলিসের চোখে ধুলো দিতে গেরুয়া পরে বেড়াব। সবচেয়ে বেশি লোক এ-পথে আসে সম্মানের সঙ্গে ভিক্ষা করে পেট ভরাতে। আমার বেলা সেটাও তো খাটে না। ভিক্ষা করতে হয়। না করলে চলে না। কিন্তু তা বলে কি আমি সেই জন্যে সংসার ছেড়েছি ?"

কালেক্টার ঘড়ির উপর দৃষ্টি রেখে বললেন, "তবে কিসের জন্যে ?"

"সংসারে থেকে কি ভগবানকে পাওয়া যায় না ?" সাধু বলতে লাগলেন, "কই, গোপীরা তো ঘরসংসার ত্যাগ করে মীরাবাঈ হন নি! যে পায় সে ঘরে বসেই পায়, যে পায় না সে বনে গিয়েও পায় না। ভগবানকে পাবার জন্যে আর যেই সন্ন্যাস নিক আমি অন্তত নিই নি। তা হলে কেন ? কেন ? কেমন করে এক কথায় বোঝাব ? রাত্রে ঘুম ভেঙে যেত। মশারির ভিতর উঠে বসে বলে উঠতুম, এ আমি কোথায় এলুম! স্ত্রী বলতেন, যেখানে ছিলে সেইখানেই রয়েছ। চেনা জায়গাকেই আমার অচেনা মনে হতো। চেনা মানুষকেই অচেনা। আমার বাবা, আমার মা, আমার

দাদা ও ছোট ভাই আমার দুই বোন, আমার স্ত্রী, আমার খুকু এদের এক-এক সময় চিনতে পারতুম না। অপ্রস্তুত হতুম। শোবার ঘরেই, শয্যাতেই এক-একটা সীন বেধে যেতো। স্ত্রী বলতেন, ও! বুঝেছি! তুমি পরস্ত্রী কামনা করছ। তাই নিজের স্ত্রীতে পরস্ত্রী ভ্রম হচ্ছে। হায় হায়! আমার কী হবে গো!"

কালেক্টার উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন। তাঁর কর্ণমূল আরক্ত।

"বাড়ির একটি মানুষ আমাকে ঠিক বুঝল না। কেউ বলে আমার মাথা খারাপ, কেউ বলে মন খারাপ। মনে পাপ আছে। আর আমি কেবল রাতের বেলা নয় দিনে-দুপুরেও ভাবি, এ আমি কোথায় এসেছি! এরা কারা! কোথায় যেন আমার যাবার কথা ছিল, যেতে যেতে পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছি। এখন আমার পথ বলে দেবে কে? কেমন করে আমি পথ খুঁজে পাব? বুঝতেই পারছেন, সার, আমার বিষয়কর্মে অবহেলা ঘটল, আমি জমিদারির দেখাশুনো করতে অপারগ হলুম। বাবার ধারণা আমি পাগল হতে বসেছি। পাগলের চিকিৎসা চলল। কী যন্ত্রণা! যে মানুষ পাগল নয় তাকে পাগল বানিয়ে তুলতে কতক্ষণ লাগে! আমার স্ত্রীর ধারণা আমার মন উড়ুউড়ু। জমিদারের ছেলেদের যা হয়ে থাকে। নিজের স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকে ক'জন! প্রকৃত চিকিৎসা হচ্ছে পরনারীসঙ্গ। আলাদা শোবার ঘর দেওয়া হলো। সেবিকা পাঠানো হলো। সেবিকা বলে রাত্রেও থাকবে। যদিও একটাই বিছানা। তখন আমাকে বাধ্য হয়ে পাগলামির ভান করতে হলো। সেবিকা সেই যে দৌড় দিল তার পর থেকে আর তাকে দেখি নি। কিন্তু হাতকড়ার আমদানি হলো।" সাধু শিউরে উঠলেন।

"স্ট্রেঞ্জ!" কালেক্টার অবাক হয়ে বললেন।

"স্ট্রেঞ্জ নয়। স্ট্রেঞ্জার।" সাধু সংশোধন করলেন। "নিজের বাড়িতেই আমি একজন স্ট্রেঞ্জার। কেউ জানে না আমি কোথাকার লোক, কী ভাষায় কথা বলি, কী ভাবনা ভাবি। আমিও জানিনে এটা কোন্ দেশ, কেমন করে আমি এখানে এলুম, জাহাজ কি আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে? পারিবারিক পরামর্শ বৈঠক বসল। স্থির হলো আমাকে পাগলা গারদে না পাঠিয়ে পাহাড়ে পাঠানো হবে। সরকার মশায় হবেন আমার রক্ষী। আমার একটা চেঞ্জ দরকার। তাই হলো। রানীখেত বেশ মনোরম স্থান। হিমালয়ের দৃশ্য নয়নাভিরাম। আনন্দেই কাটতে লাগল দিন। কিন্তু সেখানেও সেই একই সংকট। এ আমি কোথায় এলুম? পথ ভুলে এসেছি? পথ চিনিয়ে দেবে কে? বাবা, তুমি কি আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে? একদিন শুধোই এক গৈরিকধারীকে। সম্পূর্ণ অচেনা, তবু মনে হলো চিরচেনা।"

"ও নো, নো। তা হতেই পারে না।" কালেক্টার কণ্ঠক্ষেপ করলেন।

"দেখুন সার। আমার জীবনে এ রকম বার বার হয়েছে। এটা মিথ্যা নয়। একটু আগে যাকে কোনোদিন দেখি নি একটু পরে মনে হয়েছে এ আমার চিরপরিচিত।" সাধু বলতে লাগলেন, "তার পর সেই গৈরিকধারী আমার পথপ্রদর্শক হলেন। তাঁর সঙ্গে সেই অবস্থায় সেই বেশেই আমি চলে গেলুম। সঙ্গে একখানা কম্বল পর্যন্ত নিলুম না। যেন কাছেই কোথাও যাচ্ছি। আধ মাইল কি এক মাইল। খেয়াল ছিল না যে সরকার মশায়কে একবার জানানো উচিত। তিনি আমাকে চোখে চোখে রাখলেও মাঝে মাঝে চোখের আড়ালে পায়চারি করতে দিতেন। আমার উপর সেটুকু বিশ্বাস তাঁর ছিল। আমিও তাঁকে অবিশ্বাসের কারণ দিই নি। কিন্তু যখন খেয়াল হলো যে বেচারা সরকারকে না বলে আমি ভুল করেছি তখন আমি কৈলাসের পথে।"

"আর বলতে হবে না। এবার আমি বুঝেছি।" কালেক্টার বাধা দিলেন।

"কখন যে দীক্ষা নিলুম, গৈরিক পরলুম, সাধু হলুম কিছুই আমার খেয়াল নেই", থামলেন না রাজকুমার। "আমি দর্শকমাত্র। ঘটনা ঘটে গেল আপনা আপনি। তারপর থেকে রমতা সাধু, বহতা নদী। নদীর মতো বয়ে চলেছি। কে জানে কিসের অভিমুখে। সমুদ্রের না মরুভূমির। যে নদী মরুপথে হারালো ধারা আমি হয়তো সেই নদী। লাভ কী হয়েছে জানি নে। মুক্তির নিকটতর হয়েছি না শুধু মৃত্যুর নিকটতর। কিন্তু পরিত্যক্ত জীবনে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।"

কালেক্টার সেই মোটা পুঁথিখানাতে কী সব লিখে আলমারির বন্ধ করলেন।

(৪)

"অধমের বিষয়ে কী লেখা হলো অধম যে জানতে পেলো না, সার।" অনুযোগ করলেন সাধুজী।

"খারাপ কিছু নয়।" কালেক্টার বললেন, "আমার পরে যাঁরা কালেক্টার হবেন তাঁদের অবগতির জন্যেই লিখে রাখা। আর কাউকে দেখানো বা শোনানো বারণ। ওতে কী আছে জানতে হলে কালেক্টার হয়ে জন্মাতে হবে আপনাকে।"

"হেঁ হেঁ হেঁ।" সাধু কৃতার্থ হয়ে বললেন, "সাত জন্ম তপস্যা না করলে কি কালেক্টারসাহেব হওয়া যায়? আমি কি তেমন পুণ্য করেছি, সার?"

এবার কৃতার্থ হবার পালা কালেক্টারের। "হা হা! এ জেলার বাইরে আমি কে! একটা ভিখিরীও আমাকে সেলাম করবে না। কিন্তু থাকত যদি আমার অঙ্গে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা তা হলে দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে ও শহরে হাজারটি মাথা আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ত। একখানা পুরনো আলখাল্লা-টালখাল্লা আমার জন্যে তুলে রাখবেন, সাধুজী। কে জানে কোনদিন উজীর-নাজীর প্রভৃতি কাঁসার পাত্রের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধবে, তখন মাটির পাত্র ভেঙে তলিয়ে যাবে।"

সাধু রাজকুমার এর একবর্ণও বুঝতে পারলেন না। কালেক্টার বলতে থাকলেন, "সত্যি আমার হিংসে হয় সন্ন্যাসীদের। তাঁরা সংসারজ্বালার থেকে মুক্ত। তার চেয়ে বড় কথা তাঁদের যৌবনজ্বালা নেই।"

"কী নেই? কী নেই?" ধরতে পারলেন না সাধু। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, "ওঃ বুঝেছি! কী যে মনে করেন, সার! আচ্ছা, তা না হয় হলো। কিন্তু যাদের ওটা নেই তাদের আর একটা জ্বালা আছে যে। অনবরত জিব লকলক করছে। দিনরাত খাই খাই। কখন খাই, কী খাই। গৃহীদেরও অত খাই খাই নেই।"

"বটে! এটা তো আমার জানা ছিল না।" কালেক্টার হাসলেন।

"যাদের এটা নেই তাদের আরেক জ্বালা। সারাক্ষণ বকবক বকবক। চব্বিশ ঘণ্টা বিজলীর ডাইনামো চলছে। কেউ শুনতে চায় না। মানুষ কাছে ঘেঁষতে চায় না। তবু বকবক বকবক।" সাধু তার সঙ্গে জুড়লেন, "গৃহীরাও এত বেশি মুখ চালায় না।"

"তাই নাকি! এটা তো আমার জানা ছিল না।" কালেক্টার মেতে উঠলেন।

"সার, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো অবাধ্য ঘোড়া। একটাকে দমন করতে গেলে আর একটা উদ্দাম হয়। যার সব ক'টা ইন্দ্রিয় বাগ মানে তার মন ব্যাটা বেয়াদব। তাই বলি সন্ন্যাসীদের দৌড় বেশি দূর নয়। গৃহীরাও ছাড়িয়ে যেতে পারে। আমার তো মনে হয় দমন করে তেমন ফল হয় না।" সাধুজী আফসোস করলেন।

"আমি ভাবছিলুম কী", কালেক্টার বললেন, "ইন্দ্রিয়গুলোর সব ক'টার সঙ্গে সব ক'টার যোগাযোগ আছে। একটার খিদে না মিটলে আরেকটার খিদে বেড়ে যায়। এই-ভাবেই ক্ষতিপূরণ ঘটে। প্রকৃতির প্রতিশোধ।"

"মহামায়ার ফাঁদ পাতা রয়েছে। তাকে এড়াতে পারে কে!" সাধু জমিয়ে বললেন।

"আপনাকে এক মহারাজের গল্প বলি। তিনি ভাবতেন তিনি ষড় রিপু জয় করেছেন। হরিদ্বারের কাছে একটি জঙ্গলে তাঁর আশ্রম। কদাচিৎ দুটো-একটা কথা বলেন মুমুক্ষুদের জিজ্ঞাসার উত্তরে। অধিকাংশ সময় ধ্যানস্থ থাকেন। ঘুরতে ঘুরতে আমি একবার তাঁর আশ্রমে অতিথি হই। তাঁর পাশে বসে ধ্যানের চেষ্টা করি। সাধুসঙ্গের একটা অদৃশ্য প্রভাব আছে। একজন আরেকজনকে এগিয়ে দেন।"

কালেক্টার কৌতূহলী হন। ঘড়ির দিকে তাকাতে ভুলে যান।

"এখন হয়েছে কী", সাধু বলতে লাগলেন, "আশ্রমের বাইরেই জঙ্গল। সেখানে একদিন একটা হরিণ চরতে এসেছিল। শিষ্যেরা কাঠ

কাটতে গিয়ে দেখতে পায় ও মেরে খায়। একটা বিশেষ কর্মের জন্যে আমাকে যেতে হয়েছিল সেদিকে। দেখি বাবাজীরা হরিণের মাংস গোপনে রেঁধে খাচ্ছেন। বনভোজন। আমাকেও আস্বাদন করতে বললেন। আমি তখন আগুন। নিরীহ হরিণ! কার কী করেছিল! কেন জীবহত্যা করা হলো? আমি চললুম মহারাজকে খবর দিতে। স্বচক্ষে দেখুন এসে তাঁর গুণধর শিষ্যদের কীর্তি। গুরুকেও তো পাপের বোঝা বইতে হবে শিষ্যের। বললুম, মহারাজ! ওরা হরিণ মেরে খাচ্ছে। আর যায় কোথায়! মহারাজ ক্রোধে খড়্গহস্ত। শালা, তুমহারা হিরণ? জিস্‌কা হিরণ ও বোলেগা। তুম কাহে বোলেগা? এই বলে আমার দিকে খড়্গ ছুঁড়লেন। আমি হুঁশিয়ার না থাকলে আমার মাথায় লাগত। হরিণ হত্যার পর নরহত্যা হতো।" সাধুর চোখ ছল ছল করছিল।

"ভয়ানক অন্যায়!" কালেক্টারের চোখ জ্বলছিল।

"পূর্বাশ্রমের সংস্কার যে আমি ভুলতে পারি নি মহামায়া তার পরীক্ষা নিলেন। আমি ফেল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমি একটা যে সে লোক নই, একটা রাজার ছেলে। আমাকে আপনি "শালা" বললেন! এই আপনার সাধনার স্বরূপ! এ আশ্রমের মঙ্গল হবে না। মহারাজ আমার গা জড়িয়ে ধরলেন। মিটমাট হলো। বললেন, তুমিও তোমার সাধনা নিয়ে থাকবে, আমিও আমার সাধনা নিয়ে থাকব, সে আর হয়ে উঠল কই! ও শালাদের শয়তানি দেখে তুমিও ভ্রষ্ট হলে, তোমার নাক গলানো দেখে আমিও ভ্রষ্ট হলুম। মাথার উপর একজন আছেন তিনি সর্বদর্শী। সাজা দিতে হয় তিনি দেবেন। আমি দেবার কে! তবে মৃগ মেরে খেয়েছে বলে নয়, আশ্রমের বিধি লঙ্ঘন করেছে বলে আমিও শাসন করব। যাও, নিজের আসনে গিয়ে ধ্যান লাগাও। প্রেমসে প্রীতমের সাথে মিলে যাও।"

"তারপর?" কালেক্টার আকর্ষণ বোধ করছিলেন।

"তারপর আবার সেইরকম অনুভব। এ আমি কোথায় এসেছি? এরা কারা? মহারাজ আমাকে ধরে রাখতে পারলেন না। আমাকে ধরে রাখবে এত প্রেম কার আছে! নেই। নেই। রমতা সাধু বহতা নদী।" সাধু ভাবে ভোর।

কালেক্টারও ভাবাকুল। "আমার তো মনে হয় আপনার সংসার ত্যাগ ব্যর্থ হয়েছে। আপনি যাকে খুঁজছেন সংসারের বাইরেও সে নেই। তা হলে ফিরে এলেই হয় সংসারে। তত প্রেম নেই, কিন্তু কিছু প্রেম তো আছে। নইলে আমরা বেঁচে আছি কী করে? আপনার পূর্ব-সংস্কার এখনো রয়েছে। আপনি একটা রাজার ছেলে। বেশ তো। ফিরে এসে সম্পত্তির ভাগ নিন। আমি পিছনে আছি।"

"আরে না, না। না, না, না। এ আপনি কী বললেন এত বড় জ্ঞানী হয়ে।" সাধু লাফিয়ে উঠলেন। "এখানেও দেখছি সেই মহামায়ার ফাঁদ। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলুম আর অমনি আপনি আমাকে ধরে নিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন? না, দাদা, ও ঘাটে আর বাঁধব না মোর তরী। উজিয়ে যেতে পারব না দাঁড় বেয়ে বা গুন টেনে। ফুটো পাল, ভাঙা মাস্তুল। বাতাস প্রতিকূল।"

এই বলে গুন গুন করে গান ধরলেন, "মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না।"

সমস্তটা মনে আসছিল না। সাধু দুই চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, "আমি হাল ছেড়ে দিয়ে ভেসে যাচ্ছি যে দিকে স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমাকে বাঁচিয়ে রাখার গরজ যার সে-ই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। যখনি দেখি আসক্তি বোধ করছি, আলস্য বোধ করছি, আরাম বোধ করছি তখনি আবার মনে পড়ে যায়, এ আমি কোথায় এলুম! এরা কারা! অমনি লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ভেসে যাই। বহতা নদী আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।"

কালেক্টারদের সঙ্গে জমিদারদের একটা অলিখিত সম্পর্ক দেড় শ' বছর ধরে গড়ে ওঠে। সেটা অর্থনৈতিক বা অফিসিয়াল নয়। আবার সামাজিকও নয়। জেলার জমিদাররা জানতেন যে তাঁদের বন্ধু, দার্শনিক ও দিশারী বলে একজন আছেন। তিনি কালেক্টার। অপর পক্ষে কালেক্টাররাও জানতেন যে এইসব পুরোনো অভিজাত বংশকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তেছে।

"ওয়েল, কুমার," কালেক্টার এবার পূর্বাশ্রমের সুবাদে বললেন, "আমার চোখের সামনে একটা প্রাচীন বংশ ধ্বসে পড়ছে। আপনি বোধহয় নিয়ামৎপুরের সব খবর রাখেন না। কষ্ট হয়, কিন্তু রুগী যদি বাঁচতে না চায় ডাক্তার কী করতে পারে!"

"খবর যে কানে পৌঁছয় না তা নয়।" বললেন ভূতপূর্ব কুমার, "কিন্তু বাঁচা বলতে কী বোঝায়? স্বার্থপরের মতো বাঁচা না সবাইকে নিয়ে বাঁচা? মিলে মিশে বাঁচা? জমিদাররা বাঁচতে শেখেনি। প্রজাদের মেরেছে। শরিকদের ভুগিয়েছে। এবার আর ওদের রক্ষা নেই, স্যার। কেন অক্সিজেন দিচ্ছেন? ওরাও জানে যে ওদের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে।"

কালেক্টার বেল টিপলেন। সাধুকে ইঙ্গিত করা হলো যে তাঁরও সময় ফুরিয়েছে।

হঠাৎ ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ল। সাধু এতক্ষণ চেপে রেখেছিলেন। আর পারলেন না। বলে ফেললেন, "শালা বলে কী না, ও টাকা তোর ভগ্নীপৎ দিয়েছে আমাকে। আমি বলি, তোর বাপ দিয়েছে আমাকে। ও শালার সঙ্গে আমি পারব কেন? ওর গায়ে হাতীর জোর। নিল কেড়ে দশ টাকার নোটখানা। সারারাত শালা যক্ষের মতো পাহারা দিয়ে জেগে থাকল। পাছে আমি নোটখানা দখল করি। আমাকেও জাগিয়ে রাখল। আর ওই ছোটলোকটার মুখ দেখব না বলে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কেটে পড়লুম। আজকেই পশ্চিমের ট্রেন ধরব। বিনা টিকিটেই যেতুম, কিন্তু ধরা পড়লে নিয়ামৎপুরেরই বদনাম হবে। প্রাচীন বংশের বদনামে আপনারও তো বদনাম।"

"ননসেন্স!" কালেক্টার ক্ষেপে গিয়ে টেবিল বাজালেন। চুপ করার ইঙ্গিত।

ফরগিভ মি, ইওর অনার। ওই দশটি টাকার মালিক তো আমিই। ওর ক্ষতিপূরণ কি আমি পাব না?" কাতর চোখে তাকালেন প্রেমতলীর সাধু। ভক্ত মহারাজ।

কালেক্টার রাগে ঠোঁট চেপে দেরাজ থেকে একখানা দশ টাকার নোট টেনে নিয়ে নিঃশব্দে বাড়িয়ে দিলেন। দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অশ্বিনীবাবুর দিকে তাকালেন। অমনি ডিকটেশন শুরু হলো। "মাই ডিয়ার ফকনার—" অর্থাৎ কমিশনার।

"শতগুণ হয়ে ফিরে আসবে," বলে ত্রস্ত পদে বিদায় হলেন কুমার ত্রিযুগীনারায়ণ।

মা নিষাদ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কাজটা খুব তাড়াতাড়িই চুকে গেল যাহোক। এখন শিবদাস কী করে, কোথায় যায়!

ভেবেছিল অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখবে। ফাইলটা খুঁজে পেতেই লেগে যাবে ঘণ্টাখানেক। কিংবা গিয়ে হয়তো দেখবে অফিসর লাঞ্চ খেতে বেরিয়েছে। তা হলে কতক্ষণে ফেরে তার ঠিক কী। স্বস্তিতে প্রতীক্ষা করতে পারবে শিবদাস। যদি লাঞ্চে না বেরোয়, ক্যাণ্টিন থেকে আনিয়ে ঘরে বসেই টিফিন করে, তাহলে সে সময় দু একজন বন্ধু কোন না জুটবে। আর একবার আড্ডার মধ্যে পড়লে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসা কষ্টকর।

সে ক্ষেত্রে চারটে বাজিয়ে, নিশ্চিন্তে, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে শিবদাস।

কিন্তু অন্য রকম হয়ে গেল। অফিসরকে পাওয়া গেল তার চেয়ারে, ফাইলটা টেবিলের উপর আর ডিলিং ক্লার্ক পাশে দাঁড়িয়ে। এমনও হল না যে একটা লোক আগে থেকে বসে আছে, অপেক্ষা করতে হবে।

আধঘণ্টার মধ্যেই কাজ শেষ। কিছুটা এগিয়ে জি-পি-ওর ঘড়ি নজরে পড়ল। ছি ছি, মোটে এখন দেড়টা।

এখন কোথায় যায়, কী করে!

বাড়ি ফেরার কথা ভাবতেও পারে না। আস্তে-আস্তে প্রায় নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছে এ পর্যন্ত বেশ ভাবা যায়, সিঁড়ির মুখে বন্ধ দরজায় টোকা মারছে এও না হয় কল্পনা করা চলে, কিন্তু তারপর?

দরজা খুলে দেবে কে? ডেকে নেবে কে ভেতরে? ভাবতেই শিবদাসের বুকের মাঝখানটা একটুখানি হয়ে গেল।

বাড়ির মধ্যে এখন, এ সময়টায়, মোটে একজন প্রাণী উপস্থিত। সে আর কেউ নয় স্বয়ং বিভাবতী।

আরো একদিন দুপুরে বেরিয়ে দুটো-তিনটের মধ্যে ফিরেছিল শিবদাস। আঁচল লুটোতে-লুটোতে উঠে এসেছিল বিভাবতী। দরজা খুলে দিয়ে বলেছিল, 'এরই মধ্যে হয়ে গেল?'

সে কী লজ্জা, এরই মধ্যে হয়ে যাওয়া! চারটে-পাঁচটের আগেই বাড়ি ফিরে আসা!

দরজাটা ফের বন্ধ করতে করতে বিভাবতী বলেছিল, 'আমার ঘুমটা নষ্ট করে দিল! একেবারে চারটে বাজিয়ে বাড়ি ফেরা যেত না?'

দুপুর একটা থেকে চারটে পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র ঘুমোয় বিভাবতী। আজ ত্রিশ বছর ঘুমুচ্ছে।

'ত্রিশ বছর?' হিসেবে ভুল ধরতে চাইত বিভাবতী।

গণনায় অব্যর্থ শিবদাস। 'আটাশ বছর চাকরি করেছি আর রিটায়ার করেছি দু বছর। আটাশে আর দুয়ে যোগ করলে কত হয়?'

'তুমি তো এ দু বছর বাড়িতে বসে থেকে আমার ঘুম দেখছ। বাকি আটাশ বছরের তুমি কী জানো? বাকি আটাশ বছর তো দুপুরে তুমি আপিসে, বাড়ির বাইরে। আমি কী করেছি না করেছি তা বলো কী করে?'

'এ দু বছর ঘুমের যা নমুনা দেখছি তা থেকে বলি।' মাথা চুলকেছে শিবদাস: 'আটাশ বছর একটানা সাধনা করা না থাকলে দু বছরে এমন পাকাপোক্ত ঘুম হয় না।'

'কিন্তু তুমি একটা সমর্থ পুরুষ মানুষ হয়ে কী করে যে দুপুরে ঘুমুচ্ছ দু বছর, ভাবতে লজ্জায় মিশে যাই মাটির সঙ্গে।'

লজ্জায় শিবদাসও মিশে যায়। কিন্তু করবে কী? রিটায়ার করার পর কর্তৃপক্ষের কাছে কত ঘোরাফেরা করেছে একটা রি-এমপ্লয়মেন্ট-এর জন্যে, কিন্তু পাত্তা পায়নি।

'আপনার মাথার চুল সব পেকে গিয়েছে।' কর্তৃপক্ষের মুখে এই এক বুলি।

'ওটা আমাদের বংশের বৈশিষ্ট্য। চুল পেকে গিয়েছে বলে আমি তো আর অথর্ব হয়ে যাইনি। যে বয়সে আর পাঁচজন রি-এমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছে আমারও সেই বয়েস।'

'তা হলে কী হবে? সবাই আপনার মাথার চুল দেখে বলবে, ঐ দেখ, আর রাজ্যে লোক ছিল না, কোত্থেকে এক বুড়োকে এনে বসিয়েছে।'

'বুড়ো না হলেও বুড়ো বলবে?'

'তা বলতে, গালাগাল দিতে, বাধা কী! দিলেই হল। তা ছাড়া—'

'কী তা ছাড়া?'

'তা ছাড়া আপনার অবস্থা ভালো। আপনি একখানা বাড়ি করেছেন।'

'তা ছোটখাটো একখানা করেছি। রিটায়ার করে কে না করে?'

'নিচের তলাটা ভাড়া দিয়েছেন।'

'কেন দেব না? আমার ফ্যামিলি ছোট, দুই ছেলে আর আমরা স্বামী-স্ত্রী—অক্লেশে ভাড়া দেওয়া যায় নিচেটা। বলুন, আপনি হলে দিতেন না?'

'তা ছাড়া আপনার বড় ছেলে ভালো চাকরি করে।'

'হ্যাঁ, বার্নার-মরিসনএ আছে, সাতশো টাকা মাইনে। ছোট ছেলেটা স্কলারশিপ নিয়ে লণ্ডনে গিয়েছে ডক্টরেটের জন্যে।'

'তবেই দেখুন—'

'কী দেখব? আর্থিক অবস্থা দেখে রিএমপ্লয়মেন্ট হবে নাকি? না কি যোগ্যতা দেখবেন? লোকটা দুঃস্থ বা কন্যাদায়গ্রস্ত বা অনেকগুলো তার নাবালক শিশু আছে এই বিবেচনায় চাকরি হবে?'

'এ সব বিবেচনা করতে হবে বৈকি। আপনার যখন ডিপেণ্ডেণ্ট নেই—'

'ডিপেণ্ডেণ্ট নেই মানে? আমার স্ত্রী ডিপেণ্ডেণ্ট। তার দ্বিপ্রহরের ঘুম আমার ডিপেণ্ডেণ্ট।'

'ঘুম?'

'দুপুরে আমি আপিসে আবদ্ধ ছিলাম বলেই আটাশ বছর একটা থেকে চারটে একটানা ঘুমুতে পেরেছেন। এখন আমি ঘরে এসে বসেছি বলে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। আর ঘুমের ব্যাঘাত হলেই ব্লাড-প্রেশার।'

'কেন আলাদা ঘরে থাকলেই হয়!'

'কী যে বলেন! উপরে ঘর তো তিনখানা। একখানা বড় ছেলের, আরেকখানা জিনিসপত্রে ঠাসা, ছোট ছেলে ফিরলে ছোট ছেলের হবে। আর তৃতীয়খানা আমাদের স্বামী-স্ত্রীর।'

'আপনার বড় ছেলের বিয়ে হয়েছে?'

'না, হয়নি এখনো। তবে এবার হবে। সম্বন্ধ আসছে।'

'যতদিন না হচ্ছে ততদিন দুপুরবেলাটা আপনি আপনার ছেলের ঘরে বসে কাটান। গৃহিণীকে রাখতে দিন তাঁর পূর্বাবস্থা।'

'অসম্ভব। ছেলে যতক্ষণ না থাকে ততক্ষণ দোরে তালা ঝোলানো। ছেলের ফিরতে-ফিরতে আটটা। তাই ওঘর আর আমাদের কাজে আসে না।'

'তবে ছেলের বিয়ে হয়ে গেলে?'

'তখন আর তালা ঝোলাবে কোনখানে? তখন ওর বউ তো আমাদের হেপাজতে, আমাদের তত্ত্বাবধানে, যা বলব তাই শুনবে। কিন্তু সে কবে আসবে, ভবিতব্য জানে।'

'ছোট ছেলের ঘরটায় যান না।'

'কতদিন বলেছি ঐ ঘরেই আমার একটু জায়গা করে দাও। বলেছেন ঐ ধুলো বালি আবর্জনার মধ্যে তোমার জায়গা হয় না। তোমার একটা মান নেই? শুনুন কথা! চাকরি থেকে বার হয়ে যাওয়া সরকারী বুড়োর আবার মান! শিবের খোঁজ নেই, গাজনের ঘটা! আমি বলি কী, রিটায়ার করার পর আমি তো এখন জিনিস হয়ে গিয়েছি, আমি তোমার ঐ জিনিসপত্রের সামিল হয়ে সেখানেই পড়ে থাকি গে। তাতেও আবার মায়া! বলুন, তবে আমি কী করি, কী করে আমার দুপুরগুলো কাটাই ভদ্রভাবে?'

'দুপুর কাটাবারই জন্যে আপনাকে তা হলে চাকরি দিতে হবে?'

'সত্যি কথা বলতে কী, শুধু দুপুর কাটাবার জন্যে। আর সেটা বুঝতেই পাচ্ছেন, মানী চাকরি। নইলে কী রকম উচ্ছন্নে গিয়েছি দেখুন, রিটায়ার করার পর থেকে দুপুরে সমানে ঘুমুচ্ছি দু বছর। চাকরিতে থাকতে এ কথা কল্পনা করতে পেরেছি কোনোদিন? দুপুরের রোদের কী রকম চেহারা তাই জানতাম না।'

'না ঘুমিয়ে ঘরে বসে অন্য কোনো কাজ-কর্ম করলেই হয়। ধরুন লেখাপড়ার কাজ। রিটায়ার করার পর অনেকেই তো বই লেখে, ধর্মের বই, কিংবা পূর্বস্মৃতি—'

'দুপুরে জেগে থেকে কাজ করব? তা হলে ওপক্ষ ঘুমুবেন কী করে? খুটখাট হবে, কাগজ ওলটাবার খসখস, হয়তো একবার চেয়ারটাকে টানলাম টেবিলের কাছে—আর কথা নেই, অমনি ভস্ম থেকে জেগে উঠবেন হুতাশন। তা ছাড়া যাতে আলো না আসে জানলাগুলোও তো বন্ধ করে দেবেন। করুন আপনার লেখাপড়া! সুতরাং জাগন্ত লোকটাকে ঘুমন্ত করে ছাড়বেন। আমাদের রিটায়ারমেণ্ট আছে ওদের রিটায়ারমেণ্ট নেই। না ঘুম থেকে, না বা রসনা থেকে। সুতরাং—'

এত আবেদন-নিবেদন করেও চাকরি হয়নি শিবদাসের। ঘরের অন্ধকূপেই বন্দী হয়েছে দুপুরগুলো।

একবার মনে হল এখন বাড়ি না ফিরলে কেমন হয়?

যদি আরেকটা কোনো ঘর থাকত। আরেকটা কোনো বিশ্রাম। আরেকটা কোনো ঘনিষ্ঠতা।

যেখানে বেকারত্বের ক্ষমা আছে। বার্ধক্যেরও প্রশ্রয় আছে। আছে সমস্ত আলস্যের অভিনন্দন।

হায়, সে মরীচিকাই বা কোথায়?

অন্বেষণের অভ্যাস বাঁচিয়ে না রাখলে মরীচিকার পিছনেও ছোটা যায় না।

ডাক্তার ঠিকই বলে, 'জীবনে স্নিগ্ধ হতে হলে একটি নির্বন্ধকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।'

কোথায় সেই নির্বন্ধ?

ভাবতে-ভাবতে বাড়ির দিকেই পা বাড়াল

শ্রেষ্ঠ বাংলা সাহিত্য-সাপ্তাহিক "দেশ"-এর

লোকপ্রিয়তার স্বরূপ

(সাপ্তাহিক বিক্রয় সংখ্যার গড় : হাজার হিসাব)
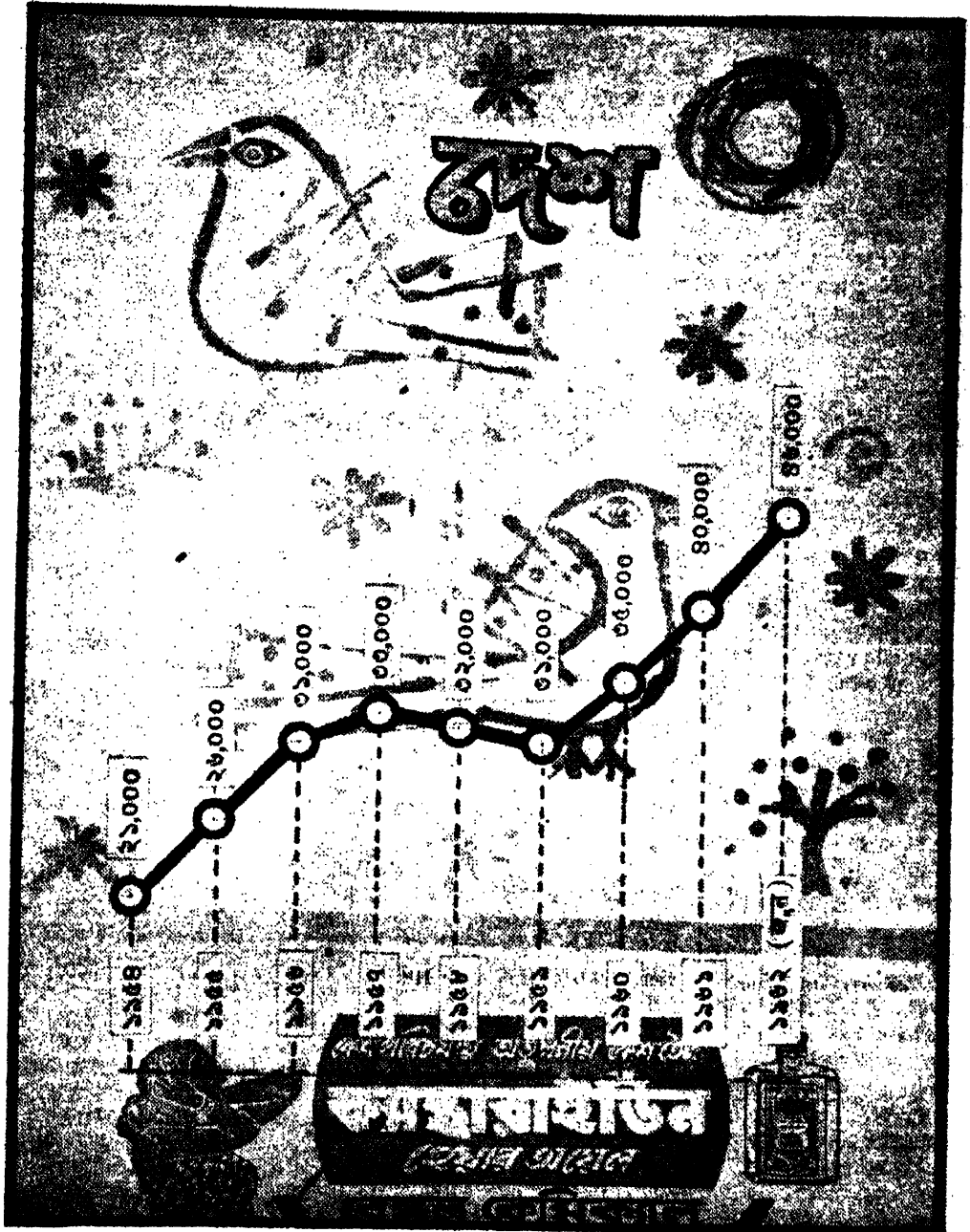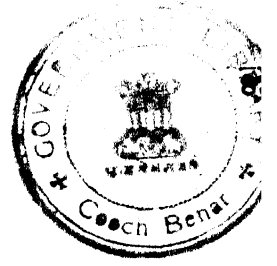
শিবদাস। আপিস পাড়ায় এমন কোনো বন্ধু নেই যে যার সঙ্গে সহৃদয় গল্প করা চলে। কারু সঙ্গে আজকাল বক্তব্য বিষয়ে সমতা খুঁজে পাওয়াই কঠিন। এমন নিশ্চয়ই উৎসাহ নেই যে ঘুরে ঘুরে দোকান দেখেই দিন কাটাতে পারে। কিংবা মাঠে গিয়ে শুতে পারে গাছতলায়। আর ট্র্যামে-বাসএ যে ঘুরবে ট্র্যাম-বাসএ জায়গা কোথায়?

দড়িছেঁড়া গরু আবার গোয়ালের দিকেই ফিরে চলল।

সিঁড়িটা যেখানে দোতলার দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে ছোট একটা মোড়া রেখে এসেছে শিবদাস। পা টিপে-টিপে উঠে গিয়ে সেখানে বসে অপেক্ষা করলে। চারটা বাজো-বাজো হলেই ধাক্কা দেবে দরজায়।

যদি একটা নাতি থাকত, এখুনি, অসময়েই, খুলে দিত দরজা। হ্যাঁ, বয়সে নিতান্ত ছোটই হবে সে, কিন্তু অত্যন্ত দুরন্ত বলে ঘুমুত না সে দুপুরে। হয়তো হাত বাড়িয়ে খিলের নাগাল পেত না, কিন্তু দুষ্টু ছেলে, ঠিক একটা টুল এনে, তার উপর দাঁড়িয়ে খিল ধরত। আর হাসত খিলখিল করে।

কতদিনে এত বড় নাতি হবে তার! নিজের মনেই হেসে উঠল শিবদাস।

নাতি না হোক বড় ছেলের বউ তো হতে পারত। সংসারে আর এক বন্দী বাসিন্দে। সে নিশ্চয়ই তার শাশুড়ির মত নিরুদ্দম-বিমুখ হত না। নিঃশব্দে উঠে এসে আরো নিঃশব্দে খুলে দিত দরজা।

শাশুড়ি যে ঘুমে সেই ঘুমে। জানতেও পেত না ঘুণাক্ষরে।

না, আর দেরি করবে না। এই মাসের মধ্যেই ছেলের সম্বন্ধ করবে। ছেলে বলে দিয়েছে যে মেয়ে বাবা পছন্দ করবেন তাতেই সে সম্মত। সারাজীবন যিনি সাক্ষী দেখে এসেছেন, তাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস করেছেন, তাঁর বিচার ভুল হবার নয়। আর তুমি এত বড় একটা জ্ঞানী লোক, বলেছে বিভাবতী, তোমার হাঁ-কে আমি না করতে যাব না।

ঘুমিয়ে পড়লে দুপুরটা শুধু কাটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সন্ধে কাটানো আরো কঠিন।

'সন্ধেবেলা ঘরের মধ্যে বসে আছ কী গুম হয়ে?' ঝাঁটা দিয়ে ওঠে বিভাবতী: 'যাও না, দু দণ্ড ঘুরে এস না।'

কোথায় যায়! কী করে!

পার্কে যাবে? দলের মধ্যে বসে অতীতের গন্ধ শুঁকবে? না পথে-পথে ঘুরবে আবোল-তাবোল? এত বয়সেও ধর্মে মতি হল না যে, লোকের কাছে উপোসী সেজে ডুবে-ডুবে জল খাবে? এখন কোনো পাঠাগারে ঢুকে বই-ম্যাগাজিন পড়া মানে মেটে হুঁকোয় তামাক খেয়ে গড়গড়ার খোঁজ করা।

কোথাও ভালো লাগে না, নরহরি ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে এসে বসে। আধুনিক সমাজের নানা বিচিত্র কাহিনী শোনায় নরহরি। শোনা কথা নয়, দেখা কথা, হাত দিয়ে নাড়া-চাড়া করা কথা। যদি বলেন তো আপনাকে দেখাব একদিন।

'না, না, ভালোও যথেষ্ট আছে।' মুখচোখ গম্ভীর করল শিবদাস।

'না, ভালোই তো অনেক। তবে খারাপও কিছু মন্দ নয়। কনট্রোলের বা একেকটা হাওয়া উঠছে না থেকে-থেকে—'নরহরি তার ডাক্তারি ব্যাগের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে লাগল।

'কিন্তু খারাপ কী, আপনি খারাপ কাকে বলেন?'

'একমাত্র দারিদ্র্যই খারাপ। একমাত্র দারিদ্র্যকেই খারাপ বলি।' শিবদাসের কানের কাছে মুখ আনল নরহরি: 'দেখবেন একদিন?'

'কী রকম খারাপ?' অলক্ষ্যে শিবদাসের গলাও মন্থর হল।

'সে আপনি বুঝবেন, আপনার বিচক্ষণ চোখ বুঝবে।'

কী ভেবে পিছিয়ে গেল শিবদাস। বললে, 'দরকার নেই।'

'না, না, দরকার আছে।' ডাক্তারি পরামর্শ দিচ্ছে এমনিভাবে বলে উঠল নরহরি: 'একটুও মন্দের গন্ধ না থাকলে আনন্দ নেই জীবনে। আপনাকে আগেও বলেছি, এখনো বলি, সব সময়েই বলি, জীবনে একটি নিষিদ্ধতা না থাকলে সিদ্ধ হওয়া যায় না।' বলে দরাজ গলায় নিজেই প্রচুর হেসে উঠল নরহরি।

'কী রকম খারাপ তবে?' শিবদাস আবার কৌতূহলী হল: 'ঐ বাবা রাস্তার বারান্দার জানলার শিক ধরে—'

'না, না, ওরা কোথায়? ওরা কবে হটে গিয়েছে, সরে পড়েছে, কিংবা মিশে গিয়েছে ডাইলিউট হয়ে।'

'তবে তোমার হাতের কাটা-ছেঁড়া অপারেশন-করা রুগীরা?'

'না তারা ভালো হয়ে বাড়ি ফিরেছে। নির্বিঘ্নে বিয়ে করেছে।'

'তবে এরা কারা?'

'এরা এক নতুন দল। এরা শুধু প্রেমালাপ করে। এদের চাহিদা কম, এরা খারাপ হতে-হতেও খারাপ হয় না। ক্যালিকুলেটের মত চেউকে এরা সামনে রাখে। রাখতে পারে। দেখবেন একটি?'

গলার কাছটা দলা পাকিয়ে এল শিবদাসের। বললে, 'এদের ভবিষ্যৎ কী?'

'বিয়ে, নয়তো ভাল চাকরি। দারিদ্র্যের জন্যেই তো সব। দারিদ্র্যের সমাধান হয়ে গেলেই আর এটার দরকার হয় না।'

'কিন্তু বিয়ে বা চাকরি সব জায়গাতেই একটা কিছু এনকোয়ারি থাকে।' বিচক্ষণের মতই মুখ করল শিবদাস:

'সেই এনকোয়ারিতে যদি জেনে ফেলে মেয়েটা এই রকম—'

'বা, সেই রিস্ক তো আছেই।' হাসল নরহরি: 'অফিসরের ঘুষ নেওয়াতেও তো সেই রিস্ক। তাই বলে কি ঘুষ নিচ্ছে না অফিসর?' স্বরের মৃদুতার অর্থকে তীক্ষ্ণ করল নরহরি: 'কী, চাই? দেখবেন একদিন? একটি বিষণ্ণ সন্ধ্যা রমণীয় করে তুলবেন?'

যেমন অভ্যেস এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল শিবদাস।

'ভয়ের কিছু নেই।' চিরকাল আশ্বাস দিতে অভ্যস্ত তেমনি মসৃণ গলায় বললে নরহরি।

'ভয়ের কথা ভাবি না।' শিবদাস হাসল: 'রিটায়ার করার পর ভয়ও রিটায়ার করেছে।'

'তবে আসুন একদিন।'

'আসব? কোথায়?'

'আমার গাড়িতে।'

'তোমার গাড়িতে?' মূঢ়ের মত তাকাল শিবদাস: 'গাড়ি করে শেষ পর্যন্ত কোথায়? কার বাড়িতে?'

'ঐ গাড়িটাই বাড়ি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গাড়িই ভালো।' যেন খানিক আশ্বস্ত হল শিবদাস: 'গাড়িটা চালাবে কে?'

'আমার গাড়ি আমিই চালাব।'

'বা, তা হলে তো আরো ভালো।' বুক-জোড়া পাথরটা নেমে গেল শিবদাসের।

'সামনের সিটে বসে আমি চালাব। আর আপনারা পিছনে বসে দুটিতে প্রেমালাপ করবেন।'

'সেই ভালো।'

'দেখবেন অন্যরকম লাগবে। আর বুঝবেন,' ডাক্তারও দার্শনিক হল: 'সব কিছুর থেকে রিটায়ার করলেও আকাঙ্ক্ষার থেকে রিটায়ারমেন্ট নেই।'

দিন-ক্ষণ ঠিক হল। ঠিক হল রাস্তার মোড়। আর নরহরির গাড়ি আর তার নম্বর সম্বন্ধে শিবদাসের কোনোই অস্পষ্টতা নেই।

হঠাৎ এক পাশে সরে গিয়ে শিবদাস জিজ্ঞেস করলে, 'কত দিতে হবে?'

'টাকা? না, না, টাকা পয়সা কিছু দিতে হবে না।' নরহরির দুষ্টুমি কথায় এবার কাব্যের আমেজ আনল: 'এই এমনি একটু ঘুরে বেড়ানো। স্বাস্থ্যের জন্যেই ঘুরে বেড়ানো।'

'কী সন্ধে বেলা ঘরের মধ্যে বসে আছ গুম হয়ে?' মুখিয়ে উঠল বিভাবতী: 'যাও না দু দণ্ড ঘুরে এস না।'

'শরীরটা ভালো নেই।'

'বাইরে খানিকক্ষণ ঘুরে এলেই ভালো লাগবে।'

তবুও গড়িমসি করছে শিবদাস। যেন কত অনিচ্ছা এমনি ক্লিষ্ট করছে চোখমুখ।

এ ছলনাটুকুতেও কত রঙ কত রহস্য।

'কী আশ্চর্য, এখন আমি স্নান করে এসে সারা গায়ে-পিঠে পাউডার মাখব।' বিভাবতী হুংকার করে উঠল : 'তোমার জ্বালায় আমার কি একটু প্রাইভেসিও থাকতে নেই?'

'আহা, কী গোপন করে রাখবার মত সম্পত্তি!' বিনা তর্কেই বেরিয়ে গেল শিবদাস। কিছু বলতে পারবে না যদি ফিরতে দেরি হয়। তুমিই ঘরের বার করে দিয়েছ। তুমিই বলেছ ঘোরাঘুরি করে শরীর চাঙ্গা করে নিয়ে আসতে। আমার কোনো দোষ নেই।

আজই সেই ধার্য দিন। সোনার হরিণের ধরা পড়ার কথা।

অনেকক্ষণ আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে শিবদাস। কোনোদিন দাঁড়ায়নি এমনিভাবে। মাঝে মাঝে রেলস্টেশনে খোলা প্ল্যাটফর্মে গাড়ি-ইনএর জন্যে দাঁড়িয়েছে। একবার এক মন্ত্রীর জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল হাঁ করে। হাসল শিবদাস। কিসের সঙ্গে কিসে, সোনায় আর সিসে!

ঠিক সময়ে নরহরির গাড়ি এসে দাঁড়াল।

উপরে-নিচে দুরকম কাঁচ চশমায়, কোনভাগে চোখ রাখবে সহসা ঠাহর করতে পারল না শিবদাস, মনে হল, গাড়িটা ফাঁকা এসেছে।

এগিয়ে হাত বাড়িয়ে নরহরিই খুলে দিল দরজা। বললে, 'চলে আসুন।'

এখানটায় বুঝি বেশিক্ষণ দাঁড় করানো যায় না গাড়ি, ব্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল শিবদাস। না, গাড়ি শূন্য নয়।

'আহা, লাগল?' শিবদাসের কণ্ঠে মমতার সুর এসে লাগল।

'না, লাগেনি কিছু।' গাড়ির মধ্যেই পার্শ্ববর্তিনী হঠাৎ নিচু হয়ে শিবদাসকে প্রণাম করল।

নরহরি স্পিড দিল গাড়িতে। বললে, 'আপনারা নিঃসঙ্কোচে আলাপ-পরিচয় করুন। গাড়ি একটা চলছে এই শুধু জেনে রাখুন, কে চালাচ্ছে ভুলে যান। জীবন একটা পেয়েছি এই শুধু হিসেবে আছে, কে চালাচ্ছে তার খবরে কী দরকার।' খানিক পরে অন্য আরোহীকে লক্ষ্য করলে: 'তোমার কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই। ইনি কতবড় সম্ভ্রান্ত লোক পরে বুঝবে।'

গাড়ি চলল নরহরির খেয়ালে।

শিবদাসের মনে হল, এ বুঝি সে কোন গ্রহান্তরে এসেছে। এখানে বুঝি সব অতিমানবের বাসা কিন্তু অতিমানবের ভাষা কী তাই তার জানা নেই।

শিবদাস জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'অনীতা চক্রবর্তী।'

'কী করো? পড়ো?'

'না।'

'কদ্দুর পড়েছিলে?'

'আই-এ পাশ করে আর পড়িনি।'

'পড়োনি মানে পারোনি পড়তে।'

'হ্যাঁ, তাই। সংসারের আয়ে আর কুলোল না।'

কী অপূর্ব প্রেমালাপ! এ কথা শুধু নরহরিরই নয়, স্বয়ং শিবদাসেরও মনে হল।

কিন্তু এছাড়া বুঝি অন্য আলাপ সম্ভব নয়। মেয়েটি এত সুশ্রী, এত ভদ্র, এত পরিচ্ছন্ন দেখতে। বড় বড় চোখদুটিতে ভয় আর বিষাদ ছাড়াও আরেকটা কী আছে, যা ভয় আর বিষাদও মুছে দিতে পারেনি। আর গলার স্বরটি কী অকৃত্রিম কোমল! যেখানে গাছ নেই, পাখি নেই, সেখানে এমন কণ্ঠস্বর ও কার কাছ থেকে শিখল?

বয়েসটা সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না। তাই শিবদাস ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল: 'ম্যাট্রিক পাশ করেছ কবে?'

বছরটা বললে অনীতা। শিবদাস হিসেব করে দেখল একুশ-বাইশ হবে।

'এখানে এসেছ কবে?'

'দ্বিতীয় দাংগা যেটা হয়ে গেল ঢাকায়-বরিশালে, তখন—'

'এসব আলাপের সময় কি চলে গেছে?' সামনে থেকে টিটকিরি দিয়ে উঠল নরহরি: 'পরে কি আর সময় পাওয়া যেত না?'

দুজনেই চুপ করে গেল।

যে আলাপটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, তাই করা যাচ্ছে না। সেটা হচ্ছে ঐ পাষণ্ড নরহরি তোমাকে কোথায় পেল, কী করে তুমি ওর সংস্রবে এলে, আর কোন অতল অধঃপাতে ও তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে?

মফস্বলে আগে যেখানে নরহরি ডাক্তারি করত এককালে, আমি সেখানে পোস্টেড ছিলাম। সেই সূত্রে ওর সঙ্গে হৃদ্যতা। পার্টিসনের পর এখানে এসে আবার ব্যবসা ধরেছে, আর, সস্তায় কিস্তি মারবার আশায় ডাইং ক্লিনিং-এর দোকান খুলেছে। ডাক্তারি ডাইং ক্লিনিং। তার মানেই ক্লিনিক আর নার্সিং হোম-এর ব্যবসা। ব্রাটন-পাটনের যজ্ঞ। কিন্তু তুমিতো সেরকম নও। তোমাকে তো সেরকম মনে হচ্ছে না।

এসবও একটু বিশদ করে নেওয়া দরকার ছিল।

সবচেয়ে দরকার ছিল সেই পরামর্শ—ঐ পাষণ্ডটার হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করা যায় কী করে?

কিন্তু সাধ্য নেই গোপনে প্রাণ খুলে আলাপ করা যায়। নরহরি কান খাড়া করে রেখেছে।

অনীতার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল শিবদাস। আদ্যোপান্ত খালি। শাঁখের একটি আংটি পর্যন্ত নেই।

'বাড়িতে ঝি-চাকর নেই?'

'না।'

'নিজেই বাসন মাজো?'

'উপায় কী তা ছাড়া?'

'রান্না?'

'মা করেন, আমিও করি।

'খুব বড় পরিবার বুঝি?'

'অনেকগুলো ভাই-বোন।'

'বাবা নেই?'

'আছেন।'

'কিছু করেন না?'

'না। দাঙ্গায় মার খেয়ে অচল হয়ে রয়েছেন।'

'তুমি কিছু করো না?'

'একটা সামান্য ইস্কুল মাস্টারি আছে।'

'তাতে আর কত হয়! কিছুই হয় না। চলে না সংসার।'

এ কে না জানে! নরহরি বিরক্তিতে হর্ন বাজিয়ে বসল। একটা বস্তাপচা মামুলি কাহিনী শুনতে কী এত আগ্রহ। বিশ্ব-সংসারে কথা বলবার আর কোনো বিষয় নেই? কথা বলাই বা কী দরকার? স্তব্ধ হয়ে থাক না। দ্যাখ না স্তব্ধতা কী কথা বলে!

বুড়োকে এবার নামিয়ে দিতে হয়।

হ্যাঁ, সামনে ঐ তিন আলোর মোড়ের কাছে নামিয়ে দিলেই হবে।

মানিব্যাগের বাইরে দুখানা দশ টাকার নোট ভাঁজ করে ছোট্ট করা ছিল পকেটে। গাড়ির [illegible]ই অগোচরে এ প্রক্রিয়াটা সমাধা করছে শিবদাস। যদি নরহরিকে ডিঙিয়ে [illegible] একটা বোঝাপড়ায় আসা যায় মেয়েটার সঙ্গে। একটা গোপন জানাজানি।

[illegible]বার সময় নোটের দলাটা অনীতার

'দেখে ফেলুন চটপট। ফাইন্যাল করে ফেলুন।'

বিভাবতীই ঠিকানাটা দিলে। নগরের মধ্যে পল্লী, পল্লীর মধ্যে নগর সে এক মস্ত ঠিকানা। বললে, 'এই একটি দেখলেই লিস্টি শেষ হয়।'

খুঁজেপেতে একাই গেল শিবদাস। সমস্ত

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিভাবতীই অনুযোগ কোরল......নাও ওঠো বাড়ির বার হও খোঁজ করো

হাতের মধ্যে গুঁজে দিল শিবদাস। প্রত্যাখ্যানের কথাটা মুখে ফুটে ওঠবার আগেই বাঁকাচোরা আঙুলগুলি দলাটাকে আঁকড়ে ধরল, লুকিয়ে ফেলল।

'ঠিকানাটা?' মুখ বাড়াল শিবদাস।

নরহরি হর্ন বাজিয়ে দিল। বলতে দিল না। দিল না শুনতে।

হর্ন থামিয়ে নরহরি জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার ছেলের বিয়ের কদ্দুর? সম্বন্ধ হয়ে গিয়েছে?'

'হয়নি এখনো। একটি এখনো দেখতে বাকি।'

মনপ্রাণ বলছে এ ঠিকানা অনীতার ঠিকানা। আর যাকে দেখবে, সে-মেয়ে অনীতা ছাড়া কেউ নয়।

ঠিক-ঠিক অনীতা এসে দাঁড়াল।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে বসে পড়ল মেঝেতে। মুখ নামিয়ে রইল। এক পোঁচড়া কালিতে সমস্ত রঙ-রেখা মুছে একাকার হয়ে গেল।

হোক। তবু শিবদাসের মনে হল সেই অন্ধকারের চেয়ে এই রোদ্দুরের অনীতা ঢের বেশি আপনার।

'তোমার নাম কী?'

'অনীতা চক্রবর্তী।'

'কী করো? পড়ো?'

'না।'

'কদ্দুর পড়েছিলে?'

'আই-এ পাশ করে আর পড়িনি।'

সন্দেহ কী, সেই অনীতা। সেই দুখানি রিক্ত হাত, আড়ষ্ট করতল।

বাড়ির লোক বেশি কুণ্ঠিত। এত কইয়ে-বইয়ে চালাকচতুর মেয়ে সে এমন ঘাবড়াচ্ছে কেন? তার কিসের এত লজ্জা, কিসের এত দৈন্য?

তা হোক। ওকেই আমি নেব। সমস্ত লজ্জা সমস্ত দৈন্য থেকে উদ্ধার করব ওকে। ওকে পাতাল দেখতে ডুবে যেতে দেব না। ওকে স্থান দেব। প্রতিষ্ঠা দেব। ও আমার ঘর-সংসার আলো করে রাখবে।

বললে, 'একেই আমি পছন্দ করলাম। এখানেই বিয়ে দেব ছেলের।'

মেয়েরা উলু দিয়ে উঠল। শাঁখ বাজাল। আনন্দের কলরোল পড়ে গেল।

'কিন্তু', শেষ পর্যন্ত বিভাবতীই অনুযোগ করল: 'কই, মেয়ের দল তো কথা পাকা করতে এল না! নাও, ওঠো, বাড়ির বার হও, খোঁজ করো।'

নরহরির কাছে খোঁজ করতে গেল শিবদাস।

সে কী কথা? এমন হাতের লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে? ভরা এনে পারে ডোবায়?

'কি রে? তুই নাকি রাজি নোস?' একেবারে ঢেউয়ের মতন আছড়ে পড়ল নরহরি।

'না।'

'কেন?'

'আমি ঝুটা হয়ে গিয়েছি।'

'সে কী! তা কী করে হয়?'

'লোকটা আমাকে টাকা দিয়েছে।'

'টাকা? এত করে বারণ করলাম—' নরহরির মুখে বেদনার্ত হয়ে উঠেছে: 'কত টাকা?'

'কুড়ি টাকা।'

'ছি-ছি, দিল?' বেদনা নরহরির মুখে শাসনের মূর্তি ধরল: 'তুই নিতে গেলি কেন? কত ছেলেবেলা থেকে তোর বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব—তোদের সঙ্গে। তুই এমন লোভী, এমন দুর্বল তো কোনোদিন ছিলি না। টাকাটা কেন ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলি না মুখের উপর? আমাকে কেন বললি না, নরুকাকা, লোকটা টাকা দিচ্ছে—'

'কেন বলব? কেন ছুঁড়ে ফেলব?' অনীতা দু হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকল কান্নায়: 'কুড়ি টাকার যে ভীষণ দরকার। ছোট ভাইটার ফিস দেবে কে? বাবা বলে দিলেন, পরীক্ষা দিয়ে কাজ নেই। নাম কাটিয়ে আন।'

'তা যাক গে।' অনীতার কাঁধের উপর হাত রাখল নরহরি। বললে, 'ওর জন্যে ভাবিসনে। ও টাকা শোধ হয়ে যাবে।'

'না, তা হয় না।' মুখ আরো ডুবিয়ে দিয়ে অনীতা বললে: 'আমি এক বাড়িতে দুজনের হয়ে থাকতে পারব না কিছুতেই।'

ভাগবতে ভগবতী

বঙ্কিম চন্দ্র সেন

যিনিই কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ—"সঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণঃ এব সঃ।" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—'একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ, একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ। ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ।' 'উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা' চরিতামৃতে এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে. বৈদুর্যমণি যেমন বহু রূপে প্রতিভাত হয়, একই নট যেমন অনেক ভূমিকায় বিভিন্ন রূপে অভিনয় করিয়াও একই থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম ধ্যান-কেন্দ্রে বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইলেও তিনি স্বরূপে একই থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবগণের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য শাস্ত্র। ভাগবত বলেন—"বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্" অর্থাৎ ব্রহ্ম বহুমূর্তিবৎ প্রতীত হইলেও কখনও একরূপতা ত্যাগ করেন না। প্রকৃত-পক্ষে একই ব্রহ্ম শক্তিযোগে এইরূপ বিভিন্ন রূপে বিক্রীড়িত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মের বিভিন্ন স্বরূপের বৈশিষ্ট্যের মূলে তাঁহার শক্তি বিকাশেরই বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। শ্রুতি ব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তির কথা কীর্তন করিয়াছেন—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" বস্তুত শক্তিমান হইতে তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না। "শক্তি-শক্তিমতয়োরভেদঃ"—শক্তি এবং শক্তিমান্ উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু। কবিরাজ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস গোস্বামী স্বপ্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শক্তি এবং শক্তি-মানের অভেদের দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিয়াছেন —"মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ অগ্নি-জ্যোতিতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।" কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, শক্তি এবং শক্তিমান যদি একই বস্তু হয় এবং শক্তি হইতে শক্তিমানকে পৃথক করা না যায়, তাহা হইলে শক্তিকে পৃথকভাবে স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?

এ প্রয়োজন আছে। মহাপ্রভু বলেন—"ভগবান সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয় প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বাক্য কয়।" জীবনের নিত্যতা এবং পূর্ণতা উপলব্ধির জন্য একই ব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন। পরব্রহ্মের শক্তি অনন্ত। কিন্তু তাহার মধ্যে তিনটি শক্তিই প্রধান—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি। ব্রহ্মের এই তিনটি শক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি, আর বহিরঙ্গা হইতেছে মায়াশক্তি। ব্রহ্মের অন্তরঙ্গা শক্তি—ব্রহ্মের স্বরূপভূতা। ব্রহ্মের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তির সম্বন্ধ নিত্য। ব্রহ্ম পূর্ণ-শক্তিমান্—তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি তাঁহারই পূর্ণশক্তি। জীব স্বরূপে পূর্ণ নহে। ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইলে তাঁহার পূর্ণতা স্বরূপে অপরিচ্ছিন্নভাবে পূর্ণত্বের মধ্যে এবং এই পূর্ণতাকে উপলব্ধিই জীবের পক্ষে পরম-পুরুষার্থতা। জীব ব্রহ্মেরই শক্তি। জীবের প্রকৃতি বিভিন্ন। এজন্য ব্রহ্মের পূর্ণশক্তিকে বিভিন্ন ভাবে উপলব্ধির পথেই জীব ব্রহ্মকে অখণ্ডভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং পূর্ণ শক্তিমান ব্রহ্ম হইতে তাঁহার পূর্ণশক্তিকে পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি করা জীবের পক্ষে প্রয়োজন। ব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তিকে তাঁহার একই শক্তি-স্বরূপে অপরিচ্ছিন্নভাবে পূর্ণত্বের মধ্যে উপলব্ধিরূপ জীবের এই প্রয়োজন কিভাবে সিদ্ধ হইতে পারে জীবের সাধ্যতত্ত্ব বিনির্ণয়ে এই প্রশ্ন স্বভাবতই আসিয়া পড়ে।

কোন দ্রব্যের শক্তি সেই দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে। দ্রব্যের শক্তিকে কার্যোন্মুখ দ্রব্য ব্যতীত অন্য কিছু বলা চলে না। দ্রব্য এবং দ্রব্য-শক্তি সত্তাস্বরূপে একই। মৃগমদ বা কস্তুরী এবং তাহার গন্ধ—এই উভয় মিলিয়াই কস্তুরী। গন্ধহীন কস্তুরী নাই। অগ্নি এবং তাহার জ্যোতি বা উত্তাপ এই উভয়ে মিলিয়াই অগ্নি—উত্তাপ ব্যতীত অগ্নির অস্তিত্ব সম্ভব নহে।

পূর্ণব্রহ্মের ব্যক্ত ভাবেই জীবের উপ-লব্ধির উপযোগীভাবে তাঁহার পূর্ণশক্তির বিকাশ ঘটে। কার্যোন্মুখ ভাবের প্রভাবেই পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণ শক্তির সহিত অংশ-শক্তি জীবের স্বভাবধর্মে সংশ্লেষ সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ব্রহ্মের স্বরূপ যৈছে প্রদীপ্ত জ্বলন, জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।" অগ্নিশিখা হইতে বিভিন্ন স্ফুলিঙ্গকণার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। সেইরূপ পূর্ণশক্তিতে বিলাসিত পূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত যুক্ত না হইতে পারিলে জীবের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। তাহার জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ণব্রহ্ম হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার পূর্ণশক্তি হইলেন শ্রীরাধা। সর্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার স্বরূপভূতা অন্তরঙ্গাশক্তি শ্রীরাধা কৃষ্ণ হইতে অভিন্না। তবে যে কেহ কেহ বলেন, ভগবতী দুর্গাই আদ্যাশক্তি, তাঁহাদের এমন উক্তির মূলে যুক্তি আছে কি? প্রকৃতপক্ষে পরব্রহ্ম স্বরূপে কৃষ্ণতত্ত্বের পূর্ণ-শক্তিমত্তা স্বীকার করিলে এই প্রশ্নের সমাধান হইয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি এ ক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য। সনাতনকে উপদেশ দিতে গিয়া প্রভু বলিয়াছেন—"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। সর্ব আদি সর্ব অংশী কিশোর-শেখর, চিদানন্দ দেহ সর্বাশ্রয়, সর্বেশ্বর।" পরব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণ সর্বাশ্রয় এবং সর্বেশ্বর, সুতরাং সর্বশক্তির উৎস তিনি। অতএব দুর্গা, ভদ্রকালী, মহামায়া একই শক্তিরই নাম। "দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্তের স্থান" —দেহাত্মবুদ্ধির প্রভাবে পড়িয়া আমরা আমাদের জীবনের পরম প্রয়োজন সম্বন্ধে বিভ্রমের মধ্যে পতিত হইয়াছি, এজন্য বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সর্বাত্মশক্তিস্বরূপে ভগবানের শক্তিকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি না।

আমাদের চিত্তে ভেদবুদ্ধি উপজাত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে এক ব্রহ্মই চরাচরে তাঁহার শক্তি বিস্তার করিয়া বিলাসিত হইতেছেন। দুর্গা, কালী, মহামায়া পরব্রহ্মেরই শক্তি—কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধির প্রভাবজনিত চিত্তের দুর্বলতা বা অবীর্যবশতঃ একই শক্তির বিলাস-চাতুর্য এবং বৈচিত্র্যের পথে তাঁহার অখণ্ড মাধুর্য আমরা আস্বাদন করিতে পারি না। ব্রহ্মকে যদি আমরা আমাদের প্রিয়স্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, তবে কিন্তু এ সমস্যা থাকে না। কারণ, প্রিয় যে বস্তু তাঁহার সব কিছু, তাঁহার সকল শক্তি—অন্য কথায়, যে সব শক্তিকে আশ্রয় করিয়া আমাদের পক্ষে তাঁহার সত্তার অনুভূতি হয়, সে সব সম্বন্ধেই তিনি আমাদের পক্ষে প্রিয় হইয়া থাকেন। সুতরাং "আত্মানমেব প্রিয়ম্‌ উপাসীত" শ্রুতির এই অনুজ্ঞা আমাদের পক্ষে অবলম্বনীয়। সুতরাং পূর্ণ শক্তিমান্‌ ব্রহ্মের সহিত আমাদের সংযোগ সম্পর্কিত বিচারের সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে এই যে, প্রিয়স্বরূপে পরব্রহ্মকে উপাসনা করিতে হইবে। কেন করিব এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবত এবং স্বরূপত আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয়—পুত্র হইতেও তিনি প্রিয়, বিত্ত হইতেও প্রিয়। তাঁহার সহিত আমাদের প্রিয়ত্বের এই সম্বন্ধটি নিত্য—"ন অন্যৎ প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি" তাঁহাকে প্রিয়স্বরূপে পাওয়া, নিত্যভাবে তাঁহাকে পাওয়া এবং সত্যভাবে তাঁহাকে পাওয়া। প্রিয়ত্বের এই সম্বন্ধে রহস্য আরও রহিয়াছে। এই সম্বন্ধটি পারস্পরিক—আমরা তাঁহাকে প্রিয়ভাবে কামনা করিলে তিনিও আমাদিগকে প্রিয়স্বরূপে কামনা করেন। আমরা যেভাবে তাঁহাকে প্রিয়স্বরূপে উপলব্ধি করিতে চাহিব, তিনি সেইরূপেই আমাদের কাছে প্রকটিত হইয়া থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে সর্বভাবে ভগবানের সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এইসব ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন বলিয়া জানিবে। সত্ত্বাদি ত্রিগুণ হইতে জাত সুখ দুঃখাদি ভাবের দ্বারা প্রাণিসমূহ অভিভূত, এজন্য সর্ববিধ বিকারবর্জিত পরমেশ্বর আমাকে জানিতে পারে না। সপ্তশতী চণ্ডীতেও আমরা অনুরূপ উক্তি শুনিতে পাই—ব্রহ্মস্বরূপিণী জননী সমস্ত জগতের হেতুভূতা! তিনি ত্রিগুণা। অহং-মমত্ব-জনিত অবিদ্যার প্রভাবে পড়িয়া হরিহরাদির পক্ষেও অনধিগম্য তাঁহার তত্ত্ব।

হরিহরাদির পক্ষেও যিনি অনধিগম্য তাঁহাকে লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কি? তাঁহাকে সেই যে লাভ, ইহারও বিশেষত্ব রহিয়াছে—প্রিয়স্বরূপে তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। মায়ার বন্ধনে আমরা পতিত। "নিজদেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি"—এই রীতিতে আমরা বিকার-গ্রস্ত। কিন্তু ব্রহ্ম যখন আমাদের প্রিয়, তিনি আমাদের ছাড়িয়া যান নাই। আমাদের কাছেই আছেন এবং আছেন সর্ববিকারের ভূমি এই পৃথিবীতেই। বাস্তবিকপক্ষে কামই আমাদের সর্বপ্রধান বৈরী। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনের মাধ্যমে দুর্জয় এই শক্তিকে জয় করিবার জন্য আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। এই কামের প্রভাবে পড়িয়াই অমৃতের সন্তান হইয়াও আমরা মুহূর্তে মুহূর্তে মরি। কামের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারিলেই আমরা তাঁহাকে পাই; এইখানে এই পৃথিবীতেই পাই। কিন্তু তাঁহাকে না পাইলে কামের প্রভাব অতিক্রম করিবার উপায় নাই। সুতরাং সমস্যা উভয়ত। সমাধান কি ইহার? এ সম্বন্ধে চণ্ডী আমাদিগকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। চণ্ডীতে বলা হইয়াছে—তিনি সর্বাশ্রয় এবং এই বিকারশীল জগতেই অব্যাকৃত নিত্য মহিমায় বিকাররহিতা তিনি। তিনি আদ্যা বা পরমাপ্রকৃতি। তাঁহাকে পাইবার উপায় তাঁহার শরণাগতি। প্রপন্নের

আর্তি হরণকারিনী তিনি। তিনি প্রসন্ন হইলেই আমাদের প্রয়োজন মিটিবে। গীতাও এই কথাই বলেন—"ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।" সুতরাং গীতা ও চণ্ডীতে এই বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু শরণাগতি অবলম্বন কর বলিলেই শরণাগত হওয়া যায় না। শরণাগতির পক্ষে আশ্রয়তত্ত্বটি সর্বাবস্থার মধ্যে আমাদের মনের আত্মবোধের উদ্দীপক হওয়া প্রয়োজন। এই ভাবটি মাতৃভাব। কারণ মাতৃভাবই সর্ববিধ বিকারের মধ্যে আমাদের চিত্তে সাক্ষাৎ সম্পর্কে অব্যাকৃত আত্মভাবের উদ্দীপক। 'অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়'—অলংকার শাস্ত্রের ইহাই রীতি। সনাতন সত্যের অনুভূতিও আমাদের জীবনে এইভাবেই ঘটিয়া থাকে। অনুকূল ধর্মবিশিষ্ট জ্ঞাত বস্তু বা অনুবাদকে অবলম্বন করিয়াই বিধেয়ের স্বরূপ আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হয়। ব্রহ্ম বস্তুটি আমাদের পক্ষে বিধেয়। প্রিয়স্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে হইলে প্রিয়তার প্রজ্ঞানঘন মূর্তি মাকে অবলম্বন করাই আমাদের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মা প্রিয় নহে কাহার? বহুভাবে আমাদের চিত্তে বিক্ষেপ সৃষ্টি হয় মায়ার প্রভাবে। এই মায়ার সহিত মিলিত হইয়া প্রিয়ত্বের স্বাভাবিক প্রভাবে আমাদের সঙ্গে সর্বাত্মক প্রভাবে মাতৃভাবের ঘনিষ্ঠতা। মায়ারূপে বহুভাবে পরিচ্ছিন্ন স্বল্প-সংমোহের মধ্যে মাতৃভাবের একাংশেই আমরা অখণ্ডভাবে ভগবৎ শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারি এবং সেই উপলব্ধিতে আমরা আমাদের চিত্তে পরমাশ্রয় প্রাপ্তিজনিত নিবৃত্তি অনুভব করিতে সমর্থ হই। প্রিয়স্বরূপ পরব্রহ্মের তত্ত্বের প্রকাশ এবং বিলাসের মূলে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপিনী এই একানংশা বা যোগমায়া দুর্গাদেবীর আবির্ভাব এ দেশের তত্ত্বদর্শিগণ তাঁহাদের প্রজ্ঞানময় দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র্যাদি বৈষ্ণব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, দেবী দুর্গার বিজ্ঞান মাত্রে পরব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীভগবানের প্রীতি প্রিয়ত্ব সম্বন্ধটি অনাদিকালেই আমাদের পক্ষে পরিস্ফুর্ত হয়। ভাগবত বেদার্থে উপবৃংহিত অর্থাৎ ভাগবতে বেদার্থের বিস্তার সাধিত হইয়াছে। ভাগবত সর্ব বেদান্তের সার। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"প্রণবের যে অর্থ গায়ত্রীতে হয় সেই অর্থ চতুঃশ্লোকী বিবরিয়া কয়।" ব্রহ্মাকে নারায়ণ ভাগবতের এই চতুঃশ্লোক উপদেশ করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর প্রণীত চৈতন্যচরিতামৃতে ভাগবতের চতুঃশ্লোকীর তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন—

"সৃষ্টির পূর্বে ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ আমি ত হইয়ে
প্রপঞ্চ-প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি ত প্রবেশিয়ে
প্রপঞ্চ যে দেখ সব সেহ আমি হইয়ে
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে।"

ঋক বেদের দেবীসূক্তে "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে চতুঃশ্লোকী ভাগবতের "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্রীমন্নারায়ণোক্ত একই তত্ত্ব প্রকীর্তিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে যিনি সর্বভূতে এবং আমাদের ভিতরে সত্যস্বরূপে রহিয়াছেন, তাঁহার শক্তিতে জড়ত্ব প্রতীতির ফলে ভেদভাবের অনুভূতি ঘটে। ফলত সকল শক্তিই চিৎস্বরূপ সনাতন উৎস হইতে উৎসারিত হইতেছে। মূল শক্তির এই চিৎ-স্বরূপটি আমাদের দেহাত্মবুদ্ধিজনিত অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার ফলেই বহুধা বিভক্ত জড়রূপে আমাদের দৃষ্টিতে প্রতীত হইয়া থাকে। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা বিদূরিত হইলে পূর্ণ শক্তিমানের অখণ্ডৈক আত্মরসে উদ্দীপিত তাঁহার পূর্ণশক্তির সহিত আমাদের জীবনের সংযোগ লাভ হয়। যিনি ভিতরে তাঁহাকেই আমরা বাহিরে চরাচরে—সর্বতোভাবে সত্য করিয়া পাই। পূর্ণশক্তি এবং শক্তিমানের উপলব্ধি একক্ষেত্রে আনন্দময় ছন্দে আমাদের জীবনে লীলায়িত হইতে থাকে। সত্য স্বরূপ পুরুষ এবং শক্তিস্বরূপত স্ত্রী। যিনি পুরুষ, তিনিই নারী—অঙ্গাঙ্গীভাবে অদ্বয়তত্ত্বে প্রমূর্ত হইয়া উঠেন। শক্তির আশ্রয়ে সাধনাতে পরমার্থ সিদ্ধির ইহাই ক্রম। বিশ্বজননীর শরণাগতি অবলম্বন করিলে তাঁহার কৃপায় যেখানে সেই খেলা শুরু হয়। মহামায়ার প্রভাবে বিশ্ব প্রপঞ্চিত বহুভাবের মধ্যে যোগমায়া মধুভাবকে দীপ্ত করিয়া জাগেন। ভগবান স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব। তাঁহার কৃপাও তাঁহার সহিত অভিন্ন স্বপ্রকাশ বস্তু। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপা যোগমায়া দেবী পরম কৃপা স্বরূপিণী। তাঁহার কৃপায় ভগবানের অনন্ত মাধুর্য একাস্বাদনে উজ্জীবনে

বৈচিত্র্যের ছন্দে জড়মায়ায় অভিভূত জীবের চিত্তে বিলসিত হয়। বিভিন্ন উপাসকের ভাবানুযায়ী তাঁহার আরাধ্যতত্ত্ব দেহ, দেহী ... এবং ... তে অভিন্নভাবে এবং অব্যক্ত রূপে চিত্তবৃত্তিকে উল্লসিত এবং ...কিত করিয়া লাবণ্য বিস্তার লাভ করে। ...ভাবস্বরূপিণী এই জননী, তাঁহার সন্তান ...রা। আমাদের বেদনা ... বুকে লইয়া ...টিয়া আসিতেছেন—আমাদের জীবনের ...ন এই সত্য অমরা তখন উপলব্ধি করি। ...ক্ষভাবে হৃদয়ের সংস্পর্শে উপাধিগত ...ভাব বিলীন হইয়া যায়। দেবীর কৃপায় ...ন অবস্থায় সত্তাস্বরূপে শক্তিমানের বিভিন্ন...বে পরিচ্ছিন্ন শক্তি অপরিচ্ছিন্ন মাধুর্য ...র্যের ঔদার্যে তাঁহারই সহিত একীভূত হইয়া যায়। যিনি দুর্গা তাঁহাকে আমরা কৃষ্ণস্বরূপে পাই।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"আমারে তো যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে।" চরিতামৃত বলেন, ভক্তগণ "নিজ নিজ ভাব সভে শ্রেষ্ঠ করি মানে নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে। নিজ-ভাবে এই যে সুখ আস্বাদন ইঁহাকেই শাস্ত্রে অনুভূতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ভাগবতে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামী অনুভূতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অনুভূতির ...গে শ্রীভগবানের আত্মমায়া প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। আত্মমায়া বলিতে জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ সম্বন্ধের উদ্দীপনাত্মক সংবেদনই বুঝায়। শ্রীভগবানের আত্মমায়ার সহিত আমাদের চিত্ত এইভাবে সংস্পৃষ্ট হইলে তাঁহার সর্বতোময় শক্তির সহিত আমাদের চিত্তবৃত্তি ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। ইহার ফলে শক্তির জড়ত্ব-প্রতীতি বিলুপ্ত হয়। সর্বশক্তির মূর্তীভূত শ্রীভগবানের নিজ ভাবটি আমাদের চিত্তে চিন্ময়তত্ত্বে প্রমূর্ত হইয়া উঠে। আত্মমায়া ভগবানের নিজ শক্তি। পরব্রহ্ম ভগবান স্বপ্রকাশ তত্ত্ব। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানী-ক্ষতে নিজ শক্তিতঃ তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিমং প্রভুং। তাঁহার নিজশক্তি ব্যতীত কে তাঁহাকে দেখিতে পায়? দেখাই তো অনুভূতি। আত্মমায়া অপ্রাকৃত রস-সংস্পর্শে খণ্ডজ্ঞানের প্রতিবেশ হইতে আমাদের চিত্ত মুক্ত হইলে ব্যাপন-শীলা ধী-শক্তিতে আমাদের চিত্তবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৃহৎ-সত্তার সঙ্গে নিজেদের যুক্ততা উপলব্ধি করি। এইরূপে আমাদের চিত্তবৃত্তিকে সংস্কার হইতে মুক্ত করিবার মূলে ভগবানের নিজ-শক্তি এই আত্মমায়ার প্রভাবটি মহামায়া স্বরূপে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। অনন্ত-বীর্যা তিনি। তিনি বৈষ্ণবী শক্তি। "পরমাসি মায়া"—তাঁহার মায়া সর্বাতিশয়ী সেই মায়ার প্রভাবে সংসারের বন্ধন হইতে আমরা মুক্ত হই; আমাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের তখন উন্মেষ হয়। সপ্তশতী-চণ্ডীতে মহামায়ার স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে—"সা বিদ্যা পরমামুক্তে-র্হেতুভূতা সনাতনী সংসার বন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী।" তিনিই পরমা মুক্ত হেতুভূতা আবার তিনিই সংসার-বন্ধনের হেতু-তিনিই সর্বেশ্বরী। প্রকৃতপক্ষে মায়া-প্রপঞ্চময় এ জগৎ। বৈষ্ণব শাস্ত্রে এই জগৎ দেবীধাম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এখানে চারিদিকে মায়ারই খেলা। মায়ের কৃপার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে সংসারচক্র হইতে মুক্তিলাভের উপায় এখানে নাই। তাঁহার মায়া আমাদের মনকে উজ্জীবিত করিয়া তোলে। মন্ত্রের সাধনা শুরু হয় তখন। দুর্গা সমস্ত কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই দুর্গা ভগবদাত্মিকা। তিনিই পরা বা শ্রেষ্ঠা। তিনি মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী। তিনি পরমাশক্তি। ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞানের তিনিই স্বরূপভূতা। অদ্বিতীয়া এই শক্তি স্বরূপিণী দেবীই প্রেমসর্বস্ব—স্বভবা গোকুলেশ্বরী। ভাগবতে এই দেবী ভগবতীর মহিমা বহুভাবে পরিকীর্তিত হইয়াছে।

আমাদের মন সর্বদা বহির্মুখ। ভগবানের দিকে মনের গতি আমাদের স্বাভাবিক নয়। ভগবানের যে শক্তির আশ্রয়ে আমাদের এই মন সর্বতোভাবে তাঁহার অভিমুখী হয় এবং সাক্ষাৎ-সম্পর্কে তাঁহার প্রেরণা অনুভব করে, ভগবানের সেই শক্তিকে যোগমায়া বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। আমাদের জীবনে ভগবদুপলব্ধির মূলে সূক্ষ্মভাবে এই শক্তি কাজ করে। এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই ভগবান কার্স-মানুষ শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এখনও এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই ভগবানের মাধুর্য-বীর্য আমাদের জীবনে কার্যকর হয়। প্রকৃতপক্ষে এই যোগমায়ারই অন্তর্নিষ্ঠ অব্যক্ত ভাবটি আত্মমায়া।

আত্মমায়া হইতে যোগমায়ার বিস্তার। গীতায় ভগবান এই সত্যটি অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন — "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।" তিনি তাঁহার স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এখানে স্বীয় প্রকৃতি বলিতে তাঁহার শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা যোগমায়া শক্তিই বুঝাইতেছে।

চৈতন্য চরিতামৃত বলেন—"যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-পরিণতি তাঁর শক্তি লোকে দেখাইতে। সেইরূপ রতন ভক্তজনের গূঢ় ধন উদয় কৈল নিত্য লীলাহইতে।" ফলত শ্রীভগবানের আবির্ভাবের সহিত বহিরঙ্গা মায়ার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না এবং ভগবৎ-তত্ত্ব যখন আমাদের অনুভূতিতে উদ্দীপিত হয়, যোগমায়া শক্তির প্রভাবেই তাহা সংঘটিত হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ" অর্থাৎ ভগবানের চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়া যাঁহার নিকট তাঁহাকে প্রকাশ করেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পান। যাঁহার নিকট প্রকাশ করেন না, তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান না।

ভাগবতে দেখা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভাবের পূর্বে যোগমায়াকে তাঁহার লীলাকার্যে সহায়তা করিবার জন্য আদেশ করেন। দেবী যোগমায়া নন্দরাজমহিষী যশোদার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। প্রাকৃত মানবগণ যোগমায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে
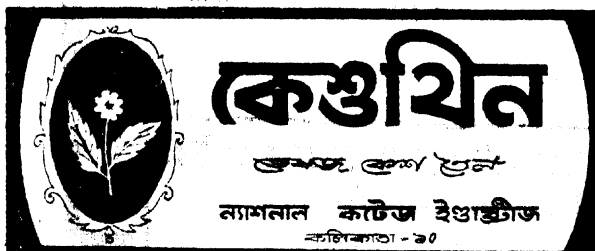
প্রিয়স্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাঁহারা পূর্ণস্বরূপে তাঁহাকে পায় নাই।

এইরূপ প্রাকৃত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সর্ববিধ কাম অর্থ এবং ভোগের বিধায়িত্রী-স্বরূপে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মূর্তিতে দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা প্রভৃতি নামে মহামায়ার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, ভাগবতে এইরূপ উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। বাস্তবিকপক্ষে প্রাকৃত মানুষগণের পক্ষে যোগমায়ার এই বিমোহন ক্রিয়াটি তাহাদের ভাবানুযায়ী ঘটে। নতুবা নাম বা মন্ত্রের দেবতা যিনি তিনি একই। উপাসকের অন্তঃনিষ্ঠাতেই পার্থক্য সূচিত হয়, উপাস্য বস্তুর কোন পার্থক্য নাই। সাধনা বিধিপূর্বক না হওয়াতে মন্ত্রের স্বাভাবিক শক্তি এ-ক্ষেত্রে পরিস্ফূর্তি পায় না। কাম ভোগ প্রভৃতি তুচ্ছ ফল লাভ সাধকের রুচি বা বাসনা অনুযায়ী আগন্তুকস্বরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। কংসের রঙ্গভূমিতে উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে সমবেত নরনারীগণ তাঁহাদের ভাবানুযায়ী বিভিন্ন রসের বিষয়রূপে অনুভব করিয়াছিলেন। দুর্যোধনও শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। "তথাপি না পাইল সুখ ভক্তি শূন্যের কারণ"—চৈতন্য ভাগবতের এই সিদ্ধান্ত। অভিমানী ভক্তিহীন দেহাভিমানবশতঃ দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ফলে দেখিয়া সবংশে মরিল দুর্যোধন।' 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্' গীতায় ভগবান স্বয়ং এ কথা বলিয়াছেন। 'কৃষ্ণ কেমন যার মন যেমন'।

সুতরাং যোগমায়া এবং বহিরঙ্গ মায়া আমাদের দিক হইতে এতদুভয়ের বিচার করিতে গেলে ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের প্রশ্নটিই মুখ্য হইয়া দেখা দেয়। বহিরঙ্গা এই মায়াকে 'মহামায়া' এই আখ্যায় অভিহিত করিয়া 'যোগমায়া' হইতে আমরা পৃথকার্থ কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু কেন করি? ভগবানকে প্রিয়স্বরূপে উপলব্ধি করি না—এই জন্যই করি। সে-ক্ষেত্রে আমাদের কল্পনার মূলে আমাদের চিত্তে ভগবৎ-প্রিয়ত্বের অভাবজনিত অভিভূতি বা অজ্ঞানতাই কার্য করে। ভোগৈশ্বর্যের কামনা এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের প্ররোচনায় পড়িয়া মায়ের কৃপার স্পর্শ অন্তরে না পাইয়া পশু-জীবনের ক্লেদ-পঙ্কে আমাদের চিত্ত নিমগ্ন হয়। ভগবানের সম্বন্ধে প্রিয়ত্ববোধ বা তাঁহার প্রীতির স্পর্শ অন্তরে পাইলে এই সমস্যা মিটিয়া যায়। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। চিত্তের দ্রবতাই প্রেম বা প্রীতির প্রধান লক্ষণ। শ্রীল মধুসূদন সরস্বতীর মতে প্রেম বা প্রীতি—'দ্রবীভাব-পূর্বিকা মনসো ভগবদাকারতা।' চিত্তের এই দ্রবতা সাধিত হয় স্নেহে, হয় মমতায় এবং এই বস্তুটি মাতৃভাবেরই বিশেষ সম্পদ। বিশ্বজননীর স্নেহের সংস্পর্শে আমাদের চিত্তের দ্রবতা সাধিত হয়। বিশেষকে আশ্রয় করিয়াই আমরা নির্বিশেষ বা নিরুপাধিক এই প্রেম আমাদের পক্ষে অধিগম্য হইয়া থাকে। নিজের মায়ের মধ্যেই আমরা পাই বিশ্বের মাকে। সদ্গুরু মাতৃদেবের স্পর্শে যাহার অন্তর বিগলিত না হয় সে নিতান্ত অমানুষ। নরপশু সে—সে কাম-কুক্কুর। তাহার সম্বন্ধে ভগবৎ-প্রেমের কোন কথাই উঠে না। গোপীভাবের কথা—কৃষ্ণপ্রেমের প্রসঙ্গ তাহার মুখে না থাকাই ভালো। 'কাম প্রেম উভয়েতে প্রভেদ বিস্তর, কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর'—চরিতামৃতের এই বাণীটি আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। বাস্তবিকপক্ষে ভগবানে সব ভাবই আছে। সেবকের যেভাবে অভিরুচি বা প্রিয়তা সমধিক তাহাকে আশ্রয় করিয়া সাধনাতেই শীঘ্র প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তৎপ্রণীত বৃহৎ-ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন—"বিচিত্র রুচিনাং লোকানাং ক্রমাৎ সর্বেষু নামসু প্রিয়তা সম্ভবাত্তানি সর্বাণি স্যুঃ প্রিয়াণি হি।" মানুষের রুচি-বৈচিত্র্য অনুসারে ভগবানের যে কোন নাম অবলম্বন করিয়া সাধনা করিলে নামের মূলীভূত সর্বাত্মক ভাবটি অন্তরে প্রভাবিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে সকল নামেই প্রিয়তার উদয় হইয়া থাকে। নাম বলিতে এখানে ভাব বা চিন্তার অবলম্বনই বুঝিতে হইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যোগমায়াকে অঙ্গীকার করিয়াই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীবিগ্রহের মাধুর্য-বীর্যটি মাতৃ-ভাবকে আশ্রয় করিয়াই বিশ্বজনের অন্তরে চিন্ময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যোগমায়া দেবী—"ভক্তজনের গূঢ়ধন" পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়স্বরূপে 'রূপেরতনটি' ব্রজবাসিগণের নিকট প্রকটিত করেন। 'রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার' ব্রজবাসীরা এই রূপের ফাঁদে পড়িয়া যান। তাঁহারা কৃষ্ণরূপের আকর্ষণে

পড়েন অতি-স্নেহের প্রভাবে। এই রূপে ব্রজদেবীগণের প্রেমের মূলে ছিল যোগমায়ার অবদান।

ব্রজকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য দেবী কাত্যায়নীর পূজা করিয়াছিলেন। দেবীর কৃপাতেই তাঁহারা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন। ভাগবতে দেখা যায়, তাঁহারা সাক্ষাৎ-সম্পর্কে মহামায়ারই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। দেবীকে তাঁহারা 'মহামায়া' এই নামাত্মক মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক আরাধনা করেন। "কাত্যায়নী, মহামায়ে, মহাযোগিন্যধীশ্বরী" তাঁহাদের উক্তিতেই আমরা সে পরিচয় পাই। ব্রজ-কুমারীগণ ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে অস্বীকার করেন নাই। মহামায়াকে শুধু তাঁহারা সংসারাসক্তির জননিয়ন্ত্রীস্বরূপে দেখেন নাই, পরমা মুক্তির হেতুভূতা সনাতনীস্বরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ-সম্পর্কটিও তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে মহামায়াই ব্রজকুমারীগণের প্রার্থনায় উপপতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দ-সম্ভোগে ব্রজবধূগণের জীবনে যোগমায়ারূপে বিক্রীড়িত হন। চৈতন্য-চরিতামৃতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"মো বিষয়ে গোপিগণ উপপতিভাবে যোগমায়া সাধিবেন বিশেষ প্রভাবে।" বস্তুত ব্রজবধূগণের কৃষ্ণপ্রেমের প্রৌঢ় নির্মলভাবের নিরবধি ভাবটি যোগমায়ার প্রভাবেই প্রকটিত হয়।

মহালক্ষ্মী স্বরূপিণী রুক্মিণী দেবী। তিনিও শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য ভবানী দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। বিদর্ভনগরে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে বিলম্ব-জনিত উদ্বেগে দেবী রুক্মিণী গৌরী, রুদ্রাণী, সতী এবং গিরিজার অনুধ্যানে রাত্রি অতিবাহিত করেন। ভবানী-মন্দিরে গিয়া তিনি মা, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার পতি হোন, এইরূপ প্রার্থনা করেন। দেবীর অনুধ্যাত মাতৃমন্ত্রের বিশিষ্ট বিভাবগুলির দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াই তাঁহার কণ্ঠ হইতে প্রার্থনা-বাণী উদ্গীত হইয়াছিল। বিশ্ব-প্রসবনী মহাশক্তির ব্যক্তাব্যক্ত সর্ব পরিব্যাপ্ত স্বরূপই অম্বিকা। রুক্মিণী দেবী ইঁহার নিকট প্রপন্না হইয়াছিলেন। বেদমন্ত্রের ভাষ্যে আচার্য ভট্টভাস্কর অম্বিকা বলিতে দেবীর এই সবিশেষ-নির্বিশেষ মাতৃস্বরূপের ব্যক্ত ভাবটিরই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং দেবী রুক্মিণীর অম্বিকা-মন্ত্রে মায়াবীজে সাকল্যে বা পূর্ণকলায় অর্থাৎ সকলভাবে বিশ্বের সংশ্রয়-তত্ত্বস্বরূপিণী বৈষ্ণবমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গাকেই বুঝাইতেছে। ভাগবতের মণিহরণ-লীলায় দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণির অনুসন্ধানে জাম্ববানের নিবাসভূমি পাতালপুরীতে অনুপ্রবিষ্ট হইলে তাঁহার সহচর যাদবগণ তাঁহাকে অপ্রত্যাগত দেখিয়া দুঃখিত-চিত্তে দ্বারকায় গমন করেন। তাঁহারা শোকাকুল অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন কামনা করিয়া দ্বারকার সন্নিকটস্থ প্রভাস-তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী জগন্মাতা চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গাদেবীর আরাধনা করেন। দেবী তাঁহাদের নিকট আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করেন। সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ত্ববোধেই এ ক্ষেত্রে মহামায়া যিনি, তিনি যোগমায়ারূপে জাগিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বৈকুণ্ঠের পীঠাবরণস্বরূপে দুর্গাদেবীর পূজার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠের পীঠাবরণস্বরূপ দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণেরই চিন্ময় বিভূতি, তাঁহারা তাঁহার অখণ্ড আত্মতত্ত্বস্বরূপ। শ্রীল বৃন্দাবনদাস বলেন—"দেবদ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ, গণসহ সেবিলে কৃষ্ণের অতি সুখ।" বৈকুণ্ঠের পীঠাবরিকাস্বরূপিণী দেবী দুর্গা প্রিয়ত্বরূপে ভগবৎ-তত্ত্বেরই স্বরূপ-শক্তি। তিনি ভগবানের প্রিয়ত্বের অভিমুখ্যের উদ্দীপিকা; সুতরাং অখণ্ড রস-বল্লভা।

প্রকৃত প্রস্তাবে প্রিয়ত্বরূপে শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করিবার আকুতির রীতিটিই ভগবৎ-মাধুর্যের পরিপূর্তির মূলে বীর্যস্বরূপে কাজ করে। "বহিরঙ্গা মায়া সেও করে প্রেম ভক্তি"—শ্রীভগবানের আত্মরস-মাধুর্যের উপলব্ধির ক্ষেত্রে বহিরঙ্গা মায়ার এই খেলাটিকে অবান্তর বা অনর্থক বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। কারণ, উপেক্ষা করিব কেমন করিয়া? কৃপার ভাবটি কোথায় নাই? কৃতজ্ঞতাবুদ্ধি আমাদের অন্তরে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও থাকে, তবে বহুরূপে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন শক্তির মধ্যেও আমরা প্রতিনিয়ত কৃপারই পরিচয় পাইব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে জীবনের মূলে এই কৃপার স্পর্শটি অনুভব করিতে উপদেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কৃতজ্ঞ যে তাঁহার অন্তরে সেবা-বুদ্ধি জাগিবেই এবং সে প্রিয়স্বরূপে ভগবানকেও পাইবে। ফলত আমরা যদি একটু কৃতজ্ঞ হই এবং আমাদের জীবনের মূলে বিভিন্ন শক্তির সংযোগসূত্রে বিশ্ব-জননীর কৃপার স্পর্শ প্রতিনিয়ত পাইয়াই যে আমরা সজীবিত রহিয়াছি এই সত্যটি স্বীকার করি, তবে তাঁহার উদার বীর্যের সংবেদনে মহামায়ার রাজ্যেই যোগমায়ার প্রচ্ছন্ন চাতুরী আমাদের অনুভূতিতে উদ্দীপিত হয় এবং আমরা ভগবৎ-মাধুর্যের প্রাচুর্য আস্বাদনের অধিকার অর্জন করি। বাস্তবিক পক্ষে মাতৃভাবকে আশ্রয় করিয়া মহাভাবের মাধুর্যের রাজ্যে আমাদের চিত্তের অনুপ্রবেশ ঘটে। বিকারের ক্ষেত্রে তখন জাগে চিদাকার। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত উভয়তত্ত্ব সেখানে একই চিন্ময়ধর্মে প্রাণময়, মনোময় এবং সর্বময় হইয়া উঠে। মাতৃভাবে সাধনার এই ধারাটি আমাদের পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক এবং এই ধারাটি অবলম্বন না করিলে ভগবানের অখণ্ড রসধর্ম ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের উক্তিতে আমরা মহামায়া এবং যোগমায়ার অন্বয় সম্বন্ধের পরিচয় পাই। প্রহ্লাদ শ্রীভগবানকে বন্দনা করিয়া বলেন, পরব্রহ্মস্বরূপে বাক্যমনের অতীতা আপনার স্বরূপভূতা যে চিচ্ছক্তি আমি তাঁহাকে বন্দনা করি। সর্ব প্রাণীর মধ্যে আপনার যে ত্রিগুণাত্মিকা অপরা মায়া নাম্নী শক্তি আছে, সে শক্তিও নিত্যা। তাঁহাকেও নমস্কার। সর্বভূতের মধ্যেই ভগবানের শক্তি চেতনাস্বরূপে কার্য করিতেছে, আমরা সতত তাহাকে অবজ্ঞা করিতেছি। মহামায়াস্বরূপে আমরা সেই শক্তিকে সংসার-বন্ধনের হেতুভূতা মনে করিয়া শঙ্কিত হইতেছি। তাঁহার সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিবার জন্য আমরা স্পর্ধা করিতেছি। কিন্তু ভক্তবর প্রহ্লাদ সেই শক্তিকে নমস্কার করিতেছেন। ভগবৎ-কৃপার স্পর্শ তিনি অন্তরে অনুভব করিয়াছেন। শ্রীভগবানের প্রিয়ত্বের আকুতি তাঁহার চিত্তে জাগ্রত হইয়াছে। গুণের রাজ্যে এবং গুণময়ী মায়ার সম্বন্ধেই গুণাতীত নিত্যসত্যের অনুভূতি তাঁহার জীবনে প্রমূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহামায়াই তাঁহার উপর যোগ-মায়ারূপে জাগিয়াছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রগতির পথে প্রত্যক্ষতাই পরম বলস্বরূপে কার্য করে—অনুমানের আশ্রয়ে সে রাজ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না. প্রকৃতপক্ষে মহামায়াস্বরূপিণী দেবী দুর্গার মাতৃ-মাধুর্য উপলব্ধি করিতে না পারিলে আমাদের জীবনে খণ্ডভাবোধ থাকেই; দেহের ধর্ম আমরা ভুলিতে পারি না এবং মহাভয় আমাদের জয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে। সে ক্ষেত্রে সত্য সম্বন্ধে জীবনে পরোক্ষতাই আমরা প্রতি-নিয়ত অনুভব করি। অভীষ্টের সম্বন্ধে তেমন সম্যক্‌দৃষ্টভাব বা ঘনিষ্ঠতার অভাব আমাদের দেহাভিমানকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। এ অবস্থায় জীবনের দীনতা আমাদের ঘোচে না। "বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা স্মৃতা"—ব্রহ্মের স্বরূপে শক্তিরূপে বিশ্বের সকল শক্তিকে অখণ্ডভাবে উপলব্ধি করাই আধ্যাত্মিক জীবনে সংপ্রতিষ্ঠা লাভের বৈজ্ঞানিক উপায়। দুর্গা দেবীর অনুধ্যানে জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রিয়ত্বের এমন অনুভূতির রীতি উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের এক পরিচ্ছেদ ॥ ১৩০৫

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্রনাথ যখন খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছেন তখন থেকে তাঁর জীবন ও কীর্তির বিবরণ আমাদের কাছে যেমন সুপরিচিত, তাঁর পূর্বজীবনের কর্ম-কথা এখনও তত সুবিদিত নয়, উপকরণও অবিরল নয়। এইজন্য নিম্নমুদ্রিত রচনাটি আমরা জন্মভূমি পত্রিকা (১৩০৭—০৮) থেকে উদ্ধার করছি। আহৃত তথ্যের পরিমাণে রচনাটি হয়ত অনেকের কাছে অতিবিস্তারিত বোধ হবে, তবু সেকালের একটি সুন্দর চিত্র লেখাটিতে পাওয়া যায় ব'লে এটি আমরা সম্পূর্ণই পুনর্মুদ্রিত করছি।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন রচনাটির পরিশেষে মুদ্রিত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় তথ্য-বিবরণ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। —সম্পাদক, দেশ

ক্ষণজন্মা, স্বনামধন্য, বঙ্গের গৌরব, কবিকেশরী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গত ২৫শে বৈশাখ ৩৯ ঊনচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘজীবন ও সুস্থ শরীর লাভ করিয়া এই অধঃপতিত বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য সিংহাসন চিরদিন সুশোভিত করুন, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

বিদ্যমান কাল, কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার উপযোগী নয়। সুতরাং তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা, সর্বব্যাপিনী বিদ্যা, বীণাবিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠস্বর—অথবা তাঁহার স্বভাবতঃ সরল হৃদয়, উদার চরিত্র, উন্নত চিত্ত, অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ, পরদুঃখ-কাতরতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি নানাগুণের কথা—তাঁহার কমনীয় কান্ত রূপ, অনবদ্য স্বাস্থ্য, মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক প্রিয়দর্শন সৌম্যমূর্তির কথা আমাদের ন্যায় হীন জনের ক্ষীণা-লেখনী দ্বারা ব্যাখ্যাত হওয়া অসম্ভব। কাজে কাজে সে সকল বিষয়, কিছুই বলা হইল না। তিনি অতুল ঐশ্বর্যের কোলে লালিত হইয়া ভোগ-বিলাস বাসনা ত্যাগ করিয়া—স্বদেশের জন্য—স্বদেশ ভাষার উন্নতিকল্পে আজন্ম পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। তিনি বঙ্গভাষার এক অভিনব পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন! তাঁহার লিখিত বঙ্গভাষাই যে, কালে বঙ্গ সাহিত্যের অনেকের আদর্শ হইবে, ইহারই মধ্যে তাঁহার প্রবর্তিত ভাষা এমনই অজ্ঞাতসারে বাংলা ভাষার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে; আজকাল বিস্তর ভাল ভাল বাঙ্গালা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষার ছায়া দেখিতে পাই। শোভাবাজারের রাজবাটীতে সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের একটি বাঙ্গলা প্রবন্ধ (১) শ্রবণ করিয়া সাহিত্য পরিষদ সভার তাৎকালিক সভাপতি ক্ষণজন্মা স্বনামধন্য ভারতের মুখোজ্জ্বলাকারী সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তজ মহাশয়, মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথবাবুর প্রবন্ধের ভাষার মত এমন শ্রুতি-মধুর বাঙ্গালা আর কখন শুনি নাই। আমি অনেক বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়াছি বটে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এমন করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, রবীন্দ্রবাবুর বাঙ্গালা প্রবন্ধ শ্রবণ করিবার পূর্বে তাহা জানিতাম না। বাস্তবিকই, রবীন্দ্রনাথের বাংলা, সতেজ অথচ সরল—অতরল সরবতের মত মুখপ্রিয় ও উপকারক, সুস্বাদু ও সুপেয়। পড়িতে পড়িতে আশ মেটে না। কিন্তু সেসব কথা যাক্। তাঁহার কলা-জ্ঞানের অনুশীলন, বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত অথবা অনুকূল নহে। অপ্রাসঙ্গিক বোধে তৎসমস্ত পরিত্যক্ত হইল।

স্বদেশের হিতের জন্য, স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথ, স্বয়ং লোকশিক্ষক-রূপে সংসারক্ষেত্রে কেমন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, কৃষি-কর্মে তিনি নিজ জীবনের বর্তমান কাল কিরূপে নিয়োজন করিয়াছেন, বক্ষ্যমাণ সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। সহৃদয় জমিদারবর্গের ও জনসাধারণের ইহাতে মনুষ্যচক্ষুঃ কথঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইলে, রাজাদের ও জমিদারগণের সমবেত চেষ্টায় ফলে আমাদের দেশের (ভারতের) ভবিষ্যতে অনেক মঙ্গলই সাধিত হইব।

কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভক্তি, ফল্গু নদীর ন্যায়, অন্তঃসলিলা। তিনি স্বদেশের হিতসাধন-সংকল্পে গলাবাজী করিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়ান নাই; অথবা গুছাইয়া গুছাইয়া শব্দ বিন্যাস করিয়া হৃদয়গ্রাহী কোন প্রবন্ধের রচনা [করেন] নাই বটে, কিন্তু এমন দিন নাই, যেদিন তিনি স্বদেশের জন্য একবিন্দুও অশ্রুপাত করিয়া পৃথিবী সিক্ত না করেন। তাঁহার হৃদয় স্বদেশ-প্রেমময়। তাঁহার রচিত কয়েকটী ভারত-সংগীত শ্রবণ করিলে, প্রকৃত ভাবুকের প্রতি ধমনীতে এক মহাশক্তি সঞ্চারিত হয়। কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথকে ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া কেবল কবিতা লিখিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে, শোনা বা দেখা যায় না। যাহাতে স্বদেশের আত্মীয় বা অনাত্মীয় দশের উপকার সাধিত হয়, যাহাতে স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যাদি কার্যের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত ও বিশেষ উন্নতি হয়, যাহাতে এদেশে বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়, যাহাতে আমাদের দেশের বিজ্ঞানানুশীলন, সমধিক শ্রীবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ, প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। শিল্প ও বাণিজ্য-শিক্ষার্থীদিগকে অর্থ-সাহায্য করিতেছেন। বিজ্ঞানাগারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন (২) এবং কৃষিকার্য ও বাণিজ্য বিস্তারের জন্য নিজেই, সমাজ-শিক্ষকরূপে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রতীচ্য শিক্ষায় অহংকৃত ও বিদ্যাভিমান-দৃপ্ত উদ্ধত ও মদগর্বিত বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত যুবকগণকে অথবা ধনীর সন্তানদিগকে কৃষিকার্য অথবা ব্যবসায়-বাণিজ্যে করক্ষেপ করিতে বলা দূরে থাকুক, মুখের কথাতে উৎসাহ দিতে বলিব না। তাঁহারা হয়তো অপমান বোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিবেন—কত অকথ্য

কথাই ব্যবহার করিবেন। এফ এ এবং বি এ পাশ করিয়াও সামান্য অর্থের জন্য লোকের বাটীতেই শিক্ষকতা করিবেন। চাকরি যোটান তো দূরের কথা। ঘরের খাইয়া অপরের নিকট উমেদারি করিবেন, তাহাও তাঁহাদের স্বীকার! তথাপি আপন জন্মভূমিতে চাষবাস করিয়া সুখে থাকিতে, তাঁহাদের মস্তকে অপমানের বোঝা যেন মাথায় আসিয়া চাপিয়া বসে। ধনীর পুত্রগণ, আলস্য-সলিলে ডুবিয়া ভোগবিলাসে পৈতৃক সম্পত্তি ক্ষয় করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। তথাপি লাভকর ব্যাপারে মনঃসংযম করিয়া, ধনাগমের পথ পরিষ্কৃত করিতে কিছুতেই তাঁহারা সম্মত হইবেন না। বঙ্গদেশে দরিদ্রতা বৃদ্ধির ইহা এক প্রধান কারণ। এই সকল কুসংস্কার বা বৃথা আত্মাভিমান, বঙ্গদেশের দুঃখ দূর করিবার অন্যতম অন্তরায়। স্বীয় দেশের এই সকল দূরবস্থা সন্দর্শন ও চিন্তা করিয়া কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথ, কৃষিকার্য ও শিল্পবাণিজ্যে অগ্রসর হইয়াছেন। গত ১৩০৫ সালের কার্য-বিবরণী হইতে পাঠকদিগকে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস, আপাততঃ দিতে হইতেছে।

বৎসরের প্রথম দিবস অর্থাৎ ১লা বৈশাখে আদি ব্রাহ্মসমাজের একটি সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের যোড়াসাঁকোর বাটীতে এই উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত বর্ষের ১ম দিবসেই এই উৎসব সমাহিত হয়। কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের জনক পরমপূজনীয় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহানুভবই, ইহার অনুষ্ঠাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে উৎসবস্থল নির্দিষ্ট ও সজ্জিত হয়। সেদিন কদলীবৃক্ষ বেষ্টিত, নানা জাতীয় লতা-পত্র মণ্ডিত, বেল, যূঁই, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি নানা সু-সৌরভসম্পন্ন পুষ্পরাজি বিরাজিত মহর্ষিদেবের বসতি, যেমন সিদ্ধার্থের তপোবনোপম হইয়া উঠিল! নানা ফল ফুলে শোভিত ধূপ-ধূনা-চন্দন, দীপ, কুঙ্কুম-কস্তুরী প্রভৃতি সদ্‌গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুবাসিত শঙ্খঘন্টা নিনাদিত সেই তপোবনবিভ নিবসতি-স্থলে সেই ভূত-ভবিষ্য বর্ষের সন্ধিস্থলে সেই অতীত মহাপুরুষদিগের কথিত ব্রাহ্ম মুহূর্তে সেই আলোক-অন্ধকারের মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চনা হয়। যথার্থই সেই সময়ে হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি-প্রেমের শত-উৎস উৎসারিত হয়। ক্ষণকালের জন্য— সমাগত উপাসনানিরত ব্যক্তি সমস্ত, স্ব স্ব অস্তিত্ব বিস্মৃতিবারিধিতে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া জগন্মাতায় আত্মসমর্পণপূর্বক ভূমানন্দ লাভ করিয়া জীবন পবিত্র করেন। কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথ, এই উৎসব উপাসনান্তে একটি ভাগবত-সংগীত গান করিয়া সমুপস্থিত সভাস্থ সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সুমধুর কালের মধুর কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সংগীত, অদ্যাপি আমাদের কর্ণপ্রান্তে বারবার প্রতিধ্বনিত হইতেছে, রবীন্দ্রনাথের এই বৎসরের কার্য-বিবরণ ধারাবাহিকরূপে সমালোচন করিলে বোধ হয়, যেন তিনি এই পবিত্র স্থানে বসিয়া বৎসরের প্রথম দিনে পবিত্র হৃদয়ে প্রশান্তমনে ১৩০৫ সালের কর্তব্যকর্ম স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সংকল্পিত কর্ম সকল কেমন করিয়া সম্পূর্ণ হইল, কিরূপে তাহা সকলের গ্রহণীয় হইল, যথাযথভাবে তাহা ব্যক্ত করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

[ভারতীর সম্পাদকতা]

কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের ১৩০৫ সালের প্রথম কর্ম ভারতীর সম্পাদকতা গ্রহণ। ভারতী আজ ২৩শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বঙ্গের গৌরব, ঋষিতুল্য মনস্বী দার্শনিক কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার জনক। গত ১২৮৪ সালে শ্রাবণ মাসে ভারতী প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রবাবু কিরূপ যোগ্যতার সহিত ভারতী সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। অতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথের যেমন স্বভাবের তেমনই রচনার অসামান্য মাধুরী। সুতরাং তাঁহার সম্পাদিত ভারতীও যে অতুল্য হইয়াছিল, তাহার আর বিচিত্রতা কি? ভারতীর জন্মকালে রবীন্দ্রনাথ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের সম্পাদিত ভারতীতে নবসুধাক্ষর প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে মনস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদনভার বঙ্গের মুখোজ্জ্বল্যকারিণী বিদুষী সহোদরা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর হস্তে অর্পণ করেন। তিনিও অতিশয় যোগ্যতার সহিত ভারতী সম্পাদন করিয়াছিলেন। কালক্রমে তিনিও ইহার সম্পাদনভার কন্যাদ্বয়ের উপর দিতে বাধ্য হন। কয়েক বৎসর পরে ভারতীর অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়ে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ বন্ধুবর্গের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া 'সাধনা'র পুনঃপ্রচারের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। প্রাচীন ভারতীর হীনাবস্থা দেখিয়া আর সাধনায় হাত না দিয়া, ভারতীর সংস্কারকল্পে ব্রতী হইলেন। ভারতীর সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া তাহা কিরূপ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। কিন্তু তিনি নানা কারণে ভারতীর সম্পাদনভার একটি বৎসরের অধিক রাখিতে পারিলেন না। ভারতীর বিদায় গ্রহণকালে ভারতীর কার্য আশানুরূপ করিতে পারিলেন না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিকেশরীর সিদ্ধহস্তে গিয়া ভারতীর অনেক আশা বর্ধিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় যে, একটী বৎসর পরেই ভারতীকে মাসিক পত্রিকার সাধারণ গতিপ্রাপ্ত হইতে হইল। জানি না, বঙ্গদেশে মাসিক পত্রিকাগুলির উপর কি অভিসম্পাত আছে। বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, প্রচার, সাধনা প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকাগুলিও অকালে যোগ্যাহস্ত হইতে এইরূপে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে! বঙ্গদেশবাসীদিগের সাহিত্যানুরাগের ইহা এক প্রধান পরিচয়!!

রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদনভার নিজস্কন্ধে লইয়া কেবল উহাতেই যে বদ্ধ ছিলেন, এমন নহে। "ঐতিহাসিক চিত্র" নামে আর একখানি নূতন ধরনের ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রচারের আয়োজনও চলিতেছিল। উদীয়মান সাহিত্যলেখক "সিরাজদ্দৌলা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রচারকালে ইহার একটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ভূমিকা লিখিয়াছেন। শেষে ঢাকি বহির্বাটীতে বসিয়া ঢাক বাজাইয়া যেমন পূজাবাড়ীর সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া নিশ্চিন্ত, বিনয়ের আধার রবীন্দ্রনাথ তেমনি ঢাকিস্বরূপ ভূমিকা দ্বারা ঐতিহাসিক চিত্রের প্রচার ঘোষণা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন বলিয়া ভূমিকা শেষ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি, পত্রিকাটির অঙ্গহীন হইবার আশঙ্কায় তাঁহাকে তত্ত্বধারকের কার্যও করিতে হইয়াছিল, এবং পত্রিকাটির দীর্ঘজীবন কামনায় যথেষ্ট অর্থ দান করিয়াছিলেন, বন্ধুবান্ধবদিগের দ্বারা তদর্থে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেও ত্রুটি করেন নাই। পত্রিকাটির পুষ্টিসাধন ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁহার প্রবন্ধবর্ষিণী লেখনীও বিরাম পায় নাই। ইহাকেই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কর্ম গণনা করা যায়। (৩)

[রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন]

তৃতীয় কর্ম পুত্র শ্রীমান রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার। রবীন্দ্রনাথ ভারতীর প্রথম সংখ্যা বাহির করিয়া দিয়াই পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কারকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার পর্বে কিছু বিশেষত্ব আছে। রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার বা আর্যসমাজ ও আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্মিলন রবীন্দ্রনাথের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বৎসর ১০ই বৈশাখ বীরভূম জেলার অন্তর্গত বোলপুর গ্রামস্থিত শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন তীর্থে রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কারকার্য সম্পন্ন হয়। এই তীর্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লুপ লাইন বোলপুর স্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্তী; স্টেশন হইতে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত বাঁধা পথ, গো-শকটে গমনাগমন করিতে হয়।

কিন্তু শক্তিমান জন এই দুই মাইল পথ পদব্রজে যাতায়াত করিতে আনন্দ বৈ কখন ক্লান্তিবোধ করেন না। এই পথ পদব্রজে যাইতে যে শ্রান্তি হয়, শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইলেই তাহার শান্তি হইয়া যায়। শান্তিনিকেতন প্রকৃতই শান্তিরই নিকেতন। সে জন-মানব-শূন্যে বৃক্ষলতাদিহীন সুদূর বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যস্থলে লতাপাদপ-বেষ্টিত, নানা ফলপুষ্পশোভিত, কোকিল-কাকলিকূজিত মহর্ষি দেবের শান্তিনিকেতন আশ্রম বড়ই মনোরম—বড়ই প্রীতিপ্রদ, আশ্রম প্রাঙ্গণে কোথাও হরিণীশাবকগণ আনন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও গাভীগণ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া রোমন্থন করিতেছে, কখন বা তাহার বৎসগণ এক একবার দুগ্ধ পান করিতেছে, আবার নির্ভয়ে আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কোথাও ময়ূরগণ পুচ্ছ মেলিয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছে, কোথাও পারাবতকুল ঝাঁকে ঝাঁকে বসিয়া আহার খুঁটিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে পুংপারাবত গ্রীবা স্ফীতকরতঃ বক্ বকম্ বক্ বকম্ রবে তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে পারাবত-পত্নীকে সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিতেছে। চটক পক্ষীর কোন বালাই নাই—তাহারা দুই চারিটী মিলিয়া কখন প্রাঙ্গণে, কখন আমলকীবৃক্ষে, কখন আশ্রম-কুটিরে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছে; কোথাও বৃক্ষের ডালে বসিয়া পুংকোকিল আপনমনে কুহু-উ-উ স্বরে কানন মোদিত করিতেছে, কোথাও চাতক পক্ষী সপ্তমস্বরে আকুল অন্তরে ফটী-ই-ইক জল ফটীই-ইক জল করিয়া নৈশগগন প্রতিধ্বনিত করিতেছে—কোথাও হলদে পক্ষী "চোখ গেল" "চো ও ওক্ গেল" স্বরে মনের অতি ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। আশ্রমের অনতিদূরে ক্ষুদ্রকায়া কুপাই নদী ধীরমন্থর গতিতে প্রবাহিত। সেখানে সকল জীবজন্তু নির্ভয় হৃদয়ে আশ্রমের শান্তি উপভোগ করিতেছে। সেখানে জনমানবের কোলাহল নাই, শোকাকুলার ক্রন্দন নাই—আতুরের আর্তনাদ নাই, সে সুন্দর শান্তিরসাস্পদ পুণ্যতীর্থের স্নিগ্ধতায় নয়নমন পরিতৃপ্ত হয়। সে নির্জন আশ্রম কেবল ভগবানের মহত্ত্ব অনুভব করাইয়া দেয়; শান্তিনিকেতনের গাম্ভীর্য যেন কোন মহাপুরুষকে স্মরণ করিবার জন্য অংগুলি নির্দেশ করে। এমন কঠোর প্রাণ কাহারও নাই যে, সে নির্জন আশ্রমে গিয়া পবিত্র স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণকালের জন্য সংসারের মায়ামোহ ভুলিয়া সেই অব্যক্ত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ না হয়।

রথীন্দ্রকে সংযত ও উপনীত করিবার এই উপযুক্ত স্থল।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে এই পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই উৎসবোপলক্ষে কবিকেশরী রবীন্দ্র-

রবীন্দ্রনাথ

নাথ পঞ্জাবের আর্য সমাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 'দয়ানন্দ সরস্বতী এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। আর্য সমাজের সহিত আদি ব্রাহ্ম সমাজের মতের কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও উভয় সমাজের উদ্দেশ্য একই। জড়ের অতীত, মূর্তিহীন, ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার জন্য উভয় সমাজ দৃঢ়ব্রত। দেশের কুসংস্কার দূর করা এবং সুবিচারে ধর্ম পালন করা উভয় সমাজের লক্ষ্য। আর্য সমাজের ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের কার্যপ্রণালী বহুদিন হইতে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন হইয়া চলিয়া আসিতেছে। আর্য সমাজের কয়েকজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সভ্যকে মহর্ষিদেবের নিকট ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদক বহু শাস্ত্রালোচনা করিতে দেখিয়া গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের সাধুবাদ করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে পুত্রের উপনয়ন সংস্কার উপলক্ষে তিনি আর্য সমাজকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া উপস্থিত সভ্যদিগের যথোপযুক্ত সম্বর্ধনা করিলেন।

আর্য সমাজের সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদিক শাস্ত্র-বিচারনিপুণ পাশ্চাত্ত্য ব্রাহ্মণগণ এই উপলক্ষে মহর্ষিদেবের সংস্কৃত অপৌত্তলিক ক্রিয়া-পদ্ধতিরও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। উভয় সমাজের বিধিব্যবস্থা লইয়া অনেক আলোচনার পর কয়েকটি বিষয়ের মীমাংসা হইয়াছিল। আজ যে আর্যসমাজ ও আদি ব্রাহ্মসমাজ একযোগে অপৌত্তলিক সনাতন ব্রহ্মোপাসনার পুনঃপ্রতিষ্ঠার্থ কার্য করা মনঃস্থ করিয়াছেন, শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন উৎসবে তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। (৪) যদি কালে কখন এই দুই সমাজের সংযোগ হয়, তবে শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন এবং কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের হাতের গড়া সুকবি 'বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাণ্ডিত্য (৫) চিরদিন স্মরণ করাইয়া দিবে।

কবিকেশরী এইরূপে পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার কার্য সম্পাদন করিয়া বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে নির্জন প্রকৃতির নীরব সৌন্দর্য সন্দর্শন করতঃ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

[শান্তিনিকেতনে ও পদ্মাতীরে]

বোলপুরের যে প্রান্তরে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তাহা কংকরময় স্থান—
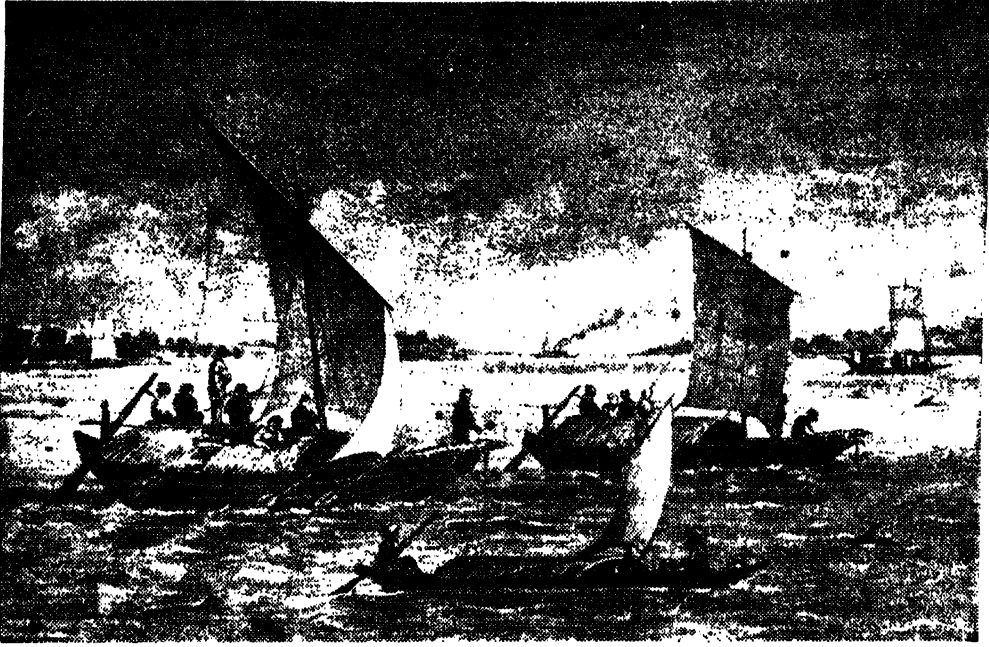
'জন্মভূমি' হইতে

কতকটা পাহাড় সদৃশ। শান্তিনিকেতন হইতে চারিদিকের ভূমি ক্রমশ ঢালু হইয়া গিয়াছে। আবার কতক দূরের ভূমি উচ্চীকৃত এবং পুনশ্চ অবনত হইয়া সেই স্থান বৃহৎ ভৌমিক তরঙ্গবৎ দৃশ্যমান হয়। সেই কঙ্করময় প্রান্তরের মধ্যস্থলে শান্তিনিকেতনের সুদৃশ্য ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত। কঠিন ভূমি বলিয়া তথায় শীত গ্রীষ্মের পূর্ণ অধিকার। শীতকালে যেমনই কম্পনকারী শীত, গ্রীষ্মকালে আবার তেমনই প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। শীতকালে শীতের কন্‌কনানিতে গাত্রাচ্ছাদক শীতবস্ত্র হইতে হস্ত বহিষ্কৃত করা দুরূহ ব্যাপার। কলসীতে বা অন্য পাত্রে জল তুলিয়া রাখিলে প্রাতঃকালে তাহা বরফতুল্য শীতল হইয়া থাকে—শরীরের যেখানে লাগে, ক্ষণকালের জন্য সে স্থান অসাড় হইয়া যায়—এমনই শীত। গ্রীষ্মকালেও তেমনই প্রচণ্ড রৌদ্র। সূর্যদেব আকাশের এক-চতুর্থাংশে না আসিতে আসিতে প্রান্তর ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া উঠে। প্রাঙ্গণে পদক্ষেপ করিবার যো থাকে না। পাদুকাও ২।৫ মিনিট পরে গরম হইয়া যায়। প্রখর রৌদ্রপ্রজ্বলিত প্রশস্ত প্রান্তর ধূ ধূ করিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে উত্তপ্ত বায়ুর ঝলকা আসিয়া মুখে চোখে লাগিয়া যেন দগ্ধ করিয়া তোলে। বেলা নয় ঘটিকা হইতে না হইতে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়; নতুবা সূর্যের উত্তাপে তিষ্ঠিবার যো থাকে না। শীত গ্রীষ্মের এমনই বিপর্যয়। কিন্তু কবিকেশরীর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। এই উৎকট প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে রসগ্রহণ করা প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ধর্ম! রবীন্দ্র নাম এখানে সার্থক!

কেবল বোলপুরের প্রান্তরের কথা বলি কেন? কাব্যসুধাবাদী রবীন্দ্রনাথ নানা স্থানে ঐ প্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেই অবস্থিতি করিতে ভালবাসেন। বঙ্গের সমতল বহু বিস্তৃত বন উপবনে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড মার্তণ্ডদেব মস্তকোপরি আসিয়া স্বীয় প্রভাব দ্বারা যখন প্রাণিগণকে আকুলিত করেন—যখন প্রখর রবিকিরণে উত্তপ্ত হইয়া আহার ত্যাগ করতঃ পশুগণ বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া রোমন্থন করিতে থাকে, পক্ষিগণ যখন বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় উপবেশন করিয়া কাকলি দ্বারা মাধ্যন্দিন গ্রীষ্মাতিশয্যের দারুণ সন্তাপ প্রকাশ করে—বঙ্গের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ যখন দ্বিতল গৃহে দুগ্ধফেননিভ সজ্জিত সোফায় শয়ন করিয়া কেওড়া জলসিক্ত খস্‌খসিতে গৃহদ্বার আচ্ছন্ন করিয়া প্রলম্বিত টানা পাখা দ্বারা সমীরণ পরিচালিত করিয়া নিদাঘ-তাপ কতক প্রশমিত করেন—তখন সর্বসুখী রবীন্দ্রনাথ সুখশয্যা ত্যাগপূর্বক ছায়াতপ-বিশিষ্ট সেই প্রান্তরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সন্দর্শন করতঃ তৃপ্তি লাভ করেন। আবার, নিদাঘ দিনান্তে দক্ষিণ পবন দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া খরস্রোতা পদ্মানদী যখন ভীষণ আকার ধারণ করে—যখন পদ্মার সুতুঙ্গ তরঙ্গরঙ্গ দেখিয়া সকলে সন্ত্রাসিত হয়—যখন কল্লোলিনী পদ্মা বৃহৎ বৃহৎ বাষ্পীয়-পোত ও বৃহদাকার তরণী সকলকে গলাধঃকরণ করিবার আশায় বিকট মুখব্যাদান করে—যখন ছোট ছোট নৌকাস্থিত মাল্লাগণ পদ্মার ভীষণ ভঙ্গিমা দেখিয়া প্রাণভয়ে "দরিয়ায় পাঁচ পীর, আল্লা ও আকবর" স্মরণপূর্বক আর্তনাদ করিতে থাকে—তখন রবীন্দ্রনাথ ভাবী বিপদ সম্মুখে দেখিয়াও "বোট ছোড়" বলিয়া আপনার ফুলচাঁদ বোটে আরোহণ করেন। সেই সর্বগ্রাসিনী খর-স্রোতা পদ্মার বক্ষে উত্তাল তরঙ্গে বোট ভাসিয়া যাইতে থাকে। বোটখানি তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে দশ হস্ত ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়, আবার কখন বিশ হস্ত নীচে পড়ে। এইরূপে কখন ডুবিয়া কখন উঠিয়া পদ্মার হিল্লোল সহ বোটখানি ভাসিয়া যায়। তখন রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে আনন্দহিল্লোল উঠে, তাহার ভাব অপরে কি বুঝিবে? রবীন্দ্রনাথ সেই তরঙ্গায়িত পদ্মাবক্ষে উচ্চাবচ গতিতে পরিচালিত বোটের ছাদে বসিয়া প্রকৃতির উৎকট দৃশ্যে এক অদ্ভুত সুখাস্বাদ করেন।

পদ্মার স্মরণে তাহার বর্ষাকালের পূর্ণ বলবিক্রমের কথা মনে পড়ে। তাহা হৃদয়কে কম্পিত না করিয়া ছাড়ে না। বর্ষাকালে পদ্মা স্ফীত হইয়া যখন দুই কূল প্লাবিত করে, তাহার স্রোতোবেগ যখন অষ্টগুণ বৃদ্ধি পাইয়া তীরগতিতে প্রবাহিত হয়, তখন কত গ্রাম, কত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নগর, কত বাজার, কত ঘরবাড়ি, কত বন জঙ্গল, কত গো মহিষ প্রভৃতি ইতর জন্তু পদ্মার নির্মম বক্ষে ডুবিয়া ভাসিয়া দূর-দূরান্তরে চলিয়া যায়। কত রাজ্যপাট, কত বিষয়বৈভব মুখে করিয়া

লইয়া পদ্মা কাহাকেও পথের কাঙ্গাল করে, আবার সেই সকল রাজা ও ধনসম্পত্তি পথের কাঙ্গালকে দিয়া হয়তো তাহাকে রাজেশ্বর করিয়া তুলে। বর্ষায় পদ্মার দিকে চাহিয়া দেখিবে—কেবল শ্বেতাম্বুরাশি ধূ ধূ করিতেছে। তাহার কূল নাই, কিনারা নাই। পদ্মা বিপুল বক্ষ বিস্তার করিয়া গম্ভীর-রবে আপন মনে বহিয়া যায়। পদ্মা কাহার দশা কি করিল, তাহা ফিরিয়াও দেখে না। যে ব্যক্তি তাহার ভীষণ বক্ষে আশ্রয় লইয়া নিতান্ত কর্মের বশে কোন দূরতর স্থানে যাইতে থাকে, সেও সন্ত্রস্তচিত্তে কেবল লক্ষ্য স্থানের দিকে চাহিয়া থাকে। অপর দিকে চাহিবার তাহার অবকাশ থাকে না।

ঈদৃশ ক্ষেত্রে কবিকেশরী প্রকৃতির শোভা দেখিতে জানেন ও পারেন। তাঁহার কোন উদ্বেগ নাই; তিনি কবির ভোগ্য তত্ত্বরস গ্রহণে সম্যক্ উৎসুক থাকেন।

জ্যোৎস্নাবিধৌত রজনীতে পদ্মার সৌন্দর্য আর এক প্রকার। পদ্মার সকলই অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ জ্যোৎস্নাময় রজনী দেখিলে পদ্মার এহেন বিচিত্র লীলা রঙ্গসময়েও ক্ষুদ্র ডিঙ্গিতে আরোহণ করিয়া উদ্বেগশূন্য হৃদয়ে চন্দ্রালোকবিভাসিত জলরাশির সহিত রজনীর মনোমুগ্ধকর ক্রীড়া সন্দর্শন করিয়া ভাবসাগরে নিমগ্ন হন।

শীতকালে আর এক বৈচিত্র্য। শীতের প্রাদুর্ভাবে যখন সকলে হি হি করিতে থাকে, যখন শীতের কন্‌কনানিতে হস্তের অঙ্গুলিগুলিকে সোজা করা যায় না, বৃদ্ধগণ শীতে যখন কুব্জপ্রায় হইয়া যায়, অথবা প্রবহমাণ শীতবায়ু যখন তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ধরিয়া দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে—ধনীযুবকগণ যখন নিত্য নূতন শীতাবরণ দ্বারা বাহার দিবার প্রশস্ত সময় পান, তখন কবি রবীন্দ্রনাথ দিবাবসানে এক অলস্টার কোট মাত্র গায়ে দিয়া, কটকী বা মোগলাই চটি পরিধান করিয়া ক্ষীণকায়া গোড়ুই-নদী-সৈকতে ভ্রমণ করেন। বালকদিগের ন্যায় প্রকৃতি-নন্দনের শীতবাত গ্রাহ্য হয় না। ঋতু-অনুযায়ী সকল সুখোপকরণ সম্পূর্ণ থাকিলেও তত্তাবৎ ত্যাগপূর্বক শীতের কম্পনের মধ্যে বাতাসে সুখ অনুভব করা কেবল ঈদৃশ কবি-হৃদয়েরই কার্য।

সৌন্দর্যরসমগ্ন এই কবির অর্ধোক্তি স্মরণ করিয়াই বুঝি অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন—

সরল হৃদয় কবি
যেখানে মাধুরী ছবি
সেখানে আকুল।
জ্যোস্নাতলে নদীকূলে
উষালোকে তরুমূলে
কত বকে ভুল।
প্রজাপতি মৃগ আঁখি
ফুলে অলি ডালে পাখি
গাছে গাছে ফুল।
দোলে লতা কাঁপে পাতা
চকাচকি ঠোঁটে গাঁথা
দেখিলে ব্যাকুল।
রমণি! তোমারে চেয়ে
ভেবো না কি গেল গেয়ে
কি বকিল ভুল।
সরল হৃদয় কবি
যেখানে মাধুরী ছবি
সেখানে আকুল।

বোলপুরের বৈশাখী প্রচণ্ড রৌদ্রের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া প্রসঙ্গাধীন অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম।

[কলিকাতায় প্লেগ]

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থাকিয়া নিশ্চিন্তমনে তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সন্দর্শনকরতঃ পরমানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। এমন সময়ে তথায় সংবাদ পঁহুছিল, কলিকাতায় প্লেগ আসিয়াছে। কলিকাতায় প্লেগের শুভাগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া কবিকেশরীর প্রেমার্দ্রচিত্ত বিচলিত হইয়া পড়িল।

প্লেগ রাক্ষসী ১৩০৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বোম্বাই শহরকে ধ্বংস করিয়াছে। সহৃদয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্লেগ-দমন মানসে বিকট আইন প্রচার করিলে বোম্বাই সহরবাসীগণ আরও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল,—কঠোর-রাজশাসনে কাহারো মান-সম্ভ্রম ছিল না, পুরস্ত্রীদিগের লাঞ্ছনার সীমা পরিসীমা ছিল না। বোম্বাই সহরের অধিকাংশ ব্যক্তি সহরকে শ্মশানক্ষেত্রবৎ ভাবিয়া মান-ইজ্জতের ভয়ে দেশ-দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। বোম্বাই সহরের সেই সকল কঠোর চিত্র বঙ্গদেশবাসীকে বড়ই সন্ত্রাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। যখন প্লেগ-রাক্ষসী বোম্বাই সহরকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে—তখন তাহার বঙ্গদেশে আসিতে কতক্ষণ? কলিকাতাবাসীগণ তজ্জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে বাস করিতেছিল। যূপকাষ্ঠসন্নিহিত অজ ছিন্নমস্তা অজকে দেখিয়া সভয়ে বাত্যান্দোলিত কদলীপত্র[বৎ] যেরূপ কম্পিত হইতে থাকে, কলিকাতা সহরবাসীগণ বোম্বাই সহরবাসীদিগের অভাবনীয় লাঞ্ছনা সন্দর্শন করিয়া তেমনি কম্পিত হইতেছিল। বৈশাখ মাসের প্রথমে যখন প্লেগের শুভাগমনবার্তা সহরে প্রচারিত হইল, যখন "করেনটাইন ল" পাশ হইবার কথা সহরের চারিদিকে আলোচিত হইতে লাগিল, তখন যে যেদিকে পারিল, সে সেইদিকে দিগ্‌বিদিক [জ্ঞান]শূন্য হইয়া পলায়ন করিল। সে লোক-পলায়ন-দৃশ্য আমার চিত্তপটে চিত্রাঙ্কিত হইয়া
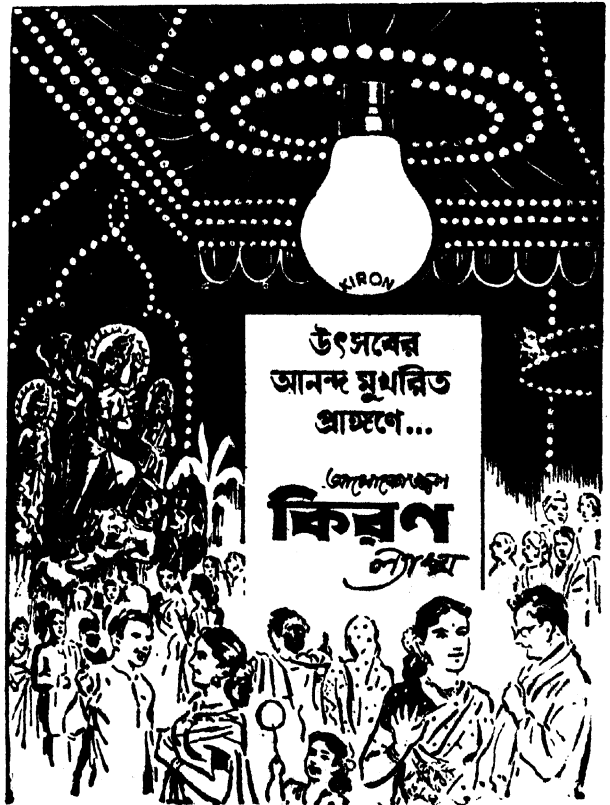
গিয়াছে, আজও স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এমন ভীষণ ব্যাপার, এমন অদ্ভুত দৃশ্য ইতঃপূর্বে আর কেহ কখন দেখে নাই। তখন কলিকাতা সহরের যে রাস্তার যে দিকে তাকাইয়া দেখি —নরনারীর স্রোত বর্ষার নদীস্রোতের ন্যায় অজস্রধারায় অপ্রতিহত বেগে চলিতেছে; ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই বৈশাখ সহরে জনস্রোতের বিরাম ছিল না। সহরের গাড়ী পাল্কী ক্রমশঃ দুর্মূল্য হইয়া উঠিল—অবশেষে তাহাও অপ্রাপ্য হইয়া উঠিল। ।৶৹ আনা ৷৷৹ আনা স্থলে ৬৲ ৮৲ টাকাতে আর ভাড়াটিয়া গাড়ী পাল্কী পাওয়া গেল না। যখন গাড়ী পাল্কী পাওয়া একেবারে দুর্লভ হইয়া পড়িল, তখন এই দুর্বিপাকে পড়িয়া কত ভদ্র-পরিবারের অসূর্যম্পশ্যা রমণী কলিকাতা সহরের রাজপথে বহিষ্কৃত হইয়া পদব্রজে চলিয়া গিয়াছে— কে তাহার গণনা করিয়াছে! কত বালক, কত বালিকা কত যুবক, কত যুবতী, কত বৃদ্ধ, কত বর্ষীয়সী কেহ কক্ষে, কেহ পৃষ্ঠে—অপোগণ্ড শিশু-সন্তান লইয়া প্রাণভয়ে নক্ষত্রবেগে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়াছে। দৌড়িয়া যাইবার ব্যাপারই বা কি অদ্ভুত দৃশ্য!— দৌড়িয়া যাইতে যাইতে এক একবার পশ্চাদ্দিকে তাকায়—আরবার ঐ বুঝি আসিল, ঐ বুঝি টীকাদার আসিয়া ধরিল! ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ থমকিয়া দাঁড়ায়;—যখন দেখে, কেহ ধরিতে আসিতেছে না—তখন কতদূর অগ্রসর হয়। পঞ্চহস্ত পরিমাণ রাস্তা অগ্রসর হয় তো দশহস্ত রাস্তা পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া আইসে। এইরূপে নরনারিগণ অতিকষ্টে—অতি উদ্বেগে রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিল।

যে যেরূপে পারিল, এইরূপে কলিকাতা শহর ত্যাগ করিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের লাঞ্ছনার ভাগ্য খণ্ডিল না। শিয়ালদহ ও হাবড়া রেলওয়ে স্টেশনে, গঙ্গার ঘাটে, স্টীমার স্টেশনে তাঁহাদের লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছিল। স্টেশনসমূহে প্যাসেঞ্জারের জনতার জন্য কত শ্বেত-পুঙ্গবের সুমধুর রুলের গুঁতা ও বেত্রাঘাত কত লোককে যে বেমালুম সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

এইরূপে সূচীভেদ্য জনতার মধ্যে টিকিট ক্রয় করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমেয়। কোনরূপে টিকিটখানা ক্রয় করিতে পারিলেই "ত্রাহি মাং মধুসূদন" বলিয়া গাড়িতে উঠিয়াছিল। প্রদত্ত টাকার যত কম মূল্যের টিকিট হউক না কেন, তাহার অবশিষ্ট পয়সা ফেরত লইবার অবসরটুকু পর্যন্ত তাহাদের সহিল না। টিকিটখানা হাতে পাওয়া মাত্র দৌড়িয়া গিয়া গাড়িতে উঠিয়া হাঁফ ছাড়িয়াছিলেন। এমনও শুনা গিয়াছিল যে, দুই একটি গর্ভবতী নারী গঙ্গার অপর পারে গিয়া এই দারুণ ত্রাসে অকালেই সন্তান প্রসব করিয়াছিল।

এ সকল অদ্ভুত ঘটনা লোকমুখে দেশ-দেশান্তরে অতিরঞ্জিত হইয়া প্রচার হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা নগরবাসি-গণের ঈদৃশ দুর্দশার কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি পুত্র-কন্যাদিগকে বোলপুরে রাখিয়া ত্বরায় প্লেগ-সংক্রমিত শহরে উপস্থিত হইলেন। লোকে ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া সহর ছাড়িয়া যখন দেশ-দেশান্তরে পলায়ন করিতেছে— সেই সময়ে তেজপুঞ্জ রবীন্দ্রনাথ প্লেগ সংক্রামিত সহরে নির্ভয় হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই এইরূপ অসীম সাহসিকতায় পূর্ণ।

একটু পরের কথা বলি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জমিদারি নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিরাহিমপুরে অবস্থিতিকালে এক সময়ে তথায় বিসূচিকা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার কুঠীর চারিপার্শ্বে জমিদারি কাছারির চারিদিকে বিস্তর লোক প্রতিদিন কালকবলে পতিত হইতেছিল। কোন কর্মচারীর এক নিকটআত্মীয়ের মৃত্যু হওয়ায় নায়েব পেস্কার প্রভৃতি অধিকাংশ আমলাগণ রবীন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইয়া যথেচ্ছ গমন করিল। তাঁহার ভৃত্যবর্গ দুর্ঘটনায় ত্রাসযুক্ত হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। তিনি নির্ভয়ে অটল হইয়া পুত্র কন্যা শিশুসন্তান সহ তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এবং দুই বেলা কাছারির অবশিষ্ট আমলাদিগের বাসায় গিয়া তাহাদের সাহস ও সান্ত্বনা দিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন পুরুষ, ইচ্ছা করিলে নিরন্তর সুখময় স্থানেই থাকিতে পারেন। কেবল নিরন্তর অবিকারী গুণপ্রভাবে তেমন মৃত্যু-বিভীষিকার মধ্যে অচল ছিলেন। (৬) তাঁহার এই প্লেগক্ষেত্র আর একটি কর্মক্ষেত্র বলিয়া প্রতীত হইল।

রবীন্দ্রনাথ প্লেগব্যাপ্ত শহরে যখন প্রবেশ করেন, তখন কলিকাতা শহরে মহা হৈ চৈ পড়িয়াছিল। সকলেই প্লেগের কথা, প্লেগ আইন, প্লেগের টীকা, করেনটাইন ল প্রভৃতির মহা আন্দোলন করিতেছিল। প্লেগ সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, রাজ আইন বড় কঠোর হইবে—পীড়ার উপর আরো পীড়া জন্মিবে, যমরাজ সমাহূত হইয়া ত্বরার উপর আরো ত্বরা করিয়া আসিবেন, এই আতঙ্কে সহরবাসীদিগের অন্তরাত্মা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া দেবতুল্য পিতার শরীর-রক্ষার্থে প্রথমে মনোনিবেশ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা তাঁহার পিতার তেজোবল অত্যন্ত অধিক; যেহেতু তাহা ব্রহ্মবল-সমন্বিত। পিতৃভক্তি, পুত্রবাৎসল্য, সকলের উপর সর্ববিজয়ী চিত্তের নির্ভীকতা প্রবল হইল। রবীন্দ্রনাথের পরিবারের কেহ কোথাও নড়িলেন না। কবিকেশরী কেশরী-বিক্রমেই প্লেগ নিবারণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যবস্থা সকল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার দ্বারা তাঁহার পরিজনের সহিত বন্ধুবর্গেরও প্রচুর সাহস ও রোগ নিবারণ শক্তি জন্মিল।

[রোগীর সেবা]

এই বৎসর শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এস্টেটে তাঁহার সুসংস্কৃত ব্রাহ্মবিধান মতে পুণ্যাহের কার্য প্রথম আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের জমিদারি নদীয়ার অন্তর্গত বিরাহিমপুর পরগণায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অতি সমারোহের সহিত শুভ পুণ্যাহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ২৩শে আষাঢ় এই শুভ পুণ্যাহ কার্য সম্পন্ন হয়। সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ অনুবাদক এবং "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার বর্তমান সহকারী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় শুভ পুণ্যাহে আচার্যের কার্য করিয়াছিলেন।

আচার্যের কর্ম সমাধান হইলে বিদ্যারত্ন মহাশয় কিছু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পীড়া সহসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলতঃ পীড়ার ভীষণ যন্ত্রণায় বিদ্যারত্নমহাশয় জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিম দশা উপস্থিত হইয়াছিল। অন্তিম-কালে ব্রাহ্মণের অতি প্রিয় পুঁথিগুলির কথা স্মরণ হইল। তিনি অতি কষ্টে বলিলেন, "রবিদাদা! আমি তো চলিলাম, আমার সকলই তোমরা জান। তবে আমার একটি প্রার্থনা এই যে, আমার কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি ও পুস্তক আছে; সেইগুলি যাহাতে আমার ছাত্র ও পুত্রপ্রতিমের হস্তগত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিও।"

এই কথা বলিতে বলিতে বিদ্যারত্নমহাশয় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। রবীন্দ্রনাথ ভাল ডাক্তার-বৈদ্যহীন দেশে তাঁহাকে লইয়া বিষম বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণের জন্য তাঁহার কিছু অধৈর্য দেখা গেল। নিজের প্রাণাধিক পুত্রের কি পরিবারস্থ অন্য কাহারো ব্যারাম হইলে, তিনি বিচলিত হয়েন না। সে সময় তাঁহার ধীর ও শান্ত প্রকৃতি অতুলনীয়। কিন্তু অপর কোন আশ্রিত ব্যক্তির পীড়া হইলে তাঁহার অস্থিরতায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। উদ্যম ও অধ্যবসায়ে রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তিনি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া আমন্ত্র থাকিয়া মনে-প্রাণে বিদ্যারত্নমহাশয়ের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এবং ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য কুমারখালিতে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসাগুণে বিদ্যারত্নের ক্রমশঃ রোগের উপশম হইতে লাগিল। শেষে তিনি রোগমুক্ত হইলে বিদ্যারত্নমহাশয় বলেন, "রবিদাদার অসামান্য গুণপনা সন্দর্শন করিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। তিনি চাকর-মুনিব-সম্পর্ক ভুলিয়া আমার যেরূপ সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। অধিক কি, রবিদাদা সেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম না করিলে, বুড়ের হাড় কয়খানা পদ্মাতেই রাখিয়া আসিতে হইত। রবিদাদা আমাকে যমের দক্ষিণ দ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথের এই মহত্ত্ব তাঁহার ন্যায় বড় লোকের পক্ষে অসাধারণ, আমরা দেখিয়াছি তিনি সামান্য ভৃত্যটিরও যে-কোন পীড়া হউক না কেন, স্বয়ং তাহার চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষার রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। যত দিন না রোগী সুস্থ ও কার্যক্ষম হয়, ততদিন পর্যন্ত তাহার চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষাদির ত্রুটি লক্ষিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ যে সকল অলোকসাধারণ সদ্গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে এ মহত্ত্ব তাঁহাতেই সম্ভবে। প্রতি পাদবিক্ষেপে তাঁহার অনন্যসাধারণ মহত্ত্ব যেন আপনি বিকশিত হয়।
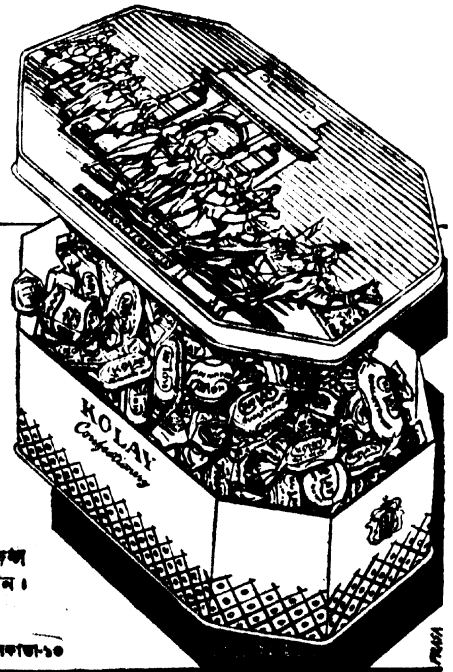
[গৃহশিক্ষক লরেন্সের জন্মোৎসব]

লরেন্সের জন্মোৎসব—লরেন্সের নাম শুনিয়া পাঠকগণ চমকিত হইবেন না। ইনি চন্দ্রশেখরের Lawrence Foster বা শৈবলিনী ওরফে যমের প্রণয়-ভিখারী ফস্টার নহেন—অথবা রবীন্দ্রনাথের স্বকপোলকল্পিত জুওলজিক্যাল গার্ডেনের উপযুক্ত কোন প্রকার কিম্ভূত-কিমাকার জীব নহেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীমান রথীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক। ইনি এখনো সশরীরে বর্তমান। বয়স কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্ব পঞ্চাশৎ বর্ষ। সাহেবপুঙ্গব বড় সরল, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং মিষ্টভাষী। সাহেবের কোন কোন দোষ থাকিলেও তাহার কর্তব্য-নিষ্ঠার গুণে রবীন্দ্রনাথ তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করেন; অধিকন্তু তাহার সকল আবদার রক্ষা করিয়া থাকেন। এই বৎসর ২৯শে শনিবার সাহেবের জন্মোৎসব-পর্ব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। সাহেব রবীন্দ্রনাথের নিকট আবদার জ্ঞাপন করিলেন যে, দেখ মিঃ ঠাকুর, আজ আমার জন্মদিন, আজ আমাকে ছুটি দিতে হইবে। আমার পিতামাতা থাকিলে আমার জন্মোৎসব করিত। সাহেবের আবদার হৃদয়বানের হৃদয় বড় লাগিয়াছিল। তিনি বিশেষ আয়োজন করিয়া সাহেবের জন্মোৎসব-পর্ব সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় স্কুলের ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। শিলাইদহ বাসভবনের সম্মুখের ময়দান, বালকদিগের খেলিবার স্থান নির্দিষ্ট ছিল। সাহেব বালকদিগকে সেই নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া তাহাদের দেশের নানাপ্রকার খেলা দেখাইলেন, Hurdle Race, Long run, Long jump, High jump প্রভৃতি নানাপ্রকার খেলা হইয়াছিল। এই সকল ক্রীড়াতে যাহারা ১ম ২য় ও ৩য় হইয়াছিল—সেই সকল বালক-দিগকে রবীন্দ্রনাথ নানাপ্রকার পুস্তক, দোয়াত, ছুরি, ছবির বহি ইত্যাদি পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এবং পরিশেষে সকল বালকদিগকে প্রচুর পরিমাণে সন্দেশ ভোজন করাইয়া সম্যক্ প্রকারে বালকদিগের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন। (৭)

[পল্লীসংস্কার]

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহস্থ বিস্তৃত প্রান্তর দেখিয়া নূতন কৃষিপদ্ধতি শিক্ষা দিবার এই প্রশস্ত সময় বুঝিলেন। কিন্তু মুখে কৃষক-দিগকে কৃষিকার্য সম্বন্ধে মুখে বক্তৃতা দিলে তাহারা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না, বরং বিপরীত ফল হইতে পারে; এই আশঙ্কায় তাহা না করিয়া, নিজেই তাহার আদর্শ হইলেন। বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া এবং অন্য কোন নূতন কৃষির সময় নয় বলিয়া—শীতের প্রারম্ভ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। বর্ষাকালের উপযোগী বেগুন, লাউ, চালকুমড়া, মিঠে কুমড়া, ঝিঙে, কাঁকরোল, চিচিঙ্গা প্রভৃতি কাঁচা তরকারি; নটে শাক, চাঁপানটে, পুঁই প্রভৃতি শাক ইত্যাদির বীজ বপন করিলেন। যাহাতে শাক-শব্জীগুলি সুজাত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও যত্ন করিতে লাগিলেন। বাগানে মালী ও আবশ্যক মত কুলি-মজুর সকল যথাসময়ে কার্য করিতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথ বর্ষান্তে শীতের প্রারম্ভেই নৈনীতাল আলুর চাষ করিবেন, মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম দেশে গিয়া এই আলুর চাষ দেখিয়া আসিয়া, নিজের দেশে প্রবর্তিত করিবেন, অনেকদিন হইতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। এক্ষণে তাহার প্রশস্ত সময় বুঝিয়া Now or Never এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আলুর চাষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আলুর চাষের প্রণালী বিশেষরূপে জানা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, ভারতের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের অন্যতম সহকারী ডিরেক্টর, তাঁহার অন্যতম সুহৃদ, বঙ্গের সুপরিচিত 'ব্যঙ্গ কবি' শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া শিলাইদহে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আলুর চাষের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি সমস্ত অবগত হইলেন। আলুর জমি কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, অর্থাৎ কয়বার লাঙল দিতে হয়, মাটি কেমন চূর্ণ হইলে মৈ দিয়া জমি সমান করিতে হয়; প্রতি বিঘা জমিতে কি পরিমাণে সার দিতে হয়, সারের মধ্যে পচা গোবরের পরিমাণ কত এবং রেড়ীর খইলেরই বা পরিমাণ কত, সার ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবার নিয়ম ও সময় কি? আলুর বীজ কেমন-ভাবে—কয়খানি করিয়া কাটিতে হয়, কয় হাত অন্তর কেমন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বীজ ক্ষেত্রে প্রোথিত করিতে হয়, প্রথম আলুর পাতা বাহির হইবার পর গাছ কত বড় হইলে কতবার গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হয়, কেমন করিয়া আইল বাঁধিতে হয়, গাছে জল দিবার নিয়ম কি? আলুর গাছ পাকিলে কেমন করিয়া ক্ষেত্র খননকরতঃ আলু বাহির করিতে হয়, ভবিষ্যৎ ফসলের জন্য কেমন করিয়া বীজ সংগ্রহ করিতে হয়, ইত্যাদি আলুর চাষের কার্যপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

রবীন্দ্রনাথ এতদ্দেশে আলুর চাষ প্রবর্তিত করিবার জন্য তাঁহার জমিদারিতে প্রথম কার্য আরম্ভ করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা, উদ্যম ও অর্থব্যয় অতীব উল্লেখযোগ্য। রুশ সম্রাট পিটার-দি-গ্রেট্ একদিন সাধারণ মনুষ্যবেশে আমস্টার্ডম নগরের সার্দম নামক একটি শহরে জাহাজ-নির্মাণ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি কর্ম-শিক্ষাকালে অন্যান্য সহকর্মচারীদিগের ন্যায় স্বোপার্জিত যৎসামান্য অর্থে দিনযাপন করিতেন। কিন্তু অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া কতদিন থাকিতে পারে? কিছুদিন পরে, তিনি রুশ সম্রাট বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইলেন। তখন জাহাজের কাপ্তেন, তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি রুশ সম্রাট

মাস্টার পিটার, আমার রাজ্যের প্রজারা জাহাজ নির্মাণ করিতে জানে না। সেই সকল মূর্খ লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আমি জাহাজ-নির্মাণ-বিষয়ক-বিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" তখন জাহাজস্থিত সকল লোক বিস্মিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। রুশ সম্রাট স্বদেশের জন্য—রাজ্যের প্রজাদিগের উন্নতির জন্য আত্মগোপন করিয়া জাহাজে ছুতারের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, ইহা তাঁহার কম মহত্ত্বের কথা নয়? তাঁহার উদারতা, মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব আজ পৃথিবীতে দৃষ্টান্তস্থল হইয়া রহিয়াছে। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণ লোকশিক্ষকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া লোক-হিতার্থ এইরূপ কার্য করিয়া থাকেন।

লোকশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ কার্তিক মাসের প্রারম্ভেই আলুর চাষ আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা এগ্রিকালচার অফিস হইতে আলুর চাষের উপযুক্ত 'বীজ ও সার' আনয়ন করিয়া স্থানীয় কৃষকদিগকে আলুর ক্ষেত্রের কার্যে নিযুক্তকরতঃ কার্যের সংগে সংগে আলুর কৃষিপ্রণালী, অর্থাৎ আলুর ক্ষেত্র কর্ষণ, সার দেওন, বীজ রোপণ, জলসেচন প্রভৃতির পদ্ধতি কর্মক্ষেত্রেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আলুর গাছে পাতা ফুটিলে—গাছগুলি যত বড় হইলে যেরূপে গাছের মূলে সার ও মৃত্তিকা দিতে হয়, যেরূপে আইল বাঁধিয়া দিতে হয়, যেরূপে ক্ষেত্র জলসিক্ত করিতে হয়, মৃত্তিকার রসের তারতম্য অনুসারে যে সময়ে জল-সিঞ্চন করিতে হয়, তৎসমস্তই পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে কৃষকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কৃষিক্ষেত্রমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া কৃষকদিগের আলুর চাষ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিল কি না, এক-আধটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা অবগত হইতেন। আলুর গাছগুলি যথানিয়মে বর্ধিত হইতেছে কি না, চাষের কার্যপ্রণালী সিদ্ধ হইতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা এগ্রিকালচার অফিস হইতে ইন্সপেক্টর লইয়া যাইতেন। আলুর চাষের কার্য সর্বাংগসুন্দর করিবার পক্ষে তাঁহার যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম অসাধারণ। তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া এই বৎসর আলুর কৃষিতে লাভবান হইতে পারেন নাই। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টের অফিসার-গণ বলেন, জলের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। যে পরিমাণ জল দেওয়া হইয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ জল দেওয়া উচিত ছিল। আলুতে লাভ হয় নাই বটে—কিন্তু যে আলু জন্মিয়াছিল, তাহা নৈনীতাল আলু অপেক্ষা কথঞ্চিৎ আকারে বড় এবং স্বাদও অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হইয়াছিল। Land Records and Agriculture অফিস হইতে প্রকাশিত সন ১৮৯৯ সালের সাম্বৎসরিক রিপোর্টে রবীন্দ্রনাথের আলুর চাষের উল্লেখ আছে। নিম্নে সেই রিপোর্টের কতকাংশ উদ্ধৃত করা হইল।

"Experiments with Nainital potatoes were made by Mr. Rabindranath Tagore in the Tagore Estate at Shelidah in the Kustea Sub-Division. The Crop was not satisfactory owing to the defective cultivation. One of Mr. Tagore's continents however working under more favourable circumstances obtained a bumper crop from portion of the same seed, and success of this experiment is said to have induced several neighbouring Rayats to take the Potatoes Cultivation. These experiments together with others introduced by Mr. Tagore on his farm will be continued.

রবীন্দ্রনাথ আলুর চাষ বিস্তৃতির জন্য কলিকাতা এগ্রিকালচার অফিস হইতে আলুর বীজ আনয়ন করিয়া প্রজাদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন, এবং আলুর কৃষি-প্রণালীর বিষয় তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। তাঁহার একজন প্রজা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম-বারেই আলুর চাষ করিয়া লাভবান হইয়াছিল। প্রত্যেক গৃহস্থ অন্যান্য শস্যাদির ন্যায় পাঁচ কাঠা, দশ কাঠা করিয়া আলুর চাষ করিলে গৃহস্থবিশেষে তাহাদের বৎসরের

আলুর খরচ অনায়াসে সংকুলান হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ শীতকালোৎপন্ন বাঁধা কপি, ফুল কপি, ওল কপি, বীট, শালগম, গাজর, সীম, বরবটী, বোম্বাই মূলা, পাটনাই মটর, লাল আলু, শাক আলু প্রভৃতি কাঁচা তরকারির চাষও করিয়াছিলেন। (৮)

টীকা

১॥ ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে (২৫ চৈত্র) 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য নামক একটি সুললিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।" (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্যবিবরণ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩০২)। সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত।

২॥ জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানচর্চার জন্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞানাগার স্থাপনের প্রস্তাব এই সময় চলছে। "একদিন রবিবাবুর তলবে জগদীশবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট কার্যে [প্রেসিডেন্সি] কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। রবিবাবু ইহাতে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন; বিশেষতঃ বুঝিলেন, জগদীশবাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাঁহার বিজ্ঞানের নূতন তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল ২০,০০০ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, ১০,০০০ টাকা রবিবাবু নিজে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন, বাকি টাকার জন্য ত্রিপুর রাজদরবারে ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইবেন। মহারাজ রাধাকিশোর তখন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। কবিকে ভিক্ষুকবেশে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "এ বেশ আপনাকে সাজে না...আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব।"— মহিমচন্দ্র দেববর্মা, "ত্রিপুরে দরবারে রবীন্দ্রনাথ", দেশীয় রাজ্য গ্রন্থ।

৩॥ "ঐতিহাসিক চিত্র" প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৪॥ রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে আর্যসমাজীদের আগমনের বিষয় যা প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে তার অপেক্ষাকৃত বিশদ বিবরণ আছে সমকালীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৮২০ শক) প্রকাশিত একখানি পত্রে। চিঠিখানি পুনর্মুদ্রিত হল—

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

নমস্তে,

আমরা গত ১০ বৈশাখে শ্রীযুক্ত বাবু রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনয়ন উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলাম। তথায় বড় গ্রীষ্মের উত্তাপ। আমরা রাত্রিশেষে বাহির হইয়া সুশীতল নির্মুক্ত বায়ু সেবন করিতে লাগিলাম। সুপ্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে প্রাতঃকাল বড় অধিকক্ষণ ভোগ করিতে পাওয়া যায় না। শীঘ্রই রৌদ্র উঠিয়া পড়ে। আমরা প্রান্তর হইতে ফিরিলাম। এবার আমাদের সঙ্গে কএকটি আর্য-সমাজের সভ্য নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। ইহাঁরা পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণ! শিক্ষা ও বিনয়াদি সদ্গুণে আর্যদিগের সঙ্গ আমাদের অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছিল। ইহাঁরাও প্রান্তর হইতে ফিরিলেন। তখনও উপনয়ন হইবার বিলম্ব আছে। প্রাতঃস্নায়ীরা স্নানাদি কার্যে ব্যাপৃত হইলেন। শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের চূড়াকরণ ও কর্ণবেধ এই অবসরেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

পরে আমরা যথা সময়ে সমবেত হইয়া ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। আর্য ব্রাহ্মণেরা উহার একদেশে আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মস্তক উষ্ণীষশোভিত এবং ললাটপট্ট কেসরচন্দনে লিপ্ত। পরে শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রবাবু বেদিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর ঐ কএকটী আর্য ব্রাহ্মণ যথাবিধি সদস্যরূপে বৃত হইলে রথীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল এবং পরিধান গৈরিক বস্ত্র। এই দেবকুমারকল্প বিপ্রকুমার ব্রহ্মচারীবেশে উপবিষ্ট হইলে রবীন্দ্রবাবু মধুর কণ্ঠে বেদগান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ-নিঃসৃত বেদগানে সকলের মন পুলকিত হইল। পরে আচার্য "আগন্তা সমগন্মহি" এই বেদমন্ত্রে প্রকৃত কর্ম আরব্ধ করিয়া দিলেন। সভাস্থলে সকলেই নিস্তব্ধ, সকলেই উৎকর্ণ হইয়া আচার্য ও মানবকের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন। এই স্থলে প্রসঙ্গত একটি কথা বলা আবশ্যক। আমরা অনেকেই কিরূপে ব্রাহ্মণের উপ[illegible] সংস্কার হয় তাহা অনেকবার প্র[illegible] করিয়াছি। কিন্তু বলিতে মনে বড় [illegible] হয়, আচার্য ও মানবকের উক্তি-প্রত্যুক্তির [illegible] কোথাও কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখা হয় [illegible] দৃষ্টান্ত স্থলে একটা কথা বলিলেই বো[illegible] পর্যাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণের এই উপ[illegible] অর্থ আর কিছুই নয় ইহা বেদপাঠার্থ [illegible] অষ্টমবর্ষীয় বালকের গুরুগৃহে গমন [illegible] যাবৎ পাঠসমাপ্তি তাবৎ কাল ব্রহ্মচর্য [illegible] পূর্বক গুরুগৃহে অবস্থান। পরে [illegible] সমাপন হইলে আচার্যের [illegible] লইয়া তাহাকে স্বগৃহে গমন ক[illegible] হয়। উপনয়নে এই কএকটী কা[illegible] বিহিত। পাঠার্থী মানবক গুরু[illegible] নিকট উপস্থিত হইলে গুরু জি[illegible] করেন "কোনামাসি" তোমার নাম কি[illegible] প্রত্যুত্তরে মানবক বলেন "অমুকনামাস্মি" আমার নাম অমুক দেবশর্মা। পরে আচার্য তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য ধারণ প্রসঙ্গে এই উপদেশ দেন "মা দিবাস্বাপ্সীঃ" দিবাভাগে নিদ্রিত হইও না। মানবকও প্রত্যুত্তরে বলিয়া থাকেন "বাঢ়ং" হইব না। কিন্তু আচার্য ও মানবকের এই উক্তি-প্রত্যুক্তি-বিভাগ যথাযথ রক্ষা করিয়া কোনও স্থলে ব্রাহ্মণের উপনয়ন-সংস্কার সমাহিত হয় না। আচার্য নিজেই কহিয়া থাকেন "কোনামাসি" আবার প্রত্যুত্তরে নিজেই কহিয়া থাকেন "অমুকনামাস্মি"। নিজেই কহিয়া থাকেন মা দিবাস্বাপ্সীঃ আবার প্রত্যুত্তরে নিজেই কহিয়া থাকেন বাঢ়ং। বাস্তবিক ইহাতে মন্ত্রের উদ্দেশ্য কিছুই রক্ষিত হয় না এবং কর্মটীও সর্বতোভাবে পণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু মহর্ষিদেবের সুসংস্কৃত অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে আচার্য ও মানবকের উক্তি-প্রত্যুক্তি-পর্যায় ঠিক রক্ষিত হইয়াছে এবং এখনকার এই সর্ববিলোপদশায় ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কারের

মুখ্য উদ্দেশ্য যতটা রক্ষিত হইতে পারে তাহাও ইহাতে রক্ষিত হইয়াছে। ফলত সকলে উৎকর্ণ হইয়া আচার্য ও মানবকের এই উক্তি-প্রত্যুক্তি শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন ব্রাহ্মণের উপনয়ন পদার্থটা কি এবং সকলে মহা আড়ম্বর সহকারে আবহমান কাল কেন তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

পরে ব্রহ্মচারী রথীন্দ্রনাথ স্বপ্রমাণ বিশ্বদণ্ড ধারণ ও ভিক্ষা ভাজন গ্রহণ পূর্বক "ভবন্ ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত আচার্যের হস্তে সম্যক সমর্পণ পূর্বক এক কম্বলাসনে বাক্যত হইয়া দিবসের অবশেষে গায়ত্রী-চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার দিনত্রয় অতিবাহিত হইয়া যায়। এই তিন দিন তিনি নিয়মিত রূপে আচার্যের নিকট বেদাধ্যয়ন ও গায়ত্রীমন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনাদি শিক্ষা করিতেন। ইহার পর সমাবর্তন।

এই বারে অধীতবেদ ব্রহ্মচারী গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। আচার্য কহিলেন "অধীতং বেদমধীহি" অধীত বেদ অধ্যয়ন কর। শিক্ষিত ব্রহ্মচারী কোমল কণ্ঠে বর্ণস্বরাদি যথাযথ রক্ষা করিয়া বেদগান করিতে লাগিলেন। সে সময়ে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অনেকেরই সেই প্রাচীন কালের কথা মনে উদিত হইল। শান্তিনিকেতন অতি নিভৃত স্থান। চতুর্দিকে ফলপুষ্পশোভিত নানাবিধ বৃক্ষ, ইতস্তত নানারূপ পক্ষী হরিণ ময়ূর বিচরণ করিতেছে। উহা প্রকৃতই একটি শান্তিরসাস্পদ তপোবন। তন্মধ্যে একটি ব্রহ্মচারী বিপ্রকুমার পাঠ সমাপনান্তে গৃহে যাইবার জন্য আচার্যের নিকট অধীত বেদ আবৃত্তি করিতেছেন, ইহা দেখিয়া সেই পূর্বকালের কথা সম্যক্ মনে উদিত হইতে লাগিল। পরে ব্রহ্মচারী বেণুদণ্ড গ্রহণ এবং পদে পাদুকা ধারণ করিয়া মঙ্গলাচারের সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইহাই সমাবর্তন। সচরাচর এই সমাবর্তনটি উপনয়নের সহিত একত্রে সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহা সর্বথা অবিধি। ইহা দ্বারা শাস্ত্রীয় মর্যাদা কিছুই রক্ষিত হয় না এবং কর্মাঙ্গেও বিলক্ষণ দোষ পড়ে। সমাবর্তনের এই শাস্ত্রানুরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া আমাদের নিমন্ত্রিত আর্য ব্রাহ্মণেরা কহিয়াছিলেন আমাদের দেশেও এক দিবসে উভয় কার্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর আমরা মহর্ষিদেবের প্রবর্তিত এই উপনয়নের ও সমাবর্তনের এইরূপ শাস্ত্রীয় প্রথা যথাযথ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। বস্তুত ধরিতে গেলে বর্তমানে এদেশে ব্রাহ্মণদিগের উপনয়ন সংস্কারের একটা নির্জীব মৃত কংকাল-মাত্র পড়িয়া আছে। এ সময় যদি কেহ কিয়ৎ পরিমাণেও তন্মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন তিনি যে চিরকালের জন্য ব্রাহ্মণদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়া থাকিবেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কর্মান্তে দ্বিপ্রহরের সময় ঐ সমস্ত আর্য ব্রাহ্মণের সহিত আমাদের নানারূপ শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থিত হইত। ই'হারা বেদকে অভ্রান্ত ঈশ্বরবাক্য বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু এই কথা শুনিয়া সহসাই মনে হইতে পারে ই'হারা বুঝি অক্ষরবন্ধ বেদ পুস্তকখানি অভ্রান্ত ঈশ্বরবাক্য বলিয়া স্বীকার করেন। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। ই'হারা কহেন বেদনিহিত সত্যই অভ্রান্ত ঈশ্বরবাক্য, অক্ষরবন্ধ পুস্তক কিছুই নহে। প্রাচীন কালে কএকটী ঋষি জ্ঞান ও ধ্যানযোগে ঈশ্বরপ্রসাদে এই সত্য লাভ করিয়া গ্রন্থবন্ধ করিয়া যান। সুতরাং সেই সত্যেরই মুখ্য গৌরব। এই জন্য ই'হারা যেখানে ঈশ্বরের সত্য আছে বেদের সেই অংশ গ্রহণ ও অপর অংশ পরিবর্জন করিয়া থাকেন। নানারূপ কথাবার্তায় আমাদের সম্যক প্রতীতি হইয়াছে ই'হারা প্রকৃতই সত্যানুরাগী এবং দেশ হইতে মূর্তিপূজার উচ্ছেদ সাধন করাই ই'হাদের প্রাণগত ইচ্ছা। যদিও প্রাচীন ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের প্রতি ই'হাদের যথেষ্ট সমাদর কিন্তু ই'হারা ঋষিপ্রণীত গ্রন্থমাত্রকেই যে সমাদর করেন তাহা নহে। যে সত্য বেদে নিহিত এবং ই'হাদের পরিগৃহীত তদবলম্বনে যে সকল গ্রন্থ-প্রণীত হইয়াছে ই'হারা তাহারই সম্মান করিয়া থাকেন। মনুসংহিতা আবহমান কাল সকলেরই সম্মানিত হইয়া আসিতেছে কিন্তু ই'হারা সত্য-নিকষে মনুর সর্বাংশ পরীক্ষা করিয়া যতটা গ্রহণ করা আবশ্যক ততটা গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপরটা ত্যাগ করিয়াছেন। পুরাণাদি সম্বন্ধেও এইরূপ। ই'হারা যেমন সত্য-নিকষে বেদ পরীক্ষা করিয়া থাকেন মহর্ষি ই'হাদের বহুপূর্বে এইরূপেই বেদ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং বৈদিক সত্য নির্বাচন করিয়া লোকহিতার্থে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। হোম সম্বন্ধেও ই'হাদের সহিত আমাদের কথোপকথন হইয়াছিল। ই'হাদের এক কথাতেই তদ্বিষয়ে ই'হাদের মনের ভাব সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। উপনয়নের দিনে ব্রহ্মমন্দির ধূপধূনা দ্বারা সুবাসিত করা হয়। ই'হারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াই কহিয়াছিলেন হবন-প্রয়োজন ইহা দ্বারাই ত সম্পন্ন হইতেছে। ই'হারা কহেন কোন কার্যোপলক্ষে দশ জন যেখানে উপস্থিত হয় তথায় বায়ু স্বভাবতই দূষিত হইয়া থাকে। সেই স্থলে হবনের বিশেষ প্রয়োজন। হবনীয় পদার্থে যে সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্য থাকে তদ্দ্বারা স্থানীয় দূষিত বায়ু নষ্ট হইয়া যায় এবং লোকের স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে। অধিক লোকসমাগমে গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য যে অভিপ্রায়ে ছিটাইয়া দেওয়া হয় ই'হাদের হবনও তদনুরূপ। এই জন্য ই'হারা ব্রহ্মমন্দিরে ধূপধূনার সুবাস আঘ্রাণ করিয়া কহিয়াছিলেন হবন-প্রয়োজন ইহাদ্বারাই তো সিদ্ধ হইতেছে।

আমরা যে কয়দিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম প্রতিদিনই মন্দিরে গিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতাম। দুই দিন আর্য সমাজের এক প্রচারক তথায় বেদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক দিবস তিনি বেদি হইতে মহর্ষিদেবের ব্যাখ্যানের হিন্দী অনুবাদ পাঠ করেন এবং দ্বিতীয় দিনে একটি উপদেশ দেন। তাঁহার উপদেশ অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। প্রতি কথাতেই তাঁহার ধর্মে অকপট বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি বলিবার কালে ওজস্বী বাক্যে সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ফলত এই কএক দিন আমরা তাঁহাদের সংসর্গে পরম সুখে শান্তিনিকেতনে কালক্ষেপ করিয়াছিলাম।

শ্রীঃ—

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮২০ শক, "পত্র"

৫॥ আদি ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের ঘনিষ্ঠতা সাধন চেষ্টায় বিশেষ উদ্যোগী

ছিলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই দুই একেশ্বরবাদী সমাজের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তার কতটা আপাতবিরোধ, উভয়ের ঐকমত্য কোথায় এ সব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায় সূত্রপাত করে তিনি আর্যসমাজীদের কাছে চিঠিপত্র লিখেছিলেন. ১৮২০ শকের আষাঢ় সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সেগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল, এখানে তার সূচী দেওয়া গেল—

To The Editor, "Arya Patrika", Lahore, ২১ মে, ১৮৯৮ তারিখের চিঠি; To The Editor, "Arya Messenger", Lahore, ৩১ মে ১৮৯৮ তারিখের চিঠি। ঐ বৎসরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় চিঠি দুটির বাংলা অনুবাদ আছে। এই শ্রাবণ সংখ্যায় বলেন্দ্রনাথের আর একটি চিঠি উদ্ধৃত হয়েছে, To The Editor, Arya Patrika, Lahore। ভাদ্র সংখ্যায় আর্যপত্রিকাসম্পাদককে লিখিত বলেন্দ্রনাথের ১ জুলাই ১৮৯৮ তারিখের চিঠি এবং আর্যসমাজীদের পক্ষ থেকে তার উত্তর, "Practical side of the Arya Samaj. A Reply to Mr. Bolendranath Tagore's Enquiry" উদ্ধৃত হয়।

ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির চেষ্টায় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্যসমাজীদের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিলেন, এবং কলকাতার বাইরে পর্যটন করে তাঁর বক্তব্য প্রচার করেছিলেন। "গত [১৩০৫] ভাদ্র মাসে ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রাঁচি আর্যসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে বলেন্দ্রবাবু তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া যান এবং সেখানে উভয় সমাজের মিলন বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতাদিও হয়। সেখানে এইটুকু অবধি হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার সময় বলেন্দ্রবাবুর সহিত আর্যসমাজের জনকয়েক সভ্যও তথায় গিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। ...ক্রমে মুরাদাবাদ এবং বেরিলি হইতেও নিমন্ত্রণ আইসে, কিন্তু নানা কার্যবশতঃ বলেন্দ্রবাবু যাইতে পারেন নাই। পরিশেষে এবার লাহোর আর্যসমাজের একবিংশ সাংবৎসরিক উপলক্ষ্যে তিনি লাহোরে নিমন্ত্রিত হইয়া যান। এবং তথায় তিনি কিরূপ কৃতকার্য হইয়াছেন লাহোরস্থ আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকাগুলি হইতে তাহার সারসংকলন করিয়া দেওয়া গেল।"—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, "সংবাদ", পৌষ ১৮২০ শক। এই সকল সারসংকলন থেকে একটি সংবাদ উল্লেখ করছি—বলেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সভায় ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আর্য ও ব্রাহ্মগণের একত্র উপাসনাও হয়েছিল—বলেন্দ্রনাথ বেদমন্ত্র পাঠ করেন, মাস্টার দুর্গাপ্রসাদ, বাবু এ. সি. মজুমদার ও ভাই জগৎ সিং

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঈশ্বরোপাসনা করেন। উপাসনান্তে এই রকম অনুষ্ঠান যাতে আরও হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা হয় এবং বলেন্দ্রনাথের আগমনোপলক্ষ্যে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

আর্যসমাজীদের মনে বলেন্দ্রনাথ কি শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন, তা তাঁর মৃত্যুর পর (১৮৯৯, অগস্ট ২০) আর্যসমাজের পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধে, ও আর্যসমাজের পক্ষ থেকে প্রেরিত শোকজ্ঞাপক পত্রাদিতে জানা যায় (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮২১ শক)। তার একটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল—"The melancholy news comes as a sudden and unexpected surprise upon the Punjab people. We were simply shocked to read the obituary notice in the Calcutta papers, and we must confess that for a minute or so we were almost stunned. Babu Balendra Nath paid two visits to this Province. The last time he visited Lahore was in March 1899....His labours in connection with bringing about a happy alliance between the Adi Brahmo Samaj and Arya Samaj will long be remembered with gratitude by those interested in this work. He had his own scheme of work and the last time we spoke to him on his noble mission he told us that he did not believe in fuss but would silently give effect to his scheme which he did not want to put into print or communicate to anybody. Alas the scheme will now remain unrealized.." Arya Patrika. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৮২১ শক আশ্বিন সংখ্যায় উদ্ধৃত।

পাঞ্জাব আর্যপ্রতিনিধি সভা, আমেটাবাদ আর্যসমাজ মহর্ষিকে চিঠি লিখে শোকজ্ঞাপন করেন।

সম্ভবতঃ বলেন্দ্রনাথের উদ্যোগেই, ১৮২০ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় "বেদ সম্বন্ধে আচার্য দয়ানন্দের মত" সংকলিত হয়েছিল।

১৮২০ শকের ৭ পৌষ শান্তিনিকেতনে অষ্টম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে আর্যসমাজের আচার্য স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ যোগ দিয়ে-

ছিলেন ও হিন্দীতে বক্তৃতা করেছিলেন। "এক সময়ে কোন সাধু এই আশ্রমে শান্তি উদ্দেশে তপস্যা করিয়া প্রকৃত শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য এই আশ্রমের নাম শান্তিনিকেতন। ঐ সাধু ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মবাদী।" রবীন্দ্রনাথের সুহৃৎ ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই বক্তৃতা "বিবৃত করিয়া বাংলা ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন।" —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৮২০ শক।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই উৎসবে সান্ধ্য উপাসনান্তে রবীন্দ্রনাথও বক্তৃতা করেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যায় সেটি মুদ্রিত হয়েছিল।

৬ ॥ প্রাসঙ্গিক বোধে প্রমথ চৌধুরীর একটি রচনা সাময়িক পত্র (রূপ ও রীতি, ভাদ্র ১৩৪৮) থেকে উদ্ধৃত করা হল—

একটি আবিষ্কার

...একদিন তাঁর চরিত্রের একটি গুণের পরিচয় পাই, যা আমাকে বিস্মিত করে এবং যার দরুন মানুষ-রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার ভক্তি বেড়ে যায়।

ঘটনাটি যুগপৎ এত সামান্য ও অসামান্য যে, তার পরিচয় দিলে অপরের মনেও তাঁর প্রতি ভক্তি বেড়ে যাবে।

রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী স্বরূপে আমার পাবনায় সাহিত্য সম্মিলনে যাবার কথা ছিল। সে সময় রবীন্দনাথ ছিলেন শিলাইদহে, আর আমি ছিলাম কলকাতায়। তাই বন্দোবস্ত ছিল যে আমি শিলাইদহে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বজরায় পদ্মা পাড়ি দিয়ে পাবনায় যাব। পাবনা শিলাইদহ থেকে বেশী দূর নয়। একটু উজিয়ে গিয়ে পদ্মা পাড়ি দিলেই পাবনা সহরে উপস্থিত হওয়া যায়।

আমি ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমার দুটি অনুচর সমভিব্যাহারে শেয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে হাজির হলুম।...

শেয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হয়ে দেখি ঠাকুরবাবুদের আমলা গোপাল চাটুয্যে আর জামাই মণিলাল গাঙ্গুলী আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মণিলাল আমার সঙ্গে এক গাড়ীতে এক কামরায় কুষ্ঠিয়া যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তিনি আমাকে বললেন যে, শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে একজনের ওলাওঠা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করে খবরটা আমাকে দিতে বলেছেন। খবরটা শুনে আমার হরিভক্তি উড়ে গেল। কারণ ওলাওঠা ও বসন্ত, এ দুটি রোগকে আমি ভারি ডরাই।

মণিলাল আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলেন, কিন্তু মনে সোয়াস্তি ছিল না বলে সে সব প্রশ্নের উত্তরে যা মনে এল তাই বললুম।...

শেষটা কুষ্ঠিয়ায় নেমে খেয়া নৌকায় গড়াই পার হয়ে, পাল্কিতে শিলাইদহে গিয়ে হাজির হলুম। কুঠিবাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখি রবীন্দ্রনাথ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন যে, আমার টেলিগ্রামে এখানকার খবর পাও নি?

আমি বললাম—পেয়েছিলুম, মাঝপথে।

তিনি বললেন, যে লোকটির কলেরা হয়েছিল, সে আজ সকালে মারা গেছে। পথচলতি একটি হিন্দুস্থানীর কলেরা হয়ে রাস্তায় পড়ে ছিল। আমি খবর পেয়ে তাকে রাস্তা থেকে তুলিয়ে এনে এই কুঠিবাড়ীতে রেখেছিলুম। দু'দিন ধরে তার সেবাযত্ন করেছি ও হোমিওপাথিক ওষুধ দিয়েছি, কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারলুম না।

আমি ভয়ে ভয়ে সেখানে মধ্যাহ্নভোজন করলুম। তারপর তিনি বললেন যে, প্রমথ, তোমার এ বাড়ীতে থাকা হবে না। আজ বিকেলেই আমরা বজরায় গিয়ে উঠব, এবং কোন বালির চরের পাশে বজরা লাগাব। আমি অবশ্য ভয় পাইনে; কিন্তু তুমি ভয় না পাও, কলকাতায় তোমার স্ত্রী ভয় পাবে।

আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হলুম......আর আমার অনুচরদ্বয়ের সঙ্গে আমরা কুঠিবাড়ী ছেড়ে বোটে গেলুম এবং দিনরাত বোটেই রইলুম।

এই সময় আমি আবিষ্কার করি যে, তিনি মনে মনে মৃত্যুঞ্জয়,—যা আমরা নই।

প্রমথ চৌধুরী

৭ ॥ বহুদিন পরেও এই "পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষকে"র কথা রবীন্দনাথ সস্নেহে স্মরণ করেছেন—দ্রষ্টব্য রবীন্দনাথের "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" গ্রন্থ, ১৩৫৮ সংস্করণ, তৃতীয় বা "আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা" প্রবন্ধ।

শিলাইদহের পাট তুলে দেবার সময় রবীন্দ্রনাথ আগরতলার মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লিখছেন—

"আমাদের শান্তিনিকেতন বোর্ডিং বিদ্যালয়ে রথীকে পড়াইব, সেজন্য লরেন্সকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বিদায় দিতে হইতেছে। যদি তোমাদের আগরতলার ঠাকুরদের স্কুলে তাহাকে ইংরেজী অধ্যাপক নিযুক্ত কর তবে তোমাদেরও উপকার তাহারও উপকার। এরূপ সুযোগ আর পাইবে না। লরেন্স পড়াইবার বিদ্যা যেমন জানে এমন অল্প লোককেই দেখিয়াছি। ও আমাকে ছাড়িতে চায় না কিন্তু উপায় দেখি না।...১৮ ভাদ্র ১৩০৮"

পরবর্তী এক চিঠিতে লিখেছেন—

"লরেন্স আমাকে ছাড়িতে চায় না। আমরা আবার শিলাইদহে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতেছি।"

—"রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা" গ্রন্থ, পৃ ২৪৫৯-৬০ লরেন্স কিছুকাল শান্তিনিকেতনেও শিক্ষকতা করেছিলেন (অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'ব্রহ্মবিদ্যালয়')।

৮ ॥ পল্লীর উন্নতিকল্পে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগের বিবরণ অনেকাংশে সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নবপ্রকাশিত "পল্লীপ্রকৃতি" গ্রন্থে।

কবিকেশরী প্রবন্ধটি আমরা এই পর্যন্তই পেয়েছি। এর পরেও "ক্রমশঃ" মন্তব্য আছে, কিন্তু পরবর্তী আর কোনো কিস্তি আমাদের লক্ষ্যগোচর হয় নি। এখানে যতদূর প্রকাশিত হয়েছে তার শেষ অংশ সংকলয়িতার দৃষ্টিগোচর করেন শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য।

রাত্রের তপস্যা

অজিত দত্ত

মানুষ কি আলো খোঁজে?
না, আলোই মানুষকে খুঁজে বেড়ায়?

অন্ধকার গুহার মধ্যে যোগাসনে ব'সে ধ্যান করি।
উর্বশী-মেনকা সেখানে আসতে পারে,
কিন্তু সূর্যের আলো আসা অসম্ভব।
কারণ, অন্ধকার গুহায় না বসলে
তপস্যা জমে কই?
আর, তপস্যা না হলে
সিদ্ধিলাভই বা হয় কেমন ক'রে?

আলো তার অসংখ্য বাহু চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে
অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে।
যদি দৈবাৎ কাকে মানুষকে মুঠোর মধ্যে পায়
তবে তার মহা সৌভাগ্য।
রাক্ষসের মত বিশ্বব্যাপী ব্যাদিত মুখে
সকল মানুষকে সে আচ্ছন্ন ক'রে দিতে চায়,
গ্রাস ক'রে নিতে চায়,
বিলীন ক'রে দিতে চায়।
কিন্তু তুমি আর আমি—
আমরা জানি যে,
আলোর সেই সত্তালোপকারী কবলে
আমরা আজও ধরা দিই নি,
ধরা দিই নি॥

আত্মা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

এ পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে।
শুধু আছে শুভ্রতায় বেঁচে
আত্মার মহিমা।
জানে না সে সীমা
বহুদূর নক্ষত্রের থেকে
আনে সে আগুন।
বিনষ্টির হাওয়া বায় হেঁকে,
তবু ত প্রোজ্জ্বল তার দ্রুণ
জন্ম দেয় আশা।
আমি আর আশা সারাৎসার,
তাছাড়া সকলি ধ্রুব মৃত্যুর পিপাসা,
পিপাসিত গাঢ় অন্ধকার।
নচিকেতা-আত্মা মৃত্যুঞ্জয়
আমাকে করেছে বিশ্বে অপার বিস্ময়॥

পিকনিক

সমর সেন

মেয়েটি বলল নতুন বন্ধুকে
"যা খুশি রটাক নিন্দুকে
ক্লান্ত মাথা রাখুন আমার উরুতে।"
ইশারা কিসের ঝলকায় তার ভুরুতে!
আকাশে বাদশা চাঁদ
খোলে তারার হারেম,
দূরে জাগে নদীর বাঁধ।
পিকনিকের পরে প্রেম
শুধুই কি শরীরের ভেলকি?
ভোর হতে প্রহরখানেক বাকি
হলুদ ঘাস লাগে শাড়ির পাড়ে
গাঁয়ের কুকুর ডাকে বারেবারে।
১৯৫৬

প্রাজ্ঞের মতো নয়

অরুণ মিত্র

প্রাজ্ঞের মতো নয়, অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো ক'রে বলো। আমার স্নায়ুতন্তু ধমনী নিয়ে আমি এক অভিন্ন সমতলে আছি। অক্ষরগুলো কাগজে বন্ধ ক'রে এসে তুমি যদি গোধূলিতে নিজেকে আচ্ছন্ন করো এবং অন্তত একটা কুড়োনো পাপড়িও আমার মূক মুখের অন্ধকারে রাখো, তাহলে আমি তোমাকে ঠিক শুনতে পাব। মঞ্চে নয়, তার বাইরে মাটিতে দৃষ্টিহীনতার মধ্যে এক প্রখর সৌহার্দ্যের অবয়বে আমি জেগে রয়েছি।

দু'একটা ঘাসের ডগা কখনো-সখনো গভীর থেকে এক অপূর্ব সম্ভাবনাকে ইন্দ্রিয়ের দৃশ্যে নিয়ে আসে। আমি নিঃসন্দেহে বুঝি আমাদের স্পর্শে রোদ রয়েছে, বৃষ্টি রয়েছে। যদি দ্যাখো বহতা নেই সবুজ নেই তবে অপেক্ষা কোরো না, আমার নিকটে এসো, আমার অবোধ্য ফাটলে আমাদের শিরা-উপশিরা বিন্যস্ত করি। তাহলে আমরা উৎসারণের মুখ পাব। আমাদের সব কথাকে শস্য আর পুষ্পের মাঠে রূপান্তরিত হতে দেখব।

একটি ঝড়

দিনেশ দাস

সবুজ ভালুক এক গাছপালা ভাঙে-চোরে
ইটপাটকেলগুলো চীৎকার করে শূন্যে ওড়েঃ
পথ কাঁদে ককিয়ে ককিয়ে
বাঁকানো দিগন্ত গেছে কোথায় মিশিয়ে
নড়ে ওঠে ঘরবাড়ি দালানের ভিতঃ
অচল স্থাণুর মত ব'সে থাকি—হারায় সংবিৎ
জড়ের মতই থাকে পুরোনো পাঁজরার নীচে
ততোধিক পুরোনো হৃদয়!
কোথাও কি বৃষ্টি হয়?
অবোধ জন্তুটি দেখি কখন নিমেষে
শহরতলীর মাঠ ছাড়িয়ে পেরিয়ে
বনের মেজের 'পরে খেলা ক'রে এসে
আমাদের দরজায় জোরে কড়া নাড়ে
সে যেন এবার
ক্লান্ত কুকুরের মত চেয়েছে আশ্রয়
চেয়েছে একটি গুহা শুধু ঘুমোবার।

সহোদর

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমি তোর মৃত আত্মা কাঁধে করে অনেক ঘুরেছি
সহোদর! কিন্তু তার পুনর্জন্ম কখনো দেখি নি।
আমি রাত্রি দিন জেগে, রাত্রিদিন নতজানু হয়ে
তোর জন্য প্রার্থনা ক'রেছি, কিন্তু তুই নিরুত্তর।

ভীষণ অপ্রেম যেন মধ্যখানে থেকে থেকে থেকে
তোর আমার দুই বুকের সামান্য হাওয়ার ফাঁকটুকু
বিষ ক'রে, হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে ইতরের মত
আমাদের কাছ থেকে জীবন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

ভীষণ অপ্রেম যেন হাসতে হাসতে আমার জীবনে
তোকে হত্যা ক'রে গেছে। হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে
দিনগুলি রাত্রিগুলি বোবা অন্ধ বধির ক'রেছে;
কাঁধে চাপিয়েছে নৈঃশব্দ্যের বোঝা!
আর আমি সইতে পারি না, সহোদর॥

সাবেক

অরুণকুমার সরকার

সবাই ইয়ারবন্ধু মনে হয় চৈত্রের সন্ধ্যায়!
প্রবাসীরা ফিরে আসে উনিশ-শতকী টেরি কেটে।
হেই, হাসিখুশি চাঁদ, প্রাণ যেন হাঁফ ছেড়ে বলে,
দুদণ্ড একজোট হ'য়ে ছিমছাম ধোঁয়া ছাড়ি এসোঃ
যাক ঝাপসা হ'য়ে যতো ফুটোফাটা ছেঁড়া আবর্জনা।
এসো গো অপ্সরী হাওয়া, নাচো, গাও, স্ফূর্তির ফোয়ার
ছোটোও গড়ের মাঠে প্রগল্ভ ঘাসের পাতায়,
মঞ্জীরধ্বনিতে স্বপ্ন আঁকো পার্মাসি নয়নপল্লবে।
তুমি বা লাজুক কেন? ডেকে ওঠো গজলে ঠুংরিতে
কুহুকুহু কুহুকুহু চিতচোরা, হে বসন্তসখা।

সবাই ইয়ারবন্ধু মনে হয় চৈত্রের সন্ধ্যায়।
তবু, ওহে নটবর, ফিরে চলো নিজ নিকেতনে।
চত্বরে ভেঙো না হাঁড়ি, ঠারে ঠোরে পিপাসা মেটাও।
যদি না জ্বলজ্বল করো লোক হাসাতে সভায় যেয়ো না।

শেষ পরিণাম

শঙ্খ ঘোষ

এখন আমি অনেকদিন তোমার মুখে তাকাব না,
প্রতিশ্রুতি ছিল, তুমি রাখো নি কোনো কথা।
এখন ওরা অনেকদিন আমার মুখে তাকাবে না,
প্রতিশ্রুতি ছিল, আমি ভেঙেছি নীরবতা।

কেন? কারণ সেই যে বুড়ি, সেই যে তিনটে পাকা বুড়,
ঘরের সামনে অশথ ঘিরে ঘুরেছে সাতবার,
বাঁধা মুঠি খোলা দুগাল ধুলোতে আর শাপশাপান্তে
ছিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে ঘর-বার।

বুকের ভিতর খরদীপালি জ্বালিয়ে বলে 'তালি, তালি'
দুহাতে তালি, ছহাতে তালি, শহাতে তালি বাজেঃ
এখন আমি আর কি নারী তোমার মুখে তাকাতে পারি?
কিংবা ওরা আমার মুখের গমক-গমক আছে?

কেবল দুজন দুধার থেকে মধ্যে আগুন আড়াল রেখে
খুলে দিয়েছি ছাইয়ের করতল,
গলিত দ্রব নীরবতা যদিও জানে শেষ পরিণাম—
তুমিও জানো, আমিও জানি, সামান্য সম্বল!

মল্লিকার মৃতদেহ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

উদ্যানে গিয়েছি আমি বারবার। দেখেছি, উদ্যান
বড় শান্ত ভূমি নয়। উদ্যানের গভীর ভিতরে
ফুলে ফুলে
তরুতে তরুতে
লতায় পাতায়
ভীষণ চক্রান্ত চলে; চক্ষের নিমেষে খুন রক্তপাত
নিঃশব্দে সমাধা হয়। উদ্যানের গভীর ভিতরে
যত না সৌন্দর্য, তার দশ গুণ বিভীষিকা।

উদ্যানে গিয়েছি আমি বারবার। উদ্যানে কখনও
কেহ যেন শান্তির সন্ধানে আর নাহি যায়।
যাওয়া অর্থহীন; তার কারণ, উদ্যানে
কিছু ফুল
নিতান্ত নিরীহ বটে, কিন্তু বাদ বাকী
ফুলেরা হিংসুক বড়। আত্মপরঘটনায় তারা
যেমন উৎসাহী, তত বলবান, হত্যাপরায়ণ।
উদ্যানে গিয়েছি আমি বারবার। সেখানে রূপের
অহঙ্কার ক্ষমাহীন। সেখানে রঙের
দাঙ্গায় নিহত হয় শত শত দুর্বল কুসুম।

আজ প্রত্যুষেই আমি উদ্যানের বিখ্যাত ভিতরে
মল্লিকার মৃতদেহ দেখতে পেয়েছি।
চক্ষু বিস্ফারিত, দেহ ছিন্নভিন্ন, বুক
তখনও কি উষ্ণ ছিল মল্লিকার?
কার নখরের চিহ্ন মল্লিকার বুকে ছিল,
কে হত্যা করেছে তাকে, কিছুই জানি না;
কিন্তু গোলাপের লতা অতখানি এগিয়ে তখন
পথের উপরে কেন ঝুঁকে ছিল?
এবং রঙ্গন কেন আমাকে দেখেই
অত্যন্ত নীরবে
হঠাৎ ফিরিয়ে নিল মুখ?

আমার বাগানে আরও কতগুলি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে?

নিয়তি

শংকর চট্টোপাধ্যায়

রক্তপাতে ভেসে যাই, আমার বিচূর্ণ অস্থি অগ্নিকুণ্ডে ফোঁশে
কে তুমি? নিয়তি? নারী? মাতাল তরণী বহে চলে যাও একা
দক্ষিণে অঙ্গুলি তুলে দেখাও গম্ভীর মৃত্যু গম্বুজের মত
সমস্ত শোকার্ত লিপ্সা উপবনে নিশাকালে প্রেতসম ঘোরে
দেখি সব আবিলতা ঝরে যায় অনুপম স্পর্শটুকু লেগে।

ফেরার পূর্বেই শুনি ঘন্টা বাজে লোকালয়ে, বিস্ফোরক ধ্বনি
কোলাহল, শোভাযাত্রা......গরলে ডোবান সব
তুমি যত্নে লালন করেছ
চুম্বনে জাগাও ধীরে সর্পিণীর মত তীব্র উত্থান তোমার
শরীরে নির্বাধ রাখো ভালবাসা পড়ে রবো ক্ষুদ্র পদতলে।

অরণ্যে সমস্ত পথ

জগন্নাথ চক্রবর্তী

অরণ্যে সমস্ত পথ খোঁজা শেষ হ'লে
সবার অরণ্যে আমরা, জনারণ্যে।
অরণ্যের শেষ নেই কোনো।

ল্যাম্পোস্ট-সন্ধ্যার পথ
এঁকেবেঁকে জল ছোঁয় লেকে
জ্যোৎস্নার অপ্সরা যেন
তৃষ্ণার্ত আকাশে শুয়ে অলক্তদিনের শেষে
অনাসক্ত।

ল্যাম্পোস্ট-সন্ধ্যার পথ
তুমি আমি;
পার্কের রেলিঙে ঘেরা কানামাছি
আমি তুমি,
চুলচেরা হিসাবের
সিদ্ধিদাতা খাতায় চিত্রিত,
জোনাকির ছদ্মবেশে ধ্রুবতারা।
এ এক অদ্ভুত!

অরণ্যে সমস্ত পথ খোঁজা হ'লে
পথের অরণ্যে আমরা।
শেষ নেই!

এই যে খঞ্জ-পা বুক
ঠুকঠুক ঠুকঠুক ঠুকঠুক পথ হাঁটে
পথ থেকে সমস্ত আকাশ,
অন্ধকারে ধুকধুক জ্বলেনেভে
জোনাকির অনুপ্রাস।

ল্যাম্পোস্ট-সন্ধ্যার পথে
পোড়ামাটি-ভাঁড়ের কফিতে
সব ঠোঁট পুড়ে গেলে
পিয়ানো-পিঞ্জর থেকে—রাত্রির কল্পিত সুখ—
টুংটং টুংটং টুংটং।
শিকড়ের ব্যথা থেকে
অরণ্য উদ্গত হয়
যেন তারা আকাশ-প্রসূত।
যেন তারা!

আকাশের রিসিভার তুলে
তোমাকে ডাকার আগে—কিংবা পরে —
আকাশে নিমগ্ন হবো।
মুখের মিথুনগুলি—ল্যাম্পোস্ট-সন্ধ্যারা-
লেক থেকে লেক থেকে লেক থেকে।
অরণ্যের শেষ নেই।

জাগ্রত জ্যোৎস্নায়

আলোক সরকার

ঘরের ভিতরে কোনো জ্যোৎস্না নেই। বাইরে জাগ্রত জ্যোৎস্নায়
স্থলপদ্ম ফুটেছে ঘোষিত দীপ্তি, বাগানের গন্ধরাজ গাছ
বেলফুল শ্বেতকরবীর ছায়া অরচিত বিপুল ইচ্ছায়
উদ্ভাষিত নিহিত বিশ্রামে জাগে, স্বতঃস্ফূর্ত লীন অবকাশ।
ঘরের ভিতরে কোনো জ্যোৎস্না নেই। অন্ধকার অনন্য স্বাধীন
কোনো ছবি নেই, সাদা দেয়ালের বিরুদ্ধ প্রয়াস।
অকলুষ একাগ্র নয়নে মাত্র স্থলপদ্ম, বিবর্তিত শুভ্র অমলিন
তেপান্তর সাতসমুদ্রের একা রচিত সম্পূর্ণ কারুকাজ।
ঘরের ভিতরে কোনো জ্যোৎস্না নেই। একদিন ঘরের ভিতরে
আলো জ্বলেছিলো ওরা এসেছিলো স্থবির নির্বোধ কোলাহল
অবিচ্ছিন্ন উদ্ধত বাগানে আর নিয়মনিরুদ্ধ প্রীতস্বরে
গন্ধরাজ কেবল নিপুণ বিন্যাসের, বেলফুল বিনত শুভ্রতা।
ঘরের ভিতরে কোনো জ্যোৎস্না নেই। বিচ্ছিন্ন আঁধারে
সমস্ত বাগান নম্র মিশে যায় সুদূর সমুদ্রে অবিরল।

আরোগ্য

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

'সেরে গেছ?' ফিরে এসে বললে আমায়। কোমল ব্যবহারে
আমি এত নিষ্ঠুরতা কখনো দেখিনি:
যেদিন রেখে গিয়েছিল, নৃশংসী ভাবিনি;
বরং সেদিন অধ্যুষিত জনপদের বাঁকে
স্বরচিত ফুলের কানন প্রবল উচ্ছ্বসিত,
আমার সকল পুরুষবন্ধু আকাশ থেকে নেমে
সেই বাগানের চতুষ্কোণে পাম গাছের সারি,
একটি শিশু মেরুদণ্ডী পাহাড় থেকে নেমে
আমায় সুস্থ হতে দেখে আশ্বস্তের মতো
শিউলিবনে মিলিয়ে গিয়েছিল
আপাত সেই ভয়ংকর বিচ্ছেদের ভোরে।

তারপরে এই মরদেহের অসুখ দিনে-দিনে
তীব্র থেকে তীব্রতর, আত্মা তা সত্ত্বেও
আরোগ্যে আরোগ্যে শুধু পবিত্র হয়েছে;
দুশ্চিকিৎস্য দেহের ব্যাধি তথাপি আত্মার
নেপথ্যে নিহিত ছিল, স্বখাতসলিলে
শ্বেত যে-পদ্ম ফুটেছিল তার ভিতরে কীট।

আত্মার ভিতরে দেহ, এই আনন্দে জেগে
আজ আমি যেই রাতের শেষে পুবের বারান্দায়
সূর্যকে হাৎড়াতে গেছি, এমন সময় তুমি
পৃষ্ঠপোষক সঙ্গে করে ঘৃণ্য দুঃসাহসে
কাছে এলে, অনুমতির অপেক্ষা না রেখে
বসলে এসে আদর-কাড়ার প্রস্থ প্রকরণে!
অনেকেই তো গা ঘেঁষে যায়, কিন্তু কোনোখানে
আমি এত অশ্লীলতা কখনো দেখিনি,
আমি এত অসৌজন্য কখনো দেখিনি
কুশলপ্রশ্ন করার মধ্যে—সেরেই উঠি যদি
শবরী তোর প্রতিহিংসা জ্বলে উঠবে আরো?

সন্ধান

উমা দেবী

রাত্রিরা গভীর হলে
আশ্চর্য রহস্য আকাশের
তারায় তারায় ফুটে ওঠে।
অথচ এ হৃদয়ের রহস্যের কোনো সমাধান
ঘটে না সুস্পষ্ট হয়ে।

হয়তো বা রহস্যই নেই—
হয়তো বা গুহাবাসী প্রাণের সংস্কার
এখনো সংগ্রাম করে
বিদ্যুৎস্ফুরিত এই নগরী মনের
কপট বীর্যের সঙ্গে।

ইতিমধ্যে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের রঙিন মিছিল
আকাশকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায় দূর থেকে অনেক সুদূরে।
সুকুমার সুরভি ফুলের
বারোমাসী পালা গানে ফিরে আসে বারো মাস ঘুরে।
শুধু আমরাই
রিক্তপ্রাণ—ক্লান্তচক্ষু নিস্পৃহ শূন্যের
অর্থ খুঁজি—হয়তো বা সেই অর্থ
যে অর্থ কোথাও আজো নেই।

বৃষ্টিতে মহামায়া

মৃগাঙ্ক রায়

জানালার বাইরে বৃষ্টির জানালা
বৃষ্টি চৌরঙ্গীতে, কালো পিচ
নিয়নের লাল ধরে জলে।
তারপর হঠাৎ না-বলা না-কওয়া
মস্ত বড় চাঁদ কলকাতা শহরে।

পাঁচ পথের মোড়ে শ্যামবাজারে
ভাঙা বেদী ট্রাফিক পুলিস
কুকুর ঘুমোয় পাশে, গাড়ি
ও গর্জন, একটু দূরে কামান
রবর্ট ক্লাইভের।

বৃষ্টি ছিল এই একটু আগে,
বিদ্যুৎ লাফিয়ে লাফিয়ে গেছে
এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে।
এখন বাস থেকে নেমে সর্বাঙ্গ
জড়িয়ে শাড়ীতে ফুটপাথে মহামায়া
প্রসাধন করবে ব'লে গভীর রাতে
লাল চিরুনি কেনে, মুখ ঢাকা,
বৃষ্টিতে নিভে-যাওয়া সহমরণের শ্মশান থেকে
উঠে এসে, ভয়ংকরী॥

কমলালেবু

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কমলালেবুর প্রতি যাওয়া ভালো। বহুদূরে হতে
উহাদের ব্যবসায় শুরু হয়, ক্রমশঃ মেধায়
রক্তের চাপের ফলে ঢোলকানা-হওয়া থেকে ওই
কমলাফলের হেতু ভেসে উঠি, জ্বরোভাব কাটে।
কমলা এগিয়ে আসে, ব্যবধান ঘুচে যেতে থাকে।
প্রধান অরুচি, তৃষ্ণা অনুভব করেছে কমলা
মানুষের, যেন তার রূপ কোনোমতে নক্ষত্রের
শোভার আধেকশায়ী, আধেক শিল্পের আস্বাদন।
একভাবে কমলার হেতু হতে চেয়েছে কবির
জিহ্বা ও ব্যক্তিত্ব। তবু ব্যক্তি হতে জিহ্বা বড়ো নয়!
ফানুস, ফুলের চেয়ে মহত্তর গৌরব নগরে—
ঢি-ঢি পড়ে যায়, গালগল্পে ফোটে কবির শূন্যতা;
যাহাদের স্মৃতি আছে, যাহারা লৌকিক ধ্যানী নয়,
তাহাদের প্রতি চেয়ে কমলারা ব্যবসা ফেঁদেছে।

ধ্বনির দূরত্বে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

হয়তো দেবতা পারে, আমাদের কণ্ঠে নেই বৃক্ষের সাহস
দাঁড়িয়ে থাকার মত বৎসর বৎসর প্রতারণা।
কোথায় রাজার রথ দূরত্বের দীর্ঘ অবেলায়
জাগাবে যুগল রেখা—আমি যখনি নিঃসঙ্গ থাকি
ভাঙি ডালপালা, ফুল, সাজাই মুকুট
পাখির পালক গুঁজে প্রাণপণ রমণীয় করি; তবু আলো
যথেষ্ট ফোটে না বলে দেখা যায় না গুপ্ত ক্ষতগুলি।

তোমাকে শব্দের শ্রমে ধ্বনির দূরত্বে তবু কাছে চাই রাজা!
এখন বয়স ভীরু উদ্‌যাপিত উৎস থেকে রচিত উৎসাহে।
তুমি উদাসীন থাকো প্রেমে, প্রকৃতিতে, তুমি প্রতিটি ঋতুর
প্রত্যাবর্তনের পথে ধ্বংস কর মনীষার অযুত অঙ্কুর।
আমি পারবো না, জানি, পারবো না বৃক্ষের মতন
লক্ষ প্রত্যাশায় শ্যাম অন্তহীন পরাগে পল্লবে
বাতাসে, ব্যাপ্তির বৃন্তে উত্তরীয় খুলে নগ্ন দাঁড়াতে সম্রাট।

বাতাস, বাতাস, এত চতুর্দ্দিকে বাতাসের গাঢ় তৃপ্তি তবু
শ্বাসকষ্টে আমি আজো একাকী, উন্মাদ।

স্বপ্ন, একুশে অগস্ট

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কোনদিকে? কোনদিকে? আমি চিৎকার করলুম
অমনি ভিড়ের ভিতরে
একটা মোহর এসে ছিট্‌কে পড়লো। তৎক্ষণাৎ নৈঋত বাদ দিয়ে
সাতদিকে সাতটা রাস্তা খুলে গেল এবং জ্যোৎস্নায়
বড় চিত্তহারী সেই পথগুলি এবং জ্যোৎস্নায়
ভিড়ের প্রতিটি টুক্‌রো শত শত হুইস্‌ল বাজিয়ে ছুটে গেল
ব্যক্তিগত পথে পথে। কোন দিকে কোন দিকে?
আমি তীব্র ধাবমান
কয়েকটি কলার চেপে হেঁকে উঠি, কি করে জানলেন এইটা ঠিক
পথ? নাকি যে-কোন রাস্তায়?
তাদের উত্তরঃ পথ ও রাস্তার মধ্যে বহু ভেদ আছে, ইডিয়ট!

পথ কিংবা রাস্তা আমি কোন্‌টায় নামবো বহু ভেবে শেষটায়
পথেই নামলুম। কেন না 'পথিক' এই সুন্দর শব্দটি
বড়ই রোমাঞ্চকর। তার বদলে 'রাস্তার লোকটা'?
পরমুহূর্তেই, হায়, কয়েকশত প্রেমিক ও
কবিদের স্তুতি, উপমার
ভয়ংকর নেকড়েগুলি ছিঁড়ে চুষে খেয়ে ফেললো
আমার শরীর, রক্ত, দু' চোখের মণি।

সমুদ্রের প্রতি

সুনীল বসু

এই সনে আমি যাব দূরে সমুদ্রের সন্নিকটে
সংসারে বড় ক্ষয় রাত্রি-দিন হিংসা কৃপণতা
সমুদ্রের রিক্ততায় শেখাবে আমাকে উদারতা
ধূ ধূ তটে শুয়ে রব বিন্দু চিহ্ন হয়ে দৃশ্যপটে

অন্তহীন নক্ষত্রের সাম্রাজ্যে তাকাব নিদ্রাহীন
জন্মমৃত্যু পরিণাম রেখে আসব দূরে ওই পারে
বিরতিবিহীন হাওয়া ক্রমাগত দগ্ধ অন্ধকারে
হবে ঝর্ণা, মাঝে-মাঝে সমুদ্রে সান্নিধ্য সমীচীন

আদি জননীর বুকে জুড়াব দেহের যাবতীয়
গ্লানি ক্লান্তি ব্যাধি দুঃখ, পাতালের শান্ত তলদেশ
আমার সর্বাঙ্গে হবে বিশ্রামের স্পর্শ অনিঃশেষ
অদৃশ্য যক্ষিণী, জলকন্যা হবে আমার আত্মীয়

উদাস বৈধব্য নেব সন্ধ্যাকালে, শান্ত পারাবার
শেখাবে নির্লিপ্তি, নিদ্রা পেতে দেবে শীতল আঁচল,
দাঁড়াবে দিগন্ত, খুলে দিয়ে চুল নিশ্ছিদ্র কাজল,
নক্ষত্রের লক্ষ ফুল নেবে কবরীর অন্ধকার

হে সমুদ্র আদি মাতা, মাতৃহীন আমি নির্বাসিত
আমার জননী হও, বিক্ষত আনন রাখি বুকে,
বহু কঙ্কাল ভূগর্ভে যেমতি রেখেছ নিমজ্জিত
সেইমত স্থান দাও আমাকেও বালুকা-ঝিনুকে।

পুনর্মিলন

মানস রায়চৌধুরী

স্মৃতি কি বিপুল ডানা ময়ূরের মত এক মেলে দেয়
বৃষ্টির দুপুরে
জানলার শিক ভেঙে শহরের জনস্রোত আমার ভিতরে
'ছুটি-ছুটি' শব্দ তুলে ঢুকে পড়ে, কোথা অন্ধ ঝড়ে
বিদ্যুৎ ধাঁধিয়ে যায় রাধিকার কৃষ্ণময় বুকের মুকুর।

স্মৃতি চতুর্দিকে যেন পাহাড়ে ধ্বনিত, গ্রীবা ছুঁতে চেয়েছিলো
নখের গভীর স্পর্শ, ওষ্ঠ, নাসা, ভুরু নয়—শুধুই নখর
ভুলেছি সমস্ত গান—প্রিয় গান—স্বরাভাবে নিপতিত ঘর,
তবু যেন বেলা গেলে 'মধুর তোমার শেষ' ভাঙা গ্রামাফোনে
একই দাগে টাল খায়, 'মধুর মধুর'
আসে একটানা বধির শ্রবণে।

তবে কি তোমার কথা মনে পড়ে যেতে পারে, আসো সুত্রাকার
শাড়ির বিহ্বল নকশা, পাড়ে কালি,
মর্মর পাষাণ তীক্ষ্ন চিবুকের নিচে,
কত গন্ধ, কত দুঃখ কানের ওপাশে কালো নিভৃত জড়ুলে
কেউ বুঝি সন্নিকট, চেনা হাত সমস্ত কুলুপ দেয় খুলে
হবো এইবার হবো মুখোমুখি, দীর্ঘ ঘোমটা,
সিঁদুর সিঁথিতে ঘোরতর প্রাচীনার।

রূপান্তর

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অঘোরে ঘুমিয়েছিলে দরোজা জানালা সব দিয়ে।
কেন ফের খুলে দিলে দোর,
কেন খুলে দিলে জানলা! দুপুর পেরিয়ে
অনিবার্য অপরাহ্ণ না এসে এখনও দ্বিপ্রহর।

তা ছাড়া, আশ্চর্য, সারা জগৎ সহসা মন্ত্রপূত
অকল্যাণভরে যেন পাল্টে গেছে, সারি সারি শাল-মহুয়ার
বন মুছে চতুর্ধারে ভাঙাচোরা স্তম্ভ ও মিনার
বিরাট ধ্বংসের শব কে সাজিয়ে রেখে গেছে দূত।
স্বপ্নের অতল তৃপ্ত জ্যোৎস্নায় নিলীঢ় হয়ে ছিলেঃ
বুকের গহনে কারও আর্দ্র হাত, ওষ্ঠে কারও তৃষিত অধর
আবেশে আলিঙ্গন ছিল, নিদ্রা টুটে সহসা নিখিলে
কেন দোর খুলে দেখলে স্থাণু অবিচল দ্বিপ্রহর

নির্লজ্জের মত মূঢ় হেসে
দাঁড়িয়ে রয়েছে, দ্রুত সারি সারি শাল-মহুয়ার
অরণ্য [illegible] গিয়ে ভাঙাচোরা স্তম্ভ ও মিনার
শয়তানের মত দম্ভে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আরূঢ় প্রতিমা

সিদ্ধেশ্বর সেন

তোমার প্রহরণগুলি কেঁপে উঠেছে
আমার উচ্ছ্রিত রক্তে তাদের চরমপ্রবৃত্ত প্রতি-
হিংসা, পিপাসা
আমার হৃদয়
খোঁজে তোমার উত্তোলিত উত্তাল প্রহরণগুলি
আমার জানুর 'পরে তোমার পশুর থাবা

আমিও এক আদিম অন্ধ, অর্ধ-
মানব আবর্ত-পথে উত্থিত
হয়েছি, আমার শরীরের অর্ধ
এখন তোমার দিকে
ঘুরে গেছে
তোমার দশাগ্রনখরে আমার গ্রহণ না, ছিন্ন
হনন, গর্জিত মৃত্যু
আমি যদি নিদ্রিত হই তোমার পশুর ব্যাদিত মুখে॥

ভ্রষ্টলগ্ন

সুনীলকুমার নন্দী

পত্রবৃন্ত খসে গেছে বিগত যৌবনা,
সম্বল বিশীর্ণ বাহু, বসন্তের সেনা
তুমি এলে অসময়ে কুসুম ফুটবে না।

রাজাধিরাজকে ব'লো বক্ষে জ্বলা সোনা
পুড়ে পুড়ে ভস্ম হলো, তখন এলে না।
শ্রাবণ এনেছে শেষে রক্তের সান্ত্বনা,—

শিকড়ে অমল স্রোত, বনরাজি নীল
মগ্ন প্রসারিত অঙ্গে, অঙ্গের সর্পিল
বাসনা প্রসন্নমুখী আত্মস্থ গভীর—

ছুঁয়ে আছে শ্রাবণের নির্মোহ সলিল।
আসঙ্গ দস্যুতা বৃথা, বিলগ্ন তিথির
অসাধ্য ভাসানো আজ এ-শীতল তীর।

ফিরে যাও, তুমি কেন, দলবদ্ধ সেনা
পাঠালেও বৃক্ষশাখে কুসুম ফুটবে না।
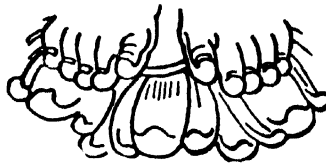
॥ ১ ॥

জরা-আবরণ
করিলে হরণ,
তব যৌবনে নিলে,
সহসা আমার সমুদ্ভাসন দিলে
তব অপরূপ রূপের ভুবনে, তরুণী চিরন্তনিকা!
পাণি পরশনে
মোর তনু-মনে
তড়িৎ সঞ্চারিলে,
রমণী পরশমণিকা।

এখন তোমার
রমণীয়তার
সরণীতে আমি চলি,
তব সাথে তব অনুরাগবাণী বলি,
তোমার অনির্বচনীয়তায় নন্দিত করি চেতনা।
চেতনে আমার
বহেনা তো আর
ক্রন্দনে উচ্ছলি'
অশ্রুনদীর বেদনা।

আমার কমলে
দোলে দলে-দলে
অমলসুখের হাসি!
তোমারি হাসিতে উঠিয়াছে উদ্ভাসি'
মোর শতদলে সকল অংগ: হে অসীমা-অনুরাগিণী,
আমার সীমার
সকলি তোমার
রঞ্জনে উল্লাসী!
কিছুই তো বাকি রাখিনি।

এই অনুরাগী
কিছুই তো বাকি
রাখেনি জীবনে আর!
মর্তগতির বন্দী-স্বাধীনতার
কোনো বিদ্রোহ, কোনো অভিমান, আমারে তো আর বাঁধে না,
লালসামদির
করে না অধীর,
বিমলিনা বাসনার
আসঙ্গে প্রাণ মাতে না।

॥ ২ ॥

তোমার বিভার
প্রতিকূলতার
কোনো-বিভারঞ্জিত
কোনোখানে মোর অভিযান থামেনি তো।
ধনীকন্যার হীরামণিহার ধূলোয় ফেলিয়া চলেছি;
পার্থিব যত
সুখ, সম্পদ
আমার অবিচলিত
চরণের তলে দলেছি।

রাজার শাসন,
রাজার আসন,
রাজার প্রাসাদখানি
আমারে চাহিলে তুচ্ছ বলিয়া মানি!
ভুবনেশ্বরী যারে রাখে, সে কি থাকে ভূপতির শাসনে?
আমি আপনারে
দিয়েছি তোমারে:
নিয়েছ নিখিলরাণী,
আমারে তোমার আসনে।

যাদের গোলাপে
প্রেমের প্রলাপে
কাঁটার কামনা ঢালা,
তাদের গোলাপকাননে তো আমি মালা
গাঁথি না কখনো, হাসিতে হাসিতে হঠাৎ-ব্যথার কাঁদি না;
সোহাগ-সাধনে
বাঁধি না বাঁধনে,
বাসরপ্রদীপজ্বালা
আলো দিয়ে ছায়া সাধি না।

পাবনপ্রভার
প্রসূন-শোভার
দিয়েছ যে উদ্যান,
প্রতি ফুলে তার তোমারি অধিষ্ঠান।
পাবনী, তোমার রূপবহ্নির শিখার গোলাপরাশিতে
মালা গেঁথে আনি,
আনি তব বাণী,
আনি তব আহ্বান
সবারে সমুদ্ভাসিতে।

॥ ৩ ॥

অতন্দ্রতার
ভ্রমর আমার
গানে গানে গুঞ্জরি'
বলে, "জগতের ভুজঙ্গবিভাবরী
অজাগরণের গরলপূর্ণ কুণ্ডলীকৃত অঙ্গ
খুলিবার তরে
তব বিভা ধরে,
হে বিশ্ববিঘ্নহরী,
সে চায় তোমার সঙ্গ"।

আমি যা পেয়েছি,
আমি যা জেনেছি,
তা' শুধু আমার নয়,
সকলের তরে তোমার অভ্যুদয়।
সে-কথা সবারে বলি বারে বারে, ধরি উদয়ের ছন্দ।
সে-বারতা দানে
মোর অভিযানে
যত হই তন্ময়—
ভেঙে যায় তমোবন্ধ।

আমি ব্যসি ভালো
শুধু তব আলো;
সে-আলো-বিমুখ যারা,
সূর্যমুখীরে তুচ্ছ করে যে তারা।
সূর্যমুখী তো তবু বিচলিত হয় না, কখনো হবে না।
সে জানে, তাদের
ঐ বিমুখের
আঁধারে আত্মহারা
গতি চিরদিন রবে না।

আমি অনধীর
সূর্যমুখীর
বিকাশ বহিয়া চলি,
সাবিত্রী, তব মর্মের বাণী বলি,
বলিতে-বলিতে তোমারি বিভায় পাই স্বরূপের তপনে।
সৌরসমীরে
রাখি ধরণীরে,
সুবর্ণরাগে জ্বলি'
পার্থিবতার পবনে।

॥ ৪ ॥

আকাশে ওড়ার
তাড়া নাই আর,
সুদূরে যাবার লাগি'
চঞ্চল ডানা মেলে না আমার পাখি।
অনন্তময়ী, তুমি যে এসেছ ধূলায় নীলিমা মিলাতে;
পাখিরে আমার
দিলে ঝঙ্কার
তোমার বীণায় রাখি'
নবনীহারিকা বিলাতে।

সাগরে যাবার
তাড়া নাই আর,
প্রবাহিণী হইনি তো।
সরসী হ'লে কি পারাবার ধরা দিত?
আমি যে তোমার তৃণলতিকার ক্ষণিক শিশিরবিন্দু,
মোর সীমতায়
স্বচ্ছ শোভায়
হয় প্রতিবিম্বিত
অসীম অমল সিন্ধু।

তিমিরদীর্ণা,
হে অবতীর্ণা,
অবতরণের ক্ষণে
প্রভাত দিয়েছ কালের দিগঙ্গনে;
তব অনুরাগ-অরুণরাগের উদয়সাগরে ধরিয়া
বসুন্ধরায়
তুমি যে আমায়
বিশাল সন্দীপনে
তুলেছ রূপান্তরিয়া।—

আমি কি আমার
এই প্রেরণার
উদয়বারিধিবারি
আমারি মাঝারে রুধিয়া রাখিতে পারি?
প্রভাতীগানের প্লাবন দিয়েছি নিখিলপ্রাণের নদীতে।
অসীমা, আমায়
অমিত-সুরায়
করেছ অমিতাচারী
ভুবন-ভাসানো-গতিতে।

॥ ৫ ॥

বিষাদে বিলীন
ছিল মোর দিন,
দিশার দীপ্তিহারা
ছিল যে আমার নিশীথের শশীতারা!
মনে হয়েছিল, মোর নিয়তির এই দুর্যোগ যাবে না,
ব্যর্থ আমার
এই অভিসার
এই সাধনার ধারা
বাঞ্ছিত বিভা পাবে না।

কত যে ব্যথায়
বেলা গেছে হায়!
দেখিনি ফুলের হাসি,
কণ্টক মুখে রেখেছি শোণিতরাশি!
কত যে বাধায় বেধেছি, তবু তো ছাড়িনি সাধনসরণী।
ছিল যে আঁধার
অকূলপাথার!
অকূল পাথার!
তবু চলেছিল ভাসি'
আমার জীর্ণতরণী।

তুমি তখনো কি
কাছে ছিলে সখি,
আমারি অন্তরালে
অনুকূল বায়ু দিয়েছিলে মোর পালে?
তনু-তরণীর গহনে, গোপনে, মাঝির মতন ছিলে গো।
তুমি ছিলে, তাই
তরী ডোবে নাই
জলধিতুফানকালে,
তাই মোরে কূলে নিলে গো।

নিজ হাতে তুলে
নিলে তব কূলে
ঘনালে শুভক্ষণ,
চিরকিরণের কুসুমকুঞ্জবন
দেখালে আমায়, সেই নিমেষেই নিলাম চয়ন করিয়া
তোমার আঁখির
শুভদৃষ্টির
আলোকমঞ্জরণ
আমার নয়ন ভরিয়া।

॥ ৬ ॥

এখন প্রগতি
হ'ল স্বর্ণদী
সুষমা-স্বর্গে তব:
ক্ষণগুলি মোর উজ্জ্বল অভিনব
আনন্দে দোলে, তরঙ্গ তোলে তব যৌবনরঙ্গে;
জীবনছন্দ
হ'ল অবন্ধ,
অনন্তবৈভব
পাই মোর প্রতি ভঙ্গে।

এখন চলার
শেষ নেই আর;
পথের প্রান্ত নাই;
এখন বিশ্বে বিভাস বিচ্ছুরাই।
অখিল-বাসরে মোরা বধূ-বর, অসাঙ্গ মধুরজনী:
ওগো আত্মার
প্রেয়সী আমার,
এখন তোমাতে পাই
সব সত্তার স্বজনী।

ভবসৃষ্টির
অবলুপ্তির
মহাজাগরণরোলে:
মহাম্বুধির অনাহত কল্লোলে:
বাজিল শঙ্খ, ধ্বনিয়া উঠিল এই বিবাহের মন্ত্র।
মোর শর্বরী
মধুময় করি'
সবার ললাটে দোলে
মহালক্ষ্মীর চন্দ্র।

কাল-আবরণ
করিলে হরণ,
চিরযৌবন দিলে,
মোর সম্বিতে সহসা সবারে নিলে
তোমারি রূপের সমুদ্ভাসনে, তরুণী চিরন্তনিকা।
পাণি পরশনে
মোর তনু-মনে
সবারে সঙ্কাশিলে,
রমণী পরশমণিকা।

[সম্পূর্ণ উপন্যাস]

বসন্ত তিলক

সুবোধ ঘোষ

ভোর হয়েছে। হঠাৎ একটা ঝড় এল আর চলে গেল। এই তো ব্যাপার। এর মধ্যে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাবার মত কী আছে?

কিন্তু চন্দ্রবাবু সত্যিই আশ্চর্য হয়েছেন। এই ভোরের ঝড়ের বাতাসটা যে এদিকের আর ওদিকের সারি-সারি যত ঘুমন্ত বাড়ির বন্ধ কপাটের কড়া নেড়ে দিয়ে চলে গেল। তবু কি কেউ জাগলো?

কে জানে এই ছোট শহরের কোন বাড়ির কোন ঘরে কোন মানুষ সত্যিই জেগেছে কিনা। কিন্তু চন্দ্রবাবু জেগেছেন, ছটফট করেছেন, মোষের শিঙের লাঠিটাকে ব্যস্তভাবে খুঁজেছেন। চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে পাশের ঘরের ঘুমন্ত চাকরটারও ঘুম ভাঙিয়েছেন।—মধু ওরে মধু! এখন জাগ তো বাবা!

মাসটা আশ্বিন। ভোরবেলার বাতাসে এমনিতেই একটু শীত-শীত ভাবের কাঁপুনি থাকে। তার উপর এই হঠাৎ-আসা ঝড়টা কিছু গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি ছড়িয়ে গাছপালা ভিজিয়ে দিয়ে গিয়েছে। কাজেই বুঝে নিতে হয়, বাইরে বাতাসের ঠাণ্ডাটা নিশ্চয় এতক্ষণে বেশ কনকনে হয়ে উঠেছে।

খসখসে ধাড়িওয়াল কম্বল কেটে তৈরী-করা একটি ঢিলে-ঢালা প্রকাণ্ড ওভারকোট আছে চন্দ্রবাবুর। ব্যস্তভাবে ওভারকোট গায়ে চাপালেন। কিন্তু লাল-ইমলির মোটা পশমের একটি গলাবন্ধ, আর, এক জোড়া ভুটিয়া মোজাও যে আছে। না, আর দেরি করতে পারলেন না চন্দ্রবাবু। গলায় গলাবন্ধ জড়ানো হলো না, পায়ে মোজাও পরা হলো না। মোষের শিঙের লাঠিটা হাতে নিয়ে আর কাঁটাল কাঠের খড়ম-জোড়া পায়ে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

মেঘলা ভোরের আকাশে কোন আলো-জাগানি আভা ঝিকমিক করে না। কিন্তু চন্দ্রবাবুর দুই চোখে যেন একটা বিস্ময় চিকচিক করে জ্বলছে। সত্তর বছর বয়সের মানুষটি, মাথার প্রকাণ্ড টাকের তিনদিক ঘিরে লম্বা-লম্বা সাদা চুল এলোমেলো হয়ে ঝুলছে। ভুরু দুটিও একেবারে সাদা। কিন্তু এমন দুটি সাদা ভুরুর কাছেই দুটি ছায়াময় কালো চোখে শিশুর চোখের কৌতূহল টলমল করছে। তাঁর ছিপছিপে শুকনো শরীরটা এই বয়সেও যেন ছেলেমানুষের মত তড়বড় করে হাঁটতে চায়।

এপাড়া আর ওপাড়ার যত বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল চন্দ্রদাদুর কাছে অনেক মজার গল্প শুনেছে। তার মধ্যে বিশেষ মজার গল্পটি হলো তাঁর নিজেরই জীবনের একটা সাংঘাতিক শখের গল্প।—আমি যখন কলকাতায় ছিলাম, তখন বছরের মধ্যে অন্তত তিনশো দিন থিয়েটার দেখতাম। থিয়েটার না পেলে যাত্রা, যাত্রা না পেলে কবিগান তরজা কিংবা হাফআখড়াই।

—কিছুই না পেলে?

—সেটি কখনও হয়নি। কিছু না কিছু পেয়েই গেছি। ধাওগড়দের ঝুমুরও দেখতে ছাড়িনি।

চন্দ্রদাদুর চোখ দুটো কি সেই দেখার অভ্যাস আর দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবার অভ্যাস আজও ছাড়তে পারেনি? আজকের ভোরের এই ঝড়টাও ,কি তবে একটা থিয়েটারের নাটুকে কাণ্ড?

হতে পারে; চন্দ্রবাবু হয়তো তাই মনে করেন। কিন্তু এই ছোট শহরের অনেকেই আবার একথাও জানেন যে, ভাল ঘুম হয় না চন্দ্রবাবুর; কোন কাজকর্ম কিংবা কোন চিন্তার বালাই নেই। তাই কী আর করবেন? ভোর হতে না হতেই বের হয়ে পড়েন আর দোরে দোরে হাঁক দিয়ে লোকের ঘুম ভাঙিয়ে বেড়ান। ভোরের ঝড়-টড় দেখে আশ্চর্য হওয়া মানে হাঁক-ডাক করবার একটা ছুতো তৈরি করে নেওয়া। যা দেখবেন আর যা শুনবেন, তাতেই আশ্চর্য হওয়া চন্দ্রবাবুর মন-প্রাণের একটা অভ্যেস হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রবাবুর বিস্ময়ের প্রশ্নটি হলো—ঝড় এল কেন? কিন্তু আজ ভোরে যদি কোন ঝড় দেখা না দিত, তাহলেই বা কি হতো? তাহলে শেষ রাতের ট্রেনের শব্দ শুনেই বের হয়ে পড়তেন চন্দ্রবাবু; আর দোরে দোরে হাঁক দিয়ে লোকের ঘুম ভাঙাতেন—ওহে জয়ন্তবাবু জেগেছো নাকি? মাইন আপ আজ এত লেট হলো কেন?

চন্দ্রবাবু হলেন এই ছোট শহরের একজন পুরনো বাসিন্দা। চন্দ্রবাবু যখন এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ কি চৌত্রিশ। এখানে তাঁর চেয়ে পুরনো যাঁরা ছিলেন, তাঁদের একজনও এখন আর নেই।

এপাড়া আর ওপাড়ার বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা চন্দ্রবাবুর জীবনের আরও কিছু খবর রাখে। এখানে এসে দাদু হবার আগে তিনি কোথায় ছিলেন আর কী ছিলেন? ওদের কাছে মজার গল্প বলতে গিয়ে চন্দ্রবাবু কয়েকবার সে-সব কথাও বলে ফেলেছেন। এই গল্পও যেন চমৎকার এক বিস্ময়ের থিয়েটার দেখার গল্প। যেন অনেক-অনেক দিন আগের এক ভোরবেলার ঘুমের একটা স্বপ্নের গল্প। —আমি তখন ঠিক এই চিনুরানীর মেজদার মত......।

চিনু বলে—ধেৎ; মিথ্যে কথা।

চন্দ্রবাবু—বিশ্বাস কর। তখন ঠিক তোর মেজদার মত আমারও মাথায় আলবার্ট-করা চুলের তেড়ি......।

চিনু—ধেৎ।

চন্দ্রবাবু—আমি তখন হাজারিবাগে একটি বাসা নিয়ে থাকতাম।

ঠিকই, একদিন হাজারিবাগের এক জমিদারের কাছারিতে সাতাশ টাকা মাইনের ইংলিশবাবু ছিলেন চন্দ্রবাবু; তার মানে ইংরেজী ভাষায় চিঠি আর দরখাস্ত লেখবার কাজ করতেন। স্ত্রী ছিল। দুটি মেয়ে ছিল—সীতু আর মিতু। আর ছিল একটি ছেলে, তিন ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি। মিতুর অভ্যেস, বাপের বুকের উপর পা দুটো তুলে দিয়ে ঘুমোবে। ইয়া মোটা গোলগাল একটা খরগোসের মত তুলতুলে, ওই অতটুকু বয়সের মেয়েটার নাক ডাকতো কত জোরে—গুর গুর গুর গুর! ভুসভুস ভুসভুস...।

চিনুরা আর সন্তুরা হেসে লুটিয়ে পড়ে। চন্দ্রবাবু বলেন—হ্যাঁ রে, সত্যিই, বিশ্বেস কর। সীতুর অভ্যেসটা আরও মজার। আমি খেতে বসলেই কোথা থেকে ছুটে এসে হুট করে আমার কোলে বসে পড়বে।

সন্তু—কেন?

চন্দ্রবাবু—কুমড়োর ডাঁটা চিবোবে। আলু না, বড়ি না, বেগুনভাজা না; শুধু কুমড়োর ডাঁটা। ছোট্ট ছোট্ট দাঁত, কিন্তু কী ধার! সীতু শুধু চুপ করে ডাঁটা চিবোতে থাকে—কুচুর কুচুর, কুচুর কুচুর।

নিউমোনিয়া হয়েছিল সীতুর; সেই একদিন খুব ভোরে, জ্বলজ্বলে শুকতারাটা যখন নিবুনিবু হয়ে এল, ঠিক তখন সীতু মরে গেল। মিতুটা ঠিক পরের বছরের বিজয়া দশমীতে, ঠিক মাঝরাতে, ঘুমের মধ্যেই ছটফট করে চন্দ্রনাথের বুকের উপর থেকে পা নামিয়ে নিল আর মরে গেল। অনেকদিন আমেশাতে ভুগে মিতুটা একেবারে এইটুকু একটা......

—কী? প্রশ্ন করে সন্তু।

—একেবারে এইটুকু একটা শুকনো চামচিকে হয়ে গিয়েছিল।

চিনুর চোখ দুটো ছলছল করে।—তারপর কি হলো?

চন্দ্রবাবু কিন্তু চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন। —তারপর একদিন ড্রপসীন পড়ে গেল রে দিদি।

একদিন সন্ধ্যায় কাছারি থেকে ঘরে ফিরে এসেই চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ—শুনছো, আমার সাত টাকা মাইনে বেড়েছে।

এক মাস ধরে রোজ যেমন আজও তেমনি, এই সন্ধ্যাবেলাতেই বিছানার উপর শুয়ে আছেন সীতুর মা। বুকের ভিতরে কি-রকম একটা ব্যথা দেখা দিয়েছে। কবিরাজের শিমুলে ছালের গুঁড়ো ছেড়ে দিয়ে এল এম এস আশু ডাক্তারের দামী ওষুধ খাওয়ানো হলো, তবু ব্যথাটা সারছে না। কিন্তু চন্দ্রনাথের এমন চেঁচিয়ে বলা কথার উত্তরে একটা কথা তো এখন বলতে পারেন সীতুর মা; বললেই তো হয়, ব্যথাটা বেড়েছে।

না, আর কথা বলেননি সীতুর মা; বিছানার কাছে এগিয়ে যেতেই বুঝেছিলেন চন্দ্রনাথ, সীতুর মা আর কোনদিনই কথা বলবেন না।

চিনু বলে—চল সন্তু।

সন্তু বলে—ছোট ছেলেটার নামটা বললে না, দাদু?

চন্দ্রবাবু একেবারে বিনীত অপরাধীর মত কাঁচুমাচু হয়ে হাসতে থাকেন—ভুলে গেছি। বিশ্বাস কর দাদা; সত্যি ভুলে গেছি। শুধু মনে আছে; ওটার দাঁত ছিল না।

ছোট ছেলেটিকে সীতারামপুরে তার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। সে ছেলে মামার বাড়িতেই বড় হয়েছে। শুনেছেন চন্দ্রবাবু, সে ছেলে কলকাতায় চাকরি করছে। বিয়েও করেছে। এর বেশি আর কিছুই জানেন না চন্দ্রবাবু। জানতে চেষ্টা করেননি, জানবার ইচ্ছাও হয়নি। সে ছেলেও এমন বাপের কোন খোঁজ নেয়নি।

সেই যে জমিদারের কাছারির চাকরি ছেড়ে দিলেন চন্দ্রবাবু, তারপর থেকে তিনি এখানে। তিন শো এগার টাকা খরচ করে তৈরি করা এই ছোট্ট বাড়িটি আছে আর চাকর আছে। আর আছে রাস্তার তেমাথায় তিনটি দোকানঘর, তৈরি করতে তিন শো টাকা খরচ পড়েছিল। দোকান-ঘরের ভাড়া মাসে মাসে পাওয়া যায়। চন্দ্রবাবুর দিন চলে যায়। নিজের হাতেই দুমুঠো চাল ফুটিয়ে নেন, আর, শুধু মেথি ফোড়ন দিয়ে বিনামশলায় কাঁচা পেঁপের তরকারী রাঁধেন। এছাড়া চন্দ্রবাবুর জীবনে আজ আর কোন কাজের ঝঞ্ঝাট নেই।

ভোর হয়েছে, একটা ঝড়ও এসেছে আর চলে গিয়েছে, তবু কোন সাড়া দিয়ে জেগে ওঠে না, এটা কেমন শহর? চন্দ্রবাবুর মত মানুষ যার পুরনো বাসিন্দা, তার বয়স কতই বা হতে পারে? ঠিকই, আকারে প্রকারে এটা একটা কাঁচা শহরই বটে।

গ্রাণ্ড কর্ড লাইনের পরেশনাথ আর চৌধুরীবাঁধ পার হয়েই সব ট্রেন যে স্টেশনে থামে, তার নাম রামবাগ রোড। কিন্তু জায়গাটার নাম সারিয়াডি।

খুব ছোট আর খুব ছিমছাম এই ছোট্ট শহর সারিয়াডি পুরনো বস্তি আর বাজারের ছোঁয়াচ থেকে একটু দূরেই সরে আছে। স্টেশনটার সঙ্গে বেশ বড় একটা নিমবাগিচার আড়াল রেখেছে। শহর হয়েও সারিয়াডির সে-রকম কোন শহুরেপনার হই হই নেই।

সারিয়াডি একটি হাওয়ানগর; তার মানে হাওয়া বদলের জন্য বাইরের মানুষের আনা-গোনা এখানে লেগেই আছে। তাঁরা একটা চেঞ্জ-এর জন্যে আসেন; তাই তাঁরা 'চেঞ্জার'। রাস্তার দুপাশে সারি-সারি যত ভিলা কটেজ ভবন আলয় আর নিবাস। ম্যানসন-ট্যানসন নেই। হ্যাঁ, বেশ শৌখীন আর রঙীন চেহারার বাড়ি অনেক আছে। যেমন নাগ সাহেবের বাড়িটি, যার নাম হাওয়াই। এই বছরেই তৈরি হয়েছে রঙীন হাওয়াই; বছরের অন্তত তিনটে মাস এই হাওয়াইয়ে থাকবেন বলে আশা করেন নাগ-সাহেব। শ্রীলেখা কটেজও কম রঙীন নয়। এ দুই বাড়ির নিজেদেরই বিজলি-বাতি আছে।

দেহাতিনী পসারিণী দাম হাঁকে—টাকে সের

এখানে শালবনের হাওয়া পাওয়া যায়, দূরের পরেশনাথ পাহাড়ের নীলচে চেহারাটা যখন তখন দেখা যায়। কুয়োর জল ভাল; জংলী নদী তিরছির জলও ভাল। হাওয়া-বদলের জন্য এখানে বছরের বারো মাসের প্রায় সব মাসেই নতুন মানুষের আনাগোনা কমবেশি চলছেই। শুধু হাওয়া-বদলের মানুষ নয়; ফুর্তির মানুষও আসেন। শখের মানুষও কম আসেন না। ছবি আঁকবার মানুষ, কবিতা লেখবার মানুষ; তা ছাড়া শুধু মুর্গীর মাংস খাওয়ার মানুষও আসেন।

আজ পিকনিক, কাল শিকার, পরশু শুধু ধানোয়ার রোড ধরে চার মাইল বেড়িয়ে আসা। বাড়ির কুয়োর জল বারবার খেয়ে খিদে বাড়াতে হয়; তিরছি নদীর জল খেয়ে চোঁয়া ঢেঁকুর তাড়াতে হয়।

মঙ্গলবারের হাটে যত ইচ্ছে টমেটো কেনা যায়; খাসি মোরগও পাওয়া যাবে। আঁট-সাট ঠাসা চেহারার কত বাঁধাকপি! কী ডাঁটো ফুলকপি! দেহাতিনী পসারিণী দাম হাঁকে—টাকে সের। তাতে চমকে উঠবার কিছু নেই। তার মানে এক টাকা সের নয়; দু'পয়সা সের। খাও, বেড়াও, গান গাও। ছুটোছুটি কর। জোরে গাড়ি চালাও, চেঁচিয়ে হাসো।

রোগী আর রোগিনী হয়ে যাঁরা আসেন, সারিয়াডির জল বাতাসের কাছে তাঁদেরও আশার দাবি কিছু কম নয়। শোথের পায়ের ফুলো কমে যাক; অজীর্ণতার পেট খাসি মোরগের মাংস হজম করুক। অনিদ্রার চোখ এগার ঘণ্টা ঘুমোবে; যক্ষ্মার ফেকাসে ঠোঁটে রক্তের আভা লালচে হয়ে ফুটে উঠবে। এই তো চাই; সারিয়াডির একমাসে কিংবা দু'মাসে আশ্রয়ের জীবনে ওরা কতই না আশা আরাম সুখ আর তৃপ্তি পেতে চায়!

সারিয়াডির এই জীবনটা যেন শত যাযাবর কামনা আর বাসনার ক্ষণকালের ভিড়ের জীবন। একটা অর্থপায়িত্বের উৎসবের জীবন। গয়া পাটনা হাজারিবাগ আর কলকাতার মানুষ শখ করে নানা ঢঙের আর নানা রূপের এত বাড়ি এখানে তৈরি করে ফেলেছেন বলেই তো সারিয়াডি আজ একটা ছোট শহরের মত চেহারা পেয়ে গিয়েছে। ভাড়া খাটে, এমন বাড়ির সংখ্যাই সব চেয়ে বেশি। আজ খালি, কাল ভরতি। আবার একটানা তিন মাস ধরে খালি, তারপর এক মাসের জন্য ভরতি। আসছে আর চলে যাচ্ছে, সবই নতুন মুখ; সারিয়াডির চোখে একটু পুরনো হতে না হতেই ওরা চলে যায়। এবাড়িতে একটা রুমাল, ওবাড়িতে একটা ছেঁড়া বই কিংবা ভাঙা পুতুল, এছাড়া তাদের জীবনের আর কোন চিহ্ন এখানে থাকে না। তাও বা কদিন থাকে? চুনকামের ঠিকেদার হাজরাবাবু হঠাৎ একদিন এসে সব জঞ্জাল পরিষ্কার করে দেন। বাড়িওয়ালার টেলিগ্রাম পেয়েছেন হাজরাবাবু, নতুন ভাড়াটিয়া আসবে।

এরই সঙ্গে, সারিয়াডির এইসব মরশুমী ভাড়ার বাড়িগুলিরই আশে-পাশে ভিন্ন একজাতের বাড়ি আছে, সেগুলি কিন্তু স্থায়িত্বেরই নীড়। স্থায়ী বাসিন্দাদের বাড়ি। অনেক অনেক বাড়ি, যেখানে চিরকাল থাকবার জন্যেই মানুষগুলি থাকে ও আছে। কেউ চাকরি করছেন, কেউ পেনসন পান। কারও কারও ব্যবসা আছে—ইটখোলা, কাঠের গোলা, বাড়ি মেরামতের ঠিকেদারী, ফার্মাসি, ফুলের নার্সারী আর মনিহারী স্টোর। কেউ বাস সার্ভিসের বুকিংবাবু, কেউ পেট্রল পাম্পের ক্যাশমেমো লেখবার কেরানী, কেউ-বা পাঁচটা ভাড়া-খাটা বাড়ির কেয়ারটেকার।

এঁদেরই বাড়িগুলি হলো বারমেসে সুখ-দুঃখের কলরবের বাড়ি। খুঁজলে এখনও হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে, এঁদের দেশের বাড়ির ভিটে এখনও আছে—খানাকুলে বীরনগরে আর পাত্রসায়রে, অন্ডালে ঘাটালে আর হরিনাভিতে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইদিলপুরে আর টাঙ্গাইলে; সাতক্ষীরা কাটোয়া আর হালিসহরে; কাঞ্চনলতা আর সেঁয়াকুলের জঙ্গল এখনও ঘন হয়ে সেসব ভিটে ঢেকে আর ছেয়ে ফেলেনি। যাই হোক না কেন, আজ এঁদের জীবনের সঙ্গে গ্র্যান্ড কর্ড লাইনের ট্রেনের শব্দ, পরেশনাথের

নীলচে চেহারা, শালবনের ঝড়, কাঁকরভরা লাল মাটি; মঙ্গলবারের দেহাতী হাটের বোঙা ধানের চাল আর মোটা অড়হরের ডাল; আর জংলী নদী তিরছির জলের তিত-পুঁটি খুব ভাল করেই মিলে মিশে গিয়েছে।

বাড়ির দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়, ওটা স্থায়ী বাসিন্দার বাড়ি। পাঁচিলের উপর পড়ে আর রোদ খেয়ে খেয়ে কুড়ি বছরের পুরনো লেপ শুকোচ্ছে। বারান্দায় সাইকেল। আদুড় গা নিয়ে ছেলেগুলো ছুটোছুটি করে কিংবা কানামাছি খেলে। উস্কো-খুস্কো চুল, চিরুনি হাতে নিয়ে একটি মেয়ে জানালার কাছে বসে আছে তো বসেই আছে। মাথা আঁচড়ায় না; কোন তাড়া নেই, ব্যস্ততা নেই। গাঁয়ের বুড়ির ঝিঙের ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে বিধবা মহিলা দর করছেন; কিন্তু সে কী দরাদরি। একটি পয়সা কমাবার জন্য পনের মিনিট ধরে বুড়ির সঙ্গে কত তর্ক আর কত কথা কাটাকাটি! বুড়িও জানে, সামনের বাড়ির ফটকের কাছে ওই যে কলকাত্তিয়া মাইজী দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি এমন নিদারুণ দরাদরি করবেনই না; এক কথায় পয়সা ফেলে দিয়ে দু সের ঝিঙে কিনে ফেলবেন।

তাই বলতে হয়, হাওয়ানগর সরিয়াডি একটু মজার শহরও বটে। একই মাটি, একই বাতাস আর একই ডাকঘর; কিন্তু দুটো দু'রকম জীবনের শিবির। ওরা আর এরা। ওরা হলো—তিষ্ঠ ক্ষণকাল; কর ত্বরা; নাই যে সময় নাই নাই। নিতে চাও তো তাড়া-তাড়ি নিয়ে ফেল। এরা হলো—আছি চির-কাল; কিছুই ফুরিয়ে যাচ্ছে না; কিসের তাড়া? ব্যস্ত হতে গিয়ে ঠকবো নাকি শেষে?

কিন্তু এই দুই জীবনের মধ্যে কি মেলা-মেশার কোন তাগিদ নেই? হাওয়া খেতে আর বেড়াতে যাঁরা আসেন, তাঁরা কি তাঁদের আশে-পাশের এইসব স্থায়ী বাসিন্দাদের বাড়িগুলির কাছে একেবারে অচেনা ও অজানা হয়ে থাকেন আর চলে যান?

না, তাও নয়। এই যে সেদিন নৈহাটির দয়ালবাবু পুরো তিনটে মাস এখানে থাকবার পর চলে গেলেন, তাঁরই স্ত্রী মনোরমা রোজ সকালে কালী ভট্চাজের নাত-বউয়ের কোলের ছেলেটাকে নিজের কোলে নিয়ে ধানোয়ার রোডে বেড়াতে যেতেন। যাবার আগে ছেলেটার জন্যে একটা টিয়ে পাখি উপহারও দিয়ে গেছেন।

কিন্তু তারপর? কালী ভট্চাজের নাত-বউ আশা করেছিল, নৈহাটি থেকে মনোদির অন্তত একটা চিঠি আসবেই আসবে। কিন্তু আসেনি কোন চিঠি।

শান্তিপুরের বসন্তবাবু কিন্তু চলে যাবার দিন সরিয়াডির সামন্তবাবুর সঙ্গে কোলাকুলি করেছিলেন। —এই তো, ঠিক আর পাঁচটি মাস পরেই, অক্টোবর পড়তে না পড়তেই আমি আবার আসছি। গৃহিণীরও তাই ইচ্ছে। কেউ না আসুক, আমি না এসে পারবো না মশাই। আসতেই হবে।

সেই বসন্তবাবু কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যেও আর আসেন নি।

নয়াপাড়ার সড়ক ধরে এগিয়ে যেতেই চন্দ্রবাবু দেখলেন, দুটো ল্যাম্পপোস্টের ঘাড় কাত হয়ে হেলে পড়েছে। টেলিগ্রাফের খুঁটির মাথা থেকে একটা শালিকের বাসা ছিটকে পড়ে রাস্তার পাশের নালার জলে আধ-ডোবা হয়ে ভাসছে। পিঁক পিঁক পিঁক, শব্দ করে কোঁকাচ্ছে শালিকের ছানা। ক্যাকর্ ক্যাকর্ করে উড়ছে আর ঘুরছে দুটো ধাড়ি শালিক। রায়সাহেবের সাধের বাগানের কৃষ্ণচূড়াটার ঘাড় মট্‌কে গিয়েছে।

বেশ কিছু দূর এগিয়ে এসেছেন চন্দ্র-বাবু। কিন্তু আবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন। কী কাণ্ড? ঝড়ের বাতাস একটা ডাস্টবিনকে রাস্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় ফেলেছে দেখ? জঞ্জালের এক একটা স্তবক রাস্তার উপর ঢেলে দিয়ে ডাস্টবিনটা একেবারে গোষ্ঠবিহারীর বাড়িটার পাঁচিলের গায়ের উপর পড়েছে।

কিন্তু এ কী? জঞ্জালের মধ্যে এত চিঠি কেন? লাল সিল্কের সুতো দিয়ে বাঁধা রঙীন খামের চিঠির তিনটে তাড়া কেন?

চন্দ্রবাবু ডাকেন—গোষ্ঠ, ওহে গোষ্ঠ-বিহারী? জেগেছ নাকি?

দরজা খুলে আর চোখ মুছতে মুছতে বের হয়ে আসেন গোষ্ঠবাবু—ঘুমোতে একটু রাত হয়েছিল, চন্দরকাকা। বুলুর মার আবার ফীট হয়েছিল।

—কেন?

—স্বপ্নে দেখেছে, ওর হাতে শাঁখা নেই আর ঘরের ভিতরে একটা কালো ছায়া।

চন্দ্রবাবুর চোখের তারার চিকচিকে হাসিটা যেন ফুরফুর করতে থাকে। চেঁচিয়ে হেসেও ফেলেন চন্দ্রবাবু—কিছুর মধ্যে কিছু নেই, খামকা একটা মজার স্বপ্ন, অ্যাঁ?...... কিন্তু এটা কি ব্যাপার বলতে পার?

—কি?

—ডাস্টবিনের জঞ্জালের মধ্যে এত গোটা-গোটা চিঠি কেন?

চিঠির তিনটে তাড়ার দিকে যেন দম বন্ধ করে আর অপলক চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকেন গোষ্ঠবাবু। খামের গায়ে লেখা নামটা পড়ে নিয়েই হাঁফ ছাড়েন। —কণিকা ভরদ্বাজ।

চন্দ্রবাবু—কে সে?

—ওই যে ওই বাড়ি, ওই স্মৃতিধামে ছিলেন যে ভদ্রলোক, হর্ষনাথ ভরদ্বাজ, বর্ধমানের মুন্সেফ; তাঁরই মেয়ে কণিকা। তিন মাস ছিল, পরশু দিন ওরা চলে গিয়েছে।

—তিন মাসের মধ্যেই এত চিঠি?

গোষ্ঠবাবু অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন—চিঠির গায়ে আবার ডাক-টিকিট নেই দেখছি। লোকাল ব্যাপার বোধহয়।

—কি বললে?

—কি আর বলবো বলুন; হঠাৎ শুনলাম, মিস্টার ভরদ্বাজ চলে যাচ্ছেন, কারণ মেয়ের বিয়ে হবে।

ডাকতে হয়নি, পাশের বাড়ি থেকে হাবুলবাবু নিজেই বের হয়ে এসেছে। হাবুলবাবু কিন্তু বেশ একটু চড়া রাগের স্বরে কথা বলে—না, ঠিক লোকাল ব্যাপার নয়। ওরা বাইরের; ওরা এই করতেই এখানে আসে। দুদিনের ফুর্তির যত জঞ্জাল এখানে রেখে দিয়ে সরে পড়ে। জানেন না গোষ্ঠদা, এসব কার লেখা চিঠি?

গোষ্ঠবিহারী—না।

হাবুল—সিন্‌হা লজের ভাড়াটে এক ছোকরা চেঞ্জার।

চন্দ্রবাবু—সে এখন কোথায়?

হাবুল—সে তো এখন এখানেই আছে আর স্বপ্ন দেখছে।

চন্দ্রবাবু ব্যস্তভাবে বলেন—চলি হে গোষ্ঠবিহারী; চললাম হাবুল; তোমাদের চায়ের সময় হয়েছে মনে হচ্ছে।

হাবুল—আপনিও একটু......।

চন্দ্রবাবু—না না, আমি তো পঁয়ত্রিশ বছর আগেই চা খাওয়ার লোভ ছেড়ে দিয়েছি। অথচ আমি, তোমরা সে-খবর জান না, দিনে আটবার চা খেতুম। ছেলের মা ভয় দেখিয়ে বলতেন, উনি মরে গেলে আমি নাকি ভয়ানক জব্দ হব; এত ঘনঘন আমাকে চা করে দেবে কে? কিন্তু......আমি একটুও জব্দ হইনি হাবুল; চা খেতে ইচ্ছেই করে না।

মোষের শিঙের লাঠি দুলিয়ে আর হেসে-হেসে এগিয়ে চললেন চন্দ্রবাবু। দেখতে পেলেন, জয়ন্ত মল্লিকের বাড়ির গেট খোলা, গরু ঢুকে বাড়ির বারান্দার টবের গাছ চিবিয়ে খাচ্ছে।

—জয়ন্ত জয়ন্ত। শিগগির বাইরে এস।

জয়ন্তবাবু বের হয়ে আসেন; গরুটাকে তাড়িয়ে দিয়ে চন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথা বলেন—কি আর করা যাবে বলুন? কাল রাত্তিরে নাগ সাহেবের গাড়ি ঠিক এখানেই রাস্তার উপর ব্যাক করতে গিয়ে আমার বাঁশের জাফরির গেটটাকে কড়মড়িয়ে ভেঙে দিল।

—তারপর?

—তারপর আর কি? নাগ সাহেব বললেন, যদিও তাঁর গাড়ির বডিতে তিনটে বড়-বড় স্ক্র্যাচ পড়েছে, তবু তিনি কোন কমপ্লেন করতে চান না।

মুখ টিপে হাসতে থাকেন জয়ন্ত মল্লিক। চন্দ্রবাবু বলেন—চলি।

মনে হচ্ছে, এইবার মেঘলা ভোরের আকাশে আলোর আভা জেগে উঠবে।

মানুষের ঘুম ভাঙাবার আর বেশি সুযোগ পাবেন না চন্দ্রবাবু।

না, এই রাস্তায় আর বেশী এগিয়ে না যেয়ে ডাইনে কিংবা বাঁয়ে কোন একটা ছোট রাস্তায় ঘুরে যাওয়াই ভাল। রজনীধামের গেট পর্যন্ত এসে বাঁদিকের কালীবাড়ি রোডে ঘুরে গেলেন চন্দ্রবাবু।

থমকে দাঁড়ালেন; ডাক দিলেন চন্দ্রবাবু। —দিবাকর! ওহে দিবাকর! জেগেছো নাকি?

দরজা খুলে বের হয়ে আসে আর বাড়ির বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে কথা বলে দিবাকর। —ঘুমোলাম কখন যে জাগবো?

চন্দ্রবাবু—আঁ? তাইতো! তোমার চোখ দুটো বেশ লাল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

—হবে না কেন? চিতের ধোঁয়া লাগলে...।

—কী ব্যাপার?

দিবাকর—এই তো, আধঘণ্টাও হয়নি, আমি পরেশ মাধব আর বিমল ঘাট থেকে ফিরেছি। মাস দুই হলো এই রজনীধামে নতুন যাঁরা এসেছেন...।

—কারা?

—নাম জানি না। এক বুড়ো বাঙালী ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী; সঙ্গে একটা মাদ্রাজী চাকর।

বারান্দা থেকে নেমে এসে এইবার রাস্তার উপর চন্দ্রবাবুর কাছেই দাঁড়িয়ে কথা বলে দিবাকর।—ভদ্রলোকের স্ত্রী কাল সন্ধ্যা-বেলাতেই মারা গেলেন। মল্লিক ডাক্তার এসে খবর দিয়ে গেলেন, একটা ব্যবস্থা কর।

বুড়ো ভদ্রলোক নিজেও রুগী; তার উপর কেঁদেকেটে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন। কাজেই, পরেশ মাধব আর বিমলকে ডাকতে হয়েছে। খাটিয়া যোগাড় করতে হয়েছে। চারজনের মধ্যে একজনের পক্ষেও কাঁধ ছাড়াবার সুযোগ হয়নি; ঘাট পর্যন্ত সারাটা পথ একটানা মড়া বইতে গিয়ে কাঁধ টাটিয়ে গিয়েছে।

চন্দ্রবাবু—যাক, তোমরাই তা হলে কাজটা ভালভাবে সেরে দিয়েছ?

—দিয়েছি বইকি। বলতে গিয়ে হেসে ফেলে দিবাকর।—পাঁজির পাতা থেকে মন্তর পড়েছে বিমল; আর আমি...।

আবার হেসে ফেলে দিবাকর।—আমি মুখাগ্নি করেছি।

চন্দ্রবাবু—এঃ, একটা কাণ্ডই করেছ তাহলে?

দিবাকর—কি করবো বলুন? বুড়ির কোন ছেলে-টেলে এখানে যখন নেই, তখন বাধ্য হয়েই কাণ্ডটা করতে হলো, চন্দর-কাকা।

এগিয়ে চললেন চন্দ্রবাবু। চন্দ্রবাবুর চোখের তারার সেই চিকচিকে হাসিটার যেন একটুও ক্লান্তি নেই।

—হেই হেই হেই! এটা আবার কে রে? থমকে দাঁড়ালেন, চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রবাবু।

একটু দূরে, মায়া ভিলার বন্ধ ফটকের লোহার গরাদের উপর দুটো পা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেশ প্রকাণ্ড কিন্তু বেশ কুৎসিত চেহারার একটা আলসেশিয়ান কুকুর। ভিতরে ঢোকবার জন্যে যেন আঁকু-পাকু করছে কুকুরটা। বন্ধ ফটকের গরাদ-গুলিকে শুঁকছে চাটছে আর দু'পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে।

নিকটের একটা ছোট্ট বাড়ির জানালা খুলে কথা বলে ছোট্ট একটা ছেলে—ওর নাম হেনরি। হেনরি খুব ভাল লোক। কাউকে কিচ্ছু বলে না; আপনি এগিয়ে যান দাদু।

চন্দ্রবাবু—যাব তো; কিন্তু কী ব্যাপার? কে এটা?

এইবার ছোট্ট বাড়ির একটি বড় ছেলে ঘরের বাইরে এসে কথা বলে—মায়া ভিলাতে ছিলেন যে দত্তসাহেব, তাঁরই কুকুর হেনরি। দত্তসাহেব হেনরিকে এখানে ফেলে রেখেই চলে গিয়েছেন।

—কেন?

—হেনরির গায়ে পোকা হয়েছে। এখন
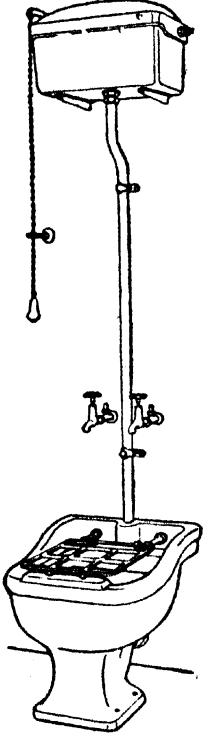
পাড়া ঘুরে সব বাড়ির এ'টো-কাঁটা খায় আর ঘুরে বেড়ায়; আর, রোজই ভোরে একবার এসে ওরকম পা তুলে দিয়ে মায়া ভিলার ফটকের গরাদ চাটে।

এগিয়ে চললেন চন্দ্রবাবু। কা কা, পিউ পিউ, পিক পিক—মেঘলা ভোরের নীরব বাতাসে এইবার পাখির ডাকের সাড়াও বেশ মুখর হয়ে উঠেছে। বলাইদের বাড়ির সামনের চালতে গাছের মাথায় অনেক পাখী কিচিরমিচির করছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, বলাইটা তবু বাইরের বারান্দার তক্তপোষের উপর পড়ে আছে আর ঘুমোচ্ছে। বলাইয়ের নাক-ডাকার শব্দও শোনা যায়।

জানেন চন্দ্রবাবু, বলাইয়ের এম-এ পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে। রাত জেগে পড়া-শোনা করে বলাই। তবু চন্দ্রবাবু ডাকেন।—ওহে বলাই: আর কত ঘুমোবে?

চমকে জেগে ওঠে বলাই। আর, বেশ বিরক্ত ও অপ্রসন্ন চোখ দুটোকে একটু কুঁচকে দিয়ে কথা বলে—আঃ, কী যে করেন চন্দর কাকা!

চন্দ্রবাবু—একটা ঝড় যে এল আর চলে গেল, টের পেয়েছো কি?

—না; তাতে হয়েছে কি?

—একটু আশ্চর্য হতে হচ্ছে, এ ছাড়া আর কি?

—আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে মাঝরাতে যে একটা ঝড় বয়ে গেছে, সে খবর রাখেন কি?

—অ্যাঁ? কি হয়েছে? সেটা আবার কি ব্যাপার?

—পাগল ধরবার জন্যে মাঝরাতে ছুটো-ছুটি করতে হয়েছে। শুধু কি আমি? হারান আর নরেনও ভুগেছে। পাগলের ঘুসি লেগে নরেনের কপালে কালশিরে পড়েছে।

—পাগল কোথা থেকে এল?

—ওই যে অমিয় ভবনে যাঁরা এসেছেন, তাঁদেরই একজন। ইয়া হট্টা-কাট্টা চেহারা, আমাদেরই বয়সের এক পাগল। সব সময় ইংরেজী গান গাইছেন। পাগলকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কাল ঠিক মাঝরাতে ঘরের দরজা ভেঙে অন্ধকারের মধ্যে সোজা তিরছি নদীর দিকে ছুটে চলে গেল। কাজেই...।

কাজেই, অমিয় ভবনের চেঁচামিচি শুনে আর পাগলের বউটির কান্নার শব্দ শুনে বলাই হারান ও নরেনকে বের হতে হয়েছে। রোড চৌকিদার বলেছে, দিন দশ হলো একটা বুড়ো নেকড়ে তিরছি নদীর আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করছে।

—তাই বেশ একটু আশংকা হয়েছিল, চন্দরকাকা।

কিন্তু ভাগ্যি ভাল তিন ঘণ্টা ধরে খোঁজাখুজির পর পাগলকে তিরছি নদীর একটু এদিকেই মাঠের মধ্যে পাওয়া গেল। কিন্তু ধরতে যেতেই বাধা দিল পাগল, একটা ধস্তাধস্তি হয়ে গেল। শেষে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে আসতে হলো।

—যাক, শেষ পর্যন্ত...।

—হ্যাঁ, ধরে এনেছি। পাগলকে আবার ঘরে বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু......। হেসে ফেলে বলাই।—পাগলের বউ আজ সকালে একবার যেতে বলেছেন, আমাদের তিনজনকে আটআনা করে বকসিস দেবেন।

এগিয়ে চললেন চন্দ্রবাবু। তাড়াতাড়ি পা চালাতে চেষ্টা করেন, যদিও ধাড়িওয়াল কম্বলের ওভারকোটের ভারে ততটা তাড়া-তাড়ি করা সম্ভব হয় না। এদিকে পুবের আকাশও লাল হয়ে উঠেছে।

এই তো; খাপরার চালার উপর লাল-লাল ফুলে ভরা একটা কাঁটালতার ঝাড় চড়ে বসেছে আর ছড়িয়ে আছে; তার উপর বসে দুটো শালিক ডাক ছাড়ছে; এটা প্রদোষ সরকারের বাড়ি। কিন্তু বাড়িটা যেন অনেকক্ষণ আগেই জেগেছে বলে মনে হচ্ছে। জানালাটা খোলা; কে যেন জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। কী ব্যাপার? সত্যিই যে প্রদোষ সরকারের মেয়ে আত্রেয়ী খোলা জানালার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কি দেখছে আত্রেয়ী? পুবের আকাশের লালচে আলোটাকে? কি শুনছে আত্রেয়ী? দূরের তিরছি নদীর ঝর্নার কলকলে শব্দটাকে? ভাবছেই বা কি? একটা স্বপ্ন দেখে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছে, সেই স্বপ্নটাকেই ভাবছে নাকি আত্রেয়ী?

চন্দ্রবাবুর মনে অবশ্য এসব প্রশ্নের কোন প্রশ্নই ছটফট করছে না। তিনি ভাবছেন, ব্যাপার কি? প্রদোষ সরকারের মেয়ে আত্রেয়ী আজ এত ভোরে জেগে উঠলো কেন? কোনদিনও তো এ সময়ে ওই জানালাটিকে খোলা দেখতে পাননি, আর আত্রেয়ীকে জানালার কাছে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখেননি চন্দ্রবাবু।

—আত্রেয়ী নাকি? ডাক দিলেন চন্দ্রবাবু।

চমকে ওঠে আত্রেয়ী।—হ্যাঁ, জেঠামশাই।

—ঝড় এসেছিল, টের পেয়েছিলে কি?

—পেয়েছি।

—অ্যাঁ? তাহলে তো অনেকক্ষণ হলো জেগেছো।

—হ্যাঁ।

—আর সব খবর ভাল?

—হ্যাঁ, ভালই।

—তোমার হাতে ওটা কি?

পুব আকাশের সব আলোর আভা যেন রক্তমাখা হয়ে প্রদোষ সরকারের মেয়ে আত্রেয়ীর মুখের উপর চমকে ওঠে। হাতটাও কেঁপে উঠেছে।

বোধহয় আত্রেয়ীর কাছ থেকে একটা উত্তর আশা করছেন চন্দ্রবাবু। কিন্তু আত্রেয়ী আর কথা বলবে বলে মনে হয় না। চন্দ্রবাবুর চোখের তারাতে কোন বিস্ময়ও আর চিকচিক করে না। যেন ভয়ানক জটিল

ও কঠিন একটা হেঁয়ালির থিয়েটার দেখছেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছেন না।

আত্রেয়ী বলে—বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, জেঠামশাই। আপনি একটা আলোয়ান গায়ে দিয়ে বেড়াতে বের হলে ভাল করতেন।

—আচ্ছা, আমি চলি। বাবাকে বলো, আমি এসেছিলাম।

মোষের শিঙের লাঠিটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়েই চলতে থাকেন চন্দ্রবাবু।

এই ছোট হাওয়ানগর সাঁরয়াডির স্থায়ী বাসিন্দা প্রদোষ সরকারের বাড়ির খাপরার চালার উপরে ওই কাঁটালতার বিপুল বোঝা কোন ঝড়ের হাওয়াতে উড়ে যেতে পারে না। ওটা যেন একটা অচলতার ভার। প্রদোষ সরকার লোকটা নিজেও একটা অচলতা। ভদ্রলোকের একটি পায়ের আধখানা নেই। ক্রাচের উপর ভর করে আস্তে-আস্তে হাঁটতে পারেন। ঘরের ভিতর থেকে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতে পাঁচ মিনিট সময় লেগে যায়।

দানাপুরের গোরাবারিকে একশো টাকা মাইনের জিমনাস্টিক মাস্টার ছিলেন প্রদোষ সরকার। দেশী মানুষ হয়েও গোরা সোলজারকে কসরং শেখাবার মাস্টারী শুধু এক প্রদোষ সরকার ছাড়া আর কেউ করেছেন বলে শোনা যায় না। আজও প্রদোষ সরকারের এই বাড়ির একটি ঘরের দেয়ালে পুরনো ফটো ঝুলছে : ব্রিগেডিয়ার সাহেবের চোখের সামনে একটি লনের ঘাসের উপর দুটি হাতের উপর ত্রিশ বছর বয়সের শক্ত-মজবুত শরীরটার ভর রেখে আর পা-জোড়া টান করে উর্ধে তুলে দিয়ে পীকক হয়েছেন প্রদোষ সরকার। সেই উর্ধমুখী দুই পায়ের পাতার উপর দুমন ওজনের একটি বারবেল সুস্থির হয়ে রয়েছে।

ছাত্রদের সামনে প্যারালাল বারের উপর কসরং করতে গিয়ে একদিন মাস্টারের হাতের কব্জি হঠাং মট্‌ করে বেজে উঠলো: ছিটকে পড়ে গেলেন মাস্টার। একটি পা ভেঙে গেল। সেই ভাঙা পা কেটে ফেলতেও হলো। অকালে পেন্সন পেলেন প্রদোষ সরকার। তারপর থেকে সাঁরয়াডির এই বাড়িতে একটানা বিশ বছর ধরে একটা অচলতার জীবন।

খুব ছোট বাড়ি, কিন্তু মানুষ কম নয়। প্রদোষ সরকার ছাড়া আর যাঁরা থাকেন, তাঁরাও যেন এক-একটা অচলতা।

প্রদোষ সরকারের স্ত্রী হৈমবতী একটি অচলতা। দিনে অন্তত দুবার শ্বাসকষ্ট হবেই। তখন পুজোর ঘরের দরজার কাছে একেবারে ধীর-স্থির হয়ে বসে থাকবেন। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির জলের ছাট ঘরে ঢুকে বিছানা ভিজিয়ে দিচ্ছে; হৈমবতী শুধু তাকিয়ে দেখেন। কিন্তু ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসতে পারেন না, জানালাটাকে বন্ধও করতে পারেন না।

হৈমবতীর এক মাসিমা আছেন, মণিময়ী; আত্রেয়ীর মণিদিদা। একে তো বেশ বুড়ো মানুষ, তার উপর চোখে ভাল দেখতে পান না। দেয়াল ধরে ধরে হাঁটেন। হাতটাও সব সময় থরথর করে কাঁপছে। তাকে খাইয়ে দিতে হয়।

তোমার হাতে ওটা কি?

আছেন আত্রেয়ীর কাকিমা সুহাসিনী; প্রদোষ সরকারের খুড়তুতো ভাই সোমনাথের বিধবা স্ত্রী। ইনিও প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ভাসুরের এই সংসারের হেঁসেল আর ভাঁড়ার আগলে রয়েছেন। রাত বারটার পরেও খইয়ের ডালা কোলে নিয়ে বসে থাকেন আর ধান বাছেন। কিন্তু তারপর আর উঠতে পারেন না; মেজের উপরেই অসাড় হয়ে শুয়ে পড়ে থাকেন।

বুড়ো চাকর রামুয়া; সেটাও একটা অচলতা। দানাপুরের চাকরির জীবনে এই রামুয়া ছিল প্রদোষ সরকারের ঘরের চাকর। কে জানে কোথায় ওর দেশ? হাঁপানিতে ভোগে আর যখন ইচ্ছে হয় তখন একটু কাজ করে। রান্না হতে দেরি হলেই রাগ করে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন অনেক সাধাসাধি করে ওর ঘুম ভাঙাতে হয়। পেট ভরে ভাত খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে রামুয়া। এই তো সেই রামুয়া, যে লোকটা একদিন দানাপুরের গোরাবারিকের ময়দানে ছুটে গিয়ে প্রদোষ সরকারের ভাঙা পা দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল।

অকালে পাওয়া পেনসন, মাত্র একচল্লিশ টাকা; তাতে যে-ভাবে থাকতে পারা যায়, সেভাবেই থাকছেন প্রদোষ সরকার। কাটা-লতার প্রকাণ্ড ভার বাড়িটাকে বিঁধছে; কিন্তু বাড়িটা সেজন্য উঃ আঃ করে না।

এ'রা তো পথের শেষে পৌঁছে গিয়েছেন আর অচল হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু আত্রেয়ীও কি তাই?

সরিয়াডির স্থায়ী বাসিন্দাদের সকলেই জানে, বেচারা আত্রেয়ী মেয়েটার জীবনও একটা অচলতা।

সেই যে কবে, বোধহয় পুরো তিনটে বছর পার হয়ে গিয়েছে; প্রদোষ সরকারের মেয়ে এই আত্রেয়ীর বিয়ে হয়েছিল। এখানে নয়, নদে জেলার বীরনগরে; আত্রেয়ীর মামা, গরীব জমিদার কান্তিবাবু খুব কম টাকা খরচ করে আর খুব কম ঘটা করে ভাগ্নীর বিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আত্রেয়ীর বয়স তখন কত? সতের কিংবা আঠার। খোঁড়া মানুষ প্রদোষ সরকার অবশ্য মেয়ের বিয়েতে বীরনগরে যেতে পারেন নি। আত্রেয়ীকে নিয়ে বীরনগর গিয়েছিলেন শুধু আত্রেয়ীর মা আর কাকিমা।

মামা তাঁর ভাগ্নীর জন্যে ভাল পাত্রই যোগাড় করেছিলেন। পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স হবে, দেখতে বেশ ভাল, রাধাপুরের সাত-আনির মালিক হেমন্ত সেই বয়সেই একজন জবরদস্ত জমিদার। ঘোড়ায় চড়ে ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে হেমন্ত, দেখতে পেলেই নয়-আনির প্রজা চাষীরা হাতের লাঙল ক্ষেতের উপর ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। নয়-আনির জ্ঞাতিরা ভয় করে কিন্তু বছরে তিনটে ক'রে মামলা বাধিয়ে ছোকরা সাত-আনিকে সদরে ছুটোছুটি না করিয়েও ছাড়ে না।

সে কাহিনী জানেন চিনুর পিসিমা।—হ্যাঁ, ঠিক ফুলশয্যের দিনে সন্ধ্যাবেলাতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এল। একমাস আগে কোথায় যেন দাঙ্গা ফৌজদারী হয়েছিল; ন' আনিদের তিনটে লোক খুন হয়েছিল। পুলিস এসে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে চলে গেল। তখন মেয়েটার মনের অবস্থাটা কি হয়েছিল, একবার ভেবে দেখুন সন্তুর মা?

—ছেলেটার বাড়ির মানুষের অবস্থাটাও একবার ভাবুন।

—না, তেমন কান্নাকাটি করবার মত কেউ ছিল না। ছেলের মা-বাপ কেউ নেই। ছেলেমানুষ এক ভাই-পো ছিল, আর এক বিধবা খুড়ি ছিল। তারা দু'জনেই যা একটু কেঁদেছিল।

রাধাপুরের সাত-আনির প্রকাণ্ড দালান-বাড়ির একটি ঘরে সন্ধ্যার ঝাড়বাতির আলো ঝলমল করে জ্বলছে: তিন বছর আগের সেই ছবিটাকে যে এই সেদিনও স্বপ্নে দেখতে পেয়েছে আত্রেয়ী। তাঁর নামটা মনে পড়ে না, এক মহিলা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে আত্রেয়ীর চিবুক ছুঁয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—ওরে তোরা দেখ এসে, আমাদের হেমন্তর বউয়ের মুখটি কী সুন্দর!

বাইরে একটা সোরগোল; মানুষের ছুটোছুটি, যেন একটা আতঙ্কের ব্যস্ততা। হেমন্তের গলার স্বর শোনা যায়; শান্ত ও গম্ভীর একটা গর্জন—চুপ! কেউ ছুটোছুটি করবে না।

ঘরে ঢোকে হেমন্ত। গায়ে একটি গেঞ্জি, কাঁধের উপর একটি পুরনো কামিজ ফেলা, আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে হেমন্ত।—আমি এখন যাচ্ছি।

আত্রেয়ী আশ্চর্য হয়ে তাকায়। হেমন্ত বলে— তুমি কিন্তু মিথ্যে ভয় পেও না; আর আমার ওপর রাগ-টাগও করো না।

আত্রেয়ী—কি হলো?

হেমন্ত—নটুর কাছ থেকেই সব জানতে
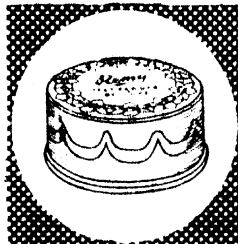
পারবে। আমি এখন আসি, কেমন?

হয় তো আরও একটি-দুটি কথা বলতো হেমন্ত। কিন্তু সেই মহিলা তখন হতভম্ব হয়ে ঘরের ভিতরেই দাঁড়িয়ে আছেন। হেমন্ত শুধু চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপরেই বলে—তুমি আমাকে এক গেলাস জল দাও, ওই যে ওখানে কুঁজো।

হেমন্তর হাতের কাছে জলের গেলাস এগিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আত্রেয়ী। ভয়ানক তৃষ্ণার্তের মত ব্যস্তভাবে ঢক ঢক করে জল খায় হেমন্ত; খালি গেলাসটাকে টেবিলের উপর রেখে দিয়েই বের হয়ে যায়।

পরের দিনই জমিদার মামা এসে ভাগ্নীকে বীরনগরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর, দিন সাত পরে একটি দিনে বলেই ফেললেন—তোরা এখন আত্রেয়ীকে নিয়ে তোদের জংলী সরিয়াডিতেই ফিরে যা, হেমি।

হেমন্ত সদরের জেল হাজতে আছে; এখন মামলা চলবে। কতদিন ধরে চলবে কে জানে? ঠিক কবে যে ফিরবে হেমন্ত; সেটাও ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

আবার সরিয়াডি; চমৎকার একটা নিশির ডাক যেন আত্রেয়ীকে ক'দিনের জন্য এখান থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা ঝাড়বাতির ঝলমলে আলোর কাছে বসিয়ে রেখেছিল। সরিয়াডির সকলেই শুনতে পেল আর দেখতেও পেল, আত্রেয়ী মেয়েটার মাথাটা শুধু সিঁদুরের একটা দাগ নিয়ে ফিরে এসেছে।

মাস ছয় পরে বীরনগরের কান্তিবাবুর একটা চিঠি পড়ে নিয়েই যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রদোষ সরকার, তখন, সবার আগে আত্রেয়ীই দেখতে পেয়ে প্রদোষ সরকারের কাছে এসে চিঠিটাকে হাতে তুলে নিয়েছিল। বোঝা গেল, কবে আসবে হেমন্ত। পাঁচ বছর পরে।

মামার চিঠিটা বেশ স্পষ্ট ভাষায় কথা বলছে—হেমন্তের পাঁচ বছরের জেল হয়েছে। আর শেখ রহিম, তোরফান আলি, ভিকু সরকার ও ভোলা প্রামাণিক, প্রত্যেকের দশ বছর। এখন আলিপুর জেলে আছে হেমন্ত। আত্রেয়ীকে দিয়ে একটা দরখাস্ত সই করে খুব তাড়াতাড়ি জেলরের কাছে পাঠাবেন, যেন বছরে অন্তত তিনটি বার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সুবিধা পায় আত্রেয়ী।

কিন্তু দু'দিন পরে আলিপুর জেল থেকে লেখা হেমন্তেরই একটি চিঠি পড়লা আত্রেয়ী—তুমি এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা-টেখা করো না, লক্ষ্মীটি। দেখা তো হবেই একদিন।

—আমারও পাঁচ বছরের জেল হলো, কাকিমা। চিঠিটা কাকিমার হাতে তুলে দিয়েই সরে যায় আত্রেয়ী। কিন্তু সরে যেতে হলে কতদূরেই বা যাওয়া যেতে পারে? বাইরের ঘরের এই জানালাটা পর্যন্ত। বাস্, তারপর আর যা-কিছু দেখা যায় ও শোনা যায়, সবই একটা অন্য দুনিয়ার ছবি আর শব্দ। শালবন, বিকেলের আকাশ, দূরের ট্রেনের শব্দ; সন্তুদের গরুটা ডাকছে; নতুন বাছুরটা ছুটোছুটি করছে। ওরা আত্রেয়ীর জীবনের, আত্রেয়ীর চোখ কান আর নিঃশ্বাসের কেউ নয়।

অন্য দিন হলে, এখনই বের হতো আর সন্তুদের নতুন বাছুরটার গায়ে নিশ্চয়ই একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে ফিরে আসতো আত্রেয়ী। কিন্তু আর পারবে না আত্রেয়ী, দরকারও নেই। গরুটা শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসবে, আত্রেয়ীর হাতটাকে গুঁতিয়ে সরিয়ে দেবে। আর, সন্তুটাও আত্রেয়ীকে হয়তো চিনতেই পারবে না।

পশ্চিমের আকাশটা লাল হলো। ঘরের সব জানালা বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে আত্রেয়ী।

সরিয়াডির সন্ধ্যাতেও কী কুয়াশার ঘোর। তাই, ওদিকে চন্দ্রবাবুও তাঁর মোষের শিঙের লাঠিটাকে হাতে তুলে নিয়ে বের হয়ে পড়েছেন।

—ওহে গোষ্ঠবিহারী, আজ হঠাৎ এত কুয়াশা কেন? এটা তো পৌষ নয়।

গোষ্ঠবিহারী—তা তো নয়।

—কুয়াশাতে আবার এত ঝাঁজ কেন? তোমাদের চোখ জ্বালা করছে না?

—করছে। কোথাও কাঁচাকয়লার পাইল পুড়ছে বোধহয়; তাই খুব ধোঁয়া ছাড়িয়েছে।

চন্দ্রবাবু চলে যেতেই হাবুলবাবু বলেন—শুনেছেন তো গোষ্ঠদা, আত্রেয়ীটা আজ বিকেল থেকেই ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে শুধু কাঁদছে।

—শুনেছি।

—ছক পাতবেন নাকি? না, ইচ্ছে করছে না?

—নাঃ, আজ আর কিছু ভাল লাগছে না।

—আমারও।

চিনুর পিসিমা দুধের বাটিটাকে এক ঠেলা দিয়ে সরিয়ে রেখে আর বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন—কী যন্ত্রণা, কোত্থেকে এমন চোখ-জ্বালানো ধোঁয়া এল রে বাবা! ওরে, ও চিনু; একবার দেখে আয় তো মা, আত্রেয়ী কিছু খেলো কি না?

আষাঢ়ের মেঘ যেদিন বিকেলে দূরের নীলচে চেহারার পরেশনাথের গায়ের উপর গলে পড়ে যায়, সরিয়াডির শালবনের উপর দিয়ে জলো হাওয়া ছুটে যায়, আর, কিছু-ক্ষণ পরেই সব আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে শুধু তারা ঝিকঝিক করে, সেদিন মনে করতে হয়, একটা বছর পার হয়ে গেল। বীরনগরের মামার বাড়ির সুপুরিবাগানের মাথার উপরে সেই আকাশের মত সরিয়াডির এই আকাশেও আজ তারা হাসে। কিন্তু সরিয়াডির সকলেই জানে, আত্রেয়ী এই একবছরের মধ্যে কোনদিনে কোনক্ষণেও হাসতে পারেনি। সন্তুর মা দেখেছেন, কত হাসি-খুশি আর কত ফুর্তি নিয়ে ছুটোছুটি করতো যে মেয়ে, সে মেয়ে আজ পাহাড়ের মত গম্ভীর। এক বছর আগে, ওই প্রদোষবাবু নিজেও একদিন দেখে-ছিলেন, আর খুশির আবেগে হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন—পা থাকলে আজ আমি তোরই সঙ্গে একবার ছুটোছুটি করে নিতাম রে আত্রেয়ী।

সেদিন বুড়ো চাকর রামুয়ার গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একটা দেহাতী ভজন গাইতে
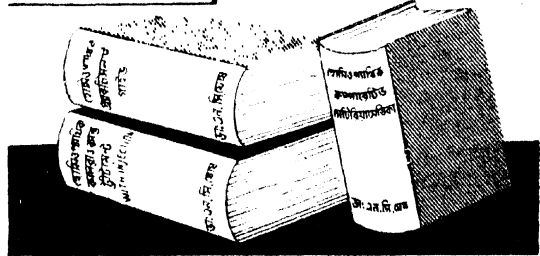
গাইতে, আর ছুটোছুটি করে ঘরের কাজ করছিল আত্রেয়ী। তার কদিন পরেই তো বীরনগর চলে গেল।

গোষ্ঠবাবুর বাড়িতে দাবা খেলার আনন্দের উল্লাসের মধ্যেও হঠাৎ হাত গুটিয়ে নিয়ে আর গম্ভীর হয়ে আক্ষেপ করেছিলেন হাবুলবাবু—মনে আছে তো গোষ্ঠদা, প্রদোষদার মেয়ে আত্রেয়ীটা একদিন কী কাণ্ড করেছিল?

মনে আছে গোষ্ঠবাবুর। আত্রেয়ী তখন নিতান্ত ছোট্ট মেয়েটি নয়। তের বছর বয়সের একটি মেয়ে; কোনদিন ফ্রক পরে; কোনদিন শাড়ি। বড় বড় দুটো বেণী দুলিয়ে, আর ছুটে এসে একটা কাঠ-বিড়ালীকে ধরবার জন্যে পাঁচিলের উপর উঠে পড়েছিল।

হাবুলবাবু বলেন—না, কাঠবিড়ালী নয়। সেই যে, চেঞ্জার ছোকরার সেই ক্যামেরাটা?

খুব মনে আছে। সরিয়াডিতে বেড়াতে এসেছিল ফটো তোলবার শখের একটি ছেলে। সব সময় ক্যামেরা হাতে নিয়ে সরিয়াডির এদিকে-সেদিকে ঘুর-ঘুর করতো। গোষ্ঠ-বাবুর বাড়ির ফটকের মালতীলতার কাছে আত্রেয়ীকে দেখতে পেয়েই ক্যামেরা তুলে ধরলো সেই চেঞ্জার ছোকরা।—একটু পোজ কর তো; লতাটাকে একটু ছুঁয়ে দাঁড়াও তো; মাথাটা বাঁদিকে একটু হেলিয়ে দাও, ...হ্যাঁ, ঠিক আছে বাস্!

অচেনা আগন্তুক যা বলছে, ঠিক তাই করছে আত্রেয়ী। চোখ দুটোও ঝকমক করে হাসছে।

ফটোসুখী ছেলেটা বলে—রেডি! ক্যামেরা বলে—ক্লিক্।

কিন্তু তার আগেই, চোখ বন্ধ করে আর জিভ বের করে দুরন্ত-ধূর্ত একটা ভেংচানির মূর্তিকে ক্যামেরার চোখের উপর এঁকে দিয়েছে, আর গোষ্ঠবাবুর বাড়ির ভিতরে ঢুকেই খিলখিল করে হেসে উঠেছে আত্রেয়ী।—বেশ চমৎকার একটা ফটো তোলালাম, গোষ্ঠকাকা।

ঘুঁটি চালবার জন্য হাত তুলেই হাবুল-বাবু বলেন—আমি ছেলেটাকে দু-চারটে বেশ কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম। গোঁয়ার দিবাকরটা আবার কোথা থেকে ছুটে এসে ছোকরার ক্যামেরা ভেঙে দিতে চেয়েছিল। আমি অবিশ্যি অতটা গড়াতে দিইনি।

গোষ্ঠবাবু—শুনেছি মেয়েটার মনে এখন আর কোন ফুর্তি-টুর্তি নেই। শুধু জেলের চিঠির আশায় ছটফট করে।

আলিপুরের জেল থেকে চিঠির আশায় ছটফট করা আর চিঠি এলে দুটি একটি দিনের মত একটু শান্ত হয়ে যাওয়া, আত্রেয়ীর প্রাণটাও যেন একটা জেলের কুঠুরীর মধ্যে কয়েদ খাটছে। বাড়ির বাইরে যাওয়া দূরে থাকুক, ঘরের জানালার কাছে গিয়েও দাঁড়াতে চায় না আত্রেয়ী।

হেমন্তের একটা চিঠিকে বার বার দশবার পড়েছে আত্রেয়ী। "দেখতে না এসে ভালই করেছ। একটা চোখের দেখা দিয়ে তুমি তখুনি চলে যেতে; সে যে আমার পক্ষে কী কষ্টের ব্যাপার হতো, তুমি বুঝতে পারবে কিনা জানি না।"

চিঠির দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর চোখ দুটো অদ্ভুত বিস্ময়ের দুটো আলো হয়ে জ্বলজ্বল করে। চিঠি নয়; হেমন্ত যেন নিজেই এসে আর কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

চিঠি দিয়ে চোখ ঢেকে তখুনি আবার ছটফট করেছে আত্রেয়ী; চাপা নিঃশ্বাসটা ফিসফিস করে কথা বলেও ফেলেছে, এতই যদি কষ্ট হয়, তবে পাঁচিল টপকে পালিয়ে এলেই তো পার।

কাকিমা ডাক দিয়েছেন—এদিকে একবার আয়, আত্রেয়ী

অনেক রাতেও বিছানার উপর বসে জপ করেন যিনি, আর চোখে ভাল দেখতেও পান না, সেই মনিদিদাও এক মাঝরাতে হঠাৎ ডাক দিলেন—ও হেমি, ও সুহাস, তোমরা ঘুমোচ্ছ কোন্ সুখে? দেখতে পাচ্ছ না?

আত্রেয়ীর মা আর কাকিমা জেগে ওঠেন —কি দেখতে বলছো, মাসি?

—ওঘরে কে যেন জেগে বসে আছে।

—তাই তো!

হৈমবতীর শ্বাসকষ্টের ব্যথাটা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে পারে; তাই হৈমবতী বলেন —আমি যাব না, তুমি একবার গিয়ে দেখে এস, সুহাস।

আলো জ্বলছে। বাক্সের ভিতর থেকে হেমন্তের একটা ফটো বের করে নিয়ে টেবিলের উপর রেখেছে আত্রেয়ী। ঘরের ভিতরে যেন ভয়ানক একটা ঠাট্টার ভাষা রাগ করে বিড়বিড় করছে—বাঃ, বেশ কাণ্ড করলে!

আত্রেয়ীর মাথায় হাত রাখেন কাকিমা—ছিঃ, তুই না বলেছিস, রাগ করবি না। যাবার আগে হেমন্ত তোকে রাগ করতে মানা করে গিয়েছে।

আত্রেয়ী—আমি তো ওর ওপর রাগ করছি না। আমার নিজেরই ওপর রাগ হচ্ছে।

আত্রেয়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে আদরের সুরে কথা বলেন কাকিমা কেন রে আত্রেয়ী? বল আমাকে, কী মনে হচ্ছে?

সে কি এখন চাদরপাতা বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে? ঘুমোতে পারছে? তোমাদের মত মুড়ির মোয়া আর সন্দেশ খাচ্ছে? সাবধান, আমাকে কাল থেকে চা খেতে দেবে না। আমাকে সাজতেও বলবে না।

—চুপ কর, চুপ কর। আত্রেয়ীর মাথাটাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরেন কাকিমা।

সরিয়াডির শীতের হাওয়া যেমন শুকনো তেমনই কনকনে; মানুষের চোখ-মুখ রুক্ষ করে দেয়। কিন্তু সে রুক্ষতা আত্রেয়ীর চেহারাটাকে বড় বেশি উদাস করে দিয়েছে। চোখ দুটো এত শান্ত আর মুখটা এত গম্ভীর যে, দেখে মনে হয়, ওর মনের গায়েও খড়ি পড়েছে। চিনুর পিসিমা তাই মনে করেন; কিন্তু কাকিমা বলেন— না, দিদি। প্রায় একুশ বছর বয়স হলো মেয়েটার; সবই বুঝতে পারি।

একটা গল্পের বই হাতে নিয়ে ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে আছে বলেই কি বই পড়ছে আত্রেয়ী? কাকিমা ওর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝে নিয়েছেন আর সরে গিয়েছেন।

বীরনগরের মামার বাড়ির উঠোনের সেই আলপনার উপর কে-যেন হলুদ-গুঁড়ো দিয়ে বড়-বড় প্রজাপতি এঁকে রেখেছে। তার গায়ের চাদরে গোলাপ আতরের গন্ধ। কপালের কাছে একটা দাগ। দিব্যি হেসে হেসে বলে দিল, ওটা ডাকাতের লাঠির
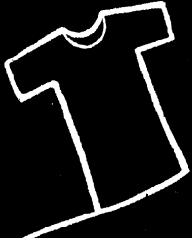
তোমার মামার অতবড় চিঠি পড়েও বুঝতে পারিনি যে তুমি এত সুন্দর

গেল। রাধাপুরের সে-বাড়ির ঘরে টেবিলের উপর সাদা পাথরের থালাতে গোলাচন্দন ভাসছে। দীঘির ধারে বাজি পুড়ছে; চমকে উঠছে নীল-লাল আলোর ঝলক। হঠাৎ এসে কানের কাছে ফিসফিস করে বলে গেল। —তোমার মামার অত বড় চিঠি পড়েও বুঝতে পারিনি যে, তুমি এত সুন্দর।

আত্রেয়ীর মুখটা যে সত্যিই চমকে ওঠে আর অদ্ভুত একটা লাজুক হাসির আভায় রাঙা হয়ে যায়।

বই রেখে দিয়ে, শক্ত করে বাঁধা রুক্ষ খোঁপাটাকে এক টানে খসিয়ে দিয়ে বিনুনী ভাঙতে থাকে আত্রেয়ী। চোখের পাতাও বেশ ভারী হয়ে নুয়ে পড়ছে। ঠোঁটের ফাঁকে একটা দুরন্ত অভিমানের ভাষা কেঁপে উঠতে চাইছে—কিন্তু তোমার পাঁচ বছর শেষ হবে কবে? আমি মরবার পর?

আয়নাতে আর দেখতে হবে কেন? সেদিনও হাতের কাছে আয়না ছিল না। বেশ বুঝতেই পারা যাচ্ছে, ভিজে গিয়েছে ঠোঁট আর লালচে হয়ে ফুলে ফুলে কাঁপছে। একটুও লজ্জা নেই ভদ্রলোকের; নিজেই আবার হাত বুলিয়ে অচেনা মেয়ের সেই মুখটার সব ভয় মুছে দিল।

জেলের আফিস চিঠি খুলে পড়ে; তা না হলে বেশ স্পষ্ট করেই লিখে দিতে পারা যায়, সব ভুলে গেলে কেন?

কাকিমা ডাক দিয়ে বলেন—চিঠি এসেছে, আত্রেয়ী।

হেমন্তের এই চিঠির অনেক কথার মধ্যে আত্রেয়ীর জীবনের এই নালিশটারও একটা জবাব যেন আছে।—আর কি লিখবো? যা লিখতে ইচ্ছে করছে তা ও ইচ্ছে করেই লিখলাম না। তুমি বুঝে নিও।

বিকেলবেলা বাইরের বারান্দায় নিথর হয়ে বসে আত্রেয়ীর মার সঙ্গে একদিন অনেক কথা বললেন প্রদোষ সরকার।—মেয়েটাকে একটু বুঝিয়ে বল; বাড়ির বাইরে গিয়ে একটু ঘোরা-ফেরা করুক। আগের মত ঘরের কাজ-টাজ করুক।

—অনেক বুঝিয়েছি।

—এই তো, দেখতে দেখতে তিনটে বছর কেটে গেল; আর দু' বছর পরেই তো...।

আত্রেয়ী এসে প্রদোষবাবুর চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে।—কি রে? মেয়ের পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে প্রদোষবাবু হাসতে থাকেন।—এই তো এইরকম শান্তটি হয়ে থাকবি, তবেই না...।

আত্রেয়ী—জেলরের কাছে একটা দরখাস্ত পাঠাতে হবে, বাবা।

—আঁ? কিসের দরখাস্ত?

আত্রেয়ী—ওকে যেন ঘানিতে খাটিয়ে কষ্ট না দেয়।

—আরে না না; হেমন্তকে ওরকম সাংঘাতিক কোন কাজ করতেই হয় না। তোর কান্তি মামা তিনবার দেখা করে এসেছে। প্রথম একটা বছর অবিশ্যি একটা খাটুনির কাজ করতে হয়েছিল, বাগানের কাজ। এখন জেল হাসপাতালের কাজ, শুধু একটা খাতা লিখতে হয়।

আত্রেয়ীর মা বলেন—তা ছাড়া, তোর মামা আরও ব্যবস্থা করেছে। হেমন্তকে এক ঝাঁড় আম পাঠানো হয়েছে। তুই সে খবর জানিস না?

আত্রেয়ী—কেমন করে জানবো? তোমরা বলনি, সে'ও কিছু লেখেনি।

প্রদোষবাবু—কিন্তু, ভাল আছে হেমন্ত। ভাববার কিছু নেই। তাই তোকেও বলছিলাম...।

আত্রেয়ী—কি?

প্রদোষ—তুইও একটু কাজ-টাজ নিয়ে থাক। একটু বাইরে ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে; আঁ? কে ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে? মেয়েটি হাত তুলে তোকেই যে ডাকছে বলে মনে হচ্ছে।

ফটকের দিকে তাকিয়েই চমকে ওঠে আত্রেয়ী। সত্যিই যে, তিনজন অচেনা মানুষ রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে প্রদোষ সরকারের বাড়ির এই বারান্দার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আত্রেয়ীর মা বলেন—হয় ও'দের এখানে

সন্তু না বলে দিলেও আত্রেয়ীর বুঝতে কোন অসুবিধে নেই, এরা, যাদের অপলক চোখের দৃষ্টি আত্রেয়ীকে একটা অদ্ভুত আবির্ভাব বলে মনে করছে, তারা সরিয়াড়ির কেউ নয়। এরকমের আরও অনেক বিস্ময়ের চাহনিকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে হলো। কয়েকটা বিস্ময়ের উক্তিকেও পাশ কাটিয়ে চলে যেতে হলো। যাচ্ছিলেন দু'জন তরুণী, তাঁদেরই মধ্যে একজন চোখ টান করে আর আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেই ফেললেন—ইনি আবার কে?

লালপেড়ে ঘিয়ে রঙের শাড়ি; খোঁপাটা ঢিলে করে বাঁধা, গলায় শুধু সোনার একটা সরু সুতোলি চেন তার সঙ্গে জোড়ামুক্তোর একটা লকেট। পায়ে একজোড়া ফুলকারি চটি। এই তো সাজ। তবু আত্রেয়ীকে একটা রূপের বিদ্যুৎ বলে ওদের মনে হয়েছে, তা না হলে ওদের চোখের চাহনিতে আর মুখের ভাষায় এমন বিস্ময়ের চমক ঝলসে উঠবে কেন?

অন্নদা কিণ্ডারগার্টেন। চারটি ছোট বেঞ্চিতে ত্রিশটা বাচ্চা ছেলেমেয়ের বসতে অসুবিধে আছে; কিন্তু ঘরের সামনে খোলা জমিটার উপর ছুটোছুটি করতে কোন অসুবিধে নেই। যেমন চিনুর বয়সের মেয়ে আর সন্তুর বয়সের ছেলে আছে; তেমনই ওদের চেয়ে অনেক ছোটও কয়েকজন আছে। সন্তুর ব্যাগের ভিতর যেমন সেলেট, বই, লাট্টু, মার্বেলগুলির ডিবে আর কাঠের বাঘ; তেমনই বুলুর হাতে একেবারে কিছুই না, একটা সেলেটও না।

তিন ঘণ্টার আগেই কিণ্ডারগার্টেনের কলরবের ক্লাস বন্ধ করে দিতে হলো; নইলে বুলু ঘুমিয়ে পড়বে।

বাড়ি ফেরবার পথে সন্তু আর আত্রেয়ীর সঙ্গে নেই। সন্তু তার লাট্টু নিয়ে ব্যস্ত। কখনো অনেক পিছনে পড়ে থাকে, কখনো আবার ছুটে ছুটে এগিয়ে যায়।

বেলা হয়েছে। মাইকা কুঠির এগারটার ঘণ্টা এখনও অবশ্য বাজেনি, কিন্তু সরিয়াড়ির রোদ বেশ তেতে উঠেছে।

কত নতুন মুখ। এ বছর হাওয়াবদলের লোক খুব বেশি এসেছে বলে মনে হচ্ছে। অনেক বেড়িয়ে এইবার ওরাও বাড়ি ফিরছে; চেষ্টা করে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা বাড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে এক-একটি ক্লান্ত আনন্দ।

আত্রেয়ীও তিন ঘণ্টার পর বাড়ি ফিরছে; আত্রেয়ীর সামান্য ক্লান্ত চেহারাটা তবু যেন একটা অটুট ফুল্লতা। আত্রেয়ীকে দেখে কয়েকটি যুবক বিস্ময়ের দৃষ্টিও তাই ক্লান্তি ভুলে গিয়ে চমকে ওঠে। শালবনের সবুজের দিকে, আর তিরতিরে নদীর জলের স্রোতের দিকে তাকাবার সময় ওদের চোখের ক্ষুধা আর তৃষ্ণাও বোধ হয় ঠিক এইরকম চমকে ওঠে। শুনতেও পায় আত্রেয়ী, একেবারে কাছে এসে পড়েছে যে কলরবের দল, তারই মধ্যে একটা কথা শব্দ করে হেসে উঠলো—সরিয়াড়ির মায়াহরিণী।

একটি মাসও সময় লাগেনি, সরিয়াড়ির যত হাওয়া-বদলের অস্থায়ীরা যেটুকু জেনেছেন তাতেই বুঝে ফেলেছেন যে, এখানে স্থায়ীদের একটি বাড়িতে এক অসাধারণী আছেন, যাঁর সঙ্গে স্বামীর কোন সম্পর্ক নেই। প্রদোষ সরকার নামে একজন স্থায়ী বাসিন্দা আছেন; গরীব মানুষ, তার উপর একটি পা নেই। মেয়ে আত্রেয়ী কিন্তু একুশ বছর বয়সের একটি অদ্ভুত-সুন্দর চেহারা নিয়ে বারো বছর বয়সের খুকিটির মত হেসেখেলে ছুটোছুটি করেন, যদিও উনি কিণ্ডারগার্টেনের টিচার-দিদি। জেলে আছে এই আত্রেয়ীর স্বামী; কিন্তু স্বামীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবার কোন চাড় নেই এই মেয়ের প্রাণে কিংবা মনে; দেখাসাক্ষাৎ করেনও না। খোঁপাটাকে সব-সময় একটু উসকো খুসকো করে রাখেন, আর খুব সরু করে আঁকা গুঁড়ো সিঁদুরের একটা সিরসিরে দাগও সিঁথিতে থাকে; বাস, ওই পর্যন্ত।

সাবধান হয়েছে সরিয়াড়ির দিবাকর, আর বলাই নরেন ও পরেশ। দিবাকরের সন্দেহ, ওরা একটু বাড়াবাড়ি করবে বলে মনে হচ্ছে।— আত্রেয়ী শেষে ভয় পেয়ে আর রাগ করে রাস্তায় বের হওয়াই বন্ধ করে দেবে বোধ হয়।

অস্থায়ী পাগলের ঘুসি খেয়ে কপালে কালশিরে পড়েছে যার, সেই নরেন ওই কাল-শিরের জন্যে একটুও দুঃখিত নয়। পাগলের ঘুসির আঘাত নরেনের মানে লাগেনি। কিন্তু ফণী মিত্রের গাড়ির হর্ন, যার শব্দ শুনে চমকে উঠে রাস্তার এক পাশে সরে গিয়েছে আত্রেয়ী, সেই হর্ন যেন সরিয়াড়িকে অপমানিত করবার একটা দুঃসাহসের উল্লাস। দৃশ্যটা সেদিন একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজেরই চোখে দেখতে পেয়েছিল নরেন।

নরেন বলে—আত্রেয়ীদি একবার বললেই তো পারেন। তারপর দেখে নেব, ফণী মিত্রের গাড়ির হর্ন কেমন করে বাজে?

দিবাকর বলে—আত্রেয়ী অবিশ্যি ওদের ফাজিলামিকে গ্রাহ্যই করে না। একবার তাকিয়েও দেখে না। নিজের মনেই হাসতে হাসতে চলে যায়।

বলাই বলে—তাই ভাল; আত্রেয়ী ওদের ঘেন্না করে হেসে হেসেই উড়িয়ে দিক। ওরা ওতেই সব চেয়ে বেশি জব্দ হবে।

দিবাকর—তা তো হবে; কিন্তু ওদের আর-একটু শক্ত শিক্ষা পাওয়া উচিত ছিল।

পরেশ—গোষ্ঠকাকা কী বললেন?

দিবাকর হেসে ফেলে।—গোষ্ঠকাকা বললেন, না গোলমাল করবার কোন দরকার নেই। আত্রেয়ী তো কণিকা ভরদ্বাজ নয়; টলমলে স্বভাবের মেয়েও নয়।

অস্থায়ীরা সে-খবর রাখে না; কিন্তু স্থায়ীদের কে না জানে যে, আত্রেয়ী একটি অটলতা। আত্রেয়ীর একুশ বছর বয়সের জীবনের সব ইতিহাস জানেন যাঁরা, যেমন চিনুর পিসিমা আর সন্তুর মা; তাঁরাও বলবেন, আত্রেয়ী একটি অটলতা।

খোঁড়া মানুষ প্রদোষ সরকার এক পায়ে হাঁটতে গিয়েও টলেন না। ষাট বছর বয়সের মানুষটির হাতের পেশীতে পুরনো জিম-নাস্টিকের দান, সেই শক্ত-পোক্ত বাঁধুনি এখনো এমন কিছু নেতিয়ে পড়েনি। তাঁরই তো মেয়ে আত্রেয়ী। মেয়েটার ভাগ্যটাই হঠাৎ পড়ে গিয়ে একটু খোঁড়া হয়েছে, এই মাত্র। কিন্তু সেজন্যে আত্রেয়ীর প্রাণটাও টলে মলে যেখানে-সেখানে যার-তার কাছে পড়ে যাবে, তেমন প্রাণই তৈরী করেনি আত্রেয়ী। আত্রেয়ীর কথা সরিয়াড়ির স্থায়ীদের জীবনের গল্পের আসরেও যেন একটা অটল গর্বের কথা।

কিন্তু একটি মাস পার হয়ে গেলেও দেখা যায়, হাওয়া-বদলের আনন্দের কয়েকটা গাড়ি প্রদোষ সরকারের বাড়ির সামনের ছোট রাস্তাতে বড় বেশি ছুটোছুটি করে। অন্নদা কিণ্ডারগার্টেনের সামনের রাস্তাতেও দু তিনটে জটলা মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আর অনেক হাসাহাসি করে।

একটি গাড়ি একদিন সন্ধ্যায় প্রদোষ সরকারের বাড়ির সামনেই হঠাৎ থেমে যায়। গাড়ি থেকে নামেন যিনি, খাকি জিনের ব্রিচেস পরা আর হাতে রাইফেল, অল্প-বয়সের এক সৌখীন শিকারী ভদ্রলোকের মূর্তি। তিনি চাকর রামুয়ার দিকে হাত নেড়ে ইসারা করেন—এক গেলাস জল।

ঘরের ভিতরে বসেই শুনতে পায় আর দেখতে পায় আত্রেয়ী, জল খেয়ে নিয়েই ভদ্রলোক কেমন যেন জড়ানো স্বরে রামুয়াকে বলেন—বাহবা বাহবা! সরিয়াড়ির জল! কোথায় লাগে হুইস্কি!

বিড়াল ছানা নিজের লেজের সঙ্গে খেলা করছে দেখতে পেয়ে চিনু যেমন চেঁচিয়ে

হেসে ওঠে, আত্রেয়ীর মুখেও তেমনই একটা হাসি চেঁচিয়ে উঠতে চায়। ভিতরের ঘরে গিয়ে কাকিমার সংগে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে আত্রেয়ী—এবার সরিয়াডিতে কত অদ্ভুত রকমের মানুষ এসেছে, কাকিমা।

আরও অদ্ভুত ব্যাপার; একদিন সকাল-বেলা অত বড় হাওয়াইয়ের নাগসাহেব নিজেই প্রদোষ সরকারের এই এত ছোট বাড়িতে হাজির হলেন। বারান্দার চেয়ারে বসা প্রদোষ সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ স্পষ্ট ভাষায় কয়েকটি কথা বললেন।—আমি শুনেছি, আপনি এখানকার খুব পুরনো লোক; আপনার অবস্থা ভাল নয়। আমার বাড়িতে রান্নার কাজের জন্য একটি মেয়ে চাই। কুড়ি টাকা মাইনে পাবে। কিন্তু চুরি-টুরির অভ্যেস যেন না থাকে।

প্রদোষবাবু ডাকেন—রামুয়া।

রামুয়া বলে—হ্যাঁ, রান্নার লোক পাওয়া যেতে পারে। লছমন ঠাকুর কাজ খুঁজছে।

—নো! নো লছমন ঠাকুর। গম্ভীর স্বরে রামুয়াকে ধমক দিলেন নাগসাহেব।

অপ্রসন্ন ভাবে প্রদোষ সরকারের কাটা পায়ের দিকে যেন সামান্য একটা ভ্রূক্ষেপ করেই চলে গেলেন নাগসাহেব।

মিডনাপোরের জগৎ ব্যানার্জি একদিন সকালে রজনীধামের কাছে রাস্তার উপরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আত্রেয়ীকে দেখতে পেয়েই মাথার টুপি ছুঁয়ে সুপ্রভাত জানালেন। সংগে সংগে বলেও ফেললেন—আপনার বাবার সংগে একটু আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কখন......।

আত্রেয়ী বলে—বাবা সব সময়েই বাড়িতে থাকেন। যখন ইচ্ছে হয় গেলেই দেখা পাবেন।

এগিয়ে যায় আত্রেয়ী। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয়। সাইকেল থেকে নামছেন দিবাকরদা।

দিবাকরের চোখের ভংগীটা বেশ শক্ত, আর বেশ শক্ত স্বরে যেন দাঁত চিবিয়ে কথা বলে দিবাকর—কি রে আত্রেয়ী? কেমন আছিস?

আত্রেয়ী হাসে—খুব ভাল আছি দিবাকর-দা। বউদি কেমন আছেন?

—হঠাৎ দেখা হলো বলে বউদির কথা জিজ্ঞেসা করছিস, কেমন? গিয়ে দেখে এলি না তো একটি দিনও।

—যাব, নিশ্চয় যাব।

—আজকাল আর রাত জেগে সেলাই-ফোঁড়াই করে না তোর বউদি। চোখে ভালই দেখতে পাচ্ছে। সে কথা থাক, আমি জানতে চাই, ওই সাহেবটিকে তুই চিনিস নাকি?

—না।

—লোকটা কি বললে তোকে?

—বাবার সংগে আলাপ করতে চান।

—আচ্ছা! ঠিক আছে! যা, তুই তোর কিণ্ডারগার্টেন করগে যা। আমি চলি।

বিড়বিড় করে যেন একটা রাগ চাপতে চেষ্টা করেই সাইকেলে উঠে পড়ে দিবাকর।

গোষ্ঠবাবু বললেন—একটু ওয়াচ করো, বাস, আর বেশি কিছু করতে হবে না।

হাবুলবাবু বলেন—সামান্য কারণে গোল-মাল বাধিও না, দিবাকর। অসহ হলে আত্রেয়ী নিজেই বলবে; তখন না হয়......।

পরেশ বলে—ওসব মতলবকে আত্রেয়ীদি নিজেই লাথি মেরে সরিয়ে দিতে জানেন।

সেকথা সবাই জানে, দিবাকরও জানে। সেকথা সরিয়াডির প্রাণের একটি কঠিন ও অনাহত বিশ্বাস। তবু, দিবাকর মনে করে, আত্রেয়ীর মত মেয়ের সংগে ওরকম ছোটলোকের মত ব্যবহার করা ওদের পক্ষে একটুও উচিত হচ্ছে না। একদিন, অন্তত একটিবার, অন্তত একজনকে একটু টিপুনি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেই ভাল হতো; তাতে অন্যগুলোও সাবধান হয়ে যেত।

হাবুলবাবু বলেন—যা ভাল মনে কর, তাই কর। তবে তোমরাও বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলো না।
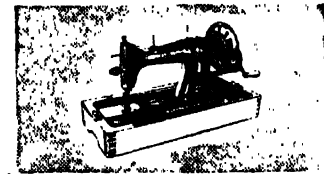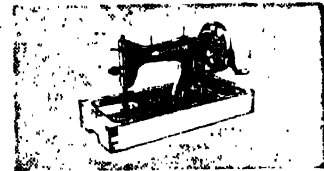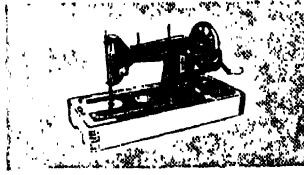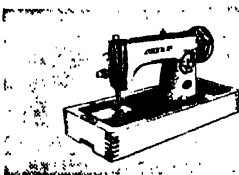
খেলার মাঠের উপর একদিন বিকেলের রোদে পাখা নরম করে নিয়ে মহাদেও পাঁড়ের পায়রার ঝাঁক যখন অলস ফূর্তির মত শুধু উসখুস করছে, তখন প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেশ ব্যস্তভাবে চা খায় দিবাকর।—তোর বউদি অনেক করে বলেছে, একবার দেখা করে আসিস। গেলে লাউয়ের পায়েসও খেতে পাবি।

চা খেয়ে নিয়ে চলেই যাচ্ছিল দিবাকর, কিন্তু হঠাৎ শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হয়; হাওয়া বদলের একটি মানুষ বেশ প্রসন্নভাবে আত্রেয়ীদের বাড়ির ফটকের তিনকাঠের বেড়াটাকে এক ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে, এই দিকেই আসছেন। না, আর চুপ করে থাকবার কোন মানে হয় না। আত্রেয়ী বলুক আর না-ই বলুক, এই লোকটিকে একটু টিপ্পনি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সরিয়াডি তোমাদের ফুর্তির রেস্টুরেন্ট নয়।

বারান্দার উপর এসে দাঁড়ালেন আগন্তুক ভদ্রলোক। দিবাকরের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও করলেন না। সোজা আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বললেন আর হাসলেন—চিনতে পারছেন তো?

আত্রেয়ীর চোখ দুটোও যেন হঠাৎ বিস্ময়ে চমকে গিয়ে জ্বলজ্বল করে।—ও, আপনি? চিনেছি বইকি। বসুন।

হাত বাড়িয়ে চেয়ারের হাতলটাকে ছুঁয়ে আস্তে একটা টান দেয় আত্রেয়ী।

আগন্তুক বলে—মঞ্জুর বেশ একটা অসুখ গেল।

আত্রেয়ী বলে—তাই বলুন; আমি তো ভেবেই পাইনি, আসবো বলেও মঞ্জুদি কেন আসতে পারলেন না।

—আসবার উপায় ছিল না মঞ্জুর। সেই ভোরেই তিনবার বমি করে শুয়ে রইল।

—আপনি তো একবার এসে খবরটা দিয়ে যেতে পারতেন।

—আমি? হ্যাঁ, আমি অবিশ্যি চেষ্টা করলে একবার আসতে পারতাম। যাই হোক, আপনার ফুল তো ঠিক সময়েই পেয়ে গেছি।

ভদ্রলোকের মুখের ঝকঝকে হাসির সঙ্গে তাঁর চশমার কাচও যেন ঝকঝক করে হাসতে থাকে।

আত্রেয়ী—মঞ্জুদির অসুখ শিগগির সেরে যাবে নিশ্চয়?

—হ্যাঁ, এখন সারবার দিকেই চলছে; কিন্তু ভয়ানক রেস্টলেস স্বভাবের মেয়ে তো। আপনাকে দেখবার জন্যে ছটফট করছে। কিন্তু আপনি কি যেতে পারবেন?

আত্রেয়ী—পারবো বইকি। মঞ্জুদিকে বললেন, আমি একদিন......।

—যদি কোন অসুবিধে না থাকে, তবে এখনই চলুন না? আমার সঙ্গেই চলুন।

এইবার দিবাকরের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক আরও স্নিগ্ধ স্বরে কথা বলেন—আমি নিখিল সেন। দাদার অসুখ, তাই তাঁকে নিয়ে এখানে এসেছি। অন্তত দু মাস থাকবো ইচ্ছে। বউদি আর আমার বোন মঞ্জুর ইচ্ছে এখানে সারা বছরটাই থাকে; এই কদিনের মধ্যেই সরিয়াডিকে ওদের এত ভাল লেগে গিয়েছে। আপনি বোধহয়...।

আত্রেয়ী—ইনি দিবাকরদা।......আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনি আসছি।

ঘরের ভিতরে গিয়ে কাকিমাকে জিজ্ঞেস করে আত্রেয়ী—যাব?

কাকিমা—যা তাহলে; মেয়েটি যখন এত করে ডাকছে।

ঘরের বাইরে এসে নিখিলের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ী একটু ব্যস্তভাবেই বলে—চলুন।

নিখিল সেনের সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতেই লতা থেকে পট পট করে কিছু ফুল তুলে নেয় আত্রেয়ী। তারপর আর দেরি হয় না। শ্রীলেখা কটেজের নিখিল সেন আর আত্রেয়ী যখন ফটক পার হয়ে রাস্তার অনেক দূরে চলে যায়, তখন একহাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে আর খুব আস্তে আস্তে হেঁটে দিবাকরও প্রদোষ সরকারের এই বাড়ির ফটক পার হয়ে চলে যায়।

আত্রেয়ী বলে—আমারও এই কদিন ধরে প্রায় রোজই মঞ্জুদির কথা মনে পড়েছে।

নিখিল হাসে—সেটা তো বেশ বুঝতেই পারছি। তা না হলে কোথাকার কে মঞ্জু আপনাকে দেখবার জন্যে ছটফট করছে, শোনা মাত্র আপনিও তাকে দেখবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠবেন কেন?

আত্রেয়ী—মঞ্জুদি নিশ্চয় অনেক লেখাপড়া করেছেন।

নিখিল—তিনবার বি-এ ফেল করেছে; কিন্তু সেজন্যে ওর মনে কোন আক্ষেপ কি লজ্জা-টজ্জা আছে বলে মনে হয় না।

আত্রেয়ী—ভালই তো।

নিখিল—তা একরকম ভালই।

রজনীধাম পার হয়ে বড় রাস্তায় উঠতেই আত্রেয়ী কুণ্ঠিতভাবে হাসে আর আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে।—আপনি একটু আস্তে হাঁটুন।

নিখিল—ও, হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমি খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছি; তাই না? কিন্তু আপনিও যেন একটু বেশি আস্তে হাঁটছেন।

আত্রেয়ী—হ্যাঁ, আমি ভুল করে......।

নিখিল—কি?

কুণ্ঠার হাসিটাকে জোর করে চাপতে চেষ্টা করে আত্রেয়ী, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। হাসিটা যেন ভাঙ্গা ঢেউয়ের জলের শব্দের মত কলকল করে গড়িয়ে যেতে চায়।—তাড়াতাড়িতে ভুল করে ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়ে বের হয়ে পড়েছি।

নিখিলও চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—বেশ করেছেন। এখন তাহলে খুব আস্তে আস্তেই হাঁটা যাক।

ঘোষ হাউসের দালানের ছায়া পার হয়ে, মায়াভিলার রেলিংয়ের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার পর নিখিল এইবার হাঁপ ছাড়ে আর হেসেও ফেলে—দেখছি, আস্তে আস্তে হাঁটাও কম সাংঘাতিক ব্যাপার নয়।

ওয়েলকাম আত্রেয়ী। ফার্স্ট লেডি অব সরিয়াডি; আসুন আসন গ্রহণ করুন

এইবার একটা ছোট মাঠ ডিঙিয়ে গেলেই হয়; তারপর শ্রীলেখা কটেজকে খুব কাছেই দেখতে পাওয়া যাবে।

আত্রেয়ী বলে—আমাদের চাকর রামুয়া ভুলেই গেছে কোথায় ওর দেশ।

নিখিল—আমাদের দশাও প্রায় তাই; শুধু শুনেছি দেশ হলো পাবনা; কখনো চোখে দেখিনি। এখন আমরা কলকাতারই মানুষ।

না আর হাঁটতে হবে না। শ্রীলেখা কটেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে, এক হাতে একটা রুমাল দুলিয়ে, আর সেই সঙ্গে নিজেরও সারা শরীরটাকে দুলিয়ে হাসছে আর ডাকছে মঞ্জু—ওয়েলকাম আত্রেয়ী। ফার্স্ট লেডি অব সরিয়াডি; আসুন, আসন গ্রহণ করুন।

আত্রেয়ীকে হাত ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল মঞ্জু।—ডাক্তার এখনও বাড়ির বাইরে যেতে অনুমতি দিচ্ছে না। তাই, বাধ্য হয়েই তোমাকে ডাকতে হলো। তোমাকে না দেখে দেখে সত্যিই আমি হাঁপিয়ে উঠেছি, আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—আপনি সেদিন......।

মঞ্জু—চুপ।

আত্রেয়ী—তুমি সেদিন সত্যিই এলে না দেখে আমারও বেশ ভাবনা হয়েছিল।

—কিসের ভাবনা?

—মনে হয়েছিল, চলেই গেল নাকি মঞ্জু।

—না, চলে যাইনি। দু' মাস পরেও যাব কিনা সন্দেহ।

আত্রেয়ীর চোখ আরও খুশি হয়ে হেসে ওঠে।—খুব ভাল হয় তাহলে। অন্তত ছটা মাস থাকো। চিরকালই থেকে যাও না কেন?

শোনা যায়, পাশের ঘরে কে একজন ডাকছেন—প্রীতি, প্রীতি, কই তুমি? মেয়েটিকে একবার আমার কাছে নিয়ে এস। আমিও একটু দেখি।

মঞ্জু বলে—বড়দা তোমাকে দেখতে চাইছেন।

প্রীতি বউদি এসে আত্রেয়ীকে ডাকেন—তুমি এক মিনিটের জন্য একটু ওঘরে চল আত্রেয়ী; উনি তোমাকে দেখতে চাইছেন। বাতের রোগী, নিজে উঠে আসতে পারেন না।

দু' পায়ে উলের মোজা; চেয়ারের উপর বসে আছেন মঞ্জুর বড়দা অখিলবাবু। পা দুটো সামনের একটা টুলের উপর তুলে রেখেছেন। আত্রেয়ী সামনে এসে দাঁড়াতেই অখিল সেন বলেন—পা অচল হয়ে গেলে মানুষের যে কী কষ্ট; সেটা আমি মর্মে মর্মে বুঝতে পারি। হ্যাঁ, তোমার কথা বাণীদিদির কাছ থেকে সবই শুনেছি। হেসে খেলে খুশি হয়ে থাকো; কি আর করবে বল? আত্রেয়ীকে চা খাওয়াও, প্রীতি।

প্রীতি বউদি চা তৈরী করতে চলে যান। আত্রেয়ীকে নিয়ে মঞ্জুও চলে যায়। ঘরের ভিতরে গোলমাথা ছোট একটা টেবিল; সেই টেবিলের রেশমী ঢাকনার দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর চোখ দুটো কিছুক্ষণ অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে।—এ নিশ্চয় তোমার হাতের কাজ, মঞ্জু?

মঞ্জু—হ্যাঁ। কিন্তু এর মধ্যে এত আশ্চর্য হয়ে দেখবার কি আছে?

আত্রেয়ী—ঝালরটা কি করে এত চমৎকার হলো, কি করেই বা লাগালে, বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে চাও?

—নিশ্চয়।

—এখনই?

—হ্যাঁ।

বুঝে নিতে পাঁচ মিনিটেরও বেশি সময় লাগে না আত্রেয়ীর। ঝালরটা জোড়া দেওয়া

কোন ব্যাপার নয়; কাপড়টারই বর্ডারের দশটা করে ঘরের সুতো তুলে নিয়ে একটা করে নট।

মঞ্জুর গলার মাফলারের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ী আবার চোখ বড় করে। মঞ্জু হাসে—বুঝতে পারছো, প্যাটার্নটা?

আত্রেয়ী—না, একটু গোলমেলে ঠেকছে।

মঞ্জু—আজ থাক্; কাল বুঝিয়ে দেব।

আত্রেয়ী—এ ছাড়া আরও কিছু যদি......।

মঞ্জু—আছে আছে, অনেক আছে। আমার গান আছে; যেদিন খুশি সেদিনই শুনতে পাবে। এক টিন চকোলেট আছে, যখন ইচ্ছে তখনই খেতে পাবে। চারটে অ্যালবাম আছে, যখন মনে হবে তখনই দেখতে পাবে। এত ঘুষ কবুল করছি; সত্যি রোজ একবার এসো কিন্তু, আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী হাসে—আসবো বইকি; কিন্তু এত শেখা দেখা শোনা আর এক টিন চকোলেট খাওয়া কি ছ' মাসেও ফুরোবে?

মঞ্জু—না ফুরোলে আরও ছ' মাস থাকবো। না হয়, ছ' মাস পরে আবার আসবো।

প্রীতি বউদি চা নিয়ে ঘরে ঢোকেন। মঞ্জু বলে—বিপদে পড়েছি আমি। বউদি তো বাইরে বের হতেই চান না, আর...।

প্রীতি বউদি—তুমিই বল আত্রেয়ী, পঙ্গু মানুষকে ঘরে ফেলে রেখে আমি কি করে বাইরে ধেই ধেই করে বেড়াই?

মঞ্জু—ইনি বেড়াবেন না; আর মেজদা যদিও বা কখনো বেড়াতে বের হন, তবে আমাকে সঙ্গে নেবেন না।

আত্রেয়ী—কেন?

মঞ্জু—আমার অপরাধ, আমি বেশি কথা বলি।

প্রীতি বউদি—আমি তো কতবার বলেছি, কারও সঙ্গে যাবার দরকার নেই, তুমি একা নিজেই রোজ একটু বেড়িয়ে এলেই পার।

মঞ্জু—আমিও তো তোমাকে কতবার বলেছি বউদি, সেটা সম্ভবই নয়। আমি কারও সঙ্গে কথা না বলে বলে বেড়াতেই পারি না। বুঝলে মঞ্জু, এই হলো আমার বিপদ। কিন্তু তোমাকে পেয়ে মনে হচ্ছে; বিপদ কেটে গেল। রোজ একবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ধানোয়ার রোড ধরে......।

আত্রেয়ী—বেশ তো; আমারও অসুবিধের কি আছে? সকালবেলার দিকে অবিশ্যি...।

মঞ্জু—জানি, সকালবেলা তোমার কিন্ডার গার্টেন আছে। কিন্তু দুপুরে বিকেল আর সন্ধ্যা তো আছে। তা ছাড়া ভোর আছে, গোধূলি আছে, কোকিলডাকা রাত আছে। বেড়ালেই তো হলো। চার প্যাকেট চকোলেট সঙ্গে নিয়ে......।

প্রীতি বউদি—এই তো! তুমি এত কথা বলেই তো মানুষকে ভয় পাইয়ে দাও।

আত্রেয়ী—আমি একটুও ভয় পাইনি বউদি। আপনি মঞ্জুকে বকবেন না।...আজ এখন আসি তবে, বউদি। আসি মঞ্জু।

গল্প করতে করতেই চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে আত্রেয়ীর; মঞ্জুর সঙ্গে অনেক চেনা-শোনাও হয়ে গেল। আজকের মত এখন এখানেই একটি খুশির হাসি রেখে দিয়ে আর একটি খুশির হাসি মুখে নিয়ে চলে যেতে চায় আত্রেয়ী। প্রীতি বউদিও বলেন—আচ্ছা, এস তবে।

কিন্তু আরও একটু দেরি করতে হলো। মঞ্জুর সঙ্গে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে এসেই দেখতে পায় আত্রেয়ী, মঞ্জুর মেজদা নিখিলবাবু দু' হাতে তিন চারটে কাগজের ঠোঙা আর প্যাকেট হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে হেঁটে আসছেন। এরই মধ্যে কোথায় গিয়েছিলেন নিখিলবাবু? বাজারে? কিসের জন্যে?

আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে নিখিল বলে—এ কি, আপনি এরই মধ্যে চলে যাচ্ছেন যে!

মঞ্জু—এ সব কি নিয়ে এলে মেজদা?

নিখিল—কিছু ফল আর খাবার।

মঞ্জু—কেন?

নিখিল—কেন মানে কি? বুঝিয়ে বলতে হবে? তোর কমনসেন্সে কি বলে?

মঞ্জু—কিন্তু আমাদের একটু বলে যেতে হয়! আমরা জানবো কি করে যে, তুমি খাবার আনতে বের হয়েছ? আমরা তো আত্রেয়ীকে চা জেলি আর ডালমুট খাইয়ে দিয়েছি।

নিখিল—তবে কি এ সব জিনিস ফেলা যাবে?

গোলমাল শুনে ঘরের ভিতর থেকে প্রীতি বউদি বের হয়ে আসেন।—ফেলা যাবে কেন? থাকবে; কেউ না কেউ খাবেই।

নিখিল—ঠিক আছে; খেও তোমরা। কিন্তু সেটাও একরকম ফেলে দেওয়াই হলো।

মঞ্জু এইবার আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।—আত্রেয়ী; বিপদ থেকে বাঁচাও। একটু বসো; কিছু খেয়ে যাও।

আত্রেয়ীকে আরও পনর মিনিট বসতে হলো। নতুন করে খাবারও খেতে হলো। আর মন-প্রাণ খোলা এক অদ্ভুত মেজাজের মানুষের একটা অদ্ভুত কথাও কানে শুনতে হলো। পাশের ঘর থেকে নিখিলবাবু চেঁচিয়ে বলছেন।—তালশাঁসটা ভাল করে ধুয়ে নিও, বউদি।

এ ঘরে প্রীতি বউদি ফিসফিস করেন।—এমন তালশাঁস আমি জীবনে দেখিনি। যেমন শক্ত, তেমনই নোংরা আর তেমনই...। খাবে নাকি আত্রেয়ী?

আত্রেয়ী হাসে—দিন।

না, আর দেরি হয় না। দেরি হবার আর কোন কারণ নেই। শ্রীলেখা কটেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে মঞ্জু; মায়া-ভিলার রেলিংয়ের লতাবীথির কাছ ঘেঁসে ঘেঁসে চলে যাচ্ছে আত্রেয়ী। তারপর আর দেখা যায় না; বাঁ দিকের রাস্তাটাতে হঠাৎ ঘুরে গিয়েছে আত্রেয়ী।

রাস্তা ঘুরতে গিয়েই আত্রেয়ীর এই এক মনে পথচলার মাস্তো হঠাৎ একটা শব্দের আঘাত পেয়ে চমকে ওঠে। সরিষাড়ির নীরবতার বুকের ভিতর থেকে হো হো করে অদ্ভুত স্বরের একটা হল্লা ছুটে বের হয়েছে।

নাই তো! এ পাড়াতে এসে এ আবার কী কাণ্ড করছে সন্তুটা! একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে, সবার আগে সন্তু; রাস্তার পাশের নালাটার দিকে ঢেলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে সন্তু—মার মার!

সন্তুর ওই কচি চোখমুখে কী কঠিন আক্রোশ!—কি করছো সন্তু? ডাক দেয় আত্রেয়ী।

—চোর, চোর, পালিয়ে যাচ্ছে, সরে পড়তে চেষ্টা করছে। বলতে বলতে আর ঢেলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটতে থাকে সন্তু। আত্রেয়ীর কথার শব্দ সন্তুর কানে পৌঁছেছে বলে মনে হয় না।

সেই মুহূর্তে, সন্তুর আক্রোশের হেতুটাকে হঠাৎ চোখে দেখতে পেয়েই হেসে ওঠে আত্রেয়ী। এই ব্যাপার? এর জন্যে সন্তুর এত রাগ? নালার জল থেকে ছোট একটা পুঁটি মাছকে মুখে তুলে নিয়ে একটা ঢোঁড়া সাপ ছটফটিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সন্তু ওকে পালাতে দেবে না।

সন্তুকে আর মানা করে লাভ নেই। ডাকলেও ক্ষান্ত হবে না সন্তু। ঢোঁড়াটাকে তাড়া করে করে সন্তু আর বাচ্চাদের দল ছুটেই চলেছে।

সন্ধ্যে হতে এখনও বেশ দেরি আছে। ছেঁড়া চটির জন্যে তাড়াতাড়ি হাঁটা যায় না। দরকারও নেই। নয়াপাড়ার রাস্তা ধরে একটু ঘুরে গেলেও চলতে পারে।

পটলবাবুর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই আত্রেয়ীর খুশি চোখের দৃষ্টিটা আবার চমকে ওঠে। কি হলো পটলকাকার?

মস্ত বড় একটা লাঠি হাতে করে বাড়ির

বারান্দা থেকে যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, আর গেটের কাছে ছুটে এসে মেহেদির বেড়াটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন পটলবাবু। আদুড় গা, গামছা-পরা পটলবাবুর হাতের লাঠিটা যেন কারও মাথায় বাড়ি দেবার জন্য ছটফট করছে।

আত্রেয়ীকে দেখতে পেয়েই কথা বলেন পটলবাবু।—কেমন আছিস আত্রেয়ী?

আত্রেয়ী—ভাল।

পটলবাবু—কিন্তু......।

মেহেদির বেড়ার পাতার ফাঁকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে পটলবাবুর চোখের রাগ তেমনই কটমট করে কাকে যেন খুঁজতে থাকে।—যখন-তখন খক্‌খক্‌ খক্‌খক্‌! এ শালা তক্ষক কাশছে না হাসছে, কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু আমি এটাকে না মেরে...।

লাঠিটাকে বাগিয়ে ধরে আবার এক লাফে মেহেদির বেড়ার ওদিকে চলে গেলেন পটলবাবু।

হেসে ফেলার ভয়ে শাড়ির আঁচলের একটা কোণ মুখের কাছে তুলে ধরে আত্রেয়ী। মুখের হাসিটা কোনমতে চাপা পড়লেও চোখের হাসিটা উথলে উঠতে থাকে।

আত্রেয়ী—চলি পটলকাকা; কাকিমা এখন রোধ হয়......।

পটলবাবু—কাকিমার এখন ঘুমোনো হবে। পরে একদিন আসিস। হোই হোই হোই। তক্ষক মারবার জন্যে মেহেদির বেড়ার উপর লাঠি তুলে দৌড়তে থাকেন পটলবাবু।

বাড়ির কাছে এসেই আস্তে একটা ক্লান্তির হাঁপ ছাড়ে আত্রেয়ী, কিন্তু চোখের আর মুখের হাসিতে একটুও ক্লান্তি নেই। দেখতে পায় আত্রেয়ী, কাকিমা বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছেন।

কাকিমা বলেন—এত দেরি হলো যে!

আত্রেয়ী—দেরি? দেরি কোথায় দেখলে? যা ভেবেছিলাম কাকিমা, মজুরা সবাই সত্যিই খুব ভাল।

কত দিন কেটে গেল [illegible]। শ্রীলেখা কটেজে প্রায় রোজই আসে আত্রেয়ী। মঞ্জুও গান শোনাতে ভুলে যায় না। আর আত্রেয়ীও গান শুনে এমন মুগ্ধ হয়ে যায় যে চোখের পাতা যেন ঘুম ঘুম আবেশে ভারী হয়ে আসে।

মঞ্জু হাসে—না, আর নয়। ঘরের ভিতরে ঠুঁটো হয়ে বসে আর গাইতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু বুঝতে পারছি না, আর কতকাল রইব বসে।

আত্রেয়ী—ডাক্তারকে বলেছ?

হ্যাঁ, অনেকবার ডাক্তারকে বলেছে মঞ্জু।—আর মিছে কত পথ চাওয়াবেন ডাক্তারবাবু? আমার পায়ে যে মরচে ধরে গেল। বাইরে বের হব কবে?

মঞ্জুর ছটফটে ভাষার কথা শুনে হেসে ফেলেছেন বুড়োমানুষ মল্লিক ডাক্তার।—আরও কিছুদিন ধৈর্য ধর মা।

মনের অনেক জোর খাটিয়ে ধৈর্য ধরে রাখতে চেষ্টা করছে মঞ্জু। কিন্তু আত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে এই ধৈর্যের ভাষাটা যেন হতাশ হয়ে যায়।—কবে যে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হব? কবে যে তিরছি নদীর ধারে একটি পাথরের ওপরে দুজনে বসে থাকবো?

ওঘরে বড়দা বসে থাকেন; বারান্দায় মেজদা ঘুরে বেড়ান, আর প্রীতি বউদি তো যখন-তখন এঘরে আসছেন; আত্রেয়ীর সঙ্গে নিরিবিলি দুটো কথা বলতে অনেক অসুবিধে আছে।

একবার মঞ্জুকে অনুমতি দিয়ে ফেলুন ডাক্তার মল্লিক; তারপর আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে একদিন বের হতে হবে। ধানোয়ার রোড ধরে হেঁটে যতদূর খুশি এগিয়ে যেতে হবে। রোদ যদি বেশি কড়া হয়, তবে একটি শালের ছায়াতে বসতে হবে। জায়গাটি বেশ নিরিবিলি হবে, কাছে কেউ থাকবে না। শুধু দু'একটা ফড়িং উড়বে ফুরফুর করে, আর ঘাসের বীজের দানা খুঁটে খুঁটে খাবে।

তখন আর আত্রেয়ীকে না বলে থাকতে পারবে না মঞ্জু; আমার এই ছটফটে খুশির শরীরের এক জায়গায় একটি চমৎকার টিউমার আছে, আত্রেয়ী। কিন্তু সে এখনও জানে না; সে বেচারা আশা করে আছে যে, একদিন আমি তার কাছে যাব। কিন্তু তা তো সম্ভব নয় আত্রেয়ী। তার সঙ্গে আমার বিয়ে হলেও তাকে ঠকতে হবে। তার কোন লাভ হবে না।

হ্যাঁ, অপারেশন হতে পারে। ডাক্তার বলেছেন, একদিন তাই করতেও হবে। কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করে শুনতেও পেয়েছি আত্রেয়ী, সেই অপারেশন আমার টিউমার তুলতে গিয়ে আমার প্রাণটাকেই শেষ করে দিতে পারে। কাজেই, এখন বুঝতে পারছো তো আত্রেয়ী, আমার এদিক-ওদিক কোনদিকই নেই।

তা একরকমের মন্দ নয় আত্রেয়ী। এখন টিউমারটাই আমার ভরসা। যতদিন এটা আছে, ততদিন সে বেচারাকে মাঝে মাঝে দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

হঠাৎ একদিন, যেদিন আত্রেয়ী ঠিক দুপুরবেলা শ্রীলেখা কটেজে এসে আর সামান্য কিছুক্ষণ মঞ্জুর সঙ্গে গল্প করেই চলে গেল, সেদিন মঞ্জুর মেজদা নিখিলও বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে মঞ্জুর কাছে একটা আক্ষেপের কথা বলেছে—তোর ডাক্তার শুধু তোকে নয়, এই মহিলাকেও বেশ জব্দ করে রেখেছে।

মঞ্জু—আত্রেয়ীর কথা বলছো?

নিখিল—হ্যাঁ।

মঞ্জু—আত্রেয়ীর জব্দ হবার কি হলো?

নিখিল—হলো না? মহিলা তোর সঙ্গে বেড়াবার ইচ্ছে নিয়ে রোজই আসছেন, অথচ তোকে এখনও বাইরে বের হবার অনুমতি দিচ্ছেন না ডাক্তার। মহিলাকেও রোজই ফিরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু এই মহিলারও তো এখন একটু হেসেখেলে বেড়ানোর দরকার ছিল।

ঠিকই বলেছে নিখিল। বীণাদির কাছ থেকে আত্রেয়ীর জীবনের যে দুঃখের কাহিনী শুনতে পাওয়া গিয়েছে; তাতে তো এই কথাই মনে হবে যে, শুধু একটা করুণ রিক্ততা হয়ে ঘরের কোণে পড়ে না থেকে, বাইরের আলো-বাতাসের সঙ্গে একটু মেলামেশা করা উচিত আত্রেয়ীর।

মনে মনে ঠিক করেই রেখেছে মঞ্জু, এইবার আত্রেয়ীকে বেশ একটু মিনতি করে আর বুঝিয়ে বলতে হবে—তুমিও আমার মত একটু ধৈর্য ধরে রাখ, আত্রেয়ী।

আজ রবিবার। সকাল বেলার চায়ের পালা শেষ হবার পর প্রীতি বউদি এখন বড়দার কাছে বসে গল্প করছেন। আজ আত্রেয়ীর কিণ্ডারগার্টেন নেই। সময় হয়ে এল, আর কিছুক্ষণ পরে আত্রেয়ী আসবে।

ঘরের ভিতরে বসেই বাইরের বারান্দার একটা হর্ষের শব্দ শুনে চমকে ওঠে মঞ্জু, ঠিকই, আত্রেয়ী এসেছে। মেজদার সঙ্গে কথা বলছে আত্রেয়ী।—আপনি কোথাও বের হচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে।

নিখিল বলছে—জিজ্ঞেস করি; আপনার কি বেড়াতে টেড়াতে একটুও ইচ্ছে করে না?

আত্রেয়ী—খুব ইচ্ছে করে।

নিখিল—তবে চলুন, আমিই আপনাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

আত্রেয়ী—কোথায় যাবেন?

নিখিল—তার কি কোন ঠিক আছে? যে-দিকে চোখ যায় সেদিকে যাব।

আত্রেয়ী হাসে—আপনি কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি হাঁটেন।

নিখিল—না, খুব আস্তে আস্তে হাঁটবো।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে মঞ্জু
—কোথায় চললে, মেজদা?

নিখিল—ঠিক নেই। ধানোয়ার রোড হতে পারে, তিরছি নদীও হতে পারে, শালবনও হতে পারে।

মঞ্জু—আত্রেয়ীকে সংগে টানছো কেন?

নিখিল—ইচ্ছে হলো। হ্যাঁ, উনি যদি হাঁটতে ভয় পান, তবে অন্য কথা।

মঞ্জু হাসে—আত্রেয়ী কি বলে?

আত্রেয়ী—হাঁটতে ভয় পাই না। কিন্তু...।

মঞ্জু—কি?

আত্রেয়ীর চোখের দৃষ্টিটা যেন কাঁচুমাচু হয়ে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে।—আমার কেমন যেন লাগছে।

মঞ্জু হেসে ফেলে—তার মানে?

আত্রেয়ী—লজ্জা করছে।

হেসে ফেলে নিখিল—এমন লজ্জার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া, আমার সংগে লজ্জা করবার আরও মানে হয় না।

নিখিলের গলার স্বরে এক আসাধারণ শান্ত ও বলিষ্ঠের করুণাকোমল মনটাই হেসে ফেলেছে। মানুষ চিনতে পারে না, তাই নিখিলের অনুরোধের মনটাকেও চিনতে পারছে না আত্রেয়ী। ছোট শহর সরিয়াডির মনই বোধহয় যত ছোট ছোট ভয়ে ভরা মন; তা না হলে বুঝতে পারতো আত্রেয়ী; নিখিলের জীবনের কোন ইচ্ছার জন্যে নয়, আত্রেয়ীরই দুঃখের জীবনের জন্য একটা সমবেদনার ব্যাকুলতা আত্রেয়ীকে বেড়াতে যেতে ডাকছে।

বলেই ফেলে নিখিল—আমি আমার কোন সুবিধের জন্য নয়; আপনারই......।

আত্রেয়ী—বুঝেছি; আপনি আর কিছু বলবেন না। চলুন। আসি মঞ্জু।

মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়ে আত্রেয়ীর এই মিথ্যে লজ্জায় কুণ্ঠিত চোখের হাসিটাও এইবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মঞ্জু বলে—এস।

নিখিলের সংগে আত্রেয়ী, শ্রীলেখা কটেজের গেট পার হয়ে আর মাঠের পথ ধরে দুজনে চলে যাচ্ছে; বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর স্তব্ধ দুটো চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে মঞ্জু।

সেদিনও তো এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিখিল আর আত্রেয়ীকে একসংগে হেঁটে এই বাড়ির গেটে ঢুকতে দেখেছিল মঞ্জু; কিন্তু সেদিন মঞ্জুর চোখে এরকমের স্তব্ধতা ছিল না। মঞ্জুর চোখ হেসে হেসে নেচে উঠেছিল।

প্রীতি বউদি ডাক দিয়ে বলেন—ওরা দুজনে সত্যিই কি বেড়াতে বের হলো, মঞ্জু?

—হ্যাঁ, বউদি।

অখিলবাবু বলেন—কে? কে? কারা দুজন বেড়াতে গেল?

প্রীতি বউদি—তোমার ভাই আর আত্রেয়ী।

অখিলবাবু—কেন? এর মানে কি?

প্রীতি বউদি—মানে আবার কি হবে?

অখিলবাবু—এসব অভ্যেস তো নিখিলের নেই। ও যে একা বেড়াতে আর একা থাকতেই ভালবাসে।

প্রীতি বউদি—সেই জন্যেই তো বলছি, কোন মানে হয় না।

মঞ্জু এসে বলে—মেজদা বোধ হয় রাগ করেই এই কান্ডটা করলো?

প্রীতি বউদি—কিসের রাগ? কার ওপর রাগ?

মঞ্জু—আমার ওপর। ডাক্তার আমাকে বাইরে যেতে দিচ্ছে না বলে আমিও আত্রেয়ীকে সব সময় এখানে আটকে রাখছি।

প্রীতি বউদি—কিন্তু সেজন্যে আত্রেয়ী তো কিছু মনে করেনি।

মঞ্জু—না; আত্রেয়ী কিছু মনে করেনি।

প্রীতি বউদি—তবে? তবু বেড়াতে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলো কেন আত্রেয়ী?

অখিলবাবু— ঠিকই বলেছ, কোন মানে হয় না।

প্রীতি বউদি—নিখিলকে জানি, ওর ব্যস্ত হওয়া আর না হওয়া দুই-ই সমান।

কিন্তু আত্রেয়ীর এত ব্যস্ত না হলেই ভাল ছিল।

চুপ করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবেন প্রীতি-বউদি—মেয়েটার জন্যে একটু মায়া হয় বলেই বলছি। তুমি শোন মঞ্জু, ডাক্তার বলুক আর না বলুক, তুমিই আত্রেয়ীকে সংগে নিয়ে কাছাকাছি একটু ঘুরে-ফিরে আসবে।

মঞ্জু—আমিও তাই ভাবছি।

ঘরের ভিতরে একটি চেয়ারে চুপ করে বসে থাকে মঞ্জু। চোখে পড়ে, উলের প্যাকেট আর এক জোড়া কাঁটা গোলমাথা ছোট টেবিলের উপরে পড়ে আছে। কথা ছিল, উলের ব্লাউজের গলার একটা নতুন ডিজাইনের ধরণগুলো আজ ভাল করে বুঝে নেবে আত্রেয়ী।

এখানে বসেই দেখতে পাওয়া যায়, নিখিলের ঘরের টেবিলে একগাদা কাগজপত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত লেখালেখি করে শেয়ারের যত পাওনা ডিভিডেন্ডের হিসেব করেছে নিখিল। কথা ছিল, আজ এজেন্ট অফিসের নামে তাগিদের যত রিমাইন্ডার ডাকে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু ভুল হবে না মেজদার। ঠিক সময়েই চিঠিগুলিকে ডাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে। মেজদা ভুল করে না। মেজদার ভুল হয় না। কিন্তু আত্রেয়ী কি...।

—আমার ভয়ানক বিচ্ছিরি লাগছে, বউদি। থার্মোমিটারটা দাও, টেম্পারেচার হয়েছে মনে হচ্ছে।

মঞ্জুর এই ব্যস্ততার ডাকের মধ্যে যেন একটা করুণ বিষাদের গুঞ্জন আছে।

প্রীতি বউদি থার্মোমিটার দিয়ে গেলেন। থার্মোমিটার কিন্তু বুঝিয়ে দেয়, কিছুই হয়নি।

বেশ তো? কিছুই হয়নি, হতে পারে না, হবেও না। তবু বেচারা আত্রেয়ীকে একটু বুঝিয়ে দিলেই বোধ হয় ভাল হয়।

ধুলো উড়িয়ে পর পর তিনটে মোটর লরি ছুটে আসছে। রাস্তার এক পাশে সরে দাঁড়ায় নিখিল আর আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী বলে—বুঝতে পারলেন, মোটর লরিগুলো কী জিনিস বয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

নিখিল—না।

আত্রেয়ী—ওদিকে কয়েকটা অভ্রের খাদ আছে। ওর মধ্যে একটা খাদ গোষ্ঠ-কাকার; আমি অনেকদিন আগে একবার খাদ দেখতে গিয়েছিলাম।

নিখিল—খাদের ভেতরে নেমেছিলেন?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ। খাদের কাজ দেখতে একটু ভয় ভয় করে ঠিকই; কিন্তু এক-একটা আওয়াজের পর যখন ফাটা পাথর ঝুপ করে পড়ে যায়, আর অভ্রের টিকুরি ঝিকঝিক করে ওঠে, তখন সত্যিই হাততালি দিয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে।

নিখিল—আপনিও তাহলে হাততালি দিয়ে হেসেছিলেন?

আত্রেয়ী—নিশ্চয়। শুধু আমি কেন? জয়া মাসিমা, বীণাদি, নয়াপাড়ার জেঠিমা, সবাই।

সড়কের পাশের ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে নিখিল বলে—ক্ষেতের জলে কিলবিল করছে, এগুলো কোন ছোটজাতের মাছ বোধহয়।

আত্রেয়ী—ব্যাঙাচি নয় তো?

নিখিল হাসে—না; ব্যাঙাচি আমি চিনি।

আত্রেয়ী—ক'দিন আগে নয়াপাড়ার নালাতে কোথা থেকে কয়েকটা পুঁটি মাছ চলে এসেছিল।

নিখিল—গত বছর বর্ষার সময় আমাদের চা বাগানের নালাতে প্রকান্ড একটা বান মাছ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। কুলিরা ওটাকে একটা অজগর মনে করে ধরতেই সাহস করেনি। শেষে গুলি করে মারা হলো।

আত্রেয়ী—আপনি শিকার করেন?

নিখিল—না: কেন জানি না, ওটা আমার একটুও পছন্দ হয় না।

আত্রেয়ী—আমারও। জয়ন্তকাকা একবার মস্তবড় একটা বাঘ মেরেছিলেন। চকচকে গা, লম্বা লম্বা ডোরা, বাঘটা দেখতে সত্যিই খুব......।

নিখিল হাসে—খুব সুন্দর ?

আত্রেয়ী—সত্যিই খুব সুন্দর ছিল। দেখলে আপনিও তাই বলতেন।

নিখিল—তারপর কি হলো ? মরা বাঘ দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন ?

আত্রেয়ী—না: কিন্তু জয়ন্তকাকাকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম।

—কি বলেছিলেন ?

—যা বলা উচিত, তাই বলেছিলাম। জঙ্গলের বাঘ জঙ্গলে ছিল, তাকে মারবার কী দরকার ছিল ?

নিখিল—কথাটা ভালই বলেছিলেন।

একটা বুড়ো বট গাছ, অনেক জটার ঝুরি ঝুলে রয়েছে। পাকা বটফল রাস্তার উপর ছড়িয়ে রয়েছে। আত্রেয়ী বলে—সন্ধ্যে হলেই এই বট গাছটা বাদুড়ে ভরে যায়।

নিখিল—তাও দেখেছেন ?

আত্রেয়ী—দেখবো না ? কতবার বিকেল-বেলা এদিকে বেড়াতে এসেছি। ফিরতে সন্ধ্যে হয়েছে: তখন দেখেছি কালো-কালো বাদুড় উড়ে আসছে আর ঝুপ ঝুপ করে গাছের মাথার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে।

একটু চুপ করে থেকেই হেসে ফেলে আত্রেয়ী—আমাদের রামুয়া একটা বাদুড়।

নিখিল—তার মানে ?

আত্রেয়ী—রামুয়া পাকা বটফল খায়।

নিখিল—আমি তাহলে কুমীর।

আত্রেয়ী—তার মানে ?

নিখিল—আমি মাছ খাই, কুমীরেও মাছ খায়।

আত্রেয়ী—কুমীর কিন্তু মাছ রান্না করে খায় না।

মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করে আত্রেয়ী। নিখিল বলে—হেসেই ফেলুন না কেন ?

আত্রেয়ী—এদিকে আর কতদূর যাবেন ?

নিখিল—বলুন তবে, কোন্ দিকে গেলে ভাল হয়।

আত্রেয়ী—কোনদিকে নয়, এখানেই দাঁড়ালে অনেক কিছু দেখতে পাবেন।

আত্রেয়ী হাত তুলে দেখিয়ে দিতে থাকে—ওই দেখুন, পরেশনাথকে কত কাছে মনে হচ্ছে। কিন্তু সত্যিই তো কাছে নয়। এখান থেকে একুশ মাইল।

নিখিল—জঙ্গলের মধ্যে ওটা একটা গির্জা বলে মনে হচ্ছে ?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ; ওখানে এক বুড়ো ফাদার থাকেন: আমরা বড়দিনের সময় কতবার ওখানে গিয়েছি। ফাদার খুব খুশি হয়ে আমাদের প্রত্যেককে একটা করে কমলালেবু দিতেন।

নিখিল—কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে ?

আত্রেয়ী—বলুন তো, কিসের শব্দ ?

নিখিল—বুঝতে পারছি না।

আত্রেয়ী—ওই যে দূরে, মাঠের উপর গরু চরছে দেখছেন, ওখান থেকেই এই শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে। গরুর গলার কাঠের ঘণ্টার শব্দ।

নিখিল হাসে—তাই বলুন; আমি ভাবলাম, কোথাও যেন একগাদা ডুগডুগি একসঙ্গে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে এসে একটা বুড়ো ভিখিরী নিখিল আর আত্রেয়ীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

আত্রেয়ী বলে—কেমন আছ জিতু ?

ভিখিরী বুড়ো হাত তুলে কথা বলে—জিতা হ্যায়, দিদি।

নিখিলের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ী বলে—ওঃ, কতদিন পরে জিতু বুড়োকে দেখলাম।

নিখিল—কতদিন পরে

আত্রেয়ী—অন্তত তিন বছর হবে।

নিখিল—বুড়ো বোধহয় আপনার কাছে কিছু চাইছে।

চমকে ওঠে আত্রেয়ী, হ্যাঁ, ঠিকই তো: জিতু বুড়ো আত্রেয়ীর মুখের দিকে কি-রকম যেন অদ্ভুত একটা খুশির চোখ তুলে তাকিয়ে আছে। আত্রেয়ী বলে—কি জিতু ?

জিতু বুড়ো বলে—হমার বকসিস দিজিয়ে।

চুপ করে, একেবারে নিথর হয়ে আনমনার মত দূরের গির্জাটার দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী। এত হাসিখুশি চোখ দুটোও হঠাৎ যেন চুপসে গিয়েছে। কিংবা পায়ে হঠাৎ কাঁটা ফুটেছে; নয়তো বেড়িয়ে ফেরার সব ব্যস্ততা হঠাৎ হোঁচট খেয়েছে। সত্যিই যে, একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে আত্রেয়ী।

—কি হলো ? জিজ্ঞেস করে নিখিল।

আত্রেয়ী বলে—আমার কাছে এখন পয়সা-টয়সা নেই।

—আমার কাছে আছে। পকেট থেকে একটা সিকি বের করে ভিখিরী জিতু বুড়োর হাতে ফেলে দেয় নিখিল। চলে যায় জিতু বুড়ো।

কিন্তু আত্রেয়ীর মাথাটা যেন একটা হঠাৎ-ক্লান্তির ভারে অলস হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। কিংবা, সড়কের কাঁকরের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর চোখ দুটো কি-যেন খুঁজতে চাইছে। আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে কোন্ সৌভাগ্যের চিহ্ন দেখতে পেল আর এত খুশি হয়ে হাত পেতে বকসিস চাইল বোকা জিতু বুড়ো ?

নিখিল বলে—দেখছেন, একটা ভালুক-ওয়ালা আসছে ?

ঝুঁকে পড়া মাথাটা না তুলেই আত্রেয়ী বলে—না।

নিখিল—এই তো; তাকিয়ে দেখুন একবার।

ধুলোয় ঢাকা পা: নিশ্চয় অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছে ভালুকওয়ালা। ভালুকটার গায়ের রোঁয়াও ধুলোতে ছেয়ে গিয়েছে। হাত তুলে নিখিলকে সেলাম জানায় ভালুকওয়ালা। —বোলিয়ে হুজুর !

ভালুকওয়ালার হাতে একটা সিকি ফেলে দিয়ে নিখিল বলে—নাচ দেখাও।

ভালুকওয়ালা তার মাথার টুপিটাকে ভালুকটার মাথার উপর রেখে দিয়ে লাঠি নাচাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ভালুকটাও দু'পায়ে ভর দিয়ে আর টান হয়ে দাঁড়ায়। একটা থাবাকে সেলামের ভঙ্গীতে তুলে ধরে নাচতে থাকে ধুলোমাখা ভালুকটা।

হেসে হেসে চেঁচিয়ে ওঠে নিখিল—কি করছেন আপনি ? এদিকে দেখুন।

মুখ তুলে আর নাচের ভালুকের চেহারাটাকে দেখতে পেয়ে হেসে ফেলে আত্রেয়ী। —বেচারার খিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে।

নিখিল—কি আর করবে বলুন ? চাকরি যখন, তখন খিদের পেট নিয়েও নাচতে হবে। উপায় নেই। এই জন্যেই তো আমি চাকরি করি না।

আত্রেয়ী—বাড়ি ফিরতে হবে কিনা ?

নিখিল—এখনই ফিরবেন ?

আত্রেয়ী—এখন ফেরাই যাক্।

নিখিল—আপনি কি মনে করছেন, খুব বেশি বেড়ানো হয়েছে ?

আত্রেয়ী—না।

নিখিল—তবে

আত্রেয়ী—মঞ্জুর সঙ্গে একটা কাজ ছিল ? মঞ্জু হয়তো ভাবছে, আমি সব ভুলেই গিয়েছি।

নিখিল—তাহলে বলুন, মঞ্জুকে বেশ একটু ভয় করতেও শুরু করেছেন।

আত্রেয়ী—কেন ভয় করবো না ? দোষ করলে ভয় করতেই হয়।

নিখিল—কি দোষ করলেন ?

আত্রেয়ী—কথা ছিল, আজ মঞ্জুর কাছ

থেকে উলের একটা প্যাটার্ন শিখবো। কাজের কথা ভুলে গিয়ে হুট্ করে বেড়াতে চলে এলাম।

নিখিল—দোষটা আসলে আমারই।

আত্রেয়ী—আপনার দোষ হবে কেন?

নিখিল—আমিই যে আপনাকে বেড়াতে যাবার জন্য হুট্ করে একটা তাড়া দিয়ে ফেললাম।

আত্রেয়ী হাসে—বেশ করেছেন।

নিখিল—তাহলে আপনিও বেশ করেছেন।

ফেরবার পথে নতুন করে দেখবার কিছু নেই। শুধু গাঁয়ের ডাকঘরের দৌড়াহা তার কাঁধের বল্লমে ডাকের ব্যাগ ঝুলিয়ে আস্তে আস্তে দৌড়ে যাচ্ছে; বল্লমের ঘুঙুর বাজছে ঝুমঝুম করে।

আত্রেয়ী বলে—আমার শুনতে সব চেয়ে ভাল লাগে দূরের ট্রেনের শব্দ; তারপর এই ডাকের দৌড়াহার ঘুঙুরের শব্দ।

নিখিল—তিরছি নদীর ঝর্নার শব্দ শুনতে ভাল লাগে না?

আত্রেয়ী—না; আগে ভাল লাগতো, এখন একটুও ভাল লাগে না।

নিখিল—এখন মানে কখন? কবে থেকে ভাল লাগছে না?

আত্রেয়ী—ঠিক মনে নেই, তবে প্রায় তিন-বছর হবে।

নিখিল—ঝর্ণার কাছে গিয়েছিলেন নাকি?

আত্রেয়ী—না; মাঝে মাঝে, অনেক রাতে, যখন জেগে বসে গল্পের বই পড়েছি, তখন হঠাৎ শুনতে হয়েছে। সত্যিই শুনতে ভয় করে, যেন একটা রাগের শব্দ গরগর করছে আর গড়িয়ে যাচ্ছে।

নিখিল—বর্ষাকালের জংলী নদীতে ওরকম শব্দ হয়েই থাকে। কিন্তু শীতকালে শুনুন, ওই নদীর ঝর্নার শব্দকেই একটা মিষ্টি গানের শব্দ বলে মনে হবে।

আত্রেয়ী—শীত আসতে এখনও অনেক দেরি আছে।

নিখিল—বেশি দেরি নেই; বড় জোর আর এক মাস। তখন একটা কাজ করবেন; সপ্তাহে অন্তত দুটো দিন আপনি বিকেলের দিকে......।

আত্রেয়ী—একা আসতে পারবোই না; অসম্ভব।

নিখিল—একা আসবেন কেন? মঞ্জু সঙ্গে থাকবে। মঞ্জু তো আর কলকাতা ফিরে যাচ্ছে না

আত্রেয়ী—আপনি যাচ্ছেন বুঝি?

নিখিল—যাবার কথা। তবে এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি, এ মাসেই যাব, না, আরও একটা মাস পরে যাব।

আত্রেয়ী—মঞ্জুও হঠাৎ আপনার মত যাব-যাব করে উঠবে না তো?

নিখিল—করলোই বা? মঞ্জু রইল কি চলে গেল, তাই নিয়ে আপনার চিন্তে করবার কী আছে? আপনি রোজ, অন্তত আরও দুটো বছর, খুশি হয়ে নিজের কাজ নিয়ে থাকবেন আর বেড়াবেন। একাই বেড়াবেন। নয় তো, আপনার কিন্ডার গার্টেনের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বের হবেন।

আনমনার মত পথ চলছে আত্রেয়ী। সড়কের কিনারার ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছে। দেখতেও পাচ্ছে না যে, হাঁটু পর্যন্ত শাড়িটা চোরকাঁটায় ভরে গিয়েছে।

নিখিল হাসে—এত তাড়াতাড়ি হাঁটছেন কেন?

আত্রেয়ী—কি বললেন?

নিখিল—এমন কিছু দেরি হয়নি, খুব বেশি হাঁটাও হয়নি; তবু আপনার বেশ ক্ষিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে।

আত্রেয়ী হাসে—আপনিও যে কাকিমার মত কথা বলছেন।

নিখিল—তার মানে?

আত্রেয়ী—কাকিমার ওই এক অভ্যেস; যখন-তখন মনে করছেন, আমার বুঝি ক্ষিদে পেয়েছে। দুটো মুড়ি খা, একটু সর খা, এক টুকরো পেঁপে খা, আত্রেয়ী। কাকিমা আমার মুখে সব সময় শুধু ক্ষিদেই দেখতে পান।

নিখিল—আপনি নিশ্চয় খাওয়া নিয়ে সব সময় গন্ডগোল করেন, তা না হলে কাকিমা......।

আত্রেয়ী—কি বললেন? আপনি কোত্থেকে কি শুনেলেন?

নিখিল—শুনেছি সামান্য, কিন্তু বুঝেছি অনেকখানি। বীণাদি বলেছেন, আপনি নাকি খেতেই চান না। কাকিমা আপনাকে সাধাসাধি করে হয়রান হয়ে যান।

আত্রেয়ী—বীণাদির কান্ড! গল্প করবার আর কিছু না পেলে আমার খাওয়া নিয়ে গল্প করতে হবে? বাঃ!

নিখিল—গল্পটা তো মিথ্যে নয়।

উত্তর দেয় না আত্রেয়ী।

নিখিল বলে—এ রকম করবেন না। আর তো মাত্র দুটো বছর।; খুশি হয়ে দিন কাটিয়ে দিন। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করুন, স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর রাখুন।

সামনেই কাছাড়ি পাড়া। একটা মুন্সেফ কোর্ট, দুটো সরকারী ডাকবাংলা, একটা ফরেস্ট আপিস আর এক সাব ডেপুটির খাজনা-মকুব দপ্তরের তাঁবু। রবিবারের কাছারিপাড়া একেবারে নিস্তব্ধ। শুধু ফুর-ফুর করে উড়ছে কাছারিপাড়ার যত সেগুন গাছের হাওয়া।

আত্রেয়ীর কপালটা ঘামে ভিজে গিয়েছে। ঢিলে খোঁপাটা আরও একটু ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে। কপালের ঘামের জলে জড়িয়ে পড়ে ছোট্ট একগুচ্ছ চুল কপালের সঙ্গে সেঁটে গিয়েছে। রুমাল তুলে কপাল মোছে আত্রেয়ী।

নিখিল—বাড়ির কাছে এসে পড়েছি মনে হচ্ছে?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ এবার বাঁদিকের এই রাস্তা ধরে চলুন।

মহাদেও পাঁড়ের পোষা পায়রার ঝাঁক উড়ে চলেছে। আত্রেয়ী বলে—ওরা এখন কোথায় যাচ্ছে, বলুন তো?

নিখিল—জানি না।

আত্রেয়ী—ওরা যাচ্ছে বাজারের মগন-লালের দোকানবাড়িতে।

নিখিল—কেন?

আত্রেয়ী—রোজ এই সময় ওদের ছোলা খাওয়ায় মগনলাল। ওরা ঠিক বুঝে ফেলতে পারে, খাওয়ার সময় হয়েছে।

নিখিল—তাহলেই বুঝে দেখুন।

আত্রেয়ী—কি?

নিখিল—পায়রাগুলোও ওদের খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম যেটুকু বুঝতে পারে, আপনি সেটুকুও বুঝতে পারেন না।

আত্রেয়ী—বুঝবো না কেন? সবই বুঝতে পারি। কিন্তু ভাল লাগে না।

নিখিল—ভাল না লাগলে চলবে কেন? ভাল লাগাতেই হবে।

এইবার দেখতে পাওয়া যায়, শ্রীলেখা কটেজের জানালার পর্দা ফুরফুরে হাওয়াতে ফুলে ফুলে কাঁপছে। কিন্তু আত্রেয়ীর আনমনা চোখে এখনও বোধহয় শ্রীলেখা কটেজের ছায়া পড়েনি। আত্রেয়ীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই নিখিল বলে—ওই দেখুন, কে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে!

—কে?

—ওই যে, কটেজের গেটের কাছে।

একটি অদ্ভুত মূর্তি বটে। দেখলে হাসি পায়। সাদা-পাকা বড়-বড় বাবরী চুল, তার উপর একটি হ্যাট; মালকোঁচা দিয়ে আঁটসাট করে পরা ধুতি। হাতে একটি ছাতা; সে ছাতার কাপড় নেই। হাতে একগাদা কাগজপত্র।

চমকে ওঠে আর পিছু হটে গিয়ে সরে দাঁড়ায় আত্রেয়ী—ওরে বাবা! পাগলা দুর্গাচরণ!

নিখিল এগিয়ে যেতেই পাগলা দুর্গাচরণ ব্যস্তভাবে আর খুব গম্ভীর হয়ে

নিখিলের হাতের কাছে একটা কাগজ তুলে দেয়—হ্যাণ্ডনোটটা রাখুন, আর টাকাটা দিয়ে ফেলুন।

দুর্গাচরণের হ্যাণ্ডনোটের দিকে তাকিয়ে নিখিল বলে—এক লাখ টাকা?

—হ্যাঁ; সুদ চার্জ করবো না; কোন ভয় নেই।

নিখিল—আপাতত চার আনা নিন।

দুর্গাচরণ—দিন।

দুর্গাচরণের হাতে একটা সিকি ফেলে দিয়ে নিখিল আবার বিনীত স্বরে আবেদন করে। —বাকিটা যদি দিতে না পারি, তবে......।

দুর্গাচরণ—ধর্মভয় থাকলে দেবেন; না থাকে দেবেন না।

নিখিল—মামলা-টামলা করবেন না তো?

দুর্গাচরণ—না, ওসব আমি পছন্দ করি না।

চলে গেল গম্ভীর পাগল দুর্গাচরণ।

হাসি চাপতে গিয়ে আত্রেয়ীর হাতের রুমালটা পড়ে যায়। রুমালটাকে তুলে নিয়েই, আর মুখের হাসির একটা সোর জাগিয়ে শ্রীলেখা কটেজের বারান্দার দিকে যেন ছুটে চলে যায় আত্রেয়ী।

বারান্দায় উঠে নিখিলও খুশির স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।—এইবার তোর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে দেখ মঞ্জু, হাসিয়ে দিতে পেরেছি কিনা।

মঞ্জুর ঘরের ভিতরে ঢুকেই হাঁপ ছাড়ে আত্রেয়ী—এমন কিছু দেরি হয়নি, মঞ্জু। কই, উলের সেই......।

মঞ্জু বেশ গম্ভীর। তাই হঠাৎ কথা থামিয়ে দিয়ে মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী।

মঞ্জু হাসতে চেষ্টা করে। —এমন কিছু দেরি হয়নি মানে পুরো তিন ঘণ্টা হয়েছে।

আত্রেয়ী—সত্যি মঞ্জু, আমি বুঝতেই পারিনি।

মঞ্জু—শোন আত্রেয়ী।

যেমন মঞ্জুর গলার স্বরে তেমনই মঞ্জুর মুখের হাসিতে যেন খুব শক্ত একটা মায়া খুব সাবধানে কথা বলতে চাইছে।

আত্রেয়ী কিন্তু মঞ্জুর একটা হাত টেনে নিয়ে মঞ্জুর আঙুলের আংটিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেরই মনের একটা অকারণ খুশির খেলা খেলতে থাকে।

শোনা যায়, ওঘর থেকে নিখিল বলছে—আমি পোস্ট অফিসে চললাম, ফিরে এসেই কিন্তু চা খাব।

চলে গেল নিখিল। মঞ্জু বলে—আমাদের এই মেজদা একটি অদ্ভুত মানুষ। কি রকম অদ্ভুত জান? এখনই যদি মেজদাকে জিজ্ঞেস করি, আত্রেয়ীকে চেন? সংগে সংগে জিজ্ঞেস করবে, কে আত্রেয়ী? কে সে?

হেসে ফেলে আত্রেয়ী—আশ্চর্য।

মঞ্জু—হ্যাঁ, আশ্চর্য, কিন্তু হেসো না আত্রেয়ী। মেজদার মত লেখা-পড়া জানা মানুষ খুব কমই আছে। পড়ার জন্য ইউরোপে দু'বছর আর আমেরিকাতেও এক বছর কাটিয়েছে। আমি তিনবার বি-এ ফেল করেছি বলে আমাকে ঘেন্না করে মেজদা। আমার কথা ছেড়েই দাও, রত্না মজুমদারের মত মেয়ে, যে-মেয়ে সোনার মেডাল নিয়ে এম-এ পাস করেছে, আর দেখতে তোমার

এমন কিছু দেরী হয়নি, মঞ্জু। কই উলের সেই...

চেয়েও সুন্দর, সে মেয়েকেও কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হয়নি আমার মেজদা এই নিখিল সেন।

আত্রেয়ী—রাজি হলে নিশ্চয় খুব ভাল হতো, মঞ্জু।

মঞ্জু—শোন। মেজদা সাধারণ মানুষ হলে রাজি হতো ঠিকই; কিন্তু তা নয়। তাই বলে কি কারও সংগে অভদ্রতা করে মেজদা? তাও নয়। এখনও রত্নার সংগে দেখা হলে মেজদা হাত তুলে নমস্কার জানাতে ভুলে যায় না।

আত্রেয়ী—রত্না কি নিখিলবাবুর চেয়ে বয়সে ছোট নয়?

মঞ্জু—ছোট;; কিন্তু সে-কথা হচ্ছে না। যা বলছি, মন দিয়ে শোন। মেজদা মানুষটা অকারণে মানুষের উপকার করে। মানুষকে খুব মায়া করতেও ভালবাসে। তুমি জান না: এখানে এই সরিয়াডিতেই সেদিন একটি লোককে মেয়ের বিয়ের জন্য একশো টাকা দিয়েছে মেজদা; কিন্তু মেয়ের বাপ লোকটা কোন ইচ্ছে আছে। এই ভুল করে শেষকালে

আবার একদিন যখন মেজদাকে নমস্কার জানাবার জন্যে দেখা করতে এল, তখন মেজদা লোকটাকে চিনতেই পারলে না।

আত্রেয়ী—পরে চিনতে পেরেছিলেন নিশ্চয়?

মঞ্জু—জানি না। কিন্তু সব চেয়ে খারাপ ব্যাপার কি হয় জান? অনেকেই আমাদের মেজদার দয়া মায়া আর ভদ্রতাকে ঠিক চিনতে পারে না। মনে করে ফেলে, মেজদার বোধহয়

কিন্তু নিজেরাই ঠকে।

আত্রেয়ী—ঠকাই উচিত।

মঞ্জু—মেজদার তো কোন ক্ষতি হয় না; ওদের নিজেদেরই ক্ষতি হয়।

আত্রেয়ী—হবেই তো।

মঞ্জু—সেই জন্যেই বলছি। তুমি......।

আত্রেয়ীর চোখের তারার জ্বলজ্বলে হাসিতে হঠাৎ যেন ধোঁয়া লেগেছে, হাসিটা আবছা হয়ে গিয়েছে।—আমাকে কিছু বলছো? মঞ্জু?

মঞ্জু—হ্যাঁ। প্রীতিবৌদি বলেছেন যে, ডাক্তার বলুক আর নাই বলুক, এবার থেকে আমরা দুজনে বেড়াতে বের হব। তুমি যদি কষ্ট করে......।

মঞ্জুর হাতটাকে শক্ত করে ধরে আত্রেয়ী। মুখটাও একেবারে ফুল্ল খুশির ফুলটির মত মিষ্টি হাসিতে ভরে যায়। —তাই বল! এই কথা! এর জন্যে এত গম্ভীরতা? তোমার কি ধারণা যে তোমার সংগে বেড়াতে যেতে আমার পা ব্যথা করবে? ছিঃ!

সরিয়াডির নয়াপাড়ার সড়কের সেই যে দুটো ল্যাম্পপোস্ট ভোরের ঝড়ের আঘাত পেয়ে কাত হয়ে গিয়েছিল, সে দুটো এখনও কাত হয়েই আছে। সন্দেহ হয়, আরও একটু ঝুঁকে পড়েছে। মনে হতে পারে, বেচারা সরিয়াডি যেন তার হেঁট মাথা আর সোজা করে তুলতে পারছে না।

দিবাকর সাইকেল চালিয়ে তার কাঠের গোলাতে যায় আর বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারা যায়, দিবাকরের মাথাটাও যেন ঝুঁকে রয়েছে। মাথা তুলে আর চোখ তুলে কিছুই দেখতে চায় না দিবাকর।

বলাই বলে—আমি বিশ্বাসই করতে পারি না জয়ন্তদা, আত্রেয়ীর মত মেয়ে কখনও...।

জয়ন্তবাবু—আত্রেয়ীর দোষ নয়। দোষ হলো ওদের, ওই চা-বাগানওয়ালা বড়-লোকের পরিবারটি, যাঁরা দু' দিনের জন্য এখানে এসে এক গরীবের মেয়ের সঙ্গে মেলামেশার বাড়াবাড়ি করছেন।

বলাই—আমিও তো তাই বলছি।

পরেশ বলে—শ্রীলেখা কটেজের ওই ভদ্র-লোককে দেখলে আমার গা জ্বালা করে। ভদ্রলোক যেন আত্রেয়ীদিকেও একটি বান্ধবী মেয়ে মনে করেছেন। হো হো, হি হি, কত রকমের কত হাসি।

দাবার ছক সামনে পাতা; কিন্তু ঘুঁটি চালতে গিয়ে আনমনা হয়ে যান হাবুল-বাবু। তার পরেই বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—না; খুবই অপমানের একটা ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

গোষ্ঠবাবু—শুনেছি, আজকাল শুধু মেয়েটিরই সঙ্গে বেড়াতে বের হয় আত্রেয়ী।

হাবুলবাবু—এরকম হলে তবু একটা মানে হয়। কিন্তু এই ছোকরা ভদ্রলোক কি সত্যিই ভদ্র হয়ে থাকতে পারবে?

গোষ্ঠবাবু—ওরা যাবে কবে?

হাবুলবাবু—কে জানে?

গোষ্ঠবাবু—প্রদোষদার জামাইয়ের মেয়াদের আর কতদিন বাকি আছে?

হাবুলবাবু—তা'ও ঠিক জানি না, দিবাকর বলছিল, বোধহয় দেড় বছরেরও কিছু বেশি।

গোষ্ঠবাবু—আত্রেয়ীকে যদি......।

হাবুলবাবু—না না; আত্রেয়ীকে কিছু বলবার কোন মানে হয় না। আত্রেয়ীর কোন দোষ নেই। আপনাদের যদি সাহস থাকে, তবে শ্রীলেখা কটেজের লোকগুলোকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করুন না কেন, কবে চলে যাবে?

গোষ্ঠবাবু—তারপর? যদি বলে, এখন যাব না?

হাবুলবাবু—তবে যাইয়ে দিতে হবে। দিবাকর বলছিল, আর দেরি না করাই উচিত।

চিনুর পিসিমা রোজই অকারণে রাগ করে চেঁচামেচি করছেন—এ এক জ্বালা হলো। এই দেখলাম বাতাসার ঠোঙাটা এখানেই আছে, এই দেখছি নেই। ওরে ও চিনু, কোথায় সরালি ঠোঙাটাকে?

চিনু বলে—তুমিই তো সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমার ঘরের কুলুঙ্গিতে রাখলে।

—একবার দৌড়ে গিয়ে দেখে আয় তো মা, তোদের আত্রেয়ীদি আজও আবার বেড়াতে বের হলো নাকি?

গোষ্ঠবাবুর স্ত্রীর কাছে যখন-তখন আক্ষেপ করেন সন্তুর মা। —জানি না, আপনি কি মনে করেন বুলুর মা, আমি কিন্তু মনে করি, আত্রেয়ী মেয়েটার দোষ নয়।

বুলুর মা—একটুও না। হাওয়া বদলের মানুষগুলো ছল করে চমৎকার হাসতে পারে, ঢং করে চমৎকার মায়া দেখাতে পারে, সেই জন্যেই তো ভয় হয়।

সন্তুর মা—জঞ্জালগুলো যাবে কবে?

বুলুর মা—বলাই বলছিল, ভয় করবার তেমন কিছু নেই।

—কেন?

—ওই, শুধু একটা দুটো দিন কটেজের চশমাপরা ছেলেটার সঙ্গে একটু বেড়াতে বের হয়েছিল আত্রেয়ী। তার পর আর নয়। আজকাল শুধু মেয়েটার সঙ্গে বেড়াতে বের হয়।

—তা মেয়েটির সঙ্গে একশোবার বেড়াতে বের হোক; দুঃখের প্রাণ কাঁদনের জন্যে একটা সাথীর সঙ্গে গল্প করে আর হেসে-খেলে নিক না কেন, কোন দোষ নেই।

—তবু, বাইরের এই লোকগুলো যত তাড়াতাড়ি চলে যায়, ততই ভাল।

—নীণা মাস্টারণী বলছিল, ওরা নাকি লোক ভাল।

—লোক ভাল হলেই বা কি? তাতে আত্রেয়ীর কি আসে যায়? আত্রেয়ীর যা ভাল হবার তা তো হয়েই গিয়েছে। স্বামীর কাছে নিয়মমত চিঠি লেখে তো আত্রেয়ী?

—লেখে।

—তবেই বুঝে দেখ; আত্রেয়ীর মনে কোন খাদ নেই। আমি তাই নরেন ছোঁড়াকে সেদিন খুব ধমকে দিয়েছি।

—কেন?

—নরেন বলছিল, আত্রেয়ীদিকে আজকাল নাকি একটি চেঞ্জার মেয়ের মত দেখায়।

—দেখাতে পারে। ওই পর্যন্ত। আত্রেয়ীকে তো চিনি, সে মেয়ে কারও ছলনায় টলবার মেয়ে নয়।

—নরেন অবিশ্যি বললে যে, আত্রেয়ীর ওপর কোন রাগ-টাগ ওদের নেই; ওরা রেগেছে শ্রীলেখা কটেজের লোকটার উপর।

সারাদিন পেট্রল পাম্পের চাকরি করে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে আসেন সামন্তবাবু। কিন্তু চায়ে চুমুক দিয়েই চেঁচিয়ে ওঠেন—এ কি চা? না চিরেতার জল?

নীহারের মা; সামন্তবাবুর স্ত্রী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কি হলো?

সামন্তবাবু—চিনি খুবই কম হয়েছে। কিন্তু আমি তো আত্রেয়ীর তেমন কিছু দোষ দেখি না। শ্রীলেখা কটেজের সেই ছোকরা ভদ্রলোকটারই যত মায়াবীপণা...।

নীহারের মা এইবার বিরক্ত হয়ে মুখ খোলেন।—কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই তো করবার মুরোদ হলো না। যেমন দিবাকর, তেমনই তুমি। শুধু আড়ালে যত গজর গজর।

সামন্তবাবুর গলার স্বর করুণ হয়ে যায়।—কি করা যায়; বলতে পার?

মাধব আর বিমল গাঁয়ের ঝিল থেকে মাছ ধরে বাড়ি ফেরবার পথে, সরিয়াডির থানার আউটপোস্টের কাছে, ঠিক যেখানে সড়কের শেষ ল্যাম্প সন্ধ্যা থেকেই নিবু-নিবু হয়ে জ্বলে, সেখানে দাঁড়িয়ে হাওয়াবদলের তিন জন মানুষের হাসি-গল্পের হররা শুনতে পেয়েছে।

নেশাজড়ানো স্বরে কথা বলছেন ব্রিচেস-পরা সেই সৌখীন শিকারী ভদ্রলোক।—শ্রীলেখা কটেজের নিখিল সেনের পায়ের ধুলো জোগাড় করে দিতে পারেন মশাই?

—কেন? কেন? এক সঙ্গে প্রশ্ন করেই ফণী মিত্র আর জগৎ ব্যানার্জি মুখ টিপে হাসতে থাকেন।

ব্রিচেস বলেন—নাঃ, বলতে পারবো না। বলতে গেলে বুক ফেটে যাবে। আমি কালই চলে যাব।

ফণী মিত্র—থানা অফিসার নাকি আপনাকে ওয়ার্নিং দিয়েছেন?

—দিয়েছে মশাই, দিয়েছে।

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে মাধব আর বিমলের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন সেই নেশাজড়ানো ব্রিচেস।—এই যে, এই এরা, এদেরই থানা অফিসার।

মাধবও মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে, আর গলার স্বর একেবারে চেপে দিয়ে কথা বলে—চল বিমল; কিছু বলিস না।

বিমল বলে—কিন্তু এইসব উপদ্রব যাবে কবে?

একটা মাস, দুটো মাস, তিনটে মাসও পার হতে চললো; সরিয়াডির প্রাণে একটা অস্বস্তির ব্যথা এইভাবে শুধু ফিসফিস করছে। জোরে চেঁচিয়ে উঠতে পারছে না। অপমানটা গায়ে বিঁধছে, কিন্তু হেঁট মাথা উঁচু করে তুলে ধরতে পারছে না। মিউনিসিপ্যাল-কমিটিরও কী যেন হয়েছে; বোধহয় ফন্ডে কুলোচ্ছে না কিংবা হাত-পা অলস হয়ে গিয়েছে। কাত হয়ে হেলে পড়া ল্যাম্পপোস্ট দুটোকে আর সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া আজও সম্ভব হলো না।

দিবাকর মাঝে মাঝে গর্জন করে বটে; হাবুলবাবুও বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করেন; কিন্তু কটেজের মানুষগুলিকে টলিয়ে নড়িয়ে সরিয়ে দেবার সাহস আছে কি? নেই বোধ হয়।

আগন্তুক অস্থায়ীর ব্যবহারে প্রায়ই আঘাত পায় ছোট্ট সরিয়াডির স্থায়ী প্রাণগুলি, কিন্তু এরকম আঘাত কোনদিনও পেতে হয়নি। এ রকম ভয়ও কোন দিন পেতে হয়নি। বাইরে থেকে দু'দিনের ফুর্তির একটা হাসি এসে প্রদোষ সরকারের মেয়ের জীবনের একটা চিরকালের চিহ্নকে হাসিয়ে পাগল করে আর এলোমেলো করে দিয়ে চলে যাবে? সরিয়াডির স্থায়িতাসুখী গর্বটাই বোধহয় ভয় পেয়েছে।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির কাঁটালতার ঝোপের ফড়িংও উসখুস করে। এক পা নিয়ে বারান্দার চেয়ারে চুপ করে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন প্রদোষ সরকার, কিন্তু উঠতে গেলেই যেন টলে ওঠেন। হাতের জোর কি কমে গেল?

শ্বাসকষ্টের মানুষ হৈমবতী, আত্রেয়ীর মা, তিনি পুজোর ঘরের দরজার গায়ে তাঁর রোগের শরীরের সব অসহায়তা এলিয়ে দিয়ে শুধু দেখতে থাকেন—আত্রেয়ী বেড়াতে বের হয়ে গেল। বলেও গেল না, ঠিক কখন ফিরবে।

কাকিমা কতবার বলেছেন—রোজই শুধু

শ্রীলেখা কটেজের নিখিল সেনের পায়ের ধুলো জোগাড় করে দিতে পারেন মশাই?

শ্রীলেখা কটেজে কেন রে আত্রেয়ী? মাঝে-সাঝে দিবাকরের বউয়ের সঙ্গে একটু দেখা-টেখা করে আসতে তো হয়।

আত্রেয়ী হাসে—সে তো যাবই; শান্তি বউদি তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না। শান্তি বউদি এখানকার দু'দিনের মানুষ নয়।

কাকিমা—দু'দিনের মানুষদের সঙ্গে শুধু দুটো দিন ভদ্রতা করলেই তো হলো।

আত্রেয়ী—আমিও তো তাই করছি। মশুরা আর মাত্র তিনটে মাস আছে।

আত্রেয়ী চলে যাবার পর মণিদিদা তাঁর জপের মালা থামিয়ে কথা বলেন—তোমরা

আত্রেয়ীকে বেশি বাজে কথা-টথা বলো না সুহাস। ওর দোষ নেই।

কাকিমা—আমি আত্রেয়ীর দোষ ধরছি না। ওর মন, ওর বয়স তো একটু হেসে খেলে থাকতে চাইবেই। কিন্তু একটু সাবধান থাকা উচিত।

প্রদোষবাবু হাসেন—তোমরা সে-রকম মেয়ে পাওনি, সুহাস। মিছিমিছি কোন ভয়-সন্দেহ করো না।

কিন্তু কাটালতার ফড়িং বোধহয় ভয় পেয়েছে বলেই উসখুস করে ভয় তাড়াতে চেষ্টা করছে। প্রদোষ সরকার জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়েন—আমার পা থাকলে আমি নিজেই আত্রেয়ীকে রোজ বেড়াতে নিয়ে যেতাম।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলেন আত্রেয়ীর মা—হেমন্তর চিঠির উত্তর দিয়েছে আত্রেয়ী? আজ না চিঠি লেখবার কথা ছিল?

আত্রেয়ীর ঘরের টেবিলটার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন কাকিমা—হ্যাঁ, লিখেছে বলে মনে হচ্ছে।

টেবিলটার কাছে এগিয়ে যান কাকিমা। হ্যাঁ, চিঠিটাকে অর্ধেক লিখেই চলে গিয়েছে আত্রেয়ী।

"আমার একটা অনুরোধের কথা রাখবে কি? মন খারাপ করো না। সব সময় হেসে-খেলে থাকবে। আমিও তো জেলেই আছি। তবু হেসে খেলে বেড়িয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। স্বাস্থ্যের দিকেও একটু নজর রেখ। আর একটা কথা......সব মনে আছে, কিছুই ভুলে যাইনি। তুমি যখন......"

কাকিমা নিজের মনে বিড়বিড় করেন—ভাল কথাই তো লিখেছিস; সবই তো ঠিক আছে।

চমকে ওঠেন কাকিমা। বাইরের বারান্দাতে কে যেন হঠাৎ এসে আর চেঁচিয়ে উঠেছে—হে হে হে। কেমন আছেন প্রদোষবাবু? খবর ভাল?

মোষের শিঙের লাঠিটাকে হাতে দুলিয়ে কথা বলছেন চন্দ্রবাবু।

প্রদোষবাবু—বসুন চন্দরদা, অনেকদিন পরে এলেন।

চন্দ্রবাবু—আসি বা না আসি, সব সময় ভাবতে চেষ্টা করি, আপনারা সবাই ভাল আছেন। ভাল থাকলেই হলো।

প্রদোষবাবু হাসেন—আপনার মত ভাল থাকতে আমরা কি করে পারবো বলুন? নানারকম ভাবনা-চিন্তা তো আছেই, তার ওপর......।

চন্দ্রবাবু—এতদিনে সত্যি কথাটা তাহলে স্বীকার করলেন? খুব সত্যি কথা প্রদোষবাবু, আমি সবচেয়ে ভাল আছি। যেই হোক, সারিয়াডির যত চেঙ্গার আর নো-চেঙ্গার, সবার চেয়ে আমি চালাক।

প্রদোষবাবু—বুঝলাম না, চন্দরদা। আপনি চালাক হবেন কেন? আপনি তো জ্ঞানী মানুষ।

—হে হে হে; চেঁচিয়ে হাসতে থাকেন চন্দ্রবাবু। —কিন্তু আমার জ্ঞানকে যে কেউই পছন্দ করে না।

—কে পছন্দ করে না?

—দিবাকর, গোষ্ঠ, হাবুল, হয়তো আপনিও।......আচ্ছা, চলি এখন, প্রদোষবাবু। আসল কথাটা কি জানেন? কিছুই না। কিচ্ছু নেই। কিছুই থাকে না। সবই তিরছি নদীকা পানি।

প্রদোষবাবুর পিঠে একবার হাত বুলিয়ে নিয়েই ব্যস্তভাবে চলে গেলেন চন্দ্রবাবু।

—হৈম? শুনছো? একবার এদিকে এসো। ডাকতে গিয়ে প্রদোষ সরকারের চোখ ভিজে যায়।

আত্রেয়ীর মা ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন—কি হলো?

প্রদোষবাবু—সবই যদি তিরছি নদীর পানি হয়, তবে বেঁচে থাকবো কি করে?

কাকিমা ছুটে আসেন—বড়দা, কেন যে এত ভয় করছেন, বুঝছি না। এই তো চিঠি, হেমন্তকে আজই লিখেছে আত্রেয়ী। পড়ে দেখুন।

চিঠিটাকে পড়ে নিয়েই হেসে ফেলেন প্রদোষ সরকার। —বলেছি না, ভয় করবার মত কিছুই হয়নি, হচ্ছেও না। কিন্তু ওরা যাবে কবে?

না, এখনও তিরছি নদীর ঝর্ণা দেখতে যাবার অনুমতি পায়নি মঞ্জু; কিন্তু তর সয়নি মঞ্জুর; একদিন শালবনের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর কানের কাছে গল্পটাকে বলেই দিয়েছে।

মল্লিক ডাক্তার বলেছেন; বেশী দূরে নয়, বেশিক্ষণও নয়, বাড়ির কাছাকাছি সামান্য একটু বেড়িয়ে আসাই ভাল।

মঞ্জু কিন্তু মল্লিক ডাক্তারের উপদেশ একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে রাজি নয়।—না আত্রেয়ী, এত তুকুপাকু করবার কোন মানে হয় না। একদিন তো অপারেশনের টেবিলে শুয়ে পড়তে হবে, আর উঠতেও হবে না বোধহয়। তার আগে যা পারি আর যতটা পারি বেড়িয়ে নেওয়াই ভাল।

আত্রেয়ী—এরকম করে কথা বললে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে কোনদিন বেড়াতে বের হব না।

মঞ্জু হাসে—সত্যি কথা বলছি; রাগ করছো কেন?

আত্রেয়ী—একেবারে মিথ্যে কথা। আমি বলছি, তোমার অসুখ সেরে যাবে।

মঞ্জু—কেমন করে বুঝলে?

আত্রেয়ী—আমার মন বলছে।

আত্রেয়ীর হাত ধরে মঞ্জু যেন করুণ মিনতির সুরে কথা বলে—তাই বল আত্রেয়ী; বার বার বল। সে বেচারাকে আমি যে সত্যি ঠকাতে চাই না। ওর জন্যেই আমার এত বাঁচতে ইচ্ছে করছে।

আত্রেয়ীর চোখ ভিজে যায়।—আমাকে আবার একথা বলতে হবে নাকি? আমি তো তোমার জন্যে মহাদেও পাড়ের মন্দিরে পুজো পাঠিয়েছি।

কাছারিপাড়া পার হলেই লাল মাটির যে ডাঙ্গাটা তিরছি নদীর খাত পর্যন্ত গড়িয়ে চলে গিয়েছে, সেই ডাঙ্গায় বড়-বড় কালো পাথরের পিঠ যেন বসবার আসনের মত এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। আমলকীর কয়েকটা ঝোপও আছে। এক জায়গায় বুনো খেজুর গাছের একটা ভিড়ও আছে। তা ছাড়া কয়েকটা শিরীষও আছে।

কখনও কালো পাথরের পিঠের উপর, কখনও বা শিরীষের ছায়ার কাছে ঘাসের উপর বসে থাকতে ভাল লাগে। মঞ্জুর মুখের হাসিটাও নতুন শিরীষ ফুলের মত লালচে হয়ে যায়; মঞ্জুর জীবনের গল্প ফুরোতে চায় না।

কিন্তু আত্রেয়ীর জীবনে কি কোন শিরীষ ফুলের গল্প নেই? লাজুক রঙীন গল্প? কিন্তু জানতে চেষ্টা করেনি, জিজ্ঞেসা করতে ভুলেই গিয়েছে মঞ্জু।

বুঝেছে মঞ্জু, সারিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ী মঞ্জুর পাশে বসে আর মঞ্জুরই স্বপ্নের গল্প শুনে ধন্য হয়ে গিয়েছে।

আত্রেয়ীর সেই বোকা দুঃসাহসের কোন চিহ্নও আর নেই। প্রীতি বউদিও একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন। আত্রেয়ী এসে নিজেই তাগিদ দিয়ে মঞ্জুকে ব্যস্ত করে তোলে আর মঞ্জুর সঙ্গে বেড়াতে চলে যায়।

হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে রেল-পার্শেল হয়ে প্রকাণ্ড একটা কাঠের বাক্স এসেছে। গল্পের বইয়ে ভরা একটা বাক্স। আত্রেয়ীও শুনতে পেয়েছে, চেঁচিয়ে কথা বলছেন নিখিলবাবু—জানিস তো মঞ্জু, কার জন্যে এত গল্পের বই আনানো হলো?

মঞ্জু হাসে—তা একটু জানতে পেরেছি বই কি।

একটা একটা করে গল্পের বই বাড়িতে নিয়ে যায় আত্রেয়ী। পড়া শেষ হলেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

বই পড়বার জন্যে আত্রেয়ীর এই ব্যস্ততার মধ্যে যেন একটা বেশী খুশির ব্যস্ততাও দেখা যায়। তাই মঞ্জু একদিন হঠাৎ আত্রেয়ীকে বলেই দেয়।—তুমি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারনি আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—কি?

মঞ্জু—মেজদা এত গল্পের বই কার জন্যে আনিয়েছেন, বলতে পার?

আত্রেয়ী—আমার জন্যেই তো মনে হচ্ছে।

হেসে ফেলে মঞ্জু—ভুল, খুব ভুল ধারণা করেছ আত্রেয়ী। তোমাদের সারিয়াডিতে

যে ছোট একটা লাইব্রেরী আছে সেই লাইব্রেরীকে দান করবার জন্যে এত গল্পের বই আনিয়েছে মেজদা।

আত্রেয়ীও হাসে—আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি মঞ্জু। তাই লোভীর মত তোমাদের বই চেয়ে নিয়ে...।

মঞ্জু—না না; তুমি ঠিকই করেছ। মেজদা বলেছেন, তোমার পড়া হয়ে গেলেই সব বই লাইব্রেরীতে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সেজন্যে আবার মনে করে বসো না যে...।

আত্রেয়ী—কি বললো?

মঞ্জু—আসল কথা হলো, মেজদা লাইব্রেরীটাকেই সাহায্য করতে চান।

আত্রেয়ী—তাতেও আমাকেই সাহায্য করা হলো। যখন ইচ্ছে তখন লাইব্রেরী থেকে বই আনবো আর পড়বো।

মঞ্জু—হ্যাঁ, সে রকম একটা সুবিধা পাবে, ঠিকই।

একদিন খাঁচাওলা কাঠকের গেটের কাছে পৌঁছেই যখন গেটের পাশের জবা গাছটার একটা ডাল ধরে বাড়িওয়ালার দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী, তখন কঠিন ফিলজফির একটা মস্ত মোটা প্রকাণ্ড বই হাতে নিয়ে তার ঘরের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে হেসে ওঠে নিখিল—ছুঁয়ে দিন; একটু ভাল করে ছুঁয়ে দিন।

আত্রেয়ী—কি বলছেন?

নিখিল—ওই সিঁড়িতে জবার কুঁড়ি-গুলোকে আপনি একটু ভাল করে ছুঁয়ে দিন।

আত্রেয়ী—কেন?

নিখিল—তাহলে কুঁড়িগুলো এখনই ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

আত্রেয়ী—এতদিন তাহলে কি করে কুঁড়ি ফুটেছিল? আমি তো ছুঁইনি।

নিখিল—ফুটেছিল নাকি?

আত্রেয়ী—ফোটেনি?

নিখিল—মঞ্জুকে জিজ্ঞেস করুন।

বইয়ের লেখার দিকে চোখের সব দৃষ্টি ফেলে দিয়ে আর একেবারে নীরব হয়ে আবার বই পড়তে থাকে নিখিল।

ঘরে ঢুকেই দেখতে পায় আত্রেয়ী, মঞ্জু হাসছে।—মেজদার কথার মানে কিছু বুঝতে পারলে, আত্রেয়ী?

আত্রেয়ী—না।

মঞ্জু—তোমাকে ঠাট্টা করলেন মেজদা।

আত্রেয়ী—কিসের ঠাট্টা?

মঞ্জু—এই জবাটার শুধু কুঁড়ি ধরে আর ঝরে পড়ে যায়; ফুল ফোটে না। তাই মেজদা বোম্বাইয়ের নার্সারী থেকে খুব দামী সার আনিয়েছে। তিনদিন হলো সার দেওয়াও হয়েছে। এইবার দেখবে, কী চমৎকার ফুল ফুটবে।

আত্রেয়ী—ভালই হবে। কিন্তু সেজন্যে আমাকে......।

মঞ্জু—বুঝলে না? তুমি হয়তো মনে করবে যে, সত্যিই তুমি ছুঁয়েছিলে বলে কুঁড়ি ফুটেছে। তাই মেজদা ঠাট্টা করে তোমাকে একটু সাবধান করে দিলেন।

আত্রেয়ী—আমি কিন্তু সত্যিই এরকমের একটা কাণ্ড করেছিলাম একদিন। আমাদের লেবু গাছের গোড়াতে আমি যেদিন জল দিলাম, ঠিক তার পরের দিনেই গাছে ফুল ধরেছিল।

মঞ্জু—সেটা তোমাদের সরিয়াডির লেবু গাছ? কলকাতা থেকে আনানো জবা গাছ নয়।

প্রীতি বউদি হেসে ফেলেন—বসো আত্রেয়ী। একটু চা খেয়ে নাও। মঞ্জুর সঙ্গে মিছে আর তর্ক করো না।

মঞ্জু বলে—পুরো তিনটি মাস ধরে প্রায় রোজই তো মেজদাকে দেখলে; কিন্তু দেখলে তো, কেমন অদ্ভুত মানুষ? হয়তো কালই দেখবে, ওই এত আদরের জবাটাকে উপড়ে ফেলে দিয়ে হেসে ফেলবে। জিজ্ঞেস করলে বলবে, নাঃ, এটা একেবারে বাজে জবা রে মঞ্জু!

আত্রেয়ী—তুমি কিন্তু একটা ভুল হিসেব দিলে। এখানে তোমাদের এখনও পুরো তিন মাস হয়নি।

মঞ্জু—না হোক; এবার চলে যাবার কথাই ভাবতে হচ্ছে।

আত্রেয়ী—এত শিগগির চলে যাবে?

মঞ্জু—কপালে থাকলে আবার নিশ্চয় আসবো।

পরের দিনই আত্রেয়ীর একটা কাণ্ড দেখে হাসতে থাকে মঞ্জু, প্রীতি বউদিও হাসেন। ওঘর থেকে অখিলবাবুও বলেন—কি হলো তোদের মঞ্জু? এত হাসাহাসি কিসের?

আত্রেয়ী এসেছে; আত্রেয়ীর সঙ্গে ওদের চাকর রামুয়া এসেছে। তোয়ালে দিয়ে ঢাকা দুটো মস্ত বড় থালা বয়ে নিয়ে এসেছে রামুয়া। এক একটা থালার উপর চারটে করে বাটি, চার রকমের খাবারে ঠাসা। মোট আটরকমের খাবার। বসবড়া আছে, ক্ষীরের পায়েস আছে; আবার ছোলার ডালের নোনতা হালুয়াও আছে।

মঞ্জু বলে—আত্রেয়ী আমাদের ফ্ল্যাট সাপার খাইয়ে দিচ্ছে বড়দা!

অখিলবাবু—আমাকেও একটু দিস।

আত্রেয়ী—মনে করো না মঞ্জু, সবই কাকিমা করেছেন। আমিও নিজে হাত লাগিয়ে অনেক কিছু করেছি। এই চমচম আমারই তৈরী।

নিখিলের গলার স্বর শোনা যায়—আমাকে এক কাপ চা দাও, বউদি।

আত্রেয়ী মঞ্জুর কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে কথা বলে—নিখিলবাবুকে চায়ের সঙ্গে এই খাবারও কিছু দিয়ে দাও।

চমকে ওঠে মঞ্জু। মঞ্জুর চোখের এত-ক্ষণের স্নিগ্ধ দৃষ্টিটা বেশ একটু রুক্ষ হয়ে কাঁপতে থাকে। আত্রেয়ীর চোখে-মুখে এমন আশার হাসির মানে কি? এতদিন পরে, আবার হঠাৎ ভুল করে কি ভেবে ফেলেছে আত্রেয়ী?

মঞ্জু বলে—মেজদা এসময় চায়ের সঙ্গে কিছুই খায় না। কিছু দিলেও খাবে না। তুমি সেজন্যে ব্যস্ত হয়ো না, আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—একবার বলেই দেখ না?

মঞ্জু এইবার যেন ওর চোখের ছোট্ট একটা ভ্রুকুটি লুকিয়ে ফেলতে চায়; তাই নিখিলের ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে আর বেশ একটু চড়া স্বরে ডাক দেয়—মেজদা, চায়ের সঙ্গে এখন আর-কিছু খাবে নাকি?

নিখিল উত্তর দেয়।—হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো চা চাইলাম। তোর বন্ধু কি-সব খাবার-টাবার এনেছেন শুনলাম, তা থেকে আমাকেও কিছু খেতে দে। শুধু বড়দাকেই দিচ্ছিস কেন?

মঞ্জু নীরব হয়ে যায়। এইবার প্রীতি বউদি এগিয়ে এসে আত্রেয়ীর মুখের দিকে বেশ শক্ত ভঙ্গীর একটি দৃষ্টি তুলে, অথচ খুব মৃদু স্বরে কথা বলেন।—একটা ভদ্রতা দেখালেন আমাদের নিখিল সেন। খাবার খেতে একটুও ইচ্ছে নেই, কিন্তু তুমি হয়তো মনে করবে যে, একজন বড়লোক মানুষ তোমার মত মানুষের জিনিস তুচ্ছ করলেন, সেইজন্যে; এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই।

আত্রেয়ী—আমি জানি বউদি।

প্রীতি বৌদি—কি জান?

আত্রেয়ী—নিখিলবাবু খুব মহৎ মানুষ।

মঞ্জু—কথাটা তো বললে, কিন্তু মানেটা বুঝে নিয়ে বলেছো তো?

আত্রেয়ী—বুঝেছি বইকি। নিখিলবাবু কখনও ছোট হয়ে যেতে পারেন না।

মঞ্জু—নিখিল সেনকে ছোট করে দেবার সাধ্যিও কারও নেই।

আত্রেয়ী—খুব সত্যি কথা।

প্রীতি বউদির চোখের রুক্ষ দৃষ্টিটা স্নিগ্ধ হয়ে যায়। মঞ্জুর নীরব মুখের গম্ভীরতাও মুছে যায়। সরিয়াডির মেয়ের মুখ থেকে এই উপলব্ধির ঘোষণাটি শোনবার জন্যেই তো প্রীতি বউদি আর মঞ্জুর মন অশান্ত হয়ে উঠেছিল। যে কথাটা আত্রেয়ীকে বুঝিয়ে দেবার জন্য এত চিন্তা আর চেষ্টা হয়েছে, সেটা বুঝে নিতে পেরেছে আত্রেয়ী। সরিয়াডির মেয়ের বুদ্ধি-শুদ্ধি মতিগতি আর দুঃসাহসের উপর প্রীতি-বৌদি আর মঞ্জুর মায়ার শাসন সফল হয়েছে।

মল্লিক ডাক্তার একদিন খুশি হয়েই বললেন—হ্যাঁ, এবার একটু দূরে দূরে বেড়িয়ে আসতে পার মঞ্জু মা। কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করো না।

আত্রেয়ী আসতেই মঞ্জুর প্রাণের খুশিটা মুখর হয়ে হেসে ওঠে।—ঠিক করেছি আত্রেয়ী, যাবার আগে তোমাকে রাঁচিতে দিয়ে যেতে হবে।

আত্রেয়ী—বুঝলাম না।

মঞ্জু—আজ নয়, কাল বিকেলে দুজনে তিরছি নদীর ঝর্ণা দেখে আসি চল। ডাক্তারের কোন মানা আর নেই।

আত্রেয়ী—বেশ তো।

মঞ্জু হাসে—কিন্তু মুখটি এত শুকনো করে কথা বলছো কেন আত্রেয়ী?

আত্রেয়ী—কি বললে?

মঞ্জু—সুন্দর মুখটিকে একটু রাঙা করে নিয়ে কথা বল।

আত্রেয়ী—আপনি বলুন তো বউদি, আপনাদের চলে যাবার কথা শুনে মুখ রাঙা করি কি করে?

প্রীতি-বউদিও হেসে সায় দেন—ঠিক কথা।

আত্রেয়ীর সুন্দর শুকনো মুখের মধ্যে কালো চোখের তারা দুটো যেন ভিজে গিয়ে চিকচিক করে। মঞ্জু বলে—ছি আত্রেয়ী, এরকম করছো কেন? আমরা আবার ছ'মাস পরে আসছি।

আত্রেয়ী—এত সৌভাগ্য আশা করি না।

মঞ্জু—বিশ্বাস কর। বড়দার তাই ইচ্ছে। সরিয়াডির জলবাতাসে বড়দা খুব উপকার পেয়েছেন।

ব্যস্তভাবে ঘরে ঢোকে নিখিল—ট্রেসপাস করলাম, কিছু মনে করিস না মঞ্জু। আমি এঁকেই একটা কথা বলতে এসেছি।

মঞ্জু—আত্রেয়ীকে?

নিখিল—হ্যাঁ।

মঞ্জু—বল।

আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে কথা বলে নিখিল—চলুন, কোথায় আপনাদের তিরছি নদীর ঝর্ণা; আপনাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি। যাবেন?

আত্রেয়ী—চলুন।

চমকে ওঠে মঞ্জু, আর দেখতেও পায়, আত্রেয়ীর এতক্ষণের শুকনো মুখ হঠাৎ হাসির আভা লেগে কেমন রাঙা হয়ে উঠেছে।

মঞ্জু বলে—সত্যিই যাবে নাকি আত্রেয়ী?

আত্রেয়ী—যাই; নিখিলবাবু যখন বলছেন, তখন একটু ঘুরেই আসি।

চলে গেল নিখিল আর আত্রেয়ী।

গেট পার হতে গিয়েই হাসতে থাকে নিখিল—এই দেখুন, আপনি ছুঁয়ে দিয়েছিলেন বলেই জবাটার কত ফুল ফুটেছে।

আত্রেয়ী হাসে—জানি, বোম্বাই থেকে দামী সার আনানো হয়েছে।

নিখিল আর আত্রেয়ীর মুখের হাসির শব্দ গেট পার হয়ে চলে গেল। প্রীতি বউদি ডাক দিয়ে বলেন—ওরা দুজনে বেড়াতে বের হলো বুঝি মঞ্জু?

মঞ্জু—হ্যাঁ।

প্রীতি বউদি—কেন?

মঞ্জু—জানি না।

কাছারিপাড়ার সড়কের সেগুনের ছায়া ধরে ধরে এগিয়ে চলেছে নিখিল আর আত্রেয়ী। সড়কের পাশে মিউনিসিপ্যাল অফিসের রেকর্ড ঘরের ঘুলঘুলিটা যেন সরিয়াডির চোখ, কটমট করে তাকিয়ে দেখছে। ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে বাইরে উঁকি দিতে গিয়ে হেড ক্লার্ক হাবুলবাবুর চোখ যেন একটা যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে জ্বলছে।

লালমাটির ডাঙ্গাটার শিরীষের ছায়াও পার হয়ে চলে গেল নিখিল আর আত্রেয়ী। আজ সরিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ীই যেন গাইড হয়েছে; সরিয়াডির অচেনা একটি বাইরের মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। যেতে যেতে নিখিলকেই মাঝে মাঝে সাবধান করে দেয় আত্রেয়ী—আঃ, নুড়িগুলোর ওপর দিয়ে হাঁটছেন কেন? ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটুন।

দেখতে পায়নি আত্রেয়ী, ওদিকের সড়কের উপরে ছোট নালার কালভার্টের কাছে, তিনটি সাইকেলের হ্যান্ডেল শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সরিয়াডির তিনটে আক্রোশ দম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পরেশ, বিমল আর মাধব, তিনজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে এদিকের মাঠের বুকে এই অদ্ভুত খুশির দুটি মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে।

আত্রেয়ী—আমলকী খাবেন?

নিখিল—কোথায় আমলকী?

আত্রেয়ী হাসে—আচ্ছা, আপনি এখানেই চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকুন।

কয়েক পা এগিয়ে যেয়ে মস্ত বড় একটা কালো পাথরের একেবারে মাথার উপর উঠে দাঁড়ায় আত্রেয়ী। পাথরটার গা ঘেঁষে আমলকীর ঝোপ। ঝোপের মাথার উপর থেকে পট্ পট্ করে আমলকী ছিঁড়ে নিয়ে নিখিলের দিকে ছুঁড়তে থাকে আত্রেয়ী—ধরুন।

নিখিল হাসে—নেমে আসুন, আর দরকার নেই।

আঁকাবাঁকা জংলী নদী তিরছির খাত, বালুর উপর দিয়ে ঝিরঝিরে রোগা জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে শেওলামাখা সেঁতসেঁতে বালু। আত্রেয়ী বলে—আঃ, ওভাবে যেখানে-সেখানে পা ফেলবেন না। চোরাবালি থাকতে পারে।

একটা বেঁটে বুনো খেজুরের গাছ। গাছের তলায় একটা উঁইঢিবি আর কয়েকটা গর্ত। সিগারেট ধরাবার জন্য খেজুর গাছের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে নিখিল।

আত্রেয়ী বলে—সরে আসুন, সরে আসুন।

নিখিল—কেন?

আত্রেয়ী হাসে—ওই দেখুন, দুটো চোখ কী রকম আশ্চর্য হয়ে আপনাকে দেখছে।

একটা গর্তের ভিতর থেকে ছোট্ট একটা

শজারুর বাচ্চা ঘাড়ের কাঁচ কাঁচ কাঁটা ফাঁপিয়ে আর চকচকে দুটো রাগের চোখ তুলে তাকিয়ে আছে।

আত্রেয়ী বলে—রামুয়া এখন থাকলে দেখতেন কী কাণ্ড হতো?

নিখিল—কী হতো?

আত্রেয়ী—শজারুটার চোখে ঝট্ করে এক মুঠো ধুলো ছিটিয়ে দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে শজারুর মাথাটা চেপে ধরতো।

নিখিল—আমিও চেষ্টা করবো না কি?

আত্রেয়ী—থাক্, আপনার আর এত সাহস করে দরকার নেই।...শুনতে পাচ্ছেন এখন? ঝর্ণার শব্দ?

নিখিল—হ্যাঁ খুব কাছেই তো মনে হচ্ছে।

আত্রেয়ী—না, এমন কিছু কাছে নয়। এখনও প্রায় আধ ঘণ্টা হাঁটতে হবে।

যেতে যেতেই বুনো কুলের একটা ঝোপ থেকে একটা পাকা কুল তুলে নিয়ে আর মুখে ফেলে দিয়ে হাসতে থাকে আত্রেয়ী—আপনি কিন্তু খাবেন না; আপনার ভাল লাগবে না। মিষ্টি হলেও এ কুল বেশ কষা।

বেশ জোরে একটা হোঁচট খেয়েছে আত্রেয়ী। বুঝতে পারেনি আত্রেয়ী, ঘাসের ভিতরে এত বড় একটা ছুঁচলো পাথরের টুকরো লুকিয়ে থাকতে পারে। হঠাৎ ঠোকর লেগে আত্রেয়ীর এক পায়ের চটি দূরে ছিটকে পড়েছে। ঢিলে খোঁপাটাও একেবারে আলগা হয়ে এলিয়ে পড়েছে। পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে আত্রেয়ী—এ কী হলো? আত্রেয়ীর পায়ের দুটো আঙুল রক্তে ভরে গিয়েছে।

চমকে ওঠে নিখিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে নিয়েই সযত্নে আত্রেয়ীর কাছে এগিয়ে আসে—শেষে একটা কাণ্ড করেই ছাড়লেন।

হাত তুলে, নিখিলের এই চমকে ওঠা ব্যস্ততাকে যেন শান্ত হতে অনুরোধ করে আত্রেয়ী।—থামুন, আপনি একটুও ব্যস্ত হবেন না।

শালের হাওয়া ফুরফুর করছে। দূরের জঙ্গলের ঘুঘু ডেকেই চলেছে। খোলামেলা একটা বিরাট নিরিবিলির মধ্যে নিখিল সেন হঠাৎ যেন একেবারে একলা হয়ে গিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিখিল সেনের এই স্তব্ধতা হয়তো একটা চকিত মুগ্ধতা। চোখের কত কাছে একটা অদ্ভুত ছবি। খোঁপাটা পিঠের উপর এলিয়ে পড়েছে; কপালে ঘাম; ভুরু দুটো যেন একটু কুঁচকে আছে; আর ঠোঁটের উপর একটা মিষ্টি হাসির নিবিড়তা থমকে রয়েছে। ঘাসের উপর উবু হয়ে বসে আর একটি হাঁটুর উপর চিবুক পেতে রেখে রুমালের ফালি দিয়ে পায়ের পাতার জখমের আঙুল দুটোকে বাঁধছে আত্রেয়ী। সিঁথিতে গুঁড়ো সিঁদুরের সরু দাগটা আর দু' হাতের সোনার চুলির পাশে দুটো শাঁখা। প্রদোষ সরকারের মেয়ে আত্রেয়ী

অদ্ভুত এক স্টাইলের সাজে সেজে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছে।

নিখিল সেনের এই স্তব্ধতার মুখে কিন্তু অদ্ভুত একটি কৌতুকের হাসিও নীরব হয়ে কাঁপছে। কেমন চট করে আর কত শক্ত ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে নিখিলকে থামিয়ে দিয়েছে সরিয়াডির এই মেয়ে আত্রেয়ী। যদি এখন বিধাতা মশাই নিজেই এসে আর মায়া করে আত্রেয়ীর পায়ের ক্ষতের কাছে হাত এগিয়ে দেন, তবে

আত্রেয়ীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় নিখিল—চলে আসুন

আত্রেয়ী বোধহয় এইভাবে হাত তুলে থামিয়ে দেবে—আপনি এত ব্যস্ত হবেন না।

ভাল; প্রদোষ সরকারের মেয়ের এই ভয় লজ্জা আর সতর্কতার মধ্যে যেমন বোকা একটা অবিশ্বাস, তেমনই একটা বোকা স্পর্ধাও আছে। তবু দেখতে মন্দ লাগে না।

একটা সত্য কথা এখনই বলে দিতে পারে নিখিল; কিন্তু সেটা বেশ একটু রূঢ় অহংকারের কথা হবে বলেই স্পষ্ট করে বলে দিতে ইচ্ছে করে না। স্কুলে পড়বার সময়েই ফার্স্ট এড শিখেছিল নিখিল; আর ক্লাসের একটি বছরের মধ্যে দুটি মাস রেড ক্রসের অ্যাম্বুলেন্সের ভলান্টিয়ারও হয়েছিল। আহতের জন্য মায়া করে রুমাল হাতে নিয়ে কাছে ছুটে যাওয়া নিখিলের জীবনের একটা অভ্যেস মাত্র। এছাড়া সরিয়াডির মেয়ের পায়ের জখম ব্যাণ্ডেজ করে দেবার জন্য কোন গরজ নিখিল সেনের মত মানুষের প্রাণে থাকতেই পারে না।

আত্রেয়ী বলে—চলুন এবার।

তিরছি নদীর কিনারা ধরে আরও অনেকেই হেঁটে চলেছে। বুঝতে পারা যায় ওরা এক-একটি পিকনিকের দল।

আত্রেয়ী বলে—মল্লিক ডাক্তারই সব গোলমাল করে দিলেন। তা না হলে এতদিনের মধ্যে অন্তত একটি দিন মঞ্জুকে সংগে নিয়ে এসে আপনারাও এখানে পিকনিক করে যেতে পারতেন। কত খুশি হতো মঞ্জু।

নিখিল—এবার আর হলো না।

আত্রেয়ী—আবার কখনও কি আপনারা আসবেন?

নিখিল—আমার তো আপত্তি নেই। কিন্তু ওরা সত্যিই আবার আসতে চাইবে কিনা সন্দেহ।

আত্রেয়ী—তা হলে আপনি একাই আসবেন। অসুবিধের কি আছে? শ্রীলেখা কটেজ তো আপনারই কাকার বাড়ি। অন্য কাউকে ভাড়া দিতে মানা করে দেবেন।

নিখিল হাসে—আপনি কি মনে করেন, চাকরি করি না বলেই আমার কোন কাজ-টাজ নেই?

আত্রেয়ী—তা মনে করবো কেন? নিশ্চয় আপনার অনেক কাজ আছে। কিন্তু কাজের চাপ থেকে মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে চলে আসবেন। এই যে, দেখুন চেয়ে, ঝর্ণার জল নীচের পাথরের উপর আছাড় খেয়ে পড়ছে আর গড়িয়ে যাচ্ছে।

নিখিল—বাঃ, আগে ধারণা করতে পারিনি, এমন বিরাট আর বিশাল একটা ঝর্ণা দেখতে হবে।

আত্রেয়ী—ঠাট্টা করছেন? কিন্তু খুব ভুল ঠাট্টা। একবার শ্রাবণ মাসে এসে দেখবেন, এই জিরজিরে রোগা ঝর্ণার চেহারা সত্যি বিরাট হয়ে ওঠে কিনা? দেখলে ভয় পেতে হবে।

নিখিল—চেষ্টা করবো তাহলে; দেখি, কোন শ্রাবণ মাসে আসতে পারি কিনা।

দশ-বারো হাত উঁচু খাড়াই পাথরের মাথার উপর থেকে নীচের পাথরের উপর রোগা তিরছি নদীর একটা লিকলিকে ধারা ঝরে পড়ছে। এপারের ব্যাঙ লাফ দিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছে। জলের বুদ্বুদের ছোট ছোট ফোসকা ভেসে উঠেই ফেটে যাচ্ছে। শালবনের হাওয়া রোগা ঝর্ণার জলের ঝর-ঝর শব্দটাকে হঠাৎ এক-একটা ঝাপটা দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে সরে পড়ছে।

আত্রেয়ী—জলের ওপারে যাবেন?

নিখিল—চলুন।

রোগা জলের ধারাটা দু' হাতের বেশি চওড়া নয়। এক লাফে পার হয়ে গিয়েই ভিজে বালুর উপর দাঁড়িয়ে আত্রেয়ীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় নিখিল—চলে আসুন।

নিখিলের আগ-বাড়ানো হাতের ইচ্ছেটাকে চোখে বোধহয় দেখতেই পেল না আত্রেয়ী। পায়ের চটি দুটোকে খুলে আর হাতে তুলে নিয়ে, আর একেবারে খুশি হরিণীর মত ত্বরিত-চটুল ভঙ্গিতে একটি লাফ দিয়ে জলের ধারাটাকে ডিঙিয়ে পার হয়ে যায় আত্রেয়ী।

নিখিলের মুখে খুশির হাসিটা যেন একটু ঠান্ডা-লাগা কাঁপুনির মত সিরসির করে ওঠে—আপনি বোধহয় স্কুলের স্পোর্টে...।

আত্রেয়ী—স্কুলে নয়, স্কুলে আমি পড়িনি। কিন্তু দিবাকরদা মাঝে মাঝে স্পোর্ট করাতেন; তাতে আমিই..

নিখিল—লং জাম্পে ফার্স্ট হয়েছিলেন?

আত্রেয়ী কলকল করে হেসে ওঠে—নিশ্চয়।

এইবার, তিরছি নদীর জলের ধারার এপারের ধানক্ষেতের আল ধরে ধরে কিছু-দূর হাঁটলেই ধানোয়ার রোডের উপরে ছোট একটা আমগাছের ছায়ার কাছে পৌঁছতে পারা যায়।

নিখিল বলে—রোদটা বেশ কড়া।

আত্রেয়ী—এদিকে তো গাছটাছ নেই; কোথায় দাঁড়াবেন?

নিখিল—না, দাঁড়াতে চাই না।

কিন্তু ধানোয়ার রোডের উপরে এসে উঠতেই হাঁপ ছাড়ে নিখিল আর হাঁটার ব্যস্ততাও মৃদু হয়ে যায়।—বাঃ, বেশ চমৎকার ছায়া।

ছোট গাছ, ছায়াটাও ছোট, এমন ছায়ার মধ্যে জায়গাই বা কতটুকু?

আত্রেয়ী—আপনি এখানে একটু জিরিয়ে নিন।

নিখিল—আপনি কি করবেন? চলে যাবেন?

আত্রেয়ী হাসে—না; আমি এখন তিলকের মার সঙ্গে একটু গল্প করবো।

নিখিল—কে তিলকের মা?

আত্রেয়ী—ওই যে, রাস্তার পাশে ঝুড়ি নিয়ে বসে রয়েছে। ঝুড়িতে বরবটি।

নিখিল—বুড়ি যে রোদের মধ্যে বসে আছে।

আত্রেয়ী—তাতে কি হয়েছে?

এগিয়ে যায় আত্রেয়ী। তিলকের মার সঙ্গে কথা বলে আর বরবটির দর করে। আমের ছায়ায় একাই দাঁড়িয়ে আর সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে নিখিল—বরবটি কিনবেন নাকি?

আত্রেয়ী—না।

নিখিল—তবে চলুন। হ্যাঁ, একটা কথা বলি। আপনি কিন্তু বেশ অবুঝ মানুষ।

আত্রেয়ী—কেন?

নিখিল—কি কান্ডই না করলেন। হোঁচট খেলেন, আঙুলে জখম করলেন, আর রোদে মুখ শুকিয়ে গেছে, তবু একটু ছায়াতে দাঁড়াতেও ভুলে গেলেন।

আত্রেয়ী—ওতে কি আসে যায়?

নিখিল—না; খুব আসে যায়। আপনি একটু বুঝে দেখুন।

আত্রেয়ী হাসে—বুঝলাম না।

নিখিল—আজ যদি হেমন্তবাবু আপনাকে এসব কান্ড করতে দেখতেন, তবে...।

চমকে উঠে আর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাস্তার পাশের ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী।

নিখিল—তবে তিনি আপনাকে নিশ্চয় বুঝিয়ে দিতে পারতেন।

সিগারেটের টুকরোটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই নিখিল আবার বলে—হেমন্তবাবু কি দুঃখিত হতেন না? আর আপনাকে ধমক দিয়ে দু-একটা কথা না বলেও ছাড়তেন?

ঢিলে খোঁপাটাকে একটু শক্ত করে এঁটে দিয়ে আত্রেয়ী যেন একটা নিরেট নীরবতা হয়ে হাঁটতে থাকে।

নিখিল বলে—আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলবার মত এখন কেউ নেই বলেই আমি গায়ে-পড়ে আপনাকে এসব কথা বলছি। কিছু মনে করবেন না। আপনি আপনার নিজের দিকে একটু লক্ষ্য আর যত্ন রাখবেন। অসুখ-টসুখ করে ফেলবেন না। মনে রাখবেন, আপনি এখন শুধু আপনারই নিজের কেউ নন, আপনি আর একজনের অনেক আশার মানুষ।

আত্রেয়ীর মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নেয় নিখিল। দেখে খুশি হয়, আত্রেয়ীর নীরবতার মুখটা যেন একটা স্নিগ্ধ আলোর আভায় ভরে গিয়েছে।

নিখিল বলে—আমি তো বাইরের মানুষ, দু'দিন পরেই চলে যাব। শুধু মুখের ভদ্রতা করে দু' একটা কথা বলা ছাড়া আপনার আর কোন উপকার তো করতে পারবো না।

ডাঙার জংলী শিরীষের রঙীন মাথা দুলছে, এখান থেকেই স্পষ্ট দেখা যায়। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে নিখিল বলে—একটা অনধিকার চর্চা বটে; কিন্তু বিশ্বেস করুন, ফিলসফি আর সায়েন্সের বই পড়ি, আর চায়ের শেয়ারের যত পাওনা ডিভিডেন্ডের হিসাবই করি, হঠাৎ আমার মত মানুষের শক্ত মনও যেন ছটফট করে ওঠে, হেমন্তবাবু আর কত দেরি করবেন?

সরিয়াডির থানার আউটপোস্ট; বারান্দার দেয়ালে গা এলিয়ে দিয়ে একটা রাতজাগা পাহারার চৌকিদার অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

নিখিল বলে—সত্যি যদি কখনো সুযোগ পাই, তবে একদিন নিশ্চয় আসবো। অন্তত আপনাদের দুজনকে দেখবার জন্যে একবার আসবো। তখন কিন্তু...।

হাসতে থাকে নিখিল। আত্রেয়ীও হেসে ফেলে—বলুন না, কি হবে তখন?

নিখিল—কি আর হবে? আপনি হয়তো অনেক কষ্টে চিনতে পারবেন আর বলবেন, হ্যাঁ, এই লোকটা একদিন গায়ে পড়ে অনেক বাজে কথা বলেছিল।

আত্রেয়ী—একটুও বাজে কথা নয়। কিন্তু আপনি কি সত্যিই আসবেন?

নিখিল—আসবো।

আত্রেয়ী হাসে—এটা কিন্তু বাজে কথা।

নিখিল—এতটা মিথ্যেবাদী, মনে করবেন না।

আত্রেয়ী—মঞ্জুর বিয়ে হয়ে গেলে যেন একটা খবর পাই।

নিখিল—মঞ্জুর বিয়ে? হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু সে-কথা আপনাকে জানাতে হলে আমার কিছু লেখবার দরকার হবে না। মঞ্জু নিজেই আপনাকে দশ পাতা চিঠি লিখবে।

আত্রেয়ী—আরও একটা খবর, যেটা আপনি...।

নিখিল চেঁচিয়ে হেসে ওঠে—হ্যাঁ, সে-রকম কিছু যদি হয়, তবে তার খবরও মঞ্জুর চিঠিতে জানতে পারবেন।

কাছারিপাড়ার সড়কের সেগুন গাছের ছায়া পার হয়ে অমিয়ভবনের কাছে এসে পৌঁছতেই থমকে দাঁড়ায় আত্রেয়ী। অমিয় ভবনে ভাড়াটে নেই। খালি বাড়িটাকে চুন-কাম করা হচ্ছে। আত্রেয়ী বলে—আমি এখন আর আপনাদের কটেজে যাব না নিখিলবাবু। সোজা বাড়িতেই ফিরে যাব।

নিখিল—আসুন।

অমিয় ভবনের একটা জানালা হঠাৎ কড়মড় শব্দ করে বেজে উঠেই বন্ধ হয়ে গেল। হয়তো কেয়ারটেকার হাজরাবাবু নিজেই জানালাটাকে এক ঠেলা দিয়ে আচমকা বন্ধ করে দিয়েছেন।

—মার মার মার! ভয়ানক চিৎকার করো কথা বলছে দূরের একটা হল্লার আক্রোশ।

মোটর-মিস্তির পটলবাবু তখন তাঁর বাগানের একটা টিনের শেডের ভিতরে বসে গৌরীনাথের ট্যাক্সির কারবুরেটার মাত্র একটু খুলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে হল্লার শব্দটা ছুটে এসে তাঁর কাজের মনটাকে বিশ্রীভাবে চমকে দিল। আদুড় গা আর কালিঝুলিমাখা, একটি গামছা পরা পটলবাবু সেই মুহূর্তে লাঠি হাতে নিয়ে দৌড় দিলেন।

পটলবাবুর বাড়ি থেকে সামান্য একটু দূরে, নয়াপাড়ার সড়ক যেখানে রেলের লেবেল ক্রসিংয়ের কাছে এসে শেষ হয়েছে,

আরব্যরজনী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেখানে ছোট একটা ভিড় দাঁড়িয়ে আছে, আর চিৎকার করছে।

শুধু চুপ করে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের একটা দল; তার মধ্যে সন্তু আর চিনুও আছে।

সন্তুর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন সামন্তবাবু—যা যা যা; তোরা চলে যা এখান থেকে। তোদের আর এখানে দাঁড়িয়ে বেশী মায়া দেখাতে হবে না।

পটলবাবুর দিকে তাকিয়ে হাজরাবাবু বলেন—লাঠির দরকার নেই; অনাদি এখনি এক গুলীতে ওটাকে সাবড়ে দিতে পারবে।

সামনেই একটা শুকনো অড়হরের ক্ষেত; তারই উপর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে বুনো হেনারি। এক হাতে বন্দুকটাকে শক্ত করে ধরে অনাদিও এক-একটা লাফ দিয়ে হেনারিকে ধাওয়া করে চলেছে। গায়ে পোকাপড়া খাড়ুসার চেহারা ওই কুকুর হেনারি দিন দুই হলো পাগলা হয়ে গিয়েছে। ডাক-পিয়নের পা কামড়ে দিয়েছে, শ্রীপদবাবুর গরুটাকেও কামড়েছে, আর মালাক ডাক্তারকে তিনবার তাড়া করেছে।

সাঁরিয়াড়ির বুকের ভিতরে এই ক'মাস ধরে গুমরে গুমরে কাঁপছিল যে ভীতু আক্রোশ, যেন সেই আক্রোশই এইবার একটা হিংস্র মূর্তি হয়ে ফেটে পড়েছে। ফেটে পড়লো অনাদির বন্দুকের গুলীর শব্দ। চেঁচিয়ে উঠলেন সামন্তবাবু—ঠিক হায়; চলে এস অনাদি।

হাওয়াইয়ের সাঁরিয়াড়ির এতদিনের নরম আস্থাটা এইবার সত্যিই যেন শক্ত পাথরের ঢেলা হয়ে সব উপদ্রব তাড়িয়ে দেবার জন্য তৈরী হয়েছে।

আর দু'দিন পরেই ফণী মিত্তিরের গাড়িটা বাক্স-বেডিং সমেত নিয়ে সেই জি টি রোডের দিকে যেন আতঙ্কিতের মত ছুটে চলে গেল। রাতের অন্ধকারে কে যেন একটা ইট ছুঁড়ে ফণী মিত্তিরের গাড়ির হেড লাইট চুরমার করে দিয়েছে।

একদিন, ঠিক সকাল আটটার সময়, রজনীধামের কাছে সড়কের মোড়ের উপর জগৎ ব্যানার্জি যখন পাইপ ধরাবার জন্য একটু দাঁড়িয়েছেন, তখন তাঁর দু'পাশে হঠাৎ দুটো সাইকেল ছুটে এসেই থেমে যায়। সাইকেল থেকে যারা দুজন নামে, তারা কোন কথা বলে না। শুধু জগৎ ব্যানার্জির দু'পাশে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর একটি দিনও দেরি করলেন না জগৎ ব্যানার্জি, সন্ধ্যার ফাস্ট প্যাসেঞ্জারেই সাঁরিয়াড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।

একদিন হাওয়াইয়ের ফটকের সামনে দিবাকরকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই ভ্রূকুটি করলেন নাগ সাহেব।—কে তুমি? কী মতলব?

দিবাকরও ভ্রূকুটি ক'রে তাকায়।—একটা মেয়েছেলে যোগাড় করে দিতে পারেন, রান্নার কাজ করবে? মাইনে কুড়ি টাকা।

নাগসাহেবের চোখ দপ্ করে জ্বলে ওঠে।—কি বললে? এর মানে কি?

দিবাকরেরও চোখ জ্বলে—বুঝে দেখুন।

নাগ সাহেবের গালের মাংস কাঁপতে থাকে। —না, বুঝে দেখবার কিছু নেই।

দিবাকরের চোয়াল শক্ত হয়ে থর থর করে। —আছে।

নাগসাহেবের কটমটে রাগের চোখ দুটো সাদা হয়ে যায়। বিড়বিড় করে কথা বলেন। —তুমি চলে যাও।

দিবাকর দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলে—আপনি চলে যান।

নাগসাহেবের সারা শরীরে যেন সাঁরিয়াড়ির শীতের সব কাঁপুনি ভর করেছে; কাঁপতে থাকে নাগসাহেবের গলার স্বর।—অল-রাইট। তাই হবে।

নাগ সাহেবের এত চমৎকার বাড়ি, যার নাম হাওয়াই, তার ফটকের থামের গায়ে হাতে লেখা হরপে বেশ বড় একটা পোস্টার দেখা যায়—ফর সেল।

পরের দিন সন্ধ্যা হয়ে যাবার পরেও হাওয়াইয়ের কোন আলো আর ঝলমল করে জেগে উঠলো না। কেউ জানতেও পারেনি, ঠিক কখন চলে গেলেন নাগসাহেব। বোধহয় শেষ রাতের আবছা অন্ধকারের মধ্যে নাগ-সাহেবের গাড়িটা গা-ঢাকা দিয়ে, হেড লাইট না জ্বালিয়ে, কোন শব্দ না করে, খুব স্লো স্পীডে, যেন পা টিপে টিপে সরে পড়েছে।

—কি হলো? কি ব্যাপার? ক'দিন ধরে রোজই সন্ধ্যায় হৈ হৈ করে পথে বের হয়ে আর হাঁক দিয়ে বেড়াতে শুরু করেছেন চন্দ্রবাবু। ঠিক সন্ধ্যা হলেই কোথা থেকে সাংঘাতিক একটা ধুলোর ঘূর্ণি এসে নাগ-পাড়ার সড়ক ধরে ছুটে চলে যায়। সাঁরিয়াড়ির শীতের সন্ধ্যার ঝিমানো বাতাস বুঝি হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ধুলো ওড়াতে শুরু করেছে; আশ্চর্য না হয়ে পারবেন কেন চন্দ্রবাবু?—ওহে সামন্ত, এত ধুলো কেন? ধুলোতে আবার এত গরম কিসের?

ধুলোর ঘূর্ণি থেকে গরম কাঁকরের কুচি শ্রীলেখা কটেজের জানালার কাঁচে আর আলো-জ্বলা বারান্দার উপর ছিটকে এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার উপর উঠে শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন হাবুলেবাবু আর গোষ্ঠবাবু। —বাড়িতে কে আছেন?

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে নিখিল।—বসুন।

চেয়ারে বসেই হাবুলেবাবু বলেন।—আপনারা যাবেন কবে?

নিখিল—কেন জিজ্ঞেসা করছেন, বলুন তো?

গোষ্ঠবাবু—এর মধ্যে কোন কেন নেই মশাই; শুধু জানতে চাই, কবে আপনারা যাচ্ছেন?

নিখিল—বলছি; আপনারা কষ্ট করে একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসছি।

কটেজের চাকর ছোট একটা টেবিল ঘরের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে এসে বারান্দায় রেখে গেল; আর দু'হাতে দু'পেয়ালা চা নিয়ে বের হয়ে এল নিখিল সেন। মঞ্জুও এল; দু' ডিস খাবার টেবিলের উপর রেখে দিয়ে মঞ্জু আবার ঘরের ভিতরে চলে গেল। যাবার সময় গোষ্ঠবাবু আর হাবুলেবাবুর দিকে হাত তুলে দুটো নমস্কারও জানিয়ে গেল মঞ্জু।

হাবুলেবাবু বললেন—এসব আবার কেন?

গোষ্ঠবাবু—আমরা যে কথা জানতে এসেছি; শুধু সেই কথাটা জেনে নিয়েই চলে যাব।

নিখিল—বেশ তো, চা খান। আর, যা বলবার আছে, সবই বলুন।

দরজার পর্দা সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন প্রীতি বউদি; তাঁর পাশে মঞ্জু। প্রীতি-বউদির চোখে শঙ্কা। মঞ্জুর চোখে আতঙ্ক।

প্রীতি বউদি বলেন—আপনারা আগে চা খেয়ে নিন। তারপর গল্প করুন। আমি এই নিখিলের বউদি।

মঞ্জু—বড়দা ভেতরের ঘরে বসে আছেন। পায়ে বাতের ব্যথা; তা না হলে নিজেই এসে আপনাদের চা খেতে বলতেন।

হাবুলেবাবু—না, সেটা কোন প্রশ্ন নয়; কোন দরকার নেই।

গোষ্ঠবাবু—শুধু একটা কাজের কথা বলতে এসেছি।

মঞ্জু—বলুন; কিন্তু তার আগে চা খেয়ে নিন।

হাবুলবাবু—তা খাচ্ছি; কিন্তু কথাটা হলো...।

গোষ্ঠবাবু—কথাটা শুধু এই নিখিলবাবুকেই বলতে চাই।

প্রীতি বউদি আর মঞ্জু ঘরের ভিতরে যেতে যেতেই নিখিল বলে—কথাটা শুধু যদি আমাকেই বলতে চান, তবে এখানে না বলে...।

হাবুলবাবু—হ্যাঁ, চলুন, বাইরে গিয়ে রাস্তাতেই কথা বলি।

নিখিল—কিন্তু চা আর খাবার খেয়ে নিন।

চা খেলেন, কিন্তু খাবার খেলেন না গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু। আর রাস্তাতে এসেই নিখিলের চোখের সামনে দুজনে আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন।

হাবুলবাবু—আপনি কি জানেন না, আমাদের প্রদোষদার মেয়ে আত্রেয়ীর অনেকদিন আগেই বিয়ে হয়েছে?

নিখিল—জানি বইকি। বোধহয়, প্রায় সাড়ে তিন বছর হলো...।

গোষ্ঠবাবু—এই হিসেবটা তো ঠিকই রেখেছেন দেখছি। কিন্তু আত্রেয়ীর সঙ্গে আপনার ব্যবহারটা কেন এত বোহিসেবী হয়ে উঠলো?

নিখিল—বুঝেছি, আপনারা কি বলতে চাইছেন।

হাবুলবাবু—এখন আপনার কি বলবার আছে বলুন।

হেসে ফেলে নিখিল—আমার কিছু বলবার নেই।

গোষ্ঠবাবু—তবে কে বলবে?

নিখিল—প্রদোষবাবুর মেয়ে আত্রেয়ীই বলবে। তাকে জিজ্ঞেসা করুন।

হাবুলবাবুর গলার স্বর ক্ষুব্ধ হয়ে খড়খড় করে—কি জিজ্ঞেস করবো আত্রেয়ীকে?

নিখিল—আমি কোন বেহিসেবী ব্যবহার করেছি কিনা; আমি বেহিসেবী ব্যবহার করবার মত একটা লোক কিনা; আত্রেয়ীকে জিজ্ঞেসা করলে সবই জানতে পারবেন।

গোষ্ঠবাবু—তা না-হয় আত্রেয়ীকে জিজ্ঞেসা করা যাবে; কিন্তু আপনি যাচ্ছেন কবে?

নিখিল হাসে—ঠিক কবে যাব বলতে পারি না। তবে এমাসেই চলে যাবার কথা আছে।

হাবুলবাবু—ভাল কথা।

নিখিল—খুব সম্ভব, আবার আসবো।

গোষ্ঠবাবু—কেন?

নিখিল—ইচ্ছে।

হাবুলবাবু—ফল খুব খারাপ হবে।

নিখিল—হলে হবে।

গোষ্ঠবাবু—আত্রেয়ীর স্বামী এখন [illegible]

নিখিল—জানি।

হাবুলবাবু—সে যে একদিন এসেও পড়বে, সেটা কি ভুলে গেছেন?

নিখিল—আমি চাই তিনি শিগগির এসে পড়ুন।

গোষ্ঠবাবু—তখন কি হবে?

নিখিল হাসে—তখন আমি অন্তত আপনাদের চেয়ে বেশী সুখী হব।

হাবুলবাবু—তার মানে?

নিখিলবাবু—তার মানে, প্রদোষবাবুর মেয়ের জীবনের জন্য আপনাদের মত স্থায়ীদের মনে যত মায়া আছে, আমার মত একজন অস্থায়ীর মনে বোধহয় তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম মায়া নেই।

গোষ্ঠবাবুর গলার স্বরের কড়া মেজাজ হঠাৎ যেন নরম হয়ে যায়।—আপনি একটা ভাল কথা, বেশ চমৎকার কথাই বলছেন, কিন্তু...।

হাবুলবাবু বেশ জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন—এরকম হলে তো ভালই হয়, কিন্তু...।

নিখিলেরও মুখের ভাষা সব রুক্ষতা হারিয়ে গিয়ে একেবারে স্নিগ্ধ হয়ে যায়।—কোন কিন্তু নেই। আমি বাইরের মানুষ, আপনাদের প্রদোষদার মেয়ের দুঃখের জীবনকে খুশী করে রাখবার জন্য আমি আর কতটুকুই বা কি করতে পারি? সেটা আপনাদের কাজ, আপনারাই করবেন। আমি দুদিনের জন্যে এখানে এসে দুদিনের চেনা এক মহিলাকে শুধু মুখের ভাষায় একটু ভদ্রতা দেখিয়ে চলে যেতে পারি, এই মাত্র।

গোষ্ঠবাবু হঠাৎ একেবারে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে ফেলেন—সেটা আপনার মহত্ত্ব।

হাবুলবাবু—বাণীদির কাছ থেকে আপনাদের কত প্রশংসার কথা শুনেছি। মনেও হয়েছে, আপনারা কি কখনও কারও ক্ষতি করতে পারেন? কখনই না।

নিখিল হাসে—কারও ক্ষতি করবো, সে রকম সাংঘাতিক সাহস অন্তত এখনও পর্যন্ত...।

গোষ্ঠবাবু—না না, ওরকম জঘন্য সাহস আর যেই করুক না কেন, আপনার পক্ষে সেটা সম্ভবই নয়।

হাবুলবাবু—আপনার দাদা সরিয়াডির জল-বাতাসে কিছু উপকার পেয়েছেন নিশ্চয়?

নিখিল—দাদা তো বলছেন, পেয়েছেন।

গোষ্ঠবাবু—আপনি?

নিখিল হাসে—আমার শরীরটা তো সরিয়াডির জল-বাতাসের কাছে নতুন করে কোন স্বাস্থ্য আশা করে না।

হাবুলবাবু—দরকারও হয় না। আপনার তো এমনিতেই সুন্দর স্বাস্থ্য।

নিখিল—তবে আমিও একটি উপকার পেয়েছি। বেশ মন লাগিয়ে পড়াশুনা করতে পেরেছি।

গোষ্ঠবাবু—শুনে খুবই খুশী হলাম নিখিলবাবু। একটা দুঃখের কথা কি জানেন? এখানে হাওয়া বদল করতে যাঁরা আসেন, তাঁদের অনেকেই সব সময় শুধু ফূর্তির কথা ভাবেন। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কলকাতার অধরবাবুর মত; বর্ধমানের শৈলেশবাবুর মত......।

হাবুলবাবু—আর মেদিনীপুরের সরোজবাবুর মত...।

গোষ্ঠবাবু—হ্যাঁ, অত্যন্ত সদাশয় মানুষও এসেছেন। কী চমৎকার হৃদয়; আর কত সুন্দর ব্যবহার। শৈলেশবাবু চলে যাবার সময় আমার হাত ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন।

হাবুলবাবুর চোখের দৃষ্টিটা প্রসন্ন হয়ে হাসতে থাকে।—আপনারা আরও কটা দিন এখানে থেকে গেলেও পারেন। আচ্ছা, আমরা এখন তবে চলি।

গম্ভীর পাগল দুর্গাচরণের একটা অদ্ভুত অভ্যাস আছে। পথে যেতে চেনা-অচেনা কোন মহিলার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলেই এক লাফে পথের এক পাশে সরে যায়। মুখ ফিরিয়ে আর মাথা হেঁট করে কুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। সে সময় দুর্গাচরণের গম্ভীর মুখটা বিচিত্র এক লজ্জার হাসিতে ভরে যায়।

—আর একটু বেশী মেজাজ খারাপ করলে বড়ই লজ্জার ব্যাপার হয়ে যেত, গোষ্ঠদা। বলতে গিয়ে বেশ একটু লজ্জিতভাবে হেসে ফেলেন হাবুলবাবু; আর মাথা হেঁট করে দাবার ছকের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

গোষ্ঠবাবুও লজ্জিতভাবে হাসেন—ছিঃ, ভুল ধারণা করে কী বিশ্রী একটা কাণ্ড বাধাতে চেয়েছিলেন।

হাবুলবাবু—আসল অসুবিধেটা কি জানেন? খুব বেশি ভাল লোক হলে তাকে চিনতে সকলেই ভুল করে।

গোষ্ঠবাবু—তা বটে; কিন্তু ছোটলোক দেখে দেখে আমাদের চোখের অভ্যাসও খারাপ হয়ে গিয়েছে; তাই ভদ্রলোক চিনতে পারি না।

দিবাকরও লজ্জা পেয়েছে। এই লজ্জার মধ্যে যেন একটা বিস্ময়ের চমক আছে; শ্রীলেখা কটেজের নিখিলকে সত্যিই যে ভদ্রতার একটা বিস্ময় বলে মনে হয়। আত্রেয়ীর স্বামী তাড়াতাড়ি চলে আসুক, এমন প্রার্থনা যার মনের মধ্যে রয়েছে, তাকেই আত্রেয়ীর জীবনের একটা ক্ষতির মতলব বলে সন্দেহ করা হয়েছে। ঠিকই বলেছেন গোষ্ঠদা, মানুষ একটু বেশী মহৎ হয়ে গেলে লোকে তাকে চিনতে খুবই ভুল করে।

এক আনাতে চার জোড়া পাকা তাল দিয়ে চলে গিয়েছে এক দেহাতী বুড়ি। চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন চিনুর পিসিমা—ওরে ও চিনু, দেখ তো মা, বুড়িটা চলে গেল নাকি? ভুল করে দু'জোড়া বেশী দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

পিসিমার হাসিটা যেমন একটা হঠাৎ-খুশির তেমনই একটা হঠাৎ লজ্জার হাসিও বটে। যা ধারণা করা হয়েছিল, তা নয়। তার চেয়ে বেশী দিয়ে ফেলেছে বুড়িটা; ঠকাবে বলে মিথ্যে সন্দেহ করা হয়েছিল বুড়িটাকে, আর অনেক দরাদরিও করা হয়েছিল। ছি।

চিনু বলে—চলে গিয়েছে বুড়ি।

পিসিমা—তবে একবার একটু দৌড়ে গিয়ে দেখে আয় তো মা, প্রদোষ জেঠা কি করছেন? ঘুমিয়ে আছেন, না হেসে-হেসে গল্প করছেন?

চিনু—দেখেছি।

পিসিমা—কি দেখেছিস?

চিনু—প্রদোষ জেঠা গান গাইছেন।

লজ্জা পেয়েছে আর নিশ্চিন্ত হয়েছে ছোট শহর সরিয়াডি। মনে মনে একটা পরাভবও খুশি হয়ে স্বীকার করে নিয়েছে। হাওয়াবদলের জন্য বাইরে থেকে শুধু দু'দিনের ফুর্তিগুলি আর স্বার্থগুলি আসে না; দু'দিনের একটা মহত্ত্বও আসে।

লজ্জা পেয়ে সরিয়াডির প্রাণটাও এখন থেকে বেশ সামলে থাকতে চেষ্টা করছে। নিখিলের সঙ্গে পথে দেখা হলেই নমস্কার জানায় দিবাকর—ভাল আছেন?

দেখতে পাওয়া যায়, হাওয়া বদলের জন্য সরিয়াডিতে এসে কদিন থেকে নতুন আগন্তুকের মূর্তি নয়াপাড়ার সড়ক ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ায়। নিতান্ত অল্পবয়সের এক স্বামী ও তার স্ত্রী; প্রায় কচি বয়সের একটি মেয়ে। একেবারে শুকনো সাদাটে ও জিরজিরে শরীরের মেয়েটিকে দেখেই চিনে নিতে পারা যায়, ওটা এক টি-বি রোগিণীর করুণ মূর্তি। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বেড়াতে বের হয়ে মাঝে-মাঝে সরিয়াডির যত স্থানীদেরই বাড়ির গেটের কাছে চুপ করে কিন্তু যেন বেশ ভয়ে-ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

না, আর ভুল করেন না হাবুলবাবু। হাবুলবাবুর এতদিনের কড়া মেজাজের চোখ দুটো যেন একটু করুণ হয়ে যাবার জন্যেই ছটফট করে। গেটের কাছে এগিয়ে যান হাবুলবাবু।—কেমন বোধ করছো এখানকার জলবাতাস? ভাল?

ছেলেটি হাসে—হ্যাঁ ভাল তো বটেই; তার চেয়ে ভাল আপনাদের আশীর্বাদ।

হাবুলবাবু—আঁ? চমকে ওঠেন হাবুলবাবু।

ছেলেটি বলে—আপনাদের আশীর্বাদ থাকলেই কুন্তলার রোগ ভাল হয়ে যাবে।

কুন্তলার বড়-বড় চোখ দুটো চকচক করে। সরু শীর্ণ গলাটা একবার কেঁপে ওঠে; তারপরেই মাথা হেঁট করে হাসতে থাকে কুন্তলা।

অদ্ভুত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন হাবুলবাবু—নিশ্চয়, নিশ্চয় কুন্তলা সেরে উঠবে, তুমি ভাবছো কেন?

বাড়ির ভিতর থেকে হাবুলবাবুর স্ত্রী বের হয়ে আসেন। কাচের বাড়ি থেকে গোষ্ঠবাবু ও তাঁর স্ত্রী বের হয়ে আসেন। সবাই এক সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে কথা বলেন—ভাল হবে বইকি। একটুও ভেব না।

—শুধু একটু সাবধানে থেক।

—ডাক্তারের কথা শুনে চলবে।

—কোন ওষুধ দরকার হলেই বলো, গয়া থেকে আনিয়ে দেবে দিবাকর।

শ্রীলেখা কটেজের সামনের মাঠের উপর দৌড়ে দৌড়ে ঘুড়ি ওড়ায় সন্তু। কটেজের মাথার উপরের আকাশে সন্তুর ঘুড়িটা ডগমগ হয়ে দুলছে। চেঁচিয়ে ডাক দেয় সন্তু—একবার এসে দেখে যাও, মঞ্জুদি, আমার ঘুড়ি তোমাদের বাড়ির ধোঁয়ার ওপরে উঠে গেছে।

কে জানে কবে আর কেমন করে, মঞ্জুর সঙ্গে ভাব করে ফেলেছে সন্তু। কিন্তু সন্তুর এমন উৎফুল্ল স্বরের ডাক শুনেও ঘরের বাইরে বের হয়ে আসে না মঞ্জু। মঞ্জু বড় গম্ভীর। ছোট্ট সন্তুর ডাক তো নয়, ওটা যেন সরিয়াডির একটা ভয়ানক গর্বের ডাক।

মঞ্জুর আর ঝর্না দেখতে যাওয়া হয়নি। যেতে চায়ও না মঞ্জু। আত্রেয়ী অবশ্য রোজই আসে আর ঝর্না বেড়াতে যাবার জন্যে তাগিদও দেয়।

আত্রেয়ীর যত হাসির কথার সঙ্গে অনেক চেষ্টা করে একটু হেসে নেয় মঞ্জু; কিন্তু আত্রেয়ী চলে গেলেই গম্ভীর হয়ে যায়।

যেন একটা ভয়ের ছায়া দেখতে পেয়ে সর্বক্ষণ ভীরু হয়ে রয়েছে মঞ্জুর মন। প্রীতি বউদির কাছে এসে ফিসফিস করে কথা বলে মঞ্জু—আর এখানে দেরি করো না বউদি; যত তাড়াতাড়ি পার সরে পড়।

প্রীতি বউদির চোখমুখে একটা গম্ভীর ভয়ের ছায়া সব সময় ছমছম করছে। সরিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ীর মুখের মিষ্টি হাসিটাকে দেখতে একটুও আর ভাল লাগে না। এ বাড়ির সব সতর্কতার যেন মাথা হেঁট করিয়ে দিয়ে আত্রেয়ীর মুখে একটা বিশ্রী জয়ের আনন্দ হাসছে।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী ভয় করে নিখিলের উচ্ছল খুশির মুখের হাসিটাকে।

প্রীতি বউদির মনের গভীরে আজ যেন একটা অবুঝ ভয় বেশ যন্ত্রণা দিয়ে কথা বলছে—ফিলসফি আর সায়েন্সের বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন বলেই কি নিখিল যেন সব ইচ্ছের ধরাছোঁয়ার একেবারে বাইরে চলে গিয়েছেন? কিংবা, মঞ্জুর এই মেজদাটি কি সত্যিই একটি লোহা?

—না মঞ্জু, আমার একটুও ভাল লাগছে না। সব লোহা অশোকের থামের লোহার মত নয় যে তার গায়ে মরচে ধরবে না।

মঞ্জু—ওই ভদ্রলোক দু'জন বাড়াবাড়িও হয়ে কিরকম বিশ্রী ভাষায় ভয় দেখিয়ে কথা বললেন, শুনলে তো?

প্রীতি বউদি—শুনেছি বলেই তো বুঝেছি। কে জানে ওদের কী কথা বলে এত বুঝিয়ে দিল আর খুশি করে দিল তোমার তার্কিক মেজদা।

মঞ্জু—থাকগে, ওসব কথা ছেড়ে দাও। এখন তাড়াতাড়ি চলে যাবার ব্যবস্থা কর।

প্রীতি বউদি—তোমার বড়দা বলছেন, এই রবিবারেই দিন ভাল আছে।

ঘরে ঢুকলো নিখিল।—তোমরা কি যাবার দিন-টিন ঠিক করে ফেলেছ বউদি?

প্রীতি বউদি—হ্যাঁ, এরকম ঠিক হয়েই আছে।

নিখিল—কবে?

প্রীতি বউদি—এই রবিবারে।

নিখিল—আরও একটা মাস থেকে যাও না।

প্রীতি বউদি—না।

নিখিল—আমি কিন্তু আরও কিছুদিন থাকবো।

প্রীতি বউদি—কেন?

নিখিল—এখানে থাকতে ভালই লাগছে।

প্রীতি বউদি—বুঝতে পারছি না, এখানে তোমার এত ভাল লাগবার মত কি বস্তু থাকতে পারে?

নিখিল—সব চেয়ে ভাল বস্তুটি আছে।

চমকে ওঠেন প্রীতি বউদি—কি?

নিখিল—একেবারে একা হয়ে পড়ে থাকবার সুযোগ; নিরিবিলি এই কটেজের এই ঘরটি।

প্রীতি বউদি—নিরিবিলি ঘর তো চাকলাতেও আছে। না, তোমার এখানে থাকবার কোন দরকার নেই।

নিখিল—আমার কোন দরকার নেই বলেই তো থাকতে চাইছি।

প্রীতি বউদি—এখানে নানারকম ভয়ের ব্যাপার আছে।

নিখিলের চোখে যেন ধীর-স্থির একটা বিদ্যুৎ জ্বলছে—আমি কাউকে ভয় করি না বউদি। তোমাদের বাজে ভয়কে, সরিয়াডির মিথ্যে ভয়কে, এমন কি নিজেকেও আমি ভয় করি না।

বোধ হয় আর কোন কথা বলতে চান না প্রীতি বউদি। যেন অদ্ভুত একটা হেঁয়ালির মুখরতা শুনেছেন, কিছুই বোঝা যায় না; বলবারও কিছু নেই। তাই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

নিখিল বলে—সরিয়াডির মত সামান্য একটা জায়গাতে আমার কোন আশা আর ইচ্ছে থাকতেই পারে না, বউদি।

প্রীতি বউদির মুখের গম্ভীরতা তবু একটুও মুছে যায় না; বোধহয় নিখিলের এইসব কথা বিশ্বাস করবারও কোন ইচ্ছে তাঁর আর নেই।

হেসে হেসে সিগারেট ধরায় নিখিল।—হ্যাঁ, চার আনার পোপে আট আনায় কিনে একটু ঠকে যেতে পারি। কিংবা আমার সিগারেটের এই আট টাকা দামের পলকা আইভরির কেস ভুল করে হারিয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু সেটা কি খুব বেশী ক্ষতির ব্যাপার হবে বউদি?...ও গম্ভীর বউদি? ও নীরব বউদি?

বলতে বলতে নিখিলের গলার স্বর হঠাৎ যেন একটা চতুর হাসির তুফান হয়ে ফেটে পড়ে। বউদি তবু নীরব; আর মঞ্জুও নীরব।

নিখিল বলে—কথাটা হলো, আমি এখনই রওনা হচ্ছি।

চমকে ওঠেন প্রীতি বউদি; চোখ ফিরিয়ে নিখিলের মুখের দিকে তাকান।

নিখিল—হ্যাঁ, আর পাঁচিশ মিনিট পরেই ট্রেন। কাজেই তোমাদের সঙ্গে এখন আর বাজে তর্ক করবার সময় নেই।

দেখতে পেলেন প্রীতি বউদি, সত্যিই তো, বারান্দার চেয়ারের উপর নিখিলের ছোট টুরিস্ট ব্যাগটি কোথাও যাবার জন্যেই তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে; ব্যাগের উপরে নিখিলের একটা আলোয়ানও চার ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে।

নিখিল—আমি যাচ্ছি। কলকাতায় পৌঁছেই সরকার মশাই আর বেহারা বিনয়কে পাঠিয়ে দেব। ওরা বড় টুরারটাকে নিয়ে সোজা বাই রোড চলে আসবে। দাদার পক্ষে এখন ট্রেনে যাওয়া ঠিক হবে না।

প্রীতি বউদির মুখে গম্ভীরতার এক ছিটে মেঘও আর নেই। শান্ত ও প্রসন্ন প্রীতি বউদির চোখ-মুখ যেন একটা লজ্জিত খুশির হাসিতে ভরে গিয়েছে। মঞ্জুও নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে—মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে এরকম থিয়েটার করবার কী দরকার ছিল, মেজদা? তুমি সত্যিই একটা যাচ্ছেতাই অদ্ভুত মানুষ।

নিখিল—বাজে কথা ভাবলে এই রকমই অদ্ভুত হতে হয়।...আচ্ছা, আমি এখন চলি, আর দেরি করবো না। চা-টা এখন দরকার নেই।

আলোয়ান কাঁধে ফেলে আর ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়েই ব্যস্তভাবে আরও একটা কথা চেঁচিয়ে বলে দিয়ে চলে যায় নিখিল—কলকাতা থেকে আমি সোজা চা-বাগানে চলে যাব বউদি।

গেটের কাছে এগিয়ে যেয়ে আবার একটু থেমে নিয়ে কথা বলে নিখিল।—বাজে গল্পের মত বই সবই লাইব্রেরীতে দান করে দিও; আর আমার সব বই ভাল করে গুছিয়ে দুটো বড় বাক্সে ভরে নিও, বউদি

নিখিল চলে যাবার পর বারান্দায় পায়চারি করে মঞ্জু আর প্রীতি বউদি দুজনেই অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে করে হাসতে থাকেন।

প্রীতি বউদি বলেন—নিখিলের মনটা সত্যিই মহৎ, কোন সন্দেহ নেই। সেই জন্যেই তো দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম।

আত্রেয়ী আসছে; গেট পার হয়ে জবা গাছটার কাছে দাঁড়িয়েছে আর ওদিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে।

—ওয়েলকাম আত্রেয়ী। ডাকতে গিয়ে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে মঞ্জু।

প্রীতি বউদিও হাসেন—কি ব্যাপার আত্রেয়ী? তোমাকে খুব ব্যস্ত বলে মনে হচ্ছে।

আত্রেয়ী—ব্যস্ত না হয়ে উপায় কি? মঞ্জু যে সাংঘাতিক কথাটি বলে রেখেছে।

প্রীতি বউদি—কি কথা?

আত্রেয়ী—আপনারা এমাসেই চলে যাবেন।

মঞ্জু হাসে—এ মাসে নয়, আত্রেয়ী; এই সপ্তাহে; এই রবিবারেই যাচ্ছি।

—বেশ করছো! আত্রেয়ীর চোখ-মুখ করুণ হয়ে গিয়ে যেন একটা অভিমানের আপত্তি চাপা দিতে চেষ্টা করে।

মঞ্জু—মেজদা তো চলেই গিয়েছেন।

আত্রেয়ী হাসতে চেষ্টা করে—মিথ্যে কথা।

মঞ্জু—তোমার তাই মনে হতে পারে, কিন্তু...।

আত্রেয়ী—ওই তো, বাগানে একটা বেতের মোড়ার ওপর নিখিলবাবুর বই পড়ে রয়েছে।

মঞ্জু অদ্ভুতভাবে হাসে—তাই নাকি? বইটাকে বাগানে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে মেজদা? তাই বল! কিন্তু ওটা তো মেজদার চিরকেলে অভ্যেস; তোমাকে আগেও কতবার বলেছি। বিশ্বাস করনি বোধহয়?

প্রীতি বউদি চোখ বড় করে তাকেন।—মনে হচ্ছে, এইবার বিশ্বাস করতে পেরেছে আত্রেয়ী?

আত্রেয়ী—তা হলে সত্যিই আপনারা চললেন, বউদি? বলতে গিয়ে আত্রেয়ীর গলার স্বর ছলছল করে ওঠে।

প্রীতি বউদি হাঁ; ঠিক করেছি খুব ভোরেই রওনা হয়ে যাব। তোমার বাবাকে আমাদের নমস্কার জানিয়ে দিও।

রুমাল দিয়ে চোখ দুটোকে চেপে রেখে কিছুক্ষণ নিথর হয়ে বসে থাকে আত্রেয়ী। তারপরেই উঠে দাঁড়ায়।—চলি বউদি, চলি মঞ্জু।

একবার অখিলবাবুর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় আত্রেয়ী।

অখিলবাবুর চোখ দুটো একবার কেঁপে ওঠে। তবু হেসে হেসে কথা বলেন অখিলবাবু। —হ্যাঁ, এবার আমাদের যেতেই হচ্ছে।

প্রীতি বউদি আত্রেয়ীর পিঠে হাত বুলিয়ে হাসতে থাকেন—ছিঃ, এত দুঃখ করবার কি আছে?

আত্রেয়ীর একটা হাত ধরে মঞ্জুও হাসে। —তোমার কথা কি আমি কখনও ভুলতে পারবো? কখ্খনো না।

চন্দ্রবাবুর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিয়েছে চিনু আর সন্তু; সেই সঙ্গে বাচ্চা ছেলে-মেয়ের একটা দল।

চিনু বলে—এ কি দাদু? তুমি উনুন ধরাচ্ছো কেন? মধু কোথায়?

চন্দ্রবাবু—মধু নেই রে দিদি।

সন্তু—কোথায় গেল মধু?

চন্দ্রবাবু হাসলেন—মধু জানে।

চিনু—এ কি? তোমার বাক্সটা ভাঙা কেন দাদু? বিছানায় চাদর নেই কেন? আলনাতে জামা-কাপড়ও কিচ্ছু নেই কেন?

চন্দ্রবাবু উনুনের ধোঁয়াতে মুখের উপর জোরে জোরে পাখার বাতাস দিয়ে হাসতে থাকেন।—সবই মধু জানে।

সন্তু—মধু আর আসবে না?

চন্দ্রবাবু—চলে গেলে কেউ কি আবার ফিরে আসে?

চিনু—মধুটা তবে নিশ্চয় তোমার সব জিনিস চুরি করে পালিয়েছে।

চন্দ্রবাবু—এ আর এমন কি চুরি হলো রে দিদি? আরও কত বড়-বড় জিনিস চুরি হয়ে গিয়েছে।

সন্তু—মা বলছিল, তুমি খুব ভাল লোক; তুমি স্বর্গে যাবে।

চন্দ্রবাবু—স্বর্গেই তো আছি।

সন্তু হাসে—এটা স্বর্গ? এই বিচ্ছিরি ঘর; ধোঁয়া উনুন আর কাঁচাপেপে; হারমোনিয়াম নেই, ফটো নেই, ট্রাইসাইকেল নেই, তোমার তো কিছুই নেই দাদু।

চন্দ্রবাবু—একেই বলে স্বর্গসুখ। বড় হলে বুঝবি।

চিনু—আলুর বড়া খাবে, দাদু? এনে দেব? মা এখন আলুর বড়া ভাজছে।

চন্দ্রবাবু—আর কত খাব?

চিনু—কবে খেলে?

চন্দ্রবাবু—অনেকদিন আগে।

চিনু—কে ভেজে দিলে?

চন্দ্রবাবু—আমার বউ।

চিনু—ধেৎ

চন্দ্রবাবু—বিশ্বেস কর; আমি তো লঙ্কার ঝাল একেবারেই সহ্য করতে পারি না। তাই শুধু আদাবাটা দিয়ে চমৎকার বড়া ভেজে দিত সেই বউটা।

সন্তু—ছেলেটার নামটা মনে পড়েছে দাদু?

চমকে ওঠেন চন্দ্রবাবু; উনুনের ধোঁয়ার সব জ্বালা যেন তাঁর চিকচিকে হাসির

চোখ দুটোর উপর ছড়িয়ে পড়েছে।—কার নাম? কার ছেলে?

সন্তু—সেই যে বলেছিল; দাঁত নেই, এইটুকু একটা ছেলে।

উনুনটা জ্বলতে শুরু করেছে, এইবার এক হাতে একটা কাঁচা পেঁপে ঝুড়ি থেকে তুলে নিয়ে আর-এক হাতে বঁটিটাকে কাছে টেনে আনেন চন্দ্রবাবু। —নাঃ, একেবারেই মনে পড়ে না। নামই ছিল না। তবে আর মনে পড়বে কোন্ ছাই?

চিনু—আমি কিন্তু সব নাম মনে করতে পারি। রাধুদির ছেলের নাম হরতন, সজু কাকার ছেলের নাম বিশু, মউর মাসিমার ছেলের নাম বিজয়।

মাথা দোলাতে থাকেন চন্দ্রবাবু—বাঃ, আমাদের চিনুরানী কত নাম ধরে রেখেছে, দেখ।

সন্তু—তুমি কেন পার না?

চন্দ্রবাবু—আমি চাই না। আমি কিছুই ধরতে টিকতে চাই না।

চিনু—তুমি বোকা।

চন্দ্রবাবু—তবে শুনবি? একটা কথা বলবো?

চিনু—বল।

চন্দ্রবাবু—এই গাঁয়ের [illegible] একা [illegible] চালাক; আর সব বোকা।

সন্তু—আমাদের [illegible] আত্রেয়ীদি [illegible]?

চন্দ্রবাবু—ওরা তো সব [illegible]।

চিনু [illegible]—আত্রেয়ীদি [illegible] কিন্তু।

চন্দ্রবাবু হাসেন—কি বলে! [illegible] না। [illegible]।

চিনু [illegible]?

চন্দ্রবাবু [illegible], চিনিকে [illegible] আত্রেয়ীদি [illegible]।

[illegible] একলা প্রাণ।

এইবার আকাশের দিকে তাকিয়ে কোন নতুন বিস্ময়ের ছুতো খুঁজতে থাকেন চন্দ্রবাবু। মনে হচ্ছে, পুবের আকাশের এক কোণে সামান্য একটুকরো মেঘ বেশ কালো হয়ে উঠেছে। বেশ তো! কিন্তু সেজন্যে রোদের তেজ এত কমে যাবে কেন? সারিবাড়ির মত বাড়ির খাপরার চালাগুলির উপর এত ছায়া-ছায়া মায়া-মায়া ভাব কেন?

চন্দ্রবাবু।

—কি হে দিবাকর? আজ তো তোমার ছুটি? সড়কে দাঁড়িয়েই দিবাকরের বাড়ির জানালার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন চন্দ্রবাবু।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জানালার কাছে এসে উত্তর দেয় দিবাকর।

চন্দ্রবাবু—একটু মেঘ করেছে বটে; কিন্তু সেজন্যে চারিদিকে এত কালো-কালো ভাব কেন? রোদে তেজ নেই কেন? এরকম তো কখনও দেখিনি। কী ব্যাপার?

দিবাকর—বৃষ্টি হতে পারে; আপনি একটা ছাতা নিয়ে বের হলে ভাল করতেন, চন্দরকাকা।

কিন্তু দিবাকরের কথা শেষ হতে না হতেই চলে গিয়েছেন চন্দ্রবাবু। দিবাকরও তার কাঠের গোলার দিকে একবার ঘুরে আসবার জন্য সাইকেল নিয়ে বের হয়ে পড়ে।

—কি রে আত্রেয়ী? এত রোগা হয়ে গেলি কেন? আত্রেয়ীর সঙ্গে পথে দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করে দিবাকর। আত্রেয়ী হাসতে চেষ্টা করে।—রোগা হওয়াই তো ভাল। ভাত কম খাব অথচ বেঁচেও থাকবো। শান্তি বউদি কেমন আছেন?

দিবাকর—তিনি তো [illegible] সঙ্গে [illegible] চলেছেন।

[illegible] আর দিবাকর: [illegible] কিছুদিন ধরে [illegible] আর বেশ উদাস হয়ে গিয়েছে [illegible]। [illegible] কিন্তু এরকমটি হতে দিলে তো [illegible]।

বাড়ি ফিরে এসেই দিবাকর ঘরের ভিতরে [illegible] তাকিয়ে বেশ একটু মায়া মায়া করে আর নরম স্বরে কথা বলে।—সেই জন্যেই বলছি। [illegible] তোমার একটু চেষ্টা করা উচিত ছিল।

শান্তি [illegible] আমি নিজেই [illegible]......

দিবাকরের [illegible] আত্রেয়ীকে ডেকেছিলাম। কিন্তু [illegible] হয়নি, হতেও পারে না। তোমরা সড়কে নেমেই ব্যস্তভাবে চলতে থাকেন বেকুব বলেই বাইরের লোকের কাছে আমাদের কথা শুনতে হয়।

শান্তি—কে আবার কথা শোনালে?

দিবাকর—শ্রীলেখা কটেজে এতদিন যারা ছিল, তারাই গোষ্ঠদাকে আর হাবুলদাকে বেশ ভাল করে শুনিয়ে দিয়েছে।

শান্তি—বুঝলাম না।

দিবাকর—সেই ভদ্রলোক, নিখিলবাবু, বেশ ঠাট্টা করে বলেই দিয়েছে যে, আত্রেয়ীর মত একটা দুঃখের জীবনের মেয়েকে একটু খুশি করে ভুলিয়ে রাখা এখানকারই লোকের কর্তব্য ছিল। কথাটাই তো মিথ্যে বলেনি?

শান্তি—ঠিকই বলেছে।

দিবাকর—কিন্তু তোমরা কি কোন চেষ্টা করেছ? বরং বাইরের দুই মহিলা এসে মেয়েটাকে কটা দিন খুশি করে রেখেছিল। তবু কি তোমাদের একটুও লজ্জা হলো?

শান্তি—চিনুর পিসিমা আর সন্তুর মা তো অনেকবার আত্রেয়ীর কাছে গিয়েছেন।

দিবাকর—এটা পিসিমা মাসিমার কাজ নয়। তোমার কাজ। তুমি চেষ্টা করলে কাজ হতো।

শান্তি এইবার মুখ টিপে হাসে—বুঝেছি; আচ্ছা তাই হবে।

হেসে ফেলে দিবাকর। কড়া মেজাজের দিবাকরের মুখে সত্যিই একটা স্নিগ্ধ ছায়া-ছায়া হাসি।—তবে এতক্ষণ না-বোঝার ভান করছিলে কেন?

গোষ্ঠবাবু বাড়িতে বেশ একটু গজগজ করেছেন। এটাও একটা মায়ার গজগজানি।—তোমরা মিথ্যেই মেয়ে মানুষ হয়েছিলে। তোমরা নিজেরা একটু গরজ করে মেয়েটাকে কাছে ডাকলে, দুটো ভাল কথা বললে, তবে তো? বাইরের লোকের সঙ্গে শুধু লাঠালাঠি করেই কি একটা মেয়ের মন কেড়ে আনতে পারা যায়?

হাবুলবাবু ভাত খেতে বসে তিনবার হাত গুটিয়ে রেখে বিড় বিড় করেছেন।—আমরা ভাবতে খোড়া মানুষ প্রদোষদার একটা অপমান হয়ে গেলে সেটা আমাদের সবারই অপমান। সেটা আমরা বুঝি। কিন্তু তোমরা মেয়েমানুষ হয়েও এটুকু বোঝ না যে, আত্রেয়ীর কোন অপমান হলে সেটা তোমাদের মেয়ে জাতটারই অপমান হয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের কোন চেষ্টাই নেই, শুধু মুখেই যত মায়া।

শ্রীলেখা কটেজ এখন শূন্য। কয়েকটা ভাল লোক এসেছিল, আর ভালয় ভালয় চলে গিয়েছে। তাই বাইরের হাতছানিটা প্রদোষ সরকারের মেয়ের জীবনে কোন অভিশাপ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আত্রেয়ীর ভাগ্যটাকে তো আগলে রাখতেই হবে; যতদিন না ওর স্বামী জেল থেকে খালাস পেয়ে চলে আসে। সরিয়াডির মায়ার এই ব্যস্ততা একটা সজাগ সাবধানতাও বটে।

একদিন প্রদোষ সরকারের বাড়ির গেটের তিনকাঠের বেড়ার শব্দটা মচকে

বুঝতে পারছি কে আপনি, তবু বলতে সাহস পাচ্ছি না

উঠতেই একটা কাঠবিড়ালী তিড়িং করে লাফ দিয়ে কাটালতার ঝোপের গা বেয়ে উপরে উঠে যায় আর তাকিয়ে দেখতে থাকে। হাসতে হাসতে সরিয়াডির শান্তি বউদি এসে বারান্দায় উঠে পড়ে। পা টিপে টিপে আত্রেয়ীর ঘরে ঢুকেই আত্রেয়ীর আনমনা মূর্তিটার পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পরেই দুহাত বাড়িয়ে আত্রেয়ীর চোখ চেপে ধরে।

আত্রেয়ী ছটফট করে হাসতে থাকে।—বুঝতে পারছি কে আপনি, তবু বলতে সাহস পাচ্ছি না।

শান্তি বলে—শ্রীলেখা কটেজের বউদি নয়। সরিয়াডির পেত্নী বউদি।

শান্তি বউদির হাত দুটোকে দু'হাতে শক্ত করে ধরে রেখেই আত্রেয়ী বলে—আত্রেয়ী সাড়ে তিন বছর আগে মরে পেত্নী হয়ে গিয়েছে। আপনি কাকে খুঁজছেন?

শান্তি—এরকম করে কথা শুনিয়ো না আত্রেয়ী; আমারই দোষ; আমিই সাড়ে তিন বছর হলো মরে পড়ে ছিলাম।

আত্রেয়ী—কেন? কি হয়েছিল তোমার?

শান্তি—তোমার দাদা কিছু বলেনি?

আত্রেয়ী—কই? দিবাকরদা কিছু বলেছেন বলে তো মনে পড়ছে না।

শান্তি—একেবারে অন্ধ হয়ে যেতে বসেছিলাম, আত্রেয়ী। পুরো তিনটি বছর ধরে, চোখে সবই ঝাপসা দেখতাম।

আত্রেয়ী—এখন ভাল দেখতে পাচ্ছ?

শান্তি—নিশ্চয়। খুব বেশি ভাল দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এক এক সময় মনে হয়, ঝাপ্‌সা দেখাই ভাল ছিল!

আত্রেয়ী—কেন?

শান্তি—তোমার দাদাটির আধেক গোঁফ যে পেকে গিয়েছে, এ কুদৃশ্য তাহলে আর দেখতে পেতে হতো না। ছিঃ, তিন বছরের মধ্যেই মানুষের চেহারা এত পেকে যায়! পাকবে না-ই বা কেন? সব সময় মেজাজ এত তাতিয়ে রাখলে এমনটি হবেই। রক্ষে করবে কে?

আত্রেয়ী হাসে—তুমি।

শান্তি—তা সত্যি কথা বললে বলতেই হয়, যথাসাধ্য চেষ্টা করেই যাচ্ছি। কোন আপত্তি করি না।

আত্রেয়ী—কী যে বলছো! তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝবার সাধ্য নেই।

শান্তি—থাকগে; এসব বাসি ফুলের গল্প এখন থাকুক। এখন একটু...

আত্রেয়ী—চুপ কর বউদি। তোমার কথা শুনলে সত্যিই ভয় করে।

শান্তি—কিন্তু আমি এখন তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইছি না।

আত্রেয়ী—তবে?

শান্তি—দেখতে চাইছি।

আত্রেয়ী—কি?

শান্তি—তোমার বরের চিঠি?

আত্রেয়ী—না। আত্রেয়ীর গম্ভীর মুখের উপর একটা [illegible] ভ্রূকুটি আস্তে আস্তে কাঁপতে থাকে।

শান্তি মিনতি করে—দাও, অন্তত একটি চিঠি দেখতে দাও।

আত্রেয়ী—না বউদি, মাপ কর।

শান্তি—মাপ করবার সাধ্যই নেই আমার।

আত্রেয়ী—আমারও চিঠি দেখাবার সাধ্য নেই।

শান্তি—তাতো বটেই।

আত্রেয়ীর হাতের বইটাকে হঠাৎ একটা টান মেরে বুকে নিয়েই হাসতে থাকে শান্তি। আত্রেয়ী একেবারে স্তব্ধ হয়ে, আর, দুটো অপলক চোখ তুলে শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে।—কী আশ্চর্য।

শান্তি—আশ্চর্যের কিছু নেই। শ্রীলেখা কটেজের বউদির মত এম-এ বি-এ পাশ না করলেও এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধিসুদ্ধি আমার আছে।

বই খুলে বইয়ের ভিতর থেকে একটা চিঠি বের করে শান্তি। আত্রেয়ী বলে—ও চিঠিটা না পড়লেই ভাল করবে বউদি! না না, পড়ো না বলছি। পড়লে তোমারও একটুও ভাল লাগবে না।

আত্রেয়ীর গলার স্বরের সঙ্গে যেন একটা ক্ষীণ আর্তনাদের শিহরণ শান্তিকে বাধা দিতে চাইছে। কিন্তু শান্তি ততক্ষণে চিঠিটাকে পড়ে ফেলেছে। খুব ছোট চিঠি। "গত মাসে তোমার একটিও চিঠি পাইনি। তার আগের মাসে তবু একটা চিঠি পেয়েছিলাম। আশা করি, ভালই আছ।"

চিঠি পড়ে নিয়েই শান্তির চোখ দুটো যেন শুকনো হয়ে ছটফট করতে থাকে। ঘরের এদিকে-ওদিকে ঘুরে; আর মাঝে-মাঝে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে.

আনমনার মত বাইরের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে। তারপরেই একেবারে ছটফটে খুশির হাসিটি হয়ে ছুটে এসে আত্রেয়ীর গায়ের উপর এলিয়ে পড়ে। —ওগো বোকা মেয়ে, এ চিঠি কি বইয়ের মধ্যে ফেলে রাখতে আছে?

আত্রেয়ী—কি বললে?

শান্তি—এ চিঠি বুকের ভেতরে লুকিয়ে রাখতে হয়।

চট্ করে এক হাতে আত্রেয়ীর জামার গলাটা ফাঁক করে, আর-এক হাতে চিঠিটাকে টুপ করে সেই ফাঁকের ভিতরে ফেলে দেয় আর দুলে দুলে হাসতে থাকে শান্তি।

কাকিমার ডাক শোনা যায়—তুমি একবার এদিকে এসো, শান্তি।

—এখনই আসছি, কাকিমা। তখনি ব্যস্তভাবে পাশের ঘরে কাকিমার কাছে এসে দাঁড়ায় শান্তি।

কাকিমা—তুমি যখন এসেছো, তখন আর চিন্তা করি না।

আত্রেয়ীর মা—তুমি এবার মেয়েটার ভার নাও শান্তি। আমরা যে সবাই অচল; কিছুই করতে পারি না; শুধু ভয় পেয়ে পেয়ে আধমরা হয়ে পড়ে থাকি।

শান্তিদি, তাদের মামা হাসিতে হেসে কথা বলেন—ঠিক [illegible] মত [illegible]। তোমরা এসে [illegible] সঙ্গে একমত একটি হাসাহাসি করলে দেখো [illegible] যে [illegible] মনের মত [illegible]।

শান্তি [illegible] সেই [illegible] চল এসেছি। কিন্তু, [illegible] আমি এখন আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাব।

আবার [illegible] আত্রেয়ীর [illegible] ভিতরে [illegible] হেসে ওঠে শান্তি। —চল, বেড়িয়ে আসি। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, সেজে-গুজে নাও।

আত্রেয়ী—কোন দরকার নেই।

শান্তি—খুব দরকার আছে।

আয়নার টেবিলের উপর থেকে পাউডারের ডিবেটা হাতে তুলে নেয় শান্তি; চটপট হাত চালিয়ে আত্রেয়ীর মুখে কপালে গলায় আর ঘাড়ে পাউডার ছিটিয়ে দিতে থাকে। বিরক্ত হয়ে আর দুই ভুরু কুঁচকে নিয়ে শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী।

কিন্তু শান্তির ব্যস্ততা সেজন্য একটুও ভয় পায় না, একটুও বিচলিত হয় না। আত্রেয়ীর একটা ভুরু আস্তে একটা চিমটি দিয়ে ধরে শান্তি বিহ্বল হয়ে হাসে।—ভুরু তো নয়; যেন প্রজাপতির ডানা। বুঝবেন ঠেলা হেমন্তবাবু।

হঠাৎ হাত তুলে আর বেশ বড় করে তেল-সিঁদুরের একটা দাগ আত্রেয়ীর সিঁথিতে এঁকে দেয় শান্তি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আত্রেয়ী। শান্তি বউদির হাত দুটো যেন এক জাদুকরীর হাতের মত খেলা করে করে মায়ার ঝাঁপি খুলে ধরছে। রঙীন শোলার পাখিকে কথা বলাচ্ছে। জলকে আলতা করে দিচ্ছে, আর মাটিকে সোনা।

—চল; সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, আর দেরি করলে দেখতেই পাবে না। ব্যস্তভাবে আত্রেয়ীর হাত ধরে টানতে থাকে শান্তি।

—কোথায় যাচ্ছ? দেখবারই বা কি আছে?

—কিছু শোননি?

—না।

—ছোট ঝিলের জলে একটা ডিঙি ভাসিয়েছেন শ্রীপদবাবু। জাল ফেলে সব মাছ ছেঁকে তুলছেন। আজ দুপুর থেকেই এই কাণ্ড শুরু হয়েছে।

হেসে ফেলে আত্রেয়ী। —চল; কিন্তু তোমার রকম দেখে মনে হচ্ছে; তুমিও জাল ফেলে কিছু ছেঁকে তুলতে চাইছো।

—না আত্রেয়ী; বিশ্বাস কর। আমার কোন মতলব নেই।

ছোট ঝিলের চারদিকে লোকের ভিড়, সন্ধ্যা হলেও হাল্কা হয় নি। কিন্তু সন্ধ্যা হলেও দেখতে কোন অসুবিধে নেই; কারণ বেশ বড় একটা চাঁদ উঠেছে। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ঝিলের ধারে এক জায়গায় ঘাসের উপর বড়-বড় [illegible] বড়-বড় কাৎলা, চিতল আর বোয়াল। চাঁদের আলোতে চিকচিক করে উঠছে বড়-বড় [illegible]।

হেমন্তবাবু চেঁচিয়ে বলে দিলেন—এইটেই [illegible] সবচেয়ে বড় কাৎলা; কি বলেন দীপঙ্করবাবু?

[illegible] টিবির উপর দাঁড়িয়ে [illegible] হাঁকেন দীপঙ্করবাবু—আশা হচ্ছে, এখানের কাৎলা আরও ভাল হবে।

দিবাকর বলে—এখনও কিন্তু একটাও [illegible] ওঠে নি।

[illegible] নামে যাদের ঝিলের জল ছড়িয়ে পড়ে, তাদেরই আনন্দের এক-একটা গর্জন শোনা যাচ্ছে। মাথার কাপড় টেনে দিয়ে আর একটু দাঁড়িয়ে পড়ে শান্তি। —চল আত্রেয়ী; এখানে সুবিধে হবে না। আমি কি জানতাম ছাই, ওরাও সবাই এখানে এসে জুটেছে?

আত্রেয়ী হাসে—এর চেয়ে ভাল, ধানোয়ার রোড ধরে একটু বেড়িয়ে আসি চল।

ধানোয়ার রোডের আমের গাছে নতুন বোল ধরেছে। কাছেই নালার কালভার্টের কাছে সড়কের কিনারায় ঘাসের উপর কারা যেন বসে আছে।

শান্তি বলে—দূর ছাই এখানে এসেও একটু নিরিবিলি হয়ে বসবার উপায় নেই, কারা আগেই এসে জুটেছে। চল, ফিরে যাই।

—আসুন আত্রেয়ীদি; আসুন বউদি; ফিরে যাচ্ছেন কেন?

নরেশ পরেশ মাধব আর বিমল একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে।

শান্তি হাসে—তাই বল! তোমরা এখানে? আচ্ছা, তোমরা এখন একটু দয়া করে সরে পড়।

পরেশ—যাচ্ছিই তো। আপনারা এখন একটু দয়া করে বসুন এখানে।

বিমল—কিন্তু একটু আস্তে কথা বলবেন বউদি, কেউ যেন শুনতে না পায়।

মাধব—কিছু মনে করবেন না আত্রেয়ীদি; গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলবার নিয়ম-কানুন এখনও শিখিনি।

আত্রেয়ী হাসে—যেও একবার দিবাকরদার কাছে; ভাল করে শিখিয়ে দেবেন।

চলে গেল বিমল মাধব নরেশ আর পরেশ।

নালার জলে চার-পাঁচটা পানকৌড়ি তখনও হাবুডুবু দিয়ে খেলা করছে। দু' পাশের সাদা কাশের বন চাঁদের আলোতে আরও সাদা হয়ে হাসছে আর দুলছে। শান্তি বলে—এটা তো ফাল্গুন মাস।

আত্রেয়ী—হাঁ।

শান্তি—তোমার তো আষাঢ়।

আত্রেয়ী—আঁ?

শান্তি—আঁ আবার কি? যেন কিছু মনে নেই। কিছুই বুঝতে পারছেন না।

আত্রেয়ী—বুঝেছি; হাঁ, মনে আছে।

শান্তি মুখ টিপে হাসে—আষাঢ় মাস যখন, তখন নিশ্চয় খুব ভিজেছিলে। তাই না?

আত্রেয়ী—কি বললে?

শান্তি—আমি তো জানতে চাইছি; তুমিই বল।

আত্রেয়ী—কি বলবো?

শান্তি—হেমন্তবাবু প্রথম কি কথাটি বলেছেন?

আত্রেয়ী হাসে—এটা কি হচ্ছে?

শান্তি—কি?

আত্রেয়ী—এটা জাল ফেলা হচ্ছে না? খুব যে বড় গলা করে বলেছিল, কোন মতলব নেই।

শান্তি—বল ভাই; না শুনলে আজ আমার পেটের সিঙাড়া হজম হবে না।

আত্রেয়ী—আজ বুঝি খুব সিঙাড়া খেয়েছো?

শান্তি—খুব নয়; একটি। আমার তো চোখের জন্যে ওসব কড়া-ভাজা জিনিস খাওয়াই মানা।

আত্রেয়ী—তবে খেলে কেন?

শান্তি—ইচ্ছে করে তো খাই নি।

আত্রেয়ী—তার মানে?

শান্তি—জোর করে খাইয়ে দিলে আমি আর কি করতে পারি? ওরকম একটা হট্টা-কট্টা নির্লজ্জ পুরুষ মানুষের গায়ের জোরের সঙ্গে আমি পেরে উঠবো কি করে?

আত্রেয়ী—বাঃ, কি কথাই বললেন! দিবাকরদা নির্লজ্জ? আর তিনি [illegible]

সেই সিঙ্গাড়া খেলেন, তিনি হলেন লজ্জাবতী লতাটি?

শান্তি—যাকগে, বাজে কথার চালাকি ছেড়ে দাও। যা জিজ্ঞেস করেছি, এখন সে কথার সোজা জবাব দাও।

আত্রেয়ী—কি কথা?

শান্তি—হেমন্তবাবু প্রথমে কি কথা বললেন?

আত্রেয়ী বোধহয় একটা ধূর্ত হাসি লুকোবার জন্য মুখ ফিরিয়ে নালার জলের পানকৌড়ির দিকে তাকিয়ে কথা বলে—কোন কথাই হয় নি।

শান্তি—হতেই পারে না। মিথ্যে কথা!

আত্রেয়ী—আমি দিব্যি করে বলতে পারি, সত্যি কথা।

শান্তি—তবে? এর মানে কি? প্রথমে তুমিই কথা বলেছিলে?

আত্রেয়ী—আমি বলবো কি করে? আমার তো তখন মুখ বন্ধ।

শান্তি—কে তোমার মুখ বন্ধ করে দিল?

আত্রেয়ী—যার [illegible]কার ছিল, সে-ই।

শান্তি—তার মানে...।

আত্রেয়ীর মুখের ধূর্ত হাসিটা হঠাৎ যেন একটা ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে—আর মানে বুঝতে হবে না। চুপ করে থাক।

চমকে ওঠে শান্তি। আত্রেয়ীর একটা হাত শক্ত করে ধরে আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। —এইবার বুঝলাম; উঃ, কী বোকা আমি!

দেখলেন শান্তি বউদি; আত্রেয়ীর চোখের তারা দুটো যেন দুটো নিবিড় খুশির পানকৌড়ি; চাঁদের আলো গায়ে মেখে স্বপ্নের জলে হাবুডুবু খেলছে।

শান্তি বলে—তারপর কি হলো?

আত্রেয়ী—তারপর যা হয়েছে আমি চোখে দেখতে পাই নি।

শান্তি—চোখ বন্ধ করে ছিলে বুঝি?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

—বেশ একটু ভয়-ভয় করছিলো?

—একটু।

—ভয় ভাঙলো কখন্?

—তখনই।

—কেন?

—সে নিজেই হাত বুলিয়ে সব ভয়ের দাগ মুছে দিল।

—তুমি কি করলে?

—কিছুই না।

—ইচ্ছে হয় নি?

—হয়েছিল। কিন্তু সেদিন সাহস হয় নি।

—কবে সাহস হলো?

—রাধাপুরে এসে। কিন্তু সব সাহস হঠাৎ মিথ্যে হয়ে গেল।

—কেন?

—হঠাৎ পুলিস এল; তাই সেও চলে গেল। একটা কথা বলবারও সুবিধে পেলাম [illegible]।...

আত্রেয়ীর মাথাটা অলস হয়ে হাঁটুর উপর ঝুঁকে পড়তে চাইছে। শান্তি তখুনি যেন একটা আহ্লাদের ঝড় হয়ে আর হেসে গড়িয়ে আত্রেয়ীর গায়ের উপর ভেঙে পড়ে। —ধন্যি তুমি! কোন মেয়ে তিনদিনের মধ্যেই বরের সঙ্গে এমন জমাট কাণ্ড করতে পেরেছে বলে আমি কখনও শুনি নি।

কাশের বন দুলছে, সেই দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে শান্তি; তারপরেই গলার স্বর একেবারে মৃদু করে দিয়ে আর ফিসফিস করে হেসে কথা বলে —হেমন্তবাবু যেদিন আসবেন সেদিনই, প্রথম দেখা হওয়া মাত্র, বুঝলে তো আত্রেয়ী?

—কি?

—দেনা শোধ করে দিও।

আত্রেয়ী হাসে—তোমাকে সাক্ষী রেখে, কেমন?

শান্তি—নিশ্চয়; আমি উঁকি দেবই।

—সেই আশাতেই থাক।

—আছিই তো। আর তো মাত্র দেড় বছর।

—দেড়টা বছর বেঁচে থাকতে পারবো তো, বউদি?

—কি ছাই বলছো? এরকম কথা শুনলে সত্যিই আমার পিত্তি জ্বলে যায়।

—চল এবার। আমের বোলের কড়া গন্ধে গায়ে বোধহয় চিনি জমে গেল।

—ভালই হলো। কালই হেমন্তবাবুকে বেশ স্পষ্ট করে কথাটা চিঠিতে জানিয়ে দিও।

—কি?

—অনেক চিনি জমেছে।

আত্রেয়ীর পিঠে মিষ্টি করে একটা চিমটি কেটেই উঠে দাঁড়ায় শান্তি। আত্রেয়ীর হাত ধরে আর নীরব হয়ে হাঁটতে থাকে।

টাউন আউট-পোস্টের কাছে পলাশের মাথাটা হাওয়াতে দুলছে; জমাদারের পোষা ময়নাটা ডাকতে শুরু করেছে; সঙ্গে সঙ্গে শান্তির মুখেও একটা নতুন হাসির শব্দ ডেকে ওঠে।—কী সুন্দর চিঠি।

আত্রেয়ী হাসে।—কোন্ চিঠি? আজ যেটা পড়লে?

—হ্যাঁ।

—ও চিঠিতে সুন্দর কি দেখলে?

—হেমন্তবাবুর মনটাকেই দেখলাম। তোমার চিঠি না পেয়েও কেমন শান্ত মনটি নিয়ে চিঠি লিখেছে। কিছু না জেনেও অনেক কিছু বুঝতে পারি আত্রেয়ী। তোমার স্বামীর মত খাঁটি ভালবাসার মানুষ খুব কমই হয়।

—কেমন করে বুঝলে?

—বললাম তো, সব কিছু না জেনেও এটুকু বুঝতে পারছি। তোমার হাতের লেখা একটা চিঠিকেই যে-মানুষ এত ভালবাসে, সে যে তোমাকে কত ভালবাসে, সেটা......।

—কথা বাড়িও না বউদি; তোমার পায়ে পড়ি।

এইবার চোখ দুটো বেশ টান করে, আর আজকের সব মতলবের পিপাসা ব্যাকুল করে দিয়ে আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকায় শান্তি। হ্যাঁ, আত্রেয়ীর চোখের তারাতে চাঁদের আলো ভিজে গিয়ে চিকচিক করছে।

সরিয়াডির শান্তি বউদির একটা মানত সফল হয়েছে এতক্ষণে; শান্তি বউদির চোখের আর মুখের হাসিও যেন অদ্ভুত এক তৃপ্তির স্বাদ পেয়ে নিবিড় হয়ে ওঠে।

শান্তি বলে—তুমি একটু বড় করে চিঠি লিখলে ভদ্রলোক কী খুশিই না হবেন।...যাই হোক, বেশি রাত জেগে চিঠি লেখালেখি করো না আত্রেয়ী।

ছোট ঝিলের কিনারাতে ভিড় এখনও কমে নি। চেঁচিয়ে কথা বলছে দিবাকর।— একটা বড় কালবোশ, আর একটা ছোট শোল আমি নিয়ে চললাম শ্রীপদদা।

চমকে ওঠে শান্তি।—শুনলে তো আত্রেয়ী। আমার [illegible] তোমার দাদাটি কেমন [illegible] হয়েছেন?

আত্রেয়ী হাসে—কেন? [illegible]?

শান্তি—[illegible] একেবারে জীবজন্তু নিয়ে গিয়ে যারা [illegible] বলে যে মানুষকে কী [illegible] করা হয়, সেটা এই ভদ্রলোক একটুও [illegible]। [illegible] মনই নেই। সত্যি কি হেমন্তবাবু?

[illegible] সড়ক ধরে এগিয়ে চলে যায় শান্তি, আর কালীবাড়ি রোড ধরে আত্রেয়ী।

ঠিক সন্ধ্যেবেলা, সরিয়াডির গা-ঘেঁষা রেল লাইনের উপর থমকে থাকা যত কুয়াশার চাপ ছিঁড়ে দিয়ে ওপারে পিতৃপক্ষের একটা স্পেশাল ট্রেন হু হু করে ছুটে চলে গেল। কী ভয়ানক শব্দ। একটা হাহাকার যেন বড় হয়ে আর হুইসিল বাজিয়ে ছোট শহর সরিয়াডির মাটি কাঁপিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

চকের বাজারে এখনও ভিড় জমে নি, কোন হল্লাও জাগে নি। চকের সেই নীরবতার বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে একটা গম্ভীর শব্দ হাঁসফাঁস করে আর দুলতে দুলতে চলে যায়—রাম নাম সৎ হ্যায়।

সেই মুহূর্তে বৈকুণ্ঠ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের উনুনের কাছ থেকে একটা লাফ দিয়ে বের হয়ে এসে চেঁচিয়ে ওঠে শচীন কারিগর।— ধর ধর, শক্ত করে ধর, চেপে ধরে রাখ।

মহামায়া টেলারিংয়ের বিকাশ সবার আগে ছুটে গিয়ে ধরেছিল; এবার শচীনও এসে চেপে ধরে।

হঠাৎ রাম নাম সৎ হ্যায় শুনেই ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে লোচনবাবুর একার ঘোড়া। ঘোড়াটা রাস্তার পাশের নালা টপ্‌কে ছুটে যাবার জন্য একটা লাফ দিতেই একাটা টাল খেয়ে কাত হয়ে পড়েছে। একার গদির উপরে

বসে আর্তনাদ করছেন লোচনবাবুর স্ত্রী। ঘোমটায় মুখ ঢাকা, আর কোলে দুটো বাচ্চা ছেলে। গাড়োয়ান, থুরথুড়ে বুড়ো বাবুরাম এক্কা থেকে পড়েই গিয়েছে।

ঘোড়াটা দুই পা তুলে আর চমকে চমকে গা-ঝাড়া দিচ্ছে। কিন্তু পালিয়ে যাবার সাধ্য নেই। শচীন আর বিকাশ, দুজনেই শক্ত করে ধরে রেখেছে। শচীনের হাতে ঘোড়ার লাগামটা; আর বিকাশের শক্ত মুঠোর ভিতরে ঘোড়ার ঘাড়ের চুলের একটা ঝুঁটি।

বুড়ো বাবুরাম উঠে দাঁড়ায়। ভীরু ঘোড়াটার গলায় হাত বোলায়। লোচনবাবুর স্ত্রীর আর্তনাদ শান্ত হয়ে যায়। কোলের বাচ্চা দুটো হাসতে থাকে। বাবুরামের হাঁকের শব্দ শুনে আবার সুন্দর টাপুরি চালে চলতে থাকে এক্কার ঘোড়া।—টাপ্ টাপ্, টাপ্ টাপ্, তড়াপ্!

সন্দেহ হতে পারে; সরিয়াডির আত্মাটাই বুঝি খুব সজাগ হয়ে এইবার সব দিকে পাহারা রেখেছে। প্রায়ই রোজই এক-একটা কাণ্ড। ধরে রাখ, ছেড়ে দিও না, আটকে ধর, ফেলে দিও না—এক-একটা ব্যস্ততার কাণ্ড।

একদিন রাত দশটারও পরে; যখন নয়াপাড়ার সড়কে ঝিঁঝিঁ ডাকছে আর জোনাকি জ্বলছে কাশীবাড়ি রোডের যত খেজুর গাছের মাথায়, তখন লণ্ঠনহাতে হাবুলবাবু আর দিবাকর; বলাই নরেন আর পরেশ; সেই সঙ্গে থানা অফিসার আর নূতন কনেস্টবল ছুটোছুটি করে ছোট শহর সরিয়াডির আনাচে-কানাচে এখানে-ওখানে খুঁজে বেড়াতে থাকে—কোথায় গেল চিনু?

দেখা গেল কাছারিপাড়ার কাছাকাছি ছোট একটা বাগান-বাড়ি, নাম ইন্দ্রনিবাস, তারই বারান্দার উপর একা দাঁড়িয়ে আর ফুঁপিয়ে কাঁদছে চিনু।

ঘরে কেউ নেই, শুধু তিন মাস বয়সের একটা ঘুমন্ত মানুষ সে-বাড়ির ঘরের ভিতরে একটা চৌকিতে একটা তোশকের উপর পড়ে আছে।

চিনু বলে—সরিৎ দাদা আর ওরা কাকিমা সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বের হয়েছে, এখনও ফিরে আসে নি। আমাকে বলে গেল, তুমি এখানে থাক, আমরা এখনি আসছি।

হাবুলবাবু—তুই এখানে কেন এসেছিলি?

চিনু কাঁদতে থাকে—আমি রোজই একবার আসি।

—কেন?

—ওকে দেখতে। ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে দেখিয়ে দেয় চিনু। বুঝতেও আর অসুবিধে নেই, বাচ্চাটাকে এখানে একা রেখে বাড়ি যেতে পারে নি চিনু; এটাই হলো চিনুর বিপদ।

কিন্তু কে এই সরিৎ আর কে এই ওরা? পরেশ বলে—মাস চার-পাঁচ হলো, ওরা এখানে চেঞ্জে এসেছিল। বাড়ি থেকে বড়-একটা বের হতো না।

থানা অফিসার হাসেন।—আর তো বোঝবার কিছু নেই গোষ্ঠবাবু।

গোষ্ঠবাবু—না।

হাবুলবাবু—মনে হয় ওরা ছ'টা পঞ্চাশের ট্রেনেই সরে পড়েছে।

থানা অফিসার—বোধহয়। কিন্তু এখন কি করা যায়? বাচ্চাটাকে কি থানাতে নিয়ে গিয়ে আমার ফাইলের ওপর ফেলে রেখে দেব?

হাবুলবাবু—না না, তা হতে পারে না, অসম্ভব। ফেলে দেওয়া যায় না।

থানা অফিসার হাসেন—আমি ঠাট্টা করছি হাবুলবাবু। কিন্তু আপনারা পাঁচজনে মিলে একটা পরামর্শ দিন, রাখা যায় কি করে?

চিনুকে বাড়ি নিয়ে গেল নরেন। বাচ্চাটাকে আগলে দাঁড়িয়ে রইলেন হাবুলবাবু ও গোষ্ঠবাবু। দিবাকর বলাই আর পরেশ লণ্ঠন হাতে নিয়ে বের হয়ে গেল। ফিরে এল যখন, তখন রাত দুটো।

বৈকুণ্ঠ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কারিগর শচীন আর শচীনের বউও সঙ্গে এসেছে। শচীনের ছেলে-পুলে নেই; তাই শচীনের কোন আপত্তি নেই। আর শচীনের বউকে দেখেই বোঝা গেল, বউটার হাত দুটো যেন ছটফট করছে।

সোজা তরতর করে হেঁটে আর ঘরের ভিতরে ঢুকেই ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে দু'হাতে কোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে ধরেই বুকের উপর তুলে নিল শচীনের বউ; আবার মিটমিট করে হাসতেও থাকে বউটা।

বীরমানিকবাবু; নেপালী ভদ্রলোক, যিনি দশ বছর ধরে এই সরিয়াডির একটি স্থায়ী মানুষ হয়ে ঘিয়ের কারবার করছেন, তাঁরই স্ত্রী নয়াপাড়ার সড়ক ছাড়িয়ে ছুটতে ছুটতে ছোট ঝিলের কাছে এসে পড়লেন। পাড়ার মানুষে তখন ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে তাঁকে নয়াপাড়ারই এদিকে-ওদিকে খোঁজাখুঁজি করছে।

স্ত্রীর হাত থেকে আফিমের গুলিটা জোর করে কেড়ে নিতে পেরেছেন বীরমানিকবাবু; কিন্তু ধরে রাখতে পারেন নি। মরণবাসনার নারী তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়েই ছুটে বের হয়ে গিয়েছে। বীরমানিকবাবু শুধু পথে দাঁড়িয়ে আর্তস্বরে ডাক দিয়েছেন—ধর ধর ধর; চলে গেল।

অত দূরে, ছোট ঝিলের কাছে পাগল দুর্গাচরণের কাছে নিশ্চয় বীরমানিকবাবুর এই আর্তস্বরের কোন শব্দ পৌঁছয় নি। কিন্তু, তবু ভুল হয় নি দুর্গাচরণের। বীর মানিকবাবুর স্ত্রীকে ঝিলের জলের দিকে ছুটে যেতে দেখেই একটা লাফ দিয়ে পথের মাঝখানে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় দুর্গাচরণ।

—হট্ যাও রে পাপী! দুর্গাচরণের দিকে তাকিয়ে আর চেঁচিয়ে ধিক্কার হানেন বীরমাণিকবাবুর স্ত্রী। কিন্তু দুই হাত মেলে দিয়ে আর পথ আটক করে দুর্গাচরণ যেন ভয়ানক কঠিন বাধার পাথরটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

পাড়ার মানুষ ছুটে এসে যখন বীরমানিকবাবুর স্ত্রীকে ঘিরে ধরে, তখন এক লাফে রাস্তার এক পাশে সরে যায় আর অধোবদন হয়ে লজ্জিত ভাবে হাসতে থাকে দুর্গাচরণ।

তিন মাসেরও বেশি হবে সিগারেট খাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলেন সামন্তবাবু। কিন্তু হঠাৎ একদিন নস্যি ধরলেন আর চন্দ্রবাবুকে হো হো করে হাসতে দেখে একটা কৈফিয়তও দিলেন—কি আর করি বলুন? কিছু একটা না ধরে তো থাকতে পারা যায় না, চন্দরদা।

চন্দ্রবাবু—কিন্তু আমি তো বেশ থাকতে পারছি। আমার কিছুই ধরবার দরকার হয় না। কিছুদিন কাঁচা পেঁপে ধরেছিলাম, তা'ও এখন ছেড়ে দিয়েছি।

সামন্তবাবু—আপনার কথাই আলাদা।

চন্দ্রবাবু উৎফুল্ল হয়ে হাসেন—স্বীকার করছো তাহলে?

কিন্তু মোষের শিঙের লাঠি দুলিয়ে চন্দ্রবাবু আজ এই সরিয়াডির যাকে যতই বোঝাতে চেষ্টা করুন না কেন, কেউ কিছু বুঝবে বলে মনে হয় না। তা

না হলে, সেদিন ঠিক মাঝদুপুরে, যখন নিঝুম হয়ে আছে নয়াপাড়ার সড়ক, তখন গোষ্ঠবাবুর স্ত্রীর ঘুমটা ধড়ফড় করে ভেঙে যাবে কেন?

গেটের মালতীলতার কাছে দাঁড়িয়ে কে যেন ডাকছে—মাসিমা? মাসিমা? একবার দয়া করে আসবেন। আমি কেদার।

কে কেদার? দেখতে পেলেন গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী; সেই ছেলেটি আর সেই মেয়েটি। শুকনো শীর্ণ আর সাদাটে মুখ, সেই কুন্তলা বেশ মুখভার করে আর তফাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গেটের কাছে এগিয়ে গেলেন গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী।—আমাকে ডাকছিলে?

কেদার—হ্যাঁ মাসিমা। আচ্ছা, আপনি ওর দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে বলুন তো, এই কদিনে ওর চেহারা অনেক ভাল হয়ে গেছে কি না। আমার কথা বিশ্বাসই করতে চায় না।

গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী বলেন—হ্যাঁ, কুন্তলাকে এখন তো বেশ ভাল দেখছি। গাল দুটি তো বেশ সুন্দর লালচে হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

কুন্তলা হাসে—কিন্তু আমি তো বাঁচবো না, মাসিমা। আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

কেদার—আমাকে দিনরাত এই সব বাজে কথা বলছে, আর; আরও বিশ্রী কথা বলছে। বলছে, তুমি আবার বিয়ে কর।

গোষ্ঠবাবুর স্ত্রীর মুখের হাসিটা করুণ হয়ে কাঁপতে থাকে।—ছি, এ-সব কথা বলা তোমার একটুও উচিত নয়, কুন্তলা।

কেদার—বেড়াতে বের হয়েও আমাকে ওর হাতটা একটু ধরতে দেবে না। আমাকে শাসিয়ে ধমকে দেয়, ওকে ছুঁয়ে ফেললে আমারও নাকি রোগ হবে। আপনি বলুন মাসি মা, এ সন্দেহের কি কোন মানে হয়?

গোষ্ঠবাবুর স্ত্রীর গলার স্বর কাঁপে; চোখ দুটো সেঁত সেঁত করে।—এরকম করো না কুন্তলা; তোমার স্বামী ছেলেমানুষ, তুমিও ছেলেমানুষ; বেড়াবার সময় দুটিতে মাঝে মাঝে একটু হাত ধরাধরি করে বেড়াবে। খুব ভাল হবে।

চলে গেল কেদার আর কুন্তলা। সারিয়াডির শালবনের মতন হাওয়াও যেন ওদের সঙ্গে সঙ্গে ফুরফুর করে উড়ে চলেছে, তবু একটুও ধুলো উড়ছে না।

শান্তিও প্রায় এইরকমই হাতে হাত ধরিয়ে দেবার মত একটা কাণ্ড এই তিন মাসের মধ্যে অন্তত তিনবার করেছে।

—হেমন্তবাবু চিঠিতে কি লিখলেন, আর তুমি সে চিঠির জবাব কি লিখলে, আমি দুই চিঠিকে পাশাপাশি রেখে আগে পড়ে নেব, আত্রেয়ী; তারপর চিঠি ডাকে দেবে।

আপত্তি করেনি আত্রেয়ী। দুই চিঠিকে শান্তির হাতে তুলে দিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে কাঁটালতার ঘেরানের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়েছে।

"তোমার চিঠি পড়ে আমি ভুলেই যাই যে আমি জেলে আছি। মনে হয়, তুমি আমার চোখের সামনে বসে কথা বলছো। সেই দিনটির কথা কি কখনও ভুলতে পারি? হ্যাঁ, মনে আছে বইকি, চলে যাবার আগে তোমারই দেওয়া জল খেয়েছিলাম। সে জল কিন্তু আমিই চেয়েছিলাম, তুমি ইচ্ছে করে দাওনি। সেজন্যে তোমাকে কিন্তু এতটুকুও দোষ দিচ্ছি না। তুমি আমারই জন্যে অনেক কষ্ট সহ্য করছো; আরও কিছুদিন সহ্য কর।"

"বিশ্বাস কর, তুমি চলে যাবার সময় আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। তুমিই বুঝতে পারনি। বুঝতে পারলে নিশ্চয় আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে যেতে। মামার চিঠিতে জানলাম, জেলের হাসপাতাল তোমার জন্যে দুধ বরাদ্দ করেছে। তবু, আমি এখানে কিন্তু দুধ ছোঁবও না। এই জন্যে তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। আমাদের শান্তি বউদি সব সময় তোমার কথা জিজ্ঞেস করেন। শান্তি বউদি বলেছেন, তুমি নাকি আমাকে আর আমিও নাকি তোমাকে খুব ভালবাসি! সত্যি তো? ঠিক তো? পরের চিঠিতে জবাব চাই।"

চিঠি দুটোকে বই-চাপা দিয়ে আত্রেয়ীর টেবিলে রেখে দিয়ে, আর কৃতার্থতার আনন্দে যেন ডগমগ হয়ে শান্তিও বাইরে গিয়ে আত্রেয়ীর কাছে দাঁড়ায় আর গল্প করে।—একটা কথা লিখতে ভুলে গেলে কেন?

আত্রেয়ী—কি কথা?

শান্তি—তোমার গায়ে এখন যে খুব চিনি জমেছে, সেটা জানিয়ে দিলে হেমন্তবাবু একটু খুশি হতেন না কি?

আত্রেয়ী—বেশ তো, পরের চিঠিতেই লিখবো।

শান্তি—আজ সন্ধ্যাবেলা তৈরী হয়ে থেকো, স্টেশনে বেড়াতে যাব।

আত্রেয়ী—আজ হঠাৎ স্টেশনে কেন?

শান্তি—কিছু শোনোনি?

আত্রেয়ী—না।

শান্তি—আজ সন্ধ্যাবেলা পঞ্চম জর্জের ছেলের স্পেশাল পাস করবে।

শান্তির ক্লান্তি নেই। শান্তি যেন ছোট সারিয়াডির ঘরোয়া মায়ার দূত হয়ে প্রায় রোজই আসে হাসে আর চলে যায়। বাইরের মায়া, সে মায়া যতই ভালমানুষ হোক, তার হাতছানির টান থেকে সারিয়াডির মেয়ের প্রাণটাকে আগলে রাখার দায় নিয়ে এই তিন মাসের মধ্যেই শান্তি যা করতে পেরেছে, তাই নিয়ে শান্তির মনের গর্বেরও অন্ত নেই বোধহয়। যেন তিরতির নদীর একটা ভুল স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দিতে পেরেছে শান্তি। তাই দিবাকরকে যখন তখন এমন কথাও বলতে পেরেছে—এবার গিয়ে একদিন জিজ্ঞেস করো আত্রেয়ীকে, কি রে, তোর সেই শ্রীলেখা কটেজের বউদিকে, না এই শান্তি বউদিকে বেশি ভাল লাগে?

চিনুর পিসিমা আর সন্তুর মা'ও চুপ করে নেই। তাঁরাও দু' জনে মাঝে মাঝে মাঝে একেবারে আত্রেয়ীর ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়েন, আর আত্রেয়ীকে চোখের সামনে বসিয়ে রেখে গল্প করেন। আত্রেয়ীর জন্য মটর ডালের বড়ি নিয়ে আসেন সন্তুর মা; আর চিনুর পিসিমা নিয়ে আসেন তাঁর পুজোর ঘরের প্রসাদী ফল পেয়ারা শশা আর আখের টুকরো।

কাকিমাও সামনে থাকেন, তাই চিনুর পিসিমার গল্প করতে সুবিধা হয়।—তুমি তো দেখনি সুরোস, আমি দেখেছি, আত্রেয়ীর শ্বশুরবাড়ির দীঘিটার এপারে দাঁড়ালে ওপারের মানুষের মুখ চেনা যায় না। একটা সাগর বলে মনে হয়। রাধাপুরেই তো আমার বেণুমাসীর বাড়ি। বিয়ের আগে কতবার বেণুমাসীর বাড়িতে গিয়েছি আর কত কাঁঠাল খেয়েছি, সবই মনে আছে।

সন্তুর মা—আত্রেয়ীরা তো একাই সাত-আনি।

চিনুর পিসিমা—হ্যাঁ গো; ন' আনিদের এগারটা শরিক। যেমন হাভাতে তেমনই খুচুটে। বেণুমাসীর কাছে শুনেছি, সাত-আনিদের দুর্গোৎসবে হাজার কাঙালকে অন্নবস্ত্র দান করা হয়। এমন ঘরের ছেলেই তো হেমন্ত।

একদিন, সেদিন ঠিক মাঝ দুপুরে আত্রেয়ীদের বাড়ির মাঝের ঘরে মাদুরের উপর বসে যখন গল্প করছিলেন চিনুর পিসিমা আর সন্তুর মা, সেদিন একে একে আরও কয়েকজন এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন—গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী, হাবুলবাবুর স্ত্রী, সামন্তবাবুর মা, হাজরাবাবুর দিদি আর শ্রীপদবাবুর ছোট শালী। আত্রেয়ীর মা তাঁর শ্বাসকষ্টের সব ব্যথা ভুলে গিয়ে সবার সঙ্গে গল্প করেন।—আত্রেয়ী তো শুধু নামেই আমার মেয়ে। তোমরাই হলে ওর আসল মা।

বাইরে ঝুরু ঝুরু শব্দ করে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। কাকিমা হঠাৎ এসে আর দু' চোখে যেন দুটি অদ্ভুত বিহ্বলতা নিয়ে, মৃদু

স্বরে ফিসফিস করেন।—দেখবেন তো আসুন।

আত্রেয়ীর ঘরের দরজার একটা কপাট আস্তে একটু ঠেলে দিলেন কাকিমা। সেই ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন সবাই, খাটের উপর শুয়ে আর নিবিড় ঘুমের ঘোরে একেবারে নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে আত্রেয়ী; জানালা দিয়ে ঝুরু ঝুরু বৃষ্টির ছিটে আত্রেয়ীর মুখের উপর এসে ছড়িয়ে পড়ছে। আত্রেয়ীর হাতে একটা খোলা চিঠি। ঘুমের ঘোরে নেতিয়ে পড়া হাতটা চিঠিটাকে কী শক্ত করে ধরে রেখেছে!

গলার স্বর আরও মৃদু করে নিয়ে কথা বারান্দার উপরে একটা বেতের চেয়ার। চেয়ারের কাছে একটা বেতের টেবিল; তার উপর মোটা-মোটা চেহারার কয়েকটা বই। বইয়ের উপর একটা চশমাও পড়ে আছে।

তবে কি সেই ভদ্রলোক, যাঁর নাম নিখিল সেন, তিনিই আবার এসেছেন?

সেদিন সন্ধ্যায় নরেনের সাইকেল শ্রীলেখা কটেজের সামনের রাস্তা দিয়ে তিনবার ছুটে গেল। প্রায় মাঝ-রাত যখন, তখন মাধবও খুব আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে এই রাস্তাতেই একবার ঘুরে গেল। দেখে গেল মাধব, কটেজের বাইরের ঘরের ভিতরে একটা আলো জেগে রয়েছে।

হচ্ছে; সরিয়াড়ির মনের সেই অবুঝ অন্ধকার বুঝি এখনও ভীরু হয়েই আছে। আপত্তি করবার কিছুই নেই; নিখিল সেনের নিন্দে করবার কিছুই নেই; সন্দেহটা তো কবেই মিথ্যে হয়ে গিয়ে উল্টো সরিয়াড়িকে লজ্জা পাইয়ে দিয়েছে। তবু অস্বস্তি।

পটলবাবুর পেয়ারা বাগানে ফল ধরেছে। কাশীর জাত-পেয়ারার চারা আনিয়ে আর অনেক যত্ন করে এই পেয়ারাবাগান তৈরী করেছেন পটলবাবু। আর, এই প্রথম ফল ধরেছে। তিনটে পেয়ারার ওজন এক সেরের বেশি। পটলবাবুর এই পেয়ারা বাগানের

আত্রেয়ীর হাতে একটা খোলা চিঠি

বললেন কাকিমা—দেখেছেন এই চিঠিটা আজই এসেছে।

পাটনাতে গিয়ে এমএ পরীক্ষা দিয়েছে, আর একটা চাকরির চেষ্টাও করেছে বলাই। মাত্র একটা মাস পাটনাতে থাকতে হয়েছে। তারপর সরিয়াড়িতে ফিরে আসতে হলো। মা চিঠি লিখেছিলেন; সুমন্তর কাছে শুনলাম তোমাদের পাটনার মেসে মাস-কলাইয়ের ডাল খেতে দেয়। এ কী সর্বনেশে কথা! এখন আর তোমার মেসে থেকে কাজ নেই। পত্রপাঠ বাড়ি চলে এস।

ভোরের ট্রেনে রামবাগ রোড স্টেশনে নেমেই সরিয়াড়ির নিজের বাগানের কাকের ডাক শুনতে পেয়েছে বলাই। সরিয়াড়ির ভোরের বাতাসের ছোঁয়া লেগে বলাইয়ের মুখে একটা ভৈরবী ঠুংরিও গুনগুন করে উঠেছে।

কিন্তু কাছারিপাড়ার সড়ক ছাড়িয়ে সামান্য একটু এগিয়ে যেতেই বলাইয়ের মুখে গানের গুনগুন যেন চমকে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেল। শ্রীলেখা কটেজের একটা ঘরের সব জানালা এত ভোরেই একেবারে খোলা-মেলা হয়ে সরিয়াড়ির শালবনের হাওয়া খেতে শুরু করেছে। কটেজের

পরের দিন সকালবেলায় শ্রীলেখা কটেজের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে পথের উপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নরেন। না, আর এগিয়ে যাবার কোন দরকার নেই। দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, নিখিল সেনের আলোকিত মূর্তিটা কটেজের গেটের সামনে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে।

নরেন ফিরে এসেই খবর দেয়।—হ্যাঁ দিবাকরদা, নিখিলবাবু আবার এসেছেন।

পরেশ—একাই এসেছেন।

মাধব—সেই মহিলা দুজনের কাউকেই দেখলাম না।

ট্যাক্স-আপিসের বারান্দার ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে আর বেশ চাপা স্বরে হাবুলবাবুর সঙ্গে কথা বলেন গোষ্ঠবাবু। —মাত্র ছ' মাস পরেই আবার ভদ্রলোক চলে এলেন; বুঝছি না এত তাড়াতাড়ি আবার হাওয়া বদলের কী দরকার ছিল? ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য তো একটুও খারাপ নয়।

হাবুলবাবু—অথচ যাঁর আসা দরকার ছিল, যাঁর বাতের দোষ অনেকটা কমে গিয়েছিল, সেই ভদ্রলোকই এলেন না।

গোষ্ঠবাবু—তবে একটা কথা। মানুষটা তো ভাল।

হাবুলবাবু—তা তো বটেই। তবু এ একটা অস্বস্তির ব্যাপার হলো গোষ্ঠদা।

আলো দেখে অস্বস্তি বোধ করতে

পাঁচিলের পাশে জটাধারী এক সাধু এসে ঠাঁই নিয়েছেন। পটলবাবু সকলকেই বলেছেন, এই সাধু একজন খাঁটি মহাপুরুষ। কিন্তু পটলবাবু সব সময় বাগানের দিকে চোখ রেখে একচালার নীচে একটি চৌকির উপর বসে থাকেন। চোখের চাহনিটা চমৎকার শান্ত, কিন্তু বুকের ভিতরে বোধহয় নিদারুণ অস্বস্তি।

শান্তিও শুনতে পেয়েছে। কিন্তু শান্তির চোখে কোন ভাবনা চমকে ওঠে না, কোন স্তব্ধতাও থমথম করে না, নিঃশ্বাসেও কোন অস্বস্তি ছটফট করে না; কিচ্ছুছু না। বরং দিবাকরের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছে শান্তি।

দিবাকর—হাসবার কি হলো?

শান্তি—কেন হাসবো না?

দিবাকর—আমি তো বেশ অস্বস্তি বোধ করছি।

শান্তি—কেন?

দিবাকর—শত হোক, এটা একটু চিন্তার কথা নয় কি?

ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি দিবাকরের চোখের দিকে এগিয়ে দিয়ে শান্তি আবার হেসে ফেলে—কলাটি। তোমাদের নিখিল সেনকে শুধু বই মাথায় তুলে নিয়েই চলে যেতে হবে।

নিখিল সেন নামে একটা অস্তিত্ব শ্রীলেখা কটেজের ঘরের ভিতরে রাত-জাগা আলোর

কাছে বসে থাকে—সকালবেলা গেটের সামনের রাস্তায় পায়চারী করে বেড়ায়; ঘটনাটা এর চেয়ে বড় কোন ব্যাপার হয়ে উঠবে, এমন কোন লক্ষণও দেখা যায় না। বলাই মাধব আর নরেন দেখেছে, নিখিল সেন নিজেরই একটা খেয়ালের সুবিধার জন্য নিজের পছন্দমত খুব ছোট একটা জগৎ তৈরী করে নিয়েছেন। তারই মধ্যে থাকেন ভদ্রলোক।

পর পর প্রায় তিনটি মাস পার হয়ে গিয়েছে। বৈশাখী ঝড়ে ধানোয়ার রোডের আমগাছের মাথা থেকে কত কাঁচা আম ধানক্ষেতের উপর ছিটকে পড়ে ছড়িয়ে-গড়িয়ে গেল। কিন্তু সে-খবর জানবার জন্যে নিখিল সেনের চোখে-মুখে কোন চেষ্টার চঞ্চলতা জাগে বলে মনে হয় না। ভদ্রলোক শ্রীলেখা কটেজের ওই সামনের রাস্তা ছেড়ে একটি পা'ও এগিয়ে যেতে চান না। সরিয়াডির আম কুড়োবার জন্য হাওয়া-বদলের আর-সব মানুষগুলির যত চেষ্টা ব্যস্ততা আর ব্যাকুলতা সকাল-বিকেল সব-সময় হই হই করছে। কিন্তু নিখিল সেন শান্ত। সে ভদ্রলোকের মনে সরিয়াডির উপর হুটোপুটি করে কিছুই কুড়িয়ে নেবার জন্য কোন ফুর্তির তাড়া নেই। হাঁটাহাঁটি আর ছুটোছুটি করে সরিয়াডির রাস্তায় ধুলো ওড়াবার কোন ইচ্ছেও নেই বোধহয়। এক-এক সময় সত্যিই মনে হয় দিবাকরের, ভদ্রলোক যেন সরিয়াডির ধুলোর ছোঁয়া এড়িয়ে থাকবার জন্যে সকাল-সন্ধ্যা আর দিন-রাত ঘরের ভিতরে আর বাড়ির কাছাকাছি থাকেন। এত টাকা-পয়সা আর এত বিদ্যে, এরকম মানুষের মনে একটু অহংকার তো থাকতেই পারে। সরিয়াডির প্রদোষ সরকারের মেয়েকে এক মুঠো ধুলো বলে মনে করাও এরকম মানুষের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। কে জানে, এমনও তো হতে পারে যে, আত্রেয়ীর চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দর কোন মেয়ে কলকাতার কোন মস্ত শিক্ষিত আর মস্ত বড়লোকের বাড়ির একটি ঘরে বসে নিখিল সেনের কাছে এখন চিঠি লিখছে। হতে পারে; আত্রেয়ী-কেই একটা উপদ্রব বলে মনে করেন, তাই ভয় পেয়ে বেশ সাবধান হয়ে গিয়েছেন নিখিল সেন।

যেমন দিবাকরের, তেমনই গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবুর মনের অস্বস্তিও ঠিক এই-ভাবে একটা বুঝ মেনে নিয়ে এই তিন মাসের মধ্যেই অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। নরেনের সন্দেহের সাইকেলও আর শ্রীলেখা কটেজের সামনের রাস্তা দিয়ে বার বার যাওয়া-আসা করে না।

বলাই বলে—ভদ্রলোক সত্যিই ভদ্রলোক মানুষ।

নরেন—আমারও তাই মনে হয়, বলাইদা। কতবার দেখলাম, বই পড়তে পড়তেই কটেজের সামনের রাস্তাতে ঘুরছেন ভদ্রলোক।

অস্বস্তিটা সত্যিই জব্দ হয়ে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। দাবা খেলার আসরে গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু মাঝে মাঝে ধ্যান ভঙ্গ করে কত কথা নিয়ে কত তর্কই না করেন; কিন্তু নিখিল সেনের নামে কোন কথাই মুখর হয়ে ওঠে না। আগেকার ওসব কথা নিতান্তই একটা বাজে সন্দেহের কথা।

অনেকদিন পরে একদিন, দিবাকর যেন অস্বস্তির শেষটুকুও একেবারে শেষ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে।—আচ্ছা শান্তি, আত্রেয়ী কি জানে না যে, নিখিলবাবু এখানে আছে?

শান্তি—কি করে বলবো? আমি কোন-দিন জিজ্ঞেস করি নি। কিন্তু তোমার মনে হঠাৎ একথা জাগলো কেন?

দিবাকর—এমনি; হঠাৎ মনে হলো, তাই জিজ্ঞেস করলাম।

শান্তি—কী মন বে বাবা! ছিঃ।

দিবাকর ভ্রূকুটি করে তাকায়—তুমি কিসের জন্যে এত দাপট দেখিয়ে কথা বলছো?

শান্তি—তুমিই বা মেয়েটাকে কি মনে করেছো?

দিবাকর—কি মনে করেছি?

শান্তি—তোমার ধারণা, আত্রেয়ীও যেন একটা কণিকা ভরদ্বাজ। কথা নেই বার্তা নেই, ফস্ করে একটা বাইরের অচেনা অজানা লোকের সঙ্গে বড় মাখামাখি করে ফেলবে।

হেসে ফেলে দিবাকর।—আঁতে ঘা লেগেছে মনে হচ্ছে।

শান্তি—হ্যাঁ, আমি তো একটা কণিকা ভরদ্বাজ, ঠিকই।

দিবাকর—আমি কি তাই বললাম?

শান্তি—বললেই তো। কিন্তু সত্যিই যদি কণিকা ভরদ্বাজ হতাম, তবে আর একথা বলতেই পারতে না। তখন কত নভেলী ভাষায় ডাক দিয়ে দিয়ে আর ভজনা করে কথা বলতে; সবই জানি।

দিবাকর—কি জান?

শান্তি—পুরুষমানুষ এইরকমই হয়ে হয়।

দিবাকর—হয়ে মানে তো পারো। তাই না?

হেসে ফেলে শান্তি—তা জানি না। যাই হোক্; আমার কথা হলো...।

চুপ করে কি-যেন ভাবতে থাকে শান্তি। তার পরেই, যেন একেবারে জয়িনীর মত ভঙ্গীতে ঘাড় দুলিয়ে হেসে ওঠে।—আচ্ছা, ঠিক আছে।

দিবাকর—কি?

শান্তি—তোমরা যে কত ইয়ে, সেটা শিগ্গিরই জানতে পারবে।

দিবাকর—কে জানাবে?

শান্তি—আমি, আমি, আবার কে?

শান্তির কাছে এগিয়ে যেতে থাকে দিবাকর।—কে তুমি?

—সাবধান! হাসতে হাসতে সরে যায় শান্তি। আবার ব্যস্ত হয়ে ঘরের কাজ খুঁজতে থাকে। তিনটে ল্যাম্পের চিমনির সব কালি মুছে দিয়ে তখনি আবার পিতলের ফুলদানিটাকে তেঁতুল-জলে চুবিয়ে মাজতে থাকে। ঘরের কোন জিনিসে একটুও ময়লা সহ্য করতে পারে না শান্তি। সব পরিষ্কার হয়ে আর তকতক ঝকঝক করে হাসবে, তবে তো? তা না হলে, সোনাও আবর্জনা।

মাজা-ঘসা হয়ে পিতলের ফুলদানিটা ঝকঝক করে হাসছে। আত্রেয়ীর মুখটাকেই হঠাৎ মনে পড়ে যায়। মনে পড়বেই বা না কেন? আজকাল আত্রেয়ীর মুখে যে সব-সময়ই সুন্দর শান্ত ও পরিষ্কার একটি ঝকঝকে হাসি ফুটে থাকে।

কিণ্ডারগার্টেনের সামনের ছোট মাঠে ঘাসের উপর কানামাছি খেলছে বাচ্চারা। চিনু আর সন্তু কাঁচপোকা ধরবার জন্য বুনো তুলসীর একটা ঝোপের আশে-পাশে পা টিপে টিপে ঘুরছে। আত্রেয়ী একটা ছড়ার বই হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

হাওয়াবদলের তিনজন মহিলা, যাঁরা এই মাসেই এসেছেন, তাঁরা চোখ বড় করে আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে সামনের সড়ক ধরে চলে যান। কোন সন্দেহ নেই, শুধু আত্রেয়ীর সুন্দর মুখটাকে নয়; মুখের ওই ঝকঝকে হাসিটাকেও বেশ একটু বিস্ময় নিয়ে তাঁরা চেয়ে দেখেছেন। শুনতে পায় আত্রেয়ী, চাপা গলায় কি-কথা বলে বলে আর হাসাহাসি করে ওঁরা চলে যাচ্ছেন।—ইনিই বোধহয় সেই সুন্দরী, যার নামে এত গল্প......।

হঠাৎ চিনু আর সন্তু ছুটে এসে আত্রেয়ীর কাছে একটা অভিযোগের কথা চিৎকার করে শোনাতে থাকে।

—জান আত্রেয়ীদি; চন্দরদাদু তোমার নামে কি বলেছে?

আত্রেয়ী—কে?

চিনু—ওই যে? দেখছো না? চিনতে পারছো না? চন্দরদাদু চলে যাচ্ছে।

দেখতে পায় আত্রেয়ী; মোষের শিঙের লাঠিটি হাতে দুলিয়ে অমিয় ভবনের পাশের ছোট রাস্তার কাঁকরের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যাচ্ছেন চন্দর জেঠামশাই।

সন্তু বলে—দাদু বলেছে; তুমি সবচেয়ে বোকা।

আত্রেয়ী—কাকে বলেছে? আমাকে?

চিনু—হ্যাঁ।

আত্রেয়ী হাসে—কেন? আমি কি দোষ করেছি?

চিনু—তুমি একটা চিঠিকে আঁকড়ে ধরে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিলে, একদিন দেখতে পেয়েছেন দাদু।

সন্তু—দাদু বলেছে, ধেৎ, কোন মানে হয় না।

—খুব মানে হয়। সন্তুর গাল টিপে দেয় আত্রেয়ী। আত্রেয়ীর মুখে আবও ঝকঝক করে হেসে ওঠে।

চিনু—একদিন দাদুকে একথা বলে দিও, আত্রেয়ীদি।

আত্রেয়ী—না চিনু, গুরুজনকে মুখের ওপর একথা বলতে নেই। আমি বলবো না, তোমরাও বলবে না।

সন্তু—কি মানে হয় আত্রেয়ীদি? বল না?

আবার সন্তুর গাল টিপে দেয় আত্রেয়ী—ভাল লাগে।

সন্তু আর চিনুও আবার কাচপোকা ধরতে ছুটে চলে যায়।

ভুলে যায় নি শান্তি, দিবাকরকে জব্দ করবার জন্যে যে কথাটি একদিন বেশ ভাল করে চেঁচিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সে কথাটা এখনও ভাল করে জানা হয় নি। শান্তিকে এখন শুধু ভাবতে হয়, কি করে, কি-কথা বলে আর কেমন করে জানা যায়? শ্রীলেখা কটেজের ঘরে আজকাল আলো জ্বলে, আত্রেয়ীর কাছে শুধু এই কথাটি বললেই তো অনেক কথা বলা হয়ে গেল। তারপর দেখা যাক, কী বলে আত্রেয়ী।

কিন্তু ছি, আর এভাবে একটা ঘোরা প্রশ্ন দিয়ে আত্রেয়ীকে যাচাই করবার কোন দরকার হয় না। আর জানারই বা কি বাকি আছে? দেখতেই তো পাওয়া গেল, এই তিন মাসের মধ্যে কোনদিনও আত্রেয়ীকে শ্রীলেখা কটেজের নাম করে একটা সামান্য কথাও বলতে শোনা গেল না।

হ্যাঁ, একদিন শ্রীলেখা কটেজের সামনের রাস্তা দিয়ে আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলেই তো হয়। তাহলে সেই ভদ্রলোককে আত্রেয়ী নিজের চোখেই দেখতে পাবে। তার-পর আত্রেয়ীকে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করে জানবার দরকার হবে না।

কল্পনাতে সবই ঠিক করে রাখে শান্তি। কিন্তু আত্রেয়ীর বাড়িতে এসে গল্প করতে গিয়ে সবই ভুলে যায়। এরকম একটা চেষ্টাকেও যেন বিশ্রী একটা নোংরা মনের চেষ্টা বলে মনে হয়। বেড়াতে যেতে হলে বরং ওই শ্রীলেখা কটেজের রাস্তায় না যাওয়াই ভাল। পৃথিবীতে এত মেয়ে থাকতে, শুধু বেচারা আত্রেয়ীকে নিয়ে এরকম একটা অগ্নিপরীক্ষা খেলা করবার কোন মানে হয় না।

প্রয়াগবাবুর বাড়িতে আজ সন্ধ্যায় রামলীলার গান হবে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছেন প্রয়াগবাবু। প্রয়াগবাবুর স্ত্রী নিজেও একবার এসে সব বাড়ির মেয়েদের সেধে গিয়েছেন; বলেও গিয়েছেন, মেয়েদের বসবার জন্যে ভিন্ন করে খুব ভাল ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিকেল হয়েছে। আত্রেয়ীদের বাড়ির মাঝের ঘরে বসে কাকিমা'র সঙ্গে গল্প করে শান্তি। তাড়াতাড়ি সেজে নিক আত্রেয়ী; এখনই বের হয়ে, ছোট ঝিলের চারিদিকে একটু ঘুরে তারপর রামলীলার গান কিছুক্ষণ শুনে এলেই চলবে।

হঠাৎ কাকিমা'র মুখের একটা কথা শুনেই শান্তির মুখের হাসিটা যেন হঠাৎ আলোর ঝলকের মত উথলে ওঠে। যেন শান্তিরই জীবনের একটা বিশ্বাসের স্পর্ধা হাততালি দিয়ে হেসে উঠেছে।

কাকিমা বলেন—হ্যাঁ, আত্রেয়ী তো জানেই। রামুয়া কবেই বলে দিয়েছে, কটেজের সেই ছোটবাবু আবার এসেছে; দিদি বহুদিদি আর বড়বাবু আসে নি।

শান্তি যেন এখানেই বসে দিবাকরকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে আর মনে মনে বলতেই শুরু করে দিয়েছে—এবার শুনলে তো? কে না কে, নিখিল সেন নামে কে একজন শ্রীলেখা কটেজে এসে তিন মাস ধরে বসে আছেন, কিন্তু সেজন্যে আত্রেয়ীর যে কোন মাথাব্যথা নেই, তার প্রমাণ পেলে তো? লজ্জা হচ্ছে তো?

গেটের তিনকাঠের বেড়াটাকে কে যেন বেশ জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। মট্‌মট্‌ করে শব্দটাও যেন কাউকে পথ ছেড়ে দিল।

প্রদোষবাবু এখন ঘরের ভিতরে বসে আছেন; বাইরের বারান্দায় কেউ নেই। কিন্তু একটা আগন্তুক পায়ের শব্দ মচ্‌মচ্‌ করে বারান্দার উপর আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায়।

কাকিমা বলেন—দিবাকর বোধহয়!

শান্তি বলে—সে তো পরেশনাথ গিয়েছে; সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরবে।

কাকিমা—তবে কে এল?

যে এসেছে তার কোন ডাক শোনা যায়

না। সেই ডাকহীন আগমন তবে কি বারান্দার চেয়ারে চুপ করে বসে পড়েছে?

কিন্তু আত্রেয়ী এ কী করছে? সাজ সারা হয় নি আত্রেয়ীর; শাড়ির আঁচলটাকে এখনও হাতে ধরেই রেখেছে; গলার পাউডারের মোটা ছোপটাকে এখনও মিহি করে মিলিয়ে দেয় নি। পাশের ঘর থেকে হঠাৎ বের হয়ে এসে, মাঝের ঘরের কাকিমা আর শান্তির মুখের দিকে না তাকিয়ে, একটি কথাও না বলে, যেন একটা স্রোতের টানের ফুলের মত ভেসে বের হয়ে গেল।

—কেমন আছেন? বাইরের সেই আবির্ভাবের কাছে গিয়ে যেন উচ্ছল একটা অভ্যর্থনা হয়ে হাসতে থাকে আত্রেয়ী।

আগন্তুকের গলার গম্ভীর স্বরে কিন্তু বেশ স্পষ্ট একটা অভিযোগের গুঞ্জন শোনা যায়।—আগে জিজ্ঞেস করুন, কবে এসেছি। তারপর প্রশ্ন, কেমন আছি বা না আছি।

আত্রেয়ী—আমি তো জানিই, আপনি এখন এখানে আছেন।

—কতদিন হলো আছি, সেটা জানেন কি?

—তিন মাস বোধহয়।

—তবে তো জানেনই দেখছি। কিন্তু তারপর? একটুও তো খোঁজ নিলেন না। মঞ্জু না থাকলেই কি আমি একেবারে সাইফার?

—মঞ্জু কেমন আছে?

—খুব ভাল আছে আপনার মঞ্জু; একটা অপারেশন হয়েছিল। তারপর থেকে স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাল হয়ে চলেছে।

—প্রীতি বউদি?

—সব ভাল আছে। বড়দাও ভাল আছেন। আমিও ভাল আছি। আপনি কেমন?

—আমিও ভালই আছি।

—ভাল কথা। আমি তবে মিথ্যেই একটা সন্দেহ করেছিলাম।

—কিসের সন্দেহ?

—মনে হয়েছিল, হয় আপনি জানেন না যে আমি এসেছি; নয় আপনার অসুখ-টসুখ করেছে।

—দুটোই মিথ্যে সন্দেহ।

—এখন আরও একটা সন্দেহ করছি; এটা নিশ্চয়ই মিথ্যে সন্দেহ হতে পারে না।

—কি?

—বেড়াতে বের হচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—তবে আর একা-একা কেন বেড়াবেন? আমার সঙ্গেই চলুন।

—কিন্তু…।

—কিন্তু করবার কি আছে? আমি এই তিন মাসের মধ্যে একদিনও বেড়াতে বের হই নি। আজ এই প্রথম একটু বেড়াবার ইচ্ছে নিয়েই বের হয়েছি। কিন্তু আপনি থাকতে একা-একা বেড়াতে যাব কেন? তাই কটেজ থেকে বের হয়ে সোজা আপনার এখানেই চলে এলাম।

—চা খাবেন?

—চা-বাগানের লোককে চা না খাওয়ালেও চলে।

—আচ্ছা; একটু বসুন তাহলে।

—না, এখন চা খাব না কিন্তু।

—বুঝেছি। আমি শুধু কাকিমাকে একটা কথা বলে আসছি।

কাকিমা আর শান্তি; দু'জনেই একেবারে নিথর হয়ে বসে আছেন। আত্রেয়ী ঘরে ঢুকেই শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।—মঞ্জুর মেজদা, নিখিলবাবু এসেছেন। কিন্তু কী ঝঞ্ঝাটে ফেললেন, দেখছো তো বউদি?

কাকিমা—কিসের ঝঞ্ঝাট?

আত্রেয়ী—বেড়াতে যেতে বলছেন। এদিকে শান্তি বউদির সঙ্গে……।

কাকিমা—শান্তির সঙ্গেই বেড়াতে যাবি। ও ভদ্রলোকের কথায় কি এসে যায়?

আত্রেয়ী—তুমি কি বলছো, বউদি?

শান্তির স্তব্ধ চোখ দুটো শুধু একবার কেঁপে ওঠে।—আমি কিছুই বলছি না। তোমার ইচ্ছে।

আত্রেয়ী—তা হলে একবার ঘুরেই আসি, বউদি।

কাকিমা চমকে ওঠেন—সত্যিই যাবি?

আত্রেয়ী হাসে—হ্যাঁ; খুব শিগগির ফিরে আসবো। খুব দূরে কোথাও যাব না।

খোলা গেটের তিনকাঠের বেড়াটা আবার যখন মটমট্ শব্দ করে বেজে উঠে গেট বন্ধ করে দেয়, তখন প্রদোষ সরকারের বাড়ির খাপরার চালাটাও যেন মটমট্ করে বেজে ওঠে। একটা বিড়াল চালার উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়েছে এই মাত্র; কিন্তু তাতেই কী ভয়ানক মটমট শব্দ! যেন সব অটলতার হাড়গোড় ভেঙে গেল।

খাট থেকে নামতে গিয়ে প্রদোষ সরকারের পা টলে যায়। একটা ক্রাচ হাতের মুঠো থেকে ফসকে গিয়ে মেজের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে। ভয়ানক বিশ্রী আর্তনাদের মত একটা শব্দও করেছে এই ক্রাচটা, যেন কেউ মুখ থুবড়ে পড়েছে।

শান্তি বলে—আমি যাই, কাকিমা।

কাছারিপাড়ার শেষ সেগুন গাছের কাছে একটা সেকেলে পুরনো মন্দিরের ধড় টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইঁট-পাথর ছড়িয়ে রেখেছে। তারই পাশে একজন একেলে সাধুর সমাধি, চারদিকে শ্বেত করবীর ঘেরান। ঘেরানের এক জায়গায় ছোট একটা ফাঁক; সেই ফাঁক দিয়ে গরু ঢুকে সমাধির চারপাশের ঘাসের গোছা পট্‌পট্ করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

সামনেই রেল-লাইন। লাইনটার দু' পাশের মাটির উপর দিয়ে পায়ে-চলা পথের একটা দাগও লাইনটার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। লাইনের পাশের মাটির এই হাঁটুরে দাগ ধরে ধরে টানেল পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসা যায়। এমন বেশি কিছু সময় লাগবে না; বিকেলের শেষ আলো ফুরিয়েও যাবে না।

শ্বেত করবীর ঘেরান দেওয়া এই সমাধিটা যেন খোলামেলা নিরিবিলির মধ্যেই বেশ নিবিড় একটি ছোট্ট নিরিবিলি। সমাধির কাছে বসবার জন্য শান-বাঁধানো একটি চাতালও আছে। সে চাতালের উপরে বসলে শুধু আকাশের মুখ ছাড়া বাইরের আর কারও মুখ দেখা যায় না। বিকেলের গয়া-গোমো প্যাসেঞ্জার যখন ছুটে চলে যাবে, তখন মনে হবে, অন্য কোন একটা পৃথিবীর কোলাহল ছুটে চলে গেল।

চলতে চলতে শ্বেত-করবীর এই ঘেরানের কাছেই এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে নিখিল সেন, সেই সঙ্গে আত্রেয়ী।

নিখিল বলে—আপনি বোধহয় মনে করেছিলেন যে, আমিও এই তিন মাস ধরে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে লুকিয়ে আছি।

আত্রেয়ী—তা মনে করবো কেন? আমি তো জানিই, আপনি বই পড়েন; বই পড়তে খুব ভালবাসেন।

নিখিল—ঠিক কথা; খুব বই পড়ে নিয়েছি। কিন্তু মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত কাণ্ডও করেছি।

আত্রেয়ী—কি?

নিখিল—আপনার সঙ্গে কথা বলে ফেলেছি।

আত্রেয়ী—রাময়ো ঘুমের মধ্যে কথা বলে।

নিখিল—না, আপনাদের রাময়োর মত ঘুমের মধ্যে নয়; জাগার মধ্যেই আমি কথা বলে ফেলেছি।

আত্রেয়ী হাসে—আমিও একদিন হঠাৎ শান্তি বউদিকে একটা কথা বলে ফেলেই বুঝতে পারলাম, ঘরে কেউ নেই।

নিখিল—একদিন কটেজের গেটের শব্দ হতেই মনে হলো, আপনি এসেছেন। অমনি হঠাৎ বলে ফেললাম, আসুন।

আত্রেয়ী—আমি কিন্তু শান্তি বউদিকে ঠিক উল্টো কথাটি বলেছিলাম, এখন যাও বউদি।

নিখিল—এই তিনটে মাস বই নিয়েই কাটিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু মাঝে-মাঝে বেশ বিশ্রী একটা অস্বস্তিতেও ভুগতে হয়েছে। অনেকবার শুধু রাতজাগাই সার হয়েছে, বইয়ের এক পাতাও পড়ে উঠতে পারি নি।

আত্রেয়ী—বাবাকেও দেখেছি; এক-একদিন রাত্রিবেলা ফটোর আলবাম হাতে নিয়ে দেখতে বসেন আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা

ধমক-ধামক করেন, তখন বাবা অ্যালবাম রেখে দিয়ে শুয়ে পড়েন।

নিখিল—কিসের ফটোর অ্যালবাম?

আত্রেয়ী—বাবার জিমন্যাস্টিক আর কসরতের যত পুরনো ফটোর অ্যালবাম। মাটিতে শুয়ে দু'পা দিয়ে মস্ত একটা পিপেকে তুলে ধরেছেন বাবা; পিপের উপর আবার চারজন মানুষও দাঁড়িয়ে আছে।

নিখিল—একটা সত্যি কথা বলছি; কিছু মনে করবেন না। আপনার ওপর একদিন সত্যিই খুব রাগ হয়েছিল।

আত্রেয়ী হাসে। —শান্তি বউদিকেও দেখেছি; আমার উপর হঠাৎ এক-একদিন, একেবারে মিছিমিছি রাগ করে বসে থাকেন।

নিখিল—আমি কিন্তু মিছিমিছি রাগ করি নি। আপনি কি মনে করেন যে, আপনাকে বিরক্ত করবার কোন ইচ্ছে আমার আছে?

আত্রেয়ী—ছি, একথা বলছেন কেন? আমি ওসব কিছুই ভাবি না।

নিখিল—তবে আসেন নি কেন?

আত্রেয়ী—আমি বুঝতে পারি নি।

নিখিল—কি বোঝেন নি?

আত্রেয়ী—বুঝতে পারি নি যে, আমার আসবার কোন দরকার আছে।

নিখিল—দরকার আছে। কিন্তু আমার দরকার নয়; আপনারই দরকার।

আত্রেয়ী—আরও গল্পের বই এনেছেন?

নিখিল—না।

নিখিলের কথাটা যেন অদ্ভুত একটা গম্ভীরতার ধ্বনি হয়ে ফুঁপিয়ে উঠতে গিয়েই আবার সামলে নিয়েছে। হাত বাড়িয়ে শ্বেত-করবীর একটা পাতা পট্ করে ছিঁড়ে নিয়ে নিখিল যেন বোধহয় একটা ছটফটে অস্বস্তিকে মুক্ত করে দেয়।—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। গল্পের বই না পড়ে আমার সঙ্গে গল্প করতে কি আপনার খারাপ লাগে?

আত্রেয়ী—না।

গঙ্গা ফড়িংটা বুনো লতার একটা কচি পাতাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। দেখতে পেয়ে আত্রেয়ীর চোখ দুটো শিউরে কাঁপতে শুরু করেছে। তাই বোধহয় আত্রেয়ীর গলার স্বরটাও বেশ শিউরে উঠেছে।

শ্বেত-করবীর ঘেরানের যে ফাঁক দিয়ে ভিতরে গরু ঢুকেছে, সেই ফাঁক দিয়ে নিখিলও হাসতে হাসতে ভিতরে ঢুকে পড়ে।—বাঃ, জায়গাটি তো বেশ চমৎকার। বসে গল্প করবার মত জায়গা বটে।

ঘেরানের বাইরে যেখানে দাঁড়িয়েছিল আত্রেয়ী, চুপ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে গঙ্গা-ফড়িংয়ের ফূর্তির কীর্তিটাকেই দেখতে থাকে।

নিখিল ডাকে—কই? আপনি কোথায়? ভেতরে আসবেন না?

নিবিড় নিরিবিলির অন্তঃপুর থেকে নিখিলের গলার স্বরের আহ্বানও একটা নিবিড়তার ডাক হয়ে বেজে উঠেছে। এখানে বসে একঘণ্টার মধ্যেই দেশ-বিদেশের কত সমাধির আর কত ভাঙ্গা-মন্দিরের মজার মজার গল্প শুনিয়ে দিতে পারে নিখিল; সে গল্প শুনে আত্রেয়ীর চোখের বিস্ময়ও কত নিবিড় হয়ে উঠতে পারে।

আত্রেয়ী হেসে ফেলে—আপনি চলে আসুন; ওখানে সাপটাপ থাকতে পারে।

ফিরে আসে নিখিল। কিন্তু নিখিলের পায়ে যেন কাঁটা বিঁধেছে। আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিখিল সেনের বিরক্ত চোখ দুটো হঠাৎ কঠিন ঠাট্টার বড়-বড় চোখ হয়ে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে।—আমি ভেতরে ঢোকবার পরেই জায়গাটা সাপে ভরে গেল; কেমন?

আত্রেয়ী—কোন্ দিকে যাবেন?

নিখিল হাসে—চলুন, যেদিকে আপনার দু'চোখ যায়।

আত্রেয়ী—লাইন ধরে একটু এগিয়ে যেয়ে আর তাড়াতাড়ি ফিরে এলেই তো হয়।

নিখিল—চলুন।

আত্রেয়ী—ছত্রের মেলার সময় লাইনের এখানে গরুর ট্রেন এসে থেমে থাকে।

নিখিল—গরুর ট্রেন মানে?

আত্রেয়ী—ট্রেনে শুধু গরু থাকে; ছত্রের মেলাতে বিক্রী হবার জন্যে কত গরু নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু প্রয়াগবাবুর একটা গরু ট্রেনে উঠেই একটা কাণ্ড করেছিল।

নিখিল—কি?

আত্রেয়ী—ট্রেনের ওয়াগনে উঠতে গিয়ে গরুটা মুখ ফিরিয়ে যেই প্রয়াগবাবুর ছোট ছেলেটাকে দেখতে পেল, অমনি একটা লাফ দিয়ে ফিরে চলে এল।

নিখিল—গরুর কাণ্ড।

আত্রেয়ী—কিন্তু কেমন অদ্ভুত কাণ্ড বলুন তো!

নিখিল—হ্যাঁ, দেখতে একটু অদ্ভুত লাগে, ঠিকই।

কিন্তু লাইনের কাছে এখন যেতে হলে প্রথমেই বেশ উঁচু একটা কণ্টকাক্ত বাধাকে টপকাতে হবে। তিন ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া রেলের জমির নিশানা হয়ে টানেল পর্যন্ত গিয়েছে। নিখিলের কাছে তিন ফুট উঁচু ওই কাঁটাতারের বেড়া কোন বাধাই নয়। এক লাফে পার হয়ে গিয়ে হাসতে থাকে নিখিল। আত্রেয়ী চমকে উঠে হাসতে থাকে।—ওরে বাবা!

কাঁটাতারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আত্রেয়ীর দিকে দু'হাত টান করে বাড়িয়ে দিয়ে হাসতে থাকে নিখিল।—কোন ভাবনা নেই, চলে আসুন।

কিন্তু আত্রেয়ী যেন একটা স্তব্ধ শক্ত ও বধির পাথরের মূর্তি। শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, নিখিলের কথার কোন শব্দ কানে পৌঁছেছে বলে মনে হয় না।

নিখিল—কোন সন্দেহ করবেন না; আমার হাতে যথেষ্ট জোর আছে; আপনাকে অনায়াসে তুলে নিতে পারবো।

আত্রেয়ী হাসতে চেষ্টা করে—কি যে বলছেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

নিখিল—কেউ নেই এখানে, কেউ দেখছে না, আপনার লজ্জা করবার কিছুই নেই।

নিখিল সেনের চোখ দুটোকে বোধ হয় ভাল করে তাকিয়ে দেখছে না আত্রেয়ী। তা না হলে, বুঝতে পারতো আত্রেয়ী, কী অদ্ভুত তীব্র হয়ে জ্বলছে নিখিল সেনের আহত অহংকারের চোখ। নিখিল সেনের হাত দুটোর এই আগ্রহ যে একটা খেলনা-পুতুলকে কোলে তুলে নিয়ে কাঁটাতারের বাধা পার করে দেবার জন্য একটা কৌতুকের আগ্রহ মাত্র। সরিয়াডির মেয়ের গা ছুঁয়ে দেবার জন্য নিখিল সেনের মত মানুষের মনে যে কোন ইচ্ছেই থাকতে পারে না; সেটা বোধ হয় এখনও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারেনি আত্রেয়ী।

নিখিল বলে — আপনি কিন্তু খুব ভুল করছেন।

এক-পা পিছু সরে গিয়ে, হাতের রুমালটাকে ঠোঁটের উপর চেপে রেখে, আর

দুলে দুলে হাসতে থাকে আত্রেয়ী। —কী যে বলছেন আপনি, কোন মানে হয় না। শেষে কি পড়ে মরে একটা কাণ্ড বাধাবো?

নিখিল—হাসবেন না। বিশ্বাস করুন, পড়ে যাবেন না। পড়ে যেতে দেব না। আমার হাত হাওয়া-বদলের যক্ষ্মারোগীর লিকপিকে হাত নয় যে মট্ করে ভেঙে যাবে।

আত্রেয়ীর হাসিটা হঠাৎ যেন একটা পথ দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। —আপনি ওখানেই থাকুন। আমি আসছি।

একটু দূরে, ডিঙিয়ে যাবার সুবিধের জন্য কে যেন কাঁটাতারের বেড়াটাকে এক জায়গায় পিটিয়ে বেশ নীচু করে দিয়েছে। লাফ-ঝাঁপ না করেও অনায়াসে পার হওয়া যায়। এগিয়ে যায় আত্রেয়ী, বেড়া পার হয়ে আবার নিখিলের কাছে এসে দাঁড়ায়।

নিখিলের চোখে-মুখে যেন একটা চাপা ঠাট্টার হাসি জ্বলছে।—আমি ভাবলাম, পড়ে-মরে যাবার ভয়ে সোজা বোধ হয় বাড়ির দিকেই চললেন। এখন দেখছি, তা নয়। এখানেই আবার এলেন।

আত্রেয়ী—সন্ধ্যা হবার আগেই কিন্তু বাড়ি ফিরতে হবে।

—নিশ্চয়। কিন্তু এক-একবার মনে হচ্ছে, এখনি ফিরে গেলে মন্দ কি?

—কেন?

—ভাল লাগছে না।

—এদিকে না এসে ছোট ঝিলের কাছে বেড়াতে গেলে বোধহয় ভাল লাগতো।

—আপনি যদি আমার একটা কথা বিশ্বাস না করেন, তবে আমার কিছুই ভাল লাগবে না।

—কি কথা?

—আমাকে ভয় করবার কিছু নেই।

—আপনাকে একটুও ভয় করি না।

—আমি যে এখানে এসে আপনাকে দেখতে চাই, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে চাই, সে শুধু আপনারই জন্য।

—একথা তো আগেও বলেছেন।

—বিশ্বাস করেছেন?

—নিশ্চয়।

—আমার মত মানুষ এখানে এসে কারও সঙ্গে একটা চিরকালের কাণ্ড বাধাতে পারে না, এটা বিশ্বাস করেন তো?

—কেন করবো না? প্রীতি-বৌদির কাছ থেকে তো সবই জানতে পেরেছি।

—দুদিনের জন্যে এসে ছোটলোকও হয়ে যেতে পারি না; এটাও তো বিশ্বাস করবেন?

—ছি নিখিলবাবু; আপনি মিছিমিছি কেন এত শক্ত-শক্ত কথা বলছেন? এসব কথা আমার তো কোনদিনই মনে হ…

নিখিল হেসে ফেলে—সবই তো পরিষ্কার বুঝে ফেলেছেন। এবার শুধু বিশ্বাস করুন, আমি দুদিনের ভদ্রতা মাত্র। মাঝে মাঝে এখানে আসবো, থাকবো, আর বেড়িয়ে গল্প করে চলে যাব। আপনি কি তাতে বিরক্ত হবেন?

আত্রেয়ী—একটুও না।

—বাস্, তাহলেই হল। সবচেয়ে খুশি হব সেদিন, যেদিন দেখবো হেমন্তবাবুর সঙ্গে আপনি বেড়াতে বের হয়েছেন। সেদিন

আমাকে ভয় করবার কিছু নেই

আমিও আপনাদের সরিয়াডিকে শেষ সেলাম জানিয়ে সরে পড়বো।

—আর আসবেন না?

—সেটা ভবিষ্যৎ জানে; আমি জানি না।

গুমরে উঠেছে দূরের টানেল। ছুটে বের হয়ে এল হাওড়া-দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার। যেন বিকেলের আলোতে সাঁতার দিয়ে ছুটে আসছে ট্রেনটা। কিন্তু সিগন্যাল পায়নি বলেই মন্থর হতে হতে একেবারে থেমেই গেল।

ট্রেনের কামরার জানলা দিয়ে অনেক চোখ উঁকি দিয়ে নিখিল আর আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে থাকে। নিতান্ত ক্ষণকালের একটি ছবির দিকে কত মুগ্ধ হয়ে ওরা তাকিয়ে আছে! শুধু সিগন্যালের অপেক্ষায় থমকে আছে ট্রেনটা; যে-কোন মুহূর্তে চলে যাবার সংকেত পেলেই চলে যাবে।

নিখিল আর আত্রেয়ীর চোখে এই ট্রেনটাও ক্ষণকালের মায়ার ছবি হয়ে একটা মুগ্ধতা ঘনিয়ে তুলেছে। হাই তুলছে, হাঁপ ছাড়ছে, কাশছে, হো-হো করে হেসে উঠছে, আর বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে কত কথাই না বলে নিচ্ছে যাত্রী প্রাণের একটা মিছিল, যেটা আর দু-তিন মিনিট পরেই এখানে আর থাকবে না, কোনকালেও না, ইহজীবনেও না। তবু তো দেখতে ভালই লাগে, মায়া করে তাকাতেও ইচ্ছে করে। ট্রেনের দিকে তাকিয়ে নিখিল আর আত্রেয়ী খুশি হয়েই হাসে আর হাঁটতে থাকে।

নিখিলের গলার স্বরে এবার যেন বেশ শান্ত একটা করুণতা ফুটে ওঠে। —আমার একটা অসুবিধে কি জানেন? আমাকে অনেকেই ঠিক বুঝতে পারে না। এমন কি, বউদি আর মঞ্জু, যারা আমাকে বেশ ভাল করেই চেনে, তারাও মাঝে মাঝে আমাকে যেন একটুও বুঝতে পারে না।

আত্রেয়ী—না বোঝবার কি আছে?

নিখিল—আমি যে এখানে এসে আপনার মত দুদিনের চেনা এক মেয়েকে ডাকাডাকি করি, এটা যেন আমার একটা খামখেয়ালী বাড়াবাড়ি।

—তাতেই বা কি এসে যায়?

—হ্যাঁ, মিথ্যে কথা বলবো না; আপনাকে ডাকবার আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াবার একটা ইচ্ছে তো থাকেই; কিন্তু সে ইচ্ছেটা নিশ্চয় একটা দাবি নয়। আপনার যেদিন খুশি সেদিনই বলে দেবেন, না দরকার নেই। আমিও সেদিন সেই মুহূর্তে খুশি হয়ে, হয় চলেই যাব, নয় সরিয়াডির ঝিলে মাছ ধরতে বসে যাব। জীবনেও আর কখনও আপনার কাছে গিয়ে বলবো না যে, বেড়াতে চলুন।

আত্রেয়ীর চোখে বেশ রুক্ষ একটা ভ্রূকুটির ছায়া কাঁপতে থাকে।—আপনি কেন যে এত কথা আর এসব কথা তুলছেন, বুঝি না।

নিখিল হাসে—যাক্, এতদিনে তবু রাগ করে একটা কথা বললেন।

আত্রেয়ীও হেসে ফেলে—কিন্তু আর কোনদিন এসব কথা তুলবেন না।

—হেমন্তবাবুর চিঠি পেয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—কেমন আছেন?

—ভাল।

—আর তো......বোধহয় আর এক বছর...!

—না, তারও কম।

খুব জোরে হুইসিল বাজিয়েছে ট্রেন; ধক্ ধক্ করে ধোঁয়া উগরে দিয়ে চলতে শুরু করেছে ট্রেন। আত্রেয়ী হাসে। —মঞ্জু তো একটিও চিঠি দিল না।

শুধু দেখতেই থাকেন। দেখা আর ফুরোয় না। অনেক রাতে কাকিমা যখন উঠে এসে

—মঞ্জুই জানে, এমন অভদ্রতা করে মঞ্জুর কি লাভ হলো? কিন্তু আপনারই বা তাতে কোন্ ক্ষতিটা?

আত্রেয়ী এইবার মুখ ঘুরিয়ে হাসে—কিছুই জানতে পারছি না, এই একটা ক্ষতি, আর কিছু নয়।

নিখিল—মঞ্জুর বিয়ে হবে শিগগিরই।

—আরও একটা সুখবর পাওয়া দরকার ছিল।

—সে-খবরও হঠাৎ একদিন পেয়ে যেতে পারেন।

—মঞ্জু তো চিঠিই লেখে না; কি করে পাবো?

—বেশ তো; আমিই জানিয়ে দেব।

—জানাবার কোন দরকার নেই; হাওয়া-বদলের জন্য দুজনেই সোজা এখানে চলে আসবেন, তাহলেই হবে।

—অসম্ভব নয়। কিন্তু আপনি কি তখনও এখানে থাকবেন?

—তখন না থাকি, একদিন ফিরে এসে সবই শুনতে পাব। ভাগ্যে থাকে তো, দেখতেও পাব।

বুঝতে পারেনি আত্রেয়ী, নিখিলের চোখ দুটো তখন অপলক হয়ে আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন দেখছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় আত্রেয়ী; মাথা ঝুঁকিয়ে আর দু-হাত দিয়ে খুঁটে খুঁটে হাঁটুর কাছের শাড়িটার গা থেকে কয়েকটা চোর-কাঁটা তুলে ফেলে দেয়।

নিখিল বলে—আপনি কিন্তু অনেক রোগা হয়ে গিয়েছেন।

আত্রেয়ী হাসে—কিন্তু খাচ্ছি তো খুব।

—বিশ্বাস করি না।

—আপনিও দেখছি শান্তি বউদির মত আমার সব কথা শুধু অবিশ্বাস করেন। শান্তি বউদি সব সময় আমার মুখ শুকনো দেখছেন। সব সময় ওই এক কথা, খেয়েছো তো আত্রেয়ী? কি খেলে? কখন খেলে?

—বাঃ, শুনে মনে হচ্ছে, আপনার শান্তি বউদিও বেশ মায়ার মানুষ।

—সে আর বলতে! কিন্তু......।

—কি?

—ভাবতে একটু কষ্ট হচ্ছে, শান্তি বউদি আজ হয়তো আমার উপর রাগ করেছেন।

—কেন?

—আজ শান্তি বউদির সঙ্গে বেড়াতে বের হবার কথা ছিল। কিন্তু আপনি এসে ডাকলেন বলে আপনারই সঙ্গে চলে এলাম।

—আপনার শান্তি বউদির কিন্তু রাগ করবার কোন মানে হয় না। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াবার সুযোগ উনি তো চিরকালই পাবেন; কিন্তু আমি তো পাব না। আমি তো ট্রেনের মানুষ; হঠাৎ সিগন্যাল পড়ে যাবে, আর হুইসিল বেজে উঠবে। তারপর আর......।

আত্রেয়ী—কি?

নিখিল হাসে—তারপর কে আর কার কোন্ মায়ার কড়ি ধারে।

আত্রেয়ী—আবার আপনি বেশি কথা বলতে শুরু করেছেন।

নিখিল—থাক তবে; কোন কথাই বলবো না।

আত্রেয়ী—তা হবে না। কথা বলতেই হবে। আমাকে ডেকে নিয়ে এলেন কেন?

নিখিল—কি বলবো, বলুন?

আত্রেয়ী—রান্না-বান্না করছে কে?

নিখিল—ধীরু খানসামা।

আত্রেয়ী—আজ দুপুরে কি খেলেন?

নিখিল—অনেক কিছু। আতপ চালের ভাত, চারটে আলু সেদ্ধ আর এক চামচ ঘি।

—এ তো সন্ন্যাসীর খাওয়া।

—যখন বেশি পড়াশোনা করি, তখন এর চেয়ে বেশি কিছু খাই না।

—এত পড়াশোনারই বা কি দরকার কি?

—কোন দরকার নেই। ওটা একটা অভ্যেস।

—ছাই অভ্যেস। ছেড়ে দিলেই ভাল।

—হতে পারে; কিন্তু এ ছাই অভ্যেস ছাড়তে পারবো বলে মনে হয় না।

—আমার কথা শুনে ছাড়বেন না জানি; কিন্তু একদিন একজনের কথা শুনে ছেড়ে দিতেই হবে।

সত্যিই যে আবার রাগ করে কথা বলছে আত্রেয়ী। নিখিল সেনের জীবনের কঠিন ফিলসফি আর কঠোর সায়েন্সের চোখ দুটো যেন হঠাৎ-বিস্ময়ে বোকা হয়ে গিয়ে সরিয়াডির এক সামান্য মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আত্রেয়ী বলে—এবার ফিরতে হয়।

শালবনের মাথার উপর ঠান্ডা সূর্যের চেহারাটা আবীরমাখা হয়ে ঢলে পড়েছে। নিখিল বলে—হ্যাঁ, এখন ফিরে যাওয়াই ভাল। কিন্তু......।

আত্রেয়ী—কি?

—আপনি কাল একবার আসবেন?

—কোথায়?

—কটেজে।

—না। আপনি আসবেন।

—কোথায়?

—আমাদের বাড়িতে।

সরিয়াডির ঘন সন্ধ্যাটা হঠাৎ লালচে হয়ে জ্বলে উঠেছে।

সন্ধ্যার ট্রেনে পরেশনাথ থেকে সরিয়াডি ফিরে এসেই দেখতে পেয়েছে দিবাকর, কালীবাড়ি রোডের নিতাইবাবুর বাড়ির ঘরের মাচানে আগুন লেগেছে। উড়ছে আগুনের জটা; গোঁ গোঁ করে শব্দ করে জ্বলছে আগুনের আহ্লাদ। গনগনে গরম ছাই ছিটকে পড়ছে; গাছের বক উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আগুন নেভাতে এসে ভিড়টা শুধু ভীরু হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। নিতাইবাবুর বাড়ির কুয়োটা একেবারে শুকনো খটখটে; এক ফোঁটাও জল নেই। কিছুই করা গেল না। মাচানের খড়ের পাহাড় দেখতে দেখতে একটা ছাই-গাদা হয়ে গেল।

সেই ভীড়ের ভীরু নীরবতার মধ্যে শুধু চন্দ্রবাবুর গলার স্বর একবার হই হই করে চলে গেল—কী ব্যাপার? কিসের আগুন? হঠাৎ একটা আগুন কোথেকে এল হে দিবাকর?

বেচারী শান্তি, সরিয়াডির শান্তি বউদি; দিবাকরের হাতের কাছে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিতে যেয়েই ফুঁপিয়ে ওঠে।

শান্তির একটা সাধের গর্ব হেরে গেল, একটা মায়ার চেষ্টা মিথ্যে হয়ে গেল, শুধু সেই জন্যে নয় বোধহয়; শান্তির জীবনের একটা আদুরে বিশ্বাস, যেটা মায়ের কোলের ছেলের মত একটা আদুরে মানিক, দেখতে ভাল-মন্দ সত্যি-মিথ্যে যা-ই হোক না কেন, সেটাই যে মরে যেতে চলেছে। ভয় না পেয়ে আর ফুঁপিয়ে না কেঁদে পারবে কেন শান্তির মত মেয়ে?

দিবাকর—শুনেছি, এইমাত্র নরেনের কাছ থেকে শুনতে পেলাম।

শান্তি—তবে আর কি? আমার কিছু আর বলবার নেই। তুমি যা ইচ্ছে হয় বলতে পার।

দিবাকরের গলার স্বর উদাস হয়ে যায়।—কি আর বলবো? আমারও কিছু বলবার নেই।

পর পর চারবার হলো, ঠিক মাঝরাতে হাজরাবাবুর ঘুম হঠাৎ ভেঙে গিয়েছে। বাকি রাতটুকু আর ঘুমোতেই পারেননি। বার বার সিগারেট খেয়েছেন, তবু যেন গা ছমছম করেছে! সকাল হতেই সামন্ত-বাবুর কাছে গিয়ে বলেছেন—কিছুই বে বুঝতে পারছি না, সামন্তদা। রোজ রাত্তিরে একটা কাণ্ড হচ্ছে।

—কি হলো?

—বাইরে থেকে কপাটের গা কেউ যেন আঁচড়াচ্ছে বলে মনে হলো। টর্চ জেলে আর লাঠি নিয়ে বাইরে গেলাম; কিন্তু কই? কেউ কোথাও নেই। আবার যেই ফিরে এসে একটু শুয়েছি আর চোখ বন্ধ করেছি, অমনি আবার। আবার উঠলাম। কিন্তু কিছুই না, কেউ নেই।

—ছায়ার মত কিছু পালিয়ে যেতে দেখতে পেয়েছেন কি?

—ঠিক দেখতে পাইনি। তবে মনে হলো।

—তবে তো চিন্তার কথা।

—এর মধ্যে আর এক চিন্তে বাধিয়ে রেখেছে প্রদোষদার মেয়ে। আমার তো ভাবতে সত্যিই ভয় করছে সামন্তদা।

—হ্যাঁ, আপনি তো ভাও টর্চ জেলে আর লাঠি নিয়ে তেড়েমেড়ে বাইরে গিয়ে ছায়াটাকে তাড়ালেন; খোঁড়া মানুষ প্রদোষদার যে সে সাধ্যিটুকুও নেই।

শ্রীপদবাবুর বাড়িতে চুরি হয়ে গিয়েছে। এটাও একটা ভয়ানক রহস্যের চুরি। থানা অফিসার বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বলেছেন—ঘরের ভিতর থেকে দরজার খিল কেউ খুলে দিয়েছে, তা না হলে কোন চোরের পক্ষে এমন চুরি সম্ভব নয়।

শ্রীপদবাবু সে-রাতে একাই বাড়িতে ছিলেন। আর কেউ ছিল না। তবে কে খুলে দিল খিল? থানা অফিসারের কথা শুনে শ্রীপদবাবু খুবই ভয় পেয়েছেন—তবে কি আমিই হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে খিল খুলে দিয়েছিলাম?

সন্ধ্যাবেলা ধানোয়ার রোডের কালভার্টের কাছে ঘাসে ভরা ঢালুটার উপর গা এলিয়ে দিয়ে আর শুয়ে-বসে গল্প করতে সাহস করে না নরেন আর বিমল পরেশ আর মাধব। চিতি সাপটা নিশ্চয় এখানেই ঘাসের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে ঘুরছে; খোলসটা যদিও একটু দূরে ঝোপের গায়ে ঝুলছে।

কালভার্টের উপরে দাঁড়িয়ে গল্প করতে গিয়েও ওরা যেন স্বস্তি না পেয়ে উসখুস করে। ভয় হয়, হয়তো এখনই এই দিকে বেড়াতে চলে আসবে একটা অপমানের ছবি। তখন দূরে সরে যেতেই হবে।

নরেন বলে—আত্রেয়ীদি কেন যে এরকম একটা যাচ্ছেতাই কান্ড করছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

পরেশ—রজনীধামে নতুন যারা এসেছে, তারা কি বলাবলি করছিল, শুনবে?

নরেন—কি?

পরেশ—ইয়া মোটা এক টেকো ভদ্রলোক, হাফ-প্যান্ট পরে আর চুরুট টানে; সেই ভদ্রলোক বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আর হেসে-হেসে ওইরকমই মোটা আর-এক ভদ্রলোককে বলছেনঃ জানেন তো মশাই, সরিয়াডিতে শুধু লজ কটেজ আর ভবন নয়, বেড়াবার সুন্দরী সঙ্গিনীও ভাড়া পাওয়া যায়। ট্রাই করবেন নাকি?

নরেন—চিনিয়ে দিস তো লোক দুটোকে।

মাধব—কিন্তু চিনিয়ে দিলেই বা কি হবে?

আলোচনার সব শক্তি যেন এইবার স্তব্ধ হয়ে যায়। কেউ আর কোন কথা বলে না; বলতে চায়ও না। বলবার মত কিছু খুঁজেও পায় না। যাদের হাত ফণী মিত্রের গাড়ির হেডলাইট চূর্ণ করে দিয়েছে; যাদের শক্ত ছায়া দেখে জগৎ ব্যানার্জি পালিয়ে গিয়েছে, তারা আজ যেন নিজেরাই ভয় পেয়ে ছায়া হয়ে গিয়েছে।

চিনুর পিসিমার শঙ্কিত চোখ দুটো ছলছল করে। কুলোর বড়ি তুলতে গিয়ে হাতটা বড়ির উপরেই অনড় হয়ে পড়ে থাকে। নিজের মনেই কথা বলেন পিসিমা?—ছি ছি, এ কী হলো? এমন কান্ড হয়ই বা কেন? মেয়েটার বুদ্ধিসুদ্ধিতে কি এটুকুও বলে না যে, চিরকালের কথাটা ভুলে গিয়ে দু'দিনের তামাসার নাচ নাচতে নেই? ওরে ও চিনু একবার দেখে আয় তো মা, তোদের আত্রেয়ীদি এখন কি করছে।

চিনু বলে—দেখেছি, আত্রেয়ীদি এখন গল্প করছে।

—কার সঙ্গে?

—চিনি না। একজন চশমাপরা চেহারা।

শুধু চিনু কেন, সরিয়াডির কে না দেখেছে আর দেখতে পাচ্ছে? শ্রীলেখা কটেজের ভদ্রলোক প্রায়ই এসে প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দায় উঠে শুধু দুটি কথা ধ্বনিত করেন। —আমি নিখিল।

তখনি বের হয়ে আসে আত্রেয়ী। কোনদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে, কোনদিন গেটের কাছে এসে, কখনও বা সামনের রাস্তায় পায়চারী করে। এক-একদিন কাছারিপাড়া ছাড়িয়ে শিরীষ আর খেজুরের ছায়া ছড়ানো ডাঙার চারদিকে দুজনে বেড়িয়ে আসে। ডাঙার লালমাটির উপর দাঁড়িয়ে ওরা দূরের পরেশনাথের নীলচে চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। কখনও বা দেখতে থাকে, শালবনের সবুজ একদিনের বৃষ্টির জলে কত ঘন হয়ে গিয়েছে।

তবু দিবাকরের মত মানুষের মেজাজও আর ছটফট করে উঠতে পারছে না। দিবাকরের সাইকেলে স্পীড নেই। শান্তির কাছে বসে আর আনমনার মত অন্যদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে দিবাকর। —চন্দরকাকা হে হে করে হেসে হেসে যে কথাটা বললেন, সে কথাটা তবে নেহাৎ মিথ্যে কিছু নয়।

শান্তি—গোষ্ঠদা কি বলছেন?

দিবাকর—গোষ্ঠদা আর হাবুলদা তো কথা বলতেই চান না। ওরা বলেন, ও'দের আর কিছু বলবার নেই।

শান্তি—কিন্তু এত ভয় করলে চলবে কেন?

চমকে ওঠে দিবাকর। —তুমি বলছো একথা?

শান্তি—বলছিই তো।

বেচারা দিবাকর, ছোট্ট একটি স্থায়িতার

ঘরে সুখী হয়ে পড়ে আছে যে মানুষটা, কাঠের গোলাদারী করে আর মাঝে মাঝে ছিপ হাতে নিয়ে ছোট ঝিলের জলে মাছ ধরে যার জীবনের দিনগুলি খুশি হয়ে যায়, ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়া সামান্য বিদ্যের মানুষটি, ফিলসফির তন্ত্রমন্ত্রের কোন ধারই যে ধারে না, সে মানুষেরই চোখে বেশ শক্ত একটা ভ্রুকুটি হঠাৎ পাকিয়ে উঠতে থাকে। যেন একটা হেঁয়ালির কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে চেষ্টা করছে দিবাকর। দিবাকরের অবুঝ আত্মাটাই যেন রাগ চাপতে গিয়ে বিড়বিড় করে।—না, চন্দরকাকা যা-ই বলুন, তিরছি নদীকা পানি হয়ে শুধু বয়ে গেলে আর সব বইয়ে দিলেই চলে না। বাঁচতে হলে এক জায়গায় ঠেকে থাকতে হয়।

শান্তি—আমি বলি, অন্তত চেষ্টা করা তো উচিত। তারপর ঠেকে থাকতে পারি বা না পারি, যা হবার হবে। আত্রেয়ী যে একটু চেষ্টাও করে না।

দিবাকর উঠে দাঁড়ায়। —আমি, এখনি আসছি।

দুপুরের রোদে তেতে উঠেছে নয়াপাড়ার সড়কের ধুলো। তারই উপর দিয়ে কী সাংঘাতিক স্পীড নিয়ে ছুটে চলে গেল দিবাকরের সাইকেল।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দায় উঠেই ডাক দেয় দিবাকর। —কাকিমা!

কাকিমা বের হয়ে আসেন—কি খবর দিবাকর?

—আত্রেয়ী কোথায়?

—ঘুমিয়ে আছে।

—আপনি এখুনি আত্রেয়ীকে বলুন, নিখিলবাবুর সঙ্গে যেন আর বেড়াতে না যায়, গল্পটল্পও না করে।

—এখুনি বলবো?

—হ্যাঁ, আমি এখানে দাঁড়িয়েই শুনবো, আত্রেয়ী কি বলে।

শুনতে পেল দিবাকর, আত্রেয়ী যেন স্বপ্ন দেখে পাগল হয়ে যাওয়া একটা মানুষের মত কথা বলছে। —না, তা হয় না, কাকিমা। নিখিলবাবুর মত মানুষের সঙ্গে আমি অভদ্রতা করতে পারবো না। ভদ্রলোক এলে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলবোই, বলা উচিত। না বললে, মিছি-মিছি ভদ্রলোককে অপমান করা হয়।

কাকিমা আবার বাইরে এসেই দেখতে পান, দিবাকর গেট পার হয়ে গিয়ে রাস্তার উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

যেন অনেক চেষ্টা করে কোনমতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিবাকর; একটু জোরে হাওয়া বইলেই ধুলোর উপর পড়ে যাবে দিবাকর আর দিবাকরের সাইকেল।

এগিয়ে আসেন কাকিমা। —শুনলে তো দিবাকর। এখন বল, আমাদের আর কী করবার সাধ্যি আছে?

দিবাকরের চোখ দুটো লাল হয়ে গিয়েছে।

—শেষ চেষ্টা করবেন?

—কি করবো বল?

—আপনি নিজেই নিখিলবাবুকে একদিন একটু বুঝিয়ে বলুন, নিখিলবাবু যেন আর আত্রেয়ীকে ডাকাডাকি না করেন।

সেদিনই সন্ধ্যায়, যখন শ্রীলেখা কটেজের বারান্দায় বসে বই পড়ছে নিখিল সেন, তখন সরিয়াডির একটি করুণ আবেদনের মূর্তি, সরিয়াডির সুহাস কাকিমা চিনুর হাত ধরে সেই বারান্দার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আর দিবাকর যেন আবছায়া হয়ে গেটের থামের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিখিল একটু বিস্মিত হয়ে তাকায়—কে আপনি?

—আমি আত্রেয়ীর কাকিমা।

—কি আশ্চর্য, আপনি এখানে কি মনে করে?

—আপনাকেই একটা কথা বলতে এসেছি।

—বলুন।

—আমাদের আত্রেয়ী তো একটা মুখ্খু সুখ্খু অবুঝ মেয়ে, কিন্তু......।

—কিন্তু তাতে কি আসে যায়? হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নিখিল।

—আপনি তো সবই বোঝেন; আত্রেয়ীর অবস্থার কথা নিশ্চয় সবই জানেন। তাই আপনি যদি এখন......।

—বলুন।

—আপনি যদি আত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা-টেখা না করেন, তবে আমরা সবাই একটু নিশ্চিন্ত হই।

—সে কি কথা? আপনাদের কিসের এত দুশ্চিন্তা? আত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা-টেখা করে কি আমি ভয়ানক একটা দোষ করে ফেলেছি?

—আপনার কোন দোষই নেই। আপনার মত মানুষ আমাদের মত ঘরের একটা মেয়ের সঙ্গে ভদ্রতা করে দুটো কথা বলবে, এটা তো আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আত্রেয়ী যে একটা বোকা মেয়ে, ভুল করে ফেলতে পারে।

—কিন্তু আমার ভুল হতে পারে না; আমি ভুল-টুল করি না।

—যদি সত্যি কথা।

—তবে তো আপনার আর কিছু বলবার নেই।

—আপনি দয়া করুন।

—ছি, দয়ার কথা আবার তুলছেন কেন? কোন মানে হয় না।

নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কাকিমা। চিনু হঠাৎ ছটফট করে কাকিমার হাত ধরে টানতে থাকে।

হেসে ওঠে নিখিল সেন। শান্ত সুন্দর ও স্নিগ্ধ হাসি। —আপনি বরং দয়া করে অনুমতি দিন কাকিমা, কাল আপনাদের **মেয়েকে একবার পরেশনাথ বেড়িয়ে নিয়ে আসতে চাই; ট্যাক্সিতে যাব, ট্যাক্সিতেই ফিরবো।**

ফিরে এলেন কাকিমা। দেখতে পায় দিবাকর, কাকিমার চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছে।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে দিবাকরের চোখ। সরিয়াডির চোখ। কী ভয়ানক আগুন ঠিকরে পড়ছে সেই দুটো চোখ থেকে! সরিয়াডির কাকিমাকে ঠাট্টা করে কাঁদিয়ে দিয়েছে বাইরের একটা ভালমানুষী হামবড়াই, অপমানের জ্বালাটা যেন সরিয়াডির শালজঙ্গলের নেকড়ের মত এইবার হিংস্র হয়ে ছুটে গিয়ে টুঁটি কামড়ে ধরতে চায়। দিবাকরের চোয়াল কাঁপে, দাঁতে দাঁতে শব্দ হয়।

—ঠিক আছে, এখন বাড়ি চলুন কাকিমা।

একদিন, দুদিন, পর পর সাতদিন সরিয়াডির প্রাণের জ্বালার নেকড়েটা শুধু আড়াল থেকে চোখ রেখে দেখতে থাকে; হ্যাঁ, ট্যাক্সি করে পরেশনাথ থেকে ফিরে এল নিখিল আর আত্রেয়ী। একদিন ছোট ঝিলের জলের একটা শালুক তুলে নিয়ে আত্রেয়ীর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে নিখিল; শিউরে হেসে উঠেছে আর একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়েছে আত্রেয়ী। নিখিল বলে—কেন, কি হলো? লুফে ধরতে পারলেন না? আত্রেয়ী হাসে—ওরে বাবা, ঝিলের জলের শালুকে জোঁক থাকে।

রাত মন্দ হয়নি। নয়াপাড়ার সড়কের মোড়ের টিমটিমে বাতি নিবে গিয়েছে। ঝড়ের বাতাস লেগে গভীর অন্ধকারটাই বুঝি ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে। দাঁড়িয়ে আছে পরেশ মাধব নরেন আর বিমল।

নরেন বলে—হতে পারে লোকটা সত্যিই একটা স্কলার। কিন্তু নিজেকে ছাড়া আর কাউকে যেন মানুষ বলেই মনে করে না।

মাধব—মাঝে মাঝে সরিয়াডিতে আসবেন, আর, কোন সম্পর্ক নেই এক ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে বেড়িয়ে হেসে আর গল্প করে আবার স্বস্থানে প্রস্থান করবেন, এ তো বেশ মজার ফিলসফি! বেড়ে আবদেরে জীবন!

দিবাকর এসে বলে—চল।

শ্রীলেখা কটেজের কোন ঘরে আলো নেই। বারান্দার উপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায় নরেন মাধব বিমল আর পরেশ। দরজার কড়া নাড়ে দিবাকর। দরজা খুলে বের হয়ে আসে কটেজের মালী—সাহেব নেই। আজ বিকেলের ট্রেনে কলকাতা চলে গিয়েছেন।

বিকেল হলে কাঁটালতার লাল ফুলের উপর মৌমাছি গড়ায়। আর, আত্রেয়ী শুধু গেটের সামনের রাস্তাটুকুর ওপর একাই **আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ায়। কিন্তু মনটা**

বোধহয় একা নয়, সে মন একটা অপেক্ষার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে; আজ হয়তো নিখিলবাবু আর-একটু পরেই এসে পড়বেন।

রামুয়া একদিন হঠাৎ বলে দিল বলেই বুঝতে পারলো আত্রেয়ী, নিখিলবাবু এখন সরিয়াডিতে নেই। কটেজের ছোটবাবু তো দশ রোজ হলো কলকত্তা চলিয়ে গিয়েছে।

বিকেলের আলো ফুরিয়ে যাবার আগেই, বাড়ির সামনের রাস্তাটুকুর উপর আত্রেয়ীর এই একা ঘুরে বেড়াবার সামান্য চঞ্চলতাও একেবারে মৃদু হয়ে যায়। ফিরে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে, উলের গোছা আর কাঁটা হাতে নিয়ে জানালার কাছে বসে পড়ে।

কাকিমা যখন ঘরের ভিতরে টেবিলের ল্যাম্পটাকে জেলে দিয়ে চলে গেলেন, তখন বাইরের সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারও অনেক পরে, রাত দশটার নীরবতার বাতাসে যখন স্টেশনের লোকো শেডের ভিতর থেকে হাতুড়ি পেটানোর শব্দটাকে বেশ স্পষ্ট করে শোনা যায়, তখন হঠাৎ চমকে ওঠে আত্রেয়ী। উলের গোছা আর কাঁটা তাকের উপর রেখে দিয়েই টেবিলের বইটাকে তুলে ধরে, নাড়া দেয়, খুলে দেখে। টেবিলের সবুজ কাপড়ের ঢাকাটার একটা কোণ তুলে ধরে আর দেখতে থাকে। বিছানার কাছে এগিয়ে যেয়ে বালিশের নীচে আর তোষকের তলায় হাত চালিয়ে খুঁজতে থাকে। আয়নার পিছনে দেয়ালের গায়ে যে খোপের ভিতরে আত্রেয়ী ওর চুল বাঁধবার পুরনো ফিতে-গুলিকে একটা কুণ্ডলী করে রেখে দেয়, শেষে সেই খোপের ভিতরে চিঠিটাকে পাওয়া গেল।

দু'মাস আগে হেমন্তের এই চিঠিটা এসেছিল। এ চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। কিন্তু হেমন্তের আর একটিও চিঠি কি এই দু'মাসের মধ্যে আসেনি?

ব্যস্ত হয়ে আবার খুঁজতে থাকে আত্রেয়ী। আলমারির মাথাটার উপরে, সেলাই কলের খোপটার ভিতরে; কোথাও কোন চিঠি নেই। কুলুঙ্গিতে মস্ত বড় একটা শঙ্খ আছে, কাকিমা তাঁর হরিনাম লেখা কাগজের টুকরো এই শঙ্খের ভিতরে জমা করে রাখেন। না, এই শঙ্খের ভিতরেও হেমন্তের কোন চিঠিকে ভুল করে কেউ রেখে দেয়নি।

দু'মাস আগের এই চিঠিটার অনেক কথার মধ্যে হেমন্তের একটা নতুন কথাও আছে—ক'দিন ধরে শরীর ভাল যাচ্ছে না। ওষুধ খেয়েছি।

রাগ হয় কাকিমার উপর। কাকিমা একবার মনে করিয়েও দিতে পারেনি যে, চিঠিটার জবাব দিতে হবে। জবাব দেওয়া হলো কিনা, সেটুকুও খোঁজ নিয়ে জানতে চেষ্টা করেনি কাকিমা। অথচ দিনের মধ্যে অন্তত তিন-বার আত্রেয়ীকে জিজ্ঞেস করেছে কাকিমা, ঘুম ভাল হয়েছে কিনা।

কাকিমা ঘরে ঢুকতেই আত্রেয়ীর এই রাগের মনটাই যেন ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। —বেশ হলো, তোমার ইচ্ছেই সত্য হলো।

—কি হলো?

—দু'মাস ধরে বেশ ভাল করে ঘুমিয়েছি, কিন্তু চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি।

—আমি কেমন করে জানবো যে, চিঠির জবাব দিসনি?

—তুমি কেমন করে জানতে পারো যে, আমার ঘুম হয়নি? ছি।

—কাকে ছি করছিস? বুঝে দেখ।

—আমাকেই করছি। শুনে খুশি হলে তো?

কোন কথা না বলে চলে গেলেন কাকিমা। আত্রেয়ীর মনটা এবার যেন হেমন্তেরই উপর রাগ করে ছটফট করতে থাকে। —আমি না হয় ভুলে গেছি, কিন্তু তুমিই বা এত হিসেব করে চিঠি লিখবে কেন? আগে তো চিঠির জবাব না পেয়েও তিনটে চিঠি লিখে ফেলতে; এখন এমন কী কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলে যে, দু'মাসের মধ্যে আর-একটাও চিঠি লিখতে ভুলে গেলে?

চিঠি লেখে আত্রেয়ী। —জানি, আমার চিঠির এত দেরী দেখে তুমি বেশ কথা শুনিয়ে জবাব দেবে। তাই দিও; আমি কিছু মনে করবো না। কিন্তু অসুখ কেন হয়েছিল? এখন কেমন আছ?

সরিয়াডির আকাশে কোন মেঘ নেই, যদিও আষাঢ় প্রায় ফুরিয়ে এল। শালবনের হাওয়া রোজই সকালবেলার আলোর সঙ্গে জেগে উঠে ফুরফুর করে, আর দূরের পাহাড়তলীর গির্জার ঘণ্টার শব্দ বেশ স্পষ্ট করে শোনা যায়।

দেখতে পেয়েছে দিবাকর, কিন্ডার-গার্টেনের কলরবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দিয়ে আত্রেয়ীও কলকল করে হাসছে।

একটা মাস পার হয়ে গিয়েছে, শ্রীলেখা কটেজের ঘরের জানালার গায়ে রাতজাগা আলোর কোন চিহ্ন দেখা যায় না; বারান্দার বেতের টেবিলে মোটা-মোটা বইয়ের কোন স্তূপও নেই। ধানোয়ার রোডে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেয়েছে আর হেসে ফেলেছে নরেন, কালভার্টের কাছে সড়কের ধুলোর উপর চিতি সাপটা গরুর গাড়ির চাকায় থেঁতলে গিয়ে মরে পড়ে আছে।

প্রদোষ সরকার কিন্তু একদিন হঠাৎ বেশ একটু চমকে উঠে জিজ্ঞেস করেন—কই সুহাস? হেমন্তর চিঠি তো এল না।

কাকিমা—না।

প্রদোষবাবু—তিন মাসের মধ্যেও একটা চিঠি নেই, এর মানে কি?

—কি করে বলি? কিছু বুঝতে পারছি না।

—শেষ চিঠিতে কি লিখেছিল হেমন্ত?

—শরীর ভাল নয়, ওষুধ খাচ্ছে।

চমকে ওঠেন প্রদোষ সরকার। —তারপর দু'লাইন লিখে জানাবে তো হেমন্ত, যে অসুখ সেরে গিয়েছে?

—জানানো উচিত ছিল।

—হিসেব করে দেখেছো, হেমন্তর মেয়াদের আর ক'মাস বাকি আছে?

—আর তো মাত্র ছ-মাস।

গেটের তিন কাঠের বেড়াটার দিকে দুই চোখ অপলক করে তাকিয়ে থাকেন প্রদোষ সরকার।

হাবুলবাবুর বাড়িতে দাবার আসরের কাছে কাঁচের চিমনি দিয়ে ঢাকা কেরোসিনের বাতির শিখাটা বড় উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে। হাবুলবাবু দাবার চাল চালতে গিয়ে হেসে ওঠেন—আর ছ'মাস।

গোষ্ঠবাবুও হাসেন—কার? সামন্তদা'র স্ত্রীর?

হাবুলবাবু—আরে না; দিবাকর বলছিল, প্রদোষদার জামাইয়ের ছাড়া পেতে আর মাত্র ছ'মাস বাকি। সামন্তদার স্ত্রীর ছাড়া পেতে আর মাত্র তিন মাস।

গোষ্ঠবাবু—যাক, এ ছ'মাসের মধ্যে শ্রীলেখা কটেজের উপদ্রবটা আবার দেখা না দেয়, তবেই ভাল।

সেদিন, সরিয়াডির দুপুরে বেলার স্তব্ধতা হঠাৎ যেন দুটো রাগী কুকুরের চিৎকার হয়ে প্রদোষ সরকারের ঘুম ভেঙে দিল। সামনের সড়কের গরম ধুলোর উপর দিয়ে কামড়া-কামড়ি করে ছুটোছুটি করছে কে জানে কোথাকার আর কোন্ পাড়ার দুটো কুকুর।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন প্রদোষবাবু, তারপর বাইরের বারান্দায় এসে চেয়ারের উপর বসতে গিয়েই একটা ক্রাচ হাত ফসকে মেজেতে পড়ে গেল। চেয়ারের কাঁধটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটা চিঠি পড়ে আছে চেয়ারের উপরে। কে জানে কখন এসে চিঠিটাকে এখানে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছে ডাকপিয়ন হরিরাম।

চিঠি পড়লেন প্রদোষবাবু। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের উপর ধপ্ করে বসে পড়ে ডাক দিলেন—এদিকে একবার এসো, সুহাস। যেন প্রদোষ সরকারের আস্ত পা'টা হঠাৎ মট্ করে ভেঙে গিয়েছে, তাই একটা আর্ত অসহায়তা চেঁচিয়ে উঠেছে।

জেলরের চিঠি। তিনশো তের নম্বরের কয়েদী হেমন্ত চৌধুরীর স্ত্রী আত্রেয়ী চৌধুরীকে জ্ঞাত করা হচ্ছে যে, তার স্বামী সাংঘাতিক অসুখে পীড়িত। যদি দেখা করবার ইচ্ছে থাকে, তবে অবিলম্বে দেখা করে যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

চিঠির ভাষা শুনে কাকিমা কাঁপতে থাকেন। প্রদোষ সরকারের কপালটা ঘামে ভরে যায়।

আত্রেয়ীর মা আর মণিদিদা যখন খবরটা শুনতে পেলেন, তখন বিকেল হয়ে এসেছে। পুজোর ঘরের কপাটে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে রইলেন আত্রেয়ীর মা; আর মণিদিদা তাঁর জপের মালা কপালে ঠেকিয়ে দিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে বসে রইলেন।

আত্রেয়ী এখনও ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক, এ খবর শুনিয়ে দেবার জন্য আত্রেয়ীকে এখন ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলবে, এমন হাত কোন জহ্লাদেরও থাকতে পারে না।

বাইরের কার্নিশ [illegible] কাঠ-বিড়ালটা জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে ঘুমন্ত আত্রেয়ীর গায়ের উপর পড়ে গেল বলেই আত্রেয়ীর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ-মুখ ধুয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে আত্রেয়ী। তারপরেই চমকে ওঠে। —তোমার হাতে ওটা কি, বাবা?

—জেলারের চিঠি।

কপালটা [illegible], কিন্তু চোখ দুটো যেন [illegible] চাই-চাই। প্রদোষ সরকার এই চিঠির ভাষাটা আত্রেয়ীকে শুনিয়ে দিতেও আর দেরি করেন না।

[illegible] একেবারে [illegible] হয়ে [illegible] দাঁড়িয়ে থেকেই সরে যায় আত্রেয়ী। ঘরের ভিতরে গিয়ে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে।

[illegible] পিসিমা এলেন, সন্ধ্যাবেলা। জেলারের চিঠি [illegible] তিনিও শুনলেন। [illegible] মুখ ঢেকে বিছানার উপর [illegible] আছে আত্রেয়ী।

প্রদোষ [illegible] বাড়ির বারান্দার সিঁড়ি ধরে [illegible] চিনুর পিসিমা হঠাৎ মাথা ঘুরে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন; কিন্তু সামলে নিলেন আর আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ি চলে গেলেন।

শুনতে পেল শান্তি। শান্তির হাত থেকে [illegible] প্রথম জ্বালানো বাতিটার [illegible] এত ধর ধর করে কাঁপতে কাঁপতে মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেল আর চুরমার হয়ে গেল। [illegible] দিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শান্তি।

শুনতে পেলেন [illegible]বাবুর স্ত্রী। ডালের কাঁটা হাতে ধরে নিথর হয়ে শুধু উনুনের আগুনটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ডাল-পোড়া গন্ধে সারা বাড়ির বাতাস ভরে গেল। শুনতে পেয়েছেন সন্তুর মা। শ্বাস ছাড়তে গিয়ে বুক কেঁপেছে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায় ডাক দিয়েছেন। —সন্ধ্যাবেলা আর বাঁশি বাজাসনি সন্তু। কী বিচ্ছিরি তোর বাঁশির শব্দ।

সন্তু বলে—বাঁশিতে জল ঢুকেছে, মা।

আজই কাণপুর থেকে সন্তুর বাবার চিঠি এসেছে। কি আশ্চর্য, যে মানুষ চিঠিতে আত্রেয়ীর নামে কোন কথা কোন-দিনও লেখেনি, সে মানুষ তার এই চিঠিতে একটা অদ্ভুত কথা লিখে বসে আছে; আশা করি আত্রেয়ীর স্বামী এতদিনে মুক্তি পেয়েছে।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দাতে বাতি নেই। সড়কের বাতির একটা ঘোলাটে আভা বারান্দার অন্ধকারের গায়ের উপর পড়ে আর মর-মর হয়ে কাঁপছে। কিন্তু প্রদোষ সরকার যেন এরই মধ্যে তাঁর অচল জীবনের সমাধি পেয়ে গিয়েছেন। হাত কাঁপে না, চোখ ছটফট করে না, নিঃশ্বাসের সঙ্গে কোন ব্যথা উসখুস করে না।

গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু এলেন; প্রদোষবাবুর উদাস চোখ দুটোর একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

গোষ্ঠবাবু—বেশি মন খারাপ করবেন না, প্রদোষদা।

হাবুলবাবু—এমন কিছু চিন্তা করবার ব্যাপার নয়। মানুষের জীবনে অসুখ বিসুখ তো থাকবেই।

চলে গেলেন গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু। [illegible] এসে ডাক দেয়। —কাকিমা একবার বাইরে আসবেন?

কাকিমা বাইরে আসেন—বল।

দিবাকর—কি ঠিক করলেন?

কাকিমা—কিছুই না।

দিবাকর—আত্রেয়ী কি বলে? দেখতে যেতে চায়?

কাকিমা—জানি না।

দিবাকর—কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি জেনে নেওয়া ভাল। যেতে হলে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াই উচিত।

প্রদোষবাবু বলেন—আর একটা চিঠি এসেছে, বিকেলের ডাকে।

কাকিমা—কার চিঠি?

প্রদোষবাবু—বীরনগর থেকে লিখেছে আত্রেয়ীর মামা কান্তি। হেমন্তর অবস্থা সুবিধের নয়। আত্রেয়ীকে এখন আর হেমন্তের সঙ্গে দেখা করিয়ে লাভ নেই। এমন দেখার কোন মানে হয় না। কপালে যা আছে, তাই হবে।

কেউ বুঝতে পারেনি, কখন ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে সবার পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী বলে—মামার চিঠিটা দাও।

প্রদোষবাবু বলেন—নাও।

চিঠি হাতে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায় আত্রেয়ী। দিবাকরও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়ে আর চলে যায়।

তাকিয়ে দেখবার মত কিংবা শোনবার মত এখানে আর কিছুই নেই।

কত রাত হলো কে জানে? আত্রেয়ীকে কয়েকবার খেতে সেধেছেন কাকিমা, কিন্তু কোন কথা বলেনি, খায়ওনি আত্রেয়ী। তবে কে আর খাবে?

ঘুমোবেই বা কে? কার চোখেই বা ঘুম আসবে? কাকিমা সারা রাত জেগে বসে শুধু শুনতে থাকেন; ঘরেতে টেবিলের আলোর কাছে মাথাটাকে পেতে দিয়ে একটা টুলের উপর বসে আছে আত্রেয়ী। থেকে থেকে ছটফট করছে। মাঝে মাঝে মাথা দুলিয়ে কপালটাকে টেবিলের উপর আস্তে আস্তে ঘসছে।

শেষ রাতে, যখন টেবিলের ল্যাম্পের কাঁচ ধোঁয়ার কালিতে কালো হয়ে গিয়েছে, তখন পাশের ঘর থেকে উঠে আসেন কাকিমা।

টেবিলেরই উপরে মাথা রেখে, ঘুমিয়ে পড়েছে আত্রেয়ী। কিন্তু একটা চিঠিও লিখে রেখেছে। "এ রকম দেখার কথা তো ছিল না। কথা ছিল তুমি এসে দেখা দেবে। তোমার পায়ে পড়ি, কথা রাখ তুমি। শিগগির সেরে ওঠো আর চলে এস। এই চিঠি পেয়েই জবাব দেবে। তোমাকে দেখতে যাব কি যাব না, তুমি নিজে লিখে জানাবে।"

কাকিমা ডাকেন—আত্রেয়ী, এবার শুয়ে পড় তো মা; নইলে তোর বাবা যে ঘুমোতে পারছেন না।

উঠে গিয়ে বিছানার উপর এলিয়ে পড়ে আত্রেয়ী।

শালবনের মাথা ছুঁয়ে সরিয়াডির ভোরের আলো যখন সবে মাত্র জেগেছে, তখন জেগে ওঠে আত্রেয়ী। ঘরে বসে থাকে না, বাইরের বারান্দাতে এসেও দাঁড়িয়ে থাকে না; এগিয়ে যেয়ে গেটের তিনকাঠের বেড়াটার কাছে একবার দাঁড়ায়; তার পরেই কাঁটালতার ঘেরানের আশে-পাশে শিশিরে ভেজা ঘাসের উপর ঘুরে বেড়ায়।

সরিয়াডির প্রাণটাও বোধহয় ভাল করে ঘুমোতে না পেরে রাত জেগেছে আর ছটফট করেছে, আর, ভোরের আলো দেখা দিতেই সবার আগে আত্রেয়ীকেই দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তা না হলে, আজ এত ভোরে প্রদোষ সরকারের বাড়ির সামনের এই সরু সড়ক দিয়ে এত লোকের আনা-গোনা শুরু হয়ে যাবে কেন?

চলে গেল নরেনের সাইকেল। সামন্ত-বাবু আর হাজরাবাবু একসঙ্গে হেঁটে হেঁটে চলে গেলেন। জয়ন্তবাবু গেটের কাছে একবার থমকে দাঁড়ালেন; আত্রেয়ীর সঙ্গে একটা কথাও বলে নিলেন। —আজ বেশ ঠাণ্ডা আছে আত্রেয়ী, খালি পায়ে ভেজা ঘাসের ওপর ওভাবে বেড়িয়ো না।

শ্রীপদবাবুও যেতে যেতে একবার থেমে নিলেন—প্রদোষদা এখনও ওঠেননি বোধহয়?

আত্রেয়ী বলে—না।

শ্রীপদবাবু—বাবাকে বলো, আমি এসে-ছিলাম।

বিমল আর মাধব এসেই একটা হাঁফ ছাড়ে।—আত্রেয়ীদি কি করছেন?

আত্রেয়ী—কিছু না। তোমরা এত সকালে কি করতে বের হয়েছ?

মাধব—কিছু না।

বিমল—আমরা দুজন রাত জেগে শুধু তাস খেলেছি; ঘুমোতে পারিনি।

আত্রেয়ী হাসে—তাসের পরীক্ষা আছে বোধহয়?

মাধব—পরীক্ষা কথাটা মুখে আনবেন না আত্রেয়ীদি; শুনলে বুক ঢিপ ঢিপ করে।

এত সকালে রাময়া আবার বাড়ির কোন্ কাজের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে?

রাময়ার হাতের জিনিসটা চোখে পড়তেই এগিয়ে আসে আত্রেয়ী। —চিঠিটা একবার দেখি।

হেমন্তের কাছে লেখা চিঠি ডাকে ফেলবার জন্য ব্যস্তভাবে চলে যাচ্ছে রাময়া। নিশ্চয় আত্রেয়ীর লেখা দুটো চিঠিই এই খামের ভিতরে আছে। খামের উপর কাকিমা নিজেই ঠিকানা লিখে দিয়েছেন।

—আঃ, এ কি করেছো রাময়া? হাতটা ভাল করে মুছে নাও।

আঁচল বুলিয়ে খামটাকে একটু মুছে দেয় আত্রেয়ী। সেঁতসেঁতে খামের উপরে লেখা নামটা সত্যিই যে বেশ চুপসে গিয়েছে!

—নাও, মাঝ রাস্তায় গল্প করতে বসে আবার দেরি করে ফেলো না রাময়া। সকাল ন'টার ডাকেই যেন চিঠি চলে যায়।

আত্রেয়ী নিজেই গেটের তিনকাঠের বেড়াটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। চলে যায় রাময়া।

সরিয়াডির প্রদোষ সরকারের মেয়ে আত্রেয়ী কি তবে বেশ শান্তটি হয়ে ওর অপেক্ষার শেষকৃত্য সেরে দিচ্ছে? এই চিঠিকেই কি শেষ চিঠি বলে মনে করেছে আত্রেয়ী? কিংবা পাঁচ বছর আগের পাওয়া একটি স্পর্শকে যত্ন করে প্রাপকের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিল?

চিনুর পিসিমা তো আগেই দেখে গিয়েছেন, আত্রেয়ী কত শান্তটি হয়ে আঘাত সহ্য করতে পারে। শুধু দু'হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ে ছিল আত্রেয়ী, কেঁদে ভাসায় নি, মেজেতে মাথা কুটে চিৎকারও করেনি। সন্তুর মা'ও এই সকালে এসে দেখে গেলেন, জানালার কাছে চুপ করে বসে উল বুনছে আত্রেয়ী।

কাকিমার কানের কাছে একটা কথা বেশ খুশির স্বরেই বলে চলে গেলেন সন্তুর মা। —এই ভাল। কান্নাকাটি করে আর লাভ কি?

হাবুলবাবু বললেন—এটা একরকম ভালই বলতে হবে, গোষ্ঠদা। আত্রেয়ীটা একটুও মুসড়ে পড়েনি।

গোষ্ঠবাবু—হ্যাঁ ভালই; এখন শেষ খবরটা ভাল হয়, তবেই সব চেয়ে ভাল হয়।

হাবুল বাবু—আমার কিন্তু ভরসা করতে সাহস হচ্ছে না, গোষ্ঠদা। আত্রেয়ীর স্বামী ছাড়া পাওয়ার আগেই চরম ছাড়া পেয়ে যাবে না তো?

গোষ্ঠদা—থাক্, এ কথা আর এখুনি তুলছেন কেন? দেখা যাক্ কি হয়? আত্রেয়ী যে শান্ত হয়ে গিয়েছে, এটাই একটা ভাল লক্ষণ।

আত্রেয়ী শান্ত হয়ে গিয়েছে, দেখতে পেয়ে সরিয়াডির প্রাণটাও শান্ত হয়ে গিয়েছে। সকলেই বলছেন, এই ভাল।

দিবাকর শুধু একটু গম্ভীর হয়ে বলে —শুনেছো শান্তি?

—কি?

—বিমল বলে গেল, আত্রেয়ী হেসে হেসে কথা বলেছে।

চমকে ওঠে শান্তি। কিন্তু তারপরেই আনমনার মত তাকিয়ে কথা বলে—হাসতে পারলে তো ভালই।

দিবাকর—আমিও তো বলছি, ভালই। কিন্তু......।

শান্তি—কি?

দিবাকর—আত্রেয়ী আর একটু কান্না-কাটি করলেই ভালো হতো না কি?

শান্তি—ছি, ওকথা বলতে নেই।

দিবাকর—না না, আমি বলতে চাই, একটু ভাল দেখাতো, এই মাত্র। মনের জোর থাকলে হাসবে না কেন?

মনের জোর আছে বইকি, তা না হলে অন্যদিনের মত আজও সকালে ঠিক সময়-মত আর নিয়মমত কিণ্ডারগার্টেন করে আসতে পারতো না আত্রেয়ী। সামন্তবাবুর মা পথে যেতে আত্রেয়ীকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছেন। ঠিক সেই আত্রেয়ীই তো চলে যাচ্ছে। সেই ঢিলে খোঁপাটি, গলায় সেই সোনার সুতলি চেনের সঙ্গে জোড়া-মুক্তোর লকেটটি। সিঁথিতে সেই গুঁড়ো সিঁদুরের সরু দাগ; ঘিয়ে রঙের সিল্কের শাড়ির সেই লাল-রঙা আঁচল। মেয়েটার মুখ দেখে কারও বুঝতে সাধ্যি হবে না যে, ওর ভাগ্যটাকে কাঁদিয়ে দেবার মত একটা খবর কাল বিকালেই এসেছে।

সামন্তবাবুর মা'র এই খুশির চোখের চাহনির সঙ্গে একটা করুণ বিস্ময়ের ছায়াও ছমছম করে। যেন ক্ষণমায়ার চোখ তুলে আত্রেয়ীর এই ঘিয়ে রঙের শাড়ির লাল-রঙা আঁচলটিকে তিনি শেষবারের মত দেখে নিচ্ছেন। কে জানে আর কতদিন? মেয়েটাকে এই মূর্তিতে আর কি কখনও দেখতে পাওয়া যাবে?

পটলবাবুর বাগানের একটা গাছের গোড়াতে এই সকালবেলাতেই কুড়ুলের কোপ পড়ছে, আর গাছটা থরথর করে কাঁপছে। পটলবাবু শক্ত করে গামছা পরে নিয়ে আর নিজেই কুড়ুল ধরে গাছটাকে কাটতে শুরু করেছেন। পটলবাবুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেন একটা শান্ত আক্রোশ হুম হুম শব্দ করে গাছটাকে কাটছে।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে মেহেদির বেড়ার মাথার উপর দিয়ে উঁকি দেয় বলাই। —এ কি? গাছটাকে কেটে ফেলছেন কেন পটলদা?

পটলবাবু—কেটে ফেলাই ভাল নয় কি? এটার কি আর কোন সার-বস্তু আছে?

বেলগাছটা শুকিয়ে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু নেড়া গাছের মাথায় এখনও কিছু সবুজ পাতা নড়বড় করছে। বলাই বলে—আরও কটা দিন অপেক্ষা করলেই পারতেন। মনে হচ্ছে, অন্তত আরও দু-একটা সাঁচেল বেল, ফল ধরতো।

পটলবাবু—তবে কি কোন ঠিক আছে রে ভাই? মগডালেও পিঁপড়ে ধরে গিয়েছে, ওটার আর কতদিন?

গাছের গোড়ায় আবার পটলবাবুর হাতের কুড়ুল ঝুপঝাপ শব্দ করে আছড়ে পড়তে থাকে।

মহাদেব পাঁড়ের পায়রার ঝাঁকও একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে আছে। কালীঘাট রোডের পাশের যে মাঠের উপর পায়রার ঝাঁক আজ সাত-আট বছর ধরে রোজই তিনবেলা আসে বসে আর হুটোপাটি করে, সে মাঠের উপরে একটা ডানা-ভাঙ্গা চিলকে এই সকালে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখেই ওরা একসঙ্গে পাখা ঝাপটে উড়ে পালিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আর কি এল? পর পর দশটা দিন পার হয়ে গেল, তবুও না। সিরিয়াডির আশাটা যেন আর অপেক্ষা করে কিছু বুঝতে চায় না, কিংবা একটু বুকে বেঁধবার জন্যে অপেক্ষা করতে চায় না।

আত্রেয়ীও দেখতে পায়, গেটের সামনের রাস্তার উপর দিয়ে ডাকপিয়ন হরিরাম চলে গেল। এবাড়ির কাঁটালতার ফুলের দিকে, বারান্দার দিকে, কিংবা গেটের তিনকাঠের বেড়াটার দিকে একবার চোখ তুলে একবারও না হরিরাম। আত্রেয়ীর জীবনের আশার বার্তাও যেন মহাদেব পাঁড়ের পায়রার মত হঠাৎ পাখা ঝাপটে উধাও হয়ে গিয়েছে।

কাকিমার চোখও দিনরাত সব সময়ই একটা দুঃস্বপ্নের ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পনর দিন পার হয়ে গেল, তবু আলিপুরের জেল থেকে কোন চিঠি এল না কেন? জেলরই বা আর কোন খবর দেয় না কেন?

পুরো একটি মাস পার হয়ে যাবার পর কাকিমার ভাবনার সব ক্লান্তি একটা দুঃসহ যন্ত্রণার কামড় খেয়ে একদিন ছটফট করতে থাকে। প্রদোষবাবুর কাছে এসে নিঃশ্বাসের শব্দটাকে জোর করে চেপে দিয়ে ফিসফিস করেন কাকিমা। —কোন খবরই তো এল না।

প্রদোষবাবু বলেন—এখনও কি তোমাদের মনে খবর জানবার ইচ্ছে আছে? খবরটাকে বুঝে নিতে কি কোন অসুবিধে আছে?

চোখ মুছে নিয়ে আর ভয়ে ভয়ে আত্রেয়ীর ঘরের ভিতরে উঁকি দিতে গিয়েই আয়নাটাকে দেখতে পেলেন কাকিমা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে আত্রেয়ী, আর, আয়নার আত্রেয়ীর চোখ দুটো কাকিমার উঁকি-দেওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে হাসছে। —কি খবর কাকিমা?

সরে গেলেন কাকিমা। হাসি তো নয়, মেয়েটার চোখে যেন একটা সাহারার আগুন জ্বলছে।

হাবুলবাবু একদিন বলেই ফেললেন, —এখনও যখন কোন খবর এল না, তখন কি খবর যে একদিন আসবে, সেটা কি বুঝতে পারছেন না গোষ্ঠদা?

গোষ্ঠবাবু—খুব বুঝছি।

• হাবুলবাবু—কিন্তু মেয়েটার জীবনটা এ কী রকমের একটা অভিশাপ হয়ে গেল; দুর্ভাগ্যেরও যেন কোন রকম নেই।

গোষ্ঠবাবু—আত্রেয়ীও বোধহয় বুঝেই ফেলেছে যে, আর কোন আশার খবর আশা করে লাভ নেই।

হাবুলবাবু—হ্যাঁ, দিবাকর বলছিল, আত্রেয়ী আর চিঠি লেখালিখি করে না।

গোষ্ঠবাবুর চোখ দুটো কাঁপতে থাকে। —কিন্তু খোঁড়ামানুষ প্রদোষদার মত আত্রেয়ীর ভাগ্যটাও কি চিরকাল অচল হয়ে পড়ে থাকবে? মাত্র তেইশ বছর বয়স মেয়েটার, ভাবতে গেলে আমার কেমন যেন লাগে। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

হাবুলবাবু হঠাৎ চমকে উঠে বলেন—একটু আস্তে কথা বলুন তো, গোষ্ঠদা। একটু শুনতে দিন, ঘরের ভিতরে ওঁরা যেন কী একটা কথা বলাবলি করছেন।

ঘরের ভিতরে কথা বলছেন গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী আর সন্তুর মা। গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী বলছেন—হ্যাঁ সন্তুর মা; সত্যিই একদিন বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম, আমার হাতে শাঁখা নেই। তখন তো ছাই খেয়ালই হয়নি যে, এ দুঃস্বপ্নটা বেচারী আত্রেয়ী মেয়েটারই অদৃষ্টের কথা বলছে।

সন্তুর মা—আজকাল তো বিধবারও বিয়ে হয়।

চমকে ওঠেন গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী—অ্যাঁ! তা তো হয়।......এখনি উঠছেন কেন?

সন্তুর মা—যাই এখন; অনেক কাজ ফেলে এসেছি। •

কথাটা হয়তো সন্তুর মা'র মুখ ফসকে বের হয়ে পড়েছে আজকাল বিধবারও তো বিয়ে হয়। কিন্তু হাবুলবাবুর কান যেন একটা দৈববাণীর আশ্বাসের ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন, তাই ওভাবে চমকে উঠেছেন।

সিরিয়াডির শালবনের হাওয়াটাও যেন এই কথাটাকে লুফে নিয়ে উড়ে বেড়াতে থাকে!

সামন্তবাবু আর হাজরাবাবু দুজনেই নয়াপাড়ার সড়কের মোড়ে তাঁদের ইঁটের গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন আর গল্প করেন। সন্তুর আর চিনুর সঙ্গে গল্প করে করে কিণ্ডারগার্টেন থেকে ফিরছে আত্রেয়ী।

—বাবা কেমন আছেন আত্রেয়ী? সামন্তবাবু জিজ্ঞেস করেন।

বেশ হাসিমুখেই উত্তর দেয় আত্রেয়ী—ভাল আছেন।

আত্রেয়ী চলে যেতেই সামন্তবাবু বলেন—আজকাল বিধবারও তো বিয়ে হয়?

হাজরাবাবু—তা হয়।

দিবাকরও বাড়ি ফিরে এসে ঝপাং করে সাইকেলটা বারান্দার রেলিংয়ের গায়ে ফেলে দিয়ে কথা বলে—শুনেছো, শান্তি?

—কি?
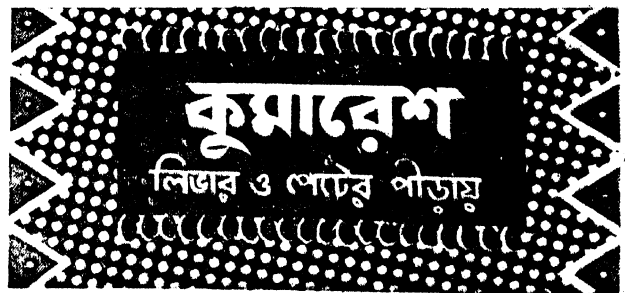
—সবাই বলছে, আজকাল বিধবারও বিয়ে হয়।

চমকে ওঠে শান্তি—তা হয়। কিন্তু......।

দিবাকর—কি?

শান্তি—না, কিছু না।

শ্রীলেখা কটেজের সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে গিয়ে গল্প করে নরেন আর বিমল। নরেন বলে—এমন কি পটলকাকাও বলছেন, আজকাল বিধবার বিয়ে হয়।

শ্রীলেখা কটেজের বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে বিমল কি-যেন ভাবতে থাকে। তারপর নিজের মনেই গুনগুন ক'রে কথা বলে—এ ভদ্রলোক আর আসবে বলে মনে হয় না।

অদ্ভুত স্বরের অদ্ভুত একটা কথা। বিমলের মুখ থেকে যেন একটা ভাবনার গুঞ্জন ফস্‌কে পড়েছে।

নরেন বলে—একটা কাজ করা যাক্ বিমল; কটেজের মালীকে জিজ্ঞাসা করি, সাহেব আবার কবে আসছেন?

শ্রীলেখা কটেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আর ডাক দিয়ে মালীকে জিজ্ঞেস করে নরেন। মালী বলে—না; কবে আসবেন তার কোন ঠিক নেই।

বিমল—একদিন তো আসবেন?

মালী বলে—কেমন করে বলি? হামি কুছ নেহি জানে।

কে জানে কেমন করে বিমলের মুখ থেকে ফসকে পড়া এই ভাবনার গুঞ্জনও সরিয়াডির বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। জয়ন্তবাবু একেবারে স্পষ্ট করে বলেই ফেলেন—ভদ্রলোক এখন একবার এলেই তো পারেন।

সন্ধ্যার দাবা খেলার আসরে নতুন পেট্রল ল্যাম্পের জ্বলন্ত ম্যান্টেলের তেজ বাড়িয়ে দিয়ে গোষ্ঠবাবুও বলেন—আমার আশা আছে, নিখিল আবার আসবেই।

হাবুলবাবু—না হয় এলই; কিন্তু তারপর?

হাবুলবাবু—তারপর আত্রেয়ীর সঙ্গে তো দেখাশোনা হবেই।

হাবুলবাবু—কিন্তু আত্রেয়ীর জন্যে কি নিখিলের মনে সেরকম কোন ইচ্ছে-টিচ্ছে আছে?

গোষ্ঠবাবু—আশা করছি, আছে।

হাবুলবাবু—থাকলেই ভাল।

চিনুর পিসিমা প্রায়ই আসছেন আর দেখে যাচ্ছেন, আত্রেয়ী আর একটুও উতলা নয়। বিকেল বেলাতেও দেখেছেন, আত্রেয়ী ঘুমিয়ে আছে, বুকের উপর একটা গল্পের বই পড়ে আছে।

মাঝের ঘরে বসে কাকিমার সঙ্গে কথা বলেন চিনুর পিসিমা। —একটা কথা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করছি সুহাস; কটেজের সেই ছেলেটির খবর কি?

চমকে ওঠেন কাকিমা।—সে তো কবেই চলে গিয়েছে।

—তা জানি; কিন্তু আবার কি আসবে?

—জানি না। চিনুর পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে কাকিমারও চোখ দুটো যেন একটা নতুন খবরের বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে কাঁপতে থাকে।

চলে যাবার সময় বাইরের বারান্দার সিঁড়িতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন চিনুর পিসিমা, আর, কাকিমাকে চমকে দিয়ে আবার একটা কথা বলেন—আজকাল তো বিধবার বিয়ে হয়, সুহাস।

দেখতে পেলেন চিনুর পিসিমা, কে জানে কখন্ জেগে উঠে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আত্রেয়ী। মেয়েটা তো তবে কথাটা শুনেই ফেলেছে। চিনুর পিসিমা ব্যস্তভাবে বলে—আমি চললুম, সুহাস।

জানালারই কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আত্রেয়ী। কিন্তু আত্রেয়ীর চোখের দৃষ্টিটাও অদ্ভুত। সরিয়াডির বিকেলের আকাশের আলোটা আত্রেয়ীর চোখের তারা দুটোকে কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। কাকিমা যে কাছে এসে বারবার ঘুর-ঘুর করে চলে গেলেন, কিছুই যেন দেখতে পেল না আত্রেয়ী। দূরের ট্রেনের একটা শব্দ শোনা যায়, কিন্তু শব্দটা যেন আত্রেয়ীর এই জাগা মনের চেতনার উপর দিয়ে একটা কথা বলে বলে চলে যাচ্ছে—আজকাল বিধবারও বিয়ে হয়। বুকের ভিতরের সব নিঃশ্বাসও যে অলস অবশ হয়ে একটা মূর্চ্ছার কোলে চলে পড়তে চাইছে।

বোম্বাই মেল রোজই অনেক লেট হয়ে শেষরাতের দিকে আসে আর চলে যায়। ঘুমন্ত সরিয়াডির চোখ রোজ ভোরে জেগে উঠেই হাওয়া বদলের কোন না কোন নতুন মানুষের মুখ দেখতে পায়। গোষ্ঠবাবু একদিন আক্ষেপ করেন।—সবই নতুন, কোন চেনা-মুখ আর আসছেই না দেখছি।

সেদিনই সন্ধ্যা হবার আগে দেখতে পেল নরেন, শ্রীলেখা কটেজের জানালা খোলা; খোলা জানালা দিয়ে বাইরের জবাকুঞ্জের গায়ে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সরিয়াডির সন্ধ্যার সব অন্ধকারও যেন হাজার জোনাকী হয়ে আর আলো চমকে দিয়ে তখনি দেখে নিল, নিখিল সেন এসেছে। শুনতে পেল দিবাকর, শুনলেন গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু। শুনলেন সন্তুর মা। সরিয়াডির একটা কামনার অপেক্ষা সাঙ্গ হলো। এখন আত্রেয়ী শুধু শুনতে পেলে হয়।

আত্রেয়ীরই বা শুনতে দেরি হবে কেন? রামুয়াই বলে দেয়, কটেজের ছোটবাবু এসেছেন।

কিন্তু নিখিল যে শুধু বাতজ্বালা আলোর কাছে বসে বই পড়ে। সকাল দুপুর আর বিকেল, কোন সময়েও কটেজের বাইরে সরিয়াডির কোন আলো ছায়ার দিকে উঁকি দিতেও চেষ্টা করে না। আত্রেয়ীকে ডাকাডাকি করে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য সেই শখের ভদ্রতাও যে আর ব্যস্ত হয়ে ওঠে না। কি ব্যাপার গোষ্ঠদা? হাবুলবাবু বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করেন। কিন্তু আত্রেয়ীই বা ভুল করছে কেন? নিখিলের সঙ্গে আত্রেয়ীর দেখা হওয়া আজ যে আত্রেয়ীর জীবনেরই গরজ হয়ে দেখা দিয়েছে। চুপ করে ঘরে বসে থাকলে চলবে কেন আত্রেয়ীর?

শালবনের মাথার উপর ঠিক সন্ধ্যা-বেলাতেই ঘন মেঘের টুকরোটা ফেটে গিয়ে ছন্নছাড়া হয়ে যেতেই একটা এক-ফালি চাঁদের আলো সারা সরিয়াডির বুকে ছড়িয়ে পড়ে একটা ঘোলাটে মায়া মাখিয়ে দিল।

কোথায় যেন যাচ্ছে আত্রেয়ী, গেট পার হয়ে রাস্তার উপর এসে দাঁড়িয়েছে। কাকিমা ব্যস্তভাবে ছুটে আসেন—এই ভর সন্ধ্যায় ঘরের বাইরে কোথায় চললি এখন?

আত্রেয়ী—বেড়াতে।

কাকিমা—কোথায়?

আত্রেয়ী—কটেজে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কাকিমা। কে যেন দু'হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে কাকিমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। যাবি না বলবার সাহস নেই। যাওয়া ভাল নয় বলবার শক্তি নেই।

রত্নাধামের গেট পার হয়ে নয়াপাড়ার সড়ক ধরে হেঁটে চলেছে আত্রেয়ী। শুধু সন্তুটা ওর মাউথ অর্গ্যানের রাজা-মামা গৎ বাজিয়ে কিছুদূর আত্রেয়ীর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে, তারপরেই শ্রীপদবাবুর খরগোসটাকে দেখতে পেয়ে ছুটে চলে গিয়েছে।

জানালার কাছ থেকে হঠাৎ সরে এসে গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী ফিস্‌ফিস্ বলেন। —দেখ দেখ, আত্রেয়ী কোথায় যেন যাচ্ছে।

গোষ্ঠবাবুও গলার স্বর চেপে কথা বলেন—যাক্ যাক্, যেতে দাও, ভালই হবে।

গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী—কিন্তু যাচ্ছে কোথায়?

—এমন কিছু অচেনা কারও কাছে যাচ্ছে না।

—যাক্ তবে। গোষ্ঠবাবুর স্ত্রী যেন একটা হাঁপ ছেড়ে কথা বলেন। —ভালয় ভালয় একটা গতি হয়ে যাক্।

দেখতে পায়নি শান্তি, কখন্ বাড়ি ফিরে এসেছে দিবাকর, আর এভাবে একেবারে ক্লান্ত হয়ে বাইরের ঘরে চুপ করে বসে আছে। দিবাকরের সাইকেলও আজ আর বারান্দার রেলিংয়ের গায়ে ঝপাং করে পড়ে কোন শব্দ করেনি। দিবাকরের সাইকেলের চাকাতে এত ধুলোও কোনদিন দেখেনি শান্তি।

শান্তি—কখন এলে?

দিবাকর—এখনি। আত্রেয়ীকে দেখলাম।

—কোথায়?

—শ্রীলেখা কটেজের দিকে চলে যাচ্ছে। তাই ও-রাস্তায় আর না এগিয়ে অনেক ঘুরে

ছোট সড়ক ধরেই পালিয়ে এলাম। ধুলোর ঠেলায় সাইকেল কি আর চলতে চায়?

দিবাকরের এই চেহারা যেন সরিয়াড়ির সব গর্বের নিদারুণ এক পরাভাবের ধুলোমাখা চেহারা। শান্তির চোখেও যেন একটা কাঁকরের কুচি খর্‌খর্‌ করে বিঁধছে, তাই ভাল করে তাকাতে পারছে না।

দিবাকর—ব্যাপারটা কি রকম হলো, শান্তি?

শান্তি—বড় তাড়াতাড়ি হলো।

দিবাকর—দেরি হলেই বা কি লাভ হতো?

শান্তি হাসতে চেষ্টা করে।—একটু ভাল দেখাতো।

হ্যাঁ, খুবই তাড়াতাড়ি ক'রে হেঁটেছে আত্রেয়ী; কটেজের গেটের কাছে পৌঁছেই থমকে দাঁড়ায় আর হাঁপাতে থাকে। কটেজের গেটের পাশে ওধার কুঞ্জটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে নিখিল। আত্রেয়ীকে দেখতে পেয়েই ডাক দেয়। —আসুন।

নিখিলের এই ডাক কোন চমকিত বিস্ময়ের ডাক নয়; যদিও আজ এই সন্ধ্যায় এভাবে শৈলেখা কটেজের এই নিভৃতে একা নিখিলের কাছে সরিয়াড়ির মেয়ে আত্রেয়ীর আবির্ভাব নিশ্চয়ই একটু বিস্মিত হবার মত ঘটনা। নিখিলের অনেক আমন্ত্রণ পেয়েও যে-মেয়ে এই কটেজে একা নিখিলের কাছে কোনদিনও আসেনি, সে মেয়েই তো আজ নিজে ইচ্ছে করে আর জ্যোৎস্নামাখা হয়ে নিখিল সেনের চোখের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

নিখিলের চোখের কত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আত্রেয়ী, সেটাও নিখিলের পক্ষে একটা নতুন বিস্ময়ের ঘটনা। এভাবে এমন সুন্দর একটি অকুণ্ঠা হয়ে কোনদিনও তো নিখিলের চোখের কাছে দাঁড়ায়নি সরিয়াড়ির মেয়ে এই আত্রেয়ী।

নিখিল বলে—সরিয়াড়িতে আসবার কোন কথা ছিল না। যাচ্ছিলাম আগ্রা; ট্রেনের কামরার জানালা দিয়ে আপনাদের সরিয়াড়ির শেষরাতের চেহারাটা চোখে পড়তেই ঠিক করে ফেললাম, নেমে পড়বো।

আত্রেয়ী—কবে এসেছেন?

নিখিল—সাতদিন হয়েছে বোধহয়।

আত্রেয়ী—কিন্তু একদিনও তো গেলেন না।

—কোথায়? আপনাদের বাড়িতে?

—হ্যাঁ।

—একদিন যেতাম ঠিকই। কবে আর আপনার খোঁজখবর না নিয়ে চলে গিয়েছি।

—আপনার দেরি দেখে আমি নিজেই এলাম।

নিখিল হাসে। —এসেছেন বইকি। আমি জানতাম, একদিন আসবেনই। বলুন, কেমন আছেন?

আত্রেয়ী—যেমন দেখছেন।

নিখিল—দেখছি তো, আরও সুন্দর হয়েছেন।

চমকে ওঠে না, সরে যায় না, মাথা হেঁট করে না, চোখ ফিরিয়েও নেয় না আত্রেয়ী। নিখিল সেনের এই প্রশস্তির ধ্বনির কাছে যেন একটি সুস্থির মুগ্ধতার ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে আত্রেয়ী।

নিখিল বলে—চলুন, বারান্দায় গিয়ে বসি।

নিখিলের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে, যেন নিখিলের ইচ্ছারই এক শান্ত সহচারী হয়ে বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায় আত্রেয়ী।

নিখিল বলে—বসুন।

বেতের চেয়ারটার উপরে বসে পড়ে আত্রেয়ী।

নিখিল বলে—কাল অনেক রাতে তিরাছি নদীর ঝর্ণার শব্দটা শুনতে পেয়েছিলাম। তখনই আপনার কথা মনে পড়ে গেল।......আচ্ছা, চলুন তো, বাগানের মাঝখানে বেগুনী লতার পিরামিডের কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

তখনি উঠে দাঁড়ায় আত্রেয়ী। নিখিলের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে বাগানের যত মরশুমী ফুলের কেয়ারির কিনারা ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। নিখিলের নিঃশ্বাসের বাতাসও যেন কোথাও স্বস্তি পাচ্ছে না; যেন আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে নতুন একটা গ্রহ-লোকের নিভৃতে গিয়ে দাঁড়াতে আর গল্প করতে চাইছে নিখিল।

বেগুনী লতার পিরামিড, ফুলের মঞ্জরী ঝুলে ঝুলে দুলছে। সে মঞ্জুরীর দিকে তাকিয়ে থাকলেও কি বুঝতে পারছে না আত্রেয়ী, নিখিল সেনের পাশে কত কাছাকাছি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? ঢিলে খোঁপাটা যে একটু হলেই নিখিলের কাঁধ ছুঁয়ে ফেলতে পারে; সামান্য হাওয়া লাগলে যে আত্রেয়ীর শাড়ির আঁচল ফুরফুর করে নিখিলের চোখে-মুখে লুটিয়ে পড়তে পারে।

নিখিল বলে—বেশ জায়গা।

নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী। কি যেন বলতে চায় আত্রেয়ী।

নিখিল বলে—কিছু বলছেন?

আত্রেয়ী—আপনি বলুন।

—আমি আবার আসবো।

—দু'দিনের জন্য?

—হ্যাঁ।

—আসবেন আর চলে যাবেন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কোন খবর পাচ্ছি না।

—কার খবর? হেমন্তবাবুর?

—হ্যাঁ। কঠিন অসুখের একটা খবর এল, তারপর আর কোন খবরই নেই।

—এ তো সত্যিই একটা অদ্ভুত কথা বলছেন; এর মানে কি?

—বুঝতে পারছি না।

—আমিও বুঝতে পারছি না। কিন্তু সত্যিই এমন যদি হয় যে......।

কথাটা হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে কি-যেন ভেবে নেয় নিখিল। তারপর যেন সত্যিই একটা নতুন গ্রহলোকের জীবনের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে দেয়—চিন্তা করবেন না। আপনাকে একেবারে একা হয়ে পড়ে থাকতে হবে না। আমি মাঝে মাঝে আসবো।

আত্রেয়ী—আমি এখন যাই।

নিখিল—আসুন। কিন্তু কাল আর আসবেন না। আমি কাল সকালের ট্রেনেই আগ্রা চলে যাব।

আত্রেয়ী—আবার কবে আসবেন?

নিখিল—মনে হচ্ছে মাস পাঁচ-ছয় পরে একবার আসতে পারবো।

আজ সকাল থেকে চন্দ্রবাবুর হাঁকডাক বেশ মাত্রাছাড়া রকমের একটা আহ্লাদের চিৎকার হয়ে সরিয়াডির সড়কে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে। —কি ব্যাপার? এর মানেটা কি?

মোষের শিঙের লাঠিটাও বড় বেশি দুলছে। এটাও যেন একটা ঠাটার লগুড়। অদ্ভুত এক মেজাজ নিয়ে হেঁটে চলেছেন চন্দ্রবাবু। রাস্তার পাশের ডাস্টবিনের গায়ে বেশ জোরে একটা লাঠির খোঁচা হেনে দিয়েই এগিয়ে যান; মাথা হেঁট করে হেলে পড়ে আছে যে ল্যাম্পপোস্ট, তারও গায়ে লাঠিটাকে একবার ঠুকে দিয়ে আবার চলতে শুরু করেন। —কি ব্যাপার হে দিবাকর? এত কড়া রোদ্দুরের মধ্যে হঠাৎ দু ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেল কেন?

উত্তর দেয় না দিবাকর। চুপ করে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আর মাথা ঝুঁকিয়ে একমনে সাইকেলটার ধুলো মুছতে থাকে।

আজ বোধহয় সব বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আর হাঁক দিয়ে সকলকেই উত্যক্ত করবেন চন্দ্রবাবু। ভাল সুযোগ পেয়েছেন চন্দ্রবাবু। আজ রবিবার, সকলেই বাড়িতে আছে।

চন্দ্রবাবুর গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েই খোলা জানালার একটা পাট আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিলেন গোষ্ঠবাবু। হাবুলবাবু গেটের কাছ থেকে সরে গিয়ে একেবারে বাড়ির পিছনে বেগুন ক্ষেতের কাছে ঘুরঘুর করতে থাকেন। চন্দ্রবাবুর এই হাঁকডাকের শব্দটা শুনতে একটুও ভাল লাগে না। সহ্য করতেও ইচ্ছে করে না।

—কি ব্যাপার জয়ন্ত? কাছারিপাড়ার নতুন কুঁয়োর জলে কেরোসিনের গন্ধ কেন?

চন্দ্রবাবুর কথার জবাব না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন জয়ন্তবাবু। আজ সামান্য একটা কথা বলতে গিয়ে কত বিশ্রী-ভাবে চেঁচিয়ে হাসছেন চন্দ্রবাবু।

রজনীধামের কাছে সড়কের উপরে সামন্তবাবুকে যেন পথরোধ করে থামিয়ে রাখলেন চন্দ্রবাবু। —তোমাদের এত লজ্জা কিসের, সামন্তবাবু?

সামন্তবাবু মিটমিট করে তাকিয়ে কথা বলেন—কিসের লজ্জাটা দেখলেন?

—এই যে, আমাকে দেখেই পাশের রাস্তায় সরে পড়বার চেষ্টা করছিলে।

—না না, সরে পড়বার চেষ্টা করবো কেন? বলতে বলতে চন্দ্রবাবুর পাশ কাটিয়ে ব্যস্তভাবে সরে পড়েন সামন্তবাবু।

কে জানে কোথা থেকে আর কেমন করে কি-কথা শুনেছেন চন্দ্রবাবু, যে জন্যে আজ সরিয়াডির মানুষগুলিকে এভাবে ঠাট্টা করে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যেন তিরছি নদীর পানি এইবার সরিয়াডির যত স্থায়িত্বের বড়াই ভাসিয়ে দেবার চমৎকার সুযোগ পেয়ে হাসছে। —ওরে, ও বলাই, একবার এদিকে এসে একটা কথা শুনে যা।

বাড়ির বারান্দার সিঁড়ি থেকে নেমে আসে বলাই; রাস্তায় এসে চন্দ্রবাবুর চোখের সামনে একেবারে শান্ত-নীরব একটি মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

চন্দ্রবাবু হে হে করে হাসতে থাকেন—তোরা নাকি সবাই নো-চেঞ্জার?

বলাই—জানি না।

চন্দ্রবাবু—বল না? বলতে লজ্জা করছিস কেন?

বলাই—আঃ, আপনি মিছিমিছি কেন কথা বাড়াচ্ছেন, চন্দরকাকা?

চন্দ্রবাবু—রাগ করলেও নিশ্চয় মনে মনে স্বীকার করছিস যে, এই চন্দরবুড়োই সব-চেয়ে চালাক।

বলাই—কিসের চালাক আপনি?

চন্দ্রবাবু—আমি থিয়েটার দেখি, তোরা থিয়েটার করিস। বুঝেছিস?

চন্দ্রবাবুর চোখ দুটো কি সত্যিই দেখতে পেয়েছে যে, এই সাতদিন পরে সরিয়াডির আত্মাটা ভিখিরীর মত হিসেব করছে?

চিনু শুধু বলেছিল—আত্রেয়ীদির বাতি হতে পারে, দাদু।

—কি বললি?

—পিসিমা বলছিলেন, কলকাতার নিখিল-বাবুর সঙ্গে আত্রেয়ীদির কথা হয়েছে।

চমকে উঠে, চোখ বড় করে আর চেঁচিয়ে হেসে উঠেছিলেন চন্দ্রবাবু।—তাই? তাহলে? তোদের আত্রেয়ীদির হাতের সেই চিঠিটা কোথায় উড়ে চলে গেল রে চিনু?

প্রদোষ সরকারের বাড়ির সামনের পথে এসেই চোখ ঘুরিয়ে একবার দেখে নিলেন, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আত্রেয়ী। কিন্তু রাস্তার উপর হাজরাবাবুকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রবাবু। —আর ধরাধরি করো না, ধরতে চেষ্টা করো না হাজরা। আর লজ্জা বাড়িও না। তোমাদের প্রদোষদার মেয়েকে একটু বুঝিয়ে দাও, সব খালি করে দিয়ে হালকা হয়ে যাওয়াই ভাল; আমি যেমনটি ভাল আছি।

রোদে ঘেমে উঠেছেন চন্দ্রবাবু। কিন্তু কোন হুঁস নেই। ক্লান্তিও নেই। কোন্ সকালে বের হয়েছেন, কিন্তু কিছু খেয়ে বের হয়েছেন কিনা সন্দেহ। আগে তবু একটু গুড় চিবিয়ে আর জল খেয়ে বের হতেন। কিন্তু সে অভ্যাসটাকেও বোধহয় ধরে রাখেননি। ঘরে চুরি হয়ে যাবার পর থেকে ঘরটাকে আরও শূন্য করে দিয়েছেন। ঘরের দরজাও খোলা রেখেই বের হয়ে পড়েন। একেবারে খালি হয়ে যাওয়া আর একলা পড়ে থাকা জীবনের গর্বটাকে আজ যেন রোদের তাপে আরও তাতিয়ে নিয়ে হনহন করে চলে যান চন্দ্রবাবু।

কিন্তু বাড়ির কাছে এসেই রাস্তার একটা নিমের ছায়াতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন চন্দ্র-বাবু। চমকে উঠেছে চন্দ্রবাবুর চোখ। কে ওরা?

চন্দ্রবাবুর দরজা-খোলা বাড়ির বারান্দাতে টিনের একটা তোরঙ্গ, তার উপর কাপড়ের একটা পুঁটলি। সাদা থান-পরা এক নারীর মূর্তি দরজার কাছে মেজের উপর চুপ করে বসে আছে; মাথার কাপড় টেনে নামিয়ে দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছে। আর, লাল শালুর জামা পরানো একটা শিশু হামা দিয়ে মেজের এদিকে-ওদিকে ঘুরঘুর করে যেন খুশি বিড়াল ছানার মত খেলছে।

এগিয়ে এসে বারান্দায় উঠলেন চন্দ্র-বাবু। বাচ্চাটা চন্দ্রবাবুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলতেই দেখতে পেলেন চন্দ্রবাবু, বাচ্চাটার দাঁত নেই।

—এটা কে রে? দাঁত নেই কেন রে? কোত্থেকে এল রে এটা? একটা অদ্ভুত চিৎকার চন্দ্রবাবুর বুকের ভিতর থেকে ফেটে বের হতে গিয়ে যেন তাঁর শুকনো শরীরের সব পাঁজর নাড়িয়ে দিয়েছে।

হাজরাবাবু, এই পথ দিয়ে হাঁটছিলেন বলেই সবার আগে তিনিই চন্দ্রবাবুর এই চিৎকারের শব্দ শুনতে পেলেন; সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন—কি হয়েছে চন্দ্রদা?

কাঁপছেন চন্দ্রবাবু। —দেখ তো ভাই হাজরা, এরা কারা এখানে বসে আছে।

বিধবা তরুণী শুধু মৃদুস্বরে আর ফুঁপিয়ে কি যেন বলছে। হাজরাবাবু কাছে এগিয়ে এসে, মাথা ঝুঁকিয়ে আর কান পেতে শুনতে চেষ্টা করেন।

চমকে চেঁচিয়ে ওঠেন হাজরাবাবু। —চন্দ্রদা! আপনার ছেলের বউ আর নাতি। কলকাতা থেকে এসেছে।

চন্দ্রবাবুর হাতের মোষের শিঙের লাঠিটা হাত থেকে আলগা হয়ে পড়ে যায়। দু'চোখ বন্ধ করে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন চন্দ্রবাবু। বুকটা শুধু অদ্ভুতভাবে ধুঁকতে থাকে।

বিধবা তরুণী উঠে এসে চন্দ্রবাবুর ধুলো-মাখা পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। সেই সঙ্গে যেন একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আস্তে আস্তে কথা বলে—তিন মাস হলো আপনার ছেলে চলে গিয়েছে। এখন আপনি যদি ঠাঁই না দেন তবে আপনিই বলে দিন, কোথায় যাব?

যে ছেলের নামটাও মনে পড়ে না; যে-ছেলে চল্লিশ বছর আগের একটা গল্পের ছেলে মাত্র, তারই বিধবা বউ আর ছেলে চন্দ্রবাবুর জীবনের খালি ঘরের ভিতরে

উঁকি দিয়েছে। চল্লিশ বছর পরে আবার রূপসীন উঠলো; কিন্তু এ কী চমৎকার হেঁয়ালির থিয়েটার! দাঁত নেই সেই বাচ্চাটা হামা দিয়ে ঘুরছে আর হাসছে।

বাচ্চাটা তরতর করে হামা দিয়ে এগিয়ে আসে আর চন্দ্রবাবুর হাঁটু ধরে উঠে দাঁড়ায়।

হাজরাবাবু ডাকেন—চন্দরদা।

চন্দ্রবাবু—বল।

হাজরাবাবুর—নাতি যে কোলে উঠতে চাইছে।

কেঁদে ফেললেন চন্দ্রবাবু: বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন—এটার নামটা কি গো বউমা?

—ভুলু।

—তোমার নামটা কি?

—পারুল।

—ঘরের ভেতরে যাও।

তোরঙ্গ আর পুঁটলিটাকে হাতে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায় চন্দ্রবাবুর পুত্রবধূ পারুল।

চন্দ্রবাবু—একটা কথা ছিল, হাজরা।

হাজরাবাবু—বলুন।

বাচ্চাটা চন্দ্রবাবুর কোল থেকে নেমে পড়বার জন্যে উসখুস করছে। বাচ্চাটাকে তাই বেশ একটু শক্ত করে আঁকড়ে ধরে চন্দ্রবাবু।—আত্রেয়ীকে একটা কথা বলে দিও; পাগলা জেঠামশাইয়ের বাজে কথার কোন মানে হয় না। যেন কিছু মনে না করে।

একে একে অনেকেই আসছেন। চন্দ্রবাবুর খালিঘরের দরজার কাছে একটা বিস্ময়ের আবির্ভাবের খবর এরই মধ্যে অনেকেই শুনতে পেয়ে গেছে নিশ্চয়। ছুটে এসেছে চিনু; তারপরেই এলেন চিনুর পিসিমা। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সন্তুর মাও ব্যস্ত-ভাবে আসছেন, আগে আগে সন্তু। সবারই মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রবাবু অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন। যেন চন্দ্রবাবুর জীবনের যত শূন্যতার বড়াই এভাবে জব্দ হয়ে বেশ খুশির হাসিই হাসছে।

হাজরাবাবু হেসে ফেলেন—আমি এখন যাই, চন্দরদা।

দুপুর থেকে বিকেল, তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত সরিয়াডিও যেন হাসতে থাকে। বড় জব্দ হয়ে গিয়েছেন চন্দ্রবাবু। ভালই হলো। চন্দরদা আর হাঁকডাক করে সরিয়াডির যত ঘর-সংসারকে ঠাট্টা করে বেড়াতে পারবেন না। গোষ্ঠবাবু হাসেন—এবার আর বোধহয় মোষের শিঙের লাঠি দুলিয়ে রোজ ভোরে বেড়াতে বের হবেন না চন্দরদা।

হাবুলবাবু হাসেন—কি করবেন তা হলে? ঘরে বসে ঘুমপাড়ানী গান গাইবেন?

দিবাকর হাসে—নাতির দুধের জন্যে ঘটি হাতে নিয়ে বের হবেন।

আত্রেয়ীও শুনতে পেয়ে হেসে ফেলেছে—জেঠামশাইকে আপনি তখুনি বলে দিলে ভাল করতেন, হাজরাকাকা। আমি একটুও রাগ করিনি।

রাত্রি আটটা কুড়ির এক্সপ্রেসে বলাইয়ের এক সন্ন্যাসী মামাকে তুলে দিয়ে বাড়ি ফেরবার পথে হাসতে থাকে বলাই আর নরেন।

বলাই—মামা তো সন্ন্যেসী, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন আশ্রমে টিকতে পারলেন না।

নরেন—তাহলে কি এখন হিমালয়ের গুহা-টুহাতে......।

বলাই—আরে দেৎ, সন্ন্যেসী মামা এখন গয়াতে লক্ষ্মী মাসিমার বাড়িতে চললেন।

নরেন—তারপর?

বলাই—তারপর নাকি পুরীতে গিয়ে বীরেন কাকার বাড়িতে কিছুদিন থাকবেন। তারপর কলকাতাতে পুঁটিদির বাড়িতে।

বলাই আর নরেন একসঙ্গে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক চেপে সাই-কেলের স্পীড থামিয়ে দেয়। দু'জনেরই চোখে পড়েছে, চকের বাজারে জানকীলালের মুদিখানার গোঞ্চর উপর চুপ করে বসে আছেন চন্দ্রবাবু।

নরেন মুখ টিপে হাসে আর ডাক দেয়—এখানে কি করছেন চন্দরকাকা?

চন্দ্রবাবু—জানকীলালের এখানে কাঁচামুগ নেই।

বলাই হাসে—ভবানীর দোকানে পাবেন।

চলে গেল বলাই আর নরেন। দু'জনেরই সাইকেলের ঘণ্টির শব্দ টুং-টাং করে খুশির হাসি বাজিয়ে কালীবাড়ি রোডের অন্ধকারও পার হয়ে যায়। কিন্তু প্রদোষ সরকারের বাড়ির কাছে এসেই দু'জনেই একসঙ্গে চমকে ওঠে। সাইকেলের ঘণ্টি হাত দিয়ে চেপে ধরে শব্দের ঝংকারকে একেবারে বোবা করে দেয়। ব্রেক দাবিয়ে সাইকেল থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে বলাই আর নরেন, দুটি শঙ্কিত মূর্তি। নরেনের গলার স্বর কেঁপে ওঠে। —আত্রেয়ীদি কাঁদছে কেন?

প্রদোষ সরকারের সব বাড়ির ঘরেই আলো শুধু একটি ঘরের বন্ধ জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ যেন গলে গলে ঝরে পড়ছে।

বলাই বলে—এ তো বেশ সাংঘাতিক কান্না বলে মনে হচ্ছে। ভয়ানক খবরটা এসে গেছে বোধহয়।

নরেন বলে—দিবাকরদাকে এখুনি খবর দিন বলাইদা।

শুধু দিবাকর নয়, অনেকেই, প্রায় সকলেই শুনতে পেল, আত্রেয়ী কাঁদছে। পাঁচ বছর আগে একবার, আর এই একবার; আত্রেয়ীর কান্নার শব্দ সরিয়াডির বাতাসে দু'বার ঝরে পড়লো। সেবার ছিল হেমন্তর কয়েদের খবর, আর এবার হলো হেমন্তর চরম ছাড়া পাওয়ার খবর।

দিবাকরের বাড়ির গেটের কাছে রাস্তার উপর ছোট একটা ভিড়। হাবুলবাবু বলেন—চলুন, একবার একটু দেখা দিয়ে চলে আসি, গোষ্ঠদা।

জয়ন্তবাবু বলেন—আপনারা যান, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

দিবাকর বলে—আমার যেতে ইচ্ছে করছে না, শান্তি। এখন আর আমার যাওয়ার কোন মানে হয় না। এখন তুমি একবার......।

চোখ মুছে নিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে শান্তি। —না। অসম্ভব। আমি পারবো না, আমি পারি না। কারও শাঁখা ভাঙবার নিয়ম আমি জানি না।

মুখ ফিরিয়ে, মাথা হেঁট করে আর একে-বারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে শান্তি।

কে জানে কার উপর রাগ করে দিবাকরও চেঁচিয়ে ওঠে। —না, আমিও যাব না।

ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দার উপরে শুধু ছটফট করে ঘুরে বেড়ায় দিবাকর। বিনা দোষে মার খেয়ে একটা ভাগ্য লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে, এ দৃশ্য দেখে দিবাকরের অবুঝ আত্মাটা শুধু নিজের রাগের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলবে। দেখে দরকার কি?

কিন্তু এ কি? আধ ঘণ্টাও তো পার হয় নি; দিবাকরের বাড়ির গেট খুলে ছায়ার মত এত চেহারা, যেন চোরের মত চুপি-চুপি কোন শব্দ না করে এগিয়ে আসছে কেন? আবার এখানে এসে ভিড় করবার কি দরকার?

এসেছেন গোষ্ঠবাবু আর হাবুলবাবু। তাঁদের পিছনে জয়ন্তবাবু। হাজরাবাবুও হাজির হলেন। বলাই আর নরেনও এসে পড়ে।

সত্যিই যে চোরের মত চাপা-গলায় ফিস-ফিস করে কথা বলেন গোষ্ঠবাবু। আবার ঢোক গিলে যেন একটা লজ্জার অস্বস্তি গিলে ফেলতে চাইছেন। —এবার শান্তিকে সঙ্গে নিয়ে তুমিই একবার যাও, দিবাকর।

দিবাকর—কেন?

হাবুলবাবু মিনমিন করে কথা বলেন—কথাটা হলো......তার মানে......কোন খবর-টবর নয়, আত্রেয়ীর স্বামী হেমন্ত নিজেই এসেছে।

সামন্তবাবু—বেশ ছেলে হেমন্ত, কত শান্ত হয়ে বাইরের ঘরে একা বসে আছে

আর হাসছে। কিন্তু আত্রেয়ী এ কী কাণ্ড শুরু করেছে? আত্রেয়ীর এখন এত কান্নাকাটি করা যে খুবই বিশ্রী একটা অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে, নয় কি?

গোষ্ঠবাবু—কথাটা হলো, আত্রেয়ী এরকম কান্নাকাটি করলে ওর স্বামী কিছু একটা মনে করে ফেলতে পারে তো!

জয়ন্তবাবু—বউমাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি একবার যাও, দিবাকর। এখন তোমরা ছাড়া......।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে শান্তি। যেন একটা উতলা উৎসাহের মূর্তি। মাথার কাপড় টানতেও ভুলে গিয়েছে শান্তি। এতক্ষণে যেন কাজের মত একটা কাজের ডাক শুনতে পেয়ে সরিয়াডির শান্তি বউদির প্রাণে আবার একটা দুর্বার মতলবের জোর হঠাৎ-ঝড়ের হাওয়ার মত জেগে উঠেছে।

দিবাকরের দিকে শান্তি বলে—তুমি বাড়িতে থাকো। আমিই যাচ্ছি।

দেখে খুশি হয় শান্তি, প্রদোষ সরকারের এই বাড়ির সব ঘরের আলো আজ একটু উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। দরজা খোলা, জানালা খোলা। বাইরের বাতাসের ব্যাকুলতাও তাই অবাধে ঘরের ভিতরে ঢুকেছে। যত অচলতার ভার শুকনো পাতার স্তূপের মত সে বাতাসেরই একটা আবেগের আঘাত পেয়ে নড়ে সরে আর গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে অনেক কাজ করে ফেলেছেন কাকিমা। হেমন্তবাবুর খাওয়া হয়ে গিয়েছে, আত্রেয়ীর ঘরটা বেশ গোছানো ও পরিচ্ছন্ন। আত্রেয়ীর ঘরের বড় খাটে নতুন করে একটা বড় বিছানাও পাতা হয়ে গিয়েছে। সেই বিছানার উপর চুপ করে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন এক ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকের কপালের একপাশে একটা পুরনো আঘাতের দাগ। কিন্তু কপাল জুড়ে একটা টানা মসৃণতা, কোথাও একটুও খাঁজ-ভাঁজ নেই। ঘন কালো চোখের পাতা-গুলিও বেশ ভারি-ভারি। কঠিন অসুখে ভোগা শরীরটাকেও তো বেশ শক্ত-পোক্ত বলে মনে হয় কিন্তু মুখের ছাঁদের মধ্যে যেন একটা ছেলেমানুষী দুরন্তপনা লুকিয়ে আছে।

ঘরের দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে হেমন্তের মুখটাকে যেন একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয় শান্তি। আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, দাঙ্গা-ফৌজদারীর হল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই মানুষেরই ওই শান্ত কালো চোখ থেকে আগুন ছুটে বের হয় কেমন করে? রাধাপুরের সাংঘাতিক সাত-আনির এ কেমন অসাংঘাতিক চেহারা! ওই চোখ দেখে আত্রেয়ীর তো ভয় পাওয়ার মত কিছুই নেই।

কিন্তু আত্রেয়ীর কান্নার শব্দ এখনও থামেনি। মনে হচ্ছে, কান্নাটা এখন ভিতরের বারান্দার এক কোণে বসে গুনগুন করছে।

এগিয়ে যেয়ে, আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে, আর আত্রেয়ীর একটা হাত শক্ত করে ধরে নিয়েই বুঝতে পারে শান্তি, এই কান্নার সঙ্গে লড়াই করা যেমন-তেমন ব্যাপার নয়।

সুখের কান্না, ভয়ের কান্না, কিংবা রাগের কান্না হলে এখনই থামিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু আত্রেয়ী যেন ওর বুকের ভিতরে একটা সাধের খেলাঘরের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে। মাঝে মাঝে দীপ জ্বেলে হেসে ওঠে সেই ক্ষণকালের খেলাঘর; তারই দরজা বন্ধ করে দেবার জন্য চিরকালের অনুমতি নিয়ে একজন দাবির মানুষ এসে গিয়েছে।

শান্তি বলে—এরকম একটা ঘটা করে কাঁদবার কি মানে হয়, আত্রেয়ী?

চমকে ওঠে আত্রেয়ী; শান্তি বউদির মুখের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর ভেজা চোখ দুটোও আশ্চর্য হয়ে যায়। শান্তি বউদির চোখে এমন ভ্রূকুটি কোনদিন দেখেনি আত্রেয়ী, এধরনের তীব্র শ্লেষের আঘাত দিয়ে কোনদিনও কথা বলেনি শান্তি বউদি।

আত্রেয়ীর কান্নার চাপা-গুঞ্জন বন্ধ হয়ে যায়। শান্তি বলে—কাঁদতে হলে এরকম একটা শোকের সোর না তুলেও চুপ করে কাঁদতে পারতে। কান্নাটাকে হেমন্তবাবুর কানে শুনিয়ে দেবার দরকার ছিল না।

আত্রেয়ী—তুমি মিথ্যে আমাকে সন্দেহ করো না, বউদি।

শান্তি—না করে উপায় কি? হেমন্ত-বাবু আসাতে তুমি যে খুশি হওনি, সে-কথাটাই তুমি তোমার এই বিশ্রী কান্না কেঁদে হেমন্তবাবুকে জানিয়ে দিলে।

আত্রেয়ীর চোখ দুটো হঠাৎ যেন একটা জ্বালার ছোঁয়া লেগে শুকনো হয়ে যায়।
—খুশি হবার সাধ্য আমার নেই।

শান্তি—তাহলে আর বলছো কেন, আমি মিথ্যে সন্দেহ করছি?

আত্রেয়ী—বেশ তো, আর বলবো না।

শান্তি—আমিও তোমাকে বলবো না যে, খুশি হও।

আবার আশ্চর্য হয়ে শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী—তবে তুমি আর কী বলতে চাও?

—আমি বলছি, তুমি যা নিয়ে খুশি হয়ে আছ, তাই নিয়ে খুশি হয়ে থাক। হেমন্ত-বাবুর সঙ্গে অন্তত একটু ভদ্রতা কর।

—কি করতে হবে?

—হেমন্তবাবুর কাছে গিয়ে কথা বল।

—অসম্ভব।

—কি বললে?

—যদি বলি তবে কাল সকালে বলবো।

—এখন বলতে কি অসুবিধে আছে?

—আমি ওঘরে যেতে পারবো না।

—কেন?

—ভয় করে।

—চিঠি দিতে তো ভয় করেনি।

—চিঠি এখনও আমি দিতে পারি।

—এ ভদ্রলোক তোমার কাছে তাহলে শুধু চিঠির মানুষ? আর কিছু নয়?

উত্তর দেয় না আত্রেয়ী। যেন ইচ্ছে করে বধির হয়ে গিয়ে শান্তি বউদির এই কঠিন প্রশ্নের রূঢ় বিদ্রূপটাকে তুচ্ছ করতে আর অবিচল অনিচ্ছার একটি পাথর হয়ে বসে থাকতে চায় আত্রেয়ী।

শান্তি—বেশ তো চিঠির মানুষের সঙ্গেই না হয় মিথ্যে করে দু-একটা কথা বললে!

আত্রেয়ী—ওঘরে যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

শান্তি—না হয় মিথ্যে করেই একবার গেলে।

আত্রেয়ী—থিয়েটার করতে বলছো?

শান্তি—হ্যাঁ। সবাই তো থিয়েটার করে; তুমিও কিছু কম করনি। তবে আজও এখন একটু থিয়েটারই না হয় করলে।

আত্রেয়ীর হাত ধরে টান দেয় শান্তি—ওঠো আত্রেয়ী। শুধু একটু মুখের ভদ্রতা রক্ষা করতে হবে, এই মাত্র। সবই তো বুঝি, তবু বলছি, একবার যাও। দু-একটা ভদ্রতার কথা হেসে হেসে বলতে হবে। এটুকুও করতে পারবে না কেন? নিশ্চয় পারবে।

উঠে দাঁড়ায় আত্রেয়ী। শান্তির গলার স্বর আরও নিবিড় হয়ে আরও একটা সান্ত্বনা দিয়ে আত্রেয়ীকে আরও নির্ভয় করে দেয়। —বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করা হবে না; তোমার যখনই ইচ্ছে হবে চলে আসতে পারবে।

হেমন্তর ঘরের দরজার একটা কপাট ফাঁক করে আত্রেয়ীর কাঁপন্ত মূর্তিটাকে ভিতরে ঠেলে দিয়েই কপাট ভেজিয়ে দেয় শান্তি।

শান্তির দুচোখে এইবার অদ্ভুত একটা হাসি বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে চমকে ওঠে। এটাও নিশ্চয় একটা সফল মতলবের হাসি। কিন্তু একটা কঠোর তৃপ্তির হাসিও বটে। বেশ তো, এখন শুধু এই রাতটুকু একটা মিথ্যেরই ঘরে বন্দিনী হয়ে পড়ে থাকুক আত্রেয়ী।

শান্তি বলে—বেশ রাত হয়েছে, কাকিমা, আমি এবার যাই। রামলালকে ডেকে দিন, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসুক।

খবরের কাগজটাকে বিছানার উপরে রেখে দিয়ে আত্রেয়ীর দিকে তাকায় হেমন্ত। দরজার ভেজানো কপাটের কাছে দেয়ালটাকে এক হাতে ছুঁয়ে আর মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আত্রেয়ী।

হেমন্তের চোখ দুটো যেন পাঁচ বছরের যত উপোষী আশার চোখ; একটা নতুন বিস্ময়ে ভরে গিয়ে দেখছে আর শান্ত হয়ে হাসছে, সেই বাসর-ঘরের বাতিটাই বুঝি

আবার নতুন করে জ্বলে উঠেছে। সেদিনও তো ঠিক এইরকমই একটি লাজুক রঙীন ছবি মুখ ফিরিয়ে ঠিক এইরকমই একটি ভীরু ভীরু ভঙ্গী নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

কিছুই তো বদলে গিয়েছে বলে মনে হয় না। আত্রেয়ীর হাতের আঙুলে সেই আংটিটাই তো আছে; সোনার চৌখুপীর মধ্যে একটা লালমণি। হ্যাঁ, সেই ঢিলে খোঁপাটা একটু বেশি ভারি আর সেই ভুরু দুটো একটু বেশি কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা তো বদলে যাওয়া নয়। সেই ছবিরই রং আরও নিবিড় হয়েছে, ভরে গিয়েছে। গলার খাঁজটা আরও গভীর হয়ে গিয়েছে। হয়ে যাবেই তো; পাঁচটা বছর তো কম সময় নয়।

হেমন্ত ডাকে—এস।

কিন্তু এগিয়ে যায় না, চোখ তুলে তাকায়ও না আত্রেয়ী। দরজার পাশের দেয়ালের গায়ে হাত রেখে আর মাথা ঝুঁকিয়ে অনড় পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

হেমন্ত হাসে—একবার তাকিয়ে দেখ, আমি সত্যিই তোমার চেনামানুষ, না অন্য কেউ?

চোখ না তুলেই কথা বলে আত্রেয়ী। —আপনি এতদিন কোন খবর দেননি কেন?

হেমন্তের চোখের শান্ত হাসির সব আশার উপর কে যেন ছাই ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু জবাব দিতে একটুও দেরি করে না হেমন্ত। —আপনি এতদিন খবর নেননি কেন?

চমকে ওঠে আত্রেয়ী। কোন মেঘের ছায়ার ভাষা নয়; বেশ একটা কড়া রোদের ঝাঁঝ কথা বলছে। চোখ তুলে হেমন্তের মুখের দিকে তাকায়। আত্রেয়ীরও চোখ দুটো যেন দুটো শুকনো রুক্ষ চাপা-ভ্রুকুটির চোখ।

চোখে পড়েছে আত্রেয়ীর; ভদ্রলোকের কপালের পাশের সেই পুরনো আঘাতের দাগটা; ওটা নাকি ডাকাতের লাঠির দাগ। মনে হচ্ছে, সাত-আনির দুর্দান্ত মেজাজ নিয়ে শিউরে উঠেছে দাগটা।

আত্রেয়ী—আমার যতটা সাধ্য খবর দিয়েছি।

হেমন্ত—আমিও আমার যতটা সাধ্য খবর নিয়েছি।

আত্রেয়ী—আমার আর কিছু বলবার নেই।

হেমন্ত—আমারও আর কিছু বলবার থাকতে পারে না।

আত্রেয়ী—আপনি এত বিরক্ত হয়ে কথা বলছেন কেন?

হেমন্ত—আপনিই বা এত বিরক্ত হয়ে জবাব দিচ্ছেন কেন?

আত্রেয়ী—আমি এখন যাই।

হেমন্ত—হ্যাঁ, আমিও যাচ্ছি।

আত্রেয়ীর চোখের চাহনির সব রুক্ষতা আরও রূঢ় হয়ে কেঁপে ওঠে—কোথায় যাবেন?

হেমন্ত হাসে—আপনার পিছু পিছু যাব না। সোজা স্টেশনেই যাব।

আত্রেয়ী—তাহলে কাকিমাকে ডেকে দিই; কাকিমাকে বলে যান।

হেমন্ত—কোন দরকার নেই। আপনাকে বলে যাচ্ছি, এই যথেষ্ট।

বিছানা থেকে নেমে পড়ে হেমন্ত। টেবিল থেকে হাত-ঘড়িটা তুলে নিয়ে হাতে পরতে থাকে। আলনা থেকে কামিজটাকে তুলে নিয়ে কাঁধের উপর রাখে।

একেবারে নতুন কোন দৃশ্য নয়। আত্রেয়ীর চোখ দুটো এবার বেশ অপলক হয়ে যেন পাঁচ বছর আগেরই একটা ঘটনার ছবি দেখতে থাকে। ঠিক এভাবেই কাঁধের উপর একটা কামিজ ফেলে দিয়ে আর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল একটি মানুষ। এই বিছানাটারই মত মিথ্যে হয়ে গিয়ে একটা ফুলশয্যা তখন সে-ঘরের ভিতরেও পড়ে ছিল।

আত্রেয়ী বলে—এটা, কিন্তু একটুও ভাল দেখাচ্ছে না।

হেমন্ত—খারাপই বা কি দেখাচ্ছে, তা তো বুঝতে পারছি না।

—খুব খারাপ দেখাচ্ছে।

—হতে পারে।

জুতো পায়ে দিয়ে ফেলেছে, হেমন্ত। এইবার বাইরের বারান্দায় যাবার দরজাটার দিকে এগিয়ে যায়।

আত্রেয়ী—বাক্সটা পড়ে রইল।

হেমন্ত—পড়ে থাকুক; ওটা এবাড়ির চাকরের বকসিস।

—যাবেন না।

—হুকুম করবেন না।

এগিয়ে যেয়ে আর হাত তুলে বন্ধ দরজাটাকে চেপে ধরে আত্রেয়ী—হুকুম করছি না। একটু বুঝতে বলছি।

হেমন্ত—কি বোঝবার আর বাকি আছে?

আত্রেয়ী—আমি তোমাকে চলে যেতে বলিনি।

হেমন্ত—তা বলনি; কিন্তু তুমিই বা চলে যেতে চাইলে কেন?

—ভয় করছিল।

—কিসের ভয়?

—তুমি বুঝবে না।

—তুমি বুঝেছো তো?

—না; বুঝতে পারলে তোমাকে বলেই দিতাম।

—বুঝে কাজ নেই, বলেও কাজ নেই।

—কিন্তু এখনও তো আমার কথাটার জবাব দিতে পারলে না।

—কি কথা?

—চিঠি দিলে না কেন? আমার চিঠি কি পাওনি?

—পেয়েছি।

—তবে? উত্তর দাওনি কেন?

—ইচ্ছে করেই দিইনি।

—এমন ইচ্ছের মানে কি?

—আমার অসুখের খবর পেয়েও আমাকে একটা চিঠি দিতে যার দুমাস সময় লাগে, তাকে আরও চিঠি দিয়ে বিরক্ত করবার কোন মানে হয় না।

—কিন্তু এসেই তো বেশ বিরক্ত করতে পারছো?

—তুমি বিরক্ত হচ্ছো; আমি তোমাকে বিরক্ত করিনি।

—যেখানে একটা চিঠি দেবারও ইচ্ছে হলো না, সেখানে নিজেই হঠাৎ চলে এলে কেন?

—হ্যাঁ, ইচ্ছে ছিল হঠাৎ এসেই দেখে নেব, জেনে নেব আর বুঝে নেব; দুমাসের মধ্যেও একটি চিঠি দেওয়া কেন তোমার সাধ্য হয়নি।

—কি দেখলে, কি জানলে, কি বুঝলে?

—আমাকে চিঠি দেবার ইচ্ছে ছিল না বলেই চিঠি দেওয়া তোমার সাধ্য হয়নি।

—একটা মিথ্যে সন্দেহ।

—হতে পারে। কিন্তু তুমি তো বলে দিলেই পার, কেন চিঠি দিতে পারনি?

—জানি না।

—আরও দু'একটা চিঠি দিয়ে জানতে চেষ্টা করলে না কেন যে, লোকটা বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে?

—মনে হয়নি।

—এ কেমন মন?

—তুমি বুঝবে না।

আত্রেয়ীর মাথাটা কেঁপে উঠেছে, রুক্ষ চোখের চাহনিটা এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। বেশ হাঁপাচ্ছেও আত্রেয়ী। এমন কঠোর একটা জিজ্ঞাসা কোনদিন এসে আত্রেয়ীর আত্মাটারই কাছে কৈফিয়ত তলব করে বসবে, এটা যে কল্পনাও করতে পারেনি সরিয়াডির মেয়ে এই আত্রেয়ী। তাই প্রস্তুতও ছিল না; তাই জবাব দিতে গিয়ে সব নিঃশ্বাসের শক্তি যেন শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

হেসে ওঠে হেমন্ত। —না, আর বলবার কিছু নেই। এরকম চমৎকার কথা বলে মুখ বন্ধ করে দিলে আর কি-ই বা বলা যায়?

আত্রেয়ী—আরও কিছু বলবার থাকে তো, বলে নিতে পার।

হেমন্ত—তাহলে বল; আমি আসতেই তুমি এত কাঁদলে কেন?

গম্ভীর মুখের প্রশ্ন নয়; বেশ শান্ত-শীতল হাসিমুখের প্রশ্ন। কিন্তু আত্রেয়ী যেন একটা নিরুত্তর স্তব্ধতা। কথা বলতেই পারছে না। আত্রেয়ীর প্রাণটা বোধ হয় একটা অন্ধকার হাতড়ে তন্ন তন্ন করে এমন একটা কথা খুঁজছে, যে কথা বলে দিলে বেশ স্পষ্ট করে বলা হয়েই যায় যে, ভুল করেছি; কিন্তু ভুল করবার কোন ইচ্ছে ছিল না।

হেমন্ত—তোমার যা ইচ্ছে হয় বলে যাও, আমি কিছুই মনে করবো না।

আত্রেয়ী—কান্না এসে গেল। ইচ্ছে করে আর চেষ্টা করে তো কাঁদিনি।

হেমন্ত—বাস্, এর পর আর কোন কথা থাকতেই পারে না। হেমন্তের কণ্ঠস্বর যেন খুশির স্বরে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে থাকে।

একটু আশ্চর্য হলেও আত্রেয়ীর শান্ত মনের এক কোণে ছোট্ট একটা সন্দেহ শির-শির করে। রাধাপুরের সাত-আনির মেজাজ এতক্ষণে যেন বিদ্রোহী মহালের এক প্রজার জেরা শেষ করে সেই খুশিতে হেসে উঠেছে। এ-ছাড়া এমন হাসির আর কোন মানে নেই। মায়ার মানুষের হাসি ওভাবে গুমরে ওঠে না।

চোখ তুলে হেমন্তর মুখের দিকে তাকায় আত্রেয়ী। দুটো অপলক কৌতূহলের শক্ত ঠাণ্ডা চোখ। যেন চরম জানা জেনে নিতে চায় আত্রেয়ী, কোথায় গেল পাঁচ বছরের আগের চেনা সেই মানুষটির চোখ আর মুখ?

আত্রেয়ী—ঠাট্টা করলে বোধহয়?

হেমন্ত—না।

আত্রেয়ী—আমাকে শুধু তুচ্ছ করতেই এসেছো?

হেমন্ত—না।

আত্রেয়ী—ঘেন্না করতে, অপমান করতে?

হেমন্ত—না। বুকে জড়িয়ে ধরতে।

বাঃ, এ তো বেশ অদ্ভুত কথা। বলা নেই কওয়া নেই, কোন জানান না দিয়ে রাধাপুরের দীঘির কিনারার মাঠে সেই উৎসবের আতসবাজির শব্দটা হঠাৎ বেজে উঠেছে; নীল-লাল রঙীন আলোর চমক জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে লুটিয়ে পড়তে চাইছে।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে কথা বলে হেমন্ত:—শুধু সামান্য একটা কথা বলে ফেললাম, তোমার ভয় করবার কিছু নেই। কিছু মনেও করো না।

আত্রেয়ী—কি বললে? বুঝতে পারছি না। ভাল করে শুনতে পাইনি।

হেমন্ত—অনেক রাত হয়েছে; তুমি এবার ভেতরে যাও।

আত্রেয়ী—তুমি?

হেমন্ত—আমি এখন যাব না; কাল সকালেই যাব।

দুঃসহ এক অপমানের জ্বালা আত্রেয়ীর গলার স্বর যেন পুড়িয়ে দিয়ে জ্বলতে থাকে।—তোমার কিসের এত রাগ? কি পাপ করেছি আমি?

হেমন্ত—তুমি যত খুশি আলাপ কর, আমার রাগ করবার কোন দরকার নেই। কিন্তু......

আত্রেয়ী—কি?

হেমন্ত হঠাৎ উদাস অন্যমনার মত যেন একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে কথা বলে—আমি তোমাকে এসো বলে কাছে ডাকলাম, আর তুমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলে?

এত সামান্য একটা কারণে এত বেশি রাগ! হেমন্তের গলার স্বরে স্পষ্ট যে একটা নাবালক ছেলেমানুষের অভিমান কথা বলছে। হেমন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখতে থাকে আত্রেয়ী, আর নিঃশ্বাসের মধ্যেও কেমন-যেন একটা স্বস্তি-ছাড়া যন্ত্রণা ছটফট করতে থাকে। চিনতে এত দেরি হলো কেন?

কাঁধের কামিজটাকে আলনার উপর ফেলে দিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে হেমন্ত। তারপর, খোলা জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের একগাদা তারার ঝিকিমিকির দিকে তাকিয়ে আবার আনমনার মত কথা বলে—আমি তো আশা করেছিলাম, আমাকে দেখা মাত্র তুমি......।

আত্রেয়ী—কি?

হেমন্ত—আশা করেছিলাম, তুমি ছুটে এসে আমার কাছে দাঁড়াবে আর হাসবে।

কে জানে কেমন করে আর কিসের জোরে এমন আশাকে স্বপ্নের গভীরে পুষে রেখেছিল হেমন্ত? জানতে ইচ্ছা করে আত্রেয়ীর; কিন্তু সব কৌতূহল যেন কাঁটায় ভরা একটা

লজ্জার ভয় হয়ে আত্রেয়ীর মুখ চেপে ধরে রেখেছে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে টেবিলের আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ী।

কিন্তু হেমন্ত যেন পাঁচ বছর ধরে বুকের ভিতরে জমা করে রাখা যত না-বলা কথা এক নিঃশ্বাসে বলে দিয়ে হাল্কা হতে চাইছে। —জেলের ঘরে কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে আমার মনে হতো না। মোটা লাল চালের ভাত আর বুড়ো মুলোর ঘাঁট; মোটা কাপড়ের জাঙিয়া আর খসখসে কম্বল; ওসব গ্রাহ্যই করিনি। কিন্তু তোমার চিঠি সময় মত না পেলে দিনরাত্রি সব সময় ভয়ানক কষ্ট হতো।

আত্রেয়ীর চোখ-মুখ হঠাৎ শিউরে ওঠে, সেই সঙ্গে মুখের প্রশ্নটাও।—কেন? কি সন্দেহ করেছিলে তুমি?

হেমন্ত—চিঠির দেরি হলেই সন্দেহ হতো, তুমি বুঝি মরে গিয়েছ। তার ওপর, মাঝে মাঝে স্বপ্নও দেখে ফেলতাম, তুমি নেই। জেগে উঠেই কি মনে হতো জান?

—কি?

—মনে হতো, মেয়াদটা যাবজ্জীবন কালাপানি হয়ে গেলেই ভাল হতো।

—আমিও একবার সন্দেহ করেছিলাম, তুমি বুঝি আর নেই। কিন্তু আমি তবু কাঁদিনি। বলতে বলতে মাথা হেঁট করে ফেলে, আর কেঁদে ফেলে আত্রেয়ী।

হেমন্ত বলে—অসুখের সময় আমিও মনে মনে বলতাম, যদি আমার কিছু হয়েও যায়, তবু আত্রেয়ী যেন না কাঁদে।

হেমন্তের চেয়ারের কাছে এগিয়ে এসে চেয়ারের কাঁধের উপর হাত রাখে আত্রেয়ী—ক্ষমা কর। কিছু মনে করো না। আমার খুবই ভুল হয়েছিল।

—ভুল? তুমি আবার কি ভুল করবে? কিসের ভুল?

এবার আর চেয়ারের কাঁধের উপরে নয়, পাঁচ বছর আগের চেনা আর পাঁচ বছর ধরে অদেখা মানুষটারই কাঁধের উপর হাত রাখে আত্রেয়ী।—মনের ভুল।

আত্রেয়ীর হাত ধরে হেসে ফেলে হেমন্ত। —প্রাণের ভুল নয় তো?

আত্রেয়ী—না।

হেমন্ত—তাহলে এবার আমার দিকে ভাল করে তাকাও।

আত্রেয়ী হাসে—তাকিয়েছি।

হেমন্ত—চিনতে পেরেছ?

আত্রেয়ী—নিশ্চয়। ওই তো সেই কালো চোখ।

হেমন্ত—আমি তো অনেক আগেই দেখতে পেয়েছি......।

ছটফট করে ওঠে আত্রেয়ী।—থামো বলছি। ছাড়ো বলছি।

ভিতরের দিকের দরজার ভেজানো কপাটের দিকে চোখ তুলে শঙ্কিতের মত তাকিয়ে বিড়বিড় করে আত্রেয়ী।—শান্তি বউদিকে বিশ্বাস নেই।

হেমন্ত—তার মানে?

আত্রেয়ী মুখে হাত দিয়ে আর চমকে চমকে হাসে।—শান্তি বউদি প্রতিজ্ঞা করেছে, উঁকি দিয়ে দেখবেই।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হেমন্ত বলে —রাত দুটো। এখন তোমার শান্তি বউদি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন।

আত্রেয়ী যে হেমন্তের একেবারে বুকের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে; তাই হেমন্তর মুখটাকে ভাল করে দেখতে গিয়ে চোখ দুটোকে ভাল করে তুলে ধরে তাকাতে হয়। এত ব্যাকুলভাবে তাকাতে গিয়ে মাথাটাকে পিছনে হেলিয়ে দিতে হয়। তাই ঢিলে খোঁপাটা হেলে পড়ে ভেঙেই যায়। আর মুখটাও ভাসতে থাকে।

ঘরে আলো জ্বলছে; টেবিলের আয়নাটারও উপর কোন ঢাকা নেই। হেমন্ত আর আত্রেয়ী, দুজনে এখন এই আয়নার দিকে তাকালেই দেখতে পেত, পাঁচ বছরের দুটো অপেক্ষার পিপাসা দুজনের মুখ কত রঙীন করে দিয়ে কতরকমের ছোঁয়ার স্বাদ আর তৃপ্তি নিয়ে কত লুটোপুটি করতে পারে।

হাঁপাচ্ছে আত্রেয়ী: চোখ বুজে আছে, কিন্তু চোখের কোণে জল।

হেমন্ত—এ কি?

আত্রেয়ী—জিজ্ঞেস করছো কেন? মুছে দিলেই তো পার।

হাত দিয়ে আত্রেয়ীর চোখ মুছে দিয়েই হেমন্ত বলে—নাঃ, তুমি যেন এখনো বিশ্বাস করতে পারছো না যে, আমি তোমার কাছে এসে গিয়েছি।

আত্রেয়ী—বিশ্বাস করতে পেরেছি বলেই তো বলতে পারছি। শুধু আজ নয়; যত দিন বেঁচে থাকবো, ততদিন এই কথা বলবো।

হেমন্ত হাসে—আমার বুঝি ওই এক কাজ; তোমার চোখ মুছতে হবে।

আত্রেয়ী হেসে ফেলে—হ্যাঁ, চিরকাল তোমাকে জ্বালাবো। পাঁচটা বছর ফাঁকি দিয়েছ, কিন্তু আর নয়, সাবধান।

হেমন্ত—এসো, জানলাটার কাছে দাঁড়াই। একটু ভোরের বাতাস গায়ে লাগাই।

চমকে ওঠে আত্রেয়ী—ভোর?

হেমন্ত—হ্যাঁ মশাই, ভোর হয়ে এসেছে। আত্রেয়ীর চোখের কাছে ঘড়িটাকে তুলে ধরে হেমন্ত।

সরিয়াডির শালবনের হাওয়ার সঙ্গে তিরাছ নদীর ঝর্ণার শব্দও ভেসে আসছে। খোলা জানলার কাছে হেমন্তের পাশে দাঁড়িয়ে রাধাপুরের গল্প শুনতে থাকে আত্রেয়ী। মেয়াদ দুমাস মাপ হয়েছিল, তাই ছাড়া পেয়ে এতদিন রাধাপুরেই ছিল হেমন্ত। দীঘির দক্ষিণে নারকেল বাগানের পাশে নতুন একটা দোলমঞ্চ তৈরী হচ্ছে। খুড়িমা আত্রেয়ীকে দেখবার জন্যে ছটফট করছেন। যেন এক মাসের বেশি দেরি না করে হেমন্ত। ন-আনির খগেন কাকা একদিন নেমন্তন্ন করে পিঠে-পায়েস খাইয়েছেন আর আত্রেয়ীর জন্যে একটা ঢাকাই শাড়িও আশীর্বাদী পাঠিয়েছেন। কিন্তু খালপারের পাটজমির মালিকানা দাবি করে একটা মামলাও এরই মধ্যে দায়ের করে দিয়েছেন। হাসতে থাকে হেমন্ত।

আত্রেয়ী—মাত্র এক মাস নয়, আরও কিছুদিন এখানে থাক। তারপর তো......।

হেমন্ত—তারপর কি?

আত্রেয়ী—তারপর তো তোমার কাছেই সারাজীবন আছি।

হেমন্ত হাসে—মাঝে মাঝে একটু......।

আত্রেয়ী—না, কখখনো না। আমি আর একা থাকতেই পারবো না।

হেমন্তের একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আত্রেয়ী। ডাউন বোম্বাই মেল আজ ঠিক সময়েই হুইসিল বাজিয়ে চলে গেল। শালবনের মাথা ছাড়িয়ে আকাশের একটা আভাও জেগে উঠছে।

হেমন্ত ডাকে—আত্রেয়ী?

আত্রেয়ী—কি?

হেমন্ত—রাস্তা দিয়ে লোক চলতে শুরু করেছে।

—সে কি? চমকে ওঠে আত্রেয়ী, তার পরেই হেসে ফেলে।—তাহলে এখন তুমি কিছুক্ষণ একা বসে থাকো; নয়তো শুয়ে
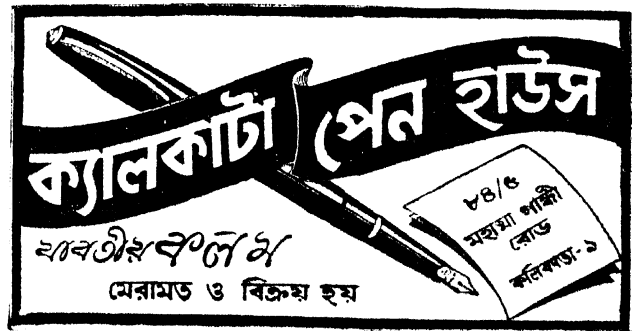
পড়তেও পার। আমি তোমার চা নিয়ে আসছি।

ছোট শহর সরিয়াডির গরীব মিউনিসিপালিটির ফন্ডের কিছু জোর বেড়েছে নিশ্চয়। দু'বছর আগের এক ভোরের একটা হঠাৎ-ঝড়ের আঘাতে মাথা হেঁট করে হেলে পড়েছিল যে দুটো ল্যাম্পপোস্ট, তারা এখন সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নয়াপাড়ার সড়কের উপরে নতুন মেটালও ঢালা হয়েছে।

কে জানে কোন্ দিকে বেড়িয়ে আসবার জন্যে নয়াপাড়ার নতুন মেটাল-ঢালা সড়ক ধরে হেঁটে চলেছে হেমন্ত আর আত্রেয়ী।

খোলা জানালার একপাশে সরে গিয়ে আর হাত তুলে আত্রেয়ীকে কি-যেন ইসারা করে শান্তি। হাসছে শান্তি, কিন্তু সেই সঙ্গে যেন একটা মিছে ভ্রূকুটি তুলে আত্রেয়ীকে একটু শাসিয়ে দিতেও চাইছে। নিজেরই মাথার কাপড়টাকে টেনে দিয়ে আত্রেয়ীকে বুঝিয়ে দেয় শান্তি—মাথায় কাপড় দাও।

সড়কেরই উপরে হেমন্তের পাশে দাঁড়িয়ে একেবারে মুক্তকণ্ঠে কথা বলে আত্রেয়ী—এটা রাধাপুর নয়; বউদি। এটা সরিয়াডি।

হেমন্ত—অ্যাঁ? কি হলো?

আত্রেয়ী—শান্তি বউদি চিমটি কাটছে।

হেমন্ত—কোথায় শান্তি বউদি?

আত্রেয়ী—ওই যে, জানালার কাছে......না আর নেই, পালিয়েছে।

বিকেলে বেড়াতে বের হয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সরিয়াডির সন্ধ্যা ঘন হয়ে যায়, তবু দেখতে পায় আত্রেয়ী আর হেমন্ত, দূরের পাহাড়ের মাথায় তখনো মরা বিকেলের শেষ আলোর ছোঁয়াটা লেগে আছে। আজকাল সরিয়াডির রাতগুলি যেন কুয়াশামাখা স্বপ্নালুতা; আর দিনগুলি ঝকঝকে উজ্জ্বলতার ছবি। শেষ রাতে কাছারি-পাড়ার সেগুন গাছের গা জড়িয়ে যে-টুকু কুয়াশা থাকে, সে-টুকুও ভোর হতে হতেই গলে গিয়ে ঘাসের শিশির হয়ে যায়।

এবছরে সরিয়াডির মঙ্গলবারের বাজারের এত বড় ময়দানেও নতুন ফুলকপির ঠাঁই আর ধরে না; বাজার ছাড়িয়ে নতুন ফুলকপির লাইন নয়াপাড়ার সড়কের দু'পাশ ধরে প্রায় রঞ্জনীধামের কাছাকাছি চলে যায়। হাওয়ানগর সরিয়াডির হাওয়াও বড় শান্ত। ধুলোর ঘূর্ণি নেই, আচমকা ঝড়ের হুল্লোড়ও নেই। মেঘও নেই। পিকনিকের মানুষে তিরহি নদীর পাশে খোলামেলা ডাঙ্গার এদিকে-সেদিকে আসর জমিয়ে হাসে আর গল্প করে। রান্নার ডেকচি আনতে ভুলে গেলেও চিন্তা করে না; টিনের কানেস্তারাতে খিচুড়ি চড়িয়ে দিয়ে ওরা গান গায়।

সরিয়াডির যত আলো ছায়া আর শব্দের জীবনেও আর কোন উদ্বেগ নেই। দিবাকরের কাঠের গোলাতে করাতের শব্দ সেই পুরনো ছন্দেই বাজতে থাকে। শ্রীপদবাবু ছিপ হাতে নিয়ে ছোট ঝিলের কিনারায় একেবারে সুস্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন। ফাতনার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে চোখ ঢুলু-ঢুলু করে, তবু সুস্থির। কাছারি-পাড়াতে রেকর্ডঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়েন হাবুলবাবু। চিনুর পিসিমার কাঁচা বড়ি একবেলার রোদে শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। সরিয়াডির জীবনে কোন সমস্যাই নেই।

কিন্তু চন্দ্রবাবুর চোখ দুটো এখনও আশ্চর্য হবার অভ্যেস ছেড়ে দিতে পারেনি। তাই মাঝে মাঝে পথে বের হয়ে পড়েন আর ব্যস্তভাবে হাঁকডাক করেন। —কী ব্যাপার গোষ্ঠবাবু? কদিন হলো ঠিক নৈঋত দিক থেকে একটা ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে কেন?

আত্রেয়ী শুধু মাঝে মাঝে হেমন্তকে একটা কথা বলতে গিয়ে একটু বেশি ছটফট করে ওঠে।—তুমিও যে চেঞ্জারদের মত অস্থিরতা শুরু করে দিলে। এত যাব-যাব করছো কেন?

হেমন্ত বলে—এক মাসের জায়গায় পাঁচ মাস হয়ে গেল। সরিয়াডির কোন বাড়িতে চেঞ্জাররা থাকার আর বাকিও নেই। লোকে যে এবার ঘরজামাই বলে সন্দেহ করতে শুরু করে দেবে?

আত্রেয়ী—করুক।

হেমন্ত—খুড়িমা কী ভাবতে পারেন সেটা বুঝে দেখেছো?

আত্রেয়ী—কি ভাবতে পারেন?

হেমন্ত—নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন, হেমন্ত এখন আর সে হেমন্ত নেই।

আত্রেয়ী—না, খুড়িমা এমন একটা বাজে কথা ভাবতেই পারেন না। মা'র কাছে চিঠিতে খুড়িমা তোমাকে আরও কিছুদিন থেকে আর শরীর আরও ভাল করে সারিয়ে নিতে বলেছেন।

হেমন্ত—তোমার মতে, শরীর আরও ভাল করে সারতে আর কতদিন লাগবে? আরও এক বছর?

আত্রেয়ী হাসে—না; ধর এই আর-একটা মাস।

হেমন্ত—বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে, আত্রেয়ী। আমার অনেক কাজও তো আছে।

আত্রেয়ীর গলার স্বরে যেন একটা কোমল অনুরোধের ভাষা গলে পড়ে।—না, আর তোমাকে দেরি করিয়ে দেব না; শুধু আর একটা মাস।

হেমন্ত—আর একটা মাসই বা কেন?

আত্রেয়ী—সন্তুর পৈতেটা হয়ে যাক্।

একদিন শান্তি, সরিয়াডির বিখ্যাত শান্তি বউদি নিজেই এসে আত্রেয়ীর কানের কাছে খুব আস্তে একটা কথা বলে দিয়ে চলে গেল—ধানোয়ার রোডের আমগাছে বোল ধরেছে, আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—তাতে কি হয়েছে?

শান্তি—এবার একদিন ধানোয়ার রোডে বেড়াতে যাও আর গায়ে চিনি জমিয়ে হেমন্তবাবুর পাশে কিছুক্ষণ বসো। তবে তো বুঝতে পারবেন ভদ্রলোক, সরিয়াডির কেমন জিনিসটিকে তিনি পেয়েছেন।

আত্রেয়ী—এতদিন পরে কি-আর এমন নতুন কথাটি বলছো, বউদি। সেটা তো ভদ্রলোক কবেই বুঝে ফেলেছেন।

শান্তি—বেশ ভাল করে বুঝেছেন তো?

আত্রেয়ী—হুঁ।

সন্ধ্যে হতেই সরিয়াডির শালবনের মাথায় এক-ফালি চাঁদ আলো ছড়ায়। ধানোয়ার রোডের আমের বোলের গন্ধ নিয়ে বাতাসও থমথম করে। একবার বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করে বইকি। আজ তো আত্রেয়ীর জীবনের কোথাও একটুও শূন্যতা কোন ফাঁক ধরে রাখেনি।

নালার কালভার্টের কাছে, সড়কের পাশে ঢালুর ঘাসের উপর বসে হেমন্তের সঙ্গে গল্প করে আত্রেয়ী। নালার জলের পানকৌড়ির গল্প, শান্তি বউদির যত মতলবের গল্প, কিন্ডারগার্টেনের গল্প, চন্দর জ্যেঠামশাইয়ের যত হাঁকডাকের গল্প। আত্রেয়ীর পাঁচ বছরের একা জীবনটা একেবারে একলা হয়ে পড়ে থাকতে পারেনি, অনেক গল্পের সঙ্গে মেলামেশা করে আর হেসে-খেলে পার করে দিয়েছে।

সড়কের মানুষের চোখ চেষ্টা করলেও কিছু দেখতে পাবে না, কারণ ফালি-চাঁদের আলোটা খুবই ফিকে, তাই এক হাত দিয়ে আত্রেয়ীর গলা জড়িয়ে ধরে গল্প শুনতে হেমন্তেরও কোন অসুবিধে নেই।

আত্রেয়ী বলে—শুধু তিনটি বছর, কিছুই ভাল লাগতো না। তোমার ওপর রাগ করে নয়, নিজেরই ভাগ্যটার ওপর রাগ করে একেবারে ঘরে বন্ধ হয়ে দিন-রাত পার করে দিয়েছি। তারপর হঠাৎ একদিন......।

হেমন্ত—বল।

আত্রেয়ী—শ্রীলেখা কটেজ নামে সুন্দর একটা বাড়ি আছে, কালীবাড়ি রোডের শেষে ছোট রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাওয়া যায়; তুমি দেখেছো?

হেমন্ত—না।

আত্রেয়ী—ওই কটেজে এসেছিলেন কলকাতার প্রীতি বউদি আর মঞ্জু, আমারই সমানবয়সী একটি মেয়ে, আর মঞ্জুর বড়দা অখিলবাবু। ওরা সবাই খুব ভাল লোক। হ্যাঁ, কিন্তু সবচেয়ে ভাল নিখিলবাবু।

হেমন্ত—কে নিখিলবাবু?

আত্রেয়ী—মঞ্জুর মেজদা।

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
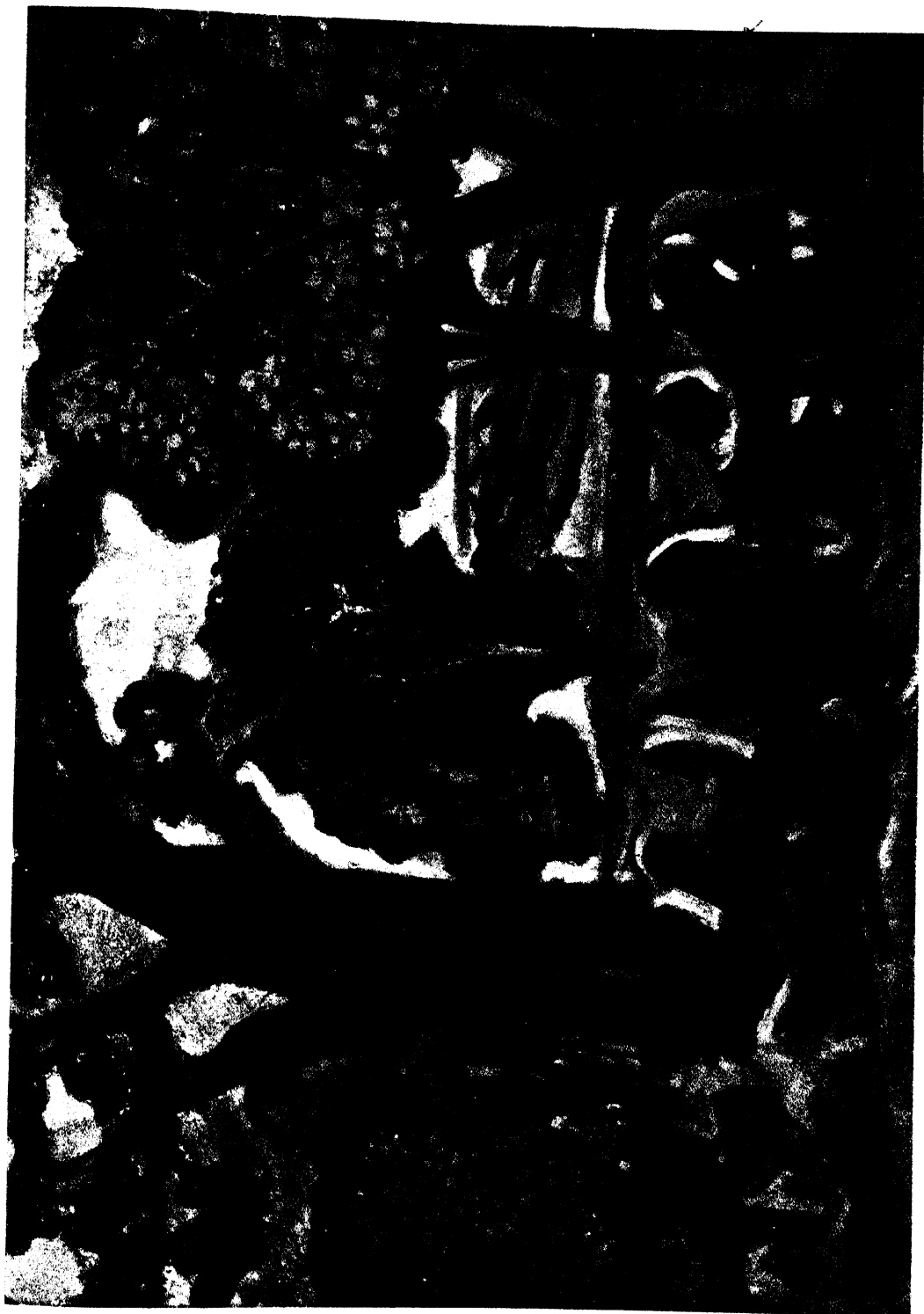
হেমন্ত—বুঝলাম। কিন্তু নিখিলবাবু সবচেয়ে ভাল হলেন কেন?

আত্রেয়ী—যদি আবার কখনও আসেন আর তোমার সঙ্গে আলাপ হয়, তবে তুমিও বুঝতে পারবে, এরকম মহৎ মানুষ খুব কমই হয়।

হেমন্ত—তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ। নিজেই এসে কতবার আমাকে ডেকেছেন আর বেড়াতে নিয়ে গেছেন।

হেমন্ত হাসে—এই জন্যেই মহৎ? আমিও তো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছি; কিন্তু আমি কি একটা মহৎ লোক?

আত্রেয়ী হেসে ফেলে—তুমি মহৎ হবে কেন?

হেমন্ত—কি বললে?

আত্রেয়ী—তুমি একরকমের মানুষ; নিখিলবাবু ভিন্নরকমের মানুষ। একেবারে আশ্চর্য মানুষ।

হেমন্তর একটা হাত, যে হাতটা আত্রেয়ীর গলা জড়িয়ে ধরে রয়েছে, সেই হাতেরই উপর একটা জোনাকী বসে দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছে। হাত নামিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরায় হেমন্ত।

আত্রেয়ী—ভদ্রলোক খুব বিদ্বান মানুষ। দিন-রাত সব সময় গাদা-গাদা বই নিয়ে বসে থাকেন। ভুলেও কারও সঙ্গে অভদ্রতা করতে পারেন না। দুদিনের চেনা মানুষকে কত মায়া করে কথা বলতে পারেন।

আত্রেয়ীর বুকের ভিতর থেকে যেন একটা আনমনা আবেগের ঢেউ শ্রদ্ধাময় প্রশস্তির কল্লোল হয়ে উথলে পড়ছে। হেমন্ত বলে—সত্যি, এরকম মানুষ হয় না।

আত্রেয়ী—সেকথাই তো বলছি। ভদ্রলোকের মনে কোন হিসেব নেই, কারও কাছ থেকে কিছুই আশা করেন না, কিন্তু উপকার করেন।

হেমন্ত উঠে দাঁড়ায়—সত্যি খুব মহৎ লোক। চল এবার, বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।

ঠিকই, আকাশের কোণে সেই একফালি চাঁদ এখন আর নেই। নালার জলের পানকৌড়িকেও আর দেখা যায় না।

বাড়ি ফিরে যাবার পথেও আত্রেয়ীর নানা গল্পের মুখরতা তেমনই উচ্ছল হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে।—মঞ্জুর বোধ হয় বিয়ে হয়ে গেছে এতদিনে; এইবার নিখিলবাবুর বিয়েটা হয়ে গেলে বেশ ভাল হয়।...কিন্তু তুমি আবার সিগারেট ধরাচ্ছো কেন?

হেমন্ত—না, ভাবছি; একটু চিন্তে করতে হচ্ছে।

—কিসের চিন্তে?

—নুটু লিখেছে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট গগন মুস্তফী মামলাতে বাদীপক্ষের সাক্ষী হবে বলেছে।

—তার মানে?

—তার মানে, আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে।

—তাতে তোমার ক্ষতি হবে?

—শেষ পর্যন্ত ক্ষতি হয়তো হবে না, কিন্তু অনেক অসুবিধে হবে, বেশ ভুগিয়ে ছাড়বে।

—কিছুছু হবে না; মামলাতে শেষ পর্যন্ত তুমিই জিতে যাবে।

হেসে ফেলে হেমন্ত।—ঠিক কথা তো?

আত্রেয়ী—খাঁটি কথা; একদিন দেখতেই পাবে, আমার কথাটা ফলে গেল কিনা।

হেমন্ত—দেখা যাক্।

আত্রেয়ীর কথাটা ফলে গেলে তো ভালই হয়। কিন্তু ফলবে কি? ভাইপো নুটুর লেখা শেষ চিঠিটা হাতে নিয়ে যখন বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে, আর ল্যাম্পের আলোর তেজও একেবারে কমিয়ে দিয়ে, চুপ করে ভাবতে থাকে হেমন্ত, তখন হেমন্তের অমন টানা-মসৃণ কপালেও যেন একটা ভাঁজের রেখা ফুটে ওঠে। মামলা লড়তে আর ইচ্ছে করে না; সব ইচ্ছারই জোর যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হেঁয়ালির মত কেমন-যেন একটা খটকা এসে, শুধু হেমন্তের মনটাকে নয়, হাতটাকেও ভীরু করে দিতে চাইছে।

যেন নিজেরই উপর বিরক্ত হয়ে ল্যাম্পের আলোটার তেজ দপ্ করে বাড়িয়ে দেয় হেমন্ত। মামলার কথা ভাবতে গিয়ে এসব আবার কোন্ বাজে কথার দিকে চলে যাচ্ছে মনটা?

বুঝতে পারেনি হেমন্ত, আত্রেয়ী কখন্ এসে চেয়ারের পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। পিছন থেকেই দু'হাত দিয়ে হেমন্তের গলা জড়িয়ে ধরে আর ধমক দিয়ে হাসতে থাকে আত্রেয়ী—আমি কিন্তু তোমার নুটু ভাইপোর সব চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেব, তুমি যদি ওরকম চিন্তে-টিন্তে করতে থাক।

আত্রেয়ী যখন ওর গভীর ঘুমের মধ্যেও হেমন্তের অলস হাতটাকে নিজেই টেনে নিয়ে নিজের গলায় জড়িয়ে ধরে, তখন হেমন্তের ফাঁকা-ঘুমের উসখুসে অস্বস্তিটাও লজ্জা পেয়ে চমকে ওঠে। আত্রেয়ীর তো কোন ভুল হচ্ছে না; তবে হেমন্তর হাতটা কেন নিজেই ব্যস্ত হয়ে আত্রেয়ীর গলা জড়িয়ে ধরতে পারছে না?

সরিয়াডির এই পাঁচ মাসের প্রতিদিনের জীবন, হেমন্তের কাছে সত্যিই যে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের আর অদ্ভুত এক পরিতৃপ্তির জীবন। সেই বিস্ময় আত্রেয়ী, সেই বিস্ময়ের পরিতৃপ্তিও আত্রেয়ী। শুধু দু'হাতে দিয়ে তো নয়, আত্রেয়ী যে সর্বক্ষণের ভাবনা দিয়ে হেমন্তকে জড়িয়ে ধরে আপন করে নিয়েছে।

কতবার শুনতে পেয়েছে হেমন্ত, ভিতরের ঘরে কাকিমার সঙ্গে যেন একটা তর্ক বাধিয়ে কথা বলছে আত্রেয়ী।—আমি বলছি, কাকিমা, এ সময়ে এক গাদা মিষ্টি খাবার ওকে দিও না; খেতে পারবে না; এখন ওর খিদেই নেই।

কাকিমা—তুই কি করে জানলি যে...।

আত্রেয়ী—আমি জানি, আমি বুঝতে পারি; এখন ওর খিদে নেই।

হেমন্তর জুতো পালিশের জন্য মুচি ডাকতে বাজারে যাবে চাকর রামুয়া। কিন্তু যেতে পারে না। আত্রেয়ীই বাধা দিয়ে রামুয়াকে জিজ্ঞেস করেছে—কে বলেছে মুচি ডাকতে?

—জামাইবাবু।

—যেতে হবে না; কোন দরকার নেই।

আত্রেয়ী নিজেই হেমন্তর তিন জোড়া জুতো পরিষ্কার করেছে আর পালিশ করেছে। কতবার চোখে পড়েছে হেমন্তর, উঠোনের মাঝখানে বসে আর গামলার জলে সাবান ফেনিয়ে নিয়ে হেমন্তর একগাদা ময়লা রুমাল আর গেঞ্জি কাচতে বসেছে আত্রেয়ী; গুনগুন করে গান গাইছে আত্রেয়ী।

হেমন্তর চোখের যত ঘুম আর তন্দ্রাও যেন আত্রেয়ীর জীবনের একটা মজার খেলাপাতি হয়ে উঠেছে। হেমন্তর ভোর-বেলার ঘুম ভাঙাতে হলে হেমন্তর কপালে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয় আত্রেয়ী। অসময়ের ঘুম ভাঙাতে হলে হেমন্তর হাতের একটা আঙুল মট্ করে ফুটিয়ে দিয়েই পালিয়ে যায় আর হাসতে থাকে।

আত্রেয়ীর প্রাণে ভুল নেই; কোন সন্দেহ নেই। হঠাৎ মাথাখারাপ হয়ে একটা পাগল হয়ে গেলেও বোধহয় সন্দেহ করতে পারবে না হেমন্ত, আত্রেয়ীর প্রাণটা কিপটেমি করে হেমন্তকে কোন দান না-দেওয়া করে রেখে দিয়েছে, কিংবা দেবে না বলেই ইচ্ছে করে লুকিয়ে রেখেছে।

তবু, কি আশ্চর্য, এই ধানোয়ার রোডের আশে-পাশে, কত নিরালার পথে পথে, সন্ধ্যার ছায়া আবছায়া আর ফিকে জ্যোৎস্নার মধ্যে আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে আরও কতবার বেড়িয়ে ফিরে এল হেমন্ত, কিন্তু একটি-বারও আত্রেয়ীর কাঁধে হাত রাখতে পারেনি। লজ্জা পেয়েছে হেমন্ত, নিজেরই উপর রাগ করেছে। বুঝতে চেষ্টা করেছে, মনটা এমন ছোট হয়ে গেল কেন?

শুধু একদিন; সেদিন সরিয়াডির স্তব্ধ দুপুরবেলার বাতাসে দূরের শালবনের ঘুঘুর স্বর হঠাৎ ভেসে যেতেই হেমন্তর কান দুটো যেন চমকে ওঠে। আত্রেয়ীরই হাসিমুখের একটা সামান্য কথাকে কেউ যেন হেমন্তর কানের কাছে চেঁচিয়ে বলে দিয়ে চলে গিয়েছে। তুমি মহৎ হবে কেন?

কিন্তু রাগ করবার তো কোন মানে হয় না। কানে জ্বালা ধরলে চলবে কেন? কথাটা তো নেহাৎ মিথ্যে কিছু নয়। পাঁচ বছরের জেল-খাটা কয়েদী, গাদা গাদা বই পড়তে জানে না। লোকের চোখে চমৎকার দেখাবে, হেমন্তর জীবনটা তো এমন কোন বিস্ময় দেখাতে পারে না, পারবেও না।

আত্রেয়ীর জীবনকেও চমকে দেবার মত কোন মহত্ত্বের কাণ্ড করে দেখাতে পেরেছে কি হেমন্ত? কিছুই না। আত্রেয়ীকে শুধু একটা পাওনা বলে ধরে নিয়েছে আর পেয়ে গিয়েছে। জয় করতে পেরেছে বলে মনে করবার কিছুই নেই; একটা গর্বের তৃপ্তি নিয়ে আত্রেয়ীর গলা জড়িয়ে ধরতে পারবে কেন হাতটা?

হেসে ফেলে হেমন্ত; এ তো অদ্ভুত বিপদ। চেষ্টা করে একটা মহৎ কাণ্ড দেখাতে পারা যায়ই বা কি করে? আত্রেয়ীকে কি তবে একদিন ঝিলের জলে ডুবে যাওয়া দরকার? আর, একটা মহৎ কাণ্ড দেখাবার সুযোগ পেয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্রেয়ীকে টেনে তুলবে হেমন্ত?

ঘরে ঢুকেই আত্রেয়ী বলে—এ কি? নিজের মনেই এত হাসছো কেন?

হেমন্ত—হাসবার কথা।

আত্রেয়ী—কি?

হেমন্ত—ভাবছিলাম, তুমি ঝিলের জলে ডুবে গিয়েছ আর আমি একেবারে বীরের মত মরিয়া হয়ে একটা লাফ দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমাকে টেনে তুলেছি।

আত্রেয়ী—যত বিদ্ঘুটে চিন্তে।

হেমন্ত—কি বললে?

আত্রেয়ী—কোনদিনও জলে ডুববো না; তোমার বীরত্ব দেখিয়ে আমাকে তোলার দরকারও হবে না; আর...।

হেমন্ত—আর কি?

আত্রেয়ী—আর, তোমার এরকম দর্প করে হাসবার সুবিধেও হবে না।

হেমন্ত হাসে—ভাল কথা।

কিন্তু হাসিটা যেন অদ্ভুত একটা আক্ষেপের মনমরা হাসি। আত্রেয়ীর চোখে আশ্চর্য-মানুষ হবার সুযোগ এজীবনে আর হবে না। মনের গভীরে কোথায় যেন একটা অতৃপ্তির ছায়া মুখ লুকিয়ে থেকে গেল।

হেমন্তর কাছে এগিয়ে আসে আত্রেয়ী। হেমন্তর হাতটাকে তুলে নিয়ে গলা জড়িয়ে দেয়। কিন্তু হেমন্তর হাতটা যেন নিতান্ত অলস উদাস একটা হাত। বেশ রাগের স্বরে ধমক দিয়ে ছটফটিয়ে ওঠে আত্রেয়ী—আঃ, কি হলো? তোমার হাতটার যে একটুও বুদ্ধিসুদ্ধি নেই।

হেমন্ত বলে—না; ভাবছি, খুড়িমাকে আর মিথ্যে কথা বলে বুঝিয়ে রাখা উচিত হচ্ছে না। আর দেরি করা ঠিক নয়। এবার কাকিমাকে একবার বলে নিয়ে যাবার জন্যেই তৈরী হও আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—কাকিমা বলেছে, এই অমাবস্যাটা পার হয়ে যাক্।

—ওই দেখ বিমল; অন্ধকারে সাপের মাথার মণি জ্বলছে।

বেশ রাত হয়েছে, কালীবাড়ি রোডের কাছে এসে সন্তুদের ঘুড়ি ওড়াবার মাঠের ওপাশে শ্রীলেখা কটেজের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে ফেলেছে নরেন। সত্যিই, বেশ কুচকুচে কালো অন্ধকার, তার মধ্যে শুধু শ্রীলেখা কটেজের বাইরের ঘরের খোলা জানালাটা যেন জ্বলজ্বল করছে।

নরেন হাসে, বিমলও হাসে।—জ্বলুক, যত খুশি জ্বলুক।

সে রাতেই খবর পেলে গেল দিবাকর, শ্রীলেখা কটেজের ঘরে আলো জ্বলছে।

দিবাকর হেসে ফেলে—জ্বলুক।

শুনতে পেলেন গোষ্ঠবাবু আর হারুল-বাবু, শ্রীলেখা কটেজের ঘরে আলো জ্বলছে। শুনেই হেসে ফেললেন।—জ্বলুক।

কবে এসেছে নিখিল সেন, তা কেউ জানে না। কবে চলে যাবে নিখিল সেন, তাও আজ আর কারও জানাবার দরকার নেই। সরিয়াডির প্রাণ এখন শুধু জানতে পেরে খুশি হয়েছে যে, নবমী পেরিয়ে যাবার পর অমাবস্যা পার হলে গেলেই হেমন্ত আর আত্রেয়ী চলে যাবে। গোঁড়া মানুষ প্রদোষবাবুর চোখের মত সরিয়াডির সব মানুষের চোখ বোধহয় সেদিন স্টেশনের দিকে তাকিয়ে ছলছল করবে, কিন্তু চরম খুশির হাসিও হাসবে।

সাপের মাথার মণি নাই বা জ্বলুক, আর সরিয়াডির কেউ নাই বা জানুক, কিন্তু শ্রীলেখা কটেজের বাইরের ঘরে নিখিল সেন এতক্ষণে জানতে পেরেছে, মাথাটা জ্বলছে। কেন জ্বলছে, তাও বুঝতে পেরেছে।

বাঙালী ফিলসফারের লেখার উপর নিখিল সেনের শ্রদ্ধা কোনদিনও ছিল না, আজও নেই; তবু নেহাৎ অনিচ্ছা নিয়েই, বিদ্যা-জবরদস্ত এক বাঙালী ফিলসফারের লেখা এই বইটা এতক্ষণ ধরে পড়েছে নিখিল সেন। কত ভয় দেখিয়ে, কত যুক্তির কচকচি করে মানুষের নকল জীবনের যত লক্ষণ ধরিয়ে দিয়েছেন পণ্ডিত মশাই। নকল জীবনেরই অহংকার নাকি সবচেয়ে বড় গলা করে বলতে পারে, ভুল করি না, ভয় করি না, লোভ করি না, আর কোন ইচ্ছেরও ধার ধারি না।

বইটাকে এক ঠেলা দিয়ে টেবিলের এক পাশে সরিয়ে দেয় নিখিল। ঘরের বাইরে এসে বারান্দার উপর ছটফট করে ঘুরে বেড়ায়।

আজই বিকেলবেলা আত্রেয়ীদের বাড়ির চাকর এসেছিল আর মালীর সঙ্গে কথা বলছিল। তারপর ধীরু খানসামার কাছে মালী যে-কথাটা খুব আস্তে আস্তে বলেছে, সে-কথার শব্দটা নিখিলের কানে যেন একটা চিৎকার হয়ে বেজে উঠেছে।—লেংড়াবাবুকা দামাদ আ গিয়া।

ধীরু খানসামা—সেই দিদিমনির বর?

মালী—আরে হাঁ, হাঁ।

বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই সারিয়াডির যে-কোন শব্দের মধ্যে এই চিৎকারটাকেই শুনেছে নিখিল। সারিয়াডির এই কুচকুচে কালো রাতের ঝিঁঝির ডাকও যেন চিৎকার করে শুনিয়ে দিচ্ছে—আত্রেয়ীর স্বামী হেমন্ত এসেছে।

আর বুঝতে অসুবিধের কি আছে, পরপর এই দশদিনের মধ্যে একটি দিনও কেন আসেনি আত্রেয়ী, আর, আজও কেন এল না? এই দশদিনের মধ্যে যদিই বা কোন খবর না পেয়ে থাকে আত্রেয়ী, আজ তো পেয়েছে। চাকর রামুয়া কি খবরটা না জানিয়ে রেখেছে? তবু কই? সন্ধ্যা পার হয়ে গেল; এল না তো আত্রেয়ী!

পাঁচ বছর ধরে অদেখা স্বামীর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে; আত্রেয়ীর কাছে এটা যদি মস্ত বড় একটা সৌভাগ্যের ঘটনা বলে মনে হয়েই থাকে, [illegible] সেই সৌভাগ্যের বার্তাটা খুশি হয়ে এখানেও একবার এসে [illegible] কি দোষ হতো? না হয় স্বামী [illegible] সঙ্গে নিয়েই আসতো। সারিয়াডির মেয়ের মনে কি সামান্য ভদ্রতারও একটু বোধ নেই?

কৃতজ্ঞতা নামে কোন বস্তুও কি আত্রেয়ীর প্রাণের মধ্যে নেই? স্মৃতি নামে কোন পদার্থ নেই? সব ভুলে গেল?

ভিতরের একটা ঘরে ঘড়ির অ্যালার্ম বাজতে শুরু করেছে। এখন তাহলে রাত একটা; এখনই তবে জেগে উঠবে খানসামা ধীরু, আর পাট ভাঁজ করে গরম কফি বাইরের ঘরের একটা ছোট টেবিলের উপরে রেখে দিয়েই চলে যাবে।

কিন্তু তারপর মাথার জ্বালাটা কমবে কি? মন লাগিয়ে বই পড়তে পারা যাবে?

কফি খায় নিখিল, আর বুঝতেও পারে, মাথার জ্বালাটা নেই। কিন্তু বই পড়তে আর ইচ্ছেই করে না। এই বারান্দায় চুপ করে বেতের চেয়ারে বসে শুধু রাত জাগতে ইচ্ছে করে।

খোলা জানালা দিয়ে আলোর আভা বাইরে ছড়িয়ে পড়তে গিয়ে ঠিক গেটের কাছে জবাটারই কাছে একটা বাধা পেয়ে থমকে গিয়েছে আর ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে। বুঝতে অসুবিধে নেই, একটা কুয়াশার স্তবক শব্দহীন প্রলেপ হয়ে গেট আর গেটের কাছের জবাবৃক্ষকে ঢেকে ফেলেছে।

আর রাত জাগতে ইচ্ছে করে না। নিখিল সেনের মনটা যেন লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলেছে। আত্রেয়ীর উপর মিছিমিছি এত রাগ করা সত্যিই যে একটা লজ্জা। সারিয়াডির এই সামান্য একটু কুয়াশাকে একেবারে প্রলয়ের বাষ্প বলে সন্দেহ করবার কোন মানে হয় না।

শেষ রাতের তিনটে ঘণ্টা বেশ ভাল করেই ঘুমোতে পারে নিখিল সেন। আর, খুব ভোরে জেগে উঠেই টেবিলের উপরে স্তূপ করে সাজিয়ে রাখা নতুন বইয়ের দিকে খুশি হয়ে তাকাতে, এগিয়ে যেতে, আর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলতে পারে নিখিল। বেশ মন দিয়ে বইও পড়তে পারে; যতক্ষণ না ধীরু খানসামা এসে চা দিয়ে যায়।

বিকেল ফুরিয়ে গিয়ে যখন সন্ধ্যাটাও শেষ হয়ে যায়; তখন বুঝতে পারে নিখিল, আরও একটা সারাদিনের অপেক্ষার মন এইবার বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আজও এল না আত্রেয়ী।

ইচ্ছে হয় বইকি; বিকেলের দিকে বের হয়ে ধলোয়ার রোড ধরে এগিয়ে গেলে দেখতেই পাওয়া যাবে, হাওয়া-বদলের কত মানুষের খুশির চঞ্চলতা। ছুটোছুটি করে আমলকীর ঝোপের গায়ে খাবলা দিয়ে দিয়ে আমলকী ছিঁড়ছে। ছোট ছেলেগুলি খরগোস দেখবার আশায় গর্তের মুখে ঢিল ছুঁড়ছে। কিন্তু সারিয়াডিতে এসে এভাবে একা-একা বেড়াতে যাওয়া নিখিল সেনের মত মানুষের [illegible] যে দুঃসহ একটা অপমান।

কিন্তু আত্রেয়ী নিশ্চয় বেড়াতে বের হয়েছে। আত্রেয়ীর সঙ্গে ওর স্বামী ভদ্রলোকও নিশ্চয় আছেন। সারিয়াডির পাহাড়ী ময়নার মত মিষ্টিস্বরে কতই না খুশির ডাক ডেকে যেন একটি ফিরে-পাওয়া হারানিধির সঙ্গে গল্প করে করে চলে যাচ্ছে আত্রেয়ী।

না, হতেই পারে না। অসম্ভব। কটেজের বাগানের এদিকে ওদিকে সামান্য একটু ঘুরে বেড়াতে গিয়েই কি-যেন দেখতে পেয়েছে হেমন্ত; সঙ্গে সঙ্গে হেমন্তের মনের সন্দেহটা আবার নিজেরই ভুলের লজ্জায় হেসে ফেলেছে।

ওই তো, বাগানের মাঝখানে রেঙ্গুনলতার পিরামিডের বুকে ফুলের মঞ্জরী দুলছে। ওখানে রেঙ্গুনলতার যত পাতার গায়ে সারিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ীর সেই নিঃশ্বাসের ছোঁয়াটা যে এখনও লেগে আছে। নিজেই ইচ্ছে করে, একা-একা এসে, একটি অবাধ আত্মসমর্পণের ছবিটি হয়ে নিখিলের কত কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল আত্রেয়ী। নিখিল সেনের সভ্য-ভব্য আত্মাটা সেদিনও ভব্যতা ভুলে যেতে পারেনি; তাই আত্রেয়ীর হাত ধরতে পারেনি। এ সত্য কি ভুলে যেতে পারে আত্রেয়ী? কখনই না। ভুলে যাবার সাধ্যই হবে না।

কি এমন ব্যাপার হয়েছে যে, ভুলে যাবে আত্রেয়ী? [illegible] চোখ [illegible] দিকে তাকিয়ে কি নতুন কোন উজ্জ্বলতা দেখতে পায় আর আশ্চর্য হতে পারে? হেমন্ত চৌধুরীর মত পাঁচ বছরের জেলখাটা একটা মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর চোখ কতটুকুই বা তৃপ্তি পেতে পারে? হতে পারে, পাঁচ বছর আগে হেমন্ত চৌধুরীর সঙ্গে আত্রেয়ীর বিয়ে নামে একটা শাঁখ-বাজানো ব্যাপার হয়েছিল।

আত্রেয়ীর জন্যে দুঃখ হয়। আত্রেয়ী এখন একটা নকল প্রাণ তৈরী করে নিয়ে, অনিচ্ছার সব জ্বালা বুকের ভিতরে লুকিয়ে রেখে একটা নতুন দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কথা বলছে আর চেষ্টা করে হাসছে। এ যে আত্রেয়ীর একটা দুঃসহ শূন্যতার জীবন।

কিন্তু বুঝতে এত দেরি হচ্ছে কেন আত্রেয়ীর, এই শূন্যতাকে মিথ্যে করে দিতে পারে যে, সে এখন এখানেই আছে? একবার এখানে এসে দাঁড়ালেই তো বুঝতে পারতো আত্রেয়ী, নিখিল সেনের মন আজ আত্রেয়ীর ভীরু প্রাণটাকে কত নির্ভয় করে দিতে পারে।

খুব সাবধান আছে নিখিল সেনের মন, আত্রেয়ীকে বুঝতে আর বিচার করতে গিয়ে যুক্তিছাড়া কোন ধারণা যেন নিখিলের সবচেয়ে সুন্দর বিশ্বাসের উপর মিথ্যে একটা আঘাত হেনে নিখিলের জীবনের স্বস্তি নষ্ট না করে দেয়। শেষ রাতের ঘুমের স্বপ্নটাও তাই যুক্তি হারিয়ে এলোমেলো হয়ে যেতে পারে না। শুধু স্বপ্নে নয়, জেগে উঠেও নিখিল সেনের মনটা সেই বিশ্বাসেরই গুঞ্জন শুনতে পায়। না, আর যাই করুক আত্রেয়ী, আত্রেয়ীর নিঃশ্বাসের বাতাসে কোন ধুলো লাগেনি। সারিয়াডির মেয়ের ওই নরম রঙীন চেহারা আজ আর কোন বাজে লোকের লোভের দাবি মেনে নিতে পারে না; পারেওনি। আত্রেয়ীর কাছে হেমন্ত একটা ছায়া মাত্র; কায়া নয়।

বিকাল হয়েছে, চা খাওয়াও হয়ে গিয়েছে; এবার বাইরে একটু বেড়িয়ে আসবার জন্যেই তৈরী হয়েছে নিখিল। আট টাকা দামের আইভরি কেসের ভিতরে আটটা সিগারেট ভরে নেয়; কিন্তু তখনি চমকে ওঠে। গেটের কাছে কিসের শব্দ? আত্রেয়ী?

না, আত্রেয়ী নয়; মল্লিক ডাক্তারের একাগাড়ি থেমেছে। সড়কের কাঁকরের উপর পা ঘষছে একার ঘোড়া।

—তুমি কবে এসেছো, নিখিল? নিখিলকে দেখতে পেয়েই হেসে হেসে জিজ্ঞেস করেন মল্লিক ডাক্তার।

—দিন পনর হলো। আপনি কেমন আছেন?

—ডাক্তার মানুষের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থায় আছি।

নিখিলও হাসে—তার মানে?

মল্লিক ডাক্তার—নিজের শরীরের রোগটাকে বুঝতে পারছি না, ধরতেও পারছি না। যাই হোক, মঞ্জু মা'র খবর কি?

—মঞ্জুর বিয়ে হয়েছে।

—থ্যাঙ্ক গড। খুব ভাল খবর। এখানেও এইমাত্র আর-একটি ভাল খবরের পেসেন্টকে দেখে আসছি। এবার মঞ্জুকে জানিয়ে দিতে পার যে, তার প্রাণের বন্ধু আত্রেয়ীরও খবর ভাল।

নিখিল- হাঁ শুনেছি, আত্রেয়ীর স্বামী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে।

মল্লিক ডাক্তার যেন ব্যাকুল হয়ে হাসেন।—না না, শুধু তাই নয়। আত্রেয়ী এখন অন্তঃসত্ত্বা; ক্যারিং ফুল ফোর মান্থস্। দেখে সুখী হলাম, কোন কমপ্লেন নেই।

সড়কের কাঁকর ছিটকে দিয়ে মল্লিক ডাক্তারের এক্কাটা চলে যাচ্ছে। আর, ছোট্ট একটা আগুনের সাপ যেন নিখিলের বুকের ভিতরে ঢুকে ছোট-ছোট জ্বালার কুচি ছিটকে দিয়ে ছুটোছুটি করছে।

প্রদোষ সরকারের এই মেয়েটি তাহলে একটি মায়াঠগিনী। নিখিল সেনকে ঠকাতে পেরেই খুশি। কালচে ঠোঁটে একটা চমৎকার মধুবিষের মিষ্টি মেখে নিয়ে নিখিলের গল্পের সঙ্গে হেসেছে। কাছে কাছে থেকে আর ধরা না দিয়ে দিয়ে নিখিলের চোখে মুখে বুকে শুধু মুঠো মুঠো পিপাসা ছুঁড়ে দিয়েছে।

দাম বাড়াবার কায়দা জানে সরিষাডির মেয়ে এই আত্রেয়ী। এ মেয়েকে পাড়াগাঁয়ের [illegible] দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়; একটুও ধাক্কা খাবে না। ওর বাঁকা হাসির ঠোঁট [illegible] কাকাবে, [illegible] খেলাবার ভঙ্গী, [illegible] দিয়ে চোখের কালো নিবিড় করা চাহনি; সবারই মাথা ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবে।

কিন্তু মানুষের বুকে তৃষ্ণা মাতিয়ে দিতে এত কায়দাকুশলী হয়েও ওর কী লাভটা হলো? কী পেল আত্রেয়ী? শেষে তো হেমন্ত নামে একটা সামান্য মানুষের বুকের কাছে বেহায়া হয়ে শুয়ে পড়তে হলো।

আত্রেয়ীকে চিনতেই খুব ভুল হয়েছে। সেই বোকা-বোকা লাজুক চেহারা দেখে সন্দেহই করতে পারেনি নিখিল, ওটা সরিষাডির একটা সস্তা জংলী লতার চেহারা। ফিকে রঙের সিল্কের শাড়ি দিয়ে জড়ানো ওই শরীর কারও হাতের ভদ্রতার ছোঁয়া বোঝে না, পছন্দও করে না। [illegible] জোর করে চেপে ধরা [illegible] শুধু চিমটি দিয়ে খুশি হয়।

[illegible] দিকে দিয়ে দুপুরের [illegible] নিখিল আর [illegible] সরিষাডির এই দুপুরের সম্বন্ধেরই সঙ্গে মিশে থাকবার জন্যে ঘুমোতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুমোবার সাধ্য নেই। নিখিলের শরীরের সব স্নায়ু আর শিরা জড়িয়ে ধরে একটা নিঃশ্বাস আক্ষেপ করে এইবার কি-যেন বলতে চাইছে। তিরছি নদীর খাতের কাছে, বুনো খেজুরের ছায়ার পাশে সেই নিরালায় অমন চুপটি করে বসে পায়ের আঙুলের জখম বাঁধবার সুযোগ আত্রেয়ীকে দেওয়া হলো কেন? জোর করে কোলে বসিয়ে নিয়ে আত্রেয়ীর পায়ের আঙুলের রক্তমাখা জখমটাকে হাত দিয়ে চেপে ধরতে পারেনি কেন নিখিল?

রেলের জমির সীমানার সেই কাঁটাতারের বেড়াটা আত্রেয়ীকে পার করিয়ে দিতে কী অসুবিধে ছিল? ছল-ভীরুতার সেই সাংঘাতিক নারীকে দু'হাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আর বুকের উপর তুলে নিয়ে বেড়াটার ওপারে নামিয়ে দিলেই তো ভাল হতো। খুশি হতো, ধন্য হয়ে যেতে সরিষাডির মেয়ে।

কিন্তু আত্রেয়ী তো ভুল করেনি। ভুল করেছে নিখিলেরই একটা মূর্খ ধৈর্য। আত্রেয়ীর প্রাণটা সেদিন যে তৃপ্তি পেতে চেয়েছিল, তা পায়নি। দিতে ভুলে গিয়েছে নিখিল। জ্যোৎস্নামাখা একটি উপহার হয়ে নিখিলের কাছে নিজেই এসেছিল, আর বাগানের নিরালাতে রেঙ্গুনলতার কাছে দাঁড়িয়ে নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে সবই দিতে চেয়েছিল আত্রেয়ী। নিতে ভুলে গিয়েছে নিখিল।

আত্রেয়ীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আত্রেয়ীকে একবার বলে দেওয়াই উচিত, ভুল হয়ে গিয়েছে, কিছু মনে করো না। কিন্তু আর ভুল হবে না। আমি জানি, আমি শুধু দু'দিনের পাথিক হয়ে তোমার কাছে এসে দাঁড়ালেও তোমার আশার জীবনে আমার চেয়ে বড় আর কেউ ছিল না, এখনও নেই।

আর দেরি করে না নিখিল। দেরি করবার সাধ্যও [illegible] আর নেই। সরিষাডির মেয়ের অভিমান শান্ত করে দেবার জন্য নিখিলের এই নিঃশ্বাসটা যে ভয়ানক ছটফট করছে, কিছুতেই শান্ত হতে চাইছে না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। প্রদোষ সরকারের বাড়ির কাঁটালতার উপর বসে এখনও শালিক ডাকছে।

রাধাপুর থেকে রেল-পার্সেল হয়ে লিচুর তিনটে ঝুড়ি স্টেশনে এসে পড়ে আছে। সেই পার্সেল ছাড়িয়ে আনতে স্টেশনে গিয়েছে হেমন্ত। ফিরে এসেই আত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে দিবাকরের বাড়িতে চা খেতে যাবে হেমন্ত। [illegible] সাদা [illegible] পরে নিয়ে আর সাজ [illegible] তৈরী হয়েই আছে আত্রেয়ী।

প্রদোষ সরকারের বাড়ির বারান্দাতে [illegible] দুটি কথার ধ্বনি বেজে ওঠে।—আমি নিখিল।

চমকে ওঠেন কাকিমা। প্রদোষ সরকারের চোখের তারা আর নড়ে না। শালিকটাও ডাক বন্ধ করে দেয়।

আত্রেয়ী কিন্তু ব্যস্ত খুশির একটি মূর্তি হয়ে ছুটে গিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়ায় আর হেসে ওঠে।—আপনি এসেছেন?

নিখিল হাসে—এসেছি বইকি। কিন্তু এসে কি কোন অপরাধ করলাম?

আত্রেয়ী—একটুও না। আপনার এরকম কথার কোন মানেই হয় না।

নিখিল—কথাই তো ছিল, আমি মাঝে মাঝে আসবো; আর দেখাও হবে।

আত্রেয়ী—নিশ্চয় আসবেন, দেখাও হবে বইকি। মঞ্জুর খবর কি? বিয়ে হয়ে গিয়েছে?

নিখিল—হাঁ। কিন্তু আরও একটা কথা বলবার ছিল।

আত্রেয়ী—বলুন।

নিখিল—এখানে নয়; কটেজে চলুন।

নীরব হয়ে, নিখিলের মুখের দিকে যেন অদ্ভুত বিস্ময়ের একটা তন্দ্রা নিয়ে আত্রেয়ীর কালো চোখের তারা দুটো শিথিল হয়ে তাকিয়ে থাকে।

নিখিল ডাকে—চলুন।

নিখিলের চোখের দৃষ্টিটাও যেন অপলক হয়ে বলতে চাইছে—যেতেই হবে।

আত্রেয়ী বলে—চলুন।

কাকিমা আর দরজার আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। বাইরে এসেই আত্রেয়ীকে বেশ রূঢ় স্বরে ধমকে দিয়ে কথা বলেন।—কি হচ্ছে? কোথায় যাচ্ছিস?

আত্রেয়ী—এখনি আসছি।

কাকিমা হেমন্ত [illegible] জিজ্ঞেস করলে কি বলবো?

আত্রেয়ী—বলবে, আমি এখনি আসছি।

চলে গেল আত্রেয়ী আর কটেজের নিখিল সেন। কাকিমার চোখ দুটো যেন পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কসাইয়ের গরুও এমন করে খুশি হয়ে নাচতে নাচতে কিলখানার দিকে ছুটে যায় না; কিন্তু আত্রেয়ী যাচ্ছে।

জপের মালা থামিয়ে ঘরের ভিতর থেকে মণিদিদা বলেন—ও আপদ আবার কোথা থেকে এল, সুহাস? আত্রেয়ীকেও কি মরণ ভূতে পেয়েছে? কোন্ লজ্জায়, কোন্ সাহসে আজ বাইরের লোকটার সংগে চলে গেল?

কাকিমা আর কথা বলেন না। কোন কথা বলবার শক্তিই নেই। পুজোর ঘরের মেজের উপর শুয়ে পড়ে থাকেন। আত্রেয়ীর মা, শ্বাসকষ্টের সেই মানুষটা তো আগেই একটা মূর্ছা নিয়ে সেই মেজেতে লুটিয়ে পড়েছেন।

শালিক আর ডাকেনি। কে জানে কতক্ষণ ধরে একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছে শালিকটা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেল। প্রদোষ সরকারের বাড়ির কোন ঘরে আলো নেই।

চোখে দেখতে পান না মণিদিদা, তাই দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েই কথা বলেন।—ছি ছি, এ কি হলো? দিবাকরকে ডেকে ওই সর্বনেশে কটেজে এখনি একবার যেতে বল, সুহাস। মেয়েটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুক। হেমন্ত এসে জানতে পেলে যে আগুন জ্বলে উঠবে।

কার সঙ্গে এসব কথা বলছেন অন্ধ মণি-মাসী? চমকে উঠলেন কাকিমা। আতঙ্কিতের মত পুজোর ঘরে থেকে বের হয়ে বাইরের বারান্দায় এসে নিজের চোখেই দেখতে পেলেন, গেটের টিন-কাঠের বেড়াটাকে একটা লাথি মেরে সরিয়ে দিল হেমন্ত।

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিল। তারপর হাতের ছাতাটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে হেমন্তের মূর্তিটা হনহন করে হেঁটে চলে গেল। ছাতাটাকে সত্যিই যে একটা খুনখারাপী হাতিয়ার বলে মনে হয়।

—রামুয়া, ও রামু, শিগগির একবার যাও, দিবাকরকে একটা খবর দাও; বল গিয়ে আমি ডাকছি। একটুও দেরি না করে এখুনি যেন চলে আসে।

কিন্তু বাড়িতে রামুয়া নেই। কাকিমা শুধু উদ্ভ্রান্তের মত ডাকাডাকি করে হাঁপাতে থাকেন।

খুব মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। বিদ্যুতের ঝিলিক ছুটছে। বেশ ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝড়ও যেন শনশনিয়ে জেগে উঠছে।

সামনের রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে এক একজন জোরে পা চালিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে, তাদের কারও মুখ চিনতে পারা যাচ্ছে না। কাকিমা তবু গলাভাঙা স্বরে একটা আর্তনাদ তুলে ডাকতে থাকেন—ও নরেন! ও পরেশ! কে যাচ্ছ তুমি? একবার শুনে যাও।

কিন্তু ওরা কেউ নরেন নয়, পরেশও নয়। যারা যাচ্ছে, তারা কাকিমার এই ক্ষীণ আর্তনাদ শুনতেও পায় না। নয় তো, বুঝতেই পারে না। আজ সারিয়াডির বাতাসের এই ঝড় যেন ইচ্ছে করেই কাকিমার আর্তস্বরের সব আবেদন উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মিথ্যে করে দিচ্ছে। যেন কেউ শুনতে না পারে; যেন কেউ ছুটে না আসে। আত্রেয়ী আজ ওরই একলা প্রাণের সম্বল নিয়ে যা ইচ্ছে হয় তাই করুক।

কিন্তু কাকিমা যে একটা দুঃস্বপ্নের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। রাধাপুরের সাত-আনির হাত যে শানানো রাম-দা তুলে ধরতে একটুও কাঁপে না। জীবনের ঝঞ্ঝাট শুধু এক কোপে শেষ করে দিতেই জানে; আর কোন নিয়ম জানে না। আজ হেমন্তের কাছে আত্রেয়ীর এই ভুলের ক্ষমা নেই। সারিয়াডির আকাট মুখের মেয়ে সে এখনি একটা রক্তমাখা লাশ হয়ে পড়ে যাবে!

রাস্তার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা সাইকেল ছুটে চলে যাচ্ছে। কাকিমা চেঁচিয়ে ডাক দেন—ও নরেন! ও নরেন!

কিন্তু ওটা নরেনের সাইকেল নয়।

দিবাকরের বাড়িতে ছুটে যাবার জন্য চেষ্টা করতে গিয়েও যেতে পারলেন না; দুই পায়ের দুই হাঁটুর হাড়ের গিঁটগুলি যেন খুলে আলগা হয়ে গিয়েছে। মেঝের উপর ধপ্ করে বসে পড়লেন, আর একটা প্রাণহীন অস্তিত্বের মত একেবারে নিথর হয়ে গেলেন কাকিমা।

শ্রীলেখা কটেজের বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। টেবিলের একদিকে নিখিল, আর মুখোমুখি অন্যদিকে আত্রেয়ী। আত্রেয়ীর খোঁপার গন্ধরাজের দিকে তাকিয়ে কথা বলে নিখিল।—ওটা কি টাটকা গন্ধরাজ?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ, এই তো, সন্ধ্যে হবার একটু আগে তুলেছি।

নিখিল হাসে—দেখে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু সত্যিই তো তা নয়।

আত্রেয়ী—কি বললেন?

নিখিল—মল্লিক ডাক্তার নিজেই একটা খবর শুনিয়ে দিয়েছেন, তাই জানতে পেরেছি।

মাথা হেঁট করে আত্রেয়ী। চোখ দুটো শিউরে ওঠে। আর, মুখের হাসিটা যেন লজ্জারক্ত একটা আলো হয়ে ছলকে ওঠে।

নিখিল—আমি বোধহয় কালই চলে যাব। কাজেই আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

আত্রেয়ী—আমরাও বোধহয় আর দু'তিন দিন পরেই চলে যাব।

নিখিল—তা হলে বুঝুন, আজ আমাদের দু'জনের এই দেখাই শেষ দেখা।

আত্রেয়ী—তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু আবার হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যেতেও পারে।

নিখিল হাসে—হয়তো হতে পারে। কিন্তু আমাকে দেখবার জন্যে আপনার মনে আর কি কোন ইচ্ছে কিংবা আশা থাকবে?

আত্রেয়ী—থাকবে বইকি।

নিখিল—আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না, ভাবতে আপনার একটু কষ্টও হচ্ছে বোধহয়?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

নিখিল—আমাকে কি কখনও ভুলে যেতে পারবেন?

আত্রেয়ী—না।

নিখিল—এই যে আমি, আপনার দু'দিনের চেনা একটা মানুষ হয়েও বার বার এসে শুধু দু'দিনের আনন্দের জন্য আপনাকে সঙ্গে নিয়ে এত বেড়ালাম, সে সব কথা মনে থাকবে তো?

আত্রেয়ী—থাকবে।

নিখিল—সবই ভাল লেগেছিল?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

নিখিল—আমাকে কখনও ভাল লেগে-ছিল?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

নিখিল—এখনও কি ভাল লাগে?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ।

নিখিল—এত স্পষ্ট করে আগে কোনদিন বলেন নি কেন?

আত্রেয়ী—বলবার দরকার কি? আপনি তো বুঝতেই পারেন।

নিখিল—কিন্তু আপনি কি বুঝতে পারতেন না?

আত্রেয়ী—কি?

নিখিল—আপনাকেও আমার খুব ভাল লাগে।

আত্রেয়ী—বুঝতাম।

নিখিল—এখনও তো ভাল লাগছে।

চমকে উঠেছে আত্রেয়ী। কিন্তু মাথা হেঁট করে নয়; চোখ তুলে সোজা নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়—ভালই তো।

নিখিল সেনের বুকের মরুপিপাসা এইবার জলভরা মেঘের ডাক শুনতে পেয়েছে। সারিয়াডির মেয়ের মুখের ভাষায় আর গলার স্বরে কোন ভীরুতা কুণ্ঠা কৃপণতা নেই। কথাটা আত্রেয়ীর প্রাণের গোপনের একটি সংকেতের ধ্বনি হয়ে বেজে উঠেছে।

আর দেরি করতে ইচ্ছে করে না। দেরি করে লাভই বা কি? আত্রেয়ীর খোঁপার ওই গন্ধ-রাজ হাতের এক টানে ফেলে দিয়ে রেংগুন-লতার একটা মঞ্জরী পরিয়ে দিলেই তো হয়। তারপর সারিয়াডির মেয়ের ওই লালচে ঠোঁট দুটো ফুলে-ফুলে কাঁপবে আর নিবিড় এক ইচ্ছার ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

নিখিল—আর-একটা কথা জানতে চাই।

আত্রেয়ী—বলুন।

নিখিল—হেমন্তবাবু কি আপনার কাছে একটা আশ্চর্য মানুষ?

আত্রেয়ী হাসতে চেষ্টা করে; কিন্তু হাসিটা যেন একটা ব্যথার বাধা পেয়ে ঠোঁটের ফাঁকে আটকে থাকে। কথা বলতে পারে না।

নিখিল—বললেন না? চেপে রেখে লাভ কি?

আত্রেয়ী—উনি আশ্চর্য মানুষ হবেন কেন?

নিখিল—তবে?

আত্রেয়ী—মানুষ যেমন হয় তেমনই এক-জন মানুষ।

নিখিল হাসে—নিশ্চয় আমার চেয়ে অনেক অনেক উঁচুদরের মানুষ।

আত্রেয়ী—ঠাট্টা করছেন কেন? আমি কি সে-কথা বলছি? আপনার সঙ্গে কি কারও তুলনা হয়?

নিখিল—তবে?

নিখিলের চোখের দৃষ্টিটা বড় তীব্র, যেন আত্রেয়ীর হৃৎপিণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখছে আর কি যেন জানতে চাইছে নিখিল।

আত্রেয়ীর চোখের তারা ছটফট করে।

—বলেছিই তো, আপনার মত মহৎ মানুষ আমি কখনও দেখিনি। বার বার জিজ্ঞেস করেন কেন?

নিখিল—আর হেমন্তবাবু?

আত্রেয়ী—তার কথা ছেড়ে দিন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নিখিল। এগিয়ে যায়। আত্রেয়ীর কাছে এসে দাঁড়ায়। আত্রেয়ীর চেয়ারের কাঁধের উপর হাত রাখে। একেবারে নীরব হয়ে, শুধু উষ্ণ নিঃশ্বাসের একটা বাতাস ছড়িয়ে দিয়ে সরিয়াডির মেয়ের মাথার ঢিলে খোঁপার দিকে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ হাত তুলে দেয়ালের গায়ে আলোর সুইচটাকে চেপে ধরে নিখিল সেন। খুট্ করে একটি শব্দ বেজে ওঠে। শ্রীলেখা কটেজের বাইরের ঘর অন্ধকারে ভরে যায়।

কিন্তু নিতান্ত ব্যর্থ অন্ধকার। একটা অধঃপতিত দুঃসাহসের অন্ধতা মাত্র। সরিয়াডির মেয়ে আত্রেয়ী সেই মুহূর্তে নিজেই যেন চকিত বিদ্যুতের মত একটা জ্বালা হয়ে ঘরের অন্ধকার ঝলসে দিয়েছে। আত্রেয়ী নিজেরই হাতে সুইচ টিপে ঘরের আলো তখুনি জেলে দিয়েছে।

সুইচের উপরে একটা হাত শক্ত করে চেপে রেখে আর জ্বলন্ত দুটো চোখ তুলে নিখিলের মুখের দিকে তাকায়। আত্রেয়ী—মহত্ত্ব দেখাচ্ছেন?

কিন্তু নিখিল সেনের দুই চোখের তারা একেবারে নিশ্চল হয়ে গিয়ে, ভয়ানক অর্থহীন ও মূর্খ একটা জংলী বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে; জ্বলছে সরিয়াডির এক মায়ানাগিনীর চোখ।

হাত কাঁপে নিখিলের; তবু সিগারেট ধরায়। আর, দুই চোখ যেন একটা কুটিল শ্লেষে পিচ্ছল হয়ে গিয়ে চিকচিক করে কাঁপতে থাকে।—খুব যে থিয়েটার দেখাচ্ছেন।

আত্রেয়ী—বেশ করছি।

নিখিল—থিয়েটার দেখাবেন আপনার ভদ্রলোকের কাছে, আমার কাছে নয়।

আত্রেয়ী—সে জন্য আপনার উপদেশের কোন দরকার নেই।

নিখিল—সেদিন চোখে মুখে চাঁদের আলো মেখে একা-একা নিখিল সেনের চোখের কাছে একেবারে একটি নৈবেদ্য হয়ে কেন এসেছিলেন?

আত্রেয়ী—ইচ্ছে হয়েছিল।

নিখিল—সেদিন নিখিল সেন যদি হাত চেপে ধরতো, কি বলতেন আপনি?

আত্রেয়ী—কিছুই বলতাম না।

নিখিল—তবে?

আত্রেয়ী—চেপে ধরলেন না কেন? তাহলে তো বুঝতেই পারা যেত......।

—কি বুঝতেন?

—বুঝতাম, মহৎ না হলেও আপনি একটা মানুষ।

—আজ কি বুঝলেন? আমি একটা অমানুষ?

—একটা ভয়ানক নকল মানুষ।

—আপনি তাহলে কি?

উত্তর দেয় না আত্রেয়ী। বাইরে যাবার দরজাটার দিকে তাকায়। নিখিল সেনের গলার স্বরে ছোট্ট একটা গর্জন শিউরে ওঠে।—যাবেন না।

আত্রেয়ীর চোখে একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে।—ছিঃ, কোথায় নেমেছেন আপনি!

নিখিল—আমাকে এভাবে অকারণে অপমান করে গেলে আমিও কিন্তু আপনার সারাজীবনের আশা-আহ্লাদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেব।

আত্রেয়ী—কিছুই করতে পারবেন না।

নিখিল—সরিয়াডির মেয়ে যে একেবারে সাহসের দেবীর মত কথা বলছেন।

আত্রেয়ী—সাহস আছে বলেই বলতে পারছি।

নিখিল—সাহস করে হেমন্তবাবুর কাছে বলে দিতে পেরেছেন কি, কেন সেদিন একা-একা এই কটেজে এসে নিখিল সেনের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন?

আত্রেয়ী—বলবার দরকার হয় না।

নিখিল—আমি যদি বলে দিই, তবে কি হবে? দাঙ্গাবাজ জমিদার যে রামদা'র এক কোপে এরকম একটি খাঁটি পতিব্রতা পত্নীর গলা কেটে দু'টুকরো করে দেবে।

আত্রেয়ী—ভালই হবে।

নিখিল—কি বললেন?

নিখিল সেনের এই ক্ষিপ্র মুখরতার সঙ্গে আর তর্ক করতে চায় না আত্রেয়ী। কোন কথা না বলে খোলা দরজার দিকে ছুটে চলে যায়।

কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয়। বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে আছে হেমন্ত।

খুব জোরে বৃষ্টি ঝরিয়ে গরগর করছে সরিয়াডির মেঘ। দমকা বাতাসে বৃষ্টির জলের গুঁড়ো ছুটে এসে এই খোলা দরজার কাছে ছিটকে পড়ছে। কিন্তু ঝুঁকে পড়েছে আত্রেয়ীর মাথাটা।

আত্রেয়ী বোধ হয় আর নড়তে পারবে না। ভয় নয় লজ্জাও নয়, চিরকালের মত মুছে যাবার আগে শুধু একটু দেখা। লুকোবার ঢাকবার আর কিছুই নেই। আর চেষ্টা করবারও কিছুই নেই। এখন শুধু যদি হেমন্তের বুকের আক্রোশটা চরম পুরস্কার হয়ে ছুটে এসে আর ক্ষমাহীন হাতে আত্রেয়ীর গলা টিপে ধরে আত্রেয়ীকে চরম ছুটি দিয়ে দেয়, তাহলেই মুক্তি পাওয়া হয়ে গেলো। চুপ করে, শান্ত হয়ে, যেন মাথা পেতে দাঁড়িয়ে থাকে আত্রেয়ী।

—চলে এস আত্রেয়ী। হেমন্ত ডাকে।

মুখ তুলে হেমন্তর দিকে তাকায় আত্রেয়ী। হাসছে হেমন্ত, হাত তুলে ডাকছে, হেমন্ত। আত্রেয়ীকে মরণ-ঝিলের জল থেকে তুলে নেবার জন্য একটি আশ্চর্য-মানুষের হাত ছটফট করছে। হাসিটাও যে বেশ দর্প করেই হাসছে।

এগিয়ে যায় আত্রেয়ী। আত্রেয়ীর একটা হাত ধরে বারান্দা থেকে নেমে যায় হেমন্ত। ছাতাটা খুলে ধরে।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে নিখিল সেন চেঁচিয়ে ওঠে।—আপনার কাছে একটা কথা বলবার ছিল, মশাই।

হেমন্ত মুখ ফিরিয়ে তাকায়।—আমার কাছে?

নিখিল—হ্যাঁ।

হেমন্ত—না; কিচ্ছু না, আপনার কিছুই বলবার নেই।

হেসে ফেলে আত্রেয়ী। এক হাতে ছাতা, আর-এক হাতে আত্রেয়ীর গলা, হেমন্তও হাসতে থাকে—স্টেশনে গিয়ে মিথ্যে হয়রান হলাম। লিচুর ঝাঁড় আজও এসে পৌঁছয়নি।

শ্রীলেখা কটেজের গেট পার হয়ে কাঁকরের রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে নয়াপাড়ার সড়কের ল্যাম্পপোস্টের কাছে আসতেই চমকে হেসে ওঠে আত্রেয়ী—এবার হাতটা একটু নামাও।

হাত নামায় হেমন্ত, কারণ রাস্তার ওদিক থেকে আর-একটি ছাতা একেবারে সামনেই এসে পড়েছে।

চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রবাবু—কে? আত্রেয়ী নাকি?

আত্রেয়ী—হ্যাঁ জেঠামশাই।

চন্দ্রবাবু—তোমার সঙ্গে উনি কে? জামাইবাবাজী নাকি?

আত্রেয়ী মুখ টিপে হাসে—হ্যাঁ; আপনার কোলে ওটি কে?

চন্দ্রবাবু—আমার নাতি। মল্লিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম, পায়ে একটা ফোঁড়া হয়েছে।

আত্রেয়ী—কিন্তু নাতি যে ঘুমিয়ে পড়েছে, একটু শক্ত করে ধরুন।

চন্দ্রবাবু—শক্ত করেই তো ধরে আছি।

জোর বৃষ্টির সঙ্গে ঝরঝর করে শিলা ঝরছে আর ছাতার উপর আছাড় খেয়ে সাদা খইয়ের মত ছিটকে পড়ছে।

চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন চন্দ্রবাবু—কী ব্যাপার! কী আশ্চর্য! ওহে ও দিবাকর? আজ হঠাৎ এত শিলাবৃষ্টি কেন?

খাইখাই

মনোজ বসু
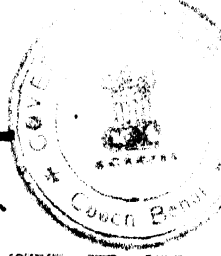
মায়ের ঘরে নীলমণি—মায়ের তক্তাপোশের পাশে। হাতের পাঁচটা আঙুল—কনিষ্ঠা, অনামিকা মধ্যমা তর্জনী আর বৃদ্ধ—একটার পর একটা উঁচু করে মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ছড়া বলছে। ছড়াটা আজ নতুন শিখেছে।

এইটে বলে, খাবো খাবো—

কনিষ্ঠা থেকে শুরু। কনিষ্ঠা সকলের ছোট কিনা—খিদে পেয়েছে তার, খেতে চাইছে।

এবং পর পর চলল আঙুলদের সকলের কথা—

এইটে বলে, খাবো খাবো—
এইটে বলে, কোথায় পাবো?
এইটে বলে, কর্জ করো—
এইটে বলে, শোধের বেলা?
এইটে বলে, এই কলা, এই কলা—

এইটে বৃদ্ধাঙ্গুলি ভারি শয়তান—কর্জ শোধ করবে না, কলা দেখিয়ে দেবে।

মুখ-চোখ ঘুরিয়ে মাকে নীলমণি নতুন ছড়া শোনাচ্ছে। কিন্তু হাসে না মেনকা। কড়ে-আঙুল বলে কেন, তার দেহের প্রতিটি রোমকূপ যেন 'খেতে দাও' 'খেতে দাও' করছে।

অথচ এই মেনকা একদিন ভাতের তলে মাছ ঢাকা দিয়ে শাশুড়িকে ফাঁকি দিয়েছে: খেয়েছি মা। তারপর সবসুদ্ধ নিয়ে আঁস্তাকুড়ে ঢেলেছে। আর এই নীলমণির কথা ফোটেনি—বাচ্চা ছেলে, তখন থেকেই না খাওয়ার চালাকিটা শিখে ফেলেছে। ঝিনুক ভরে মুখে দুধ ঢেলে দিয়েছ, না গিলে টাকরার ভিতর রেখে দিয়েছে—আবার ঝিনুক ভরছ, ফুচ করে দুধ ফোয়ারার ধারে বের করে দিল। ঝিকঝিকে দাঁত কটিতে হাসির কী ছটা তখন!

আজকে রোগের মধ্যে মেনকার স্বপন বলে মনে হয়। এসব সত্যি সত্যি ঘটে নি বুঝি কোনদিন। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে, খাওয়া হয়ে গেল তোদের?

ঠাঁই হচ্ছে।

আমারও ঠাঁই করতে বল। আমি খাব তোদের সঙ্গে।

হঠাৎ একেবারে ক্ষেপে গেলঃ বলছি তা কানে যায় না বুঝি? ডেকে আন্ তোর বাবাকে।

বলরাম এসে তার উপর মেনকা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেঃ স্বার্থপর তোমরা। আমায় উপোসী রেখে আকণ্ঠ এইবারে গিলতে বসবে।

উপোসী কেন থাকতে যাবে?

আমিও তাই বলি। আর নয়, কোন কথা আজ শুনব না। থালার চারপাশে বাটি সাজিয়ে ভাত-তরকারি খাব তোমাদের পাশে বসে।

মেনকা কাঁদতে লাগল। চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলরাম বলে, ডাক্তারে যেমন বলে তাই খাবে তুমি। অবুঝ হচ্ছ কেন?

ডাক্তারে বলে, জ্যান্ত মাছ কাঁচ-পাঁঠার ঝোল মাখন আপেল-বেদানা পুরোনো দাদখানি চালের ভাত। দাও এনে তাই।

এখন বলে না। হজমের ক্ষমতা যে নেই। দুধ খাচ্ছ—দুধের চেয়ে ভাল জিনিস কি আছে বলো।

হজমের যখন ক্ষমতা ছিল, তখনো কি খাইয়েছ আপেল-বেদানা-মাখন? বাড়ির গরু পোয়াটাক দুধ দেয়, ছেলেটাকে বঞ্চিত করে দেদার তাই দুধ খেয়ে যাচ্ছি।

বলরাম কি বলবে, চুপ করে থাকে। কথা যা বলছে, একেবারে মিছা নয়।

মেনকা বলে, আমি বাঁচব না—ডাক্তার জানে, তুমিও জান। এখনো তবু খেতে দেবে না। না খেতে দিয়ে তাড়াতাড়ি মেরে ফেলতে চাও। তুমি খুনে।

বলরামেরও মুখে শক্ত কথা এসে গিয়েছিল, সামলে নিল। বলে, রাজব্যাধি জুটিয়ে নিয়েছ, কিন্তু আমি রাজা নই। যা-কিছু ছিল, একে একে সমস্ত গেছে। তিরিশ বিঘের এমন চকটাও বিকি করে দিলাম। এর পরে তুমি যদি যাও, আমরাও তো পিছু পিছু আসছি। থাকব কি খেয়ে? ছেলে যাবে, আমিও যাব—দুনিয়ার উপর কেউ আমরা বেঁচে থাকছিনে। হিংসার কিছু নেই মেনকা।

মেনকা হাউহাউ করে কেঁদে উঠলঃ ব্যাধির খোঁটা দিলে। কিন্তু কাদের জন্য এই ব্যাধি, জিজ্ঞাসা করি। বিয়ে হয়ে বাপের বাড়ি থেকে এলাম—শাশুড়ি বললেন, পাথরের বউ এসেছে, মাটিতে শুবি তোরা, বউয়ের ভারে তক্তাপোশ ভেঙে পড়বে। সেই মানুষ শুকিয়ে কণ্ঠিখানা। নিজে না খেয়ে সারা জন্ম তোমাদের খাইয়ে এলাম। বিদায় হয়ে যাচ্ছি, একটা বেলাও তবু সাধ মিটিয়ে খেতে দেবে না। উঠতে পারিনে দেখতে পারিনে সেই জন্যে বড্ড মজা—নিজেদের অষ্টব্যঞ্জন সাজিয়ে রেখে ডাক্তারের দোহাই পাড়তে এসেছ। আজ আমি শুনছিনে, তোমাদের ঐ বাড়া ভাত কেড়েকুড়ে খেয়ে নেবো—

লাফিয়ে উঠতে গিয়ে মেজের উপর পড়ে গেল। গলগল করে রক্ত—এত রক্ত শুকনো দেহটুকুর মধ্যে! রক্ত দেখে ডর লাগে, বলরাম থরথরিয়ে কাঁপছে। মানুষজন ডাকবে, তা-ও অনেকক্ষণ পেরে ওঠে না।

মেনকা মারা গেল। মেজের চাপ-চাপ রক্ত, তারই উপর বাসি-মড়া পড়ে আছে একটা বেলা এবং পুরো এক রাত্রি। ডাক্তার সতর্ক করে দেনঃ এ ব্যাধি বিশ্রী রকমের ছোঁয়াচে। শ্মশানে যাবার আগে নিজেদের দিকটা সকলে ভেবে দেখো। মড়া ভাল করে জীবাণুমুক্ত হয় যেন। পুড়ে কয়লা হয়ে গেলে তবে নিশ্চিন্ত।

শ্মশানে যাবে বলে যারা কোমর বাঁধছিল, এমন কথার পরে তারা পিছিয়ে পড়ে। বলরাম বলে, কুচ পরোয়া নেই। জীবাণু মারতে কি কি লাগবে, প্রেসক্রিপশন করে দিন ডাক্তারবাবু। এত টাকা আপনাদের খাওয়ালাম, শেষটুকুতে বঞ্চিত করব না।

আচার্যি ঠাকুর পাঁজি দেখে ইতিমধ্যে নতুন এক বাগড়া তুললেন। মড়া তিনপোয়া দোষ পেয়েছে, তা ছাড়া এই রকম দীর্ঘ কালের যাপ্য ব্যাধিতে মরা। মহাপাতকের ফল—শান্তিস্বস্ত্যয়নে সেই পাতকের খণ্ডন করে তবে মড়া বাড়ির বার হবে। নয়তো গ্রামসুদ্ধ লোক সঙ্গে টানবে কিন্তু। যারা ঘাড়ে করে নিয়ে যাবে, তাদের ঘাড় সকলের আগে ভাঙবে।

উঠতে গিয়ে যে মানুষটা আছাড় খেয়ে মারা গেল, মরার সঙ্গে সঙ্গেই তার এমন দৈত্য সম প্রতাপ, বলরাম বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। তবু বলে, ফর্দ করে দিন ঠাকুরমশায়। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন। এত হল তো স্বস্ত্যয়নও বাকি থাকবে না।

নেশাখোর রঘুপ্রসাদ উদয় হল এর মধ্যে। বলরামকে এক পাশে ডেকে নিয়ে কানে কানে বলে, শুনেছি সব দাদা। ঘরের ভিতরের মড়া শেয়ালে শকুনে নাগাল পেল না তো এরাই এখন ছেঁড়াছোঁড় করছে। কিচ্ছু লাগবে না। অষুধে আর স্বস্ত্যয়নে যা পড়বে, তার সিকি আন্দাজ ছাড়ো। কলের মতো কাজ হয়ে যাবে।

বলরাম বলে, বুঝিয়ে বলো।

বলি, ডাক্তার আর আচার্যি ঠাকুর ছাড় করে দিলেই মড়া অমনি পায়ে হেঁটে চিতায় উঠবে না। তার পরেও খরচ আছে। সেই খরচাটা আগে করতে বলি। কিছু দরাজ হাতে।

চোখ টিপে বলে, শিবের জটা নয়—জটার উপরের মা সুরধুনী, সেই পর্যন্ত উঠতে হবে। জটা বুঝলে না, কী মুশকিল! ইকড়ি মিকড়ি চামচিকড়ি, কলকের সেজে চড়-চড়-চড়াৎ—যার অন্য নাম গাঁজা। গাঁজায় হবে না। সুরধুনী, যিনি শিবের জটা ছেড়ে বোতলে ঢুকেছেন, তারই দুটো এনে দাও দিকি। কোমরে গামছা বেঁধে চারজনে চলে আসি। বল হরি, হরিবোল! খাটিয়া দাও কি বাঁশের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধতে বল —চক্ষের পলকে চালান হয়ে যাবে।

এমন সুবিধা পেয়ে কে ছাড়ে! বলরাম বলে, কথা পাকা। একটুখানি কেবল সবুর করতে হবে।

অধীর রঘুপ্রসাদ বলে, কাল দুপুর থেকে দরাদরি চলছে। মড়ায় মাছি পড়ছে, গন্ধ হয়ে গেছে। আর সবুর করলে হাত-পাগুলো খসে খসে আসবে কিন্তু।

বলরাম বলে, বেশি দেরি হবে না। গাই গরুটা দিয়ে খদ্দেরের কাছ থেকে টাকা ক'টা নিয়ে আসা।

রঘুপ্রসাদ অবাক হয়ে বলে, গাইগরুটাও বেচে দিচ্ছ দাদা?

আর কিছুই নেই—কী বেচব বলো? ডাক্তার-বদ্যিতে সাফ করে নিয়েছে, যম এসে শেষটা প্রাণটুকু নিয়ে নিল। গাইগরু রয়ে গেছে রোগির জন্য দুধ দিত বলে। দুধ আর মেনকা খেতে আসবে না, গরু কোন কাজে লাগবে?

রঘুপ্রসাদ বলে, তিনি নেই, ছেলে রয়েছে। ছেলে দুধ খাবে। গরু বেচতে হবে না দাদা, দু-আনার জটাজালের ব্যবস্থাই হোক। সে পয়সা না জোটে, আমরা চার স্যাঙাত চাঁদা করে তুলে নেবো।

ততক্ষণে বলরাম গাইয়ের দড়ি হাতে নিয়েছে। বলে, শুধু এক পোয়া দুধে ছেলে বেঁচে থাকবে না। গরু বেচতেই হবে আজ হোক কিম্বা কাল হোক। তবে কেন আজকে নয়? এত জাঁকজমকের চিকিচ্ছের শেষ একেবারে নিরম্বু হলে মানাবে কেন?

শ্মশানের কাজ চুকেবুকে গেল। গিয়েছিল মোট সাত—মেনকাকেও হিসাবে ধরতে হবে। ফেরার কথা ছ-জনের। রঘুপ্রসাদরা চার, এবং এরা বাপ-বেটা দুই। গণে দেখ, ঠিকঠাক ফিরছি তো বটে?

আকাশ মেঘে থমথম করছে। অন্ধকার। দেখ দিকি, কাউকে বউঠান দোসর করে রেখে দিল কিনা? আছিস নীলমণি—মা তোকে তো চোখে হারাত। সাড়া দে, কথা বলতে বলতে হাঁটু—বোবা হয়ে গেছিস যে একেবারে। নাম ধরে ধরে কাঁহাতক ঠাহর করা যায়, গনে ফেল সকলকে, 'কয় শুভঙ্কর মজুত গোনো'।

চিতার আগুনের পাশে কাজের উত্তেজনায় এতক্ষণ রঘুপ্রসাদ চাঙ্গা ছিল, ফিরতি পথে এইবার সুরধুনীর গুণ দেখা দিয়েছে। গণনায় পাঁচ হল।

কে গেল? দেখ দিকি হিসাব করে—

অন্য একজন গণে। অবস্থার ইতরবিশেষ

হয় না—পাঁচই বটে। নীলমণির হাত ধরে বলরাম অন্যমনস্ক ভাবে আগে আগে চলেছে. পিছন তাকিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল ঃ নিজেকে বাদ দিয়ে গ়ুনছ যে তোমরা।

আরও পরে বলরামেরও এক সময় সন্দেহ আসে ঃ পাঁচ না হোক, ছয়ও তো নয়—গোড়াকার সেই সাত পুরোপুরি। তখন বাড়ির কাছে আমবাগানের মধ্যে পুকুরঘাটে এসে বসেছে সকলে। জিরিয়ে নিচ্ছে। মাথার উপরে বড় বড় ডালপালা, আরও উপরে মেঘান্ধকার আকাশ। পাশাপাশি বসেছে. কিন্তু পাশের মানুষটাও ঠাহরে আসে না।

শ্মশান থেকে বাড়ি ঢুকবার মুখে রীতকর্ম আছে। স্নান করে সেই কাজগুলো সেরে যেতে হয়। জিরিয়ে গায়ের ঘাম মেরে ঝুপঝুপ করে এইবারে সব জলে পড়বে। ছ-জন তো হওয়া উচিত, কিন্তু পিছন দিকে ফোঁস করে আবার কে নিশ্বাস ফেলল ?

চমকে ওঠে বলরাম, দু-চোখের সকল দৃষ্টি পুঞ্জিত করে দেখে। আশশ্যাওড়ার ঝোপজঙ্গলের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসেছে. খাঃ—খাঃ খাঃ—খাঃ এমনি ধরনের একটু আওয়াজও কানে পাওয়া যায়। শুধু মেনকা চিতার আগুনেও পুড়ল না—কাঁধে চড়ে গিয়েছিল, অলক্ষ্যে পিছু পিছু এসে মৃত্যু-সময়ের মতো খাওয়ার কথাই বলছে।

আতঙ্কে বলরাম চেঁচিয়ে ওঠে ঃ কে তুমি —কে, কে ?

বলরাম হেসেছিল ওদের গণনার সময়, এবারে রঘুপ্রসাদের পালা। হাত বাড়িয়ে ঘুসি দিল বস্তুটার গায়ে। নেড়ি কুকুর ঠাঁই নিয়ে আছে, কেঁউ-কেঁউ করে পালাল। হেসে সকলে লুটোপুটি খায়। দেখাদেখি বলরামও হাসে। কিন্তু হাসি কেন? মরে ভূতপেত্নী হয়ে নানান মূর্তি ধরে—কুকুরই বা কেন হতে পারবে না ?

স্নান করে উঠে ভিজা কাপড়ে শ্মশান-যাত্রীকে লোহা ছুঁতে হয়। বিদেহীর লোহাকে বড় ভয়। উচ্ছেপাতা বা অমনি কোন তিতো জিনিস চিবিয়ে মুখ বিস্বাদ করতে হয়। এত প্রক্রিয়ার পর মরা মানুষ তবে সংগ ছাড়ে।

কিন্তু মেনকার বেলা কোন-কিছুই খাটল না। বাড়ির বউ বাড়িতেই ফিরেছে—এসে দিনরাত খাই-খাই করে বেড়ায়। চোখে না দেখেও বলরাম অনুভবে বোঝে। একেবারে দেখে নি, তাই বা বলা যায় কেমন করে ? ভূতচতুর্দশীর নিশিরাত্রে ভাঁড়ারঘরের দরজার সামনে ছায়ার মতন দেখেছিল। তালাবন্ধ ছিল তাই রক্ষে, নইলে পরের দিনের পুজোসামগ্রী — মুড়কি-তালশাঁস-নারিকেল নাড়ু সমস্ত বোধহয় শেষ করে যেত। দুপুরে খেতে বসলে রান্নাঘরের বেড়ার উপর চোখ দুটো রেখে একদৃষ্টে খাওয়া দেখে—অমন লোভী দৃষ্টি পড়ার পর ভাত হজম হয় কখনো ? জ্বালাতন করে মারল। আর একদিন—ঝড়বাদলে দুর্যোগময় সে দিনটা—দরজার উপরে কী ধাক্কাধাক্কি! ব্যাপার হল কিনা—নীলমণির জন্মদিন বলে পায়েস রান্না হয়েছে।

বাড়ি-ঘর বাগান-পুকুর যেদিকে তাকানো যায়—মেনকার দেখাদেখি, খাই-খাই করছে সবাই মিলে। গরু বিক্রির টাকা ফুরিয়ে এল, সামান্য অবশেষ। বলরাম একদিন সমারোহে রান্নাবান্নার আয়োজন করল। মাছই দু-তিন রকমের, পায়েস, মাছের মুড়ো দিয়ে কচুশাকের ঘন্ট (মেনকার প্রিয় তরকারি—মাছের মুড়ো এলেই বাগানের কচুশাক তুলে ঘন্ট রাঁধত)। বড় থালায় পরিপাটি করে ভাত বেড়ে চারিপাশে বাটি সাজিয়ে সন্ধ্যার পর হুড়কোর পাশে পথের উপর রেখে এল। গেলাসে জল, বাটায় আস্ত পান কাটা-সুপারি চুন-খয়ের। কলকাতায় চলে যাবে পরমাত্মীয় দিব্যনাথ রায়ের ওখানে। তার আগে থাক এসে শেষ-খাওয়া—সাধ মিটিয়ে খেয়ে যাক।

রাত দুপুরে নেশাখোর রঘুপ্রসাদ এই পথে যাবার সময় হাঁকডাক করে বলরামকে জাগিয়ে তুলল।

থালা-বাটি-গেলাস হুড়কোর ধারে ফেলে রেখেছ দাদা, এক্ষুণি তো চোরে তুলে নিয়ে যাবে।

বলরাম উঠে এসে পরমানন্দে বাসন তুলে নেয়। বাটায় পান ও গেলাসে জল পড়ে আছে, তা ছাড়া বাকি সমস্ত চেটেমুছে শেষ করে চলে গেছে।

রঘুপ্রসাদ বলে, শিবাপুজো নাকি তোমার বাড়ি ? আমায় দেখে শিয়াল পালিয়ে গেল। কিন্তু কাঁসার থালা-বাটি কে কবে শিবা-ভোজনে দিয়ে থাকে !

শিবাপুজোর অনুষ্ঠানে সন্ধ্যার আগে বনের ধারে গিয়ে শিয়ালকে সসম্ভ্রমে নিমন্ত্রণ করে আসতে হয়। এখানে বিনা নিমন্ত্রণে এসে পরিতুষ্ট হয়ে খেয়ে গেল। মানুষই ক্ষিধের জ্বালায় কুকুর-শিয়াল হয়ে যায়—পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় কাগজে একটা ছবি দেখেছিল বলরাম, মানুষে আর কুকুরে ডাস্টবিন থেকে কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। জ্যান্ত মানুষই পারে তো ভূতপেত্নী শিয়ালের মূর্তি ধরে খাবে, এটা অসম্ভব কিসে ?

বেরিয়ে পড়ল বাপ আর ছেলে। কলকাতা শহরে এক পরমাত্মীয় আছেন—দিব্যনাথ রায়। মস্ত বড়লোক। পুঁটলি করে কিছু চাল-ডাল বেঁধে নিয়েছে—সেকালে, রেলগাড়ি হবার আগে, জগন্নাথক্ষেত্রের তীর্থযাত্রীরা

যেমন নিত। তিনখানা চারখানা পাঁচখানা গ্রাম অবধি চেনা মানুষ—যাকে পায়, খবরটা শুনিয়ে দেয়ঃ কলকাতা চললাম। মন খারাপ, বুঝতেই পারছ। ছেলেটা কান্নাকাটি করে। যাই, বেড়িয়ে আসি গে।

দাঁত মেলে হাসির মতো ভাব করে সকলে আনন্দ জানায় ঃ বেশ বুদ্ধি করেছ। কলকাতা ভাল জায়গা। দুটো দিনেই মন ঠিক হয়ে যাবে।

বলে আর নিশ্বাস চেপে নেয়। বলরাম মানুষটাকে ভগবান কত দিয়েছেন না জানি। বউয়ের রাজসূয় চিকিৎসা চালাল দুটো বছর ধরে। সে লেঠা চুকল তো বাপেছেলেয় শহরে যাচ্ছে। কত সব দেখবার জিনিস—হাওড়ার পোল, থিয়েটার, চিড়িয়াখানা, মরা সোসাইটি। বড় বড় দালানকোঠায় সুখের পায়রা হয়ে বকম-বকম করতে চলল।

সকল পথ দৌড়াদৌড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি—। খেয়ানৌকো ওপারে। একবার পার হয়ে গিয়ে পড়েছে, মানুষ না পেলে ফিরবে না। বলরাম কাতর হয়ে ডাকাডাকি করছেঃ চলে এসো ভাই। ক্ষিধেয় ছেলেটা নেতিয়ে পড়ছে। স্টেশনে গিয়ে উঠতে পারলে যে বাঁচি।

অবশেষে দয়া হল মাঝির। নৌকো এপারে এনে বলে, যাবে কোথা?

বলরাম তো, স্টেশনে।

তারপরে? হিল্লিদিল্লি, না ঝিঙেডাঙার গঞ্জ অবধি? সাঁজের বেলা খেয়াঘাটে এসে আবার এমনি দিগদারি করবে তো?

বলরাম সগর্বে বলে, সাঁজের বেলা নয়, কাল নয়, পরশুও নয়। কবে ফেরা হবে, এখন বলা যায় না। কোনদিনই নয় হয়তো। যাব কলকাতা।

খেয়ামাঝির চোখ বড়-বড় হয়ে ওঠে।

বলরাম বলছে, সোনাইছড়ির দিবোদাসকে জানতে মাঝি? সম্পর্কে ভগ্নিপতি হয়। জানতে বইকি—গঞ্জের মাল গস্ত করে তোমার নৌকোয় কতদিন পার হয়েছে। ব্যাপারবাণিজ্যে ফেঁপে গিয়ে কলকাতায় সে একজন লাটবেলাট। বিপদের কথা শুনে অবধি বোন ক্রমাগত লিখছেঃ ছেলেটাকে নিয়ে চলে এসো। ভাবছি, মায়ের অভাবে দেখাশুনোর কেউ নেই। তেমন যদি চাপাচাপি করে পিসির কাছেই রেখে আসব।

ঘাড় নেড়ে মাঝিও সায় দেয়ঃ রেখেই এসো বলরাম। কলকাতা যে সে জায়গা! কল ঘোরালে জল, কল টিপলে আলো। এক বছর দু-বছর বাদে নিজের ছেলে বলে তুমিই চিনতে পারবে না।

বলরাম হেসে বলে, যা বললে মাঝি—আমার ভগ্নিপতির ব্যাপারে হুবহু কিন্তু তাই। ঝিঙেডাঙার গুদাম থেকে কেরোসিনের টিন ঘাড়ে করে খেয়াপার হত, এখন শুনি, পরনের কাপড়খানা হাতে করে তুলতে গেলে দুটো চাকর দু-দিক দিয়ে ছোঁ মেরে কাপড় নিয়ে চানের জায়গায় পৌঁছে দেয়। নাম অবধি বদলেছে—দিবোদাস গুঁই গিয়ে দিবানাথ রায়।

পার করে দিয়ে খেয়ামাঝি ভাড়ার জন্য হাত পাতল ঃ দুটো পয়সা। দু-জনের পারানি।

একফোঁটা ছেলে, তার আবার পারানি! ওর পয়সাটা মাপ করে দাও।

পেট যে মাপ করে না। পাকা-হর্তুকি পেতাম একটা—তাহলে দু-জনের দুটোই মাপ করে দিতাম। দয়াময় বলে নাম হয়ে যেত।

(পাকা হরিতকী খেলে নাকি ক্ষুধা-তৃষ্ণা চিরকালের মতো ঘুচে যায়। কিন্তু পাচ্ছি কোথায় সে বস্তু—কাঁচা অবস্থায় হরিতকী ঝরে পড়ে। মানুষ কত কি করছে—এমন কিছু পারে না ডালে ডালে যাতে হরিতকী-ফল পেকে থাকে? সকল দায়ে নিশ্চিন্ত—দুনিয়া কত সুখের হত!)

শহর কলকাতা। মুগ্ধ নীলমণি বলে, ও বাবা, কত মানুষ! রথের মেলা লেগেছে বুঝি?

বলরাম সহাস্যে বলে, এ শহরে নিত্যি-রথের মেলা। বারো মাস, চৌপহর দিন। চলে আয়—

কয়েক পা গিয়ে নীলমণি আবার থমকে দাঁড়ায় ঃ বাবা, কত সব গাড়ি। এক, দুই, তিন—

গর্ব ভরে বলরাম বলে, এই কটা দেখেই তাক লেগে গেল! চল্ এগিয়ে, কত গাড়ি দেখবি।

গুণে গুণে বত্রিশ অবধি উঠেছে। কিছু বিরক্ত হয়ে বলরাম বলে, পা চালিয়ে চল্ রে বাবা। কত গুণবি, তোর ধারাপাতে কুলোবে না। আকাশের তারা পাতালের বালির মতো গুণে পারা যায় না।

এতক্ষণে নীলমণিও বুঝেছে সেটা। গোনা অসম্ভব। প্রশ্ন করে, গাড়ি চড়ে এত মানুষ যায় কোথা বাবা?

বহুদর্শী বলরাম বলে, কাজকর্মে যায়, বিনি কাজেও ঘুরতে যায়। টাকার মানুষ হাঁটতে পারে না তো—

খোঁড়া?

পায়ে হাঁটা ছোট কাজ। আমরা হাঁটি আবার বড়লোকেও যদি হাঁটবে, তফাৎটা রইল কোথা? টাকা হলে আমরাও কি হাঁটতে যাব, রাস্তার এপার-ওপার হতেও গাড়ি। আজকে হাঁট—পা চালিয়ে হাঁট রে বাবা। উল্টোডাঙা কি এখানে?

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। রাত্রিবেলা চারিদিক আলো-আলো হয়ে শহরের নতুন বাহার। মানুষগুলোর চেহারাও বুঝি পালটে যায়। দিনমানে ছিল কাজকর্মের মানুষ, এখন উল্লাসের। সেজেগুজে হাসি ছড়াতে ছড়াতে চলেছে দেখ।

সেই মায়া-জগতের ঝলমলে রাস্তা ধরে দূর-পাড়াগাঁয়ের মানুষ বলরাম-নীলমণিও যাচ্ছে। একটা বড় সুবিধা, ছিন্নবেশ এবং নগ্নপায়ে পথ হাঁটতে মানা নেই। এমন কি কলের জলও যত খুশি খাওয়া যায়, সেজন্য পয়সা দিতে হয় না। এত বড় শহর জায়গায় এই তো অনেক।

হাঁটছে দু-জনে। নীলমণি ঘ্যান-ঘ্যান করছে ঃ ও বাবা, খেতে দাও কিছু। হাঁটতে পারি নে।

এই তো জল খেলি একবার। আর খানিকটা না হয় খেয়ে নে। পেট ভরতি করলে লোকসান। বড়লোকের বাড়ি—গেলেই তো খেতে নিয়ে বসাবে।

কিন্তু পথ চিনে উল্টোডাঙায় যাওয়া রাত্রের মধ্যে ঘটে উঠল না। একবাড়ির পাকা রোয়াকে পড়ে ছিল। সকালবেলা গিয়ে পৌঁচেছে। অজ পাড়াগাঁয়ের লোক—সদর-অন্দরের তফাত বোঝে না, 'দিদি', 'দিদি' করে একেবারে ভিতর-উঠানে।

আমার দিদি হয় গো, বড়-মাসিমার মেয়ে, বাইরের লোক নই আমরা। ও দিদি, অমন করে কি দেখছ? আমি বলরাম, এই আমার ছেলে।

এত পরিচয়েও দিদি ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে থাকেন। আশ্চর্য বটে! টাকা হলে লোকে শুধু খোঁড়াই হয় না, কানাও হয়। টাকার দোষ বিস্তর।

আমি বলাই গো, যেটা বললে চিনবে। তোমায় বিয়ের মাছ ধরতে গিয়ে পুকুরঘাটে আছাড় খেয়েছিলাম কপালের উপর এই যে দাগ এখনো আছে। দেখ।

দিদি এতক্ষণে চিনলেন মনে হচ্ছে।

হঠাৎ কি মনে করে?

প্রশ্নের ধরনে বলরাম ঘাবড়ে গেল। আপনজনের কাছে বউয়ের মৃত্যুর কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলবে। এবং দিদিই তখন প্রস্তাব করবেন—বাঁধন কেটেছে তো থেকে যাও এখানে দিনকতক। যাবার সময় ছেলেটাকে বরঞ্চ রেখে যেও। শহরে আমোদ-স্ফূর্তিতে থাকবে, মরা মায়ের কথা মনেই পড়বে না তার। এদের এই এলাহি ব্যাপারের মধ্যে একটি দুটি মানুষের কম-বেশিতে যায় আসে না কিছু, খোঁজই হবে না। দিদির কথার কি জবাব হবে তা-ও বলরাম ভেবে এসেছে। কিন্তু গোড়াতেই সব উল্টোপাল্টা হয়ে যায়।

ছেলের হাত ধরে কলকাতা অবধি ধাওয়া করেছ, ব্যাপার কি বলাই?

বলরাম আমতা-আমতা করে বলে, সর্বনাশের কথা চিঠিতে সবই তো লিখেছি দিদি। ঘরে মন টিঁকল না—ভাবলাম, আত্মীয়স্বজনদের দেখেশুনে আসি।

এখান থেকে আর কোথায় যাচ্ছ?

প্রশ্ন করে জবাব আসার আগেই দিদি অলক্ষ্য কার উদ্দেশে হাঁক দিয়ে উঠলেনঃ ছেলেমানুষটা এসেছে,— শুধু-মুখে চলে যাবে, জলটল দে কিছু খেতে।

সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় প্রশ্ন ঃ যাচ্ছ কোথা এখন?

খুঁজে খুঁজে এই কষ্ট করে এল, ধুলো-পায়েই যে বিদায় করতে চায়। মরীয়া হয়ে বলরাম বলে, এবেলাটা থেকে যাব দিদি।

এখানে? সে তো ভাল কথা, চমৎকার কথা—

দিদিও হকচকিয়ে গেছেন, শহরের মানুষ এ ভাবে বলে না, লাগসই উত্তরটা পাচ্ছেন না। বললেন, কত কাল পরে দেখা। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমাদের অবস্থা—

বলরাম চতুর্দিকে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। ভাল বই খারাপ তো কিছু নজরে আসে না। উপরে নিচে ব্যস্তসমস্ত ঝি-চাকরের দল এঘর থেকে ওঘর থেকে প্রাতরাশের উচ্ছিষ্ট বাসন কলতলায় এনে গাদা করছে। সরকার বাজারের ঝুড়ি একটা লোকের মাথায় দিয়ে দালানে এনে নামাল। ঝি একজন ছুটে এসে বঁটি পেতে মাছ কুটছে। উপরে থেকে স্ত্রী-কণ্ঠের হুকুম ঃ খান চারেক মাছ ভেজে শিগগির দিয়ে যাও ঠাকুর। উত্তম সাজ-গোজের কাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে হুড়োহুড়ি করছে বারান্দার উপর। এই প্রহর দেড়েক বেলায় ধনীর বাড়ির অন্দরমহল যেমনধারা গমগম করবার কথা, তেমনি।

মুখে তবু যথাসম্ভব উদ্বেগের ডাক এনে বলরাম প্রশ্ন করে, হয়েছে কি দিদি?

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখগে। তোমার ভগ্নি-পতির মাড়ি ফুলে ঢোল। কাল থেকে মুখে কুটোগাছটি কাটেন নি।

কিন্তু সেই মাড়িটার দরুন বাড়ির অন্য সকলেও যে উপোস করে পড়ে আছে, সে ব্যাপার নয়। উল্টোটাই বরঞ্চ। তবু শশব্যস্তে যেতে হয় ঘরের মধ্যে মাড়ি ফুলিয়ে ভগ্নিপতি যেখানে বসে আছেন। বলরাম আর নীলমণি ঢপাঢপ করে পায়ের গোড়ায় প্রণাম করল।

মাড়ি ফুলুক যাই হোক, কথার বিন্দুমাত্র অকুলান নেই। কেরোসিন টিন ঘাড়ে বয়ে আনতেন, সেই থেকে কী করে এত বড় ডিপো গড়লেন তারই আনুপূর্বিক কথা। সেকালের দরিদ্র-দশা যারা দেখেছে, তাদেরই একজনকে পেয়ে দিবানাথ শতমুখ হয়ে গেছেন। আঙুল ফুলে কী করে কলাগাছ হল সেই কাহিনী।

কলকাতায় এসেও দিবোদাসের কেরোসিন বেচা-কেনা। ডিপো থেকে দুটো টিন কিনে দু-হাতে ঝুলিয়ে ঘোড়ার-গাড়িতে তুলছেন। গায়ে মাত্র গেঞ্জি, চেহারাটা বড় ভাল—বোঝার ভারে পেশীগুলো ফুলে উঠেছে। কোম্পানির সাহেব সেদিন ডিপোয় এসেছে কি কারণে, দিবোদাসকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অফিসের ঠিকানা দিয়ে দিল। ক'দিন যাতায়াত সেই অফিসে। এক মেম-সাহেব স্টেনো সেখানে, তার সঙ্গেও জানাশোনা হয়েছে। সাহেব বলে দিল, খালের ধারে একটা ঘরভাড়া কর তুমি, তারপরে যা করতে হয় বলব। মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায় এক খোপ টিনের ঘর নিলেন এই উল্টোডাঙায়। মাস গেলে সেই পাঁচ টাকার কি উপায় হবে ভেবে পান না। সেই কথা মেম-সাহেবকে ক্লায়ক্লেশে বোঝালেন বাঙাল টানের কথার মধ্যে গোটা পাঁচ-সাত ইংরেজি কথা ঢুকিয়ে দিয়ে। মেম-সাহেব খুটখুট করে হেসে পাঁচটা টাকা টেবিলের উপর রেখে বলল, ভাড়া চুকিয়ে দাওগে যাই, সাহেবকে আমিও বলব। এবং কার বলার গুণে জানি না, ডকের গুদাম থেকে সাহেব পুরো এক নৌকো মাল পাঠিয়ে দিলেন উল্টোডিঙির ঘরে। খদ্দেরও সেই মালের পিছু পিছু।

এমনি চলল। এই সময় লড়াইটা থেমে গেল ভাগ্যক্রমে। বাজারে কেরোসিন আমিল। দিবোদাস সেই মওকায় দিব্যনাথ হয়ে গেলেন, গদ্দি পদবি দিয়ে রায়।

বলতে বলতে হঠাৎ দিব্যনাথ ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : হলে হবে কি, ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। পুরোনো জানা-শোনার মানুষ বলে তোমাকেই শুধু বলতে পারছি। টাকা চোখে দেখা যায় না। এত লোকজন ঠাটবাট কুলিয়ে উঠতে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি। এর চেয়ে কাঁধে মাল বয়ে ব্যবসা করতাম, সেই বোধহয় ভাল ছিল। এত অভাব-অভিযোগ ছিল না। দাঁতের যন্ত্রণায় কাল যাইনি, সকাল থেকে এক-শ গণ্ডা টেলিফোন। মরতে মরতেও আজ বেরুতে হবে, না হলে রক্ষে নেই।

বানিয়ে বানিয়ে দুঃখের কাঁদুনি গাইছেন, মনে হয় না। এত বড় ডিপোর মালিক, এত ধনদৌলত বাড়ি-গাড়ি—অভাবের তবু অবধি নেই। মানুষের টাকা যত বাড়ে, পেটও বড় হয় বুঝি সঙ্গে সঙ্গে। তিরিশ দিনের চকটা যে নেই—এদের অনটনের সংসারে কিছু দিয়ে যেতে ইচ্ছে করে বলরামের।

দিব্যনাথ আবার বলেন ভাল লাগে না সত্যি বলছি বলাই। কাশীধামে বিশ্বনাথগলির কাছে ঠিক গঙ্গার উপর একটা বাড়ির সন্ধান পেয়েছি। দরাদরি হচ্ছে—বাড়িটা পেয়ে যাই তো বাবা বিশ্বনাথের পদতলে গিয়ে পড়ব। চিরকাল খাটব নাকি। পেরেও উঠছি নে আর।

ঠিক বলরামেরই দোসর। খাই-খাইয়ের তাড়নায় বলরাম এসেছে কলকাতা, উনি পালাতে চান কাশী। মানুষের উপায় নেই একমাত্র পাকা-হরিতকী ছাড়া। দীর্ঘ কথা-বার্তার ফলে বলরামের মোটের উপর একটা লাভ—অনেকখানি দেরি করিয়ে দিলেন—। অবস্থা যা-ই হোক, দুপুরবেলাটা অন্ততঃ না খাইয়ে ছাড় পাচ্ছেন না।

খাওয়ার পর বিশ্রামের নামে বলরাম চোখ বুজে পড়ল। সন্ধ্যাটা পার করে দেবে ভেবেছিল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। কিন্তু বলরামেরই সম্পর্কে দিদি হন—তিনি আরও সেয়ানা। এসে পড়ে গা ঝাঁকাচ্ছেন। এমন ঝাঁকানি মরে গেলেও লাফিয়ে না উঠে উপায় নেই। বলছেন, কত আর ঘুমোবে বলাই? বেলা পড়ে গেল। সেই যে কোথায় যাবার কথা, কখন যাবে?

বলরাম ধীরেসুস্থে উঠে আড়ামোড়া ভাঙছে।

দিদি বিষম ব্যাকুল হয়ে ওঠেন : ডিপোর লোকেরা এইবারে এসে পড়বে। তারা থাকে এই ঘরে, তাদের বিছানা। উঠে পড়, বিছানা ঠিকঠাক করে রাখুক। রগচটা মানুষ সব, বিছানা জুড়ে শুয়ে আছ দেখলে আগুন হবে।

বেরিয়ে না পড়ে অতএব উপায় নেই। শহরের মানুষ আর কোথায় কে জানা আছে, ভ্রূকুঞ্চিত করে বলরাম ভাবতে লাগল।

আরও চারটে পাঁচটা দিন বোধহয় গেছে। রাস্তায় রাস্তায় এখন। নীলমণি দু-পা করে যাচ্ছে, আর থমকে দাঁড়ায়। বলরাম খিঁচিয়ে ওঠে : কি হল রে?

শহরের শোভা দেখছে না আজ। গাড়ি গুণছে না। কেঁদে বলে, ক্ষিধে পেয়েছে, খাবো—

ক্ষিধের নাম শুনে বলরামেরও পেট চোঁ-চোঁ করে উঠল। বিকৃত মুখে বলে, সকালে ক্ষিধে দুপুরে ক্ষিধে সন্ধ্যার ক্ষিধে রাতে ক্ষিধে—পাকা হর্তুকি ছাড়া রাক্ষুসে ক্ষিধের রক্ষে হবে না। নেই কিছু, কোথায় পাবো?

খাবারের দোকানের কাচের দিকে আঙুল দেখিয়ে শিশু বলে, ঐ যে কত সব রয়েছে।

আমার বাপের দোকান কিনা, চাইলেই অমনি দিয়ে দেবে! চল্, চল্—

পারছি নে আর বাবা। খেতে দাও।

বলরামের হঠাৎ যেন অসুরের শক্তি আসে দেহে। হাঁটতে পারিনে বলে নীলমণি যত কাঁদে, ততই সে পায়ের জোর বাড়িয়ে দেয়।

ক্ষুধাতে শিশুর কবল থেকে ছুটে পালাবে। ঘরবাড়ি ছেড়ে যেমন পালিয়েছে। মরা-বউটার হাত থেকে। নীলমণি যত পিছিয়ে পড়ে, ফ্যূর্তি ততই বাড়ে। আরও জোর দেয়।

দূরে পড়ে গিয়ে ছেলে এখন মর্মান্তিক চেঁচাচ্ছে : খেতে দাও ও বাবা, খাবো, খাবো—

শিশু তাড়া করেছে, প্রেতিনী মা যেমন করে তুলেছিল। পায়ের জোর না থাক, গলার জোরটা ভয়ানক। ছুটছে বলরাম এই কল-কাতার রাস্তার উপরে যতদূর সম্ভব। প্রাণের দায়ে ছুটছে যেন। বাদাবনে বাঘের তাড়ায় কাঠুরে যেমন পালায়। বেঁচেও যেত ঠিক। খানিকটা দূরে ডাইনের গলিটা নিরিখ করে নিয়েছে, সাঁ করে তার মধ্যে ঢুকে পড়ত। শিশুর বাপের ক্ষমতা ছিল না অলিগলির মধ্যে খোঁজ করে ধরবার। কিন্তু দুর্দৈব—

সিনেমা ভেঙে মেয়েদের একটা দল মাঝ-খানে পড়ে গেল। কলহাস্যময়ী। বাতাস হাসির উচ্ছ্বাসে আর অঙ্গের সুবাসে ভরেছে। পাহাড় কিম্বা দুস্তর নদী হঠাৎ যেন পথ আটকে দিল। পেরে উঠল না, নীলমণি আবার এসে পড়েছে।

খাবো খাবো—ও বাবা, খেতে দাও। বাবা গো—

শরীরটা বলরামের হঠাৎ বিষম ভারী লাগছে। দশমণি বিশমণি পাথর যেন এক-খানা, নড়ানো যায় না। অসহায়ের মতো পিছন দিকে তাকায়। খাবো খাবো—করে দুর্বার নির্ঘাতের মতো একফোঁটা ছেলে তেড়ে আসছে। দূরত্ব ক্রমেই কমছে। কাছে, একে-বারে কাছে পড়ল—বাবা বলে দুহাতে জাপটে ধরবে এইবার।

মাথার মধ্যে বনবন করে কেমন যেন পাক দিয়ে ওঠে। ছুটে এসে কঠিন মুঠিতে ধরল নীলমণিকে ঠ্যাং দুটো ধরে উঁচু করেছে। ছেলে আর্তনাদ করে ওঠে। কতটুকু বা সময়! উঁচু করে তুলে আছাড় মারল সিমেন্ট-বাঁধানো ফুটপাথের উপর।

তার পরে যেমন হয়। জনতা ক্ষেপে গিয়ে কিল-চড়-লাথি মারছে বলরামকে। এরা যে বাপ ছেলে, কে জানতে যাচ্ছে? মারতে মারতে ভূমিশায়ী করে ফেলেছে, তারও উপর চলছে। পুলিস না এসে পড়া পর্যন্ত চলবে এই রকম। মেরে মেরে হাতের সুখ করছে।

হঠাৎ মানুষ ছুটে পালায় : মরে গেল নাকি রে? বেআন্দাজি মার মেরেছে—কী দরকার ছিল? এত করে মানা করছি—

পুলিস এসে পড়ল ধীরেসুস্থে। অ্যাম্বুলেন্স এল। পিতাপুত্র দু-জনে অচেতন। হাসপাতালে এক গাড়িতে চলল।

ঠোঁট নড়ছে বলরামের। কান এগিয়ে সহৃদয় একজনে প্রশ্ন করেন, ও বুড়ো কী বলছ তুমি?

খাবো—
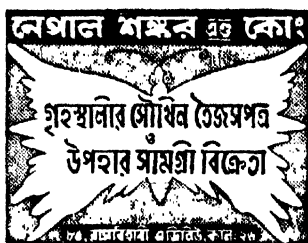
স্টেশনের নামটা অদ্ভুত রাজাভাতখাওয়া। কোন্ এক রাজা নাকি কী একটা উৎকট পণ রক্ষা ক'রে এখানে ব'সে ভাত খেয়েছিলেন। তা খান, আমাদের আপত্তি নাই। আপত্তি এই যে, এমন সৃষ্টিছাড়া স্থানও যে ভূ-ভারতে থাকতে পারে তা কল্পনায় ছিল না। পাহাড়ে আর জঙ্গলে চারদিক থেকে জায়গাটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরেছে তারই মাঝখানে মীটার গজ লাইনের ছোট্ট একটি রেল স্টেশন—এ ছাড়া দূরে বা নিকটে গ্রাম বা শহর বলে যদি কিছু থাকে তা জানবার উপায় নেই—পাহাড় আর জঙ্গল দৃষ্টির অন্তরায়। গাড়িতে আসবার সময়ে দু' মিনিট আগেও বুঝতে পারিনি যে, একটা স্টেশনের কাছে এসে পড়েছি। গাড়ির গতি একটু মন্দ হতে অনুভব করে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি যে সামনেই স্টেশন। এ যেন জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে এতটুকু একটু লোকালয় প্রদীপ। নেমে পড়লাম। দু'জন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন, ওঁদেরই আমি অতিথি।

পাঠকেরা হয়তো ভাবছেন এমন স্থানে আসবার কি প্রয়োজন ছিল। কিছুই প্রয়োজন ছিল না তবে কিনা রবীন্দ্রনাথ নামে একজন বাঙালী কবি কিছুকাল আগে দেহরক্ষা করেছেন, বৈশাখ মাসে তাঁর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একে যদি প্রয়োজন বলা যায় তবে সে প্রয়োজন কবির নিশ্চয় নয়। আমারও নয় বলে
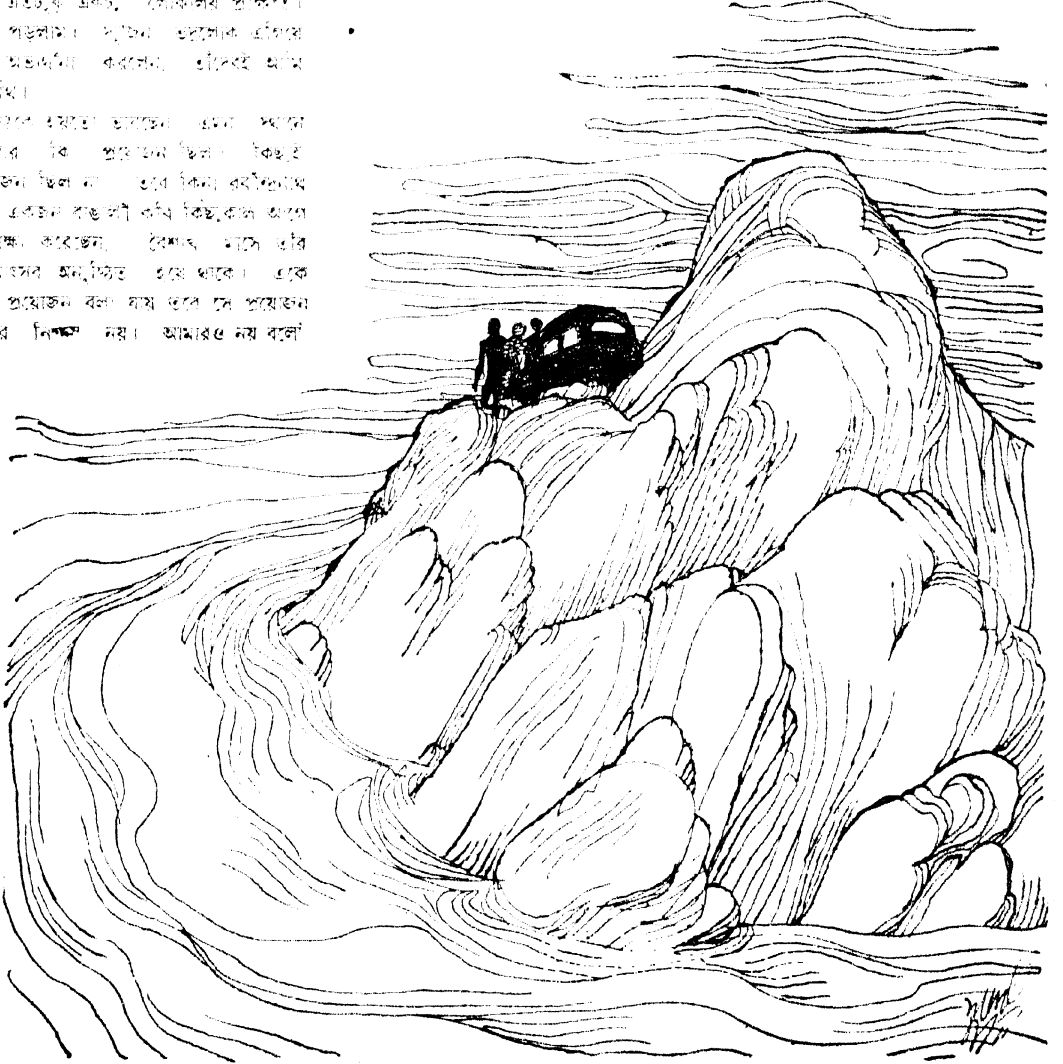
মনে করি। জামালগুড়ি চা-বাগানের যে সব উদ্যমী যুবক এই উপলক্ষে আমাকে এতদূরে টেনে এনেছেন তাদেরও নিশ্চয় নয়। তবে কার? একেই বলে ভূতের বেগার।

নমস্কার স্যার, পথে নিশ্চয় কষ্ট হয়েছে।

না, না, কষ্ট কোথায়? বেশ আরামে এসেছি।

এই পর্যন্ত বলে মনে মনে বললাম, পথ তো এখনো ফুরোয়নি।

এমন মর্মান্তিক সত্য অনুভূতি অল্পই ঘটেছে। অল্পক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম।

আসুন স্যার, এবারে রওনা হতে হবে।

অনেক দূর নাকি?

দূর আর কই—কুড়ি পঁচিশ মাইল। অপর যুবকটি বলল, চমৎকার পাকা রাস্তা। ঘণ্টাখানেকে পৌঁছে যাবো।

ছোট একখানা মোটর গাড়িতে করে তিনজনে রওনা হ'লাম—ড্রাইভারকে নিয়ে চারজন।

সরু কালো ফিতের মতো পীচঢালা পথ, দু'পাশে ঘন বনস্পতির অরণ্য, দু হাত ভিতরে দৃষ্টি চলে না, বনস্পতির তলায় আগাছার নিবিড় জঙ্গল। এ যেন পথের দু'দিকে দুর্ভেদ্য উদ্ভিদের প্রাচীর উঠে গিয়েছে। উপরের দিকে চাইলে দেখতে পাওয়া যায়—ঐ অনেক উঁচুতে দু'পাশের গাছের মাথায় মাথায় মিলে গিয়েছে। এ যেন উদ্ভিদের একটি অন্তহীন টানেলের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে কাজেই টানেল ঘন অন্ধকার কেবল মোটরের বাতি দুটো আলোর সম্মার্জনী নিক্ষেপ করে পথ ঝাঁট দিয়ে চলেছে। ঐ ক্ষীণ আভাতে অন্ধকার আরো ভয়াবহ হয়ে চোখে পড়ছে।

আমি শহরের মানুষ, বনজঙ্গলের কথা বই ছাড়া পড়িনি, বললাম বাঘ টাঘ বের হবে না তো।

না স্যার, বাঘ কোথায় মানুষের দাপটে সব ভুটান পাহাড়ের দিকে চলে গিয়েছে।

বাঘও যে মহাপ্রস্থানের পথে যেতে পারে নূতন জানলাম।

অপর যুবকটি বলল, ভয় যা হাতীর।

তার মানে?

মাঝে মাঝে বের হয় কিনা।

তবে তো মুশকিল।

মুশকিল আর কি। গাড়ি থেকে নেমে দূরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

তারপর?

তারপরে আর কি? ধীরে ধীরে চলে যায়—আর তেমন তেমন খেয়াল হলে গাড়ি-খানা দুমড়ে ভেঙে ফেলে দিয়ে যায়। ভারি মেজাজী জানোয়ার।

গাড়ি ভেঙে ফেললে হেটে যেতে হয়?

তা ছাড়া আর কি উপায় আছে বলুন।

তা বটে। মনে মনে বললাম—ভয় আর কাকে বলে।

একজন বলে উঠল—আসল ভয় কি জানেন?

ভাবলাম এ সব তবে আসল ভয় নয়। শোনাই যাক সে বস্তু না জানি কি।

পথে একটা নদী আছে।

নৌকায় পার হ'তে হবে বুঝি।

এ সব পাহাড়ী নদীতে নৌকো কোথায়?

খুব স্রোত বুঝি?

জল নেই তার স্রোত। স্যার, আপনি বুঝি এদিকে এই প্রথম?

প্রথম (এবং শেষ—এটা অবশ্য মনে মনে)।

হঠাৎ বন্যা নামে।

হঠাৎ?

এ তো বাংলাদেশের বন্যা নয় যে, বৃষ্টি দেখে বা নদীতে জল বাড়তে দেখে বুঝতে পারা যাবে। এ দেশের বন্যা আধ ঘণ্টা আগেও বুঝতে পারা যায় না।

অপর যুবকটি ব্যাখ্যা করে বলল, পাহাড়-গুলো কাছেই কিনা। দু' তিন মাইলের মধ্যেও পাহাড় আছে। সেখানে বৃষ্টি হলেই পাহাড়ের সমস্ত জল ঝাঁপিয়ে চলে আসে মালখাই নদী দিয়ে।

বৃষ্টি এখন হচ্ছে নাকি?

বৃষ্টি কোন্ সময় না হচ্ছে। স্যার, ডুয়ার্সে দুটো ঋতু বর্ষা আর শীত।

বেশতো বন্যা দেখলে নদীতে না নামলেই চলবে।

বন্যা দেখলে আর নামবো কেন।

তবে আর কি ভয়?

নেমেছি এমন সময়ে বন্যা এসে পড়লেই ভয়।

তেমনও ঘটে নাকি?

যুবক দু'জন সমস্বরে বলে উঠল—খু-ব।

এমন কখনো ঘটেছে নাকি? কতবার?

এই তো সে বছর জোয়ালখালি চা বাগানের ম্যানেজার মিস্টার জেফ্রি গাড়ি-সুদ্ধ বন্যার মুখে পড়ে গিয়েছিল।

মারা গেল নাকি?

মিস্টার জেফ্রি অনেক কষ্টে বেঁচে গেল কিন্তু মিসেস জেফ্রি যে কোথায় তলিয়ে গেল আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

অপর যুবক বলল, পাঁচ সাতদিন পরে পাওয়া গিয়েছিল মাইল পঁচিশ ত্রিশ দূরে। তবে তখন আর চিনবার উপায় ছিল না—পাথরের ধাক্কায় ধাক্কায় একটা মাংসপিণ্ড মাত্র।'

সাহেব কি করলো?

মিস্টার জেফ্রি বছর খানেকের মধ্যেই চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গিয়েছে।

লোকে তো বলে স্যার—

এই যে নদীতে এসে পড়েছি বলে উঠল অপর যুবকটি।

নদীর কাছে বন না থাকায় অনেকটা ফাঁকা। তারার আলোয় আর মোটরের আলোয় মালখাই নদীর চেহারা দেখতে পেলাম। অনেকটা চওড়া সত্য, নদীগর্ভে ছোট বড় উপল বিছানো—ওর উপর দিয়েই পথ—অর্থাৎ মোটর চলাচল করে। অদূরে একটা উঁচু দ্বীপের মতো।

ওটা কি?

ওটা দ্বীপ। বন্যার সময়ে ওখানে উঠে প্রাণ বাঁচায়।

ওখানে উঠেই তো মিস্টার জেফ্রি প্রাণ বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিল।

ওটা যদি তলিয়ে যায়!

তবে এ অঞ্চলে একখানা গ্রামও জেগে থাকবে না।

ভয়ংকর যার কীর্তিকলাপ সেই নদী কিন্তু আমরা একেবারে নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেলাম। সংসারে ভীষণতম ভয়ের ব্যাপারগুলো অধিকাংশ সময়েই মনে মনে ঘটে।

॥ ২ ॥

দু'দিন জামালগুড়ি চা বাগানে কাটিয়ে আবার ফিরে চলেছি। শেষ রাতে গাড়ি ধরতে হবে রাজাভাতখাওয়া স্টেশনে, তাই রাত্রে আহারান্তে বেশ খানিকটা সময় হাতে রেখে রওনা হ'লাম। সেই পথ, সেই গাড়ি, সেই দু'জন যুবক সঙ্গী। এ দু'দিন মন্দ কাটে নি। তবে রবীন্দ্র জন্মোৎসব কেমন হ'ল জিজ্ঞাসা বাহুল্য, যেহেতু অধিকাংশ চায়ের বাগান এবং অধিকাংশ রবীন্দ্র

জন্মোৎসব সভা একই ছাঁচে ঢালাই। ওর মধ্যে ছোট বড় আছে, তবে ছাঁচ আলাদা নয়। কাজেই যাঁরা একটি চায়ের বাগান ও একটি রবীন্দ্র জন্মোৎসব সভা দেখেছেন তাঁদের সব দেখা হ'য়ে গিয়েছে। অতএব ও আলোচনা বাহুল্য।

অনেকক্ষণ নীরবে চলবার পরে মৌন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে বললাম, আকাশে খুব মেঘ করেছে।

একটি যুবক বলল, এদিকে আকাশে কখনো মেঘ নেই স্যার?

শীতকালে?

ঘন কুয়াশা মেঘের চেয়েও খারাপ। মেঘ তবু কতকটা উঁচুতে, কুয়াশা দরজা জানলা দিয়ে ঢুকে চোখে মুখে ভেজা গামছা চাপা দেয়।

যুবক দুটির কথাবার্তা শুনলে বেশ বুঝতে পারা যায় এরকম প্রশ্নে অভ্যস্ত, উত্তরগুলো সব সময়েই হাতের কাছে গোছানো থাকে। চায়ের বাগানের মতো চায়ের বাগানের বাবুদের কথাবার্তাও বুঝি এক ছাঁচে ঢালা।

বললাম পথে আবার না বৃষ্টি নামে!

একজন বলল, নদীটা পেরিয়ে গেলে নামুক যত খুশি বৃষ্টি।

বললাম বন্যা নামলে নদী পার হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, কি বলেন?

অসম্ভব বই কি! সেইজন্যেই তো একটু আগে বের হলাম। নইলে দোকানের গাড়ি, ঘণ্টা দুই আগে বের হলেই চলতো।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা চললো। তারপর ..... একে ভরা পেট তাতে রাত্রি হয়েছে, তার উপরে ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস। চাদর মুড়ি দিয়ে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে কতক্ষণ জানি না একটি যুবক বলে উঠল উঠুন স্যার, উঠুন নদীর ধারে এসে পড়েছি।

ঘুমের ঘোরে শুনলাম নদীতে বান এসে পড়েছে। ধড়ফড় করে জেগে উঠে বললাম—বান এসে পড়েছে তবে তো মুশকিল!

ওরা বলল, বান কোথায়? দিব্বি শুকনো। তাইতো দেখছি।

নিশ্চিন্ত মনে মোটর নদীর মধ্যে নেমে গেল। গাড়ি অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে এমন সময় এক তুমুল কলরব উঠল।

স্যার নামুন,

কেন, কি হয়েছে?

ড্রাইভার ও সঙ্গী দুজনের মুখ থেকে সমস্বরে একটিমাত্র শব্দ বের হ'ল—বান।

গাড়ি থেকে নেমে দেখি তিনজনে মোটরখানা ঠেলছে। আপদ্‌ধর্মে অতিথি বিচার নেই—বলল, স্যার একবার যদি হাত লাগান।

চারজনে মোটরখানা ঠেলছি। যাওয়ার সময় ঐ যে উঁচু দ্বীপটা দেখেছিলাম, বুঝলাম, তার উপরে তুলতে হবে গাড়িখানা।

আমার অবস্থা উপভোগ করবার মতো বটে! স্থান অজানা, রাত্রি ঘনান্ধকার, পশ্চাতে ধাবমান মৃত্যুর বন্যা, অচেনা এক নদীগর্ভে রাত্রি দ্বিপ্রহরে মোটর গাড়ি ঠেলছি।

ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। বন্যার কলগর্জনের মধ্যেও তার টুকরো ভেসে আসছিল আমার কানে।

গাড়িখানা তুলতে পারবো কি?

বোধহয় পারবো, এখনো মিনিট দশেক সময় পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে।

স্যার, বড় কষ্ট দিলাম।

সে কি কথা! প্রকৃতির খেয়ালের দায়িত্ব তো আপনাদের নয়!

অবশেষে দ্বীপের নীচে এসে উপস্থিত হলাম, দেখলাম গায়ে বেশ প্রশস্ত পথ।

এখানে এমন সুন্দর পথ হ'ল কি করে?

মিস্টার জেফ্রি এই দ্বীপে উঠে রক্ষা পেয়েছিলেন তারপরে তৈরি করে দিয়েছেন পথটা, যাতে বিপদের সময়ে লোকে সহজে মোটর তুলতে পারে।

মোটরখানাকে ঠেলে দ্বীপের মাথায় তুলে চারজনে শুয়ে পড়লাম, বসে থাকবার মতো শক্তি কারো দেহে অবশিষ্ট ছিল না। আকাশের দিকে চোখ পড়তেই দেখি ..... একটা বন্যা আসন্ন হয়ে উঠেছে। মেঘগুলো তাড়া খেয়ে ছুটছে, তারাগুলো হাবুডুবু খাচ্ছে, সমস্ত আকাশটায় চলছে একটা সমুদ্র মন্থনের পালা। কিন্তু অধিক ..... করবার সময় ছিল না। সেকালের বিজয়ী রাজারা হতভাগ্য পরাজিতকে রথ-চক্রে বেঁধে নিয়ে যেতো তেমনি ..... সমারোহে আসছে ঐ পাহাড়ী বন্যা। অন্ধকারের রথারোহণে নিশীথের মৌন প্রহরগুলিকে বেঁধে নিয়েছে রথের চাকার সঙ্গে। অতিকায় একটা নিরেট হাতুড়ির মতো সমস্ত বন্যাপ্রবাহ একবেগে আঘাত করলো ক্ষুদ্র দ্বীপটাকে। মনে হল চরাচর কাঁপছে। কারো কথা কেউ শুনতে পাচ্ছি না, মনের মধ্যেকার চিন্তাগুলোও যেন ঐ শব্দে চাপা পড়ে গিয়েছে। দ্বীপের মজ্জার মধ্যে আছে পাথর তাই তাকে ধসাতে পারলো না, সেই ক্ষোভে অধিকতর ফেনিল, কুটিল, জটিল হয়ে, ফুলে ফেঁপে, গর্জে, যমরাজের বাহন মহিষের মতো খরখড়্গ শৃঙ্গ দ্বারা ঢুঁরে পরে ঢুঁ মেরে সহস্রকণ্ঠের হল-হলায় দিগ্‌দিগন্ত ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত ক'রে তরল মৃত্যু দুই চক্ষুর সীমানা অবধি বিস্তারিত হয়ে গিয়েছে। ভালো করে দেখে মনে হ'ল যেন আর একখানা আকাশ বন্যায় উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে; কালো জল, কালো মেঘ, ফেনার চমক তারা, আর ঐ গর্জন ছাপিয়ে গিয়েছে মেঘের ডাককে।

চারজনে নীরব। এমন উপচীয়মান মৃত্যুর সম্মুখে কীই বা থাকতে পারে বলবার।

কিছুক্ষণ পরে, কতক্ষণ বলতে পারি না, কানের প্রতায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে ঐ মহা-কালীর লোলিহ রসনার সম্মুখে—সঙ্গীদের একজন বলে উঠ্‌ল, যাক্‌, বেঁচে গেলাম।

তাইতো মনে হচ্ছে ভাই, আর জল বাড়বার আশঙ্কা নাই।

এতক্ষণ তাদের নীরবতার কারণ বুঝতে পারলাম। অভ্যস্ত চোখ ও অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে ওরা বিচার করছিল বন্যার জল কতদূর উঠবে।

একজন বলল, স্যার আর ভয় নেই, জল আর বাড়বে না।

আর একজন বলল, যা বাড়বার বেড়েছে, এবার কমবার পালা।

শেষ রাতে আমরা রওনা হ'তে পারবো মনে হচ্ছে।

তখন একজন পূর্ব পূর্ব অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিয়ে বলল, আগেও বন্যার মুখে এই-ভাবে এখানে আশ্রয় নিয়েছি, কিন্তু এমনতরো রোখ কখনো দেখিনি।

আর একজন আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, স্যার এক হাত নীচেই জল, খুব

সাবধানে নড়াচড়া করবেন, একবার জলে পা পড়লে আর রক্ষা নেই।

আমি বললাম—একেবারে মিসেস জেফ্রির দশা। কেউ উত্তর দিল না।

তারপরে একজন বলল, স্যার আপনি গাড়ির মধ্যে উঠে একটু গড়িয়ে নিন।

আর আপনারা?

আমাদের জেগে থাকা ছাড়া উপায় নাই, তাছাড়া গাড়ির মধ্যে চারজনের শোবার জায়গা তো হবে না।

অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলাম, বেশি অনুরোধ করতে হ'ল না, সন্তর্পণ পদক্ষেপে মিসেস জেফ্রির দশা এড়িয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। একটুখানি গড়িয়ে নেবো মনে করে শুতেই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লাম।

॥ ৩ ॥

স্যার, উঠুন, উঠুন।

ডাক শুনে জেগে উঠে নিতান্ত অপ্রস্তুত বোধ করলাম, সবাই জেগে আর আমি নিদ্রা স্বার্থপরের মতো ঘুমোচ্ছিলাম। বললাম—এই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তার পরে আকাশের দিকে চোখ পড়তেই বলে উঠলাম—এ কি, আকাশ যে বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, ভোর হ'ল বুঝি।

তারা বলল, ভোর হয়নি, তবে রাত শেষ হ'ল বলে।

নদীর দিকে তাকাতেই বিস্ময়ের সীমা রইলো না, এ যে আগাগোড়া শুকনো। কাল রাতের বন্যা তবে কি দুঃস্বপ্ন নাকি?

তারা বললো, এখানকার বন্যার এই তো রীতি! কে বলবে রাতে প্রলয়ংকরী বন্যা এসেছিল।

আমার মুখ দিয়ে শুধু বের হ'ল—কি আশ্চর্য!

তখন সকলে মিলে মোটরখানা ঠেলে নামিয়ে নিয়ে নির্বিঘ্নে নদী পার হলাম। তারপরে বাঁধানো রাস্তায় মোটর সবেগে ছুটে চলল।

সহানুভূতির সুরে বললাম আপনাদের

রাতে ঘুম হ'ল না। আমি একাই সব জায়গা জুড়ে নিয়ে ছিলাম।

জায়গা থাকলেও ঘুমোতে পারতাম না। বানের দিকে চোখ রেখে জেগে থাকা অত্যাবশ্যক। পাহাড়ী নদীর বান বিশ্বাস নাই, কমে গিয়েও অনেক সময়ে আবার বেড়ে যায়।

অন্য একজন বলল, ঐটুকু জায়গায় ব'সে ব'সে আপনিই বা কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন।

বলতে যাচ্ছিলাম তা বটে। এমন সময়ে স্বপ্নের কথা মনে পড়লো। স্বপ্নের কথা মনে পড়তেই বুঝলাম ঘুম এসেছিল নিশ্চয়। আগুন ছাড়া তো ধোঁয়া হয় না। স্বপ্নের স্মৃতি সৃষ্টি হয়ে উঠতেই রহস্যের আর এক দিগন্ত অবারিত হয়ে গেল। অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বের হল—তাই তো!

কি স্যার!

না এমন কিছু নয়।

বললাম বটে এমন কিছু নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারলাম না। শুধোলাম আচ্ছা—মিসেস জেফ্রি কি বাঙালী ছিলেন?

তারা সবিস্ময়ে বলে উঠলেন চিনতেন নাকি?

কি ক'রে জানলেন?

না, হঠাৎ এমনি মনে হ'ল তাই বললাম।

হঠাৎ এ কথা মনে হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি—অবশ্য যদি কিছু না মনে করেন!

শুনুন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছি। নদীতে বান এসেছে। বানের তাড়ায় একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি এসে উঠল দ্বীপটায়। পুরুষটি শ্বেতাঙ্গ, রমণী সুন্দরী হলেও শ্বেতাঙ্গিনী নয়। চারিদিক ডুবে গিয়েছে—দ্বীপেরও আগাগোড়া নিমজ্জিত শুধু মাথার টাকটা যেন শুকনো। পাশাপাশি ওরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপরে পুরুষটি মেয়েটিকে ইঙ্গিতে বলল এদিকে সরে এসো, তোমার পায়ের কাছে জল এসে পড়েছে। মেয়েটি পুরুষটির কাছে স'রে আসতেই হঠাৎ পুরুষটি তাকে মারলো এক প্রচণ্ড ধাক্কা।

একি করলে! একি করলে! oh brute! and all for Dorothy! কতক বাংলায়, কতক ইংরাজিতে বলতে বলতে প্রবল স্রোতের মধ্যে পড়ে মেয়েটি, আর তার শেষ কথাগুলো গেল তলিয়ে।

এই পর্যন্ত বলে মন্তব্য করলাম অবশ্য এরা নিশ্চয় জেফ্রি দম্পতি নয়। তবু কেমন মনে হ'ল তাই বললাম।

তারপরে প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম—ট্রেন পাবতো।

তারা ঘড়ি দেখে বলল—যথেষ্ট সময় আছে—তা ছাড়া এদিকের ট্রেন প্রায়ই দেরী করে।

তাদের কথাই ঠিক। ট্রেন পোঁছবার আগেই আমরা স্টেশনে পোঁছলাম। আমাকে একখানি খালি কামরায় তুলে দিয়ে একটু ইতস্তত ক'রে যুবক দুজনের একজন বলে উঠল, স্যার, আপনি স্বপ্নে যা দেখেছেন তা একেবারে মিথ্যা নয়।

তারপরে তারা জেফ্রি দম্পতির যে কাহিনী বলল তার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এই রকম।

মিস্টার জেফ্রি চা-বাগানের ম্যানেজার। বাগানের এক কেরানীর মেয়ে নলিনী, সুন্দরী আর শিক্ষিতা। একবার ছুটিতে কলকাতা থেকে বেড়াতে আসে। জেফ্রি সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে তাকে বিয়ে ক'রে ফেলল। বেশ চলছিল তাদের দাম্পত্য-জীবন শিক্ষাদীক্ষাহীন তেপান্তরের মধ্যে। এমন সময় নূতন এসিস্টাণ্ট-ম্যানেজার এলো জোনস্, সঙ্গে তার অবিবাহিতা ভগ্নী ডরোথি। তারপর থেকেই ফাটল ধরলো জেফ্রি-দম্পতির মিলিত জীবনে। এ মুল্লুকের সমস্ত চা-বাগান জানলো যে জেফ্রি বিয়ে করতে চায় ডরোথিকে—কিন্তু পথে দুস্তর বাধা নলিনী বা নেলি। তারপরেই পাহাড়ী নদীর বন্যায় নেলির তলিয়ে যাওয়া।

কি আশ্চর্য তারপরে কি হ'ল?

সে তো কাল রাতে বলিছিলাম। জেফ্রি বিলেত চলে গেল।

আর নূতন এসিস্টাণ্ট-ম্যানেজার আর ডরোথি! তারাও সেই সঙ্গে বিলেত চলে যায়।

এবারে বুঝেছি। তারপরে তাদের বিয়ে হয়েছে—তাই বুঝি কালকে বলছিলেন লোকে বলে—কথাটা আর শেষ করতে পারেন নি নদী এসে পড়েছিল।

সে অর্থে বলি নি।

তবে?

লোকে বলে জেফ্রি আত্মহত্যা করেছে।

কেন?

ডরোথি বিয়ে করতে অস্বীকৃত হয়েছিল।

কেন?

নেলির মৃত্যু তার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছিল।

গাড়ি নড়ে উঠতেই যুবক দুজন নমস্কার ক'রে নেমে গেল। গাড়ি ছেড়ে দিল। অজ্ঞাত একটি রমণীর মৃত্যুর বিবরণ কি ক'রে আমার স্বপ্নে প্রতিভাত হ'ল—সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যভেদের চেষ্টায় মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম। সেই মৃত্যু-কণ্টকিত দ্বীপের স্থান-মাহাত্ম্যই কি এর কারণ? না সেই মৃত্যু-তরঙ্গিণী পার্বতী বন্যাই এর কারণ? সেদিনও স্থির করতে পারি নি। তারপরে অনেক বছর চলে গিয়েছে এখনো পারি নি। এখন আর রহস্যভেদের বৃথা চেষ্টা করি না, মাঝে মাঝে রহস্যটা মনে প'ড়ে যাওয়ায় কেমন যেন আতংক অনুভব করতে থাকি।

পরকীয় সন-ইন-ল

সতীনাথ ভাদুড়ী
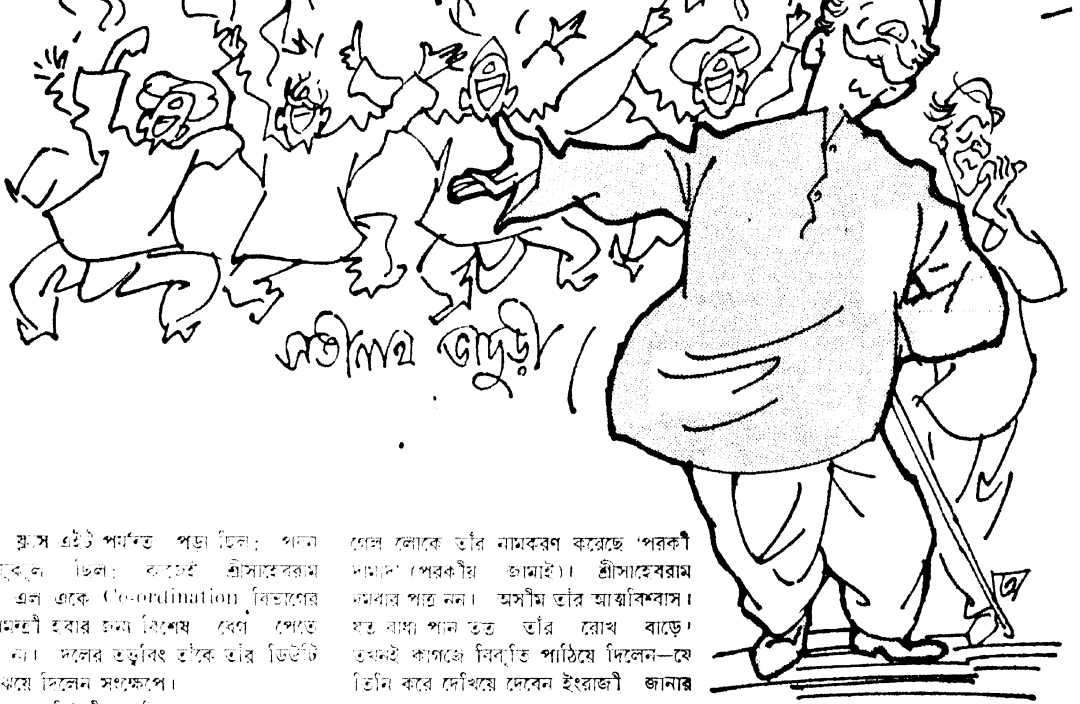
ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া ছিল; পবন অনুকূল ছিল; তবেই শ্রীসাহেবরাম এম এল একে Co-ordination বিভাগের উপমন্ত্রী হবার জন্য বিশেষ বেগ পেতে হল না। দলের তত্ত্ববিৎ তাঁকে তাঁর ডিউটি বুঝিয়ে দিলেন সংক্ষেপে।

"পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের পথের দুইটি বাধার উপর শুধু আপনার সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রথম হচ্ছে bottleneck; আর দ্বিতীয় হচ্ছে Parkinson's Law"...

পাশে আর কয়েকজন দলের লোক বসে-ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন চাপা গলায় অনুরোধ করলেন "হিন্দীতে বুঝিয়ে দিন সাহেবরামজীকে।"

মনের এক স্পর্শকাতর জায়গায় আঘাত লাগায় সাহেবরামজী বলে উঠেন—"ওটুকু বোঝবার মত ইংরাজীর জ্ঞান আমার আছে। পরের (পরকী) সন-ইন-ল কেন, নিজের জামাইকেও আমি চাকরি দেব না।"

তাঁর আপত্তি ঠেলে, তত্ত্ববিৎ হিন্দীতে পার্কিনসনের সূত্র বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে। "অফিসাররা দরকার না থাকলেও নিত্য নতুন নতুন লোক কাজে বাহাল করেন। ফলে অদরকারী কাজের বোঝা বাড়ে অথচ আসল কাজ এগয় না। ইত্যাদি"...

এসব বক্তৃতা শোনবার মত মানসিক অবস্থা তখন সাহেবরামজীর নাই। উঠে চলে আসবার সময় পিছন থেকে চাপাহাসির আওয়াজ কানে আসায় মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল।

কথা হাওয়ায় ওড়ে। পরের দিনই দেখা গেল লোকে তাঁর নামকরণ করেছে 'পরকী দামাদ' (পরকীয় জামাই)। শ্রীসাহেবরাম দমবার পাত্র নন। অসীম তাঁর আত্মবিশ্বাস। যত বাধা পান তত তাঁর রোখ বাড়ে। তখনই কাগজে বিবৃতি পাঠিয়ে দিলেন—যে তিনি করে দেখিয়ে দেবেন ইংরাজী জানার বা বলার সঙ্গে কাজ করবার কোন সম্বন্ধ নাই।

কাজের মানুষ তিনি। জিরানিয়া জেলা থেকে তিনজন গ্রামীণ নেতার এক 'ডেপুটেশন' এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

"নমস্তে! বসুন! কী ব্যাপার? না না অত সব কাগজপত্র পড়বার সময় আমার নাই এখন। আপনাদের মুখ থেকে শোনবার জন্যই তো ডেকে আনালাম ভিতরে।"

কথা কোথায় আরম্ভ করতে হয়, কোথায় শেষ করতে হয় সেসব কিছু জানা নাই ডেপুটেশনের লোকদের। একেবারে রামায়ণ মহাভারত খুলে বসল।

"সঙ্গে করে জল নিয়ে এসেছে পাকিস্তান থেকে আসবার সময়। জলের পোকা ওরা। যবে থেকে শরণার্থীরা আমাদের গ্রামে এসে বসবাস করা আরম্ভ করেছে, তবে থেকে জল হচ্ছে কি রকম! জল আর কচুরিপানা, আর জোঁক, এই তিনটে জিনিসই সঙ্গে করে নিয়ে এসে একেবারে পেঁছে দিয়েছে আমাদের ঘরের দাওয়া পর্যন্ত। কী জোঁক, কী জোঁক এ বছর! কিন্তু পাটের চাষ করে ভাল ওরা। আমাদের চেয়ে অনেক ভাল। অনেক কিছু শেখবার আছে ওদের কাছে। গজদাঁতওয়ালা বড় বড় হাতি ডুবে যায় ওদের পাটের খেতের মধ্যে—এত বড় বড় পাট। আর পাট ধোয়ার কাজে ওদের জুড়ি নেই হুজুর। পাইকাররা এক টাকা করে বেশী দেয়, ওদের ধোয়া পাটে। কী করে যে ওরা ওই জোঁকভরা জলের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে পাট ধোয়ার কাজ করে আশ্চর্য! আমরা আধ-ঘণ্টা পর পর জল থেকে উঠে রেড়ির তেল মেখে নিই; তাও জোঁক মানে কই! আর ওরা সারাদিনের মধ্যে একবার জল থেকে ওঠে না! নিজের পাট তো ধোয়াই, তা ছাড়া অন্যের পাট ধুয়েও কম মজুরি কামায় না। পাট ধুয়ে দু টাকা রোজগার করতে আমাদের বাই জন্মে যায়, আর ওরা প্রত্যেক দিন চার, সাড়ে চার পর্যন্ত রোজগার করে নেয় হেসে খেলে!"

শ্রীসাহেবরাম বাধা দিলেন—"আসল কথাটা কি, বলুন না!"

"সেই কথাই তো বলছি। যা বলছি সবই আসল কথা। ওখানকার কলেক্টর হাকিম, পুলিসদের তো আমাদের কথা শোনবার ফুরসত নাই। মিটিং করো, প্রস্তাব পাস করো, 'জিল্লা সমাচার' কাগজে ছাপাও ওরা ফিরেও তাকায় না। আপনার কাছে ছুটে এলাম নিজেদের দুঃখের কথা জানাতে—

কাজ কিছু হক আর নাই হক—তা হুজুরের দেখছি শোনবার ধৈর্য নাই।"

"কে বললে কাজ হবে না! আলবত হবে! কালকের কাগজে আমার বিবৃতি দেখে নেবেন। এখন বলে যান প্রাণ ভরে। আপনাদের সেবার জন্যই তো আমি এখানে রয়েছি।"

"হ্যাঁ কী যেন বলছিলাম? হ্যাঁ—ওই পাট ধোয়ার কথা। আমরা বুঝি, যে রেড়ির তেলের চেয়েও ধকওয়ালা কোন ওষুধ-বিশুধ রেফিউজিরা গায়ে মেখে নেয় জলে নামবার আগে। নইলে ওই রক্তবীজের ঝাড় জোঁক-গুলোর হাত থেকে বাঁচে কেমন করে? রেফিউজিদের জিজ্ঞাসা করলে তারা খিক খিক করে দাঁত বার করে হাসে, আর কি সব কিচির মিচির নিজেদের মধ্যে বলে—তার এক বর্ণও বোঝে কার সাধ্য। বহুদিন তর্কে তর্কে থেকে যে গোপন ওষুধের সন্ধান আমরা পাইনি, সেটার নাম সেদিন ফাঁস করে দিয়েছে সিমরবনী গ্রামের রেফিউজিরা। মুবিল। ওষুধটার নাম হচ্ছে মুবিল। আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে কথাটা লোকের মুখে মুখে। জিরানিয়া শহরে কিনতে পাওয়া যায়। দাম বেশী নয়। যার যেমন সামর্থ, আর যতটুকু দরকার কিনতে পার। যত চাও পয়সা কামাও। জোঁকের ওষুধ বাতলে দিয়ে রেফিউজিরা স্বেচ্ছায় নিজেদের পয়সা রোজগারের এক-চেটিয়া অধিকার ছেড়ে দিয়েছে। লোক খারাপ নয় বাঙ্গালীরা; আমরা মিছামিছি এতকাল ওদের দোষ দিতাম। খুব বুদ্ধি। কথায় বলে—ছাতা, বাতা, কেশ; তিন বাঙ্গলা দেশ। (ঘর ছাওয়ার কারিগুরি, বাজনা, আর মেয়েদের মাথার চুল, এ দেখতে চাও তো বাংলা দেশে যাও)। মুবিল হচ্ছেন লক্ষ্মী। মুবিল। হল্লা হয়ে গেল সারা জেলার সকল গাঁ জুড়ে। শহরে যে যে দোকানে 'অটোমুবিল' বলে সাইন বোর্ড লেখা আছে সেই সেই দোকানে পাওয়া যায়। অটো-দিল-বাহারের মত অটো-মুবিলও আতর বললেই হয়, সেই রকমই গন্ধ হবে বোধহয়, নইলে লোকে গায়ে মাখতে যাবে কেন। এই সব কত কথা গাঁয়ের লোকের মধ্যে।"

উপমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন—"মুবিল জিনিসটা কি? মোটর গাড়ির দোকানে কিনতে পাওয়া যায়?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা নয়ত এতক্ষণ ধরে বলছি কী! জিনিসটা দেখিনি। মোটর গাড়ির দোকান শুনেই তো কত লোক ভয়ে মরে; দোকানে, যাদের মোটর গাড়ি নাই তাদের ঢুকতে দেবে কিনা সেই ভয়ে। আমরা তাদের আশ্বাস দিই, তবে তাদের ভয় ভাঙে। আজকালকার দিনে কোন দোকানে ঢুকতে দেবে না তাও কি হয়? মুবিল লক্ষ্মী; টাকার ভাবনা কি। আঙুলের ছাপ দিয়ে সাওজীর কাছ থেকে দু টাকা করে ধার করল প্রত্যেকে, একমাস পরে পাট বেচে চার টাকা করে ফেরত দেবে তাকে। সবাই আমাদের জিজ্ঞাসা করে মুবিল জিনিসটা কেমন? জলের মত, না জমে যাওয়া ঘিএর মত? শিশি নেবো, না ভাঁড় নেবো? আমরা জানব কি করে। রেফিউজিরাও কিছু বলে না: শুধু হাসে।"

শ্রীসাহেবরাম বললেন—"bottleneck"

এক মিনিট ভ্যাবাচাকা হয়ে তাকিয়ে তারা আবার আরম্ভ করল। "রাত থাকতেই লোকে লোকারণ্য শহরের তিনটে অটো-মুবিল লেখা দোকানে। কোন দোকানের মুবিলটায় ধক বেশী সকলেই সেই খবরটা জানতে চায়। মারামারি, ধস্তাধস্তি। একজন জিজ্ঞাসা করেছিল মুবিলে চর্বি মেশানো আছে নাকি? সকলে মিলে তাকে বেশ উত্তম মধ্যম দিল। এতকাণ্ডের পর দেখা গেল কোন দোকানে মুবিল নাই। পুলিস এসে লোকজনদের সরিয়ে দিল দোকানের কাছ থেকে। এই হচ্ছে ব্যাপার জিরানিয়া জেলার।

পাট ধোয়ার সময় এসে গেল। মুবিল উধাও। দোকানদাররা দশ গুণ দামে মুবিল 'বিলাক' (ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রি) করবে বলে ঠিক করেছে। 'জিলা সমাচার' আর 'জিরা-নিয়া দর্পণ' দুখান সাপ্তাহিকেই এই বিলাকের (কালোবাজারের) কথা বেরিয়েছে। মিটিংয়ে প্রস্তাব পাস হয়েছে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট পুলিস কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। ওরা সবাই কালোবাজারীদের দিকে। যারই মোটর গাড়ি আছে, সেই ওই মুবিলের দোকানদারের দিকে। এটাকে শুধু জিরানিয়ার চাষীদের প্রশ্ন বলে ভাববেন না হুজুর। পাটের উৎপাদনের সঙ্গে এর সম্বন্ধ।"

শ্রীসাহেবরামকে আর বোঝাবার দরকার ছিল না। পাট রপ্তানি হয় বিদেশে; তার থেকে আমাদের দেশ বৈদেশিক-বিনিময় পায়; এসব কথা উপমন্ত্রীর কণ্ঠস্থ। গম্ভীর হয়ে বললেন—"আপনাদের কেস আমি টেক আপ করলাম। কালকের কাগজে আমার যে স্টেটমেণ্ট বার হবে সেটাকে পড়ে দেখতে বললেন জিরানিয়া জেলার লোকদের। নমস্তে!"

ডেপুটেশনের লোকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে চটলেই শ্রীসাহেবরামের মুখ দিয়ে ইংরাজী কথার খই ফোটে। উনি ইংরাজী জানেন।

উপমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করলেন জিরানিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, পরশুদিন 'জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির' জরুরী মিটিং ডাকতে। ঘণ্টা কয়েক পর জবাব এল টেলিগ্রামের। নিয়মানুযায়ী সাতদিনের নোটিস লাগে মিটিং ডাকতে stop এক সপ্তাহ পরে মিটিং ডাকলাম stop এজেণ্ডা জানা নাই stop

পড়ে চক্ষু রক্তবর্ণ শ্রীসাহেবরামের। ভাবে কী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজেকে! উপমন্ত্রীকে stop করতে চায়! Superior অফিসারের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে চায়! নিশ্চয়ই এদের যোগসাজশ আছে মুবিলের দোকান-দারদের সঙ্গে। এই রাগের মধ্যেও ভেবে নিতে চেষ্টা করলেন ম্যাজিস্ট্রেটের এই আচরণ কিসের মধ্যে পড়বে—bottleneck না Parkinson's Law? সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করতে বাধে। তাঁকে বললেন "একখান লিখে দিন তো explanation Call for করে!"

উপমন্ত্রীর মুখ থেকে ইংরাজী বার হচ্ছে; সময় নিরাপদ নয়। তা সত্ত্বেও সেক্রেটারি, টেলিগ্রাফের stop কথাটির অর্থ বাধা হয়ে বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে। তখন তিনি চটে সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করেন—"ইংরাজী না জানলে কী হয়? কটা স্বাধীন দেশের লোক ইংরাজী জানে? Slavish mentality!"

"ঠিকই বলছেন হুজুর।"

"আচ্ছা সাতদিন পর জিরানিয়া যাব টুরে, এই রকম খবর দিয়ে দিন সেখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে"।

"আচ্ছা স্যার!"

উপমন্ত্রী তারপর ট্রাংক কল করে জিরানিয়ার লোকদের খবর দিয়ে দিলেন যে, পরশু স্পেশ্যালে সেখানে যাবেন মুবিল মোটরে লড়াই করবার জন্য অবশ্য বেসরকারীভাবে। সাতদিন পর আবার যাবেন সরকারী টুরে।

স্টেশন থেকে নামতেই দেখা কালোপতাকা-ধারী দলের সঙ্গে। তারা রামধুন গাইতে শুরু করে।

পরকী নামাক সাহেবরাম,
লোটো তুরংত যহাঁ কা কাম।
(এখনই ফিরে যা, এখানে কি কাজ)
বিলাক সহায়ক সাহেবরাম,
লোটো তুরংত যহাঁ কা কাম।
ফোটো পোষাক সাহেবরাম
লোটো তুরংত যহাঁ কা কাম।

চতুর্দিক থেকে ধ্বনি উঠল—'মুবিল সরকার মুর্দাবাদ!' 'মুবিল বিলাক বন্ধ করো!'

এরকম স্বাগত সম্ভাষণের জন্য শ্রীসাহেব-রাম তৈরী ছিলেন না। গ্রামীণ ডেপুটে-শনের লোকদের কথা থেকে, এখানকার উত্তেজনার গভীরতা ও তীব্রতা ঠিক আন্দাজ করতে পারেননি। নিজের দলের জনকয়েক সমর্থককে সঙ্গে করে তিনি গিয়ে ঢুকলেন একেবারে কালাঝাণ্ডার দলের মধ্যখানে। এরা সকলেই গ্রামের লোক। সকলেই একেবারে মারমুখো হয়ে রয়েছে।

"নামেই সাহেবরামজী! সাহেবদের মত কাজ করুন, শ্রীরামচন্দ্রজীর মত কর্তব্য করুন, তবে না বুঝি! মুবিল উধাও হওয়া সম্বন্ধে আমরা যা বলছি তা সত্য কিনা যাচাই করতে এসেছেন? তাহলে এখনই একা চলে যান অফিসারদের নতুন ক্লাবঘরে। দেখবেন এই দিনে দুপুরে কতগুলো অফিসার, অফিসের কাজ ফেলে সেখানে বসে জটলা

করে। মবিলের দোকানের মালিকদেরও সেখানে দেখতে পাবেন। আরও কত রকমের লোক দেখতে পাবেন সেখানে। দেখে আসুন। দেখে বুঝে নিন অফিসারদের যোগসাজশ আছে কিনা এইসব কালো-বাজারীদের সঙ্গে। বিনা পয়সায় মোটর গাড়ি মেরামত করায় কিনা অফিসাররা খোঁজ নিন।"

আরও কত অভিযোগ।

ঘণ্টা দুয়েক ধরে বিভিন্ন স্থানে তদন্তের পর শ্রীসাহেবরাম যখন এরোড্রোমে ফিরে এলেন, তখন তাঁর মুখ থেকে ইংরাজী কথা বার হতে আরম্ভ হয়েছে। সেখানে লোক জমেছে বিস্তর। তাঁর দলের লোকরা সেখানে মাইক এনেছে, চেয়ার টেবিল এনেছে। সকলে তাঁর কাছ থেকে জানতে চায়, তদন্তের পর মবিল-সংকট সম্বন্ধে কি নির্ণয়ে তিনি পৌঁছেছেন। মুর্দাবাদ ধ্বনি কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রেখেছে তারা। মাইকের সম্মুখে গিয়ে উপমন্ত্রীজী আরম্ভ করলেন –

"মবিল পিপাসী ভাই সকল! তদন্ত শেষ। সমস্যার প্রকৃতি bottleneck এর। এটা যখন জানা গিয়েছে তখন এর আশু সমাধান অবশ্য হবে। সাহেবের মত ইংরাজী না বলতে পারলেও তাদের মত কর্মপটু হতে কোন বাধা নাই; আর শ্রীরাম-চন্দ্রজীর মত কর্তব্যপরায়ণ না হতে পারলেও কাঠবেরালির অনুকরণ সকলেই করতে পারে। অন্ততঃ সাহেবরাম পারে। চাষার ঘরের ছেলে সে; চাষীর দুঃখদরদ বোঝে। কাল থেকে এই এরোপ্লেন আপনাদের জন্য দিনে বারকয়েক করে মবিল আনবে। (তুমুল হর্ষধ্বনি। শান্তি! শান্তি! চুপ করুন আপনারা! মেশিন চালু রাখবার জন্য যখন যেখানে দরকার তখন সেখানে তেল দেওয়া, এই হচ্ছে আমার পোর্ট-ফোলিওর কাজ। মবিলের অভাবে জোঁকরা কেমন করে প্রোডাকশনে বাধা দিচ্ছে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বানচাল করে দিচ্ছে, সে সব খবর আমার ভাল করে জানা। কাল থেকে মবিল পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে এই এরোড্রোমের কাছেই বিতরণের ব্যবস্থা হবে। একসঙ্গে একজনকে বেশী দেওয়া যাবে না; বুঝতেই পারছেন bottleneck এর ব্যাপার কাজেই ছোট ছোট শিশিতে করে দেওয়া হবে। প্রোডাকশন-মোর্চার লড়াই এটা তাই কাজ হবে একেবারে মিলিটারি ধরনে। হ্যাঁ, এইবার আসা যাক যারা এই মবিল-সংকট এনেছে তাদের কথায়। সাহেবরামের কাছে রাজ্য চালাবার সময় কারও খাতির-খাতরা নাই। অফিসার, ব্যবসাদার, পুলিস, বাসড্রাইভার, মোটরের মিস্ত্রি যে যে এখান-কার মবিল উধাও করবার ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে সব ক'টাকে আমি বম্বু দেবো। সাহেবরাম যা বলে, তাই করে।"

তুমুল হর্ষধ্বনি, ঢোল, করতাল, হাত-তালি, শিস, ফুলের মালার ছড়াছড়ির মধ্যে রামধুন গান আবার আরম্ভ হ'ল।

চোরোঁকে দুশ্‌মন্ সাহেব রাম,
বাত ছোড়কর চাহতা কাম্।
(কথা ছেড়ে কাজ চায়)
বিলাক নাশক সাহেব রাম,
জানতা কুছ নহী, সিধা কাম্।
(কিছু জানে না কাজ ছাড়া)
মবিল প্রেষক্ সাহেব রাম,
ফিরসে আনা, রহ্ গয়া কাম্।
(আবার এস, কাজ বাকি আছে)

গলার ফুলের মালা একটি ছোট ছেলেকে পরিয়ে দিয়ে নমস্তে করতে করতে তিনি এগলেন এরোপ্লেনে ওঠবার সিঁড়ির দিকে।

"এক মিনিট হুজুর!"

'জিলা সমাচার'-এর সম্পাদক ছুটে এসে একটা খালি বোতল, আর একখান ইঁট তাঁর হাতে দিলেন।

"এই ইটের উপর ঠুকে বোতলের গলাটা আপনি ভাঙ্গুন।"

• Bottleneck ভাঙ্গবার সময় সম্পাদক-মশাই উপমন্ত্রীর ফোটো তুলে নিলেন।

জয়ধ্বনি উঠল "বম্বুকো বাদ! না ভুলো!" (বম্বুর প্রতিশ্রুতি ভুলবেন না!) "সাহেবরাম জিন্দাবাদ!"

হাত উঁচু করে সকলকে আশ্বাস দিতে দিতে তিনি এরোপ্লেনের ভিতর ঢুকে গেলেন।

'জিলা সমাচার' আর 'জিরানিয়া দর্পণ' দুই সাপ্তাহিকেরই নিলামী-ইস্তাহার-বর্জিত বিশেষ সংখ্যা বার হ'ল পরের দিন ভোরবেলায়। বড় বড় অক্ষরে লেখা: 'বম্বু দেওয়া হইবে।'

রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী, মোটর-মালিক, ড্রাইভার প্রভৃতি যাহারা মবিল কালো-বাজারের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহাদের বম্বু দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন উপমন্ত্রী শ্রীসাহেবরাম।'

শহরে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। বাবারও বাবা আছে! কলেক্টরকেও বম্বু দিতে পারে উপমন্ত্রী!

কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা মিলে এরো-ড্রোমের বাইরে একজায়গায় একটা একচালা তুলেছে রাতারাতি। এখান থেকে মবিল বিতরণ হবে। প্রথম দিন অন্ততঃ ত্রিশ-চল্লিশ হাজার লোক আসবে মবিল নিতে এই হচ্ছে তাদের আন্দাজ। পুলিস এবং সর-কারী কর্মচারীরা কোন রকম সহযোগিতা করতে নারাজ। সেজন্য তাদের দায়িত্ব অনেক বেড়েছে। তারা আশা করেছিল দুপুর হবার আগেই এক মাইল লম্বা লাইন দাঁড়িয়ে যাবে, মবিল-প্রার্থীদের। কিন্তু বেলা একটা পর্যন্ত লোকজনের ভিড় না দেখে তারা আশ্চর্য হ'ল। বিস্ময় দুশ্চিন্তায় পরিণত হ'ল বেলা দুটো নাগাত। লোক পাঠান হ'ল আশপাশের গ্রামাঞ্চলে। তিনটের সময় যখন এরোপ্লেন এসে নামল, তখন মবিল নেবার জন্য একজন লোকও আসেনি; শুধু কর্মীরা হতাশ হয়ে বসে ঘাঁটি আগলাচ্ছেন। যে কানাঘুষো সকালের দিক থেকে শোনা যাচ্ছিল সেটা তাহলে ভুল না। স্বেচ্ছা-সেবকরা খবর আনল, ব্ল্যাকমার্কেট থেকে কেনা মবিল, গায়ে মেখে কয়েকজন লোক

সকালবেলায় জমে গেছিল পার্ট খোলার জন্য। দোকেরে কামড়ের ঠেলায় সকলকে উঠে আসতে হয়েছে জল থেকে। খুব বোকা বানিয়েছে রেফিউজিরা সকলকে। অতি বদ এই রেফিউজিগুলো! সরকারী পয়সায় ফুটানি দেখায়! গাঁয়ের মোড়লদের কথা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়! সাবেককাল থেকে গ্রামে যেসব নিয়ম আর রেয়াজ চলে আসছে সেগুলোকে একেবারে তছনছ করে দিল! ভাল মানুষে কিছু বলতে গেলে আবার চোখ রাঙায়! এ চোখ রাঙানি পাকিস্তানে দেখাতে পারিসনি?... গেলেন ফিরে গেল মুবিল নিয়ে। আর ওদিকে শহরে বেধেছে হুলস্থুল কাণ্ড সাপ্তাহিকে প্রকাশিত উপমন্ত্রীর সারগর্ভ বক্তৃতা নিয়ে। দোকানদার, মোটর বাস ও ট্রাকের মালিক, ড্রাইভার, মিস্ত্রি, ক্লিনার সবাই মিটিং করে তাঁর প্রতিবাদ জানাল, উপমন্ত্রীর অসংযত ভাষণের। এর নকল পাঠান হল প্রধানমন্ত্রীর কাছে। উকিলের নোটিস দেওয়া হল 'জিলা সমাচার' ও 'জিরানিয়া দর্পণ'এর সম্পাদকের উপর। গভর্নমেন্ট অফিসাররা গোপনে উৎসাহ ও উস্কানি দিতে লাগলেন ব্যবসায়ীদের। মোটর ইউনিয়নের কর্মীরা একদিন সর্বাত্মক ধর্মঘট ঘোষণা করল শ্রীসাহেবরামের অপমানসূচক উক্তির প্রতিবাদে। দুখানা হ্যান্ডবিল বার হ'ল শহরে। প্রথমখানায় লেখা—"যাহারা বলে পরকী Son-in-law ইংরাজী জানেন না তাহাদের ধারণা অসার প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি বম্বু দিবার মধ্যে ইডিয়ম ব্যবহার করিয়াছেন।" দ্বিতীয় হ্যান্ডবিলে লেখা:—

"কে বলে বম্বু শব্দ হিন্দী নয়? তাঁহাকে 'বাজারাম হিন্দী শব্দকোষ'এর ৬৭৩ পৃষ্ঠা দেখিতে অনুরোধ করি।"

মুবিল সংকটের পরিণতির খবর পাবার পর উপমন্ত্রীর টনক নড়ল। তিনদিন পর আবার জিরানিয়ায় যেতে হবে, তাঁর কথায় আহূত জেলা Co-ordination Committee-র বৈঠকে। মুবিলের সমস্যা আপনা থেকে মিটে যাবার খবর পেয়েছেন, তবু না গিয়ে উপায় নাই।

শ্রীসাহেবরাম জিরানিয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ফোন করলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হ'ল। তারপর উপমন্ত্রী অন্যান্য বিচক্ষণ মন্ত্রীদের সঙ্গে গোপনে কিসব যেন বিচারবিমর্শ করলেন। নূতন লোক কিনা উপমন্ত্রিত্বে, তাই সাহেবরামজী এই সামান্য একটা কথা নিয়ে এত ভেবে মরছিলেন। তখনই জিরানিয়ার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কিসব যেন নির্দেশ চলে গেল।

পরের দিন 'জিলা সমাচার' আর 'জিরানিয়া দর্পণ' দুখানা সাপ্তাহিকেরই আবার এক বিশেষ সংখ্যা বার হল। দুটোতেই একই সংবাদ। উপমন্ত্রীর প্রতিবাদ বার হয়েছে। তিনি সেদিনকার ভাষণে রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী, মোটরকর্মী বা অন্য কাউকে বম্বু দেবেন এমন কথা বলেননি। শ্রোতা ও সাংবাদিকদের শুনতে ভুল হয়ে থাকবে। ইত্যাদি

সকলে পড়ে আশ্বস্ত হল। 'খণ্ডন (প্রতিবাদ) হো গয়া'। আর চিন্তা কিসের। 'খণ্ডন নিকল গয়া'। আর কারও মুখভার করবার কারণ নাই। খবরের কাগজে যখন প্রতিবাদ বার হয়ে গিয়েছে, তখন কাল উপমন্ত্রীর এখানে ভাল করে 'স্বাগত' করা উচিত। লেবর অফিসার, ওজন যাচাইএর অফিসার, আর সেলসট্যাক্স অফিসার, সব ব্যবসাদারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে এলেন কাল শ্রীসাহেবরামজীকে যেন উপযুক্ত সম্মান দেখান হয়।

পাবলিক হেলথের এনজিনিয়ার নিজে দাঁড়িয়ে টিউবওয়েল পোঁতালেন শহরের তিনটে অটোমোবিলের দোকানের সম্মুখে। কৌতূহলী প্রশ্নকর্তাদের বললেন, জনস্বাস্থ্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে গাড়ি ধোয়ার কাজে টিউবওয়েলের জল ব্যবহার করাই ভাল। মোটরকর্মীদের ইউনিয়ন-অফিসের সম্মুখে টিউবওয়েল পোঁতালেন ওভারসিয়ারবাবু। অফিসারদের ক্লাবের সম্মুখে টিউবওয়েল পোঁতান হল সবচেয়ে শেষে। ক্লাব ঘরের কলি ফেরান হল। সার্কিট-হাউস থেকে ক্লাব পর্যন্ত রাস্তায় সারাদিন নূতন করে পিচ ঢালাই করা হল। ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব ঠিক করেছেন ওই ক্লাব ঘরে জেলা Co-ordination Committeeর মিটিং হবে।

পরের দিন রাস্তার দুধারে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছে উপমন্ত্রীর 'দর্শন' পাবার জন্য। গেট, নিশান, জয়ধ্বনি ও লোকের সারির মধ্য দিয়ে সার্কিট-হাউস থেকে গাড়ি এসে পৌঁছল অফিসারদের ক্লাবে। ঝকঝকে নূতন রাস্তা দেখে উপমন্ত্রী খুব খুশী। বললেন—"Transport bottleneck-ই আমাদের পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় শত্রু।"

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—"হ্যাঁ সার।"

সকলে ঘরে বসবার পর ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব জানালেন—"আজকের Co-ordination Committeeর মিটিংএ কোন agenda নাই। কারণ উপমন্ত্রীর আদেশে এ মিটিং আহূত হয়েছে। তিনি কোন কার্যক্রমের খবর আমাদের দেননি।"

অপ্রস্তুত হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না শ্রীসাহেবরামের।

"নাই বা থাকল লিখিত কার্যক্রম কিছু। bottleneck আর Parkinson's Law এ দুটো আছেই। কর্মতৎপর সদস্যরা এই দুটো সম্বন্ধে সব সময় সচেতন থাকেন, এ আমি নিশ্চয় আশা করতে পারি।"

"নিশ্চয়ই সার।"

লেবর অফিসার হচ্ছেন অফিসারদের ক্লাবের সেক্রেটারি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু চোখের ইশারা করায়, তিনি উঠে বললেন—"পঞ্চবার্ষিক" পরিকল্পনা সফল করতে গেলে সরকারী অফিসারদের কর্মতৎপর রাখতে হবে। অফিসারদের কর্মতৎপরতা বজায় রাখতে হলে দরকার রুচিকর খাদ্যের। অখাদ্য কুখাদ্যের bottleneck দূর করবার জন্য, আমি প্রস্তাব করছি যে Parkinson's Law অনুযায়ী সরকারী খরচে দুইজন বাবুর্চি বহাল করা হ'ক, অফিসারদের ক্লাবে।" শ্রীসাহেবরাম বললেন—"Law যখন, তখন আমাদের তা মানতেই হবে।"

ঘন করতালির মধ্যে মিটিংএর কাজ শেষ হ'ল। 'জিলা সমাচার' আর 'জিরানিয়া দর্পণের' সম্পাদকরা সাংবাদিক হিসাবে সেখানে উপস্থিত থাকবার অনুমতি পেয়েছিলেন। তাঁরা তখন এগিয়ে এলেন উপমন্ত্রীর কাছে।

"হুজুর আপনার প্রতিবাদ তো আমরা ছাপিয়ে দিয়েছি কাগজে, নিজেদের ভুল স্বীকার করে। আপনি যখন বলছেন যে বম্বু বলেননি তখন নিশ্চয় আমরা ভুল শুনে থাকব। কিন্তু আপনি ঠিক কি বলেছিলেন সেটা তো প্রতিবাদের মধ্যে লেখেননি। সেটা জানতে পারলে আমাদের একটু সুবিধা হ'ত।"

গম্ভীর হয়ে উপমন্ত্রী বললেন—"আমি বলেছিলাম 'বম্বা' (জলের কল)। বম্বু না বম্বা। কথা আর কাজে তফাত নাই সাহেব "মর"।

চিমনি'র ধোঁয়া

নবেন্দু ঘোষ

হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে এল।

রোজকার মত বুড়ী ঝি, ঝণ্টুর মা, সকাল আটটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত কাজ করে আজো তার ছেলের বাড়িতে গেছে। আবার আসবে সেই বিকেল পাঁচটায়। এই সময়টাই সবচেয়ে বেশী খারাপ লাগে মাধুরীর। বড় একা-একা লাগে। আজো লাগছিল। তেতলায় দু'টো কামরা আর একটা রান্নাঘরের ফ্ল্যাট তাদের, তার মধ্যে বারবার এঘর ওঘর ছুটোছুটি করছিল সে। ভাবল হয়ত খিদে পেয়েছে, একটা কিছু খেলে হত। কিন্তু শেলফ্ খুলে একটা নোন্‌তা বিস্কুট মুখে দিয়েই মনে হল যে, নোন্‌তা নয়, মিষ্টি কিছু খেলে হত। রসোগোল্লা রাখা ছিল, তার থেকে একটা মুখে দিয়েই কিন্তু আবার মনে হল যে, তার আসলে খিদে পায় নি। আসলে তার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে। দিল্লী কিংবা বোম্বাই, কাশী কিংবা বৃন্দাবন এমন কোথাও নয়। যেতে ইচ্ছে করছে তাদের গাঁয়ে, পলাশপুরে, ইছামতীর ধারে। সেখানে হয়ত বাব্‌লা গাছে হলদে রংয়ের ফুল ফুটে আছে এখন, সেই কতকালের পুরনো মোটা শিমুল গাছটার গায়ে জড়ানো গুলঞ্চলতা'র ওপর বিকেলের পড়ন্ত রোদের সোনামাখানো ছোঁয়াচ। নদীর ওপারে যে মাঠটা, সেই মাঠের শেষে নীল আকাশটা যেন অনেক দূরের একটা রহস্যলোকের খবর বলার জন্য ঝুঁকে পড়েছে—আর সে যেন । সে এখন উত্তর কলকাতায়, মাখন বড়াল লেনের [illegible] এক বাড়ির নয় নম্বর ফ্ল্যাটে। একা।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাধুরী তাকাল চারদিকে। শুধু বাড়ি আর বাড়ির ছাদ। শুধু লোহা আর ইঁটের ইমারত।
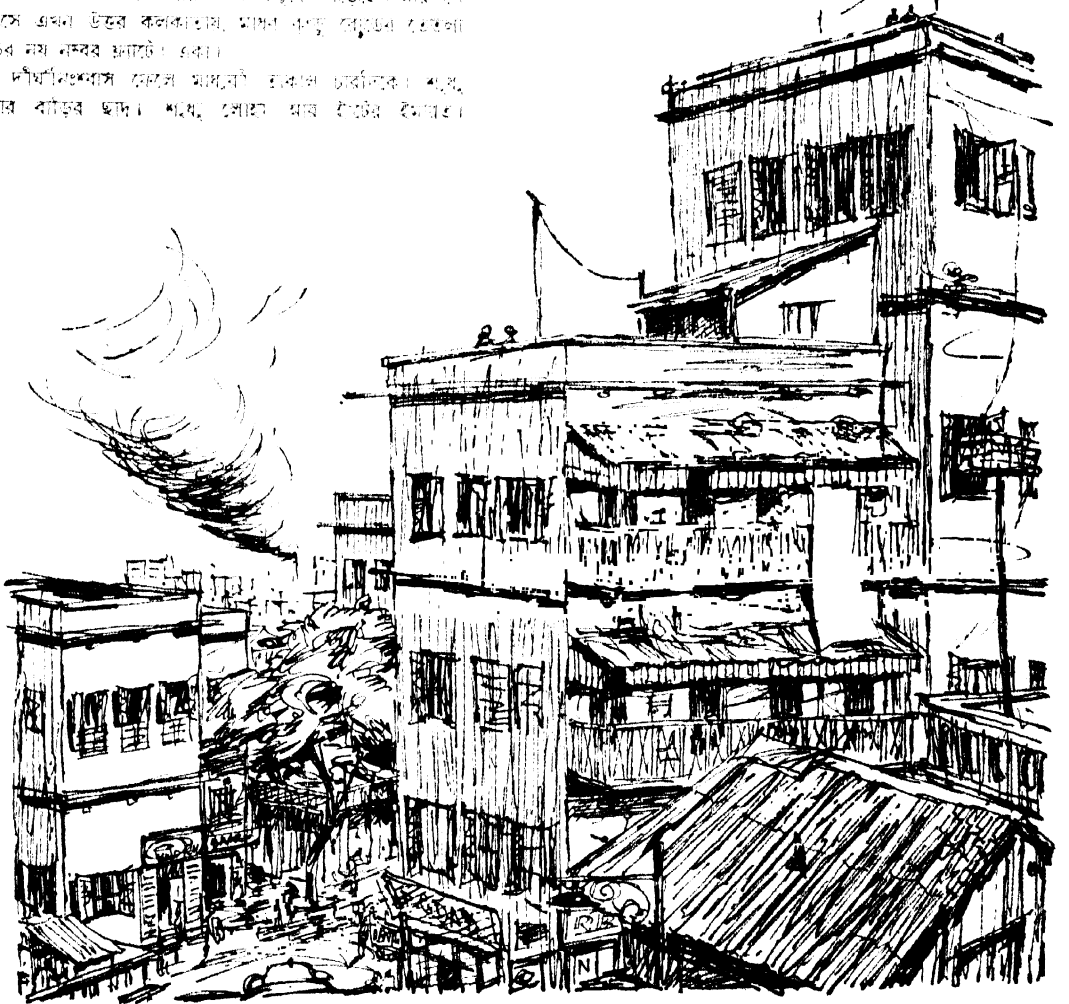
শোবার ঘর থেকে আকাশ দেখা যায় একটু-খানি, কিন্তু সেই আকাশ জুড়ে আছে ভারত স্টীল ফ্যাক্টরীর মস্ত বড় চিমনিটা। দিনরাত সেই চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। মাধুরীর ভাগের এই আকাশটুকু কোনো সময়েই পরিষ্কার থাকে না। ওই চিমনি'র ধোঁয়ায় তা সব সময়েই মলিন। বড় একঘেয়ে লাগে এক সময়ে। ঘরের জানালা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তা দিয়ে সব সময়েই রিক্সা আর মোটর-গাড়ি যাচ্ছে, নানারকমের শব্দ আসছে চারদিক থেকে, আসছে এবাড়ি ওবাড়ির মানুষদের গলার আওয়াজ, কাকের ডাক—সবই কেমন যেন রুক্ষ, কর্কশ, ছন্দহীন—বাবাঃ—হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে এল।

বাইরের দরজায় তালা লাগিয়ে ছাদে পালাল মাধুরী। তবু ভাল এখানটা। আকাশটা আকাশের মতই বড় মনে হয়। দূরে অন্যান্য বাড়ির ছাদে মেয়েদের, ছেলেদের দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সে সব দিকে তাকাতে রুচি হল না তার। রেলিং-এর এক কোণে বসে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে এক বছর ধরে ফেলে-আসা পলাশপুরের আকাশকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায়? কলকাতার এই আকাশ মোটেই তেমন নীল নয়, তেমন উদার নয়। এখানকার মেঘও তেমন কাশফুলের মত সাদা নয়। এক বছর ধরে সেই আকাশ সে অনেক দূরে ফেলে এসেছে।

এক বছর আগে বিয়ে হয়েছে মাধুরীর। বিধবা মায়ের চোখের বালি ছিল সে। কুড়িতে পা দিয়েছিল সে তখন, মা তাকে দেখত আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত। মাধুরী বুঝত মায়ের মনের দুঃখটুকু, সে চাইতও যে চটপট হয়ে যাক তার বিয়েটা, মা'র নিঃশ্বাস সহজ হোক। আর কোন্ মেয়েই বা বিয়ে না চায়! বিয়ের কথা বলাবলি করে সে তার সইদের সঙ্গে কত হাসাহাসিই না করেছে, কত রোমাঞ্চকর মধুর ছবিই না তৈরি করেছে মনে মনে! সেই বিয়েই হঠাৎ হয়ে গেল তার—এই এক বছর আগে। সই নন্দিতার বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে সে বরযাত্রীদের একজনের নজরে পড়ল। লোকটির বয়স প্রায় চল্লিশ, একটু রোগা লম্বাটে চেহারা, গায়ের রং বেশ ফর্সা, গলায় একটা সরু সোনার চেন আর নাকটা বেশ টিকোলো। সব মিলিয়ে ভালো না বললেও মন্দ বলা যায় না এমনি চেহারা লোকটির। কলকাতায় ব্যবসা করে, মা-বাপ ভাইবোন ওসব ঝামেলাই নেই। মাসে অন্তত পাঁচশো টাকা রোজগার। মা শুনে প্রথমটায় রাজী হতে পারছিল না। লোকটির বয়স একটু বেশী। কিন্তু আত্মীয়বন্ধুদের যুক্তিতর্কে শেষ পর্যন্ত মা মত দিতে বাধ্য হল। সব মিলিয়ে একমাসের মধ্যেই কথা পাকা হয়ে প্রায় বিনা পণেই বিয়েও হয়ে গেল। মাধব কুণ্ডু রোডের এই তেতলা বাড়ির নয় নম্বর ফ্ল্যাটে সে সেই লোকটির পিছু পিছু এসে ঢুকল। লোকটির নাম সদানন্দ মুখুজ্যে। নামটা বাইরের দরজায় ছোট্ট একটা পেতলের প্লেটে ইংরিজিতে লেখাও ছিল দেখে মাধুরীর মনে বেশ সম্ভ্রম জেগেছিল স্বামী সম্পর্কে। কিন্তু পলাশপুরের বনফুল-ঝোলানো ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের আড়ালে বসে, ঘুঘু-ডাকা উদাস মধ্যাহ্নে আরতি আর নন্দিতার সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে বিবাহিত জীবনের যে রোমাঞ্চকর ও তীব্রমধুর দৃশ্যগুলো সে কল্পনা করেছিল তা তার জীবনে দেখা দিল না তো! সবাই বলেছিল যে সেরা শহর কলকাতায় খুব মজা, কিন্তু কী আশ্চর্য, মাধুরীর কিন্তু দুদিন বাদেই কান্না পেতে লাগল। এই অপরিচিত ইঁটের অরণ্যে, এই লক্ষ লক্ষ লোকের বেসুরো কোলাহলে সে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেল, একা-একা বোধ করতে লাগল। সদানন্দ মুখুজ্যের বাড়ি বর্ধমান জেলার নবীপুরে নামে একটি অজ পাড়াগাঁয়ে, সেখানে মাধুরী এখনো যায় নি। সদানন্দের পৈতৃক ভিটেতে কোনমতে বাতি জ্বালাতে তার' এক বিধবা পিসী। আপন নয়, সদানন্দের বাবার মামাতো বোন। বিয়ের পর কলকাতায় এসে সেই বুড়ী পিসীকে এ বাড়িতে দেখেছিল মাধুরী। বুড়ী কানে কম শুনত একটু খিটখিটেও ছিল। তবু সে মাধুরীকে কাজ করতে দিত না। তবু তার সঙ্গে একটু গেঁয়ো কথা বলে সময়টা কাটিয়ে দিত মাধুরী। নবীপুরে কি কোনো নদী আছে, হ্যাঁ পিসীমা? নেই? কোনো বিল? আচ্ছা মাঠ নেই? আমাদের ডাকাতে মাঠের মত ধু-ধু মাঠ? রথের মেলা কোন জায়গাতে বসে? আর গাজনের মেলা, হ্যাঁ পিসীমা?

পিসী হাসত, আবার বিরক্তির সুরেই বলত, "তুমি তো গাঁয়ের মেয়ে বাপু, গাঁয়ে কি সুখ জানো না? তোমার ভাগ্যি ভাল যে, আমার সদানন্দের হাতে পড়ে কলকাতায় এসে থাকতে পারছ! গাঁয়ে আছে কি বউমা যে, ওসব শুধোচ্ছ? শোন বাছা, তোমায় একটা কথা বলি। আমার সদানন্দ বড় শৌখীন মানুষ, তুমি তোমার গেঁয়ো ভাবটি কমাও, বুঝেছ?"

মাধুরী কিন্তু বুঝত না। সদানন্দও এ নিয়ে মাঝে মাঝে বকেছে তাকে। তার বন্ধুরা দু'একবার নেমন্তন্ন খেতে এসেছিল বিয়ের পর। তাদের সামনে সে ঘোমটা টেনে যেত। স্বামীর বন্ধুরা হাসাহাসি করেছিল। সদানন্দ বকেছিল তাকে, "ঘোমটা নিশ্চয় টানবে, কিন্তু অতটা কেন? একটু স্মার্ট হও, বুঝলে? খালি ওদের সামনে বেশীক্ষণ থেকো না—ব্যস"—মাধুরী চেষ্টা করত কিন্তু পুরোপুরি পারত না। শহরের লোকদের চাউনি কেমন যেন। বড় ধারালো। পলাশপুরের মানুষদের মত সোজা তাকায় না এরা এরা তাকায় বাঁকা চোখে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে দেখতে ওরা যেন তার সারা শরীরটার জরিপ করতে থাকে।

সেই পিসী দু'মাস বাদেই নবীপুরে ফিরে গেছে। ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। বুড়ীর বড় শখ কলকাতায় থাকার, কিন্তু সদানন্দ শোনেনি। আড়ালে মাধুরীর কাছে বলেছে, "ওসব ঝামেলা দূরে থাকাই ভাল—আরে দূর, আমি তোমায় ভালবাসি দেখলে ও বুড়ীর কাছে ন্যাকামি বলে মনে হবে—তাছাড়া এখানে খরচ বেশী বাপু। আর দেশের ও দশ বিঘে জমির দেখাশোনাও তো দরকার।" অগত্যা পিসী গেছে। এই এক মাস ধরে পিসীর দুটো চিঠি এসেছে পর পর—পিসীর নাকি বউমাকে দেখার জন্য মন পুড়েছে। সদানন্দ খেঁকিয়ে উঠেছে চিঠি পড়ে, "আরে ধোৎ—এ বুড়ী তো ভারী জ্বালালে মাইরি।" না, সদানন্দ আর পিসীকে নবীপুর ছাড়া আর কোথাও মরতে দেবে না।

পিসী যাবার পর থেকেই একা একা ভাবটা বেড়ে গেছে। এ বাড়িতে বারোটা ফ্ল্যাট—কিন্তু থাকে আঠারো জন ভাড়াটে। তাদের বাড়ির মেয়েদের সংখ্যা কম নয়। নিবারণ গুপ্তের বৌ প্রভাদি'র ফ্ল্যাটে কিংবা সত্যপ্রকাশবাবুর ফ্ল্যাটে ললিতাদি'দের ওখানে দিব্যি আড্ডা জমে। তাকে তখন থেকেই সবাই ডাকাডাকি করে। যায়ও সে মাঝে মাঝে, কিন্তু তার বেশীক্ষণ ভাল লাগে না ওদের কথাবার্তা। একটু বাদেই আবার সে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে ছটফট করে আর ঝণ্টুর মা না-আসা পর্যন্ত পলাশপুরের কথা ভাবে। তারপর ঝি এলেই আবার সে রান্নাঘরে গিয়ে ব্যস্ত হয়। চা করে নিজে খায়, ঝণ্টুর মাকেও এক কাপ দিয়ে গল্প করে। হ্যাঁ ঝণ্টুর মা, তোমাদের গাঁয়ে কাদের বাস বেশী? হিন্দু বেশী, না মুসলমান? বামুন বেশী না শুদ্দুর? সেখানে গাছ-পালা কি কি আছে সেদিন বলেছিলে? আচ্ছা তোমাদের গাঁয়ে নাটা-কাঁটা আছে? বেতঝোপ আছে? ময়না-কাঁটা? বাঁশ-ঝোপের ছায়া তোমার কেমন লাগত বলত—হ্যাঁগা বাছা? গাঁয়ের জন্য তোমার মন পোড়ে না?

মাস দুই আগে মা এসে দু'দিন ছিলেন কলকাতায়। কিন্তু তাদের বাড়িতে খেলেন না। নাতি না হওয়া পর্যন্ত তাদের অন্ন খাবেন না। সদানন্দ শুনে আড়ালে হেসে বলেছিল, "সে গুড়ে বালি, বুঝেছ—জমানা বদলে গেছে বাবা—তোমার মায়ের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে কিন্তু।" দু'দিন থেকেই মা অনাদিকাকার সঙ্গে গয়াতে তীর্থ করতে চলে যান। তারপর আবার যে কে সেই। একা, বড় একা।

ঝণ্টুর মা বিকেলে চা খেয়েই বাসনের পাঁজা নিয়ে বসে, আর মাধুরী বসে রান্না নিয়ে। কিন্তু দু'জনের রান্নায় কত সময়ই বা লাগে? সাতটাতেই সব সারা হয়ে যায়। ■

মাধুরী খবরের কাগজ নয় তো লাইব্রেরী থেকে সপ্তাহে একবার করে আনা উপন্যাস দুটোর একটা নিয়ে বসে। পড়তে খুব ভাল লাগত না আগে, তবু পড়ে আজকাল। সময় কাটাতে হবে তো! সে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে, সুতরাং নিজেকে একেবারে বোকা মনে করে না। পড়তে পড়তে হাই তোলে সে, আর ঘড়ির দিকে তাকায়। সদানন্দ ফিরতে বড় দেরি করে। ঝণ্টুর মা'র আটটায় যাবার কথা। সে সাতটার পর থেকেই উসখুস করে এবং সাড়ে সাতটা হবার আগেই নিজের ভাত নিয়ে চলে যায়। দরজা বন্ধ করে একেবারে একা হয়ে বই মুড়ে রেখে দিয়ে বিছানায় গিয়ে বসে মাধুরী। ভাবে। ঠিক এই সময়ে পলাশপুরের ঝিঁ ঝিঁ ডাকা অন্ধকারে হয়ত যুঁই আর ভাঁট-ফুলের সুবাস ভেসে বেড়াচ্ছে—হয়ত দত্তদের দেবদারু গাছটার আড়ালে এখন একটি বড় তারা কাঁপছে আর কাঁপছে……। ভাবে আর মনে মনে রাগ করে মাধুরী। কেমনধারা লোক বাপু। কি এমন কাজ যে, ফিরতে প্রায়ই রাত হয়! তার স্বামী নাকি জমির দালালি করে, শেয়ার মার্কেটেও ঘোরাঘুরি করে, আরো কত কি যে করে তা মাধুরী ভাল বোঝে না। শুধু এটুকু বোঝে যে, টাকার দরকার, কারণ মাঝে মাঝে তাকে জড়িয়ে ধরে সদানন্দ বলে, "তোমায় ভালো করে সাজাতে হবে মাধুরী—পা থেকে মাথা পর্যন্ত গয়নায় মুড়ে দেব তোমায়, দেখো না। টাকা, বুঝলে মাধুরাণী, টাকাই সব এ দুনিয়ায়।" তার স্বামী লোক মন্দ নয়, একটু বয়স বেশী, একটু ব্যক্তিকগ্রস্ত মানুষ, অনেকটা তার হরু কাকার মত। লোকটাকে পুরো বোঝে না মাধুরী, তবু মন্দ লাগে না। শুধু এই দেরি করে ফেরাটা পছন্দ নয়—বড় একা একা লাগে তার। এক একদিন মনে হয় যে, সে চেঁচাবে—ওগো এসো, এসো। এই স্বামী-স্ত্রীর খেলাটা মন্দ নয়, একা-একা ভাবটা কমে তাতে। শরীরের মধ্যে কোথাও একটা দাহ আছে তা যেন খানিক শান্ত হয় এই খেলায়। কিন্তু তবু আসে না সদানন্দ। রাগ করে নিজে খেয়ে নানা কথা ভাবতে ভাবতে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে মাধুরী। তারপর এক সময়ে কড়া নড়ে। তখন রাত কত সে খেয়াল আর থাকে না তার, ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দেয় সে। ঝিমোতে ঝিমোতে সে আসন পাতে, স্বামীকে খেতে দেয়, তারপর বসে বসেই আবার ঢুলে পড়ে। তারপর সে স্বপ্ন দেখে যে, কে যেন তাকে দৃঢ় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করেছে। ঘুমে জড়ানো চোখ মেলে সে দেখে যে, সে বিছানায় আর সদানন্দ তাকে আদর করছে। তাকে তাকাতে দেখে সদানন্দ হ্যা হ্যা করে হাসে আর বলে, "অবাক হলে? তোমায় তুলে এনেছি ওঘর থেকে—ইস্ কি ঘুম বাবা! কি গো, চিনতে পারছ না? চেঁচিও না বাবা—আমি পর-পুরুষ নই গো, আমি তোমার সদানন্দ—"

চুলে হাত বুলিয়ে দেয় সদানন্দ, তার খোঁপা খুলে দেয়। মাধুরীর নিদ্রা লাগে। ইচ্ছে হয় পালিয়ে যায় সে। পলাশপুরের নীল নির্জন আকাশ-পথের তলা দিয়ে হাঁটে। সেখানকার নিঃশব্দতায় সবুজ প্রাণ, চপল তীব্র নিঃশব্দ প্রাণের বিচিত্র ছন্দ। সেখানে ডাকাতে মাঠের ওপর যখন হাঁসখালির চরের দিক থেকে সোনালী রংয়ের চাঁদ উঠে আসে তখন মনের মধ্যে বিচিত্র এক মাদকতা ছড়িয়ে যায়। সেখানে সদানন্দ তাকে আদর করলে হয়ত দেহের দাহ কমাবার এই আদিম খেলাটা এতখানি গ্লানিকর মনে হত না।

মাধুরী বলে, "হ্যাঁগা, গাঁয়ে চল না"—

"কোন্ গাঁয়ে?"

"আমাদের পলাশপুরে—নয়তো তোমাদের নবীপুরে"—

"আরে দূর দূর, গাঁয়ে কি আছে রে পাগলী?"

"কেন ছায়া আছে, ফুল আছে, খোলা মাঠ আর নদী—সেখানকার আকাশ বাতাস"—

"আরে দূর দূর কি যে বলে—এখানে কি ফুল নেই? কালই দেখো রজনীগন্ধা আনব"—

"কিন্তু গাঁয়ের মত"—

কথা শেষ করতে দেয়নি সদানন্দ, বলেছে, "কিন্তু এই শহরের মত টাকা আছে সেখানে? এ্যাঁ? বুঝলে মাধুরাণী, টাকা—টাকাই সব। টাকা হলে চাঁদেও বেড়াতে পারবে তুমি"

বলেই সে টাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বোঝাতে থাকে মাধুরীকে। মাধুরী খানিকটা বুঝতেও পারে সেসব কথা। একটিও টাকা নেই এমন একটি অবস্থার কথা ভেবে তার কষ্টই হয়। তার নিজের অতীতের কথা যখন মনে পড়ে যায়, তখন টাকা-ছাড়া ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভয়ই পায় সে। কিন্তু তবু পলাশপুরের সেই অভাবের দিনেও সন্ধ্যার আলোতে যে তীব্র আনন্দরস সে পান করেছে যে নিবিড় শান্তির স্বাদ। সদানন্দ তাকে জগৎসংসার সম্পর্কে বলে যেতে থাকে, মাধুরী আর ভাবতে পায় না। সদানন্দ বলে তার

উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা, বলে সে কত কি করতে চায়। সে তার ব্যবসার কথা বলতে বলতে বিনয়ের খুব প্রশংসা করে। বিনয় হচ্ছে সদানন্দর মামার মাসতুতো ভাইয়ের ছেলে। বেশ চৌখস ছেলে, বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ, দেখতে-শুনতে ধারালো আর সদানন্দের দালালীর ব্যাপারে সে খুব সাহায্য করে। আজ সদানন্দের যে ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার টাকা হতে চলেছে তা ঐ বিনয়ের জন্যে। বিনয় নিজেও কি সব কনট্র্যাক্টরি ব্যবসা করে বেশ কিছু রোজগার করে। এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ সম্পর্কেই সদানন্দের মনে সন্দেহ আর অবিশ্বাস হলেও বিনয় সম্পর্কে তার অগাধ বিশ্বাস। শুনতে শুনতে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে মাধুরী।

"বুঝলে, ছোঁড়া খু-উব—হ্যাঁগা, ঘুমুলে?"

"উঁ? না—শোন—আজ গোবর্ধনবাবু এসে তাঁর টাকা কটা ফেরত চেয়ে গেছেন।"

"আরে গোবর্ধন শালাকে আরো ক'দিন ধরে রাখতে হবে—টাকাটা মোহিনীবাবুকে চড়া সুদে ধার দিয়েছি।"

শুধু সুদের অঙ্কই মাসে কেমন বাড়ছে সে হিসেবটাও সদানন্দ তাকে দিতে থাকে। তারপর এক সময়ে সে নাক ডাকাতে থাকে। স্বামীর শরীর থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে মাধুরী আবার ভাবতে থাকে। হ্যাঁ, টাকাও দরকারী, কিন্তু হঠাৎ তার ভাবনা থেমে যায়। দশ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে মণীশ পালিতের মাতলামোর শব্দ ভেসে আসে। মণীশ পালিত নেশার ঘোরে সিরাজদ্দৌলার অভিনয় করছে।

"জানি, আমি আজও জানি, আজও যদি পলাশীর মাঠে পরাজয় স্বীকার করে আমাকে ফিরে আসতে না হোতো তাহলে তেমনই আনন্দে তোমরা আবার আমাকে অভ্যর্থনা করতে। কিন্তু কেন এই পরাজয়?"

মণীশ পালিতের বৌ রমার গলা ভেসে আসে—"আঃ, কী হচ্ছে?"

সিরাজদ্দৌলা বলে যেতে থাকে, "বল বল, কেন এই পরাজয়? তোমাদের মীরমদন

প্রাণ দিল, মোহনলাল অগ্নিবর্ষণে শত্রুসেনা বিধ্বস্ত করল—"

"বলি থামবে কি না?"

"কেঁদো না লুৎফা—প্রেয়সী"—

"আমি লুৎফা নই—আমি রবার্ট কেলাইভ"—

"ক্লাইভ! আমার শত্রু—সে আসছে! সিপাহসালার, পলাশী-প্রান্তরে আমাদের সৈন্য সমাবেশ করুন"—

রমার তীক্ষ্ণ গলা দু'চার পর্দা চড়ে যায় হঠাৎ, "থামো, থামো বলছি"—

"ও বাবা—এলোকেশী সর্বনাশী! আচ্ছা বাওয়া—আমি আর স্পিকটি নট্"—

প্রভাবতী হই হই করে উঠল, "আয় আয় ভাই—বোস্"—

প্রভাবতীর ফ্ল্যাটে সারা দুপুরেই আড্ডা জমে থাকে। আজো ছ'নম্বরের ললিতাদি', বারো নম্বরের নির্মলাদি', তিন নম্বরের বিধবা লীলাদি' এবং পাশের বাড়ির দুটি বউ বসে আছে। প্রভাবতীর স্বামী নিবারণ গুপ্ত পুলিস কোর্টে ওকালতি করে বেশ দু'পয়সা করেছেন, কিন্তু ছেলেপুলে হয়নি, আত্মীয়কুটুম্বের বালাইও নেই। তাই দিনরাত পানদোক্তা খায় আর আড্ডা দেয় প্রভাবতী।

নির্মলা বলল, "মাধুরীর বর বুঝি "ভূত—কে একটা লোক নাকি মেশিনে কাটা পড়েছিল"—

বউটি গল্প বলতে শুরু করল। সবাই ঘন হয়ে বসল মেঝেতে। পড়ন্ত দিনের আলোতেও কেমন ভয় ঘনাল। বউয়ের দেওরের দেখা ভূতের গল্প শেষ হতেই লীলা বলতে শুরু করল তার শ্বশুরবাড়ি দেওঘরে দেখা এক ভূতের গল্প। সে ভূত নাকি কাকে ভালবেসে না পেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। সেই রোমাঞ্চকর গল্প শেষ হতেই নির্মলা শুরু করল তার খুড়-শ্বশুরের দেখা ভূতের গল্প। তিনি লক্ষ্ণৌতে ডাক্তারী করেন। একদিন রাতে

"আমি লুৎফা নই—আমি রবার্ট কেলাইভ"—

মণীশ পালিত নিঃশব্দ হয়। মণীশ পালিতের বউবাজারে একটি কাপড়ের দোকান আছে, ভালই চলে। কিন্তু রোজ রাতে মাতাল হয়ে ফেরে লোকটা। হাসি-খুশী বৌটাকে জ্বালায়, পাড়াসুদ্ধু সবাইকে জ্বালায়, মাতলামো করে। তারপর রাত যখন গভীর হয়, যখন শেয়ালদার দিক থেকে ট্রেনের শব্দ স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসে তখন কেমন যেন গুম্ গুম্ একটা শব্দ......

—ভূ'—উ'—উ'—উ'—

ভারতমাতা স্টীম ফ্যাক্টরীর সাইরেন বাজছে। একদল মজুর এখন বেরোবে, আর একদল আসবে। ফ্যাক্টরীর চিমনি দিয়ে গল্ গল্ করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কালো ধোঁয়া। ধোঁয়াটে আকাশটা প্রতি মুহূর্তে মলিন, মলিনতর হয়ে যাচ্ছে, বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। কী নোংরা, মাগো—

ছাদেও ভাল লাগে না। মাধুরী সিঁড়ি বেয়ে আবার নীচে নামল।

পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকতেই দিনের বেলাতেও থাকে? হ্যাঁরে?"

মাধুরী লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে হাসে।

প্রভা বলল, "আহা থাক্, আমাদের সদানন্দবাবুর আনন্দময়ী ও—আর, এক বছর হল বিয়ে হয়েছে—ওর এখন সব দোষ মাফ্—নে নে পান খা মাধুরী।"

লীলা বলল, "আহা, তোমার কোল জুড়ে একটি বাচ্চা থাকলে বেশ হ'ত প্রভা"—

প্রভা হাসল, "কেন ভাই, কেন? কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ কেন আমার বিপদ বাড়াতে চাইছ? তোমরা যাই বল, আমার বর কিন্তু আমায় বাঁজা বলে না"—

সবাই হেসে উঠল।

পাশের বাড়ির গোলগাল ফরসা-মত বউটি যার নাম বেলা, সে হঠাৎ বলল, "জানো, কাল কি হয়েছে দিদি?"

"কি রে?"

"আমার দেওর কাল কারখানায় ভূত দেখেছে"—

"অ্যাঁ! ভূত না পেত্নী রে?"

রোগী দেখার জন্য একজন ডাকতে এল। চোখে ঘুম নিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে একটি গলিতে এক মুসলমানের বিরাট বড় বাড়িতে ঢুকলেন ডাক্তারবাবু। কিন্তু বাড়ি অন্ধকার, কোথাও আলো নেই দেখে অবাক হলেন তিনি, বিরক্তও হলেন। সেই লোকটার পেছন পেছন একটি কামরায় ঢুকে তিনি বাতি জ্বালাতে বললেন। লোকটা জবাব না দেওয়ায় তিনি পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বেলে দেখলেন যে, বিছানায় কে যেন শুয়ে আছে। তার সারা শরীর চাদর দিয়ে ঢাকা। কাছে গিয়ে চাদর সরাতেই তিনি দেখলেন যে, একটি কংকাল শুয়ে আছে......

"ওমা—ও দিদি"—ললিতা গল্প শুনতে শুনতে সভয়ে প্রভাবতীকে জড়িয়ে ধরল। প্রভাবতী খিল খিল করে হেসে উঠল।

"মর ছুঁড়ী—ভয়ের কি আছে লা? এখনো যে দিন"—

নির্মলা গল্প শেষ করতেই হঠাৎ ঘরের মধ্যে মণীশ পালিতের বউ রমা এসে হাজি-

হল। তার পরনে পুরুষদের মত পাজামা ও পাঞ্জাবি।

"ওমা—ওমা—একি রে?"

"ওরে এ যে রমা"—

"হি হি হি"—

রমা সোজা এসে প্রভাবতীকে জড়িয়ে ধরে বলল, "প্রভা, আমি তোমায় ভালবাসি—আই লাভ ইউ"—

"এই—এই—ভালো হবে না কিন্তু ছুঁড়ি—আমার বর দেখলে পুলিস-কোর্টে টেনে নিয়ে যাবে তোকে"—

"তোমার বরের চেয়েও আমি তোমাকে বেশী ভালবাসব মাই ডিয়ার। লজ্জা করো না, এ যুগ আলাদা, এ হচ্ছে ফ্রিডমের যুগ, ইচ্ছেমত বেলেল্লাগিরি করার যুগ—স্টাশি মাটিশ ধাটিন্ টিন্"—

"হি হি হি হা হা হা"—

"উ মাগো"—

"ওলো ওটা কি বললি? ও রমা?"

"রমা নই রমেশ আমি—ওটা ইংরিজীতে ভালবাসার কথা বললাম—স্টানিশ মাটিশ ধাটিন্ টিন্"—

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সবাই। বাবারে, রমার পেটে পেটে এত!

"ও রমা, তুই এমন রসিক মানুষ, অথচ মনীশবাবুকে একটু সামাল দিতে পারিস না?"

"দিদিগো, আমার ইয়ে যে অন্য রসের ভক্ত—সে রসে যে ব্রহ্মদর্শন হয়"—

কে বলবে যে রমার দশ বারো বছরের দুটি ছেলেমেয়ে আছে। ঐ নিয়েই বেচারী ভুলে থাকে। মাঝে মাঝে ব্যাটাছেলে সেজে ব্যাটাছেলেদের নামে বিষোদ্গার করে, গাল দিয়ে শান্তি পায়। আর কথায় কথায় ছড়া কাটে রমা।

রমা বলল, "ভাই আমারো আজকাল ইচ্ছে হয় মদ খাই, ঐ যে একটা সিনেমা দেখেছিলাম"—

"ওমা—সে আবার কি কথা লা? ওতেই কি পুরুষের ভালবাসা পাওয়া যায়?"

"থাক থাক—ওদের ভালবাসার জন্য আর আকুলিবিকুলি নেই আমার—বলে না, 'পুরুষের ভালবাসা—মোল্লার মুরগী পোষা' —ওদের ভালবাসার কথা আর বলো না। ঐ যে বলে না—'কত দুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি রোহিণী'।"

"সে কি কথা—মণীশবাবু একটু মদ খায় এই যা, ভালও তো বাসে তোকে"—

"রক্ষে কর দিদি—আমি জানি সে কেমন ভালবাসা—বলে না, 'তোমায় বড় ভালবাসি, তাই তোমার আঙিনা চষি'—বাবুর আমার সেই ভালবাসা"—

হঠাৎ মাধুরী উঠে দাঁড়াল।

"ও কিরে সদানন্দময়ী—উঠছিস যে?"

"যাই দিদি—কলটা খুলে এসেছি—এতক্ষণে মনে পড়ল।"

পালিয়ে বাঁচল মাধুরী।

বিছানায় বসে জানালা দিয়ে তাকাল মাধুরী। সেই চিমনিটা থেকে এখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দিনরাত জ্বলে বাবা—রাবণের চিতার মত। না, তার মেয়েদের আড্ডাও ভাল লাগে না। খালি আবোলতাবোল গল্প। ভূত, ডাকাত, খুন জখম, গল্পের ছিরি কেমন। নয়তো কে কার বৌকে নিয়ে পালাল, কোন মেয়ে কুমারী অবস্থাতেই মা হল, কে কাকে বিষ দিল—শুনতে শুনতে দমবন্ধ হয়ে আসে। এ সময়ে পলাশপুরে তাদের বাড়ির পেছনকার আমবাগানে ছায়া নিশ্চয়ই ঘন হয়ে উঠেছে, পুব দিকে হেলে পড়েছে, দত্তদের পুকুরে সরকারদের হাঁস চারটে মনের সুখে সাঁতার কাটছে আর তিনকড়ি স্যাকরার বাঁশবনে ঘুঘুরা ডেকে চলেছে। এই সময়টা একা-একা পুকুরঘাটে বসে কী অনুভূতই যে লাগত তার। মনে হত যেন লতাপাতা গাছপালারাও ফিসফিস করে কোনো—কে? কে যেন কড়া নাড়ছে! ঝণ্টুর মা এত তাড়াতাড়ি ফিরে এল?

"কে?" মাধুরী উঠে বসল। তার শরীরের মধ্যে শিরশির করে উঠল একবার। বিনয়দা নয় তো?

পরমুহূর্তেই অনুচ্চকণ্ঠে জবাব এল, "আমি!"

মাধুরী যা ভেবেছিল, তাই।

দরজা খুলতেই বিনয় হাসল, বলল, "ঘুমোচ্ছিলে বুঝি?"

মাধুরী ঘাড় নাড়ল।

বিনয়ের চোখে মুখে যেন চোরের ছায়া, সে চকিতে একবার চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল, তারপর বলল, "কী, বসতে টসতে বলবি না বুঝি মাধুরী?"

মাধুরী বলল, "এসো"—

ঘরে এসে বসল বিনয়, বলল, "ইস, কী গুমোট! এক গেলাস জল দে তো।"

মাধুরী জল আনতে গেল।

বিনয়ও পলাশপুরের লোক, ছোটবেলা থেকেই মাধুরীকে চেনে সে। সদানন্দের সুবাদে সেই পরিচয় এখন সম্পর্কে দাঁড়িয়েছে। বিনয় সদানন্দকে বলেছে যে, সে মাধুরীকে বৌদি বলে ডাকতে পারবে না, তাকে এতটুকু থেকে বড় হতে দেখেছে সে। সদানন্দ তাকে অভয় দিয়ে বলেছে মাধুরীকে নাম ধরেই ডাকতে। সদানন্দ বিনয়কে বিশ্বাস করে, কারণ বিনয় তার মামার মাসতুতো ভাইয়ের ছেলে। কিন্তু মাধুরী আজকাল তার স্বামীর বিশ্বাসভাজনটিকে আর বিশ্বাস করতে চাইছে না। বিনয়ের চোখের চাউনি, হেঁয়ালিভরা কথা আর সদানন্দের অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে আসার মধ্যে সে আজকাল এক নতুন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে।

জল নিয়ে ফিরে এল মাধুরী।

এক নিঃশ্বাসে জলটা শেষ করল বিনয়, হেসে বলল, "তেষ্টা কিন্তু মিটল না।"

"আরো জল এনে দেব?"

"শুধু জল?"

"রসোগোল্লা আছে—দেব?"

বিনয় মাধুরীর দিকে তাকাল, তার চোখ দুটো চকচক করে উঠল, ঠোঁটের কোনে মৃদু একটু হাসির আভাস বজায় রেখে সে গলা নামিয়ে বলল, "কিন্তু তাতেই ত সব তেষ্টা মেটে না মাধুরী।"

"সব তেষ্টা মানে?" মাধুরী ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, যে ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট তা বুঝেও না বোঝার ভান করতে গিয়ে শরীর তার টান-টান হয়ে উঠল।

বিনয় মুচকি হাসল, "তাও বলতে হবে? তেষ্টা কি জলেরই হয়? বড়লোক হওয়ার তেষ্টা, গণ্যমান্য লোক হওয়ার তেষ্টা, ভাল কাজ করার তেষ্টা—তেষ্টার কি অন্ত আছে মাধুরী?"

মাধুরী গম্ভীর মুখে বলল, "এতো তেষ্টা নয় বিনয়দা—এ লোভ"—

শিকারী বেড়ালের মত বিনয় তাকাল, মাধুরীর এই কথার অর্থ সে কি বুঝতে পারেনি? বেশ পেরেছে—তাই মাধুরীর মন ভাল করে যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করল, "লোভ!"

মাধুরী প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে বলল, "হ্যাঁ লোভ"—কিন্তু তার ভয় হয়, এমন স্পষ্ট করে বললে আবার বিনয় হয়ত ক্ষেপেই যাবে, হয়ত তাতে তার স্বামীর ক্ষতি হবে। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, "তোমাদের এই শহরের হাওয়ায় শুধু লোভ আর লোভ বিনয়দা"—

বেড়াল বুঝল যে ইঁদুর কথা ঘুরিয়ে দিল, সেও মেনে নিল এই খেলার ভঙ্গী, বলল, "হয়ত তাই। আমি তাকে তেষ্টাই বলি আর এই তেষ্টারই নাম জীবন।"

মাধুরী হঠাৎ মাথা ঝাঁকাল, কণ্ঠস্বরে তরলতা টেনে এনে বলল, "বাবাঃ, এ সব বড় বড় কথা আমার মাথায় ঢুকছে না, ও সব কথা তুমি ছাড়ো দেখি বিনয়দা"—

বেড়াল হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠল, বলল, "বেশ, বড় বড় কথা না হয় ছোট আর সহজ করেই বলছি"—

"কিন্তু ও কথা তবু বলতেই হবে?"

"হ্যাঁ—এ কথা ছাড়া যে তোর কাছে আমার এখন অন্য কোন কথাই নেই মাধুরী"—

"তার মানে?" মাধুরীর শরীর আবার টান টান হয়ে উঠল। রাস্তার মধ্যে একটা মোটর বোধ হয় হঠাৎ ব্রেক কষল। একটা হই হই—হল্লা। কেউ হয়ত চাপা পড়ল কিংবা চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। আকস্মিক সেই শব্দের ধাক্কায় বিনয়ের কথার অর্থ যেন আরো স্পষ্ট এবং আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠল।

"তার মানে?" বিনয় হাসল, একটু থেমে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল মাধুরীর

অবশ্য যে শোনে সে ইচ্ছে করলেই মানে খুঁজে বের করতে পারে।"

দাঁত দিয়ে দাঁত চেপে আবার প্রশ্ন করল মাধুরী, "তার মানে?" তার হঠাৎ একটা কিছু কুচি কুচি করে কাটতে ইচ্ছে করল।

"মানে ফ্যানটা চালিয়ে দাও—সদাদা দেখছি নতুন টেবল ফ্যান কিনেছে"—

নিজেকে গুটিয়ে নিল মাধুরী, ফ্যানটা চালিয়ে দিল।

"আঃ"—বিনয় রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বলল, "তুই কি রে? এক কাপ চায়ের কথাও বলছিস না! সদাদার কাছে কিন্তু এবার নালিশ ঠুকে দেব—মাইরি বলছি"—

মাধুরী এবার জিভ বের করল, "ওমা,

"ভেতরে যদি কুকুর চলে আসে—তাই বন্ধ করলাম মাধুরী"—বলেই সে ভেতরে চলে গেল।

কুকুর? তেতলায়? বিনয়ের তো অদ্ভুত ভয়! ভয় না অছিলা? স্টোভের কাছাকাছি যায় সে। স্টোভটা জ্বলছে। সশব্দে। হঠাৎ মাধুরীর মনে হয় সে যেন একটা খাঁচায় বন্দিনী বুনো পাখি। মনে হয় পালিয়ে যায় সে। কিন্তু কোথায়? ছাদে? যেখানে মহানগরীর ধূম্রনিঃশ্বাসে কলঙ্কিত বিবর্ণ আকাশটা মাথার ওপর কুটিল হয়ে আছে। যে আকাশের নীচে ছড়িয়ে আছে ইঁটপাথর আর লোহা দিয়ে গাঁথা অন্তহীন সৌধাবলী—যেন অন্তহীন কারাগার—

"জল চাপিয়েছিস?"

"জল চাপিয়েছিস?"

উক্তিকে, যেন সে তার পরেই মানেটা ব্যাখ্যা করবে। পায়ের ওপর একটা পা তুলে সে জাঁকিয়ে বসল, তারপর পকেট থেকে দামী সিগারেট বের করে ধরাল। হঠাৎ শেয়ালদা স্টেশনের কোনো ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ একটানা শব্দটা ফালি ফালি করে বাতাস কেটে কেটে ঘরের চার দেয়ালে প্রতিহত হল, মাধুরীর দু' কানের পর্দাতে একটা বধির ঝনঝনানির সৃষ্টি করল।

"জবাব দিচ্ছ না যে?" হঠাৎ কেমন যেন জেদ চাপল মাধুরীর।

বিনয় সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, "মানে আবার কি মাধুরী? মানুষ কি মানে ভেবে ভেবেই সব সময় কথা বলে?

আমি ভুলেই গেছি—দিচ্ছি চা করে বিনয়দা"—

সে ছুটে রান্নাঘরে গেল। লজ্জা পেল সে। এ সব কি করছে সে! কি বলছে সব? বিনয়ই বা কি বলছে? স্টোভে আগুন দেয় সে, ধীরে ধীরে স্টোভের আগুনের নীল শিখাটা সশব্দে জ্বলে ওঠে। কেৎলীতে জল ভরে স্টোভে বসায় সে। হঠাৎ খুট্‌ করে একটা শব্দ শুনে সে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখল যে বিনয় বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছে। মাধুরীর রক্তে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। বিনয় দরজা বন্ধ করে ঘুরতেই তাকে দেখতে পেল। সে হাসল।

চমকে ঘুরল মাধুরী। বিনয় রান্নাঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

"তুমি আবার এখানে এলে কেন বিনয়দা—যাও ও ঘরে। এখুনি চা আনছি"—

"একা বসে থাকতে ভাল লাগে নাকি রে—দুটো কথা বলার জন্যেই তো আসা।"

"তুমি বিয়ে করে করছ, বিনয়দা?"

হঠাৎ যেন একটু চুপসে যায় বিনয়, ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে, "বিয়ে কেন?"

"তাহলে কথা বলার লোক পাবে।"

"আমি বিয়ে করব না এখন।" বিনয় আবার আত্মস্থ হয়ে হাসল।

"কেন?"

"আমি একজনকে ভালবাসি।"

"বটে! কে সে বল না"—

"সব কথাই তোকে বলতে হবে এমন কোনও দলিল করে দিয়েছি নাকি আমি।"

মাধুরী জবাব খুঁজে পায় না। স্টোভের দিকে হাসির ভান করে মুখ ফেরায়। নীল আগুন কাঁপছে।

"মাধুরী তুই ঘামছিস।"

"হবে।"

"কিন্তু তাতেও বেশ দেখাচ্ছে তোকে।"

মাধুরী কাঠ হয়ে গেল। নড়ল না সে, স্টোভের আগুনের দিকেই তাকিয়ে রইল।

বিনয় হঠাৎ একেবারে কাছে ঘেঁষে এল, দু' হাতে মাধুরীর কাঁধ ধরে সবলে, আচমকা তাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "তুই গাঁয়ের মেয়ে হলেও সাংঘাতিক চালাক মাধুরী কিন্তু আমিও তো বোকা নই যে তোর মন বুঝব না—কেন আর কষ্ট দিচ্ছিস বল তো?"

"তার মানে?"

"মানে বুঝিসনি তুই?" বলেই বিনয় তার মুখটা নামাতে গেল মাধুরীর মুখের দিকে।

তার আগেই বিনয়ের গালে চড় মারল মাধুরী। বেশ জোরে—পুরো পাঁচ আঙুল দিয়ে। সশব্দে।

বিনয় দু'পা পিছিয়ে গিয়ে তাকাল।

মাধুরী ছুটে বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে।

বিনয় দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

করিডর দিয়ে ছুটে গিয়ে বাইরের দরজা খুলে মাধুরী দু'চোখে আগুন জেলে চাপা গলায় বলল, "বেরিয়ে যাও।"

মুহূর্তকাল ভাবল বিনয় তারপর মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল সেই খোলা দরজা দিয়ে। শিকারী বেড়াল জানে কখন শিকার ছেড়ে দিতে হয়। দরজা পার হবার সময় মাধুরীর গলা আবার শুনতে পেল সে, "আর কোনদিন এখানে এসো না।"

দরজাটা বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত তাতে ঠেস দিয়ে হাঁপাল মাধুরী। খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে তার। ধীরে ধীরে সে তার শোবার ঘরে গিয়ে বসল। রান্নাঘরে স্টোভটা জ্বলছে। জ্বলুক। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সে। সেই চিমনিটা। কালো ধোঁয়া গল গল করে বেরোচ্ছে। পলাশপুরে ডাকাতে মাঠের ওপারে কি এখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে? কেমন যেন ভয় করছে, একা-একা লাগছে।

মহানগরীতে সূর্যাস্ত দেখা যায় না। মাধুরীও তা দেখতে পেল না। কিন্তু অন্ধকারে ছেয়ে যাবার আগে সে দেখল কেমন করে ঐ চিমনির ধোঁয়ায় আর এবাড়ি ওবাড়ির কয়লার ধোঁয়ায় সারা শহর ধোঁয়াটে হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ অন্ধকার ঘনাল আর একসঙ্গে দপ্ করে রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে উঠল। বাড়ির পর বাড়িগুলো অন্ধকারে আর আলোয় ঠাসাঠাসি করে দৈত্যদের মত ঝিমোতে লাগল। আর সেই ভয়-ভয় একা-একা ভাবটা নিয়ে মাধুরী আবার কাজ করতে শুরু করল। রান্না শেষ করল সে। ঝণ্টুর মা চলে গেল। সদানন্দ ফিরল রাত করে। ঘুমের ঘোরে স্বামীর শ্বাসরোধী আদরে ছটফট করতে লাগল মাধুরী। যেমন সে গত এক বছর ধরে করছে। তারপর পলাশপুরের আকাশ-বাতাসের কথা ভাবতে ভাবতে তার মনে হল যেন তার শরীরের কোথাও আগুন জ্বলছে। হঠাৎ অনেকদিন আগেকার তাদের গাঁয়ের একটা অগ্নিকাণ্ডের কথা তার মনে পড়ে গেল। তেলিপাড়ায় একদিন আগুন লেগেছিল বৈশাখের এক সন্ধ্যায়। সেদিন জোর হাওয়াও ছিল। লাল আগুন যেন লাফিয়ে লাফিয়ে একটা কুঁড়ে থেকে আর একটা কুঁড়েতে ছড়াচ্ছিল। সে কী হট্টগোল, হই হই কাণ্ড। আগুন নেবাবার চেষ্টা করতে করতেই কিন্তু পাড়াকে পাড়া পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আশ্চর্য, পলাশপুরের আগুনের রং-ও আলাদা। ভাবতে ভাবতে মাধুরীর মনে হল কোথাও একটা গুম্‌গুম্ শব্দ হচ্ছে। যেন এই শহরের মাটির তলায়। কেমন যেন ভয় হল। সদানন্দকে আঁকড়ে ধরে যে ভয় কমাবার চেষ্টা করতে করতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। মাধুরীর শহর-জীবনের আরও একটি দিন ও রাত শেষ হল।

তারপর মাধুরীর বিবাহিত জীবনের আরো দিন কাটল। মাস কাটল। দু' বছর কাটল। তাদের পাড়ার রাস্তাটা আরো চওড়া হয়ে মাধব কুণ্ড রোড থেকে স্ট্রীট হয়ে গেল। দেশের রাজনীতির কত ওলটপালট হল, কত ভুখ-মিছিল গলা ফাটিয়ে বিপ্লবের রক্তচক্ষু ঘুরিয়ে শহর কাঁপাল, তারপর মিছিল ভেঙে যে যার বাসায় ফিরল। কত মানুষ মরে মিটে গেল, কিন্তু শহর কলকাতার জনসমুদ্রে একটি ঢেউও কমল না। কমল না তার শব্দ, কোলাহল, আলো, অন্ধকার আর ঐ ভারতমাতা স্টীল ফ্যাক্টরীর চিমনির ধোঁয়া।

সিলিং ফ্যানের তলায় বসে নতুন-কেনা রেডিওতে গ্রাম্য-গীতি শুনতে শুনতে মাধুরী এখনো ঐ চিমনি'র ধোঁয়ায় তার ভাগের আকাশটুকুকে দিনরাত কলঙ্কিত হতে দেখে আর পলাশপুরের কথা ভাবে। ক'মাস আগে তার মা মারা গেছে, পলাশ-পুর আরো দূরে সরে গেছে বলেই পলাশপুরের কথা আরো বেশী করে মনে পড়ে তার। আর এখনো তার একা-একা লাগে, মনে হয় সে যেন বন্দিনী।

সেদিনও পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটে প্রভাবতীর ঘরে মেয়েদের আড্ডা জমেছিল। মাধুরী গেল।

"আয় ভাই মাধুরী—আয়—" প্রভাবতী ডাক দিল।

ললিতা বলল, "অবাক করলি তুই মাধুরী—এ ই ক'বছরেও একটা হল না তোর—প্ল্যাক্‌সো, কোম্পানী যে ফেল মারবে রে?"

প্রভাবতী বলল, "নারে, তুইও আমার মত বাঁজা হয়ে থাক। সব বর কি সমান হয়—অনেক বর বাঁজা বৌদের বেশী আদর করে।"

ললিতা হাসতে হাসতে বলল, "ঐ আনন্দেই থাকো দিদি—ধন্যি তুমি।"

বিধবা লীলাদি এই সময় ঘরে ঢুকে প্রভাবতীর পানের বাটা টেনে নিয়ে বলল, "আজ নাকি ব্লালিগঞ্জের দিকে কোন্ এক ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেল বাপু"—

"তাই নাকি! ওমা"—

"কে বললে দিদি?"—

পান মুখে দিয়ে লীলা বলতে শুরু করল। তারপর দুনিয়ার সমস্ত ডাকাতেরা এসে পাঁচনম্বর ফ্ল্যাটে মিছিল করে চলতে শুরু করল। সে-যুগের রঘু আর বিশে ডাকাত থেকে শুরু করে মধ্যপ্রদেশের মান-সিংহে গিয়ে গল্প যখন শেষ হল তখন মাধুরীর রক্তে বেশ একটা শিহরণ খেলে যাচ্ছ। বাবাঃ, পৃথিবীতে এমন সব হিংস্র লোকেরা আছে!

ডাকাতের গল্প শেষ হতে না হতেই [illegible]দের ওপর অত্যাচারের গল্প শুরু করল ললিতা। একমাস ধরে খবরের কাগজে যা যা পড়েছে তা সব গড়গড় করে বলল সে। যত সব বিকৃতমনা পাষণ্ড ও দুর্বৃত্তদের কাহিনী শুনতে শুনতে সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠল। আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে ছোরা রাখার উপদেশ দিল লীলা। সবাই সমর্থন করল তা। শুনতে শুনতে মাধুরীর শরীরে কেমন যেন একটা কাঁপুনি ধরে। এ কোথায় এসেছে সে? পলাশপুরের সেই নিশ্চিন্ত জীবন তার কোথায় গেল?

ঘরের ভেতর হঠাৎ হুড়মুড় করে ঢুকল রমা।

"এই যে—এতক্ষণে আসর জমল"—ললিতা বলল।

রমা বলল, "শ্‌শ্‌শ্—শীগ্‌গীর সবাই দরজার গোড়ায় এসো"—

"কেন রে?"

"এসোই না"—

সবাই গিয়ে বাইরের ভেজানো দরজার ফাঁকে চোখ রাখল। কয়েক সেকেণ্ড বাদে দেখা গেল যে একটি চব্বিশ পঁচিশ বছরের সুদর্শন যুবক সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

রমা বলল, "দেখলে?"

"কি?"

"ঐ যে ছোঁড়া গেল?"

"কে ও?"

"উনিই সেই"—

"আ মলো যা—খুলেই বল না"—

"নির্মলাদির রতন ঠাকুরপো"—

"ওঃ"—

"বুঝেচি"—

"ইনিই!"

ঘরে ফিরে গিয়ে কেচ্ছা জমল। কিছুদিন ধরেই ব্যাপারটা সবার চোখে পড়েছে। নির্মলার অধঃপতন ঘটেছে। দেওরের বন্ধু ঘন ঘন আসা-যাওয়া করছে। আর আসে ঠিক দুপুরবেলা যখন তার স্বামী যতীন রেল-অফিসে কাজ করতে যায়। নির্মলার দু'টি বাচ্চা হয়েও বাঁচে নি। তার স্বামী দেখতে শুনতে ঐ রতনের মত না হলেও বেশ কিন্তু। রমাই প্রথম সন্দেহ করেছিল, তারপর ঝি-চাকরেরা প্রমাণ জড় করেছে। ছি ছি ছি, মেয়েদের নাম ডোবাল নির্মলা।

রমা বলল, "আমি আগেই জানতাম দিদি—গেরস্তের বৌ অমন পটের বিবি সেজে থাকে গো কেন দিনরাত? সাজ না সাজ—ঐ যে বলে না, 'সাজ করতে দোল ফুরোল'—ও হল তাই"—

ললিতা বলল, "যাই বল্ ভাই, ওর স্বামীর নিশ্চয় কোনো দোষ আছে"—

"কিসের দোষ? পুরুষেরা সবাই খারাপ কিন্তু তবু দু'এক জনকে বাদ দিতে হয়"—

"যেমন আমার উকীল ভাই"—প্রভাবতী পান মুখে দিতে দিতে বলল।

রমা চোখ ঘুরিয়ে বলল, "তবু উকীলবাবুর ওপর নজর রাখিস দিদি"—সবাই হেসে উঠল।

"সত্যি, পুরুষেরা বড় বজ্জাত"—ললিতা বলল।

বেলা বলল, "বিলেতের মেয়েদের দেখ—কেমন স্বাধীন!"—

রমা বলল, "আরে আমরাও আগের চেয়ে ঢের স্বাধীন হয়েছি বাবা—এবার দেখবে আমরাও ইচ্ছেমত বিয়ে করব, যটা খুশি"—

"হি হি হি"—

"হা হা হা"—

"কেন করব না—মিনসেরা তিনটে চারটে বিয়ে করে কি মজা পায় তা আমরাও পরখ করব ভাই। বুঝলে দিদি, এসো আমরা একটা মহিলা সমিতি করি"—

"কি করবি বাপু?"

"কেন মেয়েদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করব, পণপ্রথার বিরুদ্ধে লড়ব, পুরুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইনকেলাব জিন্দাবাদ হল্লা করতে করতে মিছিল নিয়ে মনুমেন্টের তলায় গিয়ে চুল এলো করে দিয়ে বক্তৃতা দেব—স্টানিশ মাটিশ ধা টিন টিন"—

"হি হি হি"—

"উরে বাবারে—হিঃ হিঃ হিঃ"—

"দিদি হাসি নয়, তুমি হবে সেই সমিতির প্রেসিডেন্ট"—

"রক্ষে কর ভাই—প্রেসিডেন্ট বরং আমার উকীলকে করিস"—

"দূর, সে তো পুরুষ—না না, তুমিই হবে"—

"আচ্ছা নে হলাম—সমিতির নাম কি?"

বেলা বলল, "অবলা সমিতি?"

রমা বলল, "মেরে ফেলব তোকে—আমরা অবলা কোন্ দুঃখে লা? আমাদের সমিতির নাম হবে সবলা সমিতি"—

"হাততালি দে ভাই তোরা—বেশ নাম হয়েছে"—

হাততালি।

হঠাৎ ললিতা বলল, "আমার জন্যে তোরা একটা পাত্তর দেখিস তো রমা, আমি আবার বিয়ে করব"—

মুহূর্তের মধ্যে কামরার ভেতরে স্তব্ধতা নেমে এল। সত্যি, ললিতার দুঃখ আছে। তার স্বামী অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত। সেই মেয়েটি নাকি বাগবাজারের দিকে থাকে। রিফিউজী।

ললিতাদি ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "আহা ভেঙে পড়লে চলবে কেন ললিতা—তুমি ভালবাসলে সেও ভালবাসবে"—

রমা ঠোঁট উলটে বলল, "বাজে কথা দিদি—পিরীত আর গীত জোরের কাজ নয়"—

"শুনেছি সে বেটি নাকি ললিতার পায়ের নখেরও যুগ্যি নয়"—

"নয়ই তো, কিন্তু কথায় বলে না যে পিরীতের পেত্নীও ভাল? —ব্যাপারটা তাই যে"—হঠাৎ সে গা ঝাড়া দিয়ে বলল, "ঝাঁটা মারো ওসব দুঃখের কথায়—এসব কথাই যদি শুনতে হবে তাহলে আমার মাতালদির অ্যাকটিং-ই না হয় শুনব—না ভাই, এসো তার চেয়ে একটু ফষ্টিনষ্টি কথা বলি"—

"বল্ না ছুঁড়ী"—প্রভা মুখে জরদা পুরে বলল।

রমা বলল, "তাহার মানে ভাল হল, দুই সতীনে পিরিত হল"—

"কার, রে?"

"আরে জগমোহনবাবুর দুই বৌ—আজকাল আর ঝগড়া হয় না—ওদের এস্টেটের ম্যানেজার মালিক মারা যাবার পর ঝগড়া মিটিয়ে দিয়েছে"—

"ছি ছি ছি—ছি ছি ছি"—

"আর জানো—তোমাদের বালিগঞ্জের তারিণীবাবুর বউ তিন নম্বর স্বামীর ঘর করছে ক'দিন ধরে"—

"অ্যাঁ! এই না, সেদিন দু'নম্বরকে তালাক দিল"—

"ছি ছি ছি—ছিঃ"—

"ছি ছি কেন ভাই—এ-যুগের ব্যাপারই যে সব্বোনেশে, এ-যুগে—

সাতভাতারী সাবিত্রী,
বারোভাতারী এয়ো,
একভাতারী পোড়াকপালী
দুয়ার দিয়ে না যেয়ো।"

"ঠিক ঠিক"—

"বেশ বলেছিস ভাই"—

হঠাৎ ঘরে নির্মলার আবির্ভাব ঘটল। আবার স্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। সবাই তাকায় নির্মলার মুখের দিকে, গালের দিকে, চোখের দিকে। রমা মাধুরীর হাতে একটা চিমটি কাটল।

"কি দিদি—চুপ করে কেন?" নির্মলা একটু হাসল বসতে বসতে।

প্রভাবতী বলল, "বোস ভাই বোস্—চুপ আবার কোথায়—ভাবছিলাম মেয়েদের আমাদের কী দুঃখ"—

নির্মলা হাসল, "তোমার দুঃখটা কিসের?"

"আছে ভাই আছে—হ্যাঁলা, এতক্ষণ ছিলি কোথায়?"

নির্মলার মুখে ক্ষণকালের জন্য যেন একটু রক্তিম আভা দেখা গেল। রমা মাধুরীর হাতে আবার চিমটি কাটল। উঃ।

নির্মলা বলল, "ঘরেই তো ছিলাম—আমাদের রতন এয়েছিল—আমাদের কানু ঠাকুরপোদের এক ভাই"—

মাধুরীর হাতে আবার চিমটি কাটল রমা।

মাধুরী অবাক হয়ে গেল—নির্মলা মিথ্যে কথা বলল।

নির্মলা বলে যেতে থাকল, "সেই সকালে বেরিয়ে যায় আপিসে—তাই মাঝে মাঝে খাবার ছুটিতে একটু আবদার করে খেতে আসে"—

প্রভাবতী বলল, "ভালই তো, ভালই তো"—

রমার চিমটির চোটে মাধুরী এবার হাসি চাপবার জন্য উঠে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময়েই কানে শোনা গেল—"ধর—ধর—ধর—পাকড়ো—ও-ও"—

সবাই হাসাহাসি থেকে পড়ল রাস্তার জানালার দিকে। একদল লোক ডানদিকে ছুটে চলে গেল। তাদের পেছনে পেছনে কয়েক জন লোক একজন লোককে ধরে নিয়ে চলেছে—"পকেটমার এই পকেটমার"—লোকটির পিঠ বেয়ে তাজা টকটকে লাল রং-এর রক্তধারা নেমেছে। দেখতে দেখতে গা গুলিয়ে উঠল। মা—গো—।

মাধুরী প্রভাবতীর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। পেছন পেছন এল লীলা।

"আমিও যাই মাধুরী—অসীমা হয়ত জেগেছে এতক্ষণে"—

লীলা তার ভাগ্নে যোগেনের সঙ্গে থাকে। যোগেন ভাল চাকরি করে। যোগেনের বউ অসীমা, বি-এ পাস—বড় দেমাকী মেয়ে। দিনরাত নাটক নভেল পড়ে আর পড়ে পড়ে ঘুমোয়। লীলাই সংসার চালায়। আবার ভাগ্নের মুখের দিকেও চেয়ে নেই লীলা, তার স্বামীর ইনসিওরেন্সের টাকা, জায়গা-জমি সব পেয়েছে সে। যোগেনের সংসার চালিয়েও স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করে, শহর দেখে, সিনেমা দেখে।

"ও মাধুরী—দিনভর তো একা একা থাকিস—চ' কাল দুজনে সিনেমা দেখে আসি"—

"সিনেমা! উনি রাগ করবেন দিদি"—

"ওমা—এর জন্যে তুই আবার মতামত নিতে যাবি নাকি? এইত কাছেপিঠে আমার সঙ্গে যাবি, তাতে আবার জিজ্ঞেস করবি? একা একা পাগল হয়ে যাবি নাকি?"

"আচ্ছা দেখা যাবে দিদি"—

ঘরে ফিরে গিয়ে একা একা আচার খেতে খেতে ভাবে মাধুরী। রমাদি কেমন অদ্ভুত লোক। 'নির্লজ্জ'—ছি ছি ছি। ইস্, রমাদি কেমন ছড়া কাটতে পারে? একদিন তার খোঁপায় হাত দিয়ে বলেছিল, "দেখ দিদি দেখ, 'আমাই যে মরদ তা মেয়ের খোঁপাতেই পরিচয়'—"। জিভ টাকরায় লাগিয়ে একটা শব্দ করে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মাধুরী। নিজের খোঁপাটায় হাত দিয়ে দেখল। এই খোঁপা থেকে তার সদানন্দবাবুকে চেনা যায়? হঠাৎ চুল এলো করে দিল সে। তার চুল বেশ লম্বা, কিন্তু সদানন্দ একদিনের জন্যেও তার চুল নিয়ে কিছু বলেনি এখনো। হি হি হি হি মনুমেন্টের তলায় সেও কি 'বক্তৃতা' দেবে—'প্রিয় বোনেরা, স্টানিশ মার্টিশ ধা টিন্ টিন?'—হি হি হি—উঃ বাবা—রমাদি'টা খুব রগুড়ে! কিন্তু সত্যি কথাও বলে। পুরুষেরাই মেয়েদের কষ্ট দেয়। ললিতাদির বড় কষ্ট। হ্যাঁ, সবলা সমিতির সেও মেম্বর হবে। শেয়ালদার দিক থেকে একটা ইঞ্জিনের বাঁশীর শব্দ ভেসে এল। বাবারে বাবা, কী শব্দ এই শহরে। আর [illegible] কারা যেন হাসা-হাসি করে উচ্চকণ্ঠে অশ্লীল আলি-[illegible] করছে। [illegible]। বাতাসে যেন কেমন একটা [illegible] গন্ধ। উঃ মাগো—[illegible]। নিশ্চয়ই মরে গেছে এতক্ষণে। কী ভাল হল! একা একা লাগছে। বড় [illegible]। ঐ চিমনির ধোঁয়া। আরো অনেক চিমনি আছে ওখানে। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। [illegible] চিমনির [illegible]। পলাশপুরে [illegible] ঝিঁঝির [illegible]। নটাকাঁটার ফুলের সুগন্ধ। ভিজেভেজা মাটির সুবাস। সূর্যাস্তের রং-এ আর ছায়াতে মায়াময় পলাশপুরের সন্ধ্যা......। কখন আসবে লোকটা......এ-দেহের দাহ......

সদানন্দ আজ তাড়াতাড়িই ফিরে এল। রাত আটটার আগেই।

"মাধুরী—মাধুরানী—ও মাধুরীলতা"—

"কি বলছ?"

"দেখ তোমার জন্য কি এনেছি"—

মাধুরী কাছে গেল, "কি এনেছ?"

সদানন্দ হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল, "উঁ—হুঁ,—আগে আদর চাই।"

"যা—ও"—

কিন্তু সদানন্দ নাছোড়বান্দা। কাছে এসে সশব্দে চুমু খায়, তারপর একটা প্যাকেট খোলে। তাতে স্নো, পাউডার, আলতা। তার সঙ্গে একটা লিপস্টিক।

"ওমা—লিপস্টিক!"

"হ্যাঁ—তুমি লাগাবে—তুমি যে সদানন্দ সাহেবের মেম গো—লাগাও, লাগাও একটু—কিন্তু খবরদার, শুধু আমার সামনে লাগাবে, রাতের বেলা"—

"ছি ছি—এসব আবার কেন?" বলতে বলতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে একটু রং লাগাল মাধুরী, তারপর খিলখিল করে হাসতে লাগল, "ওমা—ছিঃ"—

"ছিঃ কেন, বেশ দেখাচ্ছে তো—এই, অত জোরে হেসো না—দেখি দেখি, আর একটু আদর করি আমার মেমসাহেবকে—উম্—উম্"—

হঠাৎ বিশ্রী লাগে। সদানন্দের মুখ-চোখের চেহারা দেখে কেমন যেন খারাপ লাগে মাধুরীর। সদানন্দ যেন খাঁচার পাখিকে আদর করছে।

"দেখছ কি মাধুরানী—আরো আছে"—

—মনে হল, সে পালিয়ে যায় কোথাও।

বলতে বলতে পকেট থেকে একটা গয়নার বাক্স বের করে সদানন্দ। একটা আধুনিক ডিজাইনের নেকলেস, আর এক-জোড়া কানপাশা।

"কি, নড়ছ না যে! পছন্দ নয় বুঝি?"

"কি যে বল—কত দাম পড়ল?"

"সে খবরে তোমার দরকার কি—নাও পরো দেখি। বলিনি যে তোমায় গয়নায় মুড়ে দেব আমি। আরে দেখ না, দু'তিন মাসেই নতুন ফ্ল্যাটে চলে যাব আমরা—বালিগঞ্জে। হেঃ হেঃ হেঃ—একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িও কিনব, গাড়ি ছাড়া আর চলছে না—কন্ট্রাক্টরি কি সহজ ব্যাপার"—

"সত্যি? গাড়ি কিনবে?"

"তবে? বাঁচতে হলে বাবা ভালভাবে বাঁচতে হবে। ছলে বলে কৌশলে—টাকা আনতেই হবে।"

গয়না পরে নিজেকে দেখে মাধুরী। বড় ভাল লাগে তার নিজেকে। পেছন থেকে তার ঘাড়ের কাছে মুখ এনে সদানন্দ বলল, "কি মাধুরানী, পছন্দ হল? অ্যাঁ?"

তৃতীয় দফা আদর করতে শুরু করল সদানন্দ। তখন আষাঢ়-শেষের মেঘ ডেকে উঠল বাইরে।

"বৃষ্টি হবে"—বলেই একটা জানালার দিকে তাকাল সদানন্দ। ওদিকের একটা বাড়ির একটা জানালাতে একটি ছোকরাকে দেখা যাচ্ছে। ছোকরা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে।

হঠাৎ সদানন্দের মুখচোখ কুৎসিতভাবে কঠিন হয়ে উঠল, জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে মাধুরীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে সে বলল, "এসব চলবে না—বুঝলে?"

"কি?"

"জানালা খুলে বাজারের মেয়েদের মত নিজেকে জাহির করা"—

"ছি ছি—কি বলছ!"

"ঠিক বলছি—খবরদার, এ-জানালা আর কক্ষনো খুলবে না"—

সদানন্দের হাবভাব দেখে বিশ্রী লাগল মাধুরীর। মনে হল সে পালিয়ে যায় কোথাও। যেদিকে হোক। কিন্তু মুখে কিছু বলল না সে। খারাপ কথার জবাবে খারাপ কথা বলতে ইচ্ছে করে না তার।

আকাশে মেঘ আবার ডাকল।

বৃষ্টি নামল দু' ঘণ্টা বাদে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সেই বিদ্যুতের আলোতেও চিমনিটাকে দেখতে পেল মাধুরী। তখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

বৃষ্টির শব্দ শুনতে-শুনতে সদানন্দের নাক ডাকার আগেই মাধুরী বলল, 'শুনছ?'

"বল মেমসাব"—

"কাল সিনেমা দেখতে চল"—

"উঁ?"

"সিনেমা"—

"সময় নেই"—

"তাহলে আর কোথাও চল—চল পুরী যাই—সমুদ্র দেখা যাবে"—

সদানন্দ খেঁকিয়ে উঠল, "হবে হবে ওসবের ঢের সময় আছে—তার আগে টাকা চাই। টাকা—বুঝলে? টাকা কামাবার বয়স চিরকাল থাকে না"—

মাধুরী আর কথা বলল না। কিন্তু সদানন্দ ঘুমভরা গলায় বলে যেতে লাগল। বাজে কথায় ও বাজে খেয়ালে সময় নষ্ট করার সময় নেই তার। তার লাখ লাখ টাকার দরকার। সে বাড়ি করবে, গাড়ি করবে, ফ্যাক্টরী, মিল কিনবে, জীবনে বড় হবে। কথা বলতে বলতে সে যেন নিজেই নিজেকে হিসেব শোনাতে লাগল। কোন কাজে কত লাভ হয়েছে, কার কাছে এ মাসে কত সুদ পেয়েছে, এখন পর্যন্ত ব্যাঙ্কে কত টাকা জমেছে।

হঠাৎ মণীশ পালিতের গলা ভেসে এল দশ নম্বর থেকে। আজো মাতাল হয়েছে সে আর 'বিল্বমঙ্গল' নাটক থেকে আউড়ে যাচ্ছে। মণীশ পালিতের অ্যামেচার স্টেজে বেশ নাম আছে।

শোনা গেল, "এই পরিণাম!

এই নরদেহ—

জলে ভেসে যায়,

ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল,

কিংবা চিতাভস্ম পবন উড়ায়!"

রমাদির গলা ভেসে এল, "বলি, আজ আবার কোন পার্ট হচ্ছে?"

জবাবে শোনা গেল, 'বিল্বমঙ্গল' থেকে বলছি—নে চুপ করে শোন্ আমার কেমন ডেলিভারী—

আরে রে নয়ন,

মন্মথের তুই রে প্রধান সেনাপতি!

ছদ্মবেশে আপন হইয়ে,

শত্রু ডেকে আন ঘরে!

"বলি ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুর—কিছু খাবেন না?"

"চোপরও—ইউ শাট্ আপ্"—

দাঁতে দাঁত চেপে সদানন্দ বলল, "শালা-শুয়োর— সারারাত জ্বালাবে শালা"—

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, বিল্বমঙ্গলের 'ডেলিভারী' আর শোনা গেল না। বাইরে বৃষ্টির জোর বাড়ল, আকাশের বুকে কে যেন এদিক থেকে ওদিকে বার বার একটা লোহার বল গড়িয়ে দিল। কাঠ মনে করে গলিত শবদেহ ধরে নদী পার হবার মত প্রাকৃতিক অবস্থা যখন বাইরে তৈরি হয়ে গেল, তখন ঘরের ভেতর সদানন্দের নাক ডাকতে শুরু করল, আর কামরার অন্ধকারে চোখ মেলে মাধুরী ভাবতে লাগল যে, কলকাতার বৃষ্টির শব্দও আলাদা ঢংয়ের। ঝরঝর বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে পাইপ বেয়ে জল নামার কলকল শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে হর্ন দিতে দিতে যাচ্ছে মোটরগুলো। এখানে হাওয়া যত সব রাস্তা আর গলির মুখে মুখে থমকে দাঁড়ায়, আর পলাশপুরে কেমন হু হু হাওয়া বইত—সেখানে হেমন্তকালে সবুজ ঘাসের ওপর কেমন সোনালী আলো পড়ত...... আর সেই তেলিপাড়ার আগুন...কী লাল!...

দুপুরবেলা দরজা বন্ধ করে নতুন গয়না পরে নিজেকে দেখছিল মাধুরী। বেশ দেখাচ্ছে তাকে। সোনার স্বাদ যে বেশ তীব্র তা আজ বুঝতে পারল সে। এমনি সময় দরজায় টকটক শব্দ হল।

দরজা খুলে দেখল লীলাদি।

"চ' সিনেমা দেখতে যাব!"

"আজ?"

"বাঃ—কাল তোকে বললাম না। চল্ চল্—দেরী করিসনে—দুপুরের শো'তে দেখব—পাঁচটায় শেষ হয়ে যাবে"—

"কিন্তু"—

"ঐ দেখ—সিনেমাতে কী এমন অপরাধ বাপু"—

"আচ্ছা চল"—

সত্যিই তো, কী এমন অপরাধ। মাধুরী সেজেগুজে বেরোল।

রাস্তায় বেরিয়ে একটা রিকশায় চড়ে দুজনে 'পূরবী'তে গেল। রাস্তাঘাটে কত লোক, কত শব্দ। ট্রাম-বাস ছুটছে—তারে তারে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মানুষ ছুটছে। দেখতে দেখতে কেমন যেন নেশা লাগে।

লীলাই টিকিট কাটল। যথাসময়ে সিনেমা শুরু হল। প্রেমের দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে লীলা তার হাত ধরে ফিসফিস করে মাঝে মাঝে বলতে লাগল,"দেখ, কেমন করে ভালবাসার কথা বলতে হয়।" লীলার কথায় হাসি পায় তার, তবু বেশ লাগে। এ এক নতুন স্বাদ। সদানন্দের আইন ভেঙেছে সে, খাঁচা থেকে বেরিয়েছে।

ফেরার পথেও আবার তারা রিকশা চড়ল। পথে লীলা তাকে বোঝায় কোন্ বাসে কোথায় যেতে হয়। বাবাঃ, বাসের নম্বরও বলিহারী। তিন নম্বর, পাঁচ নম্বর, আট, আট-এর এ, এগার, এগার-এ, তেত্রিশ নম্বর —ক-ত নম্বর। রাস্তার জনস্রোতকে দেখে মাধুরীর মনে হয় যেন একটা সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে। পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে মোটরেরা ছুটে যাচ্ছে। কোনোটা যেন হরিণ, কোনোটা বাঘ, কোনোটা মত্তহস্তী। চারদিকে শব্দ, কোলাহল, একটা গমগম শব্দ। হঠাৎ মনে হল যে রিকশা আস্তে চলছে। মোটর হলে বেশ হ'ত। খুব জোরে ছোটার একটা দুরন্ত বাসনা জাগে মাধুরীর। রক্তে যেন এক চঞ্চল বিদ্যুৎ-বলাকা ডানা ঝাপটাচ্ছে।

বাড়ির কম্পাউন্ডে পা দিয়ে লীলা বলল, "কেমন, হারিয়ে যাও নি তো?"

মাধুরী হাসল।

গলা নামিয়ে লীলা বলল, "কাউকে বলিস নি কিন্তু—ওই রমা-মমা কাউকে বিশ্বাস করিনে বাপু—যা করবার চুপচাপ করবে—আমি বিধবা মানুষ সিনেমা দেখেছি শুনে ওদের কত কথা—কিন্তু কি করা যায়, তুই-ই বল মাধুরী—বিধবা মানুষ, একা একা হাঁপিয়ে উঠি—"

নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে মাধুরী দেখল যে ঝন্টুর মা তখনো আসে নি। আর এলেই বা কি? কিসের ভয়? সে কি চুরি করেছে, খুন করেছে?

সেই জানালার ধারে গেল সে—যে জানালাটা রাতের বেলা সদানন্দ কুৎসিত ইঙ্গিত করে বন্ধ করে দিয়েছিল। মাধুরী সেটা খুলে দিল। কোথায়, কেউ নেই। থাক না খোলা। কে একটা ফোকলা জানালা দিয়ে তাকালেই বা কি? সেখান থেকে রাস্তার দিকের জানালার কাছে গেল সে। সিনেমা দেখে ফেরার সময় লীলাদি পান কিনেছিল। এখনো মুখে আছে পান। জানালা দিয়ে পিচ ফেলল সে। ওমা একজন লোকের মাথায় পড়ল যে। লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকাল। মাধুরী ঝট করে সরে গেল দু'পা। ছি-ছি-ছি কী কাণ্ড —লোকটা নিশ্চয় মনে মনে গাল দিচ্ছে তাকে। জানালা দিয়ে সেই অতি-পরিচিত চিমনিটা দেখা যাচ্ছে। ধোঁয়া বেরোচ্ছে গলগল করে। হাওয়ার ধাক্কায় সেই ধোঁয়া তাদের ফ্ল্যাটের দিকেই যেন আসছে। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। কেমন যেন একা-একা লাগছে—সিনেমা দেখে এসেও যেন সেই শূন্যতা-বোধ কমছে না। আচারের শিশি খুলে আচার খেতে বসল মাধুরী।

তারপর আরো দু'তিনদিন লীলার সঙ্গে সিনেমা দেখল মাধুরী। রাস্তাঘাট প্রায় চেনা হয়ে এল তার। আর তারপর একদিন একাই বেরোল। বেরোবার আগে হাল্কা করে লিপস্টিক ঘষল ঠোঁটে আর নতুন কানপাশা জোড়া পরল।

একা। একা-একা দিব্যি রাস্তা চিনে চলল সে। চড়ে পড়ল একটা বাসে। হাওড়ার বাস সেটা। দেখাই যাক না হাওড়ায় গিয়ে। হঠাৎ যদি সদানন্দের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? তা হলে কি বলবে? একটা মিথ্যে অজুহাত তৈরি করার চেষ্টা করতে করতে সে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেল। তারপর সেখান থেকে একটা বাসে গেল বালিগঞ্জে। সেখান থেকে

আবার ফিরে চলল শেয়ালদা। চলতে চলতে সে আড়নয়নে লক্ষ্য করল যে পুরুষেরা কেমন লক্ষ্য করছে তাকে। পুরুষেরা ভারী হ্যাংলা, রমাদি'র কথাই ঠিক। কিন্তু তবু কেমন যেন একটা মজাও লাগল তার। একটা সিরসির আনন্দ। রক্তে যেন চঞ্চল বিদ্যুৎ-বলাকা। শহরটা কত বড়! ইস্পাতের মত তার ধূসর আকাশ। অন্ধকার দ্বীপের মত তার মনটা। একা একা ঘুরে কি খুঁজছে মাধুরী? পলাশপুর? চারদিকে অবিরাম মুখর শব্দ। ইঁট-কাঠ-লোহার অরণ্যে মানুষের বিপুল বন্যা। আর বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। গলানো পিচের গন্ধ। ডাস্টবিনের পচা খাবার আর তরকারির খোসার গন্ধ। ভুলে-যাওয়া গন্ধের মত পলাশপুরের ডাকাতে-মাঠ একবার মনের কোণে উঁকি মেরে গেল। মাধুরী ভাবে। কোথায়? কি চাই?

মন ভরে না, তবু একটা বিচিত্র স্বাদ এই স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোতে। সেই স্বাদের কথা ভাবতে ভাবতে মাধুরী বাসায় ফিরল কিন্তু ফ্ল্যাটে ঢুকল না। রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে সে প্রভাবতীদের ফ্ল্যাটে ঢুকল। প্রভাবতী আদর করে বসিয়ে পান খেতে দিল।

"নে নে খা—তোর ঠোঁট অবশ্য আমাদের মত কালচে নয় যে পান খেয়ে লাল করতে হবে" বেলা বলল।

মাধুরী হাসল। লিপস্টিকের ব্যাপারটা ধরতে পারে নি কেউ।

আড্ডা চলল। অ্যাক্সিডেন্টের গল্প শুরু হল। কোথায় বাস উলটেছে, কোন মানুষ কোথায় চাপা পড়েছে, কোথায় কটা এরোপ্লেন চুরমার হয়েছে। এইসব গল্প। তারপর হয় রকেটের কথা। চাঁদে আর মঙ্গলগ্রহে যাবার গল্প। শুনতে শুনতে মাধুরীর কেমন যেন চাঁদে যাবার একটা শখ জন্মাল মনে।

তারপর কথা ঘুরে যায়। এটম বোমার গল্প ওঠে। কয়েকটা বোমা ফাটলে কি হবে সেইসব ভয়াবহ কথা বলাবলি করে তারা। ভূতের গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক তা। ভয় করে শুনলে, তবু শুনতে ইচ্ছে করে। ভয় পাওয়ার সুখের জন্যই শুনতে ইচ্ছে করে।

রমা বলল, "অ' দিদি—এবার একটু চা চড়াও—বোমা ফাটলেই তো অক্কা পাব সবাই —এসো বাকী কটা দিন ফুর্তি করে নিই। তাছাড়া আজকাল বড় ইচ্ছে হয় যে কেউ বসে বসে খাওয়াক"—

"সে কি লা—খবর কি?"

"খবর খুব সাধারণ—আর রেঁধে রেঁধে পারি নে বাপু—দাও দিদি, দুটো বিস্কুটই দাও—'আমার নাম যমুনাদাসী, আমি পরের খেতে ভালবাসি'—"

সবাই হাসতে থাকে।

ললিতা জিজ্ঞেস করল, "নির্মলা আজ কোথায় রে রমা?"

"ওমা তোমায় বলি নি বুঝি, সেই মুখপোড়ার সঙ্গে বেরিয়েছে"—

"নির্মলার কানু ঠাকুরপোদের এক ভাই?"

"তা কোথায় গেল?" বেলা প্রশ্ন করল।

রমা তেড়ে বলল, "তা আমি কি জানি বাপু—ও কি আমায় বলে গেছে"—

"ওমা—নির্মলার পেটে পেটে এত!"

"ছি-ছি-ছি—ছিঃ"—

রমা চোখ ঘোরাল, "অত ছি ছি কেন ভাই—মনে কি আর ইচ্ছে জাগছে না তোমাদের?"

"ছি ছি—যাঃ"—

"যাঃ কেন মাই ডিয়ার—আর লুকিয়ে লাভ কি? তবে আর ভরসা কর না—আমাদের সবলা সমিতি যখন দেশের শাসনভার হাতে পাবে তখন আমাদের পুরনো বরদের আমরা নাকচ করে দেব"—

"হি-হি-হি—সে কবে?"

"এটম বোমা ফাটলে পর"—

"এটম বোমায় শুধু ব্যাটাছেলেরাই মরবে বুঝি!"

"নির্ঘাৎ—মেয়েরা শক্তির অংশ তো তাই ওরা বেঁচে যাবে"—

"তাহলে তালাক দেব কাদের?"

"থুড়ি—আমাদের লোকগুলো বেঁচে থাকবে"—

"আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করবি কাদের?"

"মঙ্গলগ্রহের লোকদের—তবে তারা দেখতে কেমন জানি না ভাই—তবে শুনেছি লাল লাল হবে"—

হি হি করে হেসে লুটিয়ে পড়ল সবাই।

রাত দশটা নাগাদ সদানন্দ ফিরল সেদিন। হাতে শালপাতায় মোড়া একটা বেলফুলের মালা আর রজনীগন্ধা।

"সব—নিউ মার্কেট থেকে আনলাম—এই মালাটা খোঁপায় জড়াও দেখি—আর এই চিকেন-রোস্ট এনেছি—লাগাও ভোজ"—

রজনীগন্ধাগুলো ভাসে রেখে খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়াল মাধুরী।

"দেখি দেখি"—সদানন্দ তার মুখটি কাছে নিয়ে এল। চোখ দুটো কেমন যেন জ্বলছে তার। আর মুখটা মুখের কাছে আনতেই একটা উগ্র গন্ধ পেল মাধুরী।

মুখ সরিয়ে মাধুরী বলল, "কিসের গন্ধ? ইঃ"—

হা হা করে হাসল সদানন্দ, "চটে গেলে তো—জানতাম চটবে"—

"কিসের গন্ধ? কি খেয়েছ?"

"রাগবে না বল—ছুঁয়ে বল—একটু মদ খেয়েছি, সবচেয়ে দামী মদ—স্কচ"—

"মদ!"

"আরে ও একটু খেতে হয় পাগলী। কন্ট্র্যাক্ট বাগাতে হলে একটু-আধটু—রেগো না, আমি ঐ শালা পাঁড়াতের মত বিল্বমঙ্গল আওড়াব না—আর আমার কথা কি উড়িয়ে যাচ্ছ? আমি কি টলছি? আরে একটুখানি 'ইয়ে' করার ফল কি হয়েছে জানো? পঞ্চাশ হাজার টাকার কন্ট্র্যাক্ট বাগিয়েছি—নেট দশ হাজার টাকা লাভ"—

তবু মাধুরী নড়ল না।

"ও কি, রাগ করলে না? আমার মাধুরানী"—

"হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও"—

কিন্তু সদানন্দ ছাড়ে না, হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে জড়িতকণ্ঠে বলল, "আমায় তোর ভাল লাগে না—না রে?"

"কি যে বল—ছাড়"—

"আমি বুড়ো—তাই না? এাঁ?"

"বাজে কথা বলো না"—

"বাজে কথা নয়? সত্যি? সত্যি! তাহলে একটু হাসো হাসো মাধুরীলতা"—

বিশ্রী লাগে মাধুরীর, তবু সে হাসে।

হঠাৎ সেই জানালাটার দিকে নজর পড়ল সদানন্দের।

"এ জানালা খোলা কেন, অ্যাঁ?"

মাধুরী তাকাল। এই যাঃ, জানালাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে সে।

"কি? কথা বলছ না যে!"

"কি আবার বলব—জানালা বন্ধ করে থাকা যায় নাকি!"

সদানন্দ লাফিয়ে কাছে এল, "আলবৎ

যায়—আমি বন্ধ করতে বলেছি, ব্যস বন্ধ থাকবে"—

"অমন চেঁচাচ্ছ কেন?"

"চেঁচাচ্ছি কেন? তবে রে"—

হঠাৎ সদানন্দ একটা চড় মেরে বসল মাধুরীকে। মাধুরী এর জন্য তৈরি ছিল না, হকচকিয়ে গেল। তারপর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। সদানন্দ গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—চড় মেরেই তার নেশাটা হঠাৎ তরল হয়ে গিয়েছিল।

খানিক বাদেই রান্নাঘরে গিয়ে মাধুরীর কাছে দাঁড়াল সদানন্দ। তখন মাধুরী থালা সাজাচ্ছে।

"মাধুরী"—

মাধুরী জবাব দিল না।

"মাধু—আমায় মাপ কর—বেশ, খুলে রেখো তুমি জানালা"—

মাধুরী বলল, "খেতে বস"—

"আগে বল মাপ করেছ—বস"—বলতে বলতে হঠাৎ মাধুরীর পায়ের কাছে ধপ করে বসে পড়ল সদানন্দ।

"ওকি—ওঠ, ওঠ বলছি—ছিঃ"—মাধুরী সদানন্দকে হাত ধরে ওঠাল।

সদানন্দ হঠাৎ পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করল। বলল, "তুমি ধর"—

"এ কিসের টাকা? কত টাকা?"

সদানন্দ আবার হাসল হা হা করে, "পাঁচ হাজার টাকা—সব একশ' টাকার নোট—আগের কন্ট্র্যাক্টের একটা কিস্তি আজ পেলাম, আরো তিন হাজার পাব—ব্যস্, সামনের মাসেই বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে যাব, আজ তার আগামও দিয়ে এসেছি। গাড়িটা সেখানে গিয়েই কিনব বুঝেছ—সেখানে গ্যারেজ পাব কিনা"—

মাধুরীর রাগ কমে গেল—হাতের মধ্যে তার একশ' টাকার পঞ্চাশটা নোট করকর করতে লাগল।

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন মাধু—যাও, সেফটার মধ্যে রেখে দাও—ও টাকা তোমার, মাইরি বলছি। তুমি আসার পর থেকেই তো আমার কপাল খুলে গেছে গো—মাইরি বলছি"—

গড্‌রেজের আলমারির সেফের মধ্যে গুনে গুনে নোটগুলো রাখল মাধুরী। গুনতে বড় আরাম লাগল তার।

তারপর খাওয়াদাওয়ার পর সদানন্দের সে কী আদর আর ভালবাসা দেখানো। মুখ দিয়ে তার তখনো হুইস্কির গন্ধ বেরোচ্ছে—সে গন্ধে মাধুরীর রীতিমত কষ্ট হতে লাগল। চিকেন রোস্ট চিবোবার সময় আর বউকে আদর করার সময় সদানন্দের মুখ-চোখ একই রকম লালাস্রাবী দেখায়।

কিন্তু আদর করতে করতে রাত জাগার অভ্যেস সদানন্দের নেই, তাই একসময়ে সে নাক ডাকিয়ে মাধুরীকে রেহাই দিল। মাধুরী উঠে বসল বিছানায়। জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। বর্ণহীন আকাশ—সেই আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে তখন। সেই চাঁদের আলোয় সেই চিমনিটাকে একটা প্রাগৈতিহাসিক দানবের মত ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছে। এখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে তা দিয়ে। এখনো আগুন জ্বলছে ফ্যাক্টরীতে। আরো অনেক ফ্যাক্টরীতে। যেন যজ্ঞের আগুন জ্বলছে। শহরে ঘুম এসেছে এখন, তবু একটা গুম গুম গুম গুম শব্দ চলছে। যেন কারা প্রার্থনা করছে—দাও, দাও, দাও। রূপ দাও, যশ দাও, জয় দাও, অর্থ দাও, অফুরন্ত যৌবন দাও, মৃত্যুহীন প্রাণ দাও।

একফালি চাঁদের আলোতে বাড়ি-ঘরগুলো সব কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। এ শহরের লক্ষ লক্ষ লোকেরা কি সবাই এখন ঘুমিয়েছে? আবার জাগবে তো? আচ্ছা, মাধুরী যদি হঠাৎ মরে যায়? ভাবতে ভয় লাগল মাধুরীর। না, না, বাঁচতে হবে। কিন্তু চাইলেই কি বাঁচা যায়? মানুষ যেমন বাঁচতে চাইছে তেমনি মারতেও চাইছে যে। কে জানে কখন কে মরবে। মাধুরীর ভয় হল। ভয়ে ভয়ে সদানন্দের গা ঘেঁষে সে চোখ বুজল।

সাধারণত সকাল দশটা নাগাদ সদানন্দ বেরোয়, কিন্তু পরদিন সে একটা পর্যন্ত বাড়িতে রইল। কিসব কাগজপত্র দেখল, কিসব চিঠিপত্র লিখল, তারপর ধীরে-সুস্থে খেয়েদেয়ে, মাধুরীকে একপ্রস্থ আদর করে কাজে বেরোল।

বলে গেল, "ফিরতে একটু দেরি হবে হয়ত মাধুরানী—হয়ত এগারোটা হবে—ভেবোনি।"

একা-একা লাগে মাধুরীর। খানিকক্ষণ সে নভেল পড়ল, তারপর উঠে বসল। আলমারী খুলে একশ' টাকার নোটগুলো গুনতে বসল। নোটগুলো বেশ কড়কড়ে, নতুন। তারপর কি ভেবে সে সাজতে বসল। ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে ভুলল না সে, তারপর তালাবন্ধ করে তরতর করে নীচে নেমে গেল।

শেয়ালদার মোড় থেকে বাস ধরল সে। গেল শ্যামবাজার। শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জ। বালিগঞ্জ থেকে নিউ আলিপুর। সেখান থেকে এসপ্ল্যানেড। চলতে চলতে ব্যস্ত জনতার বিপুল স্রোত দেখল সে। দেখল হরিণের মত, বাঘের মত, মত্তহস্তীর মত ধাবমান মোটর আর বাস। দেখল ট্রামের তারে তারে বিদ্যুতের চমক। দেখল অসংখ্য পুরুষের লুব্ধ চাউনি। দেখল, বিশ্রী লাগল, আবার ভালও লাগল। ভাল লাগল এই ভেবে যে, সে অবলা নয়, গাঁয়ের মেয়ে হলেও গেঁয়ো নয়। ঘুরতে ঘুরতে মাধুরী জীবনের স্বাদ পেল। দেখল শহরের বিবর্ণ, ধোঁয়ায় ক্লিষ্ট আকাশে মেঘের নিরুদ্দেশ যাত্রা। অনুভব করল যে এই দিনের আলোর আড়ালে যেন এক গন্ধ-মদির অন্ধকার আছে। সে অন্ধকার যেন তার রক্তের মধ্যেও আছে। সেই অন্ধকারের স্বাদই যেন জীবনের স্বাদ।

বিকেলের আলো ম্লান হয়ে এল। বাড়ির সিঁড়িতে পা দিয়েই মাধুরী একপাশে সরে দাঁড়াল। ওপর থেকে একটি সুদর্শন যুবক নেমে আসছে। নির্মলাদির সেই রতন-ঠাকুরপো। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় রতন একবার তাকাল তারদিকে। তার চোখে যে মুগ্ধতার ছায়া ঘনাল তা টের পেয়ে মাধুরী মনে মনে হাসল, আর তার কান দুটো গরম হয়ে উঠল।

ওপরে উঠে মাধুরী দেখল যে ঝণ্টুর মা দশ নম্বরের ঝির সঙ্গে গল্প করছে। তাকে ডেকে কাজে লাগিয়ে দিল সে।

"ওমা, তোমায় কী সুন্দর দেখাচ্ছে গো দিদিমণি—কোথায় গেছলে?"

"বাজারে—যাও যাও হাত চালিয়ে নাও ঝণ্টুর মা—আজ উনি একটু তাড়াতাড়ি আসবেন।"

ঝণ্টুর মা রান্নাঘরে গিয়ে বাসন মাজতে বসল।

নিজের ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল মাধুরী। সে সুন্দরী। তার তন্বী, সুঠাম দেহ। কিন্তু একী দায়? কেন এই একা-একা ভাব? বিছানায় বসে সে জানালার দিকে তাকাল। সেই চিমনিটা আকাশের বুকে মাথা তুলে রয়েছে। তা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। যজ্ঞের ধোঁয়া। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। মাধুরীও জ্বলছে। তার নিঃশ্বাস দিয়েও যেন ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তার দেহের ভেতরেও যেন যজ্ঞের আগুন জ্বলছে। হঠাৎ তার ভাগের আকাশটুকু আজ মাধুরীর ভাল লাগল। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে মাধুরী হঠাৎ একটা কথা ভেবে হাসল। সে ভাবল সে বিনয়কে একটা চিঠি লিখবে। লিখবে—শ্রীচরণেষু, বিনয়দা, আপনি যে আজকাল খুব বড়লোক হয়েছেন সে খবর আমি রাখি। কিন্তু বড়লোক হলেই কি সবাইকে ভুলে যেতে আছে? দোষত্রুটি সবাই করে, কিন্তু তাই বলে ক্ষমা কি পাওয়া যাবে না? বিনয়দা, আপনি কবে আসবেন বলুন। আমি আজকাল বড় একা একা দিন কাটাচ্ছি। উনি সকালে বেরিয়ে অনেক রাতে ফেরেন—দুপুরবেলাটা একা একা আমার কী কষ্টে যে কাটে তা আর কী বলব। একদিন দুপুরে গল্প করতে আসুন না? আসবেন তো?

ভাবতে ভাবতে রাঙা হয়ে উঠল মাধুরী, বালিশে মুখ গুঁজল। আর ঠিক সেই সময়েই শহরের রাস্তায় বাতিগুলো দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠতে লাগল। পলাশপুরের তেলিপাড়ায় একদিন যেমন লকলকিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। আর সেই চিমনিটা দিয়ে গাঢ় কালো ধোঁয়া গলগল করে বেরোতে লাগল। তাতে রক্তের ছিটের মত আগুনের স্ফুলিঙ্গ সন্ধ্যার আকাশে জ্বলতে জ্বলতে নিবতে লাগল।

বীট বংশ পরিচয়

সরোজ আচার্য

"বীট", "বীটনিক", "দি বীট জেনারেশন" মার্কিন তরুণ মহলের ছোট একটি গোষ্ঠী; ব্রিটেনের "রাগী ছোকরারা" (অ্যাংরি ইয়ং মেন), ফ্রান্সের "আউটসাইডাররা" মার্কিন বীটদের সমধর্মী না হলেও ছককাটা সমাজ-জীবনের বিরুদ্ধে তারুণ্যের প্রতিবাদ ঘোষণায় এরা সকলেই মোটের ওপর একই যুগলক্ষণাক্রান্ত। প্রতিবাদের সূত্র এবং তাৎপর্য কারোরই খুব স্পষ্ট নয়, তবে ভঙ্গিটা চমক লাগায়; প্রবীণদের মতে ভঙ্গিটা সম্ভবত ভান—অন্ততপক্ষে মার্কিন বীটদের ভঙ্গিটা।

"বীট জেনারেশন" বলা যায় এমন কোনও বাঁধাধরা গোষ্ঠী মার্কিন তরুণ মহলে বাস্তবিকই গড়ে উঠেছে কিনা তাও সন্দেহ। ভবঘুরে বাউণ্ডুলে যাযাবর প্রকৃতির ঢিলেঢালা কিছু ছেলেছোকরা সব যুগেই দেখা যায়। এরা সাধারণত দল বাঁধে না; তবে এদের আচার আচরণ বলনচলনকে চিহ্নিত করে 'বীট' বা 'হিপস্টার' কিম্বা "বোহেমিয়ান" এমনতর একটা নাম অবশ্য দেওয়া যায়। "বীট" কিম্বা "বোহেমিয়ান"দের সাহিত্যশিল্পের বিশিষ্ট কোনও পদ্ধতি বা আদর্শ হিসাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করাও অনেকাংশে প্রাতিকর। মার্কিন বীটদের চলাফেরা, কথাবার্তা, জীবনযাত্রা পদ্ধতি ইত্যাদি অবশ্য কিছুটা অভিনবত্বের দাবি করে। অভিনব হলেও বীটবংশীয় তরুণরা আনকোরা নতুন কোনও জীবনচর্যার ধারা প্রবর্তন করেছে মনে করা যায় না।

এক কালের বোহেমিয়ান একালের বীট। ছককাটা রুটিনবাঁধা কাজ, পোষমানা জীবন, বাঁধাধরা চিন্তা এবং নৈতিক মূল্যনিরূপণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার রোমান্টিক ঝোঁক য়ুরোপ-আমেরিকায় নতুন নয়। সে-বিদ্রোহ কখনও ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কখনও বা সামাজিক আন্দোলন-অভিমুখী। সে-বিদ্রোহের প্রকাশভঙ্গি নানারকম। যন্ত্র-শিল্পনির্ভর সভ্যতায় বেশির ভাগ মানুষই কাজের চাকায় বাঁধা, প্রায় সকলেই কিস্তিবন্দী সুখের সন্ধানে রুদ্ধশ্বাস, দ্রুত ধাবমান। পার্থিব সাফল্যের সোনার হরিণ ধরার চেষ্টায় প্রায় সকলেরই আচার, আচরণ, অভ্যাস, রুচি, চিন্তা এবং চরিত্র একানুবর্তী নিয়মবন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। মার্কিন বীটরা হতে চায় এই নিয়মবন্ধনের একানুবর্তিতা থেকে মুক্ত।

মার্কিন সমাজে, সাহিত্যে জ্যাক লণ্ডনের আদিম আরণ্যক জীবনের প্রশস্তিতে, কিম্বা বিদঘুটে বেপরোয়া কতকগুলি ছোটখাট গোষ্ঠীর জীবনযাত্রাপদ্ধতিতে, (মর্মন/কিম্বা দুখোবর), "হোবো"দের যাযাবরবৃত্তিতে বীটদের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এক কালে

বীট কুল-গুরু কেরুয়াক

বোহেমিয়ানরাও নিয়মবন্ধন থেকে মুক্তি চেয়েছে, হয়ত কিছুটা অন্যভাবে। বীটদের আলাভোলা ঢিলেঢালা বাউণ্ডুলে ঢং দেখে আমরা কেউ কেউ বিস্ময়ে বিগলিত হয়েছি, ধরে নিয়েছি যে, বীটবংশীয়রা একেবারে অভিনব, অভূতপূর্ব, নতুন কালের মোহমুক্ত অবতার। য়ুরোপ-আমেরিকার বোহেমিয়ান ঐতিহ্যের সঙ্গে বীটরা জন্মসূত্রে আবদ্ধ, একথা বিস্মৃত হলে তবেই বীটবংশীয়দের একেবারে অসাধারণ কল্পনা করে গদগদ হওয়া সম্ভব। নিউইয়র্কের গ্রীনিচ ভিলেজে বীটদের আবির্ভাবে এমন কিছু অসাধারণত্ব নেই; প্যারিসের 'লেফট ব্যাঙ্কের' মত গ্রীনিচ ভিলেজও বহুকাল ধরে বোহেমিয়ান শিল্পী, সাহিত্যিক, জীবনরসিক ও বাচাল ও কাচাদের আস্তানা।

বীট "কবিগুরু" অ্যালেন গিন্সবার্গ নাকি একবার তাঁর কবিতা আবৃত্তিকালে শ্রোতাদের কাছে তাঁর কবিতার অর্থ বোধগম্য করার জন্য সব পোষাক খুলে ফেলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে দর্শন দিয়েছিলেন। আমরা কেউ কেউ বীটকবির এই "স্বাভাবিক" আচরণে বিমুগ্ধ হয়ে থাকতে পারি। তবু মনে রাখা ভালো, বীটকবির এই খেয়ালী আত্মপ্রকাশ বীটবংশীয়দের কোন নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গি মোটেই নয়, গ্রীনিচ ভিলেজে তো নয়ই।

জোসেফ ফ্রীম্যান তাঁর "অ্যান আমেরিকান টেস্টামেণ্ট" গ্রন্থে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগে গ্রীনিচ ভিলেজের বোহেমিয়ান মহলে অনুরূপ একটি ঘটনার খবর দিয়েছেন। সে-সময়ের য়ুরোপ-আমেরিকার বোহেমিয়ান শিল্পিগোষ্ঠীর একটি জীবন্ত যোগসূত্র ছিলেন "দাদাইস্ট" কবি ব্যারনেস এলসা ফন ফ্রেটাগ-লরিঙ-হোভেন। গ্রীনিচ ভিলেজে কোন এক মজলিসে সৌন্দর্যরসিক দু'চারজন বন্ধু কটাক্ষ করেছিলেন যে, শ্রীমতী এলসার মুখশ্রী খুব মনোহারিণী নয়। শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ সর্বজন সমক্ষে বিবসনা উর্বশী হয়ে বিজয়ভঙ্গিতে ঘোষণা করলেন, "মেয়েদের মুখের পানে চেয়ে দেখো না, মূর্খ! তনুশ্রী দেখ—এই দেখ!" আর যাই হোক, এদিক দিয়ে বীট কবি গিন্সবার্গ আগের কালের বোহেমিয়ান কবি শ্রীমতী এলসার উপর টেক্কা দিতে পারেন নি।

মার্কিন মুলুকে বেলেল্লাপনা কিম্বা "সৃষ্টি ছাড়া" (সাঁচ্চাই কিন্তু সৃষ্টিছাড়া নয়) দেখে অল্পপায়ী বঙ্গসন্তান আমরা রোমাঞ্চিত হতে পারি, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, য়ুরোপ-আমেরিকার রোমাণ্টিক-বোহেমিয়ান ঐতিহ্যের ধারায় বীটবংশীয়দের হুল্লোড় এমন কিছু নতুন বস্তু নয়।

পোষাক আশাকে, চালচলনে সুপরিকল্পিত অপরিচ্ছন্নতা, এলোমেলো জীবনযাত্রা, প্রচলিত নীতি-বন্ধন-মুক্ত যৌনাচার, রকমারি মাদক দ্রব্যের মারফৎ তুরীয়মার্গী প্রেরণার সন্ধান, মার্কিন বীটদের এই নব "সন্ন্যাসব্রতের" সবটা একেবারে আদি অকৃত্রিম এবং অভূতপূর্ব মনে করার কারণ নেই। ১৯ শতকের ইংরেজী রোমাণ্টিক কবিরা, ফ্রান্সের বোহেমিয়ান সাহিত্যিক শিল্পীরাও তাঁদের আচারে আচরণে, নতুন প্রেরণা এবং উত্তেজন সন্ধানে নানাভাবে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির অনুশাসন অমান্য করেছিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী বায়রন, শতাব্দীর অন্তিমকালে সুইনবার্ন, অস্কার ওয়াইল্ড; ফ্রান্সে বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, ভার্লেন প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে সামাজিক বিধিনিয়মের একানুবর্তিতা তথা 'কনফর্মিটির' কট্টর শুচিবাইকে অপদস্থ, বিপর্যস্ত করেছেন।

বীট এবং বোহেমিয়ানের জাত একই, যুগভেদে তাদের জীবনযাত্রার আচরণ-বিধিতে কেবল কিছুটা পার্থক্য ঘটেছে। প্রথম মহাযুদ্ধান্তে গ্রীনিচ ভিলেজের মার্কিন বোহেমিয়ানদের কথাই প্রথমে ধরা যাক। ফ্রীম্যান লিখেছেন, ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি মার্কিন তরুণ মহলে অনেকে দুনিয়ার হালচাল, বাস্তব রাজনীতির ছলনা ও প্রতারণায় চরম হতাশাগ্রস্ত হয়েছিল। পার্থিব জীবনের সব পথই চোরাবালিতে শেষ, পাশ্চাত্যের "ইউটিলিটেরিয়ান" সার্থকতার দর্শন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস ও মহাবিনাশের শেষসীমায় ঠেলে এনেছে এবং অতএব এ কালের তরুণদের জীবনদর্শনের সংজ্ঞা হল, "ফিউটিলিটেরিয়ানিজম" অর্থাৎ পরম ও চরম ব্যর্থতা। গ্রীনিচ ভিলেজ তখনকার কালের এই নেতিবাদী জীবন-বিরাগী সামাজিক শাসনবারণবিরোধী তরুণদের তীর্থক্ষেত্র কিম্বা আশ্রয়-স্থল। আড্ডা, আদবকায়দাবর্জিত সাধা-সিধে মেলামেশা, আলাপ-আলোচনা, অবাধ প্রণয় এবং যৌন সম্ভোগ, কড়া পানীয় এবং আরো পাঁচরকম নেশায় যথেচ্ছাচার—সে-কালের গ্রীনিচ ভিলেজের এই বোহেমিয়ান স্বর্গরাজ্যে এ-কালের বীটরা নবাগত হলেও জীবনচর্চায় তারা এমন কিছু নতুন সুর সংযোজন করতে পারে নি।

বীটদের মতই তখনকার কালের মার্কিন বোহেমিয়ানরা বিশ্বাস করেছে যে তাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি, তাদের চিন্তাচারিত্র আচরণবিধি একদিন না একদিন সর্বজয়ী হবে; তারাই নববিধানের পথিকৃৎ। পথটা সোজাই, বাঁধা লাইনের জীবনের দায় ও দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলায় পরমা গতি ও পরমা প্রীতি। বীটদেরও সেই কথা।

"বীট" মানে পরাজিত মোটেই নয়; ভুল ধারণা নিরসনের জন্য বীট-গুরু কেরুয়াক বলেছেন, 'বীটে'র অন্বিষ্ট হল "বিয়েটিচুড" অর্থাৎ দিব্য অনুভূতি, ভাগবত উপলব্ধি। গাঁজা, ভাঙ, চরস, সেকুরস, মারিহুয়ানা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবা, 'জেন' বৌদ্ধ যোগচর্চা, এ-সবই কোন কোন বীট "সাধকের" স্বর্গীয় অভীপ্সা পূরণের উপায় মাত্র। তবে বীট-গুরু কেরুয়াক জন্মসূত্রে রোমান ক্যাথলিক খৃস্টান তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী, গাঁজা, ভাঙ, মারিহুয়ানার মাধ্যমে স্বর্গ-সুখ তথা "বিয়েটিচুড" সন্ধানে গিন্সবার্গের যে-পরিমাণ আগ্রহ কেরুয়াকের ততটা বোধহয় নয়।

অর্কেস্ট্রা সহযোগে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করছে জনৈক বীট-কবি

মার্কিন পত্র-পত্রিকায় বীটদের চরিত্র-চিত্র যেভাবে আঁকা হয়েছে তাতে এদের "লক্ষ্মীছাড়া" এলোমেলো আচার-আচরণের উপর রং ফলানো হয়েছে বেশী। সে-দিক থেকে এরা যেন প্রায় "টেডী বয়" তথা রকবাজ ছোকরাদের কিম্বা লক্ষ্যহীন পথচারী "হোবো"দের সমগোত্রীয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে বীটরা বোধহয় টেডীবয়দের চেয়ে অনেক বেশী নিরীহ, নিরুপদ্রব।

বীট তত্ত্ব এবং তন্ত্রমন্ত্রের "আদি-খ্যেতা" বাদ দিলে বীটরা অনেকাংশে আগের কালের বোহেমিয়ানদের মতই যথেচ্ছ যৌনসম্ভোগ, মাদকদ্রব্য সেবা, লক্ষ্যহীন বিচরণ, এবং খামখেয়ালী কাজকর্মে অনুরক্ত। বোহেমিয়ানদের মধ্যে তবুও কিছু কিছু গুণী সাহিত্যিক এবং শিল্পী দেখা গিয়েছিল; কেরুয়াক, গিন্স-বার্গের বীট-দার্শনিক বোলচাল যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, সাহিত্যশিল্পগত নতুন কোনও ভাববস্তু সৃজনে তাঁরা এখন পর্যন্ত কৃতকার্য হননি। গিন্সবার্গের 'হাউল' কবিতার আর্তনাদ, তাঁর বয়ঃসন্ধি-কালের বিক্ষোভ মার্কিন সাহিত্যিক সমাজের বনেদী মহলকে কিছুটা সচকিত, সন্ত্রস্ত করে থাকতে পারে, কিন্তু 'হাউল' কোন অংশেই এলিয়টের "ওয়েস্টল্যান্ডের" সমতুল নয়—না বক্তব্যে, না ব্যঞ্জনায় বা চিত্রকল্পনাসৃজনে।

বীট-গুরু কেরুয়াকের "অন দি রোড" বীট তরুণদের নিয়মবন্ধনহীন উচ্ছৃঙ্খল যাযাবরবৃত্তির চিত্রপট হিসাবে কৌতূহলো-দ্দীপক, বীট-দর্শনের স্বরূপ ও তাৎপর্যের প্রথম প্রকাশও সম্ভবত কেরুয়াকের 'অন দি রোডে', কিন্তু মার্কিন কথাসাহিত্যে এই ধরনের লক্ষ্যহীন জীবনাভিসারের কাহিনী এমন কিছু নতুন নয়। ডি. এইচ লরেন্স লিখেছিলেন, য়ুরোপের চেয়েও আমেরিকা অনেক বেশী শক্ত করে পারলো ভাবনাচিন্তা আদর্শের আঁটসাঁট ব্যান্ডেজে আস্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সে-বাঁধন বীটরাই প্রথম ছিঁড়তে চেষ্টা করেনি। থিওডোর ড্রেজার, জ্যাক লন্ডন, শেরউড এন্ডারসন, মাইকেল গোল্ড প্রমুখ কথাশিল্পীদের রচনাতেও মার্কিন সমাজ ও সভ্যতার নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী যাযাবর, আরণ্যক, লক্ষ্যহীন পথচারীর ভিড়। বীটরা আর একটু বেশী আলুথালু, বেয়াড়া এবং শিল্পকৌশল প্রয়োগে নাবালক। বীট তন্ত্রমন্ত্র গুহ্য প্রক্রিয়া ও উপকরণের আয়োজন প্রতীক ও ইঙ্গিত আলাদা, নতুন ধরনের মুদ্রাদোষযুক্ত। অসংলগ্নতা, কপট আধ্যাত্মিক বোলচালের টুকিটাকি যদি আর্ট হয় তাহলে বীটসাহিত্য অবশ্যই অভিনব আর্ট। কিন্তু সাহিত্যিক শিল্পকৌশলে সেই অভিনবত্বই রমণীয় স্থায়িত্বের দাবি করতে পারে যা জীবনের অভিজ্ঞতা কল্পনা এবং আবেগকে নতুন শ্রী ও তাৎপর্যে মণ্ডিত করে। সেক্ষেত্রে মার্কিন বীটদের তুলনায় ব্রিটেনের "অ্যাংরীদে"র সাহিত্যিক প্রয়াস অনেক বেশী সার্থক।

মার্কিন বীটদের উদ্ভব ও আবির্ভাব খুব বেশীদিনের কথা নয়—১৯৫৬-৫৭ সালে। "সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ-জীবনের কলরব", কতকটা এইরকম মনোভাব তরুণ মার্কিন ছাত্রছাত্রী মহলে দেখা দেয় বিগত দশকে। ১৯৫৭ সালে এলমার রাইস মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের সংকট সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আক্ষেপ করেন যে, "লেখকরা আজ-কাল করকারখানায় উৎপাদন যন্ত্রের সামিল হয়েছেন; সৃজনধর্মী রচনার সুযোগ দুর্লভ, তাঁরা ফরমায়েসমত লেখেন ঠিক যেমন বাড়িঘর তৈরীর জন্য কণ্ট্রাক্টররা ইস্পাতের কড়িবর্গার ফরমায়েস দেয়।" বীটবংশীয়দের প্রতিবাদ নাকি এরই বিরুদ্ধে, কেরুয়াকের ভাষায় বীটদের প্রতিবাদী হল মার্কিন সমাজের সেই অগণিত পোষমানা লোক যারা "স্কয়ার" অর্থাৎ নিয়মের দাস, যারা সুবোধ খেয়েপরে, রোজগার করে বেঁচে থাকে, বাঁধা

লাইনে যাদের ভাবনা-চিন্তা আমোদ-প্রমোদ; বৈষয়িক সাফল্যই যাদের ধ্যানজ্ঞান। বীটরা অবশ্যই "স্কয়ার" নয়; ঋানু সৌভাগ্য-সন্ধানী নয়, এবং সে কারণে অবশ্যই এরা সংখ্যালঘু, স্বতন্ত্র। এরা অন্তহীন পথচারী, যাযাবর, এদের কোথায়ও শিকড় নেই, পয়সাও নেই, অতএব মোটরগাড়ি ধার কিম্বা চুরি করে মার্কিন মুলুকের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত পাড়ি, পথে পথে বীট তরুণ-তরুণীর আনন্দ বিহার, নব নব উন্মাদনার অভিজ্ঞতাস্রোতে অবগাহন।

বীট-গুরু কেরুয়াকের "অন দি রোড" সে হিসেবে বীটবংশীয়দের নবসংহিতা; কেরুয়াকের ভাষায়, এদের নেই কোনো শাসন বারণ, এরা সব কিছু অভিজ্ঞতার আস্বাদ পেতে চায়, "বাঁচবার জন্য পাগল, কথা বলবার জন্য পাগল, পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পাগল। এরা একসঙ্গে সব কিছু পেতে চায়, এদের ক্লান্তি নেই, সংসারে আর পাঁচজন শেয়ানা লোকের মত কথা ও কাজ নিয়ে এদের কারবার কদাপি নয়; এরা রোমান মোমবাতির মত কেবলই জ্বলবে, কেবলই পুড়বে।"

কেরুয়াকের দাবি, বীট আন্দোলনটা হল পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্তিম লগ্নে পরম জ্ঞানের উপলব্ধি, পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস, একেবারে বিশুদ্ধ মরমী রহস্যবাদ। অতি চমৎকার অধ্যাত্মদর্শন বটে, কিন্তু এর ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগকৌশলে বীটপন্থীরা কিছুটা বেচাল মনে হয়। যেমন একজন বীট মোহান্তের পরমেশ্বরপ্রশস্তি, "হে দিব্য-পুরুষ, আবির্ভূত হোন যাতে আমরাও এই "জাজ" নাচগান থেকে পুনরুত্থিত হতে পারি!" যেমন, "বীট নাচিয়ে গাইয়ে নেশাখোর ছন্নছাড়াদের সঙ্গে যীশুখৃষ্টের কিছুমাত্র তফাৎ নেই, কেন না খৃস্টই তো সবাইকে, এমন কী ছন্নছাড়া, সমাজবিচ্যুত-দের পর্যন্ত তাঁর কাছে ডেকেছেন।" এই সব অপূর্ব বীটদর্শননিঃসৃত সুসমাচার শ্রবণ করে স্টর্ম জেমসনের মত কোন কোন মননশীল সাহিত্য ও জীবনাদর্শ-সমালোচক উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছেন, এই বীটদের উপর-উপর দেখে মনে হতে পারে এরা যেন মধ্যযুগের তত্ত্বসন্ধানী ভ্রাম্যমাণ পুণ্যপিপাসী, কিন্তু এরা যে কোন কালে এদের আচরণে, আদর্শচিন্তায় উচ্চস্তরের কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে তার লক্ষণ নেই।

প্রচলিত অর্থে যাকে ধর্মবুদ্ধি বলা যায় বীটদের "অধ্যাত্ম"চেতনায় তার ঠাঁই নেই। ধর্মবিশ্বাসীরা সাধারণত মেনে থাকেন, জগৎ ও জীবন শুভাত্মক; ইতিহাসাশ্রয়ী চিন্তায় যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা যেমন মোটের ওপর বিশ্বাস করেন মানবসভ্যতা উত্তরোত্তর উন্নতিশীল। বীটরা সেদিক দিয়ে অনেকটা অস্তিত্ববাদীদের মত শুদ্ধ তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতাকেই ধ্রুব সত্য মনে করে। তাদের জীবনে ও মননে বাস্তব ইতিহাসের গতিধারা নিরর্থক, কখনও ভীতিপ্রদ কখনও বা তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপেক্ষার বিষয়মাত্র। বীট-দর্শনবিচারে মানুষ হল একান্তই অভিজ্ঞতার ক্রীড়নক আর সে-অভিজ্ঞতা বীটদের মতে বস্তু-বিশ্বের ভিড়ে ঠাসা, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতির নগদ লাভলোকসানের জটিল অঙ্কে আকীর্ণ। ব্যক্তি-মানুষের সাধ্য নেই এই যান্ত্রিক ব্যবসায়কেন্দ্রিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের চাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার। একমাত্র উপায় নির্বাণের পথ সন্ধান অথবা পৃথিবীর অতীত, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নির্মোহ নিরাসক্ত হয়ে মুহূর্ত-মাদকতার নব নব অভিজ্ঞতা আস্বাদান।

বীট দার্শনিক যুক্তি যাই হোক, বীট-জীবনচর্চা প্রায় ওমর খৈয়ামের মধ্য-বিংশশতকী মার্কিন সংস্করণ। শখের সন্ন্যাস আর নকল বৈদান্তিকতার সঙ্গে নাচগান, হৈহল্লা নেশাভাঙ এবং চোরাই মোটরগাড়িযোগে যাযাবর বৃত্তির সমাহার—এই হল নির্ভেজাল বীটদর্শন। কেউ কারো নয়, সবাই একলা, একক, নিঃসঙ্গ পথচারী। বীট-গুরু

কেরুয়াকের সর্বশেষতম বীট-কাহিনি-চরিত গ্রন্থের [illegible] বৃদ্ধা [illegible] 'লোনসাম ট্রাভেলার'—নিঃসঙ্গ পথিক। আর সব কিছুই ফাঁকি, অর্থহীন মায়াপ্রপঞ্চ, কেবল বীটের নিঃসঙ্গ অভিসারেই পরম শান্তি, পরমা প্রীতি। বীট অভিসারে অবশ্য ইন্দ্রিয়সুখসন্ধানের যথেষ্ট গতি। তবু নাকি বীটকুলগুরু কেরুয়াকের মতে এ-সবই বাহ্য, নেশাভাঙ, চোরাই মোটরে নিরুদ্দেশ যাত্রা দরকার মত ছোটখাট চুরিচামারি, রাহাজানি, "চিকদের" সঙ্গে অর্থাৎ যেখানে যখন খুশী যে কোনও মেয়ের সঙ্গে বীটতান্ত্রিক অভিচার, এ-সব আর কিছুই নয় এই অরাজক অর্থহীন বস্তুবিশ্বের বাঁধন খসিয়ে, আবরণ উন্মোচন করে পরম সত্যের আবিষ্কার চেষ্টা।

বীটগুরু কেরুয়াক কিন্তু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, কাজেই বীট জীবন-দর্শনের মৌল প্রেরণাকে তিনি ঈশ্বর সন্ধান প্রয়াসী বলে দাবি করেন। "কিংডম অব গড" তথা ঈশ্বরের রাজ্যে পৌঁছুবার জন্যই নাকি এই বীট-মার্গী সাধন-ভজন—যার ধরণটা সম্ভবত আমাদের কোন কোন তান্ত্রিক ক্রিয়াকৌশলের অনুরূপ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুতীব্র শাণিত সম্ভোগ-ক্ষমতার পরিপূর্ণ প্রয়োগ ও ব্যবহারেই পারমার্থিক অস্তিত্বের অনিবর্চনীয় উপলব্ধি।

মার্কিন বীটদের সঙ্গে ব্রিটিশ "অ্যাংরীদের" জীবনচর্চার পার্থক্যও এইখানে। বীটরা বাস্তব সমাজ-সত্য সম্পর্কে অজ্ঞান অথবা নির্জ্ঞান। ব্রিটেনের "রাগী ছোকরারা" সমকালীন সমাজের প্রচলিত মতাদর্শে আস্থাহীন বটে, কিন্তু বাস্তব-জগতের ইতিহাসাশ্রয়ী সমস্যা ও সংকটকে তারা মায়া বলে উড়িয়ে দেয় না। 'অ্যাংরীরা' নিঃসঙ্গ পথচারী নয়, ইন্দ্রিয়সুখচর্চার নতুন কোনও ঢং নিয়ে তারা বেপরোয়া বাউণ্ডুলে জীবনযাত্রাপদ্ধতির সমর্থনে ঝাপসা মরমীবাদ কিম্বা উদ্ভট তন্ত্রমন্ত্রের দোহাই দেয় না। বীটরা পলাতক, অ্যাংরীরা সমালোচক, বীটদের কথনে ও লেখনে বয়ঃসন্ধিকালের অপরিণত উত্তেজনা প্রবল; অ্যাংরীদের লেখার এবং কথায় ধার আছে, ভার আছে, আর আছে সমস্যাসংকুল বস্তুবিশ্বের রহস্য উপলব্ধি ও ব্যাখ্যার জন্য কুশলী আন্তরিক প্রয়াস।

নিউইয়র্কের কোন রঙ্গমঞ্চে এক আলোচনা-চক্রে বীটগুরু কেরুয়াকের সঙ্গে ব্রিটিশ "অ্যাংরীদে"র মুখপাত্রস্থানীয় কিংসলী অ্যামিসের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা যেমন উপভোগ্য তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। আলোচনার বিষয় ছিল, "বীট জেনারেশন" বলে সত্যিই কিছু আছে কি? কেরুয়াক ছাড়া আর যাঁরা আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা বলেন, বীট, বীটনিক, বীট জেনারেশন বলে রীতিমত অভিহিত করা যায় এমন কোনও তরুণগোষ্ঠী মার্কিন সমাজে নেই। বীট তন্ত্রমন্ত্রের প্রবক্তা ও প্রচারক দু'চার দশজন এবং তাদের কিছু শিষ্যপ্রশিষ্যমাত্র থাকতে পারে। এক কথায় "বীট, বীটনিক, বীট জেনারেশন" [illegible] জীবনধারার [illegible] [illegible] উল্লেখযোগ্য অংশ নয়। [illegible] [illegible] [illegible] বীট-[illegible] [illegible] উপর বাঁপিয়ে উঠে [illegible] [illegible] কিংসলী অ্যামিসের ঘাড়ে পড়ে সবাইকে দিতে চাইলেন যে "বীট জেনারেশন" অবশ্যই আছে। আর বীটগুরু কেরুয়াক আলোচনার দোড় ছাড়িয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করতে, [illegible] [illegible] এছাড়া [illegible] বীটগুরু সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে এমন দিন আসবে যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু পর্যন্ত হবেন বীটপন্থী নিরঙ্কুশ [illegible]। [illegible] বীট, কিন্তু আমেরিকার দেশসুদ্ধ লোক যদি 'হিপস্টার' 'বপস্টার' 'হট' 'কুল' 'চিক' ইত্যাদি বিবিধ বীটপন্থী কাঁচা ও কাঁচা হয় তাহলে [illegible] [illegible] নেশাভাঙ, ইন্দ্রিয়সম্ভোগের উপকরণ জুটবে কী করে। [illegible] বীটপন্থার প্রগতির [illegible] [illegible]।

[illegible] জগৎ ও জীবনের চাকা ঘোরাতে "স্কয়াররা" অর্থাৎ পাঁচমিশেলী লোকরা লেগে আছে বলেই সমাজ-সংসারের প্রত্যন্ত প্রদেশে যুগে-যুগে বোহেমিয়ান, বীট, বীটনিকদের স্ফূর্তিবাজি, নিঃসঙ্গ অভিসার, আত্মসম্ভোগ সম্ভব হতে পারছে। সবাই যদি বীট, বীটনিক হয়ে যায়, হতে চায়, তাহলে তার পরিণাম কী হবে সেই ভাবনায় কোন এক কবি বীটগুরু কেরুয়াককে জিজ্ঞাসা করেছেন,

"O Kerouac, Kerouac
What on earth shall we do,
If a Single Idea
Ever gets through!"

প্রশ্নটা কেবল বীট ও বীট জীবনদর্শন সম্পর্কে নয়, সমাজকল্যাণ [illegible] [illegible] মানবিক দায়দায়িত্বশূন্য সব জীবনদর্শন সম্পর্কেই এই কথা।

ভাত

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

পাশের ঘরে ঘড়ি আছে। একবার ডেকে জিজ্ঞেস করলেই মীনাবাবু বলে দেন।

কিন্তু বার বার একটা মানুষকে বিরক্ত করাটা কাজের কথা না। তাই কৈলাসবাবু চুপ করে থাকেন। আকাশের তারা দেখেন। রাত্রির অন্ধকার দেখেন। বা জোরে শ্বাস টেনে বাতাসের গন্ধ শোঁকেন।

কিন্তু এখানে সেই নির্মল বাতাস কোথায়। শিশিরে ভেজা ঘাসের গন্ধে বা লেবুফুলের বা বকুলের গন্ধে ভারি হওয়া বাতাস এখানে অনুপস্থিত। না হলে কৈলাসবাবুর বাবা, সেকেলে মানুষ, অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন যাঁরা, শুধু সেই বাতাসের গন্ধ শুঁকে টের পেতেন রাত কটা বাজল। অনায়াসে কারো সময় ঠিক করে অপরকেও নির্ভুল সময়টি বলে দিতে পারতেন। কতদিন কৈলাসকে বলেছেন, হঠাৎ জেগে উঠে তার মা যদি জানতে চেয়েছে, কৈলাসের বাবা তাঁকেও ঠিক সময়টি বলে দিয়েছেন। অবশ্য তখন তাঁরা রাত কটা বাজে নিয়ে কত আর মাথা ঘামিয়েছেন। রাতের মতো রাত হত। শিশির পড়ত, ভুরভুর করে বকুলের গন্ধ ছড়াত, পাতার শব্দের সঙ্গে লেবুফুলের গন্ধে ভারি হয়ে উঠে বাতাস মাতালের মতো চলত, আবার এক সময় টুপ করে কখন জানি কাক ডেকে উঠে পুবদিক ফর্সা হয়ে যেত। রাত বা দিন—সময় নিয়ে, ঘড়ি নিয়ে মানুষ কাড়াকাড়ি করত না। দরকার হয় নি।

আজ! আজ আর তা ভাবা যায় না। উঠোনে দাঁড়ালে কাঁচা ড্রেনের বিদ্‌ঘুটে গন্ধটা নাকে আসে। ঘরের ভিতর গরম। আর মশার দৌরাত্ম্য। তাই কৈলাসবাবু ঘর ও বাইরের মাঝামাঝি, অর্থাৎ দরজার চৌকাঠের ওপর চেপে বসেন। উপায় কি। সেখানে বসে থেকে রাত্রির দিকে তাকিয়ে রাত্রির গাঢ়তা অনুমান করেন। অথচ তাঁর খুব জানা আছে চৌকাঠের ওপর বসতে নেই। গৃহস্থ যদি চৌকাঠকে আসন করে নেয় তবে সে ঋণগ্রস্ত হয়। জানা থাকলেও, কৈলাসবাবুর মনের এখন যে অবস্থা, তাতে অঋণী, অপ্রবাসী থাকতে পারার চরম সৌভাগ্যের কথা তিনি চিন্তা করতে পারেন না। রাত কটা বাজে ভাবনার সঙ্গে কৈলাস দুপুরের চড়া রোদ ও গরমের কথাই চিন্তা করছেন বেশি। আকাশের তারার দিকে দৃষ্টি, কিন্তু তিনি অন্য চিত্র চোখের সামনে দেখছেন। প্রশস্ত দীর্ঘ পথ ও প্রাসাদোপম অট্টালিকার ছড়াছড়ি যেখানে সেখানে তেমন গাছপালা চোখে পড়ে কি। ছায়া! রৌদ্রদগ্ধ ক্লান্ত পথচারী গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করবে নতুন বনেদী অঞ্চল নিউ আলিপুরে তার সুযোগ কম। হয়তো নতুন বলেই এমন। কথায় বলে নতুন বড়লোক। বিনয় নম্রতা দয়া দাক্ষিণ্যের পরিবর্তে ঔদ্ধত্য অহংকারটাই চোখে-মুখে আগে ফুটে ওঠে। বনেদী পাড়া নিউ আলিপুরের চওড়া বাঁধানো তকতকে ঝকঝকে এক-একটা রাস্তার কথা ভাবতে গেলে কৈলাস দত্তর তাই মনে হয়। অথচ কত শত বছরের পুরনো ঐ জি টি রোড। ওদিকে বি টি রোডের বয়স কম হয়েছে কি। সেসব রাস্তার দুধারে কত বড় বড় গাছ। পথিকের মোটেই কষ্ট হয় না। ছায়ায় ছায়ায় পাখির কিচিরমিচির শুনতে শুনতে মাইলের পর মাইল হেঁটে চলে যেতে পারে। হ্যাঁ, তবে কথা উঠতে পারে নিউ আলিপুরে যাঁদের বাস

তাঁদের অনেকেরই গাড়ি আছে। গাড়ি না থাকলে তাঁরা ট্যাক্সি ডাকেন। ট্যাক্সির অভাবে রিক্সা। অর্থাৎ হেঁটে চলার মানুষ সেখানে নেই। চড়া রোদ মাথায় নিয়ে গরম পেভ্‌মেণ্টে পা পুড়িয়ে চলার মতন মূর্খ সেখানে একটিও নেই।

কিন্তু কৈলাস দত্ত একটি মূর্খকে দেখছেন। স্নান নেই, আহার নেই, চৈত্র মাসের কাঠ-ফাটা রোদ মাথায় নিয়ে বনেদী পাড়ার রাস্তায় হাঁটছে। পেভমেণ্ট ছেড়ে রাস্তার গরম গলা পিচের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে হাঁটছে। রাস্তায় নামতেই হবে। কেউ যদি গাড়ি থেকে না নামে, গাড়ির জানালায় গলা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে দিনের পর দিন আশার বাণী শোনায় তো মূর্খ যতক্ষণ পারে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটবে, দরকার হলে ছুটবে, অবশ্য জমকালো বাড়ি থেকে জমকালো গাড়ি নিয়ে যখন কেউ বেরোন তখন গাড়িটা প্রথম দিকে একটু আস্তে আস্তে, বেশ গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, অর্থাৎ রাস্তার আর দশটা মানুষ আমায় দেখুক, আমার নূতন গাড়ি অবলোকন করুক বা যদি কোন মূর্খ কোনরকম প্রার্থনা জানাতে আসে তো এইবেলা সেরে নিক—তারপর আমার অনেক কাজ, রাইটার্স বিল্ডিং, এসেম্বলী, পাঁচরকমের সভাসমিতি, সমাজের হিতের জন্য দশ জায়গায় ছুটোছুটি।

তাই মূর্খ পেভ্‌মেণ্ট ছেড়ে গরম গলা পিচের ওপর দিয়ে ছোটে, যতক্ষণ না গাড়ি স্পীড নেয়। হয়তো তখনও একবার গাড়ির সঙ্গে দৌড়াতে চেষ্টা করে। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে। হাঁ করে নূতন মডেলের গাড়ির হঠাৎ চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ-চমক হয়ে যাওয়া দেখে।

মূর্খ মূর্খ। গায়ে-মাথায় তেল নেই। রুক্ষ চেহারা। পায়ে এক জোড়া চটি পর্যন্ত নেই। ছিটের সার্টটা এক নাগাড়ে আজ ক' মাস গায়ে উঠেছে খেয়াল নেই। কৈলাস দত্তর চোখে জল এসে যায়। হাতের তেলো দিয়ে চোখ ঘষে তিনি এক সময় চৌকাঠ ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। একটু ইতস্তত করেন। পাশের ঘরের মতিবাবুর ঘড়ি আছে। কিন্তু এত রাত্রে ডাকাডাকি করে সময় জানতে চাওয়াটা কিছু কাজের কথা না। তা ছাড়া ভদ্রলোক এতক্ষণ আর জেগে নেই।

'কে!' কৈলাসবাবু চমকে উঠে ঘাড় ফেরান। আবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভুল ভাঙে। উঠোনের নর্দমা পার হয়ে বাইরের কাঁচা ড্রেনের জঞ্জালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে ছুঁচোটা সদরের টিনের দরজার ফুটোটা খুব চিনে গেছে। তাই এমন নাড়াচাড়া দিয়ে দরজার প্রচণ্ড শব্দ করে ওটা ওখান দিয়ে বেরিয়ে যায় বা ভিতরে ঢোকে। ঘরে ঢুকে কৈলাসবাবু হ্যারিকেনের সলতেটা চড়িয়ে দেন। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় না। বাতির তেল ফুরিয়ে গেছে। সলতেটা বেড়ে উঠে চড়চড় শব্দ করে আর ধোঁয়া ছড়ায়। তা হলেও একটু সময়ের জন্য সলতেটা ওভাবে পুড়তে দিয়ে হ্যারিকেনটা তুলে ধরে তিনি আস্তে আস্তে এগোন। পা টিপে টিপে এগোন। কেননা একটু ঝাঁকুনি লাগলে বাতির সলতে হুস্ করে নিবে যেতে পারে। হ্যারিকেনের মাথার দিকের টিনটাও আলগা হয়ে গেছে। কোনরকমে ওটা আটকে রাখা হয়েছে। টিনটা আলগা হয়ে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে। আলোর অভাবে সারারাত কাটাতে হবে।

কিন্তু এত সাবধানে চলা সত্ত্বেও কৈলাস-বাবুর পায়ে লেগে জলের কুঁজোটা কাত হয়ে গেল। ভাঙল না। অনেকটা জল গল-গলিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে মেঝেটা ভাসিয়ে দিল। ভাগ্যিস মেঝের এ-দিকটা ঢালু বলে দেওয়ালের ফুটোর দিকে জলটা সরে যেতে লাগল। কুঁজোর জল ফুরিয়ে গেল বলে দুঃখ নেই। রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল এনে রাখলেই হবে।

কৈলাসবাবু হ্যারিকেনটা সন্তর্পণে মেঝের ওপর নামিয়ে রাখলেন। তারপর নুয়ে কলাই করা লোহার গামলার ওপর থেকে শিলটা নামিয়ে দিয়ে গামলাটা আস্তে আস্তে তুললেন। আশ্চর্য! কৈলাসবাবুর চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল। তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, তাঁর ঘরে এত আরশোলা। যেন কয়েক হাজার হবে। তা হোক। কিন্তু তিনি ভেবে পেলেন না গামলা দিয়ে ঢেকে রাখা সত্ত্বেও কি করে এরা এখানে এসে জুটল। অবশ্য ভাতের নাগাল তারা পাচ্ছে না। আর একটা বড় থালায় জল ঢেলে তিনি মাঝখানে ভাতের থালা ও তরকারির বাটিটা বসিয়ে রেখেছেন। একটু আগে তিনি এটা করেছেন। কেননা ভাতে পিঁপড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। এখন এসেছে আরশোলা। জল পার হতে পারছে না, তাই বড় থালাটার চারদিক ঘিরে আছে সব, কেমন গিসগিস করছে। একটার ওপর আর একটা। একটার ঘাড়ের নিচ দিয়ে আর একটা ঘাড় গলিয়ে দিয়েছে। এমন করে তারা ভাত-তরকারির গন্ধ শুঁকছে। জলের বাধা অতিক্রম করতে পারলে তারা এতক্ষণে ভাতের থালার ওপর চড়াও হত।

কৈলাসবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অন্ন ব্রহ্ম—বড় পবিত্র এই অন্ন। আর এই জিনিসকে দূষিত করতে, উচ্ছিষ্ট করতে কত শত জীব ছুটে ছুটে আসছে। কিছুক্ষণ আগে বিড়ালটা এসে ঘুরঘুর করছিল। মাছ না মাংস না। একটু আলু-কুমড়োর ছক্কা, মসুর ডাল আর ভাত—সাদা ভাত। কিন্তু তার জন্যও বিড়ালের জিভে লালা গড়াচ্ছিল। বিড়ালের ভয়ে লোহার কলাইকরা গামলা দিয়ে তার ওপর শিল চাপা দিয়ে কৈলাস ভাত ঢেকে রেখেছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে গামলার বর্ম ভেদ করে আরশোলার ঝাঁক এসে থালার চারদিকে ভিড় করে রয়েছে।

কৈলাস এক মুহূর্ত কী চিন্তা করলেন তার-পর জল দেওয়া বড় থালা সমেত ভাত ও তরকারিটা তুলে দেওয়ালের ওধারে নিয়ে গেলেন। কাঠের আসবাব বলতে ঘরে ঐ একটা জিনিস এখনও আছে। ফেটে গেছে রং চটে গেছে। তিনটে পায়ার দুটো পায়াই খটখট করে নড়ে। কিন্তু তা হলেও টেবিল। গোল টেবিল। পুরানো খবরের কাগজ কটা কনুই দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তিনি থালাটা টেবিলের ওপর রাখলেন। না, তখনই গামলা দিয়ে চাপা দেবার কথা ভাবলেন না কৈলাস। ওপাশ থেকে আলোটা তুলে আনলেন তার-পর ভাত তরকারির ওপর কয়েক সেকেন্ড ঝুঁকে রইলেন। পিঁপড়ে-টিপড়ে আর চোখে পড়ছে না বটে, কিন্তু আর একটা বিষয় তিনি চিন্তা করছেন। চিন্তা করতে করতে হ্যারিকেনটা বাঁ হাতে ধরে রেখে কৈলাস ডান হাতটা তরকারির বাটির দিকে বাড়িয়ে দিলেন। দুটো আঙুল একত্র করে অতি সাবধানে বাটি থেকে দু টুকরো আলু ও দু টুকরো কুমড়া তুলে আনলেন। গন্ধ শুঁকলেন, তারপর হাতের আলু কুমড়োগুলো মুখে ফেলে দিলেন। কৈলাস নিশ্চিন্ত হন। এখনও তরকারিটা নষ্ট হয় নি। অথচ নষ্ট হবার সম্ভাবনা খুবই ছিল। কুমড়োর তরকারি সহজেই পচে ওঠে। অবশ্য জলের ওপর বসানো আছে। কৈলাস কটা ভাত তুলে নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলেন। ভাতও ঠিক আছে। তবে কড়কড়ে হয়ে গেছে। হবেই তো। কখন রান্না হয়েছে। কৈলাস হাতের ভাত কটা আর থালায় রাখলেন না। মুখে পুরলেন। আলুকুমড়োর সঙ্গে এক মুঠো ভাত চিবোতে চিবোতে অবশ্য শেষ হয়ে গেল—যেন মুখের ভিতর কোথায় মিলিয়ে গেল। কুঁজোর কাছে গিয়ে ওটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। একটু জল আছে। ঢকঢক করে জলটুকু খেয়ে নিলেন। তারপর কলাইকরা গামলাটা তুলে নিয়ে ভাতটা ঢেকে রাখলেন। শিলটা আর চাপালেন না। বিড়ালটা সেই যে তাড়া খেয়ে পালিয়েছে আর এদিকে আসেনি। অন্ন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কত শত জীবকে হাতছানি দিয়ে ডাকে চিন্তা করে কৈলাসবাবু আর একবার মনে মনে হাসলেন। আলুকুমড়োর গন্ধটা তাঁর আঙুলে লেগে রইল। তাঁর নিজের হাতে রান্না। রান্না খারাপ হবার কথা নয়। স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে আজ বারো বছর কৈলাসবাবু রেঁধে আসছেন। খোকা পারে না। হাত-পা পুড়িয়ে ফেলে। নয়তো ভাত তরকারি নষ্ট করে দেয়। দু-একদিন যে ভাতটা-ডালটা না নামিয়েছে এমন নয়—কিন্তু কৈলাসবাবু তা মুখে তুলতে পারেন না। মুখ ফুটে তিনি কিছু বলেন না বটে—চুপ করে কোনরকমে দু গ্রাস গিলে উঠে পড়েন। কেননা কিছু বললেই খোকা অভিমান করবে। ভয়ংকর অভিমানী ছেলে। হয়তো ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছে বলে। হয়তো ভাই-বোন বলতে ঘরে আর কেউ নেই

বলে। পারতপক্ষে কৈলাসবাবু, কেবল রান্না না, অনেক কিছু ব্যাপারে ছেলেকে কিছু বলেন না। চুপ করে থাকেন। কিন্তু আজ বুঝি চুপ করে থাকা কৈলাসবাবুর পক্ষে সম্ভব হবে না। যত রাত বাড়ছে তত তাঁর দুশ্চিন্তা বাড়ছে। ক্রোধ বাড়ছে। কথায় কথায় ছেলে অভিমান করে। আজ কৈলাসবাবুর বুকে অভিমান জমা হচ্ছে। বস্তুত তিনি ভেবে পাচ্ছেন না, বেলা আটটায় বেরিয়েছে, এখনো ঘরে ফিরছে না ছেলে, অর্থ কি। কোথায় আছে সে। কি করছে। সকালে এক মুঠ মুড়ি পর্যন্ত খেয়ে বেরোয় নি। পয়সা ছিল। কিন্তু সব পয়সাই তার ট্রামে-বাসে লাগবে বলে নিয়ে গেছে। বড়লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে—আগেও কদিন গেছে, দেখা পায় নি, কিন্তু আজ যাতে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে না হয় সেভাবে ব্যবস্থা করা আছে, আজ শুধু দেখা পাওয়া নয়, যা হোক একটা কথা নিয়ে আসতে পারবে সেরকম আশ্বাসও পাওয়া গেছে, সুতরাং—সুতরাং ট্রাম-বাসের জন্য ঘরের শেষ কটা পয়সা ছেলের হাতে তুলে দিতে কৈলাসবাবু আপত্তি করতে পারেন নি। কিন্তু কোথায় ছেলে। সকাল আটটায় বেরিয়েছে, এখন রাত এগারটার বেশি হবে। হয়তো বারোটা বাজে। পয়সার অভাবে সকালে বাজার করা হয় নি। ঘরে দুটো আলু ও এক ফালি কুমড়ো ছিল। কৈলাসবাবু দুটো ভাত ফুটিয়ে একটু তরকারি রেঁধেছেন, একটু ডাল করেছেন। বারোটা-একটার মধ্যে খোকা ফিরবে কথা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। বারোটা একটা—বেলা দুটো পর্যন্ত ছেলের আশায় বসে থেকে থেকে কৈলাসবাবু পরে দুটো খেয়ে নিয়েছেন। সকালে সেই এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু পেটে যায় নি। ক্ষুধায় তাঁর মাথা ঘুরছিল। হয়তো দুজনের মত চালও ছিল না ঘরে। কিন্তু তা হলেও ওবেলার মত হয়ে যাবে মনে করে কৈলাসবাবু ভাতটা ফুটিয়ে নিয়েছিলেন। পরিমাণ যেমন হোক নিজেরটা খেয়ে তিনি খোকারটা থালায় বেড়ে রেখেছিলেন। সারাটা দিন পার হল, সন্ধ্যা হল—এখন দুপুর রাত—এখনও বসে বসে তিনি সেই দুপুরের বাড়া ভাত পাহারা দিচ্ছেন।

'কে, খোকা এলি ?' টিনের দরজাটা আবার ঝপাং করে নড়ে উঠল। কৈলাসবাবু লাফিয়ে উঠতে গিয়েও তেমনি স্থির হয়ে বসে রইলেন। ছুঁচোটা। অথচ, না, একথা কাউকে বলা যায় না, আর তিনি বলবেন এবং একজন ধৈর্য ধরে কান পেতে শুনবে এমন মানুষ পৃথিবীতে তাঁর কে-ই বা আছে; ছেলের জন্য দুশ্চিন্তার শেষ নেই, আর এভাবে বসে থাকতে তাঁর নিজেরও ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। কটা ভাত আর দুপুরে খেয়েছেন। বিকেলে চা খাওয়া হয় নি। আনা ছয়েকের মতো ধার জমে গেছে হারুর দোকানে। মুখ-কাটা লোক। বিকেলে আবার ধার করে চা খেতে গেলে কি না কি বলে বসে চিন্তা করে কৈলাসবাবু আর ওদিকে যান নি। চিনা-বাদামওলা এসেছিল। তখন মতিবাবুও বাইরের রোয়াকের ওপর বসে ছিলেন। মতিবাবুকে চিনাবাদাম কিনে খেতে দেখে কৈলাসবাবুর সাহস হয়। অবশ্য মতিবাবু বিকেলে ছানাটা ফলটা খান। তাঁর চিনাবাদাম খাওয়াটা শখের। ভাল ভাল জিনিস দিয়ে জলযোগ সেরে একটু ভাজাভুজি মুখে দেওয়া। আর কৈলাসবাবু—যাক সে কথা। মতিবাবুকে বাদামভাজা খেতে দেখে কৈলাস-বাবু দু পয়সার নিয়েছিলেন। মতিবাবু বাদাম খাচ্ছেন না দেখলে কৈলাসবাবু কখনই বাদাম কিনতে সাহস পেতেন না, কেননা মতিবাবু তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করে বসতেন ক্ষুধা নিবারণের জন্য খোকনের বাবা বাদাম খাচ্ছে। বাদামওলাকে পয়সা দেওয়া হয় নি। টাকার ভাংগানি নেই—কাল দেবেন বলতে লোকটা ঘাড় কাত করে চলে গেছে। লোকটা ভাল। চায়ের দোকানের হারুর মতন ঠোঁট-কাটা না। হ্যাঁ, কৈলাসবাবু এখন ঐ বাদাম খাওয়ার কথাই চিন্তা করছেন। দু পয়সার বাদাম খেয়ে আর কত রাত অবধি—

আশা করেছিলেন খোকা ফিরে এলে এবেলা একটু বাজারটাজার করা হবে। বিকেলে চাল না আনলে হাঁড়ি চড়বে না খোকন জেনে গেছে; কেবল তাই নয়, কাল দু জায়গায় পাঁচটা টাকা ধার চেয়ে কৈলাস-বাবু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন খোকা তা-ও জানে। এই জন্যই আজ বিশেষ করে তার নিউ আলিপুরে যাওয়া। তার বন্ধু পরিতোষ বড়লোকের ছেলে। পাঁচ-দশ টাকা যে-কোন সময় ধার দিতে পারে। আর এই পরিতোষই আজ খোকনকে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করাবার ব্যবস্থা করেছে।

বারোটা বেজে গেছে সন্দেহ নেই। পুলিসটা পাড়ায় টহল দিতে বেরিয়েছে। কৈলাসবাবু রাস্তায় হঠাৎ বুটের ঠকঠক শব্দ শুনলেন যেন। বাইরের ঐ শব্দটা শুনতে তিনি কান খাড়া করেছেন কি সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর শব্দ হল। কৈলাসবাবু লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান। নিশ্চয় বিড়ালটা আবার এসেছে। চৌকাঠ ডিঙিয়ে তিনি ভিতরে ঢুকলেন। হ্যারিকেনের সলতেটা আর বাড়াতে চাইছেন না, যদি বা একটু তেল থেকে থাকে খোকন বসে ভাত খাবে বলে তিনি বাতিটা নিবু নিবু করে কমিয়ে রেখেছেন। আবছা আলোয় ভাল কিছু দেখা গেল না। তবে বিড়াল আসে নি বোঝা যাচ্ছে। সাদা মতন কিছুই কৈলাসবাবুর চোখে পড়ল না। কিন্তু ভাতের থালা সমেত ছোট গোল টেবিলটা তখনও নড়ছে। দুটো পায়াই ভাংগা বলে একটু ধাক্কা লাগলে টেবিলটা খটখট করে নড়তে থাকে, কাঁপতে থাকে। একটু চিন্তা করার পর কৈলাসবাবু ব্যাপারটা ধরতে পারলেন। বেশ কিছুক্ষণ সদরের টিনের দরজাটার ঝপাং ঝপাং শব্দটা বন্ধ আছে। তার মানে ছুঁচোটা আর ওদিকে নেই, নিশ্চয়ই ভাতের লোভে ঘরে ঢুকেছিল। জল নিকাশের ফুটোটা দিয়ে ঢুকেছিল হয়তো। ভাতের থালার নাগাল পায় নি, টেবিলের পায়ার কাছে ঘুরঘুর করে গেছে।

তা হলেও হ্যারিকেনের সলতেটা তিনি আর একবার বাড়িয়ে দিলেন। আগের চেয়েও বেশি ফটফট শব্দ করতে লাগল, ধোঁয়া ছড়াতে লাগল বাতির শিখা। বাঁ হাতে আলোটা ধরে রেখে ডান হাত দিয়ে তিনি কলাইকরা গামলাটা আস্তে আস্তে তুললেন। ঢাকনাটা নিচে নামিয়ে রেখে তিনি আবার থালার ওপর ঝুঁকে পড়ে ভাত তরকারির বাটিটা দেখতে লাগলেন। বেশ একটু জোরে শ্বাস টানলেন। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হতে ডালের বাটিটা তুলে নাকের কাছে ধরলেন। বেলা বারোটার রান্না, এখন রাত বারোটা বাজে। ডালটা ঘন হয়ে আছে থকথক করছে। ফোঁড়নের লংকাটা ডালের রস খেয়ে খেয়ে কেমন চমৎকার ফুলে উঠেছে, পুষ্ট হয়ে উঠেছে। চিকচিক করছে কালো রংটা। তা হোক, কিন্তু ডালের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে গন্ধ শুঁকে বোঝা শক্ত। কৈলাসবাবু বাটিতে চুমুক দিলেন। ঘন ঠাণ্ডা বেশ খানিকটা ডাল তাঁর মুখে উঠে এল। লংকাটা ঠোঁটের কাছে এসে ঠেকে রইল। ওটা আর মুখে তুললেন না তিনি, সন্তর্পণে বাটিটা আবার নামিয়ে রেখে ভাতের থালার ওপর বসিয়ে দিয়ে গামলা দিয়ে সবটা ঢেকে দিলেন। তারপর আর টেবিলের কাছে দাঁড়ালেন না তিনি। মুখের ডালটুকু জিভ দিয়ে নেড়েচেড়ে স্বাদটা অনুভব করতে করতে চৌকাঠের কাছে ফিরে এলেন। এখনো ডালটা টিঁকে আছে, টকে যায় নি। থালায় জল দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে, তাই।

কিন্তু ঐ একটুখানি ডাল পেটে যাওয়ার দরুণ, কৈলাস দত্ত বেশ টের পান, তার ক্ষুধা যেন চতুর্গুণ বেড়ে গেল। এই নিয়ম। প্রবল ক্ষুধার সময় একটু খাদ্যকণা ভিতরে গেলে জঠরাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। কৈলাস-বাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু তা হলেও তিনি দাঁতে দাঁত চেপে হাত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরে চুপ করে বসে রইলেন।

আর, কৈলাসবাবু একটু অবাকই হন, খোকার কথা যত না মনে পড়ছে, ঘরের পায়া ভাংগা গোল টেবিলটার ছবি তার চোখে যেন এখন বেশি ভাসছে। আর ঐ টেবিলের তলায় ছুঁচোটার ঘোরাঘুরির দৃশ্য। গোল টেবিলের নিকট ব্যর্থ পরাজিত ছুঁচো। কারণ আছে। হঠাৎ এই ছবি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল কেন চিন্তা করে তিনি নিজের মনে একটু হাসলেন। এই সংসারটাও একটা গোল টেবিলের সামিল। গোল টেবিলের বৈঠকে তারাই জিতে যাচ্ছে যারা গলা উঁচু করে কথা বলতে পারে—জোরে টেবিল চাপড়াতে জানে। যারা জানে না পারে না তারা হেরে যায়। যেমন কৈলাসবাবু হেরে গেছেন। তা

না হলে আর সারা জীবন উপোসী মাইনে নিয়ে একটা প্রাইমারী স্কুলে পড়ে থাকতেন! এখন তিনি হাঁপানিতে ভুগছেন, কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। তাঁর দিন চলে না। খোকন আজ দু বছর স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে ঘরে বসা। তাকে কলেজে পড়ানোর ক্ষমতা কৈলাসবাবুর হল না।

টিনের দরজাটা নড়ে উঠল। তেমন ঝপাং করে শব্দ হল না। ক্যাঁচ করে সামান্য একটু শব্দ হল। যেন কেউ চোরের মতন পা টিপে টিপে ভিতরে ঢুকছে। কাঁঠাল গাছটার জন্য ওদিকটা একটু বেশি অন্ধকার। কৈলাসবাবু হঠাৎ যেন ভূত দেখতে পাওয়ার মতন চোখ দুটো বড় করে ফেলেন আর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেন অন্ধকারটা দু-ভাগ হয়ে গেল। কিছুটা অন্ধকার সদরের গেট-এর কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল বাকিটা এদিকে সরে আসতে থাকে। ক্রমে সেটা একটা ছায়ামূর্তির আকার নেয়। ছায়ামূর্তি উঠোন পার হয়ে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। একটু ইতস্তত করে। তারপর রীতিমত কৈলাসবাবুর গা ঘেঁষে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

কৈলাসবাবু এখন নীরব নতনেত্র। সদরের দিকে আর দৃষ্টি নেই। দরজাটা নড়ছে কি নড়ছে না শুনতে কান খাড়া করে থাকেন না। যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে নিজের কোলের কাছের অন্ধকার দেখেন, নিজের হাত দেখেন, হাঁটু দেখেন, পা দেখেন।

অথবা এ-ও বলা যায়, কৈলাসবাবু চেষ্টা করেও ঘাড় সোজা রাখতে পারছেন না, মাথাটা তুলতে পারছেন না।

কেননা তিনি তখনই সব বুঝে গেছেন।

ঘরের ভিতর এত বেশি নীরব ও স্তব্ধ যে সেই ভাষা কৈলাসবাবুর মুখস্থ। গোল টেবিলের বৈঠকের সোরগোল থেকে যিনি সরে এসেছেন তিনি বোবার ভাষা বুঝবেন না তা কে বুঝবে।

'খোকা।' তিনি ধরাগলায় ডাকলেন।

ছায়ার মতো খোকা এসে চৌকাঠের পাশে দাঁড়াল।

'জামা ছেড়েছিস?'

'হুঁ।'

'পা-হাত-মুখ ভাল করে ধুয়ে আয়।'

'রাস্তার টিউবওয়েল থেকে আমি ধুয়ে এসেছি।'

'তবে আর কি।' যেন নিজের মনে বিড়-বিড় করে উঠলেন কৈলাসবাবু, তারপর চৌকাঠ ছেড়ে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলেন। হ্যারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে দিলেন।

'আয়, এইবেলা খেয়ে নে।' ঢাকনা সরিয়ে ভাতের থালাটা টেবিল থেকে নামিয়ে আলোর কাছে রাখলেন তিনি। 'তেল নেই—চট করে খেয়ে নে।'

'আমি খাব না।'

'কেন!' কৈলাসবাবু ছেলের মুখের দিকে তাকান। প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করে বাতির শিখা থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু তা হলেও, সেই অবস্থা কম্পমান আলোয় ছেলের মুখের প্রত্যেকটা রেখা কৈলাসবাবু চোখের নিমেষে পড়ে শেষ করলেন। আর দেখলেন চোখ দুটো কতটা গর্তে ঢুকে পড়েছে, মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে—সারাদিন ঐ শরীরটার ওপর কী পরিমাণ রোদ লেগেছে, কত পথ হাঁটা হয়েছে চিন্তা করে কৈলাস দত্ত একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললেন।

'না খাবার হয়েছে কি।' তিনি রীতিমত ধমক লাগান। 'সেই কখন থেকে ভাত বেড়ে আমি বসে আছি—থালায় জল দিয়ে বসিয়ে রেখেছিলাম, নষ্ট হয় নি। ডালটা চমৎকার হয়েছে খেয়ে দ্যাখ্।'

'আমার ক্ষুধা নেই।' প্রথমে বাবার মুখের দিকে, তারপর ভাতের থালাটার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে খোকা।

'ক্ষুধা নেই—বাইরে কিছু খেয়ে এসেছিস?' চোখ দুটো ছোট করে ফেললেন কৈলাস। একটা ঢোক গিললেন। 'চুপ করে আছিস কেন, আমার দিকে তাকা।' স্বরটা রুক্ষ করতে গিয়েও তিনি কেমন সংযত হয়ে যান।

স্থির উলটলে দুটো চোখ বাবার দিকে মেলে ধরল ছেলে। কৈলাসবাবু ওই চোখের দিকে তাকিয়ে আবার একটা চাপা নিশ্বাস ফেললেন। তারপর কি ভেবে মৃদু হাসলেন।

'না কি বন্ধুর সঙ্গে বসে রেস্টুরেণ্টে খেয়ে এসেছিস—পরিতোষ খুব খাইয়েছে বুঝি?'

চোখ নামিয়ে খোকা হাতের নখ খুঁটতে লাগল।

'কি হল?'

'তুমি খেয়ে নাও। আমার ক্ষুধা নেই।'

'আমি!' কৈলাসবাবু মাথা নাড়লেন, চেহারাটা বিকৃত করে ফেললেন। 'আমি এখন ভাত খাব কি। বিকেলে দুবার পাতলা পায়খানা হয়েছে।'

'সত্যি!' চমকে উঠে খোকা বাবার চোখ দুটো দেখল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত বাবার সবটা শরীরের ওপর চোখ বুলোল; যেন ভয় পেতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সে ভয় পেল না, ফিক করে হাসল। 'কিছুই হয় নি তোমার, মিথ্যা কথা বলছ।'

'বটে, আমি মিথ্যা কথা বলছি—আর তোর সব কথাই সত্য, কেমন না?' কৈলাস-বাবু এবার নাকে হাসলেন—'সারাদিন যে তোর পেটে কিছু পড়েনি, ক্ষুধায় নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে তোর মুখ দেখে চোখ দেখেই তো আমি ধরে ফেলেছি দুষ্টু—আর খেয়ে নে, আলোটা এখনই নিবে যাবে।' সলতের গায়ে কালির ফুল জমতে আরম্ভ করেছে, কৈলাসবাবু আস্তে সেটা নেড়েচেড়ে দেন।

একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে খোকা মেঝেয় বসল। কুঁজো থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে কৈলাসবাবু ছেলের সামনে রাখলেন।

'পরিতোষ টাকা দিয়েছে?'

ভাতের থালা থেকে মুখ না তুলে খোকা মাথা নাড়ল।

'আমি জানি। তোর কফিহাউসের বন্ধু তো, তার আবার মন্ত্রীর ভাগ্নে, কেমন তাই না'—যেন দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে কৈলাস দত্ত নিজের মনে হাসেন: 'ওই মুখেই লম্বা লম্বা কথা।'

মাথা গুঁজে খোকা ভাত কচলায়, একটাও মুখে তুলছে না।

'তা মন্ত্রীর সঙ্গে কি দেখা করিয়ে দিয়েছে? বলছিল দেখা করাতে পারলেই তোর চাকরি হয়ে যাবে?'

খোকা চুপ করে থাকে।

'খেয়ে নে খেয়ে নে।' সলতেটা এখন চরচর করে পুড়তে আরম্ভ করেছে দেখে কৈলাসবাবু শঙ্কিত হন। পোড়া গন্ধটা তাঁর নাকে লাগল।

'আমি সব ভাত খাব না, বাবা।'

'কেন, ভাত কি এখানে খুব বেশি—তবে কি ফেলে দিবি!' কেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠেন কৈলাসবাবু।

'তুমিও দুটো খাও, ডালটা দিয়ে খাও—আমি তারা খাব না—ওই আলুকুমড়োর তরকারী আমার হয়ে যাবে।'

কৈলাসবাবু হঠাৎ কথা বলেন না।

অর্ধেক ভাত ডালের বাটিতে তুলে দিয়ে খোকা বাটিটা বাবার সামনে বাড়িয়ে দিল। আর দুজনের খাওয়ার মাঝপথে আলোটা দপ্ করে নিবে গেল।

'ভালই হল।' খোকা হাসল। 'কেবল ধোঁয়া আর গন্ধ ছড়াচ্ছিল বাতিটা, অন্ধকারে আমরা বেশ খেতে পারছি, কেমন বাবা!'

'হুঁ।' মুখের গ্রাসটা গলাধঃকরণ করে কৈলাসবাবুও হাসলেন। 'তোর বন্ধু পরি-তোষকে কথাটা শুনিয়ে দিলে পারতিস। মন্ত্রীর সঙ্গে আর অমুকের সঙ্গে দেখা করিয়ে চাকরির সুবিধা করে দেবে বলে তুমি আমার খামকা ভোগাচ্ছ হাঁটিয়ে মারছ—অদৃষ্টে যদি ভাত লেখা থাকে তো তোমাদের চেষ্টা ছাড়াই আমি সংসারে খেয়ে পরে বেঁচে থাকব।'

'ভয়ানক বাজে পরিতোষটা।' খোকা এবার হাসে না। 'আমায় এক এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে কোথায় যে ও সরে পড়ে, যাবার সময় বলে যায়, এখুনি এদিক দিয়ে মন্ত্রীর গাড়ি পাশ করবে—তোর সঙ্গে কথা বলবে, আমি ততক্ষণে এসে যাব।'

'কোথায় যায় ও?'

'মেয়ের পিছনে ঘোরে।'

কৈলাসবাবু হঠাৎ কথা বলেন না। জলের গেলাসের জন্য হাত বাড়ান। অনেকটা জল একসঙ্গে পান করার পর পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন, তারপর আস্তে আস্তে বলেন, 'ডালটা তুই খেলি না, বড় ভাল হয়েছিল রান্নাটা।'

স্ত্রী তো আসলে ইস্ত্রিই। সংসারের পাটরানী। ধোলাই করার পর দুরমুশ করে পাট করা কাজ যেমন ইস্ত্রির, স্ত্রীরও প্রায় ঠিক তাই। স্বামীর হাতে পাট না ভাঙে, তাকে পরিপাটি রাখা।

কমনীয় নববধূ যে ক্রমে কি করে দুর্দমনীয় ইস্ত্রি হয়ে ওঠে—জীবনের সেই এক রহস্য!

কুমারীর হ্লাদিনী রূপ একদিন উন্মাদিনীরূপে দেখা দেয়!

অনুপমের জীবনে কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখা গেছল।

কথিত আছে যে, বিয়ের প্রথম বছরে বউ স্বামীর কথা শোনে, দ্বিতীয় বছরে স্বামী শোনে বউয়ের কথা। তৃতীয় বছরে পাড়া-পড়শীরা সবাই তাদের কথা শুনতে পায়।

কিন্তু বিয়ের আজ দশ বছর বাদেও অনুপমদের ঘরোয়া কথা বাড়ি ছাড়িয়ে যায়নি কখনো। ছড়ায়নি গিয়ে পাড়ায়। তাদের দাম্পত্য কলহ নাস্তি—এতদিনেও।

অনুপমের গার্হস্থ্য জীবনকে অনুপমই বলতে হয়। মীরার সঙ্গে এই দশ বছরে কখনও যে তার মতভেদ ঘটেনি তা নয়; মীরার অন্ধ সংস্কার প্রায়ই তাকে পীড়িত করেছে। কিন্তু তাহলেও 'শুভ বিবাহের পর তারা সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল' বলে উপকথার উপসংহারে যে রমণীয় বিবৃতি থাকে তার জীবনে যেন সেটাই ঠিক ঘটেছিল। কলকাতার কোনো সদাগরী আপিসের সামান্য কেরানী হয়েও অনুপম সেই উপকথারই নায়ক।

শহরতলীর স্টেশন থেকে সকাল ৮-৩০-এর ট্রেন ধরে সারাদিন ক্লাইভ স্ট্রীটের আপিস ঘরে কাটিয়ে সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় বাড়ি ফিরে রোজই সে দেখেছে বউয়ের হাসিমুখ। দুটি চোখ অভ্যর্থনায় উৎসুক। হাত-মুখ ধোবার জলের টব এগুনো, মুখ হাত ধুতে না ধুতেই চা জলখাবার। ফুলকো লুচি আর আলুভাজা তৈরি।

কিন্তু সেদিন আপিস থেকে ফিরে অনুপম যেন তার ব্যতিক্রম দেখল।

জলের টব, ঘটি আর তোয়ালে যথাস্থানে নেই, নেই তাদের পাশে তার পুরনো স্লিপার জোড়া। বউ এগিয়ে এল না হাসি-মুখে, লুচি ভাজার মিষ্টি গন্ধও তাকে স্বাগত জানাল না। ব্যাপার কি, স্বগতোক্তি করে ভেতরে উঁকি মেরে দেখল, তোলা উনুনে কখনো আঁচ পড়েনি। খাটের পায়ায় ঠেস দিয়ে গোমরা মুখে বসে তার বউ।

এরকমটা দেখতে সে অভ্যস্ত নয়। গত দশ বছরে এ দৃশ্য সে দেখেনি। দশ বছর স্লিপারের জায়গায় স্লিপার, বউয়ের মুখে স্লিপারের জায়গায় স্লিপার, বৌয়ের মুখে মিঠে হাসি সে দেখে এসেছে এবং আরো বিশ ত্রিশ বছর, মানে যাবৎ তাদের জীবদ্দশা, তাই দেখবে আশা করেছিল। এখন তার অন্যথা দেখে একটু বিচলিত হল বইকি!

'ঐখেনে অমন করে বসে যে!' অনুপম উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো।

'এতক্ষণে বাড়ি ফেরার সময় হল তোমার!' ঝংকার দিয়ে উঠল তার বউ।

'তার মানে?' আপনমনেই প্রশ্ন করল অনুপম। সপ্রশ্ন নেত্রে তাকালো নিজের হাতঘড়ির দিকে। কানে দিয়ে দেখল চলছে কিনা ঘড়িটা। কেন, টিকটিক করছে ত ঠিক ঠিকই।

তৃতীয় বছরে......

'সাড়ে ছটা তো বেজেছে ঘড়িতে।' বলল অনুপম: 'রোজ ত আমি ঠিক এই সময়েই বাড়ি আসি। গত দশ বছর ধরে আসছি।'

'এবার একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথাটা মনে রেখ', কড়া গলায় জানাল মীরা।

জবাব দেবার কিছু না পেয়ে চুপ করে রইল অনুপম।

'সেই সাড়ে আটটায় তুমি বেরিয়ে যাও, আর ঠিক দশ ঘণ্টা পরে বাড়ি ফেরো! সারাটা দিন খালি বাড়িতে একলাটি আমি পড়ে থাকি সে কথাটা ত ভাবতে হয় একবার! এর মধ্যে আমি বেঁচে আছি, না, মারা গেলাম! কী ঘটলো না ঘটলো আমার!

ভাবিনে?

কিন্তু সেকথা কি তুমি কোনোদিন ভেবেছ? আর তুমি ভাববেই বা কেন? আসা মাত্রই তোমার হাতের কাছে জলের ঘটি তৈরি চা আর পায়ের কাছে চটিজুতো! আর সে সঙ্গে খাবার যেন তৈরি থাকে। এই খালি চাও তুমি। আমার কী হল না হ সে কথা তুমি ভাবতে যাবে কেন! তোমার ঠিক ঠিক হলেই হল!'

অনুপম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। সম্ভবত তার বউয়ের হয়ে।

'সারাদিন আপিসে বসে একবারটিও কি আমার কথা মনে পড়ে তোমার!' ওর বউ ফোঁস করে ওঠে। —'আমার কথা ভাবো তুমি?'

'ভাবিনে? বসে বসে ব্লটিং পেপারে সারা দিন তো খালি তোমার ছবিই আঁকি!'

'বলে যাও! বলতে তো তোমাদের মুখে কিছু বাধে না।' গুমরে ওঠে মীরা—'কি

আমাকে অত বোকা পাওনি। তোমার কথায় ভুলব না আর। দশ বছর ধরে কথায় ভুলিয়ে আমাকে তুমি বোকা বানিয়ে রেখেছ কিন্তু আর তুমি তা পারবে না। এই শেষ।'

দম নেবার জন্য মীরা একটু থামল। আবার নব উদ্যমে তার শুরু করার আগে অনুপম মুখ খোলার ফুরসত পেল একটু।

'এক মিনিট চুপ করবে? ঠাণ্ডা হবে

এবার আমার চোখ ফুটেছে

একটু?' বলল সেঃ 'বলি হয়েছেটা কি, যে আমি আসতে না আসতেই এমন তুল-কালাম শুরু করেছ! পাগল হয়ে গেছ নাকি?'

'পাগল হবার কিছু বাকী আছে আমার? নাও, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। আমার গায়ে হাত দিয়ো না বলছি। আমাকে খুব ঠকিয়েছ। এ্যাদিন আমি বুঝতে পারিনি। এবার আমার চোখ ফুটেছে।'

অনুপমের ধারণা ছিল মেয়েদের চোখ সর্বদাই প্রস্ফুটিত—সেই কিশোরী বয়সের থেকেই। তার নজরকে কখনই ফাঁকি দেয়া যায় না। কারো ওপর যদি কোন মেয়ের নেকনজর পড়ে তখন তার ঘাড় বাঁচানো দায় —সেই ঘাড়ে [illegible] আবির্ভাব অনিবার্যই। কিন্তু এতদিন পরে এইবার তার চোখ ফুটেছে, কোন মেয়ে যদি ভূয়ঃ ভূয়ঃ এই কথা জাহির করতে থাকে বুঝতে হবে তার ভুয়ো-দর্শনের মধ্যে ভুয়োর ভাগটাই বেশী।

'কেন তোমার ফিরতে দেরি হয় তা কি আমি আর জানিনে? বুঝতে পারিনে? আমি এতই বোকা তুমি ভাবো? এখানে আমি একলাটি হাপিত্যেশ বসে। ওধারে তুমি মজা করে কফি হাউসে ফুর্তি লুটছ!'

ফুর্তিই বটে! ফুর্তির সময়ও বুঝি অঢেল! সাড়ে পাঁচটায় আপিসের ছুটি হয়, কোনরকমে বাস ধরে শিয়ালদায় এসে ট্রেন ধরতেই ছটা বেজে যায়—এর ভেতর ফাঁক আছে বটে কোথাও বসে কফি খাবার! কথাটা গলা পর্যন্ত ঠেলে আসে অনুপমের, কিন্তু তার বেশি আর সে গলায় না।

বরং বউকেই গলাবার চেষ্টা করে। 'কী পাগলের মতন যা-তা বকছো...' নরম সুরে বলতে যায়।

'পাগলই তো বটে আমি! দশ বছরের পুরনো বউয়ের কাছে ফিরতে মন উঠবে কেন তোমার?' ঝাঁঝিয়ে ওঠে মীরা—'তার চেয়ে নিত্য নতুন...বলি হ্যাঁ, সেই মেয়েটির খবর কি? তাকে নিয়েই বুঝি কফি হাউসে বেশ জমানো হয় আজকাল?'

'কোন মেয়েটি?'

'ন্যাকা সাজছেন! কফি হাউসের গায়ে-পড়ে ভাব জমানো সেই মেয়েগো...'

'গায়ে পড়ে ভাব জমানো তো নয়।' একটু প্রতিবাদের সুরেই বলে বুঝি অনুপমঃ 'সে-তো এক কলেজে পড়ত আমার সঙ্গে। আমার সহপাঠিনী ও! কিন্তু তার কথা আজ কেন আবার! সেত আমাদের বিয়ের আগেই চুকে বুকে গেছে।'

'বুঝেছি, এড়াতে চাচ্ছো কথাটা! সেই তোমার পুতুল গো! সেই তোমার প্রাণের.. আহা, তা কি আমি আর জানিনে। সেই পুতুলের জন্যেই ব্যাকুল হয়ে আপিসের পর বসে থাকো তুমি কফি হাউসে! পুতুল-খেলার বয়েস তো তোমার যায়নি এখনও।'

'থামো! চুপ করো!' গর্জন করে ওঠে অনুপমঃ 'কী যা তা বকছো পাগলের মতো! পুতুলের সঙ্গে আমার এক যুগ দেখা হয়নি। কোথায় আছে কী করছে কিচ্ছু জানি না। তার কথা আবার টেনে আনছো কেন এখানে?...এখন বলতো আমায় খোলসা করে বলো, কী হয়েছে তোমার? হঠাৎ এমন কালবোশেখীর নৃত্য কেন শুনি? আমার নামে কেউ এসে লাগিয়েছে তোমার কাছে?'

'না।'

'না? তাহলে এই রণরঙ্গিনী মূর্তি কেন? কিসের জন্যে? কী হয়েছে?'

'কিছুই হয়নি। কিচ্ছু না। এসব ভুলে যাও...' মৃদু মধুর হেসে এগিয়ে এল মীরা। আগের মতই আবার। হঠাৎ মিরাকল দেখা গেল যেন, অনুপম নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না—'ভুলে যাব বলছ?'

'হ্যাঁ, ভুলে যাও লক্ষ্মীটি! এসব কিছু না।' গায়ে এসে গড়িয়ে পড়ে বউঃ 'কেমন মিটে গেল ত সব?'

'মিটে গেল!'

'তুমি কিছু মনে কোরো না। আজ ভোর-বেলায় ভারী একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে-

হ্যাঁ ভুলে যাও লক্ষ্মীটি

ছিলাম। দেখলাম কি জানো, তোমার সঙ্গে আমার দারুণ ঝগড়া বেধেছে। তখন থেকে মনটা আমার ভার হয়ে আছে। ভোরের স্বপ্নতো ফলবেই। খারাপ স্বপ্ন আবার না ফলে যায় না। তাই স্বপ্নটা যাতে চট করে কেটে যায়, তাড়াতাড়ি ঝগড়ার পালাটা সেরে নিলাম আগে। স্বপ্ন ফলে গেল, চুকে গেল সব।' হাসি মুখে জানাল মীরাঃ 'থাক্, এখনতো সব মিটে গেছে। হাত মুখ ধুয়ে জল খাবার খাও এখন।'

'জল খাবার?'

'আজকে বাইরের খাবার খেতে হবে। বাজার থেকে ভালো মিষ্টি আনিয়ে রেখেছি। নাও, হাতমুখ ধোও এখন, লক্ষ্মীটি!'

জলের বালতি, তোয়ালে, সাবান, স্লিপার সব এনে সে হাজির করেঃ 'আমি চট করে গা ধুয়ে নিয়ে উনুনে আঁচ দিই গে। কেমন?'

বোধন

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ছোট বোন দীপ্তির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সাধনা ভেবেছিল বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে কোন হস্টেলে চলে যাবে। শুধু একার জন্যে পুরো বাড়িটা ভাড়া করে রাখার কোন মানে হয় না। তাছাড়া একা একটা বাড়ি আগলাবেই বা কে? কিন্তু গীতা আর দীপ্তি দুজনেই আপত্তি করল, 'না দিদি ছেড়ো না। আমাদের বাপের বাড়ি বলতে তাহলে আর কিছু থাকবে না। তোমার হস্টেলে গিয়ে আমরা তো এক রাতও কাটাতে পারব না, কিন্তু এ বাড়িটা থাকলে আমরা মাঝে মাঝে দু'চার দিন করে রেস্ট নিয়ে যেতে পারব।'

সাধনা বলেছিল, 'ঈস কত তোদের দরদ। বালিগঞ্জ ভবানীপুর ছেড়ে তোরা আসবি এই উল্টোডাঙ্গার ভাঙা বাড়িতে রেস্ট নিতে। তোদের কি আর সেদিন আছে।'

গীতা বলল, 'না দিদি আসব। নিশ্চয়ই আসব। এ বাড়িতে বাবা ছিলেন, মা ছিলেন। তাঁরা চলে গেলে তুমি একা বাবা আর মা হয়ে আমাদের মানুষ করলে, বিয়ে থা দিলে এ বাড়ির সঙ্গে আমাদের অনেকদিনের—।'

সাধনা স্বীকার করল সে কথা। এ বাড়ির সঙ্গে তাদের অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়ানো আছে।

দীপ্তি বলল, 'তা ছাড়া রন্তু জার্মানী থেকে ফিরলে ওরও তো একটা দাঁড়াবার জায়গা—'

সাধনা হেসে বলল, 'কী যে বলিস তুই। জার্মানী ফেরত ইঞ্জিনীয়ারের এই সেকেলে গোয়াল ঘরে উঠতে বয়ে গেছে। ও নিজেই তখন নতুন রাস্তায় নতুন বাড়ি করে নিতে পারবে।'

গীতা বলল, তাতো পারবেই। তখন তুমি সেই নতুন বাড়িতে উঠে যেও। ততদিন কষ্ট করে এই গোয়ালটা ভাড়া দিয়ে রাখো।'

রন্তু এই তিন বোনের একমাত্র ভাই। সব চেয়ে ছোট। কিন্তু সব চেয়ে কৃতী হয়েছে। শিবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে

ওয়েস্ট জার্মানীর একটি নামকরা ফার্মে শিক্ষানবীশী নিয়ে চলে গেছে। ফিরতে আরও বছর দুয়েক বাকি। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট করে চাকরির টাকায় টুইশনের টাকায় তাকে পড়িয়েছে সাধনা। পরে তার স্কলারশিপের টাকারও খানিকটা সাহায্য পেয়েছে। চার বছর ধরে ভাইয়ের ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার খরচ চালাতে খুবই অবশ্য কষ্ট করতে হয়েছে সাধনাকে। ধ্রুবও কষ্ট করেই পড়েছে। একটি পয়সা বাজে ব্যয় করেনি। দিদির ওপর কোন ভাই-বোনেরই কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, সীমা নেই মায়ামমতার। শেষদিকে অবশ্য গীতাও তার স্বামীর পকেট থেকে তুলে কিছু কিছু দিয়েছে। কিন্তু সে টাকা তেমন খুশী মনে নিতে পারেনি সাধনা। কুটুম্বের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেওয়া কি ভালো। চিরজীবনের জন্যে একটা খোঁটার ব্যাপার হয়ে থাকে।

কিন্তু গীতা যখন মুখ ভার করে বলেছে 'তোমার মত বড় না হলেও আমিও তো রুন্তুর দিদিই' তখন আর সাধনা ওর সাহায্য না নিয়ে পারেনি।

ভাই-বোনদের মুখ ভার দেখতে পারে না সাধনা। তাদের মুখ কালো দেখলে তার বিশ্বসংসার আঁধার হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত বাড়িটি রেখেই দিল সাধনা। যদিও পুরোন একতলা বাড়ি, কিন্তু খানচারেক ঘর আছে। মাঝখানে উঠোন আছে, পিছনে বাগান করবার মত জায়গা আছে। বিকেলে কি জ্যোৎস্না রাত্রে আলিসায় বসে গল্প করবার মত ছাদ আছে। বাড়ির চারদিকে পাঁচিল। যদিও তা এখন জীর্ণ হয়ে গেছে তবু তার ধার ঘেঁষে যে কটি পেয়ারা আর কামরাঙা গাছ উপরে মাথা তুলেছে তা এখনও সতেজ সবুজ আর ফলবান।

সাধনার বাবা পঁচিশ বছর আগে মাত্র তিরিশ টাকায় এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। বাড়িওয়ালা বাড়িয়ে বাড়িয়ে এতদিনে ষাট তুলেছেন। কিন্তু সাধনা ছেড়ে দিলে এক্ষুণি এ বাড়ির দেড়শ টাকা ভাড়া হয়ে যাবে। বাড়িওয়ালা সেজন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন। তিনি এ বাড়ি ভেঙে দোতলা করবেন, তিনতলা করবেন। অনেক রকম তাঁর পরিকল্পনা।

কিন্তু সাধনা বাড়ি ছাড়ল না। অনেককালের অনেক জিনিসপত্র জমেছে। এসব নিয়ে সে উঠবে কোথায়? বাক্স ডেক্স খাট আলমারি। কোনটাই হয়তো তেমন মূল্যবান না। কিন্তু স্মৃতিরও তো মূল্য আছে।

তাছাড়া গীতাও ছাড়তে দিল না। সে বলল, 'দিদি, তোমার একা একা থাকতে হবে না। আমার পিসতুতো ননদ ছন্দা ঘর খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছে। আমার হাতে-পায়ে ধরে সে কি সাধাসাধি। দুখানা ঘর তাকে দিয়ে দাও সে পুরো ষাট টাকাই তোমাকে দেবে। তাকে রসিদ দিতে হবে না। বাড়িওয়ালাকে বললে আমাদের আত্মীয় এসে উঠেছে।'

সাধনা ভেবে দেখল কথাটা। জিজ্ঞেস করল, 'লোক কজন? শেষে আবার ঝামেলা-টামেলা বাড়বে না তো?'

গীতা বলল, 'না না, ঝামেলা আবার কিসের? স্বামীটি শান্ত গোবেচারা গোছের। স্টেট ব্যাঙ্কে কাজ করেন। একটি বাচ্চা হয়েছে। ছেলে। বছর দুই-আড়াই হবে বুঝি বয়স। আর ছন্দার একটি দেওর আছে। দাদার গলগ্রহ। কিছুদিন থাকবে। তারপর চাকরিবাকরি পেলেই চলে যাবে।'

গীতা গলা খাটো করে বলল, 'ছন্দার ইচ্ছা নয় একসঙ্গে থাকা। সেও ঝামেলা পছন্দ করে না।'

সাধনা আরো দু-তিন দিন ভাববার সময় নিল। শেষে অফিস থেকে একদিন ফোনে বলল, 'আচ্ছা। আসতে বল তোর ননদকে। দেখি, তাদের আবার পছন্দ হয় কিনা।'

গীতা বলল, 'ঈস পছন্দ আবার হবে না! বর্তে যাবে।'

সাধনা ভেবে দেখল কথাটা মন্দ নয়। একা একটা বাড়ি নিয়ে থাকা তার পক্ষে ঠিক হবে না। চোরডাকাত কি গুন্ডা বদমাসের ভয় তার নেই। কলঙ্ক রটনার কথাও সে ভাবে না। পাড়ার সবাই তাকে চেনে। আড়ালে আবডালে ছেলেরা নাকি তার উদ্দেশ্যে কপালে জোর হাত ঠেকিয়ে বলে, 'উনি পুরুষের বাবা।'

সেজন্যে নয়! বোনদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সাধনা নিজেই যেন কেমন বদলে গেছে। যেন আর কিছু করবার নেই, ভাববার নেই, সব ব্রত উদযাপন হয়ে গেছে। মনে মনে কিসের একটা শূন্যতা বোধ করে সাধনা যা কারো কাছে বলা যায় না। অথচ তার বাইরের জগৎ অফিসের কাজকর্ম তেমনি আছে। দায়িত্ব বেড়েছে ছাড়া কমেনি। এখন অনেক নিশ্চিন্তভাবে সাধনা পড়াশুনো করতে পারে। কিন্তু তেমন যেন মন বসে না। অথচ বোনদের বিয়ের জন্যে সাধনা নিজেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। পাছে ওরাও তার মত চির কৌমার্য বরণ করে নেয় তা নিয়ে চিন্তার অন্ত ছিল না। সে চিন্তা গেছে। কিন্তু সেই নিশ্চিন্ততা এক গোপন নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গে করে নিয়েছে। নিজেদের ছোট্ট পরিবার আর অফিস-এর বাইরে সাধনার কোন জীবন ছিল না। মিশুকে ধরনের মেয়ে নয় সে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন কারো সঙ্গেই অন্তরের যোগ তার ঘনিষ্ঠ নয়। মেয়েদের সাধারণত মেয়েবন্ধু খুব থাকে। সাধনার তাও নেই। চল্লিশ পার হয়ে এসে নতুন করে সেই চেষ্টায় লাভ কি। বোনেরা অবশ্য মাঝে মাঝে আসে। আগের মতই হইচই করে। তাদের শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে টানাটানিও করে। কিন্তু সাধনা কোথাও গিয়ে বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। তাতে অবশ্য কেউ কিছু মনে করে না। গীতা আর দীপ্তি দুজনেই তাদের শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বুঝিয়ে দিয়েছে, 'দিদি ওইরকমই।'

ছন্দারা সত্যিই বর্তে গেল। বাড়ি দেখে যাওয়ার দুদিন বাদেই মালপত্র নিয়ে চলে এল ওরা। সরু গলির মধ্যে বাড়ি। গলিতে লরী ঢোকে না। বড় রাস্তায় লরী দাঁড় করিয়ে হাতে হাতে জিনিসপত্র ওরা নিয়ে এল।

সাধনা একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে লাগল। ছন্দা দেখতে সুশ্রী। কিন্তু বড্ড ছোটখাটো চেহারা। ওর স্বামী সে তুলনায় মোটাসোটা। তেমন যেন মানায়নি। দেওরটি বেশ লম্বা। ছিপছিপে চেহারা। যেন তালপাতার সেপাই। তবে বেশ ফর্সা রঙ। নাক চোখ টানা টানা। মুখের ডৌলটুকু মিষ্টি। ঠোঁট দুটি পাতলা আর লাল। অনেকটা মেয়েদের মত।

সাধনা ওই একদিনই দেখেছিল। তারপর আর তাকায়নি। ওদের ঘরদোর কলপায়খানা দেখিয়ে দিয়ে ফের নিজের কোটরে এসে ঢুকেছে। ছন্দাকে বলেছে, 'যখন যা দরকার হবে বলো। যদি কোন অসুবিধে টসুবিধে হয় জানাতে লজ্জা করো না।'

ছন্দা জবাব দিয়েছে, 'আপনার কাছে আবার লজ্জা কি দিদি।'

বউটি অবশ্য মোটেই লাজুক ধরনের নয়। বেশ চটপটে। কোলে একটি বাচ্চা আছে। কাঁদলে তাকে খুব ধমকায়। মারেও। স্বামী দেওরকেও ধমকাতে ছাড়ে না। সংসারের কাজকর্ম নিয়েও নিজেও যেমন সব সময় ব্যস্ত থাকে, দুটি পুরুষকেও তেমনি ব্যস্ত রাখতে চায়। অধীর অফিসে বেরিয়ে যায়। সারা দিনের মধ্যে তার আর নাগাল পায় না ছন্দা। কিন্তু দেওরটি তো হাতের কাছেই থাকে। তার ওপর ফাইফরমায়েস সব সময়েই চলে ছন্দার। সুধীর জল তোলে বাজার করে, ছেলে রাখে। সংসারের আরো এটা ওটা করে দেয়। সাধনার ঠিকে ঝিটির সঙ্গেই ছন্দা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। সে দু বেলা জল তুলে কয়লা ভেঙে উনুনে আঁচ দিয়ে বাটনা বেটে চলে যায়। কিন্তু আরো হাজার রকমের কাজ বাকি থাকে। সে সব সুধীর করে। একটু ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে ছন্দা বেশ বকে।

মাঝে মাঝে সাধনার কেমন যেন অসহ্য লাগে। বয়স অন্তত বাইশ তেইশ বছরের কম হবে না। জোয়ান ছেলে। হলই বা বেকার। তবু কি ওর মধ্যে এতটুকু পৌরুষ নেই? তেজ নেই? বীর্য নেই? মাঝে মাঝে একটু-আধটু প্রতিবাদ করলেও তো পারে? কিন্তু সেটুকুও যেন শক্তি নেই ছেলেটির।

কিন্তু তা নেই। কিন্তু অদ্ভুত এক ধরনের কৌতূহল আছে। যখনই একটু সময় পায় সুধীর দূর থেকে সাধনাকে লক্ষ্য করে। তার চলাফেরা অফিসে বেরোনো অফিস থেকে আসা ছেলেটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। প্রথম

প্রথম একটু-আধটু অস্বস্তি বোধ করত সাধনা। কিন্তু পরে বুঝল ওর দৃষ্টিতে আর কিছু নেই। শুধু শ্রদ্ধা সম্ভ্রম আর বিস্ময়। অফিসেও এমন অনেক যুবকের বিস্ময়ের উদ্রেক করে সাধনা।

একদিন সুধীর এসে নিজেই আলাপ করল। সাধনা বাজারে বেরোচ্ছিল। কাছেই ছোট বাজার। নিজের দৈনন্দিন বাজার সে নিজেই করে।

সুধীর এসে বলল, 'থলিটা দিন না আমাকে।'

সাধনা বলল, 'কেন?'

সুধীর বলল, 'আমি তো রোজই বাজারে যাই। আপনার তো বেশি কিছু লাগে না। আমিও এনে দিতে পারি।'

সাধনা হেসে বলে, 'না, তার দরকার নেই। আমার এসব অভ্যাস আছে।'

[illegible] অবশ্য বলেছে, আপনি কেন শুধু কষ্ট করেন সাধনাদি। [illegible] সুধীরের কাছে যদি দিয়ে দেন ওটিকে [illegible] নিতে পারে। এর জন্যে তো ওকে দূরে যেতে হয় না।'

সাধনা জানে ওকে [illegible] বাজারে ছুটতে হয়।

হেসে এড়িয়ে যায় সাধনা, 'কী দরকার। আমি নিজেই তো পারি। আজও তো নিজেই সব করলাম।'

পারতপক্ষে কারো সাহায্য নিতে চায় না সাধনা। ছোট ব্যাপারেই হোক আর বড় ব্যাপারেই হোক আত্মনির্ভরতা তার অনেকদিনের অভ্যাস। কারো কাছ থেকে সাহায্য নিতে নেই না, এমন একটু অহংকারও আছে।

কিন্তু সুধীর যেন সেবা করবার জন্যে সাহায্য করবার জন্যে উৎসুক হয়েই রয়েছে।

ছুটির দিনে ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে সাধনা বই পড়ছে সুধীর এসে ঘরের সামনে দাঁড়াল।

প্রথমে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল সাধনা, পড়ায় বাধা হওয়ায় বিরক্তও হয়েছিল। কিন্তু সেটুকু চেপে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবে?'

সুধীর একটু কুণ্ঠিত হয়ে একটু ইতস্তত করে বলল, 'আপনার ঘরের পিছনটা জংলা হয়ে আছে, পরিষ্কার করে দেব?'

সাধনা হঠাৎ বলে ফেলল, 'দাও না।'

তারপর তাড়াতাড়ি কথাটা ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'কিন্তু তোমার নিজেরই তো কত কাজ। আচ্ছা আমিই একদিন পরিষ্কার করে নেব। কী দরকার তোমার কষ্ট করে।'

মনে পড়ল বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার দিকে আগে সাধনার বেশ লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আজকাল আর তেমন যেন উৎসাহ নেই। কেমন যেন চুপচাপ এক কোণে পড়ে থাকতে ভালো লাগে। ভালো কি লাগে? না তাও ঠিক লাগে না। কিন্তু ভালোই লাগুক আর মন্দই লাগুক জীবনকে মেনে নিতে হয়, জীবনকে সহ্য করতে হয়। বিশেষ করে যে জীবন তার নিজের পছন্দমত তৈরি করা তাকে ভালো লাগলে, ভালো না বাসলে তাতে নিজেরই পরাজয়।

সেই যে সুধীরকে একবার অনুমতি দিয়ে ফেলেছে সাধনা ফিরিয়ে নিলেও ও আর তা নিতে পারল না।

সুধীর সাধনার ঘরগুলির পিছনে আনাচে-কানাচে যে সব ঘাস জন্মেছিল সেগুলি পরিষ্কার করে ফেলল। নিজেরা যে দিকে থাকে সে দিকটাও পরিচ্ছন্ন করল। শুধু তাই নয় কোত্থেকে দুটি ফুলের টব এনে রাখল সাধনার ঘরের সামনে। সবুজ চারায় দুটি একটি করে বেলের কুঁড়ি ধরেছে।

দেখে অবশ্য সাধনা খুশী হল। ফুল দেখলে কে না খুশী হয়। কিন্তু মুখে [illegible] বলল, 'না না এসব কি? এ সব তুমি কিনতে গেলে। কত খরচ করেছ তাই বল।'

কিন্তু সুধীর কিছুতেই সে কথা বলবে না। [illegible] সামান্যই খরচ হয়েছে। দাদা তো ওকে হাতখরচ দেন সেই টাকা থেকে কিনেছে। এতে সাধনাদি অত রাগ করছেন কেন। ফুল তো সারা বাড়িরই শোভা।

সাধনা আর কিছু বলল না। এর বদলে ওকে কী দেওয়া যায় কয়েক মিনিট ভাবল। ভাবল একটা জামাটামা কিনে দিলে হয়। খানিক বাদে সে কথা আর মনে রইল না।

দিন কয়েক বাদে সুধীর নিজেই এল উপযাচক হয়ে। অনুরোধ সত্ত্বেও ভিতরে ঢুকল না। দোরের বাইরে থেকেই আবেদন নিবেদনের পালা চলল।

'আপনি বুঝি অডিট অফিসে কাজ করেন না সাধনাদি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি ওখানকার অফিসার?'

সাধনা হেসে বলল, 'ওইরকমই একটা কিছু। কেন বলতো?'

সুধীর তবু সরাসরি বলতে পারে না। খানিকক্ষণ মুখ নীচু করে রইল। দেয়ালের চুন খুঁটল। তারপর ইতস্তত করে বলল, 'আচ্ছা ওখানে কি কোন কাজটাজ খালি আছে?'

'কি কাজের কথা?'

'এই ক্লারিক্যাল কাজের কথাই বলছিলাম।'

'কার জন্যে?'

সুধীর কোন জবাব দিল না।

সাধনা বলল, 'কিছু মনে কোরো না। তুমি পড়াশুনো কোন পর্যন্ত করেছিলে?'

সুধীর বলল, 'আই-এ পর্যন্ত।'

সাধনা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'তাহলেই

বড় মুশকিল। আমাদের অফিসে গ্র্যাজুয়েটের কমে আজকাল আর—। তাছাড়া খালিটালিও নেই।'

সুধীর যেন পালাতে পারলে বাঁচে. 'আচ্ছা সাধনাদি। আমি তবে এখন যাই। পরে আসব।'

সাধনা বলল. 'আচ্ছা এসো।' তারপর একটু মৌখিক ভরসা দিয়ে বলল. 'দেখব আমি।'

সুধীর চলে গেলে সাধনা মনে মনে হাসল। এই জন্যেই কি এত ভক্তি শ্রদ্ধা এত সেবা শুশ্রূষার আগ্রহ? ছেলেটিকে দেখলে মায়া হয়। কিন্তু জীবনে কোনদিন যে ও কিছু করতে পারবে তেমন ভরসা হয় না।

বউদির সংসারের কাজে জোগান দিয়ে মাঝে মাঝে সুধীর চাকরির চেষ্টায় বেরোয়। কোত্থেকে ঘুরে ঘুরে প্রায়ই ক্লান্ত আর হতাশ হয়ে ফিরে আসে।

সাধনা ভাবে একেক দিন বলে. 'এর চেয়ে একটা বুকস্টল টুকস্টল দিয়ে বসে যাও। কি সাইকেল কিনে নিয়ে কাগজের চাকরি কর। তাতেও কিছু হবে। কিন্তু ওই বিদেবুদ্ধিতে অফিসের চাকরি খোঁজা মানে সোনার হরিণের পিছনে পিছনে ছোটা।'

কিন্তু সাধনা ওকে কিছু বলে না। যার জন্যে কিছু করা যাবে না তাকে আঘাত দিয়ে লাভ কি। ব্যবসা বাণিজ্যের উপদেশ দেওয়াও বৃথা। তাতে মূলধন লাগে। সে টাকাও পাবে কোথায়? টাকা যদি বা জোটে দোকান পাট চালাবার মত বুদ্ধি কি ওর ঘটে আছে।

সেদিনকার মত পালিয়ে গেলেও সুধীর একেবারে পালায় না। আবার আসে। আবার সাধনার সেবা করতে চায়। কোন না কোন কাজে লাগতে চায়। কিন্তু সাধনা যে ওকে কী কাজ দেবে ভেবে পায় না।

সুধীর একদিন নিজেই জোর করে সাধনার ময়লা শাড়িগুলি লন্ড্রিতে দিয়ে এল। রিসিট চেয়ে নিয়ে আগের দেওয়া শাড়ি ও নিয়ে এল।

সাধনা ভাবল ওকে একটা সস্তা ট্রাউজার আর সার্ট কিনে দিতে হবে। কিন্তু নানা কাজকর্মের চাপে ফের কথাটা ভুলে গেল।

সুধীরের মত ছেলের কথা বেশিক্ষণ মনে রাখা যায় না। অবশ্য এ ধরনের কিছু কিছু ছেলেকে অফিসেও দেখেছে সাধনা। তারা কোন কাজের নয়।

সাধনার সেকসনেও এ ধরনের ছেলে আছে। তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে ভয়ও করে। চেহারায় গলার স্বরে, স্বভাবেও কেমন একটা দৃঢ়তা রূঢ়তা হয়তো এসেছে সাধনার। তার জন্যে সে লজ্জিত নয়। প্রত্যেক মেয়েই ললিতে কঠোরে বিপরীত। আর নারীই হোক পুরুষই হোক যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ কোন জনসমষ্টিকে চালনা করে তাড়না করে. শাসন করে কিছুটা কঠিন তাকে হতেই হয়।

কিন্তু বাইরে তার আচার আচরণ যত কঠিনই হোক ভিতরে ভিতরে একটি কোমল হৃদয়েরও যে সে অধিকারিণী তাই সহকর্মীরা জানে। কাজে ভুলচুক কি গাফিলতির জন্যে যে মেয়েকে কড়া বকুনি দেয় সাধনা, খানিক বাদে কি বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা বাদে তাকে ডেকে হেসে দুটি মিষ্টি কথা বলে. বেশি আলাপ পরিচয় থাকলে হয়তো গালটাও টিপে দেয়, নববিবাহিতা হলে স্বামীর প্রসঙ্গ তুলে ঠাট্টা করে, কিন্তু কাজটি আদায় করে নিতে ভোলে না। ছেলেদের সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। সাধনার চোখে ছেলে আর মেয়েতে তফাৎ নেই। মেয়েদের সে বলে 'তোমরা অফিসের শোভা বাড়াতে এসেছ কাজ করতে আসনি—ছেলেদের দেওয়া এই দুর্নাম তোমাদের দূর করতে হবে।'

মেয়েরা বলে. 'আসলে সাধনাদির আমাদের জন্যেই বেশি চিন্তা। আপনি আমাদেরই দলে।'

সাধনা বলে. 'তোমাদের নয়তো কাদের? আমার কি গোঁফ দাড়ি গজিয়েছে?'

অফিসে একটা কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি আছে। সাধনা আছে তার একজিকিউটিভে। কোন কোন বছর সেক্রেটারীও হয়। তখন দেখা যায় অপাত্রে অযোগ্য পাত্রে সেক্রেটারীর কী অগাধ মমতা। যে ধারবার কিস্তি খেলাপ করেছে তাকেও সাধনা লোন দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করে। বলে, দিয়ে দাও হে টাকাটা। ওর বউটা নাকি মরমর। এই বয়সে বউ মরলে ফের কি আর ভদ্রলোক বিয়ে করতে পারবেন?'

শুধু অসুস্থ স্ত্রীর স্বামীর ওপর নয়, অনূঢ়া মেয়ের বাপের ওপরও সাধনার সমান সহানুভূতি।

মানুষের অভাব যে কী বস্তু তা তো সে হাড়েহাড়েই জানে। অপ্রবাসী হলে অঋণী থাকা যে অনেক গৃহস্থের পক্ষেই অসম্ভব তাতে তাদের দিন চলা ভার সে কথাও সাধনার অজানা নয়। এখনো সব ঋণ সে শোধ দিতে পারেনি। সব দায় থেকে মুক্তি পেতে এখনো অনেক দেরি আছে সাধনার।

অফিসে যায়, কাজকর্ম সেরে অফিস থেকে প্রায় রোজই সরাসরি বাড়ি ফিরে আসে। অকারণে বাইরে টোটো করে ঘুরবার আড্ডা দেবার তার অভ্যাস নেই। বাড়িতেও যে আজকাল বিশেষ কোন আকর্ষণ আছে তা নয়। তবু বাড়িতেই চলে আসে। তালা খুলে নিজের ঘরখানার মধ্যে ঢোকে। অফিসের শাড়িটাড়ি ছাড়ে। মুখ হাত ধুয়ে বিশ্রাম করে। নিজের জন্যে স্টোভে চা আর খাবার তৈরি করে নেয়। তারপর হয়তো খানিকটা সময় বই পড়ে, খানিকটা সময় বোনে। কিছুক্ষণ জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। সামনে সারি সারি বাড়ি। চোখ বেশি দূরে যাবার পথ

পায় না। সময়টা অবশ্য কেটেই যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় তেমন ভালোভাবে কাটল না। বড় একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। নিজেই নিজের জীবনকে বড় একঘেয়ে করে ফেলেছে সাধনা। এখন জীবনে কিছু ঘটনা ঘটা দরকার; পরিবর্তন দরকার। কিন্তু পরিবর্তন তো চাইলেই আসে না। ঘটনা তো আর ইচ্ছা করলেই ঘটানো যায় না।

মাঝে মাঝে সিনেমাটিনেমায় গিয়ে দেখেছে সাধনা। আগের মত আর ভালো লাগে না। মনে হয় উঠে আসতে পারলেই বাঁচে। গীতা আর দীপ্তি মাঝে মাঝে এসে অনুযোগ দেয়, 'তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ দিদি।'

সাধনা স্বীকার করে না, বলে, 'যাঃ, কেমন আবার হব। আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি।'

গীতা বলে. 'এর চেয়ে দিদি তুমি একটা বিয়ে কর।'

সাধনা হেসে বলে. 'হ্যাঁ চল্লিশ বছর বয়সে ওইটাই এখন বাকি? দে পাত্রটাত্র খুঁজে দে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দে একটা।'

দীপ্তিও তর্ক করে. 'কেন দিদি, আজকাল অনেকে করে। লেট এজেও অনেকে—।'

সাধনা বলে. 'আচ্ছা দেখি. তোর মত একজন প্রফেসর ট্রফেসর যদি পাই—।'

দীপ্তি লজ্জিত হয়। বিজন তাদের কলেজেরই প্রফেসর ছিল। দীপ্তিকে দেখে তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে। দীপ্তির বিয়ে নিয়ে বেশি ভুগতে হয়নি সাধনাকে।

তার জন্যে বোনদের দুর্ভাবনা দেখে ভালো লাগে সাধনার। কিন্তু ওদের অসম্ভব কথায় সায় দেয়ই বা কী করে। কেউ কেউ অবশ্য করে। এত বেশি বয়সে এসেও করে। এই বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজেও ও ধরনের ঘটনা যে একেবারে না ঘটে তা নয়। কিন্তু এই বয়সে এসে যে সব মেয়ে পুরুষ বিয়ে করে তাদের হয়তো অনেক আগে থেকেই নিজেদের মধ্যে জানাশোনা থাকে, না হয়তো কোন বিশেষ ধরনের ঘনিষ্ঠতা হয়ে যাবার পরে ওরকম একটা ঘটনা ঘটে। কোন ঘটকালি করে এমন বিয়ে ঘটানো যায় না। ঘটালেও তা সুখের না হবারই কথা।

আজকাল মাঝে মাঝে এধরনের চিন্তাও আসে সাধনার। আমল দিতে চায় না, তবু আসে। নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ দিনগুলির কথা মনে হয়। রিটায়ার করবার পর বোনদের সংসারে গিয়ে থাকবে না সাধনা। সে কথাই ওঠে না। ছোট ভাই আছে ওয়েস্ট জার্মানীতে। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে নিজেই এক জার্মান ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাইরে চলে গেছে। শিক্ষানবিশী শেষ করে তিন বছর বাদে ফিরবার কথা। কিন্তু এরই মধ্যে ওর চিঠিপত্রে গীতা আর দীপ্তি নাকি ওর এক বান্ধবীর পায়ের সাড়া পাচ্ছে। বলা যায় না ভাইটি যখন সাহেব হয়ে দেশে ফিরবে একজন মেমকেও সঙ্গে করে নিয়ে

আসতে পারে। তাতে অবশ্য সাধনার কোন আপত্তি নেই। রন্তু ভালোবেসে যাকে খুশি তাকে বিয়ে করতে পারে। সে যে কোন দেশের যে কোন জাতের মেয়ে হোক তাতে কিছু এসে যায় না। সেই উদারতা সাধনার আছে। কিন্তু তাই বলে সাধনা ভাইয়ের সংসারে আর থাকতে পারবে না। রন্তু এদেশের কোন মেয়েকে বিয়ে করলেও সাধনা তাদের মধ্যে গিয়ে বাস করবে না। যদিও সেই ভাইকে সে নিজের হাতে মানুষ করেছে স্কুল কলেজে পড়িয়েছে, তবু তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর—। না আজকাল তা আর চলে না। শেষ পর্যন্ত তা একটা অশান্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এখনকার সংসারের হালচাল সাধনা তো আর জানে না এমন নয়।

নিজের চিন্তার ধারা দেখে সাধনা নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়। আচ্ছা এখনই অত ভাববার কী হয়েছে। এখনো রিটায়ার করতে অনেক দেরি। অন্তত পনের বছর। একেবারে বুড়ী হবার আগে তার চেয়েও বেশি সময় পাবে সাধনা। তবু নিজের জীবনের শেষ কয়েকটি অধ্যায়ের প্যাটার্নটি আগে থেকেই বুনে দেখতে ইচ্ছা করে সাধনার। পছন্দ আর হয় না। বোনে আর খোলে। বোনে আর খোলে। না মঠ নয় মিশন নয়, আশ্রম নয় ওসব কিছু নয়। চট করে কোন রাজনৈতিক দলের আশ্রয়েও যেতে পারবে না সাধনা। দেশ-বিদেশ ঘোরাঘুরিও তেমন আগ্রহ নেই। সেই উৎসাহ বেশি বয়সে হঠাৎ আসবে? মনে তো হয় না। তখন শরীর আরো অশক্ত হবে। আরো ঘরের কোণ শরণ নিতে ইচ্ছে করবে। শেষ পর্যন্ত সাধনা হয়তো যেমন আছে তেমনই থেকে যাবে। হয়তো এবাড়িতে আর থাকবে না। কোন হস্টেলের একটি ঘর ভাড়া নেবে। কি কোন ফ্ল্যাট বাড়ির একাংশ। তারপর হাতের কাছে যা পায় তাই পড়বে, বাকি সময়টায় হয়তো কিছু-না কিছু বুনবে। তারপরেও যে সময় থাকবে এমনি চেয়ারে শুয়ে একা একা বসে ভাববে। শুধু অফিসে আর যাবে না। সারাদিন ঘর আর ঘর। সে ঘরে আর কেউ নেই। যদি কারো কথা শুনতে ইচ্ছা করে নিজে কথা বলবে। যদি কাউকে দেখতে ইচ্ছা করে নিজে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াবে।

নাঃ এ প্যাটার্নটাও পছন্দ হয় না সাধনার। আবার খুলে ফেলতে থাকে। কিন্তু নতুন প্যাটার্ন আর মনে আসে না।

ছন্দা এক-এক দিন ছেলে কোলে হঠাৎ দোরের কাছে এসে দাঁড়ায়, 'আসব সাধনাদি?'

সাধনা বলে, 'বাঃ আসবে না কেন? এসো, বসো এসে।'

সাধনা তাকে নিজের খাটটানা দেখিয়ে দেয়। ছন্দা এসে বসে। দুষ্টু ছেলেকে সামলাতে সামলাতে কথা বলে।

পরিবারটি খুব কৃতজ্ঞ। ওদের কাছ থেকে তিরিশ টাকা করেই ভাড়া নেয় সাধনা। বেশি নেয় না। তিরিশ টাকায় দু-খানা ঘর আজকালকার দিনে অসম্ভব সস্তায় পেয়েছে ওরা। তা ছাড়া এক হিসেবে সারা বাড়িটাইতো ওদের। উঠোন ছাদ সমস্তই ওরা ব্যবহার করে। সাধনা যে সময়টুকু বাড়িতে থাকে নিজের ঘরের মধ্যেই থাকে। দু-একটা দরকারী কাজ ছাড়া বড় একটা বাইরে আসে না।

ছন্দা অনুযোগ করে, 'সাধনাদি আমিই শুধু যেচে যেচে আসি। কই আপনি তো একবারও যান না আমাদের ওখানে। আমিও তো মাঝে মাঝে একা একা থাকি।'

সাধনা মৃদু হেসে বলে, 'না গেলেও সব টের পাই।'

ছন্দা বলে, 'কী টের পান সাধনাদি?'

সাধনা তেমনি হাসে, 'এই তোমাদের ঘর-সংসার, রান্না-খাওয়া, ঝগড়া-সন্ধি। সেদিন কি তোমার একখানা সিল্কের শাড়ি [illegible]? আনিভার্সারীর ছিল নাকি?'

ছন্দা লজ্জিত হয়ে বলে, 'বাব্বা, এত-সবও আপনার লক্ষ্য থাকে। এতও কানে যায়।'

তা যায়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেন যায়। চোখ, কান, অনুভূতি যেন আগের চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ হয়েছে সাধনার। আগে যেসব কথা কানে যেত না, এখন তা যায়। আগে যেসব দৃশ্য চোখে পড়ত না এখন তা পড়ে। এত কাছাকাছি, একটি দম্পতীর পাশাপাশি তো এর আগে কখনো বাস করেনি সাধনা। ছেলেবেলায় বাবা মাকে দেখেছে। সে আর কতটুকু দেখা। এখন অনেক বেশি দেখে। চোখ দিয়ে নয় কল্পনা দিয়ে অনুভবশক্তি দিয়ে দেখে। একটি দম্পতী তাদের একটি ছেলে, তাদের বর্তমান আর ভবিষ্যৎ একটির সঙ্গে আর একটি সংলগ্ন। হাসি ঠাট্টা, মান অভিমান, সামান্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া আবার মিলন —ওদের মধ্যে কোনদিন কি ঘটে না ঘটে সবই জানতে পারে সাধনা। চেঁচামেচি ঝগড়া-ঝাটিতে অবশ্য বিরক্ত হয়, আবার যখন ওদের দাম্পত্য জীবন ছন্দে মিলে ঝংকৃত হয়, মন্দ লাগে না শুনতে। মনে হয় যেন সত্যিই একখানা কাব্য পড়ছে সাধনা, যেন উপন্যাস পড়ছে। তা কাগজের ওপরে কালির অক্ষরে লেখা নয়। এইটুকুই যা তফাৎ। হাতের বই বন্ধ করে কান পেতে থাকে সাধনা। পরে নিজেই লজ্জিত হয়। ছি ছি ছি, মেয়ে হলেও এমন আড়ি পাতবার অভ্যাস তো তার কোনকালে ছিল না।

ছন্দা সাধনার দিকে আঙুল দেখিয়ে ছেলেকে বলে, 'বলতো বাচ্চু উনি কে?'

বাচ্চু বলে, 'সাধনাদি।'

ছন্দা বলে, 'শুনলেন? ও-ও বলে সাধনাদি। পাজী হতভাগা কোথাকার। বল মাসী। মা—সী'

ছন্দার ছেলে আবার বলে, 'সাধনাদিদি।'

সাধনা হাসে, 'মন্দ কি ছন্দা। দরকার

নেই আমার মা মাসী হবার। দিদি থেকে একেবারে দিদিমায় ডবল প্রমোশন পেয়ে যাব সেই ভালো।'

ছন্দা হঠাৎ বলে ফেলে, 'তাই কি হয় সাধনাদি? মা না হয়ে কি আর দিদিমা হওয়া যায়? সবাইকেই সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠতে হয়।'

বলে ছন্দা নিজেই যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। যে এত বয়স পর্যন্ত বিয়ে করেনি, জীবনে কোনদিনই আর করবে না তার কাছে মা হওয়ার কথা তোলা নিষ্ঠুরতা। ছন্দার হয়তো সেই কথাই মনে হয়।

একটু গম্ভীর হয়ে থেকে সাধনা হেসে ওঠে, 'সবাইকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে কেন ছন্দা। কেউ কেউ লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে: কেউ বা লিফটে ওঠে। আমাদের অফিসে লিফট আছে।'

ছন্দা বলে, 'যাই দিদি। কাজকর্ম পড়ে আছে।' ছেলে নিয়ে মাঝে মাঝে ছন্দা এঘরে আসে, বসে। সাধনা কিছু লজেন্স আর বিস্কুট আনিয়ে রেখেছে। কৌটো খুলে সাধনা তার দু-একখানা বের করে ওর হাতে দেয়। গাল টিপে দেয়ে একটু-বা আদর করে, ভারি সুন্দর ছেলে হয়েছে ছন্দার।

তারপর সাধনা কথাটা নিয়ে ভাবতে থাকে। মা হওয়া! মা হওয়ার মধ্যে নারী-জীবনের সব সার্থকতা গচ্ছিত আছে সাধনা তা বিশ্বাস করে না। অনেক মেয়ের জীবনেই তো মা হওয়ার অভিজ্ঞতা ঘটে। তাদের জীবন কি সব দিক থেকে সার্থক? সাধনা তা বিশ্বাস করে না। মেয়েদের জীবনে সিদ্ধির কি আর দ্বিতীয় পথ নেই? সাধনা তা বিশ্বাস করে না। ওদেশে নাকি কোন কোন মেয়ে কৃত্রিম উপায়েও মা হতে পারে। দূর তাতে কি সুখ? তার চেয়ে কাউকে ছেলেবেলা থেকে নিজের কাছে রেখে পুষলেই হয়। সত্যি সত্যি সন্তান জন্ম দেওয়ার মধ্যে যে শারীরিক যন্ত্রণা আনন্দ সুখ দুঃখের অনুভূতি তা আর কতক্ষণ থাকে। ছেলেমেয়ে বড় হবার সংগে সংগে মা তা ভুলে যায়। তখন আর দেহ নয়, শুধু মন। মা হয়ে যে স্বাদ মাতৃত্বের অনুভূতিতে, স্নেহ আর বাৎসল্যের রস মনের মধ্যে লালন করতে পারলে সেই সুখ সেই আনন্দ। আর কারো শিশুকে, হাজার হাজার শিশুকে ভালোবাসলেও সেই আনন্দ পাওয়া যায়। বরং যারা সন্তানের মা তারা স্বার্থপর। নিজের সন্তান ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না। যারা মা হয় না মনের ঔদার্যে তারা অনেকের মা হতে পারে। তবু সত্যিকারের মা হওয়ার মধ্যে দৈহিক কী সুখ মেয়েরা পায় জানতে ইচ্ছা করল সাধনার।

অফিসে যাতায়াতের পথে, কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে এই হল তার চিন্তার বিষয়।

রেখা সান্যাল ম্যাটার্নিটি লীভ নিয়েছিল। তিন মাস পরে ফের জয়েন করেছে। মেয়ে হয়েছে ওর।

ছুটির পরে সাধনা ওকে একদিন চা খাওবাতে নিয়ে গেল। খানিকক্ষণ গল্প করল ওর সংগে। সহজে আসেনি মেয়ে। সীজারিয়ান অপারেশন করতে হয়েছে। সাধনার কৌতূহল দেখে রেখা একটু একটু অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে লাগল। 'সে যা কষ্ট মিস দাশগুপ্ত।'

সাধনা জিজ্ঞাসা করল, 'শুধুই কষ্ট? আর কিছু পাওনি? আনন্দ সুখ?'

রেখা লজ্জিতভাবে হাসে। 'কী যে বলেন মিস দাশগুপ্ত।'

সাধনা বুঝল কষ্টও আছে সুখও আছে কিন্তু রেখার তা বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা নেই। অথচ লেখাপড়া জানা আজকাল মেয়ে। কিছুই বলতে পারে না। সাধনা হতাশ হল। ভাবল, কিছু বইপত্রের শরণ নিতে হবে। বই-ই জ্ঞান অর্জনের শ্রেষ্ঠ সহায়। কিন্তু এসব বই ধার পাওয়া দুষ্কর। গীতাও স্বামীর কাছে চাইতে পারে। কিন্তু সে যদি বলে, 'কী করবেন এসব বই দিয়ে?' লজ্জায় পড়ে যাবে সাধনা। কী জানি কে কী ভাববে। তার চেয়ে কিনে নেওয়াই ভালো। এসব বিষয়েও সহজবোধ্য সুলভ সংস্করণের ইংরেজী বইয়ের নিশ্চয়ই অভাব নেই। সামনের মাসের মাইনে পেয়ে সাধনা নিজেই কিছু বই কিনে নেবে। এক মাসে সব কিনতে না পারে মাসে মাসে কিনবে। মা যারা হয় তারাও মা হওয়ার সব রহস্য জানে না। সাধনা বই পড়ে সব জানবে। জানতে বাধা কি। জানাও একরকমের হওয়া।

সাধনা মাঝে মাঝে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে। দেখবার মত চেহারা তার নয়। কালো, লম্বা, একহারা চেহারা। চোকো ধরনের মুখ। দেখবার মত নয় বলেই বোধ হয় তেমন করে কারো চোখে পড়েনি। তবু প্রথম প্রথম কোন কোন যুবক বিরক্ত করত। সাধনা তাদের কাউকে আমল দেয়নি। যারা এগোতে চেয়েছে কঠিন শাসনে তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে সাধনা। আজ আর কেউ আসে না। সুন্দরী নয় সাধনা তবে সবাই বলে স্বাস্থ্যবতী। পেটা লোহায় গড়া শরীর। নইলে কি এত খাটতে পারত। অফিসে কেউ কেউ বলে গত দশ বছরের মধ্যে মিস দাশগুপ্তের আর বয়স বাড়েনি। হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করে। কিন্তু সাধনার শরীর বেশ শক্ত মজবুত। সাধনার এক মাসিমা আছেন। বরানগরে থাকেন। তিনিও অনেকটা এই রকম। তাঁর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হয়েছে। পঞ্চাশ বছর বয়সেও সেদিন একটি ছেলে হয়েছে তাঁর। স্বাস্থ্য ভালো। থাকগে। সাধনার পঞ্চাশ হতে এখনো অনেক দেরি। ছি ছি ছি। সে কথা কিসে আসে। এসব কী ভাবছে সে। সাধনা তাড়াতাড়ি আয়নার কাছ থেকে সরে এল। নিজের মুখ নিজে দেখতে লজ্জা। নিজের চোখের দিকে তাকাতে লজ্জা করল সাধনার।

এর কয়েকদিন পরে সেদিন এক কাণ্ড ঘটল। অফিস থেকে ফিরে এসে সাধনা দেখল বাচ্চু চীৎকার করে বাড়ি মাথায় করে তুলেছে। বেশ একটু বিরক্ত হল সাধনা। ব্যাপার কি। ছেলেটাকে কেউ একটু শান্ত করতে পারে না? আর কাউকে কি বাড়িতে টিকতে দেবে না ওরা?

'ছন্দা ও ছন্দা! কী হল তোমার ছেলের?'

বলতে বলতে সাধনা ওদের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। পূর্বদিকের দুখানা ঘরে ওরা থাকে। সেদিক থেকে কান্নার শব্দ আসছে। কিন্তু ছন্দা নেই—তার বদলে সুধীরই ছেলে কোলে বেরিয়ে এল।

সাধনার মুখের ভাব দেখে একটু ভয়ে ভয়ে বলল, 'দাদা বউদি তো বাড়িতে নেই। সিনেমা দেখতে গেছেন।'

সাধনা একটুকাল তাকিয়ে কী দেখল। বিরক্তির বদলে এবার হাসি পেল তার। হেসেই বলল, 'আর ছেলেকে বুঝি তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন? তুমি কি ছন্দার দেওর না ননদ?'

সুধীর মৃদু হেসে মুখ নিচু করল।

সাধনা বলল, 'ওকে নিয়ে এ-ঘরে এসো। আমি শান্ত করে দিচ্ছি।'

সুধীর একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'না সাধনাদি' আমি নিজেই পারব। আপনি এই মাত্র অফিস থেকে ফিরলেন। এখনো কাপড় ছাড়েননি, হাত-মুখ ধোননি।'

সাধনা বলল, 'থাক থাক, তোমার অত ভদ্রতা করতে হবে না। যা বলছি শোন। ওকে নিয়ে এসো এ-ঘরে।'

এমন করে সাধনাদি তাকে এর আগে কখনো ডাকেনি। সুধীর বাচ্চুকে কোলে নিয়ে প্রায় তার পায়ে পায়ে চলে এলো।

সাধনা ঘরের তালা খুলল। ভিতরে ঢুকল। সুইচ টিপে আলো জ্বালল। জুতো খুলে স্যাণ্ডাল পরল।

তারপর সুধীরের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'ওকে দাও আমার কাছে।'

সুধীরের তবু যেন সংকোচ যায় না! 'আপনি এখনো রেস্ট নিলেন না সাধনাদি—।'

সাধনা আর কোন কথা না বলে বাচ্চুকে প্রায় ওর কাছ থেকে কেড়ে নিল।

সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সাধনা লক্ষ করল, সুধীর তার চেয়েও প্রায় ইঞ্চিখানেক লম্বা। কিন্তু কী লজ্জা ছেলের। একটুকু ছোঁয়া লেগেছে কি লাগেনি, মুখ একেবারে নিচু করে রেখেছে। ওর লজ্জাটুকু উপভোগ করল সাধনা।

চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে হেসে বলল, 'বোসো। ছেলে কীভাবে শান্ত করে শিখিয়ে দিচ্ছি।'

তারপর সুধীরকে দেখাবার জন্যেই যেন বাচ্চুকে বুকে চেপে ধরে সাধনা খুব আদর করল। গালে ঠোঁটে চুমু খেল। কৌটা থেকে বিস্কুট বের করে দিল ওর হাতে।

তারপর সুধীরের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'দেখেছ, ছেলের কান্না কেমন থেমে গেছে? পারতে তুমি?'

সুধীর নিজের অক্ষমতার কথা স্বীকার করে বলল, 'আপনারা যা পারেন, তা আমরা কী করে পারব? এবার ওকে দিন সাধনাদি, আমি যাই।'

সাধনা ওকে সস্নেহে ধমক দিয়ে বলল, 'কেবল যাই-যাই করছ। বোসো চা-টা খাও। যদি পারো বরং স্টোভটা ধরাও। দেখ, হাত-টাত পুড়িয়ে আবার কেলেংকারি করে বোসো না যেন।'
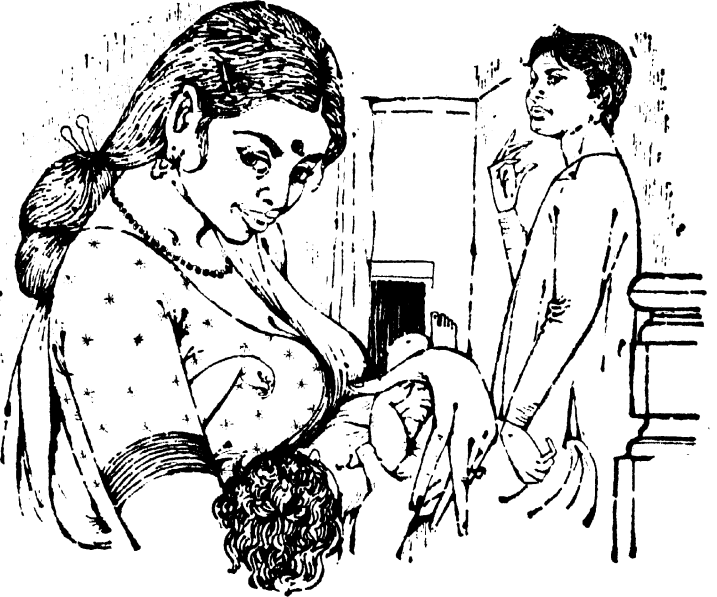
ছেলে কীভাবে শান্ত করে দেখিয়ে দিচ্ছি

গা টা ধুয়ে শাড়ি পাল্টে এল সাধনা। প্রায়ই সে সাদা খোলের শাড়ি পরে। আজ ফিকে বেগুনি রঙের শাড়ি পরল। কুংকুমের টিপ পরল। তারপর নিজের হাতে চা করল, খাবার করল। খেতে খেতে সুধীরের সঙ্গে গল্প করল।

সুধীর তবু উসখুস করছে দেখে সাধনা হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা ধরো, আমাদের অফিসে তোমার যদি একটা কাজ-টাজ করে দেওয়া যায়—'

সুধীর এবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, 'সত্যি বলছেন সাধনাদি? তাহলে তো বেঁচে যাই। জানেন বোধ হয়, অধীরদা আমার আপন দাদা নয়। জ্ঞাতি সম্পর্কে—। কী কষ্টে যে এখানে আছি। সব মেনে সব সহ্য করে। কিন্তু আপনাদের ওখানে তো আবার গ্র্যাজুয়েট না হলে—।'

সাধনা বলল, 'সে দেখা যাবে। সব ব্যাপারেরই তো একটু এদিক-ওদিক হয়।'

সুধীর আপ্যায়িত হল, আশ্বস্ত হল, ঘুমন্ত বাচ্চুকে তুলে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তাহলে সত্যি আমার জন্যে চেষ্টা করবেন সাধনাদি?'

সাধনা বলল, 'করব বইকি? আমি নিজেই তো বললাম। তুমি একটা অ্যাপলিকেশন করে দিয়ো।'

'কী পোস্টের জন্যে?'

'অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট বলেই লিখো। তারপর যা হয়।'

ও চলে যাওয়ার পর সাধনার হঠাৎ যেন খেয়াল হল। ছি ছি ছি, এ কী করে বসল সে। এ কী বলে বসল। এর পরিণাম কোথায়! এই ছলনা কোন অতল অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাবে সাধনাকে? এই লুব্ধতা কোন্ কলঙ্ক অপবাদ আর সর্বনাশের মধ্যে তাকে আকর্ষণ করে নেবে? ও হয়তো এখনো কিছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু যখন পারবে, তখন কোথায় থাকবে সাধনার মান-মর্যাদা—সকলের কাছে পাওয়া শ্রদ্ধা আর সুখ্যাতি? কী ভাববে রন্তু? যে ছোট ভাই এখনো বিদেশ থেকে লেখে, 'দিদি, তোমার সেই ফটোখানা আমার টেবিলের সামনে দেয়ালে টানিয়ে রেখেছি। যখন দেখি, কী যে বল পাই মনে—।' সেই রন্তুর কাছে কী করে মুখ দেখাবে সাধনা?

রাত্রে ভালো করে খাওয়া হল না সাধনার। ঘুমেরও ব্যাঘাত হল। কিসের একটা গ্লানি আর অনুশোচনায় মন বারবার ভরে উঠতে লাগল।

ভোরে উঠে অবশ্য রাত্রির সেই তাপ আর রইল না। সাধনা এমন কিছু করেনি যাতে সে অত অনুতপ্ত হতে পারে। চাকরির

কথাটা যদি একটু বানিয়ে বলে থাকে, তাতেই বা কী হয়েছে। বোস সাহেবকে বলে রুটিন-গ্রেড ক্লার্কের কাজ কি ফোন অপারেটের শিক্ষানবিশী কিছু-না-কিছু ওকে একটা জুটিয়ে দেওয়া যাবেই। ওর মত মানুষের পক্ষে আশা-ভরসারও তো একটা দাম আছে। তাই-বা ও কোথায় পায়?

একটু বেলা হলে সাধনা নিজেই ছন্দার সঙ্গে আলাপ করতে গেল। কেবলই খোঁটা দেয় আসেন না, আসেন না। আজ এসেছে।

ছন্দা বারান্দায় বঁটি পেতে বসে তরকারি কুটছিল, সাধনাকে দেখে খুশী হয়ে বলল, 'আসুন।'

একটা মোড়া এগিয়ে দিল বসতে।

তারপর হেসে বলল, 'কাল নাকি বাচ্চু আপনার ওপর খুব উৎপাত করেছে?'

সাধনা বলল, 'উৎপাত আবার কিসের?'

ছন্দা বলল, 'আপনি ওকে বিস্কুট খাইয়েছেন, আদর করেছেন। সবই শুনলাম। জানেন দেখি সব।'

সাধনা হঠাৎ বলে ফেলল, 'জানব না কেন। আমিও তো মেয়েছেলে।'

ছন্দা হেসে বলল, 'সেকথা কে অস্বীকার করে সাধনাদি। বরং আপনিই যেন স্বীকার করতে চাইতেন না।'

সাধনা কী যে বলবে, হঠাৎ যেন ভেবে পেল না।

ছন্দা একটু হেসে বলল, 'শুনলুম আমাদের সুধীরের ভাগ্যেও কাল খুব সমাদর জুটেছে। আর আপনি নাকি ওকে একটা চাকরি জুটিয়ে দেবেন বলেছেন।'

সাধনা বলল, 'দেবই যে একথা বলিনি। চেষ্টা করব বলেছি।'

ছন্দা বলল, 'দিন সাধনাদি। যাই হোক একটা কিছু জুটিয়ে দিন। তাহলে বেঁচে যাই। বাব্বা, একটা লোকের খরচ কি এ-বাজারে কম? মা নেই, বাপ নেই, কাছা-কাছি আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। ঘাড়ে এসে পড়েছে। ফেলতে তো আর পারিনে।'

'অফিসের বেলা হল' বলে উঠতে যাচ্ছিল সাধনা, কিন্তু ছন্দা ওকে উঠতে দিল না। বলল, 'তা হবে না সাধনাদি, চা খেয়ে যাবেন। আমাদের দু দফায় চা হয় সকালে। নইলে বাবুরা গরম।'

চা-টা খেয়ে উঠে পড়ল সাধনা। কিসের যেন একটা অস্বস্তি লেগে রইল মনে। সে মেয়েমানুষ, একথা তাকে আজ নিজের মুখেই বলতে হল। ছন্দা তা নিয়ে তাকে ঠাট্টা করতে ছাড়েনি। ঠাট্টা করবে বইকি ছন্দা। পুরুষের চোখেও এই নিঃশব্দ কৌতুক সাধনা দেখতে পায়। যত সব পরিচিত আধা-পরিচিত প্রৌঢ়, কি লোলুপ অক্ষম বৃদ্ধ তার সঙ্গে কথা বলে, ঘনিষ্ঠতার সুযোগ খোঁজে। কিন্তু যৌবন—হৃদয়হরণ দুঃখহরণ যৌবন তার দিকে আর তাকায় না। তাকে কি আর সাধনা কোন দিনই ফিরে পাবে? নিজের দেহে নয়, অন্যের দেহেও নয় কোথাও আর তাকে পাবে না। তাকে পেতে হলে চুরি করতে হবে, ডাকাতি করতে হবে।

সাবান তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে স্নান করতে এল সাধনা। এসেও ওই একই চিন্তাস্রোতে ভাসতে লাগল। আজও অক্ষতা অনাঘ্রাতা সাধনা। শুধু কুমারী নয় মনে মনে কিশোরী। কিন্তু কে আর তার সেই কৈশোরকে মনে করে রেখেছে? কবে যে

একটি কুঁড়ি ধরল গাছে, ফুল হয়ে ফুটল তা কেউ লক্ষ্যও করেনি। আজ ঝরা পাপড়িগুলির দিকে তাকিয়ে সবাই অবজ্ঞায় হাসছে, পায়ে দলে দলে যাচ্ছে। সাধনার সাধ্য নেই ছুটে গিয়ে কারো হাত ধরে কি কারো পা জড়িয়ে ধরে। সাধনা জানে ধরেও কোন লাভ নেই।

বড় রাস্তায় এসে বাসস্টপ পর্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতে দাঁড়ানো বাসটা দৌড় দিল। দ্বিতীয় বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল সাধনা। স্টপে সাটেপরা আরও কয়েকজন অফিসযাত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অনেকেরই মুখ চেনে। চিনবে না কেন? বছরের পর বছর ধরে দেখছে। সেই নবনী কোমল মুখগুলিতে কালের হাতের পাঁচ আঙুলের দাগ কী ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তাও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছে সাধনা।

এক ভদ্রলোক সিগারেট ধরালেন। সাধনা একটু পিছিয়ে এল। আর হঠাৎ কানের কাছে শুনতে পেল 'সাধনাদি!' চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল সাধনা, অস্ফুট স্বরে বলল, 'কে?'

এতক্ষণে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসেছে সুধীর। এখন রুদ্ধশ্বাস। কিন্তু ওর মুখে এখন প্রত্যাশা পূরণের প্রসন্ন হাসি।

সুধীর বলল, 'আমি একেবারে টাইপ করে নিয়ে এসেছি সাধনাদি।'

'কী ওটা?'

'সেই অ্যাপ্লিকেশন। দেব এখানে?'

রোলকরা কাগজখানা একটু বাড়িয়ে ধরল সুধীর।

সাধনা মাথা নেড়ে বলল, 'না না, এখানে নয়। অফিসে যেও। হেস্টিংস স্ট্রীট চেন তো?'

সুধীর বলল, 'চিনি বইকি। কখন যাব?'

'পাঁচটায়।'

'পাঁচটায়! তখন যে ছুটি হয়ে যাবে সাধনাদি।'

সাধনা বলল, 'তা হোক। তখনই কথাটথা বলতে সুবিধে হবে। তা ছাড়া ছুটির পরে ভেবেছি একটু মার্কেটিং করে ফিরব। তুমি তো ও ব্যাপারে ওস্তাদ। যদি একটু হেলপ চাই—'

সুধীর উল্লসিত হয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই সাধনাদি নিশ্চয়ই। আপনি যা করতে বলবেন—।'

সাধনা গলা নামিয়ে বলল, 'আস্তে।'

সঙ্গে সঙ্গে সুধীরও অর্ধস্ফুট হল, 'আপনি যেখানে যেতে বলবেন—।'

সাধনা আর কোন কথা বলল না। দ্বিতীয়বার সুধীরের দিকে আর তাকাল না। যেন আর কোন দিকে তার লক্ষ্য নেই। দ্রুত পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সাধনা।

তার বাস এসে গেছে।

ইণ্ডিয়া

বিমল মিত্র

খবরের কাগজে একবার এক খুনের খবর বেরিয়েছিল। কোথায় কোন্ দেশে এক নাপিত একজনের দাড়ি কামাতে কামাতে তার গলাটা কেটে নাকি দু'ভাগ করে দিয়েছিল। মাঝে-মাঝে এ-ধরনের খবর না ছাপা হলে খবরের কাগজের বিক্রী কমে যায়। লোকে বলতে আরম্ভ করে—আজকাল খবরের কাগজওয়ালারা ফাঁকি দিতে আরম্ভ করেছে, কিছুছু খবর দিচ্ছে না।

খবর শুধু শুকনো খবরই। যে-খবর প্রতিদিন পৃথিবীর চারদিকে ঘটছে, তার একটা ছোট ভগ্নাংশও খবরের কাগজে ছাপা সম্ভব নয়। এমন খবরও ছাপা হয়, যা ছাপা হওয়া উচিত কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তবু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কিছু-না-কিছু মুখরোচক খবর চাই। নইলে খারাপ লাগে। হয় কোনও দেশের প্রেসিডেণ্টের উত্থান, নয় পতন, নয় ভূমিকম্পের মৃত্যু-তালিকা, নয় আরো এমনি কিছু যা নিয়ে সারাদিন রোমন্থন করতে পারি। এ-ও একরকম নেশার মতন। চিউইং-গামের মত, বা পান-সুপুরির মত এ-নেশাও আমাদের প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

সেদিনও একটা খুনের খবর কাগজে ছাপা হয়েছিল। যে-দেশে খুনটা হয়েছিল, তার নাম-গন্ধও কারোর জানা ছিল না আগে। হয় চায়না, নয় জাপান, নয় কিউবা, এমনি একটা কোনও জায়গার মধ্যে একটা অখ্যাত জনপদের ঘটনা। কিন্তু খুনটা মজার খুন বলেই কলকাতার লোকের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল সেটা।

পাটিল সাহেব বললেন—আমি একবার এই রকম একটা খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—আপনি?

—হ্যাঁ আমি। তখন আমি ফিলম্-লাইনে আসিনি। আমার অবস্থাও তখন এ-রকম ছিল না, আমি তখন চাকরি করতাম! বললে অবাক হয়ে যাবেন আমি দশ বছর সার্ভিস করেছি, গভর্মেণ্ট জব্!

পাটিল সাহেব যে আবার কোনওদিন গভর্মেণ্ট চাকরি করেছেন, তা আমার জানা ছিল না। বোম্বেতে কারোরই জানা ছিল না। সবাই জানে পাটিল-সাহেবকে ফিলম্-ডাইরেক্টর বলে! শুধু ডাইরেক্টর নয়, প্রোডিউসার। ছোটখাটো প্রোডিউসার নয়। বড়-বড় দামী-দামী ছবি করেন পাটিল-সাহেব। সে-ছবি ফার-ইস্টে যায়, ফিলম্-ফেস্টিভ্যালে যায়। পাটিল-সাহেব নিজেও

দল-বল নিয়ে বার কয়েক কণ্টিনেণ্ট ঘুরে এসেছেন। বাড়ি করেন নি, কিন্তু গাড়ি করেছেন দু'খানা। বাড়ি ইচ্ছে করেই করেন নি। ইচ্ছে হলে এই বোম্বাইতেই পাঁচ-খানা ফ্ল্যাট কিনতে পারেন, এমন ক্রেডিট্ আছে বাজারে।

—চাকরি এখানে করতাম না, করতাম কলকাতায়। তখন চাকরি করা ছাড়া আর কিছু করবার ক্ষমতাও ছিল না আমার। কোনও দিন যে ফিলম্-এর ছবি তুলবো, প্রোডিউসার হবো তা কল্পনাও করিনি! আসলে এই খুনের সঙ্গে জড়িয়ে না-পড়লে হয়ত এই সিনেমার লাইনে আসতামই না—

পাটিল-সাহেবের কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

বললেন—আপনি তো কলকাতার লোক, আপনাকে বললে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন। কলকাতার মত ন্যাস্টি প্লেস, আমি আর কোনও শহর দেখিনি। আপনি হয়ত শুনে মনে দুঃখ পাবেন, কিন্তু আমার জীবনে সেই দশটা বছর একটা দুঃস্বপ্নের মত কেটেছে, জানি না, এ-ও হয়ত আমার দুর্ভাগ্য! আমার ভাগ্যেই হয়ত যত খারাপ-খারাপ লোক জুটে গিয়েছিল! তা-ও হতে পারে—আর সেইজন্যেই আমার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল—

গল্পটা হচ্ছিল পাটিল-সাহেবের বাড়িতে বসে। প্যারেলের পুরোন মহল্লায় পুরোন একটা ফ্ল্যাট। ঘরের ভেতরে আর কেউ ছিল না। সারাদিন স্ক্রিপ্ট্ লেখার পর অ্যাসিস্টেণ্ট্রা চলে গেছে যে-যার বাড়িতে। আমিও চলে যাচ্ছিলাম আমার হোটেলে। কিন্তু ড্রাইভার ছিল না বলে আমাকে বসতে বললেন। বললেন—আপনি একটু বসুন, ড্রাইভারকে পাঠিয়েছি বাঙলা পান আনতে মাতুঙ্গাতে, এখুনি এসে পড়বে।

তারপর গ্লাস এল। সন্ধ্যেবেলা তিন-চার গ্লাস খাওয়া নিয়ম পাটিল-সাহেবের। এতে কেউ অবাক হয় না। বোম্বের প্রোহিবিশন শুধু নাম-কা-ওয়াস্তে। মদ খাওয়া সরকারী-ভাবে বে-আইনী। কিন্তু ওটা সব বাড়িতেই ভেতরে ভেতরে চলে। ও-নিয়ে কথা তুলতে নেই। সেই দু'একবার চুমুক দিতে-দিতেই পাটিল-সাহেব যেন বেশ পাত্‌লা হয়ে আসতে লাগলেন। আর তারপরেই খুনের কথাটা উঠলো।

বললেন—তাহলে শুনুন—

বলে মৌজ করে পাটিল-সাহেব গল্প আরম্ভ করলেন।

আমার এক মামার কাছে থেকে তখন আমি পড়ি। মামা আমার ভারি সৎ লোক। ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়ে আমার পড়াশোনা হলো না আর। তারপর হয়ত অন্য লোকে যা করে আমিও তাই করতাম—ভ্যাগাবণ্ডাইজিং। কিন্তু তা করতে হলো না। মামার এক বন্ধুর সুপারিশে আমার একটা চাকরি হয়ে গেল। তিরিশ টাকা মাইনে! গভর্নমেণ্ট অফিস। রোজ চাকরি করতে যাই। যাই আর আসি, আসি আর যাই। শেয়ালদ থেকে ডালহৌসী স্কোয়ার। এই চাকরিতে যদি আমি শেষ-জীবন পর্যন্ত টিঁকে থাকতুম তো যখন আমার পঞ্চান্ন বছর বয়সে হতো, তখন গ্রেডটা গিয়ে দাঁড়াতো একশো নব্বুই টাকায়। এই টাকায় আমাকে বাড়ি ভাড়া দিতে হতো, মেয়ের বিয়ে দিতে হতো, ডাক্তারের খরচ জোগাতে হতো, আরো অনেক কিছুই করতে হতো, যা সব ক্লার্কেরই করতে হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে দশ বছর চাকরি করার পর আমি মুক্তি পেলুম। মুক্তি পেলুম ওই খুনের জন্যে—

—কী-রকম?

পাটিল-সাহেব বললেন—তখন আমার মামা মারা গেছে। আমার রিলেটিভ্ যারা ক্যালকাটায় ছিল, সবাই পুণায় চলে গেছে। আমি একটা ফ্ল্যাট্ ভাড়া করে থাকি শেয়ালদা' অঞ্চলে। আপনি তো জানেন, শেয়ালদা লোক্যালিটিটা কী ডার্টি জায়গা! আর ক্যালকাটার কোন্ জায়গাটাই বা ডার্টি নয় বলুন? বাঙালীরা যে কী করে বেঁচে আছে এখনও সেইটেই আশ্চর্য—

পাটিল-সাহেব গেলাসে আর একবার চুমুক দিলেন।

বললেন—ভাববেন না নেশার ঝোঁকে এ-সব কথা বলছি, নেশা আমার হয় না। নেশা যখন হতো, তখন নেশা করবার পয়সা জুটতো না আমার। সত্যিই বড় কষ্টে দিন কেটেছে আমার। একশো তিরিশ টাকা মাইনে পাই তখন। চাকরিতে ঢুকে-ছিলাম তিরিশটাকায়। তখন যুদ্ধ বাধেনি। তখন তিরিশটা টাকা পেয়ে ভালোভাবেই কাটতো। কলকাতায় তখন তিন টাকা মণ চাল, তিন আনা সের ডাল, টাকায় আড়াই সের দুধ। তারপর সেই কলকাতাতেই আবার একদিন চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা মণ চালের দর উঠলো, একটাকা সের ডাল, টাকায় একসের দুধ। কিন্তু সেই অনুপাতে মাইনে বাড়লো না। ক'বছর চাকরির পর জিনিসের দাম বাড়বার জন্যে তিরিশ টাকা থেকে বেড়ে আমার মাইনে হলো একশো তিরিশ টাকা। তবু কষ্ট করে চালাচ্ছিলাম, কিন্তু মুশকিল হলো আমার ছেলেকে নিয়ে। ছেলের টাইফয়েড অসুখে অনেক টাকা লোন হয়ে গেল।

আমাদের অফিসের বস্ ছিল একজন বাঙালী। নাম, কী নাম্ মজুমদার। আমরা ডাকতুম মজুমদার সাহেব বলে।

অফিসে গেছেই ডেকে পাঠালে মজুমদার সাহেব। আমি গিয়ে তার টেবিলে হাত রেখে দাঁড়ালুম। খেঁকিয়ে উঠলো সাহেব। বললে—স্ট্যাণ্ড স্ট্রেট্—

বেটার পেছনে নিশ্চয় লোক ছিল। তাদের জোর দিয়ে চাকরিটা পেয়েছিল সাহেব। তাই আমাদের কুকুর-বেড়ালের মত দেখতো।

আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালুম। মুখ দিয়ে আমার কথা বেরোল না। দু'মাস ঘুমোইনি। দু'মাস খাইনি ভাল করে। দু'মাস ভাবনায় পাগল হয়ে গিয়েছি। তবু অফিসে ছুটি পাইনি। যখনই ছুটি চেয়েছি সাহেব বলেছে—ক্যান্ নট্ বি স্পেয়ার্ড্। ছুটি দেওয়া চলবে না—

সাহেব আবার হাউ-হাউ করে উঠলো—কেন ছুটি চাও তুমি?

খুব নিচু গলায় বললাম—আমার ছেলের খুব অসুখ স্যার, সাফারিং ফ্রম টাইফয়েড—আমার বাড়িতে আর কেউ নেই, আমি একলা আর আমার ওয়াইফ্, আমার ওন্‌লি সন্—

সাহেব কথা শেষ করতে না দিয়ে বললে—দ্যাট্‌স্ নট্ গভর্মেণ্ট্‌স্ লুক্-আউট, তোমার ছেলে মরুক বাঁচুক তা দেখা গভর্মেণ্টের কাজ নয়। গভর্মেণ্ট্ চায় কাজ,

ওয়ার্ক ফার্স্ট এন্ড্ ওয়ার্ক লাস্ট্। গভর্মেণ্টের ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্ মাস্ট্ বি গিভ্ন্ প্রাওরিটি, গভর্মেণ্টের ফাইভ্ ইয়ার প্ল্যান যদি সাক্সেসফুল হয়, তখন লক্ষ-লক্ষ ছেলে মানুষ হবে, ইণ্ডিয়ার কোটি-কোটি মানুষ বেনিফিটেড্ হবে— সেইটে বড় না তোমার একটা ছেলের লাইফ বড়ো? যাও—আমার সামনে থেকে চলে যাও—

কথাটা বলে মজুমদার সাহেব আবার নিজের ফাইলের দিকে নজর দিলে।

আমি মরীয়া হয়ে তখনও দাঁড়িয়ে রইলুম। ভাবলাম আজ যেমন করে হোক ছুটি আদায় করতেই হবে। আমি একশো তিরিশ টাকার ক্লার্ক জগদীশ পাটিল কিছুতেই ছুটি আদায় না করে ছাড়বো না।

হঠাৎ ভাল্লুকের মত আবার খেঁকিয়ে উঠলো মজুমদার সাহেব।

—তবু দাঁড়িয়ে আছ? গিটল্ ইউ আর ফিয়ার?

বললাম স্যার, একটু কাইণ্ডলি আমার কথাটা কন্সিডার করুন—

—কল্ ইওর বড়বাবু, কল্ হিম্—কুইক্—

তারপর ঘটাং করে কলিং-বেলটা বাজাতেই চাপরাশি ভেতরে এসে সেলাম করলে।

—বড়বাবু কো বোলাও—

সেক্শানে প্রচুর ফাইলের স্তূপের মধ্যে বসে ছিলেন কান্তিবাবু। কান্তিবাবু পুরোন লোক। তিনিও বাঙালী। জীবনে পঁয়ত্রিশটা অফিসারকে চরিয়ে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। তাড়াতাড়ি কোট গায়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। যেন নিজের মনেই বললেন—আঃ জ্বালিয়ে খেলে বেটা—

অফিস সুদ্ধু লোক জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছিল সাহেবের অত্যাচারে। সারা অফিসের লোক জানতো মজুমদার সাহেবের দয়া-মায়ার কোনও বালাই নেই। কত লোকের চাকরি খেয়েছে মজুমদার সাহেব, কত লোকের পার্সোনাল ফাইল চিরকালের মত দাগী করে দিয়েছে। লোকে অভিশাপ দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অফিস থেকে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে। জীবনে মজুমদার সাহেব কারো উপকার করেছে বলে শোনা যায়নি। অথচ মজুমদার সাহেব যে কেমন চরিত্রের লোক তা জানতে কারো বাকি ছিল না। মজুমদার সাহেবের ঘরের সামনে লাল আলো জ্বলতো মাঝে-মাঝে। লাল আলো জ্বললে বুঝতে হবে সাহেব ভীষণ ব্যস্ত। কারো সঙ্গে তখন দেখা করবার সময় নেই তার। অথচ তখন হয়ত স্টেনোগ্রাফার মিস্ চক্রবর্তী তার কোলে বসে আছে। তখন হয়ত মিস্ চক্রবর্তী মজুমদার সাহেবের কোলে বসে......

পাটিল সাহেব আবার গ্লাসে চুমুক দিলেন।

বললেন—যাক গে, এ-সব সব অফিসেই হয়। যেখানেই লাল-আলোর সিস্টেম্, বুঝবেন সেখানেই ওই ব্যাপার হচ্ছে। ও-নিয়ে আমরা ক্লার্করা কোনো দিন মাথা ঘামাইনি। ধরে নিয়েছিলাম আমরাও ওই চেয়ারে বসলে ওই-রকমই করতাম।

—তারপর কী হলো বলুন!

পাটিল সাহেব বললেন—কান্তিবাবু তো এলেন। সাহেব বললে—কান্তি—

সাহেবের বাবার বয়েসী কান্তিবাবু। তবু কান্তি বলে ডেকেই সাহেব নিজের গুরুত্ব জাহির করতে চাইতো।

বললে—গভর্মেণ্ট্ কোটি-কোটি টাকা খরচ করছে, এই সব আইডলারদের ফিড্ করবার জন্যে? তুমি কি চাও আমি অফিস ক্লোজ করে দিই? হোয়াট ডু ইউ থিংক্? হোল্ ওয়ার্ল্ড ইণ্ডিয়ার দিকে চেয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছো না? শুধু কেবল ছুটি আর ছুটি! আজ একমাসে থার্টি অ্যাপ্লিকেশন এসেছে আমার কাছে ছুটির জন্যে। সকলকে যদি ছুটি দিই, তাহলে আমি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সাক্সেসফুল করবো, কী করে শুনি? আমি একলা অফিস চালাবো? তাহলে ক্লার্কস রাখা হয়েছে কীসের জন্যে? বসে-বসে ঘুমোবার জন্যে?

কান্তিবাবু বললেন—না স্যার, ওর ছেলের সত্যিই টাইফয়েড, কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে প্যাটিল এই সেদিন—আজকাল কলকাতা শহরে......

আর শেষ করতে দিলে না সাহেব। বলে উঠলো—তুমি আমাকে কলকাতা শহর দেখাচ্ছো কান্তি, আমি জানি না কলকাতার কি অবস্থা? তাহলে বোম্বের লোক কী করে অফিস চালাচ্ছে? দিল্লী ম্যাড্রাসের লোক কী করে অফিস চালাচ্ছে? আমি এই সেদিন ইউ-এস-এ থেকে কনফারেন্স করে এসেছি, তারাও তো মানুষ, সেখানে ফ্যাক্টরি থেকে ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মটর ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে, তা জানো? সেখানে অফিসের ক্লার্কস্রা কত এফিসিয়াণ্ট জানো? আর অত দূরে গিয়ে দরকার নেই, ম্যাড্রাস কত এগিয়ে গিয়েছে দেখে এসো, বোম্বে কত এগিয়ে গিয়েছে দেখে এসো, তারা তোমাদের মতন সমান পে পাচ্ছে, দে ড্র সেম্ পে, দে গেট্ সেম্ ফেসিলিটিজ, কিন্তু আমি বুঝতে পারি না হোয়াই বেংগলীজ আর সো ব্যাকওয়ার্ড, বুঝতে পারি না বাঙালীরা কেন এত পেছিয়ে যাচ্ছে, ইট্ ইজ্ এ সেম্ টু দি স্টেট্, আমাদের দেশের লজ্জা, আমাদের

জাতের লজ্জা, আমার নিজেকেও বাঙালী বলতে লজ্জা হয়—ছিঃ—

কান্তিবাবু এ-কথার আর কী জবাব দেবেন? বললেন—স্যার, আমরা তো চেষ্টা করি—

—থামো তুমি কান্তি! কোনও এক্সকিউজ আমি শুনতে চাই না! আই ওন্ট গিভ হিম লীভ—

—কিন্তু স্যার, এর ছেলে বোধহয় বাঁচবে না!

সাহেব টেবিলের ওপর বিরাট একটা কিল মারলে।

—বাট ইজ ইট গভর্মেন্টস লুক আউট? কার ছেলে বাঁচবে কি বাঁচবে না, তাও কি গভর্মেন্টকে দেখতে হবে? ইণ্ডিয়ার প্রগ্রেস আগে না একজন ক্লার্কের ছেলে আগে, আমাকে বুঝিয়ে বলো তো? পণ্ডিত নেহরু কি আমাকে এই সব দেখবার জন্যে মাইনে দিচ্ছে না অফিসের কাজের জন্যে মাইনে দিচ্ছে?

তারপর একটু থেমে মজুমদার সাহেব আবার বলতে লাগলো—জানো সমস্ত দেশ আজ বাঙালীদের দেখতে পারে না, কেন? হোয়াই? বাঙালীরা আইডল, বাঙালীরা ডিজঅনেস্ট, বাঙালীরা ফাঁকিবাজ—যত রকমের ভাইস আছে, সব বাঙ্গালীদের রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, আমি হোল অফিস স্টাফকে স্যাক করবো একদিন—আপনারা বাঙালী জাতের বদনাম করছেন—

পাটিল সাহেব বললেন—আমি মজুমদার সাহেবের কথার তোড়ের মুখে বলতে পারলাম না যে, আমি বাঙালী নই। কিন্তু সাহেবের কথার প্রতিবাদ করা যায় না। সাহেবকে যা খুশি বলে যেতে দিতে হয়, এইটেই অফিসের নিয়ম। বড়বাবুও দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমিও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো। মিস চক্রবর্তী ঘরে ঢুকলো টাইপ-করা চিঠি নিয়ে। লাল রং-এর শাড়ি। মুখময় রুজ পাউডার স্নোর বাহার। ময়ূরের মত পেখম তুলে মজুমদার সাহেবের কাছে এল। মিস চক্রবর্তীকে দেখেই মজুমদার সাহেবের মুখখানা যেন আমূল বদলে গেল। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়লো আমরা ভেতরে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের দিকে চোখ কট-মট চেয়ে সাহেব গর্জে উঠলো—গো ব্যাক টু ইওর সেকশন—গিয়ে কাজ করো—যাও—

আমরা চলে এলাম বাইরে। বাইরে আসতেই দেখলাম সাহেব লাল আলোটা জেবলে দিয়েছে। বোঝা গেল, আর কেউ ভেতরে যেতে পারবে না। এখন সাহেব অফিসরে ফাইলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

বড়বাবুকে জিজ্ঞেস করলাম—তাহলে কী করবো বড়বাবু?

কান্তিবাবু বললেন—আমি আর কী বলবো, সাহেব রেগে গেছে, এখন তো কিছুতেই ছুটি দেবে না, একবার যখন না বলেছে, তখন আর হ্যাঁ করানো যাবে না—

নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলুম। কিন্তু কাজে মন গেল না। অফিসের মধ্যে বসে-বসেই বাড়ির কথাটা মনে পড়তে লাগলো। তিন-ঘণ্টা অন্তর-অন্তর ওষুধ খাওয়াতে হবে। আগের দিন আমার ওয়াইফ আর আমি সারা রাত জেগে কাটিয়েছি আর ওষুধ খাইয়েছি আর টেম্পারেচার দেখেছি।

পাশেই বসতো ব্যানার্জিবাবু। অতি ভদ্রলোক। নির্ঝঞ্ঝাট-নির্বিবাদী মানুষ। আমার অবস্থাটা জানতো। নিজের মনেই ব্যানার্জিবাবু বললে—এত লোক অ্যাকসিডেন্টে মারা যাচ্ছে আর মজুমদার সাহেব মরে না রে—

ওপাশ থেকে পরিতোষবাবু বললেন—কেউ খুন করতেও পারে না বেটাকে—

হরিসাধনবাবু বললে—প্যাটেলবাবু, আপনি কামাই করুন, আমি বলছি আপনি কামাই করুন। কালকে অফিসে আসবেন না, যতদিন আপনার ছেলে না সেরে ওঠে, ততদিন আসবেন না, দেখি ও কী করতে পারে—

আমি আর কী বলবো! আমার চোখ দিয়ে সত্যিই তখন জল গড়িয়ে পড়ছে। অথচ যত দোষ আমাদের বেলাতেই। অফিসের জন্যে বড় ঘড়ি এলে চলে যায় মজুমদার সাহেবের বাড়ি। সাহেবের টেবলের ওপরকার বড় গ্লাসখানা হঠাৎ সাহেব গাড়িতে তুলে নিজের বাড়ি নিয়ে গেল। কই, তার বেলায় তো কেউ কিছু বলবার নেই। অফিসার বলে কি সাত-খুন মাপ? এর কোনও প্রতিকার নেই? এই যে কনফারেন্সের নাম করে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা ঘুরে আসে প্লেনে করে, আরাম করে খাওয়া-দাওয়া করে, তাতে গভর্মেন্টের কাজের কী সুবিধে হয়? তার বেলায় তো ফরেন-এক্সচেঞ্জের কথা ওঠে না? সাহেব অফিস থেকে ছ'মাস বাইরে থাকলে তো অফিসের কাজের কোনও ক্ষতি হয় না? আর আমি ক'দিন কামাই করলেই গভর্মেণ্ট অচল হয়ে যাবে?

পরিতোষবাবু যখন ভীষণ রেগে যেত তখন বলতো—ভগবান-ফগবান সব বাজে কথা মশাই, সব মিথ্যে, ভগবান থাকলে কখনও এমন অন্যায় চলতো?

পাটিল সাহেব আবার গ্লাস তুলে চুমুক দিলেন।

বলতে লাগলেন—সে-সব দিনের কথা আজ ভাবতে ভালোই লাগে আমার। সেদিনকার অভাব আর দারিদ্র্যের গল্প এখন লোকের কাছে বলতেও ভাল লাগে। অথচ বেশি দিনের কথাও তো নয়। আজ থেকে মাত্র দশ বছর আগের কথা। নাইনটিন ফিফ্‌টি-থ্রির কথা। মাত্র ছ'বছর হলো ইণ্ডিয়া তখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়েছে। মিনিস্টার আর ভি-আই-পিদের রাজত্ব সবে শুরু হয়েছে। সবাই দু'হাতে চুরি করতে শুরু করে দিয়েছে। যারা চিরকাল জেল খেটে এসেছে, হঠাৎ রাতারাতি তারা রাজা হয়ে বসেছে। ব্রিটিশ-আমলের অফিসাররা সেই সুযোগে হঠাৎ দেশ-ভক্তির কথা বলতে শুরু করেছে। লর্ড আরউইন লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের বদলে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীকে গড বলে পুজো করতে আরম্ভ করেছে। ইণ্ডিয়ানদের তখন আর মানুষ বলেই মনে করে না। আমি ঘটনাচক্রে সেই সন্ধি-যুগের ইণ্ডিয়ান। মজুমদার সাহেবের কোপটা হয়ত সেই-জন্যে আমার ওপরেই পড়লো। আমি না-হয়ে অন্য কারোর ওপরেও পড়তে পারতো। কিন্তু আসলে আমিই হয়ে গেলাম ভিকটিম। কারণ ঠিক সেই সময়েই আমার ছেলের হলো টাইফয়েড।

যা হোক, অফিস বন্ধ হবার পরই আমি দৌড়তে-দৌড়তে বাড়ি গেলাম। কিন্তু গিয়ে পৌছোবার আগেই যা হবার তা হয়ে গেছে। কিছু পাড়ার লোক, কিছু অন্য ফ্ল্যাটের লোক তখন জমে গেছে বাড়ির

সামনে। তারপর যা হয় এসব ক্ষেত্রে তাই হলো। আমার স্ত্রী বিকেল থেকেই কাঁদছিল। আমিও খানিক কাঁদলুম। অর্থাৎ বাড়ির কর্তা হয়ে যতখানি কাঁদা যায় ততখানি। দুঃখটা ছেলের মৃত্যুর জন্যে হচ্ছিল কি নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে হচ্ছিল তা বলতে পারবো না। আর সে-সব ব্যাখ্যা এখন এতদিন পরে আমি করতেও পারবো না। সে-সব আমার সিনেমার স্ক্রিপ্টে আমি অনেকবার ঢুকিয়ে দিয়েছি, বক্স-অফিসের জন্যে আমাদের সিনেমায় ওটা দরকার হয়। সে-সব আপনাকে শুনিয়ে আমি বিরক্ত করবো না। ঘটনাটা ঘটলো রাত্রে। আমি বারানসীঘাট থেকে ফিরে এলুম ন'টার সময়। সে-রাত্রে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। আমার ওয়াইফকে আমি একলা ফেলে বাইরে বেরোলুম।

আমার ওয়াইফ জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাচ্ছো?

বললাম তুমি শোও, আমি আসছি—

আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না বোধহয়। রাত ন'টা বেজে গেছে। ক'দিন রাত জাগা, তারপর সমস্ত দিন অফিস-করা, তারপর শ্মশানে আগুনের সামনে গরমে-পোড়া, আমার মাথার মধ্যে আগুন ধরে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় আমার কাঞ্চনগরের ছোরাটা জামার নিচে লুকিয়ে নিয়েছিলাম। শেয়ালদার রাস্তায় ট্রাম-বাসগুলো তখন ফাঁকা। একটাতে উঠে বসলাম। মৃত্যুর সামনে মানুষ যেমন অসহায় বোধ করে, তেমনি আবার হয়ত বেপরোয়াও হয়ে যায় বোধহয়। মৃত্যু যেমন বৈরাগ্য আনে, আবার সাহসও বাড়ায়। আমার শেষ ছবিটাতে আমি এ-সিন দেখিয়েছি। আমার হীরো কেমন করে যুদ্ধে গিয়ে হাসতে হাসতে প্রাণ দিলে। এ-সিনটা দেখবার সময় অডিয়ান্স-এর চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ে, আমি নিজে গিয়ে অনেকবার দেখেছি। ওই সিন্‌টার জন্যেই এ-ছবিটার সিলভার-জুবিলী হয়েছিল। কিন্তু তারা জানে না তো যে, এ আমার নিজের স্টোরি, এ আমার নিজের বায়োগ্রাফি। আমি নিজের রক্ত দিয়ে এ-ছবি করেছি। এ-ছবিটাতে আমার প্রফিট্ হয়েছে পঞ্চাশ লাখ, কিন্তু সে-টাকা আমি ইনকাম করেছি আমার ছেলের মৃত্যুর বিনিময়ে।

যা হোক, আমি ট্রাম বদলে গিয়ে পৌঁছুলাম মজুমদার সাহেবের কোয়ার্টারের সামনে। মজুমদার সাহেব থাকতো অফিসর ফারনিশ্‌ড্ ফ্ল্যাটে। ইন্ডিপেন্ডেন্সের আগে এই সব ফ্ল্যাটেই থাকতো ইউরোপীয়ানরা। তারা চলে গেছে। তাতে তখন ইন্ডিয়ান অফিসাররা বাস করছে। সে-বাগান, সে-ফার্নিচার তখন আর নেই। বাগানের জন্যে মালী দিয়েছে গভর্মেণ্ট থেকে। কিন্তু মালীরা তখন সাহেবের অন্য কাজ করে। ঘর ঝাঁট দেয়। কাপড় কাচে। বাটনা বাটে বা রান্না করে। বাড়ির কাজ অফিসের দেওয়া চাপরাশিদের দিয়েই করে নেয় দিশী সাহেবরা।

বাড়ির সামনে অন্ধকার। আমি বেপরোয়া হয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ভয় করছিল না যে তা নয়। কিন্তু কোথা থেকে যে সেদিন আমার অত সাহস এসেছিল, তা এখন আর আপনাকে বোঝাতে পারবো না।

অনেকখানি কম্পাউণ্ড। প্রায় কুড়ি বিঘে জমি। তার মধ্যে অমন দু'শ অফিসারের কোয়ার্টার। কোথাও কারো বাড়িতে পিআনো বাজছে, কোথাও রেডিও। কোথাও চপ্‌কাটলেট্ রান্নার গন্ধ আসছে। এ যেন কলকাতা নয়। অফিসারদের থাকবার জন্যে গভর্মেণ্ট সব রকম সুখ-সুবিধে করে দিয়েছে। ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের সব কিছু লিগেসি পুরোদমে ভোগ করছে ইন্ডিয়ান অফিসাররা। তাদের শান্তি চাই, সুখ চাই। তা না হলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলবে না। গভর্মেণ্ট অচল হয়ে যাবে। এ-পাড়ায় চোর-জোচ্চোরের ভয় নেই। সদর গেটে গুর্খা দারোয়ান পোষা আছে। তাদের হাতে বন্দুক রাইফেল গুলী বারুদ আছে। সামনের ভার্নিস করা দরজাটা সামান্য ভেজানো ছিল। মাথার ওপর একটা গোল শেডের ভেতর লাইট জ্বলছে। আমি নিঃশব্দে মার্বেল-ফ্লোরের ওপর পা বাড়ালাম। বার্নিশ করা দরজা-জানালা। সব তক্-তক্ করছে, ঝক্-ঝক্ করছে। আমি জানতুম সাহেবদের চাকর-বাকররা থাকে আউট-হাউসে। যদি ভেতরে কেউ থাকে তো বড় জোর একজন কি দুজন। হয়ত মজুমদার সাহেব এখন বাড়ি নেই। ক্লাবে গেছে। ক্লাবেই সাধারণত যায় সাহেব। সেখানে মদ আছে, মেয়েমানুষ আছে, জুয়া আছে—আরো যা-কিছু সাহেবদের দরকার হতে পারে সবই আছে।

আমি চুপি-চুপি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে দোতলায় উঠলুম। কাউকে দেখতে পেলাম না সেখানে। একটা মেহগনি কাঠের আলনা, আয়না ফিট করা। হলঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলাম। সেই অফিসের টেবিল-চেয়ার, গভর্মেণ্টের পয়সায় কেনা ঘড়ি। অফিসের নাম করে কনট্রাক্টার-এর কাছ থেকে অর্ডার দেওয়া জিনিস। সে-ঘরেও টিম্-টিম্ করে আলো জ্বলছে। আমি পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। মনে হলো সেইটেই যেন বেডরুম। যত রাত্রেই হোক সাহেব শুতে আসবেই। হয়ত রাত একটা কি দুটোর সময়। কিম্বা হয়ত শেষ রাত্রের দিকে। যত রাত্রেই হোক আমি বসে থাকবো। সারা রাত আমার শান্তি নেই। সাহেবের লাইফ না নিয়ে আমি আজ যাবো না। আমার ছেলের লাইফ যে নিয়েছে, তার লাইফ আমি নেবোই।

পাটিল সাহেব বললেন—আপনি আমার

লাস্ট ছবিটা দেখেছেন? 'বিগড় গয়া ইন্‌সান'?

বললাম—না—

—সেই ছবিতে একটা আইডেনটিক্যাল সট্‌ নিয়েছি আমি, সেম্‌ বেডরুম, সেম্‌ টাইপ অফ্‌ ফার্নিচার। লোকে দেখে বলেছিল—এটা রিয়্যালিস্টিক হয়নি, আমি মনে-মনে হেসেছিলুম শুধু—!

—তারপর?

পাটিল সাহেব আর-একবার গ্লাসে চুমুক দিলেন। প্যারেলের আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে তখন। বাইরের ওমনিবাসের শব্দ কমে এসেছে। মাথার ওপর পাখা-দুটো বন্‌ বন্‌ করে ঘুরছে।

—তারপর আমি সেই বেডরুমের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। ফ্লোরের ওপর পার্শিয়ান গালচে পাতা। মধ্যেখানে একটা খাট। আরো কী কী সব ছিল অত দেখবার সময় ছিল না তখন। আমার বুক তখন ধুক-ধুক করছে। আমি গিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে পড়লুম। চারদিক নিঃসাড়। নিজের হার্টবিটটাও যেন শুনতে পাচ্ছি আমি জানি না সে-রকম অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন জেলখানার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। আমার যেন ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। এখন আমার সাত-খুন মাফ। আমি যা-খুশী করতে পারি। কলকাতার সহরের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আমি যেন গভর্নরকে গালা-গালিও দিতে পারি। আমি কাকে পরোয়া করি? কত শাস্তি আমাকে দেবে দাও তোমরা। আমাকে ছুটি দিলে না, আমার ছেলেকে তোমরা খুন করলে, এবার আমি তৈরি, আমাকেও খুন করো।

হঠাৎ বাইরে যেন কাদের গলার আওয়াজ পেলাম।

আরো আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম আমি। হয়ত সাহেব আজকে সকাল-সকালই ফিরে এল। হয়ত এই ঘরে এসেই ঢুকবে। হয়ত এখানে এসেই শোবে এবার!

হঠাৎ বাইরে যেন কাদের গলার আওয়াজ পেলাম।

আরো আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম আমি। হয়ত সাহেব আজ সকাল-সকালই ফিরে এল। হয়ত এখানে এসেই শোবে এবার।

—তোমার সাহেব কোথায়?

—আজ্ঞে, সাহেব তো নেই?

লোকটা যেন বড় হতাশ হলো। বললে—সায়েব কখন আসবে?

—তার কোন ঠিক নেই হুজুর। রাত্তিরে একটা হতে পারে, দুটোও হতে পারে—

—কোথায় থাকে সাহেব?

—কেলাবে যান। অফিস থেকে আর ফেরেন না সাহেব, সোজা কেলাবে চলে যান—

—ক্লাব কোথায়?

—কলকাতায়। সেখানে দেখা করবেন না হুজুর সাহেব গোসা করেন খুব। আপনার কিসের দরকার?

লোকটা বললে—তোমার সাহেব আমার ছেলে—

চাপরাশিটা যেন একটু শশব্যস্ত হয়ে উঠলো। সেটা আন্দাজ করতে পারলুম গলার আওয়াজে। মজুমদার সাহেবের বাবাকে বোধহয় কখনও দেখেনি চাপরাশিটা। চাপরাশিটা বললে—আপনি এই বসুন হুজুর, এখানে খাওয়া-দাওয়া করুন, কাল যাবেন—

ভদ্রলোক বললেন—তুমি যে আমাকে থাকতে বলছো তুমি চেনো তোমার সাহেবকে?

চাপরাশিটা কথাটার মানে বুঝতে পারলে না।

ভদ্রলোকের গলা আবার শোনা গেল—দেখ বাপু, আমি তোমার সাহেবের বাড়িতে থাকতে আসিনি, খেতেও আসিনি। তুমি কতদিনের লোক? ক'বছরের চাকরি তোমার?

—আজ্ঞে দশ বছর কাজ করছি সাহেবের বাড়িতে!

ভদ্রলোকের গলায় তাচ্ছিল্যের হাসির শব্দ শোনা গেল। বললেন—বাপু, আমি তোমার সাহেবের জন্মদাতা পিতা, আমায় আর তোমার সাহেবকে চিনিও না। তিরিশ টাকা মাইনে পেয়ে সেকালে তোমার সাহেবকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি তা জানো? একবার সাহেবের টাইফয়েড অসুখ হয়েছিল, আমি দু'মাস রাত জেগে ওই ছেলের সেবা করেছি, গু-মুত পরিষ্কার করেছি, অফিসের বড়-সাহেব ছুটি দেয়নি আমাকে, সারা দিন অফিসে কাজ করেছি গাধার মত আর রাত জেগেছি, কেবল ভগবানকে ডেকেছি—হে ভগবান আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও তুমি! আমি কাবলিওলার কাছে চড়া সুদে টাকা ধার করে এই ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলেছি; ভেবেছি বুড়ো বয়েসে সেই ছেলে আমাকে দেখবে—

কথাটা বলে ভদ্রলোক বোধহয় একটু দম নিলেন। আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনতে লাগলাম।

—তা এখন ভাবি সে-ছেলে যদি সেদিন মরে যেত তো আজকে আমার এই ভোগান্তি হতো না।

চাপরাশিটা বোধহয় কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। চুপ করে রইল।

ভদ্রলোক বললেন—আর সাহেবের আপিসে যারা কাজ করে তাদেরও ভোগান্তি হতো না। তোমরা সাহেবের মুখে লাথি মারতে পারো না? সাহেবকে খুন করতে পারো না?

ভদ্রলোক বোধহয় কথা বলতে বলতে একসাইটেড্ হয়ে উঠেছিলেন।

আবার বলতে লাগলেন—আজ গভর্মেণ্ট এই বড় বাড়ি দিয়েছে তোমার সাহেবকে, চাকর-বাকর দিয়েছে, তা তো দেবেই, বাপ-মা'কে যারা খেতে দেয় না, বাপ-মা'কে যারা ভক্তি করে না, শ্রদ্ধা করে না, তাদেরই তো এ রাজ্যে খাতির—তা তোমাদের সায়েবের ভাগ্যি ভালো যে, তার দেখা পেলাম না—

বলে ভদ্রলোক বোধহয় ফিরেই চলে যাচ্ছিলেন। জুতোর আওয়াজে তা বুঝতে পারলুম।

চাপরাশিটা পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলে—সাহেব এলে কী বলবো হুজুর?

ভদ্রলোক চিৎকার করে বললেন—বলবে আপনার বাবা আপনাকে খুন করতে এসেছিল—

বলে ভদ্রলোক সত্যি-সত্যিই চলে যাচ্ছিলেন। তারপর হঠাৎ যেন মত বদলালেন।

বললেন—না, একটা কাগজ দাও দিকিনি, চিঠি লিখেই যাই, বেটারছেলেকে দুটো ছত্তোর লিখে জানাই, জীবনে ভেবেছিলুম ওর মুখ-দর্শন করবো না, তা কত চিঠি লিখেছিলুম একটারও উত্তর দেয়নি, আজও উত্তর চাই না, আজ ওকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবো যে আমি ভগবানের কাছে সারাদিন ওর মৃত্যুকামনা করছি, দাও, একটা কাগজ দাও—লিখেই যাই

চাপরাশিটা দৌড়ে ঘরে ঢুকলো। আমি যে-ঘরে লুকিয়েছিলুম সেই ঘরে। টেবলের ওপর থেকে বোধহয় প্যাড্ নিয়েই আবার বাইরে চলে গেল। কিছুক্ষণ কোনও আওয়াজই শুনতে পেলাম না। মনে হলো ভদ্রলোক যেন চিঠিটা লিখছেন।

—এই নাও, কোথায় রাখবে চিঠিখানা?

—আজ্ঞে, ওঁর টেবিলে রেখে দেব—

—না, বিছানার পাশেই রেখে দিও, হারামজাদাকে অনেক চিঠি লিখেছি, পোস্টকার্ডে লিখেছি, খামে লিখেছি, রেজিস্ট্রি করে চিঠি দিয়েছি, একখানা চিঠিরও জবাব দেয়নি। এ-চিঠিটা বিছানার পাশে রেখে দিও, যেন পড়ে। এর উত্তর দিতে হবে না, উত্তর আমি চাইও না, বুঝলে? তোমরা বোল যে আমি তাকে গালাগালি দিয়েছি হারামজাদা বলে, বোল আমি তার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি, তাকে আমি গলা টিপে খুন করতে এসেছিলুম—

কথাগুলো স্পষ্ট আমার কানে আসছিল। খুব লোভ হচ্ছিল ভদ্রলোককে দেখবার, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবার। খুব লোভ হচ্ছিল গিয়ে বলি—মশাই, আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাবো আমি, আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনিই আপনার ছেলেকে অভিশম্পাত করুন, যেন আপনার ছেলের অপঘাতে মৃত্যু হয়—। কিন্তু আমার কোনও উপায় নেই। আমি সেই অল্প অন্ধকার ঘরের ভেতরে চুপ করে খাটের তলায় শুধু লুকিয়ে রইলুম।

চাপরাশিটা বললে আপনি কিছু ভাববেন না, আমি ঠিক জায়গায় রেখে দেব—

—না, দেখি কোথায় রাখবে তুমি? কোথায় সাহেবের শোবার ঘর? আমি নিজের চোখে দেখবো কোথায় রাখছো তুমি?

চাপরাশিটা বললে আসুন, আমার সঙ্গে ভেতরে আসুন না—

আর একটা বাতি জ্বলে উঠলো। চেয়ে দেখলাম দুজন খালি পায়ে। বুঝলাম দুজন চাপরাশি। আর একজোড়া ডার্বি জুতো। ময়লা কাদা মাখা, তালি দেওয়া জুতো। কাপড়টাও যেটুকু দেখা যাচ্ছিল বেশ মোটা ময়লা।

তিন জোড়া পা-ই কাছের দিকে এল। একেবারে আমার কাছাকাছি। বিছানার কাছে এসেই থেমে গেল পা তিন জোড়া।

একজন চাপরাশি বললে—এই টেবিলের ওপরেই সাহেবের গেলাস থাকে, এখানেই চাপা দিয়ে রেখে দেব—এলেই দেখতে পাবেন—

ভদ্রলোক বললেন—এই ঘরেই শোয় বুঝি হারামজাদা?

—আজ্ঞে হাঁ হুজুর।

ভদ্রলোক বোধহয় চারদিকের আসবাবপত্র মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—এ-সব হারামজাদার নিজের পয়সায় কেনা না গভর্মেণ্টের চুরি করা মাল?

চাপরাশিরা এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না।

—নিজের পয়সা দিয়ে কেনবার ছেলে তো সে নয়। আমার পকেট থেকেই পয়সা চুরি করতো ছোটবেলায়। ছোটবেলা থেকেই বখে গিয়েছিল হারামজাদা। বিড়ি সিগারেট ফুঁকতে শিখেছিল, মদ খেতে শিখেছিল, নিজের ভাগ্নিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, এখন তার মতন লোকের উন্নতি হবে না তো কার হবে? ভগবান থাকলে কি আর এমন হতো? কলিযুগে যে ভগবানেরও ক্ষমতা থাকে না—

বলতে বলতে ভদ্রলোক ছেলের ঐশ্বর্য্য দেখে যেন ক্ষেপে উঠলেন। বলতে লাগলেন—কিন্তু এ থাকবে না, আমি তোমাদের এই বলে রাখলুম, এ-সব কিছু থাকবে না, এত অধর্ম সয় না, যে বাপ-মাকে ঘেন্না করে, যে বিড়ি সিগ্রেট ফোঁকে,

যে মদ গেলে, যে নিজের ভাগ্নিকে ভাগিয়ে নিয়ে যায়, তার কখনও ভাল হতে পারে না! যে নিজের বাপের মুখ পুড়িয়েছে, সে দেশের মুখ পোড়াবেই পোড়াবে—এই তোমাদের বলে রাখলুম—আমার অভিশম্পাত মিথ্যে হবে না এই তোমরা জেনে রেখো—

বলে ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। দেখলাম ডার্বি জুতো জোড়া মুখ ঘোরালো। তারপর দরজা দিয়ে সোজা বাইরে বেরিয়ে গেল। খালি দু'জোড়া পাও পেছন-পেছন বাইরে চলে গেল। যাবার সময় বড় আলোটা নিবিয়ে দিয়ে গেল ঘরের।

আমি যেন নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলুম। আমার নিজের ছেলের মুখটা মনে পড়লো। আজই নিজের হাতে গিয়ে পুড়িয়ে এসেছি। চোখের সামনে তার মুখটা ভেসে উঠলো। যদি সে বেঁচে থাকতো! বেঁচে থেকে যদি মজুমদার সাহেবের মত হতো!

কী করবো বুঝতে পারলুম না। কতক্ষণ এ-ভাবে থাকতে হবে তাও বুঝতে পারলুম না। রাত ক'টা বেজেছে তাও বুঝতে পারছি না। কোনও দিকে কোথাও কোনও শব্দ নেই। এখানে এই ঘরে থাকলে যেন দুনিয়াকে ভুলে যেতে হয়। সাহেবের এই ঘর আর আমার শেয়ালদার সেই ভাড়াটে বাড়ি!

হঠাৎ কী খেয়াল হলো। মনে হলো চিঠিটাতে কী লিখেছে দেখি না! যদি বুঝতে পারি। আমি বাঙলা স্কুলে পড়েছি, বাঙলা বলতে পারি, বাঙলা পড়তে পারি, লিখতেও পারি। ভয় করছিল, তবু আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিতে চেষ্টা করলাম। ছোট প্যাডের ওপর বড় বড় অক্ষরে বাঙলা লেখা চিঠি। সেই ঝাপ্সা ঝাপ্সা আলোয় চিঠিটা পড়তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না, কিছুই বুঝতে পারলাম না। আরো মন দিয়ে বানান করে করে পড়বার চেষ্টা করতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো। আমি তাড়াতাড়ি যেখানকার চিঠি সেখানে রেখে দিয়ে খাটের তলায় গিয়ে লুকিয়ে পড়লাম।

দৌড়তে দৌড়তে দু'জোড়া পা ঘরের ভেতর ঢুকলো। আলো জ্বলে উঠলো।

—হ্যালো!

—আমি গোবিন্দ হুজুর! ঠিক আছে হুজুর! না হুজুর! যে আজ্ঞে হুজুর—

কী সব কথা হলো বুঝতে পারলাম না। শুধু বুঝলাম ক্লাব থেকে সাহেব টেলিফোন করছে!

—শুধু একজন এসেছিলেন হুজুর! আপনার বাবা হুজুর।

—না হুজুর, বসতে বলিনি হুজুর, তিনি বসতে চাইছিলেন হুজুর, আমি জানি হুজুর, আমি তাড়িয়ে দিয়েছি হুজুর, ভেতরে ঢুকতেই দিইনি হুজুর। না হুজুর, না হুজুর—ভেতরে ঢুকতেই দিইনি তাকে, একটা চিঠি দিয়েছিল আপনাকে দেবার জন্যে হুজুর, না হুজুর, সে-চিঠি আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি হুজুর—ঠিক আছে হুজুর! আমি বুঝতে পেরেছি হুজুর—রাত্তিরে ডিনার রাখবো না হুজুর, সকালে ব্রেক-ফাস্ট তৈরি থাকবে হুজুর, হ্যাঁ হুজুর, আন্ডা আর টোস্ট-রুটি—হ্যাঁ হুজুর, সেলাম হুজুর—

বলে চাপরাশিটা টেলিফোন-রিসিভারটা রেখে দিলে।

পাশের চাপরাশিটা বললে—সাহেব বুঝি? কী বলছিল রে গোবিন্দ?
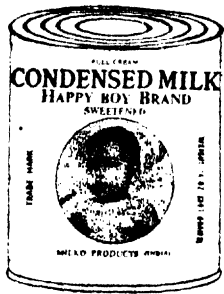
গোবিন্দ বললে—শালা হারামজাদা আজ আসবে না রে বাড়িতে, শালা সেই মেয়ে-মানুষটাকে নিয়ে আজকে বোধ হয় রাত কাবার করবে!

—কোন্ মেয়েটা রে?

—সেই যে নতুন মেয়েটাকে আপিসে তিনশো টাকার চাকরি দিয়েছে, টাইপ্-মেয়ে—! শালা একটা করে মেয়ের চাকরি দেবে আর তার সর্ব্বোনাশ করবে, শালা বেশ আছে মাইরি, মোটা মাইনে পাবে আবার ফুর্তিও করবে—কপাল করে এসেছে বটে এরা—

তারপর একটু থেমে গোবিন্দ বললে—যা তো কেষ্ট, বাবুর্চিকে বলে আয় শালা

আজকে ডিনার খাবে না, শালার ফিশ্-ফ্রাই কপালে নেই,—আমাদের কপালে ঝুলেছে—

কেষ্ট হেসে উঠলো। বললে—সে শালা এখন অন্য মাল খাচ্ছে, ফিশ-ফ্রাই খেতে তার বয়ে গেছে—তুইও যেমন।

আবার আলো নিভে গেল। তারপর কেষ্ট আর গোবিন্দ কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি হতবাক হয়ে সেখানেই পড়ে রইলুম। এ কাকে খুন করতে এসেছি আমি! এ কোন্ মানুষ? পৃথিবীর কোনও মানুষের শ্রদ্ধা-ভক্তি ভালবাসা স্নেহ মায়া মমতা যে পেলে না, সে যে বেঁচে আছে এখনও এইটেই তো এক বিড়ম্বনা। এর বেঁচে থাকাও বিড়ম্বনা, এর মরে যাওয়াটাও যে বিড়ম্বনা! আমি সেই সেদিন সেই খাটের তলায় শুয়ে হঠাৎ যেন দার্শনিক হয়ে উঠলুম। দু'মাস রাত জাগা, অফিসের খাটুনি, সমস্ত সন্ধ্যেটা শ্মশানে কাটানো, সমস্ত ঘটনা যেন আমার কাছে আর একটা নতুন মানে নিয়ে সামনে হাজির হলো। বাপের অভিশাপ কুড়িয়ে যে বড় হয়েছে, আত্মীয়-পরিজনের ঘৃণার পাত্র হয়ে যে বেঁচে আছে, অফিসের সাব-অর্ডিনেটদের গালাগালি কুড়িয়ে কুড়িয়ে যার পকেট ভর্তি হয়ে গেছে, সে তো কৃপার পাত্র! তাকে আমি খুন করতে এসেছি? সে তো খুন হয়েই আছে?

ক'টা বাজলো হুঁশ্ ছিল না। চারিদিকে সব নিস্তব্ধ নিঝুম। আমি আস্তে আস্তে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এলুম। বেরিয়ে এসে ছোট টেবিলটার ওপর থেকে সেই চিঠিটা আবার তুলে নিলুম। চিঠিটা পড়তে চেষ্টা করলুম সেই ঝাপ্সা অন্ধকারেই। বড় বড় অক্ষর হলেও কিছু পড়তে পারলুম না। শুধু শেষের লাইন ক'টা অনেক কষ্টে পড়লুম—

......তোমার মা স্বর্গে গিয়ে বেঁচেছেন। যাবার সময় বলে গেছেন তাঁর ছেলে যেন অশৌচ পালন না করে। তোমার মত ছেলেকে গর্ভে ধারণ করেছেন বলে তাঁর বড় ক্ষোভ ছিল। তুমি গভর্মেন্টের বড় চাকরি করো বলে ধরাকে সরা বলে মনে কোর না। ভগবান যদি কোথাও থাকেন তো তিনি একদিন নিশ্চয়ই এর শাস্তি-বিধান করবেন। এই খবরটা দিতেই তোমার কাছে এসেছিলাম। আমার পরম সৌভাগ্য যে, তোমার মুখ-দর্শন করতে হলো না। বেঁচে থাকতে যেন কখনও তোমার মুখ দেখতে না হয়—তুমি আমার বংশের কলঙ্ক,......

—তারপর?

পাটিল সাহেব আবার গ্লাসে চুমুক দিলেন। বললেন—অথচ দেখুন, কী আশ্চর্য, বরাবর দেখে এসেছি জীবনে এরা স্নেহ-ভালবাসা না পাক্, কেমন করে কী জানি ইন্ডিয়া গভর্মেন্টের বড় বড় চাকরিটা এরা পায়। এদেরই প্রমোশন হয়, এরাই আবার ইন্ডিয়ার ফাইভ্-ইয়ার-প্ল্যানের বড়াই করে। এরাই ইন্ডিয়ার বাইরে ফ্রান্সে জার্মানীতে আমেরিকাতে ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করে। বিদেশের লোকেরা ভাবে এরাই হয়ত খাঁটি ইন্ডিয়ান। এদের দেখেই সমস্ত ইন্ডিয়ানদের চোর-জোচ্চোর-মিথ্যেবাদী ভাবে!

আমি বললাম—কিন্তু তারপর কী হলো? আপনি সেই রাতে সেই ঘরের মধ্যেই কাটালেন?

পাটিল সাহেব বললেন—না, আমার ঘেন্না হলো, আমার লজ্জা হলো—মনে হলো এর চেয়ে ইঁদুর-বেড়াল মারাও বেশি সাহসের কাজ! আমি আর সে অফিসে চাকরি করিনি। আমি তার পরদিন থেকে আর অফিসেও যাইনি। আমি আমার ওয়াইফকে নিয়ে বোম্বাই চলে এলুম—

—আপনাকে কেউ ধরলে না, বেরোবার সময়?

পাটিল সাহেব বললেন—সে রাতে সাহেব ফিরবে না, তাই সকলেই ছিলো দিয়েছিল, আউট-হাউসে যে-যার ঘরে গিয়ে ঘুমোচ্ছিল, আমি নিঃশব্দে পালিয়ে এসে-ছিলুম, কেউ জানতেই পারে নি।

—তারপর?

প্যারেল তখন আরো নিঝুম হয়ে এসেছে। পাটিল সাহেবের গাড়ি নিয়ে ফিরে এল ড্রাইভার।

বললাম—শেষটা শুনি, শেষটা শুনে যাই, তারপর?

—তারপর আর কি? আমি একদিন অ্যাসিস্টেন্ট হয়ে এই স্টুডিওতে ঢুকলুম, তারপর দু-একখানা ছবি করার পরেই এক-দিন এক ফাইনান্সিয়ারের সুনজরে পড়ে গেলুম। আর কপাল ভাল ছিল, আমার প্রথম ছবিখানাই হিট্ হয়ে গেল! আমি এ-ক্লাস ডাইরেক্টর হয়ে গেলুম তিন বছরের মধ্যেই—

—কিন্তু সেই মজুমদার-সাহেব? আর কখনও দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে?

পাটিল সাহেব বললেন—দেখা হয়েছিল—

—সাহেবের চাকরি তখন আছে?

পাটিল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—কী-হতে পারে কল্পনা করুন তো আপনি?

বললাম—চাকরি আছে না গেছে?

পাটিল সাহেব হাসতে লাগলেন। বললেন—এ-বছরে ফিল্ম-ফেস্টিভ্যালে হয়ে-ছিল দিল্লীতে, আমার ছবির শো হচ্ছে, ছবি দেখানোর পর হঠাৎ দেখি হল্ থেকে বেরিয়ে আসছে সেই মজুমদার সাহেব। তখন আমায় আর চিনতে পারলে না। বড় বড় বড় অ্যামবাসাডার আছে ফরেন-কান্ট্রির, তাদের সঙ্গে হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে বেরোচ্ছে। চেহারা আরো ভালো হয়েছে। সবাই আমাকে এসে কন্‌গ্রাচুলেট্ করলে। মজুমদার-সাহেবও হাত বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে—কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্! আমিও যেন চিনতে পারলুম না, বললুম—থ্যাংকউ! তারপর শুনলুম মজুমদার-সাহেব নাকি আরো বড় চাকরি পেয়েছে সেক্রেটারিয়েটে। আরো বড় পোস্ট, আরো বেশি মাইনে। আরো শুনলুম ইন্ডিয়ার অ্যাম্বাসাডার হয়ে খুব শিগ্‌গিরই নাকি বাইরে যাচ্ছে, হয় আমেরিকা, নয় ফ্রান্স, নয় জার্মানী, নয় ইন্দোনেশিয়া, নয় অন্য কোথাও। জায়গার তো অভাব নেই। বার্মা, চায়না, পেরু, চিলি থাইল্যান্ড কত জায়গা আছে, কত অ্যাম্বাসাডার কত জায়গায় আছে। ভালো-ভালো লোক ইন্ডিয়ার বাইরে না-পাঠালে ইন্ডিয়ার প্রেস্টিজ্ থাকবে কেন? আমি তখন সেই মজুমদার-সাহেবের দিকে চেয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম—একদিন এই ইন্ডিয়াই রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অ্যামবাসাডার করে বাইরে পাঠিয়েছিল, আর আজ আবার সেই ইন্ডিয়াই অ্যামবাসাডার করে পাঠাচ্ছে মজুমদার-সাহেবকে! ভাবছিলাম—গড্ বোধ হয় নিশ্চয়ই নেই, নইলে বাবা, মা, আত্মীয়স্বজন, বড়বাবু, ক্লার্ক, চাকর-খানসামা-বাবুর্চি, কারোর অভিশাপই বা ফলে না কেন? চেয়ে দেখলাম, আমার চোখের সামনেই মজুমদার-সাহেব একজন মেমসাহেবের হাতখানা বগলে পুরে একটা বিরাট বিলিতি এয়ার-কন্‌ডিশনড্ গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

হলদে চিঠি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে নিছক অভ্যাসেই লেটার-বক্সটা খুলল অনিন্দ্য। একটি লম্বা ধরনের হলদে লেফাফা—ওপরে অন ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট সার্ভিস। এবং চিঠিখানা তারই নামে।

না খুলেও অনিন্দ্য জানে কী লেখা আছে চিঠিতে। সেই ইণ্টারভিউয়ের প্রহসন। বাঁধা প্রশ্নোত্তর। কখনো বা একপাতা ডিক্টেশন লেখা। 'অল্ রাইট—ইয়্ মে গো।'

সেই যাওয়াই অগস্ত্যযাত্রা—অর্থাৎ সে-পথে ফেরবার দরকার পড়ে না। আজ চার বছরের মধ্যেও পড়েনি।

চিঠিটা না খুললেও চলে, পাশের ডাস্ট-বিনটি উপচে পড়ছে, এই মূল্যবান বস্তুটিকে নিশ্চিন্তেই সেখানে জমা করে দেওয়া যেতে পারে। তবু অভ্যাসেই খুলতে হল একবার এবং—

তারপরেই মেঘহীন আকাশ থেকে এক আকস্মিক বজ্রাঘাত !

চিঠির বয়ান-বাদ করলে যা দাঁড়ায়, তা সংক্ষেপে এই রকম:
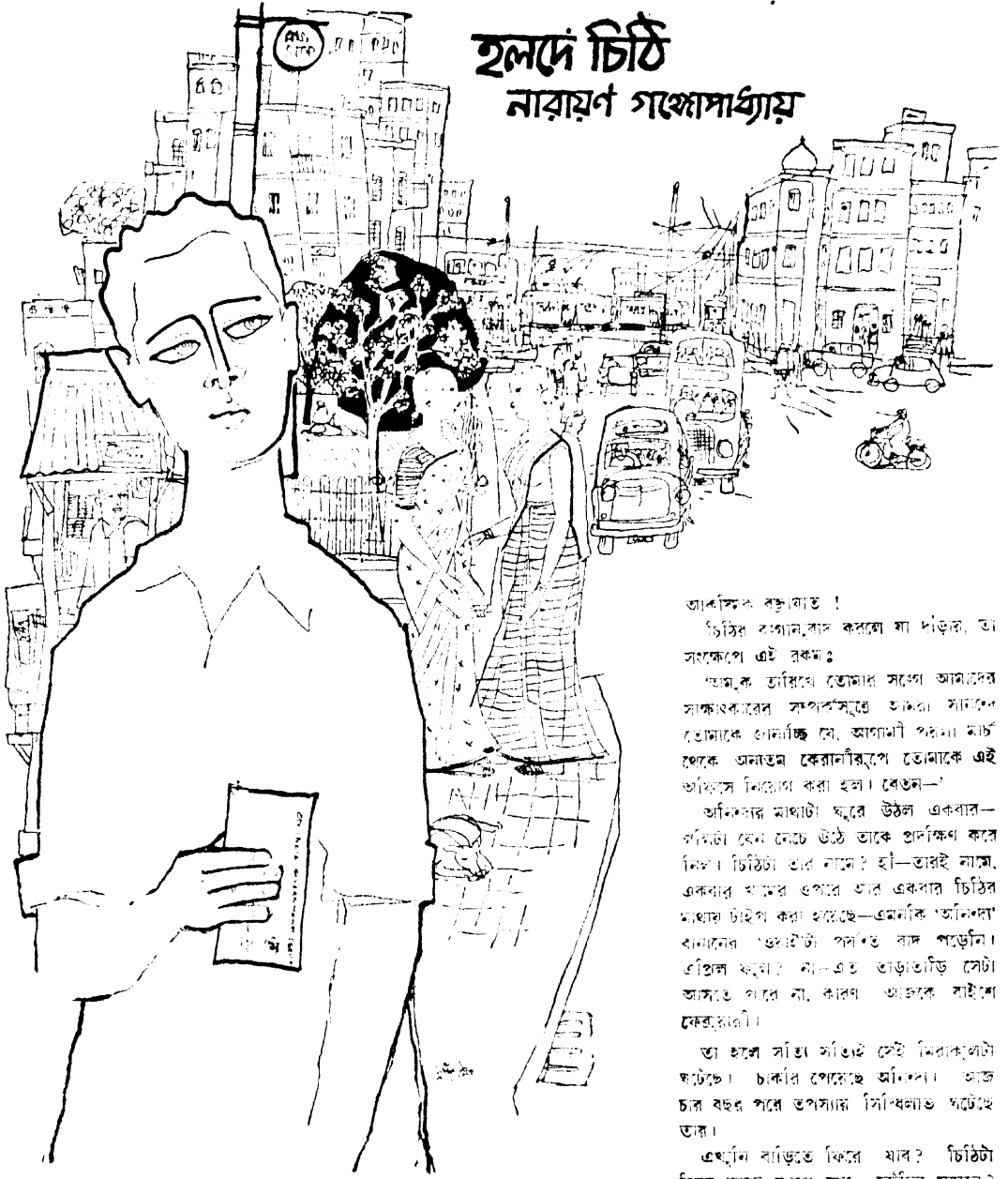
'অমুক তারিখে তোমার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের সম্পর্কসূত্রে আমরা সানন্দে তোমাকে জানাচ্ছি যে, আগামী পয়লা মার্চ থেকে অন্যতম কেরানীরূপে তোমাকে এই অফিসে নিয়োগ করা হল। বেতন—'

অনিন্দ্যর মাথাটা ঘুরে উঠল একবার—গলিটা যেন নেচে উঠে তাকে প্রদক্ষিণ করে নিল। চিঠিটা তার নামে? হাঁ—তারই নামে, একবার খামের ওপরে আর একবার চিঠির মাথায় টাইপ করা হয়েছে—এমনকি 'অনিন্দ্য' বানানের 'ওয়াই'টা পর্যন্ত বাদ পড়েনি। এপ্রিল ফুল? না—এত তাড়াতাড়ি সেটা আসতে পারে না, কারণ আজকে বাইশে ফেব্রুয়ারী।

তা হলে সত্যি সত্যিই সেই মিরাকলটা ঘটেছে। চাকরি পেয়েছে অনিন্দ্য। আজ চার বছর পরে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ঘটেছে তার।

এখুনি বাড়িতে ফিরে যাব? চিঠিটা গিয়ে ছুড়ে ফেলে দেব বৌদির সামনে? বলব, 'আর তোমায় বাঁকা বাঁকা কথা শোনাতে হবে না, এবার থেকে নিজের পেটের ভাবনা নিজেই ভাবব আমি?'

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি নয়। আগে ধাতস্থ হওয়া যাক একটুখানি।

গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার ওপরেই ফায়ার-ব্রিগেডের যে লাল রঙের বাক্সটা রয়েছে, সেইখানেই হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অনিন্দ্য। চিঠিটা একবার পড়ল, দু বার পড়ল, তিনবার পড়ল। চিঠির তলায়

কালি দিয়ে যে দুর্বোধ্য স্বাক্ষরটা রয়েছে, সেটা বুঝতে চেষ্টা করল : এ কে রায়—না এস কে রাহা—কিংবা এস কে বোস? ডাক্তার আর বড় অফিসারদের সই কখনো পড়া যায় না—ওটা ওঁদের বিশিষ্টতার চিহ্ন।

সামনে দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রামের একটা প্রথম সংস্করণ ঘোড়ার মতো লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল। ওই ট্রামটার দিকে তাকিয়ে সেই লোকাল ট্রেনটার কথা মনে পড়ল তার—যেটায় করে এই চাকরিটার জন্যে সে খড়্গপুরে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল।

সেই বেঞ্চিপাতা লম্বা বারান্দায় তিনটি চাকরির জন্যে ষাটটি লোকের ভিড়। অনেক ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়ে দার্শনিক হয়ে-যাওয়া অনিন্দ্য ভিড় থেকে সরে দাঁড়িয়ে দোতলার রেলিংয়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। আদালতের পেয়াদার মতো গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে একের পর এক নাম ডাকছে বেয়ারা, আধ মাইল দূরে পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে—নিতান্তই কাঠকালা না হলে অনিন্দ্যর পালাও ফসকাবার জো নেই। তা ছাড়া বেঞ্চিগুলোতে বসে কিংবা দেওয়ালে হেলান দিয়ে যারা চুন আর পায়রার গন্ধ শুঁকছিল, তাদেরও চেঁচিয়ে কথা বলবার মতো কারো উৎসাহ ছিল না। সবাই প্রতীক্ষা করছিল, সকলের মুখেই একটা শ্রান্ত গাম্ভীর্য থমথম করছিল, কেউ কেউ বার বার কপালের ঘাম মুছে ফেলছিল। অভিজ্ঞ অনিন্দ্য দেখেই বুঝতে পারছিল কার প্রথম ইন্টারভিউ—কে তার মতো অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছে।

সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অনিন্দ্য তাকিয়েছিল বাইরে। ট্রেনের আসা-যাওয়ার আওয়াজে থেকে থেকে গম গম করছে স্টেশন, সাইডিঙের ধোঁয়ায় কালো হয়ে আছে আকাশ, নানা সুরে এঞ্জিনের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ আসছে। একটু দূরে লন আর বাগান নিয়ে অফিসারদের কোয়ার্টার্স—তাদেরই সামনে দুটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কালো পেরাম্বুলেটারে যেন একটা সাদা মোমের পুতুল ঠেলে নিয়ে চলেছে। এক জোড়া ফলন্ত রাধাচূড়ো গাছে গায়ে হলুদের রঙ—এক জায়গায় ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে গোটা তিনেক গোরুর নিশ্চিন্ত জাবর-কাটা, আরো দূরে কালো ফিতের মতো পথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ঝকঝকে নীল রঙের একখানা মোটরগাড়ী।

অনেক ইন্টারভিউ দিয়েছে অনিন্দ্য, কলকাতার এয়ার-কনডিশনড অফিসে, কোথাও অন্ধকার ঘুপচি ঘরে, কোথাও বা দুপুরের রোদে গনগন করে জ্বলতে থাকা টিনের ছাউনির তলায়। কিন্তু চাকরি না পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—অথবা ইন্টারভিউ দিয়ে বেরিয়ে আসামাত্রই—সেই সব ঘর, তাদের পরিবেশ—কোনো গভীর পুরোনো ইঁদারার কালো জলের ভেতর একটা শুকনো পাতা ঝরে পড়বার মতো মিলিয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিকে ধারালো আর উগ্র করে তাদের কখনো খুঁজতে যায়নি অনিন্দ্য। কিন্তু ইঁদারার সেই কষকালির মতো জলের ভেতর থেকে আজ খড়্গপুরের সেই দিনটা হঠাৎ তার সবটুকু নিয়ে উড়ে এল, শুকনো পাতা নয়—প্রজাপতি হয়ে ডানা মেলল তার চোখের সামনে।

কিছুক্ষণ মগ্ন হয়ে অনিন্দ্য ফায়ার-ব্রিগেডের লাল বাক্সটার গায়ে তেমনি ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই ষাটজন মানুষের তখনকার বর্ণহীন ভিড়ের মধ্য থেকে আরো দুটো মুখকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতে লাগল সে। তিনটে পোস্টে আর দুজন কে কে এল? সেই যে অল্প টাকপড়া ভদ্রলোক একমনে ডুবে বসেছিলেন খবরের কাগজের পাতায়? সেই সোনার চশমা আর পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবি পরা ছেলেটি—যাকে দেখে অনিন্দ্য ভেবেছিল—চাকরির ইন্টারভিউ না দিয়ে এ কেন ফিল্মস্টার হতে চেষ্টা করে না? কিংবা লম্বা-চওড়া স্পোর্টসম্যান চেহারার ছোকরা—যে ট্রাউজারের দু পকেটে হাত পুরে আর ভারী জুতোর মচমচানি তুলে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল করিডোরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত?

ভেবে লাভ নেই—সাতদিন পরেই চক্ষু আর কানের বিবাদ মিটে যাবে।

ফুটপাথে একটা ফিরিওলা কতগুলো কাগজের সাপ নিয়ে চলেছিল, তাদেরই একটা খড়মড়িয়ে পায়ের শব্দে এগিয়ে আসতে অনিন্দ্যর চমক ভাঙল। এ ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো মানে হয় না, যেখানে রওনা হয়েছিল, সেদিকেই যাওয়া যাক।

পকেটে হাত দিয়ে দেখল, বিড়ি ফুরিয়ে গেছে। এগিয়ে গেল সামনের দোকানটার দিকে।

'ছয় নয়া পয়সার বিড়ি'—বলতে গিয়েও সামলে নিলে সে। আজকে একটা বিশেষ দিন—বি-এ পাশ করবার খবরটা যেদিন প্রথম পেয়েছিল—সে এর কাছে কিছুই নয়। আর বি-এ পাশ করবার আনন্দ তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিকে হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল এতদিন ছাত্র থেকে তার কোনো ভাবনা ছিল না, কোথাও কোনো দায় ছিল না। এইবারে তাকে নিজের ওপর দাঁড়াতে হবে, চাকরি করতে হবে—দাদার ঘাড়ে বসে থাকা আর চলবে না।

রাতে খেতে বসে দাদাই তুলেছিল কথাটা।

'কী করবি এবার?'

'যদি এম-এটা পড়া যায়—'

ভুরু কুঁচকে দাদা বলেছিল, 'পাস কোর্সে বেরিয়ে সাঁট পাবি পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে?'

'পোলিটিকাল সায়েন্সে কিংবা এনশেণ্ট হিস্ট্রিতে'—

'হয়েছে, আর দরকার নেই। একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা দ্যাখো তার চাইতে।'

তারপরে চার বছর কেটেছে। একবার একটা টেম্পোরারি কাজ জুটেছিল, ছ মাসের, কিছুদিন স্কুল মাস্টারিও মিলেছিল। বাকী সময়টা খুচরো-খাচরা টিউশন, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে রিনিউ করানো আর দরখাস্তের পর দরখাস্ত। এতদিনে প্রতীক্ষার অবসান, অবশ্য শেষ পর্যন্ত যদি পাকা হয় চাকরিটা।

পানওলা অনিন্দ্যের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে।

'কী চাইলেন বাবু?'

পকেটে হাত দিয়ে দেখল তিন টাকার মতো আছে। আজকে এক প্যাকেট দামি সিগারেট খাওয়ার বিলাসিতা চিন্তা করা যেতে পারে।

'গোল্ড ফ্লেক দাও এক বাক্স।'

নোটটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে পানওলা বললে, 'আউর পাঁচ পয়সা।'

'কেন, এক টাকা করেই তো দাম।'

'ওতো ঠিক হ্যায়। লেকিন্ মিলতা নেই, দাম বাড় গিয়া—' পানওলা হাসল।

ব্ল্যাক মার্কেট। মনটা বিষিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে—যে ঘোরটা লেগেছিল, সেটা তরল হয়ে এল।

গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেটটা ঠকাং করে ফেলে দিয়ে বললে, 'নাম্বার টেন।'

'কেয়া?' —পানওলা যেন বিশ্বাস করতে পারল না। একবারে এতখানি পশ্চাদপসরণ তার কানে অদ্ভুত ঠেকল।

'নাম্বার টেন।'

পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই একটা সিগারেট শেষ করল, ট্রাম বাসের আনাগোনা দেখল কিছুক্ষণ, বাস স্টপের সামনে দুটি কলেজের ছাত্রী হাসিতে উছলে পড়ছিল—বেশ লাগল অনিন্দ্যর। দেখল, রাস্তার ওপারের গাছটা বকুল, অনেক ফুল ধরেছে তাতে—ঝরেও যাচ্ছে বৃষ্টির গুঁড়োর মতো। এতদিন ধরে এই পথ দিয়ে কতবার এসেছে গেছে, অথচ বকুল গাছটাকে সে লক্ষ্যই করেনি!

তারপর সিগারেটটা শেষ হল, আঙুলে গরমের ছোঁয়া লাগল, তখন অনিন্দ্য সামনের ট্রামটাতে উঠে পড়ল।

সাড়ে ন'টা বাজেনি, এর মধ্যেই অফিসের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। অনিন্দ্য বসতে গেল না, একটা হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রইল পেছনের দিকটায়। আর ক'দিন পরে তাকেও হয়তো সাড়ে ন'টায় অফিসে যেতে হবে। কিন্তু কলকাতার বাসে ট্রামে নয়—সে চাকরী করবে খড়্গপুরে, তাকে প্রাণ হাতে করে ঝুলতে হবে না এদের মতো। কলকাতায় চাকরি না পেয়ে একদিক থেকে ভালোই হয়েছে অনিন্দ্যর, পরমায়ু কিছুদিন বেড়েই যাবে। উঃ—এমনি ভিড়ে, এমনি অমানুষিক অ্যাক্রোব্যাটিক করে দশটা পাঁচটা জার্নি করা যায় প্রত্যেক দিন?

পরের স্টপে ফোলিও ব্যাগ হাতে ঘর্মাক্ত এক ভদ্রলোক উঠে এলেন। বয়েস চল্লিশ

পেরুনো, শরীর একটু মোটার দিকেই। করুণ চোখে একবার সীটগুলোর দিকে তাকালেন, শেষে অনিন্দ্যর পাশেই রড ধরে দাঁড়িয়ে গেলেন। বড় বড় ক্লান্ত নিঃশ্বাস পড়ছে—অনেকটা দৌড়ে এসেই ট্রাম ধরেছেন মনে হল।

অনিন্দ্যর চিন্তাটাই যেন বেরিয়ে এল তাঁর মুখ থেকে।

'সাত সকালে বেরিয়েও ট্রামে বসতে পাইনে মশাই—ওঃ। কী যে হয়েছে কলকাতার!'

এতদিন এ-সব আলোচনায় অনিন্দ্যর কোনো অংশ ছিল না। এই মানুষগুলোর দোলায়মান অবস্থা দেখে দূর থেকে হিংসে হয়েছে, কখনো কখনো কোনো-কোনোদিন ডালহাউসি স্কোয়ার-ফেরত ট্রামে বাসে বিকেলে এদের দোলায়মান অবস্থা দেখে অনুকম্পায় মন ভরে গেছে তার। আজকে এই ভদ্রলোককে—ট্রামের এই অফিস যাত্রী প্রতিটি মানুষকে, আপনার জন বলে বোধ হল যেন। তৎক্ষণাৎ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল সে

'আমরা যারা কলকাতার বাইরে চাকরি করি—' অনিন্দ্য হাসল : 'বেশ আছি আমরা। আপনাদের মতো বাদুড় ঝুলতে হয় না।'

ভদ্রলোক মোটা শেলের চশমার ভেতর দিয়ে ঘোলাটে চোখে অনিন্দ্যর দিকে চাইলেন।

'কোথায় কাজ করেন আপনি?'

'খড়্গপুরে। সাউথ ইস্টার্ন রেলে।'—প্রত্যেকটা কথা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করল অনিন্দ্য, আলাদা করে জোর দিলে প্রত্যেকটার ওপর। আজ আর সে বেকার মানুষগুলোর একজন নয়—একটা সরকারী অফিসের দরকারের খাতায় তার নামটা জায়গা করে নিয়েছে এখন।

'অ!'—ভদ্রলোককে বিমর্ষ দেখালো : 'কিছুদিন আগে আমিও বাইরে পোস্টেড ছিলুম মশাই—ঘাটালে। দিব্যি জায়গা, এখনো খাবার-দাবার মেলে—মিষ্টি তো চমৎকার। নদীর ধারে বাড়িটিও পেয়েছিলুম ভালো। কিন্তু কী যে দুর্বুদ্ধি হল, তদ্বির করে চলে এলুম কলকাতায়। কিন্তু আর থাকা যায় না এখানে—নরককুণ্ড হয়ে গেছে একেবারে।'

কথাটা শেষ হবার আগেই সামনের সীট থেকে একজন যাত্রী উঠে পড়লেন, মোটা ভদ্রলোক বিদ্যুৎগতিতে দখল করলেন তার জায়গাটা। অনিন্দ্য একভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। দেখতে লাগল—লোক উঠছে নামছে, একজন নামলে ছ'জন উঠে পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে। অফিস টাইম।

এক বুড়ো ভদ্রলোক ঝিমুচ্ছেন বসে বসে। মাথার ছাটা চুলগুলো ধবধব করছে বকের পাখার মতো, এক হাতে একটা পুরোনো ফাইল ধরা রয়েছে—হাতটা শিরা-বের-করা চামড়া কোঁচকানো। বয়েস কত হতে পারে? পঁয়ষট্টির কম নয়। এত বয়েস পর্যন্ত নিশ্চয় সরকারী চাকরিতে রাখে না—কোনো মার্চেন্ট অফিসেই কি রাখে? এই বুড়ো মানুষ তা হলে কোথায় চলেছেন, কী চাকরি করতে?

একটা চিন্তা চমকে উঠল মনে।

কার মুখে যেন শুনেছিল গল্পটা। রিটায়ার করে এক ভদ্রলোক নাকি ভয়ানক দমে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল পা-ভাঙা রেসের ঘোড়ার মতো দুনিয়ার কাছে একেবারেই অকেজো হয়ে গেছেন তিনি—কেউ আর তাঁকে চায় না, বাড়িতে ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, এমনকি ঝি-চাকরের কাছে পর্যন্ত, কোনো আর সম্মান নেই তাঁর। দিনের পর দিন মেলাংকলিয়ায় ডুবে যেতে লাগলেন—খান না, ঘুমোন না—কারো সঙ্গে কথা বলেন না। শুধু বাড়ির ঘড়িতে টং টং করে দশটা বাজলেই ছটফটিয়ে ওঠেন—যেন মৃত্যু-যন্ত্রণার মতো একটা অসহ্য কষ্ট শুরু হয়ে যায় তাঁর।

ডাক্তার এলেন। সব দেখে শুনে এক অদ্ভুত প্রেসক্রীপশন দিলেন তাঁকে।

রোজ ন'টা বাজলেই দৌড়ে গিয়ে স্নান করবেন, খাবেন, অফিসের জামা-কাপড় পরবেন, ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে চলে যাবেন ডালহাউসি স্কোয়ারে। সেখান থেকে যেখানে খুশি যেতে পারেন—কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেন ইডেন গার্ডেনে। তারপর চারটেতে আবার ট্রাম ধরবেন—তেমনি করে ত্রিশূন্যে দুলতে দুলতে বাড়ি ফিরে আসবেন।

প্রেসক্রীপশনে নাকি কাজ হয়েছে, বেশ আছেন এখন। দৌড়-ঝাঁপ নিয়মিত করে আর দুপুরে ঘণ্টা পাঁচেক পার্কের ছায়ায় নিরুপদ্রবে ঘুমিয়ে শরীর আগের চেয়ে ভালো হয়েছে—মেজাজও নাকি চমৎকার। অভ্যেস একেই বলে।

ঝিমন্ত ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে অনিন্দ্যর মনে হল ইনিই তিনি নন তো? অথবা তাঁরই দলের আর কেউ? ফলো করে দেখলে মন্দ হয় না। অফিসেই যান, না ইডেন গার্ডেনের ঝিলের পাশে শুয়ে পড়েন কোথাও?

সে নিজেও তো একদিন রিটায়ার করবে। সেদিন কেমন দাঁড়াবে তারও অবস্থা?

অনিন্দ্যর হাসি পেলো। চাকরিতে জয়েন করবার আগেই রিটায়ারমেন্টের কথা ভাবছে। সে এখনো অনেক দূরে।

চব্বিশ বছর বয়েস তার এখন। কম করে আরো একত্রিশ বছর। অত পরের কথা এখন না ভাবলেও ক্ষতি নেই—অনেকখানি পথ এখনো সামনে পড়ে আছে।

কিন্তু ভদ্রলোককে আর ফলো করা হল না, একত্রিশ বছর পরেকার কথাও ধামাচাপা রইল আপাতত। অনিন্দ্য দেখল সামনে জগুবাবুর বাজার। এখানেই নামতে হবে তাকে।

অমরেশের বসবার ঘরে আড্ডা জমে উঠেছে। দলের আর দুজনও এসে গেছে আগেই।

অমরেশ তার নতুন উপন্যাস পড়ে শোনাচ্ছে। তক্তপোশের ময়লা বালিশটায় কনুই রেখে আধশোয়া ভঙ্গিতে সিগারেটে টান দিচ্ছে মনোরঞ্জন আর অরুণাভ ঠিক সেই একই ভঙ্গিতে হাঁ করে আছে কাতলার মতো। অমনি বিশ্রী বোকাটে ভাবে দাঁত বের করে তাকিয়ে থাকাই ওর স্বভাব।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল অনিন্দ্য। একটি মেয়ে—খুনে সন্দেহ—নায়িকা—এই মুহূর্তে পটাশিয়াম সায়নাইড খেতে যাচ্ছে। আবহাওয়াটা বেশ ঘনিয়ে তুলেছিল অমরেশ, হঠাৎ মাঝখানে টিপ্পনী কাটল মনোরঞ্জন।

'তুই পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়েছিস কখনো?'

চটে পাণ্ডুলিপি বন্ধ করল অমরেশ।

'খেলে আর উপন্যাস লেখবার সুযোগ পেতুম নাকি? না তোর মতো ইডিয়টকে গল্প শোনাতে হত?'

'আহা, বন্ধ করছিস কেন? পড়ে যা।'

অনিন্দ্য ঘরে ঢুকে তক্তপোশের এক পাশে বসে পড়ল। হাত বাড়ালো অমরেশের উপন্যাসের দিকে : 'সেই "নানা আলোর রঙ" —না?'

অমরেশ বিদ্যুৎবেগে সেটা কেড়ে নিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

'তোরা সব সমান। খালি যা তা কমেন্ট্ করতে পারিস। ঠিক আমার সেই হাঙর-মার্কা পাবলিশারের মতো।'

'তোর নতুন উপন্যাসটা কেমন চলছে রে?' অরুণাভ কৌতূহল প্রকাশ করল।

'এক বছরে একশো কপি'—গলা দিয়ে বিষ ঝরল অমরেশের।

অরুণাভ বললে, 'শেম।'

অনিন্দ্য অবাক হল : 'কেন রে! আজকাল তো বাজারে এক মাসে এডিশন্ হয় শুনতে পাই।'

'কাদের হয়?'—তক্তপোশে একটা বিরাট চড় বসালো অমরেশ। সেই আকস্মিক বিপর্যয়ে শতরঞ্চির তলা থেকে ছোটখাটো চটপটির মতো একটি পুথুল ছারপোকা কোথা থেকে লাফিয়ে উঠল আর অমরেশ তাকে সংহার করবার আগেই কাঠের জোড়ের মধ্যে চট্‌পট অদৃশ্য হল সে।

ছারপোকাটার সন্ধান না পেয়ে আরো হিংস্র হয়ে উঠল অমরেশ : 'কাদের বই বিক্রী হয়? যারা মেয়েদের কাঁদাতে পারে, পুরুষের সস্তা সেন্টিমেন্ট নিয়ে কাঁপাতে পারে আর গোল আলুর মতো গোলালো একটি গল্প বানাতে পারে। তোদের সব দিকপালের দল'—পরম ঘৃণাভরে বাংলা-

দেশের একদল শ্রদ্ধেয় লেখকের নাম চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল : 'এ'রাই হচ্ছেন তোমাদের মাথার মণি। পড়াশ্ননো নেই, ইনটেলেকট্ নেই—সামান্য, 'ন্যাক' ছিল, সেই ব্যাঙের আধ্নলি দিয়েই কারবার চালাচ্ছে। একেবারে হালের কথা নয় ছেড়েই দে। মেরিডিথ্—হেন্রি জেম্স পড়েছে কেউ? প্রস্তের একপাতা ব্ঝতে পারবে? জোসেফ কন্র্যাড্ না-ই পড়্ক, কন্র্যাড্ অয়কেনের গল্পগ্লোর নাম শ্নেছে? এইটিনথ্ সেঞ্চ্রির রীডার—সিক্সটিন্থ্ সেঞ্চ্রির লেখক।'
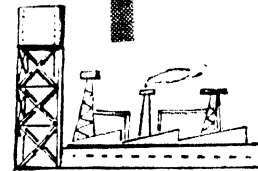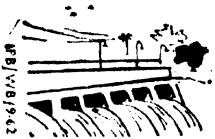
মনোরঞ্জন আর একটা বিড়ি ধরালো। একদা নিজের বিদ্যার উপর তার কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা ছিল। ইতিহাসে থার্ড ক্লাস এম-এ হবার পর থেকেই সিনিক হয়ে গেছে। এখন একটা কোচিং ক্লাসে পড়ায়, টিউশন জ্টলে তা-ও করে। অমরেশের কথায় তার চোখ দ্বটো মিট মিট করে উঠল।

'তুমিও তাদের মতো করে লিখলেই পারো বন্ধ্। এইটিনথ্ সেঞ্চ্রির পাঠকের কাছে টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চ্রির র্চি আশা করো কেন?'

'আমি? দি লাস্ট ম্যান। ওসব লেখবার আগে কলম ছেড়ে দিয়ে বরং কেরানীগিরিতে ঢ্কব।'

কথাটা অনিন্দ্যর কানে বাজল। উত্তেজিত হলেই এই সংকল্পটা বরাবর প্রকাশ করে থাকে অমরেশ। তার মতো ব্দ্ধিজীবীর কাছে কেরানীগিরির মতো দীনতা আর নেই। এতদিন এই নিয়ে কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। অমরেশ চাকরি করে না—পৈতৃক বাড়ির আধখানা ভাড়া দিয়ে সেই টাকায় কোনো মতে তার চলে, অবসর সময়ে বাংলা উপন্যাসে বিপ্লব আনবার স্বপ্ন দেখে সে। অর্ণাভ বিএ ফেল করে শেয়ার মার্কেটে ঘ্রে বেড়ায়—তার ঊর্ধ্ব দৃষ্টি বড়বাজারের ভাগ্যবানদের দিকে।

কালও অনিন্দ্য বলছিল, এবার শেয়ার মার্কেটেই অর্ণাভর সঙ্গেই জ্টে যাবে সে। কিন্তু আজকের সকালে—এই এক ঘণ্টার মধ্যে—বদলে গেছে সমস্তই। অমরেশের কথাটা তার গায়ে লাগল।

অনিন্দ্য বললে, 'নাইন্টি পারসেণ্ট শিক্ষিত বাঙালীই কেরানী। বাংলা বইয়ের তারাই রীডার।'

অমরেশ থাবা দিয়ে বললে, 'আলবাৎ। ট্রামে আর লোকাল ট্রেনে তারাই বাংলা বই পড়ে—পড়তে পড়তে ঘ্মোয়। আইডিয়াল!'

অনিন্দ্যর কান লাল হয়ে উঠল : 'তোমাদের পনেরো আনা গল্পই লেখা হয় তাদের নিয়ে।'

'আমি লিখি না। সেই একঘেয়ে মিড্লক্লাসিজ্ম্—ওঃ, হরিড্। ছাটাই—ইনক্রিমেণ্ট—অভাবের ফিরিস্তি, ফাঁকে ফাঁকে মিনমিনে প্রেম, কখনো সেক্সের খোঁচা,—ভাড়াটে বাড়ির একতলা, কল নিয়ে ঝগড়া আর একআধ ডোজ সোশ্যালিজম—পড়া যায় না।'

বি-এ ফেল অর্ণাভ মাথা নাড়ল : 'যা বলেছিস। ওর চাইতে ডিটেক্টিভ উপন্যাস পড়া ভালো।'

মনোরঞ্জন বলতে যাচ্ছিল : 'তোমার ইনটেলেকচুয়াল জিমনাস্টিকও—' কিন্তু বলতে গিয়ে থমকে গেল। অনিন্দ্য নেমে পড়েছে তক্তপোশ থেকে, নিজের চটি জোড়াকে খ্ঁজছে।

'কিরে এখ্নি চললি কোথায়?'

'কাজ আছে।'

অমরেশের রাগ পড়ে এসেছিল, "নানা আলোর রঙে'র পাণ্ডুলিপি খ্লতে যাচ্ছিল আবার। এরকম এক-আধট্ ঝগড়াঝাঁটি সব সময়েই চলে। বললে—' বোস—বোস—এই চ্যাপ্টারটা শ্নে যা। মনোরঞ্জনের তো কিছ্ই ভালো লাগে না—আর অর্ণাভ এখন থেকেই বলছে—মেয়েটাকে বিষ খাওয়াসনি ভাই, লাস্টে বিয়ে দিয়ে দে। তোর ওপিনিয়ানটাই জেন্যিন। তা ছাড়া চা আনাচ্ছি—সেই সঙ্গে গরম পকোড়ী।'

অর্ণাভ প্লকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: 'লাভ্লি!'

কিন্তু সামনের তেলেভাজার দোকান থেকে বিখ্যাত গরম পাকোড়ী আসবার সম্ভাবনাতেও এতট্কু উৎসাহ পেল না অনিন্দ্য। মনের স্রটা কেটে গেছে। এক মুহূর্তে যেন ব্ঝতে পেরেছে, এতদিনের চেনা বন্ধ্র দল থেকে আজ সকালেই সে একেবারে আলাদা হয়ে গেল। এদের সঙ্গে তার আর মিলবে না।

আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল অনিন্দ্য। কালীঘাটের দিক থেকে দলে দলে মান্ষ আসছে, কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা, হাতে প্রসাদ, গঙ্গা জলের ঘটি। আজ কি তিথি আছে কোনো? তখন মনে পড়ল দিনটা মঙ্গলবার। শনি-মঙ্গলবারে এমনিতেই ভিড় হয় কালীঘাটে।

চাকরি পেলে লোকে প্জো দেয় ওখানে। সে-ও যাবে একবার? পকেটে পাঁচসিকের বেশি পয়সা নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু খেয়ালী কল্পনাটা থমকে গেল, ভ্র্ কুঁচকে এল অনিন্দ্যর। গাড়ি বোঝাই অফিস যাত্রীর ভিড়। ঊর্ধ্বশ্বাসে উঠছে—উঠতে পারছে না। খানিক দৌড়ে ফিরে আসছে—আবার পরের গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছে। একখানা একট্ ফাঁকা ধরনের ট্রাম এল—কয়েকটি ব্যস্ত মান্ষ সেদিকে ছ্টে গিয়েই নিরাশ মুখে যথাস্থানে ফিরে এল আবার। 'লেডীজ্ স্পেশাল।'

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে অনিন্দ্য ভাবতে লাগল। অমরেশই কি ঠিক বলছিল? এই অফিস করতে করতে—এই কেরানীগিরির ধর্দায়, দিনের পর দিন তারও মনটা বিন্দ্ বিন্দ্ করে মরে আসবে? কোনোমতে বেঁচে থাকা—একটা দিন কেটে গেলে আর একটা দিনের কথা ভাবতে থাকা—ইনক্রিমেণ্টের চিন্তা, ছোটখাটো দাবিদাওয়া—এর ভেতরই একট্ একট্ করে শ্কিয়ে আসবে সে? তখন কোথাও কোনো রং থাকবে না—র্প থাকবে না—অমরেশের আধ্নিক চিন্তার একটি বর্ণও তার মাথায় ঢ্কবে না—কোনো জমাট গল্পওলা বাংলা উপন্যাস কোলের ওপর মেলে রেখে লোকাল ট্রেনের দোলায় দোলায় সে ঝিম্তে থাকবে?

হরেনবাব্কে মনে পড়ল। পাড়ার লোক। সাড়ে ন'টায় বেরিয়ে যান, সাড়ে পাঁচটায় কুঁজো হয়ে ফেরেন। চশমাটা তখন নাকের সামনে ঝ্লে আসে, হাতের ছাতাটার ওপর যেন ভর দিয়েই বাড়ি ফেরেন ভদ্রলোক। তারপর—

তারপর কারণে অকারণে ছেলেমেয়েগ্লোকে ধরে প্রহার। স্ত্রীর সঙ্গে কুৎসিত কলহ।

'আত্মহত্যা—আত্মহত্যা করব আমি। নইলে তুমি আর তোমার এই শ্য়োরের পাল একদিন ছিঁড়ে খাবে আমাকে।'

'করো না আত্মহত্যা। কে বারণ করছে তোমাকে?'—স্ত্রীর ঝাঁঝালো জবাব আসে।

'সে তো বটেই। কিন্তু আমি মরলে যে হবিষ্যি করতে হবে, মাছের মুড়ো যে আর চিব্নো চলবে না—সেটা খেয়াল আছে তো?'

'মাছের ম্ড়ো! এই কুড়ি বছরে চোখে দেখিয়েছ নাকি কোনোদিন?'—স্ত্রীর গলায় যেন ঝাঁ ঝাঁ করে ক্ষ্রের শান পড়ে : ' যে স্খে রেখেছ, এর চেয়ে হবিষ্যিও আমার ঢের ভালো।'

এইসব শ্নতে শ্নতে কতদিন ধড়াম ধড়াম শব্দে নিজের জানালা বন্ধ করে দিয়েছে অনিন্দ্য—ভেবেছে, মান্ষ কী কদর্য হয়ে যায় কখনো কখনো! এখন তার চোখের সামনে এইগ্লো যেন প্রেতচ্ছায়ার মতো দ্লতে লাগল। সেও কি আজ থেকে ওই হরেনবাব্র ভাগ্যই বেছে নিয়েছে, আজ থেকে কুড়ি বছর পরে তারও কি—

ধেৎ!

বিরক্ত হয়ে সিগারেট ছ্ড়ে ফেলল অনিন্দ্য, আর ফেলেই অন্তপ্ত হল। আধখানাও খাওয়া হয়নি। কিন্তু আর কুড়িয়ে নেওয়া চলেও না, কারণ একেবারে রাস্তার ঝাঁজির মুখে খানিকটা পানের পিকের ওপরে গিয়ে পড়েছে।

আশ্চর্য তার মন! চার বছর চেষ্টার পর চাকরি হয়েছে—আর মাস ছয়েক মাত্র দেরী হলে চব্বিশ পেরিয়ে যেত—সরকারী চাকরিই আর জ্টত না তখন। একেবারে শেষ মুহূর্তে শিকে ছিঁড়েছে বলতে গেলে।

এত বড় একটা সৌভাগ্যে কোথায় যে আনন্দে উপচে পড়বে, তার বদলে একরাশ এলোমেলো দুর্ভাবনার ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে! পাগলামি আর কাকে বলে!

অমরেশের কথা ছেড়ে দাও—ওর উপন্যাসের মতোই ওর কথারও কোনো অর্থ হয় না। হরেনবাবু রোগা আর ডিসপেপ্‌টিক লোক—মাসে দু হাজার টাকা মাইনে পেলেও স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করত—না করেই থাকতে পারত না। অকারণে অবান্তর ভাবনার জাল বুনে সামনে সিনেমার একটা পোস্টার চোখে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রতারকার মুখে ভেসে উঠল নমিতা।

অথচ নমিতার কাছেই সব চাইতে আগে যাওয়া উচিত ছিল তার। চিঠিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাকে মনে পড়া স্বাভাবিক ছিল—কী করে এতক্ষণ তাকে ভুলে গিয়েছিল সে! অনিন্দ্য আবার নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললে, 'আশ্চর্য!'

বালিগঞ্জের একখানা ট্রাম বাঁক নিচ্ছিল। আরো দশজন ছুটন্ত কেরানীর ভঙ্গিতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রামটার দিকে দৌড়োল অনিন্দ্য, উঠে পড়ল এক লাফে। নামল এসে ফার্ন রোডের মোড়ে।

দুই বোন—নমিতা আর শমিতা। শমিতা বি-এ পড়ছে, নমিতা একটা স্কুলের টীচার। ওই গার্লস স্কুলেই কয়েক মাসের টেম্পোরারি চাকরি করতে গিয়ে নমিতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল অনিন্দ্যর। প্রথম দিনেই দুজনে মিলে রুটিন ঠিক করে নিয়েছিল নিজেদের।

স্কুল অনিন্দ্যকে চার মাস পরেই ছাড়তে হল—চাকরিটা মেটার্নিটি লিভে। কিন্তু পরিচয়টা টিকেই রইল নমিতার সঙ্গে। দুজনে কাছাকাছি এল, এক সঙ্গে চা খেল অনেকদিন, লেকের ধার দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দুজনের মনে হল, সারাটা জীবন যদি এমনিভাবে পাশে পাশে চলতে পারা যেত! কিন্তু বেকার অনিন্দ্য কথাটা ভাববার আগেই আতঙ্কের অন্ধকারে তলিয়ে দিলে, আর ক্লান্ত স্কুল মিস্ট্রেস্ নমিতা শ্রান্তভাবেই কোনো ঘুমভাঙা রাতের নিঃসঙ্গ প্রহরগুলির জন্যে সেটা সরিয়ে রাখল। আপাতত এসব বিলাসিতা তাদের জন্যে নয়।

ইন্টারমিডিয়েটের আগে কখনো কখনো পড়াতে যেত শমিতাকে। আর, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আভাস দিত শমিতাই।

'আজকাল তো এদিক প্রায় ভুলেই যাচ্ছেন।'

'সময় পাই না।'

'আমার জন্যে বলিনি।'—শমিতা অল্প একটু হেসে বলত, 'আপনি মাঝে মাঝে এলে দিদির মেজাজটা ভালো থাকে। কারণে অকারণে আমাকে বকুনি খেতে হয় না।'

'পাকামো করতে হবে না। পড়ো।'

বাপ-মা পাকিস্তানে, দুই বোন কলকাতায় একখানা ঘর নিয়ে থাকে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি—সামান্যই ভাড়া দিতে হয়। একটি ঘরেই দুখানা তক্তপোশ, দুটি চেয়ার, শমিতার পড়ার টেবিল। ঘরের কোনায় একটুখানি কাঠের পার্টিশন দুই বোনের রান্নাঘর।

পার্টিশনের ওপার থেকে চা নিয়ে বেরিয়ে আসত নমিতা। অনিন্দ্যর সামনে চায়ের পেয়ালা রেখে, ঘামে ভেজা কপালের ওপর লেপ্‌টে থাকা কয়েকটা ঝুরো চুল সরিয়ে দিয়ে হয়তো জিজ্ঞেস করত: 'কী বলছিল শমি?'

শমিতা জবাব দিত: কিছু না দিদি, কিছু না। লজিকের কয়েকটা ফ্যালাসি বুঝে নিচ্ছিলুম।'

ফার্ন রোড দিয়ে এগোতে এগোতে অনিন্দ্য ভাবছিল, নমিতা নিশ্চয় স্কুলে বেরিয়ে গেছে এতক্ষণ। শমিতার কলেজ হয় সকালে—সে ফিরে এসেছে ঘরে। খবরটা তাকেই দিয়ে যাবে, বলবে, 'সন্ধের দিকে আসব, দিদিকে থাকতে বলে দিয়ো।'

কিন্তু দেখা হল নমিতার সঙ্গেই। শমিতার টেবিলে বসে কী যেন লিখছিল সে!

'এসো—এসো!' খুশিতে আলো হয়ে উঠল নমিতার মুখ: 'হঠাৎ এ সময়ে যে? কী করে তুমি টের পেলে আজ আমাদের স্কুলে ফাউণ্ডেশন ডের ছুটি?'

'ইন্‌স্টিংক্ট্। শোনো, মিষ্টি খেতে এলুম। চাকরি পেয়েছি।'

'পেয়েছ—সত্যি?'—আনন্দে ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে উঠল নমিতা: 'সত্যিই চাকরি পেয়েছ? কোথায়—কবে থেকে?'

হলদে খামখানা এগিয়ে দিলে অনিন্দ্য। প্রায় ছোঁ মেরে চিঠিটা নিলে নমিতা—চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে তার।

কিন্তু লাইন কয়েক পড়েই মুখের আলোটা নিবে গেল। পাতলা ভ্রূ দুটোর ওপর ছায়া ঘনালো একটুখানি।

'কলকাতায় নয়—খড়্গপুরে!'

'বেশি দূর তো আর নয়—মেল ট্রেনে চট্ করে চলে আসা যায়।'

'তা নয় তবু—' নমিতা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। একটা আগেও যে খুশীর ... ... মাস্টারির ক্লান্ত অবসাদে সেটা কোথায় তলিয়ে গেল আবার।

'কী ভাবছ?'

'ভাবছি চাকরিটা কলকাতায় হলেই খুব ভালো হত। আমাদের অ্যাসিস্‌ট্যান্ট্ হেড মিস্ট্রেস্ রিটায়ার করছেন মাস তিনেক পরে—তাঁর জায়গায় চান্সটা আমিই পাব। মাইনেও কিছু বাড়বে। তুমি যদি কলকাতায় থাকতে পারতে—'

যে-কথা নমিতা বলতে বলতে থেমে গেল, সেগুলো এক মুহূর্তে অনিন্দ্যর মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ হানল চাকরি-টাকা-স্বার্থ! অনিন্দ্য কলকাতায় থাকলে লেকের ধারের স্বপ্নটাকে একবার জাগিয়ে তোলা যেত, ভাবা যেতে পারত দুজনের রোজগারে কোনোমতে ভদ্রভাবে বাঁচাও যায় হয়তো। কিন্তু নমিতা কি চাকরি ছেড়ে দিয়ে খড়্গপুরে যেতে পারে এক সামান্য কেরানীর অভাবের সংসারে—আরো বিশেষ করে অ্যাসিস্‌ট্যান্ট্ হেড মিস্ট্রেস হওয়ার সম্ভাবনাটা এত কাছেই এগিয়ে এসেছে যখন?

আর হেড্ মিস্ট্রেস হওয়ার পরম লগ্নটিই বা কি এমন সুদূরে? তার মাইনে তো রীতিমতো কুলীন! অনিন্দ্য মুহূর্তে অনুভব করল, কেবল অমরেশের আড্ডাই নয়—এই চাকরিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সমস্ত ঘাটগুলো তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, কেউ যেন হঠাৎ একটা বন্যার নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে তাকে!

বলতে পারত: 'একদিন হয়তো কলকাতায় বদলী হয়ে আসব—' কিন্তু সে-কথা বলতে তার প্রবৃত্তি হল না। সেই অভিশপ্ত হলদে খামটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে, আসি আজকে।'

নমিতা তখনো হয়তো সেই হিসেবের মধ্যেই মগ্ন হয়ে ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে বললে, 'চা খাবে না?'

'আজ থাক। যাওয়ার আগে একদিন আসব।'

'আচ্ছা।'

রাস্তায় বেরিয়েই সবে যে সিগারেটটা ধরিয়েছিল, সেটা ছুড়ে ফেলল অনিন্দ্য। কিন্তু এমন অপচয়ের দিকটা সে খেয়ালও করল না এবার। আর বড়ো বড়ো পায়ে রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের দিকে যেতে যেতে তার মনে হল, ফার্ন রোডে আর সে ফিরবে না—কখনোই না। অ্যাসিস্‌ট্যান্ট্ হেড্ মিস্ট্রেস—হেড্ মিস্ট্রেস্—অনেক দূরের কূলে নমিতার মূর্তিটা এখনি ঝাপসা হতে শুরু করেছে। যখন বেকার ছিল—তখন সম্ভাবনার সীমা ছিল না, কিন্তু চাকরির এই বৃত্তটার ভেতরে এই মুহূর্তে জীবনের কাছে—নমিতার কাছে সম্পূর্ণ ফুরিয়ে গেল সে!

চাকরি পাওয়ার প্রথম দিনেই সমস্ত পৃথিবীটা এমন কদর্য বিস্বাদ হয়ে যায়—কে জানত!

মাদমোয়াজেল গতিয়ে

প্রতিভা বসু

প্যারিসের কতিপয় আধুনিক যুবক কবি লেফট ব্যাংকের কোনো বিখ্যাত এক সাহিত্যিক মেজাজের গরীব হোটেলে আমাদের জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিল। হোটেলটির প্রায় উল্টোদিকেরই কোণাকুণি একটি দোতলা বাড়িতে একদা 'র‍্যাবো আর ভেরলেন বাস করতেন। সেকথা শুনে এবং সে বাড়ি দেখে আমরা রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম এই নিচু দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তো কতোদিন ওঁরা এই রাস্তা আর এই হোটেলের ভিড় দেখেছেন, এই রাস্তা কতোবার এদের পায়ের ধুলোয় ধুসরিত হয়েছে, ভাবতে ভাবতে হৃদয় আবেগে ভ'রে উঠছিলো।

পার্টিটা সেদিন জমেওছিল খুব এবং মাদমোয়াজেল গতিয়ের সংগে সেখানেই আমার বন্ধুতার সূত্রপাত। তিনি প্যারিস শহরের একজন বিখ্যাত গায়িকা। তাঁর গলার গান সেই শহরের অনেকের হৃদয়েই বান ডাকায়। সেদিন তিনিও সেই হোটেলে তাঁর বন্ধুবান্ধবের ছোট্ট একটি দল নিয়ে খেতে এসে খুব হই-হল্লা করছিলেন। এই দু'টি দলেই সেদিন হোটেল কক্ষ প্রায় পূর্ণ ছিল, মুখর ছিল, এমন জোরে জোরে চেঁচিয়ে কথা বলছিল সবাই যে মনে হচ্ছিলো বাংলা-দেশের বিয়ে বাড়ি। সদ্য সদ্য ইংল্যান্ড থেকে প্যারিসে গিয়ে হাজির হয়েছি, ফিস-ফিস শুনতে শুনতে আর ফিসফিস করতে করতে ওষ্ঠাগত প্রাণে এই চ্যাঁচামেচি প্রায় মধু ঢাললো কানে।

এক সময়ে সেই কলরোল ছাপিয়ে মাদ-মোয়াজেল গতিয়ের কিন্নরকণ্ঠ কেঁপে কেঁপে উচ্চগ্রামে উঠে স্থির হ'লো। চুপ হ'য়ে গেল সব; তারপরেই বাহবা ধ্বনিতে ঘরের

দেয়াল ফেটে যেতে লাগলো। তারপর তিনি আর একখানা গাইলেন। শেষ গানখানা গাওয়া হ'লো সমবেত স্বরে। বোঝা গেল শহরের জনপ্রিয় গান সেটি, সবাই জানে। আমাদের দলের যুবকেরাও তাতে গলা মিশালো।

হোটেলের ঘরটা লম্বায় চওড়ায় ষোল থাই বারোর বেশি না, শ্লিনথ রাস্তার সঙ্গে মিশানো, আসবাবপত্র পুরোনো, এবং সেকেলে, জানালা দরজার মোটা পর্দা আধময়লা, টেবিলে চেককাটা গোলাপী ঢাকনা, এখানে ওখানে ফুল আছে অনেক, সিলিংয়ের আলো ঝাপসা, দেয়াল ঘেঁষেই কাউণ্টার, কাউণ্টারে হাসিখুশি ম্যানেজার গিন্নী, পাশের দরজা দিয়ে রান্নাঘর দেখা যাচ্ছে, সুন্দরী যুবতী চারজন পরিচারিকা নীল রংয়ের আঁটো পোশাকে অপ্সরীর মতো আসছে যাচ্ছে দিচ্ছে হাসছে, আধো আধো ভাষায় কথা বলছে, চোখ টিপছে, গানের সঙ্গে মাথা নাড়ছে, আবহাওয়ায় ফুর্তির বন্যা। ফরাসীরা জাত বটে।

একটা হোটেলে এসে খেতে বসে স্ত্রীপুরুষ মিলে এমন উদ্দাম উচ্ছ্বাস, টেবিল চাপড়ে এমন জোর গলার নাচগান বন্ধুতা আর অবিরল হাসি আমার মতো একজন বাঙালী মেয়ের কাছে তো বটেই, পৃথিবীর অন্য যে কোনো ভূখণ্ডেই বোধহয় অভাবনীয়। তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করছিলাম, হঠাৎ আমার পাশের সংগীটিকে স্থানচ্যুত ক'রে মাদমোয়াজেল এসে বসলেন। ভালো ভালো পানীয় বেশী বেশী খেয়ে খুব আনন্দের মেজাজে ছিলেন, চোখেমুখে হাসির ছটা ছড়িয়ে বললেন 'ইনদিয়া ?'

আমি খুব খুশী হ'লাম, বললাম 'পোশাক দেখেই ধরেছ নিশ্চয় ?' মাদমোয়াজেল গড়িয়ে চোখ পিটপিট করলেন, নরম গলায় হাসলেন পরম ফরাসী সুরে ইংরিজিতে বললেন 'ইনদিয়া আমার স্বপ্ন, সেখানকার সব আমি জানি।' আমি বললাম তাই নাকি ? এরপরে আলাপ আমাদের রাস্তা পেয়ে অনেক দূর পৌঁছলো। দুই দল এক হ'য়ে আরো জমে উঠলো আড্ডা। রাত বারোটা বাজলো সেখানে।

মাদমোয়াজেল গড়িয়ে প্রস্তাব করলেন, এবার অন্য একটি কাফেতে গিয়ে কফিপান হোক, তারপর অন্য একটি কাফেতে গিয়ে আইসক্রীম হবে! এক বাক্যে সব রাজী। হই হই করতে করতে বেরিয়ে পড়লো সবাই, মাদমোয়াজেল আমাকে বগলদাবা ক'রে ঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে চললেন। ফরাসী মেয়েরা দেখতে হাল্কা, সেটা তাদের গড়নের গুণ, কিন্তু লম্বায় চওড়ায় সে তা বলে কম বড়ো নয়। আমার দেড়া। তার বিদেশী পায়ের সঙ্গে আমার বাঙালী পা কোনোখানেই মিলছিলো না, তার ফ্রকের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আমার শাড়ি পাল্লা দিতে পারছিল না। তিনি হাঁটছিলেন আমি দৌড়ে ছিলাম। এক সময়ে বললাম 'আমাকে ছাড়ো, আমি তোমার সঙ্গে পারছি না।' সে হেসে খুন।

সেই রাত্রে কফি পান করতে করতে দেড়টা বেজেছিল, আইসক্রীম খেতে খেতে তিন। একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিল। আবার থেমে যাচ্ছিল। জুন মাসের মাঝামাঝি বেশী ঠাণ্ডা ছিলো না, আকাশে চাঁদ উঠেছিল, দু'পাশ বাঁধানো সোন নদীতে তার ছায়া টলটল করছিল।

সময়টা গ্রীষ্মকাল। প্যারিস শহর ফুলে-পাতায় কুঞ্জবন হ'য়ে উঠেছে, শাল চেরিতে ঢেকে গেছে আকাশ। কাফেগুলো এতো রাত্তিরেও গিসগিস করছিল লোকে: এখন আস্তে আস্তে জনবিরল হ'য়ে আসছে, এখানে ওখানে দু'চারজন প্রেমিক-প্রেমিকা বিদায় বেলার গাঢ় আলিঙ্গন চুম্বন ইত্যাদিতে নিমগ্ন, লাল-নীল আলোর বন্যার ফোয়ারা-গুলো অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

সয়্ নদীর এপারে ওপারে অসংখ্য চত্বর, অসংখ্য মর্মরমূর্তি, অসংখ্য বই আর ছবির দোকান। পৃথিবীর অন্যান্য শহরের সঙ্গে এই শহরের চেহারা ও চরিত্রের তফাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট। এর এমন একটি খোলামেলা মাঠ-মাঠ ভাঙার গড়ন যে রাস্তাকে রাস্তা মনে হয় না, মনে হয় সারা শহরটাই যেন একটা বাগানবাড়ি। হাঁটতে হাঁটতে সেতু পার হ'য়ে প্লাস দলা ক'কর্দে এসে সমস্ত দলটি থামলাম। এই বিশাল গোল বাঁধানো চত্বরটি থেকে বারো দিকে বারোটি রাস্তা চলে গেছে এদিকে ওদিকে, সাঁজেলিজে আলোতে ফুলেতে নতুন পাতার কলরোলে ততো রাত্রেও সজীব। পৃথিবীর নন্দন কানন। এই নন্দন কাননই একদিন সারা পৃথিবীতে আলো ছড়িয়েছিল। আর ঠিক এই চত্বরেই একদিন ষোড়শ লুইয়ের অনিন্দ্যসুন্দরী পত্নী মারী আঁতোয়ানেৎকে দেশের ক্ষুধিত উদ্ধত জনগণ তার সাতমহলা রাজপ্রাসাদ থেকে টেনে বার ক'রে এনে সকলের চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, উৎকট উল্লাসে ছিন্ন-ভিন্ন করেছিল সেই অপরূপ রূপ, লাবণ্যে ভরা চাঁদের কণা দিয়ে গড়া ফুলের মতো পেলব দেহসৌষ্ঠব। মনে হ'লো পায়ের নীচে যেন সেই রক্তের উষ্ণতা অনুভব করলাম। অদূরে জ্যোৎস্না ধোয়া বুর্ব-প্রাসাদের চুড়োর দিকে তাকিয়ে বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো।

দল ভাঙলো এইখানে। মাদমোয়াজেল জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনদিকে ?'

'বুলেভার মালেশের্ব, হোটেল ক্যাবিভা।'

'মাদলীন গির্জের কাছে ? বুঝেছি, চলো পৌঁছে দিয়ে যাই।'

পৌঁছে দেবার জন্য অন্য দু'জন যুবকও

ছিলো, মাদমোয়াজেলও সঙ্গে এলেন। কথা রইলো এরপরে আবার কোথায় এবং কখন দেখা হবে সেটা তিনি ফোন ক'রে জেনে নেবেন।

দিন তিনেক পরে এক সকালে ফোন ক'রে তিনি নিজেই হাজির হ'লেন এসে। হাত ঝাঁকাঝাঁকি, চুমু খাওয়াখাওয়ি খুব হ'লো একচোট। বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে খুব শুভক্ষণে দেখা হয়েছে, খুব মনে পড়েছে এ কয়দিন।' দিনের আলোয় দেখলুম ভদ্রমহিলার বয়েস খুব বেশী নয়, কিন্তু কোথায় যেন একটা বেদনার ছাপ পড়েছে, মুখখানা অত্যন্ত করুণ। বললেন, 'শোনো কয়েক ঘণ্টার জন্যে একটা গাড়ি পাওয়া গেছে, চলো একসঙ্গে কোথাও ঘুরে আসি।'

আমরা নেচে উঠলাম, 'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।'

'চলো না ভের্সাইটা ঘুরে আসি।'—

'কাল গিয়েছিলাম।'

'ও, গিয়েছিলে?'

'সেই সঙ্গে শার্ত ক্যাথিড্রেলটাও দেখে এলুম।'

'শার্ত ক্যাথিড্রেল!' চোখ বড়ো করলেন তিনি,—'কার সঙ্গে গিয়েছিলে?'

'তোমাদের ফরাসী সরকার আমাদের সঙ্গে খুব খাতিরদারী করছেন। রবিবার বাদে প্রায় রোজই একটি গাড়ি, এবং সঙ্গী পাওয়া যাচ্ছে।'

'তা হ'লে তো খুব ভালো। কিন্তু আজ রবিবার, আজ তোমরা আমার।'

আমি বললাম 'এবং তুমি আমাদের।'

মাদমোয়াজেল বললেন, 'এবং আমরা পরস্পরের। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক, যেখানে হয় ঘুরবো।'

পাগলের মতো ঘুরেছিলাম সেদিন। সেদিনও দলটি আমাদের মন্দ ছিলো না, গাড়ির নির্দিষ্ট সময় উৎরে গেলে তাকে বিদায় দিলেন মাদমোয়াজেল গাঁতিয়ে। সেদিনও বাড়ি ফিরতে রাত তিনটে। জোর বৃষ্টি হয়েছিল সেদিন, সেদিনকার আড্ডাটা আরো জমাট হয়েছিল, ফেরবার পথে হাতে হাত ধ'রে মাদমোয়াজেল গান ধরলেন 'ঘদো বাদ্‌ ঘদো বেতে, চাতিদিক ছাতো মেদে' অর্থাৎ খরবায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে। এক বাঙালী বন্ধু নাকি শিখিয়েছিলেন অনেক আগে। উচ্চারণ শুনে হাসতে হাসতে মরি আর কি। কিন্তু সুরে কোথাও ভুল নেই, আর গলা! অতুলনীয়। রাত তিনটের রাস্তায় আমিও সুর মিলোলাম, পথচারীরা দাঁড়িয়ে গেল। আর সেই গানের সূত্র ধরেই বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হয়ে উঠলো। দুজনে দুজনের শিক্ষাগুরু হলাম। দিন পাখির পালকের মতো হালকা হাওয়ায় ভাসতে লাগলো।

মাদমোয়াজেল গাঁতিয়ে একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে একলা থাকেন। গান গেয়ে ভালোই উপার্জন করেন, সংসারের কাজ করেন নিজের হাতে। অবিবাহিত সে দেশের সব মেয়েই তাই করে, কিন্তু তিনি কর্মঠ, নিরলস। কৌতূহলবশত জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিয়ে করোনি কেন?' মাদমোয়াজেল হাসলেন, 'মাদাম হবো, তেমন ভাগ্য বোধহয় আর হ'লো না এ জীবনে।'

'কতো লোকের হৃদয় ভেঙেছ সত্য ক'রে বলো।'

মাথায় টোকা দিলেন তিনি। কিন্তু সেদিন আমাদের গান জমলো না, হঠাৎ বললেন, 'চলো তোমাকে একটা নাইট ক্লাবে নিয়ে যাই, স্ট্রিপটিজ দেখেছ?'

'ভাবছি প্যারিস ছাড়বার আগে দেখবো একদিন। এমন অদ্ভুত ব্যাপার না দেখে কি পারি?'

'আজই চলো না। কৌতূহলটা মিটে যাক।'

'বেশ তো, চলো না—'

আমি তখন বুঝিনি মাদমোয়াজেল হঠাৎ কেন আমাকে স্ট্রিপটিজ দেখাতে চাইলেন, পরে বুঝলাম। ফেরার পথে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে হ'লো?'

আমি তাঁকেরে থেকে বললাম, 'টাকার জন্য কি সব সম্ভব?'

মাদমোয়াজেল বললেন, 'সব। নইলে কোন মেয়ে স্বেচ্ছায় তার দেহ থেকে এভাবে আবরণ উন্মোচন করতে পারে, বলো?'

'এদের মা বাপ আছে? বাড়িঘর বলে
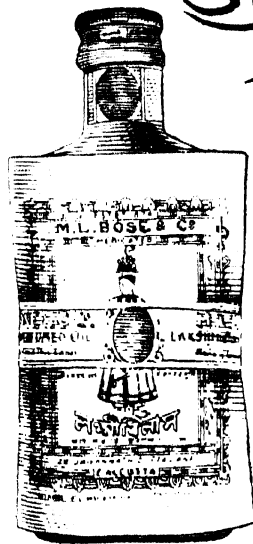
লক্ষ্মীবিলাস

এম, এল, বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা

কিছু আছে? নাকি এরা বহুবল্লভা। আলাদা একটা জাত?'

মাদমোয়াজেলের চোখে করুণা ঝরে পড়লো। আস্তে বললেন, 'বেশি রাত হয়নি, চলো কাফেতে গিয়ে বসি। এদের মধ্যে কোনো একটি মেয়েকে আমি চিনতাম তার গল্প তোমাকে শোনাবো। তাহ'লেই বুঝবে এরা কী।'

কাফেতে বসে মাদমোয়াজেল ভ্যাঁদ'অর নিলেন, আমি কফি। তিনি গল্প বললেন।

একটি তরুণীর বাপ মারা গেল, মা পঙ্গু হলেন, ভাইবোন চারটি। প্রতিবেশীরা মেয়েটিকে একটা উলের দোকানে কাজ জুটিয়ে দিল। সামান্য মাইনে, লাঞ্চটা ফ্রী। প্রচুর খাটুনি ছিলো সেখানে। দোকানের পাড়াটা ভালো ছিল না, বিচিত্র স্বভাবের লোক আসতো, তার মধ্যে লোভী বুড়োরাই আসতো বেশী। তারা তাকে তাদের সঙ্গে ডেট করতে বলতো, পয়সার লোভ দেখাতো, মেয়েটির ঘেন্না করতো। এই ক'রে ক'রে যুবতী হলো সে। সংসারে সব মিলিয়ে মুখ তাকে নিয়ে ছ'টি, উপার্জন তার একলার। বলাই বাহুল্য, আধপেটাও চলতে চাইতো না। একদিন মরীয়া হয়ে দোকানের কাজটা সে ছেড়ে দিলে। লেখাপড়া তো শেষ করার সুযোগ হয়নি যে তা ভাঙিয়ে খাবে, অন্য কাজ পাওয়া দায় হয়ে উঠলো আর সেই সঙ্গে এই চাকরি ছাড়লো বলে তার মা হৃদয়হীন হয়ে উঠলেন। এক উপায় ছিল চরিত্র ভাঙিয়ে খাওয়া, সেটা সে কিছুতেই পেরে উঠলো না। শেষে খোঁজ পেয়ে এক চিত্রকরের কাছে তার ছবির মডেল হতে গেল। প্রথম প্রথম গায়ের জামা কাপড় ছেড়ে একজনের চোখের সামনে দাঁড়াতে তার গ্লানির অবধি থাকতো না, শরীর শক্ত হয়ে যেতো, দু'টো হাত আড়াআড়ি হয়ে পড়ে থাকতে চাইতো বুকের উপর, ধমক খেতো, কিন্তু উপার্জন হতো অনেক বেশী। তাই পেশাটা ছাড়তে পারত না। শেষে নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে নিল। ক্রমে অভ্যাস হয়ে গেল। শেষে যেন কিছুই নয়, এমনিভাবে সে গিয়ে চটপট জামা কাপড় ছেড়ে দাঁড়াতে পারত চিত্রকরের চোখের তলায়। এমন কি সেই চিত্রকর যখন খুব মনোযোগ দিয়ে তার শরীরের বিশেষ কোনো অঙ্গ আঁকতেন, দরকার হ'লে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেন বা ছুঁতেন, তখনো তার কোনো বিকার হ'তো না। পারিশ্রমিকটাই ছিলো লক্ষ্য। তার দেহ সুগঠিত ছিল, আস্তে আস্তে মডেল হিসেবে নাম হ'লো তার। একই সঙ্গে সে দু'তিন জনের কাছেও কাজ করতে যেতো। ঈভের সরলতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, শুয়ে থাকতো, বসে থাকতো, যা তাঁরা চাইতেন তাই করত। কিন্তু ব্যক্তির তারতম্য থাকত সেখানে, লোভী চিত্রকরের সংখ্যাও কম ছিল না। এমনও কতদিন হয়েছে, আচমকা রং তুলি পেন্সিল ফেলে উঠে গেছে কেউ, কেউ সব ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে দেখেছে, কেউ ইঙ্গিত করেছে, কেউ আহ্বান করেছে—মেয়েটি নিস্তরঙ্গ। তার বাড়িতে তখন অসুখে বিসুখে ওষুধ গেছে, ভাইবোনরা ছেঁড়া পোশাকের বদলে আস্ত পোশাক পরেছে, নিজের দু' একটা ভালো ফ্রক হয়েছে, খেয়ে পেট ভরেছে সকলের।

এই করতে করতে একদিন এক চিত্রকরকে ভালো লেগে গেল, তার স্পর্শে তার যৌবন জাগ্রত হয়ে উঠলো, পৃথিবীটাকে আর তত নীরস লাগল না, গলার গান আপনিই উচ্ছ্বিত হতে থাকলো। সেই চিত্রকরকে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবেসেছিল, বলেছিল, 'এসো আমরা বিয়ে করি।' চিত্রকর হেসে উড়িয়ে দিল সে কথা। পরে টের পাওয়া গেল, প্রেমিকার অভাব নেই তার। বিভিন্ন শরীরে বিচরণ করতে ভালোবাসে সে। এ ব্যাপারে মেয়েটি ভয়ানক আঘাত পেল। ব্যর্থ প্রেমের প্রথম আঘাত। লাগল খুব। মনের দুঃখে ছেড়ে দিল ঐ লাইন।

আবার গ্রাসাচ্ছাদনের ভয়ঙ্কর তাগিদ, আবার ছেঁড়া নোংরা আর ক্ষুধা। আবার মায়ের অপরিসীম হৃদয়হীনতার বেদনা। ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হয়ে এক বন্ধুর সহায়তায় দু' মাসের মাথায় আবার একটা কাজ পেল সে। গাইতে পারত, মিষ্টি গলা ছিল, ছোট একটা নাইট ক্লাব চটুল গানের জন্য নিয়ে নিল তাকে। সেই ক্লাবে প্রথম রাত্রিটা গান হ'ত, দশটার পরে বারোটা পর্যন্ত জ্যাজ বাজত, জ্যাজের তালে তালে একদল মেয়ে পিছন নাড়াতো, একদল মদ পরিবেশন করতে করতে চোখ মারতো, কুৎসিত ইঙ্গিত করত। বারোটার পরে স্ট্রিপটীজ। চলত সারারাত।

শুধু গান গেয়ে যা রোজগার হ'ত তাতে কেবলমাত্র খাওয়াটুকুর সংস্থান হ'ত বটে, অন্য আর কিছু চলত না। চিরদিন সংসার তার উপরেই ঠেস দিয়ে চলেছে, সেটাই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল সকলের, সকলে স্বার্থপর হয়ে গিয়েছিল, সবচেয়ে বেশী হয়েছিলেন তার মা। রোজগার কমে যাওয়ায় তাঁর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল। শুয়ে শুয়েই তিনি তাকে গালিগালাজ করতে লাগলেন, অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জোট হয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে লাগলেন। তখন সে মায়ের যন্ত্রণায় টিঁকতে না পেরে বেশী উপার্জনের জন্য গানের পরে জ্যাজের সঙ্গে কোমর দুলোবার কাজটাও নিয়ে নিল। একটু আয় বাড়ল এবার। একটু সচ্ছলতার মুখও দেখল, খুশি হ'লো ভাইবোনেরা। মার মেজাজ প্রশমিত হ'ল। তিনি মনে করতেন, মেয়ে তাদের খাওয়াতে পরাতে বাধ্য, কিন্তু মেয়ে কীভাবে কী করছে, নিজে কী খাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে, কোন পথে

উপার্জন করছে এ সবে তাঁর কোনো মাথা-ব্যথা ছিল না। আর সেই কারণেই রোজগার বাড়ার সংগে সংগে তাঁর চাহিদাও বেড়ে গেল। সংসারটা তিনিই চালাতেন, তাঁর আদেশে নির্দেশেই সব হ'ত। খরচ এমন বাড়িয়ে দিলেন যে, আবার টানাটানি শুরু হ'ল। দারিদ্র্য। দারিদ্র। দারিদ্র্য। ঘেন্না করত মেয়েটির, নোংরা লাগল। সে সইতে পারত না অভাবের যন্ত্রণা। বাড়ি ফিরে জানালা দরজার পর্দাগুলোর দিকে তাকাত প্রথম, তারপর আসবাবপত্র, তারপর বিছানা বালিশ, ভাইবোনের পোশাক আশাক, সমস্তটা মিলিয়ে একটা জঘন্যতার ছবি। কিছু বলার উপায় নেই, মা অমনি চিলের মত চেঁচিয়ে উঠবেন, বলবেন, যা আনছো তাতে এর বেশি হয় না। কিন্তু মেয়েটি জানত সব। আর কিছু না হোক, সবাই মিলে খাটলে ঘরবাড়ি অন্তত পরিষ্কার রাখা যায়। শেষে মেয়েটির মনে সন্দেহ হ'ল, মা লুকিয়ে টাকা জমাচ্ছেন।

মেয়েটি যখন যে কাজে গেছে, কোথাও ফাঁকি দেয়নি। তাছাড়া, আগেই বলেছি, তার ফিগার ভাল ছিল, বাইশ বছরের উদ্ধত যৌবন ছিল, জ্যাজের সংগে তার কোমর দুলিয়ে নাচার আকর্ষণে লোক জমতো। ম্যানেজার প্রস্তাব করলেন, বেশি রাত্তিরের কাজটা সে নিতে রাজি আছে কিনা। শুনে তার কান লাল হয়ে উঠল।

কিন্তু লজ্জা কী? জামা কাপড় সরিয়ে শরীর তো অনেক দেখিয়েছে। পুরো তিন বছর মডেলের কাজ করেছে সে। তবু কী লজ্জা। কী লজ্জা। কী অসম্মান। স্ট্রিপ্টিজের কান্ডকারখানা তো সে দেখেছে? যখন স্টেজে আসে, পোশাকের বস্তা হয়ে আসে। শরীরের এক ছিটে মাংস দেখতে পায় না কেউ। তারপর ধীরে ধীরে দর্শক-দের লুব্ধ ক'রে ক'রে বাসনা কামনায় জর্জরিত করতে করতে একটি একটি ক'রে সরাতে থাকে সেই ঢাকনা। একটু একটু ক'রে উন্মোচিত করতে থাকে দেহ। দেহের বিশেষ বিশেষ অংশ দেখাতে গিয়ে কৃত্রিম লজ্জার অভিনয়টাই সবচেয়ে জঘন্য।

বাড়ি গিয়ে মেয়েটি চুপ করে পড়ে রইল বিছানায়।

ম্যানেজার বললেন, 'কী, রাজি?'
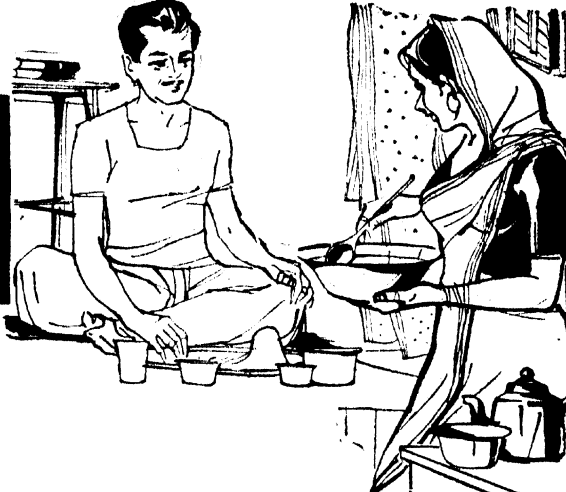
মেয়েটি সোজা বললো, 'না।'

'কেন? কী দোষ? অভ্যেস করলেই হয়ে যাবে। তুমি মডেল হ'তে, শরীর কি দেখেনি কেউ? বরং মডেলের অসুবিধে বেশী, ভয় থাকে, কোন চিত্রকর কেমন হবে বলা যায় না, তারা ছবি আঁকার নামে তোমাকে লাঞ্ছনা করতে পারে। কেননা, ওটা ব্যক্তিগত। এখানে তা পারবে না। সময় নাও—মাথা ঠিক ক'রে ভাবো গিয়ে বাড়িতে। এতে তোমার প্রচুর উপার্জন হবে, ভালো মত খেয়ে পরে সুখে থাকবে, অমন সুন্দর গলা, গান শিখতে পারবে পয়সা খরচ করে, শুনেছি কিছু-কিছু আঁকো, তা-ও শিখতে পারবে। প্রথমে তোমাকে বেশিক্ষণ কাজ করতে হবে না, একবার শুধু স্টেজে গিয়ে শরীরটা দেখাতে না দেখাতেই ছুটি করে দেবো। মনে তোমার যদি কোনো কালি না থাকে তা হলেই হলো। রাতের গ্লানি তোমার কি আর দিনের বেলায় মনে থাকবে?'

কথাগুলো মনে ধরলো। সত্যি তো, এতো আর সে জোচ্চুরি করছে না। যে সব লোভী পুরুষ ডেট ক'রে পয়সা দিতে চায়, এবং যে-সব মেয়ে বোকা ঠকিয়ে ভালোবাসার ছলনায় সেটা আদায় করে, এ কি তার চেয়ে খারাপ? এর মধ্যে কোথায় মিথ্যে আছে? কোথায় হীনতা? কে তোমার আত্মাকে ছুঁতে পারবে? শরীর তো আবরণ মাত্র, কেউ যদি দূরে থেকে দেখেই তার বিনিময়ে পয়সা দেয় বাধা কি

নিতে? এর মধ্যে লজ্জা আছে, সততার অভাব নেই।

কিন্তু যুক্তিবুদ্ধি যতই দিন না, মন-মেজাজ খুব খারাপ হয়ে রইলো। ভাই-বোনদের খুব বকলো তার উপর বসে খায় বলে, মা যখন প্রতিবাদ করলেন, মাকেও ছাড়ল না। মুখের কাছে প্রায় অভদ্রের মত হাত নেড়ে বলল, 'তোমার তো টাকা হলেই হ'লো। মেয়ে যদি উলঙ্গ হয়ে নেচেও টাকা আনে, তাতেও তোমার আপত্তি নেই। মা-ও সমান তালে চ্যাঁচালেন, 'আহাহা। কী আমার সতীরে। তা যেন আর নাচ না।'

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো মেয়েটি, তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এই আমি চললুম।' ব'লেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'হ্যাঁ, তাই নাচব; কিন্তু তোমাদের জন্য নয়, নিজের জন্য। নিজে সুখী হবার জন্য। তোমরা এবার দ্যাখ, কত ধানে কত চাল। কুকুরের গলায় টিন বেঁধে ভিক্ষে নাও আর বড়লোক দেখলে টুপি পাতো, আমি দেখতে আসব না।

সেই ঝোঁকের মাথায়ই সে ম্যানেজারকে গিয়ে নিজের সম্মতি জানিয়ে এল।

প্রথম রাতটা মেয়েটি আগুনের উপর দিয়ে হেঁটেছিল। সারা শরীরটা যখন লেস আর লিনেনের স্তূপে ঢেকে স্টেজে গিয়ে দাঁড়ালো, করতালিতে ফেটে পড়লো সব। এটা তার যৌবনকে অভিবাদন। দর্শকদের পছন্দ হয়েছে তাকে। ম্যানেজার স্টেজ থেকে নেমে পাদপ্রদীপের সামনে এসে তাকালেন তার দিকে, চোখে চোখে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করলেন। মেয়েটি তার নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে পেল। আস্তে আস্তে আলো নিবে গেল প্রেক্ষাগৃহের, লোক-গুলোকে তত স্পষ্ট দেখা গেল না, একটু যেন কমলো কাঁপুনি। এক পাক নেচে নিল সে। নাচতে নাচতে উপরকার আলগা কাপড় চোপড়গুলো খুলে ফেললো বটে, কিন্তু ভিতরেরটা খুলল না। কিছুতেই পারল না। তাইতেই দর্শকরা যথেষ্ট পুলকিত হ'লো। কিছু কিছু লোক চ্যাঁচালো বটে, শুধু ম্যানেজার গ্রাহ্য করলেন না। তাঁর অভিজ্ঞতা আছে, তিনি জানেন, এসব প্রথম দিনেই হবার নয়, তিনি পুরো টাকার দ্বিগুণ দিলেন মেয়েটিকে। তিনি বুঝেছিলেন, এই মেয়ে দিয়ে ম'মাৎ-এর অন্য নাইট ক্লাবগুলো একেবারে নিষ্প্রভ করে দিতে পারবেন তিনি।

পরের দিন গেটের কাছে ব্যাণ্ড বাজিয়ে লোক ডাকবার ধুম পড়ে গেল, মেয়েটির অর্ধনগ্ন পুষ্টদেহের পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেল দেয়াল, জলের মত কলকলিয়ে লোক ঢুকতে লাগল। সেই রাত্রে মেয়েটি একটু কম নারভাস হ'ল, তারপর তৃতীয় দিন, চতুর্থ দিন, পঞ্চম দিন, ষষ্ঠদিন, এক মাস দু' মাস, চার মাস ছ' মাস, করে যেন একেবারে শিশুর মত নির্লজ্জ হয়ে গেল উলঙ্গ হতে।

পুরো ছ' বছর রাতের পর রাত এই কাজ করেছে সে। একেবারে কলের মত ক'রে গেছে। ম্যানেজারকে যত বড়লোক করেছে, নিজেও তার চেয়ে কম হয়নি। ভালো ফ্ল্যাট নিয়েছে, ভাল পোশাক পরেছে, ভাল খেয়েছে। সবচেয়ে ভাল গাইয়ের কাছে গান শিখেছে। কিন্তু ভক্তের ভিড় জমতে দেয়নি বাড়িতে। কাজ সাঙ্গ হলেই সেই জীবন ঝেড়ে ফেলে ফিরে এসেছে ঘরে, স্নান ক'রে এক পট কফি নিয়ে বসে গান প্র্যাকটিস করেছে, নয়তো ছবি এঁকেছে। থেকেছে একেবারে একা, নিঃসঙ্গ।

কোনো এক রাতে যখন সে নাচতে নাচতে শেষ আবরণটুকু পর্যন্ত খুলে ফেললো, হঠাৎ সামনের আসন থেকে শব্দ করে বমি করে ফেললো একটা লোক। মেয়েটি চকিতে তাকালো সেদিকে। কালো কুচকুচে এক মাথা চুল, টানাটানা কালো চোখ, আর কালো রঙের এক যুবক মুখে রুমাল চাপা দিয়ে শিউরে শিউরে উঠছিলো। বোঝা গেল ভীষণ ঘেন্না করছে তার। মেয়েটির বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটলো। সে অনুভব করলো এই ঘৃণার পাত্রী সে নিজে। টাকার জন্য নিজেকে সে এই হতে দিয়েছে। ছুটে ভিতরে গিয়ে ড্রেসমেণ্টের বড়ো ড্রেসিংরুমে চলে গেল। দেয়ালজোড়া সব আয়না, চারদিকে নিজের নগ্ন দেহের প্রতিফলন দেখতে দেখতে তারও গা গুলিয়ে এলো। দ্রুত হাতে মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে, ফ্রক পরে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলো বাইরে, একটু আলো-আঁধারি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলো। যার জন্য দাঁড়িয়ে-ছিলো, একটু বাদেই দেখা গেল তাকে। তার সঙ্গে অন্য একজন যুবক ছিলো, বোঝা গেল সে-ই নিয়ে এসেছিলো নাইট ক্লাব দেখাতে।

কালো ছেলেটিকে অসুস্থ দেখাচ্ছিলো। হতাশ গলায় বললো 'এই! এই দেখাতে তুমি নিয়ে এসেছ আমাকে? এই দেখিয়ে তুমি আমাকে ফুর্তি দেবে, খারাপ মন ভালো করবে? কেন, আমি কি কুকুর?'

অন্য যুবকটি বললো, 'তুমি কুকুর-বেড়াল কিছু নও, আস্তো একটি ইডিয়েট, ওখানে তুমি বমি করে ফেললে? ছি ছি। যাও, হোস্টেলে গিয়ে পাদ্রি হয়ে ঘুমিয়ে থাক, আমি টিকিট কেটেছি, নষ্ট হতে দেবো না।' এই বলে সে আবার ঢুকে গেল ভিতরে। কালো ছেলেটি ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো ফুটপাত ধরে ধরে।

মেয়েটির মুখে নেটের আবরণ ছিলো সে-ও ভিড় বাঁচিয়ে উল্টো ফুটপাতের আলোয় তাকে নজর করে করে হাঁটতে লাগলো। ক্লাবগুলোর আওতা ছাড়িয়ে যখন নির্জন রাস্তায় নামলো ছেলেটি, সে গিয়ে কাছাকাছি হ'লো, বললো 'একটা কথা।'

ছেলেটি অন্যমনস্ক ছিলো, একটু চমকে গেল, বললো 'বলুন।'

'আপনার দেশ কোথায়?'

'ভারতবর্ষ।'

'আপনি কি ছাত্র?'

'হ্যাঁ।'

'কদ্দিন এসেছেন?'

'ছ' মাস।'

'এখানে কেন এসেছিলেন?'

'দেখতে।'

'স্ট্রিপটীজ?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো লাগলো?'

'ভালো? না। দুঃখ হলো, ঘেন্না করলো।'

'দুঃখ হলো? দুঃখ কেন?'

'যে মেয়েটি নাচছিলো সে বড়ো সুন্দর।'

'তাতে দুঃখের কী আছে?'

'সে কেন এই কাজ নিতে গেল, অন্য কাজ করলে কতো মানুষকে সুখী করতে পারতো।'

'এও তো কতো মানুষকে সুখী করছে।'

'সুখী! এ দেখে মানুষের সুখ হয়?'

'না হলে আসে কেন?'

'বমি করতে আসে। বমি। বমিরও নেশা আছে।' বলতে বলতে আবার সে মুখে রুমাল চাপা দিল।

মেয়েটি বললো 'ইণ্ডিয়ানরা পিউরিটান, তাদের রক্ত ঠাণ্ডা, মন জেলিফিশের মতো।'

তর্ক না করে ছেলেটি বললো, 'হয়তো তাই।'

'এখানে এসে আপনি কি কারো ভালো-বাসায় পড়েছেন?'

'না।'

'এখানকার মেয়েদের ভালো লাগছে না আপনার?'

'খুব।'

'তবে?'

'তা বলে ভালোবাসায় পড়তে হবে? ভালোবাসা কি এতো সহজ?'

'ভালোবাসার চেয়ে সহজ আর কী আছে জীবনে?'

'সহজ বলেই কঠিন। এতো আর রাস্তার লোককে ভালোবাসা নয়, প্রতিবেশীকে ভালোবাসা নয়, ভগবানের ইচ্ছার বন্ধনে জড়িত মা বাপ ভাইবোনকে ভালোবাসা নয়, এই এক ধরনের আত্মিক ভালোবাসা, এর অনেক চাহিদা, সে রকম কারো সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।'

'একটা অনুরোধ করবো?'

'নিশ্চয়ই।'

'একদিন আপনি আমার বাড়ি বেড়াতে আসবেন? এই আমার ঠিকানা' মেয়েটি ঠিকানা লেখা একটা কার্ড ব্যাগ থেকে বার করলো, বললো, 'কোনো নির্দিষ্ট দিন আমি দিচ্ছি না, কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই, যদি ইচ্ছে হয়, ফোন করবেন, আমি অপেক্ষা করবো।'

'বেশ তো।' কার্ডটি হাতে নিল ছেলেটি। এর পরে মেয়েটি বিদায় নিয়ে সোজা চলে গেল নিজের ফ্ল্যাটে। পরের দিন ম্যানেজারকে লিখে পাঠালো, 'শরীর খুব অসুস্থ হওয়ায় কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছি, বর্তমানে কিছুকাল কাজ করতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না। আমার প্রাপ্য টাকাটা যদি অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন বাধিত হবো।'

হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন ম্যানেজার। সবে ক্লাবটা উজিয়ে উঠেছে এর মধ্যেই নায়িকার অবসর গ্রহণ? টাকার প্রলোভন যতোদূর সম্ভব দেখালেন তিনি, মেয়েটি রাজী হলো না, তার মুখে ঐ এক কথা আমার শরীর খারাপ।

বলাই বাহুল্য কাজ ছেড়ে দিয়ে কিছু-কালের মধ্যেই আবার অসুবিধায় পড়ে গেল সে। কিন্তু এখন সে একা, কারো চোখ রাঙানি নেই, বিরক্তি নেই, অনেক মুখের চাহিদা নেই। তবুও অভাবের কষ্ট আর সইছিলো না তার। আবাল্য অভাবে থেকে

থেকে অভাবকে সব কিছুর চেয়ে তার ভয়াবহ মনে হতো। ঘরে ঘরে গান শেখানোর কাজ পেলো দুটো। কিন্তু যার জন্য এই অপেক্ষা তার কিন্তু দেখা নেই। মেয়েটি মনে মনে ভেবে দেখলো সেই চিত্রকরের পরে এই ক্ষণিক দেখা যুবকটিই আবার তার মনে রং ধরিয়েছে। তাকে ভাবতে তার ভালো লাগছে, তাকে ভেবে ভেবে সব দুঃখ ভুলে যাচ্ছে সে। সে প্রতীক্ষা করে করে কষ্ট পেতে লাগলো। মাস তিনেক কেটে যাবার পরে যখন সে আশা ছেড়ে দিল, এক সন্ধ্যায় একটি ফোন এলো।

'হ্যালো।'

'শুনুন, আমি একবার এই ঠিকানায় আসতে চাই।'

'কী দরকার?'

'কিছু না, কিন্তু এই ঠিকানার একজন মহিলা আমাকে আসতে বলেছিলেন, আমি কথা দিয়েছিলাম'—

'ও, আপনি! আপনি! নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। কখন? কবে? কবে আসবেন?'

'আপনিই কি তিনি?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'তা হলে আপনিই বলুন কবে আপনার সুবিধে।'

'এখন আসতে পারেন?'

'পারি।'

'তবে আসুন।'

ফোন ছেড়ে মেয়েটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, হাত পা কাঁপতে লাগলো তার, সে বুঝলো ঘৃণা দিয়েই এ যুবকটি জয় করে গিয়েছে তাকে। তার বুক আনন্দে ফেটে যেতে লাগলো।

ছেলেটি বোধ হয় বাড়ির কাছাকাছি এসেই কোথা থেকে ফোন করেছিলো, তিন মিনিটের মধ্যে এসে গেল। আর এসেই আলোর তলায় দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। 'আপনি।' তার মুখ থেকে এই শব্দটি খসে পড়লো।

মেয়েটি ম্লান হেসে বললো, 'আমিই তো, আমার সঙ্গেই আপনার পথে কথা হয়েছিলো।'

'কিন্তু—'

হ্যাঁ, এই আমিই সেই নাইট ক্লাবে নেচেছিলাম।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু আমিও মানুষ। হৃদয় মন সততা ভদ্রতা মমতা সব বৃত্তিই আমার আর পাঁচজন মানুষের মতোই আছে, আর সেটা দেখাতেই আমি আপনাকে ডেকেছি।' বলতে বলতে মেয়েটির চোখে জল এসে গেল।

ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললো 'আমি যাই।' মেয়েটি নিঃশব্দে তাকে লিফট পর্যন্ত এসে এগিয়ে দিল। আর মেয়েটির। তার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে সে চলে যাবার পরে অদ্ভুত এক ইচ্ছে হলো ইচ্ছে করলো, বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু কিছুই করলো না, কিছুই খেলো না, চুপচাপ বসলো এসে ব্যালকনিতে। হাতের ভাঁজে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো দিন তিনেক পরে আবার ফোন করলো ছেলেটি, 'একবার আসবো?'

মেয়েটি চুপ করে থেকে বললো, 'কেন?'

'ইচ্ছে করছে।'

'ঘৃণা করছে না?'

'না।'

'আমি যে নাইট ক্লাবে নাচি তা কি আপনি ভুলে গেছেন?'

'ভুলবো কেন?'

'তবে?'

'সেটা আপনার চাকরী, আপনি নন।'

'আমি আর আমার চাকরি কি আলাদা?'

'ভেবেছিলাম আলাদা নয়, আপনাকে দেখে অন্য রকম মনে হচ্ছে।'

'তাই দয়া করে বন্ধুত্ব করতে আসছেন?'

'দয়া! না দয়া নয়।'

'কী।'

'কী আমি জানি না।'

মেয়েটি বললো। 'আসুন।'

সেদিনের মতো আবার তিন মিনিটের মধ্যেই এসে হাজির হলো। বসলো, কফি খেলো। যাবার সময় সেদিনের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইলো।

এর পরে মধ্যে মধ্যেই আসতে লাগলো সে। বেশিক্ষণ থাকতো না, যতোটুকু আসতো চুপ করেই থাকতো বেশী, উঠে যাবার সময় তাকিয়ে থাকতো অনেকক্ষণ।

একদিন বললো, 'আপনার কাজটা ভালো না।'

'কেন?'

'এতে মানুষের অকল্যাণ হয়।'

'কোন মানুষের? যে নাচে তার, না দর্শকদের।'

'দর্শকদের।'

'তবে তারা আসে কেন?'

'নরকের টানে।'

'নরক!'

'নরকটা সৃষ্টি না-করলে কী হয়? অথবা অন্য যার খুশি করুন, আপনি না।'

'উপার্জন না-করলে খাবো কী?'

'এ-রাস্তা ছাড়া কি রাস্তা নেই?'

ঈশ্বরের দেয়া এই শরীরটাই আমার একমাত্র যোগ্যতা। আগে আমি চিত্রকরের মডেল হতুম, তাতে বিপদ বেশী। বরং এতেই আমি এক রকমের শান্তিতে আছি। অনেকগুলো লোভী চোখ আমাকে দেখে বটে, কিন্তু আমার মনে কোনো বেদনা দিতে পারে না, তারা জানে আমি তাদের নাগালের বাইরে।'

'ও, আচ্ছা।'

চুপ করলো ছেলেটি। একটু পরে বললো 'আপনার ঘর সংসার করতে ইচ্ছে করে না?'

'করলেই বা পাই কোথায়?'

'বিয়ে করুন না।'

'প্রেমিক জোটে অনেক, স্বামী জোটে না।'

'আমাকে আপনার পছন্দ হয়?'

প্রশ্ন শুনে মেয়েটি হেসে ফেললো, 'পছন্দ কেন হবে না।'

'যদি পছন্দই হয়, তবে আমাকেই বিয়ে করুন না।'

'সে কী!

'আমি ভেবে দেখেছি যে, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আমি সারাক্ষণ আপনার কথা ভাবি। দেরিতে দেরিতে এলে কী হবে, আপনি ছাড়া আমার আর কিছু ভালো লাগে না।'

এ রকম সহজ সরল ভালোবাসার স্বীকৃতি এবং বিয়ের আবেদন সেই যুবক ব্যতীত আর কে করতে পারতো। মেয়েটি চুপ করে গেল। তখন ব্যস্ত হয়ে বললো, 'রাগ করলেন কি? দেখুন আমি জানি, আমি মানুষটা একটু খাপছাড়া, যা মনে হয় বলে ফেলি। আমি বরং আর আসবো না, সেই ভালো।' মেয়েটি তখন মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করলো 'প্রভু, এ তোমার কী খেলা! সত্যিই কি তুমি করুণাময়?'

ছেলেটিকে বললো, 'তুমি ভালো করে

ভেবে দেখো; আমাকে দয়া কোরো না, এই নোংরা জীবন থেকে উদ্ধার করার মহৎ ব্রত নিয়ো না, যদি সত্যি ভালোবেসে থাকো তা হলেই গ্রহণ কোরো।' খুশিতে ঝকমকে হয়ে উঠলো তার চোখ। শান্ত হয়ে বসে বললো, 'আমার বয়েস ত্রিশ, দেশে বিষয় সম্পত্তি আছে কিছু, মালিক একা আমিই, আমার মা বাবা কেউ নেই, লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু করতে পারি না, এখানে সাহিত্য পড়তে এসেছি। আর আমার চেহারা তো তুমি দেখতে পাচ্ছ। এই আমি পাত্র। মনে ধরে?' মেয়েটি হাঁটু ভেঙে পায়ের কাছে বসে দু হাতে মুখ ঢাকলো।

আর সেই সুখের দিনে দু বছর ধরে ত্যাগ করে আসা পঙ্গু মা আর অনাথ ভাইবোনদের মনে পড়ে গেল তার। প্যারিস থেকে সাতান্ন মাইল দূরে নিজেদের গ্রামে তখন বাস করছিলো তারা। সামান্য জমি ছিলো, ঘোড়ার লাঙল দিয়ে সেই জমি চষিয়ে তারা বার্লির খেত বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছিলো, একটা বোন বড়ো হয়ে উঠে ভীষণ বেগে প্রেম করে নিত্যনতুন সাজে সজ্জায় নিত্যনতুনের চোখ ধাঁধাচ্ছিলো। সব খবরই রাখতো সে, দরকার মতো টাকাকড়িও যে কিছু কিছু না দিত তা নয়, কিন্তু দায়িত্ব ছিলো না, সম্পর্ক ছিলো না।

বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পরে একদিন সেখানে গেল। যাবার আগে ঘুরে ঘুরে তার জীবনের এই আশ্চর্য সুখের খবরটা পরিচিত সকলকেই জানিয়ে গেল। বোধ হয় সেইটাই তার ভুল হয়েছিলো। কে জানে।

মায়ের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে একটা রাত সে রইলো তাঁর সঙ্গে। অনেক সুখ দুঃখের কথা হলো। মা ক্ষমা চাইলেন তার কাছে, আশীর্বাদ করলেন, বলে ছিলেন একবার যেন জামাইকে নিয়ে সে আবার আসে।

ছেলেটির সঙ্গে একদিনের অদর্শনেই কাতর হয়ে উঠেছিলো মেয়েটি। শহরে ফিরে সে প্রথমেই তার আস্তানায় গেল। ঘর বন্ধ দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলো, আগের দিন নাকি অনেক জিনিসপত্র কিনে বিকেল ছটা নাগাদ ফিরেছিলো, তখুনি কে একজন এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল, তারপর থেকে আজ দুপুর পর্যন্ত আর তাকে কেউ দেখেনি।

সে কী কথা? মেয়েটি চিন্তিত হয়ে ফিরে এলো নিজের ফ্ল্যাটে। সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলো। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেল তবু সে এলো না। টিকতে না পেরে মেয়েটি আবার এলো তার হোটেলে। শোনা গেল তখনো সে ফেরেনি। লবিতে বসে রইলো সে। বসে বসেই রাত দশটা বেজে গেল। দৌড়ে আবার নিজের ফ্ল্যাটে এলো, আবার দৌড়ে হোটেলে গেল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলো, কোথাও নেই।

পরের দিন ভোর না হতে আবার এলো হোটেলে আবার ফিরে গেল। তারপর যতো জায়গা সম্ভব বলে মনে হলো সব জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলো, কোথাও নেই। ততক্ষণে হোটেলের মধ্যেও খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। খোঁজ নেয়া হলো হাসপাতালে হাসপাতালে, কেউ কোনো সংবাদ দিতে পারলো না। তারপর পুলিসে খবর গেল, পুলিস এসে দরজা ভাঙলো। ঘরভরা সব বিয়ের জিনিস ছড়ানো। একজন মেয়ের জন্য যা কেনা যায়, যতো কেনা যায়, সারা প্যারিস শহর তচনচ করে সব কিনেছিল বোধ হয়। শুধু মানুষটিই নেই। নেই। নেই। নেই। কোথাও নেই।

জলে স্থলে আকাশে অন্তরীক্ষে ঐ একটি কথাই প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো নেই, নেই, সে নেই, সে নেই।

মেয়েটি প্রায় উন্মাদ হয়ে গেল, সরকারে আবেদন করলো, পুলিসের পিছনে সর্বস্ব ঢাললো, ছেলেটির দেশের ঠিকানায় টেলিগ্রাম করলো, সব নিষ্ফল হলো। ভাঙা হৃদয়ে শয্যা নিল সে।

একান্ত মনে বললো, যদি জীবনে কখনো কোনো অন্যায় না করে থাকি, তবে এই শয্যাই যেন আমার শেষ শয্যা হয়। কিন্তু কী আশ্চর্য। তা হলো না। সে বেঁচে রইলো। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে অনুভব করলো, 'সে নেই', তবু তার খিদে পাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে। তাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ ছিলো না, তবু সে দেখলো সে নিজেই যেন কখন শয্যা ছেড়ে উঠে খাবার খুঁজছে। আর তারপর তার শরীর মনের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চূর্ণ করতে করতে কখন যেন দশটা বসন্ত পার হয়ে গেল, তবু সে ফিরলো না।

গল্প শেষ করে মাদমোয়াজেল গতিয়ে চোখ নিচু করলেন। তার রঙিন ফ্রকের হাঁটুতে গাছের পাতা থেকে শিশিরের ফোঁটার মতো বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়তে লাগলো। হঠাৎ মুখ তুলে ভাঙা গলায় বললেন, 'কিন্তু—কিন্তু—আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি সে আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। আমি আমরণ তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবো।' বলতে বলতে তার উচ্ছ্বসিত কান্না আর বাধ মানলো না। আমি তাকিয়ে রইলাম অপলকে।

অনেক পরে বললাম, 'কী হলো? কোথায় গেল?'

'জানি না, জানি না। তবে মনে হয় কেউ তাকে সরিয়ে দিয়েছে, কেউ তাকে ওষুধ খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে। পৃথিবী তোলপাড় করে ফেলতে ইচ্ছে করে আমার। আর ঐ ম্যানেজার, সেই নাইট ক্লাবের ম্যানেজার কী জানি কেন তাকে খুন করার উদ্দাম ইচ্ছেতে আমি মধ্যে মধ্যে পাগল উঠি।

'তুমি কি তাকেই সন্দেহ কর?

'ওর ক্লাব ছেড়ে ওর ব্যবসা ছাড়া 'আর কার কী ক্ষতি করেছি। কেউ তো আমার শত্রু ছিলো না।'

মাদমোয়াজেলের কণ্ঠের কাছটা কেঁপে কেঁপে উঠছিলো ফুঁপিয়ে কান্নার দমকে।

আমি আর কোনো কথা বললাম না। খুঁচিয়ে আগুন বাড়িয়ে লাভ নেই।

ভারি মনে বাড়ি ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম খোলা জানালার ধারে। এক ফালি নীল আকাশ ধরা দিলো চোখে, এক রাশি তারা ঝিকমিক করে উঠলো। মনে মনে ভাবলাম প্যারিস শহর দেখে এই দেশের কতোটুকু আমি জানতাম যদি না মাদমোয়াজেল গতিয়ের সঙ্গে আমার দেখা হতো। আর এই হাসি খুশী, যখন তখন গান গেয়ে ওঠা সুন্দরী চপলা ফরাসিনীকে দেখেই বা আমি কী করে বুঝতাম তাঁর বুকের তলায় কী আগুন জ্বলছে, যদি না কুখ্যাত মমার্ৎ পাড়ার স্ট্রীপটিজ দেখতে যেতাম।

সেই মুহূর্তে গতিয়ের সব দুঃখ আমার দুঃখে হয়ে বেদনাবিদ্ধ করলো আমাকে। আমার চোখে আকাশটা ঝাপসা হয়ে উঠলো।

সে আমার প্রেম ✳ সন্তোষকুমার ঘোষ

॥ এক ॥

** আমি, লেখক, অন্তর্যামী, আমার উপস্থিতি অশরীরী, তাই অলক্ষ্য থেকে ওদের দেখছিলাম, ওদের মনের কথা মুখের ভাষা সব শুনছিলাম।

আর কারও নজরে যাতে না পড়ে, এমন একটা কোণ খুঁজে নিয়ে ওরা বসেছিল। দুজনেরই হাত পৌঁছয় এমন জায়গায় চীনেবাদাম ওরা ছড়িয়ে রেখেছিল। তবু মাঝে মাঝে হাওয়া হাজির হচ্ছিল বলে এর চীনেবাদামের খোসা ওর গায়ে উড়ে পড়ছিল, সেগুলোকে বাদাম বলে ভুল করে ওরা কখনও কখনও কাড়াকাড়ি, ফলত হাসাহাসিও করছিল এবং লেখকের এইটুকু সাক্ষ্য লিপিবন্ধ হলেই যথেষ্ট হবে যে, আঁচল ইত্যাদি সর্বদাই সম্বৃত ছিল না।

আকাশ মেঘ মেখে মোলায়েম হয়ে ছিল বলে ওদের বরং কিছু সুবিধাই হয়েছিল। গাছের গুঁড়িতে কাঠ পিঁপড়ে, ওরা ছায়ায় না বসে বাইরেই পা ছড়িয়ে দিয়েছে। একটু দূরে জলা ডাঙায় লম্বা লম্বা ঘাসের শিসে কয়েকটা ফড়িং ট্রাপিজের খেলা খেলছিল। ফার্লং দূরে হাইওয়ের বাঁকে একটা প্রকাণ্ড লরির টায়ার ফাটার আওয়াজ নিশ্চিন্ত কয়েকটা কাকচিলকে তাড়া করে দিগ্বিদিকে উড়িয়ে দিল।

শশব্যস্ত ওরা একটু সরে বসল।

ওপর দিকে মুখ তুলে মেয়েটি একবার বুঝি বলেছিল, কয়েক ফোঁটা জল হলে বেশ হয়।

'বেশ হয় কেন?'

'ঠোঁট খুলে ওপর দিকে চেয়ে থাকব, যেই ফোঁটা পড়বে, অমনি চেটে চেটে নেব। আচ্ছা, বৃষ্টির জল কোন দিন চেখে দেখেছ? নোনতা?'

'ছেলেবেলায় একবার বৃষ্টির পর আমার হাতের তেলো চেটে দেখেছিলাম। একটু নোনতা লেগেছিল; তবে—তবে সেটা আমার হাতের স্বাদও হতে পারে। রোমকূপে ঘাম থাকে তো!'

কিন্তু সত্যিই যখন বৃষ্টি নামল তখন ওরা আর এক মুহূর্তও বসল না, সব চিনেবাদাম উড়তে দিয়ে, সব ফড়িংদের ভুলে গিয়ে মাথা বাঁচাতে ছুটল।

একটা চালাঘর কাছেই ছিল। গোল-পাতার ছাউনি, একটু এলোমেলো, তিন দিক গিয়ে এক দিকে শুধু দর্মার বেড়া আছে, তাতে ছাট ঠেকে না। একটা বোঁঞ পাতা ছিল কে পেতে রেখেছে কে জানে, তার নিচে একটা কুকুর কাতর-কুণ্ডলী হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। ওদের বসতে দেখে সে সসম্ভ্রমে সরে গেল।

আঁচলের কোণ দিয়ে মেয়েটি জলের বিন্দুগুলি চেপে চেপে মুছছিল, আর ব্লাউজের হাতায়, কাঁধে যা জমেছিল, ছেলেটি ক্যারম খেলার মত টোকা দিয়ে সেই ফটিক-ফোঁটাগুলো ঝেড়ে ফেলল।

দুটো হাত দিয়ে টেনে টেনে মেয়েটি তখন চুলগুলো গোছালো করল। এতক্ষণে ফুরসুত পেল পায়ের দিকে তাকাতে।

'ইস্, ভিজে ভারী হয়ে উঠেছে।' পাড়ের ওপরে অন্তত ইঞ্চি চারেক শপশপে, ছেঁড়া ঘাসের টুকরোয় মাথামাখি। নুয়ে পড়ে নিংড়ানো চলে কিনা, মেয়েটি হয়ত ক্ষণেক তাই ভাবল। তলপেটে চাপ না পড়লে হয়ত নুয়ে পড়তও। কাজ নেই, সে ভাবল, তার চেয়ে, পা দুটোকে টানটান করে পায়ের পাতার দিকে তাকাই।

সে তাকাল বলে, তার দৃষ্টির পিছু-পিছু ছেলেটির নজরও পৌঁছল সেখানে।

স্লিপার খসে পড়েছে জেনেও কী কারণে কী জানি তখন হঠাৎ-অকুণ্ঠিত মেয়েটি প্রদর্শনীর পর্দা তুলেই রাখল। বরং সরে এসে বলল, "কী দেখছ!"

"কী ধবধবে ফর্সা!"

"ও তো ঢাকা থাকে বলে।" মেয়েটি তাড়াতাড়ি পা গুটিয়ে নিল। "কী ভাবছিলে তাই বল।"

"শুনলে তুমি হাসবে। দ্যাখ, আলতা তো তুমি পরো না, কিন্তু এখন এই সময়ে, বৃষ্টির জল আর ভিজে ঘাস পা দুটি যখন ধুয়ে দিয়ে গেছে, তখন পরা থাকলে বেশ মানাত।"

এই কথা শুনে যে-রঙ ওর পায়ে নেই, সেই রঙ মেয়েটির মুখে লাগল। চোখ নামাল। "দ্যাখ, অন্য সময়ে শুনলে হয়ত হাসতাম। তুমি জানো, রঙ আমার শিশিতে নেই, মনে নেই, কোথ্থাও নেই। তবু তোমার মুখে এখন শুনতে কিন্তু ভালই লাগল। কারণ—কারণ ও-কথাটা ঠিক তখনই আমারও মনে এসেছিল।"

দুজনের মনে যুগপৎ মৌন [illegible]

প্রার্থনার কথা জেনে ফেলে দু'জনেই খুব হাল্কা-চাপা হাসতে থাকল।

গোলপাতার চালা ফ'ুড়ে টপ টপ জল তখনও সমানে ঝরছিল। ঝুঁটি ধরে নেড়ে অশথগাছের ডালপালাগুলোকে পাগল করে দিয়েই দমকা হাওয়া চালাঘরের আড়ালে এক-লহমা গা-ঢাকা থেকেই ফের ছুটে বেরিয়ে পড়ছিল। একটা জলজ সুবাস কোথা থেকে উঠে এসে সব ঢেকে দিল, ওরা জানে না। আলো কমে আসছে, বৃষ্টি কমছে না। মেয়েটির হাঁটুতে মাথা ডুবিয়ে ছেলেটি আরও একটি গন্ধের আভাস পাচ্ছিল। হয়ত ওর ভিজে পায়ের পাতার। কিন্তু শুধু তা হলে তো এ-গন্ধ আরও মৃদু হত। পায়ের পাতার সঙ্গে তবে কি স্লিপারের কাঁচা চামড়ার গন্ধ মিশেছে? কবে লুকিয়ে খেয়েছিল সেই মদের গন্ধের কথা ওর মনে পড়ল। অদ্যতন স্বাদ নয়, তদানীন্তন গন্ধ—গন্ধেরও স্মৃতিমাত্র—সময়ে সময়ে অবশ-বিবশ করে।

"তোমার জামাটা ভিজে।"

"বোতাম খুলে দিয়েছি। গায়ের গরমে আর হাওয়ার টানে শুকিয়ে যাবে।"

"ঠান্ডা লাগবে না? জ্বর যদি হয়?"

মিষ্টি-দুষ্টু করে ছেলেটি হাসল।

আরও একটু এগিয়ে এল অন্যজন। ছেলেটির কাঁধে থুতনি রেখে বলল, "তার চেয়ে তুমি আমার একটা কথা শোন। তোমাদের তো অসুবিধে নেই—তুমি, তুমি বরং তোমার জামাটা ছেড়ে ফেল। শুকিয়ে যাবে।"

"সুবিধা-অসুবিধা এখানে কিন্তু সবারই সমান। অন্ধকারকে তো জানতাম নির্বিকার, নিরপেক্ষ।"

এবার যা ঘটে ঘটুক, আমি, সর্বত্রগামী লেখক, সেখান থেকে সুরুচির মুখ চেয়ে সরে যেতে পারি। (অন্তর্যামী, তাই কখন জোয়ার আসে জানতে পাই) একটু দূরে গিয়ে মর্ত্য দেহ ধরে নদীর ধারে বসে পর পর ছ'টা সাতটা সিগারেট শেষ করে ফিরলেও ক্ষতি নেই।

হলদে ছোপলাগা অন্তর্বাসের চেহারা-ওয়ালা চাঁদটাকে গাছের ডালপালায় ঝুলিয়ে শুকোতে দেওয়া হয়েছে দেখে আমি ফিরে এলাম।

তখন ছেলেটি চালাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলছে, "আর বৃষ্টি নেই।"

মেয়েটি অন্ধকার ঠেলে ওর পাশে এসে দাঁড়াল। পা বাড়াতে গিয়েও একবার তাকাল পিছন ফিরে।

"এ-ঘরটা কে বানিয়েছিল, কেন বানিয়েছিল, জানো?"

"না।"

"কেউ জানে?"

"কেউ না।"

"আশ্চর্য।" মেয়েটি বাইরে পা দিল। ভাঙা বেড়া, ফুটো চাল, তবু সে বলল 'আশ্চর্য'। আরও আশ্চর্য, ছেলেটি ওই কথাটারই প্রতিধ্বনি করল।

আমি জানি, কেন। সেই মুহূর্তে প্রবল কোন ইচ্ছা দু'জনেরই ভিতর থেকে নির্গত হয়ে মিলিত হয়েছিল। যোগফল একটি ঘর। হোক ভাঙা হোক ফুটো, এমন একটি ঘর।

একেবারে খোলা আকাশের তলায় দুজনের নিশ্বাস যুক্ত হয়ে একটি প্রার্থনায় সফল হল।

"যাবে না?"

"চল।"

"হাইওয়ে এখান থেকে দু' ফার্লং দূর। শহরে ফেরার শেষ বাস সওয়া আটটায়।"

॥ দুই ॥

"কতক্ষণ এসেছ?"

কতক্ষণ আর—এই মিনিট দশেক। তুমি ঘুমুচ্ছিলে, তোমাকে তাই আর ডাকিনি।

"ও।" ক্লান্ত একটা হাসির ভাব ফোটাতে চেয়ে মেয়েটি চোখ বুজল। ছোট্ট একটি হাই তুলে বলল, "আমি আর একটু ঘুমোই?"

"ঘুমোও। আমি বরং এই ম্যাগাজিনটার পাতা ওলটাই। আর কোন ভয় নেই তো?"

"নার্স তো বলে গেল, নেই।"

সন্ধ্যার পর ওদের হাইওয়েতে শেষ বাসে তুলে দিয়ে আসি, সে প্রায় মাস তিনেক হবে। তারপর আরও নানা নায়কনায়িকা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, বিরহমিলন প্রভৃতি ঘটিয়ে ওদের ভুলে ছিলাম। অবশেষে আমি সর্ব-

শক্তিমান, সীমিত ক্ষেত্রে বিধাতাসমান, লেখক ওদের টেনে এনেছি এখানে, খাস শহরের খিড়কি সড়কের এই হোমে।

মধ্যবর্তী পর্বে একটুখানি ফাঁক রেখে দিয়েছি। পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থে লেখকের নোট বইয়ের বর্জিতাংশ থেকে কয়েকটি আলাপের টুকরো জুড়ে দেওয়া গেল।

....

'বলো কী! ঠিক বলছ, তোমার ভুল হয়নি ত?'

'হলে তো বাঁচতাম।'

'উপায়?'

'উপায় তো তোমার হাতে। তুমি পারুষ না?'

(যেন এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার দরকার ছিল, ছেলেটি এমন ধরনে মাথা নেড়েছিল)।

....

'তুমি তো এই সাতদিনেও উপায় ঠিক করতে পারলে না। উপায়টা আমিই তবে বলে দিই। দ্যাখ, এখনও সময় আছে...... রেজেস্ট্রী অফিসে নোটিশ দিলে হয় না?"

উত্তরে ছেলেটি যা বলে নিঃ

কিন্তু মণি, তুমি তো জানো, আমার চাল-চুলো কোনটারই ঠিক নেই। পাশ করেছি বটে, কিন্তু পাশকরারা সকলে তো শয়ে শয়ে ঘুরছে। নতুন একজোড়া জুতো জোটাতে পারলে আমিও আর-একবার লেগে পড়ি। পুরোনো জোড়ায় আর তালি দেবারও জায়গা নেই।......হঠাৎ অকিমধ্যে কিছু করলে দাদারা ঘাড় ধরে রাস্তায় ছুঁড়ে দেবে। তা ছাড়া তুমি এখনও হস্টেলের ছাত্রী, রেজিস্ট্রির সময়ে তোমার বয়স নিয়ে না ফ্যাসাদ বাধে......

যা বলেছে:

"নোটিস? কিন্তু মণি, সেটা কি খুব ঝুঁকি নেওয়া হবে না?"

তিক্ত হাসি ছড়িয়ে গিয়েছিল মেয়েটির সারা মুখে। "ঝুঁকি তা-হলে একা আমিই নিয়ে যাই, কী বলো?"

... ...

"আমাকে তুমি আর দু'দিন সময় দাও।"

"তুমি রাজী হয়ে যাও।"

"ভাল করে সব খবর নিয়েছ?"

"নিইনি? খুব বিশ্বাসযোগ্য জায়গা। খালি একটা মুশকিল—খরচ। প্রায় দেড়শো টাকার ধাক্কা। গোটা পঞ্চাশেক পর্যন্ত আমি বড় জোর জোগাড় করতে পারি—পুরোনো বই, মেডেল-টেডেল বেচে দিয়ে, কিন্তু—"

"কিছু আমিও হয়ত পারব। ঘড়িটা তো আছে। হাতেও ত্রিশটা টাকা—"

কৃতজ্ঞ বিস্ফারিত ছেলেটি যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

....

"এই সিঁদুরটুকু পরে নাও।"

দূর! ঠাট্টার মত দেখাবে।"

'তবু। ওটা দরকার। যেখানে ঠিক করেছি, সেটা রেসপেক্টেব্‌ল। অন্য কথা বলতে হয়েছে।'

'তার মানে, যে-সম্পর্ক হয়নি, তাই বলেছ?'

'হয়নি, কিন্তু হবে তো?

'হবে বুঝি! মেয়েটি হঠাৎ হেসে ফেলতে গিয়েও সামলে নিয়েছিল— —'কী জানি।' সিঁদুর পরে সে বলেছিল, "এই নাও টাকা। দেড়শোর অল্পই শর্ট আছে।" হাতের আংটিটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে বলল, "এটা বেহাত হতে দিলে বোধহয় পুরোই পাওয়া যেত। তা আর হতে দিলাম না। তুমিই পরিয়ে দিও। এই আংটি থাকাই ভাল, কী বলো। বিয়ের আর একটা উপরি প্রমাণ—সিঁদুরের ওপর আংটি।"

"তোমার হস্টেলে কী বলে......"

"সেজন্যে ভেবো না। মাসীর বাড়ি মাঝে মাঝে যাই। দিন কয়েকের ছুটি মঞ্জুর কোনরকমে করিয়ে নেব।"

এগিয়ে এসে ছেলেটি ওর হাত ছুঁয়ে বলল 'কিছু ভেব না। খুব ডিপেনডেব্‌ল জায়গা।'

"আর রেসপেক্টেব্‌ল, না?"

"খুব। ভয় নেই।"

এক ধরনের ভাষাহীন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে মেয়েটি বলল, "ভয়? ভয় আমার আর কোন কিছুতেই নেই।"

"ক'দিন এখানে থাকতে হবে ডাক্তার বলল?"

"ডাক্তার কিছুই বলেনি। নার্স—ওই যে মেয়েটি, একবার ঢুকে ফিরে গেল, সে বলছিল তিন দিন।"

"কোন গোলমাল হবে না?"

"এর চেয়ে আর কী গোলমাল হবে?"

এত অবসন্ন, তবু মেয়েটির ফ্যাকাশে হাসিতে কি বিদ্রূপ ফুটলো!

"এই! তুমি কি ওকে দেখেছ?"

"কাকে?"

"মানে যেটা হতে যাচ্ছিল......"

"যে হতেই পায়নি, তাকে?" অল্প হেসে মেয়েটি চোখ খুলল। —"না। ওরা দেখতে দেয়নি। তাছাড়া আমি তো অজ্ঞান হয়েছিলাম। নার্স বলছিল, ওদিককার একটা ঘরে প্যানে রেখে দিয়েছে।"

"ও। এখনও ফেলে দেয়নি, কী বলো। আচ্ছা, ওরা এগুলো নিয়ে কী করে জানো?"

"জানি না।" শরীরে বল পেলে মেয়েটি তখন ও-পাশ ফিরে শুত, মুখ ঘোরাত।

হয়ত শেয়ালকুকুরে টেনে নিয়ে যায়, কিংবা শকুনে ছোঁ মারে, অথবা ফুল-বাগানের সার হয়, ছেলেটি ভাবল, (অবশ্য বেশি সহনীয় বলে দ্বিতীয়টা বিশ্বাস করতেই তার সাধ যাচ্ছে।)

"তুমি জানো না?"

"না। শখ হয়ে থাকে, তুমি নিজে গিয়ে দেখে এসো না।"

"না—না—না, আমি পারব না। হয়ত রক্ত-তুলোয় চোবানো, হয়ত এখনও ডেলাটার কাটা-ছেঁড়া টুকরো এখানে-ওখানে নড়ছে—আমার গা ঘিন ঘিন করবে।"

গা ঘিন ঘিন, জ্যান্ত, আস্ত মানুষের সান্নিধ্যেও করতে পারে। সেই চালাঘরটা এখান থেকে কতদূরে, কতদিন বৃষ্টি হয়নি এই হাসপাতালটার ওষুধ-ওষুধ বিকট গন্ধ সেখানে কিন্তু ছিল না ও এখানে আর কতক্ষণ বসবে, একটি কুমোরের চাক মেয়েটির মগজে বন বন করছিল।

"তোমার সময় ছিল না?"

"আর-একটু বসি।" ছেলেটি ঘড়ি দেখল, "এটা তো ঠিক হাসপাতাল নয়—তেমন কড়াকড়ি বোধহয় নেই।" যদিও বলেই টের পেল, আর বসে থাকারও কোন মানে নেই, মেয়েটির শাদা মুখে শুকনো খড়ির দাগ ফুটছে। ও খুব ক্লান্ত, হতাশ, ক্লান্ত, ক্লান্ত, ও এখন ঘুমোবে, ঘুমোতে চায়।

"তুমি এখানে সিগারেট ধরাতে পারছ না।" মেয়েটি এবার বলল, স্পষ্টতর স্বরে।

"না পারলাম, তবু বসি। তোমার কষ্ট হচ্ছে কি কোন। কপালে হাত বুলিয়ে দিই?"

"না—না—না", বিব্রত, কিছু-বা বিরক্ত-ভাবে মেয়েটি বলে উঠল, "তুমি যেন কী। বলছি না তোমাকে, আমার আর কোন-কিছু চাই না, আমি এবার শুধু ঘুমোতে চাই!"

আর বুঝতে কিছু বাকী ছিল না। ছেলেটির বোধ প্রখর, টের পেল, শারীরিক অথবা যে-কোন অবসাদজনিত কারণেই হোক, ও এখন চলে যাক, মেয়েটি তাই চায়। এর পরে ইঙ্গিত আরও স্পষ্টতর হবে কিনা, সে তাই ভাবছিল। 'জানো, ডাক্তার বলে গেছে বেশি বকবক করলে আমার ক্ষতি হতে পারে, বেশি কথা শোনাও বারণ, এই পরবর্তী-সংলাপের জন্য ছেলেটি কান খাড়া করেই রাখল, কিন্তু মেয়েটি করুণায় অসীমা, অতদূর গেল না।

সেই সুযোগে ছেলেটি সাহস সঞ্চয় করল। যতটুকু পারে, কণ্ঠে ততটুকু আবেগ ধারণ করে বলল, "তোমাকে কথা দিচ্ছি, আর এরকম হবে না। টুাশন আর-একটা আমি জুটিয়ে নেবই, তুমি দেখো।"

—"আর এমন হবে না?"

—"না।"

একটু সাহসের সঙ্গে একটু জোর বরাত যুক্ত হলে কী-হয়; কী-কী হতে পারে; ছেলেটি মনে মনে তাই খতিয়ে দেখছিল। কী নোংরা এবারের এই অভিজ্ঞতা, কী বিশ্রী। টুাশনি ছাড়িয়ে তার চিন্তা আর আশা তখন চাকরি, বিয়ে, বাসা ইত্যাদি-ইত্যাদির নভোপটে, অবাধে পক্ষ-বিস্তার করেছিল। তাই গালে দুধ-ভাত ভরা থাকলে যেমন অদ্ভুত, ভরাট শোনাত, তেমন গলায় ছেলেটি বলল, "তোমার কষ্ট বুঝি। সে কষ্ট আমারও। আমি অপদার্থ স্বীকার করি। তাই আমাদের প্রথম সন্তান—"

"প্রথম? প্রথম না। দ্বিতীয়।" ফ্যাকাশে যে-মেয়েটি এতক্ষণ শূন্য চোখে অন্যমনে চেয়ে ছিল, তাকে দীর্ণ করে এই শব্দ কটি যেন তীব্র চিৎকারের তীর হয়ে বেরিয়ে এল। তার পরেই সে, যার কপালে তখনও মিথ্যে সিঁদুরের আভা লেপা, শিয়রে ম্রিয়মাণ ফুলে, সে হাত বাড়িয়ে ফুলে পেড়ে পাপড়ির পর পাপড়ি টুটকাতে থাকল। উদ্বেলিত হতে হতে স্থির-কঠিন অবশেষে শ্রান্ত শিথিল হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল কি পড়ল না, ঠিক বোঝা গেল না কারণ তার চোখের পাতা খোলাই ছিল।

সেই দৃষ্টির সঙ্গে বেশিক্ষণ দৃষ্টি মিলিয়ে রাখা অসম্ভব, এমন ভয়ংকর কিছু সেখানে লেখা ছিল। ছেলেটি মাথা নিচু করল। সবই তখন বোঝা হয়ে গিয়েছিল।

নার্স প্যানে করে যে রক্তমাংসের অপুষ্ট অপরিণত ডেলাটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে, সেই চাক্ষুষ বিনষ্ট শিশুটি তো দ্বিতীয়। তারও আগে দুজনের দুজনকে চাওয়া এক হয়ে মিলে আর একটিকে তিলে তিলে তৈরী করেছিল যে! তার নাম ভালবাসা, তাদের প্রথম, এখন রক্তাক্ত থেঁতলানো হয়ে তাদের মধ্যেই মরে আছে।

আমি লেখক, অন্তর্যামী, আমি জানি, এর চেয়েও অপ্রাকৃত-ভয়ংকর এক দৃশ্য ছেলেটি দেখতে পেয়েছিল।......মেয়েটি উঠে বসেছে, ক্ষমাহীন অসম্বৃত নিষ্ঠুর প্রতিমা, বুকের বাস অনায়াসে খসিয়ে বোঁটা টিপে টিপে আরও একটি শিশুকে সে দুধ দিচ্ছে, তাদের তৃতীয়—কোলজোড়া সেই শিশুর ডাকনাম ঘৃণা।

স্ত্রৈণ

রমাপদ চৌধুরী
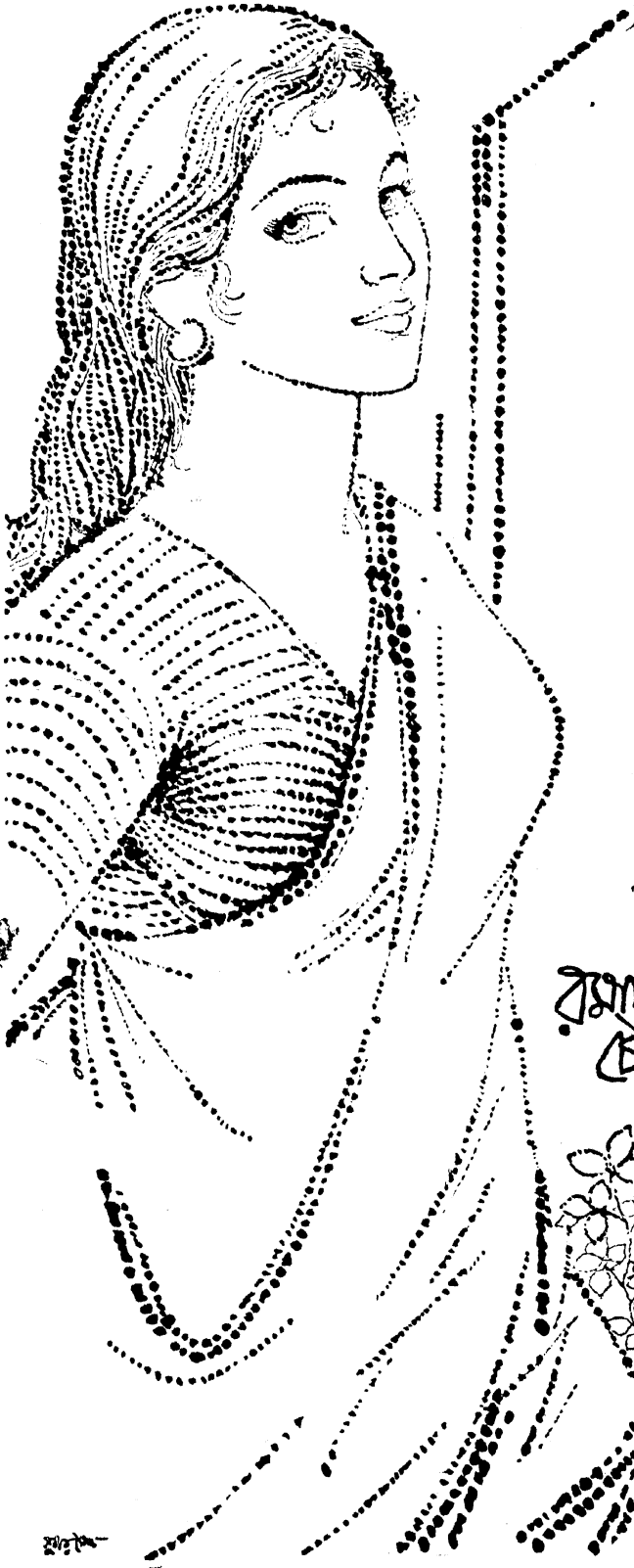
মেসের সবাই ওকে ঠাট্টা করে। করে আসছে স্ত্রৈণ বলে। ভৈরব শোনে আর হাসে। হাসিটা যেন অভিযোগের পিঠে সায় দিতে চায়। আসলে ভৈরব নিজেও নিজেকে তাই ভাবে, ভেবে খুশী হয়।

অথচ মেসের পুরোনো বাসিন্দেরাও তো কই কোনদিন ভৈরবের স্ত্রীকে দেখেনি। তার ছেলেমেয়ে, ছোট্ট সংসার—এ সবের কিছুই দেখেনি তারা। কদাচিৎ দু'একজনের চোখে হয়তো সেই নতুন বিয়ের পর বউয়ের লেখা খামখানা পড়েছে, কিন্তু তার ওপরও ঠিকানাটা লেখা থাকতো আপিসের টাইপ-রাইটারে টাইপ করা। পাছে মেয়েলী হাতের ঠিকানা দেখে কেউ সন্দেহ করে, খুলে পড়ে, তাই খামের পিঠে ঠিকানা টাইপ করে নতুন বউকে দিয়ে আসতো ভৈরব। সে খাম যে কবে থেকে পোস্টকার্ড হয়ে গেছে, পোস্ট-কার্ডে ঠিকানা লেখা হয়েছে আঁকাবাঁকা অক্ষরে, সে-অক্ষরের খোলা চিঠি হাতে পেয়েও কবে থেকে যে বাসিন্দে-বন্ধুদের পড়ে দেখার কৌতূহল মরে গেছে, তা ভৈরব নিজেও জানে না।

মরে নি শুধু একটা নেশা। শনিবারের নেশা।

এ-নেশা শুধু ভৈরবের নয়। নিশীথ কুন্ডু লেনের মেসবাড়ির ছাদের ফুটো হয়ে যাওয়া গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কের চুঁইয়ে পড়া জলে ভিজে ভিজে যে ইঁটগুলো নড়বড়ে দাঁতের মত হয়ে উঠেছে, যেন একটু আঘাত লাগলেই খসে পড়বে, সেই ইঁটগুলোও অন্যরকম

দেখায় শনিবার এলেই। অন্তত বাসিন্দেদের চোখে। তা না হলে অন্য দিন আপিস যাবার মুখে জামাকাপড়ে দু'এক ছিটে জল এসে পড়লেই যারা বাড়িওলার উদ্দেশ্যে অস্ফুট কোন অশিষ্ট উক্তি করে বসে, তারাও কেন শনিবার হলেই মেসবাড়ির নোংরা আবহাওয়ার মধ্যেও এতখানি আরাম খুঁজে পাবে !

ভৈরবের সঙ্গে একই ঘরে আরেকখানা তক্তপোশ নিয়ে থাকে সরল মুন্সী। বিয়ে-থা করেনি, সেই কোন পাঠ্যজীবনে কোলকাতার এক মেসে এসে উঠেছিল, তারপর ডজন-খানেক মেস বদলে—এখানে। এই নিশীথ কুণ্ডু লেনে। নিশীথ কুণ্ডু লেনেই বুঝি বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে। শনিবার হলেই এক কাপ চায়ের সঙ্গে রেসের বইটা খুলে বসে সরল মুন্সী। মাঠে রেস না থাকলে ঘরেই তে-তাসের আড্ডা জমাবার জন্যে একে-ওকে বলে রাখে।—মুকুন্দবাবু, তাড়াতাড়ি ফিরবেন মশাই, এক হাত বসা যাবে।

মুকুন্দবাবু কখনো রাজি হন, কখনো বা গিলে করা পাঞ্জাবিটা মাথায় গলিয়ে, তাঁতের ধুতিতে চুনোট দিতে দিতে বলেন, না সরলবাবু, আজ একটু কাজ আছে।

সারা সপ্তাহটা যিনি আধ ময়লা জামা-কাপড়ে কাটিয়ে দেন, ধোপদুরস্ত বাবু সেজে তিনি যে কোন কর্তব্যের ডাকে বেরিয়ে যান জানতে কারো বাকী নেই। তাই উত্তর শুনে সরল মুন্সী শুধু হাসে।

কিন্তু এই মুকুন্দবাবুও সরল মুন্সীর মতই ঠাট্টা করেন ভৈরবকে। বলেন, আপনার মত স্ত্রৈণ লোক মশাই জীবনে দেখিনি।

আর তাদের দেখাদেখি কলেজের ছোকরা অনুপমও শনিবার হলেই বলে, কি ভৈরবদা, বউদির মুখখানা একবার দেখে আসবার জন্যে রেডী হচ্ছেন নাকি?

ভৈরব শোনে আর হাসে। আসলে শনিবার সকাল থেকেই কি আর তৈরী হয় সে! তৈরী হয় সারা সপ্তাহ ধরেই। সোমবার সকালে যখন ছুটতে ছুটতে এসে সাতটা চল্লিশের ট্রেনটা ধরে মেমারীতে, ট্রেনে উঠে একটা বসার জায়গা খুঁজে পায়, তখন থেকেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে ভৈরব।

স্বপ্নই তো। মাঝে মাঝে শুধু স্ত্রীর দু'চারটে ফাইফরমাস মনে পড়ে যায়। বড় ছেলেটার জন্যে একখানা পাটীগণিত কিনতে হবে, ছোট মেয়ের জন্যে ওষুধ, স্ত্রীর শাড়ি-খানার আড়ং ধোলাই ইত্যাদি মনে উঁকি দেয়, স্বপ্ন ভেঙে দেয়। তারপর প্রতিদিনই এটা-ওটা কিনে, জোগাড় করে মেসে ফেরে আপিস ছুটির পর। আর শনিবার সকালে সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে একটা থলির মধ্যে ভরে নেয় ভৈরব। গুপের অঙ্ক কষার সময় মনে মনে নামতা আউড়ে নেবার মত কোথাও কিছু ভুলভ্রান্তি বাদছাঁদ পড়লো কিনা ভাবতে চেষ্টা করে।

তারপর থলি-ব্যাগটা হাতে নিয়েই তাড়াহুড়ো করে স্নান সেরে খাবার ঘরে নেমে যায় ও।

তারপর আপিস, আপিস ছুটির পর পড়ি-কি-মরি করে ভিড়ে-ভরা বাসের পা-দানিতে একটুখানি জায়গা করে নিয়ে কাঁধে থলি-ব্যাগ ঝুলিয়ে নিজেকেও ঝুলতে ঝুলতে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছতে হয়।

ট্রাম-বাসের মতই লোকাল ট্রেনেও সমান ভিড়। তারই মধ্যে কোনরকমে উঠে পড়ে তবে নিশ্চিন্তি। দুটো তিরিশের ট্রেনটা না পেলে বাড়ি পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। মনে হয় একটা বেলা বরবাদ হয়ে গেল। শুধু কি তাই? ভৈরব নিজেও জানে না, দুটো তিরিশের ট্রেনটা না পেলে হঠাৎ তার মন-মেজাজ এত খারাপ হয়ে যায় কেন।

কিন্তু, না ট্রেনটা হাতছাড়া হয় না বড় একটা। ঠিক হিসেব করেই বের হয় ভৈরব। হিসেব মতই ট্রেনে জায়গাও পেয়ে যায়। কখনো চেনাজানা দু'একজন ডেকে জায়গা দেয়, মুখচেনা অনেকে সরে বসে আধখানা আসন ছেড়ে।

তারপর ইলেকট্রিক ট্রেনের চেয়েও তাড়া-তাড়ি ছুটতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখে, আর কতক্ষণ বাকী। কখনো বা মাইল পোস্ট দেখে। মাইল পোস্ট অবশ্য এখন আর দেখতে হয় না, এ ক'বছরে এ লাইনের সব নাড়ীনক্ষত্র তার চেনা হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে একটু মুখ বাড়িয়েই বুঝতে পারে কোথায় এসেছি, কতদূর। দু'পাশের গাছগুলো, জলে ডোবা খালবিল, এমন কি মাঠে মাঠে পানের বরজ কিংবা ধানের ফলন দেখেও চিনতে পারে।

আশপাশের লোক অবশ্য ভৈরবের মত অধৈর্য হয়ে ওঠে না। ট্রেনে যখন উঠেছি, ঠিক সময়েই পৌঁছবো। বড়জোর দু'দশ মিনিট লেট হবে। কি যায় আসে তাতে। ট্রেনে উঠেই ওদিকে চার বন্ধু সামনা-সামনি বসে হাঁটুতে হাঁটুতে একটা টেবিল বানিয়ে নিয়েছে। তার ওপর রুমাল পেতে তাস ভাঁজতে শুরু করেছে ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। জানালার পাশে বসে একটি ছোকরা উপন্যাসের পাতায় ডুবে গেছে। সার্ভিস ম্যানুয়েলের কোন সাব-ক্লজ দেখিয়ে ছোটসাহেবকে কে জব্দ করেছে তার উল্লসিত বর্ণনা চলে কোথাও। কিন্তু ভৈরবের সেদিকে চোখ নেই, কান নেই।

মেমারী স্টেশনে এসে ট্রেন থামলে তবে শান্তি। ততক্ষণে ট্রেনের কামরাও ফাঁকা হয়ে গেছে একে একে। তাড়াহুড়ো করেই নেমে পড়ে ভৈরব। এক হাতে ব্যাগ, অন্য হাতে কপি নয়তো ইলিশ মাছটা ঝুলিয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে পড়ে।

এরপরও দেড় মাইল পথ হেঁটে গিয়ে তবে গ্রামের বাড়ি। সেখানে ভৈরবের বউ, ছেলেমেয়ে, বেগুনের চারায় ছোট ছোট

বেগনী রঙের ফুল দেখা দিয়েছে। একটু একটু করে মাথা তুলছে গত বছরে বসানো নারকেলের চারা।

কিন্তু এ-সব কথা এখন মনে পড়ে না ভৈরবের।

বাস রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা গিয়ে তবে গ্রামের পথে বাঁক নিতে হয়। গোটা কয়েক পয়সা দিলেই বাসে যাওয়াও যায়। তবু এটুকু পথ হেঁটে চলাতেই ভৈরবের আনন্দ। না কি কয়েকটা পয়সা বাঁচিয়েই?

পাশাপাশি কয়েকটা চালাঘর পাকা রাস্তার ধারে। কেউ চা সিঙাড়া খায়, টুকি-টাকি জিনিস কেনে, কেউ বা বিড়ি খেতে খেতে বাসের জন্যে অপেক্ষা করে। তাদের এড়িয়ে হন হন করে হেঁটে চলে ভৈরব। তারপর এক সময় পা গতি হারায়। নিজেরই অজান্তে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে ও, টিনের চালাগুলোর শেষে দোতলা ভাঙা পুরোনো দালান বাড়িখানা চোখে পড়তেই।

মান্ধাতা আমলের পুরোনো বাড়ি। এক পাশের দেয়াল ভেঙে পড়ে ইঁটের স্তূপ জমেছে। ওপাশের দেয়ালে শ্যাওলা, জানালা দরজা ক্ষয়ে গেছে বৃষ্টির জলে, ফেটে চৌচির হয়ে গেছে রোদে পুড়ে।

বাড়িটার সামনে ঘাস আর কচুর শাক গজিয়ে জঙ্গল হয়ে আছে। তারও পাশে একটা ছোট্ট ডোবা।

একটু আগেই তো ইলেকট্রিক ট্রেনটা বিচিত্র বাঁশি বাজিয়ে চলে গেছে। এই সংকেত শুনেই হয়তো বুঝতে পারে ভাঙা পুরনো বাড়ির চেনা-অচেনা একটি মেয়ে। এসে দাঁড়ায় দোতলার ভাঙা জানালার সামনে। চেয়ে চেয়ে দেখে যাত্রীদের।

ভৈরব হাতে থলি আর কাঁপ ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করে। তারপর চোখ তুলে তাকায়।

চোখোচোখি হয় মেয়েটির সঙ্গে। আর অদ্ভুত একটা আনন্দের শিহরণ খেলে যায় ভৈরবের শরীরে মনে। চোখের দৃষ্টি পরস্পরকে চিনে নেয়।

যতক্ষণ দেখা যায়, বাড়িটা পার হতে হতে বারবার চোখ ফিরিয়ে দেখে ভৈরব। একটি সুন্দর সপ্রতিভ মুখ অপেক্ষা করে থাকে জানালার সামনে। সে মুখে বুঝি আনন্দের ঈষৎ হাসিটা জ্বলে উঠেই ধীরে ধীরে নিবে যায়। যৌবনে উজ্জ্বল সুন্দর সেই মুখখানি, টানাটানা দুটি চোখের ভাষা যেন ভৈরবের মনের ওপর কত অনুক্ত হৃদয়ের কথা শুনিয়ে যায়। কবে থেকে সে মুখে বয়সের ঈষৎ ছাপ পড়েছে, কপালের সিঁদুরের ফোঁটাটা অদৃশ্য হয়েছে ভৈরব নিজেও বুঝি লক্ষ্য করে না।

মেয়েটিকে প্রথম যেই দেখতে পায়, চোখে চোখ পড়ে, ঈষৎ হাসি দোলে তার ঠোঁটে, অমনি অদ্ভুত একটা শিহরণ খেলে যায় ভৈরবের সারা শরীরে। সব ক্লান্তি ঝরে পড়ে, প্রতীক্ষা সফল হয়।

এক সময় বাড়িটা পার হয়ে চলে যায় ভৈরব, নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই পার হয়ে যেতে হয়। মেয়েটিকেও আর দেখা যায় না। কিন্তু ভৈরবের মনের ওপর একটা মুগ্ধতার প্রলেপ থেকেই যায়।

আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তবে মেঠো পথে বাঁক নিতে হয়। মনের মধ্যে কত কি কল্পনার সৌধ গড়তে গড়তে কখন যে গ্রামে এসে পৌঁছয় ও, ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ায় ভৈরব নিজেও টের পায় না।

চমক ভাঙে বড় ছেলেটা ছুটে এসে যখন আদুরে গলায় প্রশ্ন করে, আমার বই এনেছো?

ছোট মেয়েটা কাছে আসে না। পুতুল নিয়ে দাওয়ার এক কোণে খেলা করতে করতে একবার শুধু চোখ তুলে তাকায় বাপের দিকে। তারপর অপেক্ষা করে।

ভৈরব তার দিকে তাকিয়ে হাসে, অভিমান বুঝতে পারে। তাই চুলের রীবনটা থলি থেকে বের করে এগিয়ে এসে মেয়েকে কোলে তুলে নেয়।

ওদিক থেকে স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।—আলনায় কাপড় আছে, দে তো মণ্টু।

মণ্টু কাপড়খানা এনে দেয়, ভৈরব সামনের পুকুরটায় গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসে
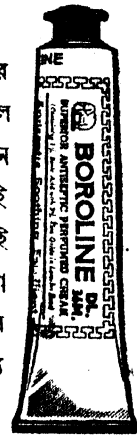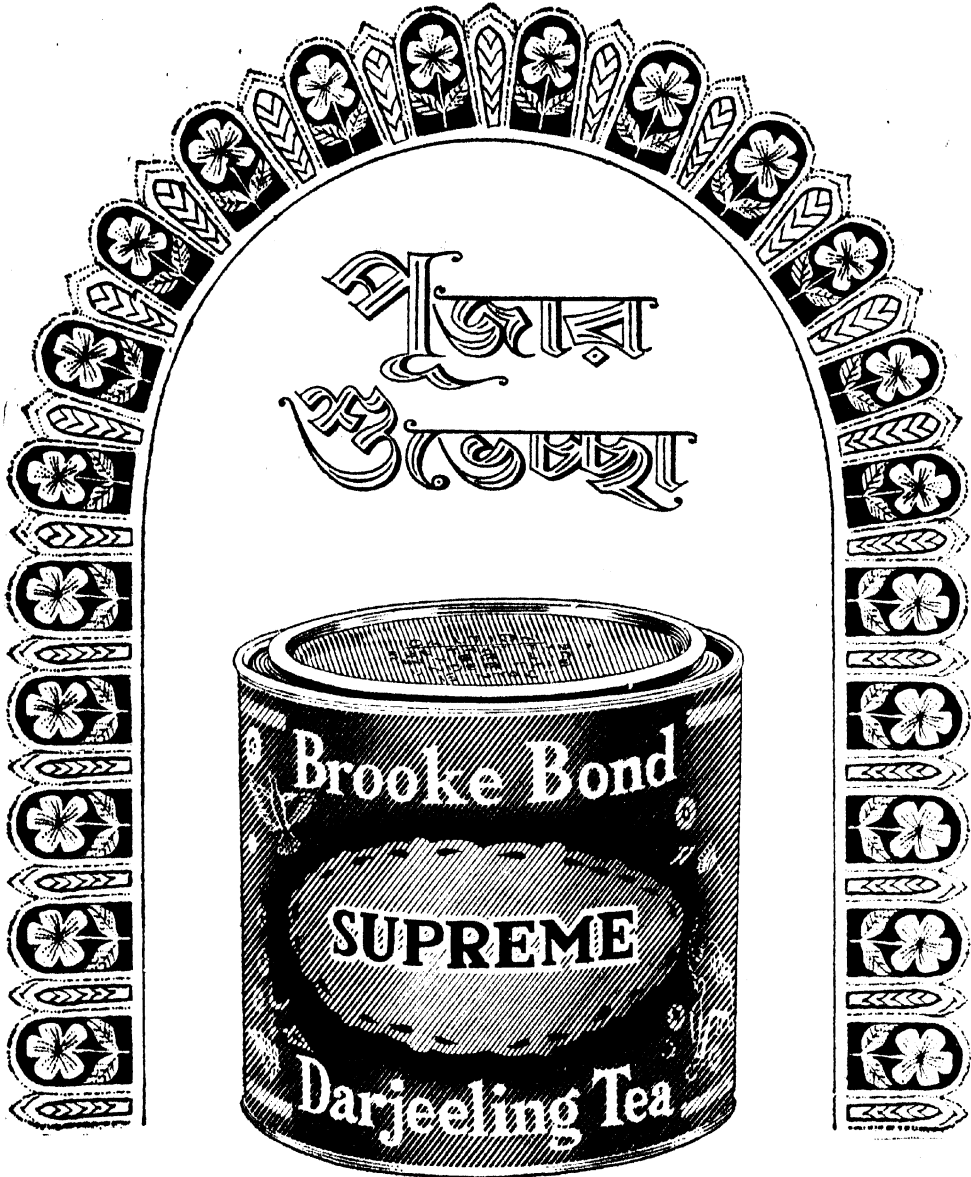
কাপড় ছাড়ে। ট্রেনের জামা কাপড় পরে ঘরে ঢোকা নিষেধ, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রীর মন জুগিয়ে চলতে হয়। কিংবা স্ত্রীর মন জুগিয়ে চলতে যেন ভালই লাগে। সমস্ত মন জুড়ে তখন খুশী-খুশী ভাব। সেই আনন্দটুকু যেন স্ত্রীর ওপরই উজার করে দিতে ইচ্ছে হয়।

সারাক্ষণ ছেলেমেয়েদের নিয়ে গল্প করে ভৈরব, আর দেখে স্ত্রী ওপাশে রান্নাঘরে একটার পর একটা কাজ করে চলেছে। একবার কাছে এসে দুটো কথা বলার সময় নেই। 'শোনার ধৈর্য' নেই। দূরে থেকে এক চোখ দেখেই সন্তুষ্ট, আগের মত কাছে এসে দাঁড়াতেও অনিচ্ছা যেন।

মণ্টুকে সঙ্গে নিয়েই বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা শাকসব্জির বাগানটা তদারক করতে বেরিয়ে আসে ভৈরব। বাঃ,পালং শাকগুলো বেশ হরহরে হয়ে উঠেছে। ক্ষুদে ক্ষুদে বেগুন ধরতে শুরু করেছে গাছে। খুরপি নিয়ে বেগুনের চারার নীচে মাটি ঢিলে করে দিতে দিতে মণ্টুকে উপদেশ দেয় ভৈরব।—ভেলীগুলো মাঝে মাঝে খুড়ে দিবি, বুঝলি। মাটি পড়ে ভেলী বন্ধ হয়ে গেলে জল আসবে না।

একটার পর একটা গাছের গায়ে হাত বুলিয়ে যেন পরম পরিতৃপ্তি। গত বছরে বসানো নারকেল গাছের চারাটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে ও কিছুক্ষণ। বাঃ, বেশ ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠছে। গাছটা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। ঠিক মণ্টুর মতই। মণ্টুই কি কম বড় হয়েছে। গত বছরেও ভৈরবের হাঁটুর কাছে পড়তো মণ্টু, এখন প্রায় কোমর ছুঁইছুঁই।

বাগানের কাজ শেষ করে গাড়ুর জলে হাত-পা ধুয়ে দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে বসে ভৈরব। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে। মণ্টু হ্যারিকেনটা জেলে বইখাতা নিয়ে এসে বসে বাপের কাছে। সারা সপ্তাহে এই তিন বেলা ছেলের পড়াশুনোর খবর নিতে পায় ভৈরব। তাই একটা মুহূর্তও অপব্যয় করতে ইচ্ছে হয় না।

এতক্ষণে ভৈরবের স্ত্রীর সময় হয়। কাঁসার থালায় দুখানা পরোটা আর বেশ খানিকটা গুড় এনে নামিয়ে দেয়। ছোট মেয়েটা জলের গ্লাসটা এনে রাখে।

পরম পরিতৃপ্তিতে পরোটা দুখানা খায় ভৈরব, আর মণ্টুর মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তারপর থালা আর গ্লাসটা তুলে নিয়ে যেতে যেতে জিগ্যেস করে, ওষুধটা এনেছো?

—হ্যাঁ, ওই থলিতে আছে। বলেই নিজে উঠে গিয়ে ওষুধটা বের করে দেয়। তারপর ব্যাগ থেকে জড়ি-পাড় শাড়িখানা বের করে খুশীর হাসি হেসে তাকায় স্ত্রীর দিকে। বলে, আপিসের লোককে দিয়ে শান্তিপুর থেকে ধুইয়ে এনেছি এবার, দেখো কেমন চমৎকার ধুয়েছে। ঠিক যেন নতুন। স্ত্রী খুশী হয়, লাজুক লাজুক হাসে।

আর কোন কথা নয়। ভৈরব আবার ছেলেকে পড়াতে শুরু করে।

কোনদিন বা আবার সেই সুন্দর মুখের স্মৃতিটুকু মুছে যেতে চায় না। স্টেশন থেকে নেমে হেঁটে আসতে আসতে দেখা সেই পুরোনো ভাঙা দালানের জানালায় আঁটা ছবির মত মুখখানা।

প্রতি শনিবারই দেখে আসছে তাকে, আবার সেই সোমবার সকালে যাবার সময়। মণ্টু হয়নি তখন, ভৈরব বিয়ে করে নি, তখন থেকেই দেখে আসছে। ঠিক অমনি এসে দাঁড়াতো সে তখনও। কতই বা বয়স ছিল! ষোল বছরের একটি কিশোরী মেয়ে, মুখেচোখে চটুল হাসি।

নাম জানে না তার ভৈরব, জানতে ইচ্ছেও হয়নি। শুধু দূরে থেকে ক্ষণিকের জন্যে দেখা, তারই মধ্যে গোপন মনের রোমাঞ্চ বুনে আসে।

তারপর একদিন বিয়ে করে ফিরলো ভৈরব। স্টেশনে নেমে গরুর গাড়িতে করে নতুন বউকে নিয়ে গ্রামে ফিরছিল সেদিন। ভৈরবের গালে কপালে তখনও চন্দনের ফোঁটা, নতুন বউয়ের মাথায় লাল চেলীর ঘোমটা।

বর-বউ দেখতে দুপাশের লোক ছুটে এলো। আর তারই ফাঁকে ভৈরব দেখলে সমবয়েসী একটি মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। ভৈরবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ফিক করে হেসে ফেললে মেয়েটি। আর সেদিন থেকেই যেন একটা পরিচয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠলো।

তারপর দিনে দিনে বয়েস বেড়েছে ভৈরবের, বয়েস বেড়েছে মেয়েটির। দোতলা পুরোনো দালান বাড়িটা থেকে ক্ষয়ে যাওয়া ইঁটের রাশি খসে খসে পড়েছে। আর সেই বাড়ি ঘিরে হঠাৎ একদিন চাঞ্চল্য দেখতে পেয়েছে ভৈরব, আনন্দের উল্লাসের হাওয়ায় মেতে উঠতে দেখেছে বাড়িটাকে। স্টেশন থেকে নেমে এমনি এক শনিবারের বিকেলে বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন ছ্যাঁৎ করে উঠেছে।

একটা অবোধ্য ব্যথা অনুভব করেছে ভৈরব বুকের মধ্যে। পরপর কয়েকটা শনিবার দীর্ঘশ্বাসের দৃষ্টি ফেলে তাকিয়েছে সে জানালাটার দিকে। ফিরে গেছে ব্যর্থ মন নিয়ে।

পর পর অনেকগুলো সপ্তাহ কেটে গেছে। ভিতরে ভিতরে যেন মুষড়ে পড়েছিল ভৈরব। কখনো বা কল্পনার চোখে একটি সুখের নীড় গড়ে তুলতে চেয়েছে মেয়েটির জন্যে। কি নাম মেয়েটির? মনে মনে কত সুন্দর সুন্দর নাম আউড়ে গেছে ভৈরব। কেমন দেখতে তার স্বামীকে? কেমন মানুষ? হয়তো খুব ভালবাসে সে ওই মেয়েটিকে। স্ত্রীকে ভালবাসাই তো

স্বাভাবিক। ভৈরব নিজেই কি তার স্ত্রীকে কম ভালবাসে?

ভৈরব ভেবেছিল আর কোনদিন বুঝি দেখতে পাবে না মেয়েটিকে।

কিন্তু একদিন চমকে উঠেছে জানালার সামনে সেই চেনা মুখখানাকে ফিরে আসতে দেখে। সিঁথির সিঁদুরটুকু দূর থেকে চোখে পড়েনি, চোখে পড়েছে শুধু কপালের ডগডগে বড়ো একটা সিঁদুরের ফোঁটা। আর ভৈরবের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ঈষৎ হেসে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়েছে মেয়েটি।

দিনের পর দিন কেটে গেছে। আর দিনের পর দিন বিস্মিত হয়েছে ভৈরব তার দিকে তাকিয়ে। প্রতিবারই মনের মধ্যে একটা আশংকা পুষে ট্রেন থেকে নেমেছে, প্রতিবারই মনে হয়েছে, এবার হয়তো যাওয়ার পথে তাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু ঠিক সময়টিতে জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হাসি মুখে। সে মুখের দিকে তাকিয়ে খুশীতে ভরে উঠেছে ভৈরবের মন, আবার রহস্যের মত মনে হয়েছে তাকে। একটা কাল্পনিক দুঃখে সমবেদনা জেগেছে। মনের মধ্যে শত প্রশ্ন উঁকি দিয়ে গেছে। মেয়েটি বছরের পর বছর এখানেই, এই বাড়িতেই কাটিয়ে চলেছে কেন! কেন, কেন! তার উত্তর খুঁজে পায় নি ভৈরব।

তবু এ এক অদ্ভুত নেশা। ওদিকে না তাকিয়ে পারে না ভৈরব। কয়েকটি মুহূর্তের জন্য, তবু তারই মধ্যে যেন লুকোনো আছে এক অপার্থিব আনন্দ।

সোমবার ভোর হতে না হতেই আবার ওই স্বপ্নটা উঁকি দেয়। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে তৈরী হয়। মুখ হাত ধুয়ে এসে দেখে, স্ত্রী উনোন ধরিয়ে রান্না শুরু করে দিয়েছে। ট্রেন থেকে একেবারে সটান আপিস চলে যেতে হয় ভৈরবকে, তাই স্নান সেরে নাকেমুখে দুটি ভাত গুঁজে নিয়ে ছুটতে হয়। নইলে ট্রেন ধরতে পারবে না, সময়মত আপিস পেঁছতে পারবে না।

আপিসের ছুটির পর সেই নিশীথ কুণ্ডু লেনের মেসবাড়ি। ছাদের গঙ্গাজলের ট্যাংক থেকে জলের ছিটে পড়ে। জলে ভেজা শ্যাওলা পড়া দেয়ালে কি একটা বিদঘুটে গন্ধ। দশটা পাঁচটা আপিস।

রেসের বই খুলে ঘোড়ার নাম দেখতে দেখতে ফিরে তাকায় সরল মুন্সী। বলে, কি দাদা, বউদি কেমন আছে?

প্রশ্নের পিঠে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

মুকুন্দবাবু টেরী-কাটা চুলে মহাভৃঙ্গরাজ মাখতে মাখতে বলেন, ভৈরববাবু ফিরেছেন দেখছি। ভাবছিলাম এবারটা হয়তো আঁচলে বাঁধা থাকবেন।

ছোকরা অনুপম কলেজ থেকে ফেরার মুখে ভৈরবের ঘরে উঁকি দেয়। বলে, সে কি, এবারও একা? ভাবলাম, বউদিকে বুঝি সঙ্গে করেই নিয়ে আসবেন।

ভৈরব শোনে আর হাসে। ভালও লাগে। রসিকতা করে বলে, বিয়ে তো একদিন করবে ভাই, তখন বুঝবে।

আবার সারা সপ্তাহ ধরে তৈরী হতে শুরু করে ভৈরব। ছেলেমেয়েদের ফাই-ফরমাশ, স্ত্রীর বায়না। একটি একটি করে খুঁটিনাটি জিনিস কিনে এনে থলিতে ভরে রাখে।

তারপর আবার সেই শনিবারের দুটো তিরিশের ট্রেন। সেই মেমারী স্টেশনে নেমে একটা খুশীর গুনগুনুনি।

প্রতিবারের মতই সেদিনও পায়ের গতি কমে এলো। পুরোনো দোতলা দালানখানা দেখা যাচ্ছে। দেখা গেলেই ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করে ভৈরব। স্বপ্নের ঘোরেই যেন এতক্ষণ কেটে গেছে তার। স্বপ্নের ঘোরেই সারা সপ্তাহটা কেটে যায়।

কিন্তু বাড়িটার সামনে পেঁছেই হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেলো ভৈরব। বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগলো বুঝি। ঠিক সেই দিনটির মত, যেদিন বিয়েবাড়ির আনন্দ আর উল্লাস দেখেছিল পোড়ো বাড়িটাকে ঘিরে। কিংবা তার চেয়েও বেশী।

নিজেরই অজান্তে কখন পা থেমে গিয়েছিল। বার বার জানালাটার দিকে তাকালো ভৈরব। জানালার আশেপাশে। সমস্ত বাড়িটার ওপর চোখের দৃষ্টিটা ঘুরে গেল।

না, জানালাটা বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ আর সেখানে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে নেই। এক-টুকরো মৃদু হাসির অভ্যর্থনা, তাও নিবে গেছে ভৈরবের জীবন থেকে।

সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে গেল। হনহন করে পথটুকু হেঁটে পার হয়ে গেল ভৈরব। বুকের মধ্যে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস যেন বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

প্রতিবারের মতই কানা-উঁচু কাঁসার থালায় দুখানা পরোটা আর গুড় নিয়ে এসে নামিয়ে রাখলো ভৈরবের স্ত্রী। জিগ্যেস করলে, আমার জর্দাটা এনেছো?

ভৈরব তিক্ত স্বরে উত্তর দিলে, ওই তো আছে, ব্যাগটা খুলেই দেখো না।

ছোট মেয়েটা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানে সরে গেল সেখান থেকে। ভৈরব তাকিয়েও দেখলে না।

বড় ছেলেটা মাদুর পেতে হারিকেন লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নিয়ে এসে বসলো। বললে, অংকটা বুঝিয়ে দাও না বাবা।

ভৈরব একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিলে, ইস্কুলের মাস্টার মশাইকে বলিস বুঝিয়ে দিতে।

কত বড় বড় বেগুন ধরেছে গাছে। নারকেলের চারাটা কত বড় হয়েছে, কোন কিছুই দেখতে ইচ্ছে হলো না ভৈরবের।

ক্লান্তিতে বিরক্তিতে দেড়টা দিন কাটিয়ে দিয়ে সোমবার সকালেই আবার ফিরে এলো ভৈরব। আসার পথে ভালো করে তাকিয়ে দেখলে দোতলা দালানটার দিকে। না, জানালাটা তেমনি বন্ধ আছে। কপাটে একটা বড় কুলুপ ঝুলছে।

একটা সপ্তাহ কেটে গিয়ে আবার শনিবার এলো। কিন্তু ভৈরব যেন সে-খবর জানে না।

শনিবার সকালে ভৈরব তখনও শুয়ে আছে তক্তপোশের ওপর। সরল মুন্সী সেদিকে তাকিয়ে বিস্মিত স্বরে বললে, কি ব্যাপার, এখনো ঘুমোচ্ছেন যে! ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নিয়েছেন?

ভৈরব কোন জবাব দিলে না।

মুকুন্দবাবু দাড়ি কামাতে কামাতে কি একটা রসিকতা করতে এসে থমকে দাঁড়ালেন।—আরে, ভৈরববাবু আজ বাড়ি যাবেন না নাকি? এর মধ্যেই স্ত্রী পুরোনো হয়ে গেল?

কলেজ যাবার মুখে একবার উঁকি দিয়েই থেমে পড়লো ছোকরা অনুপম।—ভৈরবদা কি বউদির সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছেন নাকি? বউদির সঙ্গে আপনারও তাহলে মন-কষাকষি হয়!

ভৈরব একে একে সকলের কথাই শুনলো, কিন্তু কোন কথারই জবাব দিলে না। ওর তখন চোখ ঠেলে জল আসছে, একটা অন্ধ আক্রোশে। নিজের ওপরেই একটা অসহ্য অভিমান। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, সেই বেগুনের চারা, একটু একটু করে বেড়ে ওঠা নারকেল গাছটা—সেই ছোট্ট সংসারের সমস্ত আনন্দ যে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছে সে এতদিন, সেই জানালাটাই যে আজ বন্ধ হয়ে গেছে।

জননী

বিমল কর

আমরা ভাইবোনে মিলে মার পাঁচটি সন্তান। বাবা বলত, মার হাতের পাঁচটি আঙুল। সবার বড় ছিল বড়দা, মার উনিশ বছর বয়সের ফল। প্রথম বলে বড়দা মার সেই বয়সের রূপ যতটা পেরেছিল পুঁটলি বেঁধে নিয়ে জগতে এসেছিল। শুনেছি, ঠাকুরমা বলত, অত রঙ অমন মুখ চোখ নিয়ে যদি এলি, তবে দাদু মেয়ে হয়ে এলি না কেন?

ঠাকুরমার ক্ষোভ বছর দুয়েক পরে মা মিটিয়ে দিল। এবার এল বড়দি। বড়দা পুরুষমানুষ বলে ওপর ওপর থেকে মার রূপ চুরি করেছিল, বড়দি মেয়ে বলে আমাদের মার অন্তর থেকে সব যেন শুষে নিয়ে ঠাকুরমার কোলে এসে পড়ল।

নয়নের মণির মতন করে ঠাকুরমাবুড়ি বড়দিকে তিনটি বছর আগলে আগলে রেখে, লালন-পালন করে, ঝুলন পূর্ণিমাতে মারা গেল। বুড়ি মারা যাবার সময় আমাদের তিন বছরের বড়দিকে মরণের ঘোরে রাধাকৃষ্ণর গল্প শোনাচ্ছিল। শোনাতে শোনাতেই স্বর থেমে গেল।

আমরা এ-সব গল্প মা-বাবার কাছে শুনেছি। বাবাই বেশী বলত। বাবারই অতীত-মোহ অতিরিক্ত ছিল।

বড়দির পর আমাদের মেজদা। মেজদা বাবার মতন। অবিকল বাবার মুখের আদল তার। সেই রকম লম্বা লম্বা হাত। গায়ের রঙ একটু তামাটে।

ছোট আর আমি মাত্র দেড় বছরের এদিক ওদিকে জন্মেছি। ছোটকে আমি দিদি বলিনি কোনোকালে, আজও বলি না। ছোট আমাকে ছেলেবেলায় 'কড়ে' বলত—যাকে কনিষ্ঠ! তার খেপানো ডাক থেকেই আমার ডাক নাম কড়ি হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের সংসারে প্রথম শোক এল বড়দির বিয়ের পর। তার স্বামী খারাপ রোগে ভুগছিল। বড়দির প্রথম ছেলেটা হল নাক ভাঙা, বিকলাঙ্গ। মরে গেল। পরে আরও একটা পেটে এসেই নষ্ট হয়ে গেল। স্বামীর রক্তে কোন রোগের পোকা বংশ-বৃদ্ধি করেছে, ততদিনে বুঝতে পেরে গিয়েছে বড়দি। নিজেও ভুগছিল। একদিন স্বামীকে ঘরের মধ্যে পুরে বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে দিয়ে বড়দি চলে এল, আর স্বামী-গৃহে যায় নি।

বড়দির পর, দ্বিতীয় শোক, মেজদার অন্ধ হওয়া। মেজদা দানাপুর যাচ্ছিল কাজে। ট্রেনে বড় ভিড়। যাত্রীরা ঢোকার দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। মেজদা পান কেনার জন্যে জানলা খুলে পানঅলা ডাক-ছিল। এক দঙ্গল বেহারীকে আসতে দেখে গোলমালের ভয়ে কাচের জানলা নামিয়ে চুপ করে বসে থাকল। তারা প্রথমে দরজার কাছে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করল, পরে জানলার কাছে এসে ক্ষিপ্তভাবে কি বলছিল। কামরার লোক মেজদাকে জানলা খুলতে বারণ করল। তখন খুব আচমকা বাইরে থেকে একটা লোক তার টিনের সুটকেশ জানলায় ছুঁড়ে মারল। কাচ ভেঙে তার ধারালো ফলা মেজদার চোখে মুখে ঢুকে গেল, রক্তে তার সর্বাঙ্গ লাল হল।...হাস-পাতালে একটানা ছ'মাস কাটিয়ে বেচারী মেজদা ফিরে এল বাড়িতে, তার দু'চোখ সেই নির্বোধ সুটকেশঅলা অন্ধ করে দিয়ে ভিড়েই মিশে থাকল।

আমাদের তৃতীয় শোক, বাবার মৃত্যু। বাবা সন্ন্যাস রোগে মারা গেল। মার কাছে বাবা স্নান করছিল। অল্প অল্প জ্বর

ছিল গায়ে। মা ঈষদুষ্ণ জলে বাবার গা ধুইয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিচ্ছিল; বাবা মার কোলের ওপর হঠাৎ শুয়ে পড়ে কি বলতে গেল, পারল না; মৃত্যু এসে বাবার মুখে হাত চাপা দিয়ে কথা থামিয়ে দিল। বাবা তৈরী ছিল, চলে গেল।

বাবার মৃত্যুর বছর দুই পরে আমাদের চতুর্থ শোক এল। ছোট বড় জেদী। চিরকালই সে যখন যা ঝোঁক ধরেছে, করতে গেছে। আমি তাকে কত বলেছি, ওভাবে জেদ ধরে কাজ করতে যাস না। তুই সব পারবি এমন কোনো কথা নেই।...আমার কথা ছোট গ্রাহ্য করত না। তার ধারণা ছিল, সে চেষ্টা করলে সব পারে। ছোট এ-সব বুঝত না। বুঝতে চাইত না। অকারণে সে মেতে থাকত। তার কাজের অন্ত ছিল না, খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের বালাই ছিল না। সকালে মিশনারীদের অনাথ-আলয়ে গৃহিণী-পনা করত, দুপুরে বড়দির সঙ্গে শখের চাকরি করতে যেত স্কুলে, বিকেল আর সন্ধ্যেবেলায় ফুলবাজারের সেই ঝুপসি ঘরটায় লণ্ঠনের টিমটিমে বাতির আলোয় বসে ওর দলের ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে রাজনীতির কাজ করত।...একদিন ছোট বুঝতে পারল, তার বয়সে যতখানি জীবনীশক্তি স্বাভাবিক, তার অনেক বেশী সে অত্যন্ত হঠকারির মতন ব্যয় করেছে। এখন তার জীবনের কলসি প্রায় ফাঁকা। ডাক্তারবাবু স্পষ্টই বলে দিল, আর ওঠা চলা নয়, বেশী কথা বলাও না। বিছানায় শুয়ে থাকা। ইনজেকসান ওষুধ, ভাল ভাল খাওয়া আর চুপ করে পড়ে থাকা। ছোট বলল, তাহলে আমি মরে যাব। জবাবে ডাক্তারবাবু বলল, দেখা যাক্...।

সেই থেকে ছোট বিছানায়। বছর পুরো হয়ে গেছে। আরও কিছুদিন থাকতে হবে।

আমাদের সংসারে পঞ্চম শোক এসেছে সদ্য। মা মারা যাবার পর। এই ফাল্গুনের গোড়ায় মা চলে গেল। মার মাথার চুল সাদা হয়েছিল, গালের চামড়া দুধের জুড়োনো সরের মতন কুঁচকে এসেছিল। কপালভরা দাগ আর আধপাকা ছানি চোখ নিয়ে মা বিদায় নিল। যাবার সময় দেখে গেল তার হাতের পাঁচটি আঙুলই একে অন্যের পাশে রয়েছে।

তখনও সকালে হিম পড়ে। আমাদের দোতলার বড় বারান্দা শিশিরে ভিজে রয়েছে। সূর্য ওঠে নি, রঙ ধরেছে সবে; মার বিছানার চারপাশে আমরা পাঁচজনে দাঁড়িয়ে, মা চলে গেল।

বড়দা আগেই বলেছিল, আমরা বারোয়ারী শ্মশানে মাকে নিয়ে যাব না, আমাদের বাড়ির বাগানে দাহ করব, পরে সেখানে একটা বেদী করে রাখব।

বিঘে খানেকের ওপর জমি নিয়ে আমাদের দোতলা বাড়ি। পাঁচ বিঘের বাগান। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

উত্তরের দিকে, যেখানে করবীর ঝোপ, স্থলপদ্মর রাশিকৃত গাছ, ঘাসের জঙ্গল—সেই দিকটা মাকে দাহ করার জন্যে আমরা বেছে নিয়েছিলাম। ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করে কদম গাছটাকে মাথার কাছে রেখে মার চিতা তৈরী হল, পাশে বুড়ো কাঠ-চাঁপা দাঁড়িয়ে থাকল—আমাদের বাবার মতন দেখাচ্ছিল তাকে। তারপর মার দাহ হল।

যখন আগুন তার অকলুষ শিখা বিস্তার করে মার শরীর আগলে রেখেছিল, তখন আমি আমাদের পাঁচজনকে দেখছিলাম। বড়দা খানিক রোদ খানিক ছায়ায় দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চিতার দিকে

তাকিয়েছিল, মাঝে মাঝে কি বলছিল; বড়দি কদমতলায় মাটিতে গালে হাত দিয়ে বসেছিল; মেজদা বড়দির পাশে আসন-পা করে বসে, দু'হাত বুকের কাছে,—তার অন্ধ চোখ চিতার দিকে; কাঠচাঁপার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ছোট ফোলা ফোলা মুখ করে বসে; আমি ছোটর কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে-ছিলাম।

ছোট এক সময় বলল, 'এখন কি জল খেতে আছে রে, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে।'

আমি কিছু জানতাম না। বললাম, 'এখন না। আর খানিকটা পরে খাস।'

এখন চৈত্র মাস। চৈত্রর শুরু সবে। মার শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেছে। যে জায়গায় আমরা আমাদের মাকে দাহ করেছিলাম, সেই জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চার-পাশটা যেন নিকোনো। শ্রাদ্ধর পর পরই আমরা ওখানে সুন্দর করে বেদী করেছি। কাশীর সাদা পাথর দিয়ে বেদীটা মোড়া। এখনও যেন কাঁচা গন্ধ লেগে আছে ওর গায়ে। হাত রাখলে মনে হয় ঠান্ডা লাগছে; নরম মসৃণ স্পর্শ।

মাসান্তে আমরা এই বেদীতে বসে-ছিলাম। বেদীর মাথার দিকে ছোট একটু কুলুঙ্গির মতন, বড়দি সেখানে প্রদীপ এবং ধূপ জেলে দিয়েছিল। বাতাসের ঝাপটা লাগছিল না বলে দীপের শিখাটি জ্বলছিল, অগুরু-চন্দনের ধূপ পুড়ে পুড়ে খুব ফিকে একটা গন্ধ বাতাসে ভাসছিল। আর শুক্ল-পক্ষের পূর্ণিমা বলে চাঁদের আলোয় সাদা বেদীটা ধবধব করছিল।

আমরা পাঁচজনে বেদীর ওপর বসে।

বড়দা বলল, 'আমরা যতদিন বেঁচে আছি, মাসের এই দিনটিতে সবাই একসঙ্গে এখানে এসে বসব।' বলে একটু থামল বড়দা, বড়দির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল আবার, 'এই পরিবারের এটাই নিয়ম হল। কি বলিস, অনু।'

অনু বড়দির ডাক নাম। পুরো করে অনুপমা। ছোট-র নাম নিরুপমা। বড়দির সঙ্গে মিল করে রাখা। বড়দি মাথা নেড়ে বড়দার কথায় সায় দিল; বলল, 'বাবার বেদীটাও যদি আমরা করে রাখতাম!' বড়দির গলায় আক্ষেপের সুর।

বড়দির আক্ষেপ খুবই সঙ্গত। কিন্তু তখন ত আমাদের মাথায় এ-বুদ্ধি আসে নি। মাও কিছু বলে নি।

বড়দা কয়েক দণ্ড আকাশের দিকে চেয়ে থাকল, তারপর নিশ্বাস ফেলল মুখ নামিয়ে। বলল, 'খুবই ভাল হত। তবে, মা রাজী হত কিনা কে জানে!'

'রাজী হত না!' বড়দি বেশ অবাক হয়েছিল যেন, 'কেন? মা কেন রাজী হত না?'

'হত না হয়ত।' বড়দা সন্দেহের গলায় বলল। 'সবাই এসব পছন্দ করে না। সংস্কার। আমরা বোধ হয় অনেক কিছু পুরোপুরি অগোচরে রাখতে চাই।'

মেজদা হঠাৎ কথা বলল। আমরা তাকালাম। তার অন্ধ চোখ একদিকে স্থির রেখে মেজদা বলল, 'শ্মশানে পুড়িয়ে আসার সময় আমরা কি ভাবি জানো, দিদি?'

'কি?'

'অনেকের মধ্যে দিয়ে এলাম। যেন, সঙ্গীসাথীর মধ্যে।'

'মরার পর আবার সঙ্গীসাথী কি?' ছোট বলল।

'কিছু না। মানুষ তবু ভাবে।' মেজদা উদাস গলায় বলল। 'তুই জানিস না ছোট, কত মানুষ মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থাকে তীর্থ যাত্রা কল্পনা করে নেয়।'

আমরা সকলে মেজদার দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। মেজদার গলার স্বর গোল ও নিটোল। বাঁশের আড় বাঁশির মতন মেঠো। এই স্বর শুনলে অনুভব করা যায়, মেজদার গলার সবটুকু অন্তর থেকে এসেছে। মেজদার কথাবার্তাও অন্যরকম। আমরা মনে মনে অহরহ কথা বলি, মুখে নয়। মনের সেই শব্দহীন বাক্যস্রোত যদি শব্দময় হয়ে

ওঠে এইরকম শোনাবে হয়ত, মেজদার কথার মতন।

বড়দি বলল, 'তুই স্বর্গের কথা বলছিস, দীনু!'

মেজদার নাম দীনেন্দ্র, ছোট করে দীনু। বড়দির কথায় মেজদা আলগা করে মাথা নাড়ল। বলল, 'না দিদি; স্বর্গ ত শেষ কল্পনা। আমি এই মর্ত্যের পর স্বর্গের আগে যে-পথ তার কথা বলছি।'

'সেটা আবার কি?' ছোট বলল অবাক হয়ে, 'মাঝপথের কথাও মানুষ ভাবে?'

'ভাবে। যত ভাল করে ভেবে নিতে পারা যায় ততই ভাল রে, ছোট।...আমি রাঁচির দিকে মুন্ডা না মুণ্ডরীদের গ্রামে এক বাড়িতে ছবি দেখেছিলাম একটা।'

'ওদের কথা বাদ দাও।' ছোট বলল।

'বাদ কেন, শোন না।' মেজদা যেন অন্ধ চোখে জ্যোৎস্না মেখে সামান্য মুখ ফেরাল। বলল, 'মাটির বাড়ি, বাইরের দেওয়ালে রঙ গুলে একটা বাচ্চা ছেলের ছবি আঁকা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাচ্চাটা চলেছে, এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে লাগাম; কাঁধে খাবারের পুঁটলি, মাথায় তেষ্টা মেটাবার জন্যে জলের ঘটি রাখা।...ওই ছবির মানে বলে দিল ফরেস্টবাবু। ও-বাড়ির ছেলে মারা গেছে, তাই ওই ছবি।'

'আ-হা--' বড়দি দুঃখ পেল।

মেজদা বলল, 'মানেটা তুমি শোন, দিদি। বড় অদ্ভুত লাগে ভাবতে, ওরা বিশ্বাস করে নিয়েছে মৃত্যুর পর তাদের ছোট ছেলেটিকে একা একা অনেক দূরে যেতে হবে। তাই তাকে বসিয়ে দিয়েছে ঘোড়ায়, হাতে দিয়েছে লাঠি, পুঁটলিতে বোধ হয় চিঁড়ে গুড়, আর মাথায় তেষ্টা মেটাবার জল।'

স্নেহ মমতা, ইহলোকের মায়া ও দুঃখ, পরলোকের দুর্ভাবনা—সব যেন এই ছবিতে মহৎ ও সুন্দর হয়ে কল্পিত ছিল। আমি অভিভূত হলাম। জ্যোৎস্নার ধারার মতন আমার কল্পনা সেই ছবির গায়ে আলো বর্ষণ করছিল।

অনেকক্ষণ বুঝি কেউ কোনো কথা বলল না আর। চৈত্রের চঞ্চল বাতাস বাগানের তৃণ এনে আমাদের গায়ে মাথায় ফেলে দিচ্ছিল। বেদীতে আমাদের পাঁচজনের ছায়া: পরস্পরকে স্পর্শ করে যেন ছায়ার একটি আশ্চর্য রকম ঝাফরি তৈরী হয়েছে। চাঁদটা সমুদ্রের জলের মতনই নীল অনেকটা। পর্যাপ্ত জ্যোৎস্না। মার বেদীর মাথার কাছে সেই বৃন্দাবনের কদম্ব গাছ। মার পাশে বুড়ো কাঠচাঁপা।

কদম গাছটার বয়স আমার সমান। বৃন্দাবন থেকে এনেছিল বাবা। এখনও বর্ষায় ফুল ফোটে।

বড়দি প্রথমে নিশ্বাস ফেলল। বড়দার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমার গাটা একটু দেখ ত, দাদা।'

'কেন রে, কি হল?' বড়দা উদ্বেগের গলায় বলল, বলে বড়দির গা দেখল। 'কই না, ভালই ত!'

'আমার গায়ে কেমন কাঁটা ফোটে!' বড়দি নিজের গায়ের শিহরণ প্রশমিত করছিল। সামান্য চুপ করে থেকে মৃদু স্বরে বলল, 'আমায় যদি কেউ মার হাতে কিছু দিতে বলে, কি দেব রে......!' বড়দি আমাদের প্রত্যেকের মুখে একে একে তাকাল, তারপর কেমন করে যেন মাথা নাড়ল, বলল, 'জানি না। কি দেব মার হাতে কে জানে!'

কথাটা আমাদের কানের পাশ দিয়ে ভেসে যেতে যেতে হঠাৎ যেন ঘুরে দাঁড়াল। আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হল। সহসা অনুভব করলাম আমরা বিহ্বল হয়েছি।

'মার হাতে কি দেব—' এই প্রশ্ন আচমকা বড়দি আমাদের সামনে যবনিকার মতন নিক্ষেপ করল। আমরা অসংবিত ও বিমূঢ় হয়ে বসে থাকলাম। তারপর ক্রমশ বড়দির কথার পরিপূর্ণ মর্ম আমাদের হৃদয়ে অনুভব করতে পারলাম।

সমূলে সচকিত হবার মতন আমরা শিহরিত ও কম্পিত হয়ে দেখলাম, এই প্রশ্ন যেন আমাদের সমস্ত বোধ অধিকার করেছে। আমরা কি দেব, কি দিতে পারি মাকে?...মনে হল, এই অদ্ভুত প্রশ্নে আমরা আমাদের সম্মিলিত বোধ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছি। যেন কোনো ভয়ংকর পর্বতচূড়ায় এনে কেউ আমাদের পরস্পরের দেহের সঙ্গে বাঁধা দড়ি কেটে দিয়েছে, আর আমরা সবাই চূড়ার অন্তিম প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি।

স্তব্ধ নিঃসাড় হয়ে আমরা বসে থাকলাম। চাঁদের আলো কদম গাছের ছায়াটিকে বেদীর সামনে শুইয়ে রেখেছে। করবীঝোপে বাতাস যেন ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে কেটে যাচ্ছিল, শব্দ হচ্ছিল পাতার। আমরা আমাদের ছায়ার নকশা থেকে চোখ তুলে কখন যে শূন্যে দৃষ্টি রেখেছি কেউ জানি না।

পুণ্য উৎসব দিন নন্দনের
এনেছে সংবাদ
এই বহু প্রতীক্ষিত দিন আগের চেয়ে
অনেক বেশী আনন্দের বার্ত্তা বহন করে
এনেছে. কারণ এর আগে
কখনো এই মহান উৎসব
দেশের এমন বৈপ্লবিক উন্নয়নের
পটভূমিকায় অনুষ্ঠিত নি।
দেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৃহত্তম
সংস্থা রেলপথ সব শক্তি নিয়োগ করে
অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় ও স্বনির্ভরশীল
করে তোলার প্রয়াসে নিরত রয়েছে।
তা ছাড়া, বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী ও
তাঁদের ভাবসম্পদের আদান
জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং প্রগতিকে
রেলপথ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
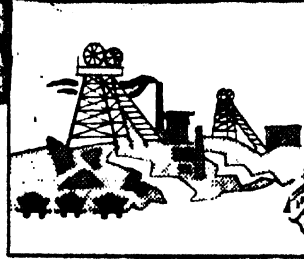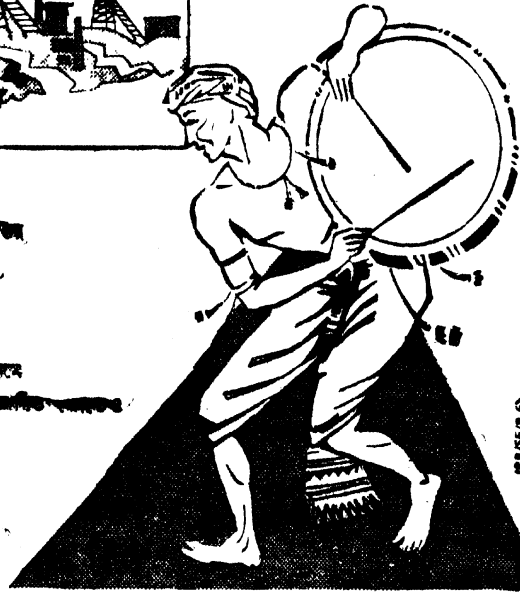
বড়দাই প্রথমে কথা বলল। মার কোলে বড়দাই প্রথম এসেছিল, বড়দাকে দিয়েই মার মাতৃত্ব শুরু, হয়ত তাই বড়দা এই নীরবতা এবং অপেক্ষা প্রথমে ভাঙল, যেমন করে মার সন্তান কামনার অপেক্ষা ভেঙেছিল।

'অনু কিন্তু কথাটা মন্দ বলে নি।' বড়দা ধীরে সুস্থে নরম গলায় থেমে থেমে বলতে লাগল, 'আমরা কেউ মৃত্যুর পরটর বিশ্বাস করি না, তবু ভাবতে ভাল লাগছে আমাদের মা দীনুর গল্পর মতন দীর্ঘ পথ হেঁটে যাবে। আমরা মার জন্যে কে কি দিতে পারি?'

আমরা প্রকৃতপক্ষে ওই একই চিন্তা করছিলাম। মার সেই দীর্ঘ অন্তহীন পথ-যাত্রায় আমরা মাকে কি সম্পদ দিতে পারি?

বড়দা দীর্ঘ করে নিশ্বাস ফেলল; কদম-ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক দণ্ড, তারপর মুখ তুলে বলল, 'কি যে দেব, আমিও ভেবে পাচ্ছি না।' বড়দার গলার স্বর বিষণ্ণ উদাস। বড়দিকে দেখল বড়দা, কাঠচাঁপার বুড়ো গাছটাকে অন্যমনস্ক ভাবে লক্ষ্য করল। 'মার অনেক দুঃখ ছিল, অ-নেক। আমি সব দুঃখর কথা জানি না। একটা দুঃখ জানি, আমায় নিয়ে।'

আমার মনে হল বড়দা ঠিক আমার মতন করেই ভাবছে। এ-সংসারে মা কি পায় নি, কি অভাব তার ছিল, কি পেলে মার সে-অভাব থাকত না, আমরা এখন তাই ভাবছিলাম। মার এই পরবর্তী যাত্রায় আমরা বোধ হয় মাকে সেই জিনিস দিতে চাইছিলাম যা এখানে দিতে পারি নি।

'সে-রকম দুঃখ ত আমার জন্যেও মার ছিল।' ছোট বলল বড়দাকে লক্ষ্য করে।

'আমাদের সবায়ের জন্যেই ছিল।' বড়দা জবাব দিল।

'তাহলে কি আমরা মার হাতে সেই দুঃখগুলো আর দিতে চাই না?' ছোট অসহায়ের মতন শুধালো।

'তা ছাড়া আমরা আর কি দিতে পারি!...' বড়দা ছোটর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চাল কলা জল আমাদের মার দরকার নেই। মাকে যদি আমরা সেই মনের জিনিসগুলো দিতে পারি, এখানে যা পারি নি—মার কাজে লাগবে।' 'কাজ' শব্দটা বড়দা টেনে বড় করে উচ্চারণ করল।

আমি মনে মনে বড়দার কথায় সায় দিলাম। মাকে আমরা অন্য কিছু দিতে পারি না।

'তুই ত জানিস, অনু—' বড়দা বড়দিকে লক্ষ্য করে কথা শুরু করল, 'আমি বিয়ে করি নি বলে মার মনে মনে বড় দুঃখ ছিল। অভিমানও। মার কি সাধ ছিল আমি জানি। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল না।...আমার জন্যে মা মেয়ে পছন্দ করে রেখেছিল, বাবা সেই মেয়েকে আশীর্বাদ করতে যাবে বলে ঠিক করেছিল, আমি অমত করায় আর ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গড়ায় নি।'

'তুমি অমত করলে কেন?' আমি বড়দার ওপর যেন অপ্রসন্ন হয়ে বললাম।

'কেন করলাম—!' বড়দা আমার দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল। পলক ফেলল না। তারপর অতিশয় স্নিগ্ধ হয়ে বলল, 'আমার বন্ধু অবনীর সঙ্গে সেই মেয়েটির ভাব ছিল।'

'তা হলে সন্দেহ?' ছোট যেন বিরক্ত হল।

'না রে, সন্দেহ নয়। মেয়েটিকে অবনী ভালবাসত।' বড়দা শান্ত গলায় বলল, 'মাকে আমি বলেছিলাম। মা বলেছিল, কিন্তু কনক যে অপরূপ সুন্দরী। এ-মেয়ে এলে আমার বংশধররা কত সুন্দর হবে ভেবে দেখ।' কয়েক দণ্ড থেমে বড়দা যেন মার সঙ্গে তার সেই কথপোকথন স্মরণ করল, তারপর বলল, 'আমি সৌন্দর্য ভালবাসি, কিন্তু ভালবাসা আরও বেশী ভালবাসি।' অনেকক্ষণ আর কথা বলল না। বেদীর দিকে তাকিয়ে থাকল। 'মা এই কথাটা কেন যে বুঝল না!' বড়দা আক্ষেপের গলায় বলল, মনে হচ্ছিল তার কোনো পুরনো প্রদাহ সে আজ অত্যন্ত ব্যথার সঙ্গে আবার অনুভব করছে। অনেকটা সময় চুপ করে থেকে বড়দা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলল, মৃদু গলায় টেনে টেনে বলল, 'আমি মাকে আমার সেই ভালবাসার মন দিতে পারি।'

বড়দা নীরব হলে সাদা বেদীটার গায়ে চাঁদের আলো ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে মলিন হল সামান্য।

আমরা নির্বাক বসে থাকলাম। চৈত্রের বাতাস করবী ঝোপের তলা থেকে ধুলোর গুঁড়ো এনে মাখিয়ে গেল। রাস্তা দিয়ে একটা টাঙা যাচ্ছে, টাঙাঅলার পায়ে-টেপা ঘণ্টি বাজছিল। কদম গাছের ছায়া একটু যেন হেলে গেছে।

'তা হলে আমিও বলি—' বড়দি বলল। বড়দার পর বড়দিরই বলার কথা। আগে বড়দি দিশেহারা হয়ে বলেছিল, সে কি দেবে জানে না; এখন বড়দার কথার পর বড়দি মন স্থির করতে পেরেছে।

বড়দি কি দেয় শোনার জন্যে আমরা সকলে মুখ তুলে তার দিকে তাকালাম। জ্যোৎস্না আবার স্পষ্ট হয়েছে। চন্দ্রকিরণে বড়দিকে রেশমের মতন নরম মসৃণ দেখাচ্ছিল। হাঁটু ভেঙে একপাশে হেলে বসেছিল বড়দি, তার হাতে সরু দু-গাছা করে সোনার চুড়ি, সাদা হাতে মিনের কাজের মতন চুড়ি দুটো চকচক করছিল।

অল্প সময় ইতস্তত করে বড়দি বলল, 'আমি অমন করে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি বলে মা কোনোদিন খুশী হয়নি। তুই ত জানিস দাদা, মা তোকে কতবার সেই লোকটার কাছে যেতে বলেছে। কেন বলত! বলত যাতে তুই তাকে ভুলিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আনতে পারিস।' সোজা হয়ে বসে নিল বড়দি, বাঁ হাত গলার কাছে নিয়ে গিয়ে তার মটর হারে আঙুলে রাখল। 'বাবাকেও মা বুঝিয়েছিল, আমি ওখান থেকে চলে এসে ভুল করেছি, অন্যায় করেছি। বরং চেপে বসে থাকলে তাদের জামাইকে শুধরে নিতে পারতাম।...মা আমায় বলত, এই তেজ দেখিয়ে তুমি তোমার ক্ষতি করলে। সারা জীবন পুড়বে।'

'তুমি ত আজও মাঝে মাঝে কাঁদ, বড়দি।' ছোট আচমকা বলল।

বড়দি ছোটর দিকে তাকাল। ভাবল যেন। বলল, 'কাঁদি—'; আস্তে মাথা নাড়ল বড়দি, 'কাঁদি, মা কেন আমায় আবার বিয়ে করতে বলল না।'

'তোমার কি আবার বিয়ে করার সাধ ছিল?' আমি অবাক হয়ে বড়দিকে দেখছিলাম।

'হ্যাঁ, মা বাবা যদি বলত, আমি আবার বিয়ে করতাম।......চামড়ার ব্যবসাদার সেই লোকটাকে ত্যাগ করে এসে আমি শুধু নিজেকে বাঁচিয়েছিলাম, কিন্তু আমার দরকারটুকু ত পাই নি।'

'তোমার আবার বিয়ে করা খুব সহজ ছিল না, বড়দি।' ছোট বলল।

'না হয় কঠিনই ছিল। তাতে কি!...' বড়দি যেন দ্বিধা বোধ করে থামল, তারপর বলল, 'সংসারে এমন মানুষ ছিল যে আমায় বিয়ে করত।...মার সাহস হল না।...একদিন আমি মাকে বলেছিলাম, রোগ নোঙরামি কষ্ট সব সহ্য করি তাতে তোমার আপত্তি নেই; আপত্তি সুখ পাবার ব্যবস্থা করতে। মা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল, বলেছিল—এ-বাড়ির মর্যাদা নষ্ট হোক এমন কিছু করতে আমি দেব না।...মা মর্যাদা চাইত, আমি সাহস চাইতাম।' বড়দি সামান্য থামল, তার সমস্ত শরীর রেশম দিয়ে মোড়া সাজানো পুতুলের মতন দেখাচ্ছিল, ভাঙা হাঁটু, মাটির ওপর ভর করা হাত; নিশ্বাস ফেলে বড়দি বলল, 'মাকে আমি মানুষের উচিত সাহস দিতে পারি নি। মা যেন সেই সাহস পায়।'

কথা শেষ করে বড়দি আকাশের দিকে চোখ তুলল। আমরা স্তব্ধ। চৈত্রের বাতাস এসে কদমের কয়েকটি শুকনো পাতা ফেলে গেল, চাঁদের আলোয় একটা কাঠবেড়ালি কাঠচাঁপার ডাল বেয়ে এগিয়ে এসে আবার ছুটে পালাল।

বেদীর কুলুঙ্গির মধ্যে প্রদীপটা অকম্পিত জ্বলছে। ধুপধুনো ফুরিয়ে গেছে। আমরা আর গন্ধ পাচ্ছিলাম না।

এবার মেজদার পালা। আমরা মেজদার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। মেজদা কিছু বলছিল না।

ছোট মেজদার গায়ে হাত দিল। 'মেজদা—তুমি?'

মেজদা মাথা নাড়ল। 'এখনও কিছু ভেবে পাই নি। তোরা বল। তুই বল, ছোট।'

ছোটর স্বভাবই আলাদা। তার অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবনা নেই। ছোট একবার প্রদীপের দিকে তাকাল, একবার আকাশের দিকে। খুক খুক করে কাশল ক'বার, তারপর বলল, 'এত অল্প বয়সে আমার এমন একটা বিশ্রী অসুখ করল বলে মা বেচারী বড় কষ্ট পেয়েছিল। ভাবত, আমি আর বাঁচব না। আমিও প্রথম প্রথম সেই রকম ভেবেছি। মা বলত, তুই নিজে ইচ্ছে করে এই অসুখ বাধালি। কী বোকার মতন কথা বল ত, বড়দি। অসুখ কি কেউ ইচ্ছে করে বাধায়—! না অসুখে সুখ আছে—!' এক দমকে কথা বলছিল ছোট, বলতে বলতে থামল; মনে হল সে কোনো কিছু না ভেবেই কথা শুরু করেছিল, তারপর খেই হারিয়ে

ফেলেছে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। আমরা চুপ করে থাকলাম। ছোট একটু যেন অপ্রস্তুত হল। মাথার বেণী বুকের কাছে টেনে আঙুলে জড়িয়ে দু-চার বার দোলালো। ছোটর গায়ে হালকা রঙের একটা শাড়ি, গায়ে অর্ধেক-হাত জামা। ছোটর কপাল ছোট; দু-পাশের চুল তার প্রায় সবটুকু কপালই ঢেকে ফেলেছে। নাকটি লম্বা; চোখ দুটি খুব কালো। ছোটর হঠাৎ থেমে যাওয়া, হঠাৎ অপ্রস্তুত বোধ করা এবং এই আপাত চাঞ্চল্য থেকে মনে হল ছোট যেন খেই খুঁজে নেবার চেষ্টা করছে।

আরও একটু সময় নিল ছোট। সে তার কথা খুঁজে পেল। বলল, 'অসুখ কেউ ইচ্ছে করে বাঁধায় না, অসুখে সুখ নেই—তাও ঠিক। তবু আমি এই অসুখে পড়ে একটা সুখ পাচ্ছিলাম।...তুমি ত জানো বড়দি, অসুখের সময় আমার বন্ধুটন্ধুরা খোঁজ খবর নিতে আসত। বেশী আসত সুশান্ত, প্রায় রোজই। অনেকক্ষণ থাকত। আমায় ভোলাবার চেষ্টা করত, বলত, এ

অসুখ কিছু নয়, কিছুই না।...মা কেন জানি এটা পছন্দ করত না, একেবারেই নয়।' ছোট তার দীর্ঘ বেণী কাঁধের ডান পাশে রাখল, আকাশের দিকে তাকাল আবার, তাকিয়ে থাকল, বলল, 'একদিন মা আমার সামনেই সুশান্তকে বলল, তুমি ত ডাক্তার নও; কেন অযথা ও-সব কথা বল। ওকে বকিয়ো না, বিরক্ত করো না।...সুশান্ত তারপর থেকে আর আসত না। আমি মাকে বলেছিলাম, অকারণে তুমি ওকে অপদস্থ করলে। মা বলেছিল, ওরা আমার অনেক করেছে, তোমায় মাতিয়ে এই অসুখ দিয়েছে। তা দিক, আর আমার সুখ দরকার নেই।' ছোট আকাশ থেকে চোখ নামাল, তার গলা পাতলা, কাঁপছিল, চোখ যেন একটু চিকচিক করছে। ও বলল, 'মা আমার অসুখটাই দেখেছিল, সুখ দেখে নি। মা জানত না, জগতে সব রোগ কেবল ডাক্তার দিয়ে সারানো যায় না। আশা পাওয়া অনেক; ভরসা পাওয়ার কত শক্তি...' ছোট আমার দিকে তাকাল, 'আমি মাকে আর কিছু দিতে পারি না, মন ছাড়া, আশা ছাড়া ভরসা ছাড়া। মা যেন তার মনে ভরসা পায়।'

ছোট নীরব হল। মার বেদীতে কদম ছায়া উঠে এসেছে। বড়দার পাশ দিয়ে ছায়াটা বড়দির কোলে গিয়ে বসেছে। বাতাবি লেবুর গাছটা অনেক দূরে। তার মাথার ওপর দিয়ে ভাঙা দেওয়ালের ফাঁকে রেল লাইনের বাতি চোখে পড়ছিল আমার। দশরথ ধোপার কুঠিতে ওরা গান গাইছে। গত সপ্তাহে দশরথের ছেলের বিয়ে হয়েছে, আজও থেকে থেকে সেই আনন্দের লহরী তোলে তারা।

খুব যেন ক্লান্ত হয়ে ছোট তার মাথা আমার কাঁধে রাখল। বলল, 'কড়ি, এবার তোর পালা—'

বড়দা বড়দি আমার দিকে তাকাল। মেজদা তার অন্ধ চোখ অনুমানে আমার দিকে ফিরিয়ে রাখল। সহসা অনুভব করলাম, ওরা আমার হৃদয়ে লুকোনো মার ছবি দেখার জন্যে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে আছে। আমার ভয় করছিল। কাঠগড়ায় দাঁড়ানো কোনো সাক্ষীর বোধ হয় জবানবন্দী দেবার সময় এই রকম ভয় হয়।

এই মুহূর্তে সকলই স্তব্ধ। চৈত্রের বাতাসও শান্ত হয়ে আছে। দুধের ফেনার মতন জ্যোৎস্নায় আমার চারটি উৎকর্ণ আত্মীয় নিষ্পলকে আমায় দেখছে। বড়দার দিকে তাকিয়ে আমি কথা বলার আয়োজন করছিলাম। বড়দার পাশ দিয়ে বেদীর কুলুঙ্গিতে প্রদীপ চোখে পড়ছিল। শিখাটি স্থির। মার চোখের মতন শিখাটি যেন আমায় লক্ষ্য করছিল।

'ভেবে পাচ্ছি না—' আমি বললাম। আমার মন স্থির নয়, নিঃসংশয় নয়। দ্বিধার গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে আমি বললাম 'কখনও মনে হচ্ছে অনেক কিছু যেন দেবার আছে, আবার মনে হচ্ছে কিছু নেই।...আমি সব চেয়ে ছোট বলেই মা আমায় তার শেষ গচ্ছিত ধনের মতন করে সরিয়ে রেখেছিল। মানুষ যেমন করে সিন্দুকে অবশিষ্ট অলংকার তুলে রাখে অনেকটা সেইরকম। ব্যবহার করত না, দেখত না।' কথা বলার সময় ক্রমশ আমার মনে হচ্ছিল আমি ভয় কাটিয়ে উঠতে পারছি না। গলা কাঁপছিল তখনও, তবু আমার স্বর স্পষ্ট হয়ে এসেছে অনেকটা। 'তোমরা মাকে যত পেয়েছ, যেমন করে পেয়েছ, আমি পাইনি। আমায় মা আমাদের সংসারকে তেমন করে বুঝতে

দেয় নি। ভাবত, আমার এ-সবে দরকার নেই।...কিন্তু আমি মাকে 'দেখেছি।...একবার মার সঙ্গে আমায় কাশী যেতে হয়েছিল। তোর মনে আছে ছোট, বাবা মারা যাবার পর, মা একবার আমায় নিয়ে কাশী গিয়েছিল পনেরো বিশ দিনের জন্যে। তোরা ভেবেছিলি মার মন ভাল নয়, বাবার অভাবে মা বড় কাতর—তাই মা কটা দিন তীর্থের জায়গায় মন জুড়িয়ে আসতে গেছে। হয়ত খানিকটা সেই উদ্দেশ্যেই মা গিয়েছিল, কিন্তু সবটা নয়।...' আমার গলা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, আমি আর ভীত হচ্ছিলাম না;

আমার মনের সামনে সব স্থির হয়ে গিয়েছিল, যা খোঁজার আমি যেন তা পেয়ে গিয়েছিলাম। প্রদীপশিখাটি শেষ বারের মতন দেখে আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মেজদাকে দেখছিলাম। 'কাশীতে বাবার এক বন্ধু থাকত। আমি কখনও তার নাম শুনি নি—'

'শচীন জ্যেঠামশাই?' বড়দা বলল অবাক হয়ে।

'হ্যাঁ। তুমি তাহলে জানো!'

'জানি বই কি। শচী জ্যেঠাকে আমি কতবার দেখেছি। তুইও দেখেছিস, অনু।'

'দেখেছি।' বড়দি মাথা নাড়ল।

'বাবার সঙ্গেই ব্যবসা করত। তারপর কি হয়, আলাদা হয়ে গেল। পরে আর আমি শচীজ্যেঠার কথা শুনি নি।'

'নানা জায়গায় ঘুরে শেষে তিনি কাশীতে গিয়েই শেষ জীবন কাটাচ্ছিলেন।' আমি বললাম। বলার সময় শচীন জ্যেঠামশাইয়ের কাশীর সংসার আমার চোখে ভাসছিল, স্পষ্ট অনাবৃত। 'বাঙালীটোলার অন্ধকার গলিতে নরকের মতন ছোট ছোট খুপরির ঘরে ওঁরা থাকেন; উনি স্থবির হয়ে পড়েছেন, স্ত্রী শ্বাসরোগে শয্যাশায়ী, বড় ছেলে হোটেলের গাইডগিরি করে, দুটি মেয়ে—একটির পা খোঁড়া হয়ে গেছে টাঙা থেকে পড়ে, অন্যটি কোন বাড়িতে যেন রান্নাবান্নার কাজ করে দেয়। ছেলের বউ মারা গেছে দুটি বাচ্চা-কাচ্চা রেখে।...কাশীর সেই অন্ধকার সরু নোংরা পাতকুয়োয় একটি অসহায় পরিবার গলা পর্যন্ত ডুবে। মা গিয়েছিল সেখানে বাবার পুরোনো কোন ব্যবসায় শচীনজ্যেঠা কবে কাগজপত্রে বাবার অংশীদার ছিল সেটা নাকচ করিয়ে আনতে। উনি সে-কথা মনেও রাখেন নি, মনে রাখার কথাও নয়। তবু মা আইনে ফাঁক রাখতে রাজী নয়। কে জানে কবে এই গর্ত খুঁড়ে সাপ বেরুবে না।...একশো টাকার দু'খানা মাত্র নোট মা শচীন-জ্যেঠার হাতে দিয়ে সেই পুরোনো অংশীদারী বাতিল করিয়ে নিল।...আমি মাকে বলেছিলাম, তুমি ত অনেক আগেই এটা ও'দের ছেড়ে দিতে পারতে মা। বাবাও ত কাঠের ব্যবসাটা আর করত না।...জবাবে মা বলেছিল, তুমি ছেলেমানুষ, বিষয়-আশয়ের কিছু বোঝ না। ওই ব্যবসা অন্যের তদারকিতে দেওয়া আছে, বছরে হাজার দুয়েক টাকা বাড়িতে আসে। টাকাটা আমি অকারণে খোওয়াব! অত স্বার্থত্যাগ আমি শিখি নি।' আমার গলার শিরা যেন কেউ আঙুলে জড়িয়ে জড়িয়ে টানছিল, সেই যন্ত্রণায় আমি কিছুক্ষণ আর কথা বলতে পারলাম না; আমার সামনে পিচুটিভরা শচীন-জ্যেঠার চোখ দুটি ভাসছিল, কী দুর্গতি তাঁর। 'মা স্বার্থত্যাগ জানত না।' আমি চাপা গলায় বললাম, 'মা দীন ছিল, মার মন কৃপণ ছিল।...আমায় যদি কিছু দিতে হয় আমি মাকে স্বার্থত্যাগ দেব। আর কিছু না। কিছু নয়।'

আমি নীরব হলে বৃন্দাবনের কদম গাছ তার ছায়া আরও দীর্ঘ করল। বড়দির বুকে সেই ছায়া দেখলাম। কয়েকটি খড়কুটো এল দমকা বাতাসে। দশরথ ধোপাদের বস্তিতে গানের সুর থেমে গেছে। একটি রাত্রিগামী ট্রেন সাঁকোর ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে হুইসল দিচ্ছে পথের জন্যে। ধ্বনিটা ক্ষীণ হয়ে এখানে ভেসে আসছিল।

মেজদা কিছু বলে নি। এবার বলবে। মেজদার পালা ফুরোলে আমাদের পাঁচটি আঙুলই গুটিয়ে যাবে।

আমরা কেউ কোনো কথা না বলে মেজদার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মেজদা কিছু বলছিল না। মেজদা শূন্যে পানে মুখ তুলে রেখেছিল। আমরা অপেক্ষা করছিলাম। অধীর উৎকণ্ঠিত সেই অপেক্ষা দীর্ঘ মনে হচ্ছিল।

'দীনু—' বড়দা মেজদাকে ডাকল।

মেজদা স্থির, শান্ত। যেন আকাশের দিকে তার অন্ধ চোখ মেলে সে হৃদয় দিয়ে মাকে দেখছে।

'দীনু—' এবার বড়দি হাত বাড়িয়ে মেজদার গা স্পর্শ করল।

মেজদা তবু পাথরের মতন বসে। তার নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না বোঝা যাচ্ছিল না।

ছোট ডাকল, 'মেজদা।'

আমি হাত দিয়ে মেজদার গা স্পর্শ করে বললাম, 'মেজদা, এবার তোমার পালা।'

মেজদা সামান্য নড়ল। আকাশের দিকেই তার মুখটি তোলা, অমন জ্যোৎস্না তার সমস্ত মুখে লিপ্ত করেছে, তার দুই অন্ধ নয়ন নিবিড় করে সেই আলো মাখছিল।

মেজদা তার সাদামাটা মেঠো সুরেলো গলায় বলল, 'সৎকার শেষ হয়ে গেলে মানুষ আর কি দিতে পারে! তোমরা মার সৎকার শেষ করেছ। আমার কিছু দেওয়ার নেই।' কয়েক দণ্ড থামল মেজদা, তারপর বলল, 'আমাকে যেমন একটা নির্বোধ সুটকেশঅলা অন্ধ করে দিয়ে গেল, তেমনি মাকে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল।...মা যে কত অন্ধ আমি জানতাম।...এই অন্ধ চোখ মাকে আর দিতে ইচ্ছে করে না। মা আমার হৃদয়ের চক্ষু পাক।'

মেজদা আর কিছু বলল না। কাশীর সাদা পাথরে বাঁধানো মার বেদীর ওপর আমরা পাঁচটি সন্তান বসে থাকলাম। শব্দ-হীন সেই চরাচরে বসে অনুভব করলাম, আমাদের মার সৎকার যেন এই মাত্র সমাধা হল।

সর্বগ্রাস এই দুঃখেও আমরা মার নির্বিঘ্ন যাত্রা কামনা করছিলাম। আমাদের যা দেবার সাধ্যমত দিয়েছি। **মা সেই অন্তহীন পথ অতিক্রম করুন।**

—কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

টগর আর একবার জিজ্ঞেস করল। সন্দেহ আর বিদ্রূপ, দুই-ই আছে ওর গলায়।

—কথা না বলে, চুপচাপ চল।

কেদারের মোটা চাপা গলা আক্রোশে ফুঁসে উঠল।

টগরের ঠোঁটের কোণে একটি রেখা বেঁকে উঠল। চলতে চলতেই অপাঙ্গে আপাদ-মস্তক দেখল একবার কেদারের। মুখের মধ্যে চর্বিত পানের সুপুরি-কুচি বোধ হয় তখনো ছিল। তাই হয় তো দাঁতে দাঁতে কাটার শব্দ হল কুট্ করে।

জল কাদা ছিটকে গেল কেদারের পায়ের চাপে। একটা অস্ফুট শব্দ উচ্চারিত হল তার গলায়।

রাস্তাটা খারাপ। বহুদিন মেরামতের অভাবে নানান জায়গায় আলকাতরার প্রলেপ উঠে গিয়েছে। খানে খানে গর্ত হাঁ করে আছে। আলোর অবস্থাও শোচনীয়। সব-গুলি জ্বলছে না। যেগুলি জ্বলছে, সেগুলিও ছানি পড়া চোখের মত জ্যোতি-হীন। কলকাতার একেবারে পায়ের কাছে, উত্তর উপকণ্ঠে, এ অঞ্চলটাও শ্রীহীন, দরিদ্র। যেন একটা চিরদুর্ভাগ্যের অভিশাপে, টালি, খোলা, টিন, জীর্ণ দেওয়াল, কাঁচা কানা-গলি, খানা খন্দ, সব নিয়ে একইভাবে, অপরিবর্তনীয় অবস্থায় পড়ে আছে।

যদিও মাত্রই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, তবু আকাশে মেঘের ঘটাই লোক তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে রাস্তা থেকে। কালো মেঘ, ভারী জমাট, গোটা আকাশটাকে ঢেকে যেন একটা মন্ত্র-স্তব্ধতায় থমকে আছে। চুপ করে আছে, এবং কোথাও থেকে, কোনো অদৃশ্য থেকে, খাঁপস চোখে তাকিয়ে রয়েছে পৃথিবীর দিকে। আর বাতাসকেও সে-ই বাঁধ দিয়ে আটকে রেখেছে কোনো দূর অন্ধকারের শূন্যে, এমনি একটা ভাব। কেবল মাঝে মাঝে বায়ু কোণে ক্রুদ্ধ কটাক্ষের এক একটা ঝিলিক হেনে উঠছে। '—আমি আসছি!' যেন বলছে, আর তার পূর্বলক্ষণ হিসাবে ভ্যাপসা পচা গুমসোনির গ্লানি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ওরা দুজনে সামনের দিকে তাকিয়ে চলেছে। দুজনেই চুপ।

কেদারের [illegible] একটা গেঞ্জি। মাপের থেকে ছোট, ছেঁড়া পুরনো একটা খাকী প্যান্ট। খালি পা। মাথায় চুল কম। পাতলা চুলগুলি উসকোখুসকো। সপ্তাহ দুয়েকের গোঁফ-দাড়ি মুখটাকে বড় করে দিয়েছে। রাগে ও উত্তেজনাতেও বোধ হয় মানুষের মুখ বড় দেখায়।' রাগ এবং উত্তেজনার থেকেও আর কিছু ছিল কেদারের মুখে। হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতা। চাপা মোটা ঠোঁট, শক্ত চোয়াল, নিষ্পলক জ্বলন্ত চোখ। সাঁড়াশীর মত শক্ত হাতের থাবা থেকে থেকে মুঠো পাকাচ্ছে, খুলছে।

আর তার কাঁধ সমান টগর। টগরের কাজল মাখা চোখেও দৃষ্টি অপলক। ভ্রু ঈষৎ কোঁচকানো। পান খাওয়া ঠোঁট দুটি লাল। মুখে একটু হিমানীর প্রলেপও আছে। কপালে কুমকুমের টিপ। চোখ মুখের বিচারে প্রশংসা করবার মত কিছু নেই। কিন্তু একটা চটক আছে। একটা ভঙ্গি, একটা ছাঁদ, সব মিলিয়ে হঠাৎ একটা ফুটন্ত ফুল ফুল। কী ফুল, তার বিচারে যেয়ো না। সেই চটকটাই শরীরের বাঁধুনিতেও বিদ্য-মান। চোখে পড়ার মতো। যেমন শাড়ির [illegible]

উচ্ছ্রিত, বৃত্তাকারে বাঁকা। চলার করে উত্তরণ।

সাদায়-সবুজে ডুরে শাড়িটা ফর্সাই। বেগুনী রংএর জামাটাও গায়ে খুলেছে। গায়ের রংটা মাজা মাজা, তাই। আর এ সবই সদ্য, বোঝাই যাচ্ছে। এই কাজল হিমানী পান শাড়ি, এর কোনো কিছুই অনেকক্ষণের নয়। এ সবই যখন অংগে তুলছিল, মাখছিল টগর, তখনই কেদার চোয়াল শক্ত করে, চোখ খাবলার মতো তাকিয়ে দেখছিল। এই খানিকক্ষণ আগে মাত্র। ভাঙা আয়নাটা বেড়া থেকে তুলে, টগর মুখটা দেখছিল। তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, কেদারের ভাবসাব সে লক্ষ্য করছে। সামান্য একটু অস্বস্তির ছায়া মুখে পড়েছিল কিনা ধরা যাচ্ছিল না। কিন্তু ঠোঁটের কোণ্‌ একবার বেঁকে উঠেছিল টগরের। তারপর উল্টে, জিভ দিয়ে চেটে বিম্বোষ্ঠা হয়েছিল। ভ্রূ টেনে, টিপটা লক্ষ্য করেছিল, ঠিক মাঝখানেই এঁকেছে। দেখে, আয়নাটা রেখে, সেই গুহা, হ্যাঁ ঘরটা গুহার মতোই নীচু, লম্বায় চওড়ায় ছ' হাত বাই তিন হাত, উচ্চতায় তিন চার ফুট হতে পারে, সেই গুহার ভিতর থেকে হামা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। লম্ফর আলোয়, তার ছায়ার আড়ালে, দু' বছরের ছেলেটা ঘুমোচ্ছিল। টগর বেরিয়ে যাবার পর, ছেলেটাকে দেখা গিয়েছিল।

টগর বেরিয়ে যেতেই, কেদার একবার তাকিয়ে দেখেছিল ছেলেটার দিকে। তারপর ডেকে উঠেছিল, দাঁড়াও। আমার সঙ্গে যাবে।

ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝামাঝি গলায় জিজ্ঞেস করেছিল টগর, কোথায় ?

কেদার বেরিয়ে এসে, ঘরের মুখে ঝাঁপ টেনে দিতে দিতে বলেছিল, যেখানে যেতে বলি, সেখানেই।

তখনই কেদারের চাপা মোটা গলায় একটা ভয়ংকর নিষ্ঠুর সুর বেজে উঠেছিল। টগরের বুক কিংবা কাঁধের ওপর নিবদ্ধ চোখ দুটো হিংস্রতায় জ্বলছিল কেদারের।

টগর কিন্তু ফিরে তাকায় নি। তার মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছিল। নিষ্ঠুরতা কিংবা হিংস্রতা সেটা নয়। একটা দৃঢ় কঠিন পণে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, দূর অন্ধকারের দিকে স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে, এক মুহূর্ত চুপ করেছিল। যেন একটা কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। তারপর স্পষ্ট নিচু গলায় বলেছিল, ছেলেটা ?

—ঘুমোক।

—উঠে পড়লে ?

—লোকে দেখবে।

তা লোক ছিল। ফুটপাতের ওপর, লম্বা পাঁচিল ঘেঁষে লাইনবন্দী খুপরি। প্রতি খোপেই লোক। এক একটা পুরো পরিবার, এক একটা খোপে। হোগলা গোলপাতা, ছেঁচা বেড়া, টিনের টুকরো, নানান
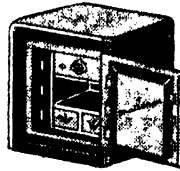
জাড়াতালিতে খুপরিগুলি তৈরী। একদা এরা রিফ্যুজি ছিল। এখন কী, তা নিজেরাই হয় তো ভুলে গিয়েছে।

টগর বলেছিল, চল।

কেদার পা বাড়িয়েছিল। দুজনের কেউ-ই ছেলেটার জন্যে কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করে নি। কেবল, কয়েক পা এগিয়েই, টগর যখন বাঁদিকে মোড় নিতে যাচ্ছিল, তখনই কেদার চাপা স্বরে গর্জে উঠেছিল, বারো খোপের কবুতরি! ওদিকে না, এদিকে।

টগর একবার ঠাণ্ডা তীক্ষ্ন নিষ্পলক দৃষ্টিতে কেদারের জ্বলন্ত চোখের দিকে তখন তাকিয়েছিল। সারা পথে সেই একবারই চোখে চোখ মিলেছিল ওদের। একবার, খুব সূক্ষ্মভাবে, তখন একবার বোধহয় টগরের চোখের কোণ দুটি কুঁচকে উঠেছিল। আর নাকের পাশে, ঠোঁটের কোণে, রেখা একটু গাঢ় হয়েছিল। যাতে সম্ভবত একটা বিদ্রূপের আভাসই ছিল। আর ঘৃণা, হ্যাঁ ঘৃণাও ছিল বোধহয়। এবং ঈষৎ সন্দেহের স্পর্শ।

সেই পথ ধরেই, দুজনে এ পর্যন্ত এসেছে। হয়তো, কেদার ভেবে বেছে, সমস্ত পথটাই এরকম অন্ধকারময় দুর্ভাগা অঞ্চলের ওপর দিয়ে চলেছে। বড় রাস্তায় একবারও পড়ে নি। কিংবা, তার গন্তব্যের এই হয়তো রাস্তা।

এবং তখন থেকেই, দুজনের এই একই রকম ভাব। কোনো পরিবর্তন হয়নি। একজন যেন রাগে, হিংস্রতায় ভিতরে ভিতরে অস্থির, নিষ্ঠুর। আর একজন কঠিন, ঠাণ্ডা। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, টগরের থমথমে কাঠিন্যের মধ্যেও একটা দপদপে আগুন-চাপা ভাব। তবু, হঠাৎ একটা সন্দেহ তার ভ্রূ জোড়া কাঁপিয়ে দিল। শ্লেষের একটু খোঁচা মিশিয়ে কথাটা বলল। আর কেদারের জবাব শুনে, হঠাৎ টগরের পদক্ষেপই যেন দ্রুত হয়ে উঠল। কেদারের পায়ের চাপে জল কাদা ছিটকে গেল।

মেঘ গলছে না। জমাট বেঁধেই হয় তো একটু একটু করে নামছে। কারণ, অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে আসছে। বায়ু-কোণের অস্পষ্ট চিকুরহানা ঝিলিক স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর রাস্তাটা যেন এঁকে বেঁকে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। অঞ্চলটাই হয়তো নিচু। কারণ প্রায়ই এখানে সেখানে বর্ষার জল জমে রয়েছে। নর্দমা-গুলিও কাঁচা। তার থেকে নোংরা জল উপচে উঠেছে।

এ সমস্ত অঞ্চলটাই যেন পৃথিবীর
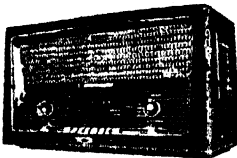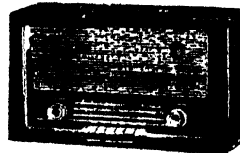
বাইরে। এই অস্পষ্ট, আবছা, ছায়াময়, বাতাসহীন পরিবেশ। অধিবাসী এবং পথচারীরা যেন ঠিক মানুষ নয়। কতগুলি ছায়া। ছায়াগুলি কিম্ভূত। কেউই স্পষ্ট ভষায় কথা বলছে না। অস্পষ্ট, ভাঙা ভাঙা, চুপিচুপি, নানান রকমের মিশ্রিত গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে এক একটা ভারী মোটর ট্রাক, সগর্জনে লাফাতে লাফাতে, আলোর ঝলক বিঁধিয়ে, পিছন থেকে এসে সামনের দিকে দৌড়ুচ্ছে। গাড়িগুলি আবর্জনা ভরতি।

টগরের ভ্রূ আর একবার কেঁপে উঠল। ঠোঁট নড়ল। নত চোখের কোণ্ দিয়ে একবার কেদারের হাত পা কোমরের দিকে দেখল। কিন্তু কিছু বলল না। আবার ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগল। খসে যাওয়া ঘোমটা তুলে দিল। টুং টাং করে বেজে উঠল লাল নীল বেলোয়ারি চুড়ি।

কেদারের ভাবান্তর অবিশ্যি কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। চুপচাপ, গম্ভীর এবং সব সময়েই যেন কী ভাবছে। সেই গুহাটার মধ্যে, কালো কঠিন থ্যাবড়া হাত পাগুলি গুটিয়ে, একটা কোণ্ নিয়ে বসে থাকছিল চুপচাপ। টগরের সঙ্গে কথাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল।

সারাদিনে যা-ও বা দু' চারটে বলছিল, সন্ধেবেলা একেবারেই মুখে খিল। একটা ভয়ংকর আক্রোশে, প্রায় সাপের মতো ঘাড় কাত করা অপলক চোখে যেন টগরের বেশ-ভূষা বদলানো দেখছিল।

ওই সময়েই টগর সারাদিন পরে লুটি লুটি ধুলি ধুলি ন্যাকড়াটা গায়ের থেকে খুলত। আর এই জামা কাপড় পরত। এই কাপড়টা, এই জামাটা। পুরনো বিবর্ণ একটা শায়া পরত তখন, আর একটা 'বডি'। টগর ওটাকে তাই বলে। যেটা প্রথম বুকে আঁটতে ওর লজ্জা করেছিল। কেমন একটা অসভ্যতা বলে মনে হত। মনে মনে বলত, ছি! এ আবার কি! কেদারের চোখ দেখেই বুঝতে পারত, ওটা পরলেই, বউয়ের দিকে সে ক্ষুধাতুর চোখে চেয়ে থাকে। বলে, কেমন বেশ দেখায়।

পরে টগর মেনে নিয়েছিল। সারাদিন নয়, সন্ধ্যাবেলার সময়ের জন্যে। সন্ধ্যাবেলায় জামাকাপড় পরে সাজত টগর। কাজল হিমানী মাখত। কপালে টিপ দিত। পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করত। কেদার বসে বসে দেখত। সারাদিন নানান উঞ্ছবৃত্তি করে, সামান্য রোজগারের ধান্দা করে এসে, বসে বসে দেখত। সরকারি ডোল বন্ধ হয়েছে কয়েক মাস। তার আগে, কয়েক বছর ধরেই কেদার অনেক রকম কাজের ধান্দা করেছে। কিন্তু, কিছু পায় নি। কাছেই যে বাজারটা আছে, সেখানেই ঝাঁকা মুটে, বাজারওয়ালাদের মাল খালাস, এ সব ছাড়া কিছু জুটিয়ে

উঠতে পারল না। এবং এসব কোনোদিন করতে হবে ভাবেনি। করেও, দুটো পেট চালানো দুরূহ। পেট তো সরকারী ডোলেও চলছিল। কিন্তু মানুষ নামের পরিচয়টা ভুলে যেতে হচ্ছিল। যেতে হচ্ছিল নয়, ভুলেই গিয়েছে বা।

সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল টগরের। নমশূদ্রদের ঘরে যেরকম হয়ে থাকে। তেরো বছর তখন কেদারের। বিয়ের দু' বছর পরে দেশ ভাগাভাগি। তার তিন বছর পরে এ দেশে এসেছিল। তখন কেদারের বাপ মা ভাই-ভাজেরা ছিল। তারপরে বাপ-মা মারা গিয়েছে। ভাইয়েরা কে কোথায় ছিটকে গিয়েছে। কেদার টগরকে নিয়ে আরো অনেকের সঙ্গে শহরের এ তল্লাট কামড়ে পড়ে রয়েছে। তাও আট বছর হয়ে গেল।

এই পৃথিবীতে মানুষেরা যা-ই করুক, প্রকৃতি তার নিয়মেই চলে। গ্রীষ্ম আসে, বর্ষা আসে, সূর্য একটা অয়নবিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে ফিরে যায়। ঠিক তেমনি, দাঙ্গা, দেশভাগ আর দেশ ছেড়ে পথে, পথের কূলায়, একদা কেদার যুবক হল, আর টগর যুবতী। এবং একদা ওরা দুজনেই আবিষ্কার করল, দুজনের একটা খোপ না হলে চলে না। সেই আবিষ্কারের প্রথম ফল, একটি মেয়ে, জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মরেছিল। পরের ফল ছেলেটা এখনো বেঁচে রয়েছে।

তারপরেই তো এল সেই সাজার পালা। টগর সাজত, কেদার বসে বসে দেখত। প্রায় ছ' মাস ধরে এই চলছে।

প্রথম টগর আপত্তি করেছিল। —না। ছি!

কেদার হেসে বলেছিল, আ রে! দ্যাখ মেয়েমানুষের বুদ্ধি! শুধু টোপ দেখিয়ে যদি মাছ ধরা যায়—।

টগর বলে উঠেছিল, না।

তখন কেদার বলেছিল, এইটুকুতে আপত্তি? একবেলা খাই, টগর তোর প্রাণে একটু দয়া মায়া নেই?

কথাটা লেগেছিল প্রাণেই। তাকে দয়া-মায়ার খোটা দেয় কেদার! আজকের মতোই এমনি ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, কেদারের মুখের দিকে তাকিয়েছিল টগর। তারপরে কেদারের শরীরের দিকে। হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলে ভাঙা আয়নাটা তুলে, টগর নিজের মুখখানি দেখেছিল। মনে মনে হাসতে গিয়ে, অস্বস্তিতে থমকে গিয়েছিল। তবু রাজী না হয়ে পারে নি।

প্রথম প্রথম কেদার দেখত, আর হাসত। বলত, শালার ধিঙ্গি শোল যাবে কোথায়? এমন তাজা চকচকে আরশোলার টোপ!

টগর হাসত কি না হাসত, বোঝা যেত না। ঘাড় বাঁকিয়ে চোখ তুলে বলত একটু লজ্জা করে না বলতে?

কেদার বলত, নে রাখ, এই নিয়ে আবার লজ্জা! এতে তোরই বা কি। আমারই বা কি। তুই আর আমি তো সাচ্চা আছি।

—সাচ্চাগিরি দেখাচ্ছে আমাকে।

কেদার চাপা গলায় ফুঁসে উঠল। আর ক্রমাগত নিচু পথটার জল কাদার ওপর দিয়ে ছপ্ ছপ্ করে এগিয়ে চলল। পরমুহূর্তেই দাঁতে দাঁত পিষে আবার উচ্চারণ করল, ঢেমনি!

টগরের চোখেও যেন একটা হিংস্রতা দপ্ করে জ্বলে উঠল একবার। ঠোঁটে ঠোঁট আরো শক্ত করে চেপে বসল। কঠিন মুখে, স্ফীত নাসারন্ধ্রে, ঘাড় না ফিরিয়ে, চোখের তারায় একবার পাশ থেকে হানল।

ক্রমেই বাতির সীমানা পেরিয়ে, দিগন্ত-বিস্তৃত অন্ধকার এগিয়ে আসছে। ক্রমেই লোকালয় কমে আসছে আর মেঘ জমাট আকাশ এবং পৃথিবীর নিঃশব্দ কালো গ্রাস দুজনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

টগরের ঠোঁটের কোণে হঠাৎ চিকুর হেনে গেল। চাপা তীক্ষ্ণ স্বর শোনা গেল তার, লজ্জা করে না।

—চুপ!

সজোরে কনুইয়ের ধাক্কা এসে লাগল পাঁজরে। কিন্তু টগর থামল না। পাঁজরে ব্যথা লাগল হয় তো। তবু মুখের ভাব অপরি-

বর্তিত রইল। এবং আবার উচ্চারণ করল, মুরোদ!

—চুপ বলছি।

প্রায় চেঁচিয়ে, গর্জে উঠল কেদার। চকিতে একবার ফিরে তাকাল আশে পাশে। বোঝা যাচ্ছে, একটা নিষ্ঠুর বাসনায় সে অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু কঠিন বিদ্রূপে টগরের ঠোঁট উল্টে গেল। সে কাদার ওপর দিয়ে সমান তালে এগিয়ে চলল।

টগর সাজত। ছেলে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে কেদার দেখত। তারপরে টগর বলত, চল।

ঘুমন্ত ছেলেকে ঝাপ বন্ধ করে রেখে, দুজনে বেরুত। একটু এগিয়ে, পাঁচিলের ধারে, জল কলের পাশেই বিষ্টুর মূর্তি ভেসে উঠত। তাদের খোপেরই এক আঁধ-বাসী বিষ্টু। অন্ধকার পৃথিবীর এক মূর্তিমান দূত। অনেককে সে অনেক পথের সন্ধান দিয়েছে।

কেদার দাঁড়িয়ে পড়ত। বিষ্টুর সংকেতে টগর এগিয়ে যেত। সেখানেও মানুষেরা সব ছায়া। অনেক দূরে দূরে নিষ্প্রভ আলো। তা আলো দেয় না, অন্ধকারকে ছায়ালোকের রহস্যে ভরে তোলে। দু পাশের কারখানা পাঁচিলের গায়ে, স্বল্প পথচারীদের পায়ের শব্দ কয়েদখানার সাবধানী প্রহরীর পায়ের প্রতিধ্বনিতে বাজে। আর সেই আবছায়ায় দুটি কাজল কালো চোখের তারা যেন অনুসন্ধিৎসায় বিচ্ছুরিত হত। দুটি লাল ঠোঁট জেগে উঠত, ভাসতে ভাসতে যেত একটি জোরাকাটা উচ্ছ্রিত দেহের তরংগ।

বিষ্টুর সংকেতে টগর যেন একটা মন্ত্রের মায়ায় এগিয়ে চলত। তারপরে, আবছায়ার আর এক বিন্দুতে ভেসে উঠত রতনের মুখ। খোপের অধিবাসী, অন্ধকারের আর এক দূত। রতনের সংকেত লক্ষ্য করত টগর, ঘাড় না ফিরিয়ে, নিঃশব্দে, চোখের পলকে। আর মন্ত্রাচ্ছন্নের মতো এগিয়ে চলত। জাল বিস্তৃত হত। নিঃশব্দে, আটঘাট বেঁধে, জাল পাতা হত, ছড়িয়ে পড়ত। শিকার বড় কানখাড়া, ভীরু এবং সচতুর। সাবধান! এগিয়ে চল। দাঁড়াও একটু। তোমার পাশে একটা শিকারের ছায়া। তাকাও!...হল না। এগিয়ে চল।

দূরে দূরে বিষ্টু আর রতন। প্রতি পলে পলে তাদের সংকেত। মন্ত্রাচ্ছন্ন টগরের নিঃশ্বাস ক্রমেই দ্রুত হত। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসত। বুকের থেকে একটা আগুনের শিখা উঠে, চোখের দরজায় এসে স্থির হয়ে জ্বলত। এগিয়ে যেত। সাবধান! শিকার সামনে। আস্তে চল। আরো আস্তে। তাকাও। বারে বারে তাকাও। একটু হাসো। অন্যদিকে তাকাবার অবসর দিও না। আর একটু হাসো। ভয় নেই, চোখ নামিও না। দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে পড়।

টগরের বুকের মধ্যে ধকধক করত। নিশ্বাস গলার কাছে এসে ঠেকে থাকত। গায়ের কাছে একটা পুরুষ। একটু অস্ফুট খ্যাকারি। তারপর 'কোথায় থাকা হয়?' নীরবতা। 'নতুন নামা হয়েছে বুঝি?' তাকাও। 'ঘরের বউ বলে মনে হচ্ছে', খুশির স্বর। চোখ নামাও। 'কোনো জায়গাটায়গা—।'

—কি হয়েছে? কিসের জায়গা মশায়?

বিন্টু যেন সহসা, অন্ধকারে পড়ে থাকা সাপের মতো ফণা তুলে এসে দাঁড়াত। আর চমকানো থতিয়ে যাওয়া একটা শব্দ উঠত, অ্যাঁ?

সঙ্গে সঙ্গে বিন্টুর ঠোঁট বেঁকে উঠত। —ও! গরীবের মেয়েছেলেকে রাস্তায় দেখেছেন, আর অমনি—।

কথা শেষ করার আগেই, গোখরোর পাশেই শংখচুড়ের মতো রতন ভেসে উঠত। —কি হয়েছে রে বিন্টু?

বিন্টুর নিষ্ঠুর বিদ্রূপ একটা ভীরু অসহায় বুকে যেন ছোবল বসিয়ে দিত। —এই আমাদের টগর বউদিকে লোকটা কি সব বলছে। খারাপ কথা, না বউদি?

সত্যি বুঝি ভয় এবং লজ্জা হত টগরের। হয় তো কান্নাও পেত। কিংবা সেইরকম একটা ভঙ্গিতেই টগরের ঘাড় নড়ে উঠত। আর সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠিত ভয়ার্ত একটা পুরুষের গলায় শোনা যেত, না, মানে......।

—না মানে আবার কি? যাচ্ছেন কোথায় মশায়?

রতন জামা টেনে ধরত।

অসহায় ভীরু অপরাধীর চোখের দৃষ্টি চারদিকে একবার দেখে নিত। আত্মসমর্পণের আকুতি শোনা যেত, যাচ্ছি না ভাই।

বিন্টুর ভয়ংকর গলা শোনা যেত, যেতে দিচ্ছে কে? লোকজন ডাকি, পুলিস আসুক, তারপরে তো।

তখন মৃত্যুর গ্রাস থেকে যেন শেষ আর্তনাদ শোনা যেত, ক্ষমা করে দিন ভাই। মানে, আমি—।

—হুঁ! ক্ষমা?

রতন বলত। বিন্টু ঘোষণা করত, তা ক্ষমা হতে পারে। মোটা মালকড়ি ছাড়ুন তো দেখি, কী আছে?

তারপর, শিকার বুঝে দরাদরি, টানাটানি। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই, নাটকের সেই চরম দৃশ্য শেষ হয়ে যেত। কোনো পক্ষেরই দেরী করার উপায় নেই। এবং তারপরেই হাতের মুঠোয়, ধাতু আর কাগজের মুদ্রা, ঝনঝনিয়ে খসখসিয়ে বেজে উঠত।

টগর ফিরে আসত। বিন্টু আর রতনের সঙ্গে গিয়ে মিলত কেদার। তখন টগরকে দেখে মনে হত, এই সবে যেন ওর প্রবল জ্বরটা ঘাম দিয়ে ছেড়েছে। কাজল হত চোখের কালি। ঠোঁট হত যেন বাসি রক্ত-জমা শুকনো। মুখটা রক্তহীন ফ্যাকাশে। শূন্য নিষ্পলক নত দৃষ্টি নিয়ে টগর ঝাপ খুলে খোপে এসে বসত। ভাবত, অথচ, প্রথম দিন এত মতলব করে এর শুরু হয়নি। সন্ধ্যার পর একদিন, শুরুর দিন, জলকলের কাছে আবছায়ায় দাঁড়িয়েছিল টগর। রাত নটা হয়েছিল। সকাল থেকে কেদার খোপে ফেরেনি। টগর দূরের দিকে, অন্ধকারে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিল। আর যে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে সকলের দিকে চোখ তুলে তুলে দেখছিল। ঠিক তখনই একজন তার সামনে দিয়ে যাবার সময় থমকে দাঁড়িয়েছিল। চোখে চোখ পড়তে একটু বুঝি চমকেছিল টগর। চমকাবার কথা নয়। কতদিনই অর্ধউলঙ্গ দেখেছে তাকে লোকে। লোভীর মতো তাকিয়েছে। বুকটা কিংবা কাঁধটা একটু ঢাকবার চেষ্টা করেছে টগর। সেদিন সে বুকের আঁচলটা টানতেই যেন ভুলে গিয়েছিল। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে গিয়ে আবার তাকিয়েছিল। তার ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল।

লোকটা অস্ফুটে কী যেন উচ্চারণও করেছিল। আর ঠিক সে সময়েই, বিন্টুর আবির্ভাব হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল, অপরাধীরা কত সহজে শিকার হয়। ওদের কথার মধ্যে আর টগর ছিল না। খোপে ফিরে এসেছিল। রাত্রে কেদার হাসতে হাসতে এসে, একটা পাঁচ টাকার নোট দেখিয়ে বলেছিল, টগর, মাঝে মাঝে কলতলায় গিয়ে একটু দাঁড়ালেই পারিস।

টগর অবাক হয়ে বলেছিল, কেন?

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছিল কেদার। টগর আপত্তি করেছিল, না। ছি!

কিন্তু কেদারের কাছ থেকে যে প্রাণের দয়া মায়ার খোটা সহ্য হয়নি টগরের। কেদারের সারাদিনের অভুক্ত ক্লান্ত শরীরটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নিশ্বাস পড়েছিল তার। মনে হয়েছিল, আহা। তার, প্রাণের পুরুষের শরীরটা যে সত্যি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই, যা একদিন কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল, তা চুরি করবার জন্যে হাত বাড়াতে হয়েছিল। এবং সব কিছুরই একটা ছাঁদ ভঙ্গি আছে। তাই, হিমানী কাজলও মাখতে হয়েছিল। আর কলতলা থেকে, পায়ে পায়ে পথ বিস্তৃত করতে হয়েছিল দূরে, আর একটু দূরে।

তারপর যা ছিল দ্বিধার, লজ্জার, ভয়ের শংকার, তাই হয়ে উঠেছিল অন্তস্রোতের একটা উত্তেজিত হাসির খোরাক। সংকোচ কেটে যাচ্ছিল নিঃশেষে। কারণ, কেদার যে বলত, 'তুই আর আমি তো সাচ্চা আছি।' স্বভাবতই রতন আর বিন্টু হয়ে উঠেছিল অন্তরঙ্গ। সাচ্চা প্রাণের ভয় কি।

প্রথম প্রথম যে অসুস্থতা বোধ করত তার, বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা, একটা রুদ্ধ অভিমানে কেদারের সঙ্গে কথা বলতে পারত না, সেটা সহজ হয়ে আসছিল। সাচ্চা প্রাণ, ঝুটা কাজ। সে কাজের আবার দায়িত্ব কি!

ছিল না কিছু? আরো দূর অন্ধকার পথের সংকেত পাওয়া যায় নি বিন্টু, রতনের কাছ থেকে। ওদের সেই সাহসের মুখের ওপর তো সাচ্চা প্রাণের মুখ থাবড়ি দেওয়া যায় নি। চুপ করে শুনতে হচ্ছিল। আর টগরের প্রাণের মধ্যে কী একটা অশুভ ছায়া যেন সাপের মতো ফণা তুলছিল আস্তে আস্তে। একটা বাথা, হতাশা যেন গ্রাস করছিল তাকে। অনেক ঝড়ের দুর্ভাগ্যের মধ্যেও তাদের খোপের ভিতরে যে মেয়ে-পুরুষ পায়রা দুটোর বকম্ বকম্ শোনা যেত, তা বন্ধ হয়েছিল কবে থেকে। টের পাওয়া যাচ্ছিল না। টের পাওয়া যাচ্ছিল না, খোপের মধ্যে, গায়ে গায়ে শুয়েও ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠছিল। এবং কয়েকদিন ধরেই, কেদারের চুপচাপ স্তব্ধতা, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা থেকেও কিছু আবিষ্কার করা যায়নি। যেন সাচ্চা প্রাণ নিয়ে, নিঃশব্দে দুজনে খাচ্ছিল, শুয়ে থাকছিল। আর সন্ধ্যাবেলার অপেক্ষা করছিল। কিছুই তো করার ছিল না আর।

এই সাত দিন আগেই, সেজেগুজে যখন ডেকেছিল টগর, কেদার লুটিয়ে শুয়ে পড়ে বলেছিল সেই প্রথম তুই যা!

—শরীর খারাপ নাকি?

—হ্যাঁ।

—ওষুধ খেলেই পার।

হ্যাঁ, ওষুধ খাওয়ার পয়সা যে একেবারে নেই, সে অবস্থা তো আর ছিল না তাদের। কেদার বলেছিল, খাব।

কিন্তু, কেন, কথা বন্ধ কেন। অমন আগুনের মতো চোখ করে, টগরকে দেখা কেন? আপত্তি? তা হলে তো বলতই। নিজেও তো কেদার রোজগারের জন্য বেরুচ্ছিল না। ঝগড়া বিবাদ চলছিল নাকি কারুর সঙ্গে, কে জানে। টগরের তো বসে থাকবার উপায় ছিল না। সময় বয়ে যায়। রাত পোহালেই যে ভাবনা, সে যেন টগরের কাঁধেই কবে গুটিগুটি এসে উঠেছিল।

কিন্তু কথা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা, রুদ্ধশ্বাস অবস্থা ঘনিয়ে উঠছিল। কেদার যেন লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠেছিল। আর আগুনে গুঁজে রাখার মতো, তেতে দপদপিয়ে উঠছিল। এবং এই অকারণ বিতৃষ্ণা, স্তব্ধতা, জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টিতে, টগরও যেন নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছিল। কঠিন মুখে, অপলক চোখে, যন্ত্রের মতো সব কিছু করছিল। তারপরেই তো—।

—ওদিকে কোথায়?

চাপা রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়ল কেদার। টগরের কাঁধের কাছে সাঁড়াশী থাবায় খামচে ধরে আর একদিকে ছুঁড়ে ফেলল প্রায় তাকে। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, অসৎ! কুলটা!

হয় তো ভুল করেই টগর, অন্যদিকে যাচ্ছিল। লোকালয়ের শেষ প্রান্তে, প্রেতচক্ষু শেষ আলোটার পাশ দিয়ে, আরো দূরের একটা আলোর দিকে চোখ ছিল বলেই বোধহয় টগর আনমনে সেদিকে যাচ্ছিল। এখন রাস্তাটা আরো সরু হয়ে গিয়েছে। সামনের অন্ধকারে একটা দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর চুপ করে পড়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। সেই অন্ধকারের বুকে, একটি গাঢ় উঁচু রেখা চোখে পড়ছে। যে রেখাটা পৃথিবী এবং মেঘ জমাট আকাশের মাঝখানটাকে অস্পষ্ট ভাবে ভাগ করে দিয়েছে। বায়ু-কোণের ক্রুদ্ধ কটাক্ষের ঝিলিক এখন আরো স্পষ্ট। সেই ঝিলিকেই, অনুমান করা গেল, উঁচু গাঢ় রেখাটি রেল লাইন। আর বায়ু-কোণের সেই দৃষ্টিশিখা সাপের জিভের মতো ক্রমেই এগিয়ে আসছে। নামছে আস্তে আস্তে। চাপা গর্জনও এখন শোনা যাচ্ছে।

টগর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। আলোর অস্পষ্টতায় প্রথমে মনে হল, কপালের কুমকুমের টিপ বুঝি ভ্রূর কাছে,

কপালের পাশে সরে গিয়েছে। পরমুহূর্তেই সেই রক্তাভ বিন্দুটিকে গলে পড়তে দেখে বোঝা গেল, কপালটা কেটে গিয়েছে। টিপ ঠিক আছে। গালের পাশে কাদামাটি লেগেছে। কিন্তু বুক থেকে খসে যাওয়া আঁচল শান্তভাবেই টেনে দিল টগর। চোখে তার আগুন আছে কিনা, বোঝা যায় না। জল নেই এক ফোঁটা। কঠিন জমাট মুখ, আর স্ফীত নাসারন্ধ্রে সে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে দূরে অন্ধকারের দিকে তাকাল।

হিংস্র চাপা গলায় দ্রুত বলে উঠল—কেদার, এবার, এবার বুঝতে পারছিস, কোথায় নিয়ে আসতে চেয়েছি তোকে?

বলতে বলতে সে টগরের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। ঝিঁঝিঁ যেন আতঙ্কিত গলায় চীৎকার করছে। বায়ু-কোণ থেকে একটা তীক্ষ্ণ রেখা, মাটিতে নেমে এসে দূরে চাপা স্বরে গর্জন করে উঠল।

টগর নিচু স্পষ্ট গলায়, দূরে চোখ রেখেই বলল, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু মিছে কথা বল না।

—মিছে কথা? তুই কুলটা নস?

—না।

টগর উচ্চারণ করবার আগেই, হিংস্র উন্মত্তের মতো তাকে আবার সজোরে আঘাত করল কেদার। এবারও টগর সামলাতে পারল না। অনেকটা দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল। ভারী পতনের সঙ্গে কাঁচের চুড়ি ভাঙারই ঠুং ঠুং শব্দ বাজল বোধহয়। এবং এবার উঠতে টগরের সময় লাগল। চেষ্টা করে, একটু একটু করে ঠেলে সে উঠল। আস্তে আস্তে আঁচলটা টেনে দিল। রক্ত লেপে গিয়েছে চোখের কোলে, গালের পাশে। আর একটা চোখের কাছে ফুলে গিয়েছে কিংবা কাদাই লেগেছে। খোঁপা ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের কাছে। কিন্তু মুখ কঠিনতর। ঠোঁট যেন চির আবদ্ধতায় শক্ত। শুধু একটা নিঃশ্বাসের শব্দ উঠল। অপলক চোখের দৃষ্টি অন্ধকারে। বিদ্যুৎ সারা আকাশটাকে একটা ফালা দিল।

কেদারের গর্জন শোনা গেল, কসবী!

টগর মুখ না ফিরিয়েই আবার বলল, মিছে কথা বল না।

কেদার আঘাত করতে উদ্যত হয়ে, একটা প্রবলবেগে ঝুঁকে পড়ে বলল, চুপ! চুপ! আমি জানি না? আমি বুঝি না? নষ্ট ছাড়া আর কারা এসব করে?

—তুমি বলেছিলে।

—তাই? তাই বুঝি? তাহলে, এই করেই তোকে চিনতে পেরেছি। বেশ্যা!

এবার সহসা যেন রুদ্ধশ্বাসে বলল টগর, ওকথাটা আর বল না।

—বলব!

বলেই টগরের চুলের মুঠি ধরে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে ঠেলে দিল কেদার। বলল, চল। ওই উঁচুতে তোকে টুকরো করে রেখে যাব। টগর পড়ে গেল না। সে চলতে লাগল। ততক্ষণে বায়ুকোণ থেকে সারা আকাশে ঘন ঘন চমক লেগেছে। বদ্ধ বাতাসের মুখও খুলে দেওয়া হয়েছে বোধহয়। বাতাস বইতে শুরু করেছে। এবং সেই উঁচু রেখাটির দূরে একটি অস্পষ্ট আলোর ইশারা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্ শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু কেদার রুদ্ধ চাপা গলায় বিড়বিড় করতে লাগল, তোর চিহ্ন আমি শেষ করব। লোপাট করব। আমি আর পারছি না। আর কিছুতেই পারছি না। তোকে নিয়ে... না, তোকে নিয়ে আমি আর...।

কেদারের গলার স্বর টুঁটিচাপা হয়ে উঠল। আর হঠাৎ তার খেয়াল হল, টগর তার আগে আগে, দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এবং দেখতে দেখতে, টগর দৌড় দিল। ছুটল উঁচু রেখাটার দিকে, যেখানে তীক্ষ্ণ আলোর বৃত্তটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে, এগিয়ে আসছে। ধোঁয়া উড়িয়ে, ভারী মালগাড়ি বেগে, মাটি কাঁপিয়ে ছুটে আসছে।

কেদার চকিতে একবার থমকে দাঁড়াল। এবং মুহূর্তে তার সমস্ত অনুভূতি কাঁপিয়ে, তার মুখ দিয়ে আপনি উচ্চারিত হল, ও মরতে যাচ্ছে। টগর মরতে যাচ্ছে।...

কথাটা মনে হতেই, তার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা বিদ্যুতের মতো চিরে দিয়ে গেল। হঠাৎ ভয়ে এবং একটা তীব্র-বিদ্ধ কষ্টে সে চীৎকার করে উঠল, টগর! যাস না। টগর, বড় কষ্টে...!'

কথা শেষ হল না। কেদার ছুটল। আলোর বৃত্ত। সামনে। সেই আলোর টানে যেন, তীর বেগে ছুটেছে টগর। ইঞ্জিনের গর্জনে একটা ক্ষুধার চীৎকার উঠছে। এবং টগর তখনো উচ্চারণ করছিল, বল না, ওগো বল না।

কেদার প্রাণপণ বেগে ছুটতে ছুটতে কেবল উচ্চারণ করছিল, টগর, আমাকে ফেলে যাস না। টগর, তখন তোর সাত বছর...।

আলোর বৃত্তটা পার হয়ে গেল। তারপরেই নিকষ অন্ধকারে, লাইনের বাইরেই সম্ভবত জড়াজড়ি করে পড়ে গেল দুজনে। কিংবা ভিতরেই। এত অন্ধকার যে, দেখা গেল না।

ব্যথা-বেদনা থেকে
মুক্তি দেবে
উইটকপ
সীট
প্রস্তুতকারক
সেন-র‍্যালে
কলিকাতা

বিশুদ্ধতা স্থায়ীত্ব এবং উৎকর্ষের জন্য
ক্রাউন মার্কা
এ্যালুমিনিয়মের দ্রব্যগুলি সুবিখ্যাত
'ক্রাউন মার্কা' অ্যালুমিনিয়ম দ্রব্যাবলী আপনাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য বিশুদ্ধ ও খাঁটি অ্যালুমিনিয়ম থেকে তৈরী। জিনিসগুলি যাতে শক্ত ও টেঁকসই হয় তার জন্য যথেষ্ট মোটা পাত ব্যবহার করা হয়। অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতাপুষ্ট 'ক্রাউন মার্কা' সস্তা দরে শ্রেষ্ঠ এবং আধুনিক জিনিসপত্র দেয়। শিল্পকার্যের জন্য অ্যালুমিনিয়ম, ও বহুবর্ণের দ্রব্যাবলী, বিমান-ভ্রমণ ও স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য অ্যালুমিনিয়ম স্যুটকেসও পাওয়া যায়।
আমাদের ক্রেতাদের সুবিধার জন্য আমরা এখন ২৩ ব্র্যাবোর্ণ রোডে খুচরা বিক্রয় শুরু করেছি।
আমাদের রিটেল শো-রুম-এ আসুন
জীবনলাল (১৯২৯) লিমিটেড
ক্রাউন অ্যালুমিনিয়ম হাউস, ২৩, ব্র্যাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১
এডেন • বোম্বাই • দিল্লি • মাদ্রাজ • রাজমহেন্দ্রী
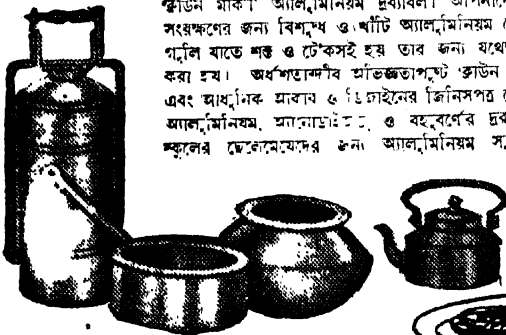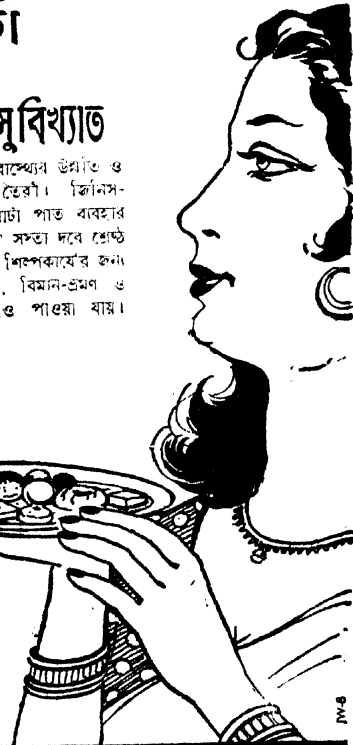
ময়দান এবং ইডেন উদ্যানের সংগে কলকাতাবাসীদের দীর্ঘকালের আত্মীয়তা। দীর্ঘকাল ধরেই এই উন্মুক্ত বিস্তৃত প্রান্তর শহরবাসীদের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব দিয়ে আসছে। খেলা দেখার উদ্দেশ্য ছাড়াও প্রতিদিন কত মানুষ এখানে আসে—কেউ স্বাস্থ্যরক্ষার প্রেরণায় বা উদ্ধারের আশায়, আবার কেউ দৈনন্দিন কাজের শেষে একরাশ অবসাদের বোঝা নিয়ে। বুকভরা গংগার হাওয়া আর চোখভরা মাঠের সবুজ— কলকাতার বর্তমান শহর-জীবনে এ তো পরম আশীর্বাদ। ভারতের অন্য কোনো শহরের মাটিতে এমনিতর আশীর্বাদ মাখানো আছে কি না জানিনে। তবে এখানে এই প্রান্তরটুকু আছে বলেই বোধ হয় কলকাতার অনেক মানুষ আজ বেঁচে থাকার জন্যে একটু দম নিতে পারে।

কিন্তু এই অঞ্চলটির সংগে শহরবাসীদের সুদীর্ঘ আত্মীয়তার বিচিত্র পরিচয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরা এই প্রবন্ধ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আমি বলব প্রধানত ইতিহাসের কথা।

ইডেন উদ্যানে যাঁরা ক্রিকেট খেলা দেখেন তাঁদের মধ্যে হয়তো অনেকেই জানেন না যে এই উদ্যানের জন্মের বহু বছর আগেই এই অঞ্চলটিতে ক্রিকেট খেলা শুরু হয়েছিল। তাই উদ্যানটির ইতিহাস আলোচনা-প্রসংগে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের কথা প্রথমেই এসে পড়ে। কারণ ক্লাবটি উদ্যানের চেয়ে বয়েসে অনেক বড়।

খেলাধুলো আর দৌড়-ঝাঁপ পশ্চিমের প্রায় সব জাতিরই একটা সাধারণ চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। কোম্পানীর আমলে যেসব ইংরেজ সিভিলিয়ান এদেশে আসতেন উনিশ শতকের আগে খেলাধুলোর ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে বিশেষ একটা অভাব-বোধ ছিল। ক্রিকেট ইংরেজদের খুব প্রিয় জাতীয় খেলা। কলকাতায় কি করে নিজেদের মধ্যে এই খেলার সূত্রপাত করা যায় উনিশ শতকের শুরুতেই তৎকালীন সিভিলিয়ানদের মধ্যে এই চিন্তা বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই চিন্তা-প্রসূত চেষ্টার প্রথম ফল দেখা দেয় ১৮০৪ সালের জানুয়ারী মাসের ১৮ এবং ১৯ তারিখে। এই দুদিন সিভিলিয়ানদের দুটি বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয় রাজভবনের দক্ষিণ-পশ্চিমে। এই খেলাই কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম ক্রিকেট খেলা। তাই এ দেশের খেলাধুলোর ইতিহাসে ১৮০৪ সালের এই দুটি দিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। প্রথম খেলার পর থেকেই কলকাতার ক্রিকেট-প্রেমী ইংরেজরা এই উদ্দেশ্যে একটা সংঘ গড়ে তোলার এবং খেলার জন্যে একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রয়োজনীয়তা খুবই অনুভব করছিলেন। ১৮২৫ সালে রাজভবনের দক্ষিণ-পশ্চিমে ময়দানের কিছুটা অংশের ওপর এঁরা নিয়মিত ক্রিকেট খেলার অধিকার লাভ করেন।১ এই বছরেই জন্মলাভ করে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব। ইডেন উদ্যানের দক্ষিণে বর্তমান কিংস্ ওয়ে তৈরি হয়েছে অনেক পরে। কেল্লার পলাশী গেট রোড যেখানে এই রাস্তায় এসে পড়ছে সেখানে একটা পুরোনো বটগাছ সকলেরই চোখে পড়ে। কিন্তু এই গাছটি যে এদেশের ক্রিকেটের ইতিহাসের সংগে জড়িয়ে থাকতে পারে সে কথা শুনলে হয়তো অনেকেই আশ্চর্য হবেন। ১৮২৫ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত এই বটগাছতলাই ছিল ক্রিকেট ক্লাবের প্যাভিলিয়ান। অবশ্য কয়েক বছর পর থেকে যখন খেলা দেখার জন্যে ভিড় হতে শুরু হল তখন খেলার মাঠের সীমানায় খড়ের কয়েকটি ছাউনি তৈরি করা হয়। প্যাভিলিয়ানের কথা পরে বলছি।

১৮৫৯ সালে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব। প্রাচীন বটগাছটির তলায় বসে ক্লাবের সভ্যরা খেলা দেখছেন।

ক্লাবকে খেলার মাঠের চারিদিকে বেড়া দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় ১৮৪১ সালে। মাঠের পূর্বদিকে ক্লাবের নেটিভ চাকরদের কয়েকটা খড়ের ঘর ছিল। কেল্লার অবস্থানের জন্যে সামরিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সরকার তখন ময়দানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কোথাও কোনো স্থায়ী ঘর নির্মাণের অনুমতি দিতেন না। তাই ক্রিকেট মাঠের সীমানায় অননুমোদিত খড়ের ঘরগুলি

---

১ India P. W. D. (Civil Works Misc.) Progs. (B) March 1864, No. 3.

ভেঙে দেবার কথা সরকার অনেকদিন থেকেই চিন্তা করছিলেন। তা ছাড়া ক্লাবের সভ্যরা এই জমিটি দখল করতে চাইছিলেন "more by matter of right than of favour." এই কারণে ১৮৫৪ সালে সরকারী ব্যবস্থা অনুযায়ী এই ঘরগুলি তুলে দেওয়া হয় এবং ১৫ অক্টোবর থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁবু ফেলার অনুমতি দেওয়া হয়।[2]

কিন্তু ১৮৬৪ সালের প্রথম দিকে ক্লাবের সভ্যরা সহসা এক অপ্রত্যাশিত প্রতিকূলতার সামনে এসে পড়েন। তাঁরা জানতে পারেন ফোর্ট উইলিয়ামে যাবার সুবিধার জন্যে একটা নতুন রাস্তা তৈরি আরম্ভ হয়েছে এবং সেটা যাবে সরাসরি ক্রিকেট মাঠের ওপর দিয়ে। ফলে এতদিনের চেষ্টায় সযত্নে গড়ে তোলা 'পিচ্'-টি নষ্ট হবে। দুশ্চিন্তায় পীড়িত হয়ে তাঁরা তদানীন্তন ছোটলাটের কাছে ক্লাবের প্রতি সুবিচার প্রার্থনা করলেন। এই প্রার্থনা-পত্রে বট-গাছটিরও প্রসঙ্গ ছিল। কারণ নতুন সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী গাছটিকেও খেলার মাঠের সীমানা থেকে বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ক্রিকেট-প্রেমী দর্শকের মতো গাছটিও এতকাল যে শুধু সাগ্রহে খেলা দেখে আসছিল তাই নয়, অন্যান্য দর্শকদের জন্যেও আপন বলিষ্ঠ দেহ দিয়ে রচনা করে দিয়েছিল ছায়াস্নিগ্ধ এক অভিনব প্যাভিলিয়ান।

ক্লাবের সভ্যদের আবেদন-নিবেদনে কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্তের কোনোই পরিবর্তন হল না। তবে খেলার মাঠের পূব দিকের যেটুকু জমি সরকার দখল করলেন তার বদলে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ মাঠের পশ্চিম সীমানা অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু তখনো খেলার মাঠটি ইডেন উদ্যানের বাইরেই ছিল। ধীরে ধীরে চারপাশে উদ্যানটিকে সম্প্রসারিত করার ফলে মাঠটি উদ্যানের মধ্যে এসে পড়ে। ১৮৬৪ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত ক্রিকেট মাঠের আর কোনো পরিবর্তন হয়নি। এবং দীর্ঘদিনের যত্ন ও প্রচেষ্টায় মাঠের 'পিচ্'-টিকেও সুন্দরভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। অবশ্য মাঠে প্যাভিলিয়ান নির্মাণের অনুমতি লাভের জন্যে ক্লাবকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। অনেক ওজর-আপত্তির পর এই সালের এপ্রিল মাসে দুটি বিশেষ শর্তে ক্লাবকে প্যাভিলিয়ান নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। নিচের চিঠিটি এই প্রসঙ্গে মূল্যবান।

"From Colonel B. E. Bacon; Officiating Secretary to the Government of India, Military Department, to the Honorary Secretary to Special Committee of the Calcutta Cricket Club,—(No. 699,

2. Bengal Judicial Proceedings, 29 April 1854 No. 109 and 110.

dated Fort William, the 19th April, 1871.)

Your letter of the 4th instant having been laid before the Government of India, I am directed in reply to inform you that, the Right Hon'ble the Commander-in-Chief has no objection to the construction of the proposed pavilion (100×40 feet) in the Cricket ground in the place of the present thatched hut, on the condition (1st) that the materials are of wood or corrugated iron which can at any time be swept away, and that no walls of any other material are erected, and (2nd.) that the Cricket Club will at any time, on being required to do so, promptly remove the erection without compensation,—the Right Hon'ble the Governor-General in Council sanctions its construction on the same terms and of the somewhat larger dimentions (125X55) which you state have been found necessary." 3

প্যাভিলিয়ান তৈরির ব্যাপারে সরকারের দিক থেকে এই দুটি শর্তের একমাত্র কারণ ছিল কেল্লার নিরাপত্তা। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব ছাড়া আরো দু-একটি ক্লাব সেকালে কলকাতায় গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে ইউনিয়ান ক্লাব ও নিড্লে ক্লাবের নাম জানা যায়।৪ অবশ্য এগুলি ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের কয়েক বছর পরে গড়ে ওঠে। ইডেন উদ্যানের মাটির ওপর সুদীর্ঘকালের অধিকার ত্যাগ করে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবকে আজ সরে যেতে হয়েছে অনেকটা দূরে—বালীগঞ্জে।

বহু বছর ধরে নানা পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে ইডেন উদ্যানের চেহারা অনেক বদলেছে। চারপাশে রাস্তাঘাটেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে; নতুন রাস্তাও তৈরি হয়েছে কয়েকটা। কিন্তু ইডেন উদ্যানের অতীতের কথা বলতে গেলে ময়দানের প্রসংগও কিছুটা এসে পড়ে।

ষোল শতকের পূর্বার্ধে হুগলীর কাছে সরস্বতী নদীর ধারে সাত গাঁ (সপ্তগ্রাম) একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। কিন্তু চড়া পড়ে নদীটি ক্রমশ অনাব্য হয়ে ওঠায় এখানকার অনেক অধিবাসী হুগলী শহরে চলে যান। সে সময় বসাকদের চারটি এবং শেঠদের একটি পরিবার সেখান থেকে চলে আসেন প্রাচীন কলকাতার পাশে গঙ্গার পূর্ব তটে। জানা যায়, এই পাঁচটি পরিবারই ষোল শতকে এখানে গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তন করেন।৫ অবশ্য এ তথ্যের সত্যতা নির্ণয় করা কঠিন। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ সম্প্রতি তাঁর একটি মূল্যবান প্রবন্ধে লিখেছেন, সতেরো শতকের শেষে জব চার্ণক যখন কুঠি নির্মাণের জন্যে গঙ্গার পূর্ব তীরের এই অঞ্চলটি বেছে নিয়েছিলেন "গোবিন্দপুর গ্রাম তারও আগে থেকে ছিল কিনা সঠিক জানা যায় না।"৬

তবে এ কথা সত্য যে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা পুরাতন কেল্লা তুলে দিয়ে এই অঞ্চলে নতুন কেল্লা (ফোর্ট উইলিয়াম) স্থাপনের জন্যে যখন গোবিন্দপুর গ্রামটি দখল করে তখন এখানে লোকবসতি মোটেই ঘন ছিল না। ১১৭৮ বিঘা জমির মধ্যে মাত্র ৫৭ বিঘায় মানুষের বসতি ছিল।৭ আর বাকী অঞ্চল ছিল পুকুর-ডোবা ও বন-জংগলে পরিপূর্ণ। নতুন কেল্লা স্থাপনের উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদের কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে তুলে দেওয়া হয় এবং কেল্লা স্থাপনের সংগে সংগে চারপাশের অঞ্চলটির বন-জংগলও পরিষ্কৃত হতে থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে বর্তমান ময়দান গড়ে ওঠে। এখানে গঙ্গার ধারে তখন একটি মাত্রই ঘাট ছিল—চাঁদ পাল ঘাট। ঘাটটি কবে তৈরি

পলাশী গেট্ রোড এবং বর্তমান কিংস ওয়ের সংযোগস্থলে পুরনো বটগাছ, যেটি বহুকাল ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের প্যাভিলিয়নের কাজ করেছে।

3 Mily. Cons. (A) April, 1871, Nos. 291-92.

4 Calcutta Monthly Journal, Jan. 1832.

5 "In the sixteenth century the Saraswati began to silt up, and Satgaon was abandoned. Most of its inhabitants went to the town of Hooghly, but about the middle of the century four families of Bysakhs and one of Seths founded the village of Gobindpur on the site of the modern Fort William." — Imperial Gazetteer of India. Provincial Series, Vol. I, p. 395.

৬ 'ঠাকুর পরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমাজ'—বিনয় ঘোষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৬৯, পৃ ৩৮৪।

7 The Calcutta Cricket Club—by Narendra Nath Ganguly, p. 17

হয়েছে সঠিক বলার উপায় নেই। তবে প্রাচীন চিহ্ন কলকাতার, দক্ষিণ সীমানায় ১৭৭৪ সালেও এটির অস্তিত্বের কথা জানা যায়।[৮] বর্তমান ময়দান অতীতে যখন অরণ্যময় ছিল তখন চন্দ্রনাথ পাল নামক এক ব্যক্তি গঙ্গার পূর্ব তীরের এই অঞ্চলটিতে এসে উপস্থিত হন। চন্দ্রনাথ ঠিক কোন্ সময়ে এখানে আসেন তা অজ্ঞাত হলেও আন্দাজ অনুমান তিনি জব চার্ণকের সমসাময়িক। চন্দ্রনাথের আগমনের আগেই যে এখানে গোবিন্দপুর গ্রাম গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ এখানে তাঁর একটি মুদির দোকান ছিল। গ্রাম-বসতি না থাকলে কেউ দোকান দেয় না। যা হোক, চন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় নি। কলকাতার কোনো প্রাচীন পাল-পরিবারের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ আছে কি না তাও নির্ণয় করা কঠিন। তবে চন্দ্রনাথ (চাঁদ) পালের নাম যখন গঙ্গার এই ঘাটটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তখন, যে কারণেই হোক, তিনি যে বিখ্যাত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চাঁদপালের পাশে বাবুঘাটটি তৈরি হয় ১৮৩৮ সালে—উইলিয়াম বেণ্টিংকের আমলে। জানবাজারের বিখ্যাত রানী রাসমণির স্বামী নিজের টাকায় এটি নির্মাণ করে দেন এবং তখন থেকে তাঁর নামেই ঘাটটি পরিচিত হয়—বাবু রাজচন্দ্র দাস ঘাট। আজ অবশ্য তাঁর নাম ভুলে গিয়ে আমরা মনে রেখেছি শুধু তাঁর নামের 'উপসর্গ'-টুকু। বাবুঘাটের পাশে আউটরাম ঘাটটি তৈরি হয় অনেক পরে। ইডেন উদ্যানের পশ্চিমে এই তিনটি ঘাটের মধ্যে সর্বপ্রাচীন এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাটটি হল চাঁদপাল ঘাট। কোম্পানীর আমলে গভর্নর-জেনরল, প্রধান সেনাপতি, বিশপ, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি প্রভৃতি শাসন- প্রচার- এবং বিচার- বিভাগের পদস্থ লোকেরা এই ঘাটে এসেই প্রথম ভারতের মাটিতে পা দিতেন। ময়দানের এই অংশের পরিবেশ রচনাতেও এই ঘাটগুলির প্রভাব ছিল। তাই ময়দানের প্রসঙ্গে এই তিনটি ঘাটের কথা এসে পড়ল। উত্তরে রাজভবন ও ইডেন উদ্যান, দক্ষিণে টালীর নালা (খিদিরপুরের আদি গঙ্গার অংশ)[৯], পূর্বে চৌরঙ্গী এবং

৮ Census of India, 1901—by A. K. Roy, Vol.—VII, Part I, p. 111.

৯ "This nullah, which followed the silted-up bed of the Adi ganga and branched off from the river Hooghly at the old pillar-stone which marked the boundary of Govindpur, was excavated originally by Surman. It bore for some time his name: but was deepened in 1773 by Tolly [Capt. Tolly] and hence forward became Tolly's Nullah." —Calcutta Old and New—by H. E. A. Cotton, p. 44.

পশ্চিমে গঙ্গার কিছুটা অংশ—এই হল ময়দানের চতুঃসীমা। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজরা কলকাতার উন্নতির জন্যে খুবই সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেসলির সময় 'টাউন ইম্প্রুভমেণ্ট কমিটি' (১৮০৩) এবং কয়েক বছর পরে 'লটারি কমিটি' (১৮১৭) গঠিত হয়। ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত 'লটারি কমিটি'র প্রচেষ্টায় বিশেষ করে শহরের রাস্তাঘাটের প্রভূত উন্নতি হয়। 'লটারি কমিটি'র কার্যকাল শেষ হয় ১৮৩৬ সালে এবং এই সালেই লর্ড অকল্যাণ্ড 'ফিভার হস্‌পিটাল্ কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটিই প্রথম কলকাতার নাগরিক জীবনের অন্যান্য সুখ-সুবিধা, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে যথার্থ দৃষ্টি দেয়। ১৮৪০ সালে লর্ড অকল্যাণ্ড এসপ্লানেডের উত্তর-পশ্চিমে একটি উদ্যান তৈরি করেন এবং সেটির নাম দেওয়া হয় 'অকল্যাণ্ড সার্কাস গার্ডেন'। বাগানটির নক্সা তৈরি করে দিয়েছিলেন অসামরিক বিভাগের স্থপতি Capt, Fitzgerald। তখন এর দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল 'রেস্‌পণ্ডেন্‌সিয়া ওয়াক্', কেল্লায় যাবার ক্যালকাটা গেট রোড ও ক্রিকেট ক্লাব ছিল পূব দিকে এবং উত্তরে ছিল এস্‌প্লানেড রো। কেল্লার ধারে 'রেস্‌পণ্ডেন্‌সিয়া ওয়াক্' নামক ছোট জায়গাটির গুরুত্ব সে সময় কম ছিল না। জাহাজে করে যেসব জিনিস নিয়ে বণিকরা আসতেন ব্যবসা করতে সেগুলি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করার শর্তে সে সময় টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই ঋণদান-ব্যবস্থার নামই 'রেস্‌পণ্ডেন্‌সিয়া'। কেল্লার উত্তর-পশ্চিমের খানিকটা জায়গায় এই ঋণ-দানের ব্যাপারে চুক্তি করা হত বলে এই বাণিজ্যিক ব্যবস্থার নামেই স্থানটি বিখ্যাত হয়েছিল।

'অকল্যাণ্ড সার্কাস গার্ডেন' তৈরি হবার আগে থেকেই সে সময়ে এসপ্লানেডের পশ্চিম অঞ্চলটি সান্ধ্যভ্রমণের একটা চমৎকার জায়গা হয়ে উঠেছিল। রোজ সন্ধ্যায় এখানে অনেকেই হাওয়া খেতে আসতেন। বিচিত্র ধরনের মানুষ, বেশভূষা আর গাড়ি-ঘোড়ায় জায়গাটি সরগরম হয়ে উঠত। কেউ আসতেন 'কোচ' বা 'বগি' গাড়ি চেপে, আবার কেউ আসতেন সস্ত্রীক ঘোড়ায় চড়ে। গোঁয়ার ধরনের কোম্পানীর সৈনিক আর বদ-মেজাজী বৃদ্ধদেরও দেখা যেত। এই সময়ে যাঁরা এখানে সান্ধ্যভ্রমণে আসতেন তাঁদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে W. H. Leigh সাহেব যা লিখেছেন এখানে তার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

"...There is a wealthy Baboo (merchant native) and his tribe; and there is a coach-load of natives, trying to 'do the English'. Here is Mrs. Such-a-one and her deary; and there is Mrs. So-and-so, and she has a very fine equipage in comparison with that of Mrs.

Such-a-one, and therefore Mrs. Such-a-one envies her, and as they pass, turns up her nose in affected contempt. Here is a load of Calcutta Anglo-English belles; they have still good features, but their face is the colour of the desert of Zaarah. After proceeding rather more than a quarter of a mile they all turn round and gaze at each other; and this amusement continues till the sun has set, when there being no twilight in Calcutta, it becomes almost instantly dark and the worthies all drive to their respective domiciles to dinner". 10.

শহরবাসীর স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ভ্রমণের জন্যে একটা সুন্দর সংরক্ষিত জায়গার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা প্রথম উপলব্ধি করেন লর্ড অকল্যান্ড। তাঁর এই উপলব্ধির বাস্তব সার্থক রূপ 'অকল্যান্ড সার্কাস গার্ডেন'। প্রথম চোদ্দ বছর উদ্যানটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল তদানীন্তন পৌরপ্রধান এবং অসামরিক বিভাগের স্থপতির হাতে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁরা পেতেন 'কুলিবাজার ফান্ড' থেকে। এখানে 'কুলিবাজার' এবং তার এই 'ফান্ড'টি সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার। ময়দানে নতুন কেল্লা তৈরি হওয়ার সময় সেখানে যে সব কুলি কাজ করত তারা থাকত খিদিরপুরের একটি অঞ্চলে। তাই এই অঞ্চলটিকে বলা হত কুলি-বাজার।১১ সম্পূর্ণ অঞ্চলটিই ছিল সরকারের সম্পত্তি। দুচারজন সাহেবও এখানে থাকতেন। এই অঞ্চল থেকে যে বাড়ী ভাড়া আদায় করা হত সেই টাকাতেই গঠিত হয় 'কুলিবাজার ফান্ড'। এই ফান্ডের টাকায় অন্যান্য কি কাজ হয়েছিল আমার জানা নেই, তবে ইংরেজ সরকার তখন একটি যে সংকর্ম করেছিলেন আমরা আজো তার সুফল ভোগ করছি।

১৮৫৪ সাল থেকে উদ্যানটির রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তদানীন্তন চীফ ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিস কমিশনার। অবশ্য গাছপালাগুলি দেখাশোনা করার ভার দেওয়া হয় 'বোটানিকাল গার্ডেন'-এর কর্তাদের ওপর। সঠিকভাবে জানা না গেলেও মনে হয় ১৮৫৪ সাল থেকেই 'অকল্যান্ড সার্কাস গার্ডেন'-এর নাম দেওয়া হয় 'ইডেন গার্ডেন'। এই সালের একটি মানচিত্রেও এই নামই পাওয়া যাচ্ছে। তবে এই নাম-পরিবর্তন কয়েক বছর আগে হওয়াও অসম্ভব নয়। লর্ড অকল্যান্ডের পারিবারিক পদবী ছিল 'ইডেন'। জানা যায় তাঁর অবিবাহিতা ভগিনীদের নামের সঙ্গে নাকি এই উদ্যানের নামটি জড়িত হয়ে আছে।১২ তবে এ তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। উদ্যানটি তৈরির প্রায় চোদ্দ বছর পরে, এমন কি কারণ থাকতে পারে, যার জন্যে স্বয়ং অকল্যান্ডকে ছেড়ে তাঁর ভগিনীদের স্মরণ করা হল? অবশ্য উদ্যানের ভিতর (বর্ত-মানে বাইরে) অকল্যান্ডের মূর্তিটি তৈরি করে দেওয়ার ব্যাপারে ভগিনীদের উদ্যম প্রশংসনীয় মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তা হলেও 'ইডেন' যখন তাঁদের বংশপদবী তখন সাধারণ বুদ্ধির আলোকে এইটুকু স্পষ্ট করে নিলে অন্যায় হবে না যে অকল্যান্ডকে মধ্যমণি করে সমগ্র 'ইডেন'
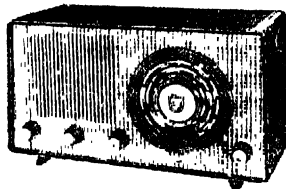
10 Reconnoitering Voyages, Travels and Adventures, etc. by W. H. Leigh. London 1839, pp. 224-35

১১ বর্তমান হেস্‌টিংস্‌। ১৮৫০ সালের আগে অঞ্চলটির এই নামই ছিল। দ্রঃ Bengal Past and Present—vol. XIX. pp 81-82.

12 "Other open spaces are the Eden Gardens named after the Misses Eden, sisters of Lord Auckland, on the north-west of the Maidan."—Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Vol. I p. 416.

বংশটাকে স্মরণীয় করাই এই নাম-পরিবর্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। এ সম্বন্ধে পুরানো নথি-পত্র থেকে সঠিক কিছু জানা যায় নি।

যা হোক, ক্রমশ উদ্যানটির শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় শুধু 'কুলি বাজার ফাণ্ড'-এর টাকায় এটির রক্ষণাবেক্ষণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এই কারণে ১৮৬২ সাল থেকে এটি পি-ডব্ল্যু-ডি'র তত্ত্বাবধানে চলে যায়। উদ্যানের উত্তর-পশ্চিমে অকল্যাণ্ডের মূর্তিটি স্থাপিত হয় ১৮৪৯ সালে। পরে মূর্তিটিকে উদ্যানের বাইরে উত্তর-পশ্চিমের প্রবেশপথের সামনে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে দক্ষিণ-পশ্চিমে সৈন্যাধ্যক্ষ উইলিয়াম পীলের মূর্তিটি স্বস্থানেই আছে। এটি স্থাপিত হয় ১৮৬৪ সালে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাদ্য-করের দল জায়গাটিকে মুখরিত করে তুলত। এখানে সান্ধ্যভ্রমণের এটাই ছিল তখন প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু সে সময় সকলেরই বাজনা শোনার অধিকার ছিল না। কলকাতার সম্পদশালী অভিজাতদের কাছে এখানে সান্ধ্যভ্রমণ যেন পরম পুণ্যকর্মের মর্যাদা পেয়েছিল। যাঁরা বাজনা শুনতেন প্রথম দিকে তাঁদের মধ্যে সবাই ছিলেন য়ুরোপীয়। তার পর নিয়ম হয়, অন্য যাঁরা বাজনা শুনতে চান তাঁদের শরীরে হ্যাট্-কোট চড়ান বাধ্যতামূলক। ক্রমশ উদার ও ভদ্র মনোভাবের বিকাশে এ ধরনের অযৌক্তিক বাধ্যবাধকতার বেড়াগুলো ভেঙে দেওয়া হয় এবং বাজনা শোনার একচেটিয়া অধিকার থেকে য়ুরোপীয়রা বঞ্চিত হয়। ১৮৬৫ সালের পর থেকে উদ্যানটির অনেক উন্নতি ও পরিবর্তন হয়। এখানে সব কথার অব-তারণ নিষ্প্রয়োজন। তবে উদ্যানের অন্তর্গত প্যাগোডাটি সম্বন্ধে কিছু না বললে এই ইতিকথা অসম্পূর্ণ থাকবে।

ব্রহ্মদেশের প্রোম নগরে এই প্যাগোডাটি তৈরি হয় ১৮৫২ সালে। প্রোমের তদানীন্তন গভর্নর এটি নির্মাণ করিয়ে-ছিলেন। ব্রহ্মদেশে এই ধরনের প্যাগোডার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। শুধু যে বুদ্ধের উপাসনার জন্যেই এখানে ব্রহ্মবাসী বৌদ্ধরা সমবেত হতেন তাই নয়, শ্রামণিক জীবনে প্রবেশের সময় এখানেই তাঁরা দীক্ষিত হতেন। সুতরাং স্থানমাহাত্ম্যের দিক থেকে এই ধরনের প্যাগোডার গুরুত্ব সাধারণ উপাসনালয়ের চেয়ে বেশি ছিল। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহউসি প্রথম প্রোম পরি-দর্শনে যান। প্যাগোডাটি দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং সেটি খুলে কলকাতায় চালান
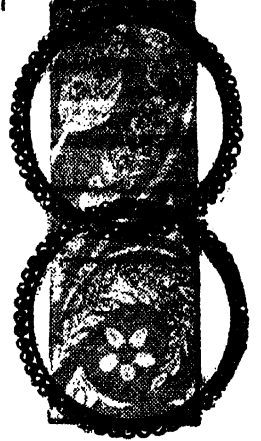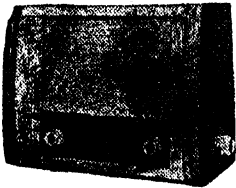
দেবার আদেশ দেন। তাঁর আদেশানুযায়ী এর ভিতরে যে বুদ্ধমূর্তিটি ছিল সেটি সমেত সমগ্র প্যাগোডাটি ১৮৫৪ সালের শেষের দিকে কলকাতায় এসে পৌঁছায়। কিন্তু এটিকে পুনরায় স্থাপনের উদ্দেশ্যে

উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে কর্তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। অবশেষে লর্ড ডালহউসির ইচ্ছানুসারেই প্যাগোডাটিকে ইডেন উদ্যানের ভিতরেই স্থাপন করা হয়। প্যাগোডার পুনর্গঠন যাতে নিখুঁত ও সুষ্ঠু হয় সে জন্যে ব্রহ্মদেশ থেকে বারজন দক্ষ কারিগরকে কলকাতায় আনা হয়েছিল। তাঁদের পরিশ্রমে, তদানীন্তন ছোট লাটের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং ছ' হাজার টাকা ব্যয়ে রক্ষণাবেক্ষণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এই কারণে ১৮৬২ সাল থেকে এটি পি-ডব্ল্যু-ডি'র তত্ত্বাবধানে চলে যায়। উদ্যানের উত্তর-পশ্চিমে অকল্যাণ্ডের মূর্তিটি স্থাপিত হয় ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে উদ্যানের ভিতর প্যাগোডাটির পুনর্গঠনকার্য শেষ হয়। বুদ্ধ মূর্তিটিকে অনেক কাল এর অভ্যন্তরে দেখা গিয়েছিল। কলকাতার দু একজন সুপ্রাচীন অধিবাসীর কাছে শুনেছি, এই শতকের গোড়ার দিকেও মূর্তিটিকে এর অভ্যন্তরে দেখা যেত। কিন্তু এটি এখান থেকে কবে, কি ভাবে এবং কোথায় অদৃশ্য হয়েছে সঠিক জানা যায় নি।

প্যাগোডাটির জীর্ণদশা আজ সকলেরই চোখে পড়ে। কিন্তু এটিকে বোধ হয় আরো কিছু কাল সুগঠিত রাখা যেত। উদ্যানের সৌন্দর্যে এটি ছিল একটি রুচি-সম্মত আলংকারিক সংযোজন। কিন্তু দীর্ঘ-দিনের অবহেলা আর অযত্নে এটির ধ্বংস প্রায় ঘনিয়ে এল। একদিন যা ছিল অলংকার তাই আজ দূষিত ক্ষতের মতো উদ্যান-দেহকে কুৎসিত করে তুলেছে। আমাদের জাতীয় সরকার কর্তৃক এখানে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এক্জিবিশনটি অনুষ্ঠিত হবার পর থেকেই উদ্যানটিকেও মৃত্যুদশায় ধরেছিল; কয়েক বছর যাবৎ এটিকে আবার সুশ্রী করে তোলার চেষ্টা চলছে। এ চেষ্টা শহরবাসীদের হয়তো আশান্বিত করেছে, কিন্তু প্যাগোডাটি শীঘ্রই কোন্ দিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা বুদ্ধিমান বুদ্ধ তাই বোধ হয় বহুকাল আগেই এর তলা থেকে অদৃশ্য হয়েছেন।

[প্রবন্ধটির পাদটীকায় উল্লিখিত একটি কনসাল্টেশন ও দুটি প্রসিডিং শ্রীযুক্ত নবেন্দুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব' নামক গ্রন্থটি থেকে গৃহীত। অন্যান্য তথ্যগত সাহায্যও বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে। লেখক।]

বাংলা ছবির সঙ্কট
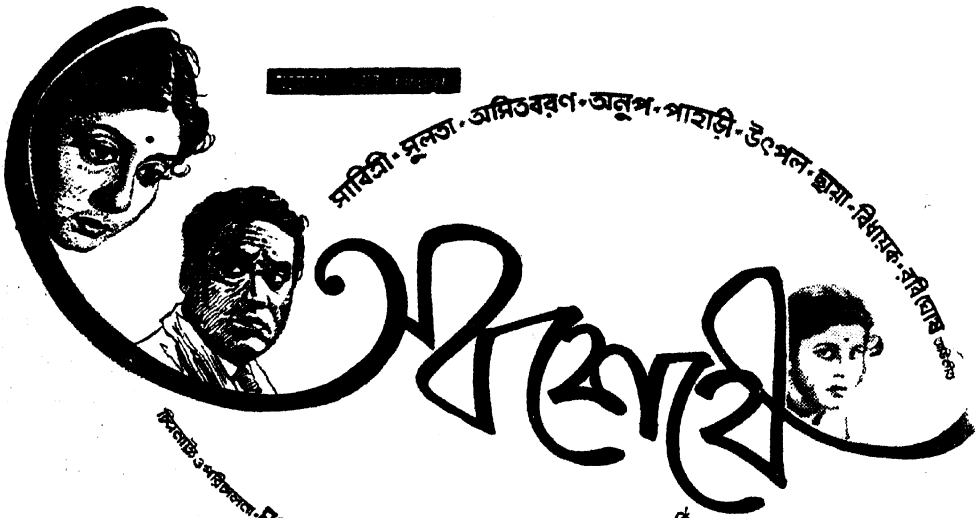
বীরেন্দ্রনাথ সরকার

বর্তমান বাংলা ছবির সংকট সম্বন্ধে আমার প্রথম কথা ছবি সব সময়েই সবদেশেই, সংকটের মধ্যেই তৈরী হয়। বহুবিধ ব্যবস্থা, কিছুটা বা সুব্যবস্থা আর কিছুটা অব্যবস্থা—তারই মধ্যে ছবি

নিউ থিয়েটার্স-এর শিল্পী কে এল সায়গল

নিউ থিয়েটার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার

নিউ থিয়েটার্স-এর অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিনও তৈরী হয়েছে, আজও তৈরী হয়।

সাহিত্যের সঙ্গে সিনেমার তফাৎ এইখানে যে সিনেমার পুনরুদ্ধার নেই। অনেক লেখক আছেন যাঁরা তাঁদের জীবিত কালে না পেয়েছেন খ্যাতি, না পেয়েছেন অর্থ। মৃত্যুর পরে লক্ষ্মী আর সরস্বতী উভয়েরই আশীর্বাদ পড়েছে তাঁদের পরিবারবর্গের ওপর।

একজন অমর সাহিত্যিককে আমি জানি, যিনি জীবিতকালে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করলেও লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি থেকে একরকম বঞ্চিতই ছিলেন। মৃত্যুর পরে সেই কৃপাদৃষ্টি পড়ল তাঁর পরিবারের ওপর। এই সাহিত্যিকের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়!

১৯৩৪ সালে শরৎবাবু তাঁর সব কাহিনীকে ছবি করবার স্বত্ব অতি সামান্য অর্থের বিনিময়ে আমাকে দিতে চেয়েছিলেন। আজ সেই অর্থের তিনগুন টাকা দিলেও তাঁর একটি গল্পের ছবি করবার চিত্রস্বত্ব পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

সংকটের কথা তুললেই প্রথমেই বলতে হয় "দেবদাস" ছবির কথা। তখন অর্থের সংকট ছিল না। "স্টার থিয়েটার"এর সংকট ছিল না। কিন্তু এর চেয়েও ভয়ানক সংকট ছিল সামনে। সে যুগে যে সব ছবি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল তার মধ্যে নাম করা ছবি ছিল—"হান্টারওয়ালী" আর "তুফানমেল"। তাই সকলেই ভয় পেলেন "দেবদাস" চলবে না। শেষপর্যন্ত সেই ভয় আমার মনকেও আচ্ছন্ন করল। এই ছবির মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে ছবির জগতে নতুন অধ্যায় শুরু হল। স্টার কথাটি বললে আমরা যাঁদের বুঝি ছবির জগতে এখন শরৎচন্দ্রও তাঁদের অন্যতম।

ভাল ছবি নির্মাণের মূল সংজ্ঞা হল, যে ছবি তৈরী করতে ভাল লাগে। আর তাকে দর্শকের কাছে ভাল লাগানো।

"দেবদাস" ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়া

আর কোন থিয়োরির কোন মূল্য নেই আমার কাছে। অনেক সময়ে আমাদের ভাল লাগলেও দর্শকের যে ভাল লাগবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু সেই দুর্ভাগ্যের সংগে সব শিল্পীর জীবনই জড়িত। কী সাহিত্যে, কী সংগীতে, কী নাট্যরচনায়, কী ছবির নির্মাণে—এই অনিশ্চয়তা শিল্পীর জীবনের নিত্যসংগী—

কিন্তু এখানে ঋষিবাক্য স্মরণের প্রয়োজন "সত্যম শিবম্ সুন্দরম্ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।" নিউ থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠানের মন্ত্র ছিল "জীবতাম জ্যোতিরেতু ছায়াম।"

আমি নিউথিয়েটার্স প্রতিষ্ঠা করে প্রথম ছবি তৈরী করেছিলাম শরৎচন্দ্রের "দেনা-পাওনা"— আমার প্রতিষ্ঠানের প্রথম পরিচালক ছিলেন সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী মহাশয়।

প্রথম ছবি সফল হয়নি। তবু বুঝেছিলাম সাহিত্যের পথ ধরেই আমি পথের সন্ধান পাব। এরপর আরও সাতখানি ছবির ভাগ্যেও ব্যবসায়িক অসাফল্যই জোটে। কিন্তু প্রতিটি ছবি ব্যর্থতার ভেতর দিয়ে পথেরই সন্ধান দেয়।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—আমার স্টুডিওতে রবীন্দ্রনাথের পরিচালনাধীনে তোলা "নটীর পূজা।" এবং সেই সংগে রবীন্দ্রনাথ নিজে এক ছবিতে অবতীর্ণ হন। তাঁর সত্তর বৎসরের জীবনের উক্তিগুলো তিনি ছবির জগতকে দান করে গেলেন। সেই উক্তির একজায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম, চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি।

সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোটো শ্যামল পৃথিবীকে ঋতুর আকাশ-দূতগুলি বিচিত্ররসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়। এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনদিন আলস্য করি নি। মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত। অনেকদিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে নানা অবস্থায়। শুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝি নি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে।"

তাঁর এই উক্তি আমাদের সংকটময় দিনগুলোর মধ্যে আলো ছড়িয়ে দিল, আমরা পেলুম সাহস—ঐ উক্তিকে মন্ত্র বলে গ্রহণ করলাম। এর সতেরো বছর পরে যখন বহু চিত্র বিশেষজ্ঞের বাধা নিষেধসত্ত্বেও আমি "মহাপ্রস্থানের পথে" ছবিটি তুলি, সে শুধু এই কারণে যে, এ ছবি তৈরী করতে আমার মন চেয়েছিল। আমি সাফল্যের আশা করিনি—কিন্তু এ ছবি বিপুল সাফল্য লাভ করল—খ্যাতি ও অর্থ সব দিক দিয়ে। কাজেই যা আমাদের ভাল লাগবে, মনকে স্পর্শ করবে তাকেই যদি মূল সংজ্ঞা করি তবে যেমন ব্যর্থতা আসবে, তেমনি আবার সাফল্যও আসবে। তাই বলেছি ছবি তৈরী করার একটি সংজ্ঞাই আমার কাছে মূল্যবান: যা করেছি তা নিজের ভাল লাগছে কিনা।

"স্টার সিস্টেম"-এর বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশই নেই। যোগ্যতা না থাকলে কেউ স্টার হতে পারেন না। কিন্তু স্টার নিয়ে ছবি করার সিস্টেম আমাদেরই সৃষ্টি। স্টার'রা কোনদিন ষড়যন্ত্র করে এই সিস্টেম তৈরী করেননি। নতুন অভিনেতা অভিনেত্রীকে নিয়ে ছবি করতে না পারার সাহসেই স্টার সিস্টেম গড়ে উঠেছে। তার জন্যে স্টার কেন দায়ী হবেন?

নিউথিয়েটার্স বহু স্টার সৃষ্টি করেছে—কিন্তু নিউথিয়েটার্সের প্রয়োজনে তাঁরা কোনদিন এমন ব্যবহার করেন নি যা অসম্মানজনক বা ক্ষতির কারণ হয়েছে।

আমি কোনদিনই চিত্র ব্যবসাকে এক বিশেষ প্রদেশের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখিনি।

আমি বাংলা দেশেই ছবি করেছি, কিন্তু চিরদিনই মনে হয়েছে বাংলাদেশ যেন ভারতীয় চিত্র নির্মাণ শিল্পের পূর্ব বিভাগ।

তাই নিউথিয়েটার্সে বাংলা ছবিও তৈরী হয়েছে—হিন্দী ছবিও তৈরী হয়েছে—ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও ছবি তৈরী করার পরিকল্পনা ছিল। একটি তামিল ছবিও করেছি—চিরদিন সংকটময় পথেই চলেছি। আজকের বাধা বিপত্তি আজকের দিনের। কী করে সংকটবিহীন পথে আমরা চলব তা আমার জানা নেই। শুধু জানি, সংকটে সতর্কতার যেমনি প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সাহসের।

আমি বলব এগিয়ে চলুন দেখা যাক কী হয়। গভীর বিপদেও আমার নিজের একটি মন্ত্র ছিল "Things could have been worse"—অর্থাৎ সবকিছু আরও তো খারাপ হতে পারতো। হয়নি যে সেই ভরসায় ১৯৩১ সালে নিউথিয়েটার্স গড়বার পর হিন্দী বাংলা মিলিয়ে প্রায় দেড়শো ছবি তৈরী করেছিলাম।

দুই চরিত্র

সত্যজিৎ রায়

বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকার কাজ ছেড়ে যখন সিনেমার ছবি তৈরির কাজে অগ্রসর হই, তখন আমার কাছে চলচ্চিত্রের প্রধান আকর্ষণ ছিল শিল্পের আকর্ষণ। অবিশ্যি সেই শিল্প মারফৎ কায়েমি ভাবে একটা রোজগারের বন্দোবস্ত হতে পারে এমন আশাও ছিল।

কাজের আনন্দ এবং কাজের পারিশ্রমিক, এই দুই-এরও অতিরিক্ত কিছু যে চলচ্চিত্র থেকে লাভ হতে পারে সেটা গোড়ায় জানতে পারিনি, বা জানা সম্ভব ছিল না।

আজ জানি, যে একটা ছবি নির্মাণেরকালে এমন সব অভিজ্ঞতা হয় যার সঙ্গে হয়ত সে-ছবির সরাসরি কোন যোগ নেই, কিন্তু যা মনে গভীরভাবে দাগ রেখে যায়। আজ অবধি যে দশখানা ছবি করেছি, তার দৈনিক কাজের খুঁটিনাটি বিবরণ মনে করতে বসলে সত্যিই বেগ পেতে হবে। কিন্তু সেই তুলনায় আশ্চর্য স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ে মনে গাঁথা হয়ে আছে কিছু চরিত্র ও কিছু ঘটনা, যাদের আবির্ভাব এই সব ছবিকে অবলম্বন করেই।

এ-হেন দুটি চরিত্র হলেন বোড়ালের সুবোধদা ও কাশীর রমণীরঞ্জন সেন মহাশয়।

বোড়াল গ্রামে "পথের পাঁচালী"র সুটিং হবে বলে ঠিক হ'ল। এক শীতের সকালে লটবহর নিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে সুটিং-এর জায়গায় চলেছি, এমন সময় কানে এলো—"ফিল্মের দল এয়েচে! বল্লম নিয়ে লাপিয়ে পড়ো সব, বল্লম নিয়ে লাপিয়ে পড়ো!"

খোঁজ নিয়ে জানলাম ইনিই নাকি সুবোধদা'—বছর দশেক যাবৎ বিকৃতমস্তিষ্ক। কাউকে নাকি বিশ্বাস করেন না ইনি—ফিল্মের দলকে ত নয়ই।

আশ্চর্য এই যে পরে সুবোধদার সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হয়েছিল—শুধু আলাপ কেন, রীতিমত সৌহার্দ্য। সুটিং-এর অবসরে প্রায়ই তার দাওয়ায় গিয়ে বসতাম, আর গেলেই তিনি ঘর থেকে একটি ধূলিমলিন চটের থলি এনে তার থেকে আদ্যিকালের সব দলিলপত্র বার করে কোথায় তাঁর কত জমি আছে এবং কে তাঁকে কীভাবে ঠকাচ্ছে তার ফিরিস্তি দিতেন।

অবিশ্যি সুবোধদার মতে শঠতা নাকি তার স্বগ্রামবাসীদের মজ্জাগত। একদিন বললেন, 'মনে করুন দশজন লোক অমাবস্যার রাত্তিরে সার বেঁধে গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে চলেছে। বাতি নেই কারো হাতে—সব কঞ্জুস ত? সামনের লোকটি একটি খানায় পড়লেন, পড়ে আবার সামলে নিয়ে উঠে চলতে লাগলেন—কিন্তু পেছনের লোককে সাবধান করলেন না। এইভাবে একে একে দশজনের দশজনই খানায় পড়ল, কিন্তু পাছে পরোপকার হয়ে যায় তাই কেউ টুঁ শব্দটি করলেন না। এই হল বোড়ালের লোক।'

নাম ধরে খুব কম লোককেই ডাকতেন সুবোধদা। 'ওই যে সাইকেল চড়ে যাচ্ছে—ও কে জানেন? রুজভেল্ট। ওর হাবভাব ভুলবেন না যেন। এ ভারী শয়তান।'

শ্রীসত্যজিৎ রায়

"অপরাজিত" ছবিতে শ্রীরমণীরঞ্জন সেন

রুজভেল্ট, চার্চিল, ফজলুল হক, আলিবর্দি খাঁ, হিটলার, এঁরা সবাই সুবোধদার প্রতিবেশী, কেউই বিশ্বাসযোগ্য নন, সবাই-কেই এড়িয়ে চলতে হবে।

একদিন সুবোধদাকে বললাম, 'আপনি নাকি বেহালা বাজান—কই, শোনান নি ত?' সুবোধদা তৎক্ষণাৎ বাড়ির ভেতর থেকে বেহালার বাক্সটি নিয়ে এলেন। 'কী শুনবেন, ইমন না বাগেশ্রী?' বললাম, 'ইমনই হোক্।' 'সা পা পাম্পামা গা মা নিধানি...' সুবোধদা গুনগুন করে গতের মুখ ভেঁজে বেহালায় ছড় প্রয়োগ করলেন।

প্রায় আধঘন্টা এ-গৎ সে-গৎ বাজানোর পর সুবোধদা থামলেন। হাতের টিপ এখন তেমন না থাকলেও তিনি যে সঙ্গীতরসিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না।

তার পাগল হবার সূত্রপাতটিও সুবোধদা আমাদের কাছে একদিন বর্ণনা করেছিলেন। 'বসে আছি, বসে আছি, হঠাৎ চোখটা কেমন ধাঁধিয়ে গেলো। যেন একটা দিব্য জ্যোতি দেখলুম। আর তার পরেই দেখলুম তাঁকে—মা জগদম্বা। ছেকল শুদ্ধ টেনে নিয়ে আকাশের দিকে উড়ে চলেছেন—পরণে ডুরে শাড়ি, কোমর অবধি এলো চুল, পায়ে কেড্স জুতো।...ব্যস্, আমারও এদিকে ভোঁ।'

প্রায় পাঁচ বছর পর এই সেদিন আবার গিয়েছিলাম বোড়ালে কী জানি একটা কাজে। সুবোধদার বাড়ির সামনে গিয়ে ডাক দিতেই তিনি বেরিয়ে এলেন। চেহারায় একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। কোথায় যেন একটা নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত ভাব, আর সেই সঙ্গে একটা জৌলুসের অভাব। সেই চটের থলিও নেই, আর নেই কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ। দাওয়ায় কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বললেন, 'আগের সময় এলে না ভাই, এবার আম হয়েছিল ভালো।'

এছাড়া আর বিশেষ কথা হয়নি। ফেরার সময় লোকমুখে জানলাম যে মাস ছয়েক হ'ল আপনা থেকেই সুবোধদার মাথার ব্যামো সেরে গেছে।

রমণীরঞ্জন সেন মহাশয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় কাশীর ঘাটে ।

১৯৫৭ সন, শীতকাল। আমরা 'অপরাজিত' সুটিং-এর জন্য উপযুক্ত লোকজন খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আর খুঁজছি সর্বজয়ার জ্যাঠামশাই ভবতারণ চাটুজ্যের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য একজন বৃদ্ধকে। ঠিক করেছিলাম
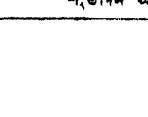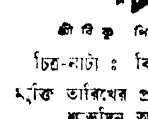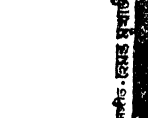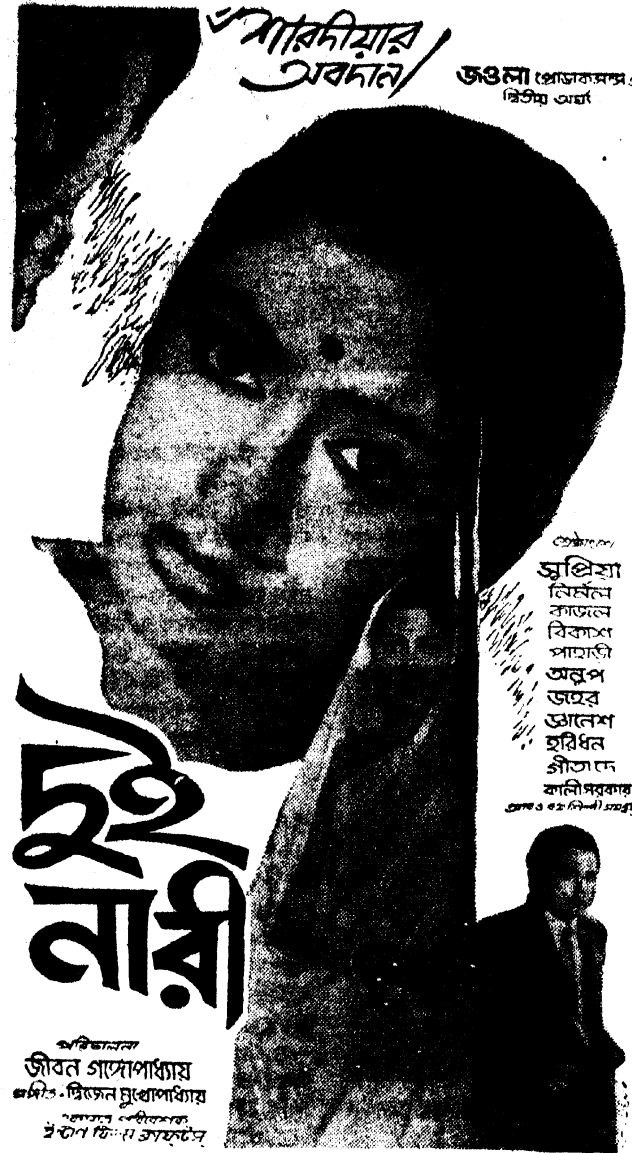
"অভিযান" শুরু হল

'অভিযান'-এর নায়িকা ওয়াহীদা রেহমান; (মাঝখানে) ছবির একটি বহির্দৃশ্য (নীচে) পরিচালক সত্যজিৎ রায়। ফটো—দেশ

সম্ভব হলে অ-পেশাদার অভিনেতা, কিম্বা একেবারে অনভিনেতা নিয়েই কাজ করব।

এক সন্ধ্যায় দশাশ্বমেধ ঘাটে কীর্তন শ্রোতাদের ভীড়ের মধ্যে রমণীরঞ্জনের দেখা পেলাম। ভবতারণের চেহারার যে ধাঁচটি কল্পনায় ছিল, বৃদ্ধের চেহারা দেখলাম তার খুবই কাছাকাছি।

প্রথম দিনে এগোবার সাহস হ'ল না। কথা নেই বার্তা নেই একজন সম্ভ্রান্তপর নিরীহ কাশীবাসী বৃদ্ধকে গিয়ে ফিল্মে অভিনয় করার প্রস্তাব করলে না জানি তার এফেক্ট কী হবে!

দ্বিতীয় দিনে আরো কিছুটা সাহস করে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে গেলাম। কীর্তনের আয়োজন চলেছে তখন; আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই খোলে চাঁটি পড়বে।

বৃদ্ধের সঙ্গে এই দ্বিতীয় দিনে আমার যা কথোপকথন হয় তার প্রায় অবিকল বর্ণনা নীচে দেওয়া গেলো—

আমি—নমস্কার! কিছু মনে করবেন না। আমি—মানে, একজন পরিচালক। ফিল্ম পরিচালক। ছবি—ইয়ে, বায়স্কোপ তৈরি করি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অ প রা জি ত' উপন্যাসটি থেকে এখন একটা ছবি করছি। তাতে—মানে, এই বইটিতে, একটি কাশীবাসী বৃদ্ধের চরিত্র আছে। বেশ ভালো চরিত্র। চমৎকার। তাই—ব্যাপার হয়েছে কি—ফিল্মে যে সব সময় পেশাদারী অভিনেতার দরকার হয়, তা ত নয়? তাই ভাবছিলাম যে ধরুন, ওই পার্টটা যদি আপনি করেন......।

বৃদ্ধ—করুম না ক্যান?

বাস্। ওই পর্যন্ত।

'করুম না ক্যান'-এর কোন উত্তর সেদিন বৃদ্ধকে দিতে পারিনি—বা দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করিনি। পরে ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছে—না-করার হাজার কারণ খুঁজে পাওয়া বৃদ্ধের পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। বরঞ্চ করাটাই এক অভাবনীয় ব্যতিক্রম।

রমণীরঞ্জন যে কেন এক কথায় তাঁর নিঝঞ্ঝাট জীবনে সিনেমায় অভিনয় করার ঝক্কি পোয়াতে রাজি হলেন (পারিশ্রমিকের কথা আসে অনেক পরে) তা আজ অবধি বুঝতে পারিনি। আরো আশ্চর্য এই যে বৃদ্ধ নাকি কোনদিন জীবনে সিনেমা দেখেন নি, কোনদিন কোন শখের থিয়েটারে অভিনয় করেন নি।

এক একজন অনভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় করাতে বেশ বেগ পেতে হয়; তার তুলনায় রমণীবাবুকে দিয়ে কাজ করানো ছিল সহজ। জড়তা বা ক্যামেরাভীতির কোন লক্ষণ তার অভিনয়ে কখনো দেখিনি। বরঞ্চ সহ-অভিনেতার অক্ষমতা সম্পর্কে তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেখেছি।

একদিন সর্বজয়ার দাওয়াতে নৈশ ভোজনের দৃশ্য তোলা হবে। অপু (পিনাকী সেনগুপ্ত) ও ভবতারণ খাচ্ছেন, সর্বজয়া হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন। ভবতারণ সংলাপ বলবেন, এবং কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অপু গেলাস তুলে জলে চুমুক দেবে।

রিহার্সাল নির্ভুল হওয়ায় এবার শট্ নেওয়া হবে। সব তৈরি। ক্যামেরা চলল, খাওয়া চলল, পাখার বাতাস চলল। ভবতারণকে সংকেত দিতে তাঁর সংলাপও চলল। কিন্তু হঠাৎ দেখি কথা শেষ করেই রমণীরঞ্জন তাঁর বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে অপুর কোমরে একটি খোঁচা মারলেন।

আমি ত থ! ক্যামেরা বন্ধ করে বললাম—'দাদু, ও কী করলেন? ওকে আঙুল দিয়ে অমন করলেন কেন?'

দাদু বললেন, 'অর জলখাবার কথা না এইখানে? পোলাপান, যদি ভুইলা যায়?'

অন্যের অভিনয় সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেও তাঁর নিজের কাজ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ। কোন পেশাদারী অভিনেতাকে এতটা নিরুদ্বেগ হতে আমি কখনো দেখিনি।

'অপরাজিত' ছবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তাঁর সজাগ ঔৎসুক্য ছিল। কাশীর কাজ সেরে কলকাতায় ফিরে যাবার পরও মাঝে মাঝে পোস্টকার্ডে ছবির খবর নিতেন—'পালার কাজ কতদূর অগ্রসর হইল জানাইয়া বাধিত করিবেন।' ফিল্মকে 'পালা' ছাড়া অন্য কোন শব্দে উল্লেখ করতে শুনিনি কখনো রমণীরঞ্জনকে।

রমণীবাবুর শেষ দিনের কাজে একটা রীতিমত কঠিন সংলাপের অংশ ছিল। কঠিন এই জন্যই যে কথাগুলো একটানা বলা চলে না। অসংলগ্ন চিন্তা টুকরো টুকরো ভাবে ব্যক্ত হবে এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে উপযুক্ত ছেদ না থাকলে সব মাটি হয়ে যাবে।

দৃশ্যটি সর্বজয়ার মৃত্যুর কিছুদিন পরের। অপু হাঁটুতে মুখ গুঁজে দাওয়ায় বসে কাঁদছে, ভবতারণ দাওয়ার এক প্রান্তে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে তামাক টানতে টানতে নাতিকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—'কাঁদিস্ না অপু, কাঁদিস্ না। বাপ মা কারো চিরকাল থাকে না। আমি বলছি, তুই আমার কাছেই থাক, থেকে পুজোআচ্চার কাজটাজগুলো আবার শুরু কর। আর পড়াশুনো করে কী লাভ? তার চেয়ে বরং এখানেই থাক্।'

প্রথম 'টেক্'-এই তামাক টানার ফাঁকে ফাঁকে আশ্চর্য স্বাভাবিক ভাবে কথাগুলো বললেন রমণীরঞ্জন।

দিনের শেষে বৃদ্ধের কাছে গিয়ে সকৃতজ্ঞভাবে বললাম, 'দাদু আজ আপনার কাজ সত্যিই ভালো হয়েছে।'

দাদুর উত্তর আজও আমার কানে বাজে। আমার দিকে না-ফিরেই ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে গম্ভীর গলায় বৃদ্ধ বললেন, 'বল্লি, খারাপটা হইল কবে?'

বাংলা রঙ্গমঞ্চের একাল ও সেকাল

জহর গাঙ্গুলী

"সুতোরাং থিয়েটার হচ্ছে সমাজ। সমাজে আগে মিশতে শেখ। তারপর অভিনয় করতে এস। কতবড় ভাগ্যবান তোমরা, পুত্রশোকাতুরের মুখে হাসি এনে দাও। সেই ভাগ্যকে যে অবহেলা করে তার অভিনেতা হওয়া উচিত নয়।" এমনিভাবেই আমাকে একদিন ভর্ৎসনা করেছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার-পরিচালক অপরেশ মুখোপাধ্যায়। স্টার-এ "শকুন্তলা" নাটকের রিহার্সেল হচ্ছিল। অপরেশবাবু তাঁর নিজের কোন নাটক মঞ্চস্থ করার আগে বিদগ্ধজন ও সাংবাদিকদের নিমন্ত্রণ করে এনে রিহার্সেল দেখাতেন। নাট্যরচনায় কোন ভুল-ভ্রান্তি আছে কিনা তিনি তাঁদের কাছ থেকে জানতে চাইতেন। পরে প্রয়োজনমত ভুল সংশোধন করে নিতেন। "শকুন্তলা" নাটকের এই বিশেষ রিহার্সেল-এর দিনই অপরেশবাবু গালি দিয়েছিলেন আমাকে। রিহার্সেল চলার সময় পেছন থেকে তুলসী চক্রবর্তী কী যেন একটা হাসির কথা বলেছিলেন। আমি হঠাৎ হেসে ফেলেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই বকুনি দিলেন অপরেশবাবু। অভিমান হয়েছিল খুব। দু-তিনদিন যাইনি রিহার্সেল-এ। তারপর একদিন ডেকে পাঠালেন অপরেশবাবু। বললেন, বাপও তো ছেলেকে বকে। আমাকে কাছে ডেকে কথাগুলি বলার সময় তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। আমার সব রাগ-অভিমান কোথায় যেন ভেসে গেল।

শ্রীজহর গাঙ্গুলী

এমনি মধুর সম্পর্ক ছিল আমাদের। নাট্যকার-পরিচালককে আমরা গুরুর মত দেখতাম। কী করে ভাল অভিনয় করতে পারব তাই ছিল আমাদের একমাত্র ভাবনা। এই ভাবনাকে অন্তরে সদা জাগ্রত রেখেই একদিন অভিনয়-জীবনে পদার্পণ করি।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে আমি অভিনয় শুরু করি ১৯২৬ সালে। মিত্র থিয়েটার-এ "শ্রীবৎস" নাটকেই আমার মঞ্চাভিনয়ের সূত্রপাত। স্থায়ীভাবে নাট্যাভিনয়ের সুযোগ আমি পেয়েছিলাম অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর সুপারিশে। অর্থাৎ আমাকে দিয়ে অভিনয় হবে কিনা তা ইনিই প্রথম পরীক্ষা করে দেখেন। মনে আছে, "জনা" নাটকের বৃষকেতু চরিত্রের রিহার্সেল আমি দিয়েছিলাম তারাসুন্দরীর সামনে। পরে তিনি বলেছিলেন, (যিনি আমাকে তারাসুন্দরীর কাছে উপস্থিত করেছিলেন তাঁকে) "আমার সামনে দাঁড়িয়ে বৃষকেতুর অভিনয় করতে পারে এমন ছেলে ত আগে কখনও দেখিনি।" তারাসুন্দরীর কথাতেই একদিন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার আমাকে "আলমগীর"-এ জয়সিংহের অভিনয় করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

বিগত যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সঙ্গে একই মঞ্চে অভিনয় করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অমৃতলাল বসু, নরী সুন্দরী, নৃপেন বসু, দানীবাবু, তারাসুন্দরী, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এঁদের সংস্পর্শে এসে দেখেছি নিষ্ঠা কী জিনিস। দানীবাবুর কথা মনে পড়ে। স্টার থিয়েটার-এ "পোষ্যপুত্র" নাটকে তাঁর সঙ্গে আমি অভিনয় করেছি। নাটকে যে ভূমিকায় তাঁকে অভিনয় করতে হত সে ভূমিকার সংলাপ তিনি নিবিষ্টমনে বসে শুনতেন। শুনতেন গিরিশচন্দ্রের ছবির নীচে বসে। শুনতে শুনতে যেন অনেকটা ধ্যানস্থ হয়ে যেতেন তিনি। সে চরিত্রের ভাবটি তিনি নিজের অনুভূতি দিয়ে আয়ত্ত করে নিতেন, একাত্ম হয়ে উঠতেন ওই চরিত্রের সঙ্গে। তারপর সংলাপ মুখস্থ করতেন।

মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে যে মহান শিল্পীদের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আমি এসেছি, অভিনয় তাঁদের কাছে ছিল সাধনার বস্তু। ওই অসাধারণ শিল্পনিষ্ঠা ছিল বলেই তখনকার দিনে বড় বড় শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল।

তখনকার দিনে নাটকের মূল আকর্ষণ ছিল অভিনয়। অভিনয়ই যে নাটকের প্রাণ সেটা সেদিনের নাট্যপ্রযোজক, নাট্যপরিচালক ও শিল্পীরা মনে-প্রাণে অনুভব করতেন। তাই অভিনয়ের উৎকর্ষের দিকে তাঁরা নজর দিতেন বেশী। সে-যুগে অমিত্রাক্ষর ছন্দে সংলাপ বলতে না পারলে নাটকে অভিনয় করা সম্ভব হত না কোন শিল্পীর পক্ষে। কোন নবাগত শিল্পী মঞ্চে অভিনয় করতে এলে অপরেশ মুখোপাধ্যায় আগেই দেখে নিতেন উনি ধ্রুপদ্দ ও

লিপটন LAOJEE লাওজী চা

LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL

LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL

লাওজী চা LAOJEE কম দামে সেরা চা
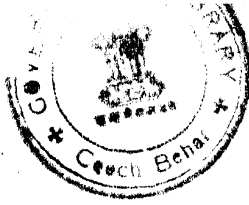
বিকর্ণের ভূমিকার অমিত্রাক্ষর সংলাপ বলতে পারেন কিনা। ওই সংলাপ সুন্দরভাবে বলতে পারলেই নতুন শিল্পী মঞ্চে অভিনয় করার সুযোগ পেতেন। তা-ছাড়া, তখনকারদিনে রিহার্সেল-এর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত অনেক বেশী। রিহার্সেল চলত রোজই। শিল্পীদের কাছে রিহার্সেল যেন ছিল প্রতিদিনকার সাধনা। এই প্রগাঢ় অনুশীলন ছিল বলেই সেদিনকার নাট্যাভিনয় দর্শকদের এমনভাবে অভিভূত করত। স্টার-এ "পোষ্যপুত্র" নাটকে দানীবাবুর মুখের দুটি মাত্র ছোট্ট কথা —"আমার চশমা, আমার চশমা কই?—" দর্শকদের স্তব্ধ করে রাখত। দানীবাবুর মুখের এই দুটি কথা শোনার জন্য অনেক দর্শক একাধিকবার "পোষ্যপুত্র" দেখেছেন। দানীবাবুর এই সামান্য দুটি সংলাপ ও সে মুহূর্তের অপূর্ব অভিনয় নাট্যামোদী-মহলে আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছিল। আজকের দিনে কি এমনটি ঘটে? পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে এমন কোন নাটকের কথা শুনিনি যার কোন চরিত্রের কোন সংলাপ ও অভিনয় নাট্যরসিক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সেদিন এমনটি ঘটত, আজ ঘটে না। তার কারণ, অভিনয়ের মান আজ অনেক নীচে নেমে এসেছে। অভিনয়ের ওপর আজকাল আর ততটা জোর দেওয়া হয় না। আজকের দিনের নাট্যাভিনয় আলোকসম্পাত ও আঙ্গিকের রাহুগ্রাসে দিনের পর দিন স্তিমিত হয়ে আসছে।

বাংলা নাটক আজকাল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সত্য। রঙ্গালয়েও আজকের দিনে দর্শকের ভিড় লেগেই আছে। নাট্য-আন্দোলনও একালে প্রসারলাভ করেছে। এর কোনটাই আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু নাটকে আজকের দিনের দর্শকরা পাচ্ছেন কী? অনেকটা ছায়াছবিরই মঞ্চরূপ নয় কি? বিষয়বস্তুতে, সংলাপে, গতিতে, আলো-আঁধারির রূপমায়ায় আজকের দিনের নাটক চলচ্চিত্রের আস্বাদই যেন পরিবেশন করে চলেছে। আজকের নাটক চলচ্চিত্র-ধর্মী। আজকের নাটকে আবহ-সংগীত ব্যবহার করা হয় টেপ-রেকর্ড-এর সাহায্যে। প্লে-ব্যাক গানের সঙ্গে মঞ্চ-শিল্পীর ঠোঁট নেড়ে যাওয়ার ঘটনাও চোখে পড়ে। নাটকের গান আমোদের প্রয়োজনে যদি অপরিহার্য মনে হয় তবে ভাল গাইয়েদের একটি বা দুটি দৃশ্যের জন্য নিয়ে আসা হয়। ওঁরা অভিনেতা নন, শুধু গান করতেই আসেন।

সেদিনকার নাটকে এ-ব্যাপার ঘটত না। অভিনয়-শিল্পীদেরই নাচতে হত, গাইতে হত। "স্বয়ম্বরা" নাটকে আমি নেচেছিলাম। এই নাটকে মালীর চরিত্রে নাচার জন্য আমাকে রীতিমত নাচ শিখতে হয়েছিল। আমি সেজেছিলাম মালী, মালিনী সেজে-ছিলেন মল্লিনা দেবী। আমরা দুজনেই
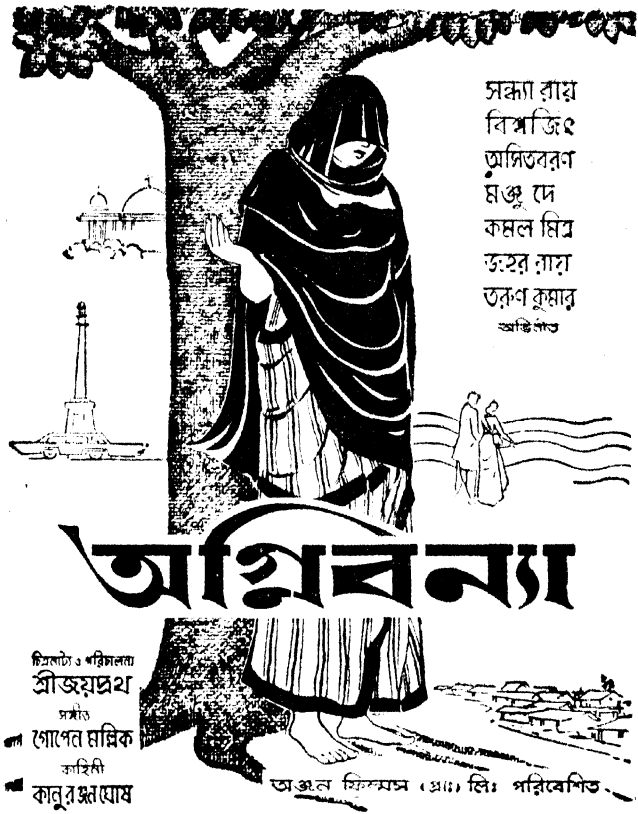
নেচেছিলাম। আমি গাইয়ে নই। তবুও কোরাস গান গাইতে হয়েছে আমাকে নাটকে। তখনকার দিনে মঞ্চশিল্পীদেরই গাইতে হত এবং গানের সঙ্গে যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করতেন নেপথ্যের যন্ত্রশিল্পীরা। আজকাল যন্ত্রশিল্পীরা নেপথ্য থেকে মোটেই বাজান না তা-নয়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে টেপ-রেকর্ডেই প্রয়োজন সেরে নেওয়া হয়।

কিন্তু সেদিন এসব ছিল না। মনে আছে, "ফুল্লরা" নাটক অভিনয়ের সময় নীহারবালা একদিন ভয়ে ভয়ে এসে জানালেন, তাঁর গলা খারাপ। চড়া গলায় গান গাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। নেপথ্য থেকে নাটকে বাঁশি বাজাতেন অমৃতলাল ঘোষ। তিনি ভরসা দিলেন নীহারবালাকে। নীহারবালার গলার আওয়াজের সঙ্গে বাঁশির সুর মিশিয়ে দিয়ে সেদিন শিল্পীকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তখনকার দিনে শিল্পীদের সমবেত সাধনার ভেতর দিয়ে নাট্যাভিনয় সার্থক হয়ে উঠত। কোন কৃত্রিমতার আশ্রয় নেওয়া হত না। তাই নাটক হয়ে উঠত প্রাণবন্ত। আজ সেই প্রাণের স্পর্শ কোথায়?

সেকালে নিষ্ঠা ছিল বলেই প্রাণ ছিল। অমৃতলাল ঘোষের কথাই বলি। এত সুন্দর বাঁশি বাজাতে পারতেন না কেউ তাঁর মত। আজও তাঁর মত শিল্পী দেখি না। স্টার থিয়েটার থেকে তাঁর অবসর নেওয়ার ঘটনাটি কোনদিনই ভুলব না। একদিন এসে কর্তৃপক্ষকে বললেন তিনি, এবার তিনি অবসর গ্রহণ করবেন। কারণ হিসাবে তিনি বললেন, এতকাল চাকুরী করেছি। কোনদিন কোন ব্যাপারে কারোর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়নি। এখন বুড়ো হয়ে গেছি। এখন যদি কাজ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি হয় তবে তো কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তবে রঙ্গালয়ের ক্ষতি হবে না আমি চলে গেলে। বঙ্কিমই আমার জায়গায় কাজ করবে।

পরে জানা গেল, গত চার মাস ধরে বঙ্কিমবাবুকে সেই রঙ্গালয়ের উপযোগী করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন। যতদিন বঙ্কিমবাবু তাঁর সঙ্গে ছিলেন, ততদিন নিজের মাইনের অর্ধেক টাকা তিনি তাঁকে দিতেন। তিনি অবসর নিলে রঙ্গালয়ের না ক্ষতি হয় এই ভয়েই তিনি বঙ্কিমবাবুকে তৈরী করে তুলেছিলেন।

আরেক দিনের একটি ঘটনা চিরকাল মনে থাকবে। নাটকের রিহার্সেল হবে দর্জিপাড়ায়। আমি ও তুলসী চক্রবর্তী রাস্তার দোকানে পান খেতে গিয়ে রিহার্সেল-এ আসতে দেরী করে ফেলেছি। অমৃতলাল ঘোষ আমাদের বললেন, যখন টিকিট কেটে ট্রেনে কোথাও যাও তখন সময়মত, এমনকি কয়েক মিনিট আগেই হয়ত স্টেশনে গিয়ে হাজির হও। কারণ ট্রেন ফেল করলে নিজেরই ক্ষতি। আর যেখানে অনেক লোক তোমার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকেন সেখানে তুমি সময়মত না এলে যে ওঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। এটা করা কি উচিত?

আমরা শুনেছিলাম অমৃতলাল ঘোষের ছেলে খুব শক্ত অসুখে ভুগছে। রিহার্সেল-এর পর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম তাঁর ছেলে এখন কেমন আছে। শুনলাম সেদিনই সকালে তাঁর ছেলে মারা গেছে। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তাঁর অনুপস্থিতে রিহার্সেল না পণ্ড হয় সে-ভয়ে পুত্রশোক বুকে চেপে রেখে তিনি সময়মত এসে হাজির হয়েছিলেন রিহার্সেল-এ।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের শিল্পীদের একদিন এই নিষ্ঠা ছিল, এই আত্মত্যাগ ছিল। আজ আর তা নেই। অনুশীলনে অনেক সময় ভুল হয়, দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক সময় ত্রুটি থাকে। কিন্তু নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা যদি থাকে তবে উন্নতির পথ কোনদিনই রুদ্ধ হয় না। নির্ভুল সাধনার পথে বাংলা রঙ্গমঞ্চ আবার মহৎ শিল্পীর জন্ম দেবে—এই আশা নিয়েই আছি।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

মূল্য তিন টাকা

। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রী রামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।